ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

৮ম বর্ষ ঃ প্রথম খণ্ড

শুক্রবার, ২৭ বৈশাখ, ১৩৭৫ — শুক্রবার, ১০ শ্রাবণ, ১৩৭৫

Friday, 10th May, 1968—Friday, 26th July, 1968.

লেখক | **বিষয় ও পৃষ্ঠা**

লেখক — বিষয় ও পৃষ্ঠা

লেখক	বিষয় ও পৃষ্ঠা
॥ ন ॥	
শ্রীনিশানাথ	রাতের শহর ৭৩৮, ৮৪৯, ৯২০;
শ্রীনৃপেন বসু	রোপওয়ে (আলোচনা) ৪৬১;
॥ প ॥	
× × ×	পথে ও পথের প্রান্তে ৭৬৩, ৮৪৯, ৯৪২;
শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায়	কি যে চাই (কবিতা) ৫৭০;
শ্রীপরিতোষ সান্যাল	সর্পিল নির্জন মৃত্যু (কবিতা) ৪৫২;
শ্রীপারিজাত মজুমদার	ল্যাবার্ণামের গুচ্ছ (বড় গল্প) ৬৪৬, ৭২৬, ৮২৮, ৯২৫;
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন	আচার্য শঙ্কর (আলোচনা) ৭৬০;
শ্রীপ্রমীলা	অঙ্গনা ৬২, ১২৫, ২০০, ২৮৭, ৪৩৯, ৫১৮, ৬০০, ৬৮০, ৭৫৬, ৮৬১, ৯৩০; আফ্রিকার নারী সমাজ (আলোচনা) ৩৪৮;
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	একালের কবিতা (আলোচনা) ১৩; সুখ কাঁদলে সোনা (উপন্যাস) ১০৯, ১৮৭, ২৬৪, ৩৬০, ৪৩০, ৫০৬, ৫৭৯, ৬৬৪, ৭৪৫, ৮৩২ ৯০২; সাহিত্যে বিজ্ঞান (আলোচনা) ৮২৬;
॥ ব ॥	
শ্রীবনবিহারী মোদক	বিচিত্র অঙ্গরাগ : উল্কি (আলোচনা) ৪৯৫;
শ্রীবরুণ রায়	চীনের পররাষ্ট্রনীতি (আলোচনা) ১০;
শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	সোনার তালের ভারে (আলোচনা)
শ্রীবিশ্বজিৎ রায়	চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন (আলোচনা) ৯৬;
শ্রীবিশ্বেশ্বর সামন্ত	এখন সশব্দে (কবিতা) ২৯৬;
শ্রীবিষ্ণু দে	অকাল বৃষ্টি ফোঁটা ফোঁটা (কবিতা) ৩৮;
শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীতশিল্প (আলোচনা) ৬২৩;
[illegible]ধদেব বসু	উপন্যাসের রূপান্তর (আলোচনা) ১৬;
[illegible]নাথ মুখোপাধ্যায়	আদি বাঙালী খৃষ্টান-সমাজ (আলোচনা) ২৫৬;
× ×	বৈষয়িক প্রসঙ্গ ৫৫, ১২৩, ১৯০, ২৬৭, ৩৬৪, ৪৩৫, ৫১০, ৫৮৯, ৬৬৭, ৭৫০, ৮৫৭, ৯১৫;
[illegible]ই ॥	
[illegible]খোপাধ্যায়	আধুনিক সমালোচনা সাহিত্য (আলোচনা) ২৮;
[illegible]দ্রনাথ [illegible]র	রবীন্দ্রসংগীতের ভাবলোক (আলোচনা) ২২০;
[illegible]দার	ট্রেন দুর্ঘটনা (আলোচনা) ৬৫৭;
॥ ক[illegible]	
[illegible]	পিয়েত্রা (আলোচনা) ৪৩৬;
[illegible]টক	মন শুধু মন জানে (কবিতা) ১২৪;
[illegible] সরকার	মৃগবিলাপ (গল্প) ৬৮৯;
[illegible]া দেবী	আত্মজা (গল্প) ৩১;
[illegible]ক্রবর্তী	ভারতীয় রাজনীতিতে চীনা প্রভাব (আলোচনা) ৯৪; রাজ্যের রাজনীতি (আলোচনা) ২৭০; রাজনৈতিক পর্যালোচনা ৯১৬;
[illegible]য়চৌধুরী	সাধনা (কবিতা) ১২৪;
[illegible]চৌধুরী	স্বপ্ন ও সংকট (আলোচনা) ৩৮৩;
[illegible] আচার্য	তথাপি মানুষ (গল্প) ২৫১;
[illegible] ঘোষ	নবাব সাহেব উইলিয়ম বোল্টস (আলোচনা) ৯৩৩;
[illegible]ক রায়	বৃক্ষি-কে (কবিতা) ৪৫২;

শ্রীআ[illegible]
শ্রীআলো[illegible]
শ্রীআশা[illegible]া
শ্রীআশিস সা[illegible]

৮ম বর্ষ
১ম খণ্ড

১ম সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 10th MAY, 1968 শুক্রবার, ২৭শে বৈশাখ, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

সিন্ধুতীরে প্রলয় দোলা

শ্রীমুকুল গুপ্ত লিখিত 'সিন্ধুতীরে প্রলয় দোলা' প্রবন্ধটি পড়লাম। লেখক এই সভ্যতা বিলোপের কয়েকটি নতুন কারণ সংগৃহীত করেছেন যা একটি নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছে।

সিন্ধুসভ্যতা বিলোপের একটি কারণ বন্যার আক্রমণ বলেও অনেক পণ্ডিত মনে করেন। তবে অগ্ন্যুৎপাত প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে এমন ধারণা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গোবী (চীনে অবস্থিত) মরুভূমিতে লোয়েগ মৃত্তিকা অবক্ষেপণের ন্যায় আগ্নেয়-গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা অব-ক্ষেপণের ফলে এই সভ্যতা বিলোপ পেয়েছিল, এমনও হতে পারে। তবে এর ফলে যে ধরনের শিলা এই স্থানে পাওয়া যেতে পারে যথা Tuff ইত্যাদি, তা চেনার জন্য Carbon 14 পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ ভূতাত্ত্বিক গবেষকরাই তা পরীক্ষা করে বলতে পারেন বলেও আমার ধারণা।

আমার প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় সত্য-চরণ চট্টোপাধ্যায় ভূপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদের নিকট শুনেছিলাম যে, পৃথিবীর আবহাওয়া যুগে যুগে বদলায়। আমরা অধুনা যে যুগে বাস করছি তা উত্তপ্ততার aridity যুগ। যার ফল-স্বরূপ পৃথিবীর মরুভূমিগুলি আয়তনে বাড়ছে এবং হিমবাহগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র হচ্ছে। প্রায়শই ভূকম্পন স্থানে স্থানে এবং প্রধানত দক্ষিণ আমেরিকায় অগ্ন্যুৎপাতের বৃদ্ধি দেখে মনে হয় এই আকস্মিক পরি-বর্তনগুলিও এই যুগের বৈশিষ্ট্য। এইরূপে উত্তপ্ত আবহাওয়া পরিবর্তন আগের যুগেও ঘটেছে। প্রাচীন অগ্ন্যুৎপাতগুলি সেই সময়েই ঘটা সম্ভব।

ভারতবর্ষে কোনও আগ্নেয়গিরি নেই (অনেকে মনে করেন আবু পর্বতস্থিত হ্রদটি জ্বালামুখী হ্রদ); তবে অগ্ন্যুৎ-পাতের নিদর্শন আছে। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সাধারণত দুই প্রকার লাভা নির্গলিত হয়। এক প্রকার লাভা আঠালো, চটচটে। এই প্রকার লাভাই আগ্নেয়গিরির সৃষ্টির কারণ। দ্বিতীয় প্রকার লাভা অত্যন্ত তরল; যা জলস্রোতের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই দ্বিতীয় প্রকারের লাভা দিয়েই দাক্ষিণাত্যের মালভূমি গঠিত। উষ্ণ প্রস্রবণগুলি অগ্ন্যুৎপাতের after effect.

সিন্ধু প্রদেশের নিকট আফগানিস্থানে যে 'হিংলাজ তীর্থ' আছে, অবধূতের মরুতীর্থ তা মনে হয় Mud Volcano.

সুতরাং পুরাণোক্ত মহাদেবের প্রলয় নাচের কাহিনীর সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাতের সংযোগ থাকা বিচিত্র নয়। লক্ষ্য করে দেখেছি পীঠস্থানগুলি প্রায় প্রত্যেকটিই যেমন, মুঙ্গেরের চণ্ডীস্থান, আসামের কামাখ্যা ইত্যাদি স্থানগুলিতে অগ্ন্যুৎ-পাতের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। হয়তো সতী দেহত্যাগ করলে পর তাঁর দেহাবশেষ নানা স্থানে (মহাত্মা গান্ধীর দেহভস্মের ন্যায়) প্রোথিত হয়, এবং পুরাণোক্ত এই ঘটনার পরই প্রাচীন যুগের অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়।

পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তনে মানুষও অনেকাংশে দায়ী, লেখকের এই মত আমিও সমর্থন করি। অধুনাতম 'আণবিক বিস্ফোরণ'-এর ফল প্রত্যক্ষভাবে আবহাওয়া পরিবর্তনে সাহায্য করেছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই ফল সুদূরপ্রসারী এবং বিষময় হওয়াই সম্ভব।

ইন্দিরা দাশ
শ্রীরামপুর

কেন এই ছাত্র অসন্তোষ

অমৃতে ৫১শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅসীম সেনের পত্রের উত্তরে কয়েকটি কথা লিখতে উৎসাহ বোধ করছি।

শ্রীসেন প্রথমেই আমার চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, 'স্বভাবগত কারণে শিক্ষকতা বৃত্তিকে যাঁরা আন্তরিক-ভাবে গ্রহণ করেন, ডব্ল্যু-বি-সি-এস বা আই-এ-এস এর জন্যে 'দীর্ঘ নিঃশ্বাস' ফেলবার কারণ তাঁদের ঘটে না।' তাঁর উক্তির এ অংশটিকে অতিবড় নির্বোধও প্রতিবাদ করবেন না। প্রকৃত আদর্শবাদী শিক্ষক সম্বন্ধে তিনি উক্তিটি করেছেন। কিন্তু পরেই তিনি স্বীকার করেছেন যে, 'অবশ্য আজকাল জীবিকার জন্যে পথ ভুল করে অনেকেই শিক্ষকতার লাইনে আসছেন।' আমিও এই কথাটাই বলতে চেয়েছি যে, জীবিকার জন্যে পথ ভুল করে বা বাধ্য হয়ে অনেকেই শিক্ষকতাকে বেছে নিয়েছেন। এই অনেকের সংখ্যা কত সেটা কি নির্ণয় করে দেখেছেন শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয়? আমাদের সমাজে ইতিহাসিক নিয়মেই এই সংখ্যাটি নিদারুণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়া 'নান্যপন্থা'। আরেকটি কথা আমি শ্রীসেনকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি, কলেজের অধ্যাপক ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-দের মধ্যে কতজনকে তিনি ডব্ল্যু-বি-সি-এস বা আই-এ-এস দিয়ে শিক্ষকতা পরিত্যাগ করতে দেখেছেন আর কজন আই-এ-এসকে চাকুরী পরিত্যাগ করে শিক্ষকতা গ্রহণ করতে দেখেছেন? যদি অভিমানাহত না হয়ে এই সংখ্যাটির তিনি হিসাব নেন তাহলে বোধহয় আমার উক্তিতে তিনি ক্ষুব্ধ হবেন না।

'রাষ্ট্রপতি পদক' যেটি কয়েকজনকে দেওয়া আমি অর্থহীন বলেছি, সেইটি সকলকে দিলেই অর্থবহ হয়ে উঠবে এমন নির্বোধ চিন্তা আমি করি নি। অন্য পথের কথা ভেবেই আমি উক্তিটি করেছি।

যাঁদের সরাসরি কোন দায়িত্ব নেই, তাঁরা দায়িত্বশীল কিনা একথা বিচার করতে গেলে তাঁরা যাঁদের ওপর দায়িত্ব পালন করছেন তাঁদের অর্থাৎ ছাত্রদের পরীক্ষা পাসের হার এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখেই করতে হবে, বর্তমান ছাত্রদের পাশের হার, পরীক্ষার ফল এবং নানান ক্ষেত্রের ব্যবহার কী শিক্ষককুলের গৌরব বহন করছে?

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়ের সামনে আমি একটি মাত্র বিনীত জিজ্ঞাসা রাখছি।

উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জীবন পর্যন্ত একটি ছাত্রকে প্রতিটি পরীক্ষায় লিখিতভাবে প্রায় এক হাজার নম্বর পরীক্ষা দিতে হয়। এই লেখার ক্ষমতাটা বক্তৃতার মধ্য দিয়ে কখনও বৃদ্ধি পায় না। কটি বিদ্যালয়ে এবং কলেজে নিয়মিত সাপ্তাহিক পরীক্ষা, শ্রেণীর কাজ এ সমস্তর মধ্য দিয়ে ছাত্রদের লেখার অভ্যাস করান হয় এবং শিক্ষককুল তার ভুল সংশোধন করেন নিয়মিতভাবে? হয়ত এমন উত্তর আসবে যে, শিক্ষক-ছাত্রের সংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে বর্তমানে এসব করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল যে, কোন কারণেই হোক যদি দায়িত্ব পালন করা সম্ভব না হয় তাহলেও আমরা দায়িত্বশীল এমন চিন্তা কি যুক্তিপূর্ণ?

সত্য কিছুটা অপ্রিয় হলেও তাকে অস্বীকার করলেই গৌরব অর্জন করা যায় না। সত্যকে স্বীকার করেই দোষের কারণ-গুলিকে হয়ত কিছুটা পরিবর্তন করা যায়। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু আদর্শ শিক্ষক যদি ছড়িয়ে থাকেন তা দেখেই আত্মতৃপ্তি লাভ করলে সেটা মঙ্গল নিয়ে আসে না। শিক্ষক-কুলকে যখন আমরা ভাবব, তখন অগণিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় — এই সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষক নিয়েই আমাদের ভাবতে হবে। আর এই জাতীয় চিন্তা বোধহয় আমার প্রতিটি উক্তির সত্যতাই বহন করবে।

নিখিলেশ গোস্বামী
শ্রীরামপুর, হুগলী

অমৃত

কবির জন্মদিন

অমৃতের অষ্টম বর্ষের সূচনায় পাঠকবর্গ ও শুভানুধ্যায়ীগণকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাই।

কবি বলেছিলেন, বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক। বসন্ত কোথায়, আমরা কিন্তু কবিকে পেয়েছিলাম বৈশাখে। নামে তিনি রবি, খরতপনের দীপ্তি নিয়ে সে কারণেই যেন বৈশাখে তাঁর আবির্ভাবটা বেমানান মনে হয়নি। নয়তো এই দারুণ গ্রীষ্মের বদলে তিনি যদি হেমন্তে কি বসন্তে আসতেন, তাহলেই বা মন্দ হত কি! অবশ্য বৈশাখে এলেও এই মাসের প্রতিই শুধু তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তিনি এত ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছিলেন যে, ফেলে-ছড়িয়ে সকলকে দিয়েও তিনি ছিলেন অফুরন্ত। তাঁকে স্মরণ করার অর্থ তো নিজেদের দিকেই তাকানো। প্রাণ-অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি—এ-কথা তিনি বলেছিলেন তরুণদের। কার্পণ্যে বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি, বাংলাদেশকে তিনি ঝুড়ি উজাড় করে দিয়ে গেছেন। সেজনাই তো তিনি এ-দেশের প্রাণের কবি।

অবাক হতে হয় ভাবলে যে, এমন একজন শিল্পীকে দিয়ে এই দেশ কত কাজ করিয়ে নিয়েছে। কারণ তিনি তো শুধু কবি নন, তাঁকে আপন মানুষ হিসেবে পেয়েছিল এই দেশ। ভালবাসার দাবীতে তাঁর কাছ থেকে কড়ায়-গণ্ডায় উশুল করে নিয়েছে যা ছিল দেবার। তিনি যে বড় কবি ছিলেন এ নিয়ে নতুন কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তিনি যে একজন বড় মানুষ ছিলেন এবং তাঁর অজেয় কবিসত্তা সত্ত্বেও মনুষ্যত্বের দাবী মেটাতে তিনি এ-দেশের জন্য তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে গেছেন—এ-সত্য আজ দেশবাসীকে মনে রাখতে হবে। মহৎ কবি অনেক দেশেই জন্মান। ইংরেজ বলবে, আমাদের শেক্সপীয়ারকে দেখ, জর্মনরা অঙ্গুলি নির্দেশ করবে গ্যয়টের দিকে, রুশদের আছে পুশকিন, গর্কি। সব মানি, কিন্তু বাঙালীর কাছে, ভারতীয়দের কাছে রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন বড় কবি নন, তার চেয়েও বেশি। যে-কাজ রাষ্ট্রনায়কের, যে-কাজ সমাজ-সংস্কারকের, যে-দায়িত্ব শিক্ষাবিদের—এই কবিকে তাঁর শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজও করতে হয়েছে। কেননা, আমাদের দেশের প্রত্যাশা ছিল বেশি, আর এই দেশের বঞ্চিত ভাগ্যহতদের জন্য কাজ করার লোকের ছিল অভাব।

কবির জন্মোৎসবে সারা দেশ যখন আনন্দে উৎসবে মেতে ওঠে, তখন এই মহৎ মানুষটির সার্বিক সত্তার কথা সকলের মনে থাকে না। তাঁর কাব্য ও শিল্পসৃষ্টির বিচার-বিশ্লেষণের জন্য অনন্ত কাল তার মানদণ্ড নিয়ে অপেক্ষা করে আছে। সে-বিচারে তিনি যে বিজয়ী হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা এই বিরাট পুরুষের অন্য কর্মের দিকটি নিয়েও ভাবব, বিচার করব এবং দেখব যে, তাঁর এই কর্মপ্রয়াস যদি না থাকত, তিনি যদি শুধুমাত্র শিল্পীসত্তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন, তাহলে এই দেশের অন্ধকারের গভীরতা আরও কতদূর হত বিস্তৃত।

ক্রান্তদর্শী না হলে এত গভীরে কোনো মানুষের দৃষ্টি গিয়ে পৌঁছয় না। দীর্ঘজীবন পেয়েছিলেন তিনি, মহর্ষিভবনের সম্পদও তখন একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। যে-বিরাট কাব্যপ্রতিভা নিয়ে তিনি এসেছিলেন, শুধুমাত্র কবি হয়ে থাকলেই সারা দেশ তাঁকে মাথায় করে রাখত। অন্যদিকে দেশে তাঁর সমালোচকের অভাব ছিল না। তাঁর কবিতা গ্রহণ করতেই রক্ষণশীল সমাজের অনেক সময় লেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনোদিন কোনো সমসাময়িক লেখককে আঘাত দিয়ে কিছু লেখেননি, বা বলেননি। কিন্তু তাঁকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এর জন্য দুঃখ তাঁর বুকে কম বাজেনি। তবুও তো এই মানুষই গেয়েছেন, 'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে।' কেন বলেছিলেন? কারণ, এই দেশ জন্মদুঃখিনী সীতার মতো চিরলাঞ্ছিতা, চিরবঞ্চিতা। তার জন্য অনেক কাজ ছিল করার। এই কবি সেই কাজ সুসম্পন্ন করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কেউ তাঁকে এই গুরুভার বহনের জন্য ডাকেনি, নিজের হৃদয়ের আমন্ত্রণেই তিনি দুঃখী, পীড়িত, অজ্ঞ মানুষের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সে যে আমাদের কত বড় পাওয়া তা আমরা ভাষা দিয়ে ব্যাখ্যা করব কী করে? সূর্য যখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ভেদ করে উদিত হয়, পৃথিবীকে সে কী ঋণে আবদ্ধ করল তার পরিমাপ করবে কে? কবির জন্মদিনে তাঁর নামে যখন চারিদিকে উঠছে জয়ধ্বনি, তখন তাঁর কবিসত্তাকেও ছাপিয়ে যে মনুষ্যসত্তা সর্বকালে সর্বদেশের মানুষের কাছে আদর্শ হয়ে থাকবে তার দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কেননা, যে কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন, যে-স্বপ্ন এই কবিকে সারাজীবন পরিচালিত করেছে, তার পূর্ণতা প্রাপ্তি এখনো ঘটেনি। এখনো যেন মধ্যাহ্নের তন্দ্রা ভেঙে দিয়ে কবিকণ্ঠে সেই বজ্রবাণী উচ্চারিত হয়—ওরে তুই ওঠ আজি। আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি জাগাতে জগৎজনে! এই আবাহন-মন্ত্র যেন বিফল না হয়, কবির জন্মদিনে এই প্রার্থনা জানাই।

একালের রবীন্দ্রচর্চা

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-সাহিত্যের চর্চা যে দিন দিন ব্যাপক আকার গ্রহণ করছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষত তাঁর জন্ম তারিখের শতবর্ষপূর্তির পর থেকে চর্চার পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। লোকোত্তর প্রতিভা নিয়ে যে সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁর রচনায় বিশ্বজনীন আবেদন আছে, তাঁকে ভালভাবে বুঝে আস্বাদন করতে মানুষের অনেক দিন লেগে যায়। কালিদাস সেই গুপ্তযুগে জন্মেছিলেন; কিন্তু তাঁকে নিয়ে আলোচনা এখনও অব্যাহত আছে। শেকসপীয়ার চারশো বছর আগে জন্মেছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিক গবেষণা ও আলোচনা এখনও সাহিত্য-রসিককে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। এই শ্রেণীর সাহিত্যিককে ভালভাবে বুঝে আস্বাদন করতে শত শত বছর কেটে যায়। সুতরাং রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা ক্রমশ বর্ধিত হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সম্প্রতি তাঁকে কেন্দ্র করে যে বিরাট আলোচনা গড়ে উঠেছে, বর্তমান প্রবন্ধে তার একটি সামগ্রিক বিবরণ দেবার চেষ্টা হবে।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, সাহিত্য-সেবার তিনটি দিক আছে, একটি কর্মকান্ড, একটি জ্ঞানকান্ড এবং তৃতীয়টি রসকান্ড। রবীন্দ্রসাহিত্যের চর্চাকেও আমরা এই তিন দিক হতে আলোচনা করতে পারি।

সাহিত্যের কর্মকান্ড বলতে আমরা বুঝি নানা সভা বা স্থায়ী সমিতির আনুকূল্যে উৎসবের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত জনসাধারণের পরিচয় ঘটানো। এখন এই ব্যাপারটি একটি ব্যাপক হারে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উৎসবের রূপ গ্রহণ করেছে। বাঙালী এখন দুটি বার্ষিক উৎসবে মাতে। এক, দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে দেবীপক্ষ। সেখানে পুজোকে উপলক্ষ্য করে চিত্ত-বিনোদন এবং নানাভাবে সাংস্কৃতিক আয়োজনই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথের জন্ম-দিবসকে কেন্দ্র করে নানা উৎসবের আয়োজন। তাও প্রায় এক পক্ষকাল চলে বলে তার নাম কবিপক্ষ। এইসব উৎসবের অবলম্বন রবীন্দ্রনাথের নানা শ্রেণীর রচনা। কবিতা, আবৃত্তি, গান, নৃত্য-নাট্য, গীতিনাট্য প্রভৃতির অভিনয় ছোট-বড় নানা সাহিত্যরসিকগোষ্ঠী সারা বাংলাদেশে এবং বাহিরে এ আয়োজন করেন। বিখ্যাত শিল্পী তথা সাহিত্যিকদের নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়, কে কোথায় কাকে কোন উৎসবে আনবে এই নিয়ে। এইসব অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় চিত্ত-বিনোদন। তবে একথাও সত্য যে, আনুষঙ্গিকভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে তা সাহায্য করে। এইভাবে তার একটা সীমিত সার্থকতা আছে।

রবীন্দ্রচর্চার জ্ঞানকান্ডে ফেলা যায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রচারের জন্য যত কিছু ব্যবস্থা হয়েছে সেগুলিকে। তাঁর জন্ম-শতবর্ষ পূর্তিকে কেন্দ্র করে এই বিষয়ে প্রচেষ্টা বেশ শক্তি সঞ্চয় করেছে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর সস্তা সংস্করণ সর্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। এর ফলে হাজার হাজার বাঙালী পরিবারের ঘরে সমগ্র গ্রন্থাবলী স্থান পেয়েছে এবং তার সাহায্যে সকল সাহিত্য-রসিক বাঙালী পরিবার রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে পরিচিত হবার ব্যাপকহারে সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্ররচনার আবেদন শুধু বাঙালীর মধ্যে আবদ্ধ নয়, তা সর্বজনীন। সকল ভারতবাসীর কাছে যেমন তার আবেদন আছে বিদেশী সাহিত্যরসিকের কাছেও আছে। তাই তাঁর রচনার ব্যাপক হারে অনুবাদেরও প্রয়োজন আছে। এই অনুবাদ যেমন

আঞ্চলিক ভাষায় হওয়া উচিত, তেমনি ইংরাজি ভাষাতে হওয়া দরকার। তাছাড়া অন্য বিদেশী ভাষায় হওয়াও বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় আঞ্চলিক সব ভাষাতেই তার অনুবাদ ব্যাপক হারে শুরু হয়েছে জন্ম-শতবর্ষ উৎসবের পর থেকে। ইংরাজিতে অনুবাদের সংকলনও নানা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে এই উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে সাহিত্য আকাডেমির সংকলন, ম্যাকমিলন কোম্পানির অমিয় চক্রবর্তী সম্পাদিত সংকলন এবং বিশ্বভারতীর 'বাউন্ডলেস স্কাই' এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের রচনার পাশ্চাত্য ভাষাগুলিতে অনুবাদ অনেক আগেই শুরু হয়েছিল; জন্মশতবার্ষিক উৎসব এই ধরনের প্রচেষ্টাকে আরও প্রেরণা দিয়েছে। তার বিস্ময়কর ফল ফলেছে রুশ ভাষায়। এই হল একমাত্র বিদেশী ভাষা যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমগ্র রচনাবলীই অনূদিত হয়েছে। এই ধরনের সংকলন রবীন্দ্রনাথের রচনাকে বিশ্বের মানুষের কাছে সুলভ করেছে। এইখানেই তার সার্থকতা।

কিন্তু রবীন্দ্র-রচনার প্রকৃত সার্থকতা তার রস আস্বাদনে। এইখানেই সমালোচনা সাহিত্যের বিশেষ ভূমিকা। যাঁর মধ্যে একাধারে মনীষা, কল্পনাশক্তি এবং সূক্ষ্ম শিল্পবোধের অনন্যসাধারণ সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর সাহিত্যের রসাস্বাদন করতেও বিশেষ সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনা করবেন এমন সাহিত্যরসিক যিনি একাধারে মনস্বী এবং সহৃদয়। তবেই ত রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ পাঠকের কাছে পরিচিত করার যোগ্যতা তিনি অর্জন করবেন। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের রচনার নানাভাবে ভাষ্য লিখে গেছেন। প্রবন্ধে, চিঠিতে, ভাষণে, নিবন্ধ-গ্রন্থে, আত্মপরিচয় শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে সে ভাষ্য ছড়ানো রয়েছে। ফলে সমালোচকের পক্ষে তাঁকে বোঝবার সূত্র খুঁজে পাওয়া সহজ হয়েছে।

এই সমালোচনা-সাহিত্য প্রধানত দুভাবে গড়ে উঠেছে। প্রথমত জন্মশতবর্ষ-পূর্তির উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁকে বোঝবার চেষ্টায় নানা প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে চারু ভট্টাচার্য সম্পাদিত এবং বসুশ্রী প্রকাশিত 'রবি প্রদক্ষিণ' নামে সংকলন গ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রসাহিত্যের তথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আজীবন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার ফলে তিনি এই সম্পাদনা কার্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। বিরাট রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্বন্ধে নানাদিক নিয়ে বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ শুধু তাতে স্থান পায়নি, প্রতিটি দিক সম্বন্ধে সারগর্ভ পরিচয়ও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আর এক-ভাবে রবীন্দ্ররচনা আলোচনার একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হয়েছে। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের সহযোগিতায় ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের শত-বার্ষিক জন্মোৎসবটি স্মরণ রাখবার জন্য দুই ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। প্রথম, রবীন্দ্রনাথের নামে অধ্যাপক পদ

সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়, এমন একটি স্থায়ী অর্থভাণ্ডার সৃষ্টি করা যার আয় থেকে নিয়মিতভাবে রবীন্দ্ররচনার আলোচনার জন্য বক্তৃতামালার ব্যবস্থা হবে। প্রথমটির সার্থকতা রবীন্দ্রনাথের নামকে ধরে রাখাতেই পর্যবসিত। দ্বিতীয়টির সার্থকতা আরও বেশী। তাতে স্থায়ীভাবে বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ করে রবীন্দ্রনাথের রচনার আলোচনার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। পুণা বিশ্ববিদ্যালয়, মারাঠওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় এইভাবে স্থায়ী বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করেছেন। এই ব্যবস্থা অবাঙালী ভারতীয়ের কাছে রবীন্দ্ররচনার রসমাধুর্য পরিবেশন করতে সাহায্য করবে। এইখানেই তার অতিরিক্ত সার্থকতা।

অপর যেভাবে সমালোচনা সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার প্রেরণা স্থায়ী। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমে, বিশেষ করে স্নাতকোত্তর বিভাগে রবীন্দ্রনাথের রচনার অংশ পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ায় রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের রস আস্বাদনে বিদ্যার্থীদের সাহায্য করতে অনেক অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথকে বিষয় করে নানা আলোচনাগ্রন্থ রচনা করেছেন। শিক্ষাবিভাগে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ও ডক্টরেট উপাধি লাভের উদ্দেশ্যে বহু গবেষক রবীন্দ্রনাথের রচনাকে বিষয় করে নানা নিবন্ধ লিখছেন। ফলে এই সূত্রে

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

উচ্চস্তরে রবীন্দ্রচর্চার একটি স্থায়ী প্রেরণা ক্রিয়াশীল হয়েছে। এই সব নিবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত সম্ভব হচ্ছে। অনেক সাহিত্যরসিক কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়েও রবীন্দ্ররচনাকে বিষয় করে প্রবন্ধ বা আলোচনা গ্রন্থ লিখেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি ব্যবহারিক প্রয়োজন নিরপেক্ষ এই অহেতুক আকর্ষণও রবীন্দ্রচর্চার একটি স্থায়ী প্রেরণা।

এইভাবে নানা সূত্রে যে রবীন্দ্রসাহিত্যের ব্যাপক আলোচনা চলেছে তা বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য। তবে এই সব আলোচনা-গ্রন্থের সার্থকতা নির্ভর করে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। দুর্ভাগ্যক্রমে যে আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রসাহিত্যের আস্বাদনকে সাহায্য করে তার খানিকটা অভাব লক্ষিত হয়। আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বুঝি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সহৃদয়তার সঙ্গে লেখকের মন দিয়ে লেখককে বোঝবার চেষ্টা করা। এই পথেই রবীন্দ্রনাথকে ঠিক বোঝা যাবে এবং তাঁকে ঠিক মত বুঝলে তবেই পাঠকের নিকট তাঁর রচনার প্রকৃত রূপটি তুলে ধরা যাবে। আর তখনই তাঁর রচনার আস্বাদনও হবে সম্ভব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সমালোচক সেই পথে যান না। ফলে যে অনুপাতে বিরাট সমালোচনা-সাহিত্য গড়ে উঠেছে সেই অনুপাতে তা সার্থক হয়ে উঠছে না।

এই আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ঘটে নানা কারণে। কোথাও লেখককে বুঝতে সমালোচক বেশী পরিশ্রম করতে প্রস্তুত থাকেন না। হাল্কা মন নিয়ে তিনি কিছু লিখতে চান। কিন্তু সেভাবে রবীন্দ্রনাথের মত লোকোত্তর প্রতিভার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয় না। কোথাও নিন্দা প্রসঙ্গে নূতন কথা বলে পাঠকের মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করবার ইচ্ছাও ক্রিয়াশীল হয়। এই আলোচনার কোনো মূল্য থাকে না, কারণ তা ব্যবহারিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সহৃদয়তার একান্ত অভাব হেতু সমালোচকের মনকে একদেশদর্শী করে তোলে। ফলে রচনার প্রকৃত পরিচয় তার মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। আবার এমনও দেখা যায় সমালোচকের মনে যে ব্যাখ্যাটি ধরেছে তাই রচনার ওপর আরোপ করার ইচ্ছা এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে লেখকের রচনার মধ্যে তার প্রতিকূলে ইঙ্গিত থাকলেও বা তাঁর ভাষ্যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকলেও তাকে তিনি আমল দেন না। এ দৃষ্টিভঙ্গি কখনও সমর্থনযোগ্য হতে পারে না, কারণ তা লেখককে বুঝতে সাহায্য না করে তাঁর অপব্যাখ্যা দিয়ে বসে। এই সব কারণে সমালোচনা-সাহিত্য যে পরিমাণে গড়ে উঠছে সেই পরিমাণে রবীন্দ্রনাথকে বুঝে তাঁর সাহিত্যের প্রকৃত রসাস্বাদনে তা সাহায্য করছে না।

এই প্রতিপাদ্য সম্পর্কে একটি উদাহরণ স্থাপন করে এ আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রসাহিত্যে জীবনদেবতা তত্ত্ব একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। তাঁর কাব্য তথা তাঁর দর্শনকে বুঝতে সে তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাঁর কাব্যজীবন তথা সাধনজীবনের তা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বিষয়টি দুরূহ সন্দেহ নেই, কিন্তু তাকে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব ভাষ্য আছে। চিঠিতে, বিভিন্ন মন্তব্যে এবং বিশেষ করে তাঁর রিলিজিয়ন অফ ম্যান গ্রন্থটিতে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। সুতরাং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর মন দিয়ে এই তত্ত্বটি বোঝা কষ্টসাধ্য হতে পারে, কিন্তু অসাধ্য নয়।

অথচ আশ্চর্য হতে হয় এ বিষয়ে বিভিন্ন সমালোচকের মতের বিভিন্নতার পরিমাণ দেখে। বদরায়ণ রচিত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই রকম বিভ্রাট ঘটেছিল। বিভিন্ন দার্শনিক তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এমনভাবে যে তারা প্রত্যেকে এক একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক তত্ত্বের সম্মানীয়। সেখানে এ বিভ্রাট কেন ঘটেছিল না বোঝা যায়; কারণ ব্রহ্মসূত্র সূত্রাকারে রচিত এবং গ্রন্থকর্তার নিজস্ব ভাষ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বেলায় কিন্তু ব্যাখ্যার এত বৈচিত্র্যের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের রচনায় ভাষার ছটা এবং রূপকের ঘটা খানিক পরিমাণে রহস্যজাল বিস্তার করে। কিন্তু তাকে অপসারিত করতে তাঁর নিজস্ব ভাষ্যই রয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন ব্যাখ্যার এতখানি অনৈক্যের সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিক্ষিপ্ত অনুরূপ নানা তত্ত্ব, এমন কি বিশেষ বিশেষ কবিতার ব্যাখ্যাতেও এইরকম মতান্তর দেখা যায়। অথচ আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হলে সম্ভবত এই বিভ্রাট ঘটত না। এই কারণে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনার মূল্য পরিমাণের অনুপাতে অনেকখানি খর্ব হয়ে গেছে বলে মনে হয়। সেটি আমাদের দুর্ভাগ্য।

রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব

সুকুমার সেন

সেদিন বই নাড়ানাড়ি করতে গিয়ে হাতে ঠেকল গীতলিপি। বাঁধানো বইটিতে কি কি গান আছে দেখবার কৌতূহল হল। পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখে পড়ল—

প্রভাতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে। গানটি সর্বপরিচিত এবং গীতাঞ্জলিতে আবদ্ধ। কিন্তু পাঠ তো ও নয়।

শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে। মনে হল কী আশ্চর্য! গোড়ায় একটি মাত্র শব্দ বদলে দিতেই যেন সমস্ত রচনাটিতে বিজলি বাতি জ্বলে উঠল। উষা যেন ঘোমটা খুলে দাঁড়াল। মনে হল এই তো শারদোৎসবের পরিপূর্ণতা।

গানটি শারদোৎসবে (ভাদ্র ১৩১৫) নেই, তার কিছু পরেই লেখা হয়েছিল। কিন্তু মনে হতে লাগল যেন শারদোৎসবের অভিনয়ে গানটি শুনেছিলুম এবং তখন থেকেই ভাষায়-সুরে গানটি আমার মনে দাগ কেটে বসে আছে। ঋতু-উৎসব খুললুম। তাতে শারদোৎসবের প্রস্তাবনাযুক্ত কলিকাতায় অভিনীত সংস্করণটি (ভাদ্র ১৩২৯) ছাপা আছে। কিন্তু রচনার মধ্যে তো নতুন গান কিছু দেওয়া নেই। তখন খুঁজতে লাগলুম এলফেড থিয়েটারে ছাত্রাবস্থায় দেখা (১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২) শারদোৎসবের প্রোগ্রাম-পুস্তিকাখানি। এতে প্রস্তাবনাটি ছিল এবং যে-সব গান গাওয়া হয়েছিল, তাও দেওয়া ছিল। পুস্তিকাখানি পাওয়া গেল। দেখলুম, সব শেষে গাওয়া হয়েছিল—

শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে।

গানের মোহ মনকে পেয়ে বসেছে। দুপুরবেলা শারদোৎসব পড়তে বসলুম। নিতান্ত সরল সহজ সোজাসুজি রচনা। ভিতরে ঢোকবার প্রয়োজন নেই, বাইরে থেকেই বেশ ভালো লাগে। ভালো লাগার একটা স্বাভাবিক ধর্ম হল আরো ভালো লাগাতে চাওয়া। সেই আরো ভালো লাগার প্রত্যাশা নিয়ে আবার শারদোৎসব পড়লুম। প্রত্যাশা ভঙ্গ হল না। শারদোৎসব আরো ভালো লাগল। রচনাটির সম্বন্ধে যেন একটু নতুন দৃষ্টি খুলে গেল। সেই কথাটুকু বলবার জন্যেই এই 'কলমে আঁচড় কাটা'।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার মধ্যে শারদোৎসব আমার মতে অযথা উপেক্ষিত। সে উপেক্ষার কারণও আছে। শারদোৎসব ছোট বই, সহজ লেখা। ছোট বই আর সহজ রচনার প্রতি আমাদের বিরূপ দৃষ্টি স্বভাবতই ভুরু কোঁচকায়। আর যেখানেই হই, সাহিত্যে আমরা মোটেই সহজিয়া নই। এই একটা কারণ। আর একটা কারণ হল নাম। শারদোৎসব কথাটি আমাদের অতি পরিচিত। তার উপর গোড়াতেই "মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি"। তাছাড়া আছে ছেলের দল ও তাদের গান। সুতরাং এতে আর পড়বার এমন কী আছে।

আমাদের দেশে প্রকৃতির প্রসন্নতম রূপ বসন্তকালে ফোটে না, ফোটে শরতকালে। বর্ষাশেষে নদনদী সরোবরে পরিপূর্ণতা, আকাশে সোনার রোদে মেঘের খেলা, ধরণীতে কাশগুচ্ছের চামরদোলা—প্রকৃতির এই শারদ-শোভার ইঙ্গিতমাত্র দিয়েছিলেন কালিদাস, আর রবীন্দ্রনাথ তা চিরস্থায়ী সিম্বল করে দিয়েছেন। কবিতায় গানে তার পরিচয় অজস্র ছড়ানো আছে। সেই

পরিচয়ের দৃশ্য ও শ্রব্য রূপ শারদোৎসব। বাঙালী চিরকাল কৃষি-নির্ভর। কৃষি-শ্রম শেষ হয়েছে, ফসল কিছু কিছু উঠছে। ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় কৃষিজীবীর আনন্দ শরৎকাল। তাই শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালীর জাতীয় আনন্দ-অনুষ্ঠান। এই উৎসবে নৃত্যগীত ও আনুষঙ্গিক ভালো-মন্দ অনাচার-হুল্লোড় 'শবরোৎসব' একদা শারদোৎসবের অঙ্গ ছিল। কৃষ্ণের রাসলীলাও সেই শবরোৎসবের একটা পালটা পিঠ।

ভগবান্ অপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল-মল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপা-শ্রিতঃ।।

এই যোগমায়াই শারদা, রবীন্দ্রনাথের শারদলক্ষ্মী।

শারদ প্রকৃতি পটের একটা বৃহৎ অংশ হল 'সাদা মেঘের ভেলা'। শরতের মেঘ রবীন্দ্রনাথের কবি-ভাবনায় এবং জীবন-চিন্তায় স্বতন্ত্র ও মূল্যবান প্রতীকে পরিণত। দেওয়া-নেওয়া-ফিরিয়ে দেওয়া—প্রকৃতি ও জীবনের সত্য ধর্ম। কালিদাস শরৎ-মেঘের উপমা অনেকবার ব্যবহার করেছেন।

আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচাম্ ইব।।
নির্গলিতাম্বুগর্ভং শরদ্ঘনং নার্দতি চাতকোঽপি।।

সুকুমার সেন

রবীন্দ্রনাথ এইটিকে করেছেন শারদোৎসবের তত্ত্বপ্রতীক। এ-তত্ত্ব মানবজীবনের সার্থকতার মূল কথা। আমাদের দেশের সর্ববিধ অধ্যাত্মচিন্তারও সার কথা—'ত্যাগে-নৈকেনামৃতত্বমানশুঃ' — একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব পেয়েছেন। এ ত্যাগ হল তপস্যা, অর্থাৎ কষ্ট করা। জীবনের যা কিছু অভিজ্ঞতা তার মূল্য দিতেই হবে। অনিচ্ছায় দিতে হলে তা নিছক ক্লেশ, দুর্গতি। আর সে ঋণ সজ্ঞানে শোধ করতে চেষ্টা করলে তার মধ্যে মিলবে—সুখভোগ নয়—দুঃখমুক্তি, অর্থাৎ আনন্দ, যা সুখও নয়, দুঃখও নয়, তার উপরে মানুষের জীবনে, তার সংসারে, তার চিন্তায় যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ, সে সবই এই ঋণ-শোধেরই বেদনার পথেই লব্ধ।

শারদোৎসবে নায়ক তিনজন—অতিনায়ক, নায়ক ও উপনায়ক। অতিনায়ক মৃত বীণাচার্য সুরসেন (অনেকটা রক্তকরবীর রঞ্জনের মতোই নায়ক রাজার প্রতিরূপ, তবে বিরুদ্ধ-ধর্মী নয়)। তাঁর গুণ নায়ক সম্রাটকে বাইরে টেনে এনেছে তাঁর খোঁজে। আর তাঁর প্রেম উপনায়ক উপনন্দকে তপস্যার পথে দাঁড় করিয়েছে। সুরসেনের প্রসঙ্গে যা বলেছে, তার খানিকটা পরে রবীন্দ্রনাথের নিজের বেলায়ই খেটেছে। সুরসেনের খ্যাতি দেশের রাজার কানে ওঠে নি। 'এখনকার রাজা তো কোনদিন তাঁকে ডাকেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। তুমি তার বীণা কোথায় শুনলে?' ঠাকুরদাদার প্রশ্নে সন্ন্যাসী বললেন যে, তিনি রাজা বিজয়াদিত্যের সভায় শুনেছিলেন। শুনে ঠাকুরদাদা বললে, 'হায় হায়, এত বড় লোকের আমরা কোন আদর করতে পারিনি।' উপনন্দ বলেছিল, 'আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু,

আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তাহলে কিছু কিছু উপার্জন করে আপনার হাতে দিতে পারবো। তিনি বল্লেন, বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয়, আমার আর এক বিদ্যা জানা আছে, তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে আমাকে রং দিয়ে চিত্র করে পুঁথি লিখতে শিখিয়েছেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠতো তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জানতো।'

সুরসেন রবীন্দ্রনাথেরই যেন প্রতিফলন। তিনি পরমগুণী, কিন্তু গুণের পরিমাণে কিছুই সমাদর নেই (অন্তত তখন পর্যন্ত)। যাঁরা আগে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁরা অনেকে শান্তিনিকেতনে চলে আসার পর হয়ত পাগল বলেই ভাবতেন। পুঁথিতে দাগ বুলিয়ে চিত্রাঙ্কন কাজ তখনও বোধ হয় রীতিমত শুরু হয়নি, চিত্রাঙ্কনে যশোলাভ তো প্রায় শেষ জীবনের ঘটনা। আর আশ্রমের জন্য অর্থাভাব ঘটলে তিনি যে মাঝে মাঝে দেশের নানা স্থানে গিয়ে 'বীণা বাজিয়ে' কিছু কিছু টাকা আনতেন, তাও পরের কথা এবং সর্বজনবিদিত।

রবীন্দ্র-নাট্য রচনাবলীর মধ্যে শারদোৎসবের একটি বিশেষ মূল্য অথবা মর্যাদা আছে। পূর্বপ্রচলিত কৃষ্ণযাত্রার ধারার সঙ্গে এই রচনাটিরই যৎকিঞ্চিৎ মিল দেখা যায়। সে মিল রয়েছে রচনাটির প্রসন্ন, নম্র ও অন্তর্গূঢ় ভক্তিভাবে, সে মিল রয়েছে রচনার নির্মল সরলতায়, সে মিল রয়েছে ছেলের দলের গানে, সে মিল রয়েছে ঠাকুরদাদার ও সন্ন্যাসী রাজার ভূমিকায়। শান্তিনিকেতনের বার্ষিক মেলায় যাত্রাগান বরাবরই হত, এবং সে উপলক্ষ্যে নীলকণ্ঠের কৃষ্ণযাত্রা অবশ্যই একাধিকবার হয়েছে। (নীলকণ্ঠ প্রায় স্থানীয় ব্যক্তি এবং তখনকার শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণযাত্রার গায়ক-অধিকারী)। নীলকণ্ঠের যাত্রা রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই শুনেছিলেন এবং তা তাঁর নিশ্চয় ভালো লেগেছিল। সুতরাং শারদোৎসব রচনার কালে কৃষ্ণযাত্রার আদর্শ তাঁর মনের কোণে থাকা কিছুমাত্র অনপেক্ষিত ও অসঙ্গত নয়। নীলকণ্ঠের প্রসিদ্ধি ছিল তাঁর গানে ও দূতীয়ালিতে। ঠাকুরদাদার ভূমিকায় হয়ত তার একটু অস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। অভিনয়ের মধ্যে শারদোৎসবের আয়োজন, সন্ন্যাসীকে কাশগুচ্ছ দিয়ে সাজানো, শারদলক্ষ্মীর বোধন, আগমনী গান, বরণ ও প্রদক্ষিণ—এই ব্যাপারগুলিতেও গীতাভিনয়ের (কৃষ্ণকালী, রাই-রাজা, ইত্যাদি কৃষ্ণযাত্রার পালায় যেমন) এবং শারদীয় দুর্গাপূজার (—এ বিষয়েও যাত্রাপালা খুব জনপ্রিয় ছিল) কথা আমাদের মনে আসে। কৃষ্ণযাত্রার রাখাল-বালক ছেলেবেলা থেকেই যে রবীন্দ্রনাথের মন টানত তা আমরা জানি। লঙ্কেশ্বরের ভূমিকাও যাত্রার কথা স্মরণ করায়। শারদোৎসবের সামান্য গল্প-বীজ রূপকথার ডালা থেকে রবীন্দ্রনাথের মনে এসেছিল। শারদোৎসবের মর্মকথাটুকুও রূপকথায় খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। "লক্ষ্মী যখন মানবের মর্ত্যলোকে আসেন, তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনী বেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন, শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে, সে খবরটি আজ ঐ উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েছি।"

শারদোৎসবের গল্পবীজ যে ধরনের রূপকথা থেকে এসেছে, তা সকলেরই জানা। রূপকথায় রাজা নিঃসন্তান পরলোকে গেলে তাঁর পাটহাতী বেরত উত্তরাধিকারী বেছে নিতে। আর রাজার সন্তান-সম্ভাবনা না থাকলে তিনি যেতেন তপস্যায় সাধু-সন্ন্যাসীর খোঁজে অথবা গুরুর আশ্রমে (—যেমন করেছিলেন কালিদাসের দিলীপ)। অথবা সন্তান পত্নীকে নির্বাসন দিয়ে থাকলে রাজা সেই সন্তানের (এবং পত্নীর) খোঁজে বেরতেন। সম্রাট বিজয়াদিত্য রাজকার্য থেকে ছুটি নিয়ে সন্ন্যাসী সেজে অজ্ঞাতবাসে বেরিয়েছিলেন খানিকটা সেই কারণে। তিনি সুরসেনের খোঁজে এবং উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর সন্ধানে পরিব্রাজক হয়েছিলেন। সুরসেন তাঁকে আনন্দ দিয়েছিলেন। সেই হারানো হৃদয়নন্দনকে তিনি খুঁজে বার করে এনে কাছে রাখবেন—এই এক উদ্দেশ্য। উপনন্দের মুখে সুরসেন নামটি শুনে সন্ন্যাসী বলেছিলেন, 'আমি তাঁর বীণা শুনবো আশা করেই এখানে এসেছিলেম।' তারপরে বলেছিলেন, 'রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই পারেন নি।' দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী খুঁজে আনা। উপনন্দকে দেখিয়ে রাজা মন্ত্রীকে বলেছিলেন, 'আমার পুত্র নেই বলে তোমরা সর্বদা আক্ষেপ করতে। এবারে সন্ন্যাসধর্মের জোরে এই পুত্রটি লাভ করেছি।' মন্ত্রী বললেন, 'বড় আনন্দ। তা ইনি কোন্ রাজগৃহে—'। রাজা, 'ইনি যে গৃহে জন্মেছেন সে গৃহে জগতের অনেক বড় বড় বীর জন্মগ্রহণ করেছেন—পুরাণ ইতিহাস খুঁজে সে আমি পরে তোমাকে দেখিয়ে দেবো।'

সুরসেনের স্নেহপুষ্ট, গোত্রপরিচয়হীন অনাথ বালক উপনন্দ রূপকথায় হত সম্রাট বিজয়াদিত্যেরই পরিত্যক্ত পত্নীর গর্ভজাত সন্তান।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

একালের কবিতা

একজন বন্ধু ডাক্তারের বাড়ি গিয়েছিলাম সেদিন।

ডাক্তার বন্ধুটি দু দিক দিয়ে একটু অদ্ভুত ব্যতিক্রম। তিনি ভালো ডাক্তার হয়েও কবিতা সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী। শুধু উৎসাহী নন তিনি নিজে কবিতা লেখেন এবং এমন কবিতা যার মানে বোঝার জন্যে দস্তুর মত মাথা খুঁড়তে হয়। কবিতায় এই অনুরাগ সত্ত্বেও তাঁর ডাক্তারী পেশায় কোনো শৈথিল্য নেই। আর সেখানে তিনি একেবারে ভিন্ন মানুষ। রোগীকে পরীক্ষা করতে তিনি বুক পিঠের বদলে মাথায় স্টেথিস্কোপ দেন না। প্রেসক্রিপশনে ওষুধের নাম কি বানান তিনি ভুল করেন না বা পরীক্ষিত জানা ওষুধের জায়গায় উদ্ভট অপরিচিত ওষুধ প্রয়োগের ঝোঁক তাঁর নেই।

আসল কথা একদিকে তিনি উগ্র আধুনিক হলেও আরেক দিকে সম্পূর্ণ রক্ষণশীল সনাতনী বলা যায়।

সনাতনী তিনি শুধু চিকিৎসা ব্যাপারেই যে নন—তাঁর বাড়ি গিয়ে সেদিন তার প্রমাণ পেয়ে প্রথমটা বেশ একটু বিস্মিতই হলাম।

ডাক্তারদেরও কখনো সখনো শয্যাশায়ী হতে হয়। কবি ডাক্তার বন্ধুকেও হঠাৎ পদস্খলন হয়ে পায়ের একটি হাড় ভেঙে যাওয়ার দরুণ কদিনের জন্যে প্লাস্টার-লিপ্ত হয়ে শয্যাশায়ী হতে হয়েছে।

সেই অবস্থায় একটু দেখা করবার জন্যে তিনি ফোনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং ডাক্তার কবির সঙ্গ অত্যন্ত উপভোগ্য বলে যথাসম্ভব দ্রুত তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম।

শয্যাশায়ী অবস্থায় বন্ধুকে দেখে করুণ মুখে এ দুর্ঘটনার জন্যে একটু সহানুভূতি জ্ঞাপন করবার চেষ্টা করেছিলাম প্রথমে। কিন্তু ডাক্তার বন্ধুর উচ্চকৌতুক হাস্যে বেশ একটু অপ্রস্তুত হতে হল।

উচ্চ হাস্যের পর বন্ধু কৌতুকসরস কণ্ঠে বুঝিয়ে দিলেন যে, সহানুভূতির বদলে তাঁকে অভিনন্দিত করা উচিত তাঁর এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের জন্যে। প্ল্যাস্টারমণ্ডিত পা ঝুলিয়ে শুয়ে থাকতে হয়েছে বলেই তিনি অন্ততঃ কয়েক দিনের ছুটি পেয়েছেন—ইচ্ছেসুখে সময় কাটাবার।

তাঁর ইচ্ছেসুখে সময় কাটানটা কি রকম তার পর মুহূর্তেই দেখতে পেলাম। তাঁর বালিশের ধারে একটি ও হাতে আরেকটি কবিতার বই।

ডাক্তার বন্ধু সম্বন্ধে ভনিতাটা হয়ত একটু দীর্ঘ হয়ে গেল কিন্তু তাঁর বালিশের ধারের আর হাতের বইদুটির নাম করলেই সে ভনিতা নেহাৎ অবান্তর বাহুল্য বলে বোধহয় মনে হবে না।

পেশাদার ডাক্তার হয়েও যিনি আধুনিক কবিতা লেখেন তাঁর বিছানায় ও হাতে কি বই থাকতে পারে তা এ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে যাঁরা পড়েছেন তাঁরা অনুমান করে ফেলেছেন নিশ্চয়।

বাংলা হলে নির্ঘাৎ সুধীন দত্ত ও জীবনানন্দ দাশ ও বিদেশী হলে যদি এজরা পাউন্ড আর সেন্ট জন পার্স না হয় ত ডাইলান টমাস আর ই ই কমিংস গোছের কিছু না হয়ে যায় না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এ অনুমান কটির একটিও সঠিক নয়। আধুনিক কবিতায় উৎসাহী পাঠক ও লেখক তাঁর আনন্দের রোগশয্যায় যে দুটি বইকে সঙ্গী করেছেন তার একটির লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অপরটির উইলিয়ম বাটলার ইয়েট্‌স।

বিস্ময়চমক এতে কিছু লাগতে পারে জেনেই সংবাদটা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ অবান্তর ভূমিকার পর নাটকীয়ভাবে উপস্থিত করবার চেষ্টা করলাম কিন্তু এ চমক দেওয়ার চেষ্টার মধ্যে আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে কোন অবজ্ঞা কি বিদ্রুপের ইঙ্গিত রাখিনি এটুকু হলফ করে বলতে পারি।

ইঙ্গিত যেটুকু আছে তা একটু বিমূঢ় জিজ্ঞাসার।

ডাক্তার বন্ধুর রুচিটাই সাধারণের মাপকাঠি এমন কথা বলতে চাই না, কিন্তু আনন্দের বা দুঃখের মুহূর্তে কিংবা কোনো অসুস্থতা কি অপটুতার শয্যায় সাধ করে আধুনিক কবিতা পড়বার মানুষ বেশী পাওয়া যাবে কি?

আমার ডাক্তার বন্ধুর বিছানায় বালিশের পাশে সেদিন ছিল রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা আর হাতে ইয়েটস-এর কবিতা-সংগ্রহ।

ইয়েটস্‌-এর যে কবিতাটি তিনি পড়ছিলেন সেটি আমার অনুরোধে ডাক্তার আবৃত্তি করে শোনালেন—

> Nor dread nor hope attend
> A dying animal;

A man awaits his end
Dreading & hoping all;
Many times he died
Many times rose again.
A great man in his pride
Confronting murderous men
Casts derison upon
supersession of breath;
He knows death to the bone.
Man has created death.

প্ল্যাস্টারে জমানো ভাঙা পা ঝুলিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়েছে বলে ডাক্তারের মনে সত্যিই মৃত্যুচিন্তা কিছু প্রবল হয় নি যে খুঁজে পেতে ওই কবিতা বার করে পড়ে নিজেকে সাহস দেবার দরকার হয়েছিল। কথার পিঠে যেমন কিছুটা অসংলগ্নভাবেও কথা আসে, বিছানায় শায়িত অবস্থায় অসহায় পঙ্গুত্ব থেকে হয়ত তেমনি মনটা চলে গেছে দুঃখ আঘাত আর মৃত্যু নিয়ে জল্পনায়।

ইয়েটসের আগে রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা থেকে যে কবিতাটি তাঁর মনকে টেনে রেখেছিল ডাক্তারবাবু মুখে মুখেই তারও শেষ কটি লাইন আউড়ে গেলেন। অতি পরিচিত একটি গানের শেষ দুটি ছত্র:—

এসো দুঃসহ এসো এসো নির্দয়
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল এসো এসো নির্ভয়
তোমারি হউক জয়।
প্রভাত সূর্য এসেছ রুদ্র সাজে—
অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে—
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারই হউক জয়।

রবীন্দ্রনাথের এ গানটির সঙ্গে ইয়েটস-এর কবিতাটির কোনো সুদূর আত্মীয়তা বার করা বেশ গবেষণাসাপেক্ষ। কবিতা দুটি পর পর শুনে কেমন করে মনের কি রহস্য প্রক্রিয়ায় একটি আর একটিতে পৌঁছে দিল, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমি কিন্তু উদগ্রীব হই নি, আমাকে তখন ভাবিয়ে তুলেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রশ্ন।

আমার ডাক্তার বন্ধু না হয় এক বিরল ব্যতিক্রম। হুঁসিয়ার হিসেবী ডাক্তার হয়ে তিনি আধুনিক কবিতা লেখেন আর আধুনিক কবিতা লিখলেও অবসর উপভোগের সময় যা পড়েন তা অন্ততঃ আধুনিক কবিতা নয়।

কিন্তু তাঁর কথা বাদ দিয়েও সাধারণ ক'জনের কথা ভাবতে পারি যাঁরা মনের নানা অবস্থার সঙ্গে সুর মেলাবার জন্যে আধুনিক বলতে যা বোঝায় তেমন কবিতা নিজে থেকে খুঁজে পড়েন? পড়ার চেয়েও যা বড় কথা, বিনা চেষ্টায় তাঁদের মনের মধ্যে কখনো আধুনিক যাকা' কোনো কবিতা আপনা আপনি গুঞ্জন করে ওঠে কি!

'Now leave me, I am going alone. I shall go forth, for I have business: an insect awaits me to negotiate. I have joy of the great eye with facets angular, unforeseen like the cypress fruit, or else I have a union with the blue-veined stones: and you leave me likewise, seated in the friendship of my knees.

কিংবা—

Never until the mankind making!
Bird and beast and flower
Fathering and all humbling
darkness.
Tells with silence the last
light breaking
And the still hour
Is come of the sea tumbling
in harness
And I must enter again the round
Zion of the water bead.
And the synagogue of the
ear of corn.
Shall I let pray the shadow of
a sound
Or sow my salt seed
In the least valley of sack cloth
to mourn
The majesty and burning of the
child's death

এ রকম কবিতা মনের মধ্যে একটু নাড়াতেই বেজে ওঠবার জন্যে নিজের অগোচরে সঞ্চিত হয়ে বোধ হয় থাকে না।

বাংলা কবিতা বুঝে-শুনেই বাদ দিয়ে যে দুটি উদাহরণ দিয়েছি, তার একটি ইংরেজী কাব্যজগতে বলতে গেলে এই সেদিন রীতিমত উত্তেজনার তুফান-তোলা একজন কবির লেখা। অপরটির লেখক ইংরেজ নয়, বিদগ্ধ বিশেষ সুপরিচিত একজন ফরাসী কবি। তাঁর কবিতাটির অনুমোদিত ইংরাজি অনুবাদই তুলে দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছে করেই দুজনের কারুর নাম এখানে জানালাম না।

কবিতাগুলি উদ্ধৃত করার মধ্যে বিদ্রূপ করবার বা নিজস্ব কোনো ধারণায় ইঙ্গিত দেবার বিন্দুমাত্র উদ্দেশ্য নেই। আছে শুধু আগেই যা [illegible] সেই একটু সংশয়বিমূঢ়তা।

কবিতা যে শুধু শোকে সান্ত্বনা, বিপদে সাহস, কি দুঃসাধ্য ব্রতে উদ্দীপনা যোগাবার জন্যে লেখা হয় না, আমাদের মনমেজাজের সঙ্গত করাতেই যে তার একমাত্র সার্থকতা নয়, এ কথা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবার পরও বেয়াড়া প্রশ্নটা মনের মধ্যে একটা খোঁচা হয়েই থাকে।

আধুনিক সাবেকী যা-ই হোক কবিতা মাত্রেরই মনের মধ্যে সুর হয়ে ওঠার একটা বিশেষ দায় কি নেই?

ভক্ত, স্তাবক, সমালোচক প্রচারকেরা সাড়ম্বর অভিষেকে যত উঁচু মঞ্চেই ঠেলে তুলুক না কেন, নিভৃত হৃদয়ের ঝংকারে না মিশে যেতে পারলে কোনো কবিতা এক দণ্ডও কি সত্যি করে বাঁচে।

॥ আমাদের বিশিষ্ট প্রকাশন ॥

• উপন্যাস •

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- দত্তা ৩·৫০
- বিপ্রদাস ৫·০০

অন্নদাশঙ্কর রায়
- অসমাপিকা ৩·০০
- বিশল্যকরণী ৫·০০

বুদ্ধদেব বসু
- যেদিন ফুটলো কমল ৪·০০
- শোণপাংশু ৪·০০
- রাত ভ'রে বৃষ্টি ৫·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
- মনুস্বাদশ ৩·৫০

প্রবোধকুমার সান্যাল
- মনে রেখ ৬·৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
- মেঘের উপর প্রাসাদ ৭·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
- এবার প্রিয়ংবদা ৬·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
- অনিমিত্তা ৪·৫০

মণীন্দ্রলাল বসু
- এষণা ২·৫০

আশাপূর্ণা দেবী
- দিনান্তের রঙ ৬·৫০

বিমল মিত্র
- অন্যরূপ (২য় সং) ৫·৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
- বসুন্ধরা ৩·০০

সুশীল রায়
- ত্রিনয়না ৫·০০

দীপক চৌধুরী
- পাতালে এক ঋতু : ১ম ৬·০০
- শঙ্খবিষ ৫·৫০

'দীপঙ্কর'
- আঁধার অন্তরে ৬·০০

• প্রবন্ধ ও আলোচনা •

রাজশেখর বসু
- লঘুগুরু (৩য় সং) ৩·০০
- কালিদাসের মেঘদূত ২·৫০

অন্নদাশঙ্কর রায়
- দেখা ৩·০০ ॥ অপ্রমাদ ৩·০০

হুমায়ুন কবির
- দিল্লী ওয়াশিংটন মস্কো ৩·০০

বুদ্ধদেব বসু
- সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ ৫·০০

ভবানী মুখোপাধ্যায়
- বিশ্বসাহিত্যের লেখক ৫·০০

• সংকলন •

সুধীরচন্দ্র সরকার
- কথাগুচ্ছ (৪র্থ সং) ১২·৫০
- পৌরাণিক অভিধান ১০·০০
- জীবনী-অভিধান ৬·০০

বিশু মুখোপাধ্যায়
- রবীন্দ্র-সাগর সঙ্গমে ১০·০০

• কাব্যগ্রন্থ •

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
- কাব্য-সঞ্চয়ন (১১শ সং) ৭·০০

বুদ্ধদেব বসু
- দময়ন্তী দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা ৪·০০
- যে আঁধার আলোর অধিক ৩·০০
- হোল্ডার্লিনের কবিতা (অনুঃ) ৩·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
- অথবা কিন্নর ৩·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
- আজন্ম সুরভি ৩·০০

বিষ্ণু দে
- একশ বাইশ ৮·০০
- আলেখ্য ২·৫০

মণীন্দ্র রায়
- রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা ৩·০০
- সংকলিত কবিতা ৪·০০

• গল্প-সংগ্রহ •

বুদ্ধদেব বসু
- ভাসো, আমার ভেলা ১২·০০

সুবোধ ঘোষ
- ফসিল (৫ম সং) ৩·৫০

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- চিত্রালী ৬·০০

তুষারকান্তি ঘোষ
- বিচিত্র কাহিনী ২·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
- রাঙা ধুলো ৩·০০

ভবানী মুখোপাধ্যায় অনূদিত
- জার্মানীর ছোট গল্প ৬·০০

• জীবনী •

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
- বীরেশ্বর বিবেকানন্দ : ১ম ৫·০০
- —ঐ— ২য় ৫·০০

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
- কেনেডী (অনুঃ) ৩·০০

• ভ্রমণ-কাহিনী •

অন্নদাশঙ্কর রায়
- ফেরা ৫·৫০
- জাপানে (২য় সং) ৭·০০
- পথে প্রবাসে (১০ম সং) ৪·০০

বুদ্ধদেব বসু
- দেশান্তর ১০·০০
- জাপানি জর্নাল ৩·৫০

অপূর্বরতন ভাদুড়ী
- মন্দিরময় ভারত : ১ম ৫·০০
- ঐ ৩য় ১২·০০

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত
- হামেশা বাহার ৭·০০

বন্দনা গুপ্ত
- দ্বীপমালার দেশে ৩·০০

সুরেশচন্দ্র সাহা
- মালয় থেকে মালয়েশিয়া ৪·০০

শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাস
- হিমবাহ পথে বদ্রীনারায়ণ ৫·০০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বুদ্ধদেব বসু

উপন্যাসের রূপান্তর

কবিতা ও নাটকের তুলনায় উপন্যাস একটি অর্বাচীন শিল্প; 'কাদম্বরী' বা 'গেঞ্জি-কাহিনী', রাব্লে বা সেরভান্তেস-এর উদাহরণ সত্ত্বেও আমাদের মানতে হবে যে একালে আমরা উপন্যাস বলতে যা বুঝি, তার উদ্ভব হয়েছিলো আঠারো-শতকের য়োরোপে, জন্মস্থল ইংলণ্ড বললে ঐতিহাসিক অর্থে ভুল হয় না। ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে, জর্মানিতে, রাশিয়াতে, আমেরিকায়, এমন কি বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থিত এক গাঙ্গেয় ভূমিতে, যেখানে প্রায় এক হাজার বছর ধ'রে পদ্যাকারে ভিন্ন সাহিত্য রচিত হয়নি : দেখতে-দেখতে এই সাহিত্যরূপ জগৎ জয় ক'রে নিলে। এর সহযোগী হ'লো যন্ত্রযুগ, সাংবাদিকতা, সাক্ষরতার বিস্তার, শ্বেতাঙ্গ মানুষের সাম্রাজ্যবিস্তার; এর দ্বারা অধিকৃত হলেন উনিশ শতকের বহু মেধাবী পুরুষ ও নারী, দেশে-দেশে আবালবৃদ্ধবণিতা অভিভূত হ'লো। এর বৃদ্ধির বেগ লক্ষ ক'রে উনিশ-শতকে কেউ-কেউ কবিতার মৃত্যু আশঙ্কা করেছিলেন, যেমন বিশ শতকের তৃতীয় দশকে চলচ্চিত্র যখন মুখর হ'লো, তখনও অনেকে ভয় পেয়েছিলেন রঙ্গমঞ্চ না লুপ্ত হ'য়ে যায়। কবিতা অবশ্য মরেনি, নাটকও দিব্যি বেঁচে-ব'র্তে আছে; কিন্তু আজকের দিনে অধিকাংশ মানুষ অধিকাংশ সময় ছাপার অক্ষরে যা প'ড়ে থাকে, তার মধ্যে (সংবাদপত্র বাদ দিয়ে) অধিকাংশই উপন্যাস। সত্য, দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে সহজ ক'রে লেখা নাতিদীর্ঘ জ্ঞান-গর্ভ বইও পাশ্চাত্য জগতে 'বেস্ট-সেলার' রূপে চিহ্নিত হয়েছে, তবু, যা নেহাৎই ছাপার অক্ষরে পাঠ্যবস্তু, নাটকের মতো দৃশ্য নয়, গানের মতো শ্রাব্য নয়, তার মধ্যে উপন্যাসের আধিপত্য এখনো তর্কাতীত।

এ-কথাও সত্য যে মাত্র দু-শো বছরের মধ্যে উপন্যাস যে-ভাবে বিকশিত, পল্লবিত, বিবর্তিত, সম্প্রসারিত ও রূপান্তরিত হয়েছে, তা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এই দ্রুতির একটি কারণ সহজেই অনুমেয় : কবিতা ও নাটক, তাদের প্রাচীনতা ও বহুযুগব্যাপী ঐতিহ্যের জন্য, কতগুলো সনাতন আদর্শের প্রভাব কাটাতে পারে না; তাদের আধুনিকতাও অনেক সময় পুরাতনের নবকলেবর; হুইটম্যানে আমরা ইহুদি পুরাণের ছন্দ শুনতে পাই, বেকেটের নাটকে গ্রীক ট্র্যাজেডির রূপায়ণ-শিল্প লক্ষ করি। কিন্তু উপন্যাসের কোনো স্থির বা আবহমান আদর্শ নেই—অন্তত এখনো গড়ে ওঠেনি; তাতে পরীক্ষার সুযোগ কবিতা ও নাটকের তুলনায় প্রচুরতর, অরণ্য কেটে পথ তৈরি করার সম্ভাবনা আজ পর্যন্ত নিঃশেষিত হয়নি। পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসে এমন সব উদাহরণ জ'মে উঠেছে যা চকমপ্রদভাবে [illegible]পরের প্রতিবাদ।

সাধারণভাবে যাকে বাস্তবতা বলা হয়, আসলে যা বাস্তবতার রচিত প্রতিভাস, তারই খুঁটিতে উপন্যাসের বিজয়ধ্বজা প্রথম উড়েছিলো। স্মর্তব্য, উপন্যাসের ভাষা (অন্তত আপাতদৃষ্টিতে) সর্বসাধারণের মুখে-মুখে ব্যবহৃত দৈনন্দিন গদ্য; সে আমাদের কাছে দাবি করে না (অন্তত আপাতদৃষ্টিতে) ছন্দের কান বা কোনো বিশেষ বিদ্যা বা শৈলীচেতনা; অন্তত উপন্যাস বিষয়ে এইটেই সর্বাধিক প্রচলিত ধারণা, এবং তার বিপুল জনপ্রিয়তার এও একটা প্রধান কারণ। খুব সহজ ক'রে বলা যায় যে সেই উপন্যাসই প্রায় সর্বশ্রেণীর পাঠকের পক্ষে নির্বিঘ্নে ও অব্যবাহিতভাবে উপভোগ্য, যাতে আছে উজ্জ্বল চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, আর এমন একটি সুসংবদ্ধ কাহিনী, যা তার [illegible]-

বোধ্যতার গুণে পাঠকের মনে 'জীবন' ব'লে প্রতিভাত হয়। এই শ্রেণীর উপন্যাসই ছিলো ঊনিশ শতকের আদর্শ, এবং সকলেই মানবেন যে এর একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি'। একটি অস্থির, অধৈর্যহীন, নিশ্চিন্ত, গতি, বহু দ্বন্দ্বের অন্তরালবর্তী স্থৈর্য, চরিত্রগুলির ভাস্কর্যোপম ঘনতা, চরিত্র ও ঘটনাবলির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য, পাঠকের চঞ্চল চিত্তকে নিবিষ্ট করার অব্যর্থ ও আপাতচেষ্টাহীন ক্ষমতা। এই সব গুণ লক্ষ ক'রে উপন্যাসটিকে অনেকেই বলেছেন প্রাচীন এপিকের আধুনিক প্রতিরূপ। পুস্তকটির একটি মৌলিক লক্ষণে ঊনিশ-শতকী অনেক উপন্যাসই সমৃদ্ধ, যদিও লেখকদের মধ্যে প্রকরণে ও জীবনদর্শনে ব্যবধান অনেক ক্ষেত্রে দুস্তর। সেই লক্ষণটি হ'লো যাকে বলে 'গল্পের টান', যার ফলে পাঠকের আগ্রহ শেষ পর্যন্ত সজীব থাকে। ডিকেন্স ও বালজাক, পিতা-দ্যুমা ও মার্ক টোয়েন, স্তাঁদাল ও ডস্টয়েভস্কি : জাতে-গোত্রে মিল না থাকলেও এঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্নভাবে প্লটের কারুকর্মী।

কিন্তু ঊনিশ শতকেই লেখা হয়েছিলো 'মাদাম বভারি' ও 'মোবি ডিক' : প্রথমটি বাস্তবপন্থার চরম নমুনা, দ্বিতীয়টিকে সামুদ্রিক অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনীও বলা যায়, অথচ কোনোটিই 'সুখপাঠ্য' নয়, সাধারণ পাঠকের অধিগম্য কিনা তাও সন্দেহ। তাছাড়া, বালজাক, ও আরো বেশি ডস্টয়েভস্কিকে বলা যায় অংশত মিস্টিক; এমনকি ফ্লোবেয়র, যিনি খড়ে-পোরা কাকাতুয়ার নির্ভুল বর্ণনা লেখার জন্য জাদুঘর থেকে একটি নমুনা আনিয়ে লেখার টেবিলে রেখে দিয়েছিলেন, তিনিও, সেইন্ট জুলিয়েনের কাহিনী লিখতে গিয়ে, অলজ্জভাবে অতিপ্রাকৃতকে স্থান না-দিয়ে পারেননি। মুহূর্তের জন্য উপন্যাস থেকে নাটকে চোখ ফেরালে আমরা দেখতে পাবো, বাস্তবতার অবক্ষয়ের বীজ কেমন তার নিজেরই মধ্যে লুকোনো ছিলো (যেমন ছিলো ধ্রুপদী রীতি বা রোমান্টিকতায়); দেখতো পাবো, [illegible]ন ক'রে সমাজ-সমালোচক হেনরিক ইবসেন ধীরে-ধীরে হ'য়ে উঠলেন স্বাপ্নিল, সাংকেতিক, রহস্যময়। বললে নেহাৎ ভুল হয় না যে 'বুনো হাঁস' থেকে 'আমরা মৃতেরা যখন জেগে উঠি' পর্যন্ত নাটক-পর্যায়ে ইবসেনের যা চরিত্রলক্ষণ, তা-ই আরো বলীয়ান ও বিচিত্র ও দূরস্পর্শী হ'য়ে উঠলো বিশ শতকের উপন্যাসে, যার প্রতিভূস্বরূপ আমি চারটি ভিন্ন দেশের চারজন লেখককে বেছে নিচ্ছি : জেমস জয়স, টোমাস মান, মার্সেল প্রুস্ত ও ফ্রানৎস কাফকা।

বিপ্লব নয়, বিবর্তন; বিদ্রোহ নয়, ক্রমবিকাশ। উল্লিখিত চারজনের মধ্যে প্রথম তিনজন আপাতিকভাবে বাস্তবপন্থাকে অস্বীকার করেননি। জয়স ও মান-এ কিয়ৎ পরিমাণে অতিপ্রাকৃতের উপস্থিতি সত্ত্বেও, মোটের উপর বলা যায় যে, বর্ণনার যাথার্থ্যে ও অনুপুঙ্খে তাঁরা 'মাদাম বভারি'র স্রষ্টার প্রতিযোগী। কাফকাতে, এবং কিছু পরিমাণে টোমাস মান্-এও ডিকেন্সতুল্য হাস্যরস পাই আমরা, পাই ডস্টয়েভস্কির মতো অপরাধ ও আতঙ্কের দিকে উন্মুখতা: এবং যাকে সমাজচেতনা বলা হয়, অর্থাৎ দেশ, কাল ও অবস্থার সামগ্রিক উপলব্ধি, তাতে মান্ হয়তো বালজাক ও টলস্টয়ের সমকক্ষ। কিন্তু তবু—এই সবই ব্যবহৃত হচ্ছে ভিন্নভাবে, অন্য এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এঁদের অভিপ্রায় ভিন্ন, পদ্ধতি ভিন্ন, পাঠকের মনের উপর অভিঘাতও অন্য রকম। এঁরা এবং এঁদের সহযোগীরা উপন্যাসের যে- রূপান্তর ঘটিয়েছেন, তা বিশ শতকের প্রথমার্ধের একটি প্রধান কীর্তি।

দৈবক্রমে টোমাস মান্-এর যে-উপন্যাসটি আমি প্রথম পড়েছিলুম, তা সদ্য-প্রকাশিত 'ডক্টর ফাউস্টুস'। আরাম নয়, সুখ নয়, টলস্টয়ের সচ্ছলতা বা ডস্টয়েভস্কির উত্তেজনা নয় — রীতিমতো কষ্ট, খাটুনি, দেড়পাতা-জোড়া দীর্ঘ জটিল পার্শ্বোক্তি-বহুল বাক্য ও দশ-পাতা-জোড়া এক-একটি অনুচ্ছেদের ব্যূহ পেরিয়ে-পেরিয়ে শম্বুক-গতিতে অগ্রসর হ'তে হয়েছিলো। সাধারণ অর্থে যাকে বলে সাস্পেন্স বা উৎকণ্ঠা, তার চিহ্নমাত্র নেই; তবু যেন কোথায় আছে এক আকর্ষণ, সূক্ষ্ম, অন্তর্লীন, দূরাগত বংশীধ্বনীর মতো, এক অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি অতি ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। পিছনের পাতা উল্টে কোনো তথ্য মিলিয়ে নিতে হচ্ছে মাঝে-মাঝে, যা তুচ্ছ ভেবেছিলাম তাতে কোনো আশাতীত অর্থ ধরা পড়ছে; পড়া হ'তে-হ'তে, পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছেদে, যেন বদলে যাচ্ছে বইখানা। পড়া শেষ হ'লো : কী পেলাম? জীবন-চিত্র? সমকালীন সমাজচিত্র? নাৎসি-বিরোধী প্রচার? শিল্পসৃষ্টির তত্ত্বকথা? এই সব, এবং আরো অনেক-কিছু, এবং সব উপাদান ছাড়িয়ে অন্য কিছুও। উপন্যাসটি স্তরবহুল, স্তরগুলি পরস্পর-সম্পৃক্ত: আমাদের মনে তার পূর্ণ অভিঘাত তখনই ঘটে, যখন শেষ ক'রে উঠে আমরা চিন্তা করি তা নিয়ে, আবিষ্কার করি লেখকের পরিকল্পনা, পদ্ধতি, কলাকৌশল, বহু প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ও চাতুরী। গল্পের টান নয়, শিল্পিতার টান, সৃষ্টিশীল প্রোজ্জ্বল প্রতিভার অদম্য আকর্ষণ। জয়সের 'ইউলিসিস' প'ড়ে, প্রুস্ত-এর বারো খণ্ড 'হারানো দিনের সন্ধান' প'ড়ে, একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয় আমাদের। 'যুদ্ধ ও শান্তি'র পিছনে টলস্টয় অন্তর্হিত, ট্রজান যুদ্ধের সময়ে জেয়ুসের মতো সুদূরবর্তী ও উদাসীন; কিন্তু এঁরা যেন মহাভারতের কৃষ্ণের মতো আপন সৃষ্টির মধ্যে লিপ্ত হ'য়ে আছেন, আমরা প্রতি মুহূর্তে তাঁদের উপস্থিতি অনুভব করি—দক্ষ, চতুর, ইচ্ছাময়, পক্ষপাতী।

সংক্ষেপে বলা যায় বিশ শতকের উপন্যাস কবিতার সমগ্র অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছে। বক্রোক্তি, চিত্রকল্প, প্রতীক: সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক

উল্লেখ; পূর্বসূরিদের ব্যঙ্গানুকৃতি; লেখকের স্বগতোক্তি ও ভাবনা; ভাষার সচেতন ও অতিসূক্ষ্ম কারুশিল্প; বোদলেয়ার-কথিত সাদৃশ্যস্থাপন ('অ্যানালজি') ও প্রতিষঙ্গ 'করেসপণ্ডেন্স'), র‍্যাঁবো-কথিত ইন্দ্রিয়সমূহের সচেতন বিশৃঙ্খলাসাধন; শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক : কবিতার এমন কোনো কৌশল নেই, যা আধুনিক উপন্যাসে বিপুলভাবে বিজয়ীভাবে ব্যবহৃত হয়নি। উপরন্তু, জয়েস, মান ও প্রুস্ত তাঁদের মননশীলতা ও বিদ্যাবত্তাকেও রচনার উপাদান হিশেবে ব্যবহার করেছেন; তাঁদের উপন্যাসের বহু অংশ রীতিমতো প্রাবন্ধিক; ধর্ম, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলা নিয়ে বিশ্লেষণ ও তত্ত্বালোচনা। আর-এক কথা : গ্রন্থগুলির আকার ও ব্যাপ্তির তুলনায় 'ঘটনা'র অংশ অকিঞ্চিৎকর।

উপন্যাসের পাঠক ও পাঠিকারা অনেকেই খুব সংগতভাবে ব'লে থাকেন, 'সে-বই প'ড়েই সবচেয়ে আরাম পাওয়া যায়, যার পাত্রপাত্রীরা আমাদেরই ঘরের লোক, আমরা দেখামাত্র যাদের চিনতে পারি।' (বাংলা দেশে শরৎচন্দ্রের অক্ষয় জনপ্রিয়তা ও 'ঘরে বাইরে' থেকে 'মালঞ্চ' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আপেক্ষিক অনাদরের এইটেই কারণ।) কিন্তু এই আদর্শে বিচার করলে উপরোক্ত লেখকত্রয়ের একজনও উঁচু নম্বর পাবেন না। অসামান্য বা অস্বভাবী বা বিকারদুষ্ট মানুষের প্রতি এঁদের পক্ষপাত স্পষ্ট। জয়সের স্টিভেন ডেডেলাস লেখক বা লেখক হ'তে চাচ্ছে; মার্সেল প্রুস্তের নায়কও তাই, মান্-এর লেফেরকুন্ গীতস্রষ্টা, টোনিও ক্রোগার ও আশেনবাখ সাহিত্যিক, আর ধূর্ত কিতব ফিলিক্স ক্রুল শিল্পীরই ব্যঙ্গচিত্র, অপরাধ ও শিল্পকর্মের সমীকরণ। প্রুস্তের কুশীলবদের মধ্যে একজন ঔপন্যাসিক (সম্ভবত আনাতোল ফ্রাঁস), একজন চিত্রকর (সম্ভবত ইম্প্রেশনিজম-এর প্রবর্তক ক্লোদ মনে), আর একজন গীতস্রষ্টা (সম্ভবত স্যাঁ-স্যাঁজ) : এঁদের উপস্থিতি সুচিন্তিত ও উদ্দেশ্যময়। তাছাড়া, এঁদের কোনো চরিত্রকেই ঠিক 'সাধারণ' মানুষ বলা যায় না; এমনকি এঁদের নায়িকারাও 'যুদ্ধ ও শান্তি'র নাটাশার মতো গা ভাসিয়ে দেয় না ঘটনা-স্রোতে; মলি ব্লুম, মাদাম শোশা, সমকামী আলবের্তিন, এদের সকলেরই জীবন সচেতন ও স্বপরিকল্পিত। উপন্যাসের যারা সম্ভাব্য পাঠক, যারা চাকরি করে, সংসার চালায়, সন্তান বড়ো ক'রে তোলে—তাদের সঙ্গে এই সব মানুষের আপাতিক সাদৃশ্য প্রায় কিছুই নেই : অথচ, কোনো গভীরতর স্তরে, এদেরই মধ্যে আমাদের সব অব্যক্ত ও অকথ্য আকাঙ্ক্ষার উচ্চারণ যেন শোনা যাচ্ছে। অন্য একটি সামান্য লক্ষণেও এই তিনজন একসূত্রে বাঁধা, তা হ'লো সময় বিষয়ে এমন একটি চেতনা যা পাশ্চাত্ত্য দেশে অভিনব (শুনতে পাই আইনস্টাইনের বিজ্ঞান ও বের্গস'র দর্শনের ফলশ্রুতি), কিন্তু ভারতবর্ষীয় হিন্দুর কাছে চির-পুরাতন। উপন্যাসে কালক্রমের যে-সুস্পষ্ট অগ্রগতিতে আমরা অভ্যস্ত, তাকে এঁরা লঙ্ঘন করেছেন : প্রুস্ত-এ, মান্-এর 'ফাউস্টুস' ও য়োসেফ-পর্যায়ে (যেমন মহা-ভারতেও অনেক সময়, বিশেষত 'ভগবদ্-গীতা' অধ্যায়ে) অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ভেদরেখা স্পষ্ট থাকে না, আমরা মাঝে-মাঝেই অনুভব করি একটা ঘটনা পৌনঃপুনিকভাবে ঘ'টে যাচ্ছে। 'ইউ-লিসিসে' চিত্রিত হয়েছে মানবজাতির বহু-যুগব্যাপী অভিজ্ঞতা, কিন্তু তার যথার্থ ঘটনাকাল চব্বিশ ঘণ্টা। তেমনি প্রুস্তের উপন্যাস যখন শেষ হ'য়ে আসছে ঠিক তখনই, উপন্যাসের মধ্যে, উপন্যাসের বক্তা বা 'আমি' তার বহুকাল-পরিকল্পিত বই-খানা লিখতে শুরু করার সংকল্প নিলো। 'In my beginning is my end.' হিন্দু-বৌদ্ধ দর্শনে অনুপ্রাণিত এলিয়টের সময় বিষয়ে যা ধারণা, মূলত এঁদেরও তা-ই।

'অদেসী'রই অনুলিখন হ'লো 'ইউলিসিস', কিন্তু হোমর-ভক্ত টলস্টয় জয়স প'ড়ে খুশি হতেন না। টলস্টয়, যিনি শেক্সপীয়রকে কবি ব'লেই গণ্য করেননি, আর ডস্টয়েভস্কি প'ড়ে বলেছিলেন, 'এসব লম্পট, ইডিয়ট, অ্যাডোলেসেন্ট—এদের কোনো মানেই হয় না। জীবন অতি সহজ, সরল—', যাঁর কাছে হোমর ছিলেন 'সাক্ষাৎ প্রকৃতি', জয়সের জটিলতা, অশ্লীলতা, অস্বাভাবিকতা তাঁর দুঃসহ মনে হতো। না-বললেও চলে, উপন্যাস বিষয়ে একটি নতুন ধারণার আমরা সম্মুখীন হচ্ছি এখানে; তার উনিশ-শতকী কাঠামোকে ভেঙে ফেলা হয়েছে, বা গালিয়ে ফেলা হয়েছে, তাতে ধরানো হচ্ছে এমন অনেক বিষয় বা উপাদান, যা ইতিপূর্বে উপন্যাসের পক্ষে অবান্তর বা অশিষ্ট ব'লে গণ্য ছিলো। প্রুস্তের প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প'ড়ে প্যারিসের এক প্রকাশক বলেছিলেন, 'যে-লোক ঘুমিয়ে পড়ার জন্য চল্লিশ পৃষ্ঠা কাটিয়ে দেয়, তার বই ছাপাই কী করে?' '...তার বই পড়ি কী ক'রে?' অনেক পাঠকের দিক থেকেও একই আপত্তি ওঠা সম্ভব। প্রতি খণ্ডে, পাতার পর পাতা জুড়ে, প্রুস্ত তৃপ্তিহীনভাবে এবং হয়তো বা অনুকম্পায়ী পাঠকের পক্ষেও ক্লান্তিকরভাবে তত্ত্বালোচনা ক'রে গেছেন : সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত, ক্যাথিড্রেল-স্থাপত্য, এই চারটি প্রসঙ্গ অবিরলভাবে পুনরুক্ত; তাছাড়া আছে 'নিদ্রা' নামক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা, 'স্মৃতি' নামক মানবিক বৃত্তির বিশ্লেষণ, প্রেমের বিভিন্ন অবস্থার আণুবীক্ষণিক ব্যবচ্ছেদ। তেমনি, জয়সও এক-একটি সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদ কাটিয়ে দেন শেক্সপীয়র সংক্রান্ত আলোচনায়, বা এলিজাবেথীয় যুগ থেকে তাঁর স্বকাল পর্যন্ত প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য ইংরেজি গদ্যলেখকের ব্যঙ্গানুকৃতি রচনা ক'রে। আর মান্-এর 'মায়াবী পর্বত' উপন্যাসটিকে তো বিতর্কের এক বৃহদরণ্য বললে ভুল হয় না। যেখানে 'যুদ্ধ ও শান্তি'তে আমরা পর-পর পাচ্ছি মদ্যপান, প্রণয়-লীলা, নেকড়ে শিকার, পারিবারিক দৃশ্য, সামরিক দৃশ্য, মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্ব ও সামঞ্জস্য—অর্থাৎ, স্পর্শসহ বাস্তব ঘটনা, সেখানে 'মায়াবী পর্বত'-এ এক গোঁড়া জর্মান রোমান ক্যাথলিক ও একটি মানবধর্মী ইটালিয়ান যুক্তের যাবতীয় বিষয় নিয়ে অনবরত [illegible] ক'রে যাচ্ছে। কী ঘটছে এই উপন্যাসে? কিছু কি ঘটছে? হান্স কাস্টর্প নামে একটি যুবক যক্ষ্মা সারাতে সুইৎসার্ল্যাণ্ডের এক আরোগ্য-শালায় এলো; কিন্তু তার অজান্তে ঐ আরোগ্যশালা হ'য়ে উঠলো তার বিদ্যালয়: ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাপ্থা-সেতেম্ব্রিনির তর্ক শুনে-শুনে চিকিৎসকদের বক্তৃতা শুনে-শুনে, একটি অসতী রহস্যময়ী রুশ রমণীকে শুধু দৃষ্টির দ্বারা ভালোবেসে, এক ধনী, স্বল্পশিক্ষিত ওলন্দাজি ব্যবসায়ীর উষ্ণ ও উদার হৃদয়ের সংস্পর্শ পেয়ে : এই সব মানসিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই কাস্টর্প হ'য়ে উঠলো 'শিক্ষিত', জীবনযোগ্য—যে-অবস্থায় পৌঁছবার জন্য টলস্টয়ের পিটার বেজুহভকে পেরোতে হয়েছিলো এক বিচিত্র ও চমকপ্রদ ঘটনা-পর্যায়। মার্সেল প্রুস্তের উপন্যাসটির বক্তাও রোগশয্যায় শুয়ে-শুয়ে চেষ্টা করছে তার অতীতকে ফিরে পেতে, তার সব

অভিজ্ঞতাকে অর্থ, রূপ, সংহতি দিতে : এইটুকুই ঐ সুদীর্ঘ গ্রন্থের 'ঘটনা'। অর্থাৎ, এ'দের পক্ষে পুরো বহির্জগৎটাই মানুষের মনের চিত্রকল্প; সব প্রধান ঘটনা ঘ'টে যাচ্ছে মনের মধ্যে, বাইরে যা-কিছু দেখা যাচ্ছে বা শোনা যাচ্ছে, সব তারই প্রতিফলন ও প্রতিধ্বনি। জ্ঞান ও মননকেও এই লেখকেরা ইন্দ্রিয়ের মতো ব্যবহার করছেন; তাই এ'দের বিতর্ক, তত্ত্বকথা, আলোচনা—এ-সব কিছুই অবান্তর নয়, এগুলিও অভিজ্ঞতা, উপন্যাসের অন্তরঙ্গ, রচনার একটি আয়তন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহার্য 'সমালোচনা' নয়—এগুলি সপ্রাণ, বক্তা ও শ্রোতাদের আবেগের দ্বারা রঞ্জিত, জীবন দ্বারা অনুভূত; কখনো শেক্সপীয়র, কখনো শিলার, কখনো বালজাক, কখনো ভের্মের বিষয়ে চিন্তা ক'রে বা কথা ব'লে কুশীলবেরা তাদের ব্যক্তিত্বকেই প্রকাশ করছে, ঠিক যে-ভাবে ব্রন্স্কি তার ব্যক্তিত্বকেই প্রকাশ করেছে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, বা রস্টভ নেকড়ে-শিকারের উত্তেজনায়। ঘটনার বিবরণী নয়, ঘটনার যা হেতু ও ফলাফল, সেই সব অনুভূতি ও চিন্তারও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ না ক'রে তৃপ্ত হন না এ'রা; যে-শৃঙ্খলে এ'দের কাহিনীগুলি সংবদ্ধ থাকে, তা অনুক্রমিক অন্তর্বীক্ষণে তৈরি। না-মেনে উপায় নেই, এই মননধর্মিতা অনেকের পক্ষেই ক্লান্তিকর; এবং এ-সব গ্রন্থ যথোচিতভাবে উপভোগ করতে হ'লে, পাঠককেও হ'তে হবে বিদগ্ধ, পরিশ্রমী, ভাবুক, শৈল্পীচেতন, এমনকি অলংকার-শাস্ত্রে কিছুটা অভিজ্ঞ। মানতেই হবে, এই লেখকদের আবেদন ডিকেন্স বা বালজাকের মতো সার্বজনীন নয়; এ'দের হাতে প'ড়ে উপন্যাস তার প্রত্যক্ষতা ও সহজবোধ্যতার গুণ কিছু পরিমাণে হারিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এও আমরা মানতে বাধ্য যে উনিশ শতকে বাস্তবতার পূর্ণ বিকাশ ও অবক্ষয় ঘ'টে যাবার পরে উপন্যাসকে এ'রাই দিয়েছেন নবজীবন, নতুন দেশ জয় করেছেন তার জন্য, অনেক নিষিদ্ধ বা অজ্ঞাত দ্বার উন্মোচন ক'রে উপন্যাসের সম্ভাবনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। অতএব এ'দের দুরূহতা শ্রদ্ধেয়; এ'দের মধ্যে প্রবেশ করাতে হ'লে যেটুকু পরিশ্রম আমাদের করতে হয়, সে-তুলনায় অনেক বেশি এ'রা ফিরিয়ে দেন।

জয়স, প্রুস্ত ও টোমাস মান্-এ অন্ততপক্ষে 'চরিত্র' আছে, কখনো-কখনো সযত্নে আঁকা, পরিণতিপ্রবণ (যেমন 'তরুণ শিল্পীর প্রতিকৃতি'তে ডেডেলাস, বা মান্-এর ফিলিক্স ক্রুল); আর কখনো বা স্মৃতির মধ্য দিয়ে, বা অন্য কারো ভাবনা-বেদনার মধ্য দিয়ে দেখা, যেন কোনো পুনরাবৃত্ত স্বপ্নের মধ্যে দেখা, বাস্তব থেকে এক ধাপ দূরে সরানো (যেমন প্রুস্তের কুশীলবেরা, বা 'মায়াবী পর্বত'-এর মাদাম শোশা, বা 'টোনিও ক্রোগার'-এ হান্স ও ইঙ্গেবর্গ।) কখনো-কখনো 'স্থির' চরিত্রও পাওয়া যায়, কাহিনী শুরু হবার আগেই যার ভাগ্য নির্দিষ্ট হ'য়ে গেছে—যেমন

'ভেনিসে মৃত্যু'র আশেনবাখ্ বা 'ইউলিসিস'-এ লেওপোল্ড ব্লুম। কিন্তু ফ্রান্‌ৎস কাফকার মানসতায় 'চরিত্র' কোনো স্থান পেলো না; তাঁর নায়ক বা অপনায়কদের নাম সুদ্ধ অনেক ক্ষেত্রে তাঁর নিজেরই নামের আদ্যক্ষর, (লক্ষণীয়, প্রুস্তের উপন্যাসে নায়ক বা বক্তার নামও মার্সেল, কোনো পদবির উল্লেখ নেই); এবং যে-ভূমিতে তারা সঞ্চরণ করে তা যে-কোনো বিশ্বাসযোগ্য সমাজ-সংসারের সীমান্তরেখায় অবস্থিত। অপ্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত, বিকৃত, বিশৃঙ্খল, পরাবাস্তব : কাফকার জগৎ হলো এই। ডস্টয়েভস্কির জগৎও দুঃস্বপ্নভরাতুর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর কোনো চরিত্রের মনে (এমনকি রাস্কলনিকভ বা স্ত্রাভ্রগিনের মনেও) স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধানটুকু লুপ্ত হয় না। মান্ বহুবার, এবং ফ্লোবেয়র অন্তত একবার, স্মরণীয়ভাবে স্বপ্ন ব্যবহার করেছেন; সেগুলিও বাস্তবেরই পূর্বাভাস বা প্রতীকচিত্র। কিন্তু কাফকার উপন্যাসে দুঃস্বপ্নই মানুষের 'স্বভাবী' অবস্থা, যা থেকে জেগে ওঠার চেষ্টা তাঁর প্রধান দুটি উপন্যাসের বিষয়। কাফকা প'ড়ে আমরা যে-উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ অনুভব করি, তার মূলে আছে দুই বিপরীতের অঙ্গাঙ্গী মিলন; একদিকে তাঁর মূল বিষয় যেমন অতিপ্রাকৃত (সাধারণ ভাষায় অপ্রাকৃত ও অসম্ভব), তেমনি আনুষঙ্গিকের বর্ণনায় তাঁরও বাস্তবনিষ্ঠা নিটোল। 'একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে গ্রেগর সাম্‌সা দেখলে সে একটি বৃহৎ কীটে পরিণত হয়েছে—' এই প্রথম ঘোষণার অস্বভাবিতা একবার মেনে নেবার পরে (আর কথাটা এমন সাধারণ সুরে আলগোছে বলা যে মেনে নিতে কোনো অসুবিধেও হয় না) আমরা দেখতে পাই কাহিনীর পরবর্তী পরিণতি একেবারে ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে এগিয়ে চলছে, সবই মনে হয় বিশ্বাস্য ও প্রামাণিক। 'বিচার' উপন্যাসেও তা-ই; য়োসেফ কা-র 'গ্রেপ্তারে' একবার অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে অন্য কোথাও আর আপত্তি ওঠে না আমাদের : বিচারকক্ষে ধোপানি, বিচারকের টেবিলে অশ্লীল পুঁথি, উকিলের বাড়ির কামাতুরা পরিচারিকা, চিত্রকরের ঘরে বেলেল্লা ছুঁড়িগুলো, শেষ পর্যন্ত 'কুকুরের মতো' কা-র অপমৃত্যু—সবই মনে হয় 'স্বাভাবিক', যথাযথ। অনিবার্যভাবে মনে পড়ে 'দি এনশেণ্ট ম্যারিনার', কিন্তু অতিপ্রাকৃতের ব্যবহারে এতদূর পর্যন্ত বিস্তার, এতদূর পর্যন্ত অনাস্থার অপনোদন, যাতে বিবিধ সাংসারিক অনুপুঙ্খের সঙ্গে মৌলিক স্বভাবচ্যুতিকে মিলিয়ে নেয়া যায় : এর তুলনা আর কোথাও আছে কিনা জানি না। ডিকেন্স, বালজাক, টলস্টয় থেকে বহুদূরে স'রে এসেছি আমরা। রূপক নয়, রূপকথা নয়, নয় আপুলেউস-এর 'সোনালি গাধা'র মতো রঙ্গরচনা, বা 'ডাক্তার জিকল ও মিস্টার হাইড'-এর মতো রহস্যোপন্যাস, 'ডোরিয়ান গ্রে-র চিত্রে'-র মতো ছদ্মবেশী নীতিকথাও নয় : সব সংকেত নিয়ে, নিগূঢ়তা নিয়ে, ব্যক্তিগত আতঙ্ক ও আর্তি নিয়ে, মৃত ভগবানের জন্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, শেষ পর্যন্ত কাফকার রচনাপর্যায় গভীরতম অর্থে 'বাস্তবসদৃশ', অর্থাৎ আমাদের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁর রচনায় কোনো সমাজচিত্র নেই, সাংবাদিক উপাদান নেই, বলতে গেলে দেশ, কাল, ভূগোল, ইতিহাসের পটভূমিকাও নেই, মনে হয় তাদের ঘটনাস্থল যে-কোনো স্থান হ'তে পারতো। অথচ তাঁর কল্পনায় কোনো গলিভার-বর্ণিত দ্বীপও ধরা দেয়নি; তিনি আমাদের অনুভব করিয়ে দেন যে তাঁর জগৎ আক্ষরিক অর্থেই আমাদের এই চিরচেনা পৃথিবী। উদাহরণস্বরূপ তাঁর 'আমেরিকা'র উল্লেখ করা যায়, যেটি তাঁর সবচেয়ে হালকা মেজাজের আর সবচেয়ে অসংবদ্ধ রচনা (যেহেতু অসমাপ্ত, এবং মাঝের কয়েকটা পরিচ্ছেদ পাওয়া যায়নি)। কাফকা প্রাগ্ নগরীর বাইরে বেশি বেরোননি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিষয়ে বেশি কিছু জানতেন ব'লেও মনে হয় না, তাঁর কাল্পনিক আমেরিকায় কিছুটা আছে চ্যাপলিনের 'সিটি লাইটস' ও 'মডার্ন টাইমস' ধরনের মৃদু ব্যঙ্গ ও প্রহসন, আর কিছুটা আছে এমন ধরনের অতীকৃত, অতিরঞ্জিত চিত্র, যা একেবারেই কোনো তথ্য বা যুক্তিনির্ভর নয়। অথচ, কোথায় যেন বাস্তব আমেরিকার সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্যও পাওয়া যায়, যেন কাফকা তাঁর বিশুদ্ধ স্বজ্ঞার দ্বারাই সেই বিচিত্র, নূতন, অস্থির মহাদেশের মর্মস্থল স্পর্শ করেছিলেন। উপন্যাস বিষয়ে ধারণা তাঁর আগেই বদলে গিয়েছিলো, 'বাস্তব' বিষয়ে আমাদের ধারণাতেও তিনি মৌলিক পরিবর্তন ঘটালেন। বিশ-শতকী সাহিত্যে তাঁর স্থান কেন্দ্রিক; ডস্টয়েভস্কির যোগ্য উত্তরসাধক তিনি, এবং পরবর্তী অনেক-কিছুই তাঁরই জন্য সম্ভব হতে পেরেছে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একালের ছোট গল্প

সবুজপত্রের জন্যে একটা লেখা এনেছি।

কী লেখা?

ছোট গল্প।

ছোট গল্প? প্রথম চৌধুরী উৎসাহিত হয়ে উঠলেন : পড়ো শুনি।

পড়া শেষ হলে লেখক জানতে চাইল কেমন হয়েছে।

হয়েছে কিন্তু উতরোয়নি। প্রমথ চৌধুরী আরো বিশদ হলেন : মৃতদেহে আভরণ পরানো হয়েছে। সাজসজ্জা অলংকার সব পরিপাটি কিন্তু দেহ মৃত।

লেখক বুঝি এততেও অবহিত হল না।

চৌধুরীমশাই আরো স্বচ্ছ হলেন। বললেন, লেখা হয়েছে কিন্তু গল্প হয়নি।

এখন প্রশ্ন : কী হলে গল্প হয়?

গল্প থাকলেই গল্প হয়। ছোট গল্পের ন্যূনতম শর্ত ছোট হওয়া আর গল্প হওয়া। ছোট হওয়াও তত নয়, যত গল্প হওয়া। দইকে ঠিক দইই হতে হবে, ক্ষীরও নয়, ঘোলও নয়।

হয়েছে কিন্তু উতরোয়নি।

কিসে উত্তীর্ণ হবে? সেই পুরোনো কথা—পুরোনো হলেও যা নিরন্ত নবীন—উত্তীর্ণ হবে রসে।

রস কী?

সংক্ষিপ্ততর উত্তর—আনন্দচমৎকারিতা।

কাহিনীর শেষে এই আনন্দচমৎকারিতার অমোঘ স্পর্শ। এই স্পর্শেই কাহিনীর গল্প হয়ে ওঠা। এই স্পর্শটুকুর অভাব ঘটলেই গল্পের ব্রতচ্যুতি ঘটল, গল্প হয়ে দাঁড়াল বিবৃতি। নয়তো সংবাদ।

তাই গল্পের প্রাণ শেষ ছত্রে। এই শেষ হয়েই তার অশেষ হওয়া। তাই যা নিয়েই না লেখা হোক, ঘটনা নিয়ে চেতনা নিয়ে ভাবনা নিয়ে, বাসনা নিয়ে, মনমেজাজ নিয়ে—এই শেষের চমকেই একটি মণি দুলিয়ে দিতে হবে—'যে মণি দুলিল যে ব্যাথা বাজিল বুকে—' তবেই গল্প চিরায়ত।

এই চমক আকস্মিক হবে না। তার ইশারা প্রচ্ছন্নভাবেই বাহিত হয়ে আসবে এবং শেষে এসে তার উন্মোচন ঘটবে। প্রচ্ছন্নের উদ্ঘাটনের মধ্যেই তো রসের জাগরণ।

গল্প তো আর্ট—রসসৃষ্টি, তাই তার একাল-সেকাল নেই, তার চিরকাল। একাল আর কী? শুধু নতুন পরিবেশ, নতুন সন্নিবেশ, নতুন মূল্যায়ন। কিন্তু আর্টের যে চাহিদা, তার অবয়ব আর আত্মা—প্রতিমার ঠাট আর প্রাণকর মন্ত্র—এ পূরণ করতেই হবে। মানতেই হবে শেষ নিশ্বাসেই তার আসল জন্ম। মরতে হলেও মরে প্রমাণ করতে হবে সে মরেনি।

আর যত কিছু নিয়ে বিতর্ক হোক, আঙ্গিক নিয়ে, আয়তন নিয়ে, বিন্যাস-বিন্যাস নিয়ে, যত ভূগোল বাড়ুক, ইতিহাস মেলুক, যতই নতুন উত্তেজনার চূড়া স্পর্শ করুক, এই শেষ কথা—শেষ রতি। 'রীতি-রেখা সনাতনী।'

কথার শেষ নেই, কিন্তু গল্পের শেষ আছে।

গল্পের শেষে শুনেছি জলধরদা তাঁর নায়ককে সর্পদংশনে মেরে ফেললেন।

শরৎচন্দ্র বললেন, আপনার নায়ক শেষে সাপে কাটা পড়ল?

কেন, সাপে কাটা পড়েও তো লোকে মরে।

তা মরুক, কিন্তু আপনার নায়ক ওভাবে মরবে কেন?

'নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভালো নহে তাহা, আমি যা খেলিতে বলি সে খেলা খেলাও হে।'

আধুনিক সমাজজীবনের অনেকাংশই যে আজ হতাশায় পঙ্গু, নৈষ্ফল্যে মন্দবুদ্ধি, মূল্যচ্যুত, ছিন্নবন্ধ—নিরাশ্রয় নিরাদর্শ—হ্লাদিনী অধিষ্ঠাত্রী দেবীই যে আজ মদিরা, কামই যে সংসারগুরু, অর্থই যে একমাত্র অভিসন্ধি—এ কঠোর বাস্তব থেকে চোখ ফেরাবে কে? যেখানে আয়োজনের চেয়ে প্রয়োজন বেশি, ফুটপাতের চেয়েও ঘুম বেশি, জেলখানার চেয়েও কয়েদী বেশি, সেখানে বিপর্যয়ের বাজারে কে স্থির থাকবে?

শিল্পী স্থির থাকবে। স্থির থেকে নিমেষকালের চকিত আলোতেই একটি সূচির ছবি ফুটিয়ে তুলবে।

ধরুন এ কালের এমন যদি একটা কাহিনী হয়।

ইস্পাতনগরী—পথঘাট কোয়ার্টার্স—চাকরির খুঁটিনাটি—সুন্দর, শান্ত, বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা। তার মধ্যে একজন বিল-কেরানি, স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে ফেলে রেখে একা-একা থাকে। দুশ্চরিত্র মাতাল। নানা ঘটনায় ইঙ্গিত করে বোঝানো হয়েছে লোকটার কাছে শিকারের জাত বা বয়েস বলে কোনো প্রশ্ন নেই, সে মেথেন হোক, কাফির হোক, হলেই

না পশ্চিমা বাসমঙলি। প্রায় এক
র্বেক বর্বর। কিশোরকাল থেকেই
, ঝিনুক দিয়ে পাড়াতুতো বউদিদির
ঠের ঘামাচি গেলে-গেলে। এ হেন
রোয়ার নির্জন কোয়ার্টারে বৃষ্টির
ক ত্রাণ পাবার জন্যে একদিন একটি
-পরা কিশোরী ও তার ছোটভাই আশ্রয়
। কিশোরীটির বাড়ন্ত গড়ন, বিপন্ন
স্তুত মুখটা ভালোই লাগল। আস্তে-
স্ত আলাপ জমল, একটু বুঝি বা
াপ—শেষে একদিন বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায়
য়টিই নায়কের ঘরে স্বয়মাগতা হল।
ন যেন আগের বিপন্ন ভাবটা নেই, তার
লে আশাভরা কৌতূহল—নড়াচড়ায়
ড়ানোতে-চাউনিতে কেমন যেন রহস্যে
স উপনীত হয়েছে মেয়েটি। চায়ের জল
বেগ করে ফুটছিল কেতলিতে, এখন
কিয়ে গিয়ে একটানা শি-শি শব্দ হচ্ছে।
য়েটি গভীর কালো চোখে লোকটার দিকে
রাট দৃষ্টিতে তাকাল। লোকটা অচঞ্চল
ম গলায় বললে, তুমি এখন বাড়ি যাও,
ত হয়েছে।

এই শেষে এসেই কাহিনী সার্থক গল্প
ল। একটা লম্পটেরও কোনো এক
লৌকিক মুহূর্তে বিচারবুদ্ধি জাগতে
ারে, কামের চেয়েও মমতা বেশি হতে
ারে এ ব্যঞ্জনায়ই গল্পটি মহৎ হতে
পরেছে।

তবে কেউ যদি বলেন সরল রেখার টানা এ গল্পের এই পরিণাম তো প্রথম থেকেই অনুমান করা গিয়েছে, তাই এ গল্পের শেষে আনন্দ থাকলেও আনন্দ-চমৎকারিতা নেই, তাহলে বলব এ ত্রুটি আঙ্গিকের ত্রুটি।

আরেক মাতাল দুশ্চরিত্রের কথা শোনা যাক।

এক ছন্নছাড়া যুবক, সরকারি আফিসে মাঝারি চাকরি করে, কর্তৃপক্ষ তার ইতিহাসে রাজনীতির গন্ধ খুঁজে খুঁজে হয়রান। স্বাস্থ্যের জন্যে লেপের নিচে সে নগ্ন হয়ে শোয়, লেপের নিচেই প্যান্টটা গলিয়ে নিয়ে সজ্জাপর্ব সমাধা করে বেরিয়ে আসে। তারপর রাস্তায় বেরোয়। পকেটে যে রুমাল নেয়, তার দুটো ভাঁজ। একটাতে জুতোর টো মোছে, অন্যটাতে মুখ। তারপর মেয়েদের পেছনে হাঁটার উত্তাপ সর্বাঙ্গে নিয়ে পথ চলে। তেমনিভাবে চলে একদিন এক বন্ধুর দোকানে এসে ঢুকল যুবক। সেখানে খানিকক্ষণ চলচ্চিত্রের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করল। তারপর মার্কেটের রাস্তা থেকে এক ক্ষণপ্রভা মেয়েকে কুড়িয়ে নিয়ে দামি রেস্তরায় এসে আইসক্রিম অর্ডার দিল। সেখানে দুটি মাড়োয়ারি ছেলেকে দেখে ক্ষণপ্রভা লাফিয়ে উঠল—হ্যালো ম্যান, হাউ ডু য়ু ডু? সেখান থেকে বেরিয়ে যুবক গেল এক সাহিত্যের দাদার কাছে যে তাকে বাক্যগঠন শিক্ষা করতে উপদেশ দিলে। সেখান থেকে বেরিয়ে গেল তার গুরুদেবের কাছে যিনি পনেরো পেগেও যথাযথ, যিনি একদিন ষোলো পেগের ঝোঁকে বলে ফেলেছিলেন, তোমার বউদির বাচ্চা দুটো আমার নয়, ওর পূর্বপ্রেমিকের। গুরুদেব তার চাকরি নিঃসন্দিগ্ধ করার ব্যবস্থা করে দিলেন। হালকা মনে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল যুবক। তারপর একটি রোগশয্যালীন নিষ্পাপ মেয়েকে টেলিফোন করলে যা কিনা মুখোশের তলায় দগদগে ঘা-ভরা মুখে ওষুধ লাগানোর মতন।

শিক্ষিত হাতের শক্তিশালী রচনা। কিন্তু গল্প কই?

তারপর যুবক ঢুকল এক নরকে। মাতাল মেয়ে-পুরুষের হট্টমন্দিরে। কী হল কে জানে, যুবক এক ফোঁটাও গিলতে চাইল না। একটা ছাইমাখানো কই-মাছের মত মেয়ে মাতাল হয়ে তার গ্লাশভর্তি বিয়ার যুবকের গায়ে ছুঁড়ে দিল। বিয়ারে সমস্ত গা ভিজে গেল—বুক-পকেটে ছিল একটা পোস্টকার্ড—সেটাও। সেটা তার মায়ের লেখা চিঠি। কার্ডের সব লেখা মুছে গেলেও শেষ কটা কথা অলৌকিকভাবে বেঁচে আছে—আমার আশীর্বাদ নাও, ভালো থেকো।

বলা-বাহুল্য এখানেই গল্পের শেষ।

কিন্তু এই শেষ কি গল্পের পক্ষে আকস্মিক নয়? না কি এটাই আনন্দচমৎকারিতা? এটা কি একটা ব্যঙ্গ, না কি সমস্ত দিন অলখ্যে এই মায়ের আশীর্বাদই কাজ করেছে? সমস্ত দিন একবারও অলক্ষ্যে পকেটের উপর যুবক হাত রাখল না কেন? না কি হাত রাখলে পাঠক প্রস্তুত হয়ে যেত? ভালো থেকো—দরকার নেই বুঝে, এ শুধু শরীরে ভালো থাকা, না, চরিত্রেও?

তার মানেই গল্পটা হয়েছে। কিন্তু ঐ শেষ লাইনেই যখন গল্পের তাৎপর্য, তখন ফিল্মের বন্ধু ও পত্রিকার দাদার সঙ্গে অবান্তর বাগবিস্তার কেন? কেন এই অতিস্ফীতি? নির্মাণচাতুরী আত্যন্তিকতাকে আমোল দেবে কেন? কেন ভারসাম্য ব্যাহত হবে?

আরেকটি কাহিনী নিন।

অফিস ছুটি হতেই পুরোনো পাড়ার চেনা মেয়ে-কেরানিকে ট্রাম-স্টপে পেয়ে গেল

এক ছেলে-কেরানি। খানিকটা হাঁটবার পর একটা ট্যাক্সি নিলে। ড্রাইভারকে বললে লেকে যেতে। ড্রাইভার জান্তা লোক, বললে, ভিক্টোরিয়ায় চলুন। (লেকে গেলেই কিন্তু ড্রাইভারের বেশি আয়) ছেলে-কেরানি লেকই পছন্দ করলে। ড্রাইভার যথারীতি বারে-বারে আয়না ঘোরাল। পৌঁছে দিয়ে ভাড়ার উপর বকশিস চাইল। ছেলেটি বললে, ঠিকানাটা দিয়ে যান, বিয়েতে নেমন্তন্ন করব। মেয়েটি বললে, কী অসভ্য, ভাগ!

সুন্দর আয়েসী লেখা, ছিমছাম কথা-বার্তা। ঠিকঠাক টিপ্পনী। বস্তুনিষ্ঠার দিকে কড়া চোখ। একটু অন্ধকার মত জায়গা বেছে নিতে যাচ্ছে, দেখলে একটা লোক খানিকদূরে গাছের গুঁড়িতে মূত্রত্যাগ করতে বসে গেল। আসছে বাদামঅলা, চাঅলা, ভিখিরি, রিলিফ ফন্ডের চাঁদা আদায়ের ভলানটিয়র, ফাঁকা গাড়ির দালাল—এখন ছোরাওঁচানো গুন্ডা এলেই চমৎকার। শান্তিতে একটুও প্রেম করার মত নির্বিবিলি জায়গা নেই। এক যদি কবরখানায় গিয়ে কোনো কবরের পাশে বসা যায় চুপচাপ।

সরল রেখায় টানা স্বচ্ছন্দ কাহিনী, কিন্তু গল্প কোথায়? আনন্দচমৎকারিতা কোথায়? মেয়েটিকে বাস-এ তুলে দিয়ে ছেলেটি অনুভব করল সে ভীষণ একা। হঠাৎ চোখের উপর কার নরম হাতের স্পর্শ পেল মনে হল— মায় তার চুড়ি আর আংটির স্পর্শ—মনে মনে মেয়েটিরই নাম উচ্চারণ করল— সে ছাড়া আর কে আছে, কে হতে পারে? পরমুহূর্তেই ঘোর কেটে গেলে দেখল আলো আর আলো——আলোর উৎসব?

কিন্তু এতেই কি মণি দুলল? ব্যথা বাজল? গল্প হল?

আর, যদি গল্প হল তো, মূত্রত্যাগের বস্তুনিষ্ঠার কোনো প্রয়োজন ছিল কি? আরো তো বহুতর ত্যাগ আছে, বস্তুনিষ্ঠার খাতিরে কি সাহিত্য তা বরদাস্ত করবে? শিল্পের প্রয়োজন নেই অথচ জোরদার স্থূলতার আমদানি—তাকেই বুঝি সাহিত্যে আবর্জনা বলে।

জীবনে যা সম্ভব তার সমস্তটাই সাহিত্যে সহনীয় নয়। জীবন ব্যাকরণ লঙ্ঘন করতে পারে কিন্তু সাহিত্য পারে না।

এক শিক্ষিকা তার জীবনের সব চেয়ে গোপন কথাটি তার এক অল্পদিনের পুরুষ-বন্ধু গানের মাস্টারকে বলছে। বলবার কোনো বাধ্যতা নেই, তবু বলছে। যেন বলবার জন্যেই বলছে। কিন্তু গোপন কথাটাকে শুধু ভয়ংকর করে তুললেই তো সেটা গল্প হবে না। সত্য হলেও হবে না। গল্পের জন্যে অন্য মশলা, অন্য কৌশল।

গোপন কথাটা এই। দেশবিভাগের অভিশাপে যখন দাঙ্গা বেধে গেছে তখন শিক্ষিকা থার্ড ইয়ারের ছাত্রী—আর সকলের মত ঢাকা থেকে পালাচ্ছে কলকাতায়। রাতের স্টিমারে অসম্ভব ভিড়, কে কোথায় জায়গা করে এলোপাথাড়ি শুয়ে পড়ছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সেই বিপর্যয়ের মুহূর্তে চোখের সম্মুখে কী এক দৃশ্য দেখে শিক্ষিকার—তখন অবশ্যি ছাত্রী—দুর্বার ইচ্ছে হল কোনো পুরুষের বাহুবন্ধনে নিষ্পেষিত হই। পাশের অচেনা এক ঘুমন্ত কিশোরের হাত অকস্মাৎ তার গায়ে এসে পড়ল। শিক্ষিকা তাকে উপেক্ষা না করে ঘুমের আবরণের নিচে অভ্যর্থনা করে নিল। অন্ধকারে কেউ কাউকে চিনল না—চেনবার দরকারও ছিল না।

শুনতে শুনতে গানের মাস্টারের সম্বিৎ হল। সেই তো সেদিনের সেই ছেলেটি। কিন্তু সেকথা কি আর এখন বলা যায়? গানের মাস্টার টলতে টলতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শিক্ষিকা কিছুই আন্দাজ করতে পারল না। এই মাস্টারই সেদিনের সেই অবার্য পুরুষ। তাহলে মাস্টারই যে সে ব্যক্তি তার প্রমাণ কী? মাস্টার নিজে বললে, নিজে টললেই হবে?

সুতরাং দুঃসাহসিকতা হল, আনন্দ-চমৎকারিতা হল না।

এবার এ গল্পটি দেখুন।

এক তরুণ তার প্রেমিকা তরুণীকে ফিরিঙ্গিপাড়ার এক নির্জন কক্ষে সন্ধ্যা-রাত্রির সঙ্গী করে নিয়ে এল। এ বুঝি ভালোবাসারই আরতি এই বোধে এই মায়ায় তরুণী আত্মসমর্পণ করলে। আরতি আহুতি হয়ে উঠল, সেই আত্মসমর্পণ রক্তে শত্রুতা বাধাল। খবর শোনা মাত্রই তরুণ বিবাহে উৎসাহিত হল না, যোগ্য ডাক্তারের ঠিকানা এনে দিল। বুঝি পাশ কাটাতে চাইল। ডাক্তারের কাছে না গিয়ে আর পথ রইল না। ডাক্তার রুগী দেখে তার কঠিন স্বাস্থ্যের প্রশংসা করে বসল, কিন্তু ফি যা চাইল তা অনুনয়-বিনয়ের পর আধেক করা হলেও তরুণীর ক্ষমতার বাইরে। তখন নিরুপায় তরুণী নিজের স্বাস্থ্যটুকুকেই মূলধন করতে চাইল। বললে, একটা অন্যায় যখন সারাজীবন গোপন করে রাখতে হবে, আরেকটাও পারব। বাড়ি ফিরে এসে দেখল সেই তরুণ মায়ের সঙ্গে আলাপ করছে। তরুণীকে দেখতে পেয়ে ক্ষমা চাইল, বললে, সে আজ বিকেলেই বিয়ে-রেজেস্ট্রির নোটিশ দিয়ে এসেছে। এবার তবে শুভেলাভে শেষ হল বুঝি গল্প। কিন্তু, না, তরুণী বললে, তা আর হয় না। দেরি করে ফেলেছ। আমি আজই ডাক্তারকে কথা দিয়ে এসেছি। আমি কথার খেলাপ করতে পারিনে।

একেই বলে আনন্দচমৎকারিতা।

সবাই আজ যেন সরলীকরণের পথে চলেছি, নিরর্গলতার পথে। গভীরগামিতার পথ যেন দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমে-ক্রমে। আর, ভুলে যাচ্ছি নগ্নতার শেষ আছে, আবরণেরই শেষ নেই। আর, যার শেষ নেই সেই সৌন্দর্য আর কল্যাণই সাহিত্যের আদিকথা।

আধুনিকতার জয় হোক। মৃত্তিকা যে রঙেই ধরুক, মলিন বা রক্তাক্ত, তার উপাদানেই অমরাবতীর সৃষ্টি।

দেশে ও বিদেশে
ভারতের সর্বাধিক
বিক্রীত ফ্যান
উষা
কেনা ভাল সবার ভাল উষা ফ্যান

লীলা মজুমদার

ছোটদের বই ঃ আজকের কথা

ছয় বছর ধরে 'সন্দেশ' সম্পাদনা করে ছোটদের বই ও ছোটদের জন্যে লেখা সম্পর্কে আমার পুরনো মতামতগুলোকে একটু বদলাতে হয়েছে। বছর তিনেক আগে বৎসরান্তে আমরা গত বারো মাসের মধ্যে পাঠকদের মতে কোন কোন লেখা সবচেয়ে ভালো হয়েছে তাই জানতে চেয়েছিলাম।

[illegible]যা অনেকে বলেছিলেন এটার কো[illegible]ই হয় না, কারণ ছোটদের ভালোম[illegible]নই থাকে না; সাধারণত সস্তা খেলো [illegible]জিনিস-ই ওদের বেশি পছন্দ। আমাদের গবেষণার ফলটি কিন্তু কিঞ্চিৎ অ-প্রত্যাশিত হয়েছিল। ছোটদের রুচিবোধ নেই একথা আমি আর কখনো বলব না।

সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিল প্রিয়ম্বদা দেবীর 'পঞ্চুলাল', অর্থাৎ পুরনো ইটালিয়ান 'পিনক্কিও'র গল্পের বাংলা সংস্করণ, যেমনি কাল্পনিকতায়, তেমনি দুঃসাহসিকতায় ও সরসতায় ঠাসা। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল শ্রীমতী নলিনী দাশের লেখা একটা দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চময় গল্প। তৃতীয় হয়েছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের ও আমার যুগ্ম সম্পাদনা 'হট্টমালার দেশে'। তাতে দুঃসাহসিকতা, কাল্পনিকতা ও প্রচ্ছন্ন আদর্শবাদের সরস সমাবেশ। এর পরে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ছয়টি রোমাঞ্চময় গল্প পর পর ছয়টি স্থান অধিকার করেছিল। প্রত্যেকটি কাল্পনিকতা ও দুঃসাহসিকতার চূড়ান্ত। এতগুলির পর তিনটি স্থান নিয়েছিল 'উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর তিনটি অপূর্ব পৌরাণিক কাহিনী; সেগুলিও দেবতাদের বলবিক্রম ও দুঃসাহসিকতার সরস বিবৃতি।

বলা বাহুল্য ছোটদের বিচারশক্তি সম্পর্কে সেদিন আমাদের চোখ খুলে গেছিল। অবিশ্যি এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে অপরিণত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের মৌলিক মতামত খুব বেশি শোনা যায় না। পাঁচজনের মুখে যা শোনে, বাড়ির বড়রা যা বলেন, স্কুলে যা শেখে ও বন্ধুবান্ধবদের যেমন মতামত, ছোটরা সাধারণত পাখির মতো তাই বলে। অবিশ্যি স্বাধীন মতাবলম্বী দুই-একটা ব্যতিক্রম যে হয় না তা-ও নয়। এদিকে সমালোচক হিসাবে ছোটরা যেমনি কাঁচা হয়, ওদিকে তাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা আবার তেমনি প্রবল হয়। কি ভালো লাগছে সেটা খুব জানে, কিন্তু কেন ভালো লাগছে বলতে পারে না। বিশ্লেষণ করে দেখার ক্ষমতা অনেক পরে জন্মায়। বুদ্ধিমান লেখকরা সুযোগ বুঝে, ঐ ভালো-লাগার বাহনটির উপরে নিজেদের বক্তব্যগুলি চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন যে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে।

আমাদের সেদিনের ঐ জনপ্রিয়তার হিসাবনিকাশ থেকে বোঝা গিয়েছিল, অন্তত দশ থেকে ষোল বছরের ছেলেমেয়ে-দের কাছে তিনটি গুণের তুলনা নেই। সেগুলি হল কাল্পনিকতা, দুঃসাহসিকতা ও সরসতা। একটু নজর করে দেখলেই বোঝা যায় যে-কোনো কালের যে-কোনো দেশের সার্থক শিশু-সাহিত্য এই তিনটি গুণকেই অবলম্বন করে থাকে, সেই সঙ্গে এক রকম প্রচ্ছন্ন আদর্শবাদও থাকে।

শুধু শিশু-সাহিত্য কেন, যে-কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূলেও দেখা যায় জ্ঞানের সঙ্গে সমান পরিমাণে কাল্পনিকতা ও দুঃসাহসিকতা। তৃতীয় গুণটিও পরে আসে, জনসাধারণের কাছে তথ্য পরি-বেষণের সময়। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে ছোটদের ঐ বিশেষ গুণগুলিকে ভালো লাগার পিছনে আছে দুনিয়াকে প্রকৃত ও অন্তরঙ্গভাবে দেখবার, জানবার, আপন করে নেবার আকাঙ্ক্ষা। অতি পরিচিত প্রাত্যহিক পৃথিবীর মধ্যে তারা রোমাঞ্চ খোঁজে। যাকে দেখতে চিনতে ভাবতে গেলে কষ্ট করতে হয়, সবাই সেটা পারে না, হয়তো কেউ-ই যেটা পারে না, হয়তো এমন কিছু যাকে আসলে দেখাই যায় না, ভাবাই যায় না, তারি জন্যে অসীম আগ্রহ। এই গুণের কি নিন্দা করতে হয়?

প্রবীণরা, অর্থাৎ আমারি বয়স্যারা অনেক সময় বলেন যে আমাদের সময় নাকি এত বাজে বই কেউ পড়ত না; আমরা মহা-

পুরুষদের জীবনী পড়তাম, যাতে ভালো ভালো শিক্ষা পাওয়া যায় এমন সব বই পড়তাম। কথাটা তলিয়ে দেখলে কিন্তু মনে হয় এত বাজে বই তখন ছিলই না, তা পড়ব কোত্থেকে? যদি বা দু-চারটে থাকত, তা-ও আমাদের অভিভাবকরা কখনো কিনতেন না। খুব বেশি ভালো বই-ও ছিল না। যে-গুলি ছিল সে সবই আমরা আগ্রহের সঙ্গে পড়তাম। সে-সব বই এখনো পাওয়া যায়, এখনো তাদের আদর কমেনি। তাছাড়া অনেক নতুন বই-ও লেখা হয়েছে, যেগুলি কোনো অংশে তাদের চেয়ে মন্দ নয়। অনেক বিষয়ে বরং আরো ভালো, অনেক বেশি মৌলিক, নির্ভুল, সরস।

এর উপর অনেক ইংরেজি বই পড়তাম। এইদিক দিয়ে আজকালকার সাধারণ বাঙালী স্কুলের ছেলেমেয়েদের কপালটাই মন্দ। বিদেশী বই আমদানির অসুবিধার জন্যে ও ছেলেমেয়েদের ইংরেজি বিদ্যার ক্রমশ ব্যাপক অবনতির কারণে, তখন সে সব ইংরেজি বই প্রায় সব ছাত্র-ছাত্রী উপভোগ করত, এখন সেগুলি হাতে পেলেও, নিজে-দের অক্ষমতার জন্যে তার রস সকলে উপভোগ করতে পারে না।

এর একমাত্র ওষুধ হল ভালো বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ করা, তাতে আর কিছু না হক মূল রসের এক তৃতীয়াংশও পাবে এরা। বেরিয়েছে অনেক অনুবাদ, আরো দরকার। কিন্তু অধিকাংশ অনুবাদ পড়ে হতাশ হতে হয়, মূল গ্রন্থের রস বজায় রাখার কোনো চেষ্টাই নেই। নাম বদলে, বাঙালী বানিয়ে একাকার করা হয়। অথচ ছেলেমেয়েদের বিদেশের কথা জানবার আগ্রহের অভাব নেই। অনুবাদকারীকে মূল ভাষায়-ও দক্ষ হতে হবে।

বাস্তবিক সব দেশের ছোটদের জন্যে লেখা সব শ্রেষ্ঠ বইগুলি সব দেশের ছেলে-মেয়েদের প্রাপ্য। কাব্যের মধ্যে যেমন একটা সর্বজনীন ভাব থাকে, যার জন্যে সে কখনো পুরনো হয় না, অকেজো হয় না, সব কালের সব দেশের মানুষের কাছে তার মর্মকথাটি পেঁছায়, ছোটদের বইয়ের বেলাও তাই। এই গুণের কথা ভেবেই শেক্‌সপীয়র লিখেছিলেন,

> Whats' He cuba to him, as he to He cuba.
> That he should weep for her'

একরকম ভাবাবেগ আছে যা সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক, ঘটনাকে অবলম্বন করে থাকে মাত্র, ঘটনাসর্বস্ব নয়; শিল্পে, কাব্যে ও শিশুসাহিত্যে সেই গুণটি না থাকলে তারা কালজয়ী হতে পারে না। প্রমথের বুদ্ধদেব বসু যেমন বলেছিলেন, কালের নির্মম সম্মার্জনী তাদের ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

আরেকটি উদাহরণ দিই। ইংলণ্ডের কোন এক অখ্যাত অঙ্কের মাস্টার 'অ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড' লিখে-ছিলেন, আজ পর্যন্ত তার জুড়ি খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিংসলির 'ওয়াটার বেবিজে'র কথাই যদি ভাবা যায়। ঘর গরম করার উনুনের ধোঁয়া বেরুবার চোঙা পরিষ্কার করে তার খুদে নায়ক। আমাদের দেশে ঘর গরম করার উনুনও নেই, পরিষ্কার করার লোকও লাগে না। তবু আজ পর্যন্ত ও বই পড়লে পাগল হয়ে যেতে হয়।

এই সবকটি বইয়ের-ও মূলধন ঐ এক-ই, যথা :—কাল্পনিকতা, দুঃসাহসিকতা সরসতার সঙ্গে মেশানো খানিকটা প্রচ্ছন্ন আদর্শবাদ। এই থেকে মনে হয় যে, একথা ঠিক নয় যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা ভালো বই পড়তে চায় না। তবে ভালো বইটির শুধু তথ্যটুকুই ভালো হলে আজ-কাল চলে না, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়গ্রাহীও হওয়া চাই আর সরস হলে তো কথাই নেই। সত্যি কথা বলতে কি নীরস তথ্য-বহুল বই কোনো কালেই কোনো ছোট ছেলে ভালোবাসেনি। আমরাও ভালো-বাসতাম না; হাজার ভালো হলেও নয়। গুরুজনরা বলতেন তাই পড়তাম, তাছাড়া তথ্য আহরণের তার চেয়ে বেশি চিত্তা-কর্ষক কোনো উপায়ই আমাদের হাতে ছিল না।

আমার মনে আছে আমার যখন দশ বছর বয়স, তখন স্কুলে কোনো একটা বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখানোর জন্যে একটা মোটা চেম্বার্স ডিক্‌সনারি পুরস্কার পেয়েছিলাম। এই পেয়ে আমার কান্নাও পেয়েছিল; যদিও ডিক্‌সনারিটি ছিল ভালো এবং দামী এবং পরবর্তীকালে অনেক কাজেও এসেছিল। সেদিন একটি ছোট মেয়ের হাতে একটা Children's Pictorial Dictionary দেখলাম; বই নিয়ে সেই মেয়েটি তন্ময় হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাচ্ছিল। নীরস ও বিস্বাদ বলেই বইয়ের গুণ বাড়ে না। ছোটদের বইয়ের সাফল্যই এইখানে যে শুধু তথ্য জিজ্ঞাসা পূর্ণ করলেই হল না, সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুর্বার রসপিপাসাও মিটিয়ে, শিক্ষা ব্যাপারটাকে আনন্দময় করে তুলতে পারা চাই।

এই প্রসঙ্গে স্কুলপাঠ্য বইয়ের কথা ওঠে। অনেককে বলতে শুনি পড়ার বই আর ছুটির বই আলাদা হওয়া উচিত। কথাটার মধ্যে বাস্তবিক কোনো যাথার্থ্য নেই, বিষয়ের দিক থেকে পড়ার বইকে নিয়ম মেনে চলতে হলেও, পরিবেশনের দিক থেকে তারা ছুটির বইয়ের মতোই হৃদয়গ্রাহী হলেই ভালো। এম-এ ক্লাসে ক্ল্যাসেনের ভাষাতত্ত্বের বই পড়ে এই কথাই মনে হয়েছিল যে, ভাষাতত্ত্বকে লোকে নীরস বলে কেন! অধিকাংশ পাঠ্য-পুস্তককেই চিত্তাকর্ষক করে তোলা যায়, রঙ-রসিকতা দিয়ে নয়, পরিব্যক্তির মাধুর্য দিয়ে। ছোটদের জ্ঞানপিপাসার সঙ্গে রস-পিপাসাও মেটানো যায়। পড়ার ঘণ্টা আর বিভীষিকা হয়ে ওঠে না। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, দেহতত্ত্ব, সবই সহজ, সরস, সচিত্র করে প্রণয়ন করা যায়। অঙ্কের বেলায় খানিকটা শুষ্কতা মেনে নিতেই হবে, কিন্তু তারও ভাষা সহজ ও সুন্দর হতে পারে। পরে অনেক ছাত্রছাত্রী সংখ্যার অপূর্ব রস নতুন করে আবিষ্কার করে। তখন কাল্পনিকতায় চরম শিখরে যুক্তির সুবর্ণ জ্যোতি প্রতিফলিত হয়ে যে অভাবনীয় রসের সৃষ্টি হয়, সমগ্র চিন্তারাজ্যে তার তুলনা নেই। ছোটরা কেন সংখ্যা দেখে ভয় পাবে?

ছোটবেলায় নীরস কঠিন অঙ্কের বই দেখে ভয় খেয়ে, শতকরা নব্বুইটি শিশু পারলে অঙ্কশাস্ত্রকে পরিহার করে চলে, নেহাৎ গুরুজনদের ভয়ে পারে না। এর মধ্যে অনেক বিজ্ঞানের ছাত্রও পড়ে, যারা বাধ্য হয়ে অঙ্ক শেখে, ভালোবেসে নয়।

আপাতত স্কুলপাঠ্যের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। নীতিপুস্তকও [illegible]। তবু এ কথা বলতেই হয় [illegible] ক্ষেত্রে শুধু সেই জিনিসকেই উৎসাহ [illegible] হয় যা তাদের মানসকে বিদ্যার পথে খানিকটা এগিয়ে নিতে পারে, জ্ঞান বাড়িয়ে, কল্পনাকে সঞ্জীবিত করে, রূপ দেখিয়ে, রস জুগিয়ে, ভাবিয়ে তুলে, তা সে যেমন করেই হক। শুধু সময় কাটানোর খেলো বই, রুচি-বিহীন কার্টুন কেন পড়ে ছোটরা? ছন্দের জন্য? ছবির জন্য? রসের জন্য? ছন্দ তো একা দাঁড়াতে পারে না, তার সঙ্গে কাব্যগুণ দিতে হয়। ছবির মধ্যে মধ্যে শিল্পগুণ দিতে হয়। রসের মধ্যে পবিত্রতা থাকা চাই।

মুস্কিল হয়েছে যে, ছোটদের অভি-ভাবকরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নন। যাঁরা নিজেদের জন্যে স্বচ্ছন্দে পাঁচ টাকা

দিয়ে বিলিতী ডিটেকটিভ বই কেনেন, তাঁরাও তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্যে পাঁচ টাকা দিয়ে বই কেনার কথা শুনলে আঁৎকে ওঠেন। তা ছাড়া তাঁরা অনেকেই ছোটদের কোনো বই পড়েন না। অথচ ছোটদের জন্যে লেখা যে-কোনো ভালো বই সহানুভূতিশীল বাবা-মাদেরও উপভোগ্য হয়। যদি না তাঁরা নিতান্তই বে-রসিক হন।

ছোটদের লেখকদের মধ্যে কারা সত্যি ভালো আর কারা রঙ দিয়ে চটক দিয়ে বিজ্ঞাপনের জোরে নাম কেনেন, সে খবরও এ'রা রাখেন না। তা হলে ছোটরাই বা বই চিনতে শিখবে কি করে, কাঁচা বুদ্ধি পাকবে কি করে? অনেক স্কুলে ক্লাস লাইব্রেরি আছে। মাস্টারমশাইরা হয়তো বই বিতরণ করেন। তাও সম্ভবত নামেমাত্র। আমি একটি ছোট ছেলের কথা জানি, সে পড়ত কলকাতার একটা বিখ্যাত স্কুলে। প্রত্যেক শনিবার সে ক্লাস লাইব্রেরি থেকে একটা করে বই আনত। বইয়ের নাম হয় 'কবরের নিচে' নয় 'মড়ার মৃত্যু' নয় 'রক্তের হাতছানি' কিম্বা ঐ ধরণের কিছু। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে ছেলের মা হেডমাস্টারমশাইকে চিঠি লিখলেন, লাইব্রেরিতে কি কোনো ভালো বই নেই?

তার ফল হল উল্টো। হেডমাস্টারমশাই নিয়ম করে দিলেন কোনো ছেলে বাড়িতে বাংলা বই নিতে পারবে না, নিতে হলে ইংরেজি বই নিতে হবে। অর্থাৎ তিনি পরোক্ষভাবে বলতে চাইছিলেন যে, বাংলায় ভালো বই নেই। তাই স্কুলের প্রভাবের উপরেই বা কতটুকু আশা রাখা যায়?

শুধু শিক্ষক ও অভিভাবককেও দায়ী করা যায় না। প্রতি বছরে হয়তো শতাধিক বাংলা ছোটদের বই প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে হয়তো আট দশটি খুব-ই ভালো থাকে। কিন্তু কেউ সে বিষয়ে জানতে পারে না; কদাচিৎ ভালো সমালোচনা হয়, কোথাও কোনো নিরপেক্ষ পরিচিতি দেওয়া হয় না। বুড়োদের লেখা বুড়োদের জন্যে গল্পে শ্লীলতার হানি বিষয়ক রচনা মাসের পর মাসে, পত্রিকার পর পত্রিকায়, পাতার পর পাতা লেখা হচ্ছে—যার ফলে যাঁরা স্বাভাবিকভাবে উপরিউক্ত অশ্লীল রচনা-গুলির নামও শুনতে পেতেন না, তাঁরাও কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে ঐ বইগুলি জোগাড় করে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলে, জিব কেটে বলেন, ছিঃ কি খারাপ।—যাই হোক আমাদের এই পত্রপত্রিকার দেশে ছোটদের বইয়ের সমালোচনা বড়দের কাগজে প্রায় দেখাই যায় না। অথচ সেই সমালোচনা অভিভাবকদেরি পড়া উচিত; শিশুরা সমালোচনা বোঝেও না, তার ধারও ধারে না। যাঁরা ছোটদের জন্যে বই কেনেন তাঁদের সকলেরি উচিত বই প্রকাশিত হবামাত্র সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া। বড়দের জনপ্রিয় পত্রিকাগুলিতে ছোটদের সব ভালো বই সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে দক্ষ সমালোচকদের লেখা পরিচিতি থাকা উচিত। অযোগ্য বইয়ের—শি বড়দের কি ছোটদের সমালোচনা ছেপে কাগজ নষ্ট না করে, শুধু ভালো বইয়ের যথাযোগ্য আলোচনার দরকার। অযোগ্যকে প্রাধান্য দিলে ইংরেজ সাহিত্যিকের মতে তারা দীর্ঘজীবন ও সমাদর লাভ করে, 'like flies in amber.' তাদের দিয়ে গয়না গড়ায় লোকে।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

আধুনিক সমালোচনা সাহিত্য

বর্তমান যুগ সমালোচনার যুগ, এখন সমালোচকরা সৃজনশীল বা ক্রিয়েটিভ্ লোকদের চেয়ে মর্যাদায় কিছু কম নন এবং তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও ক্রমবর্ধনশীল। সমালোচকদের পাঠক সংখ্যা কিন্তু অনেক কম, তাঁরা সংখ্যালঘুদের দলে, এবং সাহিত্যের ব্যবস্থাপক সভায় তাঁদের ভূমিকা বিরোধী পক্ষের। বিরোধী পক্ষ সরকারি পক্ষের কর্তাদের চক্ষুশূল—কারণ বিরোধীরা সময়ে অসময়ে নানাবিধ ভুল-ত্রুটীর নির্দেশ করে প্রতিপক্ষের অপ্রতিহত ক্ষমতাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করেন, অনেক সময় বিরোধী পক্ষের সতর্কতার ফলে অনেক বিপর্যয়ের হাত থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়। সমালোচকদের ভূমিকাও তাই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তরুণ লেখকরা সমালোচকদের কথা শোনেন আগ্রহ নিয়ে আবার তরুণ উপন্যাস লেখকদের অনেকেই উত্তম সমালোচক। নানা ধরণের লিটল ম্যাগাজিন পাঠ করে তরুণ সমালোচকদের বক্তব্য জানা যায়, তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে নির্ভীক এবং দলগত প্রভাবমুক্ত। এলিয়টের মতে প্রতিটি সৃজনশীল লেখকই সমালোচক।

জর্জ সেন্টসবেরী তাঁর "এ হিস্টরি অব ইংলিস ক্রিটিসিজম"এ সমালোচকদের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন—

> "They are judges, not jurists, 'lawmen'; not lawmongers and potterers with codes. Appreciation and enjoyment, with their, in this case necessary, consequences, the communication of enjoyment and appreciation — these are the chief and principal things, and these they never fail to provide".

রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের বিচারক' নামক প্রবন্ধে দুই শ্রেণীর সমালোচকের উল্লেখ করেছেন—

প্রথম শ্রেণীর সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথের মতে—

"যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন, স্বভাবে ও শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।"

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচকরা ব্যবসাদার, তিনি বলেছেন—

"আবার ব্যবসাদার বিচারকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বত প্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁক-ডাক, তর্জন-গর্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে, অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অনেক সময়েই গাড়ি-জুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়া ভোলে।"

রবীন্দ্রনাথের এই সংজ্ঞা নির্দেশ অস্বীকার করা যায় না। আর একদল সমালোচক তিনি দেখে যেতে পারেন নি। এই শ্রেণীর সমালোচক কোনো শক্তিশালী গোষ্ঠীর প্রসাদপুষ্ট, তাই তাদের সমালোচনায় চাটুকারের পদলেহন প্রবৃত্তিটা প্রকট। কিছু মানুষকে এরা বিভ্রান্ত করতে পারেন, কিন্তু চালাকি সর্বত্র খাটে না।

মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত অজস্র গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথ চৌধুরী, বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহিত্য-কর্ম বিষয়ে একাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। নজরুলের কাব্য সমালোচনা চোখে পড়েনি, কিন্তু তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনীতে নজরুল সাহিত্যেরও আলোচনা হয়েছে।

সংবাদপত্রগুলির পুস্তক সমালোচনা স্থানাভাবে সংক্ষিপ্ত। অবশ্য এই অবস্থা শুধু বাংলাদেশেই ঘটেছে, ভারতের অন্য সব প্রান্তে আজও গ্রন্থাদির পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা প্রকাশিত হয়ে থাকে। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে নব প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সমালোচনার একটি বিশেষ মূল্য আছে। নিরপেক্ষ সমালোচনা সহজেই ধরা যায়। সমালোচনা যেখানে লেখকের প্রশংসায় পঞ্চ-মুখ এবং দোষত্রুটির কোনো উল্লেখ করে না সেইখানে অনুমান করা কঠিন নয় যে, সেই সব সমালোচনা সমালোচক নিজে লেখেন নি, তাঁকে দিয়ে লেখানো হয়েছে। কোনোরকম অনুগ্রহলাভের আশায় তিনি স্তাবকতা করেছেন, কিংবা কোনোরূপ ক্ষতির সম্ভাবনায় স্পষ্ট কথা বলতে ভয় পেয়েছেন। যা বলেছেন তা সামান্য, যা বলা হয়নি তা অসামান্য।

এই দিক থেকে 'লিট্ল ম্যাগাজিনে'র ভূমিকা রীতিমত প্রশংসনীয়। এই সব পত্রিকায় নিরপেক্ষ এবং নির্ভীক সমালোচনা প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়, এবং এমন অনেক লেখকের রচনা বিশ্লেষিত হয় যা তথাকথিত উচ্চমানের পত্রিকায় আশা করা অন্যায়।

বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারাটি সুপ্রাচীন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে এবং প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের যুগ্ম-সম্পাদনায় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে 'মাসিক পত্র' প্রকাশিত হয়। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' পুস্তক সমালোচনার সূচনা হয়, এবং বিদেশী সাহিত্যের সমালোচনাদিও প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য, সমকালীন রীতিমাফিক এই সব সমালোচনা বিশ্লেষণ-ধর্মী এবং তথ্যবহুল হত। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' সমকালীন লেখকগোষ্ঠীর রচনা-বলীর সমালোচনাও প্রকাশিত হত। রঙ্গ-লালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' নিয়ে সেকালে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। তারপর এল মধু-সূদনের কাল। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে 'মধুসূদন' এক সুলভ উপজীব্য। সন্ধান করলে হয়ত দেখা যাবে যে এই মুহূর্তে মধুসূদনের সাহিত্য বিশ্লেষণ করে [illegible] ডজনখানেক সমালোচনা গ্র[illegible] অপেক্ষায় পড়ে আছে। আর [illegible]ন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনার কোনো [illegible] দেওয়া সম্ভব নয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'আমেরিকান মারকারী' পত্রিকার সম্পাদক এইচ, এল, মেনকেন বার্নাড শ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

> "Every habitual writer now before the public, from William Archer and James Hunekar to 'Vox-Populi' and 'An old Subscriber' has had his say about SHAW."

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এই কথাগুলি সমভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের শত্রু ও মিত্র সকলেই গত সত্তর বছর কিছু না কিছু লিখেছেন।

বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় সরকার-ঈশ্বর গুপ্ত যুগে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা সুরু হয়েছিল, কিন্তু সমালোচনা সাহিত্য ১৮৫০-এর পূর্বে আত্মপ্রকাশ করেনি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' রঙ্গলালের কাব্য আলোচনা করেন তারপর মধুসূদনের

আবির্ভাবে তাঁর রচিত নাটক ও কাব্যগুলির সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সব সমালোচনার মধ্যে নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, এ ছাড়া বিদ্রোহী কবির নতুন পরীক্ষাকেও অভিনন্দিত করা হয়েছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের সহপাঠী রাজনারায়ণ বসু 'মেঘনাদ বধ কাব্য' সম্পর্কে একটি সুন্দর সমালোচনা করেন, মূল রচনাটি ইংরাজীতে লিখিত, পরে বাংলা অনুবাদ করা হয়। রাজনারায়ণ বসুর সমালোচনায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগীতে বিচারের প্রয়াস ছিল, কিন্তু সেই বছরই 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনকে তীব্র আক্রমণ করলেন। তিনি তখন বয়সে কিশোর। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাথ বধের একটি তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ।" ১২৮৮-র আশ্বিন সংখ্যার 'বঙ্গ দর্শনে' শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের যুক্তি খণ্ডন করে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে তাঁর 'সাহিত্য-সৃষ্টি' নামক প্রবন্ধে অল্পবয়সের অর্বাচীন উক্তি খণ্ডন করে বলেছেন—"ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে।" ইদানীং কোনো কোনো সমালোচক অবশ্য বলেন, রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের মতটাই খাঁটি, পরবর্তী জীবনের প্রবন্ধ শীতল রক্তের প্রভাব।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী প্রবন্ধে (বঙ্কিম রচনাবলী—২য় খণ্ড) 'নীলদর্পণ' নাটক প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

"বাঙ্গালাভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক, নবেল ও অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য-সৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া সমাজ সংস্কারকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল ... কিন্তু নীলদর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য ... হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। ... কারণ এই যে, গ্রন্থকার মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্যময় করিয়া তুলিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার নমুনা হিসাবে এই অংশটুকু উধৃত করা হল। দীনবন্ধুর রচনার প্রসাদগুণ তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। মধুসূদনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান প্রসঙ্গে তাঁর 'মৃত মাইকেল মধুসূদন' নামক প্রবন্ধে বলেছিলেন—"এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।" সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্য ছিল।

মাইকেল প্রসঙ্গে এ যুগে যাঁরা যুক্তিবাদী মন নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার স্মরণীয়। তাঁর রচনার মধ্যে আছে আশ্চর্য বিশ্লেষণধারা ও সৌন্দর্যবিচার। শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর "মাইকেল মধুসূদন—জীবনভাষ্য" গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রদত্ত "শরৎচন্দ্র বক্তৃতা", "মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার", বিষ্ণু দে'র " মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা", ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'গীতিকবি মধুসূদন' 'মহাকবি মধুসূদন' এবং ডঃ শিশিরকুমার দাসের 'মধুসূদনের কবিমানস' নূতন-রীতির সমালোচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসলেখক হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছেন সর্বাগ্রে, তারপর তাঁর পরিচয় পাওয়া গেছে চিন্তানায়করূপে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় যেমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁর তেমনই কৃতীত্ব ছিল প্রবন্ধ রচনায়। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিরপেক্ষ বলা যায় না। তাঁর চরিত্রের গোঁড়ামি ও অহংকারই এই দৃষ্টিভংগীর জন্য দায়ী। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি সুনজরে দেখতেন না। 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থে অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখেছেন :—

"ইনি (অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র) স্বনামে ও বেনামিতে বহুবার বহু স্থানে বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-রীতির উপর কটাক্ষপাত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অভিযোগ ছিল বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা মাত্র এবং তাঁহার রচনা মৌলিক নহে। সবই হয় ইংরাজী নয় সংস্কৃতের অনুবাদ। সুতরাং বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকের সম্মান তাঁহার প্রাপ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অনায্য।—মোট কথা বিদ্যাসাগরের যশে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু ঈর্ষালু ছিলেন—সমসাময়িক গদ্যলেখকদিগের অনেকের প্রতিই তিনি অবিচার করিয়া গিয়াছেন। ইত্যাদি"

এই দিক থেকে লেখক ও সমালোচক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ অনেক উদার। ব্যক্তিগত আক্রোশ তাঁর বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার প্রাণবস্তু ছিল যুক্তিধর্মীতা, এবং তার বিচারের মাপকাঠি ছিল ইংরাজী সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের "শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেস্‌দিমোনা" প্রবন্ধটি এই সূত্রে পাঠ কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনার কাল তখনও আসেনি। ইদানীংকালে প্রকাশিত ভবতোষ দত্তের 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র', ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের 'বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ' ও প্রমথনাথ বিশীর 'বঙ্কিম-সরণী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে অজস্র আলোচনা গ্রন্থের মধ্যে ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দারের 'বঙ্কিম মানস' ও অসিতকুমার ভট্টাচার্যের 'বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা' বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। বঙ্কিম মানসের অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্য এই গ্রন্থ দুটি প্রশংসনীয়।

সমালোচক রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের পথে'র ভূমিকায় বলেছিলেন—"একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলাম, সৌন্দর্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ু দত্তকে সুন্দর বলা যায় না—সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না। তখন মনে এল, এতদিন যা উলটো করে বলেছিলাম তা সোজা করে বলার দরকার। বস্তুতঃ বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।"

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সমালোচনা কথাটির চেয়ে সাহিত্য বিচার কথাটাই গ্রহণ করেছেন। জর্জ সেন্টস বেরীর মত রবীন্দ্রনাথের সমালোচক বিচারকের আসনে সমাসীন। আলোচনা অর্থে তিনি বোঝেন পরিক্রমা। আর সাহিত্যের বিচার তাঁর কাছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সমালোচনা' 'প্রাচীন-সাহিত্য', 'লোক-সাহিত্য', 'সাহিত্য' 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রভৃতি পুস্তিকা-

গুলিতে, এ ছাড়া তাঁর অজস্র চিঠিপত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম সমালোচনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'কবিকাহিনী'র সমালোচনা করেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১২৮৫ বঙ্গাব্দের বান্ধব পত্রিকায়। কালীপ্রসন্ন লিখেছিলেন "কিন্তু তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) পদ্য যেমনই কেন না হউক উহা কবিতার গুণে উদ্ধার পাইয়া গিয়াছে।" কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১২৮৮ সালের বান্ধব পত্রিকার একটি সংখ্যায় রুদ্রচণ্ডের সমালোচনা করেছেন। সমালোচনার বক্তব্য বিশেষ কিছু নেই। উধৃতি-অংশ অনেকখানি কিন্তু তাঁর একটি মন্তব্য লক্ষ্য করার মতো—

"বাবু রবীন্দ্রনাথ এদেশের একজন উদীয়মান কবি। বোধ হয়, তাঁহার জ্যোতির আভায় নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছাইয়া পড়িবে।"

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে "একটুকু অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ নূতনত্ব আছে" একথাও তিনি বলেছিলেন। তারপর সেইকালের 'সাহিত্য', 'দাসী', 'প্রদীপ' 'সমালোচনী', 'প্রবাসী', 'বঙ্গদর্শন' 'সুপ্রভাত', 'আর্যাবর্ত', 'বঙ্গ দর্শন' 'ভারতী', 'অর্চনা' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, প্রিয়নাথ সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মোহিতচন্দ্র সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী, যদুনাথ সরকার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি স্বনামখ্যাত লেখকবৃন্দ রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনা করেছেন এবং রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় প্রকাশে সহায়তা করেছেন। এই প্রবন্ধাবলী রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পূর্বে লিখিত। পরবর্তীকালে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবিরশ্মি' একখানি আদর্শ গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তারপর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বৎসরে প্রকাশিত অজস্র মূল্যবান সমালোচনা গ্রন্থ। এইসব সমালোচক বিভিন্ন দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রতিভার বিচার করেছেন। প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ', 'রবীন্দ্র সরণী' এই দুটি গ্রন্থে নতুন দৃষ্টিকোণে রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার প্রয়াস করেছেন। তাঁর আঙ্গিক য়ুরোপীয়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রণীত 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। ডঃ আদিত্য ওহদেদার 'রবীন্দ্র সাহিত্য-সমালোচনার ধারা' নামক গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইকালে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ অমলেন্দু বসু, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি অধ্যাপকবৃন্দ রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রচর্চা বাংলার সমালোচনা সাহিত্যকে বিকাশের পথনির্দেশ করেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মোহিতলাল মজুমদারের কবি-প্রতিভা হয়ত কালে বিস্মৃতির গহ্বরে লীন হবে, কিন্তু সমালোচক মোহিতলালকে ভোলা কঠিন হবে। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে মোহিতলাল একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভংগী ছিল গোঁড়া, এবং তাঁর মনের কপাট সর্বক্ষেত্রে উন্মুক্ত ছিল না, তথাপি তিনি বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে বিরল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন একথা অনস্বীকার্য। মোহিতলালের একখানি সমালোচনা গ্রন্থের নাম 'শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত'। শরৎ সাহিত্যের এত গভীর আলোচনা আর কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। এদিক থেকে শরৎচন্দ্রের ভাগ্য তেমন সুপ্রসন্ন নয়। এক মোহিতলাল ও ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ব্যতীত শরৎ সাহিত্যের তেমন উল্লেখনীয় আলোচনা আজো রচিত হয়নি বলা যায়। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের কৃতিত্ব এই যে, তিনি বোধ হয় শরৎ-চর্চায় সর্বপ্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন।

বাংলায় আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের দান অবিস্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সমালোচনার সূত্রপাত তাঁর নেতৃত্বে শুরু হয়। প্রমথ চৌধুরী বাংলা, সংস্কৃত ও ফরাসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং 'সবুজপত্র' মাসিক পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেছিলেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি লিখেছিলেন—

"আমাদের নব-মন্দিরের চারিদিকের অবারিতদ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে।"

প্রমথ চৌধুরী মনের দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলেন, চারদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে এসে প্রাণবায়ুর সঙ্গে এসে মনের গভীরে অবাধে প্রবেশ করেছে। প্রমথ চৌধুরীর সতীর্থদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশংকর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হারীতকৃষ্ণ দেব, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন মননশীলতার জন্য। প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে 'সবুজপত্রে' যে নতুনের অভিযান শুরু হল তার প্রতিধ্বনি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এসে পড়েছিল ভারতীয় লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে। ভারতীয় লেখকরাও চারিদিকের দ্বার উন্মুক্ত করে আলোবাতাস গ্রহণ করেছেন প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে।

এরপর অভ্যুদয় ঘটেছে 'কল্লোলে'র লেখকদের। কল্লোলের লেখকদের নিয়ে এক শ্রেণীর অধ্যাপকীয় সমালোচনা দেখা যায় যা দায়িত্বজ্ঞানহীন। কেউ বলেন 'কল্লোলের বিভ্রান্তিকর কাল', 'কল্লোলের লেখকদের দুঃস্বপ্ন', 'কল্লোলের ভাবোচ্ছ্বাস' কল্লোল-কালিকলম - ধূপছায়া - প্রগতি ও উত্তরার লেখকবৃন্দ উচ্চশিক্ষিত। পশ্চিমের সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং একালের অন্তত দুজন বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক কল্লোলের দলভুক্ত তাঁদের নাম বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে। 'কল্লোল' মুখ্যত ছিল গল্প-কবিতার সাময়িকপত্র, তাই প্রবন্ধ সেই পত্রিকায় কম প্রকাশিত হত। শুধু প্রবন্ধ সমালোচনা এবং একটিমাত্র অনুবাদ গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় 'পরিচয়'। 'পরিচয়', 'লাইফ অ্যান্ড লেটার্স' নামক বিলাতী ত্রৈমাসিকের অবিকল অনুকরণ ছিল। 'লাইফ অ্যান্ড লেটার্স'-এ ঠিক যে ধরনের রচনা পরিবেশিত হত 'পরিচয়' ত্রৈমাসিকেও তাই হত। বাংলা দেশের ক্ষেত্রে অভিনব। অভিজাতগোষ্ঠীর লেখক, পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব এবং বৈচিত্র্য অভাবনীয়। তাই 'পরিচয়' একটি বিশিষ্ট পথচিহ্ন। কিন্তু 'পরিচয়'কে কেন্দ্র করে একটিমাত্র কবি ও সমালোচক বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সুধীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশ, শিক্ষাদীক্ষা, মননশীলতা একমাত্র প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তুলনীয়। তিনি স্বয়ং অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাই নিজের প্রতিভার জোরেই তিনি স্বীকৃতিলাভ করেছেন। কোনো গোষ্ঠী বা আন্দোলনের নেতা হিসাবে নয়।

'পরিচয়ে'র সমালোচনার ধারা ছিল উন্নাসিক। সাধারণ মানুষের মানসিকতার সঙ্গে তার যোগ ছিল না। বাংলা দেশে স্বাধীনতাউত্তরকালে অসংখ্য ক্ষুদ্র পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন লেখক আবির্ভূত হয়েছেন। অনুকূল আবহাওয়া তাঁরা লাভ করেননি প্রতিভার বিকাশে, তথাপি আশ্চর্য মৌলিক চিন্তা ও স্বকীয়তার পরিচয় এইসব সমালোচকরা দিয়েছেন। পুরাতনদের মধ্যে গোপাল হালদার, সরোজ আচার্য, নারায়ণ চৌধুরী, জগদীশ ভট্টাচার্য, পুলকেশ দেসরকার, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আর অপেক্ষাকৃত ন[illegible]দের মধ্যে অশ্রুকুমার শিকদার, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশ[illegible], অচ্যুত গোস্বামী, ক্ষেত্র গুপ্ত, জীবেন্দ্রকুমার সিংহরায়, সুধীর করণ, শীতাংশু মৈত্র, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আধুনিক সমালোচনার ক্ষেত্রে একটা নতুনত্বের স্বাদ এনেছেন।

এই সমালোচকদের উক্তি নির্ভীক, বিচারনিরপেক্ষ, যুক্তি সহজগ্রাহ্য এবং ভাষা অতিশয় স্বচ্ছ এবং সরল। আধুনিক য়ুরোপীয় সমালোচনা পদ্ধতির সঙ্গে এঁরা সুপরিচিত তাই এই লেখকদের সমালোচনায় দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, সমালোচনার বেত্রদণ্ড হাতে করে সমাজশাসনের দুরাকাঙ্ক্ষাও এঁদের নেই। মহত্তর জীবনতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণই যে এই সমালোচকগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করেছে এমন পরিচয় তাঁদের রচনায় পাওয়া যায়।

আত্মজা

মহাশ্বেতা দেবী

রাণীখেতের মল্-এ এক কুয়াশাঢাকা সকালে বিনু আবার বোনটিকে খুঁজে পেল। ভীষণ দরদস্তুর করে পেঁপে কিনছিল বোনটি, হাতে একটা বেতের ব্যাগ। [illegible]কোটের কলার একটু তোলা, পায়ে [illegible] মেয়েটিকে ভীষণ চেনাচেনা মনে হ[illegible]।

'বাঙালী মেয়ে।' ওর বন্ধুরা একটু হাসল। বিনু বাঙালী দেখলে এখনো হেঁদিয়ে গিয়ে আলাপ করে, কলকাতায় কোথায় থাকে নামঠিকানা যাতলে দিয়ে আসে, বন্ধুরা সেজন্যে ওকে কাঠগুদাম ছাড়বার পর থেকেই ঠাট্টা করছে।

শুধু কট্টর নীতিবাদী রামযোশী ভুরু কুঁচকে বললে 'মেয়েই যদি দেখতে চাও তাহলে নৈনীতালে থাকলেই পারতে।'

বিনু বললে 'এক মিনিট ভাই! মেয়েটি আমার চেনা।' পাথরে পা দিয়ে ও লাফিয়ে নেমে এল। 'এই বোনটি!' বিনু ওর সামনে এসে দাঁড়াল। শুনতে বোকাবোকা, কিন্তু ফুলপিসীমা ও'র একটি ছেলে আর মেজমেয়ের ডাকনাম ভাইটি আর বোনটি রেখেছিলেন। কিংবা উনি রাখেন নি, ওরা দুজনে দুজনকে যা বলে ডাকত সেটাই ডাকনাম দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ওর ভাল নাম নীলাঞ্জনা।

'আরে বিনু যে!'

ওরা দুজন প্রায় সমবয়সী। এক বাড়ীতে পিসতুত-মামাত, অনেকগুলি ভাইবোন গুঁতোগুঁতি করে মানুষ হলে যা হয়, এক সময়ে ওদের খুব ভাবও ছিল। বোনটি যখন বাড়ী ছেড়ে চলে যায় ফুলপিসীমা ত বিনুকেই সন্দেহ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'তোর সঙ্গে ঘুরত-ফিরত তুই জানিস না কোথায় গেছে? ছি ছি বিনু, তুই যে এতখানি নীচ তা আমি ভাবি নি।'

ফুলপিসীমার দাদা, বিনুর বাবাও চ্যাঁচামেচি করেছিলেন। ও'দের কি করে ধারণা হল বিনুও জড়িত সেকথা বিনু আগে বোঝেনি। তারপর বুঝেছিল বিনুর সঙ্গে বোনটির ভাব আছে, বিনুকে ফুলপিসীমারা সবাই ভাল ছেলে বলে মনে করেন, বোনটি এর দুটোকেই নিজের কাজে লাগিয়েছিল।

ততদিনে বিনুরা আলাদা বাড়ীতে উঠে এসেছে। বোনটি যখন-তখন বেরোবার জন্যে বিনুর নাম ব্যবহার করত। 'বিনুর সঙ্গে গিয়েছিলাম, বিনু মোড় অব্দি পৌঁছে দিলে', বাড়ীতে প্রত্যেকদিনই এসে বলত। কাজেই 'আমার খোঁজ কোর না, লাভ হবে না', লেখা চিঠিটা আবিষ্কার হবার পর ফুলপিসীমা বিনুর কাছেই ছুটে এসেছিলেন।

মা, বাবা, পিসীমা সবাই ওদের মেলা-মেশাকে কি চোখে দেখেছে, বিনুকে কতখানি দুর্বলচিত্ত মনে করেছে টের পেয়ে বিনুর মাথাকাটা গিয়েছিল। তারপর বোনটির ওপর রাগ হয়েছিল। মিছেমিছি ওর নামকে নোংরা করবার জন্যে বেজায় চটে গিয়েছিল বিনু।

এখন সেকথা মনে পড়ল। ফুল-পিসীমা সেদিন অব্দি বলতেন যদি কোথাও দেখতে পাস ওর মুখখানা মাটিতে ঘষে দিস বিনু', কিন্তু ইদানীং আর কিছু বলেন না। বোধহয় ও'রা ধরেই নিয়েছেন ও'দের মেয়ে আর নেই। পাঁচ বছর যখন খবর পাওয়া যায়নি তখন মরে গিয়েছে নিশ্চয়।

পিসেমশায় আবার বড্ড বেশী গোঁড়া। উনি তো ছোটমেয়ের বিয়ের আগে স্পষ্ট বলে দিলেন 'আমার দুই মেয়ে,

অঞ্জনা আর রঞ্জনা। অন্য কারো নাম আমি শুনতে চাই না।'

বিনুর চট করে মনে হল বোনটির সঙ্গে দেখা হবার চমকপ্রদ খবরটা সত্যেন রায় রোডে কাউকে দেওয়াও যাবে না। পিসেমশার বাব। ফুলপিসীমা ছোটমেয়ের কাছে বেড়াতে গেছেন। ভাইটি, ও'দের একমাত্র ছেলে, বোনের নাম শুনতে পর্যন্ত রাজী নয়।

'বাবার কথার ওপর আমার কথা নেই ভাই—' ওর সাফ জবাব। মাকে পর্যন্ত বলে দিয়েছে 'যদি আমাকে চাও, তাহ'লে এ বাড়ীতে ওর নাম পর্যন্ত কোর না মা। আমাদের কথা ও যদি তিলমাত্র ভাবত তাহলে বুঝতাম!'

বোনটির হাতে কাচের চুড়ি, গলায় মঙ্গলসূত্র দেখতে দেখতে বিনুর মনে হল মেয়েটা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, ওর কথা কাউকে বলা যাবে না ভাবতে ওর খারাপ লাগল।

'তুমি কি বেড়াতে এসেছ? বোনটি ওর লজ্জা কাটাতে চেণ্টা করছে। এই পাঁচ বছরেই চেহারা ভারী হয়ে গিয়েছে। কে বলবে এই মেয়ে এক সময়ে ভাল নাচত, থিয়েটার করত।

'অফিসের কাজে।'

'কি অফিস?'

বিনু নাম বললে।

'ক'দিন থাকবে?'

'সাতদিন।'

আসলে চারদিনের মেয়াদ কিন্তু বিনু নিজেই জানে না কেন দুম করে মিছে কথা বলে বসল। এতক্ষণে সম্ভবত যাওয়া-আসার কথা উঠল বলে বন্ধুদের কথা মনে পড়ল।

'কোথায় থাক বোনটি?'

'এই তো, পি ডবলিউ ডি বাংলোর বাঁদিকে একটু এগিয়ে আমাদের বাড়ী। ডাক্তার ঠক্কর এখানেই চেম্বার করেছেন।... যাবে?' বোনটি হঠাৎ সাহস করে জিগ্যেস করে ফেলল।

'ডাক্তার ঠক্কর কোথায়?'

'এখন শহরে। ওষুধের দোকানে একটু বসেন। লাঞ্চে আসবেন। তুমি কোথায় উঠেছ? ও, তোমাদের তো আপিস থেকেই বন্দোবস্ত করে।'

'চল, বাড়ীটা দেখেই আসি।' বিনু ওকে দাঁড়াতে বলে বন্ধুদের কাছে ফিরে গেল। বন্ধুরা বেকারী থেকে রুটি কিনছে।

'লাকি চ্যাপ!' রামযোশী বললে।

'কে বাবা?' মদন পেরেরা জিগ্যেস করলে। এক বিনু ছাড়া ওরা চারজনই অবাঙালী যদিও সবাই বাংলা বলে। বিনুর মনে হল মদন পেরেরার সঙ্গে বরঞ্চ ঠক্করদের কোন-না-কোন রকম আত্মীয়তা থাকলেও থাকতে পারে, আর যা হোক একই রাজ্যের লোক তো! হয়তো বোনটি ওর ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলেও সহজ বোধ করবে কিন্তু বিনুর সঙ্গে কথায়বার্তায় ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা আড়াল এসে গিয়েছে।

'আমার পিসতুত বোন।' বিনু সংক্ষেপে জবাব দিল।

'এখানে থাকেন?'

'হ্যাঁ। আমি ওকে পৌঁছে দিয়ে আসছি। তোমরা যাও।'

'আরে, আমরা তো চৌবাটিয়া যাব।'

'আমি না হয় কাল যাব।' বিনুকে দেখে বোঝা যাচ্ছে ও বিরক্ত, বোধহয় উদ্বিগ্নও খানিকটা। 'অলরাইট' বলে ওরা চলে গেল। অফিস ওদের হোটেলে থাকবার বন্দোবস্ত করেছে। মল্-এর ওপরেই ওদের হোটেল।

বোনটির বাড়ীতে বিনু বসে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল। ছোট বাড়ী, সামনে একটু বাগান। জানলা দিয়ে নিচের চীরবন দেখা যায়। খন্ড খন্ড কুয়াশা চীরগাছের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল। অনেক নিচে বোধহয় কেউ কাঠ কাটছে তার ঠকাঠক শব্দ ভেসে আসছিল। কোথায় রেডিওতে গানের শব্দ।

বোনটি রান্নাবান্না নিজেই করে। বিনুর জন্যে চা করতে গিয়ে ও উধাও হয়ে গেল। বোধহয় বিনুর সামনাসামনি আসতে এখনো লজ্জা পাচ্ছে।

এই ডাক্তার অমৃতলাল ঠক্করের বয়স বাষট্টির কম নয়। কলকাতায় থেকে থেকে উনি একেবারে বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন। পিসেমশায়ের বাড়ীর সবাই ও'কে 'কাকা' বলত, বিনুরাও বলত। ছোটবেলা থেকে ও'র ওখানে ওরা চিকিৎসা করাচ্ছে। বিনুরা গেলে উনি ওদের লজেন্স দিতেন, ছবির বই, পেনসিল। বিনু রোজ একটা ডাব্বাওয়ালাকে হোটেল থেকে খাবার আনতে দেখত। বাড়ীতে রান্নার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। ভাসাভাসা শুনেছিল ও'র বউ বম্বের এক বড়লোকের মেয়ে, বাপের ওয়ারিশান। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে উনি বম্বেতেই থাকেন। স্বামীর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। দু'পক্ষই দু'পক্ষ সম্পর্কে একেবারে চুপচাপ। ডাক্তার ঠক্কর কখনো বম্বে যেতেন না।

পিসেমশায় বলতেন, 'মরে গেলে লোকটা টাকাকড়ি সব চ্যারিটিতে দিয়ে যাবে জানলে?'

কলকাতার গুজরাটি সমাজে ও'র খুব একটা যাতায়াত ছিল না। যদিও ডাক্তার হিসেবে সব সমাজেই ও'র মোটামুটি পশার ছিল।

বয়স আঠারো হতে না হতেই বোনটির মুখে অসম্ভব ব্রণ বেরিয়েছিল। কি রকম চাপা আর গম্ভীর স্বভাব হয়ে গিয়েছিল ওর, কারো সঙ্গে বেশী কথা বলত না। বিনুর এখন মনে পড়ল দু'বার বোনটি ওকে নিদারুণ লজ্জায় ফেলেছিল। ওদের বয়স যখন বছর বারো, তখন ঘর অন্ধকার করে চোর-চোর খেলছিল ওরা। বাইরে ভীষণ বিষ্টি। ছাট আসবে বলে গোটা বাড়ীটাই দোর-জানলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাড়ীটা একেবারে একটা বন্ধ কৌটোর মত।

মহাশ্বেতা দেবী

সেই সময়ে বোনটি ওকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরেছিল। বিনু প্রথমটা খেলা-খেলা মনে করে কিন্তু পরে 'এই ছেড়ে দাও, কি হচ্ছে?' বলে চেঁচিয়ে ওঠাতে মন্টুটা ফট করে বাতি জেবলে দিয়েছিল। বিনু তো অপ্রস্তুত, কিন্তু বোনটি বললে 'বিনুটা খেলা নষ্ট করে দিয়েছে। আমি আর খেলব না।'

আরেকবার, তখন ওরা নতুন বাড়ীতে চলে এসেছে, ওদের বাড়ীতেই পোস্টম্যান-পোস্টম্যান খেলা হচ্ছিল। বোনটি ওর হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলেছিল 'এই পোস্টম্যান, তোমাকে তো কেউ চিঠি দেয় না, আমি একটা চিঠি দিলাম। তুমি পড়ে দেখো।' চিঠিটায় লেখা ছিল 'বিনু স্বাতীকে বিয়ে করবে।'

স্বাতী পাশের বাড়ীর মেয়ে। বিনু তাকে কোনদিন ভাল করে চেয়েও দেখে নি। স্বাতীদের বাড়ীতে একটা আইসক্রীম বানাবার কল ছিল আর পাড়ায় ছোটোদের মেলা হল যখন, বি [illegible] সেই কলে এন্তার আইসক্রীম বানি[illegible] বিক্রী করেছিল। স্বাতীর দাদা ছিল মেলার পান্ডা।

সেদিনও বিনু কম অপ্রস্তুত হয় নি। বোনটিকে ওর একটু ভয় ভয়ই করত অনেকদিন পর্যন্ত। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই, সতেরো বছর বয়সে বোনটি পাড়ায় একজন আসল পোস্টম্যানের হাতেই চিঠি গুঁজে দিয়েছিল একটা। লিখেছিল 'আপনার সঙ্গে আমার অনেক গোপন কথা আছে।'

পোস্টম্যান আবার সে-চিঠি এনে পিসেমশায়ের হাতে দেয়। উনি যতই চেঁচান কুরুচি, কুশিক্ষা, এইসব বলে, বোনটি একেবারে নির্বিকার। কেন লিখেছিস, ওকে কেন লিখেছিস, একটি প্রশ্নেরও জবাব দেয় নি। বিনুর পরে মনে হয়েছে মেয়ের ওপর ও'দের খুব একটা বিশ্বাস ছিল না বলেই বিনুকেও ও'রা

অবিশ্বাস করতে পেরেছিলেন। সে অবিশ্বাসের স্মৃতি এখনো বিন্দুকে লজ্জা দেয়। শরীর ঘেমে ওঠে ওর, মনে হয় এ-কথা জানাজানি হয়ে গেলে সবাই ওকে দুশ্চরিত্র মনে করবে। বিন্দুর মা যদিও ফুলপিসীমাকে ঝর-ঝরিয়ে অনেকগুলো খরখরে কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ঘর সামলে পরকে বলতে এস। তোমার ও মেয়ে হাড়ে বজ্জাত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বা ঝুলোঝুলি করত।'

বিন্দুও বিশ্বাস করে বোনটি বজ্জাত। নইলে ডাক্তার ঠক্‌করের কাছে গেলি রূপর চিকিৎসা করতে, ডাকতিস 'কাকা' বলে। কেমন করে কোন রুচিতে লোকটাকে বিয়ে করে চলে গেলি। ও বাড়ীতে কোন মেয়েটার বিয়ে উনিশ বছরের মধ্যে হয় নি? তোরও হত। বিন্দুর মা ঠিকই বলেন। কিছু কিছু মেয়ে আছে তারা বিশ্ব-সংসারকে জ্বালাতেই আসে।

ডাক্তার ঠক্‌করের চেহারা চোখে পড়ার মত। কাটা-কাটা মুখ চোখ, কালো রঙ, মুখের হাসি মিষ্টি। মাথার চুল অনেক-দিন ধরেই ধপধপে সাদা। ওখানে ও'র পশার এমন কিছু ফলাও ছিল না। ধর্মতলায় ছোট্ট একটা ঘরে দিনে আলো জেবলে পাখা ঘুরিয়ে টেবিলের পেছনে বিরাট একটা গণেশের ছবি ঝুলিয়ে উনি ডাক্তারী করতেন।

এখানে পাখাটা ঘুরছে না বটে, কিন্তু সেই সবুজ রেক্সিনের টেবিল: দেওয়ালে গণেশ, টেবিলে কাচের নিচে 'গড ইজ গুড', 'অল্‌ জ ওয়েল দ্যাট এন্ড্‌জ ওয়েল' লেখা কাগজের টুকরো চাপা দেওয়া। তাছাড়া কাগজের ফুল। বিবর্ণ, পাঁশুটে কতকগুলো কারনেশান। এই তো ঘরের বাইরে উৎসুক শিশুদের মত উজ্জ্বল সোনালী ক্যানা, পোর্টিকোতে নীলমণি-লতায় ফুল, টবে এখনো ডালিয়া। যার বাগানে এত ফুল সে কাগজের ফুলে ঘর সাজায় কেন?

এখন বিন্দু দেখতে পেল পাশের [illegible]য়ালে একটি মেয়ের ছবি, ছবি ঘিরে [illegible] ফুলের মালা।

'[illegible]দেখে যাও।' বোনটি ঘরে ঢুকেছে।

'ওটা কার ছবি?'

'ওর মেয়ের।'

'মেয়ের?'

'হ্যাঁ বিন্দু। এ বাড়ীর কোন ঘরে জান আমার একটাও ছবি নেই। প্রতিটি ঘরে ওর মেয়ের একেকটা ছবি দেখতে পাবে। এমন কি জান? ওর পকেটে পর্যন্ত মেয়ের ছবি থাকে।' বোনটি হঠাৎ হাসতে লাগল। ওর হাসি দেখতে দেখতে বিন্দু বুঝতে পারল হাসিটা হিস্টিরিআর। চীনে ধাঁধার একটা টালি যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন বসিয়ে দিতেই ছবিটা পরিষ্কার। আর বুঝতে ভুল হবার কথা নয়। হিস্টিরিআর হাসি বিন্দু আগেও দেখেছে। নিশ্চয় দেখেছে কোথাও, নইলে চট করে বুঝে ফেলল কি করে?

হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে বোনটি মুখে আঁচল চাপা দিল। বলল, 'বিকেলে এসো বিন্দু। বাড়ী তো দেখে গেলে।'

ডাক্তার ঠক্‌কর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বিন্দু ও'কে আলগোছে একটা নমস্কার সেরে বেরিয়ে এল। বোনটির হাসির শব্দ। একটা প্রচন্ড চড় মারল কে। হাসি নেই। চীরবনের গভীর থেকে কাঠ কাটবার ঠকাঠক শব্দ। বিন্দু রাস্তায় পা দিল।

'বাড়ী ফিরে চল বোনটি।' সন্ধ্যায় আকাশের নিচে বসে বিন্দু বলছিল। এখন বাড়ীতে কেউ নেই। ঘরে বাতি। বাতির চার পাশে পোকা উড়ছে। বোনটি চেআরে এলিয়ে বসে আছে।

'বাড়ী ফিরে চল। ভুল করেছ বলেই ভুলের জের টেনে চলতে হবে তার কোন মানে নেই।'

'বাবার বাড়ীতে?'

'ফুলপিসীমা আছেন।'

'না।' বোনটি মৃদু বিষণ্ণতায় মাথা নাড়ল, 'তুমি তো জান বাবা কতটা শক্ত হতে পারেন। দাদাও বাবারই মত। বাবা কতবার মা-কে বলতেন এ বাড়ীতে তোমার শুধু খোরপোষের অধিকার, মনে নেই?' দাদা বউদি একবার রাণীখেতে এসেছিল। ওর সঙ্গে দেখা হতেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল জান?'

'তুমি কেন এমন কাজ করলে বোনটি?'

'কি জন্যে করেছি বলে মনে হয়?'

'জানি না। বুঝতে পারি না।'

'আমি কিন্তু অনুতাপ করি না বিন্দু। শুধু ও যদি আগে নিজের মন একটু স্পষ্ট করে বুঝত!'

'ও কি তোমায় কষ্ট দেয়?

'কষ্ট কাকে বলে বিন্দু?' বোনটির স্বর যেন ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে, কুয়াশার মত থিতিয়ে যাচ্ছে কোন অন্ধকারের বুকে। দূরে চীরগাছের মাথার ওপর দিয়ে কোন উপত্যকায় আলো। ব্যাগপাইপ বাজাতে বাজাতে একটা গাড়োয়ালী বিয়ের শোভাযাত্রা যাচ্ছে। 'হোম, সুইট হোম' গানের সুর চীরবনের মাথায় মাথায় ছড়িয়ে গেল।

'মনের কষ্ট।'

'বুঝি না।' বোনটি কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবল। তারপর বলল 'ওর মেয়েকে ও দু'বছর বয়সের পর দেখেনি জান?'

'কি করে জানব বল?'

'মেয়ের মা দেয়নি। কোন সম্পর্ক ছিল না ওদের মধ্যে। এমনকি ওর মেয়ের বিয়ের খবরও ডাক্তার পায়নি। কাগজে দেখে একটা চেক পাঠিয়েছিল, চেক ফেরৎ আসে। মেয়ের বিয়ে হয়েছিল কার সঙ্গে জান? কার ছেলের সঙ্গে?'

একটি বিখ্যাত হোটেল মালিক পরিবারের কর্তার নাম করল বোনটি। ভারতবর্ষের প্রতিটি হিলস্টেশনে ওদের বড় বড় হোটেল আছে। সবশুদ্ধ চল্লিশটি।

'আমাকে বিয়ে করবার জন্যে ও যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল বিন্দু। আমি তো ওকে

ভালবেসেছিলাম, কিন্তু ও আমায় ভাল না বেসেই বিয়ে করবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছিল কেন বল তো?'

বোনটি কথা বলতে বলতে অস্থির একটা আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠল। বিনুর মনে হল অনেকদিন ও কথা বলতে পারেনি।

বিয়ের পরে বোনটি সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিল যখন ডাক্তার ঠক্কর ওকে কিছুতেই স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চাননি। 'আমাদের বিয়ে অনেকদিন অব্দি শুধু কাগজকলমের বিয়ে ছিল বিনু!' বোনটি বারকয়েক বলল। ও বোধহয় ভাবছিল বিবাহিতা মেয়েরা যেমন করে বোঝে, বিনুর মত আনাড়ি ছেলেরা তেমন করে এসব কথার গুরুত্ব বোঝে না। কিন্তু বিনু বললে 'আমি বুঝেছি।'

ডাক্তার ঠক্কর ফুল দিয়ে বিছানা সাজিয়েছিলেন। বোনটি পরিবারের কারো সহযোগিতা পেল না সেজন্যে উনি অপ্রতিভ হয়েছিলেন। অনেক ফুলটুল এনে ঘর সাজিয়েছিলেন। বিনুদের আর বোনটিদের বাড়ী বাদ দিয়ে অন্য রোগীদের ডেকে-ছিলেন রিসেপশানে। চীনে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, গুজরাটি, সিন্ধী, বাঙালী, মারাঠি সবাই এসেছিল।

ফুলশয্যার রাতে বোনটি যখন বসে বসে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে সেই সময়ে ঘরে এলেন ডাক্তার ঠক্কর। ওর হাত ধরে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেললেন। বললেন 'আমি অন্যায় করেছি নীলা।'

অন্যায় কেন হবে? লোকের চোখ না হয় অস্বাভাবিক, কিন্তু ওরা দুজনে তো দুজনকে ভালবেসেছে। ভালবাসার মধ্যে ন্যায়অন্যায়ের প্রশ্ন ওঠে কেমন করে?

ডাক্তার ঠক্কর হঠাৎ বলেছিলেন 'আমার একটি মেয়ে আছে নীলা। ও কি আমায় ক্ষমা করবে?'

বোনটি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার ঠক্কর তো ওকে সব কথাই বলেছিলেন। ও'র স্ত্রী-কে একদিন উনিই ত্যাগ করে চলে আসেন। স্ত্রী-র অপরাধ ও'র বাবা স্যার দয়ারাম, ও'রা ভীষণ বড়লোক। স্ত্রী ভেবেছিলেন হয়তো মেয়ের সঙ্গেও বাপের কিছুটা সম্পর্ক থাকবে কিন্তু ডাক্তার ঠক্কর সে কথা শোনেননি। পরে ডাক্তার ঠক্কর চলে আসবার পর বছর বারো কেটে যেতে হঠাৎ ও'র মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ইচ্ছে হয়। তখন মেয়ের মা ও'কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করে চিঠি লেখেন। মেয়ে জানে না ওর বাবা একজন সামান্য ডাক্তার মাত্র। মেয়ের কাছে একটি কাল্পনিক পিতার কাল্পনিক চেহারা গড়ে তোলা হয়েছে। এখন আর যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত নয়, সম্ভবও নয়।

ভদ্রমহিলা পরের দিকে খুব ধার্মিক হয়ে গিয়েছিলেন, ধর্ম-ধর্ম বাই, ধর্মশালা করে দেওয়া, এইসব নিয়ে থাকতেন। ডাক্তার ঠক্করকে সান্ত্বনা দিয়ে উনি জানালেন, মেয়ে তো দাদুর আদরে নিজের ইচ্ছেমত জীবন কাটায়। আমি থাকি আমার ঠাকুরদেবতা নিয়ে। ধর্ম একটা ফুলটাইম চাকরী বললেও হয়। তুমিও ঠাকুরদেবতাকে ডাকো, শান্তি পাবে।'

কিন্তু শান্তি তো ডাক্তার ঠক্কর চাননি, চেয়েছিলেন মেয়েকে। যতদিন ইচ্ছে করলেই যেতে পারতেন, মেয়েকে দেখতে পারতেন, ততদিন মেয়ে সম্পর্কে বোধহয় কোন কথাই ভাবেন নি। কিন্তু এখন চেকপোস্ট বসে যাবার পর হঠাৎ ওকে ভালবাসতে সুরু করলেন। মেয়ে যদি এক কাল্পনিক বাবার কাল্পনিক ছবিকে স্বীকার করে নিতে পারে, উনিই বা কেন কাল্পনিক এক আত্মজাকে ভালবাসতে পারবেন না? রক্তমাংসের মেয়ে তো তাঁরই সৃষ্টি, কল্পনার মেয়েকে তিনি আবার সৃষ্টি করলেন। শান্ত, সুন্দর, শ্রীময়ী একটি মেয়ে। বাবার জন্যে যে অস্থির, উদ্বিগ্ন। মেয়ে যে বাবাকে ক্ষমা না-ও করতে পারে তা ডাক্তার ঠক্কর ভাবেন নি। স্ত্রী লিখেছিলেন ও এক কাল্পনিক পিতাকে জানে। উনি ভেবেছিলেন স্ত্রী নিশ্চয় ও'র প্রতি খুব নির্দয় হবেন না। মেয়েকে জানতে দেবেন ওর বাবা খারাপ লোক নয়। ডাক্তার ঠক্কর ভেবেছিলেন বউ অত্যন্ত ধনী এবং জাঁহাবাজ বলে তাকে ছেড়ে এসেছেন। সেটা আর এমন কি অপরাধ? সেজন্যে কি প্রভাবতী দয়ারাম এতদিন রাগ পুষে রাখতে পারেন? আর, ডাক্তার ঠক্কর ছেড়ে এসেছেন বলেই না ভদ্রমহিলা ঠাকুর-দেবতা, ধর্মকর্ম করতে পারছেন?

ডাক্তার ঠক্কর প্রভাবতী দয়ারামের রাগের ও আক্রোশের পরিমাপ বোঝেন নি। ছেড়ে যাবার জন্যে স্বামীকে উনি ক্ষমা করেননি, কোনদিন না। উনি ছেড়ে এলে সেটা অলরাইট হত, কিন্তু তাঁকে, দয়ারামের মেয়েকে ছেড়ে চলে যায়, লোকটার এতবড় আস্পর্ধা? মেয়েকে বলেছিলেন, 'বাবার কথা তোমার ভাববার দরকার নেই। বেঁচে আছে এইটুকু জেনে রাখ শুধু। তোমার বাপ একটা অপদার্থ।'

মেয়ের কাছে মা যতটা সত্যি ছিল বাপ ততটা নয়। ডাক্তার ঠক্করের কল্পনার মেয়ে, দ্বিতীয় আত্মজা, বাবার স্নেহমমতা পাবে বলে কোথায় কেন অপেক্ষা করত। তার রক্তমাংসের মেয়ে দাদুর আদর আর টাকার বন্যায়, পার্টি থেকে পার্টিতে খড়কুটোর মত ভেসে বেড়াত। বিয়ের পর ওর উচ্ছৃংখলতা আরো বেড়ে যায়। টাকার সঙ্গে টাকার বিয়ে ফলে এই অতৃপ্তি, অ-সুখ আর অশান্তির জন্ম।

বোনটি তো সব কথাই জানত। বলত, 'কেন তোমার এ অপরাধবোধ? আর যে মেয়ে-মেয়ে করে তুমি অস্থির হচ্ছ সে কি তোমার কথা ভাবে?'

ডাক্তার ঠক্কর না কি বলতেন, 'নীলা', তুমি আমার মেয়েকে মেরে ফেলতে চাও? ওআন্ট টু ডেস্ট্রয় হার ইমেজ?'

বোনটির মনে হয়েছিল তোমার কল্পনায় ও শিশু, নিষ্পাপ বালিকা। তাকেই ভালবেসে যদি সুখ পাও তো তাই পেলে না কেন? আমাকে কেন মাঝখান থেকে আমার সমাজ-সংসার থেকে ছিঁড়ে আনলে?

ডাক্তার ঠক্কর বলেছিলেন আগে উনিও নীলাকে ভালবেসেছেন। এখনো বাসেন। তবু কেন যেন দোষী-দোষী মনে হয় নিজেকে। মনে হয় মেয়েকে মেয়ের প্রাপ্য স্নেহ মমতা দিইনি সেটা অপরাধ।

শুনে বোনটি ক্ষেপে যায়। সেই থেকেই যে মেয়েকে দেখেনি, যাকে জানে না, তার ওপর ওর ভয়ানক হিংসে হয়।

বোনটি বলতে লাগল, 'মেয়ে, মেয়ে, আর মেয়ে! আমি একদিন বলেছিলাম, তুমি একটা শয়তান, তোমাকে জেলে পোরা উচিত। ও বললে হ্যাঁ নীলা, কেস কর[illegible] তুমি মুক্তি পাও। আমি ওকে মুক্তি চাইনি। ভালবাসাই একমাত্র বেঁধে [illegible] ক্ষমতা রাখে না বিনু। ঘৃণাও মর্মান্তিক টানে টানতে পারে। তুমি কি ভাব আমি ওকে ছেড়ে গেলেই সমস্যার মুক্তি হবে? কখনো না। দুজন দুজনের মধ্যে এত বেশী জড়িয়ে গেছি বিনু, এখন যেখানে যাব সেখানে আমার মধ্যে ও-ও থাকবে। আমার সাধ্যি কি ওর থেকে মুক্তি পাই, ওর সাধ্য কি আমার থেকে মুক্তি পায়? দুটো সাপের মত পরস্পরকে গিলতে গিলতে আমরা এখানে এসেছি।

'শুনতে জঘন্য, কিন্তু আমি ওকে নিদারুণ আঘাত করেছি। মেয়ে আর আমার মধ্যে একজনকে বেছে নাও, এ কথাও বলেছি। ও বলেছে ছি ছি নীলা, এ তুমি কি বলছ? মেয়ের সম্পর্কে আমার

তো একটু স্নেহ শুধু......আমি বলেছি তাহলে আমাকে ভালবাসতে পারছ না কেন।

'ও হতাশ হয়ে আমার দিকে চেয়ে থেকেছে। বলেছে আমি তোমায় ভালবাসি নীলা। বুড়ো হয়ে গেছি তো! কেমন করে তোমায় বোঝাব বল? আমি তো ওর বুকে আছড়ে পড়েছি বিনু, জড়িয়ে ধরে বলেছি বয়সের কথা বোল না। আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি ওদের কথা ভুলে যাও। ওরা তোমার জন্যে কেয়ারও করে না। হ্যাঁ বিনু, আমি তোমায় খুব ফ্র্যাঙ্কলি বললাম সব। কিন্তু আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম। আমরা একঘরে, এক বিছানাতেই ঘুমোই। কিন্তু কাছাকাছি আসা এত কঠিন বিনু! যা হোক, একদিন কাগজে দেখলাম ওর মেয়ে আর জামাই রাণীখেতে আসছে। ওদের নতুন কেনা হোটেলে।'

ডাক্তার ঠক্কর বললেন, 'আমি যাব।'

বোনটি বলল 'তুমি যেও না।' ও বুঝতে পেরেছিল এতদিনে একটি মেয়ের মৃত্যু আসন্ন। ডাক্তার ঠক্করের কল্পনার সেই শান্ত, সুন্দর, শ্রীময়ী আত্মজা এবার মরে যাবে। বহুদিন বেঁচে আছে মেয়েটি, ডাক্তার ঠক্করের ক্ষুধিত কল্পনায় একটু একটু করে বড় হয়েছে। এখন ও শুধু এক অফুরন্ত ভালবাসা, অসীম করুণা, অপার ক্ষমা। অথচ এমন সুন্দর মেয়েটাকে সরস্বতী গ্রেওয়াল এক মিনিটে মেরে ফেলবে। বোনটি সেই সময়ে ডাক্তার ঠক্করের কল্পনার সরস্বতীকে ভালবেসে ফেলেছিল।

কোন গল্প যদি জানা থাকে, সে গল্পের সিনেমা দেখতে দেখতে যখন মনে হয় এমন সুন্দর ছেলেটা বা মেয়েটা এখনি মরে যাবে, তখন যেমন কষ্ট হয়, বোনটিরও তাই হয়েছিল।

কিন্তু ডাক্তার ঠক্করও ক্ষেপে গিয়েছিলেন। বোনটির মত নিউরোসিস না থাক, ও'র মেয়ের ওপর ভালবাসা, ওর নিউ-[illegible]সিসের মতই তীব্র। বোনটি বলেছিল, [illegible]তে চাও যাও, কিন্তু জেনে রেখ, লাথি[illegible]ওয়া কুত্তার মত তুমি আমার কাছেই ফিরে আসবে। আমি বলছি তুমি যেও না।'

সরস্বতী গ্রেওয়াল ডাক্তার অমৃতলাল ঠক্করকে দেড় মিনিটের ইন্টারভিউ দিয়েছিল। লাউঞ্জে বসেছিল ও, পরনে লাল স্ল্যাকস, হাতে ড্রিংক। একটু পরেই ওকে আদর্শ গৃহকর্ত্রী হতে হবে। একজন মন্ত্রী চম্বা থেকে ফিরছেন, রাণীখেতে হল্ট করবেন। ওদের হোটেলেও কয়েকজন ভি-আই-পি আসবেন। শাড়ী পরতে হবে মনে করেই সরস্বতীর কান্না পাচ্ছিল।

ডাক্তার ঠক্করকে দেখে ওর মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল।

'আমি তোমার বাবা...'

'প্লীজ গো অ্যাওয়ে।'

'আমি তোমার বাবা......একটু কথা বলেই চলে যাব।'

'রিয়ালি!' সরস্বতী কোন সদ্য-বরখাস্ত অবুঝ চাকরকে বোঝাবার ভঙ্গীতে আঙ্গুল তুলে বলেছিল 'আমি তোমায় চিনি না, চিনতেও চাই না। আমার স্বামী তোমার অস্তিত্বই জানেন না। তুমি চলে যাও।'

মেয়েটির স্বামীও ঘরে ঢুকেছিল। অত্যন্ত বড়লোকের (একপুরুষের বড়লোকের বলাই ভালো) অত্যন্ত দুর্বিনয়ে বলেছিল 'লোকটা কে ডার্লিং? কি চায়?'

'আমাকে দেখতে চায়।'

'দেখেছে তো। এখন যেতে বল।'

'ইয়েস। গো অ্যাওয়ে।'

সরস্বতী শেষের কথাটা চেঁচিয়ে বলেছিল। ডাক্তার ঠক্করের চোখে জল এসেছিল। রক্তমাংসের সরস্বতী ও'র কল্পনার সরস্বতীকে মেরে ফেলল। এর চেয়ে যদি না আসতেন এখানে...নীলা ঠিকই বলেছিল।

লাথিখাওয়া কুকুরের মত বোনটির কাছেই ছুটে এসেছিলেন ডাক্তার ঠক্কর। বলতে চেয়েছিলেন, 'ও আমায় চিনতে লজ্জা পেল নীলা...তুমি আমায় ক্ষমা কর। এখন তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'

বোনটি বললে, 'আমি তো জানতাম ও আসবে বিনু। আমি তো জানতাম ওর মেয়ে প্রথমে বাবাকে, তারপর নিম্নবিত্তদের ঘেন্না করতে শিখেছিল। ওর মেয়ের কাছে হয়তো এ দেশের সবাই নিম্নবিত্ত। তা, ওদের আন্দাজে ময়লা জামাকাপড়পরা লোক দেখলেই ওর হিস্টিরিয়া হত। আমি জানতাম ডাক্তার আমার কাছেই আসবে, আর ওর চোখে জল দেখলেই আমি সব ভুলে যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘরে থাকতে পারলাম না। ঘর থেকে বেরিয়ে আমি চৌবাটিয়া চলে গিয়েছিলাম বিনু, ট্যাক্সি নিয়ে।'

'কেন?'

'আমি যে জানতাম ওকে দেখলেই সব ভুলে যাব? আমি যে ভুলতে চাই নি? কেন একটা মিথ্যে কল্পনাকে ভালবাসতে গিয়ে ও আমার উপর অবিচার করেছিল? কেন নিজের মন বোঝেনি। এতদিন ও আমায় শাস্তি দিয়েছে, এবার আমি ওকে শাস্তি দিলাম। সেদিন ওর মুখটা কেমন হয়েছিল জান? দু'বার লাথিখাওয়া কুকুরের মত।'

বিনু অস্বস্তি বোধ করছিল। ক্রমেই বোনটিকে অচেনা মনে হচ্ছিল তার, যেন অপরিচিত।

'তারপর ওর মেয়ে মারা গেল।'

'সে কি?'

'আমেরিকায়। যখন মেয়ে মারা গেল সেদিন ও দরজা বন্ধ করে বসেছিল বিনু, আর আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম। এতদিনের দুঃখ আর অভিমান, সব। আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ওকে দোর খুলতে অনুনয় করছিলাম বিনু। বুঝতে পারছিলাম কি ভুল করেছি এতদিন ধরে। মিছেমিছি কি নীচে নেমে গিয়েছি আমি। কিন্তু ও বেরিয়ে এসে কি বললে জান?'

'কি?'

'কে মারা গিয়েছে, কি হয়েছে আমি কিছুই জানি না তো! আমি বললাম—সরস্বতী। ও বললে সে কে?'

বোনটি আবার হাসতে লাগল। হাসি আর ডুকরে কান্নার মাঝামাঝি একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরোতে লাগল ওর গলা দিয়ে। ও বলল 'ঐটেই ওর শাস্তি দেওয়া। সরস্বতীর নাম পর্যন্ত করে না বিনু, কখনো ওর কথা বলে না। আমরা যে যেখানে ছিলাম, সেখানেই রয়ে গেলাম। কাছে যাই, সে সাধ্যও নেই, ছেড়ে যেতেও পারি না। কিছুই যেন করে উঠতে পারি না আমরা। আমাকে ও এখনো যত্ন করে, আদরে মুড়ে রাখে। হিস্টিরিয়া বাড়লে চড়চাপড়টা মারে হয়তো, সকালে হয়তো টেরও পেয়েছে।'

'বোনটি, এভাবে সম্পর্ক টেনে রেখে কি লাভ?'

'জানি না। তোমার তো রবীন্দ্রনাথের সে গল্পটা মনে পড়ে বিনু, আমারো মনে হয়, আমাদের দুজনের মাঝখানে সেই মরামেয়েটা শুয়ে আছে। ওকে আমরা ডিঙোতে পারি না। মাঝে মাঝে হয়তো দুজনে একটু কাছে আসি, মনে মনে শান্তি পাই, কিন্তু তখনই মেয়েটা এসে আড়াল করে দেয় সব। আমারো তো লজ্জা, আমিও তো ওকে ঘেন্না করেছি।'

'এ রকম ভাবে কতদিন চলবে বল?'

'জানি না, জানি না বিনু। ওকে ভাল বেসে বেসে, ওর মেয়েকে হিংসে করে করে আমি যেন ফুরিয়ে গিয়েছি, আর কিছু করবার জোর নেই আমার, আর কিছু ভাববার শক্তি নেই।'

অন্ধকার। রাণীখেতের ওপর কুয়াশার ঘেরাটোপ নামছে। নামতে নামতে চীরবনের ওপর শাদা চাদর টেনে দিয়ে কুয়াশা নিচের উপত্যকায় নেমে গেল। ওখানে, অন্ধকার খাদের সবটুকু ওরা ঢেকে রেখে দেবে। খাদের ভেতরটা বড় কুশ্রী।

হঠাৎ ভীষণ শীত করল বিনুর। 'চল ঘরে যাই', বোনটি আস্তে বলল। গেটের শেকল খোলার শব্দ। ডাক্তার ঠক্কর ফিরে এলেন।

॥ ভ্রম সংশোধন ॥

গত সংখ্যার প্রকাশিত 'কিশোর-কিশোরী' গল্পের শেষ অনুচ্ছেদটি মুদ্রণ প্রমাদবশত বাদ পড়ে গিয়েছিল। সেটি এখানে দেওয়া হল:

আর এদিকে নিজের ঘরে ফিরে এসে জয়া লজ্জায় অপমানে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। তার মনে হল, অসীমের মত একটা গুণ্ডাপ্রকৃতির ছেলের সঙ্গে সারাদিন মিশেই সে অন্যায় করেছে। ঐ ছেলেটির অভদ্র ইতরতার আকস্মিকতা সে ভুলতে পারছিল না কিছুতেই। তাকে শাস্তি দেওয়াতে হবে এই কথা মনের মধ্যে উচ্চারণ করে সে এবার তাই মার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

আর্টের উদ্দেশ্য

আর্টের উদ্দেশ্য কী?

এর পাল্টা প্রশ্ন, প্রকৃতির উদ্দেশ্য কী?

একমাত্র প্রকৃতির সঙ্গেই আর্টের প্রতিতুলনা। আর্টের কথা ভাবলে নেচারের কথা মনে আসে। আবার নেচারের কথা ভাবলে আর্টের কথা। মানুষ বলে আরেকজন না থাকলে প্রকৃতি একাই থাকত। এটা হতো একমাত্র প্রকৃতির জগৎ। মানুষ এসেছে তার সৃষ্টির অমিত শক্তি নিয়ে। প্রকৃতির মতোই সে অকৃপণ ও সর্বক্ষণ সক্রিয়। এটা তাই মানুষেরও জগৎ।

কিন্তু মানুষ যদি শ্রান্ত হয়ে ক্ষান্তি দেয় তা হলে আর মানুষের জগৎ বলে কিছু থাকবে না। থাকবে শুধু প্রকৃতির জগৎ। প্রকৃতির শ্রান্তি নেই। ক্ষান্তি নেই। মানুষ যদি প্রকৃতির কাছ থেকে প্রকৃতিরই মতো অশ্রান্ত অক্লান্ত থাকার রহস্যটি আয়ত্ত করতে পারে তা হলে মানুষেরও শ্রান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই। সেও অনন্তকাল সৃষ্টি করে যেতে পারবে।

প্রায় প্রত্যেক যুগসন্ধিতে একবার করে প্রকৃতির কাছে ফিরে চলার রব ওঠে। কিন্তু সভ্যতা মানুষকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে যে প্রকৃতির সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে নেবার সাধ্য তার ক্ষীণ। আরো প্রাকৃতিক না হয়ে সে তাই আরো সভ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সেটা যে আর্টের দিক থেকেও অগ্রগতি তা নয়। কারণ আর্টের দিক থেকে সে শ্রান্ত ক্লান্ত নিঃশেষিত। তখন তার নূতনত্ব সাধারণত পদ্ধতির বা ঘটনার। আর নয়তো বিকৃতির।

প্রকৃতির থেকে দূরে সরে গেলে আর্ট তার উদ্দেশ্য থেকেও দূরে সরে যায়। তখন আর্ট হয় উদ্দেশ্যহীন কেরামতী। প্রকৃতি তো কোনোদিন কেরামতীর চেষ্টা করে না। প্রকৃতির রাজ্যে কেরামতী বলে কিছু নেই। প্রকৃতির সমস্তটাই লীলা। প্রকৃতির উদ্দেশ্য ওই এককথায় বলা যায়। লীলা।

তেমনি আর্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে লীলা।

যে কোনো একটি খেলার মতো তার নিয়মকানুন খুব কড়া। সে সব মেনে না নিলে খেলা জমে না। কিন্তু খেলার শেষে বোঝা যায় তার সার্থকতা আছে। খেলোয়াড়রা খেলায় সুখ পান নিয়মকানুন মেনে ও তার ঊর্ধ্বে উঠে। তেমনি লীলারও নিয়মকানুন আছে। সে সবও কম কড়া নয়। যদিও অনেক সময় আমরা না জেনেই মেনে চলি। লিখতে লিখতে লেখা আপনি নিখুঁত হয়।

লীলা তখনি সার্থক হয় যখন সৃষ্টি একটা পরিপূর্ণতায় এসে পৌঁছয়। হয়তো চার লাইনের একটি কবিতা। চৌপদী যার নাম। জাপানী হাইকুর মতো সতেরো সিলেবলও হতে পারে। নির্দিষ্ট একটি সীমার মধ্যেই তার পরিপূর্ণতা। তার সেই সীমা মেনে নিয়ে সে যখন পরিপূর্ণতা পায় তখন তার আকৃতি তাকে আর্ট বলে চিনিয়ে দেয়। আকৃতি বিনা আর্ট নেই। আর্ট বিনা আকৃতি নেই।

আর্টের একদিকে যেমন প্রকৃতি আরেক দিকে তেমনি আকৃতি। প্রকৃতির প্রত্যেকটি সৃষ্টির নিজের একটি আকৃতি আছে। প্রকৃতি যতখুশি সৃষ্টি করে চললেও প্রত্যেকের জন্যে আলাদা একটি আকৃতি বরাদ্দ করতে ভোলে না। তেমনি শিল্পীরাও তাঁদের সৃষ্টির প্রত্যেকটির আকৃতি সম্বন্ধে সচেতন। কোনো সৃ নিরবয়ব বা নিরাকার নয়। কিন্তু তাই য নয়। আকারের সঙ্গে থাকবে আকৃতি।

নৈসর্গিক কবিপ্রতিভা সকলের নেই। কিন্তু আকৃতিজ্ঞান যেমন করে হোক অর্জন করতে হবে। নানা দেশের নানা যুগের সেরা কবিতা পড়তে পড়তে শুনতে শুনতে এ জ্ঞান জন্মাতে পারে। তেমনি ছবি দেখতে দেখতে চিত্রকরসুলভ আকৃতিজ্ঞান। গান শুনতে শুনতে সংগীত সম্পর্কিত আকৃতিজ্ঞান। মানুষকে জন্মসূত্রে যা দেওয়া হয়েছে তার অভাব যদি কারো জীবনে দেখা যায় তবে তার অভাব পূরণ করে শিক্ষা। এই জন্যে শিক্ষার এত মূল্য। যারা জাতশিল্পী তাদেরও শিক্ষার দরকার হয়। ঐতিহ্য তো পড়ে পাওয়া যায় না। বড়ো বড়ো প্রতিভাকেও হাতেকলমে পূর্বসূরীদের কাছে শিখতে হয়।

ধারাবাহিকতা যেমন প্রকৃতির বেলা তেমনি আর্টের বেলাও সত্য। বহতা নদীর মতো এর আদি নেই অন্ত নেই। আছে শুধু ধারা। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি ধারাভঙ্গ করতে পারো, কিন্তু তা হলেও একটি নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়। আর সে ধারাকে আলাদা করে দেখলেও সে একেবারে নিঃসম্পর্কীয় নয়। যার থেকে সে পৃথক তার ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র কোথাও এক জায়গায় রয়েছেই। শাখা অসংখ্য হলেও মূলস্রোত একই। ধারাভঙ্গ বার বার ঘটলেও ধারাবাহিকতা গঙ্গোত্রীর সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করে। ঐতিহ্য যেখানে হারিয়ে গেছে সেখানেও তার সঙ্গে সংযোগ ফিরে পাবার জন্যে প্রাচীনের পুনরুদ্ধার করতে হয়।

কিন্তু পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে পুনরাবৃত্তি নয়। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে যখন আমরা ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে নতুন করে সজাগ হই তখন অজন্তার সঙ্গে জোড় মিলিয়ে নেবার দরকার ছিল। কিন্তু পৌরাণিকের পুনরাবৃত্তি দু'দিনেই নিঃশেষ হতে বাধ্য। কারণ যুগটা পৌরাণিক নয়। ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের পরে আর পুনরাবৃত্তি নয়। নব নব কল্পনা ও নব নব আকৃতি আমাদের ঐশ্বর্যের পরিচায়ক।

দেশের মতো যুগেরও একটা মূলস্রোত আছে। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে শুধুমাত্র দেশের ধারা বেশীদিন বাঁচিয়ে থাকে না। ঊনবিংশ শতাব্দী আমাদের কবিদের গঙ্গাস্নানে অভ্যস্ত জীবনকে সমুদ্রস্নান করায়। সমুদ্রের জোয়ার ছুটে আসে গঙ্গার বুকে। তার ফলে যা ঘটে তার নাম আমাদের সাহিত্যের রেনেসাঁস। প্রয়াগের বা হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় বার বার গঙ্গাবগাহন করেও এ ফল লাভ হতো না। আমাদের অনেকেই এ সত্য ইতিমধ্যে ভুলে গেছেন। কুম্ভমেলায় সহস্র সহস্র বর্ষের পুনরাবৃত্তি পরম বিস্ময়ের বিষয় হলেও সমুদ্রের একদিনের একটা জোয়ার তার চেয়েও ফলপ্রসূ। তবে ফলপ্রসূ বলতে যাঁরা পরকালে বা পরলোকে ফলপ্রসূ বোঝেন [illegible]দের কাছে এ যুক্তি নিষ্ফল।

[illegible]গা বাস করলে এ যুগের মূলস্রোতে [illegible]াহন করতে হয়। সেই মূলস্রোত যদি [illegible] হয়ে এ দেশের নদীতে প্রবেশ করে তবে তা যদিও উল্টো স্রোত তবু তার সঙ্গে স্বদেশের বহমান স্রোতকে মিলিয়ে নিতে হবে। এটা একপ্রকার সংস্কৃতিবিপ্লব। সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে এর সঙ্গে বোঝাযুঝি ও বোঝাবুঝি চলেছে। বিংশ শতাব্দীতেও তার শেষ নিষ্পত্তি হয়নি। লক্ষণ দেখে মনে হয় সমুদ্র আমাদের পর আর গঙ্গা আমাদের আপনার এই সংস্কার এখনো একান্ত প্রবল। রেনেসাঁস যদি ভঙ্গীসর্বস্ব হয় তবে তার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে বলতে হবে।

রেনেসাঁস হচ্ছে নতুন প্রাণশক্তির উত্তাল তরঙ্গ। যা জীবনের অন্যান্য বিভাগের মতো আর্টকেও আন্দোলিত করে। যে তরণী এতদিন নদীর জলে পাল তুলে ভেসেছিল সে এখন সমুদ্রের জলে দিশাহারা বোধ করে। মাথার উপরে ধ্রুবতারা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। হাতের কাছে থাকে কম্পাস। আকাশ যখন মেঘে ঢাকা তখনো তার দিকনির্ণয়ের ভুল হয় না। ঝড়ঝাপটায় কম্পাসও ভেঙে যেতে পারে। সে সময় তাকে বাঁচাবে কে? সেইটেই বিংশ শতকের মধ্যভাগে যুদ্ধবিগ্রহের ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মুখে পড়া তরণীর প্রশ্ন। এ প্রশ্নে ইউরোপই এখন জর্জরিত। জীবন যদি লণ্ডভণ্ড হয় আর্ট কী করে আপনাকে নিয়ে আত্মসমাহিতভাবে বাঁচবে?

কবিদের কাছে জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা আসছে। তাঁদের নিজেদেরও জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা জমছে। এসব জিজ্ঞাসার উত্তর হোমর বাল্মীকি ভার্জিল কালিদাসের দিকে তাকালে পাওয়া যাবে না। ক্লাসিক এখানে নিরুত্তর। রেনেসাঁস যতগুলো ঢেউ তুলেছে ততগুলো ঢেউ ভাঙতে বা ঢেউয়ের পিঠে চড়তে শেখায়নি। সাহিত্য আজকাল সমস্যার অবতারণা করে। সমাধান বলে দেয় না। বলতে পারে না। সমাধানের জন্যে দ্বারস্থ হলে পাশ কাটিয়ে যায়। বলে, "একালের সাহিত্য বেদ বাইবেল কোরান তো নয়ই, কার্ল মার্কসের ডাস কাপিটাল বা মাও-সে-তুং-এর চিন্তাও নয়। কী জবাব দেবে? জবাব জানা থাকলে তো? আজকে যেটা দেবে কালকেই সেটা বাসি হয়ে যাবে। কাল যে কী ঘটবে কেউ তা বলতে পারে না। আমরা দিন আনি দিন খাই।"

কতক লোক যে ধর্মের শরণ নেবে এটা অস্বাভাবিক নয়, এটাই বরং স্বাভাবিক। তেমনি সঙ্ঘের শরণ নেওয়া, তা সে যে কোনো একটা সঙ্ঘই হোক। বুদ্ধের স্থান নিয়েছেন রাজনীতির গণনায়করা। তাঁদের কাছেও লোকে শরণ পায়। কিন্তু আর্ট বা সাহিত্য কাউকে শরণ দিতে অক্ষম। এই যে অক্ষমতা এটা ইচ্ছাকৃত নয়। ধ্রুবতারা অদৃশ্য হলে, কম্পাস অচল হলে তরণী নিজেই দিশাহারা।

তা হলেও কেবল ভেসে বেড়ানো চলবে না। আপনার ভিতর থেকেই প্রত্যয় সংগ্রহ করতে হবে। আর্টের কাছে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর মিলবে না সেকথা ঠিক। কিন্তু আর্ট কেন মিথ্যার ব্যাপারী হবে? আর্টের কাজ সত্যের কাছে সত্যরক্ষা। আমার জীবনের যা সত্য, আমার যা সত্য, তাই আমার হাতে রূপ পাবে। কারো ভয়ে আমি যেন তাকে চেপে না রাখি বা অন্যরকম না করি।

সংকট যতই ঘনিয়ে আসুক না কেন কবি বলে যদি কেউ বেঁচে থাকেন ও লেখনী তুলে ধরা যদি অসম্ভব না হয় তবে সত্যের কাছে সত্যরক্ষাই তাঁর কাজ। সেইভাবে কাব্যের মধুচক্রে যা জমবার তা জমবে। লোকে একদিন তার আস্বাদন নেবে। কিন্তু সদ্য সদ্য কোনো দুরূহ প্রশ্নের উত্তর পাবে কিনা সন্দেহ।

সভ্যতা দিন দিন যেমন জটিল হচ্ছে তাকে সরল করে আনার কোনো উপায় যদি না থাকে তবে আর্ট তাকে কারো কাছে সরল করতে পারবে না। সরল করতে হলে বাদসাদ দিতে হয়, পরিহার করতে হয়। পপুলার সায়েন্সের মতো পপুলার আর্ট সৃষ্টি করতে হয়। তেমন করে আর্ট অগ্রসর হবে না।

যেটুকু আমার কাছে উপলব্ধ সত্য সেইটুকুতেই আমার অধিকার। আর্টের অতি সামান্য ভগ্নাংশ হলেও সত্যের দিক থেকে তা নিটোল। তেমনি রূপের দিক থেকেও নিখুঁত। হয়তো একফোঁটা চোখের জল, তবু আর্টের মধুচক্রে তারও ঠাঁই আছে। কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর না হয়েও সে স্বত্ববান। সে অস্তিত্ববান।

লীলা যাকে বলি তা এই অস্তিত্বের মধ্যে আপনাকে খুঁজে পাওয়া ও ধরে দেওয়া। কার কোন্ কাজে লাগবে জানিনে, তবে এ না হলে আমি বাঁচিনে। আর্ট আমাকে বাঁচায়।

অকাল বৃষ্টি ফোঁটা ফোঁটা

বিষ্ণু দে

ক্লান্তিতে যখন মেশে কলকাতার সন্ধ্যার বিষাদ
তখন কিই বা করা?
একা একা এ পথে সে পথে হেঁটে মরা ছাড়া
—অবশ্য ডাক্তারি মতে বৃদ্ধের স্বাস্থ্যের
এই সবচেয়ে নিরাপদ অন্বেষণ।
তাই যৌবনের লেক ছেড়ে ময়দানের ব্যবসায়ী প্রকাশ্যতা ছেড়ে
আধো-আলো আধো-ছায়া নিরিবিলি গৃহস্থের
এ পাড়া সে পাড়া বেয়ে চলা।

ভাঙা পথ, ভাঙা শান,
ঘাড় নিচু, প্রাণ নিয়ে ঘাড়ে,
—বলা কিছুই যায় না, চলি, দুর্মর যে স্বাস্থ্যের সন্ধান।
হঠাৎ জলের ফোঁটা, হিমশুকনো মাঘের শৃঙ্খলা ভেঙে
আশ্চর্য
পথে দেখে দেখে বুঝি ভুলেছি আকাশ—
বৃষ্টি এল কোথা থেকে, ফোঁটা ফোঁটা অকালের
গোপন চোখের জল।
যেন পড়ে কুশ্রী এই কলকাতার ধুলোক্রান্ত মাটির শিকড়ে।
অপ্রস্তুত। কান্নার হাওয়ায়
জোরে চলি দ্রুতশ্বাসে যেন অদৃশ্য মিছিলে
অশ্রুজল বিস্তার ছড়ায়
কলকাতার পথে পথে সারা দেশে।

ছায়া খুঁজি পথে কোনও অশ্বত্থের ছাদে।
কিন্তু কান্না কিছুক্ষণ বাদে
আবার চালায়
যেন সেই দেশব্যাপী গুম্ফিত অপঘাতে আক্রোশের জল মেশে।।

রবীন্দ্রনাথ ও সাম্প্রতিক রবীন্দ্রচর্চা

টাইপরাইটার মেশিনের সাহায্যে রবীন্দ্র-নাথের এই ছবিটি এঁকেছেন শ্রীনির্মলকুমার দত্ত।

রবীন্দ্রনাথের বিপুল পত্র-প্রাচুর্য বাংলা-সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। তিনি বলতেন, যাকে মন খুলে চিঠি লেখা যায়, তারই আকর্ষণী শক্তির দামে চিঠি মূল্যবান হয়ে ওঠে। এই গুণে রবীন্দ্রনাথের চিঠি সর্ব-জনপ্রিয় সাহিত্যসম্পদে পরিণত হয়েছে। চিঠির উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, দূরের মানুষকে লেখার মধ্য দিয়ে কাছে নিয়ে আসা এবং বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়ার অনায়াসনৈপুণ্য, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিঠি-গুলোকেও সাহিত্যিক স্থায়িত্ব দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নানা-জনকে চিঠি লিখেছেন। সেইসব চিঠির মধ্যে তার যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা একদিকে যেমন বিস্ময়ের, তেমনি আনন্দদায়ক। বাংলা-সহিত্যের এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি একক। পরবর্তীকালে তাঁর লেখা চিঠিগুলি সংকলিত হয়েছে। মৃণালিনী দেবী, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিমা দেবী, মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, নী[illegible]নাথ, নন্দিতা, নন্দিনী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, [illegible]নদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী, প্রমথ চৌধুরী, জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু, কাদম্বিনী দেবী, নির্ঝরিণী সরকার, প্রিয়নাথ সেন, হেমন্তবালা দেবী এবং আরো কয়েকজনকে লেখা চিঠি নিয়ে চিঠিপত্রের নয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া আছে ছিন্ন-পত্রাবলীর দুটি সংস্করণ, নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা পত্রসংগ্রহ 'পথে ও পথের প্রান্তে', রাণা দেবীকে লেখা পত্র-সংগ্রহ 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথ এন্ডরুজ পত্রাবলী' এবং চিঠিপত্রের দশম খণ্ড। 'রবীন্দ্রনাথ এন্ডরুজ পত্রাবলীতে' এন্ডরুজ ও পিয়ারসনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, তাঁর অপ্রকাশিত কয়েকটি চিঠি এবং গুরুদেবকে লেখা এন্ডরুজের চিঠি সংকলিত হয়েছে। ইণ্টারন্যাশনাল য়ুনি-ভার্সিটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আবেদনের পূর্ণ বয়ানটিও রয়েছে এই পত্র-সংকলনে।

এন্ডরুজ ছিলেন বিদেশী। তিনি এ-দেশে মিশনারীর কাজ ত্যাগ করে শান্তি-নিকেতনে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, তা বিভিন্ন পথে বিভিন্ন কর্মে ছিল অটুট। দুই সৃষ্টিশীল প্রাণের সামনে কত সমস্যা কত সংকট এসেছে, কিভাবে তাদের উত্তরণ ঘটেছে—তারই স্বচ্ছ সুন্দর রূপ পাওয়া যাবে এই পত্রাবলীতে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও এন্ডরুজের মানস-বিনিময়ের বাণীরূপ পরস্পরের চিঠিপত্র। ১৯১২ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে লেখা রবীন্দ্র-নাথের চিঠির একটি সংকলন 'লেটার্স টু এ ফ্রেন্ড' প্রকাশ করেন এন্ডরুজ। সব চিঠিই কবির রচিত। বিদেশী বন্ধুর অপূর্ব সান্নিধ্যে দুটি শ্রেষ্ঠ মানুষের পরিচয় পত্রা-বলীতে স্পষ্ট। চিঠিগুলিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে প্রতিটি পর্বের প্রথমে ভূমিকা-যুক্ত করেছিলেন এন্ডরুজ। এই ভূমিকায় দুই মনের যুক্ত কল্যাণ কামনা পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রন্থটি অনেকদিন ছাপা নেই। গ্রন্থখানির বাংলা অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী মলিনা রায়। বাংলা সংস্করণটি সুসম্পাদিত। মূল গ্রন্থের পত্রগুলির যোগসূত্রে এন্ডরুজের কয়েকটি পত্রের অনুবাদ পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য অতুলনীয় গদ্য রচনার মত বর্তমান পত্র সংগ্রহের চিঠি-গুলিও অপূর্ব। অনুবাদে শ্রীমতী রায় সেই ধারাকে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন এবং সক্ষম হয়েছেন। গ্রন্থ-পরিচয় লিখেছেন শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী। পত্রসংগ্রহ থেকে দুটি উদ্ধৃতি তুলছি। দুটিই রবীন্দ্রনাথের।

"মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমায় যেতে হবে, সে আমি জানি। যে-বেদনা আমার হৃদয়

বিদীর্ণ করছে, ভগবান জানেন, তা মৃত্যু-যন্ত্রণাই। নিজের পুরোনো সত্তাকে ত্যাগ করা খুবই কঠিন। সময় না এলে কেউ বুঝতেই পারে না, কতদূর পর্যন্ত তার শিকড় ছড়িয়ে গেছে, আর কোন্ অভাবিত অজ্ঞাত গভীরে তার সূক্ষ্ম তন্তুগুলি পেঁাছে অমৃতময় জীবনরস আকর্ষণ করে শুষে নিচ্ছে।"

আবার লিখছেন তিনি :—

"জগৎ জুড়ে মানুষের দুঃখ, আমার মনও বিষণ্ণ। গান দিয়ে এই দুঃখকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে বিশ্বাত্মার অতল গভীরতা থেকে চির আনন্দের বাণীটি তুলে এনে যদি পৃথিবীর ক্রোধজর্জর বা লজ্জাভারাব-নত মানুষগুলিকে শুনিয়ে বলতে পারতুম —'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যাভিসং বিশন্তি।' এই যে প্রকাশমান জগৎ, এ আর কিছুই নয়, তাঁর অন্তহীন আনন্দই রূপধারণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দেই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশেই তাঁর আনন্দ।"

চিঠিপত্রের দশম খণ্ডের অধিকাংশ চিঠি দীনেশচন্দ্র সেনকে রবীন্দ্রনাথের লেখা। দীনেশচন্দ্রের লেখা কয়েকটি চিঠিও আছে। দীনেশচন্দ্রের আত্মজীবনীর সংকলন, টীকা-টিপ্পনি, মডার্ন রিভ্যু-এ বাংলায় এম-এ পরীক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিঠি এবং ব্যক্তিপরিচয় রয়েছে গ্রন্থশেষে। রবীন্দ্রনাথের ছেচল্লিশখানি এবং দীনেশচন্দ্রের বারখানি চিঠি আছে বর্তমান খণ্ডে।

বত্রিশ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে যে-কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে বিশ্ব-কবির চিন্তাধারায় পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পঁয়ত্রিশ সংখ্যক চিঠিতে তিনি লিখছেন, "আমার কাব্য সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্র-লাল রায় মহাশয় যে-সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করিবার কোনোই প্রয়োজন নাই। আমরা বৃথা সকল জিনিসকে বাড়াইয়া দেখিয়া নিজের মনের মধ্যে অশান্তি ও বিরোধ সৃষ্টি করি। জগতে আমার রচনা খুব একটা গুরুতর ব্যাপার নহে, তাহার সমা-লোচনাও তথৈবচ। তাছাড়া সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ মত থাকে থাক না, সেই তুচ্ছ বিষয় লইয়া কলহের সৃষ্টি করিতে হইবে নাকি? আমার লেখা দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাল লাগে না কিন্তু তাঁহার লেখা আমার ভাল লাগে, অতএব আমিই জিতিয়াছি—আমি তাঁহাকে আঘাত করিতে চাই না।"

ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গ, সাহিত্য এবং বাংলাদেশের নানান বিষয়ে দুইজনে চিঠি-পত্র আদানপ্রদান হয়েছিল। কতকগুলি চিঠি এমন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে লেখা, যেগুলি এই ধরনের সংকলনে স্থান না পেলে বিশেষ কোন ক্ষতি হত না।

●

রবীন্দ্র সাহিত্যের সামুদ্রিক ব্যাপ্তি আজও আমাদের বিস্মিত করে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের সমগ্ররচনাতে প্রতিভার প্রকা-শের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা দেখা যায়; কোনো একটা রচনা আর একটার চেয়ে অনেক বেশি ভালো,—বা কোনো একটা অপরটি অপেক্ষা অনেক বেশি খারাপ—এমন বলবার উপায় নাই।" —শ্রীবিশী রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে একথার উল্লেখ করেছেন।

দীর্ঘকাল পূর্বে শ্রীবিশীর রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহের দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে কয়েকটি সংস্করণও প্রকা-শিত হয়। প্রতিটি সংস্করণেই গ্রন্থের কলে-বর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমালোচক নতুন করে সমগ্র আলোচনার পুনর্বিন্যাস করেছেন। সম্প্রতি দুটি খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক বর্তমান পূর্ণাঙ্গ সংস্করণে তিনটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছেন এবং পূর্ব-তন দুই খণ্ডের অধ্যায়গুলি বর্তমান গ্রন্থে পুনর্বিন্যস্ত। পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাট্যের কালানুক্রমিক সংস্করণের যে সুবৃহৎ তালিকা দেওয়া হয়েছে, গ্রন্থখানির মূল্য তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকাভিনয়ের আটটি আলোকচিত্র বর্তমান সংস্করণকে সমৃদ্ধ করেছে। সুদৃশ্য প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী। এই ধরণের সুমুদ্রিত প্রবন্ধগ্রন্থ বাঙলা দেশে সম্পূর্ণ অভিনব।

গীতিনাট্য, কাব্য নাট্য, নৃত্যনাট্য, ঋতু-নাট্য, তত্ত্বনাট প্রহসন মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংখ্যা কম নয়। একটি খণ্ডে ঐ সমস্ত নাটকের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দুরূহ ব্যাপার। শ্রীযুক্ত বিশী সেই দুরূহ কাজ সম্ভব করেছেন। বাল্মীকি প্রতিভা মায়ার খেলা, মালিনী, রাজা, ডাকঘর, মুক্তধারা রথের রশি, ফাল্গুনী, তাশের দেশ, চির-কুমার সভা, শেষরক্ষা, বৈকুণ্ঠের খাতা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, রাজা ও রাণী, রাজা, তপতী, অচলায়তন, বিদায় অভিশাপ, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, শাপমোচন, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ কৌতুক, মুক্তির উপায় প্রভৃতি আরো অনেক নাটকের যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠক মাত্রেরই পরম আদরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যের প্রতীক, তত্ত্ব-নাট্যের দোষ, রবীন্দ্রনাথের নাটকে 'ঠাকুর্দা ও কবি', রবীন্দ্রনাথের নাটকে জনতা, রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়যোগ্যতা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বিশী যে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে পাণ্ডিত্য প্রকাশের অহমিকা নেই, নেই বিদেশী পণ্ডিতদের বহুল উদ্ধৃতি।

শ্রীবিশীর আর একখানি রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনা গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থখানির নাম 'রবীন্দ্র সাহিত্য বিচিত্রা'। রবীন্দ্র বিচিত্রা নামে গ্রন্থখানি প্রচলিত ছিল। নামান্তর করণের কৈফিয়ৎ-স্বরূপ শ্রীবিশী বর্তমান চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন : "এত দিন গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি ছিল। এবারে একটি পরি-কল্পনা অনুসারে ইহা বিন্যস্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পরবর্তী সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের জীবন সঙ্গীত ও চিত্রকলা সম্বন্ধে কয়েকটি নিবন্ধ সংযোজিত করে গ্রন্থখানিকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়া হবে।

বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের রচনার উৎস, কাব্য, গদ্যরচনা ও উপন্যাস বিষয়ে কয়েকটি নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। তাছাড়া চরিত্র বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি নিবন্ধ আছে। রবীন্দ্র কাব্যে বস্তুবিচার, রবীন্দ্রনাটকের রূপান্তর ও নামান্তর, রবীন্দ্র-কাব্যের পাঠান্তর, রবীন্দ্র সাহিত্যে একটি প্রতীক, রবীন্দ্র কাব্যের কয়েকটি অনাদৃত কবিতা, রবীন্দ্র কাব্য পাঠের সঙ্কেত, জীবন স্মৃতি ও ছেলেবেলা, ছিন্নপত্রের কবি, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, রবীন্দ্রনাথের খণ্ডো-পন্যাস, শেষের কবিতা নিবন্ধগুলি মনন-বৈদগ্ধে উজ্জ্বল। দেবযানী, মালিনী, বৈরাগী, বসন্ত রায়, বিনোদিনী, আনন্দময়ী গোরা ও অমিত রায়, নিখিলেশ ও সন্দীপ, শচীন, বিপ্রদাস ও মধুসূদন অভীককুমার ও মোহিনী চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীবিশী। বিবিধ প্রবন্ধাবলীর মধ্যে আছে রবীন্দ্র সাহিত্যে গান্ধী চরিত্রের পূর্বাভাষ, মহা-রাষ্ট্র ও রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় জানবার পক্ষে এই গ্রন্থখানির মূল্য যথেষ্ট। তাছাড়া যাঁরা রবীন্দ্র সাহিত্যের সম্পর্কে খুব বেশী সচেতন নন তাঁদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি পরম আদরণীয় হবে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের উল্লেখযোগ[illegible]-পঞ্জী এবং রবীন্দ্র তথ্যপঞ্জীর [illegible]ং তালিকাটি বর্তমান নতুন সংস্করণে [illegible]তম আকর্ষণ।

●

'যোগাযোগ', 'মানসী', 'চতুরঙ্গ' 'জীবনস্মৃতি', 'রাজা', 'সোনারতরী', 'চিত্রা', এবং 'শ্যামলীর' বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ ভৌমিক তার 'রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের প্রাক অন্তিম-পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে যোগাযোগ নানাদিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। চতুরঙ্গও তার উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম সৃষ্টি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাস-দুটি বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। মানসী রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ যৌবনের কাব্য। মানসীতে রবীন্দ্র-জীবনের যে সকল ভাব-অঙ্কুর পৃথিবীর মাটি আর আকাশের আলো

প্রার্থনা করেছিলো, সোনার তরীতে তারাই পাখা মেলে আলোক রহস্যের গভীরে যাবার জন্যে উন্মুখ। বিশ্বপ্রকৃতির আদিম রহস্যময় অন্তঃপুরে প্রবেশের যে ব্যাকুলতা এই পর্বের কোন কোন কবিতায় লক্ষ্য করা গেছে—সেই চেতনাই প্রসারিত হয়ে দূর ভবিষ্যতের দিকে আপন অস্তিত্বের স্পর্শলাভে উৎসাহিত হয়েছে চিত্রা কাব্যগ্রন্থে। মানসী-সোনারতরী-চিত্রা সমালোচনায় তরুণ সমালোচক বুদ্ধি-দীপ্ত চিন্তা এবং গভীর মননশীলতার পরিচয় রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্য বয়সের রচনা জীবন-স্মৃতি। সম্পাদকের তাগিদে রচিত রবীন্দ্র সাহিত্যের এই অসামান্য ফসল বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ। শ্রীভৌমিক নিপুণভাবে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ জীবন স্মৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন।

রাজা প্রকাশিত হয় ১৩৭০ বঙ্গাব্দে। রবীন্দ্র প্রতিভার তখন মধ্যাহ্নকাল। জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসলগুলি তখন ভাঁড়ারে সঞ্চিত হয়ে চলেছে। গীতাঞ্জলি সবে প্রকাশিত হয়েছে। খেয়া প্রকাশিত হয়েছে তারও আগে। সেই সময়ে রাজা সম্পর্কিত একটি মিস্টিক কনসেপশন কবির মনে জন্মলাভ করে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে গীতালির ভেতর দিয়ে, ক্রমবর্ধিত হয়ে, পূর্ণতা লাভ বিশ্বাসেরই উপলব্ধনি। রাজা নাটক আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও সমালোচকের নাটক সম্পর্কিত চিন্তার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

●

মহাবোধি সোসাইটিতে বুদ্ধজয়ন্তীর অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম মন্দির দর্শনে, সেদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল—যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাইনি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্য-প্রভাব অনুভব করিনি?"

বুদ্ধদেবের চরিত্র মহিমা ও তাঁর প্রবর্তিত নীতিধর্ম রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে প্রভাবিত করে এবং তাঁর বাণী সাধনায় বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির যে প্রতিফলন ঘটেছে তা তুলনা বিরল। ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে যে নীতিধর্মের মধ্য দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ তার মহনীয় রূপকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়েছেন। তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ঘটেছে তারই উজ্জ্বল প্রতিফলন। এর পেছনে ছিল রবীন্দ্রনাথের গভীর ইতিহাস-বোধ। একযুগে তথাগত বুদ্ধের চারিত্র মহিমা এবং নীতিধর্ম প্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ঘটে এক উজ্জীবন। তার সৌন্দর্য ও মহত্বে রবীন্দ্র সাহিত্যও সঞ্জীবিত। বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনুশীলনরত মনীষীদের সঙ্গে যেমন তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল, তেমনি তিনি বৌদ্ধধর্ম বিজিত এশিয়ার প্রায় সকল দেশ ভ্রমণ করেছেন। বৌদ্ধধর্ম তাঁর চিন্তা ও কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে নবনব সৃষ্টির প্রেরণায়।

শ্রীসুধাংশুবিমল বড়ুয়ার রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি' গ্রন্থখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত সমগ্র আলোচনায় আছে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম, রবীন্দ্র-চেতনায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, রবীন্দ্র দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও অশোক, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ ও বৌদ্ধধর্ম। বাঙালী জাতির কীর্তিতে ও কর্মে ও ধ্যানধারণায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যে কত অপরিসীম বাংলায় বৌদ্ধধর্ম অধ্যায়ে সুন্দরভাবে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যদিও আলোচনাটি খুবই ছোট। রবীন্দ্র দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি অনুধাবনের পক্ষে বিভিন্ন ঘটনার কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ রবীন্দ্র চেতনায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি অধ্যায়ে লেখক তথ্য প্রমাণসহ উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও অশোক এবং রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি অধ্যায় দুটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, মহৎ মানবীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা দুই মহৎ ব্যক্তি এবং বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। শেষ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ বৌদ্ধ-ধর্মের সঙ্গে তার মিল এবং পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থশেষে আছে মহাবোধি সোসাইটিতে বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ, রবীন্দ্র সাহিত্যে বুদ্ধপ্রসঙ্গের একটি তালিকা, বিস্তৃত গ্রন্থ তালিকা। রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্র; কবিতার প্রতিলিপি গ্রন্থখানিকে করেছে সুশোভিত।

●

আলোচিত গ্রন্থপঞ্জী

●

রবীন্দ্রনাথ-এন্ড্রুজ পত্রাবলী। অনুবাদঃ মলিনা রায়। বিশ্বভারতী ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলকাতা-৭। দাম ৬ টাকা।

চিঠিপত্র—দশম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলকাতা-৭। দাম ২-৫০ টাকা।

রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী। **রবীন্দ্র সাহিত্য বিচিত্রা**—প্রমথনাথ বিশী। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম যথাক্রমে কুড়ি টাকা এবং আঠারো টাকা। **রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা**—গৌরাঙ্গ ভৌমিক। অ্যাকাডেমিকা, ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম ছয় টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি—সুধাংশুবিমল বড়ুয়া। সাহিত্য সংসদ। ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলকাতা-৯। দাম-দশ টাকা

ভারতীয় সাহিত্য

পরলোকে অসমীয়া সাহিত্যিক ॥

গত ২৩ এপ্রিল, আসামের প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅম্বিকানাথ বোরা দীর্ঘ রোগভোগের পর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বৎসর। শ্রীবোরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক। ১৯৫৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অসমীয়া ভাষায় তাঁর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতা সভা ॥

গত ২৭ এপ্রিল, 'রবীন্দ্র ভারতী' বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। কবিতা পাঠে অংশ গ্রহণ করেন মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ছাত্রদের থেকে কবিতা পাঠ করেন উদয়ন মিত্র, চণ্ডীদাস রায়, প্রভাতকুমার দাস, পার্থ চৌধুরী, সমীর গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য।

বিচিত্রা বাসর ॥

'বিচিত্রা বাসর' হল জব্বলপুরের প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠার বছর আগে। সম্প্রতি নতুন করে আসরটিকে সক্রিয় করে তুলবার চেষ্টা হচ্ছে। গত ২১ এপ্রিল কবি হেনা হালদারের বাড়িতে আসরের একটি অধিবেশন বসে। শ্রীমতী হেনা হালদার আসরের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করেন। কুসুমবিহারী চৌধুরীর একটি গল্প পাঠ করে শোনান ক্ষিতীন্দ্রশংকর রায়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে আসরের পরিচালকসভা গঠিত হয়েছে।—

সভানেত্রী—হেনা হালদার। সহঃ সভাপতি—ক্ষিতীন্দ্রশংকর রায় ও বিমল মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক—কুসুমবিহারী চৌধুরী। সহঃ-সম্পাদক — সুধেন্দু চন্দ ও রাধাগোবিন্দ সেনগুপ্ত। কোষাধ্যক্ষ—ডাঃ নিমাইচরণ হালদার। সদস্যবৃন্দ—সুস্মিতা দত্ত, সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সেন, ইন্দুভূষণ গাঙ্গোপাধ্যায়, পরিমল ভট্টাচার্য, গৌরী রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বীরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন ॥

বাংলাদেশে এই সর্বপ্রথম একটি প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' নামক একটি পত্রিকা। সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সঞ্জীবকুমার বসু। কয়েকজন প্রখ্যাত প্রাবন্ধিককে নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতিও গঠিত হয়েছে। এই সম্মেলন উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক সংকটের দিনে এই সম্মেলন প্রেরণা যোগাবে বলেই আমরা আশা করি। উৎসাহীরা সম্পাদক, ১০ হেস্টিংস স্ট্রিট, কলকাতা-১, এই ঠিকানায় যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন।

অনুবাদকদের সভা ॥

গত ২৮ এপ্রিল সকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে ট্রান্সলেটরস্ অ্যাসোসিয়েশনের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন ডঃ নরেশ গুহ। শ্রীমতী লীলা রায় জানান, ভারতে অনুবাদকদের সম্মান খুবই কম। অনুবাদের জন্য প্রাপ্য অর্থের পরিমাণও খুব অল্প। তিনি এই অবস্থার পরিবর্তনের দাবী করেন। এই সভায় অনুবাদ সম্বন্ধে একাধিক আলোচনা হয়। সম্পাদক শ্রীশেখর সেন ভবিষ্যৎ কর্মসূচী বর্ণনা করেন।

নেহরু পরিবার ॥

নেহরু পরিবারের বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ অপরিসীম। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ, উৎসব ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল কিছুটা নিবারণ করবে শ্রীমতী কৃষ্ণা হাতী সিং-এর লেখা সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে পণ্ডিত মতিলাল থেকে আরম্ভ করে ইদানীংকাল পর্যন্ত নেহরু পরিবারে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। লেখিকার বর্ণনা খুবই সুন্দর। সর্বত্র একটা ঘরোয়া আমেজ ফুটে উঠেছে।

একটি তেলুগু গ্রন্থ ॥

শ্রীপি মাধব শর্মা তেলুগু সাহিত্যের অন্যতম প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক। তেলুগু ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে তিনি গবেষণার জন্য ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। সম্প্রতি তাঁর এই গবেষণার বিষয়টি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন, তেলুগু রামায়ণ-মহাভারত প্রধানত সংস্কৃতের অনুবাদ। কিন্তু এই অনুবাদগুলো যথাযথ নয়। বরং রামায়ণ ও মহাভারত যেভাবে জীবনধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, তার বাঙ্ময় প্রকাশ তেলুগু অনুবাদ রামায়ণ-মহাভারত গ্রন্থগুলি। এই গ্রন্থগুলির উপর দ্রাবিড় প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা খুবই উল্লেখযোগ্য হয়েছে।

একটি তামিল পত্রিকা ॥

"তামিল বত্তম" নামক পত্রিকার একটি বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য হল, তামিল সাহিত্য ও শিল্পকে অ-তামিলভাষীদের মধ্যে প্রচার করা। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য যে মহৎ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তামিল সাহিত্য ও শিল্পের উপর ৫৩টি মূল্যবান প্রবন্ধ এসংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও কুরাল, শিলাপ্পাদিকরণ, এবং কাম্বা রামায়ণ থেকে কিছু কিছু উল্লেখ্য অংশের উদ্ধৃতি আছে। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কয়েকটি ইংরেজিতে রচিত। পত্রিকাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আশা করি।

বুনিয়াদি সাহিত্য প্রতিযোগিতা ॥

কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজ উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পঞ্চম লিখিত ভারত বুনিয়াদি সাহিত্য প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার ১২টি বই ও পাণ্ডুলিপি পুরস্কারের জন্যে মনোনীত হয়েছে। পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেক লেখক পাবেন এক হাজার টাকা।

শিশু-সাহিত্য সম্মেলন ॥

সম্প্রতি নিখিল বঙ্গ শিশু-সাহিত্য সম্মেলনের একাদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান বিড়লা একাডেমী হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন। এই উপলক্ষে শিশু-সাহিত্যিক ও শিল্পীরা পরশুরামের 'রাতারাতি' অভিনয় করেন। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন শংকরনাথ ভট্টাচার্য, কল্পনা ভট্টাচার্য, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, তপন ধর, গৌর আদক, মীরা রায়, অখিল নিয়োগী, ননীগোপাল মজুমদার, কুঞ্জবিহারী পাল, পরিমল মুখোপাধ্যায়, দেবাশীষ গৌতম, শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, শৈল চক্রবর্তী ও ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বিদেশী সাহিত্য

রেড ইণ্ডিয়ানদের সমাজসংস্কৃতি ॥

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের সমাজ ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করে ক্লার্ক উইসলার 'ইণ্ডিয়ানস অব দি ইউনাইটেড স্টেটস' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রেড ইণ্ডিয়ানদের সামগ্রিক পরিচয় বর্ণিত হয়েছে।

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম গ্রন্থ ॥

নিকোলাই সিয়াদ্রিতি নামে একজন উক্রানীয়ান ইঞ্জিনীয়ার সেভচেংকোর 'কোবাজার' গ্রন্থটির একটি অনুলিপি প্রস্তুত করেছেন। এটি আকারে এত ছোট হয়েছে যে, একটি সাধারণ সূচের গর্তের মধ্য দিয়ে একে অনায়াসে গলিয়ে দেওয়া যায়।

এই ইঞ্জিনীয়ার আরো কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার জিনিসের স্রষ্টা। এইসব জিনিসের মধ্যে রয়েছে একটি এঞ্জিন (যা আকারে একটি দেশলাই কাঠির মাথার এক-শতাংশের সমান), একটি সোনার তালাচাবি (একটি পাপি বীজের চাইতে চারশত গুণ ক্ষুদ্র) এবং একটি লাল গোলাপ (মানুষের একটি চুলের মধ্যে আঁকা)।

নিকোলাই সিয়াদ্রিতি নির্মিত মোট পঞ্চাশটি ক্ষুদ্রাকার দ্রব্য উক্রাইনের রাজধানী কিয়েভের একটি প্রদর্শনীতে সম্প্রতি দেখানো হয়েছে।

অ্যাডওয়ার্ড আলবির নাটক ॥

অ্যাডওয়ার্ড আলবি ১৯৬৬ সালে নাটকের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁর একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে। নাটকটির নাম 'এ ডেলিকেট ব্যালান্স'। এটি তিন অংকে সমাপ্ত।

ভারত প্রেমিক জোনস্ ॥

অধ্যাপক গার্লেন্ড ক্যানন "ওরিয়েন্টাল জোন্স' নামে ভারতপ্রেমিক স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর একটি জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটি নানা কারণেই ভারতবাসীদের কাছে উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জোন্স সুপ্রীম কোর্টের অধস্তন বিচারক হিসেবে ভারতবর্ষে আসেন। পেশাগত কাজের বাইরে তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ পন্ডিত মানুষ ও ভাষাবিদ্। প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ ছিল তাঁর কল্পনায় একটি মহান দেশ। তিনি মনে করতেন, এই দেশটি প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের প্রসূতি-আগার, প্রয়োজনীয় ও আনন্দবর্ধক শিল্পের আবিষ্কর্তী। ১৭৮৪ সালের ১০ মার্চ একটি চিঠিতে তিনি প্যাট্রিক রাসেলকে লেখেন, 'প্রতিটি দিন আমাকে প্রাচ্যবিষয়ে নতুন তথ্য সরবরাহ করে যাচ্ছে। আমি যদি এখানে অর্ধ শতাব্দী থাকতে পারতাম, তা হলেও ক্রমাগত চমৎকৃত হতে থাকতাম।"

কেউ প্রাচ্য-সাহিত্যের প্রতি উপেক্ষা দেখালে তিনি দুঃখিত হতেন। ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনে তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী মানুষ। তাঁর মতে, সংস্কৃত হলো এমন একটি ভাষা যার বিস্ময়কর গঠন-বৈশিষ্ট্য গ্রীক-ভাষার চাইতেও বিশুদ্ধ, ল্যাটিনের চাইতেও সমৃদ্ধ এবং উভয় ভাষার তুলনায় বহুলাংশে মার্জিত। পার্শিয়ান ভাষার প্রতিও তিনি গভীর অনুরাগ পোষণ করতেন। এই ভাষাটি সংগীতময় ও ভাবগম্ভীর। অত্যন্ত প্রবল প্রক্ষোভজাত অনুভবের প্রকাশে এই ভাষার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। জোন্স পৃথিবীর নয়টি ভাষায় লিখতে, পড়তে ও ভাষণ দিতে পারতেন। উনিশ শতকীয় ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষলগ্নে এই প্রাচ্যবিদ মণীষীর ঘোষণাও বহুলাংশে দেশবাসীকে প্রাণিত করেছিল।

গণতন্ত্রের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। ১৭৮২ সালের ২৫ এপ্রিল তারিখে তিনি টমাস ইয়েটসকে লেখেন, প্রত্যেক আইনসম্মত সরকারের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নির্ভর করে জনকল্যাণের ওপরে; জনসাধারণের মধ্যেই সর্বপ্রকার মৌলশক্তির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। জনসাধারণের কাছে ঐ সব সামর্থ ও জ্ঞান আমরা কখনো বিজ্ঞভাবে... এবং সর্বদাই ঐশীশক্তির যোগ্য ব্যবহারের দ্বারা গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারি, যার সাহায্যে তারা সময়ের বিচারে বিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

অধ্যাপক ক্যানন মূলতঃ জোন্সের চিঠিপত্র ও সাহিত্যিক নিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সম্পর্কে পূর্ণতর কোন ধারাবাহিক তথ্য-সমৃদ্ধ লেখাও বোধ হয় আর সম্ভব নয়। তবু একটি মানুষের বিবিধ বৈচিত্রের মধ্য থেকে তথ্য সঞ্চয় করে পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করার বিরল পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়াস হিসেবে গ্রন্থকার সমগ্র ভারতবাসীর কাছে ধন্যবাদার্হ। এই গ্রন্থে জোন্স সম্পর্কে অপরের কিছু অভিমত এবং অপরের সম্পর্কে জোন্সের কিছু অভিমত অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে; কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা এই উপ-মহাদেশের মানুষের কাছে নিঃসন্দেহে উৎসাহজনক ও বিশ্বাসগত সত্য।

পশ্চিম জার্মানীর গ্রন্থব্যবসা ॥

পুস্তক রপ্তানির ব্যাপারে পশ্চিম জার্মানী বর্তমান পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর প্রায় ১২১টি দেশে এখানকার প্রকাশকরা নানাপ্রকার বই রপ্তানি করে থাকেন। শুধু স্বদেশের সাহিত্য প্রচার করে তাঁরা সন্তুষ্ট নন। গত তিন দশকের মধ্যে রচিত এবং জার্মান ভাষাভাষীদের কাছে অপরিচিত এমন বহু ইংরেজী, আমেরিকান, ফরাসী ও অন্যান্য দেশের অনুবাদগ্রন্থ তারা প্রকাশ করেছেন। সাহিত্য, শিল্প, কাব্য, দর্শন, ভ্রমণ, চিত্র, রাজনীতি, জীবনী প্রভৃতি নানাপ্রকার গ্রন্থ তারা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে রপ্তানি করে থাকেন।

ইদানীংকালে জার্মান ভাষা-সাহিত্যের বিস্ময়কর উন্নতি বিদেশী পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শুধু সুইজারল্যাণ্ডেই তারা ১১৯০০০০০টি বই রপ্তানি করে থাকেন। অছাড়া অস্ট্রিয়ায় ১১৩০০০০০, মার্কিন দেশে ৫১০০০০০ এবং নেদারল্যাণ্ডে রপ্তানিকৃত বইয়ের সংখ্যা ৪৩০০০০০।

অবশ্য উপরোক্ত সংখ্যার মধ্যে সাময়িক পত্রিকা, ছবির বই, রাজনীতি ও দর্শন-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি এবং সমকালীন তরুণ লেখক-লেখিকাদের পরীক্ষামূলক অর্ধ-প্রতিবাদী কবিতা ও গল্পের বইগুলি অন্তর্ভুক্ত। সর্বাধিক বিক্রীত বইগুলির মধ্যে রয়েছে রলফ হুছুৎ-এর নাটক, গুন্টার গ্রাসের 'টিনড্রাম' ও 'ডগ ইয়ার্স' প্রভৃতি গ্রন্থ। হেনরিখ বোল, ইউই জনসন, কার্ল জেসপার্স প্রভৃতি সাহিত্যিকদের নামও এখন বহির্বিশ্বে সুপরিচিত ও জনপ্রিয়।

শ্রেষ্ঠ নাটকের পরিচয় ॥

ডড প্রকাশিত ১৯৬৫-৬৬ সালের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত শ্রেষ্ঠ নাটকের পরিচায়িকা গ্রন্থটি সাম্প্রতিক প্রকাশন জগতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে বিবেচিত হবে। এটি আসলে একটি সংকলনগ্রন্থ। এই সংকলনে নিউইয়র্ক ও আঞ্চলিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি, শেক্সপীয়র উৎসবের পরিচয়সহ লণ্ডন ও প্যারিসে অভিনীত নাটকসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেসব নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে—তার মধ্যে জেনারেশন, রয়েল হান্ট অব দি সান, হোগানস গোট, ইনঅ্যাডমিসিবল এভিডেন্স, ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার, লায়ন ইন উইন্টার প্রভৃতি নাটকের নাম উল্লেখযোগ্য।

নতুন বই

গল্প সংগ্রহ : —(গল্প-সংকলন) মিহির আচার্য। প্রকাশক : স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।।

মিহির আচার্য বাংলা সাহিত্যের আধুনিক লেখকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিস্থানীয়। তিনি কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন, প্রচারবিমুখ শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নীল চোখ'—এই গল্পগ্রন্থটি চেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর আরও কিছু গল্প বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৬২-তে প্রকাশিত হয় তাঁর অন্য গল্পগ্রন্থ 'অপরাহ্নের নদী'। অতি অল্পকালের মধ্যেই মিহির আচার্য স্বীকৃতি লাভ করেছেন শক্তিমান গল্পলেখক হিসাবে, তাই পরিমাণে কম লিখলেও, তাঁর প্রতিটি গল্পে আছে সেই বৈশিষ্ট্যের ছাপ যা সুলভ নয়। সম্প্রতি মিহির আচার্যের 'গল্প-সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়েছে। এই সুনির্বাচিত গল্পগুলি প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন—

> "গল্পগুলিই লেখকের সত্যিকারের ভূমিকা। লেখক মনে করেন, গল্পগুলির সহৃদয় পাঠেই লেখকের জীবন, সমাজ তথা সাহিত্য-বক্তব্য ধরা পড়বে। যেহেতু লেখক বক্তব্য প্রচ্ছন্ন রাখবার জন্য লেখনী ধারণ করেননি।"

লেখকের এই উক্তির মধ্যেই তাঁর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক শান্ত অথচ দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। সমবেদনা ও সহানুভূতিতে তিনি বিগলিত কিন্তু অতি কঠোর তাঁর মূর্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এই প্রকৃতি তাঁর গল্পগুলিকে এক অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছে। এই সংগ্রহে মোট তেরটি গল্প আছে। প্রথম গল্প 'পারিবারিক' আত্মকথনের ভঙ্গীতে রচিত একটি পরিবারের নিদারুণ ইতিহাস। গল্পটির আঙ্গিক লক্ষ্য করার মতো। সামান্য এক-একটি প্যারাগ্রাফে এক-একটি পরিচ্ছেদ গড়ে উঠেছে। সংক্ষিপ্ত সংলাপে গল্প অগ্রসর হয়েছে। স্বপ্নার বাড়ি থেকে চলে যাওয়া এবং পরে অশোকের হাত ধরে প্রত্যাবর্তন, এবং তারপর সুমনকে ঘর ছেড়ে শেষপর্যন্ত কলকাতার ট্রেনে উঠতে হল, এর মধ্যে একটি সামাজিক সমস্যার ক্লান্তিকর ইঙ্গিত রেখেছেন লেখক। 'পান্না হল সবুজ' গল্পটি আর এক জাতের। চেতন-অবচেতনের বিচিত্র লীলায় আমরা কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ি তার বিচিত্র চিত্র। অনিন্দ্যসুন্দর তাঁর সুন্দরী স্ত্রী নন্দিতাকে ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পেয়েছিলেন সানুকে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সানু এসে বলে—আমার লোভ আছে, কামনা আছে, সেই মুহূর্তে অনিন্দ্যসুন্দরের চেতনার রঙ বিবর্ণ হয়ে যায়। আবার পাড়ি দিতে হয় কলকাতার নাগরিক জীবনে। 'যুদ্ধ, রণনীতি ও পরিখা' গল্পটিতেও সেই আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা। একটা ভয়ংকর যুদ্ধের আগুনে আমরা প্রতিনিয়ত পুড়ছি এই চিন্তা অতীশের। যান্ত্রিক গতিতে — কথা বলে— খেটে-খাওয়া মেয়ে প্রিয়া। প্রেমিক অতীশ সংসারে বাঁধা পড়েছে। স্বামীগিরি পছন্দ নয় প্রিয়ার, সে স্বামীকে একজন প্রেমিক হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাই শেষপর্যন্ত লেখিকা স্ত্রী গভীর রাতে মদ্যবিচলিতপদে বাড়ি ফিরে দেখে স্বামী বাচ্চাদুটির হাত ধরে বাড়ি থেকে চলে গেছে একটি চিঠি রেখে। অতীশের সাহিত্যিক পত্নীটিকে পাঠকের চোখে অতিপরিচিত নারী-চরিত্র মনে হবে।

অল্পপরিসরে সবগুলি গল্পের বিস্তারিত বিবরণ দানের অবকাশ নেই। যে গল্পগুলির কথা উল্লিখিত হল, তার মধ্যে পরিচয় পাওয়া যাবে মিহির আচার্যের বক্তব্যের। সমাজ-জীবনের মধ্যে যে পাপ আজ পুঞ্জীভূত, তার প্রতি লেখকের ঘৃণা নেই, বলিষ্ঠ তুলিতে, জমকালো রঙে তিনি ছবি এঁকেছেন—ছবি এঁকেছেন সেই বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের, অতি দ্রুত যার রঙ বদলাচ্ছে, জীবনের দুর্বার গতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে যে জীবন আজ বিপর্যস্ত, সেই জীবনের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন মিহির আচার্য। সনাতন রোমান্স নয়, শস্তা যৌন বিকৃতির ক্লেদাক্ত পরিবেশ নয়, বাস্তবের কয়েকটি রূঢ়-রুক্ষ ছবি মিহির আচার্য পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। মিহির আচার্যের গল্পগ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন।

সবুজ দ্বীপ আন্দামান :—প্রতিভা গুপ্ত। ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৫৭-সি কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা—১২। মূল্য : চার টাকা।

বাঙলা দেশ থেকে সাড়ে সাতশ মাইল দূরে আন্দামান। এই দ্বীপময় দেশটির অপরিসীম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আজও অনুদ্ঘাটিত থেকে গেছে। দ্বীপান্তরিত স্বদেশপ্রেমিকদের নির্যাতিত জীবনের অন্ধকার ইতিহাসের সঙ্গে আন্দামানও দৃষ্টিশক্তির অনেকখানি বাইরে পড়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে এদিকে সকলের দৃষ্টি পড়ে। আন্দামান সম্পর্কে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও নানান আলোচনা দেখা যায়।

সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীপ্রতিভা গুপ্তের 'সবুজ দ্বীপ আন্দামান' গ্রন্থখানি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বিশেষ। এই গ্রন্থে আন্দামানের নানান সমাজের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিকে চিত্রিত করা হয়েছে।

পোর্ট ব্লেয়ার ও গ্রেট আন্দামানের দুটি মানচিত্র, আদিবাসী সমাজের প্রাসঙ্গিক পরিচয়, সরকারী প্রয়াসের উল্লেখ প্রভৃতি গ্রন্থটির প্রামানিকতা নির্ণয়ে সহায়ক হবে। লেখিকা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই গ্রন্থটি লিখেছেন।

সরল হিন্দুধর্ম [ধর্মগ্রন্থ] **দাশরথি সোম। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১নং শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত। দাম : এক টাকা।**

বেদ, পুরাণ, গীতা, চন্ডী প্রভৃতি হিন্দুধর্মের প্রামাণ্য বইগুলি সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন দিনই সহজবোধ্য নয়। তাই আলোচ্য বইখানির গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের সহজ এবং সরল ব্যাখ্যা করতেই তাঁর বইখানি রচনার কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন এবং সে বিষয় তিনি সার্থকতা লাভ করেছেন বলেই দৃঢ় বিশ্বাস। এই বইতে চন্ডী এবং গীতার যে সহজ ব্যাখ্যা আছে তা ধর্মপ্রাণ পাঠকমাত্রেরই মর্মস্পর্শী হবে। সব মানুষই এ বই থেকে সহজে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করতে পারবে। এক কথায় বইখানি প্রত্যেকেরই সংগ্রহ করে রাখবার মত। প্রচ্ছদপট ও ছাপা সুন্দর।

সমুদ্র মহিষ : (অনুভব কবিতা-পুস্তিকা ১০) গণেশ বসু, অনুভব প্রকাশনী। ১৯ পন্ডিতিয়া টেরেস, কলকাতা ২৯, প্রাপ্তিস্থান : সি[illegible]ট বুকশপ, কলকাতা ১২, পঞ্চাশ পয়সা।

'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' প্রকাশের পর এবং 'নিজের মুখোমুখি' রচনার প্রাক্কালে গণেশ বসুর কবিতায় যে পুনর্গঠনের স্বাতন্ত্র্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, 'সমুদ্র মহিষ'-এ সেই অনুচিন্তনেরই অভিব্যক্তি স্বচ্ছতর হয়ে উঠেছে। এই পুস্তিকায় কবির নয়টি উল্লেখযোগ্য কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। গণেশ বসুর কাব্যিক উত্থানভূমি সমাজবেষ্টিত। তাঁর 'সমুদ্রমহিষ' কবিতাটি কিছুকাল আগে ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। মার্চ ১৯৬৬, সোনালি মোরগ, রক্তাক্ত জটায়ু, দুরন্ত আলোর তৃষ্ণা, ঝড়, খড়োর মুখে, সিংহ প্রভৃতি কবিতা কবির এক একটি উদ্দীপ্ত ভাবনার উজ্জ্বল ফসল। পুস্তিকাটি সম্পাদনা করেছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক। প্রচ্ছদ এঁকেছেন তপনলাল ধর।

নীল দরিয়ায় (৯)

দুরন্ত বুকানিয়র

অজিত চট্টোপাধ্যায়

বুকানিয়ররা জলদস্যু। কিন্তু জলদস্যু মাত্রেই বুকানিয়র নয়। সীমাহীন মহাসমুদ্রে যারা জাতিধর্ম নির্বিচারে লুঠপাটের জন্য ভেসে যাওয়া জাহাজ বা অন্য কোনো জলযানের উপর চড়াও হয়েছে অভিধান তাদেরই জলদস্যু নামে অভিহিত করে। মহাসাগরে বুকানিয়ররাও লুঠপাট চালিয়েছে। উপকূলে উঠে তারা হামলা করেছে। অসংখ্য জাহাজ হয়েছে তাদের শিকার। কল্পনাতীত ধনসম্পদ এসেছে বুকানিয়রদের ভোগদখলে। অগুনতি নরনারী জীবন দিয়েছে তাদের তরবারির ধারালো আঘাতে। বহু নাবিক এবং মানুষজন বুকানিয়রদের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে প্রাণ হারিয়েছে। তবু বুকানিয়ররা সাধারণ জলদস্যুর চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। অন্তত বুকানিয়রদের আবির্ভাব এই স্বাতন্ত্র্যকে বহন করে। পৃথিবীর সমস্ত জাতির বাণিজ্য জাহাজ বা অন্য জলযানের উপর বুকানিয়রদের দল হামলা করেনি। তাদের অভীষ্ট শিকার স্পেনের জাহাজগুলি। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে তারা যত্রতত্র জলদস্যুবৃত্তি চালায় নি। আমেরিকার উপকূলে এবং স্পেনের নতুন উপনিবেশগুলির উপরই বুকানিয়ররা তাদের দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেছে। কখনও নিজেরাই এ কাজে অগ্রণী হয়েছে। কখনও স্থানীয় শাসক বা গভর্নরের দেওয়া কমিশন তাদের এই অভিযানে ব্রতী করেছে।

নতুন উপনিবেশগুলির সঙ্গে স্পেন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করে বসল। অর্থাৎ স্বামীর প্রয়োজনে স্ত্রীর ধন-সম্পদ জাহাজে করে স্বামীর কাছে এসে পৌঁছবে। আর স্ত্রীর প্রয়োজনটুকু স্বামীই দেবেন মিটিয়ে। ভোগ্যপণ্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যা কিছু প্রয়োজন সব আসবে স্পেন দেশ থেকে। এর মধ্যে তৃতীয় পুরুষের হস্তক্ষেপ নিতান্ত বেমানান। এবং স্পেন স্বামী হিসেবে কোনো পরপুরুষকে বরদাস্ত করতে রাজী নয়। ফলে স্পেনের নতুন উপনিবেশগুলিতে পদার্পণ করা বণিকজন এবং বিদেশী মানুষের কাছে হল নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রবেশদ্বার মানেই তো সিংদরজা নয়। খিড়কীর পথ বলেও একটি বস্তু আছে। এদিকে উপনিবেশের লোকেরাও সস্তায় মাল পেতে অগ্রণী। সেই খিড়কীর পথে

মালের যোগান দিতে উদ্ভূত হল এক আধা বণিক, আধা দস্যু দল। এদের প্রথম ঘাঁটি হিসপ্যানিওলা,—যার নতুন নাম হাইতি বা সানডোমিংগো।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে হাইতি বা হিসপ্যানিওলা একটি সুন্দর এবং বৃহৎ দ্বীপ। স্পেনের লোকেরা পেরু এবং মেক্সিকোর দখল পেয়ে হাইতি ছেড়ে চলে যায়। এই বৃহৎ দ্বীপে তখন রয়ে গেছে স্পেনীয়দের ফেলে-যাওয়া অসংখ্য গরু মোষ এবং দীর্ঘ এক শুকরের পাল। দ্বীপের বনে-জংগলে পশুগুলি নিজেদের ইচ্ছেমত চরে বেড়ায়। এর আগেই বলেছি যে স্পেনের উপনিবেশগুলির উদ্দেশ্যে প্রথম পাড়ি দিয়েছিল ফরাসীরা। তাদের পিছু পিছু ইংরেজ। হিসপ্যানিওলাতে এসে তারা দেখল খাদ্যদ্রব্য প্রচুর। গরু মোষ এবং শুকর মেরে সেই মাংস শুকিয়ে পথ চলতি জাহাজের নাবিকদের বিক্রী করলে দু পয়সা উপার্জন হয়।

হিসপ্যানিওলাতে এই আগন্তুকের দলের উল্লেখ রয়েছে ক্লার্ক রাসেলের বইতে। ......বিশ্রী এবং কর্কশ চেহারার কতকগুলি লোককে দেখা গেল দ্বীপে। ওদের পরণে মোটা লিনেন কাপড়ের প্যান্ট শার্ট। লোকগুলি কদর্য এবং রুক্ষ স্বভাবের। তাদের হাবভাব এবং প্রকৃতি অনেকটা সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মত। সকলের মাথায় গোল টুপী, পায়ে শুকরের চামড়ার জুতো এবং কাঁচা চামড়ার কোমরবন্ধনীতে ছোরা-ছুরী ঝোলানো। ওরা মাটিতে শোয়, মাটিতে বসেই খায় দায়। একখণ্ড মস্ত পাথর ওদের টেবিলের কাজ দেয়। যেখানে লোকগুলি কাঁচা মাংস শুকিয়ে নিত এবং নুন মিশিয়ে দিত মাংসের সংগে সে জায়গাটাকে বলা হত বোকান বা বৌকান। এই বোকান বা বৌকান থেকেই বুকানিয়র কথার উৎপত্তি।......

স্পেনের একাধিপত্যের জগতে দুষ্টগ্রহের মত উদয় হল ফরাসীরা। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকেই ফরাসী নাবিকের দল এসে গেছে এই সুদূর পশ্চিমে। ধনরত্ন এবং অন্যান্য সম্পদ বোঝাই স্পেনের জাহাজগুলি কোন পথে স্বদেশে ফিরে যায় তা আবিষ্কার করতে দেরী হল না ফরাসীদের। জলদস্যুর দল অপেক্ষা করে,—গা ঢাকা দিয়ে এক পাশে আত্মগোপনে থাকে। কিউবার উপকূলে কিংবা ফ্লোরিডা প্রণালীতে জলদস্যুদের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অথচ ক্ষিপ্রগতি জলযানগুলি রইল সুযোগের অপেক্ষায়। বেকায়দায় একটি স্পেনীয় জাহাজ পেলেই তার উপর হামলা কর। লুণ্ঠিত মালপত্র নিয়ে নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে যাও নীল দরিয়ার অন্যদিকে।

কিন্তু সত্যকার বুকানিয়রদের আবির্ভাব ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে নয়। আরো বহু বৎসর গড়িয়ে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। ইতিমধ্যে স্পেনীয়রা এই দুর্দান্ত প্রকৃতির আগন্তুক বা উড়ে-এসে জুড়ে-বসা মানুষগুলির উপর কম অত্যাচার করে নি। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে লন্ডনে সংবাদ এল যে স্পেনীয়রা দুটি ইংলন্ডের জাহাজের নাবিকদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ধৃত বন্দীদের নাক কান হাত-পা কেটে দিয়ে ক্ষতের উপর মধু ছড়িয়ে লোকগুলোকে বেঁধে দেওয়া হয় ঝোপ-জংগলের মধ্যে গাছের সংগে। যাতে মুমূর্ষু মানুষগুলির উপর মাছি এবং অন্যান্য পতংগ এসে বসে ওদের মৃত্যুযন্ত্রণাকে আরো কিছুটা বাড়িয়ে দেয়। স্পেনের রাজদূত অবশ্যই অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করল। তার বক্তব্য হল ইংলন্ডের বাণিজ্য জাহাজের নাবিকদের উপর কোনরূপ অত্যাচার হয় নি। যাদের বন্দী করা হয়েছিল, তারা জলদস্যু, ইংলন্ডের শান্তিকামী নাগরিক নয়।

স্পেনের সৈন্যরা একদিন হিসপ্যানিওলা থেকে এই আগন্তুক দলকে বিতাড়িত করল। আক্রমণে কিছু লোক মারা পড়ল। যারা প্রাণে বাঁচল তারা পালিয়ে গেল দ্বীপটির উত্তর পশ্চিম উপকূলের দিক থেকে কিছু মাইল দূরবর্তী আর একটি দ্বীপে। এই দ্বীপটির নাম তর্তুগা বা কুর্ম দ্বীপ। পাহাড়ে পাথুরে জায়গা। এই বিতাড়িত মানুষগুলি তর্তুগাতে নতুন করে আশ্রয় বাঁধল। নিজেদের রক্ষা করবার জন্য নির্মাণ করল দুর্গ। ছোটখাটো একটি সাধারণতন্ত্রের রূপ নিল তর্তুগা। কিন্তু স্পেনীয়রা তবু এদের উপস্থিতি সহ্য করতে চাইল না। হিসপ্যানিওলা থেকে এক সৈন্যবাহিনী এল তর্তুগাতে। আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে মানুষগুলো পালিয়ে গেল দ্বীপ ছেড়ে—।

কিন্তু কতদিন? স্পেনীয়রা দ্বীপ ছেড়ে কিছুদিন পরে ফিরে গেল। কয়েক বৎসর পরেই কিছু ফরাসী নাবিক এসে উঠল তর্তুগায়। বুকানিয়রদের এরাই প্রথম দল। জন পঞ্চাশ দেশত্যাগী ফরাসী নাবিক মঁসিয়ে লোভাস্যর নেতৃত্বে কুর্ম দ্বীপে ঘাঁটি তৈরী করতে প্রয়াসী হল। এদের অনেকেই আসে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সেন্ট কিটস্ দ্বীপটি থেকে। মঁসিয়ে লোভাস্যর শক্ত লোক। ভদ্রলোক দক্ষ ইঞ্জিনিয়র। তর্তুগাতে একটি পোক্ত দুর্গ নির্মাণ হল তার প্রথম কাজ। দুর্গের প্রাকারে কামান বসানো হল শত্রুকে আক্রমণ করবার জন্য। এর কিছুদিনের মধ্যেই স্পেনীয়দের একটি নৌবহর হঠাৎ এসে হাজির হল তর্তুগার সমুদ্র উপকূলে। সংগে সংগে দুর্গের উপর থেকে কামান উঠল গর্জে। কয়েকটি জাহাজের হল সলিল সমাধি। বাকীগুলি কুর্ম দ্বীপ ছেড়ে বহুদূরে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তর্তুগা ভরে উঠল নানা মানুষের কলরবে। ফরাসী, ইংরেজ এমন কি ডাচেরাও এসে উঠল সেখানে। কুর্ম দ্বীপে সকলের জন্যই অবারিত দ্বার। ঘর-পালানো নাবিক, আবাদ এবং বসবাস করতে ইচ্ছুক নানা মানুষ পদার্পণ করল তর্তুগায়। মাটিতে ফলল চিনি এবং তামাক। হিসপ্যানিওলা বা হাইতি থেকে এল শুকনো মাংস এবং কাঁচা চামড়া। দুঃসাহসী বুকানিয়ররা নিকটস্থ নীল দরিয়ার সুবিধেমত স্পেনের জাহাজের উপর চড়াও হয়ে লুঠের মালপত্র এনে তুলতে লাগল কুর্মদ্বীপের বন্দরে। এই সব নানা পণ্য গ্রহণ করতে এগিয়ে এল ফরাসী এবং ডাচদের বাণিজ্য জাহাজগুলি। তর্তুগার বন্দরে শুরু হল মালের আদান-প্রদান। ওরা দিল তামাক, চিনি, কাঁচা মাংস, চামড়া, লুঠের নানা সম্পদ—পরিবর্তে পেল ভালো ফরাসী মদ, বন্দুক এবং বারুদ, পরিধানের বস্ত্র পোশাক। কুর্ম দ্বীপের এই নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় ঘর ছাড়া দুঃসাহসী এবং ভাগ্যান্বেষী মানুষগুলির কাছে হয়ে উঠল এক দুর্নিবার অদম্য আকর্ষণ।

বুকানিয়রদের কাহিনী রূপকথার গল্পের মত মনোমুগ্ধকর। অ্যাডভেঞ্চার বা রোমাঞ্চকর ঘটনার ঠাস বুনন। কত লোমহর্ষক দুঃসাহসী অভিযানে বুকানিয়রের দল বেরিয়ে পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বুকানিয়রদের সম্বন্ধে প্রথম যে বইখানি প্রকাশিত হয়ে সাড়া জাগিয়ে তোলে তা এক বুকানিয়র দলভুক্ত ব্যক্তিরই লেখা। এর নাম আলেকজান্ডার অলিভিয়ে এসকোয়েমেলিং। অপর বইটি বেসিল রিংরোসের রচনা। বিখ্যাত বুকানিয়র ক্যাপ্টেন বার্থেলোমিউ শার্প এবং অন্যান্য নাবিকের দল দক্ষিণ সমুদ্রে দীর্ঘকাল ধরে যে অভিযান চালিয়েছে, রিংরোস সেই অভিযানের সংগী। এই কারণে বুকানিয়রদের সম্বন্ধে লেখা এই দুটি বই-ই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

অলিভিয়ে এসকোয়েমেলিং তর্তুগাতে গিয়েছিলেন খুব অল্প বয়সে। সেখানে প্রথম কয়েক বৎসর খুব দুঃখ কষ্টে কেটেছে তার। প্রায় দাসজীবন কাটাতে হয়েছে তাকে। ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং মনও পংগু। অবস্থা দেখে তর্তুগার গভর্ণর খুব শস্তা দামে এক শল্য চিকিৎসকের কাছে বিক্রী করে দিলেন অলিভিয়েকে। এসকোয়েমেলিং-এর কপাল ভালো। এই সার্জন লোকটি অলিভিয়েকে স্নেহ-যত্ন করলেন। ধীরে ধীরে অলিভিয়ে হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। সার্জনের কাছ থেকে চিকিৎসা-বিদ্যাও আয়ত্ব হল তার। কিছুদিন পরে শল্য চিকিৎসক মনিব অলিভিয়েকে মুক্তি দিলেন। শুধু হাতে নয়। শল্য চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় কয়েকটি যন্ত্রপাতি অলিভিয়েকে দান করলেন তিনি। নতুন চিকিৎসক চাকরী খুঁজতে মনোযোগী হলেন। শীঘ্রই একটা সুযোগ এল তার কাছে। কুর্ম দ্বীপ থেকে একদল বুকানিয়র যাচ্ছিল সমুদ্রে। তাদের জাহাজে একজন চিকিৎসকের প্রয়োজন। অস্ত্রোপচার ছাড়াও এই হাতুড়ে সার্জন ক্ষুরের সাহায্যে সংগী নাবিকদের দাড়ি গোঁফ কামিয়ে দিতে পারবে। সুতরাং বুকানিয়রের দলে নাপিত-কাম-সার্জন হয়ে অলিভিয়ে এসকোয়েমেলিং যোগ দিলেন।

ইতিমধ্যে পিটার লেগ্রান্ড নামক জনৈক বুকানিয়র এক দুঃসাহসী অভিযানে সাফল্য লাভ করে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। বুকানিয়ররা তখনও কোনো বড় শিকার হাত করতে পারে নি। তর্তুগার কাছাকাছি নীল সমুদ্রে তারা ছোট ছোট

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ॥ অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি—প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের কাব্য-বাণীর দুই অমর সাধকের অন্তরঙ্গ পরিচয় এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসু পাঠক এই গ্রন্থে পরিতৃপ্ত হবেন। লেখকের পাণ্ডিত্য ও রসবোধ এ গ্রন্থের বিষয়কে গভীরতায় নিয়ে গেছে। ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভাবের স্বতঃস্ফূর্তি গ্রন্থখানির পরম সম্পদ॥ মূল্য ঃ ছ' টাকা॥

দুই মনীষী ॥ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ — এই দুই মনীষী স্বমহিমায় জগৎ সভায় প্রতিষ্ঠিত। মানবাত্মার দুই রূপ একই দেশকালের পটভূমিতে এই দুই মনীষীকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানসিকতার দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও মানবতার সেবায় অনন্য চিন্তাস্রোতে প্রবাহিত উভয়ের পরিচয় সুনিপুণভাবে ব্যক্ত হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখক তাঁর সমগ্র আন্তরিকতা নিয়োজিত করেছেন উভয়ের মনীষার উৎস-সন্ধানে। রবীন্দ্রজীবনের একটি নতুন দিক গ্রন্থখানিতে বিশ্লেষিত হয়েছে।

পিতৃস্মৃতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আত্মকথার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ যে স্মৃতিচারণ করেছেন স্বভাবতই তার কেন্দ্রে আছেন তাঁর পিতৃদেব; শিলাইদহ-শান্তিনিকেতন-জোড়াসাঁকোর ঘরোয়া পরিবেশ থেকে শুরু করে বিদেশে—ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় — ভ্রাম্যমাণ কবিগুরুর অবিস্মরণীয় আলেখ্য রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পিতৃহৃদয়ের পরিচয় এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। বহু চিত্রসম্বলিত এই গ্রন্থ রবীন্দ্র পাঠকের কাছে নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়॥ মূল্য ঃ ষোল টাকা॥

পুণ্যস্মৃতি ॥ সীতা দেবী

রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-চর্চার মূল্যবান উপকরণরূপে এবং হাস্য-পরিহাসদীপ্ত রবীন্দ্রসংলাপের সংগ্রহরূপে এই দিন-লিপিকাটি অসামান্য। সেকালের শান্তিনিকেতন-আশ্রমজীবনের রসসমুজ্জ্বল আলেখ্য গ্রন্থখানিতে প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রপাঠকের পক্ষে গ্রন্থখানি অপরিহার্য।

রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রজীবনের প্রতিটি বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী লেখক এই গ্রন্থে সুবিন্যস্ত করেছেন। ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা এবং সাহিত্যিকের আন্তরিকতা মিশ্রিত হওয়ায় গ্রন্থখানি পাঠকের কাছে অতিপ্রয়োজনীয়। মূল্য ঃ চার টাকা॥

রবিচ্ছবি ॥ প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

রবীন্দ্রপরিচয়-গ্রন্থমালায় "রবিচ্ছবির" বিশিষ্টতা সর্বজন-স্বীকৃত। গ্রন্থখানিতে রবীন্দ্রনাট্য-প্রসঙ্গ, অভিনয়-উৎসব, কাব্য ও বিচিত্র বিষয়ের বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। মূল্য ঃ ছ' টাকা॥

দীনেশচন্দ্র বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিপুল সাহিত্যসম্ভার দীনেশচন্দ্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তাঁর একনিষ্ঠ প্রয়াসে পূর্ববঙ্গ-গীতিকা অবলুপ্তির গ্রাস থেকে ফিরে এসেছে, সুবিপুল বৈষ্ণব সাহিত্য পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এই দুই প্রবীন ধারায় দীনেশচন্দ্র নিজে মানসিক মুক্তি লাভ করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর সৃজনীপ্রতিভা এই দুই ধারা বিকশিত হয়ে উঠেছে আপন গৌরবে ॥

বাংলার পুরনারী ॥

পুরাণ এবং বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে সুললিত ভাষায় দীনেশচন্দ্র রূপায়িত করেছেন। পুরোনো গল্পও যে বলার ভঙ্গিতে নতুন হয়ে ওঠে, এ গ্রন্থ তার-ই প্রমাণ। মূল্য আট টাকা॥

পৌরাণিকী ॥

[গ্রন্থখানিতে আছে — জড়ভরত, ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ, ফুল্লরা, সতী, বেহুলা — গ্রন্থগুলি স্বতন্ত্র পাওয়া যায়। মূল্য যথাক্রমে ১·৫০, ১·২০, ১·৪০, ১·৩০, ১·৬০॥ মূল্য ছ' টাকা।

• কানু পরিবাদ ও শ্যামলী খোঁজা • মুক্তাচুরি • রাখালের রাজগি • রাগরঙ্গ • সুবল-সখার কাণ্ড॥

বৈষ্ণব সাহিত্যরসে দীনেশচন্দ্রের মন কতদূর অভিসিঞ্চিত হয়েছিল উক্ত গ্রন্থগুলি তার প্রমাণ। বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্বত্রই বাঙালির প্রাণের স্পর্শ সঞ্চারিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র তাঁর আন্তরিকতার সাহায্যে সেই প্রাণস্পন্দনের স্বরূপ তুলে ধরেছেন গ্রন্থগুলিতে।

[প্রতি গ্রন্থের মূল্য ঃ দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।]

*

জিজ্ঞাসা

কলকাতা ঃ ৯ ॥ কলকাতা ঃ ২৯

ক্যাপ্টেনের ভাবনা গেল ছুটে.........

দাঁড়টানা জলযানে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। উপকূলের কাছে কিংবা খাড়ির মুখে তারা সংগোপনে লুকিয়ে থাকত। হঠাৎ কোনো ছোটখাটো স্পেনীয় জাহাজকে বেকায়দায় পেলেই বুকানিয়রের দল ক্ষিপ্রগতিতে এসে তার উপর চড়াও হত। কিন্তু পিটার লেগ্রান্ডের অভিযানের পরিসমাপ্তি হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে। লেগ্রান্ড বেরিয়েছিলেন আঠাশজন সংগী নিয়ে। নীল দরিয়ায় স্পেনের ছোটখাটো জাহাজ পাবেন এই ছিল তার ভরসা। কিন্তু বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। সমুদ্রের বুকে প্রত্যাশিত সেই শিকারের দেখা কোথায়? এদিকে রসদে টান পড়েছে। আর দু এক বেলা বড় জোর চলতে পারে। তারপরই দলশুদ্ধ সকলের কপালে উপবাস। লেগ্রান্ড পরিস্থিতির গুরুত্ব চিন্তা করে গম্ভীর হয়ে গেলেন। ঠিক সেদিনই অবসন্ন অপরাহ্ণে গ্রীষ্মশেষের বর্ষার মেঘের মত সারিবদ্ধ কয়েকটি স্পেনীয় জাহাজ দেখা দিল সমুদ্রের বুকে। রাজহংসের মত জাহাজগুলি নীল জল কেটে তরতর করে এগিয়ে চলেছে। জাহাজগুলির মধ্যে অল্প বিস্তর কিছু দূরত্বের ব্যবধান।

পিটার লেগ্রান্ড চেয়ে দেখলেন। সব চেয়ে বড় জাহাজটা একেবারে পিছনে। অন্যগুলির চেয়ে সে রয়েছে বেশ কিছুটা দূরে। সমুদ্রের বুকে সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হয়ে নেমে আসছে। ঘন অন্ধকারে চারপাশে আর কিছুই দেখা যাবে না। লেগ্রান্ড মনঃস্থির করে বসলেন। ঐ বড় জাহাজটি তার চাই। কিন্তু মাত্র আঠাশ জন সংগী নিয়ে অত বড় একটা জাহাজের উপর চড়াও হওয়া কি আত্মহত্যার সামিল হবে না? পিটারের বুকের মধ্যে ভয়ের এক অজানা ছায়া চকিত বিদ্যুৎ ঝলকানির মত উঁকি দিয়ে গেল। কিন্তু বুকানিয়র পিটার লেগ্রান্ড সংকল্পে অটল রইলেন। এই জাহাজকে যেতে দেওয়া মানেই সমুদ্রে উপবাস। নিশ্চিত মরণের মুখোমুখি হতে হবে। তার চেয়ে একবার ভাগ্যকে যাচাই করে নিলে মন্দ কি?

নিঃশব্দে মৃত্যুর মত ধীরগতিতে লেগ্রান্ড তার জাহাজটি নিয়ে এলেন স্পেনীয় জাহাজটির পিছনে। ইতিমধ্যে সমুদ্রের বুকে অন্ধকারের ছায়া ছায়া ভাব পুঞ্জীভূত এবং গাঢ় হয়েছে। স্পেনীয় জাহাজটির নাবিকেরা বুকানিয়রদের লক্ষ্য করেনি। লেগ্রান্ড সংগীদের জাহাজে উঠতে আদেশ দিলেন। জাহাজে উঠবার আগে তার নিজের জলযানটির তলদেশে কয়েকটি ছিদ্র করে দেওয়া হল। পলায়নের পথে পড়ল কাঁটা। বুকানিয়রদের ফেরার পথ এইভাবে বন্ধ করে দিয়ে আক্রমণের উদ্দেশ্যকে আরো জোরদার করলেন তিনি। এখন দুটি মাত্র পথ—হয় সম্মুখ সমরে মৃত্যু, নাহলে স্পেনের জাহাজটির অধিকার লাভ। সন্তর্পণে সংগীদের নিয়ে লেগ্রান্ড উঠলেন জাহাজে। বুকানিয়রদের এক হাতে উঁচানো পিস্তল, অন্য হাতে খাপ খোলা তরবারি। মুহূর্তে কয়েকজনকে নিয়ে পিটার লেগ্রান্ড ছুটে গেলেন ক্যাপ্টেনের কেবিনের দিকে। কেবিনের মধ্যে তখন তাসের আসর সরগরম। অফিসারদের নিয়ে স্প্যানিশ ক্যাপ্টেন রঙের বিবির হিসেব করছেন মনে মনে। সাহেব দিয়ে বিবিকে কিভাবে ধরবেন, এই তার চিন্তা। হঠাৎ এক হুংকার শব্দে ক্যাপ্টেনের ভাবনা গেল ছুটে। সম্মুখে পিস্তল উঁচিয়ে এক জলদস্যু। জাহাজের দখল না দিলে ক্যাপ্টেন এবং তার অফিসারদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে দেরী করবে না তারা। রঙের সাহেব বিবি গোলাম নয়। এরা দুরন্ত শমন। ক্যাপ্টেন ভরসাহীন কণ্ঠে শুধু বললেন—ক্রাইস্ট আমাদের আশীর্বাদ করুন। এ লোকগুলো শয়তান ছাড়া আর কি!

ইতিমধ্যে লেগ্রান্ডের সংগীসাথীরা জাহাজের অন্যত্র নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। গোলাবারুদের ঘরটা দখল করেছে কয়েকজন। বেশ কিছু স্প্যানিশ নাবিক হতাহতের দলে। অল্প সময়ের মধ্যেই অমন সুন্দর বড় জাহাজটা পিটার লেগ্রান্ডের আদেশাধীনে চলে এল।

বুকানিয়র লেগ্রান্ড কিন্তু একটা কাজ করলেন। জাহাজে প্রচুর ধনরত্ন। পণ্যদ্রব্য এবং খাদ্য ও পানীয় যথেষ্ট। লেগ্রান্ড সমস্ত কিছু দেখে খুশী তো হলেনই, মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। জাহাজ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কুর্মদ্বীপের পথ ধরল না। লেগ্রান্ড আদেশ করলেন জাহাজকে ফ্রান্সের দিকে নিয়ে যাওয়া হোক। এত ধনরত্ন এই আঠাশটা মানুষের একটা জন্মের পক্ষে যথেষ্ট। তর্তুগাতে ফিরে পুনরায় নীল দরিয়ার বুকে ভেসে বেড়ানোর প্রয়োজন কি? পিটার লেগ্রান্ড নর্ম্যান্ডির উপকূলে এসে নামলেন। বাকী জীবনটা নিশ্চয়ই ভোগবিলাসে কাটিয়ে গিয়েছিলেন পিটার। অর্থাভাবজনিত দুশ্চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করেনি। পরবর্তী জীবনে নীল সমুদ্রের দিনগুলি একটা রোমাঞ্চ সুখকর স্বপ্নস্মৃতির মত মাঝে মাঝে মনে পড়েছে ঠিকই। কারণ পিটার লেগ্রান্ড আর কোনোদিন সমুদ্রে পাড়ি দেন নি।

অবশ্য সমস্ত বুকানিয়রই শিকারলাভে চূড়ান্ত সাফল্যের পরই রাতারাতি জীবনযাত্রা বদলে ফেলেনি। এসকোয়েমেলিং বলেছেন যে বুকানিয়ররা প্রায় সকলেই বেশ আমুদে এবং খরচে। তিনি যে জাহাজে অভিযানের সংগী হন তার ক্যাপ্টেন ডাঙায় উঠে এক পিপে মদ কিনে রাস্তার ধারে বসে পড়তেন। পথচারী প্রায় প্রত্যেককেই মদ খেতে অনুরোধ জানাতেন তিনি। মাঝে মাঝে মৌতাত জমে উঠলে সমস্ত মদটাই রাস্তার উপর ঢেলে দিতেন। কখনও কখনও নেশার ঝোঁকে পথচারী মেয়ে-পুরুষদের জামাকাপড় মদে ভিজিয়ে দিয়ে হো হো করে হাসতেন।

যাই হোক, পিটার লেগ্রান্ডের এই সাফল্যের কাহিনী বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। বুকানিয়ররা ভাবল যে স্পেনের বড় জাহাজগুলি সুবিধে বুঝে শিকার করা তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু আর এক ফরাসী বুকানিয়র লেগ্রান্ডের চেয়েও অনেক বেশী দুঃসাহসিক এবং রোমাঞ্চকর এক অভিযানে আশাতীত সাফল্য লাভ করল। এই লোকটি কিন্তু অনেক বেশী নৃশংস এবং নির্দয় বলে কুখ্যাত। ফরাসী লোকটির নাম ফ্রাঁসোয়া লোলোনোয়া। লোলোনোয়া নীল সমুদ্রে কোনো স্পেনীয় জাহাজের উপর চড়াও হবার কথা চিন্তা করল না। দলবল নিয়ে নীল দরিয়ায় ভেসে সে চলল ভেনেজুয়েলা উপসাগরের দিকে। বুকানিয়রের মনে ধনরত্নে ভরা আশ্চর্য সুন্দর এক নগরী সর্বদাই উঁকি দিচ্ছিল। সমৃদ্ধশালী মারাকাইবো নগরী,—সুবিস্তৃত এক হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে জলের ছায়ায় নার্সিসাসের মত সে আপনার সৌন্দর্য অবলোকন করছে। ভেনেজুয়েলা উপসাগরের সংগে এই হ্রদটির সংযোগ একটি অপ্রশস্ত খালের দ্বারা সম্ভব হয়েছে। খালের উপর

একটি দুর্গ অনুক্ষণ জলপথের দিকে প্রহরীর দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে।

লোলোনোয়া অতর্কিত আক্রমণে দুর্গের প্রহরীদের পরাস্ত করে মারাকাইবো নগরী অবরোধ করে বসল। ভীত ত্রস্ত নগরবাসী জলদস্যুর আগমনের সংবাদ পেয়েই পলায়ন করল নিকটবর্তী বনে-জংগলে। শূন্য নগরীর বুক থেকে ধন-সম্পদ রমণীর অংগ থেকে অলংকার অপহরণের মতই সংগ্রহ করল লোলো-নোয়া। কিন্তু বুকানিয়রের মন এতে ভরল না। তার মনে হল হয়ত আরো অনেক কিছু রয়ে গেল সংগোপনে। সুতরাং পরদিন সকালে একদল অনুচরকে বনে জংগলে পাঠিয়ে দিল জলদস্যু। তারা চিরুনির দাঁড়ার মত বনজংগল ঝেঁটিয়ে বহু নগরবাসী মেয়েপুরুষ এবং শিশুকে হাজির করল দুর্দান্ত বুকানিয়রের সামনে। শুরু হল অত্যাচার। দাবী হল স্বীকারোক্তির। লুকানো ধনরত্ন কোথায় রয়েছে তাই জানতে চায় অর্থলিপ্সু ফ্রাঁসোয়া। বলা বাহুল্য অত্যাচারিত নরনারীর দল কাঁদতে কাঁদতে তাদের সংগৃহীত ধনসম্পদের সুলুক সন্ধান ব্যক্ত করল।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল মারা-কাইবোতে। নগরবাসী স্পেনীয়রা আর একবার চেষ্টা করল জলদস্যুকে জব্দ করতে। কিন্তু বুকানিয়রের দলকে এঁটে ওঠা অসম্ভব। ধূর্ত এবং লোলুপ লোলোনোয়া মারাকাইবো নগরীর প্রতিটি গৃহ ও অট্টালিকা খুঁজে ফিরল পরশ-পাথরের সন্ধানে। তার মনে অনুক্ষণ চিন্তা, বুঝি বা অনেক রত্নসম্পদ, অর্থ এবং মূল্যবান সামগ্রী রয়ে গেল চোখের আড়ালে।

অবশেষে দলবল নিয়ে লোলোনোয়া ফিরে চলল। সংগে প্রচুর ধনসম্পদ, সোনাদানা এবং মূল্যবান সামগ্রী। পিছনে পড়ে রইল মারাকাইবো নগরী। হৃত, লুণ্ঠিত এবং অপমানিত মারাকাইবো। হ্রদের জলে তার রমণীয় সৌন্দর্যের ছায়া দেখতে তখন সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে।

কার্ড দ্বীপে এসে লোলোনোয়া লুঠ-পাটের সামগ্রী ভাগবাঁটোয়ারা করে নিল নিজেদের মধ্যে। প্রত্যেকটি বুকানিয়র তার নিজের ভাগে যা পেল বাকী জীবনটা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাবার পক্ষে তা যথেষ্ট। আর ফ্রাঁসোয়া লোলোনোয়া? ক্যাপ্টেন হিসেবে তারই তো হল সিংহভাগ। শুধু সাধারণ সুখটুখ নয়। ধনী হবার পক্ষে সে অর্থ-সম্পদ যথেষ্ট তো বটেই,—বরং আরো কিছু বেশী।

কিন্তু পিটার লেগ্রাণ্ডের মত লোলো-নোয়া তার অর্জিত সাফল্যকে দীর্ঘদিন উপভোগ করে যেতে পারে নি। নৃশংস এবং নির্মম বুকানিয়রকে ডেরিয়েনের অধিবাসীরা নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিল। যে ভয়ংকরকে নীল সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল বুকানিয়র, সেই ভয়ংকরই একদিন তাকে গ্রাস করল।

পিটার লেগ্রান্ড এবং ফ্রাঁসোয়া লোলো-নোয়া বুকানিয়রদের আদিপর্বের কৃতী পুরুষ। অবশ্য 'স্প্যানিশ মেইনে' আক্রমণ পরিচালনা করে আরো অনেকে ভাগ্য ফিরিয়ে নিতে পেরেছেন। লটারীতে টাকা পাওয়ার মত অভিযানের সাফল্য হঠাৎই তাদের অর্থবান করে দিয়েছে। এদের মধ্যে রক ব্রেসিলিয়ানো, মন্টবার এবং ইংরেজ লুইস স্কট উল্লেখযোগ্য। স্কট আক্রমণ করেছিলেন কাম্পেচে নগরীকে। পরবর্তী সময়ে এক ডাচ বুকানিয়রও এই শহরটির উপর হামলা করেন। ডাচ বুকানিয়রের নাম ক্যাপ্টেন মেন্সফিল্ড। মনে মনে একটা স্বপ্ন ছিল মেন্সফিল্ডের। প্রভিডেন্স দ্বীপপুঞ্জে জলদস্যুদের জন্য তিনি একটা উপনিবেশ গড়ে তুলবেন। স্বপ্ন অবশ্য বাস্তব হয়নি। কারণ মেন্সফিল্ড খুব শীঘ্রই মারা যান।

দুঃসাহসিক এক অভিযানের নায়ক পিয়ের ফ্রাঁসোয়া নামক বুকানিয়র। মাত্র ছাব্বিশজন অনুচর নিয়ে ফ্রাঁসোয়া স্পেনের মুক্তা আহরণকারী এক নৌবহরের উপর চড়াও হন। এই নৌবহরটি এসেছিল কার্তাজেনা থেকে। সংখ্যায় বারো তেরটি জলযান। স্পেনের দুটি রণতরী এদের

পথচারী প্রায় প্রত্যেককেই মদ খেতে অনুরোধ জানাতেন তিনি

দু'পাশে প্রহরীর মত সতর্কতার সংগে দাঁড়িয়ে থাকত। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা এবং কৌশলের সাহায্যে ছোট রণতরীটি প্রথম দখল করে বসলেন ফ্রাঁসোয়া। রণতরীতে ষাটজনের মত সৈন্য ছিল। কিন্তু পিয়ের ফ্রাঁসোয়া প্রতিহত হবার আগেই প্রতিপক্ষের শক্তিকে খর্ব করে দিলেন। ইচ্ছে করলে এই রণতরী এবং কিছু মুক্তো আহরণকারী নৌকো নিয়ে ফ্রাঁসোয়া চম্পট দিতে পারতেন। কিন্তু দুঃসাহসী বুকানিয়রের মনে হল বড় রণতরীটা দখল করে নিলে ক্ষতি কি? একটা যখন হাতে এসেছে, অন্যটাও হাতে আসবে। সুতরাং কিছু মুক্তো, কয়েকটি নৌকো এবং একটি রণতরী নিয়ে উধাও হলেন না বুকানিয়র পিয়ের। ঝাঁপিয়ে পড়লেন অমিতবিক্রমে অন্য রণ-তরীটির উপর। কিন্তু চাতুর্য, দুঃসাহস এবং কৌশল দ্বিতীয়বার তার সহায় হল না। এই দুরন্ত পাগলামির মাশুল দিতে হল ফ্রাঁসোয়াকে। হাতের মুঠোয় যেটুকু এসেছিল তাও পরিত্যাগ করতে হল তাকে। কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন ফ্রাঁসোয়া।

ইতিমধ্যে কর্মদ্বীপে বুকানিয়র জল-দস্যুদের সামান্য কিছু অসুবিধাও ঘটেছে। স্পেনীয় সৈন্যেরা মাঝে মাঝে এসে হানা দিয়েছে দ্বীপে। ফরাসী এবং ইংরেজ বুকানিয়রদের তাড়া করে নিয়ে গেছে। স্পেনের সৈন্যেরা কর্মদ্বীপ ছেড়ে চলে গেলে বুকানিয়ররা আবার ফিরে এসেছে। ফলে আরো একটি আড্ডা বা ঘাঁটি স্থাপনের জন্য বুকানিয়রের দল ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। জামাইকাতে এমন একটি স্থান খুঁজে পাওয়া গেল। ছোট্ট একটি শহর—নাম পোর্ট রয়্যাল। ইচ্ছে করলে এখানে লুঠের মালপত্র সহজেই বেচাকেনা করতে পারবে বুকানিয়রের দল। খুশীমত খাও দাও, নাচ, গান কর। কেউ তাতে নাক গলাতে আসবে না।

পোর্ট রয়্যাল থেকে যে সমস্ত বুকানিয়র নানা অভিযানে অংশ নিয়েছে, হেনরী মরগ্যান তাদের অন্যতম। এক হিসেবে সমস্ত বুকানিয়রদের মধ্যে হেনরী মরগ্যানের মত প্রসিদ্ধি আর কেউ লাভ করেন নি। মরগ্যানের আবির্ভাব, দুঃসাহসিক অভিযান এবং পরিণতি সব কিছুই উজ্জ্বল। কালিমা কিংবা কলংক কোথাও তাকে ম্লান করেনি। হেনরী মরগ্যান বুকানিয়র কুলে একটি প্রদীপ্ত সূর্য। তার মৃত্যুর সময়েও সে সূর্য মধ্যগগনে।

হেনরী মরগ্যানের বাবার নাম রবার্ট মরগ্যান। ভদ্রলোক চাষী মানুষ। জনশ্রুতি যে ছোটবেলায় হেনরীকে কারা চুরি করে নিয়ে যায় এবং বার্বাডোসে দাস হিসেবে বিক্রী করে দেয়। আরেক মতে হেনরীর মা বাবা ভীষণ গরীব ছিলেন এবং অভাবের তাড়নায় দরিদ্র মা বাবা ছেলেকে সামান্য

মজুর হিসেবে বার্বাডোসে বিক্রী করে দেন।

জামাইকাতে এসে হেনরী মরগ্যান বুকানিয়রের দলে নাম লেখালেন। স্যার টমাস মোদীফোর্ড তখন জামাইকার গভর্নর। গভর্নর সাহেব সে সময়কার নেতা বুকানিয়র ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড মেন্স-ফিল্ডকে কমিশন দিলেন। ক্যাপ্টেন মেন্সফিল্ড কুরাসাও দখল করেন। অভিযাত্রী দলের সঙ্গে হেনরী মরগ্যানও চললেন। একটি জাহাজের উপর তখন তার আদেশই বলবৎ। হঠাৎ এক আক্রমণের মুখে মেন্সফিল্ড বন্দী হলেন স্পেনীয়দের হাতে। ওরা তাকে মেরে ফেলল। নেতৃত্বহীন বুকানিয়ররা হেনরী মরগ্যানকে নিজেদের অ্যাডমিরাল পদে বরণ করল। হেনরীর আদেশে তখন দশটি জাহাজ এবং পাঁচশত বুকানিয়র।

হেনরী মরগ্যানের প্রথম অভিযান হল কিউবার পথে। কিউবার মাটিতে নেমে বুকানিয়ররা এল পুয়ের্তো প্রিন্সিপেতে। উপকূল থেকে স্থানটি অনেকদূর। জল-দস্যুর আক্রমণ কোনোদিন সেখানে হয়নি। শহরটি লুণ্ঠন করে বুকানিয়ররা হয়ত আগুন ধরিয়ে দিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর আগুন ধরানো হয়নি। এক হাজারটি গরু দান করে পুয়ের্তো প্রিন্সিপে শহরের অধিবাসীরা নগরীকে অগ্নিদগ্ধ করার আদেশ থেকে অব্যাহতি চেয়ে নেয়।

হেনরী মরগ্যানের পরবর্তী অভিযান দুর্গবেষ্টিত পোর্তো বেলো নগরীর পথে। হেনরী শুনেছিলেন যে পোর্তো বেলো শহরের স্পেনীয়রা জামাইকা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সুরক্ষিত নগরীকে দখল করা প্রায় অসম্ভব মনে করে ফরাসী বুকানিয়রের দল মরগ্যানের অনুগামী হতে অস্বীকার করল। কিন্তু দুঃসাহসী হেনরী তার সংকল্পে অটল। নগরী থেকে কয়েক মাইল দূরে মরগ্যান তার জাহাজগুলি রেখে ছোট ডিঙি নৌকোয় বুকানিয়রদের নিয়ে চললেন নগরী অবরোধ করতে। তিনটি দুর্গ পাহারা দিয়ে রেখেছে নগরীকে। প্রথম দুটিকে পরাস্ত করতে বুকানিয়রকে বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু শেষেরটি যেন দুর্ভেদ্য। শহরের গভর্নর ঐ দুর্গের মধ্য থেকে সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করবার আদেশ দিচ্ছেন। উপায় না দেখে ইংরেজরা বেশ কিছু মই বানিয়ে ফেলল। বেশ চওড়া মই। তিন চারজন এক সঙ্গে মই বেয়ে উঠতে পারে। উন্মত্ত হেনরী স্থানীয় কিছু ধর্মযাজক এবং মঠ-বাসিনীদের কাঁধের উপর এই সিঁড়িগুলি বহন করিয়ে নিয়ে গেলেন। সিঁড়ির সাহায্যে বুকানিয়রের দল প্রবেশ করল দুর্গে। স্পেনীয়রা বাধা দিল দুই হাতে। কিন্তু বুকানিয়রদের সঙ্গে সংঘর্ষে শহরের গভর্নর মারা পড়ার পরই সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হল।

হেনরী মরগ্যানের আদেশে শুরু হল লুঠপাট এবং অত্যাচার। টাকাকড়ি, সোনা-দানা, ধনরত্ন কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তা কবুল করুক অধিবাসীরা। অন্যথায় কঠোর শাস্তি পেতে হবে। বলা বাহুল্য দলবল নিয়ে মরগ্যান যখন জামাইকার পথ ধরলেন তখন পোর্তো বেলো শহরের প্রায় সমস্ত ধনরত্নই তার সঙ্গে এসেছে।

পোর্ট রয়্যালে ফিরে হেনরী মরগ্যান বেশ সম্বর্ধনা লাভ করলেন। কমিশনে যেটুকু অধিকার ছিল বুকানিয়র তার চেয়ে একটু বাড়াবাড়ি করেছেন ঠিকই। কিন্তু সামান্য একটু বাড়াবাড়ি না হলে পোর্ট রয়্যালে এই পরিমাণ সোনাদানা এবং ধনরত্ন কি আমদানী করতে পারতেন মরগ্যান? গভর্নর মোদীফোর্ড মোটামুটি খুশী। (সামান্য একটু ভর্ৎসনা করেছেন, কিন্তু সে লোক দেখানো।) তবু কিছুদিনের মধ্যেই হেনরীর পকেট হাল্কা হয়ে এল। তিনি ঘোষণা করলেন যে জানুয়ারী মাসে পুনরায় তিনি অভিযানে বেরোচ্ছেন। তার অনুগামী যারা হতে চায় তারা যেন কাউ দ্বীপে হেনরীর সঙ্গে মিলিত হয়।

অনেকগুলি রোমাঞ্চকর এবং দুঃসাহ-সিক অভিযানের নায়ক হেনরী মরগ্যান। সুবিস্তৃত সেই হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দর শহর মারাকাইবো তার হাতে লুণ্ঠিত হয়েছে। ছোট বড় নানা অভিযান পরিচালনা করেছেন বুকানিয়র হেনরী মরগ্যান। সাফল্যের চাবিকাঠি সব সময়ই তার হাতের মুঠোয় থেকেছে।

কিন্তু সমৃদ্ধশালী পানামা শহর দখল এবং লুণ্ঠনই হেনরী মরগ্যানের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জামাইকার গভর্নর নতুন করে কমিশন দান করেছিলেন হেনরীকে। মস্ত এক নৌবহর নিয়ে হেনরী পুনরায় নীল সমুদ্রে ভেসে পড়েন। স্পেনীয় জাহাজ, নগর দুর্গ এবং রসদ ভাণ্ডার তার হাতে ধ্বংস হোক। মনে করা হল এর ফলে স্পেনীয়রা নিশ্চয় ভয় পাবে। জামাইকার উপকূলে চড়াও হতে ওরা সাহসী হবে না।

এই ধরনের কমিশন মানেই জলদস্যু-বৃত্তি করবার একটি অনুমতি পত্র। বেআইনী কাজকারবারকে আইনসিদ্ধ করে নেবার ফন্দীফিকির মাত্র। তবুও কমিশন পত্রকে যথাসম্ভব মর্যাদা দেবার চেষ্টা হত। লুণ্ঠিত ধনরত্ন টাকাকড়ি গ্রহণ করবার জন্য কমিশনে লেখা হল—যেহেতু এই অভি-যানের জন্য কোনো মাইনেপত্র নির্দিষ্ট নেই, সে কারণে বুকানিয়ররা তাদের দলের নিয়ম অনুযায়ী লুণ্ঠিত টাকাকড়ি ইত্যাদি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে।

প্রায় আঠারো'শ বুকানিয়র সঙ্গে নিয়ে হেনরী চললেন পানামার পথে। ছোট ছোট নৌকোয় সকলে চলেছে। নদীর দুপাশে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্য। স্পেনীয়রা পথে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে দিয়ে গেছে। চাগ্রেস নদীর মুখে নিজের নৌবহর এবং জাহাজ-গুলি রেখে এসেছেন হেনরী। সঙ্গের রসদও পর্যাপ্ত নয়। বুকানিয়রদের প্রায় উপবাস করবার মত অবস্থা। সকলে শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত,...মনে মনে বিরক্ত। নবম দিনের শেষে কে একজন পানামা শহরের একটি গীর্জার চূড়ো দেখতে পেয়ে সঙ্গীদের জানাল।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক দিক থেকে হেনরী মরগ্যান শহর আক্রমণ করলেন। ফলে স্পেনীয়রা নিজেদের কামান বন্দুক এবং প্রস্তুত অবস্থান ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হল। হেনরী চেয়েছিলেন মুখোমুখী লড়াই। প্রথম আক্রমণে স্পেনীয়রা এক চাল

দয়ে বসল। কয়েকশত ক্ষ্যাপা ষাঁড় তারা ছুটিয়ে দিল বুকানিয়রদের দিকে। কিন্তু চালে বাজীমাৎ হল না। বন্দুকের গুলীতে এবং শব্দে ষাঁড়ের দল উল্টোমুখে হঠাৎ বেপরোয়াভাবে ছোটা শুরু করল। ফলে স্পেনীয় সৈন্য এবং অশ্বারোহীদের নাকাল হবার অবস্থা। কিছু সময় যুদ্ধের পর স্পেনীয়রা পরাস্ত হল। শ্রান্ত ক্ষুধার্ত বুকানিয়রের দল ক্লান্ত চরণে নগরের অধিকার গ্রহণ করল। মরগ্যান এবং অন্য বুকানিয়ররা শহরটিকে ভালো করে দেখল। ইতিমধ্যে হেনরী আদেশ দিয়েছেন তার দলের লোকেরা যেন না মদ্যপান করে। তিনি সংবাদ পেয়েছেন যে স্পেনীয়রা শহরের সমস্ত মদ্যে বিষ মিশিয়ে রেখেছে। (বলা বাহুল্য মদ্যপান করে শ্রান্ত বুকানিয়ররা নেশাগ্রস্ত হলে পুনরায় আক্রান্ত হত।) সুন্দর নগরী। সিডার কাঠের বড় বড় বাড়ী। চওড়া রাজপথ। পুরো তিন সপ্তাহ হেনরী মরগ্যান শহরে ছিলেন। অবাধে চলল লুণ্ঠন। যেদিন জামাইকা ফিরতে মন চাইল, সেদিন মরগ্যানের সঙ্গে নানা সম্পদ। শ' দুই খচ্চরের পিঠে বহু বস্তা ধনরত্ন, সোনা সম্পদ এবং বেশ কিছু বন্দীদের নিয়ে বুকানিয়রের দল জামাইকার পথ ধরল।

জামাইকার কাউন্সিল হেনরী মরগ্যানকে সভা করে অভিনন্দিত করলেন। এই অভিযানের সাফল্য তো একা হেনরীর নয়। তাদের সকলের। কিন্তু সম্ভবত একটা ব্যাপার কেউই তলিয়ে দেখেন নি। অল্প কিছুদিন আগে মাদ্রিদে স্পেন এবং ইংলণ্ডের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল। স্পেনের উপনিবেশে ইংরেজরা আর হামলা করবে না। তা সত্ত্বেও হেনরীর এই অভিযান রাজাদেশ লংঘন ছাড়া আর কি? চুক্তিভঙ্গের জন্য ইংলণ্ডের সম্রাট নিশ্চয় অপদস্থ হয়েছেন।

দ্বিতীয় চার্লসের দরবারে স্পেনের রাজদূত প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন। সুতরাং হেনরী মরগ্যানকে জামাইকা থেকে আনা হল, বন্দীর পোশাক পরিয়ে। তার বিরুদ্ধে জলদস্যুবৃত্তির অভিযোগ, বিচারকদের সামনে হাজির করা হল হেনরীকে। আইনের চোখে তিনি অপরাধী।

কিন্তু হেনরী মরগ্যান তখন ইংলণ্ডের জনগণের কাছে রূপকথার নায়ক। দুঃসাহসী, নির্ভীক এবং প্রাণচঞ্চল এই বুকানিয়রের নানা কীর্তিকাহিনী গল্পে এবং কল্পনায় বহুগুণ বর্ধিত হয়ে ইংলণ্ডের গ্রামে গঞ্জে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। অতএব হেনরীকে দোষী সাব্যস্ত করতে কোনো জুরী বা বিচারক অগ্রসর হলেন না। দ্বিতীয় চার্লস এই জনচিত্ত-জয়কারী মানুষটিকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করলেন। শুধু এইটুকু নয়—রাজার আদেশে হেনরী মরগ্যানকে এক উচ্চপদে নিয়োগ করা হল। জামাইকার ডেপুটি গভর্নর। হেনরী ইংলণ্ডের মাটিকে বিদায় জানিয়ে ফিরে গেলেন জামাইকাতে।

পরবর্তী জীবনে মরগ্যান রীতিমত রাজঅনুরক্ত। তার নতুন পদের মর্যাদা তিনি ক্ষুণ্ণ করেন নি। জামাইকার কাউন্সিলের তিনি সদস্য হন এবং দ্বীপের সৈন্যরা তার অধীনেই কাজ করেছে।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে হেনরী মারা যান। নিজের ঘরে পরিচিত পরিবেশে শয্যায় শুয়ে মৃত্যু ক'জন বুকানিয়রের ভাগ্যে ঘটেছে? হেনরী মরগ্যানকে পোর্ট রয়্যাল শহরের সেণ্ট ক্যাথেরিন গীর্জায় সমাধিস্থ করা হল। তার অধীনস্থ সৈন্যরা, পুরাতন বুকানিয়র বন্ধুর দল, জামাইকার আরো অনেক রাজপুরুষ এসেছিলেন তাকে শেষ বিদায় জানাতে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল। শোকসঙ্গীত শেষ হলে হেনরী মরগ্যানকে শেষ বিদায় জানিয়ে সবাই ফিরল। খ্যাতি, কীর্তি এবং সাফল্যের তুঙ্গে উঠে এমনভাবে ওপারে যাত্রা বোধহয় খুব কম জনেরই ভাগ্যে ঘটেছে।

হেনরী মরগ্যানের বুকানিয়রবৃত্তি পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই দুরন্ত ডানপিটেপনার ইতিহাসের প্রথমার্ধ বা এক অধ্যায় শেষ। দ্বিতীয়ার্ধ বা শেষ অধ্যায়
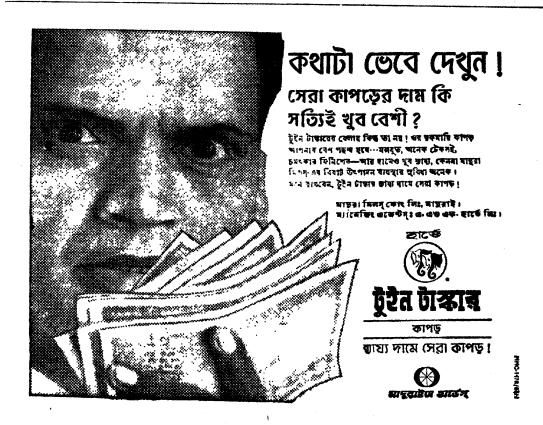
শুরু হয়েছিল ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে। মরগ্যানের দুঃসাহসিক অভিযান এবং পানামা শহর লুণ্ঠনের সাফল্য বুকানিয়রদের নব নব অভিযানের পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করে তোলে। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন বুকানিয়র প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটি অভিযান শুরু করতে মনস্থ করে। এদের দলে ছিলেন বিখ্যাত বুকানিয়র বার্থো-লোমিউ শার্প, জন কক্সন, রিচার্ড সকিন্স ও পিটার হ্যারিস। এই অভিযানের ব্যাপ্তি বা সময়কাল সুদীর্ঘ দুই বৎসর। এই দলে গিয়েছিলেন বেসিল রিংরোজ। অভিযানের নানা ঘটনা, ছোটখাটো বিবরণ রিংরোজ তার ডায়েরী বা জর্নালে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। সীমাহীন নীল সমুদ্রের বুকে সুদীর্ঘ দুই বৎসরকালের এই কাহিনী সাসপেন্স, রোমাঞ্চ এবং দুঃসাহসিক নানা ঘটনার ঘনঘটায় ঘোর। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে চিলির সুদূর আরিকা শহর পর্যন্ত এই অভিযানের গল্প এখনই নয়।

সে কাহিনী বারান্তরে।

ইতিমধ্যে বিপথগামী বুকানিয়রদের আইনশৃংখলার পথে ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন সরকার সচেষ্ট হয়েছে। যারা দস্যুবৃত্তি ছেড়ে সৎ নাগরিকের জীবন গ্রহণ করবে তাদের অপরাধ সরকার মার্জনা করবেন বলে ঘোষণা করা হল। এবং যারা এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে নীল দরিয়ার বুকে জলদস্যুর উৎপাত চালিয়ে যাবে তাদের দেওয়া হবে কঠিন শাস্তি। বলা বাহুল্য কিছু বুকানিয়র পুরানো দিনের দুরন্তপনা ত্যাগ করে উঠে এল ছকে ফেলা নাগরিক জীবন কাটাতে। যাদের কাছে ডাঙার স্যাঁতসেঁতে, মিনমিনে জীবনের চেয়ে দরিয়ার উচ্ছলতাই বেশী কাম্য হল, তারা এল না ফিরে। এদিকে জামাইকা এবং অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের ব্যবসায়ী ও জমিজমার মালিক এবং পূর্ব-পৃষ্ঠপোষকের দল বুকানিয়রদের এখন আর সমর্থন করতে চাইল না। তারা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিল যে ক্যারিবিয়ানের সমুদ্রে বুকানিয়রদের এই ডানপিটেপনার ইতি না হলে ব্যবসা বাণিজ্য একদিন স্তব্ধ হয়ে যাবে। ফলে পোর্ট রয়্যালে এসে নামা এবং মালপত্র বিক্রি করবার সুযোগ বুকানিয়র-দের কাছে বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু তার জন্যই বুকানিয়ররা দমল না। পোর্ট রয়্যালের অধিকার যদি যায় তবে অন্য পোর্ট খুঁজতে হবে। এবং বাহামা দ্বীপপুঞ্জ এই ব্যাপারে বুকানিয়রদের সহায়ক হল। বাহামার গভর্নর মিঃ রবার্ট ক্লার্ক বুকানিয়রদের আবেদন নিবেদনে সাড়া দিলেন। নিউ প্রভিডেন্স দ্বীপপুঞ্জে বসে গভর্নর ক্লার্ক বুকানিয়রদের কমিশন,—পরোক্ষে জল-দস্যুবৃত্তি চালাবার আদেশপত্রে দস্তখৎ করতে লাগলেন। সামান্য কিছু দিলেই গভর্নর সাহেব সদয় হতেন। ফলে বেকার জলদস্যু বা বুকানিয়ররা অভীষ্ট কর্মের সন্ধান পেল।

অবশ্য শুধু রবার্ট ক্লার্ককে দোষারোপ করলে কিছু অন্যায় করা হবে। কমিশন দান করতে অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের শাসক বা গভর্নররা কিছুমাত্র পিছপাও ছিলেন না। ক্যারিবিয়ান সাগরে ছোট-বড় অনেকগুলি দ্বীপ। হিসপ্যানিওলার গভর্নর শুধুমাত্র দস্তখৎ করে দিয়েই কমিশন পত্রটা জলদস্যু ক্যাপ্টেনকে ধরিয়ে দিতেন। এই আদেশপত্রের দ্বারা যে সব অধিকার জলদস্যুদের উপর বর্তাবে সেটুকু তারা নিজেদের ইচ্ছেমত পূরণ করে নিতে পারবে। অনেকটা ব্ল্যাঙ্ক চেক দেওয়ার মত ব্যাপার। টাকার অংকটা গ্রহীতা নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী লিখে নেবে।

কমিশন দেবার ব্যাপারে একটা মজার কাহিনী জানা গেছে। জনৈক জলদস্যু কোন এক দ্বীপপুঞ্জের গভর্নরের কাছ থেকে একটি কমিশন পত্র সংগ্রহ করে।

গভর্নর ডেনমার্কের লোক এবং পূর্বে তিনিও ছিলেন জলদস্যু। কমিশনপত্রটি ডেনমার্কের ভাষায় লেখা। তাতে সুন্দর একটি শীলমোহর দেওয়া। কোন ত্রুটি বা অসঙ্গতি নেই। একবার কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে কে একজন কমিশনপত্রটি পড়তে চেষ্টা করে। ডেনমার্কের ভাষায় লেখা কমিশনপত্রটির পাঠোদ্ধার হলে দেখা গেল যে, গভর্নর শুধু হিসপ্যানিওলা দ্বীপে ছাগল এবং শূকর শিকার করবার অধিকার কমিশনপত্রে দান করেছেন। এ কথা নিশ্চয়ই বলা প্রয়োজন যে, এর পূর্বেই বেশ কয়েকটি জাহাজ, কিছু গীর্জা এবং দু-একটি শহর এই জলদস্যুর দলের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে।

জলদস্যুদের জন্য নতুন নতুন বন্দরের দ্বার প্রত্যহই উন্মুক্ত হচ্ছিল। আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশের বণিকরা সস্তায় লুঠের মাল কিনবার জন্য সদা চেষ্টিত ছিলেন। বোস্টন বন্দরে পণ্য বিক্রী করবার বেশ সুবিধে। মাইকেল ল্যাপেস্ট্রসন নামে এক কুখ্যাত জলদস্যু ক্যারিবিয়ান সাগরে লুঠপাট চালিয়ে, বোস্টনে এসে সোনাদানা মুক্তো এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্য বিক্রী করে দিয়ে যেত। মোটা লাভের আশায় বোস্টনের বণিকের দল এই লুঠের মাল কিনতে খুবই আগ্রহী ছিল। ল্যাপেস্ট্রসন অবশ্য বেশী দিন কারবার চালাতে পারে নি। স্পেনীয়দের হাতে ধরা পড়ে তার ফাঁসি হয়।

বুকানিয়রদের দলে নানা ধরনের লোক এসে ভীড় করেছিল। শুধু দলছুট ঘরপালানো নাবিক,...শুধুমাত্র ভাগ্যান্বেষী, দুর্দান্ত প্রকৃতির জলদস্যু নয়। বুকানিয়র-দের দলে এসেছে নানা জীবিকার মানুষ, নানা প্রকৃতির লোক। কেউ চিকিৎসক, কেউ প্রাণী এবং উদ্ভিদবিদ্যা আলোচনাকারী, কেউ বা ছন্দ এবং কথার সমন্বয় সৃষ্টি-কারী কবি, এদের মধ্যে একজনের কথা বিশেষভাবে জানা গেছে। — ইনি পরবর্তী জীবনে ইংলণ্ডে একটি সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত হন।

ল্যান্সলেট ব্ল্যাকবার্নের নাম সম্ভবত বুকানিয়রদের প্রসঙ্গে কোনদিনই উচ্চারিত হত না। হঠাৎ লণ্ডনে সেবার এক বুকা-নিয়র এসে হাজির হল। তার পুরানো বন্ধু ল্যান্সলেট ব্ল্যাকবার্নের সংবাদ এবং বর্তমান ঠিকানার সে খোঁজ করছে। সকলে তো অবাক। বুকানিয়রের সঙ্গে ল্যান্স-লেটের সম্পর্ক কোথায়? ল্যান্সলেট ব্ল্যাকবার্ন অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চের স্নাতক এবং বর্তমানে ইয়র্কের আর্চ বিশপ। বুকানিয়র বলল, ল্যান্সলেট ব্ল্যাকবার্ন ১৬৮১-৮২ খৃস্টাব্দে তাদের সঙ্গে অভিযানে সঙ্গী হয়। এবং তখন তো সে ছিল তাদেরই মত একজন বুকানিয়র।

এই সব অভিযোগের কোন উত্তর বা স্বীকারোক্তি অবশ্য ব্ল্যাকবার্নের কাছে পাওয়া যায় নি। কিন্তু বেশ কিছু দিন পরে আর্চ বিশপের একটি তরবারি ক্রাইস্ট চার্চে সংরক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে আনা হয়। তরবারিটির সঙ্গে একটি রহস্য কাহিনী লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। কোষ থেকে তরবারিটি যে টেনে বের করবার চেষ্টা করবে দুর্ভাগ্য তার সঙ্গী হবে।...আর্চ বিশপ ল্যান্সলেট ব্ল্যাকবার্নের এই তরবারি নিশ্চয়ই তার বুকানিয়র জীবনের স্মৃতি-চিহ্ন। কারণ বিশপ বা আর্চ বিশপদের নিজস্ব তরবারি রাখবার কোন নজীর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

দস্যু বুকানিয়রের আর্চ বিশপ হওয়ার কাহিনী নিশ্চয়ই আমাদের খুব বেশী আশ্চর্যান্বিত করবে না। কারণ এদেশে তস্কর রত্নাকর, মহাকবি বাল্মীকিরূপে খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু নজীর ওদেশেও রয়েছে। এবং এই ধরনের কাহিনী জানবার কৌতূহল স্বাভাবিক কারণেই বেশী। প্রথম জেমসের আমলে জন পপহ্যাম নামে এক ভদ্রলোক ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতির আসন অলংকৃত করেন। দীর্ঘ পনেরো বৎসর কাল পপহ্যাম এই পদে ছিলেন। তার কোর্টে অসংখ্য মামলার বিচার হয়েছে এই পঞ্চদশ বৎসর কালের মধ্যে। আইনের চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে মামলার রায় দিয়েছেন বিচারপতি পপহ্যাম। কিন্তু পথ-দস্যু বা রাহাজানি মামলার আসামীরা কদাচিৎ তার কাছে মুক্তি পেয়েছে। বরং তাদের কঠিন শাস্তি দিয়েছেন বিচারপতি। যাতে বিপথগামী পথদস্যুরা এই শাস্তির কথা জানতে পেরে অপরাধ না করে। একটা কথা ভাবলে কিন্তু অবাক হতে হয়।

প্রধান বিচারপতি জন পপহ্যাম প্রথম জীবনে ছিলেন একজন নির্দয় পথদস্যু।

দেশে বিদেশে

বৃটেনে ধলা-কালো

বৃটেনে আগামী নির্বাচনে যদি রক্ষণশীল দল জয়ী হয় (যার সম্ভাবনা আছে বলে অনেকেই মনে করছেন) তাহলে ঐ দলের মন্ত্রিসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল যে ব্যক্তির তাঁর নাম এনক পাওয়েল। ৫৫ বছর বয়সের এই টোরি এম-পি একজন প্রাক্তন মন্ত্রী ও দলের একজন উঁচুদরের নেতা। ১৯৬৫ সালে যখন দলের নেতা নির্বাচন হয় তখন তিনি অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে তিনি এঁটে উঠতে পারেন নি। কিন্তু রক্ষণশীল দলের "ছায়া মন্ত্রিসভায়" তাঁর স্থান হয়ে-"প্রতিরক্ষামন্ত্রী" হিসাবে। তিনি প্রিভি কাউন্সিলেরও একজন সদস্য।

মিঃ পাওয়েল গত ২১ এপ্রিল তারিখে বার্মিংহাম শহরে একটি প্ররোচনামূলক বক্তৃতায় বলেন, "যেসব বহিরাগত বৃটেনে রয়েছে তাদের স্ত্রী ও সন্তান হিসাবে প্রতি বছর আরও ৫০ হাজার জনকে বৃটেনে আসতে দিয়ে বৃটেন পাগলামি,. বিশুদ্ধ পাগলামি" করছে। ২০ বছরে বৃটেনে বহিরাগতের সংখ্যা দাঁড়াবে ৩৫ লক্ষ, একথা উল্লেখ করে তিনি বললেন, "একটা জাতিকে আমরা যেন তার চিতাশয্যা রচনা করতে দেখছি।"

গ্রীক ভাষার প্রাক্তন অধ্যাপক ও প্রাচীন ইতিহাসের পাঠক মিঃ এনক পাওয়েল শ্রমিক-প্রধান বার্মিংহামের এই সভার শ্রোতাদের উদ্দেশে বললেন, "সেকালের রোমানের মত আমিও যেন টাইবার নদীতে রক্তের প্লাবন দেখতে পাচ্ছি।"

কট্টর রক্ষণশীল বলে পরিচিত মিঃ এনক পাওয়েলের এই উত্তেজনাকর বক্তৃতা বৃটেনে ধলা-কালো ভেদবুদ্ধির আগুনে নূতন ইন্ধন যুগিয়েছে। মিঃ পাওয়েলের উষ্মার মূল লক্ষ্য ছিল বৃটেনের শ্রমিক সরকার কর্তৃক উত্থাপিত নূতন একটি বর্ণ-বৈষম্য বিরোধী বিল। ১৯৬৫ সালে যে বর্ণবৈষম্য বিরোধী আইনটি গৃহীত হয়েছে তার পরিধি সম্প্রসারিত করে এবারকার বিলে গৃহসংস্থান, চাকুরী, বীমা, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গায়ের চামড়ার রং-এর ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করা আইনত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এনক পাওয়েল ও তাঁর অনুগামীরা এই বিলের বিরোধী। পাওয়েল সেই মতের প্রতিনিধি যাঁরা বৃটেনে খোলাখুলি একটা শ্বেতাঙ্গ-প্রাধান্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রণনীতি চালাতে চান। অথচ নূতন বিলটির ঘোষিত উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত ও পাকিস্তান থেকে আগত যে প্রায় দশ লাখ অশ্বেতকায় মানুষ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে বাস করছেন তাঁদের এখন বাড়ী পাওয়ার ব্যাপারে, যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরী বা প্রমোশন পাওয়ার ব্যাপারে, ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে ভর্তি করার ব্যাপারে যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি দূর করা। রক্ষণশীল দল সরকারীভাবে এই ধরনের একটা আইন রচনা করার প্রয়োজন অস্বীকার করেন না; কিন্তু তাঁরা বর্তমান বিলের কয়েকটি সংশোধন চান। তাঁরা বহিরাগত বসবাসকারীদের মধ্যে যতজনকে সম্ভব টাকাকড়ি দিয়ে দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে চান। অন্যদিকে, এনক পাওয়েল ও তাঁর অনুগামীরা এই বিল একেবারে নাকচ করে দিতেই চান। পাওয়েল তাঁর বার্মিংহামের বক্তৃতায় দলের নীতির বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।

এই বক্তৃতা বৃটেনে একটা প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় তুলেছে। বক্তৃতার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রক্ষণশীল দলের নেতা এডওয়ার্ড হীথ ঘোষণা করেছেন যে, বর্ণবৈষম্যে উস্কানি দিয়ে মিঃ পাওয়েল যে দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তৃতা দিয়েছেন সেজন্য মিঃ পাওয়েলকে "ছায়া মন্ত্রিসভা" থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই পর পর অনেকগুলি ঘটনা থেকে প্রকাশ পেল যে, মিঃ পাওয়েল বৃটেনের অনেকেরই মনের কথা প্রকাশ করে বলেছেন। ডেইলি এক্সপ্রেস পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কার্টুনে দেখান হল, মিঃ পাওয়েলের বিচারকরা তাঁকে শাস্তি দিয়ে বলেছেন "আসামী পাওয়েল, সত্যি কথা বলার জঘন্য অপরাধে আমরা তোমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করলাম।" বিচারকদের পিছনে "আমাদের জাতীয় প্রতীক" একটি উট পাখী, তার মুখ গোঁজা বালির মধ্যে, উট পাখীর গায়ে ইউনিয়ন জ্যাক। কয়েক দিনের মধ্যে পাওয়েলের কাছে ৮৫,০০০ চিঠি এল। তার মধ্যে খান ত্রিশেক ছাড়া বাকী সবই তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে। লণ্ডনে ডক শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন পাওয়েলকে সমর্থন করে ১৯টি ধর্মঘট বা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। এই রকম একটা বিক্ষোভের সামনা-সামনি পড়ে গিয়ে বৃটেনস্থিত কেনিয়ার হাই-কমিশনার অপমানিত হলেন।

১৯৬৫ সালের আইনে ছিল যে জাতি-বিদ্বেষের প্ররোচনা দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। মিঃ পাওয়েলকে সেই বিধান অনুযায়ী আদালতে সোপর্দ করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু মিঃ পাওয়েলের গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা উইলসন সরকারের আছে মনে হচ্ছে না।

এই সব ঘটনা থেকে প্রশ্ন উঠছে, "আমেরিকার মত বৃটেনেও কি একটা বর্ণসংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠছে?" যদিও বৃটেনে মোট জনসংখ্যার কৃষ্ণাঙ্গ বহিরাগতদের অনুপাত খুব সামান্য (২ শতাংশ) তথাপি বৃহত্তর লণ্ডন, বার্মিংহাম, লিভারপুল, ব্র্যাডফোর্ড ইত্যাদি কতকগুলি শিল্প-প্রধান শহরে তারা সংখ্যায় বেশ ভারী। এই সব অঞ্চলে শ্বেতকায়দের মধ্যে অশ্বেতকায়দের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ কিছু দিন যাবৎ ধূমায়িত হচ্ছে। ১৯৫৮ সালে লণ্ডনের অসওয়াল্ড মোসলের ফ্যাসিস্ট দলের ছোকরারা কালোদের উপর যে জুলুম চালিয়েছিল সেটা স্বল্পস্থায়ী হলেও তার মধ্য দিয়ে একটা অন্তঃপ্রবাহী বিরোধের চিত্র ফুটে বেরিয়েছিল। ১৯৬৪ সালে স্মেদউইক নির্বাচনকেন্দ্রে একজন অপরিচিত রক্ষণশীল সদস্য প্যাট্রিক গর্ডন-ওয়াকারের মত সুপরিচিত শ্রমিক নেতাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন শুধু বৃটেনকে 'বৃটিশ রাখার' শ্লোগান তুলে।

এনক পাওয়েলের এই ঘটনার পর লণ্ডনের টাইমস পত্রিকায় একজন ভারতীয় ছাত্রের লেখা চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে যে, একদল শ্বেতাঙ্গ ছোকরা তাঁকে লণ্ডনের রাস্তায় প্রহার করেছে এবং প্রহার করার সময় 'পাওয়েল' পাওয়েল বলে চীৎকার করছিল।

আজকে এনক পাওয়েলের গলায় যে সুর শোনা যাচ্ছে এবং তাঁর পিছনে বৃটিশ সমাজের যে সমর্থন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের হুঁশিয়ার হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। তাঁদের তরফের প্রস্তুতির একটা লক্ষণ ইতিমধ্যে দেখা গেছে। সেটা হচ্ছে এই যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, পাকিস্তান ও আফ্রিকা থেকে আগতদের ২০টি সংস্থা মিলে 'ব্ল্যাক পিপলস অ্যালায়েন্স' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন।

সম্রাটের সঙ্গে মৈত্রী

লিজ আফারি মাকোনেন ওরফে সম্রাট প্রথম হাইলে সেলাসি। ইথিওপিয়ার রাষ্ট্র-প্রধান, ৭৬ বছর বয়সের এই মানুষটি আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো, সবচেয়ে সুপরিচিত রাষ্ট্রনায়ক। ত্রিশের দশকে যাঁরা অন্য সকলের আগে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন এবং সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন সম্রাট হাইলে সেলাসি তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

তাঁর নেতৃত্বে আজকের ইথিওপিয়া ধীরে ধীরে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে।

এই সম্রাট সম্প্রতি ভারতবর্ষে সফর করে গেলেন। সেই সূত্রে নবজাগ্রত এশিয়া ও আফ্রিকার এই দুই দেশের মধ্যে মৈত্রীর অংগীকার পুনরায় উচ্চারিত হল। জোট-নিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতি আস্থাশীল এই দুই রাষ্ট্র আজকের পৃথিবীর প্রায় সব সমস্যাকে একই দৃষ্টি দিয়ে দেখে। সম্রাট হাইলে সেলাসির সফরের শেষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও সম্রাট কর্তৃক যুক্তভাবে স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে দুই রাষ্ট্রের ঐক্যমত পুনরায় ঘোষণা করা হল।

উভয় নেতা তাঁদের বিবৃতিতে স্বীকার করেছেন যে, বিশ্বশান্তি রক্ষায় ও আন্তর্জাতিক সদ্ভাব রক্ষায় জোটনিরপেক্ষ নীতির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

ভিয়েতনাম ও পশ্চিম এশিয়ার প্রশ্নেও দুই নেতার মধ্যে মতভেদ নেই। ভারতের ন্যায় ইথিওপিয়াও আশা করে যে, ভিয়েতনামে সার্থক শান্তি আলোচনা আরম্ভ করা খুব শীঘ্রই সম্ভব হবে। পশ্চিম এশিয়ার প্রশ্নে উভয়েরই মত হল, এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য যেটা দরকার তা হল, আগে হানাদারদের দখল-করা জমি ছেড়ে যেতে হবে।

পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসাররোধ সম্পর্কে সোভিয়েট-মার্কিন খসড়া চুক্তির বিষয়ে এই যুক্ত বিবৃতিতে সরাসরি কোন উল্লেখ না করে বলা হয়েছে যে, পারমাণবিক শক্তির মালিকরা বিশ্ব থেকে পারমাণবিক অস্ত্র উচ্ছেদের সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর পন্থা অবলম্বন করবেন বলে উভয় দেশ আশা করে।

বৃহত্তর আকারে আর একটি জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন আহ্বানের জন্য যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো যে প্রস্তাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও সম্রাট হাইলে সেলাসি তা সমর্থন করে বলেছেন, এই ধরনের সম্মেলন আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের ও বিশ্বশান্তি রক্ষার সহায়ক হবে; সুতরাং এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চালান দরকার।

তাসখন্দ চুক্তির সার্থকতায় দুই রাষ্ট্রনায়কের গভীর প্রত্যয় ঘোষণা করে যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ভারত তাসখন্দ চুক্তির প্রতিটি অক্ষর এবং এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ অনুগত।"

নাৎসীদের অভ্যুত্থান?

পশ্চিম জার্মানীর তৃতীয় বৃহত্তম প্রদেশ বাডেন-ভুর্টেমবুর্গে (রাজধানী স্টুটগার্ট) প্রাদেশিক আইনসভার যে নির্বাচন সম্প্রতি হয়ে গেল তাতে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দশ শতাংশ ভোট পেয়ে ১২৭টি আসনের মধ্যে ১২টি আসন দখল করায় জার্মানীর রাজনীতি কোন্ দিকে যাচ্ছে সে বিষয়ে সারা পৃথিবীতে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। কেননা, এই দলের কার্যনির্বাহক সমিতির শতকরা ৬০ জন সদস্যই পুরানো নাৎসী। দলের নেতা অ্যাডলফ ফন থাডেন বলেছেন, জার্মানীর রাজনীতি মোড় ফিরে "পিতৃভূমির দেশাত্মবোধক আদর্শের দিকে যাচ্ছে।" বৃটিশ টেলিভিসনে এক সাক্ষাৎকারে ৪৭ বছর বয়স্ক ফন থাডেন অবশ্য বলেছেন যে, তিনি কখনও নাৎসী দলের সদস্য ছিলেন না এবং হিটলারের নীতি আজ আবার চালান সম্ভব বলে মনে করেন না।

পশ্চিম জার্মানীর প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এখন একটা "গ্র্যান্ড কোয়ালিশনে" আবদ্ধ। ফলে বিরোধী দল বলতে সেখানে তখন কিছুই নেই। ফ্রি ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য।

অথচ, কিছুকাল যাবৎ সেদেশে বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে একটা অসন্তোষ, সরকারের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছিল। অধিকতর চরমপন্থী ছাত্রেরা সোশ্যালিস্ট স্টুডেন্ট লীগ নামে একটি সংস্থার মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ। পশ্চিম জার্মানীর ছাত্রদের মধ্যে লীগের প্রভাব কতখানি সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ এই ছাত্র প্রতিষ্ঠান পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, জার্মান সরকারের বিরুদ্ধে, ভিয়েতনামে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, হো চি মিনের সমর্থনে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে আন্দোলন করছিল। গত মাসে পশ্চিম বার্লিনে এই লীগের নেতা রুডি ডুৎস্কেকে একজন তরুণ গুলী করে হত্যার চেষ্টা করে। এর পরই ছাত্রদের ক্রোধ গিয়ে পড়ে যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে সবচেয়ে সফল সংবাদপত্র প্রকাশক আলেক্সি স্প্রিঙ্গারের উপর। পশ্চিম বার্লিন ও পূর্ব বার্লিনের সীমান্তে যে সব প্রবেশদ্বার আছে তাদের মধ্যে একটির নাম 'চেকপয়েন্ট চার্লি'। এই 'চেকপয়েন্ট চার্লি'র ঠিক গায়েই স্প্রিঙ্গার গোষ্ঠীর ১৯তলা বাড়ী। এই বাড়ীর সামনে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সঙ্ঘর্ষ হয়ে গেল। স্প্রিঙ্গার গোষ্ঠীর সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ছাত্রদের অভিযোগ, তারা দেশের মধ্যে যে কমুনিস্ট-বিরোধী অসহিষ্ণুতার আবহাওয়া সৃষ্টি করছে তার ফলেই রুডির উপর হামলা হয়েছে।

সোস্যালিস্ট ছাত্র লীগের এই সব আন্দোলন যখন চলছিল তখন জার্মানীর রাজনীতির পর্যবেক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে জার্মান নাৎসীদের পুনরভ্যুত্থান ঘটবে। কেননা, নব্য নাৎসীরা পর্দার আড়ালেই অপেক্ষা করছে।

এই হতাশাবাদীদের ভবিষ্যদ্বাণীই কি সত্য হতে চলেছে?

*

মন্ত্রীদের দেহরক্ষা করার জন্য সশস্ত্র রক্ষী আছেন আর এম-পি-দের রক্ষা করার জন্য একটা কুকুরও নেই। বলেছেন লোকসভার সদস্য শ্রী ও এন বেরওয়া। অতএব তাঁর প্রার্থনা, প্রত্যেক এম-পিকে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অনুমতি দেওয়া হোক।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

মোরারজির ছিঁটে-ফোঁটা

গত ২৯ এপ্রিল লোকসভায় অর্থ বিল উত্থাপন করে শ্রীমোরারজী দেশাই তাঁর ১৯৬৮-৬৯ সালের বাজেটে (যার খসড়া তিনি গত ২৯ ফেব্রুয়ারী পেশ করেছিলেন) ছিঁটেফোঁটা কিছু সুবিধা দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সেগুলি নিতান্তই ছিঁটে-ফোঁটা। তাতে সাধারণ মানুষের তো বটেই ব্যবসায়ী মহলেরও প্রায় কিছুই লাভ হবে না। অর্থাৎ দেশাইয়ের এই দাক্ষিণ্যের আগেও অবস্থা যে-রকম ছিল পরেও সে-রকম থাকছে।

তিনি স্টীলের ফার্ণিচারের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা দিয়েছেন। যে সব কারখানায় কোন আর্থিক বছরে ৫০ হাজার টাকার বেশী ফার্ণিচার তৈরী হয় না, সেগুলির ক্ষেত্রে উৎপাদন শুল্ক সম্পূর্ণ মকুব করা হবে। আর যে সব কারখানার উৎপাদন দু লাখ টাকার বেশী নয় তাদের বেলাতেও প্রথম ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত শুল্ক মকুব করা হবে।

অনুরূপভাবে যে সব কনফেকশনারীতে ২০ টন বার্ষিক উৎপাদন হয়ে থাকে তাদের বেলায় সম্পূর্ণ এবং যেখানে উৎপাদন ৪০ টনের বেশী নয় সেখানে প্রথম কুড়ি টন পর্যন্ত উৎপাদন শুল্ক মকুব করা হবে।

এই দুটি সুবিধা দানের ফলে ছোট ছোট ইউনিটগুলির কিছুটা সুবিধা হবে বটে, কিন্তু এর ফলে পরোক্ষে ছোট, অর্থনৈতিক ইউনিট গঠনকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে কিনা সেটাও ভেবে দেখতে হবে।

নতুন পাঁচ শতাংশ সুদের পাঁচ-সালা ফিক্সড ডিপজিট পরিকল্পনাকে সম্পদ-করের আওতা থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেবার যে কথা শ্রীদেশাই ঘোষণা করেছেন সেটা খুব একটা বড় সুবিধে নয়। কারণ অন্যান্য ফিক্সড ডিপজিট ও পোস্ট অফিস সঞ্চয়ের মত এই পরিকল্পনাকে আগে বাদ দেওয়া হয় নি।

আসলে যে সুবিধা দিলে সাধারণ মানুষের উপকার হত সেই সুবিধা দিতে শ্রীদেশাই সরাসরি অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, ২৯ ফেব্রুয়ারীর বাজেটে ডাকমাশুল যেভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে তার কোনরকম হেরফের হবে না। শ্রীদেশাইর বক্তব্য : ডাক-তার বিভাগ থেকে রাজস্ব আদায় করা সরকারের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু ঐ বিভাগের খরচায় যাতে কোন টান না পড়ে সেটা তো দেখতে হবে। একথা কেউই অস্বীকার করবে না। কিন্তু একথাও শ্রীদেশাই ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করবেন না যে, ডাকমাশুল যেভাবে চড়ানো হয়েছে সেটা অত্যধিক এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে তা খুবই দুঃসহ। এক্ষেত্রে ডাকমাশুল কমানো খুবই বাঞ্ছনীয় ছিল, তার সুযোগও ছিল, এবং করলে মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হয়ে যেত না। বিশেষ করে ডাক-তার বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচের কোন সুযোগ নেই একথা যখন বলা যাচ্ছে না, তখন এই রকম পিটুনী-মাশুল ধার্য করাটা খুবই আপত্তিকর।

কাপড়ের দাম বাড়লো

বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং গত ১ মে ঘোষণা করেন যে, বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে শতকরা ৪০ ভাগ নিয়ন্ত্রিত বস্ত্র উৎপাদনের যে বাধ্যবাধকতা ছিল তা কমিয়ে শতকরা ২৫ ভাগ করা হয়েছে। সুপার ফাইন, ফাইন, উচ্চতর মাঝারি শ্রেণীর ধুতি-শাড়ী, লং ক্লথ, সার্টিং ও ড্রিল নিয়ন্ত্রণমুক্ত হবে।

মোটা এবং নিম্নতর মাঝারী শ্রেণীর ধুতি, শাড়ী, লং ক্লথ, সার্টিং ও ড্রিল প্রভৃতি সাধারণের ব্যবহার্য কাপড়গুলি আগের মতোই নিয়ন্ত্রিত থাকবে। তবে নিয়ন্ত্রিত কাপড়ের মিলের দর শতকরা দু ভাগ বাড়বে। অবশ্য কোরা ধুতি ও শাড়ীর দর বাড়বে না।

এই বৃদ্ধির বোঝা যাতে ক্রেতাদের ওপর না পড়ে সেজন্যে উৎপাদন শুল্কের কিছু হেরফের করা হয়েছে বলে শ্রীসিং জানান।

ভারত সরকারের এই সর্বশেষ কাপড় নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেস সংসদীয় দলের সভায় তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। শ্রীঅমৃত নাহাটা বলেন, সরকার কার্যত কল মালিকদের কাছে আংশিকভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন। তিনি বলেন, সরকারের উচিত ছিল মিল মালিকদের বাধ্য করা যাতে তারা তাদের অতিরিক্ত মুনাফার একাংশ শিল্পের আধুনিকীকরণের জন্যে ব্যয় করেন।

শ্রী এ জি কুলকার্ণী বলেন যে, বর্তমান কাপড়ের কলগুলির ২৫ শতাংশ জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। বস্ত্রশিল্পে যদি আজ সঙ্কট দেখা দিয়ে থাকে তার জন্যে মিল মালিকরাই দায়ী। তাঁর মতে অন্তত ১৫০টি ইউনিট বাতিল করে দেবার যোগ্য।

চল্লিশ শতাংশ নিয়ন্ত্রিত ও ৬০ শতাংশ অনিয়ন্ত্রিত রেখে সরকারের যে কাপড় নীতি এতদিন চালু ছিল তা গৃহীত হয়েছিল বছর দুই আগে। এই দু বছরের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত কাপড়ের দাম বেশ কয়েকবার বাড়াবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর বিনিয়ন্ত্রিত কাপড়ের ওপর মালিকরা যদিচ্ছা দাম আদায় করতে পারবেন। এর ফলে এমনিতেই সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের দুর্দশার শেষ ছিল না। তার ওপর এখন নিয়ন্ত্রিত কাপড়ের পরিমাণ সাড়ে ৩৭½ শতাংশ কমানোর ফলে গরীব ও নিম্ন-বিত্ত খদ্দেররা যে কি বিষম বিপাকে পড়বে তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

অভিযুক্ত কাহিনী—(২)

একদা

[ডেভিড হার্বার্ট লরেন্সের ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ইস্ট-উডে এক খনিশ্রমিকের ঘরে জন্ম হয়। প্রথম উপন্যাস 'হোয়াইট পীকক' (১৯১১)। লেডী চ্যাটার্লীর লাভার গ্রন্থটি নানাকারণে ভুবন বিখ্যাত। লরেন্স ভিক্টোরীয় যুগের শুচিবাগীশতার মূলে কুঠার-ঘাত করে সাধারণ মানুষের কথা অতি সাধারণের উপযোগী ভাষায় পরিবেশন করে এক আশ্চর্য দুঃসাহসিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে। এই কাহিনীটি লরেন্সের 'লাভ এমং দি হেস্ট্যাকস'-এর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩০-এ যক্ষারোগে দক্ষিণ ফ্রান্সে লরেন্সের মৃত্যু হয়।]

ডি এচ লরেন্স

সকালটা ভারী চমৎকার ছিল। নদীর ওপর শাদা শাদা কুয়াশার ছোপ ছড়ানো, যেন একটা বিরাট ট্রেন এই মাত্র চলে গিয়েছে, ফেলে গিয়েছে তার বাষ্পরাশি, উপত্যকার সারা অঙ্গে সেই বাষ্পের রেখা। পাহাড়গুলি অস্পষ্ট ধূসর-নীল, শিখরে যেখানে সূর্যালোক পড়েছে সেই জায়গায় সামান্য তুষার-রেখা চক্‌চক্ করছে। যেন অনেক দূর থেকে দাঁড়িয়ে আমাকে অবাক হয়ে লক্ষ্য করছে। প্রসারিত উন্মুক্ত জানালা দিয়ে সূর্যকিরণে আমি স্নান করছি—আমার দুপাশে যেন জল ঝরে পড়ছে, সেই আবছা প্রভাতে আমার মন উধাও হয়ে যায়, বেশ মধুর কিন্তু অনেক দূরের এবং স্তব্ধতায় মূর্ছিত তাই নিজের অঙ্গ মার্জনা করে শুকিয়ে নেওয়ার মত খেয়ালও যেন আমার নেই। তাই ড্রেসিং গাউনটা গায়ে দিয়েই আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়ি অলস ভঙ্গীতে। প্রত্যূষ থেকেই আকাশ এখনও বেশ সবুজ এবং স্তব্ধ হয়ে আছে—অনীতার কথা মনে এল। তার কথাই ভাবছিলাম।

যখন বালক ছিলাম সেইকালে তাকে ভালোবাসতাম। অভিজাত পরিবারের মেয়ে তবে তেমন গুণী নয়, তখন আমরা ছিলাম সাদাসিধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। আমি তখনও বেশ কাঁচা এবং মন ছিল এত ভীরু যে তার সঙ্গে ভালোবাসা করার কথা ভাবতে পারিনি। স্কুলের পড়া সাঙ্গ করেই মেয়েটা একজন সামরিক অফিসারকে বিয়ে করে বসল। লোকটি বেশ সুপুরুষ বলা চলে, অনেকটা কাইজারী ভঙ্গী, তবে একেবারে গর্দভের মত নির্বোধ। আর অনীতার বয়স মাত্র আঠারো। অনেক পরে, যখন শেষ পর্যন্ত আমাকে ওর প্রেমিক হিসাবে গ্রহণ করল তখন আমাকে এই বিষয়ে সব কথা খুলে বলেছিল।

সে বলেছিল—যে রাতে আমাদের বিয়ে হয়, সেই রাতটি আমি দেয়ালের গায়ে আঁকা ফুল গণনা করে কাটিয়েছি, এক সুতোয় কতগুলি গাঁথা তা দেখেছি। আমার কাছে এমনই বিরক্তিকর মনে হয়েছিল লোকটিকে।

ভালো পরিবারের ছেলে, সেনাবিভাগে বেশ নাম, কর্মীলোক। বুলডগের মতো ছিল ওর গোঁ, আর গ্রীক পুরাণের সেনটাওর মত ঘোড়ায় চড়তে পারত। দূরে থেকে এই সব গুণ বেশ লাগে, অনীতা বলল। দূরে থেকে চমৎকার মনে হলেও এই নিয়ে ঘর করা সহ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

কুড়ির ঘরে পড়ার আগেই ওর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, দু বছর পরে আর একটি। তারপর আর নয়। স্বামীটা একেবারে পশুর মতো ছিল। স্ত্রীকে অবহেলা করত, অবশ্য এই দুর্ব্যবহার তেমন প্রচণ্ড না হলেও, স্ত্রীকে সে একটা চমৎকার জন্তুর মতো মনে করত। তারপর শেষ পর্যন্ত চরম অবস্থায় দাঁড়াল, যখন ঋণ, জুয়াখেলা এবং অনাবিধ ব্যাপারে নিজের সর্বনাশ করে সরকারী অর্থ নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করে ধরা পড়ে লাঞ্ছিত হল।

আমি অনীতাকে লিখেছিলাম—'তোমার ভালে চুল পড়েছে।'

অনীতা জবাবে লিখেছিল—'একটি নয়, মাথার সব চুল।'

এরপর থেকে ওর প্রেমিকদল আসা-যাওয়া করতে লাগল। চমৎকার আকৃতি, কাঁচা বয়স, বার্লিনের মনোরম ফ্ল্যাটে বসে মালা জপ করে সময় কাটানোর মেয়ে ও নয়। ওর স্বামী ছিল রেজিমেন্টের অফিসার। অনীতাকে চমৎকার দেখতে ছিল বলে স্বামীদেবতা সগর্বে স্ত্রীরত্নটিকে সকলের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতেন। তার ওপর, বার্লিনে অনীতার নিজের আত্মীয়-স্বজন ছিল, অভিজাত এবং ধনী সম্প্রদায়, তারা একটু দ্রুতলয়ের সমাজের মানুষ। তাই অনীতা প্রেমিক গ্রহণ করতে সুরু করল।

অনীতার আকৃতিতে আভিজাত্যের সে সোজা হয়ে থাকে, মনোভংগী চ, আর তার ভ্রূকুটির মধ্যে সরসতা । গড়নে লম্বা এবং আঁট-সাঁট, বাদামী থ ভ্রূকুটিভরা, তার গায়ের রঙটা বেশ পভরা, কালো চুলের সংগে বাদামী ন চমৎকার মানিয়েছে।

অবশেষে সে আমাকেও একটু ভালো-তে সুরু করল। ওর মনটা নষ্ট নি—আমার ত' মনে হয় ওর মনটা র কুমারীর মত শুচিশুভ্র। মনে হয়, মত ভালোবাসা পায়নি বলে ওর জাজটা খিটখিটে। প্রকৃত সম্মান বলতে বোঝায় তা সে পায়নি। পুরুষের ছে ও খেলনার সামগ্রী। গত দশ দিন র টাইরোলে এসে আমার কাছে আছে। মি ওকে ভালোবাসি, নিজেকে নিয়ে মিই সন্তুষ্ট নই। হয়ত আমিও ওর গ্য হয়ে উঠতে পারব না।

আমি ওকে প্রশ্ন করি, তুমি কখনো উকে ভালোবাসোনি?

অনীতা বলল, ভালোবেসেছি, তবে কেটে রেখেছি। ওর রসিকতার মধ্যে ীণ হতাশা ছিল। আমি ওর দিকে ম্ভীরভাবে তাকাতে ও কাঁধ নাড়ল।

আমি শুয়ে শুয়ে ভাবি, আমিও কি অনীতার পকেটস্থ হব নাকি! ওর টাকার পার্স, সুগন্ধি দ্রব্যসম্ভার আর যে ছোট-টো মিঠাই ওর পছন্দ তা ওর সংগে কে, আমিও কি তাদের সংগে একাসনে াই পাব। অবশ্য সেও মন্দ হবে না, নোরম হবে বলা যায়। এক প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ-চেতনা আমার মনে বাসনা গোয় অনীতার কাছে ধরা দেওয়ার। পুরুক আমাকে ওর পকেটে। ভারী মজার হবে। আমি কিন্তু ওকে ভালোবাসি; তাই এটা কিন্তু ওর পক্ষে কল্যাণকর হবে না—আনন্দের অতিরিক্ত ওকে কিছু দিতে চেয়েছিলাম আমি।

সহসা আমার এই মনোবিলাসের মাঝে দরজা খুলে গেল। অনীতা আমার শোবার ঘরে এল। আমার মন থেকে হেসে উঠলাম, ওকে আদর করলাম। এমনিই স্বাভাবিক সারল্যেভরা অনীতা যে ভালো লাগে। ওর কাঁধ থেকে একটা স্বচ্ছ কাপড়ের সেমিজ ঝুলছে। পায়ে উঁচু বুট, তার একটার ওপর মোজাটা আধখানা গড়িয়ে পড়েছে। মাথায় ওর একটা বিরাট টুপি। কালো রঙ, ধারে সাদা পাড়, আর তার ওপর ঘি রঙের পালক ঢাকা—যেন বাদামী ফেনার মত হালকা হাওয়ায় আন্দোলিত। ওর লজ্জাহীনতার ওপর এই বিরাট টুপী আর ঐ বিশাল ধূসর কোমল পালকটি যেন গড়িয়ে পড়ছে। ওর যখন মাথাটা দোলালো তখন হ্যাটটা পড়ে গেল।

ও আমার দিকে তাকালো, তারপর আয়নার দিকে এগিয়ে গেল।

প্রশ্ন করল, আমার এই হ্যাটটা কেমন লাগছে তোমার!

আয়নার দিকে তাকিয়ে ও এখন শুধু এই হ্যাটটি নিয়েই সচেতন—পালক

ঢেউ-এ আন্দোলিত। ওর নগ্ন কাঁধ চকচক করছে, আর ঐ সূক্ষ্ম সেমিজের তলা থেকে ওর উত্তাপময় সমগ্র দেহবিভঙ্গ আমি দেখতে পাচ্ছি। বুক আর বাহুমূলে সোনালি ছায়া প্রতিবিম্বিত। আর যে হাতটি ওঠানো সেখানে আলো রূপালি, আর হ্যাট ঠিক করার সময় সোনালি ছায়া নড়ে যায়।

সে আবার প্রশ্ন করে, হ্যাটটা কেমন?

এরপরও যখন আমি জবাব দিই না তখন ও ঘুরে আমার দিকে তাকায়। আমি তখনও বিছানায় পড়ে। ও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে যে আমি ওর হ্যাটের দিকে না তাকিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছি। তাছাড়া ওর চোখে আঁধার, ও ভ্রূকুটি দেখা যায়। তবে তখনই মেঘ কেটে যায়, ও মৃদু কঠোর ভঙ্গীতে প্রশ্ন করে,

—কি হ্যাটটা পছন্দ নয়?

আমি এবার জবাবে বলি, চমৎকার! কোথা থেকে এলো?

ও উত্তর দেয়, বার্লিন থেকে কাল সন্ধ্যায়—বা আজ সকালে এসেছে।

আমি সাহস করে বলি, একটু বিরাট নয় কি?

ও একটু সোজা হয়ে ওঠে তারপর আয়নার দিকে সরে গিয়ে বলে, মোটেই না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ড্রেসিং গাউনটা ছাড়লাম, মাথায় একটা সিল্কের হ্যাট চড়ালাম, একেবারে ঠিক-ঠিক করে তারপর সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় (মাথায় শুধু হ্যাট ও হাতে দস্তানা ছিল) ওর দিকে এগিয়ে গেলাম—

প্রশ্ন করলাম, আমার হ্যাটটা কেমন?

ও আমার দিকে একটু তাকিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল! তারপর ওর হ্যাটটা চেয়ারে নামিয়ে রেখে, হাসিতে আকুল হয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে মাথাটা তুলে কালো চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকায় আর বালিশে মুখ গোঁজে। আমি শুধু হ্যাটটা মাথায় দিয়ে ওর সামনে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকি। ও আবার উঁকি মেরে দেখে।

সে চীৎকার করে এবার বলে, তুমি ভারী মজার! সত্যি তুমি ভারী চমৎকার।

বেশ মর্যাদামণ্ডিত ভঙ্গীতে আমি হ্যাটটি খুলে ফেলার উদ্যোগ করতে করতে বলি,

তাহলেও আমার ত ওরকম হাই-লেশ দেওয়া বুট জুতা আর একটা মোজা নেই।

ও কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমার মাথায় হ্যাটটি চেপে রেখে দিয়ে, চুমায় চুমায় আকুল করে দেয়।

সে অনুনয় করে বলে, লক্ষ্মীটি, টুপিটা খুলো না, ওর জন্যই আরো বেশী করে তোমাকে ভালোবাসি।

আমি তাই গাম্ভীর্য মুখে কুণ্ঠাহীন ভঙ্গীতে বিছানায় বসে পড়ি, তারপর আহতভঙ্গীতে প্রশ্ন করি,

কিন্তু আমার হ্যাটটা কি তোমার ভালো লাগেনি? গেল মাসে লণ্ডনে ওটা কেনা।

ও আমার মুখের দিকে ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে তাকিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

সে বলে ওঠে, ভেবে দেখ সব ইংরাজ যদি ঐভাবে পিকাডিলিতে ঘুরে বেড়ায়।

কথাটা আমার বেশ লাগে। মজার কথা।

পরিশেষে আমি ওকে বলি যে, ওর হ্যাটটি অতি চমৎকার এবং এই কথা বলে, সিলকের টুপিটা খুলে আবার ড্রেসিং গাউনটা পরে নিই।

ও কিন্তু তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলে, কি ঢাকার চেষ্টা করছ, জানো কিছু না পরে শুধু হ্যাটটা মাথায় দিয়ে তোমাকে কী সুন্দর যে দেখাচ্ছিল।

আমি বললাম, সেই পুরাতন আপেল আমার হজম হয় না—

ও কিন্তু সেই উঁচু বুট আর সেমিজেই ভারী খুসি। আমি ওর সুন্দর চরণযুগলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকি।

আমি প্রশ্ন করি, আরও কতজন পুরুষের সঙ্গে এমন কাণ্ডটি করেছ বলো ত?

কি আবার করেছি? ও প্রশ্ন করে।

এইরকম কুয়াশা মাখানো পোষাক পরে তাদের শয়নকক্ষে অনুপ্রবেশ করে মাথার টুপী নিরীক্ষণ করেছ?

ও আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে চুমো খায় তারপর বলে,

না গো তেমন বেশী নয়। মনে হয়, আগে আমি তেমন সড়গড় হইনি।

আমি বললাম, হয়ত ভুলে গেছ! যাকগে তাতে কিছু এসে যায় না। হয়ত আমার কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ তিক্ততা ছিল, সেই তিক্ততা ওকে স্পর্শ করে। ও তৎক্ষণাৎ ঘৃণাভরে বলে ওঠে, তোমার কি ধারণা আমি তোমার তোষামোদ করছি, আমি কি বলতে চাইছি যে তুমিই সেই প্রথম জন যাকে—যাকে—

আমি জবাবে বলি, জানি না। তোমাকে বা আমাকে দুজনের কাউকেই সহজে ভোলানো যাবে না।

আমার মুখের দিকে ও অদ্ভুত এবং ধীরভাবে তাকায়।

আমি বললাম, আমি বেশ জানি যে আমিও টিকে, কতদিন যে টিকে থাকব, আমিই তা জানি না। ওদের অনেকের চাইতেও আমার মেয়াদ কম।

সে ব্যঙ্গ করে, নিজের অদৃষ্টে তোমার দুঃখ হচ্ছে, নয়?

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কাঁধ নাড়ি। ও আমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে, কিন্তু আমি ওর কাছে ধরা দিইনি।

আমি বললাম, আমি কিন্তু সুইসাইড করবো না।

আমার বিছানার ওপর সেঁটে নিয়ে ও বলে উঠল, তুমি আমার চিরদিনের। আমি ওকে ভালোবাসলাম। বেঁচে থাকার আনন্দ মাধুরীর মধ্যে ভেসে বেড়াবার মানে ওর ছিল।

আমি বললাম, যদিও তোমার বয়স মাত্র একত্রিশ, তবু তোমার জীবনে অসংখ্য পুরুষ। তোমার অতীতের লীলা-গুলির কথা মনে করো।

অনীতা বলল, সংখ্যায় তেমন বেশী নয়, মাত্র কয়েকজন—আর তুমি ত' একত্রিশের ওপর জোর দিচ্ছ—

আমি বললাম, কিন্তু ওদের কথা যখন ভাবো তখন কি মনে হয়? ওর চোখ দ্রুত কুঞ্চিত হয়, চোখে একটা ছায়া, মুখে একটু ধাঁধাগ্রস্তের ভাব ফুটে উঠেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলে, সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু ভালো ছিল। জানো, মানুষ কিন্তু ভীষণ ভালো।

আমি ঠাট্টা করে বলি, তবু যদি পকেট এডিশন না হত!

ও হাসল, তারপর সেমিজের সিলকের জোড়টা বেদনাভরা মুখে খুলতে থাকে। ওর কাঁধ দুটি যেন পুরনো হাতির দাঁতের মত জ্বল জ্বল করে—বাহুমূলে একটা ক্ষীণ বাদামী ছাপ।

আমার চোখের দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে মাথাটি তুলে ও বলে, না, আমার লজ্জার কিছুই নেই, তার মানে—আমার লজ্জা করার কিছু নেই।

আমি বললাম, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। এবং আমার বিশ্বাস যে তুমি এমন কিছু করোনি যা আমার পক্ষেও হজম করা কঠিন। কি, করেছ নাকি?

আমার প্রশ্নটা অভিযোগের মত শোনালো। ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁধ নাড়ল।

আমি বলি, আমি বিশ্বাস করি, তুমি তা করোনি। তোমার সব লীলাখেলাই পরিচ্ছন্ন। তোমার চেয়ে পুরুষের কাছেই তার অর্থ গভীরতর।

ওর বুকের ছায়া, সেই চমৎকার দুটি গোলক, পাতলা ওড়নার ভেতর থেকে বেশ উত্তপ্ত দেখাচ্ছিল। কি যেন ভাবছিল অনীতা।

সে বলে উঠল—একটা কাণ্ড করে-ছিলাম, তোমাকে বলব?

আমি বললাম, ইচ্ছে হয় ত' বলো। তবে তার আগে তোমার গায়ের একটা ঢাকা এনে দিই। এই বলে আমি ওর কাঁধে চুমা দিলাম। সেই চুম্বনেও যেন হাতির দাঁতের মনোরম শীতলতা।

সে জবাবে বলল, না, আচ্ছা, নিয়েই এসো।

আমি ওকে চীনা কালো সিলকের একটা আলখাল্লা এনে দিলাম, তার গায়ে ড্রাগনের ছবি আঁকা। আগুনের শিখার মত জ্বলন্ত হয়ে আছে আঁকাবাঁকা ড্রাগন।

কাপড়ের ওপর থেকেই ওর স্তনের অর্ধেকটায় চুমা খেয়ে বলি,

এই কালো সিলকের ভেতর থেকে তোমাকে কত ফর্সা দেখাচ্ছে।

আমাকে হুকুম করা হল, চুপটি করে শুয়ে থাকো।

বিছানার মাঝখানটায় ও বসল, আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি। আমার ড্রেসিং গাউনের কালো সিলকের টাসেলটা ও

লে নিয়ে যেন একটা ডেইজী-
টছে এমনভাবে চটকায়।
য জার্মান ভাষায় বললাম, এইবার
শুরু হোক!
হেসে ফরাসী ভাষায় বলে ওঠে,
লজ্জা করে, তবে তুমি আমার
বিচার কোরো না—
ম বলি, একটা সিগারেট নাও।
কটি মুহূর্তে ধরে ও বেশ সতৃষ্ণ
সিগারেটে টান দিল, তারপর
তোমাকে কিন্তু মন দিয়ে শুনতে

যাও।
মি তখন ড্রেসডেন একটা চমৎকার
থাকি। আমার বেশ ভালো লাগে।
জিয়ে হুকুম জানাই, দিনে তিনবার
রি, আধা মহিয়সী আর আধা
। কথাটি উচ্চারণ করলাম বলে রাগ
না—আমার মুখের দিকে তাকাও।
দূরে একটা গ্যারিসনে লোকটি কাজ
সম্ভব হলে, মানে পারলে হয়ত
বিয়ে করতাম—
র সেই মনোহর বাদামী কাঁধ নাড়ে,
একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলে—
নোদিন পরে কিন্তু বিরক্তি এল।
সব সময়েই একা। দোকানে উঁকি
একা-একা, অপেরায় যাই একা।
পশুমার্কা পুরুষগুলো তাদের
র আড়াল দিয়ে আমার দিকে উঁকি-
মারে! পরিশেষে, লোকটার ওপর
রাগ হল, তবে আসতে না পারার
ধটা কিন্তু তার নয়।
সগারেটে আর একটা টান দেওয়ার
ও সামান্য হেসে বলে,
তুর্থ দিনে আমি নীচে নেমে এলাম—
ক ভয়ংকর ভালো দেখাচ্ছিল। মনে
একটু দম্ভও জেগেছিল। আমার
অতি ম্লান রঙের ব্লাউজ আর পরনে
উপযুক্ত স্কার্ট। আর পোষাকটি
শায় মানানসই ছিল।
একটু থেমে ও আবার বলে ওঠে,
আমার মাথায় প্রকাণ্ড একটা কালো
তাতে সাদা পালক খচিত। একজন
র প্রায় ঘাড়ে এসে পড়াতে আমি
য়ে উঠেছিলাম। দেখলাম একজন
অফিসর।
পরিপূর্ণ জীবন যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে
ছ। চমৎকার প্রাণী। উচ্চাঙ্গের জার্মান
জাত। তেমন বেশী লম্বা নয়, গায়ে
নীল ইউনিফর্ম, আর জীবন যেন
দীপ্ত মূর্তিতে উপস্থিত। আমার গা
একটা বিদ্যুততরঙ্গ প্রবাহিত হল।
চোখের দিকে তাকাতে আমার দেহে
ন ধরে গেল। ওর চোখও আমার
র্কে সচেতন হয়ে প্রজ্জ্বলিত। আর
দুটি ওর ঘন-নীল ইউনিফর্মের
খাপ খাওয়ানো। আমার দিকে
য়ে ভদ্রলোক মাথা নত করে অভি-
করলেন—এই জাতীয় অভিবাদন
লোকের কাছে সুড়সুড়ির মতো।
নমস্কার ফ্রয়েলাইন, মাপ করবেন!
আমি মাথা সামান্য নত করলাম।

দুজনে দুজনের গতিপথে চলে গেলাম। মনে হল যেন একটা যান্ত্রিক গতিতে আমরা বিচ্ছিন্ন হলাম, স্বেচ্ছায় নয়।

আমি সেদিন বড়ো অশান্ত হয়ে উঠলাম। কিছুতেই আর ঠিক থাকতে পারি না। কি যেন আমার ধমনীতে সঞ্চরনশীল। আমি ব্রুলার টেরাসে বসলাম। তারপর চা পান করছি, যান্ত্রিক শোভাযাত্রার মত মানুষজন আসা-যাওয়া করছে দেখছি, আর চওড়া নদীটা পটভূমিতে শান্ত হয়ে পড়ে আছে। এমন সময় ও এসে আমার সামনে দাঁড়াল। অভিবাদন জানিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিল। অর্ধেকটা লজ্জা-লজ্জা-ভাব আর বাকীটা যা থাকে কপালে গোছ মনোভংগী। আমি যান্ত্রিক গতিতে চলমান মানুষের দিকে যতটা বিস্ময়বোধ কর-ছিলাম, ওর দিকে তাকিয়ে তেমন বিস্ময় আমার মনে জাগেনি। আমি বেশ বুঝলাম, ও আমাকে একটি বাজে মেয়ে ঠাউরেছে।

চিন্তাকুল দৃষ্টিতে ও ঘরের চারপাশ দেখে নিল। ওর কালো চোখে অতীত যেন ভেসে এল।

অনীতা বলে, খেলাটায় মজা লাগল। আমি সামান্য উত্তেজনাবোধ করলাম। লোকটি জানালো যে আজ রাত্রে একটা রাজসভায় বলনৃত্যে ওকে যেতে হবে, এবং তারপর—

ও একটু কামনাভরে অনুনয়ের ভংগীতে বলল,

তারপর, মানে তারপর— ?

আমি পুনরাবৃত্তি করি, আর তারপর?

ছেলেটি প্রশ্ন করে, আমি কি?

আমি তখন ওকে আমার ঘরের নাম্বার বলে দিলাম।

হোটেলেই ঘোরাফেরায় কাটিয়ে ডিনারের পোষাক পরে নিলাম। আমার পাশে যিনি বসে ছিলেন তাঁর সঙ্গে একটু বকবক করলাম। কিন্তু ছেলেটি আসার সময় এখনও দু-এক ঘন্টা পরে। আমি আমার রুপোর জিনিষপত্র, ব্রাশ প্রভৃতি সাজিয়ে রাখলাম। এক বিরাট গুচ্ছভরা লিলি অব দি ভ্যালি ফুলের অর্ডার দিলাম। সেগুলি কালো ফুলদানিতে রাখলাম। অতি সূক্ষ্ম গোলাপী সিলকের পরদা ছিল, কার্পেটের রঙটা ছিল শীতল—প্রায় সাদা। পারস্যদেশের কার্পেট। আমার তাই মনে হয়েছিল। আমি জানতাম এই আমার ভালো লাগে। যেন সারা ঘরখানি আমার মতই প্রতীক্ষায় আকুল।

প্রতীক্ষার শেষের আধঘন্টা ভারী মজার। আমার কোনো অনুভূতি নেই, চেতনা নেই। অন্ধকারে শুয়ে আছি, আর একটু আরামের জন্য গায়ে জড়িয়ে আছি ক্রেম ডি সিনের ম্লান নীল গাউনটা। সহসা দোরে মৃদু করাঘাত শোনা গেল। আমি নিশ্বাস চেপে থাকি। ও অতি দ্রুত ঘরে এসে ঢুকল, দরজাটা বন্ধ করে দিল, তারপর সবকটা আলো জেলে দিল। ঘরের মধ্যে ও দাঁড়িয়ে। সবকিছুর কেন্দ্র-বিন্দু। ওর হালকা বাদামী চুলের ওপর আলোর রেখা প্রতিফলিত। ওর পোষাকের ভিতর কি একটা রয়েছে। এবার ও আমার দিকে এগিয়ে এসে পোষাকের ভেতর থেকে একরাশ লাল আর গোলাপী গোলাপ ছুঁড়ে দিল। কী যে চমৎকার। দু-একটা গায়ে লাগল, বেশ ঠান্ডা। ও জামাটা খুলে

ফেলল। নীল ইউনিফর্মে ওর আকৃতিটা বড় মনোহর হচ্ছিল। ওঃ তারপর ও আমাকে ধরে বিছানায় নিয়ে গেল—গোলাপ-টোলাপ সবসুদ্ধ, তারপর চুমোয় চুমোয় আমার সারা অংগ ভরে দিল—কিভাবে যে চুমা খেয়েছিল!

ভেবে নেওয়ার জন্য একটু থামে অনীতা।

—আমার পাতলা গাউনে ওর মুখের স্পর্শ অনুভব করি, তারপর ও গভীরতর হয়ে ওঠে। ও আমার জামা-কাপড় খুলে দেয়, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমাকে একটু দূরে রেখে বিস্ময়ে হাঁ করে থাকে। তবু ওকে যা দেখতে, স্বয়ং ঈশ্বরেরও ঈর্ষা হবে। বিস্ময়, ভালোলাগা আর গর্বে তার মুখ উজ্জ্বল। ওর এই পূজার্চনা আমার ভালো লাগল। তারপর ও আমাকে আবার বিছানায় শুইয়ে দিল, ধীরে ধীরে আমার পায়ে ঢাকা দিয়ে দিল, আর গোলাপগুলি আমার দুপাশে রাখল। আমার মাথার ওপর একগুচ্ছ। কিছু বালিশে।

দ্বিধা ও লজ্জাহীন ভঙ্গীতে কোনো রকম সচেতনতার পরিচয় না দিয়ে ওর পোষাক খুলে ফেলল। —আহা! কি যে চমৎকার দেহ— কি কাঁচা বয়স! সারা অংগ যেন আমার প্রতি ভালোবাসায় উন্মুখর হয়ে আছে। কি উচ্চাংগের দেহ।

আমার দিকে একটু সবিনয়ে ও তাকিয়ে থাকে। আমি ওর দিকে আমার বাহু প্রসারিত করে দিই।

সেদিন সারা রাত ধরে আমাদের পরস্পরের প্রেমলীলা চলল। ও যখন উঠে বসে তখন ওর গায়ে দলিত মথিত গোলাপের পাপড়ি, প্রায় রক্তের মত রাঙা। ছেলেটি ভয়ংকর, আবার সেই সংগে মধুর!

অনীতার ঠোঁট সামান্য কাঁপছে। সে থমকে থামে। তারপর অতি ধীরে ধীরে বলে,

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, দেখি ও চলে গেছে। সোনালি মুকুট আঁকা রাজ-দরবারের নৃত্যের সেই কার্ডে কয়েকটি কথা লিখে আমার টেবলে রেখে গেছে। অনুরোধ করেছে ব্রুলার টেরেসে সন্ধ্যায় দেখা করতে। কিন্তু আমি সকালের ট্রেন ধরে বার্লিনে চলে এলাম—

আমরা দুজনে চুপ করে আছি। সকালের নদী অনেক দূরে গড়িয়ে চলেছে।

আমিই প্রশ্ন করলাম, তারপর—?

—তারপর ওকে আর কখনও দেখিনি।

আবার আমরা চুপচাপ। ওর চমৎকার হাঁটুতে দুটি হাত জড়িয়ে এবং তার মুখ দিয়ে সেই হাঁটু দুটিকে আদর করে; অতিশয় প্রেমভরা আদর। আর ওর গায়ের সেই উজ্জ্বল সবুজ রঙের ড্রাগনটা যেন আমাকে ভেঙচাচ্ছে।

অনেক পরে প্রশ্ন করি, তোমার দুঃখ হচ্ছে না!

আমার কথায় কান না দিয়েই সে বলে, না। আমার শুধু মনে আছে কিভাবে ওর গা থেকে পোষাকগুলি খুলে অন্য বিছানায় একে একে ফেলছিল।

অনীতার ওপর রাগে আমার অংগ জ্বলে যাচ্ছিল। একটা লোক কিভাবে প্যান্টের বেলট খুলেছে এই ভেবেই সে তাকে এমন ভালোবাসবে কেন?

অনীতা বলল, ওর সংগে সব কিছুই কেমন অবশ্যম্ভাবী মনে হয়েছিল।

আমি বুক ঠুকে বলি, এমন কি পরে আর তোমার দেখা না করাটাও—?

সে শান্ত গলায় বলল, হাঁ।

তখনও সেইভাবে মনের আনন্দে নিজের হাঁটুতে হাত বুলিয়ে আদর করছে অনীতা।

সে বলল, যেন ও আমাকে বলেছিল যে আমরা যেন একটি বাদামের দুটি অর্ধাংশ—

তারপর মৃদু হেসে বলে উঠল, এমন সব মজার কথা বলেছিল। 'আজ রাতে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর' তারপর বলে-ছিল 'তোমার যে কোন অংশ স্পর্শ করি তাতেই যেন আমার আনন্দ শিহরণ জাগে'—আর বলেছিল আমার গাত্র-চর্মের ভেলভেট স্পর্শকে কোনোদিন ভুলবে না। কত কি যে মজার কথা সব বলেছিল আমাকে—।

অনীতা করুণভাবে এসব কথা তার মনের গহ্বরে জমা রাখে। আর আমি রাগে আগুন হয়ে আমার আঙুল কামড়াই।

—আমি ওর মাথায় চুলে গোলাপ গুঁজে দিয়েছিলাম। যখন সাজাচ্ছিলাম তখন কেমন চুপটি করে বসেছিল, বেশ লজ্জা-লজ্জা মুখ করে। ওর দেহটা প্রায় তোমার মতই ছিল—।

এই সাধুবাদ আমার চূড়ান্ত অপমান।

আর জানো, ওর একটা প্রকাণ্ড সোনার চেন ছিল, তাতে সব ছোট ছোট মণি-মুক্তা বসানো। সেইটা আমার হাঁটুতে জড়িয়ে পাক দিয়ে আমাকে বন্দীর মত বাঁধতো, কিছু না ভেবে-চিন্তেই হয়তো করেছিল।

আমি বললাম, তোমার বাসনা সে যদি তোমাকে বন্দী করেই রাখত ত' বেশ হত।

সে জবাব দেয়, তা নয়, ও তা করতে পারত না।

আমি বললাম, ওঃ তুমি তাকে আমাদের সবায়ের কাছে যে আনন্দ পাও তার একটা মাপকাঠি হিসাবে মনের মণি-কোঠোয় সাজিয়ে রেখেছ।

বেশ ঠান্ডা গলায় অনীতা বলল, হাঁ।

এরপর আমি যাতে ক্ষেপে যাই সেই চেষ্টা তার ছিল।

আমি বললাম, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম তোমার এই সব অভিযানের জন্য তুমি লজ্জিত।

সে বেশ বিকারগ্রস্তের মত বলল, না, মোটেই নয়।

আমাকে ও ক্লান্ত করে দিল। কেউ কখনো তাকে নিয়ে দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়াতে পারে না। সর্বদাই অনিশ্চয়তার পিছনে পড়তে হচ্ছে। আমি [illegible] সূর্যালোকের দিকে তাকিয়ে নীরবে রইলাম।

অনীতা প্রশ্ন করে, কি ভাবছ?

আমরা যখন কফি খেতে নীচে [illegible] তখন ওয়েটারটা হাসবে।

না বলো, আমাকে বলতেই হবে।

এখন প্রায় সাড়ে নটা।

ও তার জামার বাঁধনে আঙুলে [illegible] নেয়, তারপর অতি মৃদু গলায় বলে,

বলো না, কী ভাবছ!

ভাবছি, যা কিছু তুমি চাও, পাও।

কী ভাবে?

ভালোবাসায়।

কি আমি চাই? কি আমার কাম্য? উত্তেজনা!

তাই কি! আমি কি তাই চাই?

হ্যাঁ। ঠিক তাই।

মাথাটি নামিয়ে চুপ করে বসে অনীতা।

আমি বললাম, নাও একটা সিগ[illegible] নাও। আজ কি সেইখানে যাবে ন[illegible] বরফে নৃত্য করতে?

সে বেশ শান্ত গলায় প্রশ্ন ক[illegible] তুমি কি বললে—আমি উত্তেজনা চাই?

—পুরুষের কাছ থেকে এই এ[illegible] বস্তুই তুমি নিতে চাও। কি সিগা[illegible] চাই না?

—না, ধন্যবাদ। আমি আর কি চাই[illegible] কি চাইতে পারি?

আমি কাঁধ নাড়লাম। বললাম, [illegible] হয়, আর কিছুই নয়।

ও তখনও বেদনাহত ভঙ্গী[illegible] সেমিজের গা থেকে দড়ির ফাঁস খুলছে।

আমি বললাম, আজ পর্যন্ত তু[illegible] কিছুই হারাও নি, ভালোবাসায় কো[illegible] কিছুর অভাব অনুভব করোনি।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল [illegible] তারপর গম্ভীর গলায় বললো,

না, না, সেই অনুভূতিও ঘটেছে।

ওর মুখে এই কথা শুনে আমা[illegible] রক্ত জল হয়ে গেল।

ইন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক সংক্ষেপি[illegible] ও অনূদিত।

সাহিত্যে অশ্লীলতা একটি বড় সমস্যা[illegible] সারা পৃথিবীতেই এখন সে বিষয়ে আলো[illegible]চনা চলছে। কিন্তু সে আলোচনায় যো[illegible] দিতে হলে জানা দরকার, বিশ্ব সাহি[illegible] এখন কোন্ পথে। অশ্লীলতার অভিযো[illegible] যে গল্পগুলি সারা পৃথিবীতে পরিচি[illegible] সেগুলির এবং অনুরূপ কয়েকটি গল্প[illegible] উপন্যাসের সংক্ষেপিত কাহিনী এই বিভা[illegible] প্রকাশ করা হবে প্রতি সপ্তাহে। পাঠকগ[illegible] অশ্লীলতার বিষয়ে নিজেদের ধারণার সং[illegible] এই কাহিনীগুলি মিলিয়ে দেখতে পারে[illegible]

ভারত-জাপান মহিলা পর্বতারোহী দল ছাম্ব অভিযানের উদ্দেশ্যে মালপত্র নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন।

অঙ্গনা

প্রমীলা

সমস্যার আলো আঁধারি

সমস্যার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে অবস্থার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন না।

নানা কথার ভিড়ে এখানে এসে একটু খটকা লাগে। আগ্রহে নাড়াচাড়া খেয়ে সিধে হয়ে বসি। এক ঝলক মনের ভিতরটা ভাল করে হাতড়ে নিই। মনে মনে ভাবি, সব সমস্যাই তো আজ সূচীমুখ। তাই একটা ছেড়ে আর একটার গুরুত্ব অনুধাবন করা ক্রমেই সহজ হয়ে আসছে। বরং কুফল এই যে, সব সমস্যাকেই আমরা একইরকম গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে শিখছি।

পুরনো কথার খেই ধরে আবার তিনি বললেন, সমস্যা সমাধানে আমাদের অতিরিক্ত তৎপরতাই সমস্যার গুরুত্ব কমিয়ে দিচ্ছে। ছাড়া একজন আর একজনের সমস্যা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে রাজি নয়। তিনি নিজেরটাকেই সবচেয়ে জরুরী মনে করেন। এটা অবশ্য তাঁর পক্ষে দোষের কিছু নয়। এরকমভাবে দেখা যায় যে, কোন সমস্যাই যথার্থ গুরুত্ব পাচ্ছে না।

সত্যি গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং যথেষ্ট ভাববারও বটে। আমরা নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত। কাজের চাপে নয়, সমস্যার চাপেই আমাদের পিঠ নুয়ে পড়ার উপক্রম। গঠনমূলক দেশের পক্ষে সমস্যা নতুন কিছু নয়। দেশ এবং জাতি গঠন করতে গিয়ে সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে সবাইকে। কিন্তু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এবং উত্তরণই জাতির ক্রম অগ্রগতির পরিচয় দেবে। সে-রকম পরিচয় যে আমাদের একেবারে নেই, এমন নয়। সে পরিচয়ে আমরা মোটামুটি আত্মসন্তোষ অনুভব করতে পারি। তবুও মনে হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে এতো হাজারো সমস্যা চারদিক আমাদের ঘিরে ধরছে যে, বাঁচার বুঝি কোন পথই নেই। শুনেছিলাম সপ্তরথী অন্যায় যুদ্ধে বালক অভিমন্যুকে হত্যা করেছিল। আমাদের অবস্থাটা তার চেয়ে খুব প্রীতিপদ নয় নিশ্চয়ই। সমস্যাকে আমরা অন্যায় রথী মনে পারি না।

তিনি একটু থেমে আবার বলতে করলেন, মেয়েদের কথা দিয়েই শুরু না কেন। আমাদের কত আশা ছিল স্বাধীনতার পর সব সাধ পূরণ হবে। তার কটা পূরণ হয়েছে? অবশ্য ব্যক্তিগত সাধ-আকাঙ্ক্ষার কথা বলা

এবার একটু অবাক হবার ভাববার চেষ্টা করি মেয়েদের অভাব যোগের তালিকা। প্রথমেই মনে পড়ে সার্বজনীন ভোটাধিকারের কথা। ভারতে মেয়েরা কোনমতেই উপেক্ষি পুরুষের সমান অধিকার তাদের। পৃথিবীর অন্যতম সম্পদশালী দুটি আমেরিকা ও ব্রিটেনের মেয়েরা সংগ্রামের পর এই অধিকার অর্জন আমাদের দেশের মেয়েদের সে-পথ

হয় নি। অবশ্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁরা বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেজন্য তাঁদের এই অধিকারের পথ সহজ হয়েছে। আমাদের সংবিধান নারী-পুরুষে কোন ভেদাভেদ রাখেনি একথা ভাবলে সত্যি আনন্দে বুক ভরে ওঠে। এতবড় স্বীকৃতি যেখানে মিলেছে সেখানে সব সমস্যারই সমাধান হবে এরকম আশা রাখা প্রত্যেকের উচিত।

আমাকে চিন্তিত দেখে তিনি এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। বোধ হয় আমাকে একটু ভাববার অবসর দিচ্ছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন, মেয়েদের ভোটাধিকার বা সমান অধিকার নিশ্চয়ই মস্ত বড় লাভ। কিন্তু শুধু একটিমাত্র পাওনায় তো আর সব পাওনার দাবী বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। বরং এই পাওনার ভিত্তিতে অন্যান্য সবকিছুর জন্য আমাদের দাবী জোরদার হবে।

কথাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং বিবেচনাপ্রসূত বলে মনে হলো। সত্যিই তো একটি দাবী পূরণ আমাদের অন্যান্য দাবীর কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। কিন্তু মেয়েদের নানা দাবী পূরণের জন্য সরকারী প্রশাসন সব সময়েই সজাগ। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে নানা ক্ষেত্রে মেয়েরা যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরিচয় রেখেছেন তাতে নিশ্চয়ই আমাদের সকলের সহযোগী মনোভাব পরিস্ফুট। এরপর মেয়েদের আর কি কি অভিযোগ থাকতে পারে তাই ভাবতে লাগলাম। আকাশ-পাতাল অনেক কিছু ভাবছি, কিন্তু সমস্যার কোন হদিশ করতে পারলাম না।

আমাকে সমস্যাক্লিষ্ট দেখে তিনি একটু হেসে বললেন, আমাদের সমস্যা খুঁজে পাচ্ছেন না। এই তো আমাকেই দেখুন না, আমাকে। লেডি রাবোর্ণ ডিপ্লোমা পাশ করে বসে আছি তিন বছর। কিন্তু চাকরি-বাকরি আজো হলো না। উচ্চশিক্ষার কোন উপায় ছিল না। তাই একটি শিল্পাশ্রমে সূচীশিল্পের এই ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হই এবং যথারীতি পাশও করি। তারপর যে শূন্যতা সেই শূন্যতা।

তাঁর কথায় চেতনা প্রায় ফিরে পেয়েছিলাম। আর একটু হলেই বলে ফেলতে যাচ্ছিলাম, দেশের আনাচে-কানাচে কত শিল্পাশ্রম গড়ে উঠেছে। সেখানে কত মেয়ে তাদের জীবিকার পথ খুঁজে পেয়েছে, খেয়ে পরে আরো সুদিনের অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া এসব শিল্পাশ্রমের মাধ্যমে দেশের শিল্পকাজ বাইরে পাঠিয়ে কিছু বৈদেশিক মুদ্রাও আসছে। কিন্তু বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। এই তো আমার সামনে বসে আছেন এমনি একজন। ডিপ্লোমা পাওয়ার তিন বছর পরেও বেকার জীবন যাপন করেছেন। হয়তো এ'র উপরে নির্ভর করে আছে পরিবারের আরো কয়েকজন। কিন্তু সেদিক থেকে ইনি কোন সাহায্যই করতে পারছেন না।

তিনি কিন্তু থেমে থাকলেন না। বললেন, অবশ্য বলতে পারেন মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত হয়েছে। স্কুল,

পশ্চিম জার্মানীর সব চেয়ে বুদ্ধিমতী মহিলা

মেয়েটির বয়স ২০ বছর, নাম এর্ভালিন জ্যাকোবি। মেয়েটি একটি ওষুধের দোকানে সহকারিণীর কাজ করে। মেনৎস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ হারবার্ট স্টেইনারের সহযোগিতায় পশ্চিম জার্মাণীর একটি বিশিষ্ট মহিলা পত্রিকা ছয় মাস ধরে যে পরীক্ষা চালান তাতেই এই মেয়েটি এই গৌরবের অধিকারিণী হন।

কলেজ অনেক গড়ে উঠেছে এবং আশা করা যায়, আরো গড়ে উঠবে। কিন্তু নৈরাশ্য এখানেও বেশ আছে। শহরে মেয়েদের কলেজে পড়বার হোস্টেলের ব্যবস্থায় সেরকম কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। অসংখ্য মেয়ে প্রতিবছর হোস্টেলে সীট না পেয়ে উচ্চশিক্ষার আশায় নিরাশ হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রতিবছর পরীক্ষার পর ছাত্রী ও অভিভাবকের যে কি হয়রানি হয় তা কল্পনাতীত।

একবার ভাববার চেষ্টা করলাম অভিযোগটা কতদূর সত্যি। মেয়েদের হোস্টেলের সংখ্যা কলকাতায় বা উপকণ্ঠে তেমন বাড়ে নি। তাছাড়া কর্মী মেয়েদের হোস্টেলের সংখ্যাও খুব অনুল্লেখ্য। অথচ প্রয়োজনে অনেক মেয়েকেই কলকাতায় থাকতে হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকরির জন্য। এসব ভেবে একটু হতাশ হলাম।

তারপর দেখুন, বৃত্তিশিক্ষার ব্যাপারে মেয়েদের তেমন বিশেষ কোন সুযোগ নেই। ইঞ্জিনীয়ারিং, পলিটেকনিক এবং ডাক্তারী শিক্ষার কথা বলছি। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে মেয়েদের জন্য এ শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা হয় নি এবং এজন্য আলাদা কলেজ তৈরি হয়েছে খুবই কম। নানা সমস্যার মধ্যেও এদিকে মেয়েরা আশাতিরিক্ত সাফল্যের পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের স্বার্থের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয় নি।

এই অভিযোগ সম্বন্ধেও কথা বাড়ানো সঙ্গত নয়। এসবের যথার্থতা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বাধ্য হয়ে কথাগুলি নীরবে হজম করলাম।

আমার এই নীরবতা কিন্তু বক্তাকে বাঙময় করে তুললো। তিনি বললেন, চাকরির ক্ষেত্রেও নৈরাশ্য কিরকম দেখুন না! এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে ক'জনের মধ্যে কজন চাকরি পায় একবার খোঁজ নিয়ে দেখবেন। যাঁরা এরকমভাবে চাকরি আমিও তাঁদের মধ্যে একজন। আবার অফিসে যাতায়াতের দুর্ভোগও অশেষ। পীক আওয়ার্সে লেডিস স্পেশালের একান্ত অভাব একটু চেষ্টা করলে আপনারও নজর এড়াবে না।

আমি এবার সত্যি চিন্তিত। তবু ব্যস্ত হয়ে কাজের অছিলায় উঠে পড়লাম। পাছে তিনি আবার আমার কাছে এসব সমস্যার সমাধানের নির্দেশ চান অথবা সমস্যার ফিরিস্তি আরো বেড়ে ওঠে। একমাত্র এরকম করে পালিয়ে বেড়ানোই হয়তো আজকের দিনের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

মেমসাহেব

নিমাই ভট্টাচার্য

(১৩)

দোলাবৌদি,

বাঙালীর ছেলেরা ঘর ছেড়ে বেরুতে চায় না বলে একদল পেশাদার অন্ধ রাজনীতিবিদ অভিযোগ করেন। অভিযোগটি সর্বৈব মিথ্যা। মহেঞ্জোদাড়ো বা হরপ্পার যুগের কথা আমি জানি না। তবে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ও মধ্যযুগে লক্ষ লক্ষ বাঙালী সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়েছেন। রুজি-রোজগার করতে বাঙালী কোথাও যেতে দ্বিধা করেনি। সুদূর রাওয়ালপিন্ডি-পেশোয়ার-সিমলা পর্যন্ত বাঙালীরা গিয়েছেন, থেকেছেন, থিয়েটার করেছেন, কালীবাড়ী গড়েছেন।

এই যাওয়ার পিছনে একটা কারণ ছিল। প্রথমতঃ বাঙালীরাই আগে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে সরকারী অফিসে বাবু হবার বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করে। সবাই যে কুইন ভিক্টোরিয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে করে হাওড়া স্টেশন থেকে পাঞ্জাব মেলে চাপতেন তা নয়। তবে রাওলপিন্ডি মিলিটারী একাউন্টস অফিসে কোন না কোন মেসোমশাই - পিসেমশাই-এর আমন্ত্রণে অনেকেই বাংলা ত্যাগ করেছেন।

পরে বাঙালী ছেলেছোকরারা বোমা-পটকা ছুঁড়ে ইংরেজদের ল্যাজে আগুন দেবার কাজে মেতে ওঠায় সরকারী চাকুরির বাজারে বাঙালীর দাম কমতে লাগল। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের দিকে দিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হওয়ায় সরকারী অফিসের বাবু জোগাড় করতে ইংরেজকে আর শুধু বাংলার দিকে চাইবার প্রয়োজন হলো না। বাঙালীর বাংলার বাইরে যাবার বাজারে ভাঁটা পড়ল।

জীবনযুদ্ধে ধীরে ধীরে বাঙালীর পরাজয় যত বেশী প্রকাশ হতে লাগল, মিথ্যা আত্মসম্মানবোধ বাঙালীকে তত বেশী পেয়ে বসল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চক্রান্তের সংগে সংগে বাঙালীর এই আত্মসম্মানবোধ তাকে প্রায় বাংলাদেশে বন্দী করে তুললো। বাংলাদেশের নব্য যুবসমাজ চক্রান্ত ভাঙতে পারত, গড়তে পারত নিজেদের ভবিষ্যত, অগ্রাহ্য করতে পারত অদৃষ্টের অভিশাপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা সম্ভব হলো না। মোহনবাগান - ইস্টবেঙ্গল, সুচিত্রা - উত্তম, সন্ধ্যা মুখুজ্যে-শ্যামল মিত্তির, বিষ্ণু দে-সুধীন দত্ত, সত্যজিৎ-তপন সিংহ থেকে শুরু করে নানাকিছুর দৌলতে বেকার বাঙালীও চরম উত্তেজনা ও কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে জীবন কাটায়। এই উত্তেজনা, কর্মচাঞ্চল্যের মোহ আছে সত্য কিন্তু সার্থকতা কতটা আছে তা ঠিক জানি না।

কলকাতায় রিপোর্টারী করতে গিয়ে বাংলাদেশের বহু মনীষীর উপদেশ পেয়েছি, পরামর্শ পেয়েছি কিন্তু পাইনি অনুপ্রেরণা। নিজেদের আসন অটুট রেখে, নিজেদের স্বার্থ বজায় রেখে তাঁরা শুধু রিক্ত নিঃস্ব বুভুক্ষু বাঙালী ছেলেমেয়েদের হাততালি চান। সাড়ে তিন কোটি বাঙালীকে বিকলাঙ্গ করে সাড়ে তিন ডজন নেতা আনন্দে মশগুল।

উদার মহৎ মানুষের অভাব বাংলাদেশে নেই। প্রতিটি পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে-শহরে-নগরে বহু মহাপ্রাণ বাঙালী আজও রয়েছেন। কিন্তু অন্যায়, অবিচার, অসৎ-এর অরণ্যে তাঁরা হারিয়ে গেছেন।

কলকাতার এই বিচিত্র পরিবেশে থাকতে থাকতে আমার মনটা বেশ তেঁতো হয়েছিল। আশপাশের অসংখ্য মানুষের অবহেলা আর অপমান অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সবার অজ্ঞাতে, অলক্ষ্যে মন আমার বিদ্রোহ করত কিন্তু রাস্তা খুঁজে পেতাম না। এক পা এগিয়ে তিনপা পিছিয়ে যেতাম। সমাজ-সংসার-সংস্কারের জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে বেরুতে গিয়ে ভয় করত। ঘাবড়ে যেতাম।

নিজের মনের মধ্যে যে এইসব দ্বন্দ্ব ছিল, তা মেমসাহেবকেও বলতাম না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। তাইতো নিয়তির খেলাঘরে মেমসাহেবকে নিয়ে খেলতে গিয়ে যেদিন সত্যি-সত্যিই ভবিষ্যতের অন্ধকারে ঝাঁপ দিলাম, সেদিন মুহূর্তের জন্য পিছনে ফিরে তাকাইনি। মনের মধ্যে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল। হয়ত প্রতিহিংসা আমাকে আরো কঠোর কঠিন করেছিল।

আর?

মেমসাহেবকে আর দূরে রাখতে পারছিলাম না। জীবনসংগ্রামের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত তিলে তিলে দগ্ধ হওয়ায় দিনের শেষে রাতের অন্ধকারে মেমসাহেবের একটু কোমল স্পর্শ পাবার জন্য মনটা সত্যি বড় ব্যাকুল হতো। জীবনসংগ্রাম কঠোর থেকে কঠোরতর হতে পারে, সে সংগ্রামে কখনও জিতব, কখনও হারব। তা হোক। কিন্তু দিনের শেষে সূর্যাস্তের পর কর্মজীবনের সমস্ত উত্তেজনা থেকে বহুদূরে মানসলোকের নির্জন সৈকতে বন্ধনহীন মন মুক্তি চাইত মেমসাহেবের অন্তরে।

স্বপ্ন দেখতাম আমি ঘরে ফিরেছি। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই আমি সুইচটা 'অফ' করে দিয়ে মেমসাহেবকে অকস্মাৎ একটু আদর করে তার সর্বাংগে ভালবাসার ঢেউ তুলেছি। দুটি বাহুর মধ্যে তাকে বন্দিনী করে নিজের মনের সব দৈন্য দূর করেছি, সারাদিনের সমস্ত গ্লানি মুছে ফেলেছি।

মেমসাহেব আমার দুটি বাহু থেকে মুক্তি পাবার কোন চেষ্টা করে না, কিন্তু বলে, আঃ ছাড় না।

ঐ দুটি একটি মুহূর্তের অন্ধকারেই মেসাহেবের ভালবাসার জেনারেটরে আমার মনের সব বালবগুলো জ্বালিয়ে নিই।

তারপর মেমসাহেবকে টানতে টানতে ডিভানের পর ফেলে দিই। আমিও হুমড়ি খেয়ে পড়ি ওর উপর। অবাক বিস্ময়ে ওর দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। মেমসাহেবও স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে। অত নিবিড় করে দুজনে দুজনকে কাছে পাওয়ায় দুজনেরই চোখে নেশা লাগে। সে নেশায় দুজনেই হয়ত একটু মাতলামি করি।

হয়ত বলি, জান মেমসাহেব, তোমার ঐ দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে যখন আমার নেশা হয়, যখন আমি সমস্ত সংযম হারিয়ে মাতলামী পাগলামি করি তখন জিগর মুরাদাবাদীর একটা 'শের' মনে পড়ে।

পাশ ফিরে আর শোয় না মেমসাহেব। চিৎ হয়ে শুয়ে দু'হাত দিয়ে আমার গলটা জড়িয়ে ধরে বলে, বল না, কোন 'শের'টা তোমার মনে পড়ছে।

আমি এবার বলি, তেরী আঁখো কা কুছ কসুর নেহি, মুছকো খারাব হোনা থা।...বুঝলে মেমসাহেব, তোমার চোখের কোন দোষ নেই, আমি খারাপ হতামই।

চোখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু ঢলঢল-ভাবে ও বলে, তাতো একশ'বার সত্যি! আমি কেন তোমাকে খারাপ করতে যাব?

আমি কানে কানে ফিসফিস করে বলি, আমার আবার খারাপ হতে ইচ্ছে করছে।

ও তিড়িং করে একলাফে উঠে বসে আমার গালে একটা ছোট্ট মিষ্টি চড় মেরে বলে অসভ্য কোথাকার!

আরো কত কি ভাবতাম। ভাবতে ভাবতে আমি পাগল হবার উপক্রম হতো। শত-সহস্র কাজকর্ম চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও মেমসাহেবের ছবিটা সবসময় আমার মনের পর্দায় ফুটে উঠত। তাই তো দিল্লী আসার সংগে সংগে ঠিক করলাম, করেংগে ইয়ে মরেংগে হয়ে অদৃষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে কর্মজীবনে। আর? মেমসাহেবকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমার জীবনে।

দোলাবৌদি, আমি শিবনাথ শাস্ত্রী বা বিদ্যাসাগর নই যে আত্মজীবনী লিখব। তবে বিশ্বাস কর দিল্লীর মাটিতে পা দেবার সংগে সংগে আমি একেবারে পাল্টে গিয়েছিলাম। যেদিন প্রথম দিল্লী স্টেশনে নামি, সেদিন একজন নগণ্যতম মানুষও আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন না। এতবড় রাজধানী একটি বন্ধু বা পরিচিত মানুষ খুঁজে

পাইনি। একটু আশ্রয়, একটু সাহায্যের আশা করতে পারিনি কোথাও। দিল্লীর প্রচন্ড গ্রীষ্মে ও শীতে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে আমি যে কিভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি তা আজ লিখতে গেলেও গা শিউরে ওঠে। কিন্তু তবুও আমি মাথা নীচু করিনি।

একটি বছরের মধ্যে রাতকে দিন করে ফেল্লাম। শুধু মনের জোর আর নিষ্ঠা দিয়ে অদৃষ্টের মোড় ঘুরিয়ে দিলাম। পার্লামেন্ট হাউস বা সাউথ ব্লকের এক্সটারন্যাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রী থেকে বেরুবার মুখে দেখা হলে স্বয়ং প্রাইম মিনিস্টার আমাকে বলতেন, হাউ আর ইউ?

আমি বলতাম, ফাইন, থ্যাংক ইউ স্যার!

তুমি ভাবছ হয়ত গল্প মারছি। কিন্তু সত্যি বলছি এমনিই হতো। একদিন আমার সেই অতীতের অখ্যাত উইকলির একটা আর্টিকেল দেখাবার জন্য তিনমূর্তি ভবনে গিয়েছিলাম। আর্টিকেলটা দেখাবার পর প্রাইম মিনিস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, আর ইউ নিউ টু দেলহি?

'ইয়েস স্যার।'

'কবে এসেছ?'

'এইত মাস চারেক।'

তারপর যখন শুনলেন আমি ঐ অখ্যাত উইকলির একশ' টাকার চাকরি নিয়ে দিল্লী এসেছি, তখন প্রশ্ন করলেন, আর ইউ টেলিং এ লাই?

'নো স্যার।'

'এই মাইনেতে দিল্লীতে টি'কতে পারবে?'

'সার্টেনলি স্যার!'

শেষে প্রাইম মিনিস্টার বলেছিলেন গুড লাক টু ইউ। সী মী ফ্রম টাইম টু টাইম।

দেখতে দেখতে কত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো, ঘনিষ্ঠতা হলো। কত মানুষের ভালবাসা পেলাম। কত অফিসার, কত এম-পি, কত মিনিস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। নিত্যনতুন নিউজ পেতে শুরু করলাম। উইকলি থেকে ডেইলীতে চাকরি পেলাম।

আমি দিল্লীতে আসার মাসকয়েকের মধ্যেই মেমসাহেব একবার দিল্লী আসতে চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, না এখন নয়। একটি মুহূর্ত নষ্ট করাও এখন ঠিক হবে না। আমাকে একটু দাঁড়াতে দাও, একটু নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ দাও। তারপর এসো।

ভাবতে পার মুহূর্তের জন্য যে মেমসাহেবের স্পর্শ পাবার আশায় প্রায় কাঙালের মত ঘুরেছি। সেই মেমসাহেবকে আমি দিল্লী আসতে দিইনি। মেমসাহেব রাগ করেনি। সে উপলব্ধি করেছিল আমার কথা। চিঠি পেলাম—

ওগো, কি আশ্চর্যভাবে তুমি আমার জীবনে এলে, সেকথা ভাবলেও অবাক লাগে। কলেজ-ইউনিভার্সিটির জীবনে, সোশ্যাল—রি-ইউনিয়ন বা রবীন্দ্রজয়ন্তী-বসন্তোৎসবে কত ছেলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে। কাউকে ভাল লেগেছে, কাউকে ভাল লাগেনি। দু'একজন হয়ত আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে। আশুতোষ বিল্ডিং-এর ঐ কোণার ঘরে গান-বাজনার রিহার্সাল দিয়ে বাড়ী ফেরার পথে মদন চৌধুরী হঠাৎ আমার ডান হাতটা চেপে ধরে ভালবাসা জানিয়েছে। বিয়ে করতেও চেয়েছে। তালতলার মোড়ের সেই যে ভাব-ভোলা দেশপ্রেমিক, তিনিও একদিন আত্ম-নিবেদন করেছিলেন আমাকে।

মুহূর্তের জন্য চমকে গেছি কিন্তু থমকে দাঁড়াইনি। তারপর যেদিন তুমি আমার জীবনে এলে সেদিন কে যেন আমার সব শক্তি কেড়ে নিল। কে যেন কানে কানে ফিসফিস করে বলল, এইত সেই!

তুমি তো জান আমি আর কোনদিকে ফিরে তাকাইনি। শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছি। তোমাকে আমার জীবনদেবতার আসরে বসিয়ে পুজো করেছি, নিজের সর্বস্ব কিছু দিয়ে তোমাকে অঞ্জলি দিয়েছি। মন্ত্র পড়ে, যজ্ঞ করে সর্বসমক্ষে আমাদের বিয়ে আজও হয়নি। কিন্তু আমি জানি তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার ভবিষ্যত সন্তানের পিতা।

মেমসাহেব বেশী কথা বলত না কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর বড় বড় চিঠি লিখতে পারত। এই চিঠিটাও অনেক বড়। সবটা তোমাকে লেখার প্রয়োজন নেই। তবে শেষের দিকে কি লিখেছিল জান? লিখেছিল—

......তুমি যে এমনকরে আমাকে চমকে দেবে, আমি ভাবতে পারিনি। ভেবেছিলাম ঘুরে-ফিরে একটা কাগজে চাকরি জোগাড় করবে। কিন্তু এই সামান্য ক'মাসের মধ্যে তুমি এমন করে নিজেকে দিল্লীর মত অপরিচিত শহরে এত বড় বড় রথীমহারথীদের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, সত্যি আমি তা কল্পনা করতে পারিনি। তোমার মধ্যে যে এতটা আগুন লুকিয়ে ছিল, আমি তা বুঝতে পারিনি।...

যাইহোক তোমার গর্বে আমার সারা বুকটা ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে আমার চাইতে সুখী স্ত্রী আর কেউ হতে পারবে না। আমি সত্যি বড় খুশী, বড় আনন্দিত। তোমার এই সাফল্যের জন্য তোমাকে একটা বিরাট পুরস্কার দেব। কি দেব জান? যা চাইবে তাই দেব। বুঝলে? আর কোন আপত্তি করব না। আর আপত্তি করলে তুমিই বা শুনবে কেন?......

দোলাবৌদি, তুমি কল্পনা করতে পার মেসাহেবের ঐ চিঠি পড়ে আমার কি প্রতি-ক্রিয়া হলো? প্রথমে ভেবেছিলাম দু'এক-দিনের জন্য কলকাতা যাই। মেমসাহেবের পুরস্কার নিয়ে আসি। কিন্তু কাজকর্ম পয়সাকড়ির হিসাবনিকাশ করে আর যেতে পারলাম না।

তবে মনে মনে এই ভেবে শান্তি পেলাম যে আমাকে বঞ্চিত করে কৃপণের মত অনেক ঐশ্বর্য ভবিষ্যতের জন্য অন্যায়ভাবে গচ্ছিত রেখে মেসাহেবের মনে অনুশোচনা দেখা দিয়েছে। আমি হাজার মাইল দূরে পালিয়ে এসেছিলাম। মেমসাহেব সেই আদর, ভাল-বাসা, সেই মজা, রসিকতা কিছুই উপভোগ করছিল না। আমাকে যতই বাধা দিক, আমি জানতাম রোজ আমার একটু আদর না পেলে ও শান্তি পেত না। আমি বেশ অনুমান করছিলাম ওর কি কষ্ট হচ্ছে; উপলব্ধি করছিলাম আমাকে কাছে না পাবার অতৃপ্তি ওকে কিভাবে পীড়া দিচ্ছে।

মনে মনে অনেক কষ্ট পেলেও ওর আসাটা বন্ধ করে ভালই করেছিলাম।
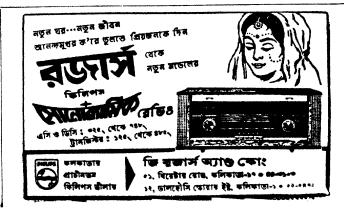
দিল্লীতে আসার জন্য ও যে বেশ উতলা হয়েছিল সেটা বুঝতে কষ্ট হয়নি। তাই তো আরো তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রস্তুত করবার জন্য আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করলাম। ঠিক করলাম ওকে এনে চমকে দেব।

ভগবান আমাকে অনেকদিন বঞ্চিত করে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। দুঃখে অপমানে বছরের পর বছর জ্বলেপুড়ে মরেছি। কলকাতার শহরে এমন দিনও গেছে যখন মাত্র একটা পয়সার অভাবে সেকেন্ড ক্লাশ ট্রামে পর্যন্ত চড়তে পারিনি। কিন্তু কি আশ্চর্য! দিল্লীতে আসার পর আগের সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। সে পরিবর্তনের বিস্তৃত ইতিহাস তোমার এই চিঠিতে লেখার নয়। সুযোগ পেলে পরে শোনাব। তবে বিশ্বাস কর অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এলো আমার কর্মজীবনে। সাফল্যের আকস্মিক বন্যায় আমি নিজেকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

মাস ছয়েক পরে মেমসাহেব যখন আমাকে দেখবার জন্য দিল্লী এলো, তখন আমি সবে বোর্ডিং হাউসের মায়া কাটিয়ে ওয়েস্টার্ন কোর্টে এসেছি। নিশ্চিত জানতাম মেমসাহেব আমাকে দেখে, ওয়েস্টার্ন কোর্টে আমার ঘর দেখে, আমার কাজকর্ম, আমার জীবনধারা দেখে চমকে যাবে। কিন্তু আমি চমকে দেবার আগেই ও আমাকে চমকে দিল।

নিউদিল্লী স্টেশনে পৌঁছে ডিল্যুক্স এয়ার কন্ডিশনড এক্সপ্রেস অ্যাটেন্ড করতে। মেমসাহেব আসছে। জীবনের এক অধ্যায় শেষ করে নতুন অধ্যায় শুরু করার পর ওর সংগে এই প্রথম দেখা হবে।

লাউডস্পীকারে অ্যানাউন্সমেন্ট হলো, এ-সি-সি এক্সপ্রেস এক্ষুনি একনম্বর প্ল্যাটফর্মে পেঁছিবে। আমি সানগ্লাসটা খুলে রুমাল দিয়ে মুখটা আর একবার মুছে নিলাম। একটা সিগরেট ধরিয়ে দু'একটা টান দিতে না দিতেই ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়ল। এদিক-ওদিক দেখতে না দেখতেই মেমসাহেব দু' নম্বর চেয়ার কার থেকে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু একি? মেমসাহেবের কি বিয়ে হয়েছে? এত সাজগোছ? এত গহনা? মাথায় কাপড়, কপালে অতবড় সিন্দুরের টিপ।

মেমসাহেবকে কোনদিন এত সাজগোছ করতে দেখিনি। গহনা? শুধু ডানহাতে একটা কঙ্কন। ব্যস, আর কিছু না। গলায় হার? না, তাও না। কোন এক বন্ধুর বিপদে সাহায্য করার জন্য গলার হার দিয়েছেন। তাছাড়া মাথার কাপড় আর কপালে অতবড় একটা সিঁদুরের টিপ দেখে অবাক হবার চাইতে ঘাবড়ে গেলাম বেশী। মুহূর্তের জন্য পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে গেল। গলাটা শকিয়ে এলো, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। দুনিয়াটা ওলট-পালট হয়ে গেল।

প্রথমে ভাবলাম স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ঐ কয়েক হাজার লোকের সামনে ওর গালে ঠাস করে একটা চড় মারি। বলি, আমাকে অপমান করবার জন্য এত দূরে না এসে শুধু ইনভিটেশন লেটারটা পাঠালেই তো হতো!

আবার ভাবলাম, না, ওসব কিছু করব না, বলব না।

বিশেষ কথাবর্তা না বলে সোজা গিয়ে ট্যাক্সি চড়লাম।

ট্যাক্সিতে উঠেই মেমসাহেব আমাকে প্রণাম করল। আমার বাঁ হাতটা টেনে নিল নিজের ডান হাতের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ?

'আমার কথা ছেড়ে দাও। এখন বল তুমি কেমন আছ? তোমার বিয়ে কেমন হলো? বর কেমন হলো? সর্বোপরি তুমি দিল্লী এলে কেন?'

মেমসাহেব একেবারে গলে গেল, সত্যি বলছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এমন হঠাৎ সবকিছু হয়ে গেল যে কাউকেই খবর দেওয়া হয়নি।......

'ছেলেটি কেমন?'

বেশ গর্বের সংগে উত্তর এলো, ব্রিলিয়ান্ট!

'কোথায় থাকেন?'

'এইত তোমাদের দিল্লীতেই।'

আমি চমকে উঠি, দিল্লীতে?

ও আমার গালটা একটু টিপে দিয়ে বলে, ইয়েস স্যার! তবে কি আমার বর আদি সপ্তগ্রাম বা মছলন্দপুর থাকবে?

ট্যাক্সি কনটপ্লেস ঘুরে জনপদে ঢুকে পড়ল। আর এক মিনিটের মধ্যেই ওয়েস্টার্ণ কোর্ট এসে যাবে। জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কোথায় যাবে?

'কোথায় আবার? তোমার ওখানে।'

ট্যাক্সি ওয়েস্টার্ন কোর্ট ঢুকে পড়ল। থামল। আমরা নামলাম। ভাড়া মিটিয়ে ছোট্ট সুটকেশটা হাতে করে ভিতরে ঢুকলাম। রিসেপসন থেকে চাবি নিয়ে লিফট-এ চড়লাম। তিন তলায় গেলাম। আমার ঘরে এলাম।

মাথার কাপড় ফেলে দিয়ে দু'হাত দিয়ে মেমসাহেব আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আঃ কি শান্তি!

আমার বুকটা জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু সংগে সংগেই থেমে গেল। ওর সিঁথিতে সিন্দুর না দেখে বুঝলাম......

এবার আমিও আর স্থির থাকতে পারলাম না। দু'হাত দিয়ে টেনে নিলাম বুকের মধ্যে। আদর করে, ভালবাসা দিয়ে ওকে ক্ষতবিক্ষত করে দিলাম আমি। মেমসাহেবও তার উন্মত্ত যৌবনের জোয়ারে আমাকে অনেক দূর ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমার দেহে, মনে ওর ভালবাসা, আবেগ উচ্ছলতার পলিমাটি মাখিয়ে দিয়ে গেল। আমার মন আরো উর্বরা হলো।

এতদিন পরে দুজনে দুজনকে কাছে পেয়ে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম। কতক্ষণ যে ঐ জোয়ারের জলে ডুবেছিলাম, তা মনে নেই। তবে সম্বিত ফিরে এলো, দরজায় নক্ করার আওয়াজ শুনে।

তাড়াতাড়ি দুজনে আলাদা হয়ে বসলাম। আমি বললাম, কোন?

'ছোটা সাব, ম্যাঁয়।'

ও জিজ্ঞাসা করল কে?

আমি বললাম, গজানন।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে ডাক দিলাম, এসো, ভিতরে এসো।

মেমসাহেবকে দেখেই গজানন দু'হাত জোড় করে প্রণাম করল, নমস্তে বিবিজি।

ও একটু হাসল। বলল, নমস্তে।

আমি বললাম, 'গজানন, বিবিজিকে কেমন লাগছে?'

'বহুত আচ্ছা, ছোটা সাব।' এক সেকেন্ড পরে আবার বলল, আমার ছোটসাহেবের বিবি কখনও খারাপ হতে পারে?

আমরা দুজনেই হেসে ফেলি। মেমসাহেব বলল, গজানন, বাবুজি প্রত্যেক চিঠিতে তোমার কথা লেখেন।

গজানন দু'হাত কচলে বলে, ছোটসাবকা মেহেরবাণী।

আমি উঠে গিয়ে গজাননের পিঠে একটা চাপড় মেরে বলি, জান মেমসাহেব, গজানন আমার লোক্যাল বস্! আমার গার্ডিয়ান!

'কিয়া করেগা বিবিজি, বাতাও। ছোটাসাব এমন বিশ্রী কাজ করে যে কোন সময়ের ঠিকঠিকানা নেই। তারপর কিছু সংসারী বুদ্ধি নেই। আমি না দেখলে কে দেখবে বল? গজানন প্রায় খুনী আসামীর মত ভয়ে ভয়ে জেরার জবাব দেয়।

গজানন এবার মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করে, বিবিজি, ট্রেনে কোন কষ্ট হয়নি তো?

মেমসাহেব, না, না, কষ্ট হবে কেন?

গজানন চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের দু'জনের ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসে। ব্রেকফাস্টের ট্রে নামিয়ে রেখে গজানন চলে যায়, আমি যাচ্ছি। একটু পরেই আসছি।

গজানন চলে যাবার পর আমি মেমসাহেবের কোলে শুয়ে পড়লাম। আর ও আমাকে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দিতে লাগল।

দোলাবৌদি, মেমসাহেব আর আমি অনেক কান্ড করেছি। বাঙালী হয়েও প্রায় হলিউড ফিল্মে অভিনয় করেছি। শেষপর্যন্ত অবশ্য আমাদের বেশ একজন বাঙালী লেখকের 'হিট্' বই-এর মত হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে সব জানবে। বেশী ব্যস্ত হয়ো না।

তোমাদের বাচ্চু

কলকাতা কলকাতা কলকাতা

ইব্রাহিম সন্তরাজ! সে আবার কি বস্তু? ইব্রাহিমের জবাব : "এই ছেনি আর হাতুড়ি এই হাতে নিয়ে যে কোন কঠিন-সে-কঠিন কনকিরিট ভেঙে দিতে পারি।" কনকিরিট ভাঙতে ওর নাকি জোড়া নেই। "আর. সি হোক কিংবা প্রি-কাস্ট হোক হাতুড়ি হাতে ইব্রাহিম ও কনকিরিটকে তোড়কে আপনার কামের মাফিক বানিয়ে দেবে। হু।"

ইব্রাহিম একা নয়। সাত সকালে মেট্রো সিনেমার দিকে যদি কোন দিন যেতে হয়, সামনের দিকে তাকিয়ে দেখবেন ইব্রাহিম কোম্পানি রকমারি সাইজের ছেনি আর হাতুড়ি নিয়ে বসে আছে। কেউ বিড়ি ফুঁকছে, কেউ বা একমনে কান চুলকে যাচ্ছে। অল্পবয়েসী ছোকরার চোখ দেখলে মনে হবে খদ্দেরের দেখা পাওয়া মাত্রই তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার ধান্দায় আছে সে। ঠিক যেখানটায় "হ্যালো ট্যাক্সি"র ঠাঁই, যেখানে কার পার্কিং-এর জন্যে ঘটা করে বেড়া দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যিখানের জায়গাটাই হল সন্তরাজের হাট। ইব্রাহিম, জয়নাল, বদরি, কামেশ, রামসিংহাসন—সকাল থেকেই সকলে হাজির হয় এই হাটে।

লক্ষ্য করলুম বেশ ব্যস্তভাবে একজন ভদ্রলোক এলেন। পরনে ধুতি, হাফসার্ট, আর গোঁফ। হনহনিয়ে এসে দাঁড়ালেন এক সন্তরাজের সামনে। হাত-পা নেড়ে কি যেন একটা বোঝালেন তাকে। সন্তরাজ মাথা নাড়লে যার মানে বোধ হয় এই যে, সে রাজী নয়। ভদ্রলোক এবার এগিয়ে এলেন ইব্রাহিমের কাছে। বললেন, তাঁর বাড়িতে প্লাসটারের আগে সন্তরাজকে চীপিং করে দিতে হবে। ইব্রাহিম রাজি। দরদস্তুর শুরু হল।

ইব্রাহিম বললে, রোজানা সাড়ে চার। তিন সন্তরাজ চাহিয়ে। ভদ্রলোক চার পেরুতে রাজি নন। ইব্রাহিমও নামবে না। হঠাৎ বললে, বেশ, ফুরণ কর লো। ঠিক হ্যায়, ভদ্রলোক সায় দিলেন শেষ পর্যন্ত। ইব্রাহিম এবার চলল আর দুজন সন্তরাজকে নিয়ে, ছেনি-হাতুড়ি বগলদাবা করে।

কাসেমকে প্রশ্ন করলুম, কী হল? সে জানালে, বাড়ি তৈরির 'কলাম' ব্যবস্থা হবার পর থেকে বহুৎ জোরসে চীপিং-এর কাজ চলছে। কনকিরিটের পর পেলেসটার ধরে না। তাই সন্তরাজ গিয়ে কনকিরিটকে চীপিং করে। অনেকটা শিল কাটাইয়ের মত। এ ছাড়া কংক্রিটের ছাদ বা অন্য ঢালাইয়েও ওদের প্লাসটারের জন্যে ডাক পড়ে।

ঘুরে দেখি আরও চারজন লোক সন্তরাজ-হাটে ঢুকেছেন। কিছুক্ষণ বার্তাচত হল, তারপর ডজনখানেক সন্তরাজ চলল ওদের পিছন পিছন।

বেলা নটা। এখনও অনেকে পসরা সাজিয়ে বসে আছে। কাসেম বেচারার এখনও কিছু হয়নি। ওর কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলাম।

কাসেম বললে, চার থেকে সাড়ে চার রোজ পাই। ইতোয়ারে কাজ থাকে না, এমনিতেই প্রায় নষ্ট হয়ে যায়। বাজারে বেশ কাজ ছিল হঠাৎ কী যেন হয়েছে বাড়িঘরদোড় আর তৈরিই হচ্ছে না। এখন আর মাসে একশ টাকা কেউ আয় করতে পারছে না। তা হোক, ওরা কেউ মজুরি কমাতে রাজি নয়। চার টাকার নিচে নামলে আর কোন দিনই পেট ভরবে না। "যাই বলুন বাবু, সন্তরাজের বহু দুসরা আদমির বাড়িতে তো মেহনত করতে পারবে না। তা ছাড়া বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে এ কাজ চলে আসছে, এখন আলুকাবলি কি ফুচকা বিক্রির কাজে শরম লাগে।"

লক্ষ্য করে দেখলুম সন্তরাজের হাটে যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ সকলেই আছে। পিঙ্গল গুম্ফ, শুভ্র কেশ—সকলেই ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে দোকান সাজিয়ে বসেছে।

রোদ উঠছে অথচ সন্তরাজের হাট ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। সামনে মেট্রোতে সোফিয়া লোরেনের অর্ধ-নগ্ন ছবি। ফুট-পাথে চোরাই জাপানী মাল বিক্রির সঙ্গে প্রচণ্ড চেল্লাচেল্লি। ব্যস্ত ট্রাফিক, ততোধিক ব্যস্ত অফিসযাত্রী বাবুবাহিনী। এ সবের মাঝে এই সন্তরাজ হাট যেকোন কলকাতা-প্রেমিকের মনকে উদাস করে দেবে।

এই কলকাতায় মানুষ এখনও নিজের দৈহিক কলা সাজিয়ে তুলে ধরে খদ্দেরদের সামনে। রুটি-রুজির তাড়নায় সকাল থেকে হাজির হয় পণ্যের হাটে। কাসেম বললে, না বাবু, শুধু ইসপেলেনেড নয়, যাদবপুর পালের বাজার, পার্কসার্কাস আর শ্রীমানী বাজারেও রোজ সন্তরাজের হাট বসে। "কনকিরিট কাটতে আর কেউ পারবে না। আমাদের হাতে যাদু আছে। যেমনটি চাইবেন, তেমনটি তোড়কে দেব। আমরা ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারবে না।"

খবর নিয়ে জেনেছি কাসেম সন্তরাজ ঠিকই বলেছে। এমন কি মার্টিন-বার্ণ, কিংবা স্যাস-এর মত কোম্পানিও গরজে পড়লেই সন্তরাজদের ডাকে। বড় বড় স্কাই স্ক্রাপার উঠছে কংক্রিটের কলামের উপরে। এই কলাম কিংবা আর-সি-সি ব্লককে প্লাসটার করতে হলে সন্তরাজকে ডাকতে হয়। চীপিং, প্লামবিংও এরা করে। সন্তরাজ ছাড়া আর কেউ গোটা বাড়িতে প্লামবিং লাইন নিয়ে যাবার মত রাস্তা করতে পারবে না। কংক্রিটের বিরাট সব দেয়াল কেটে বড় বড় পাইপ যাবার রাস্তাও করে দেয় সন্তরাজরা।

সত্যিই যাদু আছে এদের হাতে। কুড়ি বছরের একটা ছোকরাও কঠিন কংক্রিটকে ফুটো করে দেবে ছেনি আর হাতুড়ি চালিয়ে।

বাজারে ঢল নেমেছে। আকাশছোঁয়া বাড়ি আর তৈরি হচ্ছে না। সরকারের হাতেও পয়সা নেই, কাজকর্ম প্রায় অচল। কলকারখানার মালিকেরা কলকাতাকে আর তেমনভাবে ভালবাসছে না। বাইরে সরে পড়বার দিকেই যেন সকলের মন। এত কাণ্ডের পরও এই নতুন সিনেমা হল তৈরি করতে এগিয়ে এলেন না। একদিকে বাড়ি-ভাড়া কমছে, অন্যদিকে বাড়িগড়া থামছে।

মোদ্দা কথা বাজারে সন্তরাজের চাহিদা কমে গেছে। এসপ্লানেডের সকালে তাই খালিহাতে-ঘরে-ফিরে-যাওয়া সন্তরাজের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। না, রিসেসান, শ্রমিক অশান্তি, রাজনৈতিক জটিলতা—ওসব বুঝবে না। ওরা জানে শুধু শুধুই বসে থাকতে হচ্ছে ওদের। কংক্রিটের কাজে ওদের আর তেমন ডাক পড়ছে না। ছেনি হাতুড়ি বেকার বসে থাকছে। এই বেকার

ধাক্কাটা ওরা পেট দিয়ে বুঝছে। খদ্দের না জুটলে ছোনি হাতুড়ি স্তব্ধ হলে সন্তরাজেরা কি করবে ভেবে পায় না।

*

এ বছর আমের বাজার বহুত জোরদার। আকাশ যদি আর একটু করুণা করেন, কলকাতার ফুটপাথে ফুটপাথে আম গড়াগড়ি যাবে।

ফলপট্টির অবাঙালী সাগরে বাঙালী জগদীশ চট্টোপাধ্যায় একটি দ্বীপের মত। পাইওনীয়ার বাঙালী ফ্রুট মার্চেন্ট চট্টোপাধ্যায় বললেন, ধারেকাছের হাওড়া-হুগলী-মুর্শিদাবাদেও এবার যা আম হয়েছে, গত তিন বছরের ফলনের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। অন্ধ্র-বিহার-উত্তরপ্রদেশ-মালদা : সব জায়গাতেই আমের গাছগুলো ফলের ভারে নুয়ে আছে।

আমের রাজ্য এই বঙ্গভূমিতে প্রথম যে আম আসে—সেই চৈত্র মাসে—সে কিন্তু 'বঙ্গের বাহিরের' আম। বম্বের আম, নাম কিন্তু বোম্বাইয়া নয়।

এই আমের নামের খ্যাতি বিশ্বজোড়া—আলফানসো—দামও সৃষ্টিছাড়া। তা হোক, আলফানসো অনেক বাঙালীর কাছেই গোলাপখাস-হিমসাগর-ল্যাংড়ার মত নয়। তবুও যে চাহিদা বাড়ছে তার কারণ বস্তুটি অকালের। চৈত্র মাসে উল্টাডাঙার মুচি-বাজারে যখন কাঁচা আম ডুমুরের ফুলের মত, নিউ মার্কেটে তখন তোফা পাকা আম পাওয়া যায়। আমভক্ত কলকাতা অত দাম হলেও অকালে প্রতিদিন হাজার দশেক আলফানসো খায়।

বোম্বাইয়ের দেনা-পাওনা চুকে যেতেই ফলপট্টির কারবার সুরু হয় অন্ধ্রের সঙ্গে। অন্ধ্রের সেরা আমের নাম 'সুন্দরী'—এখানকার নতুন নাম গোলাপখাস। অন্ধ্রের বেগুনফুলি, তোতাপুলি, রাজভোগ (কলকাতায় সফেদা) এখন কলকাতার আমের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। প্রতিদিন আড়াই লাখের মত অন্ধ্র আম।

অন্ধ্রের পর কলকাতার আম-চাহিদা মেটাবে হাওড়া-হুগলি-মুর্শিদাবাদের হিমসাগর, বোম্বাই আর অনামী রকমারি মিষ্টি আম। বোম্বাই আমের ফলনই বেশি। কিন্তু নাম শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন বাঙালীবাবুদের মুখে ওসব রোচে না। ওসব আম পাইকারি হারে কলকাতা থেকে চালান যায় অমৃতসর অবধি।

এরপর আসবে বিহারী আম—ভাগলপুর, বেতিয়া, পাটনা, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙা প্রভৃতি থেকে ট্রেনে, ট্রাকে লাগাতর আম আসবে। কত বছর কলকাতা বিহারী আমের মুখ দেখেনি। এবার বিহারী ল্যাংড়ার হাত পা গজাবে।

বিহারের পর মালদার ল্যাংড়া, তারপর ফজলি। শ্রাবণ মাস অবধি কলকাতা নির্ভাবনায় আম খাবে।

কলকাতায় কম করে ছ হাজার পরিবার আম-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। আড়তদার ৪০, ফড়িয়া ৫০, বাদবাকি হকার অথবা দোকানি।

আগে বিক্রি হত 'টাকায় কটা' হিসেবে এ বছর থেকে ওজনে বিক্রি হচ্ছে। আমের চাহিদা বাড়ছে, মওকা বুঝে ব্যবসায়ীরাও দাঁও মারছেন।

ব্যবসায়ীদের অবশ্য মেহনত করতে হয়। আড়তদার তো টুকরি বিক্রি করেই খালাস। সে টুকরির মধ্যে কি আম থাকে? স্রেফ কাঁচা আম। ঝাঁকাভর্তি কাঁচা আম কারবাইড দিয়ে কি করে পাকিয়ে গাছপাকা করে তোলা যায় তা কলকাতার আমের ব্যবসায়ীরা ভাল করেই জানেন।

'ফজলি আম শেষ হলে ফজলিতর আম চাইব না, তখন নতুনবাজার থেকে আমড়া কিনে আনব।' রবীন্দ্রনাথের এই কোটেশনটা দিলেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। বললেন, কিন্তু বাঙালীর সে-টেস্ট আর নেই। এখন অনেকটা 'যাহা পাই তাহা খাই' ভাব। কাগজে আম আগে অপাঙক্তেয় ছিল, এখন জাতে উঠে গেছে।

স্বাধীনতার পর আর কিছু না হোক আম-দুনিয়ায় বর্ণবিদ্বেষ উঠে গেছে।

অ-চ

● জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম্।

প্রেক্ষাগৃহ

তেরশ' চব্বিশ না পঁচিশ ?

একদিন ছিলো যখন নিউ এম্পায়ারে ছবি দেখতে গেলে প্রেক্ষাগৃহের আলো নেভবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যেত, মঞ্চের সম্মুখভাগস্থ তরঙ্গায়িত পর্দার উপর রঙের খেলা চলত অন্তত পাঁচ মিনিট ধরে আবহসংগীতসহযোগে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দর্শকমনকে কঠিন বাস্তব জগৎ থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বিচ্ছিন্ন করে ছবির কল্পলোকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি সাধন। কোনো নাটক দেখবার সময় দর্শকমনকে প্রস্তুত করবার জন্যে এতকাল ধরে কিছুটা যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করাই যথেষ্ট বিবেচিত হতো। কিন্তু সেদিন বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলাম এমন নাটকও আজকাল অভিনীত হতে শুরু করেছে যা প্রত্যক্ষ করবার বহু পূর্ব থেকে মনের প্রস্তুতির প্রয়োজন হচ্ছে। এমনি একটি নাটক হচ্ছে 'ইন্টারভিউ'। জাঁ ক্লড ভ্যান ইটালি ও আমেরিকা হুর-রে নাটকের প্রথম পর্ব হচ্ছে এই ইন্টারভিউ। লোয়ার সার্কুলার রোড ও শেক্সপীয়র সরণির প্রায়-সংযোগস্থলে বর্তমানে নির্মীয়মান সংগীতকলা মন্দির ভবনের অর্ধসমাপ্ত প্রেক্ষাগৃহে এই মার্কিনী নাটকটি অভিনীত হয়েছিল গত ১লা ও ২রা মে সন্ধ্যায়। এতে অভিনয় করেছিলেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের চারজন ছাত্র এবং লরেটো ও শ্রীশিক্ষায়তন কলেজের চারজন ছাত্রী। পরিচালনা করেছিলেন ডঃ জেমস্ ভি হ্যাচ।

এই অভিনয় দেখবার নিমন্ত্রণপত্রটি হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করা গেল, পত্রটিকে যেন কোনোরকমে মুড়ে বা পাকিয়ে বিকৃত করা না হয় এই নির্দেশ-নামা। আরো লক্ষ্য করা গেল যে, কম্পিউটারে ব্যবহৃত হওয়ার দরুন পত্রটির এখানে সেখানে অনেকগুলি ছিদ্র এবং অপর পৃষ্ঠায় নানারকম ক্ষুদ্রাকৃতি সংখ্যা ও বর্ণমালা। সাবধানেই রাখতে হল পত্রটিকে। এবং নির্দিষ্ট তারিখে নির্ঘোষিত সময়ের কিছু পূর্বেই সংগীত কলামন্দির ভবনের সম্মুখে হাজির হওয়া গেল। কিন্তু না, তখনি প্রবেশ করা চলবে না, অপেক্ষা করতে হবে আরো বেশ কিছুক্ষণের জন্যে। নিমন্ত্রিতের দল আভাঁজ আনকোরা টিকিট হাতে একের পর এক এসে জড়ো হতে লাগলেন এবং অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন ভিতর থেকে অনুমতি আসে প্রবেশ করার জন্যে। অনুমতি এলো। ভাঙাচোরা ইঁট-কাঠ তক্তা বাঁশ বাখারি সুরকি বালি দুপাশে রেখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হতে থমকে দাঁড়াতে হল এক জায়গায়। সেখানে টেবিলে বসা চোখের কাছে দুই গর্তওলা চৌকো বাক্স আঁটা জনৈক বললেন, 'এই ফর্মটি নিন।' নিয়ে অগ্রসর হতে গিয়ে কানে এলো তিনি বলছেন, 'এই নম্বরটি মনে রাখবেন, ভুলবেন না।' তাড়াতাড়ি তাকিয়ে দেখলাম সেই ফর্মের উপর লেখা রয়েছে ১৩২৪। তখনো অনুজ্ঞা ভেসে আসছে, 'সামনেই যে টেলিভিশন যন্ত্রটি দেখছেন, সেদিকে তাকিয়ে হাসুন, আপনার ছবি উঠে যাবে। ভালো করে হাসতে ভুলবেন না। তারপর আরেকটু এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে একটি সুইচ্ পাবেন, ওটি টিপে দেবেন। তারপর এগিয়ে বাঁদিকে—। হ্যাঁ, বাঁদিকে আর এক-জন ঐ চৌকো মুখোশ-আঁটা লোক পাওয়া গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন (সবই ইংরেজি ভাষায়), 'কই আবেদনপত্র?' সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হল। আদেশ এল, এগিয়ে

যান। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় আরেকজন মুখোশধারী ব্যক্তি একটি ফর্ম হাতে দিলেন। এবং বললেন, ঐ টেবিলে গিয়ে এই ফর্মের নাম্বার দেখে ঐ টেবিলে রাখা একটি ফর্মে নাম্বারটি বসিয়ে নিন।' পেন্সিল হাতে করে নাম্বারটি বসাতে গিয়ে দেখি, আমার নাম্বারটি হয়ে গেছে ১৩২৫। এ কি হলো? আমার তো জলজ্যান্ত মনে আছে আমার নাম্বার ছিল ১৩২৪। তাহলে? আবার তো পেছিয়ে যাওয়া যায় না? পরবর্তিনীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার নাম্বারটি যে পাল্টে গেছে, করি কি?' তিনি জবাব দিলেন, 'চেপে যান।' মনে হয় সকলেরই নম্বর এরকম পাল্টে গেছে।' তথাস্তু। এগিয়ে গিয়ে আরেক টেবিলে ঐ কাগজগুলো দিতে হল। সেখানে ওর উপর আর্জেন্ট শ্লিপ করে কাগজগুলো পাঞ্চ হয়ে হাতে ফেরৎ দিল। তারপর আবার কাগজ, আবার পাঞ্চ, আবার কাগজ, আবার পাঞ্চ। সবশেষে প্রেক্ষাগৃহে ঢোকবার আগে প্রায়-পোস্টারের আকারে একটি ছাপা পরিচয়লিপি, যাতে পরিচালক, কলাকুশলী এবং শিল্পীদের নাম তাঁদের পরিচয়সহ লিপিবদ্ধ আছে। ওঃ বলতে ভুলে গেছি, এক জায়গায় উপদেশ হল সামনের ফোকরটিতে হাত দিয়ে গোটাকয়েক ট্যাবলেট নিয়ে নিন, কাজে দেবে। অভিনয় দেখতে দেখতে কাজে দেবে।

ঘণ্টা বাজল। মনে হল অভিনয় শুরু হবে। না, তা হল না। তার পরিবর্তে খোলা মঞ্চের পশ্চাৎপটে দুটি টেলিভিশনের ছবি পড়ল পাশাপাশি। একদিকে দেখানো হচ্ছে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক সাধনা—নিউ-ক্লিয়ার ফিজিক্স সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক্স প্রভৃতি; অপরদিকে আর্টের চর্চা, অঙ্কন, নৃত্য, অভিনয় ইত্যাদি ইত্যাদি। দুয়েরই সঙ্গে চলছে একযোগে আনুষঙ্গিক শব্দ। অবস্থাটা বুঝুন। বাঁ চোখ ও বাঁ কান বিজ্ঞানের দিকে আর ডান চোখ ও ডান কান আর্টের দিকে। হঠাৎ দেখা গেল, একটি ফ্রেমের উপর দুটি জিনিসই পড়তে লাগল, আর্টে বিজ্ঞানে একাকার। হঠাৎ বেজে উঠল তীব্র বংশীধ্বনি। টেলিভিশন বন্ধ। আলো জ্বলে উঠল। শুরু হল ইন্টারভিউ নাটকের অভিনয়। একেকজন দরখাস্তকারী প্রেক্ষাগৃহ থেকে মঞ্চের উপর আসেন, আর চারজন ইন্টারভিউআর তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। এমনি করে পর পর এলেন চারজন দরখাস্ত-কারী। মঞ্চে তখন আটজন। বিচিত্র জীবন-কথা। দরখাস্তকারীরা প্রথমে ছিল মানুষ কিন্তু ইন্টারভিউর দাপটে ক্রমশ ভুলে যেতে লাগল ওরা কি। শেষপর্যন্ত একজনের এমন হল, সে চেঁচিয়ে বলছে, আমি এক জায়গায় যাবো, আমাকে কেউ পথ বলে দিতে পারো? এমনই হাল হল চারজনের শেষপর্যন্ত যে তারা তাদের নাম গেল ভুলে, পরিচয় রইল তাদের নাম্বারের মারফৎ। কিন্তু দর্শকমনে আশঙ্কা রইল হয়তো নাম্বারও তারা ভুলে যাবে। নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ মার্কিন তরুণ-তরুণীদের এমনিভাবে আক্রমণ করেছে যে, অভিনীত নাটকটি যদি তথ্যবাহী হয়, তাহলে তাদের অবস্থা দেখলে সহানুভূতির উদয় হতে বাধ্য। দর্শক ব্যথিত অন্তঃকরণে মনুষ্যত্বের এই অপমৃত্যু দেখে অনুশোচনায় ভরে ওঠে।

ডঃ জেমস ভি হ্যাচ আমাদের একটি নতুন বিষণ্ণ জগতের সঙ্গে চমৎকারভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন অভাবিত আঙ্গিকের মাধ্যমে।

কিন্তু মনে প্রশ্ন থেকে গেল আমার নাম্বারটি ১৩২৪ না ১৩২৫? এবং বাড়িতে এসে হাতে গুঁজে-দেওয়া পত্রসম্ভার উল্টে-উল্টে দেখতে লাগলাম—পার্সোন্যালিটি প্রোফাইল অ্যানালিসিস থেকে কাজ আমাকে মুক্তি দেবে' এই উপদেশ-বাণী পর্যন্ত এবং আমার ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের সিম্বলটি জানা আছে কিনা তা-ও আমার হাতে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। আর একটি জিনিস ছিল অভিনয় ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে কলকাতার নাট্য-উৎসাহী যুবকবৃন্দের প্রতি ডঃ হ্যাচের প্রস্তাবমূলক প্রবন্ধ।

—নান্দীকর

দেশী ছবির খবর

শ্রীলোকনাথ চিত্রমন্দিরের 'সাবরমতী' ছবিটি বর্তমানে চলচ্চিত্রে রূপ দিচ্ছেন পরিচালক হীরেন নাগ। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে এ চিত্রের প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, ছায়া দেবী, দীপ্তি রায়, পদ্মা দেবী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রূপক মজুমদার। দেবেশ ঘোষ প্রযোজিত এ ছবিটির পরিবেশক শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স।

সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'অপরিচিত' ছবিটি পরিচালনা করছেন সলিল দত্ত। রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরকৃত এ ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সন্ধ্যা রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, বিকাশ রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী ও উৎপল দত্ত। চণ্ডীমাতা ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

চলচ্চিত্র ভারতীর 'কখনো মেঘ' ছবিটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত। প্রশান্ত দেবের কাহিনী অবলম্বনে এ চিত্রটি পরিচালনা করেছেন অগ্রদূত। কাহিনীর উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্কিম ঘোষ ও তরুণ মিত্র। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত। ডি ল্যুকস্ ফিল্ম ছবিটির পরিবেশক।

অসীমা ভট্টাচার্য প্রযোজিত পম্পি ফিল্মসের 'চৌরঙ্গী' ছবিটি পরিচালনা করছেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়। শঙ্কর রচিত এই জনপ্রিয় কাহিনীটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, বিশ্বজিৎ, অঞ্জনা ভৌমিক, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ ও উৎপল দত্ত। দেবালী পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

সতীর্থ প্রোডাকসন্সের 'তিন ভুবনের পারে' চিত্রের দৃশ্য গ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। সমরেশ বসু রচিত এ কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তনুজা, তরুণকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, যমুনা সিংহ, পদ্মা দেবী, কমল মিত্র এবং রবি ঘোষ। সুধীন দাশগুপ্ত সুরকৃত এ ছবিটির পরিবেশক রুমা ফিল্ম।

কে পি মুভিজের রঙিন ছবি 'পরিবার' মুক্তিপ্রতীক্ষিত। ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন কেওরল পি কাশ্যপ। ভূমিকালিপিতে রয়েছেন নন্দা, জীতেন্দ্র, সুলোচনা চ্যাটার্জি, রাজেন্দ্রনাথ, রণধির ও মাধবী। কল্যাণজী-আনন্দজী ছবিটির সুরকার।

সম্প্রতি ফেমাস সিনে ল্যাবরেটরীতে 'কৈ শুন লেগা' ছবির সংগীত গ্রহণ শেষ হল। সংগীত পরিচালনা করলেন গণেশ। ভীষরাম বেদেকর পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন পৃথিরাজ কাপুর, মমতাজ, জয়ন্ত, উল্লাষ, মবারক, কৃষ্ণা মেহতা ও লক্ষ্মীছায়া।

কাহিনীকার-পরিচালক সুন্দর দার সম্প্রতি বোম্বাই অঞ্চলে 'রুখো না কর' চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণ শেষ করলেন। কাহিনীর মুল চরিত্রে রূপদান করেছেন নন্দা, শশি কাপুর, নাজ ও সুলোচনা। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন সি রামচন্দ্র।

পরিচালক বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তীর চলতি ছবি 'দিবা রাত্রির কাব্য'র বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্যে সম্প্রতি তাঁরা সদলবলে কোনারক ও পুরী ঘুরে এলেন। বহির্দৃশ্যের মধ্যে সুবিখ্যাত কোনারকের সূর্যমন্দিরের অপূর্ব স্থাপত্যশিল্পের পটভূমি, পুরীর মহাবীরের মন্দিরের পবিত্র পরিবেশ, ঘন-সবুজ ঝাউবনের অভ্যন্তর ও সমুদ্রতীরের সুন্দর ব্যাক-গ্রাউন্ড। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এ-কাহিনীর চিত্র গ্রহণে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, অঞ্জনা ভৌমিক ও নবাগত প্রতিভাবান স্বপন রায়।

এই ছবির চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও সংগীত পরিচালনায় আছেন যথাক্রমে কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সন্তোষ গাঙ্গুলী ও প্রখ্যাত তিমিরবরণ। পরিবেশনা : স্প্যান ফিল্মস।

বিদেশী ছবির খবর

চেকোশ্লোভাকিয়ার ছবি

নিউইয়র্কে চেকোশ্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসবের সময় উৎসব পরিচালক অ্যামস ভোগল্ বলেছিলেন, উৎসবটি নাকি ছিল "আউটস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড হ্যাড্ রিয়েলি সেন্সেশনাল শকসেস্—রিয়েলি এ সাক্‌শেস্ দ্যাট ফার এক্সিডেড্ আওয়ার মোস্ট অপ্‌টিমিস্টিক এক্সপেক্টেশনস।" কিছুদিন আগে প্যারিসের ছ'টা প্রেক্ষাগৃহে আর ফ্রান্সের চব্বিশটা শহরে যখন ব্যাপকভাবে এক চেকোশ্লোভাক চিত্র উৎসব হয়ে গেল, তখনও সেখানকার পত্রিকার পাতায় পাতায় তার প্রশংসা ছড়িয়েছিল। অতদূরে হাতড়াবার প্রয়োজন নেই, এই আমাদের কলকাতায় যখন প্রথম সাতখানা ছবি নিয়ে উৎসব শুরু হয়, তখন এখানকার চিত্রামোদী-সাধারণের মধ্যেও কম উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়নি! তাঁদের এই কৌতূহল অহেতুকও নয়। ফোরম্যান, স্করম, চিট্‌লোভার অসামান্য সাফল্যের পর সে দেশের ছবি সম্পর্কে উৎসাহ থাকা স্বাভাবিক। জনৈক আমেরিকার সমালোচক নব্য ধারার চেক ছবিকে পুরাতনী সংস্কৃতি আর নতুন চিন্তার এক সুন্দর মিশ্রণ-জাত শিল্প হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

যদি কেউ বর্তমান চেক ছবির ধারা সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে এর উৎস খুঁজতে চেষ্টা করেন, তবে তিনি কোনো তথাকথিত 'স্কুল' বা 'ধারা' খুঁজে পাবেন না। বিভিন্ন পরিচালক, তাঁদের বিভিন্ন মানসিক কাঠামো ও তাঁদের ছবির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এর উৎস। এ'দের অনেকেই তাঁদের ব্যক্তিগত দর্শন ও চিন্তার মধ্য দিয়ে নতুন এক ধারার প্রবর্তন করেছেন। মোটকথা সমুদ্র এক, ঢেউ আলাদা। কোনটা ছোট, কোনটা বড়, কোনটা কম উঁচু, কোনটা বেশী আবার। তবে এটা সত্য যে, বর্তমান চেক্ চিত্র-জগতের যে অ্যাসেট অর্থাৎ আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাওয়ার যে কৃতিত্ব, তা কিন্তু জাঁ কাদার—এলমার ক্লোস্ থেকে শুরু করে জার্সান, ব্রাইনিচ্ ভ্যাসিল এর মধ্য দিয়ে ফোরম্যান, স্করম্ ও নিমেক্-এর কাছে এসে মাথা ঠেকেছে। বছরের পর বছর ধরে যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও পুরস্কারাদি পেয়ে আসছে চেক্ ছবি, অনেক লোকের মুখে তাই আজ শোনা যাচ্ছে যে, চেক ছবি এভাবে 'দম বন্ধ' করা দৌড় ক'দিন দিতে পারবে? যারা আশাবাদী, তারা একটু বেশী আশা করবেন, আবার যাঁরা নৈরাশ্যবাদী, তাঁরা 'দম বন্ধ' করা দৌড়ের আয়ু সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করবেন। যাই হোক, নিরপেক্ষভাবে ওদের দেশের ছবির প্রযোজনার দিকটা দেখা যাক। ১৯৬৭ সনের প্রায় শেষ অবধি ব্রান্দভ্ স্টুডিও ১৮-খানা ছবি তৈরি করেছে, ৯-খানা মুক্তি-প্রতীক্ষায়, ১১-খানা ছবির কাজ হচ্ছে আর তিনখানা ছবির কাজ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। ঐ সময়েই ব্রাতিস্লাভ স্টুডিওয় পাঁচখানা ছবি হয়েছে, ৬-খানা রয়েছে মুক্তি-প্রতীক্ষায় আর পাঁচখানা রয়েছে স্টুডিও ফ্লোরে।

যে সব ছবির কাজ শেষ হয়ে গেছে তার মধ্যে তরুণ পরিচালক জাকুবিস্কোর 'ইনডিসিসিভ্ ইয়ারস' গত ম্যানহেম চিত্র উৎসবে উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। আর রয়েছে ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে তোলা ভ্যাসিল-এর 'মার্কেট লাজারেভো', স্করম্ এর 'ফাইভ গার্লস টু কোপ উইথ' আর কার্লোপর্সিটর সঙ্গে যুগ্ম প্রযোজনায় ফোরম্যানের 'লাইক এ হাউস অন ফায়ার'। ভ্যাসিল আর ফোরম্যানের ছবি নিয়ে ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা চলছে। স্করম এর ছবি নিয়ে প্রাগ্ এর একটি পত্রিকা লিখছে—"আমি স্করমের অনুরাগী কারণ সে তার উপযুক্ত, কেউ কেউ হয়ত ভাবতে পারেন যে উনি যখন কোন শিশু পুস্তক প্রকাশক সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত কোন বই নিয়ে ছবি করছেন উনি বোধহয় তাহলে তার আগামী ছবির কাজের আগে একটু 'বিশ্রাম' করে নিচ্ছেন। কিন্তু স্করম্ তা জানেন না এবং তিনি তা কোনদিনই করবেন না। সুতরাং আমরা যদি 'ফাইভ গার্লস টু কোপ উইথ' ছবির সঙ্গে তাঁর আগের ছবি 'এভরিডে কারেজ' বা 'রিটার্ন অফ দি প্রডিগ্যাল সন' এর তুলনা করি তাহলে লক্ষ্য করব যে এই ছোটদের বইটা বেছে নেওয়ার মধ্যে তাঁর চিন্তার গভীরে যে মানসিক ঐক্যের সুর সেটাই কাজ করেছে।"

"আমরা আরও একবার এমন একটা চরিত্রের সামনে এলাম যে একাকীত্বের জ্বালায় সব কিছু থেকে বিচ্যুত। এবারের এ চরিত্রটা হচ্ছে একটি মেয়ের যে কৈশোর আর যৌবনের মাঝামাঝি অবস্থায় দাঁড়িয়ে। আগের ছবির নায়কদের মত এই নায়িকাও সাধারণ সরল হতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি। মানসিক উত্তেজনা ও অনভিমানজাত

চেক্ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এর উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন চেক কন্সাল শ্রীযোসেফ কাফ্‌কা।　　ফটো : অমৃত

এবার আপনার মনের মতো গানবাজনা শোনার সুন্দর সুযোগ !

এইচ এম ভি

'ফিয়েস্টা' আর 'ক্যালিপ্সো'র

নতুন দাম

এখন আপনার নাগালের মধ্যে

ক্যালিপ্সো

রেকর্ড প্লেয়ার রেডিওর মারফত বাজাতে হয়

দাম—১৭৫ টাকা ৬০ পয়সা

বিক্রয় কর আলাদা

অতি সহজেই আপনার রেডিওর সঙ্গে জুড়ে রেডিওগ্রামের মত ব্যবহার করতে পারেন। এতে সবরকম স্পীডের রেকর্ডই বাজানো যায়—৭৮, ৪৫, ৩৩ ১/৩ (এল পি), এমন কি ১৬ ২/৩ আর-পি-এম পর্যন্ত। এসি ও ব্যাটারীচালিত—দুরকম মডেল। সহজ-সরল নির্ভরযোগ্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা। আধুনিক সুবহ 'র‍্যাপ-অ্যারাউণ্ড' ক্যাবিনেট—দেখতেও সুন্দর।

ফিয়েস্টা

রেকর্ড প্লেয়ার

দাম—২৯২ টাকা ৬০ পয়সা

বিক্রয় কর আলাদা

আধুনিক কালের স্বয়ংসম্পূর্ণ ৪-স্পীডের অ্যাম্প্লিফায়ারযুক্ত গ্রামোফোন। এসি ও ব্যাটারীচালিত—দুরকম মডেল। এতে ৭৮, ৪৫, ৩৩ ১/৩ (এল পি), এমন কি ১৬ ২/৩ আর-পি-এম পর্যন্ত যে কোনো স্পীডের রেকর্ড বাজানো যায়। জোরালো ইলিপটিক্যাল স্পীকার। অটোমেটিক অন্/অফ্ সুইচ। এক পীস কাঠে তৈরী সুন্দর 'র‍্যাপ-অ্যারাউণ্ড' ক্যাবিনেট—বেজায় মজবুত।

ব্যবহারে ও উপহারে অনবদ্য —
এইচ এম ভি 'ফিয়েস্টা' আর 'ক্যালিপ্সো'

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

কাজে ভালো, দামে কম

GC 4382

অস্বাভাবিক সংক্ষুব্ধ জ্বালা নিয়ে স্করম্ আবার এমনভাবে আলোচনা করেছেন যার ফলে পরিচালকের একবারে নিজস্ব এক প্রকাশভঙ্গীর রূপায়ন দেখা গেছে। আর এ ব্যাপারেই সাধারণ উদাসীনতা অবলম্বনে রাজী নয়।"

মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবির মধ্যে জিরনিক্ ব্রিনিথ এর 'আই জাস্টিস' অন্যতম। কাল্পনিক এক কাহিনী নিয়ে এ ছবি পরিচালকের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর ও প্রয়োগ-পদ্ধতির দক্ষতার পরিচয়ই দেয়। কয়েকজন জার্মান সৈনিকের হাতে বন্দী হিটলারের বিচার এ ছবির মূল বস্তু।

আর যে সব ছবির কাজ বর্তমানে প্রায় শেষ পর্যায়ে তার মধ্যে রয়েছে জনৈক অফিসারের অফিসে একদিনের কাজকর্ম ও তার মানসিক বিবর্তন নিয়ে তোলা লাদিশ্লাভ হেজের্ এর 'শেম'; ভ্লাদিশ্লাভ ভাঙ্কুরার কবিতার মত একখানা সুন্দর ছোটগল্প নিয়ে তোলা হচ্ছে 'ব্রিথ সামার' —পরিচালক জিরি মেনসেল। 'দ্যাট ক্যাট' এর মত নাটকীয় ব্যাপারগুলোর ওপর জোর দেবার জন্য ভোজতেক জাস্নি একটা মোরাভিয়ান গ্রামের গত বাইশ বছরের ইতিহাসকে তুলছেন নতুন ছবি 'অল গুড ক্যান্ট্রিম্যান'। এ ছাড়াও রয়েছে স্টিফান উহর্ এর 'থ্রি ডটারস্', জিন্দ্রিচ্ পোলকের 'দি স্কাই রাইডার্স', জুরেজ হার্জ এর 'দি স্লিপিং ডেভিল' ও জিরি ক্রিজিক এর 'বেডটাইম স্টোরী' ও আরও কয়েকটা। তাছাড়া পূর্বোক্ত দুজন সর্বকনিষ্ঠ পরিচালক জাঁ মোরাভেক্ ও জাকুবিস্কো যথাক্রমে 'দি ম্যান হুজ্ প্রাইস্ ওয়েন্ট আপ' ও 'ডেসারটার্স' ছবি দুটোর কাজ ব্রাতিশ্লাভ স্টুডিওয় শেষ করে ফেলেছেন। উপরোক্ত ছবিগুলোর মধ্যে কোনটা বা কোন ছবিগুলো এ বছরে দর্শকদের ভালো লাগবে বা আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাবে তা যদিও এখন নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয় তবে আশা করা যায় গত বছর যেমন নিউইয়র্ক, প্যারিস প্রভৃতি শহরে ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হয়েছে চেক্ ছবি—এবারেও হবে। জীবনের প্রতি দৃষ্টি মেলে রেখে জীবনমুখী দর্শনের ছাপ যখনই এই চেক্ ছবিতে পড়েছে তখনই তা হয়ে উঠেছে সত্যকারের বাঙ্ময় শিল্প।

মঞ্চাভিনয়

পশ্চিমবঙ্গ শিশু কল্যাণ পরিষদের সাহায্যার্থে চিরকুমার সভা

গত ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনে গিয়েছিলাম 'চিরকুমার সভার' অভিনয় দেখতে দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে তা অস্বীকার করব না। প্রচারপত্রে দেখেছিলাম অভিনব শিল্পী সমাবেশ। তাঁদের কয়েকজনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের কোন খ্যাতি বা অভিজ্ঞতা আছে বলে শুনিনি। তার ওপর কবিগুরুর 'চিরকুমার সভা'র মত নাটক-অভিনয়ে সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু অনুষ্ঠান সুরু হতেই নাটক এত জমে উঠেছিল যে অনুভব করলাম প্রকৃতই কুশলী এক শিল্পী-গোষ্ঠী অবতীর্ণ হয়েছেন রঙ্গমঞ্চে, আর প্রচেষ্টা তাঁদের ব্যর্থ হবে না।

বাস্তবিকই সেদিন এক সুরুচিপূর্ণ নাটক দেখলাম স্বীকার করব সানন্দে। মঞ্চ, দৃশ্যপট, রূপসজ্জা, আলোকসম্পাত, আবহ-সঙ্গীত অভিনয় প্রত্যেকটি জিনিষ প্রায় ত্রুটিহীন হয়েছিল বললে অত্যুক্তি করা হবে না। বিরামের সময় বহু দর্শককে অকুণ্ঠিত ভাবে প্রশংসা করতে শুনেছিলাম, "এরকম সুন্দর নাটক আজকাল সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না"।

'চিরকুমার সভার' বিষয়বস্তু ও রস-পরিবেশন আজকের যুগে কিছুটা উদ্ভট ও সেকেলে বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু সেকালের বাঙালী সমাজের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, চালচলন, কথাবার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ, তরুণ-তরুণীদের মিলন সাধনের উপায় আজকের যুগে অপ্রাসঙ্গিক বা অচল বলে মনে হলেও নাটকটির কৌতুকরসপ্রবাহ যে এখনও সমানভাবে উচ্ছল ও উজ্জ্বল তা প্রমাণ হলো সেদিন সন্ধ্যায় প্রত্যেকটি দর্শকের কাছে। সংলাপ শুনে ও অভিনয় দেখে হেসেছেন ও উপভোগ করেছেন প্রত্যেকেই নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত— সফলতার এইটাই ছিল প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যুগ ও সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, রুচি ও সমাজ আজ ভিন্ন প্রকৃতর [illegible] রবীন্দ্রনাথের লেখনীর আবেদন চিরন্তন। চিরনবীন কবিগুরুর এই নাটকটিও তাই সর্বকালের— সময় ও সমাজ পরিবেশের ব্যবধান উপেক্ষা করে দর্শকবৃন্দ উপভোগ করলেন চিরনবীন এই নাটকের দৃশ্যের পর দৃশ্য।

অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্বাচনে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন পরিচালক, সন্দেহ নেই। সঙ্গীতজগতে খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট কয়েকজন শিল্পী নিয়ে যে অভিনয় অনুষ্ঠান সম্ভব হতে পারে এ ধারণা ছিল না অনেকেরই। তাই এদিক থেকে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি পরিচালকের, বরঞ্চ প্রথিতযশা সঙ্গীত শিল্পীদের অভিনয় বিশেষ আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল সকলের কাছে।

অবশ্য অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে হয় রসিক চরিত্র রূপায়ণে শ্রীকল্যাণ রায়ের পারদর্শিতা। সুকণ্ঠ ও পরিষ্কার বাচনভঙ্গীর সাহায্যে অপূর্ব রস-সৃষ্টি করেছিল তাঁর অভিনয়—দৃশ্যের পর দৃশ্যে সমস্ত নাটকটিকে তিনি সঞ্জীবিত করে রেখেছিলেন তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয়ের দ্বারা। একজন দক্ষ ও নিপুণ অভিনেতা তিনি সন্দেহ নেই, তা না হলে 'রসিকের' মত কঠিন চরিত্রে সফলতার সঙ্গে রূপদান করা সম্ভব হতো না তাঁর দ্বারা। সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তির অংশ কম করে দেওয়া হয়েছিল বোধহয় তাঁর অভিনয় অংশে— আবৃত্তি আরও একটু ভাল আশা করেছিলাম। চালচলনে আর একটু বয়সের প্রভাব এবং রূপায়ণে আরও একটু রোমান্টিক হলে বোধহয় তাঁর রূপায়ণ সর্বাঙ্গসুন্দর ও নিখুঁত হতো। তবে তিনি যে অভিনয় করেছেন তার তুলনা নেই।

শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের অক্ষয় অনবদ্য। এত স্বাভাবিক বাচনভঙ্গী, চলাফেরা, রসিকতা ও ঘরোয়া অভিনয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের
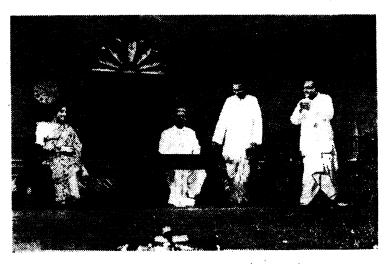
চিরকুমার সভা নাটকে রিণা ঘোষ, চারুপ্রকাশ ঘোষ, নির্মল চট্টোপাধ্যায় এবং কল্যাণ রায়

কোন অভিনেতার দ্বারা সম্ভব হয়েছে বলে মনে পড়ে না ইদানীং। ও'র বেশভূষা ও রূপ-সজ্জাও চমৎকার ও মানানসই হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'অক্ষয়' ও'র অভিনয়ে অত্যন্ত সাবলীল ও স্বাভাবিকভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। গানও ভাল হয়েছিল জ্ঞানবাবুর, তবে ও'র কাছে আরও ভাল গান আশা করেছিলাম। ও'র কণ্ঠ কেমন যেন নিস্তব্ধ শুনিয়েছিল সেদিন এবং প্রথমদিকে ও'র কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে অভিযোগ করেছিলেন পিছনের আসনের কিছু দর্শক। শ্রীচারুপ্রকাশ ঘোষ পাকা অভিনেতা। চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় ও'র চরিত্র-রূপায়ণ যে ত্রুটিহীন হবে এ-সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলেন। পর্দায় ও রঙ্গমঞ্চে চরিত্র-ভূমিকা অভিনয়ে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তবে তাঁর কণ্ঠস্বরও নীচু শুনিয়েছিল কিছুটা। চারুবাবুর রূপ-সজ্জাও চমৎকার। শ্রীশ, বিপিন, পূর্ণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে সুঅভিনয় করেছিলেন। শোভেন ঠাকুরের কণ্ঠস্বর ভাল তাঁর কথার মধ্যে কিছুটা জড়তা ছিল, তবু শ্রীশের চরিত্র যথোচিত রূপায়িত হয়েছিল তাঁর অভিনয়ে। বিপিনের ভূমিকায় শ্রীশুভেন মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত সরস অভিনয় করেছিলেন—সুন্দর কণ্ঠ ও স্বাভাবিক চাল-চলনে বিপিনের চরিত্র বেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। পায়ে আঘাত পেয়েও যে-মনোবল নিয়ে তিনি অভিনয় করলেন শেষ দৃশ্যের, তা সত্যই প্রশংসনীয়। পূর্ণর চরিত্র রূপায়ণে অতি-অভিনয় ও আতিশয্য দেখেছি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। কিন্তু শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সংযমী অভিনয়ের দ্বারা নাটকে বর্ণিত চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন সূক্ষ্ম-ভাবে রসসৃষ্টি করে। মুখের ভাব, কথা বলা, লাজুক স্বভাবের অভিব্যক্তি কোথাও এতটুকু বাড়াবাড়ি ছিল না। অথচ, রস-পরিবেশনও ব্যাহত হয়নি। কণ্ঠটিও ভাল নির্মলবাবুর। 'বনমালী' মন্দ নয়। দারুকেশ্বর ও মৃত্যুঞ্জয়ের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীজহর রায় ও শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায় তাঁদের পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কিছুটা অতিঅভিনয়ের সাহায্য নিলেও তাঁদের কৌতুক-অভিনয় দৃশ্যটিতে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছিল।
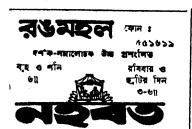
স্ত্রী-চরিত্রের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে আসে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের কথা। তাঁর নীরবালা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ধারণাই ছিল না যে, শ্রীমতী মিত্র এত সুন্দর অভিনয় করেন। এরকম উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত সপ্রতিভ অভিনয়, বিশেষত অক্ষয়ের সঙ্গে রসিকতার উত্তর-প্রত্যুত্তর, আদর-আবদার ইত্যাদির সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা দর্শকদের চমৎকৃত করে রেখেছিল সর্বক্ষণ। তাঁর গান সম্বন্ধে নতুন করে বলবার কিছু নেই। একাধারে সুগায়িকা ও সু-অভিনেত্রী এরকম মণিকাঞ্চন যোগাযোগ অন্য কোন শিল্পীর মধ্যে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। শ্রীমতী নমিতা সিংহ অত্যন্ত স্বচ্ছ, সহজ ও চরিত্রপোযোগী অভিনয় করেছিলেন 'পুরবালা'র ভূমিকায়। জ্যেষ্ঠা ভগিনী হিসাবে ও প্রিয় সহধর্মিণী হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছিল অভিনয়ে। অপেক্ষাকৃত শান্ত, সহজ ও মিষ্ট স্বভাবের 'নৃপবালা'র ভূমিকায় শ্রীমতী সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় সুন্দর। কমনীয়তা ও শ্রীমাধুর্যে সুমিত্রার অভিনয়ে লাবণ্য সঞ্চার করেছিল। শ্রীমতী অনিমা দাশগুপ্তা একজন প্রতিভাময়ী শিল্পী। প্রথমে বিধবা 'শৈলবালা'র ভূমিকায় 'রসিক' ও 'অক্ষয়ের' সঙ্গে তাঁর সরস কথাবার্তা ও পরে অবলাকান্ত বেশে পুরুষ চরিত্র রূপায়ণ ত্রুটিহীন হয়েছিল। নির্মলার ভূমিকায় শ্রীমতী রিনা ঘোষকে দেখিয়েছিল সুন্দর, চরিত্রের ব্যক্তিত্বও রূপায়িত হয়েছিল ঠিকই, তবে আরও জড়তা পরিত্যাগ করে, সংলাপ আরও ভালভাবে বলা আশা করেছিলাম তাঁর কাছে।

প্রত্যেকটি চরিত্রই সকলে নিষ্ঠা ও সংযমের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন বলেই কোথাও অতিঅভিনয়ে রস-পরিবেশন ব্যাহত হয়নি একটুও। সেদিনকার 'চির-কুমার সভা'র অভিনয়ে এই ছিল বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্র-সংলাপের মর্যাদা রক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন পরিচালকরা। মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট, রূপসজ্জা, বেশভূষা, আবহসংগীত, আলোকসম্পাত সবকিছুই যে সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল প্রথম দৃশ্যের অবতারণা থেকে। সামান্য কিছু কিছু কনট্রাস্ট ও প্রতীকের আভাসও দেখলাম। মোটের ওপর অভিনয় ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অভিবাদন জানাচ্ছি শ্রীশশাঙ্ক সোম, শ্রী ও সি গাঙ্গুলী ও শ্রীবিমান ঘোষকে।

দু-একটি সামান্য ত্রুটির মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য সকলের অভিনয়ের মধ্যেই গতি-হীনতা, যে-কারণে নাটকটি শেষ হতে সময় লাগলো অনেক। নাটকের সম্পাদনা কিন্তু প্রশংসনীয়। প্রথম দৃশ্য থেকে মাইক্রোফোন ব্যবহার করলে অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতো সম্পূর্ণভাবে।

সবশেষে এই কথাই বলা দরকার যে, 'অভিনব শিল্পী সমাবেশে' চিরকুমার সভা যদি আরো একবার মঞ্চস্থ হয় তো দর্শক সমাগম হবে আরও বেশী। কেননা, এরকম সুরুচিপূর্ণ, সৌখীন, সুষ্ঠু ও সুপরি-চালিত অভিনয় দেখবার জন্য ঔৎসুক্য জাগাই স্বাভাবিক।

।। স্বর্ণ ।।

সম্প্রতি 'নবাঙ্কুর' নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'স্বর্ণ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে। নাটকটি সার্থকভাবে পরিচালনা করেন শিবশঙ্কর দাস। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন—সমীর চট্টোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর দাস, স্বপন রায়-চৌধুরী, শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়, নিতাই রায়, সমীর রাহা, রীতা হালদার, জয়গোপাল পাল, খুকু ভট্টাচার্য, শান্তিরঞ্জন পাল, সুখেন চক্রবর্তী, পরিতোষ পাল, অসিত ঘোষ, রতন দাস।

বিবিধ সংবাদ

অহোরাত্র রবীন্দ্রজন্মোৎসব

সর্বসাধারণের তীর্থক্ষেত্র মহাজাতি সদনের দ্বার অহোরাত্র উন্মুক্ত থাকছে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনের জন্য। প্রত্যূষ পাঁচ ঘটিকায় এর শুভারম্ভ সমাপ্তি পর দিবস উষা পাঁচটায়। অহোরাত্রব্যাপী এই অনুষ্ঠানে সকাল থেকেই যোগ দেবেন সর্বস্তরের কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, মঞ্চ ও চিত্র জগতের অভিনেতা-অভিনেত্রী, সুর-শিল্পী; এবং নাটক, নৃত্যনাট্য পরিবেশনে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী। তারিখ ৮ মে (২৫শে বৈশাখ) দ্বিপ্রহরের অনুষ্ঠান কেবল শিশুদের জন্য। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা নাট্য সম্মেলন, সহযোগিতায় মহাজাতি সদন অছি পরিষদ।

বারাণসী বঙ্গীয় সমাজ

প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম পীঠ-স্থান বারাণসী, এখানকার বাঙালীর সাংস্কৃতিক সংস্থা বঙ্গীয় সমাজ শুভ নববর্ষে এক বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। উৎসবে যোগদানের জন্য কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী ও শ্রীনন্দগোপাল সেন-গুপ্ত। সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী বর্তমান বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত বর্তমান বাঙালী সমাজের আত্মিক ও আর্থিক দুর্গতির কথা উল্লেখ করেন। উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এক শিল্প প্রদর্শনীতে ওরেয়িন্টাল আর্ট ও কনটেম্পোরারী আর্ট উভয় শ্রেণীর শিল্পীর ছবি স্থান পায়। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শান্তিরঞ্জন বসু, মন্মথ দাস, সুধীন লাহিড়ী, দিলীপ দাশগুপ্ত ও আরও অনেকে। শান্তিনিকেতন থেকে আগত শ্রীসনাতনদাস ঠাকুর পরিবেশন করেন বাউল গান এবং লোকসংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী যোগমায়া দেবী। রবীন্দ্র-

সঙ্গীতে অংশ নিয়েছিলেন গগন দে ও চামেলী দে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন ডঃ সুপ্রকাশ ভট্টাচার্য।

যাদুকর চক্রের উদ্যোগে যাদু প্রদর্শনী

আগামী রবিবার ১২ মে চন্দননগর যাদুকর চক্রের সভ্যগণ সকাল ৯টায় রঙমহলে এক যাদু প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। সংস্থার সভ্যগণ এই অনুষ্ঠানে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করবেন। প্রতি বছরের মতো এবারও বহু নতুন নতুন খেলা এই প্রদর্শনীতে স্থান পাবে।

যাদুসম্রাট পি সি সরকারের সম্বর্ধনা

গত ২১ এপ্রিল খিদিরপুর কবিতীর্থে শিশু ও কিশোর প্রতিষ্ঠান 'স্কাইলার্ক' পরিচালিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত যাদুকর শ্রীপি সি সরকারকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে সভানেতৃত্ব করেন শ্রীমতী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতির বিবরণ দেন। প্রখ্যাত রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পী শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস, উদীয়মান যাদুকর শ্রীকৃষ্ণকান্ত বাগচী এবং সংস্থার অন্যান্য শিশুশিল্পীদের অনুষ্ঠান উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রভূত আনন্দ দেয়। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীসরকার তাঁর দেশ-বিদেশে যাদু প্রদর্শনের বিবরণ দেন।

তিনি এ প্রসঙ্গে আমাদের দেশের দর্শকদের সূক্ষ্ম রসবোধের অভাবের কথা উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং আশা করেন ব্যাপক উন্নতি ও প্রসারের।

ঝরিয়ায় নববর্ষ উৎসব

গত বাংলা শুভ নববর্ষে ঝরিয়ার বাঙালীগণ কর্তৃক তাঁদের নববর্ষ সম্মেলন ৪৬তম অধিবেশন উপলক্ষে অন্যান্য অনুষ্ঠানের সহিত দুদিন দুটি নাটক অভিনীত হল। প্রথমদিন শ্রীনীরেন দত্ত পরিচালিত শ্রীশৈলেশ গুহ নিয়োগী রচিত 'কলেজ হোস্টেল' এবং দ্বিতীয়দিন শ্রীযতীন গুপ্ত পরিচালিত শ্রীপার্থপ্রতিম চৌধুরী রচিত 'ছায়া নায়িকা' মঞ্চস্থ হয়। প্রথমদিনের নাটকে সুঅভিনয়ের জন্য শ্রীমানবেন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীউজ্জ্বল চ্যাটার্জী ও শ্রীশিবচরণ চ্যাটার্জী পুরস্কৃত হন। এ ভিন্ন উভয় নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন—শ্যামল চৌধুরী, তারাশংকর করহাই, শ্যামাপদ সরকার, চন্দন ঘোষ, অনুপ চৌধুরী, নারায়ণ দে, অতুল দত্ত, তুষার মুখার্জী, অজয় রায়চৌধুরী, যতীন্দ্র-নাথ ঘোষ, পঙ্কজ দত্ত, বিশ্বনাথ সরকার, সলিল রায়, অমর ঘোষ, নীরেন দত্ত, অসীম চ্যাটার্জী, চিত্তরঞ্জন দাস, বিশ্বনাথ মুখার্জী, যতীন গুপ্ত, রঞ্জন মুখার্জী, শেফালী দে, সান্ত্বনা ঘোষ।

নিখিল বঙ্গ তরুণ নাট্যকার সমিতি

সম্প্রতি নিখিল বঙ্গ তরুণ নাট্যকার সমিতির এক ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দাদাঠাকুর, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী ও বাজী সরকারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিভিন্ন তরুণ নাট্যকার মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। তারপর সমিতির সভাপতি লক্ষ্মণ বন্দোপাধ্যায় নাট্যকারের প্রতিবাদে 'জাতি নাট্য সংগ্রাম সমিতি' যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলেছে তার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানান এবং সেই সঙ্গে ডেপুটি মেয়র ও কর্পোরেশনের অর্থ-কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান যে উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্যও ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় যথা সম্ভব শীঘ্র নাটকের প্রত্যাহার করার কথা বিবেচনা করবেন।

শিশুকেন্দ্রের 'তাপসী মীরা' নাটকে নিবেদিতা ভট্টাচার্য ও পুরবী ভট্টাচার্য। ফটো : অমৃত

শিশুকেন্দ্রের বসন্ত উৎসব

শিশুকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই কম। উত্তর কলকাতার ১৭৮, শ্রীঅরবিন্দ সরণী, কলকাতা-৪এ অবস্থিত 'শিশুকেন্দ্র' প্রতিষ্ঠানটি এই অভাব বহুলাংশে মোচন করেছে বলে তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মোদ্যম ইতি-মধ্যেই সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বসন্ত উৎসবের প্রথম পর্বে গত ২৪ মার্চ, ১৯৬৮, তারিখে শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শ্রীঅরবিন্দ সরণীতে অনুষ্ঠিত হয়।

বসন্ত উৎসবের দ্বিতীয় পর্বে গত ২১ এপ্রিল, ১৯৬৮, সন্ধ্যায় শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'শিশুকেন্দ্র সরোজিনী দে পাঠাগার'-এর দ্বারোদ্ঘাটন ও শিশুকেন্দ্রের শিশু সদস্যবৃন্দ কর্তৃক 'তাপসী মীরা' গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডঃ বলাইচন্দ্র পাল, শিশুকেন্দ্রের পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করে এই সংস্থার কার্যাবলীর প্রশংসা করেন।

পরে শ্রীকালীপদ ঘোষের পরিচালনায় 'তাপসী মীরা'র অভিনয় বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়। পুরবী ভট্টাচার্য, নিবেদিতা ভট্টাচার্য জয়ন্তী পাল, কাবেরী পালিত, কাবেরী রায়চৌধুরী, সুদেষ্ণা মুখার্জি, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র মুখার্জি, গণেশ হালদার, ঊর্মিতা হালদার, ইভা ভট্টাচার্য, লিলি শেঠ ও অন্যান্যেরা অপূর্ব অভিনয় করে। নিবেদিতা ও ইভার নৃত্য দর্শকবৃন্দকে আনন্দদান করে। শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সঙ্গীতাংশটি আকর্ষণীয় হয়। অনুষ্ঠানে সমবেত শিশুদের মনোমুগ্ধকর দ্রব্যাদি উপহার দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়।

জলসা

চার্লি বার্ডের কনসার্ট

চার্লি বার্ড ও সম্প্রদায়ের কোয়ার্টেট কনসার্ট সংগীতজগতের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটি ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটের যুগ্ম উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার হলে পরিবেশিত এই অনুষ্ঠানের আগে পার্ক হোটেলের এক মনোজ্ঞ সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ বার্ডের সাঙ্গীতিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেছিল। শিল্পী পিতার কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া লোকসংগীতের দ্বারা সংগীতজীবন সুরু হলেও নিজস্ব এক সংগীতবোধ প্রথম থেকেই স্বাভাবিক সম্পদের মতই তাঁর করতলগত।

ক্লাসিক্যাল সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে জাজ মিউজিকও তিনি অধ্যয়ন করেছেন। ক্লাসিকেলের সুনিয়ন্ত্রিত শৃংখলায় বিশ্বাসী হলেও জাজ সংগীতের ইমপ্রোভাইজেসনের সম্ভাবনা তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে! এই উভয় প্রকার সংগীতের আলোচনা প্রসংগে—চার্লি বলেন, সুর বা স্বর ক্ল্যাসিকাল সংগীতের মূল প্রেরণা। জাজসংগীতে ছন্দটাই বড়। ক্ল্যাসিকালের স্বরসমন্বয় ও জাজসংগীতের ছন্দের সম্মেলন তাঁর মৌলিক অবদান।

"ভারতীয় সংগীতের ফিলসফি আমায় মুগ্ধ করেছে। এ সংগীত আমার কাছে শুধুমাত্র নতুন শব্দসম্পদবৃদ্ধিরই সহায়ক নয়—সংগীতশিক্ষক হিসাবেও আমায় নতুন আলো দিয়েছে।"

এরপরই বিদেশী অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য জুনিয়র স্টেটসম্যান ও ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটি আয়োজিত এক কনসার্টের ব্যবস্থা ছিল। জাজ ও পপ মিউজিকের ভিত্তিতে রচিত এই অনুষ্ঠান-সূচীর অন্তর্ভুক্ত চার্লস ম্যান্ডার রচিত "ট্রিবিউট টু মহাঋষি মহেশ", "নিউ মি মোস্ট" "রোলিং স্টোন"—কৌতুক ও করুণ রসের এক অপূর্ব মিলন।

গোল পার্কের বিবেকানন্দ হলে চার্লি বার্ড (গীটার) মেরিও ডোরিনো (বাঁশী), বিল রিচেনবাক (ড্রাম), জো বার্ড (ব্যাসো) সম্মিলিত বাদ্য সুরু হয় চার্লির নিজস্ব রচনা "ব্লু-সোনাটা" দিয়ে। মন্দলয়ে সুরের অগ্রগতি উজ্জ্বল স্বর-সমন্বয়ের রামধনু বিদেশী সংগীতে অনভ্যস্ত মনকে তৈরী করে দিতে সময় নেয়নি। সংগীত-পরিচালক চার্লির পাণ্ডিত্য ও অন্তর্দৃষ্টি আপনার আকর্ষণেই শ্রোতৃচিত্তকে আকৃষ্ট করেছে।

চার্লির গীটার এবং ডোরিনার ফ্লুটের যুগলবন্দী একের শান্ত সংযত সুরবিস্তার অন্যের আবেগবিহ্বল তীব্র বেগময়তার অনুভবঘন মুহূর্তের সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয়াংশে আবেগে উজ্জ্বলতা ও প্রকাশব্যাকুলতায় শিল্পী যেন ছন্দ ও সুরের নৃত্যচঞ্চলো প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি দর্শককে উদ্বেল করেছেন। বাঁশীর আবেগ, ব্যাসো ও ড্রামের সওয়াল জবাবের (ভারতীয় সংগীতের অনুরূপ) উত্তেজনার মধ্যে চার্লির সংযম ও মন্দ্রসপ্তকে সুরের সীমিত প্রয়োগ ভারসাম্য রচনা করে সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানটিকে রসোত্তীর্ণ করেছে।

বিশেষ অনুরোধে এঁরা একটি সমবেত বাদ্য বাজিয়ে সহর্ষ করতালি ধ্বনির মধ্যে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

জীবনের গভীর দিকটির সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকরসের সমন্বয় এঁদের বাজনাকে এমন সার্থকমণ্ডিত করেছে।

রবীন্দ্রসংগীতের নতুন রেকর্ড

এবার রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে গ্রামোফোন কোম্পানী রবীন্দ্রসংগীতের কয়েকটি রেকর্ড বের করেছেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" নাটকখানি। মাত্র একখানি লং প্লেইং রেকর্ডে প্রকাশিত এই জনপ্রিয় নাটকখানি পরিচালনা করেছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য।

ঈ-পি রেকর্ড বেরিয়েছে, তাতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় চমৎকারভাবে গেয়েছেন—আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে; নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে; তুমি মোর পাও নাই পরিচয়; সেই ভালো সেই ভালো। সুমিত্রা মিত্র গেয়েছেন—ওই যে তরী দিল খুলে, সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি, চিত্ত পিপাসিত রে, ফিরবে না তা জানি। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন—আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে, দুজনে দেখা হল মধুযামিনী রে, তোমায় নতুন করেই পাব বলে, লক্ষ্মী যখন আসবে। অতুলনীয় পরিবেশন। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় গেয়েছেন—মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি, আছ আকাশপানে তুলে মাথা, আমার যেদিন ভেসে গেছে চোখের জলে, এবার আমায় ডাকলে দূরে। শ্যামল মিত্র গেয়েছেন—না, নাগো না, কোরো না ভাবনা, কিছু বলব বলে এসেছিলাম, হে মাধবী দ্বিধা কেন, জানি তোমার অজানা নাহি গো। ঋতু গুহ গেয়েছেন—এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, মম দুঃখের সাধন, মোর পথিকের বুঝি, তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে। অর্ঘ সেন এবং মানসী পালের দুখানি করে গান বেরিয়েছে। গান হল যথাক্রমেঃ অশ্রুনদীর সুদূর পারে, সীমার মাঝে অসীম তুমি এবং ওরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে, ওগো সাওতালি ছেলে। শৈলেন দাস, পূর্বা সিংহ, সাগর সেন, সুস্মিতা ঘোষের দুখানি করে গান আছে। সুমিত্রা সেন গেয়েছেন—মোর প্রভাতের এই, আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা, এদিন আজি কোন ঘরে গো, বনে যদি ফুটলো কুসুম। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন—অনেক কথা বলেছিলেম, অনেক দিনের মনের মানুষ, একদা তুমি প্রিয়ে, কত কথা তারে ছিল বলিতে।

৭৮ আর-পি-এম রেকর্ডে গেয়েছেন বুলবুল সেন—আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে এবং আমার ঢালা গানের ধারা। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন—রাতে রাতে আলোর শিখা এবং যাত্রী আমি ওরে। সীমা মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন—স্বপন পারের ডাক শুনেছি এবং আরো একটু বসো তুমি। সুশীল মল্লিক গেয়েছেন—পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে এবং আমি হৃদয় আমার যায় যে ভেসে। রবীণ চৌধুরী গেয়েছেন—আবার যদি ইচ্ছা কর এবং মন রে ওরে মন। মন।

প্রতিটি গান অতি যত্নের সঙ্গে নিখুঁত আঙ্গিকে শিল্পিগণ পরিবেশন করেছেন। রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে এই বিচিত্র উপচারের জন্য হিজ মাস্টার্স ভয়েস এবং কলাম্বিয়া রবীন্দ্রসংগীতের অনুরাগীদের ধন্যবাদভাজন হবেন।

বড়ে গোলাম আলির শোকসভায় চার্লি বার্ড ও সম্প্রদায়

ক্রিয়েটিভ ক্লাবের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত অদ্রিজানাথ মুখোপাধ্যায় আহূত 'বড়ে গোলাম আলির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনার্থ এক শোকসভায়—বিদেশী বন্ধু চার্লি বার্ড ও সম্প্রদায় আমাদের বেদনায় সমবেদনা জ্ঞাপনার্থে মিলিত হয়েছিলেন। "সংগীত মিলিত করে, কিন্তু বিভেদ ঘটায় রাজনীতি" এ সত্যকে নতুন করে অনুভব করলাম যেন।

সর্বশ্রী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, কালিদাস সান্যাল, অদ্রিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের ছোট কিন্তু অনুভব গভীর ভাষণে এই বিরাট সংগীতব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক উদ্ভাসিত হয়।

অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় ধ্রুপদী অঙ্গে ওস্তাদ মহিনুদ্দিন ডাগারের 'যোগ' রাগে পরিবেশিত আলাপের বিলম্বিত অঙ্গ দিয়ে। উভয় রাগই বেদনাশ্রিত।

চিত্রাঙ্গদা

প্রতিদিন
প্রতিঘরে
লক্ষ্মী ঘি
সকলকে তৃপ্তি দেয়
LAKHMI
LAKHMIDAS PREMJI
লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার বেশ
সুস্বাদু ও হৃদ্য হয়
LG 4/67

অলিম্পিক পরিক্রমা

ক্ষেত্রনাথ রায়
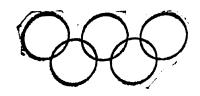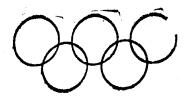
মেক্সিকো সিটির ইউনিভারসিটি স্টেডিয়ামে আগামী অক্টোবর মাসে আধুনিক **কালের ১৯তম অলিম্পিক** গেমসের আসর **বসছে। প্রাচীন গ্রীসের সুমহান অলিম্পিক গেমসের আদর্শ এবং ঐতিহ্যের** অনুপ্রেরণায় **১৮৯৬ সালে** এথেন্সে এই আধুনিক **কালের অলিম্পিক** গেমসের প্রথম আসর **বসেছিল। সেই সময়** থেকে প্রতি চতুর্থ **বৎসরে অলিম্পিক** গেমসের আসর বসার **কথা। কিন্তু** দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে ৩ **বার অলিম্পিক** গেমসের আসর নির্দিষ্ট **বছরে** বসেনি—১৯১৬ সালে বার্লিনে, **১৯৪০ সালে** টোকিওতে এবং ১৯৪৪ সালে **লণ্ডনে।** এই অলিম্পিক গেমসের প্রভাব **সারা পৃথিবী** জুড়ে। সমস্ত সভ্য দেশ **অলিম্পিক** গেমসে অংশ গ্রহণ করে থাকে। **অলিম্পিক গেমস** এখন সভ্যদেশের ঘরে **ঘরে এক** অতি প্রিয় নাম। অলিম্পিক **গেমস হল** বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতীক এবং **অলিম্পিক আসর**—নিঃসন্দেহে মানবজাতীয় **এক** মহান মিলনক্ষেত্র। আর অলিম্পিক **ক্রীড়ানুষ্ঠানের** স্বর্ণপদক জয়—বিশ্ব খেতাব **লাভের সমতুল্য।**

মানুষের আহার-বিহার বেশভূষা, **শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম,** সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-**ভাস্কর্য, খেলাধুলো** এবং আরও বিবিধ **ক্রিয়াকর্মের সমন্বয়ে** যে মানব সভ্যতা গড়ে **উঠেছে তা** কোন একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ **অথবা** চিরস্থির নয়—সর্বদাই পরিবর্তন-**শীল এবং** নিজের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও সম্প্রসারিত। বর্তমান যুগের মানব **সভ্যতার** উপর বিজ্ঞানের প্রভাব **অপরিসীম।** এই বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের রুজি-রোজগারের পথের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পথ অর্থাৎ পেশাও এক-**রকম** নয় বহু রকমের। ফলে মানুষের দৌড়-ঝাঁপের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। এক সময়ে নানা প্রয়োজনের তাগিদে মানুষকে যথেষ্ট দৌড়-ঝাঁপ করতে **হয়েছে।** পশু, পক্ষী প্রভৃতির আক্রমণ **প্রতিহত** করতে অথবা খাদ্য সংগ্রহের তাগিদে মানুষ কত না দৌড়-ঝাঁপ করেছে এবং হাতিয়ার হিসাবে বর্শা, পাথর প্রভৃতি নিক্ষেপ করেছে। কেতাদুরস্ত নাগরিক **জীবনে** এদের প্রয়োজন হ্রাস পেলেও গ্রাম্য-**জীবনে** আজও তাদের যথেষ্ট প্রয়োজন **আছে।** দৌড়-ঝাঁপ এবং ঢিল ছোড়ার মধ্যে কি **অফুরন্ত** আনন্দ! গ্রামের ছেলে-মেয়েদের **কাছে** তা খুবই মজার খেলা। **খেলাধুলোর বংশ** তালিকায় এই ছেলে-**খেলাগুলিই হল** আদি পুরুষ। গ্রামের ছেলেমেয়েদের এই প্রাচীন খেলাগুলি স্কুল-কলেজে নব কলেবরে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আরও বড় কথা, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক গেমসের তালিকায় এই সব খেলা সম্মানজনক স্থান করে নিয়েছে। বিশ্ব এ্যাথলীটদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের প্রধান **পরীক্ষাকেন্দ্র** হল অলিম্পিক গেমসের আসর। এই আসরে স্বর্ণপদক লাভের গুরুত্ব—বিশ্ব খেতাব জয়। অলিম্পিক খেতাব জয়ের জন্য এ্যাথলীটদের কি আশা-উদ্দীপনা এবং কঠোর সাধনা! আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে এ্যাথলীটদের সাহায্যার্থে দেশের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকেরা এগিয়ে এসেছেন। বিরাট বিরাট গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। সকলেরই লক্ষ্য এক—আরও কম সময়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব পথ অতিক্রম করা, লাফ দিয়ে আরও বেশী উচ্চতা এবং দূরত্ব লংঘন করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসন্ন মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসের প্রাক্কালে বিগত ১৫টি অলিম্পিক গেমসের প্রতিটি অনুষ্ঠানের ফলাফল সম্পর্কে ক্রীড়ানুরাগী মাত্রেরই উৎসাহ স্বাভাবিক। তাঁদের আগ্রহ নিরসনের জন্য বর্তমান নিবন্ধে এ্যাথলেটিক্সের হাইজাম্প অনুষ্ঠানের পর্যালোচনা করা হল।

হাই জাম্প

পুরুষ বিভাগ

অলিম্পিক হাইজাম্পের পুরুষ বিভাগে মাত্র এই চারটি দেশ স্বর্ণ পদক জয় করেছে—আমেরিকা ১১টি, রাশিয়া ২টি (১৯৬০ ও ১৯৬৪) এবং ১টি করে কানাডা (১৯৩২) এবং অস্ট্রেলিয়া (১৯৪৮)। মোট পদক জয়ের তালিকায় আমেরিকারই শীর্ষস্থান—মোট পদক সংখ্যা

॥ হাইজাম্প—পুরুষ বিভাগ ॥

বৎসর	উচ্চতা		বিজয়ী	দেশ
	ফিট	ইঞ্চি		
১৮৯৬	৫	১১ ১/৪	ই এইচ ক্লার্ক	আমেরিকা
১৯০০	৬	২ ৩/৪	আই কে বাক্সটার	আমেরিকা
১৯০৪	৫	১১	এস এস জোন্স	আমেরিকা
১৯০৮	৬	৩	এইচ এফ পোর্টার	আমেরিকা
১৯১২	৬	৪	এ ডবলিউ রিচার্ডস	আমেরিকা
১৯২০	৬	৪	আর ডবলিউ ল্যাণ্ডন	আমেরিকা
১৯২৪	৬	৬	এইচ এম ওসবর্ণ	আমেরিকা
১৯২৮	৬	৪ ৩/৮	আর ডবলিউ কিং	আমেরিকা
১৯৩২	৬	৫ ৫/৮	ডি ম্যাকনাউটন	কানাডা
১৯৩৬	৬	৮	সি সি জনসন	আমেরিকা
১৯৪৮	৬	৬	জে এ উইণ্টার	অস্ট্রেলিয়া
১৯৫২	৬	৮ ৫/১৬	ডবলিউ এফ ডেভিস	আমেরিকা
১৯৫৬	৬	১১ ১/৪	চার্লস ডুমাস	আমেরিকা
১৯৬০	৭	১	রবার্ট স্যাভালকাজে	রাশিয়া
১৯৬৪	৭	১ ৩/৪	ভ্যালেরী ব্রুমেল	রাশিয়া

॥ হাইজাম্প—মহিলা বিভাগ ॥

বৎসর	উচ্চতা		বিজয়িনী	দেশ
	ফিট	ইঞ্চি		
১৯২৮	৫	২ ৯/১৬	ই ক্যাথারউড	কানাডা
১৯৩২	৫	৫ ১/৪	জে এম শিলী	আমেরিকা
১৯৩৬	৫	৩	আই স্যাক	হাঙ্গেরী
১৯৪৮	৫	৬ ১/৮	এ কোচম্যান	আমেরিকা
১৯৫২	৫	৫ ৩/৪	ই ব্র্যান্ড	দঃ আফ্রিকা
১৯৫৬	৫	৯ ১/৪	এম ম্যাকডেনিয়াল	আমেরিকা
১৯৬০	৬	০ ৩/৪	আইয়োলেণ্ডা ব্যালাস	রুমানিয়া
১৯৬৪	৬	২ ৩/৪	আইয়োলেণ্ডা ব্যালাস	রুমানিয়া

আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীট চার্লস ডুমাস ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ণ অলিম্পিকে ৬ ফিট ১১½ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম করে হাইজাম্পে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সূত্রে স্বর্ণপদক জয়ী হন।

...টি (স্বর্ণ ১১, রৌপ্য ৯ ও ব্রোঞ্জ ৬)। ...তীয় স্থানে আছে রাশিয়া—মোট পদক ...টি (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ১)। ...খানে উল্লেখ্য, অলিম্পিক গেমসে রাশিয়া ...থম যোগদান করেছে মাত্র ১৯৫২ সালে। ...তরাং ১৯৫২ সালের আগে অলিম্পিক ...মসের হাইজাম্প অনুষ্ঠানে আমেরিকা ...ল অপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ। আধুনিক কালের অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন বছর (১৮৯৬) থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত আমেরিকা হাইজাম্পে একাদিক্রমে ৮-বার স্বর্ণ পদক জয়ী হয়। আমেরিকার এই একটানা স্বর্ণপদক জয়লাভের পথে বাধা দেয় ১৯৩২ সালে কানাডা, ১৯৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়া এবং ১৯৬০ ও ১৯৬৪ সালে রাশিয়া। যুদ্ধোত্তর কালের বিগত পাঁচটি অলিম্পিকের মোট ১৫টি পদকের মধ্যে আমেরিকা পেয়েছে ৭টি পদক—১৯৪৮ সালে ব্রোঞ্জ, ১৯৫২ সালে স্বর্ণ ও রৌপ্য, ১৯৫৬ সালে স্বর্ণ, ১৯৬০ সালে ব্রোঞ্জ এবং ১৯৬৪ সালে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক। একই বছরের অলিম্পিক আসরে আমেরিকা হাইজাম্পের স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক জয়ী হয়েছে ৫ বার এবং তিনটি পদকই (স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ) পেয়েছে ২ বার (১৮৯৬ ও ১৯৩৬)। আমেরিকা ছাড়া আর কোন দেশ একই বছরের অলিম্পিক আসরে হাইজাম্পের তিনটি পদকই জয়ী হয়নি। সুতরাং এই দুর্লভ সম্মান লাভের অধিকারী একমাত্র আমেরিকা। অলিম্পিকের হাইজাম্পের ৬ ফিট উচ্চতা অতিক্রমের প্রথম নজির সৃষ্টি করেন আমেরিকার আরভিং বাক্সটার ১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকে। তিনি ৬ ফিট ২¾ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম করে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিলেন।

৭ ফিটের প্রথম নজির

অলিম্পিকের হাইজাম্পে ৭ ফিট উচ্চতা অতিক্রম করার প্রথম নজির সৃষ্টি হয় ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে—রাশিয়ার রবার্ট স্যাভালাকাজে (৭' ১¼") এবং ভ্যালেরী ব্রুমেল (৭' ১¼"), আমেরিকার জন টমাস (৭' ০¼") এবং রাশিয়ার ভি বলশোভ (৭'-০¼")। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হন। দ্বিতীয় দফায় এই ৭ ফিট উচ্চতা অতিক্রান্ত হয় ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে—রাশিয়ার ব্রুমেল (৭'-১¾"), আমেরিকার জন টমাস (৭'-১¾") এবং জন রাম্বো (৭'-১"), সুইডেনের এস প্যাটারসন (৭'-০¾") এবং রাশিয়ার রবার্ট স্যাভালাকাজে ৭ ফিটের গাঁট অতিক্রম করেন।

একজনের দুবার স্বর্ণপদক জয়

পুরুষ বিভাগের হাইজাম্পে একজনের পক্ষে দুবার স্বর্ণপদক জয়ের কোন নজির নেই। মহিলা বিভাগে রুমানিয়ার আইয়োলেন্ডা ব্যালাস ১৯৬০ এবং ১৯৬৪ সালে স্বর্ণপদক জয়লাভের সূত্রে এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেছেন। তাঁর জয়ই হাইজাম্পে একমাত্র নজির।

মহিলা বিভাগ

অলিম্পিক গেমসে মহিলা বিভাগের হাইজাম্প তালিকাভুক্ত হয় ১৯২৮ সালে। অর্থাৎ পুরুষদের থেকে ৭টি অলিম্পিক পরে। মহিলা বিভাগের বিগত ৮টি অলিম্পিকে এই পাঁচটি দেশ স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে: আমেরিকা ৩ বার, রুমানিয়া ২ বার, এবং ১ বার করে কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং হাঙ্গেরী। মোট পদক লাভের তালিকায় যুগ্মভাবে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে—আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড। দুই দেশেরই মোট পদক লাভের সংখ্যা ৫টি করে। আমেরিকার ৫টি পদকের মধ্যে আছে স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ১ এবং ব্রোঞ্জ ১। অপর দিকে ইংল্যান্ডের রৌপ্য ৪ ও ব্রোঞ্জ ১। ২য় স্থান রাশিয়ার—মোট পদক ৩টি (ব্রোঞ্জ ৩)।

৬ ফিটের গাঁট অতিক্রম

মহিলা বিভাগের হাইজাম্পে ৬ ফিটের গাঁট অতিক্রম করেছেন একমাত্র রুমানিয়ার আইয়োলেন্ডা ব্যালাস—১৯৬০ সালে ৬ ফিট ০¾ ইঞ্চি এবং ১৯৬৪ সালে ৬ ফিট ২¾ ইঞ্চি।

খেলাধূলা

দর্শক

মেহেরো ট্রফি

সি এ বি পরিচালিত ১৯৬৭-৬৮ সালের সিনিয়র নক আউট ক্রিকেট প্রতি-যোগিতার ফাইনালে কালীঘাট প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যার ভিত্তিতে গত দু বছরের বিজয়ী (১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭) স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার মেহেরো ট্রফি জয়ী হয়েছে। তারা প্রথম এই ট্রফি জয়ী হয় ১৯৫৯-৬০ সালে।

প্রথম দিনের খেলায় কালীঘাট ৮ উইকেট খুইয়ে ২৪৪ রান সংগ্রহ করেছিল। কালীঘাটের খেলার সূচনা মোটেই ভাল হয়নি—৬৬ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে কল্যাণ ঘোষ এবং পি সি পোদ্দার খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে দলের ১০৯ রান তুলে দেন। কল্যাণ ঘোষ ১০১ করেন।

দ্বিতীয় দিনে ২৬৮ রানের মাথায় কালীঘাট দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে বাকি সময়ে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৫ উইকেট খুইয়ে ১৭৩ রান সংগ্রহ করে। ফলে ৫ উইকেট হাতে নিয়ে তারা ৯৫ রানের পিছনে পড়ে থাকে।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষদিনে লাঞ্চের আট মিনিট আগে ২৩৭ রানের মাথায় স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ফলে কালীঘাট প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩১ রানে অগ্রগামী হওয়াতে এইখানেই খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের এই পরাজয়ের ফলে তারা উপর্যুপরি ৩ বার মেহেরো ট্রফি এবং একই বছরে লীগ এবং নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

কালীঘাট : ২৬৮ রান (কল্যাণ ঘোষ ১০১ রান। ডি দোসী ৪১ রানে ৪ এবং সুব্রত গুহ ৯৪ রানে ৪ উইকেট)

স্পোর্টিং ইউনিয়নঃ ২৩৭ রান (অম্বর রায় ৫২ রান। দীপংকর সরকার ৮৭ রানে ৫ উইকেট)

মেহেরো ট্রফি বিজয়ী দল

১৯৫২-৫৩	মোহনবাগান
১৯৫৩-৫৪	মোহনবাগান
১৯৫৪-৫৫	মোহনবাগান
১৯৫৫-৫৬	মোহনবাগান ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন
১৯৫৬-৫৭	স্পোর্টিং ইউনিয়ন
১৯৫৭-৫৮	মোহনবাগান
১৯৫৮-৫৯	মোহনবাগান
১৯৫৯-৬০	কালীঘাট
১৯৬০-৬১	মোহনবাগান
১৯৬১-৬২	স্পোর্টিং ইউনিয়ন
১৯৬২-৬৩	বি এন আর
১৯৬৩-৬৪	মোহনবাগান
১৯৬৪-৬৫	মোহনবাগান
১৯৬৫-৬৬	স্পোর্টিং ইউনিয়ন
১৯৬৬-৬৭	স্পোর্টিং ইউনিয়ন
১৯৬৭-৬৮	কালীঘাট

মোট ১৬ বারের প্রতিযোগিতায় মোহন-বাগান ৯-বার (১৯৫৬ সালে স্পোর্টিং ইউনিয়নের সংগে ১ বার যুগ্ম বিজয়ী), স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৫ বার, কালীঘাট ২ বার এবং বি এন আর ১ বার মেহেরো ট্রফি জয়ী হয়েছে।

বৃটিশ হার্ডকোর্ট টেনিস

১৯৬৮ সালের বৃটিশ হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিংগলস ফাইনালে কেন রোজওয়াল ৩-৬, ৬-২, ৬-০ ও ৬-৩ গেমে রড লেভারকে পরাজিত করেন। দুজনেই অস্ট্রেলিয়ার পেশাদার খেলোয়াড়। ফাইনালে জয়লাভের সূত্রে রোজওয়াল নগদ ১,০০০ পাউন্ড এবং ফাইনালে খেলার দরুন রড লেভার নগদ ৫০০ পাউন্ড পুরস্কার লাভ করেছেন। এ প্রসংগে উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতাটিই বিশ্বের প্রথম উন্মুক্ত টেনিস প্রতিযোগিতা। গত বছর পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায় এক-মাত্র অপেশাদার খেলোয়াড়রাই যোগদান করে এসেছেন। পেশাদার খেলোয়াড়দের যোগদান সম্পর্কে যে কঠোর বাধা-নিষেধ ছিল তা এ বছর থেকে তুলে দেওয়া হল।

অলিম্পিক গেমসে ভারতীয় দল

খিড়কি দরজা দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার আসন্ন মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে যোগদানের সমস্ত তোড়জোড় বানচাল হয়ে গেছে। তাদের যোগদানের অনুমতি দেওয়ার ফলে ৫০টির বেশী দেশের অলিম্পিক গেমস বর্জনের হুমকি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে অলিম্পিক গেমস ভণ্ডুল হওয়ার যে প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তার কাল মেঘ এখন কেটে গেছে। সুতরাং এখন কোমর বেঁধে শেষ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হওয়া।

মেক্সিকো অলিম্পিকের ভারতীয় দলে ৫৪ জন যাওয়ার কথা উঠেছে। এই ৫৪ জনের মধ্যে মোট খেলোয়াড় সংখ্যা ৩৬ জন, বাকি কর্মকর্তা, কোচ, আম্পায়ার রেফারী, ডেলিগেট ইত্যাদি ইত্যাদি ভারতবর্ষ এই ৬টি বিষয়ে যোগদান করবে—হকি, এ্যাথলেটিক্স, কুস্তি, ভারোত্তোলন বক্সিং এবং রাইফেল সুটিং। এই ভারতীয় দলটি পাঠাতে ৬,৭৫,০০০ টাকার মত খরচ পড়বে। ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এসোসিয়েশন এই দলের বিমানে যাতায়াত বাবদ ভারত সরকারের কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকার বেশী সাহায্য চাইবেন।

টাকা নিয়ে ছিনিমিনি

স্বাধীনতালাভের পর ভারতবর্ষের জাতীয় সরকার দেশের খেলাধুলার প্রসার এবং উন্নতিকল্পে এ পর্যন্ত কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। এই খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেটে বরাদ্দ টাকার পরিমাণ ছিল ২৭.৬৫ লক্ষ আর চলতি ১৯৬৮-৬৯ সালে বরাদ্দর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭.১৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় ব্যয় অনুযায়ী আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়নি। খেলাধুলার আন্তর্জাতিক আসরে দু একটা খেলা বাদে ভারতীয় দল ও খেলোয়াড়রা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে দেশের মুখে চুনকালি মাখিয়েছে। খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, কোচ, হিসাবরক্ষক পর্যবেক্ষক প্রভৃতি নিয়ে ভারতীয় দল বহুবারের বিদেশ সফরে ভারতবর্ষের অতি কষ্টার্জিত মোটা অংকের বৈদেশিক মুদ্রা জলের মত খরচ করে এসেছে। জনসাধারণের টাকায় এমন ছিনিমিনি খেলা একমাত্র ভারতবর্ষের মাটিতেই সম্ভব। এবং এ খেলায় ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৮ম বর্ষ ১ম খণ্ড

২য় সংখ্যা মূল্য ৪০ পয়সা

Friday 17th MAY, 1968 শুক্রবার, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

গত সংখ্যার প্রচ্ছদ : শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

পত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠি

বিদেশে ভারতীয় লেখক

গত ৫২শ সংখ্যা অমৃতে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' বিভাগে প্রকাশিত আলোচনাটি পড়ে খুশী হয়েছি। শ্রীসুভাষচন্দ্র সরকারের যে-প্রবন্ধটির উল্লেখ অভয়ঙ্কর করেছেন, তা স্থানীয় একটি ইংরেজী সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়ে বিদগ্ধ মহলে ইতিমধ্যেই কিছু আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বর্তমান পত্র-লেখকের সেই মূলে ইংরেজী প্রবন্ধটি পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। বস্তুতই প্রবন্ধটি (Indian Literary Delittantes) একটি দৃষ্টিউন্মোচনকারী উল্লেখযোগ্য রচনা। শ্রীসরকার ও অভয়ঙ্কর উভয়েই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য ধন্যবাদের পাত্র। তাঁদের দুজনকেই সাধুবাদ জানাই।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে করি। সমস্যাটি গুরুত্বের এ-বিষয়ে কারও দ্বিমত হবার কথা নয়। কিন্তু এ কি শুধুমাত্র কয়েকজন তথাকথিত শিক্ষিত লেখক, জার্নালিস্ট, কবি বা শিল্পীরই দোষ যাঁরা ভারতের বাইরে সস্তা জনপ্রিয়তার মোহে ও অর্থলোভে নিজেদের জাতির, সমাজের, দেশের এই বিকৃত ভুল ও মিথ্যা কাহিনী পরিবেশন করে চলেছেন! আমার মনে হয়, তা নয়। প্রতিটি সচেতন ভারতবাসীরই এ-বিষয়ে কিছু দোষ আছে। কারণ, তাঁরা পড়ে, দেখে বা শুনেও নির্বিকার থাকেন। প্রতিবাদ করা বা এ-অসভ্যতা বন্ধ করার কোন ব্যবহারিক চেষ্টা করেন না। বাংলা-দেশে খাপছাড়াভাবে কিছু আংশিক আলোচনা হলেও তা যে খুবই সামান্য, সে-বিষয়ে সকলে নিশ্চয়ই একমত হবেন। ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীসরকার ও অভয়ঙ্কর বিষয়টির ওপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে সময়োপযোগী কাজ করেছেন, তাকে ব্যাপক করে তুলতে হবে নিপুণ বিচার-বিশ্লেষণ ও আলোচনার মাধ্যমে। দরকার হলে একটি সুনির্দিষ্ট সাহিত্যিক আন্দোলন গড়ে তুলে পারিপার্শ্বিকের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এ-ধরনের লেখা ভারতীয়দের দ্বারা লেখানো বন্ধ করতে হবে। এ-ব্যাপারে শুধু পাঠক ও লেখকরাই এগিয়ে এলে চলবে না, বিভিন্ন শক্তিশালী পত্রিকাকেও উদার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে এ-আন্দোলনকে জোরদার করা যেতে পারে। নইলে এই কদাচার দিন দিন বাড়বে বই কমবে না। এ-বিষয়ে এখুনি অবহিত হতে অনুরোধ করি।

জীবনময় দত্ত
সপ্তদীপা, পাটনা

'তুঙ্গনাথ' প্রসঙ্গে

গত ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৭৪ তারিখে প্রকাশিত 'অমৃতে' 'তুঙ্গনাথ' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ ভ্রমণকাহিনী পাঠ করে তৃপ্ত হয়েছি।

কিন্তু লেখকের পরিবেশিত তথ্যে সামান্য বিভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে। তিনি লিখেছেন, কেদারনাথের পথে উখীমঠ অঞ্চলেই প্রাচীন শোণিতপুরের অবস্থিতি ছিল। বাণরাজার রাজ্য এবং দুর্গ সেখানেই নাকি ছিল। এবং রাজকন্যা ঊষা এখানেই বন্দিনী ছিলেন।

যতদূর জানি দরং জেলায় তেজপুর শহরটির অনতিদূরেই প্রাচীন শোণিত-পুরের অবস্থিতি। শোণিত অথবা রক্তের অসমীয়া প্রতিশব্দ 'তেজ'—এই থেকেই আধুনিক তেজপুর। সেখানকার মানসিক চিকিৎসালয়ের পথে ডানদিকে একটি মেটে সড়ক ধরে আধ মাইল এগোলেই একটি ছোটো পাহাড় দেখা যায়। খাঁজকাটা পথ বেয়ে উপরে উঠলে কিছু প্রাচীন ভগ্ন-স্তূপ চোখে পড়ে। কিংবদন্তী অনুযায়ী সেখানেই বাণরাজার বন্দীশালা ছিলো—ঊষা সেখানেই নাকি অবরুদ্ধা ছিলেন; এর নাম 'উখাপাহাড়' ('উখা' ঊষা শব্দেরই অসমীয়া উচ্চারণ)। একপাশে জঙ্গল, এবং ব্রহ্মপুত্রের খাত। আমি স্বয়ং পাহাড়টিতে উঠে ভগ্নাবশেষ দেখে এসেছি—অবশ্য আমার কোনোরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যুৎপত্তি নেই।

শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর 'রম্যাণি বীক্ষ্য' (কামরূপ পর্ব) লিখেছেন—"অসুররাজ বাণের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। তেজপুরে তাঁরই রাজধানী ছিল। তখন নাম ছিল শোণিতপুর।" ঊষা-অনিরুদ্ধ উপাখ্যানটিও তিনি বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য জায়গাতেও একই কথা পড়েছি। অবশ্য দূরত্বের কথা স্মরণ রেখে কেদারনাথের 'উখীমঠ' বাণের রাজধানী হিসেবে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য (দ্বারকা থেকে নিকটতর বলেই), কিন্তু গৌহাটির অনতিদূরে প্রাগজ্যোতিষপুরে কৃষ্ণ এসে-ছিলেন; এখানকার রাজা ভগদত্ত মহা-ভারতের যুদ্ধে যোগদান করেন। এঁর পিতা নরকাসুর এবং বাণ মিত্র ছিলেন। কাজেই তেজপুরের 'খ্যাতি' উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আশা করি আপনার পত্রিকা মাধ্যমে এ-প্রশ্নের সঠিক সমাধান পাবো।

কল্লোল নন্দী
কলকাতা-১৯

সিন্ধুতীরে প্রলয় দোলা

গত ৫১ সংখ্যার অমৃতে শ্রীমুকুল গুপ্তের 'সিন্ধুতীরে প্রলয় দোলা' নিবন্ধ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন আছে। নিকট প্রাচ্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাচীন সভ্যতা-সমূহ নগরগুলির ধ্বংস সম্বন্ধে তিনি যে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা করেছেন তাতে কতকগুলি বিষয় পরিষ্কার হয় নি।

যেমন প্লেটো বর্ণিত আটলান্টিসের অবস্থান যে কোথায় সে সম্বন্ধে যে বিভিন্ন মতামত শোনা যায় সে বিষয়ে কোন আলোকপাত হয় নি।

প্রাচীন সভ্যতাগুলির ধ্বংসের ব্যাপারে জলপ্লাবনের একটা অংশ আছে, বিশেষ করে যেগুলি মূলত। নদীমাতৃক সভ্যতা। উর নগর খনন করার সময় একটি বড় রকম জলপ্লাবনের চিহ্ন পাওয়া যায়। ব্যাবিলনের প্রাচীন কাহিনীতে জলপ্লাবনের যে উল্লেখ আছে অনেকে মনে করেন সেখান থেকেই বাইবেলের প্লাবনের কাহিনীর উৎপত্তি। সিন্ধু সভ্যতাতেও প্লাবনের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রাচীন ভারতের মৎসাবতারের কাহিনীতেও মহাপ্লাবনের উল্লেখ রয়েছে। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধে কোন আলোচনা দেখা গেল না।

পরিশেষে লেখক জনৈক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীর মতানুযায়ী উল্লেখ করেছেন যে, আর্য সভ্যতার আগমনের ফলে মোহেঞ্জো-দাড়োর ধ্বংস হতে পারে না, কারণ আর্যরা খৃঃ পূঃ ৫০০ বছরের আগে নাকি তাঁদের পিতৃভূমি থেকে এক পাও নড়েন নি। আর্যদের পিতৃভূমিটা যে ঠিক কোথায় তার কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না, তাছাড়া আমাদের দেশের ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঋগ্বেদের রচনা-কাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৫০০ বছরের কাছাকাছি এবং সেটাই অনেকে ভারতে আর্য আগমনের কাল বলে মনে করেন। আর গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কাল আনুমানিক ৫৪০ খৃঃ পূর্বাব্দ। দীর্ঘকাল-ব্যাপী বৈদিক সভ্যতার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি। সুতরাং এই পরি-প্রেক্ষিতে ভারতে আর্য আগমনের কাল সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য একটু বিচিত্র মনে হয় নাকি?

আরেকটি কথা, সান্টোরীনির অগ্ন্যুৎ-পাতের সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের যখন কোন সম্পর্ক নেই বলে লেখক উল্লেখ করছেন এবং এর সঙ্গে ট্রয় এবং ক্রেটাস সভ্যতার ধ্বংসের প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে বলে বলছেন তখন প্রবন্ধের নামকরণ কতকটা সেই "কামরূপেতে কাগ মরেছে কাশীধামে হাহাকার" গোছের শোনায় না কি?

বিনীত
সত্য মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-২৯

অমৃত

ভিয়েতনামে শান্তির উদ্যোগ

শেষপর্যন্ত গত শুক্রবার ১০ই মে থেকে প্যারিসে ভিয়েতনাম শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছে। অবশ্য এটা ঠিক শান্তি আলোচনা নয়, শান্তি আলোচনার প্রাথমিক প্রস্তুতি। তবু এর জন্যেও কম টালবাহানা করা হয়নি। গত ৩১শে মার্চ প্রেসিডেন্ট জনসন ঘোষণা করেন যে, শান্তি আলোচনা যাতে শুরু হ'তে পারে, সেজন্যে তিনি উত্তর ভিয়েতনামের শতকরা নব্বই ভাগ জায়গায় বোমাবর্ষণ থামিয়ে দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। এরপর ৩রা এপ্রিল উত্তর ভিয়েতনাম সরকারের পক্ষ থেকে এ-ঘোষণার জবাবে জানানো হয়, আলোচনা শুরু করতে তাঁরা তৈরি। তবে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা চালাতে হবে শুধু আমেরিকার পক্ষ থেকে বোমাবর্ষণ এবং অন্যান্য সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করা নিয়ে। কিন্তু তারপর থেকে পাঁচ সপ্তাহ কেটে গেছে স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে। আমেরিকা যে-স্থানগুলির নাম করেছিল, তা হ্যানয়ের পছন্দ হয়নি। উত্তর ভিয়েতনাম পাল্টা নাম প্রস্তাব করে জানায়, নোমপেন বা ওয়ারশ'তে বৈঠক হলে সে রাজি আছে। কিন্তু এ-দুটি নামের কোনোটিই আমেরিকার সমর্থন পেল না। শেষপর্যন্ত ওঠে প্যারিসের নাম, এবং দুপক্ষেরই তা গ্রহণীয় হয়। ১০ই মে থেকে প্যারিসের ক্লেবার এভেনিউয়ে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেণ্টারে শুরু হয়েছে বৈঠক। আমেরিকার পক্ষ থেকে মিঃ অ্যাভারেল হ্যারিম্যান এবং উত্তর ভিয়েতনামের পক্ষ থেকে মিঃ জুয়ান থুই নেতৃত্ব করছেন সেই বৈঠকে।

অবশ্য বৈঠকের ঠিক আগেই উত্তর ভিয়েতনাম ও ভিয়েৎকংদের যুগ্ম আক্রমণ তীব্র হয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনামে। এ-আক্রমণের তীব্রতা গত বড়দিনের সময় যে প্রথমবার আক্রমণ করেছিল উত্তর ভিয়েতনাম, তার চেয়ে কম নয় মোটেই। অন্যদিকে আমেরিকার তরফ থেকেও প্রতিরোধের তীব্রতাও কমে যায়নি। সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামই এখন আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে পর্যুদস্ত। কিন্তু সেটা শোচনীয় হলেও তাতে হতাশা বোধ করার কারণ নেই। কারণ শান্তি আলোচনার উদ্যোগপর্বে দুটি যুধ্যমান শক্তির পক্ষ থেকে নিজেদের অধিকৃত অঞ্চল বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কোরিয়ার যুদ্ধের সময়েও এইরকমই দেখা গিয়েছিল। এবং তাতে শান্তি আলোচনা ব্যাহত হয়নি। আশা করা যায়, এবারের শান্তি বৈঠকও সফল হবে। কারণ এক যুগ ধরে অমানুষিক রক্তক্ষয়ে কাতর ভিয়েতনামে শান্তির আকাঙ্ক্ষা এখন দুপক্ষেই যথেষ্ট আন্তরিক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

এর প্রথম নিদর্শন পাওয়া যাবে আমেরিকার পক্ষ থেকে 'মিত্রপক্ষের শীর্ষ সম্মেলনের' প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে। প্যারিস বৈঠকের আগে এই ধরনের কোনো সম্মেলন বসিয়ে প্রতিনিধিদের স্বাধীনতা সংকুচিত করতে রাজি হননি প্রেসিডেন্ট জনসন। অন্যদিকে আমেরিকার এই শান্তি প্রচেষ্টা যে নিছক ধোঁকাবাজি এমন কথা চীনের পক্ষ থেকে অনেকবারই সোচ্চারে ঘোষণা করা হয়েছে। কাজেই অনুমান করা যায়, চীনা পক্ষ থেকেও উত্তর ভিয়েতনামকে পিছনে টানবার চেষ্টা কম হয়নি। কিন্তু হ্যানয় সরকার তাতে প্রভাবিত হননি। এবং নিজেদের প্রতিনিধিদলকেও তাঁরা পাঠিয়েছেন প্যারিসে শান্তি আলোচনার পথ সুগম করার জন্যে। ফলে আশা করা যায় যে, প্যারিসের এই উদ্যোগপর্ব নিষ্ফল হবে না।

ভারত বরাবরই শান্তির স্বপক্ষে। উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করে শান্তি আলোচনার প্রস্তুতি চালানোর কথা ভারতের পক্ষ থেকে অনেকবারই ঘোষণা করা হয়েছে। আর, আংশিকভাবে বোমাবর্ষণ বন্ধ এর আগে যে কখনো হয়নি তাও নয়। কিন্তু নানা কারণে তা সত্ত্বেও শান্তি আলোচনা শুরু করা যায়নি। এই ব্যর্থতার ফল বলা বাহুল্য শুভ হয়নি কারো পক্ষেই। হাজার হাজার সৈন্য প্রাণ দিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হ'য়েছে। এবং সারা দক্ষিণ ভিয়েতনাম জুড়েই চলছে নিদারুণ এক অরাজক অবস্থা। এ-পরিস্থিতি ভিয়েতনামীদের পক্ষে কখনোই কাম্য হতে পারে না। আমেরিকার দিক থেকেও এ-পরিস্থিতি ঈর্ষনীয় বলা চলে না। কাজেই বছরের পর বছর ধরে একটা অত্যন্ত হতাশাজনক গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে আজ যখন দুটি যুধ্যমান পক্ষ শান্তির জন্যে মিলিত হতে পারছে, তখন আশা করা অন্যায় হবে না যে, দুঃখ-রজনীর পূর্বদিগন্তে নবীন আশার সূর্যোদয় ঘটবে, এবং শান্তি সংস্থাপিত হবে।

ভারত এবং সারা পৃথিবীর দৃষ্টি এখন প্যারিসের দিকে। প্যারিস বৈঠক ভিয়েতনামে শান্তির পথ সুগম করুক।

রাস্তায় মাও সে তুং-এর গান গাইছে ছেলেরা

চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব

সুধীরকুমার সেন

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে সুউচ্চ কলরোল দীর্ঘ দু' বছর ধরে চীনাবাসীদের সন্ত্রস্ত, বিপর্যস্ত এবং বিশ্ববাসীদের বিস্ময়বিমূঢ় করে রেখেছিল স্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে তা আজ স্তব্ধ হয়েছে। ঝড়ের পর ক্ষতির হিসেব-নিকাশের পালা। রেড গার্ড'রা ফিরে গেছে যে যার স্কুলে, কলেজে, শ্রমিকরা কারখানায়। কিন্তু সকলে ফেরেনি, যেমন ঝড়ের পর অনেক ফেরে না। ১৯৬৬ সালে যখন এই রাজনৈতিক গেরিলাদের স্কুল-কলেজ ছেড়ে নব্য সংস্কৃতি অভিযানে সামিল হওয়ার জন্য ডাক দেওয়া হয়েছিল, তখন চীনের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংখ্যা ছিলো মোট ৮ কোটি ৯৫ লক্ষ। প্রতিবিপ্লবীদের শায়েস্তা করার অভিযান শেষ হওয়ার পর ১৯৬৭-র জানুয়ারী থেকে আবার স্কুল কলেজ চালু করার চেষ্টা হয়, ছেলেমেয়েদের নিজ নিজ পাঠগৃহে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশে শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা দাঁড়িয়েছে ভয়াবহ। ১৯৬৬ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ছিলো ১ কোটি ২৯ লক্ষ। জোর এর অর্ধেক ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে ফিরে গেছে, কিন্তু বাকী ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘ সময় বলগাহীন জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার পর আবার বিদ্যালয়ের শৃংখলার কাছে আত্মসমর্পণে রাজি হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ কারিগরি বিদ্যালয়গুলোতে ১৯৬৬ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিলো প্রায় ১০ লক্ষ। এরা প্রায় সবই ফিরেছে, কিন্তু পড়াশুনো কার্যত বন্ধ।

শিক্ষার দুর্গতির কারণ

শিক্ষার এই দুর্গতির কারণ একাধিক। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চরম দিনগুলোতে বহু শিক্ষকই ছাত্রদের হাতে গুরুতররূপে অবমানিত, লাঞ্ছিত হয়েছেন। যেসব ছাত্র-ছাত্রীরা সে দিন এই শিক্ষক লাঞ্ছনার পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিল, শিক্ষকরা তাদের সংগে আর সেই পূর্বেকার সম্পর্ক স্থাপনে ইচ্ছুক নয়। ১৯৬৬ ও ৬৭ সালে স্কুল-কলেজগুলোর সম্পত্তির যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। পাঠ্য বইগুলোকে বুর্জোয়া

শোধনবাদের বাহক বলে ধ্বংস করা হয়, এমনকি, তার মুদ্রণ ও প্রকাশন সংস্থাগুলোও ভেঙে দেওয়া হয়। ফলে চীনে আজ পাঠ্য-পুস্তকের গুরুতর অভাব, নতুন পাঠ্য রচনার ব্যবস্থাও প্রায় নেই।

উৎপাদন, বাণিজ্য

চীনের এই ভয়াবহ অন্তর্বিরোধ কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের ওপরও গুরুতর ছাপ রেখে গেছে। কম্যুনিস্ট চীনের রপ্তানীর মুখ্য বাজার হচ্ছে হংকং। হংকংএর খাদ্য-প্রয়োজনেরও অর্ধেক মেটে চীন থেকে আমদানী করে। হিসেবে দেখা গেছে যে, গত বছর জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত তিন মাসে হংকংএ জলপথে চীনা পণ্য আমদানী হয়েছিল ২,৫৯১৫৯ টন। পূর্ব বছরের ঐ সময়ে আমদানীর পরিমাণ ছিলো ৪,৬৩,৮২১ টন। ঐ সময়ে চীন থেকে রেলে হংকংএ আমদানী হয় ৩,৪৯৬ ওয়াগন মাল। পূর্ব বছরে ঐ তিন মাসে এসেছিল ১০,৫৫৩ ওয়াগন। অন্যান্য দেশের সঙ্গেও চীনের বাণিজ্য এইভাবেই নিম্নমুখী হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, চীনের মধ্যে পরিবহণ ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিশৃংখলা, শ্রমিক অশান্তি ও বন্দরগুলোতে সুষ্ঠুভাবে কাজ চলায় বাধা সৃষ্টির ফলেই চীনের বাণিজ্য এই অবস্থায় পৌঁছেছে। বলা বাহুল্য, এ সবেরই মূলে রয়েছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব-উদ্ভূত বিশৃংখলা ও বিভ্রান্তি।

সূচনা

চীনের এই বালখিল্য-তান্ডবের হেতু, তাৎপর্য ও পরিণতি সম্পর্কে বাইরের জগতে ধারণায় অস্পষ্টতা আছে, যা সংবাদের অপ্রাচুর্যের ক্ষেত্রে থাকতে বাধ্য। তবু যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে চীনের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতি কৌতূহলী দৃষ্টি রেখেছেন তাঁদের চোখে এর একটা কার্যকারণ সম্পর্ক ও ধারাবাহিকতা ধরা পড়েছে। এই মতে, ১৯৬৫ সালের নভেম্বরে সাংহাইর ওয়েন হুই প্যাও পত্রিকায় ইয়াও ওয়েন ইয়ুয়ানের যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তা-ই প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করে। এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল চীনের খ্যাতকীর্তি ঐতিহাসিক ও নাট্যকার উ হানের একখানি নাটকের সমালোচনায়। মাওপন্থী সমালোচকদের মতে, উ হান এই নাটকে প্রাচীন কাহিনীর প্রচ্ছন্নতায় চীনের কমিউনের নিন্দা করেছেন এবং কৃষিজীবীদের আবার ব্যক্তিগত কৃষিপ্রথায় ফিরে যেতে উপদেশ দিয়েছেন।

ইয়াও ওয়েন ইউয়ানের সমালোচনা আরো সুস্পষ্ট। তিনি সোজাসুজিই বললেন যে, উ হানের নাটকের সঙ্গে ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক নেই, বর্তমানের সঙ্গেই তার সম্বন্ধ। আসলে, ১৯৫৯ সালে 'জোর কদমে এগোনোর' (বিগ লিপ) নীতির বিরোধিতার জন্য যাঁরা নিন্দিত হয়েছিলেন, ১৯৬১ সালের অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ নিয়ে তাঁরাই আবার মাথা তোলবার চেষ্টা করেছেন।

১৯৬৬ সালের বসন্তকালে সৈন্যবাহিনীর মুখপত্র লিবারেশন আর্মি ডেইলি সোজাসুজি বলে বসলো যে চীনের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 'দল-বিরোধী, সমাজতন্ত্র-বিরোধী এক দুষ্টচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং একে সম্পূর্ণ নির্মূল করা দরকার। পত্রিকায় আরো বলা হলো যে দলের ভেতর এমন কিছু কর্তাব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা মাওএর ভাবধারার অনুসারী বলে নিজেদের জাহির করলেও তলে তলে দল নেতার বিরুদ্ধাচরণ করছে।

এই দল-বিরোধী সমাজতন্ত্র-বিরোধীদের আবিষ্কারে খুব বেশী দেরী লাগলো না। শিগ্‌গিরই প্রতিপন্ন করা হলো যে ইনি হচ্ছেন তেং তো, পিকিং মিউনিসিপ্যাল পার্টি কমিটির অন্যতম সেক্রেটারি, যিনি চীনের সমস্ত দুর্গতির জন্য দায়ী। বলা দরকার, যে সব প্রবন্ধের মধ্যে তেং তোর এই দল-বিরোধী ভাবধারা আবিষ্কৃত হলো, সেগুলো সব ১৯৬০-৬১ সালে লিখিত। ফলত এগুলোর তাৎপর্য আবিষ্কারে প্রায় ৫।৬ বছর লেগেছিল।

১৯৬৬র গ্রীষ্মে চীনে এক চাঞ্চল্যকর খবর ছড়ালো যে একদল রাজতন্ত্রী পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের প্রতিবিপ্লবী আড্ডা গেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক—অধ্যাপক চিয়েন পো সানের কঠোর সমালোচনা করা হলো যেহেতু তিনি ছাত্রদের আরো বেশী ঐতিহাসিক উপাদান আয়ত্ব করতে উপদেশ দিয়েছেন। ক্রমে আরো কিছু অধ্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হলেন, যাতে বিপ্লবী ছাত্ররা একটা বিশেষ ভূমিকা নিলো। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে শোনা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর মহিলা সেক্রেটারি ওয়ান শিউ মিংএর মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে দিয়ে 'বিপ্লবী ছাত্রদের' সামনে নতজানু হয়ে বসতে বাধ্য করা হয়েছে। পরদিন পিকিং পার্টি কমিটির দুজন সদস্যের মাথায় গাধার টুপি পরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যামপাসে ঘোরানো হয় এবং ছাত্ররা তাদের গায়ে কাদা ও আঠা ছোঁড়ে। একদল ছাত্র জোর করে অধ্যাপক পো সানের বাড়িতে ঢুকলো, স্ত্রীর অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও বন্ধ রুগ্ন অধ্যাপক লাঞ্ছনা থেকে রেহাই পেলেন না। অচিরেই বিপ্লব-বিরোধীদের বাদ দিয়ে পিকিং মিউনিসিপ্যাল কমিটি পুনর্গঠিত হলো।

পিকিং থেকে সারা দেশে

পিকিং-এর ঘটনাবলী অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সারা দেশে তথাকথিত প্রতি-বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলনের রূপ নিলো। আক্রমণের লক্ষ্য হলো প্রধানত বিভিন্ন সংস্থার প্রচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, সংবাদপত্রের কর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অভিযোগ এক : মাওএর ভাবধারার বিরুদ্ধাচরণ। চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার বিভাগের প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা চু ইয়ান, সিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর পেং কাং, চীনা বিজ্ঞান একাডেমির সুং ইয়ে-ফাং এবং আরো অনেকে এবার মাও-বিরোধী ভাবধারার প্রসারের অভিযোগে বিপ্লবীদের কোপে পড়লেন।

ছাত্রদের ডাক

১৯৬৬ সালের ১লা জুন পিপলস ডেইলি পত্রিকা কিশোর-কিশোরীদের সাংস্কৃতিক অভিযানে সামিল হওয়ার জন্য ডাক দিলো। ছাত্র-ছাত্রীরা অবিলম্বে এই আহ্বানে সাড়া দিলো। দিন কয়েক পরেই পিকিং ১নং বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পরীক্ষা বন্ধের দাবী জানালো, কারণ প্রাচীন পরীক্ষা-প্রথার সঙ্গে মাওএর শিক্ষাধারার সঙ্গতি নেই। ক্রমে পরীক্ষা বন্ধের দাবী আসতে লাগলো চাংশা, কুয়াংচৌর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে। পিকিংএর এক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা লিখলো যে তারা এখন 'মাওএর বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্দীপিত', পুরোনো শিক্ষারীতির তারা আমূল বিরুদ্ধে।

ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী মেনে নিতে দেরী হলো না, ১৩ই জুনেই চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিলো। সাংস্কৃতিক বিপ্লব কার্যকরী করার জন্য বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তিও ৬ মাসের জন্য বন্ধ রাখা হলো। পরে বন্ধের মেয়াদ আরো বাড়লো।

চীনের পত্রিকাগুলোতে খবর বেরুলো,

সারা দেশ জুড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

ছেলেমেয়েরা পথে নামলো

বিদ্যালয় বন্ধ, পাঠ্য বাতিল, খবরের কাগজেরা হাঁকছে : দল-বিরোধী, সমাজতন্ত্র-বিরোধী, মাও-বিরোধী শিক্ষকদের দূর করে দাও। ছাত্ররা সাড়া দিলো। ১৯৬৬-র গ্রীষ্ম পর্যন্ত চীনের সর্বত্র ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয় ঘর-বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে।

আগস্ট মাসে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১১শ প্রকাশ্য অধিবেশন বসলো। মাওর ভাবধারা প্রচার, সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সর্বহারাদের মহান সাংস্কৃতিক অভিযানের প্রসারের জন্য সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হলো। কমিটিতে প্রেসিডেন্ট লিউ শাও চি, তেং সিয়াও পিং এবং পেং চেনের নেতৃত্বে একটা বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও মাও-সমর্থকদের জয়ে কোনো বাধা হলো না।

পিকিং-এর রাস্তায় লালরক্ষী

এই অধিবেশনের আগেই পিকিংএর রাস্তায় লালরক্ষীদের আবির্ভাব ঘটে। মাও-বিরোধীদের ওপর হামলা ও গুণ্ডামি এই সময় থেকেই সূচনা হলেও লালরক্ষীদের সাহস, তখন পর্যন্ত দানা বাঁধেনি। ১৮ই আগস্ট মাও পিকিংএ হেভ্‌নলি পীস স্কোয়ারে লালরক্ষীদের এক সমাবেশে আবির্ভূত হলেন। সভায় মাও বক্তৃতা করলেন না, ভাষণ দিলেন তাঁর নামে প্রতিরক্ষী মন্ত্রী লিন পিয়াও ও চৌ এন লাই। পিপলস ডেইলির বর্ণনায়—মাওকে দেখে তরুণ-তরুণীরা আনন্দে নাচতে লাগলো, গাইতে লাগলো।

এরপর, লালরক্ষীদের আরো কয়েকটি সমাবেশে মাও আবির্ভূত হলেন। মাওএর নাম লালরক্ষীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পর তাদের সামনে আর কোনো প্রতিবন্ধক রইল না। ছোকরার দল এইবার একেবারে রাস্তায় নামলো। পিকিংএর প্রাচীন ঐতিহ্য-মন্ডিত রাস্তাগুলোর নাম বদলে **'বিপ্লব'** বা শোধনবাদ-বিরোধিতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো। দোকানপাটের সাইন বোর্ড ভেঙ্গে চুরমার করা হতে লাগলো। ট্রাফিক আলোয় লালের তাৎপর্য বদলানো হলো, কারণ, লালই হলো অগ্রগতির সংকেত। দোকান থেকে দূর করা হলো সুগন্ধি দ্রব্য, পাউডার।

যারা সরু ট্রাউজার বা ছুঁচোলো জুতো পরতো, পিকিংএ লালরক্ষীরা তাদের সায়েস্তা করার কাজে নামলো। দুদিন মাত্র সময়, দুদিনে হুকুম তামিল না করলে প্যান্ট কেটে ছোট করে দেওয়া হতে লাগলো, ছুঁচোলো জুতোর মাথা খণ্ডিত হলো। যারা বিটল ছাঁট দেয়, জায়গায় জায়গায় তাদের মাথার চুলের স্তূপ। প্রত্যেক বাড়ির রূপসজ্জা হতে লাগলো মাওএর চিত্র ও বাণী দিয়ে। বাস, ট্রাম, মোটর, রিকসাও বাদ দেওয়া হলো না। বই, গানের রেকর্ডের দোকানে **হানা** দিলো নব্য-সংস্কৃতির ঝান্ডাবাহী বালখিল্যরা। সেকসপীয়র, গোর্কি, পুশকিন, গেটে, রোমাঁ রোলাঁ অগ্নি বা আবর্জনাস্তূপে আশ্রয় পেলেন। মোজার্ট, বাখ, বিটোভেন, শোস্টাভিকোচের রেকর্ডও তাদের অনুসরণ করলো।

সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো পিকিংএ সোভিয়েট দূতাবাসের সামনে পোস্টার ও স্লোগানের বিক্ষোভ। দাবী : সোভিয়েট শোধনবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বন। এক-খানা পোস্টারে লেখা ছিলো : আমরা তোমাদের চামড়া তুলে নেব।

পার্টি ও মাও-বিরোধিতার অভিযোগে লালরক্ষীদের উপদ্রব ক্রমশ মারাত্মক আকার ধারণ করতে লাগলো। লালরক্ষীরা পিকিং থেকে যেমন বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, তেমনি নানা জায়গায় হাঙ্গামারও খবর আসতে লাগলো। সিনানে একদল শ্রমিকের সঙ্গে লালরক্ষীদের সংঘর্ষ হলো। টিয়েনসিন, চ্যাংচৌ, ল্যানচৌ প্রভৃতি শহরেও গোলযোগ দেখা দিলো। ফুচৌর শ্রমিকরা লালরক্ষীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। চ্যাং-শার মিউনিসিপ্যাল পার্টি কমিটির দরজায় লালরক্ষীদের সঙ্গে শ্রমিকদের প্রচন্ড সংঘর্ষ হলো। তেমনি সংঘর্ষ হলো পিকিংএর এক বয়ন কারখানায়। সবচেয়ে কড়া প্রতিরোধ এলো সাংহাইএর শ্রমিকদের কাছ থেকে।

লিউ শাও চি, তেং সিয়াও পিং

সাংস্কৃতিক অভিযানের গোড়ার দিকে, আক্রমণের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে একটা প্রচ্ছন্নতা ছিলো। সেই প্রচ্ছন্ন ভাষায় পার্টি-বিরোধী, মাও-বিরোধী ব্যক্তিদের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বর্ণনা করা হতো 'কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত' কিছু লোক বলে। ১৯৬৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এই প্রচ্ছন্নতা আর রইলো না। চীনা রিপাবলিকের চেয়ারম্যান লিউ শাও চি এবং পার্টির সেক্রেটারি-জেনারেল তেং শিয়াও পিংএর বিরুদ্ধে এই সময় থেকে খোলা-খুলিভাবে আক্রমণ আরম্ভ হয় এবং পিকিংএ মাও-বিরোধীদের বিরুদ্ধে এক বিচিত্র পোস্টার-যুদ্ধের সূচনা হয়। লিন পিয়াও এই সময় সোজাসুজি বলেন যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব হচ্ছে মাওএর সর্বহারা বিপ্লব ও লিউ-তেং দলের বুর্জোয়া নীতির মধ্যে এক কঠোর রাজনৈতিক সংগ্রাম। কিন্তু চৌ এন লাই এতোটা এগুতে রাজী ছিলেন না। ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে এক বিবৃতিতে লিউ ও তেংএর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণে লালরক্ষীদের সংযম অবলম্বনের জন্য তিনি উপদেশ দেন।

সাংহাই-এর শিক্ষা

জনস্বার্থের বিরুদ্ধে মাও তথা লাল-রক্ষীদের অভিযানের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে সাংহাইএর ঘটনাবলী। এখানে মিউনিসিপ্যাল কমিটি শিল্প শ্রমিকদের সমর্থন লাভের আশায় তাদের আর্থিক কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেন। লাল-রক্ষীরা এই ব্যবস্থা পাল্টে দেওয়ার জন্য সাংহাইএ আবির্ভূত হলে বেশ কয়েক দিন ধরে সেখানে শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ চলে। শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরা পরাস্ত হয়, সংবাদপত্রগুলো মাওপন্থীরা দখল করে, শ্রমিকদের নবলব্ধ সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নিয়ে সুদিনের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে বলা হয়।

ঘরে ফেরার ডাক

সাংহাইর ঘটনাই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শেষ বড়ো ঘটনা। ১৯৬৭ সালের শুরুতেই লালরক্ষীদের পিকিং ত্যাগ ও স্কুল, কলেজে ফিরে যাওয়ার জন্য চৌ এন লাই উপদেশ দেন। কিন্তু যারা একবার বেরোয় তারা সকলে যে আর ফেরে না, সূচনাতেই তার একটা হিসেব দিয়েছি। ১৯৬৭ থেকে চীনের এই অন্তর্বিপ্লব ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। তবুও দীর্ঘ দুবছর ধরে চীনবাসীদের মনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে, বিদেশীদের চোখে মাও, তাঁর পত্নী চিয়াং চিং (যিনি লালরক্ষীদের মুখ্য নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছিলেন), লিন পিয়াও, চৌ এন লাই চীনকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তা সহজে বিস্মৃত হওয়ার নয়। বিশ্ব সমাজে চীনের আসন কোথায় তা দীর্ঘকাল পরে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পটভূমিকাতেই বিচার হবে।

অন্তরাল কাহিনী

এবং সেই সঙ্গে এই প্রশ্নও এসে স্বতঃই উদয় হবে যে এই বিপ্লবের কি প্রয়োজন ছিল? আর মানবতা, গণতন্ত্র, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই অভিযানে লাভ-বান হয়েছে কারা?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৯৫৮ সালে যখন চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির ৮ম কংগ্রেসে 'জোর কদমে এগিয়ে যাওয়ার' এবং গণ-কমিউন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। লৌহ ঢালাইকে চীনে কুটির শিল্প হিসেবে প্রবর্তনও ছিলো এই কংগ্রেসের আর এক সিদ্ধান্ত যাতে আধুনিক কারিগরি বিদ্যা ও প্রয়োগ-বিজ্ঞানকে মাওপন্থীরা নস্যাৎ করে দেন। যদিও 'গ্রেট লিপে'র লক্ষ্য ছিলো ১৫ বছরে বা তারো কম সময়ে শিল্প উৎপাদনে বৃটেনকে ছাড়িয়ে যাওয়া তবুও এই নীতি যে কতখানি ভ্রান্ত তার প্রমাণ হতে দু' বছরও লাগলো না। ১৯৬২ সালে চীনের শিল্পোৎপাদন সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেয়ে ১৯৫৯এর প্রায় অর্ধেকে পৌঁছুলো, ফসল গেলো এক-তৃতীয়াংশ কমে। পার্টির নেতারা এই ভুল উপলব্ধি করে লক্ষ্য সিদ্ধির মেয়াদ তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে দিলেন, এমন কতকগুলো বৈষয়িক ব্যবস্থা চালু করলেন যাতে 'গ্রেট লিপ' ও কমিউনের মারাত্মক পরিণতি কিছুটা সংশোধিত হলো, অর্থনীতিতে একটু স্থিতিশীলতা এলো। কিন্তু ভারী শিল্পের সংকোচন এবং জঙ্গী নীতির পরিপোষণে সামরিক ব্যয়ের অত্যধিক

বৃদ্ধি এই স্থায়িত্বের পথে ক্রমে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। ফলে ১৯৬৫ সালের শেষাশেষি দেখা গেলো চীনের জাতীয় উৎপাদন অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে, কৃষি উৎপাদন জোর ১৯৫৭ সালের অবস্থায় পেঁৗছেছে।

মানুষের জীবনযাত্রার মান এর ফলে নিম্নমুখী হলো। শ্রমিক ও অফিসকর্মীদের বেতন ১৯৫৭-এর হারের চেয়ে এগুতে পারলো না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে মাথা-পিছু উৎপাদন পা মেলাতে পারলো না।

এই অবস্থায় যখন পার্টির একাংশের মধ্যে এবং জনসাধারণের মনে মাও-এর ভ্রান্ত-নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো, তখন পার্টির মাও-পন্থীরা এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নতুন আদর্শ প্রচারে ব্রতী হলেন। এই আদর্শ হলো মাও-পূজো এবং দারিদ্র্যবরণই যে সাম্যবাদের উজ্জ্বল লক্ষ্য তাই প্রচার।

কিন্তু চীনের আসল ব্যাধি গোপন করা সহজ ছিলো না। পার্টির সদস্য এবং জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনা পররাষ্ট্র-নীতির ব্যর্থতা ও মিত্রহীন জনসাধারণকে মাও-নীতির অভ্রান্ততা সম্পর্কে আরো সন্দিহান করে তুললো।

১৯৬৫ সালে যখন অর্থনৈতিক স্থিতি কিছুটা ফিরে আসে, তখনই দলের ভেতর ভবিষ্যতের অর্থনীতি সম্পর্কে মত ও পথের পার্থক্য সুস্পষ্ট রূপ নিতে থাকে। চীন কি পরিকল্পিত অর্থনীতির পথে এগুবে, যার জন্য সোভিয়েট সহযোগিতা অপরিহার্য, না, জোর কদমে এগোবার জন্য আবার ঝাঁপ দেবে? কিন্তু প্রথম পথে এগুতে হলে মাও ও তাঁর সমর্থকদের পূর্বোক্ত নীতির ব্যর্থতা স্বীকার করতে হবে। ফলে মাও, লিন পিয়াও প্রভৃতি দ্বিতীয় পন্থাই বরণীয় মনে করলেন।

কিন্তু সমগ্রভাবে পার্টিকে এই পথে টেনে আনা সহজ নয়। কারণ, দলের প্রাচীন সদস্যরা মাও-এর বাণী দ্বারা বিপ্লবে উদ্দীপিত হননি, মার্কস্-লেনিনবাদই তাঁদের বিপ্লবকে সাফল্যের পথে টেনে নিয়ে এসেছিল। কৃষক ও শ্রমিকদেরও ধীরে ধীরে মোহমুক্তি ঘটছিল, যার ফলে মাও-বাদীরা এদের ওপরও নির্ভর করতে পারছিলেন না। এই অবস্থাতেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন পিয়াও-এর মাধ্যমে সৈন্যবাহিনীকে মাও-নীতির আশ্রয় করা হয় এবং ক্রমে তরলমতি ছেলে-মেয়েদেরও পাঠ ও পরীক্ষা থেকে রেহাই দিয়ে বিপ্লবের নিশান-বরদার করা হয়।

এ-কথা আজ সুস্পষ্ট যে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার মধ্যেই মাও চীনের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু এর জন্য যে অর্থ প্রয়োজন, চীনের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে তার সংকুলান সম্ভব নয়, একমাত্র জনসাধারণকে তাদের জীবনযাত্রার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো থেকে বঞ্চিত না করে। এই জন্য মাওপন্থীরা দারিদ্র্যকে গৌরবের আসনে বসাবার জন্য প্রচারকার্য চালিয়েছেন। গত কয়েক বছরে চীনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে ব্যয় অতিমাত্রায় সংক্ষেপিত হয়েছে। বিদ্যালয়, কলেজ প্রভৃতি নির্মাণ বন্ধ আছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে সরকারী ব্যয়ে কোনো বসতবাড়ী বা হাসপাতাল নির্মিত হয়নি। শ্রমিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মজুরীর এই নিম্ন হারেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

দেশের তরুণদের সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করা অবশ্য অসম্ভব নয়।' কিন্তু জনসাধারণকে দীর্ঘদিন বঞ্চনার মধ্যে দিনযাপনে বাধ্য করাও সম্ভব হতে পারে না। মাও ও তাঁর অনুবর্তীরাও এ-কথা ভালভাবেই জানেন। কাজেই, তাঁরা চেষ্টা করছেন দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির সমস্ত দায়িত্ব বিরোধীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার। সৈন্যবাহিনী ও দেশের তরুণ-সমাজের একাংশের সাহায্যে যদি তাঁদের সাময়িক সাফল্য হয়েও থাকে, তাহলেও আশ্বস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ জনসাধারণের একদিন মোহভঙ্গ হবেই।

চীনের পররাষ্ট্র নীতি

বরুণ রায়

"God is in His heaven,
All is right with the world".

একই ভাষায় না হলেও অনেকটা এই রকম ভাষায় সম্প্রতি চীনা নেতৃবৃন্দ তাঁদের পররাষ্ট্র নীতির জয়গান গেয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, লাল চীন ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে একথা ঠিক নয়। চীনই আজকে বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবীর দৃষ্টি আজ চীনের দিকে। চীন কি করছে না করছে সেদিকে আজ সকলের আগ্রহ। আর দেশে দেশে আজ এমন বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে যে পৃথিবী আগে কখনো এত ভালো ছিল না। সুতরাং চীনা পররাষ্ট্র নীতি ব্যর্থ এ-কথা কি করে বলা যায়।

এ যেন অনেকটা সেই লোকটির মতো যিনি চাকরী হারিয়ে লাটসাহেবের কাছে দরখাস্ত করেছিলেন। লাটসাহেবের সেক্রেটারীর কাছ থেকে দরখাস্তের উত্তর এসেছিল। সেক্রেটারী লিখে পাঠিয়েছিলেন, আপনার বিষয় অবগত হয়ে লাটসাহেব বিলকুল দুঃখিত হয়েছেন, কিন্তু আপাতত এই ব্যাপারে তাঁর কিছু করার নেই। কিন্তু তাতে কি। লোকটি ঐ চিঠি নিয়ে সব্বাইকে দেখিয়ে বলে বেড়াতে লাগল, দেখেছিস, আমার চাকরী যাওয়ায় লাট-সাহেব পর্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন।

চীনেরও অনেকটা হয়েছে সেই দশা। পৃথিবীর কোথায় কোন দেশে কি বিপ্লবী কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হচ্ছে, চীন তার ক্রেডিট নিয়ে বলে বেড়াচ্ছে, দেখেছ চীনের নীতিরই জয়-জয়াকার।

আজকের চীনের পররাষ্ট্র নীতি যে কতখানি নেতিবাচক, অসহায় ও অক্ষম হয়ে পড়েছে এ-থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

চীনের ধারণায় পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো অবস্থাটা কি সেটা গত ১ জানুয়ারী পিকিংয়ের পিপলস ডেইলি পত্রিকায় একটি মানচিত্রের মধ্যে দিয়ে বোঝানো হয়েছিল। তাতে এক, দুই করে দেখানো হয়েছিল কোন দেশে কি রকম 'বৈপ্লবিক' কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখানে সেটা আমি পাঠকদের আগ্রহ থাকতে পারে মনে করে তুলে দিচ্ছি :

এক, আলবেনীয় সাধারণতন্ত্রের মানুষের বৈপ্লবিক আন্দোলন উল্লেখযোগ্য জয়লাভ করেছে আর তার ফলে ইয়োরোপে সমাজবাদের উজ্জ্বল আলো উজ্জ্বলতর হয়েছে।

দুই, পশ্চিম ইয়োরোপের কয়েকটি দেশে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের (চীন-পন্থী গোষ্ঠী) সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরগুলি দ্রুত শিথিল

হচ্ছে। ন্যাটোর সদর দপ্তর প্যারিস থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃটিশ পাউন্ডের অবমূল্যায়ণ পুঁজিবাদী আর্থিক ও মুদ্রা ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে।

তিন, ইস্রায়েলী আক্রমণকে কেন্দ্র করে আরব রাজ্যগুলিতে কঠোর মার্কিন-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। প্যালেস্টাইনের জনগণ তাদের পিতৃভূমি উদ্ধারের জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রস্তুত হচ্ছে।

চার, কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলো, মোজাম্বিক, পর্তুগীজ গিনি, জিম্বাবোয়ে (রোডেশিয়া), প্রভৃতি দেশের মানুষ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামকে জোরদার করে তুলছে।

পাঁচ, দক্ষিণ ইয়েমেনের মানুষ বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে জয়লাভ করেছে এবং গত ৩০ নভেম্বর দক্ষিণ ইয়েমেন জন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ছয়, মার্চ মাসে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক শাখা দার্জিলিং জেলার নক্সালবাড়ীতে কৃষক বিদ্রোহ পরিচালনা করেছে। ভারতের বিভিন্ন জেলায় এই ধরনের আন্দোলন দেখা দিচ্ছে।

সাত, রুশ নেতৃত্ব আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনছেন, আর তার ফলে সেখানে শ্রেণী বৈষম্য প্রতিদিনই বাড়ছে। বহির্বিষয়ক ক্ষেত্রে তাঁরা আত্ম-সমর্পণমূলক পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে চলেছেন, এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারে পরিণত হয়েছেন।

আট, চীনের প্রথম হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে পৃথিবীর সর্বত্র বিপ্লবী মানুষের মনোবল বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নয়, বর্মায় কম্যুনিস্ট পার্টির সশস্ত্র সংগ্রাম দ্রুত প্রসার লাভ করছে।

দশ, হংকংয়ে তাদের সগোত্ররা বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূত্রপাত করেছে।

এগারো, তাদের মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও সে-তুং স্বয়ং ঐতিহাসিক দিক দিয়ে অভূতপূর্ব এবং মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করে তাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এর ফলে পৃথিবীর মানুষ চীনকে বিশ্ব বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি বলে মনে করতে সুরু করেছে।

বারো, ভিয়েতনামের মানুষ আমেরিকার বিরুদ্ধে সংগ্রামে গৌরবময় জয়লাভ করেছে। গত বছর তারা দু' লক্ষ শত্রু (এক লক্ষ মার্কিন সৈন্যসহ) এবং এক হাজারেরও বেশি মার্কিন বিমানকে ঘায়েল করেছে।

তেরো, লাওসীয় সৈন্যবাহিনী ও জনগণ ইতিমধ্যেই দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মুক্ত করে ফেলেছে। গত বছর তারা ৫,০০০ শত্রু ও ২০০ শ'র বেশি মার্কিন বিমান ঘায়েল করেছে।

চোদ্দ, থাই জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম দেশের ৭১টার মধ্যে ২৮টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। গত দু' বছরে বারো শতাধিক শত্রু খতম হয়েছে।

পনেরো, মালয়ের জনগণের দীর্ঘ-মেয়াদী বৈপ্লবিক সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ হচ্ছে।

ষোল, ফিলিপিন জনগণের দৃঢ়, দীর্ঘ-মেয়াদী সশস্ত্র সংগ্রাম আরেকবার দেখা দিচ্ছে।

সতেরো, ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবী জনগণ আবার শক্তি সঞ্চয় এবং পশ্চিম কালিমান্তানের গ্রামাঞ্চলে ফ্যাসীবাদী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রসার করছে।

আঠেরো, নিউজিল্যান্ডের ও অস্ট্রেলিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ধ্বজা ঊর্ধে তুলে ধরেছে।

ঊনিশ, জাপানী জনগণের মার্কিন বিরোধী আন্দোলন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কুড়ি, জনসন সরকার দেশে ও বিদেশে সংকটের দ্বারা পরিকীর্ণ। ভিয়েৎনামে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে বিপর্যয়ের সম্মুখীন। প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাকনামারা পদত্যাগ করেছেন। দেশের সর্বত্র এক শ'রও বেশি শহরে নিগ্রো প্রতিরোধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। ভিয়েৎনামের যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন বেড়েই চলেছে।

একুশ, লাতিন আমেরিকায় গণতান্ত্রিক বিপ্লব আরো গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। দেশের পর দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তল্পিবাহকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের আগুন জ্বলে উঠছে।

কল্পনার স্বর্গ

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, একমাত্র নিজের দেশের সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া আর কোথাও যে সব বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ঘটছে বলে বলা হচ্ছে তার পেছনে কম্যুনিস্ট চীনের সক্রিয় হাত বিশেষ নেই। এবং বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বলে যা চালানো হচ্ছে তার গুরুত্বও তেমন কিছুই নয়।

যেমন ভারতে নকশালবাড়ী আন্দোলন। ওয়াকিফহাল লোক মাত্রই জানেন ঐ বিপ্লবের স্বরূপ ও শক্তি কতখানি ছিল এবং তা এখন কিভাবে একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। অথচ চীন তারই মধ্যে নিজের পররাষ্ট্রনীতির জয়-জয়কার লক্ষ্য করে আত্মতৃপ্তি লাভ করছে! এমনি প্রায় সর্বত্রই। মাও সে-তুং তাঁর কল্পনার স্বর্গে বাস করছেন আর চীনারা ভাবছে সব কিছুই ঠিক আছে।

অথচ এদিকে যে একের পর এক দেশ থেকে চীন মান-মর্যাদা হারিয়ে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে, একের পর এক কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র ও পার্টি যে চীনের প্রভাবের পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসছে, সে সম্পর্কে সে নীরব।

সর্বশেষ দৃষ্টান্ত ভিয়েৎনাম। ভিয়েৎনামের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে চীন এ যাবৎ

আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড তড়পিয়ে এসেছে এবং চীনাদের ভিয়েৎনামে লড়তে দেবার জন্যে উত্তর ভিয়েৎনামের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এসেছে। কিন্তু উত্তর ভিয়েৎনাম ঐ চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে অস্বীকার করেছে। সেটা আমেরিকার প্রতি প্রীতিবশত নয়, নিজের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে। তবে চীনের কাছ থেকে সামরিক ও অন্যান্য সাহায্য এসেছিল এবং সেই সঙ্গে এই চাপও এসেছিল যে, আমেরিকা ভিয়েৎনাম থেকে একেবারে সরে না যাওয়া পর্যন্ত হ্যানয় যুদ্ধ চালিয়ে যায়। হ্যানয় এখন এই চাপও অগ্রাহ্য করেছে। সে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করতে রাজী হয়েছে।

তার আগে আমরা দেখেছি কিভাবে কিউবা, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি দেশ প্রকাশ্যে চীনের আদর্শের প্রতি বিরোধিতা ঘোষণা করেছে। সর্বশেষে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির চীনপন্থী বলে চিহ্নিত গোষ্ঠীও চীনের প্রভাব থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছে। কম্বোডিয়া, যার সঙ্গে চীনের আতাত ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ, এখন চীনের কবল থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছে। বর্মায় চীন-বিরোধী গণবিক্ষোভ খুব বেশী দিনের কথা নয়। যে ফ্রান্স ১৯৬৪ সালে লাল চীনকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছিল সেই ফ্রান্সের সঙ্গে তার সম্পর্কেও এখন ভাঙন ধরেছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কবলে পিকিংয়ে ফরাসী কূটনীতিকদেরও হেনস্থা হ'তে হয়েছিল।

ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৬৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর চীনাদের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তার ফলে চীনকে ঐ দেশ থেকে হতমান হয়ে চলে আসতে হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে চীনের পররাষ্ট্র নীতিতে ভাটার যুগ আরম্ভ হয়েছে ১৯৬৩ সাল থেকে। ঐ বছর জুলাই মাসে মস্কো আলোচনা ব্যর্থ হবার পর চীন ও রাশিয়ার মধ্যে ভাঙন চূড়ান্ত হয়। ঐ ভাঙনের পর রাশিয়াকে কোণঠাসা করার উদ্দেশ্য নিয়ে চীনা নেতৃবৃন্দ মিত্রের সন্ধানে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। লিউ শাও-চি যান উত্তর কোরিয়ায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন ঈকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই যান আফ্রিকায়ঃ দীর্ঘদিন ধরে তিনি ক্রমে ক্রমে সফর করেন সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, আলজিরিয়া, মরক্কো, টিউনিসিয়া, ঘানা, মালি, গিনি, সুদান, ইথিওপিয়া ও সোমালি সাধারণতন্ত্র। ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চৌ আটদিনের সফরে যান পাকিস্থানে। অক্টোবর মাসে ব্রাৎসাভিল কঙ্গো ও সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক কম্যুনিস্ট চীনকে স্বীকৃতি দেয়।

চীনা নেতাদের এই দৌতিয়ালী যে ঐ সময় কিছুটা সফল না হয়েছিল তা নয়।

কিন্তু অনুরাগ বিরাগে পরিণত হ'তে বেশি দেরী হয়নি। "আফ্রিকা বিপ্লবের জন্যে তৈরী," চৌ এন্-লাইর এই মর্মে একটি উক্তি আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রধানমন্ত্রী চৌ'র ঐ উক্তির মধ্যে ঐ রাষ্ট্রগুলি চীনা প্রভুত্ব বিস্তারের একটা চেষ্টা বলে মনে করে সন্ত্রস্ত ও সতর্ক হয়। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে বুরুন্ডি সরকার চীনা কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের বহিষ্কৃত করে এবং সাময়িকভাবে চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। এক বছর পর, ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে, ডাহোমি ও মধ্য আফ্রিকা রিপাবলিক চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। এর কিছুদিনের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপার ভল্টা। ২৪ ফেব্রুয়ারী, ঘানার কোয়ামে এনক্রুমা যখন পিকিংয়ে সফর করছিলেন তখন এক অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। এই ঘটনাও চীনের প্রতি একটা আঘাতের মতো। এপ্রিল মাসে আইভরি কোস্টের প্রেসিডেন্ট ফেলিক্স হুফুয়ে-বোয়ানি পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলিতে চীনের "শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশ" সম্পর্কে সতর্ক করে দেন।

আফ্রো-এশীয় দুনিয়ায় চীনের কণ্ঠ যে কতখানি ক্ষীণ হয়ে এসেছে তার প্রমাণ স্বরূপ আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে একটা পিকিং-পন্থী আতাত গড়ে তোলার জন্যে চীন একটি সংহতি সম্মেলনের ডাক দেয়। ১৯৬৫ সালের ২৯ জুন আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে সম্মেলন বসবার কথা ছিল। সম্মেলন অনুষ্ঠানের পথে প্রথম বাধা আসে যে মাসে যখন রাশিয়া জানায় যে, সে সংহতি সম্মেলনে যোগ দেবে। চীন এর বিরোধিতা করে বলে যে, তা সম্ভব নয় কেননা রাশিয়া এশীয় শক্তি নয়। কিন্তু এই যুক্তি সকলের গ্রাহ্য হয়নি এবং এই নিয়ে আফ্রো-এশীয় দেশগুলি স্পষ্টতই দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বাধা আসে আলজিরিয়ায় একটি অভ্যুত্থানের ফলে বেন বেল্লার ক্ষমতাচ্যুতির মধ্যে দিয়ে। এই ঘটনার পর ১৩টি আফ্রো-এশীয় দেশ সম্মেলন পিছিয়ে দেবার জন্যে দাবী জানায়, তারপর ২৭ জুন কায়রোয় প্রেসিডেন্ট নাসের, প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ ও প্রধানমন্ত্রী চৌ'র মধ্যে এক বৈঠকে ঠিক হয় যে, সম্মেলন নভেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হোক। পরে অবশ্য সম্মেলন অনির্দিষ্টকালের জন্যেই পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ পর্যন্ত ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্যে চীন যে রকম তৎপরতা দেখিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলনের এই পরিণতি চীনের পক্ষে কূটনৈতিক বিপর্যয়েরই সামিল।

মূল কারণ

এটা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কে ভাঙন না ধরলে চীনের পররাষ্ট্র নীতি এইভাবে বিবর্তিত হ'ত না এবং তাকে এইভাবে বিচ্ছিন্নও হ'তে হ'ত না। এতদিন সোভিয়েট ইউনিয়নই ছিল বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। এখন চীন ঐ সম্মানের দাবীদার হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করেছে। স্বভাবতই রুশ প্রভাবকে খর্ব করবার জন্যে তাকে উঠে-পড়ে লাগতে হয়। কিন্তু এই চেষ্টা করতে গিয়ে সে এমন আচরণ দেখাতে থাকে, এমন কথাবার্তা বলতে থাকে, এমন থিসিস প্রচার করতে থাকে যে, আফ্রো-এশীয় দুনিয়ার ছোটখাটো দেশগুলি তার সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়ে। এই দেশগুলি প্রায় সকলেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আওতা থেকে স্বাধীন হয়েছিল। এখন চীনের অতিরিক্ত কূটনৈতিক ও সামরিক প্রয়াস নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা বলেই তাদের মনে হয়েছিল। এইভাবে না এগিয়ে চীন যদি অনেক সুক্ষ্মভাবে এবং সুকৌশলে ও প্রত্যেক দেশের বাস্তব অবস্থার প্রতি মর্যাদা রেখে এগোতো তাহলে আজকে যে সে আফ্রো-এশীয় দুনিয়ায় রাশিয়ার স্থান অনেকখানি দখল করতে পারত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ চীন একে আফ্রো-এশীয় দুনিয়ারই একটি দেশ তার ওপর তার বৈষয়িক সমৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়।

চীনের এই মানসিকতার পেছনে যে দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করছে, তার পররাষ্ট্র নীতিকে বুঝতে গেলে সেটা জানা দরকার। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই চীন ও রাশিয়ার সম্পর্কে প্রথমে ফাটল ও পরে চূড়ান্ত ভাঙন ধরেছিল।

এই দৃষ্টিভঙ্গীকে এক কথায় বলা যায়ঃ জঙ্গী জাতীয়তাবাদ। চীনারা এমনিতেই মনে করে তারা ঈশ্বরের বরপুত্র, তাদের দেশ পৃথিবীর মধ্যমণি, পৃথিবীর সভ্যতা তাদের দেশ থেকেই উৎসারিত হয়েছে। তার ওপর মাঞ্চু রাজত্বের পর এই প্রথম কম্যুনিস্টরা খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত চীনকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শোষণের পাত্র ছিল যে দেশ, সে দেশ এখন একটি শক্তিশালী নেতৃত্বের উৎসস্থল হয়ে উঠল। স্বভাবতই চীনের নতুন নেতৃত্বের মনে নিজেদের ক্ষমতা ও চীনের গৌরব সম্পর্কে ধারণা হল অভ্রংলিহ। এই রকম একটি দেশ যে দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি হিসেবে থাকতে পারে না এটা তাঁরা ধরেই নিলেন। পৃথিবীর বৃহত্তম না হোক অন্যতম বিরাট শক্তিতে পরিণত হবার জন্যে তাদের বাসনা উদগ্র হয়ে উঠল। তার ওপর এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জাপানকে পরাস্ত করার পর তাঁদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠল যে, চীনা জাতীয়তাবাদকে সম্বল করে তাঁরা যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন।

চীনের প্রতিটি কাজকর্মের মধ্যে এই মানসিকতার ছাপ রয়েছে। তবে এ-কথা ঠিক যে এই মানসিকতাকে আরো বেশি জঙ্গী করে তুলেছিল চীনের প্রতি পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের প্রকাশ্য শত্রুতা। কম্যুনিস্ট চীনের জন্ম-লগ্ন থেকে আমেরিকা তার বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে আসছে। তার ওপর চীনকে চক্রান্ত করে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাইরে রাখা হয়েছে। তার বদলে চীনের আসনে বসতে দেওয়া হয়েছে যে তাইওয়ানকে, সে আয়তনেও যেমন

একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, তার শক্তিও কিছুই নেই। কম্যুনিস্ট চীনের পক্ষে এটা ইচ্ছাকৃত অপমান ছাড়া আর কিছু নয়।

স্বভাবতই চীনের এই জঙ্গী মানসিকতা প্রথম থেকেই আমেরিকার বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়। এশিয়ায় মার্কিন প্রভাব যেভাবেই হোক খর্ব করতে হবে এই ছিল গোড়ার দিকে চীনের একমাত্র পররাষ্ট্র নীতি। কোরিয়ার যুদ্ধে চীনের অংশ গ্রহণ এবং ফরমোজা (তাইওয়ান), কীময় ও মাৎসু উদ্ধারের জন্যে তার সামরিক তৎপরতা এই নীতির বহিঃপ্রকাশ। রাশিয়ার সঙ্গে আঁতাত (১৯৫০ সালের মৈত্রী চুক্তির ভিত্তিতে) এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির ভিত্তিতে (বান্দুং সম্মেলন) আফ্রো-এশীয় দুনিয়ায় একটি মার্কিন-বিরোধী গোষ্ঠী গড়ে তোলার চেষ্টাও এই পর্যায়ের অপর দুটি বৈশিষ্ট্য।

তারপরেই তত্ত্বগত কারণে ও আমেরিকার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের বিরোধ দেখা দিতে আরম্ভ করে। এই বিরোধই পরে দুদেশের সম্পর্কে চূড়ান্ত ভাঙন ধরায়। এদিকে আরো দুটি ঘটনা ঘটতে থাকে ঃ প্রথমত রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধ যতই প্রবল হতে লাগল, আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে ফাটলও ততই প্রশস্ত হতে লাগল, এবং আনুগত্যও এইভাবে বিভক্ত হ'তে লাগল। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে আফ্রো-এশীয় দেশগুলির মধ্যে অনেকেই আমেরিকার সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হ'তে চাইল না। এই দুটি ব্যাপারের কোনটাই চীনের পছন্দ হবার কথা নয়, কারণ তার পররাষ্ট্র নীতির মূল আদর্শই অর্থাৎ মার্কিন-বিরোধিতা, এর দ্বারা ব্যাহত হচ্ছিল।

এরপর আমরা চীনকে দেখি, নিজেকে রাশিয়ার স্থলাভিষিক্ত করে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দিয়ে আফ্রো-এশীয় দেশগুলিকে আমেরিকার প্রভাব থেকে বার করে আনবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। কোথাও গায়ের জোরে, কোথাও ভয় দেখিয়ে। যে দেশ তার ঐ ভ্রূকুটির কাছে নতি স্বীকার করতে রাজী হয়নি তার বিরুদ্ধে সে নানাভাবে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছে। ১৯৬২ সালে ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনের আক্রমণ এই কারণ থেকেই উদ্ভূত। এর সঙ্গে আরো একটি জোরালো কারণ ছিল। চীনের মতো ভারতও একটি প্রাচীন ও বিরাট দেশ এবং আফ্রো-এশীয় দুনিয়ায় তার মর্যাদাও কিছু কম ছিল না। সুতরাং ভারতকে যে-কোনভাবে হতমান করতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হয়ে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। সীমান্ত যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকের মতো আক্রমণ করে চীন ভারতকে পর্যুদস্ত করেছিল ঠিকই কিন্তু তার ফলে একদিকে যেমন ভারতকে চীনের বিরুদ্ধে একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলতে উৎসাহ দিয়েছে অন্যদিকে তেমনি আমেরিকাকে আরো ব্যাপকভাবে এই অঞ্চলে জড়িয়ে ফেলেছে। এটা চীনের পররাষ্ট্র নীতির ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

লাল চীন এখন চারদিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের মধ্যে গুটিয়ে এসে ভাবছে তার পররাষ্ট্র নীতি আশ্চর্য রকমে সফল হয়েছে, কারণ পৃথিবীর দেশে দেশে এখন বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চলছে। চীনা পররাষ্ট্র নীতি বর্তমানে যে কতখানি ব্যর্থ এটাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

কথা হচ্ছে ভবিষ্যতে কি হবে। আর দশ বছরের মধ্যে একদিকে যেমন চীনের অর্থনৈতিক বনিয়াদ আরও সুদৃঢ় হবে তেমনি সামরিক শক্তিও বাড়বে। চীনের পারমাণবিক অগ্রগতি ঐ সময় এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছবে যেখানে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পারমাণবিক আক্রমণ চালাতে সক্ষম হবে। তখন কি চীন তার পূর্ণ জঙ্গী প্রতিশোধ চরিতার্থ করবার চেষ্টা করবে?

চীনের মতিগতি অবশ্য নিশ্চয় করে বলা মুস্কিল তবে যতদূর মনে হয় সে সেইরকম কিছু করবার চেষ্টা করবে না। কারণ ততদিনে আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়েরই সামরিক শক্তিও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। এই আনুপাতিক ক্ষমতার কথা মনে রেখেই চীন রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর তর্জন-গর্জন করলেও আমেরিকার সঙ্গে বা রাশিয়ার সঙ্গে কোন সম্মুখ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি। আশা করা যায় এই বিবেচনা তার তখনও থাকবে।

অবশ্য অনেক কিছুই নির্ভর করছে মাও সে-তুংয়ের পর চীনা নেতৃত্বের চরিত্র কিভাবে বদলায় তার ওপর।

মহেন্দ্র চক্রবর্তী
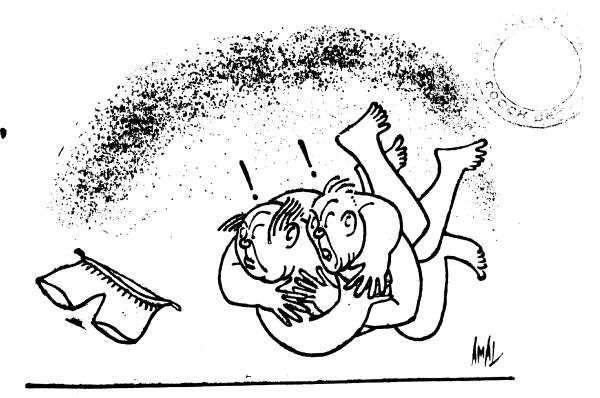
ভারতীয় রাজনীতিতে চীনা প্রভাব

৬২ সালে চীন আক্রমণের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলিতে ভারতের আত্ম-বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হয়েছিল। পাশের যে দেশকে ভারত ভাই বলে আলিঙ্গন করেছিল, রাতের অন্ধকারে সে ছুরিকাঘাত করলো। ভারতের আপামর জনসাধারণ মন-প্রাণ দিয়ে তা সেদিন প্রথমে বিশ্বাস করেনি। এ দেশের সে সময় জীবনের গতি থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এ বিপদ মাথায় পেতে নিয়েও ভারত সরকার চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। তাই চীন আক্রমণের প্রতিক্রিয়া ফুটে বেরুতে সুরু করলো তার পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যবস্থাদির মধ্যে। পারস্পারিক সৌহার্দ্যের মধ্য দিয়ে সকল দেশের উন্নতি হোক এবং এই কাজের জন্য শান্তি ও সহাবস্থান নীতিকে ভারত মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিল বলে সে তখন দেশরক্ষার ব্যাপারে ছিলেন পুরোপুরি উদাসীন। সে ভাবতেই পারে নি, চীন কেন অন্য কোন দেশই তার শত্রুতা করতে পারে। কিন্তু বাস্তবের কষাঘাতে তার সে ভুল ভাঙলো।

যে ভারত তার মাটিতে মার্কিন সরকারকে র‍্যাডার বসাবার সুযোগ দেয়নি, সেই দেশেরই এক প্রান্ত তেজপুরে তখন ছুটে এসেছিলেন মার্কিন ও বৃটিশ সমরবিশারদরা। পণ্ডিত নেহেরুর মত নেতাকে এ অবস্থা মাথা পেতে নিতে হয়েছিল। কারণ পার্শ্ববর্তী রাজ্য চীন ভারতের সার্বভৌমত্ব কেড়ে নিতে কার্পণ্য করেনি। এমন কি তখন বিদেশী সমরবিদরা 'অ্যাটমিক আমব্রেলা' সৃষ্টি করে ভারতকে চীনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। যে ভারত চিরদিন যুদ্ধের বিরোধী সেই দেশ তাতে সায় দিয়েছিল।

৬২ সালের পর থেকে চীন ক্রমাগত ভারতের সঙ্গে নানা অছিলায় শত্রুতা করে আসছে। এই কুকাজে আজও তাদের বিরাম নেই। সামান্যতম অছিলায় তারা সীমান্ত সংঘর্ষের জন্য উস্কানী দিয়ে চলেছে। আজও মনে পড়ে সেই গল্প—দিল্লীস্থ চীনা দূতাবাসের সামনে কতকগুলি ছাগল নিয়ে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল। কারণ তার কিছুদিন আগে পিকিং সরকার ভারতের কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়ে বলেছিল তাদের সীমান্ত থেকে ভারত সরকার কতকগুলি ছাগল চুরি করে নিয়ে গেছে।

চীন সে সময় থেকে ভারতবিদ্বেষী রাষ্ট্র, যেমন পাকিস্থান, তার সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা চালাতে সুরু করে। অতএব সমগ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ভারত সরকারকেও কতকগুলি সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। প্রথমে দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করে ভারত তার সীমান্তে কঠোর পাহারার ব্যবস্থা করে। তাই পরবর্তীকালে দেখা গেছে, সীমান্তে সংঘর্ষ লাগাবার চেষ্টা করে লালচীন বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। বিশেষ করে পাকিস্থান যখন ভারত আক্রমণ করে পর্যুদস্ত হতে চলেছিল, তখন তার দোসর চীন অকস্মাৎ নাথুলা সীমান্তে আক্রমণ সুরু করে দেয়। কিন্তু ভারতীয় জোয়ান-দের প্রতিরোধের সামনে সে দাঁড়াতে পারেনি। চীন কৌশল হিসেবে আর এক কাজ সুরু করে দেয়। ভারতের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সিকিম ও ভুটান এবং নেপালের কাছে বন্ধুত্বের মুখোশ পরে হাত এগিয়ে দেয়। তাদের মনের কোণে তখন অন্য উদ্দেশ্য। এই সময় দেখা যায়, বড় না হলেও ভারতের পররাষ্ট্র নীতিতে কিছু কিছু পরিবর্তনের দরকার হয়ে পড়েছে। বান্দুং সম্মেলনে গৃহীত নীতি ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেছিল প্রথমে চীন। গত পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে চীন শুধু ভারতই আক্রমণ করেছে, তাই নয়। তাদের আগ্রাসী নীতির ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের শক্তিও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। রাশিয়াকে চীন শোধনবাদী বলে নিন্দিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। ফলে সোভিয়েট রাশিয়া ভারতের দিকে আরো এগিয়ে এসেছে। ইন্দোনেশিয়ায় যতদিন কম্যু-নিস্টদের প্রভাব অব্যাহত ছিল, ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা কিছুটা বিদ্বেষ-প্রসূত ছিল। তবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র নীতি তখন পিকিং-এর নির্দেশে পরিচালিত হয়ে আসছিল। তাই দেখা গেছে ইন্দোনেশিয়া পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় প্রকাশ্যে পাকি-স্থানের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া ও ভারতের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ভারতের সংযোগ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু আজ তার ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গেছে। নেপালের মানে মাঝে মাঝে অন্য চিন্তাধারা হয়তো ছায়া-পাতের সুযোগ খুঁজছিল তারও অবসান

হয়েছে। চীন সিকিম আর ভুটানের সংগে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।

চীন আক্রমণের পরে গত কয়েক বছরে ভারতের রাজনীতিতে যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, তা ভারত সরকারের অনুসৃত দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করলেই বোঝা যায়।

আর সেই সংগেই লক্ষ্য করা যাবে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির ও তাদের আদর্শেও বেশ কয়েকটি পরিবর্তন।

বাংলা দেশের অবস্থা

গত বছর পশ্চিমবংগে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে পিকিং রেডিও প্রকাশ্যে বলতে সুরু করেছিল, নক্সালবাড়ীতে সাচ্চা কম্যুনিস্টরা মাও সে তুং-র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষি বিপ্লব ঘটাতে চলেছে। আর কম্যুনিস্টদের মধ্যে শোধনবাদী নেতারা তাতে বাধা দিচ্ছে।

পিকিং রেডিও-র একথা শুনে বাংলা দেশের বাম কম্যুনিস্টদের নেতারা তখন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কারো কারো কথা ছিল, তীর-ধনুক নিয়ে কয়েকজন লোক রোমাঞ্চকর কোন কাজ করতে এগিয়ে গেলে তাকে বিপ্লব বলা যায় না। তাঁরা একথা মানেন যে, অবশেষে একদিন এমন সময় আসবে যখন বিপ্লব ছাড়া শোষিত মানুষের হাতে ক্ষমতা দেওয়া যাবে না। কিন্তু তা বলে শীতকালে গরম পোষাক পরতে হবে বলে কেউ যদি মার্চ মাসেই গরম পোষাক পরতে সুরু করে, তবে তা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।

চীনকে আক্রমণকারী বলা হবে কিনা, এই প্রশ্ন নিয়ে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ৬২ সালেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। তার ওপর গত বছর থেকে পঃ বঙ্গের বাম কম্যুনিস্ট পার্টি পিকিং-এর সার্টিফিকেট পাওয়া নক্সালবাড়ী গ্রুপের ওপর আক্রমণ সুরু করে দেয়। ফলে অবস্থার আরো জটিলতা বাড়ে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, যতই দিন এগিয়ে চলেছে, বাম কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব বিশেষ কারণে ঐ নক্সালবাড়ীর নেতাদের ওপর তাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখলেও অন্যান্য সাধারণ কর্মীদের ওপর অন্যভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করে দিয়েছে। এর আবার দুটো দিক আছে। প্রথমত বাম কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে (তাদের দেওয়া সংখ্যানুযায়ী) শতকরা দশভাগ নক্সালবাড়ীর মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে গেছে। দ্বিতীয় এই পার্টির নেতাদের প্রকাশ্যে শোধনবাদী বলা হচ্ছে, এই দুর্নাম ঘোচানো অবশ্য দরকার।

তাই আগে গত নির্বাচনের পর যেটা মনে হয়েছিল যে, লাল চীনের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনীতির ওপর থেকে ক্রমশ চলে যাচ্ছে, পরে সে কথা ভুল প্রমাণিত হতে চলেছে। বরং তা আরো দানা বেঁধে উঠছে। কিছুদিন আগে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির বর্ধমানে যে প্লেনাম হ'লো, তখন এক সময় আশংকা দেখা দিয়েছিল উগ্রপন্থীরা হয়তো পার্টি কবজা করে ফেলবে। যা হো'ক পার্টির নেতাদের বিপদ কানের পাশ দিয়ে কেটে গেছে।

বাংলার জনসাধারণ ভারতের অপর প্রান্তের মানুষের মতই যে জাতীয়তাবাদের নাগপাশ থেকে এখনও মুক্তি পায়নি, তা বাম কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা ভুলতে পারছেন না। তাই তাঁরা জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির সংগে একজোটে ফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনের পথে যেতে কুণ্ঠাবোধ করছেন না। কিন্তু তাঁদের অন্য এক স্ট্র্যাটিজি আছে।

১৯৬২ সালে যখন অকস্মাৎ লালচীন ভারত আক্রমণ করেছিল, তখন অল্প সময়ের জন্য হলেও ভারতের আপামর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত বেদনার কাছে কিছু লোক নতি স্বীকার করে বসে পড়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, সীমান্ত নিয়ে ভারতের সংগে চীনের যে মতবিরোধ, তাতে ভারত একটার পর একটা অন্যায় করে চলেছে। ম্যাকমোহন লাইনের কথা ইত্যাদি কেবল অজুহাত। আসলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় ভারত এই অন্যায় করছে।

সে সময় থেকে দুটি কম্যুনিস্ট পার্টি সৃষ্টি হয়েছিল। আজ তারা প্রকাশ্যে লড়াই সুরু করে দিয়েছে।

তবে একথা সত্য যে, ভারত সরকারের সৌজন্যে লালচীনের সংগে আমাদের দেশের মধ্যে এক সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। প্রকাশ্যে পঞ্চশীলের ভিত্তিতে দু দেশের মধ্যে এক প্রগাঢ় বন্ধুত্ব দেখা দেয়। দুই সরকারের মধ্যে বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি গোড়া থেকেই এই দেশের কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করে আসছিল।

এদিকে চীন যখন ভারত আক্রমণ করে, তখন আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রেও রাশিয়া ও চীনের মধ্যে আদর্শগত সব পার্থক্য দানা বাঁধতে সুরু করেছে। ফলে তার এক ভয়ংকর রূপ দেখা গিয়েছিল ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে। অবশ্য কিছুসংখ্যক দুষ্টু লোক সমালোচনা করে বলে থাকেন, নেতৃত্বের লড়াই-এর জন্যও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে ভাঙন এসেছে। তবে তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই।

বাম কম্যুনিস্ট পার্টি নির্বাচনের পথে পা বাড়ালেও তারা যে নতুন স্ট্র্যাটিজি গ্রহণ করেছে, তার ইংগিত আগেই দেওয়া হয়েছে। জাতীয়তাবাদী দলগুলির সংগে একজোটে ফ্রন্ট গঠন করলেও তারা অন্যান্য পার্টির গলদের কথা প্রকাশ্যে জনতাকে বলে দিতে কার্পণ্য করছে না। ফলে অন্যান্য জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলিকে জনসাধারণের সামনে তারা মুখোশ খুলে চিনিয়ে দিতে সচেষ্ট। মাও যখন অন্যান্য দলের সংগে চীনের অভ্যন্তরে ফ্রন্ট গঠন করেছিল, তখনও সে এই স্ট্র্যাটিজি অনুসরণ করে ঐ দেশের অন্যান্য পার্টির মুখোশ খুলে দিয়েছিল। এর ফলে সমগ্র চীনকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে মাও-এর বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি।

লাল চীনের প্রভাব থেকে ভারতের রাজনীতিকে মুক্ত রাখার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস এখন কিছুটা সচেষ্ট হয়েছে। গোড়ার দিকে তাঁরা এই সমস্যার ওপর ততোধিক গুরুত্ব দেয়নি। ভারতীয় ক্রান্তিদল, প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছে যে, কম্যুনিস্টদের সংগে কোন ফ্রন্ট গঠন করা হবে না। গত নির্বাচনের পর কয়েকটি রাজ্যে তাঁরা অবশ্য কম্যুনিস্টদের সংগে জোট বেঁধে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা বোধহয় বুঝতে পেরেছে যে, কম্যুনিস্টদের সমগ্র কাজের মধ্যে একটা গুরুতর পরিকল্পনা আছে। এবং কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রচারের নামে তারা যা চাইছে তা ধ্বংসাত্মক। আর অন্যদিকে কম্যুনিস্টরা 'পোলারিজেশনের' দিকে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। গত নির্বাচনে কংগ্রেসকে হঠাতে হবে—এই শ্লোগানের ওপর তারা নিজেদের আসল উদ্দেশ্য জনসাধারণকে না জানিয়েই অন্যান্য জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলির সংগে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল। কিন্তু এবার বোধহয়, তার সুযোগ ও সুবিধে কম।

চীন এবং সোভিয়েৎ ইউনিয়ন

বিশ্বজিৎ রায়
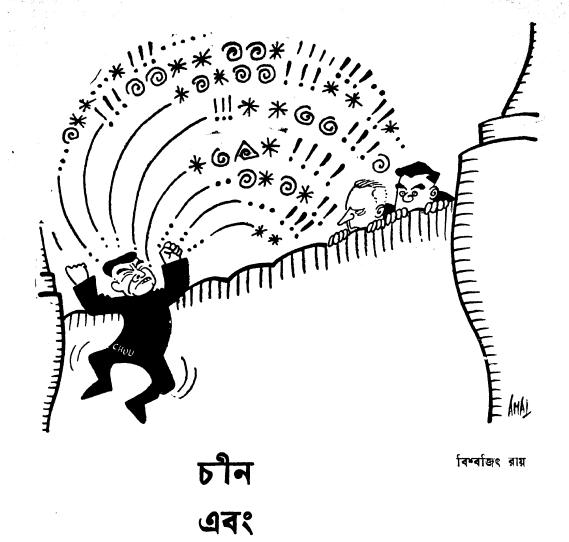
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এক সবচেয়ে তাৎপর্যমূলক রাজনৈতিক ঘটনা নিঃসন্দেহে সোভিয়েত-চীন বিবাদ। পৃথিবীর দুটি বৃহত্তম দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন। প্রথমটি কলেবরে দ্বিতীয়টি লোকবলে। ভৌগোলিক নৈকট্যও এদের রয়েছে। সর্বোপরি, উভয় দেশই একটি মতাদর্শকে রাষ্ট্রগতভাবে গ্রহণ করেছিল। অতএব এরা যদি একজোট থাকতে পারত তবে আন্তর্জাতিক শক্তি অনুপাত এবং রাজনীতির রূপ সম্পূর্ণ অন্যরকম হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে অবশ্য বেশ কিছুদিন এদের ঐক্য ছিল। ১৯৪৫ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার নিজের অর্থনীতি বিকাশে মনোযোগী হতে পারল এবং ১৯৪৯ সালে দেশে কম্যুনিস্ট শাসন কায়েম করার পর যখন চীন সমাজতন্ত্র গঠনে হাত দিল, তখন তারা ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিল। কোরিয়ার যুদ্ধের সময় সোভিয়েত সামরিক সাহায্য চীনে এসেছিল অজস্র পরিমাণে। তাছাড়া আর্থনীতিক সম্পর্ক এই সময় যথেষ্ট বিচিত্র এবং গভীর হয়ে উঠেছিল। দশ বছরের মধ্যে সোভিয়েত-চীন বাণিজ্য ৫ হাজার কোটি ডলার থেকে ২০ হাজার কোটি ডলারে পৌঁছেছিল। হাজার হাজার সোভিয়েত প্রযুক্তিবিদ-বিশেষজ্ঞ চীনে প্রায় ২০০ কলকারখানা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি ১৯৫৯ সালেও চীনের সরকারী কাগজে সোভিয়েত সাহায্যদানকে অভূতপূর্ব বলে বর্ণনা করা হয়েছিল।

কিন্তু মতাদর্শগত বিবাদ আস্তে আস্তে মাথাচাড়া দিতে শুরু করল। ১৯৬০ সালে বুখারেস্তে পারস্পরিক সাহায্যদান পরিষদে চীন-সোভিয়েত মতান্তর প্রথম সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাওয়ার সামান্য কিছু আগে চীন-সোভিয়েত দীর্ঘকালীন বাণিজ্যচুক্তি-বিষয়ক আলোচনা নিষ্ফল হল। আর, পূর্বোক্ত বুখারেস্ত সম্মেলনের পরেই চীনে কর্মরত সোভিয়েত ইঞ্জিনীয়ার, প্রযুক্তিবিদ এবং উপদেষ্টাদের হঠাৎ দল বেঁধে ফিরিয়ে আনা হল। তখন কিছু না বললেও সরকারী চীনা পত্রিকা ১৯৬৩ সালের শেষে অভিযোগ করেছিল

যে, মতাদর্শগত পার্থক্যকে অন্য ক্ষেত্রে বিস্তৃত করে চাপ দেবার চেষ্টায় সোভিয়েত সরকার প্রায় ১৪০০ বিশেষজ্ঞকে ফিরিয়ে নেন; প্রায় ৩৪০টি চুক্তি বিনষ্ট করেন; বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার ২৫০টি বিষয়কে নস্যাৎ করেন এবং বিভিন্ন যন্ত্র সরবরাহের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চীনের শিল্পায়নের পরিকল্পনাকে গুরুতরভাবে বিপর্যস্ত করে দেন।

শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রেই নয়, আরক্ষা বিষয়েও মতভেদ বিষম প্রকট হয়ে ওঠে এবং ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে আণবিক বোমা প্রস্তুতিতে যে সাহায্য দিতে সম্মত হয়েছিল তা ১৯৫৯ সালে দিতে অস্বীকার করে বলে চীন ঘোষণা করে। বলাবাহুল্য পারস্পরিক বিশ্বাস যে বহুল পরিমাণে লোপ পেয়েছিল তার প্রমাণ এতেই পাওয়া যায়। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যে ঐক্যবন্ধনের বিরাট সম্ভাবনা ছিল তা অত্যল্পকালের মধ্যে এত সাংঘাতিকভাবে ক্ষুণ্ণ হল যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতি কিম্বা মতাদর্শের ক্ষেত্রে এক দেশ চাইছে আরেক দেশকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে; একে অন্যের রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে বিশেষ ধরনের আরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। একদা অর্থোডক্স চার্চ এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ এক খৃস্টধর্মের অন্তর্গত হয়েও যেমন তীব্র বৈরভাব পোষণ করত আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধতা তারচেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়।

মতাদর্শগতভাবেই অবশ্য এ বিরোধের শুরু। স্তালিনের পর ক্রুশ্চভ যখন সরকার এবং পার্টিকে নতুন নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন তখন মতাদর্শকে "সৃষ্টিমুখীভাবে বিকাশ করে" তাকে খানিকটা নতুন রূপ দিলেন সোভিয়েত সমাজের বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নিয়ে। এই নতুন রূপ নিয়ে শুরু হল চীন-সোভিয়েত লড়াই। প্রধানত যে যে বিষয় নিয়ে মতানৈক্য প্রকট হল তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে যুদ্ধ এবং শান্তি। যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং আণবিক যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন—এই দুই ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে সোভিয়েত দেশ যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের কোন এক উপায় বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। আবার তার অনুসৃতি হিসেবে জগতের অগ্রগতিতে যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী সেই ধারণাকেও সে করল পরিত্যাগ। সঙ্গে সঙ্গে কোন সমাজে বিপ্লব ঘটানোর একমাত্র পন্থা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছাড়া আর কিছুও হতে পারে তাও সে মেনে নিল। মাও সে তুং-এর কাছে অবশ্যই এমন মতবাদ বড় সুকুমার ঠেকল। তার সামনে তখন আফ্রিকা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ক্ষেত্র; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কেবল বিপ্লব-শুরুর সংকেতধ্বনির অপেক্ষায়, ওদিকে ফিদেল কাস্ত্রোর বিপুল শক্তির মাধ্যমে প্রাচীন সমাজব্যবস্থাকে ঠেলে ফেলে দিতে ল্যাটিন আমেরিকা পা বাড়িয়ে দিয়েছে। এর পর যদি সাম্যবাদ বা বিপ্লব-বিরোধী শক্তিবর্গ যুদ্ধ বাধাতে আসে তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নই না হয় তাদের ঠেকাবে। তাতে অবশ্য অনেক লোক মারা যাবে। তা মরুক না তারা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আশা করা যায় সব বড় বড় শক্তিবর্গের পতন হবে আর ফলে জগতে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে নিশ্চিন্তভাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের তাতে আপত্তি। যুদ্ধের সাহায্য নয়, শান্তিবাদী সমাজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেই বিভিন্ন জাতিকে উক্ত মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে তাদের বিপ্লবের দিকে এগিয়ে দেওয়া যায়—এই হল তাদের বক্তব্য। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন বুঝবে যে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে কোন এক পরিবেশে সুবিধাজনক সেখানে সে তার সমর্থন করবে না। আবার ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির অমৃতসর কংগ্রেসে গৃহীত সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে সাম্যবাদের জয়ের সম্ভাবনাকে স্বীকৃতিদানকারী সিদ্ধান্তকেও সে স্বাগত জানিয়েছে। এই মৌলিক ধারণায় ন্যায়সঙ্গত বিস্তৃতি ঘটল বিভিন্ন বিকাশমান দেশে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকাকে এবং এক ধরনের শ্রেণী-সহযোগিতাকে মেনে নেওয়া। বলাবাহুল্য যাঁরা "বিরাট উল্লম্ফনে" বিশ্বাসী, তাঁরা এ ধরনের বিভিন্ন বা মাধ্যমিক পর্যায়ের ভিতর দিয়ে বিপ্লবে উত্তরণ গ্রাহ্য করতে পারেন না। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমন চীনের কম্যুন প্রথা বা "বিরাট উল্লম্ফনের" পরিকল্পনাকে ছেলেমানুষী বলে অবজ্ঞা করেছিল চীনও তেমনি সোভিয়েত মতবাদকে বিশুদ্ধ নয়, পরিশোধিত বুর্জোমানুষী বলে ধিক্কার দিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি সম্পর্কে চীন আরও কিছু এগিয়ে গিয়ে সে নীতিকে সাম্রাজ্যবাদ এবং নয়া-উপনিবেশবাদের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের গোপন সমঝোতার প্রকাশ হিসেবে বর্ণনা করল।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবর্তিত মুনাফা এবং বৈষয়িক উৎসাহদানের রীতি এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের অবসানমূলক ধারণারও চরম বিরোধী চীন। তার মতে সোভিয়েত নেতৃত্বের নীতিবিহীন সুবিধাবাদী-শোধনবাদী চরিত্রের অন্যতম প্রমাণ এই রীতি এবং ধারণার মধ্যে মেলে। বলাবাহুল্য যে বাস্তবানুগ বিচারে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সব নতুন দিকে উদ্যোগী হয়েছে—অবশ্য অনেকের মতে যতটা হওয়ার সম্ভাবনা এবং প্রয়োজন ছিল তারচেয়ে অনেক কম হয়েছে—চীনের পক্ষে সে বিচার মানা অসম্ভব। তাহলে হয়ত মাও-এর গদীতে টান পড়তে পারে।

কিন্তু এই মতাদর্শের লড়াই যেহেতু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে বাধ্য—কারণ মতাদর্শটি প্রধানত রাজনৈতিক — তাই রাষ্ট্রীয় সম্পর্কেও দুই দেশের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। আর্থনীতিক এবং বাণিজ্যের দিক দিয়েও যেমন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও তেমনি চীন আর সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্তমানে একে অন্যের বহু দূরে। উভয়েরই বাসনা অন্যকে পর্যুদস্ত করা। চীন চাইল আলজিরিয়াতে আফ্রো-এশীয় সম্মেলন করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ও-মহল থেকে সরিয়ে রাখতে। কিন্তু ভারতের মৈত্রীর সাহায্যে সে চক্রান্ত সফল হতে দিল না সোভিয়েত দেশ। ফলে চীন সে সম্মেলন হতেই দিল না। এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফ্রো-এশিয়া দেশে চীনের তুলনায় অনেক বেশী সম্মানার্হ। আফ্রিকার নানা দেশে এবং বিশেষত ইন্দোনেশিয়াতে চীনাদের অ্যাডভেঞ্চারমূলক নীতির শোচনীয় ব্যর্থতা এবং স্বদেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অনপনেয় কালিমার ফলে চীন যতখানি হেয় হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নও সেই পরিমাণে নিজের মান বাড়িয়েছে।

তবে তার ফলে মাও আরেকটি ভয়ংকর হাতিয়ার হাতে তুলে নিয়েছে যদিও তার সম্পূর্ণ ব্যবহার এখনো শুরু করে নি। সে হচ্ছে শ্বেতকায় জাতির বিরুদ্ধে ঘৃণার অভিযান। এর ফল শেষ পর্যন্ত কী হবে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু এর মধ্যে যে এক সাংঘাতিক ধ্বংসবীজ লুকিয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ ছাড়া সোভিয়েত-বিদ্বেষের অভিব্যক্তি হিসেবে মাও সরবে বলছে চীনের — এবং শুধু চীনের নয়, আরো অনেক দেশের — বিভিন্ন এলাকা সোভিয়েত ইউনিয়ন কুক্ষিগত করে রেখেছে। অবশ্য মাও বলেছে এখনো সে চীনের দাবীর পুরো দলিলটি সোভিয়েত সমক্ষে পেশ করে নি।

বর্তমানের এই তিক্ত পটভূমিতে সোভিয়েত দেশে কোন ভারতবাসী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললে তার শ্রোতাদের কাছ থেকে খুব একটি সুব্যক্ত সহানুভূতি পাবেন না। কিন্তু ভারতের প্রতি চীনের বিশ্বাসঘাতকতার প্রসঙ্গ অবতারণা মাত্র যে তিনি উপস্থিত সকলের সমর্থন লাভ করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সত্যি কথা বলতে কি রাষ্ট্রগত বা পার্টিগত বিভেদ যেভাবে সাধারণ মানুষের মনে প্রবেশ করেছে তাতে চীন এবং সোভিয়েত জনগণের মধ্যে মৈত্রীর পুনঃস্থাপন উভয় দেশের পার্টির মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির তুলনায় ঢের বেশী কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ হবে। জনসাধারণের মনের তিক্ততার একটি উদাহরণ হল নেহরু প্রয়াণের পরের দিন মস্কোর এক নামজাদা অধ্যাপক আমায় বলেছিলেন, "আচ্ছা, জগতের প্রয়োজন যাঁদের তাঁরা কেন মারা যান, (অর্থাৎ নেহরু) আর যাদের পৃথিবীতে কোন দরকারই নেই (অর্থাৎ মাও সে তুং) তারা কেন বহাল তবিয়তে টিঁকে থাকে?"

এটা লক্ষ্য করেছি যে, ভারত সম্বন্ধে সাধারণ সোভিয়েত নাগরিকের প্রীতি এবং উৎসাহ অন্তত তিনজন ভারতীয়কে ঘিরে—যাঁদের মনে করা হয় ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ। কিন্তু চীনের কোন রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত ইউনিয়ন পায় নি; রাজকাপুর তো নয়ই; আর নেহরুর মত মায়াজাল বিস্তার করা মাও সে তুং, লিউ শাও চি অথবা চৌ এন লাই-এর দ্বারা সম্ভব হয় নি। ফলে যখন মাও-এর দুলাল লালরক্ষীরা হতভাগ্য চীনের ওপর চড়াও হল তখন সোভিয়েত দেশবাসীরা চীনের প্রেরিত-পুরুষকে কোনরকমে সামান্যতম সমর্থনের সূত্রও খুঁজে পেলেন না। তাছাড়া লালরক্ষীদের বর্বরতায় চীনের সেইসব সম্পদ বিনষ্ট হল যার প্রতি সোভিয়েত দেশে ন্যায়সঙ্গতভাবেই একটা শ্রদ্ধা ছিল। চীনের গান-নাচ নাটক-সিনেমা নয়, একমাত্র চিত্রকলাই সোভিয়েত ইউনিয়নে অকুণ্ঠ প্রশংসার বস্তু। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত মস্কোতে চীনা চিত্র ব্যাপকভাবে বিক্রি হয়েছে। আর সেই চিত্রকলার সব ঐতিহাসিক নিদর্শনকে মাও-বাদের ধ্বজাধারীরা যে নির্লজ্জভাবে ক্ষতি করল এটা সেই জনগণ ঠিক মেনে নিতে পারলেন না, যাঁরা অক্টোবর বিপ্লবের সূচনায় জারের শীতপ্রাসাদের ওপরে ঝটিকাক্রমণ করেও সেখানকার প্রসিদ্ধ চিত্রসংগ্রহের ওপর যাতে একটি আঁচড়ও না পড়ে সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। সেদিন নেতা ছিলেন লেনিন আর চীনেতে উক্ত বীভৎসতার পুরোহিত লেনিনবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা বলে নিজের দাবী জানিয়ে থাকেন।

মাও-এর "সাংস্কৃতিক বিপ্লব" বাকি চিত্রটি চীন সম্বন্ধে সোভিয়েত শ্রদ্ধার সবটুকু নিঃশেষ করে দিয়েছে। পৃথিবীর আর কোন দেশে বোধহয় সংবাদপত্রে এমন কৌতুকের খোরাক যোগান হয় নি যেভাবে লিতেরাতুরণীয়া গাজিয়েতা দিনের পর দিন বিনা মন্তব্যে চীনা সংবাদপত্র থেকে বিভিন্ন সংবাদ-নিবন্ধ ইত্যাদি সঙ্কলন করে পরিবেশন করেছে। কিভাবে একজন তরমুজওয়ালা তার ফল বিক্রির রীতি উন্নত করেছে মাও-এর মহিমায়; কেমন করে চীনের নাপিত তার কাঁচি চালানোর কেরামতি বৃদ্ধি করেছে মাও-নামের মন্ত্রবলে; কেন পিংপং খেলোয়াড়রা খেলার কায়দা রপ্ত করতে পারছিলেন না, যতক্ষণ না তাঁরা মাও-এর শরণ নিলেন — এবম্বিধ চমকপ্রদ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তথ্য এবং তত্ত্ব সোভিয়েত পাঠক-পাঠিকারা পেতেন নানা চীনা খবরের কাগজের অনুবাদ থেকে। একদিন, বছর দুই আগের কথা, ছ' বছরের ছেলে বোরিস এসে খবর দিল 'জানো বাবা, মাওৎসে দুনের (মাও সে-তুং-এর রুশ উচ্চারণ) ছবি, দাঁতের বুরুশ আর সাবান ছাড়া চীনের দোকানপাটে কেউ আর কিছু রাখতে পারছে না বলে ইস্কুলের মাসির কাছে শুনলাম।' এর থেকে মাও-চীনের সাধারণ সোভিয়েত মনোভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

আজ সত্যি বলতে কি সোভিয়েত দেশের সামনে সবচেয়ে বড় ভয় চীন। বহু কাল চীন চেয়েছে পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে সোভিয়েতের যুদ্ধ বাধিয়ে নিজের প্রাধান্য সুনিশ্চিত করা। কিউবা কিংবা ভিয়েতনামে যে প্রত্যক্ষ মার্কিনী-সোভিয়েত সংঘাত হয় নি তার জন্যে চীন সোভিয়েত নেতাদের ভীরু বলে গালাগাল দিতে কসুর করে নি। এখন যখন স্নায়ুযুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পাওয়ায় সে সম্ভাবনা মিলিয়ে এসেছে তখন সোভিয়েতের আশঙ্কা যে চীনের সঙ্গে তার সোজাসুজি সামরিক গোলমাল লেগে যেতে পারে। সেইজন্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আফ্রো-এশীয় সব দেশে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় — কোরিয়া-ভিয়েতনামে — নিজের স্থিতি সরাসরিভাবে সুদৃঢ় করতে তৎপর; পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তির এলাকা গঠনে মনোযোগী এবং মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে সামরিক আরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ। এ আশঙ্কা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীরতন নেহরুর কাছে চীনের বিপদ কোন দিক থেকে আসতে পারে সে সম্বন্ধে মাও সরকারীভাবে যা বলেছিল তার প্রতিবেদনে। একদিকে রাষ্ট্রীয় আরক্ষা অন্যদিকে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে তাকে কোণঠাসা করা—চীনের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন এই দুই ভাবেই সক্রিয় হয়েছে।

সাঙচিতে মাও সে তুং পন্থীদের সমাবেশ।

মার্কিন-চীন সম্পর্ক

জাপান ও ক্যানাডার সম্ভাব্য ভূমিকা

সমীর দাশগুপ্ত

একথা বোধহয় বলা চলে যে ১৯৬২ সনের কিউবা-ঘটনার পরে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিতে মৌলিক চিন্তা-পরিবর্তনের তাগিদ এসেছে। আগে আমেরিকার সামরিক প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ-ব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল ইউরোপের মাটিতে, এবং উত্তর-আটলান্টিক-চুক্তি-সংস্থা ছিল ইউরোপ সম্বন্ধে আমেরিকার নিরন্তর সংশয় ও ভীতির মুখ্য প্রকাশ। কিউবা থেকে খ্রুশ্চেভের সামরিক প্রত্যাহরণের গ্লানি, তথাচ বার্লিনে তার প্রতিশোধের কোন প্রয়াসের অভাব, যুদ্ধোত্তর কালে প্রথমবারের মতো প্রমাণ করে দিল যে ইউরোপ অবশেষে এক ধরণের স্থিতি লাভ করেছে—যুদ্ধের ভয় সেখানে নয়। অথচ ঠিক একই সময় একাধিক ঘটনার মধ্য দিয়ে ক্রমে মস্কো-পিকিং আড়ির খবর প্রায় সোচ্চার হয়ে উঠছিল। কেময় ও মাৎসু সম্পর্কে চীনের অভিপ্রায়কে সমর্থন না করে এবং ভারত-চীন বিবাদে ভারতবর্ষের পক্ষে সহানুভূতি প্রদর্শন করে সোভিয়েট সরকার ওয়াশিংটনকে যেন সুস্পষ্ট ইংগিতে পরিস্থিতিটি বুঝিয়ে দিল। এবং উত্তর ভিয়েৎনামে বিপুল মার্কিনী আক্রমণ এবং মিশরের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন সত্ত্বেও ক্রেমলিনের নীতিতে স্পষ্টই কোন পরিবর্তন ঘটল না। সি-আই-এর পরিবর্তিত হিশেব অনুসারে একথাও জানা গেল যে, ইউরোপে রুশ সৈন্যের পরিমাণ এবং অস্ত্রশস্ত্রের প্রকার ও বণ্টন থেকে বোঝা গেছে তার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষামূলক, আক্রমণাত্মক নয়। অতএব অনুমান করা চলে যে এই দশকে ওয়াশিংটনের মনে ইউরোপ সম্পর্কে স্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে শিরঃপীড়া বেড়েছে, এবং মার্কিনী সামরিক নীতি ক্রমশ চীনা-মুখী ও তাও-য়াই-কেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অথচ মানুষের মতো জাতির চিন্তাতেও অতীতের প্রভাব লেগে থাকে, যা প্রায়শই শুধু মাত্র অপ্রাসঙ্গিক নয়, বিপথ প্রদর্শকও। ষাটের আগে পর্যন্ত আমেরিকা একথাই ভাবতে শিখেছিল যে বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন মস্কো নামক একটি কেন্দ্র থেকেই পরিচালিত হচ্ছে এবং বিশালদেহী, সুপ্রাচীন ঐতিহ্যগর্বী চীন দেশও কার্যত সোভিয়েট উপগ্রহ মাত্র। এই ধারণার কাঠামোতে, হো-চি-মিনের নেতৃত্বপুষ্ট ভিয়েৎনাম-স্বাধীনতা-সংগ্রামকে আমেরিকা প্রথম থেকেই বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি ষড়যন্ত্র-কেন্দ্র হিশেবে ধরে নিয়েছে। বস্তুত, ভিয়েৎনামেই প্রথম আমেরিকা তার পূর্ব-প্রতিশ্রুত উপনিবেশ-বিরোধী নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে ফ্রান্সকে ২০০ কোটি ডলারের সাহায্য দান করল। ফ্রান্স হতাশ হয়ে ভিয়েৎনাম থেকে চলে যাবার পরে আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে সেদেশে ঢুকে আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগল। এবং ১৯৫৪ সনের জেনিভা বৈঠকের অনুমোদন সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্য করে ডিয়েমকে সে নির্বাচনরহিত পন্থায়

উত্তরোত্তর ক্ষমতাশালী হতে সাহায্য করল। জেনারেল গেভিনের সাম্প্রতিক ব্যাখ্যান থেকে একথাও জানা যায় যে কোন-এক পর্যায়ে উত্তর ভিয়েৎনামকে সরাসরি আক্রমণ ক'রে দখল করার সমস্ত পরিকল্পনাও নাকি ঠিক হয়ে গিয়েছিল। গত আট-দশ বছরের বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে মার্কিনী পররাষ্ট্রনীতি ও সামরিক প্রতিরক্ষা চিন্তার কেন্দ্র-বদলের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও কিন্তু ভিয়েৎনাম বিষয়ে আমেরিকার বুদ্ধি-বিবেচনায় পুরোতন অভ্যাসের জাড্য কাটল না। ভিয়েৎনামের সংগ্রামকে সেই দেশের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম হিশেবে আমেরিকা কখনোই দেখতে শিখল না।

একথা অবশ্য বলা চলে যে ভিয়েৎনামে মার্কিনী লিপ্ততার আসল কারণ চীন সম্বন্ধে ভয়। আমেরিকার থিওরি এই যে ভিয়েৎনামের তথাকথিত গণ-সংগ্রাম কার্যত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীন-আকাঙ্ক্ষিত এবং চীন-পরিকল্পিত এক সাম্যবাদী জোটের অংশ। এই থিওরিই প্রকাশ পায় গত অক্টোবরে ডীন রাস্কের এক বিবৃতি থেকে, যার মধ্যে তিনি বলেছিলেন যে প্রকৃত সমস্যা উত্তর ভিয়েৎনামও নয়, ভিয়েৎকংও নয়; সমস্যা হল পরমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত একশ কোটি চীন সৈন্যের সমূহ সম্ভাবনা। এই থিওরি অনুসারেই প্রেসিডেন্ট জনসনের আমলে মার্কিনী সৈন্যের ক্রমবর্ধমান সমাবেশ হয়েছে এশিয়ার মাটিতে। এবং চীনের পরমাণবিক শক্তি ও তার সার্বিক সামরিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে আমেরিকার সার্বিক অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদনও অনেক বেড়ে গেছে। তদুপরি আজকাল মার্কিনী প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে গেরিলা যুদ্ধ-বিদ্যার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার মতে, ভিয়েৎনামের পক্ষে তথাকথিত গণসংগ্রামে সাফল্যলাভের তাৎপর্য এই যে অতঃপর অচিরেই বার্মা, থাইল্যান্ড, মালেশিয়া ও উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষে চীনের নেতৃত্বে গেরিলা-যুদ্ধ শুরু হ'য়ে যাবে, এবং এমনকি আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকায় অনুরূপ বিপ্লবী সংগ্রাম ঘটবে। কিন্তু এই থিওরি থেকে বোঝা কঠিন, কেন ভিয়েৎনামের গণসংগ্রামকে প্রতিহত করতে পারলেও উল্লিখিত অন্যান্য বিপ্লবযোগ্য অঞ্চলে চীন তার সুযোগ খুঁজে নিতে পারবে না। বরং, ভিয়েৎনামে মার্কিনী লিপ্ততা এবং প্রতিশ্রুতি যতই বেড়ে চলবে, সেখানে মার্কিনী অভিজ্ঞতায় যত বেশি হতাশা স্থান পাবে, অন্যান্য অঞ্চলের সম্ভাব্য বিপ্লবী আন্দোলনে মার্কিনী সাহায্যদানের ক্ষমতা ও স্পৃহাও তত কমে আসবে বলেই অনুমান করা উচিত।

অথচ আমেরিকার এই থিওরির দৌলতেই আদ্যাবধি সে শুধু তার মিত্র-শক্তিগুলির কাছ থেকে নয়, অনেক এশিয় শক্তির কাছ থেকেও, প্রয়োজনীয় সমর্থন পেয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষ কমিউনিস্ট বিরোধী না-হলেও সাম্প্রতিকালে চীনকে সাম্রাজ্যলিপ্সু ব'লে আখ্যায়িত করার সুযোগ পেয়েছে, এবং সেহেতু চীন-প্রতিরোধী সামরিক ব্যবস্থায় সে মার্কিনের বিরোধিতা করবে না। তা ছাড়া, চীন পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হ'য়ে এবং প্রতিবেশী কয়েকটি দেশকে নানাভাবে উদ্বেজিত ক'রে, তাদের মনকে মার্কিনী ছাতার আশ্রয়ের দিকে প্রলুব্ধ করেছে। ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতাও এইসব দেশকে চীন-প্রণোদিত সংগ্রামী প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সন্দিহান করেছে। পরিশেষে, চীনের সাম্প্রতিক কার্যকলাপে অতিরিক্ততা সম্বন্ধে সে দেশের নেতাদেরই কারও কারও বিরক্তির ফলে, এবং আভ্যন্তরীণ অন্যান্য বিশৃংখলার জন্য চীনের ছবি অনেকের চোখেই আগের তুলনায় কিয়ৎ পরিমাণে ম্লান হয়ে গেছে। এই সব কারণে চীনকে প্রতিহত করার অভিযানে আমেরিকার অনেক সমর্থন-অযোগ্য কাজও 'বৃহত্তর স্বার্থের' অজুহাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মোটের উপর অন্তত নীরব সমর্থন পেয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু 'সাম্রাজ্য-লোলুপ', 'বিস্তার-লোলুপ' ইত্যাদি আখ্যা সত্ত্বেও, এবং চীনেরই বিরুদ্ধে বর্তমানে মার্কিনী সামরিক সজাগতা সত্ত্বেও একটি বড় প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। আমেরিকা কি চীন জাতিকেই তার শত্রু মনে করে, না চীন-প্রভাবিত কমিউনিজম্‌কে? এই প্রশ্নটি অবান্তর নয়, কারণ এর যথাযথ উত্তরের উপর ভবিষ্যতের মার্কিনী কর্মপন্থা, অন্যান্য 'মধ্যবর্তী' রাষ্ট্রের ভূমিকা, এবং বিশ্ব-শান্তির সম্ভাবনা নির্ভর করবে। ১৯৪৯ সনের আগেকার চীন-মার্কিন সম্পর্কের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে চীন সম্বন্ধে আমেরিকার বিশেষ শ্রদ্ধা এবং আগ্রহ ছিল, এবং চীনের নব-জাগরণের দীর্ঘ ইতিহাসেও মার্কিনী সহানুভূতির অভাব দেখা যায় নি। তারপর হঠাৎ মাও-ৎসে-তুং এর নেতৃত্বে বিপুল-বিক্রমে লাল চীন সমস্ত সাম্যবাদী জগতের শক্তি ও স্পর্ধাকে বহুগুণে বর্ধিত ক'রে দিয়ে আমেরিকাকে হতাশ ও বিরক্ত করল—যদিও ১৯৫০-এর শুরুতেই বৃটিশ সরকার যখন কমিউনিস্ট চীনকে স্বীকার ক'রে নিল, ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যও তখন অন্যরকম ছিল না। কিন্তু শুরুতেই কয়েকজন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের প্রতি চীন সরকারের দুর্ব্যবহার, এবং তারপর ১৯৫০ সনে উত্তর কোরিয়ার আক্রমণ, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে উদ্বেজিত করল। তিনি লালচীন এবং ফরমোসার মধ্যবর্তী জলভূমিতে একটি মার্কিনী নৌবহর দাঁড় করিয়ে কমিউনিস্টদের মনে করতে দিলেন যে চীনের গৃহযুদ্ধে আমেরিকার সমর্থন চিয়াং কাইশেকের পক্ষে। এই ঘটনার পরবর্তী ইতিহাস উভয় দেশের পারস্পারিক দ্বেষ, ক্রোধ এবং শত্রুতায় কর্দমাক্ত—যে কর্দম নিক্ষেপণের ভূমিকায় মার্কিনী নির্বুদ্ধিতার পরিমাণ বিস্ময়কর।

কারণ এই কর্দমক্ষেপণের উন্মত্ততায় চীনের রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশের দ্বারে যেভাবে মার্কিনী অর্গল তুলে দেওয়া হ'ল, এবং বছরের পর বছর প্রায় সারা পৃথিবীর ইচ্ছার এবং সুবিবেচনার বিরুদ্ধে সেই অর্গল আর নামানো হ'ল না— তাতে ইতিহাসে এক বৃহত্তম হঠকারিতা ও একগুঁয়েমির নজিরই শুধু সৃষ্টি হয় নি, আজকের পৃথিবীতে সর্বাধিক বিদ্বেষভাবাপন্ন দুটি পরমাণবিকশক্তিমত্ত রাষ্ট্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথোপকথনের সম্ভাবনাও বিপর্যস্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য, চীনকে একঘরে ক'রে রাখার অর্থ তাকে দিন দিন ক্ষেপিয়ে তুলে পৃথিবীর জন্য অশান্তি ডেকে আনা, যে-অশান্তির জন্য এক অর্থে আমেরিকার দায়িত্ব শতকরা একশ' ভাগ।

সৌভাগ্যবশত, আমেরিকার চোখেও তার স্বকৃত এই একগুঁয়েমি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে। হয়তো জন ফস্টার ডালেসের শ্বাসরোধকারী ভূমিকাটি আমেরিকার ইতিহাসে আদৌ স্থান না-পেলে এতদিনে ওয়াশিংটন সহজেই চীনের কমিউনিস্ট সরকারকে স্বীকৃতি দান করতে পারত। কেনেডির প্রেসিডেন্ট পদপ্রাপ্তির ঠিক পরেই আমেরিকায় এ-ধরনের একটা বিশ্বাস চালু হয়েছিল যে তিনি তাঁর ক্ষমতা অনুযায়ী সমস্ত চেষ্টা করবেন যাতে চীনের স্বীকৃতির পথে মার্কিনী বাধা কমে আসে। একদিকে, চীনের সংগে সরাসরি কথোপকথনের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা প্রেসিডেন্ট কেনেডি তাঁর পূর্বগামীর তুলনায় বেশি বুঝেছিলেন।

অপর দিকে, তিনি একথাও জানতেন যে চীনকে বিরক্ত ক'রে আমেরিকা শুধু তাকে রুশ-কক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতেই বাধ্য করছেন। অর্থাৎ বোঝা গিয়েছিল যে চীনকে মার্কিনী স্বীকৃতি দান ক'রে কিছুটা কাছে টানতে পারলে সোভিয়েটের সঙ্গে তার নানারকম বিভেদ হয়তো আরো সহজে বাহ্যপ্রকাশ পাবে—যে পরিস্থিতির সুযোগ কমিউনিস্ট-বিরোধী যে-কোন শক্তিরই গ্রহণ করা স্বাভাবিক। ঘরের পাশেই কিউবা যে-ভাবে তথাকথিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হয়ে রুশ ও চীনের সংলগ্ন হতে বাধ্য হ'ল, তাতে মার্কিনী মূর্খতার আরেক বিপুল নিদর্শন ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়েছিল। এই মূর্খতার উপলব্ধি এবং তার অপনোদনের আকাঙ্ক্ষা আমেরিকায় ক্রমশ বেড়ে চলেছে বলেই মনে হয়। তাছাড়া, চীনের আভ্যন্তরীণ নীতিতে যতই কেন না ভুলভ্রান্তি ঘটুক এবং তার সঙ্গে সোভিয়েট রুশের মুখ দেখাদেখি যতই কমে আসুক, এই সত্যটি এখন আমেরিকার কাছে পরিষ্কার যে চীনের মাটিতে ঢুকে আক্রমণ চালানোর ক্ষমতা আজ আর কোন দেশেরই নেই। কাজেই এ হেন শক্তিশালী শত্রুকে উত্তরোত্তর না-ক্ষেপিয়ে বরং তার সঙ্গে একটা অর্থপূর্ণ বোঝাপড়া ঘটাতে পারলে আমেরিকার স্বার্থই বজায় থাকবে।

চীনের শক্তিমত্তা ও প্রভাব সম্বন্ধে আমেরিকার ধারণাতেও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন, এখন আর মনে করার কারণ নেই যে এশিয়ায়, এবং বিশেষত আফ্রিকায় ও লাতিন আমেরিকায়, চীনের নেতৃত্বে অথবা সহায়তায় বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটবে। বরং নাগা এবং কাচিনদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ব্যাপারটি ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পরিণতিতে চীনের হতাশারই পরিচায়ক। এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চীনের তরফ থেকে বাস্তবভিত্তিক চৈতন্য। ১৯৬৫ সনের সেপ্টেম্বরে লিন পিআও, পৃথিবীর 'গ্রাম' সমুদায় কর্তৃক 'শহর'গুলিকে ঘেরাও করার যে-থীসিস পেশ করেছিলেন, তা থেকে মনে হয়েছিল যে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবী রণহুঙ্কার দেবার ক্ষমতা (anti-status quo power) একমাত্র চীনেরই বোধহয় আছে। কিন্তু পরবর্তী কালে তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায় যতদিন চীনের রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশের পথে মার্কিনদেশ তার মূর্খ প্রতিবন্ধকতাকে অপসারিত করতে পারবে না বা চাইবে না, ততদিনে এই দুই বিশ্বশক্তির মধ্যে ন্যূনতম কথোপকথনের সম্ভাবনা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। অর্থাৎ তৃতীয় কোন শক্তি, যার আদর্শ এবং স্বার্থ কমিউনিস্ট চীন এবং আমেরিকা উভয়ের উপরেই সমভাবে নির্ভরশীল, এই প্রয়োজনীয় কথোপকথনে সাহায্য করতে পারে কিনা তাও দরকার। দুর্ভাগ্যত, ভারতবর্ষের পক্ষে আজ আর এই ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনের সুযোগ নেই। অন্য যে-দুটি দেশের নাম বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক তারা হ'ল জাপান ও ক্যানাডা।

বিশ্বসমস্যায় ক্যানাডার ভূমিকা কখনো সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। ঐতিহাসিক কারণে ক্যানাডার হাত তার ক্ষমতাশালী প্রতিবেশীর শৃঙ্খলে নানাভাবে বাঁধা। চীন ও ভিয়েৎনাম প্রসঙ্গে অসংখ্যবার ক্যানাডার মার্কিন-বিরোধী মনোভাব এবং বিরক্তি প্রকাশ পেয়ে আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকার ভর্ৎসনায় চাপা পড়ে গেছে। অথচ রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনের প্রবেশ ক্যানাডার একান্ত কাম্য বিষয়। ১৯৬৪-র এপ্রিলে যে গ্যালাপ পোল নেওয়া হয়েছিল তাতে দেখা গেছে যে, ক্যানাডার শতকরা ৫১জন ব্যক্তি চীনকে স্বীকৃতি দানের পক্ষে এবং ৩৩জন বিপক্ষে ছিলেন—যেখানে ১৯৫৯-এর পোলে দেখা যায় এই পরিমাণগুলি ছিল যথাক্রমে শতকরা ৩২জন ও ৪৪জন। ক্যানাডা সরকারের নীতিও স্পষ্টতই সে দেশের জনমতের এই বিবর্তনের সঙ্গে পা ফেলে চলতে চেয়েছে। এবং অধুনা চীনের সঙ্গে বিশাল খাদ্যশস্যের বাণিজ্যে কানাডার জাতীয় স্বার্থ এত গভীরভাবে ন্যস্ত রয়েছে যে এ, দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো হওয়াটাই স্বাভাবিক। যদি মার্কিন সরকার সুযুক্তি-আশ্রয়ী হয়ে চীনের সঙ্গে বোঝাপড়ায় ক্যানাডার সাহায্য নিতে প্রস্তুত হয়, তাহলে তা সুখেরই কথা হবে।

কিন্তু ক্যানাডার চেয়েও বোধহয় জাপানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ও অধিকতর সম্ভাবনাময়। প্রথমত, জাপানের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য ক্রমশ বাড়ছে এবং বর্তমানে জাপানই চীনের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদার। দ্বিতীয়ত, আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ এবং চীনের সঙ্গে ব্যাপকতর বাণিজ্য টোকিওর পক্ষে বিকল্পমাত্র নয়—দুটোই একসঙ্গে সম্ভব। তৃতীয়তঃ ১৯৫১ সনে ফরমোসা সরকারকে মার্কিনী চাপে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেও, জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, ইয়োশিদা, মার্কিন সেনেটকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে

> "the Japanese Government desires ultimately to have a full measure of political peace and commercial intercourse with China, which is Japan's neighbour."

চতুর্থত, যুদ্ধোত্তর জাপানের কোন রাজ্য-বিস্তৃতির অভিলাষ আর নেই একথা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। বরং জাপান মনে করে যে, দক্ষিণ-পূর্ব আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সাহায্য দান ক'রে ধীরে ধীরে সে তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে। চীনের দিক থেকেও, বাণিজ্যিক কারণ ছাড়াও, উন্নয়নমূলক পুঁজি আমদানির তাগিদে এখন জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজন অবশ্যই রুশ-চীন বিবাদের পরে বিশেষ আকার ধারণ করেছে।

এসব সুদূরপ্রসারী এবং ঐতিহাসিক কারণে ক্রমশই একথা বিশ্বাস করার কারণ দেখা যাচ্ছে যে আগামী কয়েক বছরে মার্কিন সরকার ও চীনের মধ্যেকার আকাঙ্ক্ষিত সেতুবন্ধনে জাপানের ভূমিকা বিশেষভাবে সম্ভাবনা-উজ্জ্বল। এজন্য তার দিক থেকে বর্তমানের কোন প্রতিশ্রুতিই ভঙ্গ করার প্রয়োজন হবে না—একমাত্র ফরমোসা সম্বন্ধে ছাড়া। আর জাপানের এই সম্ভাব্য ভূমিকা আজকের পটভূমিকায় এমন কিছু উন্মাদ কল্পনা নয় একথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের খবর দেওয়ালে লাগান পোস্টার থেকে জেনে নিচ্ছেন জনৈক নারী কর্মী।

লাল চীন সম্বন্ধে ইউরোপ কি বলে?

দিলীপ মালাকার

একালে লাল চীন সবারই বিস্ময়। ঘুমন্ত চীনকে উনবিংশ শতকে এবং বিংশ শতকের অর্ধেক পর্যন্ত ইউরোপ আধা-উপনিবেশ হিসেবেই ভাবত। পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো বরাবরই একটু পিছিয়ে ছিল। তাদের উপনিবেশও ছিল না। পশ্চিম ইউরোপ বরাবরই উন্নত। তারাই উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য চালাত। তাদের দাপটে এশিয়া-আফ্রিকা পদানত ছিল অনেককাল। ইংরেজ-ফরাসী এবং তাদের দোসর জার্মানরাও প্রায় একশ বছর ধরে ঘুমন্ত চীনে খবরদারি করেছে। চীনের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল এবং এখনও আছে। এই তিন দেশে এখনও প্রচুর চীনাকে দেখা যাবে। তারা এই সব দেশে আসে লেখাপড়া শিখতে ও ব্যবসা করতে। এদের সঙ্গে চীনের বর্তমান সম্পর্ক কোন দিকে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে করছি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই পূর্ব ইউরোপ কম্যুনিস্ট সরকার শাসিত। গোড়ার দিকে যখন চীনে কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এদের সঙ্গে ছিল গলাগলি দোস্তি। ইতিহাসের কপট পরিহাসে সে সম্পর্ক দোস্তির পর্যায় থেকে মুখ-না-দেখাদেখির পর্যায়ে নামে। কেন এমন হল? এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ চালাতে গেলে প্রবন্ধটি মহাভারতের আকার নেবে। কম্যুনিস্ট দুনিয়ার মহাভারত লেখার সময় অবশ্য তার চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে। এখন নয়।

ক্রুশ্চভের আমল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্ব বেশ শক্ত ছিল। তারপর থেকেই পূর্ব ইউরোপের প্রতিটি রাষ্ট্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্ব শিথিল হতে আরম্ভ করে। কম্যুনিস্ট

শাসিত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো ১৯৪৯ সালে। *এরা কম্যুনিস্ট, কিন্তু* সোভিয়েটদের আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে। তারপর একমাত্র বড়দরের গণ্ডগোল সৃষ্টি করে মাও সে তুং। স্তালিন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মাও সে তুং-এর সঙ্গে তাঁর তত মতবিরোধ হয় নি। ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় মাও সে তুং ও ক্রুশ্চভের মধ্যে ১৯৫৬ সালে। স্তালিন বিরোধী মতামত প্রকাশ করতেই ঝগড়ার সূত্রপাত। এবং ১৯৫৭ সাল থেকে মাও সে তুং-এর লাল চীনের সঙ্গে ক্রুশ্চভের সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরোধের আগুন তুষানলের মতন জ্বলতে শুরু করে। ১৯৫৯ সালে তিব্বতে চীনের সাম্রাজ্য বিস্তার কালে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আবছা বিরোধ দেখা দেয়। তখন কিন্তু অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে চীনের যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। কেবল মাত্র আলবানিয়া চীনের পক্ষ সমর্থন করে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরোধিতা শুরু করে প্রত্যক্ষভাবে। ১৯৬২ সালে চীন তো খোলাখুলিভাবে ভারত, বার্মা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের অনেক অঞ্চল নিজের বলে দাবী জানাতে থাকে। তারপর ১৯৬২ সালের শেষের দিকে ভারত-চীন লড়াই চীনের আক্রমণকারী মুখোশ উন্মোচন করে। ১৯৬৩ সালে আমি পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণকালে দেখেছি অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা চীনের বাড়াবাড়ি নিয়ে বেশ বিরক্তি প্রকাশ করেছে। একদল গোঁড়া কম্যুনিস্ট চীনকে সমর্থন শুরু করে দেয়, কিন্তু জনসাধারণদের দেখেছি চীনের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করতে। তারপর ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে দুটো নাটকীয় ঘটনা ঘটল, (১) ক্রুশ্চভের বিদায় ও (২) চীনের অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণ।

চীনের প্রথম অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের ফলে চীন প্রমাণ করল যে, চীন আর পিছিয়ে পড়া দেশ নয়। তারা সামরিক শক্তিতে বেশ [illegible]য়ান। এবং এও প্রচার হল যে, চীনে [illegible] ঘটেছে তার জন্যে মাও সে তুং-এর অদম্য প্রচেষ্টাই দায়ী। শুরু হল ১৯৬৫ সাল থেকে মাও সে তুং পূজো। মাও সে তুং-এর বই পড়া ও লাল মলাটে মাও বাণী বইয়ের ছড়াছড়ি শুরু হয়ে গেল। শুরু হল লাল রক্ষীদের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে বিদেশীদের ওপর হামলা। প্রথমে রুশ বিরোধী প্রচার ও প্রহার শুরু করার পর শ্বেতকায় ব্যক্তি মাত্রেই পিকিং শহরে তাদের হামলা ও জুলুমের শিকার হল। পিকিং শহরে লাল রক্ষীরা পূর্ব জার্মান, চেকোশ্লোভাক ও পোলিশ কর্মচারী এমন কি সাংবাদিকদের ওপর হামলা শুরু করে দেয়। শুধু তাই নয় এই তিন দেশের রাজধানীতে বসে চীনারা সরকার বিরোধী প্রচারকার্য শুরু করে। ফলে সেখান থেকে কিছু সংখ্যক চীনাদের তাড়াতে বাধ্য হয় পূর্ব জার্মান, চেকোশ্লোভাক ও পোলিশ সরকার। সাংস্কৃতিক

বিপ্লব শুরু হয় আদর্শগত নীতি নিয়ে। পরে এটি মোড় নেয় জাতি ও সম্প্রদায়ের দিকে। চীনের পীত জাতিদের সঙ্গে ইউরোপের শ্বেতকায় জাতিদের সঙ্গে তুলনা করে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করার অনেক অপচেষ্টাও চলে পিকিং-এর একদল মাথা-পাগলা নেতাদের মধ্যে। তারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ পাল্টা প্রচার ও চাপা আক্রোশ জমতে থাকে পূর্ব ইউরোপের প্রতিটি দেশে। কেবলমাত্র নিরপেক্ষ থাকে আলবানিয়া ও রুমানিয়া। রুমানিয়ার সঙ্গে সোভিয়েটদের সম্পর্ক বরাবর একটু তিক্ত ছিল। তারা চীন-সোভিয়েট বিরোধে চীন পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে রুমানিয়ায় চীন বিরোধী বিক্ষোভ এবং চীনে রুমানিয়া বিরোধী বিক্ষোভ হয় নি।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক খারাপের দিকে যায় ১৯৬৫ সালে। ওই বছরে আমি মস্কোয় চীনা ছাত্রদের দেখেছি খোলাখুলিভাবে রুশ বিরোধী কথাবার্তা বলতে। তারপর তারা মস্কোয় বসে সোভিয়েট বিরোধী প্রচারকার্য চালায় বলে তাদের বড় অংশ চলে যেতে বাধ্য হয়। চীন ও সোভিয়েট সীমান্তে দুই পক্ষের প্রহরীদের মধ্যে প্রায়ই বচসা থেকে শুরু করে হাতাহাতি হতে দেখা গেছে। চীনা ট্রেন সোভিয়েট এলাকায় প্রবেশ করে রুশ বিরোধী শ্লোগান দিত ও মাও সে তুং-এর বাণী প্রচার করত। এইভাবে সম্পর্ক তিক্ত হতে তিক্ততর হয়ে গেলে দুই দেশের সীমান্তে সামরিক বাহিনী সব সময়ে সঙ্গীন উঁচিয়ে থাকতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে সোভিয়েট জনগণের মনোভাব কখনোই চীনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হতে পারে না। বরং আমি দেখছি সাধারণ রুশরা চীনের সাম্প্রতিক কার্যকলাপের নিন্দা করছে।

১৯৬৬ সালটা চীনাদের বদনামের বছর। লাল রক্ষীদের অতি বাড়াবাড়িতে পূর্ব ইউরোপের বহু অধিবাসীকে পিকিং-এ অপমানিত এমন কি মারধর পর্যন্ত করা হয়। ফলে চীনের সঙ্গে অধিকাংশ পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের সম্পর্ক তিক্ত হতে থাকে। এ অবস্থায় পূর্ব ইউরোপের জনসাধারণ আর কতখানি চীন ভক্ত থাকতে পারে? তারাও প্রত্যক্ষভাবে চীনাদের কঠোর সমালোচনা করতে শুরু করে। চীনা ছাত্ররাও দলে দলে পূর্ব জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গারী, বুলগারিয়া থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। ওই বছরে বহু সংখ্যক চীনা ছাত্র ওই দেশগুলোয় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, এমন কি ওখানকার ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষও বাধায়।

মাও সরকারের সঙ্গে পূর্ব ইউরোপীয় কম্যুনিস্ট সরকারগুলোর সঙ্গে যখন নীতিগত মতবাদ নিয়ে রাজনৈতিক বিরোধ দেখা দেয় ঠিক সেই সময় থেকে ওই সব দেশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্কও নিম্নদিকে গড়াতে থাকে। যে সময়ে মাও সে তুং সরকারের সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট সরকারের সম্পর্ক খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যেতে থাকে ঠিক

সেই সময়ে মাও সরকার পশ্চিম ইউরোপের কম্যুনিস্ট-বিরোধী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়াতে থাকে। রাজনীতিতে আদর্শের স্থান নেই বললেই চলে। এটাই তার প্রমাণ। মাও সে তুং-এর লাল চীন সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এবং লালচীনকে যাতে কূটনৈতিক স্বীকৃতি না দেওয়া হয় তার জন্যে আবার চেষ্টা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার তল্পি বহন-কারী বহু রাষ্ট্রকেও সে বাধ্য করে যাতে লালচীনকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি না দেওয়া হয়। মুখ্যত পশ্চিম ইউরোপের এবং 'নেটো' বা উত্তর অতলান্তিক সামরিক চুক্তি সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলো যাতে লালচীনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখে তার জন্যে প্রচণ্ড চেষ্টা করে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি। কারণ পশ্চিম ইউরোপের প্রতিটি রাষ্ট্র স্বাধীন, এবং দ্বিতীয়ত তারা ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে ভালভাবে বেঁচে থাকতে চায়। এটাই তাদের মূলমন্ত্র অথবা আদর্শ। চীনের যেমন প্রয়োজন পশ্চিম ইউরোপের উন্নত রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে যন্ত্রপাতি কেনা ও তার কাঁচা মাল বেচা, তেমনি পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোরও একান্ত প্রয়োজন চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করা। কাজটা দুই পক্ষের স্বার্থেই সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, বিশেষ করে বৃটেন, ফ্রান্স, ও পশ্চিম জার্মানী চীনের সঙ্গে গোপনে বাণিজ্য চালাত সুইজারল্যাণ্ড ও হংকং-এর মাধ্যমে। চীনের অ্যাটম বোমা নির্মাণে অনেক দুষ্প্রাপ্য যন্ত্রপাতি তারা পশ্চিম ইউরোপের বহু উন্নত দেশ থেকে কেনে বহুকাল ধরে তাদের সুইজারল্যাণ্ড ও হংকং-এর বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে।

অনেকের ধারণা যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাল চীনকে স্বীকৃতি দেয় নি বলে এবং পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না বলে চীনের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগই ছিল না। এ ধারণা ভুল। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে যখন চীনে মাও সে তুং-এর কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তার কিছুকালের মধ্যেই লণ্ডনে কম্যুনিস্ট চীনের দূতাবাস কায়েম হয়। কূটনৈতিক সংজ্ঞায় সেটা রাষ্ট্রীয় দূতাবাস অর্থাৎ 'এম্বাসী' ছিল না। ছিল 'লিগেশান' পর্যায়ে। অর্থাৎ বৃটেন বরাবরই লাল চীন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে পরোক্ষভাবে। তার বড় স্বার্থ হল হংকং। নইলে বৃটেনের কাছ থেকে লাল চীন বহু আগেই হংকং কেড়ে নিত। যেমন ভারতকে বোকা বানিয়ে নিয়ে নিয়েছে তিব্বত। তাছাড়া লাল চীনের নিজের স্বার্থেই হংকংকে বর্তমান পর্যায়ে রেখে দিয়েছে নানান কারণে। হংকং-এর মাধ্যমে পশ্চিমী

দুনিয়ার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল করে ফলাও করাটাও তার প্রধান উদ্দেশ্য।

বৃটেনের মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় বৃটেনের প্রাক্তন উপনিবেশ ও তখনকার উপনিবেশে প্রবেশ করতে চীনের বিশেষ বাধা ছিল না। বৃটেনের মাধ্যমে লাল চীন যেমন পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ করে তেমনি এশিয়া ও আফ্রিকায়। সেখানেও তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ওইভাবেই চালায়।

বৃটেনের পর হল্যান্ডে লাল চীনের 'লিগেশন' স্থাপিত হয়। এবং এই লিগেশনের মাধ্যমে শুধু হল্যান্ড বা বেলজিয়াম নয় জার্মানীর সঙ্গেও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে শুরু করে চীন। উপরন্তু সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক 'লিগেশন' পর্যায়ে আছে বহুকাল ধরে। সুইজারল্যান্ড ব্যবসায়ীর দেশ। ওদের দিয়ে চীনের পক্ষে কেনাকাটা করা সহজই ছিল।

তারপর শুরু হল ১৯৬৩ সালে নতুন অধ্যায়। পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একমাত্র ও প্রথম রাষ্ট্র হল ফ্রান্স যে, লাল চীনকে পূর্ণ মর্যাদায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব করে। এবং ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে পিকিং-এ স্থাপিত হয় ফরাসী দূতাবাস অর্থাৎ 'এম্বাসী'। তেমনি প্রতিষ্ঠিত হয় প্যারিসে চীনা দূতাবাস। ফ্রান্সের সঙ্গে চীনের পুরোপুরি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে চীনের লাভ ছাড়া লোকসান হয় নি। তেমনি হয় নি ফ্রান্সের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খবরদারীতে অনেক পশ্চিমী রাষ্ট্র চীনকে খোলাখুলিভাবে সামরিক যন্ত্রাংশ ও অ্যাটম বোমা নির্মাণের কিছু যন্ত্রাংশ বেচত না। তারা লুকিয়ে বা ঢেকে বিক্রী করত। ফ্রান্সের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় প্রথমে ফ্রান্সের কাছ থেকে খোলাখুলিভাবেই চীন তার সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা শুরু করে এবং প্যারিসের মাধ্যমে ফ্রান্সের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকেও সে জিনিসপত্র কেনা শুরু করে। আর ফ্রান্সের বড় স্বার্থ হল তার উদ্বৃত্ত কৃষিজ দ্রব্য চীনকে বেচা। যন্ত্রপাতি বেচার উদ্দেশ্য তো আছেই। এতে দুই পক্ষই লাভবান।

গত এক শতাব্দী ধরে চীনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল বৃটেন ও ফ্রান্সের। কারণ রুশদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বটে কিন্তু সেটা খুব প্রীতিকর ছিল না। বৃটেন ও ফ্রান্স চীনে গিয়ে ভাগাভাগি করে লুট-পাট করত। তারাই কামান বেচত। এবং চীনের ধনী সম্প্রদায় বেড়াতে যেত বৃটেনে ও ফ্রান্সে। তারাই আবার ছেলে-মেয়েদের পাঠাত বৃটেনে ও ফ্রান্সে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে। প্যারিস ও লন্ডনের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ যেমন আগেও ছিল তেমনি আজও আছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এশীয় রাজনীতিতে বৃটেন ও ফ্রান্স বেশ খবরদারী করেছে। এবং এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ছিল প্রচুর রেষারেষি। যে দেশে বৃটেন খবরদারী করত সেই দেশ আবার ভারসাম্য রক্ষার জন্য ফ্রান্সের কাছে যেত বৃটেনকে খোঁচা মারার জন্যে। ফ্রান্সও এগিয়ে আসত বৃটেনকে খোঁচা মারতে। বৃটেনের সঙ্গে চীনের গন্ডগোল শুরু হতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে একদল চীনা ছাত্রকে পাঠান হয় ফ্রান্সে। তাদের অনেকেই ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির প্ররোচনায় কম্যুনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত হয়। এদের মধ্যে ছিল বর্তমান প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন-ঈ এবং আরো একালের অনেক নেতা। ঠিক তেমনি কয়েক জন নাম-করা চীনা বিজ্ঞানীও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে। এদেরই একজন অধ্যাপক চ্যান শান শিয়াং চীনের অ্যাটম বোমা নির্মাণে পিতৃস্থানীয় বলে চিহ্নিত হয়েছেন।

চীনের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্কটা বেশ জমে উঠেছিল কিন্তু বাদ সাধে চীনের লাল রক্ষীরা। তারা ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে পিকিং শহরে ফরাসী দূতাবাসের এক রাজকর্মচারী ও তার স্ত্রীকে ধরে প্রহার করে এবং ফরাসী দূতাবাসের ওপর ইঁট-পাটকেল বর্ষণ করে। তার ফলস্বরূপ প্যারিসে ফরাসী তরুণেরা চীনা দূতাবাস আক্রমণ করতে যায়। এক দল চীনা ছাত্র এই নিয়ে সংঘর্ষ বাধাতে গেলে শেষ পর্যন্ত তাদের প্যারিস ত্যাগ করতে হয়। সেই থেকে ফরাসী জনসাধারণ চীনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে থাকে। তাই আমি দেখেছি প্যারিসে চীনা দূতাবাসের সামনে সর্বদাই পুলিশ বাহিনীর প্রচন্ড পাহারা। বছর খানেক এই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত ছিল। আবার ১৯৬৮ সালের গোড়ার দিকে সম্পর্ক ভালর দিকে গেছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের দরুন মার্কিন ডলারের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। মার্কিনদের স্বর্ণ মজুত কমে যাচ্ছে। ফরাসী মুদ্রার অবস্থা আগের চেয়ে বেশ ভাল। বরং বলা চলে ডলারের চেয়ে বেশ মজবুত। ডলারকে অবজ্ঞা করার জন্যে চীনও ভাল চাল চেলেছে। সম্প্রতি তারা ঠিক করেছে যে, চীন ও জাপানের মধ্যে যে বাণিজ্য হবে তার দরুন পাওনা মেটান হবে ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঁর বিনিময়ে। ফলে ফরাসী ফ্রাঁর ইজ্জত আরও বাড়ল।

পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে চীনের বিশেষ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। উপরন্তু পশ্চিম জার্মানী কট্টর কম্যুনিস্ট বিরোধী বলে চীনের প্রতি তাদের মনোভাব প্রীতিকর ছিল না। কিন্তু আজকাল তাদের মনোভাব বদলেছে। আগে কম্যুনিস্ট চীন সম্বন্ধে আমি পশ্চিম জার্মানীতে বেশী সংবাদ বা বই-পত্তর দেখি নি। আজকাল যে কোন বই-এর দোকানে গেলে চীন সম্বন্ধে প্রচুর বই দেখা যাবে। এবং প্রায়ই কোন-না-কোন সংবাদপত্রে থাকে চীন সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। এর একমাত্র কারণ হল চীনের অ্যাটম বোমা। অ্যাটম বোমা হল চীনের প্রগতির প্রতীক। তাই জার্মানরা বলে যে, চীন আর পিছিয়ে নেই। ভারতের প্রতি ফ্রান্স বা জার্মানীর উচ্চ ধারণা ছিল ১৯৫৫—১৯৫৮ সাল পর্যন্ত। ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনে ভারতের সম্মান বাড়ে। কিন্তু ১৯৫৯ সালে চীন তিব্বত দখল করলে ইউরোপে ভারতের সম্মান একেবারে কমে যায়। অর্থাৎ ভারত চীনের চেয়ে বেশী শক্তিশালী নয় এটাও প্রমাণিত হয়। তারপর ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। দুর্বল দেশকে ইউরোপীয়রা কোন দিনই সম্মানের চোখে দেখে না। উপরন্তু খাদ্যাভাব ভারতে যেমন আছে তেমনি আছে চীনে। কিন্তু চীনকে বিদেশের দরজায় ধর্ণা দিতে হয় না। ভারতকে দিতে হয়। এই কারণে ইউরোপের জনগণ চীনকে যে চোখে দেখে ঠিক সেই চোখে ভারতকে দেখে না। জার্মানরা তো নয়ই। জার্মানদের আবার পীত জাতির অভ্যুত্থানে একটা ভীতির ভাবও রয়েছে। অবশ্য ফরাসী ও জার্মানরা মনে করে যে, চীন এখন জেগেছে এবং যদি অদূর ভবিষ্যতে সংঘর্ষ বা লড়াই হয় সেটা হবে চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে। তবে চীন যদি কখনো ইউরোপ পর্যন্ত ধাওয়া করে তাহলে ফরাসী বা জার্মানরা বিস্মিত হবে না। তাই ফরাসী ও জার্মানরা চীনকে বেশ সন্দেহের চোখে দেখে।

ভারতের চেয়ে চীনকে অনেক বেশী শ্রদ্ধার চোখে দেখে জার্মানরা দুটো কারণে. (১) ভারতবর্ষ সর্বদাই জার্মানীর কাছে ঋণপ্রার্থী, (২) পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে চীনের বাণিজ্যের বহর প্রতি বছরই বাড়ছে। বছরে কম করে জার্মানী চীনকে বেচে সাড়ে চারশ মিলিয়ন থেকে পাঁচশ মিলিয়ন মার্কের জিনিসপত্র। অর্থাৎ পঁয়ষট্টি কোটি টাকা। এদিকে পশ্চিম জার্মানী কম্যুনিস্ট বিরোধী এবং পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে নেই লাল চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক। কিন্তু বাণিজ্য চলেছে পুরোদমে। একেই বলে 'রিয়াল-পলিটিক' অর্থাৎ সত্যিকারের রাজনীতি। জার্মানরা চীনকে ঠিক শ্রদ্ধা করে না। অনেকটা ভয়ে ভক্তি গোছের। চীন বিরাট দেশ এবং তার সামরিক শক্তি দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাকে নস্যাৎ করা জার্মানরা বোকামি বলে মনে করে। চীনাদের প্রতি তাদের ভয় বেশ। একে কম্যুনিস্ট তায় আবার পীত জাতি। এর ওপর লাল রক্ষীদের বেশী বাড়াবাড়ি, মাও সে তুং-এর বাণীর ছড়াছড়িতে জার্মান জনগণ খুব আশান্বিত নয়। তাই তাদের চীনাদের প্রতি দরদ তেমন নেই। তবে বাণিজ্যিক দরদ আছে প্রভূত পরিমাণে। চীন যে এখন আস্তে আস্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর সামরিক শক্তি থেকে প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তিকে পরিণত হচ্ছে সে সম্বন্ধে জার্মানরা বেশ হুঁশিয়ার। এই জন্যে তাদের দুশ্চিন্তাও বাড়ছে।

সমগ্র বিশ্ব জুড়ে কম্যুনিস্ট পার্টি-গুলোতে ভাঙ্গন ধরিয়েছে মাও সে তুং এর লাল চীন। ইউরোপের কম্যুনিস্ট পার্টি-

গুলোও এর থেকে বাদ যায় নি। তাদের মধ্যেও দলাদলি চলেছে মাও সে তুং-এর আদর্শ নিয়ে। গোঁড়া ও উদারনৈতিক কম্যুনিস্ট নেতাদের দুই শিবিরের ঝগড়া লক্ষ্য করার মতন। ইউরোপীয় কম্যুনিস্ট দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সদস্য-সংখ্যায় বড় দল—আছে ফ্রান্সে ও ইতালিতে। এই দুই দেশের দলে সদস্যসংখ্যা বিশ লাখ করে। ইতালি ও ফ্রান্সের কম্যুনিস্ট দল বেশ শক্তিশালী। তাদের অধীনে পরিচালিত হয় অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন। যদিও দল এখন মস্কোপন্থী কিন্তু দলের মধ্যে মাওপন্থীদের চাপা অসন্তোষ প্রায়ই ফেটে পড়ে। সে দৃশ্য আমি অনেকবার দেখেছি জনসভায়। তবে এখনও দল ভেঙে দু টুকরো হয় নি। কয়েকজন মাওপন্থী নেতা দলত্যাগ করে নতুন চরম বামপন্থী যার আবার নাম বিপ্লবীপন্থী দল তাই গড়েছে। সেগুলো খুবই ছোট ও দুর্বল। বৃটেনে ও পশ্চিম জার্মানীতে কম্যুনিস্ট দল বেশী শক্তিশালী নয়। বেলজিয়ামে ও হল্যান্ডে কম্যুনিস্ট দলে মাওপন্থীরা বেশ শক্তিশালী। তবে তারা খুবই সংখ্যালঘিষ্ঠ।

এক দল আদর্শবাদী তরুণ আজকাল মাও পুজো শুরু করে দিয়েছে ইউরোপে। তাদের ধারণা যে মাও-এর পথই চরম বিপ্লবের পথ। কিন্তু সে বিপ্লব কি সম্ভব উন্নত ইউরোপে? এটাই ঐতিহাসিকদের প্রশ্ন।

রাস্তায় মাও সে তুং-এর ছবিসহ চীনা ছাত্রদল

চীনের বাইরে চীনা অধিবাসী

অরুণ ভট্টাচার্য

পাখীরা যাযাবর। পৃথিবীর গতি আর ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে তারা ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে। মানুষও যাযাবর। মানুষের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে যে গ্রেট মাইগ্রেসন থেকে শুরু করে মানুষ সাগর, পর্বত, হিমবাহ পাড়ি দিয়ে নতুন নতুন দেশে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। বিহঙ্গের সঙ্গে মানুষের তফাৎ হল যে মানুষ সকল সময় এদের মত আবার ঋতুর শেষে দেশে ফিরে আসে না। আর্যরা, ভাইকিং এবং মধ্যযুগের পরবর্তী সময়ে ভারতীয় ও চীনের বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এরা সকলেই বিদেশকে নিজ দেশ বলে গ্রহণ করে। পার্থক্য একমাত্র চীনেদের বেলায়। চীনেরা পরদেশকে নিজ দেশ না করে নিজ দেশকেই পরদেশে নিয়ে যায়। একটু ব্যাখ্যা না করলে কথাটা স্পষ্ট

সব থেকে বেশী চীনেরা। যেখানেই চীনেরা গেছে সেখানেই এরা ছোটখাট একটি "চীন" তৈরী করে নিয়েছে। কলকাতা থেকে স্যানফ্রানসিস্‌কো যে স্থানেই যাওয়া যাক না কেন চায়না-টাউন সকলের চোখেই পড়বে। শতাব্দীর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সামাজিকতা নিয়ে এই চায়না-টাউনগুলির গন্ডীর মধ্যে চীনেরা আবরণীবদ্ধ এক পৃথক জগতে বাস করে।

সারা পৃথিবীর দু'কোটি চীনা—অর্থাৎ কম্যুনিস্ট চীনের বাইরে যারা বসবাস করছে ওভারসীস চাইনিজ নাম নিয়ে—সমাজনীতিবিদ্‌দের চিন্তার খোরাক যোগালেও, ১৯৪৯ সালের আগে এরা রাজনৈতিক শক্তি বা পোলিটিক্যাল্ ফোর্স বলে গণ্য হত না। চীনে কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র

দেখতে শুরু করল। এ সন্দে ণ দুটি। প্রথমত এরা নিজ সভ্যতা, সংস্কৃতি ত্যাগ করে অন্যদেশীয়দের সঙ্গে মিশে যায় নি। দ্বিতীয়ত, এরা স্বভাবতই স্বদেশপ্রেমিক এবং সর্ববিষয়ে চীনা শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। সুপীরীয়রিটি অব দি চাইনিজ রেস—এ হল এদের হৃদয়ের মন্ত্র, তাই কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে যোগ না থাকলেও এদের স্বভাবতই মূল চীনা ভূখন্ডের প্রতি আস্থাশীল বলে ধরে নেওয়া হয়।

আমেরিকা বা ইউরোপে চীনাদের ততটা গুরুত্ব না দিলেও এশিয়া ও আফ্রিকা ভূখণ্ডে এদের যথেষ্ট শ্রদ্ধামিশ্রিত সন্দেহের চোখে দেখা হয়। শ্রদ্ধা—এদের কর্মকুশলতা, পরিশ্রম, ধৈর্য ও ঐক্যের জন্য। আর সন্দেহ—গুপ্তচরবৃত্তি, গোপন

হংকং-এ বিক্ষুব্ধ চীনা ছাত্র-ছাত্রী
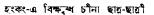
রিটি ও বিকারহীন একাগ্রতার জন্য। এ অবস্থার জন্য দায়ী পরবাসী চীনারা নয়। দায়ী কম্যুনিস্ট চীনের উগ্র স্বাদেশিকতা ও বিশ্বে বিপ্লব রপ্তানির প্রচেষ্টায় স্থানীয় চীনাদের ব্যবহারের চেষ্টা।

যে দু'কোটি চীনা বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে—তাদের প্রধান অংশ আছে তাইওয়ান বা ফরমোসায়। ফিলিপিনস, মালয়, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, হংকং—যদি একে বিদেশ বলে স্বীকার করা হয়, বর্মা, কাম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েৎনাম ও ভারতে বহু চীনা দলবদ্ধভাবে বহুদিন থেকে বসবাস করছে। আমেরিকার নিউ ওর্লিয়েন্স ও স্যানফ্রান্সিসকোর চায়না-টাউন বিরাট। এছাড়া [illegible]বাদ মেনে বলতে হয় ফিলিপিনো [illegible] চীনা রাঁধুনি আর ভারতীয় দরওয়ান বিশ্বের সবখানে আছে। যাই হোক বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চীনারা ব্যবসায়ী। যারা চাকুরিজীবী তাদেরও অধিকাংশ চীনা ব্যবসায়ীর অধীনে কাজ করে। একমাত্র আমেরিকাতেই আমেরিকান আর চীনাদের মধ্যে কিছু সংমিশ্রণ হয়েছে। তার কারণ আমেরিকানদের চীনা মেয়ে বিবাহ। কিন্তু মাইগ্রেটেড চীনাদের সঙ্গে সামান্যই সংমিশ্রণ হয়েছে। আমেরিকাতে চীনাদের উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধও কম। এরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত।

পরবাসী চীনারা একটি স্বতন্ত্র সমস্যা হিসাবে দেখা দেয় ১৯৬০ সালের পর থেকে। অর্থাৎ পঞ্চশীলের মুখোস চীনা নেতাদের মুখ থেকে খুলে যাবার পরে। ১৯৬২ সালে একজন থাই-সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে স্থানীয় ১৫ হাজার চীনাদের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "এদের ঘরে একই সঙ্গে মাও সে-তুং ও চিয়াং কাইশেকের ছবি থাকে। পুলিশ খুঁজলে এরা ছবির যে পিঠে চিয়াং-এর ছবি আছে সে দিকটি ওপরে তুলে রাখে।" সর্বত্র এটা সত্যি নয়। তাছাড়া ভারতের মত চীনের সঙ্গে থাইল্যান্ডেরও সমস্যা আছে। বহু পরবাসী চীনা আছে যারা চীনকে মাতৃভূমি চিন্তা করলেও সেখানে ফিরে যেতে মোটেই উৎসুক নয়। কলকাতার ৭,৫০০ চীনের মধ্যে মাত্র ১১৯ জন কম্যুনিস্ট চীনের পাসপোর্ট গ্রহণ করছে—তাও বাধ্য হয়ে—আর মাত্র ৩৭৫ জনকে কম্যুনিস্ট চীনের প্রতি সহানুভূতিশীল দেখে দেশত্যাগের হুকুম দেওয়া হয়েছিল।

প্রথমেই ধরা যাক তাইওয়ানের কথা। প্রায় এক কোটি লোকের বাস এই দ্বীপে। তাইওয়ানের আইল্যান্ডার ও মূল চীন ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। প্রথম দল শান্ত, দ্বিতীয়রা উগ্র। তাই চিয়াংএর সঙ্গে মাত্র ২০,০০০ চীনা—সৈন্য মূল চীন থেকে এসে এখানে নিজ শক্তিতে রাজত্ব করে চলেছে। ফরমোসাবাসীরা এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ এবং এদের ঘৃণা করে। উপরন্তু চীন ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকায় এদের মধ্যে অনেকেই চিয়াংএর দলের আচার ব্যবহারের দৌরাত্ম্য মেনে নেয় নি। যতদিন চিয়াং বেঁচে আছে এবং আমেরিকা তার সমগ্র শক্তি দিয়ে ফরমোজাকে সাহায্য করছে ততদিন হয়ত চীনের প্রতি এদের মনোভাবের কোনও পরিবর্তন দেখা দেবে না। কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফরমোজাবাসীরাও মূল চীনেদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছে। চীনের শক্তি যতই বাড়ছে—নতুন যুগের ছেলেরা ততই চীনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। চিয়াং গত হলে ফরমোসার নীতি কি হবে বলা শক্ত। চিয়াং যদিও তার পুত্র চিয়াং চিং কুওকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ক্ষমতায় বসিয়েছে এবং সৈন্য বাহিনীর পুরো ক্ষমতা দিয়েছে, তবুও একথা সত্য যে, চিয়ং চিং কুও'র মূল চীনা ভূখণ্ডের প্রতি দুর্বলতা আছে। এর প্রমাণ ১৯৬৫ সালে মাও সে-তুং-এর দরবারে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকারীকে এক গুপ্ত সফরে পাঠান। মাও তাকে শুধু সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েই ক্ষান্ত হন নি, পিপলস ডেলীতে তার গুণগানও করেছেন। এই বন্ধুটি আবার ফরমোসায় ফিরেও এসেছেন। চিয়াং-এর সম্মতি ছাড়া ফরমোসায় এ কাজ করার ক্ষমতা কারও আছে বলে মনে হয় না। এছাড়া ক্রমবর্ধমান মূল ভূখণ্ডের বাস্তুহারার সংখ্যা হয়ত কিছু দিন পরে ফরমোসাকে স্রেফ জনসংখ্যার জোরে দখল করে ফেলবে। তখন চীনের প্রতি সহানুভূতিশীলদের সংখ্যা বিরোধীদের ছাড়িয়ে যাবে এবং আমেরিকার অমতেই ফরমোসা চীনের কুক্ষিগত হবে।

পরবাসী চীনেরা মূল ভূখণ্ডের নির্দেশে কতটা চলে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফিলিপিনসে। ফিলিপিনস ভ্রমণের সময় তার বহু প্রমাণ পেয়েছি। ফিলিপিনসকে কম্যুনিস্ট চীনের কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা ব্যাহত করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রামন ম্যাগসেসে। ফিলিপিনে কম্যুনিস্ট সন্ত্রাসবাদী দল, যারা "হুক" নামেই বিশেষ পরিচিত, স্থানীয় চীনেদের পৃষ্ঠপোষকতায়

ও অর্থ-সাহায্যে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। হুকদের দমনের পরেই তাই স্থানীয় চীনেদের ওপরে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করেন ম্যাগসেসে। বহু চীনা তখন ফিলিপিনস ছেড়ে চলে যায় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের ততটা প্রাধান্য না থাকায় ফিলিপিনোদের এতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি।

ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথমেই প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর সঙ্গে চীনের বিবাদ বাধে যখন সুকর্ণ চীনেদের অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে ইন্দোনেশিয়াকে মুক্ত করতে চান। এছাড়া ১৯৫৪ সালের প্রকাশিত চীনের ম্যাপে ইন্দোনেশিয়াকে চীনের অন্তর্গত দেখানোর ফলে এবং স্থানীয় চীনেদের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টায় শঙ্কিত হয়ে সুকর্ণ জাহাজ বোঝাই করে কিছু চীনাকে চীনে পাঠাতে চান। এর ফলে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় যে দু দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হতে বসে। সুকর্ণ প্রায় ৩০,০০০ চীনাকে সাংহাইতে পাঠান। চীন তখন সুকর্ণর দাবী মেনে নিয়ে একটা ফয়সালা করে। স্থানীয় চীনাদের প্রভাব আরও স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যখন ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিস্ট বিপ্লব ব্যর্থ হল। স্থানীয় চীনারা যাদের হাতে ইন্দোনেশিয়ার পাইকারী চালের ব্যবসা ছিল তারা ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে সমগ্র দেশকে মন্বন্তরের মুখে ঠেলে দিল এবং প্রমাণ করল যে, দলবদ্ধ চীনাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব কত প্রবল। এর জন্য চীনারা অবশ্য সম্পূর্ণ দায়ী নয়, কারণ ইন্দোনেশিয়ার ব্যর্থ বিপ্লবোত্তর যুগে বহু চীনপন্থী চীনা প্রাণ হারায়।

পরবাসী চীনাদের গোষ্ঠীশক্তির প্রমাণ পাওয়া যাবে মালয়ে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুর রহমানের মালয়েশিয়া ফেডারেশনে রাজি হওয়ার একমাত্র কারণ ওদেশের চীনা জনসংখ্যা। যদি ঐ ১১টি বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে টুংকু ফেডারেশন না করত তবে চীন ও মালয়দের জনসংখ্যার রেশিও হয় ৬০:৪০। সিঙ্গাপুর ও কুয়ালালামপুরে অধিবাসী চীনারা মালয়দের অপেক্ষা প্রায় গড়ে ২০ ভাগ বেশী। সিঙ্গাপুর ও মালয় নিয়ে ছিল বৃটিশ মালয়। টুংকু সারাওক ও আরও ৮টি রাজা শাসিত দ্বীপ নিয়ে ফেডারেশনে রাজী হল। আশা ছিল উভয় দলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবে ১৯ ভাগ ভারতীয় পরবাসীরা। হংকং-এর পর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী চীনা গোষ্ঠী বাস করে সিঙ্গাপুরে। ওখানকার জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ চীনা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের শতকরা ৮৬ ভাগ চীনাদের অধীনে। কাজেই ফেডারেশন না হলে অর্থনৈতিক, বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ সকল নীতি ঐ চীনা জনসংখ্যার চাপে প্রভাবান্বিত হত। মালয়েশিয়ার রবার, টিন এবং অন্যান্য বহু শিল্প চীনাদের দখলে। মালয়দের বিক্ষোভ অবশ্য ফেডারেশন হওয়ায় মেটে নি, আবার চীনারাও মালয়ীদের প্রভুত্ব মেনে নিতে রাজী হয় নি। তাই তিন বৎসরের মধ্যেই চীনা-প্রধান সিঙ্গাপুর ফেডারেশন থেকে বেরিয়ে আসে।

এর অর্থ এই নয় যে, সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ চীনপন্থী বা সিঙ্গাপুরের চৈনিক অধিবাসীরা কম্যুনিস্ট চীনের সমর্থক। কিন্তু চীনাদের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ববোধ এবং চীনকে বিশ্বের সকল সংস্কৃতির আধার বলে মনে করায় এরা বস্তুত চীনপন্থী — কম্যুনিস্ট না হলেও। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে লি কুয়ান ইউর একটি উক্তির কথা। কুয়ালালামপুরে একটি সম্বর্ধনা সভায় ভারতীয় সাংবাদিক জেনে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপিসাড়ে বলেছিলেন লি : "চীনের প্রতাপে তো আর টিঁকতে পারছি না।"

চীন তখন সবেমাত্র তার প্রথম অ্যাটম বোমা ফাটিয়েছে আর সিঙ্গাপুরের রাস্তায়, হোটেল-রেস্তোরাঁয় সিঙ্গাপুরের চীনারা চীনের শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উৎসবে মেতে উঠেছে। লি এটা পছন্দ করেন নি। নিজে সোস্যালিস্ট এবং চীনা হয়েও তিনি সিঙ্গাপুরের চীনাদের পিকিং-পন্থী মনোভাব দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।

শ্যাম, কম্বোডিয়া, লাওস এবং ভিয়েতনামে যদিও স্থানীয় চীনারা প্রভাবশালী তবুও এই সব দেশের সরকারগুলি এদের ক্ষমতা খর্ব করতে সর্বদাই সচেষ্ট। থাইল্যান্ডে চীনারা নিজেদের সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন বলে মনে করে, যদিও সেখানে তাদের ওপরে কোনও অত্যাচার হয় না। চীনাদের এই মনোভাবের পেছনে ঐতিহাসিক কারণ বর্তমান। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে রাজ্যগুলি এককালে চীনের অধীনে বা তার সুজেরেইনটির অন্তর্ভুক্ত ছিল সে সব দেশের লোকেরা স্বভাবতই চীনাদের অপছন্দ করে। তাই ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া বা লাওসে চীনারা জনপ্রিয় নয়। ভিয়েতনাম এত বড় সংকটের সম্মুখীন হয়েও চীনা সৈন্যদের নিজ দেশে যুদ্ধ করতে আহবান করে নি।

পরবাসী চীনাদের প্রতি বিরূপতার আর এক কারণ হল তাদের স্থানীয় অধিবাসীদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে থাকবার প্রচেষ্টা। অতি নগণ্য সংখ্যক অ্যাংলো-চাইনিজ ছাড়া খুব কম সংখ্যক চীনাই অন্য সভ্যতার আওতায় এসেছে। ফল হয়েছে সাংস্কৃতিক মূল ধারায় সঙ্গে এরা নিজেদের মিশিয়ে দিতে পারে নি। এর জন্য যেমন দায়ী ইতিহাস তেমনি দায়ী বর্তমান চীনের নেতারা। আজও তাঁরা প্রচার করেন এবং অন্তরে বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীর অন্যদেশীয়রা বর্বর এবং চীনই পৃথিবীর সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। অন্যদেশীয় অধিবাসীদের প্রতি চীনা মনোভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় সুং যুগের বিখ্যাত কবি সুং টুং পোর লেখায়। সুং টুং পো লিখেছেন : 'বর্বরতা পশুর মত। এদের শাসন করতে হলে চীনাদের শাসন করার নীতি প্রয়োগ করলে চলবে না। উন্নত চীনাদের ওপরে প্রযোজ্য শাসন নীতি প্রয়োগ করলে কেবল অরাজকতাই বাড়বে! তাই আমাদের পূর্বপুরুষরা বর্বরদের অব্যবস্থার শাসন ব্যবস্থার মধ্যে রেখেছিল। অব্যবস্থার শাসনই বর্বরদের উপযুক্ত।" বর্বর বলতে সুং টুং পো অচৈনিকদেরই বুঝিয়েছেন। আজও চীনা অভিধানে বিদেশী মাত্রেই বর্বর।

যেখানে রাজনৈতিক শাসন চলছে না সেখানে হীন দৃষ্টিতে স্থানীয় অধিবাসীদের দেখাই এরা পথ বলে ধরে নিয়েছে।

এই গোল্ডেন রুল অনুসারেই চীনের শাসকরা তাদের অধীনস্থ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলিকে শাসন করেছে। আর যেখানে সম্ভব হয় নি সেখানে বর্বরদের ছোঁয়া থেকে নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়েছে। তিব্বতে ১৯৫৪ সালে চীনের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে সেখানকার চীনা এবং তিব্বতী সকল অধিবাসীকে এ গানটি ঝাঁ সুরে গাইতে শুনা যায় :

"বিশ্বের রাজধানী পিকিং থে
বেজে ওঠে ভেরী;
জানি না কে ভেরী বাজায়,
কিন্তু আমরা ও শব্দে
আনন্দে মেতে উঠি
কম্যুনিস্ট পার্টির সূর্যের আলোয়
ঝলসে ওঠার মত,
কারণ তাতে সব জিনিস জন্মায়
ও তরতরিয়ে বেড়ে ওঠে
চন্দ্রের মতই চেয়ারম্যান মাও সে তুং
এবং সেই আমাদের পথ দেখায়।"
(চীনা সাহিত্য ৭ই নভেম্বর ১৯৫৯)

কম্বোডিয়া ও লাওসে একই অবস্থা। কম্বোডিয়ার রাজপুত্র নরোদম সিহানুক বহুবার তাঁর দেশের চীনাদের সংযত হতে বলেছেন। তাদের পিকিং প্রীতি ও আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের

তিনি বিরোধী হলেও মূল চীনা ভূখণ্ডের সংলগ্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলে তাঁকে স্থানীয় চীনাদের বহু অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। লাওসের নিরপেক্ষ নীতির সমর্থক সৌভানা ফৌমা তাঁর ভ্রাতা সৌফানা ভংকে স্থানীয় চীনা অধিবাসীদের দ্বারা পরিচালিত হতে নিষেধ করেছেন। স্বদেশীয় এবং পরবাসী চীনাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক উইলিয়ম লেডারার বলেছেন : "শত শত যুগ ধরে চীনাদের বাস্তববুদ্ধি, সূক্ষ্ম কর্মদক্ষতা আর রাজনীতির প্রতিভা এক যুগ আর এক যুগকে দিয়ে যাচ্ছে: বাপ দিয়েছে ছেলেকে, মা মেয়েকে, প্রধানমন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীদের। এর সঙ্গে পিতৃ-পুরুষানুক্রমে এরা পেয়েছে ধৈর্য শিক্ষা, সাময়িক সঙ্কট ও হতাশাকে দমন করে এগিয়ে যাবার উৎসাহ; অপেক্ষা করবার সুবর্ণ সুযোগের প্রতীক্ষা। ধনী, দরিদ্র সকল চীনারাই জানে তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি — আচারে, ব্যবহারে, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে তাই তাদের পক্ষে অসভ্য বর্বরদের ওপরে ওঠবার সিঁড়ির ধাপ অথবা পা রাখবার টুল হিসাবে ব্যবহার করতে বাধে না। প্রয়োজন হলে এরা চাটুকার, কখনও বা ক্রূর, কখনও ঘুষ দিতে সিদ্ধহস্ত, আবার কখনও বা ভয়ে সন্ত্রস্ত; কখনও বা রাজনীতির চাণক্য।"

পরবাসী চীনা চরিত্র বিশ্লেষণ করলে এ কথাগুলি অত্যন্ত সত্য বলে মনে হবে। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চীনারা নিজের স্বভাব ও ব্যবহার শুধরেছে। যখন ব্রহ্মদেশের সঙ্গে চীনের সীমানা বিরোধ মিটল তখন চীন উভয় দেশের সদ্ভাবের উপঢৌকন হিসাবে ব্রহ্মদেশকে ৫০টি গ্রাম দান করে। আর তার সঙ্গে দান করে এক হাজার গরিলাযুদ্ধে দক্ষ চীনা অধিবাসী, যাঁরা ঐ অঞ্চলে বসবাস করত। যে মুহূর্তে চীনের সঙ্গে ব্রহ্মের আবার বিরোধ বাধল, এরা নিজ মূর্তি ধরে সারা দেশে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে দিল। আবার সান অঞ্চলে চিয়াংপন্থী চীনারা অশান্তি শুরু করল। কমিউনিস্ট চীনারা আরও একটু এগিয়ে ব্রহ্মদেশ[illegible] একটি স্বতন্ত্র চীনা অঞ্চল দাবী ক[illegible]।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, কম্যুনিস্ট চীন ও চিয়াং ফরমোজার মধ্যে যত বিরোধ থাক না কেন চীনাদের স্বার্থের ক্ষেত্রে উভয়েই এক। যখন কম্যুনিস্ট চীনের ম্যাপে ভারতের নেফা ও লাডাক অঞ্চলকে চীনের বলে দাবী করা হল, চিয়াং কাইশেক নির্বিধায় ঐ দাবীকে সমর্থন করে বললেন ও অঞ্চলগুলি চীনের।

বিদেশে ছড়িয়ে পড়া চীনারা কিন্তু স্বদেশে খুব কমই ফিরতে চায়। বস্তুত বিদেশে থাকবার ইচ্ছাটা এদের মধ্যে জন্মগত। নিজ দেশের সভ্যতাকে বিদেশে প্রচার করার চেষ্টা এদের সকলেরই আছে। যে স্থানে এরা বসবাস করে সেস্থানে স্কুল, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্থান এবং নিজ শিল্প ও কর্মকুশলতার পরিচয় দেখার সকল রকম সুযোগ এরা নিজেরাই তৈরী করে নেয়। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের বসবাসের অঞ্চলকে এরা একটি 'ক্ষুদ্র-চীন'-এ পর্যবসিত করে।

রাজনৈতিক দিক থেকে চীনা মনোভাবের পরিবর্তন হয়ত চীনের প্রচ্ছদপটে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আসবে। তার কিছুটা আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। মাও সে তুং চীনের রাজনৈতিক আকাশ থেকে সরে গেলে—যা একেবারে অসম্ভব নয় — এবং লিউ সাও চি ও পেং তে হুইরা আবার চৌ এন লাই-এর পেছনে এসে দাঁড়ালে হয়ত চীনা উগ্র স্বাদেশিকতার কিছুটা পরিবর্তন আসবে। কিন্তু সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী তারা কোন সময়েই ছাড়বে না। বিদেশী চীনাদের ইদানীং উগ্র মনোভাবের কারণ মাও-এর পলিসি হলেও হয়ত নিজেদের স্বার্থ চিন্তা করেই চৌ এবং চেন ই সেটা সম্পূর্ণ মেনে নেন নি। চৌ এন লাই বলেছেন : "সমগ্র বিশ্ব এখন একটা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলেছে।" আর চেন ই আরও একটু স্পষ্ট করে বলেছেন : "এশিয়া ও আফ্রিকায় একটা বিরোধ শক্ত দানা বেঁধে উঠছে; তাতে ভয় পাবার কারণ নেই, বিপ্লবের পথ চিরকালই বন্ধুর"। কিন্তু এঁরা দুজনেই স্বীকার করেছেন যে, স্থানীয় চীনাদের ব্যবহার করার জন্যই হোক আর চীনের উগ্র বৈদেশিক নীতির জন্যই হোক এশিয়া ও আফ্রিকায় চীন হঠছে।

মাও সে তুং-এর পরে কে ক্ষমতায় আসবে তা এ রচনার বিষয়বস্তু নয়। চীনের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে পরবাসী চীনাদের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে বলে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা না করলে নয়। মাও সে তুং যে পূর্বপথ বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথ থেকে অনেকটা সরে এসেছেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর বর্তমান 'বাম' থেকে 'মধ্য বামে' সরে যাবার নীতির ফলে পূর্বতন হুতগৌরব নেতারা আবার কিছু কিছু ক্ষমতায় ফিরে আসছেন।

লিন পিয়াও ও চৌ এন লাই অবশ্য ক্ষমতাসীন আছেন। লিউ শাও চি, পেং তে হুই, সিয়ে ফু চি, পাবলিক সিকিউরিটির প্রধান, লি সিয়েন নিয়েন, অর্থ ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান লি ফু চুন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দপ্তরের প্রধান ইয়ে উ নসুং, বিজ্ঞান বিষয়ে সৈন সাং, আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ওয়াং চেন, কৃষি বিষয়ে চেন চেঙ-জেন এবং শিল্পে ফাং ই প্রভৃতি যাঁরা বিভিন্ন দপ্তর থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন তাঁরাও আবার ফিরে আসছেন। এর কারণ অবশ্য মাও-এর পশ্চাৎ অপসারণ। মাও নিজে বলেছেন : "শ্রমিক শ্রেণী বা ওয়ার্কিং ক্লাসের মধ্যে স্বার্থের কোনও দ্বন্দ্ব নেই। শ্রমিক রাজত্বের একনায়কত্বেও তাই পার্টিকে দু দলে ভাগ হবার কোনও কারণ নেই। নেই শক্তির মোহে, ক্ষমতার মোহে মত্ত হয়ে নেতাদের দ্বিধা-বিভক্ত হবার অধিকার।" (ওয়েন হুই পাও কাগজে ২০শে সেপ্টেম্বর)।

বর্তমান অবস্থা থেকে মনে হয় যে, মাও-এর পরে একটি ট্রায়ামভাইরেট চীনে কাজ করবে। তার মধ্যস্থলে চৌ এবং তাঁকে ভারসাম্য দেবে সৈন্য বাহিনীর তরফ থেকে লিন পিয়াও এবং লিউ শাও চি। আশা করা যায় যে, চীনের আকাশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে বিদেশী চীনারাও তাদের উগ্রতা কিছুটা কমাবে। তবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ববোধ, নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গর্ব এবং অন্যকে নিজ অপেক্ষা হীন মনে করার কোনও পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। যদিও চীনের মতই সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার ঐতিহ্যে ঐতিহ্যশালী ভারতবাসীর মনে তাতে কোনও পরিবর্তন আসবে না, আফ্রিকান দেশগুলিতে এর প্রতিক্রিয়া খুব ভাল হবে না। প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকাতে চীনের অজনপ্রিয়তার কারণ তার এই শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব।

বিদেশী চীনারা অত্যন্ত পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সহায়ক। যে কোনও দেশই তাদের স্বাগত জানাবে। কিন্তু রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে তারা বহু স্থানেই অপ্রিয় হয়ে উঠছে।
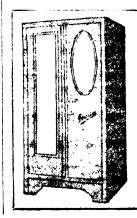
সুদূর আকাশে

সুনীল গুহ

এখন এই দুপুরে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে নেবে ভাস্বতী। আর এই এখন থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি ঘুম ছাড়া আর কোন কাজ নেই। রোজই ঘুমোয়। শুধু মাঝে মাঝে এই নির্বিঘ্ন আরামের ঘুম ভাঙিয়ে দেয় অমলেশ। ক্রিং-ক্রিং করে ওঠে টেলিফোনটা। হাতে কাজ না থাকলে আপিস থেকে টেলি-ফোন করে খোঁজ-খবর নেবার অছিলায় আলাপ করে অমলেশ।

—'কি করছ এখন?'

—'ঘুমিয়ে ছিলাম বেশ, ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে ত।'

—'যাব নাকি আপিস থেকে ছুটি নিয়ে?'

—'মন্দ কী?'

এমনি সংলাপের আদান-প্রদান হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু বললে কি হবে, অমলেশ আসে না। আসতে পারে না। আর এদিকে রিসিভারটা রেখে আবার ঘুম। বিয়ের পর থেকে ঘুম যা বেড়েছে ওর। অমলেশ ত এ জন্য বকেই, ও নিজেও এটা ভেবে দেখেছে। কোন দায়দায়িত্ব নেই অবশ্য। নিজেরা দুজিভে খাও-দাও, খেলাও, বেড়াও ঘুমাও। তাই বলে এত ঘুম!

বিয়েতে পাওয়া বইগুলির একটাও পড়া হয় নি। পড়ে আছে। যেমন করে গুছিয়ে রেখেছিল তেমনি। অথচ বইগুলি গুছিয়ে রাখবার সময় মনে হয়েছিল, মাসখানেকের মধ্যে সব শেষ করে ফেলবে। কিন্তু এই ছ মাসের মধ্যে একখানাও শেষ করতে পারে নি। দুপুরে বই নিয়ে শুয়ে একটা পাতাও শেষ করে উঠতে পারে না, চোখ জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে কখন, সেটা ও মাঝে মাঝে টেরও পায় না। শুধু মাঝে মাঝে ব্যাঘাত করে টেলিফোনটা। অমলেশের প্ররোচনায় ক্রিং-ক্রিং করতে থাকে। ঘুমজড়ান চোখে রিসিভারটা কানে না চেপে ধরে উপায় থাকে না। ওদিক থেকে কথা ভেসে আসে,—'খুব ঘুমুচ্ছ, এদিকে আমার অবস্থাটা কি জান?'

—'বললে ত ঘুমুচ্ছি তবে আর জানব কি করে।'

'তুমি যদি আমার সহধর্মিণী না হয়ে সহকর্মিণী হতে।'

'মাফ করবেন মশাই, তাহলে আমার দ্বারা আপনার কোন উপকারই হত না।'

—'এ রকম উত্তর কি কোন সতীসাধ্বী পত্নীর মুখে শোভা পায়?' বলেই ওদিক থেকে হো হো করে হেসে ওঠে অমলেশ। হেসে ওঠে ভাস্বতীও।

তারপরেই আবার ঘুম। বিয়ের পরে এসেছে রোগটা। সম্ভবত বিয়ে থেকেই উৎপত্তি। মনে মনে এ প্রত্যয়টাই দৃঢ় হয়েছে। বিয়ের আগে ত এত [illegible]া। আর দুপুরে ঘুমোবার কথা [illegible]পনাও করত না। দুপুরে কলেজে যেত। আর ছুটির দিনে নানান কাজ। এটা-ওটা সেরে রাখত। অতএব বিয়েটাই যে এজন্য দায়ী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কোন ঝামেলা নেই, তাই রক্ষা। যদি পাঁচজনের সংসার হত, তাহলে বোধহয় এ কারণে অন্য কোন পরিণামে ক্ষত-বিক্ষত হত ও। যাক রক্ষা। যার যেমন তার জন্য তেমন ব্যবস্থা ঈশ্বরই করে রাখেন। তদোপরি অমলেশের মত স্বামী! নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী বলে বর্ণনা করতে চাইল ও।

ছুটির দিনে অমলেশ বাড়ি থাকলে উচ্ছল খুশীতে ও যেন সারা বাড়িময় আরো বেশী করে ছড়িয়ে পড়ে। রেডিওটা খুলে দিয়ে পরিচিত সুরের কোন গান বাজতে থাকলে গুনগুন করে ভাস্বতীও

গায়। অমলেশ তখন বেশী মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে। রেডিওরটা নয়, ওরটা। গলাটা মন্দ নয় ওর। বিয়ের আগে যে একটু-আধটু চর্চা করেছিল সেটা স্পষ্ট। বিয়ের কদিনের মধ্যেই সেটা টের পেয়েছিল অমলেশ। তাই একদিন বলেছিল,—'এখন একটু চেষ্টা করলে হত না?'

হত না কেন? হত। তবে মনটা যেন এখন আর কোন কাজেই সায় দিচ্ছে না। যখন-তখন ঘুম পায়। নয়ত মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কখনো আনন্দের আবেগে নিজের কাছে নিজেকেই হারিয়ে ফেলে। তাই উত্তরে বলেছিল,—'এখন আমাকে এসব কিছু বলো না, পারব না আমি।'

—'তা জানতাম।'

ভাস্বতীর ইচ্ছে হচ্ছিল অমলেশের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করে, বল, কি জানতে।

কিন্তু ও অতটা বাড়াবাড়ির মধ্যে গেল না। নিজেকে সংযত করে চুপ করে রইল। এ ছ' মাসে ও অমলেশকে খুব চিনে নিয়েছে, কথার একবার প্যাঁচ ধরলে টানতে টানতে নিয়ে যাবে অনেক দূর। কিছু সময় চুপচাপ থেকে আবার বলে,—'আজ তোমার ছুটি বলে এই ঘরে বসে আর কিছু ভাল লাগছে না।'

অমলেশ বুঝতে পারে নতুন বায়না শুরু হল বলে। সে-ও কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। ও তাই খানিকটা চিৎকারের মত করে বলে ওঠে, — 'শুনছ, আমি কি বলেছি।'

—'শুনেছি, কিন্তু তারপরে কি বলতে চাও তা ত শুনি নি।'

ভাস্বতী যেন খুশী হল। মোটামুটি ভালই লাগল। অমলেশ ওকে অবহেলা করে না। ওর সব কিছুরই একটা মূল্য দিতে চায়। তাই আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে,—'চলো বেরিয়ে পড়ি।'

অমলেশ যেন আকাশ থেকে পড়ে! ব[illegible]বে?'

—'[illegible]য়, ঘাটে, মাঠে, ময়দানে, সিনেমায়,—সব জায়গায়।'

ভাস্বতীর এসবের সঙ্গে অমলেশ যে সায় দেয় নি তা নয়। বেরিয়েছে। তারপর পথে পথে ঘুরেছে। দুপুরের খাওয়াটা হোটেলে সেরে, ম্যাটিনী শো'য় সিনেমা দেখেছে, তারপর গড়ের মাঠের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে চিনাবাদামের খোসা ছাড়িয়ে একজন আরেকজনের গায়ে ছুঁড়ে মেরেছে। তারপর ফিরেছে রাত্রিতে। হোটেল থেকেই খাওয়া সেরে।

তারপর আবার সেই এক নিয়ম। অমলেশ অফিসে। আর বাড়িতে ভাস্বতী! মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ফাঁকে রান্নায় টেলিফোন করে অমলেশ, আর ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে রিসিভারটা কানে তোলে ভাস্বতী।

এমনি একদিন ঘুম-জড়ানো চোখে রিসিভারটা কানের কাছে ধরতেই চমকে উঠল ভাস্বতী। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত জড়তা কেটে গেল। আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। ওদিক থেকে অমলেশের চেয়ে অনেক মোটা এবং রুক্ষ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো,—'চিনতে পারছ ভাস্বতী।' ইচ্ছে হচ্ছিল রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু সাহসে কুলোলো না। বলল,—'মানে, মানে ওই ইয়ে ত?'

—'হ্যাঁ, আমি ভবানী, ভবানী রায়।'

ওর দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা বেয়ে যেন ছুটে গেল কোন তপ্ত শলাকা। ভীষণ জ্বালা করছে। মাথা ঝিমঝিম করছে, হাত-পা অবশ! হয়ত বিছানা থেকেই পড়ে যাবে নিচে। মেঝেয়। তবু কোন রকমে রিসিভারটাকে চেপে রাখল কানে। তারপর কাঁপতে কাঁপতে বলল,—'হ্যাঁ, তুমি, তুমি ভবানীদা ত?'

—'হ্যাঁ, তোমার ভবানী, ভুলে যাও নি তাহলে?'

ভুল। ভুলে যাওয়াই ত উচিত। আর বিয়ের আগের সবকিছু ভুলে যাওয়ার জন্যই যেন এ ছ' মাস ধরে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে ভাস্বতী, আরও ঘুমিয়ে আরও ভুলে যেতে চায় ও। কিন্তু ভুলতে দিল না ভবানী। সব মনে করিয়ে দিল। বুকের ভিতরে শুরু হল এক ধরণের কাঁপুনি। তবু নিজেকে সংযত করে বলল,—'ভালো আছ ভবানীদা?'

—'না, ভালো নেই, শরীর খারাপ, মন খারাপ, তাই দিনগুলিও কাটছে খারাপভাবেই।'

ভাস্বতীর মনে হচ্ছিল ও বোধহয় আর পারবে না। হাত থেকে পড়ে যাবে রিসিভারটা। কি যে বলতে যাচ্ছিল ও। কিন্তু তার আগেই ওদিক থেকে ভেসে এলো,—'একদিন আসব তোমার এখানে, টেলিফোন গাইড থেকে ঠিকানাটা টুকে নিয়েছি, এসে বলব সব তোমাকে।'

আর দেরী করল না ভাস্বতী। রিসিভারটা রেখে দিল। সমস্ত মুখে ছুটে এলো রক্ত। চোখ হলো আরও ভীষণ রক্তাক্ত। আর নিজের ভিতরে একটা সাপের মত কি যেন ফুঁসে ফুঁসে উঠতে লাগল। মনে হচ্ছিল নিজের হাতটা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে। অমলেশ যদি কোনরকম কিছু টের পায়, যদি কোনরকম সন্দেহ তার মনে আসে, তাহলে কি বলে ও আত্মরক্ষা করবে? চোখের সামনে থেকে সমস্ত আলো ক্রমে ক্রমে নিভে যেতে লাগল।

সেই থেকে আর ঘুম এলো না। পালিয়ে গেছে যেন। এখনো ভবানীর কণ্ঠস্বর ওর কানে বাজছে। মনে হল একটা ভয়ংকর পশু যেন ওদিক থেকে মানুষের গলায় কথা বলেছে। সে কিছুতেই ভবানী নয়। কিন্তু কি ভুল করল ও। অস্বীকার করলেই পারত। চিনি না বলে দিলেই হত চুকে যেত সব। কেন তার এই আসবার বাসনা কি তার উদ্দেশ্য! এখানে এই অবস্থায় এলে ওর নিজের আত্মরক্ষার পথ কোথায়? অতল সমুদ্রে যেন তলিয়ে যাচ্ছে ও। দম আটকে আসছে। চিৎকার করতে ইচ্ছে হল। অমলেশ, তুমি কোথায়? এসো, শীগগীর ছুটে এসো। ডাকাতের সন্ধান পাচ্ছি। রাত্রে শুতে গিয়ে অমলেশকে বলল, —'এ বাড়িটা বদলাও না গো।'

হাসল অমলেশ। বলল,—'তোমার যত-সব অদ্ভুত আবদার।'

সত্যি অদ্ভুত আবদার। নিজেও বুঝতে পারে ভাস্বতী। কিন্তু কি করবে ও, যে কথা অমলেশকে পর্যন্ত জানাতে পারছে না, সে কথা নিয়ে ওর যে অসহায় বোধের অন্ত নেই।

সেই এক সময়ের কথা। কেন যে অমন অশান্ত হয়ে উঠেছিল ও। কি চোখে সে দেখেছিল ভবানীকে। সেই ভবানী। সত্যি, যাকে একদিন নির্দ্বিধায় ভালোবেসে ফেলেছিল ও। টানাটানা চোখ, কোঁকড়ানো চুল, গৌরবর্ণ গায়ের রঙ, তদোপরি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। ভালো লেগেছিল ভাস্বতীর। আজো মনে মনে ও তা স্বীকার করে। তবু যা হয়নি, হবার নয়, যা অসংগত তা আর মনে মনে পুষে লাভ কি? তাই ভুলে যেতে চেয়েছিল ভবানীকে। অন্তরের দুষ্ট ক্ষতটা শুকিয়ে উঠেছিল প্রায়। আবার তা দগদগে আকার ধারণ করল।

সেই একদিন। সেদিনের কথা আজ আবার যেন নতুন করে মনে পড়ল। হারিয়ে গিয়েছিল মন থেকে। ফুরিয়ে গিয়েছিল সেই চপলতার অতীত। সেই একটানা বৃষ্টির ফলে সেদিন কলকাতার পথঘাট জলে থৈ থৈ! ট্রাম বাস বন্ধ। ঝিরঝিরে বৃষ্টির তখনো একটানা গুঞ্জন। কোন রকমে একটা ট্যাক্সি ধরতে সক্ষম হয়েছিল ভবানী। সেই ট্যাক্সিতেই উঠেছিল ভাস্বতী এবং আরো কয়েকটি মেয়ে। যার যার বাড়ি সবাইকে পৌঁছে দিয়ে সবশেষে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল ওকে। সেই কয়েক মিনিট ওরা ট্যাক্সির পিছনের সিটে পাশাপাশি বসেছিল। সেই প্রথম। জীবনের কোন এক অজানিত বন্ধ দুয়ার নিজের ভিতরে প্রথম খুলে গিয়েছিল ওর। এক অজ্ঞাত রহস্যের উদ্ঘাটনে পুলকিত হয়ে উঠেছিল মন। মনে হয়েছিল আরো ঘেঁষে বসতে পারলে যেন আরো আনন্দ পেত।

ভবানীর সেই সেদিনকার উপকার থেকে একটা কৃতজ্ঞতা বোধ জন্মেছিল ওর মধ্যে। আর মনে হয়েছিল সেই উপকারের সংগে আরো যে কি ছিল। যা সত্য ও সুন্দর মহিমান্বিত হলেও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অথচ মনের সংগে জড়িয়ে থাকে। প্রতিনিয়ত অনুভবের মধ্যে তা অক্ষয় হয়ে থাকে। সেই থেকে দেখা হলেই চোখে চোখ পড়েছে, হাসিতে মিলেছে হাসি। সামান্য সময়ের দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত কথার আদান প্রদান হয়েছে। আর তারই ফলে হয়েছে অসামান্য হাসির লেনদেন।

কলেজের ক্যান্টিনে দৃষ্টি বিনিময় হত, সেই সংগে ইশারা। সেই ইশারার মধ্যে ছিল আশ্চর্য এক গোপন কথা। এবং পরে কলেজ থেকে বেরিয়ে সোজা পার্কে। পার্কের এক কোণে নিরিবিলি খুঁজে বসত ওরা। তারপর কথা। অনেক কথা। কত যে কথা ওরা বলতে পারত! আজো সে সব কথা মনে হলে ভাস্বতী নিজেই বিস্মিত হয়।

কলেজ পালিয়ে সিনেমায় গেছে ওরা। আশ্চর্য, এখন সে সব দিনের কথা মনে হলে গা শিউরে ওঠে ওর। কী অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল ভবানীর! সে কোন কথা বললে তা উপেক্ষা করার ক্ষমতা ছিল না ওর। ডাকলেই সাড়া দিতে হত। সিনেমার অন্ধকার ঘরে বসে ছবির চেয়ে ভবানীর দিকেই ওর মনোযোগ ছিল বেশী। কি যে ভালো লাগত তখন এই ভবানীকে!

একবার কি একটা কারণে কলেজ-ধর্মঘট হয়েছিল। কলেজে আর ঢুকতে পারেনি ওরা, দরজা থেকেই ফিরতে হয়েছিল। এবং কথায় কথায় হাঁটতে হাঁটতে ওরা গিয়ে হাজির হয়েছিল গংগার ধারে। কোন পরিকল্পনা ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না কোন। তবু পায়ে পায়ে হাজির হয়েছিল সেখানে। সেখানে গিয়ে ভবানীর হঠাৎ খেয়াল হল নৌকোয় বেড়াবে। বলল, 'চল দক্ষিণেশ্বর যাই।' ও কোন অসম্মতি জানাতে পারেনি। ফলে নৌকোয় উঠে বসতে হয়েছিল ওকে। আবার সেই ভবানীর পাশে। অনেকখানি জায়গা ফাঁকা ছিল, তবু কেন যেন, কিসের আকর্ষণে যেন বসেছিল সেইভাবেই। আবার সেই ভালো লাগা! সেই রোমাঞ্চকর অনুভূতি। আরেকদিন ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে বৃষ্টির গুঞ্জন শুনেছিল।

নৌকোটা দুলেছিল। কেমন এক অব্যক্ত ভয় ওর ভিতরে ভিতরে জেগে উঠছিল। হঠাৎ ও বলে উঠেছিল, 'যদি এখন জলে পড়ে ডুবে যাই।'

—'আমি নিশ্চয় বসে বসে দেখব না।' সংগে সংগে উত্তর দিয়েছিল ভবানী।

কি যে ভালো লেগেছিল ওর। প্রত্যুত্তরে শুধু ভবানীর মুখের দিকে সপ্রেম হাসি হেসেছিল। তখন মনে হয়েছিল ভবানী শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, পুরুষোচিত বিবেকসম্পন্ন মানুষ। যার উপর অনায়াসে নির্ভর করা চলে। যার মহত্ত্ব সারাজীবন ধরে স্বীকার করতে রাজি আছে ও।

সেদিন সন্ধ্যে অবধি বেড়িয়েছিল দক্ষিণেশ্বরের গংগার ঘাটে বসে। অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভায় দেখেছিল একজন আরেকজনকে। সুন্দর গাম্ভীর্য তখন দুজনেরই মুখে স্পষ্ট। যেন আজ নতুন করে আবার জানল একজন আরেকজনকে। দেখল দুজনে দুজনের মুখ। রক্তাভ গোলাকার সূর্যদেব ঢলে পড়লেন দিগন্তের গর্ভে।

তারপর আরো অনেকদিনের কথা মনে করলেই মনে পড়ে। কফি হাউসে মুখোমুখি বসে কাটিয়েছে অনেক বিকেল। অনেক অপরাহ্ণের আলো ওদের আড়ালে মুছে গেছে পৃথিবী থেকে। এককোণে নিভৃতে ওরা বসে বসে সময় যাপন করেছে। একদিন কোন এক আত্মীয়ের সামনে ধরা পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে পালিয়ে বেঁচেছে। একদিন ভবানী সিগারেট ধরিয়েছিল, ওর সেদিন ভীষণ রাগ হয়েছিল ভবানীর উপর। সেই থেকে আর কোনদিন ও ভবানীকে সিগারেট খেতে দেখেনি।

এ সব ওর জীবনের বিগত দিনের কাহিনী। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি এক এক করে মনে পড়তে লাগল। আবার হয়ত এদিক ওদিকের দুয়েকটি ঘটনার কথা ভুলেও গেছে। যাক, সে সব আর টেনে টেনে মনে করে লাভ নেই।

অবশেষে একদিন বিপর্যয় ঘটল। সুখের ত একটা শেষ আছে। তাই শান্তির পিছে পিছে এলো অশান্তি। বি-এস সি'র ফল বেরুতেই দেখা গেল ভবানী পাশ করতে পারেনি, অল্পের জন্য আটকে গেছে। মনে মনে নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিল ভাস্বতী। মনে হয়েছিল, ওর [illegible] ানীর পাশ করা সম্ভব হল না, [illegible] ভবিষ্যতের পরিণতির কথা না ভেবেই ঘুরে বেড়িয়েছে। একজনের আকর্ষণে আরেকজন ঘুরেছে। ও যদি অন্তত ভবানীকে যথাসময়ে যথেষ্ট সতর্ক করে পড়ার ঘরে বসিয়ে রাখতে পারত! মনে মনে অনেকখানি দমে গেল ও।

বলতে গেলে ওদের ছাড়াছাড়ির সেইটেই সূত্রপাত। বেশ ক'দিন আর ভবানীর দেখা পাওয়া যায় নি। একদিন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে দুজনের দেখা হয়ে গেল। কলেজ যাচ্ছিল ভাস্বতী। লেডিস্ সিটে বসেছিল ভবানী। ভাস্বতী আগেই লক্ষ্য করেছিল পিছন দিক থেকে লেডিস্ সিটে বসে আছেন যে পুরুষ-মানুষটি সেই মহাশয় ব্যক্তিটি আর কেউ, ও যাকে খুঁজছে সেই পলাতক আসামী।

এগিয়ে গিয়ে চটপট বসে পড়েছিল পাশে। আর চোখাচোখি হতেই ভবানীর মুখ ধরা পড়ে যাওয়া ফেরারী আসামীর মতই বিবর্ণ হল। ভাস্বতীর চোখে ধরা পড়ল তা। বলল, 'কলেজে যাচ্ছ না কেন?'

—'যাব না আর, তাই।'

ভাস্বতীর বুকের ভিতর থেকে থাবলা দিয়ে কে যেন অনেকখানি মাংস তুলে নিয়ে গেল। মনে হল এ ধরণের অদ্ভুত উত্তর পাওয়ার চেয়ে যদি ওর সঙ্গে আর দেখা না হত! সেই ছিল বরং ভালো। দিনের পর দিন ভবানীকে খুঁজতে খুঁজতেই কাটত।

ভাস্বতী আবার তাকালো ওর দিকে। দেখল, ভবানীদা যেন আর তেমনটি নেই। মুখ শুকনো, উদাস ভাব, চোখের নিচে কালি, স্বাস্থ্যটাও অনেকখানি ভেঙেছে। আবার বললে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

—'একটা চাকরীর খোঁজে।'

—'সত্যি?' যেন বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। মনটা আরো দমে গেল ভাস্বতীর। আর ভালো লাগছিল না ভবানীর সঙ্গে কথা বলতে। ইতিমধ্যে ওর নামবার সময়ও হয়ে এসেছিল। একটু আস্তে আস্তে আবার বলল, 'আমাকে নামতে হবে, বিকেলে ছুটির পরে পার্কে তোমার জন্য অপেক্ষা করব, এসো।'

—'বলতে পারছি নে, কখন ফিরব ঠিক নেই।' বলে ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে-ছিল ভবানী।

আর দেখা হয় নি ভবানীর সঙ্গে। মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করে ভবানীকে শেষ পর্যন্ত নিজের মন থেকে মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। সেই সব কষ্টের দিনগুলি আজ আবার মনে পড়ল। বুকের ভিতরটা সেই থেকে কাঁপছিল। ভবানীর সঙ্গে মেলামেশার স্মৃতি টুকরো টুকরো মনে পড়ল। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ল, [illegible] করে ভুলে গিয়েছিল ভবানীকে [illegible] সেই ভুলতে নিজের মনের সঙ্গে কী পরিমাণ লড়াই করতে হয়েছিল।

তারপর এক সময় ওর বিয়ে হয়ে গেল। যেমন আর পাঁচজনের বিয়ে হয়। সেই বিয়ের সময় দু' একবার হয়ত ভবানীর কথা ওর মনে পড়ে থাকবে। কিন্তু কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি ভবানীর স্মৃতি। কিন্তু আবার কেন? মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের এই ব্যর্থ প্রয়াসকে মনে মনে ধিক্‌কার না জানিয়ে পারল না ও। কেননা, ওর আজকের জীবনে যে কোন আলো-অন্ধকারে অমলেশই সব। আর কেউ নয়।

সত্যি, এমন অসহায় বোধ আর কখনো হয় নি। কি করবে ও এখন? অমলেশকে সব খুলে বলবে কি? সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি অমলেশ যখন বাসায় থাকবে তখন যদি আসে, অথবা একেবারে খালি বাড়িতে? উভয়ই বিপদ। কি করবে ও এখন? অন্ধকার নামল ওর দু' চোখে। অমলেশ, অমলেশ সব শুনলে, সব বুঝলে সহজে কি তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে? মনে মনে কথাগুলি আউড়ে পাশ ফিরল ও। আঁকড়ে ধরায় বালিশ, যেন কোনরকমে খাট থেকে পড়ে যেতে পারে এই ওর ভয়। মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করছে, কানের দু' পাশ গরম।

পর পর কটা দিন কেটে গেল, একদিন দু'দিন করে কয়েকটি দিন। মনের মধ্যে সেই এক ভয়। এক যন্ত্রণা। ভবানী, সেই ভবানী। একটা অশরীরীর মত ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। মন থেকে কিছুতেই সরিয়ে ফেলতে পারছে না। সে অবশ্য আসে নি। কিন্তু ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে, আসবে। যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। যে কোন মুহূর্তে এসে ওর এই সুখের সংসারটুকুতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যেতে পারে। এ ক'দিনের সব সময় এক বিপন্ন বোধে আক্রান্ত হয়ে রয়েছে।

সিঁড়িতে বাতাসের শব্দে আঁৎকে উঠেছে। মনে হয়েছে কে যেন আসছে পা টিপে টিপে। গা শির-শির করে উঠেছে। হঠাৎ কিসের শব্দে মনে হয়েছে, কেউ যেন বাইরে থেকে কড়া নাড়ল, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল কপালে, অবশ হয়ে গেল হাত-পা। দুপুরে টেলিফোনটা চীৎকার করলেই, সেই দুপুরের নির্দয় সময়টুকুর স্মৃতি উদিত হয় মনে। এই বুঝি ভবানী আবার কথা বলতে চায়। কিন্তু না, অমলেশ। ভবানী নয়। এ কদিনের মধ্যে জীবনের সবটুকু আনন্দ ওর নিঃশেষ হয়ে গেছে। ঘুম ত নেই-ই।

অমলেশের কাছে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। কালই জিজ্ঞেস করেছিল অমলেশ,—'কি হয়েছে তোমার বলত?'

—'কৈ, কিছু না ত?' বুক দুরু দুরু করে উঠেছিল। অমলেশের দিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়েও হাসতে পারে নি।

'—কদিন ধরে মনে হচ্ছে তুমি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছ?'

—'ও তোমার এক বাতিক।' উত্তর দিয়েছিল ও। উত্তর ত নয়, নিজেকে সামলিয়ে নেওয়া। হারিয়ে যেতে যেতে নিজেকে খুঁজে পাওয়া। স্বচ্ছ নির্দোষ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দেওয়া।

অমলেশ অবশ্য আর কথা বাড়ায় নি। একটু হেসেছিল মাত্র। কিন্তু ওর মনে হয়েছিল, ও যেন ধরা পড়ে গেছে। সর্বনাশ হতে আর বেশী বাকি নেই।

আরো ক'টা দিন কেটে গেল। নির্বিঘ্নে, নিরাপদে। তবু মনে হল, ওর নিজেরই মনে হল, ও যেন আরো শুকিয়ে গেছে, বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। হাত পায়ের শক্তি কম। রাত্রেও ঠিকমত ঘুমাতে পারে না।

অবশেষে সত্যি সত্যি একদিন দুপুরে বাইরে থেকে কড়া নড়ে উঠল। যেন ভয়ঙ্কর এক অমানুষিক চীৎকার। বিছানায় শুয়ে শুয়েই তা শুনল। একবার। দুবার। তৃতীয় বারে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো তবু খুলল না। আবার সেই চীৎকার। মনে মনে নিঃশব্দে নিজেও চীৎকার করে উঠল, অমলেশ, অমলেশ তুমি নেই এখন আমার কাছে, থাকলে দেখতে পেতে আমি কি দারুণ বিপদে পড়েছি, কি অসহায় আমি। অমলেশ তুমি কোথায়? ইচ্ছে হল, দরজাটা না খুলে এদিক থেকে বলে দেয়, ভবানী তুমি ফিরে যাও, তোমাকে আমি চিনি না, আমার সঙ্গে তোমার কোন দরকার থাকতে পারে না, বড় শান্তিতে ছিলেম, বড় শান্তি পেয়েছি অমলেশের কাছে।

অবশেষে দরজাটা খুলতে হল। আশ্চর্য, ভবানী ত নয়। কোন একটা আপিসের পিয়ন। বললে, 'ভাস্বতী দেবী আছেন?'

—'হ্যাঁ, আমিই।' দু চোখের অন্ধকার অনেকখানি কেটে গেছে এতক্ষণে। নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিল মনে মনে। পিয়নটা একটা চিঠি ওর হাতে দিয়ে চলে গেল। খামের উপরে ওর নাম ঠিকানা লেখা। ভিতরে এসে পড়তে লাগল চিঠিটা। সংক্ষিপ্ত চিঠি।

...দুপুরের দিকে তোমার স্বামী বাড়ি নেই জেনেই লোক পাঠালাম, মনে আমার কোন পাপ নেই, তাই ভয়েরও কিছু নেই, তবু পুরুষের মন ত, আমারই মত দুর্বল, চাকরীতে পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ভারতবর্ষের বাইরে চলে যেতে হচ্ছে। জানি না কবে আবার দেশে ফিরে আসতে পারব, হয়ত বা আর ফিরবই না। শেষ পর্যন্ত এম-এস-সিটা ভালোভাবেই পাশ করতে পেরেছিলাম, সেদিন বাসে তোমার কালো মুখের যে ধিক্কার আমার প্রতি বিচ্ছুরিত হয়েছিল, তাই আমার শিক্ষার অগ্রগতির পথে প্রধান পাথেয় হয়েছিল। তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার পরেও কয়েকটা বছর কেটে গেল, তবু আমার আজো মনে হচ্ছে সমস্ত সাফল্যের মধ্যে একটা যেন কি অসাফল্য ঘটে গেছে, যার দাগ কোনদিন মন থেকে মুছবে না। আসতে পারলাম না অনেক কাজের তাড়ায়। আজ রাত্রেই রওয়ানা হতে হবে। আরো একটি কথা বলবার আছে, বিয়েটা এখনো করতে পারিনি, একটা কিছু ভাবতে গেলেই বিবেকের দংশনে আমি শিউরে উঠি, তোমার ঠিকানাটা নিয়ে গেলাম। দেশে বা দেশের বাইরে যদি কখনো বিয়ে করি তখন তোমাকে চিঠি দিয়ে জানাবো। সেই সঙ্গে আমার ঠিকানা। তোমার শুভেচ্ছা যেন সেই সময় আমায় সুখী করতে পারে। আমাকে ক্ষমা করো।

—ইতি তোমার ভবানীদা

দু' চোখে কখন জলের ধারা নেমে এসেছিল এতক্ষণ তা টের পায়নি ভাস্বতী।

সংবাদ সাহিত্য

সংবাদ সাহিত্য কথাটি বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক সংযোজন। সংবাদকে সাহিত্যের স্তরে পৌঁছানোর কাজে যাঁরা ব্রতী তাঁদের সংবাদ সাহিত্যিক বলা হচ্ছে ইদানীং। প্রকৃতপক্ষে বিদেশী 'Columnist' কথাটিকেই আমরা আজকাল সংবাদ সাহিত্যিক বলছি, আগে বলা হত স্তম্ভ-লেখক। রবীন্দ্রনাথ 'স্তম্ভ' কথাটি পছন্দ করতেন না, তিনি 'সম্পাদকীয় স্তম্ভ' নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। তাই স্তম্ভ লেখকের চাইতে 'সংবাদ সাহিত্যিক' কথাটি অনেক দিক থেকে পরিচ্ছন্ন।

সেই পরিচিত প্রশ্ন এবং উত্তর এই প্রসঙ্গে মনে আসে—সংবাদ কাকে বলে? মানুষকে কুকুর কামড়ালে তাকে সংবাদ বলা হয় না, বলা যায় না, কারণ তা হামেশাই ঘটে থাকে। মানুষ যদি কুকুরকে কামড়ায় লর্ড নর্থক্লিফ নামক সংবাদপত্র সম্রাটের মতে তাই সংবাদ। আবার যদি সেই মানুষের পিছনের ইতিহাসকে সরস করে পরিবেশন করা যায়, তার নাম স্টোরী, আর কুকুর এবং মানুষের পারস্পরিক যোগসূত্র, বিরোধের হেতু প্রভৃতি যদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা যায় তার নাম হয় সংবাদ সাহিত্য।

আমাদের দেশে স্তম্ভলেখকদের আবির্ভাব হয়েছে অনেক দিন আগে। 'বঙ্গবাণী'তে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পঞ্চানন্দ' এই নামে একটি স্তম্ভ নিয়মিত লিখতেন। সমসাময়িক সংবাদ এবং সমস্যাকে সরস করে শেষে সুনিপুণ ব্যঙ্গের মাধ্যমে পরিবেশন করতেন। ইন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৯১১ খৃস্টাব্দে। প্রায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সরস ভঙ্গীতে লেখনী চালনা করেছেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে লঘুভাবে পরিবেশন করে সাধারণের বোধগম্য করেছেন।

ইন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন 'নায়ক' পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যেমন জ্ঞান ছিল তেমনই অধিকার ছিল শাস্ত্র এবং পুরাণে। পাঁচকড়ির অসংখ্য রচনা সংবাদ সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। সেই কালে পত্র-পত্রিকার বহুল প্রচার না থাকলেও, পাঁচকড়ি এবং তাঁর রচনার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। পাঁচকড়ি লঘু এবং গুরু দুই রকম প্রবন্ধই লিখেছেন। তবে লঘু সংবাদ সাহিত্যের জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

পাঁচকড়ির প্রায় সমসাময়িক যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইদানীং তিনি প্রায়-বিস্মৃত। কিন্তু একদা 'হিতবাদী'র পৃষ্ঠায় তার সাপ্তাহিক 'বুধের বচন' পাঠ করার জন্য অসংখ্য পাঠক উদ্গ্রীব হয়ে থাকত। যোগেন্দ্রনাথের রচনারীতি ইন্দ্রনাথের মত হলেও তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে অতি চমৎকার ভঙ্গীতে এবং একটি বিশিষ্ট আঙ্গিকে পরিবেশন করতেন। ইতিমধ্যে যুগ পরিবর্তন ঘটে গেল। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে বাংলার রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ঘটল। রবীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আন্দামান থেকে ফিরে আসার পর প্রথমে দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' নামক মাসিক পত্রিকা ও পরে 'আত্মশক্তি' ও 'বিজলী' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হল। 'আত্মশক্তি'র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন স্বভাবসিদ্ধ সাংবাদিক ছিলেন। ইংরাজী এবং বাংলা উভয় ভাষায় তাঁর অসাধারণ লিপিদক্ষতা ছিল আর সবচেয়ে বেশী ছিল তাঁর রসিকতার অফুরন্ত উৎস। তিনি 'আত্মশক্তি'তে 'ঊনপঞ্চাশী' নামক যে নিয়মিত কলম লিখতেন বাংলা সংবাদ সাহিত্যে তা অবিস্মরণীয় সম্পদ। সমসাময়িক রাজনৈতিক তরঙ্গকে এমন মধুর অথচ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে তিনি কশাঘাত করতেন যা তখন পর্যন্ত দুর্লভ ছিল।

প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের 'বীরবলের পত্র' এই কালের ফসল। 'বীরবলের পত্রাবলী' সম্ভবতঃ এখনও একত্রে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় নি। সেই সব রচনা ১৯১৯ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে লিখিত, সমকালীন রাজনীতির ওপর লিখিত মন্তব্য। বলাবাহুল্য 'বীরবলে'র রসিকতা ছিল মার্জিত এবং তাঁর আঘাত ছিল সূক্ষ্ম।

এই সময় 'বিজলী'তে প্রকাশিত হত 'কমলাকান্তে'র পত্র। এই নব কমলাকান্তের নাম চারুচন্দ্র রায়, তিনি সেইকালে বোধহয় চন্দননগরে মেয়রও হয়েছিলেন। 'নব কমলাকান্ত' মহাপণ্ডিত চারুচন্দ্র রায় বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ, যদিও আজ তা বিস্মৃত।

আর একজন 'কমলাকান্ত' ছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (পন্ডিচেরী)। তিনি কবি ছিলেন। তাঁর কবিতা বিশের দশকে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, কিন্তু তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে যে বৈদগ্ধ এবং সরসতার পরিচয় আছে তা আজও অনুকরণীয়।

এই কালেই অভ্যুদয় ঘটেছিল আনন্দবাজারের সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের। সত্যেন্দ্রনাথ যেমন গুরু প্রবন্ধ অনায়াসে রচনা করতে পারতেন, তেমনই অনায়াসে তীক্ষ্ণ শ্লেষপূর্ণ 'রঙ-বেরঙ' রচনায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। নন্দী-ভৃঙ্গী এই ছদ্মনামে তিনি অনেক গুপ্ত তথ্যও ফাঁস করতেন। অনেক সময় নাটকাকারেও তিনি 'রঙ-বেরঙ' লিখতেন। সত্যেন্দ্রনাথও আজ বিস্মৃত। যুগান্তর পত্রিকা প্রতিষ্ঠার পর বিনয় মুখোপাধ্যায় (যাযাবর) পথচারী নামে দীর্ঘ দিন একটি নিয়মিত স্তম্ভ লিখতেন। তাঁর রচনারীতিতে নিজস্বতা ছিল।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে গেল। সমাজব্যবস্থায় দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেল। অর্থনীতি ও সমাজনীতির চাপে বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা ভেঙে-চুরে ছারখার হয়ে গেল। নতুন ধরনের এই সমাজব্যবস্থায় লিখনভঙ্গীও পরিবর্তিত হল। এইকালে পরিমল গোস্বামী (এককলমী) ও শিবরাম চক্রবর্তী 'বাঁকা চোখে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দীর্ঘদিন লিখে আসছেন। এখনও এঁদের লেখনী ক্লান্তিহীন।

প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের 'কমলাকান্তের আসর' নামক নিয়মিত ফিচারটি বিশেষ জনপ্রিয়। তিনি গদ্যে ও পদ্যে সমসাময়িক চিন্তার ওপর কশাঘাত করেন।

এই কালেই আবির্ভাব ঘটেছে সৈয়দ মুজতবা আলীর। তাঁর 'পঞ্চতন্ত্র' ঠিক সামাজিক বা রাজনৈতিক শ্লেষাত্মক মন্তব্য নয়। মুজতবা আলীর রচনায় আছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির অফুরন্ত প্রবাহ।

'যুগান্তর' পত্রিকায় 'ভ্রাম্যমান' 'মল্লিনাথ', ও 'নাগরিক' প্রভৃতি ছদ্মনামে বিভিন্ন লেখকবৃন্দ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন।

সম্প্রতি ২৫শে বৈশাখ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সম্বর্ধনা সভায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে সহযোগী 'সাপ্তাহিক বসুমতী' সম্মানিত করলেন 'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগে তাঁর স্মরণীয় অবদানের জন্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় [illegible] ত্যে একটি বিশিষ্ট পথচিহ্ন। স্ব[illegible] শিল্পে সমুজ্জ্বল এই নাম বাংলার উপন্যাসে এবং ছোটগল্পে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর রচনার গুণাগুণ বিশ্লেষণের প্রয়োজন আজ আর নেই, তিনি সাহিত্যিক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের তিনি অন্যতম নায়ক।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল 'সংবাদ সাহিত্যে'র জনপ্রিয় লেখক হিসাবে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সুনিপুণ ব্যঙ্গের সঙ্গে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণ করে একটা নতুন রীতির প্রবর্তন করেছেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক। সহানুভূতি ও সমবেদনায় তিনি আকুল অথচ দৃঢ়তার কোন অভাব নেই তাঁর রচনায়। স্বয়ং কুশলী গল্পলেখক হওয়ায় তাঁর আঙ্গিকও সহজবোধ্য। সংবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদানের জন্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই সম্মাননায় আমরা আনন্দিত।

—অভয়ঙ্কর

ভারতীয় সাহিত্য

অনুষ্ঠানে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীরমেশ মজুমদার এবং শ্রীঅশোককুমার সরকার

সাহিত্য বাসর ১৩৭৫ ॥

নববর্ষ উপলক্ষে সাহিত্যসেবী, সাংবাদিক ও সাহিত্যানুরাগীদের উপস্থিতিতে অন্যান্য বছরের মতো এবারও এক সাহিত্য-বাসরে ১৩৭৫ (ইংরেজী ১৯৬৮) সালের সাহিত্য পুরস্কার বিতরণ করা হয় ইনফরমেশন সেন্টারে। ডঃ রমেশ মজুমদার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন।

পত্রিকা-যুগান্তরের বিবিধ পুরস্কার

১৯৬৮ সালের অমৃতবাজার ও যুগান্তর কর্তৃক শিশিরকুমার পুরস্কার দেওয়া হয় স্বর্গীয় সুধীরচন্দ্র সরকারকে। জীবিত অবস্থায় তিনি কখনই পুরস্কার নিতে সম্মত হন নি। তাই আজ তাঁর অবর্তমানে এই মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া হয়।

অমৃতবাজার ও যুগান্তর পত্রিকার অপর পুরস্কার—'মতিলাল পুরস্কার' লাভ করেন শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবী।

'মৌচাক'

মৌচাক পত্রিকার সুধীরচন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্টোরথ পত্রিকার পুরস্কার পান শ্রীসুনীল চন্দ্র সরকার।

আনন্দবাজার গোষ্ঠী

আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার প্রফুল্ল সরকার ও সুরেশচন্দ্র পুরস্কার পান যথাক্রমে সর্বশ্রী গোপাল ভট্টাচার্য ও সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সকলেই উপস্থিত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন। স্বর্গীয় সুধীরচন্দ্র সরকারের পৌত্র মরণোত্তর পুরস্কার গ্রহণ করেন।

পুরস্কার গ্রহণের পর শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবী ও সর্বশ্রী সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুনীলচন্দ্র সরকার ও প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সকলকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, প্রতি বছর এই পুরস্কার দেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের সৃজনশীল রচনাকে উৎসাহিত করা। যাতে তাঁরা এর দ্বারা আরও বেশী ও সার্থক সৃষ্টি করতে পারেন—এই হচ্ছে পুরস্কারের উদ্দেশ্য।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, ডঃ সুশীলকুমার দে, রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির আত্মার প্রতি সম্মান জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

সভাপতির ভাষণে ডঃ রমেশ মজুমদার বলেন, সাহিত্য রস সৃষ্টির জন্য রচিত হলেও সাহিত্যের মারফৎ দেশের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা দরকার। সাহিত্যকে বস্তু-নির্ভর হতে হবে। হাওয়াতে সাহিত্য হতে পারে না।

তিনি সরকারী পুরস্কার সম্পর্কে বলেন, সাহিত্যিকদের পুরস্কৃত করার পিছনে সরকারের উদ্দেশ্য থাকতে পারে এবং উৎকর্ষের ন্যায়বিচার নাও হতে পারে। তিনি এ ধরনের বে-সরকারী পুরস্কারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি সরকারী উপাধি ও স্বীকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, "সরকার যে পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ উপাধি দেন তার যে কি অর্থ তা আমি বুঝতেই পারি না।"

সভায় সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী গীতা সেন ও শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়। শ্রীঅশোক সরকার ধন্যবাদ জানান।

গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-তর্পণ ॥

বিবেকানন্দ মিশনের উদ্যোগে গত ২৮ এপ্রিল মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ১২৫তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য। শ্রীহরিপদ দাস, শ্রীপ্রভাতকুমার ঘোষ, শ্রীমতী সুনীতি দাস প্রমুখ আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশন করেন। অধ্যাপক সমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভবানী দে গিরিশচন্দ্রের নাট্য প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

নজরুল সম্বর্ধনার উদ্যোগ ॥

বিদ্রোহী কবি নজরুলকে এবার নাগরিক সম্বর্ধনা দেবার ব্যবস্থা করেছেন কলকাতা পৌরসভা। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পৌর সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। তবে এবারের এই সম্বর্ধনা দেবার সিদ্ধান্তটি নানাদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। আমরা পৌর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

শিশু-সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ॥

ভারত সরকার পরিচালিত ১৯৬৭ সালের শিশু-সাহিত্য প্রতিযোগিতায় সারা ভারতে ছোটদের জন্য লেখা বিভিন্ন ভাষার

১৫টি বই রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় বাংলা ভাষায় শিশুদের জন্য লেখা বই "মিতুল নামে পুতুলটি" শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে। এই পুরস্কারের মূল্য এক হাজার টাকা। ছোটদের নাটক ও সাহিত্য রচনায় শ্রীঘোষ ইতিমধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। ইতিপূর্বে তাঁর শিশু-নাটক "অরুণ-বরুণ-কিরণমালা" ভারত সরকারের সংগীত নাটক আকাদেমির পুরস্কার লাভ করে।

পরলোকে পারভেজ শাহেদী ॥

পারভেজ শাহেদী আর আমাদের মধ্যে নেই। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি সম্প্রতি পরলোকগমন করেন। পাটনার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে শ্রীশাহেদী জন্মগ্রহণ করেন। প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। উর্দু কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অন্যতম। তাঁর বহু কবিতা ভারতীয় ও বিভিন্ন অভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৮ বৎসর।

পুরস্কৃত ঃ শ্রীমহাশ্বেতা দেবী এবং শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কলকাতায় পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনী ॥

কবি বা লেখকদের রচনার পাণ্ডুলিপির আবেদন সাধারণ মানুষের কাছে অপারসীম।

গত ২৫ বৈশাখ সন্ধ্যায় 'বিড়লা আকাদমি অব আর্ট এন্ড কালচার' ভবনে এই রকম একটি পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিও অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্যকে অনেকখানি বৃদ্ধি করেছে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী অকুণ্ঠানন্দজী।

অনুষ্ঠানটি আরও ভাল লাগল এই কারণে যে, উদ্যোক্তারা উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র ভারতবর্ষকে তাঁরা তুলে ধরতে চেয়েছেন। বাংলা, পাঞ্জাবী, মারাঠি, তেলুগু, মালয়ালম, সংস্কৃত প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনার পাণ্ডুলিপি এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা এবং বেশ কয়েকটি চিঠির পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও মাইকেল মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্র দেব প্রমুখ প্রখ্যাত লেখকদের রচনা ও চিঠির পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীতে আছে। আগামী ২৭ মে পর্যন্ত এই প্রদর্শনী সাধারণের জন্য খোলা থাকবে।

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য এবং শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

বি দে শী সা হি ত্য

পরলোকে হার্ভে ব্রেট ॥

সম্প্রতি মার্কিনী ঔপন্যাসিক, চিত্র-নাট্যকার ও কবি হার্ভে ব্রেট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আটান্ন বছর। তিনি এলিয়ট, ফ্রস্ট, মম, হেমিংওয়ে, ফকনার, স্যান্ডবার্গ প্রমুখ অনেকের গ্রন্থ-সমালোচনা লিখে বিদগ্ধমহলে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু একান্তভাবেই আকস্মিক।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শহর ॥

অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শহর ও বন্দরগুলির জন্ম-ইতিহাস বেশ বৈচিত্রপূর্ণ। বিশেষত ঘন অরণ্যাবেষ্টিত দ্বীপময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছোট-বড় শহর ও আন্তর্জাতিক বন্দরগুলি দেশী-বিদেশী নানাশ্রেণীর মানুষের বিহারভূমি। সম্প্রতি প্রকাশিত টি জি ম্যাকগি রচিত 'দি সাউথ-ইস্ট এশিয়ান সিটি' নামক একটি গ্রন্থে—রেঙ্গুন, ব্যাঙকক, সিঙ্গাপুর, সায়গন, জাকার্তা ও ম্যানিলা—এই সাতটি নগর ও বন্দরের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তবে লেখক এইসব শহরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশের গ্রামীণ ও উপ-নগরীয় জীবনযাত্রাও যে বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে—সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন।

কোরিয়ান মুদ্রণলিপির নমুনা ॥

ক[illegible] শতাব্দী থেকে শুরু করে ১[illegible] পর্যন্ত কোরিয়ান ভাষায় মুদ্রিত[illegible] প্রকার টাইপের নমুনা সম্পর্কে 'স্পেসিমেন পেজেস অব কোরিয়ান মুভেবল টাইপস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন লস এঞ্জেলসের পুস্তক ব্যবসায়ী দ্য সন্স বুকশপ।

এই গ্রন্থে ৭৫০ সালে মুদ্রিত একটি মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ৭৭০ সালে জাপানীরা মুদ্রণ-শিল্পে যে বিস্ময়ের সূত্রপাত করেছিল—এই আবিষ্কারের ফলে সেই রেকর্ড ম্লান হয়ে গেল। ১২৩৭ সাল থেকে ১২৫১ সালের মধ্যে খোদাই করা ৪৬২৯টি ব্লক আবিষ্কারের ফলে এই বিস্ময়টি মুদ্রণশিল্পের জগতে চমক সৃষ্টি করেছে। এই ব্লকগুলি 'ত্রিপিটক' গ্রন্থের কোরিয়ান সংস্করণ ছাপার জন্য তৈরী করা হয়েছিল। মুদ্রণশিল্পে ধাতু ব্যবহারের প্রথম নিপুণ নিদর্শন হিসেবেও এগুলি উল্লেখযোগ্য। ব্লকগুলির উভয় দিক খোদাই করা। অবশ্য চীনদেশে প্রথম প্রথম মাটির ছাঁচে সচল টাইপ নির্মিত হয়েছিল এবং এই ছাঁচ থেকে ঢালাই করে তারাই প্রথম ধাতুনির্মিত টাইপ প্রস্তুত করেন। কোরিয়ানরা তাকে আরো মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন করে তোলে।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় ম্যাকগভার্ন কোরিয়ান মুদ্রণশিল্পের বিকাশ (পৃ ১১—১৮), কোরিয়ান লিপির কালানুক্রমিক পরিচয়, কোরিয়ান ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক ও রচনার তালিকা দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে চীনা মুদ্রণকার্যে ব্লকের ব্যবহার, চীনাদের দ্বারা তৈরী একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পোড়ামাটির সচল টাইপ ও ত্রয়োদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কোরিয়ানদের দ্বারা নির্মিত নানাপ্রকার টাইপের ঐতিহাসিক পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে।

আট শতাব্দীর পুরোনো পুঁথি ॥

আজারবাইজান বিজ্ঞান আকাদেমীর পাণ্ডুলিপি বিভাগ সম্প্রতি একটি আটশ বছরের পুরোনো পুঁথি উপহার হিসেবে পেয়েছেন। পুঁথিটির প্রাক্তন মালিক গুসেইন গাইবভ বলেন, "এতে আবিসেনার বিখ্যাত উপদেশাবলী রয়েছে। আমি আমার বাবার কাছ থেকে বইটি পেয়েছি। তিনি পেয়েছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। এইভাবে বইটি আমাদের পূর্বপুরুষদের হাত থেকে আমার হাতে এসেছে। আমাদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে বইটি রক্ষিত ছিল।"

পাণ্ডুলিপি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ও প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ এফ মাইদভ বইটি সম্পর্কে বলেছেন, "এই বিরল পুঁথিটি আরও বেশী মূল্যবান এই কারণে যে এ যাবৎ পরিচিত আবু আলি ইবন-সিনার (আবিসেন্নার) পাণ্ডুলিপির মধ্যে এটিই সব থেকে প্রাচীন।" এর অর্থ আসল পুঁথিটির যতগুলি অনুলিপি হয়েছে, এটিই তাঁর সব থেকে কাছাকাছি সময়ের। এতে লিপিকার খুব কমই ভুল করেছেন। বিখ্যাত প্রাচ্যপণ্ডিত আবিসেন্নার মৃত্যুর সত্তর বছর পর বাগদাদে এগারোশ চৌদ্দ সনে এই পুঁথিটির অনুলিপি তৈরী হয়েছে।

শিল্পে প্রাচ্যপ্রতীচ্য ॥

পূর্ব-পশ্চিমের শিল্পকলায় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে থিয়োডোর বোই 'ইস্ট-ওয়েস্ট ইন আর্ট : প্যাটার্নস অব কালচারেল রিলেশনশিপ' নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। এই গ্রন্থে মোট নয়টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে—(১) স্টাইল—ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট (২) কনফ্লুয়েন্‌শন অ্যান্ড ফার-ইস্টার্ন আর্টিস্টিসপেসনস (৩) কালচারেল ডিফিসন ফ্রম অ্যান-ইয়াং টু দানিউব (৪) দি আর্ট অব সিল্ক রুট (৫) ইরান বিটুইন ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট (৬) কালচারেল অ্যান্ড আর্টিস্টিক ইন্টারচেঞ্জেস ইন মডার্ন টাইমস (৭) এ বিব্লিওগ্রাফি অব ডিসকভারি (৮) ফরেইনার—বারবারিয়ান—মনস্টার (৯) ইকোনোগ্রাফি অব দি ইউনিভার্সেল হিরো।

এই গ্রন্থ রচনায় তাঁকে সাহায্য করেছেন জে লেবয় ডেভিডসন, জেন গেস্টন মেলার, রিচার্ড বি রিড, ডরোথি জি শেফার্ড, ডেনিস সিনার। এবং ভূমিকা লিখেছেন রুডলফ উইটকাওয়ার।

উইটকাওয়ার তাঁর ভূমিকায় বর্তমান জগতের সাংস্কৃতিক সংকটের কিছু কিছু জটিল সমস্যা তুলে ধরেছেন।

সফল নাটকের সালতামামি ॥

পশ্চিম জার্মানীর থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন ১৯৬৬-৬৭ সালে জার্মানভাষী ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও প্রকাশিত নাটকের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন। সর্বসাকুল্যে এই বছরে ২৯৮টি নাটকের মধ্যে জার্মান রঙ্গমঞ্চে ৩০ জন নতুন নাট্যকারের অনুপ্রবেশ ঘটল। এঁদের মধ্যে সব চাইতে সফল নাট্যকার হলেন ব্যারিলেট ও গ্রেডি। তাঁদের যুগ্মরচনা 'দি ক্যাকটাস ব্লজম' নামে একটি নাটক ১৫টি রঙ্গমঞ্চে ৭৩২ রজনী অভিনীত হয়।

চ্যাং সুয়ে-চেং এর জীবন ও চিন্তা ॥

চ্যাং সুয়ে-চেং ছিলেন একজন অতি-স্বভাবী প্রকৃতির মানুষ। সম্প্রতি ডেভিস এস নিভিসন-এর লেখা 'দি লাইফ অ্যান্ড থট অব চাং সুয়ে-চেং' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে। সমকালীন ও পরবর্তীকালের বহু রচনায় তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। চিং-এর সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

মিঃ নিভিসন পুরোনো গ্রন্থ ও তথ্যের ওপর কিছুটা নির্ভর করলেও ছকেবাঁধা পথে তিনি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর জীবন ও চিন্তাকে বিশ্লেষণ করেছেন। এগিয়ে যান নি। মিঃ নিভিসন চ্যাং সুয়ে-চেং-এর চিন্তাধারার বিকাশ, ভাবজীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা, পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান এবং সর্বোপরি তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব, অনুকম্পাবোধ প্রভৃতির কথাও বলেছেন। এমন কি তাঁর সঙ্গে সমকালীন কয়েকজন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বিবাদ-বিসংবাদের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে।

নতুন বই

The Judge: Tarasankar Banerjee: (Translated by Sudhansu Mohan Banerjee. Published by Orient Paper Backs (P) Ltd. — Price Rs. 2/- only.

প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিচারক' বাংলা সাহিত্যের একখানি জনপ্রিয় উপন্যাস। এই উপন্যাসটির মধ্যে জনৈক বিচারকের মানসিক প্রতিক্রিয়ার এক মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতের কাহিনী আছে। বিচারাসনে সমাসীন বিচারক বিবেকদংশনে জর্জরিত। তারাশঙ্করের এই কাহিনীটির ইংরাজী অনুবাদ করেছেন সুসাহিত্যিক শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অতিশয় নিপুণতার সঙ্গে মূল কাহিনীটির রস এবং অন্তর্নিহিত সুর অক্ষুন্ন রেখে গ্রন্থটি অনুবাদ করে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা উপন্যাসের যত অনুবাদ হয় ততই মঙ্গল, সেই কারণে আমরা অনুবাদককে অভিনন্দিত করি।

বসোরার উজিরেরা: **শ্রীঅরবিন্দ। অনুবাদ — শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক — শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির। কলিকাতা-১২। মূল্য — চার টাকা।**

বৃটিশ যুগে আলিপুর বোমার মামলার সময় শ্রীঅরবিন্দের বাসগৃহ সার্চ করে তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই সব কাগজপত্রের মধ্যে তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও কিছু কিছু ছিল। শ্রীঅরবিন্দের 'কারাকাহিনী'তে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে পুরাতন নথিপত্র যখন ভস্মীভূত করা হয় সেই সময় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী যতীন্দ্রনাথ ঘোষ দাস্তিদার শ্রীঅরবিন্দের পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষণ করেন। ১৯৫১ খৃস্টাব্দে কালিদাস নাগ ও নীহারেন্দু দত্তমজুমদার মহাশয়ের চেষ্টায় ঐ সব পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ উদ্ধার করা হয়। 'বসোরার উজীরেরা' নামক নাটকটির সম্পূর্ণ অংশ এইভাবে পাওয়া যায়। এই নাটকটিকে কাব্য নাটক বলা যায়। আরব্য উপন্যাসের বিচিত্র আবহাওয়ায় নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছে। বিশেষত শ্রীঅরবিন্দের প্রথম জীবনের এই রচনায় তাঁর সাহিত্য কর্মের আর একটি দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে। ইংরাজী নাটিকাটি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। কাহিনী কাল হারুণ-অল রসিদের। ঘটনাস্থল—বসোরা ও বাগদাদ। আনিস আলজালিস নামক একটি বাঁদী এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের কেন্দ্রবিন্দু। অনুবাদকের ভূমিকাটি জ্ঞানগর্ভ এবং মূল নাটকের অনুবাদও বিশেষ প্রাঞ্জল হয়েছে। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত এবং প্রচ্ছদপটটি মনোজ্ঞ।

কম্পন: [নাটক] — **অনিল দে।। প্রাপ্তিস্থান: ৪৭ গোবিন্দ ব্যানার্জী লেন, কলকাতা-৩৩ ও অন্যত্র।। তিন টাকা।**

জাতীয়তাবাদ যখন আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে ওঠে, তখন তা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে সংকটস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ এই শতকের প্রথমার্ধে বিষয়টি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। গত মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে ফ্যাসিবাদী জাতীয়তার অভ্যুত্থান ছিল সমগ্র মানবসমাজের কাছে একটি জাগ্রত বিভীষিকা। 'কম্পন' নাটকের মূলে রয়েছে সেই ফ্যাসিবাদী স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী চেক জনগণের সফল সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯৬৫ সালের ২৩শে আগস্ট এই নাটকটি মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে অভিনীত হয়। তখন অমৃতের নাট্য-সমালোচক একে 'মানুষের মূল্যবোধের নাটক' বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। 'যুগান্তর' আরও বিস্তৃতভাবে লিখেছিলেন, "মানবতার কণ্ঠকে কিছুতেই রোধ করা যায় না, স্বাধীনতাবোধকে যে ধ্বংস করা যায় না—নাটকটি দেখতে বসে সবসময় একথা মনে হয়েছে।"

বিদেশের পটভূমিতে লেখা হলেও নাটকটি বাঙালি দর্শকদের কাছে ভালো লাগবে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিযুগের ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা বইটি পড়ে কিংবা তার নাট্যাভিনয় দেখে মুগ্ধ হবেন।

পত্র-পত্রিকা

প্রমথ চৌধুরী—জন্মশতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি —অশোক কুণ্ডু। ভারতী বুক স্টল। কলকাতা-৯। দাম ১-৫০ টাকা।

প্রমথ চৌধুরী শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এই পুস্তিকায় প্রমথ চৌধুরীর জীবন, গ্রন্থাবলী, সাহিত্যকৃতি, সবুজপত্র, প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ, বাংলা চলিত গদ্যরীতির বিবর্তনে প্রমথ চৌধুরীর অবদান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর সম্বন্ধে আলোচনাগ্রন্থের একটি তালিকা আছে।

●

কবিকণ্ঠ—(মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪) — সম্পাদক: অসীমকৃষ্ণ দত্ত। ১০।১, ইব্রাহিমপুর রোড (ত্রিতল)। কলকাতা: ৩২। দাম: এক টাকা।

সর্বভারতীয় কবি-সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত কবিকণ্ঠের বর্তমান সংখ্যায় বীরেশ্বর বড়ুয়া, মহেশ পাটিয়ালবী, জিয়াউল আনজুম, কানা সুব্রহ্মণ্যম, বালামণি আম্মা, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, প্যারা সিংহ সহরাই, সদানন্দ রেগে, গোবিন্দ অগ্রবাল এবং আরো কয়েকজন।

●

পথের চিঠি — জনসংযোগ বিভাগ। ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড।। ৬২এ ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলকাতা-১৬।।

পথের নিয়মকানুন, পথচারীদের প্রতি পরামর্শদান, রাস্তা পারাপার, গাড়ীচালকদের প্রতি পরামর্শ, ট্রাফিক পুলিশের সিগন্যালের তাৎপর্য বর্ণনা করে এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। এই শহরের প্রতিটি নাগরিক এই পুস্তিকাটি পড়ে উপকৃত হবেন।

●

বিচিন্তা-ভারতী (মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪) — সম্পাদক: নন্দদুলাল চক্রবর্তী। ৭১এ নেতাজী সুভাষ রোড (রুম নং ভি ২৭), কলকাতা-১। দাম এক টাকা।

প্রবন্ধ, বড় গল্প, ছোটগল্প, কবিতা, ভ্রমণ, নাটক, ফিচার, মেয়েদের বিভাগ প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ এই মাসিক পত্রিকায় লিখেছেন—নরেন্দ্র দেব, এইচ ভি, কামাথ, নিকুঞ্জবিহারী ভৌমিক, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, নন্দদুলাল চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু গৌতম, কালিদাস রায়, গোপাল ভৌমিক, রমানাথ মুখোপাধ্যায়, শিবাণী ঘোষাল এবং আরো কয়েকজন।

●

লোকশ্রুতি (২): (ত্রৈমাসিক লোক-সাহিত্য সংকলন) ।। ডঃ আশুতোষ [illegible] সম্পাদিত। প্রকাশক—পশ্চিম[illegible] সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ। ৩২[illegible]রাম চ্যাটার্জি রোড, কলিকাতা—৩৪। দাম—একটাকা মাত্র।

"লোকশ্রুতি"র এই খণ্ডটিতে পুরুলিয়ার কুলাইপাল অঞ্চলের বিবাহ-গীত সংগ্রহ করে সেই বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভা গোস্বামী, অরূপ ভট্টাচার্য, ইরা রায় প্রভৃতি। সম্পাদক কর্তৃক লিখিত বিবাহে মেয়েলী গীত প্রবন্ধটি মূল্যবান। তিনি সাঁওতাল বিবাহের গানও অনুবাদ করে এই সংখ্যায় সংকলন করেছেন। পুরুলিয়ার একটি গণ্ডগ্রাম কুলাইপাল। সেইখানে শিবির সংস্থাপনা করে এই মূল্যবান সম্পদ আহরণ করা হয়েছে। লোক-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকের কাছে এই খণ্ডটি মূল্যবান সম্পদ বলা যায়।

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]

না, তার চেয়ে বড় ভয় কিছু আমার নেই। পিজারোর প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গটুকু গ্রাহ্য না করে দৃঢ়স্বরে বলেছেন আতাহুয়ালপা—যেমন বড় সৌভাগ্য কিছু নেই তাঁকে প্রসন্ন করার চেয়ে।

ভীরাকোচা প্রসন্ন হলে কি সৌভাগ্য আপনার হবে বলে আশা করেন?—পিজারোর মুখে আপনা থেকেই প্রশ্নটা যেন উঠে এসেছে।

আশা কেন করব, কি সৌভাগ্য আমার হবে আমি জানি। আগের মতই গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন আতাহুয়ালপা—সমস্ত অভিশাপের মেঘ কাটিয়ে উঠে আমার আরাধ্য সূর্যদেবের মতই আমি আবার দীপ্তিমান হয়ে উঠব।

কীর্তিমান হতে পারেন। —ব্যঙ্গ ভরে নয় কিছুটা আন্তরিকতার সঙ্গেই পিজারো এ শুভকামনা জানিয়েছেন মনে হয়েছে।

পরের দিন থেকেই আতাহুয়ালপার নির্দেশ মত পিজারোর হুকুম নিয়ে সমস্ত পেরু রাজ্যের দূরদূরান্তরে পাইক-পেয়াদারা ছুটে গেছে যেখানে যত সোনা সঞ্চিত আছে সব কাক্সামালকায় বয়ে নিয়ে আসবার জন্যে। দেখা গেছে এসপানি-ওলদের হাতে বন্দী হওয়া সত্ত্বেও কি আশ্চর্য আতাহুয়ালপার প্রতাপ প্রতিপত্তি! দুরদুর্গম পথে ভারে ভারে সোনা এসে পৌঁছেছে প্রতিদিন কাক্সামালকা শহরে। দেখতে দেখতে দরবার ঘর সত্যিই সোনায় ভরে উঠেছে।

সমস্ত এসপানিওল বাহিনীর মধ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে এই সোনার স্তূপ জমা হওয়ার উত্তেজনা।

কল্পনাতীত দুর্ভোগ, যন্ত্রণা আর বিপদ মৃত্যু সব কিছু তুচ্ছ করে তাদের এ দুঃসাহসী অভিযানের পরম সার্থকতা এবার তারা নিজেদের চোখে দেখতে পাচ্ছে, স্পর্শ করতে পারছে নিজেদের হাতে ওই সোনার স্তূপের মধ্যে।

তাঁর বাহিনীর আর সবাইকার মতই পিজারোর উল্লাসের আর সীমা নেই। এমন আশাতীত সৌভাগ্যের জন্যে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেবার জন্যে তিনি কাক্সামালকা শহরে নতুন এক গীর্জা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গীর্জার জন্যে নতুন আয়তন তাঁকে তৈরী করাতে হয় নি। অতিথি মহল্লার একটি জমকালো বাড়িই একটু আধটু অদলবদল করে তিনি গীর্জা বানিয়েছেন।

পিজারো একেবারে অকৃতজ্ঞ নয়। দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মানুষের কথা এবার তাঁর মনে হয়েছে।

গানাদোর অবশ্য নিজে থেকেই তাঁর কাছে আসবার কথা। এতবড় একটা বাহাদুরী দেখাবার পর কেন যে সে নিজের তারিফ শুনতে আর বখরা চাইতে আসে নি সেইটেই একটু আশ্চর্য লেগেছে পিজারোর।

আতাহুয়ালপার প্রতিজ্ঞা পূরণ হতে আর সামান্য কিছু বাকি। হয়ত কাজটা শেষ হবার পর আরো মোটা বকশিস দাবী করবার জোর পাবে বলেই গানাদো এখন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছে কিংবা নিজে হাত বাড়িয়ে পুরস্কার চাইতে তার সাহসে কুলোয় নি। গানাদোর এপর্যন্ত দেখা করতে না আসার কারণ এইরকমই ধরে নিয়েছেন পিজারো।

বকশিশ নেবার জন্যে অপেক্ষা করার ধৈর্য গানাদোর যদি থাকে ত থাক পিজারোর সে ধৈর্য নেই। গানাদো আতাহুয়ালপাকে জ্যোতিষের কি ভড়ং ভাঁওতায় এমন করে কাবু করেছে জানবার জন্যে তিনি ব্যাকুল। আতাহুয়ালপার পেটের কথা আরো কিছু যে বার করতে পেরেছে তাও তাঁর জানা দরকার।

পিজারো গানাদোকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তলব পাঠিয়েছেন। গানাদোকে ডেকে আনতে যে গেছল সেই সেপাই যা খবর এনেছে পিজারো তা বিশ্বাস করতেই পারেন নি।

গানাদো তার ডেরায় নেই। ডেরায় ত নয়ই কাক্সামালকার অতিথি মহল্লার সৈন্য-শিবিরের কোথাও নাকি তাকে খোঁজ করে পাওয়া যায় নি।

খোঁজ করতে গিয়ে অনেকেরই খেয়াল হয়েছে যে শুধু সেইদিনই নয় গত কয়েক-দিন ধরেই গানাদোর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা কেউ মনে করতে পারে না।

কোথায় গেল তাহলে গানাদো!

এসপানিওল একজন সৈনিক হিসেবে কাক্সামালকা থেকে একেবারে তার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ত আজগুবি ব্যাপার। সোনা নিয়ে সবাই তখন মেতে আছে, গানাদোও কেওকেটাদের একজন নয়, তবু তাকে নিয়েও কিছু জল্পনাকল্পনা সুরু হয়েছে।

তার অন্তর্ধানের পেছনেও ভীরাকোচার রহস্য কিছু আছে নাকি! কিন্তু তা থাকলেও মানুষটা এমন হাওয়া হয়ে যায় কি করে?

ভীরাকোচার হাতে যাদের লাঞ্ছনার কথা জানা গেছে তাদের ত সব সশরীরেই উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। একেবারে গায়েব ত কেউ হয়ে যায় নি গানাদোর মত।

অন্যেরা যত না হোক পিজারো আর তাঁর দুই বিশ্বস্ত সেনাপতি দে সটো আর

কাণ্ডিয়া চিন্তিত অস্থির হয়েছেন সবচেয়ে বেশী।

দে সটোকে নিয়ে পিজারো শেষ পর্যন্ত আতাহুয়ালপার কাছেই গেছেন এ রহস্যের হদিস পাবার আশায়।

আপনার কাছেই ত সে ইদানিং আসত যেত! পিজারো প্রায় অভিযোগের সুরে বলেছেন,—শেষ তাকে দেখেছেন কবে?

কবে? আতাহুয়ালপাকে যেন ভাবতে হয়েছে।

এই ত দিন তিনেক আগেই! ভেবে নিয়ে জানিয়েছেন আতাহুয়ালপা, হ্যাঁ, সেইদিনই আমাকে ভীরাকোচার কোপে পড়বার ভয় দেখায়।

ভীরাকোচার কোপে পড়বার ভয় দেখায়? আপনাকে!

পিজারোর সঙ্গে দে সটো আর কাণ্ডিয়ার মুখে একই বিস্মিত প্রশ্ন শোনা গেছে।

এ ভয় দেখাবার কারণ? গানাদোর অন্তর্ধান রহস্যের মীমাংসা আপাততঃ স্থগিত রেখে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে পিজারোকে।

ভয় দেখাবার কারণ প্রতিজ্ঞা রাখবার মেয়াদ আমার ফুরিয়ে আসছে বলে। আতাহুয়ালপা যেন অনিচ্ছার সঙ্গে জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কথা না রাখতে পারলে ভীরাকোচা ত আমায় ক্ষমা করবেন না। আপনাদের গানাদো তাই সেদিন আমার জমানো সোনা দূরদূরান্তর থেকে বয়ে আনবার জন্যে আরো বেশী লোকজন লাগাতে বলেছিল। তা না লাগালে আমারই শুধু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না, আমার লুকোনো সব পুঁজি হয়ত বেহাতই হয়ে যাবে।

বেহাত হবে কেন? সোনার পুঁজি থেকে বঞ্চিত হবার ভয়, গানাদোর অন্তর্ধান রহস্য সম্বন্ধে উদ্বেগ কৌতুহল ছাপিয়ে পিজারোর গলা রুক্ষ করে তুলেছে।

হবে-ই বলছি না, আতাহুয়ালপা মনে মনে নিশ্চয় পিজারোর এই অস্থিরতাটুকু উপভোগ করে বাইরে অবিচলিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে সম্রাটোচিত কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তাঁর জবাবে, তবে আমার নিজের টাকা বার হওয়া বন্ধ দেখে কেউ কেউ শয়তানির চেষ্টা করতে পারে বলে ভাবনা হচ্ছে। তাই উপরি লোক লাগিয়ে যেখানে যা আছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আনিয়ে ফেলা দরকার মনে করছি।

বেশ, উপরি লোকই আজ থেকে পাবেন। পিজারো আশ্বাস দিতে দেরী না করলেও আর একটা প্রশ্ন তুলেছেন কিন্তু আপনার লোকজনের অমন ঘটা করে জাঁক-জমকের সাজপোশাকে যাবার দরকার কি অত সাজগোজের মধ্যে আবার মুখে রং চং আর মুখোশের ছড়াছড়ি দেখলে ত' মনে, হয় কোন বিয়ের বরযাত্রীদের সঙ্গে তামাসা দেখাবার সব ভাঁড় চলেছে। ও সব হৈ-হুল্লোড় না করে আর সোনা আনতে যাওয়া যায় না!

চুপি চুপি কাউকে কিছু না জানিয়ে যাওয়া আসার কথা বলছেন!

দোভাষীকে দিয়ে বলাবার ভেতরেও আতাহুয়ালপার প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপের রেশ একটু বুঝি থেকে গেছে। সেটা চাপা দেবার জন্যে একটু বেশী গাম্ভীর্যের সঙ্গে আতাহুয়ালপা তারপর জানিয়েছেন,— চোরের মত লুকিয়ে গেলে আসল কাজই যে হবে না। লুকোনো পুঁজির জিম্মাদার-রাই যে অবিশ্বাস করবে। ইংকা অধীশ্বরদের সম্পদ, সূর্যদেবের জমানো চোখের জল রাখতে বা বার করে আনতে এমনি সমারোহ করাই যে এ দেশের দস্তুর।

দস্তুর শোনবার পর পিজারো তার বিরুদ্ধে আর কিছু বলার পান নি। গানাদো সম্বন্ধে আর দু' চারটে প্রশ্ন করে আতাহুয়ালপাকে বাড়তি কিছু লোক লাগাতে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে দে সটো আর কাণ্ডিয়াকে নিয়ে ফিরে গেছেন।

গানাদোর মত একজন সৈনিকের বেমালুম গায়েব হয়ে যাওয়া যত বড় রহস্যই হোক তা নিয়ে মাথা ঘামাবার বেশ সময় পিজারো বা তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতিরা পান নি।

আতাহুয়ালপার দরবার ঘর সোনায় ভরে ওঠার উত্তেজনা ত' আছেই তার ওপর আর এক খবর দূতমুখে এসে পিজারো আর তাঁর বিশ্বাসী সেনাপতিদের অস্থির চঞ্চল করে তুলেছে।

আর কারুর কাছ থেকে নয়, খবর এসেছে আতাহুয়ালপারই ভাই আর প্রতিদ্বন্দ্বী ইংকা সাম্রাজ্যের ন্যায্য প্রথা-সংগত অধীশ্বর হুয়াসকারের কাছ থেকে।

রাজসিংহাসন নিয়ে হুয়াসকার আর আতাহুয়ালপার জীবনপণ সংগ্রামের কথা আমরা জানি। আতাহুয়ালপার কাছে পরাজিত হয়ে হুয়াসকার যে ইংকা সাম্রাজ্যের যথার্থ রাজধানী কুজকোর কাছে 'সৌসা'-র সুরক্ষিত দুর্গে বন্দী হয়ে আছেন তাও আমাদের অজানা নয়।

সৌসা-য় বন্দী থাকতেই হুয়াসকার এসপানিওল নামে অজানা এক শত্রুর হাতে আতাহুয়ালপার কল্পনাতীত ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা শুনেছেন। শুনেছেন যে আতাহুয়ালপা বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্রচুর ধনরত্ন এসপানিওলদের দেবার কড়ার করেছেন।

এই সংবাদই উৎসাহিত করে তুলেছে হুয়াসকারকে। আতাহুয়ালপার ওপর পরা-জয়ের প্রতিশোধ নেবার আর নিজের মুক্তি কেনবার একটা কূটকৌশল তাঁর মাথায় এসেছে। গোপনে নিজের বিশ্বাসী গুপ্ত-চরকে দিয়ে 'এসপানিওলদের অধিপতির কাছে তিনি একটা প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন। প্রস্তাব এই যে আতা-হুয়ালপার বদলে তাঁকে মুক্তি দিলে তিনি আতাহুয়ালপার চেয়ে 'অনেকগুণ বেশী সোনাদানার সম্পদ এসপানিওলদের দিতে প্রস্তুত। সে ক্ষমতা তাঁর সত্যিই আছে কারণ কুজকো তাঁর নিজের রাজধানী। ইংকা সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বেশী সম্পদ স্বাভাবিকভাবে এই শহরেই মজুত।

কোথায় তা কি পরিমাণ আছে তা বাইরের লোক হয়ে আতাহুয়ালপা আর কতটুকু জানে!

হুয়াসকারের এই প্রস্তাবে পিজারো আর তাঁর ঘনিষ্ঠ সাঙ্গপাঙ্গের উত্তেজিত চঞ্চল হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কি এ বিষয়ে করা উচিত স্থির করা সত্যিই তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে।

প্রলোভন ত' বড় সামান্য নয়। আতা-হুয়ালপা যা দিতে চেয়েছেন তাই পিজারো আর তাঁর দলবলের কাছে কল্পনাতীত। হুয়াসকার তার চেয়েও অনেকগুণ বেশী দেওয়ার লোভ দেখাচ্ছেন। এখন আতা-হুয়ালপা না হুয়াসকার কার দিকে হেলা যায়?

গোপন রাখবার চেষ্টা সত্ত্বেও হুয়াস-কারের এ প্রস্তাবের খবর আতাহুয়ালপার কানে একেবারে পৌঁছোয় নি এমন নয়।

তাঁর ত' এ খবরে অত্যন্ত বিচলিত হবার কথা। কিন্তু তা তিনি হন নি।

হ'ন নি এই কারণে যে এই রকম একটা অবস্থা যে হতে পারে তা জেনে তিনি আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিলেন অনেকখানি। এস-পানিওলরা এই দোটানার মধ্যে মনঃস্থির করে ওঠবার আগেই তারা যা ভাবতে পারে না এমন কিছু ঘটে যাবে। আতাহুয়ালপা আর হুয়াসকারের মধ্যে একজনকে বেছে নেবার সময় সুযোগ তখন আর পিজারোর থাকবে না এই মেঘ-ছাড়ানো তুষার-চূড়ার দেশে।

নির্ভুলভাবে সমস্ত মতলব ভাঁজা হয়েছে, ধাপে ধাপে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছাবার যে আয়োজন করা হয়েছে তা নিখুঁত।

প্রথম ধাপ হ'ল পিজারোকে স্তূপাকার সোনা উপহার দিয়ে বিমূঢ় বিহ্বল করার সেই প্রস্তাব। এসপানিওলরা সোনা বলতে অজ্ঞান। তাদের সেই উন্মত্ত লোভই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার ফাঁদ হয়েছে তাই।

এ ফাঁদ অবশ্য আতাহুয়ালপার নিজের মাথা থেকে বার হয়নি। ধাপে ধাপে [illegible]গা-গোড়া সমস্ত চালগুলো যিনি [illegible] সাজিয়েছেন তিনি যে কে তা আত[illegible]পা এখনো ঠিকমত জানেন না। গানাদো নামে পরিচিত এ লোকটি এসপানিওল বাহিনীরই একজন। তবু আতাহুয়ালপা লোকটিকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন। বাধ্য হয়েছেন তার কাজ দেখে।

কিন্তু ঘনরামকে কাক্সামালকা শহরে ত' পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত ফাঁদ সাজিয়ে তিনি নিজে গেলেন কোথায়?

আর কেউ না জানুক আতাহুয়ালপা তা জানেন।

দুদিন বাদে আতাহুয়ালপা নিজে যেখানে রওনা হবেন নেহাৎ অসম্ভব কিছু না ঘটে থাকলে গানাদো সেই 'সৌসা'য় ইতিমধ্যে পৌঁছে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন।

হ্যাঁ 'সৌসা' সেই সুরক্ষিত দুর্গনগরী আতাহুয়ালপার ভাই হুয়াসকার যেখানে বন্দী হয়ে আছেন।

(ক্রমশঃ)

দেশে বিদেশে

সর্বহারার দার্শনিক

"দুনিয়ার মেহনতি মানুষ এক হও!" এই সংগ্রামধ্বনির মধ্যে দিয়ে যিনি বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছেন, সেই কার্ল মার্কসের জন্মের ১৫০-তম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল গত ৫ মে।

কার্ল মার্কস্ ফ্রিডরিশ এঙ্গেলসের সঙ্গে মিলে বিজ্ঞানসম্মত, সংগঠিত, আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের পত্তন করেছিলেন। ইয়োরোপে শিল্প বিপ্লবের সূত্র ধরে এক নতুন বিত্তহীন শ্রেণীর আবির্ভাবে সমাজজীবনে যখন প্রবল সংঘাত দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল, সেই মুহূর্তে এই আন্দোলনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির দূত হিসেবে মার্কস [illegible] হয়েছিলেন। তাঁর মহাগ্রন্থ [illegible] ক্যাপিটাল'-এ (১৮৬৭) তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়, বিকাশ ঘটে, এবং কিভাবে তার নিজের মধ্যেই তার ধ্বংসের বীজ লুকিয়ে থাকে।

কিন্তু কেবল এই উদ্ঘাটনের মধ্যেই মার্কসের তাৎপর্য সীমাবদ্ধ নয়। এই উদ্ঘাটনের ভিত্তিতে তিনি যে সিদ্ধান্ত টেনেছেন তার মধ্যেই তাঁর যথার্থ তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক কারণে এমন একটি শ্রেণী সংগ্রাম অন্তর্নিহিত আছে যা ইতিহাসকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোন দিকে? পুঁজিবাদী সমাজের ক্রমাবলুপ্তি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের দিকে।
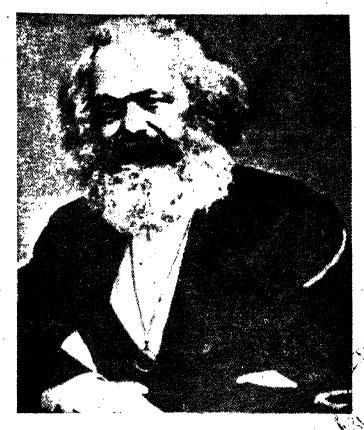
শ্রেণী-সংগ্রামের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তরের এই মতবাদ গত এক শতাব্দী ধরে পৃথিবীর চিন্তা ও কর্মকাণ্ডকে যে আর সব কিছুর চাইতে বেশী প্রভাবিত করেছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্যে যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্যে মার্কস ও এঙ্গেলস 'ম্যানিফেস্টো অব দি কম্যুনিস্ট পার্টি' (১৮৪৮)-তে ডাক দিয়েছিলেন, সেই আন্দোলনের বাস্তব প্রসার হয়ত খুব বেশি দেশে হয়নি। কিন্তু মার্কসের মতবাদের সাফল্য বা ব্যর্থতা কেবল সেই নিরিখেই যাচাই করলে চলবে না। মনে রাখতে হবে যে-সব দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে কম্যুনিস্ট সরকারের পত্তন হয়নি সেই সব দেশের সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণী সংগ্রামের মার্ক্সীয় থিসিস ব্যাপক রূপান্তর ঘটিয়েছে বা ঘটাতে চলেছে, যা 'বৈপ্লবিক' বললেও কিছু ভুল বলা হয় না। কম্যুনিস্ট নাম নিয়ে না হলেও সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা আজ সমস্ত উন্নতিশীল দেশেরই লক্ষ্য। এমনকি পুঁজিবাদের চরিত্রও যাচ্ছে পাল্টে। ধনী হয়ত আরো ধনী হচ্ছে, কিন্তু দরিদ্র দরিদ্রতর হচ্ছে না। তাদের সামাজিক অবস্থার মধ্যেও লক্ষ্যণীয়ভাবে রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে। যেখানে হচ্ছে না বা ধীরে ধীরে হচ্ছে সেখানেই প্রধান প্রতিবন্ধক পুঁজিবাদী শোষণ নয়, হয় সীমাবদ্ধ ক্ষমতা না হয় দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার। যে কোন শক্ত নেতৃত্ব ঐ প্রতিবন্ধক সহজেই দূর করতে পারবে। আশা করা যায়, সেদিন হয়ত সারা পৃথিবী থেকে ঠাণ্ডা লড়াইও যাবে দূর হয়ে।

প্যারিস বৈঠক

প্যারিসের বিজয় তোরণ থেকে বেশি দূরে নয়, ক্লেবার অ্যাভিনিউর ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের বাড়ীতে ১০ মে উত্তর ভিয়েৎনাম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা প্রস্তাবিত শান্তি আলোচনার প্রস্তুতি নিয়ে এক আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনা আনুষ্ঠানিকভাবে সুরু হচ্ছে ১৩ মে।

প্রস্তুতি আলোচনায় উত্তর ভিয়েৎনামের পক্ষে ছিলেন কর্নেল হা ভান লাউ উত্তর ভিয়েৎনামী প্রতিনিধি দলের ডেপুটি

লীডার, এবং আমেরিকার পক্ষে ছিলেন তাঁদের ডেপুটি লীডার মিঃ সাইরাস ভ্যান্স। তাঁরা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক ধরে আলোচনা করেন। আনুষ্ঠানিক আলোচনায় উভয় পক্ষের নেতৃত্ব করবেন মিঃ সুয়ান থুই ও মিঃ অ্যাভারেল হ্যারিম্যান।

১৯৫৪ সালের জেনিভা চুক্তি ব্যর্থ হয়ে যাবার পর ভিয়েৎনামের যুদ্ধ নতুন করে সুরু হয়ে গিয়েছিল। তার পর চোদ্দ বছর ধরে এই যুদ্ধের তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চোদ্দ বছরের মধ্যে এই প্রথম বিবদমান পক্ষদ্বয় আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তির জন্যে আলোচনার টেবিলে বসতে চলেছে, এই সম্মেলন তাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

এই আলোচনার গোড়াপত্তন হয়েছিল গত ৩১ জানুয়ারী ও তার পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে গেরিলাদের 'টেট' আক্রমণের পর। একসঙ্গে দেশের সর্বত্র প্রায় গোটা চল্লিশেক শহরে হানা দিয়ে গেরিলারা আমেরিকানদের অবস্থা কাহিল করে তুলেছিল।

প্যারিস বৈঠক আরম্ভ হবার প্রাক্কালে গেরিলারা দ্বিতীয়বার ব্যাপক আক্রমণ চালায়। ৫ মে সায়গন, উয়ে, দানাং, কোয়াং ত্রি, হোই আন, মি তো, কান তো, ভিন লং, কোন্টুম, বেন ট্রে, ফান রাং, বিয়েন হোয়া ও লাই খে শহর সমেত প্রায় ১২০টি জায়গায় গেরিলারা চড়াও হয়েছিল। আগের বারের মতো এবারেও সায়গনের রাস্তায় রাস্তায় প্রচণ্ড লড়াই চলেছিল। ঐ লড়াইয়ের সময় একজন পশ্চিম জার্মান কূটনীতিক ও পাঁচজন সাংবাদিক নিহত হন। গুরুতর আহত হন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পুলিশ বাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল নুয়েন নক লোয়ান, যিনি একজন ভিয়েৎকং বন্দীকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, প্যারিস বৈঠক আরম্ভ হবার প্রাক্কালে সায়গনের লড়াই আপাতত থেমে গেছে।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণের পেছনে ভিয়েৎকংদের লক্ষ্য যা-ই থেকে থাকুক, এটা আরেকবার প্রমাণ হয়ে গেল যে, অপর পক্ষের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, ঐ ব্যূহ ভেদ করতে গেরিলারা সক্ষম। 'টেট' আক্রমণের পর আমেরিকানরা নিজেদের যথাসম্ভব নিরাপদ করার ব্যাপক ব্যবস্থা করেছিল। তা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার এবং প্রথম আক্রমণের ভৌগোলিক প্যাটার্ন অনুসরণ করে আক্রমণ চালিয়ে গেরিলারা প্রমাণ করল যে, তারা অপ্রতিরোধ্য।

পাঞ্জাবের সংকট

পাঞ্জাব একটি বড় রকমের সাংবিধানিক সংকটের মধ্যে পড়েছে।

গত ১০ মে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের একটি স্পেশ্যাল বেঞ্চ সর্বসম্মত রায়ে ঘোষণা করেন যে, সরকারের দুটি ব্যয়-বরাদ্দ আইন (১৯৬৮ সালের বাজেট) সংবিধানবিরোধী। সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে ঐ বেঞ্চ আরও জানান যে, বিধানসভার অর্থ-কর্মী কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে যে অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছে, সেটিও সংবিধান-বিরোধী।

এই রায়ের ফলে কার্যত পাঞ্জাব রাজ্যে গোটা শাসনযন্ত্রই অচল হয়ে পড়ল। রাজ্যের
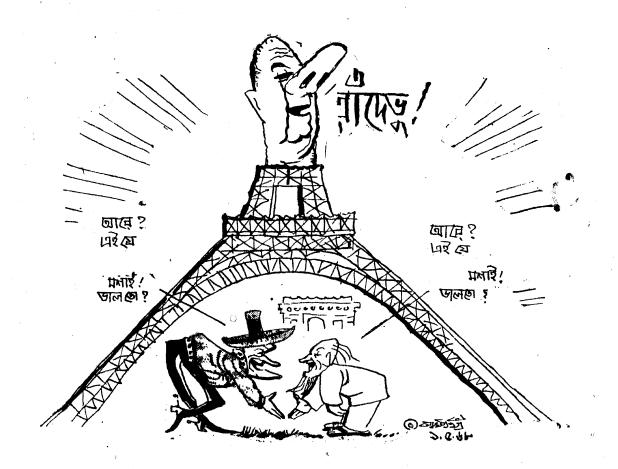
যে কনসলিডেটেড ফান্ড ছিল তা এর ফলে 'জমে' থাকছে কারণ এই ফান্ড থেকে টাকা তোলবার কোন ক্ষমতা আর রইল না।

প্রধান বিচারপতি শ্রীমেহের সিং তাঁর রায়ে বলেন, ব্যয়-বরাদ্দ আইন দুটি সংবিধানসম্মত নয় তার কারণ সেগুলি সংবিধানসম্মতভাবে এবং স্পীকারের রুলিং সংক্রান্ত আইন অনুসারে আহুত ও অধিবেশনরত বিধানসভায় গৃহীত হয়নি। তিনি বলেন, ১৮ মার্চ স্পীকার যে রুলিং দেন তা এই আদালতে বাতিল করা যাবে না এবং তা চূড়ান্ত।

পাঞ্জাবের সাংবিধানিক সংকটের সূত্রপাত হয় ৭ মার্চ যখন স্পীকার শ্রীযোগীন্দার সিং মান তাঁর বিরুদ্ধে আনীত দুটি অনাস্থা প্রস্তাবকে অবৈধ ঘোষণা করে বিধানসভার অধিবেশন দু' মাস স্থগিত ঘোষণা করেন।

এই অবস্থায় পাঞ্জাব সরকারের সামনে তিনটি পথ খোলা আছে : এক, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা; দুই, বিধানসভার অধিবেশন ডেকে বাজেট পাশ করিয়ে নেওয়া; তিন, রাষ্ট্রপতির শাসনের জন্যে সুপারিশ করা।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্প

ভারতবর্ষে অন্য যে-কোন শিল্পের চেয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প তার উৎপন্ন পণ্যের কাটতির জন্য সরকারী ফরমায়েসের উপর বেশী নির্ভরশীল এবং পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের প্রাধান্য বেশী। এই দুটি তথ্য মনে রাখলে বোঝা যাবে যে, বর্তমানে শিল্পের ক্ষেত্রে সারাদেশে যে মন্দা চলেছে, তাতে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের চেয়েও পশ্চিমবঙ্গ অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত। ১৯৬৪-৬৫ সালের এক অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছিল যে, অন্যান্য শিল্পের মোট উৎপাদনের ৩৯ শতাংশ যেখানে গার্হস্থ্য প্রয়োজন মেটায় সেখানে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের মোট উৎপাদনের শতকরা মাত্র ১৬ ভাগ গার্হস্থ্য চাহিদা মেটায়। অন্যদিক থেকে, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের মোট উৎপাদনের ১০ শতাংশের খরিদ্দার হচ্ছেন গবর্নমেণ্ট, অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে এই অনুপাত হচ্ছে এর অর্ধেক (৫ শতাংশ)। এই অঙ্কগুলিই প্রমাণ করছে যে, বেসরকারী চাহিদা ঠিক থাকা সত্ত্বেও সরকারী চাহিদা যদি কমে যায় তাহলে অন্য যে-কোন শিল্পের চেয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের মার খাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এবার পশ্চিমবঙ্গের কথায় আসা যাক। ১৯৬৫ সালের শেষে পশ্চিমবঙ্গে মোট কারখানার সংখ্যা ছিল ৫৬৪২ আর তার মধ্যে ২২১২টি ছিল ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা। অর্থাৎ মোট কারখানার অনুপাতে ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার হার হচ্ছে ৪০.৯৮ শতাংশ। ১৯৬৫ সালের শেষে পশ্চিমবঙ্গে কারখানার কর্মীদের শতকরা ৩৮.৩০ জন কাজ করতেন ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায়। মহারাষ্ট্রে ও মাদ্রাজে তখন এই হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ২৮.১২ জন ও ২৬.২২ জন।

সরকার যখন রেলওয়ের অর্ডার কমিয়ে দিলেন এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম খরিদও কমিয়ে দিলেন, তখন তার সবচেয়ে বড় চোট এসে পড়ল ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের উপর এবং যেহেতু পশ্চিমবঙ্গেই ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার প্রাধান্য, সেহেতু এখানেই এই চাহিদা হ্রাসের আঘাত সবচেয়ে বেশী করে দেখা দিল।

একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। সারাদেশে যত রেলওয়ে ওয়াগন তৈরী করার ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে ৬১.৮ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে তৈরী হতে পারে। যেসব কারখানায় এই ওয়াগন তৈরী হয়, তারা প্রতি এক টাকার কাজের মধ্যে চার আনার কাজ ছোটখাট কলকারখানাগুলিকে বাঁটোয়ারা করে দেয়। এই ছোটখাট কারখানাগুলি ওয়াগনের বিভিন্ন অংশ বানায়। তাছাড়া তারা রেলওয়ে স্লিপার, সিগন্যাল ইত্যাদিও তৈরী করে। হাওড়ার ঢালাই কারখানাগুলি প্রকৃতপক্ষে রেলওয়ের ফরমায়েস মেটাবার মত করেই তৈরী। রেলওয়ের ফরমায়েস যখন কমল, তখন ওয়াগন তৈরীও কমতে থাকল। পশ্চিমবঙ্গের যেখানে বছরে চার-চাকার মোট ২৪,৪৮০টি ওয়াগন তৈরী করার ক্ষমতা আছে সেখানে ১৯৬৬ সালে তৈরী হল মাত্র ৯৬০৪টি।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য তার এই মৌলিক দুর্বলতা দূর করা প্রয়োজন। রেলওয়ের চাহিদা মেটাবার দিকে লক্ষ্য রেখে যে-শিল্প গড়ে উঠেছিল তাকে এখন অধিকতর প্রশস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এই পথে প্রথম বাধা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের কারখানাগুলি প্রায় সবই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গড়ে উঠেছিল এবং এখনও সেগুলি পুরানো, অচল, অকেজো যন্ত্রপাতি নিয়ে ও সেকেলে উৎপাদন-পদ্ধতিতে কাজ করছে। এইসব পুরানো যন্ত্রপাতি বদলে নূতন যন্ত্র বসাতে হবে, উৎপাদন-পদ্ধতি বদলাতে হবে।

এদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের সামনে একটা নূতন চ্যালেঞ্জ আসছে বলা চলে। কৃষির উন্নয়নের জন্য আগামী কয়েক বৎসরে সরকার বেশ কিছু অর্থব্যয় করবেন। চাষের উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরী করতে হবে, সেচের জন্য পাম্প চাই। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প যদি ঠিকভাবে প্রস্তুত হতে পারে, তাহলে কৃষিতে এই বিপুল পরিমাণ লগ্নীর কিছুটা সুফল তাদের হাতে যাওয়া উচিত।

দ্বিতীয় যে চ্যালেঞ্জ পশ্চিমবঙ্গের এইসব শিল্পের সামনে আসছে সেটি হচ্ছে, কি করে রপ্তানি বাড়ান যায়। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এটা দুর্ভাগ্যের কথা যে, যদিও গত কয়েক বছরে ভারতবর্ষের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের রপ্তানি সমগ্রভাবে বেড়েছে তথাপি এই রপ্তানি বৃদ্ধিতে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ ক্রমশঃ কমছে। ১৯৬০ সালে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের রপ্তানিতে কলকাতা অঞ্চলের অংশ ছিল শতকরা ৭৯ ভাগ আর ১৯৬৫-৬৬ সালে এই অংশ কমে শতকরা ৫৬ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের পণ্য রপ্তানি যে-হারে বৃদ্ধি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্পের রপ্তানি তার চেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে মাদ্রাজ থেকে রপ্তানি বেড়ে ১২ গুণ হয়েছে এবং দিল্লী অঞ্চল থেকে রপ্তানি বেড়ে হয়েছে ১৯ গুণ। অথচ ঐ সময়ের মধ্যে কলকাতা অঞ্চলে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে মাত্র দ্বিগুণের কিছু বেশী হয়েছে।

রপ্তানি বৃদ্ধির এই প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের ছোটখাট ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। পুরানো অকেজো যন্ত্রপাতি বদল করে নূতন যন্ত্রপাতি না বসালে, উৎপাদন-পদ্ধতির সময়োপযোগী পরিবর্তন না করলে পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প রপ্তানি বাড়াবার এই চ্যালেঞ্জ ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে না।

মন জানে, শুধু মন জানে॥

মনীশ ঘটক

নদ নদী পাহাড়
পশু পক্ষী মানুষ
মাটি বায়ু আকাশ
সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা
বিচিত্র, বিচিত্রতর রূপে,
কতো নব, নবতর রূপে,
দুর্নিবার আকর্ষণে আমাকে টানে!
কী কুহক, কী সম্মোহন আছে ওদের?
মন জানে, শুধু মন জানে।

প্রলোভন জয় করতে চায়
সন্দিগ্ধ সতর্ক মন,
বলতে চায়
এরা সব মায়া, এরা সব মিথ্যে।
বলে মুখ ফেরাও মুখ ফেরাও
নিপীড়ন করো নিজেকে
নিগ্রহ করো নিজেকে।

ভীতু সাবধানী মন
লুকোতে যায়
অন্তরের অন্তরতম
গোপন চোরকুঠুরিতে।
কিন্তু সেখানে গিয়ে
দেখে
কে এ চিরপ্রভ,
স্বরাট যার প্রকাশ,
স্বরূপে যে সমুজ্জ্বল?
যে সবায়ের চেয়ে আলাদা
আবার সবায়েরই প্রকাশক?
যার বিভায়
দিক্‌দিগন্ত চিরভাস্বর?

এই অনির্বচনীয়কে দেখে
সব জানা-অজানার পরপারে
চলে যাই আমি,
কেন, সে কথা
মন জানে, শুধু মন জানে।।

সাধনা॥

মানস রায়চৌধুরী

তোমার কথা ভুলে যাওয়ার বড় কঠিন সাধনা এই
কত কঠিন সাধনাভরা জীবন লোকে বলছে কানে
আমার কানে নানারকম সেতার সানাই অজস্রতা
সহজ করে জীবনটাকে বুঝতে গিয়ে তোমাকে ভোলা
নখের মধ্যে সূক্ষ্ম ময়লা তোমার স্মৃতি রোমকূপের
পারমাণবিক অভিজ্ঞতা ঘুমের গন্ধে তোমার চুমুক
আমিও চুমুক দিচ্ছি তোমার স্নেহধবল দুধের কাপে
অথচ চাই ভুলে যাবার নিখুঁত সাবান ফেনানো স্নান
স্নানে তোমার আত্মঘাতী চিরপ্রাচীন সুবাস বেড়ায়
জলের মধ্যে জল থাকে না থাকে কেবল শুষ্ক স্মৃতি
কবে পুকুর উজাড় করে স্বাদ নিয়েছি তোমার টানের
অঢেল গড়ন তমিস্র চুল বিলীন লজ্জা কই ভুলেছি?
তোমার কথা ভোলা এখন বেঁচে থাকার শেষ তামাসা
তোমার গাড়ীর দুটি গরুর একটি কি নেয় আত্মা আমার
সহনশীল বলে আমার সুনাম নেই কোনোখানেই
তবু বইতে ভালো লাগছে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে ভ্রমণ
পরিপূর্ণ আলস্যে কি তুমি শুয়েছো ছইয়ের তলে
দুলছে গাড়ীর ভারসাম্য দুলছে জীবন কেন্দ্রহারা
বিস্মৃতি কি মৃত্যু দেবে ভুলতে ভুলতে সব এসে যায়
তোমার বাড়ীর সেই যে উঠোন জ্যোৎস্না-আলোয় নিশান [illegible]
তার তলে কি বসতে হবে ভুলে যাবার মন্ত্র শিখতে—

অঙ্গনা

প্রমীলা

শাড়ির প্রদর্শনী

উদ্ভিন্ন যৌবন সাঁওতালী মেয়ে খোঁপায় লাল টকটকে একটি জবা ফুল গুঁজে পথ আলো করে চলেছে। চলার গমকে তার যৌবন যেন কথা কইছে। অপরূপ এই দৃশ্যটি নেহাৎ অ-রসিকেরও মনের একতারায় গুন-গুন্ নিয়ে একটা সুর ভেসে উঠে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। শহুরে সভ্যতা আমাদের রুচিতে পরিবর্তন এনেছে এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতির এই সহজ সৌন্দর্যবোধকে আমরা চিরতরে বিসর্জন করেছি। পল্লীর পথে সাঁওতালী মেয়ের এই নিরাভরণ অপরূপ সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করলেও সেই রুচিতে নিজেদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া শুধু কল্পনাই সার,—হয়তো অনেকের কল্পনায়ও বাধে। রুচির পরিবর্তন প্রসঙ্গে এসব কথা বলছিলেন শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপলক্ষ্য ছিল 'অভিরুচ' আয়োজিত হ্যান্ড প্রিন্টেড ও প্রিন্টেড সিল্ক টেক্সটাইলসের প্রদর্শনী।

রুচিতে যে পরিবর্তন এসেছে পথে-ঘাটে তার অনেক নমুনা মেলে। সহজ স্বাভাবিক রুচির বদলে আমরা কৃত্রিমতার কব্জাবদ্ধ হয়েছি। এজন্য কত না সাজ-পোষাকে কিছুতেই আমরা আর সহজ স্বাভাবিক হতে পারছি না। রুচি আমাদের ক্রমেই ঠেলে নিয়ে চলেছে জটিলতার পথে। সহজ, নিরাভরণ সাজ তাই আজ অচ্ছুৎ। মনে হয়, সকলেরই এই রায়। আস্তে আস্তে এপক্ষই যে জোরদার হবে তার সমস্ত লক্ষণ ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে।

সাজপোষাকে জগৎজোড়া কত না পরিবর্তন কিন্তু সবকিছুকে টেক্কা মেরে শাড়ির মহিমা অম্লান। অনেক পরিবর্তনের ঢেউ সহ্য করেও শাড়ি ঠিক নিজের ঐতিহ্য বজায় রেখে সদর্প পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও তার চাহিদা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। এ থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, শাড়ি সকল পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে ঠিক মানিয়ে চলতে পারছে। এ মর্যাদা শুধু একমাত্র শাড়ির প্রাপ্য। বিশ্বের আর কোন পোষাকের এরকম স্বীকৃতি মিলেছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য ভারতীয় ললনার অঙ্গ-গৌরব শাড়ির অতীত গৌরবজনক ইতিহাসই তাকে এই মর্যাদা দিয়েছে। অবশ্য অতীতে ইতিহাস শুধু নয়, ভারতীয় শাড়ির আজকের ইতিহাসও যথেষ্ট গৌরব-মণ্ডিত। ভারতীয় রমণী পাশ্চাত্যের অনেক-কিছু নিয়েছে, দেশী জিনিস ছেড়ে বিদেশী জিনিসে নিজেকে সাজিয়েছে। কিন্তু শাড়ি না হলে তার সাজ ঠিক সম্পূর্ণ হয় না।

শাড়ির ইতিহাস বলতে গেলে প্রথমেই অবশ্য মসলিনের কথা মনে পড়ে। কিন্তু সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। মসলিন হারিয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায়। অবশ্য সে পথ বেয়ে তাঁতের শাড়ি রকমারী ঘরানা আজো বাজার আলো করে আছে। ঢাকাই, ধনেখালী, বালুচরী শাড়ি নারীর অতি আদরের অঙ্গভূষণ। দক্ষিণ ভারতের রকমফের শাড়িও অনেকের মনে পাকাপোক্ত আসন করে নিয়েছে। তারপর আজকের টেরিলিনের যুগেও

শাড়ির অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতীয় মিলগুলি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। শাড়ির প্রসার এবং প্রচারের ব্যাপারে এ উৎসাহ রীতিমত আশার কথা।

ভারতীয় নারীদের কাছে ছাপা শাড়ির বিশেষ আবেদন অনস্বীকার্য। মোটামুটি সব শাড়িতেই ছাপার কাজ চলে। এই ছাপার ব্যাপারেও শাড়ি বিশেষ উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। অজন্তা, ইলোরার গুহাগাত্রে এবং ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নানা নিদর্শন ফুটিয়ে তোলা হত শাড়িতে। দীর্ঘদিন চলেছিল এই রীতি। পরে অবশ্য ছাপার ব্যাপারে দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রসারতা ঘটেছে। নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুল, লতাপাতা প্রভৃতি মনোহর ছাপায় শাড়ির আকর্ষণ বেড়েছে, মিলের শাড়িতেও ছাপার উৎকর্ষ ঘটেছে। সম্প্রতি বাটিক প্রিন্ট ভারতীয় নারীর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। শাড়ি, স্কার্ফ, ব্লাউজ সবকিছুতেই তাঁরা বাটিকের স্থান নির্ধারণ করেন সর্বোচ্চে।

প্রিন্টের শাড়ির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা মনে রেখেই সেদিন গিয়েছিলাম 'অভিরুচি' আয়োজিত সিল্ক শাড়ির প্রদর্শনী এবং ফ্যাশান শো দেখতে। হ্যান্ড প্রিন্টেড এবং প্রিন্টেড দু' রকম শাড়িই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। ছাপার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের সুনিপুণ অলংকারিত্বে শাড়ির মনোহারিত্ব প্রমাণ। বাটিক ধরনের কতগুলি প্রিন্ট প্রদর্শনীর মর্যাদা বহুলাংশে বাড়িয়েছে বলা চলে। শুধু প্রাচীন ভাস্কর্য নয় সেই সঙ্গে শিল্পীর নিজস্ব কল্পনাও স্থান পেয়েছিল। শাড়ির সঙ্গে ছিল স্কার্ফের সমাবেশ। ছাপার গুণে স্কার্ফগুলি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছিল এবং বার বার মনে হচ্ছিল শাড়ির এই সূক্ষ্ম শিল্পপ্রয়াস নিশ্চয়ই রসিকজনকে আনন্দদান করবে। বিদেশে শাড়ির চাহিদা বাড়ানোর ব্যাপারেও এসব শাড়ি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এজন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের উদ্যোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিল্পরুচিতে অভিরুচির শাড়ির প্রদর্শনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সুন্দর সুন্দর শাড়ির ফ্যাশান আরেকটু অন্যরকম হওয়া উচিত ছিল। বিভিন্ন শাড়িতে সমস্ত মডেলকে একসঙ্গে জড়ো করানোর ফ্যাশান শো'র আসল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে গেছে। প্রদর্শনীতে উপস্থিত অনেকেই বুঝতে পারেননি কোন শাড়ির কি অসাধারণত্ব। তাছাড়া কোন শাড়ি সম্পর্কেই দর্শকদের বিশদ কোন পরিচয় দেওয়া হয়নি। অথচ ফ্যাশান শোয়ের মাধ্যমে সেটি সহজেই করা যেত। পরবর্তী প্রদর্শনী এবং ফ্যাশান শো'য়ে 'অভিরুচি' এ ব্যাপারে সচেতন হবেন এটাই আশা করবো।

অন্তঃপুরে নারী

একজন গৃহস্থ বধূ তাঁর অন্তঃপুর থেকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন:

মাননীয়াসু,

'জীবন সংগ্রামে নারী' অমৃতের পাতায় মাঝে মাঝে দেখি। ভাবি এতদিনে শুধু এই কথাগুলো, ভাববার দিন এলো। আজকের ভয়াবহ সমাজ ব্যবস্থায় ও দারিদ্র্যের অভিশাপে যে মেয়েদের জীবন যায়, মান যায়, তাদের কথা ভাববার মানুষও বুঝি নেই এই সংসারে। যাইহোক, ইদানীং এ ভুল আমার খন্ডন হয়েছে। অমৃতের পাতায় পাতায় গাঁথা হচ্ছে—ওদের অমৃত ঝরা জীবন। শুধু এইটুকুতে কেমন মন ভরে ওঠে। রাষ্ট্রের এবং সমাজের সহযোগিতায় এরা যদি ধরা পড়তো, তাহলে প্রতিকারের জন্য এত চিৎকারের দরকার ছিল না। যাহোক, ওরা সহানুভূতি পাক আপনার কালিতে কলমে। স্বপ্নের আরকে ভেজানো—ওদের মমির মত

আন্তর্জাতিক স্কলারশিপ ফাণ্ডের সাহায্য ধরণ) র্থে বিড়লা আকাদমিতে আয়োজিত ইকেবনোর (জাপানী পুষ্পসজ্জার একটি বিশেষ প্রদর্শনীর একটি দৃশ্য। বাম দিকে ইকেবনো বিশেষজ্ঞ নমিতা বসু।

জীবনগুলো, একটা অবাক জন্ম নিক—আমরা আজ সেটুকুতেই আনন্দ পাই।

হ্যাঁ, ওদের কথা অর্থাৎ যাদের কথা এখন লিখছেন—ঘর ফেলে বাইরে গেছে যারা, অর্থ সংগ্রহে তৃষ্ণার্ত চাতকের মত পথে পথে ফিরছে, নিরাশ ক্রন্দনে—যারা বুক ফাটাচ্ছে—তাদেরই জীবন কাহিনী নিয়ে এখন আপনি ব্যস্ত; আজ আপনার দৃষ্টি বাইরে প্রসারিত; যারা বাইরে সংগ্রাম করছে—তাদের দিকে দৃষ্টি রেখেছেন। কিন্তু একবার কি ভেতরের দিকে চোখ ফেরাবেন? এই সব অন্তঃপুরচারিণীদের দিকে? যারা এখনো পথে পা দেয়নি—বাইরের জীবন সংগ্রামে যারা বিপ্লবী সাজেনি 'অমৃত' পাতায় গাঁথা হয়নি যাদের কথা, দেখবেন নাকি একবার তাদের দিকে চেয়ে? কি ভয়ংকর সংগ্রাম চলেছে—অন্তঃপুরের জীবনে, সেখানেও কত অন্তঃপুরচারিণী জীবন সংগ্রামের অপরাজেয় যন্ত্রণায় হাঁফাচ্ছে?

প্রথমেই বলি, অভাবের চেহারা আজ ঘরে ঘরে। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত পরিবারে—'দারিদ্র্যের' ভূমিকা একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

সকাল থেকে রেশনের লাইন, তেলের লাইন, দুষ্প্রাপ্য কাঁচা বাজারেও লাইন। এর মধ্যেই আছে অফিস স্কুলের তাড়া! অফিসের উর্ধতন মহলরা—নিরীহ কেরাণী-জীবদের কখনোই নেকনজরে দেখেন না—এ সংবাদ ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এছাড়া স্কুলের টাইমও সেই পর্যায়ভুক্ত। সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে গৃহিণীদের স্বস্তি পাবার উপায় নেই। নির্দিষ্ট সময়ে রন্ধন পর্বের 'যজ্ঞশালার' আয়োজনে সবাই ব্যস্তসমস্ত। 'যজ্ঞ' বলছি এই কারণে। পুরাকালে যে বড় বড় 'যজ্ঞ' পর্বের কথা শুনেছি—তার জন্যে মানুষকে যত না হিমসিম খেতে হয়েছে—তার চেয়ে অনেক বেশী মহাকাণ্ড চলেছে আজকের গৃহিণীদের রন্ধনশালায়। যদিও, এখন যৌথ পরিবার কম! পরিজন আত্মীয়কুলের ভূরি ভোজনের নিত্য সমারোহ নেই। সংসার এখন সব ছোট ছোটই। কিন্তু সমস্যা আজ বড় বড়। বর্তমান জীবন যজ্ঞে যাদের আত্মাহুতি দিতে হচ্ছে তাদের অবস্থা আজ বর্ণনাতীত। সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী যাঁরা—তাঁরা কোন দিকটা আজকে সামলাবেন—একথা ভাবতে গেলেই, চোখে জল আসে। রেশন বাজার সব যখন এসে পৌঁছয়—তখন ঘড়ির কাঁটা উদ্যত খড়্গের মত আমাদের মাথায় ঝুলে থাকে। সময় মত স্বামী সন্তানকে ভাত দিতে না পারলে, সেখানে কোন 'ক্ষমা'র প্রশ্ন নেই। না খেয়ে হয়তো কর্তা বেরিয়ে গেলেন দু-একবার রোষ কণ্ঠ উদ্গার করে। অভিমানী ছেলেমেয়ে কাঁদো কাঁদো মুখেই স্কুলে চলে গেল।

কিন্তু এরপর নেপথ্যের দৃশ্য—কারো বোধহয় চোখে পড়বে না। এই রেঁধে দেওয়ার ব্যস্ততায় আমাদের হয়তো হাতটা পুড়ে গেছে সারাক্ষণ ছোটা-ছুটিতে শরীরও ক্লান্ত! আর যাদের জন্য এই আয়োজন যাদের জন্য ব্যস্ততার ব্যথা তারা চলে গেছে বাইরে—ভেতরের এত বড় খবর না নিয়েই।

এরপর শুধু আমাদের কাঁদবার পালা! ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের রূপ অনেকবারই দেখেছি। কিন্তু এই বিশ শতকের দারিদ্র্য এসেছে এক ভয়াবহ ছন্নছাড়া রূপ নিয়ে। সকাল থেকে ওঠে লাইন দিয়ে দিয়ে যে খাদ্যের আয়োজন চলে—যে অব্যবস্থার মধ্যে আমাদের দুর্বহ জীবনগুলো শুধু খাবার জন্যেই বেঁচে রয়েছে আজও একথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে!

আর এরই জন্যে এই অন্তঃপুরের নিভৃত বেদনাগুলো যখন কোনদিনও রূপ পায় না—মানুষের সহানুভূতির মধ্যে—যাদের কথায় এমনি 'অমৃত' কুঞ্জে ফুল ফোটে না তাদের ইতিহাস কি এমনি করেই রেখে যাবে চোখের জলের অকথিত কাহিনী?

তাদের জন্য আজ একজনও লেখক সৃষ্টি হবে না? হবে না একজনও পাঠক?

—জয়শ্রী চক্রবর্তী

Pure
Silvikrin
ORGANIC HAIR FOOD
Silvikrin
HAIR DRESSING
A LOTION WITH OIL

(৮৫)

গোবিন্দ (দ্বারপাল)

নীলাচলে কে এক আগন্তুক প্রভুর সামনে এসে দাঁড়াল। প্রণাম করতেই প্রভু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি?

আমার নাম গোবিন্দ। আমি ঈশ্বর-পুরীর সেবক ছিলাম। তিরোধানের সময় ঈশ্বরপুরী বলে দিলেন, নীলাচলে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করো। তাই এসেছি।

'আমার প্রতি পুরীশ্বরের কী কৃপা, কী স্নেহ!' বললেন প্রভু, 'নিজের ভৃত্যকে নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু, সার্বভৌমের দিকে তাকালেন : 'গুরুর সেবক মান্য পাত্র, তাকে দিয়ে অঙ্গ সেবা করানো কি সংগত হবে?'

সার্বভৌম বললে, 'কিন্তু গুরুবাক্য লঙ্ঘন করবে কী করে?'

তাও তো ঠিক। তাই গোবিন্দকে স্বীকার করলেন প্রভু। আলিঙ্গন করলেন।

গোবিন্দ শূদ্র। তা হোক। ঈশ্বর-পুরীকে সেবা করার ফলে তার চিত্তে শুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। তার চিত্তে এখন প্রীতি-ভক্তির লাবণ্য, কে আর তার জাতি-কুলের বিচার করে? দাসীপুত্র বিদুরের ঘরে ভোজন করেন নি শ্রীকৃষ্ণ? শুধু ভক্তির খোঁজ করো। কৃষ্ণে শুধু ভক্তির অপেক্ষা।

ঈশ্বরকৃপা পরম স্বতন্ত্র। তা কিছুরই ধার ধারে না, না কুল-মান না ধন-সম্পদ, না বা বিদ্যাবুদ্ধি। তা বেদধর্ম লোকধর্ম দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত নয়। তা শুধু স্নেহলেশ খুঁজে বেড়ায়। যেখানে প্রীতি-স্পর্শ সেখানেই কৃপা মুক্তস্রোত।

বিদুরকে দেখ। বিদুর দাসীপুত্র, তার উপরে দরিদ্র। কিন্তু কৃষ্ণে প্রীতিমান। তাই দ্বারকার অধিপতি হয়েও কৃষ্ণ এলেন তার কুটিরে, খেলেন তার খুদকণা। সে তৃপ্তি কি দুর্যোধনের রাজভোগে সম্ভব?

গোবিন্দ পেল শ্রীঅঙ্গ সেবার অধিকার। প্রভুর দুই ভৃত্য ছিল—রামাই আর নন্দাই—তারা গোবিন্দের অধীন হল। প্রভুর সমস্ত কার্যের নির্বাহভার গোবিন্দের হাতে, গোবিন্দই সর্বেসর্বা। এমন কি, যারা প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাদেরও তদারকি গোবিন্দের উপর। প্রভুর কিসে আরাম হবে—এই একমাত্র গোবিন্দের বিচার, গোবিন্দের সমাধান।

রাজপ্রাসাদের ছাদের উপর উঠে প্রতাপরুদ্র যখন কীর্তনের শোভাযাত্রা দেখছে, দেখল দুটি লোক এক অমিততেজ মহান্তকে মালা পরাচ্ছে।

এরা কারা? জিজ্ঞেস করল রাজা।

এদের একজন স্বরূপ-দামোদর, আরেক-জন গোবিন্দ। আগের জন প্রভুর দ্বিতীয়-কলেবর, পরের জন প্রভুর অঙ্গসেবক। প্রভুর পক্ষ থেকে এরা মালা দিচ্ছে।

কাকে দিচ্ছে?

সর্বশিরোধার্য অদ্বৈত আচার্যকে।

হরিদাস দূরে সরে থাকলেও প্রভু তাকে আশ্বাস দিলেন, তোমার জন্যে আসবে প্রসাদান্ন।

সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দই গিয়ে দিয়ে আসে হরিদাসকে।

প্রভু যখন জগন্নাথদর্শনে যান, ভিড় সরিয়ে আগে-আগে যায় কাশীশ্বর, পিছনে জলকরঙ্গ নিয়ে গোবিন্দ। ভিড় প্রবল হলে দুজনে হাতাহাতি দাঁড়িয়ে প্রভুর জন্যে আবরণ তৈরি করে। যেন কেউ তাঁকে ছুঁতে না পায়। কিন্তু প্রতাপরুদ্র যখন ছুঁল তখন সাময়িক শৈথিল্যে গোবিন্দ বুঝি অন্যমনস্ক ছিল।

শুধু হরিদাসকে নয়, রূপ-সনাতনকেও প্রসাদান্ন দিয়ে আসে গোবিন্দ।

কোনো ভক্ত দূর দেশ থেকে এলে তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও গোবিন্দই করবে, জগন্নাথ দর্শন করাতেও সেই যাবে। দীনহীন কাঙাল এলে তাদের প্রত্যাশাও গোবিন্দই মেটাবে। রাঘবের ঝালি এসে পৌঁছুলে বস্তুসম্ভার সেই গুছিয়ে রাখবে আর প্রভু যেমনি বলবেন তেমনি বিতরণ করে দিতে হবে। চন্দনাদি তেল আর তুলীগন্ডু জগদানন্দ গোবিন্দের কাছেই রেখেছিল। গোবিন্দ একাধারে ভৃত্য, ভান্ডারী, দ্বারপাল।

যখন কারো দ্বার-মানা হয়, গোবিন্দই আদেশ জারি করে। কমলাকান্তের উপর বিরক্ত হয়ে প্রভু যখন তাকে আসতে বারণ করতে চাইলেন গোবিন্দকে বললেন সজাগ থাকতে। ছোট হরিদাসেরও প্রবেশাধিকার বন্ধ করবার ভার গোবিন্দের উপর পড়ল।

এ নিয়ে যখন নানা অনুরোধ আসতে লাগল প্রভুর কাছে আর প্রভু যখন কিছুতেই হরিদাস-বর্জন থেকে বিরত হবেন না তখন তিনি নীলাচল ছেড়ে দিয়ে আলালনাথে চলে যেতে চাইলেন। বললেন, আমি সেখানে একা-একা থাকবো।

গোবিন্দ সেই একাকীত্বেরও অংশ। আর সকলকে পরিত্যাগ করা গেলেও গোবিন্দকে নয়। গোবিন্দ যে তাঁর ছায়া। তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

রামচন্দ্র পুরীর রূঢ় আচরণে প্রভু যখন অর্ধ-ভোজন করে তার অভিযোগ খন্ডন করলেন, তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে গোবিন্দও অর্ধাশনে দিনাতিপাত করতে লাগল।

গোবিন্দকে প্রভু সাবধান করে দিলেন—দেখো আমার পাদোদক যেন কেউ না খায়।

তবু কালিদাসকে গোবিন্দ ঠেকাতে পারল না। জগন্নাথমন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তরে বাইশ সিঁড়ির নিচে প্রভু পা ধুচ্ছেন কালিদাস হাত পেতে তিন অঞ্জলি জল গ্রহণ করে খেয়ে নিল। কালিদাসের বৈষ্ণব শ্রদ্ধার কাছে গোবিন্দের শাসন পরাস্ত দেখে প্রভু রুষ্ট হলেন না, আহারান্তে গোবিন্দকে বললে, আমার ভুক্তাবশেষ কালি-দাসকে দিয়ে এস।

গোবিন্দের সেবার অদ্ভুত মহিমা। মধ্যাহ্ন-আহারের পর প্রভু গম্ভীরায় শোন, গোবিন্দ তাঁর পা টেপে। প্রভু ঘুমিয়ে পড়লে গোবিন্দ উঠে গিয়ে আহার করে। আহার সেরে আবার দ্বারপ্রান্তে বসে, প্রভু জেগে উঠে আবার কী আদেশ করেন।

বেড়াকীর্তনের দিন প্রভু এক নতুন ভঙ্গি করলেন। প্রভাত থেকে তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নৃত্যকীর্তন করেছেন, ভিক্ষান্তে শুয়েছেন—আজই তাঁর অঙ্গসেবার বেশি দরকার। কিন্তু গোবিন্দ দেখল গম্ভীরার দ্বার জুড়ে শুয়ে আছেন প্রভু। দ্বারজোড়া হয়ে থাকলে গোবিন্দ ঢোকে কী করে?

এক পাশ হও, আমি ভিতরে যাই। গোবিন্দ মিনতি করল।

আমার নড়বার শক্তি নেই। প্রভু বললেন শুয়ে থেকে।

তোমার গা-হাত-পা টিপব যে।

তার আমি কী জানি।

গোবিন্দ তখন তার বহির্বাস প্রভুর গায়ের উপর বিছিয়ে দিল, যেন তার পায়ের ধুলো না প্রভুর গায়ে পড়ে। তারপর প্রভুকে ডিঙিয়ে সে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে প্রভুর পিঠ ও কটি টিপে দিতে লাগল। মধুর মর্দনে প্রভুর শ্রান্তি দূর হল, নিদ্রাকর্ষণ হল।

দন্ড দুই পরে জেগে উঠে প্রভু দেখলেন গোবিন্দ তখনো বসে আছে। ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এখনো বসে আছ কী! খেতে যাও নি?

কী করে যাই? গোবিন্দ বললে কাতর মুখে, দরজায় শুয়ে আছ, পথ কই?

ভিতরে এসেছিলে কী করে? সেই-ভাবেই যেতে পারতে না?

যাব তো নিজের খাওয়ার জন্যে! গোবিন্দ আত্মধিক্কারের সুরে বললে মনে-মনে, তোমার সেবার জন্যে শ্রীঅঙ্গ লঙ্ঘন করেছি—অপরাধ করেছি। শাস্তি যদি কিছু থাকে হাসিমুখে সহ্য করব। কিন্তু নিজের উদরপূর্তির জন্যে অপরাধ করব এ আমার ভাবনার অতীত।

গোবিন্দ বাইরে স্তব্ধ হয়ে রইল। ভগবৎসেবী ভক্তের মনের কথা প্রভু নিশ্চয়ই বুঝবেন।

একদিন প্রভুর কাছে গিয়ে দুঃখ জানাল গোবিন্দ। ভক্তদের দেওয়া খাবার রাশীকৃত হয়ে উঠছে। খাচ্ছ না অথচ খাদ্য সঞ্চিত হয়ে আছে একথা গোপন করে রেখে আমার অপরাধের বোঝা আর কত ভারি করব?

তোমার আবার অপরাধ কী। প্রভু হাসলেন: তুমি তো আদিবশ্য, অনাদিকাল থেকে আমার বশীভূত। নিয়ে এস কে কী খাবার দিয়ে গেছে। নাম ধরে-ধরে নিবেদন করো।

একে-একে সকলের দেওয়া খাবার প্রভুর সামনে জড়ো করতে লাগল গোবিন্দ। বাসি-বিস্বাদ মানলেন না, শতজনের ভক্ষ্য প্রভু এক দন্ডে খেয়ে ফেললেন। জড়বস্তুই পচে, চিন্ময়বস্তু পচে না। মহাপ্রভুর প্রসাদ চিন্ময়বস্তু।

হরিদাসকে রোজ মহাপ্রসাদ পৌঁছিয়ে দেয় গোবিন্দ। একদিন গিয়ে দেখে হরিদাস শুয়ে-শুয়ে নাম করছে। গোবিন্দ বললে, ওঠো প্রসাদ এনেছি।

হরিদাস বললে, আজ আমি উপবাস করব।

সে কি? কেন?

আজ আমার সংখ্যাপূরণ হয়নি। সংখ্যাপূরণ না হলে কী করে ভোজন করি? হরিদাস অস্থির হয়ে উঠল: এদিকে মহাপ্রসাদকেও বা কী করে ফিরিয়ে দিই? মহাপ্রসাদকে দন্ডবৎ প্রণাম করে হরিদাস তার কণিকামাত্র গ্রহণ করল।

এইভাবে নিজের ভজননিষ্ঠা আর মহাপ্রসাদ দুয়েরই মান রাখল হরিদাস।

প্রভু একদিন যমেশ্বরটোটা যাচ্ছেন, দূর হতে গীত-গোবিন্দের গান শুনতে পেলেন। গুর্জরীরাগে মধুর কন্ঠে এ কে গায়? গায়ক পুরুষ না স্ত্রী কিছু অনুসন্ধান করবারও অবকাশ মিলল না, বাহ্যস্মৃতি হারিয়ে সিজের কাঁটার উপর দিয়ে ছুটলেন প্রভু। কাঁটার ঘায়ে অঙ্গ রুধিরাক্ত হল, তবু প্রভুর খেয়াল নেই। যে কৃষ্ণের গান করে সে না জানি আমার কত বড় বন্ধু। কত বড় আত্মীয়!

গোবিন্দ প্রভুকে ধরে ফেলল। বললে, প্রভু এ স্ত্রীলোকের গান। কোনো এক দেবদাসী গাইছে।

দেবদাসী! প্রভু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। রূঢ় আঘাতে তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল।

গোবিন্দ, তুমি আমাকে আজ প্রাণে বাঁচালে। স্ত্রীলোকের স্পর্শ হলে আমি আর বাঁচতাম না।

আমি বাঁচাবার কে? তোমাকে জগন্নাথ বাঁচিয়েছেন। বললে গোবিন্দ।

শোনো, সব সময়ে আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে। প্রভু বললেন, আমাকে বিপথে যেতে দেবে না।

আজ কেন কে জানে মন্দিরে প্রচন্ড ভিড়।

প্রভু যথারীতি গরুড়স্তম্ভের পিছে এসে দাঁড়ালেন। এখানে দাঁড়িয়েই তিনি বরাবর জগন্নাথ দর্শন করেন। আজ সামনে-পিছে আশে-পাশে দারুণ ঠেলাঠেলি। একটি ওড়িয়া স্ত্রীলোক কিছুতেই ভিড় সরিয়ে দেখতে পাচ্ছে না জগন্নাথকে। ব্যাকুল হয়ে এদিক-ওদিক উঁকি মারছে, কিন্তু চারদিকে মানুষের প্রাচীর। একটু উঁচু হয়ে না দাঁড়ালে তার চোখ জগন্নাথের নাগাল পাচ্ছে না। অনন্যোপায় রমণী ব্যগ্র উৎকন্ঠায় ধ্যাননিশ্চল প্রভুর কাঁধে ভর রেখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল।

প্রভুর বাহ্যচেতনা নেই তাঁর কাঁধে এ কী গুরুভার!

গোবিন্দের নজর পড়ল। সে তখুনি সেই রমণীকে নেমে দাঁড়াতে বললে।

প্রভু বললেন, না, ওকে নিষেধ কোরো না। ও যত খুশি দেখুক জগন্নাথকে। ওর তনু মন প্রাণ জগন্নাথে আবিষ্ট। এত আবিষ্ট যে কারো কাঁধে পা দিয়েছে তারও খেয়াল নেই।

রমণী তক্ষুণি নেমে পড়ল। প্রভুকে দন্ডবৎ প্রণাম করল।

আহা, ওর কী আর্তি, কী আনন্দ-ময়তা! আমার যদি অমন থাকত! ও মহাভাগ্যবতী, ওকে প্রণাম করো। ওর প্রসাদে আমাদের যদি এমনি আর্তি জন্মায়, যদি এমন তন্ময়তার অধিকারী হই।

একদিন প্রভু সমুদ্রস্নানে যাচ্ছেন, চটক পর্বত তাঁর চোখে পড়ল। চটককে গোবর্ধন বলে ভাবলেন। অমনি প্রেমাবেশে চললেন চটকের দিকে।

গোবিন্দ পিছু নিল। কিন্তু সাধ্য কী প্রভুকে ধরে।

চিৎকার করে উঠল, ছুটলও সঙ্গে-সঙ্গে। খোঁড়া ভগবান আচার্যও ছুটল।

কতদূর যেতেই প্রভুর 'স্তম্ভ' ভাব উদয় হল, শরীরে জাড্য দেখা দিল। দেখা দিল স্বরভঙ্গ। দুই চোখে নেমে এল গঙ্গা-যমুনা। গাত্রবর্ণ শঙ্খের মত শাদা হয়ে গেল। কাঁপতে লাগল সর্বাঙ্গ। কম্পের ফলে মাটিতে পড়ে গেলেন। গোবিন্দ জল ছিটিয়ে চাইল সুস্থ করতে।

হরিবোল বলে প্রভু আচম্বিতে উঠে বসলেন। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। যা এতক্ষণ দেখছিলেন তা যেন আর পাচ্ছেন না দেখতে।

গোবর্ধন থেকে আমাকে এখানে কে নিয়ে এল? গোবিন্দের দিকে তাকালেন প্রভু: অনর্থক দুঃখ দেবার জন্যে আমাকে কেন সুস্থ করলে?

যখন স্বপ্নে বা দৈবাৎ আমি কৃষ্ণকে দেখি, বললেন প্রভু, আমার দুই শত্রু এসে উপস্থিত হয়। এক শত্রু আনন্দ, আরেক শত্রু মদন। হায়, প্রেমানন্দও আমার শত্রু। প্রেমানন্দে যে সেবানন্দে বাধা পড়ে। তার পর মিলনের লালসায় চিত্তে মত্ততা জাগে। দুয়ে মিলে আমার অভিনিবেশ হরণ করে নেয়। নয়ন ভরে আর দেখা হয় না।

রাত্রিদিন প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে অবস্থান করছেন আর সর্বক্ষণ তাঁর পার্শ্বে গোবিন্দ জেগে রয়েছে। তার সাধনা অতন্দ্র সাধনা। তার ভাগ্যই তার ভাগ্যের তুলনা।

প্রভুর অন্তর্ধানের পর গোবিন্দের কাজ ফুরিয়ে গেল। চৈতন্যহীন নীলাচলে আর থাকতে পারল না, বৃন্দাবনে চলে গেল।

ভক্তের যে দুঃখ তাও ভগবৎ প্রেমেরই সম্বর্ধক। ভগবানের দেওয়া দুঃখ ভক্তের পক্ষে আনন্দের সমতুল। ভক্তের আর্তি ভগবৎ প্রীতি ব্যাকুলতা ছাড়া কিছু নয়। এই প্রীতির আস্বাদনেই ভক্তের সর্ব-দুঃখের বিস্মরণ।

না জানি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য।

মোরে যদি দিয়া দুখ তাঁর হৈল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য।।

শুধু নামই নিত্যানন্দে অবস্থিত করতে পারে। নামই অখিল রসময়। তার শুধু একমাত্র পথ। সে পথ ভক্তির, প্রপত্তির, শরণাগতির। দুঃখ-সুখের পথ নয়। শুদ্ধা রতির, চিৎ-রতির পথ।

গোবিন্দ নাম করতে বসল।

(ক্রমশঃ)

ভারতে হৃদরোগের শ্রেষ্ঠ ভেষজ আবিষ্কার

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমারিটাস অধ্যাপক বিশিষ্ট রসায়ন-বিজ্ঞানী ডঃ টি আর শেষাদ্রি এবং অধ্যাপক এস রঙ্গস্বামী ভারতে প্রাপ্ত একটি অতি কটু ও বিষাক্ত গুল্ম থেকে হৃদ্-রোগের এমন একটি ভেষজ আবিষ্কার করেছেন, যা অব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৫৮ সাল নাগাদ তাঁরা ভেষজটির পেটেন্ট গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভারতে তখন ভেষজটি তেমন সমাদর লাভ করে নি। পরে জার্মানীর একটি ভেষজ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ঐ ভেষজটি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এর কার্যকারিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন।

যে গুল্ম থেকে এই মূল্যবান ভেষজটি নিষ্কাশন করা হয়েছে, সেটি বিজ্ঞানের ভাষায় 'থেভেটিয়া নেরিফোলিয়া' নামে পরিচিত। ভারতের সর্বত্র এই গুল্মটি জন্মায়। এর সোনালী ফুলের জন্যে কেউ কেউ শখ করে বাগানেও এই গুল্মের চাষ করেন। এই গুল্মটি থেকে নিষ্কাশিত স্ফটিক-স্বচ্ছ বিশুদ্ধ ভেষজটির নাম হচ্ছে 'পেরু-ভোসাইড'।

এ দেশে ভেষজটি নিয়ে বহু পরীক্ষা চালানো হয়। বিদেশেও কয়েক শত রোগীকে ভেষজটি খাওয়ানো হয়। সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়, হৃদ্-রোগের চিকিৎসায় পেরুভোসাইড-এর কার্যকারিতা অব্যর্থ। এই ভেষজ প্রয়োগ করে বহু রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা গেছে। এবার ভারতে ব্যাপকভাবে ভেষজটি প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পেরুভোসাইড কেবল ভারতের হৃদ্-রোগীদের সুস্থ করে তুলবে না, অদূর ভবিষ্যতে একান্ত প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অর্জনেও এই ভেষজটি প্রভূত সাহায্য করবে।

বিজ্ঞানের কথা

প্রাণের উৎস সন্ধানে (৩)

পরিণত বয়সে মানুষ তথা অন্যান্য জীবদেহে হাজার হাজার কোটি জীবকোষের অস্তিত্ব দেখা যায়। এরা সবাই হচ্ছে আদি-পুরুষ নিষিক্ত ডিম্ব-কোষের বংশধর। এই আদিম জীব-কোষটি আপনাকে প্রথম দ্বিধা-বিভক্ত করে জন্ম দেয় দুটি অনুরূপ নতুন জীবকোষের। এদের প্রত্যেকটি আবার অনুরূপ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করে দুটি নতুন জীব-কোষ। এই প্রক্রিয়ার অবিরত পুনরাবৃত্তির ফলে জীবকোষের সংখ্যা ক্রমশ বহুগুণ বেড়ে যায়। একে বলা হয় জীবকোষের বিভাজন।

ডি-এন-এ যুগ্মাণুর স্বতঃ-বিভাজনের ফলেই জীবকোষের এই বিভাজন ঘটে। কি প্রক্রিয়ায় এই বিভাজন ঘটে বিজ্ঞানীরা তা বর্ণনা করেছেন। ডি-এন-এ'র অসাধারণ ক্ষমতা হচ্ছে সে নিজের অনুকৃতি নিজেই গড়ে তুলতে পারে। এই প্রজনন-ক্ষমতার দরুণই জীবের বংশবৃদ্ধি ঘটে ও তার বংশ-ধারা বজায় থাকে। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমত ডি-এন-এ'র যুগ্মাণুর এক প্রান্ত খুলে যায়। ফলে ঐ প্রান্তের দুই বাহুর মধ্যে জৈবক্ষারাণুর পারস্পরিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কোষকেন্দ্রে বিশিষ্ট জৈবক্ষারাণুযুক্ত ডিঅক্সি-রিবোফস্ফেটের বহু একক-অণু সর্বদা বর্তমান থাকে। আহার্য-দ্রব্যের পরিপাক ও বিপাক থেকে এদের সৃষ্টি হয়। ডি-এন-এ'র মুক্ত প্রান্তের দুই বাহুতে অবস্থিত ক্ষারাণুর সঙ্গে এসব একক-অণুতে অবস্থিত যথাযথ ক্ষারাণু জুড়ে যায়। এভাবে একটি আদিম ডি-এন-এ যুগ্মাণু থেকে অবিকল তারই অনুরূপ দুটি নতুন যুগ্মাণুর উৎপত্তি হয়।

আগেই বলা হয়েছে, দেহ-কোষে প্রোটিন সৃষ্টি বা সংশ্লেষণের কাজে ডি-এন-এ তার কর্মীদল আর-এন-এ'কে নিযুক্ত করে। প্রোটিন সৃষ্টির কাজে দু জাতীয় আর-এন-এ দরকার হয়। একদলকে বলা হয় বার্তাবাহী আর-এন-এ এবং অপর দলকে পরিবাহক আর-এন-এ। বার্তাবাহী আর-এন-এ'র কাজ হচ্ছে প্রোটিন সংশ্লেষণের যাবতীয় বিধিবিধানের নির্দেশ বহণ করা। এক এক রকম প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্যে এক একরকম আর-এন-এ দরকার। কাজেই মানুষের দেহে যতরকম প্রোটিন আছে, বার্তাবাহী আর-এন-এ'রও থাকবে অন্তত তত রকমের। আবার এক একরকম পরিবাহক আর-এন-এ শুধু এক একরকম বিশিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডকে আকর্ষণ করতে ও ধরে রাখতে পারে। কাজেই মানুষের শরীরে যতরকম অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, অন্তত তত রকমের থাকবে বিশিষ্ট আর-এন-এ।

জিনের বার্তা-সংকেত প্রথমে ডি-এন-এ থেকে আসে আর-এন-এতে। এটিই হল বার্তা প্রেরণের প্রথম পদক্ষেপ এবং এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'প্রতিলিপি গ্রহণ' বা 'ট্রানস্ক্রিপশান'। তার পরের পদক্ষেপে বার্তাবাহী আর-এন-এ থেকে সংকেত চলে আসে প্রোটিনে। এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'অনুবাদ করণ' বা 'ট্রানশ্লেশান'। একটি বিশেষ সূত্র অনুযায়ী এক একটি পরিবাহক আর-এন-এ এক একটি বিশিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডকে আকর্ষণ করে; তাকে বলা হয় 'কোডিং'।

বার্তাবাহী আর-এন-এ'র কাজ হল ড্রিল মাস্টারের মতো। পরিবাহক আর-এন-এ ঘুরে ফিরে যথোপযোগী অ্যামিনো অ্যাসিডকে ধরে নিয়ে বার্তাবাহী আর-এন-এ'র সামনে হাজির করে এবং নিজের দেহের ক্ষারাণুর সাহায্যে বার্তাবাহী আর-এন-এ'র যথাযোগ্য ক্ষারাণুর সঙ্গে জুড়ে যায়। বিভিন্ন পরিবাহক আর-এন-এ দল এভাবে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের অণু পাশাপাশি সাজিয়ে প্রোটিন অণু সৃষ্টি করে। পরিশেষে প্রোটিন অণুটি বার্তাবাহী আর-এন-এ'র যুগ্মাণু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ।

প্রাণের উৎস সন্ধানের পথে যেসব বিজ্ঞানী অক্লান্ত সাধনায় উপরোক্ত নানা বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেছেন এবং যাঁরা এ বিষয়ে গভীর গবেষণায় নিমগ্ন আছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বীডল, টেটাম, লেডারবার্গ, কর্নবার্গ ও চোরা, উইলকিনস্, ক্রিক, ওয়াটসন প্রমুখ। এঁরা সকলেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মান নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁদের অনন্য অবদানের স্বীকৃতিতে। তাঁরা শুধু প্রাণের রহস্য উদ্ঘাটনে ক্ষান্ত থাকেন নি, কৃত্রিম উপায়ে প্রাণসৃষ্টির প্রয়াসও করেছেন।

ডঃ কর্নবার্গ ১৯৫৯ সালে কৃত্রিম উপায়ে ডি-এন-এ সৃষ্টি করেছিলেন। সেই ডি-এন-এ ছিল ক্ষুদ্র একরকম জীবাণুর (ভাইরাস)। সম্প্রতি ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী গবেষণাগারে নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ সংযোগে কৃত্রিম উপায়ে ডি-এন-এ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। ভাইরাসে যে প্রকৃতিদত্ত ডি-এন-এ থাকে তার সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই এই কৃত্রিম বস্তুটির। ভাইরাসের প্রকৃতিদত্ত ডি-এন-এ'র মতোই এই বস্তুটি জীবকোষের মধ্যে ক্রিয়াকল্প শুরু করে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন গোষ্ঠীর ভাইরাস সৃষ্টি করতে থাকে

বিজ্ঞানীদের এই অনন্য গবেষণার ফলে মানুষের পক্ষে আজ গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে জীবন সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা সত্য সত্যই একদিন প্রাণ সৃষ্টি করতে পারবেন কিনা তা আজ আমরা সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। তবে একথা আজ আমরা আস্থার সঙ্গে বলতে পারি, জীবকোষে ডি-এন-এ অণুর গঠনবিন্যাসের ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে

বিজ্ঞানীরা হয়তো একদিন দেহের যাবতীয় ব্যাধি, এমন কি বার্ধক্যের জরাকেও জয় করতে সমর্থ হবেন এবং সেদিন বোধ হয় খুব দূরবর্তী নয়।

মৃতসঞ্জীবনী সুধার সন্ধানে মানুষের অভিযান বহু যুগ আগে থেকে শুরু হয়েছে এবং আজও তা রয়েছে অব্যাহত। একেই ভিত্তি করে প্রাচীন যুগে কিমিয়া-বিদ্যা (অ্যালকেমি) গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে কিমিয়াবিদ্যা সংশোধিত ও সম্প্রসারিত হয়ে পরিণতি লাভ করে রসায়ন-বিজ্ঞানে। কিমিয়াবিদ্যার কর্মীদের যে স্বপ্ন ফলবতী হয় নি, আধুনিক যুগে বিজ্ঞানীদের অসাধারণ কৃতিত্বে সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে! মৃতদেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার করা মানুষের পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না। কিন্তু প্রাণের যে নিগূঢ় রহস্য বিজ্ঞানীরা আজ আবিষ্কার করেছেন, তাতে বৈজ্ঞানিক পন্থায় ডি-এন-এ'র গঠনবিন্যাসে তারতম্য ঘটিয়ে মানুষের পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে প্রজনন-প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ এবং তাঁর দেহ-মনের ধর্ম ইচ্ছামত পরিবর্তন সাধনের। কিন্তু সেদিন বিজ্ঞানীরা ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সৃষ্টি করবেন, না মানুষকে দেবতায় পরিণত করবেন? এই প্রশ্নের উত্তর আজ দেওয়া সম্ভব নয়, উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ।

মানুষের মতো শ্বাস গ্রহণকারী যন্ত্র

মানুষের মতো শ্বাস গ্রহণ করতে পারে, এমন একটি যন্ত্র বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি উদ্ভাবন করেছেন। ডুবুরী এবং মহাকাশ-চারীদের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে সাহায্য করবার উপযোগী যন্ত্র ও উপকরণাদি এই নতুন যন্ত্রটির সাহায্যে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

যন্ত্রটি মানুষের মতোই নির্মল বায়ু গ্রহণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। যন্ত্রটিকে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে এর সাহায্যে একজন বা একসঙ্গে দশজন মানুষ কি পরিমাণ শ্বাস গ্রহণ করতে পারে তা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে 'পালমনারী সিমুলেটর'।

যন্ত্রটি একটি বড় আকারের আলমারির মতো। এর মধ্যে হুইল, তার, ব্লাডার, লিভার, পিস্টন এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বৃত্তাকারে, কোনটা ওপর থেকে নিচে, আবার কোনটা সামনে থেকে পেছনে চলাফেরা করে। আলমারির ভেতর থেকে এক ইঞ্চি ব্যাসের একটি নল বাইরের দিকে প্রসারিত। এই নলের সাহায্যেই যন্ত্রটি শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমুদ্রের তলায় অনুসন্ধানকারী যানে বা বড় আকারের মহাকাশযানে বায়ু চলাচল-ব্যবস্থায় সাহায্যকারী যন্ত্রপাতি পরীক্ষা। আগে মানুষের ওপর শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে সাহায্যকারী যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করা হত; এখন মানুষের পরিবর্তে এই নতুন যন্ত্রটিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই যন্ত্রের উদ্ভাবক হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্টিংহাউস গবেষণাগারের চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিভাগ।

—শুভঙ্কর

পাখীদের জন্মনিয়ন্ত্রণ

বর্তমান পৃথিবীতে একটি প্রধান চিন্তার বিষয় হোলো বর্ধমান জনসংখ্যা। এই শতকের শেষেই পৃথিবীর লোকসংখ্যা ৬০০ কোটিতে দাঁড়াবে, জনসংখ্যাতত্ত্ব-বিদেরা এমন আশংকা প্রকাশ করছেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র উঠে পড়ে লেগেছে। কি করে এই মহা সমস্যার সমাধান করা যায়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এখনও পৃথিবীর জনসমষ্ঠির একটা বৃহৎ অংশ জনসংখ্যা হ্রাস পরিকল্পনার বিরোধিতা করে চলেছেন।

প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডবল্যু টিস্কলার কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এক বিশেষ বক্তৃতামালায় কথা প্রসঙ্গে বলেন যারা এখনো জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী তারা যে শুধু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে অজ্ঞ তাই নয়, তারা ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অমানুষিকভাবে দায়িত্বহীন। এবং তিনি আরও বলেন জন্মনিয়ন্ত্রণ নতুন কোনও ব্যাপার নয়—এটা পুরোপুরি প্রাকৃতিক ঘটনা।

এ প্রসঙ্গে মানবেতর প্রাণীরা কিভাবে তাদের সংখ্যা বা জন্মনিয়ন্ত্রণ করে তা আমাদের কৌতূহলের বিষয় হোতে পারে। যেখানে জীবজগতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা মোটামুটিভাবে ক্রমবর্ধমান, অন্যান্য প্রাণীরা কিন্তু তাদের সংখ্যা প্রায় একই রেখেছে বা রাখতে পেরেছে। খাদ্য এবং বাস-স্থানের অভাবই তাদেরকে প্ররোচিত করেছে তাদের নিজস্ব উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের। এ বিষয়ে তারা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে আছে।

বিশেষ করে পাখীদের জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ অনুধাবনযোগ্য। পশ্চিম জার্মানীর প্রাণীতত্ত্ববিদরা এই বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা করছেন। নতুন নতুন তথ্যও আহরিত হচ্ছে পাখীদের জীবন সম্বন্ধে। অবশ্য তারা যে-ভাবে সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে তা আমাদের কাছে পৈশাচিক মনে হতে পারে। ভবিষ্যত বংশধরদের টিকে থাকা এবং সুখ-সুবিধের জন্যে তারা যা করে—তা অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক এবং কল্যাণপ্রসূত।

পাখীদের ক্ষেত্রে সাধারণ ধারণা হোল পিতামাতা পাখীরা তাদের শাবকদের মধ্যে কাউকে কাউকে একেবারে আহার যোগায় না, বিশেষ করে দুর্বল যারা এবং যারা সব-চেয়ে কমবয়সী তাদের। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ঠিক নয়। বিশিষ্ট প্রাণীতত্ত্ব-বিদ এবং বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষায় আসল তথ্যগুলি ধরা পড়েছে এবং সেইসব প্রাপ্ত তথ্য থেকে বিশিষ্ট কতকগুলি ব্যাপার জানা গেছে।

আসলে পক্ষী পিতা-মাতা যখন খাবার নিয়ে আসে যে শাবক সকলের আগে খাবার জন্যে হাঁ করে এগিয়ে আসে তাকেই আগে খাওয়ানো হয়। পরের পর এইভাবে শেষ-পর্যন্ত চলে। পাখীদের খিধে পায় আবার খুব তাড়াতাড়ি। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে ১৮দিনে একটি নবজাতককে ৭৭৫৩ বার খাওয়াতে হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি দু মিনিটে একবার করে। পিতামাতা একবার করে খাবার নিয়ে আসে এবং একজনকে খাইয়ে আবার খাবারের খোঁজে বেরিয়ে যায়। এইভাবে যখন শেষের দিকের বাচ্চাকে খাওয়াতে যায়, ততক্ষণে একেবারে প্রথম যে খেয়েছে তার খুব ক্ষিধে পেয়ে যায় এবং তার চোখেমুখে খিধের ছাপ খুব প্রকট হয়ে ওঠে। সে তখন সকলের আগেই খাবার জন্যে মুখ খোলে এবং তাকেই আবার খাওয়ানো হয়। ক্রমাগত এইভাবে চললে শেষের দিকের শাবকেরা খাবার পায় না এবং দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মারা যেতেও পারে। প্রচুর খাবার পাওয়া গেলে এই ধরনের ঘটনা হয়ত খুব বেশী ঘটে না, কিন্তু সাধারণভাবেই খাদ্যাভাবই এই ট্র্যাজেডির মূল কারণ। কিন্তু একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, পিতা-মাতা দুর্বল বা শিশু দেখে কাউকে খাবার থেকে ইচ্ছে করে বঞ্চিত করে না।

এছাড়াও আরও আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কারণও রয়েছে—ভালভাবে খাবার পেয়েছে যে শাবকেরা তারা একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চালাকও হোতে থাকে। দূর-বর্তী পাখার ঝাপটানি শুনেই বুঝতে পারে তাদের পিতা-মাতা আসছে কিনা এবং সেই অনুযায়ী আগে থেকেই খাবার জন্যে হাঁ করে থাকে। এর ফলে প্রথমে তারাই খাবার পায়। যারা একেবারে শেষের দিকে জন্মেছে তারা দুর্বল ও শিশু রয়ে গেছে—তারাই বেশী বঞ্চিত হয়। বিশেষ করে যেসব পাখীরা একসঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে এবং বাচ্চার জন্ম দেয় তাদের মধ্যেই এই ব্যাপার-গুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পাখীদের মধ্যে যা দেখা যায় তা কখনোই ঘৃণ্য বা পৈশাচিক নয়, বরং কষ্টে অর্জিত খাদ্য যাতে সর্বোত্তম ব্যবহারে লাগে তার জন্য তারা সবসময়ই ভেবে থাকে। পৃথিবীর মানুষের হাতে যাতে শিকার না হয় তারই জন্যে এই নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। আর এই কারণেই যেখানে অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীরা ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে, পাখীরাই সেক্ষেত্রে একমাত্র প্রাণী যারা সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃত।

—তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ২৬ ।।

নিস্তারিণী এবার যাকে বলে চোচাপটে ধরে পড়ল। 'এসেছিস যখন একেবারে বিয়ে করে যা।'

চমকে ওঠে গণেশ, 'কী বলছ মা যা তা—আমার আবার বিয়ে কি! বিয়ে যে জন্যে তার কি কিছু বাকী আছে! ওসব ছেড়ে দাও। ঘরবাসী করার জন্যে বিধাতা পাঠায় নি আমাকে।'

'রেখে বোস দিকি। থাম্। বয়েসকালে ওসব একটু আধটু কে না করে। তাই বলে ঘর-কন্না করবি নি কি! কোন কথাই শুনব না। এবার আমি বে দিয়ে ছাড়ব।'

'না না, ওসব পাগলামি ক'রো না,' রীতিমতো ব্যস্ত হয়ে ওঠে গণেশ, একটু যেন সন্ত্রস্তও, 'আজ আছি কাল নেই—কোথায় কখন চলে যাই, এই তো কত বছর বাদে ফিরলুম। সে এমন কাজ নয় আর এমন সংগও নয় যে বৌ-ছেলে নিয়ে ঘুরব! মিছিমিছি একটা ভদ্দরলোকের মেয়ে নিয়ে এসে নাজেহাল করা!'

'কেন যাদের দলে তুই কাজ করিস—সেই বাবু—কি পেফেছার নাকি কি যেন বলে—সে তো শুনলুম বে-কন্না লোক, তার বৌ-মেয়ে তার সংগে সংগে ঘোরে!'

'সে ঐ একজনই। তার দল, সে মালিক, তার ওসব শোভা পায়। আর কে গেছে বৌ নিয়ে? দলে অন্তত দুশো লোক কাজ করে—তারা সকলেই একা একা থাকে।'

'তেমনি তারা বছর দেড়-বছর অন্তর ফিরেও আসে। সে তো তোর মুখেই শুনলুম। তোকেও তো আসতে হয়েছিল তাদের সংগে। নেহাৎ ঘরে কোন টান নেই বলেই বুড়ো মা আর একটা দিদি—তার আর টান কি, মা-বোন কি কেউ আর আপন ভাবে—তাই কলকাতায় ফিরিস না। টান থাকলেই আসবি। বৌ না হয় এখন এই-খানেই রইল। তা বলে কখনও ঘরকন্না করবি না, চিরকাল একটা আধদামড়া মাগীকে নিয়ে পড়ে থাকবি—এ আবার কি কথা! মেয়েটা তো ঐ কীর্তি করে বসে রইল—একরকম বাদেছরাদেরই গেল; তুমিও অমনি করে জীবন কাটাও। পূর্বপুরুষ এক গন্ডুষ জলও পাবে না। তোর জন্ম-দাতার বংশটা রেখে যা হয় কর্ অন্তত!'

তবুও হাল ছাড়ে না গণেশ, অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, 'কত বয়স হয়ে গেল তার ঠিক আছে? চেহারারও তো এই হাল দেখছ—আর কদ্দিনই বা বাঁচব। মিছিমিছি একটা মেয়ের সব্বনাশ করি কেন! শুধু শুধু নিমিত্তের ভাগী হওয়া!'

'তুই থাম দিকি! তোর আবার বয়েস কি? কত লোক পঞ্চাশ-ষাট বছরে দোজবরে তেজবরে বিয়ে করছে! তুই এত বুড়ো হয়ে গেলি একেবারে! ওসব বাজে কথা শুনছি না, বিয়ে আমি এবার তোর দোবই।'

গণেশ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখনকার মতো কথাটা চাপা দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করে। কিন্তু নিস্তারিণী ছাড়ে না। ঘরের দরজা আটকে দাঁড়ায়। বলে, 'একবার ছাড়া পেলেই পালাবে তুমি, আবার হয়ত লম্বা ডুব মারবে। তোমাকে বিশ্বাস নেই। তুমি আমাকে কথা দিয়ে—আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি গেলে যাও, তবে ছাড়ব।'

অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে গণেশ, বলে, 'আচ্ছা, দিব্যি গাল্‌ছি, এই এখন, আজ অন্তত পালাব না। রাত্তিরে ঠিক ঘুরে আসব। আমায় একটু ভাবতে দাও দিনেন। বিয়ে বললেই বিয়ে—এ কি কাঁচখোকা আছি এখনও! ভবঘুরে লোক চাল নেই চুলো নেই—দেশভুঁই পর্যন্ত নেই বলতে গেলে, কোথায় কখন থাকি তার ঠিক নেই—সারা জীবনটাই বেদের টোল ফেলে থাকা বলতে গেলে—বিয়ে করে বসব কি? এ কি ছেলে-খেলা, না তামাশার জিনিস! একা যা খুশি করি—কিছু ভাববার নেই, পুরুষমানুষ সাবালক—সে আলাদা কথা। একটা মেয়েকে জড়ানো—'

আরও অনেক কথাই বলে গণেশ, কিন্তু নিস্তারিণী নাছোড়বান্দা। শেষে ছেলের পায়ের কাছে ঢিপ্‌ঢিপ্ করে মাথা খুঁড়তে শুরু করে। ভয় দেখায় যে, না খেয়ে এই দরজা আগলে পড়ে থাকবে তিন দিন—তেরাত্তির করবে। তারপরও ছেলে যদি বিয়ে না করে তো সেও যে দিকে দুচোখ যায় চলে যাবে, গঙ্গায় গিয়ে ডুববে, মা গঙ্গার বুকে এখনও জলের অভাব হয়নি।

বিপন্ন গণেশ সুরোর মুখের দিকে তাকায়।

'দিদি, তুইও কি এই দলে?'

সুরো জোর করে কিছু বলতে পারে না। গণেশকেও না, মাকেও না। অন্য ব্যাপার হলে জোর করত, এ ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। গণেশের অবস্থা সে বোঝে কতকটা—কিন্তু মায়ের কথাটাও উড়িয়ে দেবার নয়। সে বিপন্ন কন্ঠে বলে, 'মায়ের কথাটাও ভেবে দ্যাখ খোকা। আমার দ্বারা তো কোন সাধ-আহ্লাদই পুরল না। তাছাড়া বাবার একটা জলপিন্ডির ব্যবস্থাও আছে। সেটাও যদি হয় কিছু—। বৌ না হয় তোর আমার কাছেই থাকবে, আমি বেঁচে থাকতে তার খাওয়া-পরা থাকার কোন অভাব হবে না। তুই যদি অন্তত মাঝে মাঝে আসিস, দু-একটা ছেলেমেয়ে হয়—তাহলেও মা তবু ভুলে থাকতে পারে। আবার তার সংসারটা বজায় হয়। আর চাই কি, যদি ছেলেমেয়েই হয় কিছু—এদিকে মায়া পড়তে বাধ্য। তখন চেষ্টা করলে এদেশেই রুজী-রোজগারের ব্যবস্থা হতে পারবে। চিরদিনই যে এমনি করে ভবঘুরে বাউন্ডুলে হয়ে কাটাবি, জীবনটা এমনিভাবে নষ্ট করবি ইচ্ছে করে—তারই বা কি মানে! মায়া সেখানেও যেমন পড়েছে, এখানেও তেমনি পড়তে পারে। এই কি খুব সুখে আছিস তুই খোকা, সত্যি করে বল দিকিনি!'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গণেশ বলে, 'জানি না, যা খুশি করো তোমরা। তবে, না করলেই ভাল করতে একাজ। আমাকে যে কোনদিন ঘরবাসী গেরস্ত করতে পারবে তা মনে হয় না। মিছিমিছি—আমার জন্যে অনেকেই কষ্ট পেলে আবার হয়ত ঐ একটা একরত্তি নিষ্পাপ মেয়েকে ধরে আনছ কষ্ট দেবার জন্যে।'

'আমার জন্যে অনেকেই কষ্ট পেলে' গণেশের এ কথাটার মধ্যে যে কোন বিশেষ অর্থ আছে তা বোঝে নি সুরবালা। কথার কথা বলেই ভেবেছিল। সে অনেকের মধ্যে নিজেরাও আছে মনে করেছিল। সাধারণভাবে ব্যর্থ জীবনের আক্ষেপোক্তি।

কিন্তু অর্থ একটা সত্যিই ছিল।

কথাটা গণেশের মনের এক গোপন বেদনাকোষে জমা হয়েছিল, সঞ্চিত হয়েছিল অনেকদিন ধরেই; আজ অনেক দুঃখে, অনেকখানি বিচলিত হবার ফলেই বেরিয়ে এসেছে।

গণেশের ইতিহাস বেশির ভাগই জানে না এরা। জানা সম্ভব নয়। ওর

জীবনের বহু নাটকই এদের অজ্ঞানে অভিনীত হয়েছে। বহু ভালবাসা ওকে বাঁধতে চেষ্টা করেছিল. ভবঘুরে নোংরা বেদেনী থেকে ভেল্কিওলা জাদুকরের বৌ পর্যন্ত—কামরূপ কামাখ্যার পাণ্ডার ঘরের মেয়েরা থেকে আসামের পাহাড়ী অঞ্চলের অবোধ আরণ্য নারী—অনেকেই। তাদের অভিশাপে লিখিত হয়ে আছে সে সব ইতিহাস। মানুষগুলো যাই হোক তাদের ভালবাসায় খাদ ছিল না। ......ওর রূপই কাল হয়েছিল সেই মেয়েদের। রূপ, হাসি আর কথা বলার আশ্চর্য শক্তি। আজ আর সে সবের কিছুই অবশিষ্ট নেই হয়ত—দৈহিক সব ঐশ্বর্যের একটা বাঁধা পরমায়ু আছে. তারপর ক্ষয় শুরু হয়। আগেও হয়. পরমায়ু শেষ হবার আগেও। কারণ এদের আঘাত সহ্য করারও সীমা আছে একটা। ওরও হয়ত কিছু আগেই গেছে. সহ্যসীমা অতিক্রান্ত করাতেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে সব। তবু একদিন সকলের মন হরণ করার মতো সম্পদ ছিল তার সত্যিসত্যিই—প্রচুর ছিল।

রূপই কাল হয়েছিল কি হিমি আর তার বোনের বেলাতেও?

রূপ—তার সঙ্গে গুণও হয়ত। তার জাদু দেখানোর আশ্চর্য হাত, তার বুদ্ধি; তার হৃদয়বত্তা—সব জড়িয়েই কাল হয়েছিল দুই বোনের। অন্তত একজনের তো বটেই। প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুই বোনের একজনকে সরে যেতে হয়েছে, 'সর্বাপেক্ষা সমর্থই টিকে থাকে শেষ পর্যন্ত' ইংরেজী ঐ প্রবাদবাক্যকে সফল করে। একজনই আর একজনকে সরিয়ে দিয়েছে। অন্তত গণেশের তাই বিশ্বাস। খেলা দেখাতে দেখাতেই প্রাণ দিয়েছে বটে—দলের অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস, মন ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে অনেকটা ইচ্ছে করে আত্মহত্যার মতো করেই প্রাণ দিয়েছে—কিন্তু সেটা দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা না হত্যা। সে বিষয়ে রীতিমতো সন্দেহ আছে গণেশের। আজও আছে।

অন্তত শেষেরটা যে হত্যা—এই সাম্প্রতিক দুর্ঘটনাটা, সে সম্বন্ধে গণেশ নিশ্চিত। নিশ্চিত জেনেছে বলেই সহ্য করতে পারে নি, ছুটে চলে এসেছে। অনেক দিয়েছে সে আশা আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ—সমস্ত জীবনটাই নষ্ট করেছে, নষ্ট করতে দিয়েছে ঐ মেয়েটাকে—সব খুয়েই এক নেশায় বুঁদ হয়ে বসে আছে—তবু দেওয়ারও একটা সীমা আছে। সে সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবার।

একটা কথা সুরবালা ঠিকই ধরেছিল।

গণেশ পালিয়েই এসেছে এবার। তা নইলে আর হয়ত কোনদিনই এখানে আসা হত না। মা বোন কলকাতা—এসব তো ভুলতেই বসেছিল। সে যেন কতদিনকার কথা, কোন বিগত জন্মের। কঠিন আঘাতেই সেই সকল চৈতন্য-আচ্ছন্নকরা যবনিকাটা সরে গেছে— দিশাহারা হয়ে বেরিয়ে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেছে বাড়ির কথা, মা-বোনের কথা। দুরন্ত অবাধ্য ছেলে যেমন বাড়ি-ঘর মা-বাবা সব ভুলে পড়ায় পাড়ায় রাস্তায় রাস্তায় দুষ্টুমি করে বেড়ায়—কিন্তু পড়ে গেলে কি চোট লাগলেই 'মা' বলে কেঁদে উঠে বাড়িতে মার কাছে ফিরে আসে, গণেশও তেমনিভাবে ছুটে এসেছে। চোখের কোণে যে কালি এবং দৃষ্টিতে যে ক্লান্তি লক্ষ্য করেছিল সুরো—তা শুধুই অনিয়ম অত্যাচারের ফল নয়। আরও বেশী কিছু—অনেক বেশী।

অথচ এ কাউকে বলবারও নয়।

অপরাধিনীর আবেষ্টনী থেকে, মৃত্যু-রূপার সর্বনাশা নাগপাশ থেকে কোন মতে বেরিয়ে এসেছে বটে—কিন্তু পালিয়ে কি থাকতে পারবে?

সর্বনাশিনী এখনই কি ফিরে টানছে না।.....সেই অপ্রতিহত অমোঘ টান সে যে নিজের শিরায় শিরায় নাড়ীতে নাড়ীতে এখনই অনুভব করছে। হয়ত সে সাংঘাতিক আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণও করতে হবে একদা। কে জানে!......

নরহন্ত্রীকে শাস্তিই কি দিতে পারবে কোন দিন?

তাও বোধহয় পারবে না।

সম্ভব হলেও পারবে না।

আর সেই কারণেই কাউকে কোনদিন বলতে পারবে না—কিসের জন্যে ক মাসে এমন করে বুড়িয়ে গেছে সে—কেন এমন মড়ার দশা দাঁড়িয়েছে তার। আর কেনই বা এমন করে সব ফেলে পালিয়ে এসেছে এবার—একটা ব্যাগ মাত্র সম্বল করে। কেন মনকে বার বার শাসাচ্ছে যে আর কোনদিন যেন ফেরার নাম না করে সে। আর কোনদিন না।

মার কাছে দিব্যি গেলে, মাকে কথা দিয়ে বেরিয়ে অনেকটা যেন হালকা বোধ হল মাথাটা। একটু নিশ্চিন্তও হল। আত্মরক্ষাই তো করতে চাইছে—কে জানে যদি সত্যিই একটা উপায় হয়ে যায় এখানে। যদি সত্যিই মন বসে, এখানকার টান ওখানের চেয়ে প্রবল হয়ে ওঠে। তাহলে তো বেঁচে যায় সে।...হয়ত এ ভগবানেরই হাত। তাঁর ইচ্ছাতেই হয়তো মা এমন নাছোড়বান্দা হয়ে উঠল।...ভালই হয়েছে দিব্যিটা গালিয়ে নিয়েছে। ঘটনাকে তার নিজের পথে নিজের খাতে বইতে দেওয়াই ভাল।...

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গণেশ অন্যদিনের মতো থিয়েটারের দিকে গেল না। হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার দিকে চলে এল। সন্ধ্যার বেশী দেরি নেই তখন। আস্তরণ পড়ার মতো গঙ্গার ওপর একটা ধোঁয়াটে ম্লান সন্ধ্যা নামছে একটু একটু করে। কলকাতায় কলুষিত বিষণ্ণ সন্ধ্যা।

প্রতিজ্ঞা করে এসে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে যেমন—তেমনি, এতদিন প্রাণপণ চেষ্টায় যে স্মৃতিটা কতক ভুলতে পেরেছিল, সেইটেই আবার নতুন ক'রে মনে পড়েছে। এই একটা খোঁচাতেই শুকিয়ে আসা ঘা দগদগিয়ে উঠেছে আবার।

বড়ই অস্থির হয়ে উঠেছে মনটা। নিজের ওপর বিরক্তিতেই আরও এত অস্থির হয়েছে।

অত্যন্ত দুর্বল সে। চেহারায় যতটা পৌরুষ মনে যদি তার অর্ধেকও থাকত!

পুরুষের শক্ত হওয়া উচিত, সব বিষয়েই। সেই শক্তটাই হতে পারে না সে কিছুতে। তার স্বভাবের এটা মস্তো দোষ যতটা বেপরোয়া সে নিজের সম্বন্ধে যতটা উদাসীন—ততটা কেন, তার অর্ধেকও যদি কঠিন হতে পারত!

কঠিন হ'তে পারলে, কঠোর হ'তে পারলে, নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত ও গণ্য করাতে পারলে—আজ আর এই কাণ্ডটা হ'ত না। এই দুর্ঘটনাটা।

দুর্ঘটনা?

দুর্ঘটনা বলেই মনে করা ভাল। নইলে গণেশের আর নিজের কাছেও মুখ দেখাবার উপায় থাকে না।

বেচারী তাম্পি!

কোন দোষ নেই তার। শুধু গণেশকে ভালবাসত, এই তার অপরাধ।

এই অপরাধেই প্রাণটা দিল সে।

অথচ গণেশ, এরকম একটা কিছু বিপদ ঘটতে পারে জেনেও সাবধান হয় নি। হ্যাঁ, জানত সে। জানা উচিত ছিল। ঐ স্ত্রীলোকটাকে চিনত সে। তা সত্ত্বেও সে সতর্ক হয় নি, সতর্ক করার চেষ্টা করেনি। ঐ ছেলেটার ভালবাসা, তার ভক্তি তার আপ্রাণ সেবা গ্রহণ করেছে অক্লেশে অনায়াসে—অম্লান বদনে. তার বদলে কিছুই দিতে পারে নি, বিপদে রক্ষা করতে তো পারেই নি।..

কোথা থেকে এসে যে জুটেল ছেলেটো!

প্যারালেল বারের খেলা দেখাত তাম্পি। অন্য জিমন্যাস্টিক খেলা শিখত সেই সঙ্গে। ষোল-সতেরো বছর বয়স হবে মাত্র—যখন সে প্রথম আসে। নিতান্তই ছেলেমানুষ। ঐ বয়সেই আসে অবশ্য বেশির ভাগই, আরও অল্পবয়সে আসে বরং। ছেলেবেলা থেকে না শিখলে এসব খেলায় নিপুণ হ'তে পারে না কেউ। আর নিপুণ না হলে, হিসেব নির্ভুল না হ'লে সার্কাসে খেলা দেখানো যায় না। এতটুকু আধ মুহূর্তের ভুল হ'লেও দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। তাম্পিও নাকি আট বছর বয়স থেকে এই সব খেলা শিখছে। ওর বাবা খাওয়াতে পারত না বলে ওকে ইচ্ছে করে দিয়ে দিয়েছিল একজনের কাছে—সার্কাসের দলের এমনি এক খেলোয়াড়ের কাছে। তারপর অনেক হাত ও অনেক দল ঘুরে এদের দলে এসে পড়েছে। শুধু প্যারালেল বার নয়—রিংয়ের খেলাও ভাল জানত। উন্নতি করার খুব ঝোঁক ছিল, সেই ঝোঁকই সর্বনাশের কারণ হল ছেলেটার!

কোচিনের দিকে কোথায় যেন বাড়ি—প্রায়ই গল্প করত দেশের, পাহাড়ে জায়গা, ভারী সুন্দর দেশ তার। তার যেটা নিজস্ব গ্রাম, সেখানে সমুদ্র এসে পাহাড়ে আছড়ে পড়ে দিনরাত, চারিদিকে ঘন নারকেল বন—স্বর্গের মতো দেশ। কেউ যদি সেখানে শহর বানায়—ভাল ভাল হোটেল করে তো দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসবে দেখতে আর থাকতে।...

দেশ এত ভালবাসত, দেশের সম্বন্ধে এত গৌরববোধ, তবু দেশে যেতে চাইত না কখনও। বাবা ওকে বিলিয়ে দিয়েছে, মা বাধা দেয়নি—এই প্রচ্ছন্ন অভিমানে দেশে যাবার নামও করত না একবার। এদেশে এলেও দলের সঙ্গে সঙ্গে থাকত, মালপত্র ও পশু-পাখী পাহারা দেবার পালা যাদের—তাদের সঙ্গে সেও থেকে যেত। ইদানীং গণেশের সঙ্গে সঙ্গে থাকত—ছায়ার মতো ঘুরত পিছু পিছু।

ভারী মিষ্টি স্বভাব ছিল ছেলেটার, আর তেমনি ভক্তি করত ওকে। ময়লা প্রায়-কালো রঙ, একটু বেঁটে কিন্তু স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার। অল্প বয়স থেকে ব্যায়াম করার ফলে চেহারাটা ছিল যেন পাথর-কোঁদা, নিখুঁৎ। আর একটু ঢ্যাঙ্গা হ'লে সুপুরুষই বলা চলত।

এ দলে এসে গণেশের ম্যাজিক দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন কখনও দেখেনি—এমন হতে পারে তাও ভাবে নি। প্রথম দিনের সে বিস্ময় শেষ দিনটি পর্যন্ত কাটে নি তাম্পির, বিস্ময়টা ভক্তিতে পরিণত হয়েছে খানিকটা—এই পর্যন্ত। দেবতার মতোই অমানুষিক ঐশীশক্তিসম্পন্ন মনে করত গণেশকে। এসব কি মানুষ করতে পারে! তাম্পি খ্রীশ্চানের ছেলে. বাইবেল কিছু কিছু জানত; বলত. 'এতো মিরাকল। এ ভগবান পারেন আর লর্ড যেশু পারতেন। আপনি তো তাঁদের মতোই।' গণেশ ধমক দিলেও শুনত না। ওর এই ভক্তি নিয়ে অনেকেই হাসাহাসি করত—কিন্তু তাম্পি সে সব গায়ে মাখত না। সে সর্বদা চেষ্টা করত গণেশের কাছা-কাছি থাকতে। ওকে দেখলেও যেন তার শান্তি হ'ত, আর যদি কোন কাজে লাগতে পারল—গণেশ যদি কোন ফরমাশ করল তো কথাই নেই, কৃতার্থ হয়ে যেত তাম্পি, মনে করত হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেল।

ওর এই গায়ে-পড়া ভক্তিতে আর পুজো-পুজো ভাবে প্রথমটা খুবই বিরক্ত বোধ হ'ত গণেশের। দলের বাকী সকলে এ নিয়ে ঠাট্টা করত—তাতে তাম্পির কিছু এসে না গেলেও গণেশের বিশ্রী লাগত। কতদিন বকেছে ধমক দিয়েছে—কিন্তু তাম্পির ভক্তি বা বিশ্বাস টলাতে পারেনি। তার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে গণেশের কোন ঐশীশক্তি আছে—মানুষ কখনও এমন অসম্ভব অসম্ভব কাণ্ড করতে পারে না। এসব এমন কিছু না—হাতের কায়দা মাত্র—ইত্যাদি বোঝাতে গিয়েও কোন ফল হয় নি, ধারণা পালটানো যায় নি তার।

কিছুদিন বাদে ভক্তিটা সয়ে গেছে। অতটা আর অসহ্য থাকে নি।

সয়ে গেছে তার কারণ শুধু ভক্তি নয়—তার সঙ্গে সেবাও ছিল, ব্যক্তিগত সেবা—যেটা এখানে একেবারেই দুর্লভ। সরকারী 'কিচেন' অর্থাৎ একটা রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে এই পর্যন্ত, প্রত্যেককে কিছু দাসদাসী বা পাচক যোগানো সম্ভব নয়। সকলকেই যার যা

অপটু; তাকে দুর্ভোগ ভুগতে হয়। প্রেয়সী মেলা কঠিন নয় এখানে কিন্তু তারা কেউই গৃহিণী কি সেবিকা নয়। গণেশেরও শয্যা-সঙ্গিনীর অভাব ছিল না; শেষের দিকে অবশ্য একটিতেই এসে ঠেকেছিল, ব্যাঘ্র-রক্ষিকা ব্যাঘিনীর মতোই সকলকে সরিয়ে দিয়েছে, নিজের বোন ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিনী, তাকে সুদ্ধ; সেও বাঘের হাতেই প্রাণ দিয়েছে—গণেশের বিশ্বাস সে সময় হিমিই কোন কৌশলে বাঘকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল; যাই হোক সে হিমির পক্ষেও সম্ভব নয় তার ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখা বা ছোটখাটো ফাইফরমাশ খাটা। সে সময়ও তার ছিল না অবশ্য। শুধু খেলা দেখানোই নয়—অত-গুলো জানোয়ারের খাওয়া-দাওয়া দেখা-শুনো করা, অসুখ হ'লে চিকিৎসা পর্যন্ত—অর্থাৎ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, তাকেই করতে হত। তাছাড়া নিত্য প্র্যাকটিস করা আছে, একদিনও বাদ দেবার উপায় নেই; নিজের ভুল হবে, জানোয়াররাও ভুলে যাবে।

সুতরাং বলতে গেলে এই প্রথম—ব্যক্তিগত সেবার স্বাদ পেল গণেশ। গরীবের ছেলে, বাড়িতেও এ ধরনের সেবা পায় নি কখনও। তারপর যখন বাউন্ডুলের মতো ঘুরেছে তখন তো কথা নেই। পরিষ্কার বিছানায় শোওয়ার কথা তো মনেই পড়ে না, বিছানা বলতেই তো কিছু জুটত না বেশির ভাগ দিন। কষ্ট করা সয়ে গিছল তাই, কষ্ট করা আর যেমন তেমন করে দিন কাটানো। খেলা দেখাবার পোষাক-গুলোকে যত্ন করতে হ'ত বাধ্য হয়ে, বাকী কোন কিছুরই ঠিক ছিল না। না পোশাকের, না বিছানার না অন্য কোন আসবাবপত্রের। কোন জায়গায় এসে তাঁবু পড়ত যখন সেই যে বিছানা খোলা হ'ত—আবার তাঁবু তোলার সময় ছাড়া তাতে হাত পড়ত না কোনদিন। সে সময়ও গুটিয়ে বাঁধা হ'ত এই পর্যন্ত। দৈবাৎ কোনদিন হিমির চোখ পড়লে—দিনেরবেলা ছাড়া তো চোখ পড়ে না ঠিক, তাঁবুর মিটমিটে তেলের আলোয় বিছানার ময়লা ধরা যায় না—চিরকুট ময়লা হয়েছে দেখলে হয়ত টান মেরে খুলে কাচতে পাঠাত কাছাকাছি কোন ধোপার বাড়ি।

এইতেই অভ্যস্ত ছিল গণেশ। এর কোন অসুবিধে আছে টের পায় নি। পরিষ্কার থাকার যে কোন আরাম আছে তাও জানত না। তাম্পি আসতে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সে নিয়মিত ওর কাপড়-জামা গুছিয়ে পাট করে তুলে রাখে, ময়লা অন্তর্বাস মোজা নিজে কেচে দেয়, জুতো বুরুশ ক'রে দেয় প্রত্যহ। বিছানা তুলে তাঁবুর বাইরে রোদে দিয়ে পরিপাটি করে পেতে দেয়—রাত্রে বিছানার পাশে সিগারেটের কেস, ছাইদানী, জলের ডিকেন্টার গ্লাস সব সাজিয়ে রেখে দেয়। খেলা দেখিয়ে এসে

খেলা দেখানোর ফাঁকে—অবসর পেলেই কস্টিউম সুদ্ধ ছুটতে ছুটতে এসে জুতো মোজা খুলে পোশাক ছাড়িয়ে দিয়ে যায়। চুরোট ধরিয়ে হাতে গুঁজে দিয়ে চলে যায়—আর এক ফাঁকে একবার এসে হয়ত কিছু পানীয়ের ব্যবস্থা করে।

প্রথম প্রথম এ ধরনের ব্যক্তিগত সেবায় অস্বস্তি বোধ হত, ক্রমশ একটু একটু ক'রে ভাল লাগতে শুরু হল। শেষে নেশায় পেয়ে বসল, অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। বারণ করলেও যে শুনবে না, ধমকে বকুনিতে যাকে নিবৃত্ত করা যাবে না—তাকে এড়াবেই বা কি করে! অবশ্য কোনদিন মারধোর করে দেখেনি। তবে এক আধদিন, দৈবাৎ হাতে পয়সা এলে যখন নেশার ব্যবস্থা হত তখন মদের ঝোঁকে, অন্য নেশা আজকাল আর করে না গণেশ—অসহিষ্ণু হয়ে এক-একটা লাথি-টাথি হয়ত মেরেছে। বেশ সজোরেই মেরেছে। সেবা থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে নয়, সেবার ত্রুটি ধরে, বিলম্ব হওয়ার জন্যে। তাম্পির হাসিমুখ কিন্তু তাতেও মলিন হয় নি, বরং ঠিক পরমুহূর্তে এসে সেই পায়েরই সেবা করতে বসেছে। এমন বোধহয় ক্রীতদাসেও করে না। করে না তার কারণ ক্রীতদাসরা সেবা করে বাধ্য হয়ে—তাম্পি করত প্রাণের দায়ে, নিজের গরজে। এই সেবা করাতেই তার সুখ বলে।

একটু একটু করে তার বশীভূত হয়ে পড়ল গণেশ। হ'তে বাধ্য। যে কেউই এ অবস্থায় পড়লে বশীভূত হ'ত। অবশ্য একটা স্বার্থ তাম্পি খুলেই বলেছিল গণেশকে—সে 'গুরুদেবে'র কাছে এই জাদুর খেলা শিখতে চায়। তার বড় ইচ্ছে ঐ রকম জাদুকর হবে, যা খুশি করে বেড়াবে। অন্য লোকের কাছে স্পষ্টই বলত, গুরুসেবা করে গুরুকে খুশী ক'রে বিদ্যা আদায় করবে সে, প্রাচীনকালের ছাত্র শিষ্য-দের মতো।......প্রথম প্রথম 'লর্ড' বলে সম্বোধন করত গণেশকে, কেন লর্ড বলত তা কেউ জানে না। গণেশের সন্দেহ সে দেবতা অর্থেই লর্ড বলত, যেমন যীশুকে বলে। তখন কারও নিষেধেই কর্ণপাত করেনি—পরে অবশ্য নিজে থেকেই 'গুরু' বা গুরুদেব বলতে শুরু করেছে।

কিন্তু মতলব যাই থাক, স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই সেবা করছে কবুল করলেও—শেখার জন্যে তেমন কোন গরজ বা শেখানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করে নি কোনদিন, কোন তাগাদাই দেয়নি। গণেশের বিশ্বাস সে ইচ্ছা থাকলেও সেটা গৌণ ছিল। এক শ্রেণীর ভক্ত আছে সেবাতেই তাদের সুখ, ইষ্টের মহিমায় ও ঐশ্বর্যে অভিভূত হয়ে অবাক হয়ে থাকতেই তাদের ভাল লাগে—

দেবতার স্তরে উঠবে কোনদিন— চেষ্টা বা সাধনার দ্বারা—তা ভাবতেও পারে না। ইচ্ছাও নেই তত। অনেকটা বৈষ্ণব সাধকদের মতো, ছেলেবেলায় বাবার মুখে শুনেছে কথাটা, বৈষ্ণবরা মোক্ষ চায় না, বার বার জন্ম নিতেই চায়—মানুষ হয়ে জন্মালে কৃষ্ণনাম নিতে পারবে, তাঁকে পুজো সেবা করতে পারবে—এই তাদের সুখ। এই সুখে এই আনন্দেই ডুবে মশগুল হয়ে থাকতে চায়। তাম্পিরও অনেকটা সেই ভাব। এতদিন তার জীবনে একটা বিপুল শূন্যতা ছিল, গণেশকে পেয়ে তাকে ভক্তি করতে সেবা করতে পেয়ে সেই শূন্যতা পূর্ণ হয়েছে, সুখী হয়েছে সে।

সেবায় খুশী হলে সেবক সম্বন্ধেও মানুষ সচেতন হতে বাধ্য। গণেশও একটু একটু করে তাম্পি সম্বন্ধে সচেতন হল। আগে তার এই সর্বদা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকা, গায়ে পড়া ঘনিষ্ঠতা— খুবই খারাপ লাগত, ক্রমশ সেটা সয়ে গিয়েছিল—হঠাৎ শুধু সেবা নয়—সাহচর্যটাও ভাল লাগছে তার। একটি সরল সুকুমার কিশোর মুখের শ্রদ্ধা-তদগত ভাব। দৃষ্টিতে সর্বদা একটা উৎসাহ-উদ্দীপনার আলো—সেই সঙ্গে ওর সম্বন্ধে চিরন্তন বিরাট বিস্ময় একটা—সব জড়িয়ে ছেলেটাকে ভাল লাগল তার। আরও কিছুদিন পরে বুঝতে পারল—বেশীক্ষণ তাম্পি কাছে না থাকলে একার খারাপই লাগে তার। আগে দুজনের মধ্যে একটা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছিল, গণেশের দিক থেকে কতকটা জোর করে চাপানো সম্পর্কটা—তাই খারাপ লাগত। এখন দুজনে যেন বন্ধু হয়ে উঠল। এমন কি বয়সের এতটা অসাম্যও কোন বাধা সৃষ্টি করল না।......

গণেশ যেন জীবনে নতুন একটা স্বাদ পেল। কিছুদিন ধরেই বড় একঘেয়ে লাগছিল। আগে ছিল উন্নতির স্বপ্ন, দিগ্বিজয়ের আশা—সে আশাতে সব সয়েছে, কোন অসুবিধাকেই অসুবিধা ভাবেনি—দুঃখকে দুঃখ গণ্য করেনি। সে সব এখন গেছে। এখন দাঁড়িয়েছে একটি মাত্র স্ত্রীলোককে অবলম্বন করে এই বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন— আশা ও আনন্দহীন জীবন কাটানো। ফলে একটু যেন হাঁপিয়েই উঠেছিল। অথচ ছেড়ে যাওয়ারও সামর্থ্য বা মনের দৃঢ়তা ছিল না। কতকটা বন্দীর অবস্থা হয়ে পড়েছিল ওর। স্বেচ্ছাবন্দীও বন্দী, তারও বন্ধনের যন্ত্রণা কম নয়। সেই অবস্থায় দৈবাৎ এই সঙ্গী পেয়ে বেঁচে গেল। তাম্পিরও জগতে কোন বন্ধন ছিল না। এখানে সমবয়সী যারা,—প্রায় সমবয়সী, এখানে ওর বয়সী আর কেউ ছিল না, দু-একটি সাগরেদ ছিল তারা ওর চেয়ে ঢের কমবয়সী। ছোট ছোট ছেলে সব—তাদের সঙ্গে অপ্রীতি ছিল না কিছু—কিন্তু তাদের প্রতি এমন আকর্ষণও বোধ করত না। গণেশই তার গুরু, বন্ধু, ভাই—একাধারে সব হয়ে উঠেছিল।

বন্ধু হিসেবেই অনেকটা কাছে এসে গেল সে গণেশের। গল্প করারও একটা লোক হ'ল। গল্প করতে গেলে ভাল শ্রোতা চাই। গণেশ ওর কাছে শ্রেষ্ঠ শ্রোতা। সে ওর উৎসাহদীপ্ত কচি মুখের দিকে, ওর স্বপ্নেভরা তরুণ চোখের দিকে চেয়ে বসে বসে শুনত ওর দেশের কত কি গল্প, ওর বাবা-মায়ের কথা— ওদের দেশ, সমাজ, সংস্কারের নানা কাহিনী ও বিবরণ। পাল্টা প্রশ্নও করত গণেশকে—তার মা-বাবা দিদির কথা; কী করে গণেশ প্রথম এক বেদের ভেলকী দেখে এই ইন্দ্রজালের দিকে আকৃষ্ট হল, তারপর এই বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্যে এই খেলা শেখার জন্যে কত কষ্ট করেছে, কত দুর্গতি ভোগ করেছে, কত লাঞ্ছনা সয়েছে—সেই সব শুনতে শুনত ওর দু' চোখ ছলছল ক'রে উঠত, এক-একদিন কেঁদেই ফেলত সত্যিসত্যিই। বলত, 'তবে তুমি নিজে এই বিদ্যে শেখার জন্যে এত কষ্ট করেছ, আমি তোমার একটু সেবা করি তাতে অত আপত্তি করো কেন, অবাকই বা হও কেন? কষ্ট না করলে কোন বিদ্যেই শেখা যায় না—এ আমি বেশ বুঝেছি।'

মাঝে মাঝে ওকে বাজিয়ে দেখত গণেশ, 'আচ্ছা—আমি যদি বিয়ে করি—কী হয় তা হলে? তুই কি করিস?'

'খুব ভাল হয়। আমি একটা মাদার পাই। আর বিয়ে করলে তো বাচ্চা হবে—আমার খুব ভাল লাগবে। তোমার ছেলেকে আমি মানুষ করব, দেখো। তোমাদের কোন ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না।'

আবার কোন দিন গণেশ হয়ত বলত, 'আচ্ছা, আমি যদি এ দল ছেড়ে দিই—দেশে চলে যাই?'

'আমি তোমার সঙ্গে যাবো।' বেশ নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় উত্তর দিত তাম্পি।

'কিন্তু আমি তো তখন বেকার হয়ে পড়ব—আর তুইই বা এ কাজকর্ম ছেড়ে যাবি কি করে?'

'রেখে দাও তোমার কাজ। তুমি না থাকলে আমি এই দলে থাকব ভেবেছ?... আর আমি সঙ্গে না গেলে তোমাকে দেখবে কে? তুমি তো এই আনাড়ি, নিজের একটা কাজও তোমার দ্বারা হয় না! আমাকে যেতেই হবে। তুমি যেখানে যাও, যা খুশি করো—আমি কাছে থাকলেই হ'ল। আমি তোমার চাকর হয়ে থাকব সঙ্গে সঙ্গে।'

'আরে, চাকর হয়ে থাকবি কি ক'রে? আমি তোকে খাওয়াবো কোথা থেকে? ধর—কাজটাজ যদি কিছু না-ই মেলে, আমি কি খাবো তারই তো ঠিক নেই!'

'সেজন্যে ভেবো না। আমি কারও বাড়ি কি হোটেলে দোকানে যেখানে হোক একটা কাজ-কর্ম জুটিয়ে নেব। গাড়ি চালাতেও জানি, তোমাদের দেশে তো ঘোড়ার গাড়ি চলে, সইসের কাজও কি জুটবে না? বাইরে বাইরে কাজ করব—তোমার কাছাকাছি কোথাও—ফাঁক পেলেই তোমার কাছে চলে আসব—তোমার টুক-টাক কাজ করে দেব!'

গণেশ হাসে! তার ভাল লাগে এই উত্তরগুলো, তাই ক্রমাগত এই দিকেই প্রশ্ন ক'রে যায়। বলে, 'ধর, যদি আমাকে বোনের বাড়ি গিয়েই উঠতে হয়—মা-দিদি, তারা গোঁড়া হিন্দু-ব্রাহ্মণ, তুই ক্রীশ্চান, তোকে তো ঢুকতেই দেবে না বাড়িতে—তখন?'

তাম্পি কোনমতেই দমে না, সে বলে, 'ক্রীশ্চান তুমি বলবে কেন?...আমি না হয় গলার এই ক্রস আর চেনটা খুলেই ফেলব। এমনিতেই তো আমি আধা হিন্দু, তোমাদের দেব-দেবী সব চিনি, প্রণামও করি মধ্যে মধ্যে।...আমার যেখানে বাড়ি—সেখানে হিন্দুরাও আমাদের পরবে আমাদের বাড়ি আসে, আমরাও হিন্দুদের পরবে যাই।...সে তুমি কিছু ভেবো না—সে ঠিক হয়ে যাবে সব।'

আত্মবিশ্বাসে আর সংকল্পের দৃঢ়তায় তার কাঁচা মুখখানা জ্বলজ্বল করতে থাকে।

(ক্রমশঃ)

কলকাতা কলকাতা কলকাতা

"এক-এক সময় মনে হয়, স্বচ্ছ প্লাস্টিকের একটা বিরাট ঢাকনা দিয়ে কলকাতা শহরটাকে ঢাকা দিয়ে দিতে পারলে খুশী হতাম।"

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল, "কলকাতাকে ঢাকা দেবার কথা বলছেন? মানে, একটা বেশ বড় রকমের ঢাকনা চাই বলুন। কত বড় সে সম্বন্ধে কি কিছু ভেবেছেন?"

মানবদরদী, ভারতদরদী মার্কিন মহিলার চোখে সমবেদনার দৃষ্টি ছাপিয়ে ফুটে ওঠে সূক্ষ্ম কৌতুকের হাসি। বলেন, "অবশ্যই ভেবেছি। এত বড় হবে যে, উপরে তাকালে ঢাকনার গম্বুজটা আকাশের মত মনে হবে। এমন কিছু অবাস্তব কল্পনা নয়। আপনি মনট্রীঅলে 'এক্সপো-৬৭'-এ গিয়েছেন তো?"

না, যাইনি। তবে তিনি যে-বস্তুটির দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছিলেন, সেটির কথা তখন সকলের মুখে মুখে। কানাডার মনট্রীঅলে 'এক্সপো-৬৭' প্রদর্শনীতে আমেরিকার প্যাভিলিয়নটি করা হয়েছিল একটি প্লাস্টিকের বুদবুদের ভিতরে। স্থাপত্যের পরাকাষ্ঠা হিসাবে সেটি সারা বিশ্বে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল।

"আমার কিম্বা আমার দেশের সরকারের যদি সে-সঙ্গতি থাকত, তাহলে অমনি একটা বুদবুদের ভিতরে কলকাতা শহরটাকে সারাক্ষণের জন্য রেখে দিতাম।" (আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল কলকাতার কারুশিল্পের দোকানে কেনা কাচের বালবে পোরা পুরীর মন্দিরের প্রতিকৃতি) "আর সেখানে এয়ারকন্ডিশন করে দিতাম। কলকাতার প্রায় এক লক্ষ মানুষ যারা গ্রীষ্মের পাঁচগলা গরমে, বর্ষার বানডাকানো জলে, আর শীতের হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় সারাদিনরাত রাস্তায় পড়ে থাকে, তারা মাথার উপর একটা ছাদ পেত, একটু আরাম পেত।"

তখন বস্টনে গ্রীষ্ম, বস্টন কাউন্সিল ফর ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটার্স-এর অফিসে বসে আমার মত কলকাতার গরমে পোড়-খাওয়া মানুষও ঘেমে উঠেছে। বললাম, "তাহলে এক কাজ করুন না, এক্সপেরিমেন্টটা নিজের শহরেই শুরু করুন। এ-গরম আমার কাছে কিছু নয়, কিন্তু আপনারা তো শীতের দেশের মানুষ, এত গরম সহ্য করছেন কেন। এই বস্টন শহরটাকেই আগে প্লাস্টিকের গম্বুজ দিয়ে ঢেকে এয়ারকন্ডিশন করে দিন।"

অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মার্কিন মহিলা বুঝতে পারলেন আমার জাতীয় অভিমান আহত হয়েছে। সংগে সংগে প্রসংগ ঘুরিয়ে দিলেন।

এ-লেখা ছাপা হতে হতে হয়ত আবহাওয়া বদলে যাবে। কিন্তু এখন একশ' সাত ডিগ্রী ফারেনহাইট, বৃষ্টি নেই। নির্মেঘ আকাশে ক্রুদ্ধ অগ্নিদৃষ্টির মার্তন্ড। গরম হাওয়ার হলকা কারখানার ফারনেসের কথা মনে করায়। পাগল প্রাণ জাতীয় অভিমান শিকেয় তুলে রেখে ভাবছে 'দিক না কেউ একটা এয়ারকন্ডিশন-করা গম্বুজ দিয়ে কলকাতাকে ঢেকে। চক্ররেল, টিউব রেল সবই তো হচ্ছে, তার সংগে এটাও হোক। দেশী-বিদেশী যে-সরকারই করে দিক তাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করব।

*

"আজ কি ঝড়বৃষ্টি হবে?" কেউ কেউ তার সংগে যোগ করেন একটি সৌজন্য বা মুদ্রাদোষসূচক 'স্যার'। দৈনিক কাগজের কর্মী টেলিফোনের এ-প্রান্ত থেকে জবাব দেয়, 'রং নাম্বার, স্যার, এটা আবহাওয়া অফিস নয়।"

ও প্রান্ত থেকে: "আজ্ঞে সে জানি স্যার, তবে কিনা আপনারা তো অনেক আগে থাকতে জানতে পারেন—"

"সে তো আজকের কাগজেই দেখতে পেয়েছেন, কালকে বা জেনেছি, অর্থাৎ ঝড়বৃষ্টি হবে।"

কাতর স্বর ভেসে আসে ও প্রান্ত থেকে: "কই এখনও ত হল না। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব বলুন তো!"

এমন কঠিন হৃদয় দৈনিক কাগজেও নেই যিনি এর উত্তরে বলবেন, "তা আমরা কি করতে পারি!"

একফোঁটা বৃষ্টির জন্য চাতক পাখীর মত নিষ্করুণ আকাশের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যে মানুষ সে-ও জানে, বৃষ্টি নাবাবার মালিক খবরের কাগজ নয়। তবু থেকে থেকে টেলিফোন বেজে ওঠে। শোনা যায়, 'না না আপনারাই বা কী করবেন। তবে কিনা, মনের দুঃখ আর কাকেই বা জানাই।"

ঠিক কথা, দুঃখ জানাবার একজন তো চাই। তার কাছে প্রতিকারের প্রত্যাশা থাক বা না থাক।

কিন্তু হাঁড়ির একটা ভাত টিপে সব সময়ে গোটা হাঁড়ির ভাতের খবর মেলে না। এক মিনিট পরে আবার টেলিফোন বেজে ওঠে। একেবারে আলাদা জাত। "কী সব আজেবাজে খবর ছাপেন মশাই—ঝড়, সাইক্লোন, টাইফুন, হারিকেন সব জমা হয়ে আছে বঙ্গোপসাগরে, ২৪ ঘন্টার মধ্যেই কলকাতায় এসে পড়ছে। সেই সকাল থেকে এই আসে কি সেই আসে করছি। আবার ফলাও করে লেখা হয়েছে, প্রচন্ড বাতাসসহ বৃষ্টি। এদিকে একটা ফোঁটার দেখা নেই। গুলতাপ্পি দিয়ে আর কত কাল চালাবেন!"

এই 'দীর্ঘ তপ্ত নিদাঘে' মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে না। চিকাগোতে শাদায় কালোয় মাথা ফাটাফাটি হয়ে যায়। কলকাতার মানুষের বড়জোর আবহাওয়া অফিসের লোকেদের মুন্ডপাত করবার বাসনা জাগে, তাও হাতে নয় মুখে। একটু মিষ্টি করে বললেই হয়, "কী করবেন, এতক্ষণ অপেক্ষা করেছেন, আর একটুক্ষণ করুন, এখনও সময় যায়নি। আর আবহাওয়ার কথা ঠিক অঙ্কের মত মেলে না সে তো জানেনই।'

"তাহলে অফিসটা উঠিয়ে দিলেই হয়." গজগজ করতে করতে টেলিফোন রেখে দেওয়ার শব্দ পাওয়া যায়।

কিন্তু পনের মিনিটও যায় না, এমন সময় আসে আবহাওয়ার বুলেটিন, পরদিনের পূর্বাভাষ। রুদ্ধনিঃশ্বাসে, চক্ষু ছানাবড়া করে কাগজের রিপোর্টার পড়ে যায়—যাঃ, কলকাতাকে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে গেছে। ঝড়জল, সাইক্লোন, তাও একচোখো। চলে গেছে পাকিস্তানে। কলকাতার পোড়া কপালে ঝড়জল নেই।

এরপরও টেলিফোন আসে। "বলুন না স্যার, আপনারা তো অনেক আগে থাকতে জানতে পারেন।"

জানতে তো পেরেছেই, সামনেই মেলা রয়েছে লম্বা কাগজে টাইপ-করা আবহাওয়ার সর্বশেষ বুলেটিন। ঝড় হবে না। আর যার সামনে রয়েছে শুধু সেই জানে অনেক আগে থাকতে জানতে পারার কী যন্ত্রণা, এ "না যায় কওয়া, না যায় সওয়া।"

*

মাথার উপরে অগ্নিক্ষরা সূর্য, পায়ের তলায় কুম্ভীপাকের কড়াই কলকাতার রাস্তা। রিক্সাচালক, মুটে, ফেরিওয়ালার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে অসংখ্য পদচারীর জনস্রোত! কাজ, কাজ। কারও রেহাই নেই।

ভরদুপুরে পথ চলতে চলতে হঠাৎ কখন আক্রমণ করে তৃষ্ণা। অথচ গন্তব্য এখনও অনেক দূরে। তৃষ্ণা মেটাবার উপায় অনেক আছে। পথের দুপাশে ডাব, সরবৎ আইসক্রীম, লেমোনেডের দোকানের অভাব নেই। কিন্তু একটা অভাব অনেকেরই আছে—কিনে খাবার পয়সার।

রাস্তার কলে জল নেই। হয় আসেনি, না হয় এসে চলে গেছে। কলকাতার এমন অবস্থা মরুভূমির গল্প মনে আনে। যে-কারণে মরুভূমিতে মরীচিকা দেখা যায়, দুপুরের রোদে পীচের রাস্তাতেও ঠিক সেই কারণে মরীচিকা দেখা যায়।

আর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে ওয়েসিসও দেখা যায়। শীতল পানীয় কিনে খাবার পয়সা যার নেই, সে যদি জানে তবে তার তৃষ্ণা দূর করতে পারে একটা উপায়ে। একটু কষ্ট করে হাঁটলে সে দেখতে পাবে পথের পাশে একটা গুমটি। তার গায়ে একটা ছোট জানালা, আর জানালায় বসে একজন মানুষ, হাতে তার তামার ঝারি। লজ্জা-সঙ্কোচ ছেড়ে তার সামনে অঞ্জলি পেতে দাঁড়ালেই সেই ঝারি থেকে নেমে আসবে তৃষ্ণার শান্তি, করুণাধারার মত। কী ঠাণ্ডা সে জল, প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কলকাতা-মরুতে অনেক দূরে দূরে বসানো এই জলসত্রগুলি সত্যিই ওয়েসিস।

পুণ্যের কথা থাক—পিপাসায় জলদান করে এই জলসত্রগুলির পরিচালক-প্রতিষ্ঠানটি কলকাতার পিপাসার্ত মানুষের কত কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা বলা যায় না। সর্বজনবিদিত এই প্রতিষ্ঠানটির নাম কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি। এর তত্ত্বাবধানে ১১৪টি জলসত্র শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে কী গ্রীষ্ম, কী শীত, কী বর্ষা—সারা বছর জল বিতরণ করছে। এক-একটি সত্রে গরমের দিনে ৫০০ গ্যালন করে জল দেওয়া হয়, গড়ে দু'হাজার তৃষ্ণার্ত মানুষ তা পান করে।

টালা পাম্প থেকে লরী বোঝাই করে জল এনে জলসত্রের আধারগুলি পূর্ণ করা হয়। সকাল সাতটা থেকে প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে ন'টা অবধি জল দেবার জন্য এগুলি খোলা থাকে।

একটি স্বল্পখ্যাত মন্দির থেকে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম। উত্তর কলকাতার বড়তলা অঞ্চলে ভগ্নজীর্ণ এই শিব-মন্দিরটিকে বলা হত কাশী বিশ্বনাথ মন্দির। এটি যে বাঙালী পরিবারের গৃহ-দেবতার মন্দির, সে বংশে বাতি দিতে আজ কে আছেন জানতে পারিনি। মন্দিরটিও ধ্বংস হতে চলেছিল, কিন্তু এখানে নিত্যপূজা তবুও বন্ধ হয়নি। ১৯৩৯ সালে কয়েকজন তরুণ কলকাতা-বাসী এই মন্দিরের সামনে একটি শপথ নিয়ে এর নামানুসারে সেবা প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তিস্থাপন করেন। তারপর মন্দিরটির আমূল সংস্কার করেন তাঁরা। আজকে জলদান থেকে আরম্ভ করে বিবিধ সেবার কাজে সারা দেশে এই প্রতিষ্ঠানটি উৎসর্গীকৃত।

জলসত্রগুলিতে কিছুদিন আগেও, মনে পড়ে, বড় বড় মাটির জালায় জল রাখা হত দেখেছি। জল তাতে অনেক বেশী ঠাণ্ডা থাকত। এখন মাটির জালা উঠে গেছে, তার জায়গায় ধাতুর ট্যাংকে জল রাখা হয়। মাটির জালা এখন ব্যবহার করা হয় না কেন প্রশ্ন করেছিলাম। ওতে নাকি 'রিস্ক' আছে। কী 'রিস্ক' খুলে বলতে চাই না, কলকাতাকে যাঁরা জানেন তাঁরা অনুমান করে নিন। স সে
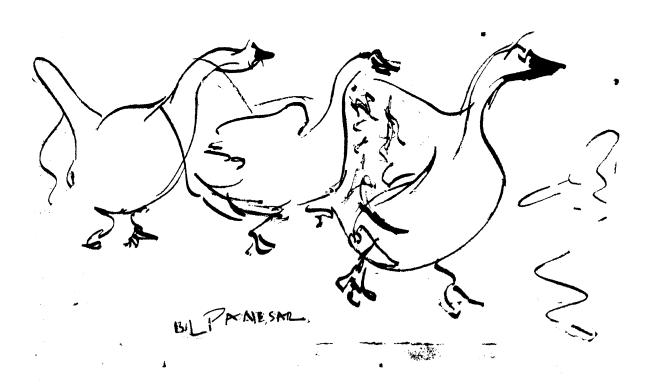
জলদস্যুতার আর এক অধ্যায়

অজিত চট্টোপাধ্যায়

*

জল থেকে ডাঙায় উঠেছিলেন জন রেকাম। প্রভিডেন্স দ্বীপপুঞ্জের মাটিতে এসে দাঁড়ালেন এই কুখ্যাত জলদস্যু। গভর্নরের কাছে আবেদন করে সম্রাটের ক্ষমাদান মিলল। হয়ত সুস্থ নাগরিক জীবনযাপনের ইচ্ছে ছিল রেকামের। কিন্তু তা হল না। পুনরায় নীল দরিয়াতে জলদস্যু হতে হল রেকামকে। তবে এবারে রেকাম একা নন। সঙ্গে তার প্রেমিকা। প্রভিডেন্স দ্বীপপুঞ্জের গভর্ণর তাদের স্বীকার করেন নি। বরং কঠোর শাস্তির হুমকী দিয়েছেন। কিন্তু প্রেম কি শাসনে বশ মানে? সুতরাং ডাঙা থেকে আবার জলে......

দ্বীপের মাটিতে সম্ভবত তখনও বসন্ত আসে নি। বইতে শুরু করে নি চঞ্চল দখিনা সমীরণ। মাটির বুকে ফোটে নি বসন্তের নানা গন্ধমাতাল পুষ্পপত্র। হয়ত ওখানের পৃথিবীতে বসন্ত আসতে তখনও কিছু দেরী। আরো কিছুকাল বাকী।......কিন্তু তাতে কি? জলদস্যু জন রেকামের মনে পরিপূর্ণ বসন্ত হাসছে। কোন মন্তরে যেন পুষ্প ফুটেছে অন্তরে। এই প্রভিডেন্স দ্বীপপুঞ্জের মাটিতে পা দেবার কয়েক দিন পরেই। দ্বীপের সেই গাছগাছালির আড়াল করা নিভৃত কোণটিতে প্রতিদিন অপরাহ্নে এসে অপেক্ষা করেন রেকাম। বেলা যে পড়ে এল। আজ ওর আসতে এত দেরী কেন? এই চিন্তা প্রত্যহের—

জলদস্যুদের মধ্যে জন রেকামের প্রেম কাহিনীটা বেশ মজাদার। শাদামাটা প্রেম-ট্রেম নয়। পরকীয়া ব্যাপার। চুম্বকের টানে লোহা, আর প্রেমের টানে মানুষ। জন রেকাম যখন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন তখন তার অবস্থাটা কেমন? ক্যাপ্টেন বার্জেস ইতিমধ্যে বহুবার এসে অনুরোধ করেছে। দিন যে বয়ে যায়। আর কবে যেতে পারবে রেকাম? সমুদ্রের নীল জল নিত্যদিন ক্যাপ্টেন বার্জেসকে টানছে। মাটির চেয়ে জলের বুকেই তো রোমাঞ্চ। অনেক বেশী গতিশীল জীবন। আর দ্বীপের উপর এই ছককাটা দিনগুলি কি জীবন নাকি? ক্যাপ্টেন বার্জেস ভাবেন রেকামের কি যেন

হয়েছে। অমন দুর্দান্ত শক্তসমর্থ জলদস্যু কি যাত্রা-থিয়েটারের সঙ হয়ে দাঁড়াল!

কিন্তু জন রেকামের পা যে উঠতে চায় না। সমুদ্রের নর্তনশীল ঢেউগুলি এক সময় তাকে অবিরাম হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। শুধু ডাকা নয়। জন রেকামের কাছে সে ডাক অপ্রতিরোধ্য মনে হয়েছে। ডাঙার মাটি পিছনে রেখে জন রেকাম নেমেছেন জলে। জাহাজ ভেসে চলেছে নীল সমুদ্রের উপর দিয়ে। সুবিধেমত কোন বাণিজ্যতরী নজরে এলেই মার মার শব্দে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু সে দিনগুলি তো রেকাম বহু পিছনে ফেলে এসেছেন। তার সামনে এখন নতুন রাজপথ। নিত্য নতুন স্বপ্ন তৈরী করছেন রেকাম। তিনি এবং তার প্রেমিকা মেয়েটি, দুজনে মিলে।

সুতরাং প্রভিডেন্স দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে কোথাও যেতে হঠাৎ রাজী হলেও হৃদয় কেঁদে ওঠে। এখানেই তার মন পড়েছে বাঁধা। অন্তর হয়েছে শীতের লাল গোলাপ ফুলের মত রক্তিম। প্রভিডেন্স দ্বীপপুঞ্জে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা,—সব কিছুই তার কাছে এখন ফুল্লকুসুমিত বসন্ত দিন বলে মনে হচ্ছে।

সম্ভবত ক্যাপ্টেন বার্জেস আর অপেক্ষা করে নি। ওর জন্য অপেক্ষা করা মানেই সময় নষ্ট করা। আর জন রেকাম? বার্জেসের চলে যাবার পর তিনিও হেসেছিলেন মনে মনে। নীল দরিয়ার আকর্ষণ আছে বৈকি! কিন্তু প্রেমদরিয়া যে সর্বনাশা কালীদহ। জন রেকাম প্রেমসাগরে তার জাহাজ ভাসিয়েছেন। বার্জেস এত কথা বুঝবে কেমন করে?

জন রেকামের কাহিনী অবশ্য এর আগেই কিছুটা বলা হয়ে গিয়েছে। পোর্ট রয়্যালে ফাঁসী হয়েছিল জন রেকামের। দলশুদ্ধ সকলকেই ঝুলতে হয়েছিল দাঁড়তে। কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর নিকোলাস লজ ফাঁসী দিয়েছিলেন আসামীদের। জন রেকাম, জন ফেটারস্টন, রিচার্ড কর্ণার, জন ডেভিস, জন হাওয়েল, প্যাট্রিক, টমাস, ডবিন এবং হারউড। প্রথম পাঁচজনের ফাঁসী হয়েছিল পোর্ট রয়্যালে,—বাকীদের কিংস্টনে। রেকাম এবং আরো দুজনকে চেনে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল তিনটি বিভিন্ন স্থানে। জলদস্যুদের এই ভয়াবহ পরিণতি দেখে যাতে অন্যরা সাবধান হতে পারে। জলদস্যু হবার ঝুঁকি নিতে না সাহসী হয়।

কেমন করে রেকাম জলদস্যুর দলে এল, সে কাহিনী সম্পূর্ণ অবান্তর। আরো অনেকের মত জন রেকামও জলদস্যুর দলে নাম লিখিয়েছিল। তার জন্য তেমন কোন কারণ নিশ্চয়ই ছিল না। ভেন নামক এক জলদস্যুর দলে জন রেকাম চলেছিল হিসপ্যানিওলার দিকে। জাহাজে রেকাম তখন কোয়ার্টার মাস্টার। সমস্ত জলপথে চার্লস ভেন ছোটখাট একটি শিকারও বাদ দেন নি। [illegible] দ্বীপে উঠে জলদস্যুরা ছাগল, ভেড়া, মুরগীও টেনে এনেছে গৃহস্থের ঘর থেকে। তার জাহাজে সব সময়ই প্রচুর খাদ্যদ্রব্য। মদেরও প্রাচুর্য। শুধু খাও দাও আর হৈ-হল্লা কর। চার্লস ভেন বুঝেছিল যে তার রসদে টান পড়লেই নেতৃত্বে ফাটল ধরতে দেরী হবে না।

ফেব্রুয়ারী মাস। শীত প্রায় শেষ হয়ে এল। আকাশ এখনও ঝকঝকে নীল। সমুদ্র একটু একটু করে অশান্ত হয়ে উঠছে। বাতাসে এখন আর শিরশিরানি নেই। চার্লস ভেনের জাহাজ ভেসে চলেছে। অনেক লোকজন জাহাজে। কয়েক দিনের মধ্যে জাহাজ এল মোস অন্তরীপের কাছে। হঠাৎ ইংলন্ডের একটি বড় বাণিজ্য জাহাজ তাদের দৃষ্টিপথে চিহ্নিত হল। জাহাজটির নাম কিংস্টন। এতে বেশ কিছু ইংরেজ আরোহী, কয়েকজন ইহুদী এবং দুটি সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী। চার্লস ভেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চড়াও হলেন জাহাজটির উপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিংস্টন এল জলদস্যুদের দখলে। জাহাজের মধ্যে মূল্যবান পণ্যসামগ্রী দেখে জলদস্যুদের চোখগুলি জ্বল জ্বল করে উঠল।

কিংস্টন জাহাজটি দখল করল জলদস্যুরা। তাদের দলে লোকজন বেড়েছে। স্থান সংকুলান হয় না। সুতরাং নতুন একটা জাহাজের প্রয়োজন। খানিকটা এগিয়ে কচ্ছপ-শিকারী একটা ছোট জাহাজের দেখা মিলল। চার্লস ভেন ছোট জাহাজটির উপর কিংস্টনের আরোহীদের তুলে দিলেন। ইচ্ছে করলে তারা যেখানে খুশী যেতে পারে। অবশ্য দুই শ্বেতাংগিনী সুন্দরীকে রেখে দেওয়া হল কিংস্টনে। সাধারণত জলদস্যুরা কিন্তু এমন কাজ করে না। রমণীকে জাহাজে তোলা মানেই নিজেদের মধ্যে কলহ ঝগড়া ডেকে আনা। সুতরাং বিবাদের বীজ পুঁতে দলের সর্বনাশ ডাকতে কোনো ক্যাপ্টেনই চায় না। কিন্তু চার্লস ভেনের বোধহয় নেশা লেগেছিল মেয়ে দুটিকে দেখে। ভালো লাগা অর্থ নারীসংগ কামনা। ফলে সুন্দরী মেয়ে দুটি রয়ে গেল কিংস্টন জাহাজে, জলদস্যুদের সংগসুখ দিতে।

কিংস্টন জাহাজটির ভার কাকে দেওয়া যায়? কথাটা চার্লস ভেনের মনে এল। নিজে পছন্দ করার চেয়ে দশজনে যাকে পছন্দ করবে সেটাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হল ভেনের। সভা বসল জলদস্যুদের। সকলে মিলে নির্বাচিত করল জন রেকামকে। কিংস্টন জাহাজের ক্যাপ্টেন হলেন রেকাম। চার্লস ভেন নিজে রইলেন অপর জাহাজটিতে। জলদস্যুর দল ভাগাভাগি করে উঠল দুটি জাহাজেই। কেউ রইল ভেনের জাহাজে, কারো স্থান হল জন রেকামের দলে। তবে সুন্দরী মেয়ে দুটিকে দুটি জাহাজে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল কিনা জানা যায়নি।

বেশ কিছুদিন দুটি জাহাজ ভেসে চলল। নেপচুন আর কিংস্টন। কখনও পাশাপাশি, কখনও ওরা আগে পিছনে। কিন্তু [illegible] মধ্যেই [illegible] ক্যাপ্টেনের মধ্যে লাগল ঠোকাঠুকি। খুব সাধারণ একটা ঘটনা। কিন্তু তাতে কি? ধুলোর ঘূর্ণীঝড় কালবৈশাখী হতে কতক্ষণ? একদিন চার্লস ভেন দেখলেন তার জাহাজের সুরার ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। অথচ মদ নইলে জলদস্যুর দল উন্মাদ হয়ে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। কিংস্টন জাহাজে অনেক রসদ, সুরারও প্রাচুর্য। চার্লস ভেন একজন অনুচর পাঠালেন কিংস্টন জাহাজে। সম্ভব হলে জন রেকাম যেন কিছু মদ পাঠিয়ে দেয়। নেপচুন জাহাজে মদ নেই। চার্লস ভেন ভেবেছিলেন রেকাম ক্যাপ্টেন হলেও এখনও তার অধীন। সুতরাং বেশ কিছু পরিমাণ সুরা অবিলম্বে এসে হাজির হবে তার জাহাজে।

অবশ্য সুরা এল। কিন্তু পরিমাণে সামান্য। আর যে কোনো বস্তুই হোক, নেশার দ্রব্য কি মাপ করে খাওয়া যায়? ভেনের রক্ত উঠল মাথায়। রেকাম কি তার সংগে পরিহাস করেছে? তখনই ভেন এসে উঠলেন রেকামের কিংস্টন জাহাজে। দুই জলদস্যুতে কথা কাটাকাটি শুরু হল। চার্লস ভেন গরম গরম কথা বলছেন দেখে রেকামও মরীয়া হয়ে উঠলেন। পিস্তল তুলে জন রেকাম চরম কথাটা বলে ফেললেন। মানে মানে চার্লস ভেন যদি সরে পড়ে তো ভালই,—নচেৎ তার মগজটা গুলি করে উড়িয়ে দিতেও রেকাম দ্বিধা বোধ করবে না। সুরা দেওয়া না দেওয়ার ইচ্ছেটা তার। জন রেকাম এখন একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন। চার্লস ভেনের চেয়ে কোনো অংশে সে কম নয়।

চার্লস ভেন চট করে নরম হয়ে এল। জন রেকামকে সে চেনে। লোকটা ডাকাবুকো এবং গোঁয়ার। কাজে আর কথায় ফারাক নেই। হুট করে পিস্তল ছুঁড়তে সে ওস্তাদ। ফলে ওর সংগে তর্কাতর্কি মানেই গোঁয়ার্তুমী। আর এই গোঁয়ার্তুমীর পরিণাম সাংঘাতিক। তাছাড়া কিংস্টন বড় জাহাজ। রেকামের দলে লোকও বেশী। ফল ছাড়াছাড়ি। দুটি জাহাজ এবার ভিন্ন পথে রওনা হল। কিংস্টন চলল প্রিন্সেস দ্বীপপুঞ্জের দিকে,—চার্লস ভেন অন্য পথে এগিয়ে গেলেন। কিংস্টনের পণ্যদ্রব্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন জন রেকাম। অনুচরদের নিয়ে তিনি এসে উঠলেন প্রিন্সেস দ্বীপপুঞ্জে। সেখানে পণ্যদ্রব্য, ধন-সম্পদ লুকিয়ে রেখে আবার জাহাজে উঠলেন সকলে। প্রিন্সেস দ্বীপপুঞ্জের মাটি, গাছপালা পিছনে পড়ে রইল। সামনে অন্তহীন নীল সমুদ্র। জন রেকাম চেয়ে দেখছেন। ভাবছেন কতদিন পরে আবার শিকারের দেখা মিলবে। হঠাৎ ছোট্ট একটি জাহাজ দেখা গেল সমুদ্রে। কচ্ছপ-শিকারী জামাইকার একটি জলযান। তখনই কয়েকজন লোক পাঠালেন রেকাম ওর মালিককে ধরে আনবার জন্য। হুকুমের সংগে সংগে কাজ। লোকটা ভয়ে জড়সড় হয়ে জন রেকামের সামনে দাঁড়াল। সম্ভবতঃ সে ভাবছিল মরণ আর কতদূর?

ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। জন রেকাম

একটা কথা শুনেছিলেন। জামাইকাতে নাকি স্পেনের সংগে যুদ্ধ ঘোষণা সমাপ্ত। জলদস্যুদের এখন সম্রাটের ক্ষমাদান শুরু হয়েছে। গভর্ণরের কাছে আবেদন করলে সম্রাটের ক্ষমা তিনিই দান করতে পারবেন। নিজের দলবলের সংগে কথাটা আলোচনা করেছেন রেকাম। ডাঙ্গায় ফিরতে এখন অনেকেই রাজী। ক্ষমা প্রার্থনা করতেও তারা একমত। জলে ভেসে ভেসে সকলেই ক্লান্ত।

কচ্ছপ-শিকারী জাহাজটির মালিকও সেই কথা বলল। রেকাম যা আঁচ করেছেন. ব্যাপারটা তাই। জামাইকার গভর্ণর জলদস্যুদের সম্রাটের ক্ষমাদান করছেন। ইচ্ছে করলে জন রেকামও ডাঙ্গায় উঠে ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেদন পেশ করতে পারেন।

কিন্তু রেকাম তাতে রাজী নন। গভর্ণরের কাছ থেকে একটা মৌখিক আশ্বাস চান তিনি। নইলে দলবল নিয়ে ডাঙ্গায় উঠতে তার ইচ্ছে নেই। ক্ষমা প্রার্থনা খারিজ হলে তার ভাগ্যে কি আছে সেকথা কে বলবে? সেই কচ্ছপ-শিকারী জাহাজের মালিককে অনুরোধ করলেন রেকাম। গভর্ণরের কাছে দূত হয়ে যেতে হবে তাকে। জন রেকাম জলদস্যুবৃত্তি ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠতে চান। গভর্ণর কি তাকে এবং তার অনুচরদের ক্ষমাদান করবেন?

লোকটি রেকামের দূত হয়ে এল জামাইকাতে। গভর্ণরের কাছে জন রেকামের
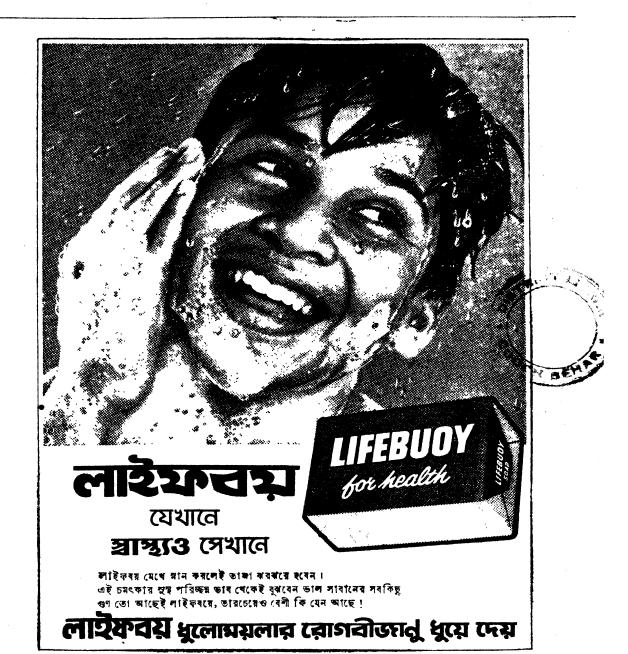
প্রস্তাব নিবেদন করল। কথা শুনে গভর্ণর মুচকি হাসলেন। দূতের কাছে রেকামের সব সংবাদ শুনলেন জামাইকার গভর্ণর। ঠিক এই মুহূর্তে দলবল নিয়ে কোথায় রয়েছে রেকাম? প্রশ্নের উত্তর অবশ্য লোকটির কাছে থেকেই পাওয়া গেল। গভর্ণরের জবাব নিয়ে রেকামের কাছে তাকেই তো যেতে হবে।

ইতিমধ্যে আর একটি ব্যাপার কিন্তু ঘটে গেছে। কিংস্টন জাহাজের সেই আরোহীর দল এসে পৌঁছেছে জামাইকায়। গভর্ণরের সংগে তারা দেখা করেছে। চার্লস ভেন এবং জন রেকামের এই কুকীর্তির গল্প সালংকারে তারা গল্প করেছে গভর্ণরের কাছে। তাদের অভিযোগ শুনে গভর্ণরও রুষ্ট। কিংস্টন জাহাজটির অত মূল্যবান পণ্য খোয়া যাওয়াতে তিনিও ব্যথিত। গভর্ণরের আদেশে দুটি সশস্ত্র জাহাজ যাচ্ছিল রেকাম এবং ভেনকে ধরে আনতে। এখন জন রেকামের সংবাদ পেয়ে ভালোই হল। ঠিক কোথায় রয়েছে রেকাম তা জানা হয়ে গেল।

জন রেকাম তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। কাছেই সবুজ এক দ্বীপ, কিংস্টন নোঙর করে দাঁড়িয়ে। জলদস্যুদের অনেকেই তীরে গেছে। ডেকে শুয়ে রেকাম রোদ পোয়াচ্ছিলেন। হঠাৎ দুটি জাহাজকে একসংগে আসতে দেখে রেকামের সন্দেহ হল। ব্যাপার কি? এখন তো কোনো বড় জাহাজ আসবার কথা নয়? চোখে দূরবীণ লাগিয়ে দেখলেন রেকাম। যা ভেবেছিলেন তাই। জাহাজ দুটি একসংগে গোলা ফেলতে শুরু করেছে।

জন রেকাম সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। দলের সবাই প্রায় তীরে। সুতরাং পৃষ্ঠ-প্রদর্শন ছাড়া পথ নেই। ছোট্ট একটি বোটে করে রেকাম পালিয়ে গিয়ে উঠলেন সেই দ্বীপে। তার শত্রুরা কিংস্টন জাহাজটিকে নিয়ে জামাইকার পথ ধরল। তাকে খুঁজে বের করতে দ্বীপের জংগলে ঢুকল না।

ওরা চলে গেলে জন রেকাম তার দলবলের লোকেদের ডাকলেন। প্রশ্ন হল, অথ কিম? কিংস্টন হাতছাড়া হলেও জলদস্যুরা কিন্তু নিঃস্ব নয়। তাদের কাছে কিছু অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে। দুটি বোট এবং একটি ডিঙি নৌকোও পুঁজি। সামান্য কিছু পণ্যও আনা হয়েছিল দ্বীপে। তা বেচেও জলদস্যুরা কিছু পেতে পারে।

অবশ্য কিংস্টন জাহাজে অনেক কিছু ছিল। প্রায় ষাটটি সোনার ঘড়ির সন্ধান জলদস্যুরাও পায়নি। মালপত্রের মধ্যে প্যাকেটে করে লুকানো ছিল ঘড়িগুলি। জাহাজ জামাইকাতে এলে ক্যাপ্টেন সেগুলি খুঁজে বার করলেন। অবশ্য মালের হিসেব-পত্র, বিল, রসিদ, রেকাম নষ্ট করে দিয়েছেন। কাজেই মালের মালিকানা প্রমাণ করার ব্যাপারটা খুবই জটিল—।

এদিকে জন রেকাম ঠিক করলেন প্রভিডেন্স দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে উঠবেন। দলের সকলে অবশ্য রাজী নয়। কিন্তু কেউ কেউ রেকামের প্রস্তাবে সায় দিল। মাত্র ছজন সংগী নিয়ে জন রেকাম নীল দরিয়ায় ভেসে পড়লেন। এবার তার সংগে জাহাজ নেই,—একটি বোটই ভরসা। সামান্য কিছু রসদ এবং অস্ত্র নিয়ে রেকাম চলেছেন প্রভিডেন্স দ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশ্যে। কিউবার উত্তর দিক দিয়ে ঘুরে আসবার সময় কয়েকটি স্পেনীয় নৌকো এবং ছোট্ট লঞ্চ লুঠ করলেন জন রেকাম। শক্ত-সমর্থ একটি বড়গোছের বোট দখল করে দলবল নিয়ে রেকাম তাতে উঠে বসলেন। এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। নিজের ছোট বোটটা জলে ডুবিয়ে দিয়ে জন রেকাম এগিয়ে চললেন প্রভিডেন্স দ্বীপপুঞ্জের দিকে।

প্রভিডেন্স দ্বীপের গভর্ণর কিন্তু জন রেকাম এবং তার দলবলকে বিমুখ করলেন না। রেকাম এবং আর সকলে ক্ষমা পেলেন সম্রাটের। রেকামের বক্তব্য ছিল লুঠপাটের

মহিলা জেমস বনির স্ত্রী

ব্যাপারে তাদের কোনো হাত ছিল না। সব দোষ জলদস্যু চার্লস ভেনের। চার্লসের কথামত তারা কাজ করেছে। সুতরাং গভর্ণর যেন তাদের সম্রাটের ক্ষমাদান করেন।

সম্রাটের ক্ষমালাভ করে জন রেকাম এসে উঠলেন ডাঙগায়। অনুচরদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেকাম হেঁটে চললেন রাজপথ দিয়ে। তার সামনে এখন রাজপথ নয়,—নতুন জীবনের সরণী। কথাটা জন রেকাম চিন্তা করছিলেন মনে মনে।

লুঠের টাকাকড়ি ভাগ বাঁটোয়ারা আগেই হয়েছে। ক্যাপ্টেন বা নেতা হিসেবে রেকাম পেয়েছেন বেশ একটি মোটা অংশ। পকেটে হাত দিয়ে রেকাম একবার সেটি অনুভব করলেন। এখন অল্প কিছুদিন বেশ আমিরী চালে কাটানো যাবে। ভবিষ্যতের কথা নিয়ে নিজেকে এখনই বিব্রত করতে ইচ্ছে হল না রেকামের। ভবিষ্যতের ভাবনা দরিয়ার মতই অন্তহীন। সে তো পড়ে রয়েছেই—।

প্রভিডেন্স দ্বীপেই রেকাম একদিন তার প্রণয়িনীর সন্ধান পেলেন। ভারী সুন্দর একটি মেয়ে। না, শুধু লাজুক, নম্র এবং রূপবতী বললে মেয়েটির সম্বন্ধে মিথ্যা ভাষণ করা হবে। মেয়েটি লাজুক তো নয়ই। ভীষণ তেজী,—আর চলন-বলনে নরম-শরম ভাব কোথায়? মেয়ে যেন যুদ্ধের ঘোড়া। দড়বড়িয়ে পথ চলতে মুখ উঁচিয়ে রয়েছে। জন রেকাম ওকে দেখলেন। একদিন, দুদিন এবং তার পরদিনই রেকাম মনস্থির করে বসলেন। মেয়েটিকে তার চাই। সুন্দরী অথচ খাপখোলা তলোয়াড়ের মত সতেজ ও মেয়ে কার বাড়ীর? কার কুলের কামিনী?

রেকাম তলে তলে খবর নিলেন। তার মনের মানুষ কিন্তু বিবাহিতা। আর একজনের সংগে সংসার পেতে সে বসেছে। মুহূর্তে কথাটা একবার চিন্তা করলেন জন রেকাম। সংসার ভেংগে দিয়ে ওকে নিজের কাছে আনবেন? ওকে পাবার জন্য আর একজনের সংসারে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে? জন রেকাম তখন মরীয়া। তার মনে চিন্তা হল মেয়েটি যদি না আসতে চায়!

অবশেষে রেকাম একদিন আলাপ করলেন ওর সংগে। না, মেয়েটি নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে নিল না। বরং তাকে আমন্ত্রণ জানাল আর একদিন দেখা করার জন্য। রেকাম খুশীতে উদ্বেল, আনন্দে ডগমগ। সজীব এবং প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর এই রমণীর সংগ লাভ করে রেকাম কৃতার্থ হবে।

মহিলা জেমস বনির স্ত্রী। জেমস বনি কিছুদিন আগেও জলদস্যু ছিল। লোকটা প্রকৃতিতে উদ্দাম নয়। একটু ঠাণ্ডা গোছের। ধীর, স্থির। এমন মানুষের জলদস্যু হবার কথা নয়। হয়ত জেমস বনি তাই ফিরে এসেছে ডাঙগায়। গভর্ণরের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বউয়ের সংগে ঘর-সংসার পেতেছে। কিন্তু সঙ্গিনী নির্বাচনে ভুল করেছে জেমস। ওর বউ ঠিক ওর উলটো। জেমস যদি প্রশান্ত বিকেল, ওর বউ তাহলে চৈত্রের শুকনো ঝড়। জেমস যদি স্থির মাটি, ওর বউ তাহলে চঞ্চল প্রজাপতি। ফলে জেমসের বউয়ের ওর স্বামীকে মনে ধরেনি। এমন শাদা-মাটা স্বামীকে নিয়ে অমন পাখনা মেলা চঞ্চল প্রজাপতির কি মন ভরে? মাটির বুকে থাকতে প্রজাপতির যে মন চায় না।

মেয়েটি অবশ্য আর কেউ নয়। আমাদের সেই পুরাণো অ্যান বনি। জেমস বনির বিয়ে করা বউ। জন রেকামকে দেখে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়েছিল অ্যান। অমন সুন্দর চওড়া ছাতিওয়ালা পুরুষ। হাতের কব্জিগুলো কি শক্ত। আর কেমন সুন্দর জামা

পোষাক। জেমস ওর কাছে মিটমিটে মাটির প্রদীপ। প্রথম আলাপেই অ্যানকে খুব সুন্দর একটি উপহার দিলেন রেকাম। অ্যান বনি উপহার পেয়ে খুব খুশী হল। মানুষটার শুধু চওড়া বুকই নয়,—দিলও প্রশস্ত। কয়েকদিন পরেই অ্যান বনি এবং জন রেকামকে একটি গোপন স্থানে দীর্ঘ সময় গল্প করতে অনেকেই দেখতে পেল। একদিন নয়, দুদিন নয়, এ দৃশ্য প্রায়ই ঘটল।

উপহার পেয়েই দিলখুশ, আর আলাপে মন পর্যন্ত রাঙা। অ্যান বনি পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করল জন রেকামের কাছে। এখন রেকাম শুধু একাই পাগল নয়,—অ্যানও প্রেম-পাগলিনী। প্রায় রোজই ওর জন্য উপহার নিয়ে আসে রেকাম। আর অ্যান ভাবে লোকটা তাকে কি ভীষণই না ভালোবেসেছে।

খবরটা কিন্তু চাপা রইল না। ছোট্ট শহর। এখানে মৌচাকের গুঞ্জনই হট্টগোল। অ্যান বনি এবং জন রেকামের প্রেমের কাহিনী গন্ধমাতাল একটা পুষ্পসৌরভের মত চারিদিক আমোদিত করে ফেলল। অ্যানকে দেখে আর পাঁচটি মেয়ে ঠোঁট টিপে হাসে। প্রেমের সংবাদ এমনিতেই সরস,—আর পরকীয়া প্রেমের কাহিনী তো রীতিমত মুখরোচক। ধীরে ধীরে বউয়ের প্রেম-কাহিনী জেমস বনিরও কানে উঠল। কিন্তু শান্ত জেমস এমন একটা সংবাদেও খুব উত্তেজিত হল না।

টার্ণলে নামক একটি লোককে কথাটা একদিন বলল অ্যান বনি। জেমস যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলে জন রেকাম ওকে মোটা টাকা দিতে রাজী। তবে টাকা নিয়ে জেমসকে একটা কাগজে লিখে দিতে হবে। আর সাক্ষী হিসেবে টার্নলেকে সই-সাবুদ দিতে হবে কাগজে। অ্যান বনি তখন বিয়ে করবে রেকামকে। তার মনের মানুষ জেমস বনি নয়,—সে হল জন রেকাম। দুঃসাহসী পুরুষ।—

এদিকে রেকামের অবস্থা কাহিল। নিত্য উপহার যোগাতে তার অবস্থা সঙিন হয়ে উঠেছে। পুঁজিপাটা যা ছিল সব খরচ হয়ে এল। পকেট এখন ফাঁকা। অথচ পয়সা না হলে অ্যান বনির জন্য উপহার কেনা যাবে না। সুতরাং ক্যাপ্টেন বার্জেস নামক এক পুরানো জলদস্যুর সঙ্গে জন রেকাম ভাব করে নিলেন। বার্জেস এখন আর জলদস্যু নয়। গভর্ণরের কাছ থেকে সে কমিশন সংগ্রহ করেছে। স্পেনীয় জাহাজগুলির উপর চড়াও হতে তার অনুমতি অবাধ। রেকাম ভিড়ে গেল বার্জেসের দলে। জন রেকামের মত একজন দুঃসাহসী লোককে পেয়ে বার্জেসও খুশী। কয়েকবার সমুদ্র ঘুরে এসে জন রেকামের পকেট হল পূর্ণ। আর সমুদ্রে যাবার প্রয়োজন নেই তার। এদিকে বার্জেস প্রায়ই লোক পাঠায়। নিজে এসে জন রেকামকে বোঝায়। সমুদ্রে যেতে রেকামের কেন এত অনিচ্ছা?

টার্ণলে লোকটি অ্যান বনির প্রস্তাবটি অনেকের কাছে বলে ফেলল। কথাটা শুনল অ্যান ফুলওয়ার্থ নামক একটি পরিচারিকা। মেয়েটি অ্যান বনিকে বেশ কিছুদিন মানুষ করেছে। কথা শুনে ফুলওয়ার্থ তো চটেমটে লাল। অ্যানের কি মাথা খারাপ? সোয়ামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষে আসক্তি! মেয়েটা পাপের পাঁকে ডুবছে। জন রেকামই ওর সর্বনাশ করবে। এর বিহিত দরকার—।

টার্ণলেকে নিয়ে ফুলওয়ার্থ এল খোদ গভর্ণরের কাছে। জন রেকাম এবং অ্যান বনির ব্যাভিচারের গল্প সখেদে বিবৃত করল। গভর্ণর সাহেব হুজুর,—তাদের মা বাপ। তিনি যদি এদের না ফেরান তবে কলংকের এই কাহিনী একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে থেকে যাবে। সব শুনে গভর্ণরও তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। এ আবার কি কথা? স্বামীকে ছেড়ে ঘরের বউ আর একজনের হাত ধরে অন্যত্র উঠবে! এ নজীর তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না।

তখনই ডাক পড়ল অ্যান বনির। গভর্ণর তাকে রক্তচক্ষু দেখালেন। অ্যান যদি নিজেকে না শোধরায় তাহলে তিনি কঠোর শাস্তি দেবেন অ্যানকে। দরকার হলে দুজনকেই তিনি বেত মেরে ঠাণ্ডা করবেন। কিংবা পুরে রাখবেন ফাটকে।

অ্যান বনি দেখল সমাজ তার বিপক্ষে। জন রেকাম সব কথা শুনলেন প্রণয়িনীর কাছ থেকে। দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ভিন্ন তাদের উপায় নেই। নইলে দেখাশুনো বন্ধ করতে হবে। পোড়ারমুখো গভর্ণর যখন পিছনে লেগেছে, তখন আর উপায় নেই। দুজনে মিলে একটা ফন্দী আঁটল। কাছাকাছি এক ছোট্ট দ্বীপে জন হামাম নামক এক ব্যক্তির বাস। লোকটার সুন্দর একটি জাহাজ আছে। খুব ক্ষিপ্র যেতে পারে এই জলযানটি। জন হামাম তার পুরানো আস্তানা ছেড়ে প্রভিডেন্স দ্বীপে এসেছিল। সংগে তার ছেলে বউ। খবর পেয়ে অ্যান বনি গেল সেই জাহাজে। হামামের বউয়ের সংগে আলাপ করবে। উদ্দেশ্যটা অবশ্য ভিন্ন। জাহাজে কে কে আছে, এই সংবাদটি সে জানতে চায়। খবরটা জন রেকামের প্রয়োজন।

অনেক রাতে আট দশ জন লোক এসে উঠল হামামের জাহাজে। তাদের সংগে জন রেকাম আর অ্যান বনি। জন হামাম জাহাজে ছিল না। ছেলে বৌ নিয়ে শহরে গিয়েছিল। জাহাজের প্রহরীদের ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিল অ্যান বনি। তার হাতে পিস্তল তুলে দিয়েছে রেকাম। অবাধ্য হলে অ্যান বনি মাথা তাগ করে গুলি ছুঁড়বে।

জন হামামের জাহাজ ভেসে চলল। দুজনে এখন বড় কাছাকাছি। রেকাম তার পাশে দাঁড়িয়ে। অ্যান তার প্রেমিককে ভালো করে চেয়ে দেখল।

টার্ণলের কথা অ্যান বনি ভোলেনি। লোকটা তাকে বিপদে ফেলেছিল। গভর্ণরের কাছে সেই তো ফুলওয়ার্থকে নিয়ে গিয়েছে। আগের দিন বিকেলে খবর পেয়েছিল অ্যান। টার্ণলে কাছিম শিকারে বেরিয়েছে তার জাহাজ নিয়ে। সমুদ্রে কোথায় রয়েছে টার্ণলে? অ্যান বনি তাকে পেলে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে। কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু টার্ণলের জাহাজটিকে দেখা গেল। সৌভাগ্যক্রমে টার্ণলে তখন কাছাকাছি এক দ্বীপে গিয়েছে। জন রেকামের আদেশে নোঙ্গরকরা জাহাজটির পাল এবং মাস্তুল কেটে দেওয়া হল। অন্যদের সঙ্গে বুড়ো মতন একটা লোক ছিল জাহাজে। তাকে রেখে অন্যদের জাহাজে তুলে নিয়ে রেকাম তার দলবল এবং প্রেমিকাকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

দ্বীপ থেকে টার্ণলে কিন্তু লক্ষ্য করেছিল সব কিছু। ভয়ে সে লুকিয়ে ছিল গাছপালার আড়ালে। যদি জলদস্যুরা এসে দ্বীপে ওঠে তবে তো সর্বনাশের আর বাকী থাকবে না। বুড়ো লোকটার সংগে দেখা হতে সে আদ্যোপান্ত সব কিছু বলল। জলদস্যুরা আর কেউ নয়। জন রেকাম এবং অ্যান বনি। হাতে পেলে তাকে নিয়ে কি করত ওরা? বুড়োকে প্রশ্ন করল টার্ণলে। বুড়ো বলেছিল, অ্যান বনি তাকে শাস্তি দেবার জন্য খুঁজছে। তাকে বলে গেছে অ্যান। টার্ণলেকে পেলে নিজের হাতে ওকে সে বেত মারবে। গভর্ণর যে বেত মারার কথা বলেছিল তাই সে কাজে দেখাত। তবে বেতটা পড়ত অ্যানের উপর নয়,—গভর্ণরের পেয়ারের টার্ণলের গায়ে। যতক্ষণ টার্ণলে না অজ্ঞান হত, বেত চালিয়ে যেত অ্যান!

জন রেকামের পরবর্তী কাহিনী বলা নিষ্প্রয়োজন। সে গল্প একবার বলা হয়েছে। অ্যানকে নিয়ে রেকাম নীল দরিয়ায় বাসা বাঁধলেন। পরে দলশুদ্ধ রেকাম ধরা পড়েছিলেন। এবং সেণ্ট জাগো দা লা ভেগায় তাদের বিচার সমাপ্ত হয়েছিল।

কিন্তু চার্লস ভেন? জন রেকামের যার কাছে হাতেখড়ি হয়েছিল। সেই জলদস্যুটির কি হল জানবার কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

জন রেকামের সংগে ছাড়াছাড়ি হবার পর চার্লস ভেন গেলেন বোনাক্কা দ্বীপে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে বোনাক্কা দ্বীপ থেকে বেরুলেন ভেন। ইচ্ছেটা সমুদ্রে এক

চক্কর মেরে আসা যাক। যদি কিছু শিকার মেলে ভালই, নইলে বসে থেকে দলের লোকেদের হাতে পায়ে বাত ধরে যাচ্ছে। কিন্তু চার্লস ভেনের কপাল মন্দ। হঠাৎ দারুণ এক ঘূর্ণিবাত্যা উঠল সমুদ্রে। প্রচন্ড এলোমেলো ঝড়। চার্লস ভেনের জাহাজডুবি হল। কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ভেন এসে উঠলেন হন্ডুরাস উপসাগরের কাছে মনুষ্য-বসতিহীন এক দ্বীপে। প্রতিদিন দ্বীপের মাটিতে ছোটাছুটি করেন চার্লস ভেন। যদি কোন জাহাজের দেখা মেলে। উদ্ধারের যদি কোনো উপায় হয়। হঠাৎ একদিন সমুদ্রের বুকে দেখা দিল একটি জাহাজ। চার্লস ভেনের মন আনন্দে নেচে উঠল। নানারকম সংকেত করে ভেন দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন জাহাজটির। জাহাজটি কাছে এলে ভেন কিন্তু নিরাশ হলেন। ওর ক্যাপ্টেন হলফোর্ড —চার্লস ভেনের পূর্বপরিচিত। ভেনের দুরবস্থা দেখে হলফোর্ড হাসল। মুখে বলল—'দুঃখিত ভেন। তোমাকে জাহাজে নেবার সাহস নেই আমার। কবে আমার মাথাতেই ডান্ডা বসিয়ে তুমি জাহাজ নিয়ে পালিয়ে যাবে।' চার্লস ভেন অনুনয় বিনয় করলেন। শুধু একবার তাকে বিশ্বাস করা হোক। সকলের নামে তিনি শপথ করছেন। কিন্তু হলফোর্ড সিদ্ধান্তে অটল। চার্লস ভেনকে তার হাড়ে হাড়ে চেনা। কালসাপ এবং চার্লস ভেনকে আশ্রয় দেওয়া একই কথা। ভেনের চোখের সামনে দিয়ে হলফোর্ডের জাহাজ চলে গেল দূরে। রাগে দুঃখে চার্লস ভেনের চোখে জল এল। চোখের জল যখন মুছলেন ভেন তখন জাহাজ দিকচক্রবালে মিলিয়ে গেছে।

অবশ্য চার্লস ভেনকে হলফোর্ড নিয়ে গিয়েছিল তার জাহাজে। কিন্তু সে ঘটনা আরো কিছুদিন পরে। হলফোর্ডের যাবার পর আর একটি জাহাজ এসেছিল এদিকে। চার্লস ভেনের অনুনয়ে তারা তাকে জাহাজে তুলে নেয়। জাহাজ চলছিল বেশ। হঠাৎ হলফোর্ডের বন্দর-ফেরতা জাহাজের সঙ্গে নতুন জাহাজটির দেখা হয়ে গেল। একদিন হলফোর্ড এল নতুন জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে। চার্লস ভেন তখন জাহাজের সাধারণ নাবিক মাত্র। ভেনকে আড়াল থেকে এক পলক দেখেই হলফোর্ড চমকে উঠল। ক্যাপ্টেন করেছে কি! এই কালসাপটাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। আদ্যোপান্ত সব কিছু শুনে ক্যাপ্টেনও চিন্তিত। তখনই পিস্তল দেখিয়ে চার্লস ভেনকে বন্দী করা হল। হলফোর্ড তাকে নিয়ে গেল নিজের জাহাজে। চার্লস ভেনের ব্যবস্থা সেই করবে। ভেন দেখলেন তার দিনগুলি এবার সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। শেষের ঘণ্টা প্রায় শোনা যায়।

হলফোর্ড জামাইকাতে এসে চার্লস ভেনকে সমর্পণ করল। গভর্ণর তো ভেনকে ধরতে পেরেছেন ভেবে বেজায় খুশী। জলদস্যুবৃত্তির অভিযোগে বিচার হল চার্লস ভেনের। ফাঁসী,—চার্লস ভেন পৃথিবী থেকে তার অভিশপ্ত জীবন মুছে দিয়ে চলে গেলেন।

বার্থোলোমিউ রবার্টসের আবির্ভাব শার্পের পরে। শার্প অবশ্য বুকানিয়র—রবার্টস পুরোপুরি জলদস্যু। আঠারো শতকের প্রথম দিকে বার্থোলোমিউ রবার্টস তার দলবল নিয়ে নীল দরিয়ায় ভেসে পড়েন। জলদস্যুদের মধ্যে রবার্টসের একটা রেকর্ড রয়েছে। মাত্র চার বৎসরকালের জলদস্যুজীবনে রবার্টস চারশতাধিক জাহাজ লুণ্ঠন করেছেন। অন্য কোনো জলদস্যুই এতগুলি জাহাজ শিকার করতে সক্ষম হন নি।

মারা যাবার সময় বার্থোলোমিউ রবার্টসের বয়স হয়েছিল চল্লিশের মত। গায়ের রং কালো,...লম্বা সুদৃঢ় গড়ন। লাল ভেলভেটের কোট প্যাণ্ট পরণে। মাথায় লাল পালক গোঁজা টুপী। গলায় সোনার চেন,...হীরের একটি ক্রশ তার মাঝখানে ঝুলছে। হাতে একটা তরবারি এবং কোমরের দুপাশে দুটি পিস্তল গোঁজা।

বার্থোলোমিউ রবার্টসের জন্ম ইংলণ্ডের নিউইবাগে। জায়গাটা পেমব্রুকশায়ারে, হাভারফোর্ড ওয়েস্টের কাছে। নভেম্বর, ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ। লণ্ডন থেকে বার্থোলোমিউ রবার্টস চলেছিলেন গিনির উপকূলের উদ্দেশ্যে। তখনও তিনি জলদস্যু নন। প্রিন্সেস নামক জাহাজটি রওনা হয়েছিল গিনির উপকূল থেকে নিগ্রো দাস সংগ্রহের মানসে। এ্যানমাবো নামক স্থানে যখন প্রিন্সেস জাহাজটি এল, তখন হাওয়েল ডেভিস নামক এক জলদস্যু তার দলবল নিয়ে এর উপর চড়াও হলেন। বলাবাহুল্য বার্থোলোমিউ রবার্টস আরো অনেকের সঙ্গে বন্দী হয়ে এসে উঠলেন জলদস্যুর জাহাজে। কিছুদিনের মধ্যেই রবার্টস ভিড়ে গেলেন জলদস্যুর দলে। সুগঠিত স্বাস্থ্য...অদম্য সাহসের অধিকারী রবার্টস! জলদস্যুরা তাকে দলে পেয়ে খুশী হল।

ইতিমধ্যে এক দুর্ঘটনায় হাওয়েল ডেভিস মারা পড়লেন। দলে নতুন নেতার প্রয়োজন। সুতরাং সভা বসল জলদস্যুদের। নতুন নেতা নির্বাচন করতে হবে। ডেনিস নামের এক জলদস্যু রবার্টসের নাম প্রস্তাব করে বসলেন। সুন্দর এক বক্তৃতার মধ্যে নেতার কি কি সদগুণ থাকা উচিত তা বললেন ডেনিস এবং বার্থোলোমিউ রবার্টস এব্যাপারে সর্বজনগ্রাহ্য হবেন বলে তিনি দাবী করলেন।

নেতা হবার বাসনা আরো অনেকের ছিল। সিম্পসন, অ্যাশপ্ল্যাণ্ট এবং অ্যানটিস —প্রত্যেকেই মনে করেছিল যে দলের সকলে তাকেই নেতা নির্বাচন করবে। কিন্তু ডেনিস বাদ সাধলেন। তার প্রস্তাবের কেউ বিরোধিতা করল না। শুধু সিম্পসন উঠে চলে গিয়েছিল। সত্যি, বেচারী সিম্পসনের রাগ করবার যথেষ্ট কারণ ছিল। মাত্র দেড়মাস দস্যুজীবন কাটিয়েই বার্থোলোমিউ রবার্টস হলেন দলনেতা। অথচ সিম্পসন, অ্যাশপ্ল্যাণ্ট এবং অ্যানটিস কতদিন দলের সঙ্গে ঘুরছেন—।

মাতব্বর হয়ে ক্যাপ্টেন রবার্টস বেশ কয়েকটি নিয়ম চালু করলেন। তার জাহাজে রাত্রি আটটার পর আলো নিভিয়ে দিতে হবে। যদি কেউ অধিক রাত্রি পর্যন্ত মদ্যপান করতে চায়, তবে তাকে যেতে হবে ডেকে। রবার্টস অবশ্য মদ স্পর্শ করতেন না। জলদস্যু রবার্টস পানীয় হিসেবে যা গ্রহণ করতেন, তা হল চা—। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পছন্দ করতেন রবার্টস। জাহাজে ছদ্মবেশে বা পরিচয় দান করে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বন্দী রমণীকে রাখা হত কঠোর প্রহরায়। অবশ্য সুন্দরী রমণীর প্রহরী হবার জন্য জলদস্যুদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা হত।

দক্ষিণ অতলান্তিক পেরিয়ে রবার্টস এসে হানা দিলেন ব্রেজিলের বাহিয়া উপসাগরে। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজরা ব্রেজিলে এসে ওঠে। আলভারেজ কেব্রাল নামে এক পর্তুগীজ প্রথম এসে পা দেন ব্রেজিলের মাটিতে। সেই থেকে ব্রেজিলে পর্তুগীজদের আধিপত্য। পরে অবশ্য ডাচেরা এসে পর্তুগীজদের ভোগদখলে ভাগ বসিয়েছে। ব্রেজিল থেকে সোনা এবং অন্যান্য সম্পদ চালান যেত পর্তুগালের লিসবোয়াতে।

রবার্টস এসে দেখলেন বাহিয়া উপসাগরে সম্পদ বোঝাই বিয়াল্লিশটি পর্তুগীজ জাহাজ অপেক্ষা করছে। খুবই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বার্থোলোমিউ রবার্টস এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বোঝাই জাহাজটি দখল করে বসলেন। লুণ্ঠন করে মিলল প্রায় চল্লিশ হাজার মইডোর (পর্তুগীজ স্বর্ণমুদ্রা) এবং পর্তুগালের রাজার জন্য তৈরী হীরের একটি ক্রশ। বাহিয়া উপসাগর ছেড়ে রবার্টস চললেন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পথে। অনেকগুলি বাণিজ্য জাহাজ ক্যারিবিয়ান সাগরে তার শিকার হল। জামাইকা এবং বারবাডোসকে পিছনে ফেলে রবার্টসের জাহাজ গেল নিউফাউন্ডল্যাণ্ডে। ১৭২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বার্থো রবার্টস আবার ফিরলেন গিনির উপকূলে। ইতিমধ্যে নীল দরিয়ায় তার নাম বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। সমস্ত বাণিজ্য জাহাজগুলি তার ভয়ে সন্ত্রস্ত। বহুদূরে থেকে তার জাহাজের পতাকা দেখে রবার্টসকে চিহ্নিত করা যেত, নাবিকেরা বুঝতে পারত,—ওটা জলদস্যুদের নৌবহর। ক্যাপ্টেন বার্থোলোমিউ রবার্টস তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে নিশ্চিত শমনের বেশে।

পতাকা গ্রহণের ব্যাপারে বার্থোলোমিউ রবার্টসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মোটামুটি তিন রকমের পতাকা ব্যবহার করতেন রবার্টস। মস্ত এক কংকালের ছবি পতাকার বুকে—তার এক হাতে মদের গ্লাস, অন্য হাতে জ্বলন্ত এক তরবারি। অন্য এক ধরণের পতাকাও তার জাহাজে উড়িয়েছেন রবার্টস। পতাকাতে তার নিজের মূর্তি আঁকা—এক হাতে তরবারি, পায়ের নীচে দুই কংকালের ছবি। একদা বারবাডোস এবং মার্টিনিক দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের হাতে জলদস্যু রবার্টস নিগৃহীত হয়েছিলেন। অপমানিত এবং আহত হবার সেই জ্বালা জলদস্যু বিস্মৃত হন নি। তার হাতে পড়ে বারবাডোস এবং মার্টিনিক দ্বীপের লোকেরা কোনোদিন মুক্তি পায়নি। বার্থোলোমিউ রবার্টস অন্য একটি পতাকাও

তৈরী করেছেন। পতাকার বুকে কংকালের ছবি,—তার দুই পা হতভাগ্য দুই দ্বীপ-বাসীর বুকে।

১৭২১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রবার্টসের কাছে সংবাদ এল যে, সোয়ালো এবং উই-মাউথ নামক দুটি যুদ্ধজাহাজ জলদস্যুদের সন্ধানে এগিয়ে আসছে। টিয়া দ্বীপে বার্থেলোমিউ রবার্টস তখন দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছেন। সোয়ালোকে দেখে রবার্টসের অন্য জাহাজ রেঞ্জার এগিয়ে গেল তাড়া করে। কৌশল করে সোয়ালো খানিকটা দূরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। বেশ কিছুটা এসে সোয়ালো রুখে দাঁড়াল। প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর রেঞ্জারের হল পরাজয়। সোয়ালো তখন ফিরে এল বার্থেলোমিউ রবার্টসের সন্ধানে।

খুব ভোরে সোয়ালো জাহাজটি এল টিয়া দ্বীপের কাছে। তার জাহাজ রয়্যাল ফরচুনে বসে ক্যাপ্টেন রবার্টস তখন প্রাতরাশ শেষ করতে ব্যস্ত। কে একজন এসে খবর দিল,—'ক্যাপ্টেন, দুশমন এগিয়ে আসছে।' রবার্টস তখন গরম গরম সালামাগুণ্ডি খেতে ব্যস্ত। জলদস্যুরা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। কেউ কেউ মদ খেয়ে তখনও বেঁহুস। তবু সাজ সাজ রব পড়ে গেল। প্রাতরাশ ফেলে রবার্টস গেলেন দৌড়ে। তার দুই হাতে উচানো পিস্তল। তবু সংঘর্ষের প্রথমেই ক্যাপ্টেন বার্থেলোমিউ রবার্টস গুলিবিদ্ধ হলেন। গুলি লাগল ক্যাপ্টেনের গলায়। একটা জায়গায় ঠেস দিয়ে রবার্টস মরণের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার অক্ষম চেষ্টা করছিলেন। তাজা লাল রক্তে তার সিল্কের জামা, সোনার চেন, হীরের ক্রশ উঠল ভিজে। রবার্টস চোখ মেলে দেখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু আলো কৈ? সব যে অন্ধকার—। দেখতে পেয়ে স্টিফেনসন নামে এক জলদস্যু এসেছিল ছুটে। সে ভেবেছিল ক্যাপ্টেন আহত,—শুশ্রূষা করলেই সেরে উঠবেন। কিন্তু গায়ে হাত দিয়েই তার ভুল ভাঙ্গল। প্রহরীর মত ঠেস দিয়ে যে লম্বা লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, সে বার্থেলোমিউ রবার্টস নয়। প্রিয় ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ মাত্র।

রয়্যাল ফরচুন এবং রেঞ্জার জাহাজের জলদস্যুদের অনেকেই ধরা পড়ে। আফ্রিকার উপকূলে কেপ করসো ক্যাসলে জল-দস্যুদের বিচার শুরু হল। সাটন, অ্যাশ-প্ল্যাণ্ট, সিম্পসন মুডি, বিল, হার্ডি মিচেল, প্ল্যাসকি, জেমস স্কার্ম, ওয়ালডেন, স্কাডামোর, জনসন, উইলসন, জেফিস, মেন্সফিল্ড ইত্যাদি অনেকেই জলদস্যুবৃত্তির অপরাধে অভিযুক্ত। দুটি জাহাজে জল-দস্যুরা সংখ্যায় কম ছিল না। বিচারের রায় বেরুল ১৭২২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাহান্ন জন জলদস্যুর ফাঁসীর হুকুম দিয়েছেন বিচারকরা। নিগ্রো বন্দীদের নিয়ে দু'শ সাতষট্টি জনের হিসেব পাওয়া গেছে। চুয়াত্তর জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, বাহান্ন জনের ফাঁসী। বিশ জনকে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তাদের হল সাত বৎসরের সশ্রম কারাবাস। সত্তর জনের মত নিগ্রো দাস ছিল দলে। তের জন প্রাণ দেয় সংঘর্ষে। উনিশ জনের মত মারা যায় পরে আহত অবস্থায়। দু জন সম্রাটের ক্ষমালাভ করে এবং বাকী সত্তের জনকে পাঠান হয় পুনর্বিচারের জন্য।

এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট জো মোর। মাত্র উনিশ বৎসর বয়স। বাহান্ন জন ফাঁসীর আসামীর মধ্যে জো মোরেরও নাম ছিল।

*　　*　　*　　*

জলদস্যু হিসেবে কবহ্যামের খুব একটা নাম ডাক নেই। কিন্তু একটা বিষয়ে কবহ্যাম অনেক জলদস্যুকে ছাড়িয়ে গেছেন। পথ-দস্যু পপহ্যামের কাহিনী আগেই বলা হয়েছে। দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করে পপহ্যাম হয়েছিলেন ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি। পপহ্যামের মত কবহ্যাম অবশ্য অতদূর পৌঁছতে পারেন নি। তিনি হয়েছিলেন ইংলণ্ডের কাউণ্টি কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট। জলদস্যুদের প্রায় অনিবার্য পরিণতি সংঘর্ষে মৃত্যু, কিংবা ধৃত হয়ে বিচারের মুখোমুখী হওয়া। জলদস্যু কবহ্যাম এ দুটোকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন।

আঠারো বৎসর বয়সে কবহ্যাম স্মাগ-লারদের দলে ভিড়ে যান। তার চালাকী এবং চাতুরীতে মাল পাচার করবার কাজে তিনি হয়ে উঠলেন সেরা স্মাগলার। কিন্তু স্মাগলিং-এর ব্যবসা বেশী দিন ভালো লাগল না তার। কবহ্যাম হলেন জলদস্যু। সেবার প্লাইমাউথ বন্দরে কি প্রয়োজনে যেন নেমেছেন কবহ্যাম। হঠাৎ মারিয়া নামের একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা। প্রথম আলাপেই মারিয়াকে পছন্দ হল কবহ্যামের। হয়ত মারিয়ারও ভালো লেগেছিল এই জল-দস্যুকে। সুতরাং কবহ্যামের প্রস্তাবে রাজী হয়ে মারিয়া এসে উঠলেন জলদস্যুর জাহাজে। কিন্তু মারিয়াকে নিয়ে জলদস্যুর দলে উঠল গুঞ্জন। ব্যাপারটা আর কিছু নয়। নারীঘটিত ঈর্ষা। কিন্তু মারিয়া সঙ্গী জলদস্যুদের তার ব্যবহারে বশ করে ফেলল। তাদের জন্য কবহ্যামকে কিছু বলতে মারিয়া সব সময়ই রাজী। ফলে মারিয়ার উপর অনেকেই খুশী।

ইংলিশ চ্যানেলে কিছুদিন কাটিয়ে কবহ্যাম বেরিয়ে পড়লেন অতলান্তিকের পথে। মহাসমুদ্র পার হয়ে দলবল নিয়ে কবহ্যাম এলেন ব্রিটন অন্তরীপ এবং 'প্রিন্স এডওয়ার্ড' দ্বীপের মাঝে। আত্মগোপন করে অতর্কিত আক্রমণে অনেকগুলি বাণিজ্য জাহাজকে কবহ্যাম লুণ্ঠন করলেন। একবার জাহাজের সমস্ত যাত্রীকে বস্তাবন্দী করে ফেলে দিয়েছিলেন নীল দরিয়ার বুকে। বস্তার মধ্য থেকে তাদের করুণ আর্তনাদও সম্ভবত শোনা যায়নি। জলদস্যুর সঙ্গে থেকে মারিয়াও হয়ে উঠল মারমুখী রমণী। হাসতে হাসতে এক ইংরেজ ক্যাপ্টেনের পেটে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল মারিয়া।

ইতিমধ্যে কবহ্যাম প্রচুর টাকাকড়ি কামিয়েছেন। নীল দরিয়াতে ভেসে বেড়াতে তার আর ভালো লাগছিল না। যে অর্থের জন্য সমুদ্রে ঘর বাঁধা, সেই অর্থই তো হস্তগত। তাহলে আর জলে ভেসে বেড়িয়ে লাভ কি? ইংলণ্ডের উপকূলে হ্যাভারের কাছে বেশ খানিকটা ভূসম্পত্তি কিনে ফেললেন কবহ্যাম। জাহাজ বেচে দিয়ে উঠে এলেন ডাঙ্গায়। কিছুদিনের মধ্যেই ঐ অঞ্চলের একজন গণ্যমান্য ধনী লোক বলে কবহ্যামের নাম ছড়িয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে দলবল নিয়ে কবহ্যাম একদিন বেরিয়েছেন চড়ুইভাতি করতে। সঙ্গে মারিয়াও। হঠাৎ সমুদ্রের বুকে নোঙর করা একটি জাহাজ দেখে কবহ্যাম কৌতূহলী হলেন। মারিয়া এবং অনুচরদের নিয়ে কব-হ্যাম গেলেন জাহাজে বেড়াতে। সুন্দর এই বাণিজ্য জাহাজটির ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে কবহ্যামের মনে পুরানো সেই জলদস্যুর লালসা দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠল। হঠাৎ চোখের ইসারায় মারিয়ার সঙ্গে কি যেন কথাবার্তা হল কবহ্যামের। পর-মুহূর্তেই গুলির শব্দ। বাণিজ্য জাহাজের ক্যাপ্টেনকে গুলি করে মেরেছেন কবহ্যাম। মারিয়া অন্যান্য অনুচরদের নিয়ে অপ্রস্তুত নাবিকদের স্তব্ধ করে ফেলল। কবহ্যামের আদেশে জাহাজটিকে নিয়ে যাওয়া হল বোর্দোতে। কিছুদিনের মধ্যেই আবার স্বস্থানে ফিরে এলেন কবহ্যাম। দুষ্কর্মের কোনো চিহ্নই তখন তার মুখে নেই। শুধু পকেট ভর্তি নোটের তাড়া। জাহাজ বেচে কবহ্যাম যা কামিয়েছেন।

এর কিছুদিন পরই কবহ্যাম হলেন কাউণ্টি কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট। মারিয়া কিন্তু বেশী দিন বাঁচেনি। সম্ভবত জলদস্যু-জীবনের নানা অন্যায়ের কথা তার নারী-মনকে তীব্র পীড়ন করছিল। বিশেষ করে সেই বিষদানের ব্যাপারটা। একটি জাহাজের সমস্ত বন্দীকে মারিয়া খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলে। বিষের জ্বালায় বন্দীর দল যেভাবে ছটফট করতে করতে মরেছে সে দৃশ্য যেন এখনও মারিয়ার চোখের সামনে ভাসে। অনুশোচনায় পাগল হয়ে মারিয়া নিজেও খেয়েছিল বিষ। যন্ত্রণায় নীল হয়ে যেতে যেতে মারিয়া ভাবছিল নীল দরিয়ার কথা,—...খাবারের সঙ্গে বিষ খেয়ে বন্দীরা যেভাবে ইঁদুরের মত ছটফট করে মরেছিল, মারিয়া কি এখন তা অনুভব করতে পারছে? সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি করে যেতে পেরেছে মারিয়া? অনু-তাপের কি ইতি হল তার?

আর কবহ্যাম?

সম্ভবত কবহ্যামের অন্তরে কোনো অনুশোচনার ঢেউ ওঠেনি। কাউণ্টি কোর্টে বিচার করতে বসে অপরাধীর মুখের দিকে চেয়ে কবহ্যামের অন্তর কি কেঁপে ওঠেনি? যাদের বিচার করতে বসেছেন কবহ্যাম, তার মুখের দিকে চেয়ে সেই অপরাধীরা কি মনে করছে? বিচারকের মনে এ সমস্ত কথার গুঞ্জন উঠেছিল কিনা জানা যায় নি।......

দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন কবহ্যাম। সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে বহাল তবিয়তে দিন কাটিয়েছেন। পরবর্তীকালে তার ছেলে-পুলে, নাতিপুতিরা কেউ কেউ হয়েছে ইংলণ্ডের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। তারা কাউণ্টি ম্যাজিস্ট্রেট কবহ্যামের বংশধর।

জলদস্যু কবহ্যাম এবং মারিয়ার কোনো পরিচয় তাদের মধ্যে আবিষ্কার করা অসম্ভব।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

শিল্পী : বারীন দে

প্রতি বছরের মত এবারেও আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডারের একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। মুদ্রণ-শিল্পের উন্নতির সঙ্গে ক্যালেন্ডার ছাপারও উন্নতি হয়েছে। এবারের ক্যালেন্ডার প্রদর্শনীতে ভারত ছাড়া বৃটেন, আমেরিকা, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, চেকোস্লোভাকিয়া, ফিলিপাইনস্, স্পেন, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী ও জাপান অংশগ্রহণ করেছে। ক্যালেন্ডার ছাপার দিক দিয়ে হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী ও বৃটেনের কাজগুলি সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করে। এবারে শিল্পীদের হাতে আঁকা ছবির চাইতে রঙিন ফটোগ্রাফের ক্যালেন্ডারেরই প্রাধান্য দেখা গেল। লেটার প্রেস, অফসেট বা লিথোর কাজই বেশী। সিল্কস্ক্রীনে ছাপার নিদর্শন বোধহয় একটি। বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের ছাপা প্রাচীন শিল্পীদের বিখ্যাত ছবির কয়েকটি ক্যালেন্ডার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপেক্ষাকৃত আধুনিক শিল্পীদের কাজ নিয়ে ছাপান বৃটেন ও আমেরিকার কয়েকটি ক্যালেন্ডারও সুদর্শনীয় হয়েছিল। রঙিন ফটোগ্রাফীর মধ্যে হল্যান্ডের ছাপা ভারতের নরনারীর ওপর ক্যালেন্ডারটি বিশেষ দর্শনীয়। ভারতীয় ক্যালেন্ডারের মধ্যে আধুনিক শিল্পীদের কাজ নিয়ে দু-একটি ক্যালেন্ডার বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল, রঙিন ফটোগ্রাফী ছাপার দিকেও ভারতীয় ক্যালেন্ডার মুদ্রণের কাজ প্রশংসনীয়, তবে সস্তার সিক্তবসনা সুন্দরীর ছবিটি প্রদর্শনীতে একটু বেমানান ঠেকল।

●

শিল্পী গোপেন রায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে তিনখানি গ্যালারী নিয়ে একটি বৃহৎ প্রদর্শনী করলেন। নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার প্রভাবটাই তাঁর কাজের মধ্যে প্রধান। জল-রং ও টেম্পারায় তাঁর একসঙ্গে এতগুলি ছবি এবং ড্রইং-এর এতবড় প্রদর্শনী বোধহয় হয়নি। ১৫৮-খানি ছবি এবং অনেকগুলি ড্রইং তিনি প্রদর্শন করেন। প্রদর্শনীর একটি বিভাগ একান্তভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের রূপকথার চিত্রায়ণ দিয়ে সাজান হয়েছে। এখানে স্বপনপুরী, সোনারকাঠি, রূপোরকাঠি, ঘুমন্তপুরী, শিয়ালপণ্ডিত, টুনটুনির গল্প প্রভৃতি কাহিনীর অজস্র ইলাস্ট্রেশন রাখা হয়েছে। শ্রীরায়ের কাজে যে একটা মূলতঃ ডেকরেটিভ ধরন আছে, সেটা এই ইলাস্ট্রেশনের ছবিগুলিতে পরিস্ফুট। এছাড়া তিনি নব্যভারতীয় প্রথায় গণেশ-জননী, ঋষভদেবের জন্ম প্রভৃতি পৌরাণিক আখ্যান নিয়ে নন্দলালের ধরনের কিছু কাজও প্রদর্শন করেছেন। গগনেন্দ্রনাথের অনুসরণে নিসর্গ-দৃশ্য, প্রভাত, সন্ধ্যা, রাত্রির ওপর অনেকগুলি ছবি ও গগনেন্দ্রনাথের কিউবিস্টিক ধরনের কাজের ধরনের অনেকগুলি কাজও দেখা গেল। কিন্তু এতগুলি কাজের মধ্যে বিশেষ করে স্মৃতিতে ধরে রাখার মত তেমন কিছু পাওয়া গেল না। কারুকার্য তাঁর উন্নত ধরনের সন্দেহ নেই কিন্তু রসের ক্ষেত্রে কোথায় যেন একটা ঘাটতি পড়েছে। তাঁর রূপকথার ছবিগুলি নিয়ে একটি রঙিন ডকুমেন্টারি তোলা হচ্ছে। প্রদর্শনী ২৩শে এপ্রিল থেকে ২রা মে পর্যন্ত খোলা ছিল।

●

চৈতন্য কলা-বিজ্ঞান কেন্দ্রের তৃতীয় বার্ষিক চিত্র-প্রদর্শনী গত ১লা থেকে ৭ই মে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রতিষ্ঠানের ছ'জন শিল্পীর ৩৩খানি ছবি ও অনেকগুলি স্কেচ প্রদর্শিত হয়। নব্যভারতীয় চিত্রকলার আদর্শে শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের অনুপ্রেরণায় শিল্প-সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। রেখাধর্মিতা এবং সমতল চিত্র নির্মাণের দিকে এঁদের ঝোঁক। দেব-দেবীর চিত্র, পৌরাণিক আখ্যান, কিছু প্রতিকৃতি এবং আধ্যাত্মিকতার তুরীয়বাদের প্রভাব কোন কোন কাজে সুস্পষ্ট, কিন্তু সারা প্রদর্শনীতে যে-ভাবটা প্রধান হয়ে ফুটে ওঠে, সেটার মধ্যে খুব যে একটা সুস্থ ও স্বাভাবিকতার ছাপ রয়েছে, সেটা নিশ্চয় করে বলা যায় না। সুধাংশু দাসের ম্যাক্সমুলার ভবনে প্রদর্শিত দু-একটি ছবি এবং দিলীপ মুখার্জির অ্যাবস্ট্রাক্ট্ কয়েকটি কাজ এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা দর্শনীয় মনে হল।

●

মোনালিসা গ্যালারীতে ৭ থেকে ১৪ এপ্রিল দিল্লীর তরুণ শিল্পী নন্দ কুণ্ডুর ১৩।১৪টি সুদৃশ্য মনোপ্রিন্টের একটি পরিচ্ছন্ন প্রদর্শনী হয়ে গেল। শিল্পী দিল্লীর কেন্দ্রীয় স্ট্যাটিস্টিক্যাল সংস্থায় কাজ করেন। কলকাতায় শিল্পশিক্ষা লাভ করার পর কর্মব্যাপদেশে দিল্লীতে বাস করছেন। শ্রীকুণ্ডুর অ্যাবস্ট্রাক্ট কাজগুলির রঙের প্যাটার্ণ অনেকখানি নয়নতৃপ্তিকর। তাঁর লাল, কালো, নীল ও হলদে রঙের উজ্জ্বল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার কয়েকটি প্রিন্টে বেশ ভাল লাগল। একরঙা প্রিন্টগুলিতে কোথাও কোথাও দেহাকৃতি বা মুখের আভাস যেভাবে ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছবির কতকটা আমেজ পাওয়া যায়। তাঁর ১, ৯, ১০, ১১ প্রভৃতি কয়েকটি কাজ বেশ সুদৃশ্য লাগল।

●

৬ থেকে ১২ই মে আকাদমি অব ফাইন আর্টসে দুটি বিভিন্ন ধরনের চিত্রকর্মের একটি যৌথ প্রদর্শনী হয়ে গেল। শ্রীমতী বিজয়া দেবী হীরেমতের বাটিক পেন্টিং এবং শ্রীমান আনন্দরূপ চক্রবর্তীর ছবি।

শ্রীমতী হীরেমত বাটিকের মাধ্যমে ২৫ খানি সুদৃশ্য চিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর রঙের হার্মনি এবং টোন ফোটাবার চাতুর্য প্রশংসনীয়। এ ধরনের কারু-শিল্পের মধ্যে দ্বিতীয় গুণটি ফোটানো বেশ দুষ্কর। ছবির বিষয়বস্তু বা কম্পোজিশানের মধ্যে পারিপাট্য থাকলেও অসাধারণত্ব কিছু নেই, কারণ অন্য মাধ্যমে

এই এফেক্ট আরো ভাল আনা সম্ভব। তবে যে উদ্দেশ্যে এ কাজ করা, অর্থাৎ গৃহাভ্যন্তরের সজ্জা, সে উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সফল হয়েছে। তাঁর কেরলসুন্দরী, হাটের পথে, নিসর্গ দৃশ্য, কেশ প্রসাধন প্রভৃতি ছবি ও দু-একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেকরেশন কারুকর্মের দিক দিয়ে সত্যিই খুব উঁচু-দরের কাজ।

১৩ বছরের ছাত্র আনন্দরূপের কাজ-গুলি বয়সের তুলনায় অনেক পরিণত। বিভিন্ন স্টাইলে করা কয়েকটি জলরঙের নিসর্গ দৃশ্য বা কবিতার ইলাস্ট্রেশন, পেপার কাটিং এবং রঙীন কালির মোরগের লড়াই বা মাছের ছবিগুলি তার দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়।

●

৯ থেকে ১৫ মে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অল বেঙ্গল কার্টুন এগজিবিসান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলা দেশের খ্যাতনামা অনেকগুলি ব্যঙ্গ-চিত্রকরের রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্টুনের অনেকগুলি নিদর্শন রাখা হয়েছে। পি সি লাহিড়ী, প্রমথ, শৈল চক্রবর্তী, অমিয়, চণ্ডী, প্রভৃতি বহু ব্যঙ্গ-চিত্রকরের কাজের নিদর্শন দেখা গেল। উদ্যোক্তারা প্রদর্শনীটি সুসজ্জিত করবার জন্যে কিছু সময় দিতে পারলে এটি আরো সুদৃশ্য হতে পারত।

●

৫ই মে আকাদেমির দোতলায় ভারতের বয়নশিল্পের নিদর্শনের একটি স্থায়ী গ্যালারীর উদ্বোধন হল। লেডী রাণু মুখার্জির ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নির্বাচিত এই প্রদর্শনীতে তিনি যে সব জিনিস আকাদেমিতে দান করেছেন তার অংশ-বিশেষমাত্র দেখানো সম্ভব হয়েছে। তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী এই সংগ্রহের মধ্যে দুবেরাজের নাম লেখা চারটি বালুচরী শাড়ি সকলেরই কৌতূহলের বিষয় হবে। এ ছাড়া আরো অনেকগুলি অপূর্ব বালুচরী, সূক্ষ্ম ঢাকাই, বিষ্ণুপুরী, কাঁথা ও খুসীদা বাংলা দেশের বয়নশিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম ভারত থেকে বিচিত্র বর্ণের নক্সাদার পাটোলা, কাঁচ ও পাঁতি বসান চোলি, চম্বার রুমাল পাঞ্জাবের অতি বিরল ফুলকারী এবং প্রাচীন বর্ণাঢ্য বেনারসী এবং ওড়না তাদের রঙ ও নক্সার বাহারে দর্শকের মনোহরণ করবে। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ থেকে চমৎকার কতকগুলি শাড়ি এবং সুনির্বাচিত কাশ্মীরী শাল গ্যালারীর অন্যতম আকর্ষণ। মোগল আমলের রীতিতে সাজান একটি চারপাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এ ছাড়া শাড়ির সঙ্গে স্থানীয় হস্তশিল্পের নিদর্শন দিয়ে প্রদর্শনী সজ্জার রুচিবৈশিষ্ট্য প্রশংসনীয় বস্ত্রশিল্পের ডিজাইনের উন্নতিকল্পে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখেই এই প্রদর্শনীর আয়োজন। আশা করা যায় তাঁরা উপকৃত হবেন।

●

৬ থেকে ১২ই মে আকাদেমি অব আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটসের উদ্যোগে আকাদেমি অব ফাইন আর্টসে একটি বৃহৎ চিত্র, বস্ত্র ও ফ্যাশান প্যারেডের অনুষ্ঠান হল। অঞ্জিঙ্কু স্টুডিওর সভ্যবৃন্দের করা অনেক-গুলি ছাপা ও হাতে আঁকা ডিজাইনের শাড়ি ও স্কার্ফ এর বিশেষ আকর্ষণ। ভারতের চিরাচরিত ডিজাইনের সুরুচি-সম্মত প্রয়োগে কতকগুলি কাজ বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। জৈন পুঁথি চিত্রণ থেকে নেওয়া কয়েকটি ডিজাইন উল্লেখ-যোগ্য। এ ছাড়া পঞ্চাশখানির ওপর বিভিন্ন মানের ছবিগুলিও ইন্টারেস্টিং হয়েছিল।

●

বাঙালীদের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের ঝোঁকের অভাব আছে বলে কখনো কখনো অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু বাস্থীন দে এর ব্যতিক্রম। এরোনটিকাল ইঞ্জিনীয়ারের কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি ছবি আঁকা শুরু করলেন। রেস্টুরেন্টের ব্যবসা তুলে প্রদর্শনীর গ্যালারী করলেন এবং বর্তমান মাসের শেষে কিম্বা আগামী মাসের গোড়ায় ছবি আঁকতে আঁকতে হিচ-হাইক করে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়বেন বলে স্থির করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য, তুরস্ক, পূর্ব ইয়োরোপ হয়ে, পশ্চিম ইয়োরোপ পেরিয়ে আমেরিকা, দক্ষিণ সাগরের দ্বীপপুঞ্জ হয়ে দূরপ্রাচ্য পরিক্রমা করে স্বদেশে ফেরা তাঁর বাসনা। সঙ্গে টাকাকড়িও বিশেষ নেই পথের প্রান্তে প্রদর্শনী করে ছবি এঁকে বা যে কোনরকম কাজ করে পাথেয় সংগ্রহ করে নেবেন বলে স্থির করেছেন। বিদেশের শিল্প ও শিল্পী-দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া তাঁর একান্ত ইচ্ছা। এ ধরনের একক সাংস্কৃতিক মিশন বড় একটা দেখা যায় না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নানারকম ব্যবহার্য জিনিসের মাধ্যমে কিছু সাহায্যও পেয়েছেন। তাঁর যাত্রার পূর্বে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ৪ থেকে ৮ই মে তাঁর পুরাতন ও আধুনিক ছবি ও কিছু ড্রয়িং-এর একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলেন। তাঁর কয়েকটি পুরনো প্রতিকৃতি, শয়নগৃহ, স্নানঘর, প্রভৃতি ছবিগুলি এবারেও ভালই লাগল। বিশ্বভ্রমণ সেরে তাঁর নতুন ছবি দেখবার আশায় রইলাম।

●

অন্ধ্র প্রদেশের শিল্পী এম রাজাজীব ১৫খানি ছোট মাপের ক্যানভাসের একটি প্রদর্শনী ১৯ থেকে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই প্রদর্শনীতে শিল্পী ভারতীয় নৃত্যকলা নিয়ে যে অনুসন্ধান করেছেন, তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। মন্দির গাত্রে ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গিমার যেসব নিদর্শন রয়েছে তার থেকেই তিনি ছবি তৈরীর মাল-মশলা যোগাড় করেছেন। প্রতিটি ক্যানভাসে একটি করে নৃত্য-ভঙ্গিমা ফ্রেমের সঙ্গে সুচিন্তিত ভাবে কম্পোজ করা। রঙের দিক দিয়ে কিন্তু তাঁর কাজে বৈচিত্র্য অনেক কম। রঙের প্রয়োগ অবশ্য সুপরিণত। তাছাড়া রেখার মাধ্যমে কয়েকটি ক্যানভাসে ছন্দ ও গতিবেগ দেখতে ভালই লাগে।

●

১৬ থেকে ২২ এপ্রিল অ্যাকাদেমির দক্ষিণের গ্যালারীতে উষা কামেরকারের একটি চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল। শিল্পী বোম্বাইয়ের জে জে স্কুলের ছাত্রী। রঙের প্রয়োগ অনেকখানি অনুভূতিশীল। শিল্পু-দের শিল্পকলার এবং আধুনিক শিল্প-রীতির বিভিন্ন ধারার প্রভাব এঁর কাজের মধ্যে পরিস্ফুট। তাঁর ৪ নম্বরের নগর-দৃশ্য, পার্বত্য দৃশ্য, কোচিনের রাস্তা, ও দু-একটি বাড়ির ছবির ডিজাইন, সমতল প্যাটার্ণ ও রঙের বাহার প্রশংসনীয়। তবে তাঁর কাজের মধ্যে ব্যক্তিগত স্টাইল এখনো পরিস্ফুট হয় নি।

নিমাই ভট্টাচার্য

(১৪)

দোলাবৌদি,
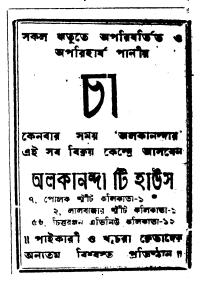
মেমসাহেবের দিল্লীবাসের প্রতিটি মুহূর্তের কাহিনী জানবার জন্য তুমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে উঠেছ। মেমসাহেব কি বলল, কি করল, কেমন করে আদর করল, কোথায় কোথায় ঘুরল ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার রকমের প্রশ্ন তোমার মনে উদয় হচ্ছে। তাই না? হবেই তো। শুধু তুমি নও, সবারই হবে।

আমি সবকিছুই তোমাকে জানাব। তবে প্রতিটি মুহূর্তের কাহিনী লেখা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাদের সম্পর্ক এমন একটা স্তরে পৌঁছেছিল যে, ইচ্ছা থাকলেও সবকিছু লেখা যায় না। তোমাকে কিছুটা অনুমান করে নিতে হবে। তাছাড়া মানুষের জীবনের ঐ বিচিত্র অধ্যায়ের সবকিছু কি ভাষা দিয়ে লেখা যায়?

বেলা এগারটার সময় ব্রেকফাস্ট খেয়ে দু'ঘণ্টা ধরে বিছানায় গড়াগড়ি করতে করতে দু'জনে কত কি করেছিলাম! কখনও ও আমাকে কাছে টেনেছে, কখনও বা আমি ওকে টেনে নিয়েছি আমার বুকের মধ্যে। কখনও আমি ওর ওষ্ঠে বিষ ঢেলেছি, কখনও বা আমার ওষ্ঠে ও ভালবাসা ঢেলেছে। কখনও আবার দু'জনে দু'জনকে দেখেছি প্রাণভরে। সে-দেখা যেন শুভ-দৃষ্টির চাইতেও অনেক মিষ্টি, অনেক স্মরণীয় হয়েছিল।

আমি বল্লাম, কতদিন বাদে তোমাকে দেখলাম! সারাজীবন ধরে দেখলেও আমার সে-লোকসান পূরণ হবে না।

আমার বুকের 'পর মাথা রেখে শুয়ে শুয়েই ও একটু হেসে শুধু বল্লো, 'তাই বুঝি?'

'তবে কি?'

বন-হরিণীর মত মুহূর্তের মধ্যে মেম-সাহেবের চোখের দৃষ্টিটা একটা ঘুরপাক দিয়ে আকাশের কোলে ভেসে বেড়াল কিছুক্ষণ। একটু পরে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লো, আমি কিন্তু তোমাকে রোজ দেখতে পেতাম।

আমি চমকে উঠলাম, তার মানে?

ও একটু হাসল। দু' হাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে প্রায় মুখের 'পর মুখ দিয়ে বল্লো, সত্যি তোমাকে রোজ দেখেছি।

এবার আর চমকে উঠিনি। হাসলাম। বল্লাম, কেন আজে-বাজে বকছ?

'আজে-বাজে নয় গো, আজে-বাজে নয়। রোজ সকালে কলেজে বেরুবার পথে রাস-বিহারীর মোড়ে এলেই মনে হতো তুমি দাঁড়িয়ে আছ, ইসারায় ডাকছ। তারপর আমরা চলেছি এসপ্লানেড, ডালহৌসী, হাওড়া।'

এবার মেমসাহেব উবুড় হয়ে শুয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার মুখের 'পর। 'বিকেলবেলায় ফেরার পথে তোমাকে যেন আরো বেশী স্পষ্ট করে দেখতে পেতাম। মনে হতো তুমি রাইটার্স বিল্ডিং-এর ডিউটি শেষ করে কোনদিন ডালহৌসী স্কোয়ারের ঐ কোণায়, কোনদিন লাটসাহেবের বাড়ীর ওপাশে দাঁড়িয়ে আছ।'

এবার যেন হঠাৎ মেমসাহেব কেঁদে ফেলল। 'ওগো, বিশ্বাস কর, কলেজ থেকে ফেরবার পর বিকেল-সন্ধ্যা যেন আর কাটতে চাইত না......

আমি চট করে মন্তব্য করলাম, রাত্রিটা বুঝি মহাশান্তিতে কাটাতে?

হঠাৎ যেন লজ্জায় ওকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমার মুখের পাশে মুখটা লুকাল। আমি জানতে চাইলাম, কি হলো?

মুখ তুলল না। মুখ গুঁজে রেখেই ফিসফিস করে বল্লো, কিছু বলব না।

'কেন?'

'তোমার ডাঁট বেড়ে যাবে।'

'ঠিক আছে। আমার কাছ থেকেও তুমি কিছু জানতে পাবে না। তাছাড়া তোমার প্রাণের বন্ধু জয়া কি করেছিল, কি বলে-ছিল, সেসব কিছু তোমাকে বলব না।'

মেমসাহেব আর স্থির থাকতে পারে না। উঠে বসল। আমার হাতদুটো ধরে বল্লো, ওগো, বল না, কি হয়েছিল।

আমি মাথা নেড়ে গাইলাম, 'কিছু বলব বলে এসেছিলেম, রইনু চেয়ে না বলে।'

প্রথমে খুব বীরত্ব দেখিয়ে মেমসাহেব গাইল, 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে—তুমি জান না, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে।'

আমি হাসতে হাসতে বল্লাম, খুব ভাল কথা। অত যখন বীরত্ব, তখন জয়ার কথা শুনে কি হবে?

আমার সোল প্রোপাইটার-কাম-ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ঘাবড়ে গেল। বোধহয় ভাবল, জয়া এই উঠতি বাজারে শেয়ার কিনে ভবিষ্যতে বেশ কিছু মুনাফা লুটতে চায়। হয়ত আরো শেয়ার কিনে শেষপর্যন্ত অংশীদার থেকে—

ও প্রায় আমার বুকের 'পর লুটিয়ে পড়ল। 'বল না গো, জয়া কি করেছে?' এক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আবার বল্লো, জয়া আমার বন্ধু হলে কি হয়। আমি জানি ও সুবিধের মেয়ে নয়, ও সবকিছু করতে পারে।

জান দোলাবৌদি, জয়া আমাকে কিছুই করেনি। তবে ও একটু বেশী স্মার্ট, বেশী মডার্ন। তাছাড়া বড়লোকের আদুরে মেয়ে বলে বেশ ঢলঢল ভাব আছে। আমার মত ছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বসলে জয়ার কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হাসতে হাসতে হয়ত দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল, হয়ত কাঁধে মাথা রেখেই হিঃ হিঃ করতে লাগল। মেমসাহেব এসব জানে।

একবার আমি, মেমসাহেব আর জয়া ব্যারাকপুর গান্ধীঘাট বেড়াতে গিয়ে কি কাণ্ডটাই না হলো! হি-হি হা-হা করে হাসতে হাসতে জয়ার বুকের কাপড়টা পাশে পড়ে গিয়েছিল। মেমসাহেব দু'-একবার ওকে ইসারা করলেও ও কিছু গ্রাহ্য করল না। রাগে গজগজ করছিল মেমসাহেব কিন্তু কিছু বলতে পারল না। আমি অবস্থা বুঝে চট করে উঠে একটু পায়চারি করতে করতে জয়ার পিছন দিকে চলে গেলাম। তারপর দেখি মেমসাহেব জয়ার আঁচল ঠিক করে দিল।

কলকাতা ফিরে মেমসাহেব আমাকে বলেছিল, এমন অসভ্য মেয়ে আর দেখিনি!

দিল্লীতে জয়ার ছোটকাকা হোম মিনিস্ট্রীতে ডেপুটি সেক্রেটারী ছিলেন। তাইতো মাঝে মাঝেই দিল্লী বেড়াতে আসত। মেমসাহেব হয়ত ভাবল না জানি ওর অনুপস্থিতিতে জয়া আরো কি করছে।

জয়ারা এর মধ্যে দু'বার দিল্লী এলেও আমার সঙ্গে একবারই দেখা হয়েছিল। তাও বেশীক্ষণের জন্য নয়। আর সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে জয়া আমার পবিত্রতা নষ্ট করবার কোন চেষ্টাও করেনি।

শুধু শুধু মেমসাহেবকে ঘাবড়ে দেবার জন্য জয়ার কথা বল্লাম।

রিপোর্টার হলেও হঠাৎ পলিটিসিয়ান হয়ে মেমসাহেবের সঙ্গে একটু পলিটিক্স করলাম। কাজ হলো।

শর্ত হলো মেমসাহেব আগে সবকিছু বলবে, পরে আমি জয়ার কথা বলব।

বেল বাজিয়ে গজাননকে তলব করে হুকুম দিলাম, হাফ-সেট চায় লেআও।

গজানন মেমসাহেবের কাছে আর্জি জানাল, বিবিজি, ছোটসাবকা চায় পিনা থোড়ি কমতি হোনা চাইয়ে।

মেমসাহেব একবার আমাকে দেখে নিয়ে গজাননকে বল্লো, তোমার ছোটাসাব আমার কিছু কথা শোনে না।

ওর কথা শুনে স্নেহাতুর বৃদ্ধ গজাননও হেসে ফেলল। 'এ-কথা ঠিক না বিবিজি। ছোটাসাব চব্বিশ ঘণ্টা শুধু তোমার কথাই বলে।

'গজানন, তুমিও তোমার ছোটাসাব-এর পাল্লায় পড়ে মিথ্যা কথা বল।'

গজানন জিভ কেটে বল্লো, ভগবান কা কসম বিবিজি, ঝুট আমি কক্ষনো বলব না।

মেমসাহেব হাসল, আমি হাসলাম।

গজানন বল্লো, যদি তোমার গুস্সা না হয়, তাহলে তোমাকে একটা কথা বলতাম।

মেমসাহেব বল্লো, তোমার কথায় আমি কেন রাগ করব?

'ছোটাসাব তোমাকে ভীষণ প্যার করে।'

'কি করে বুঝলে?' মেমসাহেব জেরা করে।

গজানন হাসল। বল্লো, বিবিজি, আমি তোমাদের আংরেজি পড়িনি। তোমাদের মত আমার দিমাগ নেই। এই দিল্লীতে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেল। অনেক বড় বড় লোক দেখলাম কিন্তু হামারা ছোটাসাব-এর মত লোক খুব বেশী হয় না।

আমি গজাননকে একটা দাবড় দিয়ে বলি, যা, ভাগ। চা নিয়ে আয়।

গজানন চা আনল। চলে যাবার সময় আমি বল্লাম, গজানন, কিছু টাকা রেখে যেও।

গজানন চোখ দিয়ে মেমসাহেবকে ইসারা করে বল্লো, হ্যাগো বিবিজি, টাকা দেব নাকি?

আমি উঠে গজাননকে একটা থাপ্পড় মারতে গেলেই ও দৌড় দিল।

চা খেতে খেতে মেমসাহেব কি বলল জান? বলল অনেক কিছু।

একদিন সকালে উঠে মেজদি ওকে বলল, আমি আর পারছি না।

মেমসাহেব জানতে চাইল, কি পারছিস না রে?

'প্রক্সি দিতে।'

'কিসের প্রক্সি? কার প্রক্সি?'

'কার আবার? রিপোর্টারের।'

মেমসাহেব বলল, অসভ্যতা করিস না মেজদি। মনে মনে কিন্তু সত্যি একটু চিন্তিত হলো।

একটু পরে একটু ফাঁকা পেয়ে মেমসাহেব মেজদিকে ধরল। 'হ্যারে কি হয়েছে রে?'

মেজদি দর কষাকষি করে, যা চাইব তাই দিবি বল।

জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একটু ভিজিয়ে নিল মেমসাহেব। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা একটু কামড়ে ভ্রূ কুঁচকে এক মুহূর্তের জন্য ভেবে নিল। 'ঠিক আছে যা চাইবি তাই দেব।'

মেজদি ওস্তাদ মেয়ে। কাঁচা কাজ করার পাত্রী সে নয়। তাই গ্যারান্টি চাইল। 'মা কালীর ফটো ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, আমি যা চাইব তাই দিবি।'

ও ঘাবড়ে যায়। একবার ভাবে মেজদি ঠকিয়ে কিছু আদায় করবে। আবার ভাবে, না, না, কিছু দিয়েও খবরটা জানা দরকার। মেমসাহেবের দোটানা মন শেষপর্যন্ত মেজদির ফাঁদে আটকে যায়। মা কালীর ফটো ছুঁয়েই প্রতিজ্ঞা করল, আমাকে সবকিছু খুলে বললে তুই যা চাইবি, তাই দেব।

মেজদি ওকে টানতে টানতে ঐ কোনার ছোট্ট বসবার ঘরে নিয়ে দরজা আটকে দেয়। মেমসাহেবের বুকটা টিপটিপ করে। গোল টেবিলের পাশ থেকে দুটো চেয়ার টেনে দুজনে পাশাপাশি বসল।

মেজদি শুরু করল, রাত্তিরে তুই কি করিস, কি বকবক করিস, তা জানিস?

'কি করি রে মেজদি?'

'কি আর করবি? আমাকে রিপোর্টার ভেবে কত আদর করিস, তা জানিস?'

লজ্জায় আমার কালো মেমসাহেবের মুখও লাল হয়েছিল। বলেছিল, যা, যা, বাজে বকিস না।

মেজদি সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ঠিক আছে। না শুনতে চাস, ভাল কথা।

ও তাড়াতাড়ি মেজদির হাত ধরে বসিয়ে দেয়, আচ্ছা যা বলবি বল।

'তোর আদরের চোটে তো আমার প্রাণ বেরুবার দায় হয়।'...

'কেন মিথ্যে কথা বলছিস?'

মেজদি মুচকি হাসতে হাসতে বল্লো, মা কালীর ফটো ছুঁয়ে বলব?

'না, না, আর মা কালীর ফটো ছুঁয়ে বলতে হবে না।'

'শুধু কি আদর? কত কথা বলিস।'

'ঘুমিয়ে? ঘুমিয়ে?'

মেজদি মুচকি হেসে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। বিশ্বাস না হয় মাকে জিজ্ঞাসা কর।'

'মা শুনেছে?' মেমসাহেব চমকে ওঠে।

'একদিন তো ডেফিনিট শুনেছে, হয়ত রোজই শোনে।'

ও তাড়াতাড়ি মেজদির হাতটা চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করল, কি কথা বলেছি রে?

নির্লিপ্তভাবে মেজদি উত্তর দিল, তুই ওকে যা যা বলে আদর করিস, তাই বলেছিস। আবার কি বলবি?

সোফায় বসে সেণ্টার টেবিলের 'পর পা তুলে দিয়ে আমরা গল্প করছিলাম। মেমসাহেব ডান হাত দিয়ে আমার মাথাটা কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে বলল, দেখেছ ঘুমিয়েও তোমাকে ভুলতে পারি না।

একটু চুপ করে এবার ফিসফিস করে বলল, দেখেছ, তোমাকে কত ভালবাসি!

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে এক গাল ধুঁয়ো ছেড়ে বললাম, ঘোড়ার ডিম ভালবাস! যদি সত্যি সত্যিই ভালবাসতে, তাহলে আজও মেজদি তোমার পাশে শোবার সাহস পায়?

মেমসাহেব আমাকে ভেংচি কেটে বলল, শুতে দিচ্ছি আর কি!

এবার আমি ওর কানে কানে বললাম, আজ তো আমার হাতে লাটাই। আজ কোথায় উড়ে যাবে? তাছাড়া আজ তো তুমি আমাকে পুরস্কার দেবে।

'পুরস্কার?'

'সেই যে—যা চাইবে, তাই পাবে—পুরস্কার!'

মেমসাহেব আমার পাশ থেকে প্রায় দৌড়ে পালিয়ে যেতে যেতে বলল, আমি আজই কলকাতা পালাচ্ছি।

নাটকের এই এক চরম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আবার গজাননের আবির্ভাব হলো। বেশ মেজাজের সঙ্গে বলল, দুটো বেজে গেছে। তোমরা কি সারাদিনই গল্প-গুজব করবে? খাওয়া-দাওয়া করবে না?

দুটো বেজে গেছে? দুজনেই এক-সঙ্গে ঘড়ি দেখে ভীষণ লজ্জিত বোধ করলাম। গজাননকে বললাম, লাঞ্চ দিয়ে এস। দশ মিনিটে আমরা স্নান করে নিচ্ছি।

দিল্লীতে আমাদের দ্বৈত জীবনের উদ্বোধন সংগীত কেমন লাগল? মনে হয় খারাপ লাগেনি। আমারও বেশ লেগেছিল। অনেক দুঃখ, কষ্ট, সংগ্রামের পর এই আনন্দের অধিকার অর্জন করেছিলাম। তাইতো বড় মিষ্টি লেগেছিল এই আনন্দের আত্মতৃপ্তির আস্বাদন।

মেজদিকে ম্যানেজ করে কলেজ থেকে সাতদিনের ছুটি নিয়ে ও আমার কাছে এসেছিল। এসেছিল অনেক কারণে, অনেক প্রয়োজনে। সমাজ-সংস্কারের অক্টোপাশ থেকে মুক্ত হয়ে একটু মিশতে চেয়েছিলাম আমরা দুজনেই। মেমসাহেবের দিল্লী আসার কারণ ছিল সেই মুক্তির স্বাদ, আনন্দ উপভোগ করা।

আরো অনেক কারণ ছিল। শূন্যের মধ্যে দুজনেই অনেক দিন ভেসে বেড়িয়েছিলাম। দুজনেরই মন চাইছিল একটু নিরাপদ আশ্রয়। সেই আশ্রয়, সেই সংসার বাঁধার জন্য অনেক কথা বলবার ছিল। দুজনেরই মনে মনে অনেক কল্পনা আর পরিকল্পনা ছিল। সেসব সম্পর্কেও কথাবার্তা বলে একটা পাকা সিদ্ধান্ত নেবার সময় হয়েছিল।

যাই হোক এক সপ্তাহ কোন কাজকর্ম করব না বলে আমিও ছুটি নিয়েছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মেমসাহেবকে ট্রেনে চড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত টাইপরাইটার আর পার্লামেণ্ট হাউস স্পর্শ করব না। চেয়েছিলাম প্রতিটি মুহূর্ত মেমসাহেবের সান্নিধ্য উপভোগ করব।

সত্যি বলছি দোলাবৌদি, একটি মুহূর্তও নষ্ট করিনি। ভগবান আমাদের বিধি-নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ জানতেন বলে একটি

মুহূর্তেও অপব্যয় করতে দেননি। কথায়, গল্পে, গানে, হাসিতে ভরিয়ে তুলেছিলাম ঐ ক'টি দিন।

লাঞ্চ খেতে খেতে অনেক বেলা হয়েছিল। চব্বিশ ঘণ্টা ট্রেন জার্নি করে নামবার পর থেকে মেমসাহেব একটুও বিশ্রাম করতে পারেনি। আমি বললাম, মেমসাহেব, তুমি একটু বিশ্রাম কর, একটু ঘুমিয়ে নাও।

'এই ক'মাসে কলকাতায় অনেক ঘুমিয়েছি, অনেক বিশ্রাম করেছি। তুমি আর আমাকে ঘুমুতে বল না।'

এক মিনিট পরেই বলল, তার চাইতে তুমি বরং একটু শোও। আমি তোমার গায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

'আমি কেন শোব?'

'শোও না। আমি তোমার পাশে বসে বসে গল্প করব।'

শোবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু লোভ সামলাতে পারলাম না। দিল্লীর কাব্যহীন জীবনে অনেক দিন এমনি একটি পরম দিনের স্বপ্ন দেখেছি।

মেমসাহেব বিশ্রাম করল না কিন্তু আমি সত্যি সত্যিই শুয়ে পড়লাম। ও আমার পাশে বসে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গুনগুন করে গান গাইছিল। কখনও কখনও আবার একটু আদর করছিল। কি আশ্চর্য, আনন্দে যে আমার সারা মন ভরে গিয়েছিল, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। স্বপ্ন যে এমন করে বাস্তবে দেখা দিতে পারে, তা ভেবে আমি অদ্ভুত সাফল্য, সার্থকতার স্বাদ উপভোগ করলাম।

বালিশ দু'টোকে ডিভোর্স করে মেমসাহেবের কোলে মাথা রেখে দু' হাত দিয়ে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে চোখ বুজলাম।

ও জিজ্ঞাসা করল, ঘুম পাচ্ছে?

কথা বললাম না, শুধু মাথা নেড়ে জানালাম, না।

'ক্লান্ত লাগছে?'

'না।'

'তবে?'

'স্বপ্ন দেখছি।'

'স্বপ্ন?'

মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, স্বপ্ন দেখছি।

'মুখটা আমার মুখের কাছে এনে ও জানতে চাইল, কি স্বপ্ন দেখছ?'

'তোমাকে স্বপ্ন দেখছি।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ, তোমাকে।'

'আমি তো তোমার পাশেই রয়েছি। আমাকে আবার কি স্বপ্ন দেখছ?'

ওর কোলের পর মাথা রেখেই চিৎ হয়ে শুলাম। দু'হাত দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে বললাম, হ্যাঁ, তোমাকেই স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্ন দেখছি, জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমি এমনি করে তোমার কোলে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাচ্ছি, ভালবাসা পাচ্ছি, ভরসা পাচ্ছি।

মুহূর্তের জন্য গর্বের বিদ্যুৎ চমকে উঠে মেমসাহেবের সারা মুখটা উজ্জ্বল করে তুললো। পরের মুহূর্তেই ওর ঘন কালো গভীর উজ্জ্বল দুটো চোখ কোথায় যেন তলিয়ে গেল। আমাকে বলল, ওগো, তুমি আমাকে অমন করে চাইবে না, তুমি আমাকে এত ভালবাসবে না।

'কেন বল তো?'

'যদি কোনদিন কোন কিছু দুর্ঘটনা ঘটে, যদি কোনদিন আমি তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলতে না পারি, সেদিন তুমি সে-দুঃখ, সে-আঘাত সহ্য করতে পারবে না।'

আমি মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম, তা হতে পারে না মেমসাহেব। আমার স্বপ্ন ভেঙে দেবার সাহস তোমারও নেই, ভগবানেরও নেই।

আমার কথা শুনে বোধহয় ওর একটু গর্ব হলো। বলল, আমি জানি তুমি আমাকে ছাড়া তোমার জীবন কল্পনা করতে পার না কিন্তু তাই বলে অমন করে বলো না।

'কেন বলব না মেমসাহেব? তোমার মনে কি আজো কোন সন্দেহ আছে?'

'সন্দেহ থাকলে কেউ এমন করে ছুটে আসে।'

মেমসাহেব আবার থামে। আবার বলল, তোমার দিক থেকে যে আমি কোন আঘাত পাব না, তা আমি জানি। ভয় হয় নিজেকে নিয়েই। আমি কি পারব তোমার আশা পূর্ণ করতে? পারব কি সুখী করতে?

'তুমি না পারলে আর কেউ তো পারবে না মেমসাহেব। তুমি না পারলে স্বয়ং ভগবানও আমাকে সুখী করতে পারবেন না।'

আরো কত কথা হলো। কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে যায়, বিকেল ঘুরে সন্ধ্যা হলো। ঘর-বাড়ী রাস্তাঘাটে আলো জ্বলে উঠল।

মেমসাহেব বলল, ছাড়। আলোটা জেবলে দিই।

'না, না, আলো জেবলো না। এই অন্ধকারেই তোমাকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আলো জ্বাললেই আরো অনেক কিছু দেখতে হবে।'

'পাগল কোথাকার!'

'এমন পাগল আর পাবে না।'

ও আমাকে চেপে জড়িয়ে ধরে বলল, এমন পাগলীও আর পাবে না।

'ভগবান অনেক হিসাব করেই পাগলার কপালে পাগলী জুটিয়েছেন। তা না হলে, কি এত মিল, এত ভালবাসা হয়?'

ঐ অন্ধকারের মধ্যেই আরো কিছু সময় কেটে গেল।

মেমসাহেব বলল, চলো, একটু ঘুরে আসি।

'তোমার কি বেড়াতে ইচ্ছা করছে?'

'কলকাতায় তো কোনদিন শান্তিতে বেড়াতে পারিনি। এখানে অন্ততঃ কো[illegible] দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘুরতে হবে না।'

মেমসাহেব আলো জ্বালল। বেল টিপে বেয়ারা ডাকল। চা আনাল। চা তৈরি করল। আমি শুয়ে শুয়েই এক কাপ চা খেলাম।

এবার মেমসাহেব তাড়া দেয়, নাও চটপট তৈরী হয়ে নাও।

আমি শুয়ে শুয়েই বললাম, ওয়াড্রবটা খোল। আমাকে একটা প্যান্ট আর বুশ সার্ট দাও।

মেমসাহেব লম্বা বেণী দুলিয়ে বেশ হেলেদুলে এগিয়ে গিয়ে ওয়াড্রব খুলেই প্রায় চীৎকার করে উঠল, একি তোমার ওয়াড্রবে শাড়ী?

একবার শাড়ীগুলো নেড়ে বলল, এ যে অনেক রকমের শাড়ী। ঘুরে ঘুরে কালেকশন করেছ বুঝি?

ও আমার প্যান্ট-বুশ-সার্ট না দিয়ে হ্যাঙ্গার থেকে একটা কটকি শাড়ী এনে আমার কাছে আব্দার করল, আমি এই শাড়ীটা পরব?

'তবে কি আমি পরব?'

শাড়ীটার দু-একটা ভাঁজ খুলে একটু জড়িয়ে নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, লাভলি!

'কি লাভলি? শাড়ী না আমি?'

শাড়ীটা গায়ে জড়িয়েই আয়নার সামনে একটু ঘুরে গেল মেমসাহেব। বলল, ইউ আর নটোরিয়াস বাট শাড়ী ইজ লাভলি।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে মেমসাহেবকে জড়িয়ে ধরতেই ও বকে উঠ[illegible] সব সময় জড়াবে না। শাড়ীটার ভাঁজ নষ্ট করো না।

চট করে ও এবার আমার দিকে ঘুরে আমার মুখের দিকে ব্যাকুল হয়ে চেয়ে বলল, ওগো, ব্লাউজের কি হবে? তুমি নিশ্চয়ই ব্লাউজ পিস কেননি?

আমি ওর কানটা ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ঘরের কোনায় নিয়ে গিয়ে একটা ছোট সুটকেশ খুলে দিলাম। 'নটি গার্ল! হ্যাভ এ লুক।'

হাসতে হাসতে বলল, ব্লাউজ তৈরী করিয়েছ?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মাপ পেলে কোথায়?'

'তোমার ব্লাউজের মাপ আমি জানি না?'

আমার মাথায় দুষ্টুমি বুদ্ধি আসে। কানে কানে বলি, সুড আই টেল ইউ ইওর ভাইট্যাল স্ট্যাটিকটিকস?

মেমসাহেব আমার পাশ থেকে পালিয়ে যেতে যেতে বলল, কেবল অসভ্যতা! জার্নালিস্টগুলো বড় অসভ্য হয়, তাই না?

'তোমাদের মত ইয়ং আনম্যারেড প্রফেসরগুলো বড় ধার্মিক হয়, তাই না?'

'কি করব? তোমাদের মত এক-একটা দস্যু-ডাকাতের হাতে পড়লে আমাদের কি নিস্তার আছে?'

আমি যেন আরো কি বলতে গিয়েছিলাম, ও বাধা দিয়ে বলল, এবার তর্ক বন্ধ করে বেরুবে কি?

মেমসাহেব শাড়ীটা সোফার পর রেখে নিজের সুটকেশ থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি বের করে বলল, এই নাও পর।

'এবারও জড়িপাড় ধুতি দিলে না?'

'জড়িপাড় ধুতি না পাবার জন্য তোমার কি কিছু অসুবিধা বা ক্ষতি হচ্ছে?'

দোলাবৌদি, আমার জীবনের সেসব স্মরণীয় দিনের কথা স্মৃতিতে অমর অক্ষয় হয়ে আছে। আজ আমি রিক্ত, নিঃস্ব। ভিখারী। আজ আমার বুকের ভিতরটা জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। মনের মধ্যে অহরহ রাবণের চিতা জ্বলছে। গঙ্গা-যমুনা নর্মদা-গোদাবরীর সমস্ত জল দিয়েও এ আগুন নিভবে না, নিভতে পারে না।

বাইরে থেকে আমার চাকচিক্য দেখে, আমার পার্থিব সাফল্য দেখে, আমার মুখের হাসি দেখে সবাই আমাকে কত সুখী ভাবে। কত মানুষ আরো কত কি ভাবে। আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কতজনের কত বিচিত্র ধারণা! মনে মনে আমার হাসি পায়। একবার যদি চিৎকার করে কাঁদতে পারতাম, যদি তারস্বরে চিৎকার করে সব কিছু বলতে পারতাম, যদি হনুমানের মত বুক চিরে আমার অন্তরটা সবাইকে দেখাতে পারতাম তবে হয়ত—

দেখেছ, আবার কি আজে-বাজে বকতে শুরু করেছি? তোমাকে তো আগেই লিখেছি ঐ পোড়াকপালীর কথা লিখতে গেলে, ভাবতে গেলে, মাঝে মাঝেই আমার মাথাটা কেমন করে উঠে। আরো একটু ধৈর্য ধর। তুমি হয়ত বুঝবে আমার মনের অবস্থা।

দোলাবৌদি, আমাদের দুজনের কাহিনী নিয়ে ভলিউম ভলিউম বই লেখা যায়। সেই সাত দিনের দিল্লী বাসের কাহিনী নিয়েই হয়ত একটা চমৎকার উপন্যাস লেখা হতে পারে। তাছাড়া তিন দিনের জন্য জয়পুর আর সিমলিকেই ঘোরা? আহাহা! সেই তিনটি দিন যদি তিনটি বছর হতো। যদি সেই তিনটি দিন কোন দিনই ফুরাত না?

দিল্লীতে সেই প্রথম রাত্রিতে আমরা এক মিনিটের জন্যও ঘুমুলাম না। সারা রাত্রি কথা বলেও ভোরবেলায় মনে হয়েছিল যেন কিছুই বলা হলো না? মনে হয়েছিল যেন বিধাতাপুরুষের রসিকতায় রাত্রিটা হঠাৎ ছোট হয়েছিল। সকালবেলায় সূর্যকে অসহ্য মনে হয়েছিল।

মোটা পর্দার ফাঁক দিয়ে সূর্যরশ্মি চুরি করে আমাদের ঘরে ঢুকে বেশ উৎপাত শুরু করেছিল। কিন্তু তবুও ও আমার গলা জড়িয়ে শুয়ে ছিল আর গুনগুন করে গাইছিল, আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো।...

আমি প্রশ্ন করলাম, সত্যি?

ও বলল, তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো। তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও—

'আমি আবার কোথায় যাব?'

মেমসাহেব মাথা নেড়ে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার গাইতে থাকে, 'আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো।

'সিওর?'

'সিওর।' ও এবার কনুই-এর ভর দিয়ে ডান হাতে মাথাটা রেখে বাঁ হাত দিয়ে আমার মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গাইল—

আমি তোমারি বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস—
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী,
দীর্ঘ বরষ-মাস।
যদি যদি আর-কারে ভালবাস......

আমি বললাম, তুমি পারমিশন দেবে?

মেমসাহেব হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই আবার গাইল—

আর যদি ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও,
আমি যত দুঃখ পাই গো।

আমি বললাম, আমি আর কিছু চাইছি না, তুমিও দুঃখ পাবে না।

ও আমাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে চেপে ধরে ঠোঁটে একটু ভালবাসা দিয়ে বলল, আমি তা জানি গো, জানি।

সকালবেলায় চা খেতে খেতে মেমসাহেব বলল, ওগো, চলো না দুদিনের জন্য জয়পুর ঘুরে আসি।

আইডিয়াটা মন্দ লাগল না। ঐ চা খেতে খেতেই প্ল্যান হয়ে গেল। একদিন জয়পুরে, একদিন সিলিকেই ফরেস্ট বাংলোয় থাকব। তারপর দিল্লী ফিরে এসে কিছু ঘোরাঘুরি, দেখাশুনা আর সংসার পাতার বিধিব্যবস্থা করা হবে বলেও ঠিক করলাম।

ভালবাসা নিও।

তোমাদের বাচ্চু

অরুন্ধতী দেবী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় নয়না শাহ্ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেক্ষাগৃহ

বি, এফ, জে, এ-র ৩১ বার্ষিক উৎসব

ছ'ই মে সন্ধ্যায় বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ৩১তম বার্ষিক শংসাপত্র (সার্টিফিকেট অব মেরিট) বিতরণী উৎসবে বাঙলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বি-এফ-জে-এ শংসাপত্র বিজয়ী চিত্রনায়ক ও নায়িকা, সহনায়ক ও সহ-নায়িকা, চরিত্রাভিনেতা, প্রযোজক, পরি-চালক, চিত্রনাট্যকার, সংলাপরচয়িতা সঙ্গীতপরিচালক, গীতিকার, নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী এবং কলাকুশলীদের যে-অভূতপূর্ব সমাগম ঘটেছিল, তা বোধকরি, বি-এফ-জে-এ-র আর কোনো বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিনি। এবং সমগ্র কর্মকান্ডটি জনকয়েক অত্যুৎ-সাহী আলোকচিত্রগ্রহণকারীর হঠকারিতার কথা বাদ দিলে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবসমৃদ্ধ পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী কে, কে, শাহ বলেন : আন্তর্জাতিক মানের জন্যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের যে খ্যাতি, তা' মূলত
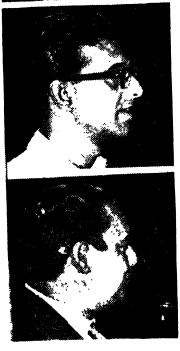
সংগীত পরিবেশনে সুষমা দে, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, মুকেশ

উদ্বোধনী ভাষণ দেন শ্রী কে কে শাহ। পাশে শ্রী বি এন সরকার

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বিকাশ রায় সুবোধ রায় ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায় সুব্রত মিত্র

স্বল্প ব্যয়ে নির্মিত বাঙলা ছবির জন্যেই। সমগ্র ভারতে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই চলচ্চিত্র শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত। সভাপতির ভাষণে অশোককুমার সরকার অনুরোধ করেন, প্রযোজকরা যেন আর্থিক সাফল্য কামনায় শালীনতাকে বিসর্জন না দেন। তিনি বলেন, "উৎকৃষ্ট ছবি নির্মাণে উৎসাহ দেবার জন্যেই বি-এফ-জে-এ-র পুরস্কার। চলচ্চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দদান, এ-কথা স্বীকার করে নিয়েও বলব, অশোভনতা এবং অশ্লীলতার আশ্রয় না নিয়েও চিত্তাকর্ষক আনন্দদায়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব। শ্রীসরকার অভিযোগ করেন, বিদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাসগুলি ভারতীয় ছবির প্রচার ব্যাপারে অমার্জনীয়ভাবে উদাসীন। প্রধান অতিথিরূপে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপনারায়ণ সিংহ বলেন, "সারা ভারতে বাঙলার ছবির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদী। বাঙলার যাত্রাগান, কীর্তন, রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য এর চলচ্চিত্রেও বর্তমান। বাঙলা ছবি ভারতের অন্য রাজ্যে ভাষার জন্যে বোধগম্য না হওয়ার সমস্যাটি কাটিয়ে ওঠা শক্ত।" বি-এফ-জে-এ-র শংসাপত্র গ্রহণের জন্যে বোম্বাই থেকে এসেছিলেন—সুনীল দত্ত, নয়না সাহু, দীনা গান্ধী, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, বিমল দত্ত ও ডি এন মুখোপাধ্যায়, মুকেশ ও মান্না দে। মাদ্রাজ থেকে এসেছিলেন, 'মিলন' ছবির শব্দযন্ত্রী : রামস্বামী ও শ্রীনিবাসন। নিউ থিয়েটার্সের স্বনামধন্য বীরেন্দ্রনাথ সরকার শংসাপত্রগুলি বিতরণ করেন।

দুই নায়ক : সুনীল দত্ত ও উত্তমকুমার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও চলচ্চিত্র শিল্প :

ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্যে খেসারত যোগাতে হয়েছে বাঙলাদেশ এবং পাঞ্জাব—পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তবর্তী এই দুই রাজ্যকে নিজেদের দেহ কর্তিত করে। কিন্তু পাঞ্জাব যেভাবে ধর্মের ভিত্তিতে দ্রুত জনসংখ্যা ও গৃহসম্পত্তি বিনিময়ের ফলে পশ্চিম পাকিস্থানভুক্ত পাঞ্জাব ও ভারতভুক্ত পূর্ব পাঞ্জাবের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান করে নিয়েছে, সমগ্র পূর্ববঙ্গ জুড়ে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে-কোনো কারণেই হোক, তা সম্ভব হয়নি এবং এই সম্ভব না হওয়ার বিষময় ফলস্বরূপে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসের জন্যে দলে দলে হিন্দু পরিবারের

ফটো—
সুকুমার রায়

শুভাগমন ভারত বিভাগের দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে আজও অব্যাহত রয়েছে এবং যোগ্য বিনিময় ব্যবস্থার অভাবে গৃহসম্পত্তি হারানোর ফলে পূর্ব পাকিস্তানাগত শরণার্থী হিন্দুদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে ও হচ্ছে বহুল পরিমাণে। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিনিময়ের যে ব্যাপক নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, আমাদের বাঙলাদেশের বেলায় তেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়নি কেন, তা সাধারণভাবে বুঝে ওঠা দুষ্কর। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা জীইয়ে থাকার ফলে একদিকে যেমন এই রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো কোনো একটা স্থির রূপ পরিগ্রহ করতে পারছে না, অন্যদিকে তেমনই নিত্য নবাগত শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবনের সঙ্গে একাত্ম

হয়ে উঠতে পারছেন না; এমনকি ভারত-বিভাগের সংগে সংগে যাঁরা পূর্ববংগ ত্যাগ করে এ-রাজ্যে এসে কায়েমীভাবে বসবাস শুরু করে দিয়েছেন, তাঁরাও অধুনা আগত শরণার্থীদের সাদরে আপন করে নিতে যথেষ্ট কুণ্ঠা বোধ করছেন, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

সমাজ এবং অর্থনীতির এই তরল ও বিশৃংখল অবস্থায় প্রতিফলন দেখা যায় পশ্চিমবংগের সর্বক্ষেত্রে—কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, শিল্প, খেলাধুলো চাকুরী, রাজনীতি—সর্বত্রই চলেছে ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত এবং নিত্য ভাঙা ও গড়া। তার ওপর পশ্চিমবংগ রাজ্য সরকারের ভীরু, দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত ও দূরদৃষ্টির নিদারুণ অভাবজনিত নীতির ফলে আর্থিক ও ব্যবসায়িক দিক দিয়ে এই রাজ্যের আসল অধিবাসীরাই হয়ে পড়ছে ক্রমেই কোণঠাসা। লোহা, পাট, কয়লা, কাপড় প্রভৃতি বড়ো বড়ো শিল্পের তো কথাই নেই, এমনকি চাল, ডাল, ঘি, তেল প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রীরও ছোটবড়ো ব্যবসা ক্রমেই আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এমনকি পশ্চিমবংগের চলচ্চিত্রশিল্প, যার ওপর সবাক যুগের শুরু থেকে অন্তত দশ-পনেরো বছর ধরে নিউ থিয়েটার্স, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন, স্ক্রীন কর্পোরেশন, রাধা ফিল্ম (?) অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রভৃতি বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানের একাধিপত্য ছিল, তাও আজ ধীরে ধীরে এমন সব স্বার্থসর্বস্ব লোকদের এক্তিয়ার-ভুক্ত হয়ে উঠেছে, যাঁদের আমলে শিল্পটির প্রতি কোনো দরদ নেই, যাঁদের শ্যেনদৃষ্টি রয়েছে মাত্র অর্থের উপর। বলতে বাধ্য হচ্ছি, ভারতের আর কোনো রাজ্য সরকার সেই রাজ্যের প্রকৃত বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এমন শোচনীয় ক্রম-অবনতিতে শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা নয়, এমনভাবে পরোক্ষে সাহায্য করেন না।

পশ্চিমবংগের চলচ্চিত্রশিল্পে আজ শান্তির স্বপ্ন চলেছে। যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতি সহজ অর্থলাভের হাতছানিতে প্রলুব্ধ করেছে আমাদের শিল্পী ও কলাকুশলীদের। ফলে যখন চার-পাঁচজন জনপ্রিয় শিল্পী পঞ্চাশ-ষাট হাজার থেকে লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট্ সই করছেন একসঙ্গে দশ-বারো-খানা ছবিতে, কৃতী এবং অপেক্ষাকৃত ভাগ্য-বান আলোকচিত্রশিল্পী, পরিচালক, সংগীত-

পরিচালক প্রভৃতিও যেখানে একসংগে ছ' আটখানা ছবিতে কাজ করতে অংগীকার-বদ্ধ হয়ে কালো টাকাকে ঘরে তুলছেন, সেখানে শিল্পী ও কলাকুশলীদের একটি বৃহত্তর অংশ দিনের পর দিন উপবাসী থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। যাঁরা টাকার পাহাড় উপার্জন করছেন, তাঁরা ভুলেও কোনো দিন বলছেন না, 'আমি অনেকগুলো কাজ হাতে নিয়েছি, অমুক বসে আছেন, তাঁকে কাজটা দিন।' অথচ কুড়ি বছর আগেও শিল্পী ও কলাকুশলীদের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি লক্ষ্য করা যেত। যোগ্যতার অতিরিক্ত অনায়াস অর্থলাভ মানুষকে কি হীনমন্যই না করে তোলে। চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিতের হাতের কালোবাজারি অর্থ একদিকে নামকরা প্রযোজক প্রতিষ্ঠানগুলির দরজা বন্ধ করতে সাহায্য করছে, অপরদিকে প্রযোজনা-ব্যয়কে অন্যায়ভাবে বর্ধিত করেছে; যেখানে এক-জন শিল্পী দশ হাজার এবং একজন কলা-কুশলী দু-তিন হাজার টাকায় হাসিমুখে কাজ করতেন, সেখানে তাঁদের চাহিদা উঠেছে অন্যূন ষাট হাজার ও দশ হাজারে। কালোবাজারীর কালো টাকার সংগে পাল্লা দিতে গিয়ে কিছু চুনোপুঁটি প্রযোজক সর্বস্বান্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছেন।

অপরদিকে পশ্চিমবংগের চলচ্চিত্র-শিল্পের পরিবেশন বিভাগে আজ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব করছেন যাঁরা, তাঁদের না আছে শিল্পের প্রতি মমতা, না আছে এ রাজ্যের শিল্পীদের প্রতি কোনো দরদ। তাঁরা নীতি-গতভাবে লোভনীয় শর্তে পশ্চিমবংগ রাজ্যের বাইরে থেকে আগত ছবিগুলিকে যত বেশী সম্ভব চিত্রগৃহে দেখাবার বন্দোবস্ত করে থাকেন। ফলে মাত্র কলকাতা ও হাওড়ার ১৫৩টি সিনেমাগৃহের মধ্যে ১০৯টিতে কোনোদিনই বাঙলা ছবি দেখানো হয় না। বাঙলার সুদূর পল্লী অঞ্চলেও বাঙালীর মালিকানায় পরিচালিত চিত্র-গৃহেও তাই ভিন্ন রাজ্যের ছবি দেখানো হয়ে থাকে অবলীলাক্রমে। চিত্রগৃহের মালিক বাঙালী হলেও ব্যবসায়ী; তাই বাঙলা ছবিকে বিসর্জন দিয়ে যে-ছবি দেখিয়ে তিনি মুনাফা লুটতে পারেন, তা দেখাতে তাঁর একটুও বাধে না। পশ্চিমবংগ সরকার বলেন, পশ্চিমবংগ সিনেমা (নিয়মবিধি) আইন অনুসারে প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহে বাঙলা ছবি প্রদর্শনীকে আবশ্যিক করা নাকি সম্ভব নয়। এ-কথা বলেন না যে, প্রতিটি সিনেমায় বাঙলা ছবির প্রদর্শনকে আবশ্যিক করবার জন্যে পুরোনো মান্ধাতা আমলের আইনকে বাতিল করে নতুন আইন গড়ব এখনই। আমাদের রাজ্যের শিল্পকে বাঁচাবার জন্যে সকল রকম রক্ষাকবচ আমাকে প্রস্তুত করতেই হবে। ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পকে পৃথিবীর মানচিত্রে মর্যাদার স্থান দিয়েছে এই বাঙলা ছবিই—এ-কথা এই সেদিন কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রী কে কে শাহ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন বেংগল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসো-সিয়েশনের ৩১ বার্ষিক শংসাপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে। সেই বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পকে শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর করবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ পর্যন্ত কোন্ সাহায্যহস্ত প্রসারিত করেছেন? পশ্চিম-বংগের নাট্যসংস্থাগুলিও কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কাছ থেকে নানারূপ সুযোগ-সুবিধা এবং আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। অথচ এমন একটা মহৎ শিল্পের সংরক্ষণের জন্যে প্রস্তাবিত উন্নয়ন-শুল্ককে তাঁরা 'প্রদর্শনী শুল্ক' (শো-ট্যাক্স্) নামে আত্মসাৎ করতে একটুও দ্বিধাগ্রস্ত হননি। ফিল্ম স্টুডিও ও ল্যাবরেটরীগুলিতে কর্ম-শৃংখলা ও নিয়মিত পারিশ্রমিক আদায়ের সুবিধার জন্যে ওগুলিকে কারখানা (ফ্যাক্টরী) আইনের আওতায় আনার প্রস্তাব ও'রা সোৎসাহে গ্রহণ ক'রে কারখানা লাইসেন্সের প্রাপ্য অর্থ আদায় করেই ক্ষান্ত রইলেন, কর্মশৃংখলা ও পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যবস্থা যে-তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্য সরকারের চলচ্চিত্রের প্রতি সহানুভূতিমূলক ও শ্রীবৃদ্ধিসাধক নীতি এবং আইনগুলি আমাদের পশ্চিমবংগ সর-কারকে যে বিন্দুমাত্রও আত্মসমীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে না, এতে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। কিংবা সরকার আমাদের বিমাতা, এই কথাই সত্য হয়ে থাকবে?

বেংগল মোশান পিকচার্স এম্প্লয়িজ ইউনিয়নের সভ্যশ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন চিত্র-গৃহের কর্মীরা আজ দু' মাসেরও ওপর (১৯ই মার্চ থেকে) ধরে ধর্মঘট চালাচ্ছেন তাঁদের ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্যে। কিন্তু কৈ, বি-এম-পি-ই-উ'এর কর্তৃ-পক্ষও তো বাঙলাদেশের প্রতিটি চিত্র-গৃহে কম করে বছরের ১০ বা ১৫ সপ্তাহ বাঙলা ছবি দেখাতেই হবে, এমন একটি শর্তকে তাঁদের দাবির অন্তর্ভুক্ত করেননি? সংকীর্ণ স্বাদেশিকতাই বলুন আর যাই বলুন, বাঙলা ছবি এবং বাঙলার চলচ্চিত্র-শিল্পকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে শ্রীবৃদ্ধির পথে চালিত করতে গেলে প্রথমে পশ্চিমবাংলা বাঙলা ছবি দেখাবার ব্যবস্থাকে আবশ্যিকভাবে প্রশস্ততর করতে হবে, পরে অপরাপর রাজ্যেও তা যাতে যোগ্য সমাদর লাভ করে, তারও ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই দুই ব্যাপারেই পশ্চিমবংগ সরকার যাতে সর্বরকমে, এমনকি নতুন আইন প্রণয়ন করেও সাহায্য করেন, তার জন্যে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। অপরদিকে চিত্র-প্রযোজনায় যাতে অনর্থক অর্থ অপব্যয়িত না হয়, তার জন্যে প্রযোজকদের সংঘবদ্ধ হয়ে শিল্পী ও কলাকুশলীদের সম্যক সহযোগিতা প্রার্থনা করতে হবে। এবং প্রযোজনার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যাতে উপযুক্ত সাহায্য (সাবসাইডি) দেবার ব্যবস্থা চালু করেন, সে-ব্যাপারেও অবহিত হতে হবে। বাঙলার চলচ্চিত্র-শিল্পকে রাহুমুক্ত করতেই হবে এবং এখনই।

—নান্দীকর

বিদেশী ছবির খবর

ফেদারিকো ফেল্লিনীর সুযোগ্য সহকারী ব্রুনেল্লো রোন্দি এবার স্বাধীনভাবে ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে আসছেন। 'দি লাভারস' নামে একখানা ছবির চিত্রনাট্য তিনি শেষ করে ফেলেছেন। আপাততঃ তিনি যে ছবির কাজ করছেন সেটি হল 'হানিমুন'। ক্যারলকার ও জাঁ সোরেল প্রধান চরিত্রদুটিতে আছেন। আজুরার সমুদ্রতীর, জেনেভা ও রোমের বিভিন্ন স্থানে ছবির দৃশ্য গ্রহণ শুরু হবে শিগগীর।

প্রায় চারশ' কোটি ইয়েন ব্যয়ে জাপানের "সান অব কুরব্যো' ছবির প্রিমিয়ার হয়ে গেল কিছুদিন আগে টোকিওর ন্যাশনাল থিয়েটারে। ছবির মুক্তি-উৎসবে উপস্থিত ছিলেন রাজন্যপরিবারের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ। কেই কুমাই পরিচালিত এ ছবিতে প্রধান দুটি চরিত্রে আছেন জাপানের দুই সর্বজনপ্রিয় শিল্পী তোশিরো মিফুন ও য়ুজিরো ইশিওরা।

১৯৬৪তে 'হাড' ছবিতে অভিনয়ের জন্য অস্কার পাওয়ার পর থেকে এ ক'বছর যাবৎ প্যাট্রিসীয়া নীল চিত্রজগৎ থেকে সরে গিয়েছিলেন। আনন্দের কথা তিনি আবার ফিরে আসছেন। যে ছবিতে তিনি অভিনয় করবেন ইতিপূর্বে সে বইটি পুলিৎজার পুরস্কার, নিউইয়র্ক নাট্য-সমালোচকদের পুরস্কার ও আঁতোনিয়েৎ পুরস্কার লাভ করেছে। য়ুলু গ্রসবার্ড-এর পরিচালনায় ছবির প্রাথমিক কাজ শেষ। শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান আগামী মাসেই হবে আশা করা যায়। প্যাট্রিসিয়া ছাড়া এ ছবিতে ওঁর স্বামীর ভূমিকায় জ্যাক এলাটিসল ও ছেলের চরিত্রে মার্টিন সীল অভিনয় করবেন।

'দি হট লাইফ', 'দুবস গাল', 'মিট দি ওয়াইফ' প্রভৃতি ছবির চিত্রনাট্যকার মার্সেলো ফনদাতো এবার চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছেন স্বকৃত চিত্রনাট্যে নতুন ছবি নিয়ে। সার্দিয়ানার ব্যাকগ্রাউন্ডে এ কাহিনীর বিস্তার। ছবির নাম 'দি প্রোটাগনিস্ট'। জর্জিও আলবর্তাজি আফ্রিকা যেতে অস্বীকার করায় 'সিটেড আট দিস রাইট' ছবির নায়ক চরিত্রটিকে এখন রূপদান করছেন ফ্রাঙ্কো সিত্তি। এর আগে সিত্তি পিয়ের পাওলো পাসোলিনির পরিচালনায় 'অডিপাস রেক্স' ছবিতে অভিনয় করেছিল। ছবির প্রায় সব কাজই হবে আফ্রিকায়।

ড্যানিশ প্রতিরোধ বাহিনীর উপর লেখা ডেভিড ল্যাম্পের উপন্যাস 'দি স্যাভাজ ক্যানারী'কে চিত্রায়ণের জন্য এগিয়ে এসেছেন প্রযোজক আর্ভিং অ্যালেন। ইতিমধ্যে প্রযোজক ছবিটি পরিচালনার জন্য ডেভিড মিলারকে চুক্তিবন্ধ করেছেন। নাৎসীদের বিরুদ্ধে ড্যানিশরা যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেছিল সেই অপরিচিত সত্য ঘটনার চিত্রায়ণ হবে এ ছবিতে। এ বছরে বসন্তেই কোপেনহেগেন ও ইংল্যান্ডের স্টুডিওয় ছবিটির চিত্র-গ্রহণ শুরু হবে। অ্যালেন-এর প্রযোজনায় দ্বিতীয় আর একখানা ছবি পরিচালনা করবেন হেনরী লেভিন। ভিন্স এডওয়ার্ড অভিনীত এ ছবির নাম 'দি মারাডির্দার্স'। ওয়াল্টার ব্রাউ-কৃত চিত্রনাট্যে পরিচালক সোনে ছবির কাজ খুব শীগ্‌গীরই শুরু করছেন।

বিবিধ সংবাদ

মুর্শিদাবাদ সংস্কৃতি পরিষদ

মুর্শিদাবাদের নবগঠিত 'মুর্শিদাবাদ সংস্কৃতি পরিষদ' ম্যাক্সিম গর্কির জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় গর্কির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে। অনুষ্ঠান সভাপতি শ্রীমতী অপরাজিতা দাসগুপ্তা এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সংস্থার সভাপতি শ্রীঅবু ঘটক স্বরচিত কবিতা পাঠ করে গর্কির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে আর যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রমথ সেন, তপেন গাঙ্গুলী নারায়ণ ঘোষ ও অন্যান্যরা। এই নতুন সংস্থা সামাজিক উন্নয়নাদি ও পল্লী সংস্কারের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করবেন বলে স্থির করেছেন।

শিশু ও কিশোর শিল্পী সম্মেলন

কৃষ্টির নবম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব ও তৃতীয় বার্ষিক সারা বাংলা শিশু ও কিশোর শিল্পী সম্মেলন উপলক্ষে ১৮ই ও ১৯শে মে সন্ধ্যা ৬টায় হাওড়া টাউন হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ১৮ই মে শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় সভাপতি ডাঃ নিমাইসাধন বসু ও প্রধান অতিথি যুগান্তর সম্পাদক শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ। নাটক—'এক পশলা বৃষ্টি' ও 'কৌটিপতি নিরুদ্দেশ।'

১৯শে মে রবিবার সন্ধ্যা ৬টায়—সংগীতানুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী উৎসব। সভাপতি শ্রীঅখিল নিয়োগী। উভয় দিনের বাংলার বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক, ও সাংবাদিকদের সম্বর্ধনা জানানো হবে।

স্কাইলার্কের রবীন্দ্র জন্মোৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ খিদিরপুর কবিতীর্থে শিশু ও কিশোর প্রতিষ্ঠান 'স্কাইলার্ক'-এর উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয়। ঐদিন সংস্থার নিজস্ব গ্রন্থাগারেরও উদ্বোধন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত, আবৃত্তি ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শেলী চন্দ্র, শ্রাবণী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাবেরী ভট্টাচার্য, অরুণিমা ভট্টাচার্য, মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

দক্ষিণ হাওড়া রবীন্দ্র সংস্কৃতি সম্মেলন

সম্মেলনের রবীন্দ্র-জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধন দিবস ২৫শে বৈশাখে সাঁত্রাগাছি, বাকসাড়ায় ন্যাশন্যাল প্লেসে অনাড়ম্বর পরিবেশ সদস্যদের সম্মিলিত কন্ঠে 'হে নতুন...' গানে কবিগুরুকে প্রণাম জানানোর পর উর্মি, রঞ্জনা ও সন্ধ্যার সমবেত সংগীত এবং পরে 'শিল্পশিবির' প্রযোজিত বিচিত্র গানের অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করলেন শচীন মুখোপাধ্যায়, আনন্দ চৌধুরী, কৃষ্ণা মৈত্র, অনিল দত্ত, অপর্ণা লাহিড়ী, শেখর রায় তৃপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিল বসু। 'বিচিত্রা' শীর্ষক আলোচনা করেন বারীন মৈত্র।

সিনে সেণ্ট্রাল-এর উদ্যোগে চেক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী :

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে সিনে সেণ্ট্রাল-এর উদ্যোগে ১২ই মে থেকে ২০এ মের মধ্যে ছ'দিন চেকোশ্লোভেকিয়ার আধুনিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের দেখবার জন্যে।

মণিপুরী নৃত্যে রাসলীলা
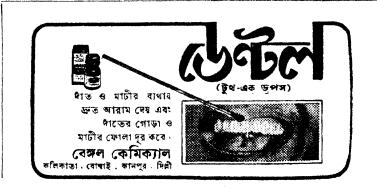
ভারতীয় সংগীতসংস্কৃতিতে কীর্তন একান্তভাবেই বাঙালীর অবদান। অবলুপ্ত-প্রায় কীর্তনকে সগৌরবে স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস সম্প্রতিকালের ঘটনা। স্যার ব্রজেন্দ্রলাল ও লেডী প্রতিভা মিত্রের পুত্র 'শংকর মিত্র শুধু সুগায়কই ছিলেন না, কীর্তনের পুনঃপ্রচার ছিল তাঁর অন্যতম আকাঙ্ক্ষা। মাত্র ২৩ বছর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যুর পর ১৯৩৭ অব্দে লেডী প্রতিভা মিত্র তাঁরই স্মৃতিরক্ষায় একটি কীর্তন শিক্ষাকেন্দ্র খোলেন। কবি-গুরু স্বয়ং এই প্রতিষ্ঠানের নাম রাখেন "শংকর মিত্র কীর্তন শিক্ষালয়"। উপযুক্ত গুরুর তত্ত্বাবধানে কীর্তন শিক্ষাদান ছাড়াও কীর্তনবিষয়ক দুটি মূল্যবান গ্রন্থের প্রকাশন এই শিক্ষালয়ের সংগঠন-মূলক কর্ম তালিকার অন্যতম।

সম্প্রতি কমলা গার্লস স্কুলে ডাঃ সতী ঘোষ পরিকল্পিত মণিপুরী নৃত্যরূপায়ণে 'রাসলীলা'র এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। কীর্তনের এক-ঘেয়েমী বর্জন করে তার রসঘন রূপটির শিল্পসম্মত বিস্তার সহজ নয়। কিন্তু এই কঠিন কাজ অনায়াসজ্ঞতায় সম্পন্ন করে বিদগ্ধ রসিকের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছেন ডাঃ সতী ঘোষ।

শ্রীমতী রাধারাণীর পরিচালনায় সুবিখ্যাত পদকর্তাদের কীর্তনগুলি শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের প্রণয়ালেখ্য তথা বিরহ মিলনের উদ্বেল আকুলতাকে রসমূর্তিদান করেছে। শ্রীমতী রাধারাণীর কয়েকটি একক সংগীত এই অনুষ্ঠানের বিশেষ সম্পদ।

শ্রীনবঘনশ্যামের নৃত্যপরিচালনায় মণিপুরীর পটভূমিকায় কিশোরী শিল্পী-দের নৃত্যনাট্য ভাববস্তুকে পরিস্ফুট করতে পেরেছে। বিশেষ করে মনে পড়ে কৃষ্ণের ভূমিকায় ছায়া ঘোষ এবং শ্রীরাধিকার রূপদক্ষতায় শ্রীমতী মায়া মুখোপাধ্যায়কে চাচর, একতাল ও তিনতালের বিভিন্ন ছন্দে সংগতে সুদক্ষ পদক্ষেপ ও বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জনায় মগ্নমুক্ত স্বচ্ছ অনুভবের স্বাক্ষর মুদ্রিত। এছাড়া মঞ্জীরা বন্দ্যো-পাধ্যায়, মঞ্জু দত্ত, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, মিত্রা ঘোষ, তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, ভাস্বতী ঘোষ, মিতালী সেন, শিল্পী বক্সীর সমবেত নৃত্যে এবং সাধনা বসু, লীলা চক্রবর্তী, আরতি বসু, ভারতী রায়, পর্ণা ভট্টাচার্য, শেফালী সাহা, দীপা বিশী ও বংশীধারীর কণ্ঠসংগতে অনুষ্ঠানটির সামগ্রিক সাফল্যের সহায়ক।

আর এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান শ্রীনব-ঘনশ্যামের মৃদংগনৃত্য। মৃদংগ হাতে একাধারে বিভিন্ন তাল বাজিয়ে তারই সংগে নৃত্যের উচ্ছল, আনন্দদীপ্ত রূপ মণিপুরী নৃত্যের ভাববস্তুকে ছন্দময় চিত্র সৌন্দর্যে দান করেছে।

তবে মঞ্চটি ছোট হওয়ায় নৃত্য শিল্পী-দের স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয়েছে। দৃশ্যমান পটভূমিকায় সংগত শিল্পীদের গদ্যময় ভাব-ভংগী বিশেষ (যেমন 'মেক-আপ করা মুখে গেঞ্জী পরিহিত নবঘনশ্যামের শ্রীখোল বাদ্য) অনুষ্ঠানের সৌন্দর্যহারিকর।

উদয়শংকর-কালচারাল সেন্টার

মাত্র এক বছর আগে উদয়শংকর কালচারাল সেন্টারের নিবেদিত "পরিচয়" শিক্ষার্থীদের প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষরবাহী—এ বছরের "অর্ঘ্য" শ্রীমতী শংকরের নিরলস সাধনার আর এক উদাহরণ।

অনুষ্ঠান সুরু হয়েছিল অমলা ও উদয়শংকরের পুত্র শ্রীআনন্দশংকরের সেতার অনুষ্ঠান দিয়ে। রাগ "মালকোশ"। স্বল্প পরিসরের মধ্যে রাগরূপায়ণ পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ এবং নির্ভুল। লম্বা তেহাই, তান ও ঝালায় গুরু লালমণি মিশ্রের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। শ্রীমান আনন্দর লয়দক্ষতা প্রশংসনীয়।

নৃত্যানুষ্ঠানগুলিতে ক্ল্যাসিকাল ও নিও-ক্ল্যাসিকাল উভয় দিকেই সমান নজর দেওয়া হয়েছে। কথাকলি অংগের 'অর্ঘ্য', 'সারী', পান্থাদী' ছাড়াও ভারতনাটাম ও মণিপুরী আঙ্গিকের অবিমিশ্র নৃত্যগুলি নির্মীয়মানা শিল্পীদের প্রাথমিক শিক্ষা ও মার্গনিত্যের মাধ্যমে ভারতীয় নৃত্যধারণার ভিৎ পাকা করে 'আনন্দ' এবং অন্যান্য নৃত্যের দ্বারা তাদের স্বাভাবিক নৃত্য-প্রবণতা ও সৃজনীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

তবলাতরঙ্গে কমলেশ মিত্রের আহির-ভৈঁরো' আর এক উপভোগ্য অনুষ্ঠান।

'প্রতীচী' নৃত্যে শ্রীমতী স্যালির অন্ত-র্ভুক্তি বৈচিত্র্য এনেছে। আনন্দ দিয়েছে বিভিন্ন ভারতীয় নৃত্যে শ্রীমতী স্যালির অংশগ্রহণ।

"নমো যন্ত্র" নৃত্যে কবিগুরুর ভাব-কল্পনার ছন্দময় রূপান্তর অত্যন্ত আবেদনসমৃদ্ধ। প্রতিটি নৃত্যে শ্রীমতী মমতাশংকরের নৃত্যকুশলতায় প্রতিভার বিকাশ লক্ষ্য করবার মত।

সুররচনায় সংগীতশিল্পীদের কৃতিত্ব তাদের ঐতিহ্যকে অনাহত রেখেছে।

সুরেশ সংগীত সংসদ পালিত : পণ্ডিত রবিশংকরের জন্মদিন

৭ই এপ্রিল পন্ডিত রবিশংকরের জন্মদিন। ঐ একই দিন সুরেশ সমাজের প্রেরণার উৎস 'সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীরও জন্মদিন। এই উভয় উপলক্ষে সমাজের সভ্যরা এক বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের আয়োজন করেছিলেন।

মালবিকা কাননের কণ্ঠসংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু হয়। তারপরই পন্ডিতজীর সেতার। ইনি বাজিয়েছিলেন 'ঝিঁঝিট' ও 'মাঝ খাম্বাজে' আলাপ ও গৎ। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই বলছেন 'অপূর্ব'—আবার বহুলোক অতৃপ্ত, ক্ষুব্ধ। তাঁদের আশা নাকি অপূর্ণ থেকে গেছে। যদি প্রথম দলের মত সত্য হয়—আশ্চর্যের কিছু নেই। রবিশংকরজী ভাল বাজাবেন এইটেই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় দলের মত কিন্তু চিন্তার বিষয়। মাত্র কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্সী কোর্টের এক নিভৃত-ক[ক্ষে] এই একই দিনে অ-প্রস্তুত এক ঘরোয়া আসরে তাঁর যে বাজনা আকস্মিকভাবে শুনেছি, তা ভোলবার নয়। সেই রবিশংকর জীবনের পরমতম সৌভাগ্যের এমন চরম মুহূর্তেও তাঁর ভক্তদের খুসী করতে পারলেন না কেন?

দক্ষিণীর রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ও দক্ষিণী'র [বিংশ] প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে ১২ই [মে] রবিবার, সন্ধ্যা ৭টায় ত্যাগরাজ হলে রবীন্দ্র-সংগীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

শ্রীশুভ গুহঠাকুরতার পরিচালনায় এই সংগীতানুষ্ঠানে দক্ষিণী'র শতাধিক শিল্পী অংশগ্রহণ করেন।

—চিত্রাংগদা

একটি প্রস্তাব

কমল ভট্টাচার্য

ওয়ার চ্যারিটি ফান্ডের খেলা সেরে ফিরছি এলাহাবাদ থেকে। ট্রেনের কামরায় বেশ মজলিস বসেছে। অন্যান্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে আছেন সি কে নাইডু। কম কথার মানুষ তিনি। বড় রাসভারী। কিন্তু সেদিন খুস মেজাজে তিনি কথা বলছিলেন সকলের সঙ্গে। ম্যাচ জিততে পেরে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন। খুশী হয়েছিলেন লালা অমরনাথের দলকে হারাতে পেরে। নাইডুকে গল্প করতে দেখে সকলের মত আমিও তাঁকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম। "ভাইসাব" ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলতে গেলে ভয় কাটানোর উপায় কি?" নাইডু সাহেব একটু হেসে উত্তর দিলেন "বোল উসমে হায় কেয়া। টেংরীসে প্যাড্ উঠা লেনা।" আমাকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন: "আরে ভাই, সাধ করে কি কেউ পায়ে বল লাগাবে। তোমাকে খেলতেই হবে। নিজেকে বাঁচাবার অন্য কোন পথ নেই। সিমপল ম্যাটার লজ্‌জী। এর চেয়ে সহজ উপায় আমার জানা নেই।" সি কের এই উপদেশ আমি কোনদিন ভুলিনি। আর এটাও ঠিক, ফাস্ট বল খেলার ব্যাপারে আমার ভীতির সঞ্চার হয়নি কোনদিন। বরং ফাস্ট বল খেলার সহজ উপায়টুকু সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। আর আজও সেকথা নতুন করে বলে গেলাম সকলের কাছে। যদিও একথা অনেক বলেছি তবু আজ আবার একথা বলছি তার কারণ আছে।

ভারতীয় ক্রিকেটে ফাস্ট বোলিংয়ের অভাবের কথা আর একবার নতুন করে বললেন প্রাক্তন ক্রিকেটার পলি উম্রিগড়। তিনি ভারতীয় দলের এই দুর্দশা মোচন করবার জন্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে ক্রিকেটের উন্নতির জন্যে কয়েকটি প্রস্তাব করেন। তার মধ্যে ফাস্ট বোলিংয়ের প্রস্তাবটি ছিল। প্রস্তাবটি গ্রাহ্য হয়। পরিকল্পনা মতই ঠিক হয়, ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা একাজে আগেভাগে হাত লাগাবেন। এবং ফাস্ট বোলিংয়ে যাঁদের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে তাঁদেরই নাম ধার্য করা হয়। ভারতের প্রধান প্রধান ক্রিকেটের ঘাঁটিগুলিতে যাতে শীঘ্র ফাস্ট বোলিংয়ের ট্রেনিং চালু করা যায় সেজন্য ব্যবস্থা রীতিমত জোরদার করা হচ্ছে। উম্রিগড়ের মতে বিদেশী ফাস্ট বোলার আনিয়ে একাজ শুরু করলে অতি শীঘ্র সুফল পাওয়া যাবে। কিন্তু মনে হয় কর্তৃপক্ষরা সে কথায় কান দেবেন না। কেননা সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ বিদেশী ফাস্ট বোলার আনিয়ে নিজেদের কাজটা তেমন গুছিয়ে তুলতে পারেননি। কিছুটা পন্ডশ্রম। আর অর্থব্যয় হয়েছে।

তিরিশ বত্রিশ বছর আগে ভারতে ফাস্ট বোলিংয়ের এতটা ঘাটতি ছিল না। আর এটাও ঠিক, ভারতীয় ব্যাটসম্যানরাও তখন ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে এত ভীত হয়ে পড়তেন না। বিদেশী ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে যাতে হেয় প্রতিপন্ন না হয় তারজন্যে খেলোয়াড়দের প্রস্তুতিরও কামাই ছিল না। বল ছুঁড়ে অথবা বেশ কাছ থেকে দ্রুতগতিতে বল করে ব্যাটসম্যানদের ভয় কাটান হত। এইরকম অভ্যাসের ফলে ব্যাটসম্যানরাও বেশ শক্তসমর্থ হয়ে পড়তেন। দেশী বা বিদেশী ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে খেলতে তাই তাঁদের কোন অসুবিধা হত না। মুস্তাক, মার্চেন্ট, মোদী, হাজারে অমরনাথ ও ভীনু মানকড়ের ব্যাটিংয়ে কোন ফাস্ট বোলাররাই প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন না। তাঁদের সময়ে কি ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলার কিছু কম ছিল!

ভারতের ফাস্ট বোলারই বা কিসে কম ছিল? বিশ-বাইশ পা ছুটে না হক, দশ পা ছুটে অমরসিং যা বল করতেন তাইতেই বিদেশীরা চোখে সর্ষে ফুল দেখতেন। আর মহম্মদ নিসারের ফাস্ট বোলিং যে কোন ব্যাটসম্যানের কাছে ভয়াবহ ছিল। সে সময়ে ইংল্যান্ডের সমালোচকরা ভারতের এই দুই বোলারের বোলিং দেখে মন্তব্য করেছিলেন —ইংল্যান্ড যদি আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে জিততে চায় তাহলে তারা যেন অমরসিং এবং নিসারকে সাদা রং করে নিয়ে যায়। এরপরেও সুঁটে ব্যানার্জি, সোহনী, রঙ্গচারীর মত ফাস্ট বোলাররাও বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন।

প্রসঙ্গত একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। ফাস্ট বোলিং খেলার ব্যাপারে আমাদের প্রস্তুতির পর্বটা কেমন ছিল সে কথাটাও বলে রাখি। বাংলা একবারই রণজি ট্রফি পেয়েছিল উনচল্লিশ সালে। ফাইনালে বাংলার বিরুদ্ধে দল ছিল সাউদার্ন পাঞ্জাব। আর এই দলেই ছিলেন ভারতবিখ্যাত ফাস্ট বোলার মহম্মদ নিসার। কাজেই বাংলার কর্তৃপক্ষরা বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সজাগ হয়েছিলেন। ফাস্ট বোলিংয়ের নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থাও তাঁরা রেখেছিলেন। তখন বাংলার ক্রিকেটে সাহেবরা কর্তা ছিলেন। ক্যাপ্টেন ছিলেন টম লংফিল্ড। কলকাতার মাঠের যত ফাস্ট বোলার আছে ধরে নিয়ে আসা হল ইডেনের আসরে। বাংলার কোচ বিল হিচ ছিলেন আরও তৎপর। তিনি অধিনায়ক লংফিল্ডের নির্দেশে আমাদের গায়ে ছুঁড়ে বল করতে লাগলেন। কোচ বিল হিচ ছিলেন একজন সেরা ফাস্ট বোলার।

আর আজ ফাস্ট বোলার নেই। ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলবার মত ব্যাটসম্যানও নেই। সেকালের তুলনায় ক্রিকেট খেলা যেন সহজ হয়ে উঠেছে। সস্তায় সবাই বাজীমাৎ করতে চায়। দু'তিন পা ছুটে এসে হাতের মোচড়ে যখন স্পিন বল করলে কাজ চলে যায় তখন সাধ করে কেউ বিশ-বাইশ পা ছুটে এসে বল করবেন কেন? স্পিন বোলারদের সুবিধে অনেক। বেশীদিন খেলোয়াড়েরা খেলতে পারবেন এই ভরসা। রুজি-রোজগারে ভয়-ভাবনা থাকে না। ফাস্ট বোলারদের আয়ু বেশীদিনের নয়। তারওপর ফাস্ট বোলারদের ভরসা তেমন কোথায়? জোরে ছুটে এসে বল ছুঁড়লেও যে বল জোরে পড়বে না একথা খেলোয়াড়েরা উপলব্ধি করেছেন। সে দোষ তাদের নয়। দোষ কর্তৃপক্ষদের। মাঠ ফাস্ট বোলারদের সহায় নয়। খেলা জিইয়ে রাখার জন্যে মাঠগুলোকে 'ডেড' করে রাখা হয়েছে। বিদেশী ফাস্ট বোলারদের দাপাদাপিতে যাতে খেলা তাড়াতাড়ি গুটিয়ে না পড়ে তারজন্যেই এই ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার ফলেই ভারতের মাঠগুলি এখন নির্জীব হয়ে পড়েছে। উদ্দেশ্য ব্যাটসম্যানরা এ মাঠে রানের বান ডাকাবেন। ফাস্ট বোলারদের অপমৃত্যু ঘটুক এইটাই চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়াম, কলকাতার ইডেন, দিল্লীর ফিরোজ কোটলার মাটির চরিত্র আজ অনেক বদলেছে। বদলেছে ভারতীয় ক্রিকেটের রীতিনীতি। ক্রিকেটকে পুনর্জীবিত করতে হলে চাই প্রকৃত ফাস্ট বোলার। আক্রমণের শুরু যেখানে ব্যাহত সেখানে জয় আশা করব কি করে? ইংল্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলা দেখে কি আমাদের চোখ ফোটে না? ফাস্ট বোলিংয়ের ভিত্তিতেই ইংল্যান্ড আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করল। এ পরাজয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হল ও চার্লি গ্রীফিথের।

আজ প্রত্যেক ক্রিকেট দলকে চিন্তা করতে হবে বিপক্ষ দল কোন শক্তিতে বড় ব্যাটিংয়ে না বোলিংয়ে। যদি বোলিংয়ে হয়— তাহলে কোন বোলার কেমন করে বল করে এবং সেই বোলারকে কি করে কাবু করা যায়। আর যদি ব্যাটিংয়ে বড় হয়—তাহলে

কোন বোলারকে দিয়ে কেমন করে কি ধরনের বলে কাবু করতে হবে। যেমন, ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর শুরু করার আগে, তারা নিশ্চয়ই চিন্তা করেছে যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সবচেয়ে প্রধান শক্তি হলো ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হল, চার্লি গ্রীফিথ, লেস্টার কিং এবং গারফিল্ড সোবার্স। এদের কাবু করার জন্য এরা নিশ্চয়ই এমন একটা ফাস্ট পীচ করেছিল যে পীচেতে দিনের পর দিন অনুশীলন করেছিল। নিশ্চয়ই কলিন কাউড্রের নির্দেশে, যত ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার ছিল তাদের ডেকে আনা হয়েছিল এবং ওই পীচেতে তাদের বলের বিরুদ্ধে ব্যাটস-ম্যানদের ব্যাট করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়—বোলারদের প্রতি ব্যাটসম্যানদের ফাস্ট বোলারের ভীতি কাটাবার জন্যে হয়তো এ নির্দেশও ছিল—ব্যাটসম্যানদের গায়ে বল দিয়ে আঘাত করার জন্যে। এইভাবে অনুশীলন করেছিলো বলেই গত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ইংল্যান্ড পেয়েছে বিজয়ীর সম্মান।

আমার আসল বক্তব্য হলো মার না খেলে মারা যায় না। আজ দেখতে হবে ভারতীয় দলকে ফাস্ট বলের বিরুদ্ধে খেলতে গেলে হয় ফাস্ট বোলারকে মারো আর না হয় তোমার ফাস্ট বোলিং দিয়ে বিপক্ষ দলকে মারো। আমাদের দেশে যখন ফাস্ট বোলার নেই, তখন অপর দলকে ফাস্ট বোলারের ভয় দেখিয়ে কাবু করার কথা চিন্তা করা যায় না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে যে অপর দলের ফাস্ট বোলারকে কাবু করা দুঃসাধ্য ব্যাপার এটা চিন্তা করা ঠিক নয়। নানান উপায়ে এর

সমাধান করা যায়। যেমন মুস্তাক আলীর কথাতেই আসা যাক্ না। ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে আমাদের খেলোয়াড়ী মনোভাবের বিহ্বলতা নিয়ে যখন প্রশ্ন করেছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন—আগে শক্ত পীচের ওপরে 'ম্যাট' পেতে যে ক্রিকেটের আসর বসতো তার গুরুত্ব যে আমাদের দেশে প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের কাছে কি গুরুতর ছিল তা আজ বুঝতে পারছি। ওই ধরনের পীচে খেলার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। কারণ ওই পীচে যে কোন মিডিয়াম ফাস্ট বোলারের বল, ফাস্ট বোলারের বলের মত দ্রুতগতি না হোক, চেহারায় দাঁড়াতো অন্ততঃ 'বাম্পারের' মত তো বটেই। প্রত্যেকটা বল পীচে পড়ে আরও দ্রুত ছুটতো এবং বেশী লাফাতো। ফলে ফাস্ট বোলারের বলের আকারের সাথে দেশীয় ব্যাটসম্যানদের সহজেই পরিচয় ঘটতো। কিন্তু আজ আর এ ধরনের পীচে খেলা হয় না। তাই আজ এই দুর্দশা। ফাস্ট বলের গতির সাথে তো নেই—এমনকি আমাদের দেশের ব্যাটসম্যানদের ফাস্ট বলের আকারের সাথেও প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। গতির সাথে না হোক কিন্তু ফাস্ট বোলারের বলের ধরনের সাথে, ফাস্ট বোলারের বলের খেলার মত উপযুক্ত সাহস করার জন্যে, সমস্ত রকম ভয় কাটাবার জন্যে আজ এই ধরনের পীচে প্র্যাকটিশের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কথা-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছিলেন 'ম্যাটিং' উইকেটে অনুশীলন করলে শুধু এই সুবিধাটুকুই পাওয়া যায় না—আরও একটা শিক্ষা পাওয়া যায়—'ফুট-ওয়ার্কস'। যে ব্যাটসম্যানের 'ফুট-ওয়ার্কস' যত উন্নত, দেখা গেছে সে তত বড়। অতএব 'ফুট ওয়ার্ক'সের' ক্ষমতা বাড়াবার জন্যেও এই ধরনের পীচে অনুশীলন করা উচিত।

পতৌদির নবাব প্রতি টেস্ট সিরিজের পরেই বলেছেন 'আজ ভারতীয় দলের এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ হলো ভারতবর্ষে ফাস্ট বোলার নেই।' তিনি বলেছেন, যতদিন না ভারতবর্ষে ফাস্ট বোলার তৈরী হবে—ততদিন ভারতীয় দল ক্রিকেটে শক্তিশালী হতে পারবে না। তার কারণ দুটো আছে। প্রথম কারণ, ব্যাটসম্যান ফাস্ট বোলারের বল খেলতে গিয়ে প্রথম একটু দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং শুধু তাই নয় সময় সময় চমক খায়; আর ফাস্ট বোলারের বল কখন বাম্পার, কখন বিমার কখন ইয়র্কার হবে তার জন্যে তটস্থ হয়ে থাকে—স্বাচ্ছন্দ্য-সহকারে খেলতে পারে না। আর দ্বিতীয় কারণ, দলে ফাস্ট বোলার থাকার বিশেষ প্রয়োজন অন্য বোলারের সঙ্গে মহামিশ্রণ। যেমন ডান হাতের বোলারের সঙ্গে যদি বাঁ হাতের বোলার থাকে তখন ব্যাটসম্যানকে দুটো বোলারের বিরুদ্ধে দুরকম করে খেলতে হয়। ডাইনে বোলারের বিরুদ্ধে একরকম খেলা খেলতে হয় এবং ন্যাটা বোলারের বিরুদ্ধে আর একরকম খেলতে হবে। ঠিক তেমনি ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলতে খেলতে সঙ্গে সঙ্গে ও প্রান্তে 'স্লো' বোলারের বিরুদ্ধে একই ধরনের খেলা খেললে চলবে না। আসলে সবসময় ব্যাটস্-ম্যানকে সতর্কের মধ্যে রাখতে হয়। তাতে দেখা যায় ব্যাটস্ম্যানদের খেলা ভুল হয়ে যায় এবং এই কারণেই সময় সময় দেখতে পাওয়া যায় হঠাৎ 'স্রেট' ব্যাটস্ম্যান 'আউট' হয়ে যান। তাই বারবার তিনি (পতৌদি) বলেছেন—আমাকে দুটো একটা ফাস্ট বোলার দাও। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, এবিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন সাড়া নেই। আজকের কর্তৃপক্ষদের উচিত এমন একটা ব্যবস্থা করা মার্চেন্ট, মুস্তাক, পলি উমরি-গড়, অমরনাথ, ভিনু মানকড়, পঙ্কজ ব্যানার্জি—এ'দের ভেতর থেকে দু'জন তিনজন করে প্রত্যেক প্রদেশে, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে ঘুরে বেড়িয়ে বাছে জোড় বোলার খুঁজে বার করতে পারেন। তাদের জন্যে ট্রেনিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা উচিত এবং উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

আর যাঁরা খুঁজবেন, তাঁদের খুঁজে বেড়ানো উচিত শক্ত সামর্থ্য চেহারার তরুণ ছেলেদের—যারা জোরের ওপর বল করতে পারে এমন স্কুলের ক্ষুদে ফাস্ট বোলারদের। তারপর তাদের একসাথে ক্যাম্পে রেখে দিনের পর দিন অনুশীলনের মাধ্যমে, অনুপ্রেরণা দিয়ে, সাহস জুগিয়ে, ভবিষ্যত-জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বড় করতে হবে। তৈরী করতে হবে আজকের ভারতবর্ষের ফাস্ট বোলারদের। আমি বিশ্বাস করি এই বিশাল ভারতবর্ষ থেকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতেই পাওয়া যাবে ফাস্ট বোলারের সন্ধান। বিশ্বের ক্রিকেটের দরবারে যোগ্য প্রতিযোগীর সম্মান পেতে তখন আর আমাদের কোন অসুবিধেই হবে না।

খেলাধুলা

দর্শক

এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা

দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল স্টেডিয়ামে আয়োজিত দশম এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে পেঁছে গেছে।

আলোচ্য প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১২টি দেশ সমানভাগে তিনটি গ্রুপে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলেছিল। প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পি-য়ান এবং রানার্স-আপ দলকে নিয়ে পরবর্তী সেমি-ফাইনাল পর্যায়ের খেলার তালিকা তৈরী হয়েছে। সেমি-ফাইনাল পর্যায়ের খেলা সমান দু' ভাগ করা হয়েছে। প্রথম বিভাগে আছে—ইস্রাইল, ব্রহ্মদেশ এবং তাই-ল্যান্ড। দ্বিতীয় বিভাগে—দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইন। সেমি-ফাইনাল পর্যায়ের খেলাও লীগ প্রথায় হবে। এই দুই বিভাগের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দলই শেষপর্যন্ত ফাইনালে খেলবে।

প্রাথমিক পর্যায়ের লীগ খেলা

প্রাথমিক পর্যায়ের লীগের খেলায় অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছে—'এ' গ্রুপে ইস্রায়েল, 'বি' গ্রুপে ব্রহ্মদেশ এবং 'সি' গ্রুপে দক্ষিণ কোরিয়া। অপরদিকে রানার্স-আপ হয়েছে 'এ' গ্রুপে মালয়েশিয়া, 'বি' গ্রুপে ফিলিপাইন এবং 'সি' গ্রুপে তাইল্যান্ড।

ভারতবর্ষের খেলা

হাবিবের নেতৃত্বে ভারতীয় ফুটবল দল 'এ' গ্রুপে খেলেছিল এবং ২ পয়েন্ট সংগ্রহ করার সূত্রে শেষপর্যন্ত লীগতালিকায় ৩য় স্থান পায়। ফলে তারা সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে যেতে পারেনি। ভারতবর্ষের একমাত্র জয়—তাইওয়ানের বিপক্ষে ৩—০ গোলে। মালয়েশিয়া ২—১ গোল এবং ইস্রায়েল ২-০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। বিরতির সময় ভারতবর্ষ বনাম মালয়েশিয়ার খেলার ফলাফল সমান ছিল (১-১ গোলে)। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ৩য় মিনিটে পেনাল্টি কিক থেকে মালয়েশিয়া জয়সূচক গোলটি দেয়।

এখানে উল্লেখ্য, ইস্রায়েল উপর্যুপরি গত ৪বার চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছে এবং ব্রহ্মদেশ গতবারের রানার্স আপ। এবারের প্রাথমিক পর্যায়ের লীগ খেলায় ইস্রায়েল এবং ব্রহ্মদেশ কোন গোল খায়নি। তিনটি খেলায় ইস্রায়েল ১৩টি এবং ব্রহ্মদেশ ১৪টি গোল দিয়েছে।

প্রাথমিক লীগ পর্যায়ে তিনটি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান দলের খেলার ফলাফল :

ইস্রায়েল ('এ' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান) : তাই-ওয়ানকে ৭-০, মালয়েশিয়াকে ৪-০ এবং ভারতবর্ষকে ২-০ গোলে পরাজিত করে।

ব্রহ্মদেশ ('বি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান) : সিঙ্গাপুরকে ৫-০, ফিলিপাইনকে ৫-০ এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে ৪-০ গোলে পরাজিত করে।

দঃ কোরিয়া ('সি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান) : হংকংকে ৪-১, জাপানকে ৩-০ এবং তাই-ল্যান্ডকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে।

প্রাথমিক পর্যায়ের লীগ তালিকা

গ্রুপ 'এ'

দেশ	জয়	ড্র	পরাঃ	পঃ
ইস্রায়েল	৩	০	০	৬
মালয়েশিয়া	২	০	১	৪
ভারতবর্ষ	১	০	২	২
তাইওয়ান	০	০	৩	০

গ্রুপ 'বি'

দেশ	জয়	ড্র	পরাঃ	পঃ
ব্রহ্মদেশ	৩	০	০	৬
ফিলিপাইন	১	০	২	২
দঃ ভিয়েৎনাম	১	০	২	২
সিঙ্গাপুর	১	০	২	২

গ্রুপ 'সি'

দেশ	জয়	ড্র	পরাঃ	পঃ
কোরিয়া	৩	০	০	৬
তাইল্যান্ড	১	১	১	৩
হংকং	০	২	১	২
জাপান	০	১	২	১

বেটন কাপ

১৯৬৮ সালের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতা শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। মোহনবাগান বনাম বি এন আর দলের ফাইনাল খেলার দিন ধার্য হয়েছে ১৫ই মে; সুতরাং বর্তমান সংখ্যায় ফাইনাল খেলার ফলাফল দেওয়া সম্ভব হল না।

কোয়ার্টার ফাইনালে যে ৮টি দল খেলেছিল তার মধ্যে স্থানীয় দল ছিল এই চারটি—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, বি এন আর এবং মহমেডান স্পোর্টিং। বাকি এই চারটি বাইরের—পাঞ্জাবের সিকিউরিটি ফোর্স, বোম্বাইয়ের সেন্ট্রাল রেলওয়ে, নাগপুর ইউনাইটেড এবং ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বাইরের দলের সংখ্যা ছিল মোট ৯টি। সেমি-ফাইনালের একদিকে মোহনবাগান ২-০ গোলে গত বছরের রানার্স-আপ ভিলাই স্টিল দলকে এবং অপরদিকে বি এন আর ১-০ গোলে গত বছরের বেটন কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। ইস্টবেঙ্গল দল এ বছরের প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান। সুতরাং এই পরাজয়ের ফলে তারা একই বছরে হকি লীগ এবং বেটন কাপ জয়ের দুর্লভ সম্মান থেকে বঞ্চিত হল। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৪ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং বেটন কাপের যুগ্ম-বিজয়ী (মোহনবাগানের সঙ্গে) হয়েছিল।

মোহনবাগান ক্লাব এই নিয়ে ৭বার বেটন কাপের ফাইনালে উঠলো। আগের ৬ বারের ফাইনালে তারা যে ৫ বার বেটন কাপ জয়ী হয়েছে তার মধ্যে ২ বার যুগ্ম-বিজয়ী—১৯৬৪ সালে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে এবং ১৯৬৫ সালে কাস্টমসের সঙ্গে। অপরদিকে বেটন কাপের ফাইনালে বি এন আর দলের (রিক্রিয়েশন ক্লাব) এই প্রথম খেলা। বেটন কাপের ফাইনাল খেলার তালিকায় (১৯০০—৬৭) যে বি এন আর দলের ১১ বার নাম আছে (বিজয়ী ৫ বার এবং রানার্স-আপ ৬ বার) তার সঙ্গে এই ১৯৬৮ সালের বেটন কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বি এন আর দলের কোন সম্পর্ক নেই। আগে যে বি এন আর দল ১১ বার বেটন কাপের ফাইনালে খেলেছে তারা চক্রধরপুর অথবা খড়্গপুর থেকে বহিরাগত দল হিসাবে বেটন কাপের খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল, তারা কলকাতার হকি লীগ খেলার অন্তর্ভুক্ত দল ছিল না।

ফাইনালের পথে

মোহনবাগান: ৩য় রাউন্ডে আর্মেনিয়ান্সকে ২-০, কোয়ার্টার ফাইনালে নাগপুর ইউনাইটেডকে ৩-০ এবং সেমি-ফাইনালে ভিলাই স্টিল দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে।

বি এন আর: ২য় রাউন্ডে এন্টালীকে ১-০, ৩য় রাউন্ডে ইস্টার্ন রেলওয়ে এ এ-কে ১-০, কোয়ার্টার ফাইনালে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে ২-১ এবং সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে।

পত্রিকা শতবার্ষিকী ক্রীড়ানুষ্ঠান

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলকে নিয়ে যে ত্রিদলীয় প্রদর্শনী ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে তার শুভ উদ্বোধন হবে আগামী ২১শে মে ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে। এই

প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আসর বসবে চারদিন—২১শে মে, ২৩শে মে, ২৫শে ও ২৬শে মে। এই চারদিন দেশের একজন করে বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রধান অতিথি হিসাবে খেলার মাঠে উপস্থিত থাকবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন উদ্বোধনী খেলার দিন প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন।

ছাত্রদের জন্য সুলভ মূল্যের টিকিট

প্রতিদিনের প্রতি টিকিটের মূল্য ৫০ পয়সা—এই সুলভ হারে স্কুলের ছাত্রদের প্রস্তাবিত প্রদর্শনী ফুটবল খেলার টিকিট দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে কলকাতা এবং শহরতলীর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কুপন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছাত্রদের সুলভ মূল্যে টিকিট পেতে হলে প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরিত এই কুপন আনতে হবে। স্কুল-ছাত্রদের জন্য সুলভ মূল্যে টিকিট বিক্রয় কেন্দ্র: (১) পত্রিকার হেড অফিস (১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, বাগবাজার, ফোন—৫৫-৫২৩১), (২) পত্রিকার সিটি অফিস (ভারত ভবন, ৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ফোন ২৩-২০৫৮) এবং (৩) পত্রিকার হাওড়া অফিস (২, পঞ্চাননতলা রোড, ফোন ৬৭-৫২৬২)।

টিকিট বিক্রয় কেন্দ্র

প্রদর্শনী ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার ২, টাকা এবং ৩, টাকা মূল্যের টিকিট বিক্রয় কেন্দ্র:

(১) পত্রিকা সিটি অফিস, ভারত ভবন, ৩নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা (ফোন: ২৩-২০৫৮), (২) পত্রিকার হাওড়া অফিস, ২নং পঞ্চাননতলা রোড (ফোন ৬৭-৫২৬২), (৩) এরিয়ান ক্লাব, ময়দান, বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্রি আটটা (ফোন ২৩-২৬৬৫), (৪) বসুশ্রী সিনেমা, ১০২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, ফোন ৪৭-৮৮০৮, (৫) আর্মেনিয়া রেস্তোরাঁ, ১নং কর্পোরেশন প্লেস, ফোন ২৪-১৩১৮, (৬) কিং অ্যান্ড কোম্পানী, ৯০।৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোন ৩৪-২০০১, (৭) কিং অ্যান্ড কোং, ১২, রবেড স্ট্রীট, ফোন ৪৪-৫৮৬৩, (৮) কিং অ্যান্ড কোং, ২৯ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, ফোন ৪৭-১৩৬৬ (সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা), (৯) ট্রেডার্স ব্যুরো, ১২, ভূপেন বসু এভিনিউ, শ্যামবাজার, ফোন ৫৫-৩২০৬, (১০) ম্যাডোরিনা, ৮, চৌরঙ্গী, ফোন ২৩-৫০৫১ সকাল দশটা থেকে রাত্রি আটটা, (১১) শ্রীচণ্ডী গাঙ্গুলী, ২।৬, বীরেন রায় রোড ইস্ট বেহালা, ফোন ৪৫-২৭৫৭, (১২) শ্রীচিত্তানন্দ বসু-চৌধুরী, ৭৫ বনমালী নস্কর রোড, বেহালা, ফোন ৪৫-১৫৪৯, সকাল আটটা থেকে দশটা ও সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত্রি নটা, (১৩) মালঞ্চ, ৮২।২, বিধান সরণী ফোন ৫৫-৯৪৪৬, সকাল আটটা থেকে রাত্রি পর্যন্ত।

খেলার তালিকা

২১শে মে: ইস্টবেঙ্গল বনাম মহঃ স্পোর্টিং

২৩শে মে: মোহনবাগান বনাম মহঃ স্পোর্টিং

২৫শে মে: মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল

২৬শে মে: ত্রিদলীয় লীগ চ্যাম্পিয়ান বনাম অবশিষ্ট দল

অর্জুন পুরস্কার

১৯৬৭ সালের খেলাধুলোয় উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভের সূত্রে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়বৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত বাৎসরিক অর্জুন পুরস্কার লাভ করেছেন:

এ্যাথলেটিক্স—পারভীন কুমার এবং ভীম সিং
ব্যাডমিন্টন—সুরেশ গোয়েল
বাস্কেটবল—খুসীরাম
ক্রিকেট—অজিত ওয়াদেকার
ফুটবল—পিটার থঙ্গরাজ
গলফ—আর কে পীতাম্বর
হকি—হারবিন্দর সিং, জগজিৎ সিং এবং মহীন্দর লাল
টেনিস—প্রেমজিৎ লাল
সাঁতার—অরুণ সাহা
টেবল টেনিস—ফারুক খোদাইজি
মল্লযুদ্ধ—মুক্তিয়ার সিং
ভারোত্তোলন—সবরী মুখু এবং জন গ্যাব্রিয়েল

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ
১ম খণ্ড

৩য় সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

FRIDAY, 24th MAY, 1968. শুক্রবার, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসনৎ কর

সাহিত্যে অশ্লীলতা

অমৃত-এর বার্ষিক সংখ্যাটি নানা কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস, ছোটগল্প এবং কবিতা সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা থেকে পাঠক অনেক জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পাবেন। সাহিত্যে যখন আজকে অন্ধের হাতী দেখার চেষ্টা চলছে তখন এরকম প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক নজীর। শ্লীল-অশ্লীলের ধোঁয়ায় আসল বক্তব্য প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। গল্পকার বা ঔপন্যাসিক যখন কোন বক্তব্য খুঁজে পান না তখনই সহজ সুড়সুড়ি দেবার পথটি তিনি বেছে নেন। ফলে যৌন কথায় সাহিত্য প্রায় অপাঠ্য হয়ে পড়ে। বলতে দ্বিধা নেই, আজকের বাংলা সাহিত্যের অবস্থাও অনেকখানি তাই দাঁড়িয়েছে। এই অশ্লীলতার স্বপক্ষে অনেকেই সাফাই গাইছেন। এতে অবশ্য চমকিত হবার কিছু নেই। কারণ সারা জীবন ধরে তাঁরা যা করে উঠতে পারেন নি এবার রুচিবিকৃতির পথে সেই বাহবাটুকু আদায় করে নিতে চান। বাহবা তাঁরা পাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

এ ব্যাপারে আপনারা যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন অমৃতের একজন অনুরক্ত পাঠক হিসেবে সেজন্য আপনাদের স্বাগত জানাই। সৌন্দর্য এবং কল্যাণই যে সাহিত্যের আদিকথা এই বোধটুকু যদি সকলের থাকতো সাহিত্য তাহলে নোংরামির বেসাতি হতে পারতো না।

অমর বসু, কলকাতা—৬।

(২)

গত সংখ্যার অমৃতে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'একালের ছোট গল্প' রচনাটি এককথায় খুবই প্রশংসনীয়। সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতা সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, সে বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে। উনি যে সাহিত্যকে অশ্লীল বলতে চাইছেন, সেগুলোকে যদি অশ্লীল আখ্যা দেওয়া হয়, তাহলে বিশ্বসাহিত্যের চৌদ্দ আনাই অশ্লীল পর্যায়ে পড়ে যায়। শ্লীল অশ্লীল বিচার করার আগে দেখতে হবে সেটা সৎ না অসৎ। সাহিত্যে যাকে শ্লীল অশ্লীল বলা হয় আসলে তা সাহিত্যের উপর সমাজনীতির আরোপ। সৎ বা সত্য কখনো অশ্লীল হতে পারে না। তবে তার পরিবেশন শ্লীল অশ্লীল হতে পারে কখনো কখনো। কিন্তু পরিবেশনেরও স্বাধীনতা থাকা দরকার। অচিন্ত্যবাবু একজায়গায় বলেছেন 'জীবনে যা সম্ভব তার সবটাই সাহিত্যে সহনীয় নয়। জীবন ব্যাকরণ লঙ্ঘন করতে পারে কিন্তু সাহিত্য পারে না।' কিন্তু জীবনকে বাদ দিয়ে কি সাহিত্য সম্ভব? যেমন জীবনকে বাদ দিয়ে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করলে তা পদ্য হয়, কবিতা হয় না। খাঁটি বাস্তব যদি সাহিত্যে প্রস্ফুটিত না হয় বা হৃদয়ে উপলব্ধি না হয়, তবে সে সাহিত্যে অগ্রগতির স্থান কোথায়? শ্লীল অশ্লীলের প্রশ্ন গৌণ রেখে সাহিত্যকে মুখ্য রাখা উচিত। সাহিত্যেও বিপ্লব দরকার। অন্ধকারের জীবদের আলোয় আনতে গেলে একটু অস্বস্তি দেখা দেয় বৈকি! কিন্তু সেই পালাবদলের কালে পাঠকদের পক্ষ থেকে একটু সহযোগিতাই বোধহয় বেশি দরকার।

মনোজ কুমার
নৈহাটী, ২৪ পরগণা।

॥ 'একটি প্রস্তাব' সম্পর্কে ॥

অমৃত-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় কমল ভট্টাচার্যের 'একটি প্রস্তাব' যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি তিনি করেছেন, ভারতে ফাস্ট বোলার নেই, ফাস্ট বোলার চাই। ইতিপূর্বেও অমৃতের পাতায় এরকম প্রস্তাব অনেকবার রাখা হয়েছে। সারাদেশের ক্রিকেট-রসিকরাও এই দাবীতে সোচ্চার। ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রক এ-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বলেই মনে হয়। কিন্তু কার্যকরী ব্যবস্থা কিছু হচ্ছে না। সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দলের নাজেহাল হওয়ার পরও এ-সম্বন্ধে কারো চৈতন্য হয়েছে বলে মনে হয় না। হয়তো কর্তৃপক্ষ ইংল্যাণ্ডের হাতে গুরুতর পরাজয়কে নিউ-জিল্যাণ্ডের সংগে জয় দিয়ে পুষিয়ে নিয়েছেন মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। অর্থাৎ দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে নেবার মতো। কিন্তু এভাবে আখেরে কোন লাভ হবে না, এ-কথা নিশ্চয় করেই বলা যায়।

ফাস্ট বোলারের জন্য কান্নার কিন্তু বিরাম নেই। বিশেষ করে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররা, যাঁরা এক সময়ে ভারতীয় ক্রিকেটের বিরাট ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন। স্বচক্ষে তার ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করা তাঁদের পক্ষে সত্যি মর্মান্তিক পরিহাস। পলি উমরিগড়, লালা অমরনাথ, বিজয় মার্চেণ্ট, ভিনু মানকড়, মুস্তাক চাইছেন ফাস্ট বোলারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আজকের ভারতীয় খেলোয়াড়দের ফাস্ট বোলিংয়ের সামনে খেলবার ভীতি কাটিয়ে উঠতে না পারলে এ-দেশে ক্রিকেটের যে উন্নতি নেই, সে-কথা তাঁরা গলা ফাটিয়ে বলছেন। এই সেদিন ভারতীয় দলের অধিনায়ক পতৌদিও স্বীকার করেছেন যে, ইংল্যাণ্ড সফরে ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় কারণ হলো ফাস্ট বোলারের অভাব। অথচ এই অভাব পূরণের কোন সক্রিয় চেষ্টা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বরং এই অভাবটি যথাসম্ভব জীইয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে কার লাভ বা ক্ষতি হচ্ছে, সে-প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু একটা কথা বেশ চোখ বুজেই বলা যায় যে, ভারতীয় ক্রিকেটের কোন উন্নতি হচ্ছে না।

কর্তৃপক্ষ হয়তো ধরে নিয়েছেন যে, ভারতে ফাস্ট বোলার তৈরি সম্ভব নয়। আমার এই ধারণার পেছনে সত্যাসত্য কতটা আছে জানা নেই—ঘটনা যা ঘটছে তা থেকেই এই ধারণা করে নিচ্ছি। তবে কি আমাদের ধরে নিতে হবে তাঁরা অমর সিং, মহম্মদ নিশার ও সুঁটে ব্যানার্জির গৌরবজনক ভূমিকা বিস্মৃত হয়েছেন। ফাস্ট বোলার হিসেবে এককালে তাঁরা স্বদেশ ও বিদেশের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন। কাজেই এ-দেশে চেষ্টা করলে ফাস্ট বোলার পাওয়া যাবে না এ-কথা অতিবড় মূর্খেও বিশ্বাস করবে না।

ভারতীয় ক্রিকেটে ফাস্ট বোলিংয়ের লুপ্ত ভূমিকা পুনরুদ্ধারের জন্য কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন বিদেশ থেকে বোলার এনে শিক্ষার ব্যবস্থা করানোর। একবার এরকম চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তা যে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে, সে-কথা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বাহুল্যমাত্র। তাই সেরকম ব্যবস্থা না করাই বাঞ্ছনীয়। বরং এদিক থেকে শ্রীকমল ভট্টাচার্য যে-প্রস্তাব করেছেন, তা বহুলাংশে গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন এ-দেশের প্রাক্তন কৃতী ক্রিকেটারদের নিয়ে দেশের সকল প্রান্ত থেকে খেলোয়াড় খুঁজে বার করে ফাস্ট বোলার তৈরি করতে হবে। বিভিন্ন ট্রেনিং ক্যাম্পে তাদের ব্যাপক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তখন আমাদের ফাস্ট বোলার পাওয়া আর অসম্ভব হবে না এবং ভারতীয় ক্রিকেটাররাও ফাস্ট বোলারের ভীতি কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

এরকম একটি পরিকল্পনায় হাত দিয়ে কর্তৃপক্ষ যদি ফাস্ট বোলার তৈরির ব্যাপারে সচেষ্ট হন, তবে আমাদের পক্ষে তা অশেষ কল্যাণকর হবে সে-কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

মহম্মদ আলি
মেমারি, বর্ধমান

অমৃত

দলত্যাগের পরিণতি

গত সপ্তাহে হরিয়ানার নির্বাচনের ফল থেকে দলত্যাগীদের মনে শঙ্কা জাগা স্বাভাবিক। এই রাজ্যটিতে কোনো মন্ত্রিসভা স্বস্তিতে কাজ করতেই পারল না নীতিভ্রষ্ট দলত্যাগীদের জন্য। কংগ্রেস ও অকংগ্রেস সকল দলই ছিল এই নীতিহীন রাজনৈতিক খেলার জন্য দায়ী। দলত্যাগীদের নামই হয়ে গিয়েছিল আয়ারাম আর গয়ারাম। এত অর্থব্যয় করে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর ক্ষমতালোভী কতকগুলো লোক যদি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘন ঘন দল বদল করে এবং মন্ত্রিসভার পতন ঘটায়, তাহলে পরিষদীয় গণতন্ত্র প্রহসনেই পরিণত হয়।

দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে বহু রাজ্যেই দলত্যাগের জন্য সরকারের পতন ঘটেছে এবং মন্ত্রিসভার অবর্তমানে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করতে হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, পশ্চিম বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে দলত্যাগের হিড়িকে মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছে একাধিকবার। তার ফলে আজ বহু রাজ্যেই রাষ্ট্রপতির শাসন। কীভাবে এই অসুস্থ রাজনীতির ধারা রোধ করা যায় তার জন্য চিন্তা শুরু হয়েছে। তবে হরিয়ানার নির্বাচকরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা দলত্যাগীদের পাত্তা দেন না। যারাই ক্ষমতায় আসুক, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে অন্তত পাঁচটি বছর তাদের রাজত্ব করতে হবে জনকল্যাণের আদর্শ সামনে রেখে। কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার চেহারা যা দেখা গেল তা আশাপ্রদ নয়। দলাদলির নোংরামির জন্য কাজ করাই দায়। তার ফলে নির্বাচকদের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা তাঁরা করতে পারেন না। সুতরাং পরিষদীয় গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে দুটি বা তিনটির বেশী দল থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। অন্তত ভারতবর্ষের নির্বাচনী আবহাওয়া দেখে তো তাই মনে হয়।

তার আগে দল ভাঙাভাঙি রোধ করতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল প্রধান রাজনৈতিক দলকে একটা বোঝাপড়ায় আসতে হবে যে, দলত্যাগীদের তাঁরা কোনোরূপে পাত্তা দেবেন না। হরিয়ানায় কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের নির্দেশে দলত্যাগীদের স্বদলে ফিরে আসার অনুমতি দিলেও নির্বাচনে তাদের মনোনয়ন দেওয়া হয় নি। অন্যান্য দলেরও এই নীতি অনুসরণ করা উচিত। অবশ্য হরিয়ানার ভোটাররা ভোট দেবার ব্যাপারে সুস্থ রাজনীতি চেতনার পরিচয় দিয়েছেন এবার। তাঁরা কোনো দলত্যাগীকেই নির্বাচিত করে পাঠান নি।

এ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আমরা জানি অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যেও দলত্যাগীদের জোরে মন্ত্রিসভা চলছে। বিহারে, পাঞ্জাবে ও মধ্যপ্রদেশে। তার মধ্যে মধ্যপ্রদেশের অবস্থা বেশ জটিল। এখানকার মুখ্যমন্ত্রী নিজে এক দলত্যাগী। কংগ্রেস দলে ব্যাপক ধ্বস নামিয়ে তিনি দলবল নিয়ে বিরোধীদের সঙ্গে যোগ দেন। তার ফলে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। দলত্যাগী শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিং মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু একবার দলভাঙার স্বাদ যিনি পেয়েছেন তিনি কোনো এক দলে বেশীদিন টিঁকে থাকতে পারেন না। তাই মধ্যপ্রদেশের দলত্যাগীরা আবার স্বদলে ফিরে যেতে চান বলে কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ এ বিষয়ে মন্দ উৎসাহী নয়। গদী যদি নীতির চেয়ে বড় হয় তাহলে এমন অদূরদর্শিতা দেখা দেবেই। দলত্যাগীরা যদি অনুতপ্ত হয়ে স্বদলে ফিরে আসতে চান তাহলে তাঁদের দলে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দলত্যাগের জন্য শাস্তি তাঁদের পেতে হবে। যাঁরা দল থেকে বহিষ্কৃত বা সাময়িকভাবে যাঁদের সাসপেণ্ড করা হয়েছে তাঁরা তো শাস্তি ভোগ করবেনই, তা ছাড়া যাঁরা রয়েছেন তাঁদের নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে হবে দীর্ঘকাল। সকল দলেরই এই নীতি মেনে চলা উচিত।

ভারতবর্ষে পরিষদীয় গণতন্ত্র নিয়ে যে কাণ্ড-কারখানা চলছে তাতে এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কার কারণ আছে। নীতিহীন রাজনীতিকদের স্বার্থের খেলা খেলতে গিয়ে বহু দেশে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়েছে। ভারতবর্ষে তার পুনরাবৃত্তি আমরা চাই না। আমরা চাই সুস্থ সবল গণতান্ত্রিক সমাজ ও প্রশাসনিক দক্ষতা। নীতিভ্রষ্ট সুবিধাবাদী রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীরা যাতে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য জাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি না খেলতে পারে তার জন্য সজাগ প্রস্তুতি চাই। হরিয়ানার নির্বাচকরা দলত্যাগীদের শাস্তি দিয়ে সেই সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্য রাজ্যের অধিবাসীরাও আশা করি এতে সতর্ক হবেন।
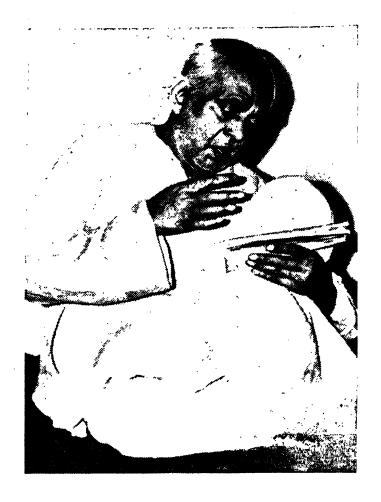
নজরুল সংগীত

আবদুল আজীজ আল আমান

॥ ১ ॥

নজরুল-সংগীত সম্পর্কে কথা উঠলে আমরা গর্বভরে বলে থাকি, এত বেশি সংখ্যক গান আর কোন কবিই রচনা করেননি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নজরুল-ইসলাম রচিত সংগীতের সঠিক সংখ্যা কত?

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী বলেছেন, তিন হাজার। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বলতেন, চার হাজার। অনেকেই মধ্যপথ অবলম্বন করে বলে থাকেন, সাড়ে তিন হাজার। অনেকে আবার এমন কথাও বলে থাকেন, বাংলা-সাহিত্যে তো বটেই—বিশ্ব-সাহিত্যেও সংগীত রচনার ক্ষেত্রে এটি একটি সর্বকালীন রেকর্ড।

স্বাভাবিকভাবেই এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কোন তথ্যের উপর ভিত্তি করে সমালোচকেরা এই সংখ্যাধিক্যের কথা উল্লেখ করেছেন? এখন যা দেখা যাচ্ছে তাতে 'সম্পূর্ণ' নজরুল-সংগীত এক হাজারের অধিক হবে বলে মনে হয় না। বর্তমানে এক হাজার নজরুল-সংগীতের সম্পূর্ণ 'কথা'ও (সুরের কথা বাদ দিয়ে) উদ্ধার করা যাবে কীনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাহলে অবশিষ্ট নজরুল-সংগীতগুলি গেল কোথায়? এই বিপুলসংখ্যক গানের সবগুলিই কী অবলুপ্তির পথে?

আমি সংগীতজ্ঞ নই। সংগীতের রাজ্যে নজরুল ইসলাম কথা ও সুরে যে বিপুল উন্মাদনা ও ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেছিলেন সে বিচার অধিকারী ব্যক্তিরা করবেন। আমি এখানে সাধারণভাবে নজরুল-সংগীতের একটি বিশেষ দিকের কথা উল্লেখ করব। যাঁরা নজরুল-সংগীত-গুলি সংগ্রহ ও সুর-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে বিচার করবেন—এ আলোচনা হয়তো তাঁদের কিছু উপকারে আসতে পারে।

॥২॥

নজরুলের সংগীত-জীবনকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম অধ্যায় কেটেছে গ্রামোফোনে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা ও সমাপ্তি রেডিওতে। প্রথম পর্বে কবি যে গানগুলি রচনা করেন সেগুলি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, কিন্তু এগুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুর এবং রাগের কারুকার্য সূক্ষ্মতম পর্যায়ে উন্নীত হ'তে পারেনি—রাগ এবং রাগিণীর হর-পার্বতী মিলন ঘটেছে দ্বিতীয় পর্বে। সংগীত শাস্ত্রের সূক্ষ্মতম বিধিনিষেধ মেনে এই পর্বের সংগীতগুলি দুর্লভ সৌন্দর্যে মনোহর হয়ে উঠেছে। নজরুল-সংগীতের বলিষ্ঠতা ও সুরবৈচিত্র্যের অন্বেষণে গবেষকদের লক্ষ্য এই পর্বের সংগীতাঞ্জলির দিকে নিবদ্ধ রাখতে হ'বে। মহৎসংগীত বলতে আমরা যা বুঝি তা নজরুল এই পর্বেই সৃষ্টি করেছেন।

বেতারে কবির জন্যে তিনটি অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট ছিল : (ক) হারামণি (খ) গীতি-বিচিত্রা এবং (গ) নবরাগমালিকা। এই তিনটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগীত রচনায় কবি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

॥৩॥

'হারামণি' অনুষ্ঠানটি মাসে একবার করে প্রচারিত হতো। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবি অপ্রচলিত এবং লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণীর পুনঃ-প্রচলনের প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। রাগ-রাগিণীতে সমৃদ্ধ হয়ে না উঠলে কোন দেশের সংগীত প্রাচুর্যময় ও শাশ্বত হয়ে উঠতে পারে না। এই সহজ সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে কবি বাংলার সংগীতকে রাগ-রাগিণীর প্রাচুর্যে অনবদ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রচারিত প্রতিটি সংগীত লুপ্তপ্রায় বা হারিয়ে যাওয়া রাগ-রাগিণীকে কেন্দ্র করে লিখিত। এই সকল রাগ-রাগিণীর মধ্যে অনন্ত গৌড়, মালগুঞ্জ, ঘুই, আহীর ভৈরব, বাঙাল বিলাবল, আনন্দ ভৈরব, বসন্ত মুখারি, উমা তিলক, শংগার বিরহাগ্নি, লংকাদহন সারং, জৌন বাহার, রক্তহংস সারং ইত্যাদি প্রধান। এদের মধ্যে আহীর ভৈরব সুরটি পরবর্তীকালে বিশেষরূপে আদৃত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 'অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী' শীর্ষক বিখ্যাত নজরুল - গীতিটি আহীর ভৈরব সুরে লিখিত। 'হারামণি' অনুষ্ঠান শুরু হবার প্রথমে স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী রাগ ও সুরের বিশ্লেষণ করতেন। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাগ সম্পর্কে শ্রোতা-দের মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে ওঠার পর সেই রাগে রচিত গানটি কবি নিজে গাইতেন, লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 'হারামণি' অনুষ্ঠানের কোন গান বাইরের শিল্পীকে দিয়ে গাওয়ানো হতো না। এই অনুষ্ঠানের সংগীতগুলি রচনার জন্য কবিকে কঠোর পরিশ্রম করতে হ'তো। সংগীতজ্ঞ আমীর খসরু রচিত ফার্সী ভাষার এক বিপুলায়-তন গ্রন্থ এবং নওয়াব আলী চৌধুরী কৃত 'মআরিফুন্ নাগমাত' বিখ্যাত সংগীত গ্রন্থ দু'খানি কবি অতি যত্নসহকারে অধ্যয়ন করতেন। এছাড়াও রাগ-রাগিণী সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা তিনি সুরেশবাবুর কাছ থেকেও পেতেন। এই দ্বিবিধ মূলধন সম্বল করে কবি গভীর রাত্রে একান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশে ধ্যান-তন্ময়তার ভিতর দিয়ে 'হারামণি'র গান-গুলি রচনা করতেন। সংগীত রচনার জন্য কোন সময় কবিকে এমন তপস্যা নিমগ্ন হতে দেখা যায়নি। অথচ দুর্ভাগ্য আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রচারিত অধিকাংশ গান বর্তমানে পাওয়া যায় না। শোনা যায় 'হারামণি' অনুষ্ঠানের গানের খাতাটি চুরি হ'য়ে গেছে। ফলে বাংলাদেশ তার নিজস্ব সংগীতের এক আশ্চর্য সম্পদ হারিয়েছে।

॥৪॥

বেতারে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হয়েছিল 'গীতি-বিচিত্রা'। অনুষ্ঠানটি মাসে দু'বার প্রচারিত হতো, পৌনে এক ঘণ্টার অনুষ্ঠান। কবি যতদিন বেতারের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, নিয়মিত অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়েছে, সংগীত পরিচালক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মতে আশি থেকে নব্বুইটি গীতি-বিচিত্রা বেতারের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি শোনার জন্যে দেশের আপামর জনসাধারণ সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতো।

'গীতি-বিচিত্রা' অনুষ্ঠানটিকে সংগীত আলেখ্য অনুষ্ঠান বলা চলে। মূলে একটি বিষয়কে অবলম্বন করে ছ'টি করে সংগীত পরিবেশন করা হ'তো। এই অনুষ্ঠানে যে সকল সংগীত আলেখ্য পরিবেশিত হ'য়েছে তাদের মধ্যে প্রধান হলো 'কাফেলা', 'কাবেরী তীরে', 'ছন্দসী' ইত্যাদি।

'কাফেলা' আলেখ্যটিতে দেখা যায় এক-দল মরুযাত্রী এগিয়ে চলেছে। তাদের চলার সংগে সংগে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও দৃশ্যাবলী পরিবর্তিত হচ্ছে আর পরি-বর্তিত হচ্ছে সময়। দিবস সন্ধ্যার বুকে বিলীন হ'য়ে রাত্রের মধ্যে প্রবেশ করছে। এই পরিবর্তনের সংগে সংগে পরিবর্তিত হচ্ছে কাফেলার গতিবেগ এবং মেজাজ। চিত্র এবং সংগীতের মাধ্যমে এই পরি-বর্তনকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হ'য়েছে। কাফেলার গতিবেগের সংগে ফুটে উঠেছে গৃহে অপেক্ষমান প্রিয়তমাদের প্রতি তাদের হৃদ্য আকর্ষণ। সব মিলিয়ে কাফেলা সংগীত আলেখ্যটি অপূর্ব। মরুভূমির পরিবেশ ফোটানোর জন্য আরব দেশ থেকে সংগৃহীত মরু-সুর-সমৃদ্ধ রেকর্ড থেকে কবি সুর সংগ্রহ করেছিলেন। এই রেকর্ড-গুলি গ্রামোফোন কোম্পানী কবির জন্য আনিয়েছিলেন। কাফেলার কয়েকটি গানে আরবী সুর বিধৃত ছিল।

'কাবেরী তীরে' গীতিনাট্যটি একটি নিটোল ভালবাসার কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কাবেরী নদীর তীরে প্রেমের আদিম আকর্ষণে মিলিত হ'য়েছে দুটি হৃদয়, তাদের মান-অভিমানকে কেন্দ্র করে ছটি গানের মাধ্যমে কাহিনী পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। নজরুলের বিখ্যাত গান 'কাবেরী নদী জলে কে গো বালিকা' এই গীতিনাট্যের জন্যেই রচিত। পরে এটি সুপ্রভা সরকারের কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়।

'ছন্দসী' গীতিনাট্যটি দু'টি অনুষ্ঠানে সমাপ্ত হয়। 'ছন্দসী'র রচনা ও প্রচার প্রধানত সুরেশবাবুর সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে আট-দশটি সংস্কৃত ছন্দকে অনুসরণ করে কবি গান রচনা করেন। সংস্কৃতের যে কটি ছন্দকে কবি অনুসরণ করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকটি হ'লো 'মালিনী', 'বসন্ততিলক' 'অনুমধ্যা', 'ইন্দ্রজা', 'মন্দাক্রান্তা' ইত্যাদি ছন্দ। এই ছন্দগুলির মাত্রা, যতি, তাল ইত্যাদির ব্যাখ্যা সুরেশবাবু কবিকে বুঝিয়ে দিতেন।

সেগুলি যথাযথ অনুধাবন করে নিয়ে ঠিক অনুরূপ ছন্দে কবি বাংলায় সংগীত রচনা করতেন। এভাবে মাত্রা ঠিক রেখে প্রকৃত সংগীত রচনা করা যে কত কঠিন তা সহৃদয় রসবেত্তা ব্যক্তিগণ অনুধাবন করবেন। এই কঠিন পরীক্ষায় নজরুল অনায়াসে সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

গীতিবিচিত্রার আর একটি অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছিল কেবলমাত্র কীর্তনের সুরে। আশি থেকে নব্বুইটি অনুষ্ঠানের জন্য কবি

কমপক্ষে পাঁচশো গান রচনা করেছিলেন, এবং এর মধ্যে অন্ততপক্ষে সত্তর আশিটি সংগীত আলেখ্য। পাঁচশো গানের মধ্যে সমসাময়িককালে যে স্বল্পসংখ্যক গান রেকর্ড করা হয়েছিল (তাদের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি নয়) সেগ্নলি ছাড়া আর একটিও এখন পাওয়া যায় না। অন্নর্পভাবে আলেখ্যগ্নলিও অবলন্প্ত হয়েছে অথবা হবার অপেক্ষায় আছে। অন্তত সেই সময়ের থেকে সেগ্নলি পাঠক-সমাজের চোখে পড়েনি। কলকাতার বেতার দপ্তরের প্নরানো রেকর্ডপত্রে হয়তো এখনো কিছ্ন গীতিনাট্য পাওয়া যেতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বেতার কার্যালয়ে দ্ন'দিন গিয়ে কোনো খবর সংগ্রহ করতে না পেরে নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছি। এই জাতীয় সম্পদের যথাযোগ্য অন্নসন্ধান হ'লে বাংলা তথা ভারতের সংগীত-ভান্ডার যে বিশেষর্পে সম্নদ্ধ হয়ে উঠবে, এ-কথা অসঙ্কোচে বলা চলে।

॥ ৫ ॥

'হারামণি' এবং 'গীতিবিচিত্রা' অন্নষ্ঠান দ্নটি ছাড়াও কবির সংগীত এবং সন্রে প্রচারিত হতো 'নবরাগ মালিকা' অন্নষ্ঠানটি। 'হারামণি' অন্নষ্ঠানে তিনি যেমন অপ্রচলিত বা হারিয়ে যাওয়া রাগ-রাগিণীগ্নলির প্ননঃপ্রচলনের দিকে দ্নষ্টি নিবন্ধ রেখেছিলেন, তেমনি নবরাগ মালিকা অন্নষ্ঠানে তাঁর লক্ষ্য স্থির ছিল নতুনতর সন্রসৃষ্টির দিকে। বর্তমান সংগীত জগতে নতুন সন্র সৃষ্টি করা যে কত কঠিন তা' সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ সহজেই অন্নধাবন করবেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট সংগীত রচনা করেছেন কিন্তু নতুন রাগ-রাগিণীর সৃষ্টির দিকে তিনি যাননি। প্নরাতন প্রচলিত রাগ-রাগিণীকেই তিনি নতুনর্পে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু নজর্নল ? কেবল একটি দ্নটি নয়, প্রায় পনেরটির মত নতুন সন্রের সৃষ্টি করেছেন। এগ্নলির মধ্যে 'উদাসী ভৈরব', 'অর্নণ ভৈরব', 'শিবানী ভৈরবী', 'আশা ভৈরবী' 'রেণ্নকা', 'অর্নণ রঞ্জনী', 'নির্ঝরিণী', 'দোলন-চাঁপা', 'ধনকুন্তলা', 'সন্ধ্যামালতী', 'মীণাক্ষী', 'র্নপমঞ্জরী' ইত্যাদি প্রধান। ভাবতে আশ্চর্য লাগে কী কঠোর তপস্যায় কবি এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন! নতুনতর সন্র-রাগিণীর প্লাবনে তিনি বন্ঝি সমগ্র দেশকে প্লাবিত করে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর সজ্ঞান জীবন-নাট্যের শেষ পর্বের দিনগ্নলি ধ্যানী তানসেনের মত সংগীতময় ও ধ্যান-সর্বস্ব হয়ে উঠেছিল। কবি সভা-সমিতি ছেড়েছিলেন, বন্ধ্ন-বান্ধব ছেড়ে নিস্তব্ধ গ্নহে সংগীত-সন্রসৃষ্টির দ্নরূহ মৌন তপস্যায় নিয়োজিত হয়েছিলেন।

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, নজর্নল-সাহিত্য নিয়ে কিছ্ন কিছ্ন আলোচনা হলেও নজর্নল-সংগীতের সত্যকার আলোচনা কোথাও হয়নি। কয়েকটি পল্লী-সংগীতের বা কয়েকটি ভক্তিমূলক সংগীতের (ইস্‌লামী - শ্যামা - কীর্তন ইত্যাদি) অথবা মন্ষ্টিমেয় গজল গানের প্রথম পংক্তি উদ্ধৃত করে গায়ক-গায়িকার নামের তালিকা প্রকাশ করলেই নজর্নল-সংগীতের আলোচনা হবে না। এর জন্যে প্রথম প্রয়োজন হারামণি এবং নবরাগ-মালিকা অন্নষ্ঠানে তিনি যে সংগীতগ্নলি প্রচারিত করেছেন সেগ্নলি সংগ্রহ করা। যে সকল সংগীতে তিনি আশ্চর্য সাফল্যে বিভিন্ন সন্রের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন সেগ্নলিও সংগ্রহ করতে হবে। এগ্নলি সংগ্রহের পর কঠোর পরিশ্রমে সংগীতগ্নলির শাস্ত্রসম্মত আলোচনা চাই— তাহলেই নজর্নল-সংগীতের কিছ্ন সত্যকার আলোচনা হবে। প্রচলিত রাগ-রাগিণী নিয়ে যে গান-গ্নলি কবি রচনা করেছেন সেগ্নলি 'নজর্নল-সংগীত' বটে তবে 'সংগীতজ্ঞ নজর্নল' সেখানে নেই। আর সংগীতজ্ঞ নজর্নলকে না জানলে নজর্নল-সংগীতের আলোচনা কখনই পূর্ণ হতে পারে না।

চপরাশী

আশাপূর্ণা দেবী

অনেকক্ষণ ধরে কথা চালিয়ে, জোরালো গলায় অনেক ওজর-আপত্তি অনিচ্ছে দেখিয়ে অবশেষে প্রায় পরাজিতের গলায় 'আচ্ছা ঠিক আছে। কবে বললেন? বাইশে? টুকে রাখছি তারিখটা। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন কিন্তু—' বলে টেলিফোন রিসিভারটা নামিয়ে রেখে রাধিকানাথ হতাশ-গলায় বলে ওঠেন, 'নাঃ এই 'সভা' করে করেই দেশটা পাগলা হয়ে যাবে। আর 'সভাতে'ই আমার জীবন মহানিশা করে তুলবে। একদিকে শ্লোগান, আর একদিকে ফাংশান, এই নিয়ে আছে দেশ। অন্য চিন্তা করতে ভুলে যাচ্ছে। কারণে অকারণে হরদম এই ফাংশান করা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

একসঙ্গে এতগুলো কথা বললে হাঁপাতেই হয়, কারণ কিছু কিঞ্চিৎ বয়েস হয়েছে রাধিকানাথের।

নন্দিতা অনেকগুলো বাংলা পত্র-পত্রিকা নিয়ে বসেছিল। পড়ছিল না, ওলটাচ্ছিল, আর বাবার জোরালো গলার আপত্তি শুনছিল। নন্দিতার হাসি হাসি মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ওই 'আপত্তি'টা সে যেন বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। নইলে গল্প পড়তে পড়তে হাসবে, যা হেসে উঠবে খিলখিলিয়ে, সে বয়েস
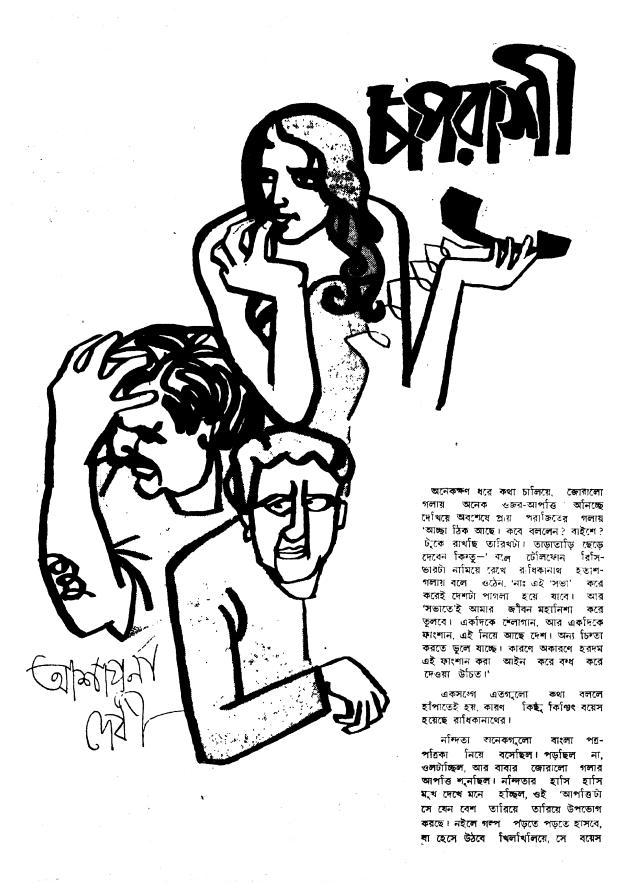
আর নেই নন্দিতার। তা'ছাড়া পড়েই বা কই এই সব পত্র-পত্রিকা? শুধুতো ওলটায়।

রাধিকানাথ একটি নামকরা কাগজের সহ-সম্পাদক, বাড়িতে পত্র-পত্রিকার বৃন্দাবন। কত পড়বে? আর কি-ই বা পড়বে?

এখন আবার স্বগতোক্তি শুনে নন্দিতা পত্রিকাটা মুড়ে রেখে মুচকি হেসে বলে, 'কেন বাবা, তুমি তো সভা করতে খুব ভালই বাসো।'

নন্দিতা সর্বদাই বাবাকে এ-অপবাদ দিয়ে থাকে, আর রাধিকানাথ সর্বদাই শুনে উত্তেজিত হন। কারণ তিনি তো জানেন এক-একটি সভাপতিত্বে, বা প্রধান অতিথিত্বে স্বীকৃতি দেবার আগে কত প্রতিরোধের চেষ্টা করেন তিনি।

জরুরী কাজ, স্বাস্থ্য ভাল নেই, সময়ের অভাব, ইত্যাদি প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র নিয়েই লড়েন, কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রাবল্যের কাছে, অবশেষে হার মানতেই হয়। বাঘ শিকারীরা কি কোনো বাধা মানে? আর সভাপতি শিকারীরা কি 'বাঘমারা'দের চেয়ে কম? অতএব পরাজয় মেনে বলতেই হয়, 'আচ্ছা ঠিক আছে—'

কিন্তু নন্দিতা যেন ওই ফাংশানকারীদের মতই একবগ্গা। কোনো কথা বুঝতে চায় না, স্বচ্ছন্দে বলে বসে, 'সভা তো তুমি ভালই বাসো বাবা?'

এতে রাধিকানাথ উত্তেজিত হবেন না? হলেন।

সেই গলাতেই বলে উঠলেন, 'ভালই বাসি? তুই বলিস কি নন্দা? তোর এই ভুল-ধারণাটা কি কিছুতেই যাবে না? সভা ভালবাসি? বলে 'সভা' শুনলেই আমার আতঙ্ক হয়। কেবল সময় নষ্ট, নিজের কাজকর্ম কিছুই হয় না। শরীরেও বয়না সবসময়।'

'তবে যাও কেন?'

দুষ্টু দুষ্টু হাসে নন্দিতা।

অল্পবয়সে মাতৃহীন মেয়ে, বাবার উপর আবদার আধিপত্য দুই-ই প্রবল। হয়তো—এতটা উত্তেজিত হয়ে ওঠার কারণও রাধিকানাথের তাই। মেয়ের কথাকে রাধিকানাথ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

'যাও কেন' প্রশ্নটিকেও গুরুত্ব দিলেন। বললেন 'যাই কেন? যাই কেন, তা দেখতে পাসনা? এককথায় যাই? কী অনুরোধ উপরোধের ঠেলা। বাপস্!'

নন্দিতা হেসে উঠে বলে, 'সে তো থাকবেই। নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তো লোকে তেমন অনুরোধই করে থাকে, যাতে ঢেঁকি গেলানো যায়। কিন্তু ঢেঁকিটা তুমি গিলবে কেন?'

রাধিকানাথ ক্ষুব্ধ হন, আবার চড়াও হন। বলেন, 'গিলি কেন? গায়ে মানুষের চামড়া আছে বলেই গিলি। না গিলে পারি না। আমাকে সবাই এত ভালবাসে, এত শ্রদ্ধা-সম্মান করে, আমাকে একটিবারের জন্যে নিয়ে যেতে পারলে কৃতার্থ হয়, সেটা দেখবো না? তবু তো চেষ্টা করি এড়াতে, তা বলে অভদ্র তো হতে পারি না? না অভদ্র হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

রাগ-রাগ মুখ করে বসে পড়েন রাধিকানাথ।

মেয়ের মুখটা কিন্তু হাসি-হাসিই থাকে, 'সম্ভব হতো বাবা—' নন্দিতা গলা ছেড়ে হেসে ওঠে। 'যদি তুমি ওই শ্রদ্ধা-সম্মান ভালবাসার স্বরূপটা বুঝতে।'

রাধিকানাথ এবার গম্ভীর হন।

গম্ভীর আর ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, 'তোর সেই কথা! তোরা এযুগের ছেলেমেয়েরা বড় অসভ্য হয়ে গেছিস নন্দা। এত ছোটকথা তোরা ভাবতে পারিস কি করে?'

নন্দিতাও অতএব গম্ভীর হয়, 'অবিরত 'ছোট' মানুষ দেখতে দেখতে, আর ছোট কথা বুঝে ফেলতে ফেলতে, 'ছোট' ভাবনা ভাবতে শিখে ফেলেছি বাবা। জ্ঞানচক্ষুটা বড় তাড়াতাড়ি খুলে গেছে আমাদের।'

রাধিকানাথ আরো গম্ভীর হন, 'যেটাকে জ্ঞানচক্ষু ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিস নন্দা, আসলে সেটা বিকৃত চক্ষু। আমাকে লোকে চায়, আমি 'কবি' বলে নয়, একটা কাগজের সাব এডিটার বলে, এই দেখাটাই তোর বিকৃত দৃষ্টির দেখা।'

নন্দিতা যদি রবীন্দ্রযুগের মেয়ে হতো, নিশ্চয়ই বাপের এই ধিক্কার বাণীতে আহত হতো, অভিমান করতো, চুপ করে যেতো। তা'হলে নন্দিতার 'চোখ ছলছলিয়া উঠিত' অথবা 'বড় বড় দুইচোখের কোল বাহিয়া দুইফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িত।'

কিন্তু নন্দিতা রবীন্দ্রযুগের মেয়ে নয়, যুদ্ধোত্তর যুগে জন্মানো মেয়ে, তাই নন্দিতা অপবাদ গায়ে রাখতে রাজী হয়না। জোর গলায় প্রতিবাদ করে, 'ওকথা বললে মানবোই না। নিজের চক্ষে দেখিনা বুঝি? যাইনা বুঝি তোমার সভায়-টভায়? দেখতে পাইনা তোমার কাগজের ক্যামেরাম্যানটি ক্যামেরা বাগিয়ে ধরলেই ফাংশান কর্তারা কেমন গুছিয়ে বাগিয়ে ক্যামেরার 'ফোকাসে'র মধ্যে এসে পড়েন। ঠেলাঠেলির চোটে তোমার মুখটাই প্রায় আড়াল হতে বসে। তা যাক, ফটোটা যখন কাগজে বেরোবে ও'দের মুখটুখগুলো তো? আর বেরোবেই ফটো। অন্তত তোমার কাগজে। তুমি যেখানে 'চীফগেষ্ট' বা প্রেসিডেন্ট, সে সভার বিবরণ তোমাদের রিপোর্টার বেশ বিস্তারিত করেই লিখবে।'

'শুধু এই জন্যেই ওরা আমায় ডাকে?' রাধিকানাথ উত্তেজিত হন।

নন্দিতা কিন্তু নির্বিকার গলায় বলে, 'আমার তো তাই বিশ্বাস।'

'তোমাদের এযুগের এই বিশ্বাসহীনতার 'বিশ্বাস'গুলো খুব ঠিক নয় নন্দা! আশ্চর্য, তুমিও এই বিকৃত আধুনিকতার শিকার হচ্ছো।'

'তুমি কবি মানুষ, কবিত্ব করে কথা বলতে পারো বাবা। আমি বলবো, 'ইহাই পরম সত্য।'

রাধিকানাথ আর কি বলতেন কে জানে, আবার টেলিফোন ঝনঝনিয়ে ওঠে। রাধিকানাথ ধরবার আগেই নন্দিতা ধরে, এবং বলে চলে, 'হ্যাঁ বাড়িতে আছেন, একটু ব্যস্ত আছেন। বলুন কি বলবেন? ও, আমাকে বললে হবে না? কিন্তু আমি তাঁর মেয়ে, যা বলবার—তাঁকেই একবার চাই? আচ্ছা ডেকে দিচ্ছি—কি নাম বলবো? 'বিশ্ববেকার সংস্কৃতি সংস্থা?' আচ্ছা, ধরুন এক মিনিট।'

কষ্টে হাসি চেপে বাবার দিকে রিসিভারটা এগিয়ে দেয় নন্দিতা। 'বাবা বিশ্ববেকার সংস্কৃতি সংস্থা।'

রাধিকানাথ সেটা হাত দিয়ে চাপা দিয়ে চাপা মেজাজী গলায় বলেন, 'কই ভাগাতে পারলে না?'

'পারতাম, যদি তুমি এখানে বসে না থাকতে।'

নন্দিতা হাসতে থাকে। এবং উৎকর্ণ থাকে বাবার কথার ধাঁচের দিকে। খুব উৎকর্ণের কারণ অবশ্য নেই। রাধিকানাথ বেশ চড়া চড়া গলাতেই বলে চলেছেন, "না না মাপ করবেন। সময় একেবারে নেই।...কি করবো বলুন? উপায় কি?...কী আশ্চর্য! রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কবি নেই বাংলাদেশে? ঠিক আছে, না থাকতে পারে। কিন্তু উপায় কি? ওইদিন আমার অন্য কাজ রয়েছে।'

নন্দিতার কর্ণগোচরের উদ্দেশ্যেই বোধহয় ঝাঁজটা বেশী। তাছাড়া বাস্তবিকই কাজ রয়েছে রাধিকানাথের। তাই বার বার বলেন, 'সময় নেই, মাপ করবেন। একদিনে দুটো সভা করিনা আমি!'

কিন্তু 'করিনা' বললেই যদি ছাড়ান পাওয়া যেতো। রাধিকানাথের 'সময়' নেই কিন্তু তাদের তো অগাধ-অনন্ত সময়? রাধিকানাথের 'কাজ' আছে, কিন্তু তারা যে 'বেকার'। তা'ছাড়া তারা সংস্কৃতির ধারক বাহক, তাদের কবির উপর একটা দাবি নেই? অতএব শেষ পর্যন্ত বলতেই হয় রাধিকানাথকে—'আচ্ছা ঠিক আছে—'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে রাধিকানাথ মেয়ের দিকে একটি প্রাজ্ঞল দৃষ্টি হানেন। যার অর্থ হচ্ছে—'দেখলে?'

নন্দিতা তো দেখেইছে।

তাই নন্দিতা মৃদু হেসে বলে, ছাড়ব না জানতাম। 'সংস্কৃতির' ধারক তো। অন্যের অনিচ্ছের বন্ধ দরজায় তুরপুন চালিয়ে ছেঁদা করে ঢুকে পড়াই কাজ যাদের।'

'কী বললি?'

'কিছু না। কিন্তু বাবা এইবার তোমায় চান করতে যেতে হয়, আবার হয়তো কেউ এসে পড়বে। হয়তো ফোন।'

রাধিকানাথ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন।

রাধিকানাথ চান করতে যান, কিন্তু মনের মধ্যে অবিরত পাক দিতে থাকে মেয়ের ব্যঙ্গোক্তি। কানের পর্দায় যেন ধাক্কা মারছে এখনো।

'...যদি ওই শ্রদ্ধাসম্মান ভালবাসার স্বরূপ বুঝতে। ...হি হি!'

রাধিকানাথের মেয়ে ওইসব অদৃশ্যপক্ষদের শ্রদ্ধাসম্মান ভালবাসার স্বরূপ বোঝাতে

বসছে তার বাবাকে। টের পাচ্ছে না তা থেকে রাধিকানাথ তাঁর মেয়ের শ্রদ্ধাসম্মান ভালবাসার স্বরূপটাই বুঝে ফেলছেন।

এই কথা মুখের ওপর বলছে নন্দিতা?

রাধিকানাথ একটা কাগজের সাব-এডিটার বলেই তাঁকে নিয়ে এত টানাটানি! রাধিকানাথের এই দীর্ঘজীবনব্যাপী কাব্য-সাধনাটা কিছুই নয়? বোঝা যাচ্ছে অন্ততঃ রাধিকানাথের মেয়ের কাছে 'কিছুই' নয়! তা-নইলে সেটা নন্দিতার সন্দেহের গণ্ডী অতিক্রম করে 'স্থিরবিশ্বাসের' ভূমিতে দাঁড়াতো না।

...'আমার তো তাই বিশ্বাস!'

রাধিকানাথ শাওয়ারের নীচে মাথাটা পেতে দাঁড়িয়েই রইলেন অন্যমনস্কের মত। যেন বাইরের জলে ভিতরের দাহ প্রশমিত হবে। আশ্চর্য বাপ সম্পর্কে এমন অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য করতে বাধলোও না নন্দিতার?

জ্ঞানচক্ষু!

জ্ঞানচক্ষুর বড়াই!

তো সেই 'জ্ঞানচক্ষুতে' ধরা পড়লো না, দেশের লোকের 'কবি রাধিকানাথের' জন্যে মাথাব্যথা নেই, মাথাব্যথা দৈনিক 'মহৎ ভারতে'র সহ-সম্পাদক রাধিকানাথের জন্য, এই 'পরম সত্যে'র বাণীটি রাধিকানাথের মুখের উপর ছুঁড়ে মারাটা কী পরিমাণ নির্মম নির্লজ্জতা!

সন্তানের হাত থেকে আসা আঘাত এত যন্ত্রণাদায়ক!

রাধিকানাথ কি তবে যাচাই করে দেখবেন নিজের মূল্যের পরিমাণ?

অথচ রাধিকানাথের জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন মেয়ে একচক্ষু হরিণের মত একটা দিকই দেখছিল। স্বপ্নেও ভাবেনি তার ওই 'স্থির বিশ্বাসের' পাথরের চাঁইটা সেই সব মতলববাজ অদৃশ্যপক্ষদের উপর না পড়ে তার সরলবিশ্বাসী এবং মানুষের ভালবাসার প্রতি আস্থাশীল বাবার উপর গিয়েই পড়েছে।

তখন বাবার মুখটাও ভাল করে লক্ষ্য করেনি নন্দিতা, তাঁকে ঘর থেকে ভাগাবার তাকটাই করেছে। কারণ 'হঠাৎ কেউ এসে পড়া'র আশংকা নয়, নিশ্চয় 'একজন' এসে পড়ার আশা ছিল। বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল আশাটা।

রাধিকানাথকে চান করতে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হলো, ঘড়ির দিকে তাকালো।

তারপর যে ঘরে ঢুকলো, সে এসেই ধপ করে বসে পড়ে বললো, 'সারা সকাল এত কার সঙ্গে টেলিফোনে আড্ডা মারো? যখনই রিং করি এনগেজড্ সাউন্ড!'

নন্দিতা ভ্রূভঙ্গী করে, 'আহা আমিই যেন সকাল থেকে টেলিফোন নিয়ে বসে আছি। কেন বাবাকে প্রধান অতিথির পদে বরণ করবার জন্যে বরমাল্য হাতে ফাংশানীর দল নেই? পার্টির পর পার্টি?'

'সত্যি!' নন্দিতার প্রধান অতিথি বলে ওঠে, 'বড্ড বেশী সভা করছেন তোমার বাবা। কাগজ খুললে, দশটা সভার মধ্যে ছটায় তোমার বাবা! হেলথ্ খারাপ হয়ে যাবে।'

'তা'তে কি? সভাকারীদের সভাটা তো উজ্জ্বল হবে? বিস্তৃত বিবরণটা তো কাগজে বেরোবে? বাস্তবিক এত রাগ হয় বাবার এই ইয়ে'র সুযোগ নিয়ে কিভাবে ভাঙিয়ে খাচ্ছে সবাই ও'কে।...বাবার ধারণা —'কবি'র প্রতিই এত শ্রদ্ধা সম্মান তাদের। টার্গেটটি যে কে, বুঝতেই পারেন না। চোখে ধরিয়ে দিলেও মানতে চান না।'

বাবার 'বোকামী' না বলে, বাবার 'ইয়ে' বলে নন্দিতা সৌজন্য করে।

তবু নন্দিতার প্রিয়বান্ধব বলে ওঠে 'এই নন্দিতা, এটা বোধহয় তুমি ঠিক বলছো না! এতটা নয়। দেশের লোকেরা কবি সাহিত্যিক এঁদের খুব ভালবাসে। সবাই দেখতে চায়, নিয়ে গেলে দর্শনার্থীর ভিড় জমে—'

'হতে পারে!' নন্দিতা হেসে উঠে বলে, 'এক্ষেত্রে কিন্তু আমার অনুমানই নির্ভুল। আমি তো হি হি বাবার একটা বিশেষণই আবিষ্কার করে ফেলেছি। বাবাকে বলি—'চাপরাশী'। বাবা কিন্তু মানে বুঝতে পারেন না, বলেন, 'চাপরাশী-চাপরাশী করিস কেন রে নন্দা?'

'তুমি একটি পয়লা নম্বরের অভব্য মেয়ে—' আগন্তুক বলে ওঠে, 'বাবা না তোমার?'

'তাতে কি? পৃথিবীটাকে যে চিনে ফেলেছি। সত্যি ওই চাপরাশটা খুলে পড়ুক, দেখবে এই সব শ্রদ্ধাসম্মান, কবি-প্রেম স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে!... পাড়ার ছেলেরা পর্যন্ত ও'কে ভুলে গিয়ে মেয়র আর মন্ত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছে?'

'বাঃ চমৎকার! পাড়ার ছেলেদের ওপর তো দেখছি অসীম শ্রদ্ধা তোমার! নিজের ভবিষ্যৎ খুব অনুকূল বলে মনে হচ্ছে না।'

'প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে জয় লাভই বীরপুরুষের কাজ।'

'বীরপুরুষ' শব্দটা তো ঐতিহাসিক।'

'ইতিহাসের পাতা থেকে নামিয়ে আনার চেষ্টা কর। জানো না বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।'

'ওটা বোকা বোঝানোর ছল। আসলে বসুন্ধরা চতুর-ভোগ্যা। কিন্তু বাজে তর্ক থাক, আমাদের ব্যাপারটার কি ভাবছো তাই বল?'

'সব ভাবনাটা আমিই ভাববো?'

'বেশ আমিই ভাবছি। এই দণ্ডে গিয়ে বলছি তোমার বাবাকে।'

'থাক, অত বাহাদুরীতে কাজ নেই, বলবে ধীরে সুস্থে। সেবারে তোমাদের সরস্বতী পূজোর প্যাণ্ডেলের কেলে-ঙ্কারীতে বাবা তোমার ওপর হাড়ে চটে গেছেন।'

'কিন্তু আমি বেচারা সবচেয়ে নির্দোষ ছিলাম।'

'সে কথা কে বোঝাবে। কিন্তু যাক— আমার শর্তটা মনে আছে তো? জীবনে কখনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা চলবে না।'

'ঠিক আছে?' বেহায়া ছেলেটা একটি ব্যঙ্গনাময় হাসি হেসে বলে, 'কথা দিচ্ছি কেবল অসংস্কৃতির অনুষ্ঠানই চালিয়ে যাবো।'

নন্দিতা চাপা রাগের গলায় বলে,

'এই দন্ডে বিদায় হও। অভব্য কোথাকার।' যেতাম না। শোধ তুলে যেতাম এই অপমানের। কিন্তু তোমার বাবা আসছেন—'

'বাবা! এই সমীর, লক্ষ্মীটি শীগগির! প্লীজ্। আমিই বলবো, মুড্ বুঝে বলবো।'

বাবার 'মুড্' লক্ষ্য করছিল নন্দিতা। কীভাবে পাড়বে কথাটা।

কিন্তু মুড্ আর পায় না। অথচ হঠাৎ ঝপ্ করে বলে ফেললে হয়তো বলা হয়েই যেতো। যেমন ঝপ্ করে বলে ফেললেন রাধিকানাথ, 'বুঝলি নন্দা 'মহৎ ভারতের' অফিসের দরজায় সেলাম ঠুকে চলে এলাম।'

মহৎ ভারতের দরজায় সেলাম ঠুকে চলে এলাম।

এ আবার কেমনতর ভাষা!

নন্দিতা অবাক হয়ে তাকায়।

রাধিকানাথ যেন ক্যানভাসারের যান্ত্রিক গলায় গড়গড়িয়ে বলে ফেলেন, 'বললাম, এই রইল তোমার সাব্-এডিটারী! এত ইয়ে হয়ে কখনো থাকা যায়! একটা কথা থাকে না, কোনো পরামর্শ কেউ গায়ে মাখে না, অথচ খেটে মরো ডবল। নাঃ পোষাল না আর! ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম।'

'ছেড়ে দিলে? কাজ ছেড়ে দিলে?'

নন্দিতা অবাক হয়ে কূল পায় না।

কিন্তু রাধিকানাথ আত্মস্থ।

'দিলাম! অপমান কয়ে টি'কে থাকতে পারে মানুষ!'

নন্দিতা আরো অবাক হয়।

বাবার ওই কাগজের অফিসে কোনোদিন তো কোনো মতবিরোধ ঘটতে শোনেনি বাবার। হঠাৎ এমন কি ঘটনা ঘটতে পারে? অথচ এ মুহূর্তে জিগ্যেস করাও যায় না! বোঝা গেল না।

সমীরও সেই কথাই বলে 'বোঝা যাচ্ছে না। মাঝখান থেকে আমাদের ব্যাপারটাই গুবলেট্ হয়ে গেল।'

'আহা, গুবলেট আবার কি? বাবা 'মহৎ ভারতের' কাজ ছেড়ে দিয়েছেন্ বলে, আমরা বিয়ে করবো না?'

'করতে দেরী হবে। ও'র এই মন মেজাজ খারাপের সময়—'

'যাক তুমি আবার মন-মেজাজটা যাচ্ছেতাই করে বোসো না। বাবাকে নিয়েই ভাবনা—'

'ভয় নেই তোমার বাবা ফাংশান টাংশানেই দিব্যি ভুলে থাকবেন। অন্য অসুবিধে আর কি! বাড়ি ভাড়ার আয়টা তো রয়েছে—'

নন্দিতা কি বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। তাকিয়ে থাকে ঘাড় ফিরিয়ে।

'কি হলো? কি বলছিলে?'

'বলছি—ফাংশানে কি আর কেউ ডাকবে বাবাকে?'

সমীর বলে ওঠে, 'বাজে কথা বোলো না। আর তোমার ওই সন্দেহের কথাটি যেন এক্ষুণি বাবাকে গিয়ে বোলো না।'

'হয়েছে। মার চেয়ে মাসীর দরদ! যাক কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকো, যখন তখন এসো না। বাবা তো বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেনই না। তোমায় দেখলে হয়তো—'

কথাটা নন্দিতার সত্যি।

বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না রাধিকানাথ। বলছেন, 'নিজের কাজ করবার সময় তো পাইনি কখনো ভাল করে,—এবার নিজের দিকে তাকাই একটু।'

তাকাচ্ছেন তাই রাধিকানাথ।

নিজের দিকে তাকাচ্ছেন। সারাক্ষণ কবিতার খাতা নিয়ে বসে আছেন।

অসুবিধেও নেই।

ব্যাঘাত আসছে না কোনোখান থেকে। যেন প্রতিমা বিসর্জনের শেষের পূজা-মন্ডপ! ঢাক-ঢোল, ঘন্টা-কাঁসরের জগঝম্প গেছে থেমে। আয়োজন করে প্রণাম করতে আসা দূরের কথা পথে যেতে যেতে কেউ থমকে দাঁড়াচ্ছেও না।

কে জানে কেমন করে কোন তারে-বেতারে বার্তা রটে। মোটকথা রটেছে। টের পাওয়া যাচ্ছে সেটা। টেলিফোনের রিসিভারের গায়ে ধুলো জমে, রাধিকানাথের ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবি চাদরের পাটভাঙা হয় না। আর সেটা হয় না বলেই হয়তো রাধিকানাথকেই কেমন ভাঙাচোরা দেখায়।

এতদিনে যেন 'ঢাপরাশী' শব্দটার মানে বুঝতে পারছেন রাধিকানাথ। মাঝে মাঝেই ধরা পড়ে সেটা তাঁর কথা-বার্তায়।

যাচ্ছে দিন সপ্তাহ মাস, মাসের পরে মাস, সেই 'মানে'টা যেন পাথরে কেটে বসছে।

নন্দিতার বাবার তবে এতদিনে জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে?

অতএব বলতে পারা যায় নন্দিতা খুশী হয়েছে?

কিন্তু নন্দিতাকেও তবে ভাঙাচোরা দেখাচ্ছে কেন আজকাল? নন্দিতা কেন বাবার দিকে তাকাতে পারছে না আজকাল?

নন্দিতা আগে হঠাৎ হঠাৎ একদিন বলতে চেষ্টা করেছিল, 'বাবা এই তুমি সারাদিন বাড়ি আছো কেউ ডাকলো না, আর যেই একটু বেরিয়েছ অমনি ফোন্!... কী না 'বেহালা থেকে বলছি'—নাম বলবে না কিছুতে। যেন বেহালায় একমাত্র তিনিই আছেন। যত বলি আমি তাঁর মেয়ে যা বলবার আমায় বলুন, কিছুতে না। রেগে মেগে দিয়েছি আচ্ছা করে শুনিয়ে।'

বেহালা, হাওড়া, দমদম, উত্তরপাড়া।

সব পার্টিকে 'আচ্ছা করে শুনিয়ে' দিচ্ছে নন্দিতা। কিন্তু লক্ষ্য করছে ওর বাবা বড় 'আচ্ছা করে' ওর কথা শুনছেন। দৃষ্টিটা অস্বস্তিকর। তাই সেই 'হঠাৎ হঠাৎ ফোন' আসার গল্পটা ক্রমশঃ ভুলে যাচ্ছে নন্দিতা।

রাধিকানাথই বরং হঠাৎ হঠাৎ বলেন, 'নাঃ স্বীকার করতেই হবে তোদের এই যুগটা বুদ্ধির যুগ।'

অবান্তরই বলে বসেন।

কিন্তু নিজের যুগের বুদ্ধির প্রশংসায় খুশি হতে পারছে না কেন নন্দিতা!

নন্দিতা কোনোদিন সমীরের কাছে যায়নি, সমীরই যায়।

তাই সমীর উদ্‌ভ্রান্ত হয়।

'এ কি, তুমি? আর এই অসময়ে?'

'অপমান বোধ করছি সমীর। আমি আসা মানেই তো সুসময়।'

'অপরাধ স্বীকার করছি। কিন্তু—'

'সমীর'!...

'কী? কী হলো বলতো?'

'সমীর, অনেক দিনতো তোমরা সাংস্কৃতিক উৎসব কর না, সামনের পয়লা আষাঢ়ে, 'মেঘদূত' উৎসব করতে পার তো?'

সমীর ওর নীচু করে থাকা মুখটার দিকে তাকায়। তারপর আস্তে বলে, 'কথাটা প্রত্যাহার করে নিচ্ছ?'

'নিচ্ছি!'

'নন্দিতা তোমার ভবিষ্যৎবাণী সফল হওয়ায় তো তোমার খুশি হওয়ারই কথা।'

'সমীর দোহাই তোমার, থামো। কিন্তু এই শোনো, তুমি নিজে যাবে না খবরদার। তোমার ক্লাবের ওই সাধারণ সম্পাদক না কে যেন তাকে পাঠাবে। তুমি শুধু টেলিফোনে যোগাযোগ করে—' নন্দিতার বড় বড় দু চোখের কোণে দু ফোঁটা জল জমে। নন্দিতা চুপ করে যায়।

এরেনবুর্গের চোখে ভারত

অভয়ঙ্কর

ইলাইয়া এরেনবুর্গ কিছুকাল আগে লোকান্তরিত হয়েছেন। এই স্তম্ভে তাঁর জীবন ও সাহিত্য প্রসঙ্গে আমরা একাধিকবার আলোচনা করেছি। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইলাইয়া এরেনবুর্গ একজন শক্তিশালী সোভিয়েট লেখক ছিলেন। তাঁর রচনায় ছিল যৌবনের আবেগ, অসামান্য মননশীলতা, সচেতন মনোভঙ্গী এবং সংগ্রামী মানসিকতা। সমকালের সমালোচনায় তিনি বস্তুনিষ্ঠা এবং সততার পরিচয় দিয়েছেন।

এরেনবুর্গ রচিত গ্রন্থমালার মধ্যে তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'পীপল-ইয়ারস-লাইফ' নামক সাম্প্রতিক গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সকল শ্রেণীর সোভিয়েট লেখকদের মতে এই গ্রন্থটি বার বার পঠিত হবে। ভবিষ্যতের মানুষকে পথনির্দেশ করবে।

সম্প্রতি 'সোভিয়েত লিটারেচার' নামক পত্রিকায় এরেনবুর্গের এই স্মৃতিচারণ থেকে ভারত সংক্রান্ত অংশ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় এরেনবুর্গের রচনা থেকে ভারতবর্ষ, কলকাতা, নেহরু প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করা গেল।

এরেনবুর্গ লিখছেন ১৯৫৬ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ভ্রমণ-কথা—"১৯৫৬ ১৪ই জানুয়ারী আমি আর লিয়ুবা দুজনে মস্কো থেকে বিমানযোগে ভারতের পথে পাড়ি দিলাম। সেই কালে হিমালয়ের ওপর দিয়ে সোজাসুজি আসার কোনো পথ ছিল না। কাজেই স্টকহোম, রোম, কাইরো এবং করাচীর ঘুরপথে যেতে হল। মস্কো ফিরে এসে লিখেছিলাম—'ইণ্ডিয়ান ইমপ্রেসনস'। কি যে বলেছি সেই প্রবন্ধে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। ভারত আমাকে কি দিয়েছে, তাই বলতে চাই। ভারতবর্ষ একটা প্রজ্বলন্ত এবং বহুবিচিত্র দেশ। আমি শুধু দেখেছি সেখানে রয়েছে বিস্ময়কর প্রাচীন কালের শিল্পের সঙ্গে আমাদের কালের ঝড়, রাজনৈতিক শোভাযাত্রা, পাকিস্তান আগত ছিন্নমূল মানুষ। আর লেখকরাও সেখানে তাঁদের য়ুরোপীয় সহযোগী লেখকদের মতই একই চিন্তায় বিক্ষত। ভারতবর্ষ একটা বিচ্ছিন্ন জগৎ নয়। সেই দেশ আর সে-দেশের মানুষ দেখে আমি স্তম্ভিত, যাত্রার পূর্বে যেসব চিন্তা এবং সংকল্প আমার মনকে আচ্ছন্ন রেখেছিল তার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও আমি অভিভূত। ভারত আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে।"

এরপর এরেনবুর্গ ভারতবর্ষের সহঅবস্থান নীতির কথা বলেছেন। তিনি একটি মাত্র শহরে যে শান্তিময় সহবস্থানের নীতি লক্ষ্য করেছেন তাতে বিস্মিত হয়েছেন। য়ুরোপের মানুষ তোতাপাখি আর বানর দেখে অবাক হয়, কারণ তারা পায়রা আর চড়ুই দেখতে অভ্যস্ত।

ইলাইয়া এরেনবুর্গ একটি কঙ্কালময় চাবির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—

"ভারতবর্ষ ভ্রমণের আগে ও পরে আমরা ফরাসী, ইংরাজ এবং রাশিয়ান কর্তৃক লিখিত ভারতবর্ষ সম্পর্কিত অনেক বই পড়েছি। এরা সকলেই বৈপরীত্যের কথা বলেছেন কিন্তু এই বৈপরীত্য বিচারে যে-যার নির্দিষ্ট দ্বান্দ্বিক বা তাত্ত্বিক চাবি ব্যবহার করেছেন। এই চাবি কঙ্কালময়, আসল চাবি তাঁরা ব্যবহার করেননি৭

"আমি একটা তিক্ত মন্তব্য দিয়ে শুরু করি। ভারতবর্ষের পথে পথে, বিশেষত কলকাতায় আমি শীর্ণ গাভীর দৃশ্য দেখে ব্যথিত হয়েছি। এরা খাদ্যের সন্ধানে নির্বিঘ্নে গাড়ি, ঘোড়া, সাইকেল থামিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অনেকে সব্জিবাজারে ঢুকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পচা-গলা সব্জি টেনে খায়। গরুকে হত্যা করা চলবে না কিন্তু না খেতে দিয়ে বুভুক্ষু রাখা চলবে। ষাঁড়, বাছুর সবাই-এর মাথায় পবিত্রতার আলোকমণ্ডল।"

এই সূত্রে তিনি ১৯৬৬-র নভেম্বর মাসের দিল্লীর গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলনের কথা বলেছেন। ভারতের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস প্রসঙ্গে এরেনবুর্গ লিখেছেন—

"বোম্বাই শহরে পারসীরা থাকেন। তাঁরা অগ্নি-পূজারী। আগুন, জল, মৃত্তিকা সবই তাঁদের কাছে পবিত্র। ওঁদের মৃতদেহ 'টাওয়ার অব সাইলেন্সে' রাখা হয়, সেখানে শকুনিরা সেই মৃতদেহ ভক্ষণ করে।"

"শিখেরা মাথার চুল কাটে না, দাড়ি কামায় না। এঁদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত, এম-পি এবং লেখক আছেন যাঁরা মাথার কেশগুচ্ছ লুকানোর জন্য মাথায় পাগড়ি বাঁধেন, রবারের ব্যাণ্ড দিয়ে দাড়ি বাঁধেন।

"আমি অনেক বৈজ্ঞানিক দেখেছি যাঁরা মাঝে মাঝে জ্ঞানদায়িনী দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাতে যান। পরলোকগত ডাঃ বলিগার সোফার কিছু মানে না। কিন্তু যখন আমরা ঔরঙ্গাবাদ থেকে বম্বের বেয়াড়া রাস্তায়, তখন সে একজন ব্রাহ্মণকে ডেকে একটি সিকি তার হাতে দিল। আমাদের দিকে ফিরে অপরাধীর ভঙ্গীতে বলল—

এমন ঘন কুয়াশা, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। গঙ্গা পবিত্র নদী, সেখানে সবাই তাদের পাপ ধৌত করার জন্য স্নান করে। সুদূর গ্রামে ঘড়ায় করে গঙ্গাজল নিয়ে যায়। তথাপি এই পবিত্র নদী পবিত্র গো-সম্পদের চাইতে উত্তম ব্যবহার পায় না। নদীর দুই পাশের জুট মিল নদীর জল নোংরা করে।

"হিন্দুধর্মের অনেক দেব-দেবী। একেশ্বরবাদী এরা নয়। দেব-দেবীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আমি যখন স্কুলে পড়ি, তখন ভারতবর্ষের আশ্চর্য মানুষদের সম্পর্কে একটি বই পড়েছিলাম। বইটার নাম 'ক্রম দি কেভ্স অ্যান্ড জাঙ্গলস্ অব হিন্দুস্তান'। লেখিকার নাম হেলেনা ব্লাভাটস্কি। মাদ্রাজের একটি ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দিরে অনেক দেব-দেবীর মূর্তি আছে। সেখানে ব্রহ্মা, বুদ্ধ, যীশু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তার পাশে রুশ আকৃতির এক বৃদ্ধা, তাঁর মূর্তির নীচে নাম লেখা আছে —হেলেনা পেট্রোভা ব্লাভাটস্কী।"

এইসব তাঁকে কিন্তু বিস্মিত করেনি। ফ্রান্সে ক্যাথলিক চার্চগুলিতে নিরাময়ের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অনেক হাত-পা অংগ-প্রত্যংগের প্রতিলিপি টাঙানো থাকে।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রতিদিন যে রাশি-চক্র এবং দিনটি কেমন যাবে, তার ভবিষ্যৎ-বাণী থাকে, সে-কথাও বলেছেন এরেনবুর্গ। কয়েক বছর আগে এরেনবুর্গ বার্জেস ক্যাথিড্রালে একটি ঘোষণা দেখেছিলেন, সেই ঘোষণায় একটি ছোট্ট পোর্তুগীজপল্লীতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে ফতিমা নামে একটি সাধারণ মেয়ে নাকি হোলি ভার্জিনের প্রত্যাদেশে জানতে পারে যে, কম্যুনিস্ট অভ্যুদয় ঘটবে। এরেনবুর্গ বলেছেন যে, য়ুরোপেও অজস্র লোকাচার এবং স্বভাবগত সংস্কারের অভাব নেই—ছেলেবেলা থেকেই তিনি এই জাতীয় বহু সংস্কারে অভ্যস্ত। অদ্ভুত রীতিনীতি নবাগতকে সেইসব জিনিস বুঝতে সাহায্য করা যা তাঁর কাছে পরিচিত।

কলকাতা প্রসংগে তিনি বলেছেন, "কলকাতার রাজপথে অনেক সময় মানুষ শুয়ে থাকে। তারা ঘুমোচ্ছে, কি মৃত, না জীবিত তা বোঝা কঠিন। পথে কুষ্ঠরোগী শুয়ে থাকে, জননী ক্ষুধার্ত সন্তানকে প্রবোধ দেয়। পথচারীর কোনো বিকার নেই, এসব দারিদ্র্য এবং সংক্রামক ব্যাধি তাদের গা-সওয়া। মাদ্রাজে পশুর বিবরে বন্দরের মজুররা থাকে, তাই সয়ে গেছে তাদের। ভারতবর্ষে যাঁদের সংগে দেখা হয়েছে, তাঁরা বলেছেন যে, ভারতীয়রা অদৃষ্টবাদী। সবাই জানে যে, সময় এলে মরতে হবে। মৃত্যুর প্রত্যাশাও সয়ে যায়, তবে অপরের দুর্দশা সহ্য করা কঠিন। কাঁদুনে গ্যাসের মত বুগেনভিলিয়া সিল্ক বা সুতীর শাড়ি, প্রাচীন সৌধ বা আধুনিক ছবি সর্বকিছুর ছবি কেমন ছায়াবৃত হয়ে যায়।"

এরেনবুর্গের বলার ভংগীটি চমৎকার। তিনি ব্যংগ করেননি, কোনো শ্লেষ নেই, কোনো বাঁকা কথা নেই। এই সংগে বিভীষণ-মার্কা জনৈক বাঙালী লেখকের বি বি সি-তে প্রদত্ত বক্তৃতাটির (যা The Listener -এ প্রকাশিত হয়েছে) কথা মনে পড়ে। এরেনবুর্গের চিন্তা স্বাধীন এবং সংস্কারমুক্ত।

ভারতীয় সাহিত্য

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার স্মরণে।।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল 'সম্ভাবশতক'। এখন আর বইটি পাওয়া যায় না। তাঁর স্বগ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। সেনহাটী সম্মিলনীর উদ্যোগে ১৯ মে বিকেল পাঁচটায় এই গ্রন্থটির প্রকাশের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন।

সর্ব ভারতীয় লেখক সম্মেলন।।

দীর্ঘদিন সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনের কোনও আয়োজন কোথাও হয়নি। সম্প্রতি এ-বিষয়ে নতুন উৎসাহ বোধের সঞ্চার হয়েছে। ভুবনেশ্বরের একদল তরুণ সাহিত্যিক এ-ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছেন। আগামী ডিসেম্বরে ভুবনেশ্বরে এই সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, শীঘ্রই এই সম্মেলনকে সফল করে তোলার জন্য একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হবে।

মোহিতলাল জন্মজয়ন্তী।।

'শরৎ সাহিত্য সংসদ' এবং 'হালিশহর নাট্য সংস্থার' যুগ্ম উদ্যোগে সম্প্রতি হালিশহর রামপ্রসাদ নাটমন্দিরে মোহিতলাল মজুমদারের অশীতিতম জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সম্বর্ধনা জানান হয়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে মোহিতলালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন—"বাংলা-সাহিত্য এবং বাঙালী জাতির প্রতি অপরিসীম ভালবাসাই ছিল মোহিতলালের কবিতার প্রধান বিষয়। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বও এখানে।"

ইংরেজিতে তামিল সাহিত্য ॥

খুবই আনন্দের কথা যে, ইদানিং ভারতীয় সাহিত্যের অনেক অনুবাদ হচ্ছে। তামিল সাহিত্যেরও কিছু কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রখ্যাত তামিল সাহিত্যিক ত্যাগরাজন গনমণ্ডমের দ্বি-শত বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর রচনার অনুবাদ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন। লেখকের ১৪১ কীর্তির (শ্লোকের) সুন্দর অনুবাদ সংকলিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে।

সাহিত্য পুরস্কার

পাঞ্জাব সরকার সওয়া লক্ষ টাকার যে সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, তা নিয়ে পাঞ্জাবী লেখকের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে। নানক সিং, মোহন সিং সিতল, বলরাজ সাহানি, প্রাভজোত কাউর, অমৃত প্রিতম প্রমুখ লেখকদের অনেকেই এই পুরস্কার প্রদান পদ্ধতির বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছেন।

সাহিত্য প্রদর্শনী।।

সম্প্রতি কলকাতায় জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসভবনে। প্রদর্শনীটি বিভিন্ন কারণেই বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। জাতীয় জীবনে স্বদেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা সঞ্চারের জন্য যাঁরা একদিন লেখনী ধারণ করেছিলেন, তাঁদের এত সহজেই আমরা ভুলে গেলাম, এ-কথা ভাবলেও দুঃখ হয়। অনেক সময় মনে হয়, জাতীয় জীবন থেকে আমরা বোধহয় অনেকদূরে সরে এসেছি। জাতীয় জীবনের মর্যাদাকে বাদ দিয়ে কোনোদিন আত্মিক মুক্তি সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এই কারণেই উদ্যোক্তাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই।

সর্ব ভারতীয় কবি সম্মেলন।।

গত ১২ মে লেক ক্লাবে এক ঘরোয়া পরিবেশে 'সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের সদস্যদের এক চা-চক্রে আপ্যায়িত করা হয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সতীকান্ত গুহ, লীলা রায়, মণীন্দ্র রায়, আলোক সরকার, শান্তি লাহিড়ী এবং আরও কয়েকজন কবি, সাংবাদিক ও লেখক এতে উপস্থিত ছিলেন। ঘরোয়া পরিবেশে অনুষ্ঠানটি বেশ জমে ওঠে। ঐদিন 'দিনমান' নামক হিন্দী সাপ্তাহিকে 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা কবিতা' নিয়ে যে-মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে।

তামিল উপন্যাস ॥

সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি তামিল উপন্যাস সাহিত্যমহলে বেশ কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। প্রথম উপন্যাসটি শাণ্ডিল্যায়ান রচিত নাগ্গুরম। এই উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে অবশ্য তেমন অভিনবত্ব নেই। শংকর হলো গাঁয়ের ছেলে, যুবক। সে সংগীত ভালবাসে। সে চায় সংগীতজগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই উদ্দেশ্যেই সে একদিন মাদ্রাজ শহরে পাড়ি দেয়। কিন্তু এখানে এসে তার অবস্থা আরও অসহায় হয়ে উঠল। এই অবস্থায় জয়লক্ষ্মীর সংগে তার পরিচয়। জয়লক্ষ্মী তার সংগীতের একজন ভক্ত হয়ে উঠল। তারপর তাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় হল এবং প্রণয়সূত্রে তারা আবদ্ধ হল। এই ধরনের কাহিনীর মধ্যে যে বিশেষ কোনও অভিনবত্ব নেই, তা পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু এই উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য হল, লেখকের পরিবেশন ক্ষমতা। অপূর্ব সুন্দর বাচনভঙ্গির সাহায্যে সম্পূর্ণ কাহিনীটি তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

দ্বিতীয় উপন্যাসটির নাম সান্ত্বনা মারম, রচয়িতা "কৃষ্ণ"। এই উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে আছে অনুরাধা নামে এক অতীব সুন্দরী ধনীকন্যা। ত্যাগরাজন নামক এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলের সে প্রেমে পড়েছে। পিতার অসম্মতি সত্ত্বেও সে তাকে বিয়ে করে। কিন্তু কিছুদিন পরেই হঠাৎ অসুখে ত্যাগরাজনের মৃত্যু ঘটে। অনুরাধার পিতা তাকে ফিরে আসবার জন্য অনুরোধ জানায় এবং পিতার নির্বাচিত কোনও পাত্রকে আবার বিয়ে করতে বলে। কিন্তু অনুরাধা সেই আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করে। পরিবর্তে স্বামীর সংসারকেই নিজের সংসার বলে গ্রহণ করে। তারপর অনুরাধা ডাক্তারী পাশ করে এবং সমাজ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে। কাহিনীর দিক থেকে এর মধ্যেও অভিনবত্ব তেমন নেই। কিন্তু তামিলনাদের সামাজিকতার বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থে। এইদিক থেকে গ্রন্থটির আবেদন বিচার্য।

নিশীথ কাব্যগ্রন্থের জন্যে ১৯৬৭ সালের ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি ও সাহিত্যিক শ্রীউমাশংকর যোশী।

বিদেশী সাহিত্য

স্টিফেন বার্মিংহামের উপন্যাস ॥

স্টিফেন বার্মিংহাম একজন ইহুদী লেখক। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আওয়ার ক্রাউড' সর্বাধিক বিক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে অন্যতম। মার্কিণ সাহিত্যমহলে তিনি একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। সম্প্রতি 'দি রাইট পিপল' নামে তাঁর একটি উপন্যাস বেরিয়েছে। মার্কিণী সমাজ ব্যবস্থার ওপর উপন্যাসটি লেখা। অর্থনৈতিক অসাম্য সমাজজীবনের ওপর কি গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, তাই লেখক নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন।

বার্মিংহামের মতে, মার্কিনীদেরও একটা সমাজ আছে। তবে এ সমাজের দুটো অংশ—বলা উচিত দুটো দিক। একদিকে বাস করে উঁচুতলার মানুষেরা—তাদের চলাফেরা, ওঠাবসা, শিক্ষাদীক্ষা, আদবকায়দা—সমস্তই অভিজাত। তাদের ছেলেমেয়েদের স্বতন্ত্র বিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। তারই পাশাপাশি বাস করে নিচুতলার মানুষেরা। উঁচুতলার সম্ভ্রান্ত মানুষদের জীবনযাপনের সংগে তাদের কোন মিল নেই। নিচুতলার মানুষেরা উঁচুতলার সমস্তই জানে—তাদের খোঁজখবর রাখে। কিন্তু উঁচুতলার বাসিন্দারা তাদের সম্পর্কে নিতান্তই অজ্ঞ এবং উদাসীন। বার্মিংহাম অত্যন্ত দক্ষতার সংগে এই বৈপরীত্যের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন।

সমালোচকদের মতে, বার্মিংহাম সুস্থভাবে মার্কিনী সমাজজীবনকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন নি। এ উপন্যাসে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ম্লান, বাঁকা ও পাণ্ডুর। এরজন্য তাঁর প্রাক্তন জনপ্রিয়তা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

জাপানী উপকথা ॥

যশিৎসুন এখন আর কোনো ব্যক্তির নাম নয়—জাপানী ছেলে-বুড়োর কাছে একটি সজীব উপকথার বিষয়। তার এখন নানা নাম। কেউ বলে উশিয়াকামারু, কেউ বলে অনযুশি, অন্যেরা বলে হোগান দোনো। শোনা যায় ইচি নো তানি, যশিমা, তাকাদাচি, কোরোমোগিয়া, প্রভৃতি স্থানের সংগে তাঁর স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। কখনো তিনি যুদ্ধ করেছেন। তাতে জয় ও পরাজয়ের সুর সমভাবে যুক্ত হয়েছে। গল্পে আছে, একবার তাঁর সৎ ভাই যোরিতোমো তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। যুগে যুগে কালে কালে জাপানী জনসাধারণ তার এই জীবনকাহিনী নিয়ে গল্প তৈরী করেছে, চারণেরা গান বেঁধেছে আর সমকালীন মানুষেরা নতুনতর অর্থে তার ব্যাখ্যা করেছে। জাপানী সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরের শিল্প-সাহিত্যে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। আধুনিক বেতার, টেলিভিশন এবং সিনেমার যুগেও জাপানী জনসাধারণের কাছে তাঁর অলৌকিক জীবন-কাহিনী একটি অত্যন্ত প্রিয় বিষয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। সমালোচকের ভাষায় বলা যেতে পারে, যশিৎসুন প্রাক-আধুনিক জাপানী ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক নায়ক, সম্ভবত, সবচেয়ে জনপ্রিয় একক চরিত্র।

তাঁর জীবন-কাহিনী প্রথম কে লিখেছিলেন, আজো ঠিক জানা যায় না। তবে সেই অজ্ঞাত-পরিচয় গ্রন্থকারের কাহিনীটি এখন অনূদিত হয়ে পৃথিবীর বহুদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি হেলেন ক্রেগ ম্যাককুলাফ যশিৎসুন এ ফিফটিনথ সেঞ্চুরী

ক্রনিকল' নামে এই কাহিনীটির একটি অনুবাদগ্রন্থ রচনা করেছেন। বইটি প্রকাশ করেছেন ক্যালিফোর্ণিয়ার একটি প্রকাশন সংস্থা।

সোভিয়েতের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ॥

শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্য রচনার জন্য ১৯৬৭ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেলেন ইয়ারোশ্লাভ স্মেলিকভ, মির্জা কেম্পে, ও ইরাকলি আন্দ্রোনিকভ।

ইয়ারোশ্লাভ স্মেলিকভ হোলেন ইতিহাস সচেতন বাস্তববাদী লেখক। তিনি 'ডে অব রাশিয়া' নামে একটি কবিতার বই লিখে এই পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর কবিতায় বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি, সংগ্রামী চেতনা ও রাশিয়ান শব্দের সার্থক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

মির্জা কেম্পে একজন লেভিসিয়ান মহিলা-কবি। তাঁর কবিতায় কবির মাতৃভূমি লিয়েপাজা, রাশিয়া, ভারতবর্ষ ও স্পেনের মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা লক্ষ্য করা যায়। তিনি 'ইটারনিটি ইনস্টেটস' নামে কাব্যগ্রন্থ লিখে এই পুরস্কার লাভ করেন।

মির্জা কেম্পে, ইয়ারোশ্লাভ স্মেলিকভ ও ইরাকলি আন্দ্রোনিকভ

ইরাকলি আন্দ্রোনিকভ একজন সাংবাদিক, সমালোচক ও সম্পাদক। ব্যক্তিত্বে ও পাণ্ডিত্যে তিনি সোভিয়েত সাহিত্য-জগতের একজন শ্রদ্ধেয় লেখক। অনেকে তাঁকে রাশিয়ান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে মনে করেন। তিনি 'লেরমানটভঃ ইনভেস্টিগেশনস অ্যান্ড ডিসকভারিজ' নামে একটি বই লিখে এই পুরস্কারে সম্মানিত হন। এই গ্রন্থে লেরমানটভের সময়, মানসিকতা, রীতিনীতি, সংস্কার ও ভাষাগত ঐতিহ্যের বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে।

নতুন বই

আধুনিক (উপন্যাস) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ।। রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২ ।। দাম ছয় টাকা ।।

সমকালীন উপন্যাসে উজ্জ্বল জীবনরসের প্রতিফলন নেই বললেই চলে। কী প্রেম কী বিরহ—সব ব্যাপারেই অকারণ জটিলতা ও বিষাদ প্রায়শ পাঠকের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এদিক থেকে অন্য দিগন্তের মানুষ। তিনি তাঁর গল্পের ঘটনা সংগ্রহ করেন স্ব-কাল থেকে কিন্তু কথা বলেন চিরকালের মানুষের মতো। একালের মানুষের প্রতি তাঁর যেমন কোন বিরাগ নেই তেমনি সেকালের মানুষের প্রতিও অকারণ অনুরাগ নেই। জীবনের উপরিতলে যত ক্ষোভ ভেতরে ততটা নেই। বরং জীবনের গভীরে ডুব দিতে পারলে দেখা যায় সেখানে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পরিবেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। বিভূতিভূষণ সেই সঙ্গতির সূত্রটি জানেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টিই অবশ্য এই সূত্রনির্ধারণের একমাত্র সহায়ক।

এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা সকলেই পূর্বপরিচিত। তাদের চোখমুখ, চলাফেরা, গতিবিধি, সবই আমাদের চেনা। প্রায় অনুরূপ বিষয় নিয়ে এর আগেও কেউ কেউ উপন্যাস লিখে থাকবেন। কিন্তু এমন সরস উপস্থাপন, নির্মল সংলাপ ব্যবহার, একটি মুখচোরা যুবক ও কয়েকটি মুখরা যুবতীর প্রেমোপাখ্যান আর কেউ এত সুন্দরভাবে বলতে পারেন নি। দুটো ভিন্ন কাহিনী সংযুক্ত হয়ে এ উপন্যাসটির অবয়ব নির্মিত হয়েছে। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

বড়লোক ব্যবসায়ী আদিনাথ ও সুরবালার একমাত্র সন্তান সন্দীপ অবস্থাবিপাকে মুখচোরা হয়েই বেড়ে উঠেছে। লেখাপড়ায় সে ভালো ছেলে। মাঝে মাঝে কবিতাও লেখে। বাবার ইচ্ছে সে উপযুক্ত হয়ে তার ব্যবসায়ের হাল ধরুক কিন্তু মায়ের ইচ্ছা অন্যরকম। অথচ উভয়েই ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ হিসেবে দেখতে চায়। ছেলের মুখচোরা স্বভাবের সংশোধনের দায়িত্ব নিলো তার শহুরে মামা ও মামাতো ভাইরা। কিন্তু সকলের সমস্ত প্রয়াসকে ব্যর্থ করে কাহিনীর মোড় ঘুরল প্রেমের দিকে। এই অংশের প্রধান নারী-চরিত্র রাঙাঠানদি। বয়সের জড়তা তার মনের ওপরে ভার হয়ে ওঠেনি। তিনি করুণাময়ী হোম নামে মেয়েদের একটি মেসের প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান করে থাকেন। এবং কোন না কোন যুবকের সংগে এই মেসের মেয়ে সদস্যাদের বিয়ে দিয়ে নির্বাসন দেন। এই রাঙাঠানদির সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত মুখচোরা সন্দীপও প্রেমের পথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। উপন্যাসটি নারীপ্রধান। সকলেরই ভাল লাগবে।

●

লোকমাতা রাণী রাসমণি [জীবনী গ্রন্থ] **বঙ্কিমচন্দ্র সেন**। প্রকাশ-ভবন ২, শম্ভুনাথ দাস লেন, কলকাতা-৫০। দাম : টাঃ ৩-৫০ পঃ।

রাণী রাসমণির জীবনীতে রাণী রাসমণির কঠোর মনোবল এবং কিভাবে তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সমস্ত ইতিবৃত্তই আছে। দেশের জন্যে এবং দেশের মানুষের জন্যে রাসমণির যে কি দান ছিল তা ভাষায় বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। আজকের এই স্বাধীন দেশ তখন ছিল পরাধীনতার অন্ধকারাচ্ছন্ন—এককথায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের করতলগত—অথচ

সেই চরম মুহূর্তে রাণী রাসমণি তাঁর দেশের স্বাধীনতার জন্য সমানতালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে কঠোর সংগ্রাম করে গেছেন। এককথায় আলোচ্য এই গ্রন্থখানি রাণী রাসমণির এক সুন্দর জীবন-কাব্য। এর ভাব-ভাষা এবং ঐতিহাসিক তথ্যগুলি প্রতি পাঠকের মনই ভরিয়ে তুলবে। প্রচ্ছদপট ও ছাপা খুবই সুরুচিপূর্ণ।

●

তোমার জন্যই বাংলা দেশ [অনুভব কবিতা পুস্তিকা ৮]—তরুণ সান্যাল।। অনুভব প্রকাশনী, ১৯, পন্ডিতিয়া টেরেস, কলকাতা ২৯।। প্রাপ্তিস্থান: সিগনেট বুকশপ, কলকাতা ১২।। পঞ্চাশ পয়সা।।

তরুণ সান্যাল পঞ্চাশের উল্লেখযোগ্য শক্তিমান কবি। তাঁর কবিতার প্রারম্ভিক মুহূর্তে যে লিরিকপ্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, পরবর্তীকালে সেই ভূমি বহুলাংশে বদল হয়ে যায়। কিন্তু বহুদিন তাঁর কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়ায়—পাঠকের পক্ষে তাঁর এই জাগ্রত মানসিকতার স্বরূপ বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। এই পুস্তিকার কবিতাগুলিতে তার আভাস পাওয়া যাবে। পদ্মা-মেঘনা আশ্রিত বাংলাদেশের মানুষ এখন গ্রামীন সংস্কার ও শহুরে বৈদগ্ধের যৌথ টানাপোড়েনে বেড়ে চলেছে। তরুণ সান্যাল এই মিশ্র বাংলাদেশের সার্থক রূপচিত্র এই পুস্তিকার কবিতাগুলিতে তুলে ধরেছেন। পুস্তিকাটি সম্পাদনা করেছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক।

●

মাটি টাকা (গল্প-সংগ্রহ) — **কমলচন্দ্র সরকার। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড। কলকাতা-৩৭। দাম চার টাকা।**

সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীসরকার নবাগত নন। তাঁর বহু গল্প নানান পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'মাটি টাকা' গ্রন্থে পূর্ব-প্রকাশিত চৌদ্দটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে। অধিকাংশ গল্পেই লেখকের সংবেদনশীল মনের পরিচয় স্পষ্ট।

●

বহুরূপী গান্ধী : (জীবনী)—অনু বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম ছ' টাকা।

জাতির জনক হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর জীবন প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট আদর্শ-স্বরূপ। জীবন ও আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। সেজন্যেই দেখা যায়, একই সংগে তিনি জাতিগঠন ও সমাজ-সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষ তাঁরই জীবনসাধনার সার্থক ফলশ্রুতি। ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ বলে কাউকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখতেন না, বরং ছোটকে বড় করে দেখবার মানবীয় দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন শক্তিমান পুরুষ। এই গ্রন্থের লেখিকা শ্রীমতী অনু বন্দ্যোপাধ্যায় তেন্ডুলকরের 'মহাত্মা' গ্রন্থ থেকে কাহিনী-সঞ্চয় করে দেখিয়েছেন, কিভাবে সেই মানুষটি তাঁর উচ্চাসন থেকে নেমে এসে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সংগে অক্লেশে মিশে যেতেন। গ্রন্থটির ভাষা সহজ, সরল, ও ছোটদের উপযোগী। আমাদের বিশ্বাস, সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাই গল্পগুলি পড়ে উপকৃত হবেন।

পন্ডিত জহরলাল নেহরুর লেখা ভূমিকাটি মূল্যবান।

●

গোর্কি (নাটক) — বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ। ৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম ১·৫০।

বিখ্যাত রুশ-সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে এই নাটকটি। গোর্কি রচিত 'ইন দি ওয়ার্ল্ড' অবলম্বনে রচিত এই নাটকে জার-শাসিত রাশিয়ার একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বাস্তব ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন নাট্যকার। গ্রন্থ-শেষে আছে সংক্ষিপ্ত অথচ সুলিখিত গোর্কি-পরিচিত 'একটি অনির্বাণ শিখা'। অভিনয়োপযোগী এই নাটকটি সমাদৃত হবে।

●

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কবিতা সাপ্তাহিকী [তৃতীয় বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা]—প্রধান সম্পাদক : মৃণাল দেব।। ২১-এফ, বীরপাড়া লেন, কলকাতা ৩০।। প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা।।

দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর কবিতা-সাপ্তাহিকীর পর পর দুটো সংকলন পুনরায় প্রকাশিত হলো। এই দুটো সংকলনে কবিতা লিখেছেন—মণীন্দ্র রায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শংকর চট্টোপাধ্যায়, নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, স্বপন সেনগুপ্ত, শিবশম্ভু পাল, মৃণাল দেব এবং আরো অনেকে।

●

আধুনিক সাহিত্য (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) সম্পাদক : রণজিৎ দেব ও অরুণেশ ঘোষ। ত্রিবৃত্ত সরণি। কুচবিহার। দাম এক টাকা।

এই সংখ্যায় লিখেছেন অমিয়ভূষণ মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, বাসুদেব দেব, মৃণাল বসুচৌধুরী, আশিস সেনগুপ্ত এবং আরো কয়েকজন।

নক্ষত্র—(গ্রীষ্ম সংখ্যা)—অনিলকুমার দলুই, শংকর মিত্র, সমর মুখোপাধ্যায় এবং অনিল লাহা। ৩৫ দেশপ্রাণ শাসমল রোড। হাওড়া-১। দাম ৫০ পয়সা।

শংকর মিত্র, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, অজিতকুমার হাইত, অনিলকুমার দলুই, অনিল লাহা, মুকুল সরকার, সমর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন বর্তমান সংখ্যায়।

●

গ্লোবের লোকবন্ধু ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা— ১৩৭৫। প্রকাশক—দি গ্লোব নার্সারী। ২৫ রামধন মিত্র লেন। **কলকাতা-৪**

কয়েক বৎসর এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। ১৩৭৫ সালের দিন-পঞ্জিকা, ইংরেজি-বাংলা অভিধান, স্মরণীয় ব্যক্তিদের জীবন, বিখ্যাত আবিষ্কার, গ্রন্থ ও গ্রন্থকার, ভারতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় তারিখ, সেরা ও শ্রেষ্ঠ সাময়িক গোষ্ঠি, কুটিরশিল্প, সমবায় আন্দোলন, খেলাধুলা, পৃথিবীর পরিচয়, ভারত, আবহাওয়া উত্তাপ, খাদ্য, কৃষি, চাষ, প্রভৃতি সম্পর্কে অসংখ্য তথ্য আছে।

●

ইন্ডিয়ান লিটারেচার (অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৬৭))—সম্পাদক : লোকনাথ ভট্টাচার্য। সাহিত্য আকাদমি। রবীন্দ্র-ভবন। নতুন দিল্লী।

ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা সমৃদ্ধ হয়ে ইংরেজি ভাষায় এই পত্রিকাটি তিনমাস অন্তর প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান সংখ্যায় আছে ১৯৬৬ খৃঃ ভারতীয় সাহিত্যের ওপর পনেরটি আলোচনা। অসমীয়া, ইংরেজী, গুজরাটী, হিন্দী, কানাড়ী, কাশ্মিরী, মৈথিলী, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, সিন্ধী, তামিল, তেলেগু, উর্দু সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন মহেশ্বর নিওগ, প্রেম নন্দকুমার, চুনিলাল মাদিয়া, প্রভাকর মাচাউ, এস্ এস মালওয়াড়, জে এল কল, রমানাথ ঝা, ধ্যানেশ্বর নাদকার্ণী, কুঞ্জবিহারী দাশ, যশবীর সিং আহুওয়ালিয়া, ভি রাঘবন, এইচ আই সাদারঙ্গানী, পি জি সুন্দরারজন, অমরেন্দ্র এবং আলি আহমদ সুরুর।

●

স্বাস্থ্য-দীপিকা : (জানুয়ারী '৬৮)—সম্পাদক : নিতাইপদ মুখোপাধ্যায়। ২ ফরডাইস লেন। কলকাতা—১৪। দাম ষাট পয়সা।

জনস্বাস্থ্যমূলক মাসিক পত্রিকা স্বাস্থ্য দীপিকার বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন বিবেকানন্দ, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাদেবী, সুনীলকুমার দাশগুপ্ত, অজিত ভৌমিক, ফাল্গুনী ভট্টাচার্য, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ই এমেরো, সুনীতিকুমার দত্ত, দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এস কে সুকুল, ইন্দিরা রায়, অরুণা সেনগুপ্ত, এন কে বসু, লক্ষ্মী মজুমদার, সরিৎনাথ মল্লিক শিক্ষামূলক, তথ্যপূর্ণ, সময়োপযোগী আলোচনা করেছেন বর্তমান সংখ্যায়।

থেরেসার বিয়ে হয়েছিল এক দুর্বল হৃতবীর্য যুবকের সঙ্গে। বিবাহ এবং বিবাহিত জীবন কাকে বলে তা থেরেসার অজানা ছিল। তারপর একদিন আবির্ভাব ঘটল স্বামীর বাল্যবন্ধু লরেঁ-র। স্বামী তাকে সঙ্গে করে এনেছিলেন, শক্তিমান, বিরাট পুরুষ।

থেরেসার জীবনের অবৈধ প্রেমলীলার সেই সূত্রপাত। এই যুগল প্রেমিক জীবনের অতলে ঝাঁপ দিল। এইবার জোলার নিজের ভাষায় কাহিনী-অংশ বিবৃত করা গেল......

সেই যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ক্যামিলসের সঙ্গে লরেঁ এসেছিলেন, তারপর প্রায় প্রতিদিনই তিনি র‍্যাকুইদের এই পরিবারে আসতে লাগলেন। লরেঁ থাকতেন মদ্যবন্দরের ধারে রু সাঁ ভিক্তরে, ছোট্ট কামরা, ভাড়া প্রতি মাসে আঠারো ফ্রাঁ। একেবারে ছাতের ওপর ছোট্ট কামরা, ঘরে আলো আসত খুপরির ওপরকার ঘুলঘুলি দিয়ে। ঘরটা বড়জোর আঠারো ফিট লম্বায়-চওড়ায়। লরেঁ এই শোবের খোঁয়াড়ে যতটা পারতেন দেরী করে ফিরতেন। ক্যামিলসের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে কাফেতে খাওয়ার উপযুক্ত অর্থ না থাকায় রাতে একটা ক্ষুদে

থেরেসা

এমিলি জোলা

[এমিলি জোলার পিতৃদেব ছিলেন আধা ইতালীয় আধা গ্রীক। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এমিলি জোলার জন্ম, অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগের পর নিদারুণ ক্লেশ ভোগের শেষে একটি প্রকাশালয়ের কেরানীর কাজ পান সপ্তাহে এক পাউন্ড মাইনে। এর তিন বছর আগে একটি গল্প দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হয় যা পড়ে এডমন্ড গস প্রশংসা করেন। পরবর্তী জীবনে জোলা তাঁর যৌবনের জীবন সংগ্রাম তিক্ততার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। জোলার 'অ্যাসিমন্যাল', 'নানা', লা' আর্জে', লা বেতে হিউমাম, লা ডিবাক্লেল, প্রভৃতি উপন্যাস পৃথিবীখ্যাত। ড্রেফুস নামক হতভাগ্যের সমর্থনে 'জ অ্যাকুস' নামক তাঁর পত্র সারা পৃথিবীতে চমক জাগায়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জোলার মৃত্যুতে কবরের ওপর দাঁড়িয়ে আনাতোল ফ্রাঁস এক আবেগপূর্ণ বক্তৃতাদান করেন। বর্তমান আখ্যানটি জোলার 'THERSE RAQUIN' নামক উপন্যাসের অংশবিশেষ]

অভিযুক্ত কাহিনী

রেস্তোরাঁয় নৈশভোজন সেরে নিতেন, আর কফির পাত্রটি সামনে রেখে কেবল পাইপ টেনে যেতেন। এই কফির দাম প্রায় তিন পয়সা। তারপর ধীরে ধীরে ফিরতেন রু সাঁ ভিক্তরে—অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে, বাতাস উষ্ণ থাকলে কখনো বেঞ্চে বসে জিরিয়ে নিতেন।

প্যাসেজ দ্যু প্যঁ নেউফ—তাঁর কাছে একটা চমৎকার আশ্রয়—উষ্ণ, শান্ত। এছাড়া ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সহৃদয়তা। যে তিন পয়সায় কফি পান করা যেত, সেই পয়সাটা বাঁচিয়ে মাদাম র‍্যাকুই-এর চমৎকার চা পান করা অনেক ভালো। লরাঁ রাত দশটা পর্যন্ত বসে বেশ স্বচ্ছন্দে ঝিমোতেন। ক্যামিলসের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করার কাজে সাহায্য করে তবে বাড়ি ফিরতেন। একদিন লরাঁ ইজেল, রঙের বাক্স প্রভৃতি নিয়ে এসে হাজির হল। একটা ক্যানভাস নিয়ে এসে রীতিমত তোড়জোড় শুরু হল। পরদিন থেকে শুরু হবে ক্যামিলসের পোর্ট্রেট আঁকা। শেষপর্যন্ত ওদের শয়নকক্ষে বসে শিল্পী ছবি আঁকবেন স্থির করলেন। বললেন—এই ঘরেই আলোটা ভালো পাওয়া যাবে।

মাথাটা স্কেচ করতে তিনটি সন্ধ্যা লাগল। ক্যানভাসে অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে তিনি চারকোল ব্যবহার করতে লাগলেন, অতি সূক্ষ্ম রেখায় মুখের বহিঃরেখা অঙ্কিত হল। লরাঁর ড্রয়িং বেশ কঠিন ভঙ্গীর, আদিম কালের মহৎ শিল্পীদের পদ্ধতি স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনভাবে তিনি ক্যামিলসের মুখখানি স্টাডি করতে লাগলেন যে, মনে হল যেন বিচলিত-ভঙ্গীতে নিম্নকার দেহবিভঙ্গ আঁকা হচ্ছে। একেবারে নিখুঁত প্রতিকৃতি করতে গিয়ে মুখটায় অতিরিক্ত গাম্ভীর্য ফুটে উঠল। চতুর্থ দিনে রঙের পাত্রে ছোট ছোট রঙের কণিকা রেখে ব্রাসের মাথাটা দিয়ে পেনটিং শুরু হল। ক্যানভাসের ওপর ছোট ছোট ছোপ রাখা হল—কোনো কোনো জায়গায় ছোট্ট এবং ঘন ছাপ রাখলেন, যেন পেনসিল ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রতিটি সিটিং-এর পরে মাদাম র‍্যাকুই এবং ক্যামিলস আত্মহারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন। লরাঁ বলতেন একটু অপেক্ষা করে থাকো, ঠিক ঠিক প্রতিলিপি পরে ফুটবে।

পোর্ট্রেট শুরু হওয়ার পর থেরেসা সর্বদাই শয়নকক্ষে থাকত। এই ঘরটাই স্টুডিয়োতে পরিণত হয়েছিল। মাসীকে একা কাউণ্টারের ধারে দাঁড় করিয়ে সামান্যতম ছল করে সে ওপরে উঠে আসত আর লরাঁর ছবি আঁকা দেখত আত্মহারা হয়ে।

থেরেসা সদাই গম্ভীর, নিপীড়িত, রক্তহীন এবং আগের চেয়েও যেন অনেক শান্ত। সে নীরবে বসে লরাঁর তুলির কাজ লক্ষ্য করে। এই দৃশ্য যে তার কোনোরকম চিত্তবিনোদন করে তা নয়। সে যেন এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে এইখানে চলে আসে, তারপর স্থাণুর মত বসে থাকে। মাঝে মাঝে লরাঁ পিছনে তাকিয়ে দেখেন। জানতে চান পোর্ট্রেট কেমন লাগছে। কদাচিৎ উত্তর দিতে পারে থেরেসা। তার গায়ে কাঁপন লাগে, তারপর এইভাবে সমাধিস্থ হয়ে থাকে।

প্রতি রাত্রে রু সাঁ ভিক্তরের দিকে যাওয়ার পথে লরাঁ দীর্ঘ স্বগতোক্তি করে। মনে মনে তর্ক করে থেরেসার প্রেমিক সে হবে কি হবে না!

লরাঁ মনকে বোঝায় — "আমার যখনই মর্জি হবে তখনই এই ক্ষীণতনু নারী আমার রক্ষিতায় পরিণত হবে। সর্বদাই ও আমার পিছনে থাকে, আমার দিকে নজর রাখে, হিসাব-নিকাশ করে।...কেঁপে কেঁপে ওঠে। ওর চোখে কেমন এক আশ্চর্য দৃষ্টি, বাণীহীন অথচ আবেগময়। মেয়েটির একটি প্রেমিকের প্রয়োজন—চোখ দেখলেই স্পষ্ট

বোঝা যায়...ক্যামিলসটা ওর কাছে কিছুই নয়।"

লরাঁ নিঃশব্দে হাসে...মেয়েটির রক্তহীন, শীর্ণ মুখখানি মনে পড়ে। তারপর লরাঁ বিড়বিড় করে...

"মেয়েটি দোকানে পচে মরছে...আমি ওখানে যাই কারণ, আর কোথাও যাওয়ার নেই। না হলে, প্যাসেজ দ্যুপ্য নেউফে আসতে পারব না...ঘরটা ঠাণ্ডা—স্যাঁতসেতে —ওখানে যে-কোনো স্ত্রীলোক মরে যাবে—মেয়েটাকে আমার ভালো লাগে। আমি এ-বিষয়ে নিশ্চিত, তাহলে অন্য কোনো ব্যক্তি আসার আগে, আমিই কেন এগিয়ে যাই না।" একটু থেমে নিজের শক্তিমত্তার মধুর চিন্তায় মত্ত হয় লরাঁ, একটু দাঁড়িয়ে প্রবহমান সীন নদীতে এলোমেলো হাওয়া লক্ষ্য করে।

সে বলে ওঠে, বাঃ আমি কেন এগিয়ে যাবো না। একদিন সুযোগ বুঝে বেশ করে জড়িয়ে ধরে চুমা খাবো...বাজী রেখে বলতে পারি মেয়েটা সোজা আমার বুকে এসে ধরা দেবে।

আবার সে পথ চলা শুরু করে। এখনও তার মনে দ্বিধার ভাব। "যাই হোক, মেয়েটা সত্যি কুশ্রী। নাকটা লম্বা, হাঁ গালটা বড়ো। তাছাড়া মেয়েটির প্রতি আমার এতটুকু প্রেম জাগেনি। হয়তো কোনোরকমে বিপদে পড়ে যাবো। ভালো করে বিবেচনা করা যাক।"

লরাঁ অতিশয় চতুর মানুষ, তাই সে একটি সপ্তাহ ধরে এইসব কথা চিন্তা করে কাটালো। থেরেসার সঙ্গে প্রেমলীলার সকল রকম সম্ভাব্য বিপদের কথা সে চিন্তা করে, সে স্থির করল, তখনই বিপদের ঝুঁকি নেওয়া যাবে যখন স্পষ্ট বোঝা যাবে এই ব্যাপারে তার দিক থেকে সত্যিকার কোনো সুবিধা হবে।

ওর দিক থেকে কথাটা ঠিক। থেরেসা দেখতে কুশ্রী, তাছাড়া লরাঁ ওকে মোটেই ভালোবাসে না, তেমনই আবার একটি পয়সাও খরচ হবে না। সামান্য পয়সা খরচ করে যেসব মেয়ে কপালে জুটেছে, তারাই বা কি সুন্দরী—তাদের কেউই ত' ওর প্রিয়তমা নয়। পয়সার দিক থেকেই বিচার করে লরাঁ স্থির করল বন্ধুর স্ত্রীটিকেই গ্রহণ করা যাক। তাছাড়া অনেককাল ধরে ও যৌন-বুভুক্ষু হয়ে আছে। পয়সাকড়ির অভাব, তাই এতদিন উপোস করে আছে। এখন যখন সুযোগ এসেছে, তখন ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থ করাই শ্রেয়। পরিশেষে, সে বেশ করে ভেবে দেখল যে, এইরকম একটা ঘটনায় বিশেষ কোনো কুফলের সম্ভাবনা নেই। থেরেসা নিজের প্রয়োজনেই ব্যাপারটি গোপন রাখবে, আর সময় বুঝে যখন খুশি তাকে ঠেলে ফেলা যাবে। ধরা যাক, যদি ক্যামিলস ব্যাপারটি জানতে পেরে রাগারাগি করে, তাহলে বেশী বাড়াবাড়ি করলে একটি ঘুঁষিতেই ওকে কাত করতে পারবে। সর্বদিক বিবেচনা করে লরাঁ দেখল প্রস্তাবটি বিশেষ সহজসাধ্য।

সেই সময় থেকে লরাঁ একটা স্বচ্ছন্দ আরামে উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষায় ও'র পেতে দিন কাটায়। প্রথম সুযোগেই সে বেশ সাহসভরে কাজ করবে। ভবিষ্যতের মনোরম সন্ধ্যার কথা সে স্মরণ করে। র‍্যাকুই পরিবারের সকলেই ওর আনন্দের খিদমৎদে ব্যস্ত হয়ে থাকবে। থেরেসা ওর রক্তের কামজ্বর প্রশমিত করবে—আর মাদাম র‍্যাকুই জননীর মত আদর দিয়ে ওর মাথা খাবেন, ক্যামিলসের সঙ্গে আলাপচার করে দোকানের সন্ধ্যাটা তেমন ক্লান্তিকর মনে হবে না।

পোর্টরেট আঁকা প্রায় শেষ হয়ে এল —তবু তেমন সুযোগ এলো না। থেরেসা সর্বদাই উপস্থিত, নিপীড়িত এবং অসচ্ছন্দ; কিন্তু ক্যামিলসটা এক মিনিটের জন্য ঘর ছেড়ে যায় না। আর একটা ঘণ্টার জনাও তাকে বাইরে রাখতে পারে না বলে লরাঁ হতাশ হয়ে পড়ে। পরিশেষে, একদিন বলতে হল, আগামীকাল ছবিটা শেষ হবে। মাদাম র‍্যাকুই বললেন, ও'রা একত্রে নৈশ-ভোজন করে শিল্পীর ছবির প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করবেন।

পরদিন লরাঁ যখন ছবিতে শেষ স্পর্শ দিয়ে ক্যানভাসটিতে শেষ রঙ লাগাল, তখন সমগ্র পরিবারের লোক ক্যামিলসের ছবিতে ঠিক ঠিক মুখের আদল এসেছে বলে আনন্দ করতে লাগল। ছবিখানি নোঙরা, ধূসর রঙের ওপর লালচে ছোপ। লরাঁ খুব উজ্জ্বল রঙকেও ম্যাড়মেড়ে এবং জ্যাবড়া না করে ব্যবহার করতে পারেনি। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মডেলের গায়ের রঙটাকে ও অতিরঞ্জিত করেছে। ক্যামিলসের মুখখানা যেন এক জলে-ডোবা মানুষের মত সবুজ সবুজ দেখাচ্ছে। স্থূলে ড্রয়িং-এর ফলে মুখাকৃতি বিকৃত হয়েছে। ফলে, ক্যামিলসের মুখের নিষ্ঠুর ভঙ্গী আরো স্পষ্ট হয়েছে; ক্যামিলস কিন্তু ভারী খুশি। সে বলতে লাগল যে, ছবিতে তাকে বেশ মর্যাদামণ্ডিত মনে হচ্ছে।

নিজের মুখাকৃতির যথেষ্ট প্রশংসা করে, সে ঘোষণা করল যে, দু' বোতল স্যাম্পেন আনার জন্য ও বাইরে যাচ্ছে। মাদাম র‍্যাকুই দোকানে নেমে গেলেন। ঘরে শিল্পী এবং থেরেসা একা।

তরুণী থেরেসা যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে শূন্যপানে তাকিয়ে আছে। সে যেন কাঁপছে। লরাঁ ইতস্তত করে। পোর্টরেটটির দিকে থেরেসা তাকায়, লরাঁর রঙের তুলিতে হাত বোলায়। বেশী সময় নেই, ক্যামিলসটা এখনই ফিরতে পারে—এ-সুযোগ আর নাও আসতে পারে। সহসা শিল্পী ঘুরে দাঁড়ায়, এখন ও থেরেসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—কয়েকটি মুহূর্তে দুজনে দুজনের মুখের পানে তাকিয়ে—

তারপর তীব্র বেগে লরাঁ ঝুঁকে পড়ে তরুণীকে ওর বুকের মধ্যে টেনে নেয়। ওর ঠোঁটটা নিজের ঠোঁট দিয়ে যখন চেপে ধরেছে, তখন থেরেসার মাথা ওর কাঁধে আশ্রয় নিল। একটি মুহূর্তে সে উদ্দাম উত্তাল হয়ে আপনাকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল, তারপর সে টালি-বসানো মেঝেতে পিছলে পড়ল। দুজনের মুখে কোনো কথা নেই—ঘটনাটি নিঃশব্দ এবং পাশবিক।

গোড়া থেকেই প্রেমিক-যুগল বুঝেছিলেন যে, ওদের এই যোগাযোগের প্রয়োজন আছে, নিয়তি এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। প্রথম যেবার ওদের মিলন ঘটল, দুজনেই বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গীতে কথা বলল দুজনের সঙ্গে, কোনোরকম আড়ষ্টতা না রেখে চুমো খেলো পরস্পরকে, কোনো লজ্জা নেই। দুজনের এই অন্তরঙ্গতা যেন অনাদিকালের। এই নতুন সম্বন্ধ নিয়ে ওরা বেশ স্বচ্ছন্দচিত্তে আছে, বেশ স্বস্তির ভাব, এতটুকু লাজলজ্জা নেই।

ওরা ঠিক করে নেয়, কিভাবে মেলামেশা করবে এর পর। থেরেসার যখন বাড়ির বাইরে যাওয়ার উপায় নেই, লরাঁই ওদের বাড়ি আসবে। পরিষ্কার, দ্বিধাহীন কণ্ঠে তরুণী জানাল, সে চিন্তা করে কি পরিকল্পনা স্থির করেছে। যে-ঘরটিতে ওরা স্বামী-স্ত্রী থাকে, সেইখানেই মিলন হবে, প্রেমিক আসবে বারান্দা দিয়ে গলিপথে, থেরেসা সিঁড়ির দিকের দরজা ওর জন্য খুলে রাখবে। সেই সময় ক্যামিলস থাকবে অফিসে আর মাদাম র‍্যাকুই নীচে দোকান-ঘরে। সমগ্র ব্যাপারটি এমনই দুঃসাহসিক যে সাফল্য অনিবার্য।

লরাঁ রাজী হয়ে গেল। ওর সবরকম চালাকী সত্ত্বেও ওর ছিল পাশবিক সাহস, প্রকাণ্ড পাঞ্জাওলা মানুষের নির্ভীকতা। প্রেমিকার শান্ত ভয়-কুণ্ঠাহীন ভঙ্গী ওর মনে সাহসিকতার সঙ্গে উৎসর্গীকৃত দেহ-সম্ভোগের আকুলতা জাগায়। একটা অছিলা করে অফিসের বড়কর্তাকে বলে দু' ঘণ্টার ছুটি নিয়ে ও প্যাসেজ দ্যু পা নেউফের পথে ছোটে।

এই গলিতে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তার অঙ্গে উষ্ণ উদগ্রতার ছোঁয়া লাগে। যে-স্ত্রীলোকটি নকল গহনা বিক্রী করে, সে একেবারে দোর গোড়ায় বসে, বারান্দার পথ জুড়ে। স্ত্রীলোকটি অন্যমনস্ক না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, একটা মেয়ে যতক্ষণ না আঙটি বা একজোড়া তামার দুল কিনতে আসে, ততক্ষণ। তারপর ও দ্রুতবেগে বারান্দায় ঢুকে পড়ে। অন্ধকার সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে, স্যাঁতসেঁতে দেয়ালের গায়ে গা লাগে। পাথরের ধাপে ওর পায়ের শব্দ হয়। প্রতিটি শব্দ ওর বুকে যেন ছুরিকাঘাতের মত এসে বাজে। একটি দরজা খুলে গেল। দেখল, দোর-গোড়ায় একটি ড্রেসিং জ্যাকেট এবং পেটি-কোট পরে থেরেসা দাঁড়িয়ে আছে। তার চারপাশে শাদা আলো ঝলকিত। মাথার পিছন দিকে চুলগুলি একটা শক্ত গাঁট দিয়ে বাঁধা। তার থেকে একটা গন্ধ ভেসে আসছে। সেই গন্ধ শাদা বিছানার চাদর আর সদ্যধৌত দেহচর্মের গন্ধ।

লরাঁ বিস্ময়ে হতবাক, এখন এই প্রেমিকাকে কেমন সুন্দরী দেখাচ্ছে। এ-রমণীকে ত' সে আগে আর দেখেনি। সুদৃঢ় এবং নমনীয়। থেরেসা লরাঁকে জড়িয়ে ধরে, ওর মাথাটি লরাঁর বুকে, ওর মুখের ওপর কেমন আলোর জ্বালা আর মুখে কামনাভরা হাসি। এ-মুখ ভালোবাসায়

ভরা রমণীর মুখ। এ এক আশ্চর্য রূপান্তর ঘটেছে—এর মধ্যে আছে উন্মাদমত্তা আর কোমলতা—ঠোঁটদুটি বেশ ভিজে ভিজে, চোখে বিদ্যুৎ, যেন জ্বলন্ত বহ্নি-শিখা। এই বেপথুমতী যুবতী তার আশ্চর্য সৌন্দর্য নিয়ে যেন পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। এ-সৌন্দর্য যেন উচ্ছলতায় পরিপূর্ণ। বলতে পারেন যে, মুখখানি অন্তর থেকেই এমন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ওর দেহ থেকে লেলিহান বহ্নি-শিখা নৃত্যচঞ্চল। ওর চারপাশে উষ্ণ আবেশ, এর উদ্ভব উত্তপ্ত রক্তের প্রভাব—ওর আকুলকরা স্নায়ুশিরা আর মর্মভেদী পরিবেশ।

প্রথম চুম্বনেই থেরেসা প্রমাণ করে দেয় যে, সে এক রঙ্গিণী নারী। তার অতৃপ্ত দেহ কামনার আনন্দ উপভোগের দুঃসাহসিক লীলায় উৎসর্গীকৃত। সে যেন সহসা স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠেছে। কামনার উত্তাল সাগরে তার আবির্ভাব। ক্যামিলসের দুর্বল বাহু বেষ্টনের গণ্ডী থেকে আপনাকে মুক্ত করে ও ধরা দিয়েছে লরাঁর পুরুষোচিত সবল বাহুডোরের পুরুষালি আশ্রয়ে। বলিষ্ঠ পুরুষের আলিঙ্গন কামনার বন্দী-শালার অন্ধকারে আচ্ছন্ন বন্দিনী থেরেসার মনে এনে দিয়েছে বিদ্যুতের চমক। ভাবা-বেগাকুল রমণীর সুগভীর অনুভূতি অবিশ্বাস্য তীব্রতার সঙ্গে ওর শরীরে প্রবহমান। ওর শরীরে ছিল ওর মার আফ্রিকার রক্ত. সেই উষ্ণ শোণিত সারা অঙ্গে প্রবাহিত—ওর সেই ক্ষীণ অথচ প্রায়-অক্ষত কৌমার্যের দেহখানি ভীষণ গতিতে আন্দোলিত হতে থাকে। আপনাকে উন্মুক্ত করে দেয়. উৎসর্গ করে দেয় থেরেসা লজ্জা-হীনার ভঙ্গীতে। তার সারা অঙ্গ, গা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্পমান।

এরকম রমণী লরাঁ কখনও দেখেনি। সে বিস্মিত এবং অস্বচ্ছন্দ বোধ করে। সাধারণত তার রক্ষিতারা কখনও তাকে এভাবে গ্রহণ করেনি। শীতল নিরুত্তাপ চুম্বন আর আটপৌরে ভালোবাসার খেলাতেই সে অভ্যস্ত। থেরেসার চাপা কান্না, আর তার থরথরায়মান অঙ্গ একটু শঙ্কিত করে তোলে লরাঁকে। আবার সেই সঙ্গে ওর কামনার কৌতূহলকেও জাগ্রত করে। যখন তরুণীর সঙ্গ ছেড়ে ও বেরিয়ে পড়ল তখন মাতালের মত তার পা টলছে।

পরদিন প্রাতে যখন ওর হিসাবী চতুর মনে শান্তভাব ফিরে এল, তখন ওর মনে প্রশ্ন জাগল, আবার কি সেই ভালোবাসার পাত্রীটির কাছে যাবে? ওর চুমো যেন টুকরো টুকরো করে দিয়েছে লরাঁকে। প্রথমটা ও দৃঢ় মনে স্থির করল, বাড়িতেই থাকবে। তারপর ধীরে ধীরে দুর্বলতা বাড়ে। থেরেসাকে ভোলার চেষ্টা করে লরাঁ। আর তার নগ্ন দেহ দেখবে না—তার মধুর অথচ তীক্ষ্ন আদর উপভোগ করবে না।— তবু থেরেসা পরমামূর্তিতে সামনে দাঁড়িয়ে. তার দুটি হাত উদার আলিঙ্গনে প্রসারিত। থেরেসার এই স্বপ্নবিলাস ওর দেহে যে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে তা ক্রমশ অসহনীয় হয়ে ওঠে।

হার মানল লরাঁ। আর একবার যাওয়া যাক। প্যাসেজ দ্যু প' নিউফে ফিরে গেল লরাঁ।

সেইদিন থেকে থেরেসা ওর জীবনের একটা অঙ্গ। এখনও তাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করেনি লরাঁ। কিন্তু লরাঁকে ঘিরে রয়েছে থেরেসা, তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অনেক আতংকিত মুহূর্তে, অনেক চতুরতার ক্ষণ, সব জড়িয়ে এই যোগাযোগ ওর মনে একটা অস্বচ্ছন্দ ভাব এনে দিল। কিন্তু ভয়, অস্বস্তি, সবকিছুকেই কামনার কাছে হার মানতে হয়। ওদের মেলামেশা অব্যাহত রইল, বরং আরো ঘন ঘন দুজনের মিলন হতে লাগল।

থেরেসার মনে কিন্তু এত-শত সংশয় নেই। সে একরকম অসীম দুঃসাহসিকতায় আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছে, কামনার তাড়নায় যেখানে যাওয়া যায় সেখানে সে পৌঁছেচে। এই স্ত্রীলোকটি ঘটনাচক্রে এতকাল নিপীড়িত, নিগৃহীত ছিল। বাসনা-কামনা তার রুদ্ধ ছিল। এতদিনে সে আবার আপনাকে খুঁজে পেয়েছে—তার কামনা-বাসনা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আপন সত্তার পরিপূর্তির পথে সে এগিয়ে চলেছে।

কখনো সে লরাঁর গলায় নিজের হাত-দুটি জড়িয়ে তার বুকের ওপর শুয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলত, "যদি জানতে—কত যে জ্বালা সয়েছি! রোগীর ঘরে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় আমাকে পালন করা হয়েছে। আমাকে ক্যামিলসের শয্যায় শুতে হয়েছে। ওর কাছ থেকে যতটুকু পাওয়া সম্ভব রাতের অন্ধকারে তা পেয়েছি, ওর দেহের রুগ্ন দুর্গন্ধ আমার বমির উদ্রেক করেছে। লোকটি হিংসুটে আর একগুঁয়ে। ও কিছুতেই ওষুধ খাবে না, আমাকেও ভাগ নিতে হবে। আমার মামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সবরকমের প্রেসক্রিপসন আমাকে রাখতে হয়েছে। কেন যে মরিনি জানি না—ওরা আমাকে কুৎসিত করেছে—আমার যা ছিল সবকিছু চুরি করে নিয়েছে। আর আমি তোমাকে যেমন ভালোবাসি, সে-ভালোবাসা তুমি আমাকে দিতে পারবে না।"

কাঁদতে কাঁদতে থেরেসা লরাঁকে চুমো খায়. তারপর গভীর উত্তাপভরে বলে, "ওদের আমি অকল্যাণ কামনা করি না। ওরা আমাকে মানুষ করেছে। আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, অভাব থেকে বাঁচিয়েছে। তবে ওদের আতিথ্য লাভের চেয়ে আমাকে বরং পথে ফেলে রাখাই ছিল ভালো। আমার প্রয়োজন ছিল আলো-বাতাসের। যখন ছোট ছিলাম, তখন স্বপ্ন দেখছি খালি পায়ে ধুলোবালির মধ্যে ভিক্ষা চাইছি, বেদেনী-দের মতো থাকতে চেয়েছিলাম। শুনেছি আমার মা নাকি কোনো আফ্রিকান সর্দারের মেয়ে ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর কথা ভেবেছি। আমার রক্ত, আমার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে অনুভব করেছি যে, আমি তাঁর। ভাবতাম তাঁকে যদি কখনো ছাড়তে না হত, মনে হত—ও'র পিঠে চড়ে মরু-বালুকা অতিক্রম করছি—সে কি মজার ছোটবেলাই না হত। আমার এখনও বিরক্তি লাগে, ক্যামিলস পড়ে পড়ে কাঁদছে আর সেই ঘরে আমাকে দীর্ঘদিন কাটাতে হয়েছে। আগুনের সামনে চুপ করে বসে চায়ের জল ফুটতে দেখেছি, মনে হয়েছে আমার হাত-পা শক্ত হয়ে যাবে। আমার নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, একটু চঞ্চল হলেই মামী ধমক দিয়ে উঠবেন। পরে নদীর ধারের ছোট্ট বাড়িতে আমি ভারী আনন্দে ছিলাম কিন্তু তখন প্রহারে জর্জরিত হয়ে আমি হাঁটতে পর্যন্ত পারতাম না। দৌড়োতে গেলে পড়ে যেতাম। তারপর ওরা আমাকে এই নোঙরা দোকানঘরে জীবন্ত কবর দিয়েছে।"

থেরেসার নিঃশ্বাস পড়ছিল জোরে জোরে। লরাঁকে সে সুদৃঢ় বাহুর বাঁধনে জড়িয়ে ধরে. সে এখন প্রতিশোধ নিচ্ছে। তার সূক্ষ্ম পাতলা নাসিকাগ্র যেন জ্বলছে! সে বলতে থাকে—

বিশ্বাস করতে পারবে না, কত দুষ্টু ওরা আমাকে করেছে। ওরা আমাকে ভণ্ড মিথ্যাবাদীতে পরিণত করেছে। ওদের মধ্যবিত্ত মধুরতার আরকে ডুবিয়ে আমাকে কঠিন করেছে। আমি ত' ভেবে পাই না—এখনও কি করে এতখানি রক্ত আমার দেহে আছে। আমি আমার চোখ নামিয়ে রাখি। ওদের মত বোকা-বোকা মুখ করে থাকি। তুমি যখন আমাকে দেখেছ, নিশ্চয়ই আমাকে নির্বোধের মত দেখাচ্ছিল, তাই না? আমি নিপীড়িত, দলিত, মথিত। আমার এতটুকু আশা-ভরসা ছিল না, একদিন সীন নদীর বুকে গিয়ে আত্মবিসর্জন করবো মনে করেছিলাম. কিন্তু তা করার আগে কত রাত্রি যন্ত্রণা ভোগ করেছি। ভেরননে আমার শীতল ঘরে ফিরে এসে আমার বালিশটা কেঁদে ভাসিয়েছি। নিজেকে আঘাত করেছি। আমি একটা ভীরু প্রাণী। আমার দেহের রক্ত আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। দুবার পালানোর চেষ্টা করেছি, দুবারই আমার সাহসে কুলায়নি। ওরা আমাকে পোষমানা জন্তুতে পরিণত করেছে বমিওঠা ভালো-বাসার পীড়নে। তারপর আমি মিথ্যা বলতে শুরু করলাম। অনর্গল মিথ্যা। আমি ওখানে নীরবে নিঃশব্দে রইলাম—স্বপ্ন দেখি, ভেঙে, গুঁড়িয়ে চূর্ণ হয়ে যাই।

লরাঁর গলায় ভিজে জিভ ঘসে চুমো খেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেয়েটি আবার বলে—

কেন যে ক্যামিলসকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম জানি না। একটা ঘৃণাসূচক ঔদাসীন্যের ফলে আমি প্রতিবাদ করিনি। এমন আশ্চর্য . বেচারী যে আমার করুণা হয়েছিল। যখন ওর সঙ্গে খেলা করতাম তখন মনে হত আমার আঙুলগুলি ওর দেহে বসে যাবে, যেন কাদায় গড়া শরীর। আমি ওকে গ্রহণ করেছিলাম মামীমা ওকে আমার কাছে দিয়েছিলেন বলে, তাছাড়া ওকে নিয়ে আমার কোনো অসুবিধা হবে ভাবিনি। আর আমার স্বামী একটি রুগ্ন বালকের মত। ওর সঙ্গে আমি অনেক

আগেই শুয়েছি, তখন আমার বয়স হয়ত ছ'বছর। তখনও ও এমনই শীর্ণ, ঘ্যানঘ্যানে ছিল। এমনই একটা পচা পচা বিশ্রী রুগ্ন গন্ধ ছিল ওর শরীরে। আমার ধর্মে আসক্তি—তোমাকে এসব বলছি, কারণ, তোমার আবার ঈর্ষা না জাগে মনে। আমার গলায় কেমন বিরক্তির পুঁটলি জমে উঠতে থাকে। যে সব ওষুধ আমি পান করেছি তার কথা ভাবি—আর কি ভীষণ ও ভয়ংকর রাতই না কেটেছে...কিন্তু তুমি... তুমি—"

থেরেসা উঠে বসে, একটু ঝুঁকে পড়ে, ওর আঙুলগুলি লরাঁর বিরাট থাবায় জড়ানো। সে ওর চওড়া কাঁধের দিকে, প্রশস্ত গলার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে—

তুমি! তোমাকে আমি ভালোবাসি। যেদিন প্রথম ক্যামিলাস তোমাকে দোকানে এনেছিল সেদিন থেকে। তোমার হয়ত আমার ওপর ঘৃণা হচ্ছে, আমি এত সহজে আত্মদান করেছি এত অল্প সময়ের মধ্যে—সত্যি, আমি নিজেই জানি না কি করে কি হয়েছে! আমি দাম্ভিক—আমার মেজাজ বেয়াড়া। যেদিন তুমি আমাকে প্রথম চুমো খেলে তোমাকে চড় মারার ইচ্ছা ছিল আমার। এই ঘরে আমি লুটিয়ে পড়লাম—জানি না কেন তোমাকে ভালবেসেছি। তোমার প্রতি আমার নিদারুণ ঘৃণা। তোমাকে দেখলেই আমি বিরক্ত হয়েছি, কষ্ট পেয়েছি। তুমি যখন এখানে থাকতে আমার স্নায়ু-শিরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।... কিন্তু আমার দুর্বলতার কাছে হার মেনেছি—আমি ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে কেঁপেছি। তোমার বাহুতে আমাকে টেনে নেওয়ার আশায় আমি অপেক্ষা করেছি—

তারপর থেরেসা চুপ করল। তার সারা অংগ কাঁপছে। সে যেন দারুণ প্রতিশোধ নিয়ে দম্ভ ভরে উদ্ধত হ'য়ে উঠল, লরাঁকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিল থেরেসা মাতালের ভংগীতে, তারপর সেই হিমশীতল ঘরটিতে উদগ্র কামনার লেলিহান শিখা প্রজ্বলিত হল। মদনযজ্ঞের সেই অনুষ্ঠানের তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতার তুলনা মেলা কঠিন।

প্রতিটি নতুন মিলনের মন, বাধাবন্ধহীন আনন্দের ধারা প্রবাহিত করে। তরুণী থেরেসা যেন লজ্জাহীনতা এবং দুঃসাহসের আনন্দে বিকশিত হয়ে ওঠে। তার এতটুকু শংকা নেই, দ্বিধা নেই, কুণ্ঠা নেই। সে অতিশয় সারল্যের সংগে ব্যভিচারে লিপ্ত হল। যে শংকার আশংকা ছিল সেই দুর্ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াবার দুঃসাহস যেন তার মনে অহংকার এনে দিয়েছিল। যখন প্রেমিক এসে পৌঁছাত তখন মামীকে শুধু বলত আমি এখন ওপরে গিয়ে একটু জিরিয়ে নিই। গোড়ায় গোড়ায় লরাঁ ভয় পেত। যখন লরাঁ আসত, তখন থেরেসা বেশ সহজ ভংগীতে কথা বলত, চলা-ফেরা করত, কোনো রকম শব্দ বা আওয়াজ গোপন করার চেষ্টা করত না। ভয় পেয়ে লরাঁ চুপি চুপি বলে উঠত—

—মাদাম শেষকালে এসে পড়তে পারে। এত হৈ চৈ করছ কেন? থেরেসা হেসে বলত—ননসেন্স্। তুমি দেখছি ভয়েই গেলে। কাউন্টারের সংগে মামী বাঁধা। সে এখানে আসবে কেন? চুরী যাওয়ার ভয় ওর খুব। আর যদি আসে, তুমি লুকিয়ে পড়ো, আমার ভয় ডর নেই। আমি তোমাকে ভালোবাসি, মামীর ভয় করি না।

এই সব বক্তৃতায় আশ্বস্ত হতনা লরাঁ। দিন-দুপুরে এই জাতীয় প্রেমলীলা তাও আবার ক্যামিলাসের ঘরে—মাদাম র‍্যাকুই-এর নাকের ওপর। বার বার থেরেসা বলত, যারা ভয়ের মুখোমুখি হয়ে মোকাবিলা করতে চায়, ভয় তাদের পরিহার করে। থেরেসার কথাই ঠিক। এমন একখানি ঘর আর কোথাও পাওয়া যেত না। দুজনের প্রেমলীলা অবিশ্বাস্য রকমের উচ্ছৃংখলতায় অব্যাহত রইল।

একদিন কিন্তু মাদাম র‍্যাকুই ওপরে উঠে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন থেরেসার বুঝি শরীর খারাপ হল। প্রায় তিনঘণ্টা আগে ওপরে উঠেছে, নামবার নাম নেই। সেদিন আবার দুঃসাহস করে থেরেসা দরজায় খিল পর্যন্ত আঁটেনি। এ ঘর দিয়ে ডাইনিং রুমে যাওয়া যায়।

কাঠের সিঁড়িতে বুড়ির পায়ের আওয়াজ পেয়ে লরাঁ ত' ভয়ে কাঠ। তাড়াতাড়ি নিজের জামা কাপড় খুঁজে বার করার উদ্যোগ করে। ওর মুখে এই ভয়ের চিহ্ন দেখে থেরেসা হেসেই আকুল। সে ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে বিছানার এক পাশে শুইয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বলে—ঐখানে থাকো, একটুও নড়বে না।

তারপর ওর দেহের ওপর পুরুষের পোষাকগুলি যা ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল তা চাপিয়ে তার ওপর ওর নিজের শাদা পেটিকোটটা ঢেকে দিল। অতি তাড়াতাড়ি এইসব বেশ শান্তভাবে করে ও শুয়ে পড়ল, চুলটুল বিপর্যস্ত, অংগে বস্ত্র নেই, আধা নগ্ন দেহ—মুখটা ফুলো ফুলো, শরীর কাঁপছে।

মাদাম দরজা খুলে বিছানা পর্যন্ত এলেন। যথাসম্ভব ধীর পায়ে। তরুণী থেরেসা ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। আর শাদা পেটিকোটের তলায় লরাঁ ঘামতে থাকে।

মাদাম র‍্যাকুই শংকিত গলায় বললেন: থেরেসা, মা তোমার কি শরীরটা ভালো নেই?

থেরেসা একটু চোখ খুলে, হাই তুলে জবাব দিল, ভীষণ মাথা ধরেছে। মামীমাকে অনুরোধ করল, একটু ঘুমাতে দাও। ঠিক যেভাবে এসেছিল বুড়ি সেইভাবেই চলে গেল।

নীরবে হেসে যুগল প্রেমিক উদগ্র উন্মাদনায় চুম্বনে আকুল হয়ে উঠল।

আর একদিন তরুণী থেরেসা ঘরের ভেতর হুলো বিড়াল ফ্রাঁসোয়াকে দেখিয়ে লরাঁকে বলে—

দেখ, ফ্রাঁসোয়া কিন্তু সব বোঝে! কেমন দেখছে দেখো। ও আজ রাতে ক্যামিলাসকে সব বলে দেবে। যদি কোনোদিন দোকানেই কথা বলতে শুরু করে কি মজাই না হবে! ও আমাদের অনেক কান্ড স্বচক্ষে দেখেছে।

ফ্রাঁসোয়া কথা বলতে পারে এই ভাবনায় থেরেসা হেসে আকুল। আর লরাঁ বিড়ালের নীলচোখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়, তার সারা শরীর শিউরে ওঠে।

থেরেসা বলল, ঠিক ও তাই করবে। একটা ঠ্যাঙ তোমার দিকে আর একটা আমার দিকে তুলে বলবে—ভদ্রমহোদয়গণ এই দুজন নরনারী প্রতিদিন ক্যামিলাসের শয়নকক্ষে পরস্পরকে গভীরভাবে চুম্বন করে। আমার দিকে তাকায় না ভয় করে না। ওদের এই নারকীয় প্রেমলীলায় আমি বিরক্ত। আমি চাই ওদের দুজনের বিচার এবং শাস্তি হোক। আমি একটু নিরিবিলিতে ঘুমাই—

থেরেসা নিশ্চয় মত্ত ভংগীতে বিড়ালকে অনুকরণ করে তার আঙুলগুলিকে বিড়ালের নখের মত বাঁকিয়ে তার কাঁধগুলি বেয়াড়াভাবে নাড়ায়। ফ্রাঁসোয়া পাথরের মত ভংগীতে দাঁড়িয়ে থাকে। তার চোখের ভিতর দুটি গভীর ভাঁজ—মনে হয় ও যেন এখনই হেসে গড়িয়ে পড়বে।

লরাঁর হাড়ে পর্যন্ত কাঁপন লাগে। থেরেসার এই রসিকতা অতি বিশ্রী বোকামি মনে হয়। সে উঠে পড়ে বিড়ালটাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়। সে সত্যি ভয় পেয়েছে। ওর এই প্রেমিকা ঠিক পরিপূর্ণভাবে ওকে অধিকার করেনি। এই তরুণীর প্রণয় চুম্বনের মধ্যে এখনও যেন কোথায় একটু অস্বস্তি রয়ে গেছে।
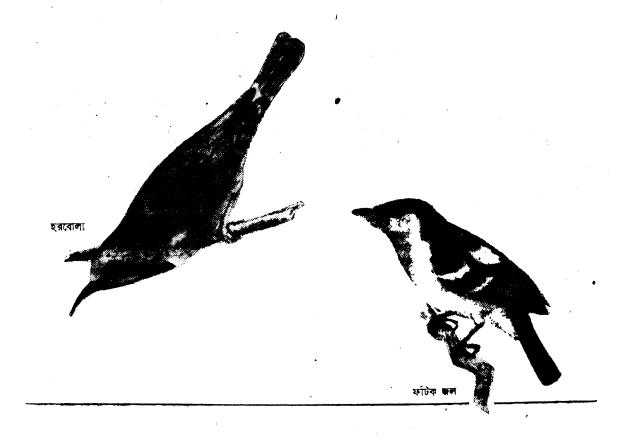
ইন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক সংক্ষেপিত ও অনূদিত।

নীলপরী

হাল্টসাদি বর্গের অন্তর্গত নীলচ্ছবি-বংশে (আইরেনিদি) তিনটি গণ—নীলচ্ছবি (আইরেনা), মধুক (ইজিথিনা) ও পত্রগুপ্ত (ক্লোরোপসিস)। এদের মধ্যে নীলচ্ছবিকে বাংলাদেশের সমতলে দেখা যায় না। পার্বত্য অঞ্চল দার্জিলিঙ জেলাতেও কচিৎ দেখা যায়। বন্দীদশায় আমার বার তিনেক দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহের অনেক চেষ্টাও করেছি কিন্তু সক্ষম হইনি।

ভারতে যত সুবেশ ও সুকণ্ঠ পাখি আছে নীলপরী তাদের মধ্যে প্রথম সারির অন্যতম। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে নাম দিয়েছিলাম—নীলপরী (আইরেনা পুয়েলা)। কারণ বাংলা বা হিন্দি কোনো ভাষাতেই এর নামকরণ কখনো হয় নি। একবার এক পাখিওয়ালার মুখে নাম শুনেছিলাম 'বুলদু'। বুলদুর কথা বলতে গিয়ে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। ইংরেজিতে বলে—ফেয়ারি ব্লুবার্ড। কাছাড়ি—দাও-গাটাং।

লম্বায় ১০ ইঞ্চি। পুরুষ নীলপরীর মাথার চাঁদি, ঘাড়, উপরের সমস্ত পালক, ডানার শুরুতে কিছুটা এবং ডানার শেষদিকে উপর থেকে নিচে গোটা কতক পালকের ঠিক মাঝখানটাতে খুব সরু করে ও লেজের তলায় কিছু অংশ লাজবর্দী নীল অর্থাৎ আলট্রামেরাইন রঙের উপর খুব ফিকে লালচে বেগুনির (লাইলাক) আভা। বাকি সমস্ত অংশ কুচকুচে ভেলভেট কালো। স্ত্রী-পাখির পুরুষের নীল অংশের বদলে নিষ্প্রভ ময়ূরকণ্ঠী; ডানা ও লেজ কালচে-পাটকিলের উপর ময়ূরকণ্ঠীর আভা। কনীনিকা টুকটুকে লাল। চোখের পাতা ফিকে লাল। পা ও চঞ্চু কালো।

বাসস্থান—ভারতে দুটি প্রজাতিকে দেখা যায়। একটি (আ পু পুয়েলা) দক্ষিণে ৬ হাজার ফিটের মধ্যে পশ্চিমঘাটে কেরালা থেকে বেলগাঁও, পূর্বঘাটে অন্ধ্রের চিত্তোর পর্বত এবং সিংহল। অপরটি (আ পু সিক্কিমেনসিস) হিমালয়ের নিম্নভূমিতে সিকিম থেকে আসামের মিশ্মি খাসি কাছাড় ও মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলে ৪ হাজার ফিটের মধ্যে।

খাদ্য—বট-পাকুড় ও নানা জাতীয় ছোটোবড়ো বুনো ফল এবং ফুলের মধু।

প্রজননকাল ছাড়া অন্য সময় নীলপরী পাঁচ-ছটির ছোটো দলে বিচরণ করে। কখনও কখনও ত্রিশ-চল্লিশের এক ঝাঁক দেখা যায় চিরহরিৎ জঙ্গলে গাছের মাথার উপরে। রৌদ্রে তাদের ঝলসানো রূপ ফেটে পড়ে। তখনকার বর্ণচ্ছটা বিস্ময়কর। সময়ে সময়ে নিচে ঝোপঝাড়েও নামে।

নীলচ্ছবি বংশ

অজয় হোম

দুপুরের দিকে পার্বত্য স্রোতস্বতী বা ছোটো নদীর পাড়ে এসে স্নান এবং জল পান করে। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকতে চায় না, সদাই চঞ্চল। মৃদু শীসের মতো নানা মিষ্টি শব্দ মুখে লেগেই আছে। তার মধ্যে একটি সুর বড়ো মধুর করে ডাকে—উইট-উইটু...হোয়াটস্-ইট। মিষ্টিসুরে 'হোয়াটস-ইট' ডাকটি দেয় খুব ঘন ঘন।

প্রজননকাল জানুয়ারী থেকে মে, কিন্তু মার্চ-এপ্রিলেই বেশি ডিম পাড়তে দেখা যায়। মাটি থেকে ১০-২০ ফিটের ভিতর আর্দ্রভূমির রৌদ্রবিহীন ছায়ায় ঢাকা গাছপালার মধ্যে পিরিচের আকারে শিকড়, কাঠি ও সবুজ শেওলা দিয়ে নীলপরী বাসা বানায়। সাধারণতঃ একসঙ্গে ২টি ডিম পাড়ে ফিকে সবুজের উপর লালচে-পাটকিলে এবং ধূসরের দাগ, ছিট ও ছোপের। ডিমের মাপ—লম্বায় ১·১০, চওড়ায় ০·৭৫ ইঞ্চি।

ফটিকজল

ফাল্গুন মাসের শেষ। মন্দ গরম নয়। আকাশের কোণে মেঘ। হঠাৎ ঝড় আসা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। চব্বিশ পরগণার ডায়মন্ডহারবার লাইনে সোনারপুর স্টেশনে রাজপুর-হরিনাভির দিকে হেঁটে চলেছি। পথের দুপাশে ঘন গাছপালার বাগান। আম, কাঁঠাল, লিচু, নিম, তেঁতুল, সবেদা, গোলাপজাম ইত্যাদির গাছই বেশি। হঠাৎ দেখলাম একটা বড়ো তেঁতুলগাছের মগ-ডালের দিকের একটা সরু ডালের উপর থেকে একটা ছোট পাখিকে শূন্যে উড়তে। পাখিটা বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে সব পালক ছড়িয়ে দিয়ে নিজেকে একটা গোল বলে পরিণত করে ঘুরতে ঘুরতে পড়তে থাকল। সে সময় একটা ডাক যা দিতে থাকল মনে হল বুঝি কটকটে ব্যাঙ বা ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে। যে সরু ডাল থেকে উড়েছিল ফিরে সেখানে এসেই ঘুরে পড়ল। ডালে বসার সঙ্গে সঙ্গেই ডানা কাঁপাতে কাঁপাতে খানিকটা ঝুলিয়ে দিয়ে লেজটাকে ময়ূরের পেখমের মতো তুলে ডাক দিল—উই-ই-ই-ই-টু... ফটিই-ই-ইক্-জল্। পাখিটা 'জল' কথাটা ঝপ করে বলে। পাশের আমগাছের এক মগডাল থেকে আর একটা অমনি উড়ে একই ডাক দিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোটা তিনেক পাখিকে দেখলাম একই রকম ব্যবহার করতে। একটাকে নিমগাছের উপর থেকে উড়তে দেখলাম। প্রথমটিকে দেখলাম বেশ কয়েকবার শূন্যে উড়ে বল হয়ে ডিগবাজি খেয়ে নামতে।

এই পাখির বিচিত্র ব্যবহারে ও মিষ্টি ডাকে আকৃষ্ট হয়ে অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ খাঁচায় পুষেছি। তখন লক্ষ্য করেছি ঘুমোবার সময় এই পাখি মাথাটা পিঠের মধ্যে গুঁজে দিয়ে এমনভাবে বুক-পিঠের বিশেষতঃ কোমরের পালক ফোলায় যেন একটি কদমফুল। লেজটি বোঁটা হয়ে ঝুলে থাকে। ফটিকজল বা উই-ই-ই-ই-টু ডাক ছাড়াও আর একটি ডাক শুনেছি সেটা শোনাতো—বৌ...ই এলি!...

নীলচ্ছবি-বংশের অন্তর্গত মধুক গণের এই পাখিটির ডাকের সঙ্গে মিলিয়ে নাম ফটিকজল (ইজিথিনা টিফিয়া)। অনেকে একে ভ্রমবশতঃ 'চাতক' বলেন। চাতক পরভৃত-বংশের গোলা কোকিলের (পায়েড ক্রেস্টেড কুক্কু) অপর নাম। হিন্দী—শোবীগি (সৌভাগ্য?)। ইংরেজি—কমন আয়োরা। মধুক গণে দুটি প্রজাতি।

লম্বায় ৫ ইঞ্চি। গ্রীষ্মে পুরুষ ফটিক-জলের উপরের পালকে কোমরটা সবজেটে-হলুদ বাকি সবটাই কালো, কিন্তু মাথা ও পিঠে কিছুটা হলুদ মেশানো। ডানার উপরে ঘাড়ের কাছ থেকে দুটো সাদা দাগ নিচ পর্যন্ত। ডানার ওড়ার পালকের ধার খুব সরু করে হলুদ। তলার পালক গাঢ় হলুদ। অবশ্য বুকের তলা থেকে কিছুটা মলিন ও সবুজাভ। শীতে উপরের পালকে কালো ভাবটা থাকে না, হলুদ অংশও খুব ফিকে। সারা বছরই স্ত্রী-পাখির পালকের রঙ সবজেটে-হলুদ। তলার অংশে হলুদ ও উপরে সবুজ ভাবটা একটু প্রকট। ডানা গাঢ় সবজেটে-পাটকিলে। ধারের পালকে খুব ফিকে সবুজ, ঘাড়ের কাছ থেকে একটি মাত্র সাদা টানা দাগ পুরুষের মতো নিচে নেমে এসেছে। কনীনিকা ফিকে হলুদ। চঞ্চু সীসে-নীল, উপরের চঞ্চুর মাঝখানটা কালো। পা সীসে-নীল। কোমরের উপর সরু সিল্কের মতো নরম পালক অজস্র।

বাসস্থান—পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের প্রায় সর্বত্র ৩ থেকে ৫ হাজার ফিটের মধ্যে, সিংহল এবং ব্রহ্মদেশ থেকে বোর্নিও। যে উপজাতিটির (ই টি টিফিয়া) সঙ্গে রাজপুর-হরিনাভির পথে প্রথম পরিচয় ঘটে সেটি ছাড়া আরও ৪টি উপজাতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। প্রথমটি (ই টি সেপ্টেনট্রিয়োনালিস) পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং পশ্চিম পাকিস্থান। পুরুষ-পাখির প্রজননকালে পিঠের উপর যে কালো অংশটা সেটা এই উপজাতির প্রায় না থাকার মধ্যে। দ্বিতীয়টি (ই টি হিউমেই) সৌরাষ্ট্র, রাজস্থান, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গ। তৃতীয়টি (ই টি দেইগনামি) কেরালা এবং মালাবার জেলা ব্যতীত সমগ্র দক্ষিণ ভারত। চতুর্থটি (ই টি মাল্টিকলার) কেরালা, পালঘাট পর্বত, রামেশ্বর ও সিংহল। এই উপজাতির দেহের সব রঙই গাঢ় এবং কালোর অংশটা কিছু বেশি।

খাদ্য—কীট-পতঙ্গ ও তাদের শূক। বন্দী অবস্থায় ঘি-ছাতু, পিঁপড়ের ডিম ও ফড়িং।

ফটিকজল যে কোনো আম, জাম লিচুর বাগানের অতি সাধারণ পাখি। গাঁয়ে বা গাঁয়ের ধারে, খেতের পাশে বা জঙ্গলের ধারে নিম-তেঁতুল অথবা কোনও ঝোপঝাড়ে দুপুরবেলায় বিশেষতঃ মেঘলা দিনে এদের প্রাণমাতানো মিষ্টি ডাক কানে আসে। সাধারণতঃ জোড়ায় বাস করে। কখনও দুই বা তিনের দলে একই গাছে পাতার ও ডালের ফাঁকে পোকা-মাকড় খুঁজে বেড়াচ্ছে দেখা যায়। এ সময় পরস্পরের দূরত্বের ব্যবধান জানার জন্যে মৃদু শিসের মতো শব্দের আদান-প্রদান করে। প্রজননকালে দেখা যায় পুরুষটি স্ত্রী-পাখির পিছনে ধাওয়া করছে। মনে হয় পরস্পরে যেন লুকোচুরি খেলছে। পুরুষ-পাখি স্ত্রীর সামনে গিয়ে দুদিকের ডানা নামিয়ে কোমরের সরু সুতো (ফিলো) পালকের গুচ্ছ ফুলিয়ে পাউডার পাফের মতো করে। সেই সঙ্গে লেজটাকে একটু তুলে ধরে কলকলানির সঙ্গে মধুর চি-ই-ই শিসে মনোনীতাকে জিজ্ঞাসা করে তার পছন্দ হয়েছে কিনা।

প্রজননকাল এপ্রিল থেকে জুলাই। দুই ডালের ফাঁকে মাটি থেকে ৩ থেকে ৩০ ফিটের মধ্যে পেয়ালার আকারে আড়াই ইঞ্চি চওড়া বাসা বানায়। উপকরণ—খুব চিকন নরম ঘাস ও সরু শিকড়। বাইরেটা সুন্দর করে মোড়ে মাকড়সার জাল ও ডিমের থলি দিয়ে। ডিম পাড়ে ২ থেকে ৪টি হাল্কা ক্রিম বা ধূসরাভ সাদা, তার উপর সরু সরু ধূসরের দাগ। কখনও কখনও ডিমের রঙ খুব ফিকে লাল তার উপর লাল দাগ দেখা যায়। ডিমের মাপ—লম্বায় ০·৭০ চওড়ায় ০·৫৫ ইঞ্চি।

পশ্চিমবঙ্গে অপর প্রজাতিটিকে দেখা যায় কচিৎ। আমার লক্ষ্যপথে পড়েছে পুরুলিয়ায়। বাংলা ও হিন্দিতে ফটিকজল বা শোবীগি ছাড়া অন্য কোনো নাম নেই, সুতরাং নামকরণ করা যায়—সোনালি ফটিকজল (ইজিথিনা নিগ্রোলুটিয়া)। ইংরেজি—মার্শালস আয়োরা।

সোনালি ফটিকজল লম্বায় ৫ ইঞ্চির চেয়ে কিছু কম। পুরুষের উপরের পালকে মাথার চাঁদি থেকে ঘাড় উজ্জ্বল সোনালি হলুদ। তার উপর খুব সরু ছোটো কালো কয়েকটি টান। পিঠের মাঝখানটা কালো, শেষাংশ থেকে লেজ পর্যন্ত কালোর ভিতর হলুদ। লেজের ডগায় চওড়া সাদা টান। ডানা কালো, ধারে সাদা। গাল, গলা ও তলার সমস্ত পালক উজ্জ্বল হলুদ। ডানার তলা সাদা। প্রজননকাল ছাড়া পুরুষের সব কালো পালকের স্থানে মলিন সবজেটে হলুদ। স্ত্রী-পাখির উপরের সমস্ত পালক সবজেটে হলুদ। লেজের গোড়ায় উপরের পালক কালো, ধারে সবুজ। লেজ ছাই-সবুজ, মাঝের পালক একজোড়া সাদা, বাকি পালকের ধার কখনও কোনোটা সাদা, কোনোটা ফিকে হলুদ, কোনোটা বা ধূসর-সাদা। বাকি পালক পুরুষের ন্যায়। ডানায় কালোর বদলে কালচে-পাটকিলে। কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল। চঞ্চু শিং রঙার উপর সীসে। পা সীসে।

বাসস্থান—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, পাঞ্জাব থেকে দিল্লী, রাজস্থান থেকে কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, বোম্বাই থেকে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, দক্ষিণ বিহার এবং পশ্চিম পাকিস্থান, কচিৎ পশ্চিমবঙ্গ।

আচার-ব্যবহারে ফটিকজলের সঙ্গে সোনালি ফটিকজলের কোনো তফাৎ নেই।

হরবোলা

ধর্মতলা স্ট্রীট যেখানে চৌরঙ্গীতে পেঁছেছে ডানদিকে একটা মসজিদ; ওই টিপু সুলতান মসজিদের গায়ে ধর্মতলার উপরেই গোটা দুই ফলের দোকান। যাঁরা কলকাতাবাসী বা আসা-যাওয়া করেন তাঁরা সকলেই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তারই. একটার সামনে ইলেকট্রিক পোস্টের গায়ে বাঁধা থাকত এক চিতল হরিণ আর খাঁচায় ঝুলতো সবুজ রঙের এক পাখি। যার গলা চিবুক ও বুকের অংশ গাঢ় বেগুনি-নীল। অনেকেই জুতো পালিস করাতে করাতে হরিণ আর পাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। চিনতেন না কেউ-ই। আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন কোথাকার পাখি এটা। যখন জেনেছেন বাংলাদেশেই একে দেখা যায় তখন অবাক হয়েছেন। আরও আশ্চর্য হয়েছেন নাম শুনে, কারণ অনেকেই নামের সঙ্গে পরিচিত চাক্ষুষ পরিচয় না ঘটলেও।

এ পাখি পুষেছি তাই খুব ভালো করেই চিনি। ভারতবর্ষে অন্যান্য পাখির ডাকের অনুকরণ করার ক্ষমতা যত পাখির আছে তাদের মধ্যে এ হচ্ছে অন্যতম। মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরে শালবনীতে জোড়ায়, আট ও দশের ঝাঁক, বীরভূমে দুবরাজপুরে জোড়ায়। দুবরাজপুরে পাখিটা এক ঝাঁকড়া

আমগাছের উপরের ডালে বসে ফিঙের ডাক নকল করছিল। আমি নিচ থেকে তত কান দিই নি। পরমুহূর্তে কানে এল *পরিষ্কার দোয়েলের শিস—সি-ই-ই...চিপ্-চিপ্-চিপ্। বাঃ! বেশ ডাকছে তো বলে দোয়েলটাকে দেখবার জন্যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছি হঠাৎ দেখি একটা সবুজ রঙের পাখি উড়ে গিয়ে বসল সামনের একটা* গাছে। পরিষ্কার দেখতে পেলাম এবার। বসেই ডাক দিল টু-টুল্...টু-টুল্। বুলবুলির হুবহু নকল। বরং আরও একটু মিষ্টি বেশি। একটু দরদ দেওয়া। সঙ্গিনীটি উড়ে গিয়ে তার পাশে এসে বসে।

ছোটো জাতের পাখির প্রায় সব ডাকই এরা নকল করতে পারে। তাছাড়া পোষা অবস্থায় বড়ো জাতের পাখি যেমন, কোকিল পাপিয়া ইত্যাদির ডাকও এদের তুলতে শুনেছি।

পাখিটি নীলচ্ছবি-বংশের অন্তর্গত পত্রগুপ্ত গণের এক প্রজাতি। নাম—হরবোলা (ক্লোরোপসিস কোচিনচাইনেনসিস)। হিন্দি—হারেওয়া। ইংরেজি—গোল্ডম্যান্টলড ক্লোরোপসিস, লিফ বার্ড, জার্ডনস ক্লোরোপসিস। বুলবুলির খুব নিকট জ্ঞাতি বলে পূর্বের বিচারে ভ্রমক্রমে বুলবুলির বংশের মধ্যে ধরে ইংরেজিতে নাম ছিল—গ্রীন বুলবুল।

লম্বায় ৭ ইঞ্চি। পুরুষ হরবোলার সমস্ত পালকই উজ্জ্বল সবুজ, কেবল নাক চোখ চিবুকে কালো এক পট্টি এবং চিবুকের তলা থেকে চক্রাকারে খোঁচা খোঁচা গোঁফের মতো পালক উজ্জ্বল নীলচে বেগুনি। গলার এই গোল জায়গার ধারে খুব সরু করে হলুদের আভা। কপাল ও মাথার চাঁদি সবজেটে হলুদ। ঘাড়ের কাছে ডানার বাঁকের উপরে খুব উজ্জ্বল সবুজাভ নীল। স্ত্রী-পাখি প্রায় পুরুষের মতোই দেখতে। শুধু কালো পট্টির স্থানে নীলচে সবুজ আর গোঁফ পালক সবুজাভ নীল। কনীনিকা পাটকিলে। চঞ্চু কালো। পা ফিকে নীল।

বাসস্থান—ভারত, দুই পাকিস্থান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ থেকে মালয়েশিয়া এবং চীন। যে প্রজাতিটিকে আমি দেখেছি *মেদিনীপুর ও বীরভূমে তাকে দেখা যায় নর্মদা নদীর দক্ষিণে পশ্চিমঘাট, কেরালা, সিংহল, হায়দ্রাবাদ, যুক্তপ্রদেশের দক্ষিণাংশ,* মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, ওড়িষ্যা, দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, পূর্ব পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ থেকে ইন্দোচীন। দ্বিতীয় প্রজাতির (ক্লো অরিফ্রন্স) মাথার চাঁদি কমলা-হলুদ ও গলা নীল। বাস করে হিমালয় থেকে যমুনার পূর্বদিকে, ছোটোনাগপুর, দক্ষিণ ভারত ও সিংহল। হিন্দি নাম— ছোটা হরিয়াল। ইংরেজি—গোল্ডফ্রন্টেড ক্লোরোপসিস। তৃতীয় প্রজাতির (ক্লো হার্ডউইকিই) নিম্নাংশ কমলা এবং ডানার অধিকাংশ গাঢ় নীল। দেখা যায় মধ্য এবং পূর্ব হিমালয়ে ৬ হাজার ফিটের মধ্যে। ইংরেজি—অরেঞ্জ-বেলীড ক্লোরোপসিস।

খাদ্য—ফলপাকড়, পোকা-মাকড় এবং বিভিন্ন ফুলের মধু।

পত্রগুপ্ত গণের সব প্রজাতি এবং উপজাতির আচার-ব্যবহার প্রায় একরকমের। একটু চঞ্চল প্রকৃতির। হরবোলা গাছে গাছেই থাকে কিন্তু উপরদিকে। রাসনা জাতীয় পরগাছার উপরে ঘোরাফেরা নজরে পড়ে বেশি। ঘন জঙ্গলে যেমন, খোলা জমির ধারে, নানাবিধ গাছের বাগানে বিশেষতঃ ফলের বাগানেও তেমন। গাছের পাতার রঙে দেহের রং এমন মিলে যায় যে চট করে ধরা যায় না গাছের উপর পাখিটা কোথায়। সবসময়েই যে গাছের উপরের ডালে থাকে তা নয় পোকামাকড় বা ছোটো বুনো ফলের খোঁজে ঝোপঝাড়ে বা বড়ো ঘাসের উপর নামতে মোটেই দ্বিধা করে না। পোকামাকড়ের মধ্যে মাকড়সা ও ঘেসোফড়িং পছন্দ করে কিঞ্চিৎ বেশি। পলাশ, রক্তমাদার, শিমুল ও মহুয়ার ফুল ফোটার সময় এদের জোড়ায় জোড়ায় অথবা আট-দশের দলে মধু খেতে দেখা যায়।

হরবোলাকে অনেক সময় দেখা যায় অন্যান্য পাখির সঙ্গে মিশে বেশ বিচরণ করছে। হঠাৎ উপরের ডাল থেকে শিক্রে পাখির ডাক নকল করে এমনভাবে ঝড়ের বেগে নেমে আসে অন্য পাখিদের মধ্যে যে তারা সত্যি শিক্রে ভেবে ভয় পেয়ে যে যার আত্মগোপনের জন্যে যেদিকে পারে উড়ে পালায়। তখন ওরা শিমুল পলাশ বা মহুয়া গাছটা অধিকার করে মহানন্দে ভোজ লাগায়। গাছের সরু ডাল ধরে যখন নানা কসরত দেখায় তখন মনে হয় এরা ট্রাপিজের খেলায় যেন কত বড়ো ওস্তাদ!

হরবোলা সাধারণতঃ অনুকরণ করে ফিঙে দোয়েল বুলবুল লাটোরা মাছ-রাঙা টুনটুনি ফটিকজল ইত্যাদির ডাক। বউ-কথা-কও পাপিয়া কোকিল ইত্যাদি পরিযায়ী পাখির ডাক ডাকে সেসব পাখি সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যাবার বেশ পর। আশ্চর্য লাগে কি করে এরা মনে রাখে সময়ের অত ব্যবধানে এই সব ডাক। দল বেঁধে অবিশ্রান্ত এক পাখির ডাকের পর আর এক পাখির ডাক এক-একজনে ডাকতে শুরু করলে মনে হয় পাখিদের কোনো কংগ্রেস বা বিরাট জনসভা সেখানে বসেছে।

হরবোলা পোষ মানে বেশ। এজন্যে এই পাখি পোষার একটা রেওয়াজ আছে পক্ষিপ্রেমিকদের মধ্যে। পক্ষিশালা বা এভিয়ারিতে রাখলে দেখেছি অন্য পাখিদের নাস্তানাবুদ করে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে।

প্রজননকাল এপ্রিল থেকে আগস্ট। ছোটো চেপটা পেয়ালার আকারে বাসা মাটি থেকে ১৫-২৫ ফিটের মধ্যে দুই ডালের ফাঁকে। উপকরণ—খুব সরু শিকড়, নরম ঘাস; বাইরেটা নানা জাতীয় উদ্ভিদের নরম আঁশ দিয়ে মোড়া। ডিম পাড়ে ২-৩টি লম্বাটে পাতলা খোসা, অল্প চকচকে। ডিমের রঙ সাদাটে তার উপর যত্রতত্র কালচে, লালচে, বেগুনি-পাটকিলে চুলের মতো সব সরু লাইন, ছোপ ও ছিট। ডিমের মাপ—লম্বায় ০·৮ চওড়ায় ০·৬০ ইঞ্চি।
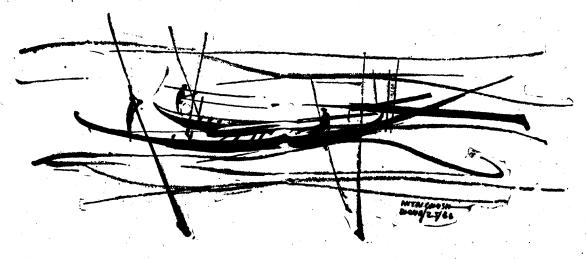
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আর কোথাও নয়, গানাদো 'সৌসা'-তে গেছেন কেন, আতাহুয়ালপার জন্যে অপেক্ষা করতে?

তাঁর পরাজিত রাজভ্রাতা ভূতপূর্ব ইংকা নরেশ হুয়াসকারকে যেখানে বন্দী করে রেখেছেন, সেই দুর্গনগরী 'সৌসা'-তেই আতাহুয়ালপার নিজেরও গোপনে যেতে চাইবার কারণ কি?

হুয়াসকার যে তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে নিজের স্বাধীনতা আর ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্যে বেশী সোনার লোভ দেখিয়ে পিজারোকে হাত করতে চাইছে, এ গোপন খবর জানবার পরও আতাহুয়ালপার সংকল্প ত বদলায়নি।

এরকম সম্ভাবনার কথা আগে থাকতেই অনুমান করে নিয়ে তিনি অবিচলিত ছিলেন কিসের জোরে?

শুধু কি গানাদোর ছকে দেওয়া চালের ওপর অটল বিশ্বাসে?

কিন্তু গানাদোর চাল যে অব্যর্থ এ বিশ্বাস তাঁর হল কি করে? গোড়ায় ত গানাদোকে পিজারোর গুপ্তচর বলে ধরে নিয়ে তাঁর সমস্ত কিছুই অবিশ্বাসের চোখে দেখেছিলেন।

যে নির্দেশ পেয়ে পিজারোর কাছে প্রথম একজন এসপানিওল দৈবজ্ঞের কথা পাড়েন তাই ত রীতিমত সন্দেহজনক মনে হয়েছিল। নির্দেশ পেয়েছিলেন অবশ্য সেই রঙীন সুতোর জট থেকে। সেই 'কিপু' ক'টা তাঁর মহলে কোথা থেকে এল তাই প্রথম বুঝে উঠতে পারেননি। পিজারোর চরেদেরই সেটা কারসাজি ভেবেছিলেন প্রথমে। এমন কথাও ভেবেছিলেন যে, ইংকা-সাম্রাজ্যের কোনো কুলাঙ্গার দেশধর্মের চরম অপমান করে বিদেশী পিজারোর কাছে 'কিপু'র রহস্য জানিয়ে দিয়েছে, আর পিজারো সেই 'কিপু' দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইছেন।

'কিপু'গুলো পর পর হাতে পড়ার পরও আতাহুয়ালপা তাই তার নির্দেশ মানবার কোনো চেষ্টা করেননি। সেগুলো যেন বাজে রঙীন সুতো হিসেবেই নাড়াচাড়া করেছেন। সত্যিই 'কিপু'র রহস্য জেনে থাকলেও পিজারো আতাহুয়ালপাকে ধরা-ছোঁয়ার যাতে কিছু না পান।

গুপ্তচরেদের চরম দেশদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁর আশঙ্কা যে অমূলক, পিজারোর 'কিপু'গুলো সম্বন্ধে খোঁজ নেবার ধরণ দেখেই আতাহুয়ালপা বুঝতে পারেন একদিন। 'কিপু'গুলো পিজারোর কাছে যে খেলাধুলোর রঙীন সুতোর বেশী কিছু নয়, তা বুঝে সেই দিনই এসপানিওল একজন দৈবজ্ঞের কাছে ভাগ্য শুনাবার ইচ্ছে জানান।

'কিপু'গুলোর মধ্যে সেই নির্দেশই ছিল।

সব দুর্ভাগ্য ঘোচাতে চাও ত এসপানিওল দৈবজ্ঞ ডাকাও।—এই ছিল 'কিপু'র রঙীন জটপাকানো সুতোর আদেশ-বাণী।

গিঁট-দেওয়া রঙীন সুতোর জট দিয়ে ঐ আদেশ-বাণী প্রকাশ করা যেমন, তার পাঠোদ্ধার করাও তেমনি পেরু রাজ্যের নিতান্ত গুপ্তবিদ্যা। 'কিপু' কি জিনিস জানলেও তা পড়বার ও তা দিয়ে কিছু বলবার ক্ষমতা যার-তার থাকে না।

ইংকা রাজবংশের লোক হিসাবে আতাহুয়ালপাকে ছেলেবেলাতেই এ বিদ্যা শিখতে হয়েছে। রাজ ও অত্যন্ত অভিজাত বংশের লোক ছাড়া, পুরোহিতদেরই শুধু এ বিদ্যা শেখার অধিকার আছে।

'কিপু'গুলির আদেশ-বাণী সেদিক দিয়েও আতাহুয়ালপাকে বিস্মিত চিন্তিত করেছিল।

'কিপু'র রঙীন সুতোয় ভাষা ফোটাতে যারা জানে, ইংকা রাজ্যের এমন কে এরকম অদ্ভুত নির্দেশ পাঠাতে পারে! দুর্ভাগ্য ঘোচাবার জন্যে শত্রুর দৈবজ্ঞের শরণ নেবার পরামর্শ দেওয়া তাদের কারুর পক্ষে সম্ভব বলেই আতাহুয়ালপা ভাবতে পারেন না।

মনের এ সমস্ত দ্বিধাসংশয় নিয়েও আতাহুয়ালপা পিজারোর কাছে 'কিপু'র নির্দেশ অনুসারে একজন এসপানিওল জ্যোতিষীর খোঁজ করেছিলেন। সেরকম কেউ থাকলে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন তাঁর কাছে। নেহাৎ 'কিপু'গুলোর মানে বোঝা যায় কিনা দেখবার চেষ্টাতেই এ অনুরোধ।

সেই অনুরোধ রাখতে পিজারো কয়েক-দিন বাদে যাকে পাঠিয়েছিলেন, তাকে দেখে ত' গোড়াতেই মনটা বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

এই কি এসপানিওল জ্যোতিষী! না, পিজারো তাঁর নিজের মতলব হাসিল করতে যাকে-তাকে দৈবজ্ঞ সাজিয়ে পাঠিয়েছেন!

লোকটার চেহারাই ত' প্রথমত অন্য এসপানিওলদের থেকে কেমন আলাদা। গায়ের রংটা তাদের মত অমন কটা নয়। আরেক পোঁচ ময়লা হলে ইংকা রাজবংশের ছেলেদের সঙ্গেই প্রায় মিলে যেত। মুখ-চোখ ধরণ-ধারণও অন্য এসপানিওলদের

সঙ্গে মেলে না। লোকটা তাদের মতই লম্বা হলেও, পাতলা একহারা ধরনের। জ্যোতিষের মত বিদ্যের চর্চা যারা করে, তাদের মুখ-চোখে যে ধীর-স্থির গাম্ভীর্যটুকু থাকা উচিত তাও এর মুখে নেই। কেমন একটা অস্থিরচঞ্চল ভাব তার জায়গায়, আর সেই সঙ্গে চোখের দৃষ্টিতে একটা চাপা কৌতুকের আভাস। মাঝে মাঝে যা হঠাৎ আবার যেন অন্যভাবে ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

লোকটার নাম জেনেছিলেন গানাদো! গানাদোর সঙ্গে প্রথম দেখার সময় যা-কিছু হয়েছিল তাও বেশ একটু অদ্ভুত বেয়াড়া ধরনের।

গানাদোর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে আতাহুয়ালপা সঙ্গে তাঁর দোভাষীকে রেখেছিলেন।

দোভাষী কিন্তু গানাদোর কথা কিছুক্ষণ শোনবার পর অনুবাদের চেষ্টা না করে একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল। বোবা হওয়ার আর দোষ কি! গানাদোর কথা সে একবর্ণ বুঝতে পারেনি।

চুপ করে থাকতে দেখে আতাহুয়ালপা ভ্রূকুটিভরে তার দিকে চেয়েছিলেন।

গানাদোকেও অত্যন্ত বিরক্ত মনে হয়েছিল। তিনি রাগের চোটে মুখে যেন তুবড়ি ছুটিয়ে কি সব বলেছিলেন দোভাষীকে।

দোভাষী ঘেমে উঠে কাঁচুমাচু মুখ করে এবার আতাহুয়ালপার কাছে স্বীকার করেছিল যে, গানাদোর কথা অনুবাদ করবার ক্ষমতা তার নেই।

কেন?—আতাহুয়ালপা রেগে উঠেছিলেন,—তুমি এসপানিওলদের ভাষা জানো না?

জানি। কিন্তু উনি যা বলছেন, তা কাস্তেলানিয়ানো মানে এসপানিওলদের ভাষা নয়।—করুণস্বরে নিবেদন করেছিল দোভাষী।

কি!—এসপানিওল শব্দটা থেকেই যেন দোভাষীর কুইচুয়া ভাষায় বলা বক্তব্যটা বুঝে ফেলে গানাদো একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেছিলেন,—আমি যা বলছি, তা এসপানিওল নয়? এসপানিওলদের ভাষা শুধু কাস্তেলিয়ানো? কেন, বাস্ক, গালিসিয়ান, কাটালান কি বানের জলে ভেসে এসেছে! আমি কাটালান বলছি, কাস্তেলিয়ানো নয়। বুঝেছ?

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গানাদোর কথাগুলো যে কাস্তেলিয়ানোতেই বলা সে খেয়াল হয়নি দোভাষীর।

কিন্তু আমি ত' শুধু কাস্তেলিয়ানোই শিখেছি।—অপরাধীর মত সে জানিয়েছে —কাটালান আমি জানি না।

না যদি জানো ত' এখানে করছ কি! যাও।

আর কিছু না বুঝুন আতাহুয়ালপা গানাদোর রাগের সঙ্গে বলা শেষ কথাটা বুঝেছিলেন। বন্দী হবার পর থেকে এসপানিওলদের সংসর্গে যে দু-একটা শব্দ তিনি এই ক'দিনে শিখেছেন তার একটা হল 'ভায়িয়া'। 'ভায়িয়া' মানে যাও। গানাদো রাগের মাথায় দোভাষীকে সেই কথাই বলেছে।

কথা যে বোঝে না এমন দোভাষীর ওপর রাগ হওয়া অবশ্য স্বাভাবিক। তার থাকা-না-থাকা সমান। যাও বলে তাকে তাড়ালে সুতরাং কোনো ক্ষতি নেই। আতাহুয়ালপা দোভাষীকে বিদায় দেওয়ায় তাই আপত্তি করেননি।

কিন্তু যে গেছে তার জায়গায় গানাদোর কথা বোঝে এমন দোভাষী ত একজন দরকার। নইলে ইসারায় ত তাঁদের পরস্পরের আলাপ আর হতে পারে না।

ইসারায় কথা বোঝাতে হয়নি, দরকার হয়নি কোনো দোভাষীরও, হঠাৎ চমকে উঠে অবাক হয়ে আতাহুয়ালপা গানাদোর দিকে তাকিয়েছেন। নিজের কানকেই তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না তখন।

বিশ্বাস করা সত্যিই শক্ত।

গানাদো তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। কথা বলছে পেরুর সাধারণ ভাষা কুইচুয়ায় নয়, ইংকা রাজপরিবারের নিজস্ব বিশেষ ভাষায়, বাইরের প্রজা-সাধারণেরও যা অজানা।

গানাদোর এ ভাষা ব্যবহারে স্তম্ভিত হয়ে আতাহুয়ালপা প্রথমে তার কথাটাই মন দিয়ে শুনতে পারেননি।

গানাদো একটু হেসে দ্বিতীয়বার কথাটা বলার পর তিনি সজাগ হয়েছেন।

দোভাষীকে তাড়িয়েছি বলে রাগ করেননি নিশ্চয়?—বলেছেন গানাদো।

না, তা করিনি।—ভ্রূকুটিভরে বলে আতাহুয়ালপা নিজের তীব্র কৌতূহলটা আর চাপতে পারেননি,—তুমি—তুমি আমাদের এভাষা শিখলে কোথায়?

এভাষা কি এমন অদ্ভুত কিছু যে শিখলে আশ্চর্য হতে হয়!—গানাদো যেন সরল বিস্ময়ই প্রকাশ করেছেন।

হ্যাঁ তাই!—ইংকা নরেশ একটু উষ্ণস্বরেই বলেছেন,—এ দেশের সবাই যা বলে এ সেই কুইচুয়া নয়। ইংকা-রক্ত যাদের গায়ে আছে, রাজবংশের তারাই শুধু এ ভাষা ব্যবহার করে।

ইংকা রক্ত আমার গায়ে নেই।—সবিনয়ে বলেছেন গানাদো,—সুতরাং এ ভাষা ব্যবহার করে আমার যদি অন্যায় হয়ে থাকে ত' মাপ করবেন। আমি কুইচুয়াতেই যা বলবার বলতে চেষ্টা করব।

সে চেষ্টা করতে তোমায় বলছি না।—আতাহুয়ালপা অধৈর্যের সঙ্গে বলেছেন—কোথায় এ রাজভাষা তুমি শিখলে তাই জানতে চাইছি।

রাজভাষা ত' যার-তার কাছে শেখা যায় না।—আবার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছেন গানাদো,—কোথায় কেমন করে শিখেছি আশা করি তা জানাবার সময় সুযোগ পরে পাব। কিন্তু এখন সবচেয়ে যা জরুরী, সেই কথাগুলোই আপনার সঙ্গে আগে আলোচনা করতে চাই। দোভাষীকে সেইজন্যেই ওভাবে সরিয়ে দিলাম।

কি জরুরী কথা আলোচনা করতে চাও!—আতাহুয়ালপা অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে গানাদোর দিকে তাকিয়েছেন, তারপর রূঢ়স্বরে বলেছেন,—এসপানিওলদের জ্যোতিষবিদ্যার দৌড় কতটা তাই আমি তোমায় দিয়ে পরীক্ষা করতে চাই। গোপন আলোচনা করবার জন্যে তোমায় ডাকিনি। পারো তুমি ভাগ্য গণনা করতে?
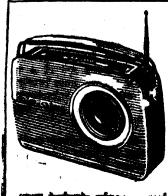
না।

সোজা স্পষ্ট দৃঢ়স্বরের এ অপ্রত্যাশিত জবাব শুনে চমকে উঠে আতাহুয়ালপা

সবিস্ময়ে গানাদোর দিকে তাকিয়েছেন। লোকটা বলে কি! অম্লানবদনে স্বীকার করছে যে, সে জ্যোতিষী নয়! গানাদোর অবিচলিত নির্বিকার মুখের ভাব দেখে একমুহূর্তে মেজাজ তাঁর আরো গরম হয়ে উঠেছে।

তীব্রস্বরে তিনি বলেছেন,—ভাগ্য গণনা করতে জানো না, তবু তুমি এখানে এসেছ! এসেছো কি পরিহাস করতে।

না, সম্রাট!—শান্ত দৃঢ়স্বরে বলেছেন গানাদো,—পরিহাস করবার জন্যে নিজের মাথায় খাঁড়া ঝুলিয়ে এখানে আসিনি। এসেছি আর এক উদ্দেশ্য আর আশা নিয়ে। ভাগ্য গণনা করতে আমি জানি না কিন্তু ভাগ্য বদলাতে হয়ত পারি।

ভাগ্য বদলাতে পারো!—আতাহুয়ালপা জ্বলন্তস্বরে ওইটুকু বলে গানাদোর স্পর্ধাতেই বোধহয় নির্বাক হয়ে গেছেন।

আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না জানি।—গানাদো আগের মতই স্থির-ধীরভাবে বলেছেন,—ভাবছেন পিজারোর চর হিসেবে আপনার মনের কথা বার করবার চেষ্টা করছি। নিজেকে বাঁচাতে পিজারোর কাছে আমার সব কথা ফাঁস করে দেবেন কিনা তাও তোলাপাড়া করছেন মনে মনে। তা আমায় ধরিয়ে দিতে আপনি সত্যিই পারেন। মুখ-সাপাটিতে তখন নিজের সাফাই গেয়ে পার পাব কিনা জানি না। পাই বা না পাই, এই তাভানতিনসুইয়ু-র যিনি জীবনের উৎস, সেই ভীরাকোচা আর তাহলে ইংকা সাম্রাজ্যের অভিশাপ মোচন করতে বোধহয় দেখা দিতে পারবেন না।

তাভানতিনসুইয়ু-র জীবনের উৎস ভীরাকোচা!—আতাহুয়ালপার গলার রাগের চেয়ে বিস্ময়বিমূঢ়তাই বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবার।—কি জানো তুমি তাঁর বিষয়ে!

এইটুকু জানি যে তাঁর নাম নিয়ে তাঁর ভরসার জোরে এই ইংকা সাম্রাজ্য আবার জাগিয়ে তুলে তার সমস্ত অভিশাপ কাটিয়ে দেওয়া যায়। আতাহুয়ালপার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছেন গানাদো,—আপনার ভাগ্য সত্যিই বদলে যেতে পারে সম্রাট শুধু যদি যা আপনাকে বলব তা বিশ্বাস করতে পারেন।

বিশ্বাস তোমায় আমি করব কেন?—এবার বিদ্রূপের স্বরে বলেছেন আতা-হুয়ালপা, শুধু আমাদের রাজভাষা তুমি কোথা থেকে শিখেছ, আর জীবনদেবতা ভীরাকোচার দোহাই দিচ্ছ বলে?

না, সম্রাট!—একটু হেসে বলেছেন গানাদো,—রাজভাষা শিখেছি বা ভীরা-কোচার দোহাই দিচ্ছি বলে আমায় বিশ্বাস করতে হবে না। তার চেয়ে ভালো প্রমাণ...

গানাদো কথাটা শেষ করতে পারেননি। ইংকা রাজবংশের সম্ভ্রান্ত কেউ একজন আতাহুয়ালপার সঙ্গে দেখা করতে দরবার-ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন। যথারীতি, খালি পায়ে কাঁধে বশ্যতার নিদর্শন হিসেবে একটা বোঝা কাঁধে নিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়ে প্রণামী দিয়ে ও কুর্ণিশ করে তিনি যেভাবে বেশ একটু ব্যাকুল অস্বস্তির সঙ্গে গানাদোর দিকে তাকিয়েছেন, তাতে বোঝা গেছে, ইংকা নরেশের কাছে খুব গুরুতর কিছু তাঁর নিবেদন করার আছে।

আতাহুয়ালপাকেও একটু বিব্রত মনে হয়েছে।

আগন্তুক ইংকা জ্ঞাতির কাছে তার জরুরী নিবেদনটা গোপনে শুনতে চান কিন্তু আলাপ অসমাপ্ত রেখে গানাদোকে বিদায় দিতেও বাধছে।

গানাদোই আতাহুয়ালপার এ দোটানার অস্বস্তি দূর করেছেন অপ্রত্যাশিতভাবে।

হঠাৎ আগন্তুক ইংকা-প্রধানকেই উদ্দেশ করে তিনি বলেছেন,—ভুল হলে মাপ করবেন। আপনার নামই ত' পাউল্লো টোপা?

ইংকা নরেশ ও আগন্তুক দুজনেই সবিস্ময়ে গানাদোর দিকে তাকিয়েছেন।

আতাহুয়ালপাই জিজ্ঞাসা করেছেন ভ্রূকুটিভরে,—তুমি ওর নাম জানলে কি করে?

শুধু ওঁর নাম নয়, উনি আপনার কাছে কি আবেদন জানাতে এসেছেন, তাও আমি জানি।—ঈষৎ কঠিনস্বরে বলেছেন গানাদো,—ওঁকে আপনি আশ্বাস দিতে পারেন সম্রাট, যে স্বয়ং ভীরাকোচা ওঁর সহায় হবেন। একবার শিক্ষা পেয়েও যার সংশোধন হয়নি, পাউল্লো টোপা'র স্ত্রীর ওপর পাশব লালসা নিয়ে আবার যে তাঁকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবার আয়োজন করেছে, আজ রাত্রেই এমন চরম শাস্তি সে পাবে, এসপানিওল বাহিনীর কাছে যা গল্প-কথা হয়ে থাকবে বহুদিন। প্রকাশ্য রাজপথে কলঙ্কচিহ্ন-ভরা মুখে তাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কাল সকালে পাওয়া যাবে।

কি বলছ কি তুমি!—যেন একটু অধৈর্যের সঙ্গে বলেছেন আতাহুয়ালপা,—ভীরাকোচার নাম নিয়ে তামাসা করছ কোন্ সাহসে!

তামাসা করিনি সম্রাট!—গানাদো দৃঢ়-স্বরে বলেছেন,—সত্য কথাই বলছি যে, ভীরাকোচাই পাউল্লো টোপাকে চরম অপমান থেকে রক্ষা করবেন। একবার শিক্ষা পেয়েও যার সংশোধন হয়নি, পাউল্লো টোপার সুন্দরী স্ত্রীর ওপর পাশব লালসা নিয়ে যে-পাষণ্ড আবার তাঁকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবার চক্রান্ত করেছে, আজ রাত্রেই এমন চরম শাস্তি সে পাবে, এসপানিওল বাহিনীর কাছে যা ভয়ঙ্কর গল্প-কথা হয়ে থাকবে বহুদিন। প্রকাশ্য রাজপথে কলঙ্ক-চিহ্নভরা মুখে কাল সকালে তাকে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যাবে।

একদিকে যেমন বিস্ময়বিমূঢ় আর একদিকে তেমনি ক্রুদ্ধ উত্তেজিত হয়ে আতাহুয়ালপা জ্বলন্তস্বরে পাউল্লো টোপাকেই জিজ্ঞাসা করেছেন,—এ এসপানি-ওল তোমার দুর্ভাগ্যের কথা যা বলছে, তা সত্য টোপা!

হ্যাঁ সত্য, সম্রাট!—নত আরক্তমুখে স্বীকার করেছে পাউল্লো টোপা।

কিন্তু ভীরাকোচার পবিত্র নাম নিয়ে যে আশ্বাস দিচ্ছ, তা যদি শুধু মিথ্যে দম্ভ হয়...!—গানাদোর দিকে ফিরে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাঁকে যেন বিদ্ধ করে আতা-হুয়ালপা প্রশ্নটা অসমাপ্তই রেখেছেন।

তাহলে আমায় প্রতারক গুপ্তচর বলেই বুঝবেন!—কুণ্ঠাহীন গলায় বলেছেন গানাদো।—আমি কতখানি বিশ্বাসের যোগ্য আমার এই দাম্ভিক আস্ফালনই তার প্রমাণ দিক।

(ক্রমশঃ)

হরিয়ানায় কংগ্রেসের জয়

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নূতনতম রাজ্যটির নাম হরিয়ানা। গত সাধারণ নির্বাচনের পর এই রাজ্যেই সর্বপ্রথম কংগ্রেস গভর্নমেন্টের পতন ঘটেছিল। ঘন ঘন দলত্যাগ সেখানে একটা কেলেঙ্কারীর আকার ধারণ করেছিল। দলত্যাগীদের "আয়ারাম-গয়ারাম" নামকরণ সেখানেই হয়েছিল। এই হরিয়ানাতেই সর্বপ্রথম অন্তর্বর্তী নির্বাচন হল।

এই প্রথম রাজ্য যেখানে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পর কংগ্রেস তার হৃতক্ষমতায় ফিরে এল।

স্বভাবতই হরিয়ানার নির্বাচনের তাৎপর্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। হরিয়ানার পর পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হওয়ার কথা আছে। হরিয়ানার ভোটের ফলাফল যদি এই দুটি নির্বাচনকে প্রভাবিত করে তাহলে কংগ্রেসের উৎসাহিত হওয়ার কারণ আছে।

আসন সংখ্যার দিক দিয়ে অবশ্য কংগ্রেস যে গত সাধারণ নির্বাচনের তুলনায় লাভবান হয়েছে তা নয়। হরিয়ানা বিধানসভার ৮১টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস গতবারও ৪৮টি আসন লাভ করেছিল, এবারও তার আসন সংখ্যা ৪৮। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে সন্তোষের কারণ প্রধানত দুটি : (১) যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা যে ভোটারদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব রেখে যেতে পারেন নি ভোটের ফলাফলে সেটা পরিষ্কার। যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচাঁদরাম একটি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে হেরে গেছেন, যদিও আর একটি কেন্দ্রে তিনি জয়ী হয়েছেন। রাও বীরেন্দ্র সিংহের মন্ত্রিসভার অন্যান্য যেসব সদস্য পরাজিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন :— শ্রীশামসের সিং, শ্রীমুলচাঁদ জৈন, শ্রীমুলতান সিং, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীফুলচাঁদ প্রভৃতি। (২) যেসব দলত্যাগী অন্তর্বর্তী নির্বাচনের আগে কংগ্রেসে ফিরে এসেছিলেন তাঁদের কংগ্রেস টিকেট না দেওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস এই সাফল্য লাভ করেছে। যাঁদের মনোনয়ন এইভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে শ্রীচাঁদরামের মত হরিজন নেতা, শ্রীদেবীলালের মত প্রভাবশালী জাঠ নেতা ইত্যাদি ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কংগ্রেসপ্রার্থীর বিরোধিতা করে নির্বাচনে নেমেছিলেন।

হরিয়ানার নির্বাচনের এই ফলাফল কংগ্রেসের দিক থেকে আর একটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। হরিয়ানার এই নির্বাচন সরাসরি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছে। ভারতবর্ষে আর কোন রাজ্যে ইতিপূর্বে আর কখনও কোন নির্বাচন সরাসরি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের তদারকিতে পরিচালিত হয় নি। দলত্যাগীদের মনোনয়ন দেওয়া হবে না—এই নীতিও কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের এবং প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের কারও কারও বিরোধিতা সত্ত্বেও এই নীতি গৃহীত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজে এই নির্বাচন উপলক্ষ্যে হরিয়ানায় ৪০টি জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের অন্যান্য অনেক কেন্দ্রীয় নেতা এই নির্বাচনী প্রচার অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন। রাজস্থান, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশ থেকে কংগ্রেস নেতা ও কংগ্রেসকর্মীরা এই নির্বাচনী অভিযানে সাহায্য করতে এসেছিলেন।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক বিবৃতি দিয়ে "কংগ্রেস দলের প্রতি তাঁদের আস্থা পুনরায় ঘোষণা করার জন্য" হরিয়ানার জনসাধারণকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।

শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, "নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করেছে যে, দলত্যাগের রাজনীতি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।"

দলত্যাগীদের বিপর্যয় সত্যি সত্যি হরিয়ানার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ফলাফলের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই বিপর্যয়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত :—

শ্রীপ্রতাপ সিং দৌলতা—গত নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে জয়ী হয়েছিলেন, দল ছেড়ে যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রী হয়েছিলেন, মন্ত্রিসভার পতনের পর কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন এবং কংগ্রেস টিকেট না পাওয়ায় কংগ্রেসপ্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ১৭ হাজার ভোটে হেরে গেছেন।

শ্রীচাঁদরাম — কংগ্রেস থেকে যুক্তফ্রণ্টে, সেখান থেকে শ্রীদেবীলালের হরিয়ানা কংগ্রেসে, সেখান থেকে কংগ্রেসে এবং কংগ্রেসের মনোনয়ন না পেয়ে নির্দলীয়-প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

শ্রীশামসের সিং — রিপাব্লিকান পার্টি থেকে যুক্তফ্রণ্টে, সেখান থেকে বিশাল হরিয়ানা দলে, সেখান থেকে স্বতন্ত্র দলে।

ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, কংগ্রেসের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পরাজয়ও ঘটেছে। কংগ্রেস কতকগুলি পুরানো আসন হারিয়ে এবং কয়েকটি নূতন আসন লাভ করে আসন সংখ্যা সমান রাখতে সমর্থ হয়েছে। কংগ্রেসের যাঁরা হেরেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রাক্তন স্পীকার শ্রীমতী শান্নো দেবী, প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীদল সিং এবং কংগ্রেস দলের সম্পাদক শ্রীদেবী সিং তেবেতিয়া।

হরিয়ানার এই অন্তর্বর্তী নির্বাচনে সবচেয়ে বেশী মার খেয়েছে জনসংঘ দল। পূর্ববর্তী বিধানসভায় জনসংঘ দ্বিতীয় বৃহত্তম দল ও যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার পিছনে প্রধান শক্তি ছিল। অন্তর্বর্তী নির্বাচনে জনসংঘ ৪৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র সাতটি আসন পেয়েছে। অথচ গত নির্বাচনে এই দল ৪৮টি আসনে লড়াই করে ১২টি আসন লাভ করেছিল।

জনসংঘের স্থলে হরিয়ানা বিধানসভায় এবার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিংহের বিশাল হরিয়ানা দল। এই দল ২৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৩টি আসন লাভ করেছে।

জনসংঘের সঙ্গে স্বতন্ত্র দলের নির্বাচনী সমঝোতা ছিল। এই দলও বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি, ৩২টি আসনে প্রার্থী দিয়ে মাত্র দুটি লাভ করেছে।

হরিয়ানায় যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রণ্টও ভেঙ্গে গেছে। ফলে সেখানে অকংগ্রেসী ভোটগুলি একদিকে জনসংঘ-স্বতন্ত্র জোট, অন্যদিকে স্বতন্ত্র দলের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। সবচেয়ে খারাপ ফল হয়েছে বামপন্থী দলগুলির। অন্তর্বর্তী নির্বাচনে এস এস পি, কম্যুনিস্ট পার্টি, কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্ক্সিস্ট) ও পি এস পি দল যথাক্রমে ৮টি, ৩টি, ১টি ও ১টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। কোন দলই একটিও আসন পায় নি। ভারতীয় ক্রান্তি

দল ৬টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ১টি ও রিপাব্লিকান পার্টি ১৪টি আসনে প্রার্থী দিয়ে একটি আসন লাভ করেছে। ৯ জন নির্দলীয় প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন।

এখন কংগ্রেসের সামনে প্রশ্ন এসেছে, হরিয়ানা বিধানসভায় দলের নেতা অর্থাৎ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন। দলের ভিতর এই নিয়ে দলাদলি এড়াবার জন্য এবার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই মুখ্যমন্ত্রিত্বের জন্য সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্বাচনের বাইরে রেখেছিলেন। প্রাক্তন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভগবৎদয়াল শর্মা নির্বাচনে দাঁড়ান নি। ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমর্থক বলে পরিচিত নবনির্বাচিত ৩৬ জন কংগ্রেস সদস্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার কাছে একটি লিপি পাঠিয়ে শ্রীশর্মাকে দলের নেতা করার দাবী জানিয়েছেন। শ্রীগুলজারীলাল নন্দ হরিয়ানায় কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব নিতে রাজী হবেন কিনা সে বিষয়ে ভিতরে ভিতরে কিছু অনুসন্ধান করা হয়েছিল বলে প্রকাশ; কিন্তু শ্রীনন্দ নাকি এই প্রস্তাবে রাজী হন নি।

শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড স্থির করেছেন যে, ভোটে যাঁরা বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তাঁদেরই মধ্যে কাউকে হরিয়ানায় কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব দেওয়া হবে, বাইরে থেকে কাউকে এই পদে আনা হবে না।

এই সিদ্ধান্তের পর নিম্নোক্ত চার জনের মধ্যে একজনকে এই পদের জন্য বেছে নিতে হবে বলে মনে হচ্ছে :— শ্রীচৌধুরী রণবীর সিং, শ্রীবংশীলাল, শ্রীমতী ওমপ্রভা জৈন ও ব্রিগেডিয়ার রণ সিং।

হরিয়ানায় এবার কোন স্থায়ী গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে কিনা সেটা অনেকাংশে নির্ভর করছে কংগ্রেসের উপর। কংগ্রেস যদি তার দল সামলাতে না পারে তাহলে ১৯৬৭ সালের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে পারে। কংগ্রেসের ভিতরে দলাদলি যে এখনও হয় নি তা এই নির্বাচনেও দেখা গেছে। ২৪ জন কংগ্রেস-কর্মীকে দল থেকে বিতাড়িত করতে হয়েছে। তাঁরা সকলেই কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। শ্রীভগবৎদয়াল শর্মার পুরানো নির্বাচনকেন্দ্র যমুনানগর থেকে শ্রীমতী শান্নো দেবীর পরাজয়ের পিছনে শ্রীশর্মার হাত আছে বলে অনেকে সন্দেহ করছেন।

প্যারিসে ভিয়েতনাম আলোচনা

প্যারিসে সীন নদীর বাম তীরে যখন ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ চলছিল তখন এই নদীর ডান তীরে ক্লেবার এ্যাভিন্যুয়ে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। আলোচনা যেদিন আরম্ভ হল তার আগের দিন ছিল রবিবার, বৈশাখী পূর্ণিমার দিন — গৌতম বুদ্ধের ২৫১২তম জন্মদিবস। সেদিন প্যারিসবাসী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভিয়েতনামীরা একত্রিত হয়ে এই আলোচনার সাফল্য কামনা করে প্রার্থনা করেছেন।

"সরকারী কথাবার্তা" বলে বর্ণিত এই আলোচনায় মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করছেন ৭৬ বৎসর বয়স্ক ধুরন্ধর কূট-

কূটনীতিবিদ অ্যাভারেল হ্যারিম্যান আর উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করছেন ৫৫ বৎসর বয়স্ক কবি-বিপ্লবী জুয়ান থুই। আলোচনার যেটুকু বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, এখন পর্যন্ত উত্তর ভিয়েতনাম মনে করে, অন্য কোনরকম আলোচনায় প্রবেশ করার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণ ও সেই দেশের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার যুদ্ধাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। অপরপক্ষে মার্কিন বক্তব্য হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামের এই দাবী মেনে নেওয়ার আগে স্পষ্টভাবে জানতে চাইবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যবস্থা অবলম্বন করলে দক্ষিণ ভিয়েতনামে "অনুপ্রবেশের" ব্যাপারে, সৈন্যমুক্ত এলাকা লংঘন করার ব্যাপারে উত্তর ভিয়েতনাম কি সংযম অবলম্বন করবে। হ্যানয়ের মুখপাত্র পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, তাঁরা অগ্রিম কোন প্রতিশ্রুতিই দেবেন না। উত্তর ভিয়েতনামের একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, "আক্রমণকারীকে কোন মুক্তিশুল্ক দেওয়া হবে না। আমরা আমাদের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও পুনরেকীকরণের জন্য লড়াই করছি। কোনরকম আপোষ করা হবে না।"

এখন পর্যন্ত অন্ততপক্ষে দুই তরফের প্রকাশ্য ঘোষণায় দেখা যাচ্ছে, এখানে এসে আলোচনা ঠেকে রয়েছে। তবে আশা করার মত লক্ষণও কিছু দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় আশার লক্ষণ এই যে, উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ করার প্রশ্নে সে দেশের প্রতিনিধিরা আলোচনা ভেঙ্গে দেন নি। (যেটা হতে পারে বলে কোন কোন পর্যবেক্ষক অনুমান করেছিলেন)। দুই পক্ষের আপাতবিরোধ সত্ত্বেও আলোচনা চলছে এবং প্রথম দুটি বৈঠকে সেই আলোচনা চলছে অনুত্তেজিত বিতর্কের আকারে। আর একটি ভাল লক্ষণ এই যে, উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধি দলকে সীন নদীর বাম তীরের যে হোটেলটিতে রাখা হয়েছে সেখান থেকে সরে তাঁরা প্যারিসের উপকণ্ঠে একটি ভিলায় উঠে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অনেকে অনুমান করেছেন যে, এই ধরনের কোন গৃহে উত্তর ভিয়েতনাম ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের মধ্যে নিভৃত আলোচনার সুযোগ বেশী পাওয়া যাবে। যদি এই অনুমান ঠিক হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, আনুষ্ঠানিক বৈঠকে যাই হোক না কেন, এই ধরনের ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে বোঝাপড়ার একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যাওয়ার আশা আছে।

*

কলকাতা কর্পোরেশনের প্রায় দশ লাখ টাকা মূল্যের মোটরের যন্ত্রপাতি ও বিজলী বাতির বাল্‌ব্‌ খোয়া গেছে। এইসব খোয়া-যাওয়া জিনিসের কিছু কিছু কানপুর ও মীরাটের বাজারে বিক্রী হতে দেখা গেছে।

বৈষয়িক-প্রসঙ্গ

পরিকল্পনা চিন্তা

সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে কোন সঙ্গতি স্থাপন করা সম্ভব না হওয়ার ফলে ১৯৬৮-৬৯ সালের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত রচনা করা সম্ভব হয়নি।

বার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া মার্চ মাসের শেষ নাগাদ সংসদে পেশ করার এবং ১ এপ্রিল থেকে এর কাজ আরম্ভ হয়ে যাবার কথা ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কয়েকটি রাজ্য, যেমন মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, অন্ধ্র প্রদেশ, মহীশূর, রাজস্থান, বিহার ও উত্তর প্রদেশ, তাদের বার্ষিক পরিকল্পনার জন্যে যে পরিমাণ বরাদ্দ ধরেছেন সেই পরিমাণে অর্থ সংস্থান করা সম্ভব নয়।

পরিকল্পনা কমিশন সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যের বর্তমান বছরের বাজেট পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁরা দেখতে পেয়েছেন রাজ্যগুলি হয় তাদের সম্পদের হিসাব অনেক বেশি করে ধরেছেন, আর না হয় বিরাট ঘাটতি রেখে বড় আকারের পরিকল্পনা রচনা করেছেন। কেন্দ্রীয় সাহায্যের ওপর রাজ্যগুলির দাবীও অনেক বেশি।

কমিশন বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এই অসুবিধাগুলি দূর করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু রাজ্যগুলি যদি তাদের দাবীতে অটল থাকে তাহলে পরিকল্পনা রচনা বেশ মুস্কিল হয়ে পড়বে।

তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা যায়নি বলেই বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ১৯৬৮-৬৯ সালের প্রস্তাবিত বার্ষিক পরিকল্পনার আগে আরো দুটি বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছিল। কথা আছে চতুর্থ পরিকল্পনা ১৯৬৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে শুরু হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনার দিকে কোন পথে যাওয়া সবচেয়ে উপযোগী তা নিয়ে আলোচনার জন্যে ১৭ মে নয়াদিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠক বসে। বৈঠকে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ ডি আর গ্যাডগিল বলেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনার সম্পদ সংকটের কিছুটা সুরাহা প্রতিরক্ষা দপ্তরের ব্যয় সংকোচ করে করা যায় কিনা সেটা ভেবে দেখা দরকার। তিনি বলেন, প্রতিরক্ষা ব্যয়ের সঙ্গে 'আভ্যন্তরীণ শিল্পোন্নয়নের একটা অর্থপূর্ণ সঙ্গতি থাকা দরকার।

ডঃ গ্যাডগিল তাঁর বক্তৃতায় চারটি মূল বিষয়ের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন : (১) যাতে আরো বেশি বিনিয়োগ করা যায় তার জন্যে অতিরিক্ত সম্পদের সংস্থান করতেই হবে; (২) আমদানী দ্রব্যের বিকল্প তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (৩) নিজেদের ভোগের পরিমাণ কম করে হলেও রপ্তানী বাড়াতে হবে; (৪) খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে যাতে দুর্বৎসরেও কোন বিশেষ অসুবিধা না হয়।

অতিরিক্ত সম্পদ জোগাড়ের উপায় হিসেবে ডঃ গ্যাডগিল পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয় হ্রাস এবং সরকার-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির আয় বৃদ্ধির চেষ্টার ওপর জোর দিয়েছেন।

এই সঙ্গে কৃষকরাও যাতে তাদের বর্ধিত আয় উন্নয়নমূলক কাজকর্মেই জন্যে ব্যয় করে তিনি তার ওপর জোর দেন। এই প্রসঙ্গে গ্রামীণ সঞ্চয়কে কাজে লাগাবার জন্যে ডিবেঞ্চার চালু করার সুপারিশ করেন।

ডঃ গ্যাডগিলের বক্তৃতার নির্গলিতার্থ হল, পরিকল্পনাকে এমন একটা নতুন গতি দিতে হবে যাতে সকল ক্ষেত্রের মানুষই পরিকল্পনার কল্যাণ ভোগ করতে পারে।

তিনি এই প্রসঙ্গে ভূমি সংস্কারের ওপর জোর দেন এবং বলেন সুসম উন্নয়নের জন্যে সারা দেশে অর্থনৈতিক ইনফ্রা-স্ট্রাকচার (কাঠামো) মজবুত করে তৈরী করতে হবে।

ডঃ গ্যাডগিল বলেন ইনফ্রা-স্ট্রাকচার তৈরী করলে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে। আমাদের অর্থনীতির অবস্থা এমন নয় যে, লোককে চাকরী দেবার জন্যে চাকরী দেওয়া যায়। কর্মসংস্থানের প্রশ্নটিকে উন্নয়ন কর্মের সঙ্গে এক করে দেখতে হবে।

তিনি পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণের এবং স্থানীয় ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচনার ওপর জোর দেন। এই সঙ্গে তিনি বেসরকারী উদ্যোগ সম্পর্কে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যতদূর সম্ভব বেসরকারী উদ্যোগের পথ থেকে বাধা ও অসুবিধাগুলি দূর করার জন্যে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে।

মেমসাহেব

নিমাই ভট্টাচার্য

(১৫)

দোলাবৌদি,

আমাকে কিছু করতে হলো না, মেমসাহেব আমার একটা অ্যাটাচি'র মধ্যে দু'দিনের জন্য দুজনের প্রয়োজনীয় সব কিছু ভরে নিয়েছিল। আমি দু'একবার এটা ওটা নেবার কথা বলেছিলাম। ও বলেছিল, তুমি চুপ করো তো!

আমি চুপ করেছিলাম। রাত্রে আমেদাবাদ মেল ধরে পরদিন ভোরবেলায় জয়পুরে পৌঁছলাম।

ট্রেনে?

ট্রেনের কথা কি লিখব? সেকেন্ড ক্লাশে গিয়েছিলাম। কম্পার্টমেন্টে আরো প্যাসেঞ্জার ছিলেন। অনেক কিছুই তো ইচ্ছা করেছিল কিন্তু...। তবে দুজনে এক কোনায় বসে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করেছিলাম। মেমসাহেবকে শুতে বলেছিলাম কিন্তু রাজী হয়নি। ও বলেছিল, তুমি শোও। আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

'না, না, তা হয় না।'

'কেন হবে না?'

'তুমি জেগে থাকবে আর আমি ঘুমাব?'

'আগে তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। পরে আমি ঘুমাব।'

আমার ঘুমুতে ইচ্ছা করছিল না। তাই বললাম, তাছাড়া এইটুকু জায়গায় কি ঘুমান যায়?

'এইত আমি সরে বসছি। তুমি আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়।'

আমার হাসি পেল।

'হাসছ কেন?'

হাসতে হাসতেই আমি জবাব দিলাম, 'রেলের এই কম্পার্টমেন্টেও কি তুমি আমাকে আদর করবে?'

ও রেগে গেল। 'বেশ করব। একশ'বার করব। আমি কি পরপুরুষকে আদর করছি?'

মেমসাহেব একটু সরে বসল। আমি ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম।

ও আমার মাথায় মুখে হাত দিয়ে আদর করে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা শুরু করল। কয়েক মিনিট বাদে মুখটা আমার মুখের পর এনে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ঘুমুচ্ছ?'

'না।'

'ঘুমুবে না?'

'না'।

'কেন?'

'এত সুখে, এত আনন্দে ঘুম আসে না।'

এবার মেমসাহেব হাসল। জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি ভাল লাগছে?'

'খুব ভাল লাগছে।'

ও চুপ করে যায়। কিছুপরে ও আবার হুমড়ি খেয়ে আমার মুখের পর পড়ল। বললো, 'একটা কথা বলব?'

'বল'।

'তুমি রোজ এমনি করে আমার কোলের পর মাথা রেখে শোবে, আর আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেব।'

'কেন?'

'কেন আবার? আমার ইচ্ছা করে, ভাল লাগে।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। ওর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে হাসছিলাম।

মেমসাহেব দু'হাত দিয়ে আমার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, 'হাসছ কেন?'

'এমনি।'

'না, তুমি অমন করে হাসবে না!'

'বেশ।'

মেমসাহেব আবার আমার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আমার ভীষণ ভাল লাগছিল। এত ভাল লাগছিল যে সত্যি সত্যিই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভেঙেছিল একেবারে ভোরবেলায়। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে চারটে। মেমসাহেবও ঘুমুচ্ছিল। দু'হাতে আমার মুখটা জড়িয়ে ধরে মাথাটা হেলান দিয়ে বসে বসেই ঘুমুচ্ছিল। ভীষণ লজ্জা, ভীষণ কষ্ট লাগল। আমি উঠে বসতেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। আমি কিছু বলবার আগেই ও জিজ্ঞাসা করল, 'উঠলে যে?'

আমি ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কটা বাজে জান?'

'কটা?'

'সাড়ে চারটে!'

'তাই বুঝি!'

'তুমি সারা রাত্রি এইভাবে বসে বসেই কাটালে?'

ঐ আবছা আলোতেই আমি দেখতে পেলাম একটু হাসিতে মেমসাহেবের মুখটা উজ্জ্বল হয়েছিল। বললো, 'তাতে কি হলো?'

আমি রেগে বললাম, 'তাতে কি হলো?' সারা রাত্রি আমি মজা করে শুয়ে রইলাম আর তুমি বসে বসে কাটিয়ে দিলে?'

শান্ত স্নিগ্ধ মেমসাহেব আমার মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, 'রাগ করছ কেন? বিশ্বাস কর, আমার একটুও কষ্ট হয়নি।'

আমি উপহাস করে বললাম, 'না, না, কষ্ট হবে কেন? বড্ড আরামে ঘুমিয়েছ।'

আবার সেই মিষ্টি হাসি, স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠ। 'আরাম না হলেও আনন্দ তো পেয়েছি।'

জান দোলাবৌদি, পোড়াকপালী এমনি করে ভালবেসে আমার সর্বনাশ করেছে।

জয়পুরে গিয়ে কি করেছিল জান? হোটেলে গিয়ে স্নান করে ব্রেকফাস্ট খাবার পর আমি বললাম, 'কাপড়-চোপড় পালটে নাও।'

'কেন?'

'কেন আবার? ঘুরতে বেরুব।'

'কোথায় আবার ঘুরবে?'

'জয়পুরে এসে সবাই যেখানে ঘুরতে যায়।'

ও বললো, 'আমি তো অম্বর প্যালেস হাওয়া মহল দেখতে আসিনি।'

'তবে জয়পুরে এলে কেন?'

'কেন আবার? তোমাকে নিয়ে বেড়াতে এলাম। এতদিন ধরে পরিশ্রম করছ। তাই একটু বিশ্রাম পাবে বলে জয়পুরে এলাম।'

আমি বললাম, 'দিল্লীতেই তো বিশ্রাম করতে পারতাম।'

'ভাবলাম আমার সঙ্গে একটু বাইরে গেলে আরো ভাল লাগবে, তাই এলাম।'

লনের এক কোনায় একটা গাছের ছায়ায় বসে বসে সারা সকাল কাটিয়ে দিলাম আমরা।

'ওগো তুমি যখন গাড়ি কিনবে তখন প্রত্যেক উইক-এন্ডে আমরা বাইরে বেরুব। কেমন?'

আঙুল দিয়ে নিজের দিকে দেখিয়ে বললাম, 'আমি গাড়ী কিনব?'

'তবে কি আমি কিনব?'

'তুমি কি পাগল হয়েছ?'

'কেন তুমি বুঝি গাড়ী কিনবে না?'

'দূর পাগল! আমি গাড়ী কেনার টাকা পাব কোথায়?'

ও যেন সত্যি একটু রেগে গেল। 'তুমি কথায় কথায় আমায় পাগল পাগল বলবে না তো!'

'পাগলের মত কথা বললেও পাগল বলব না?'

ভ্রূ কুঁচকে ও প্রায় চীৎকার করে বললো না।'

একটু পরে আবার বললো, 'গাড়ি কেনবার কথা বলায় পাগলামি কি হলো?'

আমি একটা সিগরেট ধরিয়ে ওর মুখে ধুমা ছেড়ে বললাম, 'কিছু না!'

আশ্চর্য আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ও বললো, 'দেখ না এক বছরের মধ্যে তোমার গাড়ি হবে।'

'তুমি জান?'

'একশ'বার জানি।'

একটু পরে আবার কি বললো জান? মেমসাহেব আমার গা ঘেঁষে বসে আমার কাঁধের পর মাথা রেখে আদো আদো স্বরে বললো, 'ওগো, তুমি আমাকে ড্রাইভিং শিখিয়ে দেবে?'

ও তখন বোয়িং সেভেন-জিরো-সেভেনের চাইতেও অনেক বেশী গতিতে উপরে উঠছিল। সুতরাং আমি অযথা বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা না করে বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

মনে মনে আমার হাসি পাচ্ছিল কিন্তু অনেক চেষ্টায় সে হাসি চেপে রেখে বেশ স্বাভাবিক হয়ে জানতে চাইলাম, 'কি গাড়ী কিনতে চাও?'

আমার প্রশ্নে ও খুব খুশী হলো। হাসিতে মুখটা ভরে গেল। টানা টানা চোখ দুটো যেন আরো বড় হলো। বললো, 'তোমার কোন গাড়ি পছন্দ?'

ওকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বললাম, 'গাড়ী কিনলে তো তোমার পছন্দ মতই কিনব।'

ও মনে মনে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছিল। তাইতো মুহূর্তের মধ্যে উত্তর দিল, 'স্ট্যান্ডার্ড হেরল্ড!'

'তোমার বুঝি স্ট্যান্ডার্ড হেরল্ড খুব পছন্দ', আমি জানতে চাইলাম।

'গাড়ীটা দেখতেও ভাল তাছাড়া......'

মেমসাহেব এগুতে গিয়ে একটু থামল। তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাছাড়া কি?'

হাসি হাসি মুখে ও উত্তর দিল, 'ঐ গাড়িটা যে টু-ডোর।'

'তাতে কি হলো?'

যেন মহা বোকামি করেই ঐ প্রশ্নটা করেছিলাম। ও বললো, 'বাঃ, তাতে কি হলো?'

খুব সিরিয়াস হয়ে বললো, 'বাচ্চাদের নিয়ে ঐ গাড়ীতে যাওয়ায় কত সুবিধা জান? হঠাৎ দরজা খুলে পড়ে যাবার কোন ভয় নেই, তা জান?'

মেমসাহেবের কল্পনার বোয়িং সেভেন-জিরো-সেভেন তখন চল্লিশ হাজার ফুট উপরে উড়ছে। তাছাড়া প্রায় সাড়ে পাঁচশ-ছ'শো মাইল স্পীডে ছুটে চলেছিল। আমি সেই উড়ো জাহাজের কো-পাইলট হয়েও ওকে পালামের মাটিতে নামাতে পারলাম না। মনে মনে কষ্ট হলো। তাছাড়া আগামী দিনের ওর স্বপ্ন হয়ত আমারও ভাল লেগেছিল। মুখে শুধু বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।'

দুপুর বেলা লাঞ্চের পর দুজনে শুয়ে শুয়ে আরো কত গল্প করলাম, কত গল্প শুনলাম!......

'ওগো, খোকনের খুব ইচ্ছা একবার তোমার কাছে আসে।'

আমি বললাম, 'পাঠিয়ে দিও না।'

'না, না, এখন না। আগে আমাদের সংসার হোক, তারপর আসবে।'

আমি জানতে চাইলাম, 'আচ্ছা মেমসাহেব, তুমি খোকনকে খুব ভালবাস, তাই না?'

মেমসাহেব বললো, 'কি করব বল? কাকাবাবুকে তো আমরা কোনদিনই ভাড়াটে ভাবি না। কাকিমা বেঁচে থাকলে হয়ত অত মেলামেশা ভাব হতো না। তাছাড়া কাকাবাবু অফিস আর টিউশানি নিয়ে প্রায় সারাদিনই বাড়ীর বাইরে। তাই আমরা ছাড়া খোকনকে কে দেখবে বলো?'

আমি বললাম, 'তাতো বুঝলাম কিন্তু তুমি খোকনকে একটু বেশি ভালবাস।'

পাশ ফিরে শুয়ে আমাকে আর একটু কাছে টেনে নিয়ে ও বললো, 'কেন তোমার হিংসা হয়?'

আমি উত্তর দিলাম, 'আমার হিংসা হবে কেন?'

আমিও একটু পাশ ফিরে শুলাম। বললাম, 'গতবার খোকন যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল, তখন তুমি কি কান্ডটাই না করলে?'

'করব না? আমরা ছাড়া ওর কে আছে বল?'

'আমরা, আমরা বলছ কেন? বল আমি ছাড়া কে করবে?'

ও কোন উত্তর দিল না। শুধু হাসল। একটু পরে আমার মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, 'আমি বাড়ীর মধ্যে সব চাইতে ছোট। কেউ আমাকে দিদি বলে ডাকে না। ছোটবেলা থেকেই আমার একটা ভাই'এর শখ।......'

'তাই বুঝি?'

কি যেন ভেবে ও হাসল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'হাসছ কেন?'

'ছোটবেলার একটা কথা মনে হলো।'

'কি কথা?'

মেমসাহেব আবার হাসল। বললো, 'ছোটবেলায় একটা ভাই দেবার জন্য আমি মা'কে খুব বিরক্ত করতাম।'

আমি হাসলাম।

হাসতে হাসতেই ও বললো, 'সত্যি বলছি, অনেকদিন পর্যন্ত একটা ভাই দেবার জন্য মাকে বিরক্ত করেছি। আর আমি যেই ভাই'এর কথা বলতাম সঙ্গে সঙ্গে দিদিরা চলে যেত আর মা আমাকে বকুনি দিয়ে ভাগিয়ে দিতেন।'

'তাই বুঝি তুমি খোকনকে এত ভালবাস?'

'অনেকটা তাই। তাছাড়া খোকন ছেলেটাও ভাল আর আমাকেও ভীষণ ভালবাসে।'

'সেকথা সত্যি।'

ও চট করে আমার ঠোঁটে একটু ভালবাসার স্পর্শ দিয়ে বললো, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

পরে আবার মেমসাহেব বলেছিল, 'সকাল বেলায় ধুতি পাঞ্জাবি পরে খোকন যখন কলেজে যায়, তখন আমার ভীষণ ভাল লাগে।'

'লাগবেই তো! নিজে হাতে, নিজের স্নেহ দিয়ে যাকে এত বড় করেছ, সেই ছেলে বড় হলে, ভাল হলে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।'

একটু থামি, একটু হাসি। ও জিজ্ঞাসা করল, 'আবার হাসছ কেন?'

'এমনি।'

'এমনি কেন?'

আবার হাসলাম, আবার বললাম, 'এমনি।'

মেমসাহেব পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল। 'এমনি কেন হাসছ বল না!'

হাসতে হাসতেই আমি বললাম, 'বলব?'

'বলো।'

আবার হাসলাম। বললাম, 'সত্যি বলব?'

মেমসাহেব কনুই'এর ভর দিয়ে আমার মুখের পর হুমড়ি খেয়ে বললো, 'বলছি তো বল না।'

দু'হাত দিয়ে ওর মুখটা টেনে নিয়ে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাদের খোকন কবে হবে?'

মেমসাহেবও আমার কানে কানে বললো, 'তুমি যেদিন চাইবে?'

'সিওর?'

'সিওর।'

ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ।'

ও হাসতে হাসতে উত্তর দিল, 'নট, অ্যাট অল! ইট উইল বী মাই প্লেজার।'

'আর ইউ সিওর ম্যাডাম?'

'ইয়েস স্যার, আই এ্যাম সিওর।'

এই কথার পর দুজনেরই যেন কি হলো। কি যেন সব দুষ্টুমি বুদ্ধির ঝড় উঠল দুজনেরই মাথায়। সেদিন দুপুরে ঐ শান্ত স্নিগ্ধ মেমসাহেব যে কি কান্ডটাই করল! পরে আমি বলেছিলাম, 'জান মেমসাহেব তোমাকে দেখে বুঝা যায় না তোমার মধ্যে এত দুষ্টুমি বুদ্ধি লুকিয়ে আছে।'

ও পাশ ফিরে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে বললো, 'বাজে বকো না।'

পরের দিন ভোরবেলায় এলাম সিমিলসের। লেকের ধারে পাহাড়ের পর এককালের রাজপ্রাসাদ এখন সরকারী পান্থশালা। দোতলার ম্যানেজারের খাতায় নাম ধাম লিখে ঘরের চাবি নিয়ে তিনতলার ছাদে এসে দাঁড়াতেই মেমসাহেব লেক আর পাহাড় দেখে মুগ্ধ হলো। বললো, 'চমৎকার।'

মাথায় ঘোমটা, কপালে বিরাট সিঁদুরের টিপ, চোখে সানগ্লাস দিয়ে মেমসাহেবকে এই পরিবেশে আমার যেন আরো হাজার হাজার গুণ ভাল লাগল। আমি বললাম, 'সত্যি চমৎকার!'

'তা আমার দিকে তাকিয়ে বলছ কেন?'

'এই লেক, পাহাড় আর এই রাজপ্রাসাদের চাইতেও তোমাকে বেশি ভাল লাগছে।'

আমার প্রশংসা গ্রাহ্য না করে ও ছাদের চারপাশ ঘুরে ঘুরে লেক আর পাহাড় দেখছিল। ইতিমধ্যে ছাদের ওপাশ থেকে অকস্মাৎ এক সদ্য বিবাহিতা মহিলা মেমসাহেবের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা বাঙালী।'

ও একবার ঘাড় বেঁকিয়ে সানগ্লাসের মধ্য দিয়ে আমাকে দেখে নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ।' একটু থেমে জানতে চাইল, 'আপনি ?'

ভদ্রমহিলা ছত্রিশ পাটি দাঁত বার করে বললেন, 'আমরাও বাঙালী।'

আমি মনে মনে বললাম, এখানেও কি একটু নিশ্চিন্তে থাকতে পারব না ?

ভদ্রমহিলা থামলেন না। আবার প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় থাকেন আপনারা ?'

মেমসাহেব অস্বস্তিবোধ করলেও ভদ্রমহিলার আগ্রহের তৃষ্ণা না মিটিয়ে আসতে পারছিল না। বললো, 'দিল্লী।'

'দিল্লীতে ? কোথায় ? লোদী কলোনী ?'
'না, ওয়েস্টার্ণ কোর্টে।'

'আপনার স্বামী কি গভর্ণমেন্টে আছেন ?'

'না, উনি জার্নালিস্ট।'

বেয়ারা ঘরের দরজা খুলে অ্যাটাচিটা রেখে দিল। আমি এবার ডাক দিলাম, 'শোন।'

মেমসাহেব মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে বললো, 'এখন আসি। পরে দেখা হবে।'

'আমরা আজ বিকেলেই আজমীর চলে যাব।'

'আজই ?' মেমসাহেব মনে মনে দুঃখ পাবার ভান করল।

ও ঘরের দরজায় আসতেই আমি বললাম, 'তুমি ওকে বলো এক্ষুনি বিদায় নিতে।'

সানগ্লাসটা খুলতে খুলতে ও বললো, 'আঃ, শুনতে পাবেন।'

মেমসাহেব চুল খুলতে বসল। আমি বাথরুমে ঢুকলাম। স্নান সেরে বেরিয়ে আসতেই ও আমাকে বললো, 'তুমি সাবান, তোয়ালে নিয়ে যাওনি ?'

'বাথরুমেই তো ছিল।'

'ওতো হোটেলের।'

'তাতে কি হলো ? সাবান তোয়ালে নতুন সাবান ব্যবহার করলে কি হয়েছে ?'

'কিছু হোক আর নাই হোক, আমার তোয়ালে-সাবান থাকতে তুমি কেন হোটেলের জিনিস ব্যবহার করবে ?'

মেমসাহেবও স্নান সেরে নিল। বেয়ারাকে ডেকে বললাম, নাস্তা লে আও।

ব্রেক ফাস্ট খেয়ে সোফায় এসে বসলাম দুজনে। মেমসাহেবকে বললাম, 'একটা গান শোনাও।'

'চারিদিকে লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। এখন নয়, সন্ধ্যাবেলায় পাহাড়ের পাশ দিয়ে লেকের ধারে বেড়াতে বেড়াতে তোমাকে অনেক গান শোনাব।'

সেদিন সারাদিন মেমসাহেবের গলায় রবীন্দ্রসংগীত শোনা হয়নি সত্য। কিন্তু ভবিষ্যত জীবনের সংগীত রচনা করেছিলাম দুজনে।......

'ওগো, এরপর তোমার আর কিছু আয় বাড়লেই তুমি একটা থ্রি-রুম ফ্ল্যাট নেবে।'

'এখনই ফ্ল্যাট নিয়ে কি হবে ?'

'দুজনেই আস্তে আস্তে সংসারের সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে নেব।'

'তাছাড়া থ্রি-রুম ফ্ল্যাট নিয়ে কি হবে ? একটা ঘরের একটা ছোট্ট ইউনিট হলেই তো যথেষ্ট।'

'না, না, তা হয় না। একটা ঘরের ফ্ল্যাটে আমাদের দুজনেরই তো হাত-পা ছড়িয়ে থাকা অসম্ভব।'

'দুজন ছাড়া তিনজন পাচ্ছ কোথায় ?'
এবার মেমসাহেবের সব গাম্ভীর্য উধাও হয়ে গেল। হাসতে হাসতে বললো, 'তোমার মত ডাকাতের সঙ্গে সংসার করতে শুরু করলে দু'জন থেকে তিনজন, তিনজন থেকে চারজন পাঁচজন হতেও সময় লাগবে না।'

ওর কথা শুনে আমি স্তম্ভিত না হয়ে পারলাম না। অবাক বিস্ময়ে আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম।
'অমন হাঁ করে কি দেখছ ?'
'তোমাকে।'
'আমাকে ?'
মাথা নেড়ে বললাম, 'হুঁ, তোমাকে।'

'আমাকে কোনদিন দেখনি ?'

ওর দিকে চেয়ে চেয়েই বললাম, 'দেখেছি।'

এবার মেমসাহেবও একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চাইল। 'তবে অমন করে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখছ ?'

আমি দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা তুলে ধরে বললাম, 'জান মেমসাহেব, তুমি নিশ্চয়ই সুখী সার্থক স্ত্রী হবে। কিন্তু সন্তানের জননী হিসাবে বোধহয় তোমার তুলনা হবে না।'

মেমসাহেব প্রথমে ধীরে ধীরে দৃষ্টিটা নামিয়ে নিল। তারপর আলতো করে মাথাটা আমার বুকের পর রাখল। দুটো আঙুল দিয়ে পাঞ্জাবির বোতামটা ঘুরাতে ঘুরাতে বললো, 'আমার যে ছেলেমেয়ের ভীষণ শখ। রাস্তা-ঘাটে ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা দেখলেই মনে হয়......'

'যদি তোমার হতো, তাই না ?'

মেমসাহেব আমার কথায় সম্মতি জানিয়ে মাথা নেড়ে হাসল। তারপর আস্তে আস্তে ওর মুখটা আমার কোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। আমার মনে হলো কি যেন লজ্জায় বলতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু বলবে ?'

মুখটা লুকিয়ে রেখেই আস্তে আস্তে বললো, 'তোমার ইচ্ছা করে না ?'

আমি হেসে ফেললাম। 'জান মেমসাহেব, স্বপ্ন দেখতে বড় ভয় হয়।'

আমার কোলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা মুখটা ঘুরিয়ে আমার দিকে চাইল। বললো 'কেন ভয় হয় ?'

'জীবনে চলতে গিয়ে বারবার পিছনে পড়ে গেছি। তাইতো ভবিষ্যতের কথা ভাবতে, ভবিষ্যত জীবনের স্বপ্ন দেখতে ভয় হয়।'

ও হাত দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরে বললো, 'না, না, ভয়ের কথা বলো না। ভয় কি ?' একটু আতঙ্কে, একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জানতে চাইল, 'আমি কি তোমার হবো না ?'

এবার আমি ওর মুখটা চেপে ধরে বললাম, 'ছি, ছি, ওসব আজেবাজে কথা ভাবছ কেন ? তুমি তো আমারই।'

ওর মুখে তখনও বেশ চিন্তার ছাপ। বললো, 'সে তো জানি কিন্তু তবুও তুমি ভয় পাচ্ছ কেন ?'

আমি দু'হাত দিয়ে ওকে বুকের মধ্যে তুলে নিলাম। সান্ত্বনা জানালাম, 'কিছু ভয় করো না। তোমার স্বপ্ন, তোমার ভালবাসা কোনদিন ব্যর্থ হতে পারে না।'

একটু ব্যাকুলতা মেশানো স্বরে বললো, 'সত্যি বলছ ?'

'একশ'বার বলছি। যদি বিধাতার ইচ্ছা না হতো তাহলে কি ঐ আশ্চর্যভাবে আমাদের দেখা হতো ? নাকি এমনি করে আজ আমরা সিলিসের লেকের পাড়ে মিলতে পারতাম ?'

'আমারও তো তাই মনে হয়। যদি ভগবানের কোন নির্দেশ, কোন ইঙ্গিত না থাকত তাহলে সত্যি আমরা কোনদিন মিলতে পারতাম না।'

'তবে এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন ?'

অনুযোগের সুরে মেমসাহেব বললো, 'তুমিই তো ঘাবড়ে দিচ্ছ।'

'ঘাবড়ে দিচ্ছি না, সতর্ক করে দিচ্ছি।'
দু' আঙুল দিয়ে আমার গালটা চেপে ধরে বললো, 'কি আমার সতর্ক করার ছিরি !'

দোলাবৌদি, সেই অরণ্য আর পর্বতের কোলে যে দুটি দিন কাটিয়েছিলাম, তা আমার জীবনের মহা স্মরণীয় দিন। এত আপন করে, এত নিবিড় করে মেমসাহেবের

এত ভালবাসা আমি এর আগে কোনদিন পাইনি। ঐ দুটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত মেমসাহেবের ভালবাসা আর উষ্ণ সান্নিধ্য উপভোগ করেছিলাম . আমি। তাইতো তৃতীয় কোন ব্যক্তির সাহচর্যে আসতে মন চায়নি।

মেমসাহেব বলেছিল, 'অনেক বেলা হলো। চলো লাঞ্চ খেয়ে আসি।'

আমি সোজা জানিয়ে দিয়েছিলাম, 'আমি ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছি না।'

'তবে ?'

'তবে আবার কি? বেয়ারাকে ডেকে বল ঘরে খাবার দিয়ে যেতে।'

আমি অতীত দিনের রাজপ্রাসাদের রাজকুমারের শয়নকক্ষে মহারাজার মত শুয়ে রইলাম। ও বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বললো, 'সাহাবকা তবিয়ত আচ্ছা নেই হ্যায়। মেহেরবাণী করকে খানা ইধারই লে-আনা।'

'জি হুকুম মেমসাব।'

ঘরে খাবার এসেছিল। সেন্টার টেবিলে খাবার-দাবার সাজিয়ে ও ডাক দিয়েছিল, 'এসো খেতে এসো।'

বড় সোফায় দুজনে পাশাপাশি বসে খেয়েছিলাম। খেতে খেতে এক টুকরো নরম মাংস আমার মুখে তুলে দিয়ে বলেছিল, 'এই নাও খেয়ে নাও।'

'তুমি খাও না।'

'আমি দিচ্ছি, তুমি খাও না।'

মাংসের টুকরোটা খাবার সময় ওর দুটো আঙুলে কামড় দিয়ে বললাম, 'তোমাকেও খেয়ে ফেলি।'

হাসতে হাসতে বললো, 'আমাকে কি খেতে বাকি রেখেছ?'

খেয়ে-দেয়ে ও একটা চাদর গায় দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। সতর্ক করে দিল, 'এখন চুপটি করে ঘুমোও, একটুও বিরক্ত করবে না।'

'সত্যি ?'

'সত্যি নয়ত কি মিথ্যে ?'

আমি একটু ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'বিরক্ত না করে যদি তোমাকে সুখী করি?'

আমাকে হাত দিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে হেসে বললো, 'দূরে থেকে সুখী করো।'

'অনেক দূরে সরে যাব?'

'হ্যাঁ, যাও।'

'তাই কি হয়? তোমার কষ্ট হবে।'

বুড়ো আঙুলটা দেখিয়ে বললো, 'কলা হবে। দেখি কেমন যেতে পার!'

মেমসাহেব জানত ও পাশ ফিরে শুয়ে থাকতে পারবে না, আমিও দূরে সরে থাকব না। ওর মনের কথা আমি জানতাম, আমার মনের কথাও ও জানত। তবুও হয়ত একটু বেশি আদর, একটু বেশি ভালবাসা পাবার জন্য ও এমনি দুষ্টুমি করতে ভালবাসত। আমারও মন্দ লাগত না।

পরের দিন সারা গেস্ট হাউস ফাঁকা হয়েছিল। শুধু আমরা দুজন আর দোতলায় এক বৃদ্ধ দম্পতি ছাড়া আর কোন গেস্ট ছিল না।

সন্ধ্যাবেলায় আমরা দুজনে লেকের ধারে দিয়ে পাহাড় আর অরণ্যের মধ্যে কত ঘুরে বেড়িয়েছিলাম! মেমসাহেব কত গান শুনিয়েছিল। রাত্রে ফিরে এসে ছাতের কোণে লেকের মিষ্টি হাওয়ায় বসে বসে দুজনে ডিনার খেলাম। তারপর লাইটগুলো অফ করে দিয়ে বিরাট মুক্ত আকাশের তলায় বসে রইলাম আমরা . দুজনে। আকাশের তারাগুলো মিট-মিট করে জ্বললেও সেদিন ঐ আবছা অন্ধকারে আমাদের দুজনের মনের আকাশ পূর্ণিমার আলোয় ভরে গিয়েছিল।

আশ-পাশে দুনিয়ার আর কোন জনপ্রাণী ছিল না। মনে হয়েছিল শুধু আমরা দুজনেই যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক। ভগবান যেন আমাদের মুখ চেয়ে, আমাদের শান্তির জন্য আর সবাইকে ছুটি দিয়েছিলেন এই পৃথিবী থেকে অন্য কোথাও একটু ঘুরে আসতে।

জনারণ্যের বাইরেও এর আগে কয়েকবার মেমসাহেবকে কাছে পেয়েছি কিন্তু এমন করে কাছে পাইনি। এত পূর্ণ, পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণভাবে আগে পাইনি।

'মেমসাহেব, ভুলে যাবে নাতো এই রাত্রির কথা?'

বোতল বোতল ভালবাসার হুইস্কি খেয়ে মেমসাহেবের এমন নেশা হয়েছিল যে কথা বলার ক্ষমতাও ছিল না। তাইতো শুধু মাথা নেড়ে বললো, 'না।'

'কোনদিন না?'

'না।'

'যদি কোনদিন তুমি আমার থেকে অনেক দূরে চলে যাও—

'তোমার এই ভালবাসা আর এই স্মৃতি বুকে নিয়ে কোথায় যাব বলো?'

'তবুও মানুষের অদৃষ্টের কথা তো বলা যায় না।'

জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একটু ভিজিয়ে নিল, দুটো দাঁত দিয়ে এ ঠোঁটের কোনাটা একটু কামড়ে নিল মেমসাহেব। তারপর বললো, 'তোমার এই ভালবাসা পাবার পর আর একজনের সঙ্গে সারাজীবন ধরে ভালবাসার অভিনয় করতে আমি পারব না।'

একটু থামল। আমাকে আর একটু কাছে টেনে নিল। একটু বেশি শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললো, 'তাছাড়া তোমার জীবনটা সর্বনাশ করে আর একজনকে আবার ঠকাব কেন?' একটু জোর গলায় বলে উঠল, 'না, না, আমি তা কোনদিন পারব না।'

আমিও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। আমিও বেশ জোর করে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। একটু যেন ভেজা গলায় বলেছিলাম, 'সত্যি বলছি মেমসাহেব, ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি সে দুর্দিন যেন কোনদিন না আসে। কিন্তু যদি কোনদিন আসে সেদিন আমি আর বাঁচব না। হয় উন্মাদ হবো নয়ত তোমার স্মৃতি বুকে নিয়েই এই লেকের জলে চিরকালের জন্য ডুব দেব।'

ও তাড়াতাড়ি আমার মুখটা চেপে ধরল। বললো, 'ছি, ছি, ওকথা মুখে আনে না। এই তোমার বুকে হাত দিয়ে বলছি আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।'

একটু থেমে, আমাকে একটু আদর করে মেমসাহেব আবার বলেছিল, 'আমি যেতে চাইলেই তুমি আমাকে যেতে দেবে কেন? আমি না তোমার স্ত্রী? তোমার মনে কোন দ্বিধা, কোন চিন্তা থাকলে আজ এই রাত্তিরেই তুমি আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দাও, হাতে শাঁখা পরিয়ে দাও। আমি সেই শাঁখা-সিঁদুর পরেই কলকাতা ফিরে যাব।'

মেমসাহেবের কথায় আমার মন থেকে অবিশ্বাসের ছোট্ট ছোট্ট টুকরো টুকরো মেঘগুলো পর্যন্ত কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমার মুখটা হাসিতে ঝলমল করে উঠল। বললাম, 'না, না, আমার মনে কোন দ্বিধা নেই। তুমি যদি আমার না হতে তাহলে কি এমন হাসিমুখে তোমার সমস্ত সম্পদ, সব ঐশ্বর্য আর ভালবাসা এমন করে দিতে?'

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। হাতে ঘড়ি ছিল কিন্তু দেখার মনোবৃত্তি কারুরই ছিল না। ঘরে এসে আর মেমসাহেব পাশ ফিরে শুয়ে দূরে থাকেনি। এত আপন, এত নিবিড়, এত ঘনিষ্ঠ হয়েছিল সে রাত্রে যে সে কাহিনী লেখা সম্ভব নয়। শুধু জেনে রাখ আমাদের দুটি মন, দুটি প্রাণ, দুটি আত্মা আর আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধনা সব একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল সে চিরস্মরণীয় রাত্রে।

আজ আর লিখছি না।

ভালবাসা নিও।

তোমাদের বাচ্চু

কলকাতা

কলকাতা

কলকাতা

কলকাতা

কলকাতা

গরমের কলকাতা

স্পেন-ফেরতা একজন প্রাক্তন মন্ত্রী গরমকালের কলকাতার জন্যে জুতসই এক প্রেসক্রিপশন বাৎলেছেন। তাঁর কথা হল স্পেনের মত এদেশে, অন্ততপক্ষে গরমকালে, সকাল-সন্ধ্যেতে অফিস-আদালত আর স্কুল-কলেজের ব্যবস্থা কর, মাঝরাতের মত মাঝ দুপুরে সকলে 'ফিয়েস্তা'য় ডুব দাও, দেখবে 'গরমকালকে আনন্দকাল' বলে মালুম হবে।

স্পেনে তিনি দেখে এসেছেন, দুপুর বারটার পর অফিসপত্তর সব বন্ধ, রাস্তাগুলো ফাঁকা গড়ের মাঠ। গোটা দেশটা ফিয়েস্তা যাচ্ছে। তারপর সন্ধ্যেবেলায় আবার বন্ধ দরজাগুলো খুলে যায়, রাস্তাগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে, গাড়িঘোড়া সব ছুটোছুটি করে। মাঝদুপুর আর মাঝ-রাত্তিরকে ও'রা একই পর্যায়ে ফেলেন। স্রেফ ঘুমের জন্যে রিজার্ভ করা থাকে।

যুগখানেক আগে এ রাজ্যেও গরমকালের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মর্নিং অফিস-আদালত আর স্কুল-কলেজের অর্থই হল দুপুর থেকে বিকেল অবধি ননস্টপ নিদ্রা। তারপর সারা সামার ভেকেশনটাই ছাত্র আর মাস্টারমশাইয়ের দল ফিয়েস্তায় কাটিয়ে দিতে পারতেন। হাই-কোর্টের বাবুদের এ অধিকার এখনও হরণ করা সম্ভব হয়নি।

কমার্শিয়াল আর কনসাল অফিস-গুলোতে এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা করে গলা টিপে গরমকালকে হত্যা করা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় যতই কাজ হোক না কেন, গরমকালটা উপভোগ করা যায় না। "ঘুমোতেই যদি না পারলাম, তবে গরমকালের স্পেশালিটির স্বাদ পাব কি করে?" শেষের এই কথাগুলো স্পেন-ফেরতা প্রাক্তন মন্ত্রীর প্রেসক্রিপশনের সমর্থনে বলেছেন আমার এক বন্ধু, যিনি এখনও তাঁর ব্যক্তিগতজীবনে ব্যবস্থাটা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন।

'গরমকালে আমার দাওয়াই হল,' তিনি বললেন, "ডবল বেড-টি, ডবল ব্রেক ফাস্ট অ্যান্ড লম্বা ঘুম।"

চেপে ধরতে খুলে বললেন, "মশাই, হাসবেন না। ডাক্তার-পুলিশ-বিজনেসম্যান—এমনকি আপনার জার্নালিস্টরাও এই প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী চলেন। উকিল-মাস্টার-ছাত্র-কেরানীরাও আগে চলতেন, এখন নেহাৎ পান না, তাই খান না।

পার্টিশনের পর স্কুল কলেজের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠল, তাই মর্নিং স্কুল-কলেজের সম্ভাবনাটাকে জবাই করে শিফট-সিসটেম চালু হল। তাহলেও 'সামার ভেকেশন' এখনও রয়।

কেরানীদের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু "অফিসাররা? আরে ভাই," বন্ধুটি বলে চলেছেন, "লাঞ্চ মানেই তো ঘুম। অন্যকালে যা 'ন্যাপ', গরমকালে তা 'ডীপ স্লামবার'।"

কিন্তু "ডবল ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড ডবল বেড-টি"—সে আবার কি বস্তু? বন্ধুর জবাব : ভাই জীবনকে উপভোগ করতে শেখ। সকালে ঘুম ভাঙলে যা যা কর, গরমকালে বিকেলবেলাতেও ঠিক তাই তাই করে যাও। রাত্রে আলো নিভিয়ে অন্ধকারে ডুব দাও, দুপুরে দরজা-জানলা বন্ধ করে অন্ধকারকে নেমন্তন্ন জানাও। নইলে রাত একটা অবধি রোগী ঠ্যাঙান কি অত সহজ?"

আমি ভেবে দেখেছি, দিনে ঘুমানোর মধ্যে এখন আর প্রেসটিজ নেই। এমনকি যাঁরা ঘুমোন, তাঁরাও স্বীকার করতে চান না, লজ্জা পান। খুব বেশি হলে বলেন, ইজিচেয়ারে মিনিট দুইয়ের জন্যে চোখদুটো বন্ধ করেছি মাত্র! দু মিনিট অনেক সময়েই দু ঘন্টা হয়ে যায়—কিন্তু বলতে যেন বাধা লাগে।

এই কলকাতায় সময়ের মূল্য আছে। হ্যাঁ, টাইম ইজ মানি। আগে দোকান-পাট দুপুরে বন্ধ হয়ে যেত, দোকানীরা যাঁর যাঁর বাড়িতে গিয়ে 'লম্বা' হতেন। এখন কেরানীবাবু থেকে অফিসার, রিকশাচালক, ট্যাক্সিচালক—সকলেই যে যার সিটে নিদ্রা যান। কাস্টমার এলেই আবার তড়াক করে উঠে বসেন, তারপর আবার দুচোখ বন্ধ হয়। প্রাণ খুলে ঘুমুতে পারেন শুধু গিন্নিবাহিনী, ডাক্তার, থানা-পুলিশ, শিফট ডিউটির স্টাফ আর হকার চাকর-ঠাকুর-ঝিয়ের দল।

সকলকে সমানভাবে ঘুমনোর সুযোগ দিতে হলে স্পেনের লাইন নিতে হয়। আমরা স্পেনকে বাদ দিয়ে আমেরিকাকে ধরেছি। এয়ারকন্ডিশনের পথে গরমকে জয় করার কথা ভাবছি। গরমকে ভোগ করার ভারতীয় ঐতিহ্য আমরা ভুলতে বসেছি।

*

মাটির নীচের কলকাতা

এই কলকাতার মাটির তলায় আর একটা কলকাতা আছে। টলিউডে তেমন এন্টারপ্রাইজিং ডিরেক্টর থাকলে নীচের তলার কলকাতাকে রুপোলী পর্দায় তুলে ধরে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করতেন।

মাটির তলার কলকাতা হল টানেল ক্যালকাটা। মানব দেহের শিরা-উপশিরার মত তার মধ্যে লাগাতর জলস্রোত প্রশস্ত সার্কুলার রোড দিয়ে ছুটে যেতে যেতে কখনও ভেবে দেখেছেন কি আপনার পায়ের নীচে দিয়ে বিরাট বিরাট সুড়ঙ্গও ছুটে চলেছে? বাড়ির সঙ্গে যুক্ত আছে ছোট রাস্তার সুড়ঙ্গ আর সেই ছোট সুড়ঙ্গ মিলেছে প্রকান্ড প্রকান্ড সব সুড়ঙ্গের সঙ্গে। পাম্পিং স্টেশনগুলোর কেরামতির ফলে প্রচন্ড বেগে এই সুড়ঙ্গগুলি দিয়ে জল যাচ্ছে—শহর কলকাতার আবর্জনাকে ধুয়েমুছে নিয়ে যাচ্ছে কুলটির খালে, তারপর পিয়ালী নদীতে।

এই সুড়ঙ্গপথ ইন্সপেকশনে যাবার জন্যে কর্পোরেশনে রবারের নৌকো আছে, ইঞ্জিনীয়াররা যাতে চেপে প্লেজেন্ট ট্রিপ দিয়ে আসতে পারেন। ওখানে জলের যা স্রোত তাতে নৌকো করে ঘোড়ার গাড়ির স্পীডে চলবেই।

না, কর্পোরেশনের ইঞ্জিনীয়াররা অমন আনপ্লেজান্ট কাজ নিয়ে কখনও মাথা ঘামিয়েছেন বলে শুনিনি। রবারের নৌকো এখন প্রায় লোপাত্তা। কারিৎকর্মা কোন সিনেমা-পরিচালক মাটির তলার কলকাতার

টানেল ক্যালকাটা

মাটির নীচের কলকাতা গরমকালে লোভনীয় কিছু নয়। পচা, দুর্গন্ধযুক্ত, অন্ধকারাচ্ছন্ন এই "টানেল ক্যালকাটা" ছাসে মশায় ভর্তি হয়ে গেছে। নীচে নামলে বেশ কিছু রক্ত দিয়ে আসতে হয়।

দমদম এয়ার পোর্ট থেকে তিনতলা উঁচু প্রকান্ড রাস্তা যাবে বালিগঞ্জ, সেখান থেকে সে রাস্তার এক মুখ কালিঘাট-খিদিরপুর-ডালহৌসি হয়ে শ্যামবাজারের ধারে-কাছে আর এক মুখের সঙ্গে মিলে যাবে। বড় বড় জংশনে একতলায় নামবার ছোট ছোট তিনতলা রাস্তা থাকবে।

কলকাতার এই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার চিত্র তুলে ধরেছেন সেদিন কলকাতার কান্ট্রি অ্যান্ড টাউন প্লানার শ্রীবি সি গাঙ্গুলী। "প্রবলেম সিটিকে বাঁচানোর", তাঁর মতে "একমাত্র পথ মাস ট্রান্সপোর্টেশন প্রজেক্ট।"

এই জন-পরিকল্পনার জন্য যে সার্ভে টিম নিযুক্ত করা হচ্ছে তাঁদের কাছ থেকে কলকাতা স্বপ্ন দেখার মত অনেক কিছু পাবে। মাটির তলার রেল, মনোরেল এবং বহু আলোচিত সার্কুলার রেল—সবই। সেদিন গাঙ্গুলীসাহেব শোনালেন কমবাইন্ড রেলপথের কথা। এটি ঢেউ খেলান গতিতে কখন মাটি দিয়ে, কখনও মাটির নীচে দিয়ে আবার কখনও বা মাটির উপর দিয়ে চলবে।

জন-পরিবহনের দিকে চোখ রেখে রাস্তা আর রেলপথের কথা সি-এম-পি-ও ভাবতে সুরু করেছেন। এই ভাবনার মানে কি কিছু দিন আগেকার সাব-ওয়ে আর সার্কুলার রেলপথের ভাবনা-চিন্তাকে বিসর্জন দেওয়া? এ প্রশ্নের জবাব রাজ্যপাল দিল্লী থেকে ফিরে এলে হয়ত পাওয়া যাবে।

তবে গাঙ্গুলীসাহেব আশাবাদী মানুষ। মান্ধাতার আমলের ইঞ্জিনীয়ারিং চিন্তাধারা বিসর্জন দিলে কলকাতাকে আবার চাঙ্গা করে তোলা যায়— একথা তিনি নিশ্চয় করে বলতে চান। —অ চ

তবুও দুর্ঘটনা ঘটে। ওদের বিশেষ কিছু হয় না, হয় নয়া আদমীদের। ডি-হি শ্রীরামপুর রোডের নাম পালটে গেল যে রামেশ্বর সাহুর জন্যে আসলে সে কিন্তু সিওয়ার বয় ছিল না। রামেশ্বর হালুয়া বেচত, 'কপালে ছিল, তাই নেমেছিল।'

আগে বরাদ্দ ছিল মাথাপিছু এক পোয়া তেল, তিন মাস অন্তর একটা করে গামছা, সাবান প্রভৃতি। আগে মাসিক মাইনে ছিল ন'টাকা, এখন একশ কুড়িতে উঠেছে।

বেতন বেড়েছে, কিন্তু সরষের তেলের কন্ট্রোল হবার পর থেকে তেল দেওয়া বন্ধ হয়েছে। সাবান এখন যা দেওয়া হচ্ছে, তা ইঁটের চেয়েও শক্ত, তা দিয়ে একমাত্র মানুষ মারাই নাকি সম্ভব? আর গামছা? তার কথা না বলাই ভাল।

কাশীপুরের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারকে কুলিরা বলেছিল, সাব, ঠারিয়ে, গামছা পরাছি, দেখিয়ে। বহুৎ আচ্ছা হুয়া হ্যায়। সাহেব পালাতে পথ পায় নি। কারণ রুমাল সাইজের সে গামছা পরে কুলিরা চলাফেরা করলে পাঁচ আইন ভঙ্গের অপরাধে তাঁরও ডাক পড়তে পারে থানায়!

মেথররা খাটা পায়খানা সাফ করে। ডোমদের কাজ রাজপথ থেকে মৃতপ্রাণী অপসারণ। ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাড়ু দেয়, জল-কুলি ভিস্তিতে করে জল এনে রাস্তায় ঢালে আর একদল হাইড্রেন থেকে জল ঢালে রাস্তায়। কোদালি কুলি কোদাল চালিয়ে ফুটপাথ সমান রাখে। ডাকরাজির কাজ দুর্মুস দিয়ে ফুটপাথের খানা-খন্দ বোঝাই করা। রাস্তায় গর্ত সমান করে প্যাচ রিপেয়ারিং (ওদের কথায় পি-আর-ও) কুলি। অ্যাসফালটন কুলি রাস্তায় পিচ ঢালে। ড্রেনেজ কুলি কাঁচা ড্রেন সাফ করে। ইঞ্জিনীয়ারিং সিউরার কুলির কাজ বাড়ি থেকে গালি অবধি। লরি মজদুরের কাজ লরিতে আবর্জনা বোঝাই করা।

কলকাতা ওদের হাতে। শহরকে স্বর্গ অথবা নরক ওরা করতে পারে। অনেক কিছু নির্ভর করে ওদের মেজাজের উপর। বেতন ঠিকই বেড়েছে, কিন্তু গোলমাল অনেক আছে।

দিকে চোখ ফেরালে ক্রাইম ড্রামার সমাজে বোম্বাইকে অপাঙক্তেয় করে ফেলতে পারতেন।

মাটির তলার এই কলকাতার পয়লা নম্বর শত্রু শহুরের গিন্নিসমাজ আর তাঁদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ঝি-ঠাকুর-চাকর গোষ্ঠী। পোড়া কয়লা থেকে হেন বস্তু নেই যা ও'দের অকৃপণ হস্ত দিয়ে এই সুড়ঙ্গপথে এসে না পৌঁছয়। ফলে দুরন্ত ফল্গুনদীও মজে যায়। জলের গতি ব্যাহত হয়।

তখন ডাক পড়ে দশ থেকে বার বছরের গালিপিট বয় আর বয়েসে আরও কিছু বড় সিউরার কুলিদের। কলকাতাকে ওরাই কলকাতায় রেখেছে। ওদের সঙ্গে আছে মেথর, ডোম, ঝাড়ুদার, জলকুলি, কোদালি কুলি, ডাকরাজি, পি আর ও কুলি আর অ্যাসফালটন মজদুর। আরও আছে ড্রেনেজ কুলি, লরি মজদুর।

কলকাতাকে 'সাফ সুথরা' রাখার দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা চোদ্দ হাজারের মত।

কথা হচ্ছিল ও'দের একজন নেতার সঙ্গে। বাচ্চা এক গালিপিট বয়কে হাজির করলেন আমার কাছে। বাড়ি থেকে যে নালা গলিতে গেছে, তাকে পরিষ্কার রাখাই এদের কাজ। "ঝিনঝারি" খুলে এরা ভেতরে ঢুকে যায়। উবু হয়ে বসে কোদালি দিয়ে আবর্জনা কাটে, তারপর সেগুলো ঝুড়ি-বোঝাই করে। উপর থেকে একজন ঝুড়িটাকে টেনে নেয়।

সিওয়ার কুলির কাজও একই ধরনের। তবে তার নালাটা অনেক বড়, মাথার উপরে, ওদের একজনের ভাষায়, "দো আদমি ডীপ"। বন্ধ হয়ে গেলে জল জমে যায়, তাই জল বন্ধ করে ওদের ভিতরে নামতে হয়। প্রায়শই ঢুকবার আগে জল বার করে রাস্তায় ঢালতে হয়, তারপর জল-শূন্য গহবরে নামে ওরা।

ভেতরে "গেস" হয়; "গেস লাগলে একদম খতম।" তাই প্রথমে ভাল করে দেখে নেয়। অভ্যেস হয়ে গেছে, এখন দেখলেই বুঝতে পারে খতরা আছে কি না। তাছাড়া লন্ঠন নিয়ে নামে, গ্যাস থাকলেই "ও বেটা" নিভে যাবে।

আদালতের খোসগল্প

আদালতের খোসগল্প

দুনিয়ার আদালতগুলোর ফাইলে দিনের পর দিন শুধুমাত্র মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কান্না অনুশোচনার নথিপত্রই জমা পড়ছে না, বৈচিত্র্যের, হাসি-মস্করার খোরাকও পাওয়া যাচ্ছে অনেক। আদালতে কারুর পৌষ মাস কারুর সর্বনাশ—হারজিতের পালা চলছে তো চলছেই প্রতিদিন। আইনের চুল-চেরা বিচার হচ্ছে, ব্যাখ্যা করা হচ্ছে ছত্রিশ রকম। জেতার জন্য আগ্রহী সবাই, সবারই বদ্ধমূল ধারণা ন্যায় তাদের পক্ষে। কি বাদী কি বিবাদী। কথার প্যাঁচ কষছেন উকিল ব্যারিস্টাররা, জেরার জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন সাক্ষীকে। যুক্তি খাড়া করছেন হাজারো রকম, কথার ফাঁদ রচনা করছেন একটার পর একটা।

তবু কাত হয়ে যান তাদের কেউ কেউ, তেমন তেমন সাক্ষীর পাল্লায় পড়ে। বুনো ওলের সংগে সেয়ানে সেয়ানে লড়ে যায় বাঘা তেঁতুল, দুঁদে উকিলের সংগে পাঞ্জা কষে জাঁহাবাজ সাক্ষী।

এক আইরিশ ডাক্তারের গাড়ীর সংগে সংঘর্ষ হল এক কৃষক ও তার গরুর। দু'জনেই গাড়ীর ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে পড়ল নালায়।

ডাক্তারের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করল কৃষক। ক্ষতিপূরণ চাই তার। গরুর দাম, নিজের শুশ্রূষার খরচ সব দাবী করে বসল সে।

'কিন্তু', বললেন ডাক্তারের উকিল, 'তুমি তো ডাক্তারকে বলেছিলে তোমার মোটেই চোট লাগেনি। তবে কেন ক্ষতিপূরণ চাইছ?'

'ব্যাপারটা হয়েছিল—'বলতে আরম্ভ করল কৃষক। বিচারক তির্যক নজরে তাকালেন কাঠগড়ার দিকে, বললেন, 'তুমি বলেছিলে তোমার চোট লাগেনি?'

'ধর্মাবতার', জবাব দিল কৃষক, 'ব্যাপারটা তা'হলে বলি। গাড়ীর ধাক্কায় আমি আমার গরুটির সংগে ছিটকে নালায় গিয়ে পড়লাম। ডাক্তারবাবু গাড়ী থেকে বন্দুক হাতে নেমে এলেন। আমার গরুটি ঠ্যাং ভেঙে ছটফট করছিল। ডাক্তার-বাবু বন্দুক তাক করে এক গুলিতেই গরুটিকে মেরে ফেললেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন আমারও চোট লেগেছে কিনা। ধর্মাবতার', হতভম্ব উকিলের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে বলল কৃষক, 'আমার মানসিক অবস্থা কল্পনা করে দেখুন। আমি তখন কি করে বলি আমার চোট লাগার কথা?'

মামলায় হারজিত যেমন সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর নির্ভর করে ঠিক তেমনই নির্ভর করে উকিলদের ওপর। সামান্যতম আইনের ফাঁক খুঁজে বার করতে পারলেই উকিলের পোয়া বারো, তাঁর দাপট ঠেকায় কে? বুদ্ধির দৌড়ে তাঁর সংগে টেক্কা দেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন।

কথায়, যুক্তিতে যদি বিচারক প্রভাবিত না হন তাহলে সুযোগ থাকলে অন্য পন্থার সাহায্যও নিতে হয় উকিলকে, মক্কেলের ন্যায়ের পাল্লা ভারী করবার জন্য। একবার রেল কোম্পানীর বিরুদ্ধে আনা এক বৃদ্ধার অভিযোগের বিচার হচ্ছিল। জুরীর বিচার। বৃদ্ধার আর্জি, রেল-ইঞ্জিন থেকে আগুনের ফুল্কি এসে তার বাড়ী ভস্মীভূত করে দিয়েছে, অতএব রেল কোম্পানীকে ক্ষতি-পূরণ দিতে হবে।

'তোমার বাড়ী কোথায়?' রেলের উকিল প্রশ্ন করলেন।

'এজবারটন স্টেশনের ঠিক পাশে, রেল লাইনের ধারে।'

'ওখানে তো গাড়ী মাত্র চার মিনিট দাঁড়ায়। এই চার মিনিটে এমন কি আগুনের ফুল্কি উড়তে পারে যা একটা গোটা বাড়ীকে পুড়িয়ে দিতে সক্ষম? অভিযোগটা নেহাৎই আজগুবি,' মন্তব্য করলেন রেলের উকিল।

সত্যিই তো চার মিনিট এমন আর কি বেশী সময়। এই অল্প সময়ের ভেতরে একটা বাড়ীতে আগুন লাগা কি সম্ভব? জুরীরা ভাবতে লাগলেন। বৃদ্ধার উকিল উঠে দাঁড়ালেন এবার। প্রধান জুরীর সামনে একটি হাতঘড়ি রেখে বললেন তিনি, 'দয়া করে সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখুন, ঠিক চার মিনিট কাটলে বলবেন।'

এ আর এমনকি শক্ত কাজ, ভাবলেন প্রধান জুরী। সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। ক্রমশঃ অস্থির হয়ে উঠল সবাই। কি ব্যাপার, সময় কি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে? চার মিনিট শেষ হতে এত দেরী হচ্ছে কেন? অধৈর্য হয়ে উঠলেন প্রধান জুরী। সেকেন্ডগুলো যেন ঢিমে তেতালে এগুচ্ছে। চার মিনিট তো মোটেই অল্প সময় নয়।

অবশেষে চার মিনিট পর যখন সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তখন নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলেন রেলের উকিল যে তার মক্কেলের হার হয়েছে। চার মিনিটে একটা বাড়ী কেন, গ্রাম-কে-গ্রাম ভস্মীভূত হতে পারে—এ বিষয়ে কারুর মনে আর কোন সন্দেহ নেই।

উকিলবাবুরা চালাক চতুর, সন্দেহ নেই। সাক্ষী খুঁচিয়ে কথায় প্যাঁচ কষে সত্যকথা বার করবার বেলায় তাঁদের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন তাঁরাও, নিজেদের সৃষ্ট ফাঁদে ধরা পড়েন নিজেরাই। একজন উকিল এক সাক্ষীকে তার দস্তখতের ব্যাপারে জেরা করছিলেন। সাক্ষী দস্তখতটি পরীক্ষা না করেই সেটিকে জাল বলে ঘোষণা করার পর উকিলবাবু বললেন,

'আপনি ঠিক জানেন দস্তখতটি জাল?'

'হ্যাঁ।' জবাব এল কাঠগড়া থেকে।

'আপনি তো পরীক্ষাও করে দেখেননি দস্তখতটাকে। কি করে বুঝলেন তা'হলে যে ওটা আপনার দস্তখত নয়?'

'আমি জানি।' সাফ জবাব।

'প্রমাণ কি আপনার?' ভুরু কোঁচকালেন উকিলবাবু। বিচারক তাকালেন কাঠগড়ার দিকে। নির্বিকার সাক্ষী জবাব দিল, 'আমি লেখাপড়া জানিনে, তাই দস্তখত দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমি টিপসই দেই।'

ছাগলের ডাক ডেকে বিচারক এবং তার-পর উকিলকে ঘায়েল করার গল্প আমরা সবাই জানি। উকিলের শেখানো কায়দায় উকিলকে জব্দ করার মধ্যে কেরামতি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে বিচারককেও তাঁর নিজস্ব অস্ত্রে ঘায়েল করা আরো কৃতিত্বের পরিচায়ক। একবার এক খুনের মামলায় সাক্ষীকে প্রশ্ন করলেন বিচারক—

'আপনি বন্দুকের গুলি ছুটতে দেখেছেন?'

'না', জবাব দিল সাক্ষী, 'কিন্তু আমি শব্দ শুনেছি।'

'সাক্ষ্য অসন্তোষজনক,' মন্তব্য করলেন বিচারক। মুখ ফিরিয়ে অট্টহাস্য করল সাক্ষী। শখ্‌ত বেয়াদপি! বিচারক রক্তচক্ষু করে বললেন, 'এই, তুমি হাসলে কেন ও'রকম করে? জানো না এটা আদালত?'

'ধর্মাবতার', সাক্ষী বলল, 'আপনি আমাকে হাসতে দেখেছেন?'

'তার প্রয়োজন আছে কি? তোমার হাসির শব্দ আমি কেন, সবাই শুনেছে।'

'হল না ধর্মাবতার,' মৃদু হাসল সাক্ষী, 'সাক্ষ্য অসন্তোষজনক'। আদালতকে স্তম্ভিত করে দিয়ে কাঠগড়া থেকে নেমে গেল সে।

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

অঙ্গনা

প্রমীলা

মায়ের দায়িত্ব

স্নেহ-মায়া-মমতা মানুষের জন্মগত অধিকার। জন্মলগ্নে প্রতিটি শিশুই পারিজাত-সৌরভ বয়ে নিয়ে আসে। তার সর্বাঙ্গ তখন স্নেহ-মমতায় মাখানো—ভালবাসার এই জীবন্ত পুতুল সংসারে আনন্দের-হুল্লোড়ের তুফান তোলে। সে নিজে হাসে এবং সকলকে হাসায়। অনাবিল আনন্দরসের উদ্গাতা সে শিশু তখন কোন কল্পলোকের দেবশিশু। তাকে ঘিরে তখন চলে কতশত কল্পনার জাল বোনা। অন্ধকার ঘরে আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটায় যে শিশু তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে কার না সাধ জাগে। তার আধো আধো কথা, হাসি হাসি মুখ সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলিয়ে মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। মনে হয় এ জীবনে এখনো আশা আছে, আনন্দ আছে। মা-বাবা শিশুর ভবিষ্যৎ ভেবে নিয়ে উৎফুল্ল হয়।

তারপর দিন গড়ায়, মাস যায়, বছর ঘুরে আসে। শিশু বড় হয়। তার আধো কথা তখন পূর্ণ কথায় রূপান্তরিত হয়ে নতুন অর্থ বহন করছে। বাস্তব ধীরে ধীরে তার কাছে আত্মপ্রকাশ করছে। মা-বাবার চিন্তায়ও আসে পরিবর্তন। নানা ভাবনায় তাঁরা তখন রীতিমত বিব্রত। এবার শুধু আর কল্পনার জাল বিস্তার নয়, সন্তানের সামনে ভবিষ্যতের সঠিক নির্দেশ রাখতে হবে। মা-বাবা সমস্ত প্রতিবন্ধককে অগ্রাহ্য করে তার লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করেন। তাঁরা তখন অন্য কথা ভাবেন। সন্তান লেখাপড়া শিখবে। মানুষ হবে। দেশ ও দশের একজন হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আজকের সব দুঃখকষ্ট সেদিনের আনন্দ-মধুর পরিবেশে নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করবে। ভিন্ন পরিবেশে এবং পরিবর্তিত জীবন-লগ্নে এভাবেই মা-বাবার স্বপ্ন দেখা চলে।

আরও পরের ইতিহাস কারো পক্ষে আনন্দের আবার কারো পক্ষে বেদনার। কেউ কেউ আবার যোগ-বিয়োগ করে কিছুতেই হিসাব মিলিয়ে উঠতে পারছেন না। এরকম ঘটনা তো চোখের সামনেই হামেশা দেখা যাচ্ছে। যোগ্য সন্তানের মা-বাবা গর্বে পথ চলেন, পাঁচজনকে ডেকে সন্তানের কথা শোনান। কিন্তু সবাই লেখাপড়া শিখে সমান হয়ে উঠতে পারে না অথবা লেখা-পড়ার সুযোগও সবাই পায় না। কিন্তু স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধ বজায় রেখে তাঁরা যথার্থ সামাজিক প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা অর্জন করেছেন। আর যাদের এ-ও হয়নি তা-ও হয়নি তাদের মা-বাবার অবস্থাই সবচেয়ে মর্মান্তিক। সবাই তাঁদের করুণার চোখে দেখে। পৃথিবীর সব দোষ যেন তাঁদের। সন্তান মানুষ না হলে মা-বাবাকে এরকম গঞ্জনাই সহ্য করতে হয়। তাঁদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। কেউ যখন বলে, ওমুকের ছেলেটা শেষে সত্যি গুন্ডা হয়ে দাঁড়াল, তখন মা-বাবার মনের প্রতিক্রিয়া কল্পনাতীত। নিরুপায় হয়ে তাঁরা হয়তো প্রাণপণে আত্মগোপনের পথ খোঁজেন।

এর কিন্তু শুরু হয়েছিল অনেক আগে। সেদিন মা-বাবা ছেলের ত্রুটিকে বড় করে দেখেন নি। তাই আজ তার আপসোসের অন্ত নেই। এরকম অপবাদের জন্য তিনি নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু ছেলে যখন প্রথমেই বয়ে যেতে শুরু করলো, স্কুলে না গিয়ে পাড়ার রকে আড্ডা জমাতো, অল্পবয়সে বিড়ি সিগারেটের সঙ্গে পরিচয় নিবিড় করলো তখন মা-বাবা নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, বয়সে সব দোষ কেটে যাবে। কিন্তু বাস্তবে ফল হলো ঠিক তার বিপরীত। নেশা ক্রমেই চড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে জড়িত আছে আবার নেশা পূরণের প্রশ্ন। তাই পয়সাকড়ির ধান্দাও তাকে করতে হয়। সারাদিন পাড়ায় মাস্তানি করার

ফটো : অভিজিৎ দাশগুপ্ত

পয়সাকড়ির জন্য খাটা-খাটুনি তার শোভা পায় না। তাই অন্য উপায়ের কথা ভাবতে হয়। আর ভাবতে ভাবতে উপায় একটা বেরিয়েও যায় এবং ক্রমে সেই এক উপায় বহুতে পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই আয়ের পথগুলো অন্ধকার এবং অসৎ হতে বাধ্য। আর সামাজিক-পথের মনোবৃত্তিও তার বদলে গেছে। রক্তে তার এখন অসামাজিকতার নেশা। দিনে দিনে তার ভোল বদলায়। তারপরে সে রূপ নেয় পুরোপুরি অসামাজিকের। অনেক সময় চেষ্টা করলেও এই নেশা সে চট করে কাটিয়ে উঠতে পারে না। মা-বাবার স্বপ্ন দেখা শেষ হয়েছিল অনেকদিন আগেই। এবার সব স্বপ্নের পরিপূর্ণ সমাধি ঘটে। পরিবর্তে আক্ষেপে তাঁরা ফেটে পড়েন। দুঃখ করে বলেন, শিব গড়তে গিয়ে বাদর গড়ে ফেললাম। আর এই দুঃখের জের টেনে চলতে হবে তাকে জীবনের বাকি-বকেয়া প্রতিটি দিন।

সন্তান সম্পর্কে স্বপ্ন দেখার খেসারত গুনবেন মা-বাবা। কারণ সন্তান মানুষ করার দায়িত্ব তাঁদের সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে মায়ের দায়িত্ব তো অনস্বীকার্য। যে মা সন্তানের দোষ সম্পর্কে বেশি সজাগ এবং সতর্ক তিনি যথার্থ মা পদবাচ্যের উপযুক্ত। সন্তানের ত্রুটিকে খাটো করে দেখে শুধু গুণ নিয়ে যে মা বড়াই করেন দুর্ভোগটা পোয়াতে হয় তাঁদেরই বেশি। এমনি একজন মায়ের সঙ্গে সেদিন কথা হচ্ছিল। নিজের ছেলের কথা বলতে গিয়ে দেখলাম তিনি ছেলের দোষত্রুটি নিয়েই কথা বললেন। সব কথা শেষ করে পরে বললেন, গুণ ওর যা কিছু আছে সে আপনি মেলামেশা করলেই বুঝবেন, এ সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলতে চাই না। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল, ইনি হচ্ছেন যোগ্য মা এবং সন্তানের যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এরকম কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না। বরং এর বিপরীত অভিজ্ঞতাই আমাদের সহজলভ্য।

কিন্তু সন্তান মানুষ করতে গিয়ে স্নেহের ঠুলি চোখ থেকে খুলে ফেলতে হবে। অন্তরে স্নেহের নির্ঝর বইলেও শাসনের লাগামটুকু কোন সময়েই হালকা করলে চলবে না। বিশেষ করে চারদিকে যখন প্রলোভন বিস্তর এবং স্খলনের ভয়ও যথেষ্ট। শুধু স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে যদি আশা করা যায় যে, সন্তান মানুষ হলো তাহলে তা হবে নেহাতই মূর্খের স্বর্গবাস। মা-বাবার কর্তব্য এখানেই শেষ নয় বরং শুরু বলা চলে। সন্তান শিক্ষার পথে যত অগ্রসর হবে শাসনের রাশও ক্রমে হালকা করতে হবে। তারপর একটা সময়ে নিজের ভালোমন্দ সে নিজেই বুঝে নিতে পারবে। আর তখনি মা-বাবার শাসনের দায়িত্ব সাময়িক অবসর নেবার সুযোগ পাবে। তখন সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে মা-বাবাকে পস্তাতে হবে না। অথবা ছেলে গোল্লায় গেল ভেবে দীর্ঘশ্বাসও ফেলতে হবে না।

মা-বাবা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনাকল্পনা করুন ক্ষতি নেই কিন্তু ভবিষ্যৎ পথটি তাকে তৈরি করে দিতে হবে এবং এ কর্তব্যটি একান্তভাবেই মা-বাবার। আজকের দিনে প্রচুর ছেলে বিপথে চলে যাচ্ছে। তাই আবার ভেবে দেখা উচিত সন্তান মানুষের ক্ষেত্রে মা নিজের কর্তব্য যথাযথ পালন করছেন কিনা। অতীতের অল্পশিক্ষিত বা শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত মায়েরা যে দায়িত্বটুকু পালন করতেন অত্যন্ত নৈপুণ্যে, আজকের শিক্ষিত মায়েদের সেক্ষেত্রে ব্যর্থতার সঠিক কারণ বুঝে ওঠা দায়। কিন্তু আজকের মায়েরা এ ব্যাপারে আরো দায়িত্বসচেতন হবেন এটাই প্রত্যাশিত।

দেশবন্ধুকে যেমন মনে পড়ে

আমি তখন ছোট। বেশ ছোট। বোধ করি পাঁচ কি ছয় বৎসর বয়েস। অল্প অল্প মনে আছে সেই সময়কার কথা। ঢাকা জেলার 'তেওতা' গ্রামে আমার পিতৃগৃহ। কলকাতা থেকে আমরা সেখানে গিয়েছি কিছুদিনের জন্য। তেওতার বাড়ীতে তখন বহু অতিথি।

আমাদের সেই তেওতার বাড়ীর বাহির মহলের দোতলার প্রকান্ড প্রকান্ড হল-ঘর অতিথিদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একটা হলে থাকতেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস একা। পাশেরগুলিতে সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, চিররঞ্জন দাস, হেমন্তকুমার সরকার, প্রতাপচন্দ্র গুহ-রায় এবং আরও অনেকে। এঁদের আমি ভালভাবে চিনতাম এবং জানতাম, সেই জন্য ব্যক্তিগতভাবে এঁদের নাম আলাদা আলাদা-

জাবে মনে পড়ছে। চিত্তরঞ্জন ছিলেন দেশবন্ধুর পুত্র।

বহুদিন জেলে বন্দী থেকে দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য তখন একেবারে ভেঙে গেছে। বাইরে আসবার পর সেই ভগ্নস্বাস্থ্য কিছুটা আবার উদ্ধারের জন্য আত্মীয়-স্বজন, অগণিত বন্ধু-বান্ধব ও রাজনৈতিক শিষ্য সকলেই খুব জেদ করতে লাগলেন। নিজেও তিনি বোধকরি তার প্রয়োজন কিছুটা অনুভব করছিলেন। তাই যখন আমার বাবা স্বর্গত কিরণশংকর রায় তাঁকে অনুরোধ করলেন তেওতাতে এসে কিছু-দিন বিশ্রাম নিতে, জোর দিয়ে যখন বল্লেন যে সেখানে তিনি বিশ্রাম পাবেন, নির্জনতা পাবেন এবং হয়তো বা কিছু আরামও পাবেন; তখন দেশবন্ধু আর দ্বিধা করলেন না। রাজি হয়ে গেলেন তেওতায় যেতে এবং জানালেন যে অন্তত পক্ষে মাসখানেক সেখানে তিনি থাকবেন!

এর পরই মনে আছে কলকাতা থেকে আমাদের তেওতা যাত্রা। কয়েকদিন পর যেদিন তিনি পৌঁছালেন সেদিনকার পথের দৃশ্য আমি দেখি নি। যা কিছু শুনেছি তা কেবল কানে। তবে আমাদের তেওতার সেদিনকার সেই ঝলমল দৃশ্য আমার সে শিশুমনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ফুলে আর দেবদারু পাতায় বকুলতলা থেকে আমাদের সেই শ্বেতপাথরের গোল-বারান্দা পর্যন্ত পথটি যেন এক নতুন রূপ ধরেছিল। নদীর ঘাট থেকে বাড়ী আসার পথটি পুষ্প তোরণে তোরণে কী সুন্দর যে সাজানো হয়েছিল! দেউড়ীর বাইরে, মাঠের মধ্যে হাজার হাজার লোক সমবেত হ'য়েছিল মুকুটহীন সম্রাটের দর্শন আকাঙ্ক্ষায়। আশে-পাশের সমস্ত গ্রাম ও শহর সেদিন প্রায় জনশূন্য। সবাই এসে ভীড় করেছিল তেওতাতে। পরে শুনেছি যে ঢাকা থেকেও নাকি অনেকে এসেছিলেন দেশবন্ধুকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখ্তে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যতদিন ছিলেন, তেওতা যেন মহা এক পুণ্য তীর্থ-ভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

আবার বিচ্ছিন্নভাবে মনে পড়ে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কী রকম খেলা করতেন তিনি। মস্ত মস্ত প্রকান্ড জোড়া-স্তম্ভ-গুলির ফাঁকে লুকিয়ে পড়তেন আর আমি তাঁকে খুঁজে খুঁজে সারা বারান্দা দৌড়ে বেড়াতাম। তারপর এক সময় সাড়া দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে আমাকে কোলে তুলে নিতেন।

অনেক সময় দেখেছি হলঘরের প্রকান্ড বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দিঘির দিকে তাকিয়ে থাকতেন। আমি কাছে গেলে চেয়ারের হাতলের উপর বসিয়ে কত কথা বলতেন। কী কথা যে বলতেন আজ ৪০।৪৫ বছর পর তা' আর মনে নাই। শুধু মনে আছে যখন যেতাম তাঁর কাছে, অনর্গল দু'জনে মিলে কথা বলে যেতাম।

একদিন, তেওতা যাবার পর প্রথম দিকের কথা—আমি সামনে গেছি। সেদিন সকালবেলা, চা ইত্যাদি খাবার পর, বেলা বোধকরি তখন সাড়ে আটটা-ন'টা হবে, আমি একা একা ঘুরতে ঘুরতে বাইরের মহলের দিকে গিয়েছি। আমার যে দাসী আমাকে দেখাশোনা করতো সে অনেক টানাটানি করেও আমাকে ফিরাতে না পেরে অন্দরে প্রস্থান করেছে, বোধহয় মায়ের কাছে নালিশ জানাতে আর আমিও গুটি গুটি ধীরে ধীরে হলঘরের দিকে এগোচ্ছি। ইচ্ছেটা যে গোল-বারান্দাতে একটু যাবো। ছোটবেলা থেকেই কেন জানি না ঐ গোল-বারান্দার উপর আমার একটা আকর্ষণ ছিল। কলকাতা থেকে তেওতা যেতাম, সময়ে অসময়ে দৌড়ে দৌড়ে ঐখানে চলে যেতাম। সেই মস্ত মস্ত মোটা মোটা জোড়া থামগুলো, শ্বেতপাথরের মেঝের উপর রং বেরঙের নক্সা কাটা প্রস্ফুটিত সহস্রদল পদ্ম, মুসলমানী ঢং-এ জাফ্‌রী কাটা দরজাগুলো আধো আলো, আধো ছায়াতে কেমন যেন আমার কাছে রহস্য-পুরীর মত লাগ্‌তো। চারিদিকটা ওখানকার কেমন যেন নির্জন। বারান্দার রেলিং-এর অর্ধেক পর্যন্তও মাথা যায় না তখন আমার। না হোক্‌ তবু রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে দেখতাম মস্ত বড় দিঘির বুকভরা কালো জলে মাঝে মাঝে মৃদু হাওয়ার কাঁপন। পাথরে বাঁধানো দিঘির ঘাট। পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার। ঘাটের প্রশস্ত মসৃণ লাল পাথরের সিঁড়িগুলো ক্রমশ কেমন জল পর্যন্ত নেমে গেছে। ঘাটের পাশে বিরাট বকুল গাছটি। গাছের নীচে বসবার জায়গাটি পাথরে বাঁধানো। খোঁটগুলি রূপার মত ঝক্‌ঝক্‌ করছে সেখানে। লোহার খুঁটিগুলি বেলী, চামেলী আর যুঁই লতায় সমাচ্ছন্ন। ফুলে ফুলময় সে লতাগুলো। চারিপাশে, বকুল গাছের নীচে আরও কতদূর পর্যন্ত রাশি রাশি ঝরা বকুলে ভরা। তার সামনে দিয়ে, দিঘির পাশ কাটিয়ে, বড় বাগানকে বাঁয়ে রেখে পায়ে-চলা রাস্তাটা গিয়ে নহবৎখানার নীচ দিয়ে দূরে মিলিয়ে গেছে। এ সবকিছুই আমি দেখ্‌তে বড় ভালবাসতাম। জানি না, সেই অত শিশুকালে অতখানি আকর্ষণ আমার মনকে কেন করতো এরা। তখন আমি অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী' শুনেছি। বার বার শুনেছি রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'।

আজ এতদিন পর এতখানি বয়সে হয়তো বিশেষ কিছু বিশ্লেষণ করে বলা ঠিক হবে না। হয়তো তখনকার মনের ভাবও ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে পারবো না। তবু আমার যেন মনে হতো 'ডাকঘরের' সেই 'দৈ-ওয়ালা' বার বার ঐ দিঘির পারের পথটা দিয়ে যেন আসে আর যায়। যায় যখন তখন তার দৈ-এর বাঁকটা যেন নহবৎ-খানার খিলানের নীচ দিয়েই ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়। যাক্‌ এ সব কথা। যা বলছিলাম একটু আগে, এখন সেই কথাতে ফিরে আসি আবার।

আমি তো গুটি গুটি, ধীরে ধীরে হলঘরের দিকে এগুচ্ছি যে গোল-বারান্দাতে একটু যাবো। এ কয়েকদিন একবারও সেখানে যেতে পারি নি। বাবার বন্ধুরা কেবল হৈ-হৈ করছেন আর মাঝে মাঝে কী সব হাসির কথাতে খুব হাসির শব্দ উঠ্‌ছে। এইসব দেখে শুনে আমি কিছু ভীত অবস্থাতে ওখানে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেদিন আমার দাসীকে ছেড়ে ও-দিকের কাছাকাছি, যেতেই মনে হ'লো 'আজ বড় চুপচাপ্‌ চারপাশে।' সেইজন্যই আমি সাহসে ভর করে এগোচ্ছিলাম। কিছুদূর গিয়ে হলঘরে উঁকি দিয়ে দেখি ঘরে কেউ নেই। মনে ভাবলাম যে বাবার বন্ধুরা সবাই বোধহয় ফিরে গিয়েছেন কলকাতাতে। এবার আমি পরম নিশ্চিন্তে গোলবারান্দাতে আসা-যাওয়া করতে পারবো। আর আমার বাবাকেও আবার নিরিবিলিতে পাবো। কলকাতায় থাকার সময়ে যেটা প্রায় ঘটেই ওঠে না। তেওতায় এসেও এই 'বন্ধু ভদ্রলোক'দের জ্বালায় এতদিন আমার বাবাকে ভালমত পাই নি। এইসব ভাবতে ভাবতে আপন মনে আমি গোলবারান্দাতে গিয়ে হাজির। পরম নিশ্চিন্ত মনে গোলবারান্দায় যেখানে প্রস্ফুটিত পদ্মটি আঁকা আছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি একটি আধা-কোচ জাতীয় চেয়ারে একজন কে যেন বসে আছেন। দেখেই তো খানিকটা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম,—'বন্ধুরা তো সব চলেই গিয়েছেন। সুভাষবাবু নাই, সেন-গুপ্ত মশাই নাই, হেমন্তবাবু, প্রতাপ-বাবুও নাই; তবে ইনি আবার কে?' তারপরই পিছনে ফিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। কিন্তু ছোট ছোট পায়ের ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় আর কতো জোরেই বা হতে পারে। দু' এক পা ফেলতে না ফেলতেই দেখি কার দুটো হাত আমাকে বারান্দার মেঝে থেকে শূন্যে তুলে একেবারে কোলে নিয়ে ফেলেছে। ভয়ে একবার তাকিয়ে দেখি, যে ভদ্রলোক চেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন, তাঁরই কোলে আমি। আর সহাস্য মুখে তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, "বল তো আমি কে?" আমি তখন ছাড়া পাবার জন্য ব্যাকুল। কোনও রকমে উত্তর দিলাম, "তুমি ভদ্রলোক।" তিনি বললেন "বল তো আমার নাম কি?" আমি প্রায় মরীয়া হ'য়ে বলে ফেললাম, "তুমি ভোম্বল।" শুনে তাঁর সে কী হাসি। আজও সেদিনকার কথা মনে হলে যেন সেই হাসি অস্পষ্টভাবে কানে বাজ্‌তে থাকে।

'ভোম্বল' ছিল চিত্তরঞ্জন দাসের ডাক-নাম। এই নামটা আমি প্রায়ই শুনতাম আমাদের বাড়ী। তা-ছাড়া 'ভোম্বল' নামটার মধ্যে শিশুমন হয়তো কিছু নতুনত্ব পেয়ে-ছিল। নামটার সঙ্গে খুব পরিচয় ছিল অথচ যে ব্যক্তির ঐ নাম তাঁর সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় ছিল না। তাই জিজ্ঞাসা করা মাত্র 'ভোম্বল' নামটাই আমার মুখ দিয়ে সেদিন বার হয়ে এসেছিল।

জ্ঞানত দেশবন্ধুর সঙ্গে এইভাবেই আমার প্রথম পরিচয়।

তপতী গুপ্ত

নীল দরিয়ায় বিস্ময়কর চরিত্র

অজিত চট্টোপাধ্যায়

অন্তহীন নীল সমুদ্রের বুকে জলদস্যুদের একটি জাহাজ মার মার রবে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাণিজ্য জাহাজটির নাবিকদের বন্দী করে দাঁড় করানো হল এক সারিতে। প্রথামত তাদের অঙ্গের বসন কিন্তু ছিঁড়ে ফেলা হল না। কিছুক্ষণ পরে জলদস্যু ক্যাপ্টেন এসে দাঁড়ালেন তাদের সামনে। ঘোষণা করলেন, নাবিকেরা মুক্ত। এমনকি বাণিজ্য জাহাজটির নিগ্রো দাসদেরও তিনি স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিলেন। মুখে বললেন,—জন্ম থেকেই মানুষ মুক্ত, স্বাধীন। তাকে দাস বা পরাধীন করে রাখা ঈশ্বরের ঈপ্সিত নয়। মানুষের অপচেষ্টা মাত্র। সুতরাং নাবিকেরা ইচ্ছে করলে তাদের জাহাজে করে যেখানে খুশি যেতে পারে। বাণিজ্য জাহাজের ক্যাপ্টেনকে তিনি উপযুক্ত মর্যাদা আগেই দেখিয়েছেন। বলেছেন, তার বীরত্বে তিনি মুগ্ধ। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তিনি ক্যাপ্টেনের মত ব্যবহার করার পক্ষপাতী।

এরকম একটা কাহিনী বললে সম্ভবত সকলেরই মনে একটু ছায়া ছায়া সন্দেহের মেঘ উঁকি দিতে পারে। গল্পটা সেই ইতিহাসের পুরোনো পাতায় লেখা আলেকজাণ্ডার এবং পুরুর কাহিনীর মত শোনাচ্ছে না? কেউ কেউ ভাবতে পারেন মনগড়া একটা গল্প শোনাচ্ছি। কিন্তু, ব্যাপারটা আসলে তা নয়। জলদস্যু মিশনের রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর মধ্যে এমন অনেক ঘটনার সমাবেশ রয়েছে।

সত্যি, ক্যাপ্টেন মিশন একজন ভিন্ন মানুষ। জলদস্যুদের মধ্যে তার স্বতন্ত্র স্থান। মিশনের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা, বন্দী এবং সহকর্মীদের সঙ্গে ব্যবহার—
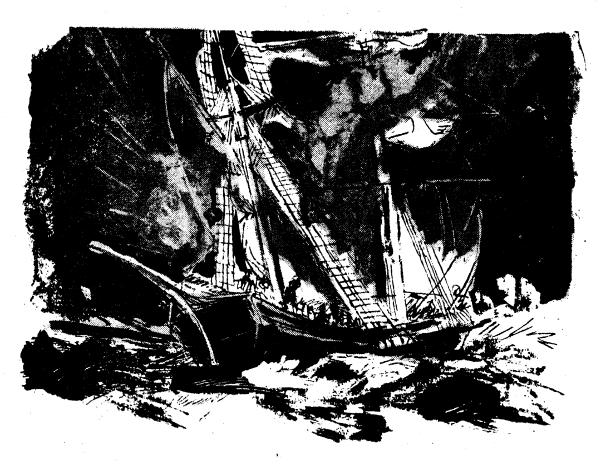
সবকিছুই জলদস্যুদের কাছে দৃষ্টান্ত-বিশেষ।

মিশন ফরাসী দেশের মানুষ। প্রভেন্সের এক বনেদী পরিবারে মিশনের জন্ম। ফরাসী ভাষায় লেখা এক আত্মজীবনীতে মিশন তার জীবনের অনেক কথাই লিখে গেছেন।

ছোটবেলায় অনেকগুলি ভাইবোনের সংগে তিনি মানুষ হয়েছেন। পনের বৎসর বয়সে স্কুলের পড়াশুনো শেষ করে মিশন গেলেন অ্যানজ্যাসে'র বিশ্ববিদ্যালয়ে। বৎসর-খানেক পরে মিশন বাড়ী ফিরলেন। তার বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলেকে বন্দুকধারী সৈন্য করবেন, কিন্তু মিশনের মনে তখন অন্য এক ইচ্ছে বর্ষার সতেজ গাছগাছালির মত মস্ত হয়ে উঠেছে। পড়াশুনো করবার সময় নানা লেখকের ভ্রমণকাহিনী পড়তে পড়তে মিশনের মনে বিদেশ ভ্রমণের বাসনা তীব্র হয়ে উঠল। সৈন্যবাহিনীতে ঢুকে কুচ-কাওয়াজ করা তার পছন্দ হল না। ছেলের মতিগতি বুঝে মিশনের বাবা আর জোর করলেন না। তার এক আত্মীয় ম'সিয়ে ফুরবে'র কাছে ছেলেকে দিলেন পাঠিয়ে। ইচ্ছেটা ক্যাপ্টেন ফুরবে'র জাহাজে চেপে ছেলে একবার বিদেশ ভ্রমণ করে আসুক। জাহাজটা তখন মার্সেলিসে অপেক্ষা করছিল, মিশন এলে পর জাহাজ নিয়ে ক্যাপ্টেন বেরিয়ে পড়লেন ভূমধ্যসাগরে। জাহাজের উপর দাঁড়িয়ে তরুণ মিশন ভূমধ্যসাগরের অগাধ নীল জলরাশির দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। সমুদ্রে ছোট বড় কত ঢেউ,...বিকেলে অস্ত-সূর্যের আলোয় পশ্চিম দিকটা কেমন লাল হয়ে ওঠে। খুব ভোরে নীল জলরাশির মধ্য থেকে একটা আগুনের চাকার মত কেমন অদ্ভুত সূর্যোদয় হয়। নাবিকের জীবন মিশনকে আকর্ষণ করল। সমস্ত দিন অভিনিবেশের সংগে জাহাজের কাজকর্ম শিখতে লাগলেন মিশন। এতটুকু ফাঁকি নেই তার শেখবার আগ্রহে। জাহাজ চালান, মেরামতি, রসদ সংগ্রহ, নাবিকদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া, ...অন্তহীন মহাসমুদ্রে সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখা, ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে তার জ্ঞান বাড়ল। নিজের পকেট খরচার টাকা দিয়ে সূত্রধরকে বশ করলেন মিশন। শিখে নিলেন জাহাজ মেরামতির কলা-কৌশল।

কিছুদিন পরে ভিক্তোয়ার জাহাজ এসে নোঙর করল নেপলসে। ক্যাপ্টেনের কাছে ছুটি নিয়ে মিশন গেলেন রোমে বেড়াতে। হয়ত রোমে না এলে মিশন জল-দস্যু হতেন না এবং জলদস্যু হলেও তার এই বিশিষ্ট আচরণ এবং দৃষ্টিভংগী কখনই প্রকাশ পেত না। কারণ রোমে না এলে সিনর ক্যারাচ্ছোলির সংগে কেমন করে মিশনের পরিচয়ের সুযোগ হত?

সিনর ক্যারাচ্ছোলি রোমের একজন পুরোহিত। পুরোহিত হলেও যাজকবৃত্তিতে তার তীব্র বিরাগ। ক্যারাচ্ছোলির মতে ধর্ম একটা বুজরুকি বা ভাঁওতা মাত্র। ঈশ্বরের পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই জন্ম থেকে মুক্ত, স্বাধীন। মানুষের মধ্যে বৈষম্য, ধনী ও নির্ধনের সৃষ্টি, পাপপুণ্যের নজীর দেওয়া সবই মানুষের রচনা। চার্চের এই ভন্ডামি এবং লোকঠকানো অপচেষ্টা তার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে।

তরুণ মিশন যাজকের কথাবার্তায় মুগ্ধ হলেন। ভদ্রলোকের বাচনভংগী সুন্দর,... কথায়-বার্তায় অন্য এক পৃথিবীর ইশারা। এসব নতুন কথা মিশন আর কারো কাছে শোনেন নি। মিশন যাজককে আমন্ত্রণ জানালেন, ভিক্তোয়ার জাহাজে কাজ নেবার জন্য। প্রস্তাব শুনে ক্যারাচ্ছোলি তো আনন্দে ডগমগ। এমন সময় ক্যাপ্টেন ফুরবে'র দূত এল মিশনের কাছে। নেপলস ছেড়ে জাহাজ যাবে লেগহর্ন। ইচ্ছে করলে মিশন এখনই নেপলসে ফিরে আসতে পারে। কিংবা হাঁটাপথে লেগহর্ন গিয়ে জাহাজ ধরতে পারে মিশন।

রোমে ভাল লাগছিল মিশনের। কত বড় শহর, আকাশচুম্বী অট্টালিকা। আর ইতালীর আকাশ কি অদ্ভুত নীল। সর্বো-পর নতুন বন্ধু যাজক ক্যারাচ্ছোলির আকর্ষণ। মিশন বললেন তিনি লেগহর্নে গিয়ে জাহাজ ধরবেন। রোম থেকে পিসা, পিসা থেকে লেগহর্ন। সিনর ক্যারাচ্ছোলিকে নিয়ে মিশন উঠলেন ভিক্তোয়ার জাহাজে। ক্যাপ্টেনের সংগে আলাপ করিয়ে দিলেন যাজকের।

লেগহর্ন ছেড়ে জাহাজ চলল। কিন্তু মাত্র দুদিন পরেই তারা এক দুর্বিপাকের সম্মুখীন হল। তুর্কী জলদস্যুদের দুটি জাহাজ ঘিরে ধরল ভিক্তোয়ারকে। শুরু হল প্রচন্ড যুদ্ধ। ভিক্তোয়ার জাহাজের ক্যাপ্টেন ফুরবে' দৃঢ়সংকল্প। জাহাজ ডুবিয়ে দেবেন, তাও সইবে। তবু আত্মসমর্পণ নয়। এই সংঘর্ষে মিশন এবং তার অনুগামী সিনর ক্যারাচ্ছোলি অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। অবশেষে তুর্কী জাহাজ দুটি পরাজয় স্বীকার করল। জলদস্যুদের বন্দী করে তোলা হল ভিকতোয়ারে। আবার জাহাজ তার যাত্রা শুরু করল ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশির উপর দিয়ে। মার্সেলিসে ফিরে চলেছে জাহাজ। কিন্তু তরুণ মিশন এখন অনেক বেশী অভিজ্ঞ। ক্যাপ্টেন সাহেবের তার উপর অগাধ আস্থা।

মার্সেলিসে নেমে নিজের বাড়ী গেলেন মিশন। বন্ধু যাজককেও নিয়ে গেলেন সংগে। সিনর ক্যারাচ্ছোলি অবশ্য এখন আর যাজক নয়। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই লোক এল মিশনের কাছে। ক্যাপ্টেন ফুরবে' চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁর জাহাজ ভিক্তোয়ার রোচেল অভিমুখে রওনা হচ্ছে। বন্দর থেকে আরো কয়েকটি বাণিজ্য জাহাজের সংগে তারা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পথ ধরবে।

চিঠি পেয়ে মহা খুশী হলেন মিশন। সমুদ্রের ঢেউ অহর্নিশ তাঁকে আকর্ষণ করছে। ঘুমোবার আগে সাগরের অশান্ত ঢেউয়ের আছড়ানি পিছড়ানি তাঁর কানে কানে মায়ের ঘুমপাড়ানি গানের মত যেন কথা বলে যায়। সিনর ক্যারাচ্ছোলিকে নিয়ে মার্সেলিসের পথ ধরলেন মিশন।

ভিক্তোয়ার গিয়ে পৌঁছল রোচেল বন্দরে। কিন্তু অন্য বাণিজ্যতরীগুলির তখনও প্রস্তুতি শেষ হয়নি। সুতরাং ভিক্-তোয়ারকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। মিশনের কাছে এই আলস্য অসহনীয় মনে হল। সমুদ্রের ধারে এসে বন্দরে পড়ে থাকা আরো বিশ্রী। সুতরাং মিশন ঠিক করলেন এই সময়টা অন্য কোথাও বেড়িয়ে আসবেন। ট্রায়াম্প নামক একটি জাহাজ যাচ্ছিল ইংলিশ চ্যানেলের দিকে। জাহাজের ক্যাপ্টেনকে নিজের কথা বললেন মিশন। প্রস্তাব শুনে ক্যাপ্টেন রাজী। সুতরাং সিনর ক্যারাচ্ছোলিকে সংগে নিয়ে মিশন চললেন ট্রায়াম্প জাহাজে ভেসে।

খানিকটা গিয়ে ট্রায়াম্পের সংগে মে ফ্লাওয়ার জাহাজের দেখা। মে ফ্লাওয়ার বাণিজ্য জাহাজ,—জামাইকা থেকে আসছে। অনেক সম্পদ তার অভ্যন্তরে। ট্রায়াম্পের নাবিকেরা চড়াও হল মে ফ্লাওয়ারের উপর। বলাবাহুল্য বাণিজ্য জাহাজটি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। ট্রায়াম্পের ক্যাপ্টেন ম'সিয়ে লো বুয়াংক কিন্তু আত্মসমর্পণকারী জাহাজটির ক্যাপ্টেন ব্যালাডিনের সংগে বন্ধুর মত ব্যবহার করলেন। নাবিকেরা কেউ কেউ ফুঁসে উঠেছিল। কিন্তু ম'সিয়ে লো বুয়াংক তাদের বোঝালেন। ট্রায়াম্পের নাবিকেরা তো পেশাদার জলদস্যু নয়। আর সম্পদে লোভ থাকলেও মানুষের প্রতি দুর্ব্যবহার কোনো কাজের কথা নয়। সাহসী লোকেরা শত্রুকেও মর্যাদা দেয়। কেবলমাত্র ভীরুরাই অরাতিকে অপমান করে। সুতরাং ক্যাপ্টেন ব্যালাডিন এবং তার সংগীদের সংগে ভদ্রতা করাই উচিত কাজ।

ট্রায়াম্প বহুদূরে ভেসে বেড়াল। ইংলিশ চ্যানেল, ব্রিস্টল চ্যানেলের ন্যাশ পয়েন্ট পর্যন্ত গেল সে। বেশ কিছুদিন পরে ট্রায়াম্প ফিরে এল রোচেল বন্দরে। ততদিনে ভিক্তোয়ার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাবার জন্য তৈরী। মিশন এবং সিনর ক্যারাচ্ছোলিকে নিয়ে জাহাজ চলল মার্টিনিক এবং গুয়াডালুপের পথে।

সমস্ত সমুদ্রপথে সিনর ক্যারাচ্ছোলি মিশনের উপর তার প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তার করলেন। আস্তে আস্তে মিশনেরও বিশ্বাস হল, ধর্ম একটা ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়। দুর্বলকে পদানত করে রাখবার উদ্দেশ্যে সবলের এটি একটি হাতিয়ার মাত্র। সিনর ক্যারাচ্ছোলি শেখালেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নেতিবাচক মনোভাবই যুক্তির মধ্যে পড়ে। ঈশ্বর থাকলেও প্রচলিত ধর্মের এই অনুশাসন নিশ্চয়ই তার অনু-মোদিত নয়। শুধু মিশন নয়, ভিক্তোয়ার জাহাজের নাবিকেরাও ক্যারাচ্ছোলির বাচন-ভংগিতে আকৃষ্ট হল। জন্ম থেকেই মানুষ মুক্ত এবং স্বাধীন। তার এই স্বাধীনতা ঈশ্বরের দান। এবং এই স্বাধীনতা কেড়ে নেবার অর্থ ঈশ্বরকে অপমান। কথাগুলি প্রত্যেক নাবিকেরই পছন্দ হল।

চট করে একটা সুযোগ এল হাতে। মার্টিনিক দ্বীপ ছেড়ে ভিক্তোয়ার বেরিয়েছে সমুদ্রে। সাগরের ঢেউ দেখে

মিশনের মনে পড়ে ফেলে আসা দিনগুলির কথা। ভূমধ্যসাগরের দিনগুলি, ইংলিশ চ্যানেলের জল, রোমের রাজপথ, ইতালীর দ্রাক্ষাকুঞ্জ, ছাত্রজীবনে পড়া ভ্রমণকাহিনীর পাতাগুলি এখন তার চোখের সামনে প্রতিদিন অভিনীত হচ্ছে। তিনি কি কল্পনায় মনে করতে পেরেছিলেন যে এতদূর পর্যন্ত ভেসে বেড়াতে পারবেন। নারিকেলবৃক্ষ সজ্জিত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মাটি দেখে মিশনের মনে হয় পৃথিবী বিচিত্র। আর জীবন? সে বুঝি বিচিত্রতর—।

হঠাৎ এক ইংরেজ রণতরীর সঙ্গে দেখা হল ভিক্তোয়ারের। জাহাজটির নাম উইনচেলসী—চল্লিশটি কামান উঁচিয়ে সে এল ভিকতোয়ারের সামনে। শুরু হল লড়াই। ভিকতোয়ার ঠিক এঁটে উঠছিল না রণতরীর সঙ্গে। ক্যাপ্টেন ফুরবেঁ এক গোলার আঘাতে লুটিয়ে পড়লেন ডেকে। তার লেফ্টেন্যান্ট তিনজনও হত হলেন যুদ্ধে। আর কেউ নেই নেতৃত্ব দিতে। সিনর ক্যারাচ্চোলি তখন তরবারি তুলে দিলেন মিশনের হাতে। জ্বালাময়ী এক ভাষণ দিয়ে মিশনকে তিনি অনুরোধ জানালেন ক্যাপ্টেনের পদ গ্রহণ করতে। মস্ত এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন ক্যারাচ্চোলি। মিশনকে তুলনা করলেন আলেকজান্ডারের সঙ্গে, চতুর্থ হেনরীর সঙ্গে। সবশেষে বললেন মাত্র অল্প কয়েকজন অনুচর নিয়ে ডেরিয়াস পারস্য দখল করেন। নাবিকদের দিকে চেয়ে তিনি বললেন এ যুদ্ধ ঈশ্বর এবং স্বাধীনতার জন্য। সুতরাং জয় অনিবার্য—।

প্রতিদানে সিনর ক্যারাচ্চোলিকে মিশন তার লেফটেন্যান্ট বলে ঘোষণা করলেন। দ্বিগুণ বিক্রমে ফরাসীরা লড়ল ইংরেজদের সঙ্গে। হঠাৎ কেমন করে এক বিস্ফোরণ হল যুদ্ধ জাহাজটিতে। সকলেই মারা পড়ল এই দুর্ঘটনায়। রণতরীর ক্যাপ্টেন জোনস এবং সমস্ত নাবিকই। কেবলমাত্র সহকারী ফ্রাংকলিন ছাড়া। ফ্রাংকলিন ভেসে গিয়েছিলেন জলে। ফরাসীরা তাঁকে উদ্ধার করে। কিন্তু আহত ফ্রাংকলিন দুদিন পরেই মারা যান—।

নীল সমুদ্রে ভিক্তোয়ার চলল ভেসে। এখন মিশন তার ক্যাপ্টেন। সিনর ক্যারাচ্চোলি সহকারী। নাবিকদের এক কাউন্সিল বা সভা বসল জাহাজে। প্রশ্ন হল, জাহাজের নতুন পতাকা কি হবে? কে একজন নাবিক উত্তর দিল কৃষ্ণপতাকাই হবে তাদের উপযুক্ত পরিচয়। বেচারা নাবিক কথাটা অত ভেবে বলেনি। সঙ্গে সঙ্গে সিনর ক্যারাচ্চোলি যেন উঠলেন জ্বলে। তিনি বললেন ভিক্তোয়ার জাহাজের নাবিকেরা তো জলদস্যু নয়। তারা প্রত্যেকেই স্বাধীন মানুষ। ঈশ্বর এবং স্বাধীনতার তারা অতন্দ্র প্রহরী। সাম্যে তাদের বিশ্বাস, বৈষম্যে নয়। কৃষ্ণপতাকা অবিশ্বাসের ইঙ্গিত,......অপরকে ভয়দেখানো বা ভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস, ঠিক হল শুভ্র একটি পতাকা হবে ভিক্তোয়ার জাহাজের উপযুক্ত। পতাকায় লেখা হবে, ঈশ্বর এবং স্বাধীনতার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের এক হুররায় জাহাজ উঠল কেঁপে। বোকা-সোকা নাবিকের দলের অনেকেই সিনর ক্যারাচ্চোলির তত্ত্বকথা বোঝে নি। তারা চিৎকার করল—ক্যাপ্টেন মিশন দীর্ঘজীবী হ'ন। কেউ কেউ বলল,—আমরা স্বাধীন। স্বাধীনতা আমাদের হাতের মুঠোয়। নতুন ক্যাপ্টেন মাথা নুইয়ে সকলকে অভিবাদন জানালেন। মিশন বললেন সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধই আমাদের ভিত্তি। এইগুলি রক্ষার জন্য আমরা সকলে একজোট। আমরা নিজেরা যেমন স্বাধীন এবং মুক্ত, অন্যকেও তেমন স্বাধীনতা এবং মুক্তি ফিরিয়ে দেব। ক্যাপ্টেনের আদেশে সংঘর্ষে নিহত নাবিকদের জামাকাপড় এবং অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্যগুলি এনে রাখা হল সামনে। প্রয়োজনমত সকলের মধ্যে সেগুলি বিলি করে দেওয়া হল। জাহাজের সিন্দুকটি এনে নামানো হল তাদের কাছে। সূত্রধরকে আদেশ করা হল কিছু চাবি তৈরী করতে। প্রত্যেক নাবিককে সিন্দুকের একটি চাবি দেওয়া হল। সিন্দুকের ধনরত্নে প্রতিটি নাবিকের সমান অধিকার। তাই প্রত্যেক নাবিকই সিন্দুকের চাবি পাবার অধিকারী।

ভিক্তোয়ার চলল সাগরের নীল জল কেটে। মাথার উপরে পতপত করে উড়ছে সাদা ফ্ল্যাগ। প্রথম শিকার হল বোস্টন অভিমুখী একটি ইংলন্ডের জাহাজ। জাহাজের ক্যাপ্টেনের নাম টমাস বাটলার। লুন্ঠন করে তেমন কিছু পাওয়া গেল না জাহাজে। কিছু মদ, খানিকটা মাংস এবং চিনি ছাড়া। নাবিকদের উপর এতটুকু অত্যাচার করল না মিশনের দলবল। টমাস বাটলার তো হতভম্ব। জলদস্যু ক্যাপ্টেন তাকে সসম্মানে বিদায় জানালেন। এরকম একটা ঘটনা শুনলেও তো কেউ বিশ্বাস করবে না। টমাস বাটলার অনেকের কাছে গল্প করেছিল। দরিয়াতে সে অদ্ভুত এক মানুষ দেখেছে। লোকটা আদৌ জলদস্যু কিনা তাই সে ভেবে পাচ্ছে না।

পরবর্তী যে জাহাজটি মিশনের কাছে আত্মসমর্পণ করল তার ক্যাপ্টেনের নাম হ্যারি রামজে। এই জাহাজটিতে ছিল কিছু কম্বল, গোলাবারুদ এবং ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র। অল্প কিছু মদও পাওয়া গেল জাহাজে। কয়েকদিন পরে হ্যারি রামজেকেও যেতে দেওয়া হল। শুধু একটা কথা দিতে হল রামজেকে। অন্তত মাস ছয়েকের জন্য এই ভাড়াটেবৃত্তি তাকে পরিহার করতে হবে। যাবার সময় রামজে একটা প্রস্তাব করেছিল। সামান্য একটু অনুমতি-ভিক্ষা। মিশন রাজী হলে তিনি তোপধ্বনি করে জলদস্যু ক্যাপ্টেনকে অভিবাদন জানাবেন। কিন্তু মিশন ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবলেন। হেসে বললেন,—ব্যাপারটা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। সুতরাং তার মত নেই।

এবার ভিক্তোয়ার চলল স্পেন অধিকৃত কার্তাজেনার পথে। কার্তাজেনা বন্দরে না ভিড়ে জাহাজটি গেল পোর্তো বেলোর দিকে। দুটি ডাচ বাণিজ্য-জাহাজের সঙ্গে ভিক্তোয়ারের দেখা হল সমুদ্রে। নাবিকেরা শুরু করল আক্রমণ। প্রচন্ড সংঘর্ষের মধ্যে একটি ডাচ জাহাজ সমুদ্রের জলে তলিয়ে গেল। অন্য জাহাজটির ভয়ব্যাকুল নাবিকেরা আত্মসমর্পণ করল মিশনের কাছে। ডাচেদের জাহাজটিতে বেশ কিছু পণ্যদ্রব্য ছিল। সোনারুপো, ব্রোকেড সিল্ক, কাপড়জামা, পায়ের মোজা,—বেশ কিছু জিনিসপত্র ভিক্তোয়ারে উঠল। ক্যাপ্টেন মিশন অবশ্য এতেও অসুখী। দলের তেরজন নাবিক মারা পড়েছে সংঘর্ষে। অনেকে আহত—তাদের মধ্যেও কয়েকজন মারা যাবে মনে হয়। কার্তাজেনাতে একবার গেলেন মিশন—। অবশ্যই নাম ভাঁড়িয়ে। মৃত ক্যাপ্টেন ফুরবেঁর নামে নিজের পরিচয় দিলেন গভর্নরের কাছে। লুঠের পণ্যদ্রব্য বেচে দিলেন কার্তাজেনার হাটে।

পাল তুলে ভিকতোয়ার এবার চলল আফ্রিকার গিনি উপকূলের দিকে। নাবিকদের কেউ কেউ চেয়েছিল নিউফাউন্ডল্যান্ড অভিমুখে রওনা হতে। ইংলণ্ডের নতুন উপনিবেশের দিকে এখন অনেক জাহাজ। ভালো শিকার পাবার সম্ভাবনা ওদিকেই বেশী। ক্যাপ্টেন মিশন এক সভা ডেকে বসলেন। ব্যাপারটার আলোচনা হোক। তিনি ক্যাপ্টেন বলেই তার মতটা সকলের উপর চাপিয়ে দিতে চান না। সকলের যা ইচ্ছে তাই গ্রহণ করা হবে। দেখা গেল অধিকাংশই আফ্রিকার গিনি উপকূলের দিকে যাবার পক্ষপাতী। জাহাজটার মেরামতি প্রয়োজন। রসদ-ভান্ডারেও এবার টান পড়েছে। সুতরাং আগে থাকতেই সাবধান হওয়া দরকার।

গোল্ডকোস্টের কাছে এসে একটি ডাচ জাহাজের দেখা মিলল। অতর্কিত আক্রমণে ডাচদের জাহাজটি দখল করে নিলেন মিশন। জাহাজের তেতাল্লিশজন নাবিককে বন্দী করে আনা হল ভিক্তোয়ারে। রসদপত্র এবং সোনাদানা আগেই হস্তগত করেছে জলদস্যুরা। বাকী ছিল সতেরো জন নিগ্রো দাস। মিশনের আদেশে তাদেরও তোলা হল ভিকতোয়ারে। মিশন আদেশ দিলেন নগ্নগাত্র নিগ্রোদের অংগে পরিধেয় দিতে। বন্দীদের সারি করে দাঁড় করানো হল তার সামনে। কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের সামনে গিয়ে মিশন ঘোষণা করলেন যে, তারা আর দাস নয়। সকলের মতই তারা স্বাধীন,—মুক্ত। জন্ম থেকে মানুষের অধিকার স্বাধীনতায়। যারা স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে মানুষকে দাস বানিয়ে রাখতে চায় তারা কুচক্রী। বন্দী ডাচদের দিকে চেয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, ইচ্ছে করলে তারা তীরে নেমে যেখানে খুশি যেতে পারে। আর যদি তেমন ইচ্ছা হয় তাহলে ভিকতোয়ার জাহাজের নাবিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে তারা এগিয়ে আসুক। ডাচেদের কাছে দ্বিতীয় প্রস্তাবটাই ভালো মনে হল। সকলেই রয়ে গেল ভিকতোয়ারে। জলদস্যুর দল শক্তিতে বেড়ে উঠল।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মিশনকে বিব্রত মনে হল। নোনা জল এসে ঢুকলে পুকুরের জলের মিষ্টতা থাকে না। ডাচ নাবিকদের সংগে মিশে মিশনের ফরাসী অনুগামীরা তাদের চরিত্র খুইয়ে বসল। তারা শিখছিল বিবাদ, ঈর্ষা পোষণ করা। এবং মদ্যপানে সকলে আসক্ত হয়ে উঠল। কথায় কথায় শপথ গ্রহণ করা এবং যুক্তি-

বিবর্জিত হয়ে ক্যাপ্টেন. মিশনকে তারা ভাবিয়ে তুলল। বাধ্য হয়ে মিশন একদিন গর্জে উঠলেন। ডাচদের ক্যাপ্টেনকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দেওয়া হল। নিজেদের শোধরাতে না পারলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে তাদের। প্রয়োজন মনে করলে নিজের হাতে বেত ধরতেও তিনি পিছপাও হবেন না। স্পেন দেশে একটা প্রবাদ আছে। সাধুর সঙ্গে যদি চোরকে বসবাস করতে হয় তবে সাধু হবে চোর কিংবা চোরকে সাধু হতে হবে। মিশন বললেন, তার জাহাজে দ্বিতীয়টা দেখতে চান তিনি। ডাচদের সে কথা মনে রাখতে হবে।

আরো কয়েকটি জাহাজ শিকার হল মিশনের। একটি ডাচ জাহাজ দখল করে জলদস্যুরা সমস্ত পণ্য এবং রসদপত্র লুণ্ঠন

মানুষকে পেয়ে জোহান্নার রানী এবং তার ভাই যেন মাঝদরিয়ায় কূল দেখতে পেল। উত্তর দিকের মহিল্লা দ্বীপের রাজার সংগে কলহ চলছে। যে কোনো দিন মহিল্লার সৈন্যরা রানীর আদরের জোহান্নার উপর চড়াও হতে পারে। সুতরাং জলদস্যুদের সাহায্য পেলে জোহান্না বাঁচে।

দীর্ঘদিন সমুদ্রে ভেসে মিশনও ক্লান্ত হয়েছিলেন। সভ্য মানুষের দেশ থেকে বহু দূরের এই সাগরবেষ্টিত সবুজ জোহান্না তার ভাল লাগল। এখানকার মানুষগুলো সরল, অকৃত্রিম এবং ভারী আমুদে। অন্তত বেশ কিছুদিন এখানে থাকা চলে। ক্যাপ্টেনের ক্লান্ত দুটি চোখের দিকে চেয়ে রানী কি যেন আঁচ করলেন। চট করে তার যুবতী বোনের কথা মনে পড়ে গেল।

তারা প্রত্যেকেই স্বাধীন মানুষ

করে নিল। কিছু ডাচ নাবিককে মিশনের প্রয়োজন ছিল। সূত্রধর, পাল তোলা-নামা করতে পারে যে নাবিকটি এবং কিছু সশস্ত্র লোককে রেখে বাকীদের যেতে দেওয়া হল সসম্মানে। কিছু সময় পরে একটি ইংরেজ জাহাজের উপর চড়াও হল জলদস্যুরা। ইতিমধ্যে নৌ-যুদ্ধে মিশনের চেলা-চামুণ্ডারা হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য: জাহাজশুদ্ধ ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করল। ষাট হাজার পাউন্ডের মত মুদ্রা পাওয়া গেল জাহাজে। সংঘর্ষে ইংরেজ ক্যাপ্টেন নিহত হলেন। মিশনের আদেশে মৃতদেহ নিয়ে সকলে এল তীরে। ধীরে ধীরে ক্যাপ্টেনকে শুইয়ে দেওয়া হল।—জলদস্যুদের মধ্যে একজন পাথরে লিপি উৎকীর্ণ করতে জানত। মিশনের আদেশে একটি সমাধি-শিলা প্রোথিত করা হল কবরের পাশে। তাতে লেখা ছিল ফরাসী ভাষায় কয়েকটি কথা : এখানে এক সাহসী ইংরেজ শুয়ে আছেন। শান্ত গম্ভীর পরিবেশে সমাধি-দান কাজটি নিষ্পন্ন হল।

অবশেষে ভিকতোয়ার জাহাজ এল জোহান্না দ্বীপে। এখানকার রানী এবং তার ভাই সমাদর করে গ্রহণ করল জল-দস্যুদের। এতগুলি সশস্ত্র এবং বলশালী

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বোনের পরিচয় করিয়ে দিলে কেমন হয়? জলদস্যু মিশন মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলেন। এদেশের মেয়েরা যেমন হয়। কিন্তু চোখ দুটি ভারী সরল... যেন নির্ভর করতে চায়। মিশন বিয়ে কর-লেন মেয়েটিকে। তার সেই লেফটেন্যান্ট সিনর ক্যারাচ্চোলিও বিয়ে করলেন রানীর ভাইঝিকে। অন্যান্য দস্যুরাও অনেকে জোহান্নার মেয়েদের বিয়ে করল। ইতিমধ্যে মহিল্লার রাজার সংগে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষ হয়ে গেছে এবং মহিল্লার সৈন্যরা মার খেয়ে ফিরে গেছে নিজেদের রাজ্যে।

অবশেষে মিশন তার অনুচরদের নিয়ে চললেন জোহান্না ছেড়ে। নিজেদের জন্য একটা উপনিবেশ গড়বেন তিনি। সাম্য, মুক্তি এবং মৈত্রীর বন্ধনে রচিত হবে সেই উপ-নিবেশের বনিয়াদ। মাদাগাস্কারের একটা ভূখণ্ড তার পছন্দ হয়েছিল। সকলকে নিয়ে মিশন উঠলেন এখানে,—নব বসতি গড়ে তুলবেন বলে।

ধীরে ধীরে সুন্দর এক বসতি গজিয়ে উঠল। দুর্গ তৈরী হল। চাষ আবাদের জমি প্রস্তুত। চাইল্ডহুড এবং লিবার্টি নামের দুটি জাহাজও তৈরী করল আগন্তুকের দল। নতুন জনপদের নাম দেওয়া হল—

লিবার্টালিয়া। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরি-চালনা করা হল জনপদকে। ব্যক্তিগত মালি-কানা বলতে কিছু নেই এখানে। টাকা-কড়ি, ভূসম্পত্তি এবং উৎপন্ন দ্রব্যে প্রত্যেকের সমান অধিকার। শাসনব্যবস্থার ভার রইল এক সভার উপর। মিশন তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হলেন সভাপতি। ক্যাপ্টেন টিউ নামের এক ইংরেজ জলদস্যুকে করা হল নৌবাহিনীর অধিনায়ক। আর সিনর ক্যারাচ্চোলি? তাকে করা হল সেক্রেটারী অফ স্টেট্। কথাবার্তা বলার জন্য ফরাসী, ইংরাজী, ডাচ এবং পর্তুগীজ ভাষাকেও বর্জন করা হল। সব ভাষা মিলিয়ে নতুন এক ভাষা গ্রহণ করা হল। এক ধরনের এস-পেরান্টো বলা চলে।

কিন্তু কোথায় গেল লিবার্টালিয়া? মাদাগাস্কার দ্বীপের এক অংশে যে নব-বসতি গড়ে উঠেছিল ক্যাপ্টেন মিশনের হাতে। জানা যায় যে, দ্বীপের জংলী অধি-বাসীরা যে কোনো কারণেই হোক, লিবার্টা-লিয়াকে সুনজরে দেখে নি। ফলে তাদের আক্রমণে ক্যাপ্টেন মিশন হয়েছিলেন ঘর-ছাড়া। পুনরায় নীল সমুদ্রে তার জাহাজ ভাসল। বহুদূরে মাদাগাস্কারের মাটি, গাছ-পালা, ভাঙ্গা ঘরবাড়ী, তার সাধের লিবার্টালিয়া ক্রমে অপসৃয়মান হয়ে দৃষ্টির আড়ালে গেল। জাহাজের এককোণে বিষণ্ণ নয়নে ক্যাপ্টেন মিশন দাঁড়িয়েছিলেন। কত-দিন আগে মার্সেলিস থেকে বেরিয়েছিলেন মিশন। ভূমধ্যসাগরের বুকে নীল আকাশ কতবার চেয়ে চেয়ে দেখেছেন। আর আজ?

বিষণ্ণ নায়কের করুণ দৃষ্টি বার বার তার স্বপ্নের লিবার্টালিয়ার মাটি ছুঁয়ে আসতে লাগল।

নিশ্চয়ই মিশন জানতেন না, সাম্য, মুক্তি এবং মৈত্রীর যে স্বপ্ন তার মনে সৃষ্টি হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়নি। আরো কিছুকাল পরে তার নিজের জন্মভূমি ফ্রান্সেই শুরু হয়েছিল বিপ্লব। বার বার বিঘোষিত হল সাম্য, মুক্তি এবং মৈত্রীর বাণী। ব্যাস্টিলের দুর্গদ্বার ভেঙে ফেলল জনগণ। শোনা গেল শুধু সাম্য মুক্তি এবং মৈত্রীর গান—। দীর্ঘদিনের বন্দীত্বের শৃংখল ভেঙে পড়ল খান খান হয়ে।

কিন্তু ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের কথা। মিশন ততদিন বেঁচে ছিলেন না। জানা গেছে নীল দরিয়ায় জাহাজডুবি হয়ে তিনি হারিয়ে যান।

* * *

জলদস্যু মিশন নিঃসন্দেহে গোবরে পদ্মফুল। কিন্তু এডওয়ার্ড টিচ্ বা ব্ল্যাকবিয়ার্ড? দুরন্ত দস্যুর বোধহয় তুলনা নেই। কিংবা তার উপমা বোধহয় সেই। নৃশংস এবং নিষ্ঠুর আচরণ ছাড়াও বিকৃত যৌনসম্ভোগের যে পরিচয় এডওয়ার্ড টিচের জীবনে পাওয়া গেছে তার তুলনা মেলা দুষ্কর।

ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড টিচ্ ব্রিস্টলের লোক। কারো কারো মতে তার জন্ম হয়েছিল জামাইকায়। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে এডওয়ার্ড বেরিয়ে পড়লেন জলদস্যু হয়ে। দুটি জাহাজ একই সংগে রওনা হল। প্রথমটিতে

ক্যাপ্টেন বেঞ্জামিন হর্নিগোল্ড, অন্যটির ক্যাপ্টেন স্বয়ং এডওয়ার্ড টিচ্‌। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কাছে একটা বড় ফরাসী জাহাজ শিকার হল টিচের। জাহাজটি যাচ্ছিল মার্টিনিক দ্বীপের দিকে। হর্নিগোল্ডকে বলে ফরাসী জাহাজটি টিচ্‌ দখল করলেন। বেশ ভালো করে সাজানো হল জাহাজটি। চল্লিশটি কামান বসানো হল জাহাজটিতে। নতুন নাম দেওয়া হল জাহাজের—রানী অ্যানের প্রতিহিংসা।

ইতিমধ্যে হর্নিগোল্ড তার জাহাজ নিয়ে ফিরে গেছেন প্রভিডেন্সে। সেখানকার গভর্নর তাকে ক্ষমা করেছেন। এডওয়ার্ড টিচ্‌ ভাবলেন হর্নিগোল্ডটা বেজায় ভীরু। নইলে উন্মুক্ত দরিয়া পরিত্যাগ করে গিয়ে উঠল ঘিঞ্জি শহরে। যেখানে অপরের শাসনে দিন কাটাতে হবে। কুইন অ্যানস রিভেঞ্জ এগিয়ে চলল। এডওয়ার্ডের মত হল, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে। প্রতিহিংসার আগুনে প্রথম জ্বলে পুড়ল গ্রেট অ্যালেন নামক জাহাজটি। সমুদ্রের বুকে জাহাজটি শিকার করে লুণ্ঠন করলেন এডওয়ার্ড। তার আদেশে জাহাজটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। লেলিহান শিখা এবং কালো ধোঁয়া দেখতে দেখতে এডওয়ার্ড টিচ্‌ হাসছিলেন পৈশাচিক হাসি। সমস্ত নীল দরিয়াতে আগুন জ্বালাবেন তিনি। এই তো সবে শুরু:—দিবসের সকাল মাত্র। এর পরই টিচ্‌ ধরলেন স্প্যানিশ আমেরিকার পথ। মধ্যগগনের মার্তণ্ডের মত জ্বালা ছড়াতে হবে তাকে।

পথে অন্য এক জলদস্যুর সঙ্গে দেখা হল টিচের। বারবাডোসের মেজর স্টেডি বনেট। বনেট সংগী হলেন জলদস্যু এডওয়ার্ডের। হণ্ডুরাস উপসাগরে জলদস্যুরা জিরিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ একটি ছোট জাহাজকে দেখা গেল সমুদ্রে। জামাইকা থেকে সে আসছিল। এর নাম অ্যাডভেঞ্চার। ডেভিড হ্যারিয়ট নামে এক ভদ্রলোক ক্যাপ্টেন। টিচের এক অনুচর রিচার্ড এগিয়ে গেলেন অ্যাডভেঞ্চারকে দখল করতে। অল্প আয়াস। অ্যাডভেঞ্চার দখলে এল এবং জলদস্যুর দল এটিকে নিজেদের জলযান বলে গ্রহণ করল। হ্যান্ডস নামে এক জলদস্যুকে দেওয়া হল অ্যাডভেঞ্চারের ভার।

কিছুদিন পরে গোটা চারেক ছোট জাহাজ এবং একটি বড় জাহাজ চিহ্নিত হল জলদস্যুর দৃষ্টিতে। বড় জাহাজটির নাম প্রোটেস্টান্ট সীজার। ছোট জাহাজগুলির তিনটির মালিক জামাইকার বার্নাড নামে এক ভদ্রলোক। অন্যটির মালিক ক্যাপ্টেন জেমস। সব কটি জাহাজকে লুণ্ঠন করল জলদস্যুরা। লুণ্ঠন শেষ হলে বার্নাডের জাহাজগুলিকে যেতে দেওয়া হল। অন্য জাহাজ দুটিতে আগুন ধরিয়ে দিল জলদস্যুরা। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড টিচের আদেশ। বড় জাহাজটি বোস্টনের। সেখানে কিছুদিন আগেই কয়েকজন জলদস্যুকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। সে কারণে এডওয়ার্ড টিচ্‌ বোস্টনের উপর খাপ্পা। তাছাড়া রানী অ্যানের প্রতিহিংসার আগুনে কাউকে তো পুড়তেই হবে। সমুদ্রে বহুদূর ঘুরে বেড়িয়ে ক্যাপ্টেন টিচ্‌ এলেন ক্যারোলিনার কাছে। এখানে বেশ কিছুদিন রইলেন টিচ্‌। লণ্ডনগামী একটি জাহাজ খুব শীঘ্র শিকার হল তার। দুটি জাহাজ বন্দরের দিকে রওনা হয়েছিল, সেগুলিও জলদস্যুর হাতে ধরা পড়ল। সমস্ত শহরে হৈ চৈ পড়ে গেল। বন্দর থেকে কোনো বাণিজ্যজাহাজই আর বেরুতে সাহস পায় না। কিছুদিন আগেই ভেন নামক এক জলদস্যু যথেষ্ট ক্ষতি করে গিয়েছে বন্দরের। আবার এডওয়ার্ড টিচের আবির্ভাব গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত হয়ে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে টিচ্‌ বন্দরগামী জাহাজ এবং তার আরোহীদের আটক করে রাখতেন। স্থানীয় গভর্নরের কাছে লোক যেত টিচের। এক পেটি ওষুধপত্র কিংবা অন্যান্য রসদের দাবী নিয়ে। দিতে পারলে ভালই, নচেৎ জাহাজগুলি কোনদিন বন্দরের মুখ দেখবে না। রিচার্ড এবং অন্য দু-একজন গিয়ে উঠত বন্দরে। সঙ্গে যেত রবার্ট ক্লার্ক নামে এক ভদ্রলোক। লণ্ডনগামী সেই জাহাজের ইনি ছিলেন আরোহী। ক্লার্ক যেতেন টিচের দূত হয়ে। গভর্নর যখন ক্লার্কের সংগে কথা বলতেন, রিচার্ড এবং তার সংগীরা ঘুরে বেড়াত শহরের পথে। দুর্বিনীত এবং উদ্ধত ভঙ্গি জলদস্যুদের। কিন্তু কারো সাধ্য ছিল না তাদের কেশ স্পর্শ করতে পারে। কিছু করবার অবশ্য উপায়ও ছিল না। এডওয়ার্ড টিচের নৃশংসতা সকলেরই জানা। আটক জাহাজগুলি প্রতিহিংসার আগুনে দাউ দাউ করে পুড়বে। আর আরোহীদের কাটা মুণ্ডুগুলি উপহার আসবে গভর্নরের কাছে।

অবশ্য চার্লসটন ছেড়ে টিচ চলে গেলেন উত্তর ক্যারোলিনায়। বড় জাহাজটিতে টিচ্‌ স্বয়ং—অন্য দুটি ছোট জাহাজের একটিতে রিচার্ড এবং অন্য জাহাজে ক্যাপ্টেন হ্যান্ডস। কিন্তু জলদস্যুর মনে হল কিছু অনুচরকে এবার হঠাতে হবে। নইলে লুঠের মালে বড় বেশী ভাগীদার। বেশ কিছু লোককে ফাঁকি দিতে পারলে অল্প কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে সমস্ত সম্পদই টিচ একা ভোগ করতে পারবেন। খুব সুন্দর একটি কৌশল তৈরী করলেন টিচ্‌। বড় জাহাজটিতে তেমন কিছু সম্পদ ছিল না। কায়দা করে টিচ জাহাজটিকে চড়ায় লাগিয়ে দিলেন। এবং উদ্ধারের জন্য হ্যান্ডসের কাছে সাহায্য চাইলেন। ছোট জাহাজটি এগিয়ে এল টিচের কাছে। কৌশলে টিচ সেটিতে উঠে পড়লেন। ব্যস, ছোট জাহাজ দুটি টিচকে নিয়ে তরতর করে এগিয়ে গেল। রানী অ্যানের প্রতিহিংসা পড়ে রইল চড়ায় আটকে। টিচ তার নাবিকদের দিকে ফিরেও চাইলেন না। সমুদ্রপথে যেতে যেতে আরো কিছু অপছন্দ করা জলদস্যুকে একরকম জোর করেই নামিয়ে দিলেন টিচ্‌। বালুময় এক দ্বীপে প্রায় মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হল হতভাগ্যদের। এ দ্বীপে পাখী নেই, পশু নেই—একটা লতাগুল্ম পর্যন্ত জন্মায় নি। কিন্তু জলদস্যুদের বরাত জোর। ঠিক দুদিন পরে মেজর বনেটের জাহাজ এসে তাদের উদ্ধার করে।

ইতিমধ্যে এডওয়ার্ড টিচ্‌ পরিচিত হয়েছেন ব্ল্যাকবিয়ার্ড নামে। কুচকুচে কালো এক মুখ দাড়ি গজাল টিচের মুখে। মেয়েদের কেশের মত দীর্ঘ। অনেকদিন দাড়ি কামান নি টিচ্‌। অযত্নবর্ধিত দাড়িগুলি দেখে টিচের কি মনে হয়েছিল কে জানে। জীবনে আর কোনোদিন দাড়ি কামানোর ইচ্ছে হয়নি তার। শাক্ত কাপালিক কিংবা মুসলমান মৌলবীদের চেয়েও দীর্ঘ এই দাড়ি বিনুনির মত ঝুলিয়ে দিতেন টিচ্‌। কানের দু পাশ থেকে ছোট-বড় নানা সাইজের বিনুনি ঝুলত। আমেরিকার লোকেদের কাছে এডওয়ার্ডের এই বিনুনি ধূমকেতুর লেজের মত মনে হয়েছে। আর ধূমকেতু হলেন ব্ল্যাক্‌বিয়ার্ড স্বয়ং—। সমুদ্রে ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে দেখা গেছে জানলে শহরে বসেও লোকের হৃদ্‌কম্প শুরু হত।

এই সময় চার্লস ইডেন নামক এক ভদ্রলোক নর্থ ক্যারোলিনার গভর্নর। ব্ল্যাকবিয়ার্ডের সঙ্গে ইডেনের খুব ভাব জমে উঠল। গভর্নর ইডেন দুর্বলচিত্ত এবং ফাঁকতালে দাঁও মারবার পক্ষপাতী। কুড়িজন অনুচর নিয়ে ব্ল্যাকবিয়ার্ড দেখা করলেন গভর্নরের সঙ্গে। কি লেন-দেন হয়েছিল জানা যায় নি। কিন্তু ইডেন সাহেব ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে সম্রাটের ক্ষমা দান করলেন।

শুধু ক্ষমাদান নয়। ব্ল্যাকবিয়ার্ডের জন্য অনেক কিছু করেছেন গভর্নর সাহেব। লুঠ করা জাহাজটি ইংরেজ বণিকের সম্পত্তি। কিন্তু বাথ-টাউনে গভর্নর সাহেব কোর্ট বসিয়ে ঘোষণা করলেন যে, জাহাজটি স্পেনীয়দের। এবং স্প্যানিশদের কাছ থেকেই ওটি জলদস্যু টিচের শিকার হয়।

চার্লস ইডেন এই কালোদাড়ি জলদস্যুটির বিয়ে পর্যন্ত দিয়েছিলেন। নর্থ ক্যারোলিনার একটি ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে। বেশী বয়স হয়নি মেয়েটির। মাত্র ষোল, ষোড়শীর সঙ্গে বিবাহের এই আসরে গভর্নর নিজে উপস্থিত ছিলেন। ওদেশে তখন নিয়ম ছিল, বিয়েটা হবে কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর উপস্থিতিতে। বেচারী ষোড়শী কিন্তু জলদস্যুর প্রথমা স্ত্রী নন। তবে কি দ্বিতীয়া? উঁহু! এর আগে এডওয়ার্ড টিচের তের্টি বিয়ে হয়েছে। মেয়েটি জলদস্যু ব্ল্যাকবিয়ার্ডের চৌদ্দ নম্বর স্ত্রী। তবে চতুর্দশী নয়,—ষোড়শী জায়া।

এডওয়ার্ড টিচ সম্রাটের ক্ষমা লাভ করলেও দস্যুবৃত্তি ছাড়লেন না। হঠাৎ একদিন তিনি বেরিয়ে পড়লেন বারমুডার পথে। কয়েকটি ইংলণ্ডের জাহাজ তার শিকার হয়েছে। রসদপত্র এবং অন্যান্য পণ্য লুণ্ঠন করে জাহাজগুলিকে অবশ্য যেতে দেওয়া হল। কিন্তু বারমুডার কাছাকাছি একস্থানে দুটি ফরাসী জাহাজকে দেখে ব্ল্যাকবিয়ার্ড যেন নেচে উঠলেন। একটিতে চিনি বোঝাই, অন্যটি শূন্য। দ্বিতীয় জাহাজটিকে ছেড়ে দেওয়া হল। প্রথমটি দখল করে ব্ল্যাকবিয়ার্ড ফিরে এলেন তার আস্তানায়। জাহাজের নাবিকদের অবশ্য

দ্বিতীয়টিতে তুলে দেওয়া হল। শুধু চিনি এবং কোকোর পণ্য নিয়ে ফরাসী জাহাজটি এল টিচের পিছু পিছু।

নর্থ ক্যারোলিনার গভর্নর অবশ্য ব্যাপারটা অন্যভাবে সাজিয়ে দিতে সহায়তা করলেন। টিচ বললেন, পণ্যভর্তি জাহাজটিতে একটি লোকও ছিল না। মনুষ্যহীন পোতটি তিনি নিয়ে এসেছেন মাত্র। গভর্নর টিচের এই যুক্তি মেনে নিলেন। চিনির বস্তাগুলি ভাগ হয়ে গেল। গভর্নর পেলেন, তাঁর সেক্রেটারী মিঃ নাইটেরও কিছু ভাগ মিলল। বাকী পণ্য বাঁটোয়ারা হল জলদস্যুদের মধ্যে।

তবু ব্ল্যাকবিয়ার্ডের মনে ভয় ছিল। জাহাজটা কেউ কোনদিন চিনে ফেলতেও পারে। সুতরাং গভর্নরের সাহায্য আবার তার প্রয়োজন হল। জাহাজটা জখম হয়েছে, এবং যে কোনো স্থানে ডুবে গিয়ে যান চলাচলে বাধা দিতে পারে। টিচ এই বক্তব্য নিয়ে এলেন চার্লস ইডেনের কাছে। ব্ল্যাকবিয়ার্ডের মন বুঝে গভর্নর হুকুম দিলেন। ফরাসী জাহাজটিকে গভীর জলে নিয়ে গিয়ে জলদস্যুর অনুচরেরা সেটিকে ডুবিয়ে দিয়ে এল। সাক্ষ্যপ্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে জলদস্যু নিশ্চিন্ত হলেন।

বেশ কিছুদিন চুপচাপ রইলেন ব্ল্যাকবিয়ার্ড। কিছু কিছু ব্যবসায়ীর সংগে তার ভাব হল। লুঠের পণ্য তাদের মাধ্যমেই বেচাকেনা হতে শুরু করল। দলের প্রয়োজনমত রসদপত্র বন্দরের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে লাগলেন ব্ল্যাকবিয়ার্ড। বলাবাহুল্য জলদস্যুর কাছে মালের দামের বিল পাঠাতে নিশ্চয়ই কেউ সাহসী হয় নি। মাঝে মাঝে ক্ষেত-মালিকদের কাছেও আসেন টিচ্। কেউ কেউ ভয়ে তাকে সমাদর করে। সময়ে সময়ে তাদের স্ত্রী এবং বয়স্কা মেয়েদের সংগেও ঘনিষ্ঠতা শুরু করলেন ব্ল্যাকবিয়ার্ড। মেয়েদের জন্য জলদস্যুরা উপহার নিয়ে আসে। ব্ল্যাকবিয়ার্ড ওদের নিয়ে বেড়িয়ে আসেন। গুজব শুরু হয়, অমুক খেতমালিকের স্ত্রী জলদস্যু টিচের সংগে জলবিহার করে এসেছে।

নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি শুরু করেছিলেন ব্ল্যাকবিয়ার্ড। ক্ষেতমালিকেরা বিরক্ত। ব্যবসায়ীর দল উত্যক্ত। নদীতে বসে জলদস্যু ব্ল্যাকবিয়ার্ড এবং তার সাংগোপাংগরা প্রায়ই বাণিজ্যজাহাজের উপর হামলা করে। সকলে মিলে খুব গোপনে একটা পরামর্শ করল। নর্থ ক্যারোলিনার গভর্নর চার্লস ইডেনের কাছে দরবার করে কোনো সুরাহা হবে না। সকলে মিলে দূত পাঠাল ভার্জিনিয়ার গভর্নর স্পটস উডের কাছে। এই ভদ্রলোক সত্যিকার সাহসী। অন্য এক গভর্নরের এক্তিয়ারে সৈন্য পাঠাতে তিনি ভয় পেলেন না। জেমস নদীতে পার্ল এবং লাইম নামের দুটি রণতরী অপেক্ষা করছিল। স্পটস উড দুই রণতরীর অধিনায়কের সংগে আলোচনা করলেন। রবার্ট মেনার্ড নামক এক ভদ্রলোককে পাঠানো হল অভিযানের নায়ক করে। মেনার্ড একজন অভিজ্ঞ অফিসার। পার্ল জাহাজে তিনি বহুদিন রয়েছেন।

ছোট ছোট জাহাজে করে অভিযানকারীরা চলল। ইতিমধ্যে গভর্নর স্পটস উড এক আদেশনামা জারী করেছেন। এডওয়ার্ড টিচ ওরফে ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে যে ধরে দিতে বা হত্যা করতে পারবে, তার জন্য একশত পাউণ্ড পুরস্কার সরকার দিতে বাধ্য। অন্যান্য জলদস্যুদের জন্যও পুরস্কার রয়েছে—চল্লিশ পাউন্ড থেকে দশ পাউন্ড পর্যন্ত। আদেশনামা জারী হল—২৪শে নভেম্বর, ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে। এক বৎসরকাল এই আদেশনামা বলবৎ থাকবে।

ওক্রকোক খাড়িতে জলদস্যুর সন্ধান পেলেন মেনার্ড। ব্যাপারটা খুবই সংগোপনে সম্পন্ন হয়েছিল। নর্থ ক্যারোলিনার গভর্নর এবং সেক্রেটারী নাইটও আঁচ করতে পারেন নি। মেনার্ডের জাহাজগুলিকে এগিয়ে

ষোড়শী জায়া

আসতে দেখে ব্ল্যাকবিয়ার্ড চমকে উঠলেন। পালাবার পথ রুদ্ধ। গতরাত্রে প্রচুর মদ খেয়েছেন টিচ। সকালে এখনও তার নেশা কাটে নি। সম্মুখে মেনার্ডের বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখে তার নেশা ছুটে গেল। শুরু হল ভীষণ যুদ্ধ। জলদস্যুর কামানের গোলার আঘাতে মেনার্ডের জাহাজ এবং সৈন্যদের বিনষ্ট হবার দশা। তবু এক সময় শুরু হল হাতাহাতি লড়াই। ঝাঁপ দিয়ে ব্ল্যাকবিয়ার্ড এসে উঠলেন মেনার্ডের জাহাজে। সংগে অল্প কয়েকজন জলদস্যু। চারিদিকে ধোঁয়ায় অন্ধকার। পিস্তলের গুলি মুহুর্মুহু গর্জে উঠছে। উন্মুক্ত তরবারি হাতে জলদস্যু টিচ লড়ছেন। তার সংগে এঁটে ওঠা যেন অসম্ভব। ইতিমধ্যে গুলি এবং অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন ব্ল্যাকবিয়ার্ড। অংগ বেয়ে রুধির পড়ছে। একসময় এই কুখ্যাত জলদস্যু পিস্তলের গুলিতে নিহত হন।

বাকী জলদস্যুরা আত্মসমর্পণ করল সৈন্যদের কাছে। মেনার্ডের আদেশে কালো-দাড়ি এই জলদস্যুর মাথা কেটে ঝুলিয়ে দেওয়া হল জাহাজের একটি দণ্ডের মাথায়। মৃত্যুর আগে টিচ ব্যবস্থা করেছিলেন তার জাহাজটিকে বিস্ফোরণ করিয়ে ডুবিয়ে দিতে। সেই মত এক বিশ্বস্ত নিগ্রো অনুচরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। মেনার্ড এবং তার সৈন্যরা জাহাজে এসে উঠবার সংগে সংগে নিগ্রোটি বারুদে অগ্নিসংযোগ করবে। ফলে জয়ী হয়েও মেনার্ড মারা পড়বেন দুর্ঘটনায়। নিগ্রোটি কিন্তু অগ্নিসংযোগ করতে পারেনি। দুই বন্দী যে কোনো উপায়েই হোক, তাকে এই কাজ থেকে বিরত করে।

জাহাজটিকে ডুবিয়ে দিতে পারলে অবশ্য গভর্নর চার্লস ইডেন এবং অন্যান্যদের উপকার হত। কারণ জাহাজের মধ্যে গভর্নরের লেখা চিঠিপত্র, ব্যবসায়ীদের সংগে গোপন কারবারের হিসেব এবং সেক্রেটারী নাইটের নানা অন্যায় নির্দেশ পাওয়া গেল। মেনার্ড গভর্নর সাহেবের গোপন গুদামে হানা দিয়ে চিনির বস্তাগুলি আবিষ্কার করলেন। সেক্রেটারী নাইটের ভাগেরও হদিশ পাওয়া গেল।

আহত সৈন্যরা সুস্থ হলে মেনার্ড ফিরলেন ভার্জিনিয়ার দিকে। তার জাহাজের একটি খুঁটির মাথায় তখনও ব্ল্যাকবিয়ার্ডের মুণ্ডটা ঝুলছে। পনের জন জলদস্যু জাহাজে বন্দী। এদের মধ্যে তেরজনের ফাঁসি হল। দুজন শুধু বেঁচে যায়। একজনের নাম স্যামুয়েল ওডেল। লোকটা সংঘর্ষের আগের দিন যোগ দিয়েছিল দলে। একটি বাণিজ্যজাহাজ থেকে তাকে এনেছিল জলদস্যুরা। দেহে সত্তরটি আঘাত দেখা গেল লোকটির। ওর পরমায়ুর জোর। লোকটা বেঁচে গেল।

আর একজনের নাম ইসরায়েল হ্যাণ্ডস। ব্ল্যাকবিয়ার্ডের একজন বিশ্বস্ত অনুচর। হ্যাণ্ডসকে পাওয়া গিয়েছিল বাথ টাউন শহরে। খোঁড়া হ্যাণ্ডস অতিকষ্টে হাঁটছিল।

বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলেও ইসরায়েল হ্যাণ্ডস সম্রাটের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করে। এবং ইংলণ্ডেশ্বর তাকে দণ্ড থেকে অব্যাহতি দেন। এর পরে সে গিয়েছিল লণ্ডনে। বাকী জীবন লণ্ডনের রাজপথের ধারে লোকটা ভিক্ষে করত। এবং সম্ভবত ঈশ্বরের কাছেও প্রার্থনা জানাত—পরম কারুণিক ঈশ্বর যেন তাকে ক্ষমা করেন। তার দুষ্কার্যের জন্য সে অনুতপ্ত।

একজন জলদস্যু বলেছিল লড়াইয়ের সময় তাদের ক্যাপ্টেনকে ভীষণ দেখাত। বিনুনিকরা দাড়ি দুলত মুখের দুপাশে, এবং নীচে। কোমরের কাছে তিনটি পিস্তল। কটিবন্ধে ছোরা। টুপীর নীচে জ্বলন্ত দুটি কাঠি। লম্বা লম্বা এই শলাকাগুলি ধীরে ধীরে জ্বলত। ঘণ্টায়

ধারো ইস্তির মত দ্যুত সেগুলি। বলা-বাহুল্য আগুনের দুই জ্বলন্ত বিন্দুর পাশে দুটি জ্বলজ্বলে ভাঁটার মত রক্ত-চক্ষুতে জলদস্যুকে মূর্তিমান শয়তান ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি।

এডওয়ার্ডের লেখা একটি ডায়েরী পাওয়া গিয়েছিল জাহাজে। জলদস্যু নেতার দৈনন্দিন দুশ্চিন্তা এবং তার সমাধানের চিত্র এতে ফুটে উঠেছে।

ব্ল্যাকবিয়ার্ডের নৃশংস আচরণের একটি কাহিনী দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে। খোঁড়া ইসরায়েল হ্যান্ডস বলেছিল তার এই অবস্থার জন্য স্বয়ং ক্যাপ্টেনই দায়ী। সে রাত্রে কি যে হয়েছিল ক্যাপ্টেনের! চারজনে বসে কেবিনে মদ গিলছিল। সে, ক্যাপ্টেন এবং অন্য দুজন। হঠাৎ পিস্তল তুলে ক্যাপ্টেন তার জানু লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। সংগে সংগে হো হো হাসি। জ্ঞান ফেরবার পর ইসরায়েল হ্যান্ডস ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে প্রশ্ন করেছিল তাকে আহত এবং খোঁড়া করে ক্যাপ্টেনের কি লাভ হ তার কি অপরাধ? সে তো অন্যায় কি করে নি।

ক্রূর হেসে ব্ল্যাকবিয়ার্ড উত্তর দি অন্যায় তেমন কিছু অবশ্য নেই। তবু ম মাঝে এরকম দু-একটা কাণ্ড না ক জলদস্যুর দল তাকে ক্যাপ্টেন বলে মা করবে কেন?

ইসরায়েল হ্যান্ডসের জন্য কে দুঃখবোধই জলদস্যুর চিত্তে জাগে নি।

একটি চিঠির উত্তরে ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

তোমার সেদিনের সুন্দর চিঠির উত্তরে
দু'হাত আমি বাড়িয়ে দিয়েছি, বন্ধু!
তপ্ত রোদ উদ্ভাসিত সেই হাত মৈত্রী-সেতু।
সেই সেতু—দূর বিস্তৃত সেই মুক্ত বাহু আজ
গঙ্গা-পদ্মা পেরিয়ে গিয়ে মেঘনা-ভৈরব
আর ধলেশ্বরী-শীতলক্ষ্যার তীর-লগ্ন ;
ইছামতীর ওপারে সে হাত পরম আশ্বাসে
সুন্দরবনের সুবিশাল সীমান্তও অতিক্রান্ত।
বন্ধু আমার, তুমি-আমি আজ আলিঙ্গনাবদ্ধ ;
এক আশ্চর্য স্বপ্নের বীজ থেকে সমুদ্ভূত অবাক
মহীরুহ এক ভাবনার সাফল্য যখন স্পষ্ট,
দু'দিকেই তখন দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলনে
স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের উন্মাদনা।
একই আশার একই ভাষার মানুষ যে আমরা,
একই অখণ্ড ভূগোল-ইতিহাসের অংশীদার—
আমরা যে একই সমাজ-সংস্কৃতির সন্তান!
তাই খুব শক্ত বুনিয়াদেই এবার প্রতিষ্ঠিত
হতে চলেছে আমাদের সবার জননী-জন্মভূমি।

যতই এগিয়ে যাই ॥

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

যতই এগিয়ে যাই, অলৌকিক বৃক্ষের শিকড়ে
কী বিচিত্র কারুকার্য! কী বিচিত্র মায়াবিনী স্বরে,
বৃষ্টির গম্ভীর মন্দ্র—
বেজে ওঠে উৎসবের ঋতু!

যতই হৃদয় ছুঁয়ে বলি, আমি তো আনন্দে সিক্ত নই—
করমচা ফলের মতো—
কিংবা ফুল অরণ্যবৃক্ষের গৃহস্থালি।
শঙ্খের শরীর বেয়ে
বীজের অঙ্কুর কেঁপে ওঠে।
জলের তরঙ্গধ্বনি পল্লবে পল্লবে প্রতিহত।

যতই এগিয়ে যাই, যতই অতলে হাত রাখি—
নদীরও অধিক বেগে অস্থির পবিত্র ভালোবাসা
মাটির গোপন গন্ধে সহসা মসৃণ হয়ে ওঠে—
রৌদ্রের সঙ্কেত নিয়ে
প্রহরে প্রহরে সূর্যমুখী!

মালিশ

সবিতা দাশগুপ্ত

মনস্থির করে ফেলেছিলাম—ঢের সয়েছি আর সইব না। না হয় পোষাক-আষাকে ওর সঙ্গে আমাদের দেশের ঝিদের কোন তুলনা নাই চলল। ঝি না হয় নাই বললাম ওকে, এখানকার রেওয়াজ মেনে ইউরোপের কায়দায় মেইড বললাম। কায়দা করে ও চুল বাঁধুক, বাহারে স্কার্ট ব্লাউজ পরুক, হাই-হীল জুতো খটখটিয়ে রাস্তায় হাঁটুক—যে রকম এখানকার সব মেইডরাই করে। ওর ভাল দিকটাও দেখতে রাজী ছিলাম : অন্য বেশ কিছু মেইডদের মত 'আমি মিস ওয়ার্ল্ড বা মিস ঈজিপ্ট, নিদেন পক্ষে মিস আমার-পাড়া হতে পারতাম' এরকম ভাবভঙ্গী করে না যদিও জনৈক বন্ধু ওকে দেখে বলেছিলেন ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স রিজনেবল্। তা ছাড়া কখনো •অন্যের লিপস্টিক বা নেইলপলিশ চুরি বা এমন কি ব্যবহার করার চেষ্টা করেনি এখন পর্যন্ত। কাজ করে প্রচুর—ঘরদোর সাফ করে, রান্না করে, নিজে সেধে উৎসাহ করে শিখে লুচি বেলে ভাজে, কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে মাছের ঝোল পর্যন্ত বানায় পুরোপুরি বাঙালী রাঁধুনীর মত। বাথরুম ঘষে মেজে চকচকে করে, বাজার করে অথচ পয়সা সরায় না, আমাদের ছোট্ট মেয়ে মিশমীর দেখাশোনা করে, স্কুলে নিয়ে যায়, নিয়ে আসে। কিন্তু এমন কাজের লোককেও বরখাস্ত করবো ঠিক করে ফেলেছিলাম, ভবিষ্যতে ঝিয়ের খোঁজে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে জেনেও। সপ্তাহে একদিনের ছুটি তার পাওনা—সেই ছুটিতে বাড়ী যায় আর ফিরতেই চায় না। দুদিন তিনদিন হয়তো পাত্তাই নেই। এমনিতে তো সারাদিনে ওর কতো টেলিফোন আসছে কিন্তু ও যখন ডুব মারে তখন ভুলেও ফোন করে বলে না ওর মার অসুখ বা বাবার অসুখ বা নিজের মাথা-ব্যথা বা যাহোক কিছু। তাই তিতিবিরক্ত হয়ে অভিধান দেখে আরবী শব্দ বেছে পর পর সাজিয়ে মুখস্ত করে নিলাম—আ্যান্তি নু, মুখআউজা আ্যান্তি হেনা। মানে তুমি বিদায় হও, তোমাকে আমাদের এখানে চাই না। বাড়ীতে এসে ঢুকলো ও তিনদিন বাদে—রবিবারে গিয়ে বুধবারে এলো এবং আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মুখ কাচুমাচু করে বলল "মালিশ!"

'মালিশ' শুনলে আমাদের মনে আসে ইডেন গার্ডেন বা ঢাকুরিয়া লেক—নানা ফিরিওয়ালাদের মধ্যে একদল ঘুরে বেড়াতো হাতে তেল বা সেরকম দেখতে কোন পদার্থের শিশি ঝুলিয়ে, বেঞ্চিতে বসে চোখ বুজে মস্তিষ্কমর্দনসুখ ভোগ করতে চায় এরকম খদ্দেরের সন্ধানে। কিছুদিন আগে একটি হিন্দী গানও শুনেছিলাম, তার-মধ্যে মাঝে মাঝে হাঁকছিল 'তেল মালিশ'। শব্দটি এসেছে বাঙলায় বোধহয় ফারসী থেকে হিন্দী উর্দু মারফৎ। অন্তত ভাষা-তাত্ত্বিকেরা তো তাই বলছেন দেখছি। ফারসীভাষায় এখনো আমরা মালিশ বলতে যা বুঝি তাই। আরবী থেকে শব্দটি পাইনি ভালই হয়েছে। লেবাননের এক আরব বন্ধু একদিন আমাদের হাসতে হাসতে বুঝিয়ে দিলেন এখানে সাত খুন মাফ হয়ে যাবে লোকে আশা করে স্রেফ 'মালিশ' মন্ত্রের জোরে।

দিল্লীর রাস্তাঘাটে একটি কথা খুব শুনতে পাওয়া যায়—"কোই বাত নেহি।" দুই সাইকেলে ঠোকাঠুকি হয়ে আরোহীদ্বয় ভূপতিত হলো, কার দোষ তাই নিয়ে মাথা ঘামাল না, আস্তিন গোটাল না, ধুলো ঝেড়ে "কোই বাত নেহি" বলে আবার যে যার অফিসমুখো বা বাড়ীমুখো রওনা হলো। মোটামুটিভাবে বোঝাতে গেলে বলা যায় এই 'কোই বাত নেহি'র আরবী সংস্করণ হোল 'মালিশ'। শব্দটির প্রয়োগ ক্ষেত্র বিস্তৃত এবং বোধহয় দরকার বুঝে ইল্যাস-টিকের মত টেনে লম্বা করাও চলে। অন্যায় করে ক্ষমা চাওয়াও মালিশ, ক্ষমা করাও মালিশ। অন্যায়কে অন্যায় হিসেবে ধরছো কেন?—এহেন আবদারের প্রকাশও সংক্ষেপে 'মালিশ'। আচমকা অনিচ্ছাকৃত-ভাবে কারুর পা মাড়িয়ে দিয়ে যদি কেউ লজ্জিত মুখে মার্জনা ভিক্ষা করতে যায়—অন্যজন খোঁড়াতে খোঁড়াতেও বলবে 'মালিশ'! অর্থাৎ এতে অতো লজ্জা পাবার কি আছে, বুঝতেই পারছি তুমি ইচ্ছে করে করোনি। অনেক সময় আবার অপরাধী ব্যক্তি (তার ওজন আড়াই মন হলেও) ক্ষমা চাওয়ার বদলে বলবে—মালিশ! এক্ষেত্রে মালিশ মানে 'আমি দুঃখিত'। বন্ধনীতে দিলাম বলে আড়াই মন ওজনের কথা একে-বারে উড়িয়ে দেবার ব্যাপার কিন্তু নয়; এখানকার লোকেরা নাসের সরকারের দয়ায় শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এখনো মাছ মাংস দুধ ফল খেয়ে যাচ্ছে আমাদের ডবল তিন ডবল চার ডবল হারে এবং তজ্জনিত স্ফীত স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করছে। কোন এক অফিসের লিফ্টে দেখেছি ইংরেজীতে লেখা আছে' '১৬ জনের জন্য' এবং তার নীচেই আরবীতে লেখা হয়েছে '১৪ জনের জন্য'।

একদিন বা দুদিন ডুব দিয়ে মেইড যখন আবার হাজির হয়—কোনরকম দুঃখ প্রকাশের চেষ্টা করে না। এজন্য আসতে পারিনি বা ঐ কারণে আটকে গিয়েছিলাম এসব বলে কৈফিয়ৎ দেবার কোন প্রয়োজনই অনুভব করে না। আপনি যদি নাছোড়বান্দা হয়ে চেপে ধরেন 'কাল আসনি কেন', নির্ঘাৎ জবাব পাবেন—'মালিশ'। অসাবধানে কাজ করে যদি আপনার সখের টি-সেটটি কানা করে ফেলে, আপনার রক্তচক্ষুর দিকে তাকিয়ে নির্বিকার মুখে বলবে—মালিশ! কায়রোবাসী মাত্রেই জানেন এখানে ভাল চিনেমাটির বাসন পাওয়া কি মুস্কিল অর্থাৎ আপনার কানা টিসেট কানাই থাকবে, নতুন আরেকটি কিনে আনবেন সে সম্ভাবনাও খুব কম। যদি কখনো কোথাও দেখেন পছন্দমত কিছু তার দামও দেখবেন লেখা আছে হয়তো এক হাজার টাকা। কিন্তু 'মালিশে'র ওপরে আর কি কথা?

একদিন রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ দেখি এক কোণে ভীষণ ভীড় এবং চেঁচা-মিচি। জনতা একটি মারমুখী জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। ক্রুদ্ধ লোকটি আরেকটি লোকের টুঁটি চেপে ধরার মতলবে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি। লোকজন বহুকষ্টে তাকে নিবৃত্ত করল মানে সকলে মিলে তাকে ধরে রাখল। আমাদের কাছে এমন কিছু একটা তাজ্জব ব্যাপার নয়, নিজের দেশেও তো কতো দেখেছি রোজ। কিন্তু নতুন লাগল চারদিক থেকে যখন সমবেত ধ্বনি শোনা যেতে লাগল মালিশ! মালিশ! অর্থাৎ যেতে দাও—যেতে দাও। না হয় একটু অন্যায় করেইছে তাই বলে কি মারতে হবে—মালিশ! তখন মনে হল শুধু এরকম অবস্থায় প্রয়োগের জন্য শব্দটি আমাদের জবানেও থাকলে বোধ হয় মন্দ হোত না।

ছোটবেলা থেকে শুনছি সময়ানুবর্তিতা ইংরেজদের জাতীয় আদর্শ। আর কার জানি না। আমাদের নয় নিজেরাই বলি আর

আরবদের নয় দেখতে পাচ্ছি। এখানে মিটিংও ঠিক ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে আরম্ভ করার তাগিদ নেই এবং কাঁটা ধরে মিটিং সুরু না করলে কেউ কোন কৈফিয়ৎ তলব করে না। কেউ হয়তো পাঁচটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে সাড়ে পাঁচটা অবধি আপনাকে বসিয়ে রাখল—আপনি ক্ষোভ বা বিস্ময় প্রকাশের চেষ্টা করলে নির্ঘাৎ শুনতে হবে 'মালিশ'! অর্থাৎ নেভার মাইন্ড। তারপরে আপনার মনে ক্রোধ ক্ষোভ বিস্ময় যাই থেকে থাক—দমন করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না, বিশেষ করে আপনি যদি বিদেশী হন।

ছোট বাচ্চারা পড়ে গিয়ে বা ধাক্কা খেয়ে যখন 'বুধসাহেবের বাচ্চাটা'র মতো হাঁ করে পৃথিবী রসাতলে পাঠাবার মতলবে থাকে, আমাদের দেশে আমরা ষষ্ঠীদেবীর কৃপা ভিক্ষা করে বলি ষাট, ষাট; এদেশের লোক বলে 'মালিশ'—অর্থাৎ কিছু হয়নি, কিছু হয়নি। একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম এখানকার এক জাপানী বাগানে! ফিরবার পথে ঢালু জায়গায় পা হড়কে আমার বান্ধবী পড়ে গেলেন। এক মিশরী ভদ্রলোক কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বলে উঠলেন 'মালিশ'! বান্ধবী ভারতীয়, নিচুস্বরে গজরাতে লাগলেন—ওরা কি আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছে? আমার ব্যথা লাগল আর বলে কিনা মালিশ! অনেক কষ্টে ওঁকে বোঝান হোল ঐ মালিশের পেছনে ভদ্রলোকের সদুদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু নেই। এক মহিলা রাস্তায় পড়ে গেলে নিশ্চয়ই অপ্রতিভ হবেন—তার সেই ভাবটা যথাসম্ভব কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করে ঐ একই শব্দ মালিশ! চা ঢালতে গিয়ে হঠাৎ কোনরকমে পেয়ালা উপচে চা ফেলে অপ্রতিভ হলে লোকে সেটা সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে কাটাবার চেষ্টা করে। এখানে লোকে ভাগ্য নিয়ে টানাটানি না করে বলে—মালিশ!

সেদিন বাজারে গিয়ে আম কিনবার সখ হোল। এখানে মাঙ্গা হিন্দী অর্থাৎ ভারতীয় আম (উত্তর ভারতের দসেরি আমের নিকৃষ্ট সংস্করণ) খুব চলে। শাড়ী পরিহিতা মহিলা দেখলে আর কোন কথা নেই—মাঙ্গা হিন্দী মাঙ্গা হিন্দী বলে চেঁচিয়ে দোকানী দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। মাঙ্গা হিন্দী ছাড়াও বেশ কিছু ভাল আম এখানে আছে—যেমন তৈমুর আম। আকারে এরা প্রায় ফজলী আমের মত—খেতেও মিষ্টি। তাই দু-একটা বেছে নিয়ে দোকানীর হাতে দিলাম ওজন করবার জন্য। এক কিলো একশ গ্রাম কুড়ি পিয়াস্তার কিলো হিসেবে দাম হওয়া উচিত বাইশ পিয়াস্তার। দোকানী খুব গম্ভীর মুখ করে বলল—তেইশ। জিজ্ঞেস করলাম তেইশ বলছো কেন—এটা তো খুব সোজা হিসেব, ভুল হবার কোনই সুযোগ নেই। সে অম্লানবদনে বলল—মালিশ, বাইশই দাও। সেরকম ওরাও কখনো কখনো ভাঙানী এদেশে এক সমস্যা বলে এক আধ পিয়াস্তার ছেড়ে দেয়, বলে—মালিশ।

এসব শুনে মনে করবেন না মালিশ একটা অপাংক্তেয় কথা। একবার টেলিভিশনে দেখছিলাম আর শুনছিলাম নাসের বক্তৃতা করছেন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট হলে। গিজগিজ করছে লোক আর কিছুক্ষণ পরে পরেই তুমুল হর্ষধ্বনি। একবার ছেলের দল বিপুল উৎসাহে এমন জিন্দাবাদ আরম্ভ করল যে থামতেই চায় না। নাসের তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে আস্তে বললেন, 'মালিশ, মালিশ' অর্থাৎ "হয়েছে হয়েছে।"

ইশ ভাগাস্ত আরো কথা আছে—এড়ানো মুস্কিল এদেশে। যেমন বকশিশ। এ শব্দটির সঙ্গে আমাদের পুরনো পরিচয় এবং ফরাসী মারফতই হয়েছে। এই ক্ষেত্রে শব্দার্থ আরবী ফারসী হিন্দী উর্দু বাঙলা সব ভাষায়ই এক। আমাদের দেশেও বকশিশের রেওয়াজ আছে তবে এতো নয়। আমাদের রেস্তোরায় হোটেলে আছে কিন্তু ডাকপিওন সারা বছর চিঠি দিয়ে বাংলাদেশে বিজয়াদশমীতে বকশিশ নিতে বেরোয়। উত্তর ভারতের কোন কোন জায়গায় বছরে দুবার তিনবার—দশেরা, দেওয়ালী এবং হোলীতে পিওনকে বকশিশ দেবার রেওয়াজ আছে। এখানে মাসের গোড়ার দিকে প্রায়ই দেখা যায় দুতিনদিন কোন চিঠিপত্র আসছে না। প্রথম প্রথম চিন্তিত হতাম। কি ব্যাপার—ডাকের গোলমাল হচ্ছে নাকি? এখন বুঝতে পারি মিশরী হরকরা জমিয়ে রাখে, একসঙ্গে একগাদা হাতে তুলে দিয়ে হাসিমুখে এসে দাঁড়াবে বলে। মানে বকশিশ! প্রতি মাসেই আছে এই ট্যাক্স। কেউ কেউ আবার মাসে একাধিকবার বকশিশ আশা করে এবং সেজন্য নীচে চিঠির বাক্স থাকলেও পাঁচ তলা লিফটে করে উঠে এসে হাতে দিতে চায় চিঠিপত্র। টেলিগ্রামের পিওন বকশিশ চাইতে ঠিক ভরসা করে না কারণ এদেশে এখনো সাধারণ বাড়ীতে তার আসা মানেই দুঃসংবাদ আন্দাজ করা হয়। আমাদের এক মেইড একবার আমাদের নামে পরপর দুদিন টেলিগ্রাম দেখে কেঁদেই ফেললো। তবে পিওন যখন দেখে কোন বাড়ীতে ঘন ঘন টেলিগ্রাম আসে, সে ঠিক বুঝে নেয় রোজ এতো খারাপ খবর আসতে পারে না। এবং তখন বকশিশ পাওয়ার আশা এবং দেওয়ার দায়িত্ব ঠেকায় কে?

ফরাসী আদব কায়দা এদেশে প্রচুর আমদানী হয়েছে সুতরাং সিনেমার টিকিট কিনে ভাঙানী ঠিক দিল কিনা গুনতে গুনতে গিয়ে হলে ঢুকলেন, সব ঠিক পেলেন বা না পেলেন এক পিয়াস্তার তার থেকে হাতে রাখবেন—যে আপনাকে সীট দেখিয়ে দেবে তাকে দিতে হবে। প্রথমে অবাক হয়েছি, ভেবেছি এ আবার কোন আজব দেশে এসে পড়লাম? এখন শুনেছি ইংরেজদের আদবকায়দার বইতে নাকি লেখা আছে ফ্রান্সে গিয়ে সিনেমা হলের 'আশারদের' যারা টিপস্ দেয় না তারা নিতান্ত অভদ্র বিবেচিত হয়। সুতরাং আর কি? কিছু করার নেই—মালিশ!

দোকানে জিনিস কিনলেন—যে লোকটি কাগজ মুড়িয়ে আপনার হাতে দেবে তাকে কিছু দিতে ভোলা উচিত নয়। না দিলে সে কিছু বলবে না কিন্তু ভবিষ্যতে যদি গুড সার্ভিস চান দেওয়াই ভাল। সোজা-কথায় বকশিশ এখানে সর্বভূতেষু। মাস মাইনে করা ধোপা কাপড় ধোয়—মাসান্তে সেও বকশিশ আশা করে। গ্যাস ফুরিয়ে গেলে সিলিণ্ডারের জন্য ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে ৬০ পিয়াস্তার হাতে মজুত রাখতে হবে। ৫৫ পিয়াস্তার গ্যাসের দাম, পাঁচ পিয়াস্তার বকশিশ।

ট্যাকসিওয়ালারা বকশিশ চায় না; দিলে অবশ্য নিয়ে ধন্যবাদ দেবে। তবে বেশীর ভাগই দেখেছি আশা করে আপনি দু-এক পিয়াস্তর ফেরৎ মালিশ করতে রাজী থাকবেন কারণ "ফাক্কা মাফিশ" অর্থাৎ ভাঙানী নেই।

মাফিশও আরেকটি ইশভাগান্ত মনে রাখার মত শব্দ এই দেশে। অর্থ হোল নেই বা ফুরিয়ে গেছে। একবার যদি কোন দোকানে কিছু খুঁজতে গিয়ে শোনেন 'মাফিশ' তাহলে চিন্তার কথা। সারা শহরে অন্য কোন দোকানে পাবেন এমন আশা কম।

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৮৬)

জীব গোস্বামী

রূপ-সনাতনের ছোট ভাই বল্লভ, মহাপ্রভু যার নাম রেখেছেন অনুপম, তার পুত্র জীব গোস্বামী।

অনুপম শিশুকাল থেকেই রঘুনাথের উপাসনা করে। নিরবধি রামায়ণ শোনে আর রাম নাম জপ করে। রামেই তার প্রাণের উপশম।

সনাতন বললে, আমি আর রূপ যেমন কৃষ্ণভজন করি, আমার ইচ্ছে তুমিও তেমনি করো। কৃষ্ণনামে প্রচুর প্রেম, প্রচুর বিলাস। তুমি আমাদের থেকে কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে?

অনুপম বললে, তোমরা আদেশ করলেই করি।

হ্যাঁ, তিনভাই একসঙ্গে কৃষ্ণকথায় মত্ত হয়ে থাকব সে বড় আনন্দের হবে।

তোমাদের আদেশ আমি কী করে লংঘন করব? তবে আমাকে দীক্ষামন্ত্র দাও, আমি কৃষ্ণভজনই করব।

মুখে বলল বটে কিন্তু হৃদয়ে সমর্থনের সুর বাজল না। চোখের ঘুম উড়ে গেল, সারারাত কাঁদল অনুপম। কী করে আমার রঘুনাথকে ছেড়ে থাকব?

ভোর হলে সনাতনের পায়ে এসে পড়ল অনুপম। বললে, রঘুনাথের পায়ে মাথা বিকিয়ে দিয়েছি, তা আর ফিরিয়ে নিতে পারছি না। তোমাদের আদেশ ফিরিয়ে নাও, বরং আশীর্বাদ করো জন্মে-জন্মে রঘুনাথের পায়েই যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে।

তার প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখে সনাতন আদেশ ফিরিয়ে নিল। বললে, তোমার দৃঢ় ভক্তিকে সাধুবাদ দিই।

সেই নৈষ্ঠিক রাম-উপাসকের পুত্রই জীব গোস্বামী।

প্রভু যখন বৃন্দাবন যাবার পথে রাম-কেলিতে আসেন ও রূপ-সনাতনকে কৃপা করেন, তখন অনুপম ও তার ছেলে জীব উপস্থিত ছিল। জীব তখন পাঁচ বছরের বালক, সংগোপনে দেখে নিল প্রভুকে।

বাল্যকাল থেকেই জীবের কৃষ্ণ-ভক্তি, অন্যান্য বালকের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম খেলা। অল্প বয়স থেকেই তার বিদ্যার্জনে রুচি, আর ভাগবত সর্ববিদ্যার সার বলে ভাগবতই তার প্রাণতুল্য। 'অল্প বয়সে অতি গম্ভীর অন্তর। শ্রীমদ্ভাগবতে জানে প্রাণের সোসর।'

একদিন হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। সকলে এসে দেখল জীব ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। কেঁদে আকুল হচ্ছে। এই অল্প বয়সেই এত বৈরাগ্য কেন? তবে কি এও গৃহত্যাগ করে চলে যাবে? বাপ মারা গিয়েছে, জেঠারা বৃন্দাবনে, জীবের পরিণাম কী? এও দেখি কৃষ্ণ বলতে তন্ময়।

তারপর জীব একরাত্রে কৃষ্ণ-বলরামকে স্বপ্ন দেখল। কৃষ্ণ-বলরাম গৌর-নিতাইয়ে রূপান্তরিত হল। গৌর-নিতাই জীবের মাথায় পা রাখলেন। গৌর বললেন, তোমাকে নিত্যানন্দের পায়ে সমর্পণ করে দিলাম।

চন্দ্রদ্বীপেই কিছুদূরে অধ্যয়ন করেছে জীব, এবার চলল নবদ্বীপ। চলল ফতেয়াবাদ হয়ে। নবদ্বীপই বিদ্যার তীর্থ। সেখানেই সর্বতত্ত্বের সন্ধান মিলবে।

এ কে এল নবদ্বীপে! গায়ের রঙ কনক চাঁপার মত, মনোহর দেহ, দীর্ঘ নেত্র—দেখ দেখ এ কোন রাজার কুমার চলেছে পায়ে হেঁটে। কণ্ঠে তুলসী মালা, গলায় শুভ্র যজ্ঞসূত্র। কে জানে সন্ন্যাস না নিয়ে বসে!

শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দ গৌরানন্দে রয়েছেন, হঠাৎ বলে বসলেন, মনে হচ্ছে জীব আসবে। তার জন্যেই আমার এখানে আসা।

বলতে না বলতেই খবর এল দ্বার-প্রান্তে কে এসে দাঁড়িয়েছে!

আর কে! জীব এসেছে। ডাকো ডাকো, ভিতরে নিয়ে এস।

নিত্যানন্দের পায়ে লুটিয়ে পড়ল জীব।

বাৎসল্যে বিহ্বল হয়ে নিত্যানন্দ জীবের মাথায় পা রাখল। মাটি থেকে তুলে নিল বুকের উপর। বললে, তোমার জন্যে আমি খড়দহ থেকে নবদ্বীপে এসেছি। তুমি এখানে থেকো না, তুমি বৃন্দাবনে চলে যাও।

বৃন্দাবন?

হ্যাঁ, গৌরহরি তোমাদের বংশকে বৃন্দাবন দান করেছেন, তোমারও স্থান সেইখানে।

তবে আর কথা কী! জীব বৃন্দাবনে চলল।

পথে কাশীতে থামল। মধুসূদন সরস্বতীর কাছে বেদান্ত পড়তে বসল। মধুসূদন একদিকে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, অন্যদিকে দাসীভাবভাবিত রসিক ভক্ত। নিজের সম্বন্ধে লিখছেন মধুসূদন: অদ্বৈতসাম্রাজ্যের পথে অধিরূঢ় হলেও কোন এক গোপীবধূবল্লভ শঠের দ্বারা বল-পূর্বক দাসীকৃত হয়েছি। মায়াবাদী হয়েও শেষ পর্যন্ত বলছেন, কৃষ্ণের চেয়ে অধিকতর কোনো তত্ত্ব নেই। 'কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।'

জীবকে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করল মধুসূদন। কাব্য ব্যাকরণ ছন্দ জ্যোতিষ ন্যায় বেদান্ত সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে দিল। এবার বৃন্দাবনে গিয়ে বোসো।

বৃন্দাবনে গিয়ে জীব রূপের চরণাশ্রয় করল। রূপের শুধু মন্ত্রশিষ্য নয়, অনুগামী ভৃত্যমাত্র নয়, সমস্ত বিদ্যাসম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠল।

রূপ কর্তৃক জীব-বর্জনের কাহিনীটি 'ভক্তিরত্নাকরে' অন্যরকম।

রূপ নির্জনে বসে গ্রন্থ রচনা করছেন, যমুনায় স্নান করতে যাবার পথে বল্লভ ভট্ট নামে এক পণ্ডিত এসে উপস্থিত হল। জিজ্ঞেস করল, কী লিখছেন?

রূপ বললে, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

মংগলাচরণ শ্লোকটি পড়ে শোনাও তো। রূপ পড়ে শোনাল।

পণ্ডিত বললে, আমার মনে হয় একটু সংশোধন করে দিলে ভালো হয়।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কৃতার্থের মত বললে রূপ, একদিন আপনার অবসরমত এসে সংশোধন করে দিয়ে যাবেন।

যমুনাস্নানে চলে গেল পণ্ডিত।

রূপের পাশে চুপ করে বসে ছিল জীব, জল আনবার ছল করে সে উঠে গেল। পণ্ডিতের পিছু নিল। খানিক দূরে গিয়ে তার কাছাকাছি হয়ে জিজ্ঞেস করলে, মঙ্গলাচরণের কোন অংশে আপনার সংশয় হচ্ছে?

জীবকে চেনে না পণ্ডিত। কিন্তু তার প্রশ্নের মধ্যে এমন বিনয়মাধুর্য যে পণ্ডিত উত্তর না দিয়ে পারল না। প্রকাশ করে দেখাল কোথায় ও কেন তার সন্দেহ।

জীব বিচারে প্রবৃত্ত হল, এক বিচার থেকে আরেক বিচারে। পণ্ডিত কিছুতেই তাকে খণ্ডন করতে পারল না। দেখল শাস্ত্রজ্ঞানে জীব কত গভীর, তর্কের ভূমিতে কী ঋজু ও দৃঢ়। স্নান শেষে তাই বলতে গেল রূপকে। জিজ্ঞেস করলে, যে যুবকটি তোমার এখানে বসেছিল সে কে?

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার শিষ্য। নাম জীব। এই কিছুদিন হল দেশ থেকে এসেছে।

পণ্ডিত মুক্তকণ্ঠে জীবের প্রশংসা করলে। তার বিচার-বিতর্ক কী রকম সতেজ-সহজ তাও প্রকাশ করলে।

বহুমানে পণ্ডিতকে বিদায় দিল রূপ।

জীব ফিরে এলে রূপ বললে, পণ্ডিত কৃপা করে আমার রচনা সংশোধন করো

দিতে চেয়েছিল, তুমি তাতে বাদ সাধলে কেন?

জীব নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল।

তোমার খুব অহংকার হয়েছে, তাই না? পণ্ডিতের বিদ্যা তুমি সহ্য করতে পারলে না! যাও তুমি ফের পূর্বদেশে চলে যাও। মনস্থির হলে বৃন্দাবনে এস।

অপ্রতিবাদে, কোনো কথা না বলে, জীব পূর্বমুখে চলতে লাগল। এক নগণ্য গ্রামে গিয়ে মাটিতে পড়ে রইল। পড়ে রইল অখণ্ড উপবাসে।

গ্রামবাসীরা পাতার কুটির নির্মাণ করে দিল। জোগাতে লাগল ফলমূল।

কেউ-কেউ সনাতনকে গিয়ে খবর দিল। এক অল্পবয়সী তপস্বী আমাদের গ্রামে এক পাতার কুটিরে পড়ে রয়েছে। ওকে বাঁচাবার উপায় করুন।

সনাতন রূপের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তোমার গ্রন্থের কত দূর?

গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে।

সংশোধনের দরকার নেই?

জীব এখানে নেই, কে সংশোধন করবে?

তখন সনাতন জীবের দুর্দশার কথা বললে। বললে, তুমি ক্ষমা করলে ওকে ডেকে আনি। তোমার কাজে লাগাই।

রূপ তক্ষুনি ক্ষমা করল। নিজেই গিয়ে সাদরে ডেকে আনল জীবকে। সস্নেহ শুশ্রূষায় সুস্থ করে তুলল।

সনাতনও তার 'বৈষ্ণব তোষণী' গ্রন্থ জীবকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিল। জীবের বিদ্যাবল সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

জীব ক্রমে ক্রমে পঁচিশখানি গ্রন্থ লিখল। অন্যতম গ্রন্থ ষটসন্দর্ভ।

মঙ্গলাচরণে বলা হল : যাঁরা সপরিকর ভগবানের তত্ত্ব জানাবার জন্যে আমাকে এই পুস্তিকা লিখতে প্রবৃত্ত করাচ্ছেন সেই মথুরামণ্ডলবাসী শ্রীল রূপ-সনাতনের জয় হোক।

তত্ত্বটি কী? তত্ত্বটি এই যে যিনি কৃষ্ণ তিনিই গৌর। যাঁর অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ ও বাইরে গৌরবর্ণ, অর্থাৎ যিনি স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ হয়েও গৌররূপ অঙ্গীকার করেছেন, যিনি স্বীয় অঙ্গ-উপাঙ্গাদির বৈভব দেখিয়েছেন, আমরা হরিনাম সংকীর্তন দ্বারা সেই কৃষ্ণচৈতন্যের শরণাগত হচ্ছি।

মহাপ্রভুর মুখে কাশীতে সনাতন যা শুনেছিল, আর প্রয়াগে যা শুনেছিল রূপ, সেই সব সিদ্ধান্ত আর বিচার নিয়ে গোপালভট্ট গোস্বামী লিখেছিল একটি কারিকা। সেই কারিকাই জীবের গ্রন্থের আকর।

ষটসন্দর্ভের একটি অংশ ভক্তিসন্দর্ভ। বলা হয়েছে, ভক্তিসন্দর্ভ অধ্যয়ন না করে ভাগবতধর্মে প্রবেশাধিকার হয় না। ভবব্যাধির চিকিৎসা প্রণালীই এই সন্দর্ভে বর্ণিত হয়েছে। ভগবৎ-বৈমুখ্য থেকেই ক্লেশের সৃষ্টি। ভগবৎ-সাম্মুখ্যেই ক্লেশের নিরসন। নিত্যানন্দলাভের একমাত্র পথই ভক্তি।

তারপর প্রীতি-সন্দর্ভে জীব লিখছেন : ভাবময়ী ভক্তির বিস্তারকল্পে এই প্রপঞ্চে যে অবতারী অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যিনি দুর্জন পর্যন্ত সকলের শরণ্য, সেই চৈতন্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হোন।

তারপর শেষ অংশ ক্রমসন্দর্ভে লিখছেন জীব : নামই চিন্তামণিস্বরূপ। নামই কৃষ্ণ-চৈতন্যরসবিগ্রহ। নামী থেকে নাম অভেদ বলে নাম পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। যাঁর অঙ্গকান্তি কনকসদৃশ, যাঁর অবয়ব সর্ব-শুভলক্ষণযুক্ত ও চন্দনচর্চিত, যিনি সন্ন্যাসলীলা প্রকট করে শান্ত, সমতাযুক্ত ও শান্তিনিষ্ঠাপরায়ণরূপে সহস্রনামোক্ত কৃষ্ণ-চৈতন্য নামে বিখ্যাত, সেই শ্রীমন্মহা-প্রভু আমাকে সমস্ত অপরাধ থেকে পরিত্রাণ করে নিজ প্রেমের কিয়দংশ দান করে আমাকে পোষণ করুন।

জীবের আরেক গ্রন্থ হরিনামামৃত ব্যাকরণ।

গয়া থেকে ফিরে মহাপ্রভু তাঁর পড়ুয়াদের বললেন, কৃষ্ণই সর্বশব্দশাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য। সাহিত্যে-ব্যাকরণে যা কিছু দেখছ, সূত্র-বৃত্তি-টীকায় সমস্ত হরিনাম। সেই প্রেরণায় এই গ্রন্থ।

মঙ্গলাচরণে জীব লিখছে : কৃষ্ণের উপাসনার জন্য ভক্তেরা যেমন মালিকা বিস্তার করে, আমিও তেমনি হরিনামাবলী সূত্র সাহায্যে গ্রন্থন করতে অভিলাষী হয়েছি। এই নামাবলী কৃষ্ণসঙ্গের আনন্দ বিলোবে। আর সব ব্যাকরণ তর্কযোগ্য, অনর্থক শব্দশাসনে পীড়িত ও দুর্বোধ্য বলে আমি এই সহজ হরিনামের ব্যাকরণ লিখেছি। যাঁরা শব্দজটিল ব্যাকরণের মরু-ভূমিতে জল খুঁজে-খুঁজে শ্রান্ত হচ্ছেন তাঁরা এই হরিনাম ব্যাকরণের সুধা পান করুন এবং সে সুধায় শত-শতবার স্নান করুন। সংকেতে পরিহাসে পাদ-পূরণে, ছলনায় অবহেলায় নাম করলেও পাপ পরাভূত হয়।

মাধবমহোৎসব-গ্রন্থে লিখছেন জীব : যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রসিদ্ধ, শচীগর্ভ-সিন্ধুতে যাঁর আবির্ভাব ও যিনি শব্দভক্তি-রসামৃতের সমুদ্রস্বরূপ, সেই গৌরকান্তি গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে স্বীয় দীপ্তি বিস্তৃত করুন।

জীবের তিন প্রধান শিষ্য—শ্রীনিবাস, আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আর শ্যামানন্দ। এরা তিনজনই জীবের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করল ও তারই আদেশে সমস্ত গোস্বামী-গ্রন্থ গৌড়ে-উৎকলে এনে পঠন-পাঠনের প্রচলন করল।

শ্রীনিবাস চাকুন্দী গ্রামের গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের ছেলে। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় গঙ্গাধর উপস্থিত ছিল। সন্ন্যাস নামের শেষে চৈতন্যশব্দ শুনে সে দারুণ বিচলিত হয়, চৈতন্য নাম উচ্চারণ করতে করতে উন্মত্ত হয়ে যায়। তাতে তার নাম হয় চৈতন্যদাস। প্রকৃতিস্থ হবার পর তার পুত্রকামনা জাগে, মহাপ্রভুকে স্বপ্নে জগন্নাথের সঙ্গে অভিন্ন দেখে নীলাচলে চলে যায়। প্রভু তাকে গৌড়ে ফিরে যেতে বলেন। বলেন, তার কামনা সিদ্ধ হবে—পুত্র হলে তার নাম রাখা হবে শ্রীনিবাস। সেই শ্রীনিবাসকে জীব বিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার পক্ষ থেকে আচার্য উপাধিতে ভূষিত করে।

নরোত্তমকেও জীবই ঠাকুর মহাশয় উপাধি দেয়। এই সেই ক্ষণজন্মা, যার নাম ধরে প্রভু আচম্বিতে ডেকে উঠেছিলেন ও যাকে পদ্মাবতী প্রেম দিয়েছিল। শ্রীনিবাস আর নরোত্তম, 'শ্রীজীবের যেন দুই বাহু দুইজন।' তারা গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের যোগ্য অধিকারী বলে নির্বাচিত করল জীব।

শ্যামানন্দ বললে, আমিও যাব।

পূর্বনাম দুঃখী কৃষ্ণদাস, দণ্ডেশ্বর গ্রামের বাসিন্দে। জীবই তার নাম রেখেছে শ্যামানন্দ। বৃন্দাবনে রাসমণ্ডল পরিষ্কার করতে করতে রাধারাণীর চরণ নূপুর কুড়িয়ে পায়, সেই নূপুর ললাটে ঠেকাতেই নূপুরাকৃতি তিলক হয়ে যায়।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম আর শ্যামানন্দ—তিনজনে অবিচ্ছিন্ন প্রীতি। যেন গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী মিলে-মিশে ত্রিবেণী হয়েছে। লোকেরা বলছে, শ্রীনিবাস হচ্ছে শ্রীচৈতন্য, নরোত্তম হচ্ছে নিত্যানন্দ, আর অদ্বৈত শ্যামানন্দ। ঐ তিনের অপ্রকটে এ তিন আবির্ভূত হয়েছে। মহাজনপদ বলছে :

নিত্যানন্দ ছিলা যেই নরোত্তম হৈলা সেই,
শ্রীচৈতন্য হইলা শ্রীনিবাস।
শ্রীঅদ্বৈত যারে কয় শ্যামানন্দ তেঁহো হয়
ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ।।

'সে তিনের অপ্রকটে এ তিনের আবির্ভাব। সর্বদেশ কৈলা ধন্য দিয়া ভক্তিভাব।।'

শ্যামানন্দকেও তাই দলে ঢুকিয়ে দিল জীব। শ্রীনিবাসের উপর নরোত্তমের ভার দিল, নরোত্তমের উপর শ্যামানন্দের ভার। সমস্ত ভক্তিগ্রন্থের বোঝাই হল তিনজন। গরুর গাড়িতে গ্রন্থ-সম্পুট নিয়ে তারা গৌড়ের অভিমুখে যাত্রা করল।

রূপ যে রাধাদামোদর প্রকটিত করেছিল তারই সেবায় নিত্য স্থিত, জীব প্রায় পঁচাশি বছর বেঁচে ছিল। পৌষী শুক্লা তৃতীয়া তার তিরোভাব তিথি।

কেউ-কেউ উমার সঙ্গে মহেশ্বরের, কেউ কেউ বা লক্ষ্মীর সঙ্গে নারায়ণের ভজনা করে। তারা তাই করুক। কিন্তু আমরা রাধাদামোদরকেই ভজনা করছি। বৃন্দাবনবাসী জীব নামক কোনো একব্যক্তির রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকাই দীপ্তি লাভ করুক।

(ক্রমশঃ)

।। ২৭ ।।

এইভাবে যখন দুটি অসমবয়সী বন্ধু—সুখস্বর্গ হয়ত নয়—নিজেদের একটি পৃথক শান্তি-নীড় রচনা করছিল, ওরই মধ্যে দুটি প্রাণী নিয়ে ছোট্ট আলাদা একটা জগৎ—তখনই ওদের অজ্ঞাতে—ওদের পিছনে বজ্রবিদ্যুৎভরা একটি মেঘও জমছিল ধীরে ধীরে।

সে-মেঘ হিমির ঈর্ষা।

প্রথমটা হিমি অত কিছু ভাবেনি। কতকটা কৌতুকই অনুভব করেছে। গণেশের গৃহস্থালী মানে তারও গৃহস্থালী কতকটা—কারণ তাঁবুর মধ্যে তার একটা পৃথক নিজস্ব ঘর নির্দিষ্ট থাকলেও—বেশির ভাগ রাত তার কাটে গণেশের ঘরেই। গণেশ যে তার ঘরে যায় না, তা নয়—তবে সে কখনও সখনও—কদাচিত। সুতরাং গণেশের ঘরের—তার শয্যা ও বেশবাসের শ্রী ফেরাতে সে খুশীই হয়েছিল। কিন্তু তারপর মনে হল বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। হাজার হলেও সে স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের কী করা উচিত—সেবাযত্ন, তার একটা ঝাপসা রকম ধারণা আছে হিমির। যেটা তার করার কথা, সেটা যদি অপরে করে দেয়, তো বড় বেশী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়, তার অকর্মণ্যতা বা অবহেলা। ভয়ও হয়—এতটা আরামে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে এরপর তার কাছেও দাবী করবে, না পেলে অসন্তুষ্ট হবে। তাই সেও একটু বকাবকি শুরু করল তাম্পিকে, তবে খুব কঠিন কিছু নয়। কারণ গণেশকে খুশী করতেই—হিমিরও কিছু কিছু ফাইফরমাশ খেটে দিত, তোয়াজ করত।

আরও কিছুদিন যেতে, সেবার এই আরামে শুধু নয়—ধীরে ধীরে সেবকেরও অনুরক্ত হয়ে পড়া দেখে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল হিমি। সে-উদ্বেগ গণেশ টের পেয়েছিল কিন্তু অতটা আমল দেয়নি। বরং একটা কৌতুকই অনুভব করছিল মনে মনে। হিমির উদ্বেগ কেন—তাও অজানা ছিল না গণেশের। সম্ভোগের তৃষ্ণা—কিছুদিন পরে কমে আসে মানুষের, তৃষ্ণা থাকলেও তার তীব্রতা থাকে না অন্তত—পুরাতন উপকরণ সম্বন্ধে তো থাকেই না। আকাঙ্ক্ষাই কমে আসে বরং—আবার নতুন কোন উপকরণ, নতুন কোন মানুষ নতুন ইন্ধনে আকাঙ্ক্ষার সে-আগুনকে নতুন করে জ্বালাতে পারে—সে অন্য কথা। কিন্তু দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য বা আরাম এমন জিনিস যা মানুষকে চিরদিনের মতো বেঁধে ফেলে। সে আরাম যার কাছ থেকে পায় মানুষ তার বশীভূত হতে বাধ্য। জীবনের পুঁথির এগুলো প্রথম পাঠ, সাংসারিক জ্ঞানের গোড়ার কথা। হিমিরও এগুলো না জানার কথা নয়। তার এমনও ভয় হতে লাগল যে, এই ছোঁড়াটা যদি সঙ্গে থাকে—গণেশের এই দল ও তার সঙ্গে হিমিকে ত্যাগ করে যেতে খুব একটা আটকাবে না। দেশে যাবার জন্যে কিছুদিন থেকেই ছটফট করছে গণেশ, তা হিমি বুঝেছিল। এখন যদি দেশে যায়, আর এই ছেলেটা যদি সঙ্গে যায়, তাহলে ওকেই কিছুটা শিখিয়ে-পড়িয়ে সাহায্য করার লোক তৈরী করে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ানো অসম্ভব হবে না। আর তাহলে ঐখানেই একটা বিয়ে-থা করে কিম্বা অন্য কোন মেয়েমানুষ জুটিয়ে থেকে যাবে—আর কোনদিনই হয়ত হিমির কাছে ফিরবে না। হিমির রূপ নেই, সুগৃহিণীর যে-আকর্ষণ বা বন্ধন থাকতে পারত—ওর ক্ষেত্রে তারও কোন কারণ নেই। তবে কিসের লোভে ফিরে আসবে গণেশ! এখন অনেকটা শাসনে রেখে দিয়েছে তাই—হিমির শাসন বা প্রভাব সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে, সেটা কাটিয়ে ওঠার মতো মনের দৃঢ়তা নেই গণেশের—কিন্তু সে সবই, যতক্ষণ ওর সামনে আছে, চোখের আড়াল হলে সে-প্রভাব কি আর কাজে লাগবে, না সে-সংস্কারের বাঁধনটাই থাকবে? ধীরে ধীরে এই ছেলেটার যেভাবে বশীভূত হয়ে যাচ্ছে, একদিন হয়ত একে অবলম্বন করেই হিমির শাসন-প্রভাব কাটিয়ে উঠবে। না, সাবধান হওয়া দরকার, এ-বিষবৃক্ষকে বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়।...

হিমি প্রথম চেষ্টা করল দলের মালিক প্রোফেসার ঘোষকে বলে তাম্পিকে তাড়াবার। তাম্পির নামে এটা-ওটা চুকলি খেতে লাগল। কিন্তু প্রোফেসার ঘোষও বহু পোড়-খাওয়া, বহু মার-খাওয়া লোক। তিনিও তাম্পির প্রতি গণেশের স্নেহ লক্ষ্য করেছিলেন। গণেশই তাঁর দলের এখন প্রধান আকর্ষণ; সে নির্বোধ তাই, নইলে এ-দল ছেড়ে আলাদা শুধু ম্যাজিক দেখাতে শুরু করলে বিস্তর পয়সা কামাতে পারত। এখনও পারে। আর তা যদি করে, এদিকে তাঁর দলের বারোটা বেজে যাবে একেবারে। গণেশকে চটালে এমনি না হোক, রাগের মাথাতেও বেরিয়ে গিয়ে আলাদা দল করা অসম্ভব নয়। অনেক সময় ঠাণ্ডা মাথাতে যা না পারে মানুষ রাগের মাথায় অনায়াসেই তা করে বসে। ছেলেটাকে তাড়ালে যদি সত্যি সত্যিই গণেশ বেগড়ায়? কী দরকার তাঁর এ-ঝুঁকি নেবার? তিনি হিমিকেই বরং এই অকারণ ঈর্ষার জন্য মৃদু তিরস্কার করলেন। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবারও চেষ্টা করলেন, গণেশ চলে গেলে তাঁর এবং হিমির দুজনেরই সর্বনাশ। এতই বা হিংসে কিসের হিমির—সতীন তো নয়! চাকরের মতোই। চাকরে আর মেয়েমানুষে ঢের তফাৎ। ভাল চাকর পেলে—বিশেষ যদি এমন বিনা মাইনের হয়—সব পুরুষই বশীভূত হয়ে পড়ে, তাই বলে কি স্ত্রীর ওপর থেকে ভালবাসা যায় তাতে? না, স্ত্রীর প্রতিপত্তি কমে?

কিন্তু এসব উপদেশে হিমি সান্ত্বনা পায় না বিশেষ।

বরং তার শঙ্কা বেড়েই যায়। অনেক দুর্লক্ষণ দেখতে পায় সে। তাতেই আশঙ্কা বেড়ে যায় আরও।

আর সেজন্যে বুঝি গণেশই দায়ী।

অতটা বুঝতে পারেনি সে। যা বিশুদ্ধ স্নেহ—তার এমন কদর্য হতে পারে ভাবেনি।

রাত্রে তাম্পি বড় তাঁবুতে শুতে যেত। একটা টানা বড় ঘরে কুড়িজনের শোবার ব্যবস্থা, তারই একটাতে তার আস্তানা ছিল। অপরিচ্ছন্ন সামান্য শয্যা, তারও এক পাশে নিজের জামা-কাপড়-লুঙ্গি ঢিপি হয়ে পড়ে থাকত জড়ো করা। গণেশের ঘর ও পোশাক সম্বন্ধে তার পরিচ্ছন্নতা ও সতর্কতার অন্ত ছিল না—কিন্তু নিজের ব্যাপারে তেমনি অগোছালো ছিল সে। বোধহয়, ওদিকেই অবসরের প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটত বলে, সময়ও পেত না। একদিন গণেশ গিয়ে দেখে কিছু তিরস্কারও করেছে। অপ্রতিভ মুখে তাম্পি জবাব দিয়েছে, 'হ্যাঃ! নিজের জন্যে আর অত করতে পারি না। থাকিই বা কতটুকু। রাতের চার-পাঁচ ঘণ্টা কাটানো, তাও তো সবদিন হয়ে ওঠে না। ও একরকম করে কেটেই যায়।'

গণেশ বড় তাঁবুর যে-কামরাটা ব্যবহার করত, তার সামনে চলনমতো একটু জায়গা

ছিল, তিনদিক খেলা—তবু সেখানে এক-জনের থাকার মতো একটু স্থান করা যায়। একদিন হিমির কাছে কথাটা পাড়ল গণেশ—ঐখানে তাম্পির থাকার ব্যবস্থা করলে কি হয়? কাছাকাছি থাকে—রাত-বিরেতে ডাকলেই পাওয়া যায়—?

নিমেষে জ্বলে উঠল হিমি, 'কখ্খনও না। ওর সামনে দিয়ে রাত্তিরে তোমার কাছে শুতে আসব, না? কথাটা বললে কি করে? এই এক ফালি ক্যাম্বিসের তো আড়াল, এখানে বসে কথা কইলে সব শোনা যাবে ওখান থেকে;· তোমার সঙ্গে দুটো কথাও কইতে পারব না নাকি—এরপর?... তা ঐটুকুই বা বাদ থাকে কেন—তাম্পিকে নিজের বিছানাতেই শোওয়ালে পারো—তাহলে আর কোন কষ্টই হবে না তার।... আমার আসা যদি বন্ধই হয়ে যায়, তাহলে আর অসুবিধা কি? বাইরেই বা ফাঁকায় কষ্ট করে শুতে যাবে কেন?'

বেগতিক দেখে গণেশ খানিকটা আমতা আমতা করে চুপ করে যায়। মাঝখান থেকে হিমি আরও বিরূপ বিম্বিষ্ট হয়ে ওঠে তাম্পির সম্বন্ধে।

দুপুরবেলাটা গণেশের অবসর থাকে। সকালে এক-আধটু 'প্র্যাকটিশ' করত আগে—এখন আর তা লাগে না। কোন কোন দিন ওদের প্র্যাকটিশের কাছে গিয়ে বসে মধ্যে মধ্যে, কিন্তু খাওয়ার পর প্রত্যহই নিজের ঘরে এসে বিশ্রাম করে। দলের অন্য সবাই কেউ বা বাইরে যায়—যেখানে যখন থাকে শহর দেখে বেড়ায়, কেউ বা পুরুষরা বিশেষ করে কাফিখানায় যায় মেয়েদের খোঁজে—এদিকে অবশ্য বিশেষ আড্ডা বা পতিতা-পল্লীর প্রয়োজন হয় না, এখানের মেয়েরা সার্কাসের লোকের জন্যে পাগল, সমুদ্রের ধারে বা নদীর ধারে গেলেই অনেকে এসে পাশে বসে, নানাভাবে মনো-হরণের চেষ্টা করে। আরও সেই ভয়ে গণেশ বাইরে যায় না বড় একটা। এখন তাম্পিও খাওয়ার পর গণেশের ঘরে চলে আসে; কখনও হাওয়া করে, কখনও বা পা টিপতে বসে। পা টেপার সময় গণেশের পা-দুটো নিজের কোলের ওপর বুকের কাছে তুলে নেয়—এটা তার কাছে দুর্লভ সৌভাগ্য বলেই বোধহয় যেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধরে গা-হাত-পা টিপলে অবস্থাটা তাম্পির কাছে কষ্টদায়ক এবং গণেশের কাছে অস্বস্তিকর হয় বলে গণেশই বিছানায় বসার অনুমতি দিয়েছিল তাম্পিকে। তাও, গুরুর সঙ্গে একাসনে বসার ধৃষ্টতা ও অপরাধ হবে বলে সহজে রাজী হয়নি, গণেশই ধমক দিয়ে জোর করে বসিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে আর আপত্তি করেনি বিশেষ।

এর মধ্যে একদিন গণেশ ঘুমিয়ে পড়েছিল—ইদানীং এই পদসেবার মধ্যেই আরামে ঘুমিয়ে পড়ত সে প্রায় নিত্যই—হঠাৎ পায়ের ওপর একটা কি ভার এবং আড়ষ্টতা অনুভব করে, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কি—ঘুম ভেঙে তাকিয়ে দেখে, পা টিপতে টিপতে পায়ের ওপরই উপুড় হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে তাম্পি। ওখানের গরমে ঐ অবস্থায় শুয়ে থাকার ফলে অজস্র ঘাম হয়েছে—সেই ঘামই গড়িয়ে পড়ায় ঠাণ্ডা জলের মতো মনে হয়েছে গণেশের। ঐ অবস্থায় অতবড় ছেলেটাকে কুঁচকে-কুঁকড়ে ঘুমোতে দেখে কেমন একটা অদ্ভুত মায়া হল গণেশের—সে ওকে টেনে নিজের পাশেই ভাল করে শুইয়ে দিল। তাম্পি অত কিছু বুঝল না, ঘুমের ঘোরেই এক-বার চোখ মেলে চেয়ে একটা তৃপ্তির হাসি হেসে নিবিড়ভাবে গণেশকে জড়িয়ে ধরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন অবস্থাটা দেখে ও বুঝে একটু লজ্জিত যে না হল তা নয়—কিন্তু তবু, এতেই বেশ একটু প্রশ্রয় পেয়ে গেল সে।। ছেলেমানুষ, যে ভালবাসে—সে এই ধরনের প্রশ্রয় আশা করে, পেলে বিস্মিত হয় না। মানুষের যত বয়স বাড়ে, অভিজ্ঞতা বাড়ে, ততই তার সন্দেহ সংশয়ও বাড়ে। সহজে কিছু আশা করতে ভরসা করে না; কোন কিছুই সহজে পাওয়াটা স্বাভাবিক বলে ভাবতে পারে না। তাম্পির সে-বয়স হয়নি। সে তার গুরু-দেবকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে, সুতরাং গুরুদেবও তাকে ভালবাসেন—এইটেই তার কাছে সহজ ও স্বাভাবিক। এর মধ্যে যে কোন বাধা থাকতে পারে, অশোভনতা কিছু বা সেটা আর কারও কাছে আপত্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে—কি দৃষ্টিকটু, তা তার মাথাতে যায় না। এরপর থেকে তাই দুপুরের এই বিশ্রামের সময়, হাওয়া করতে করতে বা পা টিপতে টিপতে নিজের ঘুম পেলে গণেশের বিছানাতে তার পাশের সংকীর্ণ জায়গাটুকুতেই সন্তর্পণে শুয়ে পড়ত। তার পর অবশ্য আর সতর্কতা থাকত না। মনের ঐকান্তিক ইচ্ছাটাই ঘুমের মধ্যে তার কাজ করে যেত—সে গণেশকে জড়িয়ে ধরে তার গলার খাঁজে নিজের মুখটা গুঁজে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোত।

ব্যাপারটা কেউ দেখে থাকবে। তাঁবুর ঘর, দরজার ব্যবস্থা নেই। একটা পর্দার ব্যবধান থাকে মাত্র। তাছাড়া এতে গোপন-তার কোন কারণ আছে তাও ভাবতে পারেনি গণেশ। সাধারণত যেসব ঘটনা গোপন করে মানুষ—তাই কখনও করার প্রয়োজন বোঝেনি সে। হিমি বা তার দিদি কুশীর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতাও ঢাকবার চেষ্টা করেনি কোনদিন। এতো একটা ! নির্দোষ ব্যাপার। সেইজন্যেই এ নিয়ে মাথাও ঘামায়নি। কিন্তু অপরে ঘামিয়েছে। কোন দরকারে কেউ এসে থাকবে অথবা নিছকই কৌতূহলবশে—ঐ অবস্থায় ওদের ঘুমোতে দেখে যথাসময়ে গিয়ে হিমিকে লাগিয়ে থাকবে, হয়ত কিছু রঙ চড়িয়েই। গণেশের প্রতি তাম্পির এই অহেতুক ভক্তিতে এবং অর্থমূল্যহীন সেবাতে অনেকেই ঈর্ষা করত গণেশকে—সেইসঙ্গে তাম্পির সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষও বোধ করত, তারা এ-সুযোগ ছাড়বে কেন?

আগুন ছিলই—তাতে ঘৃতাহুতি পড়ল। কথাটা শুনে হিমি একদিন নিজে দেখতে এল। হয়ত যেদিন শুনেছিল সেই দিনই—কিম্বা পরের দিন গণেশ ঠিক জানে না। সম্ভবত বিধাতাই বিরূপ হয়েছিলেন ছেলেটার ওপর; ভাগ্য তো খারাপ বটেই—নইলে মা-বাপ আর কাকে ঐ বয়সে বিলিয়ে দেয়, এমন সুদর্শন স্নেহময় মিষ্টস্বভাবের ছেলেকে?—হিমি যেদিন সরেজমিনে দেখতে এল, সেইদিনই আর এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল গণেশ। অসহ্য গরম বোধ হওয়াতে ঘুম ভেঙে সে দেখেছে তাম্পি তাকে প্রাণপণে জড়িয়ে থাকাতেই এত গরম লাগছে। প্রথমটা সরাতে চেষ্টা করে-ছিল—পারেনি, এমনিতেই সবল সুস্থ শরীর তাম্পির, ঘুমোলে আরও বেশী ভার লাগার কথা; তার ওপর গণেশের একটা হাত ওর মাথার নিচে, তখন উঠে জোর করে সরাবার মতোও অবস্থা নয়। ঘুমের রেশ রয়েছে দস্তুরমতো—তাই সে চেষ্টা না করে পাশ থেকে পাখাটা টেনে নিয়ে এক হাতেই বাতাস খেতে শুরু করছিল, আর স্বাভাবিকভাবেই সে-বাতাস যাতে তাম্পির গায়েও লাগে—তাম্পি ঘেমেছে আরও বেশী—সেইভাবেই পাখা চালাচ্ছিল।

ঠিক সেই সময়েই ঘরে ঢুকেছিল হিমি।

মানুষের ক্রুদ্ধ মুখের অনেক চেহারাই দেখেছে গণেশ, কিন্তু সে-সময়ে হিমির মুখের যে-চেহারাটা দাঁড়িয়েছিল—তা সাধারণ কোন ভাষাতেই বর্ণনা করা যায় না। এমন ক্রূর, এমন ভয়ঙ্কর, এমন পৈশাচিক মুখভাব আগে আর কখনও দেখেনি গণেশ। মানুষের মুখের যে এমন রূপান্তর ঘটে তা জানত না। চিরদিনের বেপরোয়া মানুষ সে—হিমির সঙ্গেও নতুন ঘর করছে না—তবু তারও বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে গেল ওর দিকে তাকিয়ে। হিমি কিন্তু তখন আর একটি কথাও কইল না, যেমন এসেছিল, তেমনিই চলে গেল পর্দাটা আবার ফেলে দিয়ে।

গণেশ তখনই তাম্পিকে উঠিয়ে দিল, বার বার ওর হাত ধরে অনুনয় করে বলল, আর যেন সে গুরুদেবের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা না করে—অন্তত এখন কিছুদিন; ম্যাডাম ফিউরিয়াস হয়ে গেছে, তাম্পি জানে না, সাংঘাতিক মেয়েছেলে ও—তাম্পি যেন বেশ হুঁশিয়ার হয়ে থাকে এখন থেকে। এ-সতর্কবাণীতেও যথেষ্ট কাজ হবে না আশঙ্কা করে শেষে বলে দিল—বিপদ শুধু তাম্পির একার নয়, বিপদ গণেশেরও হতে পারে, জীবনসংশয় হলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

এই শেষের কথাটাতেই একটু কাজ হয়ে-ছিল। তাম্পির ছেলেমানুষী জিদ জবর-দস্তী অনেকটা কমেছিল। সে দুপুরে এ ঘরে থাকাই বন্ধ করে দিয়েছিল। একবার এসে একটু বাতাস করে কিম্বা গা-হাত-পা টিপে ঘুম পাড়িয়ে সে চলে যেত নিজের সেই দীন মলিন বিছানাতে বিশ্রাম করতে। তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ বা টিটকিরির অন্ত ছিল না,—তাদের অনেকেই হিমির কথাটা শুনেছিল নিশ্চয়, তার কালিপড়া মুখও

লক্ষ্য করেছিল—কিন্তু তাম্পি তা গায়ে মাখে নি।

ওর জন্যে গুরুদেবের না কোন অনিষ্ট হয় সেইটেই বড় কথা, ওকে কে কি বলল না বলল তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা ছিল না ওর।...

হিমি অবশ্য খুব একটা কিছু করেও নি। দিন দুই-তিন গণেশের সঙ্গে কথা কয় নি, তারপর সেধেই এসেছে। ঝগড়া রাগারাগিও করেছে কিছু—তবে গণেশ যতটা ভয় করেছিল ততটা কিছু নয়। সেইটেই গণেশের মস্ত ভুল হয়ে গেল। সে মনে করল তাম্পি ঘনিষ্ঠতা কমিয়ে দিয়েছে জেনেই খুশী হয়েছে হিমি, তার রাগ পড়েছে।......

মেয়েছেলেকে তখনও চিনতে বাকী ছিল গণেশের। কে জানে হয়ত এখনও আছে। হয়ত কখনই চেনা শেষ হয় না পুরুষের, কিছুটা বাকীই থেকে যায়।......

এর পর কী ঘটনায় কেমন করে যে তাম্পির সঙ্গে হিমির ভাব জমে উঠল সেইটেই ঠিক জানে না সে। সম্ভবত হিমির তরফ থেকেই চেষ্টাটা এসেছে প্রথম, হয়ত তাম্পির মনেও, ম্যাডামকে হাত করার একটা গোপন দুরাশা ছিল, সুযোগ খুঁজেছিল সেও। বেচারী একে ছেলেমানুষ তায় তার প্রকৃতিটাই সরল, ভেবেছিল ম্যাডামকে একটু তোয়াজ করতে পারলেই গুরুদেবের কাছে আবার স্বচ্ছন্দে আসতে পারবে, কাছে কাছে থাকতে পারবে আগের মত। কে জানে, ম্যাডামেরও অন্য কোন মতলব ছিল কিনা। প্রিয়দর্শন তাম্পি সম্বন্ধে কোন দুর্বলতা বা লোভ দেখা দিয়েছিল কিনা! সে সম্ভাবনা খুব বেশী নয়—তবে একেবারে উড়িয়ে দেবার মতও নয়। নিজের অভিজ্ঞতাতেই বুঝেছে গণেশ হিমির অসাধ্য কিছু নেই, অকরণীয়ও না। গণেশকে যে ভাবে হাত করেছিল—সে তো একটা রীতিমত তপস্যাই। তবে তাম্পির মত তপস্যা নয়, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনেরই। হিমি তার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কোন হীন কৌশল—কোন ষড়যন্ত্রেই পিছপা নয়। সে-ই তার সাধনার পথ, তপস্যার পথ।

তাম্পি অবশ্য অত-শত জানে না। ম্যাডাম প্রসন্ন হয়েছেন, এইতেই তার আনন্দের সীমাপরিসীমা রইল না। সে খুশিতে লাটুর মত পাক খেতে লাগল আর ভূতের মত খাটতে লাগল। হিমির সেবারও কোন ত্রুটি রাখল না। অন্য যে কোন মেয়ে হলে সত্যিই প্রসন্ন হত—ছেলেটার ওপর মায়া পড়ে যেত, কিন্তু হিমি অন্য ধাতের মানুষ, বাঘ খেলিয়ে খেলিয়ে বাঘিনীর হিংস্রতাই শুধু নয়—তার ধূর্ততাও পেয়েছে। বহু শিকারী সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছে গণেশের—ফরাসী ওলন্দাজ ইংরেজ—সকলের মুখেই শুনেছে, বাঘেরা — বিশেষ যারা নরখাদক হয় — অসম্ভব ধূর্ত। শিকার আয়ত্ত করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করে তারা—তা মানুষের পক্ষেও বোধ করি দুর্লভ।

হিমিরও মনের ভাব মুখে প্রকাশ পেল না বরং সকলেরই মনে হল—তাম্পির মনোযোগে সে তুষ্টই হয়েছে। যদি বা কোন অপরাধ ধরে থাকে তাম্পির—তা মার্জনা করেছে। এমন কি শেষের দিকে গণেশেরও তাই মনে হয়েছিল। এও মনে হয়েছিল—এবার হিমি যা শুরু করেছে—সেইটেই বরং যথার্থ দৃষ্টিকটু। ইদানীং কস্টিউম পরার সময়ও তাম্পিকে কাছে রাখত—নানা ছুতোয়, তাম্পির খেলা দেখাতে যাওয়ার সময় হলে নিজে সাজিয়ে দিত তাকে। খেলার ফাঁকে এক-একদিন নিজে ওর হাতে পাউডার মাখিয়ে দিত। ঘামে না রিং পিছলে যায়। তার জন্যে তোয়ালে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত এরিনা থেকে ভেতরে ঢোকার পথে, তাম্পি যাতে ঘাম মুছে নিয়ে হাতে পাউডার লাগিয়ে আবার দ্রুত ফিরে যেতে পারে।...অন্য যে কোন লোক হলে এতে ঈর্ষা বোধ করত। গণেশ করে নি তার কারণ হিমির প্রতি তার সেই প্রথম দিককার প্রবল আকর্ষণ আর ছিল না, তাছাড়া তাম্পিকে সে জানত, কোন নীচ কাজ সে করবে না। বিশেষত গণেশের সঙ্গে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করা—অন্তত সে যাকে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে—তাম্পির পক্ষে অসম্ভব। সে কেউ করাতে পারবে না তাকে দিয়ে—প্রাণ থাকতে। তেমন ক্ষেত্রে বরং প্রাণই দেবে সে—অতি সহজে। গণেশ যে ওদের মধ্যে কোন অন্তরঙ্গতা ঘটলে খুব একটা ক্ষুণ্ণ হত তা নয়—বরং হয়ত কৌতুকই বোধ করত একটু। তার অভিজ্ঞতায় স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কে কিছুতেই বিচলিত হবার কোন কারণ নেই। তাদের সহজ সম্পর্কেই সে বিশ্বাসী। সে নিজেও একনিষ্ঠ ছিল না, অপরের মধ্যেও সে রকম কোন একনিষ্ঠতা আশা করে না।

কিন্তু তাম্পির ধারণা অন্যরকম। ক্রীশ্চান ধর্মের কোন পুঁথিগত শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ ঘটে নি—তবে ধর্মের কতকগুলো সংস্কার বোধহয় মজ্জাগত হয়ে যায় মানুষের—সেগুলো তাম্পির ছিল পূর্ণ মাত্রায়ই। 'পাপ' সম্বন্ধে তার নিদারুণ ভয় ছিল। পাপ করলে ঈশ্বর রাগ করবেন, লর্ড যেশু রাগ করবেন—এ ধারণা সহস্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেও ভাঙতে পারে নি গণেশ। হয়ত শুধুই ঈর্ষা নয় — এই বিশ্বস্ততাই তার সর্বনাশের কারণ হয়েছিল। কে জানে এ সন্দেহটা কি করে দেখা দিল গণেশের মনে—হাজার চেষ্টাতেও সেটা দূর করতে পারছে না। যদি তাম্পি সম্পূর্ণরূপে মনোরঞ্জন করতে পারত হিমির—তাহলে বোধহয় এ ঘটনা ঘটত না!

হঠাৎ একদিন শুনল গণেশ—তাম্পি বাঘের খেলা শিখছে 'ম্যাডামে'র কাছে।

খবরটা শুনে বেশ একটু বিচলিত বোধ করল সে। কুশীর মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিকভাবে ঘটে নি, এখনও গণেশের ধারণা তার মধ্যে হিমির হাত ছিল। অথবা হিমিই সে মৃত্যুর প্রধান হেতু। আবার সেই রকম কিছু হবে না তো? সে তাম্পিকে বুঝিয়ে নানারকম ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতে গেল কিন্তু তার উৎসাহের সমুদ্রে জোয়ার এসেছে, সে কোন কথাই শুনল না। বলল, 'বুঝছ না গুরুদেব, বাঘের খেলা—বাঘ নাচানো, বাঘ বশ করা—এ তো মরদেরই কাজ। এত বড় বুকের ছাতিটা করেছি কিসের জন্যে?......তা ছাড়া প্রোফেসার সাহেবেরও ইচ্ছা—আর একটা লোক তৈরী হয়ে থাকে। এখন ম্যাডাম একেবারে একা — যদি কোনদিন ম্যাডামের শরীর খারাপ হয়—এ খেলাই দেখানো যাবে না। মালিক বলতেই আরও ম্যাডাম রাজী হয়েছেন, নইলে সি ইজ ভেরি জেলাস, হঠাৎ কাউকে এত বড় বিদ্যে শেখানো—তেমন মেয়েই নন।'

তবু গণেশ একটা শেষ চেষ্টা করে, 'তা তুই তো ম্যাজিক শিখতে শুরু করেছিলি, সেটা শেষ হল না, নতুন লাইনে চলে গেলি! তোর কিছু হবে না। ঐ জন্যেই তো আমরা সহজে শেখাতে চাই না, আজ এটা, কাল ওটা যারা করে তাদের দ্বারা এসব বিদ্যে শেখা হয় না। আমি আর তোকে শেখাব না—যাঃ!'

ধপ করে পায়ের কাছে বসে পড়ে গণেশের, পায়ে হাত দিয়ে বলে, 'রাগ করো না গুরুদেব — তোমার ম্যাজিক তো হাতেই রইল—জানি তুমি আমাকে যখন শেখাবে, যত্ন করেই শেখাবে; মাস্টার তৈরী করে দেবে। ও আমি শিখব ঠিকই। মিরাকল করব আমার অনেক দিনের শখ!......আমি যেদিন তোমার মতো ম্যাজিক শেখাতে পারব—ইস! ভাবতেই যেন মাথার মধ্যে ঘূর্ণি লাগে। তা নয়—এটা কি জানো, ম্যাডামের তো হুইমস—আজ মন হয়েছে কালই হয়ত আর থাকবে না, মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে—বলবে শেখাব না তোকে। তাই এটা একটু আগেই কায়দা করে নিচ্ছি। বুঝছ না, এতে ম্যাডামও সন্তুষ্ট থাকবে আমার ওপরে। এত যত্ন করে শিখছি দেখে খুব খুশী হয়েছে।...একাধারে তোমাদের যুগল গুরুর বিদ্যে শিখে নিয়ে তোমাদের দুজনকেই হারিয়ে দেব এবার—দ্যাখো না।'

খুশিতে হা-হা করে হেসে ওঠে তাম্পি।......

দিন-কতক সত্যিই খুব যত্ন করে শেখাল হিমি। মনে হল সত্যি সত্যিই ওকে শেখাতে চায় সে—সত্যিকারের একটা স্নেহই পড়েছে এতদিনে ছেলেটার ওপর।

তাম্পিরও উৎসাহ অধ্যবসায়ের কমতি নেই। সে ভূতের মতো খাটতে পারে—খাটেও। ইতিমধ্যেই শুধু ব্যক্তিগত সেবা নয়—হিমির কাজ-কর্মেরও বহু দায়িত্ব নিজের ওপর তুলে নিয়েছে। তার উৎসাহের সঙ্গে বরং হিমিই পাল্লা দিতে পারে না—ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হাসিমুখে অনুযোগ করে, 'পাগলটা আমাকে খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলতে চায়!' বলে, 'কী ভেবেছিস তুই? এক মাসেই আমার চাকরি খতম করে দিবি?'

তাম্পি তার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'পাগল হয়েছ ম্যাডাম! তোমার মতো শিখতে আমি জীবনে পারব না। আসল কথা কি জানো, তোমার ওপর মাদার মেরীর দয়া আছে, নিশ্চয় তাঁর অংশেই জন্ম তোমার—নইলে একটা মেয়ে পাঁচটা বাঘকে এমন করে নাচায়—কে কবে দেখেছে? তাও মেমসাহেব মেয়ে নয়—আমাদের দেশের নেটিভ মেয়ে!'......

বায়ু অনুকূল, আকাশ উজ্জ্বল প্রসন্ন। কোথাও কোন দুর্যোগের লক্ষণ নেই—এদের জীবণতরণী নির্বাধায় ভেসে যাবে—স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে—এই-ই ভেবেছিল সবাই।

এমন কি গণেশ সুদ্ধ।

হঠাৎই এই ঘটনাটা ঘটল। বিনামেঘে বজ্রাঘাত বলে—ঠিক তাই।

কি করে যে কি হয়েছিল তা কেউ জানে না।

বাঘের খাঁচার দোর কে খুলল, আর সবচেয়ে বদমাইশ অবাধ্য বাঘটারই খাঁচা কেউ বলতে পারল না। তাম্পিই বা অত ভোরে সেখানে কি করতে গিয়েছিল তাও কারও জানা নেই। আর জানা যাবেও না কোন দিন। যে বলতে পারত, তার পক্ষে আর সে সাক্ষ্য দেওয়া সম্ভব হবে না।

একটা আর্ত চিৎকার আর সেই সঙ্গেই বাঘের ভয়ংকর গর্জন শুনে সকলে যখন ছুটে গেল—হিমিও গণেশের শয্যাতে ছিল তখন, একথা গণেশ মানতে বাধ্য—তখন দেখল খাঁচার দরজা খোলা, বাঘটা বাইরে তাম্পিকে মাটিতে ফেলে ক্ষত-বিক্ষত করছে। ইতিমধ্যেই কণ্ঠ নীরব হয়ে এসেছে তাম্পির, হয়ত আগে কিছু বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এখন আর কোন সাধ্যই নেই।

তারপর যা করবার সবই করা হল অবশ্য।

প্রফেসার ঘোষ বাঘটাকে গুলি করতে যাচ্ছিলেন, হিমি বাধা দিল। নিজের জীবন বিপন্ন করেই—সেই স্লিপিং গাউন পরা অবস্থায়, আশ্চর্য কৌশলে—সেই ক্রুদ্ধ ও উন্মত্ত বাঘটাকে খাঁচায় পুরে ফেলল। তখনও তাম্পির বুকের কাছটা ধুকধুক করছে—তাকে ধরাধরি করে ওখানকার হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হল। ভাল হাসপাতালে গেলে কী হত কে জানে—ওখানে কিছুই করতে পারল না তারা। যেটুকু সামান্য প্রাণলক্ষণ ছিল—ঘন্টাখানেক পরে তাও আর রইল না, বুকের কাছের সামান্য সেই স্পন্দনটুকুও বন্ধ হয়ে গেল।......

জানা গেল না কিছুই! যে যার নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মত অনুমান করল শুধু।

হিমি বলল, প্রোফেসার ঘোষও সে সঙ্গে একমত, অতি উৎসাহী তাম্পি নিশ্চয় ভোরে উঠে একা গিয়েছিল প্র্যাকটিশ করতে। হয়ত ভেতরে ঢুকে খাঁচার দোরটা বন্ধ করার আগেই বাঘটা বেরিয়ে এসেছে—নয়ত বাইরে এসে খোলা জায়গায় বাঘকে খেলাবে এমনি একটা দুঃসাহসিক উচ্চাশা ছিল—তাইতেই মারা পড়ল শেষ অবধি। বেছে বেছে সবচেয়ে বজ্জাত বাঘটার সঙ্গেই চালাকি করতে গিয়েছিল—বাঘও তো নয়, বাঘিনী, এই সব মাংশাসী জন্তুর মাদীরাই হয় বেশী সাংঘাতিক—সেই আরও সর্বনাশের কারণ হল ওর। ছেলেমানুষকে—বিশেষত ওর মতো উৎসাহী ছেলেকে এসব খেলা শেখাবার চেষ্টা করতে নেই—অতপর এই শিক্ষাই নিক সকলে।

কিন্তু গণেশের ধারণা অন্য রকম।

তার বিশ্বাস সর্বনাশিনী ভয়ংকরী ঐ নারীরই হাত আছে এতে ষোলআনা। সে-ই হয়ত গোপনে কোন নির্দেশ দিয়ে থাকবে। চুপি চুপি বুঝিয়ে থাকবে যে, কাজটা খুব সোজা—অথচ যদি সত্যি সত্যিই বাইরে এনে খেলিয়ে আবার একা একা খাঁচায় পুরতে পারে তো তার বাহাদুরীর সীমা থাকবে না; সবাই ধন্য ধন্য করবে—হিমিও বুঝবে সাগরেদের বাহাদুরী।

কিম্বা শেষ রাত্রে কখন উঠে হিমিই ওর খাঁচার দোর আলগা করে রেখে এসেছিল, শুতে যাবার আগে কোন একটা ছুতো বার করে তাম্পিকে বলে রেখেছিল—ভোরে উঠে বাঘটাকে একবার দেখে আসতে। হয়ত বলেছিল, 'ওর চেহারাটা তত ভাল লাগছে না, হয়ত ভেতরে ভেতরে কোন অসুখ করে থাকবে।......শেষ রাত্তিরে উঠে একটু দেখে আসতে পারবি? যদি কোন খুঁচুনি-টুঁচুনির লক্ষণ দেখিস তো তক্ষুণি আমাকে খবর দিবি। আর যদি দেখিস, ঠিক আছে—তাহলে আর কোন হাঙ্গামা করার দরকার নেই।' কে জানে আরও কি বলেছিল, কোন্ অজুহাত দেখিয়েছিল। কী কৌশলে অবোধ সরল ছেলেটাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল।...

সহস্র সম্ভাবনা মন আসে গণেশের। সেদিনও এসেছিল। প্রোফেসার ঘোষকে একবার বলেও ছিল—পুলিশে খবর দেবার কথা, পুলিশে খোঁজ করুক — এ দুর্ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত কিনা। ঘোষই মুখ চেপে ধরেছেন ওর, 'তুমি পাগল হয়েছ চক্কোত্তী! এদেশের পুলিশ কি আমাদের দেশের ইংরেজী পুলিশের মতো। করতে পারবে না কিছুই—শুধু দেদার ঘুষ খাবে আর ব্ল্যাকমেল করবে আমাদের। তাছাড়া এ ধরনের স্ক্যান্ডাল একবার রটলে আর এদেশে করে খেতে হবে না আমাদের। দলই কি রাখতে পারব—কথাটা যদি চাউর হয়ে পড়ে?...চেপে যাও। কোন সন্দেহ হয়ে থাকলে চেপে রাখ মনে। যা-ই করো, ছেলেটা তো আর ফিরবে না!'......

না, কিছুই করতে পারে নি গণেশ। বেচারী তাম্পির এই অকালমৃত্যুর কোন প্রতিকার, কোন কিনারাই করতে পারে নি। যদি হত্যাই হয়—গণেশই পরোক্ষে এর জন্যে দায়ী, তার প্রতি ভালবাসাই তাম্পির মৃত্যুর কারণ হল।...এই দুঃখ, প্রতিকারহীন অনুশোচনাই তাকে পাগল করে তুলেছিল।

ছেলেটার সহস্র স্মৃতিতে ভরা এই তাঁবু, এই ঘর তার কাছে কঠিন কারাগারের মতোই দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। শেষে আর থাকতে না পেরে একদিন বেরিয়ে পড়েছে—উদভ্রান্তের মতোই। কেউই জানতে পারে নি। এক রকম পালিয়েই এসেছে, একটি মাত্র ব্যাগ সম্বল করে। সব কিছু পড়ে আছে সেখানে। খেলা দেখানোর সাজ-সরঞ্জাম, পোশাক-আশাক—নিজস্ব বিস্তর জিনিসও। থাক সব। ওসব জিনিসেই তাম্পির হাতের স্পর্শ আছে। ঐ প্রত্যেকটি জিনিসই যেন নিত্য করুণভাবে গণেশের কাছে এই হত্যার প্রতিশোধ প্রার্থনা করে, নীরবে অভিযুক্ত করে ওকে। ওদের সান্নিধ্যে এলেই সমস্ত রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে তাই—লজ্জায় বেদনায়—আর প্রতিকারহীন একটা অনুশোচনায়।

মাদ্রাজে নেমে প্রথম গিয়েছিল কোচিনে, তাম্পির বাবা-মাকে খুঁজে বার করতে। সুবিধে হয় নি কিছু। খুঁজে পায় নি কাউকেই। হয়ত ওখানকার বাস তুলে তারা অন্য কোথাও চলে গেছে—জীবিকার সন্ধানে। তাদের দেখা পেলে তাদের কিছু টাকা দিত—তাম্পির নাম করে। তাম্পির মাইনের টাকা ও গণেশের কাছেই জমা রাখত ইদানীং—সে টাকাটাই বা কি করবে তা এখনও ভেবে পাচ্ছে না।...কোচিন থেকে ফিরে গয়ায় গিয়েছিল একবার। নিজের বাবার পিণ্ড দেবার অধিকার ওর এখনও আছে কিনা তা জানে না—সে চেষ্টাও করে নি—তাম্পির নাম করেই পিণ্ড দিয়ে এসেছে। সে ক্রীশ্চান—কিন্তু নিজের ধর্মে খুব একটা আস্থা ছিল না তার, বরং হিন্দু দেব-দেবীদেরই বেশী মানত—বিশেষ করে কালীমার ওপর ছিল প্রগাঢ় ভক্তি। আর কে জানে কেন—গণেশের মনে হয়েছিল গয়াতে পিণ্ড দিলে তাম্পির আত্মা বেশী সন্তুষ্ট হবে। ওর সঙ্গে তার আত্মীয়তা স্বীকৃত হয়ে গেল—তাতেই খুশী হবে সে।

অবশ্য দেবে। ঐ টাকা এখানকার কোন গীর্জাতে দান করে দেবে সে তাম্পির নামে। কী ছিল সে, রোমান ক্যাথলিক কিনা—তাও জানে না। মনে হয় ক্যাথলিকই ছিল, বা ঐ ধরনের কোন সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রোটেস্টান্ট নয় অন্তত। তাই টাকাটা সে ক্যাথলিক গীর্জাতেই দেবে। 'মাস' প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে বলবে তাম্পির নামে। যদি এর কোন মূল্য থাকে, এই 'মাস' দেবার বা গয়ায় পিণ্ড দিয়ে আসায়—তাম্পি হয়ত শান্তি পাবে। আহা, তাই যেন হয়—শান্তিই যেন পায় সে, যেন শান্তি হয়। যদি বা আত্মা থাকে—গণেশকে যেন সে ভুলতে পারে, ওর কথা ভেবে মৃত্যুর ওপারেও আর যেন দুঃখ না পায়।......

(ক্রমশ)

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভাবলোক

ভবানী সরকার

"সে গান আমার লাগলো যে গো,
লাগলো মনে।"

"আমি বিচিত্রের দূত, আমি চঞ্চলের লীলা-সহচর—আমার একমাত্র পরিচয় আমি কবি" (আত্মপরিচয়)। এই বৈচিত্র্য পিপাসাতেই ললিতকলার বিভিন্ন শাখাতে রবীন্দ্রনাথের আনাগোনা। শুধু আনাগোনাই বা বলি কেন; কোন কোন শাখাতে চির-স্থায়ী না হোক অন্তত দীর্ঘস্থায়ী বসবাস। কবিতাকে বাদ দিলে রবীন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠ-তম বাহন কে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ভাবতে হয় না, দুটি নাম সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, গান এবং ছোটগল্প। পঞ্চাবিংটির কাছে তাঁর শ্রেষ্ঠতম দান কবিতা, এ কথা কবিও জানতেন, স্পষ্টভাবেই জানতেন। কিন্তু গান ও গল্প সম্বন্ধে কবি হয়তো ততখানি নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারেননি। প্রতিকূল সমালোচনার কোন তিক্ত অভি-জ্ঞতাই হয়তো এই অভিমানের কারণ। মাঝে মাঝে হয়তো নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছেন:—"সব চেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান, এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালীরা, শোকে-দুঃখে, সুখে-আনন্দে, আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই—যুগে যুগে এই গান তাদের গাইতেই হবে।" (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ । রাণী চন্দ)। কিন্তু এই বিশ্বাসের 'পরে বেশীক্ষণ দৃঢ়-ভাবে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি। ছোটগল্প সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা। এই অভিমান ছিল বলেই, জীবনের শেষপর্বে যখন আপনার বিচিত্র সৃষ্টির মূল্যায়ণ সম্বন্ধে ভাববার সুযোগ এলো তখন গান ও গল্প সম্বন্ধে, নিজের পক্ষ সমর্থন করে বিভিন্ন কথা তাঁর মুখে শুনেছি। বৃদ্ধ বয়সে কবি তো কলমের বদলে তুলিই বেশী করে হাতে নিয়েছিলেন, কিন্তু ছবির পক্ষ সমর্থন করে কবির মুখে অত কথা শোনা যায়নি। তার কারণ, সম্ভবতঃ ছবি সম্বন্ধে কবি নিজেও নিঃসন্দেহ ছিলেন না, ছবির সম্পূর্ণতা এবং সার্থকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস তত নিখাদ ছিল না, যেটা গান ও গল্প সম্বন্ধে ছিল।

কবিতাকে বাদ দিলে রবীন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম বাহন নিঃসন্দেহে গান ও ছোট-গল্প। আপেক্ষিক বিচারে এ দুইয়ের মধ্যে আবার গানই কবি-মনের বেশী কাছাকাছি। এটাই স্বাভাবিক। গান ও কবিতা দুইই শ্রুতি নির্ভর এবং আন্তর্ধর্মে প্রায় সগোত্র। হার্বার্ট স্পেনসর বলেছিলেন, কথার মধ্যে যেখানে হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লেগে যায়; কথাবার্তার এই আনুষঙ্গিক সুরেরই অনু-শীলিত এবং সমৃদ্ধতর রূপ মানুষের সংগীত—(দি অরিজিন এন্ড ফাঙ্কশান অব মিউজিক—হার্বার্ট স্পেনসার)। রূপ এবং স্বরূপে তাই কবিতা ও গান পরস্পরে "হৃদয়ের বড় কাছাকাছি"; উভয়েই muse-এর অন্তর্গত। এই muse-এর মধ্যেই রবীন্দ্র প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত এবং সম্পূর্ণ প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে কবির নিজস্ব স্বীকা-রোক্তিও বর্তমান। সুদীর্ঘ সাহিত্য সাধনার কালগত বিচারেও গল্পের তুলনায় গান রচনার সময়কালের পরিধি দীর্ঘ। দীর্ঘ-কালের সাহিত্য সাধনার একেবারে সেই প্রথম পর্ব থেকে অন্তিম কাল পর্যন্ত এই গান রচনার ধারা অব্যাহত। স্তিমিত বা শৈথিল্য কোথাও নেই-ই বলা চলে।

কবিতার মত গানকেও রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন সহজ ভাবেই। জোড়াসাঁকোর আঙিনায় সেই যুগের বিখ্যাত গায়কদের সমাগম ছিল। বালক বয়সেই সংগীতে রবীন্দ্রনাথের দীক্ষা গ্রহণ। "আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতেই গান চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। ......অতি সহজেই গান আমাদের সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল" (জীবন স্মৃতি)। "কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না, তাহা মনে পড়ে না" (জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি)। সেই অল্প বয়সেই দেশী-বিদেশী (ইংরেজি ও আইরিশ গান) সংগীতের প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বাল্মীকি প্রতিভা এবং কাল মৃগয়ায় তার প্রমাণ রয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে সেই কিশোর বয়সেই (১৮৮১) "সংগীত ও ভাব" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন অনেক জ্ঞানী ও গুণীর সামনে। "অদ্য রবি বেথুন সোসাইটিতে "গান ও ভাব" এই বিষয়ে বক্তৃতা দেবে—উইথ প্র্যাকটিক্যাল ইলাস্ট্রেশন" (গুণেন্দ্র-নাথকে লিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্র)। জীবন স্মৃতিতেও এ প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। আসল কথা কবিতার মত গানকেও কবি ঠিক সহজভাবেই পেয়েছিলেন এবং কবিতার মতই গানও কবির "চিরকালের প্রেয়সী।"

।।২।।

"অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে।
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে।।"

রবীন্দ্রসংগীত গায়ক এবং শ্রোতার কাছে এইটেই সব চেয়ে বড় বিস্ময় যে, কোন একটি বিশেষ জায়গায় তাকে সম্পূর্ণ করে পাবার উপায় নেই—অথচ প্রত্যেকটি গান সম্পূর্ণ। দ্বিতীয় বিস্ময় তার সংখ্যা এবং বিষয় বৈচিত্র্য, তৃতীয় বিস্ময় কথা এবং সুরের এমন আশ্চর্য মিলন। প্রথমেই এই অন্তহীন বিস্ময় মনকে চমক্ দেয়: সেই গানের কথাই স্মরণে আসে "তার অন্ত নাই গো নাই।" কান্নাহাসির দোল দোলানো আমাদের এই হাসি খেলায় কবি যে গান গেয়েছেন তাকে মনে রাখতে মিনতি জানিয়ে-ছেন। কিন্তু একটা কথা কবি ঠিক বলেন নি—

"শুকনো ঘাসে শূন্য বনে আপন মনে
অনাদরে অবহেলায় আমি যে গান
গেয়েছিলেম।"

—অনাদরে এ গান গাওয়া হয় নি—অবহেলায় তো নয়ই। সচেতন শিল্পপ্রয়াস এবং সূক্ষ্ম অনুশীলনের সৃষ্টি এই রবীন্দ্র-সংগীত। বাণীবিগ্রহ রচনা এবং সুরারোপ উভয়ক্ষেত্রেই একথা সত্য। সংগীতে সুর-প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি সংগীতের বাণীবিগ্রহ অর্থাৎ কথাকে গৌণ করেছেন—"গানের কথা-গুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভাল। রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বরূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপ ভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেখানেই সংগীতের উৎকর্ষ।......গুন্ গুন্ করিতে করিতে যখনই একটা লাইন লিখিলাম,—'তোমার গোপন কথাটি সখি, রেখোনা মনে,'—তখনই দেখিলাম, সুর যে জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল, কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিত না" (জীবনস্মৃতি)। হিন্দুস্থানী সংগীত বা

মার্গ সংগীতের ক্ষেত্রে কথা নিতান্তই গৌণ। রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে সংগীতের বাণীদেহ গৌণ, একথা কি ভুলেও ভাবা সম্ভব? মন্তব্যটিতে কবির সিদ্ধান্ত স্বভাবতই মনে একটি প্রশ্ন জাগায়—কথা হয়তো পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছুতে পারতো না, কিন্তু কথা-বিহীন একক সুরের পক্ষেও কি তা সম্ভব হতো? ঐ একই আলোচনার উপসংহারে এসে কবি যা বলেছেন তাতে কথার প্রয়োজনীয় প্রাধান্য প্রায় স্বীকৃতই হয়েছে।—"বহু বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম—'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে।' সেই গানের ঐ একটি মাত্র পদ মনে একটি অপরূপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল। আজও সেই লাইনটি মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়। একদিন ঐ গানের ঐ পদটার মোহে আমিও একটা গান লিখিতে বসিয়াছিলাম—"আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।" বাল্যকালে শোনা গানের সেই পদটি কবির চিত্তপটে যে চিত্র রচনা করেছিলো সে কি শুধু সুরে? বাণী-বিহীন একক সুরের পক্ষে কি চিত্রকে সম্পূর্ণ করা সম্ভব? অন্তত রবীন্দ্র-সংগীতের বেলায় সম্ভব নয়, একথা সম্ভবতঃ জোর দিয়েই বলা যায়। সুরের "গণপতি" কথার "মূষিক" এর চেয়ে প্রধান একথা বলে কবি যে সিদ্ধান্ত টেনেছেন তাঁর নিজের গান সম্বন্ধে অন্ততঃ উপমাটি সার্থক নয়; বরং ইন্দ্র এবং ঐরাবতের উপমাই সহজে মনে আসে।

গুন গুন করতে করতে সুর এসেছে, পরে সেই সুরের ওপর কথা বসিয়ে গান রচিত হয়েছে, আবার কখনো কথা রচিত হবার পর ভাবানুযায়ী সুরারোপ হয়েছে। গানের কথা রচিত হয়েছে কাব্য রচনার সেই একই প্রেরণায় এবং প্রক্রিয়ায়। নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনার আবেদন এবং বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদও, কখনো প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। (এসো এসো হে তৃষ্ণার জল/আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল/অনেক কথা যাও যে বলে/যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা/কেন যামিনী না যেতে জাগালে না/বাংলার মাটি, বাংলার জল ইত্যাদি।) শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ এ প্রসংগে অনেক তথ্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রসংগীতের বাণীবিগ্রহ রচনার পশ্চাতে যে মানস প্রেরণা এবং সৃজন কৌশলটি বর্তমান তা একান্তভাবে সেই কবিসত্তারই। কবি রবীন্দ্রনাথ এবং সুরকার রবীন্দ্রনাথ একসংগে মিলেই সুরমন্ডলের এই আশ্চর্য বৃত্তটিকে সম্পূর্ণ করেছেন।

কবি যে "সুরের আগুন" মনে লাগিয়েছেন, যে "আগুনের পরশমণির" ছোঁয়ার 'বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে' দুলে উঠেছে, যার স্পর্শে 'আকাশ ভরা সূর্যতারা' থেকে 'আলোর নাচন পাতায় পাতায়' অবধি ভাল লেগেছে সেই অগ্নিশিখার প্রদীপটিও অনেক যত্নে অনেক সাধনায় রচনা করা হয়েছে। এ যদি না হতো তাহলে—

"কোন হাটে তুই বিকোতে চাস,
ওরে আমার গান,
কোনখানে তোর স্থান?"

এ প্রশ্নের উত্তর সহজে খুঁজে পাওয়া যেতো না। আসল কথা রবীন্দ্রনাথের গানে কথা আর সুর এমন আশ্চর্যভাবে মিশে আছে, যাতে প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় উভয়ে মিলে যেন পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ করে তুলেছে এবং সম্পূর্ণতার এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে যেখানে তদ্গত চিত্তের সমস্ত বোধ সত্তার গভীরতম স্তরে বৃত্ত হয়। 'Emotions recollected in tranquility"

অথবা "মাপ্রোনু, মায়ানু মতি-ভ্রমোনু"—অনুভূতির এমনিতর একটা সর্বোত্তীর্ণ উপলব্ধি।

॥৩॥

"অরূপ তোমার বাণী,
অংগে আমার, চিত্তে আমার,
মুক্তি দিক্ সে আনি।—"

রবীন্দ্রসংগীতের অভ্যন্তরে একটি বিশেষ ভাবলোক বর্তমান। এখানেও সেই রূপসাগরের মধ্যবর্তী অরূপরতনেরই সন্ধান। "আলোকের ঝর্ণাধারায়" স্নাত এই আনন্দময় ভুবনের তিল তিল উপাদান সংগ্রহ করেই এই সঙ্গীত-তিলোত্তমার সৃষ্টি। প্রাত্যহিকতার মালিন্যে আবদ্ধ খাঁচার পাখীটির ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে, সুদূরে নীল আকাশে ডানা মেলে উড়বার স্বপ্ন তার মনে আসে, যখন কোন্ অজানা লোক থেকে কোন্ এক অচিন পাখী এসে তাকে সুদূরের বার্তা জানিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের গান সেই মুক্ত অচিন পাখীটি। সেই সিন্ধু-পারের পাখীর মতই উদ্দাম অভিসারের স্বপ্ন তার বক্ষে।

এ গানে মন কানায় কানায় ভরে ওঠে। মুগ্ধতায়, তৃপ্তিতে, আনন্দে উপলব্ধির এমন একটি সম্পূর্ণতায় আমরা পৌঁছাই যখন সত্যই মনে হয়— "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।" এ পরিচিত জগতে আমরা, অনেক-খানি পরবাসী। এর মধ্যে একটি গভীর বেদনা আছে। তবে সান্ত্বনা আমাদের রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা সেই মনের আপন ভুবনটিকে, মনোজীবনের সেই ভাবলোকটিকে অনুভব করবার সুযোগ পেয়েছি। হৃদয়ের অন্তরতম সেই অনির্বচনীয় রূপটিকে, সেই নির্জন গভীর সত্তাটিকে আমরা যেন খুঁজে পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের গানে। ভারতবর্ষের গানের স্বরূপ সম্বন্ধে কবি যা বলেছেন তা তাঁর নিজের গান সম্বন্ধেই বেশী প্রযোজ্য। "—আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণরাগকে ভাষা দিতেছে; আমাদের গান নববর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নববসন্তের বনান্ত প্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্য-বিস্মৃত বিহ্বলতা" (জীবনস্মৃতি)। এই বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতাটিই রবীন্দ্রসংগীতের ভাবলোক।

কিন্তু এই ভাবলোকে পৌঁছানোর পথটি সম্পূর্ণ অচেনা নয়, পরিচিত জগতের পথ বেয়েই সেখানে গিয়ে পৌঁছাই। মানব-প্রকৃতির প্রেম এবং বিশ্বপ্রকৃতির চিত্র এক-সংগে মিশে এই পরিচিত পথটি রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের বাণীদেহে প্রেম আর প্রকৃতির চিত্র আশ্চর্যভাবে মিশে পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ করছে। "ভাল, বড় ভাল, বড় সুন্দর এই পৃথিবীটা, দুচোখ মেলে, যা দেখেছি তাই ভালবেসেছি—

এই তো ভাল লেগেছিল,
আলোর নাচন পাতায় পাতায়।

গেয়েছি, বড় খাঁটি কথাই গেয়েছি।" (আলাপাচারী রবীন্দ্রনাথ)। এই ভাল লাগাটি চিত্তলোকের আর পাতায় পাতায় আলোর নাচনটি চিত্রলোকের, আর উভয় মিলেই সেই বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতার ভাবলোক। অবশ্য একথা সত্য, রবীন্দ্রসংগীতের এই চিত্রলোক একান্তভাবেই ভাবলোকের মায়া দিয়ে গড়া। স্বতন্ত্র করে দেখার উপায় নেই, কবি নিজেও তা দেখেননি। ভাবলোকের উপলব্ধি এবং চিত্রলোকের বিস্ময়কে এক-সংগে মিশিয়ে দিয়েছেন। বক্তব্যকে উদা-হরণের সাহায্যে আরো স্পষ্ট করা যেতে পারে,—

"তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে
তখন ছিলেম বহুদূরে কিসের অন্বেষণে।
কূলে যখন এলেম ফিরে তখন অস্ত
শিখর শিরে,
চাইল রবি শেষ চাওয়া তার
কনক-চাঁপার বনে।"
আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন
অন্যমনে"—

হৃদয়ের একটি বিশেষ উপলব্ধিকে ব্যক্ত করাই গানের উদ্দেশ্য, কিন্তু সেই কথাটিই সম্পূর্ণ হয়েছে ছোট্ট একটি ছবির সাহায্যে,

"তখন অস্ত শিখর শিরে।
চাইল রবি শেষ চাওয়া তার
কনক-চাঁপার বনে।"

"চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে।" (সাহিত্যের তাৎপর্য)—কাব্যরচনায় এই মৌল পদ্ধতিটি

কবি সংগীত-রচনার ক্ষেত্রেও অনুসরণ করেছেন।

রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে এমনিতর অসংখ্য চিত্র রয়েছে। শব্দ প্রতীকের বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় কখনো ধীরে ধীরে একটি সম্পূর্ণ ছবি আঁকা হয়েছে—

"পান্থ পাখির রিক্ত কুলায় বনের
গোপন ডালে
কান পেতে ঐ তাকিয়ে আছে
পাতার অন্তরালে
বাসায় ফেরা ডানার শব্দ
নিঃশেষে সব হল স্তব্ধ
সন্ধ্যাতারার জাগল মন্ত্র দিনের
বিদায় কালে।
চন্দ্র দিল রোমাঞ্চিয়া তরংগ সিন্ধুর,
বনচ্ছায়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লাগলো
আলোর সুর।"

আবার কখনো দেখা যায় স্বল্প কয়টি রেখায় আশ্চর্য সুন্দর একখানি ছবি—

"আর নাইরে বেলা নামল ছায়া
ধরণীতে—।"

তুলির সংক্ষিপ্ত কয়েকটি রেখা ছবিটির মধ্যে একটি সমগ্রতা এনে দিয়েছে। সংগে বিলম্বিত লয়ের সুরটি এই সমগ্রতার ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। আরেক ধরনের ছবি আছে যার মধ্যে সম্পূর্ণতার পরিবর্তে একটা বিলাস প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতই একটা আচমকা ভাব এই ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য। তবে মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি ছবিই ভাব-লোকে উত্তীর্ণ হবার জন্যে এবং এইজন্যেই সুরমণ্ডলের বিচিত্র রঙের ফ্রেমে ছবিগুলি বাঁধা।

।।৪।।

"এই কথাটি মনে রেখো
তোমাদের এই হাসি খেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলাম।
জীর্ণ পাতার, ঝরার বেলায়।"

কবির দেশবাসী আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান বলে মনে করেছি বার বার, এই কথাটি ভেবে যে আমাদের গানের অভাব কোনদিন হবে না; গানের ঐশ্বর্যে আমরা দেউলে কোনদিন হবো না। আনন্দে উৎসবে, বেদনায়—বিরহে, ঋতুচক্রের বিভিন্ন রূপবৈভবের বিস্ময়ে, উপলব্ধির সমস্ত ভাবনাকে আমরা রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতে পারবো। কথাটি গর্ব করে বলবার মত বই কি!

কিন্তু সংগে সংগে একটি প্রশ্ন মনে আসে, এই গৌরবকে বহন করবার মত দক্ষতা আমরা অর্জন করেছি কি না? উত্তরাধিকার সূত্রে যে মণিহার আমাদের কন্ঠে এলো তার ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান না করে উত্তরসূরীর কন্ঠে পরিয়ে দিতে পারব কি না? মনকে চোখ না ঠেরে এ ভাবনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে একটা গভীরতম দুঃখ নিহিত আছে। যদি নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে থাকি তবে ভবিষ্যৎকালের ন্যায়সংগত অভিযোগের উত্তরে আমাদের কি বলার থাকবে?

এই মহান দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন, এমন শিল্পী এখনো আমাদের মধ্যে আছেন; নিশ্চয়ই আছেন,—কিন্তু আঙুলে গুণে বলা যায় এবং সে সংখ্যাটির নৈরাশ্যজনক স্বল্পতা মনকে পীড়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের গান গাইছেন এমন গায়কের অভাব নেই, দেশে রবীন্দ্রসংগীত ধীরে ধীরে বেশী প্রচার লাভ করছে একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। বেতার, সিনেমায়, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অনেক গান গাওয়া হচ্ছে। কিন্তু সব গান শুনে মন ভরছে না, ঠিক কেমন যেন একটা অভাব থেকে যাচ্ছে। অভিযোগটি একান্ত সত্য। এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য খুব বেশী দূরে এগুতে হয় না। উচ্চারণের অস্পষ্টতা, তবলা বা হারমোনিয়মের অস্বাভাবিক পীড়াজনক প্রাধান্য, ঋতু-পর্যায়ের সংগীত নির্বাচনের ব্যভিচার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সুরবিচ্যুতি, এসব ছাড়াও সবচেয়ে যেটা বেশী করে মনে বাজে তা হচ্ছে স্বরলিপির প্রাণহীন আবৃত্তি। "ঐতিহ্যের ওপর দাঁড়িয়ে যে গান হাত মেলেছে মুক্ত নীলাকাশের দিকে" (বেতার ভাষণ সুচিত্রা মিত্র) অনুভূতিবিহীন প্রাণহীনতা সেখানে বড় বেমানান। কন্ঠ-স্বরে স্বরলিপির প্রাণহীন আবৃত্তিতে রবীন্দ্রসংগীত হবে না, সে কন্ঠস্বর যত মধুরই হোক না কেন। সুর এবং গানের মূল স্পিরিট কোন দিক থেকেই নয়। সুরের দিক থেকে নয় তার কারণ রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যে সুরের এমন অনেক সূক্ষ্ম কাজ রয়েছে যেটা স্বরলিপিতে সম্পূর্ণ পাওয়া সম্ভব নয়। "তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) সূক্ষ্ম মীড় ও খোঁচ-খাঁচ বজায় রেখে গাওয়া মোটেই সোজা কথা নয়, তার সাক্ষী বোধহয় তাঁর গানের ভান্ডারী শ্রীমান দীনেন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীগণ দিতে পারবেন। মুস্কিল এই যে স্বরলিপিতে যে সূক্ষ্ম কারীগরী দেখানো শক্ত এবং দেখেও না দেখা সহজ; আজকাল আমরা সকলেই সহজিয়াপন্থী। তাই স্বরলিপি দেখে তাঁর গান শিখলে ফল সব সময় ভাল হয় না (সংগীতে রবীন্দ্রনাথ—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী)।

এতো গেল সুরের দিক। ভিন্ন আর একটি দিক থেকেও কথাটি ভাবতে হবে। রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে যে ভাবলোক তাকে অনুভব করতে হবে। স্বরলিপির প্রাণহীন সুর অনুসৃতি রবীন্দ্রসংগীত নয়। কাব্যরস আস্বাদনের জন্য হৃদয়বোধের যে অনুশীলন এবং প্রয়াস প্রয়োজন রবীন্দ্র-সংগীত আস্বাদনের জন্যেও তা অত্যাবশ্যক। রস পরিণামে রবীন্দ্রসংগীতে যে গীতিরসের সৃষ্টি তা সংগীতের বাক, ধ্বনি এবং ব্যঞ্জনার যৌগিক ক্রিয়ার 'পরে নির্ভরশীল। তাই রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীকে কন্ঠ তৈরী করার সংগে সংগে মনকেও তৈরী করতে হবে।

"চিত্ত পিপাসিত রে গীত সুধার তরে"—চিত্তের এই তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে যে সুরের সুরধুনীকে কবি বইয়ে দিলেন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীকে সেই স্রোতে অবগাহন করতে হবে। এ যদি না হয় তাহলে অবস্থাটা হবে—"কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে। হার মেনে তাই পরাণ আমার কাঁদে।" রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে যে স্বপ্নলোকটি রয়েছে তা শিল্পীর মনে একটি বিশেষ বোধকে জন্ম দেয়। মনের এই বিশেষ বোধটিই শিল্পীর কাছে বড় কথা। এই বোধটি আপনা আপনি হাতে আসে না, তার জন্যে সাধনা প্রয়োজন। সম্ভবতঃ এই কথাটি ভেবেই সমালোচক বলেছেন—"রবীন্দ্র সাহিত্যের স্বর্ণপদ্মের এই কুহকিনীই রবীন্দ্রনাথের গান" (রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্র না বি)।

লজ্জাহর
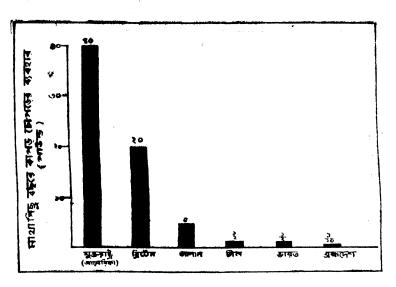
শিশির নিয়োগী

আধুনিক তন্তুজ শিল্পের সুরু হয় রেশম আবিষ্কারের থেকেই। চীন দেশেই প্রথম গুটিপোকার চাষ সুরু হয় এবং কিছুটা বৈজ্ঞানিক প্রথায় তার থেকে রেশম উৎপাদন করার প্রচেষ্টা চলে। গুটিপোকা থেকে রেশম উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি চীনারা গোপন রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু কালক্রমে এটা জাপান ও পরে ফ্রান্স ও ইটালীতে কিভাবে জানাজানি হয়ে যায়। জাপান দ্রুত রেশম শিল্পের উন্নতি করতে সুরু করে। তাই দেখা যায় ১৯৪০ সালে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের (৮½ কোটি পাউন্ড) শতকরা ৭০ ভাগই করছে জাপান, চীন করছে মাত্র ২০ ভাগ।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জোসেফ সোয়ান নাইট্রোসেলুলোস্ (Nitrocellulose) ভিনিগারে ভিজিয়ে রেখে তার থেকে সরু সুতলী কেটে কৃত্রিম রেশম তৈরী করেন। দেখতে ও অনুভূতিতে এটা খাঁটি রেশমের প্রায় কাছাকাছি গেল। তবে জোসেফ সোয়ানের ব্যবসা-বুদ্ধি ছিলো না। তিনি তাই এ সব নিয়ে খুব বেশী গবেষণা করবার মতো অর্থনৈতিক উৎসাহ পেলেন না। ঠিক এই সময়েই ফ্রান্সে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তরের একজন ছাত্র লুই মেরী হিলেয়ারের গুটিপোকার অসুখ-বিসুখের সম্বন্ধে গবেষণা করতে করতে জোসেফ সোয়ানের কৃত্রিম রেশম তৈরীর ব্যাপারটি মাথায় চাড়া দেয়। এই নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেন, কৃতকার্য হন এবং কৃত্রিম রেশম তৈরীর কারখানা স্থাপন করেন। এখন পৃথিবীতে কৃত্রিম রেশম যতোটা পরিমাণে তৈরী হয়, আসল রেশম তার এক শতাংশও হয় না।

এরপর এলো রেয়নের যুগ। রেয়ন সেলুলোজ থেকে তৈরী। প্রতিটি উদ্ভিদের দেহকাণ্ডের মধ্যে সেলুলোজ থাকে। সাধারণ তুলোও এক ধরনের সেলুলোজ। শন, পাট, কাঠের মণ্ড সব কিছুরই উপাদান সেলুলোজ। খাঁটি সেলুলোজ তিনটি মৌলিক উপাদান দিয়ে তৈরী—কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। রেয়ন প্রধানত ভিসকোস্ (Viscose) পদ্ধতিতে তৈরী করা হয়।

সেলুলোজ জলে দ্রব নয়। তবে এটাকে প্রথমে লাই (Lye) সলিউশনে ডুবিয়ে নিলে কার্বন-ডাই-সালফাইডে দ্রব হয়। এটাকে বলা হয় ভিসকোস্ সিরাপ। এই সিরাপের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম সালফেটের প্রয়োগে যে পদার্থটি তৈরী হয় তাকে জোসেফ সোয়ানের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে তন্তু তৈরী করা হয়। সোয়ানের তন্তু তৈরীর পদ্ধতিটা অনেকটা আমাদের দেশের ময়রাদের সুতোর আকারের ছানার পোলাও তৈরী প্রক্রিয়ার মতো। সেলুলোজের সঙ্গে উপরিউক্ত রাসায়নিক বস্তুগুলি মেশালে যে ঘন তরল পদার্থ তৈরী হয় তাকে বহু ছিদ্রবিশিষ্ট ছাঁকনীর মধ্যে দিয়ে জোরে গলিয়ে নিলেই অসংখ্য সুতোর মত তন্তু তৈরী হয়। তার থেকেই তাঁতে বুনে কাপড় তৈরী।

রেয়ন থেকে সেলোফেন তৈরী হয়। সেলোফেন চাদর খুব পাতলা তৈরী করা যেতে পারে। এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগ মোটা চাদরও তৈরী হচ্ছে। সেলোফেন আজকাল অনেক কাজে লাগছে। খবার-দাবারের মোড়ক তৈরী, সিগারেটের প্যাকেট মোড়া, ইত্যাদি ধরণের নানাবিধ আচ্ছাদনী কাজে সেলোফেন ব্যবহৃত হচ্ছে। সেলুলোজের আর একটি অপভ্রংশ হোল অ্যাসিটেট। এই ক্ষেত্রে সেলুলোজকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা ভিনিগারের মধ্যে ডোবানো হয়। তারপর অ্যাসিটোনের মধ্যে গলানো হয়। তারপর গরম হাওয়ার সাহায্যে অ্যাসিটোনকে উড়িয়ে দিলে যে বস্তুটি পড়ে রইলো সেটাই আমাদের তন্তু উপাদান অ্যাসিটেট।

এ পর্যন্ত যা রেয়ন তৈরী হোল সেগুলোর প্রাথমিক উপাদান প্রাকৃতিক। সেটার ওপর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগে রেয়ন তৈরী করা হয়। রাসায়নিকরা এতে সন্তুষ্ট নন। They want a baby of their own অর্থাৎ তাঁদের গবেষণাগারের মধ্যে বসে রাসায়নিক বস্তুর মারপ্যাঁচে নতুন ধরনের তন্তুর উপাদান তৈরী করতে পারলেই তাঁদের শান্তি।

গবেষণা চলতে থাকলো। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ই আই দ্যু পন্ত্ দ্য নেমু্ অ্যান্ড কোম্পানী প্রথম কয়লা, ন্যাচারাল গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, বাতাস ও জল থেকে রাসায়নিক উপায়ে এক ধরনের তন্তু তৈরী করলেন। নতুন তন্তুর একটা আদরের নাম দিতে হবে। চারশোটি বিভিন্ন নাম প্রস্তাব করা হল—

শেষ মেশ দাঁড়ালো নোরাম (Nerum) নামটি —এর থেকেই পরে আরও সুন্দর নামকরণ হয়েছে নাইলন (Nylon)

আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়ালেস হিউম ক্যারোথার নামে একজন কেমিষ্ট ছিলেন। তিনি প্লাস্টিক, বেকেলাইট, ফরম্মাইকা ইত্যাদি পলিমারের ওপর গবেষণা করছিলেন। তিনি ১৯৩৫ সালে এই ব্যাপারে গবেষণায় অনেকটা আশাপ্রদ ফল পেলেন। তিনি ঐ বৎসরই ইংলণ্ডে গিয়ে ফ্যারাডে সোসাইটির সামনে তার তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। তিনি ইংলণ্ডের কেমিক্যাল সোসাইটির ফেলো হলেন। পরের বছরই তিনি আমেরিকার ন্যাশনাল আকাডেমী অব সায়েন্সের ফেলো নির্বাচিত হলেন। শিক্ষকতা লাইনের বাইরে থেকে তিনিই প্রথম জৈব রসায়নবিদ, যিনি এই দুর্লভ সম্মান পেলেন।

নাইলন বাজারে আসতেই বাজার মাত করে নিয়েছিল—বিশেষ করে মহিলাদের পোষাক মহলে। নাইলন কেবলমাত্র দেখতেই সুন্দর নয়, টেঁকসইও বটে। আস্তে আস্তে পুরুষদের জামা কাপড় এবং আরও পরে ছিপের সুতো, মাছ ধরার জাল, ব্রাস, জানলার পর্দা, পাইপ ও টিউব এবং এই ধরনের অনেক অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী নাইলন দিয়ে তৈরী হতে লাগলো।

নাইলনের সাফল্যের পর দ্যু পন্ত নতুন গবেষণা 'অরলন' ও 'ডেক্রন' নিয়ে পড়লেন। অরলনের প্রাথমিক রাসায়নিক উপদান হ'ল ন্যাচারাল গ্যাস, অ্যামোনিয়া ও বাতাস। ডেক্রনের উপাদান পেট্রো কেমিক্যালজাত। প্রধানত দুটো পেট্রো কেমিক্যাল থেকেই ডেক্রন তৈরী করা হয়। একটা হল এথিলিন গ্লাইকল আর অন্যটা টেরেফথ্যালিক অ্যাসিড। ডেক্রনের ভেতরে সহজে জল ঢুকতে পারে না, খুবই মজবুত জিনিস এবং এর তৈরী কাপড়ে একবার ইস্ত্রি চালালেই তা বহুদিন থাকে। এর কাপড় পোকা-মাকড়েও কাটে না। এই জিনিসই ইংলণ্ডে বন্দন তৈরী হতে লাগলো তারা নাম দিলো —টেরিলীন।

এদিকে ইউনিয়ন কারবাইড কোম্পানী (এভারেডী ব্যাটারী যাদের তৈরী) 'ডাইনেল' নামে এক ধরনের তন্তু তৈরী করলেন। ডাইনেলের উপাদানে অরলনের উপাদানগুলি আছে। তাছাড়া আছে ভিনাইল ক্লোরাইড। ডাউ কেমিক্যাল কোম্পানী বার করলেন 'জেফরান' ও 'সারান'। ডাইনেলের উপাদানের সঙ্গে ভিনিলিডাইন ক্লোরাইডের সংমিশ্রণে সাবান তৈরী হয়। কেমস্ট্র্যান্ড কর্পোরেশন বার করলেন 'অ্যাক্রিলান'। এর প্রধান আকর্ষণ হল যে এর মধ্যে ডেক্রনের সব গুণ তো আছেই তাছাড়া এর তৈরী কাপড় খুব মোলায়েম হয়। তাই সোয়েটার বা স্পোর্টসের জামা-কাপড় তৈরী করতে এর চাহিদা ভীষণ বেড়ে গেল। গুডরিচ কেমিক্যাল কোম্পানী ভিনাইলিডিন ডাইনাইট্রাইল থেকে বার করলেন 'ডারলান'। আমেরিকান সিনামাইড কোম্পানীর আবিষ্কার 'ক্রেস্লান' ও টেনেসি—ইস্টম্যান কোম্পানীর আবিষ্কার 'ভেরেল'। এর পরেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রায় একশোটি নতুন ধরনের তন্তু আবিষ্কার করে বাজারে ছেড়েছেন। গুণবৈশিষ্ট্যে সব কটাই প্রায় সমান।

কেমিষ্টদের চেষ্টার বিরাম নেই। বিরাম নেই নতুন কিছু সবাইকে উপহার দেবার প্রচেষ্টার। গবেষণা চললো ঠিক উলের মতো একটা জিনিস তৈরী করবার। উলের উপাদান জৈব প্রোটিন। ইটালীতে ১৯৩৬ সালে দুধের কেজিন (প্রোটিন প্রধান) থেকে তৈরী হোল কৃত্রিম উল 'ল্যানিটাল'। আমেরিকায় বেরুলো শস্যের মধ্যের প্রোটিন থেকে 'ভিকারা' নামের কৃত্রিম উল। ক্রমে ক্রমে সয়াবিন, ডিম, কড়াইশুঁটি ইত্যাদির মধ্যেকার প্রোটিন থেকে উল তৈরী করা হয়েছে। পাখীর পালকের মধ্যেকার প্রোটিন দিয়েও উল তৈরীর প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

এরপর চেষ্টা চলেছে দুটি বা তিনটি বিভিন্ন ধরনের তন্তুর সংমিশ্রণে ভালো কোন ধরনের কাপড় তৈরী করা যায় কি না। প্রত্যেক তন্তুর এক একটি বিশিষ্ট গুণ আছে। কোনটি টেঁকসই, কোনটি মোলায়েম, কোনটা দেখতে সুন্দর আবার কোনটা শুকোয় তাড়াতাড়ি। সুতো, নাইলন, সুতো টেরিলিন বা ডেক্রন, টেরিলিন ও উল ইত্যাদির সংমিশ্রণ করে দেখা হচ্ছে কি দাঁড়ায়।

প্রথম প্রথম এই ধরনের মিশ্রিত তন্তুর কাচা-কাচির ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কারণ এক একটি বিশেষ ধরনের কাপড়ের ধোবার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। অবশ্য পরে সব অসুবিধাই দূর করেছেন কেমিষ্টরা।
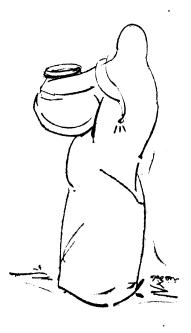
রাসায়নিক তন্তু ও কাপড়-চোপড় বার হবার ফলে সুতি বা খাঁটি উল ও রেশমের বাজার বেশ চোট খেলো। কাপড়-চোপড় ছাড়াও অন্য অনেক ব্যাপারেও এই নতুন তন্তু কাজে লাগতে লাগলো। মোটরগাড়ীর টায়ার তৈরীতে আগে সুতো লাগতো। সুতোর বদলে রেয়ন ব্যবহার করে অনেক ভালো ফল পাওয়া গেল। টায়ার অনেক বেশী টেঁকসই হ'ল। রেয়নের ভাত মারতে এলো নাইলন।

এই সেদিনও অর্থাৎ ১৯৪০ সালে জাপান ও চীন রেশম শিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করে বসেছিল। জাপানের বিদেশী মুদ্রা আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ রেশম রপ্তানী করেই আসতো। জাপানের মোট উৎপাদনের বেশীর ভাগটাই (৮০%-এর বেশী) আমেরিকা কিনতো। কিন্তু ১৯৬২ সালের হিসাবে দেখা গেল আমেরিকা জাপানের উৎপাদনের ৫ শতাংশও কিনছে না। জাপান মহা চিন্তায় পড়লো। চীনের অবস্থাও সেই রকম। জাপানে ২০ লক্ষ লোক রেশম শিল্প জীবিকা করে বসে আছে। তাদের অন্ন যায় যায়। 'নাইলন' ছিলো এই দুরবস্থার মূলে। তাই জাপান চেষ্টা করতে লাগলো রেশমের সঙ্গে নতুন রাসায়নিক তন্তুর সংমিশ্রণে একটা নতুন আকর্ষণীয় কোন কাপড় তৈরী করে বাজারে ছাড়তে। আস্তে আস্তে জাপান তার রেশম শিল্প গুটিয়ে এনেছে।

নতুন ধরনের রাসায়নিক কাপড়-চোপড বাজারে এসে মানুষকে কাপড়-চোপড বেশী করে ব্যবহার করবার দিকে ঝুঁকিয়েছে। রাসায়নিক বস্ত্র ব্যবহার গত ৪০ বছরে তিরিশ গুণ বেড়েছে। আমেরিকায় রাসায়নিক বস্ত্রের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী বেড়েছে। সেখানে তাদের মোট কাপড়-চোপড়ের খরচের ৩০ শতাংশ মত করে রাসায়নিক কাপড়-চোপড়ের জন্যে।

উলের বাজারটা এখনও ভালোভাবে মারতে পারেনি নতুন রাসায়নিক বস্ত্রগোষ্ঠী। সুতিবস্ত্রের পরিবর্তে ওগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে বেশী। তবে এখনও পৃথিবীর মোট বস্ত্র-চাহিদার ২০ শতাংশ পর্যন্ত মাত্র মেটাতে সমর্থ হয়েছে আমাদের নতুন রাসায়নিক বস্ত্রসম্ভার।

কেমিষ্টরা বস্ত্রাদি ছাড়াও অন্য দিকেও তাঁদের এই সব উপাদানের ব্যবহারের কথা নিয়ে ভাবছেন। তাদের মতে খুব শিগ্‌গিই তারা মোটামুটি সস্তা দামে রাসায়নিক কাগজ তৈরী করতে সক্ষম হবেন।

রাসায়নিক কাপড়-চোপড়ের দাম এখনও সাধারণ মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের নাগালের বাইরে। তাই কেমিষ্টদের এখন প্রধান চিন্তা হয়েছে কিভাবে এগুলোর দাম কমানো যায়। এবং সেটা করতে পারলেই তবে তাদের সব পরিশ্রম সার্থক।

অভিনেত্রী রীণা ঘোষ।   ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

মেট্রোয় 'মেরী পপিনস্'

ওয়াল্ট ডিজনে প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ডিজনে প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ৩,৯৩৯·৪৮ মিটার দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা : রবার্ট স্টিভেন্সন; কাহিনী : পি, এল, ট্রাভার্স; চিত্রনাট্য : বিল ওয়াল্‌শ্‌ ও ডন ড্যাগ্রেডি; গীতরচনা ও সংগীতরচনা : রিচার্ড, এম, শার্মান এবং রবার্ট, বি, শার্মান; সংগীত তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা : আরউইন কোস্টাল; রূপায়ণ : জুলি অ্যান্ড্রুজ, ডিক ভ্যান ডাইক, ডেভিড টমলিনসন, গ্লিনিস জন্স, এড উইন, হার্মিয়ন ব্যাডেলে, ক্যারেন ডট্রিচ, ম্যাথু গার্বার প্রভৃতি। মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার্স-এর পরিবেশনায় ১৬ই মে থেকে দেখানো হচ্ছে।

ওয়াল্ট ডিজনে অমর হোন। মিকি মাউস ও মিনি মাউস থেকে শুরু করে স্নো-হোয়াইট অ্যান্ড সেভেন ডোয়ার্ফস্, ডাম্বো, ব্যাম্বি ও ফ্যান্টাসিয়া পার হয়ে লিভিং ডেজার্ট, সাইক্লোরামা প্রভৃতির মাধ্যমে নিজের বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে জীবনাবসানের পূর্বে তিনি আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন—**'মেরী পপিন্স'**। **জীবন্ত চরিত্র, কৃত্রিম জীবজন্তু, আঁকা গাছপালা, মেঘ, ধোঁয়া, জল, বরফ প্রভৃতিকে একযোগে ব্যবহার করে এমন একটি** কল্পলোক রচনা করা একমাত্র ওয়াল্ট ডিজনের প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। **তাঁর অমর প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হচ্ছে মেরী পপিন্স।**

মানুষের মুখ্য কাম্য কি? আজ যে মানুষ নানা কাজের ভীড়ে এত ছোটাছুটি করছে, কেউ ব্যাঙ্কের কর্তাব্যক্তি সেজে টাকার পাহাড়ের স্বপ্ন দেখছে, কেউ স্ত্রী-স্বাধীনতার মধ্যেই মুক্তির পথ খুঁজছে, এ-সব আসলে কিসের সন্ধানে? সুখ, মানুষ জীবনে সুখ চায়। কিন্তু মজা এই যে, এই সুখপ্রাপ্তির আশায় তারা সুখকে সর্বরকমে পরিহার করে চলে। এমন কি, স্বর্গীয় ফুলের মতো শিশুপুত্রকন্যাকে তাদের সহজ সুখের পথ থেকে সরিয়ে হাজারো রকম বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ করে মনে করে, তাদের ভবিষ্যৎ সুখের পথ প্রশস্ত করছে। —এই ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করে সহজ সুখের পথে বিচরণ করবার জন্যে সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন মেরী পপিন্স রচয়িত্রী পি, এল, ট্রাভার্স। অঘটনঘটনপটিয়সী মেরী পপিন্স শুধু দুটি বালক-বালিকার জীবনকেই আনন্দে উচ্ছল করে তোলেনি, চেরী ট্রি লেন নামক বাঁকা পথের বালক-বৃদ্ধ-যুবানির্বিশেষে সকল বাসিন্দাকেই আনন্দ উপভোগের যথার্থ পথের সন্ধান দিয়েছে। বলেছে,

তিন অধ্যায় চিত্রে সুপ্রিয়া দেবী

বাস্তব জগতের সকল কাঠিন্যকে উপেক্ষা করে আনন্দের কল্পলোকে প্রবেশ না করলে সুখ নেই। মেরী পপিন্সের এই বাণীময় রূপটিকে সার্থকভাবে চিত্রায়িত করেছে ওয়াল্ট ডিজনের সৃষ্টিশীল অমর প্রতিভা। রূপকথার মেরী পপিন্সের চিত্ররূপ আমাদের বিস্মিত, মুগ্ধ, আলোড়িত করেছে। রূপকথার এমন অপরূপ চিত্ররূপ যে সম্ভব, এ-কথা ছবিটি দেখবার আগে পর্যন্ত আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

অভিনয়ে, নাচে, গানে মাত করে দিয়েছেন নাম-ভূমিকাভিনেত্রী জুলি অ্যান্ড্রুজ এবং পথচারী কৌতুকশিল্পী বার্ট-এর ভূমিকায় ডিকভ্যান ডাইস। মিস্টার ও মিসেস ব্যাংকস বেশে যথাক্রমে ডেভিড টমলিনসন ও গ্লিনিস জন্স আনন্দ রস-প্রবাহে অল্প সাহায্য করেননি। জেন ও মাইকেল বোন ও ভাইরূপে ক্যারেন ডট্রিচ ও ম্যাথু গার্বার মেরী পপিন্সের যোগ্য শিষ্য ও শিষ্যা। অ্যাডমিরাল বুম-এর সময়-নির্দেশক কামান গর্জন ব্যাংকস পরিবারের গৃহস্থালীতে যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা দর্শকদের মধ্যে আনন্দের তুফান তোলে। অলৌকিকভাবে মেরী পপিন্স-এর আগমন, বাড়ীর চিমনীর ভিতর দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের হাউইয়ের মতো ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হওয়া, মেরীর কাকা আলবার্টের বাড়ীতে শূন্যে দোদুল্যমান অবস্থায় চা-পান, বার্টের সঙ্গে পেঙ্গুইন চতুষ্টয়ের নৃত্য, বাড়ীর ছাদের উপর চিমনী পরিষ্কার-কারীদের নৃত্য ইত্যাদি বিভ্রান্তিকর দৃশ্যাদি মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। "স্পুনফুল অব সুগার", "জলি হলিডে" 'স্টে অ্যাওয়েক', 'সুপারক্যালিফ্রেজাই-লিস্টি কেক্সপিয়ালিডোসিয়াস" এবং "চিম্ চিম্ চেরী" প্রভৃতি গানে সম্মোহিত হবেন না, এমন মানুষের নাম জানি না।

১৯৬৪ সালে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা, শ্রেষ্ঠ মৌলিক সঙ্গীতরচনা, শ্রেষ্ঠ গীতরচনা (চিম্ চিম্ চেরী) এবং শ্রেষ্ঠ দৃষ্টিবিভ্রমকৌশল (ভিস্যুয়াল এফেক্ট)-এর জন্যে পাঁচটি অস্কার পুরস্কার-প্রাপ্ত"মেরী পপিন্স" ওয়াল্ট ডিজনের অমর প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

যখন একা

নান্দীকার-এর নিবেদন: নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়; মূল রচনা : আর্নল্ড ওয়েস্কার (রুটস্); বাঙলা রূপান্তর : রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত; মঞ্চব্যবস্থাপনা : রাধারমণ তপাদার; আলোকসম্পাত : স্বরূপ মুখোপাধ্যায়; রূপায়ণ : শেলী পাল, দীপালি চক্রবর্তী, মঞ্জু ভট্টাচার্য, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্র-প্রসাদ সেনগুপ্ত, বরুণ সেন, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ চট্টোপাধ্যায় ও রণজিৎ ঘোষ। মুক্ত-অঙ্গনে অভিনীত।

আধুনিক ইংরেজ নাট্যকারদের মধ্যে আর্নল্ড ওয়েস্কার একটি সুপরিচিত নাম। লন্ডনের ইস্ট এন্ড-এর বাসিন্দা কোনো কাল্পনিক ইহুদী পরিবারের জীবনে ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ঘটনা অবলম্বন করে তাঁর প্রথম নাটক 'চিকেন সুপ উইথ বার্লি" রচিত হয়। ১৯৫৮ সালে অভিনীত এই নাটকটিরই অন্তর্গত চরিত্রগুলির আদর্শ জীবনের সন্ধানে পরবর্তীকালের কার্যাবলীকে আশ্রয় করে ওয়েস্কার রচনা করেন আরও দু'টি নাটক: রুটস্ এবং আই অ্যাম টকিং অ্যাবাউট জেরুজালেম।' এই নাটক তিনখানি 'ওয়েস্কারত্রয়ী' নামে খ্যাতিলাভ করেছে। মধ্যবর্তী নাটক 'রুটস্'-এরই বাঙলা সংস্করণ হচ্ছে : যখন একা। নাটকটির কেন্দ্রচরিত্র হচ্ছে বীথি; নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অনূঢ়া তরুণী সে, দিল্লীতে কাজ করে এবং সেখানেই ভিন্নরাজ্যের

রবিতীর্থের রবীন্দ্রজন্মোৎসবে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন নীলিমা সেন, সুচিত্রা মিত্র এবং রবিতীর্থের ছাত্র-ছাত্রীরা। ফটো : অমৃত

ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন যুবক চিন্ময়কে সে করে ফেলেছে তার জীবনের হিরো ও মনে মনে আশা করে একদিন সে চিন্ময়ের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে আদর্শ দাম্পত্য-জীবন যাপনের সুযোগ পাবে। বীথি ছুটি নিয়ে চলে এসেছে কলকাতার শহরতলীতে অবস্থিত তার পিতৃগৃহে এবং প্রচার করেছে একটি বিশেষ দিনে তার হিরো চিন্ময়ের তাদের ঐ বস্তিগৃহে শুভাগমনের সংবাদ, যেদিন তাদের বিবাহের কথাবার্তা পাকা হবে। সেই পরমক্ষণটির জন্য বীথির পরিবারের সকলেই যখন উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করছে, ঠিক তখন চিন্ময়ের কাছ থেকে চিঠি এল বীথির 'সোনার স্বপ্নের সাধ'কে চূর্ণবিচূর্ণ করে। আজকাল আধুনিক বিদেশী নাটকে চরিত্রগুলির আইসোলেশন, আইডেন্টিফিকেশন ও কমিউনিকেশনের যে-সমস্যাকে প্রকট করে তোলা হয়ে থাকে, ভারতের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তরুণ-তরুণীদের জীবনে ঠিক সমান ধরনের সমস্যা উপস্থিত হয়েছে বলে মনে করতে পারছি না। তাই এই নাটকের বীথি যখন 'প্রচন্ড নিঃসঙ্গতা, মোহভঙ্গ ও যন্ত্রণার মুহূর্তে চীৎকার করে ওঠে : 'আমি কথা বলছি। আমি পারছি...আমি একা, একেবারে একা।' তখন সমস্ত ব্যাপারটাই মূলহীন কান্ডের মতো অবাস্তব বলে মনে হয়; মনে হয়, যার কোনো সুদৃঢ় ভিত্তি নেই, তাকেই বিদেশীদের কাছ থেকে ধার করে আমাদের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা হচ্ছে আধুনিক বলে প্রতিপন্ন হবার মিথ্যা লোভের বশীভূত হয়ে।

'যখন একা' নাটকটির মঞ্চরূপদানে যে সেট পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাকে নান্দী-কার গোষ্ঠী অভিনব বলে দাবী করলেও আমরা এই সেটের ব্যবহার আজ থেকে অন্তত বছর দুয়েক আগে কোনো একটি বাঙলা নাটকের অভিনয়কালে প্রত্যক্ষ করেছি; এছাড়া হিন্দী হাইস্কুলে আমেরিকা থেকে আগত একটি সম্প্রদায় যখন সারওয়ানের 'মাই হার্ট ইন দি হাইল্যান্ডস' অভিনয় করেছিলেন, তখন তাঁরা কাঠের ফ্রেমের বদলে টিউবের ফ্রেম ব্যবহার ক'রে দৃশ্যরচনা করেছিলেন। কাজেই 'খাঁচার চেহারার ঘর'-এ তাঁদের অভিনবত্বের দাবী আমরা পুরোপুরি অস্বীকার করছি।

অভিনয়ের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই যাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে হয়, তিনি হচ্ছেন বীথির মায়ের ভূমিকাভিনেত্রী দীপালি চক্রবর্তী। একসঙ্গে হাসিকান্নাকে বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর ও ভঙ্গীর মাধ্যমে এমন বাস্তবভাবে মূর্ত করে তোলার নিদর্শন আজকের রঙ্গমঞ্চে ক্বচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। বীথির দিদি ও জামাইবাবুরূপে মঞ্জু ভট্টাচার্য ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের অশিক্ষিত ও পরস্পরের প্রতি আসক্ত দম্পতির চিত্রটি অবলীলাক্রমে ফুটিয়ে তুলেছেন। চমৎকার করেছেন মদ্যাসক্ত হৃদয়বান রসিক বৃদ্ধ সরকারদাদুর ভূমিকায় অপরূপ রূপসজ্জায় অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। বীথির বাবা কেন্টবাবুর ভূমিকায় বার্ধক্য-পীড়িত বাসড্রাইভারের চরিত্রটিও যথাযথ-ভাবে চিত্রিত হয়েছে বরুণ সেনের স্বারা। বাদলদাদা ও হৃদয়বেশে যথাক্রমে অরুণ চট্টোপাধ্যায় ও রণজিৎ ঘোষ চলনসই। কিন্তু নাটকের প্রধানা চরিত্র বীথির ভূমিকায় শেলী পালের অভিনয়ের আমরা প্রশংসা করতে পারলুম না। 'বীথি অজস্র অনর্গল কথা' বলে কমিউনিকেশনের চেষ্টায়, সে যা বলে, তা তোতাপাখীর মতো বলে, চিন্ময়ের কাছে সে যা শুনেছে, তার অনেকখানিই না বুঝে সে অপরদের শোনায়, একথা স্বীকার ক'রে নিয়েও বলব, বাচনকে দ্রুত করতে গিয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে তিনি তাঁর কথা বুঝতে দেন নি; এ-ছাড়া অন্যে যখন চিন্ময় সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছে, তখন সেই সন্দেহ যে ক্ষণিকের জন্যেও তার মনে ছায়াপাত করেছে, এমন কোনো অভিব্যক্তি ফুটে ওঠেনি তাঁর মুখেচোখে। নাটকের এই কেন্দ্র-চরিত্রটির দুর্বল অভিনয় সমগ্র নাটকটিকেই ক্ষুণ্ন করেছে।

'আগন্তুক' নাটকের ১৫০তম রজনী অভিনয়ের স্মারক উৎসবে পুরস্কৃতা দীপান্বিতা রায়।

চেক চলচ্চিত্র উৎসব

চেক্ ছবি 'সার্কাস লাভ'

চেকোশ্লোভেকিয়ার চলচ্চিত্রগুলি সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর চলচ্চিত্রানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। কিছুদিন আগেও কার্টুন ও পাপেট চলচ্চিত্রের নির্মাণে চেকোশ্লোভেকিয়া অশেষ খ্যাতি অর্জন করলেও কাহিনী-চিত্রের ক্ষেত্রে এই দেশটির কোনো বিশেষ অবদানের কথা শোনা যায়নি। কিন্তু গেল তিন বছরের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে প্রচুর সম্মানলাভের ফলে এবং বিশেষ করে 'দি শপ অন দি মেন স্ট্রীট' ও 'ক্লোজলি গার্ডেড ট্রেন' সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদেশিক চিত্ররূপে যথাক্রমে ১৯৬৫ ও ১৯৬৭ সালে আমেরিকান অ্যাকাডেমি প্রদত্ত অস্কার পুরস্কার লাভ করায় চেক ছবি সম্বন্ধে চলচ্চিত্রসমাজে একটা সাড়া পড়ে গেছে। আধুনিক চেক ছবিগুলি দেখলে এদের বৈচিত্র্য, সতেজ প্রকাশভঙ্গী এবং আধুনিকত্ব দর্শককে বিস্মিত না করে পারে না। বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গী—কনটেণ্ট ও ফর্ম—এই দুই দিকেই চেক পরিচালকদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি কার্য করে চলেছে। তরুণ চেক পরিচালকেরা শুধু ফ্রান্সের 'নুভেল ভাগ'কেই আয়ত্ত করেননি, তাঁরা 'সিনেমা ভ্যারাইট' পর্যন্ত আত্মস্থ করে নিয়েছেন। অথচ মজা এই, মিলোস ফোরম্যান, জার্মেল জায়ার্স, এভাল্ট স্কর্ম, ভেরা চিটিলোভা, জাঁ নেমেক প্রভৃতি আধুনিক চেক পরিচালকরা আগের যুগের জাঁ কাদার, এলমার ক্লোজ, জার্কিন, ব্রাইনিচ প্রভৃতির সঙ্গে একযোগে হাত মিলিয়ে তাঁদের ছবিগুলিকে শিল্পগুণান্বিত মহিমায় তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন।

ভারত ও চেকোশ্লোভেকিয়ার মধ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি অনুসারে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রক দিল্লী, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতা—ভারতের এই পাঁচটি শহরে চেক চলচ্চিত্রের সপ্তাহব্যাপী যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, সিনেমা ধর্মঘটের জন্যে কলকাতায় সেই অনুষ্ঠান আজও পর্যন্ত সম্পন্ন হতে পারেনি। এই অবস্থায় কলকাতার চেক কনসালের আনুকূল্যে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা, সিনে সেণ্ট্রাল প্রভৃতি উৎসাহী সংস্থাগুলি কিছু সাম্প্রতিক চেক-ছবি তাঁদের সদস্যদের দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। যদি ঘটনাচক্রে কলকাতার সিনেমা ধর্মঘটের আশু অবসান ঘটে, তাহলে মে মাসের শেষ সপ্তাহে সরকারীভাবে সাধারণ্যের জন্যে চেক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী উৎসব সংঘটিত হতে পারে বলে আশা করা যাচ্ছে। এখানে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে, সরকারী উৎসবে প্রদর্শিত হবার জন্যে যে-ক'খানি ছবি মনোনীত হয়ে আছে এবং যেগুলি ভারতের আর চারটি শহরে ইতিমধ্যে প্রদর্শিত হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে একখানিও কিন্তু সিনে ক্লাবের সদস্যদের দেখানোর জন্যে পাওয়া যায়নি। এ'রা যে-ক'খানি ছবি প্রদর্শনের অনুমতি লাভ করেছেন, তার মধ্যে আমরা আজ পর্যন্ত চারখানি ছবি

দেখবার সুযোগ লাভ করেছি : (১) ক্লোজলি গার্ডেড্ ট্রেন; (২) দি এঞ্জেল অব দি ব্লিশফুল ডেথ; (৩) রিটার্ন অব দি প্রডিগ্যাল সন এবং (৪) মেন অন দি হুইল বা সার্কাস লাভ।

'ক্লোজলি গার্ডেড ট্রেণ' ১৯৬৭ সালে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদেশিক চিত্ররূপে আমেরিকান অস্কার পুরস্কার লাভ করায় ছবিটি দেখবার জন্যে একটি ঔৎসুক্য জাগা স্বাভাবিক। একটি ছোট রেল স্টেশনে শিক্ষানবীসির কাজে ঢুকেছে একটি তরুণ; প্রেমের ক্ষেত্রেও সে শিক্ষানবীস। রেলগার্ড তরুণী মাসাকে চুম্বন করবার পর্যন্ত তার সাহস নেই: অথচ বেচারা নারীসঙ্গ লাভের জন্যে ছটফট করছে। শেষ পর্যন্ত নিজের সম্বন্ধে বীতরাগ হয়ে সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু সহকর্মীদের আগ্রহ এবং ডাক্তারের তৎপরতা তাকে বাঁচিয়ে তোলে। তাকে সক্রিয় হতেই হবে।

একটি সুন্দরী তরুণী এসে তার হাতে দেয় টাইম-বোমার বাক্স; ঐ বোমার সাহায্যে জার্মানদের যুদ্ধাস্ত্রবাহী ট্রেণটিকে উড়িয়ে দিতে হবে— দিতেই হবে, ভয় করলে চলবেনা। তরুণী তার ভয় ভাঙিয়ে দিল যৌন ব্যাপারে। তরুণটি এখন নির্ভীক; সে বোমার বাক্স নিয়ে এগিয়ে গেল। ট্রেণ উড়ল, সঙ্গে সঙ্গে সেও। তার টুপিটি উড়ে এল সেই তরুণী ট্রেণ-গার্ডের কাছে, যাকে চুম্বন দিতে গিয়েও তরুণটি অসমর্থ হয়েছিল।

জীবনটা নির্মম এবং দুঃখের একথা আমরা জানি। কিন্তু তাই সকলের কাছে জাহির করে লাভ কি? তার চেয়ে কেমন করে জীবনটাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় সাহসিকতার সঙ্গে, তারই নিদর্শন হচ্ছে 'এ ক্লোজলি গার্ডেড ট্রেন'। যে-মুহূর্তে যৌনসম্ভোগের ফলে তরুণটি জীবনে 'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের' স্বাদ পেল, তার পর মুহূর্তেই সে ট্রেন ধ্বংস করতে গিয়ে মহিমান্বিত মৃত্যুবরণ করল।—এই জীবন-দর্শন চমৎকারভাবে অথচ অত্যন্ত সহজ বৈচিত্র্যময় ভঙ্গীতে চিত্রিত হয়েছে ছবিখানিতে। ফরাসী 'নুভেল ভাগ'-এর প্রভাব ছবিখানির প্রতি অঙ্গে। ক্যামেরার কাজ নয়া ঢং-য়ের, বিশেষ করে স্টেশনে ধোঁয়ায় ভরে যাওয়ার দৃশ্যগুলি।

অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছবি হচ্ছে 'রিটার্ণ অব দি প্রডিগ্যাল সন'। জীবনে সাধারণভাবে যা কাম্য, স্ত্রী, আদরের শিশু-কন্যা, ঘরবাড়ী, কাজ, শ্বশুর-শাশুড়ী—সবই আছে যুবকটির। তবু সে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করে, তাই সে নিজের সমাপ্তি ঘটাতে চায়, তাই সে আজ মানসিক চিকিৎসালয়ে ডাক্তারের হাজারো প্রশ্ন দ্বারা বিব্রত; জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ সত্ত্বেও কেন সে মরণ কামনা করেছিল। জবাব সে খুঁজে পায় না : খালি জানে কোনো অবস্থাতেই সে সন্তুষ্ট নয়, তার মনের আছে তাই পলায়নপ্রবৃত্তি। চিকিৎসকের স্ত্রী তার প্রতি সহানুভূতিশীল : তাকে সে যৌন সাহচর্যও দিতে চায়। কিন্তু যুবকটি দেখছে, জীবনটা হচ্ছে উন্মাদনাকরভাবে জটিল। মনের স্বাধীনতা কি বাইরে থেকে পাওয়া যায়? না, মনের ভিতর থেকেই তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

আশ্চর্য মনঃসমীক্ষণের ছবি এই 'রিটার্ণ অব দি প্রডিগ্যাল সন'। আধুনিক ইয়োরোপীয় সিনেমার যৌন-আকুতির চিত্র এতেও আছে, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা মনো-বিশ্লেষণের সার্থক সহায়তা করেছে। এ-ধরণের ছবি সচরাচর দেখা যায় না। ক্যামেরা ও সম্পাদনার কাজ এই অন্তর্সমীক্ষার ছবিটির বৈশিষ্টানুযায়ী।

এভাল্ড স্কর্ম স্বলিখিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বন ক'রে একটি যুবকের মানসিক বিপর্যয়ের যে আশ্চর্য গতিশীল চিত্ররূপ আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত করেছেন, তা তাঁর সৃষ্টিধর্মিতার পরিচায়ক।

দি এঞ্জেল অব ব্লিসফুল ডেথ' একটি গোয়েন্দা চিত্র। 'মার্গারেট'— আসন্ন হত্যাকান্ডের এই সাংকেতিক শব্দটি বেতার মারফত পাবার পরই গোয়েন্দা দল তৎপর হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন গেস্টাপো এজেন্টদের অন্যতম ব্যক্তির কাছে বিখ্যাত সমাধিস্মারক 'এঞ্জেল অব দি ব্লিস্-ফুল ডেথ'-এর ফোটোগ্রাফ থাকার দরুণই তিনি গুপ্তভাবে নিহত হয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রকৃত এই তথ্য উদ্ঘাটনে তৎপর হয়।

স্টেপান স্কালুস্কি পরিচালিত এই ছবিখানির একমাত্র বিশেষত্ব এই যে, কাহিনীচিত্রটি যেন একটি সত্য ঘটনা, দর্শকমনে এই ধারণা জন্মানোর উদ্দেশ্যে

'রিটার্ন অফ্ দি প্রডিগল সন্'

সমগ্র ছবিটি নিউজরীল ও তথ্যচিত্র তোলার বিশেষ ভঙ্গী অবলম্বন ক'রে তোলা হয়েছে। 'সিনেমা ভ্যারাইট'-এর প্রভাব ছবিটির মধ্যে খুব বেশী ক'রে লক্ষ্য করা যায়।

"সেভেন ডেজ্ এ উইক" (ছবির টাইটেল কিন্তু 'সেভেন লস্ট ডেজ্') হচ্ছে আর একখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চেক ছবি। হাসপাতালে নার্সের কাজ করে একটি তরুণী। তার প্রেমিক সৈন্যশিবিরে কর্মরত বলে তার সঙ্গে মিলিত হতে পারছে না। ফলে তরুণীটি নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ অনুভব করে। বৈচিত্র্যের সন্ধানে সে বেরিয়ে পড়ে প্রতি সন্ধ্যায়; তার ইচ্ছা, অজানা অচেনা পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে কিছুটা সময় সে অতিবাহিত করে। কিন্তু সে ক্ষোভের সঙ্গে আবিষ্কার করে, তার প্রেমিকের বন্ধুই হোক, আর তার হাসপাতালের ছোকরা ডাক্তারই হোক, কিংবা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক দেখতে ভালোমানুষ তরুণই হোক—সবাই সমান, সবাই শেষ পর্যন্ত তার দেহ কামনা করে, দেহসম্পর্ক বাদ দিয়ে তার আকাঙ্ক্ষিত বন্ধুত্বে কেউই সন্তুষ্ট থাকতে চায় না এবং কাজেই সময় বুঝে তাকে পলায়ন করতে হয়। একেবারে শেষের দিনটিতে, যেদিন সে বহু আয়াসে সৈন্যাবাসে মুহূর্তের জন্যে তার প্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হয়ে মনের আনন্দে শহরে ফেরবার পথে একজোড়া মনুষ্য-

'মেরী পপিনস্'

নামধারী জানোয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়েছিল, সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তাকে সাবধানে পথ চলবার নির্দেশ দিয়েছিল।

ছবির কাহিনীটি জেলেনা মাসিনোভা নামে এক মহিলার রচনা; সেই কারণেই, বোধকরি, এতে পুরুষ সম্পর্কে কিছুটা একদেশদর্শিতা প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু চিত্রনাট্যটি ঘটনাসংস্থাপনে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে অভাবিতভাবে এবং ছবিটির চিত্রধর্মিতা অবিস্মরণীয়। অপেক্ষাকৃত তরুণ পরিচালক প্যাভেল কোহুট তাঁর এই দ্বিতীয় ছবিতে যে-কৌশলী নাট্যমুহূর্তের সৃষ্টি করেছেন, কৌতুকরসের সঙ্গে গুরু-গম্ভীর পরিস্থিতিগুলির যে-আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, তার তুলনা নেই। নায়িকার চরিত্রে স্টানিস্লাভা বার্টোসোভা স্বচ্ছন্দ ও প্রাণময়ী।

*

সিনে সেন্ট্রাল আয়োজিত 'চেক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এর সাংবাদিক সম্মেলনে দেখানো হয় রঙীন চিত্র 'সার্কাস লাভ' বা 'পিপল অন হুইলস্'। সার্কাসের পটভূমিকায় একটি ছেলে ও মেয়ের ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী এবং বিশেষত্ব বর্জিত। যথার্থ প্রেম সত্ত্বেও মেয়েরা জীবনযাত্রার পথে নিশ্চিন্ত নির্ভরশীলতাকে আঁকড়ে ধরতে চায়, এই কথাই বলতে চেয়েছেন বর্ষীয়ান চিত্র-পরিচালক মার্টিন ফ্রিক।

—নান্দীকর

বিদেশী ছবির খবর

টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের নতুন ছবি 'ভ্যালি অফ দি ডলস্' মুক্তি পাবার পর থেকেই সমালোচক ও দর্শক মহলে বিশেষ আলোড়ন পড়েছে। 'সাউণ্ড অফ মিউজিক', 'ক্লিওপেট্রা' প্রভৃতি ছবির মত বক্স অফিসকে হিট্ করেছে জুলি এন্ড্রুস অভিনীত এ ছবি। প্রযোজক তাই এ ছবির শেষাংটিকেও চিত্ররূপ দিতে মনস্থ করেছেন। ছবির এ অংশের নাম হবে সম্ভবতঃ 'রিটার্ণ অফ দি ভ্যালি অফ্ দি ডলস্'। কিছুদিন আগে এই প্রযোজক সংস্থা 'পিটন প্লেস' নিয়েও এ কাজ করেছিল। এই নতুন ছবির চিত্রনাট্য লিখবেন জ্যাকুলিন সুসান। চরিত্র চিত্রণ তালিকা এখনও স্থির হয়নি, তবে আশা করা যায় জুলি এন্ড্রুসও থাকবে এই অংশে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় মিউজিক্যাল ছবি 'ও! হোয়াট্ এ লাভলি ওয়ার' এর কাজ সাসেক্স এর ব্রাইটনে শুরু হয়েছে রিচার্ড অ্যাটেনবরোর পরিচালনায়। প্যারামাউন্ট পিকচার্সের পরিবেশনায় এ ছবির প্রযোজক লিন ডাইটন্ ও ব্রায়ান ডাফি। এ ছবির চরিত্র চিত্রণে রয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত চারজন মঞ্চাভিনেতা ও ম্যাগি স্মিথ, জন মিলস্। অভিনেতা চারজন হলেন র‍্যাল্ফ রিচার্ডসন্, মাইকেল রেডগ্রেভ্, লরেন্স অলিভার ও জন গিলগ্যাড—এঁরা যথাক্রমে ব্রিটিশ বৈদেশিক সেক্রেটারী মিঃ এডওয়ার্ড গ্রেগ্, ফ্রান্সের ডেপুটি চিফ্ অফ স্টাফ হেনরী উইলসন্, ফরাসী সৈন্য বাহিনীর প্রথম কম্যান্ডার্ট জন্ ফ্রেঞ্চ ও কাউন্ট লিওপোল্ডের চরিত্রে অভিনয় করছেন।

বিগত যুগের একাধিকবার অস্কার বিজয়িনী ভিভিয়ান লির স্মৃতির উদ্দেশে কয়দিন আগে হলিউডের একটি জনপ্রিয় সংস্থা একটি শোকসভা করেছিলেন। প্রেক্ষাগৃহের সামনে ফুলে ফুলে সাজান ভিভিয়ানের মূর্তি দেখে অনেক দর্শকই চোখের জল ফেলেছেন। ভাবগম্ভীর মৌন-শান্ত পরিবেশে শোকসভাটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যায় যাঁরা পরলোকগতা ভিভিয়ানের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অস্কার বিজয়ী রড্ স্টাইগার, ক্লেয়ার বুম্, জর্জ কুকর, ওয়াল্টার ম্যাথিউ,

XVIII. INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE BERLIN
21.JUNI–2.JULI 1968

বার্লিন
চলচ্চিত্র
উৎসব

মে ওয়েস্ট, জোসেফ কটন্, গ্রিয়ার গ্যারসন, ডেম্ জুডিথ এন্ডারসন্ ও আরও অনেকে।

*

আসন্ন অষ্টাদশ বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের আমন্ত্রণপত্র পেয়ে বহুদেশ তাদের ছবি পাঠিয়েছেন কর্তৃপক্ষের কাছে। গত-বারের মত এবারেও সুইডেন থেকে আসছে জাঁ ত্রোয়েলে-এর 'এনি মিনী মিনি মো' ছোট্ট কবিতার সুরে ছন্দে আঁকা এ ছবির মুখ্যাভিনেতা পার অস্কারসন্ বার্লিনে অত্যন্ত জনপ্রিয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পাঠাচ্ছে র‍্যাল্ফ নেলসনের 'চার্লি'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এর আগে ১৯৬৩ সালে নেলসনের 'লিলিস্ অফ্ দি ফিল্ড' প্রশংসিত হয়েছিল এবং ছবির নায়ক সিডনী পোইতিয়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছিলেন। উৎ-সবের উদ্বোধন দিবসে পরিচায়ক নেলসন্, অভিনেতা ক্লিফ রবার্টসন ও ক্লেয়ার বুম উপস্থিত থাকবেন। ফ্রান্স থেকে সরকারী ভাবে যে ছবি প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য আসছে সেটি হল ক্লদ শ্যাব্রলের 'লেস্ বিচেস্'। স্বকৃত চিত্রনাট্য তৈরী ছবির প্রধান চরিত্রকটিতে আছেন স্টিফেন অদ্রাঁ, জ্যাকুলিন শার্সাদ, ও জাঁ লুই ত্রিন্তিগাঁ। উৎসব কর্তৃপক্ষ এ ছাড়াও গদারের নতুন ছবি 'উইক এন্ড'কে পাঠাবার জন্য অনু-রোধ করেছেন এবং আশা করা যায় ছবিটি আসবে।

বার্লিন উৎসব সমস্ত আন্তর্জাতিক উৎসবের মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে এখন সর্বোচ্চ। উৎসব গঠন ও পরিচালনায় অভিনবত্বই এর কারণ। তরুণ কোন পরি-চালক-এর ছবি নিয়ে প্রতি উৎসব সপ্তাহ-ব্যাপী এক প্রদর্শনী হয়। এবারে সেই পর্যায়ে দেখানো হবে কানাডার কয়েকজনের ছবি। ডন্ ওয়েন্ এর 'দি এর্নি গেম' জীব-নের গভীরতায় অর্থসন্ধানে এক যুবকের প্রচেষ্টাকে নিয়ে তোলা। এরিক টিলের 'এ গ্রেট বিগ্ থিং' এর বিষয়বস্তু হোল এক তরুণ লেখকের জীবনের ঘুরপথে আত্মানু-সন্ধান। যে সাতখানি ছবি এ পর্যায়ে দেখানো হবে সেগুলি হোল মাইকেল ব্রল্ট্ এর 'এনটার লা'মের লাইড দ্যুস্' (১৯৬৭), জাঁ পিয়ের লেফভ্র-এর 'লা রেভোলিউশ-নারি' আর্থার ল্যামোথ্-এর 'পোউসেয়ের সুর লা ভিল্' (১৯৬৭), জাঁ পিয়ের লেফ-ভর্-এর 'ইল্ নে ফৎ না ম্যুরির প্যর সা' (১৯৬৭), ল্যারি কেন্ট-এর 'হাই' (১৯৬৭), গিলেস্ কার্ল-এর 'লা ভিয়ল্ দ্যউনে জুন্' (১৯৬৮), গিলেস্ গ্রুল্-এর 'লে চান্ড্ ডান্স লে সাক্' (১৯৬৪)।

বার্লিন উৎসবে মূল প্রতিযোগিতা ছাড়াও আরও যে সব বিভিন্ন ছবির প্রদর্শনী হয় সে সব আকর্ষণই সমালোচক, সাংবা-দিকদের কাছে অধিকতর। এবারে রেট্রোস-পেকটিভ্ ফিল্ম শোতে দেখানো হবে আর্নস্ট লুবিৎস্ এর কটি সবাক চিত্র। ১৯৩০ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে তোলা ছবিগুলোর মধ্যে বাছাই করে যে ছবিগুলি দেখানো হবে তার মধ্যে আছে 'মণ্টিকার্লো' (জেনেট্ ম্যাকডোনাল্ড অভিনীত), 'ওয়ান আওয়ার উইথ ইউ' (জেনেট্ ম্যাকডোনাল্ড, ম্যারুস চ্যভেল্যরি), 'ট্রাবল ইন্ প্যারাডাইস' (কে ফ্রান্সিস, হার্বার্ট মার্শাল), 'ইফ্ আই হ্যাড এ মিলিয়ন' (চার্লস লটন্), ডিজাইন ইন্ লিভিং (গ্যারি কুপার), 'দি মেরী উইডো, (জেনেট্ ম্যাকডোনাল্ড, ম্যারুস চ্যাভেল্যরি), 'অ্যাঞ্জেল' (মেরিলিন দিয়েত্রিচ্), 'ব্লুবিয়া-র্ডস্ এইটথ্ ওয়াইফ্' (ক্লদৎ কোলবার, গ্যারি কুপার), 'নিনোৎস্কা' (গ্রেটা গার্বো) ও 'টু বি অর নট্ টু বি' (ক্যারল লম্বার্ড)।

এবারের উৎসব শুরু হচ্ছে ২১শে জুন চলবে ২রা জুলাই পর্যন্ত। ভারত থেকে শোনা যাচ্ছে 'কেদার রাজা' ও 'পাম্না' ছবির নাম। এখনও পর্যন্ত কোনটাই কর্তৃ-পক্ষের হাতে গিয়ে পৌঁছয়নি।

ফরাসী পরিচালক লুই মালের ছবি 'ভিভা মারিয়া'র কিছু উত্তেজক যৌনদৃশ্য প্রদর্শনের অনুমতি দেবার অপরাধে ওয়াশিংটনের সুপ্রীম কোর্ট ডালাস্ সেন্সর বোর্ডের বিরুদ্ধে ফরমান জারি করেছেন। বিচারক জানিয়েছেন যে টেক্সাস্ শহরের সেন্সর আইন অত্যন্ত আলগা ধরনের। যাই হোক্ বিচারকের এ কাজের প্রতিবাদ, প্রতি-প্রতিবাদও হয়েছে অনেক। বিচারকের ক্ষমতা, আইনের মারপ্যাঁচ, দর্শকের রুচি সব মিলিয়ে খোদ আমেরিকাতেই কম জল ঘোলা হয়নি।

জার্মান চিত্র পরিচালক কার্ল হফম্যান তার তৃতীয় ছবি 'স্পেসাঁত রকেটস' এর কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছেন ইতমধ্যে। হালকা রসের কৌতুক নিয়ে তোলা এছবির প্রযোজক ইনডিপেন্ডেন্ট সংস্থা। বর্তমান জার্মানীর পটভূমিকায় রঙে রসে ভরপুর এছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন ভি ভি বাথ্, উইলি মিলোউইৎস্, হ্যারল্ড লিপনিজ হানস্ রিখ্ৎ ও অন্যান্যারা।

মঁসিয়ে লুই লুমিয়ের ১৯৩৪ সালে যে সিনেমা ফ্রান্সেজ্ পুরস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন আজ পর্যন্ত তা নিয়মিতভাবে দিয়ে আসা হচ্ছে প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ ফরাসী ছবিকে। গত বছরের শ্রেষ্ঠ ফরাসী ছবি হিসাবে এ পুরস্কার পেয়েছে ক্লদ
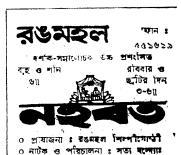
লেলুশের 'লিভ ফর লাইফ'। সংস্থার বর্তমান চেয়ারম্যান মিঃ আঁদ্রে হলোঁড ও মার্শেল আর্চাড এ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ও তার স্ত্রীর সম্পর্ক এবং একই সঙ্গে আর একটি মেয়ের সঙ্গে প্রণয় ও পরিণতিতে স্ত্রীর কাছে ফিরে আসা—এই নিয়ে একটি ত্রিভুজ প্রেমের আখ্যান রচনা করেছেন পরিচালক লেলুশ। ছবিটির প্রধান তিনটি চরিত্রে আছেন ইভস্ মর্তাঁ, অ্যানি জিরারদো ও ক্যান্ডিস্ বার্গেন।

১৯৪২য়ে যখন গ্রীসের অধিকাংশই জার্মান অধিকারে তখন একটা অস্ত্রাগার ধ্বংসের জন্য দু'দল গ্রীক সৈন্য সাবমেরিন আর রাতের অন্ধকারে প্যারাসুট্ করে লুকিয়ে নামল তাদের ঈপ্সিত জায়গায়। তারপর তারা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়ে কিভাবে সেই অস্ত্রাগারটি ধ্বংস করল তাই নিয়ে গ্রীসের জি ডি ফিল্মস তুলেছে নতুন ছবি 'দি হিরোজ'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে গ্রীস দেশের প্রায় ছবিই দেশীয় ভাষায় তোলা হয় কিন্তু এ ছবি একমাত্র ব্যতিক্রম। ইংরেজী ভাষায় তোলা এছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছে কোস্টাস্ নাওস্, তেরেজা ভল্লাদি, চোরিস্ কেরাসিওটিস্ ও আর্নল্ড কোহ্‌ন। ছবিটি পরিচালনা করছেন এ, আলাস্‌তাসাতোস্।

যুগোশ্লাভিয়ার চিত্রজগতে 'ইয়োভান্ ইয়ভনোভিক্' এর নাম নিঃসন্দেহে প্রথম নিঃশ্বাসেই উল্লেখ্য। বার্লিন ও কাঁ উৎসবে এ'র ছবি একাধিকবার পুরস্কৃত হয়েছে। ও'র নতুন ছবির নাম 'রোমিও এ্যান্ড জুলিয়েট অফ্ টুডে'। ছবির নাম শুনেই বোঝা যায় বর্তমান সামাজিক সমস্যায় ঘেরা একজোড়া যুবক-যুবতীর প্রেম কাহিনী। প্রেম কাহিনী ঠিকই, তবে শেক্সপীয়ারের নাটকাশ্রিত নয়। এছবির নায়ক-নায়িকার আর্থিক সমস্যা আছে, মানসিক জটিলতা আছে তাই হয়ত ছবির সুর আর শেষ অবধি মিলনান্তক হল না। মিস্টি-মধুর এই বিয়োগান্তক ছবির চরিত্র লিপিতে আছে স্পেলা রোজিন্, মিসা জাঁকটিক্, আলেকজান্ডার গ্যাভরিক্।

ফে ডানওয়ের নতুন ছবি 'আফটার দি ফল্' এর চরিত্রটি তার অভিনয়-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র হবে আশা করা যায়। নাট্যকার আর্থার মিলার এর মঞ্চসফল নাটক অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য করেছেন অ্যাবি ম্যান। অ্যাবি এ ছবির প্রযোজকও। এ বছরে 'বনি এ্যান্ড ক্লাইড্' ছবির জন্য ফে নমিনেশন্ পেয়েছিল শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসাবে। অটো পেরেমিঙ্গারের 'হ্যারি সানডাউন্' ছবিতে দেখে আর্থার পেন্ ওকে নির্বাচন করেন তার ছবির জন্য। 'আফটার দি ফল্' এর কাজ আগামী বছর শুরু হবে নিউইয়র্কে।

দুষ্টিদর্পন চিত্রের মহরত সঙ্গীত গ্রহণে পরিচালক রঞ্জন মজুমদার, বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য, সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্র, প্রযোজক ভাইরা ঘোষ, ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায় এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়। ফটো ঃ অমৃত

মঞ্চাভিনয়

জীবন যৌবন ও পথ নেই

'সংগঠনী নাট্যসংস্থা'র শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি 'বরানগর বিদ্যামন্দির' হলে বাস্তব জীবনভিত্তিক দুটি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাটক দুটি হোল অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জীবন যৌবন' ও পিনাকী গুপ্তের 'পথ নেই'। দুটি নাটকেরই অভিনয় শিল্পীদের আন্তরিক নিষ্ঠায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছিল। 'জীবন যৌবন' নাটকের মূল সুর হতাশা। আমরা জীবনে যে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখি এবং তাকে সফলতায় রূপ দিতে অনেক ক্লান্তি সহ্য করে যেভাবে পথ চলি, তার সব কিছুই বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুর কশাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। তাই জীবনের প্রতিটি রন্ধ্রে নেমে আসে হতাশা, নৈরাশ্য ও মর্মভেদী বেদনার অন্ধকার। এই অন্ধকারের সীমাহীন আঘাতে জর্জরিত কয়েকটা মানুষের যন্ত্রণা নিয়ে গড়ে উঠেছে এ নাটক। কাহিনী ও ঘটনার বিন্যাসগত মর্যাদা শিল্পীদের অভিনয়ে অটুট থেকেছে। সংঘাতসমৃদ্ধ এ নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেছেন পিনাকী গুপ্ত, চিরঞ্জিৎ গুহ, বাণীব্রত মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্ক ভট্টাচার্য, বিজন চৌধুরী, রণজিৎ সাহা।

'পথ নেই' নাটকের পটভূমিতে রয়েছে মফঃস্বল অঞ্চলের একটি থানা। এই অঞ্চলের একটি খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকের সংঘাত এগিয়েছে। শিল্পীদের সুষ্ঠু অভিনয়ে এই প্রযোজনাটিও সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন—চিরঞ্জিৎ গুহ, পিনাকী গুপ্ত, রণজিৎ সাহা, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, বাণীব্রত মুখোপাধ্যায়, ফটিক সাহা, হরিপ্রসাদ দত্ত চৌধুরী, শশাঙ্ক ভট্টাচার্য।

গোলাপ কাঁটা

'মালদহে'র অন্যতম নাট্য-সংস্থা 'আলোক-তীর্থ' সম্প্রতি শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'গোলাপ কাঁটা' নাটকের অভিনয় করে সুসংবদ্ধ নাট্য-প্রযোজনার একটি উল্লেখ-যোগ্য নজীর সৃষ্টি করেছেন। সমাজ-জীবনের আমাদের কয়েকটি পরিচিত মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে গড়া এই নাটকটির

সার্থক নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উন্নত ধরনের শিল্পচিন্তা ও প্রয়োগ-পরিকল্পনা সেদিনকার নাট্যাভিনয়ের একটি সুচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি চরিত্র সুঅভিনীত, তাই টিমওয়ার্কে কখনো এতটুকু শৈথিল্য আসেনি। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন—বীণাপানি নাহার, পংকজ বিশ্বাস, সতীশ নাহার, অহিভূষণ রায়, ভাস্কর বসু, তারাপদ দাস, অমূল্য সরকার, পুরুষোত্তম সোমানী, নৃসিংহ চট্টোপাধ্যায়, রুক্মিণী সেন প্রভৃতি।

প্রতিবাদ

'হাওড়ার প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা রতন ঘোষের স্যাটায়ারধর্মী নাটক 'প্রতিবাদ' মঞ্চস্থ করে সুপ্রযোজিত নাট্যাভিনয়ের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। 'প্রতিবাদ' একটি সার্থক 'স্যাটায়ার' নাটক। কিন্তু কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ এতে নেই, সমাজের চলতি রীতিকেই নাট্যকার তীব্র আক্রমণ করেছেন। শহরতলীর একটি ক্লাবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তীর পটভূমিকায় সমগ্র নাটকটি গড়ে উঠেছে। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে আমন্ত্রিত এমন একজন লোক যিনি পাপের পথে অর্থ আয় করে আমাদের এই পোষাকী সমাজে মহৎ মানুষরূপে প্রতিভাত। সমস্ত জীবনটাই তার কুশ্রীতায় মোড়া। তিনি যখন সভাপতির আসন গ্রহণ করে লেখা বক্তৃতা পাঠ করতে শুরু করেন, তখন নাটকের ক্লাইমেক্স উত্তেজনার চরম মুহূর্তে 'প্রতিবাদ' ধ্বনিত হোল চতুর্দিকে।

এই নাটকে তথাকথিত ক্লাবের সভ্যদের দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তিকর ট্র্যাজেডি, বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রতিভূ এক অধ্যাপকের যন্ত্রণা, আধুনিক এক কবির মর্মবেদনা এবং সামগ্রিক সমাজের চলতি রীতির অসম ব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। ছোট ছোট সংলাপের মধ্য দিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ভাষা পেয়েছে। এ বিষয়ে নাট্যকারের মুন্সিয়ানা অভিনন্দনযোগ্য।

এই বিদ্রূপাত্মক নাটকটির মঞ্চরূপায়ণে 'রূপকথা'র প্রতিটি শিল্পীর নিষ্ঠা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং সেই সূত্রে টিমওয়ার্কে একটি অটুট ঐক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পেরেছে।

অভিনয়ে প্রতিটি শিল্পীই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উপস্থিত করতে পেরেছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দেন—বাসব মিত্র, সৌরেন মুখোপাধ্যায়, সমীর চক্রবর্তী, তুষার ঘোষাল, রথীন সিংহরায়, অজিত সরকার, জীবন কুণ্ডু, বিকাশ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার চৌধুরী, বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ পণ্ডিত, সৌরেন গুপ্ত, সন্তোষ ভট্টাচার্য ও রমলা নাগ। সংগীত পরিচালনায় নৈপুণ্যের পরিচয় রাখেন সৌরেন গুপ্ত।

'বাণীরূপা'র একাংক মেলা

'বাণীরূপা'র শিল্পীরা আগামী ২৪শে মে সন্ধ্যা সাতটায় মুক্ত অঙ্গনে পরিবেশন করবেন এদেরই পূর্বঅভিনীত দুটি মঞ্চ-সফল একাংক—'কেন এই অবক্ষয়?' ও 'আবর্ত'। কিউবা বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত 'আবর্ত' শ্রীসৌরীন সেনের 'অাঁখের স্বাদ নোনতা'র নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীভোলা দত্ত। অপরটি রচয়িতা ও দুটি নাটকেরই নির্দেশক তরুণ অভিনেতা পরিচালক শ্রীবাবুল দাশগুপ্ত।

"জনযুদ্ধ" পুনরাভিনয়

'পথিক' সংস্থা তাঁদের সফল প্রযোজনা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনযুদ্ধ' নাটকটি মুক্তাংগন মঞ্চে পুনরাভিনয় করবেন আগামী ২৭শে মে সন্ধ্যা ৭ টায়। আমরা সকলেই স্বপ্ন দেখি নির্মল সমাজের, সুস্থ জীবনের। কিন্তু জীর্ণ, ক্লান্ত জীবনগ্লানিতে নিবিড় অন্ধকার সরিয়ে আলো জ্বালাবে কে? 'জনযুদ্ধ' নাটকের মূল প্রশ্ন—কেন এই গোটা সমাজটা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, কেন স্নিগ্ধ প্রেম পূর্ণ হচ্ছে না? অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন মণি মানী, সুনীল সুর, সনৎ বসু, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল রায়চৌধুরী, কান্তিময় রায়চৌধুরী, গোপাল দে, সান্ত্বনা ঘোষ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। পরিচালনায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

'শ্যামা' নৃত্যনাট্য

১১ই মে সন্ধ্যা ৭টায় রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়াম হলে সু-সংহতির বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নৃত্যবিদ্ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রীদের দ্বারা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য ও নৃত্য-বিচিত্রা অনুষ্ঠিত হয়। কথাকলি-বিশ্বপ্রণামে শুভ্র চ্যাটার্জি, ভারত নাট্যম—কৃষ্ণা রায়, পুতুল বিয়েতে শিপ্রা সেন, মিতা পাল, প্রেম বিন্ধাই—'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে—শ্যামা (শুক্লা সেনগুপ্তা) বজ্রসেন (সুতপা দত্ত), উত্তীয় (পাপড়ি বোস) ও অন্যান্য ভূমিকায় শেলী দাস, নন্দিতা চক্রবর্তী, মিতা হোপ, অনুপশংকর, শুভ্রা গাংগুলী ও সুচরিতা ঘোষ সু-অভিনয় করে। সংগীত পরিচালনায় বিপুল ঘোষ এবং সহকারী-রূপে সুভাষ ব্যানার্জি, কুইনি চক্রবর্তী, দীলিপ মুখার্জি, স্বপ্না সেনগুপ্তা, বেবী ঘোষ রুবি ঘোষ, কবিতা বোস ও বিন্দু চৌধুরী। সহকারী নৃত্য পরিচালনায় অনুপশংকর ও স্বপ্না সেনগুপ্তা। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন স্বপনকুমার দাস।

শুভময়ের 'ফেরা'

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'শুভময়' তাদের বহুপ্রশংসিত 'ফেরা' নাটকটি পুনরায় মঞ্চস্থ করছেন আগামী ২৪ মে, সন্ধ্যা সাতটায় কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন—চৈতালী রায়, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর রাহা, রণজিত গাংগুলী, আনন্দম্, পংকজ মুনসী, দলীপ ভট্টাচার্য, অশোক দাস, সমীর মিত্র, কালী ভট্টাচার্য, শৈলেন দাস, অর্ধেন্দু দাস, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্দেশনায়—জ্যোতিপ্রকাশ।

বিবিধ সংবাদ

বি, ঝা-এর ১৯৬৮ সালের বেংগল মোশান পিকচার ডায়েরী :

বি, ঝা সম্পাদিত ১৯৬৮ সালের বেংগল মোশান পিকচার ডায়েরীটি বহু প্রতীক্ষার অবসান করে আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রীঝায়ের অসুস্থতাই চলচ্চিত্রামোদীদের এই অতি-প্রয়োজনীয় ডায়েরীটির বিলম্বিত প্রকাশের কারণ। এবারের ডায়েরীটি অন্যান্য বছরের তুলনায় সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র-জগৎ সম্পর্কে বিস্তৃততর বিবরণে পূর্ণ। ডায়েরীটির অপরাপর সকল বৈশিষ্ট্যের সংগে এবারে আছে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ফিল্ম স্টুডিও, ল্যাবরেটরী, চলচ্চিত্রের যন্ত্রপাতির সরবরাহকারী, কাঁচা ফিল্ম ও চিত্রশিল্পে প্রয়োজনীয় অপরাপর বস্তুর সরবরাহকারীদের সম্পূর্ণ তালিকা, বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থার তালিকা, দিল্লীর চলচ্চিত্র-পরিবেশকদের তালিকা, আমেরিকার অ্যাকাডেমী অব মোশান পিকচার, আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স প্রদত্ত অস্কার বিজয়ীদের ১৯২৭ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত সম্পূর্ণ তালিকা এবং 'আন্ডারগ্রাউন্ড মুভীজ' সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ রচনা। চলচ্চিত্র-জগতের সংগে সংশ্লিষ্ট এবং এ-সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের পক্ষে এই 'ঝা-এর চলচ্চিত্র ডায়েরী' একটি অত্যাবশ্যক সুহৃদ।

মধু বসুর সম্মাননা :

১৮ই মে সন্ধ্যায় রবীন্দ্রমেলার কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত মঞ্চ ও চিত্র-পরিচালক মধু বসুকে 'প্রসাদ সিংহ স্মৃতি পুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত করেন। এই উপলক্ষ্যে শ্রীবসুকে তাম্রফলকে খচিত একটি মানপত্র এবং একটি অঙ্গবস্ত্র উপহার দেওয়া হয়।

অবনমহলে বীরেনমঞ্চ ও সিল এল টি জন্মসপ্তাহ :

"কবিগুরুর জন্মদিবসে কলকাতায় আরেকটি প্রেক্ষাগৃহের সংযোজন করার কৃতিত্ব সমরবাবু ও তাঁহার সহকর্মীদের। কোন একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইটিই ভারতবর্ষে প্রথম।"—বলেন প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায়। শিশুরংমহলের প্রধান অতিথি ডক্টর কে পি এস মেনন সমস্ত অবন-মহল পরিক্রমা করে মুগ্ধচিত্তে বলেন "এমনটি বৃশদেশের বাইরে কোথাও দেখিনি। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।" বীরেনমঞ্চ উদ্বোধনের পর আরম্ভ হয় 'আনন্দ'। ১০ তারিখে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ডঃ ডি'মেল, কলকাতার লর্ড বিশপ। ১০০০ দান করে লর্ড বিশপ বলেন "সুন্দর। এ পরীর রাজ্যের তুলনা নেই। এর অর্থাভাব কখনো হবে না।

সাংবাদিকদের সঙ্গে ফণি বিদ্যাবিনোদ, ভোলা পাল, পঞ্চু সেন ও অন্যান্যরা।

'কনকবংশী' দেখে ডক্টর ডি'মেল উচ্ছ্বসিত হন।

১১ তারিখে আসেন রাজাপাল ধর্মবীর। 'সঙ অব ইন্ডিয়া' দেখে তিনি বলেন—"সি এল টি ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরী করছেন—এটা সবচেয়ে আশার কথা। আমি জানি পন্ডিত নেহরু সি এল টি কে কি ভালোবাসতেন। সমস্ত কর্মপদ্ধতি এমন সুচারুরূপে পরিচালনা অনুকরণীয়।" শেষ-দিনে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুদের রবীন্দ্র-নাথের জীবনকথা বলেন—তারপর হয় লালচে বুড়ো। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে জন্মসপ্তাহ শেষ হয়। প্রায় পাঁচশো শিশু শিশুরংমহলের জন্মসপ্তাহ পালন করেন।

বীরেনমঞ্চের অডিটোরিয়াম সম্পূর্ণ করার চেষ্টা চলছে। বর্তমানে পরিষ্কার আবহাওয়ায় অভিনয় চলতে পারে।

মহিলা শিল্পী তারা ভাদুড়ীর সাহায্যে সৌখীন মহিলা শিল্পীদল ঃ

মঞ্চ ও চলচ্চিত্রজগতের একনিষ্ঠ শিল্পী তারা ভাদুড়ী আজ ঘোরতরভাবে অসুস্থ। অত্যন্ত নির্বিরোধী, শান্তভাষিণী এই শিল্পীটির চিকিৎসা ব্যাপারে সাহায্যের জন্যে গীতা দে-র নেতৃত্বে সৌখীন মহিলা শিল্পীদল গেল ১৫ই মে সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে কবিগুরুর 'শেষরক্ষা' অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই উপলেক্ষ্য এঁরা মোট ৫,২১৪৲ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। এরই সঙ্গে সেদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি পৌরপ্রধান গোবিন্দ দে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে আরও ২৮৬৲ টাকা যোগ দিয়ে শ্রীমতী ভাদুড়ীকে মোট ৫,৫০০৲ টাকা সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করে সমগ্র সংগৃহীত টাকাটি শ্রীমতী ভাদুড়ীর ভগ্নী-পুত্রের হাতে অর্পণ করেন।

যাত্রাজগতে একটি অভিনব উদ্যম ঃ

৩০এ এপ্রিল, অক্ষয় তৃতীয়ার সন্ধ্যায় নূতন বাজারের দ্বিতলে 'প্রমোদ প্রতিষ্ঠান' সংস্থা তাঁদের নতুন গৃহে শুভ মহরৎ উপলক্ষে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য বিবৃত করে এর স্বত্বাধিকারী হরিপদ বায়েন বলেন, বিভিন্ন যাত্রাদলের হয়ে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বিহারের শিল্পাঞ্চল ও মফস্বলে উচিত পারিশ্রমিকে প্রদর্শনীর সকল রকম বন্দোবস্ত করাই ঐ প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ। এর ফলে কলকাতার যাত্রাদলগুলি শহরে বসেই সারা মরশুমের জন্যে একটানাভাবে পরপর বহু প্রদর্শনীর নিশ্চয়তা লাভ করেন এবং সেই হিসাবে তাঁদের কর্মসূচী নির্ধারিত করতে পারেন। আবার অপরদিকে এই অগ্রিম ব্যবস্থা করবার জন্যে যাত্রাজগতের কিছু অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও কর্মসংস্থান হয়ে থাকে। এই অভিনব ব্যবস্থার জন্যে যাত্রা-জগৎ 'প্রমোদ প্রতিষ্ঠান'কে নিশ্চয়ই ধন্য-বাদের সঙ্গে স্বীকৃতি জানাবেন।

বিচিত্রিতার রবীন্দ্র-জয়ন্তী ঃ

৩১ মে সন্ধ্যা সাতটায় মিনার্ভা থিয়েটারে বিচিত্রিতার রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপ-লক্ষে প্রফুল্ল ভোসের নির্দেশনায় বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক নাট্যীকৃত 'কঙ্কাল' (একা-ঙ্কিকা), মলয়া চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'নৈবেদ্য' (গীতি-আলেখ্য) এবং সলিল মিত্র ও মুল্কি কর্তৃক যন্ত্রসঙ্গীতে 'বাল্মীকি প্রতিভা' পরিবেশিত হবে।

তরুণের অভিযান-এর রবীন্দ্রজন্মোৎসব

গত ১২ই মে-র সন্ধ্যায় রামরিক ইনস্টি-টিউশন 'তরুণের অভিযান' পত্রিকা গোষ্ঠী কর্তৃক রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শৈলজা রায়চৌধুরী ও সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শোভনা গুপ্তার কণ্ঠে 'হে নূতন' রবীন্দ্রসঙ্গীতটির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। সভানেত্রী, প্রধান অতিথি ও সম্পাদক পিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী রবীন্দ্রসম্পর্কীয় সাহিত্যের আলোচনা করেন। 'তরুণের অভিযান' রবীন্দ্রসংখ্যায় প্রকাশিত ও কবির উদ্দেশ্যে নিবেদিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনির্মল চট্টোপাধ্যায়, সুনীল সরকার, বিষ্ণু জানা, নারায়ণ চক্রবর্তী ও শিশির মজুমদার। একক রবীন্দ্র-সংগীতের অনুষ্ঠানে গান শোনালেন শিশুশিল্পী উজ্জল চৌধুরী, মিনু মুখো-পাধ্যায়, শিউলি চট্টোপাধ্যায়, শোভনা গুপ্তা, নীতা পারেখ, সীতানাথ চৌধুরী ও প্রখ্যাত বেতারশিল্পী সমরেশ রায়। রবীন্দ্র-সংগীতালেখ্য 'আলোকের এই ঝর্ণাধারায়' অংশগ্রহণ করেন রীতেন সরকার, অরুণাভ মিত্র, সাধন দে, সীতানাথ গাঙ্গুলী, অপূর্ব চৌধুরী ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধন দে-র নিখুঁত পরিচালনায় এই সংগীতা-লেখ্যটি শ্রোতাদের অকুন্ঠ প্রশংসা লাভ করে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে প্রদোষ ঘোষের ইলেকট্রিক গীটার বাদনের পর অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

যাদুকর চক্রের উদ্যোগে

যাদুপ্রদর্শনী

গত ১২ই মে, রবিবার সকালে যাদুকর চক্রের সভ্যগণ রঙমহল থিয়েটারে এক যাদুপ্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। অনু-ষ্ঠানে যাদুকর অবনী ব্যানার্জি, আর পি বোস, ভি এম ঘোষ, কাশীনাথ চন্দ্র, প্রসন্ন কুমার, কে কুমার, শিশির রায়, জটীরাম দাশ, যাদুকর শৈলেশ্বর, শঙ্কর পান্ডে, সুধীর বোস, শশাঙ্ক ব্যানার্জি, অনাদি দত্ত, জি বি অধিকারী বি আর মিত্র, এস মান্না, হিমাংশুশেখর প্রভৃতি যাদুকরগণ অংশগ্রহণ করেন। একটি যাদুনাটক করে দেখালেন ভি এম ঘোষ। প্রসন্নকুমার ও কাশীনাথ চন্দ্র দর্শকগণকে প্রচুর আনন্দ দেন। জটীরাম দাশের খেলাগুলির মধ্যে কিছু নতুনের ছোঁয়া দেখা গেল।

বিকলাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষে বনহুগলীর বীরেন্দ্র-নারায়ণ মুখার্জির পুনর্বাসন বিদ্যালয়ের বিকলাঙ্গ ছাত্রছাত্রীগণ একটি মনোজ্ঞ অনু-ষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। দুই ঘন্টা-ব্যাপী কর্মসূচীতে আবৃত্তি, গান ও দুইটি নাটিকার অভিনয় ছিল। অনুকূল পরিবেশে এরাও যে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারে তার প্রমাণ এরা গত কয়েকবছর ধরেই দিয়ে আসছে। সহজ আনন্দ ও সক্রিয় পূর্ণ সামাজিক স্বীকৃতি পেলে এদের জীবন দুর্বহ হবার কথা নয়। ওদিনকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ছিল—তিনু সরকার, বকুল দত্ত, বকুল বণিক (আবৃত্তিতে); বিজন শেঠ, পলী ভৌমিক, সুভদ্র বসু, সাধনা রায়, অনীতা রায় (গানে), অলোক রায়, পিনাকী পাহাড়ী, কার্তিক দাশ, বিকাশ মহীপাল, নারায়ণ মিত্র, বাণী রায়, বৈদ্যনাথ কাঁড়ার, নারায়ণ সাহা, বকুল দত্ত (নাটকে) ও আরও অনেকে।

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং আলি আকবর। ফটো : অমৃত
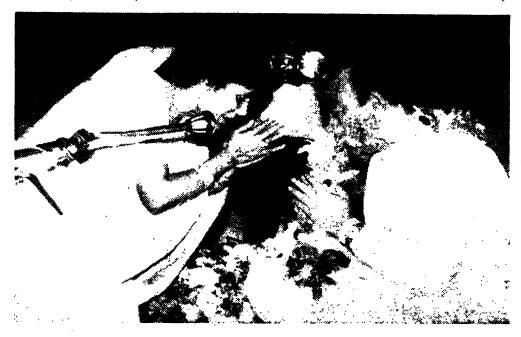
গুণী সম্বর্দ্ধনার আসরে

শ্রীমতী কানন দেবী ও ওস্তাদ আলি আকবর

রবীন্দ্রসদনে সংগীতসংগম আয়োজিত আলি আকবর সম্বর্ধনা এবং রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়ন হলে খিদিরপুর শিল্পীগোষ্ঠীর কানন দেবী সম্বর্ধনা গত সপ্তাহে কলকাতার বুকে আনন্দের জোয়ার বয়ে এনেছিল।

রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামে খিদিরপুর শিল্পীগোষ্ঠী প্রদত্ত সম্বর্ধনা আসরে সম্পাদক শ্রীঅশোক সাহা ও সভাপতি কালিপতি সাহা শ্রীমতী কানন দেবীর হাতে মানপত্র ও রৌপ্যনির্মিত হংস প্রদান করে বলেন—শুধু চিত্রজগতেই নয় সংগীত, অভিনয়, এবং জনহিতকর নানা কল্যাণকর কার্যে কানন দেবীর অনবদ্য অবদান যে কোনো দেশের বিদগ্ধ মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু। এই বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্না ব্যক্তিত্বকে সম্মানজ্ঞাপন করে আমরা ধন্য।

শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাণীতে শিল্পজগতে কানন দেবীর অতুলনীয় অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং খিদিরপুর শিল্পীগোষ্ঠীকে অভিনন্দন ও অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানিয়ে বলেন, কানন দেবীর মত শিল্পীকে সম্বর্ধনা জানিয়ে এঁরা সত্যিকারের শিল্পানুরাগ ও বিদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

সম্বর্ধনা শেষে সভায় উপস্থিত শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী শ্রীমতী কানন দেবীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "অসামান্যা প্রতিভাময়ী শিল্পী শ্রীমতী কানন দেবী তাঁর আপন যুগে চিত্রজগতে ছিলেন অনন্যা। সুদীর্ঘ একটি যুগ ভাস্কর হয়ে আছে তার অনবদ্য অভিনয়প্রতিভার স্বাক্ষরে। বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন জাত-শিল্পী। তাই তাঁর সমগ্র জীবনসাধনাটিও একটি শিল্পের মত। যে বয়সে মন সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনার স্বাদে দোলায়িত হয়, ভাললাগার রসে বিভোর হয় আমাদের সেই বয়সকালে শ্রীমতী কানন দেবী ছিলেন আমাদের হৃদয়-নায়িকা। কানন দেবীর কোনো ছবি না দেখা হয়ে থাকলে সেটাকে রীতিমত লোকসান বলেই মনে হোত। আজ আমারও চুল পেকেছে। তাঁরও চুল পেকেছে। কিন্তু সেই আসনটি আছে পাকা; তাই খিদিরপুর শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত এই সভায় শ্রীমতী কানন দেবীকে অভিনন্দন দেবার সুযোগ পেয়ে বিশেষ খুশী হলাম।"

আবেগসমৃদ্ধ অভিনন্দনে কানন দেবী অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে কিছু বলতে উঠে বারবার তাঁকে দরবিগলিত অশ্রুধারা মুছে নিতে দেখা যাচ্ছিল। সত্যিকারের শিল্পী বলেই হয়ত এমন স্পর্শকাতর। এতটুকু শ্রদ্ধার ছোঁয়ায় সারা হৃদয় এমন করে দুলে ওঠে। সংগীতমধুর অপরূপ কণ্ঠে ধ্বনিত হল কটি কথা যা পরিসরে সীমিত কিন্তু গভীর ব্যঞ্জনা সীমাহীন বিস্তারে অপরূপ। "আজকের এই স্নেহ-সজল সর্বর্ধনা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মহামূল্য রত্নের মত হৃদয়ের নিভৃতে এই মুহূর্তটিকে সযত্নে সঞ্চয় করে রাখবার মত। আজ বার বার মনে পড়ছে প্রথম জীবনের সংঘাত-দ্বন্দ্ব-ভরা অন্ধকার দিনগুলির কথা। জীবনে স্বপ্ন ছিল যতবড় যোগ্যতা তারচেয়ে অনেক ছোট। সেদিনের বেদনার পারাবার পার হয়ে অজ্ঞ যদি তটে এসে পৌঁছে থাকি সে আপনাদেরই

যুগলবন্দী অনুষ্ঠানে সেতার এবং সরোদ বাজান পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং আলি আকবর। ফটো : অমৃত

অবদান। আপনাদেরই স্নেহ, ভালবাসা উৎসাহ-প্রেরণাই আমার শক্তি জুগিয়েছে। আজকের আমি ত আপনাদেরই গড়া। আপনাদের কাছে আমার অশেষ ঋণ শোধ হবার নয়। এমন শ্রদ্ধাভরা সম্বর্ধনার আমি কতটা যোগ্য জানি না। তবে এই পুনালগ্নে আমার অন্তরের প্রণাম ও শ্রদ্ধা আপনাদের জানাতে পেরে আমিও ধন্য হলাম। খিদিরপুর শিল্পীগোষ্ঠীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক। অলস অবাস্তবের মোহে, স্বপ্ন ভাববিলাসিতায় এঁদের তারুণ্য যেন বিড়ম্বিত না হয় ঈশ্বরের কাছে আজ এই আমার প্রার্থনা।"

রবীন্দ্রসদনে শ্রীশৈলেন চ্যাটার্জি, সতীকান্ত গুহর ভাবসমৃদ্ধ ভাষণের পর বিভিন্ন সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান, শিল্পীবৃন্দ ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ, ওস্তাদ আলি আকবরকে মাল্যদান করেন। সবার শেষে পণ্ডিত রবিশঙ্কর যখন মাল্যদান করতে উঠলেন আনন্দে আবেগে দুই শিল্পী পরস্পরকে গভীর আলিঙ্গনে বদ্ধ করার দৃশ্যে সারা প্রেক্ষাগৃহে করতালির ঝড় বয়ে গেল। সর্বশেষ অনুষ্ঠানে মঞ্চে এলেন স্বয়ং আলি আকবরের মা, আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের স্ত্রী। রবিশঙ্কর আলি আকবর উভয়ের প্রণাম শেষে দুজনকেই গভীর স্নেহে জড়িয়ে ধরলেন।

কানন দেবীকে স্মৃতিফলক অর্পণ করছেন রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
ফটো : অমৃত

অন্তরাত্মার আশ্রয় সঙ্গীত

আলি আকবর

জুন মাসের মাঝামাঝি ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ আবার আমেরিকা যাত্রা করছেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় "আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিক" নামে কোলকাতা কলেজের যে সহযোগী প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বিদেশে ভারতীয় সংগীতের সমাদরের আসনটি চিরস্থায়ী করাই তাঁর অভিপ্রায়।

"মেসিনারী ইকুইপমেন্ট এবং জীবন-যাপনের সকল ব্যাপারেই ওরা অনেক প্রগ্রেসিভ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরাই ওদের মুখাপেক্ষী। আমাদের কাছে ওদের নেওয়ার যা আছে একমাত্র সংগীতের অপরিমিত ঐশ্বর্য অন্তহীন আনন্দ। এ বস্তু ওদের আয়ত্তের বাইরে। বস্তুতান্ত্রিক জীবনের সকল চাহিদা ও সমস্যা ওরা মিটিয়ে ফেলেছে। কিন্তু মনের দিক থেকে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। এই শুষ্ক রিক্ততা দূর করতে পারে সংগীত—বিশেষ করে ভারতীয় সংগীত। ওদের ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত ধরাবাঁধা নিয়মে বাঁধা, জাজ্ সংগীতে মিশোবার স্কোপ আছে। কিন্তু নানা জিনিস মিশোতে মিশোতে ওদের সংগীতের ওরিজিন্যালিটি হারিয়ে গেছে। তাই ভারতীয় সংগীতের অবিমিশ্র শুদ্ধতা ও সৃষ্টির সম্ভাবনা ওদের এমন মুগ্ধ করে। এই সম্পদেই ওরা আকৃষ্ট।" বললেন স্বল্পভাষী আলি আকবর খাঁন। এবার থেকে বছরের অর্ধাংশ ওখানে বাকী অর্ধাংশ এখানে কাটাবেন। বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে রবীন্দ্রসদনে ওরা এবং ৪ঠা জুন তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য অরুণ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় আলি আকবর সমিতি গঠিত হয়েছে। দুদিন সম্বর্ধনাশেষে তিনি সরোদ বাজিয়ে শোনাবেন।

একটি স্মরণীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান

বহুদিন বাদে আবার সেই সুবিখ্যাত জনপ্রিয় জুড়ি, ওস্তাদ আলি আকবর ও পন্ডিত রবিশঙ্করের যুগলবন্দী রবীন্দ্র-সদনে শোনা গেল সংগীতসংঘমের সৌজন্যে। সারা প্রেক্ষাগৃহের কোথাও যাকে বলে তিলধরণের জায়গা ছিল না। নির্দিষ্ট আসনও আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। বহুমূল্য-টিকিটধারীদেরও বিপন্ন হয়ে এধার-ওধার ঘুরতে দেখা গেছে। এমনই এক গমগমে আসরে শিল্পীদ্বয় শুরু করলেন—"ইমন-কল্যাণ"-এর আলাপ দিয়ে। এই বিরাট শাস্ত্রীয় রাগ দুই শিল্পীর পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ভাববিনিময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এমন এক সামগ্রিক সৌন্দর্যে বিস্তারিত হয়েছে যা আলি আকবর রবি-শঙ্কর ছাড়া আর কোনো শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়। বহু আগে যুগলবন্দীর প্রচলন ছিল রাজদরবারে—সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের পরিবেশনা পদ্ধতিতে। কিন্তু অধুনাকালের আসরে সেতার সরোদ দুটি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রের যুগলবন্দী— অবতারণা একান্তভাবে এ'দেরই অবদান এবং এই অবদানকে সার্থকতার চরমে পৌঁছে দেবার কৃতিত্ব এ'রাই দাবী করতে পারেন।

ধ্রুপদী আঙ্গিকে বিলম্বিত, মধ্য-জোড়, গমকজোড়, লারিজোড়ের ছন্দবৈচিত্র্যে বীণ ও রবাবের মর্যাদাগম্ভীর রূপটি প্রথম থেকে শেষ অবধি অনুরণিত। মন্দ্রসপ্তকে খরজের বিস্তারে, গান্ধার থেকে নিষাদের নাদধ্বনিতুল্য মীড়ে পন্ডিত রবিশঙ্কর যেন বিরাট পটভূমিকা রচনা করলেন—তারই ওপর কত না রং ও ছন্দের আল্পনা দিয়ে আলি আকবর ইমনের শুদ্ধ, পূত ভক্তিভাবের ছবি এঁকে চললেন। বিস্তার যখন গান্ধারের পর্দায় পৌঁছল তখন থেকে আলি আকবরের স্বরবিন্যাস পর্দাসমন্বয় যেন হীরকদ্যুতির উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরণ করে গেছে। "শ্যাম-কল্যাণ" গতে তানবিভব দুরূহ লয়ের অনায়াসছন্দ নানা রূপে যেন উভয় শিল্পীর বাজের আঘাতে নৃত্যোন্মুখ হয়ে উঠেছে। পৌরুষদৃপ্ত 'রা-ডা' বাজের সবল টোকায় আলি আকবর দৃপ্ততারুণ্যকে আহ্বান জানিয়েছেন আর ভাবুক চিত্তের কল্পনা ও রঙে তাকে রসোচ্ছল করেছেন রবিশঙ্কর।

এর আগে রবিশঙ্করের বাজনায় মনে হয়েছে বুঝি মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধি-দীপ্ত বস্তুই তীক্ষ্ণ হয়েছে, এবার অনুভব করলাম হৃদয়ের নিভৃত কোণে অনুভবের আলো জ্বলে না উঠলে এমন হৃদয়স্পর্শী বাজনা সম্ভব নয়। উভয় শিল্পীর মধ্যে সেতু বেঁধেছে আলাউদ্দিন ঘরানার গহন-সঞ্চারী গায়কী অঙ্গ। ন র গ র গা, এই সহজ কটি পর্দায় গান্ধারভিত্তিক কত রকমের তেহাই চক্রধার হতে পারে, শুনে বিহ্বল হয়ে যেতে হয়। কখনও ডাগরবাণী বাজে, কখনও খান্ডারবাণী বাজে ভাব-বস্তুকে পরিস্ফুট করে তোলার শিল্প-কুশলতায় এঁরা আজও অপরাজেয়।

দ্বিতীয়ার্ধে এঁরা বাজালেন "মাঝ-খাম্বাজ"। লোকসংগীতের সেন্টিমেন্টধর্মী এই রাগে সর্বদেশের, সর্বযুগের সকল মানুষের দুঃখ-বেদনা, প্রণয়াকুতি যেন একটি করুণ মিনতিতে বিধৃত। মার্গ সংগীতের সুবিস্তীর্ণ পশ্চাৎপটে লোক-সংগীতের আবেগ বেদনার ওঠাপড়ার তরঙ্গ, যন্ত্রণা, আনন্দের তীব্রতা যেন ছবির মত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। সাটামাটা পর্দা থেকে শুরু করে সুরের নানা স্তরবিন্যাস অতিক্রম করে কখনও রাগমালার ফুল ফুটিয়ে অর্কেস্ট্রা, ধাঁচের ক্রমপর্যায়ের সাপটতানের কংকর্ড ডিসকর্ডের আলোছায়া রচনা করে রাগমূর্তিকে রঙীন ও চিত্তাকর্ষক করে পৌঁছে দিলেন সেই মাধুর্যলোকে "ভাষার অতীত-তীরে কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে"—

দাদ্‌রা ছন্দের ৬ মাত্রার আধারে উভয় শিল্পীর ছন্দবিনিময় যেন দুটি আবেগ-বিহ্বল হৃদয়ের মন-দেওয়া, নেওয়ার রোমাঞ্চ।

আল্লারাখের তবলাসঙ্গত উভয় শিল্পীকে উদ্দীপ্ত করে এমন এক দ্রুততম লয়ে নিয়ে এসে যে লয়ে সুরের শুদ্ধতা বজায় রেখে বাঁধনহারা নৃত্যের এমন ঝরনা ঝরানো কল্পনাই করা যায় না।
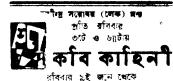
—সন্ধ্যা সেন

একটি রঙিন জলসা

সর্বশ্রী শ্যামল মিত্র, অজয় বিশ্বাস ও প্রদীপকুমারের পরিচালনায় সম্প্রতি ম্যাডান স্কোয়ারে বোম্বে ও কলকাতার জনপ্রিয় শিল্পীদের এক সংগীত আসর বসে। প্রথম রাতে মহম্মদ রফি ১৮টি গান শুনিয়েই আসর মাত করেছেন। শ্যামল মিত্র ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় তাঁদের অগণিত ভক্তদের মনস্কামনা অকৃপণ দানে পূর্ণ করেছেন। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে শুক্লা রায় প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর গানে। জনি হুইস্কির কমিক আশানুরূপ উপভোগ্য হয়েছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে ও মহেন্দ্র কাপুর যেন আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিলেন। আনন্দের হাটে অতিথি শিল্পী যূঁই বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদানও কিছু কম নয়।

লোকনৃত্য প্রদর্শনে মধুমতী ও মনোহর দীপকের প্রাণবন্ত নৃত্যে সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের আনন্দবেদনার আলেখ্যর মধ্যে একটি মানবিক আবেদন ছিল।

সোভিয়েট শিল্পী

পশ্চিমবঙ্গ তথ্যবিভাগের সৌজন্যে সম্প্রতি মিঃ আর ফ্রোলোভ ও ভি বেলচেঙ্কোর বেহালা ও পিয়ানো বাদনের দুটি আসরে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

মিঃ ভি বেলচেঙ্কোর পিয়ানো-বাদন দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তার একক অনুষ্ঠানে বাক্, প্রোকোফিভ প্রভৃতি দিকপাল স্রষ্টার রচনার ভাবনা-গভীর দিকটি শিল্পীজনোচিত সাসপেন্স শান্ত-কোমল ব্যঞ্জনার অনুরণনে পরিব্যাপ্ত। সুরের দীর্ঘস্থায়ী রেশ বিভিন্ন স্বরের সুচিন্তিত প্রয়োগ এমন কি থমকে দাঁড়ানোর নিবিড় ভাববিহ্বলতার আবেগ, গাম্ভীর্য অথচ উদ্বেলতায় মিঃ বেলচেঙ্কোর শিল্পী মনটি সুপরিলক্ষিত।
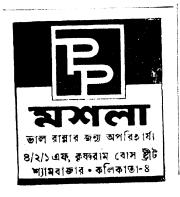
মিঃ ফ্রোলোভের বেহালার একটি ছড়েই বেগবান সুরের ঐশ্বর্যে সারা প্রেক্ষাগৃহ যেন ভরে ওঠে। স্বরলিপি নির্দিষ্ট সুরে আবেগের রঙ-ভরানো বৈচিত্র্যের অবকাশ খুব কম। সেজন্য অবশ্যম্ভাবী একঘেঁয়েমি কিছুটা ছিল নিশ্চয়। কিন্তু প্রতিটি পর্দার লক্ষ্যভেদী সুরের গুঞ্জন মনকে আকৃষ্ট না করে পারে না। পিয়ানো ও বেহালার দ্বৈত-বাদ্যে মিঃ বেলচেঙ্কো ও ফ্রোলোভের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়াটি সুন্দর। কোন সুর-সমন্বয়ের পাল্টা জবাব অথবা একই ছন্দের বিনিময় না থাকলেও পিয়ানোর কর্ড ও ভায়োলিনের ছড়ে মিঃ ফ্রোলোভের বাদ্য ও বেলচেঙ্কোর সঙ্গততুল্য সাড়া-দেওয়া এমন এক শ্রুতিমধুর সুরেলা পরিবেশ রচনা করেছিল যা সত্যিই উপভোগ্য। ছন্দের কাজ খুব কম। প্রায় ছিল না বললেই হয়। কিন্তু পরিমিত সুরের ভারসাম্য সে অভাব দূর করেছে।

এই অনুষ্ঠানের পরবর্তী সন্ধ্যায় ক্রিয়েটিভ ক্লাবের পক্ষ থেকে শ্রীঅদ্রিজানাথ মুখোপাধ্যায় শিল্পীদ্বয়কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এই আসরে শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পীদের 'কিরবাণী' রাগ বাজিয়ে শোনান। সংক্ষিপ্ত পরিসরে অনেকটা পাশ্চাত্য শ্রোতাদের উপযোগী করে আলাপ, গৎ, জোড় ঝালা সাজানো। অতিথি শিল্পীদ্বয় অত্যন্ত প্রীত হন। এই ভাল-লাগার আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ ফ্রোলোভ বললেন—"প্রাচ্য দেশের সঙ্গীতচিন্তা সুরের আনাগোনার রহস্য-মাধুর্য আমরা হয়ত সম্যক বুঝি না কিন্তু এ বাজনা যে কোনো প্রতিভাবান শিল্পীর বাজনা সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। আমাদের সঙ্গে পার্থক্যের একটা বড় দিক হল আমরা সা রে গা মা র 'রুড নোট'-এর ওপরই বাজনাকে সীমিত রাখি কিন্তু তার মাঝের শ্রুতিগুলি আমাদের অজানা। তাই ভাল লাগে। আর ভাল লাগে ইম্প্রোভাইজেসনের বিরাট সম্ভাবনা।"

এমন একটি কাব্যময় মিলনসন্ধ্যা উপহার দেবার জন্য শ্রীঅদ্রিজানাথ মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মিঃ ফ্রোলোভ বললেন—"এ শুধু আনন্দের সভা নয়—বিভিন্ন ভাষা, জাতি, ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের অন্তর্লোকের বিভেদ-হীন ঐক্যকে জাগিয়ে তোলা"—এ কাজ সহজ নয় এবং এই মহৎ কাজের দায়িত্ব যাঁরা পালন করেন তাঁরাই রসিকজনের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বিচিত্রানুষ্ঠান

বারুইপুরের নেতাজী স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যবৃন্দ তাদের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন গত ২০ এপ্রিল '৬৮ স্থানীয় পুরাতন বাজারে। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও কলকাতার কয়েকজন শিল্পী সংগীত পরিবেশন করেন। শিল্পী-দের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রীঃ—গোপাল মুখার্জী, উমা বর্মন, পরেশ চ্যাটার্জী, সীমা বর্মন, প্রণব চক্রবর্তী, সুবল সাহা এবং আরও অনেকে। এবং অনুষ্ঠানে শ্রীঅমল বসুর কৌতুকগীতি শ্রোতাদের প্রভূত আনন্দদান করে। তবলায় ছিলেন অরুণ বসু।

বাৎসরিক সংগীতানুষ্ঠান

গত ১৬ এপ্রিল ১৯৬৮ মহারাষ্ট্র নিবাস হলে প্রভাতী সংগীত প্রতিষ্ঠানের একাদশ বাৎসরিক সংগীতানুষ্ঠান ও অষ্টম বাৎসরিক সংগীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ডঃ পি কে রায়চৌধুরী। পুরস্কার বিতরণ করেন খ্যাতনামা গায়িকা শ্রীমতী মালবিকা কানন, প্রথমে লঘু সংগীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী মৃণাল চক্রবর্তী, দেবব্রত দত্ত, সরোজ চট্টোপাধ্যায়, লাবু বিশ্বাস, সৌরেন পাল ও প্রভাতীর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। উচ্চাঙ্গসংগীতে অংশ নেন শ্রী এ টি কানন, শ্রীমতী কল্যাণী রায়, পণ্ডিত মহাপুরুষ মিশ্র, মন্ময় ধর। অদ্রিজা-নাথ মুখার্জি সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

ব্রজেন্দ্রকিশোর সংগীত সংসদ

২১ এপ্রিল সন্ধ্যায় গৌরীপুর ভবনে ব্রজেন্দ্রকিশোর সংগীত সংসদের ত্রৈমাসিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর উদ্যোগে মার্গ সংগীতের আধ্যাত্মিক আদর্শ আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠের পর সাঙ্গেতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। বীরেন্দ্রকিশোরের ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিতভাবে সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার ফলে এই জলসার স্থায়ী কর্মসূচী স্থির করা হয়। জগন্নাথ মুখো-পাধ্যায় উদাত্ত কণ্ঠে বাঙলা ধ্রুপদ ও ভজন পরিবেশন করেন। রবীন্দ্রভারতীর ছাত্রী মঞ্জুশ্রী তপাদার মুলতানী রাগের আলাপ ও মুলতানী রাগের ও ললিত রাগের ধ্রুপদ গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশনের পর শ্রীমতী তপাদার স্বরচিত একটি ভজন গেয়ে শোনান। সেতারে মালকোষ রাগে আলাপ ও গৎ বাজিয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দেন হারাধন রায়চৌধুরী। ধ্রুপতি ঢঙে বাঙলা ভজন পরিবেশন করেন শ্রীজিতেন নাগ। শ্রীপঞ্চানন রায়চৌধুরী বীণাযন্ত্রে তীব্র কামোদ রাগ বাজিয়ে সকলকে চমৎকৃত করেন। সবশেষে বীরেন্দ্রকিশোর রবাব যন্ত্রে খামবাবতী রাগ পরিবেশন করেন।

—চিত্রাঙ্গদা

খেলাধুলা

দর্শক

বেটন কাপ

১৯৬৮ সালের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান ১—০ গোলে বি এন আর দলকে পরাজিত করে এই নিয়ে ৬ষ্ঠ বার বেটন কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ইতিপূর্বে তারা বেটন কাপ জয়ী হয়েছে ১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬০, ১৯৬৪ (ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুগ্মবিজয়ী) এবং ১৯৬৫ সালে (কাস্টমসের সঙ্গে যুগ্ম-বিজয়ী)।

ফাইনাল খেলার প্রথমার্ধের ২৭ মিনিটে মোহনবাগানের ইনসাইড-রাইট বেণী বুন্ডেল দলের জয়সূচক গোলটি দিয়েছিলেন। এই ফাইনাল খেলা দেখার জন্য মোহনবাগান মাঠে যে বিরাট ভীড় হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে এ বছরের হকি মরশুমের বৃহত্তম দর্শক সমাগম বলা যায়। খেলার মান খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও খেলার গতি ছিল দ্রুত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল খেলার চেহারা। দর্শকেরা খেলাতে যথেষ্ট উত্তেজনাও অনুভব করেছিলেন। এই দিনের খেলায় শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন বি এন আর দলের সেলিম বেগ।

দুই দলের খেলোয়াড়বৃন্দ

মোহনবাগান ঃ এস মুখার্জি; গুরুবক্স সিং এবং জার্ণেল সিং; রাজকুমার, ভি পেজ এবং বলবন্ত রাও; যোগীন্দর, বেণী বুন্ডেল, গোবিন্দ, ইনাম-উর-রহমন এবং মুখাপ্পা।

বি এন আর ঃ টি সেনগুপ্ত; আর্থার হাইড এণ্ড সেলিম বেগ; কুলদীপ সিং, কুশলকুমার এবং সৈয়দ; মুস্তাক আমেদ, যোগীন্দর সিং, রবিকুমার, পিয়ারা সিং এবং চাঁদ সিং।

এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা

দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল স্টেডিয়ামে দশম এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ব্রহ্মদেশ ৪—০ গোলে মালয়েশিয়াকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে এই নিয়ে ৫ বার টুঙ্কু রহমান কাপ জয়ী হয়েছে। ইতিপূর্বে ব্রহ্মদেশ অন্য দেশের সঙ্গে যুগ্মভাবে ৪ বার এই কাপ জয়ী হয়েছিল। সুতরাং এককভাবে তাদের কাপ জয় এই প্রথম।

ফাইনাল খেলার প্রথমার্ধে ব্রহ্মদেশ ৩—০ গোলে অগ্রগামী ছিল।

সেমি-ফাইনাল খেলা

প্রতিযোগিতায় যে ১২ টি দেশ যোগদান করেছিল, তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের লীগের খেলায় সমানভাগে তিনটি গ্রুপে খেলতে হয়েছিল। প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল নিয়ে প্রথমে সেমি-ফাইনালের লীগ খেলার তালিকা তৈরী হয়েছিল। এই লীগ খেলার তালিকায় ছিল মোট ৬টি দল—প্রতি গ্রুপে ৩টি করে দল খেলেছিল। এই লীগ খেলার শেষে প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল নিয়ে সেমি-ফাইনালের নক-আউট পর্যায়ের খেলা হয়েছিল।

সেমি-ফাইনালের নক-আউট পর্যায়ের খেলায় মালয়েশিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে ১—০ গোলে চারবারের টুঙ্কু রহমান কাপ বিজয়ী ইস্রায়েলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। অপরদিকে ব্রহ্মদেশ বনাম দক্ষিণ কোরিয়ার খেলা ১—১ গোলে ড্র যায়। ফলে যে টস হয় তাতে ব্রহ্মদেশ জয়ী হয়ে মালয়েশিয়ার সঙ্গে ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

সেমি-ফাইনাল লীগ

গ্রুপ এক্স

	জয়	ড্র	হার	পঃ
ইস্রায়েল	১	১	০	৩
ব্রহ্মদেশ	১	১	০	৩
থাইল্যান্ড	০	০	২	০

গ্রুপ ওয়াই

	জয়	ড্র	হার	পঃ
দঃ কোরিয়া	২	০	০	৪
মালয়েশিয়া	১	০	১	২
ফিলিপাইন	০	০	২	০

সেমি-ফাইনাল—নকআউট

মালয়েশিয়া ১ ঃ **ইস্রায়েল** ০

ব্রহ্মদেশ ১ ঃ **দক্ষিণ কোরিয়া** ১

ফাইনাল

ব্রহ্মদেশ ৪ ঃ **মালয়েশিয়া** ০

চূড়ান্ত ফলাফল ঃ ১ম ব্রহ্মদেশ, ২য় মালয়েশিয়া এবং ৩য় ইস্রায়েল এবং দক্ষিণ কোরিয়া (উভয় দলের খেলা গোলশূন্য ছিল)।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার আসন্ন ১৯৬৮ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে কলিন কাউড্রে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই ইংল্যান্ড দল পরিচালনা করবেন।

কাউড্রের বর্তমান বয়স ৩৫ বছর এবং তিনি ইতিপূর্বে ২০টি টেস্টে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক পদের গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন। কাউড্রে ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়কত্ব করেন ভারতবর্ষের বিপক্ষে, ১৯৫৯ সালে।

এখানে উল্লেখ্য, ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজটি হবে এই দুই দেশের ৪৯তম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ। ইতিপূর্বে এই দুই দেশের মধ্যে ইংল্যান্ডের মাটিতে ২৩টি এবং অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ২৫টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এই দুই দেশের শেষ টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে

১৯৬৮ সালের বেটন কাপ বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়বৃন্দ।
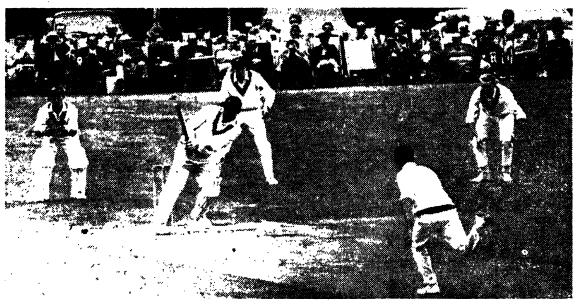
১৯৬৮ সালের ইংল্যান্ড সফরে চিরাচরিত প্রথামত ডিউক অব্ নরফোক একাদশ দলের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের উদ্বোধনী খেলায় নরফোক একাদশ দলের বব বারবার অস্ট্রেলিয়ার রেনেবার্গের বলে ড্রাইভ করেছেন। বৃষ্টির দরুণ খেলাটি শেষ পর্যন্ত ভণ্ডুল হয়।

১৯৬৫-৬৬ সালে এবং ইংল্যান্ডের মাটিতে ১৯৬৪ সালে।

প্রথম সফর

অস্ট্রেলিয়াতে ইংলিস ক্রিকেট দলের প্রথম সফর—১৮৬১ সালে, সারে কাউন্টি ক্রিকেট দলের এইচ এইচ স্টিফেনসনের নেতৃত্বে। ১৮৬১ সালের ১৮ই অক্টোবর এই দলটি অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে লিভারপুল ত্যাগ করেছিল। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের প্রথম ইংল্যান্ড সফর ১৮৭৮ সালে, ডি ডবলউ গ্রেগরীর নেতৃত্বে। অবিশ্যি, এর নয় বছর আগে—১৮৬৮ সালে চার্লস লরেন্সের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার উপজাতি ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিল।

টেস্ট খেলার তারিখ ও মাঠ

১ম টেস্ট : জুন ৬-১১, ওল্ড ট্র্যাফোর্ড
২য় টেস্ট : জুন ২০-২৫, লর্ডস
৩য় টেস্ট : জুলাই ১১-১৬, এজবাস্টন
৪র্থ টেস্ট : জুলাই ২৫-৩০, লিডস
৫ম টেস্ট : আগস্ট ২২-২৭, ওভাল

পত্রিকা শতবার্ষিকী ক্রীড়ানুষ্ঠান

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ত্রিদলীয় ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সাফল্য কামনা করে যাঁরা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন আই এফ এর সভাপতি শ্রীস্নেহাংশু আচার্য, বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মোহন-

বাগান ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্রী এস এম বসু ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক শ্রীধীরেন দে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্রী জে সি গুহ, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক শেখ আনোয়ার আলি, নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী এম দত্তরায়, ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত প্রভৃতি।

শ্রীস্নেহাংশু আচার্য তাঁর শুভেচ্ছা বাণীর একস্থানে বলেছেন, 'জাতীয় আশা এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণে অমৃতবাজার পত্রিকার ভূমিকার কথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না।'

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ পূর্তির সংবাদ ভারতবাসী মাত্রেরই কাছে এক আনন্দ সংবাদ। এই খবরে সকলেই গর্ববোধ করবেন।...আজ পত্রিকার পক্ষ থেকে যে খেলাধুলোর আয়োজন করা হয়েছে তার পৃষ্ঠপোষকতা করাও ক্রীড়ানুরাগী জনসাধারণের এক কর্তব্য বলে আমি মনে করি। আরও একশত বছর পত্রিকা 'নটআউট' থাকুক এবং সাংবাদিকতার যে উচ্চমান গত একশত বছরে ধরা হয়েছে, আগামী শতাব্দীতেও তা অক্ষুন্ন থাকুক—শতবার্ষিকীর উৎসব লগ্নে এই বলে আমি শুভেচ্ছা জানাই।'

খেলার নির্ঘণ্ট

২১শে মে : ইস্টবেঙ্গল বনাম মহঃ স্পোর্টিং
প্রধান অতিথি : শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, উপাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৩শে মে : মোহনবাগান বনাম মহঃ স্পোর্টিং

প্রধান অতিথি : প্রবীণ ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীগোষ্ঠ পাল।

২৫শে মে : মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল

প্রধান অতিথি : শ্রীগোবিন্দ দে, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র।

২৬শে মে : ত্রিদলীয় লীগ চ্যাম্পিয়ন বনাম আই এফ এ একাদশ দল

প্রধান অতিথি : রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ
১ম খণ্ড

৪র্থ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

FRIDAY, 31st MAY, 1968. শুক্রবার, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ 40 Paise.

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধাবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসুনীল দাশ

সিন্ধুতীরে প্রলয় দোলা

'সিন্ধুতীরের প্রলয়দোলা' সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সত্য মুখোপাধ্যায় লিখিত পত্রালোচনাটি পড়লাম। পত্রলেখক সুপ্রচলিত মতটি তুলে ধরেছেন। সিন্ধু নদের তীরের সভ্যতা বিলোপের কারণ প্রবল বন্যা বলে অনেক পণ্ডিতই মনে করেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী এই মতের ভিত্তিতে একটি সুখপাঠ্য ছোট গল্প রচনা করেছেন।

এই সভ্যতা বিলুপ্তি সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিমতটি অমতে পত্রিকায় আলোচনা করছি। তার আগে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের 'আটলান্টিস মহাদেশ সম্পর্কিত প্রশ্নটির জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। এই প্রসঙ্গে আমার জ্ঞাতব্য তথ্য এই। 'আটলান্টিস নামক ভূখণ্ডটি আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত ছিল। মানচিত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যায় আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল অগভীর। এই অগভীর অংশের আকার ইংরাজী 'S' অক্ষরের ন্যায়। বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড ওয়াগনার প্রথম এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন ইউরোপ, আফ্রিকা মহাদেশ, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা এক সময়ে একত্র ছিল। কোনও কারণে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মূল মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সম্ভবতঃ ঐ সময় 'S' আকৃতিযুক্ত ভূখণ্ডের কিছু কিছু অংশ সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকে (যেমন অধুনা জাপান দ্বীপপুঞ্জ এশিয়া মহাদেশের পূর্বে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে)। এই ভূখণ্ডই 'আটলান্টিস' মহাদেশ বা অস্ট্রেলিয়ার ন্যায় মহাদ্বীপ। পরবর্তী যুগে ভূখণ্ডটি সমুদ্র-জলে প্লাবিত হয়ে যায়।

বৈজ্ঞানিক ডালী (Daly) প্রবাল-দ্বীপ ও প্রাচীর সম্পর্কে গবেষণার সময় বলেন, পৃথিবীতে 'হিমযুগ' শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই জলপ্লাবন ঘটে। কারণ, হিমবাহগুলি গলে যাওয়ায় সমুদ্রের জলতল বেড়ে যায়। এর ফলে সমুদ্রতীরস্থ ভূখণ্ডগুলি জলপ্লাবিত হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই সিন্ধুতীরবর্তী সভ্যতা মুখ্যতঃ না হলেও আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। আমার ব্যক্তিগত অভিমত সিন্ধু সভ্যতা আকস্মিক 'বিপর্যয়ের' ফলে ধ্বংস হলেও তার কারণ একমাত্র জলপ্লাবনই নয়। সম্ভবতঃ মহাপ্লাবনের পরও কিছু কিছু অংশের অধিবাসীরা টিঁকে যান, আবার কেউ কেউ ঐ অঞ্চলে উত্তরে ও পূর্বে প্রধানতঃ রাজস্থান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। যাঁরা ঐ অঞ্চলেই থেকে যান তাঁরাও পরে ঐ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কারণ আগ্নেয়গিরি উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা নিক্ষেপণের ফলে সরস শস্য-শ্যামলা ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হতে থাকে।

আমার এই মতের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তি আছে। প্রথম যুক্তিটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অংশ। লেখক মুকুল গুপ্তের অভিমতানুসারে আগ্নেয়গিরি প্রসূত ধূলিকণা এই অংশে পতিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক তা আমার পূর্ব পত্রেই আলোচনা করেছি। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, সর্বশেষ 'হিমযুগ' শেষ হওয়ার পরই যেমন মহাপ্লাবন সংঘটিত হয় তেমনই পৃথিবীর ভূত্বক ভারসাম্য বা Isostatic Balance রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়। জলে - ভাসমান একটি কাষ্ঠখণ্ডে কোন ব্যক্তি বসলে সেই কাষ্ঠখণ্ডটির কিয়দংশ জলে ডুবে যায়; লোকটি উঠে গেলে তা আবার ভেসে ওঠে। সেইরূপ মহাদেশের যে সব অংশ হিমবাহের চাপে ভূগর্ভস্থ ম্যাগমার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল তা হিমবাহ গলে যাওয়ার পরই উত্থিত হয়। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে সমুদ্রগর্ভস্থ ভূমি, সমুদ্রতীরস্থ ভূমির সংলগ্ন হয়ে পড়ে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের আপালাশিয়ান পর্বতের পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরস্থ ভূমির ক্ষেত্রে ঘটেছে।

পৃথিবী এইভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে চেষ্টা করে বলেই মহাপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে বিভিন্ন ভূখণ্ডে পর্বত, মালভূমি, নূতন সমভূমি প্রভৃতি সৃষ্টি হতে থাকে এবং পৃথিবীর ভূগর্ভে আলোড়ন শুরু হয়। ভূকম্পন ও অগ্ন্যুৎপাত তারই ফল।

শেষ 'হিমযুগ'টি, যার নিদর্শন, প্রধানতঃ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় পাওয়া যায়, প্রধানতঃ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় ভারতবর্ষে তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন নেই। তবে হিমালয়ের হিমবাহগুলিতে হিম-পরিমাণ প্রচুর ছিল এবং উপত্যকা হিমবাহগুলির প্রাচুর্য্য ছিল সন্দেহ নেই।

আমার দ্বিতীয় যুক্তি 'সামাজিক বিজ্ঞানের' অংশীভূত। সংক্ষেপে তা প্রকাশ করছি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি আমার ধারণা, সিন্ধুতীর সভ্যতার উত্তরাধিকারীরা প্রধানতঃ উত্তরে ও পূর্বে, বর্তমান রাজস্থান অঞ্চলে উঠে আসে। সম্ভবতঃ এরা যাযাবর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়, কারণ এই সময়েই আর্যরা ভারতে আগমন করায় তাদের কোথাও স্থায়ী বসবাস করার ব্যাঘাত ঘটে। সম্ভব স্থলে ভারতের বাইরেও চলে যেতে বাধ্য হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠতার জন্য আর্যদের বিরুদ্ধে কায়িক বাধা প্রদান সম্ভব হয়নি। আমার মনে হয় এরাই ভারতের বর্তমানের বেদে-বেদেনী বা পৃথিবীর জিপসীর জাতির দল।

আমি ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে প্রায়ই এই বেদে-বেদেনীর জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছি। এরা তাঁবুতে থাকে। পশু পালন করে। দড়ি বোনে। দড়ি বিক্রয় করা জীবনযাত্রা-নির্বাহের উপায়। একদল বেদেনীকে শ্রীরামপুর ষ্টেশনে দেখেছিলাম। তাদের জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিল, এখানে 'চাতরা' অঞ্চলে দড়ি বিক্রয় করতে তারা আসে। অনেকেই হয়তো জ্ঞাত নন যে, এককালে, বিশেষতঃ ডেনিশদের আমলে, যখন শ্রীরামপুরের ঘাটে বড় বড় বাণিজ্য জাহাজ লাগত, তখন চাতরা অঞ্চল 'হাম্বার', 'লাকলাইন' প্রভৃতি দড়ি তৈয়ারীর জন্য বিখ্যাত ছিল। শ্রীরামপুরবাসী শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট শুনেছি ঐ অঞ্চলে আজও 'দোড়েপাড়া' নামে খ্যাত অঞ্চল আছে।

সিন্ধুতীরবাসী অধিবাসীরা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের [illegible] সমুদ্রে ভাসবার উপযোগী যানবাহনের জন্য দড়ি বোনার নৈপুণ্য নিশ্চয়ই ছিল। প্রাক্-প্লাবন যুগের [illegible] ঐ অঞ্চলে নারিকেল গাছের আধিক্য থাকাও অসম্ভব ছিল না। পরবর্তী যুগে তাঁবুর জন্য দড়ির প্রয়োজনও হয়। এখানে অবশ্য সন্দেহ দেখা দেয়। এর পরে নির্মাণ [illegible] ছেড়ে দিল কেন? আমার অভিমত [illegible] অঞ্চলে [illegible] তৈয়ারী সম্ভব ছিল না, উপযোগী সরঞ্জামেরও অভাব ছিল এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য দ্রুত পলায়নের প্রয়োজনও ছিল। কালক্রমে [illegible] নির্মাণের কুশলতা বিস্মৃত হয়।

এই যাযাবর মানবগোষ্ঠীর সৌখিন জীবনযাত্রা, পরিচ্ছদ সম্পর্কে পারিপাট্য, সৌন্দর্য প্রিয়তা, উন্নত সভ্যতার দান বলেই মনে হয়। এদের দীর্ঘায়ত চক্ষুর তীক্ষ্ণতা, উন্নত নাসিকা অথচ কপাল ও নাসিকার মধ্যবর্তী ভগ্নতা, শাণিত তরোয়ালের ন্যায় দীর্ঘ দেহ আর্যজনোচিত নয় বলে আমার মনে হচ্ছে।

আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়, এরা অধুনা প্রধানতঃ মরুসদৃশ ভূমির অধিবাসী হলেও, সরস শস্যশ্যামলা ভূমির প্রতি আকর্ষণ এদের তীব্র।

আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক এবং সামাজিক গবেষকরা আমার অভিমতগুলি গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করবেন কি-না জানি না তবে একেবারে না উড়িয়ে দিলে উপকৃত হবেন বলে মনে হয়।

ইন্দিরা দাশ,
শ্রীরামপুর, হুগলী।

অমৃত
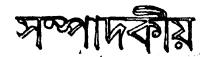
ঐক্য, সংহতি ও অন্যান্য সমস্যা

গত সপ্তাহে বোম্বাই শহরে দেশের ৫৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষক ও ছাত্র প্রতিনিধিরা ছয়দিনব্যাপী এক শিক্ষা-শিবিরে মিলিত হয়ে ভারতের ঐক্য, সংহতি ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ ধরনের শিক্ষা তথা আলোচনা শিবিরের প্রয়োজনীয়তা আজ সকলেই স্বীকার করবেন। রাজনীতিকরা স্পষ্টতই তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন নি। সমাজের অন্যান্য দায়িত্বশীল অংশের ব্যক্তিরাও বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। আত্মানুসন্ধান ও আত্মসমালোচনা ছাড়া কোনো জাতি তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগোতে পারে না। গত কুড়ি-একুশ বছর ধরে চেষ্টা করেও আজ কেন আমাদের শিক্ষাজগতে এই বিশৃংখলা, রাজনৈতিক জগতে নৈরাশ্য ও সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষের মনে নিরাশার অন্ধকার জমাট বেঁধেছে তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। শিক্ষাব্রতীরা তা করার চেষ্টা করেছেন এটা আশার কথা।

শিক্ষক ও ছাত্ররা এই শপথ নিয়েছেন যে তাঁরা ভারতীয় হিসেবে এই দেশের ঐক্য, সংহতি, গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রা, ধর্মনিরপেক্ষতা, আইনের শাসন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করবেন। এই সৎ ও সাধু সংকল্পের সঙ্গে দেশের শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ মাত্রেই একমত হবেন। ভারতীয় সংবিধানে উপরোক্ত যে-কয়টি আদর্শ উৎকীর্ণ আছে বারবার নানা অপশক্তির কাছ থেকে তার ওপর আঘাত আসছে। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই সকলের আগে এগিয়ে আসতে হবে সর্বনাশা এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার সংকল্প নিয়ে।

কেন আজ অনৈক্য ও ভেদবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে? দুর্বল রাজনৈতিক নেতৃত্ব, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন ও প্রাদেশিক শক্তির আবির্ভাবকে তাঁরা দায়ী করেছেন এর জন্য। আমরা যতই জাতীয় ঐক্যের কথা বলি না কেন, একমাত্র বহিরাক্রমণের আশংকার সময় ছাড়া ভারতের নানা প্রান্তে আজ অন্য সময়ে কোনো বিষয়েই জাতীয় ঐক্য কার্যকর হয় না। নদীর জল নিয়ে সীমানা নিয়ে খাদ্যশস্য সরবরাহ নিয়ে ভাষা নিয়ে চাকরী নিয়ে এক রাজ্যের সংগে অন্য রাজ্যের বিরোধ লেগে আছে। তথাকথিত জাতীয় নেতারাও নিজ নিজ রাজ্যের ভোটারদের মন খুশী রাখতে গিয়ে এ বিষয়ে জোর গলায় প্রতিবাদ করতে উৎসাহ পান না। তার ফলে বিভিন্ন রাজ্যে আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে চরম প্রাদেশিকতাপন্থী সেনার দল। তাদের ফ্যাসিস্টসুলভ আচরণে সকলে ত্রস্ত। আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনো রাজ্য সরকার এই ধরনের ঐক্য-বিরোধী উৎপাত দমনে কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

ছাত্র সমাজের মধ্যে যে-বিক্ষোভ তা শুধু এদেশে নয় পৃথিবীর সর্বত্রই তা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের সমস্যা এত তীব্র যে, তার আশু প্রতিকার না করলে ব্যাপক সামাজিক বিশৃংখলা অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষাব্রতীরা ছাত্রদের আচরণের নিন্দা করেছেন এবং এ কথাও বলেছেন যে, মুষ্টিমেয় ছাত্রই সমস্ত গণ্ডগোলের উস্কানিদাতা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমূল শিক্ষা সংস্কার ও তরুণদের ভবিষ্যৎ জীবিকার নিশ্চিতি না দিলে শুধুমাত্র আইনের শাসন চাপিয়ে এই ছাত্র বিক্ষোভ দমন করা সম্ভব নয়। ফ্রান্সের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমাদের চেয়ে ঢের বেশী সম্পদশালী দেশ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে শিক্ষানীতির ব্যর্থতার জন্য তীব্র ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। শিক্ষানীতির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সেখানেও সরকার পক্ষ স্বীকার করেছেন। শিক্ষাব্রতীরা স্পষ্টভাষাতেই বলেছেন যে, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি পুরানো ও অচল। একে নতুনভাবে ঢেলে সেজে সমসাময়িক সমাজের প্রয়োজন ও চ্যালেঞ্জের সমকক্ষ করে তুলতেই হবে। তাঁরা সারা ভারতে একই ধরনের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের যে-সুপারিশ করেছেন, তাও বিবেচনাযোগ্য। বস্তুত ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শিক্ষা কমিশনও শিক্ষা-পদ্ধতি পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করেছেন। তা কবে কার্যকর হবে কে জানে?

দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, উপাচার্য ও ছাত্রসমাজের প্রতিনিধিদের আলোচনার পর গৃহীত এই সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করি। সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা ও অগ্রগতির জন্যই আজ এই কর্তব্য সম্পাদন অপরিহার্য। দেশের ঐক্য, সংহতি ও সামাজিক ন্যায়াদর্শ অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব পালনে শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষার্থী সমাজের এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই।

অরণ্যের মাঝখানে

সুভাষ সিংহ

—এত তন্ময় হয়ে কী ভাবছেন?

—আপনার কথা। সুবল হাসল, অবাক হয়ে ভাবছি পাঁচ বছর এই বনের ভিতর কাটালেন কি ভাবে? এখানে থাকতে ভাল লাগে?

সীমা অপাঙ্গে তাকিয়ে হাসল। হাসলে ওর দু গালে টোল পড়ে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুবল দেখতে থাকে। সীমা চেয়ারটা বারান্দার দিকে টেনে নেয়। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে সুবল দেখল পুকুর পাড়ে মুরগীর খাঁচার সামনে ড্রাইভার টাইগার দাঁড়িয়ে। পড়ন্ত রোদের আভায় ওর পেশী-বহুল বাহুদ্বয় এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পেল সে। সীমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতে সে লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

—আমার অভ্যাস হয়ে গেছে এখানে থাকতে। আঁচল দিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল জড়াতে জড়াতে সীমা বলল, প্রথম প্রথম অবশ্য খারাপ লাগত। একটু রাত বেশি হলে জঙ্গল থেকে হিংস্র জন্তুর ডাক ভেসে আসত। গা ছমছম করত ভয়ে। সারা রাত জেগে থাকতাম। আপনার বন্ধুর অবশ্য ভয় ডর নেই। দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোত।

এর পর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

বার বার এখানে আসতে অনুরোধ করেছিল তুলসী। চিঠির পর চিঠি দিয়েছিল, একবার ঘুরে যাস সুবল। দেখে যাস দশ-বারো বছর আগেকার স্কুলের সেই বখাটে ছন্নছাড়া বন্ধুটা খাবি খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত কেমন ঘর-সংসার পেতেছে অরণ্যের মাঝখানে। সে ডাক ফেলতে পারে নি সুবল। গতকালই বেড়াতে এসেছে এখানে। কাজের মানুষ তুলসী বেরিয়ে গেছে সেই কাক-ভোরে। ব্যবসার খাতিরেই তাকে দু-একদিন থাকতে হবে বনে, কাঠের খোঁজে। সঙ্গে গেছে মকবুল।

টাইগারকে বাদ দিলে ঘরে এখন মানুষ-জন বলতে রয়েছে সুবল আর বন্ধু-পত্নী সীমা।

নীরবতা ভাঙল সুবলই আবার।

—শুনলাম মাসে দু-তিনবার তুলসী বাইরে যায়। আপনি একা থাকেন কিভাবে?

—কোথায় একা! সীমা হঠাৎ তীক্ষ্ণ চোখে সুবলের দিকে তাকায়, বলে, টাইগার থাকে। ও খুব সাহসী। যান না, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসুন। টাইগারকে সঙ্গে নিয়ে যান।

টাইগারকে ডাকতে যায় সীমা। সুবল বাধা দিয়ে বলল, থাক। ওকে ডাকবেন না। আমি বরং একাই একটু ঘুরে আসি। আপনিও চলুন না বৌদি।

—মাফ করবেন ঠাকুরপো। সীমা সমস্ত শরীর দুলিয়ে বলল, কত কাজ পড়ে রয়েছে। এখুনি হেঁসেলে ঢুকতে হবে। যাবার আগে আপনার বন্ধু বারবার বলে গেছে যেন খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধে না হয়। কে জানে হয়ত কলকাতায় ফিরে বলবেন বন্ধুপত্নী সেবাযত্ন ভালভাবে করে নি।

নীরবে হাসল সুবল। এই সামান্য অনুরোধও কী সীমা রাখতে পারত না? আধ ঘন্টা বেড়িয়ে ফিরে এসেও পাঁচ রকম রান্না করা যেত। আসলে ওর সঙ্গে যে-কোন কারণেই হোক যেতে চায় না।

—রাগ করলেন না তো?

—না না! সুবল ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল, সত্যি একা মানুষ অথচ কত কাজ রয়েছে আপনার। আচ্ছা, আমি একটু ঘুরে আসি।

—একা যাবেন। সীমা ঠোঁট কামড়ে এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল, নতুন এসেছেন। রাস্তাঘাট ভাল নয়। টাইগারকে সঙ্গে নিলে ভাল করতেন।

সুবল একটু সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। বলল, কোন ভয় নেই। বেশি দূরে যাব না। তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।

সীমা কোন কথা না বলে কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। সুবল পিছনে সরতে পারল না। সীমা প্রায় তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। সে অনুভব করল তার দেহে কাঁপুনি শুরু হয়েছে। দীর্ঘাঙ্গী সীমার কপাল প্রায় তার নাক ছুঁয়ে। পুকুর পাড়ের দিকে সুবল এক পলক তাকায়। টাইগার পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে এক দৃষ্টিতে এদিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর দু চোখের ভাষা এত দূরে থেকেও সে বুঝতে পারল। টাইগারের হাতের পেশী মাঝে মাঝে ফুলে উঠছে।

খুব বেশি দূরে যেতে সুবলের ভরসা হল না। সবে সাড়ে পাঁচটা—এরই মধ্যে চারি দিকে পাতলা অন্ধকারের আবরণ। আস্তে আস্তে কুয়াশা নামছে। বেশ ঠান্ডা অনুভব করল সে। আশে-পাশের গাছ-গাছালিতে পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ। দ্রুত হাঁটতে থাকে। সন্ধ্যার আগেই বাড়ি পেঁছিনো দরকার। কী ভয়াল স্তব্ধতা চারিদিকে। হঠাৎ ওর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। হাওয়ায় গাছের পাতা টুপটাপ শব্দে ঝরে পড়ছে। পীচ ঢালা পথের দু ধারে গভীর অরণ্য। মাঝে মাঝে বিচিত্র শব্দ ভেসে আসছে। শুকনো পাতার উপর মচমচ শব্দ। হয়ত দ্রুত বেগে ছুটে যাচ্ছে কোন প্রাণী। হরিণ-টরিণ হবে হয়ত। এই প্রচন্ড শীতেও কপালে ঘাম জমছে টের পেল সুবল। সমস্ত শরীর ভার হয়ে আসছে। তারপর একটা আচমকা চিৎকার শুনে ছুটতে শুরু করল। মনে হল কেউ যেন গাছের আড়াল থেকে বিশ্রী শব্দে হেসে উঠেছে। মরীয়া হয়ে সে ছুটল।

ভারী লোহার গেট ঠেলে হাঁপাতে হাঁপাতে সুবল ভিতরে ঢুকল। টাইগার সামনে দাঁড়িয়ে। ওর মুখে চাপা হাসি। ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে সে এগিয়ে যায়। সন্তর্পণে এগোয়। কুকুরটাকে বেঁধে রেখেছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ঘরে ঢুকতেই সীমার মুখোমুখি হল সে।

—এ কী? হাঁপাচ্ছেন কেন?

সুবল সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিতে পারল না। প্রথমেই চোখে পড়ল সীমার উগ্র প্রসাধন। খোঁপায় ফুল। সমস্ত ঘরে মৃদু সুগন্ধ। সে সোজাসুজি ওর চোখের দিকে তাকাল।

—অনেক দিন পর ছুটোছুটি করলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে সুবল মৃদু হাসল, অভ্যেস নেই তো তাই হাঁপিয়ে উঠেছি।

—একটু বিশ্রাম করুন। কফি আনছি। বলে সীমা বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

—তাড়াতাড়ি রান্না সারুন বৌদি। দেখুন বাইরে কী রকম জ্যোৎস্না। বারান্দায় বসে গল্প করা যাবে। আপনি গান জানেন?

সীমার মুখের দিকে তাকিয়ে সুবল সংকুচিত হয়ে যায়। ছিঃ কী ভাবল ওর এই উচ্ছ্বাস দেখে। বাস্তবিক নিজের অসংযমের জন্যে লজ্জিত হল মনে মনে।

দু হাত পিছনে নিয়ে বুক চিতিয়ে সীমা বলল, না। আমার গলা শুনে কী মনে হয় আপনার? চেষ্টা করলে শিখতে পারতাম। ইস্ মাংস চাপিয়ে এসেছি। পুড়ে গেল বোধহয়। বলে লঘু পায়ে সে বেরিয়ে যায়।

বাথরুম থেকে চোখে-মুখে ঠান্ডা জল ছিটিয়ে আসে সুবল। একটু আগে সে সীমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। ফেরবার পথে বাস্তবিক তার ভয় করছিল। গাছের আড়াল থেকে কে অমন বিকট চিৎকার করে উঠেছিল? মানুষ না কী কোন বন্য প্রাণী? তখন খতিয়ে দেখবার মত কোন রকম অবস্থা ছিল না তার। চিৎকার শুনেই উন্মাদের মত ছুটেছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে চুল আঁচড়ায়। সমস্ত শরীর আয়নার ভিতর প্রতিফলিত। কেমন রোগা রোগা লাগছে ওকে। বস্তুত এই প্রথম যেন সুবল নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না। এত রোগা সে!

এর পর কোথা থেকে যে অনেকটা সময় কেটে গেল তা টেরও পেল না সুবল।

ইতিমধ্যে সীমা কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, চলুন, খাবার হয়ে গেছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত টেবিলে গিয়ে বসল সুবল। এক ঝলক তাকিয়ে নিল সীমার দিকে।

—সুরু করুন। সীমা অল্প হাসল, খুব একচোট ঘুমিয়ে নিলেন। ওকি খাচ্ছেন না কেন? লজ্জা করছে? আবার হাসল।

কী অদ্ভুত রহস্যময় হাসি। হ্যারিকেনের আলোয় সীমার মুখ কেমন তেল-তেলে মসৃণ দেখাচ্ছে। সতেজ টানা চামড়া। বড় বড় চোখে মাঝে মাঝে যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সুবল সব ভুলে এক দৃষ্টিতে তাকায় সীমার দিকে।

খিলখিল হাসিতে সীমা টেবিলের উপর নুয়ে পড়ে। বুকের কাপড় সরে যায়। অন্তর্বাসহীন ব্লাউজের ভেতর থেকে বিদ্যুৎ খেলে গেল। চোখ নামিয়ে নিল সুবল। মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। ওর রক্তে কে যেন মুঠো মুঠো আগুন ছড়িয়ে দিল।

সুবল মাথা তুলতে পারে না। ছি! এভাবে ধরা পড়বে ভাবতে পারে নি। টের পেয়েছে ওর রূপমুগ্ধ দৃষ্টির অস্তিত্ব। কিন্তু ওভাবে হাসা সীমার উচিত হয় নি। সে চুপচাপ খেতে থাকে। বুঝতে পারছিল ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সীমা। ফলে মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তুলসীর উপর রাগ হল। ওকে এভাবে একা ফেলে চলে যাওয়া উচিত হয় নি। কয়েক দিন পরে গেলেও ব্যবসার কোন ক্ষতি হত না। তুলসী থাকলে সময়টা কাটত বেশ। সীমার আচরণের অনেকটা তার কাছে দুর্বোধ্য। কিন্তু এভাবে চুপচাপ থাকা ভাল দেখায় না। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়।

—রাত তো কম হয় নি বৌদি। আপনিও খেতে বসুন।

—আগে আপনার হোক। সীমা মাংসের বাটিতে আরও কয়েক টুকরো মাংস তুলে দেয়, বিয়ে করেন নি কেন? আপনার সব খবর রাখি মশাই।

সুবল সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিতে পারে না। সে যেন ঠিক এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হবে বলে আশা করে নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ধাতস্থ হয়ে উঠল।

কোন মেয়ে পছন্দ হল না। সুবলের সাহস বেড়ে যায়, পরিহাস করে বলে, তুলসীর ভাগ্য ভাল।

বোধ করি লজ্জায় সীমার মুখ লাল হয়ে ওঠে। এবং অন্য দিকে সে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে। যাক রাগ করে নি। কিছু মনে করে নি সীমা। পেট ভরে আসছিল সুবলের। এত কী খাওয়া যায়। প্লেটের চারি দিকে বাটির পর বাটি। অনেক কিছু রেঁধেছে সীমা।

—আর পারছি না। সুবল হাত গুটিয়ে নিল, আমি কী রাক্ষস?

—সে কি! কিছুই তো খেলেন না। ভাল হয় নি বুঝি রান্না?

—না না। সবকিছু চমৎকার হয়েছে। সব আপনি রেঁধেছেন?

—হ্যাঁ। আপনার বন্ধু ঠাকুর-চাকরের রান্না পছন্দ করে না।

হঠাৎ কুকুরের চিৎকার শোনা যায়। সুবল আড়ষ্ট বোধ করে। কুকুরটাকে এসে পর্যন্ত এড়িয়ে চলেছে। ওর সামনে যেতে রীতিমত ভয় হয় তার।

—রাতে কিন্তু বাইরে যাবেন না। কুকুরটা ছাড়া থাকে। আপনাকে এখনও ভালভাবে চেনে নি।

—ক্ষেপেছেন! সুবল হাত মুখ ধুয়ে সিগারেট ধরাল, ওর সামনে পড়ে গেলে নির্ঘাৎ ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।

—উঃ আপনি যা ভীতু! খিলখিল করে হেসে ওঠে সীমা।

ঘরে ফিরে সুবল পায়চারী করল খানিকক্ষণ। ভেবেছিল সীমাকে বলবে ওর খাওয়া হলে বারান্দায় আসতে। কিছুক্ষণ গল্প করা যেত। কিন্তু ওর দিক থেকে কোন সাড়া পায় নি। তাছাড়া তুলসীর কথাও মনে পড়েছে।

কুকুরের চিৎকারে মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে যায় সুবলের। বারান্দায় মৃদু হাঁটা-চলার শব্দ। কীসের যেন আওয়াজ শুনতে পেল সে। মনে হল টানতে টানতে কোন ভারী জিনিস কে যেন নিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে চাপা কণ্ঠস্বর। কৌতূহলে আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারল না ও। দেখাই যাক না ব্যাপারটা কী। পা টিপে টিপে সে বিছানা ছেড়ে নেমে দরজার সামনে এসে চুপচাপ দাঁড়ায়। হ্যাঁ, অনুচ্চ কণ্ঠে কারা যেন কথা বলছে। সে দরজার খিল খোলে। বুক থর-থর করে কাঁপে। খুব আলতোভাবে দরজা সামান্য ফাঁক করে। জ্যোৎস্নায় দেখতে তার কোন অসুবিধে হয় না। চিনতে ভুল হয় না। ঘনিষ্ঠভাবে দুজনে দাঁড়ানো। টাইগারের এক হাত সীমার কাঁধের উপর। স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে দেখল সুবল। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। টাইগারের কঠিন হাত জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সীমার বুকের ওপর। দূর থেকেও বোঝা গেল হিংস্র হয়ে উঠেছে টাইগার। রক্তের স্বাদ পেয়েছে সে। বেশ কিছুক্ষণ চলে ওদের ঝটপটানি।

টাইগারকে এখন কিছুটা ক্লান্ত মনে হচ্ছে। সীমা? না, তাকে আরো উত্তেজিত বোধ হল। কামড়ে খিমচে যেন তোলপাড় করতে চায় গোটা পৃথিবী। দুমদাম কিল চড় ঘুষি চলল টাইগারের শরীরে। সীমা কি মাতাল হয়ে উঠল?

সীমাও একসময় অবসাদে ভেঙে পড়ল। টাইগারের বুকের উপরে পুরোপুরি নিজেকে ছেড়ে দিল। সে যেন নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।

এমন ঘূর্ণির মুখোমুখি সুবল কোন-দিন হয় নি।

অনেক দূরে থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসছে। মনে হল সুবলের শিকল ছিঁড়ে কুকুরটা চলে আসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

নিঃশব্দে খিল এঁটে সে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। ভোর পর্যন্ত এ পাশ ও পাশ করে কাটাল। নানা রকম চিন্তা করল সে। ওদের কোন ডিসটার্ব করে নি। সাহস হয় নি তার। তাছাড়া ভেবেছে কেনই বা সে বাধা দেবে। সীমাকে ঘৃণা করতে পারল না তুলসীর কথা ভেবে।

তুলসী কী সীমার এই গোপন অভি-সারের কথা জানে? কোনদিন কী ওর মনে এক মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ জাগে নি? সে কী বলবে ওকে সব খুলে? এসব অনেকবার ভাবল সুবল। কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারল না।

তুলসী বলল, তোর তো ছুটি ফুরোতে দেরী আছে। যাবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

—জরুরী কাজ রয়েছে। সুবল জোর করে মুখে হাসি ফোটায়, তুই রাগ করিস না। আবার আসব।

—আর কী আসবি? এখান থেকে ফিরে গিয়ে কেউ আসে না। সবাই ভুলে যায়।

তুলসী কী বলতে চায় ঠিক বুঝতে পারল না সে। তাহলে ওর আগে আরও অনেকে এসেছিল। কারা এসেছিল? জিজ্ঞেস করল না সুবল। তুলসীর নতুন বন্ধু-বান্ধব হবে হয়ত। সে চেনে না ওদের। অনেকবার বলতে গিয়েও থেমে গেছে। সেই রাত্রের কথা ভাবলে শিহরিত হয়ে ওঠে ওর সমস্ত শরীর। অথচ কী স্বাভাবিক ব্যবহার সীমার! কোনরকম গ্লানিবোধ নেই।

—কবে যেতে চাস? তুলসীর কণ্ঠস্বর উদাস হয়ে ওঠে, তোর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না বুঝতে পারছি। তোরা শহরের লোক, অরণ্যের মাঝখানে দু দিন থেকেই হাঁপিয়ে উঠিস। আমি কিন্তু শহরে গিয়ে একদিনও থাকতে পারি না। পালিয়ে আসি।

—তোর এখানেও শহর ঝাঁপিয়ে পড়বে শিগ্গির। সুবল মৃদু হাসল, তোর স্বভাব দেখছি অসামাজিক হয়ে উঠেছে। শহরের প্রতি এত বিতৃষ্ণা কেন?

—আই হেট! তুলসী উত্তেজিতভাবে সিগারেটের টুকরো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সুবল শুনল পাশের ঘরে উত্তেজিত কণ্ঠ-স্বর। সীমার তীক্ষ্ম চিৎকার শুনতে পেল সে। একটু পরে শোনা যায় তুলসীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। তুলসী কী টের পেয়েছে? অশুভ কিছু ঘটবার আগেই সে কলকাতায় ফিরবে।

সুবলের মনে হল শিগ্গির সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটবে। চোখের সামনে দেখবে অথচ প্রতিরোধ করতে পারবে না। কী হতে পারে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। ঢের বিশ্রাম হয়েছে। এখন ফিরতে পারলে বেঁচে যাবে। এখানে চলতে-ফিরতে তার গা ছমছম করে ওঠে। অজ্ঞাত আশংকায় সে সর্বদা শংকিত। রাতে ঘুমোতে পারে না। খুট করে শব্দ হলেই জেগে ওঠে।

বোতল হাতে তুলসী ঘরে ঢুকল। টেবিলের উপর দুটো গ্লাসে মদ ঢালল। ওর মুখ চোখ অনেকটা লাল। একবার আড় চোখে ওকে দেখল সুবল। তারপর নীরবে একটা গ্লাস টেনে নেয়। মাঝে মাঝে সুবল একটু-আধটু ড্রিংক করে। প্রথম দিন রাত্রে দুজনে খেয়েছে। সীমার কথা জিজ্ঞেস করেছিল তুলসীকে। ও আবার মনে

না করে কিছু। তুলসী ঠোঁট উল্টে বলেছে, "ওর জন্যে সংকোচ করিস না। ও নিজেও একটু-আধটু খায়। অনেক বললাম তোর সামনে বসে কিছুতেই খাবে না।" শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

—কালকেই যেতে চাস। তুলসীর চোখের তারা ঘন ঘন কাঁপতে থাকে. তোকে একটা কথা বলব সুবল। কাল চল সবাই মিলে শিকারে যাই। পরশু চলে যাস। বাধা দেব না।

—কী শিকার করবি? প্রস্তাবটা মন্দ ঠেকল না সুবলের। এক ধরনের রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে ওর সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল।

—হরিণ-টরিণ আর কি। যাবি?

সুবল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। মন্দ কি! নতুন অভিজ্ঞতা হবে। কলকাতায় ফিরে আবার ডুবে যাবে নীরস কাজের মাঝখানে। সেখানে বৈচিত্র্যহীন জীবন ওৎ পেতে রয়েছে। মাত্র একটা দিনের ব্যবধান। পরশু ফিরে যাবে। তুলসী কী যেন বলছে। বোধহয় নিজের মনে বকবক করছে। সুবলের কান গরম হয়ে ওঠে। মাথা ঝিম-ঝিম করছে। এই তো সময় নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার। যত গোপন কথা আছে গলগল করে জলস্রোতের মত বেরিয়ে যাক। সে বলবার জন্যে মুখ খুলল। ডাকল : তুলসী। তোকে একটা কথা বলব।

—কী? তুলসীর দুটো চোখ লাল।

—কিছু না। সুবল ঐ ভয়ংকর দুটি চোখের সামনে আস্তে আস্তে নির্জীব হয়ে ওঠে। সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যায় তার।

খুব ভোরে ওরা যাত্রা শুরু করল। প্রথমে সীমা আসতে রাজি হয় নি। সুবল অনেক অনুরোধ করেছে। তুলসী কোন কথা বলে নি। শুধু বিরক্তি লক্ষ্য করা গেছে ওর চোখেমুখে। শেষ পর্যন্ত সীমা এল। তখন জিপ স্টার্ট নিয়েছে। প্রায় ছুটে এল সে। সুবল আর তুলসীর মাঝখানে বসে স্বগতোক্তি করল, শরীর খারাপ ঠিক কিন্তু না এসে পারলাম না। বাড়িতে একা থাকতে ভাল লাগত না।

সুবল বা তুলসী কেউ কোন কথা বলে নি। তুলসীর ডান কাঁধে বন্দুক। ও নাকি এক হাতেই বন্দুক চালাতে ওস্তাদ। সুবল সহজভাবে দু-একটা হাসি-ঠাট্টা করল সীমার সংগে। একবার আড়চোখে তাকাল টাইগারের দিকে। এক মনে জিপ চালাচ্ছে। যেন গাড়ির আরোহীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অচেতন। স্বল্পভাষী টাইগার। ইচ্ছে করছিল এক ধাক্কায় ওকে জিপ থেকে ফেলে দেয়।

জিপ বাঁক নেবার সময় সীমা হেলে পড়ছে সুবলের দিকে। নরম স্পর্শে সে একটু কেঁপে উঠল। সীমার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। তুলসী ফ্লাস্ক থেকে মদ ঢেলে খাচ্ছে। এরই মধ্যে কয়েক পেগ গিলেছে। ওকে এখন দেখাচ্ছে হন্তারকের মত।

—অত খেয়ো না। সীমা ফ্লাস্কের দিকে হাত বাড়ায়।

—ছেড়ে দাও! তুলসী রক্তচোখে তাকাতে সীমার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। সে হাত গুটিয়ে নেয় সংগে সংগে।

সুবল না দেখার ভান করল। তুলসী খুব রেগে আছে। অতএব চুপচাপ থাকাই ভাল। বেশ হাল্কা লাগছে মনটা। সীমা শেষ পর্যন্ত চলে এল। তবে প্রথম দিকে ন্যাকামো করছিল কেন? ও যে আসবেই তা সে জানত। বাইরে প্রথম প্রভাতের ইসারায় সতেজ নবীন ভাব। রাস্তার দু পাশে গভীর অরণ্য। নাম না জানা অসংখ্য পাখি আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। ওদের সম্মিলিত কোলাহল শুনতে শুনতে সে তন্ময় হয়ে উঠল।

একটা গাছের নীচে জিপ থামাল টাইগার। তুলসী লাফ দিয়ে নেমে পড়ল।

—এবার বনের ভেতরে ঢুকবো আমরা। তুলসী ডান হাতে বন্দুক ধরে এগিয়ে যায়। ওকে সবাই অনুসরণ করল। ওরা শুকনো পাতা মাড়িয়ে অগ্রসর হয়। টাইগারের কোমরে একটা ভোজালি। সুবল আর সীমা হাঁটতে হাঁটতে একটু পিছিয়ে যায়।

সুবল সন্তর্পণে হাঁটে। চারিদিকে তাকিয়ে শুধু দেখে দীর্ঘ পাইন গাছ। ঘন সারিবন্ধ। তুলসী বন্দুকের নল খুলে গুলি ভরে নেয়। ওরা হাঁটতে হাঁটতে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে। সুবলের গা ছমছম করে ওঠে। বলা যায় না যে-কোন মুহূর্তে

হিংস্র প্রাণীর মুখোমুখি হয়ে যেতে পারে। যদিও তুলসী বারবার অভয় দিয়েছে এই বলে হিংস্র প্রাণী নেই। তবু দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পায় না সে।

—ঘাবড়ে গেলি নাকি? তুলসী ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হাসল।

—কোথায় তোর হরিণ? সুবল তরল সুরে বলল, ওর চেয়ে পাখি শিকার কর। এত ভেতরে ঢুকছি, পথ হারিয়ে যেতে পারি।

—চুপ! তুলসী বন্দুক বাগিয়ে ধরে।

বেশ কিছুটা দূরে দুটো হরিণ আপনমনে হাঁটছে। হঠাৎ ওরা কান খাড়া করে এদিকে তাকাল। ওদের ঘ্রাণশক্তি বড় প্রবল। ইন্দ্রিয়-বোধ বড় তীক্ষ্ম।

—গাছের আড়ালে চলে আয়। তুলসী ফিসফিস করে বলে, একদম নড়াচড়া করবি না।

হরিণ দুটো এবার ওদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। খুব ধীর পদক্ষেপ ওদের। মাঝে মাঝে উদাসদৃষ্টিতে ওরা তাকাচ্ছে। সুবলের হাঁচি পাচ্ছিল। ও প্রাণপণে হাঁচি রোধ করার চেষ্টা করল। শেষপর্যন্ত পারল না। হাঁচির শব্দে হরিণ দুটো প্রথমে ভ্যাবা-চাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ব্যাকুল দৃষ্টিতে এদিকওদিক তাকায়। এক মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই ওরা বিদ্যুৎগতিতে পিছন ফিরে ছুটতে শুরু করে। তখন প্রচন্ড শব্দে বন-ভূমি কেঁপে ওঠে। পরপর দুবার গুলির শব্দ হয়। ঘন সারিবদ্ধ গাছের আড়ালে মিলিয়ে যায় হরিণদুটো। একটু পরে তীব্র আর্তনাদ শোনা যায়।

—লেগেছে গুলি! টাইগার, তুই আমার সঙ্গে আয়। সুবল, সীমাকে দেখিস। তুলসী ছুটতে শুরু করল। ওর কন্ঠস্বরে বোধকরি খুশীর আমেজ মেশান ছিল। ওকে অনুসরণ করল টাইগার।

সীমা ঠিকমত হাঁটতে পারছিল না। মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। সুবল কয়েকবার ওর হাত ধরেছে। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি হাঁটার সময় ছোঁয়াছুঁয়ি এড়াতে পারছে না।

—আর কত হাঁটব! সীমা স্খলিত আঁচল তুলে কাঁধে রেখে বলে, ওরা কোথায় গেল বলুন তো?

—কাছাকাছি আছে কোথায়ও। সুবল অভয় দেবার ভঙ্গিতে বলে, চলুন হাঁটা যাক।

আবার ওরা হাঁটতে শুরু করল। মাঝে মাঝেই সামনে পড়ছে বুনো লতা ঝোপঝাড়। সুবলের রীতিমত হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। তবু সীমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে অগ্রসর হয়।

—উঃ! সীমা একলাফ দিয়ে পিছিয়ে যায়। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল। তার আগেই পিছন থেকে কোমর জড়িয়ে ধরে সুবল।

একটু পরে ওরা গুলির শব্দ শুনল। মনে হল খুব বেশি দূরে নয়। ওরা এবার ছুটতে শুরু করে। সুবল এগিয়ে যায় সহজেই। সীমার জন্যে ওকে মাঝে মাঝে দাঁড়াতে হয়। সীমার মাথার চুল অবিন্যস্ত হয়ে ওঠে। রীতিমত হাঁপাতে থাকে সে।

অবশেষে ওরা দেখতে পেল তুলসীকে। ও ঝুঁকে একমনে কী যেন দেখছিল। ওর পাশে দাঁড়িয়ে ভোজালি হাতে টাইগার। সীমার বুক কেঁপে ওঠে। সে টাইগারের দিকে তাকায়।

—তোর জন্যে যা চিন্তা হচ্ছিল। সুবল হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কী দেখছিস? সে এগিয়ে এসে তুলসীর পাশে দাঁড়ায়। তারপর নীচু হয়ে তাকাল। ওর শরীর ঘেঁষে সীমাও এসে দাঁড়ায়। একটা পাথরের চাঁই-এর উপর হরিণটা চিৎ হয়ে শুয়ে। দুটো ঠ্যাং উপরের দিকে তোলা। প্রায় হাত কুড়ি নীচে। একে-বারে খাড়া হয়ে খাদ নীচের দিকে নেমেছে। কত গভীর আন্দাজ করতে পারল না সুবল। বেশিক্ষণ তাকালে মাথা ঘুরে যায়। ওর মনে হল ওখান থেকে হরিণটাকে তুলে আনা একেবারেই অসম্ভব।

—ফিরে যাই চল। সুবল তাকাল তুলসীর দিকে, ওর মায়া ত্যাগ কর। বরং অন্য হরিণটরিণ মারতে পারিস কিনা দ্যাখ।

—আবার পাব কিনা কে জানে। বিশেষ করে গুলির শব্দে সব পালিয়ে গেছে। এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। দুপুরের মধ্যেই ফিরতে হবে।

তুলসী এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। তারপর টাইগারের দিকে তাকাল। তীব্রস্বরে ওর চোখ দুটো জ্বলে উঠল একবার।

—তোর ব্যাগে দড়ি আছে?

টাইগার ঘাড় নাড়ল। ব্যাগ খুলে মোটা দড়ি বের করল। তুলসী দু'তিনবার মেপে দেখল দড়িটা। তারপর ঝুঁকে নীচের দিকে তাকাল। সুবল নিঃশব্দে সব লক্ষ্য করছিল। তুলসী কী দড়ি বেয়ে নীচে নামবে?

—তোরা দুজনে শক্ত করে ধরে থাক। আমি নীচে নামছি। বলে তুলসী বন্দুক মাটিতে রেখে নীচু হয়ে জুতো খুলতে যায়।

—না। সীমা এগিয়ে এসে তুলসীর হাত থেকে দড়ি ছিনিয়ে নেয়, তুমি কেন নীচে নামবে! টাইগার যখন রয়েছে।

তুলসী, পাগলামি করিস না। সুবল দৃঢ়স্বরে বলে, ওই নামুক।

তুলসী কিছুতেই রাজি হয় না। ওরাও নাছোড়বান্দা। টাইগার চুপচাপ থাকে। শুধু একবার ওর দুটো চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠল। সুবল লক্ষ্য করল সীমা বারবার টাই-গারের দিকে তাকাচ্ছে। শেষপর্যন্ত ঠিক হল টাইগারই নীচে নামবে।

—বেশ। তুলসী হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, সীমা, তুমি বরং বন্দুকটা ধরে থাক। আমি আর সুবল দড়ি ধরছি।

—না। সীমা তুলসীর হাত ধরে অনু-নয়ের ভঙ্গিতে বলে, অনেক পরিশ্রম করেছো তুমি। দাও আমি আর ঠাকুরপো ধরছি।

এবারও নিরাসক্ত চোখমুখে তুলসী চুপ-চাপ সরে দাঁড়ায়। টাইগার কোমরে দড়ি শক্ত করে বেঁধে নীচে নেমে যায়।

—সাবধান সুবল! শক্ত হাতে ধরিস।

আস্তে আস্তে দড়ি ছাড়ে ওরা। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটে। তুলসী মাঝে মাঝে টাইগারের নাম ধরে ডাকলে ও নীচ থেকে সাড়া দেয়। ক্রমশঃ টাইগারের কন্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। সুবলের মনে হল ওর দুটো হাত অসম্ভব ভার হয়ে আসছে। আর ঝিমঝিম করছে। আরও কত নীচে নামবে টাইগার। ওর একটু আগে সীমা। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। মুচকি হাসছে। সুবল ওর সরু কোমর দেখতে থাকে। মানানসই ফিগার।

সুবলের হাত ঘেমে ওঠে। মনে হল হাত থেকে দড়ি যে-কোন মুহূর্তে পিছলে যেতে পারে। ও অন্যমনস্ক হয়ে ভাবে কী দরকার ছিল এত পরিশ্রমের। এর চেয়ে পাখি-টাখি শিকার করে ফিরে গেলেই ভাল হত। কিন্তু যা জেদী তুলসী। ওকে কিছুতেই ফেরান গেল না।

হঠাৎ গুলির শব্দে চমকে যায় সীমা। হাত পিছলে যায় সুবলের। আতঙ্কিত চোখে দেখল সীমা প্রাণপণে দুহাতে দড়ি চেপে ধরেছে। কিন্তু আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে ওর সমস্ত দেহ। সুবল সবকিছু ভুলে ছুটে এসে পিছন থেকে দুহাতে জাপটে ধরল সীমাকে। সঙ্গে সঙ্গে খাদের ভিতর তীব্র আর্তনাদ শোনা যায়। তারপর সব চুপ।

—ইস! পাখিটা পালিয়ে গেল।

পিছন ফিরে তাকাল সুবল। সীমাকে ধরতে আরেকটু দেরী হলেই......। ধোঁয়া উড়ছে বন্দুকের নল থেকে। তুলসী ডান কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে সখেদে স্বগতোক্তি করল, ধেৎ! ভোর ব্যাড লাক। ওকি সীমা কোথায় যাচ্ছ?

সীমা একবার পিছন ফিরে তাকায়। দু'চোখ দিয়ে টপটপ করে...। ও যেন কিছু শুনতে পায় না। উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটতে শুরু করে।

—সীমা সীমা! তুলসী চিৎকার করে ডাকে কয়েকবার। তারপর সেও চোখের পলকে গাছের আড়ালে মিলিয়ে যায়।

সুবল হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। নিস্তব্ধতা পাকেপাকে তাকে জড়িয়ে ধরে। কয়েকবার সে তুলসীর নাম ধরে ডাকল। সীমার নাম ধরে ডাকল। প্রতি-ধ্বনি ফিরে এল তারই দিকে। সে আর কালবিলম্ব না করে তুলসী যেদিকে গেছে সেই পথে ছুটতে শুরু করে।

—কী ভাবছিস?

তুলসী ইতিমধ্যে একাই বোতলের অর্ধেক শেষ করেছে। আজ তেমন জ্যোৎস্না নেই। বারান্দায় মুখোমুখি ওরা বসেছে। ঠিক কটা বাজে আন্দাজ করতে পারল না সুবল। কাল ভোরবেলা রওনা দেবে সে। সীমা ফিরে এসে সেই যে ঘরে ঢুকেছে আর ওর দেখা পেল না। এখন একবার ওকে দেখতে চায়। ও কী এখনও কাঁদছে?

সুবল মনে মনে বলল, 'তুলসী আমি সব জানি!' এখন আর কোন শোকের চিহ্ন নেই তুলসীর চোখমুখে। লাল চোখে ও মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। সুবল তাকাতে পারছিল না। মনে হল সমস্ত শরীরে রক্ত হিম হয়ে আসছে। ছেলেবেলার বন্ধুকে সে যেন ঠিক চিনতে পারছে না।

—দুঃখ করিস না সুবল। তুই তো ইচ্ছে করে দড়ি ছেড়ে দিসনি। নিতান্ত দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি বলা যায়।

—সত্যি মাথা নাড়ল সুবল।

তথাপি মানুষ

মিহির আচার্য

বনলতা মুখস্তের মতো করে বলল, 'খবর কাগজে আপনার বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির প্রার্থী হয়ে আসছি।'

জীবিতেশ স্থির দৃষ্টিতে বনলতার দিকে নীরবে তাকালেন। সারা দেহে ক্লান্তি আর বিষাদ। চিন্তিত ভঙ্গিতে একটু হেসে উত্তর করলেন : 'বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল পত্রযোগে যোগাযোগ করতে হবে, সাক্ষাতের প্রয়োজন নেই, মনে হয় আপনি ভুলে গেছেন—'

বনলতাও হাসল। বলল, 'আমার প্রয়োজনটা এত বেশি যে দেরি করার উপায় ছিল না। বেশ তো পরীক্ষা করে দেখুন, পাশ না করলে চলে যাব।'

জীবিতেশ বললেন, 'ভেতরে আসুন।'

বনলতা ড্রয়িং রুমে পা দিল।

'কী খাবেন? কোল্ড না হট?'

বনলতা বলল : 'না, কোন কিছুর দরকার নেই। আপনার প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাগুলো এবার সেরে নিন। আচ্ছা চাকরিটা কী ধরনের, বিজ্ঞাপনে কিন্তু লেখা নেই?'

জীবিতেশ খয়েরি চুলে হাত বুলো-লেন। মেয়েটির দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকাচ্ছিলেন। চিন্তিত এবং গম্ভীর। তারপর একটু কেশে, বললেন, 'এই প্রকাণ্ড বাড়িটা আমার। অবশ্য পৈতৃক। পৈতৃক-সূত্রেই আমার সম্পদের অভাব নেই। ব্যাঙ্কের সুদের টাকাও খরচ করবার কোন কারণ পাইনে। বিধবা পিসি, চাকর রাঁধুনি, আর আমি, এই নিয়ে আমার সংসার......'

বনলতা বলল, 'এই ব্যক্তিগত সংবাদ-গুলি কী আমার চাকরির পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য?'

জীবিতেশ বললেন, 'হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারেন এই ঐশ্বর্যসম্পদ একটা স্থায়ী বন্ধনের মত মানুষকে খাটো

করে ফেলে। এর পিছনে মুক্তি নেই, আনন্দ নেই......'

বনলতা পরিহাস গোপন করে বলল, 'আপনার তো ভীষণ কষ্ট তাহলে? কোন চ্যারিটেবল প্রতিষ্ঠানে সমস্ত ঐশ্বর্য দান করে দিতে পারেন?'

জীবিতেশ বললেন, 'সে-অধিকারও আমার নেই। আমার ঐশ্বর্যের কাছে আমি বন্দী।'

বনলতা বলল, 'তা নয়। ঐশ্বর্যও থাকবে এবং তার জন্যে ক্লান্তিও থাকবে, নইলে আপনার সময় কাটবে কী করে?'

জীবিতেশ বললেন 'আপনাকে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মনে হয়। অবশ্য আপনার বাক্যবাণগুলো চাকরির পক্ষে সহায়ক হবে না। সম্ভবত ভুলে গেছেন চাকরি-দেবার মালিক আমি।'

বনলতা বলল 'আমি দুঃখিত। বলুন কী ধরনের কাজ করতে হবে। পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্ট অথবা কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ক.....'

জীবিতেশ উঠে দাঁড়ালেন। জানালার কাছে দাঁড়ালেন। তারপর ফিরে বললেন, 'পড়াশোনা কতদূর করেছেন?'

বনলতা একটু চমকে উঠে বলল, 'আমাকে বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'বি-এ পাশ করতে পারি নি।'

'বাড়িতে কে কে আছেন?'

'বাবা রিটায়ার করেছেন। আমার পরে এক বোন, ভায়েরা ছোট ইস্কুলে পড়ে।'

'তাহলে তো চাকরিটা আপনার দরকার?' জীবিতেশ বলল: 'কিন্তু আমার এ-চাকরি আপনার উপযোগী হবে না।'

বনলতা বলল, 'তার মানে আপনি ঘুরিয়ে বলছেন আমাকে আপনার পছন্দ হয়নি তাহলে...অবশ্য আমি এখনো চাকরির নেচারটা জানতে পারি নি।'

জীবিতেশ আবার চেয়ারে এসে বসলেন।

'ধরুন আপনার যখন সংসারে প্রয়োজন তখন আপনাকে আপাতত শ'তিনেক করে দিলুম।'

'কিন্তু চাকরির শর্তগুলো?'

'ধরুন তিনটে থেকে নটা পর্যন্ত আপনি এ বাড়িতে আমার কাছে থাকবেন—'

'চাকরিটা বুঝি বাড়িতেই?'

'হ্যাঁ।'

'তাতো বুঝলুম। কিন্তু আমাকে করতে হবে কী?'

'গান জানেন?'

'না।'

'আবৃত্তি করতে পারেন?'

'চালিয়ে নিতে পারি।'

'নাটক?'

'না।'

'কথা যে বেশ বলতে পারেন তা তো দেখতেই পাচ্ছি—'

'হ্যাঁ। সে প্রশংসা-পত্র আমার আছে।'

'বেশ। তাহলেই চলবে।' জীবিতেশ বললেন 'তাহলে আপনি দু-একদিন ভেবে দেখুন চাকরিটা আপনার করা সম্ভব হবে কিনা? পিসিমাকে ডেকে দেবো আলাপ করবেন?'

বনলতা বলল, 'এখন থাক। আমি ব্যাপারটা একেবারেই বুঝতে পারছিনে। আপনি কী বলতে চান আপনাকে তিনটে থেকে নটা সঙ্গদান করাই আমার চাকরি?

জীবিতেশ বললেন, 'হ্যাঁ তাই।'

বনলতা এবার রেগে উঠে দাঁড়াল। 'আপনাদের মত লোকেদের আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে এই ধরনের ভদ্রলোকদের কাহিনী শোনা যায়। মেয়েদের অসহায়ের সুযোগ নিয়ে...। আপনারা গোটা সমাজের কলঙ্ক, ভদ্রবেশী ইতর......'

জীবিতেশ স্তব্ধ হয়ে বললেন, 'আমি আগেই বলেছিলাম এ-কাজ আপনার করা সম্ভব হবে না। বেশ তো, ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো আপনাকে চাকরিটা নিতে হচ্ছে না।'

'এটা একটা চাকরি? আপনার মত একজন সম্ভ্রান্ত যুবক অভাবী মধ্যবিত্ত মেয়েদের সঙ্গ চাইছেন। তার অর্থটা কী হল? বাইরে দশজনের কাছে মেয়েটার কী পরিচয় হবে? একজন মিসট্রেস ছাড়া কী ভাববে তাকে? আপনার ক্ষমতা আছে বলেই আপনি দুঃস্থ মেয়েদের অপমান করতে পারেন না। মেয়েদের সঙ্গই যদি দরকার তবে বিয়ে করেন নি কেন?'

জীবিতেশ বললেন, 'আপনি যখন চাকরিটা নিচ্ছেন না তখন এ সকল আলোচনার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখিনে।'

বনলতা বলল, 'অসুস্থ হলে লোকে নার্স রাখে। আপনাকে তো মোটেই অসুস্থ মনে হয় না।'

জীবিতেশ বললেন, 'আমার এই বিষাদ কাউকে বোঝাতে পারব না। আচ্ছা আপনি এখন আসতে পারেন।'

বনলতা বলল, 'আপনার কী মনে হয় এই শর্তে কোনো মেয়ে রাজি হতে পারে চাকরি করতে? কোনো ভালো মেয়ে...'

'দেখি। বিজ্ঞাপন তো দিয়েছি।'

'পাবেন না। এ দেশটা এখনো বিলেত হয়নি।'

বনলতা নমস্কার না-করে বেরিয়ে গেল।

রাস্তার মোড়ে শুভময় অপেক্ষা করছিল।

বলল, 'ইন্টারভিউ কেমন হল?'

বনলতা বলল, 'আগে একটু চা খাই। ঈশ্, প্রথম চাকরির ইন্টারভিউতে এসে যা অভিজ্ঞতা হল।'

সব শুনে শুভময় বলল, কত বয়েস হবে জীবিতেশবাবুর?'

'কে জানে চল্লিশের বেশিই হবে। আশ্চর্য, কোনো ভদ্রলোক একজন মেয়েকে যে এ ধরনের প্রস্তাব করতে পারে! অথচ দেখে যথেষ্ট সভ্য শিক্ষিত বলেই মনে হয়।'

শুভময় বলল, 'না, আমি ভাবছিলাম—'

'কী?'

'তোমাদের যখন ভীষণ টাকার দরকার...'

'বা। তার মানে এই শর্তে? তারপর তুমিই আমাকে বিশ্বাস করতে?'

'বিশ্বাসটা নিজের কাছে।'

'না বাবু, আমার অত বিশ্বাস নেই। আমি তো একজন মেয়ে...'

'না বলছিলাম, সেই রকম পরিস্থিতি দেখলে...'

'তা হয় না। আমি দশজনের কাছে চাকরির কথা কী বলব? তারা আমাকে সন্দেহ করবে। দ্যাখো আমাকে সত্যি ভালোবাসলে ওসব জায়গায় আমাকে দ্বিতীয়বার যেতে বলবে না।'

'তিনটে থেকে নটা, তারপর অজস্র স্বাধীনতা। তাছাড়া বাড়িতে পিসিমা আছেন। বাইরে তো আর ওঁর সঙ্গে বেরোতে হচ্ছে না।'

'তুমি কী বলতে চাও?'

'না, আপাতত সংসারের কথাটা ভাবতে হবে। সামনের মাসে ভায়েদের ইস্কুলের অনেকগুলো টাকা দিতে হবে। মার হার্টের অসুখ।'

'তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ।'

'ভয়টা কী অমূলক?' শুভময় চিন্তিত হাসল। 'আমি বলছিলাম, সাময়িক একটা প্রতিরোধ...তারপর ভালো একটা চাকরি পেলে...'

বনলতা বলল, 'তুমি আমার ওপর বড় বেশি দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছ। তারপর কিছু হলে...'

শুভময় হাসল। 'আমি তোমাকে জানি।'

(২)

জীবিতেশ বললেন, 'আসুন। চাকরির কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

বনলতা হাসল। 'না, অসুবিধে কিসের?'

'কালকে ইনকাম ট্যাকসে অনেক দেরি হয়ে গেল। বুঝতে পারছিলাম, আপনি তিনটে থেকে এসে বসে আছেন! এরপর যেদিন আমার ফিরতে দেরি হবে পিসিমাকে বলে চলে যাবেন। না না আমি কিছু মনে করব না। আমি না থাকলে আপনার কাজও নেই।'

বনলতা বলল, 'নতুন চাকরি তো। স্বাধীনতা নিতে ভয় করে।'

জীবিতেশ বলল, 'না, ভয় করবেন না। জানি আপনাকে আমার যতই প্রয়োজন থাকুক আপনার পক্ষে সেটা নীরস চাকরিই মাত্র! আমার সবদিকে বিবেচনা আছে, কেমন তাই না?'

বনলতা হাসল শুধু।

'আপনার মা এখন কেমন আছেন?'

'একটু ভালো।'

'পি জি-তে আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছেন—'

'দরকার হলে বলব আপনাকে।'

'বলবেন। দেখুন, গোধূলির আকাশটা কী বিচিত্র হয়ে উঠেছে। প্লিজ,

সওয়ায়তাটা টেনে নিয়ে আসুন। কী যেন লাইনগুলো?

তারপরে যেয়ো তুমি চলে
ঝরাপাতা দ্রুতপদে দলে
নীড়ে-ফেরা পাখি যবে
অস্ফুট কাকলি রবে
দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে।

তারপর কী বনলতা?'

বনলতা মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করল:

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে,
সমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান
মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে
বিদায়ের বাণী।।

জীবিতেশ বললেন, 'তুমি এসে, তোমাকে তুমিই বলছি কিছু মনে কোরো না, আমার মতো ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তুলেছ। আমার যা কিছু প্রিয় অনুভব তার যেন নতুন করে স্বাদ পাচ্ছি।'

বনলতা বলল, 'আপনি রবীন্দ্রনাথ এত ভালোবাসেন জানতাম না।'

জীবিতেশ বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের অনেকটি কবিতা আমার ভালো লাগে।'

বনলতা বলল, 'জানি।'

জীবিতেশ হাসলেন। 'তুমি এইভাবে সব কিছু জেনে ফেলে আমাকে তোমার ওপর বেশি নির্ভরশীল করে তুলছ।'

'বারে, আমার তো এইটেই চাকরি।'

'আচ্ছা চাকরি-শব্দটার ওপর তুমি এত জোর দাও কেন বলো তো?'

'ভুলে গেলে তো কাজ পাবেন না। ঠিক দেবো।' বনলতা হাসল।

'আচ্ছা?' জীবিতেশ খয়েরি চুলে হাত বুলোতে লাগলেন।

এবং সেই মুহূর্তে বনলতা দেখল জীবিতেশের মুখের ওপর বিষাদ আর শান্তির রঙ।

'কী ভাবছেন?'

'না। কিছু না।'

'আপনি আবার ভাবতে শুরু করলে আমার চাকরি-রাখা দায় হবে।'

'আবার চাকরি!'

'বলব না?'

'না।'

'আচ্ছা।'

জীবিতেশ বললেন, 'অনেকদিন পর সেদিন যখন তুমি টলস্টয়ের 'ক্রয়েটজার সোনাটা' ছোটো উপন্যাসটা পড়ে শেষ করলে তার ফলশ্রুতি কদিন ধরে আমাকে আবিষ্ট করে রেখেছে। ফিজিকাল লাভের ওপর এমন শক্তিশালী উপন্যাস বেশি লেখা হয়নি। ইদানীং যাঁরা লিখছেন তাঁরা সেক্সের উত্তেজনা সংক্রামিত করছেন, শিল্পীর নিরাসক্তি সে সব রচনায় নেই।'

'আপনি হ্যারল্ড রবিনসের রচনার কথা বলছেন? আমার ভালো লাগে না।'

জীবিতেশ হঠাৎ থেমে জিগ্যেস করলেন, 'বনলতা, তুমি কখনো প্রেমে পড়েছ? তুমি লজ্জা পেলে অবশ্য এ-প্রসঙ্গ থাক।'

'না, লজ্জা পাইনি।'

'প্রেম একটা ঐশ্বর্য, একটা...' জীবিতেশ জানালার দিকে চোখ রাখলেন: 'আমি একজন মানুষকে জানি, সে অনেক-অনেক আগের কথা, সবটা মনে নেই, ভুলে গেছি...। বনলতা, তুমি শুনছ?'

'হুঁ।—'

'শুধু ঠিক সময়ে, উপযুক্ত লগ্নে প্রেমকে প্রকাশ করতে পারল না বলে মায়া আরেকজনকে বিয়ে করে বসল। হ্যাঁ মায়াই মেয়েটির নাম। বিয়ের পর সে একটি মাত্র চিঠি লিখেছিল যুবকটিকে। বোধহয় প্রকাশ তার নাম, কী জানি বানিয়ে বললাম না তো। মায়ার স্বামী চিঠিটার ব্যাপার জানত এবং ঈর্ষা ইত্যাদি দ্বারা পীড়িত হয়ে সে একদিন আত্মহত্যা করে বসল।'

'তারপর কী হল?'

'না, মায়া প্রকাশের কাছে ফিরে এল না। বাস্তবে ফিরে আসাও যায় না বোম্বাইয়ের সিনেমায় সুনেত্রা না কী নাম নায়িকার, সুনেত্রাই মায়া...'

'আশ্চর্য।'

'তার চেয়েও আশ্চর্য প্রকাশ-নামক যুবকটি আজো বিয়ে করল না।'

'বোকামি।'

'হ্যাঁ পৃথিবীতে এই ধরনের বোকারাও আছে। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও বয়েস বাড়ে, অজস্র ঐশ্বর্য আর আনন্দহীন বিষাদের শিকার হয়।'

বনলতা বলল, 'এমন একটা বাজে কারণে কেউ জীবনটাকে নষ্ট করে দিতে পারে না।'

'তুমি হলে কী করতে?'

'বোধহয় বোকামিকে পাহারা দিয়ে প্রেতের মতো বসে থাকতাম না।'

জীবিতেশ বললেন, 'আমিই সেই প্রকাশ।'

বনলতা বলল, 'আমি আগেই বুঝেছিলাম।'

'তুমি যেন উশখুশ করছ? কটা বেজেছে? কোনো কাজ আছে বুঝি?'

'না, কাজ কী।' বনলতা সাবধানে অধৈর্যকে গোপন করল।

'একেক সময় হৃদয় প্রকাশ হয়ে পড়ে, আমি জীবিতেশ...'

ঘড়িতে নটার সংকেত।

'দেখেছ কথায়-কথায় নটা বেজে গেল। চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আজ রাস্তায় কী-একটা গণ্ডগোল হয়েছে। তোমাকে একা ছেড়ে দিতে পারিনে।'

'না, দেখুন আমি একাই যেতে পারব।'

'আমার গাড়িতে যেতে তোমার আপত্তি আছে?'

'না, দেখুন, আমি, আমার—'

'বেশ তো। গলির মোড়েই তোমাকে নামিয়ে দেবো। মনিব হওয়ার অনেক অসুবিধে আছে আমি জানি।'

বনলতা গাড়িতে বোকার মতো বসে রইল।

(৩)

শুভময় রাগ করে বলল, 'এটার কী মানে হল? আমি সাড়ে নটা পর্যন্ত হলের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে। শেষ পর্যন্ত টিকিট বিক্রি করে দিতে হল?'

বনলতা বলল, 'রাগ কোরো না। আগে আমার কথা শোনো।'

'কী শুনব? আমি বেশ লক্ষ্য করছি তুমি আজকাল আমাকে যথেষ্ট অবহেলা করছ।'

'এসব তোমার বানানো। তোমাকে অবহেলা করে আমি কী স্বর্গরাজ্য পাবো? আসতে পারিনি রাগ করেছ, আমার অপরাধের জন্যে শাস্তি দাও, কিন্তু ভুল বুঝো না।'

শুভময় গুম হয়ে রইল।

'জীবিতেশবাবুর পাড়াতে একটা স্ট্যাবিং হয়েছিল, তিনি আমাকে কিছুতেই একা ছেড়ে দিলেন না। ওঁর গাড়িতে আমাকে পৌঁছে দিলেন।'

'তাই বলো? তার মানে আমি যে অপেক্ষা করে থাকব, সেইটে কিছু নয়?'

'বারে।'

'উপকারী হিতৈষীকে বললে না কেন হলের সামনে পৌঁছে দিতে?'

সেইটে উচিত ছিল। পারিনি লজ্জায়।'

'কেন? তোমার প্রেমিক আছে সেইটে ওঁকে গোপন করতে চাও?'

'অবশ্যই তোমার কথা ওঁকে বলবার কোনো কারণ দেখিনি।' বনলতা এবার চটল।

'তোমার চাকরিটা থাকবে না এই ভয়ে?'

'কী অসভ্যের মতো কথা বলছ? আমি বুঝতে পারিনি তুমি সামান্য ব্যাপারটাকে এইভাবে নেবে। বুঝতে পারিনি তুমি হিসেব করে ভালোবাসো। অন্তত তুমিও যদি এমন অবুঝ হও তাহলে...'

'নটার পরে তোমাকে আটকাবার কোনো অধিকার জীবিতেশবাবুর নেই।'

'আটকাবেন কেন?'

'বললেই হল: ভীষণ বৃষ্টি হয়েছে, পথঘাট ভেসে গেছে আজ রাত্তিরে এখানেই থাকো।'

'তোমার ইঙ্গিতগুলো কুৎসিত। নিজেকে এত নোংরা কোরো না।'

'তাহলে তো এখন তোমার সঙ্গে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্টই করা যায় না।'

'কোরো না।'

× × ×

'এখন থেকে এই যদি ঘটতে থাকে...'

'বেশ তো। কী করব বলো?'

'চাকরি ছেড়ে দাও।'

'তা হয় না।'

'তাই বলো চাকরিটাকে তুমি ভালোবেসে ফেলেছ?'

'কাজ করতে-করতে মায়া পড়ে ঠিক। তোমার চাকরিকে তুমি ভালোবাসো না?'

'আমার আর তোমার চাকরি!'

বনলতা চিন্তিত হল।

'আমার মনে হচ্ছে তুমি কেমন হয়ে যাচ্ছ। তুমি কী জীবিতেশবাবুকে ঈর্ষা করতে শুরু করলে? আমাকে এত চিনেও?'

শুভময় বলল, 'ঈর্ষা হতেই পারে।'

'বেশ তো। চলো একদিন, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

'কেন? আমি কী ওঁর চাকরি করি? আমার কোনো দায় পড়েনি।'

'তাহলে...?'

শুভময় ততোধিক গম্ভীর।

'এই শোনো, খোকার মতো রাগ কোরো না। বেশ তো আমি ক্ষতিপূরণ করব। কাল নয় পরশু সমস্ত দিন আমি তোমার সার্ভিসে থাকব। সকালে বেরিয়ে যাব, ঘুরব-বেড়াব, বাইরে খাবো, তারপর তুমি ক্লান্ত হয়ে গেলে আমাকে ছুটি দিও।'

'পরশু দিন জীবিতেশবাবুর ওখানে যেতে হবে না?'

'না উনি দিল্লি যাচ্ছেন।'

'তাই বলো। ওঁর অনুগ্রহে একদিনের স্বাধীনতা?'

'মন্দ কী? তুমিই তো শিখিয়েছিলে : স্টোলেন কিসেস আর প্রেশাস—'

'না, এই অনুগ্রহের কোনো দরকার নেই।'

বনলতা ব্যাগ কাঁধে তুলে নিল। মার ওষুধ কিনে নিয়ে যেতে হবে। আমি চললাম।'

শুভময় গজগজ করে বলল, 'তাতো যাবেই। আমার কাছে এসে তোমার অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।'

বনলতা অধিক গম্ভীর হল, ঠোঁট চেপে সে কী একটা উচ্চারণ আটকাল। পাশ থেকে ওর ছোট্ট কপাল, ঠোঁট কিশোরের মতো অসহায় দেখাচ্ছে। শুভময় সহসা আন্তরিক বেদনা বোধ করল ওর জন্যে।

বলল, 'চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। থেকে কী করব। আমি যতক্ষণ থাকব তুমি বাজে কথা বলবে।'

'আমার দিকটা তুমি ভেবে দেখছ না।'

'আমি আর ভাবতে পারছিনে। সকলের কথাই আমি ভাবব। আমার জন্যে কে ভাববে। এই মেয়ে-জন্মটাই—'

'আর কিছু বলব না। বোসো।' শুভময় ওর হাত ধরল।

'এখন বলবে না। আমি চলে গেলেই আবার ভাবতে বসবে। আমাকে তোমার প্রয়োজন মতো যতই পাবে না, তুমি জটিল হবে। বাঁচবার ইচ্ছেটা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই সংসারটা প্রতিনিয়ত আমাদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এই বোঝা ঠেলে জানিনে কবে কোনদিন...হয়তো এইভাবেই একদিন—'

× × ×

(৪)

'বনলতা, তুমি কী অসুস্থ?'

'কই না তো।'

'কিছুদিন থেকে তোমাকে কেমন শুকনো, অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।'

বনলতা হাসল।

'মার খবর ভালো তো?'

'ভালো আছেন।'

'তাহলে বোধহয় আমারই ভুল।' জীবিতেশবাবু হাসলেন : 'সেদিন কেন মনে হল—তোমাকে পালুশকরের ভজন বাজাতে বললুম, তুমি বাজালে বড়ে গোলাম আলির 'আয়ে না বালম...'

বনলতা লজ্জিত হল। 'আমার ভুলটা আপনি ধরিয়ে দিলেন না কেন?'

'কী জানি, ভাবলুম ওই গানটাই তোমার প্রিয়। অন্যের ভালো লাগার ওপর সব সময় হাত দেয়া যায় না।'

বনলতা গম্ভীর হয়ে বলল, 'কথাটা অনেকদিন থেকে বলার ইচ্ছে ছিল। আপনি সুযোগ করে দিলেন, তাই...। মনে হচ্ছে আমার ভুলগুলো ক্রমশ আপনার চোখে আরো বিশ্রীভাবে ধরা পড়বে। বোধহয় আমি আপনাকে কাজ দিতে পারছিনে।'

জীবিতেশবাবু বললেন, 'আমি কিন্তু অভিযোগ করিনি বনলতা। তাহলে তোমাকে বলতুম না।'

'কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি, আমি কাজের যোগ্য হতে পারছিনে।'

'তার মানে তুমি কাজ ছেড়ে দিতে চাইছ? তাহলে তোমাকে আটকাবার কোনো অধিকার আমার নেই। কী জানো, এতদিন পরে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে, আমার স্বভাবের সঙ্গে—'

বনলতা চুপ করে রইল।

'আমার সেদিনই সন্দেহ হয়েছিল, যেদিন পিসিমার অনুরোধ ঠেলে তুমি চিকনের শাড়ির প্যাকেট গ্রহণ করলে না। তুমি ঠিকই বুঝেছিলে দিল্লি থেকে ফেরার পথে আমার বন্ধুটির সঙ্গে লখনৌয়ে নেমেছিলুম, উনি বাড়ির মেয়েদের জন্যে শাড়ি কিনছিলেন, আমার দুটো পছন্দ হয়ে গেল। জানি আমার কাউকে দেবার নেই। তবু কিনেছিলুম। মিথ্যে কথা বলব না, তোমার কথা মনে করেই।'

বনলতা চুপ করে থেকে ছোট্ট করে বলল, 'আমি আপনার উপহার নিতে পারিনে।'

জীবিতেশবাবু বললেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি। আমারি ভুল হয়েছিল। আমার আবেগটাই বড় কথা নয়, অন্যের গ্রহণ করবার ক্ষমতাটাও ভাবতে হয়।'

'আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'না ভুল বুঝিনি। আমার অহংকারই বলতে হবে, ঐশ্বর্যের বোকামি আর কী! ভেবেছিলাম আমার টাকা থাকাটাই অন্যকে উপহার দেবার ক্ষমতা। এখন দেখছি আমি তোমাকে প্রকারান্তরে অপমানই করতে চেয়েছিলাম। দুটো শাড়ি কেনার পিছনে তোমার বোনের কথাও আমার মনে উদয় হয়েছিল।'

'সে কথা থাক।'

'হ্যাঁ। থাক। দক্ষিণের জানালাটা খুলে দাও তো। এটা কী মাস?'

'জ্যৈষ্ঠ।'

'এখনো বৃষ্টির দেখা নেই।'

বনলতা জানালায় দাঁড়িয়ে রইল।

'সেদিন শেয়ালদায় দেখলুম : করপোরেশন কলেরার টীকা লউন'-এর বোর্ড পালটে 'নজরুল জন্মদিবস পালন করুন' ঝুলিয়েছে। তুমি দেখেছ?'

'না।'

'আমার নজরুলের রেকর্ডগুলো পুরনো হয়ে গেছে। গ্রামোফোন কোম্পানী কী নতুন রেকর্ড কিছু বের করেছে?'

'খবর নেবো।'

'নিও।' জীবিতেশবাবু বারান্দার গাছের নীচে এগিয়ে গেলেন : 'কী জানো, আমার কাউকে যদি কিছু দেবার না থাকে তাহলে আমি বাঁচব কী করে!'

বনলতা ওঁর স্বগতোক্তি শোনবার চেষ্টা করল না।

জীবিতেশবাবুর চুলে বাতাস খেলে যাচ্ছে। মাধবীলতা হাওয়ায় দুলছে। অস্ত একটা গোল চাঁদ মাথার ওপরে।

'গেল-মাসে বাথরুমে পড়ে গিয়ে কোমরে ভীষণ চোট পেয়ে কিছুদিন শয্যাগত রইলুম। বনলতা...?'

'শুনছি।'

'সে-দিনগুলোতে তোমার মুখে একটা উদবেগ অশান্তি লক্ষ্য করেছিলুম। না, আমাকে বলতে দাও। আজ আমাকে কথায় পেয়েছে। তুমি সকালে-দুপুরে আমার খোঁজ নিতে এসেছ। একদিন মাথায় বেশ যন্ত্রণা হচ্ছিল, যতদূর মনে পড়ে তুমি আমার শিয়রে বসে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলে...'

শ্বাসরোধ করে বনলতা কোনোরকমে বলল, 'সেটা আমার কর্তব্য।'

জীবিতেশবাবু কঠিন গলায় বললেন, 'না, এগুলো তোমার চাকরির শর্ত ছিল না। তবে কেন করেছিলে?'

বনলতা রক্তের ভেতরে অসহায় কাঁপুনি বোধ করছিল। 'আমি কিছু ভেবে..'

'তোমার এই বাড়তি উদবেগগুলোর জন্যে যদি আমি কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিতে চাই, তুমি নেবে?'

'আপনি কী বলছেন!'

জীবিতেশ ক্লান্ত হাসলেন। 'তাহলে এমন কিছু আছে সংসারে যাকে স্থূল মূল্য দিয়ে বাঁধা যায় না।'

'আপনি আমাকে আশার অতিরিক্ত দিচ্ছেন।'

'একথা কী আমাকে বোঝাবে আমাদের পরস্পরের এই আর্থিকতার প্রসঙ্গটা সর্বদাই গলা উঁচু করে থাকে? আমার যদ্দুর মনে পড়ে সেই অসুস্থ অবস্থায় তোমার প্রাপ্যটুকু সময়মতো দিতেও আমার ত্রুটি হয়েছিল। এবং পরে আমি মনে না করলে তুমি নিজে থেকে কখনো চাইতেও না।'

'আমি...আপনাকে—'

'তাই বলছিলুম শেষপর্যন্ত মানুষ তার মানবিক গুণগুলো পরম বিত্তের মতো রক্ষা করে চলে।'

'একথা এখন থাক।'

'হ্যাঁ থাক। মানুষই মানুষের জন্যে

তো পারে। মানুষের হাতের দর্পণটা অনেক বড়। তাই ছোট্ট এক টুকরো প্রেমের আবেগের স্ফুলিঙ্গ থেকে পবিত্র হোমানল জ্বলে ওঠে। তার নাম স্বদেশপ্রেমই হোক কী বিশ্বপ্রেমই হোক, একই কথা।' জীবিতেশবাবু বাইরে উৎকর্ণ হয়ে কী শুনতে চাইলেন। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রেডিয়োগ্রামটা খুলে দাও তো। সেতার বাজছে মনে হচ্ছে।'

সন্ধ্যার এলোমেলো বাতাস সেতারের আলাপকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগল।

(৫)

বনলতা উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল: 'আমি কিছু বুঝতে পারছিনে, কিছু ভাবতে—'

শুভময় বিস্মিত হল। বনলতার মতো স্থির সংযত মেয়ে এমন একটা ভাবের বন্যায় ভেসে যেতে পারে, সেইটেই অদ্ভুত আশ্চর্যের। তার এই তরুণ আবেগের প্রচণ্ডতায় বোবা হয়ে গেল শুভময়।

বনলতা অশান্ত মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'আমাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। ছায়ার সঙ্গে মনগড়া লড়াই করা যায় না।'

শুভময় আস্তে বলল, 'সংসারে অনেক জিনিসই দুর্বোধ্য। একজন মানুষে সব জেনে ফেলবে তা হতে পারে না। বুদ্ধিমান মানুষ জানবার চেষ্টা না-করে তা পরিহার করে।'

'তুমি কী করতে বলো?'

'জীবন এমনিতেই জটিল, তাকে আর জটিলতর কোরো না। চাকরি ছেড়ে দাও।'

'দিলাম। তাতে কী আমি নিরাপদ হব, নিশ্চিন্ত হব? আমার নিজের পরে আর বিশ্বাস নেই। চাকরি ছাড়ার পক্ষে আমাকে একটা নির্দিষ্ট যুক্তি খুঁজে বার করতে হবে। না হলে নিজের কাছেই ছোটো হয়ে যাব। জীবিতেশবাবু অসৎ নন, তাহলে একটা অজুহাত পেতাম। আবার তিনি সৎ কিনা সে প্রশ্নেরও জবাব অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি আমাকে অধীনস্থ কর্মচারী ভাবেন যদি তাহলে এই অযাচিত উপহারের আনন্দগুলো কেন? আমার এক সময় মনে হয় আমি একটা অরণ্যে অজান্তে ঢুকে পড়েছি, বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছিনে।'

শুভময় বলল, 'পৃথিবীতে শক্তিমান এইভাবেই দুর্বলকে আচ্ছন্ন করে।'

বনলতা বলল, 'কিসের শক্তি?'

'বোধহয় ব্যক্তিত্বের। একটা প্রতিষ্ঠিত শক্তির ছায়ায় আমরা স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।'

'সম্ভবত তাই হবে।' বনলতা চিন্তিত হল। 'তাহলে চাকরিটা ছেড়ে দিই?'

'দাও'

'জীবিতেশবাবু আমাকে ভুল বুঝবেন, অন্যরকম ভাববেন। মনে করবেন, আমি অতি সস্তা সাধারণ মেয়ে, আমার লোভ কামনা...'

'গরিব মানুষের লোভ কামনা থাকতে পারে, সুখ কে না চায়?'

'এ নিয়ে পরে তুমি আমাকে কটাক্ষ করবে না, আমাকে ভুল বুঝবে না?'

'না। জীবনধারণের দায় প্রতিনিয়ত আমাদের উদ্বাস্তু করে তুলছে, এই জাতীয় মনোবিলাস রচনার সময় কোথায়।'

'দেখি ভেবে দেখি।'

'দ্যাখো।' শুভময় চায়ের বাটি এগিয়ে দিল। হেসে বলল, 'আমাদের মতো নিম্নবিত্ত মানুষেরা সমাজের কাছে কিছু কিছু সুবিধে পেয়ে আসছি। তা কেরানী-গিরি হোক, অধ্যাপনা হোক, মাস্টারিই হোক। বছরে বছরে মাইনে বাড়া কী ভাতা-বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি আছে। এই মোলায়েম সুখ আমাদের সহজেই অনায়াস বড় সুখের অভিমুখী করে। এইটেই ঘটনা।'

বনলতা চুপ করে রইল।

শুভময় আবার বলল, 'তোমার পরিবর্তনের ভঙ্গিটুকু আমি লক্ষ্য করছিলুম। প্রথম প্রথম রেগে উঠতাম, পরে দেখলাম এই রাগগুলো আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। আমি নিঃশব্দ উদাসীন হয়ে গেলাম। আমার কিছু করার ছিল না, আমার অভিমান-গুলো আমাকে কিছু করতে বাধা দিয়েছিল। জানিনে ফল ভালো হয়েছে কী খারাপ হয়েছে। তবে আমি প্রেমের কর্তৃত্ব ফলাইনি, এইটেই আমার সান্ত্বনা।'

বনলতা বলল, 'আমাকে চাকরিটা ছেড়ে দিতেই হবে। আবার আমাকে চেষ্টা করতে হবে, যতদূর তোমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছি আবার সেখানে ফিরে আসতে হবে। না হলে আমি, আমরা কেউই সহজ হতে পারব না।'

শুভময় বলল, 'আমি অপেক্ষা করব।'

বনলতা বলল, 'কোরো।'

(৬)

বনলতার পত্রাংশ:

যেটা চিঠি মারফত অথবা টেলিফোন-যোগে হতে পারত তা না করে আমি নিজেই কেন আবার গেলাম তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব না। বোধহয় মেয়েলি কৌতূহল, দেখি না মুখের ভাব কী হয়! এই অতিরিক্ত কৌতূহলগুলিই মেয়েদের স্বভাবের একটা প্রচণ্ড রকমের মূঢ়তা।

অবশ্য গিয়ে একদিক দিয়ে আমি জীবিতেশবাবু সম্পর্কে নিঃসন্দেহ রকমের নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি। অবশ্য তোমার কাছে স্বীকার করতে আর সংকোচ করব না যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে আমাকে দাম দিতে হয়েছে। এর ফলে জীবিতেশ-বাবু সম্পর্কে আমার মনে যে একটা স্থায়ী ইমেজ আঁকা ছিল সেটা চিরদিনের মতো নষ্ট হতে পেরে আমি এখন নিরুদ্বেগ বোধ করছি। এবং তোমার অত্যধিক শুচিতাবোধ না থাকলে বিশ্বাস করি এর দ্বারা আমার তোমার কাছে আসা নির্ভার ও সহজ হয়েছে।

এখন মনে হচ্ছে আমি এরকম একটি ঘটনার প্রত্যাশী ছিলাম। অন্তত ওর এই অরণ্যের দুর্জ্ঞেয়তার রহস্যটা ভেঙে পড়ুক। তা না হলে জীবনভর একটা রহস্যের ভার আমাকে বহন করতে হত। এবং আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বাধাহীন স্বচ্ছ হত না।

তাহলে ঘটনাটা বিশদ করেই বলি।

আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম ওঁর ড্রয়িংরুমে। জীবিতেশবাবু কী একটা বিলিতি জার্নালে মুখ ডুবিয়ে ছিলেন। বোধহয় আমার পদশব্দ শুনেছিলেন, কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখালেন না।

আমি কিছুক্ষণ জানালা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি ঘামছিলাম অকারণ, ছোটো ছোটো উত্তেজনা আমাকে কেমন অস্থির করে তুলছিল।

তারপর কখন জানিনে জার্নাল সরিয়ে তিনি আমার দিকে চেয়েছিলেন।

আমি একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বললাম, 'আমি কথাটা জানাতে এসেছি।'

জীবিতেশ কিছু উত্তর করলেন না। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পদচারণা শুরু করলেন। ওঁর চোখের তারা দুটো কেমন বাতির আলোকে হীরের মতো ঝকমক করছিল, হাতের আঙুলগুলো যন্ত্রণার মতো ভেঙেচুরে যাচ্ছিল। কথা বলছিলেন না, অথচ সরব চিন্তার মতো ঠোঁট দুটো নড়ছিল।

তারপর এক সময় তিনি আমার পিছনে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর উষ্ণ নিশ্বাস আমার কাঁধের ওপর পড়ছিল। আমি নড়তে পারছিলাম না। কিংবা আমার নড়বার আগ্রহটুকু তখন মরে গিয়েছিল।

আমি ওঁর চওড়া কবজির ভারি স্পর্শ আমার খোলা কাঁধের ওপর অনুভব করলাম। আমার সর্বশরীর গলগল করে ঘামছিল। আমার চোখ জ্বালা করছিল। মাথাটা মনে হচ্ছিল ভারি সীসের মতো।

হঠাৎ শক্ত বাহুর আকর্ষণে তিনি আমার স্থির অস্তিত্বকে ওঁর দিকে ফিরিয়ে আনলেন। আমি ওঁকে দেখতে পারছিলাম না। একটা আরক্ত অন্ধকার আমার দৃষ্টিশক্তিকে অন্ধ করে ফেলেছিল।

শেষ মুহূর্তে আমার মনে হল কী-একটা আগুনের শিখার মতো ক্ষিপ্র গতিশীল জিঘাংসা আমাকে বিদ্যুতের মতো জ্বালিয়ে দিল। পলকে মনে হল আমার পা দুটো মেঝের নেই মাত্রের মতো লগুভার হয়ে শূন্যে দাপাদাপি করছে। আর, বড়রকমের একটা পতনের হাত থেকে পরিত্রাণের জৈবিক তাড়নায় আমি নখ দিয়ে প্রতিপক্ষকে আঁকড়ে ধরেছি।

ম্লানায়মান ঘরে কোচের ওপর জীবিতেশবাবুর অন্ধকারে ঢাকা স্থির দেহ। প্রাণহীন রক্তহীন শবের মতো।

আর আমি জানালার গরাদ মুঠোতে চেপে বুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে।

অনেকক্ষণ পর আমি বললাম: 'চললাম।' তারপর নিজেকে টেনে সিঁড়ি বেয়ে নীচে মাটির কাছাকাছি নেমে এলাম।

আদি বাঙালী খৃস্টান সমাজ

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
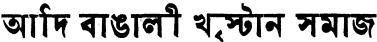
১৭৮৭ খৃস্টাব্দে জনৈক মিশনারি লিখছেন, 'আউট অফ টেন মিলিয়ন নেটিভস্ উই নো অফ নো খৃস্টান।' তাই বলে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি মিশনারিরা। প্রথম খৃস্টান হল ১৮০০ খৃস্টাব্দে। এই বারো বছর মিশনারিদের আশা উদ্দীপ্ত রেখেছিলেন রামরাম বসু। এই অধ্যায়ে প্রথম খৃস্টান হবার দুর্নিবার প্রলোভন ও প্রায় অপ্রতিরোধ্য পারিপার্শ্বিক চাপ বিশেষ দক্ষতা ও সতর্কতার সংগে পাশ কাটিয়ে গেছেন তিনি। খৃস্টান হলে যে সাংসারিক লাভের সম্ভাবনা ছিল তা তিনি ষোল আনাই আদায় করে নিয়েছেন। ভাগ্যান্বেষী যৌবনে একথা তিনি বেশ পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে, মিশনারিদের মন জুগিয়ে, আর—খৃস্টান হব-হব ভাবটা বজায় রেখে চলতে পারলে আখেরে ভালই হবে এবং তা হয়েওছিল। তিরিশ বছর বয়সে মিশনারি জন টমাসকে বাংলা পড়াবার কাজ জুটে গেল রামরামের, ছাত্র আসলে তংখাদাতা প্রভু, চাকরি পাকা করার কৌশল হিসেবে মোক্ষম অন্তর টিপুনি দিলেন তিনি, টমাসের আশা হল রামরাম বসুই হবেন আদি বাঙালী-খৃস্টান। নইলে তার প্রার্থনার উত্তরে যীশু তাকে দর্শন দেবেন কেন? আর তখনই খৃস্ট-মহিমার সেই বিখ্যাত স্বরচিত সঙ্গীতের পাণ্ডুলিপি দেখালেন টমাসকে।

'কে আর তারিতে পারে
লর্ড জিজস্ ক্রাইস্ট বিনা গো—
পাতক সাগর ঘোর
লর্ড জিজস্ ক্রাইস্ট বিনা গো।

রামরাম বসুকে যীশুর দর্শনদান বৃত্তান্ত নিতান্তই অলীক সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। এমনি করে নানা অসত্য ও অর্ধসত্য গল্প কথা বলে মিশনারিদের মনে তার ধর্মান্তর গ্রহণের সম্ভাবনাকে তিনি মাঝে মাঝে উজ্জ্বল করে তুলতেন। উদ্ধৃত সঙ্গীতাংশ উভয় অর্থেই প্রভু-বন্দনা।

জন টমাস যেই বিলেতে পাড়ি দিলেন অমনি শিকেয় উঠল বসুরাজের খৃস্ট-ভক্তি; স্বধর্মে মতি হল, স্ব-সমাজে গতি।

১৭৯৩-এ আবার এদেশে এলেন টমাস, সঙ্গে উইলিয়ম কেরি। স্বভাবতই খোঁজ পড়ল রামরামের। টমাস দেখলেন তার অবর্তমানে রঙ বদলেছেন রামরাম, ডুবেছেন নেটিভদের কুসংস্কারে। মিশনারিদের ধৈর্য অসীম, আশা বিস্তর; সুতরাং সেই বছরই কেরি সাহেবের মুন্সি নিযুক্ত হলেন রামরাম বসু, বেতন মাসে এক কুড়ি টাকা, সেকালের হিসেবে এক কাঁড়ি টাকা। কেরি সাহেবের নিত্যসহচর হিসেবে ঘুরতে ঘুরতে মালদার মদনাবতী গাঁয়ে এলেন রামরাম। বছর দুয়েক যেতে না যেতেই এক তরুণী বিধবার প্রণয়ঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়লেন তিনি। তার দ্বারা বিধবাটির একটি সন্তান হয়েছিল, প্রসবের পরেই শিশুসন্তানটিকে গোপনে হত্যা করেন রামরাম। এই জঘন্য অপরাধের জন্য মিশনারিদের আশ্রয় ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হন তিনি।

কিছুদিন গেলে, উত্তেজনা প্রশমিত হলে রামরাম যদি ধর্মান্তরিত হতেন তাহলে অনুমান করি, কেরি সাহেব ও তার সহকর্মীরা তাকে বুকে টেনে নিতেন—বিশেষ করে সেই সময় যখন অত করেও একজনকেও খৃস্টনাম ভজানো যায় নি; প্রথম খৃস্টানকরণ কী যে সে কথা? শোনা যায় কেষ্ট পালকে প্রথম খৃস্টান করতে পারার আনন্দে পাদ্রি সাহেব বদ্ধ পাগল হয়ে যান। সে ১৮০০ খৃস্টাব্দের কথা। তারও আগে রামরাম বসুর মত লিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষকে ধর্মান্তরিত করার সুযোগ পেলে মিশনারিরা বর্তে যেতেন। বসুজা দক্ষ, চতুর, মিশনারিদের এ দুর্বলতার কথা তিনি বিলক্ষণ জানতেন, তবুও যে ও-পথ মাড়ান নি তাতেই প্রমাণ, ইংরেজী শিক্ষা তাকে তেমন নাড়া দেয় নি। মিশনারিদের পকেটের প্রতি তার দৃষ্টি ছিল, তাদের ধর্মে তার আগ্রহ ছিল না। সম্ভবত সাবধানী লোক ছিলেন বলে হিন্দু-সমাজকে খুব বেশি উত্তেজিত করতে চান নি।

যাক্ সে সব কথা, আবার গোড়ার কথায় ফিরে যাই। কলকাতার ইংরেজ

কোম্পানী তাদের এলাকায় খৃস্ট-ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করেছে, তাতেও হতোদ্যম না হয়ে দিনেমার শ্রীরামপুরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন মিশনারিরা। একজন নেটিভও খৃস্টান হয়নি, তাতে কী!—প্রচারের আয়োজনে কোন ত্রুটি নেই, মিশনের নিজস্ব বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে।

গাড়ির কথাটা নেহাতই কথার কথা নয়। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে রীতিমত 'টুরে' বেরুতেন রেভারেন্ড মার্শম্যান। সেওড়াফুলি থেকে ডিহি শ্রীরামপুর, উতোরপাড়া-কোতরং-কোন্নগর। নিজের ব্যবহারের জন্যে মিশনকে দিয়ে গাড়ি ঘোড়া কেনালেন তিনি। তাতে যা খরচ পড়ল তাতে মিশনের অন্যান্য সদস্যরা বেশ বেজার হলেন। এর ওপর আবার আছে ঘোড়ার দানাপানি, গাড়ির মেরামতি, কোচম্যানের মাসমাইনে। খরচের বহর খুব, এদিকে একজনকেও খৃস্টান করা গেল না, সুতরাং মার্শম্যানের বিরুদ্ধে নিষ্ফলা ব্যয়বাহুল্যের অভিযোগ আনলেন তাঁর সহযোগীরা। মিশনারিদের নেতা কেরি সাহেবের হস্তক্ষেপে সে যাত্রা অবশ্য মার্শম্যানের গাড়ি-ঘোড়া বহাল রইল। কেরি সাহেবের মৃত্যুর পর পুরনো অভিযোগ আবার উঠেছিল এবং তাতেই উত্যক্ত হয়ে মিশনের নিজস্ব গাড়ি ঘোড়া বেচে দিয়েছিলেন মার্শম্যান। কিন্তু একবার গাড়ির আরামে ও সম্ভ্রমে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে আর কী পায়ে হেঁটে প্রচারকর্ম চলে! আর তাতে নেটিভরাই বা ভাববে কী। মার্শম্যানের এক কর্মচারী ছিল, নাম ব্রজনাথ দত্ত, তাকেই ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া খাটাবার ব্যবসা করতে পরামর্শ দিলেন তিনি। ব্রজনাথের আস্তাবলে তিনখানা পাল্কি গাড়ি, একখানা বগি গাড়ি, আর গোটা দশেক ঘোড়া ছিল। শ্রীরামপুরের তখন কী জৌলস! লোকেদেরও বাড়-বাড়ন্ত খুব, সুতরাং ভাড়া নেবার লোকেরও অভাব ছিল না। মার্শম্যান ও অন্যান্য মিশনারিরাও ব্রজনাথ দত্তের আস্তাবল থেকে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া নিতেন। তখন অবশ্য ছ'জন নেটিভকে খৃস্টান করা হয়ে গেছে। এদের সম্পর্কে মার্শম্যান বলেছেন, এই ছয়জন খৃস্টানকে আমরা ছয়টি রত্ন অপেক্ষাও মূল্যবান জ্ঞান করি।

কিন্তু কারা এই ছ'জন? কী নাম, নিবাস কোথায়?

ছ'জনের মধ্যে প্রথম কে?

ইতিহাসে যে কোন অধ্যায়ে প্রথম হওয়ার মর্যাদা অপরিসীম, অথবা বলা যায় প্রথম হলেই ইতিহাস হয়। রামরাম বসু প্রথম খৃস্টান হওয়া ত দূরের কথা, আদৌ ধর্মান্তরিত না হয়েও সেকালের ইতিহাসের অদ্বিতীয় পুরুষ হয়ে রইলেন। শিশু-হত্যার সেই কেলেঙ্কারি ও তজ্জনিত ভাগ্যবিপর্যয়ের পর বেশ কিছুকাল ডুব দিয়ে রইলেন রামরাম। ১৮০০ খৃস্টাব্দে এসে ভেসে উঠলেন শ্রীরামপুরে, আবার হলেন কেরি সাহেবের মুন্সি। ঐ বছরই প্রথম খৃস্টান হল কেষ্ট পাল। কেষ্ট পালের নিবাস ছিল চন্দননগর, ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরু ছিল সে। গুরু-গিরি ক'রে পোষায় না, তাই ছুতোরের কাজ করত শ্রীরামপুরে, বাসা করে থাকতও সেখানেই। মিশনারিরা বাড়ি-ঘর কিনছে, সারাচ্ছে, জানলা-দরজা বসাচ্ছে, সুতরাং কাঠের কাজ করতে মিশনে প্রায়ই ডাক পড়ত কেষ্টর। মিশনারিদের মুখে যীশু ছাড়া গীত নেই, শুনতে শুনতে কাজ করত; আর পাদ্রি সাহেবদের খুশি করবার জন্যে আরও শুনতে চাইত। শ্রোতার উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে কেষ্টকে নিত্য নতুন কাজ দিত মিশন। রামরাম বসু নিশ্চয়ই দেখেছেন কেষ্ট পালকে, কেষ্টকে কি ধুরন্ধর মতলববাজ ভাবতেন তিনি? মনে করতেন এ-ও তারই মত এক ধাপ্পাবাজ?

এ সবই অনুমান, কেননা এ সম্পর্কে রামরাম বসুর কোন রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি। কিন্তু একথা ঠিক যে, যে সতর্ক ও হিসাবী মনোভাব বসুজার ঐতিহাসিক ধাপ্পাবাজির প্রেরণা কেষ্ট পালের সে বালাই ছিল না। নিয়মিত কাজ পাওয়া যাবে, এমনি একটা আভাস পেয়েই কেষ্ট পাল হঠাৎ একদিন বলে বসল, আমি কেরেস্তান হব। মিশনারিদের ত হাতে চাঁদ পাওয়ার অবস্থা। মিশনে হৈ-চৈ পড়ে গেল। মিশনারিরা সবাই মিলে মস্ত ভোজ দিয়েছিল, কেষ্ট পালকে মাঝখানে বসিয়ে খাইয়েছিল।

কথাটা চাউর হতে দেরি হয় নি। কেরেস্তান সাহেবদের সঙ্গে বসে পাত পেড়ে খাওয়া, এ কী অনাসৃষ্টি কান্ড! হাজার দুয়েক লোক জড়ো হয়েছিল কেষ্ট পালের বাড়ির সামনে, বলা যায় 'ঘ্রাও' করেছিল। সবাই চীৎকার করে গালি-গালাজ করেছিল। তারপর ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল দিনেমার গভর্ণর কর্ণেল বাই-এর কুঠিতে। সাহেব নিজে খৃস্টান, মিশনারিদের মস্ত মুরুব্বি, সুতরাং মারমুখী জনতাকে খেদিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আর কেষ্ট পাল যে তার বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করতে নির্ভয়ে এগিয়ে এসেছে সে জন্যে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। কেষ্ট পাল তখন খৃস্টানদের মূল্যবান সম্পত্তি, সুতরাং তার বাড়িতে দু'জন সিপাই পাহারা বসান হয়েছিল।

কেরেস্তান হওয়ার দিনও সে কী এলাহি কান্ড! গঙ্গার ধার থেকে মিশন পর্যন্ত রাস্তার মোড়ে মোড়ে সিপাহী-সান্ত্রী পাহারা, রাস্তার দুধারে কৌতূহলী ছেলে-বুড়ো মেয়ে-মদ্দর ভীড়। তার মধ্য দিয়ে কেষ্ট পাল আর ফেলিকস কেরিকে যেন ডাইনে বাঁয়ে দুই ছেলে—কালো আর ধলো—এমনিভাবে, গঙ্গাস্নান করিয়ে এনে দীক্ষিত করেছিলেন কেরি সাহেব।

প্রথম হওয়ার উত্তেজনা রোমাঞ্চ ও বিপদ যতখানি, স্থায়ী খ্যাতির সম্ভাবনাও তত-খানি। রামরাম বসু তুলনায় অনেক বেশি কর্মদক্ষ উপযুক্ত পুরুষ, কিন্তু তাকে বর্জন করে কেষ্ট পালের জীবনী লিখেছে মিশনারি ওয়ার্ড সাহেব।

পরের বছর কেষ্ট পালের এক প্রতি-বেশী, নাম গোকুল, খৃস্টান হল। শ্রীরাম-পুরে আর তেমন উত্তেজনা হল না, এমন কী তার এক মাস পরে কেষ্ট পালের শালী জয়মণি যখন খৃস্টান হল তখনও না। অথচ তার ভগ্নীপতির মত জয়মণিও ত বলতে গেলে প্রথম—প্রথম বাঙালী নারী খৃস্টান! শালী-ভগ্নীপতিতে মিলে কেরেস্তানির পথ একেবারে সাফ করে দিল।

শালী-ভগ্নীপতির এই অভিন্ন গতিতে বোধহয় আতঙ্কিত হয়েছিল রাসমণি—কেষ্ট পালের স্ত্রী, তাই অনতিবিলম্বে সে-ও খৃস্টান হয়ে গেল। দেখাদেখি গোকুলের স্ত্রী কমলমণিও স্বামীর অনুগমন করল। ইতি-মধ্যে কেষ্ট পালের অনূঢ়া কন্যা আনন্দময়ীও মিশনে মাথা মুড়িয়েছে।

এই ছ'জনকে নিয়ে মিশনারিদের আনন্দের আর সীমা ছিল না। এদের সম্পর্কে মার্শম্যানের সেই বিখ্যাত উক্তিটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আদি বাঙালী-খৃস্টান সমাজের আদি পর্বে ধর্মান্তর গ্রহণ মুখ্যত একটি পরি-

ধারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং কেষ্ট পাল বা গোকুল হিন্দুসমাজের এমন স্তরের মানুষ যেখানে সমাজশাসন খুব প্রবল ছিল বলে মনে হয় না। তাই কেষ্ট পাল পরবর্তী কর্মকাণ্ডে হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের তেমন উৎসাহ ছিল না। রামরাম বসু যে উদ্যতদণ্ড রক্তচক্ষু সমাজকে ভয় করতেন এদের সে-ভয় ছিল না।

কেষ্ট পাল কেরেস্তান হবার আগে তার বড় মেয়ে গোলকময়ীর হিন্দুমতে বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের পর গোলক বাপের বাড়িতেই থাকত। বাপ-মা দুজনেই কেরেস্তান হল দেখে, ছোট বোন আনন্দময়ীও হব-হব করছে শুনে, গোলকও কেরেস্তান হবার সংকল্প করল। সে-কথা জামাইয়ের কানে উঠতেই সে এসে বৌকে নিয়ে চলে গেল। শ্বশুরবাড়ি গিয়েও খৃস্ট-ভজন ছাড়ল না গোলক, তাতেই ক্ষেপে গিয়ে জামাইবাবাজী বৌকে ঠ্যাঙাতে শুরু করল। গোলক মারধোর খেয়ে পালিয়ে এল বাপের বাড়ি, এবং শেষটায় খৃস্টানও হল।

ধর্মান্তর গ্রহণের স্বপক্ষে মিশনারিদের চতুর বক্তৃতায় মুসলমান ধর্মাবলম্বী কয়েকজনও মোহিত হয়েছিল। প্রথম যে মুসলমান স্বধর্ম পরিত্যাগ করে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে তার নাম পিরু। দেখাদেখি কয়েক দিনের মধ্যে আরও দশজন মুসলমান খৃস্টান হয়। তাতে লাভ কী হল জানবার জন্য স্বর্গারোহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় নি তাদের, একেবারে হাতে হাতে নগদ বিদায়। যাও, খৃস্টধর্ম প্রচারকের কাজ কর, বেতন পাবে: যখন স্বগ্রামে থেকে প্রচার করবে তখন মাসিক ছ' টাকা, মফস্বলে বারো টাকা। জয়মণি রাসমণি কমলমণি প্রভৃতি সদ্য-খৃস্টানরাও স্ত্রী-প্রচারক হিসেবে বহাল হয়েছিল। এদের প্রচারের রীতি, বক্তৃতার বা আলোচনার বিষয়বস্তু কেমন বা কী ধরনের ছিল তা আজ আর জানার উপায় নেই। গ্রন্থাদিতে যা পাওয়া যায় তা সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য নয়। তবু পাঠকের কৌতূহল নিরসনের উদ্দেশ্যে একটি ইতিহাস-গ্রন্থ থেকে বাঙালী খৃস্টানদের সভার বিবরণ তুলে দিচ্ছি। সেই সভায় উপস্থিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা খৃস্টধর্ম ও স্ব-স্ব অবস্থার কথা নিম্নরূপ আলোচনা করে ঃ

গোকুল — ইতিপূর্বে আমি একজন মহাপাপী ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে সর্বদাই যীশুখৃস্টের মৃত্যুঘটনা চিন্তা করিতে ইচ্ছা হয়। এখন লোকে আর যে মঙ্গল সমাচার অবজ্ঞা করিয়া আমাদিগকে ফিরিঙ্গি বলিয়া উপহাস করিতে পারে না, ইহাতে আমি বড় আনন্দ উপভোগ করি।

রাসমণি—আমি মহাপাপিনী, তথাপি সর্বদাই যীশুখৃস্টের মৃত্যুঘটনা চিন্তা করিতে আমার ইচ্ছা হয়। কৃষ্ণপ্রসাদের সহিত আনন্দের বিবাহ হওয়ায় আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। আমার প্রতিবাসিগণ এ সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়াছে এবং বোধ হয় তাহারাও বুঝিয়াছে যে, পিতা-মাতার মতে বিবাহ করা অপেক্ষা পুরুষের মনোমত পত্নী গ্রহণ করা প্রথা মন্দ নয়।

কমলমণি — আমি মহাপাপিনী, কিন্তু এক্ষণে গোকুলের মা সুসমাচার শুনিতে আসায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। গোকুল পীড়িত হইলে আমি বড় ভাবিত হইয়াছিলাম। একবার ভাবিয়াছিলাম যে, হয়ত সে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে এযাত্রা রক্ষা করিয়াছেন, পৃথিবীতে অনেক প্রকার দুঃখ আছে কিন্তু সে সকল ক্ষণস্থায়ী।

গোলক — আমাদের সংসারে ঈশ্বরের দয়া আছে ইহা ভাবিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমার ভগ্নী আনন্দ ও কিশোরী খৃস্টধর্মে দীক্ষিতা হইতে ইচ্ছা করিয়াছে ও তাহারা গীর্জায় আসিতে চায়। খৃস্টের মৃত্যু আমি বিশ্বাস করি, আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন তাঁহার আদেশ পালন করিব, তাহা হইলেই মুক্তি পাইব।

ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে সেকালের সদ্য-খৃস্টান বাঙালী প্রচারকদের বক্তব্যের সঙ্গে, অনুমান করি, উপরোক্ত আলোচনার খুব বেশি ফারাক ছিল না। মিশন থেকে শেখা দু-চার বুলি কণ্ঠস্থ থাকলেই যথেষ্ট হত।

এতদিন তবু নিম্নবর্ণের বাঙালী হিন্দুরাই খৃস্টান হচ্ছিল, সম্ভবত প্রচারক হবার লোভেই। ষাট বছরের বুড়ো কায়স্থ সন্তান পিতাম্বর সিংহ খৃস্টান হওয়াতে বেশ একটু চমক লেগেছিল। শোনা যায় সিংহমশাই নাকি মিশনারিদের ধর্মগ্রন্থ পড়ে ধর্মান্তরিত হওয়ার সংকল্প করেন এবং নিজে মিশনে গিয়ে দীক্ষিত হবার প্রস্তাব দেন। ধর্মগ্রন্থের এমন প্রভাব ও মহিমার কথা কদাচ শোনা যায়। কায়স্থসমাজে সিংহমশাই-ই পথিকৃতের সম্মান পাবেন। এর পরে আরও দুজন কায়স্থ খৃস্টান হন, শ্যামদাস ও পিতাম্বর মিত্র। মিত্তিরমশায়ের যুবতী স্ত্রী দ্রৌপদীও খৃস্টান হয়েছিলেন।

কায়স্থের পরে ব্রাহ্মণ। নাম কৃষ্ণপ্রসাদ। কৃষ্ণপ্রসাদ সুন্দরবনের কোন এক গাঁয়ে বাস করত। কেরি সাহেব যখন নীলকুঠির কাজ করতেন তখন তার সঙ্গে যুবক কৃষ্ণপ্রসাদের পরিচয় হয়, সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে শ্রীরামপুরে আগমন, ধর্মান্তরগ্রহণ ও বিবাহ। খৃস্টান হবার আগে কৃষ্ণপ্রসাদ গলা থেকে তার পৈতে খুলে রেভারেন্ড মিস্টার ওয়ার্ডের হাতে তুলে দেয়, তাই নিয়ে সাহেবের সে কী উল্লাস! উপস্থিত সহযোগীদের দিকে ঐ সূত্রগুচ্ছ তুলে ধরে বললেন, 'এই উপবীত রোম রাজ্যেরও কোন গীর্জায় নেই।' রোমে কি বামুন আছে, যে পৈতে থাকবে?

এই কৃষ্ণপ্রসাদ বিয়ে করেছিল আদি কেরেস্তান কেষ্ট পালের মেয়ে আনন্দময়ীকে। বিয়েতে পৌরোহিত্য করেছিলেন কেরি সাহেব।

যাই হোক, মিশনারিদের আনন্দের আর সীমা নেই, দিন দিন খৃস্টানদের সংখ্যা বাড়ছে, বিবাহাদি যখন হচ্ছে তখন জন্ম-সূত্রে খৃস্টানও কম হবে না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে মিশনারিরা মহেশ গ্রামের অন্তর্গত জান্নগর নামক গণ্ডগ্রামটি সেওড়াফুলির রাজাদের কাছ থেকে মোকররি নিয়ে সেখানে এই খৃস্টানদের জন্যে একটি গীর্জা ও একটি ইস্কুল খুললেন। ঐখানেই আরও খানিকটা জমি নিয়ে ক্যাপ্টেন উইকস তাদের বসবাসের জন্যে বাড়ি-ঘর করিয়ে দিলেন। কেষ্ট পাল, গোকুল, কৃষ্ণপ্রসাদ প্রভৃতি সবাই সেখানে গিয়ে বাস করতে লাগল। এমনি-ভাবেই গড়ে উঠল আদি বাঙালী খৃস্টান সমাজ। প্রথম প্রথম সেখানেও জাতের লড়াই ছিল, বামুন-শূদ্রের ভেদাভেদ ছিল, ভাবখানা যেন—সেই যে কথায় বলে না, কেরেস্তান হয়েছি বলে কী জাত দিয়েছি নাকি?—অনেকটা সেইরকম। মিশনারিদের চেষ্টায়, আর পারিপার্শ্বিকতার চাপে তা একদিন লোপ পেয়েছিল, প্রকাশ পেয়েছিল আর এক ধরনের ভেদজ্ঞান, কিন্তু সে আর এক প্রসঙ্গ।

মিশনারিদের নিজস্ব সমাধিক্ষেত্র আছে। কিন্তু নেটিভ কেরেস্তান মরলে ত আর হিন্দুমতে সৎকার হবে না, তাদের তা হলে কী দশা হবে? সত্যিই ত। মার্শম্যানের কর্মচারী গুরুদাস কেরানীর বেশ খানিকটা জমি কিনে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে তৈরী হল সমাধিক্ষেত্র। ব্যস খৃস্টান জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ — জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সব খৃস্টানি মতে। বাঙালীর বহুপরিচিত, অথচ কেমন যেন পর-পর একটি সমাজ গঠনের এই হল ইতিবৃত্ত।

সমাধিক্ষেত্র প্রস্তুত হবার তিন দিন পরে গোকুলের মৃত্যু হয় এবং ঐ নব-নির্মিত সমাধিক্ষেত্রে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। ধর্মান্তর গ্রহণকে যদি পুনর্জন্ম বলি তবে সেখানে গোকুল দ্বিতীয়, কিন্তু মৃত্যুতে সেই প্রথম। শবযাত্রায় সমারোহও হয়েছিল তদনুরূপ। কেরি সাহেব তখন কলকাতায়, রেভারেন্ড ওয়ার্ড দিনাজপুরে। শ্রীরামপুরে ছিলেন শুধু মার্শম্যান, তিনিই সব ব্যবস্থা করলেন। নিম্নশ্রেণীর পর্তুগীজরা সেকালে শ্রীরামপুরে শববাহকের কাজ করত, তাদের ভাড়া করা হল। ফিলিকস কেরি, কৃষ্ণপ্রসাদ, পিরু প্রভৃতি শবানুগমন করল। মার্শম্যান ত আছেনই।

বাঙালী খৃস্টান সমাজে প্রথম মৃত্যু ও সমাধি। গোকুল ইতিহাস হয়ে গেল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নেহরুজীর সঙ্গে একটি সন্ধ্যাযাপনের বিবরণ দিয়েছেন এরেনবুর্গ। এই বিবরণটুকু অতিশয্যহীন এবং রিপোর্টধর্মী। একটি সন্ধ্যার কথা অতি সংক্ষেপে বিধৃত।

এরেনবুর্গ লিখছেন ঃ "নেহরুদের বাড়ি একটি সন্ধ্যাযাপনের বিবরণ দেওয়া যাক। প্রধানমন্ত্রী আমাদের ডিনারে আমন্ত্রণ করেন। টেবিলে ছিলেন তাঁর কন্যা ইন্দিরা, লেডী মাউন্টব্যাটেন (ইনি তখন প্রধানমন্ত্রীর বাসগৃহে অতিথি), কৃষ্ণ মেনন (কিছুদিন আগে তাঁর একটা বড় অপারেশন হয়েছে, তিনিও এবাড়ির অতিথি), একজন ভারতীয় দোভাষী, লিয়ুবা এবং আমি। ডিনার শেষে একটা ছোট টেবিলে নেহরু আমাকে চায়ের আসরে আহ্বান জানালেন—প্রায় একটি ঘন্টা পৃথিবী এবং শান্তি আন্দোলন নিয়ে চমৎকার আলোচনা চলল।

আমাকে কি বিস্মিত করেছে? যে মানুষটিকে সারা ভারতের মানুষ ভালবাসে তার অসাধারণ সারল্য, তার মানবিক মানসিকতা। সারা জীবন তিনি ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে ব্যয় করেছেন। নানা ধরণের মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন বৈজ্ঞানিক (আইনস্টাইন আমাকে নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা বলেছেন), লেখক শুধু রমা রল্যাঁ নন, জার্মানীর কবি টলার আর আঁদ্রে মালরোর সঙ্গেও তিনি বৌদ্ধশিল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন। নেহরু আমাকে ন্যূনতম দ্বিধার ভাব মনে না নিয়ে আমন্ত্রণ করলেন। নেহরুর এই সারল্য আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যসঞ্জাত। আইনস্টাইনের সঙ্গে যে ভূমিতে দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন তা দুজনের কাছেই সমতুল, আবার জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে একজন কিষাণের সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছেন তা কেম্ব্রিজের কোনো অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপচারের মতই সহজ ও স্বাভাবিক।"

এরপর নেহরুজীর উইলের কথা উল্লেখ করেছেন এরেনবুর্গ। ভারতীয় মনোভঙ্গী যে মুখ্যত কাব্যধর্মী এমন কথাও তিনি বলেছেন। তিনি লিখেছেন—

নেহরু তাঁর মৃত্যুর দশ বছর আগে যে উইল করে গেছেন তাতে অনুরোধ করেছেন যে তাঁর দেহ ভস্মীভূত করার পর ভস্মাবশেষ এলাহাবাদে যেখানে গঙ্গা প্রবাহিত সেখানে ছড়িয়ে দিতে হবে। এর সঙ্গে কোনো ধর্মীয় আচার সংযুক্ত থাকবে না। নেহরুর মনে ধর্মীয় অভিব্যক্তি ছিল না। য়ুরোপ বা আমেরিকার চেয়ে বিভিন্ন কোনো বস্তু ভারতের আছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় কবি-মনোভাব।

এরেনবুর্গ যেখানে গেছেন সেখানেই ফুলের সমারোহ দেখে তিনি অভিভূত হয়েছেন। ভাত ও রুটির অভাব থাকলেও ফুলের অভাব এ দেশে নেই।

তিনি লিখেছেন, "যখন বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করলাম, আমার গলায় বিরাট মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। হোটেলে ফিরে এসে সেগুলি জলে ভিজিয়ে রাখলাম। তারপর আমি ফুলের ভার আর গন্ধে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। কতরকমের গন্ধ, রজনীগন্ধা, গোলাপ, পিংক এবং আরো অনেকরকম দেশজ ফুল তাদের নাম জানা নেই। কোনো কোনো মিটিং-এ এক ডজন মালা আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছে। ভারতীয়ের ভঙ্গীতে এক ঘন্টা পরে সেই মালা আমাকে ফেলে দিতে হয়েছে। ভারতে প্রচুর ফুল—রুটি আর ভাতের অভাব আছে। বিরাট আর বিচিত্র দেশ, এর মধ্যে আছে হিমালয়, জঙ্গল, উর্বর কৃষিভূমি আবার বারিহীন শুখনো মরুভূমি। প্রাচীনকালের রীতিতে চাষবাস হয়—বলদে কাঠের লাঙল টানে, সার দেওয়ার ব্যবস্থা নেই, অথচ অসংখ্য গরু চারদিকে। গোবর দিয়ে ঘুঁটে করে চাষীরা তাদের কুঠির আলোকিত করে।"

দিল্লীর এক হোটেলের কৌতুককর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন এরেনবুর্গ—

"বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কোনো রাজার প্রাসাদে অবস্থিত হোটেলে দিল্লীর ভি-আই-পি রোড ধরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। সব কিছুই এখানে নড়বড়ে। আর একদিন রাত্রে আমার বিছানা ভেদ করে গদিটা পড়ে গেল। আমি মাটিতে পড়লাম। আমি ভিতরকার অলিন্দের এদিকসেদিক কিছুক্ষণ ঘুরলাম—কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে ডিভানেই হাত-পা গুটিয়ে পড়ে রইলাম। সকালে 'বয়' এসে যখন দেখল গদীটা মাটিতে পড়ে তখন সে হেসে উঠল। প্রতিদিন সকালে বয়দের কেউ না কেউ আমাকে ও লিউবাকে দুটি টাটকা গোলাপ উপহার দিত।"

এরেনবুর্গ অনেক বিস্ময়ের সম্মুখীন হয়েছেন। বিদেশীর চোখে এইসব কান্ড অদ্ভুত এবং অর্থহীন মনে হয়েছে। তবু এরেনবুর্গের মন্তব্য বিরূপতায় পূর্ণ নয়, তার মধ্যে আছে সহৃদতার সুর।

তিনি লিখছেন, "আমাদের হোটেলের উল্টোদিকে আছে একটা বিরাট লন। অনেকগুলি লোক সেখানে বসে বসে কি করে। একদিন কাছে গিয়ে দেখি তারা হাত দিয়ে লন পরিষ্কার করছে। পরে আরো অনেকরকম আশ্চর্য কান্ড দেখলাম। ভারতবর্ষে

এরেনবুর্গের চোখে ভারত (২)

আধুনিক কারখানায় বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং বিমান তৈরী হয়। রামেশ্বরী নেহরু আমাকে পাকিস্থানী উদ্বাস্তুদের দ্বারা পরিচালিত এক কারখানা দেখালেন। সেখানে হাতে ভাঁড় পাত্র, কেটলী প্রভৃতি তৈরী হয়। অবশ্য আধুনিক কারখানায় বাসনপত্র তৈরী করা কিংবা 'লনমোয়ার' (ঘসকাটা যন্ত্র) দিয়ে ঘাসকাটা অনেক সহজ। কিন্তু তাহলে লক্ষ লক্ষ লোক পথে পড়ে থাকবে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। কায়িক শ্রমের জন্য মানুষের পারিশ্রমিক অতি সস্তা। একটা অতিশয় জাঁকজমকপূর্ণ শালের দাম এক প্যাকেট দাড়ি কামাবার ব্লেডের চেয়ে সুলভ।"

হাতে তৈরী খদ্দর ইত্যাদি সম্পর্কে লিখেছেন এরেনবুর্গ, আগে আমার ধারণা ছিল হাতে তৈরী খদ্দর পরিধান করাটা বুঝি ভারতীয় ঐতিহ্য। কিন্তু তা নয়, এর হেতু অর্থনৈতিক। গান্ধিজী সমাজের ওপরতলার মানুষের স্বভাব নিয়ন্ত্রণে ততখানি সচেষ্ট ছিলেন না, সমাজের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের সামাজিক ও বুভুক্ষাজনিত মৃত্যু নিবারণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। আমি একটি দিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এককালীন সুহৃদ বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মহলানবীশের সঙ্গে অতিবাহিত করলাম। সেখানে জানলাম যে ভারতের অনেক বৈপরীত্যের মূলে আছে জাতির অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার।

অবশ্য সব বৈপরীত্যের মূলেই যে অর্থনীতি তা হয়ত নয়। স্বাধীনতা উৎসব অনুষ্ঠানে দিল্লীতে সামরিক প্যারেড, পদাতিক, বিমান প্রতিরোধক কামান, বিমান প্রভৃতির সঙ্গে হাতিরও আবির্ভাব ঘটল। তারা ভারতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে চমৎকার ভঙ্গীতে অভিবাদন জানাল।

প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের মিলন—শতাব্দীকাল ধরে ইংরাজের ঔপনিবেশিক নীতি ভারতের মানুষের চিত্তবৃত্তিকে অনড় করে দিয়েছে। আবার হয়ত বিরাট কারখানা, সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র, বেতার প্রচার, সিনেমা প্রভৃতির সঙ্গে সুসজ্জিত হস্তী, ধর্মীয় মিছিল এবং নৃত্যশীলা নারীর প্রাচীন নীতির নাচ ও গান ভারতীয়ের কাছে অরুচিকর মনে হয় না। এরপর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এরেনবুর্গের অভিজ্ঞতা বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করে। তিনি লিখেছেন,

"অতীতের ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীতে যে যাদুঘর আছে সেখানে অনেক দেব-দেবীর মূর্তির সঙ্গে আছে মারিয়ানের মূর্তি—প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসী রিপাবলিকের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, আবার জুয়ারেজ এবং রমা রল্যার ছবি। মাদ্রাজে তেলেগু লেখকদের একটি সম্মেলনে সভাপতি সুরেলা গলায় কি বললেন, পরে শুনলাম সেটি একটি প্রার্থনা। তারপরই আমাকে 'THAW' গ্রন্থটির অনুবাদ উপহার দেওয়া হল। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করলেন সোভিয়েত লেখকদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে কেন আমাকে সমালোচনা করা হয়েছে। আমি তামিল ভাষার লেখক, কলকাতার বাঙালী লেখক, দিল্লী হিন্দি ও উর্দু লেখকদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের বক্তব্য অনূদিত করলে মনে হয় রিগা বা ইয়েরেভানেও যেন এই প্রশ্ন করা হচ্ছে। কলিকাতায় শিল্পী যামিনী রায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। যেন প্রাচীন ঋষি। তাঁর ছবি দেখলাম, আধুনিক ফরাসী ছবি ও ভারতীয় লোকচিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ।"

এরেনবুর্গের রচনামাধুর্য অতুলনীয়, সেই সঙ্গে পরিচিত মানুষ ও সমাজের কথা পাঠকদের আগ্রহবৃদ্ধি করে। ইদানীংকালে এমন একটি সহৃদয় ভারত-কথা আর দেখা যায়নি।

অভয়ংকর

ভারতীয় সাহিত্য

নজরুলের নামে রাস্তার দাবী ॥

কলকাতা কর্পোরেশনের এক দল বিরোধী কাউন্সিলর মেয়রের কাছে কাজী নজরুলের নামে একটি রাস্তার নামকরণের জন্য দাবী করেছেন। সুন্দরীমোহন এভিনিউ থেকে জগদীশ বসু রোড পর্যন্ত রাস্তার নাম নজরুল ইসলাম এভিনিউ রাখার প্রস্তাব করা হয়। অবশ্য মেয়র এক চিঠিতে জানিয়েছেন, কোনও জীবিত ব্যক্তির নামে রাস্তার নামকরণ কর্পোরেশনের আইনের বিরোধী।

উমাশংকর যোশী ॥

'নিশীথ' কাব্যগ্রন্থের জন্য এ বছর 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভ করেছেন শ্রীউমাশংকর যোশী। তাঁর এই নতুন সম্মান লাভে ভারতীয় সাহিত্যরসিক মাত্রেই যে আনন্দিত হবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গুজরাটি সাহিত্যের আজ তিনি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক। সমালোচক এবং শিক্ষাবিদ হলেও তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। এ কালের ভারতীয় সাহিত্যের তিনি অন্যতম প্রধান কবি।

১৯১০ সালে আমেদাবাদে শ্রীযোশীর জন্ম হয়। বোম্বাই-এ শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন এবং গুজরাটি ভাষা ও সাহিত্যে এম-এ পাশ করে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। বর্তমানে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি উপাচার্য। তিনি 'সাহিত্য আকাদমী' 'ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট' প্রভৃতির সদস্য। 'সংস্কৃতি' বলে একটি গুজরাটি পত্রিকার তিনি সম্পাদক। তাঁর প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বিশ্বশান্তি', 'গঙ্গোত্রী', 'অভিমান' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'শকুন্তলা'র তিনি গুজরাটি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম। 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে' ১৯৬৩ সালে এবং পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৬ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের উপর সুচিন্তিত ভাষণ দেন। ১৯৬৭ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত গুজরাটি সাহিত্য সম্মেলনের তিনিই ছিলেন সভাপতি। আমেরিকা, রাশিয়া এবং আরও অনেক দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন। তাঁর কবিতার নিদর্শন হিসেবে 'অভিযান' কাব্যগ্রন্থের 'ট্রেন অনেক মাইল অতিক্রম করেছে' কবিতাটির বঙ্গানুবাদ এখানে দেওয়া যাচ্ছে—

"অনেক মাইল অতিক্রম করেছে
এই ট্রেন, অনেক মাইল,
ঘরবাড়ি সব পড়েছে পেছনে
এক পাশে।
মানুষকে এই ট্রেন এমন এক
জায়গায় নামিয়ে দেয়
যেখানে কেউ বাঁচে না।
সেই বাড়িঘর কিন্তু আরও সামনে।

হয়তো আরও হেঁটে যাওয়া যায়,
কাউকে হয়তো নিতে পারে সেই ঘরে;
তবু কেউ পৌঁছবে না সেখানে,
সেই ঘরে যারা থাকে, তাদের কাছে।

একটা মুখের জন্য চোখ
খোঁজাখুঁজি করে,
কিন্তু দেখে কেবল মুখোশ,
অথবা আঁকে মুখোশ
সেই মুখে।
তাদের উন্মোচনের মুহূর্তটি
বন্ধ করে দরজা-জানালা;
চোখের ভেতর দিয়ে
একটা দীর্ঘ দূরত্ব
ভেসে ওঠে।

ট্রেনটি অনেক মাইল অতিক্রম করেছে,
ঘরবাড়ি সব পড়েছে পেছনে
এক পাশে।।

একটি অসমীয়া কাব্যগ্রন্থ ॥

নীলমণি ফুকন অসমীয়া সাহিত্যের একটি পরিচিত নাম। আধুনিক অসমীয়া কাব্য আন্দোলনেও তাঁর অবদান উল্লেখ্য। সম্প্রতি 'আরু কি নৈশব্দ' নামে তাঁর একটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি বিভিন্ন দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে, শ্রীললিতকুমার বড়ুয়া লিখেছেন—"জটিল অভিজ্ঞতার মধ্যে কবির মনের বিকাশ আর বিচরণ, বুদ্ধি ও অনুভব, মগজ আর হৃদয় একসঙ্গে কবির কেন্দ্রীয় অনুভূতি নির্মাণ করেছে।" নির্জনতার স্বাদ আস্বাদনে কবির আকুতি প্রণিধানযোগ্য। এক এক সময় মনে হয়, যেন নির্জনতার ভেতর দিয়ে তিনি এক বিশেষ উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন। প্রতিটি সূর্যোদয়ে তাঁর মনে হয়—

"প্রত্যেক সূর্যোদয়ও মই অনুভব করোঁ
মোর দেহর ভিতরত একুরা যুই
ভরির তলুৱাৰ্রো ক্রমান্বয়ে
মূরলৈ উঠে
আরু চুলির আগোদি আন্ধারত
জাঁপ মরি পরার আগেতেই
আকৌ বেলি ওলায়।

নিউইয়র্ক টাইমসে 'কলকাতা' ॥

কলকাতার দারিদ্র চেহারাটাই সাধারণত বিদেশে বেশি প্রচারিত। কিন্তু মাঝে মাঝে এই শহরের উজ্জ্বল দিকটিও বিদেশীদের কাছে ধরা পড়ে। সম্প্রতি "নিউইয়র্ক টাইমস" পত্রিকায় হাওয়ার্ড টাবম্যান কলকাতা সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা কলকাতার আসল চেহারাটা বুঝবার পক্ষে বিদেশীদের পক্ষে সুবিধা হবে বলে মনে হয়। এই পত্রিকায় অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শহরের দুরবস্থা বুঝিয়ে বলা হয়েছে, কলকাতা হল ভারতের শিল্পসাহিত্যের তীর্থভূমি। মাত্র কদিন আগে এই শহরেই অনুষ্ঠিত হয়েছে 'সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন।' এই শহরে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় বাস করেন। এছাড়া এখানেই আছেন ভারতের বিশিষ্ট নাট্য-পরিচালক শ্রীশম্ভু মিত্র। ভারতবর্ষকে যাঁরা দেখতে চান, ভারতীয় চিন্তাবিদদের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হতে চান, তাঁদের কাছে এই শহরটিই সবচেয়ে আকর্ষণ সৃষ্টি করবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

বিজ্ঞান গ্রন্থের জন্য পুরস্কার ॥

শ্রীকমলেশ রায় ১৯৬৭ সালের দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নরসিংহ দাস পুরস্কার লাভ করেছেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি এই পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর গ্রন্থটির নাম "বিশ্ববিজ্ঞান"।

পরলোকে ডব্লিউ টি স্কট ॥

সম্প্রতি প্রখ্যাত মার্কিন কবি ও সমালোচক উইনফিল্ড টাউন্লে স্কট আটান্ন বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। বেশ কিছুকাল তিনি একটি সাহিত্যপত্রের সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

মিঃ স্কট ছিলেন মূলতঃ আঞ্চলিক ও প্রকৃতিআশ্রয়ী কবি। তাঁর কবিতায় কবির স্বগ্রাম পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের প্রভাব অপরিসীম। কোন কোন কবিতায় ভিন্নদেশ ও ভিন্ন অঞ্চলের চিত্র অংকন করেছেন। তবু একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় জন্মভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই তিনি অধিকতর সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত। ম্যাসাচুসেটস এর বহুল পরিচিত নিভৃত অঞ্চলগুলি তাঁর কবিতায় অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

মানসিকতার দিক থেকে তিনি রোমান্টিক শব্দচয়নে কোমল ও সংগীতময়, আঙ্গিক প্রকরণে পরিচ্ছন্ন এবং ব্যক্তিগত জীবনে বিনীত ও শান্ত। 'টাইডেল রিভার'-এর মতো বহু স্মরণীয় কবিতা তিনি লিখে গেছেন।

সর্বাধিক বিক্রীত বই ॥

পশ্চিমী দুনিয়ায় এখন কোন্ বইয়ের চাহিদা কি রকম যাচ্ছে—তার একটি সংক্ষিপ্ত চাহিদা প্রকাশ করেছেন টাইমস সাপ্তাহিক। এই তালিকা অনুসারে প্রথম দশটি উপন্যাসের নাম যথাক্রমে—এয়ারপোর্ট (হেইলে), কাপলস (আপডাইক), ময়রা ব্রেকিনরিজ (ভিদাল), দি টাওয়ার অব বেবেল (ওয়েস্ট), টোপাজ (উরিস), ক্র্যানিসড (নেবেল), দি একজিবিশনিস্ট (সাটন), টেস্টিমনি অব টু মেন (কলডওয়েল), দি কনফেশনস অব ন্যাট টার্ণার (স্টাইরন) এবং ক্রিস্ট (মার্শাল)।

বাজার চাহিদা অনুসারে অন্যান্য শ্রেণীর প্রথম দশটি গ্রন্থের নাম—(১) প্যারেন্ট অ্যান্ড চাইল্ড : গিনট (২) দি নেকেড অ্যাপ : মরিস (৩) আওয়ার ক্রাউড : বামিংহাম (৪) নিকোলাস অ্যান্ড আলেকজান্দ্রা : ম্যাসি (৫) জিপসী মথ অ্যান্ড সার্কলস অব দি ওয়ার্ল্ড : চিচেস্টার (৬) দি ডাবল হেলিকস : ওয়াটসন (৭) কেনেডি অ্যান্ড জনসন : লিংকন (৮) দি ওয়ে থিংস অব ওয়ার্ক : অ্যান ইলাস্ট্রেটেড অ্যানসাইক্লোপিডিয় অব টেকনোলজি (৯) দি ইংলিশ : ফ্রস্ট এন্ড (১০) রিকেনবেকার।

প্রিচেট-এর সাম্প্রতিক গ্রন্থ ॥

প্রিচেট-এর পুরো নাম ভিক্টর সোডন প্রিচেট। একদা তিনি ভ্রমণকাহিনী, নিবন্ধ-প্রবন্ধ, বিদ্রূপাত্মক ছোটগল্প এবং গ্রন্থসমালোচনা লিখে মূলতঃ ব্রিটেনের নিউ স্টেটসম্যান কাগজে ইংরেজ পাঠক-পাঠিকা মহলে সুপরিচিত হয়েছিলেন। সাহিত্যিক মহল তাঁকে এডমান্ড উইলসন-এর প্রতিদ্বন্দ্বী সমালোচক বলে মনে করতেন। বর্তমানে তিনি ৬৭ বৎসর বয়স্ক রাগী বুড়ো মানুষ। এখন তিনি দারিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের উত্তেজনা ও জীবন নিয়ে গল্প লিখছেন।

সম্প্রতি তাঁর 'এ ক্যাব অ্যাট দি ডোর' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রিচেট-এর বাল্যকাল এর পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিক থেকে বইটি আত্মজীবনীমূলক। লেখকের জীবনের প্রথম কুড়ি বছরের ঘটনার সন্ধান সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ইয়র্কশায়ার এবং মা লন্ডনের মেয়ে। মেজাজের দিকে থেকে পরস্পরের মধ্যে মিলের চাইতে অমিলটাই ছিল বেশী। বাবা ছিলেন আশাবাদী, কিন্তু মা ছিলেন একটি 'ককনি গার্ল'। প্রিচেটের বারো বছর বয়সের সময় তাঁর বাবা মায়ের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন। প্রিচেট তার করুণ চিত্র অংকন করেছেন। দরজায় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মা কেঁদে চলেছেন। বাবা জিনিসপত্র দিয়ে গাড়ি বোঝাই করে চলেছেন। কোনদিকেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। এই অশ্রু কাল শুকিয়ে যাবে। আজকের দুঃখ কাল শান্ত হবে।

বিদেশী

সাহিত্য

প্রিচেট তাঁর বাবাকে ভালোবাসতেন। বাবা তাঁকে মুগ্ধ করেছিলেন। তবু অত্যন্ত শান্ত নিষ্প্রাণ কণ্ঠে তাঁকে বলতে শোনা যায় "আমি আমার বাবাকে ঘৃণা করি।" হয়তো এই ঘৃণাও ছিল অত্যন্ত গভীর। সেজন্যেই তাঁর বাবা যা কিছু ভালোবাসতেন, সেসব কিছুকেই তিনি ঘৃণা করতেন। বিপরীতপক্ষে তিনি তাঁর মাকেও ভালোবাসতে পারেননি। মায়ের প্রতিও ছিল তাঁর সমান অশ্রদ্ধা। এই-খানেই ছিল তাঁর জীবনের মর্মান্তিক দুঃখ। বস্তুতঃ তাঁর পরিবারের সকলেই ছিলেন অসুখী।

ষোল বছর বয়সে তিনি একটি চামড়ার দোকানে চাকুরী নেন। চার বছর পরে তিনি প্যারিসে চলে যান। ঘটনাক্রমে তিনি সেখানে সাংবাদিকতার মাধ্যমে একটি লেখার কাজ পেয়ে যান। পরিবারের বন্ধন থেকে তিনি এভাবে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

কিন্তু জীবনে প্রতিষ্ঠা তাঁকে সম্পূর্ণ শান্তি দিতে পারেনি। অতীত জীবনের স্মৃতি তাঁকে বারবার আকর্ষণ করে, দুঃখ দেয়। তিনি অতীতকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না। তিনি সমাপ্তিতে লেখেন, "আমি একজন বিদেশী হলুম।......আমার লেখকসত্তা একজন বিপরীত সীমান্তের বাসিন্দা।"

বাউরার স্মৃতিকথা ॥

ইংরেজী সমালোচনা-সাহিত্যের পাঠক মাত্রই সি এম বাউরার নাম জানেন। সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক বহু বই লিখে ও সম্পাদনা করে তিনি পৃথিবীখ্যাত হয়েছেন। প্রাচীন লোকসংস্কৃতি ও ধ্রুপদী সাহিত্যের সমালোচক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত মানুষ। তাঁর পান্ডিত্য সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে।

সম্প্রতি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তাঁর 'মেময়েরস্ ১৮৯৮-১৯৩৯' নামে একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বইটিতে তিনি অক্সফোর্ডের ওয়াধম কলেজ, পিকিংয়ের সিভিল সার্ভিস কোয়া-র্টার্স, ফরাসী ট্রেঞ্চ, নিউ কলেজেস এসে সোসাইটি, ওয়াধমের সিনিয়ার কমনরুম আর হার্ভার্ডস ইয়ার্ডের সম্পর্কে বহু অনতি-প্রকাশিত তথ্য পরিবেশন করেছেন।

অবশ্য এইসব প্রসঙ্গের পূর্বে লেখক বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভিক উত্তেজনা ও বিভিন্ন প্রতিভাবান মানুষের কথা আলোচনা করেছেন। বিশেষতঃ যে সকল রাজনীতিক তাঁর সমকালে জন্মগ্রহণ করেছেন—তাঁদের সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

তা ছাড়া ধ্রুপদী সাহিত্য ও সাহিত্যিক-দের প্রসঙ্গ, টমাস মান, রোজার্স, গ্রিভস প্রভৃতির সম্পর্কে আলোচনা গ্রন্থটির মূল্য-বান বিষয় বলে অনেকে মনে করেন।

বরিস পোলেভয়-এর জন্মজয়ন্তী ॥

প্রখ্যাত সোভিয়েত ঔপন্যাসিক বরিস পোলেভয় গত মার্চ মাসে ষাট বছরে পড়লেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'সাচ্চা মানুষের কাহিনী' সোভিয়েত দেশ ও পৃথিবীর সর্বত্র বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই উপন্যাসটির মূলে রয়েছে সোভিয়েত দেশের এক দুর্যোগপূর্ণ কাল—নাজী আক্রমণের প্রতিরোধে স্বাধীনতা-কামী জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ঘটনাবলী। পোলেভয়ের উপন্যাসের কাহিনী মূলতঃ যুদ্ধকালীন ও বিপ্লবোত্তর সংগ্রামের আবহে চিত্রিত।

নতুন বই

মস্কো থেকে মাদ্রিদ —ডঃ দিলীপ মালাকার, বেঙ্গল পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১২। দাম—৫·৫০ পঃ।

নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে বইখানি ভ্রমণ-কাহিনী। কিন্তু ঠিক যে ধরণের ভ্রমণ-কথা সচরাচর পড়া যায়, সে জাতের নয়। এদেশে ভ্রমণকাহিনী লেখেন তাঁরাই যাঁরা দু'চার সপ্তাহ কি দু'চার মাসের জন্যে বিদেশে যান। তাঁদের বেশির ভাগই সরকারী বা বেসরকারী-ভাবে আমন্ত্রিত হন, কিম্বা কোনো কাজের ধান্ধায় গিয়ে জোটেন। ফলে, হয় তাঁরা শহর থেকে শহরে পূর্বনির্ধারিত ভ্রমণসূচী অনু-সরণ করে ছুটে বেড়ান, নয়তো কোনো বিশেষ জায়গায় বাঁধা থাকলেও মেশেন তাঁরা তাঁদের সমব্যবসায়ী মানুষদের সঙ্গেই। এতে তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তি অগভীর হ'তে বাধ্য। কিন্তু তাঁরা এ ত্রুটি ঢেকে দেবার চেষ্টা করেন নানা ধরনের কেচ্ছাকাহিনী ফেঁদে অথবা অনায়াসলভ্য গাইডবুক মুখস্থ করে।

শ্রীদিলীপ মালাকারের বই সেদিক থেকে একটি মহৎ ব্যতিক্রম বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। প্রথমত তিনি প্রায় এক যুগের ওপর খাস প্যারিসে বসবাস করছেন। তার ফলে বিদেশী সভ্যতা এবং তার সমস্ত রকম ধরণ-ধারণ তাঁর ওলট-পালট করে চেনা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় তিনি সাংবাদিক। কাজেই নিছক চোখের দেখায় তিনি খুশি না হয়ে আঁতের খবর নিতে জানেন। এবং তৃতীয়ত সারা ইউরোপের বেশির ভাগ দেশেই তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন একাধিকবার। অতএব প্রত্যেক দেশকে একই সঙ্গে তার নিজের ক্রম-বিকাশের পটভূমিতে এবং বিশ্বপরিস্থিতির পটভূমিতে বিচার ক'রে দেখা তার পক্ষে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে অনেক বেশি সহজ।

বইখানি আদ্যোপান্ত ভালো করে প'ড়ে স্বীকার করতেই হবে এমন একখানি বইয়ের খুবই দরকার ছিল। ছাড়াছাড়িভাবে অনেক দেশের বর্ণনা আমরা আগেও অনেক পড়েছি, কিন্তু একটি মাত্র বইয়ের মধ্যে প্রায় গোটা ইউরোপকে এমনভাবে নখদর্পণে তুলে ধরার চেষ্টা আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শ্রীদিলীপ মালাকার দেখতে জানেন এবং দেখাতে জানেন। শুধু বড় বড় ঘটনা বা খুঁটিনাটি তথ্য নয়, তাঁর দেশ দেখার ভঙ্গিটাও একেবারে নিজস্ব। সেই জন্যেই আমরা জানতে পাই এমন অনেক খবর এবং মন্তব্য যা এক-একটি দেশের অনেকগুলি পূর্বপ্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী পড়েও আমাদের মনে গেঁথে যায়নি। যেমন ধরুন, রুশ দেশের সাধারণ লোকরা যে আজকাল আপনি বা তুমির বদলে তুই ক'রে কথা বলে, কিম্বা বার্লিনে টিনের কৌটোয় করে 'পবিত্র' বাতাস বিক্রি হয়, অথবা মিউনিকের গরমে শহর-বাসী নরনারীরা প্রায় অর্ধোলঙ্গ অবস্থায় খালের মতো সরু নদীর হাঁটুজলে গা ভেজাবার চেষ্টা করে। অবশ্য বড় খবর, ঐতিহাসিক ঘটনার পশ্চাদ্‌পট এবং অর্থ-নৈতিক মূল্যায়নও এ বইতে যথেষ্টই আছে। কিন্তু তা পাথরের মতো চেপে বসেনি, মানব-দেহে হাড়ের কাঠামোর মতো অন্তরালে থেকে গোটা বইটির লাবণ্যবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

যাঁরা ঘরে বসে দেশভ্রমণের আনন্দ পেতে চান বইটি পড়ে তাঁরা খুবই উৎসাহিত হবেন। আর যাঁরা আগে কখনো যাননি, কিন্তু ভবিষ্যতে যাবার আশা রাখেন তাঁরাও এ বই থেকে খুঁজে পাবেন অনেক কিছু সঞ্চয় যা মনে রাখবার মতো।

একজন আর কয়েকজন অনিলকুমার ভট্টাচার্য। ডি, এম, লাইব্রেরি, ৪২ কর্ণ-ওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা—৬। মূল্য—চার টাকা।

বসওয়েলের উপমা টানব না। কিন্তু অনিলকুমার ভট্টাচার্যের হাতে সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন-সান্নিধ্যের এই চিত্রটি বসওয়েলের কলমে ডক্টর জনসনকে দেখার মতোই স্নিগ্ধ, সরস ও তথ্যানুগ। উপেন্দ্রনাথের কোনো বয়স ছিল না, তিনি ছিলেন সকলের সমানবয়সী, সকলের উপীনদা। তিনি ছিলেন খ্যাতনামা লেখক, সফল সম্পাদক, সার্থক গল্পকার। শেষ বয়সে আমরা যাঁরা তাঁকে দেখেছি তখন তিনি তাঁর অন্যসব গুণ ছাপিয়ে একজন সদানন্দ, সদালাপী মজলিসী মানুষ। আনন্দ আহরণে তাঁর কোনো কুণ্ঠা ছিল না, আনন্দ বিতরণেও না।

এমন একটি স্মরণীয় মানুষকে কাছে থেকে দেখেছিলেন এই গ্রন্থের লেখক। দীর্ঘদিন পেয়েছিলেন তাঁর সান্নিধ্য, তাঁর স্নেহস্পর্শ। উপেন্দ্রনাথকে ঘিরে সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীর ছিল নিত্য আনাগোনা। তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যমণি। সাহিত্যের কোনো দলাদলিতে ছিল না তাঁর রুচি। তিনি ছিলেন সাহিত্যিকের সাহিত্যিক। শ্রীভট্টাচার্য নিষ্ঠার সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের এই চরিত্রটি আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন তাঁর এই গ্রন্থে। গ্রন্থটির নামকরণেই তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম উপলব্ধি করা যায়। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন এমন একজন যিনি একাই একক কিন্তু একককে নিয়েই তিনি ছিলেন অনন্য-সাধারণ এক যাত্রী, এক কথক ও এক শ্রোতা।

বাংলা সাহিত্যে এই ধরণের মানুষের সংখ্যা কমে আসছে। সেই আনন্দের বৈঠকের যুগ দ্রুত অপসৃয়মান। অনিলকুমারের রচনায় সেই বিলীয়মান যুগের চিত্রটি সার্থকভাবে ধরা রইল। এখানেই তাঁর প্রচেষ্টার সার্থকতা। লেখককে এই বইয়ের জন্য সাধুবাদ জানাই।

—কৃষ্ণ ধর

পত্র-পত্রিকা

শুকসারী : সম্পাদক : মিহির আচার্য। কার্যালয় : ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা—১৪। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

একমাত্র ছোটগল্প পত্রিকা শুক-সারীর পঞ্চম বর্ষ নববর্ষ সংখ্যাটি নানা কারণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের গল্প ও কাহিনী-নাটকের ওপর তিনটি আলোচনা করেছেন অশ্রুকুমার সিকদার, অমিতাভ দাশগুপ্ত ও পল্লব সেনগুপ্ত। আলবেয়ার কামুর, ছোট-গল্পবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ আলোচনাটি করেছেন বার্ণিক রায়। স্প্যানিশ ও নাইজেরিয়ান গল্পের অনুবাদকদ্বয় যথাক্রমে অমিতাভ ঘোষ ও বিরূপাক্ষ সাহা। পূর্ব বাঙালার ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গল্পটি লিখেছেন জিয়াউল হক। সাম্প্রতিক গল্প পরিবেশন করেছেন ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার সেনগুপ্ত, মীরা দেবী, সমরেশ দাশগুপ্ত এবং অসিত ঘোষ। এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটে গর্কির স্কেচটি রচনা করেছেন শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

●

সাময়িকী (বৈশাখ ১৩৭৫) — সম্পাদক : সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিহির রায়-চৌধুরী। ১০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট। কলকাতা-৯। দাম পঁচিশ পয়সা।

লিখেছেন সুশীল রায়, সুনীল গঙ্গো-পাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মোহিত চট্টো-পাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, উমা দেবী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, তারাপদ রায়, মানস রায়চৌধুরী, দেবী-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল দেব এবং আরো অনেকে।

●

অক্ষর — বৈশাখ ১৩৭৫ — সম্পাদক : বীরেন্দ্র দত্ত। ২৭এ, হরতুকি বাগান লেন। কলকাতা-৬। দাম এক টাকা।

বর্তমান সংখ্যায় গল্প, কবিতা এবং অন্যান্য বিষয়ে লিখেছেন—অলোক রায়, মণীন্দ্র রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, কবিতা সিংহ, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, গণেশ বসু, বেলাল চৌধুরী, মৃণাল দেব, বীরেন্দ্র দত্ত, অরুন্ধতী সেনগুপ্ত এবং আরো কয়েকজন। 'অক্ষরে'র এইটিই প্রথম সংখ্যা।

●

বালার্ক — রবীন্দ্র সংকলন ১৩৭৫ — সম্পাদক : জয়ন্তকুমার সিংহ। ৩৮। ৩।১, বোসপাড়া লেন। কলকাতা-৩। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, একাঙ্ক নাটক নিয়ে বালার্কের এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে।

●

অন্বীক্ষণ — ফাল্গুন-বৈশাখ। সত্যব্রত ঘোষাল, শান্তনু নাগ এবং দীপক ঘোষ সম্পাদিত। ১।১, বি মল্লিক লেন। কলকাতা-২৬। দাম এক টাকা।

অন্বীক্ষণের বর্তমান অনুবাদ সংখ্যায় জেমস জয়েস, গ্রাহাম গ্রীন, ভ্লাদিমির বোগোমোলভ, ই ই বেটস, গী দা মোঁপাসা, তরু দত্ত, তু হিউ, আউনোর উইলিয়ামস্, লোরকা, জর্জ সেফেরিস, এরবিনসন সাঁ বা পার্স, ডিলান টমাস, উইলিয়াম এইচ অডেন, চেখভ, হাফেজ, অ্যালান প্যাটান ব্রুক এবং কলিন উইলসন-এর রচনা অনুবাদ করেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিভূষণ চাকী, প্রতুল দত্ত, রত্নেশ্বর হাজরা, জ্যোতিপ্রকাশ চক্রবর্তী, বাসু ভট্টাচার্য, বিজয়কুমার দত্ত, শঙ্কর দাশগুপ্ত, প্রলয় শূর, সোমেন ঘোষ, মলয় রায়, যোগ-ব্রত চক্রবর্তী, সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদর্শন সেন, পার্থ বসু, প্রণব ঘোষ, সত্যব্রত সান্যাল ও অভি সেনগুপ্ত।

●

খামখেয়ালী (মে-জুন) — **সম্পাদক :** রাজেন্দ্রকুমার মিত্র। ১১এ, গোকুল মিত্র লেন। কলকাতা। দাম পঁচিশ পয়সা।

সেকালের আর্থিক অবস্থা, নারীর গোপন ক্ষুধা, তরুণীর দেহসৌন্দর্য, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির গল্প এবং আরো কয়েকটি রচনার সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

●

ব্যাহৃতি — বৈশাখ ১৩৭৫ — দাম এক টাকা। ৭, নন্দী স্ট্রীট, কলকাতা-২৯।

শিল্প ও সাহিত্য ত্রৈমাসিক হিসেবে 'ব্যাহৃতি' নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি প্রকাশিত সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ও আলোক সরকার, ম্যাকনীশ ও অডেনের কবিতা অনুবাদ করেছেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, তিলক রায়চৌধুরী ও তপন পালিত, গল্প লিখেছেন কল্লোল মজুমদার ও আশিস ঘোষ। প্রবন্ধ ও আলোচনা লিখেছেন সাগর চক্রবর্তী, ভবতোষ সাহা, শঙ্কর রায় সুব্রত নিয়োগী।

●

গ্রন্থ পরিক্রমা (৫ম বর্ষ ।। সপ্তদশ সংখ্যা) — সম্পাদক : অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম : পঁচিশ পয়সা।

সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতা সংখ্যা হিসাবে গ্রন্থ পরিক্রমার বর্তমান সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল দাশগুপ্ত, অমিতাভ চৌধুরী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, চণ্ডী লাহিড়ী, সুনীতকুমার মুখো-পাধ্যায়, জয়ন্তী সেন, মনোজিৎ মিত্র, দিলীপ সেন, কেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুধাংশুকুমার বসু, তাপসকুমার ঘোষাল, এস প্রকাশ রাও, অজিতকুমার দাশ, নীহার-রঞ্জন দাশগুপ্ত, বিনয় দত্ত, বিশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায়। মূল্যবান বিষয়ের আলোচনায় সমৃদ্ধ পত্রিকাটি সাংবাদিকতার ছাত্রদের বিশেষ প্রয়োজন মেটাবে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তিনি কতখানি বিশ্বাসের যোগ্য তাঁর দাম্ভিক আস্ফালনই তার প্রমাণ দেবে, বলেছিলেন গানাদো।

তার পরদিন সত্যিই সে প্রমাণ পেয়েছিলেন আতাহুয়ালপা গাস্পিয়েখো নামে সেই পাষণ্ড এসপানিওল সৈনিকের অবিশ্বাস্য লাঞ্ছনায়।

আতাহুয়ালপা বিস্ময়বিমূঢ় হয়েছিলেন সত্যিই কিন্তু গানাদোকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা আর তাঁর পক্ষে কঠিন হয়নি।

বিশ্বাস যে তাঁর অপাত্রে পড়েনি তার প্রমাণ এরপর পদে পদে পাওয়া গেছে। যা প্রায় কল্পনাতীত ছিল গানাদোর নিখুঁত চাল সাজাবার গুণে তা সম্ভব হয়েছে আশ্চর্যভাবে।

সোনার ঢিবি উপহার দেবার টোপ বিফল হয়নি। অসন্দিগ্ধভাবে পিজারো সে টোপ গিলেছেন। সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান হয়েছে তাই দিয়েই।

সে বড় সমস্যা কি?

চারদিকে দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের প্রাচীরে ঘেরা, কাক্সামালকা থেকে এসপানিওল বাহিনীর সজাগ পাহারা এড়িয়ে বার হওয়া।

সেই সমস্যার কিনারাই করেছেন গানাদো সোনার কাঁড়ির প্রলোভন দেখিয়ে।

তা না করতে পারলে পিজারোর পাহারাদারদের একরকম চোখের ওপর দিয়ে গানাদো কি অমন উধাও হতে পারতেন।

কিন্তু কৌশলটা সত্যিই কি ছিল?

পিজারোর ঝানু সব সঙ্গী-সাথী সেনাপতিরা ভেবেই পায়নি।

শুধু পিজারোই একবার নিজের অজান্তে কৌশলটা প্রায় ধরি-ধরি করে ফেলেছিলেন একটা কৌতূহল মেটাতে গিয়ে। রহস্যের চৌকাঠ পার হওয়া কিন্তু তাঁর হয়নি। সত্যিই কিছু সন্দেহ না করে দরজা থেকেই তিনি ফেরৎ গেছেন বলা চলে। গানাদোর অন্তর্ধান রহস্য শেষ পর্যন্ত ভেদ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কি কৌশলে গানাদো কাক্সামালকা থেকে পালিয়েছেন, তা শুধু একজনই জানেন। পালিয়ে তিনি কোথায় গেছেন তাও শুধু আতাহুয়ালপারই জানা।

আতাহুয়ালপার অনুমান নির্ভুল হলে গানাদো তখন দুর্গনগর সৌসানগরে পৌঁছে সাগরপারের দুষমনবাহিনীর বিরুদ্ধে একেবারে মোক্ষম মাৎ-এর চালটি চেলে আতাহুয়ালপার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

মাৎ-এর মোক্ষম চালটি কি?

তা আর কিছুই নয় দুভাগ হয়ে যা পলকা হয়ে গেছল তা-ই আবার এক করে জুড়ে দেওয়া। সে জোড়া হাতিয়ারের সামনে তখন দাঁড়াবে কে?

আতাহুয়ালপা আর হুয়াসকার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে যখন শক্তি ক্ষয় করছেন শত্রু হেসে তখন হানা দিয়েছে এই গৃহ বিবাদের সুযোগে। দুই ভাই একবার দেশের জন্যে জাতির জন্যে আকাশের যিনি অধীশ্বর সেই সূর্যদেব আর জীবনের যিনি উৎস সেই ভীরাকোচার জন্যে মিলিত হলে এসপানিওল বাহিনী ত ফুৎকারে উড়ে যাবে।

হুয়াস্কার তাঁর সঙ্গী-সাথীর কুপরামর্শে পিজারোর কাছে অত্যন্ত গর্হিত একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

তা পাঠালেও ক্ষতি নেই। পিজারো আর তাঁর দলবল যতক্ষণ সে প্রস্তাবের সুবিধে অসুবিধে লাভ লোকসান হিসেব করছেন ততক্ষণে গানাদো সৌসায় পৌঁছে হুয়াস্কারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলেছেন নিশ্চয়।

হুয়াস্কার নির্বোধ নন। গানাদোর ছকা চালগুলি যে অব্যর্থ তা বুঝতে তাঁর দেরী হবে না। তারপর শুধু আতাহুয়ালপার সৌসা পৌঁছোবার জন্যে অপেক্ষা। আতাহুয়ালপাকে সশরীরে সামনে দেখলে হুয়াস্কারের মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব তখনও যদি কিছু থাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে নিশ্চয়। ইংকা রাজরক্ত যাঁদের মধ্যে প্রবাহিত সেই দুই রাজভ্রাতা এখন এক হয়ে মিললে সমস্ত কর্ডিলিয়েরাই কেঁপে উঠবে তাঁদের পদভরে। কোথায় তখন দাঁড়াবে ওই কটা দুষমন বিদেশী!

কিন্তু আতাহুয়ালপা ত পিজারোর কড়া পাহারায় তাঁর নিজের অতিথি মহল্লাতেই বন্দী। অতিথি মহল্লা থেকে বাইরের চত্বরে পর্যন্ত একটু পা ছাড়িয়ে আসার সুযোগ তাঁর নেই।

তিনি সেই দূর দুর্গনগর সৌসায় যাবেন কেমন করে?

কেমন করে আর! গানাদো যেমন করে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে গেছেন তেমনি করে।

পিজারোকে সোনার কাঁড়ি উপহার দিয়ে ভীরাকোচাকে প্রসন্ন করবার ব্রত কি আতাহুয়ালপা অকারণে নিয়েছেন!

প্রতিদিন সমারোহ করে সূর্যদেবের জমানো চোখের জল বয়ে আনবার শোভাযাত্রীর দল কি এদিকে ওদিকে মিছিমিছি পাড়ি দিচ্ছে!

তাদের রংবেরংএর পোষাক, মুখের রংচং মুখোস আর যাবার পথে নাচগান বাজনা দেখতে শুনতে [illegible] গোড়ায় এসপানি-

ওলরাই রাস্তায় জড় হত। সং দেখার মত একটা মজা ছিল তার মধ্যে।

নিত্যি দুবেলা দেখে দেখে তারপর অবশ্য একঘেয়েমিতে অরুচি ধরে গেছে। এখন আর সোনা-বরদার মিছিল দেখলে কেউ দাঁড়িয়ে ভিড় জমায় না। যেটুকু আগ্রহ তাদের বিষয়ে আছে তা শুধু ভারে ভারে তারা সোনা আনছে বলে।

কাক্সামালকা থেকে কুজকো যাবার রাস্তায় প্রতিদিন একটা করে অন্ততঃ মিছিল যায় আসে। তার মধ্যে একটা বিশেষ দলকে কে আর লক্ষ করেছে।

লক্ষ করলেই বা বুঝত কি। সেই মুখোস পরে সং সাজা রংবেরংএর পোষাক পরা ভেঁপুর মত বাঁশি আর করতালের মত বাজনা নিয়ে একদল আধা নাচের ভঙ্গিতে চলেছে।

হ্যাঁ একটা ব্যাপার লক্ষ করবার মত ছিল বটে। মুখোস আঁটা নানা রংএর প্রায় ঘেরাটোপ পরা একটা নেহাৎ ছোট্টখাট্ট পাৎলা দুবলা চেহারা। একেবারে বাচ্চা ছেলেই মনে হয়। এত অল্পবয়সের কেউ সাধারণতঃ এ সব সোনা-বরদার মিছিলে থাকে না।

কিন্তু থাকলে দোষও কিছু নেই। বুড়োধাড়ি ছাড়া ছেলে-ছোকবার এ দলে থাকা বারণ ত আর নয়! কারুর চোখে পড়লে তা নিয়ে জেরা করতে পারত না সুতরাং। এসপানিওলরা ত নয়ই। কারণ
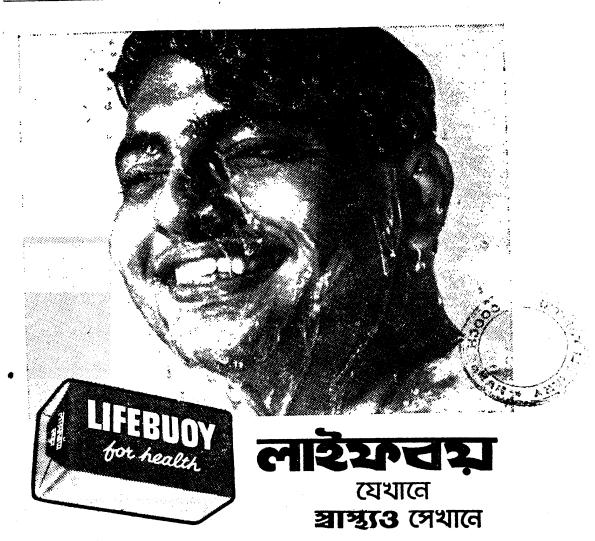
তারা এ সব মিছিলের নিয়ম-কানুন কি আর জানে।

কিন্তু লক্ষই যখন কেউ করেনি, তখন সন্দিগ্ধ হবে কে? আর এ দলের পক্ষে বেমানান এই ছেলে-ছোকরার মত চেহারা যদি নজরে না পড়ে থাকে তাহলে তার সঙ্গী হিসেবে আর কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি নিশ্চয়।

না বলতেই বোঝা গেছে বোধ হয় যে গানাদো এই দলের সঙ্গে সোনা-বরদার সেজেই কাক্সামালকা থেকে উধাও হয়েছেন। উধাও হয়েছেন কুজকোর পথে। কুজকো কাক্সামালকার খুব কাছাকাছি নয়। পথও বেশ দুর্গম। তবে ইংকা স্থপতিরা সেখানে পাহাড় কেটে পথ বানাবার এমন আশ্চর্য বাহাদুরী দেখিয়েছেন, তখনক্যর ইউরোপে অন্ততঃ যার তুলনা ছিল না।

এ পথে তখনও পর্যন্ত ইংকা সাম্রাজ্যের নিজস্ব দৌড়বাজ হরকরার ব্যবস্থা চালু আছে। পেরুর উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত আর শাদা তুষারের পাহাড়ের রাজ্য থেকে মরুর মত ধু-ধু পশ্চিম সমুদ্র-তীরের নগর বসতি পর্যন্ত এই ডাকবিলির ব্যবস্থা সে যুগের এক বিস্ময়। দৌড়বাজ ডাক-হরকরারা প্রতিদিন অবিশ্বাস্য তৎপরতার সঙ্গে রাজ্যের সংবাদ ও ইংকা নরেশের আদেশ সর্বত্র বহন করে নিয়ে যায়।

এই দৌড়বাজ হরকরাদের পর পর হাত-ফেরতা হয়ে ডাক বিলি হত অবশ্য। রিলে রেসের মত এক হরকরার দৌড় যেখানে শেষ সেখানে আরেক হরকরা তৈরী থাকত তার বার্তা নিয়ে ছুটে যাবার জন্যে।

এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও কাক্সামালকা থেকে কুজকোয় ডাক পৌঁছোতে পাঁচ দিন অন্ততঃ লাগত।

সোনা-বরদার শোভাযাত্রীদের দলের সঙ্গে গানাদোর কুজকো পৌঁছোতে আরো বেশী কিছুদিন লাগা তাই স্বাভাবিক।

কুজকো শুধু নয়, সেখান থেকে সৌসা পর্যন্ত পৌঁছোতে যে সময় লাগতে পারে, তার হিসেব ধরেই গানাদো আতাহুয়ালপার অন্তর্ধানের সব ব্যবস্থা পাকা করে ছকে রেখে গেছেন।

সৌসায় পৌঁছেই দূত হিসাবে বিশ্বাসী দৌড়বাজ হরকরাদেরই একজনকে হুয়াস্কারের পাঞ্জা দিয়ে আতাহুয়ালপার কাছে গোপন খবর দেবার জন্যে পাঠানো হবে।

আতাহুয়ালপা কিন্তু কাক্সামালকাতেই তার অপেক্ষায় বসে থাকবেন না। গানাদো যেদিন থেকে নিরুদ্দেশ তার ঠিক গুনে গুনে একপক্ষকাল বাদে তিনি কাক্সামালকা থেকে রওনা হয়ে পড়বেন। কুজকোর দূতের সঙ্গে মাঝপথেই যাতে তাঁর দেখা হয়।

আতাহুয়ালপা রওনা হবেন ওই সোনা-বরদার দলের শোভাযাত্রী হয়েই অবশ্য। কিন্তু অতিথি মহল্লার বন্দীশালায় যারা তাঁকে দিনরাত পাহারায় রাখে সেই এস্পানিওল সেপাইদের দৃষ্টি তিনি এড়াবেন কি করে?

যদি বা কিছুক্ষণের জন্যে তাদের ফাঁকি দিয়ে অতিথি মহল্লার বন্দীশালা থেকে শোভাযাত্রী সেজে পথে বেরিয়ে পড়তে পারেন, তারপর যথাস্থানে তাঁকে না দেখতে পেলে হুলুস্থুল ত বাধবেই।

গানাদোর বেলা যা হয়েছিল তার চেয়ে সহস্র গুণ বেশী নিশ্চয়ই। আতাহুয়ালপা আর গানাদো ত এক নয়। আতাহুয়ালপা তাঁর চোখের ওপর থেকে নিরুদ্দেশ হলে পিজারো আর প্রকৃতিস্থ থাকবেন কিনা সন্দেহ। ক্ষিপ্ত হয়ে সমস্ত পেরু রাজ্য তোলপাড় করে ফেলবেন নিশ্চয়।

গানাদোর পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল আতাহুয়ালপার পক্ষে সেইরকম শুধু রংবেরং-এর পোষাকে মুখোস এঁটে এস্পানিওলদের চোখে ধুলো দেওয়া বোধ হয় সম্ভব হবে না। কাক্সামালকা থেকে বার হতে পারলেও কুজকোর পথেই তিনি ধরা পড়ে যাবেন।

সৌসায় পৌঁছে হুয়াস্কারের সঙ্গে যতক্ষণ না মিলিত হতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত অতিথি মহল্লা থেকে তাঁর অন্তর্ধানটা পিজারো আর তাঁর সহচর অনুচরদের কাছে গোপন রাখবার ব্যবস্থা না করলেই নয়।

কেমন করে তা সম্ভব?

সম্ভব যেভাবে হতে পারে তার কূট-কৌশলও বলে দিয়ে গেছেন গানাদো।

গানাদোর অন্তর্ধানের কয়েকদিন বাদে পিজারো হুয়াস্কারের প্রস্তাব সম্বন্ধেই আতাহুয়ালপার সঙ্গে আলোচনা করতে এসে বিস্মিত ও হতাশ হয়েছেন।

আতাহুয়ালপা শয্যাশায়ী না হলেও অত্যন্ত অসুস্থ। রাজাসনে বসেই তিনি পিজারোর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু অসুস্থতার জন্যে তাঁর কণ্ঠ এমন রুদ্ধ যে তা থেকে কোনো আওয়াজই বার হয়নি। অতি কষ্টে তিনি পিজারোকে পরের দিন আসবার অনুরোধটা শুধু করতে পেরেছেন।

পরের দিন অবস্থা আরো খারাপই দেখা গেছে। আতাহুয়ালপা সেদিন শয্যাশায়ী। গলার স্বর সম্পূর্ণ রুদ্ধ। ইংকা পরিবারের রাজবৈদ্য তাঁর শয্যাপার্শ্বে দোভাষীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন। ব্যবস্থা বেশ একটু অদ্ভুত লেগেছে পিজারোর। আতাহুয়ালপার শয্যার পাশে এক তাল সোনার গুঁড়ো মেশানো কাদামাটির তাল।

রাজবৈদ্য সেই মাটি চাপড়া চাপড়া করে আতাহুয়ালপার মুখে মাথায় লাগাচ্ছেন।

এ আবার কি চিকিৎসা! সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছেন পিজারো।

এই হল ইংকা রাজ্যের চিকিৎসা। দোভাষীর মারফৎ জানিয়েছেন রাজবৈদ্য। রাজবৈদ্য আর কেউ নয়, পাউললো টোপা।

(ক্রমশঃ)

দেশেবিদেশে

দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব?

"যারা আমার বিরোধিতা করে, আমি তাদের শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাদের আমি সহ্য করতে পারি না।" ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গল এক সময় এই কথা বলেছিলেন।

গত দু' সপ্তাহ ধরে যে তুমুল ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে ফ্রান্স তোলপাড় হচ্ছে, যার ফলে দ্য গলের পঞ্চম রিপাবলিকের ভিত্তিই টলমলিয়ে উঠেছে, তাতে প্রতিপক্ষকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন কিনা জানা যায় না, তবে প্রতিপক্ষকে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে।

উত্তাল আন্দোলনে ফ্রান্সের জীবনযাত্রা যখন প্রায় অচল হয়ে যেতে বসেছে, তখন তাঁকে ঐ আন্দোলনের চাপে পড়ে স্বীকার করতে হয়েছে যে, তিনি আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার সংস্কার করবেন।

দ্য গলের পক্ষে এই কথা স্বীকার করা খুব সহজ হয়নি। গত দশ বছর ধরে তিনি ফ্রান্সের গদিতে একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত আছেন। আলজিরিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে তিনি ক্ষমতায় আসেন, আর তার ফলে তাঁর সরকারের প্রতি বিপুল জন-সমর্থন গোড়া থেকে ছিল। তারপর এই দশ বছরে দ্য গল ফ্রান্সকে একটা স্থায়িত্ব দিয়েছেন। পৃথিবীতে তাকে একটা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং তাঁরই আমলে এখন প্যারিসে ভিয়েৎনামী প্রাথমিক শান্তি আলোচনা চলছে।

এই গৌরবময় রেকর্ডের শেষে এই আঘাতের জন্যে তিনি স্পষ্টতই প্রস্তুত ছিলেন না। এই আঘাত তাঁর মর্যাদার ভিত্তিমূলে একটা বিরাট ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে সন্দেহ নেই। এক ধাক্কায় এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে, যে-গৌরবের ওপর পঞ্চম রিপাবলিক এতদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেটা নিতান্তই ফাঁকা। পররাষ্ট্র নীতির চাকচিক্যের আড়ালে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ফ্রান্স যে কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

গোলমাল আরম্ভ হয়েছিল গত ১২ মে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের নাঁতের শাখায় ছাত্রদের একটি হাঙ্গামাকে কেন্দ্র করে। কর্তৃপক্ষ আরো গোলমাল আশঙ্কা করে নাঁতের শাখাটি বন্ধ করে দেন। এবং প্রতিবাদে ছাত্ররা প্যারিস শহরের লাতিন কোয়ার্টার অঞ্চলে বিক্ষোভ করে এবং সেখানে পুলিশের সঙ্গে তাদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। হাজার হাজার ছাত্র লাতিন কোয়ার্টার দখল করে নেয় যেন এটা কোন স্বাধীন অঞ্চল। তারা গাড়ী উল্টিয়ে পুড়িয়ে দেয়, রাস্তা থেকে পাথর তুলে নিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে। দোকানপাট ভেঙে তছনছ করে দেয়। রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। সরকার প্রথমটায় হাঙ্গামা দমনে ততটা তৎপর ছিলেন না। কিন্তু পরে পুলিশের ওপর ঢালাও নির্দেশ যায় হাঙ্গামাকারীদের সায়েস্তা করার জন্যে। পুলিশ শুধু রাস্তাতেই হাঙ্গামাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়নি, বাড়ী বাড়ী ঢুকেও অত্যাচার চালিয়েছে।

এর ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের সহানুভূতিও ছাত্রদের ওপর গিয়ে পড়ে। হাঙ্গামা ছড়িয়েও পড়তে থাকে। শ্রমিকরা এসে ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দেয়। ভয় পেয়ে সরকার পুলিশ সরিয়ে নেন এবং কার্যত ছাত্রদের কাছে নতি স্বীকার করেন।

ফ্রান্সের বড় বড় শ্রমিক ইউনিয়নগুলি একদিন সাধারণ ধর্মঘট করে। প্রায় পাঁচ লক্ষ ছাত্র, শ্রমিক, শিক্ষক ও বিরোধী রাজনীতিক কর্মী বিরাট প্রতিবাদ মিছিল করে 'ইন্টারন্যাশনাল' গাইতে গাইতে ও 'দ্য গল পদত্যাগ কর' ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে পাঁচঘণ্টা ধরে বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে বেড়ায়।

ছাত্ররা অন্তত ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজেরা দখল করে নেয়। শ্রমিকরা কারখানার পর কারখানা অচল করে দেন।

ফরাসী রেড-গার্ডেরা পোস্টার দেয় ঃ "যতদিন না শেষ ব্যুরোক্র্যাটের নাড়ী-ভুঁড়ি দিয়ে শেষ পুঁজিপতির ফাঁসী হচ্ছে, ততদিন মানবজাতি সুখী হতে পারবে না।" যানবাহন বন্ধ হয়ে যায়, এয়ার ফ্রান্সের সমস্ত ফ্লাইট বাতিল করে দেওয়া হয়, ডাক-তার বিলি বিপর্যস্ত হয়, খবরের কাগজ ও রেডিও-কর্মীরা কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসে, পুলিশ জানিয়ে দেয় তাদের যেন ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে নিয়োগ না করা হয়।

ফ্রান্সে এই বিস্ফোরণ কিন্তু আকস্মিক নয়। চাপা অসন্তোষ চলে আসছিল বহুরদুই ধরে। কর্তৃপক্ষ তা আমল দিতে চাননি। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দ্য গল সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক। ফ্রান্সের সামরিক শক্তি ও মর্যাদা বাড়াতে গিয়ে দ্য গল সরকার প্রচুর অর্থ অপচয় করেছেন, আর তার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ অবনত হয়েছে—এই অভিযোগ সকলের। সামরিক ব্যয় বহন করতে গিয়ে কর বাড়াতে হয়েছে, জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে বাড়ছে, উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। বিভিন্ন শিল্পে সংকট চলছে অনেকদিন ধরে। সরকার এগুলির সমাধানের জন্যে কোন উদ্যোগ এপর্যন্ত দেখাননি। এই পুঞ্জীভূত অভিযোগই এখন বিস্ফোরণে ফেটে পড়েছে।

২৪ মে প্রেসিডেন্ট দ্য গল জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে বলেন যে, জুনে মাসে একটি জাতীয় গণভোট গ্রহণ করা হবে এবং ঐ গণভোটে যদি তিনি জনসাধারণের আস্থা লাভ করতে না পারেন, তাহলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করবেন। আর যদি তিনি আস্থা পান, তাহলে তিনি বলেন, প্রয়োজনমতো সংস্কার সাধন করে তিনি ফ্রান্সের যুব সম্প্রদায়ের জন্যে পথ উন্মুক্ত করে দেবেন, শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবেন। সেই সঙ্গে তিনি অর্থনীতিকে এমনভাবে গড়ে তুলবেন যাতে কোন বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠী অতিরিক্ত সুবিধা পেতে না পারে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যেও তিনি চেষ্টা করবেন।

২৭শে মে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু দিবস পালিত হয় দেশব্যাপী।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারত

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এমন একটা সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফরে গিয়েছেন, যখন একাধিক অর্থে এই অঞ্চল একটা সন্ধিক্ষণের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রথমত, ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলনে গৃহীত নীতি অনুযায়ী যে সমঝোতা গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, তা এখন অনেকখানি দূরে সরে গেছে। বান্দুংয়ের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা চীন আজকে আর আগের মতো শ্রদ্ধার পাত্র নয়। রীতিমতো আশংকার পাত্র। কাজেই তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে একটা তাগিদ এশীয় দেশগুলি ক্রমেই আরো বেশি অনুভব করছে।

দ্বিতীয়ত, ইন্দোনেশিয়ায় ডাঃ সুকর্ণর পতনের ফলে এই অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এখন মোটামুটি এই অঞ্চলের দেশগুলি সমভাবাপন্ন: আঞ্চলিক সহযোগিতা এখন যতটা সম্ভব আগে ততটা ছিল না।

তৃতীয়ত, সুয়েজের পূর্ব থেকে সরে আসবার যে-নীতি বৃটেন গ্রহণ করেছে, সেই অনুসারে ১৯৭১ সালের শেষ নাগাদ সে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে তার সামরিক তৎপরতা গুটিয়ে নেবে। এর ফলে একটা সামরিক শূন্যতা দেখা দিতে বাধ্য এবং এই নিয়ে এই অঞ্চলের দেশগুলি স্বাভাবিক কারণেই উদ্বিগ্ন বোধ করছে।

এইসবগুলি কারণেই একটা জিনিসকে তুলে ধরছে ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির আরো ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। গত আগস্ট মাসে অবশ্য ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স ও সিঙ্গাপুরকে নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জাতি সংস্থা (এশীয়ান) নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে, কিন্তু তার পরিধি স্পষ্টতই খুবেই সীমিত। এই অঞ্চলকে যদি নিরাপদ ও শক্তিশালী করতে হয়, তাহলে এই সংস্থাকে ব্যাপকতর ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে হবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি নিজেদের মধ্যে যখন এই ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত তখন শ্রীমতী গান্ধী ঐ অঞ্চলে সফরে গেলেন। স্বভাবতই এই সুযোগে তাঁর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথা হবে।

ভারত নিজেও যে এই ব্যাপারে আলোচনার জন্যে উৎসুক। কারণ, বৃটিশ উপস্থিতি ১৯৭১ সালের পর প্রত্যাহৃত হলে যে-শূন্যতার সৃষ্টি হবে, তা ভারতের স্বার্থকেও স্পর্শ করবে। এই কথা চিন্তা করে ভারত যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে একটা সক্রিয় ভূমিকা নিতে চায়, শ্রীমতী গান্ধী তার যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি এ-কথা স্পষ্টই বলেছেন যে, ভারত নিজেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারই একটি দেশ বলে মনে করে।

এই শূন্যতা পূরণের জন্যে ভারত কি উপায়ের কথা ভাবছে, শ্রীমতী গান্ধী তারও ইঙ্গিত দেন। ১৯শে মে তিনি সিঙ্গাপুরে পৌঁছান। সেখানে দ্বীপ-রাষ্ট্র সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লী কুয়ান ইউ-র সঙ্গে আলোচনার পর তিনি এই মন্তব্য করেন যে, বৃটেন চলে যাবার পর আর কোন বাইরের শক্তি এসে জুড়ে বসুক ভারত তা

চায় না। যদি শূন্যতা কিছু সৃষ্টি হয়, তাহলে সেটা এই অঞ্চলের দেশগুলির নিজেদেরই উদ্যোগী হয়ে পূরণ করা উচিত। আর সেটা সম্ভব হবে ঘনিষ্ঠতর আঞ্চলিক সহযোগিতার দ্বারা। এই সহযোগিতায় সকলেরই সমান দায়িত্ব থাকবে, কোন একটি দেশ আর সকলের ওপর খবরদারী করবে, তা চলবে না।

ভারতের এই ধারণা সম্পর্কে এই অঞ্চলের দেশগুলির মনোভাব যে প্রতিকূলে হবে না, তার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে মিঃ লী-র মন্তব্য থেকে। মিঃ লী'ও চান সংশ্লিষ্ট দেশগুলি নিজেরাই নিজেদের শক্তি গড়ে তুলুক। তিনি এমনকি ভারতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একটা বড় ভূমিকা দিতেও কুণ্ঠিত নন। তিনি বলেছেন, ভারতের নৌ-জাহাজকে সিংগাপুর তার দরিয়ায় সানন্দে স্বাগত জানাবে।

সিংগাপুরে সফর শেষ করে শ্রীমতী গান্ধী ২১শে মে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় যান। সেখানে অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী মিঃ গর্টন ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনার সময়ও তিনি আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। ভারত চায় অস্ট্রেলিয়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আরো বেশি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুক। তাতে এই এলাকায় সামরিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য আনতে সাহায্য করবে। অস্ট্রেলীয় নেতৃবৃন্দ অবশ্য এসম্পর্কে তাঁদের ধ্যান-ধারণার কথা পরিষ্কার করে বলেননি; কিন্তু তাঁরা এ-কথা বলেছেন, ভারত যদি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করে, তাহলে তাঁরা আপত্তি করবেন না।

আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্পর্কে ভারতের ধারণা যে-রকম, তাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভুত্বমূলক ভূমিকা ভারত কখনই গ্রহণ করবে না এ-কথা ঠিক। কিন্তু এখনকার চাইতে অনেক বেশি ভূমিকা গ্রহণ করবার ইচ্ছা যে তার আছে সে-কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন। কিন্তু মিঃ লী যে-কথা বলেছেন, কোন বন্ধুত্বই অর্থনৈতিক বন্ধন ছাড়া দৃঢ়তর হতে পারে না। কাজেই ভারত যদি এরপর এই অঞ্চলের সঙ্গে নিজেকে আরো বেশি জড়িত করতে চায়, তাহলে এই এলাকার অর্থনীতির সঙ্গেও তাকে জড়িয়ে পড়তে হবে। অর্থাৎ যে-পদ্ধতিতে ও ধারায় এতদিন তার বাণিজ্য হয়ে এসেছে, সেই পদ্ধতি ও ধারারও পরিবর্তন করতে হবে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

চতুর্থ পরিকল্পনার প্রস্তুতি

বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে কৃষির উৎপাদন বাড়ান হবে, মাত্র এইটুকু ছাড়া বলতে গেলে আর কোন কিছুতেই পরিকল্পনা কমিশনের প্রস্তাব বা হিসাবের সঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে সমবেত মুখ্যমন্ত্রীরা একমত হননি। কিন্তু, তবু, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির এই লক্ষ্যের ভিত্তিতে চতুর্থ পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য পরিষদ পরিকল্পনা কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ফলে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দীর্ঘকাল ধরে যে অনিশ্চয়তার শিকায় তুলে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে তাকে আবার নামিয়ে আনা হবে, এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের এই বৈঠকে বিবেচনার জন্য পরিকল্পনা কমিশন যে-দলিলটি উপস্থিত করা হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে, বার্ষিক শতকরা ৫ থেকে ৬ শতাংশ হারে ভারতীয় অর্থনীতির প্রসারের লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনা করতে হলে প্রতি বছর দুই-তিনশ' কোটি টাকা বাড়তি সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে সমবেত মুখ্যমন্ত্রীরা প্রায় একযোগে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এই পরিমাণ বাড়তি সম্পদ সংগ্রহ করার আশা দুরাশামাত্র। কয়েকজন বলেছেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনায় রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্র থেকে কি পরিমাণ সাহায্য পাবেন, তা না জানা পর্যন্ত তাঁরা বলতে পারবেন না, কি পরিমাণ বাড়তি সম্পদ সংগ্রহ করতে পারবেন। নূতন ট্যাক্স ধার্য করা সম্ভব নয়, এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীরা একমত। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ বলেছেন যে, ট্যাক্সের যেসব সূত্র থেকে আয় বাড়াবার সম্ভাবনা বেশী সেগুলি সব কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের হাতে রেখে দিয়েছেন আর রাজ্য সরকারগুলির হাতে যেসব ট্যাক্সের সূত্র রয়েছে, সেগুলি থেকে আয় বাড়াবার সম্ভাবনা কম। মুখ্যমন্ত্রীরা মনে করেন যে, পরিকল্পনার জন্য বাড়তি সম্পদ সংগ্রহ করতে হলে সেই দায়িত্ব প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। ফসল বৃদ্ধির ফলে চাষীর হাতে যে বাড়তি পয়সা এসেছে তার একটা অংশ রাজকোষে টেনে নিয়ে আসার জন্য পরিকল্পনা কমিশন যে সুপারিশ করেছিলেন সেই সুপারিশও মুখ্যমন্ত্রীরা গ্রহণ করেননি। পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী ডি আর গ্যাডগিল এক সময়ে প্রস্তাব করেছিলেন যে, কৃষি আয়কর বাড়িয়ে গ্রাম থেকে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করা যেতে পারে। রাজনৈতিক বিরোধিতার ভয়ে পরে তিনি সেই প্রস্তাব মুলতুবী রেখেছেন। তার পরিবর্তে পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব এসেছে, গ্রামাঞ্চলে ডিবেঞ্চার বিলি করে কৃষি আয়ের একটা অংশ ঋণ হিসাবে সরকারী তহবিলে গ্রহণ করা হোক। কিন্তু এই প্রস্তাবেও মুখ্যমন্ত্রীরা বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেননি।

পরিকল্পনা কমিশনের দলিলে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, রপ্তানি বাবদ আয় বছরে ৭ শতাংশ হারে বাড়ান হবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছান আদৌ সম্ভব হবে কিনা সে-বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে সংশয় আছে। এমনকি কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীগ্যাডগিলও জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অধিবেশনে বলেছেন যে, এই লক্ষ্য একটু বাড়িয়ে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ পরিকল্পনা সংক্রান্ত অন্যান্য যেসব বিষয়ে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকের পরও অনিশ্চিত হয়ে আছে সেগুলির মধ্যে আছে, বিদেশ থেকে কি পরিমাণ অর্থসাহায্য পাওয়া যাবে। পি-এল ৪৮০ অনুযায়ী খাদ্য আমদানি বন্ধ হয়ে গেলেও এই খাদ্য বিক্রীর দরুন ভারত সরকার যে-টাকা পান সেটা বন্ধ হয়ে গেলে কি হবে ইত্যাদি।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির যে লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ সায় দিয়েছেন তার ব্যাপারেও মুখ্যমন্ত্রীরা এ-কথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, এই লক্ষ্যে পৌঁছান তখনই সম্ভব হবে যখন কেন্দ্রীয় সরকার উন্নত বীজ, সেচ, সার ইত্যাদির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে পারবেন।

শ্রীগ্যাডগিল জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সমাপ্তি অধিবেশনে বলেছেন যে, ৫ শতাংশ হারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা গেলে সামগ্রিক উন্নয়নের হার ৬ থেকে ৭ শতাংশ হবেই। তবে সেটা অনেকটাই নির্ভর করবে চতুর্থ পরিকল্পনা কালে আমরা কি ধরনের কার্যসূচী গ্রহণ করব তার উপর। তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, নির্ধারিত উন্নয়নের হারে পৌঁছান যাতে সম্ভব হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে সম্ভব হবে।

শ্রীগ্যাডগিল বলেন যে, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সদস্যরা যেসব প্রস্তাব দিয়েছেন, সেগুলির কথা মনে রেখে পরিকল্পনা কমিশন এখন আগামী পাঁচ বছরের জন্য সম্পদের বিশদ হিসাব করবেন ও কার্যসূচী প্রস্তুত করবেন।

উপসংহার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, আমাদের দেশে উন্নয়নের চাহিদা বেশী, অথচ আমাদের সম্পদ সীমাবদ্ধ। সুতরাং আগামী পাঁচ বছরে এমন কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে যাতে উন্নয়নের হার দ্রুত হতে পারে।

রাজ্যের রাজনীতি

মহেন্দ্র চক্রবর্তী

কৃষ্ণনগর উপ-নির্বাচনের পরাজয় যুক্তফ্রন্টের উপর চাবুকের কাজ করেছে। ক্রান্তিদলের জাতীয় এক্‌জিকিউটিভের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রন্টকে অটুট রাখা শিবের অসাধ্য কাজ ছিল। এর ওপর আবার ভবিষ্যতের নেতৃত্বের প্রশ্ন তো আছেই।

এ সপ্তাহের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কথা হচ্ছে, বাম কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো ফ্রন্টকে না ঘাঁটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফ্রন্ট ভেঙে না দেবার পেছনে একটা কথাই উঁকি দিচ্ছে এবং তা হচ্ছে ফ্রন্ট ভেঙে গেলে জনসাধারণের কাছে 'ইমেজ' সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। তা সে ক্রান্তিদল 'জোতদারদের পার্টি' বা সি-পি-এম "চীনের তাঁবেদার পার্টিই' হোক না কেন, কারোর মুক্তি নেই।

কৃষ্ণনগর উপ-নির্বাচনে ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত পার্টিগুলি দেখতে পেয়েছেন যে, তাঁদের পায়ের মাটি আস্তে আস্তে এখন সরে যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে, আসন বন্টন নিয়ে ফ্রন্টের সামনে আর একটা বড় ফাঁড়া আছে। এই ফাঁড়াটা ফাঁড়ার মত ফাঁড়া। কারণ অনেক দল আছে, যাঁদের একটা-দুটো আসনের ওপর সত্যিসত্যি পার্টির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তবু যে বড় একটা 'সংঘর্ষ' বাধবে, তা মনে হয় না। তাই দেখা গেছে, বাম কম্যুনিস্ট পার্টির 'অতিবিপ্লবী' ভূমিকা কিছুটা স্তব্ধ হয়েছে। প্রমোদবাবু মুখ বন্ধ করেছেন। আর অন্যদিকে অজয় মুখোপাধ্যায় ফ্রন্টে সদলবলে থাকার জন্য ক্রান্তিদল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে ইতিমধ্যে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন। প্রকাশ্যেই ঐ পার্টির সর্বভারতীয় নেতা মহামায়াবাবুর সঙ্গে অজয়বাবু 'লড়াই' আরম্ভ করে দিয়েছেন।

কৃষ্ণনগর উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় প্রকৃতপক্ষে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের অদম্য উৎসাহের স্বীকৃতি। অবশ্য কংগ্রেস পার্টির লোকেরা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সাহায্য করেছিলেন। একথা সত্য যে, সাধারণ নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানির পর নিজেদের মধ্যে 'লড়াই' করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বুঝেছেন, নির্বাচনের মুখে শক্তির অপচয় না করে অন্তত লোকদেখানো সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। তাই মন-কষাকষি থাকলেও তাঁরা এখন এক হয়ে চলার ভাব দেখাচ্ছেন। প্রফুল্লবাবু যখন প্রথম এপ্রিল মাসে কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন, তখন নদীয়া জেলার কংগ্রেসের ভেতরের অবস্থা বর্ণনা না করাই ভাল। শ্রীসেন নিজেই বলেছেন, জেলা কংগ্রেসের মধ্যে প্রাণ নেই বললেই চলে।

একজন আর একজনের নামে নালিশ করে চলেছে। আটমাসের মত জেলা কংগ্রেসের বাড়ীর ভাড়া বাকি; টাকা না দেওয়ায় লাইট ও টেলিফোন কেটে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস অফিসে কেউ আসেন না। ইলা পালচৌধুরী একবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান, আর একবার সরে দাঁড়াবেন বলেন। এই সময় অনেক ধরপাকড় করে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে রাজী করা হয়েছিল। কিন্তু পরে তিনিও পালালেন। সবচেয়ে বড় কথা, কৃষ্ণনগর শহরের ওপর গত বিশ বছরের মধ্যে কংগ্রেসের পক্ষে প্রকাশ্যে কোন সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

যাক, এই অবস্থার মধ্যে বাড়ীভাড়ার টাকা শোধ করা হয়েছে। কংগ্রেস অফিসে জমজমাট ভাব শুরু হয়েছিল। কৃষ্ণনগর শহরের ওপর প্রফুল্লবাবু সভাও করেছিলেন। শ্রীমতী পালচৌধুরী এতখানি ভয় পেয়েছিলেন যে, তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে বক্তৃতা দিতে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। তবে প্রফুল্লবাবু জানিয়েছিলেন, 'একটু ভেবে দেখি।' কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা পরে দেখা গেলো প্রধানমন্ত্রী না যাওয়ার ব্যাপারটার একটা কদর্থ করা হয়েছে।

কংগ্রেসের ভেতরের বিক্ষুব্ধ দল অবশ্য গোপনে গোপনে ক্ষমতায় আসীন দলের বিরুদ্ধে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা উপ-প্রধানমন্ত্রী যে শ্রীঅতুল্য ঘোষের নেতৃত্ব স্বীকার করতে রাজী নন, তা আজ আর গোপন নেই। কিন্তু তা বলে তাঁরা এমন কিছু করতে চাইছেন না, যাতে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সংগঠনের শক্তিহানি হয়।

এদিকে লোকদলের নেতারা দেখতে পাচ্ছেন আসন্ন অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনে একক দল হিসেবে লড়তে গেলে সমূলে উৎপাটিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই তাঁরা কংগ্রেসে যোগ দেবার ব্যবস্থা করছেন। তবে কৃষ্ণনগর উপ-নির্বাচনে জয়লাভের পর কংগ্রেসের দু-একজন মাতব্বরের মধ্যে বেশী না হলেও কিঞ্চিৎ গর্ব এসেছে। আঁতাত হবে না, সোজা কংগ্রেসে আসতে হবে। এই হ'লো তাদের শেষ কথা। লোকদলের নেতাদের কাছে আর অন্য কোন পথ নেই। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে আগে যে একটা আস্থার ভাব ছিল, সম্প্রতিকালে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রিত্ব করতে গিয়ে তাতে বেশ ঘা লেগেছে। শ্রীহুমায়ুন কবির এখন একমাত্র ভরসা। তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশকে বলতে শোনা গেছে, কবির সাহেব শ্রদ্ধেয়, তবে এখন তিনি কিভাবে কংগ্রেসের হয়ে কথা বলবেন?

লোকদলের নেতারা কংগ্রেসে চলে যাওয়ার পর শ্রীজাহাঙ্গীর কবিরের জাতীয় পার্টি ও শ্রীআশুতোষ ঘোষের আই-এন-ডি-এফ-এর কথা আসবে। ছোটভাই কবির সাহেব তাঁর পার্টির হয়ে উত্তরবঙ্গে প্রার্থী মনোনয়নের কাজে এখন উঠেপড়ে লেগেছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রার্থীগুলি বাছাই করার পর রাজনীতির বাজারে তিনি বেরুবেন। তৃতীয় শক্তিগোষ্ঠী সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা এখন সুদূরপরাহত। ক্রান্তিদল, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি, প্রজা সোস্যালিস্ট, ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা মনে প্রাণে অবশ্য চাইছেন, মার্ক্সবাদী দলগুলির আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু তারপর দাঁড়াবেন কোথায়? তাই কেউ এগিয়ে এসে বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতে চাইছেন না। তাই জাতীয় পার্টি আর আই-এন-ডি-এফ এখন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

তবে এর মধ্যে আই-এন-ডি-এফ-এর নেতা আশুবাবু দুটো কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। যাঁর বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধ, সেই অতুল্যবাবুর ছবিটা জনসাধারণের কাছে কালি লাগিয়ে জঘন্যভাবে তুলে ধরার জন্য তিনি চেষ্টা করে চলেছেন। এই কাজে তিনি কতখানি সাফল্যলাভ করেছেন ভবিষ্যৎ তার প্রমাণ দেবে।

তাই পঃ বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি একটু ভালভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, যে পার্টি বা নেতা যাই করুন না কেন, এই রাজ্যের রাজনীতিতে ধীরে ধীরে 'পোলারিজেশন' শুরু হয়ে গেছে। অবশ্য মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদী দলগুলি দুটো পৃথক পৃথক দল বা ফ্রন্টে নিজেদের নাম পুরোপুরিভাবে লেখাতে কিছুটা সময় নেবে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা

ডলির নামাবলী

শৈল চক্রবর্তী

'নাম কি আসে যায়'। কোনো মনীষী-কথিত এই উক্তি অজামিল বসু মানতে পারেন নি। প্রাক-যৌবনে বয়োপ্রাপ্তির শুরুতেই তাঁর যথেষ্ট আপত্তি ছিল তাঁর নিজের নামের বিরুদ্ধে।

যখন ক্লাসের ছেলেরা অজামিলকে মিল বিবর্জিত ক'রে অজায় পরিণত করেছিল তখন তাঁর মধ্যে বিদ্রোহ জেগেছিল। পিতৃদত্ত নামাঙ্কিত হয়ে না থাকতে এবং স্বনামকে পরিবর্তিত, পরিবর্জিত ও পরিবর্ধিত ক'রে নতুন সংস্করণে প্রকাশিত হতে বাসনা জেগেছিল। কিন্তু বিদ্রোহের উত্তাপ কিছু ধূম উদ্গীরণ করেই নিভে যায়। অজামিল নামটা বসে রইল তাঁর ঘাড়ে সারাজীবন ধরে।

নামটাই ত সব। বলতেন অজামিল। নাম বাদ দিলে থাকে কি? আর তাই যদি না হবে তবে নামকরণ নিয়ে এত মাথা-ব্যথা কেন? বাপ-মারা এত ভাবিত হয়ে

ময়েই বা কেন? ডজন ডজন নামের পুষ্প-বৃষ্টি হয় তখন, তা থেকে ভেবে চিন্তে বাছাই করা হয় একটি। বাংলা অভিধান চলন্তিকা বিষ্ণুপুরাণ রামায়ণ মহাভারত ঘাঁটা বাদ যায় কি?

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় নামের ইতিহাসে অনেক অবাঞ্ছিতরাও কোনো না কোনো ফাঁকে এসে যায়। আমাদের আশে-পাশে যারা বিরাজ করেন তাঁদের মধ্যে অনেক খেঁদাপচা হেরো ফেলু বিশে ইত্যাদি কত অদ্ভুত ডাকনামই বহাল তবিয়তে সারাজীবন ধরে বিরাজ করছেন।

উত্তরজীবনে অজামিল তাই তাঁর একমাত্র কন্যার নামাকরণের সময়ে যথেষ্ট সতর্ক হয়েছিলেন। মস্তক ঘর্মাক্ত ক'রে সর্বদিকে দৃষ্টি রেখে ছন্দ, অর্থ, ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার ওজন ক'রে অনেক নামই বাছাই করেছিলেন তিনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্যালকের প্রস্তাবিত 'ডালিয়া' নামটাই টিকে গেল।

কিন্তু তের বছর পরে একদিন—

নাম নিয়ে কি ধুয়ে খাবি?

কেন? নামটা কি খুব তুচ্ছ জিনিস নাকি?

ডালিয়া তর্ক করে মার সংগে।

সে বলে, নামেতেই ত সব। তোমরা আর নাম খুঁজে পেলে না। আমার নাম রাখলে 'ডালিয়া'? আহা, কি নাম!

কেন? ডালিয়া একটা ফুলের নাম ত?

আহা, কি ফুল! একরত্তি গন্ধ নেই। শুধু ঢাউস্ চেহারা আছে। আর কি কোনো ফুল ছিল না?

দেখ ডালি, মা চটে গিয়েই ধমক দেন, তোর বাবা আর আমি অনেক নাম ঘেঁটে বাছাই করেই এটা রেখেছি। আসলে আমরা যখন হাতড়াচ্ছিলুম, কি রাখব কি রাখব, সেই সময় তোর মামা বললে, কেন দিদি 'ডালিয়া' নামটা কি খারাপ? আমাদের পছন্দ হয়ে গেল। তাই রাখলুম আমরা ঐ নাম।

তোমাদের যেমন রুচি! ডালিয়া যেন ফুলের নাম, কিন্তু তা থেকে হ'ল ডালি। ডালি মানে ডালা—আহা, কি মানে! ডালি ডালার মতই মুখ বাঁকায়।

আমরা ভেবেছিলুম 'যূথিকা' রাখব, তোর মামাই বাধা দিলে। বললে, আদ্যি-কালের পচা নাম একটা রাখবে শেষকালে? 'ডালিয়া' কত মডার্ন! সে কি আজকের কথা রে। তের বছর আগে। এখন ত তুই তেরয় পড়লি।

যাই হোক, ও নাম আমার মোটেই পছন্দ নয়, ডালি মাতুলদত্ত নামের ঘোরতর বিপক্ষেই দাঁড়াল। কেন? তের বছর চলে আসছে বলেই মানতে হবে? তার কি মানে আছে? আমরা এ যুগের মেয়ে, এখনকার মত চলব আমরা। তের বছর আগের ঐ পুরনো পচা নামে আমার দরকার নেই!

রাত্রে খাবার সময় বাবার কাছে মা তুললেন কথাটা, ওগো, শুনেছ মেয়ের কান্ড! ডালির নিজের নাম পছন্দ নয়—

অ্যাঁ, হাতে রুটির গ্রাস নিয়ে হাঁ করে থাকেন বাবা। নাম পছন্দ নয়? এ আবার কি কথা? কেউ নিশ্চয়ই ওর মাথায় ঢুকিয়েছে। কিরে ডালি, হয়েছে কি?

ডালি কপির তরকারিতে আঙ্গুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলে, হবে আর কি! তোমরা বেছে বেছে এমন একটা নাম রেখেছ—

কেন? ডালিয়া বসু—কি খারাপ শোনাচ্ছে?

ছিঃ, আমার কানেই বিচ্ছিরি লাগছে—কত ভাল ভাল নাম রয়েছে। তোমরা আর কিছু খুঁজে পেলে না। আমার ক্লাশের মেয়েদের কত সুন্দর সুন্দর নাম!

বল ত, দু'একটা শুনি, বাবা চিবুতে চিবুতে কথা বলেন।

কেন, মণিকুন্তলা রয়েছে, মধুমালতী, সূর্যমুখী সেন, ডায়েনা হালদার, উত্তরা অধিকারী। তারপর ঝুমকোলতা, কুন্তলিকা, হাসনাহানা—কত আর বলব। এসব নামের কেমন একটা গ্র্যাভিটি আছে।

তা যেন হ'ল, আবার হাল্‌কা নামও ত রয়েছে, কুহু, কেকা, রুবি, ডলি, মলি, কিটি—নেই কি এসব? বাবা চাটনি টাকনা দিতে দিতে ছেদ টানতে চান। যত মানুষ তত রকম রুচি আর তত রকম নাম, এ ত হবেই।

বাঃ, তার মধ্যে ভাল মন্দ নেই? এখন আর ঐ ছুটকো নাম চলে না। ডালি না-ছোড়। যাই হোক, আমি আমার নাম বদলাব।

এখন নাম বদলাবি? সে কি রে?

কেন কি হয়েছে? নাম কি আমার গায়ের সংগে খোদাই করা আছে নাকি? নাম ত পোষাকের মত। ওটা বদলানো এমন কি শক্ত?

তা কি নাম নিবি এখন? মা শুনতে চান মেয়ের ইচ্ছেটা।

বেশ একটা মডার্ণ নাম, ডালি মাথা নীচু করে বলে, আমি কি আর ঠিক করেছি কিছু—তোমরাই বল না।

আমাদের ওপরই যদি ভার দিস, তাহলে ভাবতে হবে ত, এখনই কি আর বলা যায়? বাবা জল খেয়ে উঠে পড়েন।

রবিবার চায়ের টেবিলে আবার কথা উঠল।

বাবা বললেন, মডার্ন নাম বলতে কি বোঝায় বুঝতে পারছি না। যদি বিদেশী নামের ধাঁচে যেতে হয় তাহলে ধর, ভায়োলেট হেলেন বিয়াত্রিচ......

তুমি থাম বাপু, ওসব আমি বলতে পারব না, মা রায় দিয়ে বসেন।

কেন? আমাদের ক্লাশেই ত রয়েছে এথিনা—

তাই নাকি? তাহলে নারসিসাস কেমন লাগে?

না, ওটা ভাল লাগছে না, 'না' দিয়ে আরম্ভ......

তাহলে ক্লিওপেট্রা?

রক্ষে কর তোমরা, মা লাফিয়ে ওঠেন যেন। আমার দ্বারা ওসব ডাকা হবে না তা বলে দিচ্ছি। যাই রাখ, আমি ওকে ডালি বলেই ডাকব।

আহা, ধৈর্য ধরো না, কর্তা আশ্বস্ত করেন গৃহিণীকে। এটা একটা আলোচনা, মানে, খোঁজা হচ্ছে। এখনও ত সিলেক্‌শান হয়নি।

কেন, আমাদের পৌরাণিক নামগুলো কি খারাপ? মা জের টানেন, কুন্তী সীতা লক্ষ্মী সাবিত্রী—

হিড়িম্বা শূর্পনখাকে বাদ দিলে কেন? ডালি মুখ বিকৃত করে। ছিঃ, ওগুলো এখন ঝিয়েরা নিয়েছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে এসেছে, বাবা যেন হাতড়ে পেলেন একটা কিছু। 'প্রজ্ঞাপারমিতা'—বেশ গুরুগম্ভীর, আবার শাস্ত্রীয়।

ওটাও পুরনো হয়ে গেছে, ডালি খুশি হল না। আমাদের ক্লাশেই রয়েছে, তপতী গার্গী লীলাবতী ভাস্বতী প্রজ্ঞা...

তাহলে বড় মুস্কিলে ফেললি দেখছি, বাবা যেন অকুল সমুদ্রে পড়েন। একবার চলন্তিকাটা কনসাল্ট করলে হত।

ডালি বলল, আমি এমন নাম চাই, যা দিয়ে আমাকে বোঝাবে। অথচ একেবারে নতুন আনকোরা, কেউ সে-নাম রাখেনি কারুর কখনো—

দাঁড়া দাঁড়া, বাবা যেন দূরে একটা আলোকবর্তিকা দেখতে পেয়েছেন এমনি ভাব করে বললেন, রবীন্দ্রনাথ একটা নাম লিখেছিলেন, অদ্ভুত এবং নতুন—

কি বলত!

হাঁচিয়েন্দানি কুরুস্কুনা।

কখখনো না, মা তীব্র প্রতিবাদ করেন। এরকম নাম রবিঠাকুর লিখতেই পারেন না।

ডালি বলে, সে ত উনি ঠাট্টা করে লিখেছেন। তোমরা যে কি! একটা নাম

রাখতে পাচ্ছ না আর আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছ! অভিমানে ডালির ঠোঁট ফুলে ওঠে।

আচ্ছা আচ্ছা, বাবা যেন এবার সিরিয়াস হয়ে ওঠেন, নামসমুদ্র মন্থন করে তুলে দিচ্ছি তোকে, পছন্দ হয় কিনা দেখ। অ আ থেকেই যদি শুরু করা যায়। তাহলে অকুণ্ঠিতা, আলোকিতা, অনাস্বাদিতা, আর একটু বড় যদি চাও, তাহলে আসমুদ্র-হিমাচলনন্দিতা...আর যদি একটু গ্রীক ধরনের চাও তাহলে, আফ্রোদিতা আপোলোনা—

কি বললে? আফ্রোদিতা, তাই না? ডালি যেন ঝলমল করে ওঠে।

হ্যাঁ, আফ্রোদিতা। মানে আফ্রোদাইতি হচ্ছেন একজন গ্রীক দেবীর নাম। তা থেকে বাংলা করে দিলাম।

এটাই থাক। বলে উঠল ডালি। বেশ গুরুগম্ভীর অথচ গ্রীক উপাখ্যান রয়েছে ওর মধ্যে। আবার বাংলা ছন্দও আছে... আজ থেকে আমি আর ডালি নই...আমি আফ্রোদিতা। মা বাবা, তোমাদের দুজনকেই বলে রাখছি, আমাকে আর ডালি ডালি করো না।

আমরা না হয় জানলুম, বাইরের লোককে জানাবি কি করে? বাবা এখন সমস্যার আর এক প্রান্তে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তোর স্কুল ক্লাশের বন্ধু তারপর আত্মীয়স্বজন...আর একটা অন্নপ্রাশনের আয়োজন করতে হবে নাকি আমায়?

লিখে টেলিফোন করে জানিয়ে দেব। ডালি এক লহমায় জটিলতার সমাধান করে দেয়। তোমরা কিন্তু ভুলে যাবে না কিছুতেই, আমি আর ডালি নই, আমি আফ্রোদিতা।

ডালি অধুনা আফ্রোদিতা গুনগুন করে চলে গেল নিজের ঘরে।

আমি জন্মে দেখিনি যে, মেয়ের পাগলামিতে বাপ এমন আস্কারা দেয়। মা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, ছি ছি, মেয়ে যা বলবে তাই করতে হবে? নাম নাম করে কাল থেকে কী কান্ডই না চলছে! মেয়ের এত জেদ ভাল নাকি? বাপ-মা নাম দিয়েছে, তা ওর পছন্দ হচ্ছে না—

ওগো শোনো শোনো—বাবা এবার সাড়া দেন। এটা একটা নির্দোষ আমোদ করা, বুঝলে না! তুমি চটে যাচ্ছ কেন?

হয়েছে! বুড়ো বয়সে ভীমরতি আর কাকে বলে? নাম নিয়ে ছেলেখেলা—এই হলো আমোদ। আজ নিজের নাম বদলাচ্ছে, কাল বলবে, বাবা, তোমার নামটা বড্ড সেকেলে, ওটা বদলে দিই, তখন খুব হবে—

আরে দেখই না কতদূর যায়। আমি বলে দিচ্ছি, অত ভয়ের কিছু নেই।

কিন্তু ঐ যে 'আ দিয়ে কি একটা মাথামুন্ডু নাম রাখা হল, মেয়ে ত খুব খুশি। ও নাম ধরে ডাকব কি করে সেইটা বুঝিয়ে বলতে পার?

[illegible] কষ্ট করলেই পারবে—

ক্রীং ক্রীং ক্রীং... ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো, বাবা ধরলেন ফোনটা। কাকে চাই? অ্যাঁ, ডালি? না ডালি বলে ত কেউ নেই এ বাড়িতে। না না—ডালিয়াও না। আমার মেয়ের নাম? আফ্রোদিতা...

তাহলে 'রং নাম্বার'—রাগত উক্তি আসে ওপার থেকে। বাবা রেখে দিলেন ফোনটা।

ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল ডালি।

বাবা, একটা ফোন আসবার কথা আছে, এলে ডাকবে তুমি আমায়, অ্যাঁ কেমন?

আরে, একটা ত ছেড়ে দিলুম এইমাত্র। বাবার নির্লিপ্ত জবাব।

কেন?

সে ত তোর নয়।

কাকে ডাকছিল?

ডালিয়াকে। আমি বললুম, ডালিয়া বা ডালি বলে কোনো মেয়ে থাকে না ত এ বাড়িতে।

কি বললে সে?

'রং নাম্বার বলে' গজগজ করতে লাগল।

ছিঃ ছিঃ তুমি কেন ডাকলে না আমায়? নিশ্চয়ই যশোপ্রকাশ, কত দরকারী কথা ছিল—তুমি যেন কী—

কোথা আমায় ধন্যবাদ দিবি, তোর প্রচার-সচিবের প্রথম কাজ একটা করলুম! তুই ত আর সত্যি ডালি নস এখন, আছিস কি? বল!

না।

তবে ত ঠিকই করেছি। তোর ফোন এলে ডেকে দেব তোকে। ঠিকই ডাকব।

ডালি—ও আবার... রান্নাঘর থেকে ডাক এল।

আঃ! সেই ডালি! যাচ্ছি—যাচ্ছি—

রান্নাঘরে গিয়ে মাকে খুব একচোট নিল ডালি, তুমি ডালিকে একদম ভুলে যাও, বলবে আফ্রোদিতা!

ওই বিদঘুটে নাম বলে আমি ডাকতে পারব না, মায়ের সাফ জবাব।

কেন? কষ্টটা কি! আ-ফ্র-রো-দি-তা... একটু চেষ্টা করলেই ত বলা যায়।

মেয়েকে ডাকবার জন্যে এখন নাম মুখস্ত করো, আমার ত আর কাজ নেই—ঐ তোর লেবুর সরবৎ করে রেখেছি, খেয়ে যা, আর ঐ ঠাকুরের প্রসাদ আছে—

বাঃ, কী নাড়ু করেছ মা! ফার্স্টক্লাশ! নবনীতা বলেছে, একদিন আসবে তোমার হাতের রান্না খেতে।

তা, একদিন তাকে বলিস খেতে, মার মনটা খুশি হয়ে ওঠে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন, বসে খা-দিকি—

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ডালি। সর্বনাশ, আজ যশোপ্রকাশের ফোন করার কথা, করেও ছিল নিশ্চয়, কিন্তু বাবা ধরেই মাটি করে দিলে। কি মনে করবে সে? আর, যদি ফোনে না পেয়ে নিজেই চলে আসে? তাহলে অবশ্য মজা হয়। খুব সারপ্রাইজ দেব একটা।

গুন গুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ডালি চুলটা আঁচড়ে বিনুনি করল। মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আয়নায় দেখল বার বার।

সিফন শাড়িটা পরা যাক—প্রকাশ এলে একেবারে বেরিয়ে পড়া যাবে। হেনাদের বাড়ি হয়ে তাকে নিয়ে একেবারে ছটার শোয়ে। শাম্মী কাপুরের বই...... বুকের ওপর দিয়ে শাড়ির আঁচলটা বার বার তুলে দিয়েও যেন ঠিক হচ্ছে না। কতটা তির্যক-ভাবে রাখা যায় সেইটাই হচ্ছে কথা। বাব্বা, সুরঙ্গমাটা কি বেহায়া! আঁচলটা এমনভাবে রাখে যে বার বার খসে যায়... ঐ, কে যেন কথা বলছে নীচে—প্রকাশ নয়ত? আমার ত হয়ে গেল, পন্ডসটা একটু ঘষে নিলেই হয়—

নীচে নামতেই হারুকে সামনে পেল ডালি।

কেউ এসেছিল নাকি হারুদা?

হাঁ হাঁ, কে যেন আসছিল, তোমারে খুঁজছিল।

তারপর?

কর্তাবাবুর সাথে কথা কইয়া চলি যাইল।

সর্বনাশ! নিশ্চয়ই প্রকাশ।

শংকরস্ উইকলির পাতা ওল্টাচ্ছিলেন কর্তাবাবু। ডালি সোজা তাঁর সামনে এসে বললে কে এসেছিল, বাবা?

একটি ছেলে, চুল ওল্টানো, সরু প্যান্ট, ছুঁচলো জুতো, মুখে বসন্তের দাগ—

হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রকাশ—কি বললে তুমি?

আমি বললুম, ডালি বলে ত কেউ নেই এ বাড়িতে, ডালিয়া বলেও নয়, তারপর সে মাথা চুলকোতে লাগল, তারপর চলে গেল, এই ত মাত্র এক মিনিট আগে—

সর্বনাশ! প্রকাশদা, প্রকাশদা রাস্তার দিকে মুখ করে চিৎকার করল ডালি!

কিন্তু কোথায়? সে ত মোড় পার হয়ে দূরে মিলিয়ে গেছে ততক্ষণে।

তুমি আমায় ডাকলে না কেন? বাবাকে জেরা করে ডালি।

তোকে ত ডাকেনি সে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিল সে।

ও যে বললে ডালিকে চাই—তুই ত আর ডালি নস—বল না তুই কি ডালি? তোর নাম না বললে তোকে ডাকব কেন বল!

আহা, নাম যাই হোক, আমাকেই ত ডেকেছিল।

দেখো, আহ্লাদিতা, নতুন নামে তুমি উদিতা হয়েছ সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

ডালি ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে খাটে দুম করে শুয়ে পড়ল। চোখটা ভারী ভারী...নতুন নাম নিয়ে এমন বিভ্রাট হবে কে জানত? এমন হবে জানলে এত জেদ ধরত কি সে?

এমন সময় আবার কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ধড়মড়িয়ে উঠে ছুটল ডালি, দেখে এক পিয়ন হাতে তার একটা প্যাকেট, দরজার দিকে পিছন ফিরে চলে যাবার জন্যে সবে মাত্র পা বাড়িয়েছে।

কে কে কে? এক নিঃশ্বাসে চেঁচিয়ে ওঠে ডালি।

একটা পার্শেল রে। ডালিয়া বসুর নামে এসেছিল, তাই আমি ফেরৎ দিলাম, বললেন বাবা।

না না না, পিয়ন—পিয়ন, দেখি ওটা! উৎকণ্ঠ ডালি।

ঠিকানা ত একই হ্যায়—লেকিন নাম মে কই গড়বড় হোগা—দেখিয়ে। পিয়ন পার্শেল প্যাকেট ডালির হাতে হস্তান্তরিত করেছে।

এ ত আমার জিনিস, দাও আমাকে, কই কোথায় সই করতে হবে—ধড়ফড় করে ডালি।

বাবুনে কহা কি, পিয়নের সন্দিগ্ধ আওয়াজ, ই নামকা কোই নেহি ইধার, লেকিন পাত্তা এহি হ্যায়—কোই গড়বড় হোনে সকতা, ময়ত নয়া আয়া হ্যায়......

না না, কিচ্ছু গড়বড় নেই, এই ত আমার নাম রয়েছে।

তব্ বাবু আপ কেয়া দেখা নেই? পিয়ন কর্তাবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করে।

অজামিল তখন আর কি করেন, কন্যা-পক্ষ সমর্থন করে পিয়নকে হিন্দিসঙ্কুল বাংলায় বুঝিয়ে বললেন যে সব ঠিকই আছে, সে নিশ্চিন্তে ডেলিভারী দিতে পারে; এটা শুধু তাঁদের একটা ফ্যামিলি রসিকতা হচ্ছিল মাত্র।

ডালি নাম সই করে পার্শেলটি কর-তলগত করে ভাবতে থাকে কি আছে ওর মধ্যে।

ইতিমধ্যে মাও এসে দাঁড়িয়েছেন অকুস্থলে। তিনি বলেন, দ্যাখ, হয়ত তোর মামা শিমলা থেকে কোনো প্রেজেন্ট পাঠিয়েছে তোর জন্যে।

তাহলে ত মজা হয়, উল্লসিত ডালি। আমিই বলেছিলুম ফলস মুক্তো আর পাথরের কথা—কটা মালা গাঁথব বলে।

পিয়ন চলে গেছে। বাবা মা ও মেয়ের মধ্যে নানা অনুমানের মন্তব্য বর্ষিত হতে থাকে।

বাবা বলেন, ভাল করে দেখত কে পাঠাচ্ছে, যে পাঠাচ্ছে তার নাম ত থাকার কথা—

উল্টে পাল্টে দেখে ডালি, পার্শেলের এক কোনে দেখে ছোট ছাপা শিলপ আঁটা—ফ্রম নো-মিস্টেক প্রেস।

তাহলে নিশ্চয়ই কোনো বইটই হবে, বাবা বলে ওঠেন।

ইতিমধ্যে প্যাকেটটা খুলে ফেলেছে ডালি। কাগজের পর কাগজ সরিয়ে ডালি যা দেখলে তাতে তার চোখ কপালে উঠে গেছে।

কিরে? অমন করে তাকিয়ে রইলি কেন? মা বলে ওঠেন, কি আছে ওর মধ্যে?

কার্ড, নিস্পৃহ জবাব ডালির।

কিসের? কার? বাবা আরও গভীরে যেতে চান।

আমার। আমার নামের কার্ড। অনেক-দিন হ'ল প্রেসে দু'হাজার কার্ড ছাপতে দিয়েছিলুম—তাই পাঠিয়েছে। একটুও মনে ছিল না আমার—

দেখি দেখি—বাবা হাত বাড়ান।

হাতে একটা কার্ড নিয়ে বলেন, ডালিয়া বসু, বাঃ! সুন্দর আইভরি কার্ডে ছেপেছে ত, কালিটাও ভাল ব্রোঞ্জ ব্লু—

চিন্তান্বিতা ডালি। ডালি না আহ্লাদিতা? দুই নামের মাঝখানে সে দোদুল্যমান হয়ে ঝুলতে থাকে!

তাহলে আহ্লাদিতা! বাবা হাসতে হাসতে বলেন, কি হবে এতগুলো কার্ড? এমন সুন্দর আইভরি ফিনিশ, একেবারে দু হাজার কার্ড ত বেবাক জলাঞ্জলি যাচ্ছে—তাই না?

কি? নষ্ট করবে ওগুলো? মা যোগ দেন।

নষ্ট হবে কেন? ডালি জোর দিয়ে বলে ওঠে।

কি করবি?

আমারই থাকল। আমি ডালিয়া বোসই থাকলুম—দরকার নেই আমার ঐ বিদঘুটে নামের। ঐটার জন্যে আজকের দিনটাই মাটি। প্রকাশ ফিরে গেল, গেল সিনেমাটাও—

যাক, বাঁচা গেল, মা বাবা দুজনেই হেসে ওঠেন হো হো করে। ডালিয়া থেকে রূপান্তরিত, আহ্লাদিতা আবার ডালিয়া-রূপেই অবতীর্ণা হলেন, কেমন? থ্রি চিয়ার্স ফর নো-মিস্টেক প্রেস!

কলকাতায় বৃষ্টি
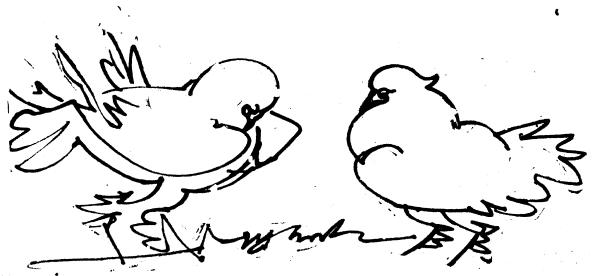
কখনো মল্লিক আর কটন স্ট্রীটের সংযোগস্থলে থমকে দাঁড়িয়েছেন কী। আমি চারতলা একটা বাড়ীর কথা বলছি। বাড়ীটার দিকে তাকালে অনেকগুলো বছর পেরিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। একদা বাড়ীর নীচে, তেতলা-চারতলায় সারাদিন গিশগিশ মানুষের ভীড় লেগে থাকত। ওরা সবাই আকাশে চোখ মেলে দু'এক টুকরো মেঘ খুঁজত। মনে মনে ছড়া কাটত—আয় বৃষ্টি ঝেঁপে। এক পশলা বৃষ্টি হলে ভাগ্যবান জুয়াড়ীরা পকেটে বাজীর টাকা তুলত। আর বৃষ্টি না হলে বাজীর টাকা ফক্কিকার।

সত্যি, সেকালের কলকাতায় বৃষ্টির জুয়া নিয়ে আপামর জনসাধারণের জীবনে কী মাতামাতিই না ছিল! দুনিয়ায় বিচিত্র-রকমের জুয়া আছে। জুয়ার নেশা যেমনি তীব্র তেমনি মারাত্মক। বৃষ্টি নিয়ে জুয়া-খেলা নিঃসন্দেহে অভিনব। তখনো আলি-পুরের হাওয়া-অফিস থেকে আবহাওয়া-বার্তা প্রচার শুরু হয়নি। বস্তুত কোন অবৈধ টিপস পাবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই বৃষ্টির জুয়া ভীষণ জমেছিল। আকাশের মুখ দেখে বলতে হোত বৃষ্টি হবে কি হবে না। এ গেসিং গেম কল-কাতার মানুষের কাছে মস্ত আকর্ষণ ছিল।

কটন ও মল্লিক স্ট্রীটের জংশনের চার-তলা বাড়ীটায় বড়োরকমের জুয়ার আড্ডা বসত। তিনতলায় রাস্তার দিকে বাড়ানো একটা সিমেন্টের জলাধার। সেটার আয়তন চার বর্গফুট। জলাধারের তলায় সবসময় কিছুটা বৃষ্টির জল জমে থাকত। জলাধার বৃষ্টির পর ভর্তি হলে বাড়তি জল কিনারা বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ত।

বৃষ্টি সম্পর্কিত জুয়ায় বেশ কয়েকটি নিয়মকানুন ছিল। অলিখিত কনভেনশন। বৃষ্টির জুয়াড়ীদের সেইসব কনভেনশন মেনে বাজী ধরতে হোত। একটু এদিক-ওদিক হলে জুয়ার কর্তা বাজীর টাকা মেরে দিত। যেমন কেউ বৃষ্টি হবে বলে বাজী ধরল, কিন্তু দেখা গেল নির্দিষ্ট সময়ে ঝিরঝির বৃষ্টি নামল কলকাতায়। মূল জুয়াড়ী তখন কিছু টাকা দিত না। বৃষ্টির জুয়ায় ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির ঠাঁই ছিল না। এক মিনিট স্থায়ী হলেও ঝেঁপে বৃষ্টি হওয়া দরকার। বৃষ্টির অঝোর ধারায় কেবল কবিচিত্ত পুলকিত হয় না, জুয়াড়ীর হৃদয়েও রোমাঞ্চ শিহরণ জেগেছে।

দিনে দু'বার জুয়ার সেশন শুরু হোত। পয়লা সেশন ছিল ভোর পাঁচটা থেকে বেলা বারোটা নাগাদ। মাঝখানে কিছু সময়ের বিরতি। দ্বিতীয় সেশন দুপুর থেকে রাত্রিশেষ। অভিনব এ জুয়ার ভক্ত ছিল অনেক। একবার এ নেশায় মজলে, এর হাত থেকে রেহাই ছিল না। জুয়ার বাজী ধরে ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকানো আর আকাশে কালো টিপছাপ দর্শনে জুয়াড়ীর রোমাঞ্চ। এক পশলা ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলে কোন জুয়াড়ী নিশ্চয় গাইতে পারত, হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে......

অনেকের অভিযোগ, জুয়া ও ফাটকা-বাজী নাকি সাহেবদের আমদানী। কিন্তু ভারতবর্ষে যে কোনরকম জুয়ার প্রচলন ছিল না, তা নয়। মৃচ্ছকটিক নাটক ও মহাভারতে জুয়ার উল্লেখ আছে। তবে মানতেই হবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় লটারী ও জুয়া ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। স্যার জন ল্যামবার্ট কলকাতার পুলিশ কমিশনারদের অন্যতম। কোনরকম জুয়ার খেলা তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর কলকাতা আসার আগে থেকে বৃষ্টির জুয়া চলে আসছিল। ল্যামবার্ট সাহেব বৃষ্টির জুয়ার পিছনে লাগলেন। ভদ্রলোকের অক্লান্ত চেষ্টায় কলকাতায় একদিন বৃষ্টির জুয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু জুয়াড়ীরা কুছ নাহি মানয়ে বাধা। ততদিন আফিম, রুপো ও পাট নিয়ে নানারকমের জুয়া চালু হয়ে গেছে। অল্প মূলধনে হঠাৎ-করে বড়লোক হবার নেশা কি সহজে যায়। আষাঢ় ও শ্রাবণ এ দু' মাস বৃষ্টির জুয়ায় তেমন উত্তেজনা ছিল না। বছরের অন্যসময়ে আবহাওয়া বুঝে জুয়ার বাজী ওঠানামা করত।

বর্ষাকালে এক টাকার বাজীতে খুব বেশী হলে দু টাকার দান পাওয়া যেত। এ যেন সিওরহিট ফেভারিট ঘোড়ায় বাজী ধরা। অন্য ঋতুতে বৃষ্টির জুয়ায় ১ টাকায় ৮০০ টাকা পর্যন্ত জুয়ার দান উঠেছে। তবে কপালে বৃষ্টি না থাকলে কি আর বৃষ্টির টাকা পকেটস্থ করা যায়? সবরকম জুয়াখেলায় একটা অনিশ্চয়তা আছে। তা নইলে আর উত্তেজনা কোথায়? রেসকোর্সে ট্রিপল টোটের বাজী কি সহজে মেলে?

রেসকোর্সের সঙ্গে বৃষ্টির জুয়ার অনেক পার্থক্য। বৃষ্টির জুয়ায় কেউ বাজী জিতলে তাকে স্টেকের টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হোত না। তাছাড়া বাড়ীটার রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য টাকায় এক আনা ফীও লাগত। বলা বাহুল্য সারা বছরে এই ফীয়ের টাকার পরিমাণ নিতান্ত কম ছিল না।

এ হেন জুয়ার বিজনেসেও বঙ্গ-সন্তান নাক গলাতে পারেনি। মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা বৃষ্টির জুয়া পরিচালনা করত। অবশ্য তাতে সর্বভারতীয় জুয়াড়ীদের ভাগ্যপরীক্ষায় কোন বাধা ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, জুয়াড়ীর দেশ কাল

শক্তি ঘোষ

র্‌য় জাতির কোন পার্থক্য নেই। দুনিয়ার সব জুয়া খেলা-ই যে নিতান্ত চান্স, এমন কথাও বলা যায় না। ঘোড়ার চৌদ্দপুরুষের কুষ্ঠী নিয়ে অনেককে আমরা ব্যস্ত দেখেছি। বৃষ্টির জুয়ার নেশায় যারা কটন আর মল্লিক স্ট্রীটের জংশনে বারবার ছুটে আসত, তারা বৃষ্টি নিয়ে কম গবেষণা করেনি।

সেকালের জুয়াড়ীরা হাওয়া-অফিস ও ব্যারোমিটারে বিশ্বাস করেনি। পাঁজির তিথি-নক্ষত্রের ওপর বৃষ্টি-জুয়াড়ীরা ঢের বেশী নির্ভর করত। চাঁদ ও জোয়ার-ভাঁটা দেখে তারা বোঝার চেষ্টা করত বৃষ্টির আদৌ সম্ভাবনা আছে কিনা। অনেক উৎসাহী জুয়াড়ী আবার সারা বছরের বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যান রাখত। কাজেই জুয়াড়ীরা যে কপাল ঠুকে গঙ্গা মাইকি কৃপার ওপর বাজী ধরত তা নয়। পাঁজির হিসেব বাদ দিলেও বিশেষ গাছ-গাছড়ার সাহায্য ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য এসব গাছ-গাছড়ার কেউ তালিকা রেখে যায়নি। জনৈক জুয়ারসিক তাঁর বইয়ে সামুদ্রিক আগাছার উল্লেখ করেছেন। এই সী-উইড কোন জাতীয় তা তিনি বলেননি। সামুদ্রিক এ আগাছার বিশেষ পরিবর্তন দেখে বোঝা যেত বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কি নেই।

একটা এক্সপেরিমেন্টের কথা আমরা জানতে পেরেছি। বেশীর ভাগ জুয়াড়ী জল-ভরা বোতলে কয়েকটি জোঁক ছেড়ে রাখত। যেদিন বোতলের তলা ছেড়ে জোঁকগুলো ওপরে উঠে আসত, জুয়াড়ীরা ধরে নিত সেদিন বৃষ্টি হবে। এ পরীক্ষা কতখানি সফল হয়েছিল আজ বলার উপায় নেই। তবে জুয়াড়ী মহলে জোঁকের কদর দেখে বোঝা যায়, জোঁকের ফলিত জ্যোতিষ একেবারে বুজরুকী ছিল না।

জুয়ার আড্ডায় অনেকে নিয়মিত ধর্না দিত। তাদের জন্য একটু স্পেশ্যাল ব্যবস্থা ছিল বইকি! এসব নিয়মিত খদ্দেরদের ঠাঁই ছিল চারতলায়। সেখান থেকে অভি-জাত জুয়াড়ীরা দেখত নীচের তলার ও রাস্তায় কেমন ভীড় বাড়ছে। তারা আরো দেখত বৃষ্টির জলে কেমন করে সিমেন্টের জলাধার ভর্তি হচ্ছে। সেদিনের কবিরা বৃষ্টির কমার্শিয়াল ছন্দপতন কেমন করে মেনে নিয়েছিল আমরা জানি না।

'দি রোমান্স অব ক্যালকাটা ডার্বি সুইপ' বইয়ের লেখক হবস সাহেব একটা ব্যাপারে জাতীয় চরিত্রের ভালো সার্টি-ফিকেট দিয়েছেন। বৃষ্টির জুয়ার আসরে কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধেনি। আজকাল খেলার ময়দানে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রায়ই ইঁট-পাটকেলের খণ্ডযুদ্ধ বাধে। কিন্তু বৃষ্টির জুয়ায় জনৈক তেও-য়ারীর সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন হট্টগোল হয়নি। বাজী ধরতে হলে যে নগদ টাকার দরকার ছিল তা নয়। চেনা খদ্দের একটু ঘাড় কাত করলেই হোল। হারলে জুয়াড়ী বাজীর টাকা শোধ করত। আবার বৃষ্টির করুণা হলে লাভের টাকাও পেয়ে যেত। জুয়ার ব্যাপারে পাকা জুয়াড়ীরা কদাচিৎ কথার খেলাপ করে। একবার কথার খেলাপ হলে জুয়াড়ীর কেরিয়ার খতম। অন্য জুয়াড়ীরা তাকে নির্ঘাত একঘরে করে দেবে।

বৃষ্টির জুয়া সম্পর্কে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। কলকাতার এক ছোকরা সরকারী অফিসে চাকরী করত। বৃষ্টির জুয়ায় দু'একবার ভাগ্যপরীক্ষা করে দেখতেও ছাড়েনি। তার বাড়ীর জানলার কাছে একটা গাছে একবার দুটো পাখি এসে বাসা বাঁধল। ছোকরা পাখি দুটোর হাব-ভাব খুব যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করত। কিছু-দিনের পর সে বুঝতে পারল যেদিন বৃষ্টি হয়, সেদিন আগে থেকে পাখিদুটোর হাব-ভাব বদলে যায়। ছোকরা তার আবিষ্কারের কথা ইউরোপীয়ান হেডক্লার্ককে জানাল। ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক যাচাই করে দেখল ছোকরার কথায় ভেজাল নেই। আর যায় কোথা! দু'জনেই বৃষ্টির জুয়ায় বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখতে লাগল। ততদিনে পক্ষী-মিথুনের গল্প সারা কলকাতায় জুয়াড়ী মহলে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই এসে ছোকরার বাড়ীর আশেপাশে ভীড় করতে লাগল। যে যা পারল ছাতু-কলা-সরিষার দানা উপহার বয়ে আনল। কিন্তু জুয়াড়ীদের নজর ও নজরানা পক্ষীমিথুনের বেশীদিন সহ্য হল না। একদিন ওরা ফুরুৎ করে কোথায় উড়ে পালাল। সেই সঙ্গে ছোকরা কেরানী ও তার ইউরোপীয়ান বসের সোনার খনিও চিরকালের মত হারিয়ে গেল।

...সেইসব রোমান্টিক দিন অধুনা কল-কাতার জনারণ্যে আর কখনও ফিরবে না।
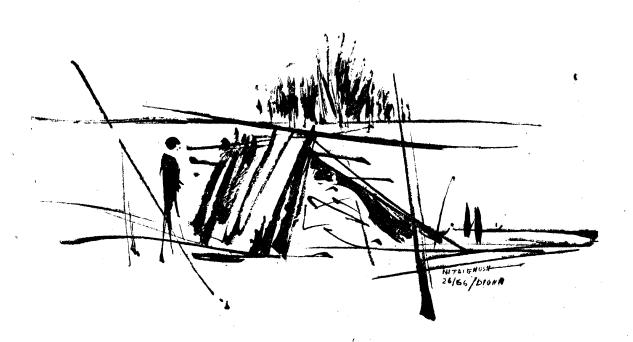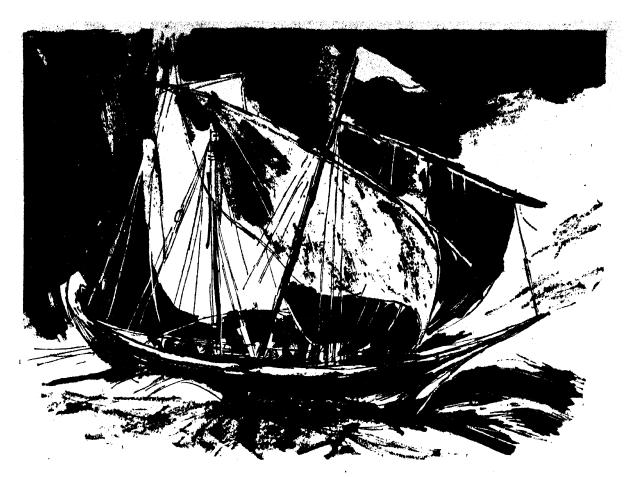
নীল দরিয়ায় ভারতীয় জলদস্যু

অজিত চট্টোপাধ্যায়

আভেরীর গল্পটা ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত ইউরোপে। জলদস্যু আভেরী মোগল বাদশাহের একটি জাহাজ লুণ্ঠন করে তাঁর ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছেন। এই হল পাতা চাপা কপাল। সামান্য একটু ঝড়বাতাসে পাতা গেল সরে। ব্যস, অমনি কপাল গেল খুলে। মোগল বাদশাহের জাহাজ লুণ্ঠন মানে অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা লাভ। আভেরী সেই মুসলমানীকে বিয়ে করে মাদাগাস্কারে বহাল তবিয়তে রয়েছেন।

আভেরীর অবশ্য পাতা চাপা কপাল নয়। তার কপালে পাথর চাপা। সে পাথর ঝড়ে বাতাসে, সমুদ্রের ঢেউয়ে, ডাঙার নানা ঘাতপ্রতিঘাতেও কখনও সরেনি। পাথর চাপা কপাল নিয়ে জন আভেরী মরেছেন, কিন্তু ইউরোপের লোকে ততদিনে তাঁর সৌভাগ্যের গল্পটাই বেশী করে জেনে নিয়েছে।

জন আভেরীর কাহিনী আকৃষ্ট করল জলদস্যুদের। ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ— সব জাতের মানুষ। বিশেষ করে ডাচদের। হল্যাণ্ডের জলদস্যুরা ভারতের উপকূলে পৌঁছবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। স্পেনের নতুন উপনিবেশগুলি অবশ্য রয়েছে। কিন্তু ওখানে বড় ভীড়। বরং আরব সাগরে মোগল বাদশাহের জাহাজ লুঠ করে রাতারাতি বরাত ফিরিয়ে নেওয়া যাবে।

বোম্বাই থেকে কোচিন পর্যন্ত সুদূর সমুদ্র উপকূলকে মালাবার উপকূল বলে অভিহিত করা হয়। এই মালাবার উপকূলে অর্ধশতাব্দীরও বেশী সময় অ্যাঙ্গ্রিয়া জলদস্যুরা আধিপত্য বিস্তার করেছে। অ্যাঙ্গ্রিয়াদের ভয়ে দীর্ঘকাল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যজাহাজগুলি বন্দর ছেড়ে বেরোতে সাহস পায়নি। দুঃখ করে বোম্বাইয়ের ইংরেজপ্রধান লণ্ডনের ডিরেক্টর-দের কাছে চিঠি লিখেছিলেন—কানোজী অ্যাঙ্গ্রিয়ার জ্বালায় ইউরোপীয় বাণিজ্য-জাহাজগুলি ধ্বংস হতে বসেছে। সুরাট থেকে দেবল পর্যন্ত কানোজীর নিরংকুশ আধিপত্য। ইউরোপীয়রা তার কাছে অসহায়। বোম্বাইয়ের ইংরেজপ্রধান সব কিছু শুনেও নীরব থাকতে বাধ্য।

ভারতীয় জলদস্যুদের মধ্যে অ্যাঙ্গ্রিয়াদের একটি উজ্জ্বল নাম। অ্যাঙ্গ্রিয়াদের জলদস্যু না বলে জলদস্যু রাজা বললে বোধহয় যথার্থ বলা হয়। লম্বায় দেড়'শ মাইল এবং প্রস্থে ষাট মাইলের মত এক ভূখণ্ডের তীরে বেশ কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল তারা। আলিবাগ, সেভার্নদুর্গ এবং বিজয়দুর্গ। দুর্গ অর্থ দুর্গসমন্বিত পাহাড় বা শিলা। এখানে বসেই কানোজী অ্যাঙ্গ্রিয়া তার সাঙ্গোপাঙ্গদের আদেশ পাঠাতেন। কোথায় সমুদ্রের কোন দিক থেকে শিকার আসছে। নির্দেশ পেলেই জলদস্যুর দল ছুটত দরিয়ার বুকে ভেসে। মার মার শব্দে

শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুণ্ঠিত ধনদ্রব্য নিয়ে ফিরত।

যে কোনো একটি ভারতীয়কে জলদস্যুরূপে কল্পনা করা কিছু শক্ত। সমুদ্র মানেই হিন্দুদের কাছে কালাপানি। সেই কালাপানির বুকে আদ্যিকালের পাল তোলা জাহাজে দাঁড়িয়ে জাতধর্ম খোয়ানো কয়েকজন হিন্দু জলদস্যু দিকচক্রবালের দিকে শিকারের সন্ধানে চেয়ে আছে, এমন একটি ছবি ধ্যানধারণার সংগে সামান্য বেমানান। তবু কিছু কিছু নজীরও আছে। সমুদ্রপথের সম্বন্ধে ভারতীয়দের অভিজ্ঞতা যে প্রয়োজন হয়েছে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। ভাস্কো ডা গামা যখন কালিকটে এসে উঠলেন তখন তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল একজন ভারতীয় জলদস্যু। লোকটি মুসলমান এবং গোগো শহরের বাসিন্দা। সম্ভবত সমুদ্রের বুকেই ভাস্কোর সংগে লোকটির সাক্ষাৎ হয়েছিল। পর্তুগীজ আলবুকার্ক যখন গোয়া আক্রমণ করলেন তখন তাঁর সংগে ছিল একজন হিন্দু জলদস্যু। কোন্ দিক থেকে আক্রমণ করলে জয় অনিবার্য হবে তার সুলুকসন্ধান দিয়েছিল এই জলদস্যু মানুষটি।

অ্যাংগ্রিয়াদের দলে অবশ্য শুধু ভারতীয়রাই ভিড় করেনি। সুদূর ইউরোপ থেকে বহু দুঃসাহসী নাবিক এসে কাজ করত অ্যাংগ্রিয়াদের সংগে। এদের প্রত্যেকেই দক্ষ এবং জলযুদ্ধে কুশলী। ঘরছাড়া এই নাবিকের দল ছুটে এসেছিল ভারতের উপকূলে। বোধহয় আভেরীর সেই ভাগ্য ফিরে যাওয়ার গল্পটা তাদের আর গৃহে টিকতে দেয়নি।

ভারতীয় জলদস্যুদের মধ্যে অ্যাংগ্রিয়াদের সমকক্ষ আর কেউ নেই। গুজরাটের কুলি জলদস্যু এবং চুনোপুঁটি আরো কিছু নাম জানা যায়। কিন্তু অ্যাংগ্রিয়ারা ওদের কাছে সুমেরু পর্বত। অ্যাংগ্রিয়ারা যদি রঘু ডাকাত হয় তবে ওরা নিতান্তই সিঁদেল চোর। অ্যাংগ্রিয়াদের প্রথম পুরুষটির নাম তুকাজী। তুকাজীর পরই কানোজী বা কোনাজী। ইনিই বিখ্যাত জলদস্যু কানোজী অ্যাংগ্রিয়া। বোম্বাই থেকে মাইল কুড়ি দূরে অ্যাংগরবাদী নামক স্থানে কানোজীর জন্ম। সম্ভবত জন্মভূমির নাম অ্যাংগরবাদী বলেই জলদস্যুরা অ্যাংগ্রিয়া বলে খ্যাত।

কংকন উপকূলে ছত্রপতি শিবাজীর একটি নৌবহর সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকত। জলযুদ্ধে কানোজীর হাতেখড়ি শিবাজীর নৌবহরে। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে কানোজী হলেন মারাঠা নৌবহরের সরখেল বা অধিনায়ক। কিন্তু কানোজী বেশীদিন রইলেন না মারাঠা নৌবহরে। দলবল সংগ্রহ করে তিনি নিজেই এক ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করে বসলেন। শুরু হল তাঁর জলদস্যুবৃত্তি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদাগরী জাহাজগুলি বাঘের মুখে অসহায় হরিণের মত টুপ টুপ শিকার হতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই টনক নড়ল ইংরেজদের। কানোজীর কাছে লোক পাঠাল তারা। বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী দরিয়ায় কানোজীর এই হামলা বরদাস্ত করবে না ইংরেজরা। পুনরায় অ্যাংগ্রিয়া জলদস্যুদের অত্যাচারের কথা শুনলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে কানোজীকে। হুমকি শুনে কানোজী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। বিদেশী বেনিয়ার এই আস্পর্ধা তাঁকে রীতিমত ক্রুদ্ধ করল। সংগে সংগে জবাব দিলেন কানোজী। চিন্তার কারণ নেই। ইংরেজরা তাঁর নাম কোনোদিন ভুলবে না। এমন কিছু করে যেতে তিনি বদ্ধপরিকর। সুতরাং শুরু হল জলদস্যুর শিকার খোঁজা। আরো কিছু সদাগরী জাহাজ ধরা পড়ল কানোজীর দলবলের হাতে। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ দূত গেল কানোজীর কাছে। এখনও সাবধান হোক কানোজী। নইলে বদলা নিতে তৈরী হবে ইংরেজরা। কিন্তু কানোজী অ্যাংগ্রিয়া এবার আর রাগলেন না। শূন্য আস্ফালন চিনতে তাঁর দেরী হয়নি। ইংরেজ দূতের দিকে চেয়ে মুচকি হেসেছিলেন কানোজী। ব্যংগ এবং জ্বালাধরানো হাসি।

ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ের খুব কাছাকাছি একটি দ্বীপে এসে আড্ডা জমালেন কানোজী। এখান থেকে বোম্বাই নজরে আসে। দুর্গ তৈরী হল দ্বীপে। বোম্বাইয়ের ইংরেজদের কানে খবরটা গেল। জলদস্যু অ্যাংগ্রিয়ার শক্তি অগ্রাহ্য করবার মত নয়। আর ইংরেজদের তেমন কি ক্ষমতা? কানোজীর দলে দক্ষ সব ইউরোপীয় নাবিক। সুতরাং ইংরেজদের মনে ঠাণ্ডা ভয় দেখা দিল। বোম্বাই তেমন সুরক্ষিত নয়। হুট করে বোম্বাইয়ে এসে ওঠা খুবই সহজ।

ইতিমধ্যে চার্লস বুনে নামক এক ভদ্রলোক গভর্নর হয়ে এলেন বোম্বাইয়ে। বুনে শক্ত লোক। দুর্বলচিত্ত নন। জলদস্যুদের হামলা শুনে তিনি রুখে দাঁড়ালেন। বোম্বাইয়ের বসতির চারপাশে মস্ত এক প্রাচীর উঠল। জলযুদ্ধের উপযোগী জাহাজ তৈরী শুরু হল তাঁর আদেশে। বুনে দেখলেন যে কোম্পানীর মাইনেপত্র ভীষণ কম। অথচ অ্যাংগ্রিয়ার কাছে গেলে সেই নাবিকগুলোই দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণ মাইনে পায়। ফলে কোম্পানীর কাজে যারা আসে, তারা প্রথম শ্রেণীর লোক নয়। ফল বিষময়। জলদস্যুর সংগে সংঘর্ষে কোম্পানীর ক্ষয়ক্ষতি প্রচণ্ড। চেষ্টাচরিত্র করে বুনে অবশ্য সবদিক সামলালেন। কিছুদিনের মধ্যেই সুন্দর একটি নৌবহর জলদস্যুদের সংগে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে বন্দরে অপেক্ষা করতে লাগল।

চার্লস বুনে চেষ্টা করেছিলেন কানোজীকে দমন করতে। পর্তুগীজদের সংগে একটি চুক্তি করে উভয়ে মিলে অ্যাংগ্রিয়াদের সংগে লড়বেন। কিন্তু সমস্ত নষ্ট করলেন সেই রগচটা কমোডর ম্যাথুস—মাদাগাস্কার হয়ে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন বোম্বাইতে। পর্তুগীজ ক্যাপ্টেনের সংগে কি একটা বিষয় নিয়ে তর্ক শুরু হয়েছিল ম্যাথুসের। ব্যাপারটা ঘটে অভিযানে বেরোবার ঠিক আগে। রগচটা ম্যাথুস তর্কের মধ্যেই বেত দিয়ে আঘাত করেছিলেন পর্তুগীজ ক্যাপ্টেনের মুখে। আর একটু হলে সংগে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার হতে যাচ্ছিল। সকলে মিলে থামিয়ে দিলেন উভয়কে। কিন্তু পর্তুগীজ ক্যাপ্টেন আর সেখানে দাঁড়ালেন না। ফলে মিলিত প্রচেষ্টার অংকুরেই হল ইতি।

সব জলদস্যুর মত কানোজী অ্যাংগ্রিয়ারও অত্যাচারের গল্প আছে। এর কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে বলা শক্ত। কার্জেনভেন নামক এক ভদ্রলোকের কথা জানা যায়। ইনি মাদ্রাজের এক ব্যবসায়ী—নিজস্ব ব্যবসা নিয়েই ভদ্রলোক থাকতেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাস। ব্যবসায়ী চলেছিলেন চীনদেশের দিকে। সুরাট থেকে পণ্য নিয়ে তাঁর জাহাজ ছাড়ল। জাহাজটির নাম চার্লোটি। উপকূল ছেড়ে চার্লোটি বেশীদূর যেতে পারেনি। অ্যাংগ্রিয়া জলদস্যুর দল ঝাঁপিয়ে পড়ল চার্লোটির উপর। লুণ্ঠন করে চার্লোটিকে নিয়ে যাওয়া হল ঘেরিয়াতে। ঘেরিয়া অ্যাংগ্রিয়াদের একটি শক্ত ঘাঁটি। আর্জেনভেন এসে নামলেন ঘেরিয়াতে। কানোজীর কাছে মুক্তি চাইলেন নিজের। কিন্তু শুধু হাতে মুক্তি দেবার মত বদান্যতা কানোজীর নেই। ফেল কড়ি, মাখ তেল। এই হল দস্তুর। কানোজী দাবী করলেন মুক্তিপণ। যতদিন সেই মুক্তিপণ না আসছে ততদিন বন্দী থাকতে হবে কার্জেনভেনকে। পায়ে শেকল বা নিগড় পরিয়ে কার্জেনভেনকে ছেড়ে দেওয়া হল ঘেরিয়াতে। যাতে সে না পালাতে পারে। বন্দী দাসজীবন কাটাতে হল কার্জেনভেনকে। এক দু' মাস নয়— বেশ কয়েকটি বৎসর।

অবশেষে তাঁর মুক্তিপণ এল। অনেকদিন ধরে চিঠি লেখা হয়েছিল বোম্বাইতে। মুক্তি পেয়ে কার্জেনভেন ফিরে গেলেন ইংলণ্ডে। দীর্ঘ অদর্শনের পর মিলিত হলেন স্ত্রীর সংগে। কিন্তু বিশীদিন নয়। কার্জেনভেন হয়ত নিজেও জানতেন না যে মুক্তি পেয়ে আশার যে আলো তিনি দেখেছেন তা প্রদীপে তেল ফুরোবার সময়কার উজ্জ্বল দীপশিখার মতই ক্ষণস্থায়ী।

লণ্ডনে পৌঁছে পায়ে খুব ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন কার্জেনভেন, সুদীর্ঘ সময় পায়ে নিগড় বেঁধে চলাফেরা করতে হয়েছে তাঁকে। ধীরে ধীরে পায়ের সেই ক্ষত ভীষণ আকার ধারণ করল। অবস্থা এমন হল যে একটা পা কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বিষাদের ছায়া ছড়িয়ে পড়ল কার্জেনভেনের সংসারে। দীর্ঘকাল অদর্শনের পর স্বামীকে কাছে পেয়ে স্ত্রী হয়েছিলেন আত্মহারা। ভেবেছিলেন দুর্যোগের ঘনঘটা বুঝি ফাঁকা হয়ে গেছে। কিন্তু ডাক্তারের রায় শুনে আষাঢ়ের কালো মেঘের মত মুখখানা ভাবলেশহীন হয়ে এল।

যথাসময়ে অ্যামপুটেশন সমাধান হল। অস্ত্রোপচারের পর ক্যাপ্টেন সেরে উঠছিলেন ধীরে ধীরে। কিন্তু হঠাৎ কেমন করে একটি শিরা ছিঁড়ে গিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণের পর তিনি মারা যান।

কানোজী অ্যাংগ্রিয়ার দুলবলের হাতে ধরা পড়ে একটি ইংরেজ মেয়েকে যেতে হয়েছিল কোলাবায়। সেখানে অ্যাংগ্রিয়াদের একটি জোরালো ঘাটি। আরো কয়েকজন বন্দীর সংগে শ্রীমতী কুককে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছিল কোলাবায়—।

শ্রীমতী কুকের কাহিনী দুঃখের, আবার মজারও। মা বাবার সংগে শ্রীমতী কুক ইংলন্ড থেকে বেরিয়েছিলেন বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে। শ্রীমতীর বাবা ক্যাপ্টেন জেরাণ্ড কুক্ ফোর্ট উইলিয়মের একজন কর্মচারী। আগে সামান্য পদে ছিলেন,—উন্নতির ধাপে ধাপে এগিয়ে ইনজিনিয়র এবং ক্যাপ্টেনের মর্যাদায় আসীন হলেন। লয়্যাল ব্রিস নামক একটি জাহাজে করে ক্যাপ্টেন কুক বেরিয়েছিলেন। সংগে স্ত্রী এবং দুই কন্যা। বড়টি আমাদের নায়িকা শ্রীমতী কুক। বয়স তখন তের কিংবা চৌদ্দ। জাহাজটি সুবিধের নয়, বড় ধীরগামী। ভারতবর্ষের কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই আগস্ট মাস এসে গেল। আর আগস্ট মানেই ভরা বর্ষা। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের বুকে ধারা শ্রাবণের রিমঝিম সেতার বাজিয়ে চলেছে। অক্টোবর মাসে জাহাজটি এসে দাঁড়াল কারওয়ার নদীর মোহনায়। খবর পেয়ে কারওয়ারের ইংরেজ কুঠিয়াল জন হারভে এলেন ছুটে। অভ্যর্থনা করে কুঠিতে নিয়ে গেলেন ইংরেজ ক্যাপ্টেনকে। তাঁর স্ত্রী এবং দুই কন্যাকেও যথেষ্ট সমাদর করলেন কুঠিয়াল সাহেব।

কুঠিতে বসে বেশ কয়েকদিন খোশগল্প হল দুজনের। বারো বছর আগে উইলিয়ম কীড এসেছিলেন এই কারওয়ার নদীর মোহনার কাছে। যেখানে নোঙ্গর করে উইলিয়ম কীড্ জাহাজে পানীয় জলে ভরেছিলেন সে জায়গাটা জন হারভে দেখালেন ক্যাপ্টেনকে। ইংলন্ডের নানা গল্প শোনালেন জেরাল্ড কুকক। মোট কথা বেশ কটা দিন গল্পগুজবে কেটে গেল।

জন হারভের মনে কিন্তু একটা গোপন ইচ্ছে বড় হচ্ছিল। একটি কামনার কুসুম। ধীরে ধীরে সেটি পাপড়ি মেলছিল। হারভের সমস্ত কামনা বাসনা ত্রয়োদশী মিস কুককে ঘিরে। ভারতবর্ষে ইংরেজ আর কতজন? আর ইংরেজ মেয়েরা তো এদেশে ডুমুরের ফুলের মত। সামান্য কয়েকজন ইংরেজ মহিলা হয়তো এদেশে এসে থাকবেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই বোম্বাই, কলকাতা এবং মাদ্রাজের মত শহরে। কারওয়ারের মত ইংরেজ কুঠিতে শ্বেতাঙ্গিনীর দর্শন পাওয়া দুর্লভ সৌভাগ্যের কথা।

এদিকে অক্টোবর শেষ হয়ে এল। আকাশে বাতাসে শীতের আগমনের ইশারা। লয়্যাল ব্রিস এখন বাংলাদেশের [illegible] [illegible] পাড়ে। [illegible] শান্ত,—জল ঝড় হবার সম্ভাবনা নেই। কুঠিয়াল সাহেব এবার নিজের মনের কথা বললেন ক্যাপ্টেনের কাছে। তার মেয়েটিকে বিয়ে করতে চান হারভে। বিয়ে হলে শ্রীমতী কুক সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে।

সম্ভবত কুঠিয়ালের মুখের দিকে চেয়ে মায়া হয়েছিল ক্যাপ্টেনের। কারওয়ারের মত জনবিরল স্থানে পড়ে আছে বেচারা। কবে বিয়েশাদী হবে তার স্থিরতা নেই। তবে পয়সাকড়ি আছে লোকটার। কুঠিয়ালগিরি ছাড়া নিজেও ব্যবসা-টাবসা করে। বেশ দু' পয়সা কামিয়েছে। বিয়ে হলে মেয়ে পায়ের উপর পা তুলে পরম সুখে কাল কাটাবে। শুধু একটা জিনিস নিয়ে মনে খচখচানি। পাত্রের বয়স বড় বেশী। তের বছরের মেয়েকে যেন তৃতীয় পক্ষের পাত্রের হাতে সমর্পণ করা হচ্ছে।

সংগে তার বালিকা-বধূ

তবু বিয়ে হয়ে গেল। কয়েকদিন পরেই শ্বশুর-শাশুড়ী চলে গেলেন কলকাতায়। শ্রীমতী কুক স্বামীর ঘরকন্নায় এসে জাঁকিয়ে বসলেন। এক বৎসর পরেই কিন্তু হারভে দেশে ফিরে যাবেন বলে স্থির করলেন। কোম্পানীর চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে হারভে এলেন বোম্বাইয়ে। সংগে তার বালিকা-বধূ—ত্রয়োদশী গৃহিণী। অবশ্য ইংলন্ডে ফেরার জন্য আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে,—নিজের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে টাকাকড়ি ফিরে পেতে সময় দরকার।

বোম্বাইয়ে এসে জন হারভের বালিকা-বধূ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কারওয়ারের দিনগুলি মন্থর, যেন পাথরের মত বুকে চেপে বসত। অথচ বোম্বাইয়ে প্রাণের ছড়াছড়ি। বুড়ো স্বামীকে মনে ধরেনি শ্রীমতীর। লোকটা ঠাকুর্দার বয়সী। বউয়ের কানে কানে প্রেমের কথা বলে না। যা শোনায় তা হল তত্ত্বকথা। অথচ সমস্ত দিন ঐ লোকটার সংগেই কাটাতে হয়।

এখানে এসে তরুণ দুই ইংরেজ ভদ্রলোকের সংগে আলাপ হল শ্রীমতীর। একজনের নাম উইলিয়ম গিফোর্ড, অন্যজন মিস্টার টমাস চৌন। এদিকে কারওয়ারে রবার্ট নেন্স নামক এক ভদ্রলোককে পাঠানো হয়েছিল কুঠিয়ালের পদে। ভদ্রলোক মারা গেলেন হঠাৎ সেখানে। নতুন কুঠিয়াল হয়ে যিনি এলেন কারওয়ারে তার নাম মিস্টার ক্লিটউড। বোম্বাইয়ের গভর্নরের আদেশে হারভে দম্পতিকে পুনরায় আসতে হল কারওয়ারে। ক্লিটউড হিসেবপত্র বোঝে না। ওকে সাহায্য করার জন্য জন হারভেকে নিতান্তই প্রয়োজন। চার মাস কেটে গেল কারওয়ারে। দুর্ভাগ্যের কথা। জন হারভে কি একটা অসুখে মারা গেলেন। বিধবা বালিকাবধূ কিন্তু একটা কাজ করে বসলেন। বোম্বাইয়ের পরিচিত সেই ইংরেজ তরুণ এসেছিল কারওয়ারে। টমাস চৌন। বিধবার আর যেন তর সইছিল না। শ্রীমতী

স্বামীর মৃত্যুর দু' তিন মাস পরেই টমাস সাহেবের গিন্নি হয়ে গেলেন।

শ্রীমতী চৌন এবার দাবী করলেন তাঁর প্রথম স্বামীর গচ্ছিত অর্থের ভাগ। কোম্পানীর ঘরে বেশ কিছু টাকা আছে তাঁর মৃত স্বামীর। আইনত সে টাকার অধিকার তাঁর। বোম্বাইয়ে গিয়ে এ টাকার জন্য তদ্বিরতদারকি প্রয়োজন।

সুতরাং দ্বিতীয়বার কারওয়ার ছেড়ে চললেন শ্রীমতী তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে। পণ্যবাহী মরিচের একটি জাহাজ—সঙ্গে দুটি প্রহরী তরী। শ্রীমতীর বয়স এখন ষোল,—সমস্ত দেহে যৌবন ঝলমল করছে। বিধবা হবার পর একটু মুষড়ে পড়েছিলেন ভদ্রমহিলা। দ্বিতীয় বিবাহের পর আবার খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

শ্রীমতীর কপাল কিন্তু তখনও মন্দ। সমুদ্রপথে এক দুর্ঘটনায় আবার কপাল পুড়ল তার। অ্যাঙ্গ্রিয়া জলদস্যুদের চারটি জাহাজ ঘিরে ধরল বাণিজ্যজাহাজটিকে। লড়াই চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। হঠাৎ জলদস্যুদের গুলির আঘাতে টমাস চৌন আহত হয়ে পড়লেন। নতুন বউ এলেন ছুটে। কোমল দুই বাহু দিয়ে আহত স্বামীকে তুলে ধরলেন। রক্তে পরিধেয় উঠল ভিজে। টমাস চৌন আর কথা বলতে পারছিলেন না। ষোড়শী সুন্দরী পত্নীর কোলে মাথা দিয়ে চৌন মারা গেলেন।

জলদস্যুরা ধরে নিয়ে গেল তাঁদের। মাঝিমাল্লাদের নিয়ে যাওয়া হল ঘেরিয়ায় এবং ক্যাপ্টেন, শ্রীমতী চৌন ও অন্যান্য কয়েকজনকে কোলাবায় নিয়ে গেল জলদস্যুরা।

খবরটা পৌঁছল বোম্বাইতে। একটি সুন্দরী ইংরেজ রমণী জলদস্যু অ্যাংগ্রিয়ার কাছে বন্দিনী। সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ের ইংরেজ তরুণদের ধমণীতে উষ্ণ রক্ত দ্রুত প্রবাহিত হতে লাগল। কিন্তু ইংরেজরা উপায়হীন, অসহায়। দুর্দান্ত কানোজীর নৌশক্তির সঙ্গে এঁটে ওঠা প্রায় অসম্ভব। বোম্বাইয়ের গভর্নর চিঠি পাঠালেন জলদস্যুর কাছে অবিলম্বে বন্দী মানুষগুলিকে প্রত্যর্পণ করবার অনুরোধ জানিয়ে। কিন্তু কানোজী অ্যাঙ্গ্রিয়া অবিচল। মুক্তিপণ দিয়ে ইংরেজরা তাদের জাতভাইদের ফিরিয়ে নিয়ে যাক। শুধু কথায় কি মুড়ি ভেজে?

কিছুদিন পরে কয়েকজনকে অবশ্য ছেড়ে দিলেন কানোজী। কিন্তু শ্রীমতী এবং জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ছাড়া হবে না, যতক্ষণ দাবী মত মুক্তিপণের টাকা না এসে কোলাবায় পৌঁছয়। অবশেষে মুক্তিপণ পাঠাবার ব্যবস্থা হল। অল্প অর্থ নয়। সাকুল্যে ত্রিশ হাজার টাকা। টাকা নিয়ে লেফ্‌টেন্যাণ্ট ম্যাকিনটোস চললেন কোলাবায়। কানোজী অবশ্য টাকা পেয়েই মুক্তি দিলেন বন্দিনীকে। ফেব্রুয়ারী মাসের এক বিষণ্ণ অপরাহ্নে শ্রীমতীকে নিয়ে জাহাজ ছাড়ল। দূরে বিভীষিকার মত কোলাবার ঘরবাড়ীগুলি এখনও যেন ভয় দেখায়—। শ্রীমতী চৌন জাহাজে বসেই দুহাতে মুখ ঢাকলেন। দুঃস্বপ্নের মত সেই দিনগুলির কথা এখনও মনে করলে ভয়ে গলা শুকিয়ে আসে।

ডাউনিং লিখেছেন যে শ্রীমতীকে নাকি প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল কোলাবাতে। ম্যাকিনটোস প্রথম সাক্ষাৎকারে লজ্জা পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে ম্যাকিনটোসের দেওয়া তার নিজের একটি পরিধেয় পরে শ্রীমতী এসে নেমেছিলেন বোম্বাইতে। ঢিলাঢালা পুরুষের পোশাক—জামা ও প্যাণ্ট। সকলে অবাক হয়ে দেখেছিল তাঁকে।

এর কয়েক মাস পরেই একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দিলেন শ্রীমতী চৌন।.....

শ্রীমতীর কাহিনী অবশ্য আরো দীর্ঘ। নতুন করে পদবী বদল করেছিলেন শ্রীমতী, আর একজন ইংরেজ তরুণের ঘরণী হয়ে। অষ্টাদশী হবার আগেই বেশ কয়েকটি স্বামীর অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর। কিন্তু সে গল্প অ্যাঙ্গ্রিয়াদের প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অবান্তর। সুতরাং বর্জনীয়।

যাই হোক ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে কানোজী অ্যাঙ্গ্রিয়া মারা গেলেন। তাঁর পাঁচ ছেলে বাপের সম্পত্তির উপর ভোগদখল করবার জন্য প্রায় নিত্যই ছোটখাটো বিরোধে উপস্থিত হল। পাঁচটি সন্তানই অবশ্য কানোজীর বিবাহিতা পত্নীদের নয়। দুটি তাঁর বিবাহিত স্ত্রীর,—অন্য তিনটি তার রক্ষিতাদের সংগে সংসর্গের ফল। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তুলাজী আঙ্গ্রিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বসলেন। জলদস্যুবৃত্তিতে তুলাজী প্রায় তাঁর বাপেরই সমান। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বেশ কিছু সদাগরী জাহাজ তুলাজীর শিকার হল। শুধু সদাগরী জাহাজ নয়,—রেস্টোরেশান নামক একটি যুদ্ধজাহাজ দখল করে নিয়ে গেলেন তুলাজী। এই জাহাজটি বোম্বাইয়ে কোম্পানীর সেরা জাহাজ। সমস্ত দ্বিপ্রহর এবং অপরাহ্নের শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেও ইংরেজরা তাদের এই প্রিয় রণতরীটিকে রক্ষা করতে পারেনি।

কচ্ছ থেকে কোচিন পর্যন্ত সমুদ্রের উপকূলে তুলাজী অ্যাঙ্গ্রিয়া ত্রাসের সঞ্চার করে বসলেন। প্রয়োজন বুঝে বোম্বাইয়ের ইংরেজ গভর্নর মাদ্রাজ থেকে চারটি বড় যুদ্ধজাহাজ আনলেন বোম্বাইতে। সদাগরী জাহাজগুলি যখন বন্দর ছেড়ে দরিয়ায় বেরিয়ে পড়ত, তখন এই যুদ্ধজাহাজগুলি প্রহরীর মত যেত তাদের সঙ্গে। কিন্তু সব সময় এতেও শেষরক্ষা হয়নি। নেকড়ের মত অ্যাঙ্গ্রিয়া জলদস্যুরা তাদের ক্ষিপ্রগতি জাহাজগুলি নিয়ে বাণিজ্যজাহাজগুলিকে অনুসরণ করত। অন্ধকারে কখনও যদি একটি জাহাজ পিছিয়ে পড়ত, জলদস্যুরা শিকারী কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ত তার উপরে। সে বেচারীর সর্বনাশ হতে দেরী হত না।

শুধু ইংরেজ জাহাজগুলি নয়। পর্তুগীজ এবং ডাচেরাও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল তুলাজীর হাতে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে ফরাসীদের উপনিবেশ স্থাপনের স্বপ্নের প্রায় ইতি হয়েছে। ইংরেজরা এখন বহুদূর পর্যন্ত নিজেদের অধিকার বিস্তার করেছে। ছোটখাটো জলদস্যুরা বোম্বাইয়ের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে সচেষ্ট। এমন কি স্বয়ং তুলাজী অ্যাঙ্গ্রিয়াও একবার বোম্বাইয়ের গভর্নরের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু দিন বদলের পালা তখন শুরু হয়ে গেছে। অ্যাঙ্গ্রিয়াদের আধিপত্য ধীরে ধীরে খর্ব হচ্ছে। নাক উঁচু করে ইংরেজরা জবাব পাঠাল। প্রয়োজন হলে ইংরেজরাই জলপথ ব্যবহারের অনুমতি বা পাশ দিয়ে থাকে। কিন্তু একজন ভারতীয়ের কাছ থেকে পাশ বা অনুমতি নিয়ে জলপথ ব্যবহারের কথা ইংরেজরা চিন্তাও করতে পারে না।

কৌশল করে ইংরেজরা সন্ধি করল মারাঠাদের সঙ্গে। ঠিক হল জলপথে এবং স্থলপথে অ্যাঙ্গ্রিয়াদের উপর একযোগে আক্রমণ করতে হবে। ইংরেজ সৈন্যদলের অধিনায়ক হয়ে চললেন—কমোডর উইলিয়াম জেমস। প্রথম আক্রমণ হল সেভার্নদুর্গের ঘাঁটির ওপর। কমোডর জেমস মালাবার উপকূলের জলদস্যুদের ব্যাপারে অভিজ্ঞ। অ্যাঙ্গ্রিয়া জলদস্যুরা পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। সম্মুখ সমরে বোধহয় তাদের সায় ছিল না। কিন্তু কমোডর জেমস সমুদ্রপথে জলদস্যুদের ধাওয়া করা অনর্থক মনে করলেন। ইংরেজ সৈন্যরা সেভার্নদুর্গ অবরোধ করল। মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টা অবরোধের পর ইংরেজ সৈন্যরা দুর্গে প্রবেশ করল।

সেভার্নদুর্গের পর জেমসের নজর পড়ল ঘেরিয়ার উপর। অ্যাঙ্গ্রিয়া জলদস্যুদের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি ঘেরিয়া। বেশ কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ এবং প্রায় চৌদ্দশত পদাতিক সৈন্য নিয়ে ইংরেজরা চড়াও হল ঘেরিয়ার উপর। এবারও দলের অধিনায়ক জেমস। পদাতিক সৈন্যদের কর্তা হয়ে গেলেন লর্ড ক্লাইভ—পরবর্তীকালে ইতিহাস যাঁকে স্মরণ করে রেখেছে। এছাড়া ছটি পুরোপুরি রণ-তরী নিয়ে রিয়ার অ্যাডমিরাল ওয়াটসন এসেছেন ইংরেজদের সামর্থ্যের খুঁটিকে সুদৃঢ় করতে। বোম্বাইয়ের কাউন্সিলের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল সৈন্যাধ্যক্ষদের উপর। ......তুলাজী হয়ত টাকাকড়ি দিয়ে একটা রফা করতে চাইবে। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে লোকটা রাজা বা রাজপুত্র নয়। ও একটা বোম্বেটে জলদস্যু মাত্র। সমুদ্রপথ নিরুপদ্রবে ব্যবহার করবার অনুমতি পাবার জন্য বহু লোক ওকে রীতিমত অর্থ যুগিয়ে থাকে। কোম্পানীর বহু জাহাজ ওর হাতে লুণ্ঠিত। সুতরাং রফা করবার আগে খুব মোটা একটা টাকা দাবী করা দরকার। যাতে এই অভিযানের ব্যয় এবং এতদিনের ক্ষয়ক্ষতি সমস্তটা উঠে আসতে পারে।

কাউন্সিল যা অনুমান করেছিলেন তা ঠিকই। ঘেরিয়াতে পৌঁছে ইংরেজরা দেখল মারাঠারা উল্টোদিক থেকে এসে আগেই হাজির হয়েছে। তাদের একজন দূত এসে সংবাদটি দিল। তুলাজী সম্ভবত একটা রফা করতে চায়। অনর্থক নরহত্যা, যুদ্ধবিগ্রহে প্রয়োজন কি? ব্যাপারটা মনঃপুত হল না অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের। তিনি বললেন,

তুলাজী অ্যাংগ্রিয়া নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ না করলে কথাবার্তার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং রণং দেহি। বন্দরের মধ্যে তুলাজীর জাহাজগুলি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত—তাদের সংগে সেই বড় জাহাজ রেস্টোরেশনও রয়েছে।

যুদ্ধের কাহিনী সেই একই। ইংরেজদের ভারী কামানের গোলাবর্ষণ। ফেব্রুয়ারী মাসের সেই শান্ত অপরাহ্ণে হঠাৎ কে যেন আগুন নিয়ে লোফালুফি খেলা শুরু করল। সমস্ত রাত্রি কেটে গিয়ে সকাল হল। ইতিমধ্যে লর্ড ক্লাইভ কিছু সৈন্য নিয়ে বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছেন। ইংরেজদের সেই রণতরী রেস্টোরেশন তাদের নিজেদেরই গোলার আঘাতে জ্বলে উঠল। তুলাজী অ্যাংগ্রিয়া দেখলেন পরাজয় নিয়তির ইচ্ছা। সেদিনই অপরাহ্নের শেষে তুলাজী মারাঠাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ইংরেজদের ইচ্ছে ছিল তুলাজীকে বন্দী করে নিয়ে যাবেন বোম্বাইতে। সম্ভবত দেশী এবং বিদেশী শত্রুর মধ্যে মারাঠাদেরই পছন্দ করেছিলেন তুলাজী। বাকী জীবনটা মারাঠাদের হাতে বন্দী হয়েই কাটাতে হয়েছিল তুলাজীকে। বন্দীদশার মধ্যেই তাঁর জীবনদীপ হঠাৎ একদিন নিভে গেল।

মালাবার উপকূলে সম্ভবত এখন আর জলদস্যুর উৎপাত নেই। সমুদ্রপথ এখন শান্ত, নিরুপদ্রব। সুদীর্ঘ দু'শত বৎসর, মহাকালের যাত্রাপথের অস্পষ্ট কুজ্ঝটিকায় অ্যাংগ্রিয়া জলদস্যুদের নাম এবং বিজয়ী

জেমসের কাহিনী এখন শুধু ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু হাজার হাজার মাইল দূরে সুদূর ইংলণ্ডের মাটিতে অ্যাংগ্রিয়া জলদস্যুরা আজও অমর। সুটারস্ হিলে শ্রীমতী জেমস স্বামীর স্মৃতি মনে করে এই কীর্তি-স্তম্ভটি রচনা করান। লোকে উপহাস করে বলে, ওটা লেডী জেমসের নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। সম্ভবত খরচপত্র করে এমনি একটা স্তম্ভ তৈরী করাটা কেউ সমর্থন করেনি। কীর্তিস্তম্ভটির গায়ে কয়েক লাইনের একটি কবিতা লেখা। রবার্ট ব্লুমফিল্ড কবিতাটি রচনা করেন—

This far seen monumental tow'r
Records the achievements of the brave.
And Angria's subjugated pow'r
Who plundered on the eastern wave.

অবশ্য তুলাজীর সংগে সংগে অ্যাংগ্রিয়ারা শেষ হয়ে যায়নি। কোলাবাতে অ্যাংগ্রিয়াদের বংশধরেরা তখনও আধিপত্য বজায় রেখেছে। তবে অবস্থাটা হাঁটুভাঙ্গা দ'য়ের মত। কোনোমতে টিঁকে থাকার চেষ্টা, পুরুষদের মত অ্যাংগ্রিয়া রমণীদেরও দুর্জয় সাহস। শাকুরবাঈ নামে এক বীর রমণীর কথা জানা গেছে। মহিলা জয়সিংয়ের পত্নী। জোর করে কেনেরী দ্বীপটি দখল করে নিয়েছিলেন শাকুরবাঈ। তাঁর স্বামী তখন বন্দীশালায়। রমণীর কাছ থেকে কেনেরী দ্বীপ পুনর্দখল করা যায়নি। প্রতারণা করে মহিলাকে বন্দী করেছিল সিন্ধিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ। রঘুজী, অ্যাংগ্রিয়ার স্ত্রী আনন্দবাঈয়ের দৃঢ় সাহসেরও অনুরূপ কাহিনী রয়েছে।

শুধু অ্যাংগ্রিয়া জলদস্যু নয়, অন্যান্য ভারতীয় জলদস্যুদের কথাও কিছু কিছু জানা গেছে। আনন্দরাও নামে এক ভারতীয় জলদস্যুর আস্তানা ছিল রসুলগড়ে। কোম্পানীর এক ইংরেজ অফিসারকে দীর্ঘদিন বন্দী থাকতে হয়েছিল সেখানে। সম্ভবত মুক্তিপণ দিয়ে সে বেচারী ফিরে গিয়েছিল বোম্বাইতে।

* * *

সম্ভবত জলদস্যুদের ব্যাপারে আধুনিক যুগের লোকের উৎসাহ এবং অনুসন্ধিৎসা কম। এই রকেট, জেট, সাবমেরিন এবং গতি-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের যুগে, আদ্যিকালের সেই পালতোলা জাহাজ এবং তার উপরে পিস্তল উঁচিয়ে দন্ডায়মান এক জলদস্যুর ছবি ঠিক কল্পনায় আসে না। হয়তো আরো কয়েক শতাব্দীর পর জলদস্যুর কাহিনী অনেকটা সেই বুড়ো ঠাকুমার কোল ঘেঁষে শোনা ভূত প্রেত দত্যিদানায় ভরা এক অপরিচিত শংকাভরা জগতের মত মনের কোণে প্রতিফলিত হবে। ভবিষ্যতের মানুষ তাদের বহু পুরাতন পূর্বপুরুষদের একটি ছোট্ট অংশের নীল দরিয়ার প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ এবং উন্মাদনার কথা স্মরণ করে অবাক হবে। মনে মনে লোকগুলিকে পাগল বলে চিহ্নিত করাও অসম্ভব নয়।

কিন্তু সমুদ্রের প্রতি এই দুর্নিবার আকর্ষণের গল্প তো দু দশ বৎসরের ইতিহাস নয়। দীর্ঘ দু হাজার বৎসর কিংবা আরো অনেক বেশী দিনের কাহিনী। নীল দরিয়াতে প্রথম কোন লোকটি জলযান ভাসিয়ে যেতে চেয়েছিল এক তীর হতে অন্য এক তীরের দিকে, আজ আর তাকে চিহ্নিত করবার কোন উপায় নেই। প্রথম কবে সমুদ্রের বুকে সদাগরের ডিঙি পাল তুলে রওনা হয়েছিল বাণিজ্যের পণ্যপশরা নিয়ে তাও আজ আর বলা যাবে না। কিন্তু একথা বোধ হয় তর্কাতীত যে জলদস্যুবৃত্তির শুরু তারই কাছাকাছি কোনো দিনে।

মুস্কিল হল জলদস্যু কে এবং জলদস্যু কে নয়—এই কথাটা নিয়ে। এক দেশের মানুষ যাকে জলদস্যু বলে অভিহিত করতে সোচ্চার হয়ে ওঠে অন্য দেশের মানুষ আবার তা স্বীকার করে না। অভিধান বলে যে মানুষ উন্মুক্ত নীল দরিয়ার বুকে অন্য জলযানের উপর চড়াও হয়, বলপূর্বক পণ্যদ্রব্য অপহরণ করে, এমন কি বন্দরে ঢুকে হামলা করতে প্রয়াসী হয়েছে,—সেই জলদস্যু। কিন্তু ইউরোপের বহু জাতির লোক, সরকার কিংবা সম্রাটের কাছ থেকে কমিশন বা লাইসেন্স বাগিয়ে অন্য দেশের বাণিজ্যতরী অথবা যাত্রীবাহী জাহাজের উপর অবাধে অত্যাচার চালিয়েছে। এ রকম দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি, আকছার মিলবে। কিন্তু সেই দেশের সরকার জলদস্যুবৃত্তির অভিযোগে তাদের বন্দী করেনি। এবং শাস্তিদানেরও কোনো ব্যবস্থা হয়নি। জলদস্যুই ভোল পালটে নীল দরিয়াতে ভাড়াটে বৃত্তি চালিয়েছে। তখন তার সাতখুন মাপ। ভিনদেশী যে কোন জাহাজের উপর সে হামলা চালিয়েছে। অবশ্য কাগজেকলমে শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্র বা দেশের জাহাজগুলির উপর তার চড়াও হওয়ার কথা। কিন্তু কমিশনে দেওয়া অধিকারের চুলচেরা নির্দেশ কে কবে মেনেছে। জলদস্যুরাও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কথাটা তোলা যাক ফ্রান্সিস ড্রেককে নিয়ে। ড্রেক কি জলদস্যু ছিলেন? এর স্বপক্ষে মত দিতে যে কোনো ইংরেজই কিন্তু কিন্তু করবে। হাজার হোক ফ্রান্সিস ড্রেক ইংলণ্ডের জাতীয় সম্মান বাঁচিয়েছেন। স্পেনের আর্মাডা ধ্বংস করতে ড্রেকের অবদান কি কম? রাণী তাঁকে সেরা সম্মানে ভূষিত করেছেন। তবু ফ্রান্সিস ড্রেকের প্রথম দিকের সমুদ্র অভিযানগুলি বুকানিয়রবৃত্তি ছাড়া আর কি? শেষদিকে এলিজাবেথের দেওয়া কমিশন বা সনদ নিয়ে ড্রেক নীল দরিয়াতে যে লুঠপাট চালিয়েছিল তা জলদস্যুবৃত্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। ভাড়াটেবৃত্তি আসলে জলদস্যুবৃত্তিরই নামান্তর।

আরো কিছুটা অতীতে গেলে একটি উজ্জ্বল নাম আমাদের দৃষ্টিতে ভাসবে। এই নামটি একজন জগদ্বিখ্যাত নাবিকের। ইনি ক্রিস্টোফার কলম্বস। কলম্বসের সম্বন্ধে জলদস্যুবৃত্তির অভিযোগের কোনো ছায়াপাত কেউ করেননি। তাঁর গভীরতম শত্রুরও এই বিষয়ে বক্তব্য নেতিবাচক। সম্ভবত ক্রিস্টোফার কলম্বসের তেমন কোনো সুযোগ ঘটেনি। কারণ ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে তাঁর জাহাজটিই প্রথম পথপ্রদর্শক। সান সালভাডর দ্বীপে এসে কলম্বস যদি একটি পণ্যবাহী সদাগরী তরীকে অপেক্ষমান দেখতেন তাহলে তাঁর দলবলের লোকেরা জাহাজটির উপর যে হামলা করত না এমন কথা কি বুক ঠুকে বলা যায়?

জলদস্যু সম্বন্ধে যা জানা গেছে তা সামান্য। যা জানা যায়নি তা অনেকখানি। এর কারণ জলদস্যুদের সম্বন্ধে তথ্যের অভাব, মালমশলার ঘাটতি। জলদস্যুদের হাতে মারা পড়েছে অনেকে। কিন্তু মরা মানুষ তো মুখ খোলে না। ফলে নিহত হয়ে তারা নীরব। আর শেষবয়সেও কোনো জলদস্যু তার অতীত কুকীর্তির কথা প্রকাশ করেনি বা লিখে রেখে যায়নি। এবং জলদস্যুদের কাছ থেকে না জানতে পারলে সে কাহিনী কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

তবু যেটুকু জানা গেছে তাও কম নয়। লোকে কেন জলদস্যু হত সে প্রশ্ন রয়েছেই। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠেছে জলদস্যুদের অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি অদম্য আকর্ষণ। দুঃসাহসী এই মনটির মাধ্যমেই জলদস্যুকে বিচার করতে হবে। সমাজচ্যুত, ঘরছাড়া, দলছুট যে মানুষের দল পৃথিবীর মাটিকে পিছনে ফেলে আশ্রয় নিয়েছে দরিয়ায়, পালতোলা জাহাজে ঘুরে বেড়িয়েছে সমুদ্রের নানা অংশে, ভাবনাহীন চিত্তে মৃত্যুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বল্গাহীন অশ্বের মত জীবনকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে জোর কদমে, তাদের কথা মনে হলে অন্তত বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া স্বাভাবিক।

একটি প্রবাদ বাক্যের কথা মনে আসছে। সফল দস্যু হল বিজয়ী পুরুষ আর ব্যর্থ বিজয়ীর নামই হল দস্যু। নীল দরিয়ার এই দুর্দান্ত মানুষগুলি সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা খাটে। প্রতিটি জলদস্যু ব্যর্থ বিজয়ী তো বটেই,— অধিকাংশই জীবনযুদ্ধের অসফল সৈনিক। জীবন তাদের সঞ্চয়ের ডালিকে কোনো সোনার ফসলে ভরিয়ে তোলেনি, শুধু অল্প কয়েকজন ছাড়া। যারা নীল দরিয়া ত্যাগ করে উঠেছিল ডাঙায়, রাজপুরুষের কোনো পদ, বড় ধর্মযাজক, অথবা খোদ সম্রাট হয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে গেছে অনায়াস সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে। কিন্তু নাগরিক জীবনের কাছে মার খেয়ে যারা পালিয়ে এসেছিল জলে এবং যাদের অধিকাংশেরই জীবনদীপ অকালে নির্বাপিত হল এই দরিয়ার বুকে তাদের স্বল্প জীবনের ব্যর্থতার হাহাকার নতুন করে বলবার প্রয়োজন রাখে না।

কেউ কেউ বলবেন জলদস্যু মানেই অত্যাচারী কতকগুলি মানুষ। খুনে, বদমাস, বেপরোয়া নৃশংস অসুর। কথাটা সত্যি—। জলদস্যুদের কাহিনী মানেই খুন-খারাবির বিবরণ, ... লোমহর্ষক নানা ঘটনার ঠাসবুনন। তবু বদমাস ও অত্যাচারী হলেও লোকগুলি মানুষ।

এবং জলদস্যুদের গল্প, মানুষেরই কাহিনী। আমাদেরই ইতিহাস।

(ক্রমশঃ)

নিমাই ভট্টাচার্য

(১৬)

দোলাবৌদি,

পরেরদিন ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হয়েছিল। হয়ত আরো অনেক বেলা হতো। কিন্তু সূর্যের আলো চোখে পড়ায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। পাশের খাটে মেমসাহেব আমার দিকে ফিরে শুয়েছিল। সূর্যের আলো ওর চোখে পড়ছিল না। মনে হলো মহানন্দে স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে।

ওর ঘুম ভাঙাতে আমার মন চাইল না। ও এত নিশ্চিন্তে, শান্তিতে ঘুমুচ্ছিল যে দেখতে বেশ লাগছিল। বহুক্ষণ ধরে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম। তারপর উঠে বসে আরো ভাল করে দেখলাম। ওর সর্বাঙ্গের পর দিয়ে বার বার চোখ বুলিয়ে নিলাম। একটু হয়ত হাত বুলিয়ে দিয়েছিলাম ওর গায়।

মনে মনে কত কি ভাবলাম। ভাবলাম, এই মেমসাহেব এই আমার জীবন-নাট্যের নায়িকা! এই সেই চপলা চঞ্চলা বালা যে আমার জীবন ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়েছে? এই সেই শিল্পী যে আমার জীবনে সুর দিয়েছে, চোখে স্বপ্ন দিয়েছে। ভাবলাম, এই সেই মেয়ে যে আমার জীবনে না এলে আমি কোথায় সবার অলক্ষ্যে হারিয়ে যেতাম, শুকনো পাতার মত কালবৈশাখীর মাতাল হাওয়ায় অজানা ভবিষ্যতের কোলে চিরকালের জন্য লুকিয়ে পড়তাম।

ভাবতে ভাবতে ভারী ভাল লাগল। ওর কপালের পর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে একটু আদর করলাম।

মেমসাহেব কাত হয়ে শুয়েছিল। ওর দীর্ঘ মোটা বিনুনিটা কাঁধের পাশ, বুকের পর দিয়ে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে আরো অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। ওর ছন্দবদ্ধ দেহের চড়াই-উতরাই দেখে যেন মনে হলো প্রাক্সিটিলীস'এর ভেনাস বা সাঁচীর যক্ষী টর্সো! নাকি খাজুরাহো'র নায়িকা, অজন্তার মারকন্যা!

মনে পড়ল ঈভার প্রতি মিলটনের কথা—
—'O fairest of creation last and best, of all God's works'

ঈভার মত মেমসাহেব নিশ্চয়ই অত সুন্দরী ছিল না কিন্তু আমার চোখে আমার মনে সে তো অনন্যা! আমার শ্যামা মেমসাহেবকে মুগ্ধ হয়ে দেখলাম অনেকক্ষণ। ভাবলাম বাইবেলের মতে তো নারীই ভগবানের শেষ কীর্তি, শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কিন্তু সবাই কি মেমসাহেব হয়? দেহের এই মাধুর্য, চোখে এমনি স্বপ্ন, চরিত্রে এই দৃঢ়তা, মনের এই প্রসারতা তো আর কোথাও পেলাম না।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যেন ও আমাকে ইসারা করল। মনে হলো যেন ডাক দিল, ওগো, কাছে এসো না, দূরে কেন? তুমি কি আমাকে তোমার বুকের মধ্যে তুলে নেবে না?

আমি হাসলাম। মনে মনে বললাম, পোড়ামুখী, তুই তো জানিস না, তোকে বেশী আদর করতেও আমার ভয় হয়। তোকে বেশীক্ষণ বুকের মধ্যে ধরে রাখলে জ্বালা করে, ভয় ধরে।

ভয়?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভয়। ভয় হবে না? যদি কোনদিন কোন কারণে কোন দৈবদুর্বিপাকে আমার বুকটা খালি হয়ে যায়? তখন?

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই মেমসাহেব ওর ডান হাতটা আমার কোলের পর ফেলে একটু জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করল। যেন বলল, না গো, না, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

আমি মেমসাহেবকে একটু কাছে টেনে নিলাম, একটু আদর করলাম।

ঐ সকালবেলার মিষ্টি সূর্যের আলোয় মেমসাহেবকে আদর করে বড় ভাল লাগল। কিন্তু আনন্দের ঐ পরম মুহূর্তেও একবার মনে হলো, সন্ধ্যায় তো সূর্য অস্ত যায়, পৃথিবীতে তো অন্ধকার নেমে আসে।

জান দোলাবৌদি, ঐ হতচ্ছাড়ী মেয়েটাকে যখনই বেশী করে কাছে পেয়েছি তখনই আমার মনের মধ্যে ভয় করত। কেন করত তা জানি না কিন্তু আজ মনে হয়—

থাকগে। ওসব কথা বলতে শুরু করলে আবার সব কিছু গুলিয়ে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে আমার মেমসাহেবের কাহিনী শোনাতে হবে। সময় ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা শুভলগ্নে আমাকে তো তোমার পাণিপ্রার্থী করতে হবে। তাই না? তাছাড়া আমারও তো বয়স বাড়ছে। বয়স বেশী হয়ে গেলে কি আমার কপালে কিছু জুটবে?

ঐ অরণ্য-পর্বত-লেকের ধারের রাজপ্রাসাদে দুটি দিন, দুটি রাত্রি স্বপ্ন দেখে আমরা আবার দিল্লী ফিরে এলাম। ফিরে এলাম ঠিকই কিন্তু যে মেমসাহেব আর আমি গিয়েছিলাম সেই আমরা ফিরে এলাম না। ফিরে এলাম সম্পূর্ণ নতুন হয়ে।

দিল্লীতে ফিরে এসে মেমসাহেব একটি মুহূর্তও নষ্ট করেনি। সংসার পাতার কাজে মেতেছিল। একটা স্কুটার রিক্সা নিয়ে দুজনে মিলে দিল্লীর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছিলাম ভবিষ্যতের আস্তানা পছন্দ করবার আশায়। করোলবাগ, ওয়েস্টার্ণ এক্সটেনশন, নিউ রাজেন্দ্রনগর ইস্ট প্যাটেল নগর থেকে দক্ষিণে নিজামুদ্দীন, জংপুরা, ডিফেন্স, সাউথ এক্সটেনশন, কৈলাশ, হাউসখাস, গ্রীনপার্ক পর্যন্ত ঘুরেছিলাম। সব দেখেশুনে ও বলেছিল, গ্রীনপার্কেই একটা ছোট্ট কটেজ নেব আমরা।

'এত জায়গা থাকতে গ্রীনপার্ক?'

'শহর থেকে বেশ একটু দূরে আর বেশ ফাঁকা ফাঁকা আছে।'

'বড্ড দূরে।'

'তা হোক। তবুও থেকে শান্তি পাওয়া যাবে।'

'তা ঠিক।'

পরে আবার বলেছিল, দু'তিন মাসের মধ্যেই বাড়ী ঠিক করবে। তারপর একটু গোছগাছ করে নিয়েই আমরা সংসার পাতব।

হাত দিয়ে আমার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করল, কেমন? তোমার আপত্তি নেই তো?

আমি মাথা নেড়ে বলেছিলাম, না।

আরো দু'চারটে কি যেন কথাবার্তা বলার পর ও আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, দেখ না, বিয়ের পর তোমাকে কেমন জব্দ করি!

'কি জব্দ করবে?'

'আজেবাজে খাওয়া-দাওয়া ফালতু আড্ডা দেওয়া, সব বন্ধ করে দেব।'

'তাই বুঝি?'

'তবে কি?'

এবার আমিও একটা হাত দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে বললাম, আর কি করবে মেমসাহেব?

আধো আধো গলায় উত্তর দিল, সব কথা বলব কেন?

'তাই বুঝি?'

'তবে কি? বাট ইউ উইল সী আই উইল মেক ইউ হ্যাপি।'

'তা আমি জানি। তবে মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়।'

'কি ভয় হয়?'

আমি ওর কানে কানে ফিস ফিস করে বললাম, আমি বোধহয় স্ত্রৈণ হবো!

মেমসাহেব আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, বাজে বকো না।

একটু মুচকি হাসলেও বেশ সিরিয়াসলি বললাম, বাজে না মেমসাহেব! বিয়ের পর বোধহয় তোমাকে ছেড়ে আমি পার্লামেন্ট বা অফিসেও যেতে পারব না!

এবার মেমসাহেব একটু মুচকি হাসে। বললে, চব্বিশ ঘন্টা বাড়ী বসে কি করবে?

আবার কানে কানে ফিসফিস করে বললাম, তোমাকে নিয়ে শুয়ে থাকব।

ও হেসে বললে, অসভ্য কোথাকার! একটু থেমে আবার বললে শুতে দিলে তো?

আমি বললাম, শুতে না দিলে আমি চীৎকার করে কান্নাকাটি করে সারা পাড়ায় জানিয়ে দেব।

মেমসাহেব এবার আমার পাশ থেকে উঠে পড়ে। মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে বললে, বাপরে বাপ! কি অসভ্য।

আমি দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরতে গেলাম। ও ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল, পারল না। আঁচল ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলাম সোফার পর। যদি বলি এখনই......

হাতে ঘুঁষি পাকিয়ে বললে, নাক ফাটিয়ে দেব।

'সত্যি?'

এমনি করে মেমসাহেবের দিল্লীবাসের মেয়াদ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেল। রবিবার বিকেলে ডিলাক্স এয়ার কণ্ডিসনড এক্সপ্রেস কলকাতা চলে গেল। ওয়েস্টার্ণ কোর্ট থেকে স্টেশন রওনা হবার আগে মেমসাহেব আমাকে প্রণাম করল, আমার বুকে মাথা রেখে জড়িয়ে ধরে একটু কাঁদল।

আমি ওকে আশীর্বাদ করলাম, আদর করলাম, চোখের জল মুছিয়ে দিলাম।

এক সপ্তাহ ধরে দুজনে কত কথা বলেছি কিন্তু সেদিন ওর বিদায় মুহূর্তে দুজনের কেউই বিশেষ কথা বলতে পারিনি। আমি শুধু বলেছিলাম, সাবধানে থেকো। ঠিকমত চিঠিপত্র দিও।

ও বলেছিল, ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করো। তোমার শরীর কিন্তু ভাল না।

শেষে নিউদিল্লী স্টেশনে ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগে বলেছিল, তুমি কিন্তু আমাকে বেশীদিন একলা রেখো না। কলকাতায় আমি একলা থাকতে পারি না।

মেমসাহেব চলে গেল। আমি আবার ওয়েস্টার্ন কোর্টের শূন্যঘরে ফিরে এলাম। মনটা ভীষণ খারাপ লাগল। খেতে গেলাম না। ডাইনিং হলে আমাকে দেখতে না পেয়ে গজানন এলো আমার ঘরে খবর নিতে। আমাকে অনেক অনুরোধ করল কিন্তু তবুও আমি খেতে গেলাম না। বললাম, শরীর খারাপ।

গজানন আমার মনের অবস্থা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিল। সেজন্য সেও আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ না করে বিদায় নিল।

কলকাতা থেকে মেমসাহেবের পৌঁছন সংবাদ আসতে না আসতেই আমি আবার কাজকর্ম শুরু করেছিলাম। পুরো একটা সপ্তাহ পার্লামেন্ট যাইনি, সাউথ ব্লক-নর্থ ব্লক যাইনি, মন্ত্রী-এম-পি-অফিসার ডিপ্লোম্যাট দর্শন করিনি। এমন কি টাইপ-রাইটার পর্যন্ত স্পর্শ করিনি।

দু'একদিন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করলাম কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন খবর-টবর পেলাম না। পার্লামেন্টে তখন আকশাই চীন সড়ক নিয়ে ঝড় বইছিল প্রায়ই। প্রাইম মিনিস্টারও বেশ গরম গরম কথা বলছিলেন মাঝে মাঝেই। দু'চারজন পলিটিসিয়ান যুদ্ধ করবার পরামর্শ দিলেও প্রাইম মিনিস্টার তা মানতে রাজী হলেন না। অথচ এইভাবে বক্তৃতার লড়াই কতদিন চলতে পারে? অল ইণ্ডিয়া রেডিও আর পিকিং বেতারের রাজনৈতিক মল্লযুদ্ধ তেতো হয়ে উঠেছিল। লড়াই করার কোন উদ্যোগ, আয়োজন বা মনোবৃত্তি সরকারী মহলে না দেখায় আমার মনে স্থির বিশ্বাস হলো আলোচনা হতে বাধ্য।

দু'চারজন সিনিয়র ক্যাবিনেট মিনিস্টারের বাড়ীতে আর অফিসে কয়েকদিন ঘোরাঘুরিও কোন কিছুর হদিশ পেলাম না। শেষে সাউথ ব্লকে ঘোরাঘুরি শুরু করলাম। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী ও স্পেশ্যাল সেক্রেটারীকেও তেল দিয়ে কিছু ফল হলো না।

শেষে আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি এমন সময়.........

আফ্রিকা ডেস্কের মিঃ চোপরার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেরুতে বেরুতে প্রায় সাড়ে ছ'টা হয়ে গেল। বেরুবার সময় প্রাইম মিনিস্টারের ঘরের সামনে উঁকি দিতে গিয়ে দেখলাম, প্রাইম মিনিস্টার লিফট'এ ঢুকেছেন। আমি তাড়াতাড়ি হুড়মুড় করে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম।

প্রাইম মিনিস্টার গাড়ীর দরজার সামনে এসে গিয়েছেন, পাইলট তার মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়েছে, অয়্যারলেস আর সিকিউরিটি কারও স্টার্ট দিয়েছে কিন্তু চলতে শুরু করেনি, এমন সময় ফরেন সেক্রেটারী প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হলেন। কানে কানে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে কি যেন কথা বললেন। প্রাইম মিনিস্টার আর ফরেন সেক্রেটারী আবার লিফট'এ চড়ে উপরে চলে গেলেন।

আমি একটু পাশে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখলাম। বুঝলাম, সামথিং ভেরী সিরিয়াস অথবা সামথিং ভেরী আর্জেন্ট। তা নয়ত ঐভাবে ফরেন সেক্রেটারী প্রাইম মিনিস্টারকে অফিসে ফেরত নিয়ে যেতেন না।

আমি প্রাইম মিনিস্টারের অফিসের পাশে ভিজিটার্স রুমে বসে রইলাম। দেখলাম, বিশ-পঁচিশ মিনিট পরে প্রাইম মিনিস্টার আবার বেরিয়ে গেলেন। প্রাইম মিনিস্টারকে এবার দেখে মনে হলো, একটু যেন স্বস্তি পেয়েছেন মনে মনে।

আমি আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলাম। দেখলাম প্রাইম মিনিস্টার চলে যাবার পর পরই চায়না ডিভিশনের জয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ মালিক ফরেন সেক্রেটারীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

আমার আর বুঝতে বাকি রইল না চীন সম্পর্কেই কিছু জরুরী খবর এসেছে। সেদিনকার মত আমি বিদায় নিলাম। পরের দিন থেকে মিঃ মালিকের বাড়ী আর অফিস ঘুরঘুর করা শুরু করলাম। তবুও কিছু সুবিধা হলো না।

শেষে ইউনাইটেড নেশনস্ ডিভিশনের একজন সিনিয়র অফিসারের কাছে খবর পেলাম সীমান্ত বিরোধ আলোচনার জন্য চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইকে দিল্লী আসার আমন্ত্রণ জানান হয়েছে এবং তিনি তা গ্রহণ করেছেন।

খবরটি সে বাজারে প্রায় অবিশ্বাস্য হলেও যাচাই করে দেখলাম, ঠিকই। দিল্লীর বাজার তখন অত্যন্ত গরম কিন্তু তবুও আমি খবরটা পাঠিয়ে দিলাম। ট্রাংককল করে নিউজ এডিটরকে ব্রিফ করে দিলাম। পরের দিন ডবল কলম হেডিং দিয়ে সেকেণ্ড লীড হয়ে ছাপা হলো, চৌ এন-লাই দিল্লী আসছেন।

এই খবরটা দেবার জন্য প্রায় সবাই আমাকে পাগল ভাবল। আমার এডিটরের কাছেও অনেকে অনেক বিরূপ মন্তব্য করলেন। এডিটর চিন্তিত হয়ে আমাকে ট্রাংককল করলেন। আমি বললাম, একটু ধৈর্য ধরুন।

এক সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই লোকসভায় কোশ্চেন-আওয়ারের পর স্বয়ং প্রাইম-মিনিস্টার ঘোষণা করলেন, প্রিমিয়ার চৌ এন-লাই তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সীমান্ত বিরোধ আলোচনার জন্য দিল্লী আসছেন।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো অনেকের মাথায়। আমি কিন্তু আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করলাম। রাতে এডিটরের টেলিগ্রাম পেলাম, কনগ্র্যাচুলেশনস্ স্পেশ্যাল ইনক্রিমেন্ট টু-ফিফটি উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট্। দু'হাত তুলে ভগবানকে প্রণাম করলাম।

সেই রাতেই মেমসাহেবকে একটা টেলিগ্রাম করে সুখবরটা জানিয়ে দিলাম।

পরের দিন মেমসাহেবেরও একটা টেলিগ্রাম পেলাম, এ্যাকসেপ্ট কনগ্র্যাচুলেশনস্ অ্যান্ড প্রণাম স্টপ লেটার ফলোজ।

চিঠিতে মেমসাহেব লিখল, আমি জানি তোমার জীবনে এমনি অনেক অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে। আমার ভালবাসা আর তোমার সাধনা কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। এইত আরম্ভ। তুমি জীবনে আরো অনেক অনেক উঠবে। বৃহত্তর কর্মজীবনে তুমি তোমার কর্মনিষ্ঠার দ্বারা সাফল্য লাভ করবে আর আমি আমার সর্বস্ব কিছু দিয়ে সাংসারিক জীবনে তোমাকে সুখী করে তুলব, তোমার কর্মজীবনের প্রেরণা জোগাবো।

মেমসাহেবের চিঠি পাবার পরও ভাবতে পারি নি ভবিষ্যতে আরো কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটবে আমার জীবনে। কিন্তু সত্যি সত্যিই ঘটল। প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে ইউরোপ যাবার দুর্লভ সুযোগ এলো আমার জীবনে কয়েক মাসের মধ্যেই।

বিদায় জানাবার জন্য মেমসাহেব দিল্লী ছুটে এসেছিল। আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমাকে সী-অফ্ করার জন্য তুমি কলকাতা থেকে দিল্লী এলে?

দুটি হাত দিয়ে আমার দুটি হাত দোলাতে দোলাতে বলেছিলে, তুমি প্রথমবারের জন্য ইউরোপ যাচ্ছ আর আমি চুপ করে বসে থাকব কলকাতায়?

ঐ কালো হরিণ চোখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বল্লো, তাও আবার প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে চলেছ! আমি না এসে থাকতে পারি?

পাগলীর কথাবার্তা শুনে আমার হাসি পেতো। কত হাজার হাজার লোক তো বিদেশ যাচ্ছে! তার জন্য এক হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে এসে বিদায় জানাতে হবে?'

দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা তুলে ধরে মেমসাহেব বল্লো, এসেছি, বেশ করেছি! তোমাকে কৈফিয়ত দিতে আসব?

বল দোলাবৌদি, অমন পাগলীর সঙ্গে কি তর্ক করা যায়? যায় না। তাই আমিও আর তর্ক করিনি।

পাশপোর্ট-ভিসা-ফরেন এক্সচেঞ্জ আগেই ঠিক ছিল। এয়ার-প্যাসেজ আগের থেকেই বুক করা ছিল। দুজনে মিলে এয়ার ইণ্ডিয়ার অফিসে গিয়ে টিকিটটা নেবার পর কনটপ্লেসে কয়েকটা ছোটখাট জিনিসপত্র কিনলাম। তারপর কফি হাউসে গিয়ে কফি খেয়ে ফিরে এলাম ওয়েস্টার্ন কোর্টে।

ফেরার পথে মেমসাহেব বল্লো, দেখ, তোমার কাজকর্ম আজই শেষ করবে। কালকে কোন কাজ করতে পারবে না।

'কেন? কাল কি হবে?' আমি জানতে চাইলাম।

ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে ও বল্লো, ... পরশু ভোরেই তো চলে যাবে। একেকের দিনটাও আমি পেতে পারি না?

লাঞ্চের পর একটু বিশ্রাম করে বেরিয়েছিলাম বাকি কাজগুলো শেষ করার জন্য। তারপর এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রিতে গিয়ে দেখাশুনা করে ফিরে এলাম সন্ধ্যার পর পরই।

এসে দেখি মেমসাহেব একটা চমৎকার বালুচরী শাড়ী পরেছে, বেশ চেপে কান ঢেকে চুল বেঁধেছে, বিরাট খোঁপায় রুপোর কাঁটা গুঁজেছে। রুপোর চেন'এ টিবেটিয়ান লকেট লাগানো একটা হার ছাড়া আরো কয়েকটা রুপোর গহনা পরেছে। কপালে টকটকে লাল একটা বিরাট টিপ ছাড়াও চোখে বোধ হয় একটু সুরমার টান লাগিয়েছিল।

আমি ঘরে ঢুকে মেমসাহেবকে দেখেই থমকে দাঁড়ালাম। ও মুখটা একটু নীচু করে চোখটা একটু ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। একটু হাসল।

আমি হাসলাম না, হাসতে পারলাম না। আগের মতই স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

ও আবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকে হাসল। জিজ্ঞাসা করল, অমন স্থির হয়ে কি দেখছ?

'তোমাকে।'

ন্যাকামি করে ও আবার বল্লো, আমাকে?

'বুঝতে পারছ না?'

একটু হাসল। বল্লো, তা তো বুঝতে পেরেছি কিন্তু অমন করে দেখবার কি আছে?

'কেন দেখছি তা বুঝতে পারছ না? দেখবার কি কোন কারণ নেই?'

মেমসাহেব এবার আর তর্ক না করে ধীর পদক্ষেপে দেহটাকে একটু দুলিয়ে দুলিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমার হাত দুটো ধরে মুখটা একটু বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লো, খুব খারাপ লাগছে?

আমি প্রায় চীৎকার করে উঠলাম, অসহ্য, অসহ্য!

'সত্যি খারাপ লাগছে?'

'অত খারাপ কি না তা জানি না, তবে তোমাকে আমি সহ্য করতে পারছি না।'

ও এবার সত্যি একটু চিন্তিত হয়ে প্রশ্ন করল, এসব খুলে ফেলব?

এতক্ষণ ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এবার ওকে পাশে টেনে নিয়ে বল্লাম, হে নিরুপমা, চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।...আর হে নিরুপমা, আঁখি যদি আজ করে অপরাধ, করিয়ো ক্ষমা।

দোলাবৌদি, মেমসাহেবও কোন কথা বলল না। দুটি হাত দিয়ে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে মাথাটা হেলান দিয়ে খুব মিহি-সুরে গাইল আমি রূপে তোমায় ভোলাব না ভালবাসায় ভোলাব।

আমি প্রশ্ন করলাম, আর কি করবে?

মেমসাহেব গাইতে গাইতে বল্লো, ভরাব না ভূষণভারে, সাজাব না ফুলের হারে—সোহাগ আমার মালা করে গলায় তোমার দোলাব।

আমি বল্লাম, সত্যি?

'হাজারবার লক্ষবার সত্যি।'

মেমসাহেব গজাননকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিল। চা এলো।

চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি এয়ার ইণ্ডিয়া বা টুরিস্টব্যুরোর চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছ?

'কেন বলতো?'

'তা নয়ত এত রুপোর গহনা চাপিয়েছ কেন?'

'আমার খুব ভাল লাগে। কেন তোমার খারাপ লাগছে?'

'পাগল হয়েছ? খারাপ লাগলে কেন? খুব ভাল লাগছে।'

'সত্যি?'

'সত্যি ছাড়া কি মিথ্যা বলছি?'

'যাই হোক এত সাজলে কেন?'

'তোমার ভাল লাগবে বলে।'

একটু থেমে আবার বল্লো, তাছাড়া...

তাছাড়া কি?'

মুখটা একটু লুকিয়ে বল্লো, ইউরোপ যাচ্ছ। না জানি কত মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবে। তাই যাতে চট করে ভুলে না যাও...

'আমাকে নিয়ে আজো তোমার এত ভয়?'

আমাকে একটু আদর করে মেমসাহেব বল্লো, না গো না। এমনি সেজেছি।

সেদিন সন্ধ্যা-রাত্রি আর পরের দিনটা পুরোপুরি মেমসাহেবকে দিয়েছিলাম।

তারপর বিদায়ের দিন এয়ারপোর্ট রওনা হবার আগে মেমসাহেব আমাকে প্রণাম করেছিল, আমি ওকে আশীর্বাদ করেছিলাম। কিন্তু তবুও ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হলো যেন কিছু বলবে। জানতে চাইলাম, কিছু বলবে?

কিছু কথা না বলে মাথা নীচু করে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে মুচকি মুচকি হাসছিল।

আমি ওর মুখটা আলতো করে তুলে ধরে আবার জানতে চাইলাম, কি, কিছু বলবে?

অনেকক্ষণ ধরে অনেকবার জিজ্ঞাসা করার পর হতচ্ছাড়ী আমার কানে কানে কি বলেছিল জান দোলাবৌদি? বলেছিল, আমার দেহে একটা চিহ্ন রেখে যাও।

কি করব? বিদায়বেলায় এই অনুরোধ না রেখে আমি পারিনি। সত্যি ওর দেহে

একটা চিহ্ন রেখে গেলাম, যে চিহ্ন শুধু মেমসাহেবই দেখেছিল কিন্তু দুনিয়ার আর কেউ দেখতে পারেনি।

পালামের মাটি ছেড়ে আমি চলে গেলাম।

ঘুরতে ঘুরতে শেষে লন্ডন পেঁছে মেমসাহেবের চার-পাঁচটা চিঠি একসঙ্গে পেলাম। বার বার করে লিখেছিল, ফেরার সময় তুমি দিল্লীতে না গিয়ে যদি সোজা কলকাতা আস, তবে খুব ভাল হয়। কলেজে টেস্ট শুরু হয়েছে; সুতরাং এখন ছুটি নেওয়া যাবে না। অথচ তুমি ফিরবে আর আমি তোমাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করব না, তা হতে পারে না।

শেষে লিখেছিল, তুমি কবে কোন্ প্লাইটে কখন দমদমে পেঁছবে, সে খবর আর কাউকে জানাবে না। দমদমে যেন ভীড় না হয়। শুধু আমিই তোমাকে রিসিভ করব, আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি যেন এয়ার-পোর্টে না থাকে।

মেমসাহেব আমাকে বিদায় জানাবার জন্য কলকাতা থেকে দিল্লী ছুটে এসেছিল। সুতরাং আমি ওর এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। বন্ড স্ট্রীটে এয়ার ইন্ডিয়া অফিসে গিয়ে আরো কিছু পেমেন্ট করে টিকিটটা চেঞ্জ করে আনলাম। তারপর রওনা হবার আগে মেমসাহেবকে একটা কেবল্ করলাম, রিচিং ডামডাম এয়ার ইন্ডিয়া স্যাটারডে মর্ণিং। মজা করবার জন্য শেষে উপদেশ দিলাম, ডোন্ট ইনফর্ম এনিবডি।

অরেঞ্জ পাড়ের একটা তাঁতের শাড়ী আর অরেঞ্জ রং-এর একটা ব্লাউজ পরে, রোদ্দুরের মধ্যে মাথায় ঘোমটা দিয়ে মেম-সাহেব রেলিং'এর ধারে দাঁড়িয়েছিল আমার আগমন প্রত্যাশায়। আমার দু'হাতে ব্রিফ কেশ, টাইপরাইটার, কেবিন ব্যাগ থাকায় হাত নাড়তে পারলাম না। শুধু একটু মুখের হাসি দিয়ে ওকে জানিয়ে দিলাম, ফিরে এসেছি।

কাস্টমস্-ইমিগ্রেশন কাউন্টার পার হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই ও আমার হাত থেকে টাইপরাইটার আর কেবিনব্যাগটা নিয়ে নিল। টার্মিনাল বিল্ডিং থেকে বেরুবার সময় জিজ্ঞাসা করল, ভাল আছ তো?

মাথা নেড়ে বল্লাম, হ্যাঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি?

'ভাল আছি।'

তারপর ট্যাক্সিতে উঠে মেমসাহেব আমাকে প্রণাম করল। আমি ওর মাথায় হাত দিয়ে বল্লাম, সুখে থাক, মেমসাহেব।

'নিশ্চয়ই সুখে থাকব।'

তারপর আমি বলেছিলাম, জান, এই শাড়ীটা আর ব্লাউজ পরে তোমাকে ভারী ভাল লাগছে।

খুব খুশী হয়ে হাসিমুখে ও বল্লো, সত্যি বলছ?

'সত্যি বলছি। তোমাকে বড় শান্ত, স্নিগ্ধ, মিষ্টি লাগছে।'

একটু পরে আবার বলেছিলাম, ইচ্ছা করছে তোমাকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করি।

মেমসাহেব দু'হাত জোড় করে বলেছিল, দোহাই তোমার, এই ট্যাক্সির মধ্যে আদর করো না।

দোলাবৌদি, এমনি করে এগিয়ে চলে-ছিলাম আমি আর মেমসাহেব। আমি দিল্লীতে থাকতাম, ও কলকাতায় থাকত। তখনও লুকিয়ে-চুরিয়ে মেজদিকে হাত করে ও দিল্লী আসত, কখনও বা আমি কলকাতা যেতাম। মাঝে মাঝেই আমাদের দেখা হতো। বেশী দিন দেখা না হলে আমরাও শান্তি পেতাম না।

ইতিমধ্যে একজন ন্যাভাল অফিসারের সঙ্গে মেমসাহেবের মেজদির বিয়ে হলো। বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমি কলকাতা গিয়েছিলাম। একটা ভাল প্রেজেনটেশনও দিয়েছিলাম।

মেজদির বিয়েতে গিয়ে ভালই করে-ছিলাম। এই উপলক্ষে আমার সঙ্গে ওদের পরিবারের অনেকের আলাপ-পরিচয় হলো। তাছাড়া ঐ বিয়ে বাড়ীতেই মেজদি আমাদের ব্যাপারটা পাকাপাকি করে দিয়েছিলেন। আমার হাত ধরে টানতে টানতে মেজদি ওর মা'র সামনে হাজির করে বলেছিলেন, হ্যাঁ মা, এই রিপোর্টারের সঙ্গে তোমার ঐ ছোটমেয়ের বিয়ে দিলে কেমন হয়?

এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। লজ্জায় আমার চোখ-মুখ-কান লাল হয়ে উঠেছিল। তবুও আমি অনেক কষ্টে ভনিতা করে বল্লাম, আঃ মেজদি! কি যা তা বলছেন?

মেজদি আমাকে এক দাবড় দিয়ে বল্লেন, আর ঢং করবেন না। চুপ করুন।

তারপর মেজদি আবার বল্লেন, কি মা? তোমার পছন্দ হয়?

এত সহজে ঐ কালো-কুচ্ছিত হতচ্ছাড়ী মেয়েটাকে যে আমার মত সুপাত্রের হাতে সমর্পণ করতে পারবেন, মেমসাহেবের মা তা স্বপ্নেও ভাবেন নি। তাই বল্লেন, তোদের যদি পছন্দ হয় তাহলে আর আমার কি আপত্তি থাকবে বল?

বিয়ে বাড়ী। ঘরে আরো অনেক লোক-জন ভর্তি ছিল। ওদের সবার সামনেই মেজদি আমার ঘাড়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বল্লেন, নিন, মা'কে প্রণাম করুন।

লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। কিন্তু কি করব? প্রণাম করলাম।

এবার মেজদি আমার মাথাটা চেপে ধরে বল্লেন, নিন, এবার আমাকে প্রণাম করুন।

আমি প্রতিবাদ করলাম, আপনাকে কেন প্রণাম করব?

মেজদি চোখ রাঙিয়ে বল্লেন, আঃ! যা বলছি তাই করুন। তা নয়ত সবকিছু ফাঁস করে দেব।

আশপাশের সবাই গিলে গিলে মেজদির কথা শুনছিলেন আর হাঁ করে আমাকে দেখছিলেন।

আমি এদিক-ওদিক বাঁচিয়ে অনেক কষ্টে মেজদিকে চোখ টিপে ইসারা করলাম।

ন্যাভাল অফিসারকে পেয়ে মেজদির প্রাণে তখন আনন্দের বন্যা। আমার ইসারাকে সে তখন গ্রাহ্য করবে কেন? তাই সবার সামনেই বলে ফেল্লেন, ওসব ইসারা-টিসারা ছাড়ুন। আগে প্রণাম করুন—তা নয়ত......

দোলাবৌদি, তুমি আমার অবস্থাটা একবার অনুমান কর। বিয়ে বাড়ী। চার-দিকে লোকজন গিজ্‌গিজ্ করছে। তারপর ঐ রণমূর্তিধারি বধূবেশী মেজদি! বীরত্ব দেখিয়ে বেশী তর্ক করলে না জানি হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভেঙে মেজদি কি সর্বনাশই করত! টিপ করে একটা প্রণাম করেই পালিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু মেজদি আবার টেনে ধরে বল্লেন, আহা-হা! একটু দাঁড়ান।

হুংকার ছেড়ে বল্লেন, ঐ যে দিদি দাঁড়িয়ে আছে। দিদিকে প্রণাম করুন।

আমি একটু ইতস্তত করতেই মেজদি আবার ভয় দেখালেন, খবরদার রিপোর্টার! অবাধ্য হলেই......

দিদিকেও প্রণাম করলাম।

দিল্লী আসার দিন মেমসাহেব স্টেশনে এসে বলেছিল, জান, তোমাকে সবার খুব পছন্দ হয়েছে।

স্টেশন প্ল্যাটফর্মে সবার সামনেই ও আমাকে প্রণাম করল, আমি ওকে আশীর্বাদ করলাম। দিল্লী-মেল ছেড়ে দিল।

ভালবাসা নিও।

তোমাদের বাচ্চু

ভবিষ্যৎ বর্তমানের সমস্ত বেদনাভার লাঘব করবে। অথচ তার পক্ষে আরো রুক্ষ-সূক্ষ্ম হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার আমরা সে চিন্তার ধারেকাছে মাড়াই না। গোটা মানব জাতির ইতিহাসই অবশ্য তাই। তফাতের মধ্যে কেউ কম আর কেউ বেশি। যাক সে কথা। ভবিষ্যতের কথা ভেবে আর অদৃষ্টকে গালমন্দ করতে করতে পথ চলি। ঘামে সারা শরীর সপ-সপে। এমন অবস্থা যে, জামাকাপড় নিগড়োলে ছোটখাটো বালতির এক বালতি কাছাকাছি কর্পোরেশনের মিঠে নোনতা জল পাওয়া যাবে। এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে বাসস্টপে এসে দাঁড়িয়েছে। একে গরমে প্রাণ যায় তার বাসেরও দেখা নেই। এ অবস্থায় মুখ গোমড়া করে দাঁড়ালো ছাড়া আর উপায় কি। অবশ্য নিজেকে নিজে দেখতে পারছিলাম না। কিন্তু বিরক্তি। যে মুখের রেখায় রেখায় বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত বয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না।

দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। এ যেন এক অদ্ভুত ধৈর্যের খেলা। দারুণ একচোট বিরক্তিতে যখন একটা ট্যাক্সি ধরবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছি ঠিক তখনি একটুর জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। একটি মেয়ে এগিয়ে আসছে এদিকেই, বোধ হয় বাস ধরবার জন্যে। আমার ধারণাই ঠিক। মেয়েটি এসে পড়েছে আর আমি আড়চোখে ওকে পুরোপুরি দেখে নেবার চেষ্টা করছি। সত্যি তাজ্জব ব্যাপার সারা শহরে ঘামের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মেয়েটি ঘামে ভেজা দূরের কথা, মুখের কোথাও একবিন্দু জল জমেনি। পুরু প্রসাধনে মেয়েটি নিজেকে সাজিয়েছে। প্রসাধনের ঘাম-রোধী ক্ষমতায় অবাক মানতে হয়। আর একবার মনে মনে সেদিনের তাপমাত্রার কথা স্মরণ করলাম। তারপরই মেয়েটির জামাকাপড়ে চোখ আটকে গেল। ভরাট শরীরে আঁটোসাটো জামা। শাড়িটা সুন্দর কায়দায় পরা। প্রসাধনের সঙ্গে সবকিছু মানিয়েছে সুন্দর। ব্লাউজের মধ্যে আধুনিকীকরণের মিঠে আমেজ। বাতাসের প্রয়োজন হয়নি। ত্রিভুজাকৃতি পিছনের দুটি দিক ফিতের

অঙ্গনা

পোশাকের ঝড়ো হাওয়া

প্রমীলা

গুমোট গরমে সারা শহর ঘামছে। বৃষ্টি এখন তৃষ্ণার জলের সামিল। তার দুর্লভ সাক্ষাতের সবাই হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। বৃষ্টিভেজা একটি সন্ধ্যার চেয়ে মনোরম আর কিছু ভাবাই যায় না। কিন্তু আবহাওয়াবিদের সমস্ত ভরসা ব্যর্থ করে সে এখন খর বা সাহারায় মুখ লুকিয়েছে, চটপট এদিক পরিদর্শনের সম্ভাবনাও নেই। তাই আমরা নিরুপায় হয়ে ঘামছি। আসন্ন বর্ষার অনিশ্চিত প্রসন্নতার পথ চেয়ে ১১৩ ডিগ্রি তাপাঙ্কে নির্ভয়ে পথ হাঁটছি। মনে আশা যে, এভাবে পথ চলতে চলতেই কোন এক সন্ধ্যায় বৃষ্টি-ভেজা সেই লগ্নটিতে পৌঁছে যাব। ললাটের স্বেদবিন্দু তখন মরকতমণির উজ্জ্বলতায় শোভা পাবে।

বর্তমানকে ঘিরে ভবিষ্যতের ভাবনা আমাদের মাথায় এমন জোরদার চেপে বসে যে, তাকে আর কিছুতেই নামানো যায় না। আর সব সময়ই আমরা ভাবি যে, আগন্তুক

মডেল : সবিতা চট্টোপাধ্যায়

বাঁধনে ধরা পড়েছে। আলতো করে শাড়িটা বুকের ওপর ফেলা। প্রাণভরে একবার সে আমেজে নিঃশ্বাস নিলাম। কলকাতার এই আইটাই গরম কয়েক মুহূর্তের জন্য থিতিয়ে এলো। বেশ একটা ঠান্ডা আমেজ অনুভব করলাম। বাস-ট্যাক্সি এবং যাবার তাড়া তখন মাথায় উঠেছে। ইতিমধ্যে বাস এসে ওকে নিয়ে গেল। আমিও শহরের গরম এবং মেয়েটির মিষ্টি পোশাক নানা চিন্তাভাবনা মাথায় চাপিয়ে বাসে উঠে বাড়ির পথ ধরলাম।

বাড়ি ফিরেও কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। পোশাকের চিন্তাটা তখনও মাথা থেকে নামেনি। চুপচাপ বসে ভাবছি। সত্যি আজকের পোশাকের জগতে বিচিত্র পরিবর্তন প্রায় রূপকথার সামিল। জীয়ন-কাঠির ছোঁয়ায় ঘুমন্ত রাজকুমারী তার শিয়রের পাশে অচিন দেশের রাজকুমারকে দেখে কত না অবাক হয়েছিল আমাদের আজকের বিস্ময় তার চেয়ে অনেক বেশি। হরদম পোশাকের রূপ বদলাচ্ছে। সেই সঙ্গে রঙ্গ এবং রসে ও বৈচিত্র্য আসছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত নিছক পোশাকের দৌলতে অপর প্রান্তের গঙ্গাজলে পরিণত হচ্ছে। দূরকে নিকট আর পরকে ভাই করার ব্যাপারে অনেক কিছুরমত পোশাকও এক বিরাট ভূমিকায় অভিনয় করছে। আর বলাই বাহুল্য, মানুষের রূপ-লাবণ্যের নিপুণ বিচারে পোশাক মোটেই ফেলনার নয়। পোশাকপরিচ্ছদের সুনির্বাচনে কুরূপা নারীও সুরূপার সার্টিফিকেট পেতে পারে। আবার সুন্দরী নারীর রূপ আরো খোলতাই হয়। একথা অবশ্য সকলেরই জানা। বিশেষ করে আধুনিকাদের রূপচর্চার বহর দেখে তাই মনে হয়। পোশাক এবং প্রসাধন সম্বন্ধে এঁরা অতিশয় সজাগ। বাজারে কখন কোন জিনিসটা বেরুল এবং রূপচর্চায় তার উপযোগিতা কতটুকু তা তাদের কন্ঠস্থ।

নারী সাজতেগুজতে ভালবাসে আর পুরুষও পছন্দ করে নারীর সাজগোজ। কিন্তু সেই পোষাক নিয়ে দেশে দেশে কি হুল্লোড়। টপলেশ আর ব্যাকলেশের ধাক্কা আমরা অনেকটা সামলে উঠেছি। তার জের অবশ্য এখনো কাটেনি। তবে সেদিনের অস্থিরতা আর নেই। তাই যায় স্লিভলেশ ব্লাউজকে অনেকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাছাড়া একটা কথা মেনে নেওয়া ভাল যে, পোশাকে দেহসৌন্দর্য যদি পুরোপুরি না ফুটে ওঠে তবে সে প্রায় জোব্বা-জাব্বার সামিল। বোরখা পরে পথে চলাফেরা কথাও যে কথা আর এসব পোশাক পরাও সে কথা। দিন অনেক বদলেছে এবং রুচিও পালটেছে তাই এ সহজ স্বীকৃতির পথে বাধা কোথায়। বিশেষ করে মেয়েদের আজ পুরুষের সমান দক্ষ হয়ে উঠতে হচ্ছে। তাই সারা দেহে জামা-কাপড়ের পাহাড় বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। একদিন অবশ্য মেয়েরা সামনে দিয়ে চলে গেলে মনে হতো জামা-কাপড়ের একটা বাণ্ডিল চলে যাচ্ছে। রুচির দিক থেকে প্রস্তুত নই। কেউ সেখানে ফিরে যেতে প্রস্তুত নই। তাই মেয়েরা সাজপোশাক [illegible], দেহসৌন্দর্য [illegible]
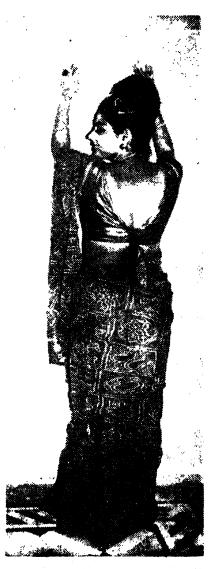
পাক এবং হালকা চালে চলতে ফিরতে অভ্যস্ত হোক এটাই হওয়া উচিত আজকের প্রার্থনা। শ্লীল-অশ্লীলের মহিমা নিয়ে মাথা ঘামানোয় আমাদের ততটা রুচিও নেই আর সেজন্য প্রয়োজনীয় সময়ও সংক্ষেপ। প্রয়োজন শুধু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা। একবার আমরা পেছনে ফিরে যদি প্রাচীন সভ্যতার পোশাকে নিদর্শন খুঁজে ফিরি তখন আর আমাদের আপসোস হবে না, গেল গেল করে দেশকাল মাথায় করবো না।

অনেকের পরিচিত এই দৃশ্যটি একবার কল্পনা করা যাক। যৌবনের উচ্ছলতায় ভরপুর এক তরুণী পথ দিয়ে চলেছে। পথচারীমাত্রেই একবার অপাঙ্গে তার দিকে দৃষ্টি হানছে। মনে মনে তারিফ করছে মেয়েটির রুচির। তার দেহের খাঁজে খাঁজে শাড়িটি সুন্দরভাবে বসেছে, শ্লীভলেশ ব্লাউজ তার ভরাট যৌবনে লাবণ্যের সৃষ্টি করেছে, প্রসাধনে সৌন্দর্যবোধ স্পষ্ট। ছোট ছোট পায়ে মেয়েটি হেঁটে যাচ্ছে। এক নজর দেখে তারিফ না করে উপায় নেই। শাড়ি থেকে শুরু করে ব্লাউজ পর্যন্ত ব্যবধানও বেশ মানানসই। সবকিছু মিলিয়ে সে আজকের রূপসজ্জার একটি জলজ্যান্ত নিদর্শন। অথচ খুব একটা উদগ্রতা নেই। আসলে সবটাই হচ্ছে দেখার ব্যাপার। শ্লীল-অশ্লীল তো নিজের কাছে।

পোশাকের রাজ্যে আজ বিরাট আলোড়ন। নানা পোশাকে মেয়েরা নিজে-দের সাজাচ্ছে। কোনটায় তাদের ভাল মানায়। মাঝে মাঝে শ্ল্যাকসের ব্যবহারও দেখা যায়। তবে এ-ব্যাপারে কিছুটা ভাটা পড়েছে মনে হয়। তিব্বতী উদ্বাস্তু এ-দেশে আসার পর এ-পোশাকও বাড়িতে পালে-পার্বণে মন্দ লাগে না। এর ব্যবহার অনেকটা শৌখিন। রাত্রির পোশাকেও পরি-বর্তনের খেলা করছে। চিরাচরিত রাত্রিবাস পরিত্যাগ করে অনেকেই ইদানীং রুচির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে নতুন কাটছাঁটের গাউন ব্যবহার করে। এতে শরীর বেশ হালকা থাকে এবং গাউনটা কোন সময়ই শরীরের উপর চেপে বসে না। এভাবে বাড়িতে হালকা পোশাকে যথার্থ হালকা থাকা যায়।

সবকিছুতেই আজকাল ছিমছাম থাকতে হবে। তাই পোশাকের ব্যাপারেও এ-কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পরিবর্তিত রুচিতে পোশাকের হাওয়া সেদিকেই বইছে। এজন্য হৈ-চৈ বা সোরগোল তুলে লাভ কিছু নেই। প্রয়োজন শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার। যা কিছু অশ্লীল সব কালস্রোতে ভেসে যাবে। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, পোশাকের পরিবর্তন অতীতেও হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। কোনরকম রোষ-কশায়িত দৃষ্টিপাত এর গতিরোধ করতে পারবে না। তাই এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ খুব একটা সফল হবে না। দৃষ্টি-ভঙ্গীর উদারতা এক্ষেত্রে একমাত্র পথ।

ফটো : সুকুমার রায়

কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

কালে ভদ্রে এক-একজন বিদেশীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়, যাঁরা কলকাতার নাম শুনেই নাক সিঁটকান না, বরং কলকাতার আত্মা আবিষ্কারে অনেক ভারতীয় বা বাঙালীর চাইতে বেশী আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন। লোহষবনিকার দুদিক থেকেই এঁরা আসেন, এবং এঁদের দৃষ্টি সাধারণত ঐতিহাসিকের। ক্যাথারিন ডীল এমনি এক-জন মার্কিন মহিলা যিনি বর্তমানে কলকাতায় আছেন আজ প্রায় এক বছর। আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ান স্টাডিজ-এর কলকাতা শাখার ইনি সিনিয়র ফেলো। এঁর এখনকার গবেষণার বিষয় বাংলা টাইপের ইতিহাস। কয়েক বছর আগে তিনি শ্রীরামপুরে কেরী লাইব্রেরীতে পুঁথি তালিকা প্রস্তুতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং সে সময়ে "আর্লি ইণ্ডিয়ান ইমপ্রিন্টস" শীর্ষক একটি তালিকা সংকলন করেন এই লাইব্রেরীর সংগ্রহের ভিত্তিতে।

সুইনহো স্ট্রীটে শ্রীমতী ডীলের অফিসে বসে তাঁর গবেষণার বিষয়ে আলোচনা করতে করতে অনেক তথ্য জানা যায়। টুকরো-টুকরো তথ্যগুলি একত্রিত করে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করবেন বলে চিন্তা করছেন।

সারা পৃথিবীর মানুষের পরস্পর ভাব আদান-প্রদানের ব্যাপারে ইতিহাসের শুরু থেকে যে সব মনীষী জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন শ্রীমতী ডীল। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একদল মানুষের কথা তাঁর মনে হয়। এই ভাব আদান-প্রদানের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র ছাপাখানা ও প্রকাশন ব্যবসা। মানুষের চিন্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার কাহিনীর পিছনে রয়েছে সেই ছাপাখানা ও প্রকাশকের দান। কত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে কত সমস্যার সমাধান করে সেই মহৎ কাজে সহায়তা করে তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন, সে কাহিনী প্রায় অলিখিত।

"তাঁদের বিস্মৃতির গহবর থেকে তুলে আনতে কত দূর পেরেছি, সেকথা জিজ্ঞাসা করবেন না। হয়ত খুব বেশী পারি নি। কিন্তু যে কোন একটি পুরনো বই হাতে নিলেই আগে আমি বুঝতে চেষ্টা করি তাদের কথা," বলেন শ্রীমতী ডীল।

এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীরামপুর মিশনারীদের কথা তোলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ইংরাজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা থেকে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় যে সব বই অনুবাদ করে ছাপা হয়েছে, সে সব বই অনুবাদ করতে অসংখ্য ভারতীয়ের সহায়তা প্রয়োজন হয়েছে। অথচ বেশীর ভাগ বইতেই সেই সব ভারতীয়ের নাম উল্লেখ পর্যন্ত নেই। "আমি জানতে চাই তাদের কথা, আর এও জানি, সে এক অসম্ভব চাওয়া।"

এই বলে একখানা বইয়ের উদাহরণ দিলেন। কে একজন হাণ্টার সাহেব ১৮০৫ সালে হিন্দুস্থানীতে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের একখানা অনুবাদ প্রকাশ করেন। বইয়ের শিরোনামায় হাণ্টার প্রণীত বলে উল্লেখ করা আছে এবং অনুবাদে সাহায্য করেছেন মির্জা মহম্মদ ফিতরুত নামে একজন মুন্সী. তাও বলা আছে। কিন্তু সেই বইয়েরই দ্বিতীয় সংস্করণে মির্জা মহম্মদ ফিতরুতের নাম-গন্ধও নেই। শুধুই হাণ্টার সাহেবের নাম আছে। "তৎকালীন ইংরেজেরা ভারতীয় অনুবাদক-দের নাম কেন যে চেপে যেতে চাইতেন সে এক রহস্য।"

আর একখানি ওড়িয়া অভিধানের দৃষ্টান্ত দিলেন শ্রীমতী ডীল। আমোস সাটন নামে এক ভদ্রলোক প্রণীত ওড়িয়া

অভিধান। তার মুখবন্ধে আছে, "গ্রন্থকারের সহায়তাকারী পণ্ডিত মশাইয়ের বড় সাধ এই গ্রন্থ প্রণয়নের কৃতিত্বে তাঁর অংশটুকুও যেন স্বীকৃত হয়।" হাঁ, এ কৃতিত্বের অংশ অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য একথা দয়া করে স্বীকারও করেছেন তিনি। অগত্যা আট লাইনের একটি পদ্যে পণ্ডিত মশাইয়ের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তা থেকে তাঁর নাম পাওয়া যায়—ভবানন্দ ন্যায়ালংকার।

এছাড়া আরও কিছু কিছু নাম পাওয়া যায়, কিন্তু খুব বেশী নয়। শ্রীমতী ডীলের অনুমান চারভাগের একভাগ নাম স্বীকার করা হয়েছে, বাদ বাকী হয়নি।

কেরী সাহেব তাঁর মুন্সীদের নাম অন্যত্র উল্লেখ করেছেন কিন্তু যে সব বইয়ে তাঁরা কাজ করেছেন সেসব বইয়ে তাঁদের নাম নেই, বলেন শ্রীমতী ডীল।

(বলতে ভুলে গেছি। শ্রীরামপুরে থেকে যে গ্রন্থ তালিকাটি তিনি প্রণয়ন করেছেন, তাতে একজন বাঙালী তাঁর সহায়তা করেছেন, তাঁর নাম তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি—তিনি শ্রীহেমেন্দ্রকুমার সরকার)।

এমন কত জানা অজানা মানুষের কাহিনী বিক্ষিপ্তভাবে মিশে আছে মুদ্রণ ও প্রকাশনের ইতিহাসে। এক-একজনের কথা তাঁর মনে হয়। "হাজি মুস্তাফা নামে এক ফরাসী ভদ্রলোকের নাম শুনেছেন কি?" শুনিনি। "ভারী ইন্টারেস্টিং ওঁর চরিত্র। হেস্টিংসের বন্ধু, ভান্সিটার্টের বন্ধু এই ভদ্রলোক আন্দাজ ১৭৫০ থেকে ১৭৮৫ অবধি কলকাতা ও মুর্শিদাবাদে ঘোরাফেরা করতেন। ওঁর কথা টুকরো টুকরো ভাবে জানতে পারা যায়, তা থেকে একটা সুসংবদ্ধ জীবনী খাড়া করবার ইচ্ছা আছে, কতটা পারব জানি না। কয়েকটি ভাষায় উনি সুপণ্ডিত ছিলেন। সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ রচিত শের মুতাখারিন গ্রন্থটি উনি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদ শেষ করে উনি নিজেই সেটি প্রকাশ করেন। কয়েক কপি কলকাতায় বিতরণ করেন এবং অবশিষ্ট কপিগুলি তিনি জাহাজে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেন। পথে জাহাজটি ডুবে যায়। এর কিছুকাল পরে তিনি মারা যান।"

"ফরাসী ভদ্রলোকের নাম হাজী মুস্তাফা কী করে হল?" প্রশ্ন করলাম।

"ওঁর ফরাসী নামও জানা যায়—মঃ রেমো। হাজী 'মুস্তাফা নাম' পরে হয়েছিল, না গোড়া থেকেই ছিল, অর্থাৎ তিনি প্রথম থেকেই মুসলমান না ধর্মান্তরের পর, তা জানবার চেষ্টা করেছি, জানতে পারি নি। তিনি অনেক দেশ ঘুরেছেন। অনেক ইউরোপীয় স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে প্রয়োজনের খাতিরে প্রবাসের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছেন এমন দৃষ্টান্ত আছে।"

আর একজনের কথা তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে বলেন। তাঁর নাম ন্যাথানিয়েল ওয়ালিখ। কেরী সাহেবের বন্ধু এবং শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের প্রধান এই ভদ্রলোক জাতে ইহুদী ছিলেন, এবং একজন খৃস্টীয় মহিলাকে বিয়ে করেন। লণ্ডন থেকে ১৮৩০ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রণীত এশিয়ার উদ্ভিদ বিষয়ক গ্রন্থ উদ্ভিদ তত্ত্বের ইতিহাসে একটি অমূল্য সম্পদ। সেকালে অত দামের কোন বই প্রকাশ করতে যাওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল, কারণ বিক্রী হবার সম্ভাবনা ছিল না। বই প্রকাশের আগে সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন হয়, এবং কোম্পানী সরকার চল্লিশ কপি বইয়ের আগাম অর্ডার দিয়ে সাহায্য দেন। আর যাঁরা আগাম অর্ডার দেন তাঁদের নাম সংগ্রহ করেছেন শ্রীমতী ডীল। তাঁরা হলেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, শিবচন্দ্র দাস, রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও সতীকিংকর ঘোষাল। এ'দের নাম করতে করতে শ্রীমতী ডীল রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, বলেন, "যে সে লোক ছিলেন নাকি এ'রা? ওই বই কেনার কথা কে ভাবতে পারত ও'রা ছাড়া।"

ওয়ালিখ সাহেবের কাজে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন, তাদের অনেকের নাম অবশ্য পাওয়া যায়। বিশেষ করে দুজন শিল্পীর—বিষ্ণুপ্রসাদ ও গোরাচাঁদ। এ'রা চিত্রবিদ্যায় বিশেষ কুশলী ছিলেন এবং ওয়ালিখ সাহেবের বিরাট পুঁথির যাবতীয় রঙীন ছবি এ'রা এ'কে দেন। "এ'দের অবদান স্বীকার করতে ওয়ালিখ সাহেব কুণ্ঠিত বা ভীত হননি," হেসে বলেন শ্রীমতী ডীল।

শ্রীমতী ডীলের বাড়ী টেক্সাসে। কর্মজীবনের সুরু থেকে তিনি লাইব্রেরী নিয়ে পড়ে আছেন। আমেরিকার রাটগারস বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান হিসাবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন, তারপরও দেশে-বিদেশে বহু লাইব্রেরীতে তিনি কাজ করেছেন, ও লাইব্রেরিয়ানশিপের বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। কলকাতার লাইব্রেরীগুলি সম্পর্কেও তিনি অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন। তাঁর মতে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর মত বিরাট গ্রন্থাগার ছাড়াও কলকাতার ছোটখাট অনেক গ্রন্থাগার অনেক বিষয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশেষ করে নাম করলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া লাইব্রেরী, আর কলকাতার বাইরে, চন্দননগর ইনস্টিটিউট, শেঠ লাইব্রেরী ও শ্রীরামপুরের কেরী লাইব্রেরী। এগুলির সম্পর্কে সব চাইতে মজার বিষয়, এতে যে কত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পাওয়া যায় তা অনেকেরই জানা নেই। এ ধারণা তাঁর কী করে হল? সে আরও মজা। দারোয়ানেরা বলে, "খালি বসে বসে পাহারাই দিই, পাহারাই দিই, কেউ আর ভিতরে আসে না!"

—স, সে
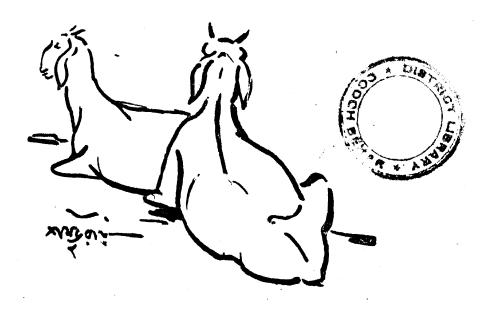
(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

গভীর রাত্রে সেদিন যখন বাড়ি ফিরল গণেশ—তখন সে মনস্থির করে ফেলেছে। প্রথম প্রথম একটা প্রশ্ন তার বিবেককে পীড়া দিচ্ছিল; সে যদি বিয়ে করে ঘরকন্না পাতে—যদি, যদি সত্যিই সুখী হয় কোনদিন, তাহলে সেটা তাম্পির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না তো? তাম্পির আত্মা দুঃখ পাবে না তো তাতে?...কিন্তু নিশীথ রাত্রির শান্ত নিস্তরঙ্গ গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে মনের মধ্যেই এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে সে—বরং এইটেই হবে তাম্পির হত্যার প্রতিশোধ। হিমিকে মর্মান্তিক আঘাত দেওয়া হবে এইতেই। এত পৈশাচিক আয়োজন যে জন্যে—গণেশকে একান্ত নিজস্ব করে পাওয়ার জন্যেই এত আয়োজন সে বিষয়ে ওর সন্দেহ মাত্র নেই—সেইটেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ওদের দলে আর ফিরে যাবে না এটা নিশ্চিত। ওসব সাজ-সরঞ্জাম অমনিই পড়ে থাক। এখানে আবার নতুন করে কিনে নিতে পারবে সে। দিদির এখন টাকার অভাব নেই, সব খুলে বললে, ওর সুমতি হয়েছে শুনলে হাসিমুখেই দেবে সে। নতুন করে জীবন শুরু করবে গণেশ। দু-একটি ছোকরা বেছে নিয়ে তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরী করে নেবে সাহায্য করার জন্যে। ম্যাজিকের খেলাই দেখাবে শুধু—এখানে এই দেশে—এই ভারতবর্ষের মধ্যেই। আর, যদি কোন দিন ভগবান মুখ তুলে চান তো বিলেত আমেরিকা কি জাপান যাবে, কিম্বা জার্মানী। ওসব দেশে আর না, সার্কাসের দলেও না। নিহাৎ যদি আলাদা খেলা দেখিয়ে অন্ন না হয়—তখন অন্য কোন সার্কাসের দল খুঁজবে। এখানকার দল যারা এই দেশেই থাকে এমনি জিমন্যাস্টিকের দল হয়েছে কিছু কিছু—শুনেছে চারদিকেই—গায়ের জোর দেখিয়ে বেড়ায় তারা, বুকে পাথর ভাঙে, হাতী তোলে—তাদের কারও সঙ্গে জুড়েও ভাল প্রোগ্রাম করা যেতে পারে।......

অনেক কিছুই ভাঙে-গড়ে মনে মনে। ভবিষ্যতের অনেক ছবি দেখে। আর মনকে বার বার শাসায়, ঐ সাংঘাতিক সর্বনাশী মেয়েছেলেটার সঙ্গে আর নয়—ঢের শিক্ষা হয়েছে।

।। ২৮ ।।

বিয়ের প্রস্তাবে যখন শেষ অবধি রাজী হয়েছিল গণেশ আর সুরোও সায় দিয়েছিল—তখন, নিস্তারিণী যে এমন কাণ্ড করবে—তা দুজনের একজনও ভাবে নি।

নিস্তারিণী যে কথাটা এতকাল মনে করে রেখেছে, তা-ই বা কে জানত!

সে সঘর থেকে মেয়ে আনবে, ওদের যা ঘর। মেয়েবেচা ঘর ওদের, তা হোক, তাই বলে লুকিয়ে অপর বামুনের জাতকুল মারতে পারবে না। অন্য ছোট ঘর থেকেও আনবে না। তাতে যা হয় হবে।

এ খবরেও তত বিচলিত বোধ করে নি কেউ। কিন্তু মেয়ে স্থির হতে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল গণেশের। বেছে বেছে, চারি দিকে ঘটকী লাগিয়ে যে মেয়ে খুঁজে বার করল, দেখে পছন্দ করে এল—তার বয়স মাত্র নয়। নয়ও বলা উচিত নয়—আট সবে পূর্ণ হয়েছে—দিন-কতক হল। মোটা পণ নিবার জন্যেই নয় বলছে তারা।

'তুমি কি পাগল হয়েছ মা!' সুরোই প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়, 'খোকার যে যেটের তিরিশ পেরিয়ে গেছে কোন্ কালে। ওর সঙ্গে আট বছরের খুকী মেয়ের বিয়ে ঠিক করছ কি!'

'কে জানে বাপু' বিরস কণ্ঠে বলে নিস্তারিণী, 'তোদের মুখেই আজ নতুন সব কথা শুনছি—ন বছরের মেয়ে নাকি খুকী! আমাদের আমলে—হোক পণ নেওয়া ঘর — মেয়ে পাঁচ-ছ বছরের হলে বাপ-মার ঘুম আসত না চোখে। তার চেয়ে বড় মেয়ে কেউ ভরসা করে ঘরে তুলত না। নানা রকম সন্দ করত, বলত এতদিন ঘরে পড়ে আছে কেন—নিশ্চয়ই কোন গোল আছে এর ভেতর! তখন ছেলেরাও দশ-বারো বছর বয়স হতে-না-হতে বিয়ে করে ফেলত।"

'পনেরো বছরের ছেলের সঙ্গে আট বছরের মেয়ে মানায়—এতো ছেলে নয়—এ তো মিনসে।'

'তা মিনসে হলে আর কী করছি বলো বাছা! কেউ যদি সময়ে বে না ক'রে তেজবরের বয়সে প্রেথম বে করতে যায়—তার মেয়ে কোথায় পাওয়া যাবে? এমনি দেখগে যাও—বড় বড় বামুনের ঘরেই দশ বছর পেরোবার আগেই সব মেয়ে পার হয়ে যায়—এত বয়স পজ্জন্ত কে বসে থাকে শুনি? আমাদের ঘরে তো আরও, যত বছরের মেয়ে তত শো টাকা পণ দিতে হবে বলে সবাই চার বছর হলেই মেয়ে নিয়ে চলে যায়। এই কি সহজে পেয়েছি! অনেক খুঁজে তবে বার করেছে নীলু ঘটক। এর চেয়ে ডাগর মেয়ে কোথাও পাবে না।'

গণেশ শুনে একেবারে বেঁকে দাঁড়ায়।

'কী বলছ মা! চুলে পাক ধরে গেল, এখন ঐটুকু একটা মেয়ে বিয়ে করতে যাব! নাতির বয়সে পুতি। দিদি বড় হতে হতে সাহেব গোরে যাবে সে!...... লোকেই বা বলবে কি?'

'কী আবার বলবে! তোর যেমন ছিষ্টি-ছাড়া কাণ্ড! ওই এত বয়স অবধি আইবুড়ো বসে রইলি বলে মেয়েও থাকবে?......এই তো এদিকে সেই হালিশহর থেকে শুরু করে এধারে কালীঘাট পজ্জন্ত ত্রিভুবন তো চষে ফেললুম একেবারে। কোথায় না মেয়ে দেখতে গেলুম! এর চেয়ে বড় মেয়ে কোথাও নেই।...আর এমনই বা কি একটা অনথ ঘটছে তাও তো বুঝি না। একটা বছর পরেই পুনুর্বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনব। তাও বোধহয় এক বছর লাগবে না, মেয়ের বাড়নশা গড়ন—তার আগেই সোমথ হয়ে যাবে। সোন্দর দেখতে মেয়ে ছেয়ানো ছেয়ানো গড়ন—আমাদের ঘরে এত সোন্দর মেয়ে তো পাওয়াই যায় না। এই তো আমার গঙ্গাজলের মেয়ে ওপাড়ার গর্ভে ধরে এগারো করে বে দিলে—আসলে দশ বছরের মেয়ে—বছর ঘুরল না কোলে ছেলে এসে গেল! তুই অত ভাবছিস কেন, সে তো তবু এমন বড়-সড়ও ছিল না।'

'হ্যাঁঃ! আমার তো ঐ ভাবনায় ঘুম হচ্ছে না। বলি, বৌ আসবে ঘরে—তার সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথাও তো কইতে হবে,—আর সেই জন্যেই তো বৌ—এ তো আমাকে দেখে ভয়েই কাঁটা হয়ে থাকবে হয়ত কোনদিন বাবা বলেই ডেকে বসবে!'

'তুই থাম্ বাপু! তোর যত নাজোর আনুন্‌কোড়ি অনাছিষ্টি কথা! অমনি বাবা বলে ডাকছে! ওরে, ওরা সব আজকালকার মেয়ে, সেয়ানা কত! তাছাড়া বয়েসটাই বা নেহাৎ কম কি? আমার বে হয়েছিল তখন সবে পাঁচে পা দিয়েছি, ভাল করে কথা বলতে পারি না তখনও—আর তোর জন্মদাতা ষোল-সতেরো বছরের সাজোয়ান ছোকরা—এই গোঁপ-দাড়ি বেরিয়ে গেছে তখন। তা কৈ, আমার তো কখনও বর বলে বুঝতে ভুল হয় নি।'

তবু গণেশ ও সুরো প্রবল আপত্তি তোলে। নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করে মাকে। শেষে বিরক্ত হয়ে মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করে নিস্তারিণী বলে, 'বেশ তো—আমি তো এখনও পাকা কথা দিই নি, আশীর্বাদও হয়ে যায় নি। এখনও তো এ মাসের কুড়ি দিন বাকী, ওমাসেও তেসরার আগে বে'র দিন নেই। তোরা দ্যাখ না বেয়ে চেয়ে এর চেয়ে বেশী বয়সের মেয়ে পাস কিনা। আমি একে জাকড়ে রেখে দিচ্ছি।'

খুঁজলও সুরো অনেক। বেশী পয়সার লোভ দেখিয়ে ঘটকী আর নাপিত লাগাল। কিন্তু কোন সুবিধেই হল না তাতে। একটু বেশী বয়স—এগারো-বারো বছরের মেয়ের যা সন্ধান এল— সব রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, জানা শোনা ভাল ভাল ঘরের মেয়ে, তারা কেউই কীর্তনউলীর ভাই—তাও এখন নষ্ট হয়ে গেছে যে—আর সে ভাইও বিশ্ব-বকাটে, সার্কাসের দলে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়—এমন পাত্রে দিতে রাজী নয়। দু-চার ঘর ঘুরে ঘটক-ঘটকীরা স্পষ্টই বলল, 'না দিদি—ও হবে না, শুধু শুধু অপমান হতে যাওয়া। মা যা খুঁজে বার করেছে ওর চেয়ে ভাল মেয়ে পাবে না। বরাতজোরে পেয়ে গেছে।... নেহাৎ খুব গরীব, হাজার টাকা পণের লোভ সামলাতে পারে নি তাই রাজী হয়েছে।... আর পেতে পারো—' সখী নাপিতনী একটু চিপটেন কেটে বললে, 'এই রকম হাফ-গেরস্ত ঘর থেকে। মানে—বাঁধা থাকে যারা—ভেক্‌লেপুলে হয়—তারা আজ-কাল অনেকে খারাপ নাইনে না দিয়ে ছেলে-মেয়েদের বে দিয়ে ঘরবাসী বসাচ্ছে। নিজেদের মধ্যেই দেয় অবিশ্যি। তার মধ্যে খোঁজ করলে এক-আধটা বামুনের মেয়েও মিলতে পারে। মানে বাপ বামুন, বরাবর তার কাছেই ছিল মা, অন্য বাবু ধরে নি—এমন খোঁজ করলে পাওয়া যায়।... দ্যাখো, খোঁজ করব তেমন ধারা?'

আগুনের মতো রাঙা হয়ে উঠেছিল সুরোর মুখ, সেদিকে ঢাকতে একবার চেয়ে নিয়ে নিস্তারিণীই কথা ঘুরিয়ে দেয়, 'না না, ওসব আমাদের ঘরে চলবে না। যদি ভাল গেরস্ত ঘর দেখতে পারো তো দ্যাখো।... আর তাও বলি—তোমার বড্ড বেশী কথা বলা অব্যেস বাপু! তোমার খোঁজে তেমন মেয়ে নেই—এই তো সাফ কথা, একটা কথায় চুকে যায় এ বাত্‌তারা—তার মধ্যে এত ছিষ্টি টানবার দরকার কি বাছা?'

সখী মুখ টিপে একটু হেসে উঠে পড়ে। খরচ বলে আজও একটা সিকি আঁচলে বেঁধেছে—পরেও কিছু আদায়ের আশা রাখে তাই—নইলে এর জবাব সে দিতে পারত। বলতে পারত, 'বামুনের মেয়ে বেনেতে জাত দিয়েছে, সেই মেয়ের ঘরে আছ, তার অন্ন খাচ্ছ—তোমার আবার অত বামনাই কিসের?'

অর্থাৎ নিস্তারিণীরই জয় হয় শেষ পর্যন্ত।

মেয়েটিকে এখানে আনিয়ে সুরোকেও দেখায়। সুরোর মতো ডাকের সুন্দরী নয়, কিন্তু বেশ দেখতে, যৌবনকালে রূপ খুলেবে আরও। পছন্দ করার মতো মেয়ে। আপত্তি করার মুখ এমনিও ছিল না—মেয়ে দেখেও আপত্তি করার কোন কারণ খুঁজে পেল না সুরো। সত্যিই বেশ নাড়ুস-নুড়ুস গড়ন, এখনই পা ভারী, হাত গোলালো হয়ে উঠেছে। গণেশকে আর দেখায় না কেউ; কারণ—সুরো বুঝেছে গণেশের এসব দিক ভেবে দেখা বা বিবেচনা করার মতো মানসিক গঠন নয়। গৃহস্থালির খুঁটি-নাটি—সঘর, বামুনের মেয়ে—এসব ভুলেই গেছে। অবশ্য সে যা চায় তা সে পাবে না—সুরো তাও জানে। অন্তত ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে হলে খুশী হয় সে। সে রকম মেয়ে ব্রাহ্মণ কেন কোন ভদ্রঘরেই পাওয়া যাবে না। একবার তো গণেশ বলেই ফেললে, 'তা বিধবাই না হয় দ্যাখো না বাপু একটা, বিধবা বিয়ের তো আইন হয়ে গেছে। ক্রীশ্চান মুসলমান সবাই করছে—এদেশেই তো নিত্য হচ্ছে—তোদের আপত্তি কি?'

'তুই থাম তো। তোর জন্যে বিধবা নিয়ে বসে আছে সব! এই তো এত দেখছিস শুনছিস—কে কোথায় কটা বিধবা বিয়ে করছে? পাবই বা কোথায়?'

গণেশ আর কিছু বলে না। তার মতও আর জিজ্ঞাসা করে না কেউ। নিস্তারিণীর তরফ থেকে পুরোহিত গিয়ে আশীর্বাদ করে এলেন। সুরবালা বারো ভরির সীতাহার গড়িয়ে রেখেছিল, তাই দিয়েই আশীর্বাদ করা হল। বেশ মোটা টাকা খরচ হয়ে গেল সুরবালার, কন্যা-পক্ষের অবস্থা খারাপ, পণের হাজার টাকা ছাড়াও ঘর-খরচা বলে ধরে দিতে হল কিছু।

অবশ্য ঘর-খরচা এদের জন্যে তেমন কিছুই হল না। বরযাত্রী বলতে বিশেষ কেউ গেলও না। এখানে গণেশের যে সব বন্ধু আগে ছিল—তাদের অনেকের সঙ্গেই এখন আর যোগাযোগ নেই, থাকলেও ভদ্রলোকের বাড়ি বরযাত্রী যাবার নেমন্তন্ন করা যায় না। চিঠি লিখে কিরণকে আনানো হল, কিরণের বাবাও এলেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। তাঁরা অবশ্য তাঁদের বাড়িতেই উঠলেন। কিরণের সঙ্গে দেখা ঐ বিয়ের দু-তিনটে দিন। সুরো আর কিছুতেই যেন তেমন সহজ হতে পারে না আগের মতো। ঠাট্টা-তামাশা করার চেষ্টা করে, আগের মতোই কথা বলতে যায়—ঠিক যেন সে সুর আর বাজে না! কিরণও কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করে, দুটো ছেলেমেয়ে হয়েছে বলতে তার অপরিসীম লজ্জা। বৌয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়—অন্তত সুর-বালার কাছে। নিস্তারিণীকে নাকি বলেছে—বৌ ভাল দেখতে, স্বভাব ভাল।

তবু বিয়েতে ঘটা কিছু হল। সুর-বালা তার পরিচিত অনেক লোককে বলেছিল। শশীবৌদিদেরও বলিয়েছিল মাকে দিয়ে। তাঁরা আসেন নি, ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন যৌতুক দিয়ে। দুর্গামারা এসেছিলেন, ওর বাবার গুরুভাই দু-চারজন—নিস্তারিণী যাদের সন্ধান জানত। ম্যারাপ বেঁধে সানাই বসিয়ে বিয়ের মতোই বিয়ে হল—দুশো আড়াই শো লোকও খেল। এতকাল পরে আমোদের তৃপ্তিতে নিস্তারিণী যেন পূর্ণ হয়ে উঠল। একটা লোক দশটার মতো খাটতে লাগল।

বিয়ের উত্তেজনা কমতে, নিত্যকিছু সেরে বৌ বাপের বাড়ি চলে যেতে গণেশ যেন কেমন মনমরা হয়ে উঠল। সর্বদাই অন্যমনস্ক হয়ে থাকে—কী যেন ভাবে শুধু। এতদিন লোকের ভীড়ে হৈ-চৈ গণ্ডগোলে এক রকম ভাল ছিল, এখন যেন একটা অহেতুক বিষণ্ণতা পেয়ে বসল ওকে। এর একটা সূত্র অবশ্য সহজেই ধরতে পারে সুরো। এর মধ্যে কিরণের বাড়ি ঘুরে দুখানা টেলিগ্রাম এসেছে জাভা থেকে। এসেছে সেই সার্কাসের দল থেকেই নিশ্চয়, সম্ভবত হিমিই করেছে। হয়ত অসুখের ছুতো করে মরণাপন্ন বলে তার পাঠিয়েছে। এর মধ্যে সুরোকে কিছু কিছু বলেছে গণেশ, ইহজীবনে আর হিমির মুখ দেখবে না—একথাও বার বার বলেছে সেই সঙ্গে। তবে সুরো জানে যে ওটা নিতান্তই কথার কথা। আশ্চর্য এক প্রভাব বিস্তার করেছিল হিমি ওর ওপর। তেজস্কর নেশার মতো আচ্ছন্ন করেছিল গণেশকে, যার ফলে আশা-আকাঙ্ক্ষা সব বিসর্জন দিয়ে বুঁদ হয়ে ডুবে ছিল হিমির অপবিত্র প্রভাবের সেই অন্ধকূপে। সে নেশা এত সহজে—এক কথায় কাটা সম্ভব নয়।

সুরো ওর এই মনমরা ভাব দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। বুঝল যে এমন নিষ্কর্মা বসে থাকলে আরও ঐসব কথা ভাববে। হিমির চিন্তা পেয়ে বসবে

আবার। নেশা আবার প্রবল হয়ে উঠতেও দেরি হবে না। সে তাগাদা দিতে লাগল, 'খেলার সে সব সাজ পাট কেনার কী হল? এদিকে তো চুকেবুকে গেল-- এবার কাজ-কর্ম শুরু কর!'

গণেশ প্রকাশ্যেই এদের সামনে বার্ডসাই চুরুট খায়। সে চুরুটটা নিভিয়ে রেখে একটু কেমন যেন সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, 'ভাবছি—আবার অতগুলো টাকা তোর খরচা করাব। বরং ওদেরই লিখে দিই- মালগুলো পার্শেল করে পাঠিয়ে দিক। ওদের আর কীই বা হবে ওসব, আর যে কেউ খেলা দেখাতে যাবে তা তো মনে হয় না। ম্যাজিকের লোক পাওয়া অত সহজ নয়। তাছাড়া—ওসবই আমার নিজস্ব ওদের কোম্পানীর নয়।'

'না-না', প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে সুরো, 'তোমাকে আর অত সুসার দেখাতে হবে না আমার। কিছু লিখতে হবে না ওদের। কোন সম্পর্ক রাখবি না বলেছিলি—ব্যাস চুকে গেছে। আবার কেন। তুই ওসব মতলব ছাড়—কি কি কিনতে হবে কিম্বা তৈরী করাতে হবে ফর্দ কর, কাজ শুরু করে দে। বসে বসে আর মাটি ভাপাতে হবে না।'

সুরোর তাগাদাতেই এক সময় সক্রিয় হয় কিছুটা, কেনা-কাটা শুরু করে। টাকাও নেয় দফায় দফায়। কিন্তু পুরো মনটা যে নেই, সেটা বেশ বুঝতে পারে সুরবালা। নিস্তারিণী অতশত বোঝে না, অনেকদিন পরে তার মনের গাঙে জোয়ার এসেছে-- সে ভবিষ্যৎ নাতি-নাতনির স্বপন দেখছে। সুরোর যে আর ছেলেপুলে হবে তা মনে হয় না, হলেই বা কি—তার 'গুষ্টি' তো সে জল পাবে না। যদি বেটের গণেশের কিছু হয় কানা-কানী—'পূর্ব্বপুরুষের' সেই ভরসা। সে অন্যমনস্ক গণেশের সামনে পা ছড়িয়ে বসে মালা জপতে জপতে সেই ভবিষ্যৎ 'ভরাভরন্ত' সংসারের উজ্জ্বল ছবি এঁকে যায়।

শেষ পর্যন্ত এক সময় সাজপাট সব জোগাড় হয়ে যায়, এবার একটু নাড়াও দিতে হয় নিজেকে। ঘুরে ঘুরে গুটি দুই ছোকরাও সংগ্রহ করে—ওকে সাহায্য করার জন্যে। আর বসে থাকার কোন অজুহাত নেই। কোথাও একটা খেলা দেখিয়ে শুরু করতে হয় নতুন যাত্রা। সকলেই যথেষ্ট উৎসুক এবং উৎসাহিত, কেবল গণেশেরই মনের সেই অনির্বাণ আগুনটা আর যেন দেখা যায় না। সে যেন এই বয়সেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

শেষে বিপন্ন সুরোর মুখ চেয়ে নানুই এগিয়ে এসে হাল ধরে। 'বাবুকে বলে ওদের থিয়েটারেই একদিন 'শো' দেবার ব্যবস্থা করে। প্রায় চল্লিশ টাকা খরচ করে সারা শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে মারা হয়—"জাদুকর গণেশ চক্রবর্তীর অত্যাশ্চর্য খেলা। তালা বন্ধ বাক্সর মধ্য হইতে হস্তপদ বন্ধ অবস্থায় অন্তর্ধান", "বাতাসে টাকার গাছ পোঁতা—টাকার বৃষ্টি" ইত্যাদি।

খুব একটা বিক্রী হল না প্রথম দিন—কিন্তু যারা দেখল তারা সকলেই সুখ্যাতি করল। এর মধ্যে সুরোরই অনুরোধে রাজাবাবু তাঁর বাগানে একদিন 'মাইফেল' দিলেন—গান-বাজনাটা উপলক্ষ, লক্ষ্য গণেশের ম্যাজিক। সুরো অবশ্য যায় নি— ভাইয়ের খাতিরেও ঐ সব উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যেতে রাজী নয় সে—কিন্তু শুনল, রাজাবাবুই বললেন, নিমন্ত্রিত অতিথিরা সকলেই ধন্য ধন্য করেছেন গণেশের ম্যাজিক দেখে, দু-একজন ঠিকানাও লিখে নিয়েছেন।

এরপর দু-একটা ডাক আসতে লাগল মধ্যে মধ্যে। হয়ত আরও আসত, হয়ত কারবার জমিয়েই তুলতে পারত—যদি আর একটু উদ্যম বা আগ্রহ প্রকাশ করত গণেশ। তারই উৎসাহের অভাব সবচেয়ে। নিতান্ত একেবারে বাড়িতে এসে বায়না দিয়ে গেলে তবেই একটু নড়াচড়া করত—খেলার কথা প্রোগ্রামের কথা ভাবত, সাগরেদদের নিয়ে বসত তালিম দিতে--নইলে কোথাও যেত না, একটু ভাবতও না কীভাবে কি করলে কাজ-কর্ম আসবে, দু পয়সা রোজগার হবে।

নিস্তারিণীর চোখে না পড়লেও--সুরো সবই লক্ষ্য করত। বুঝত যে একেবারেই দায়ঠেলা বেগারঠেলা হয়ে উঠেছে এটা। মনে শান্তি নেই স্থিরতা নেই একটুকুও। শেষে সেই অস্থির হয়ে উঠে আবার নানুকে চেপে ধরল, 'তুমি ওর একটা চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা করে দাও নানুদা কিম্বা একটা দলের সঙ্গে লাগিয়ে দাও। এত জায়গায় তো ঘুরে বেড়াও, ঘাঁতঘোঁত সব জানো—যেখানে হোক ভিড়িয়ে দাও ওকে। নইলে মন গুমরে গুমরে পাগল হয়ে যাবে যে! কাজ-কর্ম সব ভুলে যাবে—যা শিখেছে।'

নানু হাসে। বলে, 'ওরে, সে সেখান থেকে মোক্ষম টানে টানছে যে! কিছুতেই কিছু হবে না, ফিরেই যেতে হবে সেখানে! আর কিছুদিন গেলে মাগীই এসে পড়বে। আবার সেই জোড়ে না বাঁধা পড়লে শান্তি নেই। যে পাখীর পায়ে দীর্ঘকাল শেকল বাঁধা থাকে—শেকল কেটে গেলেও সে আর উড়তে পারে না। কাজ-কর্ম করবে কি—ওর যে সেই আপিংখোরের অবস্থা হয়েছে। আপিংটুকু পেটে পড়লে নিয়ম বাঁধা সব কাজ করে যাবে যন্তরের মতো—আপিং না পেলে মড়া। ওর আর নিজে থেকে উৎসাহ করে কিছু করা হয়ে উঠবে না কোনদিনই। সেখানে তার কাছে থাকলে তবু কলের মতো যেটুকু করবার করে যাবে—সেই মাগীর ধাধসে বাইরে থাকলে সেটুকুও পারবে না। ওর জীবনের রসকষ রক্ত পর্যন্ত নিংড়ে নিয়েছে তারা।...আচ্ছা, বলছিস—দেখি একটু খোঁজ-খবর নিয়ে।'

দেখা নয়—করে দিলও একটা ব্যবস্থা। প্রোফেসর কৃষ্ণমূর্তি দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, রাজপুতানা ঘুরতে যাবেন—তাঁর গায়ের জোর আর তাঁর দলের ছেলেদের জিমন্যাস্টিকের খেলা দেখাতে—তিনি গণেশের সঙ্গে জুড়ি বাঁধতে রাজী হলেন। খরচ সব তাঁর—থাকা-খাওয়া গাড়ি ভাড়া—মায় ওর সাগরেদ দুজনের সুদ্ধ, লাভের বখরা টাকায় চার আনা। আধা-আধি করতেও রাজী আছেন তিনি—যদি খরচের অর্ধেক গণেশ দেয়।

বন্দোবস্ত সকলেরই ভাল লাগল। এমন কি গণেশও যেন এতদিন পরে উৎসাহিত বোধ করল কিছুটা। বলল, 'না বাবা, সিকিই সই, লাভ না হলে না হয় পেলুম না কিছু। তেমনি ঘর থেকেও তো দিতে হচ্ছে না! যা দিচ্ছে তাই ভাল। ওসব দেশগুলো তো ঘোরা হবে।'

নানুও তাই বলল, 'না না, খরচের ঝুঁকি নিয়ে দরকার নেই। এলাহি খরচ ওর, ওর দলেই লোক বেশী, লাভের অর্দ্ধেক নিতে গেলে খরচেরও অর্ধেক দিতে হয়। কী দরকার!'

অনেক দিন ধরে ঘুরল ওরা। প্রায় ছ-সাত মাস। পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লী হয়ে লাহোর। সেখান থেকে পেশোয়ারও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল গণেশের, ডাকও এসেছিল—কৃষ্ণমূর্তি রাজী হলেন না। তিনি বেঁকে রাজপুতানা হয়ে বরোদা চলে গেলেন, সেখান থেকে গেলেন হায়দ্রাবাদ; সেইটেই দেশ তাঁর সেখানেই কিছুদিন তিনি বিশ্রাম করবেন।

গণেশ নিজের দল নিয়ে কলকাতায় ফিরে এল। লাভের ভাগ যা ওর প্রাপ্য—সবটা দিতে পারেন নি কৃষ্ণমূর্তি, ছশো টাকার মতো বাকী আছে—তা সত্ত্বেও ফেরার খরচ বাদ দিয়ে হাজার টাকার কিছু বেশিই—এনে বোনের সামনে নামিয়ে দিল, 'এই নে, গুণে-গেঁথে তোল! যা দিয়েছিস তার কিছুই ওঠেনি অবশ্য, তবু কিছু তো উশুল হল!'

সুরো সে টাকা নিল না, ওকেই রাখতে বলে দিল। বলল, 'তোর এখন কত দরকার হবে, ফী হাত আমার কাছে চাইতে লজ্জা করবে, তুই-ই রেখে দে। এরপর আবার যখন থোক কিছু পাবি—দিস।'

নিস্তারিণী গণেশের আসার দিন গুণে ছিল, এবার সে বৌকে বাড়ি আনার তোড়-জোড় শুরু করে দিল। বৌ নাকি এরই মধ্যে 'সেয়ানা' হয়ে গেছে—আর ওখানে ফেলে রাখার কোন কারণ নেই। ভটচাযিকে ডেকে পাঁজি দেখিয়ে দ্বিরাগমনের সব ব্যবস্থা করে ফেলল সে।

হয়ত এত তাড়া না করলেই ভাল হ'ত। অন্তত সুরোর তাই মনে হয় আজও। হয়ত আর কিছু খ্যাতি, আর কিছু টাকার মুখ দেখা উচিত ছিল। সাফল্যের নেশাটা সবে মনে রঙ ধরাতে শুরু করেছে তখন—সে নেশা একেবারে পেয়ে বসে নি। বৌ আসার খবরে গণেশ কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল আবার, শুকনো মুখে সুরোকে এসে ধরল, 'তুই একটু বারণ কর না দিদি। এখনই তাকে এনে লাভ কি? হয়ত তাকে নিয়ে শুতে বলবে, রোজ রোজ ঘরে পাঠাবে—সে এক মহা অস্বস্তি। আমি ওকে বৌ বলে এখনও ভাবতেই পারছি না যে!'

সুরোও বোঝে কথাটা কিন্তু মাকে বোঝাতে পারে না।

নিস্তারিণীর বিশ্বাস তার আর বেশী দিন আয়ু নেই।—তাড়াতাড়ি নাতির মুখ না দেখলে আর দেখাই হবে না। তার আরও ধারণা—নতুন কাঁচা-মেয়ের 'সোয়াদ' পেলেই সেই 'রায়বাঘিনী ডাইনীকে' ভুলে যাবে। যত শিগগির সম্ভব দুটি কচি হাতের বাঁধনে তাই ছেলেকে বেঁধে ফেলতে চায় নিস্তারিণী।

'সে তো শুনেছি ওর চেয়ে বয়সে বড় আধদামড়া মাগী। দেখিস কাঁচা বৌকে পাশে পেলেই তাকে ভুলে যাবে। আর কীই বা এমন খুকী তাই শুনি—পুনর্বিয়ে হয়ে গেছে—ওরই তো কোলে খোকাখুকী আসার সময় হ'ল।' নিস্তারিণী বলে।

সুরবালা দুজনের মধ্যে পড়ে বিপন্ন হয়ে ওঠে। মার দিকটা বোঝাবার চেষ্টা করে গণেশকে, শেষে বলে, 'আচ্ছা আমি কথা দিচ্ছি। এখন কিছু দিন মার ঘরেই যাতে থাকে সেই ব্যবস্থা করে দোব, তোকে অত ভাবতে হবে না। আর একটু সোমখ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তোর কাছে পাঠাব না। নিয়েই আসুক, বুঝলি—আর না আনা ভাল দেখায় না। তাছাড়া তারা বড় গরীব, দুবেলা পেটভরে ভাত দেবারও ক্ষমতা নেই, সে পাড়া, সে সঙ্গটাও ভাল নয়। এখানে এলে তবু আমাদের হালচাল সহবৎ শিখতে পাবে। পেটপুরে খেতেও পাবে। তাড়াতাড়ি ডাগরও হয়ে উঠবে এখানে এলে।'

অগত্যা গণেশ চুপ ক'রে যায়। বাধ্য বাধ্য হয়ে নিয়ম কর্মেও যোগ দিতে হয়। কিন্তু সে যে খুশী নয় এ ব্যবস্থায়—সেটা আর কারুর কাছেই বোধহয় ঢাকা থাকে না।

বৌ আসতে মাকে বলে-কয়ে দিনকয়েক মার ঘরেই রাখার ব্যবস্থা করে সুরো। বলে, 'পান-জল দিতে যাবে—কি এটা ওটা জলখাবারটা আসটা—এই পর্যন্ত। পারে খোকার কাপড়-জামাগুলো গুছিয়ে রাখবে, বিছানা-টিছানাগুলো দেখবে। যখন তখন কাছে পাঠাবার দরকার নেই। রাত্তিরে তো নয়ই। তুমি অমন জোর জোরাবতি ক'রো না, দু দিন দেখুক, চোখের সামনে ঘুরুক, আপনিই টান হবে। মিছিমিছি জোর করে কোন লাভ নেই, বেশী টানাটানি করতে গেলে দড়ি ছিঁড়ে যাবে হয়ত।

নিস্তারিণীও কতকটা বোঝে বোধহয়; আর বেশী জোর করে না। বৌ রজনী তার কাছেই শোয়। যেদিন রাজাবাবু আসতে পারেন না কোন কারণে, সেদিন সুরোও কাছে শোওয়ায়। এটা ওটা গল্প করে, কী ভাবে চলতে হবে, কার সঙ্গে কী ব্যবহার করতে হবে—মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে শেখাবার চেষ্টা করে।

রজনী দেখতেই শুধু সুশ্রী নয়—বেশ চালাকচতুর চটপটে। জানেও অনেক, বয়সের তুলনায় হয়ত একটু বেশীই জানে। চালাক মেয়ে বলে চেপে রাখে—আবার ছেলেমানুষ বলে কথার ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়েও যায় এক আধটা কথা। সুরো বোঝে আরও আগে এখানে আনানো উচিত ছিল ওকে।

একদিন হঠাৎ হয়ত বলে বসে রজনী, 'তুমি তো খুব ভাল গান গাও শুনেছি, একদিন শোনাও না!'

'কী করে জানলে আমি গান গাই!' সুরো প্রশ্ন করে।

'ওমা, সে কথা আবার কে না জানে! কলকেতার ডাকসাইটে কেত্তনউলী ছিলে তুমি। ঐ মুখপোড়ারা—মানে জামাইবাবু তোমাকে ধরতেই নাকি সব বন্ধ হয়ে গেল। এখেনে টাকার মুখ দেখলে বলেই আর রোজগারে মন রইল না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে! চুপ করো।' মৃদু ধমক দিয়ে ওঠে সুরো, 'ছোট মুখে ওসব বড় কথা বলতে নেই।'

'আচ্ছা, আর বলব না।' রজনী বেশ সপ্রতিভ ভাবেই মেনে নেয় তিরস্কারটা, 'তা হ্যাঁ গা ঠাকুরঝি, আমাকে শেখাবে—কেত্তন? আমি তোমার মতো মোট মোট পয়সা রোজগার করব—?'

'না। ভদ্দরলোকদের বৌরা বাইরে গান গাইতে যায় না। তোমার অভাব কি, কোন জিনিসটা পাচ্ছ না?'

'না, তা নয়।' একটু যেন ক্ষুণ্ণই হয় রজনী, 'তোমাদের সব বড় উলটো চাপ দেওয়া অব্যেস বাপু! ......তা চুপচুপু আমাকে একদিন একখানা কেত্তন শোনাও না, শোনাবে?......এমনি, দুজনে যখন একলাটি থাকব?'

'না। গান আমি বাঁধা দিয়েছি ঠাকুরের কাছে। এখন আর গাইতে নেই আমাকে।'

'গান বাঁধা দিয়েছ? ...য্যাঃ? এ কি সোনাদানা যে বন্দক দে টাকা নেবে!...তবে হ্যাঁ, অবিশ্যি মার মুখে শুনেছি, ঠাকুরদের কাছে সব বেয়াড়া-বেয়াড়া জিনিস বাঁধা দেয়। সধবা মেয়েরা নাকি মা কালীর কাছে নোয়া-সিঁদুর সুদ্ধ বাঁধা দিয়ে বসে।...আবার, হি, হি, শুনেছি বেশ্যে মাগীরা অনেকে বাবুদের সঙ্গে পরিবার সেজে যায়, কেউ যদি বলে, তা হ্যাঁ গা বাছা, এদিকে তো পাড়ওলা কাপড় পরেছ, গয়নারও তো খুব বাহার দেখতে পাই—তা হাতে নোয়া নেই কেন, কৈ, সিঁথেয়ও তো সিঁদুর দেখছি না—তা তারা নাকি বলে, আমরা কালীঘাটে নোয়া-সিঁদুর বাঁধা দিয়েছি। ওনার ভারী অসুখ হয়েছিল কিনা—তাই। হি-হি!'

সুরো হতাশ হয়ে পড়ে। বড় বেশী পেকে গেছে এ মেয়ে। মা-ই ঠিক বলেছে। বয়সটাই কম আর কোনদিকেই কচি নেই এ মেয়ে।

(ক্রমশ)

দিগন্তময় ॥ আলোক সরকার

দিগন্তময় তোমার ইচ্ছা। আজ আমার
প্রথম পরাজয়, প্রথম মৃত্যু। অন্ধকার অশ্বত্থবনের
প্রতিটি ধ্বনি স্বাধীন জাগরণ, প্রতিটি ব্যবহার
স্বনির্ভরতা। অবিস্মরণীয় প্রিয়
সর্বত্র সমাচার সর্বত্র অভিজ্ঞান, ক্রমঅপস্রিয়
অন্তর্লীন রক্তিমতা স্বপ্রতিষ্ঠ দ্যুতিময়তা জাগ্রত নির্মাণ।
উপস্থাপিত প্রকৃতি
সকল চিত্র একটি কৌশল সকল ধ্বনি আরোপিত রীতি।
বিলীয়মান জাগ্রত রচনা ছায়ানিলীন অকম্প সম্ভাবনা—
এখন সমর্পণ সর্বস্ব উৎসর্জন, এখন পরাজয়
দিনান্তবেলার অকম্প নিশ্বাস—প্রথম মৃত্যু, প্রথম বিস্ময়।

এখন সশব্দে ॥ বিশ্বেশ্বর সামন্ত

বর্ষার সংবাদ জানা আছে তোমার, মেঘ ও বিদ্যুতের খবর
কেননা আমি বিচূর্ণ মাঠে বর্ষায় ভিজবো।
সারা শরীর ও মন আর্দ্রতায় ডুবিয়ে খরা ও শুষ্কতার মধ্য থেকে
অসহায় মুখগুলি তুলে নেবো। শব্দহীন দুপুরে বেজে উঠছে,
অত্যধিক উষ্ণতার মধ্য থেকে অন্ধকারে লাফিয়ে পড়ি।
দিকবিদিক বিভ্রান্ত রাস্তায় কে এবং কারা
ছুটে পালাচ্ছে অনিয়মিত,
নিজেকে দেখতে পাচ্ছিনা, প্রতিফলিত আয়নায়
কিংবা মসৃণ কররেখায় ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তোমরা
কে কোন্ দিকে গেলে কিছুই দেখা যাচ্ছেনা, ধরা যাচ্ছেনা
তোমরা গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়ছো অন্ধকারে।

চোখের আলো তুলে নিয়ে
মাথা নীচু করে ছুটে পালাচ্ছো ঘরের কাছে, রক্তের দিকে।
বর্ষার সংবাদ জানা আছে তোমার, মেঘ ও বিদ্যুতের খবর
কেননা আমি বিচূর্ণ মাঠে বর্ষায় ভিজবো। নিজস্ব ও
স্বাধীন ভঙ্গীতে
দেখে নেবো তোমাদের চেহারা, প্রেম ও ভালবাসায়
এখনো কতটা বেঁচে আছো।

আমাদের ওপর দিয়ে প্রচণ্ডবেগে অন্ধকার বয়ে যাচ্ছে,
আমি আর হত্যাকাণ্ডের মধ্যে বসে থাকতে পারছি না—
তুমি অনুগ্রহ করে বর্ষার সংবাদটা দিও, মেঘ ও বিদ্যুতের খবর।

সঞ্জীবকুমার ঘোষ

চাঁদের দেশে বসতি
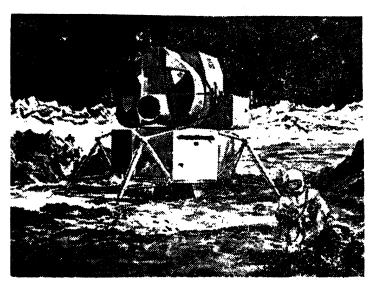
মহাকাশ অভিযান যেরকম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, তাতে মনে হয় চাঁদে পৌঁছতে আর বেশী দেরী নেই। আমরা শুনেছি, আর মাত্র বছর-তিনেকের মধ্যে মানুষ চাঁদের বুকে তার পদচিহ্ন আঁকবে আর তারপরই অজানার শত সিংহদ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত হবে। যে-চাঁদের দেশে এতকাল মানুষ কল্পনার পাখায় ভর করে হাজির হয়েছে, এবার সেখানে হাজির হবে সশরীরে। মানুষের সশরীর উপস্থিতির সেই দিনটির জন্যে নিশ্চয়ই সারা পৃথিবীর মানুষ রোমাঞ্চিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করছে।

পৃথিবী থেকে চাঁদকে কতো-না সুন্দর দেখায়। পূর্ণিমা রাতে অযুত তারায় ভরা আকাশের কোলে রূপোলী চাঁদ যখন আলো ছড়ায়, তখন মন এক স্নিগ্ধ আমেজে ভরে যায়। পূর্ণ চাঁদের সে-আলোয় বুঝিবা কবিতা রচনা করার ইচ্ছে হয় অনেকের। কিন্তু এখান থেকে চাঁদকে যতো সুন্দরই দেখাক না কেন চাঁদ আসলে মোটেই সুশ্রী নয়। বরং আপনি-আমি যদি হঠাৎ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই, তাহলে সেখানকার নিবাত নিথর পরিবেশ আর অদ্ভুত জমি-সংস্থান আমাদের কাছে ভয়াবহ লাগতে পারে। পৃথিবীর মতো বাতাস সেখানে নেই, ফলে অন্তহীন গভীর নৈঃশব্দের পারাবার সেখানে বিরাজ করছে। চাঁদের দেশে জল দৃশ্য নয়। তবে দৃশ্য না হলেও জল সেখানে নেই এমন কথা বলা সংগত হবে, না। একালের বিজ্ঞানীদের ধারণা, সেখানে জমির নীচে অন্যান্য অনেক বস্তুর অংগীভূত হয়ে সংগুপ্ত অবস্থায় জল থাকতে পারে। সেখানকার কালো আকাশ সদা নির্মেঘ, ফলে বৃষ্টিও হয় না সেখানে। বায়ু-বৃষ্টিবিহীন হওয়ায় সেখানকার জমি এবং উঁচু উঁচু পাহাড় অবক্ষয়ের কবল থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। পৃথিবী থেকে চাঁদের গায়ে কালো কালো যে-দাগগুলো আমরা দেখি আগে সেগুলোকে সাগর মনে করা হত। সেই ধারণা অনুসারে তাদের বিভিন্ন নামকরণও করা হয়েছে। যেমন: বর্ষণসাগর, ঝটিকাসাগর ইত্যাদি। পরে জানা যায়, সাগর নয়, সেগুলো আসলে পাহাড়-প্রাচীরে ঘেরা সমতল বা প্রায়-সমতল নীচু, বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সাগরসমূহ কালো দেখাবার কারন হল সূর্যালোকের স্বল্প প্রতিফলন। চাঁদের উজ্জ্বল অংশের তুলনায় সাগরতল অনেক কম আলো প্রতিফলিত করে।

যাই হোক, চাঁদের নৈসর্গিক পরিবেশ যে পৃথিবীর মানুষের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয় এটা বেশ বোঝা যায়। অথচ এই চাঁদে যাওয়ার জন্যই আজকের মানুষের উদগ্র প্রচেষ্টা। কিন্তু কেন? অবশ্যই এর মূলে রয়েছে অজানাকে জানবার, অদেখাকে দেখবার তাগিদ, মহাকাশে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীটির পূর্ণ পরিচয় লাভের আকাংখা। তাছাড়া, আজকের দিনের বিজ্ঞানীদের গ্রহবিজয়ের পরিকল্পনা রয়েছে; গ্রহ ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তের নক্ষত্রলোকেও বিজয়-বৈজয়ন্তী ওড়াবার বাসনা তাঁদের আছে। আর সে-কাজে আগামী দিনে চাঁদকেই দরকার হবে বেশী করে। সুবিধের জন্যে চাঁদকেই ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। তাই চাঁদে শুধু যাওয়া নয়, আগামী দিনে সেখানে আবাসগৃহ, গবেষণাগার, শস্যক্ষেত্র—এক কথায় সাজানো-গোছানো এক বসতি গড়ে তোলা হবে। বলা বাহুল্য, সে-কাজ নির্বাধ নয়।

চাঁদে বসতি গড়ার সময় অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে চন্দ্রগোলককে ঘিরে বাতাসের কোনো পরিমন্ডল নেই, ফলে, দিনের বেলায় সেখানে সূর্যকিরণ অবাধে পড়ে। অবিশ্যি বাতাস না থাকলেও,

কয়েকটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অস্তিত্ব সেখানে থাকতে পারে। যাই হোক, বাতাসের অবগুণ্ঠন না থাকায় চাঁদ সূর্যের আরো ঘনিষ্ঠ স্পর্শ পায়। পৃথিবীতে আমরা যতোখানি সূর্যালোক পাই, চাঁদে তার চাইতে আরো ত্রিশ শতাংশ বেশী পাওয়া যাবে। বায়ুমণ্ডল না থাকায় অতিবেগনি, এক্স-রশ্মির অবাধ রাজত্ব সেখানে। এসব রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্যে হয়ত সেখানে আবাসগৃহ বিশেষ ধরনের প্ল্যাস্টিকে তৈরী হবে। তারপর রয়েছে চাপের ব্যাপার। বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান না করেও যাতে থাকা যায়, তার জন্যে গৃহের ভেতর উপযুক্ত বায়ুচাপ সৃষ্টি করতে হবে, কেননা, শরীরের আভ্যন্তর চাপ প্রতিরোধকারী বহিঃচাপের অনুপস্থিতিতে টিকে থাকা সম্ভব নয়। চান্দ্র গৃহে এই চাপ বজায় রাখার ব্যাপারে খুব সতর্ক হতে হবে। গৃহের কোথাও সূক্ষ্মতম ছিদ্র হলে ভেতরের বাতাস বেরিয়ে যেতে পারে এবং তা গেলে মারাত্মক বিপদ ঘটবে। ছিদ্র সৃষ্টির জন্যে উল্কাপিণ্ডকেই ভয় বেশী। চান্দ্রগাত্র নিরন্তর উল্কাহত হচ্ছে। পৃথিবীও হতো যদি বায়ুমণ্ডল না থাকত। ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছবার আগেই বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে উল্কাপিণ্ড জ্বলে ওঠে, চলতি কথায় যে-ঘটনাকে আমরা 'তারা খসা' বলি। উল্কাপিণ্ড অতিকায় হলে অবশিষ্টাংশ অনেক সময় ভূ-পৃষ্ঠে এসে পড়ে। চান্দ্রগৃহ উল্কাহত হয়ে ছিদ্রযুক্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে যাতে তা' বন্ধ করা যায়, তার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। উল্কা-সমস্যা এড়ানো যায় যদি মাটির নীচে ঘর তৈরী করা হয়।

আবাসগৃহে চাপ বজায় রাখার জন্যে বাতাসের যে বেষ্টনী তৈরী করতে হবে, তা পৃথিবীতে আমরা যে-বাতাসে শ্বাসক্রিয়া চালাই ঠিক যে তারই অবিকল হবে এমন কোনো কথা নেই। বাতাসে মোটামুটিভাবে চার-পঞ্চমাংশ নাইট্রোজেন রয়েছে। চাঁদে যে কৃত্রিম আবহাওয়া তৈরী হবে, তাতে নাইট্রোজেনের পরিবর্তে হিলিয়াম গ্যাসও থাকতে পারে আর নানাদিক বিবেচনা করে সেখানে হিলিয়াম ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত হবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

শ্বাসক্রিয়ার জন্যে বাতাস থেকে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করি। তাছাড়া, আমাদের দেহ থেকে জলীয় বাষ্প, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বন-মনোঅক্সাইড ইত্যাদি নির্গত হয়। চাঁদে নির্মিত আবদ্ধ বাসগৃহের ভেতর দেহবিমুক্ত এসব পদার্থের দূরীকরণ, আর তার সঙ্গে নতুন অক্সিজেন উৎপাদনের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। কারণ, অন্যথায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আবাসগৃহের ভেতরকার বায়ু দূষিত হয়ে শ্বাসক্রিয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। জলীয় বাষ্পকে অবিশ্যি তাপাঙ্ক কমিয়ে জলে পরিণত করা যায়। সেই জলকে আবার অন্যান্য কাজেও লাগানো যেতে পারে।

ঘর-বাড়ি ত হল। কিন্তু গোটা বসতিকে ঠিকমতো চালু রাখতে হলে যে-পরিমাণ শক্তি বা এনার্জির দরকার হবে, তা পাওয়া যাবে কোথা থেকে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে ঃ সূর্য থেকে। সূর্য প্রচণ্ড শক্তির আধার এ আমরা জানি। দিনের বেলায় প্রচণ্ড সৌরতাপকে সংহত করে প্রয়োজনীয় তাপ এবং তাপ-বিদ্যুৎ দুই-ই সংগ্রহ করা যাবে। এপ্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, চাঁদের দেশে দিন এবং রাত্রি দুয়েরই স্থায়িত্ব পৃথিবীর হিসেবে প্রায় দু' সপ্তাহ করে। এই সময় তাপাঙ্ক চরমে ওঠে ফুটন্ত জলের তাপাঙ্কেরও ওপরে আর অবমে নামে বরফ-শীতেরও একশো তিপ্পান্ন ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড) নীচে। সূর্যবিহীন শীতের দীর্ঘ রাত্রির জন্যে কিছু শক্তি দিনের বেলায় সঞ্চয় করে রাখতে হবে। তাছাড়া প্রচণ্ড গরম এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে যাতে নিস্তার পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থাও করতে হবে। চান্দ্র বসতিকে চালু রাখতে পরমাণু শক্তিও ব্যবহৃত হতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, চাঁদে জল থাকা বিচিত্র নয়। আধুনিককালের বিজ্ঞানীরা অন্ততঃ তা-ই মনে করেন। তবে সে-জল খুব সহজলভ্য নয়। এমনও হতে পারে, কোনো কোনো ফাটলের মধ্যে, যেখানে সূর্যকিরণ পৌঁছায় না, জমাট-বাঁধা শক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে মেশানো অবস্থায় বরফ রয়েছে। সে-বরফকে উদ্ধার করে তা থেকে জল আহরণ করা যেতে পারে। চন্দ্রপৃষ্ঠের যেসব ছবি আজকাল আমরা দেখতে পাই, তাতে অনেক সময় চোখে পড়ে, দড়ির মতো পাকানো লম্বা, উঁচু রেখা এদিক-ওদিক ছড়ানো রয়েছে। অনেকটা আমাদের দেহের শিরার মতো দেখতে। ঐ রেখাগুলো জলের অন্যতম উৎস হতে পারে। হয়তো নীচ থেকে জলীয় বাষ্প বাইরে আসার সময় পৃষ্ঠদেশে আটকে যায় আর সেই বাষ্পের চাপে পৃষ্ঠদেশের কোনো কোনো জায়গা ফুলে ওঠার ফলে ঐ রেখাগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া, চাঁদ থেকে হয়তো মূল্যবান অনেক খনিজ পদার্থ পাওয়া যাবে। সেসব খনিজ পদার্থে এক থেকে দশ শতাংশ পর্যন্ত কেলাস-জল সংগুপ্ত আছে বলে মনে করা হয়। সৌর চুল্লীতে তপ্ত করে তা থেকে প্রথমে জলীয় বাষ্প এবং সেই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে জল সংগৃহীত হতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঠাণ্ডা করার ব্যাপারটা চাঁদের দেশে অপেক্ষাকৃত সহজ। সৌরকিরণ থেকে কোনো বস্তুকে আড়াল করলেই তা তাড়াতাড়ি অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী, এক বর্গগজ পরিমিত সৌর প্রতিফলকের সাহায্যে সত্তর গ্যালনের মতো জল পাওয়া যাবে। জল প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে, মানবদেহ স্বয়ং জলের একটি আধার। দেহনিসৃত মল-মূত্র অবাঞ্ছিত হলেও, চাঁদে তা থেকেই ব্যবহারযোগ্য জল আহরণ করতে হতে পারে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, চাঁদে বসতি গড়ার ব্যাপারে জল নিয়ে তেমন ভাবনায় পড়তে হবে না।

জল-হাওয়ার পর স্বভাবতঃই খাদ্যের

কথা আসে। প্রথম দিকে পৃথিবী থেকেই সেখানে খাদ্যের জোগান দিতে হবে। কিন্তু দিনের পর দিন থাকতে গেলে সেখানেই যাতে খাদ্য উৎপাদন করা যায়, তার বন্দোবস্ত অবশ্যই করতে হবে। কেননা, পৃথিবী থেকেই বরাবর খাদ্য পাঠাতে গেলে তাতে খরচ পড়বে অনেক। কিন্তু চাঁদের যে-পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাতে সেখানেই বা খাদ্য কিভাবে উৎপন্ন করা যাবে? সেখানে উন্মুক্ত পরিবেশে কোনো গাছ-গাছালির জন্ম একেবারেই অসম্ভব। তার ওপর পৃথিবীর মতো মাটিও সেখানে নেই। যে-ধরনের নৈসর্গিক বিবর্তনের পথ ধরে আমাদের ভূ-ত্বক আজকের অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, চাঁদ সে-ধরনের বিবর্তনের স্পর্শ পায়নি। তাই চাঁদের জমি পার্থিব জমির অনুরূপ নয়। কিন্তু তাতে চিন্তার কারণ নেই। প্রথমটায় অবিশ্বাস্য শোনালেও এ-কথা ঠিক, মাটি ছাড়াই চাঁদে ফসল ফলানো হবে। মাটি ছাড়া ফসল ফলানো এখন আর নতুন কিছু নয়। পৃথিবীতেই এর সফল পরীক্ষা করা হয়েছে। যে-ব্যবস্থায় এটা করা হয়, তার নাম হাইড্রোপনিকস্। এই ব্যবস্থায় গাছের দরকারী নানা রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণে ভেজানো পাথরের ছোটো ছোটো টুকরোর ওপর শস্যাদি উৎপন্ন করা হয়। পাথরের টুকরোর দরকার গাছকে ঠিকভাবে দাঁড়াতে সাহায্য করা। মাটি না পাওয়া গেলেও চাঁদে পাথরের নিশ্চয়ই অভাব হবে না। আর দরকারী রাসায়নিক জিনিস গোড়ার দিকে পৃথিবী থেকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে, পরে অবিশ্যি সেখানেই সেসব তৈরী করা যাবে।

তুলনামূলক বিচারে হাইড্রোপনিকস্ পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন ভালো হয়, কেননা, এতে গাছকে সর্বাধিক পুষ্টি জোগানো সম্ভব। কিন্তু চাঁদে এ-ব্যাপারে কয়েকটি অসুবিধের সম্মুখীন হতে হবে, যার কিছু ইঙ্গিত আগেই দেওয়া হয়েছে। অবিশ্যি এসব অসুবিধে যে অনপনেয় তা নয়। যেমন সূর্যালোক গাছের দরকার ঠিকই কিন্তু পক্ষকালব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সূর্যালোক গাছ-পালার ক্ষতি করবে। এজন্যে দিনের বেলায় কিছু সময় অন্তর গাছপালাকে সূর্যালোক থেকে আড়াল করতে হবে। সূর্যালোকবিহীন দীর্ঘ রাত্রে আবার কৃত্রিম উপায়ে আলোর জোগান দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, রাত্রে পৃথিবীর আলো উপকারে আসবে। হ্যাঁ, পৃথিবীর আলো। পৃথিবীতে যেমন আমরা চাঁদের জ্যোৎস্নার আলো পাই, তেমনি চাঁদে বসে পৃথিবীর জ্যোৎস্নার আলো পাওয়া যাবে। পৃথিবীপ্রদত্ত জ্যোৎস্না চন্দ্রপ্রদত্ত জ্যোৎস্নার চেয়ে অনেক জোরালো। এ-কথা অবিশ্যি চাঁদের পৃথিবীমুখী অংশ সম্পর্কেই খাটে। আমাদের প্রস্তাবিত চান্দ্র বসতি যদি মধ্যরেখায় অবস্থিত হয়, তাহলে সেখান থেকে কখনোই পৃথিবীকে অর্ধেকের চেয়ে ছোটো দেখাবে না।

গাছপালা প্রসঙ্গে বলা দরকার, চাঁদে গাছপালার দরকার শুধু খাদ্যেরই জন্যে নয়। এটা আমাদের জানা, গাছের সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া আমাদের শ্বাসক্রিয়ার বিপরীত। শ্বাসক্রিয়ার জন্যে আমরা অক্সি-জেন গ্রহণ করি আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করি। গাছ অক্সিজেন ত্যাগ করে আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড নেয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে গাছপালা চান্দ্র বসতির বাসিন্দাদের শ্বাসক্রিয়ারও সহায়ক হবে। বিশেষজ্ঞরা ভেবে দেখছেন, ঠিক কোন কোন গাছ একই সঙ্গে খাদ্যদায়ী এবং শ্বাসক্রিয়ার সহায়ক হিসেবে বেশী কাজ দেবে।

শ্বাসক্রিয়ায় আর একটি বস্তুও সহায়ক হতে পারবে। তা হল : শেওলা বা অ্যালজি। এর মধ্যে আবার ক্লোরেলা জাতীয় শেওলাই বেশী কার্যকর। এই-শেওলা যে শুধু শ্বাসক্রিয়ারই সহায়ক হবে তা নয়, উপরন্তু আমাদের দেহবিমুক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথেন প্রভৃতি কয়েকটি দূষিত পদার্থ আত্মসাৎ করে আবহাওয়ার বিশুদ্ধি রক্ষা করবে।

ওপরে আমরা খাদ্যের প্রয়োজনে হাইড্রোপনিকস্ পদ্ধতিতে কিভাবে ফসল ফলানো যায় তার কথা বলেছি। খাদ্য প্রসঙ্গে শেওলার কথাও উল্লেখ করতে হয়। শেওলা থেকে যেমন অক্সিজেন পাওয়া যাবে, তেমনি এটি খাদ্যেরও একটি উৎস হতে পারে। কারণ, এটি প্রোটিন, শ্বেতসার, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন-বি ইত্যাদি জোগাতে সমর্থ। শেওলাকে ঠিক সুস্বাদু আহার্যরূপে দেওয়ার অনেক পদ্ধতি আছে। উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করলে এ-জিনিসটিকে মাছ বা মাংসের মতো খেতে লাগতে পারে।

খাদ্য প্রসঙ্গে আরো একটি বস্তুর উল্লেখ করতে হয়। সেটি হল ব্যাঙের ছাতা। চাঁদে এর উৎপাদন অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। ব্যাঙের ছাতার কোনো ক্লোরোফিল বা সবুজকণিকা নেই। কাজেই এর বৃদ্ধির জন্যে আলোরও দরকার নেই। এজন্যে চাঁদে জমির নীচে অল্প খরচে এর চাষ করা সম্ভব হবে। ব্যাঙের ছাতা মৃত জৈব পদার্থ থেকেই তার পুষ্টি পেয়ে থাকে। বিজ্ঞানী-দের মতে ভক্ষণীয় ছত্রাকের খাদ্যমূল্য অসাধারণ। কাজেই আগামী দিনে চাঁদের দেশে ব্যাঙের ছাতা যে এক উল্লেখযোগ্য খাদ্যবস্তুরূপে পরিগণিত হবে এমন কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

চান্দ্র বসতির বাসিন্দা যতোক্ষণ ঘরের ভেতর থাকবে, ততক্ষণ তাঁর বিশেষ পোশাক পরবার দরকার নেই। কিন্তু ঘরের বাইরে বায়ুহীন প্রতিকূল উন্মুক্ততায় এলেই সেই পোশাকের দরকার হবে। ঠিক কী ধরনের পোশাক ব্যবহার করলে সুবিধে হবে তার আকৃতি এবং নক্সা নিয়ে নানা পরিকল্পনা রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে পোশাক যে-ধরনেরই হোক না, বাসগৃহের ভেতরে যেমন তার ভেতরও শ্বাসক্রিয়ার সহায়ক এবং চাপসৃষ্টিকারী আবহাওয়া রাখতে হবে। পোশাকটি অবশ্যই পুরোপুরি নিশ্ছিদ্র হবে। শ্বাসক্রিয়ার ফলে গৃহের আভ্যন্তর আবহাওয়ার চেয়েও পোশাকের ভেতরকার আবহাওয়া আরো তাড়াতাড়ি কলুষিত হয়ে পড়বে। কাজেই কলুষিত বায়ু দূরীকরণের এবং নতুন করে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা পোশাকের সঙ্গেও রাখতে হবে। এতসব ব্যবস্থাসমন্বিত পোশাক যে বেশ জবরজং ধরনের হবে, সেটা না বললেও বুঝতে অসুবিধে হয় না। তা সত্ত্বেও কিন্তু অমন পোশাক পরিধানকারীর কাছে দুর্বহ মনে হবে না। পৃথিবীর তুলনায় সেখানে সে-পোশাক অনেক হাল্কা লাগবে। কেননা, চান্দ্র অভিকর্ষ পার্থিব অভিকর্ষের তুলনায় অনেক কম—প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র।

তবে পোশাক দুর্বহ না লাগলেও চান্দ্র অভিকর্ষ দুর্বল হওয়ার জন্যে সেখানে হাঁটা-চলা, বিশেষতঃ ধীর পদচারণ খুব কষ্টকর হবে। দৌড়ে বা লাফিয়ে চলা বরং সহজসাধ্য হবে। স্বল্প অভিকর্ষ দৌড়ানো বা লাফানোর সহায়ক হয়।

কিন্তু চাঁদের বন্ধুর জমিতে যত্রতত্র দৌড়ানো বা লাফানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাতে পোশাকের ক্ষতি হতে পারে। এসব বিবেচনা করে সেখানে চলাচলের উপযোগী ট্যাংকসদৃশ বিশেষ এক ধরনের যানের কথা ভাবা হচ্ছে। সেই যানের সঙ্গে হয়তো যান্ত্রিক হাত লাগানো থাকবে, যার সাহায্যে আশপাশ থেকে নমুনা-শিলা সংগৃহীত হবে। গাড়ী চালাবার সময় লক্ষ্য স্থির করার ব্যাপারে অসুবিধে দেখা দেবে। চাঁদের আকৃতি ছোটো হওয়ার জন্যে সেখানে দিগন্ত পৃথিবীর দিগবলয়ের মতো দূর-প্রসারিত নয়। এজন্যেই দূরোবস্থিত কোনো কিছুকে নিশানা করে সেখানে চলা যাবে না। তাছাড়া এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা গহ্বর থেকে রক্ষা পাবার জন্যে চলাচলের সময় খুব সতর্ক হতে হবে। চাঁদের অভিকর্ষ কম হওয়ার জন্যে গাড়ী বাঁক নেবার সময় কেন্দ্রাতিগ বল জোরদার হবে, আর তার ফলে অল্পেই গাড়ীর উল্টে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। এই অসুবিধে দূর করার জন্যে গাড়ী এমনভাবে নির্মিত হবে যাতে সেটির ভারকেন্দ্র অনেকটা নীচে থাকবে। চান্দ্র পোশাকের মতো চন্দ্রচর যানেরও আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে।

চান্দ্র জমির বন্ধুরতা এবং অন্যান্য অসুবিধের কথা বিবেচনা করে হেলিকপ্টার সদৃশ এক ধরনের যানের কথা ভাবা হচ্ছে। বাতাস সেখানে না থাকায় রকেট পদ্ধতিতে এই যান চালিত হবে। হাল্কা, রকেট-এঞ্জিনযুক্ত ছোটো এই যানে করে যে-কোনো দিকে যাওয়া যাবে। পৃষ্ঠচারী যান কোনো কারণে বিকল হলে এই যানের ওপরই তখন নির্ভর করতে হবে।

সুদৃশ্য তুষার কণা
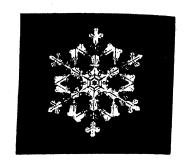
খণ্ডিত বরফে গঠিত পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ কুমেরু
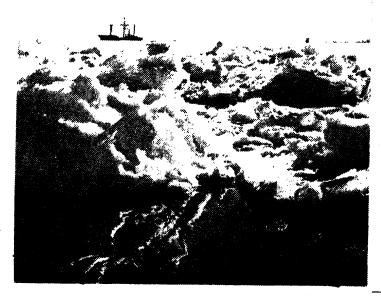
বিজ্ঞানের কথা

জল একটি অসাধারণ পদার্থ

এখন গ্রীষ্মের প্রখর দাহে যে পদার্থটির জন্যে আমাদের প্রাণ ঘন ঘন তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে, সে পদার্থটি হচ্ছে আমাদের অতি-পরিচিত জল। শুধু গ্রীষ্মকালে কেন, কোন সময়েই জল ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। আমাদের জীবনধারণের সঙ্গে জল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই সাধারণ দৃষ্টিতে জলের মধ্যে আমরা তেমন 'অসাধারণত্ব' কিছু দেখতে পাই না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জল হচ্ছে একটি অসাধারণ পদার্থ।

আমরা জানি, স্বাভাবিক উষ্ণতায় জল হচ্ছে একটি তরল পদার্থ। জলের এই তরলত্বই হচ্ছে অস্বাভাবিক। দু ভাগ হাইড্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেনের সমন্বয়ে জলের সৃষ্টি। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন উভয়েই হচ্ছে গ্যাস। অনুরূপ রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের সঙ্গে জলের তুলনা করলে তার অস্বাভাবিকত্ব উপলব্ধি করা যায়। অক্সিজেনের পূর্ববর্তী লঘুতম মৌল নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের যে যৌগিক পদার্থ আছে সেই অ্যামোনিয়া হচ্ছে একটি গ্যাস। অক্সিজেনের পরবর্তী গুরু মৌল ফ্লুরিনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের যে যৌগিক হাইড্রো-ফ্লুরিক অ্যাসিড সেটিও একটি গ্যাস। যে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় জল তরল পদার্থের ধর্ম প্রকাশ করে সেই তাপমাত্রায় অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিড উভয় পদার্থই হচ্ছে গ্যাস। পর্যায়-সারণীতে কাছাকাছি মৌলের সঙ্গে গঠিত হাইড্রোজেন যৌগিকের গুণাবলীর ভিত্তিতে যদি লেখ-চিত্র অঙ্কন করা যায়, তাহলে দেখা যাবে মিথেন, অ্যামোনিয়া, জল এবং, হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিডের মধ্যে জলের লেখ-চিত্রটি পর্বতশিখরের মত দাঁড়িয়ে আছে। এই লেখচিত্র থেকে জলের অসাধারণত্বের একটা নিরিখ পাওয়া যায়।

জলের এই অসাধারণ ধর্মের কারণ কি? বিজ্ঞানীরা বলেন, 'হাইড্রোজেন বন্ধনের মধ্যে এই অসাধারণত্ব নিহিত। আমরা জানি, বন্ধনের মাধ্যমে পরমাণু যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে। অধিকাংশ যৌগিক পদার্থের এই বন্ধনের শক্তি বিজ্ঞানীরা পরিমাপ করেছেন। তাঁরা বলেন, হাইড্রোজেন-বন্ধনের শক্তি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ।

এখন জলের ধর্ম বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, অন্যান্য তরল পদার্থ থেকে তার অসাধারণত্ব বা অভিনবত্ব কোথায়? আমরা জানি, জলের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং তার গলনাঙ্ক শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই ০ এবং ১০০ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রার মধ্যে জলের তরলত্ব বজায় থাকে এবং এই তাপমাত্রায় আমরা সাধারণত জীবন-ধারণ করে থাকি। শূন্য ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রার নিম্নে আমরা যেমন অস্বস্তি বোধ করি তেমনি ১০০ ডিগ্রী সেঃ তাপ-মাত্রার ঊর্ধ্বেও আমাদের অস্বস্তি বোধ হয়।

আমরা জানি, তাপ হচ্ছে একপ্রকার শক্তি। জলে তাপ প্রয়োগ করলে জলের

অণুগুলি দ্রুততর গতিতে সঞ্চালিত হতে থাকে। উষ্ণতা বা তাপমাত্রা হচ্ছে এই অণুগুলির গতীয় শক্তির একটা পরিমাপ। কিন্তু জলের ক্ষেত্রে এই শক্তির কিছুটা হাইড্রোজেন-বন্ধন ছিন্ন করার জন্যে ব্যয়িত হয়। অন্যান্য তরল পদার্থের তুলনায় সম-আয়তন জলে হাইড্রোজেন-বন্ধন অনেক বেশি। একারণে পৃথিবীতে প্রাপ্ত অন্যান্য তরল পদার্থের চেয়ে জলের এক ডিগ্রী উষ্ণতা বাড়াতে গেলে বেশি তাপের প্রয়োজন হয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা হয় এই বলে যে, জলের আপেক্ষিক তাপ সবচেয়ে বেশি। গাণিতিক জটিলতা পরিহারের জন্যে জলের আপেক্ষিক তাপ ১ বলে ধরা হয় এবং অন্যান্য পদার্থের আপেক্ষিক তাপ ভগ্নাংশরূপে প্রকাশ করা হয়।

এই উচ্চ আপেক্ষিক তাপের গুরুত্ব অনেকখানি। জলের উষ্ণতা বাড়াতে জল যেমন বেশি তাপ শোষণ করে, তেমনি আবার উষ্ণতা কমবার সময় বেশি তাপ ছেড়েও দেয়। একারণে স্থলভাগের তুলনায় সমুদ্র ধীরে ধীরে গরম ও ঠাণ্ডা হয়। আর এজন্যেই সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থলভাগে সব সময় তাপমাত্রা প্রায় একরকম থাকে—না গরম না ঠাণ্ডা। আর একারণে নির্লবণ ইত্যাদি যেসব পদ্ধতিতে জল উত্তপ্ত করার প্রয়োজন হয়, তাতে বেশি শক্তি ব্যয়িত হয়। জলের আপেক্ষিক তাপ যদি কম হত, তাহলে জল গরম করার জন্যে আমাদের গ্যাস ও ইলেকট্রিক বিল কম হত।

আগে বলা হয়েছে, হাইড্রোজেন-বন্ধন ছিন্ন করার জন্যে বেশি শক্তির প্রয়োজন হয়। একথার অর্থ হল তরল জলকে বাষ্পে পরিণত করার জন্যে বেশি তাপের প্রয়োজন হবে (এখানে আমরা তরল অবস্থা থেকে বাষ্পীয় অবস্থায় রূপান্তরের জন্যে প্রয়োজনীয় তাপের কথাই শুধু বলছি, তরলকে ফুটন্ত অবস্থায় আনার জন্যে তাপের কথা বলছি না)। কোন তরলকে বাষ্পীয় অবস্থায় আনতে হলে সেই তরল পদার্থের অণুগুলিকে এমন শক্তি দিতে হবে যাতে তারা বন্ধন ছিন্ন করে আবহাওয়ায় উড়ে যেতে পারে ও বাতাসের সঙ্গে মিশে থাকতে পারে। অধিকতর সংখ্যায় এবং দ্রুত পারম্পর্যায় এ ব্যাপারটা ঘটা দরকার। এ ব্যাপারটা যখন সত্যসত্যই ঘটে, তখন তাকে তরল-পদার্থের স্ফুটন বলা হয়।

কোন তরলের এই স্ফুটন সংঘটনের জন্যে গ্রাম প্রতি যে তাপের প্রয়োজন হয় তাকে সেই তরলের লীন তাপ বলা হয়। অপর যে কোন তরলের চেয়ে জলের এই লীন তাপ বেশি। একারণে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে বাষ্পীভূত করে বিশুদ্ধ জলে পরিণত করতে সমস্যা দেখা দেয়।

জল উত্তপ্ত ও ঠাণ্ডা হবার সময় তার যে আচরণ প্রকাশ পায় তার মধ্যেও অসাধারণত্ব দেখা যায়। পদার্থবিজ্ঞান থেকে আমরা জানি, কোন পদার্থ উত্তপ্ত হলে তার সম্প্রসারণ ঘটে এবং ঠাণ্ডা হলে তার সংকোচন হয়। জলের ক্ষেত্রেও কি এটা ঘটে? ঘটে বটে, তবে সম্পূর্ণরূপে নয়। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলি। শূন্য ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রার জল নিয়ে যদি আমরা আরম্ভ করি এবং তাপ দিতে থাকি, তাহলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যাবে। ৪ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রায় আসা না পর্যন্ত জলের সম্প্রসারণের পরিবর্তে সংকোচন ঘটে এবং ৪ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রায় উপনীত হবার পর থেকে সম্প্রসারণ শুরু হয়। অনুরূপভাবে দেখা যায়, জল ঠাণ্ডা করতে থাকলে ৪ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রা পর্যন্ত তার সংকোচন ঘটে এবং তারপর আরও ঠাণ্ডা হতে থাকলে বরফে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তার সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। একারণে জলের চেয়ে বরফ কম ঘন এবং জলের ওপর বরফ ভাসে। এই ব্যাপারের দরুণই পুষ্করিণী, হ্রদ, নদী ও সমুদ্রের জল অপেক্ষাকৃত গরম থাকে এবং সেখানে জলজ প্রাণীরা জীবন ধারণ করতে পারে। এটা যদি না হত, তা হলে পৃথিবী থেকে সমস্ত প্রাণীই অনেক আগে বিলুপ্ত হয়ে যেত। পৃথিবীর শীতলতর সমুদ্রে হিমশৈল ভাসমান অবস্থায় দেখা যায়। এই হিমশৈল হচ্ছে বরফের বিচ্ছিন্ন প্রকাণ্ড চাঁই। বরফ জলের ওপর শুধু ভেসে থাকে, কিন্তু এর প্রায় নবম-দশমাংশ জলের নিচে লুপ্ত থাকে। এই লুপ্ত বরফের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ১৯১২ সালে টাইটেনিক জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল।

জলে যদি কোন দ্রবীভূত পদার্থ থাকে, তাহলে হিমাঙ্ক (যে তাপমাত্রায় জল জমে বরফ হয়) নেমে আসে। যখন লবণ দ্রবীভূত জল ধীরে ধীরে জমে, তখন দ্রবণের চেয়ে বিশুদ্ধ জল আগে জমে যায় এবং সেকারণে এই দ্রবণ থেকে যে বরফ পাওয়া যায় তা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। এরই ভিত্তিতে বৃটেনে একটি নির্লবণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হচ্ছে।

শূন্য ডিগ্রী সেঃ থেকে ৪ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রায় জল উত্তপ্ত হলে তার অস্বাভাবিক সংকোচন এবং ঠাণ্ডা হলে অস্বাভাবিক প্রসারণের কারণ কি? বহু বিজ্ঞানী জলের এই অস্বাভাবিক আচরণের সঠিক উত্তর পাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন, বরফ হচ্ছে স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। বরফে জলের অণুগুলি হাইড্রোজেন-বন্ধনের দ্বারা দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকে। এই স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থে পরমাণু ও অণুগুলি নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধানে থাকে। জলে ও বরফে হাইড্রোজেন-বন্ধনের দূরত্ব পরমাণুতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যোজ্যতা-বন্ধনের প্রায় দ্বিগুণ। সুতরাং বরফ উত্তপ্ত হলে শক্তির কিছু অংশ হাইড্রোজেন-বন্ধন ভেঙে দেয়। তার ফলে বরফের স্ফটিকে ফাঁক সৃষ্টি হয় এবং সেই ফাঁকের মধ্যে জলের বিচ্ছিন্ন অণুগুলি ঢুকে যায়। এজন্যে একক আয়তনে অধিকতর সংখ্যক অণু থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, সমগ্র অণু সমষ্টি অপেক্ষাকৃত কম দেশ অধিকার করে। তাই বরফ গলে জল হলে তার সংকোচন ঘটে। ৪ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রা পর্যন্ত এই আচরণ দেখা যায়। তারপর বোধ হয় অণুগুলিতে ও বন্ধনে প্রযুক্ত শক্তি তাদের আরও দূরে সরিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্ধনও ভেঙে দেয়। কিন্তু তখনও জলের স্ফটিকাকার বর্তমান থাকে (এক্স-রশ্মি দ্বারা পরীক্ষায় এটা পর্যবেক্ষণ করা গেছে) এবং সে কারণে তখন জলের সম্প্রসারণ ঘটে।

এতক্ষণ জলের যেসব ধর্মের কথা বলা হল, তার মধ্যে কিন্তু জলের অসাধারণত্বের শেষ নয়। জলের উচ্চ সান্দ্রতার দরুন বারিকণার সৃষ্টি হয়। জলই হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র দ্রবণ যার মধ্যে অধিকাংশ পদার্থ দ্রবীভূত হয়। সমুদ্রের জলে তাই বহু খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। আমরা যে জল পান করি তাতেও বহু পদার্থ আছে। কেটলীতে জল ফুটালে তার তলায় এই সব পদার্থ দেখা যায়। শিল্পক্ষেত্রে যেখানে জল ব্যবহার করা হয়, সেখানে পাইপ ও অন্যান্য পাত্রের মধ্যে এসব পদার্থ দেখা যায়। তাই বহু শিল্পে খনিজ পদার্থ-মুক্ত জল ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া উত্তপ্ত জল হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষারী পদার্থ। একারণে বয়লারে জলের এই ক্ষারধর্ম দূরীকরণ সমস্যা সমাধানের জন্যে নানা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

বস্তুত, পৃথিবীর সমস্ত তরল পদার্থের মধ্যে জল হচ্ছে সবচেয়ে অসাধারণ এবং অন্যান্য তরল পদার্থের ধর্মের সঙ্গে তার ধর্ম অনেকখানি অস্বাভাবিক। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের বহু রহস্য জলের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এসব রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় পৃথিবীর বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বর্তমানে গবেষণায় নিমগ্ন রয়েছেন।

ঝুমুর চৌধুরী নুন কত নোনতা?

অবশেষে নুনের নামে দুর্নাম উঠেছে। সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে সংবাদপত্রের পাতায়। তাতে বলা হয়েছে লবণই নাকি সর্দির হেতু। ডাঃ এ বি বৈদ্য ও তাঁর তিন-জন সহযোগীর নাকি এই অভিমত।

কথায় আছে, নুন খাই যার গুণ গাই তার। তা এখন যখন নুনের গুণকীর্তন করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন এখন থেকে নুন খাব যার, তার তো প্রশস্তি আর গাওয়া চলবে না। নুনেরই যখন গুণকীর্তন বন্ধ, তখন নিমকদাতার গুণগান গাই কী করে? তা সে বাঁক্তি তাতে আমায় নিমকহারাম বলুক বা অন্য যা কিছু!

নুনের স্বপক্ষেও অবশ্য কিছু কথা ডাক্তাররাই অর্থাৎ বৈদ্যবৃন্দই বলে থাকেন বলে আমার ধারণা। শুনেছি গরমের দিনে বেশি ঘাম হলে নুন খাওয়া ভালো।

আবার মরুভূমি বা আধা-মরু অঞ্চলে তো রীতিমত নুনবড়ি খেতে বলা হয়।

এখন আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে এই 'বেশি খাও' এবং 'কম খাও' অভিমতের দোটানায় পড়ে দুয়ের মাঝে পাল্লা টানাটাই মুশকিল ভারি।

দুঃখ থেকে গেল একটা। এই আক্রার বাজারে সস্তার মধ্যে ছিল শুধু নুন। কিন্তু তাতেও অসুখ। সুখ কোথায় বলতে পারেন? ক্ষেপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর—আমরাও 'ক্ষ্যাপার দল' মিথ্যে ঘুরে মরছি সুখের সন্ধানে।

অতিরিক্ত নুন খেলে রক্ত জল হয়ে যাবারও নাকি ভয় আছে। এ খবরও বোধ-করি বৈদ্যদের।

নুনের এত দোষ সত্ত্বেও একটা দুর্নাম কিন্তু কেউ দিতে পারবেন না—নুনে ভেজাল। সব কিছু খাদ্য কিম্বা অখাদ্য কুখাদ্যে জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে বনবন করে—ভেজাল বিরাট জাল বিস্তার করে সবকিছু ছেয়ে আছে। তেলে শিয়ালকাঁটা, দুধে জল, চালে কাঁকর আটায় তেঁতুল বিচি......বলে কি লাভ? সবই তো আপনারা জানেন। এমনকি ডিমে পর্যন্ত নাকি ভেজাল। যেটা হাঁসের ডিম বলে পাচ্ছেন, সেটা সুন্দরবন অঞ্চলের কোন বিশেষ পক্ষীর হতে পারে, তা কি জানেন? শেষ পর্যন্ত বাজারে হয়ত পক্ষীর বদলে পক্ষীরাজের অর্থাৎ ঘোড়ার ডিম পর্যন্ত আমদানী হতে পারে।

এতসব স্বীকৃত সত্যের মধ্যে একমাত্র নুনই ছিল নির্ভেজাল ও খাঁটি আসল জিনিস: নকল ও কৃত্রিমতায় ভরা সভ্য ও সমাজতান্ত্রিক আমাদের জীবনে একমাত্র আদি ও অকৃত্রিম দ্রব্য, সমাজতান্ত্রিক রীতি অনুসারে সকলের কাছে যার যেমন প্রয়োজন-মত সহজলভ্য। বস্তুতপক্ষে, একমাত্র গুদামের কুলিদের পদধূলি ছাড়া তাতে অন্যবিধ কোনরূপ দূষিত পদার্থ থাকা আদৌ সম্ভব নয়। এবং এই পদধূলিজনিত দোষটাও তো নুনের নয়। এতেও আমাদের চরিত্রের দোষের আরেকটা দিক উন্মোচিত হচ্ছে। নুন স্বল্পমূল্যের এবং সহজলভ্য বলেই আমাদের পদদলিত হচ্ছে। সে যদি সোনার মত অমূল্য হত, তবে কি আমরা তাকে মাথায় করে রাখতাম না? কিন্তু নুন কি অমূল্য নয়?

শুধু দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি আজ বড় প্রকট সর্বব্যাপক—সর্বগ্রাসীও বলতে পারেন। বস্তুত বেঁচে থাকার যে বিড়ম্বনা, সেটা সবকিছুতেই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করা যাচ্ছে, মালুম হচ্ছে পদে পদে। মনে হচ্ছে, সকলেই নিমকহারাম, নুন কিন্তু নিজে এদলের নয়। সে ক্ষণে ক্ষণে বাজার থেকে উধাও হয় না, জীবন-যুদ্ধে দুর্বল মানুষের সঙ্গে খেলে না প্রাণান্তকর লুকোচুরি খেলা; তার মূল্যও হয় না আকাশছোঁয়া—বামন, অতি বামন-জনেরও সে থাকে নাগালের মধ্যেই। চাল-ডালের মতই সে অপরিহার্য, কিন্তু অলভ্য নয়। ব্যঞ্জনে নুন নেই, একথা আমরা ভাবি কি? পিকনিকে ভুলে নুন নেন নি, নুন

ছাড়া খিচুড়িতে আনন্দের অর্ধেকই 'মারডার'।

তবু আমাদের দরবারে শেষ বিচারে নুনের নির্দোষিতার এবং উৎকর্ষের দাবী যদি অগ্রাহ্য হয়, এবং আমরা অপেক্ষাকৃত কমহারে নুন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিই, তবে অন্তত একদিক থেকে সেটা ভালোই হবে। নুনের দেশীয় কাট্‌তি কম হলে ঘাটতিও কম হবে এবং সেজন্য বিদেশ থেকে নুন আমদানীর প্রয়োজনটা যাবে কমে। তাতে আমাদের অতি দ্রুতক্ষয়িষ্ণু বৈদেশিক মুদ্রারও কিছু সাশ্রয় হবে। চাই কি, হয়তো কিছু ভারতীয় লবণ বিদেশে রপ্তানি করে বেশ খানিকটা উপরিও আমদানি করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন করছেন কি—নুনের মত সামান্য জিনিসও কি ভারতে তৈরী হয় না? তৈরী হয়, কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, বিদেশ থেকেও আমদানি করতে হয় খানিকটা, আমাদের রাবণের গুষ্টির খোরাক যোগাতে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমরা হু হু করে বাড়াছি বই কমছি না। আমাদের একুশ বছরের শিশুরাষ্ট্র অনেক কিছুতেই তো আজও স্বাবলম্বী নয়; নুনের মত আপাত সামান্য বিষয়েও আমরা তাই স্বাবলম্বন-হীন। একুশ বছরে সাবালক হয়ে ভোটাধিকার পান—ওসব কথা বলবেন না। ওটা শুধু এজন্য যে এটা একুশে আইনের দেশ। দেশটাকে একুশবারে একুশ টুকরো করা হয়েছে, হচ্ছে; ভাষা নিয়ে একুশ রকম কার-বার চলেছে; একুশ দফা পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে; সারা দেশে একুশ রকম দল বা রাজ-নৈতিক ভাবনা থৈ থৈ করছে; আনন্দের একুশ রকম প্রকাশ, যন্ত্রণার একুশ রকম ব্যাপ্তি। তোমরাচোমড়া গোমড়া মুখের একুশ রকম গোঁফ বানাবার ধরন।

থাক এসব কথা। নুনের কথায় ফিরে আসি। কথা হচ্ছিল, বিদেশ থেকে নুন আসে। এবং সেজন্য কড়ায় গন্ডায় নয়, নয়া পয়সার হিসাবেও নয়, রীতিমত ডলারের স্টার্লিং-এর হিসেবে উচিতমূল্যে শোধ করে দিতে হয়। অথচ এই অমূল্য লবণ কত অফুরন্ত পরিমাণে রয়ে গেছে আমাদের ঘরের কত কাছে, দুয়ার হতে অদূরেই আমাদের কয়েক হাজার মাইলের সমুদ্রতট। বঙ্গোপসাগরের এক কোণ থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বেলাভূমির তটে তটে সমুদ্রের লবণাক্ত জলরাশির উচ্ছ্বাস। তা সবে অব-হেলা করে অবোধ আমরা পরদেশে সামান্য নুনের জন্যও পর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়াই। এবং অনেক বিষয়ের সঙ্গে সম্ভবত তাদের নুনও খাই বলে তাদের কেনা গোলাম হয়ে পড়ি। নুন খেয়ে নেমকহারামি আমরা করতে পারি কি করে?

তবে হ্যাঁ, এবার থেকে বৈদ্যজনকথিত সূত্র ধরে নুন কম খেতে আরম্ভ করলে, বিদেশ থেকে নুনের আমদানি বন্ধ হয়ে যাবে। আর তবে তো আমরা স্বাধীন সবল হয়ে উঠবই। তখন আমরা নিজস্ব মত ও পথ অনুসরণ করলে, স্বাধীন চিন্তাধারা অনুধাবন করলে, দেশ-বিদেশের কেউই আর আমাদের নেমকহারাম বলতে পারবে না। সেটা বিরাট লাভ সন্দেহ নেই। আমরা হাজার হাজার বছর ধরে হারিয়ে যাওয়া আত্ম-সম্মানবোধ, অধুনা যাকে আমরা ধারকরা শব্দে 'প্রেসটিজ' বলে থাকি, আবার ফিরে পাব। আর থাকবে না মীরজাফরেরা—কেননা নুনই খাইনি অন্যের, তো নেমকহারামি হবে কী করে? আর থাকবে না লক্ষ্মণসেনেরা লড়াই না করে রণে ভঙ্গ দেবার জন্য। কারণ অতিরিক্ত নুন খেয়ে রক্ত জল হয়ে যাবার অবকাশ পাবে না। রক্ত রক্তই থাকবে। তাজা, থকথকে, টলমলে উষ্ণ সে রক্ত। শিরায় শিরায় উষ্ণ সে রক্ত টগ্‌বগ্‌ ফুটে উঠবে অন্যায়ের প্রতিবাদে, অত্যাচারের প্রতিবিধানে, অবি-চারের অবসানকল্পে। সে রক্ত হৃদয় ও ধমনীতে নাচবে অগ্নিবীণার সুরে সুরে।

বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা।
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ সে কি হবে না কেনা?
বিশ্বের কান্ডারী সে কি শুধিবে না ঋণ
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?

না, অতিরিক্ত নিমকশূন্য এবং সেজন্য নিমকহারামিশূন্য রক্ত রক্তের মূল্যে স্বর্গ কিনে আনবে, দুর্জয় জয় করবে। ঋণ পরিশোধের শেষে সব পাওনা ফিরে পাওয়া যাবেই। রাত্রির তপস্যার শেষে প্রভাত আসবেই। মাতার অশ্রুধারায় দ্রবীভূত লবণের মূল্য শোধ করতে এগিয়ে আসবে না, এমন নেমকহারাম সন্তান থাকবে না এদেশের মাটিতে।

অতএব অতঃপর পরিমিত পরিমাণে নুন খেতে হবে। নুনকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও চলবে না। সবটা খুব পরিমিত হওয়া দরকার, যাতে শরীরের ক্ষতি না হয়; রক্ত জল হয়ে না পড়ে, আবার নেমকহারাম অথবা 'নুন খাই যার গুণ গাই তার' নামক রোগের প্রকোপও না দেখা দিতে পারে। আবার নুন খানিকটা চাইও, কেননা তাজা রক্তের স্বাদ নোনতা, চোখের জলও তাই। পরিশ্রমের স্বেদবিন্দু—তাতেও আছে নুন। নুনের সঙ্গে রক্তের উত্তাপের স্পর্শ, চোখের জলের ব্যথার ঝঙ্কার, এবং স্বেদবিন্দুর পরিশ্রমের স্বীকৃতি ও গর্ব জড়ানো আছে। নুনের স্বাদ তাই সবটুকুই নোন্‌তা নয়—মিঠেকড়া এবং উত্তাপেভরা নানারকমের তার স্বাদ।

সুতরাং সর্বশেষে সকলের কাছে অনু-রোধ, আপনারা নুন কম খান, যতটুকু দরকার শুধু ততটুকু। বন্ধ করুন নেমক-হারামি এবং অতিরিক্ত 'নুন খাই যার গুণ গাই তার' বশংবদ ভাবটুকু। ধরে রাখুন রক্তের উত্তাপ; চোখের জলের জ্বালায় ঋণ পরিশোধের আগুনভরা পণ; সাফল্যের স্বেদবিন্দুর গরিমা ও আত্মতৃপ্তি।

সব শেষের আগে তবু একটা কথা বাকি থেকে যায়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—সবকিছুতেই একটু নুন মিশিয়ে নেওয়া ভালো। সোজা কথায় তার মানে হল, সব কথা সহজে বিশ্বাস করবেন না। যা বাহ্যত গ্রাহ্য, তা হৃদয়গ্রাহ্য নাও হতে পারে, যা আপাত সত্য, তা সবটুকু সত্য নাও হতে পারে। অনৈক্য থাকতে পারে তার face value এবং intrinsic value—এই দুয়ের মধ্যে। সুতরাং আমার এই লবণ সংবাদটিও যদি একটু নুন মিশিয়ে গ্রহণ করেন, তবে আমি আপনাদের দোষ দিতে পারি না। যদি আপনারা বলেন—এই সর্বত্র 'নাই নাই'এর যুগে অন্তত নুনের রেশন নেই, কালোবাজারী নেই, ঊর্ধ্বগতি অগ্নিমূল্য নেই; তাই আমরা এই পর্যাপ্ত যোগান নুন খেয়েই বেঁচে থাকব, আরও বেশি পরিমাণে নুন খাব। শুধু নুনেই আমরা নির্ভেজাল স্বাদ পাই জিভে। সুতরাং নুন খাব মনের আনন্দে, মহাসুখে নৃত্য করে।
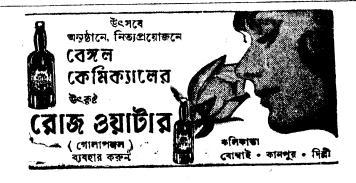
প্রদর্শনী পরিক্রমা

কে সি পরাশর ও বিবেক সাহা, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ১৩ থেকে ১৯ মে তাঁদের তেত্রিশখানি স্কেচের একটি যৌথ প্রদর্শনী করেন। বিবেক সাহার স্কেচ ইতিপূর্বে অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শিত হয়েছে। শ্রীপরাশরের স্কেচের প্রদর্শনী এই প্রথম।

শ্রীপরাশর শিল্পকে বৃত্তি হিসেবে নেন নি; ছবি আঁকা তাঁর শখ মাত্র। আসলে তিনি জিওলজিস্ট। বিবেক সাহার কাছেই কিছুকাল শিক্ষানবিশী করেছেন। তাঁর কাজের মধ্যে শ্রীসাহার প্রভাব সুস্পষ্ট। উভয়ের কাজেই একটা ক্ষিপ্রতার ছাপ বেশী; যার ফলে অনেক যায়গায় ফর্মের চাইতে ক্যালিগ্রাফির ভাবটাই বেশী ফুটে ওঠে। উভয়েই পথঘাট বাজার কর্মরত মানুষ ইত্যাদি নিয়েই কাজ করেছেন। শ্রীপরাশরের কাজের মধ্যে পথের জনতা, ভিখারী, কুলুর মেয়ে, চানাচুরওয়ালা অন্ধ গায়ক প্রভৃতি কতকগুলি স্কেচ মন্দ নয়।

শ্রীসাহার আঙুলের ছাপে আঁকা কতকগুলি রঙীন স্কেচ—যেমন এগজিস্টেন্স, বার্ডেন প্রভৃতি কাজ উল্লেখযোগ্য, রিক্সাওয়ালার ক্ষিপ্র পেন্সিল ড্রইংটি ভাল। কয়েকটি জলরঙে করা মুখ অনেকটা ফিনিশ করা কাজ এবং অন্যান্য কাজের মধ্যে ক্যালিগ্রাফিক টানের প্রাধান্যটাই বেশী।

●

গত ২৩ থেকে ২৯ মে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে তরুণ শিল্পী শ্রীরাজ বর্মার ১৭ খানি পেন্টিং ও বারো-তের খানি ড্রয়িং-এর প্রদর্শনী হয়ে গেল।

শ্রীবর্মা কোন শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেননি। নিজে নিজেই ছবি আঁকা শিখেছেন। তদুপরি শ্রীবর্মা কবি। তাঁর স্কেচগুলির সঙ্গে অনেকগুলি কবিতাও প্রদর্শিত হয়েছে। শ্রীবর্মার ছবিতে আধা ফিগারেটিভ ও প্রায় নন-ফিগারেটিভ কাজের সাক্ষাৎ মেলে। রেখার হিল্লোলিত গতি বা কোণাকুণি ভঙ্গীর মধ্যে অবশ্য সর্বত্র সংযম বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। প্যাস্টেল এবং তেল রঙে আঁকা কতকগুলি ব্যঙ্গচিত্রধর্মী মুখাকৃতির মধ্যে ক্লাউনের ছবিটি আকর্ষণীয়। কালীমূর্তির চিত্রে কতকটা জোরালো ভাব দেখা যায় কিন্তু ছবির উর্ধ ও অধোদেশের ভারসাম্য আরেকটু সুসমঞ্জস হলে ভাল হত। সেদিক থেকে 'মেটার্নিটি' ছবির আধা অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিজাইন অনেক সুপরিকল্পিত। তাঁর ছবিতে লাল, কমলা, গোলাপী ও বেগুনী রঙের প্রাধান্যই বেশী। কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া বর্ণসমাবেশ মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়।

মেটার্নিটি শিল্পী : রাজ বর্মা

উমা দাশ

●

শ্রীমতী উমা দাস সরকারী শিল্প বিদ্যালয় এবং লণ্ডনের সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফটসের শিল্প শিক্ষালাভ করেছেন। ১৯৫৮, ১৯৬০ ও ১৯৬৬ সালে কলকাতা ও বোম্বাইয়ে একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছেন। খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনের শিল্প উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি একজন টেক্সটাইল ডিজাইনার ও প্রিন্টার।

ইতিপূর্বে তিনি জলরঙ ও তেল রঙে কাজ করতেন। বর্তমানে শুধুমাত্র তেল রঙেই আঁকেন। ওয়াশিংটন ডি সি-তে পৃথিবী থেকে যে চারজন মহিলার তৈলচিত্র ইন্টারন্যাশনাল মানিটরী ফাণ্ড হলে ২৪ এপ্রিল থেকে ২৯ মে পর্যন্ত প্রদর্শিত হল তাতে তাঁর ১০ খানি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। তাঁকে অকস্মাৎ এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করতে বলা হয়। উদ্যোক্তারাই এই ছবিগুলি নিয়ে যাবার ব্যয়ভার (প্রায় ৩০০ ডলার) বহন করেন। এই চারজন ছাড়া জলরঙ বিভাগে অবশ্য অন্যান্য মহিলাদের কাজ আছে। প্রদর্শনীটি পরে আমেরিকার অন্যান্য শহর ও ক্যানাডাতেও ঘুরবে। ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীমতী দাস ডঃ এস দাস আই-সি-এসের (অবসরপ্রাপ্ত) স্ত্রী। ডঃ দাস বর্তমানে হিন্দুস্থান মোটরসের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও ভাইস চেয়ারম্যান।

শ্রীমতী দাস জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করেছেন। ভারতীয় মহিলা শিল্পীর এই সম্মানে সকলেই আনন্দিত হবেন।

—চিত্ররসিক

প্রেক্ষাগৃহ
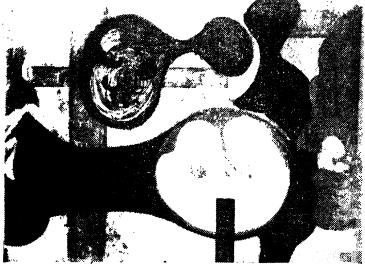
আরোগ্যনিকেতন

মহৎ অন্তঃকরণ যার তার নাম যদি মহাশয় ওরফে 'মশায়' হয় তবে জীবন মশায় সত্যিই মহাশয় ব্যক্তি। পুরুষানুক্রমে কবরেজী তাঁদের পেশা ও নেশা। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় দখল অসাধারণ। জীবন মশায় বলতে আশপাশের পাঁচ দশটা গাঁয়ের লোক সাক্ষাৎ এই দেবতাটিকেই বোঝেন। কত রোগ বিরোগ, কত কঠিন মহামারীর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন লোককে। তাঁর আরোগ্যনিকেতন এখনও পাড়ার লোকে সরগরম হয়ে থাকে সকাল সন্ধ্যে। স্মৃতি-বিস্মৃতির ঝুড়ি উপুড় করে দেন তাদের সামনে জীবন মশায়। নিজের ছেলেকে ডাক্তার করতে চেয়েছিলেন কবরেজ মশায়। কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন অনেক আশা নিয়ে সত্যবন্ধুকে।

কম্পোজিট শট্। জীবন মশায় ও সত্যবন্ধু। স্থান রেল-স্টেশন।

জীবন—আজ কিন্তু তোমাকে আমার হিংসে হচ্ছে সত্যবন্ধু।

সত্য—কেন বাবা।

জীবন—আমি যা হতে চেয়েছিলাম—পারিনি—তুমি তাই হতে চলেছ—কবিরাজ বংশের প্রথম ডাক্তার। চিকিৎসাবিদ্যার কত আধুনিক পদ্ধতি কত নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচয় হবে তোমার। কাট্।

ট্রেনের তীক্ষ্ণ বাঁশী বেজে ওঠে। গাড়ী নিয়ে যায় সত্যবন্ধুকে জীবন মহাশয়ের কাছ থেকে। আর সে ফিরে আসেনি। দুর্গাপুজোয় বাড়ী না আসার দরুণ জীবন মশায় কলকাতা এসে তাঁর সুপুত্রের কান্ডকারখানা দেখে বাড়ী এসে আতরবৌকে বলেছিলেন—'আজ থেকে আমরা জানব আমাদের ছেলে মৃত—মশায়বংশ নির্বংশ।'

এইভাবে দিন কাটে জীবন কবরেজের। একদিন শহর থেকে জমিদার ভুবন রায় এলেন গাঁয়ে। মশায়ের কাছে এসে বললেন, 'দেখ তো কবরেজ, তোমার নিদান কি বলে? বাঁচবো কদিন আর?' জীবন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে শুধু বলে—'বিষয় আশয়ের একটা ব্যবস্থা কর, নাতনীটার একটা গতি কর। তারপর আর কি, কাশীবাসী হয়ে যাও।'

কবরেজ-এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বুঝতে পারে ভুবন জমিদার। জীবন 'হাতুড়ে'র ওপর বিশ্বাস হারিয়ে হাসপাতালের তরুণ ডাক্তার প্রদ্যোৎ-এর শরণাপন্ন হয়।

মিড শট্। প্রদ্যোৎ ভুবন রায়ের বাড়ী থেকে বেরোচ্ছে।

জীবন—নমস্কার।

প্রদ্যোৎ—নমস্কার।

জীবন—আপনি ত' আমাদের নতুন ডাক্তারবাবু—দূর থেকে দেখেছি, আলাপ হয়নি।

প্রদ্যোৎ (হেসে)—আজ্ঞে হ্যাঁ! ক'মাস হল এসেছি। এমন জড়িয়ে রয়েছি হাসপাতালটা নিয়ে—সকলের সঙ্গে—মানে দেখা করে উঠতে পারিনি।

জীবন—আমি জীবন—জীবন সেন। কাট্।

সন্ধ্যা রায়। ফটো : অমৃত

ক্লোজ শট্। প্রদ্যোৎ।

প্রদ্যোত—মশায়! কাট্।

ক্লোজ শট্। জীবন।

জীবন—(হেসে) ওই বলে লোকে ডাকে আর কি!...তারপর...দেখলেন ভুবনেশ্বরকে? কাট্।

ক্লোজ কম্পোজিট শট্। প্রদ্যোৎ ও জীবন।

প্রদ্যোৎ—হ্যাঁ। আপনিও দেখেছেন কাল। জ্ঞান গঙ্গার ব্যবস্থাও দিয়েছেন শুনলাম।

জীবন—আমার নাড়ীজ্ঞানে তাই পেলাম ডাক্তারবাবু। ছ' মাস।

প্রদ্যোৎ—কি বললেন? কাট্।

কম্পোজিট শট্। জীবন ও প্রদ্যোৎ।

জীবন—ও'র ভেতরটা কাল একেবারে জীর্ণ করে ফেলেছে।

প্রদ্যোৎ—তবু উনি বাঁচবেন। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির কথা আপনি জানেন না। সারা দেশময় ছড়িয়ে গেলেও আপনার ভাঙা আরোগ্যনিকেতনের ভেতর গিয়ে সে খবর পোঁছয় নি। কাট্।

কম্পোজিট শট্। প্রদ্যোৎ ও জীবন।

প্রদ্যোৎ—ওকে আমি বাঁচাব। এবং তিনি বাঁচবেন। চলি, আমার হাসপাতালের দেরী হয়ে যাচ্ছে—।

সে চলতে শুরু করে, একটুখানি এগিয়ে থেমে আবার ফিরে আসে।

প্রদ্যোৎ—হ্যাঁ, আর একটা কথা। কাট্।

কম্পোজিট শট্। প্রদ্যোৎ ও জীবন।

প্রদ্যোৎ—হাতুড়ে চিকিৎসা ছাড়া যখন কোন চিকিৎসা ছিল না, তখন যা করেছেন, করেছেন—কিন্তু এখন এ যুগে এভাবে 'নিদান' হাঁকবেন না। এটা মরার যুগ নয়, এটা বাঁচার যুগ। আজকের মেডিক্যাল সায়েন্স যে কত উন্নত তা আপনি জানেন না!

সে চলতে শুরু করতেই ক্যামেরা অনুসরণ করে তাকে। কাট্।

জীবন মশায়ের সঙ্গে প্রদ্যোৎ-এর এই মনকষাকষি যত না আন্তরিক বাহ্যিকরূপ তার বেশী। নতুন ডাক্তারের ঔদ্ধত্য অসহ্য হলেও পুত্রহারা জীবন মশায় তার সেই অঙ্কুরিত নির্মূল আশার মধ্যে কোথায় যেন নিজের পূর্ণতা দেখতে পান।

এদিকে 'নিদান' দেওয়া ভুবন জমিদার নতুন ডাক্তারের কাছে ওষুধ খেয়ে কবরেজের 'তুক্'কে মিথ্যা প্রমাণ করতে চান। ক'দিন আগে পাড়ার পাঁড় মাতাল দাঁতু ঘোষাল এসেছিল জীবন মশায়ের কাছে। কবরেজ তাকে নেশাটেশা করতে বারণ করেছিল কিন্তু দাঁতু ঘোষাল ঐ হাতুড়ের কথায় বিশ্বাস না করে হাসপাতালের ডাক্তার প্রদ্যোৎ-এর শরণাপন্ন হয়েছিল। তবে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারেনি। জীবন মশায়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। এটা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যর্থতা না 'নিদান' দেওয়ার অমোঘ ফল বা কোন কাকতালীয় ব্যাপার যাই হোক—প্রদ্যোৎ-এর মনে রেখাপাত করে।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত শিশু-চিত্র ছেলেটার একটি দৃশ্যে বাপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝুমা সেনগুপ্তা, বাবাই পালিত এবং শিবতারা মুখোপাধ্যায়। ফটো: অমৃত

কিন্তু অপরদিকে ভুবন রায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। কবরেজ-এর ছ' মাস নিদান বুঝি বিফলে যায়! প্রদ্যোৎও নিজের সাফল্যে আনন্দিত হয়। এ সফলতার খবর জানাতে গিয়ে দেখে মনের ঘরে কখন মঞ্জুর (ভুবন রায়ের নাতনী) অকস্মাৎ আগমন ঘটেছে। দাদুর পুনর্জন্মে প্রদ্যোৎ-এর কৃতিত্বকে সে শ্রদ্ধা করে সম্মান জানায় ভালবাসে তাকে।

তারপর সত্যি সত্যিই নির্দিষ্ট দিনটি পার হয়ে যায় একদিন ভুবন রায়। জীবন মশায়ের আরোগ্যনিকেতনে সব শুভাবকের দল নির্বাক হয়ে যায়। তাদের মনে সন্দেহ জাগে—সত্যিই তাহলে 'নিদান' দেওয়ার দিন শেষ হল?

যমের হাত থেকে ফিরে আসার আনন্দে সারা গাঁয়ে রোল পড়ে যায়। ভুবন জমিদার আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ওপর এই অতিরিক্ত বিশ্বাস তখন তার মনে অনিয়ম অনাচারের ঢেউ তোলে। তিনি একটু হয়তবা তাচ্ছিল্যও করেন ভাগ্যকে। অলক্ষ্যের সেই সর্বদ্রষ্টা বুঝি মুচকে হাসেন। সেই রাতেই অতিরিক্ত মদ্যপানে আবার শয্যাশায়ী হন ভুবন রায়।

এই কি তার শেষ শয্যা? জীবন মশায়ের 'নিদান' কি তাহলে সত্যিই? প্রদ্যোৎ ডাক্তারের অক্লান্ত চেষ্টা কি প্রকৃতির কোল থেকে ভুবন জমিদারকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'আরোগ্যনিকেতন' কাহিনী অবলম্বনে আরোরা ফিল্ম করপোরেশনের নতুন ছবিটি মুক্তি-প্রতীক্ষায়। বিজয় বসু পরিচালিত এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় ও চিত্রগ্রহণে আছেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন: প্রদ্যোৎ—শুভেন্দু চ্যাটার্জি, প্রদ্যোতের মা—রুমা গুহঠাকুরতা, ভুবন রায়—জহর গাঙ্গুলী, মঞ্জু—সন্ধ্যা রায়, আতর বৌ (ভুবনের স্ত্রী) ছায়া দেবী, সত্যবন্ধু—দিলীপ রায়, শশি (কম্পাউন্ডার)—রবি ঘোষ ও জীবন মশায়ের চরিত্রে বিকাশ রায়।

দেশী ছবির খবর

বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের সমস্যার এখনো পর্যন্ত কোন সুরাহা হল না। কিন্তু এই অনিশ্চয়তা খুবই ক্ষোভের বিষয়। এর আশু প্রতিকার না হলে চলচ্চিত্র-শিল্পের বহু প্রতিনিধি চিরদিনের জন্য বেকার হয়ে পড়বেন। তাই সরকারের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ এই সমস্যার অবিলম্বে অবসান ঘটান। তবে চলতি সংকটের মধ্যেও বাংলা ছবির সুটিং একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। স্টুডিও পাড়ায় নিয়মিত ছবির চিত্রগ্রহণ এবং নতুন ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সম্প্রতি ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে এস, জি, প্রোডাকশন্সের নতুন ছবি 'দর্পণ'-এর সঙ্গীতগ্রহণের মাধ্যমে শুভ সূচনা অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত পরিচালনা করেন শ্যামল মিত্র। স্বাধীনভাবে এই প্রথম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন রঞ্জন মজুমদার। কাহিনী এবং চিত্রনাট্য রচনা করেছেন দিলীপ দে চৌধুরী। ছবির প্রধান তিনটি চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও বিকাশ রায়।

বারীন্দ্রনাথ দাশ রচিত ঐতিহাসিক কাহিনী 'গড় নাসিমপুর'-এর চলচ্চিত্রে রূপ দিচ্ছেন পরিচালক অজিত লাহিড়ী। শ্যামল মিত্র সুরকৃত শ্যাডো প্রোডাকসন্সের এ ছবিতে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার,

মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, দেব মুখার্জী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, অনুপকুমার, অসিতবরণ, কমল মিত্র ও পদ্মা দেবী। রূপছায়া ছবিটির পরিবেশক।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত **'জীবন সংগীত'** ছবিটি বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষিত। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করেছেন সন্ধ্যা রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, অনুপকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রীণা ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু, শোভা সেন, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, অসীম চক্রবর্তী, বঙ্কিম ঘোষ এবং তমাল লাহিড়ী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার। পরিবেশনায় চন্ডীমাতা ফিল্মস।

অরুণ রায় চৌধুরী প্রযোজিত এ, আর, সি, প্রোডাকসন্সের **'অদ্বিতীয়া'** ছবিটির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। ছবিটির পরিচালক হলেন নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে এ ছবিতে কন্ঠদান করেছেন লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মান্না দে এবং সুরকার শ্রীমুখোপাধ্যায়। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, সর্বেন্দ্র, লিলি চক্রবর্তী, বিকাশ রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, গীতা দে ও ডেইজী ইরাণী।

বোম্বাইয়ে প্রেক্ষাগৃহের দরজা আবার খুলেছে। হিন্দী ছবির প্রদর্শন শুরু হয়েছে। মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবিগুলোর মধ্যে গুরু দত্ত ফিল্মসের **'শীকার'** রাজশ্রী পিকচার্সের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করছে। আত্মারাম পরিচালিত এ ছবিতে রূপদান করেছেন আশা পারেখ, ধর্মেন্দ্র, সঞ্জীবকুমার, রেহমান, হেলেন, বেলা বসু এবং জনি ওয়াকার। শঙ্কর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।

রাজেন্দ্রকুমার ও সায়রা বানু অভিনীত **'ঝুক গয়া আসমান'** ছবিটি শীঘ্রই রাজশ্রী পিকচার্সের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করছে। আর, ডি, বনশাল প্রযোজিত এবং লেখ ট্যানডন পরিচালিত এই রঙিন ছবিতে অভিনয় করেছেন রাজেন্দ্রকুমার, সায়রাবানু, রাজেন্দ্রনাথ, প্রেম চোপরা, দুর্গা খোটে, জাগীরদার ও প্রভীন চৌধুরী। সুরসৃষ্টি করেছেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

নির্মীয়মাণ চিত্র। **'রাত্রি শেষে'র** স্যুটিং শুরু হচ্ছে শ্রীললিতকা প্রোডাকসন্সের টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে ১৩ মে থেকে। এই পর্যায়ে শিল্পীদের মধ্যে আছেন জহর গাঙ্গুলী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, বিদ্যা রাও, গীতা দে, শেখর চট্টোপাধ্যায় ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। চিত্রটির প্রযোজক হচ্ছেন অজিতকুমার ঘোষ। সহকারী পরিচালক-

রাজস্থানে **গুপী গাইন বাঘা বাইন** চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণ। কয়েকটি চরিত্রে : জহর রায়, তপেন চট্টোপাধ্যায় এবং রবি ঘোষ। নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়।

সাবরমতী চিত্রের দ্বৈতসংগীত গ্রহণে কিশোরকুমার ও ইলা বসু।

রূপে খ্যাত পরি দত্ত এই ছবিতেই প্রথম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সংগীত-পরিচালনায় সলিল চৌধুরী বহু দিন পরে বাংলা চিত্রে সুরের নূতন মায়াজাল সৃষ্টি করবেন। চিত্রসম্পাদনায় আছেন অরবিন্দ ভট্টাচার্য ও বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ করবেন পিন্টু দাশগুপ্ত। শিল্প-নির্দেশনায় আছেন-গৌর পোদ্দার।

বিদেশী ছবির খবর

চলচ্চিত্র জন্ম থেকেই সাহিত্যাশ্রয়ী। নাটক, লিখিত উপন্যাসই তার কাহিনীর প্রধান বস্তু। সব দেশেই এটা হয়ে আসছে প্রথম থেকেই। জাপান এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশী অগ্রণী। সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্র পৃথিবীর সব দেশেই তৈরী হচ্ছে, তবে জাপানী ছবির সংখ্যাই বেশী। জাপানের (সম্ভবতঃ পৃথিবীরও) প্রথম উপন্যাস 'দি গেন্‌জি স্টোরী'কে চিত্রায়িত করা হয়েছে দুবার। একবার করেছেন, কিমিসাবুরো ইয়োশিমুরা ১৯৫১ সালে আর দ্বিতীয় বার করেছেন কন্ ইচিকাওয়া ১৯৬৬ সালে। জাপানের শেক্সপীয়র চীকামাৎসু এবং সাইকাকুর লেখা নিয়ে এপর্যন্ত ছবি উঠেছে প্রায় পঁচিশখানা। পূর্ব-পশ্চিম ইওরোপে অবশ্য এখন অনেকেই পরিচালক-কাম্-কাহিনীকার হিসাবে দেখা দিচ্ছেন, এতে অবশ্য নিজেকে প্রকাশের সুবিধা বেশী, তবে এখনও কিন্তু সাহিত্যকে একদম ছাড়তে পারছে না চলচ্চিত্র, জাপানতো নয়ই।

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত কালব্যাপী প্রথম ইয়োরোপীয় মহাসমরের পটভূমিকায় ওহ! হোয়াট এ লাভলি ওয়ার সংগীতবহুল চিত্রটি গড়ে তুলছেন যুগ্ম-প্রযোজক লেন ডেটন ও ব্রিয়াঁ ডাফি এবং পরিচালক রিচার্ড অ্যাটেনবোরো। ছবিখানি সম্প্রতি সাসেক্সের ব্রাইটনে প্যানাভিশন এবং ইস্টম্যান কলারের মাধ্যমে তোলা হচ্ছে। এর চারটি প্রধান পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করছেনঃ সার লরেন্স অলিভিয়ার, সার জন গিলগুড, সার মাইকেল রেডগ্রেভ ও সার র‍্যালফ রিচার্ডসন এবং এ'দের সঙ্গে অপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছেন জন মিলস ও ম্যাগি স্মিথ।

আর্থার মিলার-এর বহুবিতর্কিত নাটক 'আফটার দি ফল' চিত্রে রূপান্তরিত হতে চলেছে বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার অ্যাবিমান-এর প্রযোজনায়। ছবিটির নায়িকা ম্যাগির (একদা মিলারপত্নী মেরিলিন মনরোর প্রতীক রূপ) ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন ফে ডানঅ্যাওয়ে। "বনি অ্যান্ড ক্লাইড" ছবিতে অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্যে মিস ডানঅ্যাওয়ে 'অস্কার' মনোনয়ন লাভ করেছিলেন। নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন ডি-সির বাস্তব পরিবেশে ছবিটির স্যুটিং শুরু হবে ১৯৬৯ সালে।

১৮৭০ সালে পেনসিলভেনিয়াতে যখন বিরাট কয়লাখনির ধর্মঘট হয়েছিল, তখন "দি মলি ম্যাগুয়েস" নামে এক কুখ্যাত আইরিস গোপন-চক্র ভীতিউৎপাদনকারী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই গোপন-চক্রের নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে সীন কোনারিকে নির্বাচন করেছেন প্রযোজক-পরিচালক মার্টিন রিট। খনিমালিকেরা এই গোপন-চক্রটিকে ভাঙবার জন্যে যাকে পয়সা দিয়ে নিযুক্ত করেছিলেন, সেই ভূমিকাটিতে রূপদান করবেন রিচার্ড হ্যারিস। প্যানসিলভেনিয়ার পটভূমিকায় ছবিটির শ্যুটিং ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে।

ওয়ান্স আপঅন এ টাইম ইন দি ওয়েস্টঃ ওয়েস্টার্ণ ছবিটি টেকনিকলার এবং ওয়াইড স্ক্রীনের মাধ্যমে রোমের সিনেসিট্টা স্টুডিওতে তোলা হচ্ছে। প্রযোজক পরিচালক সার্জি লিয়োঁর অধীনে এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন হেনরী ফণ্ডা, ক্লডিয়া কার্ডিনেল, জ্যাসন রবার্টস এবং চার্লস ব্রনসন।

প্রযোজক-চিত্রনাট্যকার পরিচালক ব্লেক এডওয়ার্ডস-এর ডার্লিং লিলি সংগীত-বহুল রোমান্টিক কমেডি চিত্রের শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করছেন জুলি অ্যান্ড্রুজ ও রক হাডসন এবং এ'দের সঙ্গে আছেন ফে ম্যাকেঞ্জি, জেরেমি কেম্প, আঁদ্রে মেরানে, ল্যান্স পার্সিভ্যাল, জ্যাকস মেরিন, বার্ণার্ড কে এবং ডরিন কাউ। হলিউড ছাড়া ছবিটি প্যারিস ও ডাবলিনেও তোলা হবে।

'তিন ভুবনের পারে' ছবিতে তনুজা ফটো : অমৃত

মঞ্চাভিনয়

প্যাভলভ ইনস্টিটিউট-এ "একটি স্ত্রী চরিত্র" :

বিশ্ববন্দিত রুশ বৈজ্ঞানিক, মানুষের আচরণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক কারণের আবিষ্কর্তা আই, পি, প্যাভলভ-এর স্মরণোৎসবে প্যাভলভ ইনস্টিটিউট-এর সভাবৃন্দ সংস্থা-সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত নতুন নাটক "একটি স্ত্রী চরিত্র" অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন গেল ৫ই মে, রবিবার সন্ধ্যায়। বিবাহে অসুখী একটি স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত তরুণীকে ঘিরে এই নাট্যকাহিনীটি গড়ে উঠেছে। কবি স্বামী স্ত্রীর কাছে কাব্যরস সম্পর্কিত সহানুভূতি পায় না। অথচ স্ত্রীর মাথার যন্ত্রণার কারণও নির্ণয় করতে পারে। এদিকে বিদুষী নারীর প্রতি অনুরাগী শিল্পী এবং অফিস-কর্তা দুজন বুঝতে পারে না, মেয়েটি সত্যিই তাদের সম্বন্ধে আগ্রহান্বিতা কিনা। মানসিক চিকিৎসকও তরুণীর চিকিৎসাভার গ্রহণ করে ক্রমেই তার দ্বারা এমন অভিভূত হয়ে পড়ছেন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজেরই চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়ল এবং তিনি সে-সমস্যার সমাধান করলেন আত্মহত্যার মাধ্যমে। চিকিৎসক রেখে গেলেন তরুণীসংক্রান্ত ডায়েরী, যা থেকে একটি নাটক গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন জনৈক নাট্যকার।

তরুণীটির আচরণ, অবচেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সুপ্ত চেতনা প্রভৃতি নিয়ে যে ফ্রয়েডীয় ও প্যাভলভিয় বিশ্লেষণকে নাটকের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক সংবলিত সেই বাদানুবাদ-মূলক বিষয়বস্তু নাট্যরস সমৃদ্ধিকরণে কতখানি সহায়ক হয়েছে, তা অনুধাবন-যোগ্য। 'জোনাল' পদ্ধতিতে অভিনীত এই নাটকের নায়িকারূপে সবিতা মুখোপাধ্যায় গৃহীত চরিত্রের জীবনযন্ত্রণা এবং তথাকথিত প্রেমাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি ঘৃণিত অবিশ্বাসকে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করেছেন তাঁর নাট্যনৈপুণ্যের মারফত। প্যাভলভ ও ফ্রয়েডের চরিত্র দুটি আশ্চর্য দক্ষতার সংগে চিত্রিত হয়েছে যথাক্রমে সমর গুপ্ত ও ধূর্জটী দত্ত দ্বারা। ডাক্তার সোম, শুকদেব, কমলেশ ও অনুপ সিংয়ের ভূমিকায় যথাক্রমে সন্তোষ বসু, গুরুদাস নস্কর, সুশীল বিশ্বাস ও দেবকুমার দের অভিনয় উল্লেখ-যোগ্য। নাটকটি মোটের উপর সুপ্রযুক্ত ও সু-অভিনীত।

গৈরিক পতাকা

সম্প্রতি ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস্ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ স্টার থিয়েটারে ক্লাবের মিলনোৎসব উপলক্ষে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক 'গৈরিক পতাকা' মঞ্চস্থ করেছেন। শৈলেন্দ্রনাথ সিমলাই নির্দেশিত এই নাটকের সামগ্রিক অভিনয়ের মধ্যে বহু জায়গায় শৈথিল্য থেকে গেছে। পার্শ্বচরিত্রের অভিনয়ে শিল্পীদের যথার্থ অনুশীলনের অভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এরই জন্য টিমওয়ার্ক সুসংবদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। তবু এরই মধ্যে কয়েকজন শিল্পী অভিনয়-দক্ষতার নজীর রেখেছেন। বাসুদেব ঘোষের উদাত্ত কণ্ঠ ও অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনায় 'শিবাজী' চরিত্রটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। 'তানজী' ও 'ঘোড়পুরে' চরিত্র দুটিতে সন্তোষ দত্ত ও গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় সত্যি অপূর্ব। দেবী নিয়োগী ও রমাপতি চট্টোপাধ্যায় 'আদিলশাহ' ও 'শাহজীর ভূমিকায় চরিত্রানুগ অভিনয় করতে পেরেছেন। প্রতিমা পাল ও সবিতা মুখোপাধ্যায় 'শ্যামলী' ও 'জীজাবাঈ' চরিত্র দুটিতে বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে পেরেছেন।

'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র'

সম্প্রতি প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠী একটি নতুন নাটক

রক্তরেখা চিত্রে ললিতা চট্টোপাধ্যায়

মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকটির নাম 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে", বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও সংলাপ রচনায় এই নাটকটি একটি রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি হোতে পেরেছে। যা কিছু বাধা আসুক ধর্মেরই জয় সর্বত্র, এই বক্তব্যেরই ওপর প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' নাটকটি। সুশিক্ষিত যুবক 'বিনয়' যার ধর্মের প্রতি পরম আগ্রহ, গীতা-অন্ত যার প্রাণ সেই কি করে দূর সম্পর্কের মামা ভোলানাথের কাছে নিয়মিত গীতা পাঠ শুনতে এসে তার (ভোলানাথের) সুন্দরী কন্যা 'গীতা'র সঙ্গে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল তারই প্রেক্ষাপটে এ নাটক। শেষ পর্যন্ত বিলেত ফেরত ছেলে 'বসন্ত'কেও বিয়ের আসর থেকে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হয়েছে। শানাই বাজার রাতে 'বিনয়'ই পেয়েছে গীতাকে।

শ্রীসুবীরকুমার সরকার এই নাটকটি পরিচালনার ব্যাপারে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন। পরিমিত নাট্যরস সৃষ্টিকে [illegible]র নিষ্ঠা অভিনন্দনযোগ্য। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীসরকার। অভিনয়ে যে দুজন সবচেয়ে প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন তাঁরা হোলেন 'ভোলানাথ' চরিত্রে হরিপ্রসাদ দাস ও ভোলানাথের স্ত্রী 'উত্তমা' চরিত্রে সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের স্বচ্ছন্দ অভিনয় দর্শকদের প্রতিটি মুহূর্তে মুগ্ধ করেছে। দীপক চ্যাটার্জি 'বসন্ত' চরিত্রে স্বাভাবিক অভিনয় করতে পারেন নি। অন্যান্য চরিত্রে সার্থকভাবে রূপ দেন কল্যাণ বাগচী (বিনয়), সুতপা ভট্টাচার্য (গীতা), দিলীপ সেনগুপ্ত, ধর্মব্রত মজুমদার, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিষ ঘোষ।

।। ডেথ্ অফ্ এ সেল্সম্যান ।।

বিহারের প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'বিহার আর্ট থিয়েটারে'র প্রযোজনায় গত ২০ ও ২১ এপ্রিল পাটনার রবীন্দ্র ভবনে আর্থার মিলারের বিশ্ববিখ্যাত নাটক "ডেথ্ অফ এ সেল্সম্যান" নাটকটি ইংরেজী ও বাংলায় মঞ্চস্থ হয়। আজ পর্যন্ত পাটনায় স্থানীয় কোন নাট্য সংস্থা এ ধরনের বিদেশী নাটক মঞ্চস্থ করতে সাহস করেননি, তাই বিহার আর্ট থিয়েটারের এই বলিষ্ঠ প্রয়াস আজকের নবনাট্য আন্দোলনে এক নতুনতর পথের সন্ধান দিয়েছে, একথা হয় তো বলা যেতে পারে। নাটকটির বাংলা রূপান্তরে ও নির্দেশনায় অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন বিহার আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়।

সপ্তম বিশ্বনাট্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই নাট্য প্রযোজনার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল এর অভিনব মঞ্চপরিকল্পনা। এই ধরনের মঞ্চসজ্জা আমাদের দেশে সাধারণত দেখা যায়না। এর জন্য প্রশংসা পাবেন নন্দ ভট্টাচার্য। আলোকসম্পাত ও শব্দসংযোজনার একত্র সমাবেশের ব্যাপারে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য ও গৌতম মুখোপাধ্যায়। নাটকটির নেপথ্য সঙ্গীত অতি সুন্দরভাবে গ্রোথিত হয়েছে, মেঠো বাঁশীর এফেক্টে মাঝে মাঝে সেলস্ম্যানের কাছে এক অপূর্ব স্বপ্নের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ফিউনারাল সঙ্গীত বেটোফেনের সঙ্গীত থেকে সংযোজিত হয়েছিল। তাই নাটকটির সমাপ্তি মর্মস্পর্শী।

দলগত ও ব্যক্তিগত অভিনয়ে নাটকটি দুটি ভাষাতেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছিল। সেলস্ম্যান ও লিন্ডার অভিনয় ইংরেজীতে করেছিলেন সামী খাঁ ও নীহারিকা ব্যানার্জি, বাংলা চরিত্ররূপে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও হেনা মুখার্জি। এঁদের অভিনয়ে এতটুকু শৈথিল্যের স্পর্শ কোথাও থাকেনি। সুন্দর ও সুসংযত অভিনয় করেছেন সমীর সেনগুপ্ত ও রণজিৎ পাণ্ডে ইংরেজী), আশিষ ঘোষাল, অজিত গাঙ্গুলী (বাংলা) সেলস্ম্যানের দুই ছেলে 'বিফ্' ও 'হ্যাপি' চরিত্রে। অন্যান্য ভূমিকায় চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন ব্রজগোপাল সান্যাল, সুশীল চক্রবর্তী, মহম্মদ হাই, নেপাল ভট্টাচার্য, সুষমা সান্যাল, অলিভ ফ্রান্সিস, অরুণ রেওয়ারী, অসিত বিশ্বাস, কে কে পোপনার, অভিজিৎ মুখার্জি, ওয়েল প্যারেরা, আর সে ভরুন, সুধাময় বসু, মনন গোস্বামী।

নাটকটি হিন্দী ভাষায় শীঘ্রই মঞ্চস্থ হবে। বিহার আর্ট থিয়েটার এই নাট্য প্রযোজনাটি পরলোকগত শহীদ ডাঃ মার্টিন লুথার কিং-এর স্মৃতিতে উৎসর্গ করে তাঁদের উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।

'শ্বেতছায়া' নাটক

গত ২৮ এপ্রিল "ঝরিয়া গোল্ডেন স্টার ক্লাব" কর্তৃক তাঁদের চতুর্থতম অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে শ্রীঅতনু সর্বাধিকারী রচিত রহস্য নাটক 'শ্বেত ছায়া' অভিনীত হল। এই অনুষ্ঠানে খেয়া দত্তের গান আকর্ষণীয় হয়েছিল। এ ভিন্ন নাটকটিও সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন—শিবচরণ চট্টোপাধ্যায়, চন্দন ঘোষ, তারাশঙ্কর করজাই, মনোহর রাজোয়ার, সৌমেন মিত্র, বিশ্বনাথ দত্ত, প্রশান্ত দত্ত, স্বপন মুখার্জী, সন্দীপন ঘোষ, বিদ্যুৎ নন্দী, দোলগোবিন্দ রাউথ।

মঞ্চভারতীর "লৌহ প্রাচীর"

ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কলকাতা শাখা সমূহের কর্মচারীরা "মঞ্চভারতী" নামের আড়ালে যে নাট্যসংস্থাটি করেছেন তারা গত ২৩ এপ্রিল বিশ্বরূপা মঞ্চে বাৎসরিক অনুষ্ঠান করলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি
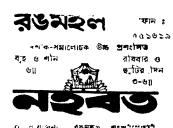
শ্রীহেমচন্দ্র গুহ ও প্রধান অতিথি শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর ভাষণের পর মূকাভিনয় ও কথক নৃত্য পরিবেশন করেন শ্রীপ্রভাস দত্ত ও কুমারী শিপ্রা সেন। এরপর শ্রীআশীষ সান্যালের একাংক 'বিয়োগ বিধুর' নাটকটি অভিনীত হয় ও সবশেষে মঞ্চস্থ হয় শ্রীঅনিলবরণ দত্তের "লৌহ প্রাচীর" নাটকটি। সাধারণ মানুষের আপোষহীন সংগ্রাম ও বর্তমান সমাজের মূর্ত প্রতিচ্ছবি এই নাটকটি শিল্পীদের সুঅভিনয়ে আকর্ষণীয় হয়। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন চিন্ময় বিশ্বাস, আশীষ সান্যাল, তপন মিত্র, অরুণ দত্ত, প্রভাস দত্ত, অঞ্জলিকা গাংগুলী, লতিকা গাংগুলী, সমর চ্যাটার্জী ও অন্যান্যরা।

।। মুকুট ।। ও
।। সত্য মারা গেছে ।।

সোদপুর গভঃ হাউসিং এস্টেট সান্ধ্যা-চক্রের তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'মুকুট' ও 'সত্য মারা গেছে' নাটক দুটি মঞ্চস্থ হয়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মিলে 'মুকুট' নাটকের অভিনয় করে। অভিনয়ে প্রশংসার দাবী রাখে দীপক দত্ত, সুঘোষ রায়, সুজিত চক্রবর্তী, সুস্মিতা চক্রবর্তী। নাটকটি পরিচালনা করেন তরুণ সেনগুপ্ত।

সান্ধ্যাচক্রের সভাবৃন্দ 'সত্য মারা গেছে' নাটকটি সার্থকতার সঙ্গে অভিনয় করেন। আশু ব্যানার্জি নির্দেশিত এই নাটকের কয়েকটি ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন---আশু

ব্যানার্জি, মৃণাল গুহ রায়, প্রদ্যোৎ বসু, চন্দ্রনাথ বসু, শেফালী ব্যানার্জি, তরুণ সেনগুপ্ত।

লোকতীর্থের নতুন নাটক

'লোকতীর্থে'র শিল্পীবৃন্দ এবার যে নাটকটি নিয়ে প্রস্তুতি চালাচ্ছেন তার নাম হোল 'সন্নিহিত কোণ'। নাটকটি লিখেছেন নীরেন্দ্র গুপ্ত এবং নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করছেন বিমল দে।

প্রতিচ্ছবি

'অনামী' নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি নীলোৎপল দে রচিত 'প্রতিচ্ছবি' নাটকটির প্রথম পর্যায়ের নিয়মিত অভিনয় সমাপ্ত করেছেন মিনার্ভায়। জানা গেলো যে, এবার এই নাটকটির দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিনয় হবে 'বিশ্বরূপা' মঞ্চে।।

মায়ামহল

তরুণ যাদুকর মৃণাল রায় প্রদর্শিত মায়ামহল শুধু নূতনত্বের চমকই আনেনি, তা তরুণ প্রতিভার সার্থক উদাহরণ। শ্রীশিক্ষায়তন মঞ্চস্থ এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সত্যজিত রায়। নাটকের আধারে এক ব্যর্থপ্রাণ যুবকের কাহিনী। উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে নায়ক হঠাৎ মায়ামহল-এর দরজায় নিজেকে আবিষ্কার করে। জীবনের অন্ধকারে আশার আলো জ্বলে উঠল। নাট্যের শুরু এখান থেকেই। কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হাউস অফ এঞ্জেলস, নন্দনকানন নাইটক্লাব বাগদাদে এক রাত্রি ইত্যাদি নানান উপভোগ্য ম্যাজিক ভারতীয় যোগবিদ্যার উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রয়োগ-কুশলের শ্রীরায়ের কল্পনাসমৃদ্ধ মন সৃষ্টিশীল প্রতিভা ও সংস্কৃতির ছাপ মুদ্রিত। কলারসিকের অকুন্ঠ অভিনন্দন ইনি আপনি যোগ্যতায় অর্জন করেছেন। তবে সঙ্গীতের অর্থহীন উচ্চগ্রামী সুর অকারণ কর্কশতার সৃষ্টি করে 'মায়ামহলের' সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবিকাশকে ব্যাহত করেছে।
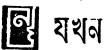
বিবিধ সংবাদ

ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইণ্ডিয়ার ফিল্ম স্টাডি অ্যাণ্ড ইনফরমেশন গ্রুপ-এর উদ্যোগে 'পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্পে সঙ্কট' সম্পর্কে আলোচনা :

২৯ মে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টার-এ এফ-এফ-এস-আই-এর ফিল্ম স্ট্যাডি অ্যাণ্ড ইনফরমেশন গ্রুপ-এর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পে বর্তমান সংকট সম্পর্কে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বারান্তরে প্রকাশিত হবে।

'পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পে সংকট উপলক্ষ্যে সাহিত্যিকদের সভা :

২৫ মে, শনিবার, সন্ধ্যা ৫-৩০ মিনিটে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরীহলে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পে বর্তমান সংকট উপলক্ষ্যে প্রধানত সাহিত্যিকদের আহ্বানে যে মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি রূপে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান সংকটকে একটি জাতীয় সংকট রূপে আখ্যাত করেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই সংকট সমাধানের জন্যে সকলকে একতাবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব পরবর্তী সংখ্যায়।

বিচিত্রিতা'র রবীন্দ্রজয়ন্তী :

আজ ৩১-এ মে শুক্রবার, 'বিচিত্রিতা' সংস্থার সভাবৃন্দ মিনার্ভা থিয়েটারে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপিত করবেন। এই উপলক্ষ্যে এঁরা যন্ত্রসঙ্গীতে বাল্মীকি প্রতিভা (ইলেকট্রিক ভায়োলিনে সলিল মিত্র ও পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়নে ওয়াই এস মুস্তিক), নৈবেদ্য (গীতি-আলেখ্য) এবং 'কঙ্কাল' (একাঙ্কিকা নাট্যরূপ) পরিবেশনের আয়োজন করেছেন।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি আয়োজিত 'সোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী' :

গেল ২৭, ২৮ ও ২৯-এ মে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গৃহে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি (১) আর্থ, (২) চাপায়েভ এবং (৩) উই ফ্রম ক্রনস্টাড—এই তিনখানি তিরিশ দশকের সোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন সদস্যদের জন্যে।

ঝুক গয়া আসমান'-এর মুক্তি উপলক্ষে ভোজসভা :

আর ডি বনসল প্রযোজিত প্রথম হিন্দী রঙীন ছবি 'ঝুক গয়া আসমান'-এর সর্বভারতীয় মুক্তি হচ্ছে ৩১-এ মে তারিখে বোম্বাই শহরের অপেরা চিত্রগৃহে। এই উপলক্ষ্যে কলকাতা ত্যাগের প্রাক্কালে প্রযোজক শ্রীবনশল কলিকাতাস্থ চিত্রসাংবাদিকদের শুভেচ্ছা বহন করে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে একটি মধ্যাহ্ন ভোজসভায় মিলিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, প্রায় তিন বছর আগে এই 'ঝুক গয়া আসমান' ছবিটি আরম্ভ করবার আগেও শ্রীবনসল স্থানীয় চিত্রসাংবাদিকদের সঙ্গে একটি চা-চক্রে মিলিত হয়েছিলেন। আমরা শ্রীবনসলের প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

মেট্রোর ৭০ মিঃ মিঃ ছবি 'ডার্টি ডজন'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নানারকম অসৎ কাজের জন্যে বারোজন ব্যক্তির প্রতি প্রাণদণ্ড বা দীর্ঘদিনের কারাবাসের আদেশ হয়েছিল। তারা কারাভ্যন্তরে তাদের দিন গুনতে ব্যস্ত ছিল। এমন সময়ে সেখানে এলেন একজন মেজর। তিনি এদের যুদ্ধের কাজে নিয়োগ করতে চাইলেন। প্রথমে এরা তাঁর কথাকে আমলেই দিল না জীবন সম্বন্ধে তারা এমনই বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু পরে তারা তাঁর শৌর্যবীর্যের কাছে বশীভূত হল এবং তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হতে থাকল এবং শেষ পর্যন্ত তারা অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করে বিখ্যাত ডি-ডে অভিযানের প্রস্তুতিপর্বে তারা শত্রুশিবির ধ্বংস করল সাফল্যের সঙ্গে। অবশ্য এ-ব্যাপারে ওদের কয়েকজনকে প্রাণ হারাতেও হয়েছিল। ৭০ মিঃ মিটারে তোলা মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার্সের এই ছবিটি অত্যন্ত উত্তেজক অথচ

দলিলচিত্রের অনুরূপে বাস্তবধর্মী। সম্প্রতি এলিট সিনেমায় ছবিখানি সাফল্যের সংগে প্রদর্শিত হচ্ছে।

শিশু ও কিশোর শিল্পী সম্মেলন

ক্লাবটির নবম বার্ষিক উৎসব ও তৃতীয় বার্ষিক সারা বাংলা শিশু ও কিশোর শিল্পী সম্মেলন উপলক্ষে ১৮ই ও ১৯শে মে হাওড়া বেতড় নিউ লাইফ-এর পরিচালনায় এক শিল্প-প্রদর্শনী, আবৃত্তি, সংগীত ও নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রশংসিত শিল্প

'ঝংকার' ও 'কোরক' শিল্পীগোষ্ঠীর উদীয়মান গায়ক প্রণব সেনগুপ্ত সম্প্রতি কয়েকটি অনুষ্ঠানে বিশেষ সুখ্যাতি পেয়েছেন। গত ১২ই এপ্রিল মানিকপুর-হরিহরপুরের অনুষ্ঠানে শ্রীসেনগুপ্ত দর্শকদের প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছেন।

'উদীচী'র রবীন্দ্রজন্মোৎসব

২৫শে বৈশাখ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় উদীচী ভবনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রফুল্ল-কুমার রায়। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের কৌতুক গীতি বিচিত্রা 'প্রেমরংগ' পরিবেশন করেন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন সুশীল মল্লিক, রথীশ রায়, তপন সিংহ, সুনন্দা রায়, মৃদুলা চক্রবর্তী। পরিচালনায় শ্রীশৈলেশ ভড়।

জয়পুরে রবীন্দ্রজয়ন্তী

২৫শে বৈশাখ জয়পুর দুর্গাবাড়ী অ্যাসোসিয়েশন স্থানীয় রবীন্দ্রমঞ্চে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত ও শ্যামা নৃত্যনাট্যটি অভিনীত হয়। অংশ গ্রহণ করেন নন্দিতা মুখোপাধ্যায়, অনিতা মুখোপাধ্যায়, সুধা মুখোপাধ্যায়। নৃত্য-নাট্যটির অভিনয়াংশে ছিলেন রীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অলকা চক্রবর্তী, মালবিকা চক্রবর্তী, দীপিকা রায় ও অন্যান্যরা। পরিচালনা করেন সুধা মুখোপাধ্যায় ও নৃত্য সম্পাদনায় ছিলেন আরতি চক্রবর্তী।

মহাজাতি সদনে রবীন্দ্রজন্মোৎসব

মহাজাতি সদর আছি পরিষদের সহযোগতায় নাট্য সম্মেলন আয়োজিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসব অনুষ্ঠান চলেছিল অহোরাত্র, ২৪ ঘন্টাব্যাপী বিরতিহীন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদেরও নাম এখানে বিজ্ঞাপিত ছিল না। তবুও ছিল বিরামহীন জনস্রোত, সারাদিন-রাত্র ধরেই সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত প্রবেশদ্বার। কেউ শুনতে, কেউবা শোনাতে। যাঁরা শুনিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই অখ্যাত অজ্ঞাত। আবার এসেছিলেন বহু সুখ্যাত শিল্পী, আর গোষ্ঠী। শিশুরাও এখানে বাদ পড়েনি। এক হাজারেরও ওপর শিল্পী এখানে যোগ দিয়েছিলেন। পত্রে, পুষ্পে, আলিম্পনে, সজ্জায় শোভিত এই সদনকে মনে হচ্ছিল পূজামণ্ডপ, পরিবেশও ছিল মনোরম সব সময়ই। অনুষ্ঠানসূচীও ছিল বিভিন্ন ধরণের, তার মধ্যে শিশু অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শনও উল্লেখযোগ্য, এছাড়া বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর নাটক, নৃত্যনাট্য, যন্ত্র ও কন্ঠসংগীত আর মূকাভিনয়।

পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত চৌরঙ্গী চিত্রে অঞ্জনা ভৌমিক ও উত্তমকুমার।

পশ্চিমবংগ চিত্রশিল্প

গত ৩রা মে পশ্চিমবংগ চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে সিনেমা কর্মী ধর্মঘটের ফলে চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ সংকট দেখা দিতে চলেছে তার জন্যে সমিতির অ্যাকশান কমিটি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। চিত্র-শিল্পের সংকট মোচনের জন্যে ৬০ দিন-ব্যাপী ধর্মঘট মীমাংসার ব্যাপারে মালিক ও শ্রমিক উভয়পক্ষের কাছেই কমিটি আবেদন ও অনুরোধ জানান এবং আশা করেন যে উদার মনোভাব নিয়ে একত্রে বসে কর্মীদের অন্তত ন্যায়সংগত দাবীর প্রতি সুবিচার করে অচিরেই একটি সৌহার্দপূর্ণ মীমাংসায় সচেষ্ট হবেন।

পশ্চিমবংগ চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতির জনসংযোগ সচিব ও প্রচার সম্পাদক জানাচ্ছেন যে তাঁদের অ্যাকশন কমিটির সদস্য পরিচালক শ্রীতপন সিংহ এবং শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত পশ্চিমবংগ সরকারের চলচ্চিত্র উন্নয়ন কমিটির সভাপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

মানবাজার রবীন্দ্রজন্মতিথি উদযাপন

পঁচিশে বৈশাখ শিশুদের কাছেও পরমপ্রিয় দিবস। নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থের সহায়তায় তারা এই দিনটিকে আনন্দে ভরিয়ে তোলে। বংগদেশের দূরপ্রান্ত থেকেও তারা সাড়া দেয়। পুরুলিয়া জেলার মানবাজারে নেতাজী ক্লাবের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নাচ-গান-কবিতা ও কৌতুক নাটিকার সাহায্যে দিনটি পালন করেছিল। অনুষ্ঠানের আন্তরিকতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে যারা সকলের প্রশংসা লাভ করে, তাদের মধ্যে সুলেখা, শুভ্রা, সজল, মণিমঞ্জুষা, সলিল, মনোজ, তারাশংকর, সরোজ, বিদিশা, রামকৃষ্ণ, রীণা, বুলো ও মীনাক্ষীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সুপ্রয়োগ ও সুপরিচালনার কৃতিত্ব শ্রীমতী ছবি চক্রবর্তীর। ছোটদের এই আসরে শ্রীগোরাচাঁদ নারাহণদেব গান গেয়ে এবং শ্রীগৌর হালদার তবলা বাজিয়ে অনুষ্ঠানটিকে আরো প্রীতিময় করে তোলেন।

কবি-প্রণাম

গত ২৫শে বৈশাখ দুর্গাপুর মিশ্র-ইস্পাত সংগঠনীর পরিচালনায় রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উৎযাপিত হয়।

প্রথমে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও স্থানীয় শিল্পীসমন্বয়ে রবীন্দ্রসংগীতানুষ্ঠান। পরে সংগঠনীয় সভাবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'বৈকন্ঠের খাতা' নাটকটি সংগঠনীর মুক্তাঙ্গনে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল, অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন তপন সরকার, নির্মল ব্যানার্জি, তপন গুপ্ত, অমরেন্দ্র পাল, রমেন্দ্ররাম বক্সী ও নির্মল মুখার্জি। নাট্যনির্দেশনায় শ্রীহীবিক রায়-এর প্রচেষ্টা সার্থক।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এ্যালায় স্টীলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীহীতেন ভায়া ও শ্রীযুক্তা ভায়া সাফল্যকারী প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

রবিতীর্থের রবীন্দ্রজয়ন্তী

গত ১৪ই মে সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ পার্ক-স্থিত বাটার উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে রবিতীর্থের উদ্যোগে রবীন্দ্রজন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে 'ঋতুরঙ্গ' গীতালেখ্য পরিবেশিত হয়। রবিতীর্থের পাঁচশ ছাত্রছাত্রী সমবেত সঙ্গতে অংশ নেন। একক সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, আলো বসু, সুস্মিতা রায়চৌধুরী, শ্রাবণী বন্দ্যোপাধ্যায়, মালবিকা রায়, অঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, এলিনা গুপ্ত, মৈত্রেয়ী ঘোষ, রবীন মুখোপাধ্যায় ও কাশীনাথ রায়। আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন সুচিত্রা মিত্র, ভক্তি চট্টোপাধ্যায় তুষার ভক্ত ও অরুণ দাম। 'ঋতুরঙ্গ'র পর একটি বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সুচিত্রা মিত্র, নীলিমা সেন, সুমিত্রা বসু, মেখলা পাল, তুষার ভক্ত ও গৌতম বসু।

ভ্রাম্যমাণ রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

২৫শে বৈশাখ সকাল বেলা ভ্রাম্যমাণ রবীন্দ্র-জন্মোৎসব কমিটি উত্তরপাড়া স্টেশন থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও কবিতা আবৃত্তি সহকারে তাদের যাত্রা শুরু করেন। এবং পথ পরিক্রমা করে এসে হাজির হন জোড়াসাঁকোয় বেলা আটটায়। যেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর কলকাতার রাজপথ পরিভ্রমণ করা হয়। এই আকর্ষণীয় উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন তিরিশ জনেরও বেশী ছেলে-মেয়ে।

পশ্চিম জার্মানীর তরুণী অভিনেত্রী ইনগ্রিড পিট্। ইনি পাঁচ বছর আগে পূর্ব জার্মানী থেকে পালিয়ে এসেছিলেন।

চন্দননগরে বেনজু, মনোবিকলন :

চন্দননগর প্রগতি সংঘের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে রঙ্গশ্রী গোষ্ঠী মানবিক আবেদনসম্পন্ন যুদ্ধবিরোধী নাটক বেনজু ও সরস সামাজিক একাংক মনোবিকলন মঞ্চস্থ করেন ১৮ই মে নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দির মঞ্চে। দুটি নাটকেরই

শিল্পীর সম্মানার্থে নাট্যোৎসব :

প্রখ্যাত মঞ্চশিল্পী শ্রীমতী তারা ভাদুড়ীর সম্মানার্থে ১৫ই মে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় মহাজাতি সদনে এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

বাঙলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পীদের উপস্থিতিতে এই নাট্যোৎসবে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন যথাক্রমে কলিকাতার পৌরপ্রধান গোবিন্দচন্দ্র দে ও নাট্যকার-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত। বিক্রয়লব্ধ অর্থ শ্রীমতী তারা ভাদুড়ীর
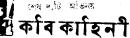
কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে রবিশঙ্কর

সম্প্রতি কমলচন্দ্র ওয়েলফেয়ার সেণ্টারের সাহায্যে বিনা পারিশ্রমিকে এক উপভোগ্য সেতার-অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। শ্রীবিমল চট্টোপাধ্যায় ও সুনীলা রায়ের সৌজন্যে সভাকারের সংগীত পরিবেশনার ও আস্বাদনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। মঞ্চের ওপর পণ্ডিতজীর আশেপাশে—সর্বশ্রী রাইচাঁদ বড়াল, কেরামতুল্লা খাঁন, শ্যাম গাঙ্গুলী, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেক শিল্পী রসিক ও সংগীত বোদ্ধাদের বসিয়ে দেওয়ার শিল্পীর মেজাজ যেন আত্মপ্রকাশের প্রেরণায় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

"পূরিয়া-কল্যাণ" রাগে আলাপ সুরু হয়। কল্যাণ অঙ্গকে প্রবল করে রাগের ভক্তিভাব ও গাম্ভীর্য—ভাবঘন পরিবেশ নেমে এল রবীন্দ্রসদনের বিরাট প্রেক্ষাগৃহের মন্দ্রসপ্তক থেকে সুরু করে মধ্যমসপ্তক পরিক্রমা করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিস্তার তারসপ্তকে স্বল্পস্থিতির পরই খরজেরভাবে জোড়ের অঙ্গে ফিরে পূর্বাঙ্গপ্রধান রাগকে জমিয়ে তুললেন। ঠোক-ঝালার অঙ্গে ছন্দ-বৈচিত্র্যে তাঁর সৃষ্টিশীল মনটি যেন কথা কয়ে উঠেছে।

রবিশংকরজীকে ধন্যবাদ যে তিনি এমন গম্ভীর রাগের পর বহুশ্রুত "মাঝ-খাম্বাজ" না বাজিয়ে "মিশ্র-পিলু'র সৌন্দর্য-মাধুর্যলোকে আমাদের মনকে পৌঁছে দিলেন তাঁর অকৃপণ বৈচিত্র্যসম্ভারের সমারোহে। মসীদখানি গতের কোমল সুষমায় বিস্তার অঙ্গের তানের পর গতের মুখ চৌদুনে নিয়েই দ্রুত গতের চিত্তহারী বন্দেজ ধরা, ছন্দের তালে তালে আনন্দে আবেগে অগণিত শ্রোতার চিত্ত যেন নেচে উঠল। "পিলু"—সাধারণতঃ ঠুংরী অঙ্গেই বাজে। কিন্তু ঠুংরীর রসসমৃদ্ধ চিত্র যেন কলাবন্তী ঢংএর তান অলংকারের ঠাসবুনোনির পরিপ্রেক্ষিতে বিদগ্ধ রসিকেরও কৌতূহলী অধ্যয়নের বস্তু হয়ে উঠেছিল। কাফি ও ভৈরবী ঠাটমিশ্রিত এই রাগে একাধারে কাফির বর্ণ সমাবেশ অন্যাধারে ভৈরবী কারুণ্য, কখনও ক্ষিপ্র ছুট্‌তানের বিদ্যুতে কখনও বিস্তারের বিস্তীর্ণ আধারে জমজমার মধুগুঞ্জনে যে নিশ্ছিদ্র রসঘন রূপসৃষ্টি করেছে, তা প্রতি মুহূর্তের উপভোগের বস্তু। বিভিন্ন ধাঁচের তানের পর গতের মুখে ফিরে আসবার সৌন্দর্যে তিনি আজও অতুলনীয়। রাগভাব প্রকাশের জন্য কখনও পঞ্চমের, কখনও খরজের তারের ছোঁয়া লাগিয়ে শব্দসৃষ্টিতে হারমনি এনেছেন কিন্তু মধ্যমের তারের পর্দার রেশ এতটুকুও ব্যাহত হয়নি। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। 'রাগমালা'র অঙ্গে বিভিন্ন রাগের আবির্ভাব ও তিরোভাবের বিদ্যুৎঝলক পিলুর ওপর চকিতদ্যুতি বিকীর্ণ করেই মিলিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে 'মিশ্র' হলেও পিলু 'পিলু'ই। কানাই দত্তর সঙ্গত তাঁর স্বাভাবিক মানে প্রতিষ্ঠিত।

মধ্য কলিকাতা সংগীত সম্মেলন

রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত মধ্য কলিকাতা সংগীত সম্মেলনের অনুষ্ঠানে আধুনিক ও মার্গসংগীত উভয় প্রকার সংগীতই পরিবেশন-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিভিন্ন রুচির শ্রোতার আকর্ষণের বস্তু হয়েছিল।

মার্গসংগীতের আসরে প্রথমেই নাম করতে হয় শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের। শিল্পী ধরলেন 'বসন্ত'। আরম্ভেই একটি ত্রি-সপ্তকব্যাপী সাপটতান নিয়ে গান সুরু করাটা চিরচলিত প্রথার বিরোধী হলেও, শিল্পীমনের সৃষ্টি-বৈভবের কারিগরির ঔজ্জ্বল্যে তার ক্ষতিপূরণ ঘটেছে। তারপর বাঙলা রাগসংগীতের যেন বন্যা প্রবাহিত করলেন। কতকালের চেনা সেই 'যদি মনে পড়ে', 'ফুলের দিন যদি', 'তব লাগি ব্যথা' —নতুন রঙে সুরে বাজনায় যেন নতুনরূপে প্রতিভাত। শিল্পীকে তার নিজস্ব মেজাজে পাওয়া এবং উপভোগ করাটা ভাগ্যের কথা। অতএব এই অনুষ্ঠানটির জন্য উদ্যোক্তৃবৃন্দ অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

উদীয়মান তরুণ প্রতিভার মধ্যে শ্রীমতী শান্তি মুখোপাধ্যায় আমাদের আনন্দ দিয়েছেন তাঁর দুটি অনুষ্ঠানেই। প্রথমটি রাজ্যপালের জন্য আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে 'সোহিনী' রাগ, দ্বিতীয়টি 'কলাবতী'। এঁর কণ্ঠস্বরের মাধুর্য, তানের সাবলীলতা ও আত্মবিশ্বাস প্রশংসনীয়। পরিবেশনা-পদ্ধতি আর একটু সুবিন্যস্ত ও বিস্তারের অঙ্গ পরিশীলিত হলে স্বমানে প্রতিষ্ঠিত হতে এঁর দেরী হবে না।

শ্রী এ টি কাননের 'যোগশেষ' ও ঠুংরী সীমিত পরিসরেও স্বচ্ছ ও ক্রমপর্যায়ের সুশৃংখল পদ্ধতিতে ন্যস্ত।

মার্গসংগীতের আসরের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন কণ্ঠসংগীতে শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক, যন্ত্রসংগীতে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়।

এঁরা উভয়েই আপনাপন উচ্চমানে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে শ্রোতাদের আশা পূর্ণ করেছেন। তবে প্রথমের দিকে অনেক অনাবশ্যক বিরক্তিকর অনুষ্ঠান দ্বারা অকারণ বিলম্ব ঘটিয়ে এই দুই জনপ্রিয় শিল্পীর অনুষ্ঠানকে সংক্ষিপ্ত করায় শ্রোতারা স্বভাবতই ক্ষুণ্ন হয়েছেন। এইদিকে উদ্যোক্তাদের আর একটু নজর দেওয়া উচিত ছিল।

আধুনিক গানের আসরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ভি বালসারা আসরে আশানুরূপ সাড়া জাগিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য হোল শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্যামলী মুখোপাধ্যায়ের গান। শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রাণবন্ত ও সুরেলা আওয়াজের আভাস এঁর কণ্ঠেও মেলে। এই প্রতিশ্রুতিসম্পন্না শিল্পীকে পেয়ে শ্রোতাদের খুশিই দেখা গেল।

সুরসভা

গত ৮ই মে সন্ধ্যায় বালিগঞ্জস্থিত রবিতীর্থ ভবনে সুরসভা কর্তৃক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'শুভ জন্মোৎসব এক অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। 'হে নূতন দেখা দিক আর বার' উদ্বোধন সঙ্গীতের পর রবীন্দ্রমূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। এরপর রথীন চৌধুরীর পরিচালনায় 'বসন্ত বিদায়' গীতালেখ্য পরিবেশিত হয়। সঙ্গীতাংশে ছিলেন রঞ্জিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রা মুখোপাধ্যায় দীপ্তি রায়, মমতা ঘোষ, প্রগতি রায়, জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, পুতুল বসাক, মৈত্রেয়ী দাস, সাবিত্রী ভট্টাচার্য, কল্পনা মিত্র রথীন চৌধুরী ও কিশোর নন্দী।

গীতশ্রী সংগীত শিক্ষালয়ের সপ্তদশ বার্ষিক সম্মিলন

গত ২২শে এপ্রিল সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে গীতশ্রী সংগীত শিক্ষালয়ের সপ্তদশ বার্ষিক সম্মিলন উদযাপিত হয়। উদ্বোধনী ও দীক্ষান্ত ভাষণে সংগীতাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ সান্যাল মহাশয় সমাজ গঠনে ও চরিত্র গঠনে সংগীত ও নৃত্যের উপযোগিতার উপর জোর দেন। প্রধান অতিথি ও সভাপতির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে মাননীয় উপ-পৌরপ্রধান শ্রীশিবকুমার খান্না ও শ্রীসুহৃদ রুদ্র। অনুষ্ঠানে শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা শ্রীমতী অনিমাবালা দত্তকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। পরে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা বিচিত্রানুষ্ঠানে একক সংগীত নৃত্যনাট্য প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। রমা দত্ত, হেমা বসাক, লিলি বসাক, আরতি বসাক প্রভৃতি অংশগ্রহণকারী ছাত্রীবৃন্দ অকুণ্ঠ প্রশংসা পান।

—চিত্রাঙ্গদা

সংবাদপত্রে স্মরণীয় খেলার স্বাক্ষর

শঙ্করবিজয় মিত্র

জাতির সেবায় একটি সংবাদপত্র শতবর্ষ উৎসর্গ করে এসেছে। এই দুর্লভ গৌরব-বাহী অমৃতবাজার পত্রিকা দেশকে সর্ব বিভাগে উন্নত করবার জন্য যে দুরূহ সাধনা করে এসেছে, খেলাধুলোর ক্ষেত্রও তা থেকে বঞ্চিত হয়নি। কলকাতার মাঠে যেদিন সমগ্র জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে বাঙালী তরুণদল ইংরেজদের করতলগত গৌরবকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল সেই স্বপ্নময় দিনটিকে অমৃতবাজার পত্রিকা স্বাগত জানিয়ে তরুণ দলটিকে আখ্যা দিয়েছিল "অমর-একাদশ"। এই শিরোনামায় এক আবেগাপ্লুত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয়—"গত শনিবার মোহনবাগানের অমর-একাদশ তাদের অসাধারণ কৃতিত্বে পশ্চিম দুনিয়ার চোখে জাতির মর্যাদাকে উচ্চে তুলে ধরেছেন। এই অমর-একাদশের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

"আমাদের জয় হয়েছে, আর সে জয় শারীরিক যোগ্যতার ক্ষেত্রে। এতকাল শারীরিক দিক দিয়ে বাঙালীরা অতি দুর্বল বলে আখ্যা পেয়ে আসছিল।

"এই ঘটনাগুলিকে আমরা যেন আমাদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার কাজে লাগাই এবং আমাদের পূর্ণতা পথে এগিয়ে নিতে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিয়োজিত করি। সেই সঙ্গে যাঁরা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং নব নব ক্ষেত্রে প্রেরণালাভে সহায়তা করছেন তাঁদের প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা বোধ যেন আমাদের হৃদয় পূর্ণ করে।"

আর "স্মরণীয় জনসমাবেশ" শিরোনামা দিয়ে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হল—"শীল্ড টুর্ণামেন্টের ফাইনালে বহুপ্রতীক্ষিত মোহনবাগান ও ইস্ট ইয়র্কের খেলা ক্যালকাটা মাঠে অনুষ্ঠিত হল গত শনিবার। ময়দানের কোথাও আর তিলধারণের স্থান ছিল না। জনসমাবেশ সকল হিসেবকেই ছাড়িয়ে গেছে। সমাবেশে আশি হাজার বা তারও বেশি লোক জমেছিল। দূর-দূরান্তর থেকে লোক এসেছে, পাটনা থেকেও এক ভদ্রলোক এই খেলা দেখতে এসেছিলেন। হাওড়া ও বর্ধমানের মধ্যে স্পেশ্যাল ট্রেণ যাতায়াত করেছে। মোহনবাগান যে অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়েছে লোকে তা কখনও ভুলতে পারবে না।"

১৯১১ সালে ২৯শে জুলাই ভারতের পুরোধা মোহনবাগান এ্যাথলেটিক ক্লাব আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হলে প্রাচীনতম জাতীয়তাবাদী অমৃতবাজার পত্রিকা ৩১শে জুলাই এইভাবে স্বাগত জানিয়েছিল। বিরাট বিজয়েও অমৃতবাজার পত্রিকা উচ্ছ্বাসে উচ্ছল না হয়ে, যে সংযত ও শোভন ভাষায় অভিনন্দন জানিয়েছে তা যে কোন সংবাদ-পত্রের আদর্শস্থল।

রয়টার এই খেলা সম্পর্কে ইংলণ্ডে যে তারবার্তা প্রেরণ করে তা এই—"জাতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এই প্রথম একটি ভারতীয় দল গোরা সেনাদলের সেরা সেরা দলগুলোকে হারিয়ে দিয়ে আই এফ এ শীল্ড জিতেছে। মোহনবাগান দলটি পুরোপুরি বাঙালীদের টিম। আজকের ফাইনাল খেলায় অসাধারণ আগ্রহ ও উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয় এবং কলকাতা ময়দানে আশি হাজার বাঙালী জমা হয়েছিল বলে মনে হয়। এদের বেশির ভাগই খেলা দেখতে পায় নি, ঘুড়ি ওড়ান দেখে এরা খেলার ফলাফল ঠিক করে। যখন তারা জানতে পারল যে, ইস্ট ইয়র্ক ২—১ গোলে পরাজিত হয়েছে, তখন যে দৃশ্যের অবতারণা হয় তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বাঙালীরা তাদের গায়ের শার্ট ছিঁড়ে ফেলে তা উড়িয়ে দিয়ে উল্লাস করতে থাকে। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় যে, কোন সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ ঘটে নি। ইউরোপীয় দর্শকরা বেশ শান্ত মেজাজেই ছিলেন এবং বাঙালীরা পরাজিত গোরা দলকেও অভিনন্দিত করে ভাল খেলার জন্যে।"

লণ্ডনের ডেলি মেল পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়—"সেরা গোরা টিমসমূহের বিরুদ্ধে এই জয় নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। কলকাতার পচা গরমের দোহাই দিয়েও তা খাটো করা যায় না; বাঙালীরা এই গরমে খেলতে অভ্যস্ত একথা বলে।

৪ঠা আগষ্ট তারিখে বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকা মন্তব্য করে—"বাঙালীদের একটা দল ব্রিটিশ সেনাদলের সেরা সেরা দলগুলিকে হারিয়ে দিয়ে আই এফ এ শীল্ড জিতেছে—তাদের আশি হাজার দেশবাসীর আনন্দধ্বনির মধ্যে। এতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই। শারীরিক যোগ্যতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও উপস্থিত বুদ্ধিতে যে দল শ্রেষ্ঠ, সেই দলই বিজয়ী হয়।"

সিঙ্গাপুর ফ্রি প্রেসের সংবাদদাতা লিখলেন—"ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন শীল্ডে ইষ্ট ইয়র্কস ও মোহনবাগানের মধ্যে ফাইনাল খেলা দেখবার জন্য আজ বিকেলে দর্শকদের যে ভিড় হয়েছিল, ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে তেমন ভিড় আর কখনও হয় নি। কম করে এক লাখ লোক জমেছিল বলে মনে হয়। হাজার হাজার লোক খেলা দেখতেই পায় নি।.............জনতা অতি সুশৃংখল, বাঙালীরা বিশেষ করে শোভন আচরণ দেখিয়েছে। খেলাও হয়েছে অতি সুন্দর। সুনাম অনুযায়ী খেলে ইস্ট ইয়র্ক প্রথম গোল করলে জনতার রব এক মাইল দূর পর্যন্ত শোনা যায়। প্রথমার্ধের শেষে গোরা দল এক গোলে এগিয়ে থাকে।

"দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান দল দৈত্যের মত খেলতে থাকে এবং আরম্ভের দশ মিনিটের মধ্যে তারা গোলটা শোধ দিয়ে দেয়। বাঙালী দর্শকরা আনন্দে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে। এর দু' মিনিটের মধ্যে মোহনবাগান দ্বিতীয় গোল করলে যে দৃশ্যের অবতারণা ঘটে তা কথায় বর্ণনা করা যায় না। এইভাবে ১৯১১ সালে বাঙালী দলটি আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়। সকলেরই অভিমত, ভাল টিমই জিতেছে। ইস্ট ইয়র্কের মত দলকে পরাজিত করতে তাদের অতি উচ্চস্তরের খেলা খেলতে হয়েছে। সারাক্ষণই অতি পরিচ্ছন্ন খেলা হয়েছে।"

মৌলনা মহম্মদ আলি সম্পাদিত কমরেড পত্রিকা লিখেছিল "মোহনবাগানের গৌরবময় বিজয়ে আমরাও তার আনন্দ ও প্রশংসার ভাগিদার হচ্ছি সারা টুর্নামেণ্টে টিমটি বেশ ভাল খেলেছে এবং নৈপুণ্যের জোরেই শীল্ড জিতেছে। টিমের গুণাগুণ সম্পর্কে মতামত দানে যোগ্য ব্যক্তিরা সকলেই একথা স্বীকার করেছেন এবং আমরা এটা লক্ষ্য করে খুবই আনন্দিত যে, কেউই একথা বলেন নি—মোহনবাগান ভাগ্যের জোরে জিতেছে।"

তৎকালীন বহুল প্রচলিত সাপ্তাহিক 'মুসলমান' লিখেছিলেন—

"গত শনিবার শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলায় দেশী দল মোহনবাগান গোরা দল ইষ্ট ইয়র্কের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ায় সারা দেশ জুড়ে শুধু আনন্দপ্লাবনের কারণই ঘটায় নি, একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, মরদের খেলায় তারা কারও চেয়ে খাটো নয়। ......মোহনবাগানের সাফল্যে কলকাতায় পুরুষোলি খেলাধুলোয় একটা নব-যুগের সূচনা হল। যে অসাধারণ দক্ষতা ও সাহসিকতা—এক কথায় ভালো খেলাতে যা কিছু দরকার তার সব কিছুর মোহনবাগান "অভ্রান্ত প্রমাণ" রেখেছে ক্রীড়ানুরাগীরা তাই তার আন্তরিক প্রশংসা করেছে।

"এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে মোহনবাগান দল বাঙালী হিন্দুদের নিয়ে গঠিত হলেও তা কোন জাতি-বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর সর্বব্যাপী আনন্দস্রোতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই অবগাহন করেছে। মুস্লিম স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যরা আনন্দে আত্মহারা হয় এবং তাদের হিন্দু ভাইদের বিজয়ে আনন্দের আতিশয্যে তারা মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকে।"

ইংরাজ পরিচালিত সান্ধ্য পত্রিকা 'এম্পায়ারে' লেখা হয়—"ইস্ট ইয়র্কের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের মহা-বিজয়ের ৪৮ ঘণ্টা পরেও এই ঘটনার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি হয়নি। এই সাফল্য অসামান্য, ভারতের ফুটবলের ইতিহাসে একে সর্বোত্তম অধ্যায় বলা চলে। আই এফ এ শীল্ড টুর্নামেন্টের ফাইনালে সর্বপ্রথম এই একটি ভারতীয় টিমই উন্নীত

হতে পেরেছে বলে নয়, এই প্রথম একটি ভারতীয় দল শীল্ড বিজয়ী হতে পেরেছে। আর ভারতীয়ই বা বলি কেন? এই টিম তো শুধু বাঙালীদের টিম, দলের প্রতিটি সদস্যের জন্ম ও কর্ম বাঙলায়। তাদের মধ্যে দু'জনের বয়স মাত্র উনিশ বছর.........

"মোহনবাগান মহান্ সম্মানের অধিকারী, এই একাদশ খেলোয়াড় তাদের নিজেদের বা তাদের ক্লাবেরই গৌরবস্থল নয়, সমগ্র জাতির গৌরব এবং ফুটবল খেলার গৌরব। একাধিক দিক থেকে তারা কলকাতা ফুটবল দলের গৌরব। কলকাতার সম্মান বিপন্ন হতে বসেছিল, স্থানীয় বে-সামরিক ও সামরিক সকল দলই পরাজিত হয়েছিল; বাকী ছিল শুধু মোহনবাগান এবং তারাই বিপন্ন সম্মান উদ্ধারে অগ্রসর হয়। মোহনবাগানই সব সিভিল মিলিটারী মিলিয়ে কলকাতার সুনাম রক্ষা করেছে।"

ষ্টেটসম্যান পত্রিকার খেলার বিবরণে লেখা হয়—"ইষ্ট ইয়র্কসায়ার দলকে খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়ে স্বীকার করতে হবে, মোহনবাগানের জয় ভাগ্যের জয় নয়। শিবদাস ভাদুড়ী ফরোয়ার্ড হিসাবে তাদের দলের খেলোয়াড়দের তুলনায় উন্নত নৈপুণ্যের অধিকারী। মোহনবাগানের অধিনায়ক সেদিন মাঠের মধ্যে সবচেয়ে কুশলী খেলোয়াড় ছিলেন এবং তাঁরই অতুলনীয় খেলার জোরে মোহনবাগান বিজয়ী হতে পেরেছে।"

এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ষ্টেটসম্যান মোহনবাগানের সাফল্যে অভিনন্দন জানায়। মন্তব্যে বলা হয়—"মোহনবাগানের সাফল্যকে যদি অনাবিল ক্রীড়া প্রসারের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে উদীয়মান খেলোয়াড় সমাজের পক্ষে উপকার সাধিত হবে।"

ইংলিশম্যান পত্রিকায় এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়—"এই বিজয় যে কোন টিমের পক্ষে মহান গৌরবের বিষয়।... মোহন কথাটার মানে মনোহারী। বাংলা সংবাদপত্রগুলিতে এই কথাটিকে নিয়ে অনেক কিছু লেখা হচ্ছে। মোহন যে ফল দেখিয়েছে, নামের সঙ্গে তার সংগতি রয়েছে। তা সত্যি সত্যি ভারতীয়দের মনমোহন।"

মডার্ন রিভিউ মাসিক পত্রিকায় লেখা হয়—"একটা ফুটবল খেলার সাফল্যে মাথা খারাপ করার কিছু নেই। পৌরুষ ও নেতৃত্বগুণ প্রয়োজন হয় এমন সব বিষয়ে আমরা অনেক উচ্চতর যোগ্যতার অধিকারী।"

বিখ্যাত 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় ৩০শে জুলাই (১৯১১)—"দি মোহনবাগানস্" শিরোনামায় এক ইংরেজী কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতার মর্মার্থ—

"ফুটবল খ্যাতি মাথায় ধরেছ
　　বন্ধু তোমরা ধন্য
পরাজিত করি ইংরাজ দলে
　　সেরা বলি যারা গণ্য
তোমাদের জয় অতি সুমহান
　　শান্ত শোভনদীপ্ত
সাহসিকতার আধারেতে মোড়া
　　দেখে হই মোরা তৃপ্ত"

ফাইনাল খেলার আগে থেকেই কলকাতার আকাশ বাতাস মোহনবাগানের প্রসঙ্গতেই ভরে উঠেছিল সে বছর। তার কারণ মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে দুর্ধর্ষ মিড্লসেক্সকে পরাভূত করে। ২৪শে জুলাই মিড্লসেক্সের সঙ্গে প্রথম দিনের খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। এই সময় থেকেই সমস্ত কলকাতা সবুট গোরা সৈন্যের প্রচণ্ড দাপটের বিরুদ্ধে শীর্ণ-শান্ত বাঙালী ছেলেদের অসাধারণ কুশলী খেলার পরিচয় পেয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এই সময়কার কলকাতার জনসাধারণের মানসিক উদ্দীপনায় দেখতে পাওয়া যায় বোম্বাইয়ের টাইমস অব ইণ্ডিয়ার ইলাস্ট্রেটেড উইকলির বিবরণ থেকে—বৃহস্পতি ও শুক্রবার প্রতিটি বাঙালীর মাথা উঁচু হয়ে উঠেছে। ট্রামে, অফিসে এবং যে সব জায়গায় বাবুরা একত্রে জমায়েৎ হয়েছে সেখানে একমাত্র প্রসঙ্গ খালি পায়ে খেলে বাঙালী ছেলেরা কিভাবে বৃটিশ রাজের সবুট সেনাদলকে নাচিয়ে নাস্তানাবুদ করেছে।"

২৪শে জুলাই মিড্লসেক্স দলের সঙ্গে মোহনবাগানের প্রথম সেমি-ফাইনালের প্রসঙ্গে ইংলিসম্যানের বিবরণে দেখা যায়—"ফুটবল খেলায় এত ভিড় কলকাতায় এর আগে কখনও দেখা যায় নি। দর্শকদের মধ্যে বহু ইউরোপীয় মহিলাও ছিলেন। মাঠের চারপাশের গাছে গাছে মানুষ। এত প্রচণ্ড ভিড় হয় যে, সমস্ত ব্যবস্থাপনা বানচাল হয়ে যায়। টাচ্ লাইন পর্যন্ত লোকের ভিড় জমে যায়।"

এই খেলাটিতে প্রতিদল একটি করে গোল করেছিল। সেই খেলায় মিড্লসেক্স দলের গোলরক্ষক পিগট্ অসাধারণভাবে খেলেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গোল করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই মরশুমে পিগট্ ন'টি পেনাল্টি বাঁচিয়ে রেকর্ড করেছিলেন। এই পিগটের বিরুদ্ধে শিবদাস ভাদুড়ী প্রথম ম্যাচে যেভাবে মাথা ঘামিয়ে গোল করেছিলেন, তাতে ধন্য ধন্য পড়ে যায় এবং তাঁর খেলার কথা লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।

২৬শে জুলাই মিড্লসেক্সের সঙ্গে দ্বিতীয়বার খেলা হয় এবং মোহনবাগান তিন গোলে বিজয়ী হয়। এই খেলায় মোহনবাগানের সেণ্টার ফরোয়ার্ড অভিলাষ ঘোষের সঙ্গে সংঘর্ষে পিগটের চোখে চোট লাগে এবং পিগটকে একটা চোখ বেঁধে খেলতে হয়। পিগটের এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে মোহনবাগানের পুরোভাগের পাঁচজন খেলোয়াড়ই তৎপর হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তিন গোলে বিজয়ী হয়।

এই খেলা সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' মন্তব্য করে—মোহনবাগান সারাক্ষণ সুন্দর পরিচ্ছন্ন ও কুশলতাপূর্ণ খেলা খেলে। তাদের প্রাধান্য এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে, শেষের দশ মিনিটকাল তারা সামরিক রক্ষণভাগকে যেন মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলে।

এইভাবে মোহনবাগানের ফাইনালে উত্তরণে সমগ্র দেশে এমন একটা বাতাবরণ রচিত হয়, যাতে দেশের মানুষগুলোকে ফুটবল পাগল করে তোলে। পথে-ঘাটে, ট্রামে-ট্রেনে, হাটে-বাজারে দু'চারজন লোক জমলেই মোহনবাগানের খেলার কথা, শিবদাসের ড্রিব্লিং-চাতুর্য ও গোরা নাচানো ছলাকলা, অভিলাষ ঘোষের দুর্ধর্ষ সাহসিকতা, পুরোভাগ ও রক্ষণভাগের প্রতিটি খেলোয়াড়ের প্রতিটি গতি আলোচনা হতে থাকে। ফাইনাল খেলার দিন তাই যে সমস্ত কলকাতা কেন সমস্ত বাংলাদেশের লোক ময়দানে ভেঙে পড়বে তাতে আর বিস্মিত হবার কিছু নেই। তা'ছাড়া সেমি-ফাইনালের ২৬শে জুলাই'এর খেলার পর থেকে ২৯শে জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন সংবাদপত্র ফাইনালের জনতা সম্পর্কে অনুমান করতে শুরু করে। অবশ্য দেখা যায় যে, সব অনুমানকে তুচ্ছ করে সেদিন বাংলাদেশের মানুষ মোহনবাগানকে জাতীয় চেতনার উদ্বোধকরূপে বরণ করে নেয়।

১৯১১ সালের ২৯শে জুলাই তারিখটা বাংলার জাতীয় ইতিহাসে তাই এক বিশেষ দিকচিহ্ন নিয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে। পরাধীন ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভের আশা-আকাঙ্খার উৎসমুখ যেন মোহনবাগানকে অবলম্বন করে সেদিন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ইষ্ট ইয়র্কশায়ার গোরা টিমটি সেদিন শাসক ইংরাজ-জাতির প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয় এবং তার পরাজয় যেন ভারতবাসীর নিকট সমগ্র ইংরাজ-জাতির হারস্বীকাররূপে গৃহীত হয়। সমগ্র রুদ্ধ আবেগ সেদিন মোহনবাগানকে ঘিরে প্রকাশের পথ পায়। তাই সেদিন মোহনবাগানের একাদশ খেলোয়াড় জাতীয় 'হিরো' রূপে গণ্য হয়। এই দলকে অভিনন্দন ও আপ্যায়নের একটা জোয়ার বইতে থাকে। প্রতিটি ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও পদস্থ ব্যক্তি অভিনন্দন জানাবার জন্য এগিয়ে আসেন।

এই আবেগ আতিশয্য প্রশমনে একদিকে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও অপরদিকে সংবাদপত্র যে ভূমিকা সেদিন নিয়েছিল তা একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য এবং প্রায় ষাট বছর আগের এই ঘটনা বর্তমান কালের একটা অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে বলে মনে হয়।

অভিনন্দন অনুষ্ঠান ছাড়াও বহু লোকের কাছ থেকে খেলোয়াড়দের নানাবিধ উপহার দানের প্রস্তাব আসতে থাকে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ বিনীতভাবে সে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সময় জনৈক পত্রলেখক অমৃতবাজার পত্রিকায় জানতে চান যে, বিজয়ী খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করবার জন্য রাজা-রাজড়ারা মোটা মোটা অংকের টাকা উপহার দিতে চাইছেন বলে যে গুজব রটেছে, তার কোন ভিত্তি আছে কি?

এই ব্যাপারের পর অনেকে অর্থ-সাহায্য দিয়ে টিমকে ইংলণ্ডে পাঠাবার জন্য প্রস্তাব করতে থাকেন। ক্লাব কর্তৃপক্ষ এই উৎসাহ-আতিশয্যকে আমল দিতে রাজী হন নি।

অমৃতবাজার পত্রিকা শতবার্ষিকী-উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরের সঙ্গে ইডেনে আয়োজিত ত্রিদলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী তিন দলের অধিনায়ক—অরুময় (মোহনবাগান), পরিমল দে (ইস্ট ও জন (মহমেডান স্পোর্টিং)।

খেলাধুলা

দর্শক

পত্রিকা শতবার্ষিকী ফুটবল লীগ

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ আয়ুষ্কাল পূর্তি উপলক্ষে ত্রিদলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন সার্থক হয়েছে। এই খেলা দেখার জন্য কলকাতা শহর এবং শহরতলীর ক্রীড়ানুরাগী জনসাধারণের মধ্যে যে পরিমাণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল, তা অনেকেরই কল্পনার বাইরে ছিল। জনসাধারণের সুবিধার্থে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণ কলকাতা, বেহালা এবং হাওড়া শহরে চল্লিশটির বেশী কেন্দ্রে টিকিট বিক্রীর ব্যবস্থা করেছিলেন। বিরাট রঞ্জি স্টেডিয়ামে খেলার আসর পেতেও কিন্তু শেষপর্যন্ত টিকিটের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

এই ফুটবল প্রতিযোগিতার যে ঐতিহাসিক তাৎপর্য তা জনসাধারণ মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই ঐতিহাসিক খেলার সঙ্গে নিজেদের স্মৃতিবিজড়িত করতে পরম উৎসাহিত হয়েছিলেন বলেই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই ত্রি-দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছে মোহনবাগান ক্লাব—যার ঐতিহ্য ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছে। মোহনবাগান ক্লাবের সুদীর্ঘ ৮০ বছরের জীবন-পরিক্রমায় যে-সব ঐতিহাসিক সাফল্যের নজির আছে, অমৃতবাজার শতবার্ষিকী ট্রফি তাদেরই সঙ্গে সসম্মানে যুক্ত হল।

ভারতবর্ষের অতি জনপ্রিয় তিনটি ক্লাব—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলকে নিয়ে অমৃতবাজার শতবার্ষিকী ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার তালিকা তৈরী হয়েছিল। কলকাতার এই তিনটি দলেরই সর্বভারতীয় খ্যাতি। বিরাট সাফল্যের সূত্রে এই তিনটি দল ভারতীয় ফুটবল খেলার আসরে বাংলার মুখোজ্জ্বল করেছে।

আলোচ্য শতবার্ষিকী ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী খেলায় ইস্টবেঙ্গল ১—০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে ২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিল। মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলা ২—২ গোলে ড্র যায়। এই খেলাটি খুবই উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। বিরতির সময় মহমেডান ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে তারা দ্বিতীয় গোল দিয়ে ২—০ গোলে অগ্রগামী হয়। কিন্তু খেলার বাকি সময়ে মোহনবাগান দুটি গোল শোধ দিয়ে শেষপর্যন্ত খেলার ফলাফল ড্র করে। লীগের শেষ খেলায় নেমেছিল মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গল দলের অনুকূলেই ছিল খেলার পরিস্থিতি। ইস্টবেঙ্গল ২ পয়েন্ট হাতে নিয়ে খেলতে নামে। লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ পেতে তাদের মাত্র ১ পয়েন্টের দরকার ছিল। অপরদিকে মোহনবাগানের প্রয়োজন ছিল ২ পয়েন্টের। অর্থাৎ লীগের খেতাব পেতে মোহনবাগানকে এই খেলায় জিততেই হবে। মোহনবাগান শেষপর্যন্ত তাদের সমর্থকদের হতাশ করেনি। তারা ২—০ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করে ঐতিহাসিক অমৃতবাজার শতবার্ষিকী ট্রফি জয়ী হয়। লীগের এই শেষ খেলায় দুই পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীর খেলা দেখতে ইডেন উদ্যানে অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়েছিল।

রবিবারের (মে ২৬) প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় পত্রিকা শতবার্ষিকী স্মারক ট্রফি বিজয়ী মোহনবাগান ১—০ গোলে আই এফ এ একাদশ দলকে পরাজিত করে তাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখে। এই খেলার শেষে পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর খেলোয়াড়, রেফারী ও লাইন্সম্যানদের পুরস্কার এবং স্মারক বিতরণ করেন এবং তাঁর ভাষণে বলেন, "দেশের প্রত্যেকটি বড় শহরেই একটি করে স্টেডিয়াম থাকলেও, ভারতীয় ফুটবল খেলার পীঠস্থান এই কলকাতায় স্টেডিয়াম নেই। রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়াম প্রয়োজনের তুলনায় যথোপযুক্ত নয়।...কলকাতায় শীঘ্রই একটি মানানসই স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে। তিনি পত্রিকা শতবার্ষিকী ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজনের জন্য সকলের পক্ষ থেকে অমৃতবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষদের ধন্যবাদ জানান এবং পত্রিকা শতবার্ষিকী স্মারক ট্রফি বিজয়ী মোহনবাগান দলকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, "ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে মোহনবাগান একটি অতি পরিচিত নাম এবং ভারতের সবচেয়ে বেশী পরিচিত এই দলটির এই ট্রফি বিজয় খুবই কালোপযোগী হয়েছে।"

এই অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানিয়ে

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন, "দেশের সর্বত্র নানা অনুষ্ঠান পরিচালনার সময় সর্বসাধারণের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও ভালবাসা পেয়েছি।...অমৃতবাজার পত্রিকার শত-বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া-বিভাগের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান এইখানে শেষ হল। দ্বিতীয় পর্বে বিদেশের কয়েকটি নামকরা ফুটবল দল এবং একটি বিদেশী ক্রিকেট দলকে বর্তমান বছরের শীতকালে আমন্ত্রণ করে আনার চেষ্টা চলছে। ত্রি-দলীয় ফুটবল খেলা উপলক্ষে দর্শনী বাবদ যে-অর্থ সংগৃহীত হয়েছে, খরচখরচা বাদ দেওয়ার পর যে টাকা অবশিষ্ট থাকবে, তার সমস্তটাই [illegible] প্রতিষ্ঠানকে বিতরণ করা হবে অথবা রাজ্যে খেলাধুলোর উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।"

চূড়ান্ত লীগ তালিকা

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	[illegible]	বিঃ	পঃ
মোহনবাগান	২	[illegible]	১	[illegible]	২	৩
ইস্টবেঙ্গল	২	০	১	১	২	২
মহঃ স্পোর্টিং	[illegible]	[illegible]	১	১	[illegible]	১

প্রদর্শনী খেলার ফলাফল

মোহনবাগান ১ ঃ আই এফ এ ০

গোলদাতা

[illegible] (মোহনবাগান) ৩, সাদাতুল্লা (মহঃ স্পোর্টিং) ২, নঈম (মোহনবাগান) ১, মনুময় (মোহনবাগান) ১ এবং পরিমল দে (ইস্টবেঙ্গল) ১।

ইংলিশ এফ এ কাপ

লণ্ডনের ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে আয়োজিত এফ এ কাপ (ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশন কাপ) ফাইনালে ওয়েস্ট ব্রমউইচ দল অপ্রত্যাশিতভাবে এভারটন দলকে পরাজিত করে ঐতিহাসিক এফ এ কাপ জয়ী হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না-হওয়াতে শেষ-পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় খেলতে হয়। এই অতিরিক্ত সময়ের খেলার তৃতীয় মিনিটে ওয়েস্ট ব্রমউইচ দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড জেফ আস্টল জয়সূচক গোলটি দেন।

এই দিনের ফাইনাল খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে লক্ষাধিক দর্শক সমাগম হয়েছিল। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মাঠে প্রবেশ করতে গিয়ে শত-শত জাল টিকিট-ধারী শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে যায়। যারা মাঠে ঢুকতে না পেয়ে স্টেডিয়ামের চার পাশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধায় এবং আসল টিকিট-ধারীদের হাত থেকে আসল টিকিট ছিনিয়ে নেয়। এ ব্যাপারে পুলিশের হাতে বেশ কয়েকজন হাঙ্গামাকারী গ্রেপ্তারও হয়েছে। এফ এ কাপ ফাইনাল খেলা উপলক্ষে এ-রকম উত্তেজনা, জাল টিকিটের ছড়াছড়ি এবং টিকিট নিয়ে কাড়া-কাড়ি এক অভূত-পূর্ব ঘটনা। দুই দলের খেলোয়াড়রাও এই উত্তেজনা থেকে নিজেদের ঠিক রাখতে পারেন নি—খেলা সুরু হওয়ার পনের মিনিটের মধ্যে দুই দলের কয়েকজন

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ত্রিদলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলার দৃশ্য। খেলাটি ২-২ গোলে ড্র যায়।

উত্তেজনা সারা বিশ্বের শান্তিকামী জনসাধারণের কাছে আজ এক বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এফ এ কাপের বিবিধ রেকর্ড

সর্বাধিকবার জয় ঃ

৭বার—অস্টন ভিলা (১৮৮৭, ১৮৯৫, ১৮৯৭, ১৯০৫, ১৯১৩, ১৯২০ ও ১৯৫৭)

৬বার—ব্ল্যাকবার্ণ রোভার্স এবং নিউ-ক্যাসল ইউনাইটেড।

উপর্যুপরি ৩ বার জয় ঃ

(১) ওয়াণ্ডারার্স (১৮৭৬-৭৮) এবং (২) ব্ল্যাকবার্ণ রোভার্স (১৮৮৪-৮৬)

ফাইনালে সর্বাধিক গোল ঃ

৭টি—ব্ল্যাকবার্ণ ৬ ঃ শেফিল্ড ওয়েন্সডে ১ (১৮৯০); ব্ল্যাকপুল ৪ ঃ বোল্টন

ফাইনালে সর্বাধিক গোলে জয় ঃ

১৯০৩ সালের ফাইনালে ডার্বি কাউন্টি দলের বিপক্ষে বারি দল ৬—০ গোলে জয়ী হয়।

ফাইনালে লণ্ডন সহরেরই দুই দল ঃ

১৯৬৭ সাল—টটেনহ্যাম হটস্পার (২)ঃ চেলসি (১)।

প্রথম বিভাগের ইংলিশ ফুটবল লীগ

১৯৬৭-৬৮ সালের প্রথম বিভাগের ইংলিশ ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি দল চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। গত ৮১ বছরের ইতিহাসে তাদের এই ২য় চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ। তারা ১ম চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ১৯৩৬-৩৭ সালের মরশুমে।

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ত্রিদলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের পুরস্কার। ফটো : অমৃত

দল তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গত-বছরের চ্যাম্পিয়ান ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড দলের থেকে ২ পয়েন্ট বেশী পেয়েছে।

ইংল্যাণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত এই এফ এ কাপ নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয় ১৮৭২ সালে। সেই সূত্রে বিশ্ব ফুটবল খেলার ইতিহাসে প্রথম নকআউট প্রতিযোগিতার সূচনা।

ডেভিস কাপ

১৯৬৮ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলের 'এ' বিভাগের ফাইনালে জাপান ৪—১ খেলায় ফিলিপাইনকে পরাজিত করেছে। জাপান বনাম ফিলিপাইনের ডেভিস কাপের খেলায় জাপানের এইটি সপ্তম জয়: অপর দিকে ফিলিপাইন ৫ বার জাপানকে পরাজিত করেছে।

এই জয়লাভের সূত্রে জাপান পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে 'বি' বিভাগ বিজয়ী ভারতবর্ষের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। এই খেলা হবে টোকিওতে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ডেভিস কাপের খেলায় ভারতবর্ষের বিপক্ষে জাপান কোন দিন জয়লাভ করতে সক্ষম হয় নি।

"গে'য়ো যোগীর ভিখ মিলে না"

উপরের বাংলা প্রবাদ বাক্যটির নির্মম সত্যতা শুধু আমাদের দেশের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা, কৃষ্টি-সভ্যতা, ঐতিহ্য এবং গণতন্ত্রের মহিমায় যে দেশ গদগদ—যে দেশের পার্লামেন্ট শুধু পার্লামেন্ট নয়, মাতৃত্বের সম্মানে গরবিণী 'মাদার পার্লামেন্ট'—এই ইংল্যাণ্ডের মাটিতে গুণীজনের আক্ষেপ কি কম!

ইংল্যাণ্ডের পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মুখপাত্র হিসাবে মিডলসেক্স কাউন্টি ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ফ্রেড টিটমাস অভিযোগ করেছেন, তাঁর স্বদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের তুলনায় বিদেশের খেলোয়াড়রা অনেক বেশী বেতন পেয়ে থাকেন। স্বদেশের খেলোয়াড়দের থেকে বিদেশী খেলোয়াড়দের বেশী টাকার বেতন দেওয়া হবে না একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেও শেষ পর্যন্ত কাউন্টি ক্লাবের কর্মকর্তারা কথার খেলাপ করে আসছেন। ফ্রেড টিটমাস ফাঁকা আওয়াজ করেননি; দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট খেলোয়াড় ডেভিড লয়েড ল্যাঙ্কাসায়ার কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাব থেকে সম্ভবতঃ দু'হাজার পাউণ্ড পাবেন। অপর দিকে ইংল্যাণ্ডের টেস্ট খেলোয়াড় টম গ্রেভনীকে উরস্টারসায়ার ক্লাব বারশত পাউণ্ড বেতন দিচ্ছেন। ফ্রেড টিটমাসের আরও অভিযোগ —রবিবারের খেলায় পেশাদার খেলোয়াড়দের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। বেতন বৃদ্ধির দাবী উত্থাপন করলেই ক্লাব কর্তৃপক্ষরা সঙ্গে সঙ্গে অর্থাভাবের কথা বলে থাকেন, অথচ লর্ডস মাঠে নতুন স্ট্যাণ্ড এবং লিসেস্টারে নতুন প্যাভেলিয়ান তৈরীর বেলায় টাকার অভাব হয় না।

ইংল্যাণ্ড আধুনিক কালের ক্রিকেট খেলার জনক ও প্রতিপালক; এবং সেইসূত্রে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকর্তা। সেই ইংল্যাণ্ডের সন্তানদেরই মুখে আক্ষেপ—অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘার দেশ
দার্জিলিঙ

চারিদিকে শৈলমালা, পদপ্রান্তে ভাসমান মেঘখণ্ড, সূর্যোদয়ের অনন্য দৃশ্য, সবুজ বনানীর মাঝে ছোট ছোট ঘর, পাহাড়ীয়া নাচগানের জমকাল আসর, নিপুণ হাতের নিখুঁত কুটীর শিল্প — এই হচ্ছে **দার্জিলিঙ**।

দার্জিলিঙে লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজ (ফোন ৬৫৬) কিংবা ইকনমি লজ 'শৈলাবাসে' (ফোন ৬৮৪) ওঠাই আপনার সুবিধে। অপেক্ষাকৃত নির্জন পরিবেশে কালিম্পঙেও একটি লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজ (ফোন ৩৮৪) আছে।

বুকিং এর জন্য লজের ম্যানেজারদের সঙ্গে অথবা নীচের যে কোন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

ট্যুরিস্ট ব্যুরো
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
দার্জিলিঙ (ফোন ৫০, টেলিগ্রাম: DARTOUR) কিংবা
৩/২, ডালহৌসি স্কোয়ার ঈষ্ট, কলিকাতা-১
ফোন: ২৩-৮২৭১, টেলিগ্রাম: TRAVELTIPS

নির্দ্দিষ্ট তারিখের ১৫ দিন পূর্ব্বে কলিকাতা ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে বুকিং বন্ধ হয়।

IPC-TB 767 BEN

৮ম বর্ষ
১ম খণ্ড

৫ম সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

FRIDAY, 7th. JUNE, 1968 শুক্রবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

পোশাকের ঝড়ো হাওয়া প্রসঙ্গে

১৭ই জ্যৈষ্ঠের অমৃতে 'অঙ্গনায় 'পোশাকের ঝড়ো হাওয়া' প্রবন্ধে প্রমীলা কিছু অযৌক্তিক উক্তি করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমার চিঠিটি প্রকাশিত হলে আনন্দিত হব।

তিনি লিখেছেন 'শ্লীল-অশ্লীলের মহিমা নিয়ে মাথা ঘামানোয় আমাদের ততটা রুচিও নেই, আর সেজন্য প্রয়োজনীয় সময়ও সংক্ষেপ।' তাঁর রুচি ও সময় কি খালি 'আজকের রূপসজ্জা'র বর্ণনা দেওয়ায় তাই তিনি অতি নিখুঁতভাবে নৈপুণ্যসহকারে লিখেছেন—"তার দেহের খাঁজে খাঁজে শাড়ীটি সুন্দরভাবে বসেছে, শ্লীলভঙ্গেশ ব্লাউজ তার ভরাট যৌবনে লাবণ্যের সৃষ্টি করেছে" আর তাই পথচারিবৃন্দ 'মনে মনে তারিফ করছে মেয়েটির রুচির।' সত্যই, দেহটা খুলে দেখানই রুচির পরিচায়ক আর তার মধ্যেই আছে 'আধুনিকীকরণের মিঠে আমেজ।' তাহলে ধরতে হয়, নগ্নতাই হচ্ছে আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার একমাত্র লক্ষণ।

তিনি লিখেছেন, "একবার আমরা পেছনে ফিরে যদি প্রাচীন সভ্যতার পোশাকে নিদর্শন খুঁজে ফিরি, তখন আর আমাদের আপশোস হবে না, গেল গেল করে দেশ-কাল মাথায় করবো না।" এখানে বলা দরকার ideas are not absolute, irrespective of social conditions but, grow out of social condition'. প্রাচীন যুগে সমাজের যে অবস্থা-পারিপার্শ্বিকতা ছিল, আজ কি তাই আছে? এমনকি বৌদ্ধযুগেও এদেশে মেয়েরা বক্ষ অনাবৃত রাখতেন, মধ্যযুগে দেখা যায় সামন্তপ্রভুরা প্রজাদের ঘর থেকে মেয়ে লুঠ করে আনতেন—কাজেই, তৎকালীন সমাজব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে মানসিকতা-সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল, আজকের সমাজে শ্লীল-অশ্লীলের বিচার নিশ্চয়ই সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে হবে না। সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষের ভাবজগতে ক্রমশই উচ্চতর চিন্তাধারার সৃষ্টি হচ্ছে; কাজেই, দৃষ্টিভঙ্গীর এই তথাকথিত 'উদারতা' ও 'প্রগতিশীলতা' দেখাতে গিয়ে আমরা নিম্নতর চিন্তাধারায় তথা বর্বরতার অন্ধকারে ফিরে যেতে পারি না। আরও কথা হচ্ছে, 'উদারতা'র সীমারেখাটি কোথায় এবং উদারতা বলতে কি anarchism বা বিকৃতি বোঝায়?

তিনি তারপর লিখেছেন—'শ্লীল-অশ্লীল ত নিজের কাছে।' ব্যাপার হচ্ছে, তাঁরা যদি সমাজের বাইরে বনে-জঙ্গলে গিয়ে এইসব আধুনিক 'মিষ্টি পোশাক' পরেন বা, এমনকি উলঙ্গ হয়েই ঘুরে বেড়ান ত আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু তাঁরা যতক্ষণ সমাজে বাস করছেন, ততক্ষণ সমাজ-নীতি মেনে চলতেই হবে। তাই তাঁরা যখন নাভির নিচে অজন্তা স্টাইলে শাড়ি পরে অর্ধনগ্ন অবস্থায় নির্লজ্জভাবে রাস্তায় চলাফেরা করেন, তখন কি মনে হয় তাঁরা 'পুরুষের সমান দক্ষ হয়ে' 'হালকা চালে চলতে ফিরতে অভ্যস্ত' হয়েছেন? নাকি, মধ্যযুগীয় সমাজের মেয়েদের মত নিজেদের খালি পুরুষের ভোগ্যপণ্য হিসাবেই ভাবেন? তাঁরা 'আধুনিকীকরণের মিঠে আমেজে' 'প্রাণভরে...নিঃশ্বাস' নিতে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের মর্যাদা খোয়ান। তাই পুরুষেরা তাঁদের সহকর্মিণী, সহধর্মিণী হিসাবে ভাবতে গিয়ে আসলে একটি মেদবহুল 'দেহের খাঁজ'-সর্বস্ব মাংসের ঢিপি দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ান। এইসব 'আধুনিকা' 'প্রগতিশীলা' মহিলাবৃন্দকে over-sexed বললে কি অযৌক্তিক হয়? 'পোশাকের পরিবর্তন অতীতেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে'—কিন্তু সেই পরিবর্তন কখনই মেয়েদের যৌনতাসর্বস্ব করে তুলবে না, অর্থাৎ উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কৃতিকে নিম্নাভিমুখী করবে না।

রজত চৌধুরী
কলিকাতা—৭

॥ বার্ষিক সংখ্যা সম্পর্কে ॥

'এ লেখাটা ঠিক উতরোয়নি' এ-ধরনের মন্তব্যের সঙ্গে নতুন লেখক অনেকেরই কমবেশি পরিচয় আছে। কিন্তু কি হলে লেখা ঠিক উতরোয় তার উত্তর অনেকেই দিতে পারেন না। লেখকের পক্ষে তখন মহা সমস্যা। সবকিছুই আছে অথচ গল্প হয়নি বা লেখা উতরোয়নি শুনলে মেজাজ টকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আবার গল্প উতরেছে শুনলে ঠিক সেরকমই আনন্দ হয়। দুয়ের মধ্যে ফারাক নজরে পড়তে কাজেই বিলক্ষণ দেরি হয়ে যায়। তার আগে পর্যন্ত অন্ধকারে হাতড়ে ফিরতে হয়। অমৃত-এর ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'একালের ছোট গল্প' পড়ে গল্প কখন উতরোয় সে সম্পর্কে অনেকটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

এই আলোচনায় অচিন্ত্যবাবু বিরাট বিশ্লেষণের সুযোগ নিয়েছেন। কিন্তু আলোচনার কোথাও তিনি তত্ত্বগত কচকচানির মধ্যে আটকে যাননি। বরং তিনি একাধিক ছোটগল্পের আলোচনায় ডুব দিয়েছেন এবং দেখাতে চেষ্টা করেছেন গল্প কখন উতরোয়। যেসব গল্প তিনি আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তা প্রায়ই পাঠকের জানাশোনার মধ্যে। গল্প আলোচনার ব্যাপারে তিনি একান্ত নবীন লেখকের গল্প সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। গল্পে সমস্ত উপাদানের সঙ্গে আরেকটি জিনিস একান্ত প্রয়োজন, তা হলো আনন্দচমৎকারিতা, যা না হলে গল্প ঠিক উতরোয় না। এ-কথা মনে রেখেই গল্পকারকে এগুতে হবে। তিনি যদি যথার্থ রস সৃষ্টি না করতে পারেন, তাহলে হাজার উৎকর্ষ সত্ত্বেও গল্প মার খেতে বাধ্য।

পরিশেষে তিনি আরেকটি কথা বলেছেন, 'নগ্নতার শেষ আছে, আবরণেরই শেষ নেই। আর, যার শেষ নেই সেই সৌন্দর্য আর কল্যাণই সাহিত্যের আদিকথা।' আজকের অশ্লীলতার শোরগোলের মধ্যে প্রায় সবাই যখন চরম উন্মার্গগামিতার পথ বেছে নিয়েছেন, তখন এরকম মনোবৃত্তি নিয়ে গল্পকাররা যদি তৈরি হন, তবে সাহিত্যের পক্ষে তা হবে পরম কল্যাণকর।

মদন রায়
কলকাতা-১২

দলত্যাগের পরিণতি প্রসঙ্গে

অমৃতের তৃতীয় সংখ্যায় 'দলত্যাগের পরিণতি' সম্পাদকীয়ের জন্য ধন্যবাদ। দলত্যাগের পরিণাম যে সংসদীয় রাজনীতিতে কি সংকট সৃষ্টি করতে পারে, তা আজ আর কারো অজানা নেই। আমাদের দেশের একাধিক রাজ্য এই সংকটের শিকার হয়েছে। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে বলবৎ হয়েছে রাষ্ট্রপতির শাসন। এতে জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

ব্যক্তিস্বার্থে দলত্যাগ করে সংকট সৃষ্টি করা যায় কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। হরিয়ানার নির্বাচন সেদিক থেকে চোখ খুলে দিয়েছে। ভবিষ্যৎ দলত্যাগকারীরা এদিকটা ভেবে দেখবেন, এ-আশা করা অন্যায় হবে না। শুধু তাই নয়, আগামী ক'-[illegible] মাসের মধ্যে কয়েকটি প্রদেশে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দলত্যাগীরা সেখানেও খুব একটা কল্কে পাবেন বলে মনে হয় না। ভোটারদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার [illegible]শা বেশিদিন চলতে পারে না।

তাছাড়া প্রতিটি নির্বাচনেই প্রচুর অর্থব্যয় হয়। সেদিক থেকে অনেক কিছু ভাববার আছে। জনসাধারণের অর্থ নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের এরকম ছিনিমিনি খেলার অধিকার আছে বলে মনে হয় না। তাঁদের খেয়াল পুরণের জন্য এক নির্বাচনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে না হতে আর একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করে টাকার অপচয় করার মত ক্ষমতাও আমাদের নেই। নির্বাচনের পর জনপ্রতিনিধিরা যেন এ-কথাটি সযত্নে মনে রেখে সেভাবেই চলার চেষ্টা করেন।

দীপক রায়
কলকাতা-৭

অমৃত

একটি মহাদেশের কথা

এ সপ্তাহে আমরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি মহাদেশের প্রতি, তার নাম আফ্রিকা। ভারতবর্ষের মানুষ আফ্রিকার দিকে মমতা, সমবেদনা ও প্রত্যাশার দৃষ্টি নিয়েই তাকিয়েছিল। একই দুঃখ ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে এই দুই দেশের মানুষকে পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকদের শাসনকালে। ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম থেকে আফ্রিকার অনেক দেশ তাদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করবার প্রেরণা লাভ করেছিল, এ-কথা বিশিষ্ট আফ্রিকান নেতারাই বলেছেন। আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রণী পুরুষ মহাত্মা গান্ধী প্রথমে তাঁর এই মহৎ কাজ শুরু করেছিলেন আফ্রিকার মাটিতে, দক্ষিণ আফ্রিকায় নিপীড়িত ভারতীয় ও নিগ্রো সমাজের মধ্যে। সেইদিক থেকে বিচার করলেও ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা মনের সূত্রে একত্র বাঁধা।

ইয়োরোপীয় সভ্যতাভিমানীরা এর নাম দিয়েছিল অন্ধকার মহাদেশ। আমরা জানি, এর চেয়ে ভ্রান্ত ও অবজ্ঞাসূচক পরিচয় আর কিছু হতে পারে না। ইয়োরোপীয়দের যাবার অনেক আগেই আফ্রিকার মানুষ নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। ঔপনিবেশিকদের নিষ্ঠুর নির্যাতনে তা বরং ধ্বংস হয়েছে। মানুষের অপমানের বোঝা হয়েছে ভারী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতের স্বাধীনতালাভ প্রাচ্যদেশে উপনিবেশবাদ উচ্ছেদের সূচনা করে। আফ্রিকা মহাদেশেও তার ঢেউ লাগে। বৃটিশ, ফরাসী, বেলজিয়ান ইত্যাদি উপনিবেশবাদী শক্তি বুঝতে পারল যে, আর এত বড় মহাদেশকে রাজনৈতিক দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। ধাপে ধাপে তারা সেখান থেকে সরে আসতে লাগল। সবাই সহজে আসেনি। যুদ্ধ, রক্তপাত ও সংঘর্ষের পর আফ্রিকার মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আফ্রিকার বুকে এখনো রয়ে গেছে উপনিবেশের কলঙ্ক। দক্ষিণ আফ্রিকা তো বহুদিন আগেই শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুদের করায়ত্ত। পর্তুগীজ বোম্বেটেরা এখনো আগলে রয়েছে এঙ্গোলা, মোজাম্বিক। রোডেশিয়ায় শ্বেতাঙ্গ বোম্বেটেরা জোর করে ক্ষমতা দখল করে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে রেখে দেওয়া হয়েছে বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের অভিভাবকত্বে। এ যেন বেড়ালের হাতে মাছ খবরদারির ভার দেওয়ার মতো। কঙ্গো থেকে বেলজিয়ানরা রাজনৈতিক ক্ষমতা সরিয়ে নিলেও তাদের ভাড়াটে সৈন্যরা সেখানে সমানে উৎপাত সৃষ্টি করে চলেছে তার সম্পদ লুঠ করবার ষড়যন্ত্র হাসিলের জন্য। এইভাবে আফ্রিকার বেদনা তীব্রতর। তার একাংশ স্বাধীন হলেও অপরাংশে চলেছে নির্লজ্জ ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও শোষণ।

অন্যদিকে আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলোর কাছ থেকে যে-নেতৃত্ব আশা করা গিয়েছিল, তা পূর্ণ হয়নি। অধিকাংশ স্বাধীন আফ্রিকান দেশে সামরিক বা আধা-সামরিক শাসন কায়েম হয়ে বসেছে। কঙ্গোর প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিক লুমুম্বার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর থেকে স্বাধীন আফ্রিকায় যে-রক্তের নেশা লেগেছে তা এখনো দূর হয়নি। নাইজেরিয়ায় চলেছে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ বিয়াফ্রানদের পৃথক স্বাধীন সত্তাকে কেন্দ্র করে। আলজিরিয়া বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করলেও, সেখানে সামরিক অভ্যুত্থানের মারফৎ ক্ষমতা দখল করেছেন জেনারেল বুমা দিয়েন। ঘানার প্রেসিডেন্ট এনক্রুমা গদিচ্যুত হয়ে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন গিনিতে। মধ্য আফ্রিকার অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রেও কম-বেশি একই অবস্থা। সুস্থ গণতন্ত্রের পরীক্ষা চালাতে বহু আফ্রিকান দেশই যেন দ্বিধাগ্রস্থ। সেদিক দিয়ে পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলো—কেনিয়া, উগান্ডা, টানজানিয়া, নিয়াসাল্যান্ড ইত্যাদি রাজনৈতিক স্থায়িত্ব অর্জন করেছে। এদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগও ঘনিষ্ঠতর। বিশেষ করে কেনিয়ায় প্রচুর ভারতীয় বংশজের বাস। কিন্তু সম্প্রতি তাদের নাগরিকত্ব নিয়ে একটা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে। এ-অঞ্চলের কোনো কোনো দেশে কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যও চালিয়েছে। এসবই খুব দুঃখের কথা। নতুন-জাগা আফ্রিকার সঙ্গে কোনো কারণেই ভারতবর্ষ কোনোরূপ মনোমালিন্য সৃষ্টি করতে চায় না। আফ্রিকার মুক্তির অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিল ভারতবর্ষ। শোষণের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের উভয়ের স্বার্থ এক। কোনো ভ্রান্ত প্রচার যেন তা নষ্ট না করে।

বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আফ্রো-এশীয় ঐক্যের প্রধান উদ্গাতা ছিলেন জওহরলাল নেহরু। আজ সেই ঐক্যের কথা খুব বেশি শোনা যায় না। কারণ, আফ্রো-এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ এই ঐক্যকে জাগ্রত থাকতে দিচ্ছে না। তা সত্ত্বেও আফ্রিকার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে। এই মহাদেশের মানুষ দীর্ঘ শতাব্দী ধরে যে-নিপীড়ন ও বঞ্চনা সহ্য করেছে, তার তুলনা বিরল। আফ্রিকার মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও তার ব্যক্তিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অর্থ মানবাত্মারই জয়। রাজনৈতিক ক্ষুদ্র স্বার্থ দিয়ে তা আমরা বিচার করব না। আফ্রিকার নেতারা যদি সে-কাজে ব্যর্থ হন, তাহলে তার চেয়ে বেদনার আর কিছু থাকবে না। আমাদের প্রিয়তম কবি রবীন্দ্রনাথ সবাইকে ডেকে বলেছিলেন, মানহারা এই মানবীর কাছে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য। আজ তার জাগরণের দিনে সেই প্রতিশ্রুতি আমরা ভুলতে পারি না। আফ্রিকার নেতাদেরও সেই কথা মনে রাখতে হবে যে, দুঃখের দিনে যারা ছিল সমব্যথী, স্বাধীনতার নতুন আস্বাদ পেয়ে তাদের যেন তাঁরা না ভোলেন।

আফ্রিকায় কয়েকদিন

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(মানবিক-বিদ্যায় ভারতের জাতীয় অধ্যাপক)

দুই পুরুষ আগেও ঘানা বা গানা-র লোকেরা শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর ছিল। প্রধানতঃ খৃষ্টান মিশনারীদের চেষ্টায়েই হালে সেখানে শিক্ষা-বিস্তারের কাজ চ'লছে। আকানদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। গানা বা Gold Coast অর্থাৎ স্বর্ণ-উপকূলের উত্তরাঞ্চলে ইসলাম ধর্মেরও ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। কিন্তু বেশীর ভাগ আকানরা এবং উত্তরাঞ্চলের অনেক উপজাতি এখনো তাদের আগের ধর্মই আঁকড়ে আছে। তারা তাদের পূর্ব-পুরুষের ধর্ম এবং সংস্কৃতি নিয়ে এখন গর্ব বোধ করে। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ক্রমশই বাড়ছে। উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা শিক্ষার দিক থেকে কিছুটা অনগ্রসর। দক্ষিণাঞ্চলের আকানদের কথ্য ভাষার সঙ্গে উত্তরের এই ভাষার মিল নেই। ওখানকার অন্যান্য উপজাতি থেকে, আকানরাই শিক্ষাদীক্ষায় বেশি উন্নত। আকানরা সারা আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা উন্নত উপজাতিগুলির মধ্যে একটি। তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেখানকার শিক্ষা, শাসনকার্য, বিভিন্ন আন্তঃরাজ্য ও উপজাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের প্রধান মাধ্যম ইংরেজি। শিক্ষাবিস্তারে সরকার এবং মিশনারিরা প্রচুর সাহায্য ক'রছেন। তাদের নিজের ভাষায় কোনো বর্ণমালা নেই। রোমান লি[illegible]তে কিছুটা অদল-বদল ক'রে লেখা বা[illegible] কাজ চালানো হয়। এই ভাষায় এখ[illegible] প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ এবং সাহিত্য রচিত হ'চ্ছে। শিক্ষালাভের জন্য উপজাতির মধ্যে এখন যথেষ্ট আ[illegible] ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। তারা প্রথমে নিজের ভাষা শেখে। তারপরই শেখে ইংরেজি। ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহ থাকলেও সৌভাগ্যবশতঃ নিজেদের ভাষার প্রতি তারা এখনো শ্রদ্ধাশীল।

প্রাথমিক-শিক্ষা-বিস্তারের জন্য একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে। এখন সেখানে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ চ'লছে। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য মাঝে-মাঝে প্রচার-অভিযান চালানো হয়। কয়েকটা গ্রাম মিলে সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতায় শিশু এবং বয়স্কদের জন্য স্কুল তৈরী ক'রছে। ভাষা Chwi চ্বী বা Twi তুই অথবা Fanti ফান্তি Gan গাঁ Dagombe দাগোম্বী, যাই হোক না কেন —রোমান হরফেই সকলকে শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে। ছাত্রদের উৎসাহ দানের জন্য প্রতি বছর পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে ছাত্র এবং শিক্ষকদের সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। তারপর চলে নাচ-গান। দূর দূর গ্রাম থেকে লোকেরা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসে দল বে'ধে।

১৯৫৪ সালের আগস্টে Kumasi কুমাসিতে যাই। কুমাসি আকানদের জাতীয় কেন্দ্র। ওখানকার ভারতীয় বণিকদের আতিথ্য নিয়ে দিন-কয়েক ছিলুম সেখানে। স্বর্ণ-উপকূল এবং পশ্চিম-আফ্রিকার অন্যান্য রাজ্যের অর্থনৈতিক জীবনে ভারতের হিন্দু, সিন্ধী ব্যাপারীরা একটি বিশেষ স্থান ক'রে নিয়েছে। ওখানকার আমদানী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির বেশির ভাগই সিন্ধীদের হাতে। তারা ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশ থেকে নানা জিনিস-পত্র সেখানে আমদানী করে, আর ভারত থেকে আনায় হাতে-বোনা কাপড়। সিন্ধী বন্ধুদের সবাই হিন্দু, এবং ব্যবসায়ে সততার জন্য তারা সেখানে বেশ জনপ্রিয়। বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষ করে নাইজেরিয়ায় তারা ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আফ্রিকার ছাত্রদের বৃত্তি দেয়। তাদের সেখানে সম্মানের চোখে দেখা হ'য়ে থাকে। কুমাসিতে শ্রীতীর্থদাস চুহরমল নানকানির বাড়িতে আমি ছিলুম। কুমাসিতে থাকাকালে শ্রীওয়াসিয়া চোলারাম দাম্বানি-ও ('বাবু' নামে তিনি সমধিক পরিচিত), আমায় অনেক সাহায্য করেছিলেন।

Accra আক্রাতে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মচারীর কাছে আগেই শুনেছিলুম যে, কাছেই এক গ্রামে "সাক্ষর দিবস" উদ্‌যাপন হ'চ্ছে, আশেপাশের গোটাকুড়ি গ্রামের লোক তাতে যোগ দেবে। শিক্ষাবিস্তারের কাজ কতটা এবং কী ভাবে এগোচ্ছে, সেখানে গেলে সে সম্পর্কে আমার একটা ধারণা হবে বলে তাঁরা জানালেন। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের একজন ইংরেজ অফিসার শ্রী Owen Barton আওয়েন বার্টন 'সাক্ষর দিবস'-এর অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য চ'লে গেছেন। সম্মতি পেয়ে, তাঁরা শ্রীবার্টনের কাছে কুমাসিতে আমার যাওয়ার সংবাদ জানিয়ে দিলেন। শ্রীবার্টন আমার ভারতীয় বন্ধুদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে খবর দিয়ে রেখেছিলেন। কুমাসির উত্তর-পশ্চিমে চোদ্দ মাইল দূরে Juoben জুওবেন গাঁয়ে এই অনুষ্ঠান হবে। শিক্ষা অনুষ্ঠান শুরু হবে ১লা আগস্ট বেলা দুটোয়। শ্রীবার্টন আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার ভারতীয় বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন।

কুমাসির একজন প্রখ্যাত ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রীঈশ্বরদাসের বাড়িতে সেদিন দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। অন্যান্য ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও লাঞ্চে এসেছিলেন। ভোজ বা টী-পার্টির আয়োজন করা ওখানকার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। শ্রীঈশ্বরদাসের বাড়িতেই আমি এই প্রথম পশ্চিম-আফ্রিকার জাতীয় খাদ্য Palm Oil Chop বা 'পাম-তেলের তরকারী' এবং 'ফুফু' খাই।

Oil Palm 'তৈল-তালী' ('তেল-তাল') নারকেল গাছের মতো লম্বা এক-কান্ডের গাছ, তার পাতা অনেকটা খেজুরের মতো, আর ফল ধরে সুপারীর মতো থোকা-থোকা। এই ফলের উপরের হলদে রঙের শাঁস থেকে তৈরি হয় Palm Oil 'পাম-তেল'। বাঙলায় একে 'গুয়া-তেল' বলা যায়।

এই তেল পশ্চিম-আফ্রিকায় সর্বত্র আমাদের ঘী বা সরষের-তেল, তিলের-তেল, নারকেল-তেল বা বাদামের-তেলের মতো ব্যবহার করে। খেতে বেশ, সুবাসযুক্ত, আর পুষ্টিকর। এই 'তেল-তালী' আমাদের দেশে এনে চাষ করা যায় না? তা হ'লে ঘী-তেলের একটা সুরাহা হয়।

Fou-fou 'ফৌ-ফৌ', 'ফুউ-ফুউ' বা 'ফুফু' হ'চ্ছে বড়-বড় মানকচু সিদ্ধ—আমাদের কচু (বা আরুই) থেকে অনেক বড়ো। এগুলো খোসা ছাড়িয়ে সিদ্ধ ক'রে, উখলীর মধ্যে পিটে নরম করে। ময়দার লেচির মতন ক'রে, মোমবাতির আকারে গোল্ল ক'রে তৈরী করা হয়। ফুউফুউ পশ্চিম-আফ্রিকার প্রধান খাদ্য। এখন অবশ্য এর সঙ্গে তারা চাল, গম, বাজরা, ভুট্টা ইত্যাদিও খায়। এই 'গুয়া-তেলের চপ' এক ধরণের তরকারি। ছোটো করে মাছ বা মাংস কেটে তার সঙ্গে আলু, বেগুন, লাউ আর অন্য সবজী, ওকরা বা ঢে'ড়শ প্রভৃতি সব কুটে দেয়, এবং তার সঙ্গে কাঁচা বা শুকনো লংকা, গু'ড়ো মশলা দেয়, আর এক ধরণের মটরসু'টি বা মসুর বাটা মিশিয়ে সিদ্ধ করে তাতে সুগন্ধি এই 'গুয়া-তেল' দিয়ে তরকারিটা তৈরী করা হয়। খাবারের রঙটা হয় চমৎকার সোনালি আর বাদামিতে মেশানো, এবং তা খেতে বেশ সুস্বাদু। আমরা যে রকম তরকারি মিশিয়ে ভাত বা রুটি খাই, ও দেশের লোকেরা পাম-তেলের চপে ফুউফুউ ভিজিয়ে ভিজিয়ে খায়। পাম-তেলের চপ খেতে সত্যই ভালো। স্বর্ণ-উপকূলের অন্যান্য ভারতীয়দের মতো ঈশ্বরদাস মহাশয়ের পাচকও আশান্তি উপজাতির লোক ছিল। বিশিষ্ট ইংরেজ পন্ডিত, রাজনীতিবিৎ এবং উপনিবেশ-শাসনকর্তা

স্যার হ্যারী জনস্টোন নাইজেরিয়ার গভর্ণর থাকা-কালে এই খাবারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। আমার মনে হয়, ইতালির মাকারোনি আর মিনেস্ত্রা, ভারতীয় ভাত-তরকারি এবং চাটনি, চীনের চপ-স্যুয়ে এবং চো-মেইন, পারস্য এবং তুর্কীর পিলাফ, পূর্ব-এবং মধ্যএশিয়ার আশপাশ অঞ্চলের শিশ্কেবাব, রুষ দেশের বোর্শ আর শ্চী, হাঙ্গেরির গুলাশের মতোই একদিন পশ্চিম-আফ্রিকার গুয়া-তেলের কারি এবং উত্তর-আফ্রিকার cous-cous কুস্-কুস্ বা ছিল্কেবিহীন গম-সিদ্ধ আর ভেড়ার মাংসের কোর্মাও সুখাদ্য হিসাবে সারা বিশ্বের সমাদর পাবে।

ঈশ্বরদাস মহাশয়ের বাড়িতে খাবারের আয়োজন হয়েছিল পর্যাপ্ত। খেতে খেতে দেরী হয়ে গেল। সিন্ধী বন্ধুদের নিয়ে যখন জুওবেন-এ পৌঁছলুম তখন বেলা সাড়ে তিনটে। দেড় ঘণ্টা দেরীতে পৌঁছানোতে অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক অনেক কিছুই দেখ্তে পেলুম না।

জুওবেনকে একটা ছোটখাটো গ্রামা-শহর বলা যেতে পারে। কিছু সরকারি আপিস-ও আছে। স্থানীয় প্রধান বা জমি-দারের বাড়িও সেখানে। গ্রামের মাঝে একটা খোলা চৌকো মতো জায়গায় সকলে জমায়েত হয়েছে। জায়গাটার চারদিকে আছে কিছু দালান-কোঠা; দেখতে অনেকটা ইংলণ্ডের 'ভিলেজ কমন'-এর মতো। দুপাশে ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সারি দিয়ে মাটিতে ব'সে, অন্য দুদিকে চেয়ারে ব'সে অতিথি-অভ্যাগত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মাঝখানে অনেকটা খালি জায়গা। শুনলুম, ওখানে গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা নাচবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যেখানটায় বসেছেন তার পাশেই বক্তাদের জন্য একটা নিচু মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। স্থানীয় প্রধান বা জমিদার Adjayi আজায়ী, তাঁর পদবী হচ্ছে Krontihene 'ক্রান্তিহেনে', তিনি রাজ্যের এক মন্ত্রী, তখন আক্রায় ছিলেন, গ্রামে অনুপস্থিত।

তাঁর পরিবর্তে পাশের গাঁয়ের একজন জমিদার বা প্রধান অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করছিলেন। তাঁর মাথার উপর ধরা ছিল একটা বিরাট্ ছাতা। প্রারত বা পার্শ্ববর্তী দেশের মতো পশ্চিম-আফ্রিকার সর্বত্র ছাতা রাজকীয় মর্যাদার প্রতীক। তাঁর পাশেই ছিলেন শ্রীবার্টন। চমৎকার দেখতে তিনি: বয়সও কম। পরনে তাঁর খাকী হাফ-প্যান্ট এবং সাদা শার্ট। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁরা আমাকে প্রধানের ছাতার নিচে নিয়ে বসালেন। আমাদের দেখে স্থানীয় লোকেদের মধ্যে ফিসফাস গুঞ্জন শুরু হ'ল। সেখানে শিক্ষাবিস্তারের নানা অসুবিধার কথা শ্রীবার্টন আমায় জানালেন। আমিও তাঁকে বললুম যে, ভারতেও এসব সমস্যা রয়েছে। শ্রীবার্টনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় খবর এবং সহযোগিতার আশ্বাস পেলাম। স্বর্ণ-উপকূলে শিক্ষাবিস্তারের জন্য দেখলুম শ্রীবার্টনের অফুরন্ত উৎসাহ। প্রধানের সঙ্গে করমর্দন ক'রলুম। তাঁর পরনে ছিল পশ্চিম-আফ্রিকার প্রাচীন রীতির পোশাক। তাঁকে অনেকটা ব্রোঞ্জের তৈরী রোমান সিনেটরের মূর্তির মতো লাগছিল। কালো শরীরে সোনার অলংকার জগমগ ক'রছিল। মাথায় ছিল জরির ফিতে জড়ানো মুকুটের মতো টুপী। তাতে পাশাপাশি ভারি সোনার বাট লাগানো। আঙুলে বড়ো বড়ো সোনার আংটি। হাতে রঙিন কাপড়ের ওপর সোনার পাতের বালা। পায়ে সোনার কাজ-করা চামড়ার চপ্পল জুতা। আমার ইংরেজী কথা তিনি বুঝতে পারছিলেন, কিন্তু তিনি এক-বারও ইংরেজিতে কথা বলেন নি। পিছনে তাঁর একজন পার্শ্বচর মাথার খোলা ছাতাটি ধরে রেখেছিল। আমাদের সামনেই ছিল একটা টেবিল। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়দের অধি-কাংশই হয় আফ্রিকার নিজস্ব পোশাকে নয়তো হাফপ্যান্ট ও হাফশার্ট পরে ছিলেন। কয়েকজনের পরনে পুরো ইউরোপীয় পোশাকও ছিল। তাঁরা সরকারী কর্মচারী।

উপস্থিত ছেলেমেয়েদের অনেকেই খালি পা। মহিলা এবং যুবতীরা রঙচঙে আফ্রিকার পোশাক পরিহিত ছিল। অর্থাৎ ভারতের ও ব্রহ্মদেশের লুঙ্গি পরার ধরণে অথবা ইন্দো-নেসিয়ার সারঙ-পরার ধরণে একটা কাপড় লঙ্গার মতো কোমর থেকে পা পর্যন্ত নামানো। তার উপর সাধারণতঃ থাকে একটা আঙিয়া। আগে আফ্রিকায় বেশির ভাগ মেয়েই কোনো বক্ষ-আবরণ ব্যবহার ক'রতো না। ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে, ইন্দো-নেসিয়ায় এবং অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও এটা দেখা যায়। অবশ্য, ক্রমশঃ এটা উঠে যাচ্ছে। আফ্রিকায় মেয়েরা ছোটো করে চুল ছেঁটে ফেলে। তাদের মাথার চুল কোঁকড়া। তারা পাগড়ির মতো করে মাথায় এক টুকরো রঙচঙে কাপড় জড়ায়। এগুলো দেখতে বড়ো আকারের রুমালের মতো। আফ্রিকার মেয়ে-দের মধ্যে মাথায় এটা পরার রেওয়াজ খুব বেশি। ব'লতে গেলে তাদের পরিচ্ছদের এটা একটি বিশেষ অঙ্গ। আপনারা জেনে নিশ্চয় খুশী হবেন যে, মাথা বাঁধার জন্য এইসব দুই গজ লম্বা এক গজ চওড়া কাপড় ভারত থেকেই যায়। এগুলি মাদ্রাজে তৈরী হয়। হাতে-বোনা এই সব কাপড়ে বিশেষ ধরণের নকশা করা থাকে। শুনলুম, লাগোসের একটি ভারতীয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান লাগোসের মেসার্স চেলারাম (নাইজেরিয়া) লিমিটেড, ভারত থেকে প্রতি মাসে ১ হাজার গাঁট এই ধরণের কাপড় আনায়। প্রতি গাঁটে ৮ গজ দৈর্ঘ্য ও ১ গজ প্রস্থের ১২০টি কাপড় থাকে। ওখানে নিয়ে পরে দু'গজ টুকরো ক'রে বিক্রী করা হয়ে থাকে। সারা নাইজেরিয়া জুড়ে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা।

আফ্রিকার মেয়েদের অনেকে ইউরোপীয় পোশাক-ও পরে। লক্ষ্য ক'রে দেখলুম, সেখানকার মেয়েরা দু'দলে বিভক্ত। একদল কাপড় পরে, আর এক দল পরে ইউরোপীয় সেলাই-করা ঘাগরা। সাধারণতঃ 'কাপড় পরিহিতা' মেয়েরা ইংরেজি স্কুলে যায় না। ঘাগরা-পরা মেয়েরা কিছুটা ইংরেজি জানে। ব্যাপারটা আমাদের দেশের শাড়ি-পরা আর গাউন-পরা মেয়েদের মতো। কিন্তু আগে আমাদের দেশের মতন আফ্রিকার উঁচু-নিচু নির্বিশেষে সমস্ত পরিবারেই মেয়েরা শুধুই কাপড় প'রত। আফ্রিকায় শিক্ষিত ছেলেরা আধুনিকা ভেবে স্কার্ট-পরা মেয়েদেরই স্ত্রী-হিসেবে পেতে বেশি পছন্দ করে। তবে আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে মেয়েরা যেমন শাড়ি পরা ছাড়েনি, তেমনি আফ্রিকার মেয়েদের মধ্যেও তাদের নিজস্ব ঢঙে কাপড়-পরার রেওয়াজ দিন-দিন বাড়বে।

আমরা পৌঁছবার আগেই পুরস্কার-বিতরণ-পর্ব চুকে গেছে। রিপোর্ট-পাঠও শেষ। তখন তারা চাঁদা তোলায় ব্যস্ত ছিল। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সমাগত লোকেদের যার যার ক্ষমতানুযায়ী নিরক্ষরতা দূর করার অভিযানে চাঁদা দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হ'ল। একজন যুবক হাতে মাইক নিয়ে শ্রোতাদের চাঁদা দেওয়ার কাজে উৎসাহিত করছিল। তার পরনে ছিল সাদা হাফ-শার্ট এবং খাকী হাফ-প্যান্ট। যুবকটিকে বেশ বুদ্ধিমান মনে হ'ল। খালি পায়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে সে নিজেদের আকান বা আশান্তি ভাষায় এক-নাগাড়ে কী সব ব'লে যাচ্ছিল। কথা বলছিল সে স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। মাঝে মাঝে সম্ভবত সে রসিকতা করছিল। দেখলুম, ছেলে-মেয়ে-যুবক-যুবতীরা হেসে কুটিপাটি। উপস্থিত লোকেরা একে একে উঠে এসে যুবকটির পাশে রাখা একটি বাক্সে সাধ্যমতো অর্থ দান করছিল। বড়োরা শিলিং এবং ছোটো ছোটো ছেলেরা-মেয়েরা ফেলছিল পেনি। পশ্চিম-আফ্রিকায় তখন পাউণ্ড, শিলিং, পেনির প্রচলন ছিল। পার্থক্য শুধু এই, পশ্চিম-আফ্রিকার শিলিং দস্তা আর তামায় মেলানো ধাতুর তৈরী মুদ্রা, আর পেনি-গুলি তামার তৈরী। আফ্রিকার কৃষ্ণকায় লোকেদের কন্ঠস্বর এমনিতেই মিষ্ট। তার ওপর আশান্তি ভাষায় মোলায়েম ক'রে যুবকটি সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছিল। এতে সুফল হয়েছিল খুব। ওদের ওই চাঁদা তোলার ব্যাপার দেখে, আমাদের দেশের কৌটোয় ক'রে রাস্তাঘাটে চাঁদা তোলার কথা মনে এলো। [illegible]রিয়ে দিলে, মহাত্মা গান্ধী কী ক'রে হরিজনদের জন্য চাঁদা তুলতেন। চাঁদা যখন তোলা হচ্ছে, দেখলুম, আমার সিন্ধী বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে দ্রুত কথা ব'লে চলেছে। নিজেদের কাছে খুচরো পয়সা যা ছিল, তা সংগ্রহ ক'রলে। সব মিলিয়ে প্রায় এক পাউণ্ডে দাঁড়াল। আপাতত তারা তাই দান করলে। উদ্যোক্তাদের অনুমতি নিয়ে আমিও দুই পাউণ্ড দান করলুম। এতে এরা খুশীই হ'ল। তার পরে, অনুষ্ঠানও আপাততঃ এখানেই সমাপ্ত। এবারে চলবে সান্ধ্যকালীন নৃত্যানুষ্ঠানের প্রস্তুতি।

শ্রীযুক্ত বার্টন এবং সভাপতি জমিদার মহাশয়ের অনুরোধে সমাগত লোকদের উদ্দেশ্যে আমাকেও কিছু ব'লতে হ'ল। আমি ভারতীয় শুনে, উৎকর্ণ হয়ে তারা আমার কথা শুনছিল। আমি ইংরেজিতে কথা বলছিলুম। সেই যুবক আমার প্রতিটি কথা আশান্তিতে অনুবাদ করে দিচ্ছিল।

একটানা পনেরো মিনিট কথা বলে গেলুম। আমার বক্তৃতায় বললুম ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং নিরক্ষরতা দূর করবার পরিকল্পনার বিষয়, এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে গান্ধীজীর ভূমিকা। এছাড়া পশ্চিম-আফ্রিকার মতো ভারতেও শিক্ষাবিস্তারের পথে যেসব সমস্যা আছে তার কথা উল্লেখ করলুম। সেই সঙ্গে জানালুম বিভিন্ন দেশের প্রতি ভারতের মনোভাব—আর ভারতের আদর্শের কথা। কথা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি এবং নেহেরুর কথা ব'লতে দেখলুম, তাঁরা তিনজনেই ঐ দেশে বেশ পরিচিত। ওদের এ কথাও বললুম, কমনওয়েলথের মাধ্যমে স্বর্ণ-উপকূলের বা গানার লোকেদের সঙ্গে ভারতবাসীর একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ হ'য়েছে। আমি আমার এবং আমার ভারতীয় বন্ধুদের পক্ষ থেকে শ্রীবার্টন এবং প্রধানকে ধন্যবাদ জানালুম। এরপরে সভা থেকে আমরা বিদায় নিলুম।

তারা অবশ্য তক্ষুনি আমাদের ছেড়ে দিলে না। স্থানীয় প্রধান, জুওবেনের জমিদারের গৃহে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল। বাড়িটা ইটের তৈরী, একতলা দালান। ভিতরটা ভারতীয় গৃহস্থের উঠোনের মতো। সামনের দরজা দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকলুম। একটা সরু বারান্দা পেরিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল একটা ঘরে। এটাকে বৈঠকখানা বা 'বাইরের-ঘর' বলা চলে। ঘরটা আধা-ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সাজানো। টেবিল আর চেয়ারে ছাপানো কাপড়ের ঢাকনা, দরজা-জানালায় সুদৃশ্য পর্দা। বুক-শেলফে বই, দেওয়ালে ছবি—ক্যালেন্ডার এবং পারিবারিক ফোটো। আমাদের দেশের বা পৃথিবীর আর দশটা সভ্য দেশের বাড়ীতে যেমন। দীর্ঘাঙ্গ এবং চমৎকার দেখতে কতকগুলি যুবক আমাদের সাদর, এমনকি অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁরা আমাদের লেমোনেড এবং বীয়ার দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। আমি বললুম, যদি আপত্তি না থাকে, বাড়ির ভিতরটা একটু দেখবো। আশান্তিদের ভিতর-বাড়ি দেখার আমার খুব ইচ্ছা ছিল। তাঁরা খুশি হয়েই বৈঠকখানা ঘর থেকে আমাদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। ভিতরে প্রশস্ত উঠোন। উঠোনের এক কোণে কয়েকটা গাছ। সারা উঠোন ইঁট-বাঁধানো; সবকিছু তকতকে ঝকঝকে এবং সুন্দর। আগে উঠোন এবং ঘরের দেওয়াল, শক্ত কাদামাটিতে তৈরী হ'ত। তাতে অনেক কিছু আঁকা থাকত; মাটির উপর উঁচু-ক'রে-কাটা নক্‌শা-কাজ থাক্‌ত। ঘরের দরজায় কাঠে কারুকার্য করা হ'ত, আর চাল হ'ত খড়ের। এই পাকা বাড়িতে তিনদিকে সারি সারি শোবার ঘর। ঘরের আসবাব-পত্র বেশির ভাগই কাঠের, এবং আন্তর্জাতিক মানের। ভিতরে বৈঠকখানা ঘরের বিপরীত দিকে কয়েকটি খড়ে ঢাকা ঘর। ঘরগুলির সামনেটা একেবারে খোলা; পিছনে শুধু একটা মাটির দেওয়াল। দেওয়ালটা আবার বাড়ির সীমানা ঘেরার কাজও ক'রছে। এই খড়ে-ঢাকা ঘরগুলি রান্নাঘর এবং ভাঁড়ার-ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যতদূর মনে পড়ে এই ঘরগুলির সামনেই ছিল একটা টিউবওয়েল। একদিকে ছিল স্তূপ করা জ্বালানি কাঠ। আমাদের চুলা বা উনোনের মতো তিন-ঝিক-ওয়ালা কয়েকটা উনোনও দেখলুম। তখন রান্না চলছিল। এখানে-ওখানে ছিল মাটির বাসনকোসন এবং জলের পাত্র। কয়েকজন যুবতী নানা কাজে এঘর-ওঘর যাওয়া-আসা করছিল। কালো রঙ হ'লেও তাদের বেশির ভাগই দেখ্‌তে ছিল বেশ সুশ্রী-তন্বী, সুঠাম, ঋজু-দেহা, উন্নত-দর্শন। তাদের পরনে ছিল আফ্রিকার জাতীয় পোশাক; মাথায় সেই রুমাল। এতজন ভারতীয়ের আগমনে তাদের চোখে-মুখে ঔৎসুক্য ফুটে উঠেছে। কিন্তু তারা হাসিমুখেই আমাদের অভ্যর্থনা জানালে। এই মেয়েরা হ'চ্ছে পরিবারের ঝী-বউ, দুহিতা বা বধূ। দেখলুম, বিপুল পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য তৈরী হ'চ্ছে। একজন মাঝবয়সী স্ত্রীলোক ভিজানো মটরশুঁটি শিলনোড়ায় বাটছে—অনেকটা আমাদের দেশের তরকারির জন্য মসলা বাটার মতো ক'রে। প্রচুর পরিমাণে ইয়াম্‌ বা মানকচু থেকে খোসা ছাড়ানো হ'চ্ছিল। এগুলি সিদ্ধ ক'রে চটকিয়ে ফউফউ তৈরী করা হবে। টুকরো টুকরো করে সব তরিতরকারি কোটা হ'চ্ছিল। নিশ্চয়ই 'পাম-তেলের চপ' হবে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে এসব দেখলুম। ভারতীয় পরিবারের অন্তঃপুরের মেয়েদের মতোই এদের মনোহর ধরণ-ধারণ, চলন-বলন, কাজ-কর্ম। এসব দেখে মনে হ'ল আফ্রিকার পারিবারিক জীবনযাত্রার সঙ্গে ভারতের মিল রয়েছে যথেষ্ট।

আরও কয়েকটা জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, বেশিক্ষণ থাকতে পারলুম না। কুমাসি ফিরে এলুম। চলে আসার আগে তারা আমাদের বিদায় জানালে। তাদের কখনোই ভুলবো না। বুঝলুম, মনের দিক থেকে সব জাতির মানুষই এক, আর পরস্পরের মিত্র এবং আত্মীয়।।

অপরিচিত আফ্রিকা

দিলীপ মালাকার

আফ্রিকার সংগে আমাদের ভৌগোলিক দূরত্ব খুব বেশী নয়। কিন্তু প্রতিবেশী এই মহাদেশের সংগে আমাদের পরিচয় খুব কমই বলতে হবে। ইউরোপ-আমেরিকার ভৌগোলিক দূরত্ব অনেক কিন্তু সে-সব দেশের সংগে আমাদের পরিচয় অনেক ঘনিষ্ঠ। অপরিচিত আফ্রিকার কথা উঠলে মনে পড়ে আফ্রিকার গহন বন-জংগল, মার্কিন সিনেমার দৌলতে জানা ছিল সভ্যতা-বঞ্চিত আফ্রিকার নগ্ন রূপ। সে আফ্রিকার দৃশ্য বদলাচ্ছে। আফ্রিকা এখন স্বাধীন। স্বাধীন আফ্রিকায় নবজাগরণের খবর এদেশে অল্পই পৌঁছয়।

আমাদের অনেকে ভুল ধারণায় বশবর্তী হয়ে আফ্রিকাকে একটা দেশ হিসেবে ভেবে নেন। আফ্রিকা মহাদেশ। বিচিত্র তার লোকজন, বিচিত্র তার আবহাওয়া। বৈচিত্র্যময় আফ্রিকার পরিধি ৩০,১৫২,৭১২ বর্গ কিলোমিটার। বিপুলায়তন আফ্রিকার লোকসংখ্যা কিন্তু বেশী নয়, মাত্র ৩১৫ মিলিয়ন (একত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লাখ)। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগর, পূর্বে ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, উত্তর-পূর্বে লোহিত সাগর। এশিয়া মহাদেশের সংগে তার সংযোগ ইজিপ্তের সিনাই ভূখণ্ডের সংগে।

উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকার আবহাওয়া মনোরম। বাকিটা গরম ও আরও গরম জায়গা। বিশালাকার নদীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নাইজের, কংগো, জাম্বেজ, অরেঞ্জ ও নীল নদী। বিশাল তার হ্রদ, যেমন, ন্যায়শা, ট্যাঙ্গানিকা, রুডল্ফ। পাহাড়-পর্বতের সংখ্যাও অল্প নয়, কিলিম্যানজারোর উচ্চতা ৫,৮৯৫ মিটার, কেনিয়ার ৫১৯৪ মিটার, এলগন—৪,৩২১ মিটার, রাস দাশিয়ানের উচ্চতা ৪,৬২০ মিটার। সাহারা ও কালাহারি মরুভূমির নাম কে না শুনেছে।

কয়েকটি গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা

কিলিমাঞ্জেরো :

কিবো—	৫,৮৯৫	মিটার
মাওয়েন্সি—	৫,৩৫৩	"
কেনিয়া—	৫,১৯৪	"
রুবেনজোরি—	৫,১১৯	"
রাস দাশিয়ান—	৪,৬২০	"
মেরু—	৪,৫৬০	"
কারিসিম্বি—	৪,৫০৭	"
এংকোলো—	৪,৩৪০	"
এলগোন—	৪,৩২১	"
আবুনা ইওসিফ—	৪,১৯৪	"
জেবেল তুবকাল—	৪,১৬৭	"

প্রধান কয়েকটি নদী

নীল-কাগেরা—	৬,৬৭১	কিলোমিটার
কংগো—	৪,৬৬৭	"
নাইজের—	৪,১৮৪	"
জাম্বেজ—	২,৬৬০	"
অরেঞ্জ —	১,৮৬০	"

কয়েকটি প্রধান দ্বীপ

মাদাগাস্কার—	৫৯৫,৭৯০	বর্গ কিলোমিটার
সোকোত্রা—	৩,৫৮০	"
রিইউনিয়ন—	২,৫১০	"
তেনেরিফ—	২,০৫৩	"

প্রধান কয়েকটি হ্রদ

ভিক্টোরিয়া—	৬৮,১০০	বর্গকিলোমিটার
ট্যাঙ্গানিকা—	৩১,৯০০	"
ন্যায়াশা—	৩০,৮০০	"
চাদ—	১৬,০০০	"
বাঙ্গোয়েলো—	১০,০০০	"
রোডোলফ—	৮,৬০০	"
অ্যালবার্ট—	৫,৩০০	"

নৃ-গোষ্ঠী

সমগ্র বিশ্বের ২৩ শতাংশ জায়গা রয়েছে আফ্রিকায়, কিন্তু লোকসংখ্যানুপাতে মাত্র ৮ শতাংশ বাস করে এই মহাদেশে। এখনও আফ্রিকায় ঘনবসতি দেখা দেয়নি। বিচিত্র এই মহাদেশে মানুষ ও জাতির বৈচিত্র্য আরও বিচিত্র। নৃতত্ত্বের দৃষ্টি থেকে বিচার করলে দেখা যায় পাঁচটি প্রধান নৃগোষ্ঠীর প্রাধান্য ওখানে। (১) **মেলানো-আফ্রিকান** গোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠতাই বেশী। এদের প্রাধান্য সুদান থেকে কেপ অব গুড হোপ পর্যন্ত। রঙ এদের কালো, ঠোঁট পুরু, নাক থ্যাবড়া ও চুল কোঁকড়ান। (২) **নেগ্রিল** গোষ্ঠীর চেহারার লোকজনদের আয়তন খাট। এরাই হচ্ছে পিগমি জাত। (৩) **খোয়াসেন** জাতের লোকেদের সবার নাম কেশিম্যান ও হটেনটট্। এদের চেহারা বেশ ছিপ্‌ছিপে। (৪) **ইথিওপিয়ান** গোষ্ঠীরা ইদানিংকালের জা[illegible]। বহু পুরাতন। (৫) **মেডিটেরি[illegible]** জাতের লোকেরা শ্বেতকায়। এদের বাস সাহারার উত্তরে। উত্তর আফ্রিকার আরবরাই হল প্রধান। আর কয়েক বছর ধরে ইউরোপীয় উপনিবেশকারীরা দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতকায় গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে।

ভাষা

সবশুদ্ধ আটশটি ভাষা চালু আছে আফ্রিকায়। তবে এর মধ্যে সবটাই পৃথক ভাষা নয়। কতকগুলো উপভাষা ছাড়া আর কিছু নয়। পাঁচটি প্রধান ভাষাই আসল। তারই শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে এত উপভাষার সৃষ্টি করেছে। (১) উত্তরে রয়েছে আরবি ভাষা। (২) পশ্চিম আফ্রিকায় বান্তু ভাষার প্রাধান্য। (৩) সুদানি ভাষা চলতি আছে

পশ্চিমের সুদান, গিনি ও কংগোর কিছু অংশে। (৪) কেশিম্যান ও হটেনটট্‌দের ভাষার নাম ক্লিক্‌। (৫) সাহারান ভাষা চলে চাদ্‌, তিবেস্তি ও লিবিয়া মরুভূমি অঞ্চলে। তাছাড়া রয়েছে উপনিবেশকারীদের দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকান ভাষা।

ভাষার মতন ধর্মও অনেক। অ্যানিমিস্ট বা প্রিমিটিভদের ধর্ম, খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্মই প্রধান।

বিশাল আফ্রিকার লোকবসতির ঘনত্ব খুবই কম তা আগেই বলা হয়েছে। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে দশজন। ভারতে লোকবসতির ঘনত্ব একশ জনেরও বেশী। বিগত কয়েকশ বছর ধরে আফ্রিকার জনগণকে ক্রীতদাস করে রাখা হয়েছিল। জীবন-মৃত্যু সবই ছিল প্রভুদের দয়ার ওপর। অনাহার ও রোগেই অর্ধেক সাবাড় হত। গত বিশ বছরে অনেক আফ্রিকান দেশেই কিছু কিছু শিল্প-কারখানার সূত্রপাত হয়েছে। আর্থিক অবস্থা একটু ভাল হওয়াতে আজকাল রোগের ও মৃত্যু-হার কিছু কমেছে। তা সত্ত্বেও সমগ্র আফ্রিকার লোকসংখ্যা ত্রিশ কোটির কিছু বেশী।

এক যুগের মধ্যে আফ্রিকায় অনেক নতুন নগর নির্মিত হয়েছে। আগে এত নগর-শহরের ছড়াছড়ি ছিল না। নগর-জীবন প্রায় ছিল না বললেই হয় সেখানে। কেবলমাত্র নাইজেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে ওরুবা দেশে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত একটামাত্র দুর্গ-শহর ছিল। বাইরের আক্রমণ হলে কৃষকরা তখন ওই দুর্গ-শহরে আশ্রয় নিত। ১৮৩০ সালে আবেওকুটা বলে একটা ছোটখাট শহর ছিল। মরুভূমি অঞ্চলে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাবার পথে আশ্রয়স্থল হিসাবে ক্যান্টনমেণ্ট গোছের শহর থাকত। যেমন টিম্বোকুটু, গাও, কানো। এগুলো হল পশ্চিমে। পূর্ব উপকূলে গড়ে ওঠে বন্দর-শহর, যেমন, সোফালা, মোম্বাসা, মালিন্দি। ঈজিপ্ত ও [illegible] আফ্রিকার আরব দেশের পুরোনো [illegible] কথা আমরা ভুলছি না। কালো আফ্রিকা[illegible] নগর সম্বন্ধেই আমাদের কৌতূহল বেশী।

ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের পর অনেক নতুন নগর-শহর গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ শহরই সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন-কার্য চালাবার জন্যে নির্মিত হয়। যেমন নাইজেরিয়ার ইবাদান, মাদাগাস্কার-এর তানানারিভ। ঔপনিবেশিকদের কাজের সুবিধের জন্যেই গড়ে ওঠে ফরাসী কংগোর ব্রাজাভিল, বেলজিয়ান কংগোর লিওপোল্ড-ভিল্‌, সেনেগালের ডাকার, নাইজেরিয়ার লাগোস ও আইভরি কোস্টের আবিজান। দক্ষিণ আফ্রিকা শিল্পে উন্নত বলে তার নগরের সংখ্যা বেশী, যেমন, ক্যাপ, ডারবান, জোহানেসবার্গ, প্রিটোরিয়া। কালো আফ্রিকার শহরের লোকসংখ্যা ইদানিংকালে অত্যন্ত দ্রুতভাবে বেড়ে চলেছে। গত পঁচিশ বছরে এক ডাকার শহরেই লোকসংখ্যা বেড়েছে ত্রিশ হাজার থেকে আড়াই লাখে।

আফ্রিকার বৃহৎ শহরের লোকসংখ্যা
(হাজার হিসেবে)

শহর	লোকসংখ্যা
কাইরো (ইজিপ্ত)	৪,২২০
আলেকজান্দ্রিয়া (ইজিপ্ত)	১,৮০০
জোহানেসবার্গ (দক্ষিণ আফ্রিকা)	১,১৫০
কাসাব্লাঙ্কা (মরক্কো)	৯৬৫
আলজের (আলজেরিয়া)	৯৪৫
ক্যাবা (দক্ষিণ আফ্রিকা)	৮১০
কিনশাশা (কংগো)	৭৩০
তিউনিশ (তিউনিশিয়া)	৬৯৫
ডারবান (দক্ষিণ আফ্রিকা)	৬৮০
লাগোস (নাইজেরিয়া)	৬৬৫
ইবাদান (নাইজেরিয়া)	৬৩০
আক্রা (ঘানা)	৫৬০
আদ্দিস আবেবা (ইথিওপিয়া)	৫৬০
প্রিটোরিয়া (দক্ষিণ আফ্রিকা)	৪২৫
ওরান (আলজেরিয়া)	৩৯৫
ডাকার (সেনেগাল)	৩৭৫
ওগ্‌বোমোশো (নাইজেরিয়া)	৩৪৩
সল্‌সবেরি (রোডেশিয়া)	৩২৫
নাইরোবি (কেনিয়া)	৩১৫

স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রের ইতিবৃত্ত

রাষ্ট্রের নাম	আয়তন বর্গ কিলোমিটারে	লোকসংখ্যা হাজারে	রাজধানী	রাষ্ট্রিক কাঠামো	রাষ্ট্রিক সর্বপ্রধানের নাম
আলজেরিয়া	২,৩৮১৭৪১	১২,০০০	আলজের্স	সাধারণতন্ত্র (১৯৬২)	কর্ণেল বুমেদিন
বোটসোয়ানা (বেচুয়ানাল্যান্ড)	৫৬৯,৫৮১	৫৭৬	গ্যাবারোনস্	ডোমিনিয়ন (১৯৬৬)	মিঃ সেরেৎসে খামা (প্রধানমন্ত্রী)
বুরুন্ডি	২৭,৮৩৪	২,৮০০	বুজুমবুরা	সাধারণতন্ত্র (১৯৬২)	ক্যাঃ মিশেল মিকোম বোরো
ক্যামেরুন	৪৭৪,৪৪২	৫,২১০	ইয়াউন্ডে	ঐ (১৯৬০)	মিঃ আহামাদু আহিজো
মধ্য আফ্রিকান সাধারণতন্ত্র	৬১৭,০০০	২,০৯০	বাঙ্গুই	ঐ (১৯৬০)	কর্ণেল বোকাশা
কংগো-ব্রাজাভিল	৩৪২,০০০	৯০০	ব্রাজাভিল	ঐ (১৯৬০)	মিঃ মাসেম্বা দেবা
কংগো-কিনশাশা	২,৩৪৫,৪০৯	১৫,৯৯০	কিনশাশা	ঐ (১৯৬০)	জেনেরাল মোবুতু
আইভরিকোস্ট	৩২২,৪৬৩	৩,৭৫০	আবিজান	ঐ (১৯৬০)	মিঃ হুপেৎ বোয়ানি
দাহোমি	১১৫,৭৬২	২,৩০০	পোর্তোনোভো	ঐ (১৯৬০)	জেনেরাল সোগোলো
ইজিপ্ত	১,০০০,০০০	৩০,০৫০	কাইরো	ঐ (১৯২২)	কর্ণেল নাশের
ইথিওপিয়া	১,২৩৭,০০০	২২,৫৯০	আদ্দিশ আবেবা	রাজতন্ত্র (১৯৪২)	১ম হাইলে সেলাসি
গাবোন	২৬৭,০০০	৪৭০	লিব্রভিল্	সাধারণতন্ত্র (১৯৬০)	মিঃ লিও' এমবা
ঘানা	২৩৯,৬৪০	৭,৮০০	আক্রা	ঐ (১৯৫৭)	জেনেরাল আংকারা
গিনি	২৪৫,৮৫৭	৩,৫০০	কোনাক্রি	ঐ (১৯৫৮)	মিঃ সেকু-তুরে
উচ্চ-ভল্টা	২৭৪,১২২	৪,৯০০	উগাডুগু	ঐ (১৯৬০)	জেঃ সাঙ্গুলে লামিজানা
কেনিয়া	৫৮২,৬৪৬	৯,৬৪৫	নাইরোবি	ঐ ১৯৬৩)	মিঃ জোমো কেনিয়াট্টা
লেশোথো (বাসুতোল্যান্ড)	৩০,৩৪৪	৮৬০	মাসেরু	রাজতন্ত্র (১৯৬৬)	দ্বিতীয় মোশোশোয়ে
লাইবেরিয়া	১১১,৩৭০	১,১০০	মনরোভিয়া	সাধারণতন্ত্র (১৮৪৭)	মিঃ উইলিয়ম ট'বম্যান
লিবিয়া	১,৭৫৯,৫০০	১,৬৮০	ত্রিপোলি	রাজতন্ত্র (১৯৫১)	মহঃ ইদ্রিস অল-সানুসি
মাদাগাস্কার	৫৯৫,৭৯০	৬,৩৪০	তানানারিভ	সাধারণতন্ত্র (১৯৬০)	মিঃ ফিলিবার শিরামানা
মালওয়াই (নিয়াশাল্যান্ড)	১১১,৩৭০	৪,০০০	জোম্বা	ঐ (১৯৬৪)	ডাঃ কামুজু ব্যান্ডা
মালি	১,২০৪,০২১	৪,৬০০	বামাকো	ঐ (১৯৬০)	মিঃ মোদিবো কিতা
মরক্কো	৪৫১,৫০৭	১৩,৩২০	রাবাত	রাজতন্ত্র (১৯৫৬)	দ্বিতীয় হাসান
মরিতানিয়া	১,০৮৫,৮০৫	১,০০০	নুয়াকশট্	সাধারণতন্ত্র (১৯৬০)	মিঃ মোক্তার উলু-দাদা
নাইজের	১,১৮৮,৭৯৪	৩,৪৩৫	নিয়ামে	ঐ (১৯৬০)	মিঃ হামানি দিওরি
নাইজেরিয়া	৯১৪৩৮২	৫৭,৫০০	লাগোস্	ঐ (১৯৬০)	কঃ ইয়াকুব গোওয়ন
উগান্ডা	২৪৩,৪১০	৭,৫৫০	কাম্পালা	ডোমিনিয়ন (১৯৬২)	মুতেশা [illegible]ল্টন ওবোটে (প্রধা[illegible]ী)
রোডেশিয়া	৩৮৯,৩৬২	৪,৩৩০	সলস্বেরি	'স্বাধীনতা' ঘোষণা ('৬৫)	মিঃ ই[illegible]থ
রুয়ান্ডা	২৬,৩৩৮	৩,০৭৫	কিগালি	সাধারণতন্ত্র (১৯৬২)	মিঃ জর্জ [illegible]ইবান্দা
সেনেগাল	১৯৭,১৬১	৩,৫০০	ডাকার	সাধারণতন্ত্র (১৯৬০)	মিঃ লিও[illegible]ল্ড সেংঘর
সিয়েরা লিওন	৭২,৩২৬	২,৪৫০	ফ্রি টাউন	সাধারণতন্ত্র (১৯৬১)	দ্বিত[illegible] এলিজাবেথ
সোমালি	৪৬১,৫৪১	২,৫০০	মোগাদিশিও	সাধারণতন্ত্র (১৯৬০)	ডা[illegible] এডেন আবদুল্লা ওসমান
সুদান	২,৫০৫,৪০৫	১৫,৯৪০	খারটুম	সাধারণতন্ত্র (১৯৫৬)	মিঃ ইসমাইল অল হাজারি
দক্ষিণ আফ্রিকা	১,২২৩,৬১৮	১৮,৩০০	প্রিটোরিয়া	সাধারণতন্ত্র (১৯৬১)	মিঃ চার্লস সোয়ার্ট
দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা	৮২২,৮৭৬	৫৮৫	উইন্ডহুক্	"	"
তানজানিয়া	৯৪২,০০৩	১০,৫১৫	দার-এস-সালাম	সাধারণতন্ত্র (১৯৬৪)	মিঃ জুলিয়াস ন্যেরেরে
চাদ্	১,২৮৪,০০০	৩,৩১০	ফোর্ট-লামি	সাধারণতন্ত্র (১৯৬০)	মিঃ ফ্রাঁসোয়া তম্বালবাই
টোগো	৫৬,৬০০	১,৬৬০	লোমে	সাধারণতন্ত্র (১৯৬০)	কর্নেল এইয়াদেমা
তিউনিশিয়া	১৫৫,৮৩০	৪,৬০০	তিউনিস	সাধারণতন্ত্র (১৯৫৭)	মিঃ হাবিব বুর্গিবা
জাম্বিয়া	৭৪৬২৫৩	৩,৭২০	লুসাকা	সাধারণতন্ত্র (১৯৬৪)	মিঃ কেনেথ কাউন্ডা
মরিশাস দ্বীপ	১,৮৬৫	৭৫০	পোর্ট লুইস	সাধারণতন্ত্র (১৯৬৮)	ডাঃ সিউগোপাল রামগুলাম

আফ্রিকার সব দেশ এখনও স্বাধীন হয় নি। কিছু কিছু অঞ্চল এখনও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের কুক্ষিগত হয়ে আছে। তাদের পরিচয় দেওয়া গেল।

ফরাসী উপনিবেশ

দেশ	আয়তন বর্গ কিলোমিটারে	লোকসংখ্যা হাজারে	রাজধানী	রাষ্ট্রিক কাঠামো
কোমোর	২,১৭১	২১০	মোরোনি	উপনিবেশ
রি-ইউনিয়ন	২,৫১০	৪০৫	স্যাঁ-দেনি	ফ্রান্সের একটি 'জেলা'
ফরাসী সোমালি	২১,৭০০	১০৫	জিবুতি	উপনিবেশ

স্প্যানিশ উপনিবেশ

দেশ	আয়তন বর্গ কিলোমিটারে	লোকসংখ্যা হাজারে	রাজধানী	রাষ্ট্রিক কাঠামো
ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ	৭,২৭৩	৯৮০	লাস্ পালমা সান্তাক্রুজ	স্পেনের একটি 'জেলা'
সিউটা	১৯	৭৬	—	স্পেনের 'অংশ'
ইকিউটোরিয়ান গিনি	২৮,০৫১	২৭০	সান্তাইসাবেল	স্বায়ত্তশাসন
ইফনি	১,৫০০	৫০	সিদি ইফনি	স্পেনের 'অংশ'
মেলিল্লা	১২	৮০	—	"
স্প্যানিশ সাহারা	২৬৬,০০০	৪৮	এলআইউন	"

পর্তুগীজ উপনিবেশ

দেশ	আয়তন বর্গ কিলোমিটারে	লোকসংখ্যা হাজারে	রাজধানী	রাষ্ট্রিক কাঠামো
এ্যাঙ্গোলা	১,২৪৬,৭০০	৫২৬০	লুয়ান্ডা	পর্তুগালের একটি 'প্রদেশ'
গ্রীন-কেপ দ্বীপ	৪,০৩৩	২৩৫	প্রাইয়া	"
পর্তুগীজ গিনি	৩৬,১২৫	৫৮০	বিস্সাউ	"
মাদের	৭৯৭	২৮০	ফুঞ্চাল	"
মোজাম্বিক	৭৭১,১২৫	৭,০০০	লুরেন্সো মার্কেস	"
সাওতোমে ও প্রিন্স দ্বীপ	৯৬৪	৭০	সাওতোমে সাওআন্তোনিও	"

বৃটিশ উপনিবেশ

দেশ	আয়তন বর্গ কিলোমিটারে	লোকসংখ্যা হাজারে	রাজধানী	রাষ্ট্রিক কাঠামো
সেন্ট হেলেনা এশেনশান ও ত্রিস্টানদা কুনহা	৩১০	৭	জেমসটাউন	উপনিবেশ
শিশেল দ্বীপপুঞ্জ	৪০৪	৪২	ভিক্টোরিয়া	"
সোয়াজিল্যান্ড	১৭,৩৬৪	৩১০	এমবাবানে	বৃটিশ আশ্রিত

অর্থনীতি

আফ্রিকার দুই-তৃতীয়াংশে এখনও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কৃষিব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। কৃষিই প্রধান উপজীবিকা। শিল্প-কলকারখানার সূত্রপাত উপনিবেশকারীদের প্রচেষ্টায়। আরবভাষী দেশগুলোতে কিছুটা আধুনিক অর্থনীতি ও শিল্প আগেও চালু ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় রাষ্ট্রগুলোতে উন্নত অর্থনীতির প্রচলন তারাই করে। প্রায় অধিকাংশ আফ্রিকায় কৃষি অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদীরা কোনো পরিবর্তন আনেনি। তাদের স্বার্থে আধুনিক চাষপদ্ধতি প্রচলন করে কোকো, কফি, বাদাম তেল ও তুলার চাষে। সেগুলো বাইরে রপ্তানি করে দু' পয়সা কামানই তাদের উদ্দেশ্য। ওই একই উদ্দেশ্যে তারা খনিজ দ্রব্যের ব্যবসা চালিয়ে থাকে। আফ্রিকার প্রায় সব খনিই ইউরোপীয় ধনপতিরা পরিচালনা করে। তারাই জলের দরে খনিজ দ্রব্য কিনে তাদের দেশে রপ্তানি করে। সেখানকার শিল্প-কারখানার তাগিদে তাদের এই উদ্যম। প্রাচীন ও মধ্যযুগের চাষ ব্যবস্থায় উৎপন্ন হয় কোনো কোনো অঞ্চলে মাইলো, জোয়ার, মানিয়ক। তবে উপনিবেশকারী ও আরবভাষী অঞ্চলে চাষ হয় তুলা, বাদাম, ভুট্টা, অলিভ, আঙুর, ধান, কফি, আখ, কলা, কোকো, রবার, খেজুর, তালের তেল। নাইজেরিয়া ও ঘানার প্রধান রপ্তানি দ্রব্যই হল কোকো। তেমনি আইভরি কোস্টের কফি।

খনিজ দ্রব্যে আফ্রিকা ঐশ্বর্যশালী। পেট্রলও পাওয়া যাচ্ছে অনেক। লোহ প্রায় অনেক দেশেই পাওয়া গেছে, লাইবেরিয়াতে সবচেয়ে বেশী। তারপর হল মরিতানিয়া, ও গাবোন-এ। তামা প্রচুর পাওয়া যায় বেলজিয়াম কংগো, বিশেষ করে কাতাঙ্গা প্রদেশে ও জাম্বিয়ায়। স্বর্ণও প্রচুর মেলে, তেমনি হীরক দক্ষিণ আফ্রিকায়। পেট্রল প্রথম পাওয়া যায় সাহারায় ১৯৫৪ সালে। তারপর থেকে পেট্রলের অনুসন্ধান চলেছে; পাওয়া গেছে নাইজেরিয়ায়, গাবোন, এ্যাঙ্গোলায় ও মরোক্কোতে। লিবিয়ায় সাহারা অঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে নতুন নতুন পেট্রল খনি। সাহারার আলজেরিয়া অঞ্চলে পেট্রলের মজুত সবচেয়ে বেশী।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে এগুলো উল্লেখযোগ্য; ফসফেট, হীরক, সোনা, অ্যান্টিমনি, সীসা, ভ্যানাডিয়াম, তামা, ইউরেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট, প্লাটিনাম, ক্রোমিয়াম। এবং উপরোক্ত খনিজ দ্রব্যগুলো বেশ বেশী পরিমাণেই পাওয়া যায়।

আফ্রিকার নদ-নদীগুলো বিশাল বলে, বাঁধ বেঁধে জল বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। বিশ্বের জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ ভাগ এখন আফ্রিকায়।

রাজনৈতিক

আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর সূত্রপাত দশ বার বছর হল। তার আগে দুটো কি তিনটে রাষ্ট্র ছাড়া সবই ছিল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের পদানত। এখনও কয়েকটা দেশে তারাই রাজত্ব চালাচ্ছে। আফ্রিকাকে ভাগাভাগি করে লুটেপুটে খেয়েছে বৃটেন ও ফ্রান্স অনেক কাল ধরে। তারপর হল বেলজিয়াম, স্পেন ও পর্তুগাল। জার্মাণরাও প্রবেশ করে উনবিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরা-

জয়ে তারা তাদের উপনিবেশ হারায়। ইতালিও উপনিবেশ চালিয়েছিল সোমালি, ইথিওপিয়া ও লিবিয়ার কিয়দংশে। তারাও সেসব দেশ ছেড়ে আসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত হয়ে।
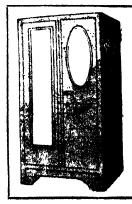
উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকায় শাসন ও শোষণ চালায় ফ্রান্স। পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় সাম্রাজ্য চালায় বৃটেন। উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকায় ফরাসী ভাষার প্রাধান্য রয়েছে প্রবলভাবে। দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকায় ইংরেজী ভাষা এখনও রাষ্ট্রভাষা হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। এই দুই ভাষার মাধ্যমে দুই দেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য এখনও অটুট রয়েছে।

উত্তর আফ্রিকায় আরবভাষীদের দেশ। আরবী ভাষায় বলা হয় মঘরেব রাষ্ট্র। অর্থাৎ পশ্চিমী আরব রাষ্ট্র। এরা অন্যান্য আফ্রিকান রাষ্ট্র থেকে অনেকখানি পৃথক। এদের চেহারা, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির যত কাছে ততখানি নয় আফ্রিকান রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত। আফ্রিকায় ফ্রান্স ও বৃটেনের প্রভাবের পরেই হল মার্কিণ, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের প্রভাব। রাশিয়া ও চীনের প্রভাব আগের চেয়ে অনেক খর্ব হয়েছে। কংগোকে নিয়ে চলে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। তাতে যোগ দিয়েছিল চীন। তাছাড়া চীন ও রাশিয়া পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকার নবলব্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রে নিজেদের প্রভাবিত সরকার কায়েম করতে গিয়ে যেমন সফল হয়েছিল তেমনি এখন বিফল হয়ে হটে আসতে বাধ্য হয়েছে। এককালে ঘানা ও গিনিতে রাশিয়া ও চীনের প্রভাব কেন্দ্র ছিল। এখন ঘানা তাদের হাতছাড়া। গিনিতেও বেশী প্রভাব নেই। মালি ও ফরাসী কংগো ও তানজানিয়াতে কিছু অবশিষ্ট প্রভাব আছে। তবে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। প্রাক্তন ফরাসী ও বৃটিশ উপনিবেশ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ফরাসীভাষী রাষ্ট্রগুলো এখনও জাতি সংঘের ভোটাভুটিতে ফ্রান্সকে ভোট দেয়। ইংরেজীভাষীরা কিন্তু বৃটেনকে দেয় না। তার কারণ দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ায় কালা আদমিদের নিপীড়ন এখনও সমানে চলেছে এবং সেখানে বৃটেনের পরোক্ষ সায় আছে বলে আফ্রিকার অন্যান্য রাষ্ট্র বৃটেনকে সমর্থন করে না। বৃটেনের সঙ্গে তাদের বিরোধ এই কারণে। তাছাড়া পর্তুগীজ উপনিবেশে চলেছে সমানে নিপীড়ন। স্প্যানিশ উপনিবেশ সেদিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম অশান্ত। তবে সেখানেও স্বাধীনতা আন্দোলন চলেছে সমানে। তার প্রতিকার নির্ভর করছে স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোর ওপর। ফরাসী ও ইংরেজীভাষী রাষ্ট্রগুলোকে দুই দলে বিভক্ত করা যায়। ফরাসী ভাষী দলে আছে : আলজেরিয়া, বুরুন্ডি, ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকান সাধারণতন্ত্র, কংগো—ব্রাজাভিল, কংগো—কিনশাশা, আইভরি কোস্ট, দাহোমি, গাবোন, গিনি, উচ্চ-ভল্টা, মাদাগাস্কার, মালি, মরক্কো, মরিতানিয়া, নাইজের, রুয়ান্ডা, সেনেগাল, চাদ, টোগো, তিউনিশিয়া। ইংরেজীভাষী দলে আছে : বোটসোয়ানা, ইজিপ্ত, ইথিওপিয়া, গ্যাম্বিয়া, ঘানা, কেনিয়া, লেসোথো, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, মালওয়াই, নাইজেরিয়া, উগান্ডা, রোডেশিয়া, সিয়েরা লেওন, সোমালি, সুদান, দক্ষিণ আফ্রিকা, তানজানিয়া, জাম্বিয়া।

আফ্রিকায় শাদা কালো সংঘাত

সুধীরকুমার সেন

খৃস্টীয় আঠেরশো পঞ্চাশ শতকের আগে শুধু মিশর ও উপকূলভাগের কিছু অঞ্চল ছাড়া আফ্রিকার সঙ্গে ইউরোপের কোনো পরিচয় ঘটেনি। তখন পর্যন্ত আমেরিকার নতুন মহাদেশই ইউরোপীয় দুঃসাহসীদের হাতছানি দিয়ে টেনে নিচ্ছিল। [illegible] ১৮১০ সালে স্পেনীয় সিংহাসনে নেপোলিয়ন-ভ্রাতা জোসেফের প্রতিষ্ঠার পরিণতিতে স্পেনের মার্কিনী উপনিবেশগুলোতে বলিভারের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ ঘটলো, তা জন্ম দিলো মনরো-নীতির। তার ফলে আমেরিকায় ইউরোপের রাজ্যবিস্তারের দ্বার রুদ্ধ হলো। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দ্রুত জনবৃদ্ধি ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়ন খাদ্য ও কাঁচামালের তাগিদে ইউরোপকে আবার দুঃসাহসের যাত্রায় বেরুবার তাগিদ দিচ্ছে। বৃটেন, হল্যান্ড ও পর্তুগাল আগেই বেরিয়েছিল, তাই সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাদের প্রতি অনেক সুপ্রসন্ন। এবার বেরুলো জার্মানী, ফরাসী, ইতালী ও বেলজিয়ানরা। উপনিবেশের জন্য পৃথিবী জুড়ে আবার নতুন করে হুড়োহুড়ি, কাড়াকাড়ি পড়ে গেলো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আফ্রিকা ছিলো অন্ধকার মহাদেশ, রহস্যময়। এইবার শুরু হলো ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইউরোপীয়দের আগমন। আবিষ্কারক, বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী, মিশনারি, বসতিসন্ধানী, রাজনীতির ব্যাপারী।

ইউরোপীয়রা যখন আফ্রিকায় এলো তার বহু আগে থেকেই আরব দাস-ব্যবসায়ীরা সেখানে জাঁকিয়ে বসেছে, তাদের মারফৎ রাইফেলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আফ্রিকার। নিগ্রো-জীবন হল বিশৃঙ্খল।

নিগ্রো-জীবনের এই বিশৃঙ্খলার পটভূমিকাতেই মানচিত্রহীন আফ্রিকার প্রথম মানচিত্র রচিত হলো। ১৮৫০ থেকে ১৯০০। মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই অন্ধকার অরণ্যদেশ, ভয়াবহ শ্বাপদ, খরস্রোতা নদী ও প্রাণঘাতী ব্যাধির লীলাভূমি সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হলো, জমির হিসাব ও সম্পদের পরিমাপ হলো এবং বহু বিরোধ ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে ভাগাভাগি হলো। এবং সেই ভাগাভাগির পর্বে নিগ্রোদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার হলো, আফ্রিকায় সমুপস্থিত কোনো ইউরোপীয় জাতিই নিজেদের সেই কলঙ্কমুক্ত বলে দাবী করতে পারে না।

আফ্রিকার ভূগোলকে এইভাবে বিদেশী রঙে চিত্রণ যে স্থায়ী হতে পারে, এ ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয়দের মনে বাসা বেঁধেছিল সম্ভবতঃ এই জন্যই যে বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কিছু বিচার করার মানসিক অবস্থা তখন তাদের ছিলো না। যন্ত্রবিপ্লব তাদের সামনে যে অসীম সুযোগ এনে দিয়েছিল তাকেই তারা কালজয়ী বলে বিশ্বাস করেছিল। কৃষ্ণ আফ্রিকা অসহায়, তবু তার রুদ্ধ প্রতিরোধ ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীদের সময়ে সময়ে কম বিপর্যস্ত করেনি, সংঘাত ও রক্তক্ষয়ও কম হয়নি। উগান্ডায় ফরাসী ক্যাথলিক ও বৃটিশ অ্যাংলিকান মিশনারিরা ধর্মপ্রচারের নামে এমন চণ্ডনীতি শুরু করলো যে কয়েক বছরের মধ্যেই রাজধানী সেংগোয় কৃষ্ণাঙ্গদের অভ্যুত্থানে অসংখ্য প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক মিশনারি নিহত হলো, রাজধানীর পথ তাদের মৃতদেহে সমাকীর্ণ হলো। ১৮৮৩ সালেই বৃটেন তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত মিশরের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৮৯৮ সালে মিশরের ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ হয়। তার অনেক আগেই, ১৮৭৭ সালে বৃটেন ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে লড়াই করে ট্রান্সভাল সাধারণতন্ত্রকে কেপ উপনিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত করে। ১৮৯৯ সালের আর

এক যুদ্ধের পর ট্রান্সভালের ওপর বৃটিশ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও এই যুদ্ধে তাদের ভয়াবহ ক্ষতি হয়। বৃটেনের এই কর্তৃত্ব অবশ্য বেশী দিন রইলো না। ১৯০৭ সালে এই সাধারণতন্ত্র কেপ উপনিবেশ ও নাটালের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মহাযুক্তরাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয় এবং স্বশাসন লাভ করে।

পঁচিশ বছর

আফ্রিকা বন্টনে ইউরোপীয়দের লেগেছিল মাত্র পঁচিশ বছর। ১৯১৪ সালের মধ্যে সমগ্র আফ্রিকা বৃটিশ, ফরাসী, জার্মান, পর্তুগীজ, বেলজিয়ান, স্প্যানিশ ও ইতালীয়দের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। শুধু স্বাধীন রইলো পশ্চিম উপকূলে লাইবেরিয়া, উত্তর উপকূলে মরক্কো এবং পূর্ব অঞ্চলে আবিসিনিয়া।

তারপর প্রথম মহাযুদ্ধ এলো, গেলো। সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের মানচিত্র নূতনভাবে অংকিত হলো, আরবভূমির মুক্তির সূচনা হলো। কিন্তু অন্ধকার আফ্রিকা তখনো অন্ধকারে। বরং পুরোনো জার্মান উপনিবেশগুলোর ওপর বন্ধনমুক্তির নামে ম্যান্ডেটের নতুন বন্ধন চাপলো। এবং চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি আফ্রিকার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র আবিসিনিয়া ইতালীর কাছে স্বাধীনতা হারালো।

আফ্রিকায় নবযুগ

আফ্রিকায় স্বাধীনতার বন্যাম্বার মুক্ত হলো আরো পরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

অবসানে। বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক আফ্রিকার বন্ধনমুক্তির দশক। এবং আলজিরিয়া ও কঙ্গো ছাড়া বিনারক্তপাতে আফ্রিকার সমগ্র উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমখণ্ডের মুক্তি ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা।

তবু আফ্রিকার মুক্তি আজো সম্পূর্ণ নয়। ইংরাজ ও ফরাসী ইতিহাসের যে শিক্ষাকে স্বীকার করে নিয়েছে, দক্ষিণখণ্ডের শ্বেত ঔপনিবেশিকরা সে শিক্ষাকে আজো প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। পর্তুগীজশাসিত অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিক, ইংরাজ বংশধরদের অধিকৃত রোডেশিয়া এবং বুয়ের-অধ্যুষিত দক্ষিণ আফ্রিকা আজো দুনিয়ায় শাদা-কালোর বৈষম্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্থল হয়ে রয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা

অ্যাপার্থেইট বা বর্ণগত পৃথকীকরণ নীতি যে কতখানি মারাত্মক হতে পারে, এককালে মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ-ধন্য দক্ষিণ আফ্রিকাতেই পাওয়া যাবে তার সব চেয়ে নগ্ন চিত্র। এই রাষ্ট্রে বুয়রদের (ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক, সংখ্যা ৩৩,৯৭,৬২৭ আর কৃষ্ণাঙ্গ বান্টুরা সংখ্যায় ১,১৪,৬৯৫২৮)। বর্ণগত পৃথকীকরণ ব্যবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের ইউরোপীয়দের সঙ্গে বিবাহ বা কোনপ্রকার যৌনসম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ, তারা ইউরোপীয় এলাকায় থাকতে পারে না, এক বাসে চড়তে, পার্কে এক বেঞ্চে বসতে, এক হোটেলে খেতে পারে না, এক সমুদ্রোপকূলে বিচরণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ। কিন্তু এগুলো আসলে দক্ষিণ আফ্রিকায় 'পেটি অ্যাপার্থেইট' বা খুদে বৈষম্য নামে পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী জন ফোর্স্টার এখন তার 'বিগ অ্যাপার্থেইট' পরিকল্পনাকে রূপদানের কাজে ব্যস্ত। এই পরিকল্পনায় গড়ে তোলা হচ্ছে বান্টুস্থান নাম দিয়ে এক পৃথক এলাকা যেখানে বান্টুরা সম্পূর্ণ শ্বেতাঙ্গ সম্পর্কহীন অবস্থায় থাকবে। অবশ্য এখানে তারা পাবে পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার এবং উন্নতি[illegible] একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁ[illegible] অর্জন করবে পূর্ণ স্বাধীনতা। বান্টুস্থানের কোন কোন অঞ্চল, যেমন টান্‌স্‌কেই ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থায় স্বশাসন অধিকার লাভ করেছে। এই ব্যবস্থায় কেপ টাউনের চতুষ্পার্শে বসবাসকারী বান্টুদের সংখ্যা বছরে পাঁচ শতাংশ হারে হ্রাস করা হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার উদারনৈতিক ইংরাজী পত্রিকা র‍্যান্ড ডেইলি মেলের সম্পাদক লরেন্স গ্যান্ডার এই ব্যবস্থাকে 'পৃথকীকরণ ব্যবস্থার স্বপ্নজগৎ' বলে বর্ণনা করেছেন। গ্যান্ডার বলেছেন, 'এই স্বতন্ত্র উন্নতির অর্থ হচ্ছে কৃত্রিম জাতীয়তা, কল্পনার রাষ্ট্র ও অর্থহীন স্বাধীনতার সৃষ্টি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সমগ্র উন্নত এলাকা যেখানে মানুষের কর্মের সংস্থান হতে পারে সেখানে বৈষম্য পুরোপুরি বজায় রাখা।'

তবু মজা এই, বান্টু নেতারা, যাদের বেশির ভাগই হচ্ছে উপজাতীয় সর্দার—এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট, কারণ সেখানে এদের কর্তৃত্ব জোরদার হবে। অপরপক্ষে, যারা এর বিরোধিতা করছে তাদের অনেককেই জেলে পাঠানো হয়েছে। ১৯৬০ সালে শার্পেভিলে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আফ্রিকানরা এক বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিস গুলী চালায়। এতে ৬৭ জন আফ্রিকান নিহত ও ১৮৬ জন জখম হয়।

কৃষ্ণাঙ্গ ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকায় আরো দুটি নরগোষ্ঠী রয়েছে যারা শ্বেতাঙ্গ সমাজে অপাংক্তেয়। এরা হচ্ছে (১) বর্ণসংকর ও (২) ভারতীয়রা। আফ্রিকায় বর্ণসংকরের সংখ্যা ১৮ লক্ষ, আর ভারতীয় ৫,২৫,০০০। ১৯০৯ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা আইনে বর্ণসংকরদের নাম সাধারণ ভোটার তালিকায় ছিলো। ১৯৫৬ সালে এদের নাম পৃথক ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখন এরা পার্লামেন্টে চারজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করে, কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটও নেই, পার্লামেন্টে প্রতিনিধিও নেই। কিন্তু আইনের ব্যবস্থায় বর্ণসংকরদের প্রতিনিধিরা সকলেই হবেন শ্বেতাঙ্গ।

দঃ পঃ আফ্রিকা

দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার প্রসঙ্গও এই সঙ্গেই আসবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পরাজিত জার্মানী ও তুরস্কের উপনিবেশ ও শাসনাধীন এলাকাগুলো যখন ইংরাজ,

ফরাসী ও তাদের মিত্ররা জাতিসংঘের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নেয় তখন দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ম্যাণ্ডেট দেওয়া হয় দক্ষিণ আফ্রিকাকে। দঃ আফ্রিকা তার ম্যাণ্ডেটের দায়িত্ব পালন দূরে থাকুক, এখানেও তার বর্ণবৈষম্য নীতি চালু করে ম্যাণ্ডেটের শর্ত লঙ্ঘন করছে এবং দঃ পঃ আফ্রিকাকে প্রকৃতপক্ষে বৈষয়িকভাবে শোষণ করছে। ১৯৬৬ সালে আফ্রিকার দুটি রাষ্ট্র আবিসিনিয়া ও লাইবেরিয়া হেগের আন্তর্জাতিক আদালতে দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এই সম্পর্কে যে অভিযোগ করে, আদালত তার মূলগত প্রশ্নে পৌঁছুবার চেষ্টা না করেই নিছক আইনগত প্রশ্নে (ফরিয়াদী রাষ্ট্রদ্বয়ের দঃ পঃ আফ্রিকার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ কোনো স্বার্থ নেই এই অজুহাতে) মামলাটি ৮—৭ ভোটে খারিজ করে দেয়।

রোডেশিয়া

আফ্রিকায় শ্বেত-কৃষ্ণ বৈষম্যের আর একটা প্রশস্ত পীঠস্থান হচ্ছে রোডেশিয়া। মাত্র তিনমাস আগে রোডেশিয়ায় তিনজন আফ্রিকানের ফাঁসি হয়ে গেল। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের, মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর এদের তিনবছর জেলে রাখা হয়েছিল।

মৃত্যুদণ্ডের পরও এত দীর্ঘকাল তা কার্যকরী না করার হেতু এই যে, এর আইনগত পরিণতি কি দাঁড়াবে রোডেশিয়ার স্মিথ সরকার সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে পারছিল না। ১৯৬১ সালে রোডেশিয়ায় যে সংবিধান চালু হয় তাতে রোডেশিয়ান আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বৃটেনের প্রিভি-কাউন্সিলে আপীলের অধিকার ছিল। ১৯৬৫ সালের ১১ই নভেম্বর রোডেশিয়া একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করার কালে শুধু রাণীর কর্তৃত্ব ছাড়া বৃটেনের অন্য সমস্ত কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। কিন্তু একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে প্রিভি কাউন্সিলের সার্বভৌমত্ব অস্বীকৃত হতে পারে কিনা, রোডেশিয়ার বিচারকদের মন এই সম্পর্কে একেবারে সন্দেহমুক্ত হয়নি। কিন্তু স্মিথ সরকার যখন জানালো যে, রোডেশিয়ার বিচারকরা যদি প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের অনুমতি দেয়, তাহলেও তারা প্রিভি কাউন্সিলের এক্তিয়ার মান্য করবে না। এরপর বিচারপতিরা হার মানলেন, আপীলের অনুমতি দিলেন না। তখন বন্দীদের পক্ষের আইনজীবীরা ক্ষমার জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানালেন। রাণী কমনওয়েলথ দপ্তরের পরামর্শক্রমে বন্দীদের ক্ষমা ঘোষণা করলেন। রোডেশীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক বসলো। মন্ত্রিসভা স্থির করলো যে, রাণীর আদেশ মান্য করা হবে না। আফ্রিকানদের ফাঁসি হয়ে গেল।

রোডেশিয়ার এই বেপরোয়া ভাব আলজিরিয়ার 'কোলোর্ণ'দের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। এবং সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেবে যে, দ্যগল যে দূরদর্শিতা, যে দৃঢ়তা নিয়ে কোলোনদের দমন করে আলজিরীয়দের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন রক্ষণশীল বা শ্রমিক নির্বিশেষে বৃটিশ সরকারের সেই দূরদর্শিতার অভাবই রোডেশিয়াকে কৃষ্ণ আফ্রিকার আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার বিরুদ্ধে এক গুরুতর প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। রোডেশিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গের সংখ্যা ৪২,৬০,০০০, আর শ্বেতাঙ্গ মাত্র ২,১৯,০০০, অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গের ৫ শতাংশ। এই একান্ত সংখ্যালঘু ঔপনিবেশিকগোষ্ঠীর কাছে শ্রমিকদলীয় প্রধানমন্ত্রী উইলসন যে দাবী রেখেছিলেন তাতে রক্ষণশীলদের থেকে তিনি একটুও এগোননি। তিনি বলেছিলেন যে, রোডেশিয়ায় উত্তরকালে সংখ্যাগুরু আফ্রিকান শাসনের পথে অগ্রগতির আভাস আছে এমন কিছু প্রতিশ্রুতি পেলেই তার স্বাধীনতা মঞ্জুর করা হবে। কিন্তু স্মিথ সরকার অনমনীয়। এই ব্যর্থ আলোচনার চূড়ান্ত পর্যায়েই রোডেশিয়া একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বৃটেন এর উত্তরে প্রথমে রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে কতকগুলো অর্থনৈতিক শাস্তি-ব্যবস্থা ঘোষণা করে এবং শেষপর্যন্ত রোডেশিয়ার সঙ্গে ১২টি পণ্য সম্পর্কে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেদের জন্য স্বস্তি পরিষদে আবেদন জানায়। স্বস্তি পরিষদে এই প্রস্তাব পাশ হলেও একথা স্পষ্ট যে আফ্রিকান দেশগুলো এত অল্পে সন্তুষ্ট হতে প্রস্তুত ছিলো না। এবং এই শাস্তি-ব্যবস্থার মধ্যেও যে ফাঁক রয়ে গেছে যার ফলে রোডেশিয়া দু বছরের এই বাণিজ্যিক বয়কট সত্ত্বেও অনমনীয় রয়ে গেছে তাও কারুর নজর এড়াবার নয়। আসলে এই বয়কট সমগ্রভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও মোজাম্বিকের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হলে যে এক অর্থহীন প্রহসনে দাঁড়ায় সেকথাও তাদের অজ্ঞাত নয়। রোডেশিয়া তার একান্ত প্রয়োজনীয় পেট্রল দক্ষিণ আফ্রিকা ও মোজাম্বিকের মারফৎ পাচ্ছে, এই দুটো দেশের আনুকূল্যে তার আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যও একেবারে স্তব্ধ হয়নি। সেই জন্যই বারটি পণ্য সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তার অর্থনীতি এই দীর্ঘ দুবছরেও ভেঙে পড়েনি।

অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক

পর্তুগাল আফ্রিকার যে বিরাট অঞ্চল দখল করে আছে তার ইউরোপীয় রাজ্যের তুলনায় তা প্রায় ২৩ গুণ বড় এবং অনেক বেশী সম্পদশালী। অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক এককালে ছিল পর্তুগীজ দাস-ব্যবসায়ের বিরাট কেন্দ্র, আধুনিককালে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে তুলা ও আখের খামার মালিকদের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। অ্যাঙ্গোলায় পর্তুগীজরা সংখ্যায়ও কম নয়, ২০ লক্ষ, আর আফ্রিকানরা ৪৮ লক্ষ। মোজাম্বিকে আফ্রিকান আছে ৭০,২৪,৫২০ আর শ্বেতাঙ্গ ৯৭,২৬৮।

এই বিরাট সাম্রাজ্যে প্রথম আলোড়ন এলো ১৯৬১র মার্চ মাসে। এই সময়ে উত্তর অ্যাঙ্গোলায় বাকোঙ্গো উপজাতীয়রা বিদ্রোহ করে হঠাৎ তিনশ' পর্তুগীজকে হত্যা করে, নারী শিশু কিছুই বাদ যায় না। এর পরে তিন সপ্তাহের মধ্যে আরো ১০০০ শ্বেতাঙ্গ এবং সন্ত্রাসবাদে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক ৬০০০ আফ্রিকান এদের হাতে নিহত হয়। এর পরে ১৯৬৩ সালে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজ গিনিতে এবং পর বছর দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের মোজাম্বিকেও সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। অ্যাঙ্গোলার উত্তরাঞ্চলে এক ঘন অরণ্যে বিদ্রোহীরা এমন সুদৃঢ় ঘাঁটি করে আছে যে, জেট জঙ্গীর সাহায্যেও তাদের দমন করা সম্ভব হচ্ছে না।

পর্তুগাল গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী, তবুও আফ্রিকায় তার অনুসৃত নীতির সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা বা রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গদের অনুসৃত নীতির একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যে শ্বেত-কৃষ্ণ বৈষম্য দঃ আফ্রিকা ও রোডেশিয়াকে বিশ্বসমাজে সবচেয়ে ঘৃণিতরূপে চিহ্নিত করেছে, পর্তুগালে তার বড় আভাস নেই। সেখানে পর্তুগীজরা আফ্রিকানদের বিয়ে করে, তাদের অধীনে চাকুরী করে, রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যকে উপহাস করে। সেখানে শিক্ষায় আফ্রিকানদের ভাগ আছে, বাৎসরিক কিছু ট্যাক্স দিলেই ভোট দিতে পারে। সেখানে কৃষ্ণাঙ্গকে পৃথক মানবগোষ্ঠীরূপে গণ্য না করে পর্তুগীজরূপে গণ্য করার একটা যে চিন্তার আভাস আছে, দঃ আফ্রিকা বা রোডেশিয়ায় তার সম্ভাব নেই।

কঙ্গো

এবং পর্তুগীজ উপনিবেশের প্রসঙ্গেই কঙ্গোর কথাও আসে। ১৯৬৬র অক্টোবরে কঙ্গোর রাজধানী কিনশাসায় মবুতু সরকারের নির্দেশে পর্তুগীজ দূতাবাসকে ভেঙেচুরে দেওয়া হয়। মবুতুর সন্দেহ যে, পর্তুগাল অ্যাঙ্গোলায় মইশে শোম্বের বেতনভোগী শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের পুষছে, উদ্দেশ্য কঙ্গোয় অভিযান চালিয়ে শোম্বের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। অপর পক্ষে, পর্তুগালের অভিযোগ যে, অ্যাঙ্গোলায় যে বিদ্রোহী ঘাঁটি রয়েছে কঙ্গো তাকে অস্ত্র যোগাচ্ছে।

প্রায় পাঁচ বছর আগে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী শোম্বেকে কাতাঙ্গার স্বাতন্ত্র্যের [illegible] লড়াই থেকে নিবৃত্ত হতে বাধ্য করে। [illegible] তারপর দেশত্যাগ করেন এবং কিছু[illegible] মধ্যে আলজিরিয়ার জেলে নিক্ষিপ্ত হন। তবু কাতাঙ্গার বিচ্ছিন্নতার লড়াই শেষ হয়নি এবং কর্ণেল শ্রামের নেতৃত্বে কাতাঙ্গী সৈন্যদের বিদ্রোহ ও লড়াই কঙ্গোতে শ্বেত-বিদ্বেষকে একটা চিরন্তন সমস্যারূপে জিইয়ে রেখেছে। কিন্তু এই সমস্যা শুধু আফ্রিকানদের নয়। শ্রামের এই বিদ্রোহ কঙ্গোবাসী ৯০,০০০ হাজার শ্বেতাঙ্গদের (যার মধ্যে ৪৫০০০ হচ্ছে বেলজিয়ান) জীবন-মরণের প্রশ্ন। বেলজিয়ানরা সরকারীভাবে কঙ্গো ত্যাগ করলেও মনেপ্রাণে যে কঙ্গোকে ত্যাগ করতে পারেনি, এই প্রশ্নের মূলে রয়েছে সেই মানসিকতা। এবং কঙ্গোবাসী আফ্রিকানদের শ্বেতাঙ্গ-ভীতি ও বিদ্বেষের পটভূমিকায় ভবিষ্যতেও বহু সংঘাত ও রক্তপাত এর ফলে অনিবার্য। ১৯৬০ সালে কঙ্গো স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে তার অভিপ্রকাশ আমরা মাঝে মাঝেই দেখছি।

আরব আফ্রিকা

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

নৃতত্ত্ববিদরা আফ্রিকার অধিবাসীদের সেমাইট, হ্যামাইট, নিগ্রো, নিলোট প্রভৃতি ছয়টি প্রধান ভাগে ভাগ ক'রে থাকেন। যারা সাহারার উত্তরে বাস করে ও সেমিটিক ভাষায় কথা বলে তারাই সেমাইট, চলতি ভাষায় আরব। সেমিটিক আফ্রিকা প্রকৃত-পক্ষে পশ্চিম এশিয়ারই বিস্তৃত ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, লিবিয়া, মিশর ও সুদান সেমাইটদের বাসভূমি। এই ছ'টি রাষ্ট্র একত্রে উত্তর আফ্রিকা, সেমেটিক আফ্রিকা বা আরব আফ্রিকা নামে পরিচিত।

উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে ফিনিশীয়, গ্রীক ও রোমানদের আসা-যাওয়া কয়েক হাজার বছর আগে শুরু হলেও আফ্রিকার স্বতন্ত্র ইতিহাস শুরু হয়েছে মুশলিম আক্রমণের পর থেকে। সপ্তম শতাব্দীতে পশ্চিম এশিয়ার আরব মুশলিমরা মরক্কো থেকে সুদান পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকা দখল করে নেয়, আর তার ফলে সেখান থেকে পূর্বতন সব সভ্যতার প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। মুশলিম সংস্কৃতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সমগ্র উত্তর আফ্রিকাকে ঐক্যবদ্ধ করে। ক্রমে আফ্রিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলেও তাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। পশ্চিম আফ্রিকার মরিটানিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার সোমালিল্যান্ড, জাঞ্জিবার প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীদের সঙ্গে আরব রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে এবং আরব ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের প্রভাবিত করে।

সারা আফ্রিকার বর্তমান লোকসংখ্যা ভারতবর্ষের অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশী। তার মধ্যে আরবের সংখ্যা সাড়ে সাত কোটির কাছাকাছি এবং আরবদের ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে আফ্রিকার দশ কোটি মানুষ। । পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে আরব আফ্রিকার ধর্ম, সংস্কৃতি ও রক্তের বন্ধন অবিচ্ছেদ্য হ'লেও উত্থিত আফ্রিকার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও সে আজ একাকার।

আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রয়েছে আরব রাজ্য মরক্কো। আয়তন এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার বর্গমাইল, লোক-সংখ্যা এক কোটি চল্লিশ লক্ষ। আরব দেশ ব'লে পরিচিত হ'লেও মরক্কোর লোক-সংখ্যার মাত্র চল্লিশ শতাংশ আরব। অবশিষ্টদের মধ্যে বার্বার পঁচিশ শতাংশ, মুর বিশ শতাংশ। বার্বাররা পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে, আর আরব ও মুররা সমতল অঞ্চলের অধিবাসী। এছাড়া আছে চার লক্ষ ইউরোপীয়, বেশীর ভাগই ফরাসী ও স্পেনীয়। তারা ক্যাথলিক, আরব বার্বার ও মুররা মুশলিম, এবং ইসলাম মরক্কোর রাষ্ট্রধর্ম। প্রায় দুই লক্ষ ইহুদীও বাস করে মরক্কোয়। সরকারী ভাষা আরবী, সহকারী ভাষা ফরাসী ও স্পেনীয়। বার্বারদের ভাষা কিছুটা স্বতন্ত্র, অনেকটা হ্যামিটিক গোষ্ঠীভুক্ত।

মরক্কো সুপ্রাচীন, প্রায় হাজার বছরের রাজ্য। তার ফেজ শহরের পত্তন হয় ৮০৮ খৃস্টাব্দে, মারাবেক শহর তার প্রায় দুশ' বছর পরে। অষ্টম শতাব্দীতে আরবরা মরক্কো অধিকার করে এবং মরক্কোর আদিবাসী বার্বাররা আরবদের ধর্ম ও সভ্যতা দুই আপন করে নেয়।

দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত মরক্কো শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল। তখন উত্তরে স্পেন ও পূর্বে তিউনিসিয়া পর্যন্ত মরক্কোর অধিকার বিস্তৃত হয়। কিন্তু ১৪৯২ খৃস্টাব্দে স্পেন থেকে মুররা বিতাড়িত হওয়ার পর মরক্কোর দুর্দিন শুরু হয়। আরও পরে মরক্কো এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে কোন বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি সে সম্পূর্ণ হারায়।

১৯১২ সালে প্রায় সমগ্র মরক্কো ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে, অবশিষ্ট প্রায় এগারো হাজার বর্গমাইল স্থান ঐ বছরেই স্পেনের দখলে চলে যায়। আবার ১৯২৩ সালে তার তাঞ্জিয়ার শহর-সহ ২২৫ বর্গ-মাইল স্থানে এক আন্তর্জাতিক কনভেন-শনের কর্তৃত্ব কায়েম হয়। এইভাবে, ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে সমগ্র মরক্কো স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আগে, তিন খণ্ডে তিনটি স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থার অধীনে বিভক্ত থাকে। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বাধীন ও সংযুক্ত মরক্কোয় নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয়।

নতুন সংবিধান অনুসারে মরক্কো একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। বর্তমান রাজা দ্বিতীয় হাসান সিংহাসন লাভ করেন ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে। সংবিধানে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকলেও ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক কারণে রাজাই মরক্কোর প্রকৃত শাসক। তিনি রাষ্ট্রপ্রধান ও ধর্মীয় ব্যাপারে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। রাজধানী রাবাত ছাড়াও ফেজ, মারাকেশ, মেকনেস ও গ্রীষ্মকালীন রাজধানী তাঞ্জিয়ারে তিনি কিছুদিন অন্তর বাস করেন।

মরক্কোর পার্লামেন্ট দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। নিম্নকক্ষ 'হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস'-এর সকল সদস্য গণ-নির্বাচিত। উচ্চকক্ষ 'হাউস অফ কাউন্সেলরস'-এর সদস্যদের নির্বাচিত করে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন, বণিক সংস্থা প্রভৃতি। রাজা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সকল সদস্যকে নিযুক্ত করেন, প্রয়োজনে পদচ্যুতও করতে পারেন। পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতাও রাজার আছে।

মরক্কোয় শিক্ষাবিস্তারের উপর বর্তমানে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সে দেশে প্রতিরক্ষার চেয়ে শিক্ষাখাতে ব্যয় বেশী করা হয়। সাত থেকে তের বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। কিন্তু সামরিক শক্তিও যে মরক্কোর কম নয় তার

প্রমাণ সে দেয় ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে আলজিরিয়ার সঙ্গে সীমান্ত বিরোধকালে।

মরক্কো-আলজিরিয়া সীমান্ত বিরোধের ব্যাপারে মরক্কোর বক্তব্য ফিগিং থেকে তিনদুফ পর্যন্ত বিস্তৃত সাহারা অঞ্চলে মরক্কো ও আলজিরিয়ার মধ্যে কোনদিন সীমান্ত নির্ধারিত হয়নি। এবং ঐ এলাকার কলোম্ব-বেশার অঞ্চলটি মরক্কোর অংশ। মরক্কোকে স্বাধীনতা দেওয়ার সময় ফ্রান্স অন্যায় ক'রে কলোম্ব-বেশার মরক্কো থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলজিরিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। কারণ ফ্রান্সের তখন ধারণা ছিল, আলজিরিয়া চিরকাল তার অধিকারভুক্ত থাকবে। মরক্কো তার দাবীর সমর্থনে আরও বলে যে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে মরক্কো যখন তার পাশে দাঁড়ায় তখন আলজিরিয়ার আজাদী সরকারের পক্ষে ফেরহাত আব্বাস লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন যে, স্বাধীনতালাভের পর আলজিরিয়া মরক্কোর সঙ্গে সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করে নেবে। কিন্তু ঐ লিখিত প্রতিশ্রুতির উপর আলজিরিয়ার তৎকালীন ভাগ্যনায়ক বেন বেলা কোন গুরুত্ব দেন না। তিনি বলেন, আলজিরিয়ার অসুবিধার সুযোগ নিয়ে মরক্কো জোর ক'রে তার কাছে ঐ প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিল।

সীমান্ত সংঘর্ষে আলজিরিয়াকেই পর্যুদস্ত হ'তে হয়। কয়েক দিন যুদ্ধের পর তৃতীয়পক্ষের হস্তক্ষেপে সংঘর্ষ থামে, কিন্তু খনিজ-সমৃদ্ধ ঐ বিতর্কিত এলাকাটির অধিকার নিয়ে মরক্কো-আলজিরিয়া বিরোধের এখনও মীমাংসা হয়নি।

আলজিরিয়াও প্রাচীন সুসভ্য দেশ। ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলবর্তী এই আরব রাষ্ট্রটির আয়তন নয় লক্ষ বিশ হাজার বর্গমাইল, কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র এক কোটি ষোল লক্ষ। অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে মাত্র বারোজন লোকের বাস। তার কারণ, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলটুকু ছাড়া আলজিরিয়ার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল অতিউষ্ণ ও বাসের অযোগ্য।

অধিবাসীদের প্রায় সকলেই আরব অথবা বার্বার। আলজিরিয়া স্বাধীন হওয়ার আগে সেখানে প্রায় দশ লক্ষ ফরাসী বাস করত, যাদের বলা হ'ত কলোন। এখন ঐ কলোনদের সংখ্যা এক লক্ষে নেমে এসেছে। আদিবাসীদের মধ্যে ইহুদী প্রায় দেড় লক্ষ। আলজিরিয়ার রাষ্ট্রভাষা আরবী, কিন্তু প্রাথমিক স্কুল থেকে শুরু করে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফরাসী ভাষাও শেখানো হয়।

আরবরা ৬৫০ খৃস্টাব্দে আলজিরিয়ায় যায় ও সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকে। তারপর পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে মুর ও ইহুদীরা স্পেন থেকে বিতাড়িত হয়ে একাংশ আলজিরিয়ায় চলে আসে এবং তারাও আলজিরিয়াকে স্বদেশরূপে গ্রহণ করে।

বহুবার হাতবদলের পর ১৮৩০ সালে আলজিরিয়া ফ্রান্সের দখলে আসে। তার উপকূলবর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া মনোরম ও জমি উর্বর দেখে ফরাসীরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের মতলব করে এবং ১৮৪৮ সালে আলজিরিয়াকে ফ্রান্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা করা হয়। সারা দেশের কর্ষণযোগ্য জমির প্রায় ত্রিশ শতাংশ, এবং ভাল জমির প্রায় সবটুকুই কলোনরা দখল করে নেয়। এরপর একশ' বছর ধরে চলে আলজিরিয়ার সর্বত্র ফরাসীদের অবাধ লুণ্ঠন ও স্থানীয় অধিবাসীদের উপর নির্মম অত্যাচার।

স্বাধীনতার জন্য আলজিরিয়া যে ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করেছে তার তুলনা নেই। নেতারা মৃত্যু পরোয়ানা মাথায় নিয়ে সংগ্রাম চালিয়েছেন এবং মুক্তি-সংগ্রামীরা দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। একজন কলোনকে হত্যার জন্য শতজন আরবের প্রাণ গেছে, কিন্তু তবুও আলজিরিয়ার মুক্তি আন্দোলন কখনও স্তিমিত হয়নি। ১৯৫৪ সালে গঠিত হয় আলজিরিয়ার রাজনৈতিক দল 'ফ্রন্ট ডি লিবারেশন ন্যাশনেল' সংক্ষেপে যা এফ-এল-এন নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৫৮ সালে কায়রোয় গঠিত হয় আলজিরিয়ার প্রবাসী সরকার, যার প্রধানমন্ত্রী হন ফেরহাত আব্বাস। তারপর প্রচণ্ড সংগ্রামের শেষে ১৯৬২ সালের ৩রা জুলাই আলজিরিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর আলজিরিয়ার নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। প্রথমে আলজিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন বেন খেদা, কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁকে উৎখাত করেন বেন বেলা। বেন বেলা ক্ষমতাসীন হয়ে ফেরহাত আব্বাস প্রমুখ তাঁর সব পুরাতন সহকর্মীকে ত্যাগ করেন। শেষে, ১৯৬৫ সালের ১৯শে জুন বেন বেলাকে অপসারিত করেন আলজিরিয়ার তৎকালীন সৈন্যাধ্যক্ষ ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট কর্ণেল বুমেদিয়েন। সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তিনি ক্ষমতা দখল করেন, তারপর বেন বেলার কি হয়েছে তা কেউ জানে না। হয়ত তিনি আজও বিনাবিচারে বন্দী হয়ে আছেন, নয়ত সামরিক অভ্যুত্থানের দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আলজিরিয়ার বর্তমান দুরবস্থার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার পরনির্ভরতা। সেখানে ফরাসীরা কোন স্বয়ংনির্ভর শিল্প গড়ে তুলতে দেয়নি। ফলে কলোনরা তাদের আঙুর, কমলা ও তামাকের ক্ষেতগুলি ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেলে আলজিরিয়ার শ্রমজীবী মানুষদের কঠিন সংকটে পড়তে হয়। আলজিরিয়া সরকার ঐ খামারগুলি দখল করেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। কারণ ঐ সব ফসল বিক্রি হ'ত শুধু ফ্রান্সের বাজারে। সুতরাং স্বাধীন হয়েও আলজিরিয়ার ফ্রান্সের মুখাপেক্ষী থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

এখন ফ্রান্সই প্রকৃতপক্ষে আলজিরিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তা। ফ্রান্সে যে চার লক্ষ আলজিরিয় কাজ করে তাদের পাঠানো টাকাই আলজিরিয়ার বিদেশী মুদ্রা অর্জনের প্রধান সূত্র। ফরাসী শিক্ষক ও ডাক্তারে ভরে যাচ্ছে আলজিরিয়া। নিজেদের প্রয়োজনেই মোটা মাইনে দিয়ে ঐ ফরাসীদের আবার ফিরিয়ে আনছে আলজিরিয়া। আলজিরিয়ার সাহারা অঞ্চলে তেল সন্ধানের একচেটিয়া অধিকারও ফ্রান্সকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্স তার তেল ও কৃষিজ পণ্যের প্রায় একচেটিয়া ক্রেতা। বিনিময়ে আলজিরিয়াকে সে বছরে বারো কোটি ডলার মতো সাহায্য ঋণ দিচ্ছে।

তিউনিসিয়া আফ্রিকার উত্তর-মধ্য প্রান্তের আর একটি আরব দেশ। আয়তন প্রায় ষাট হাজার বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা পঁয়তাল্লিশ হাজার। অধিবাসীদের প্রায় সকলেই আরব। অন্যান্যদের মধ্যে আছে লক্ষাধিক ফরাসী ও অর্ধ লক্ষ ইতালীয়। সরকারী ভাষা আরবী হলেও ফরাসী ভাষাকে বিদেশী ভাষা বলা হয় না। সকলেই ফরাসী শেখে।

ফ্রান্সের অধিকারমুক্ত হয়ে ১৯৫৬ সালের ২০শে মার্চ তিউনিসিয়া একটি সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে। গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৫৭ সালের ২৫শে জুলাই তিউনিসিয়ায় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। সেই থেকেই হাবিব বরগিবা তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট ও তাঁর দল ন্যাশনাল ফ্রন্ট সে রাষ্ট্রের একমাত্র রাজনৈতিক দল।

তিউনিসিয়ার মুক্তিআন্দোলনে ও রাষ্ট্রগঠনে হাবিব বরগিবার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আধুনিক তিউনিসিয়ার স্রষ্টা ও অবিসংবাদিত নেতা। কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাধারার দিক দিয়ে তিনি নরমপন্থী ও পশ্চিমঘেঁষা। এইজন্য আরব আন্দোলনের প্রধান নেতা প্রেসিডেন্ট নাসেরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল নয়। বরগিবাকে তাই প্রায়ই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও বাইরে নাসেরপন্থীদের সঙ্গে জোর মোকাবিলা করতে হয়। তিউনিসিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ক'রে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট বরগিবা একবার সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করেন। কিন্তু তিন বছর বাদে বিজের্তে বন্দর থেকে ফরাসী নৌ-ঘাঁটি সরানোর দাবী তুলে প্রেসিডেন্ট বরগিবা যখন তীব্র ফরাসী বৈরিতার সম্মুখীন হন তখন প্রেসিডেন্ট নাসের তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন। তখন সাময়িকভাবে মিশর-তিউনিসিয়া সম্পর্কের উন্নতি হয়। এই সম্পর্কের আবার অবনতি ঘটে ১৯৬৬ সালে, ইস্রায়েলকে স্বীকৃতির প্রশ্নে। বরগিবা ইস্রায়েলকে অনস্বীকার্য সত্য বলে মেনে নেওয়ার প্রস্তাব করলে সকল আরব-রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর মত-বিরোধ হয়, এবং আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে তিউনিসিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

১৯৬৭ সালে আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট বরগিবার সঙ্গে, আল-

জিরিয়া, মিশর প্রভৃতি চরমপন্থী আরব রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটেছে। আরবদের পরাজয় ও লাঞ্ছনার জন্য বর্গিবা সম্পূর্ণরূপে প্রেসিডেন্ট নাসেরকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট নাসের তাঁর অতীত চিন্তাধারা ও ভাবাবেগের বন্ধনে বন্দী, তাই কোন বাস্তব নীতি অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন, মানচিত্র থেকে ইস্রায়েলকে মুছে ফেলার অসম্ভব চিন্তা যতদিন না আরব দেশগুলি ত্যাগ করবে ততদিন আরব দুনিয়ার কোন সংকটের প্রতিকার হবে না।

তিউনিসিয়ার আতর বিশ্ববিখ্যাত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুররা স্পেন থেকে বিতাড়িত হয়ে তিউনিস শহরে আতরের ব্যবসা শুরু করে। তিউনিসিয়ার কাইরাওয়ান শহর আফ্রিকার মুসলিমদের তীর্থক্ষেত্র, তার আর এক নাম আফ্রিকার মক্কা। শিক্ষাবিস্তারে তিউনিসিয়া সরকার বিশেষ তৎপর। বাজেটের বিশ শতাংশ ব্যয় হয় শিক্ষায়। সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। নারী-প্রগতির দিক থেকে তিউনিসিয়া পশ্চিম ইউরোপের তুল্য।

আরব আফ্রিকার আর একটি দেশ লিবিয়া। সতেরো লক্ষ ষাট হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ঐ বিশাল দেশটির লোকসংখ্যা মাত্র পনের লক্ষ দশ হাজার। অর্থাৎ প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে একজন লোকেরও বাস নয়। তার কারণ সাহারা মরুর ঐ বিস্তীর্ণ অংশটিতে এতদিন সম্পদ বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। যার জন্য ক'বছর আগে সে দেশের মাত্র দশ লক্ষ লোককেও দারুণ দুর্দশায় দিনাতিপাত করতে হ'ত। কিন্তু লিবিয়ার কয়েক লক্ষ বর্গমাইল বালুরাশির নীচে হঠাৎ অফুরন্ত তেলের সন্ধান পাওয়ার পর থেকে [illegible]টির বৈষয়িক অবস্থার দ্রুত উন্নতি [illegible] গেছে।

[illegible] অধিবাসীদের শতকরা ৯৩ ভাগ আরব ও বার্বার; বার্বাররা পশ্চিম-অঞ্চলের অধিবাসী। দক্ষিণে সোজান অঞ্চলে নিগ্রোদের বাস। ত্রিপলিতানিয়ায় ইতালীয়রা একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। লিবিয়ার লোকসংখ্যার পাঁচ শতাংশ ইতালীয়।

রাজ্যের অধিবাসীদের ৯৩ শতাংশ মুসলিম, ৫ শতাংশ ক্যাথলিক ও দুই শতাংশ ইহুদি। আরবী সরকারী ভাষা, সহকারী ভাষা ইতালীয়।

লিবিয়ার দুটি রাজধানী—ত্রিপলি ও বেনগাজি। ষাট লক্ষ পাউন্ড ব্যয় ক'রে সাইরেনিকা প্রদেশের মুসলিম তীর্থক্ষেত্র বেইদায় রাজধানী স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি নতুন শহর গড়ে তোলা হয়। কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য সে শহর এখনও শূন্য পড়ে আছে।

লিবিয়ার রাজা সাইরেনিকার আমির, মহম্মদ ইদ্রিস অল-সেনুসি। লিবিয়া ইতালীর অধীনে থাকাকালে রাজা নির্বাসনে দিনাতিপাত করতেন। চারিত্রিক দৃঢ়তা, ধর্মনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের জন্য তিনি বরাবরই লিবিয়ার অধিবাসীদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। একারণে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হলেও রাজ্যের শাসনব্যবস্থার উপর রাজ্য ইদ্রিসের প্রভাব সামান্য নয়।

১৯১১ সালে ইতালী লিবিয়া অধিকার করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মিত্রপক্ষ ইতালীর দখল থেকে তাকে ছিনিয়ে নেয়। তারপর ১৯৫১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর, রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্তক্রমে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে লিবিয়ার প্রতিষ্ঠা হয়। তখন সাইরেনিকা ত্রিপলিতানিয়া ও ফেজান—এই তিন প্রদেশে লিবিয়া বিভক্ত ছিল এবং লিবিয়া ছিল একটি যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৬৩ সালে লিবিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে ও এক-কেন্দ্রিক শাসন প্রবর্তিত হয়।

লিবিয়ায় প্রথম উল্লেখযোগ্য তেলের খনির সন্ধান পায় এসো কোম্পানী, ১৯৫৯ সালে। তারপরেই ঐ মরু-রাজ্যের সবকটি তেলের উৎস যেন আপনা থেকেই উপচে ওঠে, আর সেই সংগে সমৃদ্ধির জোয়ার আসে লিবিয়ায়।

রাজতন্ত্রী লিবিয়া আরব আফ্রিকার অপর রাজতন্ত্রী দেশ মরক্কোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নরমপন্থী তিউনিসিয়ার সংগেও লিবিয়ার সম্পর্ক সৌহার্দপূর্ণ। আর এসবের জন্যই সাধারণতন্ত্রী আলজিরিয়া ও আরব দুনিয়ার ঐক্যকামী মিশরের শাসকদের সংগে লিবিয়ার সম্পর্ক ভাল নয়। আর এই দুটি দেশই তার প্রতিবেশী। সেকারণে জনবিরল ও তৈল-প্রাচুর্যে অতি-সমৃদ্ধ লিবিয়াকে এখন বেশ দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। সম্প্রতি আরব-ইস্রায়েল সংঘর্ষে সিনাইর তৈল খনিগুলি মিশরের হাতছাড়া হওয়ার পর লিবিয়ার দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে।

নানা কারণে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, অর্থাৎ মিশর এখন উত্তর আফ্রিকা তথা পশ্চিম এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ। তিন লক্ষ ছিয়াশি হাজার বর্গমাইল আয়তনের এই দেশটির বর্তমান লোকসংখ্যা ২ কোটি ৮০ লক্ষ। অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় ৮০। কিন্তু এই হিসাবে মিশরের জনসমস্যার প্রকৃত অবস্থা বোঝা যাবে না। তার ভৌগোলিক আয়তন যাই হ'ক না কেন, মিশরের সব লোক বাস করে নীল নদের দুই তীরে, মাত্র সাড়ে তের হাজার বর্গমাইল স্থানে। সেই হিসাবে মিশরে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় দুই হাজার। এমন ঘন-বসতি পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই।

নীল নদীর সংগে সম্পর্ক-বর্জিত মিশরে কোন স্থানে জনপদ গ'ড়ে ওঠা সম্ভব নয়, যে-কারণে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিশরকে 'নীল নদীর দান' ব'লে বর্ণনা করেছিলেন। সুদূর ভবিষ্যতেও মিশরে বাসযোগ্য স্থান বিশ হাজার বর্গমাইলের বেশী হওয়া সম্ভব নয়। অথচ মিশরের লোকসংখ্যা বাড়ছে অত্যন্ত দ্রুতহারে। এই হারে যদি লোক বেড়ে চলে, অর্থাৎ প্রতি বছরে যদি মিশরকে অতিরিক্ত দশ লক্ষ লোকের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে হয়, তাহলে ১৯৭০ সালে আসোয়ান বাঁধের কাজ শেষ হ'লেও মিশরের বর্তমান অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। সাত বছরে মিশরে যে সত্তর লক্ষ লোক বাড়বে, আসোয়ান বাঁধের কল্যাণে পাওয়া অতিরিক্ত সব ফসল তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তিতেই ফুরিয়ে যাবে। এইজন্যই উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার সমগ্র আরবভূমিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে একটি বিশাল আরব রাষ্ট্র গড়ে তোলার দাবীতে মিশরের জনগণ এত সোচ্চার।

১৯৫৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার সিরিয়া সংযুক্ত হয়ে গঠিত হয় সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র। কিন্তু ঐ ঐক্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৬১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর সিরিয়া বিদ্রোহী হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে। তারপর আর কোন দেশ মিশরের সংগে যুক্ত হয়নি, কিন্তু মিশর তার সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র নাম অপরিবর্তিত রেখেছে, কারণ মিশরের রাষ্ট্রাদর্শের সংগে ঐ নাম সংগতিমূলক। গত জুন মাসের যুদ্ধে ইস্রায়েলের আক্রমণে মিশরের ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশী। তার সামরিক শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়, এবং তার চেয়েও বড় কথা, সমগ্র সিনাই অঞ্চল

ইস্রায়েলের দখলে চ'লে যায়। যে আকাবা উপসাগর নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত, সে উপসাগর এখনও ইস্রায়েলের অধিকারে; সুয়েজ আজও বন্ধ। শ্বেতাঙ্গ পর্যটকরা বর্জন করেছে মিশরকে। ঘরে-বাইরে এমন বিপর্যয়কর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন মিশরকে কখনও হতে হয়নি। কিন্তু তবুও এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রেসিডেন্ট নাসের আজও আরব দুনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধের পরেই তিনি পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে ইচ্ছা প্রকাশিত হওয়া মাত্র উত্তাল হয়ে উঠেছিল অতলান্তিকের পূর্ব উপকূল থেকে পারস্য উপসাগরের পশ্চিম তীর পর্যন্ত আরব দুনিয়া। বেরুট, বাগদাদ, কায়রোর পথে পথে লক্ষ লক্ষ নরনারী উন্মাদের মতো চীৎকার করতে করতে বলেছিল—নাসের তুমি আমাদের ছেড়ে-যেয়ো না।

নাসের বিপ্লবী, নাসের ধর্মসহিষ্ণু, এবং রাজতন্ত্রী মরক্কো, লিবিয়া, সৌদী আরব ও জর্ডনের অবিশ্বাস আর মধ্যপন্থী হাবিব বরগিবার প্রকাশ্য বিরোধিতা সত্ত্বেও নাসের আজও আরব দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণা। কিন্তু তবুও বোধহয় একথা তাঁর ভাবার সময় এসেছে যে, ইস্রায়েলের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে আরব ঐক্য ও সংহতি সম্ভব কিনা। ১৯৪৮ ও ১৯৬৮ সালের মধ্যে আকাশ-মাটি পার্থক্য। পশ্চিমের শক্তি ও সমর্থনপুষ্ট আজকের ইস্রায়েলকে আরব-দুনিয়া নিজের শক্তিতে কোনদিন পরাস্ত করতে পারবে না, এই কঠিন সত্য নাসের ও তাঁর অনুগামীরা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারবেন ততই তাঁদের পক্ষে মঙ্গলকর হবে।

সুদানে সম্প্রতি যে জাতীয় নির্বাচন হয়ে গেল, তাতে নাসেরপন্থীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছেন। এই থেকেও বোঝা যাবে, আরব-দুনিয়ায় নাসেরের এখনও কতখানি প্রভাব।

আরব আফ্রিকার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত সুদান। আয়তন প্রায় দশ লক্ষ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা এক কোটি ত্রিশ লক্ষ। উত্তর আফ্রিকার আরব দেশগুলির মধ্যে সুদানে আরবদের সংখ্যানুপাতিক হার সবচেয়ে কম। নয়টি প্রদেশে বিভক্ত সুদানের উত্তরাংশের ছয়টি প্রদেশে • আরব ও নুবিয়ানদের বাস। প্রাচীন যুগে সুদান যখন মিশরের ফারাওদের সাম্রাজ্যের অংশ ছিল তখন সুদানের উত্তরাংশকে নুবিয়া বলা হ'ত। নুবিয়া কথাটির অর্থ কালোদের দেশ। সুদান আগে কালোদেরই দেশ ছিল। আরবরা অনেক পরে এসে দেশটি দখল করে। রোম সাম্রাজ্যের যুগে সাহারার দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রোরা সুদানের উত্তরে এসে বসতি গ'ড়ে তোলে। পরে হ্যামাইটদের (ইথিয়োপিয়ার অধিবাসী) সঙ্গে তাদের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে, এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে নুবিয়ানরা খৃস্টধর্মে দীক্ষা নেয়। কিন্তু আরবরা সুদান অধিকার করলে নুবিয়ানরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

সুদানের দক্ষিণের তিনটি প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে নিগ্রোদের বাসভূমি। সুদানের প্রায় ত্রিশ শতাংশ লোক নিগ্রো, এবং তারা পৌত্তলিক ও প্রকৃতির উপাসক। নিগ্রোরা একদিন আরবদের ক্রীতদাস ছিল, আজও সুদানের রাষ্ট্রীয় তৎপরতায় তাদের ভূমিকা সামান্য। দক্ষিণের প্রদেশগুলির অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী, বণিক ও ভূস্বামী আরব। এসবের জন্য সুদানে আরব-নিগ্রো সম্পর্ক ভাল নয়। দক্ষিণের প্রদেশগুলি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের দাবীতে সুদানের নিগ্রোরা বহুবার আন্দোলন করেছে, এবং সেসব রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে প্রাণহানি কম হয়নি।

সুদান কৃষি-সমৃদ্ধ দেশ। তার দীর্ঘ ও মজবুত আঁশবিশিষ্ট তুলার চাহিদা সারা পৃথিবীতে। জলসেচ ও কর্ষণ-পদ্ধতির উন্নতি ক'রে সুদানে তুলার উৎপাদন বহু গুণ বৃদ্ধি করা যায়। বর্তমানে তার রপ্তানির ৬০ শতাংশ তুলো।

১৯৫৬ সালের পয়লা জানুয়ারী সুদান স্বাধীনতা লাভ করার পর সেখানে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু সুদানে সংসদীয় শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৫৮ সালের ১৭ই অকটোবর লেঃ জেঃ ইব্রাহিম আব্বুদের নেতৃত্বে একদল সামরিক অফিসার সুদানের শাসন-ক্ষমতা দখল করেন। আব্বুদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে। তারপর ১৯৫৬ সালের অস্থায়ী সংবিধানের পুনরুজ্জীবন করা হয়। কিন্তু সুদানে পূর্ণ সংসদীয় শাসন এখনও প্রবর্তিত হয়নি বা তার রাজনীতি এখনও অস্থিরতা-মুক্ত নয়।

আফ্রিকার গল্প ও কবিতা

গণেশ বসু

আমি কাপুরুষ!

কালো বলে তাই বিদ্বেষ-ব্যবহারকে মেনে নিয়েছিলাম অনিবার্য হিসেবে। মুখ বুজে হজম করতাম সেই সব গায়ে জ্বালা-ধরানো নামকরণ। চুপ করে দাঁড়িয়ে সহ্য করতাম ওদের অপমান আর অত্যাচার। ঐ গুণ্ডারা আমার নাকে আঙুল ঢুকিয়ে দিত। হয়তো রক্ত ঝরত। তবু কিছু করতে পারতাম না। কখনো কখনো রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম। জাহান্নমে যাও—বলে ধিক্কার জানাতেও বেশ ভয় করতো। অবশ্য মাঝে মাঝে ওদের গলা টিপে [illegible] জন্যে আঙুলগুলো নিসপিস [illegible] ধরতাম। কারণ ওরা [illegible]

দাঁ[illegible] চেপে তখন মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করেছি। ভাবতাম ধৈর্যেই বিচক্ষণতা। সকলের সামনে দাঁড়িয়ে তাই ক্ষমা চাইতাম। কিন্তু এতে ওরা আরো পেয়ে বসল। কেউ কেউ জ্বালাধরা সহানুভূতি জানিয়ে কাটা ঘায়ে দিত নুনের ছিটে।

দেখতে দেখতে সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল। শিরাগুলো টন-টন করে উঠত। হাসিমুখে সবকিছু গ্রহণ করবার ব্যর্থতা যেন আগুন ধরিয়ে দিল। পালিয়ে এলাম। কেননা আমি কাপুরুষ। কেননা অত্যাচারকে ঘৃণা করার বদলে মানবতাকে বেশি ভালবেসেছিলাম। শুকনো গলার সম্ভাবনা দেখবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম।

তাই পালাতে হলো। পালিয়ে বাঁচতে হলো আমাকে।

আমার অন্তহীন অভিযোগ এই পৃথিবীর বিরুদ্ধে, কেননা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বয়ে আনা প্রত্যেকটি সোনার বার, প্রত্যেকটি বিনিয়োগই সাহায্য করল, মজবুত করল বর্ণ-বিদ্বেষের নির্মম ব্যবস্থা।

আমি পালিয়ে এলাম।

গল্পটি দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক ব্লক মদিসেনের। বলা বাহুল্য এটি গল্পের অন্তঃসার। নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন বিশ্লেষণ আর অক্ষম আক্রোশের জ্বালা অন্য কোনো সাহিত্যে পাওয়া যাবে কিনা জানি না। তবে নিপীড়িত সমাজের এমন গল্প আফ্রিকান সাহিত্যে ভুরি-ভুরি দেখা যাবে। অন্ধকার মহাদেশের ভয়ংকর ইতিহাসকে তুলে ধরবার জন্যে সেখানকার লেখকরা নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করে চলেছেন। এই সব গল্পের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় নিপীড়িত জনসাধারণের রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। সকলের অলক্ষ্যে পাঠকের চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে।

বয়সের দিক দিয়ে আফ্রিকার সাহিত্য তেমন পুরনো না হলেও এই ডার্ক কন্টিনেন্টের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই স্পষ্ট করে নিতে হয় এই মহাদেশের অর্থনীতিক ও রাজনীতিক পটভূমি। কেননা আবহমানকালের অত্যাচারে যে ক্ষোভ, ক্রোধ আর ঘৃণা এই মহাদেশের বুকে ঘুমিয়ে-থাকা আগ্নেয়গিরির জন্ম দিয়েছে, তা মাঝে মাঝেই ফেটে পড়ে, সংকটগ্রস্ত পৃথিবীকে জানায় নতুন চ্যালেঞ্জ। বিশ্বরাজনীতিতে তোলে ঘূর্ণির ঝড়। তবু এর মূল কারণ যা, সেই ঔপনিবেশিকতা কিংবা বর্ণ-বিদ্বেষের অন্ধকার চিরকালের জন্যে সব জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলার পাকাপাকি ব্যবস্থা হল না। তাই, এখনো এদেশের মাটিতে কান পাতলে বিক্ষোভের গুঞ্জন শুনতে পাওয়া যায়। অবশ্য এই অন্ধকারের কোথাও যে আলোর ঝলক ঠিকরে পড়েনি, তা নয়। তাঁদের এই জাগরণের আদল পাওয়া যায় তাঁদের সাহিত্যে। রক্ত-মাংসের যে মানুষগুলো দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করে চলেছে তাঁদেরই জীবন চিত্রিত হয়েছে এই সাহিত্যে। শ্বেতাঙ্গদের শিখিয়ে-তোলা বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা, কুসংস্কার, আর আফ্রিকানদের নানা টানা-পোড়েনও এতে বাদ পড়ল না। এক কথায় জাতীয়তাবাদই হল আফ্রিকান সাহিত্যের মূল থিম। বলা বাহুল্য, এই বোধের গোড়ায় রয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের বেঁচে থাকার তীব্র অধিকারবোধ। আত্ম-সচেতনতা আর আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি তাই জোরালোভাবেই দেখা যায় এঁদের গল্প-কবিতা-নাটক-উপন্যাসে। অবশ্য অক্ষম আক্রোশ, প্রচণ্ড ধিক্কার কিংবা লড়াই করে ভেঙে-পড়ার সুরও একেবারে অশ্রুত নয়। কিন্তু এর পিছনেও সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে আফ্রিকান জাতীয়তাবোধ। আর সবকিছুর মূলে আছে বর্ণের সংঘাত। উপজাতীয় বিরোধ এবং আত্মঘাতী সংগ্রামও সাহিত্যকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে।

আফ্রিকার রাজনীতিতে বর্তমানে দুটি ধারা বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে। একদিকে রয়েছে অহিংস প্রতিরোধের ঝোঁক, অন্যদিকে ঠিক এর উল্টো চিন্তায় সশস্ত্র সংগ্রাম। ঘটনাপরম্পরায় একদল মানুষ বুঝে নিয়েছেন স্বাধীনতা কেউ হাতে তুলে দেয় না, আদায় করে নিতে হয়। এই যে টানাপোড়েন—যার উদাহরণ হিসেবে এক সময় জোমো কেনিয়াট্টাকে একদিকে, এবং অন্যদিকে ধরা হত তরুণ নক্রুমাকে, তাও আফ্রিকার সাহিত্যে ছায়া ফেলেছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে রিচার্ড রাইভের একটি গল্প। বি বেঞ্চ।

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে জন্মেছিলেন রিচার্ড রাইভ। সেটা ১৯৩১ সাল। বর্ণ-বিদ্বেষের কালো ধোঁয়ার মধ্যে এই মানুষটি বেড়ে উঠেছিলেন। ফলে তাঁর ছোটগল্পে দেখা গেল এর প্রতিক্রিয়া। নানান অসুবিধা আর বাধা-

বিপত্তির মধ্যেও শেষপর্যন্ত তিনি উচ্চশিক্ষা পেয়েছিলেন। ছাত্রবয়স থেকেই গল্প লিখতে শুরু করেন। চাবুকের মতো শাণিত অথচ প্রতিজ্ঞাদৃঢ় এ'র গল্পগুলি বর্তমান আফ্রিকান সাহিত্যে কিছুটা স্বতন্ত্র মেজাজ এনেছে। অহিংস প্রতিরোধ তাঁর গল্পে নতুন পরিমণ্ডল তৈরি করেছে।

অক্টোবরের ফুটিফাটা রোদ মাথায় করে কার্লি হাজির হয়েছিল বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী এক জনসভায়। শুনছিল কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা আর সমাজগত প্রাপ্য অধিকারগুলো। কিভাবে একদল মানুষ এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে তাদের। শুনতে শুনতে কেমন আলোড়ন অনুভব করল। প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের আলো ঝলকে উঠল চোখের মণিতে। মানুষের মতো বেঁচে থাকবার দাবি সমুদ্রউত্তাল হল। বিশেষ করে আলোড়ন তুলল শ্বেতাঙ্গ মহিলার ভাষণটি। তিনি বললেন, যে সব আইন বলে এ তোমার চেয়ে ছোট, ও বড়ো, সেই সব আইনকে আজ চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। না, এ হতে পারে না। সব জায়গাতেই সকলের সমান অধিকার রয়েছে।

সভাশেষে ফিরবার পথে রেলস্টেশনে দেখতে পেল একটি বেঞ্চ। তার গায়ে শাদা রঙে বড়ো হরফে ইউরোপীয়ান ওনলি—লেখা। একটি মাত্র কাঠের বেঞ্চ দক্ষিণ আফ্রিকায় হাজার হাজার ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দিল। উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল কার্লি। আশা আর আশংকায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল মন। দাঁতে দাঁত চেপে ভাবতে লাগল কি করবে সে। সিগারেট ধরাল কার্লি। বসবার আকর্ষণ ক্রমশ দুর্বার হচ্ছে। শেষপর্যন্ত বেঞ্চে বসে পড়ল। কিন্তু মনের ভিতর আলো-ধোঁয়ার জট পাকিয়ে তুলল পরস্পরবিরোধী দুটি চিন্তা। বসবার অধিকার তার আছে কি নেই। বেঞ্চে বসে দেখতে লাগল সাধারণ দৃশ্য। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ একটি কর্কশ স্বরে তার চমক ভাঙল, আই সেড গেট অফ দি বেঞ্চ, ইউ সোয়াইন! রূঢ় বাস্তবের চাবুক তার পিঠে পড়ল। কিন্তু কার্লির মুখে ভাবান্তর দেখা গেল না, উঠবার তেমন কোন তাগিদ সে অনুভব করল না। নির্বিকারভাবে সিগারেট টেনে গেল। অক্ষম চিৎকারে সারা শহর মাথায় করে তুলল শ্বেতাঙ্গ মানুষটি। দেখতে দেখতে লোক জমল। এলো পুলিশ। ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ কার্লিকে সমর্থন জানাল। তার এই প্রতিজ্ঞাদৃঢ় উপেক্ষার ভাব পুলিশেরও ধৈর্য টলাল। গেট আপ ইউ ব্লাডি বাস্টার্ড—ভেসে এলো কঠোর কঠোর হুংকার। মারতে মারতে ওকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। কার্লি বুঝল এভাবে যুঝে ওঠা যায় না। তার মুখে দৃঢ় হাসি ফুটে উঠল।

রিচার্ড রাইভের আর একটি গল্প ড্রাইভ ইন। এতে কোনো মন্তব্য নেই। কিন্তু নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বর্ণবিদ্বেষের কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। এ ধরনের ঘটনাই হল আফ্রিকার রোজনামচা।

সভাশেষে বিল এসে দাঁড়াল বাস-স্টপে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। পথ নির্জন। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে থামল তার পেছনে। হকচকিয়ে গেল বিল। ঘুরে দাঁড়াল। গাড়ির ভেতরে সোনা-পালিশ একটি মুখ। এবার সে বলল, কোথায় যাচ্ছেন? বিল জানাল, বাসের জন্যে সে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর মেয়েটির প্রস্তাব লিফট দেবে কিনা। ইতস্তত করল বিল। কিন্তু মেয়েটি নাছোড়বান্দা। অবশেষে উঠতে হল। একদিকে বিরক্তি, ভয়, অন্যদিকে কিসের এক আকর্ষণ।

অনেক কথা হল গাড়িতে। কালো মানুষদের অবর্ণনীয় দুঃসহ জীবনযাত্রা নিয়েই সব কথা। বিল নিজে কৃষ্ণাঙ্গ।

বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি চালিয়ে এল ওরা। কথায় কথায় অনেক কাছাকাছি এল বিল আর ভালদা। একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে গিয়ে বিল এক সময় অসহায় বোধ করল। ভালদা বুঝল ওর অবস্থা। আর এটা কাটিয়ে উঠবার জন্যে হঠাৎ প্রস্তাব করে বসল, চলুন, একটু কফি খাওয়া যাক। আকাশ থেকে পড়ল বিল। স্পষ্ট বুঝতে পারল এবার তাকে দুঃসহ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। বিল জানাল, একসঙ্গে কফি পাওয়া যাবে না। শ্বেতাঙ্গ কফিখানায় কৃষ্ণাঙ্গদের ঢুকবার অধিকার নেই। অগত্যা ভালদা গাড়িতে বসেই কফি খাবার প্রস্তাব করল। রাজি হল বিল।

ওয়েটারকে ডেকে দুটো কফির অর্ডার দিল ভালদা। ওয়েটার থ বনে গেল। নিগারকে কফি দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। একটা কফিই সে দেবে ভালদার জন্যে। এই নিয়ে চলল কথা কাটাকাটি। হুলুস্থুল ব্যাপার। অবশেষে ম্যানেজার এল। রাস্তার ওপরেই চলল বচসা। গাড়ির ভিতর তখন বসে আছে একা বিল।

ম্যানেজার ওয়েটারকে সমর্থন করল। শ্বেতাঙ্গী ভালদাকে জানাল, নিগার বিলকে কফি দেওয়া আইন বিরুদ্ধ। ওদের উপর একচোট গায়ের ঝাল ঝেড়ে নিল ম্যাজোর। লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে ভালদা। থরথর কাঁপছে সে। এমন সময় পুলিশ ভ্যান এসে হাজির। ওদের কথা শুনল সব। হঠাৎ নজরে পড়ল গাড়ির ভিতর নিগার বসে। কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। গেট আউট দি ব্লাডি কার! গেট আউট!

বিল চুপ।

'শুনতে পাচ্ছিস!'

এবার পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ির দরজার ওপর। জোর করে বের করল বিলকে, তুলে নিল পেট্রল-ভ্যানে।

কনস্টেবলটি এবার ভালদার দিকে তাকাল। বলল, আপনার বয়ফ্রেন্ডকে নিজের গাড়িতে করে অনুসরণ করুন। সেলের মধ্যেই তাকে চুমু খাবেন।

রিচার্ড রাইভের সব লেখাই এমনি শানানো।

আফ্রিকার গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে বহু আলোচিত লেখক নাইজিরিয়ার সাইপ্রিয়ান একোয়েন্সি। বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী এই কথা-সাহিত্যিকের জীবন বড়ো নাটকীয়। ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন তিনি একজন ফার্মাসিস্ট হতে। কিন্তু হয়ে এলেন ঔপন্যাসিক। যোগ দিলেন বেতার দপ্তরে এবং ক্রমে প্রধান পরিচালক। তাঁর পিপলস অব দি সিটি, দি ড্রামার বয়, দি প্যাসপোর্ট অব মালাম ইলিয়া, জাগুয়া নানা, বিউটিফুল ফেয়ারস যেন আফ্রিকার জনজীবনের জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া।

গল্পলেখক ও নাট্যকার হিসেবে শরিফ ইজমনও একটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। বছর পাঁচেক আগে এনকাউন্টার আয়োজিত একটি নাট্যপ্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত তাঁর নাটক ডিয়ার পেরেন্ট অ্যান্ড ওগর দেশ-বিদেশের সাহিত্যিক মহলে বেশ আলোড়ন তুলেছিল।

আর একজন বহুপ্রশংসিত লেখক হলেন ইজিকিয়েল ম্ফালেলে। দক্ষিণ আফ্রিকার এই গল্পলেখক সামনের বছর পঞ্চাশে পা দেবেন। সত্যিকারের মননশীল লেখক বলতে যা বোঝায় ইজিকিয়েল হলেন ঠিক তাই। আফ্রিকার সবরকম সুস্থ রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনি একজন সক্রিয় কর্মী। ম্যান মাস্ট লিভ, এবং দি লিভিং অ্যান্ড দি ডেড তাঁর বহু আলোচিত দুটি গল্পগ্রন্থ। জীবনী-সাহিত্যেও তিনি নতুন রীতির প্রবর্তন করেন। ডাউন সেকেন্ড দি এভিনিউ একটি অসাধারণ আত্মজীবনী। তাঁর গল্প এ পর্যন্ত জাপানী, হাঙ্গারিয়ান, চেক, সার্বোক্রোট, বুলগারিয়ান, ফরাসী, সুইডিস প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

যে সমস্ত গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার আফ্রিকান [illegible] করেছে তার মধ্যে [illegible] ...ব, অ্যামজস তুতুওলা, টড [illegible]জা, লুই বার্নারদো হনওনা, কামারা [illegible]অ্যালেক্স লা গুমা, গ্রেস ওগোট, ফার্দিনান্দ ওইনো, লেওপোল্ড সেদার সেনঘর, আমোস তুতুওলা, নাদাই গার্ডিমার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তবে আফ্রিকান সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো কবিতা। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আদিম যুগের চেতনার যে আশ্চর্য মিল এখানে ঘটেছে, সাদা চোখে তা কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। জাতীয় জীবনের নানা সমস্যা, বিভিন্ন উপজাতীয় পিছুটান, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে একান্তভাবেই জাতীয় ভাবধারার বিরোধ—সব কিছুই জলদর্চি রেখার মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে রয়েছে অক্ষম আক্রোশ, ব্যর্থতার জ্বালা অন্যদিকে প্রতিরোধের দুঃসাহসিকতা। কালো মায়ের দিকে তাকিয়ে তাই মোজাম্বিকের কবি কাল্‌পোনো বলেন:

স্বপ্নে তার অনন্য পৃথিবী
অনিন্দ্য পৃথিবী
যেখানে বাঁচার দাবি তার সে ছেলের।

বেঁচে থাকার দাবি হল জন্মগত অধিকার। কিন্তু আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের কাছে এই বেঁচে থাকার কথা হাস্যকর। মামুলি বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলে। কিন্তু আফ্রিকানদের চেতনায় যা রয়েছে, তা কোনক্রমেই উড়িয়ে দেবার নয়। এ প্রসঙ্গে অঙ্গোলার অগোসতিনহা নেটোর বন্ধু মাসুন্দার কথা মনে পড়ে। নেটো একজন সমাজসচেতন কবি। তিনি ১৯৬০ সালে অঙ্গোলার মুক্তিযুদ্ধ ফ্রন্ট এম পি এল-এর সভাপতি হন। জেলেও কাটিয়েছেন বেশ কয়েক বছর—

এখানে আমি
বন্ধু মাসুন্দা!
এখানে আমি।
সঙ্গে তোমার
সঙ্গে দৃঢ় জয়ের তোমার উল্লাসের
এবং তোমার নীতিজ্ঞানের

—তুমিই সেই মৃত্যু, দেব সৃষ্টি করে।
তুমিই সেই মৃত্যু, দেব সৃষ্টি করে
সৃষ্টি করে...

স্মরণ কি?

অতীত দিনের বিষণ্ণতা
যেখানে যখন ছিলাম সব
আমের সঙ্গে খাদ্য হয়ে
ভাগ্য ঘিরে আত্মশোক
এবং নারী কান্নারই
দুঃখবোধের গান আমাদের
আমাদের নেই অসম ভাব
আমাদেরই চোখের মেঘ
স্মরণ কি?

এখানে আমি
বন্ধু মাসুন্দা।

[illegible] তোমার [illegible]
[illegible] জীবনটা
[illegible] একই, একই প্রেম
[illegible] রক্ষা করলে যাতে
সাপের আলিঙ্গনের থেকে
শক্তি তোমার
বদলে গেছে মানুষেরই
ভাগ্যে আজ।

কিন্তু এসব কথা প্রকাশ করাও খুব সহজ নয় সে দেশে। তাই দেখি সেখানকার কবিদের উপর শ্বেতাঙ্গদের নিষ্ঠুর অবিচার।

রোডেসিয়ার কবি ডেনিস ব্রুটাসকে আজ কারাগারের মধ্যেই কয়েকটি বছর কাটিয়ে দিতে হল। অপরাধ? খেলা-ধুলার ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী নীতির ছিলেন তিনি ঘোরতম বিরোধী। জেলে পুরবার আগে চাকরিটি খতম করে দেন শ্বেতাঙ্গ প্রভু আয়ান স্মিথের। সিরেনস, নুকেলস, বটুস, প্রভৃতি আলোড়নকারী কাব্যগ্রন্থের কবির কাছে কারাগারই হয়ে ওঠে মুক্ত বিচরণভূমি।

আফ্রিকান কবি-সাহিত্যিকদের উপর এরকম অত্যাচার বহুবারই নেমে এসেছে। তবু তাঁদের কন্ঠরোধ করা যায়নি। বরং এই অন্যায় অবিচারের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছে আফ্রিকার জাতীয়তাবাদ।

আফ্রিকার সাহিত্যে প্রতিরোধ আর প্রতিবাদের কবিতা ছাড়াও বিভিন্ন সুরের লেখা দেখতে পাওয়া যায়। মোজাম্বিকের কবিদের মধ্যে পাওয়া যায় এক ধরনের গানের সুর। চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রকান্ড নদীর দৃশ্য। রুপোলি ঢেউয়ের ঝুঁটি ধরে কারা যেন এগিয়ে যায় সামনের দিকে। এ সময় বাঙলাদেশের মাঝি-মাল্লাদের কথা মনে পড়ে, ভেসে আসে ভাটিয়ালী গান। যেমন ধরুন জোশে ক্রাভেরিনহার 'ফেরির ওপর নিগ্রোর গান' কবিতাটি।

অসময় যদি মরতে তুমি দ্যাখো
জন্ম নেবো আবার লক্ষ বার...
আমায় যদি কাঁদতে তুমি দ্যাখো
নীরব রবো, এখানে লক্ষ বার......

আমায় যদি গাইতে তুমি দ্যাখো
মরব আমি এখানে লক্ষ বার
এবং রক্তপাত......
বলছি তোমায় ইউরোপীয়ান ভাই

তোমায় জন্ম নিতে হবে
তোমায় ঠিক কাঁদতে হবে
তোমায় ঠিক গাইতে হবে
চেঁচাতে হবে, আর
মরতে হবে
রক্তপাত...
আমার মতো লক্ষ বার!!!

লোকগীতি থেকে উপকরণ নিয়ে এখানকার কবিরা আফ্রিকান সাহিত্যকে যেন বৈচিত্র্য-পূর্ণ করেছেন, তেমনি করেছেন ভাবসমৃদ্ধ। বিরাগো দিয়প, গ্রেস ও গোট, শরিফ ইজমন এবং আমোস তুতুওলার নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে।

প্রেমের কবিতাতেও আফ্রিকা নতুনত্বের দাবি রাখে। আধুনিক জীবনের জটিল মানসিকতাও এতে ছায়া ফেলে। এদিক থেকে কেনিয়ার কবি জোসেফ ই কারুইকি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপমা ও চিত্রকল্প প্রয়োগে তিনি সৃষ্টি করেন এক নতুন পরিমন্ডল।

অন্যান্য কবিদের মধ্যে ক্রিস্টিনা আমা আতা আইদু, ম্যাজিসি কুনেন জর্জ, আউনর উইলিয়াম, আন্তনি রোজার বোলাম্বা, কিউইঁস ব্রু, ডেভিড দিয়াপ, পাওলন জেয়াসিম, লুই নিকোসি, এফ ডি কুজো প্রভৃতি নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ।

এক কথায় আফ্রিকান সাহিত্য হল আন্তর্জাতিকতার জীবন্ত উপমা। একথা ঠিক যে, আফ্রিকার লেখকদের মধ্যে স্বদেশের মানুষের যন্ত্রণাই ভাষা পেয়েছে। এবং তাই স্বাভাবিক।

ঔপনিবেশিকতা থেকে স্বাধীনতা আর মুক্ত পৃথিবীর গভীর উল্লাস, নতুন আত্ম-সচেতনতা আর দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আফ্রিকা নতুন মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। এভাবে সেতুবন্ধন হয়েছে একালের সঙ্গে সেকালের।

শোনো আগুনের শব্দ
জলের ধ্বনি
বাতাসে শোনো অরণ্যের কান্না,
ও সবই আমাদের পূর্বপুরুষের
নিঃশ্বাস।

আফ্রিকার শিল্পকলা

কমল চৌধুরী

বছর দশেক আগেকার কথা।

নাইজেরিয়ার নবং জেলা। একটি খনিতে কাজ করছিল শ্রমিকরা। তাদের কোদালের আঘাতে উঠে আসছিল তাল তাল মাটি। মাঝে মাঝে সেই মাটির স্তূপের সঙ্গে উঠে আসে ভাঙা পুতুলের হাত-পা-মাথা। এ জিনিস তারা দেখল। কিন্তু তাদের কাছে এর কোন মূল্য নেই, অর্থহীন।

হঠাৎ একজনের চোখে ধরল ব্যাপারটা। মাত্র গোটাকয়েক অক্ষত পুতুল পাওয়া গেল। আর্ট বিশেষজ্ঞরা খৃস্টপূর্ব ছয়শত বৎসর পূর্বেকার এই অপূর্ব শিল্পকাজগুলির দুরবস্থা দেখে বিস্মিত হলেন। এক জায়গায় কমপক্ষে দুশটি পুতুল ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে খৃস্টপূর্ব কয়েক শ' বছর ধরে এই অঞ্চলে শিল্পের চর্চা ছিল বেশ সজীব। অনেকের মতে নিগ্রো আর্টের সূচনা এখানেই। পুরোদমে আর্টের চর্চায় এই অঞ্চলের অধিবাসীরা যে আত্মনিয়োগ করেছিল, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত।

এর আগেও আফ্রিকান শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল সে মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। সেই সমস্ত শিল্পকর্ম নিয়ে আর্ট বিশেষজ্ঞরা নানাভাবে আলোচনা করেছেন। নিগ্রো আর্টের প্রাণকেন্দ্রকে ধরবার জন্য তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি। একদা অবহেলিত আফ্রিকার সংস্কৃতি আজ দেশে-বিদেশে মর্যাদায় আসীন। চরম উপেক্ষায় অন্ধকার জগতে যার দিন কেটেছে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মূ্যজিঅমগুলিতে তার সগৌরব উপস্থিতি আজ বিস্মিত করে।

বেনুই নদীর উপত্যকায় জাবা জেলায় আনুমানিক দু' হাজার বছরের পুরনো ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। নোক গ্রামে পঁচিশ ফুট মাটির নীচে পাওয়া গেছে কয়েকটি জীবজন্তু ও নরমুণ্ড। অনেক বিশেষজ্ঞ অনুমান করছেন য়োরুবা সংস্কৃতির আবির্ভাব আরো পরে। বেনুই নদীর উপত্যকা ধরে আফ্রিকান সংস্কৃতির বিকাশ। দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ অভিমুখে খৃস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে খৃস্ট পরবর্তী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এই সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। বিরুদ্ধ আবহাওয়া এবং অহল্যাভূমির প্রতিকূলতা রুদ্ধ করতে পারে নি এর যাত্রাকে। তাই অন্ধকার খনিগহ্বর থেকে উঠে এসেছিল তামা নিকেল সোনা। এই সব জিনিস পারস্য চীন ভারতে প্রচুর পরিমানে চালান যেত। আফ্রিকান নিগ্রোশিল্পের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এই ঘটনাটি যে প্রধান শিল্পশৈলীগুলি একই এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। তার শুরু ফরাসী গায়না থেকে এবং শেষ টাঙ্গানাইকা হ্রদ অঞ্চলে। অবশ্য দক্ষিণেও খোদাই শিল্পের নিদর্শন প্রচুর।

আফ্রিকা দেশটা বিরাট। অসংখ্য নদীনালা তাকে টুকরো টুকরো করে বিচ্ছিন্ন করেছে। এই সব খন্ড বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সভ্যজগতের মানুষের কাছে খুবই বিস্ময়কর। ভৌগলিক বিরোধ যেমন প্রকট তেমনি স্টাইলের স্বাতন্ত্র আফ্রিকান শিল্পকলার অন্যতম অনুষঙ্গ স্টাইলের যেন ছড়াছড়ি। উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে কারো সঙ্গে কারোরই মিল নেই। পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রকৃত আফ্রিকান নিগ্রো শিল্পকলার সন্ধান মেলে, যা নেই উত্তর আফ্রিকার নিগ্রো আর্টে। সেখানে আরব সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্ট। আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পে বিদেশী প্রভাবের স্পর্শ পর্যন্ত লাগেনি। অবশ্য পশ্চিম আফ্রিকায় সব থেকে বেশী পরিমাণ এবং বৈচিত্র্যময় নিগ্রো আর্টের সন্ধান মেলে।

নিগ্রোদের বসতি রয়েছে প্রায় গোটা আফ্রিকাতেই। তাই সারা আফ্রিকাতেই ছড়িয়ে আছে নিগ্রো শিল্পকলার অনন্যরূপ। অদ্ভুত জীবন্ত আর প্রাণৈশ্বর্যময় এই আফ্রিকান শিল্পকলা। তমসাচ্ছন্ন আফ্রিকার কোন অতীত নেই—এমন কোন ঐতিহ্য নেই যা সভ্যতায় পুরোগামী য়ুরোপীয়
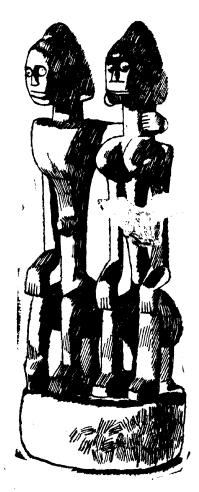
দেশগুলির সঙ্গে তুলনীয়—এই সিদ্ধান্ত আজ ভ্রান্ত।

সুকুমার চিন্তার প্রতিফলনেই জন্ম নেয় আর্ট। শিল্পী তাঁর নিজের অনুরূপ এবং আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীর প্রতিরূপ ফুটিয়ে তোলেন তাঁর সৃষ্টিতে।

নিগ্রো আর্টের ক্ষেত্রে একথা পুরোপুরি সত্য। নিগ্রোশিল্পী কল্পনা থেকে বাস্তবকে বেশি ভালবেসেছেন। পরিবেশ ও প্রতিবেশীকে রূপ দিয়েছেন কাঠের ওপর। তারপর পাথরে বা বিভিন্ন ধাতুতে। তাছাড়া নিগ্রো আর্টের আরেক মূল্যবান সম্পদ হল হাতির দাঁতের ওপর নয়নাভিরাম শিল্পকর্ম।

কাঠখোদাই, ব্রোঞ্জ, হাতীর দাঁতের কাজই একমাত্র নিগ্রো আর্ট নয়। সোনার তৈরী মূল্যবান অলঙ্কারও আছে। এগুলি অবশ্য সাজবার কাজে ব্যবহার করা হোত না। অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুখোশের লকেট গয়নায় ঝোলাত। চামচে, কাঠের চামচ, থালা এবং আরো এই ধরণের অসংখ্য জিনিস পাওয়া গেছে যা বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত।

মুখোশ অন্যতম নিগ্রো আর্ট। এ জিনিস পাওয়া যায় আফ্রিকার সর্বত্রই। বীভৎস হলেও মুখোশগুলি জীবন্ত। নিগ্রো আর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এগুলি। এই মুখোশগুলি মানুষের আকৃতি বা জন্তু জানোয়ার বা বিমূর্ত ডিজাইনের মাধ্যমে তৈরি। একাধিক মূর্তি দেখা যায় কোন কোন মুখোশে। এই মুখোশ ব্যবহারের অনেকগুলি ধর্মীয় দিক আছে। বহুবর্ণরঞ্জিত মুখোশ কোথাও কোথাও দেখা যায়। নিগ্রো আর্ট যে নির্বাক নয়, তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই মুখোশ। শিল্পীর নিখুঁত শিল্পজ্ঞানে কাঠের তৈরী এই মুখোশগুলো যেন কথা বলছে। একটি সবাক প্রতিধ্বনি ফুটে উঠেছে তাদের মুখে।

নিগ্রোদের এক একটি শিল্পকর্মের সামাজিক ধর্মীয় এবং বাস্তব তাৎপর্য রয়েছে। যেমন মৃতের আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করতে খোদাই করা মূর্তি ব্যবহৃত হোত। প্রকৃতি দেবতাকে প্রতীয়িত করা হয়েছে খোদিত মূর্তিতে। ব্রোঞ্জ-স্বর্ণের বাটখারা ছাঁচে তৈরি হোত না। তাই প্রতিটি বাটখারাই ছিল স্বতন্ত্র মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষরময়। এই বাটখারায় ফুটে উঠত দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি। কোন ধর্মীয় বিষয় বা প্রবাদবাক্যকেও শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছে।

মেয়েরা বসে গল্প করছে, মাছ, গাছপালা, বীজ, ফল, পশুপক্ষী পতঙ্গ, অস্ত্রশস্ত্র এইসব বাটখারার ওপর চিত্রিত। জ্যামিতিক ডিজাইনের বাটখারাও কিছু পাওয়া গেছে। জনজীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সাক্ষাৎ যেমন মেলে এগুলিতে তেমনি এগুলির প্রাণশক্তি ও অভিব্যক্তির অসামান্য ব্যঞ্জনাও অতুলনীয়। আফ্রিকান নিগ্রো শিল্পকলার এ এক অনন্য সম্পদ।

কুড়ু এক ধরণের ব্রোঞ্জের তৈরি পাত্র। এতে আছে কবজালাগানো ঢাকনি। তার ওপর খোদিত যুধ্যমান দুটি পশু। অপূর্ব কারুকার্য খচিত পাত্রটি। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কবর দেওয়ার সময় এই পাত্র দেওয়া হোত।

যে কোন শিল্পশৈলীই হোল যুগের সামাজিক আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ। আফ্রিকানদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার শিল্পকলা যার প্রধান মাধ্যম খোদাই শিল্প হলেও, কারুশিল্পও অবহেলিত নয়।

নিগ্রো আর্টের কাঠখোদাই, কাঠের মূর্তি ও মুখোশগুলো আজকাল তৈরি হয় অতি নরম কাঠে। একটু ধাক্কা লাগলেই ভেঙে যায়। আগেও হাল্কা কাঠে এ সব তৈরি হোত। তবে কিছু হোত আবলুশ কাঠে। কাঠের পুতুল ও মুখোশগুলো কিন্তু নিছক শিল্পচর্চার উদ্দেশ্যমূলক নয়। ভূত প্রেত তাড়াবার জন্যে, আত্মা বা দেবদেবীকে তুষ্ট করবার জন্যে নির্মিত হোত। এই শিল্পগুলিকে মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা চলে। সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হোত কিছু কাঠের পুতুল ও মুখোশ। যেমন ধান কাটা উৎসব, সন্তানলাভের উৎসব, মৃত্যু উৎসব। আর একটা উৎসব ছিল মৃত আত্মাদের নিয়ে।

কাঠখোদাই ও মুখোশ আজকাল পশ্চিম আফ্রিকায় প্রচুর তৈরি হচ্ছে। এগুলোর গায়ে ময়লা জড়িয়ে কয়েক শতাব্দীর পুরনো বলে ইউরোপে চালাবার চেষ্টা চলেছে। ইউরোপ আমেরিকা হোল নিগ্রো আর্টের অন্যতম ক্রেতা। সেখানকার বাজারে আসল ও নকল আর্টে একাকার হয়ে গেছে।

আজ আফ্রিকা সুদীর্ঘ বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে। নতুন প্রাণের সুর দেশের সর্বত্র। জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। দেশবিদেশে আফ্রিকান শিল্পকলা যেভাবে সমাদৃত হচ্ছে, তা সার্থক শিল্পেরই স্বীকৃতি, এতে সন্দেহ নেই।

আফ্রিকার নারী সমাজ

নিঃসংশয়ে বলা যায়, কালো আফ্রিকার দেশে দেশে দুরন্ত যৌবন আজ নয়া ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত। 'সাত রাজার ধন এক মাণিক' স্বাধীনতা আফ্রিকার কালো বুকে আলোর ঝিলিক তুলেছে, শুরু হয়েছে মহাদেশময় নবজাগরণের মহোৎসব। উপনিবেশের শৃংখল ক্রমেই মহাদেশের বুক থেকে অপসারিত হচ্ছে। একটি দেশের স্বাধীনতা অপর দেশকে উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করছে। এভাবেই মহাদেশের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পরাধীনতার বিরুদ্ধতা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, আর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি নিজেদের নতুন করে গড়ে তোলার কাজে উৎসাহী হয়েছে। এই উৎসাহের আন্তরিকতায় কোথাও কোন খামতি নেই। এদিক দিয়ে দেখলে গোটা আফ্রিকা আজ এক বিরাট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চলেছে। সবদিক দিয়েই আফ্রিকার এই বিপ্লব অভিনব। এই মহাদেশ যেমন পৃথিবীর কাছে বিরাট বিস্ময়, তেমনি এই বিপ্লব আরো বিস্ময়কর। সকলের নজর তাই আজ আফ্রিকার দিকে।

বিপ্লব মানেই পরিবর্তন—মানুষের চিন্তাজগতে আলোড়ন এবং নতুনের প্রবর্তন। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত অনেক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। রক্তপাতের বীভৎসতায় শিহরণ জেগেছে, ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামে সভ্যতা প্রমাদ গুণেছে। তা সত্ত্বেও সব বিপ্লবই আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি এবং স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তনের আন্তরিক উদ্দেশ্য সফল হয়নি। নতুনের প্রবর্তন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আজ আফ্রিকা এক সর্বাত্মক বিপ্লবের মাধ্যমে পরিবর্তনে উত্তীর্ণ হতে চলেছে, সেই সঙ্গে শুদ্ধিব্রতও উদযাপন করছে। পরাধীনতার কলুষমুক্ত আফ্রিকার নানা দেশে এই বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। তবে সর্বত্র এ বিপ্লব রক্তক্ষয়ী তাণ্ডবে মুখর নয়। বিশ্বের আরো অনেক দেশে এই নিঃশব্দ বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর উপনিবেশবাদীরা নিজেদের গোটাতে শুরু করে। তারপর জাতির পক্ষে এই পটপরিবর্তন অপরিহার্য। সাম্রাজ্যবাদের শেষ ঘাঁটি আফ্রিকাও নিজের অস্তিত্ব তুলে ধরার প্রয়াসী। তাই সে আজ সমানে পাঞ্জা কষে চলেছে। এর ফলে কোথাও সে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, কোথাও দাবী আদায় হচ্ছে। সব অবস্থাতেই অবশ্য দাবী আদায়ের পথ জোরদার হচ্ছে। আফ্রিকার মানুষের চিন্তাজগতে এবং মনোজগতে স্বাধীনতা এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সুদৃঢ় হয়েছে। তার প্রভাব এসে পড়ছে পারিবারিক জীবনেও।

নারীপুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতা আমাদের দেশে এক সাধনার ধন। অনেক কষ্টে মেয়েরা অর্জন করেছেন পুরুষদের সঙ্গে সমান আসন। কিন্তু

রাজনৈতিক প্রচার কার্যে আফ্রিকার নারী

আফ্রিকার ইতিহাস এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এজন্য এদেশের পুরনো দিনের পাতায় একবার নজর বুলিয়ে নেওয়া উচিত, যাতে সম্পূর্ণ জিনিষটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবে।

নারীপুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতা আফ্রিকায় নতুন নয়। যেদিন এরা বনে বনে ঘুরে বেড়াতো, নগ্ন প্রকৃতির বুকে নির্ভীক এবং একান্ত স্বাভাবিক জীবন কাটাতো, সেদিন থেকেই নারীর সমান আসন এরা স্বীকার করে নিয়েছে। এ-ব্যাপারে গোড়া থেকেই তারা সকল দ্বিধা, দ্বন্দ্ব এবং সংকোচের উর্ধ্বে। সেদিন নারীর এই মর্যাদার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল উপজাতি প্রধানের স্ত্রী হিসে[illegible] জাতি প্রধানের স্ত্রী [illegible] সকল ব্যাপারে অংশ [illegible] তিনি আবার শাসকমণ্ডলীতে [illegible] প্রতিনিধি। এ হেন বিরাট [illegible]র প্রতিনিধিকে অস্বীকার করে রাজার পক্ষে কোন আইন প্রণয়ন বা সংশোধন অসম্ভব। সর্বত্রই এই নিয়ম কঠোরভাবে পালন করা হতো। তবু পূর্ব আফ্রিকার তুলনায় পশ্চিম আফ্রিকার নারীসমাজ জনগণের মতামত সম্পর্কে আরো বেশি ক্ষমতার অধিকারী ছিল। মেয়েদের উপর অন্যায়ভাবে বা জোরজবরদস্তি কোন আইন চাপিয়ে দেওয়া সেখানে কল্পনাতীত। নতুন কোন কিছুর প্রচলন করতে হলে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের মত চাওয়া হয়। ডার্ক কন্টিনেন্ট আফ্রিকার পক্ষে সেদিন যা সম্ভব হয়েছিল পৃথিবীর অনেক সভ্য দেশেই দীর্ঘদিন তা ছিল নেহাত কল্পনার বিষয়। বলতে দ্বিধা নেই ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মত সভ্য দেশেও এই সমানাধিকার এসেছে মাত্র সেদিন। পরাধীনতার বোঝা বয়েও আফ্রিকা নিজের স্বাভাবিক চরিত্রবৈশিষ্ট্য বর্জন করেনি, বা বর্জন করার কথা কল্পনাতেও আনেনি। অথচ নারী-পুরুষের

আফ্রিকার নারী-সমাজ-সেবিকা

সমানাধিকারের সুমহান উত্তরাধিকারে আমাদের দেশেও মাঝপথে ছেদ পড়েছিল। বিদেশী শাসন এজন্য অনেকখানি দায়ী। স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই উত্তরাধিকারে পুনঃ প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করছি সাংবিধানিক ঘোষণার মাধ্যমে—যার পূর্ণ রূপায়ণ বিরাট সময়সাপেক্ষ।

আফ্রিকা নারীর মর্যাদার এই সুমহান ঐতিহ্য আজও অক্ষুন্ন রেখেছে। নতুন দেশ গড়ে তোলার কাজে মেয়েরা সমান অংশ নিয়েছে এবং যখন দেশ গড়ার প্রশ্ন ছিল সুদূরে তখনও স্বাধীনতার আন্দোলনে তারা যোগ দিয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের কাহিনী আলোচনা করলে এর সত্যতা স্পষ্ট হবে। কেনিয়ার মাউ মাউ আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা চিরকাল শ্রদ্ধার উদ্রেক করবে। অন্যান্য দেশেও তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষের পার্শ্বচর হিসেবে কাজ করেছে, হাতে হাত মিলিয়ে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা দীর্ঘদিন বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছে। এক্ষেত্রে তারা ফরাসী বিপ্লবের সময়কার মেয়েদের চেয়ে বেশি অগ্রসর। ফরাসী বিপ্লবে মেয়েদের ভূমিকা ছিল খুবই অনুল্লেখ্য। কিন্তু আফ্রিকার দেশে দেশে স্বাধীনতার লড়াইয়ে মেয়েদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বে অপরিহার্য এবং কৃতিত্বে অনন্য। সারা মহাদেশে আফ্রিকার নারীসমাজের আকাঙ্ক্ষা এখনো বাস্তব হয়ে ওঠেনি। কোন কোন দেশে-বিদেশী শাসকের ঔদ্ধত্য আজও তাদের চোখ রাঙাচ্ছে। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে তারা মরণবিজয়ী সংগ্রামে মেতে উঠেছে। বিদেশী শৃংখল তারা ভাঙবেই—স্বাধীনতার আলোকবন্যায় স্নান [illegible] দেশ গড়ার পবিত্র [illegible] কাঁধে তুলে নেবে। ইতিমধ্যে [illegible] দের যারা দেশ থেকে হটাতে [illegible] তারা জীবনের জয়গানে আকাশ-বাতাস মুখর করে তুলেছে। সে প্রচণ্ড কলরোলে আফ্রিকার বাকী অংশের মুক্তিও ত্বরান্বিত হবে, একথা জোর দিয়েই বলা যায়।

এই সুদীর্ঘ লড়াই এবং বিদেশী শাসকের ঔদ্ধত্য স্বাভাবিকভাবেই আফ্রিকার মেয়েদের করে তুলেছে উগ্র জাতীয়তাবাদী, নিজেদের সমাজ-সংস্কার এবং উন্নতি ছাড়া তারা আর কিছু ভাবতেই পারে না। কোনক্রমেই শ্বেতাংগদের বরদাস্ত করতে পারে না তারা। অবশ্য তাদের এই জাতীয়তাবাদের উদ্বোধনের মূলেও আছে পাশ্চাত্য শিক্ষা। আফ্রিকার বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রায় সকলেই ইউরোপ-আমেরিকায় শিক্ষিত। এই শিক্ষা এবং সর্বোপরি বিদেশী প্রভাবে জীবনে পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে সুস্পষ্টভাবে। আফ্রিকার নারীসমাজ কোথাও এই

অলঙ্কারে সজ্জিতা আফ্রিকার নারী

প্রভাব জীবনের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছে আবার কোথাও বর্জন করেছে। পুরোন গোষ্ঠী-জীবনকে এবার তারা সুসংহত করে ঐক্যবদ্ধ জাত হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। এজন্য প্রথমেই তারা উপজাতীয় কোন্দলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয়, আফ্রিকাকে সংহত করার পথে বিভিন্ন উপজাতীয় সংঘর্ষ যে সংকটের সৃষ্টি করতে পারে, সে সম্বন্ধেও এরা সচেতন। তাই পরিবর্তন আনায় এদের প্রয়াস খুব সহজ নয়। শুধু মাত্র আন্তরিকতার জোরে এরা এগিয়ে চলেছে। নতুন ও পুরোনোর মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের গড়ে তোলার কাজে তারা ব্রতী হয়েছে। একটা ব্যাপারে ইউরোপকে তারা মেনে নিয়েছে। পুরোন পোষাক ছেড়ে অনেক সহজ এবং স্বচ্ছন্দ পশ্চিমী পোষাক অংগে ধারণ করে তারা তৃপ্ত। কোন কোন দেশে আবার পোষাকের ব্যাপক সংস্কার শুরু হয়েছে। এ-ব্যাপারে কামাল আতাতুর্কের পরেই আফ্রিকার দেশ-নায়কদের স্থান। নানা কারণেই আফ্রিকার পক্ষে পোষাক সংস্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই মহাদেশের অনেক জায়গায় এখনও এমন অনেক উপজাতি আছে যারা পোষাকের কোন ধার ধারে না। দিন-বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধ্যান-ধারণাতে পরিবর্তন আনতে হবে। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নিয়ে অনেকে ভাবিত। দু' একটি দেশ ইতিমধ্যে দেশী পোষাক বর্জন করে পশ্চিমী পোষাকের পক্ষে আদেশও জারী করেছে। সংহতির দিক থেকেও এই আদেশের গুরুত্ব কম নয়। পোষাকে মিল দেশের দ্রুত ঐক্যবিধানের অন্যতম হাতিয়ার। এসব ভেবে আফ্রিকার নারী-সমাজও পশ্চিমী পোষাকের পক্ষে রায় দিয়েছে।

আফ্রিকার জমাট আঁধার আজ কেটে যাচ্ছে আর সে ফাঁক দিয়ে আলোক ঠিকরে পড়ছে। এই সময় ও সুযোগ আফ্রিকার

নারী-সমাজ হেলায় হারাতে রাজী নয় বা অবহেলায় কাটাতেও প্রস্তুত নয়। তারা চায় প্রতিটি মুহূর্তের পূর্ণ ব্যবহার। এভাবে জাতির প্রতি নিজের বিশ্বস্ততার পরিচয় তারা রেখে যেতে চায় ভবিষ্যতে ঠিক নির্দেশের জন্য। তাই আজ দেখা যাবে, আফ্রিকান নারী ছড়িয়ে পড়েছে জীবনের সর্বস্তরে। রাজনীতি থেকে বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী—সর্বত্র তাদের পদ-সঞ্চার। রাজনীতিক হিসেবে আন্তর্জাতিক বোঝা-পড়া এবং বিদেশে রাষ্ট্রদূতের ভূমিকায় তাঁরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন। এ-ব্যাপারে তাঁদের সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় দেখে মনে হয় এটা যেন তাদের মহান ট্রাডিশন।

দেশের সকল কাজেই আফ্রিকান নারীর ভূমিকা আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাইরে তারা সুদক্ষ কর্মী। আবার গৃহে তারা নিপুণা গৃহিণী। কর্মক্ষেত্র এবং সংসারকে এক যাদুমন্ত্রবলে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে নিয়েছেন। গৃহ-জীবনেও তাঁরা নতুন রীতির প্রবর্তন করে চলেছেন। নারীত্বের ক্ষেত্রেও তারা পশ্চিমী নারীদের ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁরা শুধু স্বামীর সহচরই নয়, সমাজের শিক্ষক এবং আদর্শ। যে যেখানেই কাজ করুক না কেন, তাঁদের সকল প্রচেষ্টা নতুন দেশ গড়ার প্রতিজ্ঞায় উন্মুখ। আফ্রিকার দেশে দেশে নারী-সমাজের জয়-কেতন আজ এভাবেই নতুন ইতিহাস রচনা করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকাও নতুন সম্ভাবনার সিংহদ্বারের সমীপবর্তী হচ্ছে।

...নোটগুলো হাতের মধ্যে পাকি... ...ড় দিলে রতন মিস্ত্রী—'যাও ভাগে... ...ওর কুছ্ নেহি মিলেগা।'

রামলগন হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল কিন্তু পারলে না। ওরি গায়ে লেগে সব ছড়িয়ে পড়লো, ঘরের মেঝেতে।

'আরে এ বুধন্-ওয়া—বলামাত্র ওর পিছন থেকে তার সতেরো আঠারো বছরের ছেলে বুধন একেবারে হুমড়ি খেয়ে কালী-ঘাটের কাঙালীর মত টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বাপের হাতে দিলে।

যা ভয় করেছিল রামলগন তাই হলো। পাঁচটাকার নোটখানার কিছু হয়নি, কিন্তু একটাকার নোট তিনখানাতেই কালো রং লেগে গেল। একটু আগে ওরা বাপ-ব্যাটায় ওই খোলার ঘরের মেঝেতে বসে টিনের সুটকেশ তৈরী করে যে 'ব্ল্যাক জাপান' তুলি করে লাগিয়েছিল তারি ফোঁটাফুটি, ছেঁড়া ময়লা চেটাইটার এখানে ওখানে তখনো পড়েছিল, তা জানতো সে। তাই নোট তিন-খানা সাবধানে নিজের কাপড়ে মুছতে মুছতে রামলগন, খইনী খাওয়া শুকনো গলায়

বলে উঠলো, 'জানি শুনলুবা, আরে এ হো মিস্ত্রী ভাই।'

ঘরের ভেতরে চলে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়িয়ে রতন মিস্ত্রী খিঁচিয়ে ওঠে, 'কেয়া, আউর আধেলা নেহি মিলেগা, বোল্ দিয়া তো। তব্ ফিন্ কাহে চিল্লাতে।'

'জানি হাত জোড়তা, আউর দুগো রুপিয়া দিজীয়ে—।'

'আর একটা পয়সাও দিতে পারবো না। যাও ভাগো।'

চার রোজ কা মজুরী বাকী, হামার আঠারো, বুধন্‌কা বারো তিরিশ রুপিয়া—

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রুক্ষস্বরে জবাব দেয় মিস্ত্রী।

হাঁ-হাঁ জান্‌তা হ্যায় সব! তোমার তিরিশ টাকা বাকী, আর আমার যে বাজারে তিনহাজার টাকা পাওনা, হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে যাচ্ছে, কোন ব্যাটা উপুরহস্ত করে না। বলে বাজার খারাপ 'রওনী' পর্যন্ত হচ্ছে না নাকি।

ওতো ঠিক বাত্। লেকিন্ পেঠ না ভরনেসে কাম কেইসে করেগা। আজ তিন্ রোজসে ভুখা মরতা। খালি 'পাওডর' চানা খাকে কাম করতা। দো সাল তো দেশমে পানি নেহি হুয়া, ক্ষেতিউতি সব জ্বল গিয়া। জরু, লেড়কালেড়কী, ভাতিজা সব ত মুলক্‌সে হিঁয়া আ গিয়া। ইস্‌মে কেয়া হ্যাম্ খায়েগা, কেয়া ওলোগকো খিলায়েগা মিস্ত্রী। সাড়ে তিন রুপেয়া ছাতুয়াকে ভাউ, আউর 'চাবল্' চার রুপেয়া কিলো। ওই সে আউর দো রুপিয়া মাঙতা। দু' কিলো চাউল, আর কুছ্ কমসে কম পিয়াঁজ-ও'য়াজ লেয়ায়েগা—বাসামে তো বালবাচ্ছাকো খিলায়েগা—হ্যাম খায়েগা।

বিকৃতস্বরে রতন মিস্ত্রী বলে উঠলো, আর খেতে হবে না! যা শুনে এলুম আজ বাজারে, ভয়ে হাত পা পেটের ভেতর সিঁদিয়ে যাচ্ছে।

রামলগনের চোখ দুটো কৌতূহলে ফেটে পড়ে, কেয়া শুনা মিস্ত্রী। কোই গোল-মাল হুয়া?

নারে বাবা না, তাহলে ত ভাবনা ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের একেবারে বারোটা বাজলো। কেবল 'ঘেরাও' আর 'ঘেরাও'— দু'তিনশো কলকারখানা নাকি বন্ধ হয়ে গেছে! আর দু-তিনটে মাস যদি এইভাবে চলে, তাহলে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে সবাইকে রাস্তায় বেরুতে হবে। কিন্তু ভিক্ষে দেবে কে, এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বলে বুড়ো আঙ্গুলটা নেড়ে রতন মিস্ত্রী যেমন দেখালে আচ্ছা 'রাম রাম' ভাই বলে ওরা বাপ-ব্যাটার ঘর থেকে নেমে গলিতে হাঁটতে শুরু করলে।

বড় রাস্তায় পড়ে রামলগন, সেই রং-লাগা নোট তিনখানা ট্যাঁক থেকে বার করে বললে, আরে এ বুধনোয়া, ইয়ে নোট চলেগা?

বুধন বাপের হাত থেকে নোট তিন-খানা নিয়ে দেখে নাকের কাছে রঙের গন্ধ শুঁকে, বললে, হাঁ, ইয়ে ত ঠিক হ্যায়। রঙ ত উঠ্ গিয়া, খালি থোড়াসে দাগ হ্যায়!

হন্ হন্ করে ওরা হাঁটতে থাকে। টাকা আদায় করতে আজ অনেকটা দেরী হয়ে গেছে। এখনি হয়ত সব রাস্তার লাইট-গুলো দপ করে জ্বলে উঠবে চোখের ওপর!

যেতে হবে তাদের সেই বৈঠকখানার বাজারের পিছনে, প্রস্রাবখানার পাশ দিয়ে যে সরু গলিটা ভেতরে ঢুকে গেছে সেইখানে রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়ে, পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে যেসব মেয়ে-ছেলেরা গ্রাম থেকে সস্তায় চাল কিনে এনে চড়া দামে বিক্রী করে রাস্তার ওপর কাপড়ে চাল ঢেলে, সিগারেটের টিনের কৌটোর মাপে দু'কৌটো এক কিলো হিসেবে. তাড়াতাড়ি যেতে না পারলে, চাল ফুরিয়ে এলে দামও তারা বাড়িয়ে দেয় ইচ্ছামত। কালোবাজারের ত কোন বাঁধা-ধরা 'রেট্' নেই। যে যার গলা যেভাবে কাটতে পারে? এই একটা মাসের মধ্যে দেখতে দেখতে দু'টাকা আশি থেকে একেবারে চার টাকায় উঠে গেছে দর। তাও কেউ আপত্তি করে না। বেশ অম্লান-বদনে কিনে নিয়ে যায়। যেন পেয়েছে এই ঢের! সত্যি এরা না থাকলে, রামলগনের মত যারা নগদা মজুরী করে খায়, তাদের কি দুর্দশা হতো। দুটো ভাতের অভাবে না খেয়ে মরতে হতো! চানা চিবিয়ে, ছাতু জল দিয়ে মেখে, কাঁচা লংকা আর নিমক্ দিয়ে রাস্তার ধারে পিতলের থালায় খেয়ে যারা মুটে-মজুরের কাজ করে রিক্সা টানে, ঠেলায় মাল বয়, তারাও তিন-চারদিন পরে একদিন ভাত না খেলে পারে না! সন্ধ্যা-বেলা বাসায় ফিরে ফেনেভাতে গরম গরম একটু আচার মেখে খেতে খেতে যেন হাতে স্বর্গ পায়!

বুধন ছেলেমানুষ, সতেরো-আঠারো বছর বয়েস, তিনদিন ধরে চানা চিবিয়ে আছে, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তার মাথার মধ্যেটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করে। কতক্ষণে চাল কিনে নিয়ে বাসায় ফিরবে। তার মা পিতলের থালিয়াতে গরম ভাত ঢেলে দেবে, আর সে দেশ থেকে আনা লংকার খট্টাই মেখে খাবে! সে কথা মনে হতেই যেন তার জিব লালাসিক্ত হয়ে ওঠে। নাকে গরম ভাতের সংগে সেই অদ্ভুত আচারের গন্ধটা বাতাসে ভেসে আসে। ওদিকে রাম-লগনও অনেকদিন পরে স্ত্রীর হাতের রান্না পিয়াঁজের সংগে নেনুয়ার তরকারি দিয়ে আজ দু'টো ভাত খাবে, স্থির করে রেখেছিল। একবছর আগে যখন মুলুক গিয়েছিল, পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে তখন তার স্ত্রী আসবার দিনে তাকে রেঁধে খাইয়েছিল। ভারী সুস্বাদু লেগেছিল। সে আস্বাদ যেন আজো ভুলতে পারেনি। কিন্তু মাত্র আটটা টাকায় কি করে তা সম্ভব হবে। দু'কিলো চাল ত কমসে কম চাই। নইলে এই দু'টো জোয়ান লোকের পেট ভরবে কি করে? তার ওপর সবাই আজ তিনদিন ধরে ক্ষুধার্ত, একমুঠো ছোলা ভিজিয়ে খেয়ে আছে!

ভগবানের কৃপায় চালটা যদি আজ দু'চার আনা সস্তায় কিনতে পারে, তাহলে বাকী পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে, বড় বড় লাল খোসাওয়ালা পিঁয়াজ আর টাট্‌কা নেনুয়া! স্ত্রী যখন পিতলের থালাটায় চাল ঢেলে কাঁকর বাচতে থাকবে ও তখন চাকু দিয়ে পিঁয়াজের খোলা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো কেটে রাখবে বুধনের মায়ের পাশে বসে।

এমনি সব কল্পনা করতে করতে ওরা বাপ-ব্যেটায় যখন বৈঠকখানা বাজারে এসে পৌঁছল, তখন দেখে গলিটা শূন্য, একটা চালউলী কোথাও নেই। ওরা বাপ-ব্যেটায় শুধু নীরবে একবার পরস্পরের দিকে তাকালো। তার-পর কন্ঠের হতাশা চেপে রামলগন প্রথম কথা বললে, আরে এ বুধনোয়া, ই-শালা লোগ্ কাঁহা ভাগ্‌লবা! চারিদিকে তাকিয়ে চালের কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে বুধনের ক্ষুধাগ্নি যেন নিমেষে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। একটু থেমে মুখে একটা অশ্লীল উক্তি করে সে জবাব দেয়, সিপাহী লোককো ডরসে, কিধার ভাগ্ গিয়া হোগা! দেখা তানি, কিধার ভাগল্‌বা? বলে রামলগন তখন তার পেটের ক্ষিধে চেপে নিয়ে, এদিক-ওদিক ঘুরে এলো। কিন্তু একটা চালউলীর সন্ধানও করতে পারলে না। বুধনও এপাশ ওপাশের চোরা গলিগুলোতে খুঁজে এলো, কোথাও চালের একটা দানাও চোখে পড়লো না।

রামলগন গলির দোকানদারদের এক-জনকে তখন জিজ্ঞেস করলে, এ ভেইয়া, ইয়ে চাউল বিক্‌নেওয়ালী লোক কিধার গিয়া?

আরে, আজ দোরোজ সে ত ইধার কৈ নেহি আয়া! সিপাহী [illegible] ত চার-পাঁচ আদমীকো [illegible] লেগিয়া।

নিমেষে ওদের চোখের [illegible] যেন সব অন্ধকার হয়ে যায়। রামলগন তখন ট্যাঁক থেকে সেই তিনখানা এক টাকার নোট ছেলের হাতে দিয়ে বললে, তুই এদিক দিয়ে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, উড়ে বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট পর্যন্ত চলে যা। চাল যেখানে পাবি, কিনে নিয়ে বাসায় ফিরবি।

আর আমি এদিক থেকে কোলে বাজার হয়ে নেবুতলা বাজার ও বৌবাজারের দিকে চলে যাই। আমি যেখানে পাবো, কিনে নিয়ে এখনি বাসায় ফিরবো, তুই তাড়াতাড়ি চলে যা বাবা! এক জায়গায় দু'জনে ঘুরে বৃথা দেরী করে লাভ নেই!

দু'জনে দুই পথে চললো। চাল যেখান থেকে হোক, যেমন করে হোক, কিনে তবে বাসায় ফিরবে! ক্ষিদের জ্বালা চেপে ওরা হাটতে থাকে। তিনদিন শুধু ছোলা ভিজে খেয়ে আছে যেমন ওরা তেমনি বাড়ীর মেয়েরা সবাই। আজ দু'মুঠো খাবেই খাবে। চারদিন ধরে রতন মিস্ত্রীর কাছে একটা পয়সা মজুরী পায়নি,

আজ অনেক কন্টে আটটা টাকা আদায় করেছে। আটটা টাকা নয়, যেন আটটা মোহর।

পথ চলতে চলতে গরম ভাতের গন্ধ নাকে ভেসে আসে বুধনের। কতক্ষণে চাল নিয়ে বাড়ী পেঁছিবে, সেই কথা চিন্তায় অস্থির হয়। রামলগনের চিন্তা গরমভাত কেবল নয়, তার সংগে সেই পিঁয়াজ ও নেনুয়ার ঝোল। সে বুড়ো হচ্ছে, অনেক-দিন পরে স্ত্রীর হাতের রান্না সেই ব্যঞ্জনের স্বাদ কতক্ষণে গ্রহণ করবে, তারি চিন্তায় বিভোর হয়ে পথ চলে।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন কলকাতার সরু গলিগুলোর মধ্যে জমতে শুরু করেছে।

বুধন লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে যেসব গলির অন্দরে-কন্দরে চোরা চাল বিক্রী হয় খোঁজ করতে থাকে। ডাফ্‌রিন হাসপাতালের পিছনে, আমহার্স্ট স্ট্রীটে, উড়ে বাজারে কোথাও চাল দেখতে না পেয়ে তখন, দেশওয়ালী এক রিক্সা-ওলাকে জিজ্ঞেস করলে। হিঁয়া চাবুল, কাঁহা বিক্‌তা এ ভেইয়া?

রিক্সাওলা সামনের গলিটা দেখিয়ে বললে, সিধা চলা যাও ইয়ে গলিসে। ফিন্ বাঁয়ে হাত ছোড়কে, ডাইনা ঘুমনা, উয়ো প্রেমচাঁদ বড়াল সড়ককে মুখপর চাউল বিকতা—আভি হাম দেখকে আয়া! ওহি একহি জায়গামে হ্যায় আউর কাঁহি নেহি মিলে গা। সিপাহী লোক আজকাল বহুত্ ধরপাকড় করতা হ্যায়।

তার নির্দেশ মত গলি ধরে বরাবর গিয়ে বাঁহাতি মোড় ঘুরতেই চমকে উঠলো বুধন, আরে ইয়ে ত রেন্ডি মহল্লা হ্যায়। সংগে সংগে পিছন ফিরলো। তাহলে কি লোকটা ওকে ভুল নির্দেশ দিয়ে গেল, না পথ ভুল করে অন্যদিকে সে চলে এসেছে! এদিকের পথ-ঘাট গলিঘুঁজি, সে চেনে না। সবে দুবছর হলো কলকাতায় এসেছে। মানিকতলা খালের কাছে তাদের বাসা—ওই দিকটার সব কিছু এতদিনে চিনেছে। এদিকে কখনো সখনো এই কালোবাজারী চাল কিনতে বাপের সংগে এসেছিল। মোটামুটি বড় বড় রাস্তা আর বাজারগুলো চেনে। কিন্তু এই সব গলির অন্দরকন্দরে কোনদিন ঢোকেনি—বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায়! এদিকের হালচাল তাই কিছু জানে না।

পিছনে ফিরে এসে, আবার একজন ঠেলাওলাকে দেখে জিজ্ঞেস করলে বুধন, ভাইয়া, ইধার চাউল কাঁহা বিক্‌তা?

আরে সিধা যাইয়ে। প্রেমচাঁদকা গলিকে মুখমে দেখেগা বহুত আদমী চাওল বিকতা। আজ তিন রোজসে সব শালা ভাগা আউর কাঁহা নেহি মিলতি হ্যায় চাওল। গরীব আদমী ইধার-ওধার ঘুমকে মরতা হ্যায়!

থমকে দাঁড়ালো বুধন। মুহূর্তে কয়েক চিন্তা করে, ওদিকে যাবে কি যাবে না। না যাওয়ার প্রশ্ন, যাবার আগ্রহে নিমেষে ভেসে যায়। চাল তার চাই যেখান থেকে হোক, যেমন করে হোক। চালের সন্ধান যখন পেয়েছে, তখন নরক হলেও সেখানে যেতে সে প্রস্তুত। বুধনের মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করতে থাকে। মায়ের হাতের রান্না সেই গরম ভাতের সংগে আচারের গন্ধ তার নাকের গহ্বর দিয়ে একেবারে উদরে প্রবেশ করে তার ক্ষুধার জ্বালা যেন চতুর্গুণ বাড়িয়ে দেয়।

আবার পিছন ফিরে সোজা সে চলতে থাকে। এ অঞ্চলে, ওই একজায়গা ছাড়া, নাকি আর কোথাও পুলিশের ভয়ে কেউ চাল নিয়ে বসছে না দুতিনদিন!

বুধনের মা ছটফট করে বাসায়। এখনো কেন ফিরলো না কেউ। বেশ রাত হয়েছে। অন্যদিন ত সাঁজের বাতি জ্বলার সংগে সংগেই ওরা কাজ থেকে ফেরে।

আজ কি হলো! কেন এতো দেরী হচ্ছে। বাচ্চা ছেলে-মেয়েটা খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ঘুমিয়ে পড়ে।

একটু পরে বুধনকে একলা ফিরতে দেখে ওর মা জিজ্ঞেস করলে তুই একলা ফিরলি যে, তোর বাপ্‌জী কৈ?

বাপ্‌জী চাল কিনতে গেছে। কোথাও চাল মিলছে না। আমিও অনেক ঘুরে এলুম, কোথাও পেলুম না।

তাহলে, আজকে তোদের টাকা দিয়েছে মনিব? খুশিতে তার চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখায়।

হাঁ, মা। বলে হঠাৎ চুপ করে যায়, বুধন। তারপর একটু ইতস্তত করে বলে, বাবা আমাকে তিনটে টাকা দিয়েছিল চাল কিনতে।

মা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, তা তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন, চাল বাজারে না পেলে তুই কি করবি? আচ্ছা দে টাকা, আমি দেখি চানাওলার দোকান থেকে ছাতুয়া কিনে আনি। তুই ততক্ষণ বিশ্রাম কর—অনেক হেঁটেছিস।

ছেলে-মেয়েদ্দুটো ক্ষিধের জবালা সহ্য করতে না পেরে ঘুমিয়ে পড়েছে। দে টাকাগুলো, আমি এখুনি কিনে আনি। তুই ততক্ষণ ভাইবোনদের কাছে একটু শুয়ে থাক। চুপ করে থাকে বুধন। কি জবাব দেবে বুঝি চিন্তা করে।

মা হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দে? ভাবছিস কি এতো? বুধন কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে, কাঁহা রূপিয়া, উয়ো ত পকেট-মার হো গিয়া!

এ্যাঁ! কি বললি। পকেটমেরে নিয়েছে। হা ভগবান, এ কি করলে। আজ তিন রোজ ছেলেমেয়েগুলো সব একমুঠো ছোলা খেয়ে রয়েছে।

অপরাধীর কণ্ঠে বুধন বলে, মা বাপুজীকো ত বহুত্ গোসা হোগা।

নাও বেটা শোচো মাত্। কেয়া হোগা। পকেটমার লোক ছিন্ লিয়া ত কেয়া হোগা? উসকো ভি ত ঘরমে বালবাচ্ছা হ্যায়, ভগবান কো উস্‌কো ভি খানা দেনা চাহিয়ে।

বুধন্ ঘরের ভেতরে গিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে। একটু পরে রামলগনকে আসতে দেখে বুধনের মা তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, কেয়া চাব্‌ল নেহি মিলা?

সেকথার জবাব না দিয়ে রামলগন বলে, বুধন কাঁহা?

উয়ো ত খাটিয়ামে আরাম কর রহা?

চাব্‌ল লায়ভিয়ো?

নেহি-মিলা ও কাঁহাসে লে আয়েগা। বেচারি ঘুমতে ঘুমতে পরিশান্ হোগয়া। তুমকো ভি নেহি মিলা কেয়া? সিপাহী লোক আজকাল বহুত্ ধরপাকড় লাগায়া!

সহসা গম্ভীর হয়ে যায় রামলগন। বলে, নেহি।

বুধনের মা, এবার স্বামীর ওপর ঝেঁজে ওঠে, বা বেশ আক্কেল তোমার। চাল পেলে না যখন তখন ছাতু আনলেই পারতে। খালি হাতে কি করে, ঘরে এলে? বাচ্চাগুলো ক্ষিদের জবালা সহ্য করতে না পেরে ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা তিনদিন তারা একমুঠো করে চানা খেয়ে আছে!

কি যেন চিন্তা করছিল রামলগন। হঠাৎ মাথাটায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, দাও বুধনের টাকাগুলো কৈ? আমি এনে দিচ্ছি ছাতু এখুনি।

বুধনের মা বললে, টাকা কোথায়? বুধন যদি টাকা এনে আমায় দিতো, তাহলে কি এতক্ষণ আমি বসে থাকতুম, ছাতু কিনে এনে কখন ওদের খেতে দিতুম! মায়ের প্রাণ তোমরা পুরুষ বুঝতে পারবে না।

সহসা রামলগনের গলার স্বর যেন গরম হয়ে ওঠে, ও টাকা তোমায় দেয়নি? তাহলে ওর টাকা কোথায় গেল? আরে এ বুধন্-ওয়া? হাঁক ছাড়লে।

বেচারীর পকেটমার হো গিয়া! যেমন বুধনের মা ওই কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছে অমনি চেঁচিয়ে উঠলো রামলগন, ঝুট্ বাত্। হাম্‌সে চালাকী। বলেই ছুটে ঘরে গিয়ে বুধনের চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে, দুই-তিন থাপ্পর তার মুখের ওপর কসিয়ে দিয়ে বললে, বুড়্‌বাক্ কাঁহাকা, রেণ্ডিবাজী কিয়া, আউর ঝুট্ কহাতা পকেটমার হুয়া। একে তিনদিন পেটে ভাত নেই, তার ওপর বাপের এই প্রবল চাপটঘাত সহ্য করতে না পেরে বুধন ঘরের মেঝেয় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে গোঁ গোঁ করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

তখন বুধনের মা, তাড়াতাড়ি জল এনে ওর মুখে চোখে ঝাপটা দিয়ে, পাখার হাওয়া করে ওকে সুস্থ করে বসিয়ে তারপর স্বামীর কাছে এসে বললে, কেন মিছিমিছি তুমি ছেলেটাকে এইভাবে ঠেঙালে। একে বেচারীর পেটে কদিন ধরে কিছু নেই। তারওপর এই মিথ্যে বদনাম। আমার ছেলেকে আমি ভাল করে চিনি। তোমার মত নয় সে। তুমি দেখেছো ওকে রেণ্ডিবাড়ী যেতে? ক্ষিদের জবালায় একে বেচারি পাগল হয়ে রয়েছে।

চুপ্ করে থাকে রামলগন। তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোয় না।

দাও টাকা দাও—ছাতু আনতে যাই। ক্ষিদের জবালায় বুধন বেচারীও ছট্‌ফট্ করছে। জোয়ান ছেলে, তিনদিন একমুঠো ছোলা চিবিয়ে রয়েছে—

কিছু না বলে, পকেট থেকে দুটো এক টাকার নোট বার করে স্ত্রীর হাতে দিলে রামলগন।

দো রুপিয়া। আউর তিন রূপিয়া কাঁহা। বুধন্ কহা তুমনে পাঁচ রূপিয়া লেগিয়া থা!

আস্তে আস্তে জবাব দেয় রামলগন, হাঁ। লেকিন এক দোস্ত নে ধার লিয়া!

নোট দুখানা নিয়ে ঘরের ভেতরে বেতেই আলোতে বুধনের মা দেখে, কোনে কালো রংয়ের দাগ লেগে। তখনি বুধনকে নোট দুটো দেখিয়ে বলে, আরে এ বুধন-ওয়া, ইয়ে নোট চলে গা, দেখা তানি?

নোট দুটো হাতে নিয়ে, নাকের কাছে শুঁকতেই, দপ্ করে জবলে উঠলো বুধনের চোখ দুটো। বাপের হাতে মার খাওয়ার জবালা তখনো তার সর্বাঙ্গে রি রি করছিল।

লাফ দিয়ে খাটিয়া থেকে নেমে পড়ে বুধন। তারপর ছুটটে বাইরে এসে একেবারে বাপের মুখোমুখি দাঁড়ালো, যেন প্রতিশোধ নেবার জন্যে। বুঝি যে অস্ত্রে তাকে ঘায়েল করেছিল বাপ এবার সেটাই পেয়েছে নিজের হাতের মধ্যে। ইয়ে নোট্ কাঁহাসে মিলা?

প্রশ্ন নয়। কিংবা কাঠগড়ায় হাকিমের সামনে দাঁড় করিয়ে জেরাও নয়। একেবারে ব-মাল সমেত আসামী ধরা পড়ে গেলে পুলিশ অফিসারের কণ্ঠ দিয়ে যে স্বর নির্গত হয়, বুধনের গলায় যেন তারি প্রতিধবনি।

মায়ের প্রাণ ভয়ে দুর দুর করে ওঠে। ছুটে এসে ছেলের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বলে, কেয়া তোমরা মাথা ভুখাসে পাগল্ হো গিয়া? ছেলে হ'য়ে বাপুজিকো সাথ্ লড়াই করেগা! ছিঃ সরম নেহি আতি।

কাহে ঝুট্ কহা পিতাজি?

এইসা বাত্ বাপুজিকো নেহি কহনা। পাপ হোগা। পিতাজি ত তোমরা দেওতা হ্যায় জানতি নেহি?

তবু ভেতরে ভেতরে ক্রুদ্ধ সিংহের মত গজরাতে থাকে বুধন। কি যেন বলতে চায় কিন্তু কিছুতেই তা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পাচ্ছে না! ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে না [illegible] মায়ের বুকের ভেতরটা [illegible] ব্যথা মোচড় দিতে থাকে। [illegible] কে সান্ত্বনা দিয়ে, তখনি স্বামীর ক[illegible] এসে দাঁড়ায় বুধনের মা।

রামলগন তখনো সেই এক জায়গায় তেমনি স্থির ও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার সেই স্তব্ধ নিরুত্তর মুখের ওপর নীরব দৃষ্টি ফেলে মুহূর্তকয়েক দাঁড়িয়ে থেকে তারপর আস্তে আস্তে বলে, আজ তোমলোককো কেয়া হুয়া বাতাও তো! হামকো তো কুছ সমঝমে নেহি আতি।

কুছ নেহি! বলে শুধু একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিল রামলগন।

ক্ষুধার জবালায় যে স্বামী-পুত্রের মেজাজ আজ এরকম বিগড়েছে, তারা মুখে একথা স্বীকার না করলেও যেন বুধনের মার মন তা জানতে পারে! তাই গোপনে চোখের জল মুছে সেই নোটদুটো হাতে করে চলে যায় ভুজাওলার দোকানের দিকে।

মনে মনে কিন্তু কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারে না চানা কিনবে না ভুজা কিনবে—কোনটা খেলে স্বামী-পুত্রের পেট বেশী ভরবে?

সাবাস চট্টগ্রাম

১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল ভারতের [illegible]নতা [illegible] ইতিহাসে এক স্মরণীয় [illegible] রাত দশটায় আক্রান্ত হয়ে[illegible]-গ্রামের অস্ত্রাগার। এই দিনটি ছিল [illegible]ড ফ্রাইডে'। ইস্টারের পবিত্র দিনটি বিশেষভাবে নির্বাচন করেছেন বিপ্লবীরা একটি কারণে। আয়ার্ল্যান্ডের বিপ্লব বাঙালীর মনে প্রচণ্ড উদ্দীপনা এনেছিল, তাই আয়ারল্যান্ডের 'ইস্টার বিদ্রোহে'র আদর্শে বাঙালী তরুণরাও ব্রিটিশ রাজশক্তির উপর এক প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল।

যেদিন কলিকাতায় এই সংবাদ পৌঁছেছিল, সেদিন সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা'য়, (তখনকার সরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত) সম্পাদকীয় প্রবন্ধের হেড লাইন—' "সাবাস চট্টগ্রাম"— বলাবাহুল্য স্বাধীনতার সেই শেষ সংখ্যা। এখন কালের ব্যবধানে দূরে অতীতের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, সে কি স্বপ্ন। সেই সব ঘটনা কি সত্যই ঘটেছিল। বাঙালীর ঘরে সূর্য সেনের মত মহাপ্রাণ বিপ্লবীর আবির্ভাব ঘটেছিল এ যেন রূপকথার কাহিনী। সূর্য সেন ১৯১৮ খৃস্টাব্দে বি-এ পাশ করেন। ছাত্র জীবনের রেকর্ড চমৎকার। আর বি-এ পাশ করেই তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ নিয়েছিলেন। সূর্য সেন ছিলেন অঙ্কের মাস্টার। তিনি তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকর্মী নিয়ে একটা বিপ্লবী বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধদেব প্রভৃতির মত বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু বিবাহ তাঁর জীবনে বিশেষ বন্ধন হয়ে দেখা দেয়নি। সূর্য সেন ধরা পড়েছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং প্রভৃতি সহযোগীদের সঙ্গে ১৯২৩-এর 'পাহাড়তলী ডাকাতি' মামলায়। ব্যারিস্টার ও দেশনেতা জে. এম সেনগুপ্তের প্রচেষ্টায় তাঁরা বেকসুর খালাস পান। তারপর তাঁর সংগঠনের কাজ নতুন ধারায় চালিত হয়েছে। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ১৯২৮-এর কংগ্রেসের পার্কসার্কাস অধিবেশনে একটা নতুন সামরিক চেতনা সৃষ্টি করে।

চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের অন্যতম নায়ক অনন্তলাল সিংহ যিনি অনন্ত সিংহ নামে সুপরিচিত, তিনি 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম নামক গ্রন্থে ১৯৩০-এর চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের পটভূমিকায় স্মৃতিচারণ করেছেন। অনন্ত সিংহও একটি স্মরণীয় নাম। তিনি বিপ্লবী বীর, আবার সুলেখক। 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রামে' তিনি তাই স্মৃতিচারণার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন ইতিহাস। সমকালের ইতিহাস। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এবং সুখের বিষয় তিনি আজো আমাদের মধ্যে বর্তমান, তাই এমন একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ তিনি লিখেছেন।

এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন বিপ্লবী গণেশ ঘোষ। তাঁর ভূমিকাংশটুকুও সুলিখিত। গণেশ ঘোষ ভূমিকায় লিখেছেন—

"একথা বলা প্রয়োজন যে অনন্তলালের এই বিবৃতির মধ্যে ঘটনাসমূহকে অর্থাৎ ইতিহাসকে, কোথাও নিজের মনোমতভাবে উপস্থিত করবার জন্য বিন্দুমাত্রও বিকৃত বা ক্ষুন্ন করার চেষ্টা হয়নি।"

সমকালীন সহকর্মীর এই উক্তি নিঃসন্দেহে গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি করবে।

গণেশ ঘোষ লিখেছেন বিপ্লবের সূত্রপাত সম্পর্কে—

"চট্টগ্রামের সেই যুগের বিপ্লবী আন্দোলন এবং তার পরিণতিতে ১৯৩০ সালের বিদ্রোহ কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমাদের দেশের যে বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে অনন্তলাল লিখেছেন, সেই আন্দোলন প্রথমে গড়ে ওঠে গত শতাব্দীর শেষ দশকে; এবং আত্মপ্রকাশ করে প্রথমে পশ্চিম ভারতে—মহারাষ্ট্র অঞ্চলে। তারপর তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে দেশের অন্যান্য স্থানে। তদানীন্তন কালে বাংলার যুবসমাজ মোটামুটিভাবে ঐ

আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে এবং একটি অংশ সক্রিয়ভাবে ঐ আন্দোলনকেই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের কার্যকর পন্থা হিসাবে গ্রহণ করে।"

গণেশ ঘোষ বলেছেন, "বাংলাদেশে এই বিপ্লবী আন্দোলন প্রধানত নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। একথা হয়ত নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, বাংলাদেশের কেবলমাত্র ইংরাজের প্রতি অনুরক্ত কয়েকটি পরিবার ভিন্ন, সর্বস্তরের প্রায় সকল মানুষই দেশের যুবকদের এই বিপ্লব প্রচেষ্টা ও বিপ্লবী কর্মধারার প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থনের ভাব পোষণ করতেন।"

গণেশ ঘোষের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি বলেছেন, সেদিন পথটার প্রশ্ন বড়ো ছিল না, সবচেয়ে বড় কথা ছিল লক্ষ্যবস্তু অর্জনের। তাই সেদিন সাম্রাজ্য-বাদী শাসকদের বিতাড়নের একমাত্র পথ ছিল বিপ্লব।

লেখক অনন্তলাল সিংহ পরিকল্পনা করেছেন—"অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" মোট তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করবেন। প্রথম খণ্ডের বর্ণিত কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে ১৯২০ খৃস্টাব্দে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সূচনা থেকে। এই গ্রন্থের শেষ হবে ১৯৩৪ খৃস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারীর মধ্যরাত্রের ঘটনায়—যেদিন মাস্টারদা সূর্য সেনকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং ফাঁসির মঞ্চ থেকে তিনি যুবশক্তিকে বিপ্লবের পথে দৃঢ়সংকল্প হওয়ার আহ্বান জানান। এর মধ্যে বাংলার বিপ্লববাদের একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে।

ইতিমধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ বাংলার বিপ্লববাদের কাহিনীকে নিয়ে রচিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু অনন্ত সিংহের গ্রন্থটি অনাস্বাদিত। তাঁর গ্রন্থের প্রথম অংশের কিছুটা ইংরাজী দৈনিকের রবি-বাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং গণেশ ঘোষ মহাশয়ের ভূমিকাও সেই কালে রচিত। লেখক এই ভূমিকাটি এই গ্রন্থে সংযোজন করে বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

অনন্ত সিংহ এই খণ্ডে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিপ্লবের ইতিহাস বিধৃত করেছেন। এই গ্রন্থে—সূর্য সেন, অনুরূপ সেন, নগেন সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও চারুবিকাশ দত্ত প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এবং তাঁদের অধীনস্থ নবীন, সত্যেন, আফসরউদ্দীন, নারায়ণ, নির্মল সেন, প্রমোদ চৌধুরী যশোদা, নন্দ সিং (অনন্ত সিং-এর দাদা), অবনী ভট্টাচার্য এবং লেখক অনন্ত সিং-এর বৈপ্লবিক কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে পরিচয় পাওয়া যাবে বিশ্বাসঘাতক বাঙালী গোয়েন্দাচরিত্রের। আর সরল দেশপ্রেমী সাধারণ মানুষের, যাঁরা সেদিন বিপ্লবীদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের রোমাঞ্চকর কাহিনী অনন্ত সিংহের অপরূপ লিপি-কুশলতায় মনোজ্ঞ কাহিনীর মত রূপায়িত হয়েছে। 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' পাঠকালে যেন সেই অতীতের সোনার যুগের গভীরে প্রবেশ করেছি মনে হয়। মনে হবে কোথায় সেই অমিতবীর্য বলিষ্ঠ বাঙালী, কোথায় সেই তেজ, কোথায় সেই নিষ্ঠা, কোথায় দৃঢ়তা। এই বাঙালী আজ যেন চিন্তাহীন। কি অসাধারণ ক্লেশের মধ্যে দেশকে স্বাধীন করার আকুল আগ্রহে বাঙালী যুবসম্প্রদায় সেদিন জীবনপণ করেছিল, তার পরিচয় এই গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে। গ্রন্থশেষে তথ্য-পঞ্জীটি মূল্যবান। চৌষট্টি বছরের যুবা বীর বিপ্লবী অনন্ত সিংহকে অভিনন্দন জানাই তাঁর সুবিশাল অথচ সুলিখিত এই মহা-মূল্যবান গ্রন্থটির জন্য। গ্রন্থটি সুন্দর প্রচ্ছদ শোভিত ও মনোরম মুদ্রণের জন্য আকর্ষণীয় হয়েছে।

অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম (১ম খণ্ড)—অনন্ত সিংহ। প্রকাশক—বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলিকাতা--৯ ।। দাম—১১্ টাকা।

—অভয়ংকর

ভারতীয় সাহিত্য

জন্মদিনে নজরুল

নজরুল একটি নাম। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙালীর অন্তরে তাঁর প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, বোধহয় আর কোনও কবিকে নিয়ে বাঙালীর অন্তরতম প্রদেশ এত আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে না। বাঙালীর কাছে নজরুল সৃষ্টিমত্ত বিধাতার কন্ঠলগ্ন সুর। পথ ভুলেই বুঝি তার এদেশে আবির্ভাব। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন—

"সৃষ্টিমত্ত বিধাতার
কন্ঠ হতে দিব্য এক সুর
করেছিল বুঝি পথ ভুল,
তারই নাম জানি নজরুল।"

প্রতি বছরই জন্মদিনে কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন হাজার হাজার কবি-ভক্ত। কিন্তু এবারের জন্মদিন অনুষ্ঠানে আর মধ্যেও ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এবার নজরুলের জন্মদিন পালন করা হয়।

পৌর সম্বর্ধনা

কবিকে তাঁর ৬৯তম জন্মদিনে কলকাতা কর্পোরেশন যে পৌর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন তা ছিল এবারের নজরুল জন্ম-দিবসের বিশেষ আকর্ষণ। কবির বাড়ির সামনে মঞ্চ তৈরী করে এই সম্বর্ধনা জানান হয়। এই অনুষ্ঠানে যত লোক হয়েছিল, তা বোধহয় কারও পক্ষে অনুমান করা সম্ভব ছিল না। তাই দেখা গেল, আটটা বাজার অনেক আগে থেকেই ফুলের মালা হাতে হাজার হাজার মানুষ। কবিকে মাল্যদান করতে এলেন রাজ্যপালের প্রতিনিধি, পাকিস্থানের ডেপুটি হাই-কমিশনার, গণনাট্য সংঘ, নজরুল পাঠাগার, লিটল থিয়েটার গ্রুপ, সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন এবং কবির পরিচিত বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী ও আরও অনেকে।

আটটার কিছু পরে কবিকে নিচের মঞ্চে নামান হয়। কিন্তু ততক্ষণে সমস্ত অঞ্চল লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। কবিকে শুধু একবার দেখবার জন্য বেশ ধাক্কা-ধাক্কি শুরু হয়। জনতার ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যাওয়াই অসম্ভব হয়ে ওঠে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন কবিকে মাল্যদান করতে। কিন্তু ভিড় ঠেলে তাঁর পক্ষে যাওয়া অসম্ভব হয়ে... শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ... দিয়ে তিনি দূরে চলে যান ... বসু, আশাপূর্ণা দেবী, মৈত্রেয়ী ... প্রমুখ প্রায় সকলেরই এমন অবস্থা। গান গাইতে এসেছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়। অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের মঞ্চে তোলা সম্ভব হয়নি।

এই অসম্ভব ভিড় দেখে কবি যেন কেমন অস্থিরতায় হাত-পা ছুঁড়তে থাকেন। ঠিক সেই মুহূর্তে গান ধরলেন সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও রাণী সোম। গান শুনে কেমন যেন তন্ময় হয়ে যান কবি। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর আবাল্যবন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে চিনতেও পেরেছিলেন। আবৃত্তি করলেন সবিতাব্রত দত্ত। মেয়র গোবিন্দচন্দ্র দে মানপত্রটি পাঠ করেন এবং কবিকে উপহার দেন। অনুষ্ঠান আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না। অবশ্য এর জন্যে কারও মনে কোনও ক্ষোভ লক্ষ্য করিনি। কেন না, এত ভিড় হবে, একথা কর্পোরেশনই নয়, অন্য যাঁরা প্রতিবারই আসেন, তাঁরাও ভাবতে পারেননি।

নজরুল সন্ধ্যা

কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধের উদ্যোগে পরের দিন সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে 'নজরুল সন্ধ্যা' উদযাপিত হয়। সমস্ত দিক থেকেই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন—"ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর যোদ্ধা আমার আবাল্য সহচর এই কাজী নজরুল ইসলাম। তরবারির চেয়েও কবির লেখনী যে শক্তিশালী—তার অজস্র প্রমাণ তাঁর কাব্যগ্রন্থমালায় সংরক্ষিত আছে। অপরূপ সুরসমৃদ্ধ তাঁর অসংখ্য সঙ্গীত বাংলার আকাশে-বাতাসে চিরদিন ধ্বনিত হবে। দেশবাসী কোনদিন বিস্মৃত হবে না তাঁর এই অবিস্মরণীয় অবদান।" বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং মৈত্রেয়ী দেবীও কবি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

নজরুলের রচনা থেকে পাঠ এবং আবৃত্তি করে শোনান—যথাক্রমে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, শান্তি লাহিড়ী প্রভৃতি। নজরুল গীতিকা পরিবেশন করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুমিত্রা সেন, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ রায়, নির্মলা মিশ্র, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন বসু, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়, তপন ঘোষ, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও সবিতাব্রত দত্ত। আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন শমিতা বিশ্বাস, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থটি [illegible] সাহিত্য [illegible]অনুরাগীদের দৃষ্টি আক[illegible] [illegible]করা যায়। নজরুল সম্বন্ধে ক[illegible] [illegible]ই মূল্যবান আলোচনা এবং গিরিবালা সম্বন্ধে জসীমউদ্দীনের রচনাটি অনেক ভ্রান্তির নিরসন করবে বলে আশা করি। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অখিল নিয়োগী, মৈত্রেয়ী দেবী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, মুকুর সর্বাধিকারী, শচীনদেব বর্মন, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস ভট্টাচার্যের আলোচনায় অনেক তথ্য আছে। কল্যাণী কাজীর রচনাটিও এক অকথিত কাহিনী তুলে ধরেছে। কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধের রচনা দুটি সুখপাঠ্য। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাটি প্রশংসার দাবী করে।

নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কবিতা লিখেছেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, দীনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শান্তি লাহিড়ী, কবিরুল ইসলাম, শান্তনু দাস ও আশিস সান্যাল।

চুরুলিয়া গ্রামে

কাজি নজরুলের জন্মস্থান বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রাম। ২৭ মে শনিবার ঐ গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় মহাসমারোহে নজরুলের জন্মদিবস পালন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি তাঁর ভাষণে নজরুলকে ম্যাক্সিম গোর্কির সঙ্গে তুলনা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীদিবেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন—'নজরুল তাঁর কাব্যে ও সাহিত্যে বিদ্রোহ এবং ভালবাসার মিলন সাধন করেছেন।'

চুরুলিয়া নজরুল আকাদমীর সম্পাদক কাজী কে এ সিদ্দিক কবির স্মৃতিরক্ষার জন্য কোনও সরকারী প্রচেষ্টা না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

পাকিস্তানে নজরুল জয়ন্তী

অন্নদাশঙ্কর রায় একটি কবিতায় লিখেছেন—

ভাগ হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।

বিভক্ত বাংলার মর্মবেদনা কবিতাটির মধ্যে ফুটে উঠেছে। বাংলা দেশ আজ বিভক্ত। কিন্তু ভাষা আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আছে উভয়ের বন্ধন। নজরুলের জন্মদিনে এ কথাটি যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নজরুল উভয় বাংলায় যৌবনের প্রতীক। পশ্চিমবাংলায় যেমন নজরুল জয়ন্তী হয়েছে, তেমনি হয়েছে পূর্ববাংলায়। নজরুলের জন্মদিন উপলক্ষে পূর্ববাংলায় এবার বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে। নজরুল আকাদমীর জন্য পাকিস্থান সরকার পঁচিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। ঢাকা বেতারে নজরুল দিবসে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই দিনই নজরুল আকাদমীরও উদ্বোধন হয়।

রেকর্ডে নজরুল

বিদ্রোহী কবির কণ্ঠ আজ স্তব্ধ। এখন আর তাঁর উদাত্ত কন্ঠস্বর শুনতে পাওয়ার কোনও পথ নেই। এই অভাব মিটেছে কিছুটা লং প্লেয়িং রেকর্ডে। এ বছর নজরুল জন্ম-দিবসে যে নতুন কয়েকটি রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে আছে কবির নিজ কণ্ঠে 'রবিহারা' কবিতাটির আবৃত্তি এবং 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে' গানটি কবির কন্ঠস্বর রেকর্ডে পরিবেশন করবার জন্য উদ্যোক্তারা সকলের প্রশংসা অর্জন করবেন বলে আশা করি। এই গান ও কবিতাটির আর একটি ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবে এই গান ও কবিতাটি নজরুল স্বয়ং রেকর্ড করেছিলেন। অপর পিঠে আছে কাজী সব্যসাচীর আবৃত্তি ও কাজী অনিরুদ্ধের গীটারে নজরুলের গানের সুর।

এবার নজরুলের বারখানি প্রেমের গানও লং প্লেয়িংয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। নজরুল অনুরাগীদের কাছে এই রেকর্ডটিও মূল্যবান বলে গৃহীত হবে বলে আশা করি।

বিদেশী

সাহিত্য

ফ্রয়েবলের রচনা সঙ্কলন ॥

বিখ্যাত জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবল শিশু-শিক্ষার জগতে যুগান্তর এনেছেন কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি আবিষ্কার করে। তাঁর মতে শিশুরা বিশ্বউদ্যানের চারাগাছ। শিক্ষক হলেন এই উদ্যানের মালী। উদ্যান-পালকের মতই যত্ন করে তিনি শিশু চারাগাছগুলি বড় করে তুলবেন। লক্ষ্য করার বিষয়, ফ্রয়েবল তাঁর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কোথাও 'বিদ্যালয়'—এই শব্দটি ব্যবহার করেননি।

ফ্রয়েবলের শিক্ষার মূলকথা হলো 'খেলার মাধ্যমে শিক্ষা'। শিশুরা ইন্দ্রিয়সচেতন। শিক্ষক শিশুদের ইন্দ্রিয় পরিমার্জনায় সাহায্য করবেন। সেজন্য তিনি নানারকমের খেলনা আবিষ্কার করেছেন। তিনি তাদের নাম দিয়েছেন 'গিফ্‌ট' বা উপহার।

ফ্রয়েবলের দার্শনিক চিন্তার সারকথাই হলো যে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক এবং অখণ্ড আনন্দময় সত্তা থেকে উদ্ভূত। এই বৈশ্বিকচেতনা প্রত্যেক শিশুর মনে জাগ্রত করে দেওয়াই হলো শিক্ষার প্রধান কাজ।

সম্প্রতি আইরিন এম লিলে সম্পাদিত 'ফেদারিখ ফ্রয়েবল : এ সিলেকসন ফ্রম হিজ রাইটিংস' নামে একটি বই বেরিয়েছে ইংরেজী ভাষায়। সঙ্কলনটি ভূমিকায় লিলে ফ্রয়েবলের শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ফ্রয়েবল

চলেন—কান্ট, ফিকটে, শেলিং, শিলার এবং গ্যেটের ধারারই উত্তরসূরী।

বইটি প্রকাশ করেছেন ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

টেলিভিসনে রহস্য রোমাঞ্চ ॥

গত ১৭মে শুক্রবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রহস্য-লেখকলেখিকারা টেলিভিসনে প্রচারিত একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। টেলিভিসন কর্তৃপক্ষ এই অনুষ্ঠানটির নাম দেন 'জাড ফর দি ডিফেন্স'। রহস্যকাহিনীর জনপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই অনুষ্ঠানটি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। শুধু মার্কিন দেশেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলেই রহস্যোপন্যাসের চাহিদা ও প্রচার বহুল পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এই অনুষ্ঠানে রহস্যোপন্যাসিকরা গত বছরে টেলিভিসনে প্রদর্শিত 'টেম্পেস্ট ইন এ টেক্সাস টাউন'-কে শ্রেষ্ঠ নাটক বলে নির্বাচন করেন!

পরলোকে বৃটিশ ঐতিহাসিক ॥

প্রখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক স্যর হ্যারল্ড নিকলসন সম্প্রতি ৮১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। এক সময় তিনি ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রামাণ্য ইতিহাস—'দি কংগ্রেস অব ভিয়েনা' লিখে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

স্যর নিকলসন ছিলেন রীতিমত সময়নিষ্ঠ পুরুষ। নিয়মিত দিনলিপি রাখার ব্যাপারে তিনি উৎসাহ বোধ করতেন। বেশ কয়েক বছর আগে তাঁর 'ডায়েরিজ অ্যান্ড লেটার্স' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি দু'খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ৩৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ন' বছরের আর দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩৯ থেকে ৪৫ সাল পর্যন্ত ছয় বছরের দৈনিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অভিজাত লর্ড পরিবারের সন্তান। সেইজন্য তিনি স্বচ্ছন্দে বৃটিশ অভিজাত সমাজে বিচরণের ছিলেন অধিকারী। এই সমাজের মানুষেরাই ছিলেন য়ুরোপীয় রাষ্ট্রজীবনেরও ভাগ্যবিধাতা। নিকলসন স্বভাবসুলভ পরিহাসের ভঙ্গিতে উঁচু সমাজের অসঙ্গতিকে তাঁর রচনায় তুলে ধরবার চেষ্টা করতেন।

তাঁর স্ত্রী ভিটা স্যাকভিল ওয়েস্ট বৃটেনের একজন প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় মহিলা ঔপন্যাসিক।

দি লাইট অ্যারাউন্ড দি বডি ॥

মার্কিনী কবি রবার্ট ব্লাই আধুনিক কবি-মহলে একজন আলোচিত পুরুষ। তিনি 'দি সিক্সটিজ' নামে একটি কবিতা-পত্রের সম্পাদক। সাম্প্রতিক কবিতার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সমালোচনা লিখে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। প্রথাগত পদ্ধতিতে কবিতার সমালোচনা করেন না। তাঁর মতে, কবিতা হলো অন্তর্জগতের এক ধরণের উত্তেজনার রোম্যান্টিক ফলশ্রুতি। তিনি বলেন, আমাদের অন্তর্মহলে যে রহস্যময় অন্ধকার রয়েছে—সেখানেই আছে সন্তুষ্টি ও আনন্দের জগৎ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাইলেন্স ইন দি স্নোয়ি ফিল্ড' মার্কিনী কবিমহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

সম্প্রতি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'দি লাইট অ্যারাউন্ড দি বডি' প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকদিন আগে 'দি নেশন' পত্রিকার কবিতাসম্পাদক ও কলাম্বিয়ার ইংরেজী শিক্ষক মাইকেল গোল্ডম্যান তার একটি বিস্তৃত সমালোচনা লিখেছেন। তাঁর মতে, এই গ্রন্থে পাঁচ থেকে ছয়টি ভালো কবিতা আছে। অধিকাংশ কবিতাকেই কবি (ব্লাই) স্বেচ্ছায় সুপারফিসিয়েল করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অন্তর্জগতের অভিজ্ঞতার কোনো খবর দেওয়া হয়নি। বরং বহুলপ্রচারিত 'রোমান্স অ্যাংগ্রি অ্যাবাউট দি ইনার ওয়ার্ল্ড' ঘোষণার স্মৃতিকেই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়।

ফিলিপ রথ-এর উপন্যাস ॥

আধুনিক আমেরিকান কথা-সাহিত্যে ফিলিপ রথ একজন শক্তিশালী ঔপন্যাসিক। সম্প্রতি 'হোয়েন শি ওয়াজ গুড' নামে তাঁর একটি মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এর আগে—'গুড বাই' 'কলম্বাস' 'লেটিং গো' নামে তিনটি উপন্যাস লিখে তিনি মার্কিনী পাঠকমহলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। এই উপন্যাসটি তাঁর খ্যাতিকে বহু গুণ বৃদ্ধি করবে।

এই উপন্যাসটির নানান অংশ বিভিন্ন নামে সাময়িক পত্রে পূর্বে প্রকাশিত হয়। আধুনিক ইহুদী-মার্কিন মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসটি লেখা।

এই উপন্যাসটির নায়ক আলেকজাণ্ডার পোর্টনয় একজন চৌত্রিশ বছর বয়স্ক অবিবাহিত অসুস্থ ইহুদী যুবক। সে মানসিকতার দিক থেকে শহুরে সংস্কৃতির ধারক এবং পেশায় নিউইয়র্ক শহরের মানবাধিকার বিষয়ক সহকারী কমিশনার। বিদ্যালয় জীবনে সে মেধাবী ছাত্র হিসেবে সুপরিচিত ছিল। আইনের পরীক্ষায় লাভ করে প্রথম স্থান। তবু মনের দিক থেকে সে ছিল ক্ষয়িষ্ণু, রোগগ্রস্ত এবং জটিল। তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব কোন ব্যাখ্যাসাপেক্ষ সহজ বিষয় নয়।

রথ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিষয়টিকে একটি সার্বজনীন রূপ দান করেছেন। একজন মনস্তত্ত্ববিদ চিকিৎসকের কাছে পোর্টনয় তার জীবনের নানা ঘটনা বলে গেছে। ফ্রয়েডীয় মুক্ত অনুষঙ্গের সূত্রটিকে অনুসরণ করে লেখক নায়কের মনের খবর প্রকাশ করেছেন। অনেক সময় লেখকের রচনায় আদিম সততায় পরিচয় পাওয়া যায়। সংলাপ ও ঘটনাক্রম স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত হওয়ায় পাঠকের মনে বিশ্বাসযোগ্যতার আবহ সৃষ্টি করে।

উপন্যাসটিতে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন অবশ্যস্বীকার্য।

মনোবিকারমূলক উপন্যাস ॥

প্রথা-বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য উপন্যাস-সাহিত্যে ফিলিপ উইলি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সমাজকে তিনি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর প্রায় সকলেই জটিল মানসিকতার অধিকারী। তাঁর 'জেনারেসন অব ভাইপার্স' নামে একটি উপন্যাস বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পৃথিবীর সর্বাধিক বইগুলির তালিকায় এটিও ছিল উল্লেখযোগ্য নাম। এই বইতে উইলি কোন-প্রকার বৈপ্লবিক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে না চাইলেও হাজার হাজার তরুণ তরুণীকে মাতৃদ্বেষী করে তুলেছিলেন।

বর্তমানে উইলির বয়স পঁয়ষট্টি। এই বয়সেও তাঁর কলমের ধার এতটুকু কমেনি। এখনো তিনি আগের মতোই রাগী এবং অংশত বদ-মেজাজী। তাঁর লেখায় এখনো সেই ঝাঁজ ও বিদ্রূপের সুর সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় তাঁকে একালের একজন উৎকেন্দ্রিক যুবকের প্রতিনিধি বলে মনে হয়। তবে তিনি সাধারণ অর্থে মানবতাবাদী।

উইলির অভিযোগ হলো, মানুষ পশুর মতো স্বাভাবিক নয়। অথচ প্রতিটি নরনারীই প্রাকৃতিক নিয়মে বেড়ে উঠছে। প্রত্যেকটি মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অনুভূতি ও প্রক্ষোভকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। সেগুলি সে ধর্ম, নানা রাজনীতিক মতবাদ কিংবা বিজ্ঞানের প্রতি অন্ধ-বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বহন করে চলে।

উইলি তাঁর এই মনোভাবকে গোপন রাখতে চান না। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'দি ম্যাজিক অ্যা[illegible]' সম্[illegible] সমাজ-বিরোধ কার্যক[illegible] উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। [illegible] অজ্ঞতা, লোভ, হিংসা ও নৈরাজ্যের পা[illegible] [illegible]লে এর বিষয়টি উপস্থাপিত।

মন্তেস্বরীর রচনা ॥

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ডঃ মাদাম মারিয়া মন্তেস্বরীর নাম আজ বিশ্ববিশ্রুত। ইতালীতে তাঁর জন্ম হলেও ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর দান অপরিসীম। তিনি স্বয়ংশিক্ষা পদ্ধতির আবিষ্কার করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়। ১৯০৭ সালে তিনি তাঁর নতুন পদ্ধতির পরীক্ষাগার হিসেবে একটি শিক্ষালয় স্থাপন করলেন। তার নাম দিলেন 'শিশু নিকেতন'। তাঁর মতে শিশুর মধ্যে যে সকল প্রতিভা, প্রবণতা ও ক্ষমতা সুপ্ত অবস্থায় আছে—নানাবিধ কাজকর্মের মধ্য দিয়ে তাদের ফুটিয়ে তোলাই হলো শিক্ষার মূলকথা।

সম্প্রতি তাঁর 'দি অ্যাবসর্বেন্ট মাইন্ড' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ ইংরেজীতে

অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ের প্রবন্ধগুলি রচিত হয় ১৯৪৯ সালে। এই সময়ে তিনি ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী হন। ভারতবর্ষে এসে শিক্ষা সম্পর্কে বহু মূল্যবান ভাষণ দেন। এই গ্রন্থটিতে সেই সব ভাষণের সংকলন বলা যায়।

জার্মান আকাদমির পুরস্কার ॥

এ বছর জার্মান আকাদমির ভাষা ও সাহিত্যের বসন্তকালীন অধিবেশন ২ মে থেকে ৫ মে পর্যন্ত সারব্রিউকেন-এ অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল : ম্যানুয়েলস অ্যান্ড লিটারেচার। সাহিত্যের ক্ষেত্র অনুসংস্থান সম্পর্কিত এটি একটি ভিন্নতর বিষয়। সাহিত্যের ক্ষেত্র সম্পর্কিত আরও দুটি বিষয় প্রবন্ধ ও ঐতিহাসিক বিবরণী আগের অধিবেশনগুলিতে আলোচিত হয়েছে।

এই অধিবেশনে দুটি আকাদমি পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এক-একটি পুরস্কারের মূল্য ৬ হাজার মার্ক। এজরা পাউন্ডের সাহিত্যের অনুবাদিকা মুনিখ-বাসী শ্রীমতী ইভা হেস ১৯৬৮ সালের জন্য অনুবাদকের পুরস্কারটি পান। ওহিয়ো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মান ভাষার অধ্যাপক ওহিয়ো সিডলিন পান বিদেশে জার্মান শিক্ষার পুরস্কার হিসাবে দ্বিতীয় পুরস্কার। অধ্যাপক সিডলিন হচ্ছেন আপার সাইলেসিয়ার অধিবাসী। তিনি ১৯৪৬ সাল থেকে ওহিয়ো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর জার্মান ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিসিজম সম্পর্কিত রচনার জন্যই তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

ল্যুডউইক জ্যাকোবোস্কি স্মরণে ॥

ভিয়েসব্যাডেনে অবস্থিত হেসিয়ান জাতীয় গ্রন্থাগার সম্প্রতি প্রায়-বিস্মৃত লেখক ল্যুডউইগ জ্যাকোবোস্কি স্মরণে, শততম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর সাহিত্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। জ্যাকোবোস্কি মোটে ৩২ বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি ১৮৬৮ সালে বার্লিনে জন্মগ্রহণ করেন আবার বার্লিনেই ১৯০০ সালে পরলোকগমন করেন। প্রায় ২০খানি বই লিখে গিয়েছেন। জ্যাকোবোস্কি যখন ডি গ্যাজেলশাফট পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তখন তিনি যে মধ্যস্থ-এর কাজ করেছিলেন তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। অধুনা আবিষ্কৃত প্রায় দেড় হাজার চিঠি, খাতা, ও অন্যান্য প্রামাণ্য কাগজপত্রের সংকলন সম্বলিত নিউইয়র্কের ফ্রেড স্টার্ণ আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে তাঁর মধ্যস্থের কাজের বিবরণ পাওয়া যায়। বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে কোথাও কোথাও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিসহ যে সমস্ত লেখকরা এই সংগ্রহে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন টমাস মান, হাইনরিখ মান, হিবলহেলম রাবে, ফ্রাঙ্ক ভেডেকাইণ্ড, রাইনার মারিয়া রিলকে, এলসে লাস্কার শ্যুলার এবং খৃশ্চীয়ান মর্গেন-স্টার্ণ। ফ্রেড স্টার্ণ লিখিত ল্যুডেউইগ জ্যাকোবোস্কি প্যারজোন লিশকাইট উণ্ড-ভ্যার্ক আইনেক্স ভিকটার্স নামক জীবনীতে ন্যাচারালিজিম থেকে নিও-রোমান্টিকজম পর্যন্ত জ্যাকোবোস্কির সব পথ পরিক্রমার সুন্দর সূক্ষ্ম বর্ণনা আছে।

নতুন বই

ভিয়েৎনাম : ঝড়ের কেন্দ্রে—

বরুণ রায়। প্রকাশক : গ্রন্থপ্রকাশ। কলিকাতা-১২। মূল্য—সাড়ে সাত টাকা।

[illegible] ভিয়েৎনামে যে-সব তরুণ ও যুবকের ব[illegible] নী[illegible] 'শান্তি' বলে শব্দ অভিধানে [illegible] কিন্তু জীবনে উপলব্ধি করেনি। যুদ্ধের মধ্যে তাদের জন্ম। লড়ায়ের মাঠে তাদের সংসার। ঐতিহাসিকদের মতে যদি আবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে তাহলে ভিয়েৎনামের আগুন দিয়েই শুরু হবে তার তান্ডবলীলা। ভিয়েৎনামের গুরুত্ব এখানেই। এবং সেই ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে জানাটা প্রতিটি শান্তিকামী মানুষেরই কাম্য বলে মনে করি। 'ভিয়েৎনাম : ঝড়ের কেন্দ্রে' বইটি কোনো কল্পনাপ্রসূত রম্যরচনা নয়। লেখক বরুণ রায় প্রতিষ্ঠাবান সাংবাদিক। তিনি ভিয়েৎনামের লড়াই-এর মাঠ স্বচক্ষে দেখেছেন। ভিয়েৎনামের সমস্যাটা বুঝে তিনি সাংবাদিক ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে অত বড় জটিল সমস্যাটা প্রাঞ্জল ভাষায় গল্পের আকারে বর্ণনা করেছেন। বরুণবাবুর লেখায় এখানেই সার্থকতা। বাঙলা ভাষায় ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু বই-এর আকারে পাওয়া গেল এই প্রথম। বাঙলা সংবাদ সাহিত্যে এটি নতুন সংযোজনা।

আড়াইশ পৃষ্ঠার বইতে লেখক ভিয়েৎনাম ইতিহাসের পাতা থেকে যেমন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন তেমনি ইদানিংকালের ঘটনা-বৈচিত্র্য, লড়াই ও রাজনীতির প্রতিটি অধ্যায় খুঁটিয়ে নাটিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

লেখকের নিজের কথায় "শান্তির জন্যে হ্যানয়ের আগ্রহের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব নেই। ......ভিয়েৎনামে আমেরিকার হস্তক্ষেপ শুধু অন্যায় নয়, অসহনীয়।" তিনি আরও বলেছেন, "গেরিলারা কোনো আলাদা জীব নয়। তারা ভিয়েৎনামের জলের সঙ্গে, জঙ্গলের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে মিশে আছে। গেরিলারা যারাই হোক, তাদের ঠেকানো সহজ নয়। তারা একদিন ঝড় তুলবেই।"

বইটা উপন্যাসের মতই সুখপাঠ্য। অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা বর্ণনায় পাঠকের মনকে কখনো বিক্ষিপ্ত করবে না। সর্বদিক দিয়েই বইটা চমৎকার।

—দিলীপ মালাকার

সংকলন পত্র-পত্রিকা

দৃশ্যপট (বৈশাখ ১৩৭৫)—সম্পাদক : শিবেন চট্টোপাধ্যায়, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুমারেশ ভট্টাচার্য। ১৩।২ দীনবন্ধু মুখার্জি লেন। হাওড়া-২। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

নবপর্যায় 'দৃশ্যপট'-এ অভিনবত্ব চোখে পড়ল। প্রবীণ ও নবীন লেখকের সঙ্গে মূল্যবান সাক্ষাৎকার, কয়েকটি কবিতা, গল্পে বর্তমান সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

●

বক্তব্য (অষ্টম সংকলন)—দীপেন রায় ও তাপস গুপ্ত সম্পাদিত। দাম পঞ্চাশ পয়সা। একমাত্র কবিতার পত্রিকা।

●

আধিব্যাধি (মে ১৯৬৮)—সম্পাদক : নীহারকুমার মুন্সী, জ্যোতির্ময় মজুমদার, সমর রায়চৌধুরী। পি-৫ সি আই টি রোড। কলকাতা-১৪। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

খাদ্যে ভেজাল সমস্যা, সমাজব্যাধি, মনের রোগ, মানব দেহ আবিষ্কার, অজনন বটীকা বিষয়ে আলোচনা আছে।

●

মানব-মন (নববর্ষ সংখ্যা ১৩৭৫)—সম্পাদক: ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩২।১এ বিধান সরণী। কলকাতা-৪। দাম ১.২৫।

মানবমনের বর্তমান নববর্ষ সংখ্যাটিতে রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণের ভূমিকা, সম্মোহন প্রসঙ্গে, কার্লরজারের 'আমি'বাদ, প্রজননের নতুন তথ্য, পৃথিবীর প্রথম প্রমেথিউস, আধুনিক বাংলা কবিতার সমীক্ষা, কোষের ভস্মকথা, দৃষ্টির পরিবেশ প্রভৃতি আলোচনাগুলি মূল্যবান। একটি নতুন ধরনের নাটক কল্মাসপাদ নাটক লিখেছেন শ্রীকুইক্সট।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হ্যাঁ, ইনি সেই পাউল্লো টোপা যাঁর পরিবারের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে স্বয়ং ভীরাকোচাই বুঝি এক এসপানিওল পাষণ্ডকে চরম শাস্তি দিতে নেমে এসেছিলেন।

গানাদো আতাহুয়ালপাকে উদ্ধার করবার যে চক্রান্ত করেছেন তাতে বিশ্বাস করে একজনকেই শুধু দলে নেওয়া হয়েছে। পাউল্লো টোপা-কে।

পাউল্লো টোপাও সম্ভ্রান্ত নাগরিক। তাঁর শরীরেও ইংকা রক্ত বয়। কিন্তু শুধু সে জন্যে তাঁকে এতখানি বিশ্বাস করা হয় নি। বিশ্বাস করা হয়েছে ভীরাকোচা ও তাঁর মুখপাত্র বলে নিজেকে যিনি প্রমাণ করেছেন সেই গানাদোর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া টোপা-র পক্ষে সম্ভব নয় জেনে।

পাউল্লো টোপা এ বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছেন। কেমন করে রেখেছেন তা পরে যথাস্থানে জানা যাবে।

আপাতত গানাদোর কূট কৌশল সব দিক দিয়েই সফল হয়েছে।

দ্বিতীয় দিনের পর তৃতীয় দিন পিজারো আতাহুয়ালপাকে দেখতে এসে বিরক্তই হয়েছেন।

আতাহুয়ালপার মুখ হাত পা সব যেন সোনালী মাটিতে পলস্তারা করা।

চোখ নাক আর মুখের হাঁ টুকু বাদে সমস্ত মুণ্ডটা একটা যেন সোনালী কাদার তাল। তার ভেতর থেকে আতাহুয়ালপার গলার স্বরেই শুধু তাঁকে চেনা গেছে।

গলার রুদ্ধ স্বর সেদিন কিছুটা খুলেছে। এটা চিকিৎসার গুণ বলেই দাবী করেছেন রাজ…।

এ আসুরিক চিকিৎসা কতদিন আর চলবে!—বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন পিজারো। চিকিৎসার গুণ পুরোপুরি কবে বোঝা যাবে জানতে চেয়েছেন।

চলবে দক্ষিণায়নের শেষ দিন পর্যন্ত। —দোভাষী মারফৎ জানিয়েছেন রাজবৈদ্য-বেশী টোপা,—সূর্যদেবের উত্তরায়নের প্রথম দিন রেইমি-র উৎসব শুরু হলেই ইংকা নরেশ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে বসবেন। সকাল-সন্ধ্যায় সূর্যদেবের অনুগত পার্শ্বচর হয়ে যে সেবা করে দেব-কিশোর সেই চাস্কা আতাহুয়ালপার প্রতি ঈর্ষায় তাঁর গলার স্বর চুরি করে পাতালে লুকিয়ে রেখে এসেছে। সূর্যদেব দক্ষিণায়নের শেষ সীমায় পৌঁছে সে স্বর খুঁজে নিয়ে আতাহুয়ালপাকে ফিরিয়ে দেবেন, রেইমি-র উৎসবের দিন সূর্যদেব উত্তর আকাশে আরোহণের প্রথম ধাপে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে যাতে আতাহুয়ালপা তাঁকে বন্দনা করতে পারেন। আর…

ঠিক আছে! ঠিক আছে! — ইংকা পুরাণের হিং টিং ছটে ধৈর্য হারিয়ে প্রায় ধমকের সঙ্গে বাধা দিয়ে পিজারো দোভাষীকে বলেছেন,—রেইমির উৎসবের পরেই একদিন আসব, দেখা করতে। তখনও যদি তোমাদের ওই চাস্কা না কার কাছ থেকে ইংকা নরেশের গলার স্বর না উদ্ধার হয় তাহলে এই সোনার গুঁড়ো মেশানো মাটির তাল ঠেসে ওই রাজবৈদ্যের গলাই বুজিয়ে দেব বলে দাও।

পিজারো বিরক্ত হয়ে আতাহুয়ালপার মহল ছেড়ে গেছেন।

রাজবৈদ্য সেজে টোপা তাঁকে হিং টিং ছট পুরাণই শুনিয়েছেন সত্যি, কিন্তু সূর্যের পার্শ্বচর সেবায়েৎ চাস্কা-র নামটা মিথ্যে করে বানানো নয়। পেরুতে শুকতারা ও সন্ধ্যাতারারূপী শুক্র গ্রহকে চাস্কা নামে কমনীয় দেব-কিশোররূপেই কল্পনা করা হয়।

রেইমি উৎসবের দিনটা উল্লেখ করবার মধ্যেও একটা গূঢ় অর্থ আছে।

আর মাত্র কয়েকদিন বাদেই সূর্যের দক্ষিণায়ন শেষ হবার তারিখ। পেরুর রেইমি উৎসব তার পর দিন থেকেই শুরু। তার আগে তিন দিন ধরে সমস্ত রাজ্যে অরন্ধন। কোথা কান কারুর উনুন এই তিন দিন জ্বালান … না।

রেইমি উৎসবের প্রথম দিনে উ… য়নের প্রথম সূর্যোদয় দেখবার জন্যে সমস্ত পেরু-বাসী যে যেখানে আছে সক্ষম হলে ভোরের আগে মুক্তাকাশের তলায় পূর্ব দিগন্তে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকবে।

উদয় দিগন্তে সূর্যের প্রথম রক্তিম রেখাটুকু দেখার মত পুণ্য আর কিছু নেই।

সেই সূর্যোদয় দেখবার সরব আনন্দোচ্ছ্বাসে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠবে তখন। তারপর সারাদিন চলবে উৎসব-মত্ততা।

গানাদো আতাহুয়ালপার কাস্কামালকা ত্যাগের জন্যে ওই দিনটিই স্থির করে দিয়ে গেছেন।

পরাধীনতার গ্লানি সত্ত্বেও পেরুর মানুষ এ দিনটিতে উৎসব-মত্ত হবেই।

সেই উৎসব-মত্ত নগরের বিশৃঙ্খলার ভেতর আতাহুয়ালপার নিঃশব্দে আত্ম-গোপন করে কাস্কামালকার সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়া অত্যন্ত সহজ।

একবার কাস্কামালকা ছাড়িয়ে কুজকো যাবার রাস্তা ধরতে পারলে আর কোন ভাবনা নেই।

পথে এমন সব গুপ্ত আশ্রয় আছে ইংকা নরেশদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত পার্শ্বচর ছাড়া যার সন্ধান কারুর জানবার কথা নয়।

আতাহুয়ালপার শরীরে ইংকা রাজরক্ত থাকলেও তিনি কুইটোর যুবরাজ। এ সব গুপ্ত আশ্রয়ের রহস্য তাঁর অজানা।

কিন্তু তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে আছেন পাউললো টোপা। সোনা-বরদার শোভাযাত্রীদের একজন হয়ে টোপাই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। পূর্বেকার ইংকা নরেশ হুয়াসকারের বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে সমস্ত গুপ্ত আশ্রয় তাঁর জানা। একবার কাস্কামালকা থেকে বার হতে পারলে এস-পানিওল বাহিনীর তাই সাধ্য নেই তাঁদের ধরবার।

শুধু তাই নয়, আতাহুয়ালপা বিদেশী শ্বেতদানবের কবল থেকে ছাড়া পেয়েছেন জানলে সমস্ত পেরু রাজ্য দুলে উঠবে উত্তেজনায়। যেখান দিয়ে আতাহুয়ালপা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যাবেন সেখানেই জ্বলে উঠবে প্রতিরোধের প্রচণ্ড আগুনের বেষ্টনী, এসপানিওলদের পক্ষে যা ভেদ করা অসম্ভব।

সূর্যের উত্তরায়নের আর মাত্র কটা দিন বাকি।

ইংকা নরেশের রাজ পালঙ্কে সোনালী কাদার প্রলেপে ঢাকা বিশ্বাসী এক অনুচর শায়িত থাকে।

রাজ অন্তঃপুরে গোপনে আতাহুয়ালপা প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করেন অনুকূল মুহূর্তটির জন্যে।

গানাদোর পরিকল্পনা এ পর্যন্ত প্রতি ধাপে আশাতীতভাবে সফল হয়েছে। এখন শুধু শেষের কাটি চালই বাকি।

গানাদো ইতিমধ্যে সৌসায় না হোক পেরুর রাজধানী কুজকোতে পৌঁছে গেছেন নিশ্চয়।

সেখানে সূর্য মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে আতাহুয়ালপার নিজের হাতে পাকানো ও সাজানো 'কিপু' তিনি এমন একজনের হাত দিয়ে পাঠাবেন যাকে হুয়াসকার নিজেও যেমন অবিশ্বাস করতে পারবেন না, বাধাও দিতে পারবে না তেমনি তাঁর প্রহরীরা।

হুয়াসকারের প্রহরীরা আতাহুয়াল-পার-ই দলের লোক। কিন্তু তারা হুয়াস-কারকে পরাজিত শত্রু বলেই জানে, নির্মমভাবে যাকে বন্দী করে রাখাই তাদের কাজ।

আতাহুয়ালপা যে হুয়াসকারের সঙ্গে মিলিত হতে চাইতে পারেন এ তারা কল্পনা করতেও পারে না। হুয়াসকারের সঙ্গে বাইরের যে কোন যোগাযোগ সম্পর্কে তাই তারা অতন্দ্রভাবে সজাগ।

কিন্তু তারাও যাকে বাধা দেবে না এমন কার হাতে 'কিপু' দিয়ে হুয়াসকারের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা ভেবে রেখেছেন গানাদো।

এমন আশ্চর্য দূতটি কে?

আর কেউ নয়, মুখোস-আঁটা সত্ত্বেও কিশোর বালকের মত কমনীয় চেহারায় যে শোভাযাত্রীটি অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম হিসেবে কৌতূহলী দর্শককে সন্দিগ্ধ করে তুলে গানাদোর দলের বিপদ ডেকে আনতে পারত।

এমন সহযাত্রী গানাদো জোটালেন কোথা থেকে তাঁর দলে? কুইটো আর কুজকো সেদিনকার দুই পরম শত্রুশিবিরের দু পক্ষের কাছেই যার অমন খাতির, কিশোর বালকের মত চেহারায় আসলে সে কে?

তা জানতে হলে সোনা-বরদারের দলের সঙ-এর মুখোস খুলে তাকে দেখতে হয়।

আর দেখলে নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকতে হয় কিছুক্ষণ।

যেমন হয়েছিলেন। গানাদো।

কবে?

আতাহুয়ালপাকে নীচ চক্রান্তে যেদিন বন্দী করা হয়, এসপানিওলদের চরম বিশ্বাসঘাতকতার সেই পৈশাচিক হত্যা-তাণ্ডবের রাত্রে।

হ্যাঁ সেই রাত্রেই আতাহুয়ালপার বিশ্রাম-শিবিরের কাছে এক অসহায় লুণ্ঠিতা নারীর আর্তধ্বনি শোনা গিয়েছিল, এস-পানিওল এক পাষণ্ডের ললাটে প্রথম দেখা গিয়েছিল তলোয়ারে আঁকা এক অদ্ভুত কলঙ্ক চিহ্ন, আর কয়েক দিন বাদে সেনা-পতি দে সটোর কাছে নিজের সময় কাটাবার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে গানাদো হেঁয়ালি করে বলেছিলেন,—পাছে ভেঙে যায় ভয়ে একটা স্বপ্নকে আমি পাহারা দিয়ে রাত কাটিয়েছি কাপিতান।

এই তিনটি ব্যাপার একই সূত্রেয় বাঁধা।

পাছে ভেঙে যায় ভয়ে যে স্বপ্নকে পাহারা দিয়ে রাত কাটাবার কথা গানাদো বলেছিলেন সে স্বপ্নকে শরীরিণীরূপে সেই রাত্রেই তিনি প্রথম দেখেছিলেন।

দেখে নির্বাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিলেন সত্যিই।

সাত সমুদ্রের জল ইতিমধ্যে যথার্থই তিনি ঘেঁটেছেন, মধ্যোপসাগর থেকে আতলান্তিকের এপারে-ওপারে নারীর সৌন্দর্যের বিচিত্র প্রকাশ দেখেছেন, তবু এ রূপ যেন তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল।

ক্ষণিকের জন্যে জ্বালা একটা মশালের আলোয় যা দেখেছিলেন তাতে নিজের প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধেই তাঁর সন্দেহ জেগে-ছিল। মনে হয়েছিল অলীক কোন মায়াই তাঁর অস্বাভাবিক কল্পনায় সময়ের কাটি বুদ্বুদে ভেসে উঠেছে, এখুনি বুঝি মিলিয়ে যাবে।

মশালটা নিভিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েও ছিল যেন মিলিয়ে।

মশালটা সংগ্রহ করেছিলেন ইংকা নরেশের প্রস্রবণ-ঘেরা বিশ্রাম শিবির থেকে শহরের প্রান্তে পর্বতপ্রাচীরের দিকে যেতে যেতে এক জায়গায় থেমে। কোনো হতভাগ্য কাস্কামালকার নাগরিক সে মশাল জ্বেলে তার কোনো আপনার-জনকে বোধহয় খুঁজে ফিরছিল সেই শ্মশান প্রান্তরে। হিংস্র কোনো এসপানিওল সৈনিকের হাতে নিহত তার দেহটার পাশেই পড়েছিল নিভে-যাওয়া মশালটা।

গানাদো তাঁর তলোয়ারের উল্টো পিঠ সেখানকার ছড়ানো পাথরে ঠুকে স্ফুলিঙ্গ বার করে অনেক কষ্টে মশালটা ধরিয়েছিলেন শুধু মৃত্যুর চেয়ে নিদারুণ নিয়তি থেকে যাকে তখনকার মত উদ্ধার করতে পেরেছেন তার সত্যকার অবস্থাটা এক পলকে দেখে একটু বুঝে নেবার জন্যে।

পাষণ্ড এসপানিওল সেপাই তার বন্দিনীকে ঘোড়ার ওপর বেঁধে রেখেছিল।

সেই ঘোড়াই চালিয়ে গানাদো প্রস্রবণ-শিবির থেকে কাস্কামালকার পর্বত-বেষ্টনীর দিকে বেশ কিছুদূর যাবার পর থেমেছিলেন। থেমেছিলেন, ঘোড়ার পিঠে বাঁধা বন্দিনী জীবিত কি মৃত বুঝতে না পেরে।

সন্তর্পণে বাঁধন খুলে বন্দিনীকে তার-পর তিনি মাটিতে নামিয়েছিলেন।

(ক্রমশ)

দেশেবিদেশে

বিশ্বজোড়া ছাত্র বিক্ষোভ

প্যারিস শহরে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ থেকে যে কাহিনীর শুরু, সেই কাহিনী গড়াতে গড়াতে এখন এতদূর গড়িয়েছে যে, ফ্রান্সে জেনারেল দ্য গলের পঞ্চম রিপাব্লিক টেঁকে কি না টেঁকে সেই বিষয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

প্যারিসের এই ঘটনার পরই বিশ্বব্যাপী ছাত্র বিক্ষোভের প্রতি সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ফ্রান্সের ছাত্র বিক্ষোভের আগে জার্মানীতে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গত কয়েক বছর ধরেই নানা ছুতানাতায় ছাত্রদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের লড়াই চলছে। পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মত দেশও ছাত্র অশান্তির ঢেউ থেকে অব্যাহতি পায় নি। ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত সুইডেন, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও ছড়িয়েছে।

এই সব ঘটনায় সারা পৃথিবীর পর্যবেক্ষকরা এই সর্বপ্রথম বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, ছাত্রদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের রাজপথের লড়াই (যার সঙ্গে কলকাতায় আমরা খুবই পরিচিত) আজ শুধু দরিদ্র, অনুন্নত দেশের একচেটিয়া নয়, সমৃদ্ধ, স্বচ্ছল, উন্নত দেশেও আজ ছাত্ররা চঞ্চল হয়ে উঠছে।

যে-সব তথ্য প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলি সত্যি চমকপ্রদ। বার্কলি থেকে বার্লিন, প্রাগ থেকে প্যারিস, ছাত্ররা প্রায় একই সময়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাদের দাবীও প্রায় একই জাতের—অধিকতর স্বাধীনতা চাই, শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনায় ভাগ চাই ইত্যাদি। একটি হিসাবে প্রকাশ যে, গত তিন মাসে ২০টি দেশে ছাত্ররা আন্দোলন করেছে। যে-সব দেশে আন্দোলন হয়েছে, তাদের মধ্যে ব্রেজিল, হল্যাণ্ড ও ডেনমার্কও আছে। এই সব দেশ থেকে অতীতে ছাত্র বিক্ষোভের কথা কমই শোনা গেছে। এই সময়ের মধ্যে সারা পৃথিবীতে কমসে কম তিন ডজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র বিক্ষোভের দরুণ বন্ধ হয়ে গেছে। যে-সব দেশে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে আছে ইতালী, স্পেন, টিউনিসিয়া, মেক্সিকো, ইথিওপিয়া প্রভৃতি। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বেলজিয়ামে সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট নাসেরকে মন্ত্রিসভায় রদবদল করতে বাধ্য করেছে, বোস্টনে একজন বস্তীমালিকের দান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেছে। প্রিন্সটনে মার্কিন যুদ্ধ দপ্তরের হয়ে গবেষণার কাজ করা বন্ধ করে দেওয়া হবে কিনা, সেবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করতে বাধ্য করেছে ইত্যাদি। সংঘবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের দ্বারা পরিবর্তন ঘটাবার এই শক্তির নাম দেওয়া হয়েছে "ছাত্রশক্তি" (student power).

এই ছাত্রশক্তির পিছনে কি আছে? একসঙ্গে বহু দেশে এই ছাত্রশক্তির আত্মপ্রকাশের কারণগুলি কি?

একটা বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পর্যবেক্ষকরা একমত। সেটা হচ্ছে এই যে, এই ছাত্রশক্তির পিছনে কোন একটা বিশেষ আন্তর্জাতিক ছাত্র আন্দোলন অথবা কোন আন্তর্জাতিক চক্রান্ত নেই। একথা ঠিক যে, বিভিন্ন দেশে এই ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছেন যে-সব ছাত্র তাঁরা অনেকেই মার্ক্সবাদী, মাওপন্থী, ট্রটস্কিবাদী অথবা

নৈরাজ্যবাদী (অ্যানার্কিস্ট)। সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্লোগান ছিল "নিষেধ করা নিষিদ্ধ", সেখানে লাল পতাকার পাশাপাশি নৈরাজ্যবাদী কালো পতাকাও উড়েছে। কিন্তু এক দেশের ছাত্র আন্দোলনের সংগে অন্য দেশের ছাত্র আন্দোলনের কোন যোগাযোগ আছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

মাও সে তুং, হো চি মিন, মার্টিন লুথার কিং, স্টোকলি কারমাইকেল, ফরাসী বিপ্লবী রেজিস্ ডেব্রে, চে গুয়েভারা, ফিদেল কাস্ত্রো ইত্যাদি হচ্ছেন উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের এই সব বিক্ষুব্ধ ছাত্রের "হিরো"। আর তাদের একটা বড় অংশের গুরু হচ্ছেন ৭০ বছর বয়সের এক অধ্যাপক যাঁর নাম আমাদের দেশে বিশেষ পরিচিত নয়। তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক হার্বার্ট মার্কিউজ—সানডিয়েগোতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ধর্মে ইহুদী ও জন্মে জার্মান এই অধ্যাপকের মূল তত্ত্ব হচ্ছে, বৃহৎ শাসন ও বৃহৎ ব্যবসায় ব্যক্তিমানুষকে দমন করছে এবং এই দমনকারীদের বিরোধিতা করা মানুষের কর্তব্য।

এই ছাত্রশক্তির আত্মপ্রকাশের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লন্ডনের "ইকনমিস্ট" পত্রিকা এই কারণগুলি উল্লেখ করেছেন :—(১) শ্রমজীবী শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা অধিক সংখ্যায় পড়তে আসছে। (২) সমাজ অধিকতর স্বচ্ছল, অধিকতর সমাজ-সচেতন ও উদার হয়েছে। (৩) দুই দশক ধরে কোন বড়রকমের যুদ্ধ হয় নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শারীরিক শক্তি ব্যয় করার সুযোগ পায় নি। (৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সংখ্যা অকস্মাৎ অনেক বেড়ে গেছে, তরুণ অধ্যাপকরা ছাত্রদের পিছনে রয়েছেন এবং যে-সব অধ্যাপক নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে নিতে ব্যস্ত, তাঁরা আর ছাত্রদের দিকে নজর দিচ্ছেন না। (৫) ছাত্রদের জন্য অনেক বৃত্তির ব্যবস্থা হওয়ায় অনেকে আগেকার চেয়ে ঢের বেশী বয়স পর্যন্ত পড়াশুনো করছে এবং তাদের হাতে সময়ও বেশী আছে। (৬) পুরানো ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও নরনারী সম্পর্কিত স্বীকৃত প্রথাগুলি ভেঙে যাচ্ছে, অথচ পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণের বাইরে সমাজের সামনে আর কোন স্থায়ী লক্ষ্য থাকছে না। (৭) এক দেশের সংগে আর এক দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতি হওয়ায় বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা পরস্পরের কার্যকলাপের সংগে অধিকতর পরিচিত হচ্ছে। (টেলিভিশনের পর্দায় এক দেশের ছেলেরা দেখতে পাচ্ছে, অন্য দেশের ছেলেরা কি করছে।)

ফরাক্কা নিয়ে জল ঘোলা

কলকাতা বন্দরকে বাঁচাবার জন্য, কলকাতায় পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য, উত্তরবংগের সংগে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য ফরাক্কায় বাঁধ তৈরী করা যে কত প্রয়োজন ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে প্রতিবেশী পাকিস্থানকে একথা বোঝাবার জন্য বহু দিন ধরে নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। এমন কোন আন্তর্জাতিক আইন নেই যাতে পাকিস্থান ভারতবর্ষকে গংগা নদীর জলের ভাগ দিতে বাধ্য করতে পারে। অথচ পাকিস্থান তাই করতে চাইছে। অন্য কথায় কাশ্মীরের মত ফরাক্কা বাঁধের প্রশ্নটিকেও পাকিস্থান একটি আন্তর্জাতিক প্রশ্নে পরিণত করতে চাইছে।

পাকিস্থানের এই অপপ্রয়াস দুটি কারণে প্রশ্রয় পেয়েছে।

এক, ভারতের ভালমানুষি। কোন বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও ভারত পাকিস্থানের সংগে বারবার এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসেছে। ১৯৫৮ সাল থেকেই এই আলোচনা চলছে। এই পর্যায়ের পঞ্চম ও শেষ আলোচনা সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে হয়ে গেল। ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্থানকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, ফরাক্কায় বাঁধ দেওয়ার পরও গংগার জলের একটা ন্যায্য অংশ যাতে পাকিস্থান পায়, সেদিকে সে লক্ষ্য রাখবে—যদিও এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আইনগত বাধ্যবাধকতা ভারতের ছিল না।

দুই, ভারত ও পাকিস্থানের ভিতরে এই বিরোধের মধ্যে নাক গলাবার জন্য তৃতীয় পক্ষ উৎসুক হয়েই আছেন। গত বছরের শেষের দিকে বিশ্ব ব্যাংকের একদল প্রতিনিধি পূর্ব পাকিস্থানে সেচ পরিকল্পনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে এসে মন্তব্য করেছিলেন যে, "আন্তর্জাতিক নদীর সমস্যা আলাপ-আলোচনার মধ্য

প্যারিসে সাম্প্রতিক হাংগামার সময় লাতিন কোয়ার্টারে এডমন্ড রস্ট্যান্ড স্কোয়ারের দৃশ্য। ছাত্ররা গাড়ি উল্টে ও অন্যান্য ভাবে অবরোধ সৃষ্টি করেছে। রাস্তা খুঁড়ে পাথর জড়ো করে রেখেছে।

দিয়ে সমাধান করতে হবে এবং ভারত ও পাকিস্থান উভয় দেশ যদি বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ জানায় তাহলে তাঁরা সিন্ধু অববাহিকার ধরনে পূর্বাঞ্চলেও একটি ভারত-পাকিস্থান চুক্তি সম্পাদন করিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁদের উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন।

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে যে আলোচনা হয়ে গেল, সেখানে পাকিস্থানের একমাত্র চেষ্টা ছিল ভারতবর্ষকে এই ধরনের একটা মধ্যস্থতার প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী করান। ভারতবর্ষের বক্তব্য ছিল, এই আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে উভয় দেশের নদী পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য বিনিময়। এই উদ্দেশ্যে ভারতের প্রতিনিধিদল গঠিত হয়েছিল শুধু বিশেষজ্ঞদের নিয়ে। অপরপক্ষে, পাকিস্থানী প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন সেদেশের পররাষ্ট্র বিভাগের একজন অফিসার। পাকিস্থানী প্রতিনিধিদল চেষ্টা করেছিলেন, মধ্যস্থতার প্রস্তাবটি যাতে এই আলোচনা বৈঠকের পক্ষ থেকে উভয় পক্ষের সরকারকে পাঠান হয়। উদ্দেশ্য স্পষ্ট—কারিগরী আলোচনার স্তর থেকে প্রশ্নটিকে রাজনৈতিক আলোচনার স্তরে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু ভারতের বাধার ফলে এই চেষ্টা সাফল্যলাভ করে নি।

এই বৈঠকে আরও প্রমাণিত হল যে, ফরাক্কা বাঁধ নিয়ে পাকিস্থানকে সন্তুষ্ট করা ভারতবর্ষের পক্ষে অসম্ভব বললেই হয়। ফরাক্কা বাঁধ নিয়ে পাকিস্থানের সংগে যখন প্রথম আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল, তখন পাকিস্থানের চাহিদা ছিল, খরায় কয়েক মাস পূর্ব পাকিস্থান যেন ফরাক্কা দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার জলের প্রায় ৯ শতাংশ (প্রতি সেকেণ্ডে ৫৫ হাজার ঘন ফুটের মধ্যে প্রতি সেকেণ্ডে ৫ হাজার ঘন ফুট) পায়। কিন্তু পাকিস্থান তার চাহিদা বাড়াতে বাড়াতে এবার নয়াদিল্লীতে দাবী করেছে ফরাক্কার গংগার জলের তিন-চতুর্থাংশই তার চাই।

নয়াদিল্লীর বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। ফরাক্কা বাঁধ সম্পর্কে কোন সমঝোতায় আসা যায় নি। পাকিস্থান অবশ্য এখনও তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে নি। কিন্তু এই বিষয়ে একটা আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা মেনে নেওয়ার জন্য ভারতের উপর অদূর ভবিষ্যতে প্রবল চাপ আসবে সেটা বোঝা যাচ্ছে। ভারতবর্ষ এই চাপ কতদিন এবং কতখানি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে, সেবিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে—বিশেষ করে পশ্চিম অঞ্চলে সিন্ধু অববাহিকায় পাকিস্থানের সংগে নদীজলের ভাগ করে নিতে রাজী হয়ে ভারতবর্ষ ইতিপূর্বেই একটি নজীর সৃষ্টি করে রেখেছে। যদি কোনরকম আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা শেষ পর্যন্ত হয়, তাহলে ফরাক্কা বাঁধ আপাতত শিকায় উঠবে। অথচ ১৯৭১ সালের জুন মাসে পৃথিবীর বৃহত্তম ব্যারাজ নির্মাণের এই পরিকল্পনা শেষ করার জন্য আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ।

ভারতবর্ষ পাকিস্থানের প্রতিনিধিগণকে ফরাক্কায় গিয়ে সরেজমিনে এই পরিকল্পনা পরীক্ষা করে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আগামী মাসে তাঁদের যাওয়ার কথা আছে। এই সফরের পর ফরাক্কা বাঁধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিত্রটি স্পষ্টতর হতে পারে।

●

বিহারে শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ মণ্ডলের মন্ত্রিসভার ৪৫ দিনব্যাপী শাসনকালে ৩৬ জন মন্ত্রীর মধ্যে ২২ জন মোট ১০৮ বার সরকারী বিমান ব্যবহার করেছিলেন।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সাম্প্রতিক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফরের সময় এই অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে বর্ধিত আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্যে যে আহ্বান জানান, তা কার্যকর করতে হলে সবচেয়ে আগে দরকার হল অর্থনৈতিক সহযোগিতা।

শ্রীমতী গান্ধীর সংগে এ-সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের কর্তৃপক্ষের কিছু কিছু আলোচনাও হয়েছে, এবং গত ২৬ মে সিডনীতে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী টি এন কল এইরকম ইংগিত দেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটা সাধারণ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হতে যাচ্ছে।

তবে, শ্রীকল বলেছেন, দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতার গুরুত্বই সর্বাধিক। এবিষয়ে শ্রীমতী গান্ধী যেসব দেশ সফরে গিয়েছিলেন (সিংগাপুর, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড) সেসব দেশের সংগে সন্তোষজনক আলোচনা হয়েছে।

ভারত ও সিংগাপুরের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি শীঘ্রই স্বাক্ষরিত হবে বলে শ্রীমতী গান্ধীর সফরের পর জানা যায়। ভারত থেকে একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল অল্পকালের মধ্যেই সিংগাপুর যাবেন। শ্রীমতী গান্ধী জানান, উভয় দেশই যুক্ত প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে রাজী আছে। আপাতত সিংগাপুরের হাল্কা ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা স্থাপনে কারিগরী সহযোগিতা দিয়ে সাহায্য করতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী গর্টনের সংগে আলোচনার সময় শ্রীমতী গান্ধী ভারত-অস্ট্রেলিয়া বাণিজ্যকে উদারতর করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে এবিষয়ে একটা সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি চান। তিনি বলেন, ভারতের রপ্তানী দ্রব্য সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার আরেকটু বেশি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। ১৯৬৬-৬৭ সালে অস্ট্রেলিয়া ভারত থেকে যে পরিমাণ দ্রব্য আমদানী করেছিল তার তুলনায় সাড়ে তিন কোটি অস্ট্রেলীয় ডলার বেশি ভারতে রপ্তানী করেছিল। এই বাণিজ্যিক অসাম্য একেবারে দূর হয়ে যাবে এটা অবশ্য ভারত আশা করে না, কিন্তু ভারত দৃষ্টিভঙ্গীর একটা পরিবর্তন দেখতে চায়। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ভারত অস্ট্রেলিয়াকে আরও বেশি তৈরী মাল বিক্রি করতে চায় এবং এই উদ্দেশ্যে বাণিজ্য শুল্কের দিক থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধার প্রার্থী।

অস্ট্রেলিয়ার পর শ্রীমতী গান্ধী নিউজিল্যান্ডে যান। সেখানে আলোচনার পর উভয় দেশ পারস্পরিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে এবং অর্থনৈতিক, কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে পরস্পরের সংগে আরো বেশিমাত্রায় সহযোগিতা করতে রাজী হয়েছে। কি কি উপায়ে এই সহযোগিতা করা হবে তা ঠিক করার জন্যে উভয় দেশের প্রতিনিধিরা মাঝে মাঝে আলোচনা করবেন।

ভারত অস্ট্রেলিয়ার সংগে একটি বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করতে চায় যার সুযোগ নিয়ে নিউজিল্যান্ড থেকে গুঁড়ো দুধ পেতে পারে।

কুয়ালালামপুরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমান ও তাঁর সহকর্মীদের সংগে শ্রীমতী গান্ধীর যে আলোচনা হয়েছে তার ফলে মালয়েশিয়া থেকে একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল শীঘ্রই ভারতে আসবার কথা আছে। আলোচনার সময় এটা স্বীকার করা হয়েছে যে, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা কতটুকু এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রয়েছে তা নির্ধারণ করবার জন্যে ভারত মালয়েশিয়ায় একটি কারিগরী সমীক্ষা চালাবে। এই ধরনের যৌথ উদ্যোগে ভারত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করবে।

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৮৭)

উদ্ধারণ দত্ত

ত্রিবেণীর অদূরে সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামে সুবর্ণবণিককুলে উদ্ধারণের আবির্ভাব। পিতা শ্রীকর দত্ত, মাতা ভদ্রাবতী।

বাসুদেব ঘোষের কড়চা বলছে, উদ্ধারণের পূর্বনাম ছিল দিবাকর। নিত্যানন্দই দিবাকরের নাম রাখেন উদ্ধারণ। দিবাকরের থেকে সমস্ত বণিককুলের উদ্ধার হল বলেই তার ঐ নাম।

প্রভু হাসি হাসি কহে বণিককুমার,
বণিককুল তোমা হৈতে হৈল উদ্ধার।।
দিবাকর করি নাম না পুছিবে কেহ।
আজি হৈতে মোর দত্ত নাম তুমি লহ।।
বণিককুল উদ্ধার করিলি বটে সে কারণ।
আজি হৈতে তোর নাম রহু উদ্ধারণ।।

শ্রীকর দত্ত সে যুগের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী, গৌড়ের নবাব পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার নিত। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী উদ্ধারণ। তারপর কাটোয়ার দু মাইল উত্তরে নৈহাটি বা নবহট্ট গ্রামের নৈ-রাজার দেওয়ান। নৈহাটির কাছে যে পল্লীতে উদ্ধারণ থাকে তারও নাম দাঁড়াল উদ্ধারণপুর।

এই উদ্ধারণপুরে একবার এসেছিলেন মহাপ্রভু। একটা নিমগাছের নিচে বসেছিলেন। সেই গোড়া-বাঁধানো নিমগাছ এখনো বর্তমান। সেই আগমন-স্মৃতি উপলক্ষ্যে প্রতি বছর মকরসংক্রান্তিতে এখানে মেলা বসে।

উদ্ধারণ বিপুল অর্থ সৎকাজে, দেব-দ্বিজ-বৈষ্ণব সেবায় ব্যয় করে, ব্যয় করতে ভালোবা[illegible] কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা—এই তার জীবনের ব্রত। তাছাড়া নিয়মিত ভাগবত পড়ে, শ্রীবিগ্রহের সেবা করে স্বহস্তে।

হলধর সেন উদ্ধারণের অধীনে কাজ করে। সেও সুবর্ণবণিক, তারই বংশ-প্রদীপ গৌরী সেন। সেই 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।' উদ্ধারণের জমিদারী থেকেই হলধরের বিত্তবিস্তার। লোকে হলধরকে বলে হলধর কুবের। হলধরের বোন সুপ্রসন্নাকে বিয়ে করল উদ্ধারণ। সুপ্রসন্না বেশি দিন বাঁচেনি। একমাত্র পুত্র শ্রীনিবাসকে রেখে অকালে দেহত্যাগ করল।

বিপত্নীক উদ্ধারণ, শ্রীনিবাসকে নিয়ে সংসারে আছে বটে কিন্তু মন রেখেছে ঈশ্বরে। অনন্ত ঐশ্বর্য কিন্তু একবিন্দু মাৎসর্য নেই। পরম ভাগবত, সংসারে থেকেও মায়া-মোহের অতীত। গভীর পাঁকের মধ্যে থেকেও পাঁকাল মাছের গায়ে যেমন পাঁক লাগে না তেমনি সংসারে বাস করেও উদ্ধারণ মুক্তপুরুষ, সংসারপঙ্কের ছিটে-ফোঁটাও তার গায়ে লাগেনি।

মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ প্রেম-বিতরণে বেরিয়েছে। প্রথমে পানিহাটি পরে খড়দহ। খড়দহ থেকে সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামে কারু বাড়িতে অতিথি হবার আগে নিত্যানন্দ সর্বগণ নিয়ে ত্রিবেণীতে স্নান করে নিল।

এরা কারা? এদের মধ্যে কে ঐ দলপতি, ঐ লাবণ্যমনোহর? মুখে হরি বলে গর্জন করছে আর সঙ্গের লোকেরা ভাবোন্মত্ত হয়ে উঠছে—এ প্রেমের বন্যাকে আমরাও রোধ করতে পারছি না কেন?

স্নান করে এক পাকুড়গাছের নিচে বসল নিত্যানন্দ। অপেক্ষা করতে লাগল।

কে যাবে তাকে সম্ভাষণ করতে?

আর কে। উদ্ধারণ মানে দিবাকর দত্ত গিয়ে হাজির। একেবারে গলবস্ত্র হয়ে প্রভুর চরণে পড়ে দৈন্যদ্রব হয়ে কাঁদতে লাগল।

নিত্যানন্দ, যার মত দয়াল দাতা আর নেই, দিবাকরের মাথায় দুই হাত রেখে প্রগাঢ় আশীর্বাদ করল। বললে, 'ওঠো, কেঁদো না, আজ থেকে তুমি আমার কিঙ্কর হলে।'

এর চেয়ে বড় পদ আর কী হতে পারে? বললে দিবাকর, তিন দিন উপবাসের পর আজ আমার পারণ, আপনার দেখা পেয়েছি, আপনাকে আমি ভোগ দেব, আপনি তা প্রসাদ করে দেবেন।

চলো তোমার মন্দিরে চলো। নিত্যানন্দ বৃক্ষতল হতে উঠে দাঁড়াল।

ভক্তের গৃহ মন্দির ছাড়া আর কী। ভক্তশ্রেষ্ঠ দিবাকরের গৃহ তো সুবর্ণ-মন্দির। 'উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে। রহিলেন তাঁহা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে।।'

পরমানন্দে দিবাকরের ঘরে ভিক্ষা নিল নিত্যানন্দ। তারপর মাঘ মাসের সেই সপ্তমী তিথিতে দিবাকরকে রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা দিল। বললে, আজ থেকে তোমার নাম উদ্ধারণ। তোমার থেকেই সমগ্র বণিককুল পবিত্র হয়ে গেল। 'যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে।।'

উদ্ধারণ কায়মনোবাক্যে অকৈতবে নিত্যানন্দের সেবা করতে লাগল।

নিত্যানন্দ বললে, আমার এখানে আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না, শুধু তোমাকে তোমার কুলকে উদ্ধার করবার জন্যেই আসা।

বণিক তারিতে নিত্যানন্দের অবতার
বণিকেরে দিলা প্রেম-ভক্তি-অধিকার।।
সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে
আপনি নিতাইচাঁদ কীর্তনে বিহরে।।

সে যেমন নবদ্বীপে লীলা হয়েছিল তেমনি সুরু হল সপ্তগ্রামে। সেদিন নবদ্বীপে—

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।।
যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি।।

আর আজ সপ্তগ্রামে উদ্ধারণের গলা ধরে কাঁদছে নিতাই, আর—

গোরা গোরা বলি মুহু ছাড়য়ে হুঙ্কার।
শুনি সপ্তগ্রামের লোক হৈল চমৎকার।।
প্রভু কহে গতি নাই মোর গোরা বিনে।
হরি হরি বলে ভাই মোরে লও কিনে।।

সমস্ত বণিকসমাজ কৃষ্ণভক্ত হয়ে গেল। 'সপ্তগ্রাম হৈল যেন নববৃন্দাবন।' বণিক-সভার কৃষ্ণভজন দেখে সকলে অভিভূত। এত ভক্তি ছিল কোথায়? আর কে না জানে ভক্তির জাতি নেই, চণ্ডালও যদি হরিভক্ত হয় তবে সে ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণ যদি ভক্তিহীন হয় তবে সে অধমাধম।

এক ব্রাহ্মণ এসেছে উদ্ধারণের বাড়িতে, নিত্যানন্দের সঙ্গে তর্ক করতে—ভক্তি শ্রেষ্ঠ না জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। তর্ক করে শেষ মীমাংসায় পৌঁছুতে বেলা অনেক বেড়ে গেল, নিত্যানন্দ ইঙ্গিত করে উদ্ধারণকে বললে, ব্রাহ্মণ যেন অভুক্ত ফিরে না যায়।

ব্রাহ্মণ সরস্বতীর জলে স্নান করতে গেল। ত্রিবেণীর এক বেণী সরস্বতী। আর দুই ধারা গঙ্গা আর যমুনা।

উদ্ধারণ নিত্যানন্দকে জিজ্ঞেস করলে, আজ কী রাঁধব? ব্রাহ্মণকেই বা কী খেতে দেব?

নিত্যানন্দ বললে, আজ চালে-ডালে খিচুড়ি রান্না করো।

তাই রান্না হল। রান্নার পর অঙ্গনে আসন ও পাতা সাজানো হল। নিত্যানন্দ ভক্তদের নিয়ে বসল পঙক্তি ভোজনে। স্নানান্তে ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়িয়েছে, নিত্যানন্দ তাকে বসতে আহ্বান করল।

রান্না করেছে কে?

উদ্ধারণ।

ক্রোধে রক্তচোখ করল ব্রাহ্মণ। বললে, বেনের রান্না কী করে খাব? 'বানিয়ার পাচিত অন্ন কেমতে খাইব। ছিয়ে ছিয়ে এমতে কি জাতি খণ্ডাইব।।'

নিত্যানন্দ বললে, সন্ন্যাসীর বা ভক্তের কখনো অন্নদোষ হয় না। উদ্ধারণ গোবিন্দের প্রসাদ পাক করেছে। এতে তার কোনো অপরাধ হয়নি। আর প্রসাদ খেতে কার অরুচি হবে?

গুণকর্মে হৈলা ই'হ জাতির উৎপত্তি।
লিখাজোখা ভাগবতে ভগবানের উক্তি।।
পরম ভক্ত বেনে এই উচ্চ-জাতি পাই।
তার গৃহে তার অন্ন মুই কিন্তু খাই।।

ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দের পাশে বসল আসনে। কিন্তু এ কী, উদ্ধারণ শুধু রান্নাই করেনি, উদ্ধারণ আবার পরিবেশন করছে। ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্ত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল— নিত্যানন্দের কোনো যুক্তি কোনো সান্ত্বনাই কাজে লাগল না। স্বরে অবজ্ঞা মিশিয়ে উদ্ধারণকে লক্ষ্য করে বললে, তোমার এত অহঙ্কার? তোমার আবার পরিবেশনের স্পর্ধা! কে তোমার অন্ন স্পর্শ করে?

নিত্যানন্দ উঠে দাঁড়িয়ে উদ্ধারণকে বললে, তোমার হাঁড়ির ঐ কাঠের হাতাটা আমাকে দাও।

উম্ধারণ সেই রান্নার কাঠিটা নিত্যানন্দের হাতে দিল।

নিত্যানন্দ সেই কাঠিটা অঙ্গনে পুঁতল আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা বিরাট একটা মাধবী তরুতে পরিণত হল। 'মুহূর্তের মধ্যে হৈল বৃক্ষের উন্নতি। পুষ্পিত হইল মধু পিয়ে অলি ততি।' যেন আতপ নিবারণের জন্যে বহুবিতত শাখায় একটি আতপত্র তৈরি হল। দেখ উম্ধারণের ভক্তির শক্তি, তার স্পর্শের পবিত্রতা!

ব্রাহ্মণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল। পরে আচ্ছন্ন ভাব কেটে যেতেই সে গাছের কাছে মাথা নত করল। উঠোনের মাটি মাখতে লাগল সর্বাঙ্গে। উম্ধারণকে বললে, উম্ধারণ, অন্ন দাও, শুধু উদরের ক্ষুধা নয়, জীবনের ক্ষুধা মেটাই।

সেই লতামণ্ডপ এখনো শীতল ছায়া দিয়ে ত্রিতাপজর্জর জীবনের ব্যথাহরণ করছে।

এই অলৌকিক বিকাশের কতদিন পরে এই মাধবী-মণ্ডপে গৌরাঙ্গসুন্দর আবির্ভূত হন। উম্ধারণকে বলেন, প্রাণ উম্ধারণ! তুমি নিতাইচাঁদের কৃপায় শান্তি লাভ করেছ। যারা এই লতামণ্ডপে আশ্রয় নেবে তারাও নিতাইচাঁদের কৃপা পাবে।

উম্ধারণের গৃহসংলগ্ন দেবালয়ের উত্তরে একটি পুকুর আছে। একদিন সে-পুকুরে স্নানের সময় নিত্যানন্দ ব্রজরাখালভাবে উম্ধারণের সঙ্গে জলক্রীড়া করতে লাগল। ক্রীড়ার মধ্যে নিত্যানন্দের পা থেকে নূপুর খসে জলে তলিয়ে গেল।

উম্ধারণ, আমার নূপুর উম্ধার করে দাও। নিত্যানন্দ বলে উঠল।

উম্ধারণ রাজি হল না। বললে, আপনার শ্রীচরণের সম্বন্ধ যাতে আছে সেই জিনিস যদি কেউ অনায়াসে পেয়ে যায় তা-কি সে প্রাণ থাকতে প্রত্যর্পণ করতে চাইবে? আপনার পায়ের নূপুর আমার এই পুকুরের মধ্যে পড়ে থাক। আমার পুকুর পরম পবিত্র তীর্থে পরিণত হোক।

সেই থেকে সে পুকুরের নাম হ'ল নূপুর পুকুর—বা, নূপুর-কুন্ড।

একদিন এক শাঁখারি সপ্তগ্রামের পথ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে—শাঁখা কিনবে গো, হঠাৎ একটি বালিকা এসে বললে, আমি কিনব। ভালো দেখে একজোড়া শাঁখা আমাকে পরিয়ে দাও।

শাঁখারি বালিকার সুন্দর দুটি মণিবন্ধে সুন্দর দুটি শাঁখা পরিয়ে দিল। দিয়ে দাম চাইল।

বালিকা বললে, আমার বাবা উম্ধারণ দত্তের কাছে গিয়ে দাম চাও, তিনি দিয়ে দেবেন।

কত দাম তিনি তা বিশ্বাস করবেন কী করে?

বলবে, পূর্বঘরের পশ্চিমের কুলুঙ্গিতে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা আছে, তাই তোমার মেয়ে দাম বলে দিতে চেয়েছে। আর বাবা যদি সেহাৎই দাম না দেন, তুমি এখানে ফিরে এস, যেমন করে পারি আমি তোমার দাম দিয়ে দেব। ইতিমধ্যে আমি নদীতে স্নান করে নিই।

শাঁখারি উম্ধারণ দত্তের বাড়ি গিয়ে উম্ধারণকে সব বলে শাঁখার দাম চাইল।

উম্ধারণ বললে, আমার মেয়ে নেই।

মেয়ে নেই এমন কথা মুখেও আনবেন না। অমন সুন্দর সরল মেয়ে কি কখনো মিছে বলতে পারে? শাঁখারি বললে অনুনয় করে, তার উপর রাগ করবেন না, শাঁখা পরে তার হাত-দুখানি কেমন সুন্দর হয়েছে যখন দেখবেন, রাগ থাকবে না। দিন দামটা দিয়ে দিন।

কত দাম?

পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা। আপনার মেয়েই দাম ঠিক করে দিল। বলে দিল আপনার পূর্বঘরের পশ্চিম কুলুঙ্গিতে মুদ্রা ক'টি আছে। তাই আমার প্রাপ্য।

ব্যস্ত হয়ে উম্ধারণ দেখতে গেল—আশ্চর্য, নির্দিষ্ট কুলুঙ্গিতে পাঁচটি সোনার মুদ্রা!

কই আমার মেয়ে কই? আমার মেয়েকে দেখাও।

শাঁখারি উম্ধারণকে সরস্বতী নদীর ঘাটে নিয়ে এল। কিন্তু কই সে-মেয়ে কই? কোথায় সে স্নান করতে নেমেছে?

মা, মা-গো, তুই কোথায়? দেখা দিয়ে আমার মান রাখ। নইলে যে আমি প্রবঞ্চক হয়ে থাকব। তোকে যে আমি শাঁখা পরিয়েছি এ কী করে দত্তঠাকুর বিশ্বাস করবেন? শাঁখারি ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

তখন সরস্বতীর জলের উপর দুখানি নিটোল হাত উঠে এল। দুই হাতে দুগাছা শাঁখা শোভা পাচ্ছে।

শাঁখারি আর উম্ধারণ দুজনেই কাঁদতে লাগল। উম্ধারণ বললে, শাঁখারি, তুমি ভাগ্যবান। তোমার ভক্তির শক্তিতে আমার এই দর্শন হ'ল। বলেছে, আমার মেয়ে, আমার মা, ত্রিলোক-জননী—আর আমার কী চাই। এই নাও স্বর্ণমুদ্রা।

শাঁখারি নিল না। বললে, মণি ফেলে এই কাচের টুকরো নিয়ে আমি কী করব? তখন আমি কেন মাকে চিনতে পারলাম না? আমি ভাগ্যবান না আমি হতভাগ্য?

সপ্তগ্রামে কিছুদিন বাস করবার পর নিত্যানন্দের 'গৃহী উম্ধারিতে হৈল গৃহী হতে সাধ।' নিত্যানন্দের ভক্ত কমলাকান্তের মুখে এ কথা শুনে উম্ধারণ লোকজন লাগিয়ে কন্যা খুঁজতে লাগল। 'রূপে গুণে লক্ষ্মী কন্যা আছে কোন ঘরে।'

খবর পাওয়া গেল অম্বিকা-কালনায় সূর্য দাস পন্ডিতের ঘরে দুটি কন্যা আছে বসুধা ও জাহ্নবা। সূর্যদাস তাদের দুজনকেই নিত্যানন্দের হাতে সম্প্রদান করুক।

নিত্যানন্দ গৌরহরিকে স্মরণ করল। 'অবধূত করিয়া সংসার ভ্রমাইলা। মোর নেত্রে পট দিয়া লুকায়ে রহিলা।' এখন আবার বেশ-ভূষায় সজ্জিত করে বিষয়ী করছ, বলছ সংসার করতে। আমি কখন যে কী হই কিছু বুঝতে পারি না। শুধু তোমার আজ্ঞা শিরে বহন করে চলি।

সূর্যদাসের ঘরের দরজায় নিত্যানন্দ দাঁড়িয়ে রইল, উম্ধারণ ঢুকল অন্তঃপুরে। সূর্যদাসকে বললে, তোমার কন্যার জন্যে বর এনেছি।

কে সে?

উত্তম ব্রাহ্মণ। সর্বশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ-গরিষ্ঠ। রাঢ়চূড়ামণি। প্রেমানন্দে বাস, নাম নিত্যানন্দ। উম্ধারণ বরের পরিচয় দিল।

সূর্যদাস উৎসাহিত হ'ল না। অজ্ঞাত-কুলশীল আগন্তুক লোককে কী করে মেয়ে দিই? আত্মীয়কুটুম্বরাও প্রত্যাখ্যান করল।

ক'দিন পরে নিত্যানন্দ আর উম্ধারণ গঙ্গাতীরে বসে কৃষ্ণকথা বলছে, দেখল শোকাকুল সূর্যদাস ও তার লোকেরা মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে চলেছে। খবর নিয়ে জানল এ বসুধার মৃতদেহ।

নিত্যানন্দ বললে, একে আমি বাঁচাতে পারি, যদি—

আপনি যা চাইবেন তাই দেব। বললে সূর্যদাস।

যদি তাকে আমার হাতে সমর্পণ করেন।

তাই করব।

মৃত-সঞ্জীবন হরিনাম শুনে বসুধা বেঁচে উঠল। মহাসমারোহে নিত্যানন্দ তাকে বিবাহ করলে। শুধু তাকে নয়, জাহ্নবাকে। 'যৌতুক ছলে জাহ্নবারে আত্মসাৎ কৈলা।'

বিবাহমহোৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার উম্ধারণ বহন করল।

তারপর নিত্যানন্দ যখন সপ্তগ্রাম অন্ধকার করে চলে যাবার উদ্যোগ করল, তখন উম্ধারণ কাঁদতে বসল।

উম্ধারণ, কেন কাঁদছ? তুমি তো জান আমি শ্রীচৈতন্যের কিঙ্কর। তাঁর আজ্ঞায় তাঁর কাজ আমাকে সমাপন করতে হবে। আমি এক জায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকি কি করে? দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে যে আমাকে নাম প্রচার করতে হবে। যত দূরেই যাই না কেন, আমার প্রাণ তোমার কাছে বাঁধা থাকবে।

আটচল্লিশ বছর বয়সে উম্ধারণ দত্ত ঠাকুর পুত্র শ্রীনিবাসের উপর বিষয়কর্মের ভার দিয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করল। ছ' বছর নীলাচলে কাটিয়ে ছ' বছর বৃন্দাবনে সাধন করল। তারপর ষাট বছর বয়সে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে নশ্বর দেহ ঈশ্বরে বিসর্জন দিল।

বৃন্দাবনের বংশীবটের কাছে তার সমাধি। সপ্তগ্রামের পাটবাড়িতে ও উম্ধারণ-পুর গ্রামেও তার সমাধি-মন্দির আছে।

উম্ধারণ দত্ত ঠাকুর দ্বাদশ গোপালের একজন। শ্রীপাট সপ্তগ্রাম। ষড়ভুজ মহাপ্রভুই প্রধান বিগ্রহ। ত্রেতায় রামের দু'হাত, দ্বাপরে কৃষ্ণের দু'হাত আর কলিতে গৌরাঙ্গের দু'হাত—এই মোট ছ'হাত। নিত্যানন্দ আর গৌরাঙ্গের যুগল-বিগ্রহও শ্রীপাটে অধিষ্ঠিত।

তারপরে মাধবীমণ্ডপ। নূপুরপুকুর।

দুই পুরুষ এক নারী

শান্তি লাহিড়ী

একটা বিদেশী ফিল্মের কাগজে ছবি দেখছিল অরুণ। বিভিন্ন আঙ্গিকের নানান ছবিতে কাগজখানা জমকালো। ছুটির দিন, ঘরে কেউ নেই, একটু চা-এর জন্য উসখুস করছিল, অগত্যা একটা সিগারেট ধরাল। দুপুরে খেয়ে উঠেই শমিতা বেরিয়েছে। মাঝে মধ্যে একা এবং অলসতা দুটোই খুব মধুর লাগে অরুণের। শমিতা বোধহয় কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিল। ঘরে এসে বাজারের জিনিসপত্তর নামিয়ে রেখে অরুণের পাশে বসে ওর পিঠের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বলল, এই সব হচ্ছে!

অরুণ সিগারেটে একটা টান দিয়ে মুখ না তুলেই বলল, এই সব হচ্ছে না, হবে।

অরুণ আধশোয়া অবস্থায় ছিল। চিৎ হয়ে ম্যাগাজিনটিকে চোখের সামনে তুলে নিয়ে বলল, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি বল ত?

শমিতা এক পলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, আসল ব্যাপার কিছুই না, দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে মাখামাখি করছে।

মাখামাখি করছে? কেন, বলতে পারলে না তিনজনে একেবারে সেক্সে ডুবে আছে?

সে তো ওই একই কথা। শমিতা খুব উৎসাহী হয়ে অরুণের কাছে সরে এসে ছবিটাকে তুলে নিল। আচ্ছা, দুটো মেয়ে, একটা ছেলে, কি করছে বল তো?

কেন, কি করছে এখনো তুমি বুঝতে পারছ না? জান শমিতা, আমার খুব ইচ্ছে করে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলে হত।

করলেই তো পার। তোমার তো আগের বান্ধবীরা রয়েইছে। ডাকো না দুজনকে একদিন।

কিন্তু তা তো আর বাস্তবে সম্ভব হবে না। তার চেয়ে ভাবছি অন্য ব্যবস্থা করব।

একটু ভীত কণ্ঠে বলল শমিতা, কি ব্যবস্থা করবে?

শমিতাকে মুখের ওপর টেনে নিয়ে ব্লাউজের ওপরের বোতামটা খুট করে খুলে দিয়ে অরুণ বলল, ভাবছি, দীপেনকে একদিন বলব।

শমিতা গাঢ় হয়ে বলল, সত্যি তুমি বলবে?

অরুণের নিশ্বাস খুব ঘন এবং উত্তপ্ত মনে হল শমিতার। আঙুলগুলো কেমন ধারালো। শমিতা নিজেকে অনেকটা এগিয়ে দিয়ে বলল, এই জন্যেই বুঝি এতক্ষণ ওঁত পেতে ছিলে।

সন্ধ্যার পরে দীপেন এসে যখন দরজায় কড়া নাড়ল তখনো ওরা বন্ধ ঘরে। শমিতা এসে দরজা খুলে দিল। দীপেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল যা ভেবেছিল তাই ঘটে গেছে।

আপনা থেকেই বলল শমিতা, একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওঘরে যাও ও আছে, আমি চোখে জল দিয়ে একটু চায়ের জল বসিয়ে আসছি।

শমিতা ফিরে এসে দীপেনকে দেখল লক্ষ্য করে, ও কেমন শান্ত এবং অন্যমনস্ক। শমিতা নিঃসন্দেহ হ'ল যে দীপেন এতক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত ঘরটাকে দেখেছে। বিছানার ওপর একপাশে খুলে রাখা ব্রা এবং ব্লাউজ দুটোও ওর চোখ এড়ায় নি। এবং এই পাতা ওলটানো ফিল্মের ম্যাগাজিনের ছবিটাও।

অরুণ তখনো ঘুমিয়ে। শমিতা দীপেনের কাঁধে হাত ছুঁয়ে বলল, কি হল?

কি হবে?

কি যেন একটা হয়েছে মনে হচ্ছে।

দীপেন মুখ না তুলেই বলল, মনে হচ্ছে না কি? মনে তাহলে হয়?

শমিতা আস্তে বলল, তুমি খুব অবুঝ দীপেন। সবকিছু বুঝেও মাঝে মাঝে অত্যন্ত অবুঝ হয়ে ওঠ। একটু বোস, আমি চা নিয়ে আসি।

এই দোলনায় শমিতা বহুবার চড়েছে। কখনো ডানে, কখনো বাঁয়ে, দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে শমিতা দুলে চলেছে। দুটি পুরুষের দুপাশের আকর্ষণে মাঝখানে না থেমে দাঁড়িয়ে আছে শমিতা। দীপেনের ইচ্ছার পক্ষে অরুণের অনেক ভালোলাগা উপেক্ষা করে, অথবা অরুণের নির্দেশে দীপেনের কোন পছন্দ-অপছন্দকে না রেখে চলতে হয় শমিতাকে। এই মন রাখারাখির মাঝখানে অনেক মানসিক গ্লানিকে সইতে হয়, নিজের ব্যক্তিত্বের অসহায় চেহারা দেখে মাঝে মাঝে ক্লান্তিও বোধ করে শমিতা, কিন্তু উপায় নেই। ওরা, ওই দুজন মানুষ, দীপেন আর অরুণ—নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব বজায় রেখে ওদের দুজনকে পাওয়া সম্ভব নয়।

চায়ের পেয়ালা হাতে শমিতা ফিরে এলো। ততক্ষণ ওরা দুজনে কথা বলছে।

চা খেয়ে অরুণ পাঞ্জাবি গায়ে চাপিয়ে বলল, আমি একটু বেরোচ্ছি, তুই আছিস তো! টুইশনিটা সেরে আসি।

শমিতা বলল, মনে হয় আজ বাবুর কাজ পড়বে অনেক, অমুক বন্ধু অমুক ক্লাব, একটা না একটা জায়গায় অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট আছেই।

অরুণ বলল, কেন? তোমাদের কিছু হয়েছে নাকি? আর হলেই বা কি, মিটতে তো আর খুব বেশী সময় লাগবে না।

অরুণ চলে যেতেই শমিতা আরো নিবিড় হয়ে এলো দীপেনের কাছে। কপালের ওপর ঠোঁট দুটো রেখে বলল, তুমি যদি এমনি কর, কি করে চলবে বলতে পার? দিন-রাত মুখ ভার, রাগা-রাগি, আমার সময় কাটে কি করে একবার ভাব তো?

তোমার সময়? তোমার সংসার নিয়ে, স্বামীকে নিয়ে আর পাঁচটা মেয়ের মত অনায়াসে কেটে যাচ্ছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে একটা মেয়ের ওপর অবিচার কোরো না দীপেন। সব সময় অমন করে কথা বোলো না, তোমার যা ভাল লাগে করলেই তো পার। তোমার অসাধারণ ভালোবাসায় আর পাঁচটা মেয়ের মত না রেখে অনন্যসাধারণ করে তুললেই তো পার।

শমিতা খাটের একপাশ ধরে বসে পড়ে। দীপেন এগিয়ে এসে শমিতার মাথাটাকে ওর বুকের মধ্যে টেনে নেয়। অন্তর্বাসহীন আঁচল জড়ানো শরীরটা আলগা হয়ে পড়ে। দীপেন শমিতার বুকের মধ্যে নিজের মুখটা সজোরে ঘসতে থাকে।

ওঠ দীপেন, সব সময় ভালো লাগে না।

কি ভালো লাগে না।

তোমাদের হাতে ইচ্ছের পুতুল হয়ে থাকতে। আমাকে একটু স্বাধীনভাবে চলতে ফিরতে দাও। আজকে রেহাই দাও, আমি খুব ক্লান্ত।

সরে আসে দীপেন।

শমিতা বলে, তোমাদের অসুবিধে হত কিনা জানি না, কিন্তু যে দুজন পুরুষের সঙ্গেই আমাকে মিথ্যা সেজে থাকতে হয়, দুঃখটাকে ঢেকে সুখ আর সুখ লুকিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে হয়, একই দিনে, মাত্র দু ঘন্টার ব্যবধানে তাদের দুজনের কাছেই দেহ দেওয়া যায় না।

কিছুক্ষণ একেবারে চুপচাপ। একটা কম পাওয়ারের ডুম জ্বলছিল। শমিতা বড় আলোটা জেলে নিয়ে ঘরদোর গোছাতে লাগল। ঝি এলো না এখনো, বাসন রেখে দিলেই চলবে কাল পর্যন্ত। রাত্রের রান্নার ব্যাপার আছে। কিন্তু এখন আর রাঁধতে ভালো লাগছে না। ঘরটা গুছিয়ে শমিতা বাথরুমে চলে গেল গা ধুতে। অরুণের দু-একটা সাবান-কাঁচা আছে, সেগুলো সঙ্গে নিল।

দীপেন আকাশ-পাতাল ভাবছে। কত-দিন, কত বছর এই ক্লান্তিকর জীবনযাপন। মাঝে মাঝে পালাতে ইচ্ছে করে। সর্বাঙ্গীণ অধিকারের মধ্যে কোথায় একটা পরম পরাধীনতার বাঁধন তাকে স্পর্শ করে থেকে থেকে। শমিতার বাহুপাশ, তার পরিবেশ অথবা নগ্নতা—তাকে সব থেকে মুক্তি দিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু শমিতার পারি-পার্শ্বিক, তার অতীতের ওপর দাঁড়ানো বর্তমান, অরুণ-দীপেনের একনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সবকিছুকে এক মুঠোয় গ্রহণ করা খুবই কষ্টকর হয়ে ওঠে ওর কাছে। এক-একদিন কেমন যেন একটা নিঃসঙ্গ ক্ষুধা তাকে তাড়না করে বেড়ায় পাগলা কুকুরের আক্রোশে। দীপেন ছুটে বেড়ায়, পালাতে পারে না। অরুণের সঙ্গে দীপেনের সম্পর্ক, অরুণের সঙ্গে শমিতার সম্পর্ক এবং দীপেন ও শমিতা—এই তিন দু গুণে ছটি চরিত্রের আলাদা অস্তিত্ব কেমন পরস্পর-বিরোধী, যেন এমন একটি খেলার ছক যার কোন শেষ দান নেই, হার কিংবা জিত, কোনটাই কারো পরিচিত নয়।

অরুণ অস্পষ্ট। যে মানুষটা স্বাভাবিক-ভাবে চলাফেরা করে বেড়ায়, ট্রামে বাসে অফিসে, বাজারে, আত্মীয়-বান্ধবে যে খুব বিকারহীন, সেও দীপেনের কাছে রহস্য-ময়। অরুণকে দীপেন যা দেখে আসল অরুণ সেখান থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে বলে দীপেনের ধারণা। আজকের সমস্ত ঘটনার জালে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়তে লাগল দীপেন, অরুণ আর শমিতার বৈধ দাম্পত্য জীবনের এই অনিবার্যতাকে সে অন্যান্য দিনের মত আজকেও গ্রহণ করতে পারল না। কোথায় একটা কুটিল ঈর্ষা কেবলই ছোবল মারতে লাগল। যখনই স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ক দীপেনের চোখে ধরা পড়ে তখনই দীপেন যেন ওর অধিকারের দুর্নিবার সাহস আর অসহায় রিক্ততা নিয়ে শমিতা আর ওর সম্পর্কের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অথচ সব যদি স্বাভাবিক হয়ে যায়। যদি দীপেন আর অরুণের দুটি আলাদা সত্তা একসঙ্গে শমিতার জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলো উন্মোচন করে দেয়, একটু নিঃশ্বাস নিতে পারে ওরা তিনজনেই। একটু স্বাধীন ভালোবাসায় বাতাসে গা উদাস করে বসতে পারে। কিন্তু তা বোধহয় সম্ভব নয়। দীপেন এক সময় নিজের বুকের মধ্যে উঁকি দেয়। পারবে। নিশ্চয় এই অনিবার্য সত্যকে গ্রহণ করতে পারবে দীপেন। চোখের আড়ালে শমিতা অরুণের জীবনকে গ্রহণ করতে না পারলেও চোখের সামনে নিশ্চয়ই পারবে কারণ সন্দেহের নিষ্ঠুর কালো হাত কিছুতেই ওর ধারণাকে ধরে অযথা টানাটানি করতে পারবে না।

কিন্তু অরুণকে দীপেন দেখতে পায় না। অরুণ তো বোঝে শমিতা এবং দীপেনের এই ঘনিষ্ঠতা কতখানি, আর দুই বলগাহীন যৌবন কোথায় কতদূর চলে যেতে পারে অনায়াসে। অরুণ জানে, বোঝে, কিন্তু সবটুকু মানতে পারে না। মানতে পারে না শমিতার দেহে কোথাও অপূর্ণতা রেখেছে ও, আর যেহেতু শমিতা একজন সুস্থদেহী পুরুষের অঙ্কশায়িনী, অতলের দৈহিক ক্ষুধা শমিতার থাকতে পারে না।

দীপেন বহুদিন খুব স্পষ্টভাবে বোঝাতে চেয়েছে, তুলে ধরতে চেয়েছে শমিতার সঙ্গে ওর গোপন সম্পর্কের এক-আধটু আভাস কিন্তু অরুণ ইচ্ছে করেই সেই মুখোমুখি বোঝাপড়ার সামনে থেকে সরে গিয়েছে।

কেন! শমিতা বলে, অরুণের এক আশ্চর্য গ্রহণ এবং পরিত্যাগের ক্ষমতা আছে। ও অনায়াসে তোমাকে গ্রহণ করেছে আমার দিকে তাকিয়ে, আবার অনায়াসে সেই জায়গাটুকু চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে তুমি ঠিক যেখানে আছ সেখান থেকে এক পাও এগিয়ে যেতে না পার।

শমিতা বাথরুম থেকে ফিরে এলো। ভেজা কাপড় ছেড়ে নিল, টেবিলে ধূপকাঠি জেলে দিল। আপন মনে ঘরের এদিক ওদিক করতে করতে বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল রাস্তার দিকে তাকিয়ে। তারপর এক সময় ফিরে এলো, দীপেনের কোলে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল ওর কোমরটা দু বাহুতে জড়িয়ে ধরে।

দীপেনের আঙুলগুলো ওর ভেজা কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরতে লাগল।

কখন অরুণ ফিরে এসেছে ওরা কেউ খেয়াল করেনি। অরুণ ঘরে এসে একবার বারান্দায় চলে গেল, আবার ফিরে এসে শমিতার পাশে বসে ওর পিঠের ওপর হাত রেখে ডাকল, শমি, কি শরীর খারাপ লাগছে? দীপেনের কোল থেকে মুখটা তুলে নিয়ে অরুণের কোলে রাখল শমিতা। অরুণ আর দীপেন দুজনের আঙুলগুলো একটা আধারকে অবলম্বন করে কেবল চলাফেরা করতে লাগল। বিকেলের ফিল্মের ছবিটার কথা মনে পড়ল অরুণের।

আজ আর তুই না ফিরলি দীপেন? কি বল শমি? আজ সেই দুপুরের এক্স-পেরিমেন্টটা হয়ে যাক।

চকিতে উঠে বসল শমিতা। বলল, তোমরা বস, আমি একটু রান্নার দিকে যাই!

না গেলেই নয়? কিছু তো এনে নিলেই হ'ত।

না, কতক্ষণ আর লাগবে। তোমরা একটু কথা বলতে বলতেই আমি আসছি। শমিতা যাবার সময় দীপেনের মাথার নীচে একটা বালিস টেনে দিয়ে গেল।

অরুণ দেশলাই জেবলে সিগারেট ধরালো, রেডিওটা খুলে দিল আস্তে করে, তারপর দীপেনের মুখোমুখি বসল।

শমিতার একটা বিচিত্র সাধ হয়েছে দীপেন। তুই শুনলে অবাক হয়ে যাবি।

কি সাধ? ওর তো সাধের অন্ত নেই।

না রে না, খুব মজার সাধ। একটু ঘুরিয়ে বলল অরুণ, আমার মনে হয় সেকস্যুয়ালি ও খুব হ্যাপী নয়, ওর কিছু অতৃপ্তি রয়ে গেছে আমার কাছে।

একথা তোর কেন মনে হয়? এর আগেও দু-একবার বলেছিস কিন্তু আমি যতটা তোকে জানি এবং ওর কাছ থেকে শুনি আমার কিন্তু মোটেই মনে হয় না।

শোন, আজ বিকেলে—এই পর্যন্ত বলে অরুণ সেই ম্যাগাজিনের পাতাটা খুলে দীপেনকে দেখাল। একটি ছেলে দুটি মেয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে। অরুণ বললে, এই ছবিটা দেখে শমিতা আমাকে এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিল, আমার মনে হয় ও অন্য কারো সঙ্গে এই ধরনের একটা অভিজ্ঞতা পেতে চায়।

আর কারো সঙ্গে বলতে তুই কি বোঝাচ্ছিস?

মানে, দেখ, বিয়ের পর থেকেই ঠিক আমরা দুজন উদ্দাম যৌনতা যাকে বলে তা মোটেই এনজয় করতে পারিনি। আর তাছাড়া আমার ধারণা আমি একটু কোল্ড এসব ব্যাপারে। সারা রাত এমন গেছে, হয়ত ওর সমস্ত শরীরটা আমার শরীরের সঙ্গে সাপটে রয়েছে তবু কোন কিছু হয়নি। এটা আমার কাছে ইদানীং খুব হ্যাপী বলে মনে হয় না দীপেন। অন্য কেউ বলতে আমি আমাকে ছাড়া কাউকে বোঝাচ্ছি।

দীপেন উঠে বসে দেয়ালে হেলান দিল। বলল, ঘটনাটা তাই, তবে সেক্স্যুয়াল আনহ্যাপীনেস নয়। শমিতা খুব ক্লান্ত। তুই দু মিনিট আমার একটা কথা শুনবি? চুপ করে শুনবি, তারপর যা হয় বলবি।

অরুণ সোজা হয়ে বসে বলল, বল, শমিতাকে নিয়ে আমরা তো আর কম কথা, কম লড়াই করলাম না। কিন্তু ও আমার কাছে আজো স্পষ্ট নয়।

দীপেন বলল, আমরা কেউ পরস্পরের কাছে স্পষ্ট নই; কারণ, আমরা একটা সাধারণ সত্যকে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে মনে করছি। অবশ্য একদিক দিয়ে এটা ঠিকই যে শমিতাকে পেতে গিয়ে আমি যেটুকুই পেয়েছি সবটুকুই আমার গ্রহণের দিক। তোর একটা দিক প্রায় অসম্ভব—তুই ওর স্বামী এবং আমি ওর প্রেমিক অথবা অনেকটা উদার হয়ে বললে অন্য একটি স্বামী, এই অবস্থাকে জীবনের সঙ্গে স্বাভাবিক করে নিয়ে খাপ খাওয়ানো, আমি হলে পারতাম কিনা সন্দেহ। তবু, যখন এতটাই তুই গ্রহণ করেছিস, তখন শমিতাকে ঠিক এভাবে ভাবা বোধহয় তোর পক্ষে ঠিক না। অন্য পুরুষকে শমিতা কামনা করে বলে তোর মনে হয়। কিন্তু সে পুরুষকে ও দৈহিক সমস্যা সমাধানের জন্য চায় না অরুণ, তাকে চায় ওর সারা জীবনের সর্পিল পথগুলোকে সরল করার জন্য। আমি, তুই, শমিতা পরস্পরের সঙ্গে একটা বিচিত্র গ্রন্থিতে বাঁধা। অথচ আমরা কোনদিন পরস্পরের কাছে স্বচ্ছ হতে পারব না, যদি না এই সমস্যার সমাধান হয়। আমাদের সকলের পক্ষেই কি এক-জনের বেশী পুরুষ অথবা নারীর প্রতি সম্পর্ক লালন করা সম্ভব নয়? কে জানতে পারত যদি শমিতা আর পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে সহবাস করে হেসে খেলে বেড়াত। তুই অথবা আমিই যদি এখানে সেখানে দু-দশটা মেয়ের সঙ্গে যৌন সংসর্গের পর ঘরে ফিরে আসি, শমিতা কি বুঝতে পারবে? সেই পুরুষ পাবার জন্য শমিতাকে হয়ত এখনকার মত সারা-জীবন তিল তিল জ্বলতে হত না।

অরুণ দেখল কথা বলতে বলতে দীপেন হাঁপাচ্ছে। অরুণ বলল, তুই রাজি হবি?

আমার কথা এখনো শেষ হয়নি অরুণ। শোন, শমিতা বোধহয় একটা আশ্রয় খুঁজছে, একটা সামঞ্জস্য করতে চাইছে। আমি আর তুই পরস্পরকে এক জায়গায় শত্রুতা করি। তোর খেয়াল আছে কিনা জানি না, যেদিন আমি এখানে থাকি, শমিতা আমাদের মাঝখানে শুয়ে সারারাত জেগে থাকে। ওর পক্ষে ঘুমানো সম্ভব নয়। ওকে আমি কচিৎ একপাশ হয়ে শুতে দেখেছি। কারণ হয় তুই, নয় আমি। দুজনের কাছে সমানভাবে নিজেকে ভাগ করে দেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ও দীর্ঘদিন ধরে একটা পথ খুঁজছে। ও কেন, আমরাও বোধহয় খুঁজছি। আমিই কি জানি শমিতা আর তোর গোপনতার সীমা কতটুকু? তুইও জানিস না আমি শমিতার কাছে কতটা গ্রহণ যোগ্য। শমিতাও বুঝতে পারে না তোর আর আমার পারস্পরিক সম্পর্কটার কোন সত্যিকারের চেহারা আছে কিনা, না সব-টুকুই ওই মেয়েটাকে কেন্দ্র করে। এখন বল, তুই রাজি হবি? ওকে আমরা যতই ভালোবাসি; আমাতে আর তোতে চেনাশোনা না হলে ওর মুক্তি নাই। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা পরস্পরের প্রতিরোধ হয়ে উঠব না তো? সমাজে এবং আইনে তুই ওর স্বামী, শুধু স্বামী নয়, ও হয়ত নিজেই জানে না আমাদের দুজনের মধ্যে কাকে ও বেশী ভালোবাসে। আর আমি ওর জীবনের সঙ্গে সব রকমে জড়িয়ে পড়েছি। সেখান থেকে সরে আসবার কথা কল্পনাও করতে পারি না আমরা কেউ। দুটো পুরুষকে ওর পক্ষে সর্বদিক সামলে ভালোবাসা আর সুখী করা কি অতই সহজ মনে হয় তোর?

ওরা কেউ কথা বলল না।

নিঃশব্দে তিনজন রাত্রের খাবার শেষ করল।

আলো নিবল।

একপাশে অরুণ, একপাশে দীপেন। মাঝখানে শমিতা।

শেষ ট্রাম চলে যাবার শব্দ হল। ওরা কেউ ঘুমোল না। ওরা তিনজন ক্রমাগত পরস্পরের সান্নিধ্যে এগিয়ে আসতে চাইল। অরুণের হাত শমিতাকে ডিঙিয়ে দীপেনের শিরদাঁড়া স্পর্শ করল, দীপেনের হাতে এসে ধরা দিল অরুণের শরীর। দুজনের মাঝখানে শমিতার সমস্ত শরীরটা কোথায় হারিয়ে গেল।

অনেকদিন পর ওরা তিনজনেই শেষে ঘুমিয়ে পড়ল।

কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

কলকাতায় রোজ অনেক নাম হারিয়ে যাচ্ছে, হয়ত ফুরিয়েও যাচ্ছে। ভুলে-যাওয়া শত শত নামের মধ্যে একটি নামের কাছে সেদিন গিয়েছিলাম। অনেক কিছু নিয়ে ফিরে এসেছি।

দেশের স্বাধীনতার জন্যে জেল খেটেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন এমন মানুষের অভাব কলকাতায় কোনদিনই হয়নি। কিন্তু বাহাত্তর বছর আগেকার বৃটিশ যুগের সেই বেত্রাঘাত এখনও শরীরে রাজ-টিকার মত জ্বল জ্বল করছে এমন মানুষ কলকাতায় এই প্রথম দেখলাম। সেদিনের সেই লম্বা-চওড়া সুদর্শন সুপুরুষ আজ ছেয়াত্তর বছরে একজন জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধ। গায়ের রং এখনও ফর্সাই আছে, এখনও সোজা হয়ে চলেন। তবে চোখের সে-জ্যোতি আর নেই। পুরু কাঁচের বড় চশমা মানুষটার চেহারা পালটে দিয়েছে। দুটো কাচের একটা আবার ঘষা, তার ভিতর দিয়ে চোখ দেখা যায় না।

পরবর্তী জীবনে এই বিপ্লবী যুবক কলকাতায় সাংবাদিক হয়েছিলেন। তবে তার আগে কলকাতার খবরের কাগজের একটি বড় রকমের 'স্কুপ' সারা দেশকে যা তোল-পাড় করে দেয়, ইনি ছিলেন তার নেপথ্য নায়ক।

বিপ্লবী বীর তখন আন্দামানে, কুখ্যাত সেলুলার জেলে। রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে তাঁকে নারকেলের ছোবড়া পিটিয়ে আঁশ বার করতে হয়। হঠাৎ হাতের কাছে একটি ইংরেজি বই পেয়ে ওঁর যেন চোখ খুলে গেল। কাজ করতে অস্বীকার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল নির্যাতন।

হাতে-পায়ে লোহার বালা পরিয়ে বিবস্ত্র করে তাঁকে বধ্যভূমিতে আনা হল, সেখানে একজন বেত-বিশেষজ্ঞ সিন্ধী কয়েদী বাঁধা মানুষটার একই স্থানে পনের ঘা বেত মেরে অপূর্ব মুন্সিয়ানা দেখাল। কাপড় খুললে আজকের বৃদ্ধ মানুষটির পিঠে এখনও সেই বেত্রাঘাতের কালো দাগ দেখা যাবে। হাতকড়ি, ডান্ডাবেড়ি, খাড়া-বেড়ি, খাদ্যহ্রাস, উল্টা পিঠে হাতকড়ি, দাঁড়ানো অবস্থায় হাতকড়ি (ইংরেজিতে স্ট্যান্ডিং হ্যান্ডকাফ, পেনাল ডায়েট, বি-হাইন্ড হ্যান্ডকাফ, বার ফেটার্স, ক্রস ফেটার্স, সলিটারি কনফাইনমেন্ট—তাঁর জীবনে অভিজ্ঞতার অন্ত নেই।

অসহায় যুবকের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। অনেক ভেবেচিন্তে পাঞ্জাবী মুসল-মান নাইট-ওয়াচম্যানের সঙ্গে দোস্তি করলেন। জোগাড় হল ছোট্ট একটা পেনসিল আর ছোট ছোট কয়েক টুকরো কাগজ। ফুরসতমত কয়েকদিনের চেষ্টায় তিন কপি করে আন্দামানের কাহিনী লেখা হল। নাইট-ওয়াচম্যান তার দোস্ত একজন আর্মড এসকর্টের শরণাপন্ন হল, যার কাজ ছিল কলকাতা থেকে আসার সময় কয়েদীদের পাহারা দেওয়া। সে কথা দিল এই তিনটে কপি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ট, স্যার সুরেন ব্যানার্জি আর অমৃত-বাজারের মতিলাল ঘোষ মশাইয়ের নামে পোস্ট করবে।

কিন্তু হল না কিছু। মাস-দুই নির্বিবাদে কেটে যাওয়ায় বোঝা গেল, চিঠি-গুলো যথাস্থানে পৌঁছয়নি। স্থির হল আবার চেষ্টা করতে হবে। এবার প্ল্যান মত একটিই চিঠি লিখলেন যুবকটি, আর্মড এসকর্ট সে-চিঠি নিয়ে হাজির হল ১২৬নং বৌবাজার স্ট্রীটে, 'বেঙ্গলী' অফিসে। সম্পাদক সুরেন ব্যানার্জির কাছে গিয়ে সেলাম দিয়ে চিঠিটি দিলেন।

সেই সর্বপ্রথম লৌহযবনিকা ভেদ করে আন্দামানের নির্মম কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। সুরেন্দ্রনাথ পর পর দুদিন লিখলেন 'বেঙ্গলী'তে। পরে কেন্দ্রীয় আইনসভায় তিনি প্রসঙ্গটি তুলে তদন্ত দাবী করলেন। আন্দামানের জেলার দুর্ধর্ষ ব্যারি সাহেব হঠাৎ পালটে, রাতারাতি কয়েদীগণের বন্ধু বনে গেলেন। যুবকটিও প্রেসে হালকা কাজ পেলেন।

হোম ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি জি ডবলু ইয়েনকে দিল্লী থেকে পাঠান হল সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্য। তিনি দেখলেন সত্যিই আন্দামান মহিলা অথবা রাজনৈতিক কয়েদীদের কিংবা কয়েদীদের উপনিবেশ হিসেবে অচল। রক্তআমাশয়, যক্ষ্মা, জ্বর প্রভৃতি এখানে লেগেই আছে। তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী আন্দামানে আর জেলখানা রইল না। কয়েদীদের কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হল। এক রিপোর্টে সব উল্টে গেল।

ইংরেজ পরে কথা রাখেনি। বত্রিশ সালে আবার আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীদের

পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আন্দামান পাকাপাকি-ভাবে জাত খোয়াল স্বাধীনতার পর।

সেদিন মহাজাতিসদনে পুরনো দিনের বিপ্লবীদের সভা বসেছিল। এই কলকাতায় অনেক প্রবীণ বিপ্লবী আছেন যাঁদের আমরা ভুলতে বসেছি। ও'দের প্রত্যেকের জীবন-স্মৃতিতেই পূর্বোক্ত বিপ্লবীর জীবন ইতি-হাসের মত জ্বলন্ত সব অধ্যায় রয়েছে। ভুলে গিয়েছি, কিন্তু ভুলতে বোধহয় পারব না। বারেবারেই মনে পড়বে তাঁদের নাম। পরম শ্রদ্ধায় নমস্কার জানাব তাঁদের উদ্দেশ্যে।

*

বিশেষজ্ঞরা হঠাৎ চিন্তিত। মাথাব্যথাটা এবার কলকাতাসমেত গোটা পশ্চিমবাংলাকে নিয়ে।

কথা হচ্ছিল পশ্চিমবাংলা সরকারের সারাদেশে নামডাক আছে এমন একজন বিশেষজ্ঞের সংগে। সরকারী চাকরে। তাই নামটা প্রকাশ করতে পারছি না।

"অপেক্ষা করুন", তিনি বললেন, "আপনাদের লাইফটাইমেই দেখে যেতে পারবেন সুজলা সুফলা দেশটা খাঁ খাঁ করা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে!"

কাগজ-কলম নিয়ে ছবি এঁকে ভদ্রলোক দেখালেন রাজ্য সরকার যে ৪০ হাজার অগভীর নলকূপ খননের 'আত্মঘাতী' সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাতে গোটা দেশটা ছারখার হয়ে যাবে। অগভীর নলকূপ মাটির ঠিক নিচের স্তরে যে-জল আছে, তা শোধন করে বার করবে। ফল কি হবে জানেন? বিমানে উঠলে দেখেছেন নিশ্চয়ই মাটির উপরে কুয়াশার মত? মাটির নিচে জল না থাকলে ওসব থাকবে না। ফলে হাওয়া গরম হয়ে যাবে। গরম হাওয়া আশে-পাশের মেঘগুলোকে দূরে সরিয়ে নেবে।"

শুধু তাই নয়। গঙ্গা নদী যদি অব্যাহত থাকেও, ছোট গঙ্গা, লেক, পুকুর, খাল সব শুকিয়ে যাবে। সুবিধের মধ্যে হবে খোলা ড্রেনগুলো খটখটে হয়ে যাবে, মশক-কুলের মৃত্যু হবে। বৃষ্টির জন্যে কর্পো-রেশনকে নাকানিচোবানি খেতে হবে না। অন্যদিকে গাছপালা ঘাস-লতাপাতা সব পটল তুলবে। ব্লাক-মার্কেটেও ওসব পাওয়া যাবে না।

কলকাতার কপালে শেষপর্যন্ত কি আছে কে জানে?

আর একজন বিশেষজ্ঞ দোতলা রাস্তার সুন্দর এক নক্সা এঁকে দেখালেন। জানালেন, সরকার মেনে নিয়েছেন এই ডিজাইন।

শ্যামবাজার থেকে বেলেঘাটা অবধি যে-খাল গেছে, সেই খালকে অটুট রেখে এই দোতলা রাস্তা তৈরি করা হবে। একতলা তৈরি আছেই—খালের দু' পাড়ের ক্যানেল ইস্ট আর ওয়েস্ট রোড। নিচের তলা হবে খালটাকে বাংলা 'দ'-এর মত শেপ দিয়ে। দ-এর মাত্রাটা হল প্রথম তলা অর্থাৎ ক্যানেল ইস্ট অথবা ওয়েস্ট রোড, তারপর প্রাচীর, তারপর মাত্রার সমান্তরাল অংশটি হবে নিচের তলার রাস্তা, তারপর আবার সিঁড়ি, সর্বশেষে খালের জল। স্বীকার করতেই হবে, আর যাই হোক, ব্যাপারটি অভিনব হবে।

*

অথ সি-এম-পি-ও'র একদল বিশেষজ্ঞ। এঁরা বাড়ি তৈরির ব্যাপারে 'বিপ্লব' আনছেন। একতলা থেকে দশ ইঞ্চি দেয়াল দিয়ে পাঁচতলা বাড়ি তোলা যায়—বাস্তবে এঁরা তা প্রমাণ করবেন। ভি আই পি রোড পাড়ায় এমন বাড়ি গণ্ডায় গণ্ডায় উঠবে। এখন পাঁচতলা বাড়ির নিচের তলার দেয়াল সাধারণত বিশ ইঞ্চি চওড়া হয়। নতুন পদ্ধতিতে বাড়ি করলে খরচা চার আনার মত কমে যাবে।

ঐ একই পাড়ায় সি এম পি ও বাড়ি তৈরির মালমশলার কারখানা বসাচ্ছেন। বাড়ি তৈরি করতে সময় তো কম লাগবেই, পয়সাও অনেক কম লাগবে।

*

কলকাতায় এখন তরমুজের সিজন চলছে। গত বছরের মত অঢেল তরমুজ পাবেন না এবার।

পরনির্ভর কলকাতাকে তরমুজ খাওয়ায় উত্তরপ্রদেশের ফারাক্কাবাদ। গত বছর যেখানে দিনে বার ওয়াগন অবধি এসেছে, এবার সেখানে গড়ে তিন ওয়াগন আসছে। এক-একটা ওয়াগনে তরমুজের সংখ্যা, আকার অনুযায়ী, চোদ্দ থেকে ষোল। শ' হিসেবে বিক্রি হয়। কিন্তু দাম স্থির হয় একটার হিসেবে। একটা তরমুজের পাইকারি দাম এক থেকে তিন টাকা। কেটে কেটে যখন বিক্রি হয়, এক পিসের দাম কুড়ি-পঁচিশ পয়সা পড়ে।

চলছে লিচুও। বোশেখ থেকে বারুই-পুরের লিচু কোলেবাজার, নতুন বাজার, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট আর বৌবাজার হয়ে কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ছে। হালে আসছে জঙ্গীপুরের লিচু। মজঃফরপুরের লিচুর আশা কিন্তু করবেন না। সে-লিচু সোজা বোম্বাই আর দিল্লী চলে যাচ্ছে। কলকাতার কপালে মজঃফরপুরী লিচু আর জুটবে বলে মনে হয় না। গঙ্গা পার হয়ে আসতে হয় যে!

কলার সিজন শেষ হলেও, মাদ্রাজ আমাদের এখনও প্রতিদিন কলা খাওয়াচ্ছে। রাজাকাটরার একতলার অন্ধকার গুদাম-গুলোতে গেলে দেখতে পাবেন পুড়িয়ে কাঁচা কলাকে পাকানো হচ্ছে!

*

বৃষ্টিভরা শুক্রবার, রাত প্রায় এগারটা। ৩নং বাসে যাচ্ছি। শেয়ালদায় নামতে হবে, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। ঠুক ঠুক করে থামতে থামতে বাস যাচ্ছে। বৌবাজারের মোড়ে হঠাৎ দেখি কনডাকটর লাফিয়ে উঠলেন দাঁড়িয়ে-থাকা বাসটাতে। জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার? কনডাকটার বললেন, ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল, টিফিন করে এলাম। পরে ঢেকুর তুলে বললেন, একটা পান পেলে ভাল হত।

বাসটা চলছে না দেখে নেমে হন্টন মারলাম। কনডাকটার পান খেতে আবার নেমেছিলেন কিনা জানি না।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ২৯ ।।

মাস দুই পরে সুরোই একদিন গণেশকে বলে, 'ওরে যা ভাবছিস তা নয়। এ মেয়ে তোকে একহাটে বেচে আর এক হাটে কিনে আনতে পারে। এর আর সোমখ হ'তে কিছু বাকী নেই। ঘরে নিয়ে শুতে শুরু কর এবার, গল্পসল্প কর। ওরও ভয়টা ভাঙুক—তোরও আড়ষ্টতা কাটুক।...খুব কথা বলে, দেখবি ভাল লাগবে তোর।'

তবু গণেশ কাকুতি মিনতি করে। আর কটা দিন যাক অন্তত। একটা মাস, আচ্ছা না হয় আর পনেরোটা দিন দিনেন।

সুরোও বেশী পীড়াপীড়ি করে না। পনেরো দিন এমন বেশী সময় নয়, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ছেলের সুমতি হয়েছে শুনে—অন্তত একটা বাঁধা সময়ের মধ্যে এসেছে শুনে নিস্তারিণীও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ছেলে ঘরবাসী হলে—ঘরে মন বসেছে বুঝলে, সে তারকেশ্বরে গিয়ে দণ্ড খেটে আসবে।

কিন্তু সেই পনেরোটা দিনই আর কাটল না। মহাকালের ভ্রূকুটি লীলায় দিনরাতের বিপুল ঘূর্ণাবর্তে কোথায় তলিয়ে গেল খণ্ডকালের সেই টুকরোটা। ভাগ্যের চড়ায় আটকে গেল স্বল্প মেয়াদের নৌকোখানা—অনির্দিষ্টকাল নয়, চিরকালের মতো। দুর্গ্রহের ছুঁকে পুঁতে গেল তার আশা আকাঙ্ক্ষার হাল দাঁড়।

হঠাৎ একদিন সকালে বেড়াতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফিরল না গণেশ। সাধারণত আটটা সাড়ে আটটাতে ফিরে আসে, বড়জোড় নটা। সে জায়গায় সাড়ে দশটাও বেজে গেল যখন—তখন নিস্তারিণী সুরবালা দুজনেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ে কোন লাভ নেই, কোথায় যায় বেড়াতে কোন দিকে তা কেউ জানে না; এখানে তেমন বন্ধুবান্ধবও কেউ হয়নি বিশেষ—হয়ে থাকলেও তাদের ঠিকানা জানা নেই। সাগরেদ দুজনের ঠিকানা জানত, এমনিও তারা সকাল নটা নাগাদ এসে ঘুরে যায় একবার করে প্রত্যহই—তাদেরই এদিক ওদিক পাঠাল খুঁজতে—কেউ কোন খবর দিতে পারল না।

বিকেলের দিকে রজনী বিছানা সাফ করতে গিয়ে গণেশের বিছানার তোষকের নিচে থেকে একখানা চিঠি আবিষ্কার করল—বার্মার মৌলমেন শহর থেকে লেখা—লিখেছে হিমি। আঁকাবাঁকা বিশ্রী হাতের লেখা, অর্ধেক শব্দই বাদ পড়েছে, অথবা এমন ভুল যে সে সব বাক্যের মানে করা যায় না। তবু অনেক কষ্টে পাঠ উদ্ধার করল সুরবালা। হিমির শরীর খুব খারাপ, কাজ কর্ম কিছুই করতে পারছে না। গণেশ না গেলে আর কাজ-কর্ম তার দ্বারা হবেও না। সুতরাং সে অবস্থায় সকলের চোখে হেয় আর দয়ার পাত্রী হয়ে বেঁচে থেকে লাভ নেই। গণেশের মনস্কামনাই পূর্ণ হোক—এর পরেও যদি সে না যায় তো হিমি ধরে নেবে—গণেশ তার মৃত্যুই চায়। আর তাহলে ওকে সুখী করতেই অন্তত হিমি আত্মহত্যা করবে। মা কালীর দিব্যি। শ্যামসুন্দরের দিব্যি, তার মরা মায়ের দিব্যি—আর পনেরো দিন দেখে সে মরবে—মরবে-মরবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না তার মৃত্যু।

চিঠি বাড়িতে আসে নি, কিরণের ঠিকানা ঘুরেও না। এসেছে পোষ্ট-মাষ্টারের জিম্মায়। নিশ্চয় ডাকঘর থেকে গিয়ে নিয়ে এসেছে কেউ। কে আর—গণেশ নিজেই গিয়ে নিয়ে এসেছে নিশ্চয়। সম্ভবত এ বন্দোবস্তও তারই, সে-ই এ ঠিকানা দিয়েছিল, নইলে তারা জানবে কেমন করে?... কে জানে আরও কত চিঠি এভাবে এসেছে।

সুরো লোক পাঠিয়ে রাজাবাবুকে খবর দিল।

তিনি খানিক পরে জানালেন, সেই দিনই সকালে রেঙ্গুনের যে জাহাজ ছেড়েছে—উনি খোঁজ নিয়েছেন, জি চক্রবর্তী নামে একজন যাত্রী গেছে সে জাহাজে। জি চক্রবর্তী যে গণেশ চক্রবর্তী—তা অনায়াসেই ধরে নেওয়া যায়।

আরও খবর পাওয়া গেল। ওখান থেকে আদা টাকাটা, আর এই গত দু'তিন মাসে টুকটাক যা রোজগার হয়েছে—সাগরেদদের প্রাপ্য বাদে সবই পোষ্টাফিসে জমা রাখত গণেশ, সুরোই বুদ্ধিটা দিয়েছিল, আট দিন আগে সেখান থেকে থোক একটা মোটা টাকা তুলে নিয়েছে—সম্ভবত রাহাখরচা।...

সুরো ছোটবেলায় কোন বইতে যেন পড়েছিল—গণেশই চেয়ে-চিন্তে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে এক আধখানা বই নিয়ে আসত—পুরুভুজ বলে একরকম সামুদ্রিক জীবের কথা। চারুদা বলতেন অবশ্য পুরুভুজ নামটা ভুল, আসলে ও প্রাণীগুলোর আটটি পা, অক্টোপাস বলে সাহেবরা, অষ্টভুজ বলাই উচিত। তা সে যাই হোক—তাদের বাঁধনে একবার পড়লে নাকি মানুষ বা কোন জীব ছাড়া পায় না। তাদের লম্বা লম্বা হাতীর শুঁড়ের মতো পায়ে নাকি অসংখ্য ছ্যাঁদা আছে—সেই সবগুলোই তাদের মুখ বা রসনা। নাগপাশ যাকে বলা হয়েছে রামায়ণে খুব সম্ভব সেও ঐ অক্টোপাসই—কেননা এর পাগুলোও কতকটা মোটা সাপের মতোই—আর ঐ আটটা পায়ে এমনভাবে জড়ায় বজ্রবন্ধনে যে মানুষ আর নড়তে চড়তে পারে না। তখন ঐ অসংখ্য মুখ দিয়ে রক্ত চুষতে থাকে প্রাণীটা। দেখতে দেখতে নির্জীব হয়ে পড়ে মানুষ, আর এমনই বিষাক্ত তাদের স্পর্শ—শুধু যে তখন ছাড়া পায় না তাই নয়—ছাড়া পাওয়ার চেষ্টাও করে না। সে ইচ্ছাটাও চলে যায়, সেই বিষের সাংঘাতিক নেশায়।

হিমিও সেই অক্টোপাসের বাঁধনে বেঁধেছে গণেশকে। ছাড়া পাবার উপায় নেই, শুধু যে তাই নয়—ইচ্ছাও নেই আর। সর্বনাশের কাছে আত্মসমর্পণ করেই নিশ্চিন্ত হতে চায়, মৃত্যুর নেশাই কাম্য—বলে মনে করে। আর, মানুষ-অক্টোপাশ বলেই বোধহয় সে শুঁড় এতদূর পৌঁচেছে সকলের তালক্ষ্যে, অদৃশ্য অথচ অমোঘ টানে বেঁধে নিয়ে গেছে শিকারকে।

চেষ্টা অবশ্য যতদূর যা করা সম্ভব—সবই করল সুরবালা। হিমির সেই চিঠির ওপর নির্ভর করে মৌলমীনে টেলিগ্রাম পাঠাল—মা মরো-মরো। কিরণকে জানাল—তার যদি কোন ঠিকানা জানা থাকে—তার পাঠাতে মার অসুখের সংবাদ দিয়ে। রেঙ্গুনে কে রাজাবাবুর লোক আছেন—তাঁকেও লেখা হ'ল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। গণেশ পৌঁছবার আগে থেকেই নাকি সব ঠিক ছিল। দল সুমাত্রা রওনা হয়ে গেছে। সেখানে কোথায় আগে যাবে—তা কেউ জানে না।

নিস্তারিণী কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে উপবাস ক'রে ধন্না দিয়ে সত্যিই মরোমরো হয়ে উঠল। সবচেয়ে শেল হেনে গেল ছেলে ঐ বৌটা ঘরে এনে। বৌটা যে তারাই জোর ক'রে চাপিয়েছিল ছেলের ঘাড়ে সে কথাটা নিস্তারিণী একেবারেই ভুলে গেল। এ তার চিরকালের স্বভাব—সমস্ত দায়িত্বটা এখন অনুপস্থিত ছেলে এবং উপস্থিত মেয়ের ওপর চাপিয়ে চেঁচামেচি করতে লাগল। সুরোর পক্ষে সেটা মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

ছেলেমানুষ বৌটার মুখের দিকে যেন চাইতে পারে না লজ্জায়। মা-ই করেছে সব আগাগোড়া—বিয়ের প্রস্তাব থেকে পাত্রী নির্বাচন—তবু তারও দায়িত্ব একটা আছে বৈকি। সে যদি শক্ত হয়ে থাকত, বিয়ের বিপুল খরচ বহন করতে রাজী না হ'ত—তাহলে হয়ত মা এ বিয়ে দিতে পারত না। কিন্তু সে সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে। অন্য কারুর পক্ষেই হ'ত না—এ রকম ক্ষেত্রে। একটা বড় আশায় সে নিজে ছাই দিয়েছে—এখন যদি সে একমাত্র ছেলেকে দিয়ে সে আশা পোরাতে চায়—তাকে বাধা দেবে কী করে? বিশেষ টাকা দেব না—এ কথা উচ্চারণ করাও তার পক্ষে দুঃসহ স্পর্ধা প্রকাশ করা হ'ত। মা কঠিন আঘাত পেত। একবার তেমন আঘাতও দিয়েছে—কিন্তু তার মধ্যে সম্পূর্ণ সুরোর হাত ছিল না। সুরোর পক্ষে সামনাসামনি সে কথা বলা সম্ভব নয়, মা যে তার মুখাপেক্ষি, এন্তাজারি—সেটা আভাসমাত্রেও মাকে জানাতে পারবে না সে।

...

আরও মাস তিন-চার আশায় আশায় থেকে নিস্তারিণী বুঝল ছেলে আর সহজে ফিরবে না এখন। আর হয়তো কোন দিনই ফিরবে না। একদিন যে আশা করেছিল সেটাও কতকটা গায়ের জোরে—সে নিজেও জানত মনে মনে যে এ আশার কোন ভিত্তি কোথাও নেই। কিন্তু এখন সেটুকু আত্মপ্রবঞ্চনারও কোন কারণ রইল না। সে সুরোকে বলল, 'বৌটাকে ওর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দে সুরো। মিছিমিছি অস্টপ্রহর চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে—বুকের মধ্যে তুষের আগুন জ্বালিয়ে রাখা। কী দরকারই বা। ওকে দিয়ে আমার সাধ-আহ্লাদ মিটবে না—আমার সাধআহ্লাদ মেটবার নয় তা ওই বা কি করবে, যেমন অদেষ্ট করে এসেছিলুম, তেমনি হবে তো। গেল জন্মে কার বাড়া-ভাতে ছাই দিয়ে এসেছি—এ জন্ম-ভোর তার প্রাচিত্তির হচ্ছে।...সে যাকগে—ওকে আর জড়িয়ে রেখে লাভ কি। বরং চার-পাঁচ ক'রে টাকা মাসে মাসে ফেলে দিস, তাদের যা হাল, মেয়েকে বসিয়ে খাওয়াবার অবস্থা তাদের নয়।'

সুরো এবার কঠিন হ'ল। বলল, 'কথ্খনো না। আমরা দাম দিয়ে কিনে এনেছি বলতে গেলে, আমাদের কাজে লাগল না ঠিকই—তাই বলে আবার তাদের ঘাড়ে ফেলে দোব? তাছাড়া, ওখানকার সঙ্গটা ভাল নয়, তা আমি বোয়ের সঙ্গে কথা কয়েই বুঝেছি। এই উঠতি বয়েস এখন—ওখানে থাকলে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'হ'লেই বা, আমাদের ক্ষেতিটা কি আর!' নিস্তারিণী মুখটা বিকৃত ক'রে বলে, 'আমাদের যখন ভোগে লাগল না—তখন ভাল রইল কি না রইল—সে মাথাব্যথা কি এত আমার। ও মেয়ে নিয়েই বা কি করব আমরা শুধু শুধু। ওর অদেষ্ট ভাল নয় সে তো দেখতেই পাচ্ছি। নইলে অমন আগুনের খাপরা বৌ বর ঘরে নেয় না—ভূ-ভারতে এমন কখনও শুনেছিস কোথাও?"

'আজ নেয় নি বলে জীবনে কোন দিন নেবে না—তা তো এরই মধ্যে ঠিক হয়ে যায় নি। এই তো তোমরা খোকাকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছিলে। এল তো—যে করেই হোক, যে কারণেই হোক। এলও, রইলও তো প্রায় বছর খানেক। আবার যে আসবে না—তাই বা কে বলতে পারে? সে মেয়েমানুষটাও কিছু অমর নয়—খোকারও যা শরীরের অবস্থা, ডাইনীটা যা হাল করে এনেছে, আরও করবে— কদ্দিন আর কাজ করতে পারবে। তার পর? অক্ষম হয়ে পড়লে তো এখানেই আসতে হবে, এলাতলা-বেলতলা, সেই বুড়ির ছাঁচতলা।...তখন কে ওকে দেখবে, কে-ই বা তোয়াজ করবে? তখন ঠিক বিয়ে করা বোয়ের কথা মনে পড়বে। না, থাক এখানেই। রাজাবাবু বলছিলেন একটা বুড়োসুড়ো মাস্টার রেখে ওকে লেখাপড়া শেখাতে। কথাটা মনে লেগেছে আমার। এখন মেয়েদের লেখা-পড়ার খুব চল হয়েছে, চাই কি একটু চলনসই গোছের শিখলে ও অন্য মেয়েদের পড়িয়ে খেতে পারবে—নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে।...এই বয়স থেকে—সারাটা জীবনই তো এখনও পড়ে—কেন লোকের হাত-তোলায় ভিক্ষের চালে জীবন কাটাবে?'

কথাটা নিস্তারিণীর মনেও লাগে। ছেলের ফিরে আসার কথাটা। আশা কখনই মরে না মানুষের মনে — জৈওজষষ্ঠীর মুলের মতোই নিত্য সঞ্জীবিত থাকে মনের তলায়—একটুখানি সম্ভাবনার জল পেলেই তা অঙ্কুরিত হয় আবার। নিস্তারিণীরও হল। তবে সে-কথা সে বলল না, উদাসীনভাবে শুধু বলল, 'দ্যাখো, যা ভাল বোঝো করো তোমরা। আমি আর ভাবতেও পারি না। সে ছোঁড়া আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়ে গেছে চিরকালের মতো।...ঠাকুরের দোরে মাথা খুঁড়ে ছেলে-মেয়ে পাওয়া আমার—তা দুই থেকেই খুব সুখ হল। এখন মানে মানে নিয়ে নেন আমাকে—তাহলেই বাঁচি। ঘরকন্নার সুখ-ঐশ্বর্য্য থেকে রেহাই পাই।'

কিন্তু চলনসই গোছের লেখাপড়াটাও রজনী শিখতে পারল না। শেখার চেস্টাই করল না। এক বছর ধরে মাসিক চার টাকা হিসেবে মাস্টারের মাইনে গোনাই সার হল, ওকে দ্বিতীয় ভাগখানাও শেষ করানো গেল না। এধারে এ বি সি শেখাতেই প্রাণান্ত হয়ে গেল। শিখল যা—সেটা শেখানোতেই ঘোরতর আপত্তি ছিল সুরবালার—আরও কিছু পাকা পাকা কথা। অবাঞ্ছিত জ্ঞানে খুনো হয়ে উঠল।

সুরবালার পাশের ভাড়াটে বাড়িতে যাওয়া-আসার জন্যে মধ্যে একটা দরজা ছিল—কিন্তু সে দরজাটা চাবি বন্ধ থাকত বারোমাসই। কদাচিত কখনও দরকার পড়তে পারে এই ভেবেই দরজা করা। কোনদিনই সে পথে কেউ যেত না। সুরবালা ওদের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করত না। মধ্যে মধ্যে তারা আসত কেউ কেউ, নিস্তারিণীকে 'বামুন মা' বলত, মেঝের বসে তার সঙ্গে গল্প করে যেত, তার কাছেই আসত আসলে—কিন্তু তারা আসত রাস্তা দিয়ে ঘুরে। সেই অবসরেই রজনীর সঙ্গেও তাদের আলাপ হয়েছে, তবে সে আলাপে তার মন ওঠে নি। শাশুড়ির সামনে মন খুলে কথা বলা যায় না—জীবন সম্বন্ধে সবোচ্ছিত জীবনের কৌতূহল মেটানো যায় না।

রজনীর আর যাই হোক দুস্টবুদ্ধির অভাব ছিল না। সেই খুঁজে খুঁজে মাঝের দোরের চাবিটা আবিষ্কার করেছে। দুপুরে যখন সবাই ঘুমোয়—ঝি-চাকর পর্যন্ত—তখন নিঃশব্দে মাঝের দরজা খুলে চলে যায় ও বাড়ি, এর ঘরে, ওর ঘরে বসে গল্প করে—আবার কলে জল আসার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ি চলে আসে। কলে জল পড়ার

আওয়াজ পেলেই ঝি উঠে পড়ে, তারপরই একে-একে সব উঠতে শুরু করে— নিস্তারিণী গিরিধারী সবাই। সুরো আগেই ওঠে—কিন্তু ঘরের বাইরে আসে না। আজকাল তার জন্যে রাজাবাবু বাংলা বই কিনে আনেন কিছু কিছু, সাপ্তাহিক খবরের কাগজও নেন একটা করে—তাই পড়ে শুয়ে শুয়ে।

এইভাবে কতদিন চালিয়ে গেছে রজনী, তা কেউ জানে না। ভাড়াটে মেয়েরা কেউ বলে নি। রজনীই নিষেধ করেছিল, সবাইকে কাকুতি-মিনতি করে বলেছিল ঠাকুরঝিকে না কেউ বলে দেয়।

'তাহলে আর আস্ত রাখবে না, যা মেজাজ! পয়সার দেমাকে ধরাকে সরা দেখে। হেই দিদি, তোমার হাতে ধরছি, বলো নি।'

তারা আরও বলে নি তার কারণ এর মধ্যে তাদেরও একটা সূক্ষ্ম বিজয়গর্ব ছিল। সুরবালা যে তাদের সঙ্গে 'অকারণেই' একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলত—এটা তাদের পছন্দ হবার কথা নয়। এটা নিতান্তই ওর অহঙ্কার — রূপ ও সৌভাগ্যের দেমাক বলে মনে করত ওরা। সেই সুরবালার আত্মীয় তার চোখে ধুলো দিয়ে ওদের ঘরে বসে গল্প করে, এটা-ওটা খায়, লুকিয়ে পরোটা মাছ চচ্চড়িও খাইয়ে দেয় ওরা, নেহাৎ 'মান্য'র ভয়েই ভাতটা খাওয়াতে সাহস করে না—এতেই যেন অনেকটা প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে যায় ওদের।

অবশ্য সে প্রতিশোধ যে তাদের ওপরই একদিন ফিরে যাবে তা কেউ ভাবে নি। দুপুরে রজনী যখন ও বাড়ি যেত তখন ওদের বাবুরা কেউই থাকত না—এক চন্ননের বাবু ছাড়া। সে কী সব দালালি-টালালী করত—সন্ধ্যের সময়ই তার বেশী কাজ, গভীর রাত হয়ে যায় প্রায়ই কাজ চোকাতে— দুপুরবেলা তাই ফাঁক পেলে এখানে কাটিয়ে যেত একটু। রাত্রে এদের যেদিন থিয়েটার থাকে সেদিন ফিরতে অনেক রাত হয়— বাবুরাও সেই মতো আসে—তাদের সঙ্গে দেখা হয় কদাচিত, বেশির ভাগকে তো চোখেও দেখে নি কখনও। সুতরাং পুরুষ বলতে বাবু বলতে ঐ চন্ননের ঘরের শ্রীশবাবুকেই দেখত রজনী। শ্রীশবাবুও দেখত তাকে, কাছে বসিয়ে গল্প করত — মজার মজার গল্প শোনাত।

রজনী তখন বারো পূর্ণ হয়ে তেরোয় পা দিয়েছে। কিন্তু এমনিতেই তার একটু বাড়নশা গড়ন বরাবর—এখানে ভাল খাওয়া-দাওয়া তোয়াজে আরও তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছিল। যা বয়স—তার থেকে অনেক বড় দেখাত। তেরো বছরের মেয়েকে পনেরো-ষোল মনে হত।

শ্রীশবাবুরও হয়ত তাই মনে হয়েছিল। চোখে ধরেছিল ওর নবীন যৌবন।

ফলে একদা রজনীকে নিয়ে সে পালিয়ে গেল। চন্ননের বাইশ-তেইশ বছর বয়স তখন। দেখতেও রজনী ঢের ভাল তার চেয়ে। শ্রীশবাবুর অবশ্য বয়স হয়েছে— চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু রজনীর তখন অত বাছবিচারের অবস্থা নয়। শ্রীশবাবুই তার সামনে তখন একমাত্র পুরুষ, সম্ভাব্য অবলম্বন।

চন্নন টের পেয়ে বাড়ি মাথায় করল। ছড়া কেটে গালাগাল দিল রজনীকে, তার চৌদ্দ পুরুষকে—ইঙ্গিতে তার শাশুড়ি ননদকেও। ভাল হবে না কারুর, ভাল হবে না, ভালর মাথা খেয়ে বসে থাকবে সব— যারা তার এমন সব্বনাশ করলে, ভালবাসার মানুষকে ক্যাঁলিয়ে কলিয়ে নিয়ে গেল।

নিস্তারিণী বলল, 'সেকালেই বলেছিলুম বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দে—ঝঞ্ঝাট চুকে যাক। তখন আমার কথা শুনলে আর আমাদের ওপর এই দায়টা বর্তাত না।...... দুর্নামের ভাগী হওয়া শুধু শুধু।...... তা নয়, উনি গেলেন তাকে লেখাপড়া শেখাতে—লেখাপড়া শিখে জজ ব্যালেস্টার হয়ে ছাসা-ছালা টাকা রোজগার করবে! শিখছে লেখাপড়া! সেই বান্দাই বটে। যার বরাত মন্দ হয় তার বুদ্ধিও মন্দ হতে বাধ্য যে! বলে আকরে টানে। ছোটলোকের ঘরের মেয়ে, যেমন শিক্ষাদীক্ষা তেমনি তো হবে!'

সুরবালার মুখেই শুধু কথা সরে না। স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে সে।

ঐটুকু মেয়ে তাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে নিত্য ও বাড়িতে যেত—তারা কেউ টের পাওয়া তো দূরের কথা, সন্দেহ পর্যন্ত করে নি। আশ্চর্য!...এই বুদ্ধিটা যদি সৎপথে যেত! মেয়েটার জন্যে দুঃখই বোধ হতে লাগল তার। এধারে যতই যা পাকা হোক, বয়সে তো একেবারেই ছেলেমানুষ, সংসারের কিছুই জানে না, কিছুই শেখে নি। ঐটুকু এক ফোঁটা কচি মেয়ে— কোথায় কার পাল্লায় পড়ল, আরও কী নরকে নামবে তা কে জানে! কী আছে ওর অদৃষ্টে!......

শ্রীশ লোকটাও ভাল নয়। ওকে দেখেছে সুরো। ছোট জাত—কিন্তু সে জন্যে নয়, মায়ের মতো অত 'বামনাই'-এর অহঙ্কার নেই সুরবালা—একেবারেই লেখাপড়া জানে না, ধূর্ত, অর্থপিশাচ, লোভী ধরনের লোক। মেয়েটাকে না বেচে দেয় শেষ পর্যন্ত কারও কাছে!

নিজেদের অপরাধী মনে হয় বৈকি! তারা যদি গণেশের বিয়ে দেবার জন্যে অত তাড়াহুড়ো না করত, আর একটু দেখত তার মনের গতি—তাহলে হয়ত অনর্থক একটা মেয়ের জীবন এমনভাবে 'ছিতিচ্ছান' হয়ে যেত না।

অবশ্য সবই ঐ মেয়েটার অদৃষ্ট। তবু মন মানে কৈ!......

অসহ একটা জ্বালা অনুভব করে সে মনে মনে।

হয়ত অহঙ্কারে ঘা পড়ারই জ্বালা এটা। বিশেষত বুদ্ধির অহঙ্কারে ঘা পড়লে মানুষ কিছুতেই স্থির হয়ে মেনে নিতে পারে না। ছিটকিটিয়ে বেড়ায় সেই জ্বালাটা অপর আরো দেহে সঞ্চারিত করে দিতে না পারা পর্যন্ত।

সেই কারণেই এই দুঃখের মধ্যে এই লজ্জার মধ্যে একটা আনন্দও অনুভব করে। প্রতিহিংসার আনন্দ।

বেশ হয়েছে চন্ননের বাবু পালিয়েছে। ওদের স্পর্ধার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।... এখন নাকে কাঁদতে এসেছে, এখন চেঁচিয়ে সাত পাড়া এক করছে। তখন একটু জানাতে কি হয়েছিল? ওদের অজ্ঞাতসারে লুকিয়ে যখন দিনের-পর-দিন মেয়েটা ওদের ঘরে যেত। তখন একবার মুখ ফুটে বলতে পারে নি কেউ! তখন খুব মজা মনে লেগেছিল, ভেবেছিল 'বাড়ীউলি'কে কেমন ফাঁকি দিচ্ছি। অপরকে ফাঁকি দিতে গেলে নিজেদেরও ফাঁকে পড়তে হয় বৈকি—মধ্যে মধ্যে।

এর অনেকদিন—বহু বছর পরে আবার রজনীর সঙ্গে দেখা হয়েছে সুরবালার— একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে দুজনার জীবনে, এসেছে অনেক বিপর্যয়। বিস্তর পরিবর্তন বা ভাগ্যবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কেটেছে ওদের এই দীর্ঘকাল। সুরবালার তো বিশেষ করে—তার জীবনের ধারাই গেছে পাল্টে—গতি বলো, লক্ষ্য বলো সমস্তই। বলতে গেলে জন্মান্তর ঘটেছে তার তখন।

জন্মান্তর ঘটেছে রজনীরও।

কী একটা যোগে কাশীতে স্নান করতে এসেছিল সুরবালা। বৃন্দাবন থেকেই এসেছিল। বোধহয় অর্ধোদয় যোগ সেটা। গ্রহনশ্চ কাশী—এটা একটা প্রবচনে দাঁড়িয়ে গেছে—সবাই বলে, অন্তত একবারও গ্রহণে কাশীতে স্নান করতে হয়, অবশ্য করণীয় পুণ্যস্নানের মধ্যেও প্রধান যোগ একটা। তাই কাশীতে এসেছিল গ্রহণের স্নান করতে। সেই সময়েই দেখা।

রজনী তখন বহু হাত ঘুরে, বহু ঘাটের জল খেয়ে ভাগ্যের স্রোতে ভাসতে ভাসতে কাশীতে এসে ঠেকেছে। ওখানকার এক বাঙালী জমিদার কালীবাবুর নজরে পড়েছে। পুরনো বনেদী জমিদার, দোল-দুর্গোৎসব হয় তাঁদের বাড়ি—সোনার বিগ্রহ-প্রতিমা বাড়িতে। চালচলন পুরনো রাজা বা নবাবদের মতোই।

সেইভাবেই রেখেছেন তিনি রক্ষিতাকে। আলাদা বাড়ি ভাড়া করে অকারণেই কিন্তর দাসী-চাকর দিয়ে রাণীর মর্যাদাতেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তখন অবশ্য রজনীর সে রূপ আর নেই, নানা অত্যাচারে অভাবে অনটনে—সে সব বিবরণই শুনল সুরবালা—রঙও পুড়ে গেছে অনেকখানি। তবু এখনও বেশ চোখ টানে—কিছুটা চটক আছে এখনও। সাজ-সজ্জা করলে তো কথাই নেই, রীতিমত রূপসী মনে হয়।

ঘাটেই দেখা স্নান করার সময়। দুজনেরই দুজনকে চিনতে দেরি লেগে-ছিল। সুরোর অবশ্য চিনতে পারার কথাও নয়, যে ঠিক চিনতে পারেও নি, কোথায় যেন আবছা কার সঙ্গে একটা আদল আছে—সেইটেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল মনে মনে, স্মৃতির অরণ্যে হাতড়ে ফিরছিল। কিন্তু সুরোর চেহারায় খুব একটা পরিবর্তন হয় নি, শুধু দীর্ঘকালের ব্যবধানে ভুলে গিয়ে-ছিল রজনী, সেই প্রথম চিনল, 'ঠাকুরঝি না!...ওমা, এ কি বেশ!'
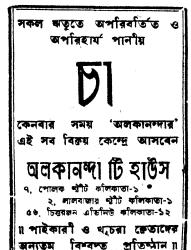
বলতে বলতেই প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল সে।

তখন সুরোও চিনতে পারল। তাড়া-তাড়ি ওর চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেল, 'ওমা, রোজে! আমি চিনতে পারি নি ভাই, সত্যিই। আর চেনার কথাও তো নয়—কত-কাল হয়ে গেল, কত বছর, মনে হয় কত যুগের কথা সে সব।'

'তা এ বেশ—হ্যাঁ দিদি? রাজাবাবু—?'

'তিনি তো অনেকদিনই তাঁর গোবিন্দের কাছে চলে গেছেন! সেও বহু কাল হয়ে গেল।'

তা এর পর কোথায় আছে সুরবালা, কী করছে ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত আলাপও হয়েছে, সেই ভীড়ের মধ্যেই। এটা শুধু মেয়েরাই পারে। আশ-পাশের অসহিষ্ণু ঠেলাঠেলি উপেক্ষা করেও মিনিট পাঁচ-সাত কথা কয়ে নিল ওরা, ওর মধ্যেই।

ঘাট থেকে উঠে ফেরার পথে রজনী জোর করে ধরে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে। আগে হলে সুরবালা কিছুতেই রাজী হত না হয়ত—কিন্তু তখন সেও অনেকখানি বদলে গেছে। এদের জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল থাকাটা তার পক্ষে তাদের পক্ষে অশোভন—এমন একটা অদ্ভুত শুচিবায়ু আর নেই।

দেখল সে রজনীর ঘরকন্না। ভাল করেই দেখল। এমন জোর করে—প্রায় হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে এল কেন—তাও বুঝল। এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম নয়,—বেশ স্পষ্ট বিজয়গর্ব ওর। রাজরাণীর মতোই আছে রজনী—সত্যিসত্যিই। দশাশ্বমেধের বাস্তার ওপর মাঝারি বাড়ি, দুটো ঝি, একটা চাকর একটা রসুইয়ে বামুন, একজন দারোয়ান। এ ছাড়া বাবুর একখানা পালকি হামেহাল হাজির থাকে ওর বাড়ির সামনে—তার চারজন বাহককেও খেতে দিতে হয়। ফলে প্রতিদিনই যজ্ঞির রান্না রজনীর সংসারে। আর সে রান্না-খাওয়াও খুব সাধারণ মাপের নয়, বেশ রাজকীয় ধরনেরই। দেওয়া-থোওয়ার হাতও খুব—গঙ্গার ঘটেও দেখে এল একটু আগে—ভিক্ষা দেওয়ার পরিমাণ, একটা ঝি ঝুলি করে চালেতে পয়সাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছিল, মুঠো মুঠো করে দিয়েছে সবাইকে। এইটুকু পথ হেঁটেই এসেছে— কিন্তু মর্যাদা হিসেবে পালকিটা ছিল পিছনে পিছনে; নেমে একটা গোটা টাকা ফেলে দিল ওদের—জলখাবার খেতে। হয়ত আরও সুরবালাকে দেখিয়েই দিল, কিন্তু তার মনে হল পরিমাণ বেশী-কম হলেও—এরকম পেতে অভ্যস্ত ওরা, নইলে সামান্য একটু বিস্ময়ও প্রকাশ পেত মুখে-চোখে।

সুরবালার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি — এতদিনে বহু অভিজ্ঞতাও হয়েছে ওর—সে খানিকটা দেখেই বুঝে নিল, বহুদিনের দারিদ্র্যের পর পয়সার মুখ দেখেছে মেয়েটা—দু হাতে টাকা-পয়সা সব উড়িয়ে দিচ্ছে। মেয়ে কাপ্তেন যাকে বলে—তাই হয়ে উঠেছে।

সুরো এক ফাঁকে প্রশ্ন করে নিল, 'এ বাড়িটা তোর—নিজস্ব?'

এক মুহূর্তের জন্য মুখখানা লাল হয়ে উঠল রজনীর, একটু অপ্রতিভের মতোই বলল, 'না—ঠিক, মানে এটা ও'র নীজের বাড়ি।'

একটু চুপ করে থেকে সুরো বলল, 'গয়না কি কি করেছিস দেখি।'

আরও একবার বিব্রত বোধ করল রজনী।

'গয়না আর কি? এই যা পরে আছি। খুব একটা নেই—হাতি-ঘোড়া কিছু। আমি চাই না কোনদিনই মুখ ফুটে—উনি যা দেন স্বইচ্ছায়—খেয়াল-খুশি মতো।'

বহুদিনের একটা গোপন অপরাধবোধ এখনও কাটে নি সুরোর। তাই সে সব দেখে-শুনে অযাচিতভাবেই উপদেশ দিয়ে-ছিল। 'এমন করে সব উড়িয়ে দিস নি রোজে। ভবিষ্যতের সংস্থান কর আগে। কালীবাবুরও তো বয়স কম নয়—রাজা-বাবুর সঙ্গে আমার যা তফাৎ ছিল—এ তো তার চেয়েও বেশী দেখছি, উনি চোখ বুজলে আবার কি পথে বসবি শেষে? এই বেলা অন্তত একটা বাড়ি কোথাও করিয়ে নে ওঁকে বলে, আর কিছু কোম্পানীর কাগজ। আমাকে তিনি না চাইতেই ঢের দিয়েছিলেন—তবু এখন মনে হয় যা নষ্ট করেছি তা যদি থাকত আমার কিশোরীমোহনের সেবায় লাগত, মনের মত করে সেবা করতে পারতুম। তুই আর সে ভুল করিস নি—আখেরের ব্যবস্থাটা করে নে আগে।'

এতখানি জিভ কেটে উত্তর দিয়েছিল রোজে, 'বাপরে, তাই কি মুখ ফুটে বলতে পারি আমি! ভাববে মরণ টাকছে আমার।... তবে, মুখে তো বারবারই বলে, তোমাকে আমি বিয়ে-করা পরিবার বলেই জানি, পরিবারের মতোই দেখি। তোমাকে যাতে জীবনে কোন অভাব পেতে না হয়—সে ব্যবস্থা আমি করে দোব।'

'দোব তো বলে—দিয়েছে কি? উইল-টুইল করেছে কিছু?'

'দেবে কি দেবে না—সে ও বুঝবে আর ওর ধম্ম বুঝবে। আমি ওকে বলতে যাব না কোনদিনই। যে অতবড় কথাটা বলতে পারে—আর দেখছই তো কি রাজার হালে রেখেছে—তার কাছে দেনা-পাওনার কথা তুলব? না ঠাকুরঝি, সে আমি পারব না।...তবে মানুষ তেমন অবিবেচক কি অধম্মে নয়—এ আমি বেশ বুঝে নিয়েছি।...

আর কিছু বলে নি সুরো, একটু হেসেছিল শুধু মনে মনে। বিষাদের হাসি। বাইরে এসে সঙ্গীকে বলেছিল, 'মা ঠিকই বলত, অদৃষ্ট মন্দ হলে বুদ্ধিও মন্দ হয়। এখন ওকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা। বুঝবে একদিন নিজেই—।'

বুঝেওছিল রোজে। কিন্তু বড় দেরিতে—তখন আর প্রতিকারের পথ ছিল না।

বুঝিয়ে দিয়েছিল সুরোও। প্রায় এক বস্ত্রে, দু আনা মাত্র পয়সা সম্বল করে

যেদিন রজনী এসে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল সেদিন — শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দিলেও কথা শোনাতে ছাড়ে নি সে। এটা তার বয়সের সঙ্গে দেখা দিয়েছিল—বেশী বয়সেরই দোষ এটা। আগে এসব অনায়াসে ক্ষমা করতে পারত, অথবা অপর পক্ষের লজ্জা, অপমান কি সঙ্কোচের কথা ভেবে অন্তত চুপ করে থাকত—এখন আর পারে না। মনের সে প্রশান্তি, সহিষ্ণুতা বা শোভনতাবোধ বিবেচনা অনেক কমে গেছে। বহু-ব্যবহারে পাথরের সিঁড়ির মসৃণতা নষ্ট হয়ে যেমন রুক্ষ ও বন্ধুর হয়ে ওঠে, তেমনিই হয়ে উঠেছে তার মনের ওপরের আস্তরণ বা পালিশটাও। দু কথা শুনিয়ে দেবার সুযোগ পেলে ছাড়তে পারে না। পরিষ্কার বলেছিল সে, 'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। খুব খুশী হয়েছি শুনে। যেমন আকাট বোকা তুই—তোর উপযুক্তই হয়েছে। সেই ছেলেবেলা থেকে এক রকম গেল তোর, কখনও নিজের ভাল বুঝতে শিখলি নি।... এত ঘা খেলি—তবু তোর চৈতন্য হল না। আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাতা, উনি গেছেন স্বর্গে উঠতে।...বাজারের মেয়েমানুষ—সে লোকটা মুখে একটু মিষ্টি করে বললে বলেই উনি নিজেকে তার পরিবার মনে করলেন!...সত্যিকারের পরিবার যে সে দেখ গিয়ে গয়না আর কোম্পানীর কাগজের বাণ্ডিলের ওপর বসে আছে, ছেলেরা বৌরা সব হাতজোড় করে তটস্থ!...বললুম আখেরের কথা ভাব, দিন কিনে নে এই বেলা। তা নয়! দু-তিন হাজার টাকা হলে কাশীতে একখানা বাড়ি হয়—তাও তুই একটা বাগাতে পারলি না! হাত্তোর বোকার ঝাড় রে!'

হয়ত সেদিন রেজেও কিছু জবাব দিতে পারত। সে জবাব যে তার ঠোঁটের ডগায় আসে নি—তাও মনে হয় না। নিশ্চয় তার ঐ কথাটাই বলতে ইচ্ছে হয়েছিল যে, এমন অনেকেরই পরিবার সাজার শখ হয়, রজনী নতুন নয় এ পথে। এঁটোপাতার স্বর্গে যাবার শখ চিরকালই থাকে—নইলে কথাটার সৃষ্টি হত না। কল্পনার প্রসাদে বসে নিজেকে রাজরাণী ভাবে—চিরকাল সব ঘুঁটেকুড়ুনিই, একদিন না একদিন। যে অহঙ্কারে সেদিন সুরবালা তার ভাড়াটে-দের সঙ্গে মিশত না—সেটাও ঐ ভ্রান্ত মর্যাদাবোধেরই ফল।

আরও বলতে পারত যে, ওর এই অবস্থার জন্যে প্রধানত সুরবালা—সুরবালারাই দায়ী। গরীব হলেও গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে সে—হয়ত অন্য কোথাও অন্য কোন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হলে জীবন তার স্বাভাবিক খাতেই বইত—সুখে না হোক শান্তিতে স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ঘর করতে পারত। আজ যে এই রকম জোয়ারের মুখে ময়লার মতো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, সে জন্যে পরোক্ষে সুরবালাই দায়ী। জেনে-শুনে গণেশের বিয়ে দেওয়াই উচিত হয় নি ওদের।

কিন্তু এসব কিছুই বলতে পারে নি রজনী, কৃপাপ্রার্থিনী, আশ্রয়প্রার্থিনী সে। মনের ক্ষোভ মনে চেপে মাথা হেঁট করে নীরবই থাকতে হয়েছে তাকে।

সুরো সেদিন আরও বলেছিল, 'এসে পড়েছ, থাকো। তাড়িয়ে দিচ্ছি না। তবে বেশীদিন টানতে আমি পারব না। আমার নিজের বলতে আর কিছুই নেই, যা কিছু দেখছ — সব কিশোরীমোহনের। টাকা সরকারের হাতে, ছ মাস অন্তর সুদ আসে। যা আসে তাতে কোনমতে ওঁর সেবাটুকুই চলে। বাহুল্যতা কি নবাবী চলে না। আত্মকুটুম নিয়ে জাঁকিয়ে সংসার করা তো নয়ই। তাই—ওঁর সেবাই আটকে যায় মধ্যে মধ্যে। তোমাকে অন্য ব্যবস্থা দেখতেই হবে। তবে হ্যাঁ—আজ কি এখুনি নয়। যা মড়ার দশা হয়ে এসেছ—এ ছিরির চেহারা কারও সামনে বার করা যাবে না। দিন কতক বসে পেসাদ পাও, বেশী করে চেপে খাও, বেশী করে ঘুমোও—গতরে মাস লাগুক—তারপর ওসব ভাবনা ভাবা যাবে।...অবিশ্যি একলা নয়—আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা করব, যতটুকু যা জানি এখেনকার হালচাল—শিখিয়ে দেব। আমার গতরে আর জ্ঞানে যেটুকু হয়—সেটুকু আমি করব। তারপর তোমার কপাল!'

এই সব নিষ্করুণ কথাই সেদিন সহ্য করতে হয়েছিল রজনীকে। চোখে জল হয়ত আসে নি—চোখের জল বোধহয় আর অবশিষ্টও ছিল না কিছু, কিন্তু মনে তখনও ঘা-লাগার অনুভূতিটা ছিল। তাই তারপর সুরবালা বহু উপকার করলেও, সে কৃতজ্ঞ বোধ করতে পারে নি।

[শেষ সেবার দেখা হয় সুরোদির সঙ্গে সেবার শুধু রজনী নয়, তার ভাই গণেশের খবরও পেয়েছিলাম। সে দেশে ফিরেছে। ফিরেছে বাইরের পাট চুকিয়েই। এখানেও এসেছিল খুঁজে খুঁজে—দিদির সঙ্গে দেখাও করে গেছে। সেও একটা ঠাকুরবাড়ি করেছে—শ্যামনগরে না বরানগরে—কী যেন বলেছিল সুরোদি জায়গার নামটা—হিমিকে নিয়েই থাকে সেখানে। স্বামী-স্ত্রীর মতই থাকে দুজনে, ঠাকুরের সেবা করে।

সুরোদি দুঃখ করে বলেছিলেন, 'খোকাকে আমি দোষ দিই না। ও-ই ওর আসল বৌ। ভালবাসার কোন বাছবিচার নেই। নিজেকে দিয়ে তো বুঝি।..... দুঃখ হয় ছুঁড়িটার জন্যেই। ছুঁড়িটারই কপাল মন্দ। কপাল মন্দ হলে মন্দ বুদ্ধিও হয়—আমার মা বলতেন, আমিও দেখেছি অনেক। জীবনভোরই দেখছি। দুটো দিন যদি সহ্য করে ধৈর্য ধরে থাকত—কাদায় গুণ ফেলে—তাহলে হয়ত আজ ও-ই ওখানে গিন্নি হয়ে বসতে পারত। পথ-চেয়ে পড়ে আছে জানলে খোকারও বিবেকে একটা ঘা লাগত হয়ত—শেষ পর্যন্ত। মনটা ফিরত। চিঠি লিখে খবরও নিয়েছিল একবার বছর দুই পরে—কিছু টাকা পাঠাতে চেয়েছিল—পালিয়ে গেছে শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।... বয়সের ঢের ফারাক মানি, তা এ-ই বা কি করছে বল,—সেই তো তিনকালগত বুড়োদেরই মন যোগাতে হল চিরকাল।... গোবিন্দ বলো।...তাঁর ইচ্ছে, ওরই বা কি দোষ দোব, তিনি যে কাকে দিয়ে কি করাবেন—তা তিনিই জানেন।']

(ক্রমশঃ)

পঞ্চামৃত ॥ কালীকিংকর সেনগুপ্ত

১ লেখনী ও মস্যাধার

মসী-কূপ লেখনীরে ডাকি দেয় গালি
'রে নির্লাজ! তোর মুখে মাখামাখি কালি!'
লেখনী হাসিয়া বলে 'করি নমস্কার!
তোমার অন্তরে কালি, অধরে আমার।'

২ আইন

আইনেরে 'ভালো' বলে 'আছে'-দের পাড়াতে
যাহারা সকলি পায় খালি হাত বাড়াতে
আইনের বদনাম 'না-আছে'র কুটিরে
চালে যার খড় নাই ঘরে নাই রুটি রে।

৩ ন্যায় ও শক্তি

'ন্যায্য-অধিকার' মিছে, তার পিছে না রহিলে 'বল'
'শক্তি' সুবিচার বিনা অত্যাচারে হয় সে বিকল,—
অবলার অশ্রু বল, দুর্বলের অনুনয় সার
ন্যায়বান বীর্যবান অর্জে নিজ ন্যায্য অধিকার।

৪ উপমা

উজল চোখে কাজল দিলে কবির মনে হয় প্রতীতি
যেমন কালো ভৃঙ্গ দলে পদ্ম দলে জানায় প্রীতি।।

৫ নারীর অস্ত্র

রমণীর চোখে দুটী মহা শর,
একঘ্নী নহে,—অনেকে মরে।
কভু 'অনুরাগে' আঁখি ভর-ভর
কভু 'অভিমানে' দু-আঁখি ঝরে!

গোপন কাঁটা ॥ হেনা হালদার

কোথায় যেন বিঁধতে থাকে গোপন কাঁটার মুখ
নড়তে-চড়তে যন্ত্রণাকে ছড়িয়ে দেয় রক্তে।
নিবিড় নীল জলোচ্ছ্বাসে পাহাড় ফুঁড়ে ওঠে
নর্মদার অঙ্গে অমর কণ্টকের মতন।

স্মৃতি তুমি জোয়ারী দিনে অনেক কুঁড়ি ফোটাও...
ভাটার দিনে পাশ কাটিয়ে ভয়ে-ভয়ে ঝরো,
ভাবের মালা ছিন্ন করে ভবিষ্যতের পথ
কাটতে চাও? বাসি বকুল তাই কি আবর্জনা?

নিমাই ভট্টাচার্য

দোলাবৌদি,

মেজদি যে এত তাড়াতাড়ি আমাদের এত বড় উপকার করবেন, তা কোনদিন ভাবিনি। শুধু ভাবিনি নয়, কল্পনাও করিনি। মেমসাহেব আমাকে ভালবাসত, আমি মেমসাহেবকে ভালবাসতাম। সে ভালবাসায় কোন ফাঁকি, কোন ভেজাল ছিল না। আমরা নিশ্চিত জানতাম আমরা মিলবই। শত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করেও আমরা মিলতাম।

কিন্তু তবুও মেজদির ঐ সাহায্য ও উপকারটুকুর একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং মেজদির প্রতি আমরা দুজনেই কৃতজ্ঞ ছিলাম।

আসলে মেজদি বরাবরই আমাকে ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন। আমারও মেজদিকে বড় ভাল লাগত। প্রথম দিন থেকেই মেজদিরও আমাকে ভাল লেগেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই মেজদি আমাদের দুজনের ভালবাসার গভীরতা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই মনে মনে ছোট বোনকে তুলে দিয়েছিলেন আমার হাতে।

এবার তো সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দিলেন, মেমসাহেব আমার, আমি মেমসাহেবের। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তির হস্তান্তরের সবকিছু পাকাপাকি হয়ে গেল। শুধু আশী টাকা মাইনের এক সাব-রেজিস্ট্রারের সই আর সীলমোহর লাগান বাকি রইল। এই কাজটুকুর জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত ছিলাম না।

মেমসাহেব অনেকদিন আগে বল্লেও আমি এতদিন বাড়ী ভাড়া নেবার কথা খুব সিরিয়াসলি ভাবিনি। সেবার কলকাতা থেকে ফিরে সত্যি সত্যিই গ্রীণপার্ক ঘোরাঘুরি শুরু করলাম, দু' চারজন বন্ধু-বান্ধবকেও বল্লাম।

দু' চারটে বাড়ী দেখলাম কিন্তু ঠিক পছন্দ হলো না। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করলাম। আরো কিছু বাড়ী দেখলাম। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আরো কিছু পরামর্শ করলাম। কয়েকটা বাড়ীর জন্য দরদস্তুরও করলাম।

এমনি করে আরো মাস দুই কেটে যাবার পর সত্যি সত্যিই তিনখানা ঘরের একটা ছোট কটেজ পেলাম তিনশ' টাকায়। বাড়ীটা আমার বেশ পছন্দ হলো। মেহরলী রোড থেকে বড় জোর দু'শো গজ হবে। গ্রীণপার্ক মার্কেট বেশ কাছে, মিনিট তিন-চারের রাস্তা। বাজার দূরে হলে মেমসাহেবের পক্ষে কষ্টকর হতো। তাছাড়া বাড়ীটাই বেশ ভাল। কর্ণার প্লট। সামনে আর পাশে মাঝারি সাইজের লন। গেটের ভিতর দিয়ে বাড়ীর ভিতরে গাড়ী রাখার ব্যবস্থা। ড্রইং-ডাইনিং রুমটা তো বেশ বড়। বারো বাই পনের। একটা বেডরুম বড়, একটা ছোট। দুটো বেডরুমেই লফট আর ওয়াড্রব। বড় বেডরুম আর ড্রইং-ডাইনিং রুমের মাঝে একটা ওয়েস্টার্ণ স্টাইলের বাথরুম। বাড়ীর ভিতরে একটা ইন্ডিয়ান স্টাইলের প্রিভি। সামনের বারান্দাটা অনেকটা লম্বা থাকলেও বিশেষ চওড়া ছিল না। ভিতরের বারান্দাটা স্কোয়ার সাইজের বেশ বড় ছিল। রান্নাঘর? দিল্লীর নতুন বাড়ীতে যেমন হয়, তেমনিই ছিল। আলমারী—মিটসেফ—সিংক সবই ছিল। লফট, আলমারী ওয়াড্রব থাকার জন্য আলাদা কোন স্টোর ছিল না কিন্তু ছাদে একটা দরজা-বিহীন ঘর ছিল।

লন দুটো বেশ ভাল ছিল সত্যি কিন্তু দিল্লীর অন্যান্য বাড়ীর মত এই বাড়ীটায় কোন ফুলগাছ ছিল না। আগে যিনি ভাড়া ছিলেন, তার নিশ্চয়ই ফুলের সখ ছিল না। তবে সামনের বারান্দার এক পাশ দিয়ে একটা বিরাট মাধবীলতা উঠেছিল।

মোটকথা সব মিলিয়ে বাড়ীটা আমার বেশ ভাল লেগেছিল। তাছাড়া আমার মত ডাকাতের হাতে পড়ে মেমসাহেব ফ্যামিলি প্ল্যানিং এসোসিয়েশনের সভানেত্রী হলেও এ বাড়ীতে থাকতে অসুবিধা হবে না বাড়ীটা আরো ভাল লেগেছিল।

বাড়ীটা নেবার পর মেমসাহেবকে কিছু জানালাম না। ঠিক করলাম ও দিল্লী আসার আগেই বেশ কিছুটা সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে চমকে দেব। আবার ভাবলাম, ওয়েস্টার্ণ কোর্ট এই বাড়ীতেই চলে আসি। পরে ভাবলাম, না, না, তা হয় না। একলা একলা থাকব এই বাড়ীতে? অসম্ভব। ঠিক করলাম ওকে নিয়েই এই বাড়ীতে ঢুকব।

গজাননকে আমার এই নতুন বাড়ীতে থাকতে দিলাম। আমি ওকে বল্লাম গজানন, তুমি আমার বাড়ীটার দেখাশুনা কর। আমি এরজন্য তোমাকে মাসে মাসে কিছু দেব।

গজানন সাফ জবাব দিয়েছিল, নেই সেই, ছোটাসাব, তুমি আমার হিসেব-টিসেব করতে পারবে না। আমি বিবিজির কাছ থেকে যা নেবার তাই নেব।

গজানন বাসে যাতায়াত করত। ডিউটি শেষ হবার পর এক মিনিটও অপেক্ষা করত না। সোজা চলে যেত গ্রীণপার্ক।

আমি আমার বাড়ীতে আড়াইশ' টাকা দিয়ে কেনাকাটা শুরু করে দিলাম। একটা সোফা সেট কিনলাম, একটা ডবল বেডের খাট কিনলাম। ওয়েস্টার্ণ কোর্ট থেকে আমার বইপত্তর ঐ বাড়ীতে নিয়ে গেলাম। বিদেশ থেকে কিনে আনা ডেকরেশন পিসগুলোও সাজালাম।

তারপর এক মাসে সমস্ত ঘরের জন্য পর্দা করলাম। তাছাড়া যখন যেরকম বাতিক আর সামর্থ হয়েছে, তখন কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এম্পোরিয়াম বা অন্য কোন স্টেট এম্পোরিয়াম থেকে কিছু কিছু জিনিসপত্র কিনে ঘরদোর সাজাচ্ছিলাম।

গজানন, বড় দরদ দিয়ে বাড়ীটার দেখাশুনা করছিল। দীর্ঘদিন ওয়েস্টার্ণ কোর্টে কাজ করার ফলে ওর বেশ একটা রুচিবোধ হয়েছিল। মানি প্ল্যান্ট, ক্যাকটাস্, ফার্ণ দিয়ে বাড়ীটা চমৎকার সাজাল।

আমি যখনই দিল্লীর বাইরে গেছি, গজানন তখনই ফরমায়েস করে ছোটখাট সুন্দর সুন্দর জিনিস আনিয়েছে। হায়দ্রাবাদ থেকে দশ-পনের টাকা দামের ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর উড্ কার্ভিং এনেছি, বেনারস থেকে পাথরের জিনিস এনেছি, কলকাতা থেকে বাঁকুড়ার টেরেকোটা ঘোড়া আর কৃষ্ণনগরের ডলস্ এনেছি। উড়িষ্যা থেকে স্যান্ডস্টোনের কোনারক মূর্তি কালীঘাট আর কটকি পটও এনেছিলাম আমাদের ড্রইংরুমের জন্য।

বুক-সেলফ'এর উপর দু' কোনায় দুটো ফটো রেখেছিলাম। একটা প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে আমার ছবি আর একটা মেমসাহেবের পোর্ট্রেট।

এদিকে যে এতকান্ড করছিলাম, সেসব কিছুই মেমসাহেবকে জানালাম না। ইচ্ছা করেই জানালাম না। ইতিমধ্যে বোম্বে থেকে মেজদির কাছ থেকে চিঠি পেলাম—

ভাই রিপোর্টার,

যুদ্ধ না করেও যারা যোদ্ধা, ইন্ডিয়ান নেভীর তেমনি এক অফিসারকে বিয়ে করে কি বিপদেই পড়েছি। সংসার করতে গিয়ে রোজ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, রোজ হেরে যাচ্ছে। রোজ বন্দী করছি, রোজ মুক্তি দিচ্ছি। তবে বার বার তো যুদ্ধ-বন্দীর প্রতি এত উদার ব্যবহার করা যায় না। এবার তাই শাস্তি দিয়েছি, দিল্লী ঘুরিয়ে আনতে হবে। তবে ভাই একথা স্বীকার করব বন্দী এক কথায়, বিনা প্রতিবাদে, শাস্তি হাসি মুখে মেনে নিয়েছে।

আর কিছুদিনের মধ্যেই তুমিও বন্দী হতে চলেছ। শাস্তি তোমাকেও পেতে হবে। তবে তুমি তোমার মেমসাহেবের কাছ থেকে শাস্তি পাবার আগেই আমরা দুজনে তোমাকে শাস্তি দেবার জন্য দিল্লী আসছি।

প্রেসিডেন্টের খুব ইচ্ছা যে আমরা রাষ্ট্রপতি ভবনে ওর অতিথি হই। কিন্তু ভাই, তোমাকে ছেড়ে কি রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকা ভাল দেখায়? তোমার মনে কষ্ট দিয়ে রাষ্ট্র-

পতি ভবনে থাকতে আমি পারব না। আমাকে ক্ষমা করো।

আগামী বুধবার ফ্রন্টিয়ার মেল অ্যাটেন্ড করতে ভুলে যেও না। তুমি স্টেশনে না এলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই আবার সেই রাষ্ট্রপতি ভবনে যেতে হবে।

তোমার মেজদি

বুধবার আমি ফ্রন্টিয়ার মেল অ্যাটেন্ড করেছিলাম। মেজদিদের নিয়ে এসেছিলাম আমার গ্রীণপার্কের নতুন আস্তানায়। সারা জীবন কলকাতায় ঐ চারখানা ঘরের ঐ তিনতলার ফ্ল্যাটে কাটিয়ে আমার গ্রীণপার্কের বাড়ী মেজদির ভীষণ পছন্দ হয়েছিল।

বন্ধ না করেও যিনি যোদ্ধা, মেজদির সেই ভাগ্যবান বন্দী ঘরবাড়ী দেখে মন্তব্য করেছিলেন, দেখেশুনে মনে হচ্ছে ম্যাডাম সপিং করতে গিয়েছেন। এক্ষুনি এসে ড্রইংরুমে বসে এককাপ কফি খেয়েই বেডরুমে লুটিয়ে পড়বেন।

তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ম্যাডাম' এর জন্য এত আয়োজন করার পর এ বাড়ীতে আপনার একলা থাকতে কষ্ট হয় না?

আমি বলেছিলাম, আমি তো এখানে থাকি না। আমি ওয়েস্টার্ণ কোর্টেই থাকি।

আমার কথায় ওরা দুজনেই অবাক হয়েছিল। বোধহয় খুশীও হয়েছিলেন। খুশী হয়েছিলেন এই কথা ভেবে যে একলা ভোগ করার জন্য আমি এত উদ্যোগ আয়োজন করিনি।

মেজদিরা তিনদিন ছিলেন। কখনো ওরা দুজনে, কখনও বা আমরা তিনজনে ঘুরে বেড়িয়েছি। ওদের দিল্লী ত্যাগের আগের দিন সন্ধ্যায় গ্রীণপার্কের বাড়ীর ড্রইংরুমে বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমরা আড্ডা দিয়েছিলাম।

কথায় কথায় মেজদি একবার বল্লেন, সংসার করার প্রায় সবকিছুই তো আপনি জোগাড় করে ফেলেছেন। বিয়েতে আপনাদের কি দেব বলুন তো?

আমি উত্তর দেবার আগেই বন্দী উত্তর দিলেন, আজেবাজে কিছু না দিয়ে একটা ফোমড্ রাবারের গদী দিও। শুয়ে আরাম পাবে আর প্রতিদিন তোমাকে ধন্যবাদ জানাবে।

এইসব আজেবাজে আলতু-ফালতু কথাবার্তা বলতে বলতে অনেক রাত হয়েছিল। মেজদি বল্লেন, আজ আর ওয়েস্টার্ণ কোর্টে যাবেন না, এইখানেই থেকে যান।

আমি হেসে বলেছিলাম, না, না, তা হয় না।

'কেন হয় না?'

'ওখানে নিশ্চয়ই জরুরী চিঠিপত্র এসেছে......'

মেজদি মাঝপথে বাধা দিয়ে বললেন, এত রাত্তিরে আর চিঠিপত্তর দেখে কি করবেন। কাল সকালে দেখবেন।

আবার বললাম, না, না, মেজদি, আমি এখন এ-বাড়ীতে থাকব না।

এবার মেজদি হাসলেন। বললেন, কেন? প্রতিজ্ঞা করেছেন বুঝি যে, একলা একলা এই বাড়ীতে থাকবেন না?

আমি কোন উত্তর না দিয়ে শুধু একটু হাসলাম। একটু পরে বিদায় নিয়ে চলে এলাম ওয়েস্টার্ণ কোর্টে।

পরের দিন স্টেশনে বিদায় জানাতে গেলে মেজদি আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিলেন। বললেন, আপনার মেমসাহেব বোম্বে দেখেনি। তাই সামনের ছুটিতে আমাদের কাছে আসবে। ক'দিনের জন্য দিল্লী পাঠিয়ে দেব, কেমন?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আপকা মেহেরবাণী!

মেজদি বললেন, মেহেরবাণীর আবার কি আছে? বিয়ের আগে একবার সবকিছু দেখেশুনে যাক।

আমি এ-কথারও কোন জবাব দিলাম না। মাথা নীচু করে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ট্রেন ছাড়ার মুখে মেজদি বললেন, ফাল্গুনে বিয়ে হলে আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

আমি মাথা নীচু করেই বললাম, সে-সময় যে পার্লামেন্টের বাজেট সেসন চলবে।

'তা চলুক গে! বেশী দেরী আর ভাল লাগছে না।'

শেষে মেজদি বলেছিলেন, সাবধানে থাকবেন ভাই। চিঠি দেবেন।

মেজদি চলে যাবার পর মনটা সত্যি বড় খারাপ লাগল। পরমাত্মীয়ের বিদায়-ব্যথা অনুভব করলাম মনে মনে।

ক'দিন পর মেমসাহেবের চিঠি পেলাম।

...'তুমি কি কোন তুক-তাক বা কবচ-মাদুলী দিয়ে মেজদিকে বশ করেছ? ও মা-র কাছে ছ' পাতা আর আমার কাছে চার পাতা চিঠি লিখেছে। সারা চিঠি ভর্তি শুধু তোমার কথা, তোমার প্রশংসা। তোমার মত ছেলে নাকি আজকাল পাওয়া মুস্কিল। তুমি নাকি ওদের খুব যত্ন করেছ? ওরা নাকি খুব আরামে ছিল?

তারপর মা-র চিঠিতে ফাল্গুন মাসে বিয়ে দেবার কথা লিখেছে। তোমারও নাকি তাই মত? মা-র কোন আপত্তি নেই। আজ মেজদির চিঠিটা মা দিদির কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

আর ক'দিন পরেই আমাদের কলেজ বন্ধ হবে। ছুটিতে মেজদির কাছে যাব। যদি মেজদিকে ম্যানেজ করতে পারি তবে ওদের কাছে দু' সপ্তাহ থেকে এক সপ্তাহের জন্য তোমার কাছে যাব।

আমাদের এখানকার আর সব খবর মোটামুটি ভাল। তবে ইদানীং খোকনকে নিয়ে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি। আমার মনে হচ্ছে ও রাজনীতিতে মেতে উঠেছে। পড়াশুনা এখনও অবশ্য ঠিকই করছে কিন্তু ভয় হয় একবার যদি রাজনীতি নিয়ে বেশী মেতে ওঠে, তবে পড়াশুনার ক্ষতি হতে বাধ্য। খোকন যদি কোন কারণে খারাপ হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য আমারও কিছুটা দায়ী হতে হবে। সর্বোপরি বৃদ্ধ বিপত্নীক কাকাবাবু বড় আঘাত পাবেন।'...

আমি মেমসাহেবকে লিখলাম, মেজদি যা লিখেছে তা বর্ণে বর্ণে সত্য। ফাল্গুন মাসে পার্লামেন্টের সেসন চলবে। কিন্তু তা চলুক গে। চুলোর দুয়োরে যাক পার্লামেন্ট! ফাল্গুন মাসে আমি বিয়ে করবই। আমার আর দেরী সহ্য হচ্ছে না। তুমি যে আমার চাইতেও বেশী অধৈর্য হয়েছ, তা আমি জানি।

আরো অনেক কিছু লিখেছিলাম। শেষের দিকে খোকনের সম্পর্কে লিখেছিলাম, তুমি ওকে নিয়ে অত চিন্তা করবে না। বাঙালীর ছেলেরা যৌবনে হয় রাজনীতি, না হয় কাব্য-সাহিত্য চর্চা করবেই। শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত ঋতুর মত এসব চিরস্থায়ী নয়। দু'চারদিন ইনকিলাব বা বন্দেমাতরম্ চিৎকার করে ডালহৌসী স্কোয়ারের স্টীম রোলারের তলায় পড়লে সব পাল্টে যাবে। খোকনও পাল্টে যাবে।

এ-কথাও লিখলাম, তুমি খোকনের জন্য অত ভাববে না। হাজার হোক আজ সে বেশ বড় হয়েছে, কলেজে পড়ছে। তাছাড়া তার বাবা তো আছেন। ছেলে-মেয়েদের এই বয়সে তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে গেলে অনেক সময়ে হিতে বিপরীত হয়। তোমারও হতে পারে। সুতরাং একটু খেয়াল করে চলবে।

শেষে লিখলাম, খোকন যখন ছোট ছিল, যখন তাকে মাতৃস্নেহ দিয়ে, দিদির ভালবাসা দিয়ে অভাবিত বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল, তুমি ও মেজদি তা করেছ। তোমাদের স্নেহচ্ছায়ায় যে একটা মাতৃহারা শিশু আজ যৌবনে পদার্পণ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, সেইটুকুই তোমাদের যথেষ্ট পুরস্কার। এর চাইতে বেশী আশা করলে হয়ত দুঃখ পেতে পার।

জান দোলাবৌদি, খোকন সম্পর্কে এত কথা আমি লিখতাম না। কিন্তু ইদানীংকালে মেমসাহেব খোকনকে নিয়ে এত বেশী মাতামাতি, এত বেশী চিন্তা করা শুরু করেছিল যে, এসব না লিখে পারলাম না। আজকাল ওর প্রত্যেকটা চিঠিতে খোকনের কথা থাকত। লিখত, খোকনের এই হয়েছে,

ঐ হয়েছে। খোকনের কি হলো, কি হবে? খোকন কি মানুষ হবে না? ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার কথা লিখত। তুমি তো জান আজকালকার দিনে নিজেদের খোকনকেই মানুষ করতে মানুষে পাগল হয়ে উঠছে। তাছাড়া স্নেহ-ভালবাসা দেওয়া সহজ কিন্তু বিনিময়ে তার মর্যাদা পাওয়া দুর্লভ।

খোকনের প্রতি ওর এত স্নেহ-ভালবাসার জন্য সত্যি আমার ভয় করত। ভয় হতো যদি কোনদিন খোকন ওর এই স্নেহ-ভালবাসার মূল্য না দেয়, মর্যাদা না দেয়, তখন সে-দুঃখ, সে-আঘাত সহ্য করা অত্যন্ত কষ্টকর হবে। তাই না?

এই চিঠির উত্তরে মেমসাহেব কি লিখল জান? লিখল, তুমি যত সহজে খোকন সম্পর্কে যেসব উপদেশ পরামর্শ দিয়েছ, আমার পক্ষে অত সহজে সেসব গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ খুব সহজ। মাতৃহারা ছ'বছরের শিশু খোকনকে নিয়ে কাকাবাবু আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। মাতৃস্নেহ দেবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না কিন্তু দিদি, মেজদি আর আমি ওকে বড় করেছি। ওকে খাইয়েছি, পরিয়েছি, সুর করে ছড়া বলতে বলতে কোলের মধ্যে নিয়ে ঘুমিয়েছি। একদিন নয়, দুদিন নয়, বছরের পর বছর খোকনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে শুয়েছি আমরা তিন বোনে।

কয়েক বছর পর দিদির বিয়ে হয়ে গেলে আমি আর মেজদি ওকে দেখেছি। ওর অসুখ হলে মেজদি ছুটি নিয়েছে, আমি কলেজ কামাই করেছি, মা মানত করেছেন। মেজদিরও বিয়ে হয়ে গেল। আজ খোকনকে দেখবার জন্য শুধু আমি পড়ে রয়েছি। তুমিও কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে। মা-বাবার কথা বাদ দিলে খোকন ছাড়া এখানে আমার আর কি আকর্ষণ আছে বল? হাতেও প্রচুর সময়। তাইতো খোকনের কথা না ভেবে উপায় কি?

এই চিঠির উত্তরে আমি আর খোকন সম্পর্কে বিশেষ কিছু লিখলাম না। ভাবলাম মেমসাহেবের ছুটিতে দিল্লী এলেই কথাবার্তা বলব।

ছুটিতে মেমসাহেব বোম্বে গিয়েছিল। একবার ভেবেছিলাম দু'তিনদিনের জন্য বোম্বে ঘুরে আসি। খুব মজা হতো। কিন্তু শেষপর্যন্ত গেলাম না। মেজদির ওখানে সতের-আঠারো দিন কাটিয়ে মেমসাহেব কলকাতায় যাবার পথে দিল্লী এসেছিল। কলকাতায় সবাই জানত ও বোম্বেতেই আছে। মেমসাহেব আমার কাছে মাত্র চার-পাঁচদিন ছিল।

মেমসাহেবকে গ্রীণ-পার্কের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওর খুব পছন্দ হয়েছিল। বলেছিল, লাভলি।

তারপর বলেছিল, তুমি যে এর মধ্যেই এত সুন্দর করে সাজিয়ে-গুছিয়ে নেবে, তা ভাবতে পারিনি।

আমি বলেছিলাম, তোমাকে বিয়ে করে তো যেখানে-সেখানে তুলতে পারি না!

ঐ লম্বা সরু কালো ভ্রূদুটো টান করে উপরে তুলে ও বলেছিল, ইজ ইট?

'তবে কি?'

মেমসাহেব গজাননকে অশেষ ধন্যবাদ জানাল অত সুন্দর করে বাগান করবার জন্য। জিজ্ঞাসা করল, গজানন, তোমার কি চাই বল?

গজানন বলেছিল, বিবিজি, অভি নেই। আগে তুমি এসো, সবকিছু বুঝে-টুঝে নাও, তারপর হিসাব-টিসাব করা যাবে।

বিকেল হয়ে এসেছিল। গজাননকে কিছু খাবার-দাবার আর কফি আনতে মার্কেটে পাঠিয়ে দিলাম। মেমসাহেব ও-পাশের সোফাটা ছেড়ে আমার পাশে এসে বসল। আমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে মাথা নীচু করে কি যেন দেখছিল, কি যেন ভাবছিল। আমি কিছু বললাম না, চুপ করেই বসে রইলাম। কয়েক মিনিট ঐভাবেই কেটে গেল। তারপর ঐ মাথা নীচু করেই নরম গলায় ও বললো, সত্যি, তুমি আমাকে সুখী করার জন্য কত কি করছ।

'কেন? আমি বুঝি সুখী হবো না?'

'নিশ্চয়ই হবে। তবুও এত বড় বাড়ী এতসব আয়োজন তো আমার জন্যই করেছ।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, সেজন্য কিছু পুরস্কার দাও না!

মেমসাহেব হেসে ফেললো। বললো, তোমার মাথায় শুধু ঐ এক চিন্তা!

'তোমার মাথায় বুঝি সে চিন্তা আসে না?'

ও চিৎকার করে বললো, নো, নো, নো!

এক মুহূর্তের জন্য আমিও চুপ করে গেলাম। একটু পরে বললাম, এদিকে তো গলাবাজি করে খুব নো, নো বলছ, আর ওদিকে বিয়ের আগেই ছেলেমেয়ের ঘর ঠিক করছ।

মেমসাহেব এইভাবে ফার্স্ট ওভারের ফার্স্ট বলে বোলড্ হবে, ভাবতে পারেনি। আমার কথার কোন জবাব ছিল না ওর কাছে। শুধু বললো, তোমার মত ডাকাতের সঙ্গে ঘর করতে হলে একটু ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে উপায় আছে?

গ্রীণ-পার্ক থেকে ওয়েস্টার্ণ কোর্টে ফিরে আসার পর মেমসাহেব বললো, জান, মেজদি বলেছিল বিয়েতে তোমার কি চাই তা জেনে নিতে।

আমি ভ্রূ কুঁচকে বেশ অবাক হয়ে বললাম, সে কি? মেজদি জানে না?

'তুমি বলেছ নাকি?'

'একবার? হাজারবার বলেছি!'

আমার রাগ দেখে ও যেন একটু ঘাবড়ে গেল। বললো, হয়ত কোন কারণে......

'এর মধ্যে কারণ-টারণ কিছু নেই।'

মেমসাহেবের মুখটা চিন্তায় কালো হয়ে গেল। মুখ নীচু করে বললো, মেজদি হয়ত ভেবেছে তুমি ফ্রাঙ্কলি আমাকে সবকিছু খুলে বলতে পার...

'তোমাকে যা বলব, মেজদিও তা জানে।'

মেমসাহেব নিশ্চল পাথরের মত মাথা নীচু করে বসে রইল। আমি চুরি করে করে ওর দিকে চাইছিলাম আর হাসছিলাম। একটু পরে ও আমার কাছে এসে হাত-দুটো ধরে বললো, ওগো, বল না, বিয়েতে তোমার কি চাই।

আমি প্রায় চিৎকার করে বললাম, তোমার মেজদি জানেন না যে আমি তোমাকে চাই?

একটা বিরাট দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে হাসতে হাসতে ও বললো, বাপরে বাপ! কি অসভ্য ছেলেরে বাবা!

আমি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বললাম, এতে অসভ্যতার কি করলাম?

মেমসাহেব আমাকে এক দাবড় দিয়ে বললো, বাজে বকো না। ছি, ছি, অমন করে কেউ ভাবিয়ে তোলে?

পরে ও আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বল না, বিয়েতে তুমি কি চাও?

আমি বললাম, তোমার এসব কথা জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করছে না? তুমি কি ভেবেছ আমি সেই ভদ্রবেশী অসভ্য ছোট-লোকগুলোর দলে যে লুকিয়ে লুকিয়ে নগদ টাকা নিয়ে পরে চালিয়াতি করব?

পরে মেজদিকে একটা চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, আপনারা আমাকে ঠিক চিনতে পারেননি। বিয়েতে যৌতুক বা

উপঢৌকন তো দূরের কথা, অন্য কোন মানুষের দয়া বা কৃপা নিয়ে আমি জীবনে দাঁড়াতে চাই না। সে মনোবৃত্তি থাকলে বেহালার সরকারী জমিতে সরকারী অর্থে একটা বাড়ী বা কলকাতার শহরে বেনামীতে দুটো-একটা ট্যাক্সি অনেক আগেই করতাম। আর শ্বশুরের পয়সায়, শ্বশুরের কৃপায় সমাজ-সংসারে প্রতিষ্ঠা? ছিঃ, ছিঃ! মেরুদণ্ডহীন হীনবীর্য পুরুষ ছাড়া এ-কাজ কেউ পারবে না। খিড়কির দরজা দিয়ে আয় করে, সম্পত্তি করে চালিয়াতি করতে আমি শিখিনি। নিজের কর্মক্ষমতা ও কলমের জোরে যেটুকু পাব, তাতেই আমি সুখী ও সন্তুষ্ট থাকব।

এই চিঠির উত্তরে মেজদি লিখেছিলেন, ভাই রিপোর্টার, তোমার চিঠি পড়ে মনে হলো তুমি আমাদের ভুল বুঝেছ। তোমার সঙ্গে আমাদের সবচাইতে ছোট বোনের বিয়ে হচ্ছে। তাইতো তোমরা দুজনে আমাদের কত প্রিয়, কত আদরের। তোমাদের বিয়েতে আমরা কিছু দেব না, তাই কি হয়? তোমাদের কিছু না দিলে কি বাবা-মা শান্তি পাবেন?

আমি আবার লিখলাম, সেন্টিমেন্টের লড়াই লড়বার ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, আমার কিছু চাই না। যদি নিতান্তই কিছু দিতে চান, তাহলে কনটেমপোরারি হিস্ট্রীর কিছু বই দেবেন। দয়া করে আর কিছু দিয়ে আমাকে বিব্রত করবেন না।

যাকগে ওসব কথা। মেমসাহেব কলকাতা যাবার আগের দিন দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে শেষে বুদ্ধ-জয়ন্তী পার্কে বসেছিলাম অনেকক্ষণ। কথায় কথায় মেমসাহেব খোকনের কথা বলেছিল, তুমি কলকাতা ছেড়ে চলে আসার পর বুঝলাম তোমাকে কত ভালবাসি। এমন একটা অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা আমাকে ঘিরে ধরল যে, তোমাকে কি বলব! কোনমতে সেই লেডিজ ট্রামে চেপে কলেজ যেতাম আর আসতাম। আর কোথাও যেতাম না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সিনেমা-টিনেমা কিছু ভাল লাগত না।

আমি বললাম, ঠিক সেইজন্যই তো খোকনকে বেশী আঁকড়ে ধরেছ, তা আমি বুঝি।

'তাইতো সন্ধ্যার পর খোকনকে পড়াতে বসতাম। পড়াশুনা হয়ে গেলে খাওয়া-দাওয়ার পর ছাদে গিয়ে দুজনে বসে বসে গল্প করে কাটাতাম। কোন কোনদিন মা আসতেন। গান গাইতে বলতেন কিন্তু আমি গাইতে পারতাম না। গান গাইবার মত মন আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

একটু পরে আবার বললো, গরমকালে কলকাতার সন্ধ্যাবেলা যে কি সুন্দর তা তো তুমি জান। তোমার সঙ্গে কত ঘুরে বেড়িয়েছি ঐ সন্ধ্যাবেলায় কিন্তু তুমি চলে আসার পর আমি কলেজ থেকে ফিরে চুপ-চাপ শুয়ে থাকতাম আমার খাটে।

'তাই বুঝি?'

'সত্যি বলছি, জানলা দিয়ে পাশের শিউলি গাছটা দেখতাম আর এক টুকরো আকাশ দেখতে পেতাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতাম শুধু তোমার কথা।'

আমি ওর হাতটা আমার হাতের মধ্যে টেনে নিলাম। বললাম, তুমি যে আমাকে ছেড়ে শান্তিতে থাকতে পার না, তা আমি জানি মেমসাহেব।

ওর চোখদুটো কেমন যেন ছলছল করছিল। গলার স্বরটাও স্বাভাবিক ছিল না। ভেজা ভেজা গলায় বললো, এখন শুধু খোকন ছাড়া কলকাতায় আমার কোন আকর্ষণ নেই। কিন্তু ছেলেটা আজকাল যে কি লাগিয়েছে তা ওই জানে।

'কি আবার লাগাল?'

'মনে হচ্ছে খুব জোর পলিটিক্স করছে।'

'তার জন্য ভয় পাবার বা চিন্তা করবার কি আছে?'

'তুমি কলকাতায় রিপোর্টারী করেছ. অনেক রাজনৈতিক আন্দোলন দেখেছ। সুতরাং তুমি দেখলে বুঝতে পারতে কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারি না ও কি করছে। সেইজন্যই বেশী ভয় হয়।'

'চুরি-জোচ্চুরি তো করছে না, সুতরাং তুমি এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন?'

মেমসাহেব দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে কেমন যেন অসহায়ার মত আমার দিকে তাকাল। বললো, জান, এই ত কিছুদিন আগে হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে ফিরল। প্রথমে কিছুই বলছিল না। বারবার জিজ্ঞাসা করার পর বললো, পুলিশের লাঠি লেগেছে। এবার মেমসাহেব আমার হাতদুটো চেপে ধরে বললো, আচ্ছা বলতো, ঐ লাঠিটাই যদি মাথায় লাগত, তাহলে কি সর্বনাশ হতো?

আমি বেশ বুঝতে পারলাম খোকন রাজনীতিতে খুব বেশী মেতে উঠেছে। সভা-সমিতি মিছিল-বিক্ষোভ করছে সে এবং আজ হাতে লাঠি পড়েছে, কাল মাথায় পড়বে, পরশু হয়ত গুলীর আঘাতে আহত হয়ে মেডিক্যাল কলেজের অপারেশন থিয়েটারে যাবে। চিন্তার নিশ্চয়ই কারণ আছে কিন্তু এ-কথাও জানি ছেলেরা একবার মেতে উঠলে ফিরিয়ে আনা খুব সহজ নয়। খবরের কাগজের রিপোর্টারী করতে গিয়ে কলকাতার রাজপথে বহুজনকে পুলিশের লাঠিতে আহত, গুলীতে নিহত হতে দেখেছি। সব রিপোর্টারই এসব দেখে থাকেন, নিশ্চল নিশ্চুপ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমিও সবকিছু দেখেছি, একফোঁটাও চোখের জল ফেলিনি।

আজ মেমসাহেব খোকনের কথা বলায় হঠাৎ মুহূর্তের জন্য এইসব দৃশ্যের ঝড় বয়ে গেল মনের পর্দায়। কেন, তা বুঝতে পারলাম না। মনে মনে বেশ একটু চিন্তিতও হলাম। ওকে সেসব কিছু বুঝতে দিলাম না। সান্ত্বনা জানিয়ে বললাম, হাতে একটু লাঠি লেগেছে বলে অত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? কলকাতায় বাস করে যে পুলিশের এক ঘা লাঠি খায়নি, সে খাঁটি বাঙালীই না।

দু' ফোঁটা চোখের জল ইতিমধ্যেই গড়িয়ে পড়েছিল মেমসাহেবের গালের পর। আমার কাছ থেকে লুকোবার জন্য তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে সারা মুখটা মুছে নিয়ে বললো, হয়ত তোমার কথাই ঠিক কিন্তু যদি কোনদিন কিছু হয়...

মেমসাহেব আর বলতে পারল না। দুই হাঁটুর পর মাথাটা রাখল। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, অত ভয় পাচ্ছ কেন মেমসাহেব? আমার বললাম, অত চিন্তা করলে কি বাঁচা যায়?

মেমসাহেব রাজনীতি করত না কিন্তু কলকাতাতে জন্মেছে, স্কুল-কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে। সুতরাং ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, অনেক কিছু দেখেছে। হয়ত গুলীতে মরতে দেখেনি কিন্তু লাঠি বা টিয়ার-গ্যাস বা ইট-পাটকেলের লড়াই নিশ্চয়ই অনেকবার দেখেছে। তাছাড়া খবরের কাগজও পড়ে, ছবি দেখে। সেই সামান্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই খোকন সম্পর্কে মেমসাহেব একটু অস্থির না হয়ে পারেনি।

ওয়েস্টার্ণ কোর্টে ফিরে আসার পর আমি মেমসাহেবকে বলেছিলাম, তুমি বরং খোকনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। এখানে পড়াশুনা করবে আর আমাকেও একটু-আধটু সাহায্য করবে।

আমার প্রস্তাবে ও আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল। বলেছিল, সত্যি ওকে পাঠিয়ে দেব?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাও।'

'কিন্তু......'

'কিন্তু কি?'

'ক'মাস পরেই তো ওর ফাইন্যাল।'

আমি বললাম, ঠিক আছে। পরীক্ষা দেবার পরই পাঠিয়ে দিও, এখানে বি-এ পড়বে।

মেমসাহেব একটু হাসল, আমাকে একটু জড়িয়ে ধরল। বললো, ততদিনে আমিও তো তোমার কাছে এসে যাব, তাই না?

আমি ওর মাথায় একটু ঝাঁকুনি দিয়ে একটু আদর করে বললাম, তখন খুব মজা হবে, তাই না?

ও আমার বুকের পর মাথা রেখে বললো, সত্যি খুব মজা হবে।

আজ আসি।

ভালবাসা নিও।

তোমাদের বাচ্চু

স্কি মোনির আলো   আণ্ডরি ওয়াইডার

ইংরেজীতে একটা জনপ্রিয় গান আছে—'রিং আউট দি ওল্ড, রিং অন্ দি নিউ।' খৃষ্টমাসের রাতে পিয়ানোর তালে তালে যখন কোন ইংরেজ পরিবারের সবাই মিলে গানটি গলা মিলিয়ে গান, তখন সত্যিই ভারী সুন্দর লাগে। আর তা'ছাড়া এটাই তো জীবনের চরম সত্য। পুরোনোর জন্য বিলাপের কি প্রয়োজন, নতুন এলেই তাকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক স্থান করে দিতে হবে। তাতে জীবনের একঘেয়েমি দূর হয়। য়ুরোপের চলচ্চিত্র জগৎও এই সত্যটাকে মেনে নিয়েছে। ইতালী, ফ্রান্সে ডি সিকা, আন্তোনিওনি, ফেলিনি, গদার, ত্রুফো, রে'নে পুরোনকে দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন। ইতালীর নিও-রিয়ালিজমের স্থানে আজ যে নতুন নাম শোনা যাচ্ছে সেটি হল নিও-নিও-রিয়ালিজম্। এ আন্দোলনের জনক হিসাবে বিশেষ কারো নাম করা না গেলেও মার্কো বেল্লোশিও, রোমানো স্কাভলিনির নাম প্রায়ই শোনা যায়। বেল্লোশিও'র শেষ ছবি

স্বপ্ন ও সংকট

মিনতি চৌধুরী

'দি চীনা ইজ নিয়ার' তো ইতালীর শুধু-মাত্র চিত্রজগতে নয়, রাজনীতির জগতেও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

শুধু ইতালীর কথা বললে নিরপেক্ষ হওয়া যাবে না, পোল্যান্ডের স্কোলিওমস্কি, চেকোশ্লোভাকিয়ার জাঁ নিমেক, সুইডেনের জাঁ ট্রোয়েল, জন ডোনার, এ-ছাড়া গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী রয়েছে। জার্মানীর চিত্রজগতে এখন একমাত্র যে উজ্জ্বল নামটা শোনা যায় তা হল পিটার স্কিমোনীর। জার্মান চিত্রের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন ভদ্রলোক। এখন অবশ্য কিছু উঠতি পরিচালক চলচ্চিত্রকে নিয়ে এমন মাতামাতি শুরু করেছেন যে, দেখে মনে হয় একটা হেস্তনেস্ত না করে বুঝি ছাড়বেন না। গত জানুয়ারীতেই পাঁচটা নতুন ছবির প্রিমিয়ার হল। কাহিনীর দিক থেকে নতুনত্ব আছে প্রতিটিতে। ওর একটা ছবিতে দেখান হয়েছে একটি মেয়ে হামবুর্গ থেকে মিউনিখ্ যাত্রা করল শুধুমাত্র নিজের 'কুমারীত্ব' হারাবার জন্য। তার এই স্বেচ্ছা 'বলিদান' আজকের পাশ্চাত্য জগতে মোটেই নতুন নয়। হত্যা, রহস্য, রোমাঞ্চ, প্রেম অন্যান্য ছবিগুলোর বিষয়বস্তু, তবে ট্রিট-মেন্ট ভিন্ন, স্বাদ আলাদা।

চিত্র প্রযোজনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এই যে নতুন জোয়ার, এর কারণ শুধুমাত্র আনন্দলাভ। চলচ্চিত্র যেহেতু শিল্প, পরিচালক শিল্পী, কাজেই আপন খেয়ালে আত্মতৃপ্তি করার সুযোগ সবাই-ই চায়। বিখ্যাত চিত্র সমালোচক জো হেম্বস্ বলেছেন—'এদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই নিরাশ করে দর্শককে', অর্থাৎ সকলেই কম-বেশী জনপ্রিয়। গত বৎসরের অন্যতম সাফল্যের অধিকারী প্রযোজক রব্ হাউভার (যিনি পাঁচ মিলিয়ান মার্ক লাভ করেছেন ব্যবসা থেকে) বলেছেন—'আমি ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত আমার ছবির মুক্তি স্থগিত রেখেছি, কারণ নতুনের জোয়ারের মধ্যে ছবিটাকে ঠেলে দিতে চাইছি না।' তাই বলে এই নবাগদের যে তিনি সহ্য করতে পারেন না তা নয়, বরং এদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা কাজ করছে।

উপরোক্ত পাঁচখানা ছবির সব কটাই আনকোরা হাতের। যদিও নাগরিকত্বে বুল-গেরিয়ান, তবুও ম্যারন্ গোসভ জার্মানীতেই কাজ করছেন। এর আগে দুটো স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবি করেছেন। Unternehmen Englechen ওর প্রথম কাহিনীচিত্র। উনি বলেন—'কল্পনা ও চিন্তার তীব্রতা থাকলেই যে কেউ ছবি করতে পারে'। প্রযোজক হাউভারএর ছবি দেখে এত মুগ্ধ হয়েছেন যে, মাসিক আট হাজার মার্ক চুক্তিতে গোসভ্‌কে নিজের ব্যানারে ছবি করার জন্য ঠিক করেছেন।

ব্রেমেনের কাছের টুইস্টিনজেনের মে স্পিলস্ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিরাট খামার বাড়ীখানা বিক্রী করে দিয়েছেন। কারণ কি—না উনি ৎসুর জাথে, শেট্সন নামে একখানা ছবি তুলবেন, তার টাকা জোগাড়ের জন্যই এত কাণ্ড। ছবির কাহিনী হল একটা মিষ্টি প্রেমের গল্প নিয়ে। উনি মনে করেন, আজকের দিনে আঁভা গার্দ,

প্রভৃতি গোষ্ঠীর পরিচালকরা যে-সব ছবি করেন, তার বেশীর ভাগেই বড় বেশী সিরিয়স্, বড় বেশী সমস্যা জর্জরিত, অত্যন্ত দার্শনিক তত্ত্বে ভারাক্রান্ত, হালকা রসের বা চিন্তার প্রাধান্য কম। তাই উনি মিষ্টিমধুর প্রেমের গল্প দিয়ে দর্শকমনকে একটু হালকা করে দিতে চান। প্রাক্তন চিত্র-সমালোচক এ কে হার্ভে সিমভ জার্মান চিত্র-জগতে জেৎ জেনারেশন ছবিখানা দিয়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন। হোর্সট্ ম্যান-ফ্রেড অ্যাডলফ্ এ পর্যন্ত চিত্র প্রযোজনাই করে আসছিলেন, হঠাৎ কি খেয়াল হল একটা গল্প লিখে ফেললেন, চিত্রনাট্যও তৈরী হল। তারপর ছবিখানা মুক্তি পেল, ভবে অনেকেই ডি গোল্ডেনে পিলে নেগে-টিভ্ অ্যাটিচুড্ সহ্য করতে পারেন নি। এই সিরিজের পঞ্চম ছবি Mit Eichenlaub und Eeigenblatt ফ্রানজ্ যোশেফ স্পিকারের দ্বিতীয় ছবি। ওর প্রথম ছবি হল ভিনলডে রাইটার। একজন যুবক তার আশা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী স্পিকারের দ্বিতীয় ছবির মূল কথা। যুবকটি ছত্রীসৈনিক হবার বাসনায় নাম লিখিয়েছিল সৈন্য বিভাগে, কিন্তু মনোনয়ন কালে তাকে বাদ দেওয়া হয় এবং তার মানসিক অসাম্যতা লক্ষিত হওয়ায় এক

অতিরিক্ত গরমের জন্য তরুণ পরিচালক মে স্পীল অত্যধিক গরমে হালকা পোষাক পরেছেন।

স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি করা হয় তাকে। পরিচালক ছবি সম্পর্কে বলছেন—'সমাজের কিছু রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ এ ছবি, তাই বলে ছবির মূল উদ্দেশ্যে কিন্তু আক্রমণাত্মক বা বেপরোয়া নয়।' ছবি তৈরী হবার সময়ও পরিচালক স্পিকার জানতেন না ছবিটা আদৌ মুক্তি পাবে কি না, অবশ্য তার জন্য স্পিকার এতটুকুও চিন্তা করেন নি। কারণ তাঁর আগের ছবি ভিনলডে রাইটার যে পরিমাণে আর্থিক সাফল্য লাভ করেছিল তার ফলেই বহু চিত্রগৃহ মালিকরাই তার ছবির প্রদর্শন অধিকার চেয়েছিল।

কোন ছবির আর্থিক সাফল্যের অনিশ্চয়-তার মতই অভিনেতা অভিনেত্রীদের ভাগ্যও অনিশ্চিত, বিশেষ করে নতুন মুখের। তারকা প্রথা বস্তাপচা উপন্যাসের মতই অবশ্যই পরিহার করা প্রয়োজন। নতুনেরা তা স্বীকার করেন, আর তাই তাঁদের প্রতিটি ছবিতে নতুন মুখের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এ সব নতুন মুখ পর্দায় নতুন হলেও অভিনয়ে যথেষ্ট দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ছাপ রাখে। ম্যারন গোসভের ছবিটায় দুটো প্রধান চরিত্রে আছে একেবারে অনভিজ্ঞ দুজন লোক—যাদের মধ্যে এক-জনের পেশা হল বার্-এর বয় এবং অপর-জন হল সেই বারের একজন নিয়মিত খরিদ্দার। গোসভ্ ওদের প্রশংসায় পঞ্চ-মুখ। উনি বলছেন—'এরা দুজনে এক অভূতপূর্ব সুন্দর জুটি। তারা এত সাব-লীল অভিনয় করেছে যে, মনে হয় না এটাই ওদের প্রথম চিত্রায়ন। অনেক পেশাদারী অভিনেতারও হিংসার বস্তু এদের অভিনয়।'

একহার্ড স্মিমৎ-এর Jet Generation এর প্রধান চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন প্রাক্তন ফটোগ্রাফার রোজার ফ্রিৎজ্। উনি এর আগে ছবি প্রযোজনা করে প্রচুর পয়সা করে নিয়েছেন। অবশ্য এ ছবির প্রযোজকও উনি নিজে। তরুণ অভিনেতা ওয়ার্নার এণ্ডিক এখন দুটো ছবিতে অন্যতম প্রধান চরিত্র দুটি করছেন। তার মধ্যে একটি হল মে স্পিলস্-এর হুসুর জাখে শেসন ছবিতে একটু হিপ্পি চরিত্র আর অপরটা হল আইশেনলাউব ছবিতে জনৈক তরুণ জার্মানীর ভূমিকায়। স্পিল্সের সঙ্গে চিত্রনাট্য করার সময়ই এণ্ডিক ওই হিপ্পি চরিত্রটার অনুপ্রবেশ করিয়েছেন।

অভিনেত্রীদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই যার কথা মনে আসে সে হল উশি গ্লস। ইনি স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং সৈনিক-দের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। মে স্পিলের ছবির নায়িকা এ। স্বেচ্ছায় 'কুমারীত্ব' বলিদানকারীর কাহিনী নিয়ে যে ছবিটা, ওর মুখ্য চরিত্র করছে কুড়ি বছরের পূর্ণযৌবনা গিসা ফন ভাইটারসহাউজেন, এ ছবিতে তার অভিনয়-সাফল্য তাকে জার্মান চিত্র-জগতে স্থান করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে ফ্রানজ জাইৎস ফিল্ম কোম্পানী ওকে তাদের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়েছেন। দি

অভিনেত্রী এলকে সোমের

গোল্ডেনে পিলে ছবির মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রী পেত্রা পাউলি কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্রী। পেত্রা অবশ্য তার এই প্রথম চিত্রাভিনয়কে সিরিয়াসলি নেয় নি, একটা নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা করা গেল' এই ভাব। ইতিমধ্যেই সে চিত্রজগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ঝুলিতে বেশ কিছু তিক্ততা সঞ্চয় করে নিয়েছে, নইলে সে কি করে বলে—'স্বকীয় চিন্তা ও মতামতের কোনটাই কিছু বিসর্জন না দিয়ে এ লাইনে কে কত-দূর এগোতে পারে?' শোনা যাচ্ছে কার্লো পন্টির আগামী ছবিতে অভিনয়ের জন্য পেত্রা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এরই মধ্যে।

এই তরুণ চিত্র পরিচালকরা কতটা হৃদয়গ্রাহী, চিত্তাকর্ষক প্রতিভাকে চিত্র-জগতে এনেছেন তার বিচার না করেও সাধারণভাবে এটা বলা যায় যে, প্রতি অভি-নেতা অভিনেত্রীই আপাতদৃষ্টিতে আকর্ষ-ণীয়। তাদের আকর্ষণীয় শারীরিক অংশকে তাই পরিচালকরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে, বিভিন্ন ভাবে কোন লাজ-লজ্জার বালাই না রেখে দেখান। আধুনিক ছবির মূল হল নগ্নতা ও যৌনতা, জার্মান চিত্রজগতও তার ব্যতিক্রম নয়। বার্লিনের অন্যতম ক্ষুরধার সমালোচক ব্রডিনার সঙ্গত কারণ দেখিয়েই আলোচনা করেছেন যে, যৌনতার প্রতি প্রযোজক ও পরিচালকদের যে এই লাগাম-ছেঁড়া আকর্ষণ এর প্রধান কারণ হল

এ সব ছবির আর্থিক সাফল্যের নিশ্চয়তা। পুরোন যুগের খ্যাতনামাদের মত আজকের এই উঠতি অভিনেতা অভিনেত্রীরা চোখের পাতা না ফেলে দেহের পোষাক খুলে ফেলতে গররাজী নন, বরং উন্মুখ। লোকেশান শুটিং-এর সময় এক হাট লোকের সামনে নগ্ন হতে পেত্রা পালির এতটুকুও দ্বিধা আসে নি। সারা দেশের পনের হাজার পোস্টারে শুধু নগ্ন পেত্রার ছবি ছড়িয়ে আছে। পক্ষান্তরে অনেকে বলে—'জুলাই-এর অমন চামড়া পোড়ান রোদে নগ্ন হওয়া খুব আনন্দদায়ক।' এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন মরালিটির প্রশ্ন ওঠে নি। মোনিকা সিনেনবের্গ, ইংগ মার্শাল ও ক্রিস্টিনা ক্রুগার ও ক্লাউস লেমকের আকাপুলকো-তে তাদের অমন 'ললিত লবংগলতা' দেহখানি নিয়ে নেমেছেন।

তা যাই হোক, এ সব ছবির আসল আকর্ষণ হল ছবির পরিচালকরা। কাহিনী থেকে শুরু করে চিত্রনাট্য, সংগীত, ক্যামেরা সব কাজই প্রায় তাঁরা করেন। ফরাসী 'নিউ ওয়েভ্'-এর সূত্র ধরে এরাও চিত্রনির্মাণের সব দায়িত্ব কাঁধে নেয়। অবশ্য এ ব্যাপারে জার্মান চিত্রজগতের গুরুপদবাচ্য আলেকজাণ্ডার ক্লুজই প্রথম পদক্ষেপ শুরু করেন। এখনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণী পরিচালকদের মধ্যে স্কিমুনী, আলেকজাণ্ডার স্লোয়েনডর্ফ হ্যারো জেনফট, হার্স্ট লর্ফ, রোজার ফ্রিৎজে, ক্লাউস লেমকে, গোসনন্ড-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

এরা, নতুনেরা সবাই নিজেদেরকে একদলের দলী হিসেবে মানতে রাজী নন। মে স্পিল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন একবার—'আমরা যখন সবাই নতুন থিয়োরীতে বিশ্বাসী, তখন আমরা সবাই এক আত্মা এক প্রাণ, কিন্তু এখন আমরা যেভাবে কাজ করছি সকলে—সেখানে ঈর্ষা, দ্বেষ আসা স্বাভাবিক। আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি যে, পুরোনো দিনে এ জিনিষটা আরও বেশী পরিমাণে ছিল কি?' এ'দের এই পরীক্ষামূলক ছবিগুলো কালের করাল গতিতে কতদিন টিঁকে থাকবে, সমাজকে কি দেবে কি দেবে না! সাফল্য সম্পর্কে যতটা সংশয় থাকুক না কেন, এ ছবিগুলো দেশের চিত্রশিল্পে যে এক নতুন অনুভূতি ও নতুন চেতনার সঞ্চার করল তা বহু পূর্ব থেকেই আশা করা যাচ্ছিল। চিত্রজগতে এ সব ছবির প্রধান দান হল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নতুনের জাগরণ, চিন্তার অকৃপট প্রকাশ, আত্মপ্রকাশের স্বতঃপ্রবৃত্ততায় ঘৃতাহুতি।

এই সব নতুন ছবি, নতুন মুখ, নতুন প্রযোজকদের সাফল্য সত্ত্বেও জার্মান চিত্রজগৎ এখনও স্রোতের প্রতিকূলের ব্যবসার নৌকো বেয়ে চলেছে। গত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জার্মান চিত্র পরিবেশক সংস্থার অধিবেশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 'দিন দিন সিনেমা দর্শকের সংখ্যা কমছে, ফলে বক্স অফিসের আয়ও কমে যাচ্ছে।'

মিস ক্রিস্টিন কাউফমান

১৯৬৬ সালে মোট আয় ছিল ৬৪০ মিলিয়ন মার্ক, সেখানে ১৯৬৭তে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬০০ মিলিয়ন মার্কে অর্থাৎ নীট আয় ১৯৬৬ সালের ৬২২ মিলিয়ন মার্ক থেকে ১৯৬৭তে ৫৮৫ মিলিয়ন মার্কে এসে ঠেকেছে। চলচ্চিত্র পত্রিকা ফিল্ম এক্রে লিখেছে—'নিঃসন্দেহে বলা যায় টেলিভিশনই এর প্রধান কারণ। সিনেমা আজ বসবার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, তাই দুয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দর্শক আজ হতবুদ্ধি। তাদের এই হতবুদ্ধিতা দূর করা প্রয়োজন সর্বাগ্রে।' অবশ্য পত্রিকাটি একথা বলেনি যে, দর্শকদের ওপর টেলিভিশনের এই প্রভাব চিত্রজগতকে বাধ্য করতে পারে অন্য পথে যেতে। অর্থাৎ শুধুমাত্র সাধারণ প্রমোদ-মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রকে না দেখে পরিপূর্ণ আর্ট মিডিয়ম হিসেবে তাকে যদি রূপান্তরের চেষ্টা হয় নিষ্ঠা সহকারে, তবে তা নিশ্চয়ই দর্শকরা নেবে।

'টাইম' পত্রিকাও লিখছে যে এতদিন যাবৎ যে হলিউড চিত্রজগতের স্বর্গোদ্যান ছিল, যেখানে দর্শক মনোরঞ্জনের বহুল উপকরণ দিয়ে ছবি তৈরী হয়ে এসেছে, সেখানেও ভাঁটা পড়েছে আজ। একঘেয়েমি এসেছে পরিচালক প্রযোজকদের মধ্যে, তাছাড়া দর্শকদের কাছ থেকেও আগের মত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তাই সেখানেও এখন এলিনর পেরী, জন কাসাভেটিস, ব্রুস ব্রাউন, আর্থার পেন, মার্টিন রিট্ প্রভৃতি নতুন নতুন নাম পর্দায় ফুটে উঠছে। 'নিউ ফ্রিডম্' এর সুশীতল হাওয়া এখন ক্যালিফোর্নিয়ার কূল ধরে এধারে আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত বয়ে চলেছে। এতদিন বাদে হলিউড বুঝতে পেরেছে সরস্বতী ও গণেশের মধ্যে বিরোধ খুব একটা নেই। আর এটাও তারা উপলব্ধি করেছে যে হয়ত শিল্পের সংগে অর্থের 'বৈবাহিক' সম্পর্কও স্থাপন করা যেতে পারে যদি উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান নীতি বজায় রাখা যায়। ইতিমধ্যে সে ধরনের কিছু প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে। জার্মানীর বিখ্যাত চিত্র প্রযোজক হোর্স্ট ভেন্টলাণ্ড এডগার ওয়ালেসকে দিয়ে নতুন ছবির কাজ আরম্ভ করেছেন, আর্থার ব্রাউনারও কার্ল মেকে দিয়ে শিগ্গির নতুন ছবির কাজ শুরু করবেন। হয়ত জার্মান চিত্র জগত সরকারের নতুন 'ফিল্ম প্রমোশন আক্ট'এর সহায়তায় বেঁচে যেতে পারে এবারের মতন। এটা আশা করা যায় যে এই নতুন আইন জার্মানীর জটিল চিত্র ব্যবসায়ে নতুন দিক খুলে দেবে, কিন্তু নবা তরুণ প্রযোজকরা এই আইনের বিরুদ্ধে। তাঁদের বিরোধিতার প্রধান কারণ হোল নতুন আইনে বলা হয়েছে যে, সরকার আর্থিক সাহায্য সেই সব ছবিকেই দেবে যা ঐ আইনের বাঁধা আওতার মরালিটিকে মেনে চলবে এবং তিন লক্ষ মার্ক বক্স অফিস থেকে আনতে পারবে। তরুণ প্রযোজকরা এ আইন মানতে চান না আর কন্ট্রোলিং বডিতেও তাঁরা থাকতে চান না।

অভিযুক্ত কাহিনী **সানিন**

মিখাইল আর্তজীবাসেভ্

[মিখাইল আর্তজীবাসেভ (১৮৬৬-১৯১৯)—বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রুশ সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট ধারার অন্যতম প্রবর্তক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যৌন-স্বাধিকার এবং যথেচ্ছাচার নীতিতে বিশ্বাসী এই সব সাহিত্যিকেরা যৌন-প্রমত্ততার উৎকট চিত্র এ'কেছেন। আর্তজীবাসেভের সানিন প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৭-এ। বাংলা দেশে ইংরাজী অনুবাদ এসে পৌঁছায় তিরিশের দশকে। পৃথিবীর সর্বত্র আর্তজীবাসেভ এই একখানি উপন্যাসের জন্যই স্মরণীয় হয়ে আছেন। এই পৃথিবীখ্যাত উপন্যাসের আংশিক অনুবাদ প্রকাশিত হল।]

সানিন ঘরের বাইরে স্বাধীনভাবে মানুষ হয়েছিল। ভ্যাদিমির সানিন যেদিন ঘরে ফিরে এল তখন সে এক অসাধারণ মানুষ। মা এবং বোন লেডা দুজনের দৃষ্টি বিস্ময়ে বিস্ফারিত। ভাই লেডার জীবনে এক পরম আকর্ষণীয় ব্যক্তি। সেদিনই বাগান দেখাতে যখন লেডা তাকে ছায়াঘেরা পথে নিয়ে গেল তখন সানিন বলেছিল—চমৎকার দেখাচ্ছে তোমায়, কি সুন্দরই না হয়েছে। যে তোমার প্রেমে প্রথমতম সে সত্যি অসাধারণ সুখী হবে।

সানিনের কথা শুনে লেডা লজ্জা পায়।

সারাদিন একজন দেহ-উপভোগী তরুণ। অশ্বারোহী বাহিনীর কাপ্তেন। কিছুকাল ধরে সে লেডার পিছনে ঘুরছে। লেডার অন্তরে জেগেছে জীবন জিজ্ঞাসা। নোভিকভও লেডার রূপের মোহে আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তার পরাজয়ের মুহূর্তে হঠাৎ ড্রয়িংরুম থেকে সারাদিন বেরিয়ে এসে লেডার কোমরটা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ রেখে ধীর গলায় বলে—কি হয়েছে। মলিন কেন হেরি মুখচন্দ্রিমা তোমারি।

সারাদিনের ঠোঁটটা এসে লেডার কান স্পর্শ করে—লেডার সারা দেহে শিহরণ খেলে যায়। সারাদিনের চেয়ে শিক্ষায়, বংশ-সম্মানে, সংস্কৃতিতে লেডারা অনেক ওপরের ধাপে। সারাদিন কোনো মতে লেডার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ওর বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয়ে তাই আপনাকে ছেড়ে দিয়ে ওর মন্দ লাগছিল না। যে গভীর গহনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে যে কোনো মুহূর্তেই ঝাঁপ দেওয়া যায়।

অস্পষ্ট গলায় সে বলে, কেউ যদি দেখে ফেলে।

সারাদিনের পেষণের কোনো জবাব নেই, অথচ আপনাকে আলিঙ্গনমুক্ত করার কোনো চেষ্টাও নেই। এই নিশ্চল নীরবতায় সারাদিন অস্থির হয়ে উঠছে। সে লেডাকে প্রবল চাপে চূর্ণ করতে চায়। সে কানে কানে আবার বলে—কথা দাও, তুমি আমার কাছে আসবে?

লেডার সারাদেহ কাঁপছে। এই প্রশ্ন এই প্রথম নয়। যতবার এই প্রশ্ন উঠেছে ততবার ওর দেহের এই অবাধ্য শিহরণ বাধা সৃষ্টি করেছে।

এইবার আকাশের চাঁদের দিকে মোহ-ভরা দৃষ্টি ছড়িয়ে লেডা শুধু বলে, কেন?

তুমি বলছ কেন? সারাদিন জবাব দেয়, আমি যে তোমাকে চাই। কথা বলতে চাই। নিবিড় করে পেতে চাই। বল তুমি আসবে!

এই বলে সারাদিন লেডাকে দুহাতে বুকের ভেতর টেনে নেয়। কি এক প্রচণ্ড জ্বালায় লেডার স্নায়ুশিরা অবশ। তার দেহ কঠিন হয়ে এসেছে। সে সারাদিনের কাছে আরো এগিয়ে আসে—আশংকায়, আনন্দে, উত্তেজনায় লেডার সমগ্র দেহলতা আকুল হয়ে ওঠে। চারপাশের জগৎ যেন লুপ্ত—আকাশে চাঁদ নেই, অতিপরিচিত বাগানটা যেন শূন্যে বিলীন। মাথাটা কেমন যেন আচ্ছন্ন। অনেক কষ্ট করে আপনাকে মুক্ত করে নেয়। তারপর বলে—আচ্ছা—যাবো। লেডার গলা শুকিয়ে গেছে, যেন সে অন্তহীন পারাবার পার হয়ে এল।

কি এক অজানা বেদনার নিবিড় পুলকে লেডার সারা অঙ্গ ভরে যায়। সারাদিনের মনের গভীরে বিজয়ের উল্লাস। এই সুরুচি-সম্পন্ন অক্ষত কৌমার্যের গর্বে গর্বিত মেয়েটিকে মনে মনে দেহসম্ভোগের সঙ্গিনী হিসাবে কল্পনা করে নেয়, ভাবে—নগ্ন তনু নিয়ে লেডা তার কাছে ধরা দিয়েছে।

এর কয়েকদিন পরে, এক সন্ধ্যায় লেডা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঘরে ঢুকে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে চিন্তায় আকুল হয়ে পড়ে। তার দেহে ও মনে একটা ক্লান্তির বোঝা। সারাদিনের সঙ্গে একটু বেশী রকমের ঘনিষ্ঠতা করে ফেলেছে, যে ওর চেয়ে অনেক নীচের স্তরের মানুষ তার করতলগত হয়ে পড়েছে। সারাদিনের নির্দেশে তাকে চলতে হয়, এখন লেডার কাছে সারাদিন আর খেলার পুতুল নয়, সেই যেন কর্তা, আর ও তার কেনা বাঁদী—।

কি করে যে এই অবস্থায় পৌঁছেছে তা ভেবে পায় না। গোড়ায় গোড়ায় উত্তেজনা-মুখর আনন্দময় দিনগুলি বেশ লাগত। তারপর এসেছে সেইদিন—যেদিন সব কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেল। একদিন সে অতল গহ্বরে ঝাঁপ দিয়েছিল, তারপর হারিয়ে ফেলেছে আত্মনিয়ন্ত্রণের সব ক্ষমতা। কামনার পাত্র উচ্ছল করে আপনাকে উৎসর্গ করেছে—আজ সে হতমান, ক্লান্ত, অবসন্ন। এখন আবার মনে জাগছে ধরা দেওয়ার সেই প্রথম মুহূর্তের কথা। সেদিনের সেই উত্তেজনাময় মুহূর্ত কোথায় গেল। কি এক বিশ্রী মোহে একটা নিম্নস্তরের মানুষের কাছে জীবনটা উৎসর্গ করে দিয়ে আজ সে নিঃশেষিত। ভাবল—যাই হোক, যতদিন বিবাহ না হচ্ছে ততদিনই ভয়। কি হবে অকারণ এই ভাবনা ভেবে!

সে বলে উঠল—যাক গে যা হয়েছে। আমায় যদি প্রাণ চায়, ভালোবাসব। যদি না চায় বাসব না।

নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানে এসে লাগে। তার কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই সিনা কার্সাভিনার চেয়েও মধুর।

আকাশের দিকে হাত ওঠায় লেডা, ওর সুন্দর স্তনচূড়া কেঁপে ওঠে।

জানালার ধার থেকে সানিন প্রশ্ন করে—লেডা ঘুমোও নি নাকি?

ভয়ে শিউরে ওঠে লেডা। তার নগ্ন বুকে একটা ওড়না ঢেকে সে জানলার কাছে এগিয়ে আসে। বলে, বাবা, এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তুমি!

সানিন ধীর গলায় বলে—কি চমৎকার! তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

লেডার মনে হয় সানিন হয়ত জেনেছে ওর মনের কথা। সমগ্র দেহ দিয়ে সে সানিনের চোখের চাওয়ার অর্থ বুঝতে চায়। সব পুরুষের চোখই কি ঐ মাতালের মত জ্বালাময়? সানিনও কি তাদের দলে? সে ওর আপন ভাই। লেডার মনে হয় একটা কুৎসিৎ সাপের মত জন্তু ওর দেহে বিচরণ করছে! সে শুধোনো গলায় শুধু বলে, আমি তা জানি। বলে সে তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দেয়। বললে, শুতে যাই।

তারপর কাঁচের সার্সিটা বন্ধ করে দেয়।

বাইরে চাঁদের আলোয় সানিনকে স্পষ্ট দেখা যায়, নীল নীল আকৃতি। ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে, মুখে মৃদু হাসি।

লেডা বিছানায় শুয়ে পড়ে, তার দেহে অসহ্য জ্বালা। সারা দেহমনে প্রচণ্ড ভয়।

সেদিন অনেকক্ষণ জেগে রইল লেডা—ভাবে ওর কুমারীত্ব নষ্ট হয়েছে তাই এই অবস্থা। সারদিনের কাছে এভাবে আত্ম-সমর্পণ করা ঠিক হয়নি। আজ তাই ভাই-এর চোখে এ কিসের চাউনি। কি এই সন্দেহ?

যৌবন—যৌবনের আনন্দবহ্নিতে দেহ জ্বলবে—যতদিন দেহ থাকবে যতদিন যৌবন থাকবে ততদিন আনন্দ। এই দেহ—এই দাহ এমন কোমল, সুন্দর তনু নিয়ে নিজের ইচ্ছামত যা প্রাণ চায় তাই করবে।

এমনই স্ববিরোধী সহস্র প্রশ্নের গভীরে সে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

গরম কাল। আলোর বন্যা নেমেছে আর তেমনই প্রচণ্ড তার উত্তাপ।

জামার বুকের সব কটি বোতাম খুলে দিয়ে সিগারেট মুখে পায়চারী করছিল সারদিন। সোফায় দেহ মেলে দিয়েছে তানারফ। পঞ্চাশটা রুবলের বড় প্রয়োজন। বন্ধুদের কাছে কয়েকবার চেয়ে বিফল হয়েছে। বার বার তিনবার অনুরোধ করতে দ্বিধা হচ্ছিল, আশা ছিল সারদিন নিজেই হয়ত প্রসঙ্গটা তুলবে। কিন্তু গেল মাসে সাতশ রুবল হেরেছে, সে এখন চালাক হয়েছে।

এমন সময় বেয়ারাটা ঘরে ঢুকে সবিনয়ে জানায়—বীয়ার আর পাওয়া যাবে না। সব খতম।

তানারফ বীয়ার চেয়েছিল, সে রেগে ওঠে, ভাবে, নগদ দাম না দিলে দেবে না। বেয়ারা মিথ্যা বলছে।

সারদিন বিরক্ত হয়ে বাক্স খুলে দুটি রুবল ছুঁড়ে দেয়। বীয়ার এসে গেল। বীয়ার পান করে ঠাণ্ডা হল সারদিন। তানারফের কাছে গিয়ে বলে লেডা কাল আবার এসেছিল। চমৎকার মেয়ে।

তানারফ নিজের জ্বালায় জ্বলেছে, ওর কথায় কান দেয় না।

এই অবস্থা লক্ষ্য করে না সারদিন, সে হঠাৎ হেসে বলে ওঠে, জান কাল ওকে শেষ পর্যন্ত বলতে হল—প্রথমটায় যেমন বাধা হয় তেমন বাধা এসেছিল, তবে আমি চোখের দৃষ্টিতেই বুঝি—বলতে কি এমন আনন্দ জীবনে যেন আর পাওয়া যায়নি।

কথাগুলি উচ্চারণ করার সময় ওর মনের পাশবিক প্রবৃত্তি যেন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

তানারফ ভাবে—একেই বলে বরাং।

এমন সময় বাইরে থেকে আইভানফ হাঁক দেয়, সারদিন আছো নাকি? আসতে পারি?

সঙ্গে সঙ্গে একদল আড্ডাধারী ঘরে এসে প্রবেশ করে—আইভানফ, নভিকভ, ক্যাপ্তেন মালিনস্কী, সানিন—ইত্যাদি। সারদিন ভাবে, আরো পঁচিশ রুবল খসবে।

অনেকক্ষণ হুল্লোড় চলে, যেন মাতালের প্রলাপ। সমস্ত আলোচনাটাই প্রায় রুচি-বিগর্হিত কুৎসিৎ আলোচনা। মেয়েমানুষ-ঘটিত। পিটস্‌বার্গ থেকে সারদিনের বন্ধু ভোলাসিন এসেছিল, সেও মেতে গেল এই আনন্দ-হুল্লোড়ে। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু—লেডা। তার নাম উচ্চারিত হচ্ছিল না বটে, তবু বোঝা যায়। একবার ত সারদিন আর নভিকভে হাতাহাতির জোগাড়।

ঠিক সেই সময় বেয়ারা এসে সারদিনকে জানায়, জনৈক তরুণী ওর জন্য দাঁড়িয়ে আছেন।

সারদিন ভাবে, লেডা নাকি?

ভোলাসিন চঞ্চল হয়ে বলে ওঠে, পুরোন ব্যাধিটা আজো আছে দেখছি।

আইভানফ বলে মেয়েমানুষ—মানে মেয়েলোক। হাজার মানুষের মাঝখানে একটা খাঁটি বেটাছেলে পাওয়া যায় না, কিন্তু মেয়েমানুষ সব সেই একপ্রকার—নগ্ন, লাঙ্গুলহীন বানরী। সব মেয়েই সমান।

ফনডাঁজ ঠাট্টা করে, চিন্তায় মৌলিকতা আছে বটে।

নভিকভ সমর্থন করে, খাঁটি কথা।

ঘরে ততক্ষণে জুয়া খেলা শুরু হয়েছিল, সারদিন তানারফকে বলল ওর হয়ে খেলতে।

মালিনস্কী বলল, মেয়েটা একবার দেখাবি না ভাই।

তানারফ তাকে টেনে বসিয়ে দেয়।

সানিন ভাবে—তাহলে কি লেডা এসেছে? তার অমন বোনটি না জানি কি প্যাঁচে পড়েছে।

ভাবতে ভাবতে মনে একটা বেদনা ও সেই সঙ্গে ক্রোধ জেগে ওঠে।

সারদিনের বিছানার এক প্রান্তে বসে-ছিল লেডা। তার সারা দেহে একটা অস্থির অস্বস্তির ছাপ। আগের দিনের গরবিনী রমণীর ভঙ্গী অন্তর্হিত। এ এক নিদারুণ হতাশার অভিব্যক্তি। সারদিনও বুঝেছে এ লেডা সেই লেডা নয়। এ রমণীমূর্তি রাজ্যহারা অনাথার, করুণার ভিখারী হয়ে এসেছে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে।

সারদিন দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে শ্লেষভরা গলায় বলে, তোমার দেখছি সাহস কম নয়। ওঘরে রয়েছে একগাদা পুরুষ ভীড় করে, আর তুমি বেশ অবলীলাক্রমে এসে হাজির হয়েছ। জানো তোমার ভাইও এ দলে হাজির।

লেডার চোখের দিকে তাকিয়ে একটু সামলে নিয়ে সারদিন বলে, যাকগে ওসব কথায় কাজ নেই। তোমার দিকটা বিবেচনা করে বলছিলাম, তোমাকে আবার দেখতে পেলাম, বেশ ভালো লাগছে।

লেডার উত্তাপভরা হাতদুটি তুলে ধরে ওষ্ঠপ্রান্তে ঠেকায় সারদিন।

লেডা এতক্ষণে বলল, আমাকে ভালো লাগে? সত্যি! কি খারাপ চেহারা হয়েছে আমার, কি কুৎসিত। কি যে হবে শেষপর্যন্ত তাই ভাবি, শুধু তুমিই আছো।

সারদিন লেডার হাতে চুমু খায়। সোহাগ স্পর্শ। দুদিন আগে এই বিছানায় শুয়েছিল ও আর লেডা, বালিশে মাথা রেখে দুটো হাত দিয়ে লেডাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেদিনকার সেই নিবিড় স্পর্শে কি আনন্দ!

সেদিন রমন-রণে লেডার মাধ্যমে পেয়েছে সারাজীবনের সঞ্চয় এযাবৎ যত রমণীসম্ভোগ করা হয়েছে তার ফলশ্রুতি। আর আজ এই মুহূর্তে এই রমণীর সাহচর্য যেন অসহনীয়। যেন একটা পঙ্কিল আবর্তে জড়িয়ে পড়েছে সারদিন—নিষ্ক্রমণের পথ নেই, মুক্তি নেই।

অসহায় ভঙ্গীতে সারদিন বলে ওঠে, মেয়েমানুষ জাতটা কি বেয়াড়া—বিনোঙরা!

শঙ্কিত লেডা ওর মুখের দিকে তাকায়। সারদিনের এই উক্তির অর্থ সুগভীর। আর কোনো আশা নেই। সারদিনকে নিঃস্ব হয়ে আত্মদান করেছে লেডা, উজাড় করে দিয়েছে যা কিছু সম্বল। যা দিয়েছে তার পরিমাপ হয় না। কুমারী মন, শুচি-শুভ্র সতীত্ব, যা কিছু গর্ব করার, যা কিছু অহঙ্কার সবই দেবতার চরণে পুজোর অর্ঘের মত নিবেদন করেছে। আর সারদিন ওর দেহমন কলুষতায় পূর্ণ করে, যা কিছু রস নিঙড়ে নিয়ে উচ্ছিষ্ট আবর্জনার মত বর্জন করেছে।

কান্নায় ভেঙে পড়তে চায় লেডা—কিন্তু না কান্না নয়, চরম প্রতিহিংসা নিতে হবে। রাগে দুঃখে, ঘৃণায়, তার মন ভার উঠেছে। সে বলে—তুমি যে কি নির্বোধ তা জানো না।

লেডার এই মুখভঙ্গী, কথা বলার সুর, সবই ওর পরিচিত চরিত্রের পরিপন্থী। লেডার চরিত্রের এই দিক সারদিনের কল্পনাতীত। সে শুধু বলে, তোমার কথাগুলো কেমন রসহীন মনে হচ্ছে!

লেডা জবাবে বলে, ইনিয়ে-বিনিয়ে ভালো ভালো কথা বলার মত মন আজ নেই।

সারদিন ওকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করে। হাত ধরে প্রচন্ড নাড়া দিতে লেডা শান্ত হল। সে বুঝল, পাশের ঘরে বন্ধুরা রয়েছে ওর কথায় সারদিনের হয়ত অস্বস্তি হবে। মাথা নাড়া দিয়ে সে বলে, তোমাকে আর মিথ্যা প্রবোধ দিতে হবে না।

সারদিন এইবার বলে, দেখ—সব জিনিসের একটা সীমা আছে।

লেডা উন্মাদিনীর মত চেঁচিয়ে বলে ওঠে, একটা কিছু বলো। আমাকে না হয় সান্ত্বনা দাও—

দুজনের মুখ থেকে সেই ভব্য ভদ্র প্রণয়ীর ভঙ্গী অন্তর্হিত। এখন ওরা যেন দুটি কলহরত পশু।

সারদিনের মাথায় আগুন জ্বলন্ত, সে ভাবে লেডাকে তার আসন্ন সন্তানের জন্য কিছু না হয় টাকাই দেবে। যে উপায়ে হোক ওর হাত থেকে ত্রাণ পাওয়া চাই। ও শান্ত গলায় বলে, দেখো—এ অবস্থার কথা কি তখন ভেবেছি।

লেডা উত্তাপভরা কন্ঠে বলে, ভাবোনি! কেন, কেন ভাবোনি। এই নিশ্চিন্ত হওয়ার স্বাধীনতা কোথায় পেলে! কে দিয়েছে?

মানে, আমি এমন কোনো কথা তোমাকে বলিনি যে—।

লেডা বোঝে সারদিন দায়িত্ব এড়াতে চায়। তার হাতে কোনো জোর নেই। হাত দুটি দুপাশে মেলে দিয়ে ও বিছানায় বসে রইল, তারপর আত্মগতভাবে প্রশ্ন করে—কি করব? কি করার আছে—জলে ডুবে মরব—!

—না না, ওসব কি কথা—!

লেডার দৃষ্টি এখন কঠোর, সে বলে, ভিকতর সারগীজেভিচ আমি জানি বাপারটায় আপনার তেমন অখুশী হওয়ার কারণ ঘটবে না—

লেডা উঠে দাঁড়ায়। তার আশা ছিল, যার কাছে জীবনের পরম রতন একদিন বিলিয়ে দিয়েছে, এই নিদারুণ দুঃসময়ে সে এগিয়ে আসবে সাহায্য করতে। কিন্তু সারদিনের এই কথা ও মনোভঙ্গীতে ও আকুল হয়ে পড়ে। প্রতিহিংসা স্পৃহা অন্তরকে আকুল করে তোলে—তবে সারদিনের ও [illegible] না করবে। সারদিনকে আঘাত হানতে গেলে ও নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

ও শুধু উচ্চারণ করল, পশু!

চাপা গলায় উচ্চারিত এই কথাগুলি যেন সাপের ফোঁস-ফোঁসানির মত শোনায়।

ওদিকে পাশের ঘরে খেলায় সকলের আগ্রহ কমে এসেছে—সানিনই প্রথম উঠে দাঁড়াল।

আইভানফ প্রশ্ন করে—কিগো যাচ্ছ কোথায়?

পাশের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে ইঙ্গিত করে সানিন বলে, দেখি ওরা কি করছে!

আইভানফ বলে, আরে ছোঃ। ওসব বোকামী করার চেয়ে এসো এক গ্লাস টানা যাক—

সানিন বলে, বোকা কে, আমি? তুমি বোকা নও?

সানিন ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের গলিপথে ঢুকে পড়ে। কাঁটালতায় ঘেরা বাড়ি—সারদিনের শোবার ঘরের জানলার পাশে সে সহজেই গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরের ভেতর লেডা তখন বলছে,

—তুমি কি এখনও বুঝতে পারো নি এই কি তোমার ধারণা?

লেডার কণ্ঠস্বর ধরা-ধরা, তার ভেতর মেশানো আছে সুগভীর হতাশা। ইঙ্গিতটা সহজ। কি চমৎকার মেয়ে লেডা, ওর বোন আজ অন্তঃসত্ত্বা। কথাটা মনে করতেও খারাপ লাগে সানিনের। লেডার এই দুরবস্থায় সে বেদনা বোধ করে।

একটা শাদা প্রজাপতি বাগানের চারা গাছগুলোর ওপর উড়ে বেড়াচ্ছিল। সেদিকে নজর থাকলেও কান তার বন্ধ ঘরের দরজায়।

লেডা যখন বলে উঠল, পশু। তখন আর দাঁড়ায় না সানিন। কাঁটাগুল্মের ঝোপ পার হয়ে সে বেরিয়ে আসে—কে দেখল না দেখল তা আর চিন্তা করে না।

লেডা কিন্তু বাড়ির পথে না গিয়ে অন্য পথে চলল। গরমকাল, দুপুরবেলা—জনহীন পথ। দু' একজন যা ছিল তাদের মধ্যে একজন চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হল, কথাও হল যান্ত্রিক ভঙ্গীতে।

সারদিনের ওপর তার কোনো রাগ নেই। কোনো উদ্দেশ্য না নিয়েই সে তার কাছে গিছল। যে দারুণ উৎকণ্ঠা ওর মনে, তার কিছু অংশ সারদিন বহন করুক এই ছিল ওর মনে—হয়ত সারদিনকে ছেড়ে থাকা যাবে না—এই মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন একাকী অতীতের স্মৃতি দুঃস্বপ্নের মত বহন করতে হবে, যা অতীত তা এখন মৃত। যেটুকু আছে তা একান্তভাবে ওর একার, সে ভার সে একাই বহন করবে।

কিন্তু এখন কি করা যায়। যা গেছে তা আর ফিরে আসবে না। এতদিন মাথাটা উঁচু ছিল। এখন ও সবায়ের চোখে হীন, কুৎসিত রমণী।

কিন্তু না তা হবে না। মনের তেজ এবং দেহের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে কেউ ওকে স্পর্শ করতে পারবে না। ধরাছোঁয়ার অতীত হয়ে থাকবে সে।

আপন মনে লেডা বলে ওঠে, সোজা পথ ত' রয়েছে। কিসের চিন্তা।

ক্রমশ জনবসতি বিরল হয়ে আসে। প্রান্তর পার হয়ে নদী প্রবাহিত, তার পাশে সাঁকো। লেডার মন এখন মেঘের ঘন ঘোমটায় ঢাকা। তার মাথাটার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে আসছে।

ওর চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। জীবন নিয়ে ঘোর বিতৃষ্ণায় পড়েছে। সাঁকোটার রেলিং-এর ওপর দেহের ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ায় লেডা, হাতের দস্তানাটা পড়ে গেল জলে। চোখ মেলে দেখল লেডা জলের একটা আবর্ত সেই দস্তানাটা গ্রাস করল। এতটুকু চিহ্ন কোথাও রইল না—।

আহা! দস্তানাটা পড়ে গেল।

চমক ভাঙে লেডার। একটি মোটাসোটা কিষাণ রমণী পাশে এসে প্রশ্ন করছে দস্তানাটা কি করে পড়ে গেল। ও কি জানতে পেরেছে লেডার মনের কথা। ইচ্ছে হয় তাকে জড়িয়ে ধরে মনের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়। কিন্তু আত্মসংবরণ করে বলে ওঠে—যাক্।

লেডা ভাবে, না, এইখানে কিছু করা যাবে না। অনেকে দেখে ফেলতে পারে। চট্ করে জল থেকে কেউ উদ্ধার করবে।

নদীর ধার ঘেঁষে—ফুল, পাতা, কাঁটাগুল্ম অতিক্রম করে চলে লেডা। একটা নির্জন অঞ্চল চাই—কেউ নেই। কেউ তাকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে আসবে না এমন একটা নির্জন প্রান্তর চাই।

লেডা প্রার্থনায় বসে পড়ে—হে ঈশ্বর। শক্তি দাও। সর্ব খর্বতাকে দহন করো।

কিছুদিন আগে শেখা একটা গান মনে পড়ে। স্কুলে শেখা সেই গান হঠাৎ মনে জাগে। মার মুখখানি মনে ভেসে আসে। না আর বিলম্ব করা উচিত নয়। সকল জ্বালার হাত থেকে নিষ্কৃতি চাই। এতদিন যারা
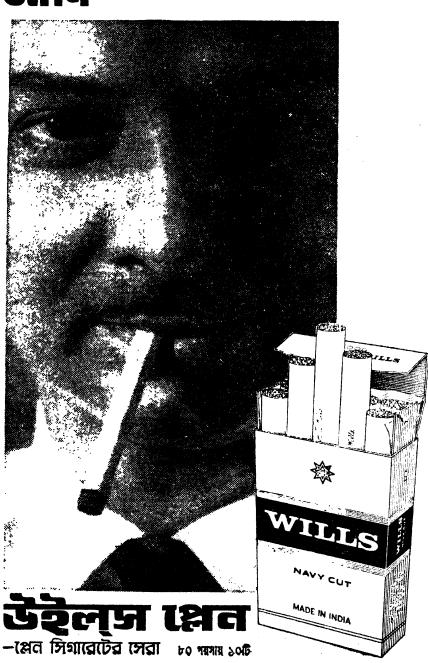
ভালোবেসেছে ওকে, তারা ওর কোন সত্তাকে ভালোবাসে। কোন সত্তা তাদের ভালোবাসা পেয়েছে? সব মিলিয়ে ও যা নিশ্চয়ই তার সামগ্রিক মূল্যের বিনিময়ে নয়। তারা ভালোবেসেছে ওর ভিতর তাদের নিজেদের সত্তাকে প্রতিফলিত করে। আজ সে বিচ্যুত হয়েছে, বাঁধা সড়ক থেকে নেমে এসেছে, আজ আর তাকে কে ভালোবাসবে? কি ওর মূল্য তাহলে?

আশা, আশ্বাস, আনন্দ, আগ্রহ, আশংকা সব কিছুর আজ অবসান ঘটেছে। সামনে এই যে বিস্ফারিত নদী, এই নদীই আজ হোক আরামের শয্যা।

এমন সময় এক পুরুষের প্রতিমূর্তি ভেসে আসে, সে অতি দ্রুত এদিকে আসছে, কাঁটা-লতার বাধা পার হয়ে। শ্রান্ত মানুষটি হাঁপিয়ে পড়েছে—নদীতে আত্মবিসর্জনে উদ্যত লেডাকে জড়িয়ে ধরে বাধা দেয় তার ভাই সানিন।

—ও কি করছ তুমি? এ কি খেয়াল তোমার?

কি যে ঘটে গেল তার হিসাব-নিকাশ করার শক্তি নেই লেডার—সে কি জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, না পড়তে যাচ্ছিল? সানিন তাকে কি আসন্ন সংকটের হাত থেকে ত্রাণ করল। কেমন যেন সূত্রগুলি সব জট পাকিয়ে গেছে, ওর স্নায়ু শিরা আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

ওকে টেনে নিয়ে একটা ঝোপের পাশে বসিয়ে দিয়ে সানিন ভাবে এইবার কি করা যায় ওকে নিয়ে!

লেডা এতক্ষণে ওকে জড়িয়ে ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে।

সানিন প্রবোধ দিয়ে বলে—কি হল! এত উতলা হচ্ছ কেন?

কান্নার বেগ কমিয়ে সানিনের মুখের দিকে নীরবে তাকায় লেডা। সানিন বলল, আমি আগাগোড়া সবই জানি।

এই সংবাদ লেডার মনে দারুণ আঘাত হানে। সানিন জেনেছে ওর জীবনের কলঙ্কময় কাহিনী। শিউরে ওঠে লেডা।

সানিন প্রশ্ন করে, কি হল! তোমার শরীরটা কেঁপে উঠল কেন? আমি সব জেনেছি বলে কি এমন শিউরে উঠলে? সারদিন যদি তোমাকে বিয়ে নাই করে তাতে হয়েছে কি? ওর আছে কি, শুধু ঐ সুন্দর চেহারাটা! পরিপূর্ণরূপে ভোগ করেছ ত' এতদিন।

লেডা বলে, না, না, মিছে কথা। সেই আমাকে ভোগ করেছে। আমার দুর্ভোগ।

—হাঁ, দুর্ভোগ তোমার! সন্তান প্রসব করা একটা বিশ্রী কান্ড, বেশ হাঙ্গামারও বটে। তা ছাড়া, সবাই তোমাকে দোষী মনে করবে—। এর পর একটু চুপ করে থেকে সানিন বলে, কিন্তু লেডা তাতেই বা কি : কারো কোনোরকম ক্ষতি ত' হয়নি।

আবার একটু থেমে সানিন বলে, আমি তোমাকে হয়ত কোনোরকম পথ বাৎলে দিতে পারি, কিন্তু আমার সে উপদেশ গ্রহণ করার মত মানসিক প্রস্তুতি তোমার এখন নেই। তবে একথা জেনো যে আত্মহননে এই সমস্যার সমাধান হবে না। যদি তুমি মারা যাও, সবাই জানবে কেন মরলে, তাহলে মরে আর লাভ কি! তোমার ছেলেপুলে হওয়ার সম্ভাবনা, তাই লোকনিন্দার ভয়ে তুমি আত্মহত্যা করবে, কিন্তু তাতে কি লাভ? যারা তোমার কেউ নয়, তোমাকে চেনে না জানে না তাদের কথায় কি এসে যায়! তোমার যারা আপনজন তারা যদি বিয়ে না করেও তুমি গর্ভবতী হয়েছ বলে তোমাকে দন্ড দিতে চায় তাহলে তাদের জন্যই বা মন খারাপ করার কি প্রয়োজন?

এইবার বেদনাবিহ্বল দৃষ্টিতে সানিনের মুখের পানে তাকিয়ে লেডা বলে, তাহলে আমি কি করব বলে দাও!

—যার প্রাণ এসেছে তাকে মারা কঠিন, কিন্তু আজো যার জন্ম হয়নি, যে শুধু একটা ভ্রূণ মাত্র, তাকে—

একটু চুপ করে থেকে সানিন বলে :

—তোমাদের দুজনের বিবাহ হয়নি, তোমরা দুজনে দুজনকে ভালোবেসেছ, ভালোবাসার মোহে ধরা দিয়েছ, বিলিয়ে দিয়েছ আপনাকে, নিঃশেষিত করে দেহদান করেছ। তাতে আর কি হবে? এখন একটা উপায় আছে। যে বাচ্চাটি এখনও ভূমিষ্ঠ হয়নি তাকে পৃথিবীর আলো দেখতে না দেওয়াই একমাত্র সহজ পথ। সন্তান যদি জন্মায় তাহলে অনেক দুর্ঘট ঘটে যাবে, অনেক অস্বস্তি।

লেডা কাতর গলায় বলে, এ আমি কি করে পারি বলো।

সানিন বলে, বেশ তাই যদি না হয় তাহলে এমন কিছু করতে হবে যাতে লোক জানাজানির পথ রোধ হয়। সারদিন যাতে এখান থেকে যায়, তার বন্দোবস্ত করছি। আর তুমি নভিকভকে বিয়ে করো। যদি সারদিন তোমার জীবনে না আসত তাহলে ত' এই ছেলেটিকেই তুমি বিয়ে করবে ঠিক করেছিলে—?

লেডা কান্নায় ভেঙে পড়ে, কিন্তু সেত' দারুণ বঞ্চনা, ঘোরতর অন্যায় হবে।

—ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তুলো না। অনেক সময় প্রসূতিকে বাঁচানোর প্রয়োজনে পেটের ভেতরকার প্রাণময় সন্তানকে নষ্ট করতে হয়। যার অস্তিত্ব শুধু এখনও অনুভবের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ, তাকে শেষ করতে দোষ কি। একটা জীবনের সব কিছু আশা-আশ্বাস যখন তার ওপর নির্ভর করে রয়েছে, তখন যা যথাযোগ্য তাই করাই কর্তব্য। আমরা বলি জীবজগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ, সেই মানুষ যদি নিজের সৃষ্টি বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে বাঁধা থাকে, আতংকিত হয় তাহলেও কি তাকে বলব শ্রেষ্ঠ?

সানিন একটু চুপ করে থাকে। তারপর আবার বলে, নভিকভের বুদ্ধিশুদ্ধি থাকলে সে তোমাকে সাগ্রহে গ্রহণ করবে। না হয় তুমি আর একজনের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিলে, তাতে কি তোমার দৈহিক সৌন্দর্য ম্লান হয়েছে? ভালোবাসার স্বাদ তুমি পেয়েছ, সেই মধুরতার স্বাদ গ্রহণ করতে আবার ভালোবাসবে। কোনো কথা নয়—ভালো করে বুঝে দেখ, যদি বিয়ে নাই হয় লেডা, বেঁচে থাকবে না কেন? অপরিচিত কোনো শহরে গিয়ে বাসা বাঁধবে—কে চিনবে সেখানে তোমাকে?

লেডা এইবার বলে ওঠে, কে জানে, তোমার কথামত কাজ হয়ত করা সম্ভব হবে।

সানিন বলে, দেখ লেডা তুমি আত্মহত্যা করলে তোমার ঐ পরম রমণীয় দেহটা পচে ঢোল হয়ে ভেসে উঠত।

ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। লেডা বলে ওঠে, না—না—!

সানিন বলে—ভাবো তখন তোমাকে কি কুৎসিত না দেখাতো—!

লেডার দেহমনে নতুন শক্তি সঞ্চারিত, সে বাঁচবে সে বেঁচে থাকবে। তার মনে নতুন করে বাঁচার প্রবল বাসনা জেগেছে। সে বলল, আমি থাকতে চাই, যা হওয়ার তা হোক আমি বাঁচব।

লেডার দেহে শক্তি সঞ্চারিত। সে আকাশের দিকে তাকায়। প্রখর তপন, স্বচ্ছ নদী জল, সামনে সানিন, তার শান্ত মুখচ্ছবি। আকাশভরা সূর্য তারা—সে এখন পুনরুজ্জীবনের পথে—নতুন আশার আলো তার চোখে—।

সানিন উৎসাহভরে বলে, সাবাস! জানো লেডা, একেই বলে জীবনসংগ্রাম!

ইন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক সংক্ষেপিত ও অনূদিত।।

প্রেক্ষাগৃহ
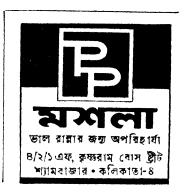
জাতীয় সংকট

২৫ মে, শনিবার ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্পে বর্তমান সংকটকে উপলক্ষ্য ক'রে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাহিত্যিকদের সভায় এই অভিমত জ্ঞাপন করা হয় যে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান সংকট হচ্ছে একটি জাতীয় সংকট। কারণস্বরূপ বলা হয় যে, যে-হেতু বাঙলা চলচ্চিত্র বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সেইহেতু চলচ্চিত্রের সংকটকে বাঙলার সাহিত্যিকবৃন্দের সঙ্গে বাঙলার আপামর জনসাধারণও জাতীয় সংকট ব'লে মনে করতে বাধ্য। এই সভায় সভাপতিরূপে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে ধ্বনিত হয়, এই মহৎ শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গুরুতর আশংকা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যিকদের শুধু আর্থিক সম্বন্ধই নেই, তার সঙ্গে শিল্পের সম্পর্কটিও অটুটভাবে গ'ড়ে উঠেছে। আবেগপূর্ণভাবে মনোজ বসু বলেছেন, বাঙলার প্রতিটি চিত্রগৃহে বাঙলা ছবি আবশ্যিকভাবে দেখানোর সঙ্গত দাবি তুলতে হবে; যেখানে শতকরা তিরিশ ভাগেরও কম বাঙালীর বাস, সেই অঞ্চলেরও চিত্রগৃহে বাঙলা ছবি দেখাতে হবে, অবাঙালীকে বাঙলা শেখানোর জন্যে, অশ্লীল হিন্দী ছবির ন্যক্কারজনক প্রভাব থেকে বাঙালীকে মুক্ত করতেই হবে। এঁরা ছাড়া সভায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এবং চলচ্চিত্রশিল্পের পক্ষ থেকে অজিত বসু, অসিত চৌধুরী, ঋত্বিক ঘটক, পূর্ণেন্দু পত্রী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সরোজ দে, বিজয় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

সভায় নিম্নলিখিত চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ (১) সকল চিত্রগৃহে বাঙলা ছবির প্রদর্শনী আবশ্যিক করতে হবে; (২) বাঙলা ছবির নির্মাণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উপযুক্তভাবে সহযোগিতা ও সাহায্যদান করতে হবে; (৩) পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক শিল্পসম্মত বাঙলা ছবির প্রদর্শনীর জন্যে রাজ্যে আর্ট থিয়েটার গঠন করতে হবে এবং (৪) বাঙলা ছবির প্রদর্শনীকে ব্যাপক করবার জন্যে চিত্রগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে বাঙলা চলচ্চিত্রের যে-সংকট উপস্থিত হয়েছে, তা সত্যই জাতীয় সংকট এবং যে-কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই এই সংকট ভাবিত না ক'রে পারে না। নির্বাক যুগ অবসানের পরে যখন ১৯৩০ সালে বাঙলাদেশে চলচ্চিত্রের সবাক যুগের সমাগম হয়, তখন বাঙালী দর্শক বাঙলা ছবি দেখবার জন্যেই কাতারে কাতারে ভিড় জমাত, বোম্বাই ছবি দেখবার জন্যে তাকে কিছুমাত্র উৎসাহিত হ'তে দেখা যায়নি। এমনকি, ইম্পিরিয়াল সিনেমার 'তুফান মেল' কলকাতার অবাঙালী যুবকদের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করলেও বাঙালী দর্শকরা তার সম্বন্ধে নির্বিকারই ছিল। হিন্দী ছবির প্রতি প্রথম বাঙালী ঝোঁকে যখন 'অচ্ছ্যুৎকন্যা' প্যারাডাইস সিনেমায় প্রদর্শিত হয়।

ডেইজি ইরাণী ফটো : অমৃত

ফাল্গুনীর রবীন্দ্র জন্মোৎসব এবং প্রতিষ্ঠা দিবসে নৃত্য পরিবেশন করেন ছবি দাশগুপ্তা।

কিন্তু তাও হিসাব নিলে দেখা যাবে যে, সমগ্র দর্শকসংখ্যার শতকরা দশভাগও বাঙালী ছিল কিনা সন্দেহ। এর পরে ঐ বোম্বে টকীজেরই 'বন্ধন', 'কঙ্গন', 'ঝুলা', 'বসন্ত', 'কিসমৎ' প্রভৃতি ছবি এবং প্রভাত সিনেটোনের 'অমৃত মন্থন', 'অমর জ্যোতি', 'দুনিয়া-না-মানে', 'আদমি', 'পড়োশী', সোরাব মোদীর 'রোটী', 'জেলার', 'ঝান্সী-কী-রাণী', মেহবুবের 'আওয়াৎ', রঞ্জিতের 'পরদেশী', 'মুশাফির' প্রভৃতি ছবি কিছু কিছু বাঙালী দর্শককে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল ছবিগুলির কাহিনী, অভিনয়, গান ও শিল্পচাতুর্য দ্বারা। কিন্তু বাঙালী দর্শক বাঙলা ছবি দেখে যে-পরিমাণ পরিতৃপ্তি লাভ করত, 'খটমট' ভাষার হিন্দী থেকে তার চতুর্থাংশেরও তৃপ্তিলাভে সমর্থ হ'ত না। তাই কলকাতা শহরের বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চলের চিত্রগৃহে কোনোদিনই হিন্দী ছবির প্রদর্শনী-ব্যবস্থা করার কথা চিত্রগৃহের মালিকেরা তাদের মনের কোণেও স্থান দিত না। হিন্দী ছবি দেখানো হ'ত শহরের অবাঙালী অঞ্চলের চিত্রগৃহগুলিতে এবং বাঙলা দেশের অবাঙালী-অধ্যুষিত শিল্পাঞ্চলগুলির চিত্রগৃহে।

কিন্তু ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হ'তে লাগল। চিত্রপরিবেশনের ব্যবসায় যখন স্ফীত হয়ে উঠল এবং মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল কাহিনীকে সম্বল ক'রে যখন ভুরি ভুরি হিন্দী ছবি নির্মিত হ'তে লাগল ও তাদের বহুল প্রচারের জন্যে লাভজনক শর্তে চিত্রগৃহের মালিকদের প্রলুব্ধ করতে লাগল, তখন শুধু শহরের বাঙালীপ্রধান অঞ্চলগুলিতেই নয়, বাঙলার সুদূর পল্লী-অঞ্চলেও যৌনধর্মী নৃত্যগীতসংবলিত হিন্দী ছবির প্রদর্শনী শুরু হয়ে গেল। নিম্নশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত নরনারী ক্রমেই এই হিন্দী ছবির কড়া মদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এই সর্বনেশে নেশা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল বাঙালী দর্শকের সকল স্তরে; বাঙালীর রুচি গেল পাল্টে, তা নেমে গেল যৌনবিকৃতির সর্বনাশা পথে জাহান্নমের পানে। এখন বাঙালীর কাছে বাঙলা ছবি লাগে জোলো, বিস্বাদ, নিরামিষের মতো। বাঙালীর রুচি ও সংস্কৃতির এমন সুপরিকল্পিত অপমৃত্যু ঘটানোর প্রয়াস জীবনের অপর কোনো ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়নি। এই সর্বনাশা অবস্থা সম্পর্কে আত্মসচেতন হবার দিন আজ সমাগত। এই সংকট—এই জাতীয় সংকট থেকে আমাদের পরিত্রাণ পেতেই হবে এবং এব্যাপারে জনসাধারণের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করতেই হবে।

মনোরম ব্যালে

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে 'এডুকেশন কর্ণার কালচারাল' ইউনিটের শিশু-শিল্পীরা কয়েকটি বিখ্যাত ব্যালের অনুষ্ঠান করে। অনুষ্ঠানে স্ট্রাভেন্‌স্কীর 'ফায়ার বার্ড', সেইন্ট সাইন্‌ এর 'ডাইং সোয়ান', চায়কোস্কির 'শ্লিপিং বিউটি' এবং স্যোপার 'ড্রীম' পরিবেশিত হয়। শিশু-শিল্পীদের দিয়ে ব্যালের অনুষ্ঠান এদেশে নতুন। তাই এ প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারা যায় না। ব্যালের কোরিও-গ্রাফের ক্ষেত্রে শ্রীমতী বাণী মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট শিল্পচিন্তা ও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এ অনুষ্ঠানে বাল্যের দুরূহ অভিব্যক্তিগুলিকে যে সব শিল্পী নয়নাভি-রাম প্রাণময় করে দর্শকদের অজস্র প্রশংসা কুড়িয়েছে, তারা হল : শর্মিষ্ঠা দাস, তনুশ্রী দাস, কল্পনা দত্ত ও সঞ্চয়িতা রায়। মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে তাপস বসুর শিল্পবোধ স্মরণযোগ্য।

সিনেমাশিল্পী ও কলাকুশলীদের বয়কটের প্রতিবাদে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভায় চন্দ্রাবতী দেবী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র প্রমুখ শিল্পীরা।

আশা নিরাশায় দোল দিয়ে যায়

আজ ২রা জুন, রবিবার শহর-কলকাতায় চিত্রগৃহ কর্মীদের ধর্মঘটের তিরাশি দিন পূর্ণ হ'ল। ধর্মঘটী কর্মীদের পক্ষে বেঙ্গল মোশান পিকচার এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন চিত্রগৃহের মালিকদের কাছে উচ্চতর বেতন, মহার্ঘ ভাতা, ১৯৬০ সালের ওয়েজ বোর্ডের সুপারিস অনুযায়ী ন্যূনতম বেতনের বকেয়া শোধ ইত্যাদি যে-সব দাবি পেশ করেছিলেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই ধর্মঘট। এবং এই ধর্মঘট কলকাতা শহরে শুরু হয়ে পর্যায়-ক্রমে সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে গেছে, যার ফলে এই রাজ্যের ৩২১টি স্থায়ী চিত্র-গৃহের মধ্যে অন্তত ২৫০টি চিত্রগৃহ এই ধর্মঘটের আওতায় এসে পড়েছে।

কিন্তু জনসাধারণ যদি ধারণা ক'রে থাকেন, চিত্রগৃহকর্মীদের ধর্মঘটের ফলেই পশ্চিমবঙ্গের চিত্রগৃহগুলি বন্ধ হয়ে আছে, তা'হলে তাঁরা ভুল করবেন। কর্মী-দের ধর্মঘটে চিত্রগৃহগুলি বন্ধ থাকার অন্যতম কারণ হ'লেও একমাত্র কারণ নয়। কারণ, কর্মীদের ধর্মঘটের সুযোগে চিত্র-গৃহের মালিকেরা 'লক আউট' ঘোষণা করেছেন এবং রাজ্যসরকারের কাছে জানিয়েছেন যে, প্রদর্শনী ব্যবসায়ে ব্যয়-বাহুল্যের জন্যে তাঁদের বর্তমানে গুরুতর লোকসানের সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে এবং সেই কারণে তাঁরা দাবি করছেন : (১) টিকিটের মূল্যবৃদ্ধি ; (২) আসনগুলির নতুন করে শ্রেণীবিন্যাস এবং (৩) প্রতি টিকিটে ১০ পয়সা ক'রে সারচার্জ ধার্য করবার অধিকার (এই সারচার্জ প্রমোদ-করের আওতায় পড়বে না এবং পুরোপুরি চিত্রগৃহের মালিকের প্রাপ্য হবে)। তাঁরা আরও জানিয়েছেন যে, তাঁদের এই দাবি-গুলি সরকার যতক্ষণ না মঞ্জুর করছেন, ততক্ষণ তাঁরা চিত্রগৃহগুলির দ্বারোদ্ঘাটন করবেন না। অর্থাৎ এমন অবস্থা যদি হয় যে, ধর্মঘটকারী কর্মীরা বিনাশর্তে তাঁদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেন, তাহ'লেও চিত্রগৃহের মালিকেরা তাঁদের দাবিতে অটুট থেকে চিত্রগৃহগুলির দরজা বন্ধই রাখবেন। ব্যাপার দেখে মনে হয়, কর্মীদের এই ধর্মঘট চিত্রগৃহের মালিকদের সামনে একটি সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত করেছে।

একদিকে চিত্রগৃহের কর্মীদের দাবি, অন্যদিকে চিত্রগৃহের মালিকদের দাবি—এই উভয় প্রকার দাবির ন্যায্যতা ও যাথার্থ্য নিরূপণ করতে রাজ্যসরকার ব্যতিব্যস্ত। রাজ্যসরকারের কাছ থেকে এক সময়ে হুমকি এসেছিল, চিত্রগৃহগুলি অবিলম্বে

এডুকেশনাল কর্ণার কালচারাল ইউনিট পরিবেশিত সোপ্যার ড্রীম ব্যালের একটি দৃশ্য

না খুললে লাইসেন্স নবীকরণের (রি-নিউ-য়াল) সুযোগ দেওয়া হবে না। আশা হ'ল, এইবার বুঝি মালিকদের টনক নড়ল। কিন্তু হা হতোস্মি! দেখা গেল, মালিকেরা তাঁদের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন, সরকারী হুমকি তাঁদের নীতিস্খালন করাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ল। অপরদিকে, কর্মীরা চিত্রগৃহের বন্ধ কোলাপসিবল গেটের সামনে তেলে-ভাজার দোকান চালু করলেন, সরকারের আনুকূল্যে শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায় সাময়িক লাইসেন্সের জোরে সিনেমা-প্রদর্শনীও শুরু করলেন এবং বাসে বাসে ১০ ও ২৫ পয়সার সাহায্য-কুপন বিক্রী করতে লাগলেন। রাজ্য-সরকারের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, এমনকি স্বয়ং রাজ্যপালের সঙ্গে উভয় পক্ষেরই ঘন ঘন বৈঠক বসতে লাগল। কিন্তু অনবরতই কানে আসতে লাগল, আশু মীমাংসার কোনো সুবর্ণসূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মধ্যে এও শোনা গেল যে, সরকার নাকি নীতিগতভাবে মালিক পক্ষের 'সারচার্জ' ধার্য করবার দাবি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তবুও তো অবস্থা যেখানেই ছিল, সেখানেই রইল। এবং উভয় পক্ষই বলতে থাকলেন—সিনেমাগৃহ খোলবার আশা এখনও অনেক দূরে। অথচ আজ, ২রা জুন, রবিবারের সংবাদে প্রকাশ, গেল কাল শনিবার সন্ধ্যায় চিত্র-গৃহের মালিকদের সঙ্গে দু'প্রস্ত আলোচনা করবার পরে রাজ্যসরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব সুনীলবরণ রায় জানিয়েছেন যে, এদিনের আলোচনা অনেকটা সন্তোষ-জনক হয়েছে। তিনি আরও জানান, সোমবার বেলা ১১টায় আবার মালিকদের সঙ্গে তিনি মিলিত হচ্ছেন এবং আশা প্রকাশ করেন, ঐ বৈঠকের পরেই একটি ত্রিপাক্ষিক—সরকার, মালিক এবং কর্মী—বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

আমরা আর আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে চাই না; আমরা চাই, সকল পক্ষের শুভবুদ্ধি একত্র মিলিত হয়ে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটাবে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চিত্রগৃহগুলির শুভ দ্বারোদ্ঘাটনকে সম্ভবপর ক'রে তুলবে।

দেশী ছবির খবর

ছায়াদূত প্রাইভেট লিমিটেডের প্রথম নিবেদন 'সুভা কাঁহি শাম কাঁহি' হিন্দী ছবির চারদিনব্যাপী চিত্রগ্রহণ আজ ('৭ই জুন) থেকে ক্যালকাটা মুভিটোনে শুরু হচ্ছে। কান্নাহাসির আলপনা আঁকা জীবনের এক গভীরতম আশাদীপ্ত দর্শনের আলোকে এর কাহিনী ও গীত রচনা করেছেন শ্রীআর এস পীতম্। চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীদিলীপ বসু। সংগীত-পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণে রয়েছেন হিমাংশু বিশ্বাস ও আশু দত্ত।

প্রথম পর্যায়ের চিত্রগ্রহণ পর্বে অংশ-গ্রহণ করেছেন—জ্ঞানেশ মুখার্জি, কালীপদ চক্রবর্তী, মৃণাল মুখার্জি, অর্চনা, ত্রিলোচন ঝা, চালিস, মানিক, কৃষ্ণা এবং অন্যান্যরা। জানা গেছে প্রথম পর্যায়ের চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হলে গান রেকর্ডিং করা হবে এবং তার-পরেই নিয়মিতভাবে সুটিং শুরু হবে।

আজকের ভেঙে-পড়া সমাজ-জীবনের কাহিনী হল **'আপন জন'**। ইন্দ্রমিত্রের একটি ছোটগল্প অবলম্বনে এ-কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক তপন সিংহ। ছবিটির সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ বর্তমানে শেষ হয়েছে। কাহিনীর দিক থেকে ছবিতে যে-বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে, তা সময়োপযোগী বলবো। মূল্যবোধের অভাবে যে বিশৃঙ্খলা, যে অন্যায়, যে অপরাধের ঝড় উঠেছে, তা এক বৃদ্ধা মহিলার চোখ দিয়ে বলতে চেষ্টা করেছেন পরিচালক শ্রীসিংহ।

ছবির প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করেছেন ছায়া দেবী, স্বরূপ দত্ত, পার্থ মুখোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, নির্মলকুমার, রোমি চৌধুরী, জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবি ঘোষ।

চিত্রযুগের তরফ থেকে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় যে নতুন ছবিটির কাজ শুরু করেছেন, তার নাম **'পিতাপুত্র'**। সম্প্রতি পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত-পরিচালনায় ছবির সংগীতানুষ্ঠান গৃহীত হয়। রাজকুমার মৈত্র রচিত এ-কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন তনুজা, স্বরূপ দত্ত, তরুণকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, জহর গাঙ্গুলী ও অসীম চক্রবর্তী।

কিরণ প্রোডাকশন্সের রঙিন **'কন্যাদান'** ছবিটির কাজ শেষ করে পরিচালক মোহন সেগল সম্প্রতি কুলু ভ্যালিতে তাঁর নতুন ছবি **'সাজন'**-এর চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। ছবিটির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন আশা পারেখ, মনোজকুমার, ওমপ্রকাশ, মদন পুরী, সুলোচনা ও শবনম। লক্ষ্মীকান্ত প্যারে-লাল ছবিটির সুরকার।

বিবিধ সংবাদ

শিশুস্বর্গ বর্ষপূর্তি উৎসব

শিশুস্বর্গের এক বছর পূর্ণ হচ্ছে, জুন মাসের ২য় সপ্তাহে। এই উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে, ৯ই জুন সকাল ৯টায়।

এদিনে সভায় সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র, উদ্বোধন করবেন মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে মহাশয়, আর প্রধান অতিথিরূপে থাকবেন শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেন।

এদিনের অনুষ্ঠান সূচীর আকর্ষণ লিটল্ বিটল্ গ্রুপের সমবেত যন্ত্রসংগীত, ছন্দম গোষ্ঠীর "বর্ষ পরিচয়" আর রবিরূপের প্রযোজনায় শ্রীঅন্নদাশংকর রায় রচিত "জনরব"।

সোদপুর হাউসিং এস্টেটে "রবীন্দ্র জন্মোৎসব"

সোদপুরে গত ২৭শে বৈশাখ সন্ধ্যায় সেন্ট্রাল পার্কে, "রবীন্দ্র জন্মোৎসব" সুন্দরম কর্তৃক উদযাপিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। এস্টেটের অধিবাসীবৃন্দ নাচ, গান ও আবৃত্তিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তবে, অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল প্রখ্যাত শিল্পীগোষ্ঠী, "সুরঞ্জনা"র সংগীতালেখ্য। শিল্পীরা ধ্রুপদী রবীন্দ্রনাথের অম্লান রূপটি বিভিন্ন তান ও সুরের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। একক সংগীত পরিবেশনে শ্রীমতী জবা লাহিড়ী বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন। এছাড়া, দেবযানী মৈত্র, অর্চনা বসাক, সুধীন মৈত্র, সুপ্রভাত অধিকারী ও সুবিমল মুখোপাধ্যায় উচ্চমানের একক ও দ্বৈতকণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানটিতে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী শান্তিরঞ্জন দে, অমিতা অধিকারী, শংকর দাস, চন্দ্রশেখর দাস ও হারাধন মান্না।

দত্তবাগানে রবীন্দ্র জন্মোৎসব

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার "কৃষ্টি তীর্থের" সভাবৃন্দ কর্তৃক দত্তবাগান হাউসিং এস্টেটের প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসনে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায় এবং জনপ্রিয় সাংবাদিক ও কবি দক্ষিণারঞ্জন বসু।

আবৃত্তি, আলোচনা, জন্মদিনের গান ও নৃত্যনাট্য "সাগরিকা" উপস্থিত দর্শকদের বিশেষভাবে আনন্দ দান করে। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন বেলা গোস্বামী, মঞ্জু মুখার্জী, মালা গোস্বামী, গার্গী দত্ত, সুরজিৎ দে, মঞ্জু মজুমদার, অশোকা ব্যানার্জী, বাণী গুহ, দেবযানী গুহ, প্রতিমা ভট্টাচার্য, শম্পা ঘোষ,

---

গত সপ্তাহে অমৃত'র অঙ্গনা বিভাগে প্রকাশিত ফ্যাশান-এর ফিচারে চিত্ররূপ দিয়েছিলেন সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়।

অন্নপূর্ণা দত্ত, বিজলী দাসগুপ্ত, কবিতা কুণ্ডু, শান্তি দাস, পরাগ দত্ত, দ্বীপেন দত্ত, আভা ধর, দীলিপ নাগ ও শ্রীমান ধর।

সংগীত ও নৃত্যে পরিচালনায় ছিলেন যথাক্রমে নবগোপাল চক্রবর্তী ও গৌরীপদ মজুমদার।

সুধীরলাল স্মৃতি-বাসর

গত ১৮ই ও ১৯শে মে মহানগরীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, পরিচালক ও, শিল্পী সমাবেশে "সুধীরলাল স্মৃতি বাসরের" সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রে সম্পন্ন হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীবিমল চট্টোপাধ্যায় ও প্রবীন সংগীতজ্ঞ শ্রীঅনাথ বসু। তাঁর ভাষণে প্রতিষ্ঠানের বাস্তব চিত্র, শিল্পীদের নৈতিক দায়িত্ব এবং শিল্পরসিক জনগণের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। সংস্থার আর্থিক সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য বাংলা দেশের শিল্পী ও শিল্পরসিকদের কাছে যে সামান্যতম আর্থিক সাহায্য ও আন্তরিক সহযোগিতার আবেদন জানান তা সত্যিই মানবধর্মী ও হৃদয়গ্রাহী। অধিবেশনে প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে সুধীর গীতি ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের দুটি আসরের আয়োজন করা হয়েছিল। উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন—সংগীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী, সর্বশ্রী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ভি-জি-যোগ, কানাই দত্ত, সন্তোষ ব্যানার্জী, গোবিন্দ বসু, অজন্তা রায় চৌধুরী ও অনিন্দিতা রায় চৌধুরী (কথক নৃত্য), মদনলাল মিশ্র। 'সুধীর গীতি' অনুষ্ঠানে ছিলেন সর্বশ্রী হেমন্ত মুখার্জী, অখিলবন্ধু ঘোষ, সুধীর মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, হিমাংশু মুখার্জী, সুপ্রভা সরকার, প্রতিমা ব্যানার্জী, অমরেশ রায় চৌধুরী, দেবব্রত দত্ত, মৃণাল গাঙ্গুলী, ভবানী চ্যাটার্জী, দেবী মিত্র, সলিল মিত্র, নির্মলা মিশ্র, গদাধর ভট্টাচার্য, বাণী ব্যানার্জী, স্বাগতা ঘোষ রায়, নিখিল সেন ও শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। তবলা সংগতে ছিলেন রাধাকান্ত নন্দী, মণীন্দ্র চক্রবর্তী, কুমুদ ঘোষ, দেবনাথ চ্যাটার্জী ইত্যাদি।

রবীন্দ্র অঙ্গনের রবীন্দ্র জন্মোৎসব

রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষায়তন 'রবীন্দ্র-অঙ্গন' কর্তৃক ৪ মে সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ীতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সভাপতিত্বে 'সারাদিনের গান', ১২ মে সকালে দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র অঙ্গন শিক্ষাকেন্দ্রে শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে 'বৈশাখী', এবং ১৯ মে সন্ধ্যায় হাওড়ায় 'ব্যাঁটরা লাইব্রেরী হল'এ শ্রীশান্তি দেব ঘোষের সভাপতিত্বে 'রবীন্দ্র-সংগীতে বেহাগ' প্রভৃতি সংগীতালেখ্যগুলি আলোচনা ও সংগীত-সহযোগে পরিবেশিত হয়।

কবিগুরুর জীবনকথা ও সংগীত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীব্রজকান্ত গুহ, শ্রীশৈবাল গুপ্ত এবং শ্রীশান্তিদেব ঘোষ।

রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করেন—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীপ্রসাদকুমার সেন, শ্রীশৈলেন দাস, শ্রীসুনীল ঘোষ, শ্রীবিশ্বজিৎ রায়, শ্রীমতী চিত্রলেখা চৌধুরী এবং শ্রীমতী নীলিমা সেন।

সংস্থার শিল্পীদের সংগীত অনুষ্ঠানগুলি মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছিল।

ফাল্গুনীর কবিপ্রণাম

সম্প্রতি রঘুনাথ হলে 'ফাল্গুনী'র প্রতিষ্ঠাদিবস ও রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানটির বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'কবি প্রণাম' শীর্ষক ছবি দাশগুপ্তার নৃত্য এবং রবীন্দ্রসংগীতে প্রত্যেক শিল্পীরা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উপস্থিত দর্শকমন্ডলীর প্রশংসাভাজন হন। কন্ঠ এবং যন্ত্রসংগীতে ছিলেন ছবি ক্ষেত্রী, রূপা, অপর্ণা, আশালতা গাঙ্গুলী, যূঁই ক্ষেত্রী (গীটার) এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (তবলা)। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু পরিচালনা এবং আবৃত্তিতে ছিলেন শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত।

আদ্রা সংগীত পরিষদের চিত্রাঙ্গদা

গত ৪ঠা জ্যেষ্ঠ আদ্রা সংগীত পরিষদ স্থানীয় নর্থ ইনস্টিটিউট হলে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য অভিনয় করেন। চিত্রাঙ্গদার বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন—উমা চক্রবর্তী, শিখা দে, অলকা, রমা ও শুক্লা গাঙ্গুলী, শেলী ঘোষাল, সন্ধ্যা মহান্তি, রুমা ও শুভ্রা পাইন ও দীপিকা ভট্টাচার্য। সংগীত, আবৃত্তি ও যন্ত্রসংগীতে অংশগ্রহণ করেন শৈলেন গাঙ্গুলী, বিজয়া গাঙ্গুলী, মধুছন্দা বসু, শিবানী চক্রবর্তী, অমলেন্দু চক্রবর্তী, অনাথ মিশ্র, শচীন্দ্রনাথ রায়, প্রদীপ গাঙ্গুলী ও নিমাই কবিরাজ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মধুছন্দা বসু ও শৈলেন গাঙ্গুলী। একক সংগীতে অংশ নেন শ্রীমতী নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তপন তরফদার। শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায় গীটারে রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজিয়ে শোনান।

কিপচো কিনো (কেনিয়া)
অষ্টম কমনওয়েলথ গেমসের ১ মাইল ও ৩ মাইল দৌড়ের স্বর্ণপদক বিজয়ী এবং ৩,০০০ মিটার দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড স্রষ্টা

আফ্রিকার খেলাধুলা

ক্ষেত্রনাথ রায়

খুব বেশী দিনের কথা নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক বছর পর থেকে আফ্রিকা মহাদেশের ছোট-বড় অনেকগুলি দেশ বৈদেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে নিজেদের একে একে মুক্ত করে নিয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হয়েছে। দেখে অবাক লাগে, সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের কি সজাগ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী। দেশের মানউন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনীতি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের পাশেই খেলাধুলোকে সমান অগ্রাধিকার দিয়ে তারা যে কতখানি বাস্তবধর্মী এবং প্রগতিশীল তারই পরিচয় তুলে ধরেছে। শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাদীদের দেওয়া আফ্রিকার 'ডার্ক কন্টিনেন্ট' নামটা আজ তারা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর। যে আফ্রিকা একদিন ছিল যাদু এবং রহস্যে ঘেরা এবং বাইরের জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন, আজ সেদেশের অধিবাসীরা সর্বাঙ্গীণ উন্নতিলাভের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর মানচিত্রে তারা স্বদেশের নাম উৎকীর্ণ করতে খুবই উৎসাহী। খেলাধুলোর ক্ষেত্রে জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক এবং ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর কাছ থেকে তারা সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা পেয়ে থাকে। আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলির ছাত্র-ছাত্রীরা দলে দলে এই দুই দেশে পাড়ি দেয় এবং সেখানের ফিজিক্যাল কলেজগুলিতে হাতেকলমে বিভিন্ন খেলাধুলোর অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিক্ষালাভ করে। তাছাড়া আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলির সঙ্গে জার্মানীর এই দুই অংশের খেলাধুলো সম্পর্কে সফর বিনিময়ের ব্যবস্থা আছে। জার্মানীর দুই অংশই আফ্রিকার খেলাধুলো সম্পর্কে খুবই আগ্রহী। একবার জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের উদ্যোগে আফ্রিকার খেলাধুলো নিয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল। জার্মানী থেকে তিনটি ভাষায় (জার্মান, ফ্রেঞ্চ এবং ইংলিশ) 'আফ্রিকান স্পোর্টস' নামে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানীতে আফ্রিকার খেলাধুলো নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। এবং এই গবেষণার স্বীকৃতি হিসাবে জার্মানীর ২২ বছরের এক মহিলা 'ডিপ্লোমা' পেয়েছেন।

আফ্রিকার দেশগুলিতে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস, বক্সিং, ভলিবল, হ্যান্ডবল, বাস্কেটবল, জুডো, এ্যাথলেটিক স্পোর্টস প্রভৃতি সবরকম খেলারই চর্চা আছে। তবে ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তার সঙ্গে অপর কোন খেলার তুলনাই হয় না। বলতে কি, ফুটবল সেখানের জাতীয় খেলা, এমনকি জাতীয় উৎসবের অঙ্গ বলা যায়। ফুটবল খেলা উপলক্ষে নাচ-গান এবং বাজনার বিরাট সমাবেশ আর কোন দেশের ফুটবল মাঠে দেখা যায় না। ফুটবল খেলায় আফ্রিকার জাতীয় গর্ব হলেন ইউসেবিও ডা সিলভা ফেরিয়া। এই ইউসেবিও হলেন পর্তুগালের বিখ্যাত বেনফিকা ফুটবল দলের শ্রেষ্ঠ পেশাদার খেলোয়াড়। এই বেনফিকা দল যে দু'বার ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ান্স কাপ জয়ী হয়েছে ইউসেবিও সেই বিজয়ী দলে খেলেছিলেন। ১৯৬৬ সালের বিশ্ব-ফুটবল প্রতিযোগিতায় (জুল রিমে কাপ) ইউসেবিও পর্তুগালের জাতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যায়ের খেলায় (১৬টি দল নিয়ে) পর্তুগালের পক্ষে ৮টা গোল দিয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালের খেলার ভিত্তিতে তিনি

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেছিলেন।

১৯৬৬ সালের ৮ম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় **(জুলে** রিমে কাপ) সেমি-ফাইনালে **পর্তুগাল** ১-২ গোলে ইংল্যান্ডের **কাছে পরাজিত হয়েছিল।** পর্তুগালের পক্ষে **ইউসেবিও একটা** গোল শোধ দেন। এই **অষ্টম প্রতিযোগিতার** শ্রেষ্ঠ ফরোয়ার্ড পর্তুগালের **ইউসেবিও** দলের পরাজয়ে মাঠের মধ্যে কান্নায় ভেঙে পড়েন। মূল প্রতিযোগিতায় **পর্তুগাল** দলের ১৫টি গোলের মধ্যে **ইউসেবিও একাই ৮টি** গোল দিয়ে **ছিলেন—তাঁর এই ৮টি** গোলই **মূল প্রতিযোগিতায়** ব্যক্তিগত সর্বাধিক গোলের **রেকর্ড।**

আফ্রিকায় ফুটবল খেলার মান খুবই **উন্নত।** বিশ্ব-ফুটবল খেলার আসরে তারা **অঘটন ঘটাতে পারে,** এমন ভবিষ্যদ্বাণী **অভিজ্ঞ মহল** থেকে অনেকেই করেছিলেন। **কিন্তু** আফ্রো-এশিয়ান দেশগুলি আন্তর্জাতিক **ফুটবল** নিয়ন্ত্রণ সংস্থার পক্ষপাতিত্বে **ক্ষুব্ধ** হয়ে শেষ পর্যন্ত বিগত **অষ্টম বিশ্ব-ফুটবল** প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি।

বৃটিশ কমনওয়েলথ গেমস

১৯৬৬ সালে (আগস্ট ৪—১৩) **কিংস্টনে অনুষ্ঠিত অষ্টম** বৃটিশ কমনওয়েলথ গেমসে **আফ্রিকার স্বাধীন** দেশগুলির **সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।**

এ্যাথলেটিকসে ১ মাইল, ৩ মাইল **এবং ৬ মাইল** দৌড়ে কেনিয়ার স্বর্ণপদক **জয়** একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। কেনিয়ার **পুলিশম্যান কিপচো কিনো** ১ মাইল এবং **৩ মাইল** দৌড়ে এবং নাফতালি তেমু ৬ **মাইল** দৌড়ে **স্বর্ণপদক জয় করে** আন্তর্জাতিক খেলাধুলার মানচিত্রে কেনিয়ার **নাম উৎকীর্ণ করেন। কিপচো কিনো** এক **মাইল এবং তিন** মাইল দৌড়ে স্বর্ণপদক **জয়ের সূত্রে** যে 'ডাবল' খেতাব **লাভ** করেন তা **কমনওয়েলথ** গেমসের একই বছরের **আসরে ইতিপূর্বে** কেউ পাননি। কিনো ১ **মাইল** দৌড় ৩ মিনিট ৫৫-৩ সেকেন্ডে **অতিক্রম করে** কমনওয়েলথ গেমসে নতুন **রেকর্ড স্থাপন** করেন। কিনো ৩ **মাইল** দৌড়ে **একাধিক** অনুষ্ঠানের বিশ্ব-রেকর্ডধারী **অস্ট্রেলিয়ার** রন **ক্লার্ককে পরাজিত করেন।** ৩ মাইল দৌড় শেষ করতে কিনোর **সময় লাগে** ১২ মিনিট ৫৭-৪ সেকেন্ড (নতুন গেমস রেকর্ড), অপরদিকে রন **ক্লার্কের লেগেছিল** ১২ মিনিট ৫৯-২ সেকেন্ড। **এই সময়** ৩ মাইল দৌড়ে রন **ক্লার্কের** যে বিশ্ব-রেকর্ড **ছিল** তার থেকে কিনোর ৭ সেকেন্ড বেশী ছিল। ১ মাইল দৌড়ে কিনোর **সময় ছিল** ৩ মিনিট ৫৫-৩ সেকেন্ড (নতুন গেমস রেকর্ড), অপরদিকে এক মাইল দৌড়ে **এই সময়ে** বিশ্ব-রেকর্ড **সময় ছিল** ৩ মিনিট ৫১-৩ সেকেন্ড (আমেরিকার জিম রিউন প্রতিষ্ঠিত)।

৬ **মাইল** দৌড়ে **বিশ্ব-রেকর্ডধারী অস্ট্রেলিয়ার** রন **ক্লার্ককে** পরাজিত করে কেনিয়ার অখ্যাতনামা দৌড়বীর নাফতালি **তেমু (বয়স ২৩) সকলকে তাক লাগিয়েছিলেন।** এ্যাথলেটিকসের আন্তর্জাতিক

আবেবা বিকিলা (ইথিওপিয়া)
১৯৬০ ও ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক
ম্যারাথনে স্বর্ণপদক বিজয়ী

আসরে এরকমের **অপ্রত্যাশিত** স্বর্ণপদক জয়ের নজির কারও স্মরণে আসে না। ৬ মাইল দৌড়ে তেমুর সময় দাঁড়ায় ২৭ মিনিট ১৪-৬ সেকেন্ড (নতুন গেমস রেকর্ড), অপরদিকে তেমু যখন দৌড় শেষ করেন তখন ক্লার্ক তাঁর থেকে ১৫০ গজ পিছনে।

অষ্টম কমনওয়েলথ গেমসে আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন দেশগুলির পদক জয় :

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
ঘানা	৫	২	২
কেনিয়া	৪	১	৩
নাইজেরিয়া	৩	৪	৩
গায়না	০	১	০
উগান্ডা	০	০	৩

অলিম্পিক আসরে

আফ্রিকার দেশগুলি **স্বাধীনতা লাভের** পর বিপুল উদ্যমে খেলাধুলার অনুশীলন আরম্ভ করে দেয় এবং কয়েক বছরের সাধনায় আশাতীত সাফল্য লাভ করে। আমরা তার প্রথম পরিচয় পেলাম ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিক আসরে—ম্যারাথন দৌড়ে ইথিওপিয়ার আবেবা বিকিলা স্বর্ণ এবং মরক্কোর রাডি বেন এ্যাবডিসেলেম রৌপ্যপদক জয়ী হন।

১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে আবেবা বিকিলা ম্যারাথন দৌড়ে উপর্যুপরি দু'বার স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে এক দুর্লভ সম্মান লাভ করেন। অলিম্পিক গেমসের ম্যারাথন দৌড়ে কোন একজনের পক্ষে দু'বার স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব একমাত্র তাঁরই। ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে আফ্রিকার পাঁচটি স্বাধীন দেশ এইভাবে অলিম্পিক পদক জয় করে—তিউনিসিয়া **২টি** (রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ১), ইথিওপিয়া স্বর্ণ ১, ঘানা ব্রোঞ্জ ১, কেনিয়া ব্রোঞ্জ ১ এবং নাইজেরিয়া ব্রোঞ্জ ১। ম্যারাথনে স্বর্ণপদক পান কেনিয়ার আবেবা বিকিলা, ১০,০০০ মিটার দৌড়ে **৭টি** বিশ্ব-রেকর্ডধারী রন ক্লার্ককে ৩য় স্থানে রেখে রৌপ্যপদক জয়ী হন তিউনিসিয়ার মহম্মদ গামুদি, ৮০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জপদক পান কেনিয়ার উইলসন কিপ্রুগাট। বক্সিংয়ে তিনজন অলিম্পিক পদক জয়ী হন—লাইট মিডল-ওয়েটে মিজিম মায়েগান (নাইজেরিয়া) এবং লাইট-ওয়েল্টার ওয়েটে ঘানার এডি ব্লে এবং তিউনিসিয়ার হবিব গালহিয়া।

টোকিও অলিম্পিকে কোন পদক জয় না করলেও আফ্রিকার পক্ষে এই কয়েকজন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন—ইথিওপিয়ার মামো ওয়ালডে (১০,০০০ মিটারে ৪র্থ স্থান) এবং নাইজেরিয়ার ওয়ারিবোকো ওয়েস্ট (লং জাম্পে ৪র্থ স্থান)।

প্রাক্-অলিম্পিক গেমস

১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসের প্রস্তুতি উপলক্ষে ১৯৬৭ সালের অকটোবর মাসে মেক্সিকোর ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়ামে যে প্রাক-অলিম্পিক গেমসের আসর বসেছিল তাতে রাশিয়া, আমেরিকা, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশ নিয়ে মোট **৫৭টি** দেশের প্রায় আড়াই হাজার প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই খুদে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের এ্যাথলেটিকসে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন পুরুষ বিভাগে তিউনিসিয়ার মহম্মদ গামুদি এবং মহিলা বিভাগে কিউবার মিগুয়েলিনা কোবিয়ান। গামুদি স্বর্ণপদক পান ৫,০০০ ও ১০,০০০ হাজার মিটার দৌড়ে এবং কোবিয়ান স্বর্ণপদক জয়ী হন ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে।

অলিম্পিক গেমসে রাশিয়া ১৯৫২ সাল থেকে যোগদান করে যেমন আমেরিকার দীর্ঘকালের একচ্ছত্র আধিপত্য **খর্ব করেছে,** তেমনি আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলির যোগদানে কোন একটি দেশের **পক্ষে** দীর্ঘকাল একচ্ছত্র আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার দিন ফুরিয়ে এসেছে বলা যায়। রাশিয়ার অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী ভ্যাডিমির কুট্‌স ভবিষদ্‌বাণী করেছেন, 'দৌড়ে যদি কেউ আমাদের অতিক্রম করে তবে তা আফ্রিকার দৌড়বীররা'।

প্রথম আফ্রিকান গেমস

ব্রাজাভিলের (কঙ্গো) প্রথম আফ্রিকান

ইউসেবিও (মোজাম্বিক)
১৯৬৫ সালে নির্বাচিত ইউরোপের
শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়

গেমস (১৯৬৫ সালের জুলাই ১৮—২৫) আফ্রিকার খেলাধুলার ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করেছে। আফ্রিকা মহাদেশের ২৯টি স্বাধীন দেশের প্রায় ২,৫০০ এ্যাথলীট এই প্রথম আফ্রিকান গেমসে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ'দের মধ্যে অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনজন—১,৫০০ ও ৫,০০০ হাজার মিটার বিজয়ী কিপচো কিনো (কেনিয়া), ৮০০ মিটার বিজয়ী উইলসন কিপ্রুগাট (কেনিয়া) এবং ৩,০০০ হাজার মিটার স্টিপলচেজে অজ্ঞাতনামা চিরিচির (কেনিয়া)। আফ্রিকান গেমসের দ্বিতীয় আসর বসবে মালীর রাজধানী বামাকো শহরে আগামী ১৯৬৯ সালে।

বক্সিংয়ে আফ্রিকার যথেষ্ট আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। অলিম্পিক এবং কমনওয়েলথ গেমসে তাদের সাফল্যের কথা বাদ দিয়ে বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ন ডিক টাইগার (নাইজেরিয়া) এবং হোগান বাসের (নাইজেরিয়া) নাম উল্লেখ করলেই যথেষ্ট বলা হবে। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ থেকে তাঁরাই প্রথম বিশ্ব খেতাব জয় করেন।

পূর্ব আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্যোগে হকি খেলা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব আফ্রিকার এশিয়ান স্পোর্টস এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বে ভারতীয় হকি দল পূর্ব আফ্রিকা সফরে যায়। আফ্রিকা মহাদেশের মাটিতে ভারতীয় হকি দলের এই প্রথম সফর ক্রীড়ামহলে খুব সাড়া এনেছিল। সফরের আটাশটি খেলাতেই ভারতীয় হকি দল জয়লাভ করে। ভারতীয় হকি দল ২৮৫টি গোল দিয়ে মাত্র ৯টি গোল খেয়েছিল। গোলদাতার তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম—দিগ্বিজয় সিং (বাবু)—২২টি খেলায় ৭০টি গোল, ধ্যানচাঁদ—২২টি খেলায় ৬১টি গোল এবং জ্যানসেন—২১টি খেলায় ৫৬টি গোল।

আফ্রিকা মহাদেশে ক্রিকেটের পীঠস্থান দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু তার আলোচনা এখানে নয়। আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে ক্রিকেট খেলা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া, উগান্ডা, তাঞ্জানিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। কেনিয়া, উগান্ডা ও তাঞ্জানিয়াতে ম্যাটিং উইকেটে ক্রিকেট খেলা হয়। অপরদিকে জাম্বিয়াতে ক্রিকেট খেলার প্রচলন বেশীর ভাগই ঘাসের উইকেটে। অতীতে শ্বেতাঙ্গ এবং ভারতীয় সমাজের মধ্যেই ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর কৃষ্ণাঙ্গ সমাজেও ক্রিকেট ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ১৯৬৭ সালে পতৌদির নবাবের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল পূর্ব আফ্রিকা সফরে গিয়ে অপরাজিত থাকে—সাতটি খেলায় ভারতীয় দলের জয় ৪ এবং খেলা ড্র ৩।

আফ্রিকান সুপ্রিম স্পোর্টস কাউন্সিল

খেলাধুলার মান-উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে আফ্রিকার ক্রীড়ানুষ্ঠান সংগঠনের উদ্দেশ্যে আফ্রিকার ৩২টি স্বাধীন দেশের সক্রিয় সহযোগিতায় 'আফ্রিকান সুপ্রিম স্পোর্টস কাউন্সিল' নামে একটি শক্তিশালী ক্রীড়া-সংস্থা গড়ে উঠেছে। এই সংস্থার হেডকোয়ার্টার্স—কঙ্গোর রাজধানী ব্রাজাভিলে। মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকাকে খিড়কির দরজা দিয়ে আমন্ত্রণ করার প্রতিবাদে এই আফ্রিকান সুপ্রিম স্পোর্টস কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে মেক্সিকো অলিম্পিক গেমস বর্জনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সারা পৃথিবী জুড়ে যে জনমত গঠন করেছিল তারই চাপে শেষ পর্যন্ত মেক্সিকো অলিম্পিকে দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদানের ছাড়পত্র বাতিল হয়ে যায়।

উইলসন কিপ্রুগাট (কেনিয়া)
৮০০ মিটার দৌড়ে অলিম্পিক ব্রোঞ্জ-পদক বিজয়ী (১৯৬৪)

উল্লেখযোগ্য ক্রীড়ানুষ্ঠান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ক্রীড়ানুষ্ঠান :

১৯৬১ : দ্বিতীয় কমিউনিটি গেমস। স্থান : আইভরি কোস্টের রাজধানী আবিদজান।

১৯৬৩ : প্রথম 'ফ্রেন্ডসীপ গেমস'। স্থান : সেনেগালের রাজধানী ডাকার।

১৯৬৫ : প্রথম 'আফ্রিকান গেমস'। স্থান : কঙ্গোর রাজধানী ব্রাজাভিলে।
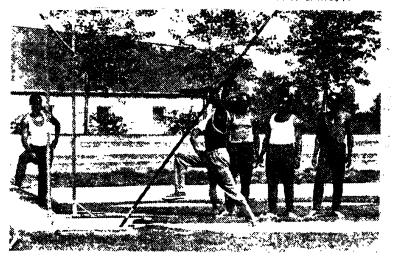
ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর বিভিন্ন ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউটে আফ্রিকা মহাদেশের স্বাধীন দেশগুলির ছাত্র-ছাত্রীরা এইভাবে খেলাধুলার অনুশীলন করে থাকেন।

খেলাধুলা

দর্শক

ইউরোপীয়ান ফুটবল কাপ

লণ্ডনের উইম্বলী স্টেডিয়ামে ১৯৬৮ সালের ইউরোপীয়ান ফুটবল কাপের ফাইনালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড দল ৪-১ গোলে পর্তুগালের বেনফিকা দলকে পরাজিত করে কাপ বিজয়ী হয়েছে। ইংলিশ ফুটবল দলের পক্ষে এই প্রথম ইউরোপীয়ান ফুটবল কাপ জয়। ফলে খেলার শেষে দর্শকরা আনন্দের আতিশয্যে মাঠে নেমে পড়ে বিজয়ী ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড দলের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানায়।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড দলের চারটি গোলের মধ্যে দলের অধিনায়ক ববি চার্লটন একাই দুটি গোল দেন এবং আর একটি গোল দেওয়ার পথ ক'রে দেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই ক্রীড়া-চাতুর্যে এবং দল পরিচালনার দক্ষতায় দু'বারের ইউরোপীয়ান ফুটবল কাপ বিজয়ী প্রখ্যাত বেনফিকা দলকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে।

খেলার ৫৩ মিনিটের মাথায় চার্লটন প্রথম গোল দিলে ইউনাইটেড দল ১-০ গোলে অগ্রগামী হয়। কিন্তু ৭৯ মিনিটের মাথায় বেনফিকার গ্রাকা গোলটি শোধ ক'রে দেন এবং খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। অতিরিক্ত সময়ের প্রথম ৯ মিনিটের মধ্যেই ইউনাইটেড দল তিনটি গোল দিয়ে শেষ পর্যন্ত ৪-১ গোলে জয়ী হয়। দশ বছর আগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড দলের ম্যানেজার ম্যাট বুসবির এই ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ান্স কাপ জয়ের আশা বিমান দুর্ঘটনার ফলে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মিউনিকের এই বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর দলের আটজন খেলোয়াড়ের অকাল-মৃত্যু ঘটে। সেই দলেরই দু'জন খেলোয়াড়—ববি চার্লটন (দলের বর্তমান অধিনায়ক) এবং সেন্টার-হাফ বিল ফাউলকেস আলোচ্য ফাইনাল খেলায় নিজ দলকে জয়যুক্ত করতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই জয়লাভে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড দলের ৫৮ বছর বয়সের ম্যানেজার বুসবির অনেক দিনের আশা পূরণ হল।

গত বছর স্কটিশ ফুটবল লীগের গ্লাসগো সেল্টিক দল ২-১ গোলে ইতালীর প্রখ্যাত ইন্টার-মিলান দলকে পরাজিত করার সূত্রে বৃটেনের পক্ষে প্রথম ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ান্স কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছিল।

আলোচ্য ফাইনাল খেলায় বেনফিকা দলের পরাজয়ের ফলে বিহার সাহায্য তহবিলে ২০০ গিনি জমা পড়বে। ম্যাঞ্চেস্টারের লর্ড মেয়র যে বিহার সাহায্যভাণ্ডার খুলেছেন সেখানে লণ্ডনের এক বাজী প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের এবং অন্ডারম্যান শ্রীমতী এলিজাবেথ ইয়ারউডের দানের প্রতিশ্রুতি ছিল এইরকম—ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জয়লাভে ১০০ গিনি, অপরদিকে বেনফিকার জয়লাভে ৫০ গিনি।

পূর্ববর্তী বিজয়ী দল :

স্পেনের রিয়েল মাদ্রিদ ৫বার (উপর্যুপরি ৫বার—১৯৫৬-৬০), পর্তুগালের বেনফিকা—২বার, ইতালীর ইন্টারন্যাশনাল মিলান—২বার এবং এ সি মিলান—১বার এবং বৃটেনের গ্লাসগো সেল্টিক—১বার।

প্রেসিডেন্সি ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে আয়োজিত প্রেসিডেন্সি ডিভিসন ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় প্রখ্যাত সর্বভারতীয় খেলোয়াড় দীপু ঘোষ সিংগলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল খেলাটি খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল—দুই দিকেই সহোদর জুটি—ঘোষ বনাম ব্যানার্জি।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিংগলস : দীপু ঘোষ ১৫-৪ ও ১৫-৪ পয়েন্টে পংকজ গুহকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : দুই ভাই দীপু এবং রঞ্জন ঘোষ ১৫-৪ ও ১৮-১৬ পয়েন্টে দুই সহোদর শংকর এবং সুব্রত ব্যানার্জিকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : কুমারী দীপা চ্যাটার্জি এবং দীপু ঘোষ ১৫-৩ ও ১৫-৪ পয়েন্টে কুমারী অনুরাধা সরকার এবং পংকজ গুহকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : কুমারী অনুরাধা সরকার ১১-৩, ৬-১১ ও ১১-৪ পয়েন্টে কুমারী দীপা চ্যাটার্জিকে পরাজিত করেন।

ডেভিস কাপ

১৯৬৮ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইউরোপীয়ান জোনের ('এ' এবং 'বি' বিভাগ) খেলা সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

ইউরোপীয়ান জোনের 'এ' এবং 'বি' বিভাগের ২য় রাউন্ডের খেলায় সংক্ষিপ্ত ফলাফল ঃ

'এ' বিভাগ

বৃটেন	৫	ঃ	ফিনল্যাণ্ড	০
রাশিয়া	৫	ঃ	যুগোশ্লাভিয়া	০
স্পেন	৪	ঃ	সুইডেন	১
ইতালী	৫	ঃ	মোনাকো	০

'বি' বিভাগ

দঃ আফ্রিকা	৫	ঃ	ইরান	০
রুমানিয়া	৫	ঃ	নরওয়ে	০
পঃ জার্মানী	৫	ঃ	বুলগেরিয়া	০
চেকোশ্লোভাকিয়া	৩	ঃ	বেলজিয়াম	২

ইউরোপীয়ান জোন সেমি-ফাইনাল

'এ' বিভাগ ঃ

বৃটেন বনাম স্পেন
রাশিয়া বনাম ইতালী

'বি' বিভাগ ঃ

দঃ আফ্রিকা বনাম রুমানিয়া
পঃ জার্মানী বনাম চেকোশ্লোভাকিয়া

আমেরিকান জোন ফাইনাল

আমেরিকা বনাম ইকুয়াডোর

এশিয়ান জোন ফাইনাল

ভারতবর্ষ বনাম জাপান

ফেডারেশন কাপ ফাইনাল

১৯৬৮ সালের মহিলাদের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ৩-০ খেলায় নেদারল্যাণ্ডসকে পরাজিত করে বিশ্ব-খেতাব জয়ী হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার এই নিয়ে তিনবার ফেডারেশন কাপ জয় (১৯৬৪-৬৫ ও ১৯৬৮)। ফেডারেশন কাপ প্রতিযোগিতার সূচনা (১৯৬৩) থেকে এপর্যন্ত মাত্র দুটি দেশ কাপ জয়ী হয়েছে—আমেরিকা ৩ বার (১৯৬৩, ১৯৬৬-৬৭) এবং অস্ট্রেলিয়াও ৩ বার।

৬০ মাইল দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড

অস্ট্রেলিয়ার পেশাদার এ্যাথলীট জর্জ পার্ডন ৬০ মাইল দৌড় মেলবোর্ণের পোর্টসী থেকে অলিম্পিক পার্ক ৬ ঘন্টা ৩৫ মিনিট ৪৫-২ সেকেণ্ডে শেষ করে ১৯৩৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার আর্থার নিউটন প্রতিষ্ঠিত ৭ ঘন্টা ১১ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডের বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। পার্ডনের বর্তমান বয়স ৪৩ বছর।

টেস্ট ক্রিকেটে ৬০০০ রাণ

এ পর্যন্ত এই সাতজন খেলোয়াড় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ব্যক্তিগত ৬০০০ রান পূর্ণ করার সূত্রে দুর্লভ সম্মান লাভ করেছেন—ইংল্যাণ্ডের ৪ জন (হ্যামণ্ড, হাটন, কাউড্রে এবং ব্যারিংটন), অস্ট্রেলিয়ায় ২ জন (ব্রাডম্যান এবং হার্ভে) এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ জন (সোবার্স)। এই সাতজনের মধ্যে ৭০০০ রাণ পূর্ণ করেছেন একমাত্র ওয়াল্টার হ্যামণ্ড (খেলা ৮৫, মোট রাণ ৭২৪৯ ও সেঞ্চুরী ২২)। দ্বিতীয় স্থানে আছেন স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান (খেলা ৫২, মোট রান ৬৯৯৬ ও সেঞ্চুরী ২৯)। সর্বাধিক রান এভারেজ এবং সর্বাধিক সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব ব্রাডম্যানের—এভারেজ ৯৯-৯৪ এবং সেঞ্চুরী ২৯। বর্তমানে টেস্ট ক্রিকেটে ৭০০০ রান পূর্ণ করার সম্ভাবনা আছে এই তিনজনের—কলিন কাউড্রে, কেন ব্যারিংটন এবং গারফিল্ড সোবার্সের।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

কয়েকটি অনবদ্য ভ্রমণ কাহিনী
প্রকাশিত হইল

অমৃতভ্রাম অমরকণ্টক

মন্মথ রায়

বিন্ধ্য পর্বতমালার সর্বোচ্চ একাংশের মনোরম ভ্রমণ-কাহিনী। উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। মূল্য : ৬·৫০

পঞ্চ কেদার ৬·৫০

শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

হিমালয়ের দুর্গম পঞ্চতীর্থের মনোজ্ঞ ভ্রমণ-সাহিত্য। ভ্রমণ-রসিকদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবে ও আনন্দ দিবে।

যে ভ্রমণ-কাহিনী সাহিত্যে আলোড়ন আনিয়াছে।

রম্যাণি বীক্ষ্য

মগধ পর্ব (২য়) ৮·৫০, কোশল—২য় ৮,৫০। এই পর্যায়ে আরো ১০টি পর্ব প্রকাশ করিয়াছি।

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে

প্রথম পর্ব ৮·০০, দ্বিতীয় পর্ব ১২·০০

শ্রীদেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

হিমালয়ের আঙ্গিনায়

৫·০০

রামপদ মুখোপাধ্যায়

* * *

নতুন ধরণের দুখানি বই ভারতীয় সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে :

বিশ্ব সাহিত্যের রূপরেখা

প্রথম পর্ব ১০·০০ দ্বিতীয় পর্ব ১২·০০

নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী

লীলা-মাহাত্ম্য ও জীবন-কথা

পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা ১০·০০

শ্রীগণেশচন্দ্র চক্রবর্তী

* * *

শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থ

শিক্ষা ও জনসম্পদ উন্নয়ন

১০·০০

Prof. V. K. R. V. Rao's
EDUCATION AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
-এর অনুবাদ
অনুবাদক : দাশগুপ্ত ও ভট্টাচার্য

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৮ম বর্ষ
১ম খণ্ড

৬ষ্ঠ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 14th June, 1968. শুক্রবার, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসনৎ কর

'নজরুল সন্ধ্যা' প্রসঙ্গে

গত ২৪শে জৈষ্ঠ্যের অমৃতে (৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা) 'নজরুল সন্ধ্যা'র বর্ণনায় লেখা হয়েছে যে, যাঁরা নজরুলের রচনা থেকে পাঠ এবং আবৃত্তি করে শোনান তাঁদের মধ্যে আমিও একজন। খবরটা ভুল। মনে হয় লেখক সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না, স্বকর্ণে কিছু শোনেননি। সে অনুষ্ঠানে আমি স্বরচিত কবিতা পড়ি যেটা গত ৯ই জ্যৈষ্ঠের সাপ্তাহিক বসুমতীতে (৭২ বর্ষ, ৪৯শ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়েছে।

সেই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে যাঁরা 'তথ্য' পরিবেশন করেছেন তাঁদের তালিকা থেকে আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমার লেখায় দুটি নতুন তথ্য ছিল—এক, নজরুলের যোগসাধন ; দুই, তার মৃত পুত্র বুলবুলের দর্শনলাভ। জানিনা লেখক যোগে অবিশ্বাসী কিনা, কিন্তু তথ্য সব সময়েই তথ্য।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
কলিকাতা—২৬।

সাহিত্যে অশ্লীলতা

অধিকারী-অনধিকারী ভেদ জাতীয় একটা কথা প্রচলিত আছে। কৌতুকের বিষয় আজকাল এই ভেদাভেদ বোধটুকু লোপ পেতে বসেছে। সম্প্রতি এইটেই আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্লক্ষণ' এরকম একটি দৃষ্টান্ত 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' শীর্ষক মনোজকুমারের আলোচনাটি। শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'একালের ছোটগল্প' নিবন্ধটির বিরুদ্ধে তিনি ডন কুইক্সোটের মতন হাওয়ায় তরবারি উৎক্ষেপ করেছেন। মনোযোগ-সহকারে অচিন্ত্যকুমারের রচনাটি পড়লে তিনি সহজেই ধরতে পারতেন যে নিবন্ধকার কতকগুলি সাম্প্রতিক গল্পের দৃষ্টান্ত তুলে আঙ্গিকগত ত্রুটি তথা সাহিত্যের ফলশ্রুতির বিচার করেছেন। সাহিত্যের শ্লীল-অশ্লীলের মাপকাঠি অচিন্ত্যকুমারের কাছে শিল্পের প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল। প্রয়োজনহীন বাহুল্য শিল্পে বস্তুত অশ্লীল বস্তু।

প্রয়োজন-অপ্রয়োজন নির্ণয় করবে কে? করবে সৎ সচেতন শিল্পীসত্তা। সার্থক শিল্পীর সৃষ্টি অশ্লীল হওয়া সম্ভব নয় যেহেতু তাঁর শিল্পীচৈতন্য বিশল্যকরণী আনতে গন্ধমাদন বহন করে নিয়ে আসে না। এই মাত্রাবোধ, পরিমিতি ও সংযম শিল্পীর আবশ্যিক শর্ত।

মনোজকুমার নিবন্ধকারের রচনা থেকে এই সিদ্ধান্ত কী করে টানলেন "তাহলে বিশ্বসাহিত্যের চৌদ্দ আনাই অশ্লীল পর্যায়ে পড়ে যায়।" অচিন্ত্যবাবু কী বিশ্বসাহিত্যের শ্লীল-অশ্লীল পরিক্রমা নিবন্ধে কোথাও করেছেন? তাহলে এই সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দেবার চালাকি কেন? মনোজকুমারের বিশ্বসাহিত্যের জ্ঞানের সীমা জানা নেই, তবে একথা নিঃসন্দেহে প্রচার করা যায় যে বিশ্বসাহিত্যের চৌদ্দ আনা অশ্লীল নয়! কোনো পণ্ডিতম্মন্য সে কথা বলবেন না।

দ্বিতীয়ত, মনোজকুমার সুপরামর্শ দিয়েছেন শ্লীল-অশ্লীল বিচারের আগে সৎ-অসৎ নির্ণয় করে দেখতে! কে আপত্তি করছে? দেখুন না। লেখকের উদ্দেশ্যের মধ্যেই সে প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব আছে। উদ্দেশ্য সু হলে সাহিত্য সু হয়, উদ্দেশ্য কু হলে সাহিত্য কু হয়। কোনো সাহিত্যিকই তাঁর আসল উদ্দেশ্যকে লুকোতে পারেন না। সাহিত্যের সততা-অসততা নির্ভর করে উদ্দেশ্যের ওপর।

তৃতীয়ত, সাহিত্যের শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিচারে সমাজনীতির আরোপ ব্যাপারে মনোজকুমারের মনোভাব ধরা গেল না। তবে একথা যথার্থ, বিভিন্ন কালের সামাজিক রীতিনীতি সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। যেহেতু সর্বকালের সাহিত্যই তৎকালীন যুগেরই দর্পণ, কখনো স্বীকারে কখনো অস্বীকারে। সনাতনীগণ সামাজিক স্থিতিকে ধরে রাখতে চান, প্রগতিশীল পুরাতন সমাজব্যবস্থার বন্ধ্যাত্ব লক্ষ্য করে নূতন সৃজনক্ষম সমাজব্যবস্থার আবাহন করেন। সেটা একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন। কিন্তু এই পরিবর্তনশীলতারও নিজস্ব একটা ব্যাকরণ আছে।

মনোজকুমার যখন বলেন, পরিবেশনে সাহিত্য শ্লীল-অশ্লীল হতে পারে, তখন তিনি অচিন্ত্যকুমারের মূল প্রতিপাদ্যেরই প্রতিধ্বনি করেন না কি?

সর্বশেষে অচিন্ত্যকুমারের "জীবনে যা সম্ভব তার সবটাই সাহিত্যে সহনীয় নয়" এই উক্তির বিরোধিতার খাতিরে আলোচক প্রশ্ন করেছেন, "জীবনকে বাদ দিয়ে কি সাহিত্য সম্ভব?" কিন্তু এসব মন্তব্য আসে কী করে? অবশ্যই আর্ট ফোটোগ্রাফি নয় এবং একদা সাহিত্যান্দোলনের ন্যাচারলিজম তত্ত্ব বহুকাল আগে পরিত্যক্ত হয়ে রিয়ালিজম, নিও-রিয়ালিজম স্তর পার হয়ে সাহিত্য আজ রিয়ালিজমকে idealize তথা sublimate করে। বিশ শতকের অন্তিম পর্বে আজ কেউ উনিশশতকীয় প্রকৃতিবাদের চর্চা করবে তা শুধু হাস্যকর নয় করুণার্হও বটে!

সাহিত্যের শেষ কথা সৌন্দর্য এবং কল্যাণ। আনন্দচমৎকারিতা-ই তার ফলশ্রুতি।

সুনির্মল কর,
কলকাতা—৩২।

'তুঙ্গনাথ' প্রসঙ্গে

শ্রদ্ধেয় উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত তুঙ্গনাথ প্রসঙ্গে ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৭৪ সালে শ্রীকল্লোল নন্দী যে চিঠিটি লিখেছেন সেই বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই।

আসাম খুব পূর্বদিকে অবস্থিত—আসামের সঙ্গে প্রাচীন যুগে আর্য-ভারতের কোন যোগাযোগ না থাকারই কথা—কিন্তু তা সত্ত্বেও মহাভারতের অনেক কাহিনীর স্থান এইখানেই বলা হয়। যেমন নেফা অঞ্চলে রুক্মিণীনগর—রুক্মিণীর পিতৃগৃহ বলে বর্ণনা করা হয়, বা পরশুরাম কুণ্ড—যেখানে পরশুরামের কুঠার ব্রহ্মপুত্রের জলে মাতৃহত্যার পাপ ক্ষালন হবার ফলে হস্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল ইত্যাদি। মহাভারতে এই পূর্বাঞ্চলের বেশ কিছুটা উল্লেখ আছে (উলুপী চিত্রাঙ্গদা ইত্যাদি)। তেমনি হিড়িম্বাকে কখনও হিমাচলবাসিনী, কখনও মণিপুরবাসিনী, কখনও পশ্চিম ভারতবাসিনী বলে বলা হয়। ঠিক এইভাবেই বাণরাজার কন্যা ঊষার কিংবদন্তী গাড়োয়াল অঞ্চলে ও আসামে রয়েছে। এই বিষয় নিয়ে সমাজ-তত্ত্ববিদদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—তাঁদের একটা ব্যাখ্যা খুবই যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। অর্থাৎ আর্যেতর জাতিরা যতোই আর্য-সভ্যতার সংস্পর্শে আসতে থাকে, ততোই আর্যদের বহু কাহিনীকে তারা নিজেদের সংস্কৃতির মধ্যে নিয়ে নিয়েছে, ফলে একই ঘটনা বহু স্থানে সংঘটিত হয়েছে বলে দেখা যায়। বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এইভাবেই গড়ে উঠেছে। বহু আদিবাসী ও পাহাড়ী জাতি—যারা অপেক্ষাকৃত উন্নততর জাতিদের সংস্পর্শে এসেছে—তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক এই মিশ্রণ খুবই দেখা যায়। আর্যদের দেবতাকেও তারা নিয়েছে, আবার আর্যরা প্রাচীন আদি-বাসীদের দেবতাদেরও গ্রহণ করেছে। যেভাবেই হোক—মহাভারতের যুগের আগে থেকেই এবং 'মহাভারত' যুগের পরে তো বটেই, বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটার ফলে এই সমস্ত সংস্কৃতির চিহ্ন আমরা একই নামে বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাই। দ্বারকা থেকে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীনগরে এসে তাঁকে হরণ করলেন—এটা বাস্তব দিক থেকে যতই অসম্ভব হোক—এর সাংস্কৃতিক মূল্য অনেকখানি। পাহাড়ী জাতিগুলি এইসব কিংবদন্তী গ্রহণ করে নিজেদের উন্নততর জাতি বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে। উত্তর ভারতের দেবদেবীর মূর্তিগুলির বিষয়ে ভালভাবে চর্চা হলে বা সতীর বাহান্ন পীঠের স্থানগুলির অবস্থিতি দেখলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তই মানতে হয়। ভবিষ্যতে হয়তো এ বিষয়ে আরও বিশদ চর্চা হবে, সাংস্কৃতিক মিশ্রণ সম্পর্কেও নতুন তথ্য জানা যাবে।

কমলা মুখোপাধ্যায়,
কলিকাতা—১৪

অমৃত

এই পথে নয়

এই প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হবে তখন রবার্ট কেনেডি আরলিংটন সমাধিক্ষেত্রে তাঁর অগ্রজের পাশে চিরকালের জন্য শায়িত। আমেরিকার বীর ও অমরাত্মাদের সঙ্গে সেনেটর কেনেডি আজ এক শয্যায় আসন নিলেন। একটি পরিবারের দুইটি সন্তান গৌরবের শিখরচূড়া স্পর্শের জন্য যখন আলোকিত পথে পা দিয়েছিলেন তখনই আততায়ীর নির্মম হস্ত তাঁদের চিরদিনের জন্য অপসারিত করে দিয়ে গেছে। সাড়ে চার বছর আগে জন এফ কেনেডি নিহত হয়েছিলেন ডালাসে। তখন তিনি ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট। এবার নিহত হলেন তাঁর অনুজ রবার্ট। প্রেসিডেণ্ট তিনি হর্নান। কিন্তু জীবিত থাকলে একদিন তিনি হোয়াইট হাউসের সোপান আরোহণ করতেন এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এই দুইটি মৃত্যুই মর্মান্তিক। মাত্র দু' মাস আগে নিহত হয়েছিলেন নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার কিং, যিনি অহিংস উপায়ে আমেরিকার নিগ্রোদের জন্য নাগরিক সমানাধিকার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। লুথার কিং এবং দুই কেনেডি ভ্রাতার শোচনীয় মৃত্যুর কারণ মূলত এক। এ'রা তিনজনেই ছিলেন মার্কিন সমাজে উদারতার সমর্থক। শুধু গায়ের রঙ কালো বলে কোনো মানুষকে সমাজের পেছনের সারিতে থাকতে হবে এ নীতি তাঁরা মানতেন না। আমেরিকার যাঁরা গরীব তাঁদের প্রতি এই সমৃদ্ধ সচ্ছল সমাজের সহানুভূতির দৃষ্টি তাঁরা আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। লুথার কিং-এর হাতে শাসনক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তিনি মার্কিন শাসকদের কাছ থেকে আন্দোলনের মারফৎ বঞ্চিত নিগ্রোদের জন্য অধিকার অর্জনে সক্ষম ছিলেন, যত ধীরে ধীরেই তা হক না কেন। সেইজন্যই তাঁকে যেতে হল। জন, এফ, কেনেডি ছিলেন প্রেসিডেণ্ট। তাঁর হাতে ছিল ক্ষমতা, ছিল সামাজিক দূরদৃষ্টি। কাজে তিনি হাতও দিয়েছিলেন। তাঁকে বিদায় নিতে হল সেজন্য। সেনেটর রবার্ট কেনেডি তাঁর অগ্রজেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তরুণ, উৎসাহী এবং উদারনীতিসম্পন্ন। প্রাইমারী নির্বাচনে তাঁর অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা নিশ্চয়ই সেই চক্রান্তকারীদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল যারা মনে করেছিল যে, এই কেনেডি যদি হোয়াইট হাউসে যান তাহলে কায়েমী স্বার্থ আর বর্ণবিদ্বেষওয়ালাদের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়া না করে তিনি ছাড়বেন না। সুতরাং একেও বিদায় কর। রবার্ট কেনেডির বিরাট সম্ভাবনাময় জীবন মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে শেষ হয়ে গেল।

তাহলে কি মানুষের আশা করার আর কিছু থাকবে না? ব্যক্তিগত হিংসার বিরুদ্ধে একমাত্র রক্ষাকবচ হল সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিশ্ছিদ্র করা। মার্কিন সমাজে এত সমৃদ্ধি ও সাচ্ছল্য সত্ত্বেও কেন যে হিংসার এত প্রাবল্য তার কারণ খুঁজতে হবে সামাজিক নিরাপত্তার গলদের মধ্যে। অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থই হিংসাকে প্রশ্রয় দেয় নিজেদের আসন পাকা[illegible] রাখার জন্য। ভাড়াটে খুনী জোগাড় করা যে সমাজে এত সহজ তার সুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিতই সন্দেহ জাগবে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মৃত্যুরহস্য আজও সঠিকভাবে উদ্ঘাটিত হল না। আততায়ীর জবানবন্দী নেবার আগেই পুলিশের সতর্ক চক্ষুর সামনে তাকে খুন করা হল। খুনীর যে খুনী সেও জেলখানায় রহস্যজনকভাবে মারা গেল। মার্টিন লুথার কিং-এর আততায়ীকে এখনও ধরা সম্ভব হল না। এবং রবার্ট কেনেডির আততায়ীরূপে যাকে ধরা হয়েছে সে ব্যক্তির হত্যার উদ্দেশ্য এত কষ্টকল্পিত যে সহজে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না তার একার মাথা থেকেই হত্যার ষড়যন্ত্র তৈরী হয়েছিল।

তথাকথিত অনুন্নত দেশেও এভাবে রাজনৈতিক নেতাদের সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা হয় না। মার্কিন গোয়েন্দাচক্র সি, আই, এ সারা দুনিয়ায় রাজনৈতিক ওলটপালট ঘটাচ্ছে বলে অভিযোগ। অথচ নিজের দেশের মহান সন্তানদের রক্ষার ব্যাপারে মার্কিন গোয়েন্দাদের কী নিদারুণ ঔদাসীন্য। ওদিকে এই দেশের ছেলেরাই গণতন্ত্র রক্ষার নামে সুদূর ভিয়েতনামে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে। এবারের প্রেসিডেন্সিয়্যাল নির্বাচনে এই প্রশ্নগুলি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সেনেটর রবার্ট কেনেডি এবং তাঁর পার্টির অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সেনেটর ইউজিন ম্যাকার্থী স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছিলেন এই প্রশ্ন—মার্কিন সমাজের নিরাপত্তার জন্যই তাঁরা ছিলেন ব্যগ্র। এই নিরাপত্তা শুধু অস্ত্রের জোরে নয়, বিদ্বেষ, ব্যবধান এবং অসাম্য যাতে সমাজকে অন্ধ হিংসার পথে না নিয়ে যেতে পারে সেই নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠাই ছিল কেনেডি ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্দেশ্য। আততায়ীরা তাঁদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু যে আদর্শের জন্য তাঁরা প্রাণ দিলেন তাকে অস্ত্র দিয়ে পরাজিত করা যায় না। আব্রাহাম লিঙ্কনের সময় থেকে আমেরিকার আদর্শবাদী মানুষ সন্ত্রাসবাদীদের হাতে এমনিভাবে প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে এ পথে আদর্শবাদ নিশ্চিহ্ন করা যায় না। রবার্ট কেনেডির মৃত্যু যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ দিতে হবে আমেরিকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে। এখুনি তার সময়।

৬ই জুন, ১৯৬৮ সাল। লস্ এঞ্জেলসের অ্যাম্বাসেডর হোটেলের ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে আসছিলেন রবার্ট ফ্রানসিস্ কেনেডি। কালিফোর্নিয়া প্রাইমারীতে নির্বাচনে জয়লাভ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন হয়তো। গুণমুগ্ধ ভক্তদের করতালির মধ্য থেকে হঠাৎ গর্জে উঠল ছোট একটি পিস্তল। মাথায় গুলি লেগে লুটিয়ে পড়লেন সিনেটর কেনেডি। পাশে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে স্ত্রী এথেল। ঠিক যেমনটি বসেছিলেন আহত স্বামীর পাশে জেকেলিন কেনেডি। মুহূর্তমধ্যে ডালাস-কালিফোর্নিয়া এক হয়ে গেল পরম সুহৃদ ও অনুগত ভ্রাতা ববিও জনের মতো মস্তিষ্কের পেছনে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় লুটিয়ে পড়লেন। ববির দেহরক্ষীরা আততায়ী সিরহামকে হাতে-নাতে ধরে ফেললেন। কিন্তু ববি আর ফিরলেন না। গুড্‌সামারিটান হাসপাতালে তিন ঘন্টাব্যাপী অস্ত্রপচারের পরে সমগ্র বিশ্বের মানুষের আন্তরিক প্রার্থনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ২৫ ঘন্টা বাদে ববি সত্যই ইহলোক ত্যাগ করলেন। মিশে গেলেন বড়ভাই জন ফিজগারেল্ড কেনেডির সঙ্গে।

কোলকাতায় সংবাদপত্র অফিসে যখন আততায়ী হস্তে ববির আহত হওয়ার সংবাদ এসে পৌঁছল তখন ভর-দুপুর। চমকে উঠলাম, ভাবলাম কেনেডি বংশের উপরে সত্যই কি কারো অভিশাপ আছে! দেশ-কালের সীমা পেরিয়ে মনটা ছুটে চলল পেছনে। চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই রক্তক্ষরা দিনটি—বাইশে নভেম্বর, ১৯৬৩ সাল। ডালাসের মটরকেড—রক্তাপ্লুত জন, হতভম্ব জ্যাকি।

শরতের শেষে ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসে লাঞ্চ সেরে সেন্টপলে আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সংস্থার গৃহে বিশ্রাম করছিলাম, শীতের আমেজ সবে জমে উঠছিল। বাইরে রোদের তাপ আর ততটা তীব্র লাগছিল না। মেপল্ গাছের পাতাগুলো লাল হয়ে পাতা-ঝরানিয়া হাওয়ায় ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছিল। বোধহয় একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ দড়াম করে ঘরের দরজা খুলে ছিটকে এসে পড়ল আমার আইরিশ বন্ধু ও সাংবাদিক ডেনিস্ কেনেডি। আমাকে রাগবার অবসর না দিয়ে বলে উঠল, "গেট আপ ইণ্ডিয়ান প্রিন্স, দে শট্ কেনেডি ইন ডালাস।"

বিশ্বাস করতে মন চাইল না ধমক দিয়ে বলে উঠলাম, "স্টপ ইয়োর সিলি আইরিশ জোক্।"

"আই অ্যাম নট জোকিং, ইউ ক্যান সি দি হোল ড্যাম শো অন দি টি ভি।" বলে ঝড়ের বেগে আবার বেরিয়ে গেল।

ওর পেছনে ছুটে বেরিয়ে এলাম। কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং-এর এ্যানাউন্সার ওয়াল্টার ক্রুংকাইট্ ভারাক্রান্ত গলায় বলে চলেছেন যে, বেলা বারোটার সময় প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে আততায়ী গুলি করেছে। নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে ডালাস হাসপাতালে। বাঁচবার আশা প্রায় নেই। সাংবাদিকের কর্তব্য ভুলে কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে স্থাণুর মতো বসে রইলাম। চোখের সামনে টেলিভিশনের পর্দায় দেখছিলাম গৃহবধূদের শোকচ্ছ্বাস, হাসপাতালের সামনে

অরুণ ভট্টাচার্য

একটি পরিবার'—দু'টি মৃত্যু

ভীড়, জেকেলিন কেনেডির ভাবলেশহীন মুখচ্ছবি, আর ভ্রাতৃশোকে মুহ্যমান ববির চেহারা।

ঘড়ির কাঁটা ঘোরার মতো আমেরিকার রাজনৈতিক দৃশ্যপট পরিবর্তিত হতে লাগল। এয়ারফোর্স নাম্বার ওয়ান—প্রেসিডেন্ট কেনেডির প্লেন—এক প্রেসিডেন্টকে পশ্চাতে রেখে নতুন প্রেসিডেন্ট জনসনকে নিয়ে সশব্দে উড়ে চলল ওয়াশিংটনের দিকে। মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে আমেরিকার জনসাধারণ নতুন প্রেসিডেন্টকে দেখল বাঁচল আমেরিকার কনস্টিটিউশন। খালি রইল না হোয়াইট হাউস।

সম্বিৎ ফিরে পেতে ভিতরের ব্যক্তি-সাংবাদিক মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। পাশের টেলিফোনটা তুলে নিলাম, ওভারসিস্ অপারেটরকে বললাম কোলকাতায় টেলিফোন পাওয়া যাবে কি না, নাম্বার দিলাম পত্রিকা—৫৫-৫২৩১। কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তর এলো "অল লাইনস টু লন্ডন অ্যান্ড বিয়ন্ড জ্যাম্ড।" কোলকাতায় টেলিফোন পাওয়ার আশা ছেড়ে দিলাম। পকেটে মাত্র ষাট ডলার রয়েছে তাতে ডালেস কিম্বা ওয়াশিংটনের এক-তরফা ভাড়া হয়। ওয়াশিংটন যাওয়াটাই স্থির করলাম, কারণ প্রেসিডেন্টের দেহ নিয়ে জেট্-বিমান ওয়াশিংটনেই আসছে। কিন্তু ভাবলে কি হবে কোন প্লেনে সিট নেই। এত বড় বিরাট ট্র্যাজেডির অংশীদার হতে সবাই ছুটে চলেছে ওয়াশিংটনে। আবার টেলিফোন তুললাম। একমাত্র আশা মিনেসোটা মাইনিং কোম্পানী। তাদের তিনখানা প্রাইভেট প্লেন আছে। পনেরজন সাংবাদিক তাদের প্রেসিডেন্টের মৃত্যু 'কাভার' করবে বলে হয়তো তাদের মনে অনুকম্পার সৃষ্টি হয়েছিল। কোম্পানী প্রেসিডেন্ট আমাদের জানালেন যে, একখানি প্লেন আধঘন্টার মধ্যে আমাদের নিয়ে ওয়াশিংটন রওয়ানা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। সামান্য কিছু জিনিসপত্র আর টাইপরাইটারটি নিয়ে উড়ে চললাম ওয়াশিংটনের দিকে। পৌঁছলাম যখন তখন রাত ১টা। ট্যাক্সী নিয়ে রওনা হলাম হোয়াইট হাউসের সবচেয়ে কাছের হোটেল স্টেটলার হিলটনের দিকে। নিগ্রো ট্যাক্সী ড্রাইভার বিদেশী সাংবাদিক জেনে শোকার্ত-কন্ঠে বলল, 'দে উইল কিল অল দি গুড গাইজ।' বলেই আবার যোগ করলো, 'এরা লিংকনকে মেরেছে—কেনেডিকেও বাদ দিল না, গরীবের বন্ধু কেউ থাকবে না।'

হোটেলে পৌঁছেই হোয়াইট হাউসে টেলিফোন করলাম, হোয়াইট হাউসে প্রবেশ-পত্রের জন্য। অ্যাক্রেডিটেড সাংবাদিক জেনে দশ মিনিটের মধ্যেই তারা প্রবেশপত্র দিয়ে দিল। হোয়াইট হাউসে যখন পৌঁছলাম তখন রাত তিনটে। শোকাচ্ছন্ন হোয়াইট হাউস। অনেকগুলো আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে শুধু গেটের কাছে আলোগুলো উজ্জ্বলভাবে জ্বলছিল। সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা পর্যন্ত শোকে মুহ্যমান হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল হোয়াইট হাউসের ভিতরে। আর অতন্দ্র অপেক্ষায় গেটের ভিতরে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা প্রায় ত্রিশজন সাংবাদিক। সাড়ে তিনটের সময় প্রেসিডেন্টের দেহ গেট পেরিয়ে হোয়াইট হাউসে ঢুকলো—যে হোয়াইট হাউস ছেড়ে মাত্র পনের ঘন্টা আগে হাস্যময় প্রেসিডেন্ট কেনেডি ডালাসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। ছাঁতলার ওপর থেকে নিক্ষিপ্ত আততায়ীর একটি গুলী আমেরিকার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় একটি প্রাণকে চিরতরে নিঃশেষ করে দিল।

এর দুমাস পরে টেক্সাসে গিয়েছি। যেখানে ডালাসের রাস্তায় গুলি খেয়ে প্রেসিডেন্ট লুটিয়ে পড়েছিলেন, সেখানে উত্তোলিত কেনেডি মেমোরিয়ালে এক-গোছা ফুল নিয়ে সদা-হাস্যময় প্রাণটিকে

১৯৬০ সালের নির্বাচনে রবার্ট কেনেডি নির্বাচনী প্রচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁর অগ্রজ জন কেনেডির কাছ থেকে।

শ্রদ্ধা জানিয়েছি। মনে পড়েছে এই দিনটিতেই প্রেসিডেন্ট আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন বলে সময় দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্টের প্রেস্-সেক্রেটারীর লেখা সে চিঠিখানা আজো আছে। গিয়েছিলাম আরলিংটন সমাধিক্ষেত্রে, যেখানে অনির্বাণ একটি দীপ নির্বাপিত একটি প্রাণের বিজয় ঘোষণা করছে।

প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছে তার কাছেই রয়েছে তার দুটি শিশু সন্তানের কবর। আজ সাড়ে চার বছর পরে হয়তো প্রিয়ভ্রাতা ববিও দাদার পাশেই অনন্তশয়ানে থাকবেন।

পিতা যোশেফ প্যাট্রিক কেনেডি। ন'টি সন্তানের মধ্যে চারটি ছেলে—যোশেফ জুনিয়র, মৃত্যু ১৯৪৪ সাল, স্থান জার্মানী; জন ফিজগারেল্ড কেনেডি, আততায়ীর হস্তে মৃত্যু, স্থান ডালাস টেক্সাস, সন ১৯৬৩; রবার্ট ফ্রান্সিস কেনেডি, মৃত্যু ১৯৬৮ সাল, ৬ই জুন, স্থান লস্ এঞ্জেলস্ কালিফোর্নিয়া।

শোকাপ্লুত সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা এডোয়ার্ড কেনেডি সিনেটর। দেখতে সে মেজদার মতোই। আচার-ব্যবহারও অনেকটা জনের মতোই, সবাই ভাবে জনের মতো সেও হয়তো প্রেসিডেন্ট হবে। মৃত্যুর ফাঁড়া তার ওপর দিয়েও গেছে। জনের মৃত্যুর পরে

সেনেটর রবার্ট কেনেডির সঙ্গে কেক ভাগ করে নিয়ে দ্রাক্ষা উৎপাদকের বিরুদ্ধে অহিংস ধর্মঘটের সমর্থনে অনশন ভাঙছেন সিজার সাভেজ।

সাত ছেলেমেয়ে নিয়ে রবার্ট ও এথেল কেনেডি। পরে আরো তিনটি সন্তান এসেছে তাদের সংসারে।

একটি প্রাইভেট প্লেন-এ করে যাচ্ছিলেন। প্লেন ক্র্যাশ করলো। শিরদাঁড়া ভেঙে বহুদিন হাসপাতালে রইলেন টেড। মেজদা জনেরও শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছিলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যখন মটর টরপেডো বোটের অধিনায়ক হয়ে যুদ্ধ করছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানীদের বিরুদ্ধে। বড় ভাই যোশেফ ছিলেন নেভী পাইলট। জার্মানীর উপরে তার প্লেনকে গুলী করে ফেলে দেয় জার্মানরা। তৃতীয় ভাই ববি—তিনিও নেভীতে ছিলেন এবং দাদার নামে উৎসর্গীকৃত যুদ্ধজাহাজ 'যোশেফ, পি কেনেডি'তেই তার শিক্ষানবীশ।

পিতা যোশেফ কেনেডি ছিলেন এককালে প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী, ছিলেন বৃটেনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত। মার্কিন রাজনীতির একজন তৎকালীন কর্ণধার। সারা বংশের মজ্জায় জড়িয়ে রয়েছে রাজনীতি। মা রোজ কেনেডি চিরকাল উৎসাহ দিয়ে এসেছেন রাজনীতি করতে। বাবা যোশেফ কিন্তু এখন সুস্থ নন। পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে শয্যাশায়ী সাড়ে পাঁচ বছর। বোঝেন সবই, চোখেও দেখেন, কিন্তু বাক্‌শক্তিরহিত। খবরের কাগজে আর টেলিভিশনে প্রেসিডেন্ট ছেলে জনের ছবি দেখতেন।

হঠাৎ ২৩ নভেম্বর ঘর থেকে টেলিভিশন সেটটি সরিয়ে নেওয়া হোল, এলো না সংবাদপত্র, বুঝলেন কিছু হয়েছে। সকলের মুখে শোকের ছায়া। পিতার চোখেও নামে অশ্রুধারা। তবে কি জনের কিছু হয়েছে? দুঃসংবাদ নিয়ে এলো রবার্ট—ববি। বাবার মাথার কাছে বসে মেজদার মৃত্যু-সংবাদ বৃদ্ধ বাবাকে জানালো।

আর আজ! গুলী খেয়ে ভুলুণ্ঠিত রবার্টের ছবিও তিনি দেখবেন না। হয়তো ছোট ছেলে, কেনেডি বংশের অবশিষ্ট দীপশিখা বাবাকে জানাবে মেজভাই-এর মৃত্যু-সংবাদ—মার্কিন রাজনীতির পাদপীঠে কেনেডি বংশের দ্বিতীয় বলি।

ববিরও সম্ভাবনা ছিল অনেক। প্রেসিডেন্ট হবার নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন না ঠিক করেছিলেন। বন্ধুরা ভেবেছিল ১৯৬৮ সালে জনসনের হয়ে কাজ করবেন আর ১৯৭২ সালে নিজে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন। সব গোলমাল হয়ে গেল। জনসনের ভিয়েৎনাম নীতি, দেশে নিগ্রোদের দুরবস্থা, অভাবী মানুষদের দুর্দশা টেনে নামালো ববিকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। বন্ধুদের বললেন, "আমার দেশের ভবিষ্যৎ, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভাগ্য সব জড়িয়ে রয়েছে এই নির্বাচনের সঙ্গে। আমি দাঁড়াচ্ছি নতুন নীতি নির্ধারণের জন্যে, ভিয়েৎনামে লক্ষ লক্ষ আমেরিকানদের রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে আর আমাদের দেশের শাদা-কালোর বিভেদ দূর করে অভাবীদের মুখে হাসি ফোটাতে। আমি চাই আমেরিকার তথা সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে বিভেদ দূর হোক। শাদা-কালো ধনী-নির্ধনের তফাৎ মুছে যাক।"

কিন্তু ববির আশা পূর্ণ হোল না। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কালিফোর্নিয়া প্রাইমারীতে জয়লাভ করবার পরেই নিয়তির নির্মম হস্ত তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল। কিন্তু ববি এ-বছর দাঁড়াতে গেলেন কেন? জনসনের নীতির ব্যর্থতা, না রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী নিক্সনকে সহজে হারানোর ইচ্ছা তাকে উৎসাহিত করেছিল? ভ্রাতা জনের নির্বাচনী প্রচারের সময়ে তিনি নিক্সনকে প্রতি পদে পরাজয়বরণ করতে বাধ্য করেছেন। যেমন জনের সময়ে পারেননি, আজও তেমনি টেলিভিশন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি ববির সঙ্গে পারতেন না। দেশের যুব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ববি, ডাইনামিক্ ববি, ভূতপূর্ব অ্যাটর্নী জেনারেল ববি, আর ভ্রাতা জনের সব সংকটের পরামর্শদাতা ববি। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ একজন সিনেটের থেকে জনমানসের প্রতিনিধি হয়ে প্রেসিডেন্সীর দুয়ারে পা বাড়িয়েছিলেন।

জনসন তাকে কোনদিনই পছন্দ করতেন না। কারণ, যতটা রাজনৈতিক, তার চেয়েও বেশী ব্যক্তিগত। ১৯৬০ সালে নির্বাচনের সময় ববি মেজদা জনকে জনসনকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিতে নিষেধ করেছিলেন। জনসন তা ভোলেননি। জন কেনেডির মৃত্যুর পরে ববি কিছুদিন প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে অ্যাটর্নী জেনারেলের কাজ করেন। পরে পদত্যাগ করেন।

দাদার ছায়াসঙ্গী ছিলেন ববি। যখন তাকে অ্যাটর্নী জেনারেল হিসাবে নিয়োগ করেন প্রেসিডেন্ট কেনেডি, তখন সারা আমেরিকায় আত্মীয় পোষণের বিরুদ্ধে অসন্তোষের ঝড় উঠেছিল। লোকে বলেছিলঃ

"হি ইজ টু পলিটিক্যাল, টু ইয়ং অ্যান্ড টু কিন।"

সকলে ববিকে ভেবেছিল অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ববি তার উত্তরে বলেছিলেন, "আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বড় নিঃসঙ্গ মানুষ, দায়িত্বের ভার তার ওপরে, কিন্তু মন খুলতে পারেন না কারো কাছে, তাই বিশ্বাসী একজন আত্মীয় কাছে থাকলে তার ভার অনেকটা লাঘব হয়।" প্রতি রাত্রেই ভ্রাতা জনের সঙ্গে ববির কথা হোত। বিষয়ঃ রাজনীতি, আভ্যন্তরীণ

জনপ্রিয় ববি

সমস্যা, পররাষ্ট্রনীতি, আমেরিকার দারিদ্র্য, শিক্ষার সংস্কার ও নিগ্রো-সমস্যা।

দু' ভাই-এর মিল যেমন ছিল, অমিলও অনেক, বিভেদও ছিল প্রচুর। যে-কোন বিষয়ে নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে ববি কোনদিন সঙ্কোচবোধ করেননি। অনেকেই এইজন্যে তাকে 'ব্লাণ্ট' নাম দিয়েছিলেন। তাঁর বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসন-ক্ষমতায় আস্থা ছিল বলেই প্রেসিডেণ্ট কেনেডি তাকে কিউবা আক্রমণের নামে সি আই এ-র হটকারিতার অনুসন্ধান করতে বলেছিলেন। ক্ষমতা দিয়েছিলেন শিক্ষা ও নির্বাচন ক্ষেত্রে নিগ্রোদের সমানাধিকার দানের।

১৯২৫ সালের বিশে নভেম্বর ম্যাসাচুসেটের ব্রুকলিনে ববির জন্ম। তারপর মিল্টন একাডেমী, হার্ভার্ড ইউনিভারসিটি ও ভার্জিনিয়া ল' স্কুল থেকে পাশ করেন। অ্যাটর্নী হিসাবে তিনি বারে যোগ দেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং কিছুদিন বোস্টন পোস্ট কাগজের ওয়ার-করেসপনডেণ্ট বা যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করেন ইস্রাইলে।

নিজে স্পোর্টসম্যান ও একজন সুদক্ষ অ্যাথেলেট হিসাবে নাম করেন। ফুটবল খেলতে ভালবাসতেন, স্কী-তে দক্ষ ছিলেন, এছাড়া খেলতেন টেনিস, কখনো বা সমুদ্রে নৌকো নিয়ে ইয়টিং করতে যেতেন। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে ক্যানাডার ইউকন অঞ্চলে ১৪,০০০ ফিট একটি পর্বতচূড়া আরোহণ করে তার নাম রেখেছিলেন ভাই-এর নাম অনুসারে মাউণ্ট কেনেডি।

ভ্রাতার মৃত্যুর পরে যথেচ্ছ আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন ববি আগ্নেয়াস্ত্র নিষেধ আইন প্রবর্তন করে। সফল হননি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আমেরিকানরা ফেডারেল গভর্নমেণ্টের এই আইন হতে দেয়নি। যদি দিতো, তাহলে হয়তো আজ ববিকেও দাদা জনের মতো অপমৃত্যুকে বরণ করতে হোত না। যে-হিংসা ও ঘৃণা বুলেটের মূর্তরূপে ববিকে আঘাত করেছে, হত্যা করেছে জনকে, মৃত্যু ঘটিয়েছে মার্টিন লুথার কিং-এর, তা হয়তো আজ আমেরিকান সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ক্যানসারের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। যতদিন এর প্রতিকার না হবে, ততদিন হাজার হাজার পরিবার জন আর ববির মতো রত্নকে সামাজিক হিংসা ও রাজনীতির পায়ে বলি দিতে বাধ্য হবে। সান্ত্বনা এই যে, পিতা যোশেফ আর মাতা রোজের চোখের জল আজ সমগ্র পৃথিবীর পিতামাতার চোখের জলের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। আর ববির দশটি সন্তান, জনের সন্তানরা হয়তো যে সহস্র সহস্র হতভাগ্য নিগ্রো ও দরিদ্র শিশুদের চোখের জল জন আর ববি মোছাতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল, তাদের সঙ্গে ক্ষণিকের জন্য একাত্ম বোধ করছে।

ব্যবধান সাড়ে চার বৎসরের, তবুও নভেম্বরের সেই নিকষ কাল দিনটি আর জুনের এই রৌদ্রতপ্ত দিনের কোনও তফাৎ নেই। ইতিহাসের যেন দুটি পর্ব—তবুও কত সংযোগ—জীবনে নয়, মৃত্যুতে। একটি শোকার্ত পরিবারের দুটি বলি। কার পায়ে?

"ববি, তুমি কি ঘুমোচ্ছ ?"

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

বর্তমান দশকের গোড়ার দিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দাক্ষিণের রাজ্যগুলিতে নিগ্রোরা (ও তাঁদের শ্বেতাঙ্গ সমর্থকরা) বাসে সাদা-চামড়ার লোকদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে যাওয়ার অধিকারের জন্য আন্দোলন করছিলেন। এই আন্দোলন সম্পর্কে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। একদিন একটি জেলে নিগ্রো মেয়ে-বন্দীরা মুখে মুখে গান তৈরী করে ফেললেন:—

Are you sleeping
Are you sleeping
Brother Bob!
Brother Bob!
Freedom Riders waiting
Freedom Riders waiting
Enforce the law
Enforce the law

অন্যান্য নিগ্রো প্রতিবাদ সঙ্গীতের মত এই গানটিও পরে মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বহু যুগের লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার দ্বারা পীড়িত নিগ্রোরা সেদিন তাঁদের যে ভ্রাতাটিকে জেগে ওঠার জন্য ও তাঁদের বন্ধন মোচনের উদ্দেশ্যে আইন প্রয়োগ করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি নিজে ছিলেন সেই সমাজেরই একজন যাঁরা একদিন আফ্রিকার কালো মানুষগুলিকে কিনে এনে দাসদাসীতে পরিণত করেছিলেন। ইতিহাসের বিচিত্র নির্দেশে সেদিনকার দাসদাসীদের বংশধররা তাঁদের মুক্তির জন্য, দাক্ষিণের রাজ্যগুলির অন্ধ বিদ্বেষপরায়ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন আর সেই সংগ্রামে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের সকল শক্তি ও সহায়তা নিয়ে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াবার ভার পড়েছিল ম্যাসাচুসেটসের কেনেডি বংশের একজন সন্তানের উপর। কেনেডি হচ্ছে সেই-সব পদবীর একটি যেগুলি একেবারে পয়লা সারির আভিজাত্যের কুললক্ষণ হিসাবে আমেরিকায় "বোস্টন ব্রাহ্মণ" নামে পরিচিত।

বব ওরফে ববি ওরফে রবার্ট ফ্রান্সিস কেনেডি সেদিন ছিলেন তাঁর বড় ভাই প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির অধীনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আটর্ণি জেনারেল ও আমেরিকার গভর্ণমেন্টে দুই নম্বর ব্যক্তি। আর যেদিন তিনি লস অ্যাঞ্জেলিসের হোটেলে আততায়ীর গুলীতে মারা গেলেন সেদিন তিনি নিজেই ছিলেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পদে একজন প্রার্থী। বড় ভাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করলেন এবং ওয়াশিংটনে বড় ভাইয়ের সমাধির পাশেই চিরনিদ্রায় শুলেন। কিন্তু, যদি তাঁর এমন আকস্মিক ও শোকাবহ মৃত্যু নাও হত, এমন কি যদি তিনি আদৌ হোয়াইট হাউসে জন কেনেডির আসনে গিয়ে বসবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ না করতেন তাহলেও আটর্ণি জেনারেল রবার্ট ফ্রান্সিস কেনেডির নাম আমেরিকার ইতিহাসে থেকে যেত তিনি নিগ্রোদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যা করেছেন তার জন্য।

থিয়োডোর এইচ হোয়াইট তাঁর বই "দি মেকিং অব দি প্রেসিডেন্ট, ১৯৬৪"-তে রবার্ট কেনেডি সম্পর্কে লিখেছেন,

নিগ্রোদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে "তাঁর চেয়ে অধিকতর নিষ্ঠাবান অ্যাটর্ণি জেনারেল আধুনিক কালে ঐ অফিসে বসেন নি।"

১৯৬১ সালের ২১ জানুয়ারী রবার্ট কেনেডি অ্যাটর্ণি জেনারেলের কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম দিন থেকেই তিনি তাঁর বিভাগের কাজগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছিলেন আমেরিকার সমাজ থেকে সাদা-কালোর বৈষম্য দূর করা ও বঞ্চিত নিগ্রোদের পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার উপর। এর জন্য তাঁকে তাঁর বিভাগকে ঢেলে সাজাতে হয়েছিল, আমলাতন্ত্রের বাধা কাটাতে হয়েছিল, নিজের আস্থাভাজন লোকদের এনে দপ্তরের দায়িত্বপূর্ণ পদে বসাতে হয়েছিল। রবার্ট কেনেডি অ্যাটর্ণি জেনারেল হওয়ার পাঁচ বছর আগেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগে বিশেষভাবে নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি দেখা-শুনা করার জন্য কোন পৃথক দপ্তর ছিল না। অ্যাটর্ণি জেনারেলের অফিসে মোট ৯৫০ জন আইনজীবী কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র দশজন ছিলেন নিগ্রো।

রবার্ট ফ্রান্সিস কেনেডি তাঁর বিভাগের পুরানো আমলাতান্ত্রিক ধারা বদলে দিলেন। ৩০ বছর বয়সের তরুণ আইনজীবী বার্ক মার্শালকে নিয়ে এসে তিনি "সিভিল রাইটস" দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্তা করে দিলেন। মিসিসিপির দুর্ধর্ষ সিনেটর, প্রকাণ্ড আবাদের মালিক জেমস ইষ্টল্যান্ড ঠাট্টা করে ববিকে বলেছিলেন, "তোমার আগে যিনি অ্যাটর্ণি জেনারেল ছিলেন তিনি কখনও নিগ্রোদের ভোটাধিকারের জন্য আমার এখানে মামলা করতে যান নি।" অ্যাটর্ণি জেনারেল ববি ছয় মাসের মধ্যেই মামলা করেছিলেন। মিসিসিপির একটি কাউণ্টিতে শ্বেতাঙ্গ রেজিষ্ট্রার নানা অজুহাতে নিগ্রোদের ভোটার হতে দিচ্ছিলেন না। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে লেগে থেকে, সহানুভূতিহীন বিচারকের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই করে, ক্রমাগত মামলা চালিয়ে প্রায় সাড়ে নয় মাস পরে ঐ শ্বেতাঙ্গ রেজিষ্ট্রারকে প্রথম নিগ্রো ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন ববি কেনেডির বিচার বিভাগ। কৃতিত্ব হিসাবে উল্লেখযোগ্য না হলেও আইনের পথে বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্য অ্যাটর্ণি জেনারেল রবার্ট কেনেডি ও তাঁর সহকর্মীরা যে অসীম

হাসিমুখে তিন ভাই : জন কেনেডি (মধ্যে), এডোয়ার্ড কেনেডি (বামে) ও রবার্ট কেনেডি (ডাইনে) যখন ওয়াশিংটনে এক ভোজসভায় মিলিত হয়েছেন, তার ছবি।

ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছিলেন, নিগ্রোদের সমানাধিকারের আন্দোলনে যে পরিপূর্ণ নৈতিক সমর্থন নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন সেটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রেসিডেন্ট কেনেডির আগে হোয়াইট হাউসের বাসিন্দা ছিলেন আইসেনহাওয়ার। বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্য আইন প্রণয়নে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তাঁর কথাঃ—"আইন দিয়ে মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করা যায় না।" রবার্ট কেনেডির জবাবঃ— "আইন প্রয়োগ করা হবে, এটা জানা থাকাই আসল কথা। অনেক সময় এটা জানা থাকলেই বিরোধের মিটমাট সম্ভব হয়ে যায়।"

আইনে আস্থা ছিল না বলেই প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের আমলে রচিত আইন অকেজো হয়েছিল আর আইনের পথে আমেরিকার বর্ণসমস্যা মেটান যায়, এটা দেখাতে চেয়েছিলেন বলেই রবার্ট কেনেডি আইসেনহাওয়ারের আমলের আইনকে কাজে লাগিয়েছিলেন। নিগ্রোদের ভোটাধিকার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় আইন গৃহীত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। তারপর প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন সেই সময়ের মধ্যে ঐ আইন অনুযায়ী ১০টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল আর পরবর্তী তিন মাসে দায়ের করা হয়েছিল ৪৫টি মামলা।

১৯৬০ সালে জন কেনেডি যখন প্রথমবার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন তখন আইসেনহাওয়ার বলেছিলেন, "দুটো টেলিফোনের জোরেই কেনেডি জিতে গেলেন।" আইসেনহাওয়ার হয়ত একটু বাড়িয়ে বলেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে ১৯৬০ সালের অকটোবর মাসে জন কেনেডি ও তাঁর ভাই রবার্ট কেনেডি যেচে দুটি টেলিফোন করে প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী নিকসনের বিরুদ্ধে বাজী মাত করে দিয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জর্জিয়ায় তখন নিগ্রোদের "সিট-ইন" আন্দোলন চলছিল। হোটেল-রেস্তোরা ইত্যাদিতে কালো-ধলার যে পার্থক্য করা হত তার বিরুদ্ধে এই সত্যাগ্রহ। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করছিলেন ডঃ মার্টিন লুথার কিং। জর্জিয়ার কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে পুরানো একটি অভিযোগ নতুন করে আনলেন। অভিযোগ হচ্ছে, তাঁর গাড়ীতে জর্জিয়ার নম্বর প্লেট নেই। জর্জিয়ার শ্বেতাঙ্গ বিচারপতি ডঃ কিংকে দন্ড দিলেন—ছয় মাসের কারবাস। নিগ্রোরা বিচলিত হয়ে উঠলেন, সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন আমেরিকানরা শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্বকামী দক্ষিণী শাসকদের প্রতিহিংসাপরায়ণতায় বিস্মিত হলেন। জন কেনেডি তখন তাঁর নির্বাচনী প্রচার অভিযানে ব্যস্ত। তাঁর পরামর্শদাতাদের পরামর্শে তিনি ডঃ মার্টিন লুথার কিংয়ের স্ত্রীকে ফোন করে সহানুভূতি জানালেন। তাঁর ভাই রবার্ট আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি বিচারককে টেলিফোন করে ডঃ কিংকে জামীনে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। ডঃ কিং ছাড়া পেলেন। অন্যদিকে, নিকসন কোন মন্তব্য করলেন না। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নামে প্রচার করার জন্য একটি বিবৃতির খসড়া রচিত হলেও সেই বিবৃতি শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করা হল না। জন কেনেডির শিবির এই ঘটনার রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করলেন। কুড়ি লক্ষ ইস্তাহার ছেপে সারা দেশে "একজন হৃদয়বান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী"-র কাহিনী প্রচার করা হল। সন্দেহ নেই, নির্বাচনের অব্যবহিত প্রাক্‌কালে এই ঘটনা কেনেডির পক্ষে বহু নিগ্রো ভোট এনে দিয়েছিল এবং ঐ ভোট না এলে সাম্প্রতিক আমেরিকার ইতিহাসই হয়ত অন্য রকম হত।

মনে হতে পারে যে, এটা একটা নিছক রাজনৈতিক কৌশলের ব্যাপার। হয়ত মূলত তাই। অন্তত আইসেনহাওয়ার এবং আরও অনেকে ব্যাপারটিকে সেভাবেই দেখিয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, পরবর্তী কালে অ্যাটর্ণি জেনারেল হিসাবে রবার্ট কেনেডি যেভাবে নিগ্রোদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জড়িত হয়েছিলেন সেটা তাঁর দাদা প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। অ্যান্টনি লিউইসের সম্পাদিত "পোর্টেট অব এ ডিকেড" গ্রন্থে বলা হয়েছে, "আসলে নিগ্রোদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় গভীর নৈতিক প্রতিশ্রুতি ছিল রবার্ট কেনেডির, তাঁর বড় ভাইয়ের নয়।"

রবার্ট কেনেডি যখন অ্যাটর্ণি জেনারেলের অফিসে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৫ এবং দেখতে তার চেয়েও কম। ওয়াল্টার লর্ড তাঁর "দি পাস্ট দ্যাট উড নট ডাই" বইয়ে লিখেছেন, রবার্ট যখন অ্যাটর্ণি জেনারেলের অফিসের ৫১১৫ নম্বর ঘরে গিয়ে কোটের হাতা গুটিয়ে, টাই খুলে, চামড়ার বিরাট চেয়ারে বসে প্রায় মিলিয়ে গেলেন তখন প্রথম নজরে মনে হল যেন, বাবা বেরিয়ে গেছেন আর সেই ফাঁকে বাচ্চা ছেলে বাবার ঘরে ঢুকে বসেছে। কিন্তু সেটা শুধু প্রথম নজরেই...।" কেননা, রবার্ট কেনেডির মধ্যে একটা প্রবল জেদী ভাব ছিল। পরাজয় তিনি কখনই মেনে নেবেন না। যে কাজ সবচেয়ে কঠিন সেটাই তাঁর পক্ষে ছিল সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য চ্যালেঞ্জ। অ্যাটর্ণি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে, অন্ধ বর্ণ-সংস্কারে, আচ্ছন্ন গবর্ণর, বিচারক, মেয়র, শেরিফ ইত্যাদির প্রত্যক্ষ বাধা ও পরোক্ষ অবরোধের কৌশলের সম্মুখীন হয়ে তাঁর এই রোখ ক্রমেই বেড়ে গিয়েছিল এবং প্রায় একটা ব্যক্তিগত জেহাদের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে-

ছিল। বাসে ও ট্রেনে নিগ্রোদের বিরুদ্ধে বৈষম্য বন্ধ করার জন্য তিনি "ইন্টার-স্টেট কমার্স কমিশন"-এর সাহায্য নিয়েছিলেন, জন হার্ডি নামক একজন নিগ্রো ছাত্রের বিরুদ্ধে অন্যায় মামলা তুলে নেওয়ার জন্য মিসিসিপি রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি বহু পুরাতন, অব্যবহৃত কেন্দ্রীয় আইন খুঁজে বের করে প্রয়োগ করেছিলেন। যেখানে তাঁর সরকারী ক্ষমতা ব্যর্থ হয়ে গেছে সেখানে তিনি ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। ১৯৬৩ সালের জুন মাসে মিসিসিপি রাজ্যের ইটা বেনা নামে এক জায়গায় একটা বাজে অভিযোগে ৪৫ জন নিগ্রো নরনারীকে একটা বিচারের প্রহসনের মধ্যে ফেলে প্রত্যেক পুরুষকে ছয় মাস কারাদণ্ডে ও পাঁচশ ডলার করে অর্থদণ্ডে এবং প্রত্যেক নারীকে ৪ মাস করে কারাদণ্ডে ও ২০০ ডলার করে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করতে হলে ঐ রাজ্যের আইন অনুযায়ী প্রত্যেক পুরুষকে ৭৫০ ডলার করে ও প্রত্যেক নারীকে ৫০০ ডলার করে জামীন দিতে হয়। এই পরিমাণ অর্থ যোগাড় করার ক্ষমতা মিসিসিপির ঐ দরিদ্র নিগ্রোদের ছিল না। অ্যাটর্ণি জেনারেলের এ ব্যাপারে কিছুই করার ছিল না। কিন্তু রবার্ট কেনেডি নিউইয়র্কের একটি ইনস্যুরেন্স কোম্পানীকে বলে দিলেন, ঐ ৪৫ জনের জামীন হতে। তাঁরা ছাড়া পেয়ে গেলেন। ভার্জিনিয়ার প্রিন্স এডওয়ার্ড কাউন্টির পৌরসভা স্থানীয় স্কুলে বর্ণবৈষম্য নিবারণের আইন এড়াবার জন্য স্কুলই বন্ধ করে দিলেন এবং শুধু শ্বেতাঙ্গ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য একটি "প্রাইভেট স্কুল" খুলে পিছনের দরজা দিয়ে সেই স্কুলের জন্য পৌরসভার অর্থ বরাদ্দ করতে লাগলেন। এক কথায় প্রিন্স এডওয়ার্ড কাউন্টি রবার্ট কেনেডি আর তাঁর দপ্তরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালেন। রবার্ট ফ্রি স্কুল অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি গঠনে উৎসাহ দিলেন, সেই সমিতি যাতে পৌরসভার অর্থ সাহায্য ছাড়াই স্কুল চালাতে পারেন সেজন্য অর্থ সংগ্রহ করে দিলেন।

নিগ্রোদের সমান অধিকারের প্রশ্নে এই তীব্র ব্যক্তিগত আগ্রহই পরবর্তী কালে প্রেসিডেন্ট কেনেডির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। গোড়ার দিকে দুই ভাইয়েরই বিশ্বাস ছিল, একবার যদি নিগ্রোদের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে নিগ্রোরা নিজেরাই নিজেদের অন্যান্য সব অধিকার আদায় করে নিতে পারবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তাঁরা বুঝেছিলেন, সমস্যাটা এত সরল নয়। ১৯৬০ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্ট কেনেডি তাঁর সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিলেন। নিগ্রোরা আজও অবিচার থেকে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পীড়ন থেকে মুক্ত হয় নি, একথার উল্লেখ করে তিনি বললেন, "দেশ হিসাবে, জাতি হিসাবে আমরা একটা নৈতিক সঙ্কটের মধ্যে এসে পড়েছি। ...শুধু আইনের সাহায্যে মানুষের মনে ন্যায়বোধ আনা যায় না। আমরা মূলত একটা নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি।" "টাইম" পত্রিকা সেদিন এই বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেছিল, "প্রেসিডেন্ট হিসাবে কেনেডি যতগুলি বক্তৃতা দিয়েছেন তার মধ্যে এটাই সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে আর কখনও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিগ্রোদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করার জন্য জাতির কাছে আবেদন জানান নি। এর আগে আর কোন প্রেসিডেন্ট তাঁর চেয়ে জোরালো ভাষায় একথা বলেন নি যে, শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে নিগ্রোদের সমতার অধিকারের ভিত্তি শুধু আইন নয়, ন্যায়নীতিও বটে।"

প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির সেই বক্তৃতার সপ্তাহখানেকের মধ্যে তাঁর কাছ থেকে নিগ্রোদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূর করার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের ব্যাপকতম আইন প্রণয়নের প্রস্তাব এসেছিল আর পাঁচ মাসের মধ্যে ডালাসে আততায়ীর গুলীতে তাঁর প্রাণান্ত হয়েছিল। ইতিহাসের এই পরিণতিতে রবার্ট ফ্রান্সিস কেনেডির অনেকখানি হাত ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

এমন কি ডঃ মার্টিন লুথার কিংয়ের মত নরমপন্থী নিগ্রো নেতাও অবশ্য স্বীকার করেন নি যে, রবার্ট কেনেডি ও তাঁর ভাই নিগ্রোদের জন্য যতটা করতে পারতেন ততটা করেছিলেন। তিনি একবার এ বিষয়ে আইসেনহাওয়ারের আমলের সঙ্গে কেনেডির "নিউ ফ্রণ্টিয়ার"-এর আমলের তুলনা করে বলেছিলেন, "আগে প্রায় কিছুই করা হয় নি আর 'নিউ ফ্রন্টিয়ারের' আমলে যথেষ্ট করা হচ্ছে না।" "এক কলমের খোঁচায়" গৃহসংস্থানের ব্যাপারে নিগ্রোদের বিরুদ্ধে বৈষম্য রদ করে দেবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েও নির্বাচনের পর ফ্রান্সিস কেনেডি যখন তাঁর কথা রাখতে পারলেন না তখন নিগ্রোরা তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে গোছা গোছা কলম পাঠিয়েছিলেন।

নিউইয়র্কের বাসিন্দা রবার্ট কেনেডি যেমন মিসিসিপির দরিদ্র নিগ্রো চাষীদের মধ্যে ঘুরেছেন তেমনি নিউইয়র্কের নিগ্রো পাড়া হার্লেমের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। হার্লেমের নিগ্রো ছোকরাদের সঙ্গে তিনি তাদের একজন হয়েই মিশেছেন। তবু তিনি যে আমেরিকান নিগ্রোদের সমস্যা পুরোপুরি বুঝেছেন এমন সাক্ষ্য হয়ত সব নিগ্রো নেতা দেবেন। ১৯৬৩ সালের মে মাসে রবার্টের নিউইয়র্কের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে নিগ্রো লেখক জেমস বল্ডুইন ও অন্যান্য কয়েকজন নিগ্রো বুদ্ধিজীবীর আলোচনার পর বল্ডুইন মন্তব্য করেছিলেন "নিগ্রোদের মনোভাবের তীব্রতায় ববি একটু বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। আর আমরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম, তিনি ব্যাপারটা কত সহজভাবে দেখেন তা উপলব্ধি করে।" ১৯৬৩ সালের ঐ মে মাসের সাক্ষাৎকারে ববি কেনেডির সঙ্গে নিউইয়র্কের নিগ্রো বুদ্ধিজীবীদের কোন বোঝাপড়াই হয় নি, কিন্তু ঐ আলোচনায় যোগদানকারীদের একজন —মনোবিদ্যার অধ্যাপক কেনেথ ক্লার্ক—তাঁর ভাষায় "ববি কেনেডি যে তিন ঘন্টার উপর বসে থেকে এই ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তাতেই বোঝা গেছে যে, শ্বেতাঙ্গ শাসকতন্ত্রের সবচেয়ে ভাল যা দেওয়ার আছে তিনি তার অন্যতম। ঐ ঘরে সেদিন কোন খলনায়ক ছিল না—ছিল শুধু আমাদের সমাজের অতীত।"

ববি কেনেডি তাঁর সাধ্য অনুযায়ী, তাঁর মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আত্মদানের গৌরব ও মার্কিণ সমাজে কেনেডি নামের যে যাদু আছে তাকে সম্বল করে আমেরিকার অতীত ইতিহাসের ঐ অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করছিলেন। "ভাই ববি, তুমি কি ঘুমোচ্ছ?"—আমেরিকার নিগ্রোদের এই ডাকে তিনি আর সাড়া দেবেন না। কিন্তু একদিন দিয়েছিলেন, এটাই সম্ভবতঃ তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হয়ে লেখা থাকবে।

অফিস থেকে বেরিয়ে, একটা পানের দোকান থেকে দুটো পান কিনে একসঙ্গে মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে, রাজভবনের পাশ দিয়ে—বাতিল-হয়ে-যাওয়া বিধানসভার কোনো বিষণ্ণ এম-এল-এর মতো ধীর অবসন্ন পায়ে—অপূর্ব এসে ময়দানে নামল।

লালচে রুক্ষ ঘাসের ওপর এখন শেষ বেলার রোদ। গাছের ছায়া লম্বা হয়ে পড়ছে। সারাদিনের আগুন-বৃষ্টির পর এখন ঠাণ্ডা হাওয়ার ঢেউ পাঠিয়েছে দক্ষিণের সমুদ্র। শুকনো কুটোর সঙ্গে উড়ে আসছে হলদে ফুলের পাপড়ি। আশপাশে মানুষ, চীনে বাদাম, মুড়ির ঠোঙা, আইসক্রীম।

পড়ন্ত রোদটাকে আড়াল দিয়ে, বনেদী একটা পাথরের মূর্তির পেছনে পিঠ এলিয়ে বেশ আরাম করে বসল অপূর্ব। বাড়ী ফেরবার কোনো তাড়া নেই—আদৌ না।

মশা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তর-পূব কলকাতার যেখানে আদিকালের জলাগুলি বুজিয়ে হালে নতুন সব উপনগর তৈরী হচ্ছে, সেইখানেই তার আস্তানা। দিনের বেলা বেশ লাগে দেখতে—চকচকে সব বাড়ী, ছড়ানো সবুজ, গাছপালার উঁকিঝুঁকি, পাখিদের যাওয়া-আসা। কিন্তু বেলা ডুবতে না ডুবতেই বিভীষিকা। কয়েক কোটি মশা তখন অবাধে রাজত্ব করতে থাকে। দাঁড়ানো যায় না, বসা যায় না, পড়া যায় না—শুধু দু-হাতে নিজের সর্বাঙ্গ থাবড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না তখন। এক মশারির মধ্যে অবশ্য ঢুকে পড়া যায়। কিন্তু বাইরে যখন কেবল একটি মনোরম সন্ধ্যা, হাওয়ায় যখন কারো টবের বেলফুল কিংবা কারোর বাগানের হেনা গন্ধ ছড়িয়েছে, যখন খোলা আকাশ আর নতুন তারার নীচে বসে গল্প করবার সময়—তখন মশারির জীবন্ত সমাধি কি কল্পনাও করা চলে?

তার চাইতে একটু দেরী করে ফেরা ভালো। সাড়ে আটটা—ন'টা—সাড়ে ন'টা। তখন মশারা খেয়ে-দেয়ে কিঞ্চিৎ তৃপ্ত, হুলের ধার কিছুটা ভোঁতা এবং তখন রাতের খাবার গিলে মশারিতে ঢোকবার পরম লগ্ন। অতএব অপূর্ব এখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত গড়ের মাঠে অপেক্ষা করতে পারে। দু আনার বাদাম কিনে চিবোতে পারে, এক ভাঁড় চা খেতে পারে—একটা আইসক্রীম—না, আইসক্রীম নয়—বাঁ-

দিকের একটা দাঁতে কনকনানি উঠেছে—এক ভাঁড় চা খেয়ে, একটু কোল-আঁধায় ঘনিয়ে এলে ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়েও পড়তে পারে।

আর ভাবতে পারে।

সেই ভাবনাটা বাসে যেতে যেতে ভাবা যায় না—কারণ পাতিপুকুর অঞ্চলের নিয়তির মতো রাস্তা যে-কোনো মানুষকে পরম নির্ভাবনায় পৌঁছে দেয়; সে ভাবনা বাসায় বসে চলে না, কারণ রেশন-বাজার-মায়ের অসুখ—ভাইদুটোর স্কুল-কলেজের খরচ সেখানে সবটুকু জুড়ে আছে; অফিসে এসে অনেকের সুখ-দুঃখের কথা শুনতে হয়—সকলের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে হয়, সেখানেও নিজের জন্যে ভাববার মতো ফাঁকা মেলে না।

অথচ, অপূর্বর ভাবনাটা খুব ছোট।

শান্তার ভাবনা। সেই আগে যখন শ্যামপুকুর স্ট্রীটে থাকত—সেখানকার তিনটে বাড়ীর পরের মেয়েটি। ছোট চেহারার শ্যামবর্ণ মেয়ে, মুখের দিকে চাইলেই বড়ো বড়ো কালো চোখ দুটো প্রথমে নজরে আসে। গলাটি খুব মিষ্টি—বাড়ীতে বাড়ীতে ছোট ছোট মেয়েদের সে গান শেখায়।

শ্যামপুকুরে থাকতেই সে শান্তার কথা ভাবত, এখানে এসেও ভাবে। তখন নিজের ঘরে বসে ভাবা যেত—এখন ময়দানে এসে ভাবতে হয়।

ভাবনাটা ছোট। বেশ মেয়েটি। দেখলে মন খুশি হয়, কথা বললে ভালো লাগে, একটুখানি সঙ্গ পেলে আরো ভালো লাগে। আর এইসব মিলিয়ে যে দরকারী কথাটা তার শান্তাকে বলতে ইচ্ছে করে, সেই কথাটা কিছুতেই আর বলা হয় না।

শান্তা কখনো বলবে না—অপূর্ব জানে। তার মতো মেয়েরা কোনোদিন এগিয়ে এসে মনের আড়াল সরিয়ে দেবে না। শান্তার মা-বাবা বলবেন না, কারণ মেয়ের টিউশনির টাকায় তাঁদের দরকার আছে; অপূর্বর মা বলবেন না—তাঁর কাছে এখন রেশন-বাজার আর ছোট ভাই দুটোর স্কুল-কলেজের খরচের ভাবনাটা ঢের বেশি জরুরি।

অগত্যা রোজকার মতো শান্তার কথা ভাবতে লাগল অপূর্ব। একাই ভাবতে লাগল।

সেই জরুরি কথাটা শান্তাকে বলতে পারলে বেশ হয়। অপূর্ব জানে, শান্তা খুশি হবে। মুখ ফুটে সে বলতে চাইবে না, কিন্তু তার চোখ দুটো কথা বলে। এখানে এই ছায়ার মতো অন্ধকারে যেমন চারদিকের অনেক অলক্ষ্য আলোর কণা-গুলো কাঁপতে থাকে, তেমনি তার কালো তারায় অনেক কথার কণা ঝিকমিক করে, যেমন করে এই সন্ধ্যার হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো কথা বলে, তেমনি করে তারও চোখের পাতায় কথারা শিউরে ওঠে।

শুধু একটু বাতাসের অপেক্ষা। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে বাতাস। সেই সমুদ্র অপূর্বর মন। সেখান থেকে হাওয়া উঠলেই শান্তার ছায়ায় ছায়ায় আলোর কণা দুলবে, পাতারা সাড়া দেবে, হলুদ ফুলের পাপড়িরা উড়ে আসবে।

কিন্তু চার বছর ধরে সেই ছোট দরকারী কথাটা বলা হল না। বলাই হল না।

কেন হয় না? অপূর্ব ঠিক জানে না। সময় আসে—অপূর্ব টের পায় না; সময় চলে যায়—তখনো টের পায় না অপূর্ব। তারপর একা হলে—একটা পানের দোকান থেকে পান-জর্দা কিনতে কিনতে—কখনো বা দোকানের আয়নায় নিজের বোকাটে ছায়াটা দেখতে দেখতে তার মনে হয়—আজ বেশ সুন্দর সময়টা ছিল, আকাশ মেঘলা ছিল, ভিজে ভিজে হাওয়া ছিল, শান্তার মনে একটা গানের সুর গুনগুন করছিল আগাগোড়া, আজ বেশ বলা যেত।

ময়দানে বসে বসে, বাসার সেই কোটি কোটি দুঃসহ মশাকে এড়াতে একা শান্তার কথা ভাবতে ভাবতে মাটির ভাঁড়ের গন্ধে ভরা স্যাকারিনে বিস্বাদ চায়ে চুমুক দিতে দিতে—আজ হঠাৎ পেয়ে বসল অপূর্বকে। চেষ্টা করা যাক্ না—আজই চেষ্টা করা যাক্ না?

আধ-খাওয়া চায়ের ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলল, খুলে-ফেলা জুতোটা পায়ে গলিয়ে নিলে, তারপর উঠে পড়ল। অনেক দেরী হয়ে গেছে অনেকটা দূরে সরে গেছে সে, এর পরে শান্তা হয়তো তাকে ভুলতে আরম্ভ করবে।

দেরী হয়ে গেলে, দূর হয়ে গেলে, কে না ভোলে?

বাড়ী পর্যন্ত যেতে হল না—ট্রাম-রাস্তার মুখেই দেখা হয়ে গেল।

'এই যে শান্তা।'

'এই যে।'

'তোমাদের ওখানেই যাচ্ছিলুম।'

'ও।' —শান্তা একটু চুপ করে রইল। যেন অস্বস্তি বোধ করছিল একটা।

'বেরুচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ। গানের টিউশন।'

'একটু দেরী করে গেলে হয় না?'

একবার রোগা মণিবন্ধের ছোট ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল শান্তা। কপাল কুঁচকে ভাবল একটুখানি। বললে, নিজেরও একটু—সে যাক, আধঘণ্টা সময় পাওয়া যেতে পারে।'

'যথেষ্ট।' —অপূর্ব একবার শান্তার চোখের দিকে তাকালো: 'আধঘণ্টাই যথেষ্ট। তোমার সঙ্গে আমার ছোট্ট একটু কথা ছিল কেবল।'

'বেশ, চলো আমাদের বাড়ীতে।'

'না—তোমাদের বাড়ীতে নয়।'

'কোথায় তা হলে?' —আশ্চর্য হল শান্তা। এর আগে অপূর্ব কোনোদিন তাকে কোথাও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়নি।

অপূর্ব বললে, 'অন্য যেখানে হোক। ধরো একটা চায়ের দোকানে।'

'চায়ের দোকানে? কিন্তু তুমি তো জানো, আমি বেশি চা খেতে পারি না।'

'গানের গলা খারাপ হয় বুঝি?'

শান্তা হাসল: 'না। সন্ধ্যের পরে চা খেলেই কেমন যেন মাথা গরম হয়ে যায় আমার। রাতে ঘুম আসে না।'

'তা হলে চা খাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু কোনো একটা কোল্ড্-ড্রিংক্?'

'বেশ, চলো।'

নির্জনতা এ তল্লাটে কোথাও পাওয়ার উপায় নেই। ভিড়-ভিড়-ভিড়। এখানে দক্ষিণ-সমুদ্রের হাওয়ায় শালপাতা আর ছেঁড়া কাগজ ওড়ে; এখানে অন্ধকারের টুকরো মুখ থুবড়ে থাকে কোনো গলির ভেতরে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধে ভরা এক-আধটা নোংরা দেওয়ালের পাশে। এখানে পথের ধারের শীর্ণ গাছ রিকেটি বাচ্চার মতো অস্থিসার আঙুল মেলে আকাশ হাতড়ায়।

অনেক খুঁজে-পেতে এক জায়গায় খালি কেবিন পাওয়া গেল একটা।

'দু গ্লাস সরবৎ।'

'অরেঞ্জ? পাইনঅ্যাপল? ম্যাংগো?'

'অরেঞ্জই আনো।' —শান্তাই জানিয়ে দিলে।

বাইরে ফুটবল-রাজনীতি-সিনেমার তর্ক। পথে ট্রাম-বাস-মানুষের হুড়োহুড়ি। কেবিনের ভেতরে শব্দ করে করে ছোট পাখা ঘুরছে। তার হাওয়াটা গরম। দক্ষিণ সাগর এখানে নেই।

সরবৎ না-আসা পর্যন্ত দু-জনে চুপচাপ। যেন তারই জন্যে অপেক্ষা করছে তারা।

বেয়ারা গ্লাস রেখে গেল। স্ট্র দিয়ে একটা বরফের টুকরোকে নাড়াচাড়া করতে করতে শান্তা বললে, 'কেমন আছো?'

'চলে যাচ্ছে একরকম।'

'নতুন বাসায় বেশ ভালোই লাগছে—তাই না?'

'চারদিক খোলা-মেলা, মন্দ কী।'

'বেঁচেছ বলো।' —শান্তা আলতো-ভাবে ঠোঁটে দুটো ঠেকালো: 'যা ঘিঞ্জি এ-সব জায়গায় আর কী লোক বেড়েছে।'

'কিন্তু ভীষণ মশা ওখানে সন্ধ্যের পর।'

'খুব?'

'খুব।'

'স্প্রে করা যায় না?'

'অ্যাটম বোমা মারলেও কিছু হবে না।'

শান্তা হাসল, অপূর্ব হাসল। আর

অপূর্ব বুঝল, মশার কথাটা সিরিয়াস্‌লি নিচ্ছে না শান্তা। ও-তল্লাটে যারা থাকে না, তারা কেউই নেয় না। মশা তাদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে সরবৎ খেল দু-জন। মাথার ওপরে ছোট পাখাটা বিরক্তিকর ভাবে কট-কট করছে। হাওয়াটা গরম। দোকানের বেসুরো রেডিয়োতে শ্রোতাহীন রবীন্দ্র-সংগীত। 'প্রখর তপন তাপে'—

শান্তা বললে, 'অফিসের খবর কী?'

'নতুন কিছু নেই। সেই একভাবেই চলছে।'

'তোমাদের একটা স্ট্রাইকের কথা শুনেছিলুম না?'

'আপাতত হচ্ছে না। আলোচনা চলছে ইউনিয়নের সঙ্গে। হয়তো একটা মিটমাট হয়ে যাবে।'

'খুব ভালো।'

'ভালোই তো। ওসব ঝঞ্ঝাট কে চায়?'

শান্তা আবার স্ট্র দিয়ে গ্লাসের ভেতরটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। অপূর্ব প্রথমে তার রোগা আঙুলগুলো দেখল, তারপর পাশে রাখা হ্যান্ড-ব্যাগটা দেখল। ব্যাগটা পুরোনো আর জীর্ণ হয়ে গেছে, স্ট্র্যাপের একটা ধার ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেফ্‌টিপিন দিয়ে আটকে রেখেছে সেখানটা। এখন এই ব্যাগটা শান্তার বদলানো দরকার। কিন্তু ওর হাতে নিশ্চয় টাকা নেই।

টাকা অপূর্বরও হাতে নেই। থাকলে একটা ভালো চামড়ার ব্যাগ সে-ই প্রেজেণ্ট করত শান্তাকে। কিন্তু কী দিনই পড়েছে। মাইনের শ-চারেক টাকা যে কোথায় চলে যায়!

অপূর্ব আস্তে আস্তে বললে, 'আমার কথা তো হল, এবার তোমার কথা বলো।'

'আমার কথা আর নতুন কী বলব। চলছে একভাবে।'

'তোমার মা কেমন আছেন?'

'ভালো।'

'তোমার বাবা?'

'আর্থ্রাইটিস কখনো সারে?'

'কবিরাজী করাচ্ছিলেন না?'

'সব একরকম। মনের সান্ত্বনাই শুধু।'

সরবৎ দুটো প্রায় শেষ হয়ে এল। পাখার হাওয়াটা তেমনি গরম। রাস্তায় কিসের একটা জোরালো চ্যাঁচামেচি উঠেছে। দোকানের ছেলেমানুষ বেয়ারাটা বোধহয় দেখে এল একবার। কাকে যেন বললে, 'ও কিছু নয়—একটা পাগল। খ্যাপাচ্ছে।' দোকানের রেডিয়োতে রবীন্দ্র-সংগীতটা শুন্যে মাথা খুঁড়তে লাগল।

শান্তা বললে, 'সেলাই-করা পাঞ্জাবি পরেছ কেন?'

'এমনি।'

'জামা নেই বুঝি?'

অপূর্ব হাসল। জবাব দিল না।

'আগে তো পরতে না।'

'অখিল কলেজে ভর্তি হয়েছে— সায়েন্সে। অনেক খরচ।'

'তা হোক। দু-একটা ভালো জামা-কাপড় তোমার দরকার। বাইরে তো বেরুতে হয়।'—

সমবেদনায় স্নিগ্ধ আর সিক্ত হয়ে উঠল শান্তার স্বর।

জামা-কাপড় তোমারও দরকার, অপূর্ব বলতে চাইল। শান্তার শাড়ীটা পুরোনো, রং জ্বলে গেছে বোঝা যায়; ব্লাউজের গলার কাছটা ঘামে মলিন। একটা সেফ্‌টিপিন যেন সেখানেও দেখা যায়। এই মলিন দীনতা ভালো লাগে না। অথচ, বাইরেই কাপড়ের দোকানের শো-কেসে—

'কয়েকটা জামা-কাপড় তোমারও কেনা উচিত'—এমনি একটা কিছু শান্তাকে বলতে গিয়েও বলতে পারল না অপূর্ব। তার বদলে শান্তার কথারই জবাব দিলে।

'ধুতি-পাঞ্জাবি আর পরব না ভাবছি।'

'কী পরবে তবে?'

'শার্ট-ট্রাউজার। অনেক কম-খরচ। ধুতি-পাঞ্জাবির লাক্‌শারি আর পোষাচ্ছে না।'

'কিন্তু শার্ট-ট্রাউজারে তোমাকে মানাবে না।' —শান্তা প্রতিবাদ করল।

'ওটা চোখে দেখার অভ্যেসে বলছ। দুদিন পরেই সয়ে যাবে।'

আবার একটু চুপ করে থাকা। সরবতের গ্লাশ শেষ হল অপূর্বর—স্ট্র টানে সবটুকু তলানি উঠে এল, বাতাসের আওয়াজ উঠল একটা। শান্তার পড়ে রইল খানিকটা— গ্লাশটা সরিয়ে দিলে একদিকে।

শান্তা কী ভাবছিল সে-ই জানে। অপূর্ব কথা খুঁজছিল। এতক্ষণ যে আলোচনা হল—জামা-কাপড় ছাড়া—তার সব পুরোনো, সব হাজারবার বলা আর শোনা। একটা নতুন কিছু বলা দরকার— সেই দরকারী বিষয়টার সূচনা করা উচিত।

কিন্তু এবারেও পুরোনো প্রশ্নই বেরিয়ে এল।

'ক'টা গানের টিউশন করছ এখন?'

'চারটে।'

'নিজের জন্যে গান গাও না আর?'

'সময় কই?'

'আর অডিশন দিয়েছিলে রেডিয়োতে?'

'দিয়ে কী লাভ? হবে না।'

'কী আশ্চর্য—কেন হবে না?' —ব্যথিত আর উত্তেজিত হল অপূর্ব : 'এত ভালো গান করো তুমি।'

'তোমার ভালো লাগলেই তো হবে না—' শীর্ণ রেখায় হাসল শান্তা : 'ওখানে যাঁরা জাজ—তাঁদের পছন্দ হলে তো।'

'সব পার্শিয়ালিটি। তদ্বির ছাড়া হয় না।'

'বলতে নেই ও-রকম। আমিই বা কতটুকু শিখেছি।'

বেয়ারা প্লাশ নিতে এল। হাতে বিল। অপূর্ব পয়সাটা মিটিয়ে দিলে। আর হাত-ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে দেখল শান্তা।

'আমার বোধহয় এবার ওঠা উচিত। নইলে দেরী হয়ে যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালো অপূর্ব।

'বেশ—চলো।'

আবার পথ। ভিড়—ভিড়—ভিড়। দক্ষিণের হাওয়া এঁটো শালপাতা আর ছেঁড়া কাগজের টুকরো নিয়ে—পোড়া গ্যাসো-লিনের গন্ধ মেখে ধুলোমুঠি ছড়িয়ে দিচ্ছে মুখের ওপর। রিকেটি বাচ্চার আঙুলের মতো শীর্ণ গাছের শুকনো ডালগুলো ছাইরঙা শূন্য আকাশে যেন মা-কে হাতড়াচ্ছে। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে কতগুলো ট্রাম—ব্রেক-ডাউন। একটা তেলে-ভাজার দোকান থেকে উঠে আসছে পোড়া বাদাম তেল আর ফেটানো-বেসনের উচ্ছ্বাস।

সন্ধ্যার ময়দানে হাওয়া থাকলে মনে পড়ে না। কিন্তু এখানে বৃষ্টি দরকার। খুব অনেকক্ষণ ধরে ঝিরঝিরানো ঠাণ্ডা বৃষ্টি—ন্যাড়া গাছগুলোতে ক'টা সবুজ পল্লব ধরানো বৃষ্টি। ছাই রঙের আকাশে মেঘ নেই। ক'টা ঘষা তামার পয়সার মতো মিটমিটে তারা।

কয়েক পা একসঙ্গে হেঁটে—মধ্যে মধ্যে মানুষের ভিড়ে শান্তার পাশ থেকে সরে গিয়ে, অপূর্ব জিজ্ঞেস করল : 'কোথায় টিউশন? কত দূরে যেতে হবে?'

'কাছেই। মোহনবাগান রো।'

'চলো, এগিয়ে দিই।'

'বেশ তো।'

কিন্তু এগিয়ে দেওয়া পর্যন্তই। শান্তা কী ভাবছিল সে-ই জানে, আর অপূর্ব কথা খুঁজছিল। সেই দরকারী আলোচনাটার ভূমিকা। কিছুতেই সেটাকে যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

'কী বিশ্রী গরম পড়েছে কলকাতায়।'

শান্তা বললে, 'হ্যাঁ, খুব।'

'একদম বৃষ্টি নেই। অথচ ওয়েদার ফোরকাস্ট রোজ বলছে বিকালে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা।'

'ওরা ওই রকমই বলে।'

'বোগাস।'

'তোমাদের ওদিকটা একটু ঠাণ্ডা—না?'

'একটু। কিন্তু বেলা পড়লেই ভীষণ মশা।'

'ওঃ, তোমার সেই মশা!' —শান্তা একটু হাসল।

মনে মনে ক্ষুণ্ণ হল অপূর্ব। ও অঞ্চলে যাদের থাকার অভ্যেস নেই, তারা কেউ মশার কথা সিরিয়াসলি নেয় না। কেউ বা বুঝতেই পারে না তারা।

বেলফুলের মালা বিক্রী করছিল একজন—শালপাতার রেখে। গলির ভেতরে হাওয়াটা একটু মধুর হল, একটু কোমল হল তার গন্ধে। শান্তা তাকালো অপূর্বর দিকে। অনেক আলোর কণা চমকালো তার গভীর চোখের ছায়া দেখল অপূর্ব।

'কী একটা দরকারী কথা আছে বলছিলে না?'

বেলফুলওলা দূরে সরে গিয়েছিল। কাদের উনুনে যেন দেরীতে আগুন দিয়েছে—ঘুঁটে আর কয়লার খানিকটা ধোঁয়া হাওয়ায় পাক খেতে খেতে এসে পড়ল ওদের মুখের ওপর।

একটু দ্বিধা করে অপূর্ব বললে, 'আজ থাক।'

আঙুল বাড়িয়ে সামনের একটা লাল বাড়ী দেখালো শান্তা।

'ওখানে আমি গান শেখাই।'

'আমি আসি তা হলে।'

'আচ্ছা।'

মশারির মশাহীন বিরুদ্ধতার বাইরে লক্ষ লক্ষ মশার গর্জন। বাতাসটা পড়ে গেছে, দম-চাপা গরম। ঘাড়ের নীচে বালিশটা ঘামে স্যাঁৎসেঁতে হয়ে উঠেছে। ঘুম আসবার আশা কম। কান পেতে মশার গুঞ্জন থেকে যেন কিছু অর্থবোধ করতে চাইল অপূর্ব। দক্ষিণ সমুদ্রের সব হাওয়া, টবের বেলফুল আর কাদের বাগানের হেনার গন্ধ—সব চাপা দিয়ে তারা ঘামে-ভেজা ব্লাউজ, সেলাইকরা পাঞ্জাবি আর অনেক-অনেক ভিড়ের ক্লান্তির খবর পৌঁছে দিচ্ছে তাকে।

সেই দরকারী কথাটা হয়তো কোনো-দিনই বলা হবে না অপূর্বর।।

বহুদূর থেকে একদল মানুষের আর্ত কোলাহল কানে আসতেই শুভ্রার হৃদপিণ্ডটা যেন নিঃসীম আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে থেমে পড়ল।......

চোর......চোর......চোর......

উপন্যাসটা বন্ধ করে বিছানায় কাঠ হয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে চিৎকারের দূরত্বটা অনুভব করতে চেষ্টা করে শুভ্রা।

না। কোন সন্দেহ নেই। আজও পাড়ায় কোথাও চোর এসেছে। আশ্চর্য, দিন দিন চোরের উপদ্রব বেড়েই চলেছে, আর রোজ এত রাত পর্যন্ত কি নিদারুণ আতঙ্ক বুকে নিয়ে যে একা জেগে বসে থাকতে হয় ওকে সে বোধটুকু যদি থাকে নিশীথের!

গভীর বিরক্তির সঙ্গে বইটা খাটের এক পাশে ছুঁড়ে দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল শুভ্রা। তাড়াতাড়ি মাথার দিকের জানলাগুলো বন্ধ করে ভেতর থেকে বন্ধ দরজাটা আরেকবার দেখে নিল।

নিজেকে শান্ত করে আবার ফিরে গিয়ে খাটের ওপর শুয়ে পড়ল। হাত বাড়িয়ে উপন্যাসটা আবার টেনে নিল। জোর করে মনটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল কাহিনীর নাটকীয় মুহূর্তটির মধ্যে। অন্যমনস্কের মত কয়েকটা পাতাও পর পর উল্টে গেল। কিন্তু না, আজ আর কিছুতেই

পড়তে পারবে না ও। লাইনগুলো শুধু কালো রেখার মত হিজি বিজি হয়ে ভেসে উঠছে চোখের সামনে। বইটা আবার সশব্দে বন্ধ করে রেখে দিল বালিশের এক পাশে।

নাঃ......অসহ্য! সত্যিই আজ কিছু ভাল লাগছে না শুভ্রার। রাত এগারটা তো বাজল, আরো কত দেরী করবে বাড়ী ফিরতে, কে জানে। নিশীথের ওপর রাগে আর বিরক্তিতে কিছুক্ষণ মনে মনে গজ গজ করল। একদিনও কি ভাবতে নেই শুভ্রার কথা! সারাদিনটা বাড়ির মধ্যে একা একা কি করে যে সময় কাটে ওর......কখনও ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেছে! একটা দিনও কি ওকে সঙ্গে করে বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে না নিশীথের। বিয়ের পর দুজনে একসঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে কটা দিন, এখুনি আঙ্গুলে গুনে বলে দিতে পারে ও। তিন বছর বিয়ে হয়েছে ওদের কিন্তু দুবারের বেশী আর বাপের বাড়ি যাওয়াই হয়ে উঠল না। মা প্রায় প্রতি চিঠিতে লিখছেন যাওয়ার জন্যে। কিন্তু বলে বলেও রাজি করাতে পারল না ওকে। নিশীথের দাদারাও কিছু-দিন থেকে লিখছেন জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে একটা মীমাংসা করে ফেলা দরকার—তাড়া-তাড়ি একবার বাড়ি এস। কিন্তু তাবও নাকি সময় নেই বাবুর। নিশীথের বাড়ির লোকেরাই বা শুভ্রার সম্বন্ধে কি ভাবছেন কে জানে। আশ্চর্য! যাত্রা থিয়েটার নিয়ে মানুষ যে এমন পাগল হয় আগে জানা ছিল না ওর।

চুপচাপ চোখ বন্ধ করে শুয়ে থেকে নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করল শুভ্রা। টেবিল ঘড়ির ছন্দবন্ধ টিকটিক শব্দটা ঘরের গুমোট বাতাসকে মুখরিত করে বেজে চলেছে। বাইরে অসংখ্য ঝিল্লিও রাত্রির স্তব্ধতাকে সচকিত করে একটানা ডেকে চলেছে। একটু আগের চোর চোর কোলা-হলটাও হারিয়ে গেছে হাওয়ায়। আর কোন শব্দ নেই কোন দিকে। রাত যে ক্রমে গভীর হয়ে উঠছে, বেশ বুঝতে পারছে শুভ্রা।

আরো কিছুক্ষণ পর বাইরে থেকে বন্ধ দরজার ওপর টোকা পড়ল। নিশীথের গলাটাও ভেসে এল কানে—শুভ্রা...শুভ্রা, দরজাটা খুলে দাও।

বিছানা ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল শুভ্রা—এতক্ষণে বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ল তা হলে? আমি তো ভেবেছিলুম বুঝি আজ রাতটুকু ক্লাবেই কাটিয়ে আসবে!

শুভ্রার রাগত মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল নিশীথ- -রেগে লাল হয়ে রয়েছে দেখছি! কিন্তু কি করি বল, কাল থিয়েটার ......আজ তার ব্যবস্থা করতে করতেই দেরী হয়ে গেল।

নিশীথের একঘেয়ে অজুহাত শোনার জন্যে অবশ্য ব্যগ্র ছিল না শুভ্রা। ওদিকের বন্ধ জানলাগুলো খুলে ফেলল একে একে। তারপর খাওয়ার ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলার জন্যে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

নিশীথ খেতে বসে ওর মনের গুমোট হাল্কা করতে চেষ্টা করল—আজ আমাদের সাকসেসফুল রিহার্সাল হল বুঝলে? কাল স্টেজে যদি এমনি অভিনয় করতে পারি সকলে......আমাদের যুব নাট্য সংস্থা নির্ঘাৎ নাম করবে বলে রাখতে পারি।

শুভ্রা গম্ভীর মুখে জলের গেলাসটা তুলে নিতে গিয়ে থেমে পড়ল—তবে আর কি? অক্ষয় পুণ্য জমা হয়ে রইল পর-জন্মের জন্যে। তারপর এক চুমুকে গ্লাসটা অর্ধেক খালি করে মেঝেতে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল—এখন তাড়াতাড়ি খাওয়াটা শেষ কর দেখি! অনেক রাত হল।

শুভ্রার রাগ করে কথা বলার ভঙ্গী দেখে হো হো করে হেসে উঠল নিশীথ। কিন্তু ও পক্ষ থেকে কোন উৎসাহ না পাওয়ায় চুপ করে গেল।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর সিগারেট ধরিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল নিশীথ। শুভ্রাও হাতের কাজগুলো সেরে নেয়। এঁটো বাসন-গুলো সশব্দে ঘরের কোণে জমা করে রাখার মধ্যে দিয়ে বোধহয় মনের বিরক্তি প্রকাশ করল। বাইরে গিয়ে অকারণ আওয়াজ করে রান্না ঘরের ছেকল তুলে দিল। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে এসে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে রাতে শোবার আগের হাল্কা প্রসাধন সেরে নিতে মনসংযোগ করল।

অন্য দিন এ সময়টা দুজনে গল্প করে কাটায়। অফিসের গল্প ক্লাবের গল্প সাংসারিক কথা আত্মীয়স্বজন প্রসঙ্গ সবই হয় এই সময়। একমাত্র এই সময়টুকুই যা কথা বলার অবকাশ। তা ছাড়া আর সুযোগ হয় না নিশীথের। সকালে ঘুম থেকে উঠেই ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করে কলকাতার চাকরী করতে ছোটাও যেমন আছে, তেমনি সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরেই কোন রকমে চা-জলখাবারটা গলাধঃকরণ করে ক্লাবে ছোটাও আছে। শুভ্রার তিন বছরের বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রথম দুটি মাস ছাড়া আর সবটাই নিছক একঘেয়েমিতে ঠাসা হয়ে রয়েছে। এর মধ্যেই যেন সব আকর্ষণ হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে জীবনটা।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিশীথ ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে রইল শুভ্রার দিকে। ভাল ব্লাউজটা বদলে সাদামাটা একটা পরে নিল শুভ্রা। মাথার খোঁপাটা খুলে বেণীটা এলিয়ে দিল পিঠের ওপর। পাউডারের পাফটা আলতো করে ছুঁইয়ে নিল ঘাড়ে গলায় কপালে। গলার সরু হারটাকে আঙ্গুলে জড়িয়ে কয়েকবার এদিক ওদিক করতে করতে পেছন ফিরে নিশীথকে জিজ্ঞেস করল—বাতিটা তুমি নিভিয়ে দেবে না আমিই দোব?

কি মনে করে একটু হাসল নিশীথ—তুমিই নিভিয়ে দাও, দিয়ে চলে এস আমার কাছে।

সুইচ টিপে বাতি নিভিয়ে দিল শুভ্রা। কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ওর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে নিশীথ মনে মনে অস্বস্তি বোধ করল। আর একটু অপেক্ষা করে ডেকে উঠল—কি হল...শুভ্রা!

অন্ধকারের মধ্যে একাকার হয়ে মিশে রইল শুভ্রা। কোন প্রত্যুত্তর ভেসে এল না কানে।

—শুনছ? কোথায় তুমি... আমার কাছে এস।

যেন বহুদূরে থেকে এবার শুভ্রার কণ্ঠস্বরটা ভেসে এল কানে—কেন?

কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল নিশীথ। তারপর খোলা জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিল। ভেতরের অন্ধকার হাতড়ে এবার খুঁজে বার করল শুভ্রাকে। কিন্তু আশ্চর্য! এমন নিরেট পাথরের মত অন্ধকারের মধ্যে অকারণে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ও ভাবতে পারেনি। বিহ্বলের মত কিছুক্ষণ শুভ্রার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থেকে বলল—কী হয়েছে তোমার বল তো? আমার ওপর খুব রাগ করে আছ না? বিশ্বাস কর আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্যে অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু......

—সে আমি জানি। রাগ করিনি তোমার ওপর। এখুনি শুতে ভাল লাগছে না, তাই দাঁড়িয়ে আছি। ভাবলেশহীন গলায় জবাব দেয় শুভ্রা।

—তবে বাতিটা জ্বালাই? এস দুজনে বসে গল্প করি!

একটু যেন হাসল শুভ্রা—কোন দরকার নেই। অনেক রাত হয়ে গেছে আজ। তুমি শুয়ে পড়। চলো আমিও শুয়ে পড়ছি।

নিশীথ ভেবেছিল, শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে ওর মনটাকে হাল্কা করে তুলতে পারবে। কিন্তু ছাড়া ছাড়া কথা-বার্তাগুলো কিছুতেই যেন দানা বাঁধল না। রাতটা যে কোথা দিয়ে ঘুমের মধ্যে কেটে গেল টের পেল না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি স্নান করতে গেল শুভ্রা। গত রাতে দুজনের চাপা বিরোধের কথা মনে পড়ে যেতে কেন কে জানে, এখন হাসিই পাচ্ছে ওর। গুন গুন করে গান গেয়ে মনটাকে হাল্কা করতে চেষ্টা করল।

ঘরে ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কী ভেবে পেছন ফিরে অনেকক্ষণ নিশীথের তন্দ্রাতুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বেচারা! যাত্রা-থিয়েটারের ওপর এতকালের ঝোঁকটা হঠাৎ ওকে এতটা বিড়ম্বিত করে তুলতে পারে, হয়তো কখনো ভাবতে পারেনি ও।

এই মুহূর্তে নিশীথের ওপর গভীর মমতায় মন-প্রাণ ভরে উঠল ওর। নেশার মধ্যে আর কিছুই নেই। অভিনয় করতে ভালবাসে। নামও করেছে যথেষ্ট। না হলে এত জায়গা থেকে ডাকই বা আসবে কেন

ওর! কিন্তু সবচেয়ে কাছের মানুষটার কাছ থেকেই যদি সেজন্যে প্রতিদিন ভৎসনা সহ্য করতে হয়......মনে আঘাত লাগে বইকি!

স্টোভ ধরিয়ে তাড়াতাড়ি চা করে এনে দাঁড়াল শুভ্রা—শুনছ, তোমার জন্যে চা এনেছি। উঠে পড় লক্ষ্মীটি!

আড়মোড়া ভেঙে বিছানার ওপর উঠে বসল নিশীথ। তারপর জানলা দিয়ে বাইরে রোদের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত গলায় জিজ্ঞেস করল—কটা বাজে বল ত আগে!

—কেন, আজ তো তোমাদের থিয়েটার বললে? আজ অফিসে যাবে, না কী?

—একটা জরুরী কাজ রয়ে গেছে অফিসে। তবে গিয়েই কাজটা সেরে সকাল সকাল ফিরে আসব।

শুভ্রা হেসে বলল—তা যেও, কিন্তু তাই বলে ঘুম ভেঙেই অমন হাঁ হাঁ করে ওঠবার মত দেরী হয়ে যায়নি। মাত্র সাতটা বাজে। বিশ্বাস না হয় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ।

শুভ্রার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে নিশীথ বলল—কিন্তু আজ বাজারটাও করা দরকার। কালও তো করা হয়নি।

নিজের কাপটাও এ ঘরে নিয়ে এসে খাটে পা ঝুলিয়ে বসে শুভ্রা বললে—সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। নিচে মাসীমাকে জিজ্ঞেস করে দেখি...যদি পূর্ণেন্দু যায় বাজারে। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে নিছক কথা বলার জন্যে বলল—কম্পিটিসানে কটা প্লে হবে আজ?

পেছনে জড়ো করা বালিশে পিঠ এলিয়ে দিয়ে নিশীথ বলল—রোজ তিনটে করেই তো হচ্ছে।

—মাগো...। তার মানে রাত কাবার হয়ে যাবে বল? টিকিট কেটে রাত জেগে লোকে থিয়েটার দেখে?

—দেখে বইকি? আজ গেলেই বুঝতে পার[illegible]

—ভাগ্যিস তোমাদের প্লেটা প্রথমেই হচ্ছে...তা না হলে বোধহয় রাত জেগে তোমাদের থিয়েটার দেখাই হত না।

চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে নিশীথ চুপচাপ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

শুভ্রা আবার বলল—তোমাকে কটার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরুতে হবে তাহলে! বলে যাও আমায়, আমাকে তো সেই রকম তৈরী হয়ে থাকতে হবে?

নিশীথ বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তাকাল শুভ্রার দিকে—আমার সঙ্গে তুমি কী করে যাবে? আমি তো বেরুব বিকেল পাঁচটায়। আর প্লে আরম্ভ সাড়ে সাতটায়। এক কাজ করতে পার তুমি, মাসীমা তো যাবেন? পূর্ণেন্দুও যাবে নিশ্চয়ই! তুমি বরং ওদের সঙ্গেই যেও।

—বারে, কাল বললাম না তোমায়, আজ মাসীমা-মেসোমশাই বড় মেয়ের বাড়ি যাচ্ছেন রানাঘাট। রানুদির অসুখ, কাল চিঠি এসেছে।

নিশীথ চিন্তিত মুখে সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল—আর পূর্ণেন্দু? ও-ও যাচ্ছে না কী ওদের সঙ্গে? তা না হলে ওর সঙ্গেও যেতে পার তুমি।

এবার বিস্মিত মুখ তুলে নিশীথের মুখের দিকে তাকায় শুভ্রা—আশ্চর্য! পূর্ণেন্দু থাকবে কী না তার ঠিক নেই। তাছাড়া দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে বেচারা। নিজের ইচ্ছে মত বেড়াবে না তোমার বউকে ঘাড়ে করে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যাবে—বল ত?

নিশীথ চিন্তিত মুখে সিগারেটে আরও কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল—তা ঠিক। তাহলে তুমি তৈরীই হয়ে থেক। দেখ যেন তোমার জন্যে আমার দেরী না হয়ে যায়।

আরও কিছুক্ষণ গল্প করে কাটাল ওরা। তারপর নিশীথ উঠে পড়ল স্নানের আগে তাড়াতাড়ি দাড়িটা কামিয়ে নিতে। শুভ্রাও টাকা আর বাজারের থলি হাতে নিচে নেমে এসে ডাকল—মাসীমা, ও মাসীমা!

অন্নপূর্ণা সাড়া দিলেন—কে বৌমা! ভেতরে এস।

বড় ছেলে সোমেনের বন্ধু নিশীথ। সেই সুবাদেই শুভ্রাকে বৌমা বলে ডাকেন অন্নপূর্ণা। স্নেহও করেন যথেষ্ট। কেমন একটা লক্ষ্মীশ্রী ভাব লক্ষ্য করেন ওর মধ্যে। এমনি একটি মেয়েকে সোমেনের বউ হিসেবে কামনা করেন মনে মনে।

ওপরের দুটো ঘর ভাড়া দিয়েছেন ওদের শুধু ছেলের কথায়। তাছাড়া এত ঘরের কোন প্রয়োজনও নেই। সোমেন বাইরে চাকরী করে। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন অনেকদিন। থাকার মধ্যে নিজেরা বুড়ো-বুড়ি। এই ফাঁকা মাঠের ওপর বাড়ি আছে এদিকে ওদিকে, কিন্তু পাড়াঘর বলে কিছু গড়ে ওঠেনি এখনো। নিছক একা একা থাকার চেয়ে তবু দুটো বাড়তি মানুষের সান্নিধ্য ভাল লাগে বইকি?

থলিটা হাতে নিয়ে হাসি মুখে শুভ্রা এসে দাঁড়াল অন্নপূর্ণার সামনে—আজ আপনাদের বাজার হবে না মাসীমা?

অন্নপূর্ণা হেসে বললেন—আমাদের দরকারের কথা থাক। তোমার প্রয়োজনের কথাটা খুলে বল দেখি বৌমা!

একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে চুপ করে রইল শুভ্রা। তারপর বলল—কী করি বলুন তো মাসীমা! মানুষটার যদি একটু মন থাকে সংসারের ওপর। দেখছেন তো, মাসের তিরিশটা দিনই থিয়েটার আর যাত্রা করতে করতেই কেটে যায়।

—তা যাই-ই বল বৌমা। অক্রূর সংবাদে অমন ভক্তের পাট বাপু আর কেউ করতে পারবে না। আহা কী ভাব, কী ভক্তি, বলতে বলতে ভাবাবেগে কণ্ঠস্বরটা যেন মাসিমার আপনি বুজে এল।

ভক্তিরসে গদগদ অন্নপূর্ণার কথা বলার ভঙ্গী দেখে আশান্বিত হয়ে বলে উঠল শুভ্রা—তা যা বলেছেন।

তারপর হাসি সংযত করে জিজ্ঞেস করল—পূর্ণেন্দুকে দেখছি না কেন মাসীমা? কাল কলকাতা থেকে ফেরেনি বুঝি? কালই তো ওর ইন্টারভিউ ছিল না?

অন্নপূর্ণা বললেন—কাল অনেক রাত করে ফিরে শুয়ে পড়েছে মা। আর কিছু জিজ্ঞেস করার সময় হয়নি। দাঁড়াও ডেকে তুলে দি।

অন্নপূর্ণার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল পূর্ণেন্দুর—আজ একটু তাড়াতাড়ি ওঠ বাবা। আর বেলাও তো হল, ওপরে বৌমার বাজারটা যদি করে এনে দিস বড় ভাল হয়।

ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে মাসীমার কথা-

গুলো শুনতে পেল শুভ্রা। একটু সংকোচই বোধ করল মনে মনে। কিছুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে পূর্ণেন্দু। এমন কিছু দীর্ঘদিনের আলাপও নয় যে রোজ রোজ ওদের বাজার করে দেবার কথা বলার মত জোর আছে ওর। একটু ইতস্তত করে নিজেও ঘরে ঢুকে পড়ল শুভ্রা। শুকনো একটা ঢোক গিলে বলল—কিছু মনে কর না ভাই পূর্ণেন্দু, বলতে লজ্জা করছে, তবু না বলেও পারছি না, যদি বাজারটা একটু করে দাও।

শুভ্রাকে এত কুণ্ঠিত গলায় কথা বলতে দেখে অন্নপূর্ণা আর পূর্ণেন্দু দুজনেই কৌতুকে হেসে উঠল। শুভ্রা আবার বলে উঠল—তুমি ততক্ষণ তৈরী হয়ে নাও, আমি চা করে আনছি।

—তুমি আবার করে আনবে কেন বৌমা! আমি তো কেটলিতে চা ভিজিয়ে রেখেছি। আমরাও তো কেউ চা খাইনি সকালে।

টাকা আর বাজারের থলিটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে শুভ্রা পূর্ণেন্দুকে বলল—একটু তাড়াতাড়ি এনো ভাই। ঘরে একদমই কিছু নেই। তোমার নিশীথদা বেরুবার আগেই যেন—।

পূর্ণেন্দু হাসল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বৌদি। আধ-ঘন্টার মধ্যেই এনে দিচ্ছি আপনার বাজার। তাহলে হবে তো?

স্বস্তির হাসি হেসে মাথা নাড়ল শুভ্রা। তারপর ওপরে উঠে এল।

দাড়ি কামিয়ে স্নানঘরের দিকে এগোচ্ছিল নিশীথ। শুভ্রাকে ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল—কী হল, পূর্ণেন্দু আছে? না আমায় যেতে হবে?

—থাক! কৃত্রিম রাগের সুরে জবাব দিল শুভ্রা। কত ভাবো সংসারের কথা আমার জানা আছে। নেহাৎ ছেলেটা খুব ভদ্র তাই। দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসে পিসীমার ভাড়াটেদের বাজার করতে করতেই কেটে গেল ওর।

—চলে যাবার আগে একদিন ওকে খাইয়ে দিও ভাল করে, বুঝলে?

—বেশ তো, তুমি নেমন্তন্ন কোর একদিন।

—কেন, আমি কেন, তুমি বললে হবে না?

—বারে! তোমার বন্ধু সোমেনবাবুর ভাই। সম্বন্ধটা তোমার সঙ্গেই বেশী। আমি বললে ভাল দেখাবে কেন?

কী ভেবে হেসে ফেলল নিশীথ—তা ঠিক। তবে পূর্ণেন্দু তোমারই বেশী ভক্ত।

নিশীথের পরিহাসের প্রত্যুত্তরে শুভ্রাও হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠল—বটে! আবার ঠাট্টা হচ্ছে? আর যদি হয়ই দোষের কী?

একটু মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে নিশীথ বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

অন্যদিন হয়তো নিশীথের এমন রসিকতায় চটে উঠত। কিন্তু আজ সকাল থেকে মনটা অকারণ খুশিতে ভরে রয়েছে বলেই রাগ করতে পারল না শুভ্রা। বরং ভক্ত কথাটা শুনে হাসিই পেল ওর। পূর্ণেন্দু ওর ভক্ত! হঠাৎ এমন একটা কথা নিশীথের মনে এল কেন? সপ্রতিভ ভদ্র, সমবয়সী একটা ছেলের সঙ্গে কথা বলা, গল্প করার মধ্যে ভাল লাগার ভাব হয়তো আছে। হয়তো কেন, আছেই। কিন্তু, ভক্ত! আবার হাসি পেল ওর। আশ্চর্য, কী ভেবে কথাটা বলল নিশীথ কে জানে।

আধ-ঘন্টার মধ্যেই পূর্ণেন্দু বাজার করে এনে হাজির—বউদি, ধরুন।

রান্নাঘর থেকে তাড়াতাড়ি ছুটে এল শুভ্রা—এসে পড়েছ! আমি তো ভেবে-চিন্তে সারা হচ্ছি। এস, ভেতরে এসে বোস।

—এখন আর বসব না বউদি।

—বারে! তাই হয় না কী? তখন চা খাওয়াবার কথা দিয়েছি না? চলে যেও না কিন্তু একটু বোস ভাই লক্ষ্মীটি। তোমার দাদা এখুনি খেতে বসবেন, চট করে কিছু করে দিই আগে।

পূর্ণেন্দু আবার আপত্তি তোলবার আগেই ঘরের ভেতর থেকে নিশীথ ডাকল—পূর্ণে এসো, ভেতরে এসে বোস।

অগত্যা আর কথা না বাড়িয়ে বাইরে চটি খুলে রেখে ঘরের ভেতর এসে বসল পূর্ণেন্দু—এ কী, আপনি যে বেরুবার জন্যে তৈরী হয়ে রয়েছেন নিশীথদা। আজও অফিসে বেরুচ্ছেন না কী?

আগের দিনের দৈনিক সংবাদপত্রটায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল নিশীথ। পূর্ণেন্দুর দিকে মুখ তুলে বলল—আর বল না। না গিয়ে উপায় নেই। তারপর একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল—কাল ইন্টারভিউ ছিল না তোমার! কেমন দিলে?

—মন্দ হয়নি। এখন দেখা যাক। তবে অনেক ছাত্র তো, খুব একটা আশা আছে বলে মনে হয় না আমার।

—মেডিকেলে চান্স না পেলে কী করবে কিছু ভেবেছ?

পূর্ণেন্দু একটু হাসল—কী আর ভাবব বলুন? আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনার কোনটা আর সফল হচ্ছে!

কিছুক্ষণ পর নিশীথ আবার জিজ্ঞেস করল—সোমেনের কোন চিঠি এল? আমার কথা কিছু লিখেছে?

—সোমেনদা? কই সে রকম তো কিছু লেখেন নি। মধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলেন, লিখেছেন এবারের চিঠিতে।

—বেশ আছে সোমেন।

পূর্ণেন্দু হঠাৎ জোরে হেসে উঠল—সোমেনদা কিন্তু আবার অন্য কথা বলেন। বলেন, নিশীথটাই বেশ আছে। যাত্রা-থিয়েটার করে দিনগুলো বেশ কাটিয়ে দিচ্ছে।

নিশীথও হেসে ফেলল—নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেই সর্বসুখ আমার বিশ্বাস। অপরের সম্বন্ধেও সকলে তাই ভাবে।

আরো কিছুক্ষণ দুজনে এমনি গল্প করে কাটাল। তারপর রান্নাঘর থেকে শুভ্রার ডাকে খাবার জন্যে উঠে গেল নিশীথ। আর কাগজখানা টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগল পূর্ণেন্দু। কিন্তু পড়তে গিয়ে খবরগুলো সব পুরনো মনে হওয়ায় তারিখটা দেখে নিয়ে হতাশ হল। তারপর ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা ফটোর অ্যালবাম তুলে নিয়ে এসে পাতা উল্টে ছবিগুলোর ওপর চোখ বোলাতে লাগল। শুভ্রার একটা সুন্দর ভঙ্গিমায় তোলা ছবির দিকে অনেকক্ষণ অপলক তাকিয়ে রইল পূর্ণেন্দু। নিশ্চয় বিয়ের আগে তোলা এটা। কিন্তু কেন উদ্দাম হাসিতে ফেটে পড়ছিল বউদি সেই মুহূর্তে কে জানে! আশ্চর্য সুন্দর উঠেছে তো ছবিটা। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পূর্ণেন্দু ফটোর দিকে। নিশীথ অফিসে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অ্যালবামের ফটোগুলো দেখেই কাটিয়ে দিল। আরো কিছুক্ষণ পর চায়ের কাপ হাতে হাসিমুখে ঘরে ঢুকলো শুভ্রা—এতক্ষণ একা একা বসিয়ে রাখলাম। নিশ্চয়ই রাগ করেছ আমার ওপর, তাই না?

অ্যালবাম থেকে মুখ তুলে শুভ্রার হাত থেকে চায়ের কাপটা টেনে নিতে নিতে পূর্ণেন্দু হাসল—বারে রাগ করব কেন? এত ব্যস্ততার মধ্যেও যে দয়া করে আমায় মনে রেখেছেন তাতেই খুশি আমি। আর, এখানে আমার আর কাজ কী বলুন? তবু যা হোক কথা বলে সময় কাটাবার মত একজনকেও পেয়েছি।

খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে আঁচলে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে শুভ্রা হেসে বলল—আমারও তো একই অবস্থা। তবু এই একমাস তোমায় পেয়েছিলাম কাছে, মনে থাকবে অনেকদিন। তারপর হঠাৎ পূর্ণেন্দুর হাতের অ্যালবামটার ওপর চোখ পড়তেই ব্যস্ত হয়ে উঠল—এ কী এটা কোথা থেকে পেলে তুমি!

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পূর্ণেন্দু বলল—কেন কিছু অন্যায় করে ফেলেছি না কী বৌদি?

—না—তা নয়। কিন্তু ওটা অনেক পুরনো। নতুন অ্যালবাম বরং দেখ, ভাল লাগবে তোমার!

—অতীতের আপনি কিন্তু আজ অ্যালবামের পাতা জুড়ে রয়েছেন বৌদি!

শুভ্রাও পরিহাস তরল গলায় বলল—অর্থাৎ অতীতের সে আমি আর নেই, তাই তো বলছ পূর্ণেন্দু? অ্যালবামের পাতায় শুধু বেঁচে আছি!

বারে! এ কথার শুধু একটাই অর্থ হয় বুঝি? তারপর একটু চুপ করে থেকে মনের কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলল—আচ্ছা বৌদি এই ছবিটা দেখুন! কী সুন্দর হাসছিলেন তখন আপনি। কিন্তু...কিন্তু...

কিন্তুটা আর সম্পূর্ণ করতে পারল না পূর্ণেন্দু। অননুভূত একটা সংকোচে কণ্ঠ-স্বরটা যেন বুজে এল ওর।

পূর্ণেন্দু থামল। কিন্তু ওর সংকোচ লক্ষ্য করে শুভ্রা না হেসে পারল না—কিন্তু কী? কেন এতো হেসেছিলাম তাই জানতে চাইছ তো তুমি? আজ এতদিন পর কী সে কথা মনে থাকে!

পূর্ণেন্দু লক্ষ্য করল, সহজ করে কথাটা বলতে চেষ্টা করল শুভ্রা কিন্তু চকিতে বিষাদের একটা ছায়ায় ভরে উঠল মুখটা। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে আবার তেমনি মিষ্টি হেসে বলল—আমাদের বাড়ির গ্রুপ ফটোগুলো দেখেছ? এসো তোমায় চিনিয়ে দি সকলকে। বলেই খাট থেকে নেমে পূর্ণেন্দুর চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়াল—কই চা খাচ্ছ না? খেয়ে নাও, ঠান্ডা হয়ে যাবে যে। তুমি খাও, আমি দেখাচ্ছি ফটোগুলো।

বলেই পূর্ণেন্দুর হাত থেকে অ্যালবামটা টেনে পর পর কয়েকটা পাতা উল্টে গ্রুপ ফটোগুলো বার করল—এই দেখ আমার বাবা। ইনি আমার মা। এরা আমার ছোট দুই বোন—চন্দ্রা আর ছন্দা। আর ইনি আমার বড় পিসিমা, গত বছর মারা গেছেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—আমার কোন ভাই নেই।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে পূর্ণেন্দু বলল—বোনেদের চেয়ে আপনাকেই কিন্তু বেশি সুন্দর দেখতে বৌদি।

তখনো ফটোর দিকে অনামনস্কের মত তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল শুভ্রা। ওর কথা শুনে কৌতুকে একেবারে জলতরঙ্গের মত হেসে উঠল—শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! আশ্চর্য, চন্দ্রা ছন্দার চেয়ে আমি বুঝি তোমার চোখে সুন্দরী হলাম?

এ কথার কোন জবাব দিল না পূর্ণেন্দু। খালি চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে পকেট থেকে সিগারেট বার করতে করতে হাসল একটু—দেশলাইটা একটু দিন না বৌদি!

রান্নাঘর[illegible] দেশলাই এনে ওর হাতে দিয়ে কৃত্রিম রাগের গলায় অনুযোগ করল—তুমি কি[illegible] একটু একটু করে সিগারেট খাওয়া বাড়িয়ে ফেলছ পূর্ণেন্দু? ও ছাই-পাঁশ বেশী না খাওয়াই ভাল।

দেশলাই জেলে সিগারেট ধরিয়ে এক-মুখ ধোঁয়া ছাড়ল পূর্ণেন্দু। তারপর আবার দেশলাইটা ফিরিয়ে দিতে গিয়ে কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে রইল শুভ্রার মুখের দিকে।

ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেতেই কেন কে জানে এই প্রথম একটা অননুভূত সংকোচ বোধ করল শুভ্রা। অনেকদিন পর হঠাৎ কান্তিদার কথা মনে পড়ে গেল। আশ্চর্য! ঠিক এমনি দৃষ্টি দিয়ে আড়াল থেকে ওকে অপাঙ্গে লক্ষ্য করতেন, না তাকিয়েও বেশ বুঝতে পারত ও। কিন্তু তার বেশী আর এক পাও এগুতে পারেন নি কান্তিদা। সে সব কথা মনে পড়লে হাসি পায় ওর। পূর্ণেন্দুর দৃষ্টির মধ্যে আজ যেন কান্তিদার প্রতিবিম্ব দেখতে পেল শুভ্রা। তবে তফাৎ আছে অনেক। কান্তিদা ছিলেন ভীরু মানুষ। কিন্তু পূর্ণেন্দুর দৃষ্টির ভাষা অত্যন্ত স্পষ্ট, সরল। বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখে দুরন্ত যৌবনের আবেগ যেন টল টল করে কেঁপে চলেছে অহর্নিশ।

তাড়াতাড়ি দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে শুভ্রা সংকোচে হাসল একটু—অমন হাঁ করে কি দেখছ বলতো?

পূর্ণেন্দু ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অসংকোচে উত্তর দিল—দেখছি, সত্যি গোপাল ঠাকুরের ভুল হল কী না শালুক চিনতে। বলেই কী ভেবে হঠাৎ নিজের রসিকতায় হো হো করে হেসে উঠল।

পূর্ণেন্দুর পরিহাস উপভোগ করে শুভ্রাও গলা মিলিয়ে হেসে ফেলল। তারপর বলল—তুমি বোস পূর্ণেন্দু এবার রান্নার কাজে মন দি একটু। ও বেলা থিয়েটার দেখতে যেতে হবে, কাজকর্ম এবেলাতেই সেরে রাখতে হবে।

—না আর বসব না বৌদি। সিগারেটটা শেষ করেই উঠব। পিসীমারা দুপুরে রান্নাদিকে দেখতে যাবেন, দেখি কোন কাজ করতে হবে কী না।

চলে যেতে গিয়েও যেতে পারল না শুভ্রা। দরজার কাছে সরে এসে পিঠ ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—বোস না বাবা আরেকটু। মাসীমার যেতে তো এখনো অনেক দেরী। এস রান্নাঘরে বসে কাজ করতে করতে গল্প করি দুজনে। হ্যাঁ আজ থিয়েটারে যাচ্ছ তো তুমি?

সিগারেটে তাড়াতাড়ি কয়েকটা টান দিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে পূর্ণেন্দু হাসল—এখানে আমার আর কাজ কী বলুন। সারা-দিন তো বসেই আছি। তবু সময়টা কাটবে ভাল। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—কাল সন্ধ্যের সময় নিশীথদাদের ক্লাবে রিহার্সাল দেখতে গিয়েছিলাম।

—তাই বুঝি? সেই জন্যেই কাল সন্ধ্যেবেলায় তোমাকে ডেকেও সাড়া পেলাম না। তা রিহার্সাল কেমন দেখলে ঠিক করে বল ত!

—ভালই। বিশেষ করে নিশীথদা আর কমলবাবু বলে একজন আছেন, এই দুজনের অভিনয়ই ভাল লাগল। তাছাড়া... কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ করার আগেই হঠাৎ কী ভেবে উচ্ছল হাসিতে ফেটে পড়ল পূর্ণেন্দু—কিন্তু জানেন বৌদি, নিশীথদার অপাজিত রোলে নায়িকা মৃণালিনীর পার্টে ...ওহো হো-হো—কোথা থেকে যে একটা বালির বস্তা জোগাড় করে এনেছে...আর কী যে পার্ট বলে। আবার উচ্ছকিত হাসির দমকে কণ্ঠস্বর আপনি রুদ্ধ হয়ে উঠল পূর্ণেন্দুর।

শুভ্রাও কৌতুকে হেসে ফেলল—খুব মোটা? কাল মত? বুঝেছি বীণা?

—কে জানে বাবা বীণা না একতারা—সে তোমরা জান। তবে আমাদের জলপাই-গুড়িতে ও মেয়ে স্টেজে নাবলে নিশ্চয় ইন্টকবৃষ্টি শুরু হয়ে যেত বলে দিতে পারি। তারপর লম্বা করে একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে বলল—বাপরে, একটা গোটা শ্লে

ঠাণ্ডা মাথায় মার্ডার করতে একা বীণাই যথেষ্ট!

—আরে কেবল হাসে। কী কারণ সেটা বলবে তো? ভাল অভিনয় করতে পারছে না বুঝি?

হঠাৎ নিচে থেকে অন্নপূর্ণার কণ্ঠস্বর ভেসে এল—ও পূর্ণ, একবার নিচে আয় তো!

অগত্যা হাসাহাসিতে ছেদ টেনে দিতে হল। সিগারেটে তাড়াতাড়ি গোটা কতক টান দিয়ে ফেলে দিল পূর্ণেন্দু। তারপর চলে যেতে যেতে বলল—এখন চলি বৌদি। আবার পরে আসব।

সেদিন সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরে এল নিশীথ। অফিসের জামা-কাপড় বদলে অনেকক্ষণ চুপচাপ বিছানায় শুয়ে শুয়ে বোধহয় অভিনয়ের সংলাপগুলো আওড়ে যাচ্ছিল মনে মনে।

একটু পর দু কাপ চা নিয়ে এসে নিশীথের কাছ ঘেঁষে বসে পড়ল শুভ্রা। তারপর আবার উঠে গিয়ে টেবিল থেকে ছোট আয়না আর চিরুনিটা নাবিয়ে এনে চা খেতে খেতে চুলটা বেঁধে নিতে বসল।

নিশীথ তখনও অনামনস্কের মত কড়ি-কাঠের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দেখে তাগাদা দিল—কই চা খাও। কী এত ভাবছ বল তো! নিশ্চয় তোমার মৃণালিনীর কথা?

চিন্তায় বাধা পেয়ে নিশীথ বিরত বোধ করল। বিস্মিত দৃষ্টিতে শুভ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—মৃণালিনী... মৃণালিনী কে?

—বারে মৃণালিনীকে চিনতে পারছ না? তোমার বীণা গো? —

—হঠাৎ এ কথা বললে যে?

আবার তেমনি করে হাসল শুভ্রা—আজ পূর্ণেন্দু বলছিল বীণাকে না কী মোটেই মানায়নি মৃণালিনীর পাটে।

বীণার কথা ভেবে এবার নিশীথও হেসে ফেলল। তারপর চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলে বলল—তাই বল। কিন্তু কী করা যাবে বল। অ্যামেচার থিয়েটারে সব কিছুই কী আর পছন্দমত হয়। তারপর একটু চুপ করে বলল—চেহারাটাই বড় জিনিস নয়। অভিনয়টাই হল আসল। বীণা সেটা ভালই করে।

আঙুলে দিয়ে চুলের জোট ছাড়াতে ছাড়াতে শুভ্রা বলল—অভিনয় ভাল করে না ছাই! আমি ওর চেয়ে ভাল অভিনয় করতে পারি।

শুভ্রার কথা বলার ভংগী দেখে নিশীথ এবার না হেসে পারল না—তুমি যা করবে আমার জানা আছে।

—এই কথা তো? বেশ পরীক্ষা করে দেখ আমায়। আর যদি পারি, আমাকে তোমাদের দলে নেবে তো? কথা দিচ্ছ?

নিশীথ কিছুক্ষণ বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর উৎসাহে সোজা হয়ে বসল—নিশ্চয়ই...আমার কোন আপত্তি নেই। বরং খুশিই হব আমি। কিন্তু ভেবে বল সত্যি বলছ! তা হলে চুলটা বেঁধে নাও তাড়াতাড়ি, দেখি তোমায় পরীক্ষা করে।

গালে টোল ফেলে হাসল শুভ্রা—আমার হয়ে এসেছে। তুমি পার্ট বলে যাও আমি সংগে সংগে বলে যাচ্ছি।

—ও রকম করে হয় না শুভ্রা। এটা সাধনার জিনিস। হেলা-ফেলার জিনিস নয়। উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়াও। আমি যে পার্ট বলব আমারও তো উৎসাহ চাই!

বাবারে বাবা! কৃত্রিম রাগের ভান করে আয়না চিরুনি ফেলে সপ্রতিভ ভংগীতে উঠে দাঁড়াল শুভ্রা—নাও এবার হয়েছে তো! বল কী বলবে?

নিশীথ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল—এই তো চাই। এমনি ফ্রি হওয়া দরকার। নাও এবার বল। হ্যাঁ, তার আগে তোমাকে সংক্ষেপে পার্টটা বুঝিয়ে দিই। আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রিয়তমকে খুনের অভিযোগ থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে মৃণালিনী। কিন্তু জাঁদরেল উকিলের জেরায় কেন যে উল্টো-পাল্টা কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে না। মৃণালিনীর মনের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর শুভ্রা।

তারপর উৎসাহের আতিশয্যে চায়ের কাপটা কয়েক চুমুকে নিঃশেষ করে নিজেও উঠে দাঁড়িয়ে বলল—নাও এবার বল। উকিলের কথাগুলো আমিই বলে যাব, আর তুমি মৃণালিনীর পার্টটা শুধু বলবে।

কিন্তু শুরুতেই ওকে এতটা নিরাশ করবে শুভ্রা ভাবতে পারেনি নিশীথ। জড়িয়ে জড়িয়ে এক একটা কথা উচ্চারণ করে আর হেসে খুন হয়। নিশীথ তবু মনের বিরত ভাবটা গোপন করার চেষ্টা করে অবিচলিত স্থৈর্যের সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ পার্ট বলে গেল। তারপর শুভ্রাকে হঠাৎ মুখে কাপড় গুঁজে হাসিতে ভেঙে পড়তে দেখে নিঃসীম বিরক্তিতে আবার খাটের ওপর বসে পড়ে বলল—দূর! তোমার দ্বারা অভিনয় হবে না। কক্ষনো হবে না। মিছিমিছি আমায়......

কিন্তু সিঁড়িতে হঠাৎ পায়ের শব্দ হতেই চুপ করে গেল নিশীথ। শুভ্রাও তাড়াতাড়ি হাসি সংযত করতে করতে মেঝে থেকে চিরুনিটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সেই মুহূর্তে দরজার বাইরে থেকে নিশীথের বন্ধু পীযূষের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—নিশীথ, হল তোর? আর কত দেরী রে!

তারপর ঘরে ঢুকে দুজনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—কীরে...কোন অসুবিধে ঘটালাম না না তো তোদের! বউঠান যা হাসছিলেন, তাতে তো তাই মনে হয়।

শুভ্রা পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে হাসি সামলাতে চেষ্টা করছিল। নিশীথই বিব্রত গলায় অভ্যর্থনা করল বন্ধুকে—আয় ভেতরে এসে বোস। না না অসুবিধে কিছু নয়। তোর বউঠানের আজ আবার কী সাধ হল কে জানে। বলে কী না ও না কী বীণার চেয়ে ঢের ভাল অভিনয় করতে পারে

—বলিস কি রে! তারপর—? নিশ্চয়ই প্রচুর সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকতে দেখলি বউঠানের মধ্যে।

এবার শুভ্রা মুখ ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে বলল—আছেই তো, কিন্তু কী করব বলুন তো? একরাশ এমন বস্তাপচা সংলাপ বলতে বলল আমায়.........

আরও কিছুক্ষণ হাসাহাসি হল এই নিয়ে। তারপর চলে গেল চা করে আনতে।

পীযূষ নিজে সিগারেট ধরিয়ে নিশীথের দিকে এগিয়ে দিল একটা—নে ধর। আর একটু তাড়াতাড়ি চল। খুব দরকার। শুনেছি কলকাতা থেকে মেকাপ-ম্যান না কী আসছে না। কাকে ধরে নিয়ে এল কে জানে!

আগেভাগেই নিশীথকে বেরিয়ে পড়তে হবে শুনে মুখভার হয়ে উঠল শুভ্রার—বেশ যাও! তোমার মনের ইচ্ছেটাও তো তাই ছিল।

নিশীথ বোঝাতে চেষ্টা করল—ভুল বুঝ না শুভ্রা। আমি তো সকালেই কথা দিয়েছিলাম দুজনেই একসংগে বেরুব বাড়ি থেকে।

—থাক্ আর বোঝাতে হবে না।

—রাগ কর না লক্ষ্মীটি। আমি পূর্ণেন্দুকে বলে যাচ্ছি—সংগে করে যেন নিয়ে যায় তোমায়।

নিশীথের কথা শুনে [illegible] করে জ্বলে উঠল শুভ্রার। [illegible] তাড়ি কী যেন বলতে যাচ্ছিল [illegible] কী ভেবে নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ [illegible]।

পীযূষের সংগে নিশীথ বেরিয়ে যাবার পর অনেকক্ষণ মন-মরা হয়ে খোলা জানলার বাইরে দূরে রেল লাইনটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুভ্রা। মনের ভেতরে যে মধুর সুর এতক্ষণ অনুরণিত হয়ে চলেছিল হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় তা কোন্ দিকে যেন উধাও হয়ে গেল।

নিশীথের ওপর অভিমানে মনটা যেন বড় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। কখনো মনে হচ্ছে ফিরে এসে দেখুক যেতে পারেনি শুভ্রা। পূর্ণেন্দুর সংগে যে যেতেই হবে তার কোন মানে নেই! আবার কখনো ভাবছে...হয়তো বা লঘু পাপে গুরুদণ্ড

দেওয়া হবে নিশীথকে! তাড়াতাড়ি না যাওয়া ছাড়া যে ওর উপায় ছিল না—তাও তো শুনল। এর পরও রাগ করে বাড়িতে বসে থাকলে নিশ্চয়ই আঘাত পাবে ও।

নিদারুণ একটা অস্থিরতায় আরও কিছুক্ষণ ছটফট করে কাটাল শুভ্রা। রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে হাতের কাজগুলো সেরে নেবে ভাবল। কিন্তু জানলা ছেড়ে সবে যেতে ইচ্ছে করল না। অন্যমনস্কের মত এ জানলা ছেড়ে ও জানলার সামনে এসে দাঁড়াল আবার। দিনান্তের রাঙা সূর্য পশ্চিম দিগন্তের কোলে হেলে পড়ছে ধীরে ধীরে। অনেকক্ষণ সেদিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল। এক ঝাঁক পানকৌড়ি চঞ্চল ডানা মেলে উড়ে চলেছে পূবমুখো। মাঠের শেষ প্রান্তে ঝাঁকড়া মাথা বটের ডালে ডালে ঘর-ফেরা পাখিদের অতি ব্যস্ত আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। এত দূর থেকেও চোখে পড়ছে শুভ্রার। রাস্তার ওপারে বেওয়ারিশ কুইচাঁপা গাছটার পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে একটা বড় প্রজাপতি। কী খুঁজে মরছে ও......ওই জানে।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানলা থেকে সরে এল শুভ্রা। না, যদি যেতেই হয় তবে আর দেরী করা উচিত হবে না। হয়তো এখুনি পূর্ণেন্দু তাগাদা দেবে বেরুবার জন্যে। কিছু কাজ এখনও বাকি রয়ে গেছে। সেরে নিতে হবে তাড়াতাড়ি।

আর দাঁড়াল না শুভ্রা। রান্নাঘরে এসে দ্রুত হাতে সেরে নিল কাজগুলো। তারপর বাথরুমে ঢুকে গা ধুয়ে ঘরে ফিরে এসে বাতিটা এখুনি জ্বালিয়ে নেবে কী না ভাবল......না থাক ... না কিছুটা আলো আছে। আলমারি ... শাড়ী জামা কাপড় বার করে পরে ... তাড়াতাড়ি। শাড়ির ... ব্লাউজটা ... হই হল কী না দেখ- ... জ্বালতেই হল। আয়নার ... অনেকক্ষণ অপাংগে নিজের ... তে থাকতে কী ভেবে ... সকালে অ্যালবাম ... পূর্ণেন্দুর মন্তব্য আর ... টা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ... ভুল বলে নি। ভক্তই বটে ... সত্যি মিথ্যে যাই হোক...... ... মুখ থেকে নিজের প্রশস্তি ... কোনু যুবতী মেয়ের ভাল না লাগে!

ড্রেসিং টেবলটা নিয়ে আয়নার সামনে প্রসাধন সেরে নিতে বসে পড়ল শুভ্রা। দরজার বাইরে হঠাৎ পূর্ণেন্দুর গলা পাওয়া গেল—আপনার হল বৌদি। এখনো দেরী না কী?

আয়না থেকে মুখ না ফিরিয়েই হাসি-মুখে শুভ্রা উত্তর দিল—ভেতরে এস পূর্ণেন্দু। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? না, আমার আর দেরী নেই।

আয়নার মধ্যে দিয়ে পূর্ণেন্দুর চেহারাটা দেখা গেল এবার। পাজামা পাঞ্জাবি পরলে ওকে এত ভাল মানায়, এই প্রথম দেখল শুভ্রা। ঘরের মধ্যে ঢুকে কোমরে হাত রেখে ওর দিকে অপলক, অসংকোচ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণেন্দু। আশ্চর্য! কী যে এত দেখে ওকে......ওই জানে।

অকারণ একটা লজ্জায় শুভ্রার চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি আয়না থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল—হাঁ করে কী দেখছ বল তো? আমার লজ্জা করে না বুঝি?

পূর্ণেন্দু আরও কাছে এগিয়ে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। তারপর হেসে বলল—মনের সব কথা কী বলা যায় বৌদি?

কি যেন বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল শুভ্রা। একটু পরে বলল—লোকের মনের কথা আমি অত বুঝতে শিখিনি পূর্ণেন্দু। শুধু বল, শাড়ির সংগে ব্লাউজটা মানিয়েছে? আমায় খারাপ দেখাচ্ছে না তো?

—সুন্দর। বিশ্বাস করুন, সব মিলিয়ে শুধু বলা যায় আপনি সুন্দর।

মুখ টিপে হাসল শুভ্রা—মনে হচ্ছে কাব্য জেগে উঠেছে তোমার মনে। সে রকম করে বল তা হলে। আর......আরও যদি কিছু বলার থাকে তোমার তাও বল।

পূর্ণেন্দু কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবগদগদ গলায় বলল,—

দূর থেকে দেখে আগুনের শিখা
ভেবেছিনু দেয় আলো
কাছে এসে দেখি আলো নয় শুধু
আছে তাপ, আছে দাহ।

পূর্ণেন্দু থামার আগেই হঠাৎ উচ্ছকিত হাসিতে ফেটে পড়ল শুভ্রা—আরে বাবা, কাব্য করতেও জান তা হলে তুমি! আর আমার সম্বন্ধে এটাও তোমার নতুন আবিষ্কার বল! কাছে এসে দেখি আছে তাপ আছে দাহ.........হি হি হি.........আবার দুর্বোধ্য হাসির দমকে উচ্ছল হয়ে উঠল। তারপর হাসি সংযত করতে করতে বলল—তুমি চেষ্টা করলে কালে কবিখ্যাতি লাভ করতে পারবে।

পূর্ণেন্দু ওর রসিকতায় হাসতে যাচ্ছিল। কিন্তু শুভ্রাকে প্রসাধন শেষে সকালে তুলে রাখা শ্বেত করবীর গুচ্ছটাকে ফুলদানী থেকে তুলে নিয়ে খোঁপায় গুঁজতে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল—আরে আরে দাঁড়ান। ফুলের ডাঁটিটা ভেঙে যাবে যে! আমার হাতে দিন আমি গুঁজে দিচ্ছি।

আশ্চর্য! পূর্ণেন্দুকে কোন বাধাই দিতে পারল না শুভ্রা। ফুলটা ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে অননুভূত সংকোচে শুধু ঘাড় হেঁট করে রুদ্ধশ্বাসে বসে রইল। বুকের মধ্যে হৃৎপিন্ডটার প্রচন্ড দাপাদাপির মধ্যে দিয়ে বেশ অনুভব করতে পারল দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে পূর্ণেন্দু ওর অনেক কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। কয়েকটি শ্বাসরুদ্ধ মুহূর্তের মধ্যে নিবিড় হয়ে উঠল একটা মধুর সান্নিধ্য। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বুকের মধ্যেটা হাল্কা করে ফেলতে চাইল; কিন্তু পারল না। চোখ তুলে তাকাতে চেষ্টা করল কিন্তু আয়নার মধ্যে পূর্ণেন্দুর সংগে চোখাচোখি হতেই দৃষ্টিটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

খোঁপায় ফুলটা গুঁজে দিয়ে পূর্ণেন্দু হঠাৎ শুভ্রার চিবুক ধরে মুখটা ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে। দুহাতে তাড়াতাড়ি পূর্ণেন্দুর হাত জড়িয়ে ধরে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠতে চাইল, কিন্তু পারল না। বরং ব্যর্থ প্রচেষ্টাটা বোধহয় অজান্তে আঘাত হেনে বসল পূর্ণেন্দুর অন্তস্থলে।

চাক ভাঙা এক ঝাঁক মৌমাছি হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল শুভ্রার গালে, ঠোঁটে, কপালে। চুম্বনে চুম্বনে ওকে অস্থির করে তুলল পূর্ণেন্দু।

হাত বাড়িয়ে কখন আলোটা নিবিয়ে দিয়েছে পূর্ণেন্দু খেয়াল করেনি শুভ্রা। শুধু চোখের সামনে তাল তাল অন্ধকার পাক খেয়ে চলেছে বলে মনে হচ্ছে। আর তার নিচে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে ওর আবেগকম্পিত দেহ মন।

না অসম্ভব। নিঃশেষিত শক্তি নিয়ে আর বাধা দিতে পাচ্ছে না শুভ্রা। শুধু আজ নয়, সে শক্তি অনেকদিন হারিয়ে ফেলেছে। আর কেউ না জানুক, কিন্তু ও তো জানে, একটু একটু করে ওর কাছ থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছে নিশীথ, তার চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে পূর্ণেন্দু এগিয়ে এসেছে ওর জীবনে। সব বুঝে সেদিনও বাধা দিতে পারেনি, আজও পারবে না আশ্চর্য কী!

শুধু শেষবারের মত বাধা দিতে চেষ্টা করল শুভ্রা। করুণ মিনতিতে ভেঙে পড়ল --আমায় ক্ষমা কর পূর্ণেন্দু, আমি পারব না......কিছুতেই পারব না......।

কিন্তু পূর্ণেন্দুর দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ হয় সেই মুহূর্তেই স্তব্ধ করে দিল ওর কণ্ঠস্বর। টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাতালের মত অন্ধকার হাতড়ে এগিয়ে চলল খাটের দিকে।

বাইরে অন্ধকার পৃথিবীর বুক জুড়ে হঠাৎ এক ঝলক উদ্দাম হাওয়া জেগে উঠল। চৈত্র দিনের ঝরা পাতার দল খড় খড় শব্দ তুলে পিছনের আমবাগানে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। গভীর নৈঃশব্দের বুক চিরে হঠাৎ অসংখ্য ঝিল্লি তীক্ষ্ম শিস দিতে শুরু করল।

শুভ্রার মনের গভীরেও বিক্ষুব্ধ একটা গুঞ্জন গুমরে বেজে চলল। সমস্ত রাগ অভিমানটা হঠাৎ নিশীথের ওপর নীরব ভর্ৎসনায় মুখর হয়ে উঠল—আমি কিছু জানি না...কিছু না। তোমার অভিনয় নিয়ে তুমি থাক; কিন্তু আমি তোমার চেয়ে অনেক বড় অভিনেত্রী। অনেক বড়—।.....

সাহিত্য সাময়িকী

শ্রীরামপুরে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ২৩শে মে তারিখে ১৮১৮ খৃস্টাব্দে। যদিও মূলতঃ খৃস্টধর্মের প্রচারকল্পে এই সাপ্তাহিকের আবির্ভাব, তবু একথা আজো সকলে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন যে, সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এই পত্রিকাটির দান অবিস্মরণীয়। এর আগে ১৮১৬ খৃস্টাব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য 'বেঙ্গল গেজেট' সম্পাদনা করেন। আর এই ১৮১৮ খৃস্টাব্দে মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'দিগদর্শন'। এই বছরে এপ্রিল মাস থেকে মাসিকপত্ররূপে 'দিগদর্শনে'র আবির্ভাব ঘটে। ১৮২৭ খৃস্টাব্দে 'দিগদর্শনে'র প্রকাশ বন্ধ হয়। 'দিগদর্শনে'র একমাস পরে 'সমাচার দর্পণে'র প্রকাশ হলেও এই পত্রিকাটি ১৮৪০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছে। মিশনারিরা 'দিগদর্শন'কে বাংলা ও ইংরাজী পত্রে পরিণত করেন, এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে নানা প্রকার ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদ পাশপাশি প্রকাশ করতেন। পত্রিকাকে সর্বজনযোগ্য করে তোলার চেষ্টা ছিল সম্পাদকের। সম্পাদনায় বৈশিষ্ট্য ছিল। সংবাদ পরিবেশনে বৈচিত্র্য ছিল। সম্প্রতি গবেষকরা এই দুটি পত্রিকা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় আলোচনা করেছেন সুতরাং বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে পথ-প্রদর্শকের গৌরবময় ভূমিকা এই দুটি পত্রিকার, সে কথা স্মর্তব্য।

সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে যেসব পত্রিকা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ও স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে স্মরণীয় হয়ে আছে, তাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার', 'নব জীবন'; রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের 'সাধনা', রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ভারতী' প্রভৃতি বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে।

পত্রপত্রিকার মাধ্যমে নতুন লেখক আবিষ্কৃত হন, নতুন লেখক উৎসাহ ও প্রেরণা পান এবং সাহিত্য নতুন নতুন লেখকের চিন্তায় সমৃদ্ধিলাভ করে।

'বঙ্গদর্শন', 'সাধনা' ও 'ভারতী'র পরিদর্শিত পথে পরে প্রকাশিত হয়েছে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'দাসী', 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী', সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য', মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের 'মানসী', ফণীন্দ্রনাথ পালের 'যমুনা', সুধাকৃষ্ণ বাগচীর 'জাহ্নবী' দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত ও জলধর সেন সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ', অমূল্য বিদ্যাভূষণের 'সংকল্প', বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বঙ্গবাণী', মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভারতী', চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ', প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র', সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'মাসিক বসুমতী', দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুল নাগ সম্পাদিত 'কল্লোল', রেণু গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ধূপছায়া', বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি', প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ সম্পাদিত 'কালিকলম', সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'উত্তরা', উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিচিত্রা', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' এবং সজনীকান্ত দাশের 'শনিবারের চিঠি' (নবপর্যায়) বাংলার সাহিত্য ইতিহাসের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। এইসব পত্রিকাগুলিরই নিজস্ব লেখকগোষ্ঠী ছিল, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের সঙ্গে নতুন নতুন লেখকদের লেখা এঁরা পরিবেশন করেছেন। 'প্রবাসী' ছোটগল্পের জন্য পুরস্কার দিয়েছেন এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখক সেইসব পুরস্কারে উৎসাহিত হয়েছেন। 'ভারতীর' লেখকরা প্রথম মহাযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী কালটিতে বাংলা সাহিত্যে একচ্ছত্র আসন বিস্তার করেছিলেন। 'নারায়ণে'র প্রবন্ধ-সম্পদ ছিল অতুলনীয়, এই পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং সেই জন্য সেকালে চিত্তরঞ্জন দাশ শরৎচন্দ্রকে একখানি ব্ল্যাংক চেক দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র অবশ্য মাত্র একশত টাকা সম্মানমূল্য হিসাবে গ্রহণ করেন। 'মাসিক বসুমতী'র রচনাবলী অবশ্য [illegible] প্রাচীনপন্থী, কিন্তু শরৎচন্দ্রের অনে[illegible] তে যার সঙ্গে অন্য অনেকের মূল্যবান [illegible] প্রকাশিত হয়েছে সেকালের 'মাসিক [illegible] সঙ্গে [illegible] তে [illegible] 'বার্ষিক বসুমতী'র কো[illegible] বিশেষ সংখ্যায় রবী[illegible] প্রমথ চৌধুরী থেকে [illegible] সাহিত্যের সকল শ্রেণী[illegible] লিখেছেন। [illegible]

'বিচিত্রা' অভিজাত [illegible] হিসাবে প্রকাশিত হল। রবী[illegible] রাজ' নৃত্যনাট্যের গান ও [illegible] য়ে যাবার নন্দলালের অলংকরণ বাংলা[illegible] জানলার সাহিত্যে আজো অপরাজেয় [illegible] বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ', শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' ও 'আগামীকাল'। এছাড়া বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', অন্নদাশঙ্করের 'পথে ও প্রবাসে', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসী মাসি' এ সবই ত' উপেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন বিচিত্রায়।

'কল্লোল'গোষ্ঠীর অনন্যসাধারণ ইতিহাস লিখে রেখেছেন অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোল-যুগে'। সেখানে কালিদাস, ধূপছায়া, উত্তরা ও প্রগতি সবাই উপস্থিত। এর পর প্রকাশিত হয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়'। সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়' নিঃসন্দেহে অভিজাত

পত্রিকা। যেমন ছাপা তেমনই কাগজ, তবে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'র সে বাহ্যিক সৌষ্ঠব ছিল না। উইকলি নোটসের ছাপাখানায় ছাপা, বিজ্ঞাপনবিহীন 'সবুজপত্র' বাংলা সাহিত্যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়ে আছে।

সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়' পরিচ্ছন্ন রুচি, নতুন রীতির প্রবন্ধ এবং নতুন ধারায় পুস্তক সমালোচনার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বর্তমানকালে কিন্তু অনেকগুলি সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়েছে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে যেগুলি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সম্প্রতিক কয়েকটি পত্রিকা যা হাতের কাছে আছে এবং যেগুলির নাম স্মরণে আছে তা উল্লেখ করে কৌতূহলী পাঠকের সামনে ধরব। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে দিলীপকুমার গুপ্ত ও অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মাসিকপত্র 'সারস্বত'। দিলীপকুমার গুপ্ত একদা বাংলার পুস্তক প্রকাশনের জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, তাঁর সম্পাদিত মাসিকপত্রেও সেই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে। এই সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় প্রবন্ধ, অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা 'নিরন্তর', নির্মল মৈত্র লিখিত গল্প 'জনমনুষ্য' (প্রথম অংশ), মহিম রুদ্র রচিত 'নিখিল বিশ্বাসের ছবি', পুষ্কর দাশগুপ্ত অনূদিত ফেদেরিকো গার্থিআ লোর্কার কবিতা এবং পুস্তক পরিচয় বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। তরুণ কবি জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত 'সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি-বিষয়ক মাসিক সংকলন', 'কলকাতা' নতুনত্বের দাবী নিয়ে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় প্রবীণরা অনুপস্থিত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ রায় ও জ্যোতির্ময় দত্তের কবিতাগুলি উপভোগ্য। সুবীর রায়চৌধুরীর 'বীরবল' ও 'বাবু-বাঙলা' প্রবন্ধটি গতানুগতিকতামুক্ত। শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুদ্ধশীল বসুর গল্প দুটি সাহসিক।

পরিচিত দুটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় দুটি প্রকাশন প্রতিষ্ঠান থেকে—একটির নাম 'কথা সাহিত্য', সম্পাদক গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষ, উনবিংশ বর্ষের বৈশাখ সংখ্যাটিতে 'দাদা ঠাকুরের' প্রতি নিবেদিত ক্রোড়পত্রটি চমৎকার। অজিত কৃষ্ণ বসুর 'খাঁ সাহেব ঘড়ে গোলাম' প্রবন্ধটিও আকর্ষণীয়। এছাড়া আছে জরাসন্ধ, আশাপূর্ণা, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ধারাবাহিক উপন্যাস। অপর পত্রিকাটির নাম 'কালি ও কলম' প্রথম বর্ষের নবম সংখ্যাটি অতিশয় সমৃদ্ধ। সম্পাদক বিমল মিত্র এবং শচীন মুখোপাধ্যায়। এই সংখ্যায় সুভাষচন্দ্র সরকার, বিমানবিহারী মজুমদার, বিনয় ঘোষ, পুলিনবিহারী সেন, দিলীপ মালাকার, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সুভাষ সমাজদার, সুন্দরলাল ত্রিপাঠী প্রভৃতির প্রবন্ধ মণীন্দ্র রায় ও রাম বসুর কবিতা, বিমল মিত্র এবং জরাসন্ধের ধারাবাহিক উপন্যাস ও সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবান নতুন লেখক অশোককুমার সেনগুপ্ত ও নির্মলেন্দু গৌতমের গল্প প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটি অল্পকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

এ ছাড়া তিনখানি উল্লেখযোগ্য ত্রৈমাসিক পত্রের কথা এই সূত্রে বলা প্রয়োজন। দুটি পত্রিকার সম্পাদক বাংলার দুজন সুপ্রতিষ্ঠিত কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ ও জগদীশ ভট্টাচার্য। বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'এষা'র মধ্যে একটা অসাধারণ নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈশাখ সংখ্যায় অন্নদাশঙ্কর রায় ও নন্দগোপাল সেনগুপ্ত লিখেছেন 'প্রমথ চৌধুরী' প্রসঙ্গে আর নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন 'ম্যাকসিম গোর্কী'। এই তিনটি প্রবন্ধই মূল্যবান আর সেই সঙ্গে আছে সম্পাদক রচিত 'এষার মুকুরে'। এই জাতীয় সম্পাদকীয় ইদানীং আর কোথাও প্রকাশিত হতে দেখিনি। জগদীশ ভট্টাচার্যের 'কবি ও কবিতা' আর একটি পরিচ্ছন্ন পত্রিকা। এই সংখ্যায় সুনীলকুমার নন্দীর 'একগুচ্ছ নূতন ফসল' বিশেষ উপভোগ্য। এছাড়া আছে রবীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্র দেব, মনীশ ঘটক, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রভৃতির কবিতা আর সম্পাদক রচিত প্রবন্ধ 'বুদ্ধদেব বসু'। অমিয় চক্রবর্তীর 'সমানো মন্ত্রঃ সমিতি সমানী' ও 'পত্রালী' কয়েকটি সাম্প্রতিক চিঠিপত্র। এছাড়া নবীন ও প্রবীণ অসংখ্য কবিদের কবিতায় এই সংখ্যা সমৃদ্ধ। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'সমকালীন' শুধু প্রবন্ধ নিয়ে দীর্ঘকাল সগৌরবে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। প্রবন্ধ ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'র সম্পাদক সঞ্জীবকুমার বসুও প্রশংসার দাবী রাখেন। এই ত্রৈমাসিকে আশুতোষ ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রনাথ রায়, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ও অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। যে পত্রিকাগুলির উল্লেখ করা হল তার সবগুলির মুদ্রণ-পারিপাট্য ও পরিবেশ পদ্ধতি অভিনব। এতগুলি সুসম্পাদিত পত্রিকা একালের বাংলা সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ গৌরবের, একথা বলা যায়।

—অভয়ংকর

ভারতীয় সাহিত্য

সাহিত্যিকের

অসংখ্য স্মৃতিমেশানো সেসব দিনের ঘটনা আজো কেমন জীবন্ত মনে হয়। মনে পড়ে, সেটা ১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়েছে। চারদিকে দারুণ উত্তেজনা। শেকল-ভাঙার গানে ক্ষেপে উঠেছে বাংলার যৌবন। ঝাঁপিয়ে পড়লাম আন্দোলনে। তিরিশে আশ্বিন সুরেন্দ্রনাথ ডাক দিলেন অরন্ধন আর রাখি বন্ধনের। দেখলাম বাংলার নতুন চেহারা। গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল স্বদেশী আন্দোলন। কী তার উন্মাদনা।—কথাগুলি বলছিলেন প্রবীণতম লেখক শ্রীবিধুভূষণ বসু। ৯৪তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর বাসভবনে পুরনো দিনের কথা শোনার জন্যে যখন তাঁকে ঘিরে ধরলেন একালের তরুণেরা, তখন তিনি স্বদেশীযুগের স্মৃতি রোমন্থন করলেন। কথায় কথায় বললেন, প্রতিকার গল্প লেখার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে কিভাবে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনেছিল ইংরেজ সরকার। বিচারের প্রহসন দেখিয়ে অবশেষে তাঁকে জেলে পাঠানো হল। চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন তিনি। হাজারিবাগ জেলে সে সময় তিনি এলেন বহু বিপ্লবী দেশকর্মীর সংস্পর্শে। নতুন জীবন যেন শুরু হল তার। এ সময় জেলে দেওয়া হতো ভুট্টার ভাত। বিধুভূষণ বসু তা খেতেন না। ফলে লাঞ্ছনা আর দুর্ভোগের মাত্রা আরো বেড়েছিল বই কমেনি।

এই একবার নয়, বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের শরিক হিসেবে তিনি বহু বোমার মামলায় আসামী হয়ে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। কিছুকাল 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। শ্রীঅরবিন্দের 'কর্মযোগী' ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' কাগজের তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন।

তাঁর বয়স যখন উনিশ, তখন থেকেই তিনি লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লক্ষ্মী মেয়ে' বের হয় ১৩০৪ বঙ্গাব্দে। তিনি চারণকবি মুকুন্দদাসের জন্যে 'দাদা ও ব্রহ্মচারিণী' পালা লিখে দিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে রচিত তাঁর বঙ্গবাসীর 'সোনার স্বপন' ও 'সতীলক্ষ্মী' ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। বঙ্গবাসীর সোনার স্বপনে লেখা তাঁর 'ফুলার, আর কি দেখাও ভয় দেহ তো মোর অধীন বটে মন তো স্বাধীন রয়' আজো অনেকের মনে পড়ে।

অশ্লীল বই আটক ॥

সাম্প্রতিক অশ্লীল পত্রপত্রিকার বিরুদ্ধে আন্দোলন থিতিয়ে আসতে না আসতেই কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ বিভিন্ন বইয়ের স্টলে হানা দিয়ে ২৩৫খানি বই আটক ও ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। অভিযোগ অবশ্যই অশ্লীলতার।

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ॥

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা বিষয়ে একটি গবেষণা-নিবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী শোভাময় নাথ পুরস্কার পাবেন। এই গবেষণা নিবন্ধ এক হাজার শব্দের মধ্যে লিখতে হবে এবং শুধুমাত্র রবীন্দ্রভারতী ও বিশ্বভারতীর বাংলার স্নাতকোত্তর উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবৃন্দই এতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

যুব উৎসবে কবি সম্মেলন ॥

সম্প্রতি রবীন্দ্র স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব। এই উপলক্ষে গত ৭ জুন দু নম্বর মুক্ত মঞ্চে একটি কবি সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন উৎসব কমিটি। পূর্ব নির্ধারিত সময় মাফিক ঠিক সন্ধ্যা ছটায় সম্মেলন বসে। মঞ্চের উপর ছিল লম্বা ফরাস পাতা। সেখানে ঘন হয়ে বসেছেন কবিরা। একের পর এক সকলে কবিতা পড়লেন। অংশ নিলেন বাংলাদেশের প্রবীণ থেকে তরুণতম প্রায় ৪০ জন কবি। মঞ্চের সামনে গ্যালারিতে বসে অসংখ্য শ্রোতা একমনে শুনলেন কবিদের আবৃত্তি। মাঝে মাঝে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন যে যার প্রিয় কবিকে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমনীশ ঘটক আর উদ্বোধন করেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। এঁরা ছাড়াও কবিতা পড়লেন সর্বশ্রী বিষ্ণু দে, দিনেশ দাস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, চিত্ত ঘোষ, তারাপদ রায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর রায়, দুর্গাদাস সরকার, শুভাশিস গোস্বামী, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সত্য গুহ, ধনঞ্জয় দাস, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন কর, অনন্ত দাস, মৃণাল বসু চৌধুরী, শান্তিকুমার ঘোষ, যুগান্তর চক্রবর্তী, তরুণ সান্যাল ও গণেশ বসু প্রমুখ কবিরা।

বিদেশী সাহিত্য

পুস্তক প্রকাশের সালতামামি ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পশ্চিম জার্মানী প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তারপর দেশবিভাগের ফলে জনসংখ্যাও ভাগাভাগি হয়ে গেল পূর্বে পশ্চিমে প্রায় আধাআধি। তবু মানুষ অপরাজেয়। প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করেই তাকে বেঁচে থাকতে হয়। সূত্রপাত হল নানা-প্রকার কর্মকাণ্ডের। শিল্পে বাণিজ্যে নতুন নতুন সম্ভাবনার দিকে তাকে হাত বাড়াতে হয়। সাংস্কৃতিক জীবনের পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করল পশ্চিম জার্মানী।

পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে সম্প্রতিকালে এই দেশটি বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়েছে। ১৯৬৭ সালে এখানকার প্রকাশকরা পাঁচ হাজার তিনশ একুশটি টাইটেলে মোট এগারো কোটি সাইত্রিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার বই প্রকাশ করেছেন। মাথা-পিছু হিসেবে সাতটি করে নতুন বই।

এই একই বছরে পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন লাইব্রেরীর পাঠক সংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ লক্ষ। তারা বাড়িতে পড়বার জন্য ছ' কোটি বই লাইব্রেরী থেকে নিয়েছেন। এখানকার মোট জনসংখ্যা এক কোটি সত্তর লক্ষ, অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

হার্টক্রেনের কবিতা ॥

মার্কিনী কবিদের মধ্যে হার্টক্রেন জীবনে কবিতা লিখেছেন খুবই কম। তবু ছন্দকৌশলে, আঙ্গিক প্রকরণে ও আধুনিক মননে তাঁর কবিতা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্প্রতি তাঁর কবিতার ওপরে চারটে উল্লেখযোগ্য আলোচনার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই চারটি বইয়ের নাম হলো—(১) দি লিটারারি ম্যানাসক্রিপ্ট অব হার্টক্রেন : কেনেথ এ, লোফ, (২) দি হার্টক্রেন ভয়েজেস : হুনসে ওয়েলকার, (৩) হার্টক্রেন, অ্যান ইনট্রোডাকসন টু পোয়েট্রি : রবার্ট লিবুইটজ, (৪) দি পোয়েট্রি অব হার্টক্রেন, এ ক্রিটিক্যাল স্টাডি : আর, ডবিউ বি, লুই।

আলেকজাণ্ডার মারাকভ ॥

আলেকজাণ্ডার মারাকভ কয়েকমাস আগে মারা গেছেন। সম্প্রতি তাঁর শেষ রচনাবলীর একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। মারাকভ ছিলেন একজন প্রখ্যাত সমালোচক। কবিতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন গভীর অনুরাগী। সাহিত্যের সব চাইতে জটিল এবং সংকটজনক সমস্যাগুলিকে পর্যন্ত তিনি তাঁর স্বচ্ছতর যুক্তিবাদী জীবন-দৃষ্টির প্রভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার শক্তি রাখতেন। তার ভাষা-কৌশলও ছিল অনন্য। তবে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কখনো তিনি নির্দয় ছিলেন না। সোভিয়েত সমালোচকরা তাঁর গভীর পান্ডিত্য ও বিশ্লেষণ-দক্ষতায় বিস্মিত হতেন। তাঁর শেষ রচনাবলীর সংকলনটি 'জেনারেশনস অ্যান্ড ডেস্টিনিস' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

ভিল লিপাটভ ॥

ভিল লিপাটভ ১৯২৭ সালে [illegible] শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় [illegible] হ্রদের নিকটবর্তী তাগুর গ্রামে। ১৯[illegible] সালে তিনি স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তী [illegible] সংবাদিক হিসেবে স্থানীয় একটি [illegible] কাজ করেন।

লিপাটভের প্রথম [illegible] ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৭ [illegible] ছোট উপন্যাস লিখে [illegible] অর্জন করেন। সম্প্রতি তাঁর [illegible] ডিটেকটিভ' নামে একটি উপন[illegible] ও রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়ে[illegible]

পরলোকে জন কোলিয়ার ॥

প্রখ্যাত মার্কিন লেখক ও নৃতাত্ত্বিক জন কোলিয়ার সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চুরাশি বছর। ১৯৩৩ থেকে ৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি আদিবাসী (রেড ইণ্ডিয়ান) বিষয়ক কমিশনার পদে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৩৪ সালে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজটি সম্পন্ন করেন। শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী ও ভূম্যাধিকারীদের দুর্নীতিপরায়ণতার হাত থেকে রেড ইণ্ডিয়ানদের রক্ষার জন্য তিনি কংগ্রেসের মারফৎ 'ইণ্ডিয়ান অরগেনাইজেশন অ্যাক্ট'-কে বিধিবদ্ধ করান। এই প্রয়াসের ফলেই মার্কিন দেশে প্রথম আদিবাসীবিষয়ক হোমরুল আইনের সূত্রপাত হয়।

নতুন বই

বিদ্যাসাগর —(জীবনকথা) — নমিতা চক্রবর্তী। প্রকাশক—জিজ্ঞাসা, কলকাতা—৯; মূল্য—ছয় টাকা মাত্র।

ডঃ নমিতা চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর কয়েকখানি উপন্যাস-গ্রন্থ বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। 'বিদ্যাসাগর' জীবনকথা লেখিকার সাহিত্য-রচনার আরেক দিকের পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। দশটি পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। এছাড়া পরিশিষ্ট অংশে বিদ্যাসাগর জীবনের সংক্ষিপ্ত পঞ্জী সংকলন করেছেন শ্রীবীরেন্দ্র নিয়োগী। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে এভাবৎ অনেকগুলি জীবনকথা প্রকাশিত হয়েছে এবং ইদানীংকালে বিনয় ঘোষ মহাশয় একাধিক খন্ডে 'বিদ্যাসাগর' জীবনী রচনা করেছেন। ডঃ নমিতা চক্রবর্তীর 'বিদ্যাসাগর' কিন্তু স্বতন্ত্র। এই গ্রন্থটির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আমাদের বিস্মিত করেছে। লেখিকা গ্রন্থটি আরম্ভ করেছেন কথাসাহিত্য পরিবেশনের আঙ্গিকে, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি গুরুতর প্রসঙ্গে যখন প্রবেশ করেছেন তখন তাঁর বর্ণনা রীতিও পরিবর্তিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাব কালের বাংলা হতশ্রী। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে ঠাকুরদাসের ঘরে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের পরমুহূর্তে পিতামহ রামজয় পুত্র ঠাকুরদাসকে রসিকতা সুরে বলেছিলেন একটি 'এঁড়ে বাছুর' । স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্র[illegible] লিখেছেন—

"জন্ম সময়ে [illegible] মহদেব পরিহাস করিয়া আমায় এঁ[illegible] বলিয়াছিলেন, জ্যোতিষ-অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম; আর সময় সময় কার্য দ্বারা পূর্বোক্ত লক্ষণ আমার আবির্ভূত হইত।"

[illegible] ঘরের এই মহাপুরুষকে [illegible] বলেছেন—'আমরা কেবল বিদ্যা আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানু[illegible]ইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গম বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য-বীর্য-মহত্ত্বের সহিত ততই আমাদের প্রত্যক্ষ সম্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁর অজেয় পৌরুষ।'

লেখিকা এই অজেয় পৌরুষের বৃত্তান্ত লিখেছেন নতুন তত্ত্ব এবং তথ্য সন্নিবেশে। বিদ্যাসাগরের কেবল-মধুর চরিত্রমহিমা লেখিকার অসামান্য লিপিকুশলতায় হৃদয়-গ্রাহী হয়েছে। যে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বিদ্যাসাগর চরিত রচনা করেছেন, সেই নিষ্ঠা ও অধ্যবসারের সঙ্গে বাংলার অন্যান্য মনীষীদের জীবনী তিনি যদি লেখেন তাহলে একটা প্রশংসনীয় কাজ হবে। গ্রন্থটির ছাপা, বাঁধা এবং প্রচ্ছদ সুরুচি-সঙ্গত।

●

অমৃতভূমি অমরকন্টক—(ভ্রমণ)—মন্মথ রায়। এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম : ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বাঙলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনীর অভাব নেই। দুঃসাহসিক ভ্রমণকারী এবং সুলেখকদের অবদানে সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তবে আগেকার থেকে সাম্প্রতিককালের রচনা তথ্যনির্ভর না হয়ে ঘটনাধর্মী হয়ে পড়ছে। এর ফলে একালের ভ্রমণকাহিনী অনেক রমণীয়। এই ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন শ্রীমন্মথ রায়ের 'অমৃত-ভূমি অমরকন্টক'।

বিন্ধ্যপর্বতমালার চারদিকে অসংখ্য পর্বত। সুদূরব্যাপ্ত অরণ্যের রূপ ভোলবার নয়। প্রস্রবণ আর নদী সমস্ত স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে করেছে নয়নাভিরাম। প্রাচীন ভারতের পবিত্র এই তীর্থভূমিতে বহু সাধক সাধনা করে গেছেন সুদীর্ঘকাল। সাধক কবীর এখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন। মহর্ষি কপিল, ভৃগু, অত্রি, জমদগ্নি, মার্কন্ডেয় ছিলেন এখানকার সাধক। সাহিত্যের মধ্যেও জীবন্ত হয়ে আছে অমরকন্টকের অনুপম সৌন্দর্য।

শ্রীরায় তাঁর গ্রন্থে অমরকন্টকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে যেমন সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন, তেমনি অসংখ্য চরিত্রের ভীড়ে সমস্ত কাহিনীটিই পরম আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যশোমতীবাঈ, শ্যামলাল, রামস্বরূপলাল, রামবাঈ, নোহরলাল, অবোধবিহারী, যোগানন্দ, মাগলুার মহারাজ, বোখারিবাবা, পাহাড়ীবাবা এবং আরো বহু মানুষ সমস্ত গ্রন্থখানিকে করেছে তীব্র গতিময় ও কাহিনীধর্মী।

প্রচ্ছদ পট, অঙ্গসজ্জা এবং মুদ্রণ প্রকাশকের সুরুচির পরিচায়ক।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

অনুক্ত (বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৭৫)—সম্পাদক : সুনীলকুমার নন্দী। ২২, ধনফিল্ড লেন। কলকাতা—১। দাম : ১·৫০ পঃ।

সাহিত্য-পত্রিকা অনুক্ত পুনরায় সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছে। বেশ কিছু-কাল আগে সাহিত্যরসিক পাঠকের কাছে এই পত্রিকাটি সমাদৃত হয়েছিল। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র হরপ্রসাদ মিত্র, সিদ্ধেশ্বর সেন, অমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শুভাশিস গোস্বামী, সুনীলকুমার নন্দী, অমলেন্দু চক্রবর্তী, নিখিলকুমার চৌধুরী এবং আরো অনেকে।

●

নবজাতক (রবীন্দ্র সংখ্যা)—সম্পাদক মৈত্রেয়ী দেবী। ১৩।১, পাম অ্যাভেন্যু। কলকাতা-১৯। দাম ১·৫০ পয়সা।

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি লিখেছেন শংকর মিত্র, গোপাল ভৌমিক, দিলওয়ার, নচিকেতা ভরদ্বাজ, বোম্মানা বিশ্বনাথম কায়সুল হক অসিতকুমার ভট্টাচার্য, আল মাহমুদ, প্রভাকর মাঝি, শামসুল কামাল, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আদুরী রাকিব, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, গিরিন্দ্র-নাথ দাশ, ক্ষিতিমোহন সেন এবং আরো কয়েকজন।

●

অনুভব— সম্পাদক— গৌরাঙ্গ ভৌমিক। ১৯, পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা—২৯। দাম—দু টাকা মাত্র।

'অনুভব' কবিতা ত্রৈমাসিকটির বর্তমান সংখ্যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। অরুণ সেনের প্রবন্ধ 'কবিতা পাঠকের রোজনামচায়' অনেক মূল্যবান ও সাহসিক উক্তি আছে। এই সংখ্যায় কৃষ্ণ ধর, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বিনয় মজুমদার, রাম বসু, শান্তিকুমার ঘোষ, পুস্কর দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রভৃতির কবিতা উল্লেখযোগ্য। লোকনাথ ভট্টাচার্য এবং তরুণ সান্যালের 'কবিতাগুচ্ছ' বিশেষভাবে প্রশংসার দাবী রাখে। জর্জ সেফেরিসের অনেকগুলি কবিতার সুন্দর অনুবাদ করেছেন সুকুমার ঘোষ। 'অনুভবে'র আলোচ্য সংখ্যাটির জন্য সম্পাদক অভিনন্দনযোগ্য।

●

COFFEE HOUSE (June-Aug.)—Editor: Amitava Bose, 133-24, Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta-6. Price Fifty Paise.

সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা কফি হাউসের বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, রাজেন্দ্র দেশমুখ্য, রঞ্জিতরঞ্জন বসু, জীবনানন্দ দাশ, কালীকিংকর সেনগুপ্ত, অমিতাভ বসু এবং আরো কয়েকজন।

সূর্য কাঁদলে সোনা
অথবা তস্য তস্য

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বন্দিনীকে বাঁধন খুলে পার্বত্যভূমির ওপর নামাবার সময় যেটুকু স্পর্শ লেগেছিল, তাতে গানাদো বুঝেছিলেন যে, অচৈতন্য অসাড় হলেও দেহে প্রাণ তখনও আছে। কিন্তু সে-প্রাণ ওষ্ঠসীমায় এসে পৌঁছেছে কিনা, আর কতক্ষণ সেখানেই বা থাকবে, সেইটেই ভাবনার বিষয় হয়েছিল।

অন্ধকার তখন চোখে কিছুটা সয়ে এসেছে। বন্দিনীকে মাটিতে নামাবার পর কিছুদূরেই একটি মৃতদেহ দেখতে পেয়ে অস্বস্তিভরে বন্দিনীকে আবার একটু সরাতে যাচ্ছেন এমন সময় নেভানো মশালটা চোখে পড়েছিল।

সেই রাত্রে হত্যাকাণ্ডের ওই মশান-প্রান্তরে মশাল জ্বালা কোথাও নিরাপদ নয়। তবু সে বিপদের ঝুঁকি গানাদো নিয়েছিলেন শুধু বন্দিনীর অবস্থাটা তাঁর না বুঝলেই নয় বলে।

অনেক কষ্টে মশালটা জ্বালবার পর বিহ্বল এক বিস্ময় ছাড়া আর সব ভাবনাই তাঁর মন থেকে মিলিয়ে গিয়েছিল অবশ্য।

বেশ কয়েকটি মুহূর্ত কেমন একটা অবর্ণনীয় মুগ্ধ বিহ্বলতায় কাটাবার পর তাঁর হুঁস ফিরে এসেছিল।

মূর্ছিতার চোখ মুখের ভাব আর নাড়ির গতি পরীক্ষা করে তিনি তাড়াতাড়ি মশালটা নিভিয়ে দিয়েছিলেন।

যেটুকু তিনি দেখেছেন তাতে বন্দিনী সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হবার কিছু পাননি। সযত্নে উপযুক্ত শুশ্রূষা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করলে এখনও তাকে বাঁচান যেতে পারে।

কিন্তু কোথায় সে ব্যবস্থা করবেন।

কাঞ্চন আর কামিনীলোলুপ লুণ্ঠন, হত্যা আর ধর্ষণের নেশায় উন্মত্ত পিশাচদের দৃষ্টির আড়ালে কোথায় এ স্বপ্নমূর্তিকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব?

বন্দিনীর শুধু রূপ নয়, তার পরিচ্ছদ অলঙ্কারও ওই কয়েক মুহূর্তের আলোয় দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন গানাদো।

এ রাজ্যে আসবার পর প্রায় সব শ্রেণীর নারী-পুরুষই তাঁর চোখে পড়েছে। দরিদ্র-সাধারণ থেকে সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারের বহু সুন্দরী তিনি দেখেছেন। অল্পবিস্তর তাদের বেশভূষাও লক্ষ্য করেছেন।

বন্দিনীর বেশভূষা তাদের থেকে বেশ একটু ভিন্ন।

কাক্সামালকা নগরে শাপভ্রষ্টা সুর-সুন্দরীর মত এ মূর্ত স্বপ্ন কোথায় ছিল লুকোনো? কোথা থেকে পাষণ্ড এসপানিওল সৈনিক তাকে লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল!

ঘটনা বিচার করে গানাদোর মনে হয়েছে নগরে হত্যাতাণ্ডব শুরু হবার পর বন্দিনী বোধহয় কোনো সঙ্গী দলের সাহায্যে নগর থেকে পালাবার জন্যে বার হয়ে পড়েছিল।

তারপর নারীমাংসলোলুপ এসপানিওল সৈনিকের দৃষ্টিতে পড়ে তার এই দশা হয়েছে। তার সঙ্গীরা হয়ত সবাই নিহত। রক্ষা কেউ যদি পেয়েও থাকে তারা এখন পলাতক।

বন্দিনীকে কারুর হাতে সমর্পণ করবার সুতরাং উপায় নেই। তা[illegible]শুষায় সুস্থ করে তোলবার চেষ্টা গানা[illegible]তে হবে।

একটা নির্জন নিরাপদ [illegible] আশ্রয় তার জন্যে অবিলম্বে প্রয়োজন।

ব্যাকুল হয়ে সেরকম [illegible] ভাবতে গিয়ে গানাদোর হঠাৎ [illegible] কার সকালের টহলদারীর [illegible] হয়েছে।

সেইদিন সকালেই কাক্সামালকা [illegible]য়ে যাবার যে উপত্যকার ওপর বসানো, তার [illegible] জানলার দিকের উত্তুঙ্গ পর্বতপ্রাচীর কা[illegible] দুর্ভেদ্য. গানাদো ঘোড়ায় চড়ে তা দে[illegible] বেরিয়েছিলেন।

উপত্যকা ঘেরা পাহাড়গুলোর তলায়-তলায় ঘুরেও ছিলেন বেশ বেলা পর্যন্ত আর তাইজন্যেই আতাহুয়ালপার পিজারোকে দর্শন দিতে আসবার সংকল্প আর পিজারোর তারই ওপর পৈশাচিক আয়োজনের কথা আগে থাকতে জানতে পারেননি। এসপানিওল শিবিরের ভেতর থেকে নয়, বাইরের পুরবাসী দর্শকদের মধ্যে থেকে এসপানিওলদের হাতে ইংকা নরেশের বন্দিত্বের অবিশ্বাস্য করুণ কুৎসিত নাটকটা তাঁকে দেখতে হয়েছিল নিরুপায়ভাবে।

সারা সকালের টহলদারীতে গানাদো কাক্সামালকার পর্বতপ্রাচীরে গোপন কোনো গিরিবর্ত্ম অবশ্য পাননি, কিন্তু এমন একটা কিছু দেখেছিলেন যা সেই মুহূর্তে তাঁর কাছে ভাগ্যের আশাতীত দান বলে মনে হয়।

উপত্যকার বেষ্টনীস্বরূপ একেবারে অলংঘ্য পাহাড়ের নানা খাঁজ গোপনপথের খোঁজে পরীক্ষা করতে করতে গানাদো এক জায়গায় একটি গুহা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। গুহাটি পাহাড়ের খাঁজের আড়ালে এমনভাবে লুকানো যে, গুপ্তপথ জানা না থাকলে অত্যন্ত কাছে দিয়ে যাতায়াত করলেও তার হদিস পাওয়া যায় না।

গানাদো গুহাটির সন্ধান যে পেয়েছিলেন, তাও নেহাৎ দৈবাৎ।

কিংবা তাঁর নিয়তিই ভাবী সম্ভাবনার কথা স্মরণে রেখে তাঁকে এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের সুযোগ দিয়েছিল বলতে ইচ্ছে করে।

গুহাটার কথা মনে হওয়ার পর গানাদো আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেননি। বন্দিনীকে ঘোড়ার পিঠে তুলে তৎক্ষণাৎ রওনা হয়েছিলেন সেই গোপন গুহার সন্ধানে।

কিন্তু দিনের আলোতেই যে গোপন গুহার প্রবেশপথ খুঁজে পাওয়া কঠিন, রাতের অন্ধকারে তা চিনে বার করবার আশাই বাতুলতা।

ঘোড়া চালিয়ে পর্বতপ্রাচীরের কাছে পৌঁছে কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টার পরই গানাদো নিরস্ত হয়েছিলেন।

দিনের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় তাঁর নেই।

একটি ঝরণা-ধারার ধারে নামিয়ে কিছুটা নরম বালুর রেখে গানাদো ঘোড়াটাকে ড়ে মেরে ছেড়ে দিয়েছেন। মাত্র ঘোড়াটা নিজে থেকেই ...রের দিকে চলে গেছে।

ড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত গানোদা। জায়গাটা বেশ নির্জন ও ...। রাতের অন্ধকারে কারুর এদিকে আসার সম্ভাবনা অল্প। এলেও সহজে কেউ সন্ধান পাবে না। ঘোড়াটা সঙ্গে থাকলে তার আকস্মিক ডাক বা পায়ের শব্দে ধরা পড়ার যেটুকু ভয় ছিল, তাও এখন নেই। নিঃশব্দে এখন শুধু রাত ভোর হবার জন্যে অপেক্ষা করে থাকাই আসল কাজ। আলো ফুটলে গোপন গুহাপথ খুঁজে বার করা খুব কঠিন হবে না বলেই মনে হয়। খুঁজে বার করার অসুবিধা বুঝেই গানাদো আশপাশের পাহাড়ের কিছু বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন মনে করে রেখেছিলেন। দিনের আলোয় দেখলেই সেগুলি চিনতে পারবেন এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না।

দিনের আলোর জন্যে অপেক্ষা করা কিন্তু সে রাত্রে এক দুঃসহ ধৈর্যের পরীক্ষা বলে মনে হয়েছিল।

মূর্ছিতা বন্দিনীকে বালির ওপর শোয়াবার পরে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে প্রথমে ঝরনার জল মুখে চোখে ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন গানাদো।

জ্ঞান তাতে ফেরেনি। মেয়েটির গলায় একটা অস্ফুট আতংকের গোঙানিই শুধু শোনা গিয়েছিল।

গানাদো মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া বন্ধ করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল নিদারুণ আতংকে মেয়েটির চেতনা অসাড় হয়ে গিয়ে একটা গাঢ় আচ্ছন্নতার মধ্যে সে ডুবে আছে। এ আচ্ছন্নতাই তার একরকম শুশ্রূষা। হঠাৎ তা ভাঙাতে গেলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হওয়া অসম্ভব নয়। চেতনার সূক্ষ্ম স্তরে সচকিত আঘাতে হয়ত স্থায়ী ক্ষতিই করতে পারে।

বন্দিনীকে তাই সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম করতে দিয়ে গানাদো নীরব অতন্দ্র পাহারায় দাঁড়িয়ে থেকেছেন।

ধীরে ধীরে তাবনতিনসুইয়ু-র দেবাদিদেবের প্রথম সুবর্ণকিরণ স্পর্শ করেছে কাক্সামালকার গিরি-প্রাকার চূড়া।

সে সোনালী ঈষৎ রক্তিম আলো তারপর ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের কোলে কোলে।

গানাদো সবিস্ময়ে ঝরনার ধারে বালির শয্যায় শোয়ানো বন্দিনীর দিকে চেয়েছেন।

না, দিনের আলোয় অপ্সরা-অস্ফুট স্বপ্ন-কায়ার মত সে মূর্তি শূন্যে মিলিয়ে যায়নি। কিন্তু তখনও এক অপার্থিব লাবণ্যের আভায় তাকে যেন মণ্ডিত মনে হয়েছে। সূর্যালোকের স্পষ্টতাতেও সে তার রহস্যমায়া হারায়নি।

সেই মুখের দিকে অনিমেষে চেয়ে থাকতে থাকতে গানাদো গাঢ় নীল জলে পদ্মকোরকের মত দুটি চোখ উন্মীলিত হতে দেখেছেন।

বন্দিনী প্রথমে বিস্মিত বিহ্বলভাবে একবার তার পরিবেশ আর একবার গানাদোর দিকে চেয়েছে।

তারপর তার মুখ অকস্মাৎ পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে আতংকে। সর্পাহতের মত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসে শংকিত অস্ফুট চিৎকারে কি যেন বলে সে ছুটে পালাবার চেষ্টা করেছে।

সাধ্যে কিন্তু তার কুলোয়নি। দাঁড়িয়ে উঠে এক-পা যেতে না যেতে সে টলে পড়ে গেছে। তারপর অনিবার্যভাবে এগিয়ে আসা অজগরের সামনে পাখা-ভাঙা পাখির মত দৃষ্টিতে গানাদোর দিকে চেয়ে আবার আকুল আর্তনাদে যা বলেছে গানাদো তার কিছুই বুঝতে পারেননি।

এ রাজ্যের ভাষার সঙ্গে গানোদা নিজের চেষ্টায় ভালোভাবেই পরিচিত। কিন্তু এই মেয়েটির অপরূপ অপার্থিব কণ্ঠে যে ভাষা শোনা গেছে, তা তাঁর সম্পূর্ণ অজানা। তার কণ্ঠের মত সে ভাষাও যেন অপার্থিব।

গানাদো তাঁর বিচক্ষণতার দরুন একটি ভুল এড়াতে পেরেছেন। এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে ধরবার চেষ্টা দূরে থাক, একটা হাত নেড়েও তাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা তিনি করেননি।

যেখানে ছিলেন, সেখানেই নিথর নিস্পন্দ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর যা জানা সেই কুইচুয়া ভাষায় শান্তস্বরে মেয়েটিকে অস্থির আতঙ্কবিহ্বল না হতে অনুরোধ করেছেন। বলেছেন যে, অবুঝ অস্থির হলে তার বিপদ বাড়বে বই কমবে না। তিনি যে মেয়েটির শত্রু নন, এ কথা তার পক্ষে বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব তিনি জানেন। যারা তার—মেয়েটির—আপনার জনের ওপর পৈশাচিক নির্মমতা দেখিয়েছে, তার চরম সর্বনাশের চেষ্টা যারা করেছিল, তাঁর নিজের অঙ্গে তাদেরই দলের পোষাক। তিনি তাদের দলেরও বটে। তবু দলের মধ্যে সবাই এরকম হয় না। তাঁকে মেয়েটি কখনই বিশ্বাস করবে এমন আশা তিনি করেন না, শুধু চান যে, সে যেন তাঁকে পরীক্ষা করে দেখে নিতে দ্বিধা না করে।

মেয়েটি কুইচুয়া ভাষায় তাঁর কথা বুঝেছে কিনা গানাদোর পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাঁর শান্ত গলার স্বরে ও বলার ধরনে কিছু বোধহয় হয়েছে। মেয়েটির মুখের আতংক-পাণ্ডুরতা কেটে গেছে অনেকখানি।

কাছে যাওয়ার বদলে আরো একটু দূরে

সরে গিয়ে ঝরনার ধারে একটি পাথরের ওপর বসে এবার গানাদো সংক্ষেপে গত রাত্রের ঘটনার কথা বলেছেন। কিভাবে তার আর্ত আবেদন শুনে পাষণ্ড এসপানিওলের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করেছেন তারও আভাস দিয়েছেন একটু।

মেয়েটি কুইচুয়া ভাষা জানে কিনা তখনও বুঝতে পারেননি গানাদো, তার মুখে শঙ্কা-বিহ্বলতার জায়গায় যে বিমূঢ় কৌতূহলের আভাসটুকু এবার ফুটে উঠেছে তাতে গানাদোর কথা তার একেবারে অবোধ্য হয়নি এইটুকু শুধু মনে হয়েছে।

বেলা বাড়ছে। এ পার্বত্য অঞ্চল সাধারণত নির্জন ও নিরাপদ, তবু নগরের বর্তমান অবস্থায় নিশ্চিন্ত নির্ভয় হয়ে কোনো জায়গাতেই থাকা যায় না।

গানাদো তাই একটু ব্যস্ত হয়েই মেয়েটিকে গোপন গুহাশ্রয়ের কথা বলেছেন। জানিয়েছেন যে, সে গুহা তিনি মেয়েটিকে দেখিয়ে দেবেন শুধু, সেখানে তাকে অনুসরণ করবেন না। সারারাত বাইরে থেকে তাকে পাহারা দেবেন আর যতদিন না এ-শত্রুপুরী থেকে তাকে মুক্ত করতে পারেন, ততদিন এই গোপন আশ্রয়ে যথাসাধ্য স্বাচ্ছন্দ্যে তাকে রাখবার চেষ্টা করবেন।

হঠাৎ চমকে উঠে নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারেননি গানাদো।

মেয়েটি ভাঙা-ভাঙা কুইচুয়াতেই তাঁকে বলছে,—তুমি কি উদয়-সমুদ্রতীরের মানুষ?

(ক্রমশঃ)

দেশেবিদেশে

আততায়ী আবার হানা দিয়েছে

...র সিটি কলেজের ছাত্রদের ...দিতে বলেছিলেন আর্থার ...বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এবং ...জন কেনেডির অন্যতম ...: "এই গ্রহের মধ্যে আমেরিকানরা ...বচেয়ে ভয়াবহ লোক।"

...ন যখন ঐ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন খব... এসেছিল জন কেনেডির ছোট ভাই সেনেটর এবং আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদের ডেমোক্র্যাট দলের মনোনয়ন প্রার্থী রবার্ট এফ কেনেডি লস এঞ্জেলেসে আততায়ীর গুলীতে গুরুতর আহত হয়েছেন।

অধ্যাপক শ্লেসিঞ্জার বলছিলেন : "তিন বছর ধরে আমরা পৃথিবীর অপর প্রান্তে মানুষকে ধ্বংস করে চলেছি। আমরা ইতিমধ্যেই এমন দুজন ব্যক্তিকে হত্যা করেছি যাঁরা বিদেশের কাছে মার্কিন আদর্শবাদের প্রতীক ছিলেন। এবং গতকাল আমরা তৃতীয় একজনকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলাম।"

ঐ বক্তৃতার পরের দিন সেই তৃতীয় ব্যক্তিটিও মারা যান।

১৯৬৩ সালের নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট কেনেডি আততায়ীর গুলীতে নিহত হন। তারপর মাস দুয়েক আগে নিহত হন মহান নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার কিং। তারপর এখন নিহত হলেন ৪২ বছরের তাজা যুবক রবার্ট কেনেডি। সাড়ে চার বছরের মধ্যে এই তিন তিনটি রাজনৈতিক হত্যা মোটেই স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এর মধ্যে দিয়ে এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, আজকের মার্কিন সমাজে এক উগ্র অসহিষ্ণুতা বিপুলভাবে দানা বাঁধছে।

৫ জুন যেদিন রবার্ট কেনেডি গুলী-বিদ্ধ হন সেইদিনই তিনি গুরুত্বপূর্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া প্রাইমারি নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন। ক্যালিফোর্ণিয়া এবং সেই সঙ্গে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিউবার্ট হামফ্রির স্ব-রাজ্য সাউথ ডেকোটায় মিঃ কেনেডির জয়লাভ তাঁর ডেমোক্র্যাটিক দলের মনোনয়ন পাবার সম্ভাবনা মোটামুটি সুনিশ্চিত করেছিল। ক্যালিফোর্ণিয়ার ঐ বিপুল জয়ের পর তাঁর সমর্থকদের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল লস এঞ্জেলেসের অ্যামবাস্যাডর হোটেলের বলরুমে। ঐ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা শেষ করার পর ভীড় এড়াবার জন্যে তাঁকে যখন বলরুমের বাইরে রান্নাঘরের বারান্দা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ঠিক তখনই আততায়ী পরপর পাঁচবার গুলী করে। সে বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। দুটি গুলী মিঃ কেনেডিকে আহত করেছিল। একটি মাথার খুলিতে সামান্য আঘাত করে, কিন্তু অন্যটি ডান কানের নীচ দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে।

মিঃ কেনেডি সঙ্গে সঙ্গে মেঝেয় পড়ে যান। তাঁর ঘাড় বেয়ে দরদর করে রক্ত

পড়েছিল। তাড়াতাড়ি কয়েকটা টেবিল ক্লথ এনে ক্ষতস্থানে চাপা দিয়ে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। একজন ডাক্তার প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। তারপর মিঃ কেনেডিকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় ইমার্জেন্সী সেন্ট্রাল রিসিভিং স্টেশনে। সেখান থেকে গুড সামারিটান হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা অপারেশনের পর দুজন সার্জনের একটি দল তাঁর মস্তিষ্ক থেকে বুলেটের একটি ছাড়া আর সবগুলি টুকরোই বার করে আনেন। ঐ একটি টুকরোকে আর কিছুতেই বার করা যায় নি। ডাক্তাররা বলেন, মিঃ কেনেডির বাঁচবার আশা ৫০-৫০।

কিন্তু ডাক্তারদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আহত হবার প্রায় ২৫ ঘণ্টা পর ৬ জুন স্থানীয় সময় ভোর ১-৪৪ মিনিটে (ভারতীয় সময় বেলা ২-১৪ মিঃ) সেনেটার কেনেডি মারা যান। মৃত্যুর সময় তাঁর স্ত্রী এথেল (যিনি আগামী নভেম্বরে তার একাদশ সন্তানের আশা করছেন), ছোট ভাই এডোয়ার্ড, প্রেসিডেন্ট কেনেডির স্ত্রী জ্যাকেলিন এবং পরিবারের অন্যান্য লোকেরা তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলেন।

এদিকে গুলী করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আততায়ী তাঁর রিভলভার সমেত ধরা পড়ে যায়। লস এঞ্জেলেসের একজন নিগ্রো ফুটবল খেলোয়াড়, রোজি গ্রীয়ার, যিনি মিঃ কেনেডির সঙ্গে ছিলেন, আততায়ীকে চেপে ধরেন। তাঁকে সাহায্য করেন অপর একজন নিগ্রো খেলোয়াড়, প্রাক্তন অলিম্পিক ডেকাথ-লন চাম্পিয়ান রেফার জনসন।

আততায়ীর গায়ের রং একটু ময়লা। বছর চব্বিশ বয়েস। পরে তাকে সারহান বিশারা সারহান এই নামে সনাক্ত করা হয়। জানা যায় সে জর্ডনের লোক। সে কিছুকাল জেরুসালেমে ছিল এবং গত প্রায় দশ বছর ধরে স্থায়ী ভিসা নিয়ে ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যের পাসাডেনাতে তার ভাইয়ের সঙ্গে বাস করত। লস এঞ্জেলেসের মেয়র জানিয়েছেন তার ভাই-ই তাকে সনাক্ত করতে পুলিশকে সাহায্য করেছে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, তাকে যখন জাপটে ধরা হয় তখন সারহান চিৎকার করে বলছিল : "আমি আমার দেশের জন্যেই এই কাজ করেছি।"

পরে পুলিশ জানায় সারহানের বাড়ীতে হানা দিয়ে তারা একটি ডায়েরী উদ্ধার করেছে। তাতে কয়েক জায়গায় সেনেটার রবার্ট কেনেডির নামের উল্লেখ আছে এবং এক জায়গায় লেখা আছে ৫ জুনের আগেই মিঃ কেনেডিকে খতম করতে হবে।

৫ জুন হচ্ছে গত বছরের আরব-ইস্রায়েলী যুদ্ধের প্রথম বার্ষিকী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্ণী-জেনারেল মিঃ র‍্যামসে ক্লার্ক ঘোষণা করেছেন, এই হত্যাকাণ্ড সারহানের একলারই কাজ, এর পেছনে কোন ষড়যন্ত্র নেই। যদিও পুলিশ একটি মেয়ের সন্ধান করছে যে নাকি সেনেটার কেনেডির গুলীবিদ্ধ হবার পর হোটেলের লাউঞ্জ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে বলছিল : "আমরা কেনেডিকে গুলী করেছি।"
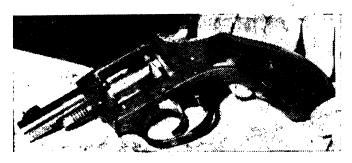
এই ২২ ক্যালিবারের রিভলবার দিয়ে সেনেটর রবার্ট কেনেডিকে গুলী করা হয়। জর্ডান থেকে আগত উদ্বাস্তু সারহান বিশারা সারহান সেনেটারের দেহে ৯টির মধ্যে ৮টি বুলেট বিদ্ধ করে।

রবার্ট কেনেডির হত্যা বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করেছে। ১৯৬৩ সালে জন কেনেডি নিহত হবার সাড়ে চার বছরের মধ্যে রবার্ট-কেও তাঁর প্রাণ দিতে হল এটা সকলের কাছে শুধু একটি পারিবারিক ট্র্যাজিডি বলে মনে হয় নি, একটি বিরাট রাজনৈতিক প্রশ্ন রূপে দেখা দিয়েছে। রবার্ট তাঁর দাদার অনেক গুণ পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়, সর্বদা কর্মচঞ্চল। তাঁর মন ছিল উদার। নিগ্রো অধিকারের জন্যে প্রেসিডেন্ট কেনেডির মতো তিনিও তাঁর সাধ্যমতো প্রয়াস চালিয়েছিলেন। ভিয়েৎ-নামের যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর মতামত ছিল অত্যন্ত তীব্র। তিনি বলেছিলেন, তিনি প্রেসিডেন্ট হলে মার্কিন ছেলেদের ভিয়েৎনাম থেকে ফিরিয়ে আনবেন। দেশের দরিদ্রদের জন্যে তাঁর চিন্তা ছিল অশেষ এবং এদের অবস্থার উন্নতির জন্যে একটা পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে দুই ভাইয়ের এই মিল খুবই লক্ষণীয় এবং এটাও কিছু কম লক্ষণীয় নয় যে, দুই ভাইকেই তাঁদের উদার ও প্রগতিশীল মতবাদের জন্যে উগ্র দক্ষিণপন্থী অসহিষ্ণু-তার শিকার হতে হল। এই সঙ্গে যদি আমরা ডাঃ মার্টিন লুথার কিংয়ের হত্যার কথা মনে রাখি তাহলে দেখতে পাবো মার্কিন সমাজে ও রাজনীতিতে উগ্র দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলতা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে।

প্রেসিডেন্ট জনসন এই হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করে বলেছেন : "আমাদের দেশে বে-আইনী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের বহর দেখে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সেনেটার কেনেডির হত্যা ঐ হিংসারই সর্বশেষ নির্মম দৃষ্টান্ত।"

মার্কিনবাসীদের প্রতি রেডিও-টেলিভিসন বক্তৃতায় তিনি এই আহ্বান জানান : "ঈশ্বরের দোহাই, আপনারা আইনের মধ্যে থাকবার সংকল্প নিন।"

প্রেসিডেন্ট জনসন এই কথার দ্বারা এমন একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন যা ক্রমবর্ধমান দক্ষিণপন্থী অসহিষ্ণুতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তা হচ্ছে মার্কিন মুলুকে আগ্নেয়াস্ত্রের অবাধ কারবার। আমেরিকাই আজকের পৃথিবীতে একমাত্র দেশ যেখানে শটগান থেকে আরম্ভ করে বাজুকা, মর্টার পর্যন্ত সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র দোকানের কাউন্টারে পয়সা দিয়ে চকোলেট-বিস্কুট কেনার মতো সহজে কিনতে পারা যায়। এমনকি ঘরে বসে ডাকযোগেও পাওয়া যেতে পারে। তার জন্যে কোন লাইসেন্সের দরকার হয় না। কোন সরকারী বাধা-নিষেধ নেই। যে যত খুশি অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে।

অস্ত্রের এই সহজলভ্যতা আজকে আমেরিকায় একটা হিংসার আবহাওয়া গড়ে তুলেছে। গত বছর সেখানে ৫,৬০০ লোক গুলীর আঘাতে নিহত হয়েছিল। কত লোক যে আহত হয় তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু হতাহতের এই ব্যা[illegible]র চাইতেও যেটা বেশি আশঙ্কার কথা [illegible]তে [illegible]ল এর ফলে মার্কিন সমাজে এ[illegible] বেপরোয়া মানসিকতার সৃষ্টি হচ্ছে। [illegible] সঙ্গে [illegible]পন্থী সংস্থাগুলি, যেগুলি বেশ কিছু[illegible] মার্কিন রাজনীতিতে আনাগোনা [illegible] বেড়াচ্ছে যে এই বেপরোয়া [illegible] সুযোগ প্রথম গ্রহণ করবে তা বলা [illegible] তিন তিনটি রাজনৈতিক হত্যাকা[illegible] প্রমাণ করছে।

এইদিকে লক্ষ্য রেখেই প্রেসিডে[illegible] জনসন অস্ত্রশস্ত্রের এই অবাধ কার[illegible]য়ে যাবার নিয়ন্ত্রণের জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। [illegible] জানবার মর্মে একটি বিল সরকারের সামনে রয়েছে [illegible] সেনেটে বিলটি আগেই গৃহীত হয়েছিল। রবার্ট কেনেডির হত্যার পর এখন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসেও সেটা গৃহীত হয়েছে। এর দ্বারা এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে চিঠি লিখে অস্ত্র কেনা নিষিদ্ধ হল। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই মার্কিন সমাজে যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ছড়িয়ে রয়েছে তার হিসাব নিলে চোখ বিস্ফারিত হবে। প্রেসিডেন্ট জনসন যদি আমেরিকায় আইনের শাসন সত্যিই ফিরিয়ে আনতে চান তাহলে তাঁকে ঐ বিপুল বেসরকারী অস্ত্র ভাণ্ডারে হাত দিতে হবে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

গমের বাজারে ছড়াছড়ি

ভারতবর্ষের কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্তাদের মুখে হাসি ফুটেছে। মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম চণ্ডীগড়ে বলেছেন যে, ফলন এবার যে রকম ভাল হয়েছে তাতে খাদ্যশস্যের চলাচলের উপর থেকে বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া যেতে পারে। প্রতিমন্ত্রী শ্রীএম এস গুরুপদস্বামী কোইম্বাটোরে বলেছেন, এই বছর দেশের ফসলের পরিস্থিতি বেশ ভাল। এই বছর ফলনের পরিমাণ ১০ কোটি মেট্রিক টনে এসে পৌঁছবে, এই আশা প্রকাশ করে তিনি বলেছেন যে, অগ্রগতির এই হার বজায় থাকলে ১৯৭২ সালে ১২॥ কোটি মেট্রিক টন উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছান যাবে।

মন্ত্রীদের মুখের এই হাসির কারণ হচ্ছে, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের মণ্ডিগুলোতে অজস্র পরিমাণ গম আসছে। উত্তর ভারতের চাষীদের মধ্যে মেক্সিকো গমের বীজ এবার খুব জনপ্রিয় হয়েছে। এই অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহার করেই এবার এই সুফল পাওয়া গেছে বলে প্রকাশ। উত্তর প্রদেশের হাপুর বাজারের যে খবর বেরিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, গত বছর যেখানে এই বাজারে দৈনিক ৫০০ কুই[illegible] বিক্রীর জন্য এসেছে সেখানে [illegible] দিনে তিন-চার হাজার কুইন্টল [illegible]ক্রীর জন্য আসছে। উত্তর [illegible]দপত্রগুলিতে চাষীদের এইসব [illegible]রের গাড়ী বোঝাই করে গম নিয়ে [illegible]বরেছে।

[illegible]এই উজ্জ্বল চিত্রের অন্য দিকও [illegible]র ভারতের এইসব পাইকারী [illegible]থেকে যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে [illegible] বোঝা যাচ্ছে, দেশের সরকার এই [illegible]লনের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত [illegible] চাষীদের এত পরিশ্রম, সেচ, সার, [illegible] বীজ ইত্যাদির সরকারী পরিকল্পনার পর যে ফসল হয়েছে সেটা চাষীদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। তার ফলে সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ীরা চাষীদের সরকার-নির্দিষ্ট মূল্যের চেয়ে কম দামে ফসল বিক্রী করে যেতে বাধ্য করছেন।

উত্তর প্রদেশ সরকার খুব সম্প্রতি ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়াকে ঐ রাজ্যের মণ্ডিগুলিতে প্রবেশ করে সরকারী দামে গম কেনার অনুমতি দিয়েছেন। এই সরকারী দাম হচ্ছে কুইন্টল প্রতি ৭৬ টাকা। অথচ সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যাচ্ছে, অনেকেই তার চেয়ে কম দামে নিজেদের উৎপন্ন ফসল ব্যবসাদারদের ঘরে তুলে দিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। একজন চাষীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, কেন তিনি কুইন্টল পিছু ৫৮-৭৫ টাকা দরে গম বিক্রী করলেন, তখন তিনি জবাব দিলেন, "মড়া কি কখনও ঘরে ফিরে যায় শুনেছেন? ফসল বেচতে এনে সে ফসল ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কি লাভ?"

চাষীদের এইভাবে ঠকাবার ব্যাপারে সরকারী লোকদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের যোগসাজস আছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। উত্তর প্রদেশের মণ্ডিগুলিতে স্পষ্ট করে দেখান নেই, কোথায় গেলে সরকারী দামে ফসল বিক্রী করা যেতে পারে। এমন কি সরকারী দাম কত সেটাও স্পষ্ট করে বলা নেই। আর একটি অভিযোগ এই যে, সরকারী এজেন্টদের কাছে বিক্রী করেও চাষীরা সব সময় পুরো দাম পাচ্ছেন না। গমের দানা যদি ভাঙা থাকে তাহলে কি পরিমাণ ভাঙা দানা আছে তার অনুপাত অনুসারে সরকারী মূল্য কমে যায়। সরকারী এজেন্টরা সেই সুযোগ নিয়ে ভাল গমের জন্যও চাষীদের কম দাম দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এজেন্টদের অনেকের বক্তব্য, সরকারী গুদামে মাল তুলে দিলে গুদামের কর্তারা যে কি দাম ধরবেন তার কোন স্থিরতা নেই; সেই কারণে তাঁরা কোন ঝুঁকি না নিয়ে চাষীদের ন্যূনতম দামই দিচ্ছেন।

আর একটি গুরুতর ত্রুটি হল এই যে, সরকার এবারকার এই প্রাচুর্যের ফসল ধরে রাখার মত গুদামের যথেষ্ট ব্যবস্থা করেন নি। মণ্ডিগুলিতে গম স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে; কিন্তু সেটা ধরে রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া করেন নি।

আর একটি অসুবিধা পরিবহন ব্যবস্থায়। সরকারী গুদামের সামনে গমের ট্রাকের ভীড় জমে যায়। এক একটি ট্রাকের মাল খালাস করে বেরোতে ১২ ঘণ্টা থেকে ৩৬ ঘণ্টা সময় লাগে। ট্রাক-ওয়ালারা বলছেন, তাঁরা যে ভাড়া পান তাতে এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা পোষায় না। সেকারণে মণ্ডিগুলি থেকে ফসল নিয়ে সরকারী গুদামে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ট্রাক পাওয়া যাচ্ছে না। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার বাজারগুলিতে প্রতিদিন ৩০ থেকে ৩২ হাজার মেট্রিক টন গম আসছে। অথচ সরকারী এজেন্টদের দৈনিক ১৩।১৪ হাজার মেট্রিক টনের বেশী গম তোলার ক্ষমতা নেই। হরিয়ানা থেকে আগত গম-বোঝাই ট্রেন দিল্লীর রেলওয়ে সাইডিং-এ পড়ে আছে। ঠিকাদার বলছেন, মজুরের অভাবে তাঁরা ট্রেনগুলি খালাস করতে পারছেন না।

অথচ, কেন্দ্রীয় সরকার এবার অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে আগে থেকে বলেছিলেন, তাঁরা ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করবেন। খাদ্যশস্য কেনবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়াকে ১৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। অথচ কর্মক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা যেন হাওয়ায় গিঁট বাঁধছেন। গুদামের ব্যবস্থা করা হয় নি, গুদামে ফসল পৌঁছবার ব্যবস্থা করা হয় নি, এমন কি সরকার ন্যায্যমূল্যে তাঁদের ফসল কিনে নেওয়ার আয়োজন করেছেন, এই খবরটাও চাষীদের কাছে পৌঁছয় নি।

এই অবস্থা চলতে থাকলে শুধু যে সরকারী খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ারই সম্ভাবনা তা নয়। এর চেয়েও যেটা বড় বিপদের কথা সেটা হল এই যে, যেসব চাষী এবার সরকারী প্রচারে বিশ্বাস করে ভাল ফসল ফলিয়েছেন তাঁরা যদি সঙ্গত দাম না পেয়ে নিরুৎসাহ হয়ে যান তাহলে অধিক ফসল ফলাবার আশা তিরোহিত হয়ে যেতে পারে। প্রকৃত পক্ষে, দিল্লীর একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, একজন চাষী কম দামে তাঁর ফসল বেচতে বাধ্য হয়ে বলেছেন পরের বার তিনি গম চাষ না করে আখের চাষ করবেন; কেননা, আখেই সোনা ফলছে, গমে পয়সা নেই।

ফসল সংগ্রহে সরকারের এই ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসায়ীমহলে আবার নূতন করে দাবী উঠেছে, খাদ্যশস্যের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হোক এবং খাদ্যশস্যের ব্যবস্থায় বেসরকারী ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। ইতিমধ্যে, দিল্লীতে গমের রেশন তুলে দেওয়া হয়েছে; কারণ, সেখানে খোলাবাজারে গমের দাম রেশন দোকানের দামের চেয়ে কমে গেছে।

শ্রীজগজীবন রাম চণ্ডীগড়ে যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা ব্যবসায়ীদের এই বিনিয়ন্ত্রণের দাবীর দিক থেকেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সাত-পাহাড়ের শহর রোমের একটির নাম ভ্যাটিকান, টাইবার নদীর বাঁ-ধারে ১৪৪ একর জমির উপর ছোট্ট এই শহর। মাত্র বিশ হাজার নাগরিক তবু এটি এক সাম্রাজ্য। ভাতিকানের নিজস্ব রেলওয়ে, রেডিও, টেলিভিশন স্টেশন আছে। আছে নিজের বিচারালয়, জেলখানা, হাসপাতাল। আর্ট গ্যালারি-মিউজিয়ম। এখানে জিনিষ সস্তা। ভাতিকানে কোন সরকারী ট্যাক্স নেই—নাগরিকরা ভাগ্যবান। এ রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—রাজর্ষি পোপ পল। সমস্ত খৃীস্টান জগতের ধর্মগুরু।

মণি রায়

পিয়েতা

আপনি যখন ভাতিকানের সেণ্ট পিটার স্কোয়ারে (ইতালীয় ভাষায়—পীয়াজা সান-পিয়েত্রো) গিয়ে দাঁড়াবেন—আপনি বিস্মিত হবেন—এর আকৃতি দেখে নয়—বিপুল জন-সমাবেশ দেখেও নয়, বিস্মিত হবেন—বিপুলা পৃথিবীর দূরে দিগন্ত থেকে ছুটে আসা বহু বিচিত্র মানব সমাজের প্রতিভূদের দেখে। পৃথিবীর যেখানে যত রকম মানুষ—সাদা-কালো-শ্যাম-পীত—যত রকম পোষাক—ছেলে-জোয়ান-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষ, সদ্যো-জাত শিশু ব্যাপটাইজেসনের জন্য, মৃত্যু-পথযাত্রী শেষ তীর্থরেণু মাথায় স্পর্শ করার জন্য মিলিত হয়েছে এই মহাতীর্থে।

শিল্পী স্থপতিবিদ বেণিনী সৃষ্ট চন্দ্রাকৃতি বিরাট অঙ্গনের শত শত খিলানের উপর সুন্দর একসার দালান। মাঝখানে এক প্রাচীন মিশরীয় শিলালিপিখচিত পাথর—আঙ্গিনার এক প্রান্তে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খৃষ্ট মন্দির—সেন্ট পিটার বেজিলিকা বা চার্চ। শুধু উচ্চতা নয়, আকৃতিতে নয়—ঐতিহ্যে এবং শিল্পসম্পদেও মহাশিল্পী মিকালেঞ্জালোর পরিকল্পিত সেণ্ট পিটার পৃথিবীর মহত্তম চার্চ।

হাজার মানুষের ভীড় ঠেলে বড় বড় সিঁড়ি পার হয়ে যীশুর দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম সাধু পিটার-এর দেহাবশেষের উপর নির্মিত বিস্ময়কর এই শিল্পসৌধের দিকে তাকিয়ে আপনার মনে হবে প্যালেস্টাইনের সেই সরল সাধারণ জেলের কথা। এক আশ্চর্য মানুষের সংস্পর্শে এসে যার জীবন-ধারা বদলে গেল। মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই দূর প্রবাসে খৃষ্ট-বিদ্বেষী রোমানদের অত্যাচারে শৃঙ্খল জর্জরিত হয়ে ক্রুশে প্রাণত্যাগ করল। ইতিহাস বলে—সেণ্ট পিটার বলেছিলেন ঈশ্বর পুত্রের মত মৃত্যুর মহান অধিকার তাঁর নেই। অনুরোধ, তাঁকে যেন উল্টো করে মাটির দিকে মাথা রেখে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, তাই হয়েছিল।

এখানকার মাটি বহু আদি খৃষ্টানের রক্তে পবিত্র। খৃষ্টভক্তরা এখানেই পিটারের কবর-স্থানের উপর প্রথম সমাধিমন্দির রচনা করেন। ৩২৬ খৃঃ-এ সেই মন্দির ভেঙে এক বেজিলিকা রচনা করেন সম্রাট কনস্টেনটিন দি গ্রেট। তাও কালক্রমে জরাজীর্ণ হল। ১৪৫২ খৃঃ-এ পোপ পঞ্চম নিকোলাস এর সংস্কার শুরু করেন। তার-পর বহু শিল্পী এবং স্থপতিবিদ—যেমন বার্ণাডো, রোসেলিনো র‍্যাফেল, বাজস্যার পেরুজি, আন্তোনিও দা স্যাঙ্গালো প্রভৃতির হাতে এর নানা বিবর্তন হতে হতে অবশেষে ১৫৪৬ খৃঃ-এ মিকালেঞ্জালোর উপর এই দায়িত্ব চাপল। তিনি গ্রীক ক্রশের উপর বিরাট এক গম্বুজের পরিকল্পনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ল্যাটিন ক্রশ ও গম্বুজে পরিণত হয়ে ১৬২৬ খৃঃ-এ এই উপাসনা-মন্দির খৃষ্টান জগতের এক শ্রেষ্ঠ তীর্থ হয়ে দাঁড়াল। আর চিত্র-স্থপতি-ভাস্কর্য-রসিকদেরও এটি এক মহাতীর্থ।

সেণ্ট পিটার মন্দিরের কারু-মণ্ডিত বিশাল ব্রোঞ্জের দরজা পার হয়ে আপনি যখন মন্দিরের মধ্যে ঢুকবেন তখন নানা মূর্তি, ভাস্কর্য-চিত্র, খিলান, গম্বুজ, ফ্রেস্কো আপনাকে আকর্ষণ করবে, শত সহস্র মানুষের আনাগোনা আলো-আঁধারির মধ্যে আভে মেরিয়ার সাম গান মুখরিত সেই বিচিত্র সুন্দর মন্দিরের মধ্যে একটু এগিয়ে ডান দিকে তাকাতেই আপনি অভিভূত হয়ে পড়বেন।

এ সেই মিকেলাঞ্জেলোর 'পিয়েতা' বা 'মহাশোক'। বিশ্ব-বন্দিত বহুবর্ণ রঞ্জিত বহু শিল্পীর বহু চিত্র নিউয়র্কের আর্ট মিউজিয়াম—লণ্ডনের ন্যাশনেল আর্ট গ্যালারীতে, প্যারিসের [illegible]ভ মিউজিয়ামে দেখা যাবে। ব্রাসেলস, [illegible], বার্লিন-ভিয়েনা-ভেনিস-মিলান-এ[illegible]তে [illegible] চিত্র-পরিচয় ঘটে। মিকালোর জন্মধন[illegible] ফ্লোরেন্সের প্রতিটি চিত্র-সংগ্রহ যাদু[illegible]সংগে [illegible] দেখে মিকালোর ভাস্কর্যশক্তি[illegible] পাওয়া যায়। ভাতিকান প্রা[illegible] চ্যাপেলে তাঁর সৃষ্ট অপূর্ব [illegible] বিচার দেখে অবাক বিস্ময়ে মে[illegible] মিকালো শুধু পৃথিবীর শ্রে[illegible] নয়—পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রা[illegible]। বটে। কিন্তু পিয়েতা দেখে আপনার[illegible]য়ে যাবার যে ভাবনার ঢেউ উঠবে—তা প্রকাশ [illegible] জানবার উপযুক্ত কোন ভাষা বোধহয় নেই।

মা মেরীর কোলে ক্রশ থেকে না[illegible]য়ে আনা যীশু। মেরীর মাথায় ঘোমটা—সর্বাঙ্গ সেকালীন ইহুদী পোষাকে আবৃত। যীশুর কোমরে একটুকরো কাপড়, মাথা পেছনে হেলানো, বাঁ হাত বাঁ উরুর উপর রাখা, ডান হাত মেরীর ডান হাটুর উপর স্খলিতভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে। ডান পা মাটিতে ছোঁয়ানো। বাঁ পা এমনভাবে শূন্যে ঝুলছে যে মনে হবে সদ্য মৃতকে ছুঁলে হয়তো নড়তে সুরু করবে। মা মেরীর ডান হাত সেই ক্রশ তনুর পাঁজড় আঁকড়ে রয়েছে। আর বাঁ হাত। তার দিকে তাকানো

যায় না। বিশ্বের হাহাকারে সেই শুভ্র সুন্দর হাতখানি এক হতাশ মুদ্রায় নিরাশার ভঙ্গিতে উল্টে রয়েছে। ত্রিভুবনের ক্রন্দন সেই বুকে গুমরে গুমরে উঠছে। বিষাদ-ক্লিষ্ট সুন্দর মুখখানি অশ্রুসিক্ত।

হঠাৎ মনে হবে এ যীশুর মা নয়—, ইনি বিশ্ব-জননী। আর তাঁর কোলে বিধৃত এই বিশ্ব। ব্যথা-অপমান, দুর্ভিক্ষ-মহামারী অনশন অপমৃত্যু যুদ্ধ ষড়যন্ত্রে-লাঞ্ছিত মুমূর্ষু পৃথিবী—মানুষের শুভ-বুদ্ধির স্বপ্ন দেখছে। হাত পায়ের চিহ্ন-গুলি হিরোসিমা-কাশ্মীর, কঙ্গো- ভিয়েৎ-নামের ক্ষত। আপনার মনে হবে আপাতত মোহাচ্ছন্ন এই পৃথিবী আবার রেজারেকশনে জেগে উঠবে। বন্যা-উপবাস-বিষবাষ্প-গোলাবারুদের গন্ধ সব একদিন মিলিয়ে যাবে। নদীভরা জল, ক্ষেতভরা ফসল, শিশুর মুখে হাসি, প্রসন্ন পৃথিবীতে হিংসা দ্বেষ-বিবাদ-বিসংবাদ-অভাব-অপ্রাচুর্য সব মিলিয়ে যাবে। বিশ্বজননী সেদিন প্রসন্নমুখ তুলে বরাভয় মুদ্রায় আবার আমাদের আশীর্বাদ করবেন।

মিকালো তখনো ধর্ম ও রাষ্ট্রগুরু পোপের 'সভাশিল্পী ভাস্কর ও স্থপতিবিদ' বলে স্বীকৃত হননি। এ সেই মিকালো নন যার সৃষ্টির কাহিনী সারা ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের বহু সম্রাট যার হাতের কোন একটি সৃষ্টি মাত্র পেলেই ধন্য হতেন। রোমের ব্যাঙ্কে তারা টাকা রাখতেন, দয়া করে গ্রহণ করে যদি নিজের খুসীমত তিনি কোন একটা কাজে হাত দেন। সব কিছু উপেক্ষা করে বার্ধক্যগ্রস্ত অসুস্থ দেহে অমানুষিক পরিশ্রম করে বছরের পর বছর ভারার উপরে আহার এবং প্রাকৃতিক কৃত্যাদি সম্পন্ন করে রং-এ পালিশে নিজের দেহ চিত্র-বিচিত্র র[illegible] রঞ্জিত করে অবিবাহিত বন্ধু-[illegible]তাঁর [illegible]ন আমোদ-আহ্লাদশূন্য সন্ন্যাস[illegible]বন যাপন করে শুধু সৃষ্টির আন[illegible]গুল হয়ে পৃথিবীর [illegible]শিল্পী [illegible]কৃত হয়েছিলেন—এ আ[illegible] নয়। পিয়েতার শিল্পী [illegible]তে যুবক যাকে হয়ে[illegible] জা[illegible] [illegible] 'যেকাপো গল্লি'র দিন[illegible]শ্চ[illegible] [illegible]ার ব্যাকাস-এ খোদাই-নিশ্চয়[illegible]। পেছনে রয়েছে বহু দুঃখ-দিন [illegible] এবং অপমানের ইতিহাস। [illegible] জনে[illegible] [illegible]শও বোনারতি অনবরত মা [illegible] [illegible] দিয়ে চিঠি দিচ্ছেন। ভাইরা বেকার, ফ্লোরেন্সের অতি দুর্দিন চলছে। রিপাব্লিক-বিধাতা লরেঞ্জোর মৃত্যুর পর পোপের সঙ্গে ফ্লোরেন্সের নিরন্তর মন কষাকষি চলছে। সন্ন্যাসী 'সভোনারোলা' বিদ্রোহ ঘোষণা করে ধর্মের নামে ফ্লোরেন্সের সমস্ত শিল্প-সামগ্রী অগ্নি-গর্ভে আহুতি দিচ্ছেন। লরেঞ্জোর কথা মনে হলে এখনো মিকালোর চোখে জল আসে। 'ঘিরলান্দোর' স্টুডিও থেকে কুড়িয়ে এনে নিজের প্রাসাদে ঠাঁই দিয়েছিলেন লরেঞ্জো। প্লেটো সম্প্রদায়কে দিয়ে তার সাহিত্য শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়েছিলেন। 'বারটোলদো'কে নিযুক্ত করেছিলেন মিকালোর ভাস্কর শিক্ষকরূপে। ফ্লোরেন্স ভাস্কর্যের মহান ঐতিহ্যের ঝরনাধারা, 'ওরকেগনো, ঘি-বারতি এবং দনেতেল্লো পর্যন্ত এসে যা প্রায় শুকিয়ে যাচ্ছিল, 'বারটোলদো'র সহায়তায় সেই বিদ্যা-ধারা মিকালোর হাতে অঞ্জলিরূপে অর্পিত হয়েছে। সুযোগের অভাবে তাও বুঝি শুকিয়ে যাবে। 'বলোনা'তে তার সৃষ্ট 'সেন্ট পেত্রোনা' এবং 'প্রক্লাস'র কথা রোমে কেউ জানে না, ব্যাকাস এখনও অসম্পূর্ণ। 'কার্ডিনাল রিয়ারিও' বহু আশা দিয়েও তাকে নিরাশ করলেন—ভাস্কর্যের কোন সুযোগ না দিয়েই। এমনি দিনে এক সন্ধ্যায় ফরাসী 'কার্ডিনাল দিওনিগি' কথায় কথায় বল্লেন, পোপ ইচ্ছে করেছেন সেন্ট পিটারের ফরাসী রাজাদের দেওয়া চ্যাপেলে একটা অলিন্দ রয়েছে সেখানে একটা ভাল মূর্তি বসানো চলে। শুনে মিকালোর বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। এ সুযোগ কি তার হবে?

ভাস্কর্যের সাধনায় তার ভাগ্যে শুধু বাধা আর বিপত্তি। চৌদ্দ বছর বয়সে সুদখোর বাপ আর খুড়োর হাতে গাধার মার খেয়েছিল একদিন শুধু শিল্পী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার অপরাধে। তবু সে মার হজম করে ঘিরলান্দোর স্টুডিওতে শিক্ষা-নবীশ হয়ে ঢুকেছিল।

ঈর্ষাগ্রস্ত সতীর্থ তোরি গিয়ানির ঘুষিতে নাকটা জন্মের মত জখম হয়ে রয়েছে। লরেঞ্জো প্রাসাদে তার বড় ছেলের অপমান সয়েও লেগে রইল শুধু শেখবার জন্য, নইলে পাথর যোগাবে কে? মাষ্টার পাবে কোথায়? দেশে তো আর ভাস্কর নেই। লরেঞ্জোর মৃত্যুর পর ধর্মের অনুশাসন এবং প্রাণদণ্ডের ভয় অগ্রাহ্য করে রাতের পর রাত লোকচক্ষুর অন্তরালে শবগৃহে ভয়ংকর পরিস্থিতিতে মোমের আলোতে শব-ব্যবচ্ছেদ করেছে একা, শুধু ভাস্কর্য শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য। কিন্তু কাজের সুযোগ কোথায়?

কিন্তু সুযোগ আসে। 'কার্ডিনাল দিওনিগি' রাজী হলেন—মিকালোর ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু শুনে। বিষয়—'পিয়েতা'। Pitty.— শোক—মহাশোক! কয়েক বছর আগে মিকালো এঁকেছিল 'ম্যাডোনা ও শিশু'। বুদ্ধের সুরু হয়েছিল সেখানে। 'পিয়েতা'তে হবে তার পরি-সমাপ্তি। সেদিনকার সৌম্য সুন্দর শিশু নয়নানন্দ হয়ে মায়ের বুক জুড়ে ছিল—আজ তেত্রিশ বছর পর তাঁর কোলে আবার ফিরে এল জীবন-পরিক্রমা সাঙ্গ করে। মায়ের কোলে ক্রুশ থেকে নামিয়ে আনা যীশু। বিষয়বস্তু শুনে কার্ডিনাল উৎসা-হিত। বল্লেন—যাও ভাল পাথর খুঁজে আন। রোমে ভাল পাথর পাওয়া গেল না। কিন্তু মিকালো দমবার পাত্র নয়। ক্যারারা গিয়ে একখণ্ড চমৎকার মর্মর-শিলা সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন।

তারপর দেখলেন যেকাপো গল্লির বাড়িতে বহু লোকের আনা-গোনা। তার ব্যাপ্তাস তখন সম্পূর্ণ। লোকের প্রশংসা এবং স্তুতি তার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হতে লাগলো। প্রশংসা যেমন উৎসাহ দেয় তেমনি বহু উঠতি সাধকের সমাধিও রচনা করে। গল্লির ঘরের আরাম ছেড়ে একটা পুরনো ছোট বাড়ি কিনে নিজের হাতে সংস্কার করে তেরো বছর বয়সের শিষ্য এবং পরিচারক নিয়ে নিজের ঘরে বসে পিয়েতার ধ্যানে বসলেন মিকালো।

প্রথম সমস্যা, পিয়েতাতে কে কে থাকবে? বাইবেল বলছে—যীশুর এক শিষ্য 'যোশেফ এরমিথ' পন্টিয়াস পাইলেট এর দেহ ভিক্ষা করেন। অনুমতি পেয়ে দেহ নিয়ে যান। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন বন্ধু 'নিকোডিমাস' যিনি এক শ' পাউন্ড আস্বকের মশলা দিয়ে আরকসিক্ত বস্ত্রখণ্ডে যীশুর দেহকে সমাধির জন্য প্রস্তুত করেন। আর সেখানে কে কে ছিলেন? মেরী, তাঁর বোন 'মেরী ম্যাগডালেন' জন, জোসেফ এরিমিথ এবং নিকোডিমাস। সমস্যা হল মেরী কখন যীশুকে একা পেলেন? বাই-বেলের বাইরে তো আর যাওয়া চলে না। কিন্তু শিল্পীর কল্পনায় মা ও ছেলে ভিন্ন আর কারুর স্থান নেই। তবে? সৈনারা দেহটিকে নামিয়ে দেওয়ার পর জোসেফ গিয়েছে দেহভিক্ষার জন্য। নিকোডিমাস আরকের মসলা সংগ্রহ করছেন। আর সবাই শোক প্রকাশের জন্য গৃহে ফিরে গিয়েছেন। দর্শকরা শুধু সামনে ভীড় করে রয়েছে। সেই সময়ে মা তার জীবন সর্বস্বকে কোলে তুলে নিলেন। ভবিষ্যতের 'পিয়েতা'র দর্শকরাও মা ও ছেলেকে সেই অবস্থাতেই দেখবে—সেদিন যেমন দেখেছিল।

তার পরের সমস্যা মা মেরীর বয়স। তেত্রিশ বছর বয়স্ক ছেলের মার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হওয়া উচিত। কিন্তু ভার্জিন মেরীর প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সের চেহারা মিকালোর পক্ষে ভাবাই অসম্ভব। তাই স্থির করলেন -মেরী তার প্রথম যৌবনেই থাকবেন—তার নিজের মার যে চেহারা মৃত্যুকালে তার মনের ছায়াপটে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে—সেই আকৃতিতে।

তারপর মিকালো ইহুদি পাড়ায় গিয়ে মধ্য বয়সী কৃশ চেহারার মানুষ জোগাড় করতে চেষ্টা করলেন মডেলের জন্য। তারা রাজী নয়—এ সব ব্যাপারে। অনেক বলে-করে মুরুব্বীদের বুঝিয়ে কয়েকজনকে স্টুডিওতে এনে প্রাথমিক রেখাঙ্কন সুরু করলেন। রোমান বন্ধুদের ঘরে গিয়ে অবিবাহিতা বা বিবাহিতা তরুণীদের স্কেচ করলেন—তাদের ঝোলানো পোষাকে। তারপর সেই দুটি জোড়া দিয়ে একটা পিয়েতার খসড়া তৈরী হল। প্রথমে মাটি তারপর মোমে সৃষ্টি করা হল সেই মূর্তির একটা কাঠামো। অবশেষে সুরু হল মর্মরের উপর আক্রমণ।

একখণ্ড পাথরের মধ্যে দুটি প্রমাণ সাইজের মানুষের স্থান—তাও একজন বসে, একজন শুয়ে। এই বিচিত্র ত্রিকোণ ভাস্কর্যের ইতিহাসে ব্যাকরণ বহির্ভূত ব্যাপার। কিন্তু মিকালোকে তাই করতে হবে। কাজ সুরু করার কিছুদিন পরই ভৃত্য-শিষ্যের অসুখ হল। তার সেবায় বেশ কিছু দিন নষ্ট হল। তারপর সুরু হল দিন-রাত্রি কাজ।

হাতুড়ি বাটালের সংঘাতে মর্মর শিলার ছোট টুকরোগুলি বরফের কুচির মত সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রাত্রিতে মাথায় কাগজের টুপিতে তারের আংটিতে একটা মোম রেখে কাজ চলতে লাগল। প্রচণ্ড শীতের রাত্রিতে আগুন জ্বালিয়ে কম্বলে গা ঢেকে কাঁপতে কাঁপতে কাজ চলল। চুক্তিতে পাওয়া টাকাগুলি বাপের তাগাদা মিটাতেই চলে যায়। ধার করে, কম খেয়ে দিন কাটে, কিন্তু কাজ এগিয়ে চলল। বন্ধুরা রাত্রি শেষে ফুর্তি করে বাড়ি ফেরার পথে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলত—আহাম্মক, কাজ করে কি হবে? আনন্দ চাও তো আমাদের সঙ্গে এস। ক্লান্ত হেসে মিকালো জবাব দেয়,—আমার আনন্দ এই পাথরের মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছে—তাকে মুক্তি দিয়ে আমার আনন্দ। মর্মর শিলা আমার প্রেয়সী। তাকে আলিঙ্গনে আমার আনন্দ, আর স্টুডিওর মূর্তিগুলি আমার সন্তান।

ধীরে ধীরে কঠিন শিলার মধ্য থেকে নতমুখী বিষাদময়ী মেরীর মুখ ফুটে উঠল। নিমিলীত-চক্ষু যীশু মায়ের কোলে শান্ত হয়ে শুয়ে। কোন পীড়নের চিহ্ন, কোন যন্ত্রণা, কোন অভিযোগ কোথাও নেই। শান্ত হয়েই তিনি সব কিছু গ্রহণ করেছেন। নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ বিশ্বকে অসীম ক্ষমায় আশীর্বাদ করে চক্ষু মুদেছেন। হাতে পায়ে সামান্য ক্ষতচিহ্ন।

কাজ শেষ হল। কিন্তু কার্ডিনাল 'দিওনিগি' সমাপ্ত পিয়েতা দেখে যেতে পারলেন না—তার আগেই স্বর্গ থেকে কার্ডিনালের ডাক এসে গেছে। 'বেকাপো গল্লি'—মর্মর মূর্তি দেখে বল্লেন—আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে। আমি বলেছিলাম এটি রোমের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য বলে স্বীকৃত হবে। তা হয়েছে।

কার্ডিনাল নেই। এই প্রতিমা সেণ্ট পিটারে প্রতিষ্ঠা করবে কে? অন্য কেউ বাধা দিতে পারে। কারণ হাজার হোক, সেণ্ট পিটার সম্মানের জায়গা। সুতরাং পরামর্শ হল চুপি চুপি একদিন ওটা বসিয়ে দেওয়াই বুদ্ধির কাজ।

পাথর-কাটা [illegible]তে [illegible] পরিবারের তিন ছেলে আর ভাইপো [illegible] নেদের নিয়ে মূর্তিটি কম্বলে কা[illegible]সংগে জড়িয়ে বাঁদের উপর চড়িয়ে সেণ্ট পিট[illegible] হওয়া গেল। অসমতল প্র[illegible] কোথাও পাথরের চাঁই [illegible] কপালের ঘাম মুছে [illegible] মিকালো বলে- আমিও কা[illegible]ল। [illegible] তা হয় না বাপু,—তুমি শিল্পী [illegible]। কিন্তু ওরা যখন কাহিল হয়ে[illegible]য়ে যাবার মিকালোও কাঁধ মিলালো। [illegible] জানলার [illegible]

বিষণ্ণ সন্ধ্যার অন্ধকারে সে[illegible] মন্দিরে এসে বাহকের দল পেঁছল [illegible]খনকার সেণ্ট পিটার—নীচু আর অন্ধকার। ডান কোণের এক কুলুঙ্গিতে প্রতিমা স্থাপন করে তারা একটা মোমবাতি জেবলে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করল। পারিশ্রমিক দিতে গেলে—ওরা প্রত্যাখ্যান করল। বলল, পারিশ্রমিক আমরা ওপরে গিয়ে নেব।

সবাই চলে গেছে। মন্দিরে মৃদু মোমের আলোতে মা মেরী একা বসে আছেন—তিনি বিষণ্ণ। শিল্পীও তাই একা এবং বিষণ্ণ। মাথা নীচু করে মিকালেঞ্জালো সেণ্ট পিটারের বাইরে—অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

অঙ্গনা

প্রমীলা

ছোট্ট সংসার

স্থান অসংকুলানের জনাই ঘর সাজানোর প্রশ্নটা বারবার ঘুরে-ফিরে আসে। কারণ ছোট্ট ঘরে সংসার পাতার পরেই এই সমস্যাটা মাথা চাড়া দেয়। তাছাড়া নারীর স্বাভাবিক প্রবণতায়ও এদিকটা সব সময়ই ভারী থাকে। শুধুমাত্র সুযোগের অপেক্ষা, সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত সময় এবং সুযোগের মাহেন্দ্রক্ষণে এই প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে এই আকাঙ্ক্ষা মুক্তির পথ খোঁজে।
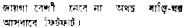
জায়গা কম, পরিবারের আয়তনও ছোট। তাই বুঝে-শুনে ঘর সাজাতে হয়। ছোট জায়গায় ছোট ছোট জিনিসপত্র দরকার। এজন্য আজকাল অবশ্য খুব একটা ব্যস্ত হতে হয় না। যন্ত্র-যুগের কল্যাণে অন্য সবকিছুর সঙ্গে [illegible] ব্যাপারেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আ[illegible]র মত সমস্যায় হাতড়ে ফিরতে হ[illegible] কাঠের কারুকাজ [illegible] বিরাট [illegible] আসবাবপত্রগুলি আজ [illegible] জায়গা দখল করছে [illegible] ক্ষুদ্রায়তন সাজ-সরঞ্জাম। [illegible]

জায়গা বেশী নেবে না অথচ বাড়ি-ঘর আসবাবে ফিটফাট।

সে রামও নেই আর সে অযোধ্যাও নেই। বিস্তীর্ণ একটি বিরাট বাড়িতে পরিবারের সবাই মিলেমিশে আছেন, ঐতিহ্য এবং গাম্ভীর্যের সেই প্রতীক আজ ভেঙে পড়েছে। সেদিন প্রয়োজন ছিল বিরাট আসবাবের। খানদানী ঘরানার প্রচার এর পেছনে যতটা ছিল, রুচির পরিচয়ও ছিল ঠিক ততখানি। আজও এমন পরিবারের হদিশ মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু এরা ক্রমেই পিছু হঠছে। সভ্যতার অগ্রগতির পথে নিজেদের জঞ্জালস্বরূপে দাঁড় না করিয়ে বরং পথ মুক্ত করে দিচ্ছে। সে পথে কালের ধ্বজা উড়ছে। এভাবেই নতুন দিন পুরোনো দিনের বুক চিরে নিজের পথ করে নেয়। যা কিছু পুরোন, তাই উচ্ছিষ্ট, তাই যাদুঘরের সামগ্রী নয়। সব

মরণজয়ী কেলার
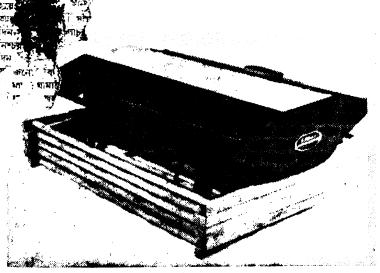
পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ অন্ধ, বধির ও মূক মানুষের প্রতিভূ হেলেন কেলার একটি বিশ্ববিশ্রুত নাম। রক্তমাংসের দেহ থেকে এই নামটি এবার ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিল। গত ১ জুন মৃত্যু এসে তাঁকে আমাদের মাঝ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সাতাশি বৎসর বয়সে এই বিস্ময়কর ও বৈচিত্র্যময় জীবনের অবসান ঘটলো।

জন্মলগ্নে পৃথিবীর আলোয় তিনি যথারীতি অবগাহন করেছিলেন আর কান-ভরে শুনেছিলেন পৃথিবীর বহমান জীবনের ধ্বনি। আলো হাসি আর গানে তিনি বিভোর হয়েছিলেন। কিন্তু বেশিদিন এভাবে চললো না। ঘনিয়ে এল সেই দুর্যোগময় প্রহর। মাত্র উনিশ মাস বয়সে স্কার্লেট ফিভারে আক্রান্ত হয়ে তিনি একই সঙ্গে দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি হারান।

এবার শ্রীমতী কেলারের জীবনে বিধাতার আশীর্বাদ হয়ে এলেন অ্যানি সালিভান। ইনি নিজেও এক সময়ে অন্ধ ছিলেন। এঁরই ওপর ভার পড়লো হেলেনের ভবিষ্যৎ গড়ার। শ্রীমতী সালিভান ছাত্রীকে নিয়ে বসলেন। প্রথম দিনেই তিনি সফল হলেন। 'জল' বানানটি ছাত্রীকে শিখিয়ে ফেললেন। এভাবেই এগিয়ে চলে দুর্জয় প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার করে হেলেনের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

ধীরে ধীরে হেলেনের বোধশক্তি জন্মাতে থাকে। তিনি ব্রেইল আয়ত্ত করেন এবং অ্যানের কণ্ঠনালীর ওপর নিজের হাত এবং ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে কথা বলা শেখেন। তারপর তিনি পার্কিন্স অন্ধ বিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং কালে র‍্যাডক্লিফ কলেজ থেকে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।

অন্ধ ও বধির হেলেনের দায়িত্ব নিয়ে শ্রীমতী সালিভানের সংগ্রাম এবং সাফল্য পৃথিবীর এক বিস্ময়কর ঘটনা। অ্যানি সালিভানের অলৌকিক ক্ষমতার কথা বিধৃত হয়েছে 'দি মিরাকল ওয়ারকার' নামে নাটক ও চলচ্চিত্রে। আজীবন তিনি ছিলেন হেলেনের সঙ্গিনী। বিয়ে করার পরও তিনি হেলেনের সঙ্গে ছিলেন। ১৯৩৬ সালে শ্রীমতী সালিভান মারা যান এবার হেলেনের সঙ্গী হন শ্রীমতী মেরী হেগেনেস পলি টমসন নামে এক স্কচ মহিলা।

নিজের জীবনীসহ বহু বই শ্রীমতী কেলার লিখেছেন। তাঁর নিজের জীবন-সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি অন্ধত্ব ও বধিরত্বে হতাশাগ্রস্ত মানুষকে নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছেন। দৈহিক অক্ষমতার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামকে সর্বপ্রথম অভি-নন্দিত করে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় সম্মান-সূচক ডিগ্রী দিয়ে। এরপর গ্লাসগো, বার্লিন ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

দৈহিক জীবনে পঙ্গুদের জন্য অক্লান্ত শ্রমের জন্য তিনি সারা বিশ্বের অভিনন্দন লাভ করেন। ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা যান। হেলেন কবি সন্দর্শনে আসেন। পরস্পরের প্রীতিনিষ্ঠ পরিচয় আজীবন অম্লান ছিল। হেলেন তাঁর 'দি ওয়ার্ল্ড আই লিভ ইন' বইটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। আর রবীন্দ্রনাথ হেলেনের কথা মনে রেখে তাঁর সমগোত্রীয়দের জন্য আজীবন আলোক প্রার্থনা করে গেছেন।

জিনিসই সযত্নে রক্ষিত হবে নিজের নিজের কালের পরিচয় তুলে ধরবার জন্য। তার বৈশিষ্ট্য এবং মনোহারিত্ব মুগ্ধও করবে, রুচিতে নতুন ভাবনার প্রেরণা জোগাবে। আর সর্বকিছুর ঊর্ধে মিটিমিটি হাসে বর্তমান কাল। ভাবটা এই যে, বাজিমাৎ করেছি আমি। আমার মহিমায় সবাই মহিমান্বিত। আমার গুণগাথা সকলের কণ্ঠে।

এভাবেই দিন এগুচ্ছে। আর বর্তমান কাল সরবে ফেটে পড়ছে। তারপর সেও যাদুঘরে পুরনোর ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। আসবাবের ক্ষেত্রে আজকের সভ্যতা রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয়, পোশাক-আশাকের মত আসবাব-সামগ্রীও ঘন ঘন রূপ বদলাচ্ছে। কিভাবে স্বল্প পরিসরে আরো বেশী স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে সেদিকে সকলের কড়া নজর। তাই চলেছে ক্রমাগত রূপ পরিবর্তন এবং ধোয়া-মোছা। শুধু পরিসর স্বল্প নয়, সেই সঙ্গে কাজটাও চটপট হওয়া চাই এবং সেজন্য যেন বেশী শ্রম ব্যয় করতে না হয়। অল্প পরিশ্রমে কাজটা চটপট হয়ে গেলে আমাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না। এ যুগে সেদিকে নজর রেখে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য দিচ্ছে এবং পরিশ্রম কমাচ্ছে।

এই সেদিনও একটা সাধারণ কাজ করতে গিয়ে গলদঘর্ম হতে হত। সারা গা বেয়ে দরদর করে ঘাম পড়ছে, গায়ে-হাতে ব্যথা—ক্লান্তির একশেষ। আজ অবস্থার উন্নতি সে তুলনায় আসমান জমিন। মাথার উপর বোঁ বোঁ করে ফ্যান ঘুরছে। সে হাওয়ার গতি ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণ করা চলে। এতেও যদি না শানায় তবে আছে এয়ার সারকুলেটর। মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য মাথার পরিশ্রমের অন্ত নেই। ফ্যান বা এয়ার সারকুলেটর ঠিক ট্রপিকাল কান্ট্রির পক্ষে যথোপযুক্ত নয়। এ উষ্ণতা থেকে গা বাঁচানো এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য অন্যকিছুর প্রয়োজন। সূর্যদেব এখানে বড় অকৃপণ, করুণা বর্ষণে তিনি মুক্তহস্ত। তাই দরকার হল এয়ার কণ্ডিসনার এবং এয়ার কুলারের। অনেক সময়, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত এয়ার কুলার দিয়ে গরমের কোপ বাঁচিয়ে কেউ কেউ এয়ার কণ্ডি-সনারের আনন্দ উপভোগ করেন। কিন্তু এয়ার কণ্ডিসনার হচ্ছে শীতাতপনিয়ন্ত্রক। আমাদের মতন [illegible]তে [illegible] গরমটাই অবশ্য মারাত্মক। শীতঋ[illegible] [illegible]নবিশেষ [illegible] [illegible]সংগে প্রায়ই মনোরম এব[illegible] আনন্দের ঋতু। তবে শী[illegible] হয়, সেজন্যও ব্যবস্থা [illegible] সাহায্যে ঘর গরম রা[illegible] পারে। আর এটাই [illegible] সহজ প্রকরণ। আমাদের পূর্ব[illegible]। শীতের কামড় থেকে রেহা[illegible] যাবার মালসা আগুন কাছে রেখে শ[illegible] জানলায় রাখতেন। ফায়ার প্লেস অনে[illegible] এসেছে। তবে এযুগে [illegible]কিছুর আয়োজনেই কোন ঘাটতি নেই। শীতের তীব্রতায় আত্মরক্ষার এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রুম হিটিংয়েরও ব্যবস্থা আছে এবং সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক উপায়ে। ইদানীং এজন্য ইলেক-ট্রিক হীটারেরও ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং রাস্তা চলার ক্লান্তিটুকু বাদ দিলে (যা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই) শীত-গ্রীষ্ম মোটামুটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার উপায় আমাদের হাতের মুঠোয়। অবশ্য সাধ্যের কথা তুলে এ প্রসঙ্গে তিক্ততার সৃষ্টি আমার কাম্য নয়।

আধুনিক যুগ সর্বত্র কিরকম স্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি করেছে সেটাই অবশ্য আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য। এবার ঘর সাজানোর দিকে নজর ফেরান। সেদিনের সঙ্গে আজকের রুচির পরিবর্তন কারো অজানা নয়। আবার সেই সঙ্গে স্থানাভাব—আসলে ঘর সাজানোর রুচিতে পরিবর্তনের দায়িত্ব এর অনেকখানি। ছোট ছোট লোহার খাট এখন দিব্যি চলছে। দেয়ালে সেট-করা দেরাজ আলমারির অভাব বেমালুম ভুলিয়ে দিয়েছে। রান্নাবান্নার সেই কালিঝুলি মেখে বা ঘেমে-নেয়ে একাকার হওয়ার কোন দরকার নেই। অনেক বাড়িতে গ্যাস চলছে। এতে বাড়িঘর নোংরা হওয়ার চান্স নেই আবার মেহনতও অনেকখানি বাঁচে। স্টোর রুম বা ভাঁড়ার আজ নেহাতই প্রয়োজনাতিরিক্ত। সামান্য কিছু জিনিস রান্নাঘরেই সাজিয়ে রাখা যায়। বাসনপত্রের ক্ষেত্রে কাঁসা-তামা তো প্রায় অচল। স্টীল বিজ্ঞাপন মারা নতুন এক ধরনের বাসনকোষনের বাজার বেশ জমজমাট। আর এদের তদারকির জন্যও নানা ব্যবস্থা আছে। বাসন মেজে হাতের চামড়া ক্ষয়ে ফেলবার আর আশঙ্কা নেই। চারদিকে তাই আধুনিকতার জয়গান।

কাপড়-চোপড় কাচার সে ধকল বিশ শতকের শেষাশেষি এসে কল্পনায়ও কষ্টসাধ্য। ধোপার মত সেই হুশহাঁশ শব্দে বাড়ির গিন্নি কাপড় কাচছেন এ রকম দৃশ্য নতুন করে ভাববারও প্রয়োজন আর নেই। এমনিতেই বাড়িতে কাপড় কাচার নানা সুবিধামূলক ফর্মুলার প্রবর্তন হয়েছে। পাউডার সাবানের বাজার ভর্তি বিজ্ঞাপনে গিন্নিদের স্বস্তির ভাব লক্ষ্যণীয়। আরেকটা জিনিসের দৌলতে কাপড় কাচার পরিচ্ছেদে আর এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন হয়েছে। পরিশ্রম আরও লঘু হয়েছে এবং যন্ত্রের প্রসাদগুণেই এজন্য দায়ী। এ জিনিসটি পাশ্চাত্য দেশে খুব চলেছে। আমাদের দেশেও এর প্রচলন শুরু হয়েছে। অবশ্য খুবই সীমিতভাবে। এটি হল ওয়াশিং মেসিন। এর দৌলতে জামা-কাপড় কাচা অনেক সুবিধা হয়ে গেছে।

কাপড়-চোপড় কাচার পরই তা শুকানোর পালা। আমাদের আবহাওয়া-সুন্দর দেশে এজন্য খুব একটা ভাবনা নেই। অধিকাংশ ভিজে কাপড় রোদেই শুকিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু গরমে প্রচণ্ড রোদের কথা ভেবে দেখুন অথবা ফ্ল্যাট-বাড়ির কথা যেখানে ছাদে যাওয়া প্রায় স্বর্গে পৌঁছানোর সামিল। অথবা শ্রাবণ-ভাদ্রের বর্ষা-ঘেরা আকাশ যখন সমানে বৃষ্টিপাত করে চলেছে তখন জামা-কাপড় শুকানোর সমস্যা সকলকেই রীতিমত ভাবিয়ে তোলে। এজন্য আছে কাপড় শুকানোর যন্ত্র। ওয়াশিং মেসিনের মত এ বস্তুও আমাদের দেশে বেশ দুর্লভ। এজন্য ডোমেস্টিক অ্যাপ্লায়েন্সেসওয়ালাদের ভাবনা চিন্তার অন্ত নেই। সম্প্রতি বাজারে বেরিয়েছে ইলেকট্রিক ক্লোদস ড্রায়ার। কিলিকস-এর এই আবিষ্কারে ভরা শ্রাবণে কাপড় শুকানোর মাথাধরা সেই ভাবনাটা সারানো যাবে।

যন্ত্রযুগে বাস করে এভাবেই যন্ত্রের প্রসাদে আমরা ধন্য হচ্ছি। আজকের সমস্যা আগামীকাল নিমেষে সমাধান হয়ে যাচ্ছে। যন্ত্র মানুষের পরিশ্রম বাঁচাচ্ছে আরো উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই পরিশ্রম ব্যয় করার জন্য। সেটুকু সে অবশ্য আমাদের সকলের কাছ থেকে আদায় করেই নিচ্ছে।

স্বামীটিকে মুঠোয় পুরুন

—বেশীর ভাগ মহিলারই চিরকুমারী সভা থেকে নাম কাটা গেছে। আর যাঁরা এক একটি কুমারের সঙ্গে জুড়ে গেছেন বা জড়িয়ে গেছেন। কেউ স্বইচ্ছায়, কেউ অনিচ্ছায়, [illegible]তু একবার যখন জুড়েই গেছেন [illegible] জোড়টা বজায় থাক এইটাই কাম্য। [illegible]হিলারই মনের কথা হল তাঁর [illegible] তিনি গত না হওয়া পর্যন্ত যেন [illegible]রই অনুগত থাকেন। কিন্তু এই [illegible]। এর জন্য সামান্য সাধনার [illegible] অবচেতনার অতলে তলিয়ে [illegible]ধনা নয়, সচেতন সাধনা।

[illegible] ধরুন তার ঘরে পা দিয়েই [illegible]পনি তাঁকে একটা সিম্পল নেচার স্টাডি [illegible]য়ে নেবেন! তবেই না হবেন নিপুণ [illegible]ণী! দেখে নেবেন তাঁর উইক পয়েন্টটি [illegible]থায়! তিনি কি খেতে ভালবাসেন! এবার আপনার অভিযান চালিয়ে যান! মনে রাখবেন মন জয় করতে হলে সর্বপ্রথম নজর রাখতে হবে রসনায়। বেশ করে তাঁর মনের মত খাবার খাওয়ান তাঁকে। অবশ্য দেখবেন সেটা যেন তাঁর উপযুক্ত হয়! এদিকে সুগার আর ওদিকে নানারকম মিষ্টির পাহাড় এতে করে দুদিনেই তো পর্বত বিলকুল সাফ! তখন আর তার আড়াল পাবেন কোথায়! যদি বেশ সুস্থ সবল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাসিখুশী স্বামীটি চান তবে তাঁর আহার রাখুন নিজের হাতে। আপনাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যাঁর সঙ্গে সমানে ঘর করতে হবে স্বভাবতঃই তাঁর স্বভাবের খুঁতগুলোও আপনার চোখে পড়বে! কিন্তু চুপিচুপি বলছি, চেপে যান। রিফু করুন। ধৈর্যের সুতো দিয়ে অনুরাগের রংএ সেলাই করে ফেলুন তাঁর অযথা রাগকে। ভদ্রলোক যদি বেলায় ওঠেন মস্ত একটা বদমেজাজের বোঝা নিয়ে! তাঁকে সোজা করা মোটেই কঠিন নয়! এক পেয়ালা কফি বা চায়ের সঙ্গে একটু না হয় স্যাকারিন হাসিই মিশিয়ে দিন! দেখুন কেমন মিষ্টি চোখে চাইছেন আপনার দিকে! ঝাঁঝ উবে গেছে। তার কারণ আপনি যে পাল্টা ঝাঁঝিয়ে ওঠেন নি তাই! এমনি করে একটু রপ্ত করে নিন নিজেকে।

তাঁর আবার হয়তো একই রসিকতা বার বার করার অভ্যাস! কিম্বা বেশ একটু হামবড়াই ভাব আছে! মেনেই নিন তাঁর বড়ত্বটুকু! বেশ একটু গুরুত্বও না হয় দিলেন। হাজার হোক স্বামীই তো! বহু পুরাতন ঐ সনাতন রসিকতায় না হয় একটু নামে হাসিই হাসলেন। এতে করে আপনাকে তিনি বেশ প্রীতির চোখেই দেখবেন। তাঁর জামা-কাপড়ের দিকেও দৃষ্টি রাখবেন। নিজে যেমন সেজেগুজে তার প্রশংসাটুকু শোনার জন্য খসখস করেন তাঁর বেলাতেও যেন সেটার কার্পণ্য না হয়। বেশ দরাজ মনে তাঁকে প্রশংসা করে দেখুনে কখনই তিনি আর পরস্মৈপদীতে মন দেবেন না।

তাঁর কাজে উৎসাহ দিন! আপনার সামান্য উৎসাহেই তিনি প্রচণ্ড উদ্দীপনা পাবেন! হয়তো তিনি বেশ বড়সড় একজন অফিসার কিন্তু আপনার কাছে সময় সময় শিশুর মত প্রশংসা আর উৎসাহ দাবী করে বসবেন দেখবেন। অবশ্য পুরুষমানুষেরা চিরকালই বয়স্ক শিশু! সুতরাং প্রশ্রয় দিন একটু! অবশ্য ভাল দিকে! দরকার মত মাঝে মাঝে একটু খোসামদও করবেন বৈকি! আপনার দেখাদেখি তিনিও আপনাকে খোসামদ করতে শিখবেন। মাঝে মাঝে তাঁর হাঁ-তে হাঁ আর না-তে নাও মেলাবেন। পরেরবার আপনিও এমনি আনুগত্য ফিরে পাবেন বৈকি!

এছাড়াও রয়েছে; তাঁর মনে এমনি একটি ভাবনার সঞ্চার করুন যেন আপনার তাঁকে নিয়ে গর্বের অন্ত নেই! তাঁর জন্যই তো আপনার এত সমৃদ্ধি! মনে এত সুখ! বন্ধুবান্ধবের কাছে প্রাণখুলে তাঁকে ভাল বলুন। তাহলে এর উল্টো ছবিটিও আপনি ঠিক দেখতে পাবেন। তিনি আপনার এমনই এক সম্পত্তি যে পাঁচজনের কাছে তাঁকে পরিবেশন করার উপযুক্ত তাতে আপনি নিঃসন্দেহ।

পারিপার্শ্বিকের কোন অশান্তি বা দুর্ঘটনাতে তিনি চিন্তিত হলে তার ভাগ নিন। অযথা যুক্তি বা বক্রোক্তি না করে

সোজা কথায় নিজের কথা তাঁকে বোঝান। বোঝানোর পরে নয় একটু আধটু অভিমান অবশ্য করলে করতেও পারেন।

তিনি হয়তো আপনার একলারই সেভিংস এ্যাকাউণ্ট কিন্তু তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে তাঁকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করলে আর আপনি সেই তাজা প্রাণের মানুষটিকে পাবেন না। একেবারে ডেবিট ব্যালান্স হয়ে যাবে শেষে! তারচেয়ে তাঁর সংগে ঐ সংগী সাথীর সংগ শেয়ার করে নিন। এবার সবচেয়ে বড় কথায় আসি যে সবপ্রথম তাঁকে ভালবাসুন, তারপর তাঁকে শ্রদ্ধা করুন তখন এই যে কার্য-কারণের তালিকা, এগুলি অনায়াসে আপনার অগোচরেই ঘটতে থাকবে আর সংসারের সব ব্যাপারেই বইবে বেশ একটি অ্যাডজাস্টমেন্টের আমেজ। এই কথাটি সব বিষয়েই প্রযোজ্য—স্বামীস্ত্রীর যে আসল সম্বন্ধ সেখানেও। দুজনের ইচ্ছার একান্ততা আর সম্পূর্ণতাই আনবে দুজনের প্রতি দুজনের আকর্ষণ, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি।

তাঁকে বুঝতে দিন যে আপনি তাঁকে কতখানি ভালবাসেন। যতই ঝড়ঝঞ্ঝা আসুক না জীবনে। যতই কেননা তিনি অবুঝের মত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করুন তবু আপনি তাকে ভালবাসবেন। সহ্য করবেন তাঁকে। হয়তো আপনার বাঁধাধরা নিয়মকানুনে তিনি সব সময় ধরা দেবেন না। তবুও। ছেলেরা অন্যায় আবদার, দুষ্টুমি, একগুঁয়েমি করে না। তবু কি আপনি তাদের কম ভালবাসেন। এমনিভাবে যদি তাঁকে সব সময় আগলে রাখেন, ভালবাসেন, দেখবেন তাঁরও আপনার কথা সবচেয়ে প্রথমে মনে থাকবে। সুন্দর একটি শ্রদ্ধার আসন নিজের জন্য গড়ে নিতে পারবেন আপনি। এর প্রথম পাঠ হল ধৈর্য আর সহ্য। অবশ্য তাঁরও দায়িত্ব আছে বৈকি, স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের আসল চাবি-কাঠি যেখানে সেখানে দুজনকেই হতে হবে দুজনের পরিপূরক। আসল বিরোধের সৃষ্টি কিন্তু ধূমায়িত হয় সেই আদিম রিপুর অপরিপূর্ণতার দরুণ। একথা হয়তো অনেকে নিজের কাছেই স্বীকার করতে অনিচ্ছুক কিন্তু নিজের কাছে নির্লজ্জ হয়ে ভালভাবে তলিয়ে দেখুন। তাছাড়া অর্থও অনর্থের মূল, সে থাকলেও কি আর না থাকলেও কি! তবু সব ব্যাপারেই সেই ইংরেজী কথাটিকে মূলমন্ত্র করে জীবনের পথে এগিয়ে চলুন দুজনে! কথাটি হল—"অ্যাডজাস্টমেণ্ট"! অবশ্য স্ত্রীর দায়িত্বই সর্বাংশে বেশী। তাঁকে হতে হবে গৃহিণী সচিব সখেঃ—একাধারে মাতা, কন্যা, সখী, স্ত্রী এই চারজনের কর্তব্য আপনাকে একা সমাধা করতে হবে। তবে ভালবাসলে কি না পারা যায়! আর ভালবাসা পেলে কি না ত্যাগ করা যায়! তাই নয় কি! তখন আর নিজের সুখটাই বড় হয়ে ওঠে না। বড় হয়ে ওঠে আর একজনের স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা।

এইভাবে চললে আপনিও কিন্তু আপনার স্বামীটিকেও অনায়াসে মুঠোয় পুরতে পারবেন দেখবেন।

আভা পাকড়াশী

কথা বলাও নাকি একটা আর্ট

আধুনিকতা যেমন দিয়েছে অনেক কিছু, তেমনি কেড়ে নিয়েছে সরলতা আর অকৃত্রিমতা। বন্ধুবান্ধব এলে পান চিবোতে চিবোতে খানিকটা মন খুলে গল্প করার আর উপায় নেই নারীদের। আধুনিক যুগে, ঘর সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা যেমন একটা আর্ট, ফুল সাজানো যেমন একটা আর্ট, সুরুচিপূর্ণভাবে প্রসাধন করা যেমন একটা আর্ট, কথা বলাও নাকি তেমনি একটি আর্ট। অতিথি-অভ্যাগতদের সামনে সরল মনে, সব কথা বলা তো চলবেই না, এমন কি কোন প্রশ্ন করাও চলবে না। এযুগে কথা বলতে হবে সাজিয়ে, মেপে, মানিয়ে। একের পক্ষে যেটা আনন্দের, অন্যের পক্ষে সেটা শ্রুতিমধুর নাও হতে পারে। তাই সব সময় নিজের ও অপরের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রত্যেক বাড়ীতেই কিছু-না-কিছু অতিথি-অভ্যাগতরা আসা-যাওয়া করে থাকে। কোন কোন অতিথির উপস্থিতিতে মজলিশ বেশ জমে ওঠে, তাদের সরস কথা মনে বেশ আনন্দ জাগায়। আবার কোন কোন অতিথিব কথা অত্যন্ত বিরক্তিকর। তারা নিজের কথাই অনর্গল বলে যায়। সেকথা শুনে করজোড়ে বলতে ইচ্ছে করে "Ration your I"—অর্থাৎ 'আমি' 'আমি' কমাও। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কে কার কথা শোনে? তাদের কথা যে অন্যের বিরক্তি উদ্রেক করতে পারে, সে বিষয়ে তারা মোটেই সচেতন নয়।

আর একদল অতিথি আছে যাঁরা নিজেদের অসুস্থতার কথা, কিম্বা নিজের বাড়ীর ভৃত্য, পরিচারিকাদের কথা বলতে বেশি ভালবাসেন। শ্রোতামাত্রই জানেন এ ধরনের কথা কতখানি বিরক্তিকর। এই প্রসঙ্গে বক্তাদের জানিয়ে রাখা ভাল, কেউ বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা না করলে এ প্রসঙ্গ না উত্থাপন করাই ভাল।

মাঝে মাঝে আর এক ধরনের অতিথিরা আসেন, যাঁরা আসেন, গল্প করেন, খাওয়া-দাওয়া করেন কিন্তু সব সময় দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে বেশি আলোচনা করেন ও শেষ-পর্যন্ত গৃহকর্ত্রীর বিশেষ অপ্রিয় হয়ে বাড়ী ফেরেন। অপরের দোষটা তাঁরা বড় করে দেখেন কিন্তু প্রশংসার ব্যাপারে বড় কৃপণ। রান্না খেয়ে তাঁরা ভাল তরকারীর প্রশংসা না করে খারাপটার কথা বারবার বলেন। বলুন কোন গৃহকর্ত্রী এতে খুশি হয়?

অতএব যদি গৃহকর্ত্রীকে খুশি করতে হয়, তবে কয়েকটা বিষয়ে সচেতন হলে কেমন হয়? যেমন দোষ-ত্রুটি খুঁজে বার না করে ছোটখাট জিনিস যা সহজে চোখে পড়ে সে বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশংসা করলে ক্ষতি কি? এতে তো কোন খরচ নেই। বরং সহজেই গৃহকর্ত্রীর প্রীতিভাজন হওয়া যাবে। যাঁরা প্রশংসা পেয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন এর কত দাম।

অনেককেই দেখা যায় প্রশংসা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশংসা ফিরিয়ে দেয়। তার-চেয়ে সেটা মনে রেখে উপযুক্ত সময়ে যদি প্রশংসা করা যায়, তাহলে সে প্রশংসা আরো কার্যকরী হয়।

কথা বলার সময় নজর রাখতে হবে যাতে তার কথায় অন্য কেউ আহত না হয়। সেজন্য সবসময় যা মানুষের নাই তা নিয়ে আলোচনা না করে, যা আছে সে বিষয়ে কথা বলা ভাল। কারণ সব মানুষের কাছেই, যে সমালোচনা করে তারচেয়ে যে প্রশংসা করে সে বেশি প্রিয়। জনপ্রিয় হতে কে না চায়? অতএব যদি জনপ্রিয়[illegible] লাভ করতে হয়, তবে সমালোচনা একবা[illegible] বর্জনীয়।

নারীদের কাছে কয়েকটা [illegible] আছে যাকে অলিখিত গর্হিত কাজ বলেই [illegible] করা হয়। যেমন ধরুন, মেয়েদের [illegible] তাদের স্বামীদের আয়, আর সংস[illegible] খরচ। এই তিনটি প্রশ্ন সাধারণ[illegible] গড়ে তোলে। যদি প্রশ্নকারিণীকে [illegible] তিনটি প্রশ্নের কোনদিন সম্মুখীন [illegible]! হয়, তবে তিনিও অন্যদের মত ক[illegible] হবেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। [illegible] যাবার [illegible]ানলায়

বাড়ীতে অতিথি-অভ্যাগতরা আস[illegible] সরস কথা, সুমধুর হাসি, সুন্দর সংগী[illegible] দিয়ে আসর ভরিয়ে তুলুন ক্ষতি নেই, কিন্তু সমালোচনা আর অবান্তর কথা বলে পরিবেশকে বিরক্তিকর করে না তোলাই ভাল।

অতিথিদের আসা-যাওয়ার রীতি খারাপ নয়, এতে নতুন নতুন চিন্তা আর ভাবধারার আদান-প্রদান হয়। কিন্তু যে অতিথিরা সমালোচনা করে, যারা পরচর্চা করে, তারা চলে যাবার পর মনে হয়—নিঃসংগতা এ চেয়ে যেন অনেক ভাল।

—অলকা [illegible]

(৮৮)

মহেশ পণ্ডিত

দ্বাদশ গোপালের একজন।

জন্মস্থান ও পূর্ববাস শ্রীহট্ট। পিতা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কমলাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভাগ্যবতী।

কমলাক্ষের দুই ছেলে, বড় জগদীশ, ছোট মহেশ। নবদ্বীপে এদের বাড়ি জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির কাছে। বলা যায় ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। জগদীশের স্ত্রী দুখিনীর সঙ্গে শচীদেবীর নিবিড় হৃদ্যতা।

গৌরাঙ্গের নৃত্য-কীর্তনে মহেশও একজন সঙ্গী। যেমন নবদ্বীপে তেমনি নীলাচলে। সে ঢাক বাজিয়ে নৃত্য করে। 'মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল। ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে—প্রেমে মাতোয়াল।।'

ব্রজের উদার গোয়াল—সে কে, তার নাম কী? তার নাম মহাবাহু। মহেশ পণ্ডিত ব্রজ[illegible]। মহাবাহু সখা।

গৌরাঙ্গ [illegible]ন্যাস নিয়ে নীলাচলে যাবে, রাষ্ট্র হল [illegible]বীপে। জগদীশ পাগলের মত [illegible]। ছুটল নীলাচলে। বলে গেল, [illegible] থেকে জগন্নাথবিগ্রহ নিয়ে আসি, [illegible] হলে নিমাই আর ওমুখো হবে না, [illegible] সন্ন্যাস।

[illegible]চলের 'বৈকুণ্ঠ' থেকে শ্রীবিগ্রহ [illegible] এল জগদীশ। কিন্তু গৌরাঙ্গ [illegible] হবার নয়। তখন জগদীশ সে-বিগ্রহ [illegible]দ্বীপের কাছে যশড়া গ্রামে স্থাপিত [illegible] থামাই।

[illegible]সন্ন্যাসের পর গৌরহরি যশড়ার জগদীশের বাড়িতে এলেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ মহেশকে দীক্ষা দিয়ে নিজের পার্ষদ করে নিল।

খড়দহে নিত্যানন্দের শ্রীপাট স্থাপনের পর মহেশ যশড়ার কাছে মাসিপুরে শ্রীপাট স্থাপন করে। মাসিপুর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হলে শ্রীপাট সরডাঙায় স্থানান্তরিত হয়। সরডাঙাকেও গঙ্গা গ্রাস করে। তখন শ্রীপাট চাকদহের এক মাইল দক্ষিণে পালপাড়ায় চলে আসে। বিগ্রহ গোপীনাথ, নিতাইগৌর আর মদনমোহন।

জগদীশের শ্রীপাট যশড়ায়, চাকদহের এক মাইল পশ্চিমে। বিগ্রহ জগন্নাথ, রাধাকৃষ্ণ ও গৌরনিতাই।

(৮৯)

ধনঞ্জয় পণ্ডিত

দ্বাদশ গোপালের আরেকজন। ব্রজলীলায় সখা বসুদাম।

আবির্ভাব চট্টগ্রাম জেলার জাড়গ্রামে। পিতা শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা কালিন্দী দেবী।

শ্রীপতি বিরাট ধনী, পুত্রও বিলাস-লালিত। শ্রীপতি বরবর্ণিনী সুন্দরীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন। ধনীপুত্র ধনঞ্জয় সংসারের আমোদে-প্রমোদে মেতে উঠল।

কিন্তু কিছুকাল পরেই বৈরাগ্যের ডাক শুনল ধনঞ্জয়। সংসার মনে হল শৃঙ্খল। বাসন-বাসনা মনে হল আবর্জনা।

তীর্থে যাচ্ছি, বলে একদিন গৃহত্যাগ করল।

সোজা চলে এল নবদ্বীপ। মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করল। মিশে গেল ভক্তদলে। কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে রইল।

তারপর চলে গেল বর্ধমান জেলার শীতলগ্রামে, সেখান থেকে মেমারির স্টেশনের কাছে সাঁচড়া-পাঁচড়ায়। জনে-জনে হরিনাম-মহামন্ত্র বিতরণ করতে লাগল।

তারপর চলে গেল বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে বীরভূম জেলার বোলপুর স্টেশনের চার-পাঁচ ক্রোশ পূবে জলন্দি গ্রামে বিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করে শীতলগ্রামে এসে উপস্থিত হয়। শীতলগ্রামে গৌরহরির সেবা প্রকাশ করে।

তার লীলাবসানও এই শীতলগ্রামে।

শ্রীপাট শীতলগ্রাম। বিগ্রহ গোপীনাথ, দামোদর আর নিতাইগৌর।

(৯০)

সুন্দরানন্দ

দ্বাদশ গোপালের আরো একজন। ব্রজলীলায় সুদাম সখা।

যশোহর জেলার মহেশপুর গ্রামে আবির্ভাব। গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বা গোষ্ঠলীলায় একজন সহচর।

মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ যখন নীলাচল থেকে গৌড়ে যাত্রা করে তখন তার সহচরদের মধ্যে একজন এই সুন্দরানন্দ। প্রেমে আনন্দসুন্দর।

'নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ষদ প্রধান।' নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ প্রিয় ভৃত্য, নিত্যানন্দের সঙ্গে তার ব্রজের ভাবে হাস্য-পরিহাস। 'সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম। যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম।।'

নিত্যানন্দের লীলাকালে সুন্দরানন্দ একবার জাহ্নবীর বক্ষ হতে কদম্ব ফুল চয়ন করে দুই কানে কুণ্ডল করে পরেছিল। প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় গঙ্গাগর্ভ থেকে কুমির ধরে এনেছিল। বনের বাঘ ধরে এনে কানে হরিনাম দিয়ে আবার পাঠিয়ে দিয়েছিল স্ববাসে।

চিরকুমার। চিরমুক্ত।

নিত্যানন্দের বিবাহে আনন্দময় বরযাত্রী।

শ্রীপাট মহেশপুর, মাজদিয়া স্টেশনের চোদ্দ মাইল পূবে। বিগ্রহ দারুময় রাধাবল্লভ।

(৯১)

বংশীবদন

নবদ্বীপের দক্ষিণে কুলিয়াপাহাড়পুরে আবির্ভাব। পিতা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়, মাতা সুনীলা দেবী।

যখন পাঁচ বছর বয়স, বংশীবদনকে নিমাই গৃহে নিয়ে গিয়ে লালন-পালন করে, বিষ্ণুপ্রিয়াও তার প্রতি মাতৃস্নেহে আকৃষ্ট হয়। মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করার পর বংশীবদনই শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দেখাশোনার ভার নেয়। সংসারের অন্যান্য বিলি-ব্যবস্থার কর্তৃত্বও বংশীবদনের হাতে।

মহাপ্রভুর লীলাবসানের পর বংশীবদনের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। যে নিমগাছের নিচে নিমাইয়ের জন্ম, বংশীর প্রতি মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ হল সেই গাছের কাঠ থেকে বিগ্রহ নির্মাণ করো। বংশী সেই নিমগাছের কাঠ থেকে গৌরাঙ্গমূর্তি প্রকাশিত করল। পদ্মাসনে নিজের নাম লিখে নিল। বসল নিত্যসেবায়।

কিন্তু বিগ্রহ চলে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার পিত্রালয়ে। বংশী তখন চলে গেল

বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে বলদেব তাকে আদেশ করল, দেশে ফিরে যাও, ফিরে গিয়ে আমার সেবা প্রকাশ করো।

বংশী একলা ফিরে এল। [illegible] বাঘনাপাড়া শ্রীপাট স্থাপন করল। বলরামের বিগ্রহ স্থাপন করল। সঙ্গে গোপাল, [illegible] রাধিকা আর রেবতী। এই গোপাল জগন্নাথ মিশ্রের কুলদেবতা। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এ বিগ্রহ বংশীকে দান করেছিলেন।

বলরামের [illegible] বংশী চন্দ্রশেখর পণ্ডিতের মেয়ে পার্বতীকে বিয়ে করল। সেই বিয়ের দুই ছেলে—নিত্যানন্দদাস আর চৈতন্যদাস। চৈতন্যদাসের দুই ছেলে—রামচন্দ্র আর শচীনন্দন। এই রামচন্দ্র বা রামাইকে জাহ্নবা দত্তক নেয়।

বংশীবদন একজন পদকর্তা। বাংলা ও ব্রজবুলি দুই ভাষাতেই পদরচনায় সিদ্ধহস্ত।

(৯২)

পরমেশ্বরদাস

দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। ব্রজের অর্জুন-সখা।

আবির্ভাব কেতুগ্রাম বা কাউগ্রামে। নিত্যানন্দর শিষ্যত্ব নিয়ে চলে আসে খড়দহে।

কানাইর নাটশালা থেকে প্রত্যাবর্তন করে মহাপ্রভু পানিহাটিতে রাঘব-পণ্ডিতের ঘরে পৌঁছুলে পরমেশ্বর দর্শন করতে যায়। পানিহাটিতে রঘুনাথ দাসের দই-চিঁড়ের মহোৎসবেও সে উপস্থিত।

নীলাচলযাত্রায় নিত্যানন্দের সঙ্গী। নিত্যানন্দ যখন ফিরে এল গৌড়ে তখনও পরমেশ্বরদাস তার সহচর।

শুধু তাই নয় পরমেশ্বরদাস জাহ্নবা দেবীরও সেবক, রক্ষক, অভিভাবক। জাহ্নবা দেবীর সমস্ত যাত্রাপর্বে সেই প্রধান সহায়, প্রাচীন পরিচালক। তা হোক খেতুরি, হোক বৃন্দাবন। পরমেশ্বরদাস ছাড়া কে জাহ্নবাকে গোস্বামীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে?

জাহ্নবা রাধিকা-বিগ্রহ নির্মাণ করিয়েছে। পাঠাবে বৃন্দাবনে। কে নিয়ে যাবে? আর কে। পরমেশ্বরদাস।

কী করে নিয়ে যাবে? [illegible]।

কণ্টকনগর থেকে রাধাকে নিয়ে সোজা চলে গেল বৃন্দাবন। সেইখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে ফিরে এলে আবার তার উপরে জাহ্নবার আদেশ হল, তড়া-আটপুরে গ্রামে রাধাগোপীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করো।

পরমেশ্বরদাসে তড়াআটপুরে গ্রামের বাসিন্দা হল। স্থাপন করল শ্রীপাট। জাহ্নবা নিজে গিয়ে প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন করলে।

গলায় গুঞ্জামালা, পরমেশ্বরদাস নাম-প্রেম-প্রচার-লীলায় নিত্যানন্দের সহচর। অলৌকিক শক্তি ধরে। বন্য জন্তুকেও হরি-নামে বশীভূত করে।

তড়াআটপুরে হুগলি জেলায় হাওড়া-আমতা রেলের আটপুর স্টেশনের সন্নিকট। অধুনা বিগ্রহের নাম শ্যামসুন্দর।

(৯৩)

মীনকেতন রামদাস

নিত্যানন্দের শিষ্য ও শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

সর্বদাই ব্রজরাখালের ভাবে আবিষ্ট হয়ে থাকে। হাতে ব্রজরাখালের মতই বাঁশি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের গৃহে অহোরাত্র কৃষ্ণ-কীর্তন হচ্ছে। সে আসরে মীনকেতনও আমন্ত্রিত। আসরে উপস্থিত হলে সমবেত বৈষ্ণবরা তাকে সংবর্ধনা করল, করল চরণবন্দনা। ভাবুক-ভক্ত রামদাসের প্রেমাবেশ হল। অশ্রু পুলক জাড্য কম্প—সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ দেখা দিল। 'কারো উপরেতে চড়ে। প্রেমে কারো বংশী মারে, কাহারে চাপড়ে।।' আর মাঝে-মাঝে 'নিত্যানন্দ' বলে হুংকার দিয়ে ওঠে। যে দেখে যে শোনে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়।

শুধু একজন তার সম্বর্ধনায় এগিয়ে আসেনি। সে গুণার্ণব মিশ্র।

কেন আসেনি? মীনকেতনের গুরু নিত্যানন্দের প্রতি অবজ্ঞায় নয় তো?

না। গুণার্ণব শ্রীমন্দিরে বিগ্রহসেবায় ব্যস্ত ছিল। তাই অঙ্গনে নেমে এসে মীনকেতনকে সম্ভাষণ করতে পারেনি।

কৃষ্ণসেবায় তৎপর ব্রাহ্মণের প্রতি মীন-কেতন রুষ্ট হতে পারল না। বরং উলটে সে-ই গুণার্ণবকে সম্বর্ধনা করলে। 'এই তো দ্বিতীয় সুত শ্রীরোমহর্ষণ। বলরামে দেখি যে না করিল প্রত্যুদগমন।।'

কিন্তু ঝগড়া বাধল কৃষ্ণদাস কবি-রাজের এক ভাইয়ের সঙ্গে। সে-ভাই মহা-প্রভুকেই স্বয়ং-ভগবান বলে মানে, নিত্যানন্দের প্রতি তার বিশেষ আস্থা নেই।

কী, কী বললে? শুধু ক্রুদ্ধ নয় ক্রুদ্ধ হল মীনকেতন'

কৃষ্ণদাসের ভাই বুদ্ধি কিছু বাদ-প্রতিবাদ করতে চাইল। মীনকেতন বৃথা বাক্যব্যয় না করে তার বাঁশি ভেঙে দিয়ে চলে গেল।

অনেক জীব-জন্তুকে উদ্ধার করেছে মীনকেতন, কৃষ্ণদাসের বিমুখ ভাইকেও ত্রাণ করল। নিত্যানন্দ না হলে যে বাঁশি বাজে না।

জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে মীনকেতন গেল খেতুরিতে, যোগ দিল সেই প্রেম-উৎসবে। সে উৎসবে সংকীর্তনরঙ্গে মহাপ্রভু সগণ-[illegible] সকলের নয়নগোচর হয়েছিলেন। জাহ্নবা দত্তক পুত্র রামাইকে নিয়ে চলে গেল বৃন্দাবন, মীনকেতন ফিরে এল খড়দহে।

কিন্তু, না, কদিন পরে মীনকেতনের ডাক এল। সেও চলল বৃন্দাবন। জাহ্নবা তাকে গোপীনাথের দুটি বিগ্রহ দিল—একটি কানাই ও আরেকটি বলাই। এদের নিয়ে দেশে ফিরে যাও।

বাঘনাপাড়ায় বিরাট উৎসব করে এ দুটি বিগ্রহ অভিরাম ঠাকুরকে দিয়ে দিল মীনকেতন।

(৯৪)

হরিদাস পণ্ডিত

বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামীর গোবিন্দ-বিগ্রহের প্রথম সেবক কাশীশ্বর গোঁসাই। নীলাচল থেকে মহাপ্রভুই পাঠিয়েছিলেন কাশীশ্বরকে।

পরবর্তী সেবক হরিদাস পণ্ডিত। সেও মহাপ্রভুরই নির্বাচিত।

গোবিন্দদেবের অনেক সেবক। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে 'সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।'

যারাই গোবিন্দের সেবক তারাই গোবিন্দের 'অধিকারী'।

অনন্ত আচার্যও ছিলেন একজন গোবিন্দাধিকারী, অনন্ত গদাধরের শিষ্য। আর এই অনন্তের শিষ্য হরিদাস।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর নীলাচলে যাবার পথে ছত্রভোগে পৌঁছুবার আগে আটিসারায় এক অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে মহাপ্রভু ভিক্ষে করেছিলেন।

সর্বগণ সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীর 'ভিক্ষাধম' করাইলা শিক্ষা।
সর্বরাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে।
[illegible] যাবার শুভদৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি [illegible]
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি।

অনেকে বলেন এই অনন্ত পণ্ডিতই অনন্ত আচার্য।

হরিদাস সুশীল, সহিষ্ণু, বদান্য, গম্ভীর মধুর ভাষী। তার শুধু দুই কাজ—গোবিন্দসেবা ও চৈতন্যগুণকীর্তনসেবন।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে মহা-প্রভুর শেষলীলার বর্ণনা নেই বলে হরিদাস সর্বপ্রথম কৃষ্ণদাস কবিরাজকে অনুরোধ করেন, তুমি যেন বঞ্চিত কোরো না।

(ক্রমশঃ)

সমুদ্রের তলায় অবস্থান করে গবেষণা করার উদ্দেশ্যে নির্মীয়মান গবেষণা কেন্দ্র

বিজ্ঞানের কথা

[illegible]নগরী
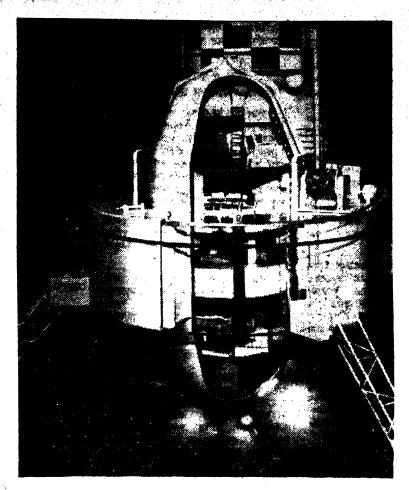
[illegible] পৃথিবীতে জনসংখ্যা যে দ্রুতহারে [illegible]ছে তাতে দুটি প্রধান সমস্যার জন্যে বিজ্ঞানীদের আজকাল বিশেষভাবে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। একটি হচ্ছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যে খাদ্যসংগ্রহ এবং দ্বিতীয়টি হল তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা। পৃথিবীর তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। তাই এই দুটি সমস্যার সমাধানের জন্যে স্থলভাগের চেয়ে জলভাগের দিকে আজ বিজ্ঞানীরা বেশি নজর দিচ্ছেন।

অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সমুদ্রগুলিকে খাদ্যসংগ্রহের উৎস, শিল্পকেন্দ্র ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যে বাসগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন।

বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি সমুদ্রে নগর স্থাপনের একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। সমুদ্র-উপকূল থেকে কিছুদূরে কাচ ও কংক্রিটে এই নগরগুলি তৈরী হবে। শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে উন্মুক্ত স্থানের পরিমাণ ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। এই সমুদ্র-নগরীগুলি তৈরী হলে তা আর হবে না। তা ছাড়া, এই সমুদ্র-নগরীগুলিতে নতুন মৎস্য-উৎপাদন শিল্প গড়ে উঠবে এবং সমুদ্রের তলদেশ থেকে উত্তোলিত প্রাকৃতিক গ্যাসকে সুদীর্ঘ পাইপের সাহায্যে মূল ভূখণ্ডে নিয়ে যেতে হবে না, এই দ্বীপ-নগরীগুলিতেই তা কাজে লাগানো যাবে।

হয়তো আগামী ৫০ বছরের মধ্যে এরকম একটি পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হবে না, কিন্তু তা হবার জন্যে প্রয়োজনীয় কলাকৌশল এখনই আমাদের হাতের কাছে প্রস্তুত। বিজ্ঞানীরা এরকম একটি দ্বীপ-নগরীর নকসাও প্রস্তুত করে ফেলেছেন। এই সমুদ্র-নগরী হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এর বাসিন্দারা যে কোন স্থল-শহরের সুযোগসুবিধা ভোগ করতে পারবেন। এর ওপর তাঁরা স্থলভাগের চেয়ে অনেক স্বাস্থ্যকর ও প্রীতিপ্রদ আবহাওয়ায় বাস করবেন।

সমুদ্র-নগরী তৈরীর পরিকল্পনা হচ্ছে এইরকম ঃ প্রথমত লোহার খুঁটির ওপর ষোলতলা একটি অ্যাম্পিথিয়েটার তৈরী করা হবে যার মধ্যে থাকবে সমুদ্র—হ্রদের আকারে। তবে একে হ্রদ না বলে 'লেগুন' বলাই ভালো, কারণ এর মধ্যে ঢোকবার একটিমাত্র প্রবেশপথ থাকবে।

লেগুনের ওপর ভাসবে মানুষের তৈরী অসংখ্য দ্বীপ।

সমুদ্রের বুকে লোহার খুঁটিগুলি পোঁতা হয়ে গেলে তার ওপর নানা রূপের পূর্বনির্মিত কংক্রিটের টুকরো জুড়ে ঘরবাড়ি তোলা হবে।

মাঝখানকার হ্রদ বা লেগুনটিতে বহু ত্রিকোণাকার কংক্রিটের সমতল নৌকা ভাসতে থাকবে। সেগুলিকে প্রয়োজনমত জুড়ে বা বিচ্ছিন্ন করে নানা মাপের দ্বীপের আকার দেওয়া হবে। তাদের ওপর হালকা ধরনের কাচ বা প্লাস্টিকের বাড়ি তৈরী হবে।

শহরকে ঘিরে শান্ত জলের পরিখা সৃষ্টি করা হবে। প্রাকৃতিক গ্যাসকে কাজে লাগানো হবে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কাজে। এতে যে অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন হবে, তার সাহায্যে জলকে নির্লবণ করবার প্ল্যান্টগুলি চালানো হবে। নানা ঘরোয়া কাজেও এই তাপ ব্যবহার করা যাবে।

শহরের চারপাশে ষোলতলা যেসব বাড়ি উঠবে, তাদের ফ্ল্যাটগুলিতে আরও ২১ হাজার লোক বসবাস করতে পারবে। লেগুনের ওপর দ্বীপগুলিতে আরও ৯ হাজার লোক বাস করতে পারবে। ঘরগুলি এমনভাবে তৈরী করা হবে, যাতে আলোর অভাব না ঘটে। সূর্যের তাপে ব্যবহৃত কাচগুলি যাতে অতিরিক্ত গরম না হয়, সেদিকেও নজর রাখা হবে।

শহরের অধিবাসীরা এস্‌ক্যালেটর, ট্রাভেলেটর ইত্যাদি করে যাতায়াত করবেন এবং ছাউনি-দেওয়া পথে হাঁটবেন। জিনিস-পত্র দেওয়া-নেওয়া হবে কন্‌ভেয়র্‌ বা নিউম্যাটিক টিউবের সাহায্যে।

এছাড়া, আভ্যন্তরীণ পরিবহনের জন্যে থাকবে বিদ্যুৎচালিত নৌকা বা ওয়াটার বাস। মূল ভূখন্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে হোভারক্র্যাফট্‌ ও হেলিবাস।

স্কুল, থিয়েটার, লাইব্রেরি, সিনেমা বা অন্যান্য সরকারী বাড়িগুলি থাকবে লেগুনের ওপর ভাসমান বড় বড় দ্বীপগুলিতে।

বলা বাহুল্য, সমুদ্রনগরীর একটি বড় বিনোদন ব্যবস্থা হবে জলক্রীড়া, কিন্তু সেখানে টেনিশ কোর্টও থাকবে, পাওয়ার স্টেশনের মাথার ওপর একটি ফুটবল মাঠও থাকবে।

সমুদ্র-নগরীকে নিশ্চয়ই সমুদ্র-শিল্পের ওপরই নির্ভর করতে হবে, যেমন মৎস্যশিল্প। সমুদ্রজলকে নির্লবণ করতে যে প্ল্যান্ট বসবে, তাতে যথেষ্ট স্বাদু জল উৎপন্ন হবে। শহরের চাহিদা মিটিয়েও পাইপযোগে তা মূল ভূখন্ডে রপ্তানি করা যাবে।

নৌকানির্মাণও শহরের অর্থনীতির অন্যতম অঙ্গ হবে। তা ছাড়া, সমুদ্রতল থেকে বালি তুলে তা চালান দেওয়া হবে। কিন্তু সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রত্যাশা হল সমুদ্র থেকে খনিজসম্পদ আহরণ করা যাবে।

গত বিশ্বযুদ্ধের সময় সমুদ্র থেকে ম্যাগনেশিয়াম আহরণ করা হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এভাবে সমুদ্র থেকে ট্রন্‌সিয়াম রুবিডিয়াম তামা এবং ম্যাঙ্গানিজ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

গঁদ ও আঠা সম্পর্কে গবেষণা প্রকল্প

জলে দ্রবণীয় গাছের বীজের গঁদ ও আঠার নতুন নতুন উৎসসন্ধানের জন্যে লখনৌ-এর জাতীয় উদ্ভিজ-উদ্যানের বিজ্ঞানীরা পাঁচ বছরের একটি প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করছেন। তরল খাদ্যবস্তুকে ঘন ও শক্ত করার জন্যে গঁদ ব্যবহার করা হয়। গঁদ তরল খাদ্যবস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলির দলা পাকিয়ে যাওয়া নিবারণ করে।

তরল বস্তুকে ঘন করার উপাদান গঁদে আছে বলেই রং, ছাপার কালি, প্রসাধন ও ভোজ্যদ্রব্য প্রভৃতিতে এই বস্তুটি ব্যবহৃত হয়।

গাছ থেকে তৈরী অনেকরকম গঁদ আমরা ব্যবহার করি। ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সেগুলি এখনও গুরুত্বপূর্ণ পণ্য-রূপে স্বীকৃত। এই আঠার বেশির ভাগ সংগ্রহ করা হয় গাছের পাতা ও ডালপালা থেকে। প্রাচীনকালে তিসি ও অন্যান্য গাছের বীজ থেকে আঠা বার করা হত।

যেসব গাছের বীজ থেকে প্রচুর পরিমাণে আঠা পাওয়া যেতে পারে লখনৌ-এর গবেষণাপ্রকল্পে সেইসব গাছ নির্বাচন করা হবে। এই গবেষণা পরিচালন করবেন উদ্ভিদ-রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ডঃ এল ডি কাপুর। আঠা ও গঁদের নতুন নতুন উৎস সন্ধানে তিনি ইতিমধ্যেই কিছু কিছু বীজ নির্বাচন করেছেন এবং উদ্ভিদের উপাদান নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা করছেন।

স্বল্প পরিসরে প্রচুর তথ্য মজুদের ব্যবস্থা

ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে স্বল্প পরিসরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তথ্য মজুদ রাখার উপযোগী একটি যন্ত্র সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভাবিত হয়েছে। যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ডাটাসেল' বা 'তথ্যকোষ'। এ থেকে মুহূর্তের মধ্যে প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য পাওয়া যায়।

ডাটা-সেল দেখতে একটা চতুষ্কোণ বাক্‌সের মতো। উচ্চতায় ১৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ও বেধে ৩ ইঞ্চি। যন্ত্রটির ওজন প্রায় পাঁচ পাউন্ড।

প্রায় চার কোটি অক্ষর ও সংখ্যায় যত তথ্য লিপিবদ্ধ করা সম্ভব, এর প্রতিটি সেল-এ সেই পরিমাণ তথ্য সঞ্চিত রাখা যায়। এতে আছে ২০০টি ম্যাগনেটিক টেপ-এর টুকরো। তাতেই উৎকীর্ণ হয়ে থাকে এই সকল তথ্য।

ডাটা-সেল থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য বার করতে হলে একে 'ডাটা-সেল ড্রাইভ' নামে আর একটি যন্ত্রের মধ্যে রাখতে হয়। শেষোক্ত যন্ত্রটি আকারে একটি রেফ্রিজারেটরের মতো। তারের সাহায্যে এটি কম্প্যুটারের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

কম্প্যুটার থেকে সংকেত আসামাত্রই ডাটা-সেল ড্রাইভ নির্দিষ্ট তথ্য সম্বলিত টেপ-এর টুকরোটি নিমেষের মধ্যে খুঁজে বার করে অন্য একটি কেন্দ্রে স্থাপন করে। এই কেন্দ্রের নাম 'পানিবিখন'। এই কেন্দ্রে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে টেপ-এ লিপিবদ্ধ তথ্য উদ্ধার করা হয়, কিংবা প্রয়োজনমত অতিরিক্ত বা নতুন তথ্য সংযোজন অথবা সঞ্চিত তথ্য সংশোধন করা হয়।

এরপর টেপটি আবার যথাস্থানে রেখে দেয় ডাটা-সেল ড্রাইভ। ইতিমধ্যে উদ্ধার-করা তথ্য কম্প্যুটারে সঞ্চারিত হয়ে কাগজে ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে আসে, কিংবা টেলি-ভিশনের মতো পর্দায় প্রতিফলিত হয়। এর সমস্ত কিছুতে সময় লাগে মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

ভারতীয় বনৌষধি

আমরা জানি, রক্তে শর্করার হার বৃদ্ধি পেয়ে বহুমূত্রতা দেখা দেয় এবং এই রোগ উপশমে ইনস্যুলিন বিশেষ কার্যকর। ইনস্যুলিন হচ্ছে স্তনপায়ী প্রাণীদের অগ্ন্যাশয়-রসে প্রাপ্ত একটি স্বাভাবিক হর্মোন। শ্বেতসারের দহনে ইনস্যুলিন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্তমানে ইনস্যুলিন সংশ্লেষণের চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা এবং এক্ষেত্রে কিছু সাফল্যও লাভ করা গেছে।

ভারতীয় বনৌষধি জাম-গাছ যকৃৎ ও শর্করা সংক্রান্ত রোগ উপশমে বেশ ভালো কাজ দেয় বলে অনেকদিন থেকে জ[illegible] আছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা দে[illegible] জাম ফলের বীজে একটি উপক্ষা[illegible] যায়। 'জাম্বোসিন' নামে [illegible]হিত উপক্ষারটি রক্তে শর্করার হার অনেক[illegible] কমিয়ে দেয়, যদি এর বীজের জ[illegible] নিষ্কাশন দেহাভ্যন্তরে ইঞ্জেকশন করা হয়। গৃহপালিত কুকুরের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু মুখ দিয়ে যদি এটি প্রয়োগ করা হয়, তা হলে তেমন ফল পাওয়া যায় না। কালো জাম ও গোলাপ জামের ফল আমাশয়, বাত, বহুমূত্রতা ও যকৃতের রোগে বেশ উপকার দেয়। কালো জামের পাতা ও ছালে জাম্বোসিন উপক্ষার আছে বলে জানা গেছে। ছোট ছেলে-মেয়েদের পেটের অসুখে কালো জামের ছালের রস অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বহুমূত্র রোগে ইনস্যুলিনের স্থান জাম গ্রহণ করতে পারে কিনা সে সম্পর্কে এখনও তেমন গবেষণা হয়নি। তবে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

—শুভঙ্কর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।।৩০।।

একেবারেই কোন প্রস্তুতি ছিল না। এর মধ্যে কোনদিন সুদূর চিন্তাতেও আসে নি কথাটা। এ সম্ভাবনা পর্যন্ত মনে ওঠে নি একবারও। কোন দুঃস্বপ্ন বা কুলক্ষণ দেখেছে বলেও মনে পড়ে না। একেবারেই অকস্মাৎ ঘটে গেল ঘটনাটা। কী হল তা ভাল করে বোঝবার আগেই। যেন বিরাট একটা ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলেন বসুমতী, ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে একটা অন্ধকার গহ্বরে রূপান্তরিত হল তার পায়ের নিচের মাটি। অন্তত সুরবালার তাই মনে হল। খান খান হয়ে ভেঙে গেল তার ইহলোকের স্বর্গ, ধুলো হয়ে ধুলোয় মিশে গেল তার সুখের প্রাসাদ।

পাবনার দিকে কিছু জমিদারী ছিল রাজাবাবুদের। বিশেষ যেতেন না কখনও। গেলেও দু বছর তিন বছরে একবার। এবার আরও দেরি হয়ে গিয়েছিল। একবার অন্তত না [illegible]েই নয়—সেই হিসেবেই, প্রায় মরীয়া হয়ে [illegible] পড়েছিলেন এবার। যাওয়ার [illegible] দিন [illegible]রবালাকে বলে গিয়েছিলেন দিন-সাতেকের মধ্যেই ফিরে আসবেন নিশ্চয়। কোনমতেই দেরি করবেন না। দীর্ঘ দিন উড়িষ্যাতেও যাওয়া হয় নি, সেখানে জমিজমাও কিছু আছে, এছাড়া বড় যেটা সেটা হর্তুকীর কারবার। পাবনা থেকে ফিরেই উড়িষ্যা যাবেন — এবং এবার সুরোকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। যাজপুর, বালেশ্বর, কটক হয়ে শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত যাবেন, সুরোকে জগন্নাথ দর্শন করিয়ে আনবেন। এখন থেকেই নাকি সেই মত ব্যবস্থা হয়ে থাকছে, ইতিমধ্যেই লোক চলে গেছে সেখানে, গাড়ি-ঘোড়ার বন্দোবস্ত করতে।

অর্থাৎ শরীর ভালই আছে। এমনিতেও অসুখ বড়-একটা তাঁর হতে দেখে নি সুরো। 'শরীর খারাপ' একথা কেউ বড়-একটা শোনে নি তাঁর মুখে। সেদিনও ভাল ছিলেন বেশ, শরীর বেগড়াবার কোন লক্ষণই দেখা যায় নি নাকি। ট্রেনে খাওয়া-দাওয়া কিছু করেন নি—বাইরে খাওয়া সম্বন্ধে বরাবরই তাঁর একটা আতঙ্ক ছিল, সঙ্কোচও। সুতরাং সেদিক দিয়েও কোন অসুবিধে ঘটার কারণ ছিল না। একেবারেই হঠাৎ—ঈশ্বরদীতে ট্রেন থেকে নেমে বজরা চড়ার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন চড়ার ওপরই। সঙ্গে লোকজন ছিল, ও'র নিজস্ব খানসামা, সরকারমশাই — ওপার থেকেও আমলার দল এসেছিল ও'কে নিয়ে যেতে। তারা ছুটোছুটি করে আরও লোকজন জড়ো করল। ডাক্তার বলতে কাছাকাছি যিনি ছিলেন কম্পাউণ্ডার থেকে ডাক্তার—তাঁকেও ডাকা হল। তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'ভারী কঠিন অবস্থা। এখনই কলকেতায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। আমি কিছু ভাল বুঝছি না। সন্ন্যাস রোগও হতে পারে—মৃগী হওয়াও আশ্চর্য নয়।'

যারা নিতে এসেছিল তারাই আবার ধরাধরি করে ফিরতি ট্রেনে চাপিয়ে দিল, সঙ্গে উঠলও দু-তিনজন। তাদের যা করণীয় সবই করল, মুখে মাথায় জল দেওয়া, বাতাস করা, গরম দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা—যা যা জানা ছিল আর যে যা বলল, কোনটারই ত্রুটি হল না। কিন্তু কিছুতেই রাজাবাবুর জ্ঞান ফিরল না। অন্য কোন রোগেরও লক্ষণ বোঝা যায় না; জ্বরটর নয়, বিকারেরও চিহ্ন নেই—শুধু বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। কেবল পরের দিন মনে হল নাক দিয়ে সামান্য একটু রক্তের মত গড়িয়ে পড়েছে, মুখেও অল্প অল্প গাঁজলা উঠেছে—সেটাও রক্তাভ।

বাড়িতে পৌঁছবার পর অবশ্য চিকিৎসার কোন ত্রুটি রাখল না কেউ। কলকাতায় যত বড় বড় ডাক্তার ছিলেন তখন—তাদের সবাইকেই ডাকা হল। কেবল রসিক দত্তকে পাওয়া গেল না—তিনি নাকি দার্জিলিঙ গেছেন কদিনের জন্যে। সেকথা শুনে অনেক প্রবীণ লোক হতাশাসূচক ঘাড় নাড়লেন। কিম্বদন্তী যাকে কালে ধরে তাকে আর কিছুতেই আর এল দত্তকে দিয়ে দেখান যায় না, ও'র ওপর ভগবান প্রসন্ন—বদনাম করতে দেন না। যাঁরা এসেছিলেন অবশ্য তাঁরাও খুব সামান্য নন, যা করবার তাঁদের শাস্ত্রে যা আছে—সবাই সব করে দেখছেন তবু কিছুতেই কিছু হল না। কলকাতায় ফিরে আসার পর আরও দুদিন অমনি বেহুঁশ পড়ে থেকে সেই অবস্থাতেই মারা গেলেন রাজাবাবু। কাউকে চিনতে পারলেন না, কাউকে কিছু বলে যেতে পারলেন না—স্ত্রী-পুত্রের কাছেও বিদায় নেওয়া হয়ে উঠল না। এই যে শ্যামা পৃথিবী তার রূপে রসে গন্ধে বর্ণে—এতদিন তাঁকে পালন ও পোষণ করে এসেছে, যুগিয়েছে আনন্দ ও সম্ভোগের সহস্র উপকরণ, সঞ্জীবিত করে রেখেছে প্রাণরসে—তার দিকে একবার শেষবারের মত তাকিয়েও যেতে পারলেন না। চোখই খুললেন না আর। শুধু শেষ মুহূর্তে একবার যেন কথা বলার মত করে ঠোঁট দুটো নড়েছিল—কিন্তু কোন স্বর বেরোয় নি। ইষ্টের নাম উচ্চারণ করার চেষ্টা করেছিলেন—কিম্বা কোন প্রিয়জনের নাম—তা কিছুতেই বোঝা গেল না।.....

ডাক্তাররা কেউ বললেন, 'এও এক ধরনের সন্ন্যাস রোগ, মাথায় রক্ত উঠে ভেতরের শির ছিঁড়ে গেছে।' কেউ বললেন, 'মাথায় বাত উঠেছে, সেও নাকি হয় কারও কারও।' কেউ বা মত প্রকাশ করলেন, 'আসলে হার্টটাই ড্যামেজড হয়ে এসেছিল, উনি অতটা লক্ষ্য করেন নি, আগে থেকে সাবধানও হন নি। তাই এই বিপত্তি।...তবু, যদি সঙ্গে সঙ্গে কেসটা হাতে পেতুম—হয়ত কিছু করা যেত। অন্তত ভাল রকম একটা এফোর্ট দিতে পারতুম।'

যে যা-ই বলুন, কিছু তর্কও করলেন চিকিৎসকরা নিজেদের মধ্যে—আসল ঘটনা যেটা, সেটা হল—মৃত্যু। কোন কারণ জানা গেল না সঠিক—কিন্তু জানলেও বেশকার কোন সান্ত্বনা লাভ হত না, মানুষটা ফিরে আসত না আর কিছুতেই। 'ডেথ ডিউ টু ফেলিয়োর অফ হার্ট'—এই সার্টিফিকেট লিখে দিলেন ও'দের বাড়ির ডাক্তার নীলরতনবাবু। সেইখানেই তাঁদের দায়িত্ব ও চিন্তার শেষ হয়ে গেল। সম্ভবত ভুলেই গেলেন 'কেসটা'—দু-একদিনের মধ্যেই।

সুরবালা এসব কিছুই জানত না। এত বড় দুর্ঘটনার কোন সংবাদই পায় নি। সে নিশ্চিন্ত ছিল—রাজাবাবু কোন্ এক পাবনা জেলায় কোন এক গ্রামে তাঁদের কাছারীবাড়িতে বসে প্রজাদের আর্জি শুনছেন। কোন পরমাত্মীয় বা প্রিয় ব্যক্তি বিদেশে থাকলে সাধারণত যতটা দুশ্চিন্তা হয়—তার চেয়ে বেশী কোন চিন্তা ছিল না। শুধু অধীর আগ্রহে দিন গুনছিল —এক সপ্তাহ বলে গেছেন, তার কদিন আর বাকী রইল, গত দুদিন যে এই কলকাতা শহরেই মাত্র আধ ক্রোশের মধ্যে পড়ে রইলেন মানুষটা—সে খবরও কেউ দিয়ে যায় নি ওকে, লোক পরম্পরায়ও কোন খবর পায় নি। আগে আগে সরকারমশাই রোজ একবার করে সংবাদ নিয়ে যেতেন, এখন পুরনো চাকর

গিরিধারীই বাজার-হাট করে, বিশেষ কোন জিনিসের দরকার থাকলে রাজাবাবুই কিনিয়ে রাখে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসেন। সরকারমশাই কখনও-কখনও কালে-ভদ্রে আসেন আজকাল। তাই সেদিক দিয়েও খবর পাবার বা নেবার কোন প্রশ্ন ওঠে নি—অথবা সরকারমশাই কেন আসছেন না বলে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠারও কারণ দেখা দেয় নি। সরকারমশাইয়েরও এই দুদিন অন্য কোন কথা মনে ছিল না—একবার-দু মিনিটের জন্যেও বিশ্রাম নিতে পারেন নি—বা অন্য কোন কাজ করতে পারেন নি।

তবু তিনিই মনে করলেন। মৃত্যুর পর সৎকারের প্রাথমিক আয়োজনগুলো শেষ হয়ে গেলে—আত্মীয়স্বজনদের খবর দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, এঁদের আত্মীয়রা বেশির ভাগই এই আহিরীটোলা, শোভাবাজার বৌবাজারে থাকে খুব দূরে থাকলেও চুঁচড়োর ওধারে কেউ নয়, তারা সকলেই এই দু দিনের মধ্যে খবর পেয়ে গেছে—সরকারমশাইয়েরই প্রথম মনে পড়ল সুরোবালার কথাটা। বহুদিনের প্রবীণ লোক, রাজাবাবুর সঙ্গে মনিব-কর্মচারীর সম্পর্ক ছাড়িয়ে একটা সৌহার্দ্যের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, অনেক সময় তিনি অনেক জটিল পরামর্শও করতেন এই সামান্য বেতনের কর্মচারীটির সঙ্গে। তিনি সুরবালাকে দেখছেন—সেই প্রথম থেকে বাগান-বাড়িতে খবর নিতে যেতে হত তাঁকে। প্রথম প্রথম বাবুর রক্ষিতার ফরমাশ খাটতে হচ্ছে—এমনি একটা অভিমানবোধ ও বিরূপতা থাকলেও সুরবালার ভদ্র বিনম্র ব্যবহারে সেটা কেটে যেতে দেরি হয় নি। সুরবালা যেমন খাতির করত, গেলে আগে বসাত পান জল জলখাবারের ব্যবস্থা করত, এমন আদর অভ্যর্থনা তিনি কোনদিন রাজাবাবুর অন্তঃপুরে পান নি, ছেলে-মেয়েরা সল্প স্বল্প বেতনের কর্মচারীকে সেইভাবেই দেখত, তার সঙ্গে সম্ভ্রমসূচক ব্যবহার করা সম্ভব তাও তারা জানত না। সুরবালার আচরণে — সমান অবস্থার মানুষের মত সহজ অন্তরঙ্গ অথচ সসম্মান ব্যবহারেই সরকারমশাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, বিরূপতা বা বিদ্বেষ স্নেহ ও প্রীতিতে পর্যবসিত হয়েছিল। তিনি ইদানীং সুরোকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন। রাজাবাবুর স্ত্রীকে 'রাণীমা' বলতেন বাধ্য হয়ে—সুরোবালাকে 'মা' বলতেন স্বেচ্ছায়, মন থেকে। বলতেন 'মা, তুমি যে বামুনের মেয়ে আর সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে—এ কাউকে বলে দিতে হয় না। আমরা এই কলকাতার কায়েত, বনেদী ঘরের ছেলে অভাবে পড়ে এখানে চাকরি করতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু বনেদীয়ানা দেখলেই চিনতে পারি! আমরা যে কাউকে কাউকে ছোট জাত বলি, নিছক অকারণে বলি না—তাদের ব্যবহারেই সেটা যেন ছাপ-মারা থাকে। পয়সা যতই হোক সে ছাপটা উঠতে চায় না।' বলতে বলতেই হয়ত সচেতন হয়ে যেতেন, 'তবে হ্যাঁ—দু-একজন কি আর এ হিসেবের বাইরে হয় না, তাও হয়। সে হল গে ভগবানের আশীর্ব্বাদ গেল জন্মের সুকৃতি। কিম্বা গেল জন্মেরই পাপের ফল। হয়ত বামুনের ঘরের লোক এ জন্মে অন্য ঘরে এসে পড়েছে, সে সংস্কারটা যায় নি।'

কাদের কথা বলতে চাইছেন সরকার-মশাই, সুরবালা তা বুঝত। মনে মনে কৌতুক অনুভব করলেও তাঁর সামনে চুপ করে থাকত। রাজাবাবুকেও কোনদিন বলে নি এসব কথা। হাজার হোক তাঁর আত্মীয়—আপনজন তাঁর স্বজাতির কথা, খুশী হবেন না শুনলে, চটে যাওয়াও বিচিত্র নয় সরকারের ওপর।......

সরকারমশাই-ই উদ্‌ভ্রান্তভাবে হাউ-হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে এসে খবরটা দিলেন। একটা গাড়ি করে আসার কথাও মনে পড়ে নি তাঁর, গায়ে পিরান আছে—সেটাও কোনমতে পরা চাদর নেই, পায়ে জুতো নেই—পাগলের মতই সমস্ত পথটা ছুটতে ছুটতে এসেছেন।

নিচে নিস্তারিণী ছিল। সে ওঁকে দেখে কি বুঝল কে জানে সেও চিৎকার করে কেঁদে উঠল। সেই কান্নার শব্দেই ওপর থেকে ছুটতে ছুটতে নেমে এল সুরবালা।

'কী-কী হয়েছে সরকারমশাই? কার কি হল!'

'আর কি হল মা, তোমার আমার—আমাদের সবাইকারই সব্বনাশ হয়ে গেল। মা, মাগো—এ খবর কী করে তোমায় বলব মা, আমার মুখ দিয়ে যে বেরোতে চাইছে না।'

তবু বুঝতে পারে না সুরবালা।

রাজাবাবুর স্ত্রী? কোন ছেলে-মেয়ে? জামাই? পুত্রবধূ?

এদের কেউ মারা গেছে? কিম্বা খুব অসুস্থ?

রাজাবাবুর কথাটা একবারও তার মাথায় এল না।

তিনি তো এখনও পাবনায়। তাঁর খবর এরা কেমন করে জানবে! তাঁর তো আসারও সময় হয় নি।

'কী-কী হয়েছে সরকারমশাই! আমি যে—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না! ভেঙ্গে না বললে—'

অনেকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে সুরবালা।

'আমরা যে অনাথ হলুম মা—এখনও কি বুঝতে পারছিস না! তোর যে সব্বনাশ হয়ে গেল। ইন্দ্রপাত ঘটে গেল যে। রাজা-বাবু—কেমন করে মুখে উচ্চারণ করব মা!' আবারও হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠেন তিনি।

'য়্যা!'

একটা আকুল আর্তস্বর, মনে হল কোন মানুষের গলা নয়—যেন কোন ধাতব যন্ত্রের মধ্যে থেকে একটা তীব্র তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেরিয়ে এল, সে স্বর এই উঠোনে ধরা সম্ভব নয়—মনে হ'ল চারিদিকের দেওয়াল বিদীর্ণ করে কোথায় যেন বেরিয়ে চলে গেল—চতুর্দিকের স্বরমণ্ডলীকে তীক্ষ্ণ তীরবিদ্ধ করে—কিছুক্ষণের জন্য নিঃশব্দ নিস্পন্দ করে দিয়ে। এরকম একটা শব্দ এর আগে কেউ কখনও যেন শোনে নি, যার কানে গেল—যেন অসাড় করে দিল তার শ্রবণশক্তি।

তারপরই হাহাকার করে উঠল সে, না না সরকারমশাই, সে কি করে হবে। সে হতে পারে না। তিনি যে—তিনি তো পাবনা গেছেন। তাঁর তো ফিরতেই এখনও দেরি। ভুল করছেন আপনি, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কী বলতে কী বলছেন। অন্য কার কথা বলছেন, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আপনার!

হাহাকার করে উঠেছে নিস্তারিণীও। সে বুঝেছে সরকারমশাইয়ের কথা। তারও যথেষ্ট শোকের কারণ ঘটেছে, আঘাতও কম লাগেনি। পূর্বেকার বিদ্বেষ স্নেহে পরিণত হয়েছে বহুদিন। রাজাবাবু তাঁর ভদ্র ব্যবহারে, অকৃত্রিম মনোযোগে ও শ্রদ্ধা-ভক্তিতে জামাইয়ের পদবীতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন নিস্তারিণীর মনে—বরং পুত্রস্থানই অধিকার করেছিলেন কতকটা। কিন্তু তবু তাঁর অতটা বিমূঢ় বা বিহ্বল অবস্থা হয় নি, এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করতে পেরেছে সে।

সে হাহাকারে সরকারমশাইয়ের কান্নাও মিলিত হয়। তিনি বলেন, 'ওরে মা রে, ভুল হলে যে আমি বাঁচতুম মা। সত্যিসত্যিই কেন ভীমরতি হল না আমার! এ খবর দেবার আগে, এ দেখবার আগে আমার কেন মৃত্যু হ'ল না। পাবনা যাওয়া হয় নি যে মা বাবুর! পথের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান, সেই অবস্থাতেই ফিরিয়ে আনে ওরা,—তারপর দুদিন মাত্র, মোটে এই দুটো দিন সময় পাওয়া গিয়েছিল—ডাক্তার বদ্যি মানুষের যা সাধ্য সবই করা হয়েছে—কিছুতেই কিছু হ'ল না। এই বেলা দশটার সময়—সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই—সব শেষ!.. ওঃ, বাপ রে! বুক বুঝি ফেটে যায় রে মা,—আর যে পারছি না আমি সইতে! আজ চল্লিশ বছর এক জায়গায় কাজ করছি, অন্য কোন কাজ অন্য কোন মনিব জানতে হয় নি। মনিব নয়—বড় ভাই-ই ছিলেন

তিনি, যথার্থ বন্ধু। ওঃ, এর আগে আমি যেতে পারলুম না, আমি গিয়ে তিনি থাকলে অনেক লোকের উপকার হ'ত যে মা, এ যে একসঙ্গে সবাই অনাথ হলুম রে...যাই—যাই আমি—'

এলোমেলো অসংলগ্ন পাগলের মতো করে কথাগুলো বলে হঠাৎই আবার বেরিয়ে চলে গেলেন সরকারমশাই, যেমন কাঁদতে কাঁদতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে এসেছিলেন—তেমনি ভাবেই।...

কিছুই জানা গেল না আর। সে মৃতদেহ কোথায়, কখন বেরোবে শবযাত্রা, কোন শ্মশানে যাবে—একবার শেষবারের মতো দেখা সম্ভব কি না—কিছুই না। একেবারে সমস্তক্ষণই অচৈতন্য হয়ে ছিলেন, না একবারও জ্ঞান হয়েছে—কিছু বলতে পেরেছেন কিনা, শেষ মুহূর্তে সুরবালার কথা মনে ছিল কিনা—তাও জানা হ'ল না। অবশ্য এসব প্রশ্ন করার অবস্থাও ছিল না সুরবালার, কেউ নিজে থেকে বললেও মাথায় যেত না তার। সরকারমশাই লক্ষ্য করেন নি অত, নিস্তারিণীও না—সুরবালা সেই যে সিঁড়ির শেষ ধাপটায় ধপ্ করে বসে পড়েছিল, সেইখানে বসে সেই অবস্থাতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। সরকারমশাইয়ের শেষ কথাগুলোও সম্ভবত তার কানে যায় নি। তিনি যে উদভ্রান্তের মতোই কখন চলে গেলেন তাও টের পেল না...

ঝি-চাকররা বেরিয়ে এসেছিল এই চেঁচামেচিতে। তখন দুপুর শেষ হয়েছে, অপরাহ্ন শেষ হয় নি—এমনি সময়টা; পাশের বাড়ির ভাড়াটে মেয়েগুলোর দিবানিদ্রা তরল হয়ে এসেছে—তারাও কেউ কেউ ছুটে এসেছিল এই চিৎকার ও কান্নার শব্দ পেয়ে। তার মধ্যে সরস্বতী বলে মেয়েটিই প্রথম লক্ষ্য করল সুরবালার অবস্থাটা, 'অ মাসীমা—দিদি যে মূর্চ্ছো গেছে গো। অ-গিরিধারী জল আন্ জল আন্। পাখাটা—অ নেত্য মা, পাখা একখানা আনতে পারছিস না! শিগগির [illegible]

তখন সকলেই ছুটে এল চারিদিক থেকে। ধরাধরি করে—নানুর জন্যে নির্দিষ্ট ছিল যে ঘরটা—সেইখানে একটা মাদুরের ওপর শুইয়ে দিলে মাথায় মুখে জল দিয়ে হাওয়া করতে লাগল দু-তিনজন। চাঁদুর ঘরে স্মেলিং সল্ট থাকে—তার মূর্চ্ছার ব্যায়রাম আছে, সে স্মেলিং সল্টের শিশি আনতে ছুটল। দরকার তার নিজেরও, মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে এই কান্নাকাটিতে।

নিস্তারিণী কিন্তু ভেতরে আসে নি, সে ঠিক সেই ভাবেই বুক চাপড়ে কেঁদে যাচ্ছে। মেয়ের জন্যে তার দুশ্চিন্তা নেই। সে নিজে মেয়েছেলে, জানে যে, যে মেয়ের কপাল পোড়ে তার সয়ও অনেক। এও সহ্য হবে। শোকে মরবে না। মরে না কেউ। অন্তত সে কাউকে শোকে মরতে দেখে নি আজ পর্যন্ত। নিস্তারিণীর নিজের শোকটা প্রবল। আন্তরিক। রাজাবাবু যে কখন ধীরে ধীরে তার গণেশের স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছিলেন তা এতকাল বোঝে নি। আজ প্রথম বুঝল। এরকম ক্ষেত্রে আঘাতের তীব্রতা পুরোপুরি অনুভব করতে সময় লাগে—ক্ষতির পূর্ণ তাৎপর্যও। রাজাবাবু যে সত্যিই মারা গেছেন সেটা সুরোর আগে বুঝতে পারলেও—সে শূন্যতা যে কতখানি কতটা যে গেল ওদের জীবন থেকে, কতখানি সর্বনাশ হ'ল—সেটা ক্রমশ বুঝছে সে, ধীরে ধীরে—তাই শোকের প্রাবল্য কমছে না, হাহাকার বেড়েই যাচ্ছে বরং।

সুরবালার জ্ঞান ফিরতে বেশ সময় লাগল।

এরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন হুঁশের লক্ষণ দেখতে পেল না—তখন চিন্তিত হয়ে উঠে গিরিধারীকে ডাক্তার ডাকতে পাঠাবার কথা আলোচনা করছে—ঠিক সেই সময় চোখের পাতা কাঁপল তার, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। আরও খানিক পরে চোখ খুলল সে। কিন্তু তবু তখনই কোন কথা মাথায় গেল না, বিহ্বল দৃষ্টি মেলে এদের মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু। তারপর একটু একটু করে সেই বিহ্বলতার মধ্যেই বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল। আরও কিছুক্ষণ পরে—বোধ করি বাইরের কান্নার শব্দটা যে নিস্তারিণীর সেটা বুঝতে পারার পর—উত্তরও পেল সে জিজ্ঞাসার। সমস্তটাই মনে পড়ে গেল এবার। ধড়মড় করে উঠে বসল সে।

'শোও, শোও, ও দিদি আর একটু শুয়ে থাকো, এখনই উঠতে যেয়ো না।' সরস্বতী মিনতি করে বলতে যায়। হাঁ-হাঁ করে উঠে বাকী মেয়েরাও।

কিন্তু সুরবালা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। মূর্চ্ছার ঘোর তখনও কাটে নি, পা টলছে—তবু সেইভাবে টাউরি খেতে খেতে, দেওয়াল কপাট গোবরাট—যেটা সামনে পড়ছে সেটাই ধরে সামলে নিতে নিতে সে একেবারে সদরে এসে পড়ল, সদর থেকে রাস্তায়। তারপর সেইভাবে একবস্ত্রে ছুটল তার বহুদিন আগেকার পরিচিত পথ ধরে গঙ্গার দিকে। খোঁপাটা খুলে কাঁধে ঝুলছে, দুপুরে জামা খুলে ঘুমিয়েছিল—সে জামা গায়ে দেবার সময় হয় নি, কাপড়খানাও গুছিয়ে পরার অবসর মেলে নি—সেই আলুথালু অসম্বৃতভাবেই ছুটে চলার মতো করে হাঁটতে লাগল। রাস্তার লোক অবাক হয়ে চেয়ে থাকছে—কারণ চোখে জল নেই। এ অবস্থায় কেউ কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে— দেখলে তার অর্থ বুঝতে পারে মানুষ। সুরবালার কান্না পাচ্ছে না তখনও। ঘটনাটার পূর্ণ তাৎপর্য তখনও তার মাথাতে যায় নি বোধহয়। আঘাতের যে মাত্রায় মানুষের চোখে জল আসে, তার চেয়ে অনেক বেশী আঘাত লেগেছে তার, আর লেগেছে একেবারে অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে। তাই কান্নার অবস্থা আসে নি তখনও। কে দেখছে, কোথায় যাচ্ছে সে, কী হয়েছে, কেন এভাবে ছুটে যাচ্ছে—তাও জানে না। শুধু যেতে হবে, আর একবার দেখতে হবে—এই জানে। সেই যে মিথ্যে স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে রেখে গেল, একবার জানতেও দিল না সেই বিদায়ই শেষ বিদায়—সেই প্রতারণার বোঝপড়া করতে হবে তার সঙ্গে। জীবিত কি মৃত, তা অত জানে না, তা নিয়ে মাথাও ঘামাচ্ছে না এখন, সামনে গিয়ে দাঁড়াক আগে—তারপর বুঝবে।

স্পষ্ট এরকম কোন চিন্তা নেই তার, বুঝি কোন চিন্তাই নেই, সে সাধ্যও নেই—অর্থহীন কতকগুলো ছেলেমানুষী কথা মাথায় উঠছে এই মাত্র—একটা ঘোরের মধ্যে চলেছে, অস্পষ্ট একটা সংকল্প নিয়ে—

মেয়েরা ততক্ষণে চেঁচামেচি করে উঠেছে। সরোজিনী চন্নন চাঁদু—এরাও বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। চাকর গিরিধারীও। সে চেঁচামেচিতে নিস্তারিণীরও কিছুটা সম্বিত ফিরেছে, সেও ব্যাপারটা শুনে, 'ওরে ধর ধর—অ মা সরো আটকা মা, ধরে ফেল যেমন করে হোক—দ্যাখো অলুক্ষুনী আবাগী মেয়ে কী কান্ড করে বসে!' বলতে বলতে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু তার মধ্যেই অনেকটা এগিয়ে গেছে সুরবালা। ও যে এত জোরে হাঁটতে পারে এখনও, এতকাল গাড়ি পালকী চড়ার পরও—তা কে জানত!

তবু চম্পন এগিয়ে গিয়ে হাতটা ধরল একবার। কিন্তু এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল সে হাত। মত্ত অসুরের বল যেন তার দেহে।

কোথায় যাচ্ছে তা অবশ্য বুঝতে পারে এরা।

সরোজিনী বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, 'নিমতলায় যদি না নিয়ে গিয়ে থাকে? কাশী মিত্তিরে যদি নিয়ে যায়? একটু খবর আনিয়ে নিই না—- তারপর একটা গাড়ি ডাকিয়ে গেলেই হবে বরং?'

উত্তর দেয় না সুরবালা। কিছুই বলে না। এদের কথা কানে যাচ্ছে কিনা তাও বোঝা যায় না। তেমনি উন্মত্তের মতো এগিয়েই চলে শুধু। খুব সম্ভব শারীরিক অক্ষমতাতেই আগের সেই ছুটে চলার মতো দ্রুততা নেই—তবু হন-হন করেই চলেছে সে। তার সংগে তাল রাখতে বরং এদের ছুটতে হচ্ছে।

ওরা যখন নিমতলার ঘাটে পৌঁছল তখন রাজাবাবুর শব এসে গেছে। কাজ করা বড় বোম্বাই খাটে অজস্র ফুল দিয়ে সাজিয়ে এনেছে তাঁকে। সেটা দূর থেকেই দেখা গেল। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখা হয়ে উঠল না। অসংখ্য লোক এসেছে শবযাত্রায়—তিন ছেলে, দুই জামাই, তিন-চারটি ভাইপো, মামাতো, খুড়তুতো পিসতুতো ভাই-ভাইপোরা—শালা, শালার ছেলে ভায়রাভাইয়ের দল, তাদের ছেলেরা—এছাড়া তাঁর অগণিত কর্মচারী। বস্তুত তারা একটা ব্যূহ রচনা ক'রে রেখেছে চারদিকে। সে ব্যূহ ভেদ ক'রে ভেতরে যাওয়া অসম্ভব। ওরা যখন ঢুকছে তখন—ঠিক সেই মুহূর্তে খাটটা নামানো হচ্ছে—তাই এক পলক দেখতে পেয়েছিল তবু, নইলে তাও দেখা হত না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সুরবালা সেইদিকে চেয়ে।

তখনও তার চোখে জল নেই, ঠোঁটের ওপরে ঠোঁট চেপে বসা—এতটুকু স্পন্দন নেই তাতে। কান্নার কোন লক্ষণই নেই। যেন পাথর হয়ে গেছে সে, কোন এক অজ্ঞাত অভিশাপে।...

শবযাত্রীরাও দেখেছে ওদের। চিনতেও ভুল হয়নি। ঘৃণায় আর বিদ্বেষে কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে তাদের ললাট আর ওষ্ঠাধর। চুপি চুপি কি আলোচনাও করছে। সম্ভবত ওদের স্পর্ধা দেখেই অবাক হয়ে গেছে।...

প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল আয়োজন সম্পূর্ণ করতে—চিতা সাজাতে। এই সমস্তক্ষণ এরা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সুরবালা আছে বলেই এদেরও থাকতে হয়েছে। নিস্তারিণী আসেনি শেষ পর্যন্ত, আসতে পারে নি। খানিকটা এসে ফিরে গেছে। আছে ভাড়াটে মেয়েরা পাঁচ-ছজন আর গিরিধারী। মেয়েরা দু-একবার হাত ধরে নাড়া দিয়েছে সুরবালার, কথা বলেছে, কাঁদাবার চেষ্টা করেছে—কিন্তু পাষাণে প্রাণের লক্ষণ জাগে নি। সেইভাবে নির্নিমেষ নেত্রে ঐদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুরো। মনে হচ্ছে ঐ যে মানুষগুলো তার দয়িত তার দেবতার চার পাশে প্রাচীর রচনা করে রেখেছে—তাদের দেখতেই পাচ্ছে না সে, অথবা তাদের দেহগুলো ভেদ করে দৃষ্টি চলে গেছে সেইখানে সেই লোকটির কাছে, যার দিকে চাইলে যে কোন সময়ে, যে কোন অবস্থায় ওর দৃষ্টি স্নিগ্ধ মধুর হয়ে আসে—অথবা এতকাল আসত।...

হরিধ্বনি দিয়ে ঠিক যখন চিতায় তুলছে ওরা শব, সেই সময়—আজ এই প্রথম—যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত প্রাণলক্ষণ দেখা দিল নির্জীব জড় পাষাণপ্রতিমায়। বোধহয়, মনে হল, উত্তপ্ত আরক্ত লৌহ-শলাকার মতই ঐ পবিত্র হরিধ্বনি আজ তার কর্ণমূল ভেদ করে মর্মে গিয়ে লাগল, সেই জ্বালাতেই ছটফট করে নড়ে উঠল যেন। তারপর কী ঘটল, কি করছে, কি করতে যাচ্ছে তা এরা কেউ ভাল করে বোঝবার আগেই সুরো পাগলের মত ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই জীবন্ত মানুষের পাষাণ প্রাচীরে--ঠেলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে চেষ্টা করল ভেতরে যাবার—চিতার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবার। একবার, আর একটি বার দেখা যে করতেই হবে তাকে, শেষবারের মত—জিজ্ঞাসা করতে হবে, 'কেন তুমি এমন করে চলে গেলে, কোন্ অভিমানে, আমি কি করেছিলুম তোমার?'

কিন্তু তারা অনেক লোক। সম্ভবত এই রকম একটা আক্রমণ হতে পারে তাও জানত। নিহাৎ অতর্কিতভাবে গিয়ে পড়েছিল বলেই দু-চারজনকে ঠেলে সরিয়ে একটুখানি ভেতরে যেতে পেরেছিল, তবে তার মধ্যেই বাকী সকলে সতর্ক হয়ে উঠেছে। কে একজন রূঢ় হস্তে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল আবার, সেই জীবন্ত প্রাচীরের বাইরে পাঠিয়ে দিল। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী যারা তারাই বেশী মারমুখো—বেশী কঠোর।

'আস্পদ্দা তো কম নয়!'

'কে ও মাগীটা? পাগলী নাকি?'

'পাগলী কেন হবে—সেয়ান পাগল বোঁচকা আগল। ঐ যে সেই মাগীটা, মামাবাবুর ঢেমনি—সেই কেত্তনউলী। দ্যাট ভ্যাম্পায়ার উয়োম্যান!'

'সেই ডাইনী মাগীটা! তাই নাকি? সাহস তো কম নয়! জলজ্যান্ত মানুষটাকে চুষে খেয়ে ফোঁপরা করে দিলে—লোকটা পড়ল আর মল, একটা চিকিৎসা পর্যন্ত করার সময় মিলল না—তবু এখনও মায়া ছাড়তে পারছে না? আবারও কি করতে এসেছে মাগী? আরও কি চায়?...মড়াটাকে চিবিয়ে খাবে নাকি?...রাক্ষসী বল!

'তা বলতে! দেখছিস না ডাকিনী-যোগিনীর দল নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে!'

নানাবিধ মন্তব্য উঠতে থাকে সেই মানবপ্রাচীরের বিভিন্ন অংশ থেকে। কে বলছে, কারা—তা কেউই অত জানে না। সেই একটা চরম মুহূর্তে কারুরই কোন উপস্থিতি বিশেষভাবে চিহ্নিত করার সাধ্য নেই, সকলেই একটা আবেগে দুলছে, কার সামনে কোন কথা বলতে নেই—সে হিসেবও করছে না কেউ।

কথাগুলো আস্তে বলা হয় নি। দূরে থেকেই সরো চম্পন চাঁদু প্রকাশী—ওরা শুনেছে। কিন্তু সুরবালার কানে এর একটা শব্দও বোধহয় ঢোকে নি। কে ধাক্কা দিচ্ছে, কতটা রূঢ় তাদের আচরণ—সে সম্বন্ধেও বিন্দুমাত্র সচেতন নয়। সে পাগলের মতই আবার অন্য দিক দিয়ে ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করল—কোন মতে পাশ কাটিয়ে গলে যাওয়ার। একবার দেখতে দিতে এত আপত্তি এদের কিসের! কৈ, এতদিন তো কেউ টুঁ শব্দও করতে পারে নি। সবাই তো জানত, ওবাড়ি থেকেই কত দিন কত কি জিনিস এসেছে, জমিদারীর ফসল, বাগানের ফলফুলুরি, প্রজাদের দেওয়া ঘি ক্ষীর—ওবাড়ির চাকরই পৌঁছে দিয়ে গেছে, তারা সসম্ভ্রমে 'ছোটমা' অথবা 'ছোট মাইজী' বলেই সম্বোধন করেছে বরাবর—এই মাত্র চার-পাঁচ ঘন্টার মধ্যেই এত পরিবর্তন তার ভাগ্যের—এখনও তো বোধহয় মৃতদেহটা শীতল হয় নি সম্পূর্ণ।

কিন্তু সে যা-ই হোক, যাওয়া গেল না কিছুতেই। এবার একজন যথেষ্ট জোরেই ধাক্কা দিল—সুরো ছিটকে গিয়ে পড়ল আর একটা নিবন্ত চিতার গরম ছাইয়ের ওপর, ডান হাতের কনুইয়ের কাছটা ইঁট না কাঠ কিসে লেগে কেটে গেল খানিকটা।

কে একজন যেন বলে উঠল, 'দে না যেতে, চিতাতে গিয়ে উঠুক না দেখি না ভালবাসার দৌড়টা!'

'সার্টেন লি নট! জ্যান্ত যা করেছে করেছে—এখন মড়াটাকে অপবিত্র করতে দেওয়া হবে না কিছুতেই।' আর একজন প্রতিবাদ করে উঠল প্রবলভাবে।

তবুও, সেই অবস্থাতেও উঠে আর একবার চেষ্টা করত হয়ত—কিন্তু ততক্ষণে মেয়েগুলো এসে চেপে ধরেছে চারিদিক থেকে। ওরা পাঁচ-ছজন—সুরো একা। সেও প্রাণপণ ছাড়াবার চেষ্টা করছে বটে—ওরাও প্রাণপণেই চেপে ধরেছে। সেই কয়েক জোড়া হাতের মধ্যে পড়ে অসহায়ভাবে ছটফট করতে লাগল সুরো, বেঁকে-চুরে ছাড়িয়ে চলে যাবার চেষ্টা করল অনেক রকমে—সুবিধা করতে পারল না।...

তখনও কে একজন বলছে—এদের কানে গেল, 'পুলিশ, পুলিশ কোথায় গেল! বার্নিং ঘাটে পুলিশ থাকত না এর আগে? ...ভদ্রলোকরা একটু শান্তিতে মড়াও

পোড়াতে পারবে না—এই থানকী মাগী-গুলোর জ্বালায়।'

আর একজন বলে উঠল, 'কাউকে পাঠাও না সেজদা থানায় একবার, ডেকে নিয়ে আসুক কটা কনস্টেবল।'

এসব অপমান সুরোকে স্পর্শ করল না, তার কারণ তখন ওর কোন বাহ্যজ্ঞান নেই—এদের চোখে জল এসে গেল। প্রকাশী চিরদিনই একটু ঠোঁটকাটা, সে বেশ একটু চেঁচিয়ে ওদের শুনিয়েই বললে, 'কোথায় যাচ্ছ দিদি, তুমি বামুনের মেয়ে সতীলক্ষ্মী—যার ঘর করেছ তাকে স্বামী জেনেই করেছ—তোমার ওসব ইত্তিক জাতের মড়া কি ছুঁতে আছে! আর কীই বা দেখবে, যাকে তুমি জানতে, যার সঙ্গে এতকাল ঘর করলে সে তো আর নেই, ও তো তার খোলশটা। হাসিমুখে চলে গিয়েছিলেন—সেই মুখ মনে আছে, তাই তো ভাল। এ মুখ আর দেখে কাজ নেই। চলো আমরা চান করে চলে যাই। এদের সামনে চোখের জল ফেললেও তোমার অপমান।'

ওরা আর দাঁড়াল না সেখানে। সুরবালাকে একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে দূরে সরে এল। আরও কি কটু কথা বলবে লোকগুলো তার ঠিক কি! শোকের সময়, মৃতের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কলহ-কোঁজিয়া করে লাভ নেই।...

দেখা হল না। আর দেখা হ'ল না। একবারটি শেষবারের মতো সেই প্রিয় মুখখানাকে দেখতে দিতেও ওদের এত আপত্তি কেন?...সুরবালার বিবশ বিহ্বল মস্তিষ্কে শুধু এই প্রশ্নটাই বার বার জাগে। সবাই তো জানে তিনি ওকে কত ভালবাসতেন, তাঁকে ওরাও ভক্তি করে, তাঁর জন্যে ওদেরও শোক কম হয়নি হয়ত—তবে তাঁর এত প্রিয় মানুষটাকে একবার কাছে যেতে দিচ্ছে না কেন? তিনি কি খুশী হচ্ছেন এতে—ওদের ওপর?

মুখাগ্নি শেষ হ'ল। ধোঁয়া দেখেই বোঝা গেল চিতায় আগুন দেওয়া হয়েছে। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই সে দেহটার বোধহয় কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। সেই স্নিগ্ধ প্রসন্ন চোখ দুটি—যা দেখে একদা প্রেমে পাগল হয়েছিল সুরবালা—তাও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। কালো হয়ে ঝলসে গেছে বোধহয় মুখখানা এর মধ্যেই—

আরও একবার অধীর চঞ্চল হয়ে উঠল সুরবালা কিন্তু এগোতে পারল না। এরাও তার চারপাশে ব্যূহ রচনা করে রেখেছে।

সরস্বতী আস্তে আস্তে বলল, 'দিদি, চলো আমরা চান করে নিই—।'

এই প্রথম কথা বলল সুরো, যেন চমকে উঠল, 'চান? কেন?'

'চান করতে হয় এখানে এলে। তাছাড়া—তোমার তো করাই উচিত।'

'আমার করাই উচিত?' ছেলেমানুষের মতো স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুরবালা, ছেলেমানুষের মতোই বলে, 'চলো তাহলে।'

এত সহজে সে রাজী হবে এখান থেকে সরে যেতে—তা ওরা ভাবেনি। তবু সকলেই একরকম ঘিরে নিয়েই এ ঘাটে এল, স্নানের ঘাটে। সেইভাবেই আস্তে আস্তে জলেও নামল। গিরিধারী ওকে ধরেনি—তবে সেও কাছে কাছে ছিল, কাছেই রইল।

পর পর ডুব দিল কয়েকটা। বেশ স্বাভাবিকভাবেই দিল, যেমন স্নানের সময় মানুষ দেয়। মনে হ'ল গঙ্গার জলে এবার তার চোখের জলও মিশেছে। একটুখানি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল এরা। মাথায় জল পড়েছে যখন, চোখের জলও যদি বেরিয়ে থাকে—আর ভয় নেই। এবার ওরাও নিজে-দের মতো স্নান সেরে নিল। কেউই প্রস্তুত হয়ে আসেনি, সকলেই প্রায় ঘুম থেকে সদ্য উঠে এসেছে। কাপড়-চোপড় এদেরও যথেষ্ট নেই, চাদর তো নেই-ই কারও। জলে দাঁড়িয়েই তাই যথাসম্ভব সেই এক বস্ত্রই গুছিয়ে পরে নিতে লাগল। এখনই এই ভিজে কাপড়ে বহু কৌতূহলী বিদ্রূপ-চঞ্চল দৃষ্টির সামনে দিয়ে ফিরতে হবে। গাড়ি যদি বা পাওয়া যায়, ওপরে উঠে ঘাটের বাইরে না গেলে তো নয়।...

একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সবাই—তাও বোধহয় দু-এক মিনিটের বেশী নয়—হঠাৎ চাঁদুর নজরে পড়ল ব্যাপারটা, 'ওকি, ওকি—এই দ্যাখো, ও সরোদি দ্যাখো দ্যাখো পাগলী কি কাণ্ড বাধিয়ে বসে বুঝি!'

সকলে চমকে চেয়ে দেখল, সুরবালা বহু দূরে এগিয়ে চলে গেছে তাদের থেকে, এখনও এগিয়েই যাচ্ছে, ক্রমাগত নেমে যাচ্ছে জলের মধ্যে, এখনই গলাজল হয়ে গেছে, আর একটু এগোলেই মাথাটা ডুবে যাবে—

ঘোলা জল গঙ্গার—একবার ডুবলে আর দেখা যাবে না কোনদিকে গেল। ভাঁটার টান শুরু হয়েছে—এখনই হয়ত কোন অতলে টেনে নিয়ে যাবে।

সরোজিনীও ব্যাকুল হয়ে ওঠে, 'তাই তো, ও গিরিধারী, যা যা বাবা, তুই তো সাঁতার জানিস—যা যা ছুটে গিয়ে ধরগে যা—। আ মলো— সঙের মতো চেয়ে আছিস কি, এখন কি আর অত ভাবতে গেলে চলে গায়ে হাত দিবি কিনা। যা যা, ডুবে গেল যে—!'

সত্যিসত্যিই একটু দ্বিধা ছিল গিরি-ধারীর মনে। সে সরোজিনীর কথায় আশ্বস্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে কাছে গিয়ে একটা হাতের কনুইয়ের কাছটা ধরে ফেলল সুরবালার। সুরো এবারও এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে-ছিল—কিন্তু গিরিধারী জোয়ান হিন্দু-স্থানী, তাছাড়া সে এই রকম একটা প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুতই ছিল খানিকটা—তার বজ্রমুষ্টি ছাড়াতে পারল না। বরং তার আকর্ষণেই আবার পাড়ের দিকে ফিরে আসতে হল।

বিকেলে তখন মেয়েদের ঘাট জনবিরল, তবু একজন বোধহয় কোন ব্রত উপবাস উপলক্ষে সেই অবেলায় স্নানে এসেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে গা ওর? ওকে অমন ধরে নে যাচ্ছ কেন?'

'আর হয়েছে!' প্রকাশী যেতে যেতেই মন্তব্য করল, 'দুগগা, দুগগা, খুব ফাঁড়া গেছে বাপু। কিছু একটা হলে বুড়ির কাছে কি জবাব দিতুম। তার ওপর থানা-পুলিশে টানাটানি শুরু হত। এখন ভালয় ভালয় গিয়ে বাড়ি পঁওছাতে পারলে হয়। গিরিধারী এবার আমরা দেখছি, তুই গিয়ে একটা গাড়ি ধর দিকি। আমাদের সব কজনকে নিতে হবে কিন্তু, আগে থাকতে বাচিয়ে নিবি। তুই বরং কোচবাক্সয় বসে থাক।...পাঁচ আনা ছ আনা—যা নেয় দোব এখন।'

(ক্রমশঃ)

বন্ধু-কে ॥

মৃগাঙ্ক রায়

মনে সাধ, সব দিয়ে যাবো তোকে
এই পৃথিবী সসাগরা, গ্রহ ও নক্ষত্রমালা
রৌদ্র রূপবান, পোড়ো ভিটে
ঝড়ের ঝাপট খাওয়া ঘর
ভাঙা দরজা, কলকাতা শহর,
আমার জীবন থেকে উচ্ছৃত যা কিছু
সব দিয়ে যাবো তোকে—
প্রেম পরমায়ু; ইচ্ছার সুদীর্ঘ দ্যুতি
সকালে সূর্যের তিলক, দিনের দারুণ দৃষ্টি
রাত্রিশেষে দূরাগত অশ্বারোহী হাওয়া—সব
মনে সাধ দিয়ে যাবো তোকে।
অথচ আমার দু'হাত শূন্য,
সখা স্মৃতি বস্তু ও বাসনা স্খলিত প্রতিদিন,
জন্মের মুহূর্ত থেকে পৃথিবী কেবলি
দূর থেকে দূরে সরে গেছে;
আমিও ভিক্ষুক।।

সর্পিল নির্জন মৃত্যু ॥

পরিতোষ সান্যাল

সে আর আসবে না কোনদিন।
ব্যর্থ ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ক্ষয়িষ্ণু মোমের দীপ
অতিরিক্ত ক্ষয় নয় তবুও শোভন।

নটীরা বিদায় নিলে রজনীর তৃতীয় প্রহরে
আমি যে বিমর্ষ কোন সুপ্রাচীন সাপ
সন্তর্পণে খুলতে জানি খুলে ফেলি পীতাভ খোলস
মণি চোখের প্রদীপ;
স্তম্ভ স্মৃতি লাইট হাউস থেকে ঝাঁপ দিই অতি হিম হিমজলে।

নিরালোক বিষণ্ন কৌবিন : কৃষ্ণরূপ দুর্বোধ্য সারেঙ
ত্রাহি ত্রাহি বাঁশি শুধু তারস্বরে বাজায় ভাসায়।

"নেমে পড়ুন, আর যাবে না, ট্রাফিক জ্যাম।"

হৃৎপিণ্ড থেমে যেতে পারে ওই কটি কথায়, কারণ হাসপাতাল এখনও অনেক দূরে, আর সংগে রয়েছেন আসন্নপ্রসবা স্ত্রী।

তখন জানতেও ইচ্ছা হয় না জ্যামটা কিসের, ইচ্ছা হয় শুধু, হাত কামড়াতে, তবু আকাশ বাতাস বলে দেয়, "বর যাচ্ছে।"

ঘোড়ার পিঠে সওয়ার, কোমরে তলোয়ার, মাথায় ধরা রাজছত্র, মুকুটধারী, যোদ্ধা-বেশে বর চলেছেন, কনে জয় করতে না তো দিগ্বিজয় করতে। কোন পথে, না কলকাতার রাজপথে। দুপাশে সারি দিয়ে তাঁর বাহিনী—আলোর ত্রিভুজ কাঁধে মশালচির দল, বোম্বাই সুরের ব্রাস ব্যান্ড, আর আগে পিছে লাল হরফে নামপত্র আঁটা মোটর-গাড়ীর মিছিল। ঢাকঢোল তুরী ভেরীর আর্তনাদে কান কালা। পথচারী হাজার-হাজার মানুষ ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে দেখে শোভাযাত্রা। তাকে যেতে দিতে হবে, তার জন্য রাস্তার অন্য হাজার গাড়ী-

কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

ঘোড়াকে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যত জরুরী কাজই পড়ে থাক না, হাসপাতালমুখী রুগী পথেই গংগা পাক না, বর যাচ্ছে যে!

বৈশাখ থেকে শ্রাবণ বিয়ের মরশুমের কটি মাস এ দৃশ্য কলকাতায় অতি পরিচিত। এ শুধু পথের দৃশ্য। তারপর বিয়ে বাড়ীর ভিতরের যে এলাহি ব্যাপার তা বর্ণনা করতে গেলে কলমের কালি ফুরিয়ে যাবে।

চলে আসুন এই পটভূমি থেকে, খানিকটা দূরে। রাইটার্স বিল্ডিং-এর একেবারে পশ্চিম কোণায় নীচতলার ছোট্ট ঘরখানিতে। দরজায় নেম-প্লেট দেখতে পাবেন : মিসেস এস বিশ্বাস, ম্যারেজ অফিসার এ্যান্ড রেজিস্ট্রার"।

দরজা ঠেলে ভিতরে আসুন—না, বিবাহ অফিস বলে এর ভিতরের চেহারায় কোন বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবেন না। সাদা-রঙীন কাপড়ের চাঁদোয়ার তলায় ফুলে, আমের পল্লবে সাজানো, চন্দন ধূপের সুবাসে স্নিগ্ধ বিবাহবাসর নয়, দশটা সরকারী অফিস যা হয় তাই—প্রায়ান্ধকার ঘর, কালো হয়ে যাওয়া পুরনো কাঠের টেবিল চেয়ার আর ফিতেয় বাঁধা কাগজ আর ফাইলের স্তূপ যেখানে সেখানে গাদা করা। একটি ছাপা কাপড়ের পর্দা দিয়ে আড়াল করা শ্রীমতী বিশ্বাসের টেবিল। এখানে বসে যখন তিনি প্রায় নীরবে "দুটি হৃদয় এক" করে দেন তখন না বাজে শানাই-শাঁখ, না পড়ে হুলুধ্বনি।।

ময়ূরপংখী গাড়ী চড়ে, ঢাকঢোল ব্যাণ্ড বাজিয়ে বর আসবে, এ স্বপ্ন কোন্ কনের নয়? যত ঝঞ্ঝাট, যত ট্রাফিক জ্যাম হোক না কেন, বর-কনের বাবা-মায়েরও সেই একই স্বপ্ন। কিন্তু যারা ভালবেসেছে, অথচ যাদের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজনের আশীর্বাদ নিয়ে পরস্পরকে পাবার উপায় নেই, তাদেরই ওই ফুলে ঢাকা পথের আশা ছেড়ে দিয়ে বিশেষ বিবাহবিধির শরণ নিয়ে শ্রীমতী বিশ্বাসের কাছে ছুটে আসতে হয়।

"সব সময় তা নয়," ভুল শুধরে দেন শ্রীমতী বিশ্বাস। এটা ঠিক, এই বিশেষ বিবাহ আইন অনুসারে (তার আগেও সিভিল ম্যারেজ আইন ছিল) ছেলে একুশ আর মেয়ে আঠার বছরেরটি হলেই স্বাধীন মতে যে কোন বিবাহ অফিসে গিয়ে তারা বিয়ে করে আসতে পারে। কলকাতায় অমন তেইশটি বিবাহ অফিস আছে। তবে?

"বহু ক্ষেত্রে বাবা-মায়েরাই বর-কনেকে সংগে নিয়ে এসে এখানে বিয়ে দিয়ে যান," শ্রীমতী বিশ্বাস বলেন। কারণ স্পষ্ট। কত সহজে, নামমাত্র খরচে এখানে বিয়ের অনুষ্ঠান চুকিয়ে দেয়া যায়। নারায়ণ শিলা, আগুন সাক্ষী করে পুরুতের মুখ থেকে নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে আর হৈ-হট্টগোলে টাকা আর সময়ের শ্রাদ্ধ করার প্রয়োজন হয়না। আর সাত-পাকের বাঁধনের চেয়ে এ-বিয়ের বাঁধন আলগা তা যদি ভেবে থাকেন তবে জানেন না, কত ভুল করছেন। এই কথা বলে তিনি বিয়ের সার্টিফিকেটের বাঁধানো বইটা চেয়ে পাঠালেন।

বইয়ের পাতা উল্টে গেলেন। কিন্তু যে সার্টিফিকেটটা খুঁজছিলেন, সেটা ওতে নেই। "যাক গে ওটা পাচ্ছি না, থাকলে দেখাতে পারতাম, অনেক স্বামী-স্ত্রী তাঁদের সাতপাকে বাঁধা বিয়ের অনেক, অনেক বছর পর (২০ বছরও হতে পারে) এখানে আসেন বিয়ে পাকা করতে। তাঁরা নতুন করে এই আইনে বিয়ে করে প্রমাণ করেন যে, তাঁরা প্রকৃতই বিবাহিত। কারণ এ দলিলের মার নেই।" এখন বলুন, কোন্ বিয়ের বাঁধন বেশী পোক্ত।

অথচ কত সহজ সরল এ বিয়ের অনুষ্ঠান। যে কোন একদিন আসুন, বর-কনে পরস্পর বিবাহিত হোন বা না হোন, একটা ছাপানো ফরম ভর্তি করুন—ওটা হবে বিয়ের বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ। নাম, ধাম, বয়স ইত্যাদির সংগে একটি ঘোষণা দিতে হবে বর-কনের মধ্যে এমন কোন আত্মীয়-সম্পর্ক নেই যাতে বিয়ে আটকায়। তিরিশ দিন সেই নোটিশ ঝুলবে, তারপর তিরিশ দিন গেলে পর, পরের ষাট দিনের মধ্যে যে কোন একদিন এসে তিনজন সাক্ষীর সামনে একটি ছোট্ট শপথ নিন, ও সার্টিফিকেটে সই করুন।

ছোট্ট শপথ। বর—"আমি উপস্থিত ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করিতেছি যেন তাঁহারা সাক্ষী হন যে, আমি অমুকচন্দ্র অমুক আজ হইতে তোমাকে অমুকবালা অমুককে আমার আইনসংগত বিবাহিতা পত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম।" কনে—"আমি উপস্থিত ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, আমি অমুকবালা অমুক আজ হইতে তোমাকে অমুকচন্দ্র অমুককে আমার আইনসংগত পতিরূপে গ্রহণ করিলাম।" ব্যাস, ছুটি। ইচ্ছা করলে মালাবদল, আংটি বদল করতে পারেন, সিঁদুর পরিয়ে দিতে পারেন, কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

হ্যাঁ, এখানেও টিপসই চলে। বরকনে সাক্ষী কেউই যদি লিখতে পড়তে না জানেন, ক্ষতি নেই। কত সুবিধা।

কথা বলতে বলতে এক যুবকের প্রবেশ। চাপা প্যান্ট বুশশার্ট পরা। কী ব্যাপার, না তাঁর বন্ধু ও বান্ধবীর বিয়ের তারিখ দেয়া ছিল সেদিন, কিন্তু বান্ধবী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতে সেদিন বিয়ে স্থগিত রাখতে হবে।

"তাতে আর কী অসুবিধা আছে, কাল আনবেন, এই ধরুন এই রকম সময়," বললেন শ্রীমতী বিশ্বাস।

তাহলেই দেখুন, আরও কত সুবিধা। দিন-ক্ষণ গোধূলি লগ্নের ঝামেলা নেই। বিয়ের লগ্নে বিয়ে না হলে মেয়ে অন্য-পূর্বা হয়ে যাবে তার ঝুঁকি নেই।

সুতরাং এখনও ভেবে দেখুন, সমাজে নীরব বিপ্লব আনার একটি পথ সামনে কত দিন থেকে খোলা রয়েছে, অথচ এখনও সেই পুরাতনের মোহ কেউ ছাড়তে পারছেন না। ফলে একটা বিয়েতে সাত দিন ধরে এক বাড়ী লোক গলদঘর্ম হচ্ছে, টাকার হরি-লুঠ দিয়ে বাজারে মাছ মিষ্টির দাম চড়ছে, আর রাস্তায় ঘাটে পথিকের দুর্দশার কথা ছেড়েই দিলাম।

বিশেষ বিবাহবিধি আইন চালু হয়েছে ১৯৫৪ থেকে, শ্রীমতী বিশ্বাস এই কাজ করছেন ১৯৬১ থেকে। অবৈতনিক, কিন্তু একাজে তিনি অফুরন্ত আনন্দ পান, কারণ সমাজ-সেবা তাঁর নেশা। ভারতীয় রেড-ক্রশে তিনি ১৯৪১ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত অক্লান্তভাবে কাজ করে গেছেন। সে সময় রেডক্রশের ডাফ্ স্ট্রীটস্থ প্রসূতি সদনের পুরো চার্জে তিনি ছিলেন। এছাড়া ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত তিনি গার্ল-গাইড সংগঠনে নিযুক্ত ছিলেন এবং গার্ল-গাইডের অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেট কমিশনারের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁর স্বামী স্বর্গত অধ্যাপক এস পি বিশ্বাস কলকাতার ক্রীড়াজগতে সুপরিচিত ছিলেন।

●

কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীর প্রশস্ত প্রাঙ্গনের এক প্রান্তে স্কলারস্ হোস্টেল। জাতীয় সম্পদ এই গ্রন্থাগারের অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহের সদ্ব্যবহার করতে সারা দেশের সকল কোণা থেকে যত পন্ডিত ও জ্ঞানপিপাসু কলকাতায় ছুটে আসেন, তাঁদের একাংশের সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যায়। লোকচক্ষুর অন্তরালে অধ্যয়ন তাঁদের দিবা-রাত্রির ধ্যানজ্ঞান, আর কত বিচিত্র তাঁদের অনুসন্ধান।

এই হোস্টেলের একটি কক্ষে শ্রীসুন্দর-লাল ত্রিপাঠীর সংগে পরিচয় হল। মধ্য-প্রদেশের বস্তার জেলার জগদ্দলপুর থেকে তিনি এসেছেন, তাঁর গবেষণার বিষয় দন্ড-কারণ্য। চমৎকার বাঙলা বলেন, ও বাঙলায় লিখেও থাকেন। কলকাতার এক সাময়িক পত্রিকায় তাঁর একটি বাঙলা রচনা পড়ে তাঁর সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে আলাপ করতে গিয়েছিলাম।

শিশুকাল থেকে দন্ডকারণ্য ও সেখান-কার আদিবাসীসমূহের প্রতি তাঁর আক-র্ষণ। তখন থেকেই তিনি এদের মধ্যে মিশে গিয়ে এদের সম্পর্কে নৃতত্ত্বমূলক তথ্য সংগ্রহ সুরু করেছিলেন। বাইরের লোক এই আদিবাসীদের কথা খুব কমই জানে বলে তাঁর ধারণা এবং বর্তমানে সেইজন্য তিনি দণ্ডকারণ্যের মানুষদের উপর একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করছেন। এটি তিনি লিখবেন হিন্দীতে।

দন্ডকারণ্য নিয়ে তাঁর আগে যাঁরা যাঁরা লিখেছেন তাঁদের সম্বন্ধে শ্রীত্রিপাঠী শ্রদ্ধাবান। নাম করলেন গ্রিগসন সাহেবের যিনি আনুমানিক ১৯৩৫ থেকে বস্তারের শাসনকর্তা ছিলেন। আর ভেরিয়ার এল-উইনের কথাও বললেন, "কিন্তু তাঁদের কারও কাজ সম্পূর্ণ নয়, সেই জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা।"

এখানকার 'নিষাদ' উপজাতিদের আচার-ব্যবহারে প্রাগৈতিহাসিক মোহেনজোদরো ও হারাপ্পা সংস্কৃতির ছাপ লক্ষ্য করেছেন শ্রীত্রিপাঠী। কিন্তু এদের ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাবও স্পষ্ট। তাঁর গবেষণা মূলতঃ এই দৃষ্টিকোণ থেকে।

মধ্যপ্রদেশের বিধানসভায় এককালীন সদস্য শ্রীত্রিপাঠী এই অঞ্চলে আদিবাসী-দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য একদা প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয় করেছেন। সেই সময় যেসব উপজাতিদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন তারা হল, মাড়িয়া, মুরিয়া, দোরলা, পারাজা, গড়াবা ইত্যাদি। বাল্মীকি-রামায়ণে ও মহাভারতে বর্ণিত দন্ডকারণ্য এদের মধ্যে (ভৌগলিক ও নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে) আবিষ্কার করা সম্ভব বলে তিনি দেখতে পেয়েছেন। মহাকাব্যের পাতার সংগে মিলিয়ে এখানেই তিনি পঞ্চবটির অবস্থান খুঁজে পেয়েছেন, যেমন পেয়েছেন ভবভূতির নাটকে বর্ণিত তমসা ও মুরলা নদী।

গত পাঁচ বছর ধরে তাঁর বইয়ের জন্য তিনি তথ্য ও মাল-মশলা সংগ্রহ করছেন, এর মধ্যে কতবার কলকাতায় এসে থেকেছেন এই ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করতে তার হিসাব নেই। এবারে তিনি চার মাস হল এসেছেন ও আরও দু-তিন মাস থাকবেন।

দন্ডকারণ্যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুও শ্রীত্রিপাঠীর গ্রন্থের বিষয়ের অন্তর্ভূত। এখানে পূর্ণবাসী বাঙালীর অবস্থা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন এবং সে সম্পর্কে তাঁর মত খুব প্রামাণ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বললেন, কেন তারা চলে আসছে এই প্রশ্নের উত্তরে : "যারা এসেছে, তারা অকারণে আসে নি। হয়ত বিধবা বুড়ী চলবার ক্ষমতা যার নেই, তাকে দেয়া হয়েছে জমি চাষের জন্য। না হয়ত যে আজন্ম সেলাইয়ের কাজ করে এসেছে তাকে দেয়া হয়েছে চাষের কাজ। খাটতে রাজী জমি পায় নি, কাজ পায় নি এমন লোকও অনেক আছে। কিন্তু যারা খাটবার সুযোগ পেয়েছে তারা ঠিকই পাথরে ফুল ফুটাতে পারবে, পারছে।"

ওখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পূর্ণবাসীদের অসুবিধা হবে না বলে তিনি মনে করেন। একটা মস্তবড় মিলের কথা তাঁর মুখ থেকে শুনলাম, সেটা ভাষার মিল। অনেক বাংলা কথার হুবহু এক ব্যবহার কোন কোন উপজাতির ভাষায়। শুধু শব্দ নয়, বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ দিয়ে সম্পূর্ণ বাক্য অনেক পাওয়া যাবে, যা ধ্বনি ও অর্থে দুই ভাষাতে এক। যেমন, বাংলা : "তোমার রান্না হোল" ওদের ভাষায় "তুমচো (বা তোমার) রাঁধা হোল"। এতটাই মিল। কাজেই বাঙালী উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্যে এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ সূচিত করছে, সে বিষয়ে শ্রীত্রিপাঠীর সন্দেহ নেই।

—স-সে

মার্কিণ মুলুকের দুর্ধর্ষ মেয়ে-খুনী বনি পার্কারের কীর্তিকলাপ কল্পনাপ্রসূত গোয়েন্দা-কাহিনীর চেয়েও চমকপ্রদ। ওদেশের লোক ওর নাম শুনলে শিউরে ওঠে আজও। পাতলা ছিপছিপে গড়ন, নীলাভ চোখ, দুই ঠোঁটের মাঝে ধূমায়িত সিগার। দেহের ওজন মাত্র নব্বই পাউণ্ড, উচ্চতা পাঁচ ফুটেরও কম। ওর চেহারা দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারত না, মানুষ মারা ওর পক্ষে সম্ভব। কিন্তু এই কৃশাঙ্গী খর্বাকৃতি তরুণী বারোজন লোককে হত্যা করেছিল নৃশংসভাবে। শুধু তাই নয়, পিস্তল উঁচিয়ে অসন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে ভীত সচকিত করে টাকা লুঠ করেছিল বহুবার। ধরা পড়ে জেলেও গিয়েছিল আবার জেলখানা থেকে পালিয়ে আসে অদ্ভুত কৌশলে। ওর মৃত্যু ঘটে পুলিশ-বাহিনীর সঙ্গে এক ভয়াবহ সংঘর্ষে। সংঘর্ষের শেষে দেখা গেল, ওর কোলের উপর ছোট্ট একটি মেসিন-গান আর ওর নিষ্প্রাণ দেহে পঞ্চাশটি বুলেটের ক্ষতচিহ্ন।।

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

বনির মোটর তীব্রগতিতে ছুটে চলেছে লুইজিয়ানার এক আরণ্য অঞ্চলে স্টীয়ারিং হুইল ধরে আছে বনির সঙ্গী। ভয়ে তার মুখ বিবর্ণ, কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছে। যেদিকে গাড়ি ঘোরায় সেদিকেই দেখে রাস্তা বন্ধ। পথের মাঝখানে অজস্র ভারী ভারী পাথর আর গাছের গুঁড়ি জড়ো করে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু যে ক্ষীণাঙ্গী তরুণীটি তার পাশে বসে রয়েছে সে একেবারে স্থির, অচঞ্চল। মুখে তার ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। তার কোলের উপর ছোট্ট একটি মেসিনগান, মাঝে মাঝে মৃদুভাবে সেটা নাড়াচাড়া করছে আঙুল দিয়ে আর ধুলোভরা উইন্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে তাকাচ্ছে সামনের দিকে। দুজনেই বুঝতে পেরেছে, এ যাত্রা রক্ষা নেই তাদের। পুলিশ যেভাবে ফাঁদ পেতেছে তাতে ধরা তাদের পড়তেই হবে। কিন্তু ভয়ে কাতর হয়ে আত্মসমর্পণ করবার মেয়ে নয় বনি। বিপদ যত বড়ই হোক না কেন, মনের বল কখনও হারায় না সে।

"আমাদের গতিবিধি সম্বন্ধে যে লোকটা পুলিশকে গোপনে খবর দিয়েছে তার সন্ধান যদি পাই তবে তার ওপর এমনিভাবে গুলি চালাবো যে তার দেহটা ঝাঁজরা হয়ে যাবে ছাঁকনির মত," ধীরকণ্ঠে বনি পার্কার বলে তার সঙ্গী ক্লাইড ব্যারোর উদ্দেশে। ক্লাইড তখন গাড়ির মুখটা ঘুরিয়েছে এক জনবিরল গ্রাম্য গলিপথের দিকে। গাড়ি এগিয়ে চলেছে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে। ওদের আশঙ্কা, কিছুদূরে যাবার পর হয়তো আবার দেখবে, রাস্তা বন্ধ, কিন্তু চড়াইয়ের উপর গাড়িটা উঠতেই ওরা দেখল সামনে প্রায় দু' মাইল রাস্তা একেবারে পরিষ্কার, কোথাও কোন বাধা নেই। অ্যাকসিলারেটারের উপর পা-টা রেখে প্রচণ্ড চাপ দিল ক্লাইড। স্পীডোমিটারের কাঁটা পৌঁছুল আশীর কাছাকাছি এবং ঐখানেই নড়তে লাগল মৃদু কম্পনে। মোটর তীব্র বেগে চলল রাতের অন্ধকার ভেদ করে। ক্লাইড এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। গুন গুন করে গান গাইতে শুরু করল আপন মনে। ক্ষুদ্রাকৃতি মেসিনগানের উপর বনির হাতের মুঠোটা শিথিল হল একটু, পাশে রাখা ময়লা একটা প্যাকেট থেকে একখানা স্যাণ্ডউইচ বের করে পুরে দিল মুখে।

"গাড়ি চালিয়ে যাও নির্ভাবনায়," উৎফুল্লকণ্ঠে বলে বনি, "আবার আমরা ওদের বোকা বানিয়েছি।"

দু' মাইলের পর রাস্তাটা নীচে নেমে গেছে খানিকটা, তারপর আবার

সোজা উঠেছে ছোট একটা পাহাড়ের উপর। পাহাড়টার ডানদিকে একটা ঘন ঝোপ, তার উপর চাঁদের আলো পড়েছে। কোথাও এত-টুকু আওয়াজ নেই। চারিধার নিস্তব্ধ। শুধু আট-সিলিন্ডার মোটরের গর্জন শোনা যায়।

সামনের ঐ ঘন ঝোপটার মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে ছ'জন লোক ওদেরই প্রতীক্ষায়। তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কান খাড়া করে। হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরা মেসিনগান, হাতের চেটো ঘামে চটচটে। কাজটা তাদের পছন্দসই নয়। পৌরুষে আঘাত লাগে—অতর্কিতে আক্রমণ করে গুলি করে হত্যা করতে হবে একটি তরুণীকে। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কী? হুকুম এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে, বনি পার্কারকে হত্যা করা চাই, ও যেন আরও কতকগুলি লোককে খুন করার সুযোগ না পায় কোনমতেই।

'ঐ ওরা আসছে!' চাপা গলায় বলেন ক্যাপ্টেন ফ্র্যাঙ্ক হ্যামার। ছ' ফুট দু' ইঞ্চি লম্বা, পেশীবহুল সুগঠিত দেহ, দুর্জয় সাহস বুকে। একসময় হ্যামার ছিলেন টেকসাস রেঞ্জার, গুন্ডা-বদমায়েসদের শায়েস্তা করতে তাঁর মত বিচক্ষণ পুলিশ অফিসার ছিল না বললেই চলে।

বনির মোটরের হেডল্যাম্পের তীব্র আলো ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার উপর। মোটরটা নীচে কিছুটা নেমে উপরে উঠতে থাকে। স্যান্ড-উইচে কামড় দিয়ে বনি সবে চিবোতে শুরু করেছে। স্টীয়ারিং হুইলটা শক্ত করে ধরে আছে ক্লাইড। দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ। রাস্তাটা পীচঢালা নয়, তাছাড়া মাঝে মাঝে ছোটখাটো গর্তও আছে। এ রাস্তায় ঘন্টায় আশী মাইল বেগে গাড়ি চালানো খুবই বিপজ্জনক। একটু অসতর্ক হলেই দুজনেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠেন হ্যামার। এক একটি সেকেন্ড চলে যাচ্ছে টিক টিক করে, মনে মনে হ্যামার গুনতে থাকেন—পাঁচ ...চার...তিন...দুই...

বনির মোটর ছুটেছে ঘণ্টায় পঁচাশী মাইল বেগে। হ্যামারের দৃষ্টি সেইদিকে। গাড়িটা যেই ঝোপের কাছে এসেছে অমনি হ্যামারের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা যায়—'গুলি চালাও!'

বনি পার্কার যে কোন দুর্বৃত্তদলের সংগে যুক্ত থাকতে পারে এ সন্দেহ পুলিশের মনে কোনদিনই জাগেনি। সে যে খুন করতে পারে এটা তার চেহারা থেকে অনুমান করা ছিল একরকম অসম্ভব। মাথায় এক রাশ সোনালি চুল, ক্ষীণ দেহ, ওজন নব্বই পাউন্ডের নীচে, উচ্চতা চার ফুট দশ ইঞ্চি মাত্র। কিন্তু এই তন্বী খর্বকায়া তরুণী বারোজনকে হত্যা করেছিল দু' বছরের মধ্যে —আর ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কয়েকটি ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজনেও হত্যা করতে দ্বিধা বোধ করেনি সে। পুলিশের লোককে গুলি করে মেরে আনন্দ পেত—ওটা তার কাছে একটা কৌতুকের মত।

বনি পার্কারের জন্ম টেকসাস-এর রাওয়েনা পল্লীতে—১৯১০ সালের ১লা অকটোবর। তার পিতা ছিল রাজমিস্ত্রি। পরিশ্রমী, সদাচারী ও ধর্মপরায়ণ বলে খ্যাতি ছিল তার। স্থানীয় ব্যাপ্টিস্ট চার্চের ওয়ার্ডেন-এর সহকারী ছিল সে।

অল্পবয়সেই বিবাহ হয় বনির, কিন্তু ঐ বিবাহবন্ধন টেঁকেনি বেশীদিন। বিবাহের কিছুদিন পরেই তার স্বামী ধরা পড়ে এক সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে এবং বিচারে দীর্ঘ-কালের জন্য কারাদন্ড হয় তার। সেই থেকে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় জন্মের মত। উনিশ বছর বয়সে বনি কাজ নেয় এক রেস্তোরাঁয়। সেখানে ক্লাইড ব্যারো নামে এক যুবকের সংগে পরিচয় হয় তার। ক্লাইড তখনও রোমাঞ্চকর কোনো অপরাধ করে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। দু'চারটে ছোটখাটো অপরাধ করে জেল খেটেছিল মাত্র। তাও কোনবারই বেশীদিন জেলে থাকতে হয়নি তাকে।

ক্লাইডের সংগে যখন বনির দেখা হয়, তখন ক্লাইড আর তার ভাই বাক্‌কে পুলিশের লোক খুঁজছে এক ডাকাতি সম্পর্কে। অপরাধটা তেমন গুরুতর না হলেও ক্লাইড জানত, ধরা পড়লে সম্ভবতঃ দশ বছরের জেল হবে তার। বনির কাছে সে কিছুই গোপন করল না, তবে নিজের পরিচয়টা দিল বেশ একটু রঙ চড়িয়ে। বনিকে সে বলল, সে একজন টেকসাস ডিলি-ঞ্জার অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের নাম করা বন্দুকধারী দস্যুদের অন্যতম! এমন একজন দুঃসাহসী ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে রীতিমত গর্ব অনুভব করে বনি। তাদের এই পরিচয় যে উত্তরকালে বহু লোকের সর্বনাশের কারণ হবে, তা কে তখন জানত!

একদিন রাত্রে ক্লাইডের ঘরে বসে গল্প করছে বনি আর ক্লাইড, এমন সময়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে পুলিশের লোক ঢুকে পড়ল ঘরে। ক্লাইডকে ওরা ধরে নিয়ে গেল এবং বিচারে চৌদ্দ বছর কারাদন্ড হল তার। ওয়াকো জেলে তাকে রাখা হল সাময়িকভাবে, স্থির হল শীঘ্রই হান্টসভিল জেলে তাকে পাঠানো হবে দন্ডভোগের জন্য।

ক্লাইড জেলে পচবে এটা বনি বরদাস্ত করবে না কিছুতেই। ওয়াকো জেলে হাজির হল সে, রক্ষীদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল একটু, তারপর এক ফোঁটা চোখের জল মুছে অনুনয় করল ক্লাইডকে একটিবার দেখে আসার অনুমতির জন্য। একথাও সে বলল, ওকে অন্যত্র পাঠানোর পর ওর সংগে আর হয়তো দেখা হবে না কোনদিন।

কারারক্ষীদের মন গলে গেল। তাদের একজন বনিকে সংগে করে নিয়ে গেল দর্শনার্থীদের কক্ষে। ক্লাইড এসে ঘরে ঢুকতেই রক্ষী সরে গেল পাশে। ক্লাইডের হাত ধরে অশ্রুসিক্তনয়নে বনি তাকে কত অনুনয় করল সৎভাবে জীবনযাপন করার জন্য। বিদায় নেবার সময় ক্লাইড যখন ঈষৎ নত হয়ে তাকে আলিংগন করতে উদ্যত, সেই সময় বনি ফিসফিস করে বলল, 'আমার ব্লাউজের মধ্যে।'

সন্তর্পণে ক্লাইড হাত চালিয়ে দিল বনির ব্লাউজের মধ্যে। পিস্তলের শীতল স্পর্শ অনুভব করল সে। বিদায়ের সময় সবার অলক্ষ্যে পিস্তলটা তুলে নিয়ে সে পুরে ফেলল পকেটে। বাড়ি ফিরে এল বনি। প্রতিদিনই রেডিওর পাশে বসে থাকে খবর শোনার জন্য। যেদিন ক্লাইডকে হান্টসভিলে জেলে পাঠানো হবে, ঠিক তার আগের দিন রাত্রে ক্লাইড অতর্কিতে পিস্তল দেখিয়ে রক্ষীকে কাবু করে পালিয়ে গেল জেল থেকে।

তবে বেশীদিন জেলের বাইরে থাকা ঘটল না তার অদৃষ্টে। এক জায়গায় রাহা-জানি করতে গিয়েছিল ক্লাইড আর বনি। বনি ধরা পড়ল, ক্লাইড পালিয়ে গেল কোন-মতে। ঘন্টা কয়েক পরে পুলিশ গ্রেপ্তার করল ক্লাইডকে।

ক্লাইড বন্দী হল হান্টসভিল জেলে এবং প্রায় দু'বছর দন্ডভোগ করল সেখানে। তারপর হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার ঘটল যাতে মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই মুক্তি পেল সে। মুক্তির আদেশ দিলেন টেকসাস-এর নারী গভর্ণর ম্যাবেল ফার্গুসন। ক্লাইড ছিল বয়সে তরুণ, মাত্র একুশ বছর বয়স, চেহারাও নিরীহগোছের। গভর্ণরের ধারণা হল, তাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তাহলে তার চরিত্রে পরিবর্তন ঘটবে, ভবিষ্যতে আর কোনোদিন অপরাধে লিপ্ত হবে না সে। গভর্ণরের এই আদেশের প্রতিবাদে চাকরিতে ইস্তফা দিলেন ক্যাপ্টেন ফ্র্যাঙ্ক হ্যামার। টেকসাস-এর পুলিশ বিভাগে দীর্ঘ সাতাশ বছর কৃতিত্বের সংগে কাজ করেছেন তিনি। ক্লাইড ব্যারোকে যারা গ্রেপ্তার করে তিনি ছিলেন তাদেরই অন্যতম।

দেশে তখন ভয়ানক মন্দা। ১৯৩২ সালের মার্চ মাস। কাজকর্ম নেই অনেকের। বেকারেরা ভীড় জমিয়েছে সরকারী লংগর-খানায়। কিন্তু রাহাজানি করা যাদের পেশা তারা দিন কাটাচ্ছে দিব্যি আরামে।

ডালাস-এ এসে ক্লাইড দেখা করল বনির সংগে। বনি তখন এক রেস্তোরাঁয় কাজ করছে। দুজনে মিলে গোপনে পরামর্শ করল অনেকক্ষণ। তারপর ঠিক করে ফেলল তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা।

বনির সংগে মিলিত হবার পরের দিন ক্লাইড আর বনি দুজনে বেরিয়ে পড়ল কিছু টাকা যোগাড় করতে। টাকা যোগাড় করতে দেরী হল না বটে, তবে এই ঘটনায় বনির মধ্যে এমন এক হিংস্র প্রেরণা জাগল, যা শেষ পর্যন্ত দুজনেরই মৃত্যু আনল ডেকে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ভয় দেখিয়ে ওরা তাঁর

টাকা লুঠ করার মতলব করেছিল, বৃদ্ধ বাধা দেন, তখন ক্লাইড তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। ঐ বৃদ্ধকে হত্যা করতে পাঁচটি গুলি ছুঁড়তে হয় ক্লাইডকে। এতে ভয়ানক চটে যায় বনি।

'একজনকে মারতে একটা গুলিই যথেষ্ট' বিরক্তির সুরে মন্তব্য করে বনি, 'লক্ষ্যভেদে এখনও পোক্ত হওনি তুমি।'

'আমাকে উপহাস করছ, তোমার লক্ষ্য কি অব্যর্থ?' ঈষৎ উষ্ণভাবে জবাব দেয় ক্লাইড।

নিকটেই ছিল একটা জঙ্গল, বনি সেখানে গিয়ে বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস করতে লাগল এবং দু-চারদিনের মধ্যেই এ কাজে সে এমনি দক্ষ হয়ে উঠল যে, পঞ্চাশ গজ দূরে থেকে ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গকে গুলিবিদ্ধ করা সহজসাধ্য হল তার পক্ষে। সপ্তাহখানেক পরে ক্লাইডের এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল ওদের। তার নাম রেমন্ড হ্যামিল্টন। চুরি, রাহাজানি ও ঐ ধরনের দুষ্কর্মে সে লিপ্ত আছে অনেকদিন, কিন্তু মগজে তার বুদ্ধি ছিল কম। আগে থেকে পরিকল্পনা না করে কাজে নামার দরুন প্রায়ই বিপদে পড়ত সে।

'দেখো, তোমাদের দরকার এমন কারও সাহায্য যে তোমাদের পরামর্শ দিতে পারবে কীভাবে কাজে অগ্রসর হলে সাফল্য অনিবার্য', বনি বলে ক্লাইড ও রেমন্ডকে উদ্দেশ করে, 'অন্ধের মত কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে লাভ হয় না কিছুই। প্রত্যেকটি কাজেই পূর্বপরিকল্পনা দরকার।'

ওরা দুজনেই বনির কথায় সায় দিল, তারপর থেকে ওরা তিনজন যে কাজে হাত দিত, তার পরিকল্পনা রচনা করত বনির তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক

চুরুট খেতে শুরু করল বনি, মাঝে মাঝে কড়া মদও। সে বলত, 'আমি যে আর ছোট্ট মেয়েটি নেই, সাবালিকা হয়েছি, এটা সবাইকে জানাবার জন্যেই চুরুট আর মদ ধরেছি।'

একদিন রাতে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরুল রেমন্ড। পথে এক পুলিশম্যান চিনতে পারল তাকে। রেমন্ড পিস্তল বের করার আগেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। ধরা পড়ে রেমন্ড বন্দী হল জেলখানায়।

তখনও পর্যন্ত কাউকে গুলি করে মারার চেষ্টা করেনি বনি, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সঙ্কোচটা সরে গেল মন থেকে। সে যে দুঃসাহসিক কাজে নেমেছে, গুলি না করে সে কাজ হাসিল করা সব সময় সম্ভবও নয়। টেক্সাস, ওকলাহোমা, নিউ মেক্সিকো ও মিসৌরি—এই বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ওরা রাহাজানি চালিয়ে যাচ্ছিল। এক জায়গায় গুলি চালালো বনি।

বনির অব্যর্থ লক্ষ্য
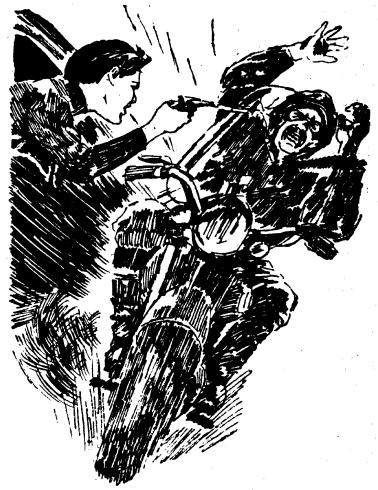
ছদ্মবেশ ধারণ করে আত্মগোপন করার চেষ্টা করত না ওরা। প্রকাশ্যভাবেই ওরা রাহাজানি করত। আর মজার ব্যাপার এই যে, বনির রীতি ছিল, যার টাকা ছিনিয়ে নেবার মতলব করেছে, তাকে সপ্রেমে চুম্বন করা।

'যার অর্থ হরণ করবো, তাকে একটি চুম্বন দান করা কর্তব্য আমার। সে অন্ততঃ বলতে পারবে, টাকার বদলে কিছু পেয়েছে সে।'—বনি বলত সহাস্যে।

ও অঞ্চলের লোকে রহস্য করে তার নাম দিয়েছিল 'চুম্বনকারী দস্যু'।

একদিন অপরাহ্নের দিকে ওরা দুজনে মোটরে করে যাচ্ছিল কার্লসবাড শহরের এক রাস্তা দিয়ে। ট্রাফিক সঙ্কেত যথারীতি মেনেই গাড়ি চালাচ্ছিল যাতে ওদের উপর কারও নজর না পড়ে। এক জায়গায় লাল আলো দেখে গাড়ি থামাল ক্লাইড। একজন পুলিশ অফিসার যাচ্ছিলেন ঐ পথ দিয়ে। হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল ওদের উপর। এক মুহূর্ত ওদের পানে তাকিয়ে তিনি এগুতে লাগলেন ওদের দিকে। যেতে যেতে কোমরে রাখা পিস্তলের খাপটার দিকে হাত বাড়ালেন। ক্লাইড লক্ষ্য করেছিল তাঁকে, বনিকে ইসারা করতেই সে তাকাল রাস্তার ওপারে এবং দেখল ধীরপদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন অফিসার, খাপ থেকে পিস্তলটা তখন বেরিয়ে এসেছে অর্ধেকটা।

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বনি পাশেই সীটের উপর রাখা পিস্তলটা তুলে নিল ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এবং মোটরের জানলা দিয়ে গুলি করলে অফিসারকে লক্ষ্য করে। গুলি গিয়ে লাগল অফিসারটির দুই চোখের ঠিক মাঝখানে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়ল রাস্তার উপর।

বনির চোখ থেকে এক অদ্ভুত আলো ঠিকরে পড়ছিল যেন। এই প্রথম একজনকে

হত্যা করল সে এবং হত্যা করেছে তার প্রথম ও একটিমাত্র গুলির আঘাতে। প্রথম নররক্ত আস্বাদন করেছে যে সিংহ, তারই মত নিমেষে নররক্তলোলুপ হয়ে উঠেছে তার মন — হত্যা করার জন্য নতুন শিকারের সন্ধান করছে যেন।

যে জায়গায় ঐ পুলিশ অফিসারটিকে বনি খুন করে, সেখান থেকে ওরা তখন বিশ মাইল দূরে চলে এসেছে। হঠাৎ দেখল মোটর সাইকেলে চেপে একজন পুলিশম্যান আসছে ওদের দিকে। পুলিশম্যান টহল দিতে বেরিয়েছে, ওদের কাউকে লক্ষ্যই করেনি সে। দ্রুতবেগে চলেছিল নিজের কাজে। বনি পিস্তলটা উঁচিয়ে তার মাথার দিকে লক্ষ্য করতে লাগল উইন্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে। তারপর কি ভেবে লক্ষ্য স্থির করল পাশের জানলা দিয়ে। পুলিশম্যান যখন ওদের মোটরের পাশ দিয়ে চলে যাবার উপক্রম করছে, ঠিক সেই সময় পিস্তলের ট্রিগার টানল বনি। গুলিটা লাগল পুলিশ-ম্যানের মাথায়। মোটর সাইকেলটা যখন পাক খেয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে, তখন দেখা গেল, পুলিশম্যানের দেহে প্রাণ নেই।

বনির এই দুটি নৃশংস হত্যাকান্ড আতঙ্ক সৃষ্টি করল সারা দেশে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুজনকে সে হত্যা করেছে বিনা প্ররোচনায়।

লক্ষ্যভেদে বনির অসাধারণ দক্ষতায় হয়তো ক্লাইড-এর আত্মাভিমানে আঘাত লেগেছিল। পরের দিনই সে দেখিয়ে দিল, লক্ষ্যভেদ করতে সেও কম দক্ষ নয়। একজন গোয়েন্দা ওদের চিনতে পেরে ওদের মোটরের দিকে এগিয়ে আসছে সন্দেহ করে সে গুলি করল তাকে। মাত্র পাঁচ ফুট তফাৎ থেকে ক্লাইড চারটে গুলি ছুঁড়ল গোয়েন্দার বুক আর পেট লক্ষ্য করে। তারপর গাড়ি ছুটিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল নিমেষে। তার এই কৃতিত্বে এবার বনির মন খুশি হল কতকটা।

পুলিশ কর্তৃপক্ষের এখন ধারণা হল, ওদের দুজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছে কে কত বেশী খুন করতে পারে এই নিয়ে।

পরের দিন একটি নিরালা পল্লীর রাস্তা দিয়ে ওরা চলেছিল মোটরে করে। বনি লক্ষ্য করল, মোটর সাইকেলে চেপে একজন পুলিশ কর্মচারী আসছে বিপরীত দিক থেকে। মোটরের দরজার উপর পিস্তলটা রেখে লক্ষ্য করতে লাগল বনি। পুলিশ কর্মচারী যেই কাছাকাছি এসেছে তাক করে গুলি করল বনি তার মাথায় এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ধরাশায়ী হল।

গাড়ি চালানোর কাজটা বেশীর ভাগ সময় করত ক্লাইড এবং বনির কাজ ছিল পুলিশের লোকের উপর নজর রাখা। বনির একটা চোখ থাকত সামনে রাস্তার উপর, আরেকটি থাকত পিছনের আয়নার উপর।

পরের মাসে বনি দুবার দেখল, টহলদার পুলিশের লোক গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে পিছু নিয়েছে ওদের। দুবারই বনি মোটরের পিছন দিকের জানলা দিয়ে গুলি চালিয়ে মারল পুলিশের লোককে। ও অঞ্চলের প্রত্যেকটি পুলিশ স্টেশনে খবর গেল—'বনি আর ক্লাইডকে গ্রেপ্তার করো— যেমন করে হোক, ওদের ধরা চাই, জীবিত বা মৃত— দেখতে পেলেই গুলি করবে, সুযোগ ছাড়বে না কিছুতেই।

আরও কয়েকটা রাহাজানি করল বনি আর ক্লাইড এবং তারপর ঠিক করল বিশ্রাম নেবে কিছুদিন। একটা গ্যারেজ ভাড়া করল ওরা মিসোরিতে জপলিন অঞ্চলে। গ্যারেজের উপরে খান দুই ঘর, থাকার অসুবিধা হবে না ওদের।

ক্লাইডের ভাই বাক্ জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে ওরই দিন কয়েক আগে। স্ত্রীকে সঙ্গে করে সেও এসে হাজির হল ঐখানে। ওরা ঠিক করল দিন কতক বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করবে ওদের কাজ। কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল করে বসল বনি। কিছু খাবারদাবার ও খবরের কাগজ কিনে আনতে বেরুল বনি। খবরের কাগজে ওর যেসব ফটোগ্রাফ ছাপা হয়েছিল, তা থেকে কে একজন ওকে চিনতে পেরে খবর দিল স্থানীয় পুলিশকে।

জপলিন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে ত্রিশ জনেরও বেশী পুলিশ কর্মচারী জড় হল বনির ডেরা ঘেরাও করার জন্য। ঘন্টাখানেক পরে বনি সিগারেট কেনার জন্য বাইরে এল। যেই সে রাস্তায় পা বাড়িয়েছে অমনি এক পশলা গুলিবৃষ্টি হল তাকে লক্ষ্য করে। বুলেটগুলো দরজার গায়ে গিয়ে আঘাত করল। কিন্তু কোনটাই স্পর্শ করল না তাকে।

অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল বনি। পুলিশ তখন গুলি ছুঁড়তে লাগল দোতলার জানলা লক্ষ্য করে। ক্লাইড, বাক আর বনি একটা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ধীরভাবে। কিন্তু ব্লানশ্—বাকের স্ত্রী—ঘরের মেঝেয় ঘোরাঘুরি করতে লাগল হামাগুড়ি দিয়ে এবং আতঙ্কে চীৎকার শুরু করল তারস্বরে।

ওরা তিনজন তখন বন্দুক আর মেসিন-গান নিয়ে পুলিশের গুলির পালটা জবাব দিতে লাগল এবং প্রথম চোটেই খতম করল দুজন পুলিশ অফিসারকে।

'এবার আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে এখান থেকে।' উত্তেজিতকণ্ঠে বলে বনি, 'নীচে নেমে মোটরে উঠে ওদের সোজাসুজি আক্রমণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

উপরতলা থেকে পুলিশের উপর গুলি চালাতে লাগল বাক আর এদিকে বনি আর ক্লাইড ক্ষিপ্রপদে নীচে নেমে এসে মোটরে চেপে বসল। বেরিয়ে পড়ার জন্য ওরা যখন প্রস্তুত তখন ক্লাইড উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল বাককে। সঙ্গে সঙ্গে বাক নীচে নেমে এল ভয়ার্ত ব্লানশ্কে টানতে টানতে এবং তাকে তুলে দিল মোটরে।

ক্লাইড স্টীয়ারিং হুইল ধরল শক্ত করে। ছোট একটা মেসিনগান নিয়ে তৈরী হয়ে রইল বনি। তারপর ক্লাইড সংকেত করতেই বাক ছুটে গিয়ে এক ধাক্কায় গ্যারেজের দরজাটা দিল খুলে। সঙ্গে সঙ্গে মোটরটা এগিয়ে গেল তীব্রবেগে। বাক লাফিয়ে উঠে পড়ল গাড়ির পিছনে। বনির মেসিনগান থেকে গুলির ঝাঁক ছড়িয়ে পড়তে লাগল চতুর্দিকে। হঠাৎ এমনিভাবে আক্রান্ত হয়ে পুলিশ-বাহিনী এমনি ঘাবড়ে গেল যে, বিশেষ কিছুই করতে পারল না তারা।

বনির মোটর যখন ছুটে চলেছে বিদ্যুৎ-গতিতে তখন পিছন থেকে মোটরটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল তারা, কিন্তু বনির মেসিনগানের অবিরাম গুলি বর্ষণের ফলে শেষ পর্যন্ত হঠে যেতে হল তাদের। রাস্তার বাঁকে বনির মোটর অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে।

এক সপ্তাহ পরে, বনি আর ক্লাইড এক-খানা ঘর ভাড়া নিল এক গ্রাম্য হোটেলে। ইতিমধ্যে বাক ও তার স্ত্রীকে ওরা পাঠিয়ে দিয়েছে এক নিরাপদ স্থানে। ও অঞ্চলে কেউ চিনত না ওদের, কিন্তু কেমন করে জানি না, হোটেলের মালিক চিনে ফেলল বনিকে এবং খবর দিল পুলিশে।

এবার কিন্তু বনি আর ক্লাইড অসতর্ক ছিল না আগের বারের মত। পালা করে ঘুমোবার বন্দোবস্ত করল তারা। ক্লাইড ঘুমোচ্ছে আর জেগে পাহারা দিচ্ছে বনি। এমন সময় পুলিশের গাড়ি এসে থামল প্রায় একশো গজ দূরে।

নিশুতি রাতে অমন আস্তে আস্তে এসে গাড়িটা থামতেই বনির মন ছ্যাঁৎ করে উঠল। হয়তো পুলিশ এসেছে ওদের পাকড়াও করতে। ব্যস্তভাবে ক্লাইডকে জাগাল বনি। তারপর যেই ওরা সন্তর্পণে ওদের মোটরের দিকে ছুটে গেছে অমনি পুলিশের লোক বেরিয়ে এল কাছাকাছি এক ঝোপের আড়াল থেকে।

ক্লাইডের আগেই মেসিনগান চালালো বনি। ক্লাইডও গুলি চালাল পুলিশকে লক্ষ্য করে। পুলিশের দল এগুতে ভরসা পেল না, আত্মরক্ষার জন্য পিছিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল

ঝোপের মধ্যে। সেই অবসরে ওরা মোটরে এসে উঠে সরে পড়ল সেখান থেকে। পুলিশ-বাহিনী অবশ্য ওদের মোটর লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করেছিল, কিন্তু ওদের কেউই আঘাত পায়নি এতটুকু। সংঘর্ষের শেষে দেখা গেল পুলিশ-বাহিনীরই একজন নিহত এবং কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে।

বনি পার্কার ও ক্লাইড ব্যারোর নৃশংস হত্যালীলা ও অঞ্চলে এক নিদারুণ ত্রাসের সৃষ্টি করল। ইতিমধ্যে এগারোজনকে হত্যা করেছে ওরা। আরও কতজন যে ওদের হাতে প্রাণ হারাবে তা কে জানে!

বনির পরামর্শমত ক্লাইড তখন চলল ডেকসাফিল্ড পার্ক-এর দিকে। এখানেও বনিকে চিনতে পারল কয়েকজন এবং আবার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চম্পট দিল ওরা।

যে অঞ্চলে বাসা নিয়েছিল ওরা তার চারিধার সতর্কভাবে ঘেরাও করে পুলিশ। পালাবার কোন পথই রাখেনি। কুটিরের মধ্যে বনি আর ক্লাইড। ওদের অবস্থা নিতান্ত সঙ্গীন। পুলিশ অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ করছে ওদের কুটিরের চারপাশে। বেরিয়ে গিয়ে মোটরে উঠে যে পালাবে সে আশা দুরাশা। ক্লাইড মরতে চায় না পুলিশের গুলিতে। ধরা দেওয়াই সে যুক্তিযুক্ত মনে করে। কিন্তু বনির মন দমেনি একটুকুও। ধরা দেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। কুটিরের পিছন দিকে সামান্য কিছু দূরে যে একটা নদী আছে, তা সে লক্ষ্য করেছে এখানে আসার পরই। ভাবল, ওরা যদি সাঁতরে নদীর ওপারে যেতে পারে, তবে হয়তো পালাবার কোন উপায় হতে পারে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আগে আগে চলল ক্লাইড, পিছনে বনি। বনির হাতেও মেশিনগান, সেও গুলি বর্ষণ করছে অবিশ্রান্ত। চারিদিকেই পুলিশের লোক ওৎ পেতে বসে ছিল, তারাও বেপরোয়া গুলি চালাতে লাগল। কিন্তু ভাগ্য ওদের অনুকূলে অক্ষতদেহে ওরা এসে পৌঁছুল নদীতীরে। জলে নেমে সাঁতরাতে শুরু করল ওরা। পুলিশের লোকও ইতি-মধ্যে এসে হাজির হল নদীতীরে। ওদের পালাতে দেখে গুলি ছুঁড়তে লাগল ওদের লক্ষ্য করে।

ওরা যখন ওপারের কাছাকাছি এসেছে সেই সময় একটা বুলেট বনির মাথা ঘেঁসে চলে গেল তীব্রবেগে। কিছুক্ষণ বনির চেতনা যেন অসাড় হয়ে গেল আর নদীর জল রাঙা হয়ে উঠল ওর রক্তে। ক্লাইডও নিষ্কৃতি পেল না তারও হাত জখম হল একটা বুলেটের আঘাতে। বনি যে অত্যন্ত বিপন্ন এটা সে জানতে পারেনি। কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে তীরের উপর উঠল।

জলের নীচে তলিয়ে গিয়েছিল বনি, কিন্তু মনের জোরে কোনরকমে উপরে ভেসে উঠল আবার। সেদিকে নজর পড়তেই তাড়া-তাড়ি জলে নেমে ক্লাইড উপরে তুলে আনল তাকে। পুলিশের লোক যখন এপারে এল তখন নদীতীরের ঘন গাছপালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে ওরা।

কিছুদূরে যাবার পর ওরা একটা বড় রাস্তায় এসে পৌঁছুল। সেই রাস্তা ধরে মাইলখানেক হাঁটার পর ওরা দেখল একটা মোটর আসছে পিছন দিক থেকে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ওরা লক্ষ্য করল, গাড়িতে চালক ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। ক্লাইড তাড়াতাড়ি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, বনি চালককে ইসারা করল গাড়ি থামাতে। চালক গাড়ি থামাতেই বনি পিস্তল তুলে ধরল চালকের মুখের সামনে। ক্লাইডও বেরিয়ে এল গুপ্তস্থান থেকে।

মোটরে উঠে কয়েক মাইল যাবার পর ওরা চালকটিকে ঠেলে ফেলে দিল রাস্তায়। তারপর এগিয়ে চলল নিঃশঙ্কচিত্তে।

দুশো মাইল অতিক্রম করার পর ওরা এসে ডালাস-এর নিকট একটা কুটিরে আশ্রয় নিল। সেখান থেকে ফোন করল একজন নার্সকে। ক্লাইড বলল, তার স্ত্রী অত্যন্ত অসুস্থ, নার্সের সাহায্য চাই। নার্স উপস্থিত হলে ক্লাইড তাকে পিস্তল দেখিয়ে বাধ্য করলে বনির ও তার নিজের ক্ষতস্থান ওষুধপত্র দিয়ে ব্যান্ডেজ করতে। তারপর ঐ নার্সকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল আবার। ডালাস ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূরে এগিয়ে আসার পর নার্সটিকে ওরা নামিয়ে দিল গাড়ি থেকে। নার্সের উপর অবশ্য কোন নির্যাতন করেনি ওরা।

পরের দিন খবরের কাগজ পড়ে ওরা জানল, ক্লাইডের ভাই বাক ডেকসাফিল্ড পার্কে আসছিল ওদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য, সঙ্গে ছিল তার স্ত্রী ব্লানশ্। পথে পুলিশের লোক চিনতে পারে তাকে, বাক রিভলবার বের করতেই গুলি চালায় পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় বাক। ব্লানশ্ ভয় পেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে স্বামীর মৃতদেহের পাশে।

নৃশংস হত্যালীলায় আবার মেতে উঠল বনি আর ক্লাইড। কোলোরাডোয় ওদের পথ-রোধ করেছিল একজন পুলিশম্যান, বনি তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারে। ক্যানসাস্-এ পেট্রোল সংগ্রহের জন্য ওরা হাজির হয়েছিল এক ফিলিং স্টেশনে, স্টেশনের কর্মচারী বাধা দেয়, বনির বুলেটে তার জীবনান্ত ঘটে।

এই সময় এক অদ্ভুত খেয়াল এল বনির মাথায়। মানুষ খুন করার শখটা হয়তো স্তিমিত হয়েছিল সাময়িকভাবে, একটা নতুন কিছু করবার জিদ পেয়ে বসল তাকে। ওদের পুরনো বন্ধু রেমন্ড হ্যামিলটন তখনও জেলে রয়েছে। তাকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত করল বনি।

এ ব্যাপারে ক্লাইডের মোটেই উৎসাহ দেখা গেল না। কিন্তু বনি নাছোড়বান্দা, ক্লাইডকে তাই রাজী হতে হল শেষ পর্যন্ত। অবশ্য বনি যখন যা বলেছে ক্লাইড তা পালন করতে গররাজী হয়নি কোনদিন।

রেমন্ডকে জেল থেকে মুক্ত করা নিতান্ত সহজ হবে না বলে ধারণা ছিল ক্লাইডের। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিশেষ বেগ পেতে হল না ওদের। কয়েদীদের যে দলে রেমন্ড ছিল, সেই দলটি কাজ করত জেলখানার বাইরে। অতি সন্তর্পণে কর্মরত রেমন্ডের খুব কাছাকাছি এসে ওরা ডাক দিল রেমন্ডকে আর অমনি রেমন্ড ছুটতে শুরু করল ওদের দিকে। পাছে জেলরক্ষীরা ছুটে এসে রেমন্ডকে ধরে ফেলে এই আশঙ্কায় ওরা বার কয়েক গুলি ছুঁড়ল রক্ষীদের দিকে তারপর দূরে দাঁড়-করানো মোটরে উঠে সরে পড়ল নিমেষের মধ্যে।

ওরা চলে যাবার পর দেখা গেল, রক্ষী-দের একজন নিহত এবং একজন আহত হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল। কেন্দ্রীয় সরকার তখন ডেকে পাঠালেন ক্যাপ্টেন ফ্র্যাঙ্ক হ্যামারকে। গুন্ডা বদমায়েসদের ঘায়েল করতে হ্যামারের মত দক্ষ লোক যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ বিভাগে ছিল বিরল। গভর্ণর ম্যাবেল ফাগুসন ক্লাইড ব্যারোকে মুক্ত দেওয়ার প্রতিবাদে ইনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার অধ্যক্ষ হুভার হ্যামারকে নির্দেশ দিলেন যেমন করেই হোক বনি পার্কার ও ক্লাইড ব্যারোকে পাকড়াও করতে।

চার মাস অনুসন্ধানের পর হ্যামার খবর পেলেন বনি ও ক্লাইডের গতিবিধি সম্পর্কে। সঙ্গে সঙ্গে সুকৌশলে তিনি অগ্রসর হলেন ওদের ফাঁদে ফেলবার জন্য।

জেলখানা থেকে পালিয়ে রেমন্ড ওদের সঙ্গে মিলিত হল বটে কিন্তু পুলিশের ভয়ে সে এমনি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, একদিন রাতে অন্যত্র চলে গেল বনি আর ক্লাইডকে ছেড়ে।

বনি এখন কবিতা লিখতে শুরু করল। হঠাৎ তার এই কবিতা রচনার ঝোঁক এল কেন তা অবশ্য জানা যায় না। হয়তো তার মনটা বাইরের জগৎ থেকে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে অন্তর্জগতের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। তার লেখা অনেকগুলি কবিতা পরে পাওয়া যায়।

সঙ্কট ঘনিয়ে এল ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। টেকসাস-এর অন্তর্গত গ্রেপভাইন শহরের কাছে টহলদার পুলিশ খবর পেল, এক তরুণ-তরুণী যুগলকে মোটর চালিয়ে যেতে দেখা গেছে যাদের সঙ্গে বনি ও ক্লাইডের চেহারার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

দ্রুতগামী মোটর সাইকেল চড়ে দুজন সশস্ত্র পুলিশ অফিসার বেরিয়ে পড়ল ওদের সন্ধানে। বনি ও ক্লাইড যে গাড়িতে ছিল সেই গাড়ির পিছু ধরল তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই। কিন্তু বনির সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে

পারল না তারা। চলন্ত মোটর থেকে বনি গুলি করল পর পর দুজন অফিসারকে লক্ষ্য করে। দুজনই সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল মোটর সাইকেল থেকে, গাড়ি যখন তীরবেগে এগিয়ে চলেছে। বনি লক্ষ্য করল আহত অফিসারদের একজন হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তার ওধারে যাবার চেষ্টা করছে। ক্লাইডকে সে হুকুম করল গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ঐ জায়গায় ফিরে যেতে।

ওরা যখন ঐ জায়গায় ফিরে এল তখন বনি দেখল একজন অফিসার মৃত, অপরজন হামাগুড়ি দিয়ে এসে মোটর সাইকেল সংলগ্ন রেডিওর দিকে হাত বাড়াবার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে ঐ জায়গায় চলমান কয়েকখানা মোটর এসে দাঁড়িয়ে গেছে। গাড়ি থেকে ঝুঁকে আহত পুলিশ অফিসারটির মাথা লক্ষ্য করে নির্ভয়ে গুলি করল বনি। অপর অফিসারটি মৃত মনে হলেও তাকেও রেহাই দিল না সে, তারও মাথায় গুলি করল একটা। কি জানি, সে যে সত্যিই মারা গেছে এমন না-ও হতে পারে। দুজনেই একেবারে খতম হয়েছে এবিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার পর ক্লাইডকে সে বলল গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য।

ওকলাহোমায় বনি আরেকজন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করল অকারণে। লোকটি ওদের গাড়ির কাছে এসেছিল কি একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করতে। বনি তার দুই চোখের মাঝখানে গুলি করল আচম্বিতে, তারপর ক্লাইডকে নির্দেশ দিল গাড়ি চালিয়ে যাবার জন্য।

হিংস্র পশুর মত বনি হয়ে উঠেছিল রক্তপিপাসু। তবে ওর ঘৃণা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল পুলিশের লোকের উপর। এই সময় ওর হাতে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় বারোজন, তার মধ্যে নজনই পুলিশের লোক। ক্লাইড হত্যা করেছিল ন'জনকে। অর্থাৎ ওরা দুজনে সবসুদ্ধ একুশজনের প্রাণ হরণ করে।

প্রত্যেকটি স্টেট-এর পুলিশ যে ওদের গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে, কোথাও যে ওরা নিরাপদ নয়, তা ওরা বুঝতে পেরেছে এখন। কিন্তু উপায়ই বা কী? যে জীবন বেছে নিয়েছে ওরা তার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ওরা চলল লুইজিয়ানার অন্তর্গত বিয়েনভিল্-এর আরণ্য অঞ্চলে। ভাবল, ওখানে ওরা গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে অনায়াসে। কিন্তু ওখানকার পথঘাট ভালোরকম জানা ছিল না ওদের কারুরই। হ্যামার বরাবরই খবর রাখছিলেন ওদের গতিবিধি সম্বন্ধে। লুইজিয়ানার পুলিশ কর্তৃপক্ষকে তিনি জানালেন, বনি ও ক্লাইড নিশ্চয় আশ্রয় নিয়েছে ঐ পার্বত্য অঞ্চলে। সঙ্গে-সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠল স্থানীয় পুলিশ।

হঠাৎ একদিন হ্যামার খবর পেলেন, ওরা বিয়েনভিল্-এর জঙ্গলের কাছে ঘোরাফেরা করছে। খবরটা দিল এক পেট্রোল স্টেশনের কর্মচারী। ওদের যেখানে দেখতে পাওয়া গেছে সেই অঞ্চলে লোকের বসতি কম। শুধু গরমের সময় বাইরে থেকে কিছু লোকের সমাগম হয়। এখানকার একটি রাস্তা বাদে সব রাস্তাই পুলিশ বন্ধ করে দিল অবরোধ সৃষ্টি করে। হ্যামারের পরামর্শ অনুযায়ী ঐ একটি রাস্তা খোলা রাখা হল এই আশা করে যে, এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে বনি ও ক্লাইড নিশ্চয়ই ওটা দেখতে পাবে এবং নির্ভয়ে ঢুকে পড়বে কোথাও কোন বাধা না দেখে। ঐ রাস্তারই ধারে একটা ঘন ঝোপের মধ্যে আস্তানা নিলেন হ্যামার—সঙ্গে পাঁচজন পুলিশের লোক। তিনজন এসেছে টেক্সাস্ থেকে, বাকী দুজন স্থানীয় পুলিশের কর্মচারী। বন্দুকে কার্তুজ ভরে ওরা নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল। বনি আর ক্লাইড যে ঐ পথে আসবে এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় না হলেও হ্যামারের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর যথেষ্ট আস্থা ছিল ওদের।

সঙ্গীদের লক্ষ্য করে হ্যামার বললেন, "আজ আমরা যার প্রতীক্ষায় রয়েছি তার মত নির্মম খুনী এদেশে কেউ কোনদিন দেখেনি। বারোজনকে হত্যা করেছে সে, আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে হত্যা করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করবে না। নারী বলে কোনরকম করুণা করো না তাকে, কারণ তার কাছ থেকে এতটুকু করুণা প্রত্যাশা করতে পারো না তোমরা। যেই ওরা দুজন কাছাকাছি হবে অমনি ওদের দিকে লক্ষ্য করে অবিরাম গুলি চালাবে, ওরা যেন প্রাণ নিয়ে পালাতে না পারে। তা যদি না পারো, ওদের গুলিতে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য।"

নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে পুলিশ অফিসাররা। উত্তেজনায় সারা দেহ ঘেমে ওঠে। হঠাৎ একটু দূরে একটা মোটরের হেডল্যাম্পের তীব্র আলো দেখা যায়। বনি আর ক্লাইড যে ঐ মোটরের আরোহী সে সম্বন্ধে হ্যামার নিঃসন্দেহ। কারণ ঐ রাস্তায় সে রাত্রে আর কোন মোটর যাতে না আসে তার ব্যবস্থা পূর্বেই করা হয়েছিল।

মোটরটা যখন নীচু থেকে চড়াইয়ের উপর উঠছে তখন বনি সীটের উপর গা এলিয়ে দিয়েছে মনের আনন্দে। ভাবছে, এবারও ওরা পুলিশকে বোকা বানিয়েছে বুদ্ধির কৌশলে। অকস্মাৎ রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে একসঙ্গে অনেকগুলি বন্দুক গর্জে উঠল। চলন্ত মোটরের উপর গুলি বর্ষণ হল শ্রাবণধারার মত। কিছুদূর এগিয়ে এসে গাড়িখানা একটা প্রকাণ্ড গাছে ধাক্কা খেয়ে উলটে গেল। হ্যামার ছুটে এসে দেখলেন, ক্লাইডের দেহটা কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে স্টীয়ারিং হুইল ও দরজার মাঝে নিষ্পিষ্ট হয়ে। এমনি বিকৃত হয়েছে তার দেহ যে তাকে চেনা যায় না মোটেই। তার ওপাশে পড়ে আছে বনি—তার কৃশ দেহে পঞ্চাশটি বুলেটের চিহ্ন, পরনের শাদা ফ্রকটা রক্তে রাঙা। তার ডান হাতে ছোট্ট একটা মেসিনগান, বাঁ হাতে স্যাণ্ডউইচের একটা টুকরো।

একখণ্ড কাগজে বনি তার শেষ ইচ্ছাটা লিখে গিয়েছিল এবং সেটি পাওয়া যায় তার গাড়ীর মধ্যে। বনি চেয়েছিল, মৃত্যুর পর যেন তাকে সমাহিত করা হয় ক্লাইড ব্যারোর পাশে। কিন্তু তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তার ক্ষতবিক্ষত দেহটা বাড়ি নিয়ে এসে নিকটস্থ এক গোরস্থানে সমাধিস্থ করেন তার মা।

রোপওয়ে

নৃপেন বসু

দার্জিলিং-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত রংগীত উপত্যকায় আটাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি নির্মিত "দার্জিলিং রংগীত ভ্যালি রোপওয়েটি" ভারতে সর্বোচ্চ ও দীর্ঘতম যাত্রী ও মালবাহী রজ্জুপথ এবং এর দৈর্ঘ্য আট কিলোমিটার। এশিয়ার মধ্যেও এটিকে দীর্ঘতম রজ্জুপথ বলে দাবী করা হয়। গত ৮ মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর আনুষ্ঠানিকভাবে এই রজ্জুপথের উদ্বোধন করেন।

পশ্চিমবঙ্গ বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে নির্মিত এই রজ্জুপথটি মাল ও যাত্রী দুই-ই পরিবহন করতে সক্ষম। দার্জিলিং-এর রংগীত উপত্যকার এবং তার পার্শ্ববর্তী সিকিম রাজ্যের অরণ্যানীর বনজ সম্পদ এতদিন যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবের দরুন কোন কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছিল না। বিশেষ করে দার্জিলিং শহরে কাঠকয়লা বা জ্বালানী কাঠের তীব্র সংকট দীর্ঘদিন থেকে অনুভূত হলেও তার সমাধানের কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি। পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ আইন কার্যে পরিণত হলে রংগীত উপত্যকার গোক ফরেস্ট বনবিভাগের অধীন আসে এবং এই অরণ্য থেকে কাঠকয়লা ও অন্যান্য বনজ সম্পদ অতি সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে শহরে নিয়ে আসার জন্য সিংগলা বাজার থেকে দার্জিলিং শহর পর্যন্ত একটি 'রোপওয়ে' নির্মাণ এক অর্থকরী পরিকল্পনা হিসাবে বন বিভাগের নিকট বিবেচিত হতে থাকে এবং সেই মত একটি পরিকল্পনাও প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু এটির নির্মাণকাজে বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হওয়ায় এবং তা সংগ্রহ করতে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় এটির নির্মাণকাজ আপাততঃ স্থগিত রাখা হয়। এক বছর পরে বিদেশী মুদ্রা লাভের পথ উন্মুক্ত হলে ১৯৬৩ সালে পরিকল্পনামত এই রজ্জুপথ তৈরীর কাজে হাত দেওয়া হয়।

এই রজ্জুপথ গোক ফরেস্টের বন-সম্পদ পরিবহন করা ব্যতীত এর সংলগ্ন সিকিমের বনজ সামগ্রী ও দুগ্ধজাত পণ্য দ্রব্য বহন করবে। এ ছাড়া এই রজ্জুপথে আলু, এলাচ, শাকসব্জী প্রভৃতি অতি সহজে এবং কম সময়ে শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আমদানী করা যাবে এবং শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীও প্রেরণ করা যাবে। এই রজ্জুপথের মধ্যে কয়েকটি চা-বাগিচা পড়ায় এর মারফৎ চা ও বাগিচার অন্যান্য সামগ্রী অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে আনা-নেওয়ার সুবিধা হবে। এই উদ্দেশ্যে এই রজ্জুপথের মধ্যবর্তী পথে দুইটি সাব-স্টেশনও নির্মাণ করা হয়েছে।
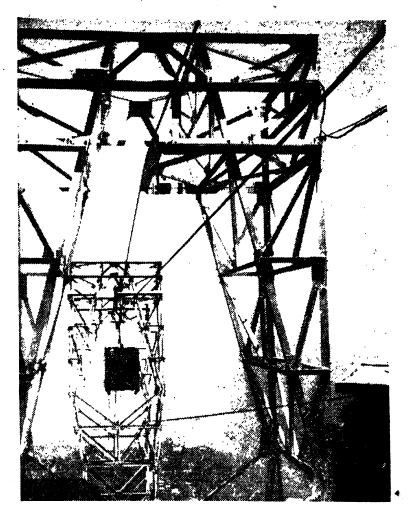
দার্জিলিং শহর থেকে দুই মাইল দূরে লেবং-এর পথে ছয় হাজার আটশত ফুট উঁচুতে অবস্থিত নর্থ পয়েন্টের সিঙ্গামারী থেকে এই রজ্জুপথটির আরম্ভ এবং শেষ তিনটি পার্বত্য স্রোতস্বিনী নদী—ছোট রংগীত, বড় রংগীত ও রামন নদীর সংগমস্থল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র আটশত ফুট উঁচুতে অবস্থিত সিংগলা বাজারে। মধ্যে ভা তাকভার ও বার্নেসবেগ--এই দুইটি সাব-স্টেশন অবস্থিত।

এই রজ্জুপথ পরিপূর্ণভাবে চালু হলে বছরে চার হাজার টন মাল এবং দশ হাজার জন যাত্রী বহন করতে পারবে বলে বন বিভাগ মনে করেন। এই মালের প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ বন বিভাগের বন সম্পদ থাকবে। রজ্জুপথটি বছরে চার থেকে সাড়ে চার মাস চালু থাকবে এবং আপাততঃ এর থেকে বছরে চার লক্ষ টাকা আয় হবে এবং ব্যয় হবে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।

রজ্জুপথের বাহক-কামরাটি একটি বিশ মিলিমিটার ব্যাসের স্থিতিশীল তারকে কেন্দ্র করে ঝুলে থাকবে এবং অন্য আর একটি দশ মিলিমিটার ব্যাসের তার কামরার সংগে জুড়ে থেকে এটিকে বিদ্যুৎ-শক্তি বলে টেনে নিয়ে যাবে। এই রজ্জুপথটি চার অংশে বিভক্ত এবং প্রতি অংশই অনন্যনির্ভর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেকেণ্ডে তিন মিটার গতিবেগসম্পন্ন এই রজ্জুপথটি প্রতি ঘণ্টায় ১·৫ টন মাল বহন করতে এবং একসংগে সাতশ' কে-জি বা ছয়জন যাত্রী নিয়ে যেতে পারবে।

বিদ্যুৎ শক্তিবাহিত এই রজ্জুপথটির জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ তাঁদের বিজনবাড়ীস্থ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র থেকে পঞ্চাশ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবেন। জনৈক বিদেশী 'সুইস' বিশেষজ্ঞের সহযোগিতায় ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের তত্ত্বাবধানে নির্মিত এই রজ্জুপথটির জন্য বিদেশী মুদ্রায় প্রায় সাত লক্ষ টাকার সরঞ্জাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাহায্য বাবদ পাওয়া গেছে এবং এটি পুরোপুরিভাবে চালু হলে দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে আশা করা যায়।

অভিযুক্তকাহিনী লিজা

আরনেস্ট হেমিংওয়ে

হর্টন্স বে শহরে জিম গিলমোর নতুন এসেছে। কানাডা থেকে এসে হর্টন-বুড়োর কামারশালাটা জিম কিনে নেয়। ঘোড়ার ভালো নাল তৈরি করতে এবং পরাতে তার জুড়ি ছিল না। তবে লোকটাকে দেখে তেমন মেহনত করার ক্ষমতা আছে মনে হত না, ভারী ছিমছাম চেহারা। দোকানঘরের ওপরতলায় সে থাকত আর স্মিথ পরিবারে আহারের ব্যবস্থা করেছিল।

লিজা কোটস্ মিঃ স্মিথের বাড়িতে কাজ করত। মিসেস্ স্মিথ বেশ মোটাসোটা তবে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং রুচি-শীলা। তিনি সব সময় বলতেন, লিজার মত এমন পরিচ্ছন্ন মেয়ে বেশী দেখেননি।

জিমের নজরে ধরেছে লিজা। তার পা-দুখানি ভারী মনোহর। সব সময়েই তার পরিধানে ধবধবে একটা ঘাঘরা—মাথার চুলগুলি সুন্দর করে গোছানো। মেয়েটার মুখখানাও জিমের পছন্দ। সব সময় হাসি লেগে আছে সে-মুখে। তবে জিমের মনে তেমন কোনো আতিশয্য নেই। লিজার কথা সে ভাবে না।

জিমকে ভালো লাগে লিজার। শুধু ভালো লাগে নয়, ভীষণ ভালো লাগে। অনেক সময় সে রান্নাঘরের চৌকাঠে বেরিয়ে এসে জিমের চলার ভঙ্গীটুকু দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। এমনকি জিমের গোঁফ-দুটিও লিজার মনে ধরেছে।

জিম হাসলে তার সুসংবদ্ধ শাদা দাঁত-গুলিও লিজাকে আকৃষ্ট করে। কামার-শালের হাতুড়িওলাদের মত যে জিমকে দেখতে নয়, তার জন্য লিজা মনে মনে পুলক অনুভব করে। একদিন লিজার মনে হল জিমের পেশীবহুল বলিষ্ঠ হাতের ওপরকার ভ্রমর-কালো চুলগুলিও তার ভালো লাগছে, আর তার দেহের যে-অংশটা জামায় ঢাকা সেই অংশটা খোলা অংশটার চেয়ে কী ভীষণ রকম ফরসা। সব জড়িয়ে এই ভালো লাগাটায় অবাক হয়ে যায় লিজা। কেমন মজার!

হর্টন্স্ বে অঞ্চলে মাত্র পাঁচখানা বাড়ি। তবে একেবারে সদর রাস্তার ওপর খাসা শহর—ওপারে বয়েন সিটি, অন্য পারে শার্লেভয়। সবরকমের দোকানপত্র এবং পোস্ট অফিস নিয়ে একটা বাড়ি, আর পর-পর স্মিথ, স্টাউড, ডিলওয়ার্থ, হর্টন ও ভ্যান হুসেনদের বাড়ি। এই নিয়ে হর্টন্স বে গড়ে উঠেছে। সব বাড়ির চারপাশে দেব-দারু গাছ খাড়া হয়ে উঠেছে, এ-অঞ্চলে পথেঘাটে বেলেমাটির অংশ বেশী। রাস্তার দুই ধারের উঁচু জমিতে চাষ হয়, কাঠ আছে। আরো ওপরে মেথডিস্ট চার্চ এবং

*

আরনেস্ট হেমিংওয়ে (১৮৯৯-১৯৬১) সিকাগোর ওক পার্ক নামক পল্লীতে এক মধ্যবিত্ত সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। হেমিংওয়ে প্রথম জীবনে ছিলেন সাংবাদিক। তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে-ছেন। তিনি স্পষ্টবাদী এবং কঠিন সমালোচক। জীবনশিল্পী হেমিংওয়ে জীবনের দিকটা রূপায়িত করেছেন নিখুঁত ভঙ্গীতে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন এবং ১৯৬১-তে আত্মহত্যা করেন। বর্তমান কাহিনীটি লেখকের বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক।

*

শহরের একমাত্র ছোট স্কুলবাড়ি। এই স্কুলের ঠিক সামনেই কামারশালার লাল-বাড়িটা।

পাহাড়ের বুক চিরে একটা বেলে-মাটির রাস্তা বৃক্ষশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে একেবারে নীচে নেমে গেছে। স্মিথের বাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বনভূমি পার হয়ে হ্রদের ধারে উপসাগরের মুখে পৌঁছে এই পথ শেষ হয়েছে। গরমের সময় আর বসন্তকালে ভারী সুন্দর দেখায় আর উপসাগরটা নীল ও উজ্জ্বল দেখায়। লিজা অনেক সময় মালবোঝাই নৌকাগুলো হ্রদের জলে ভেসে বয়েন সিটির দিকে চলেছে এই দরজা দিয়ে দেখে। যখন দেখে তখন মনে হয় সব থেমে আছে, কিন্তু ঘরের ভেতর কয়েকটা ডিস ধুয়ে আবার ফিরে এসে দেখে সেইসব নৌকা অনেকদূর এগিয়ে চলে গেছে। লিজার মনে বিস্ময়ের ঘোর সৃষ্টি হয়।

আজকাল কিন্তু সব সময়েই লিজার মন ভরে আছে জিম গিলমোর। জিম যে তার দিকে তাকায় তা মনে হয় না। সে কেবল স্মিথের সঙ্গে নানারকম কথা বলে—দোকান, রিপাবলিকান পার্টি, জেমস ব্লেইন, আরো কত কি। সন্ধ্যার পর ড্রয়িং রুমে বসে 'টোলেডো ব্লেড', বা 'গ্রান্ড র‍্যাপিডস' সংবাদপত্র পড়ে। কোনো কোনোদিন স্মিথের সঙ্গে একটা জ্যাক লাইট নিয়ে মাছ ধরতে যায়। এইভাবে দিনের পর দিন চলে যায়।

এর কিছুদিন পরে—জিম, স্মিথ এবং চার্লি ওয়ামান একটা গাড়িতে তাঁবু, কুড়ুল, রাইফেল এবং দুটি কুকুর সঙ্গে নিয়ে পাইনবনে হরিণ শিকার করতে গেল। এই শিকারযাত্রার চারদিন আগে থেকে মিসেস স্মিথ আর লিজা ওদের জন্য খাবার-দাবার আয়োজন করছে। এই সময় জিমের জন্য বিশেষ করে একটা কিছু বানাবার বড় বাসনা হয়েছিল লিজার মনে। কিন্তু লজ্জায় তা করা হল না। মিসেস স্মিথের কাছে একটু বেশী করে ডিম আর ময়দা চাইতে তার সাহসে কুলালো না। বাইরে

থেকে যে কিনে আনবে তাও পারেনি। যদি রান্নার সময় মিসেস স্মিথ ধরতে পারেন! এসব কিছুই হয়ত হত না, তবে ভয় এসে বাধা দিয়েছিল লিজার মনে।

জিমরা চলে যাওয়ার পর প্রতিদিনই তার কথা মনে মনে চিন্তা করে লিজা। জিমের এই আড়ালে থাকায় বড় অস্বস্তি বোধ করে লিজা। রাতে ভালো করে ঘুম হয় না জিমের কথা ভেবে। তবু এইটুকু কষ্টও যেন কষ্ট নয়, জিমের কথা ভাবলেও আনন্দ তার জন্য কষ্ট পাওয়ার মধ্যেও আনন্দ কম নয়। জিমের যেদিন ফিরবে তার আগের রাতটা বড় ছটফট করে কাটল লিজার। সারারাত চোখে ঘুম নেই। যখন ঘুমায় তখন স্বপ্ন দেখে জিমের, অনেকটা সময় ঘুম আর জাগরণের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে কাটায়, এইভাবেই কাটল সমস্ত রাত।

এর পরদিন যখন রাস্তায় জিমদের গাড়ি আসছে দেখা গেল, তখন সহসা আপনাকে কেমন ক্লান্ত দুর্বল মনে হল লিজার, তার মাথাটা যেন ঘুরতে থাকে: জিমকে এক ফাঁকে দেখে না নিলে তার মন যেন প্রবোধ মানতে চায় না, কি আকুলতা সারা দেহ-মনে।

এই যে ক্লান্তি, এই যে অসুখ অসুখ ভাব—এ সবই জিমকে একবার চোখে দেখলেই সেরে যাবে। এমনিতেই সারা দেহে সাড়া জেগেছে, কেমন একটা শিহরন দেহে ও মনে।

দেবদারু গাছের নীচে গাড়িটা থামল। মিসেস স্মিথ ও লিজা বাইরে বেরিয়ে দাঁড়াল। ওদের তিনজনের এ কদিন শিকারের নেশায় দাড়ি কামাবার খেয়াল হয়নি, সকলের মুখেই একরাশ গোঁফ-দাড়ি।

গাড়ির ভেতর তিনটি হরিণের দেহ পড়ে আছে। তাদের শীর্ণ পাগুলি গাড়ির পাশে বেরিয়ে পড়েছে।

মিসেস স্মিথ সোহাগভরে তাঁর স্বামীকে চুমু খেলেন, তাঁকে আবেগভরে জড়িয়ে ধরলেন মিঃ স্মিথ।

জিম এসে লিজার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো—হ্যালো লিজ—!

এই উক্তিতে লিজার চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠল। মনে মনে ভারী খুশী হয়েছে লিজা।

হরিণ-তিনটি নীচে টেনে নামাল জিম। একটা বেশ প্রকাণ্ড। হরিণটা দেখে মেয়েরা খুশী, তাদের চোখে ফুটে উঠেছে সেই অভিব্যক্তি।

লিজা মধুর হেসে জিমকে জিজ্ঞাসা করে—ওটা তুমি মেরেছ না জিম?

সম্মতিসূচক ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে জিম বলে—হ্যাঁ, আমিই মেরেছি, ভারী চমৎকার দেখতে হরিণটাকে, না?

লিজা তার চমৎকার দাঁতগুলি বিকশিত করে মধুর ভঙ্গীতে হাসল।

সেই রাত্রে চার্লি ওয়াম্যান স্মিথদের বাড়িতেই থেকে গেল। সে নিমন্ত্রিত। একপেট খেয়ে আবার শার্লেভয়তে ফিরে যাওয়া যায় না।

খাওয়ার আগে স্মিথ প্রশ্ন করে—জিম সেই পাত্রে আর কিছু আছে নাকি?

আছে—বলেই জিম উঠে চলল।

সুরার পাত্রটি গাড়ির ভেতর ছিল। তাতে চার গ্যালন হুইস্কি ধরে। একেবারে পূর্ণ পাত্র না হলেও যেটুকু মাল ছিল তার ওজন তেমন কম নয়। ভারী পাত্রটি অনায়াসে তুলে চুমুক দিল। অনেকটা পেটে পড়ল, মদ পড়ে সার্টের সামনের দিকটা ভিজে গেল।

পাত্রটি নিয়ে সে যখন ঘরে এল তখন তার অবস্থা দেখে চার্লি এবং স্মিথ দুজনেই মুখ টিপে হাসল।

লিজা তিনটি গ্লাস এনে দিল। তিনটি গ্লাসেই অনেকটা করে মদ ঢাললেন মিঃ স্মিথ।

চার্লি স্মিথের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে—তোমার অনারে এই মদ্য পান করছি—'

মিঃ স্মিথ বললেন—আমি পান করছি ঐ বিরাট হরিণটার সম্মানে—

জিম তার গ্লাসটি তুলে বলল—আর আমি পান করছি যাদের খতম করতে পারিনি সেই পলাতকদের অনারে—

এই বলেই সে এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করল।

—ও হো!

—অমৃত!

—ঠিক এই সময়ে এর চেয়ে খাঁটি আর কিছুই পাওয়া যায় না!

—আর এক গ্লাস চলবে?

—চলতেই হবে।

—ঢালো, ঢালো ভাই—

—সামনের বছরকে নিবেদন করে'

জিমের খুব সুন্দর লেগেছে। হুইস্কির এই চমৎকার স্বাদ আর তার ধীর বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া ওর বেশ লাগে।

ভালো মদ, ভালো খাবার আর নরম আরামপ্রদ বিছানা, তার কাছে কিছু নয়! আঃ—কি চমৎকার!

আর এক গ্লাস ঢালা হল। তারপর আহারে বসল। তিন জনেরই বেশ চুরচুরে নেশা হয়েছে, তবে কেউ মাত্রাজ্ঞান হারায়নি।

টেবিলের ওপর সবরকম খাদ্যদ্রব্য সাজিয়ে দিয়ে লিজাও ওদের সঙ্গে আহারে বসল। ভারী চমৎকার রান্না হয়েছে। খাবার টেবিলের পুরুষ শরিকরা বেশ গম্ভীর ভঙ্গীতে একটা অস্বাভাবিক ভক্তি নিয়ে সেই সব ভোজ্য-দ্রব্য পরমানন্দে উপভোগ করতে লাগলেন।

ভোজন পর্ব শেষ।

পুরুষরা সবাই আবার ড্রয়িং রুমে এসে বসলেন।

মিসেস স্মিথ আর লিজা দুজনে মিলে টেবিলের জিনিসপত্র সব পরিষ্কার করে, জিনিসপত্র গোছ-গাছ করে ওপরের ঘরে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পরে মিঃ স্মিথও ওপরের ঘরে চলে গেলেন।

জিম আর চার্লি দুজনে তখনও ড্রয়িং-রুমে বসে বকবক্ করছে।

লিজা রান্নাঘরটিতে ফিরে এসে বসে রইল। গরম উনানটির পাশে বসে আছে একটা বই হাতে নিয়ে, যেন পড়ছে, কিন্তু তার কান পড়ে আছে জিমের পদধ্বনি শোনার জন্য। এর মধ্যেই শুয়ে পড়তে চায় না লিজা। জিম হয়ত ড্রয়িংরুম থেকে এখনই উঠে পড়ে নিজের ঘরে শুতে যাবে। জিমকে সেই ফাঁকে চোখ-ভরে দেখবে লিজা।

সেই যে একটু দেখা, তার স্মৃতিটুকু নিয়ে চলবে মনের গভীরে রোমন্থন। সেই সুখের স্পর্শ গায়ে মেখে ও ঘরে গিয়ে বিছানায় শোবে।

যখন জিমের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে লিজা ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল জিম। জিমের মাথার চুলগুলো উসকো-খুসকো, দুটি চোখ যেন জ্বলছে।

সেদিক থেকে তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরিয়ে লিজা তার হাতের বইখানির দিকে তাকায়।

জিম এসে ঠিক পিছনে দাঁড়াল।

জিমের ভারী নিঃশ্বাসের আওয়াজ লিজার কানে আসে। কয়েকটি অস্বস্তিকর মুহূর্ত। তারপর আচমকা পিছন থেকে সজোরে জড়িয়ে ধরল জিম। জিমের বলিষ্ঠ হাতের প্রবল পেষণে লিজার স্তনচূড়া কঠিন হয়ে ওঠে।

ভীষণ ভয়ে করে লিজার।

আজ পর্যন্ত লিজাকে কেউ এমনভাবে জড়িয়ে ধরেনি। কেউ ওর অঙ্গ স্পর্শ করেনি। আজ বল-নাচের ভঙ্গীতে নিবিড় বাহুর বন্ধনে বেঁধেছে জিম। কি করবে লিজা!

নিজের মনকে প্রবোধ দেয় লিজা—এযে আমার দেহের দুয়ারে ভিক্ষা নিতে এসেছে, আমার কাছে আপনাকে নিবেদন করতে এসেছে।

কিন্তু লিজার মনে মনে ভীষণ ভয়।

কি যে হবে, কি ঘটবে কে জানে। সে যেন কাঠের পুতুল হয়ে গেছে। চেয়ারের পিছন দিক থেকেই জিম তাকে চেপে ধরে একটা প্রলম্বিত চুমায় তার দুটি ঠোঁটে আগুন ধরিয়ে দেয়।

কি সুতীব্র অনুভূতি। কি অসহ্য পুলক। কি অপরিসীম সুখ। এ যেন আনন্দময় বেদনার অনুভূতি।

জিম আছে চেয়ারের পিছনে কিন্তু তবু তার স্পর্শ সারা অঙ্গে সুতীব্র শিহরন এনেছে।

প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল এ সহ্যসীমার বাইরে। সারা অঙ্গ থরথর কাঁপছে, কিন্তু একটি কোমল মধুর আবেশ সারা দেহকে কেমন অবশ করে দিয়েছে। লিজা জিমকে চায়, আর দেরী নয়। এখনই, এই মুহূর্তে ওকে চাই।

খুব চাপা গলায় জিম বলে—চলো লিজা একটু বেড়িয়ে আসি।

কোনো কথা নয়, দেয়ালের গায়ে হুকে টাঙানো ছিল মোটা কোট, লিজা সেই কোটটি তুলে নিয়ে পরল। তারপর বেরিয়ে পড়ল দুজনে, কারো মুখে কোনো কথা নেই।

এক হাতে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরেছে জিম। আঁঠাল বেলেমাটির পথ। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বসে যাচ্ছে।

একটু করে এগিয়ে আবার ওরা থামে উন্মত্ত আবেগে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমায় চুমায় ভরিয়ে দেয়। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে।

আকাশে এখন আর চাঁদ নেই।

গাছ-পালার ঘন বীথির মাঝে ছায়া-ঢাকা পথের ভেতর দিয়ে দুজনে চলেছে। এই পথ একেবারে হ্রদের ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেইখানে ডক। ডকের পাশে মাল রাখার গুদাম-ঘর। গুদাম-ঘরে জড়োকরা কাঠের গায়ে জলের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে।

বেশ অন্ধকার, চারপাশ স্তব্ধ। শুধু বিরামবিহীন জল-কল্লোল।

আজকের রাতটিতে কনকনে শীত। কিন্তু একটু ঠান্ডা লাগছে না। জিমের সান্নিধ্যে লিজার সারা দেহটা যেন অগ্নিকুন্ডে হয়ে উঠেছে।

গুদাম-ঘরের সেই নিবিড় অন্ধকারের আশ্রয়ে লিজাকে নিবিড় করে টেনে নিয়েছে জিম। এই আকর্ষণে লিজার সারা অঙ্গ কাঁপছে। আত্ম-সমর্পণের লগ্ন এসেছে, অথচ দ্বিধায় জড়িয়ে আছে তার সমস্ত অন্তর।

জিমের একটা হাত তার জামার বোতাম ছিঁড়ে ফেলে স্তন দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

ভীষণ ভয় করছে। কি কান্ড জিমের। কি যে সে করতে চায় বোঝা যায় না তবু তার সঙ্গে এমনই ঘনিষ্ঠ হয়ে জড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে।

কাকুতি ভরে লিজা বলে—না জিম! লক্ষ্মীটি! জিমের হাত কিন্তু থামতে চায় না।

—ছি জিম। অমন কোরো না। জিম—

কিন্তু জিম বা তার অবাধ্য হাত লিজার কথা শুনতে পায় না।

এখানকার এই পাটাতনের কাঠগুলি বেশ শক্ত। জিম এইবার তার পোষাক খুলে ফেলছে।

কি যে হবে, ভীষণ আতংকিত হয়ে উঠেছে লিজা।

কিন্তু তবু জিমকে ছাড়তে মন চায় না। জিমকেও চাই।

সে আবার বলে—শোনো জিম, একটু থামো—। অমন কোরো না লক্ষ্মীটি—

—না, লিজা, আজ আর কথা নয়। আজ আমাদের দুজনার দুজনকে দরকার—

—না, না, কোনো দরকার নেই। এ বড় অন্যায়। জিম আমার বড় কষ্ট হচ্ছে জিম, থামো। থামো। আঃ—

ডকের এই পাটাতন সত্যি বড় কঠিন। উঁচু-নীচু।

লিজার বড়ই অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। জিমকে সরিয়ে দেয় লিজা। জিম এখন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার শরীর অবশ, নিশ্চল ভঙ্গীতে পড়ে আছে। কিছুতেই সে নড়বে না।

কোনো রকমে আপনাকে মুক্ত করল লিজা। এতটুকু শব্দ না করে জিমের ঘুম না ভাঙিয়ে সে উঠে বসল। অন্তর্বাস নিজের ঘাঘরা এবং কোট গুছিয়ে নিয়ে মাথার চুলগুলো দুই হাতে ঠিক করে নিল।

জিম তেমনই নিদ্রায় অচেতন। তার মুখখানি কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে আছে। লিজা তার মুখের ওপর উপুড় হয়ে একটা চুমু খেয়ে নেয়।

তেমনই ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন জিম। লিজা একবার মাথাটায় নাড়া দিল। কোনো সাড়া নেই জিমের, মাথাটা ওপাশে গড়িয়ে গেল।

এতক্ষণে লিজা কাঁদতে থাকে। আকুল-করা কান্না।

ডকের ধারে পোঁছে জলের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল লিজা। জলের ওপর বেশ ঘন কুয়াশার মেঘ নেমেছে।

বেশ শীত। লিজার খুব শীত করছে। লিজার মনটা ভালো নেই, কেমন দুঃখ হয়, নিজেকে একান্ত অসহায় মনে হয়। এইমাত্র যেন তার সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। সে এখন রিক্ত।

জিম তেমনি শুয়ে আছে। বেশ জোরে তাকে নাড়া দেয় লিজা। না, জিমের চৈতন্য নেই একেবারে। লিজা কাঁদছে। তার চোখের জল থামছে না। সে বলে—

—জিম, জিম। শোনো জিম!

একটু নড়েচড়ে আবার ভালো করে শুয়ে পড়ল জিম। নিজের গা থেকে কোটটা খুলে জিমের গায়ে দিয়ে দিল লিজা। পায়ের তলায় জামার প্রান্তটা জড়িয়ে দেয়।

এইবার উঠল লিজা। ডক পার হয়ে আবার সেই আঁঠাল মাটির পথ। এখন বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু আজ রাতে কি ঘুম হবে?

সামনে পিছনে চারপাশে কুয়াশার ঘনঘটা। নিবিড় কুয়াশায় পথ ঢাকা পড়েছে।

—ইন্দ্রনাথ চৌধুরী অনূদিত।

কখনো মেঘ চিত্রে উত্তমকুমার এবং অঞ্জনা ভৌমিক

প্রেক্ষাগৃহ

চৌরঙ্গী চিত্রে সুপ্রিয়া দেবী এবং বিশ্বজিৎ

সেন কমিটির রিপোর্ট

যে-সময়টিতে একমাত্র চিত্রপ্রদর্শক-গোষ্ঠী ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট প্রযোজক, পরিবেশক, পরিচালক, শিল্পী, কলাকুশলী প্রভৃতি অপর সকল বিভাগীয় ব্যক্তিরা এই বাজোর চলচ্চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গুরুতররূপে শঙ্কিত হয়ে একযোগে সম্মিলিতভাবে "পশ্চিমবঙ্গ চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতি" মারফত এই জনপ্রিয় সংস্কৃতির বাহন ও ব্যবসায়মাধ্যমের পুনরুজ্জীবন ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনের উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, ঠিক সেই সময়ে ১৯৬২ সালের ২৪ অক্টোবরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে গঠিত "ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটি"র বহু-প্রতীক্ষিত রিপোর্টটি সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শাসনতন্ত্র বিষয়ক উপদেষ্টা কে. সি. সেন ছিলেন এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের রীডার হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচারঅধিকর্তা প্রকাশস্বরূপ মাথুর ছিলেন অপর তিনজন সদস্য। শ্রীমাথুর এই কমিটির সেক্রেটারীও ছিলেন।

কমিটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রব্যবসায় সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা নিয়ে বোম্বাই, পুণা ও মাদ্রাজ পরিদর্শন করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও কয়েকটি মফস্বল শহরে অন্তত ছ' মাস ধরে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি গ্রহণের পরে ফুলস্কেপ কাগজের ৪৯ পৃষ্ঠাব্যাপী ২২টি পরিশিষ্ট সংবলিত ৬টি পরিচ্ছেদবিশিষ্ট ১৪৭ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্ট পেশ করেন ১৯৬৩ সালের ২৮ জুলাই তারিখে। যে-কোনো কারণেই হোক, কিংবা সম্ভবত অকারণেই প্রায় পাঁচ বছর ধামাচাপা থাকবার পরে এই তথ্যবহুল ও মূল্যবান রিপোর্টটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-উপদেষ্টার পদে অধিষ্ঠিত প্রকাশস্বরূপ মাথুরের একক প্রচেষ্টায় সাইক্লোস্টাইল মুদ্রণযোগে সাধারণ্যে প্রকাশিত হতে পেয়েছে গেল ৬ জুন, বুধবার। এবং এর জন্যে শ্রীমাথুরকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রিপোর্টটিতে মোটামুটি চোখ বুলিয়ে দেখতে পাচ্ছি, আমরা 'অমৃত'-এর প্রেক্ষাগৃহ-এ প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ মারফত পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের দুর্দশার যে-সব কারণের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পেয়েছি, কমিটিও ঠিক সেই কারণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মুদ্রাস্ফীতির দরুন কালোবাজারী অর্থসম্বল করে রাতারাতি বড়লোক হবার চেষ্টায় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞদের [illegible]প আত্মপ্রকাশ, চিত্রগৃহের

অভাবে এই রাজ্যে নির্মিত, বিশেষ করে বাঙলা ছবির মুক্তিলাভের সমস্যা, ভিন্ন রাজ্য থেকে আগত যৌনমাদকতাপূর্ণ ছবির প্রদর্শনী ব্যাপারে প্রদর্শকদের কাছে লোভনীয় শর্ত আরোপ, রাজ্যসরকার কর্তৃক ক্রমাগত প্রমোদকর বৃদ্ধি, টাকার আন্তর্জাতিক মূল্যহ্রাসের ফলে কাঁচা ফিল্ম ও সিনেমাশিল্পে ব্যবহৃত অপরাপর বিদেশাগত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতিকে কমিটি এ-রাজ্যের চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান দুরবস্থার কারণ বলে দর্শিয়েছেন।

এবং এর আশু প্রতিবিধানের জন্যে তাঁরা প্রথমেই সুপারিশ করেছেন এই রাজ্যে একটি 'ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ড' বা চলচ্চিত্র-উন্নয়ন সংস্থা গঠনের জন্যে। এই বোর্ডের কাজ হবে :

(১) চলচ্চিত্রশিল্পকে আর্থিক সাহায্যদান;

(২) এই রাজ্যের চলচ্চিত্রশিল্পের স্বার্থে এর প্রযোজনা, পরিবেশনা ও প্রদর্শনী —তিনটি বিভাগকেই বিধিবদ্ধ করা এবং অপর প্রকারে সাহায্য করা; বিশেষ করে—

(ক) এই শিল্পের অন্যায় প্রথা এবং অসুবিধাগুলি দূর করা,

(খ) এই শিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত আচরণবিধি ও নিয়ন্ত্রণরীতি প্রবর্তনের সুপারিশ করা, এবং

(গ) গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করা, পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও প্রকাশ করা, শিক্ষণকেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালা স্থাপন করা,

(ঘ) এই রাজ্যের বাইরে এই রাজ্যে নির্মিত ছবির বাজার সৃষ্টি করা ;

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপিত ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন ও ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া এবং চলচ্চিত্রশিল্পের সাহায্য ও উন্নতিবিধানের জন্যে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করা ;

(৪) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার এবং চলচ্চিত্রশিল্পের মধ্যে সংযোগরক্ষকের কাজ করা, বিশেষ করে চলচ্চিত্রশিল্প সংক্রান্ত যে-সব বিভাগ তাঁদের আছে, তাদের ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষা করা ;

(৫) ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের মীমাংসার বিরুদ্ধে আপিল হলে তার নিষ্পত্তির জন্যে ট্রাইবিউন্যালের কাজ করা; প্রয়োজন হলে কোনো রকম অভিযোগ বা বাদানুবাদের ক্ষেত্রে সরাসরি বিচার করা কিংবা ই-আই-এম-পি-এর কাছে এ-ব্যাপারে অনুসন্ধান করা বা রিপোর্ট চাওয়া।

কমিটির দ্বিতীয় সুপারিশ হচ্ছে, এই রাজ্যে প্রতি ২০,০০০ জনের জন্যে একটি সিনেমার ভিত্তিতে ক্রমে ক্রমে পর্যায়ক্রমে চিত্রগৃহের সংখ্যাকে বর্তমানের ৩২৯ থেকে ১,৭৫০টিতে বর্ধিত করা। এ ব্যাপারে কমিটি কলকাতা, শহরতলী ও মফস্বলের

মেঘ ও রৌদ্র : স্বরূপ দত্ত, ক্যামেরাম্যান বিমল মুখোপাধ্যায়, পরিচালক অরুন্ধতী দেবী।   ফটো : অমৃত

চিত্রগৃহের মধ্যে ১, ৩, ৮ বা ৯ অনুপাত রক্ষার সুপারিশ করেছেন। যে-সব জায়গায় অস্থায়ী লাইসেন্সের বলে তিন বছর ধরে সিনেমা প্রদর্শনী চলছে, সে-সব স্থানে ৫০০ আসনসম্বলিত কমিউনিটি থিয়েটার স্থাপন করে সিনেমা চালু করবার নির্দেশ দিয়েছেন। যেখানে একটিমাত্র সিনেমার একচেটিয়া অধিকার, সেখানে অবিলম্বে দ্বিতীয় চিত্রগৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। সমবায় প্রথায় চিত্রগৃহ নির্মাণের কথাও বলা হয়েছে।

কমিটির মতে কলকাতা, শহরতলী ও কিছুসংখ্যক নির্বাচিত শহরে প্রতিদিন তিনটিরও বেশী প্রদর্শনী চালু করা যেতে পারে।

বোর্ডের সহযোগিতায় যে-ছবিগুলি তৈরী হবে, সেগুলির পরিবেশনের জন্যে বোর্ডকে একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে বলা হয়েছে। রাজ্যের সকল প্রযোজনা ও পরিবেশনা সংস্থাকে বিধিবদ্ধ নিয়মাধীনে রাখবার জন্যে সকলেরই ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রথা চালু করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের কাছে রেজেস্ট্রিকৃত ছবিগুলি ক্রমানুসারে প্রদর্শনীর সুযোগলাভ করবে।

কলকাতা, শহরতলী এবং এক লাখের বেশী জনসংখ্যাবিশিষ্ট শহরগুলির চিত্রগৃহকে প্রথম শ্রেণী, ভ্রাম্যমাণ বা অস্থায়ী লাইসেন্সপ্রাপ্ত সিনেমাগুলিকে তৃতীয় শ্রেণী এবং অপরাপর সিনেমাগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বলে নির্দেশিত করে প্রথম শ্রেণীর চিত্রগৃহে মোট টিকিট-বিক্রয়লব্ধ অর্থের ২৫ শতাংশ, দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রগৃহে ২০ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশ এবং তৃতীয় শ্রেণীর চিত্রগৃহে ২০ শতাংশ হিসেবে প্রমোদকর ধার্য করার সুপারিশ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার চলচ্চিত্রশিল্পকে উৎসাহিত করবার জন্যে বাৎসরিক যে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন, সে ছাড়া রাজ্যসরকারকে রাজ্যের চিত্রশিল্পকে শিল্পমানে উন্নীত দেখবার জন্যে বিভিন্ন রকমের আর্থিক এবং অন্যবিধ পুরস্কার বিতরণের সুপারিশ করা হয়েছে।

এই "ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ড" স্থাপনকে আশু কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকারকে একটি তহবিল গঠন ছাড়াও রাজ্যের প্রদর্শনীর উপর একটি 'উন্নয়ন কর' ধার্য করার সুপারিশ করা হয়েছে।

বর্তমানে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু থাকলেও আমরা আশা করব, আমাদের মঙ্গলকামী রাজ্যপাল এই 'সেন কমিটি'র সুপারিশগুলিকে যথাসম্ভব কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে এ-রাজ্যের চলচ্চিত্রানুরাগীদের ধন্যবাদার্হ হবেন।

নান্দীকর

দেশী ছবির খবর

সমরেশ বসু রচিত **'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে'** কাহিনীটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক পীযূষ বসু। সম্প্রতি কাহিনীর পরিবেশানুযায়ী দার্জিলিং পটভূমিতে ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হল। উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোর মধ্যে জলা পাহাড়, সিনচল হ্রদ, বাতাসিয়া ও ম্যাল অঞ্চলে ছবির কয়েকটি রোমান্টিক দৃশ্য তোলা হয়েছে। শিল্পীদের

মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায় সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সুস্মিতা সান্যাল ও দিলীপ রায়। শৈলেশ রায় ছবিটির সুরকার।

চিত্রলিপি ফিল্মসের **'পরিণীতা'** ছবির চিত্রগ্রহণ নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর স্টুডিওতে শুরু করেছেন পরিচালক অজয় কর। শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে এটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় (ললিতা), সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (শেখর), বিকাশ রায় (গুরুপদ), শমিত ভঞ্জ (গিরীন), ছায়া দেবী, রোমি চৌধুরী নীরা মালিয়া ও রত্না ঘোষাল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটির সংগীত-পরিচালক।

এম বি প্রোডাকশন্সের পতাকাতলে অজিত গাঙ্গুলী রচিত ও পরিচালিত **'রূপসী'** কাহিনীটির শুভ-মহরৎ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় পুণ্যতীর্থ 'তারকেশ্বরে। এ কাহিনীর বিষয়বস্তু রাঢ় বীরভূমের মিথান-ডাঙ্গা গ্রামের পটভূমিতে রচিত। এককড়ি দাম হল এক বর্ধিষ্ণু চাষী। তারই পরিবারের কাহিনী। ছোট দৌহিত্র বলরাম চাষার ছেলে হয়েও চাষ করে না। এই গ্রামেরই এক বড় জোতদারের মেয়ে রূপসী হল এক দামাল মেয়ে। এই দুই তরুণ-তরুণীকে কেন্দ্র করে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। বৃদ্ধ এককড়ি এদের ভালবাসাকে পরখ করলেন এক অদ্ভুত উপায়ে। তিনি রূপসীকে বললেন, 'যদি বলরামকে তুই সত্যিই ভালবাসিস তাহলে ওকে মাঠে নামাতে হবে, ওকে চাষা করে গড়ে তুলতে হবে। তা যদি পারিস তবেই বুঝব তোদের ভালবাসা সত্যিকারের ভালবাসা।'

রূপসী তা প্রমাণ করল। নিষ্কর্মা বলরাম সত্যিই জাত চাষী হল। এ কাহিনীর এককড়ির চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে বিশিষ্ট শিল্পীদের দেখা যাবে। সংগীতপ্রধান এ-ছবির গীত রচনা করছেন প্রখ্যাত গীতিকার সুনীলবরণ। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন অনিল বাগচী।

স্বনামধন্য পরিচালক দেবকীকুমার বসুর সুযোগ্য পুত্র দেবকুমার বসু চিত্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত **'সংশয়'** কাহিনীটির চিত্ররূপ দেবেন শ্রীবসু। বর্তমানে তিনি চিত্রনাট্য রচনার কাজ সুসম্পন্ন করছেন।

চিরদিনের : সুপ্রিয়া দেবী এবং রূপক মজুমদার। ফটো : অমৃত

দীনেশ চিত্রম-এর **'পান্না-হীরে-চুনি'** ছবিটি বর্তমানে পরিচালনা করছেন পরিচালক অমল দত্ত। সুখেন দাস রচিত এ-কাহিনীটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, অনুপকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, মণি শ্রীমাণী, নিরঞ্জন রায়, সুখেন দাস এবং বাণী গাঙ্গুলী। সংগীত পরিচালক হলেন অজয় দাস।

সরস্বতী চিত্রম'এর **'রক্তরেখা'** ছবিটি মুক্তিপ্রতীক্ষায় রয়েছে। উমাপ্রসাদ মৈত্র পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপদান করেছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয়া চৌধুরী (বম্বে), ললিতা চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজলক্ষ্মী দেবী। নচিকেতা ঘোষ ছবিটির সুরকার।

'মেরা নাম জোকার' চিত্রের পর অভিনেতা-পরিচালক-প্রযোজক রাজকাপুর যে নতুন ছবিটির নাম ঘোষণা করেছেন, তার নাম হল **'কাল, আজ অউর কাল'**। এই ছবিতে কাপুর পরিবারের তিন পুরুষকে দেখতে পাওয়া যাবে। প্রথম পুরুষ—পৃথ্বীরাজ কাপুর, দ্বিতীয় পুরুষ—রাজকাপুর এবং তৃতীয় পুরুষ—রণধীর কাপুর।

পরিচালক এ ভিম সিংহ মাদ্রাজের প্রসাদ স্টুডিওয় দিলীপকুমার ও সায়রাবানুকে নিয়ে একটি নতুন ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। ছবিটির হিন্দী নামকরণ এখনো ঠিক হয়নি। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন ওমপ্রকাশ, নিরুপা রায়, ফরিদা জালাল, প্রাণ, ললিতা পাওয়ার এবং দুর্গা খোটে। কল্যাণজী-আনন্দজী ছবিটির সুরকার।

বিদেশী ছবির খবর

যুগোশ্লাভিয়া চিত্রজগতের দুটো দশক

বয়সের দিক থেকে বিচার করলে যুগোশ্লাভিয়ার চিত্রজগতের বয়স একুশ মাত্র। ভরা যৌবন এখন। সত্যিই বুঝি তাই। নইলে গত দু-তিন বছরে একটানা যতগুলো আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে এ-দেশের ছবি বিভিন্ন বিভাগে, তা অত অল্পবয়সী কোন দেশের চিত্রজগতের পক্ষে অসম্ভব। জেকোশ্লাভ ফ্রিক্ এর 'শ্লাভিকা' দিয়ে এদের শুভ মহরৎ হয়েছিল এদেশের চিত্রজগতের, এখন আলেকজান্ডার পেত্রোভিক্ জিভোজিন্ পাভ্লো ভিক্ এর মত নিষ্ঠাবান দরদী শিল্পী আছেন। খ্যাতনামা অভিনেতা, নিপুণ শিল্পী আর কলাকুশলীদের ভিড়ে আজকের যুগোশ্লাভ চলচ্চিত্র জমজমাট।

ব্যাবসায়িক দিকটার কথাই প্রথম ধরা যাক। আন্তর্জাতিক পুরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের ছবির বাজার ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে। ১৯৬৫তে ছবি দেখিয়ে যা অর্থ এসেছে তার পরিমাণ আগের কয়েক বছরের প্রায় দ্বিগুণ। গত বছরে এ পর্যায়ে আয় হয়েছে প্রায় এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অথচ এর আগে কোন বছরেই দু

বার্লিন উৎসবে পুরস্কৃত যুগোস্লাভ চিত্র দ্যাট অ্যাওকনিং র‍্যাটস-এর দৃশ্য

হাজার ডলারের বেশী ওঠেনি। একমাত্র আলেকজান্ডার পেত্রোভিক্ এর 'আই হ্যাভ ইভন্ মেট হ্যাপী জিপসীজ্' ছবিই তিন লক্ষ ডলার এনেছে নিজের ঘরে।

এখন যুগোশ্লোভিয়ার ছবি ব্যাপক ভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে বিভিন্ন দেশে। ক'বছর আগে আভালা ফিল্মসের 'থ্রি' অস্কার নমিনেশন পাওয়ার পর থেকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছে এ দেশের ছবির ওপর। পেত্রোভিক্ এর 'আই হ্যাভ্ ইভন্ মেট হ্যাপী জিপ্‌সীজ' গত বছর কাঁ উৎসবে ব্রিটেনের ছবি 'অ্যাকসিডেন্টের' সঙ্গে যুগ্মভাবে বিশেষ জুরী পুরস্কার পেয়েছে। আর তাছাড়া সানফ্রান্সিস্কো, পুলা, আকাপুলকো বিভিন্ন উৎসবে বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছে। ছবিটার কাঁয়ে পুরস্কারপ্রাপ্তির পরই অভিনেতা বেকিম্ ফেহ্মিউ ও গায়িকা অলিভিয়েরা ভুকো কর্পোপন্টি প্রোডাকসনে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। প্যারিস এর অলিম্পিয়ায় গান গাইবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছে সে। পালিডরের প্রযোজনায় আগামী ছবিতে গান গাইবার জন্যও তাকে চুক্তি করা হয়েছে। ভেনিস উৎসবে প্রথম যুগোশ্লাভিয়ার যে ছবি পুরস্কৃত হয়েছে সেটি হল পুরিসা জর্জেভিক্ এর 'দ মর্নিং'। এ ছবির নায়ক জুবিসা সামার্দজিক শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছিলেন উৎসবে। গত বছর বার্লিন উৎসবে জিভোজিন্ পাভলোভিক্ এর 'দ্যাট অ্যাওক্নিং ব্যাটস্' শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য পেয়েছিল রৌপ্য ভল্লুক। মস্কো উৎসবে রৌপ্য পুরস্কার পেয়েছিল ভয়াদান লিজপাসিভিকেব 'পোর্টিজ' মার্সানো উৎসবে ফাদিল হাৎজিক্ এর "প্রোটেস্ট' ছবিতে অভিনয়ের জন্য বেকিম্ দ্বিতীয়বার দেশের বাইরে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারে সম্মানিত হলেন। নিউইয়র্ক ও টিম্প্ট চলচ্চিত্র উৎসবে দ্রাগোস্লাভ লাজিক্এর 'দি ওয়ার্ম ইয়ারস্' দুসান মাকাভেজ্ভস্ এর 'এ লভ কেস্' এবং জর্ডান ফিল্মস্এর 'দি সেভেন্স্ কন্টিনেন্ট' সমালোচকের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

কাহিনীচিত্রের ব্যবসায়িক ও শৈল্পিক সাফল্যের সঙ্গে পাশাপাশি এ দেশের ডকুমেন্টারী ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিও উন্নতি করেছে। অবেরহেন্সন, অ্যানেসি, লিপজিগ, বার্গামো প্রভৃতি উৎসবে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিও পুরস্কৃত হয়েছে একাধিকবার, তবে এ সব ছবির অর্থকরী দিকটা উল্লেখ্য না হলেও ধীরে ধীরে যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে বলেই মনে হয়। বছর বছর বহু নতুন লেখক, অভিনেতা, পরিচালক এসে যোগ দিচ্ছেন, তাঁরা তাঁদের ভাবধারা চিন্তাকে ছবির মধ্যে প্রতিফলিত করতে চাইছেন। বেলগ্রেডস্থিত অ্যাকাডেমী অফ্ ফিল্ম ডিপার্টমেন্ট নতুন ছবির যেমন জন্ম দিচ্ছে, তেমনি তৈরী করছে নতুন শিল্পী আর পরিচালক।

বর্তমান ইউরোপে যুগ্ম প্রযোজনার চলন খুব বেশী। অবশ্য এর একটা লাভজনক ব্যবসায়িক দিকও আছে। যুগোশ্লাভিয়া বয়সে তরুণ হলেও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, নরওয়ে, গ্রীস, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইতালী পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সবদেশের সঙ্গেই চিত্রপ্রযোজনার ক্ষেত্রে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে যুগোশ্লাভিয়া, কলম্বিয়া, প্যারামাউন্ট প্রভৃতি বিভিন্ন প্রযোজক পরিবেশক সংস্থা এদেশের জল হাওয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করছেন, কলাকুশলী যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ব্যবহার ইত্যাদি লক্ষ্য করছেন। এ বছরের মধ্যেই এখানে আমেরিকার জনৈক প্রযোজক ছবির সুটিংএর জন্য আসছেন যুগোশ্লাভিয়ায়।

বয়স যদিও মাত্র একুশ এদেশের চিত্রজগতের, তবুও প্রোডাকসন ও কোয়ালিটির ব্যাপারে অত তরুণ মনে হয় না। ছোটখাট দোষ ত্রুটি বাধা বিপত্তি ডিঙিয়ে যেভাবে এগিয়ে চলেছে এদেশের চিত্রজগৎ তাতে এটা আশা করা অস্বাভাবিক নয় যে আগামী

পাঁচ বছরে হয়ত যুগোশ্লাভিয়া পূর্ব ইউ-রোপের চলচ্চিত্রের ব্যাপারে অন্যতম অগ্রণী দেশ হয়ে দাঁড়াবে। আমরা জিভোজিন্ পাভ্লোভিক্ ও আলেকজান্ডার পেত্রোভিক্ এর মত নিষ্ঠাবান শিল্পী পরিচালকের কাছে তাই আশা করব।

* * *

পরিচালক জন্ গুলোরমিন্ কিছুদিন আগে নতুন ছবির কাজ শুরু করলেন প্রাগে। ইউনাটেড আর্টিস্ট এর প্রযোজনায় এ ছবির নাম 'দি রেমাজেন ব্রিজ'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাইন্ নদীর ওপরে এই বিখ্যাত সেতুটির দখলের ব্যাপারে যে ভীষণ সংঘর্ষ হয়েছিল তারই ওপর ভিত্তি করে এ ছবির কাহিনী। ছবির প্রযোজক ডেভিস ওলপার এর দ্বিতীয় ছবি এটি। প্রথম ছবি 'দি ডেভিলস্ ব্রিগেড' মুক্তি পাচ্ছে খুব শিগ্গির।

* * *

ফেদারিকো ফেলিনি ছোট ছবি 'থ্রি স্টেপস্ ফ্রম ডেলিরিয়ম' শেষ করে এখন নতুন বড় কাহিনীচিত্রের প্রাথমিক কাজে ব্যস্ত। এ ছবির প্রধান চরিত্রের জন্য ফেলিনি উগো তোগানজ্জিকে মনোনীত করেছিলেন। উগোও অত্যন্ত কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও রাজী হয়েছিলেন অভিনয় করতে. কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফেলিনি নিজেই মত বদলেছেন। এখন উনি ঠিক করেছেন মর্সেলো মাস্ত্রোয়ানিকেই নেবেন।

* * *

'রোমান হলিডে' যখন আজ থেকে তের বছর আগে উইলিয়াম ওয়েলার তৈরী করেছিলেন তখন সাড়া পড়েছিল সারা বিশ্বে। এখন আবার নতুন করে সে ছবিকে চিত্রায়িত করেছেন ইতালীর ফ্রাঙ্কো জাফরেল্লি। নায়ক ফটোগ্রাফারের চরিত্রে থাকবেন সম্ভবতঃ আলবার্তো সর্দি।

ভ্রম সংশোধন

এই বিভাগে প্রকাশিত বিদেশী ছবির অস্কার পাওয়া প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল ১৯৬৬ সালে পুরস্কারটি পেয়েছে 'শপ অনদি মেইন স্ট্রীট'। তথ্যটি ভুল। ১৯৬৫ সাল হবে এবং ১৯৬৬তে ঐ পুরস্কার পেয়েছিল ফ্রান্সের 'এ ম্যান এ্যান্ড এ ওম্যান'। তথ্যটি সংশোধনের ব্যাপারে পাঠক পাঠিকারা চিঠি দিয়েছেন অনেকে।

কমললতা চিত্রে সুচিত্রা সেন এবং উত্তমকুমার

স্টুডিও থেকে

দৃশ্য—তের।

'বিছানায় অনেক কাপড় পড়ে আছে আগোছাল হয়ে। ক্যামেরা প্যান করে খাটের দিকে যায়।

কাট্।

উত্তমা কতগুলো কাপড় তুলে নেয়।

কাট্।

মিড্ শট্। এগিয়ে যায় উত্তমা।

ক্যামেরা ট্র্যাক করে। উত্তমা একটা ট্রাঙ্কের সামনে গিয়ে বসে। ক্যামেরা থামে।

কাট্।

কম্পোজিট শট্। উত্তমা আর সাবিত্রী ট্রাঙ্কের কাছে বসে আছে। সাবিত্রী ট্রাঙ্কে কাপড় গোছানো দেখতে দেখতে বলে—

সাবিত্রী—মা, মাঝখানে আর কদিন মা?

উত্তমা—ছ'দিন।

সাবিত্রী—তারপরেই এসব জিনিস আমার না মা?

উত্তমা—হ্যাঁ, সব তোমার সোনা, সব তোমার!

সাবিত্রী (ঘড়ার দিকে তাকিয়ে)—ঐ ঘড়াটা নিয়ে আমি রোজ বেশ জল আনব না মা?

ক্লোজ শট্। কম্পোজিট্।

উত্তমা—হ্যাঁ মা।

সাবিত্রী—কোথায় রাখবো? দরদালানে?

উত্তমা—তুই কি করে জানলি ওখানে দরদালান আছে?

সাবিত্রী—কোথায়?

উত্তমা—তোর শ্বশুরবাড়ীতে?

সাবিত্রী (লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে)—ধ্যাৎ!

ক্লোজ শট্। কম্পোজিট।

উত্তমা—ধ্যাৎ কিরে! এখন তো শ্বশুর-বাড়ীটাই তোর সব! শ্বশুর-শাশুড়ীর যত্ন করবি! তোর দেওর আছে, দিদি-শাশুড়ি আছে, সবাইকে দেখবি!

কাট্।

ক্লোজ শট্।

সাবিত্রী—দিদিশাশুড়ী কি মা?

কাট্।

ক্লোজ শট্।

উত্তমা—দিদি শ্বাশুড়ী হল তোর স্বামীর ঠাকুরমা।

কাট্।

ক্লোজ শট্।

সাবিত্রী (জিজ্ঞাসু লাজুক ভঙ্গিতে)—আমার স্বামী?

কাট্।

ক্লোজ শট্।

উত্তমা—হ্যাঁ তোর স্বামী। বি-এ পাশ। ইস্কুলের মাস্টার।

সাবিত্রী—কি নাম?

উত্তমা—সুনীল।

কাট্।

ক্লোজ শট্।

সাবিত্রী পেছন ফিরে হিঃ হিঃ করে হাসছে স্বামীর নাম শুনে, হেসেই চলেছে। শরীর তার ফুলে উঠতে থাকে।

উত্তমা—হাসছিস্ কেন?

সাবিত্রী—আমাদের স্কুলের সামনে যে ময়রার দোকান আছে না, সেই দোকানদারের নাম সুনীল। আমরা বলি—এই সুনীল, দু'পয়সার ঝুরিভাজা দেতো!

উত্তমা—ছিঃ স্বামীর নাম নিয়ে ঠাট্টা করে না সোনা!

কাট্।

ক্লোজ শট্।

সাবিত্রী—সব মেয়ের স্বামী থাকে মা মা?

কাট্।

ক্যামেরা এগিয়ে যায়।

উত্তমা—হ্যাঁ, যে মেয়েদের বিয়ে হয়। তাদের স্বামী থাকে।

কাট্।

মিড শট্।

সাবিত্রী—আমি জানি।

উত্তমা—কি জানিস?

সাবিত্রী—স্বামীরা চাকরী করে, খেতে দেয়, বকে না মা?

উত্তমা—ছিঃ বকবে কেন? লক্ষ্মী হয়ে হয়ে থাকলে কেউ বকে না......ওখানে খুব ভালো হয়ে থেকো কেমন! একদম দুষ্টুমি কোরো না। এখন তুমি পরের বাড়ীর বউ হবে।

কাট্।

কম্পোজিট শট্। সাবিত্রী সামনে।

সাবিত্রী—হ্যাঁ!......স্বামী বকলে আমি কি করব?

উত্তমা—(আগ্রহ নিয়ে) চুপ করে থাকবি। কোনো উত্তর দিবি না। কেমন!

কাট্।

ক্লোজ শট্।

সাবিত্রী—বেশ! কেউ বকলে তো আমি কিছু বলি না।

ক্লোজ শট্।

উত্তমা—(ম্লান হেসে)—হ্যাঁ! সেই মেয়ে কিনা তুমি!

কাট্।

ক্লোজ শট্।

সাবিত্রী—বারে, সেই যে নাগপুরে ছোটমামা একদিন একটা থাপ্পড় মেরেছিল, আমি কিছু বলেছিলুম?

উত্তমা—(চোখে জল এলো)—না।

সাবিত্রী—তবে? ......তুমি আমাকে কোনদিন মারোনি, না মা?

উত্তমা—না!

সাবিত্রী—কেন?

উত্তমা—তুমি যে আমার একটা সোনা মা। তুমি যে আমার সব! উত্তমা উঠে খাটের কাছে যায়। বাইরে বৃষ্টি নামে। সাবিত্রী ঐ খানেই বসে থাকে।

মিড্ লং শট্।

সাবিত্রী—মা!

উত্তমা—কি মা?

সাবিত্রী—মানুষ বড়ো হলে খুব রাগী হয়ে যায় না মা?

উত্তমা (হেসে)—কেন রে?

সাবিত্রী—না, এমনি! সব কাজেই খালি বলবে (ভেঙ্গানোর সুরে ও ভঙ্গিতে)—বারণ করছি না! একশোবার? মারবো একটা থাপ্পড়।

কাট্।

ক্লোজ শট্।

উত্তমা—জানলাটা বন্ধ করে দে তো—বৃষ্টির ছাট ঢুকছে যে ঘরে।

দুরন্ত চড়াই চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও অনুপকুমার

সাবিত্রী—ঢুকল।

উত্তমা—ভিজে যাবি যে।

কাট্।

ক্যামেরা ঘরের বাইরে। ক্লোজ শট্!

সাবিত্রী—ভিজবো কি? ভিজবো! ভিজবো! ভিজবো! খুব ভিজবো!

দৃশ্যটি গ্রহণের সমাপ্তি এখানে ঘটলেও ছবির কাজ এখনও অনেক বাকি। বাংলা চিত্রজগতের অন্যতম খ্যাতনামা ক্যামেরাম্যান এবার পরিচালনার ক্ষেত্রে এসেছেন।

প্রতিভা বসুর লেখা এ গল্পের চিত্রনাট্য লিখেছেন অভিনেতা, নাট্যকার ও পরিচালক অজিতেশ ব্যানার্জি। গোরা পিকচার্সের পতাকাতলে নির্মীয়মান এ ছবি কিশোরী ও তাদের খেলা ভাঙ্গার খেলার আয়োজন নিয়ে ছবির গতিকে আরও বেশী দ্রুততর করে দিয়েছেন পরিচালক দীনেন গুপ্ত। ক্যামেরাম্যান হিসাবেই এতদিন তার পরিচয় ছিল। এবার হলেন পরিচালক। ছবির নাম 'নতুন পাতা'। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন বুবুন গাঙ্গুলী (সাবিত্রী), কাজল গুপ্ত (উত্তমা), শম্ভু মিত্র, অজিতেশ ব্যানার্জি, গীতা দে, সুনীল ব্যানার্জি, চিন্ময় রায় ও অন্যান্যরা।

মঞ্চাভিনয়

অনামিকা কলা সঙ্গম-এর উদ্যোগে একাঙ্কিকা অভিনয় :

কলকাতার হিন্দী সংস্কৃতি জগতে অনামিকা কলা সঙ্গম তার এক বছরের সাফল্যপূর্ণ কর্মসূচী দ্বারাই একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নামে পরিণত হতে পেরেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাট্যপ্রচেষ্টাকে তাঁরা আমন্ত্রণ করে এই শহরে নিয়ে আসেন তাঁদের দর্শক-সদস্যদের তৃপ্তিবিধানের জন্যে। দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা প্রস্তাব করেছেন, মাত্র পূর্ণাঙ্গ নাট্যোপস্থাপনার মধ্যেই তাঁদের প্রয়াসকে সীমিত না রেখে তাঁরা অতঃপর গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, একাঙ্কিকা প্রভৃতিকেও উপস্থাপিত করাতে তৎপর হবেন। এবং এই নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা ১লা জুন, শনিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট সংস্থা 'ক্রিয়েটিভ ইউনিট' অভিনীত তিনখানি একাঙ্কিকা পরিবেশন করেন। এর মধ্যে দু'খানি—বদতমীজ ও শাদী কা পৈগাম—আন্টন শেকভ্-এর রচনার হিন্দী রূপ এবং বাকীটি—আরম্ভ কা অন্ত আইরিশ নাট্যকার সীন ও'কেসীর রচনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ। ক্রিয়েটিভ ইউনিট সংস্থাটির যিনি প্রাণকেন্দ্র, সেই প্রতিভাময়ী ডক্টর বিজবী নিজেই এই একাঙ্কিকাগুলির রূপান্তরকার্য করেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন এবং স্ত্রী-চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন। এদের মধ্যে যদিও সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছে শাদী কা পৈগাম, কিন্তু চমৎকারিত্ব এবং উচ্চাঙ্গের অভিনয়নৈপুণ্যের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় হচ্ছে বদতমীজ। একজন সদা-

বিধবার কাছ থেকে তার স্বামীর কর্জ করা টাকা আদায় করতে এসে একজন দুঁদে মিলিটারী অফিসার কেমন করে তার দৃঢ়তা দ্বারা মুগ্ধ হয়ে পড়ে, তারই নাটকীয় পরিণতি চমৎকার পরিস্ফুট হয়ে ওঠে শ্রীমতী রিজবী এবং এ কে অগ্নিহোত্রীর নাটনৈপুণ্যের মাধ্যমে। ঝগড়া করা যাদের স্বভাব, তারা ভালবাসতে বাসতেও ঝগড়া করে, এই তথ্য প্রকটিত করে তুলতে শাদী কা পৈগাম-এ রোগক্লিষ্ট, দুর্বলচিত্ত বংশীর রূপে উসমান মেনন ও নবাবের অনূঢ়া কন্যা রশীদা বেশে শ্রীমতী রিজবী তাঁদের ভূমিকাগুলিকে অসামান্যভাবে উপভোগ্য করে তুলেছিলেন। নবাবরূপী সী নাগও প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। যেসব পুরুষ মেয়েদের গৃহস্থালী কাজকে কিছুই নয় বলে উড়িয়ে দিতে চান, তাঁরা 'আরম্ভ কা অন্ত' নাটিকাটি দেখে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবেন। এই 'অ্যাকশন'পূর্ণ একাঙ্কিকাটিতে হাসির হুল্লোড় ছুটিয়েছেন বিহারী ও বনওয়ারীর ভূমিকায় যথাক্রমে এ কে অগ্নিহোত্রী এবং অজয়কুমার। শান্তার চরিত্রে ডলি রিজবীর খুব বেশী কিছু করণীয় ছিল না। তিনখানি নাটিকাই রূপসজ্জা এবং অত্যাবশ্যক আসবাব সমন্বয়ের দিক দিয়ে সুপ্রযুক্ত। দৃশ্যপটকে পুরোপুরি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতিকে ঘনীভূত করবার জন্যে 'আরম্ভ কা অন্ত'-এ আলোকসম্পাত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

রঙ-বেরঙ-এর 'তোতাকাহিনী'র শততম অভিনয় :

একটি শৌখিন নাট্যসংস্থার পক্ষে কোনো একটি নাটকের একাদিক্রমে একশত রজনী অভিনয় করা অনস্বীকার্যভাবে যে কৃতিত্বের পরিচায়ক, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তার ওপর সেই নাটক যদি রবীন্দ্রনাথের রূপককাহিনী 'তোতাকাহিনী'র বিশিষ্ট নাট্যরূপ হয়, তাহলে কৃতিত্ব হয়ে দাঁড়ায় অপরিমেয়। এই অপরিমেয় কৃতিত্বেরই অধিকারী হয়েছেন 'রঙ-বেরঙ' শিল্পী সম্প্রদায়। ২৬মে, রবিবার নিউ এম্পায়ার মঞ্চে তাঁদের 'তোতাকাহিনী'র শততম অভিনয় উৎসব সুসম্পন্ন করে মণীন্দ্র মজুমদারের নাট্যরূপায়ণ ও নির্দেশনায় সংস্থা-সদস্যরা যে একান্ত নিষ্ঠার সংগে এই রূপক নাটকটির মধ্যে মূল কাহিনীর বক্তব্যটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়। নাট্যপ্রয়োগে সাংকেতিক রীতির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

একটি প্রশংসনীয় উদ্যম

ইচ্ছা থাকলে এবং আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে কিশোর তরুণ ছাত্ররাও অসাধ্যসাধন করতে পারে—তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাধারণ মানুষের সামনে সম্প্রতি তুলে ধরেছে ২৪ পরগণার সুখচর কর্মদক্ষ চন্দ্রচূড় বিদ্যায়তনের কিশোর-বয়স্ক ছাত্ররা ২৫ ও ২৬ মে সাহায্য প্রদর্শনীর সার্থক আয়োজন করে। খেলার মাঠকে উপযোগী করে তোলার জন্যে টাকার দরকার—বিচিত্রানুষ্ঠান এবং ছায়াচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তারা প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। কিশোর ছাত্রদের এই আন্তরিক আয়োজনকে সার্থক করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন কিছু প্রাক্তন ছাত্র এবং দরদী শিক্ষকবৃন্দ। বিচিত্রানুষ্ঠানে প্রথিতযশা সঙ্গীতশিল্পী শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখেরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

'ভিলাই স্টীল প্ল্যাণ্ট' কলিকাতা অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব-এর অভিনয় :

গেল বুধবার ৫ই জুন সন্ধ্যা ৬টায় 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে ভিলাই স্টীল প্ল্যাণ্ট কলিকাতা অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে অন্যান্য অনুষ্ঠান-এর সংগে ভানু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-এর 'আজ-কাল' নাটক ক্লাব সভ্যবৃন্দ কর্তৃক কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পরিচালনায় অভিনীত হয়ে গেছে।

'আমরা সবাই'-এর নাট্যাভিনয়

সোদপুর হাউসিং এস্টেটের কিশোরদের সংস্থা 'আমরা সবাই'-এর ভাইবোনেরা এক আনন্দোৎসবের আয়োজন করেছিল ৮ই মার্চ শনিবার সন্ধ্যায়। শুরু থেকে শেষ সবটুকুই ছিল ভাইবোনেদের একান্ত যত্নে গড়া। স্টেজ তারাই বাঁধে এবং অভিনয় করেছিল তারা চমৎকার। শিশু-কিশোররা তো দল বেঁধে এসেছিল অভিনয় দেখতে। দর্শকদের মধ্যে বয়স্করাও এসেছিলেন ভিড় করে। 'আমরা সবাই'-এর সভ্যরা মঞ্চস্থ করে সাখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাসির নাটক 'ভাড়াটে চাই'। সুঅভিনয় করেছিল সবাই—বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অর্ধেন্দুশেখর চক্রবর্তী, সুব্রত পালিত, রাজশেখর চক্রবর্তী, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ পাল, বাসুদেব পাল অলক চৌধুরী দেবব্রত পালিত, বাণীব্রত পালিত নরেন চক্রবর্তী, কানু লাহিড়ী পার্থপ্রতিম সরকার প্রমুখেরা। পরিচালনায় ছিল : শ্রীদেবব্রত পালিত।

আর 'আমরা সবাই'-এর বোনেরা মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্রনাথের 'শারদোৎসব'। নাচে গানে এবং অভিনয়ে বোনেরা মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে। এই নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন : জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাশ্রী চৌধুরী, জয়শ্রী গুপ্ত, উমা চক্রবর্তী, ইন্দ্রাণী চট্টোপাধ্যায়, লিসা মজুমদার, যূথিকা দাশগুপ্ত, সুমিতা দাশগুপ্ত, মুনমুন দে, রিংকু ধর, ব্রততী পালিত, নেপথ্যসংগীতে কল্পনা সরকার ও মধুমিতা মুখোপাধ্যায়। পরিচালনায় ছিল : মণিকা চক্রবর্তী। 'আমরা সবাই'-এর এই আনন্দ-অনুষ্ঠানটি এস্টেটের বাসিন্দাদের খুশী করেছে।

বৈকুণ্ঠের উইল

সি কে সেন স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় 'স্টার' রঙ্গালয়ে বৈকুণ্ঠের উইল নাটকটির অভিনয় সমবেত দর্শকদের যে বিমুগ্ধ করেছে, একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে। সফল এই নাট্যপ্রযোজনায় প্রয়োগপরিকল্পনার স্বাতন্ত্র দেখিয়েছেন দেবব্রত দে। কয়েকটি মুহূর্তে তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পচিন্তা সুন্দরভাবে রূপ পেয়েছে।

প্রতিটি চরিত্রই সুঅভিনীত। শিল্পীদের আন্তর নিষ্ঠা সংঘবদ্ধ অভিনয়ে প্রাণ এনেছে। কয়েকটি চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন—অসিত সান্যাল (হারাণ), গীতা দে (ভবানী), সবিতা মুখোপাধ্যায় (মনোরমা), মমতা চট্টোপাধ্যায় (মায়া), অসীম সেন (জয়নাল), সত্যেন দত্ত (গোকুল), দেবকিশোর সেন (বিনোদ), সমর ঘোষ (নিমাই), সুনীল সেন (বৈকুণ্ঠ)। অন্যান্য ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন বৈদ্যনাথ দাস, সতু পাল, রামভদ্র রায়, সুবীর রায়, অসীম মিত্র, বিভু সুর, দিলীপ সেন, কমল চক্রবর্তী, পুলিন দেন, তাপস মুখোপাধ্যায়, প্রবীর সেনবরাট, শংকর দাস, রামকৃষ্ণ সরকার, লিলি গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলা দেবী, আশা দেবী।

সংক্রান্তি

সম্প্রতি 'বিবর্তন' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ দক্ষিণ কলকাতার মহারাষ্ট্র নিবাস হলে বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। বাঙলাদেশের জমিদার বংশের পটভূমিতে লেখা এই নাটকটি সার্থকভাবে পরিচালনা করেন অরূপ ভট্টাচার্য। প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন এবং সেই সূত্র ধরে সংঘবদ্ধ অভিনয় প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। 'হর্ষনারায়ণ', 'রতন' ও 'দুর্গা' চরিত্রের রূপায়ণে দক্ষতা দেখান মনোজ চক্রবর্তী, অরূপ ভট্টাচার্য ও মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় রূপ দেন —ভোলানাথ ভট্টাচার্য, তপন চক্রবর্তী, দীনতারণ ঘোষাল, শান্তনু রায়, ধীরেন্দ্র দাস, প্রতিসুন্দর চক্রবর্তী, উজ্জ্বল দাস, পুলিন সাহা, নিতাই কুণ্ডু, তপন ঘোষাল, সুব্রত চৌধুরী, শ্রীমতী মুকুল জ্যোতি, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেওয়াজ ও কপাট

সম্প্রতি প্রদর্শক নাট্যগোষ্ঠী থিয়েটার সেন্টারে দুটি একাংকিকা 'রেওয়াজ' ও

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের শ্যামা নৃত্য-নাট্যে সুতপা দত্ত এবং শুক্লা সেনগুপ্তা। সুসংহতির বাৎসরিক উৎসবে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে পরিবেশিত হয় এই নৃত্যনাট্য।

'কপাট' মঞ্চস্থ করেছেন। অমিত নন্দী রচিত এই দুটি নাটকের অভিনয়ে শিল্পীবৃন্দ উন্নত ধরনের শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন। 'রেওয়াজ' নাটকে অজয় মুখোপাধ্যায় (ভদ্রলোক), মানিক রায়চৌধুরী (মানিক), প্রদীপ দত্ত (রুদ্রপ্রকাশ), সুজাতা মুখোপাধ্যায় (বেবী) সুঅভিনয় করেছেন। 'কপাট' নাটকে অবচেতন মনে নানা ভাবের আন্দোলনকে মঞ্চে প্রাণবন্ত করে তুলতে সাহায্য করেছেন মায়া ঘোষ (শান্তা), অজয় মুখোপাধ্যায় (নিশিকান্ত), দুলাল ভট্টাচার্য (ভবদেব), রণেন বসু (চিরঞ্জীব)।

বৈকুণ্ঠের খাতা

কৃষ্ণপুর আদর্শ বিদ্যা মন্দিরের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ স্থানীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অভিনয় করলেন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটক। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন—বাসুদেব পোদ্দার, আশুতোষ চক্রবর্তী, কুমারকিশোর রায়, দিলীপ দত্ত, শংকর মজুমদার, সুবীর মজুমদার।

স্বীকৃতি

সম্প্রতি আই টি সি অফিসারস ক্লাব 'বিশ্বরূপা' রংগমঞ্চে সলিল সেনের 'স্বীকৃতি' নাটকটি অভিনয় করেছেন। মনু মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন—তরুণ রায়, রমেন মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ মন্ডল, বিমল বিশ্বাস, হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান মানস, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল সিংহ, প্রাণবল্লভ সাহা, জীবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন হালদার, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, লতিকা দাশগুপ্ত, কল্পনা ভট্টাচার্য, লতিকা বসু।

বিবিধ সংবাদ

বাংলার বাইরে 'বোকারোয়' যাত্রানুষ্ঠান

বাঙলার বাইরে ডি-ভি-সি বোকারোর খ্যাতনামা প্রবাসী বাঙালী সংস্থা 'বন্ধুশ্রী মিলন সমিতি'র সভ্যরা গত ২৫ এবং ২৬ মে বোকারো ক্লাব প্রাঙ্গণে যাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। নাট্যকার শ্রীব্রজেন দে-র 'বঙ্গবীর' এবং 'সোনাই দীঘি' যাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। দলগত অভিনয়নৈপুণ্যে যাত্রানুষ্ঠান দুটি দর্শকদের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। বিশেষত 'সোনাইদীঘি' আবালবৃদ্ধবনিতার মন জয় করতে সক্ষম হয়। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন : সর্বশ্রী প্রতুর ভট্টাচার্য (চন্দ্রপুরা), সুনীস ভট্টাচার্য, গোপাল দে, সন্তোষ মুখার্জি, কালী ঘোষ, অনিল মুখার্জি, ঝর্ণা ব্যানার্জি, পারুল কর্মকার, মান্টু মুখার্জি প্রভৃতি। যাত্রানুষ্ঠানের সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব যুগ্মভাবে পালন করেন শ্রীসাধন দত্ত এবং শ্রীকাশীনাথ বালা।

অন্যান্যবারের তুলনায় এবার দর্শক-সমাগম প্রচুর বেশী হয়েছিল। কোনার, চন্দ্রপুরা, মাইথন, পাঞ্চেৎ, কথারা, কারগালি, বেরমো, ফুসরো, জরাংডী, সোয়াং, গোমিয়া, লোধনা কোলিয়ারী প্রভৃতি স্থান থেকেও প্রচুর দর্শক সমবেত হয়েছিলেন।

কবিপক্ষ

১০ মে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড বিজিনেস

উত্তমকুমারের গৃহে অভিনেত্রী সঙ্ঘের এক জরুরী সভায় উত্তমকুমার এবং অন্যান্য শিল্পী। ফটো : অমৃত

ম্যানজমেন্টের এ্যাসেম্বলী হলে ডাইরেক-টরেট অফ ড্রাগস কনট্রোল এমপ্লয়ীজ রিক্রিয়েশান ক্লাবের 'কবিপূজো' অনুষ্ঠান মাধ্যমে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয়েছে। সুসজ্জিত ও মনোরম পরিবেশের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ বিভূতি-ভূষণ সরকার। সভ্যদের সমবেত উদ্বোধন-সংগীতের পরে বিভিন্ন সভ্য ও অতিথি শিল্পীদের কণ্ঠে, বাঁশীতে ও সেতারে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রসংগীত। সভাপতি-মহাশয়ের সুচিন্তিত অভিভাষণ ছাড়াও বিশ্বকবির শিল্পসৃষ্টির সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন শ্রীঅমলকুমার চক্রবর্তী ও আনন্দ ভট্টাচার্য। আবৃত্তি ও পাঠ করেন শ্রীদেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবিভূতিভূষণ রায়চৌধুরী।

যাদুকর এ সি সরকার

সুপ্রসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক যাদুকর এ সি সরকারের একটি নতুন আবিষ্কার 'কোর্ট অফ মুদার ইণ্ডিয়া' নামক যাদু কৌশল সম্প্রতি ভারত সরকারের 'কপিরাইট' অনু-মোদন লাভ করেছে। ভারত-ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর মুহূর্তের পটভূমিতে বিধৃত, নাটকীয় সংঘাত ও যাদুর চমকে সমৃদ্ধ এই 'যাদু-ফিচার'টি ইতিমধ্যেই দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। ইতিপূর্বে তাঁর আবিষ্কৃত ড্রিমস অফ নেহেরুজী, তাসখন্দ মিস্ট্রী, কাশ্মীর হামারা হ্যায় প্রভৃতি সাম্প্রতিক ঘটনাভিত্তিক যাদুফিচারগুলির পরিকল্পনায় ও পরিবেশনায় যাদুকর এ সি সরকার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

শিশু সঙ্ঘের 'বসন্ত' নৃত্যনাট্য

২ জুন সন্ধ্যায় শিশু সঙ্ঘের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল পাথুরিয়াঘাটা বিনানী মঞ্চে। সংঘ সভ্য ও সভ্যাবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বসন্ত' নৃত্যনাট্যটি পরিবেশিত হয়। নৃত্যনাট্যে রাজা ও কবির চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন দিলীপ বসাক ও দীপ্তিকুমার শীল। তাঁদের অভিনয় রবীন্দ্রভাবধারা ও ছিন্দ-ধারায় পরিবেশিত হয়েছিল। লিলি বসাকের সুষ্ঠু নৃত্যপরিচালনা প্রতিটি দর্শক বেশ তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করেন।

স্কাই লার্কের অনুষ্ঠান

২রা জুন খিদিরপুর কবিতীর্থে শিশু ও কিশোরদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'স্কাই-লার্কে'র উদ্যোগে এক প্রতিযোগিতামূলক গল্প বলার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েরা তাদের পছন্দসই বিচিত্র স্বাদের গল্প বলে। অধিকাংশ প্রতিযোগীর গল্প বলার অপরূপ ভঙ্গিমা উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে বিস্মিত করে। বিভিন্ন রসের গল্প বলে যারা সকলের প্রশংসাভাজন হয়, তাদের মধ্যে ছিল শেলী চন্দ্র, মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা পালচৌধুরী, কাবেরী ভট্টাচার্য, তপেন জোয়ারদার, রীতা বসু, জলি ঘোষ, শিপ্রা দাস।

প্রতিযোগিতার বাইরে যারা গল্প বলে ছোটদের মন জয় করেন, তাঁদের মধ্যে চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোক চট্টো-পাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠানশেষে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে আশুতোষ ঘটক, প্রতিযোগীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমবেত প্রচেষ্টায় ও আন্তরিকতায় অনুষ্ঠানটি প্রীতিময় হয়ে ওঠে।

মূকাভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ।। দুই বিঘা জমি ।।

১৪ই মে ডায়মন্ডহারবারের 'বিচিত্রা' নাট্যসংস্থার নিজস্ব প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে মূকাভিনয় পরিবেশন করলেন খ্যাতনামা মূকাভিনেতা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

এবারের মূকাভিনয় ছিল 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি। বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রীভট্টাচার্যের 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটির মূকাভিনয় খুবই সময়োপযোগী।

মূকাভিনয়ের সঙ্গে একমাত্র যন্ত্র-সংগীতে মাউথ অর্গানে কার্তিক রায় ভারতীয় সুরে মূকাভিনয়কে প্রাণবন্ত করেন।

'সংস্কৃতি'র বার্ষিক উৎসব

চাকপোতার (হাওড়া) জনপ্রিয় সংস্থা 'সংস্কৃতি' গত ১৯শে মে এক পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মাঝে তাদের নবম বার্ষিকী উৎসব উদযাপন করে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীকরবী চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধন সংগীতের সঙ্গে সভার কাজ শুরু হয়। ম্যাক্সিম গোর্কীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর ওপর আলোচনা করে তাঁর 'সঙ অব দি স্টর্মি পেট্রেল' কবিতাটি আবৃত্তি করেন কবি নিমাই মান্না। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ নেন সর্বশ্রী দীপান্বিতা মান্না, অনিতা পাত্র, সমীর মুখার্জি, চন্দ্রা পাত্র, মন্টু দাস, অশোক চক্রবর্তী, চন্দ্রা পাত্র, অনিল মন্ডল, তপন চক্রবর্তী, ভোলানাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, কমলেশ বসু, জ্যোতি চক্রবর্তী, নীলমণি কুন্ডু, বিমল পাত্র, দিলীপ কাঁড়ার, রণজিৎ রায়চৌধুরী, সুকুমার পাত্র, কানাই খাঁ ও আরও অনেকে। পরিশেষে সংস্থার সদস্যরা কবি ও নাট্য সমালোচক নিমাই মান্নার নির্দেশনায় ও প্রয়োগে জগদীশ চক্রবর্তীর 'প্রতিনিধি' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে সর্বশ্রী দিলীপ মান্না, ফেলু দোয়ারী, কৃষ্ণ কোলে, তারক সাধুখাঁ, কাশী দে, নবীন মান্না, কৃষ্ণ পাত্র তাঁদের ভূমিকাকে যথোচিত রূপ দেন।

চেতলা নবারুণ সংঘ

গত ১৮ই মে শ্যাম বসু রোডস্থিত নবারুণ সংঘের উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত, আবৃত্তি ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় অনুরাগীগণ এবং সংঘের সভ্য ও সভ্যাবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে কবিগুরুর ছটি নাটকটি সভ্যসভ্যাদের দ্বারা মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে কুমারী চামেলী ব্যানার্জি ও মাস্টার অশোক মুখার্জি পুরস্কৃত হন। নাটকটি পরিচালনা করেন কমলকুমার ব্যানার্জি ও গুরুদাস ব্যানার্জি। শ্রীসমীর ঘোষের পরিচালনায় কবির 'ঋতু-রঙ্গ' সংগীতের মাধ্যমে উপস্থিত দর্শকদের মন আনন্দে ভরিয়ে দেয়।

আলি আকবর সম্বর্ধনায় কানন দেবী এবং অমিয় মুখোপাধ্যায়।

আলি আকবরের বিদেশ যাত্রা

ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ ৮ই জুন আবার পাড়ি দিলেন তাঁর সাগরপারের সফরে। এর আগে তাঁর তিনদিনের তিনটি অনুষ্ঠান রসিকচিত্তে অবিস্মরণীয় সম্পদ-রূপে সঞ্চিত থাকবে।

রবীন্দ্রসদনে ৪ঠা জুন অরুণ ভট্টাচার্য নিবেদিত অনুষ্ঠান শুরু হয় 'দরবারী কানাড়া' রাগের আলাপ দিয়ে। যন্ত্রসংগীতে এই রাজকীয় রাগের রাজা হলেন স্বয়ং আলি আকবর যেমন কন্ঠসংগীতে ফৈয়াজ খাঁর 'দরবারী কানাড়া' ভোলার নয়। 'দরবারী কানাড়া'র ভাবমূর্তি ওস্তাদের ধ্যানসমাহিত চিত্তের স্বধর্মী হওয়ায় রাগের অন্তর্নিহিত নিরুদ্ধ বেদনার ম[illegible]াদা-গম্ভীর ব্যঞ্জনা—সুরে সুরে রূপময় হয়ে উঠেছিল শিল্পীর প্রতিটি বাজের আঘাতে। আবহাওয়ার প্রতিকূলতায় যন্ত্রের অবস্থা মেজাজী বাজনার বিরোধিতা করেছে যথেষ্ট। তবে প্রেক্ষাগৃহ-পূর্ণ তাঁর অগণিত অনুরাগী শ্রোতাদের আগ্রহের প্রতি যথোচিত মর্যাদা দেবার জন্য খাঁ সাহেবও প্রচুর পরিশ্রম করেছেন সরোদকে আয়ত্তে আনতে। আয়ত্তে আসার পরমুহূর্ত থেকে যন্ত্র আর যন্ত্রণা দেয়নি।

মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকে ভাবগম্ভীর সুর-বিস্তারের মধ্যে আন্দোলিত গান্ধারের চকিত সকরুণ বেদনার আবেদন, ধৈবত গান্ধারের শিল্পসুন্দর সমন্বয়ের শ্রুতিতে সৃজনবৈভব—আলি আকবরের ধ্যানলোককে উদ্ভাসিত করেছে। শিল্পীর সঙ্গে শ্রোতারাও যেন কিসের অন্বেষণে এই দৈনন্দিন জীবনের ধূলিমলিনতার ঊর্ধ্বে যাত্রা করেছিল।

দক্ষিণ ভারতীয় রাগ 'কিরবাণী' উত্তর-ভারতের শ্রোতাদের দরবারে আলি আকবর রবিশংকরেরই অবদান। শ্রুতিমাধুর্যে ও সহজেই পরিবেশ জমিয়ে তোলার গুণে এ রাগ ইদানীং অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং সকল যন্ত্রীর হাতেই শোনা যায়। কিন্তু বহুশ্রুত এই রাগের অন্তরে যে অধরা মাধুর্য নিহিত, আলি আকবরের রূপরেখায় বুঝি ক্ষণিকের জন্যও তার সবটুকুই ধরা দিয়েছিল। আর শ্রোতাদের মনের অতলে সেই রস সঞ্চারিত হয়ে এমন এক অপরূপ অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল যার বৈচিত্র্য, গভীরতা দুর্লভ। কোমল নিখাদের স্বল্প, কিন্তু মর্মস্পর্শী ছোঁয়া কিন্তু একান্তই শিল্পীর। এরপরই দেশ, দেশ-মল্লার ও মেঘ রাগে বর্ষার পটভূমিকার রূপাবেশ ঘনীভূত হোল সম্পূর্ণ আলি আকবরীয় ধাঁচে।

কোমল গান্ধারের ছোঁয়ায় সজল শ্যামল গ্রামীন সৌন্দয মূর্ত হয়ে উঠে সুরের জগতে যেমন সৌন্দর্য বিস্তার করেছে। আবার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঝালার অঙ্গে ছন্দের বৈচিত্র্য ওঠানামা যে কোন যন্ত্রীর শিক্ষণীয় বস্তু। দ্রুতগতিতে পৌঁছলে সাধারণতঃ খাড়া ঝালায় 'না ধিন্ ধিন্ ধা' বোলেই সবার মনোযোগ ন্যস্ত থাকে। কিন্তু ঝালার মধ্যে উলটি-ঝালা, ঠোক ঝালার সঙ্গে কখনও লাড়্লাপেট তান কখন ডিরিডিরি বোলের বজ্রনির্ঘোষে মেঘমন্দ্রিত বৃষ্টির বাণীই শুধু ধ্বনিত হয়নি। বহু স্বর-সমন্বয়ের সংগতির অন্তরালের ধ্বনিমাধুর্য ৫½ মাত্রার লাস্যলীলার ছন্দ ও গতিতে যে রসমূর্তি গ্রহণ করেছিল তা শুধু সৃষ্টিই নয়, নবসৃষ্টি—কল্পনাসম্পদের চরম নিদর্শন। ভারতীয় সাধক-শিল্পীর উজ্জ্বল উদাহরণ ওস্তাদ আলি আকবর খান। এ সত্যই নতুন করে অনুভব করলাম।

উপযুক্ত তবলাসংগতের দ্বারা ওস্তাদের মেজাজকে অনাহত রাখতে শংকর ঘোষের ত্রুটি ছিল না।

এছাড়াও দুটি ঘরোয়া আসরের একটি ৪৯, চৌরংগী রোড, অপরটি ৭নং ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে—বহুমুখী প্রতিভার দুই বিভিন্ন দিককে দীপ্ত করেছে। প্রথম আসরে 'যন্ত্র'-র গোলযোগে আলাপ বাজানো সম্ভব হয়নি। তবে সে ক্ষতিপূরণ করেছে ওস্তাদ আলাউদ্দিন ও আলি আকবর খাঁর যুগ্ম-সৃষ্টি 'মেধাবী' রাগ কবিগুরুর চরণে উচ্ছল প্রণতি।

আদ্ধাছন্দের প্রাণকাড়া বন্দেজের এই গতে গুরু আলাউদ্দিনের ভক্তিভাব, লয়-কিরী, সরল শুদ্ধ রূপমাধুর্যে মনকে সহজেই আপ্লুত করেছে। বাজের অঙ্গে, ছন্দ-বিস্তারে গায়কী অঙ্গের সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজে রাগাবয়ব সৃষ্ট হয়েছে, তা আলাউ-দ্দিন খাঁর মত গুরুর তালিম ও ধ্যাননিবিষ্ট রেওয়াজ ছাড়া সম্ভব নয়।

'রামদাসী' মল্লারে শিল্পী আপন কল্পনালোকের বস্তু পরিবেশন করেছেন। 'মুখার্জি ভবনে' ইনি বাজালেন স্ব-সৃষ্ট চন্দ্রনন্দন ও লাজবন্তী, আপন কন্যার নামাঙ্কিত। ধামার ও একতালে পরিবেশিত এই অনুষ্ঠানে প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী ধামারে অভিজাত ছন্দগতি, গাম্ভীর্য মুগ্ধ-বিস্ময়ে শোনবার মত। এ বস্তু লোপ পেতে বসেছে। তাই কি তার পলাতক সৌন্দর্যের রূপ মনকে এমন আকৃষ্ট করে?

কানাই দত্ত'র তবলাসংগতে রেওয়াজের ওপর উপরি-পাওনা ছিল রসবোধ।

মদন মিত্র ও মুখার্জি ভ্রাতৃদ্বয় এ অনুষ্ঠানের জন্য ধন্যবাদার্হ।

দর্শকের সমাগম। প্রায় সকলেই চেয়ে আছেন খেলার মাঠের দিকে। কারও নজর নেই এই দিকপাল খেলোয়াড়দের দিকে। অনেকেই হয়তো তাঁদের চেনেই না। তৎকালীন সময়-কার অল্পকিছু মানুষের দৃষ্টি হয়তো তাঁদের প্রতি আছে কিন্তু আমার দুর্বল দৃষ্টিতে তাঁদের কাউকেই দেখলাম না।

মোহনবাগান, মহমেডান, ইস্টবেঙ্গল—এই তিনটি দলকে নিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল শতবার্ষিকী ফুটবল লীগের। তাই ভাবছিলাম এই তিনটি দলের কথা। পশ্চিমবাংলার ক্ষুদ্রায়তন ফুটবল আসরে দলের সংখ্যা নেহাত কম কিছু নয়। কত দলই তো চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তাহলে নির্দিষ্ট করে শুধুমাত্র এই তিনটি দলকে ডাকা হলো কেন? শুধু কি শক্তিশালী দল বলে? শক্তিশালী দল তো আরও ছিল। পুরাতন সংঘটন বলে? তাও নয়, তবে?

জহুরী জহরত চেনে।

মোহনবাগান, মহমেডান এবং ইস্টবেঙ্গল—এই তিনটে ক্লাব বর্তমানে শুধু মাত্র বাংলা নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিরাজিত যে ফুটবলের জগত সেই জগতের মাটি জল, হাওয়া। আজকের যে কোন প্রতিযোগি-তার (অবশ্যই যা প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত) কথাই ধরা হোক না কেন,—যদি সেই প্রতি-যোগিতার আসরে তিনটি দলের মধ্যে একটিও উপস্থিত না থাকে তাহলে সেই প্রতিযোগিতা ঘিরে যত উন্মাদনা, যত উন্দীপনা সবই কেমন যেন নিষ্প্রাণ ও মলিন মনে হয়। শুধু বাংলা দেশের ফুটবল-পাগল মানুষ নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের দর্শক-সাধারণ আজ একথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করবেই।

আজ এই তিনটে ক্লাবের বয়স, কারোর ছিয়াত্তর, কারোর সাতাত্তর, কারোরও বা তার চেয়ে কিছু কম। আর এই সময়ের মধ্যে তারা সংগ্রহ করেছে বিপুল যশ, অতুল সম্মান, প্রভূত খ্যাতি।

জীবনে বড় হতে গেলে অনেক বাধা বিপদকে ডিঙিয়ে তবে বড় হতে হয়। জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে গেলে, বিজয়ীর সম্মান পেতে হলে এড়িয়ে যেতে হয় অনেক বিঘ্নকে, বিপত্তিকে। শতসহস্র ভাগ্য বিপ-র্যয়ের দুর্বিপাকেও স্থির রাখতে হয় নিজের নিশানাকে, উঁচু করে রাখতে হয় মাথাকে। এই অমৃতবাজার পত্রিকা! যশোহর জেলার পটুয়া গ্রামের এক অখ্যাত অঞ্চল থেকে যার প্রথম প্রকাশ, নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনীকে দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্যে, সমস্ত দেশ জুড়ে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠন করার উদ্দেশ্যে, সেই শতবর্ষ আগেকার ক্ষুদ্র বীজ আজ এক বিশাল মহীরুহে পরিণত। বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে তার শাখাপ্রশাখা আজ ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের দিকদিগন্তে। আজকের এই বড় হবার পথে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার চরম মুহূর্তে প্রভূত সম্মান, যশ, খ্যাতির আলোকে যখন চোখের সামনে এই পত্রিকাকে বারবার ভেসে উঠতে দেখি তখন শুধু মনে পড়ে যায় পেছনে ফেলে আসা সেই কঠোর সংগ্রামী দিনগুলির কথা। মনে পড়ে যায় অন্ধকার থেকে আলোকে আসার নিরলস প্রচেষ্টার কথা। কি বজ্রকঠোর সাধনা! কি নিদারুণ তপস্যা! হৃদয়ের গভীরে জেগে ওঠে অসীম শ্রদ্ধা! ঢেউ দিয়ে আসে অব্যক্ত আনন্দ পুলকের শিহরন। আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত মুহূর্তগুলিতে ভেঙে পড়ার ক্ষণে নতুন আশায় বুক বাঁধি, নতুন প্রাণের সুরে মনোবীণা ঝংকার দিয়ে ওঠে -'হারায় না! হারাতে পারে না। জীবনের সাধনা বিফলে যায় না—যেতে পারে না!'

সংবাদপত্রের জগতে এই অমৃতবাজার পত্রিকার কথাপ্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় সেদিন-কার ত্রিদলীয় লীগে আমন্ত্রিত দলগুলির কথা। তাদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তাদের চেয়েও পুরোনো ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠান আছে। যেমন ডালহৌসী ক্লাব, টাউন ক্লাব, এরিয়ান ক্লাব, কুমারটুলী ক্লাব, ক্যালকাটা ক্লাব। ঐতিহ্যে তারা মোহন-বাগান, মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইস্ট-বেঙ্গলের থেকে কোন অংশে কম নয়। কিন্তু দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে আজ তারা খুবই দুর্বল! আগের শক্তি তাদের নেই। ঐতিহ্য-শালী হয়েও তারা এই তিনটে দলের মত শক্তিশালী নয়। তাই সেদিনকার প্রতি-যোগিতার আসরে তারা বাদ পড়েছিল।

রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, সমাজসেবা, দেশগঠন, খেলাধুলো প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আজ পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। আমি খেলার মাঠের লোক। তাই খেলার জগতে পত্রিকার অবদানের কথাই বলছি।

বিগত ১৯১১ সালে আই-এফ-এ শীল্ডের ফাইনাল খেলায় মোহনবাগানের ঐতিহাসিক জয়লাভের সূত্রে ভারতবর্ষের ক্রীড়াকীর্তির ইতিহাসে যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল, তাকে অভিনন্দন জানিয়ে এই অমৃতবাজার পত্রিকাই প্রথম বলেছিল—'স্বাধীনতা আসতে আর বিলম্ব নেই।' দেশের মানুষকে নতুন জাগরণের মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে সেদিন অমৃতবাজার পত্রিকা অন্যতম সারথির ভূমিকা নিয়েছিল। খেলাধুলোর ওপরে সম্পাদকীয় স্তম্ভ রচনা হতে পারে একথা তখনকার দিনে অন্য কোন সংবাদপত্র ভাবতেই পারে নি।

কিন্তু ভারতবর্ষের ক্রিকেট জগতের এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র ভিনু মানকাদ যেদিন প্রথম ভারতীয় হিসেবে ক্রিকেটের 'ডাবলস' লাভ করেন, ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় সঞ্চিত হয় টেস্ট ক্রিকেটের এক হাজার রান এবং একশত উইকেট সেদিন একমাত্র এই পত্রিকাই সেই প্রতিভার স্বীকৃতি জানান দিয়ে প্রকাশ করেছিল বিশেষ ক্রোড়পত্র। আজ পর্যন্ত যা কোন কাগজ, কোন ব্যক্তিগত খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে সম্মান জানিয়ে প্রকাশ করেছেন কিনা আমার মনে পড়ে না।

খেলাধুলোর জগতে কোন প্রতিষ্ঠানের অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই পত্রিকা চিরদিনই তার কণ্ঠকে সোচ্চার রেখেছে। খেলার আসরের অখেলোয়াড়সুলভ মনোভাবকে—কি খেলোয়াড়ের কি দর্শকদের—তারা যেমন চিরদিন ধিক্কার জানিয়ে এসেছে তেমনি দর্শক বা খেলোয়াড়দের সত্যিকারের খেলো-য়াড়সুলভ মনোভাবকে তারা অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে এসেছে। খেলা খেলাই। এ আঙিনার দ্বার শুধুমাত্র sportsman-দের জন্যেই উন্মুক্ত। একথা বারবার জানাতে তারা কোনদিন কিছুমাত্র কার্পণ্য করেনি।

বর্তমান ভারতবর্ষের বহু প্রথিতযশা ক্রীড়া সাংবাদিকের জীবনী যদি পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে তাঁদের এই অসাধারণ প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে একমাত্র অমৃতবাজার পত্রিকার অবদানই রয়েছে।

শুধু ক্রীড়া সাংবাদিক কেন? বহু খেলোয়াড়ও আছে। নাই বা করলাম তাদের নাম। বলতে দ্বিধা নেই আমার কথাই বলছি। ১৯৩৫ সাল! সে বছর বাংলা দেশে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট দলের আসবার কথা। যে দলের অধিনায়ক ছিলেন জ্যাক রাইডার। বাংলা বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলা। বাংলা দলের খেলোয়াড়ের ভিড়ে আমার নামটি দিশেহারা। আমারও যে তাদের বিরুদ্ধে লড়বার মত শক্তি আছে এ কথা প্রমাণ করবার যখন কোন সুযোগই ছিল না তখন এই পত্রিকা আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন আমার খেলার রেকর্ড প্রকাশ করে নির্বাচকমন্ডলীর চোখ ফিরিয়ে দিয়েছিল আমার প্রতি। আমি দলভুক্ত হয়ে-ছিলাম।

মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতাবোধের স্বীকা-রোক্তি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। হয়তো এ সুযোগ আর পাব না। তাই আমার এই স্বীকারোক্তি।

খেলাধুলা

দর্শক

ফ্রেঞ্চ টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৬৮ সালের ফ্রেঞ্চ হার্ড কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতায় পেশাদার খেলোয়াড় কেন রোজওয়াল (অস্ট্রেলিয়া) পুরুষদের সিংগলস এবং ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে মোটা অঙ্কের নগদ পুরস্কার (৩,০০০ ডলার এবং ১,২০০ ডলার) লাভ করেছেন। তিনি পুরুষদের সিংগলস ফাইনালে তাঁর স্বদেশবাসী রড লেভারকে পরাজিত করেন। বিশ্বের পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের নামের তালিকায় রড লেভারের স্থান প্রথম এবং কেন রোজওয়ালের স্থান দ্বিতীয়। মহিলাদের সিংগলস ফাইনালে আমেরিকার অপেশাদার খেলোয়াড় নান্সি রিচি বৃটেনের পেশাদার খেলোয়াড় শ্রীমতী এ্যান জোন্সকে পরাজিত করে অপেশাদার খেলোয়াড়দের মুখ রক্ষা করেছেন। পুরুষদের সিংগলস ও ডাবলস, মিক্সড ডাবলস এবং মহিলাদের ডাবলসের খেতাব পেয়েছেন পেশাদার খেলোয়াড়রা।

প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য

ফ্রেঞ্চ হার্ড কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতা বিশ্বের চারটি সেরা টেনিস প্রতিযোগিতার অন্যতম। বাকি তিনটির নাম—অস্ট্রেলিয়ান, উইম্বলেডন (আসল নাম অল ইংল্যান্ড) এবং আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতা। সুমহান ঐতিহ্যে গড়া এই চারটি টেনিস প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে সমান পদমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় জয়লাভের গৌরব অনেক বেশী। একই বছরে কোন একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে এই চারটি প্রতিযোগিতারই সিংগলস খেতাব জয়ের কৃতিত্বকে টেনিসের ভাষায় বলা হয় 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' জয়। এ সম্মান অর্জন করা চারটিখানি কথা নয়। এপর্যন্ত মাত্র এই তিনজন টেনিস খেলোয়াড় একই বছরে এই চারটি প্রতিযোগিতায় সিংগলস খেতাব জয়ের সূত্রে 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব জয়ী হয়েছেন—১৯৩৮ সালে আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ, ১৯৫৩ সালে আমেরিকার কুমারী মরীন ক্যাথারিন কনোলী (পরবর্তীকালে বিবাহের সূত্রে শ্রীমতী নরম্যান ব্রিংকার) এবং ১৯৬২ সালে অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার। এই 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব জয়ের সময় কুমারী কনোলীর বয়স ছিল মাত্র ১৮, ডোনাল্ড বাজের ২২ এবং রড লেভারের ২৪ বছর। অস্ট্রেলিয়ার রড লেভারের পর অল্পের জন্যে এই 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব লাভ থেকে কয়েকবারই বঞ্চিত হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ারই রয় এমার্সন এবং কুমারী মার্গারেট স্মিথ (বর্তমানে বিবাহের সূত্রে শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট)।

কেন রোজওয়াল (অস্ট্রেলিয়া) ঃ ১৯৬৮ সালের ফ্রেঞ্চ সিংগলস খেতাব বিজয়ী

১৯৬৮ সালের ফ্রেঞ্চ হার্ড কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতায় অপেশাদার এবং পেশাদার খেলোয়াড়রা একত্রে যোগদান করেছিলেন। এই প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে পেশাদার খেলোয়াড়দের যোগদান এই প্রথম। প্রতিযোগিতায় খেলতে নেমেছিলেন ১১ জন বিশ্ববিশ্রুত পেশাদার খেলোয়াড়—পুরুষ বিভাগে ৭ জন এবং মহিলা বিভাগে ৪ জন। পুরুষ বিভাগে খেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ারই পাঁচজন—রড লেভার (১নং), কেন রোজওয়াল (২নং), রয় এমার্সন, লিউ হোড এবং ফ্রেড স্টোলে; তাছাড়া আমেরিকার পাঞ্চো গঞ্জালেস এবং স্পেনের এ্যান্ড্রিজ গিমেনো। মহিলা বিভাগে ছিলেন আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিং এবং রোজমেরী ক্যাসেল, ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়াজ ডুর এবং বৃটেনের শ্রীমতী এ্যান জোন্স।

এবছরের এই ঐতিহাসিক ফ্রেঞ্চ টেনিস প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিশ্রুত পেশাদারদের সংগে অপেশাদার খেলোয়াড়দের লড়াইয়ের ফলাফল দেখবার জন্য পৃথিবীর টেনিস অনুরাগী মহল উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। পুরুষদের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলায় দেখা গেল ৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে এই ৫ জন পেশাদার খেলোয়াড় উঠেছেন—রড লেভার, কেন রোজওয়াল, রয় এমার্সন (সকলেই অস্ট্রেলিয়ার), এ্যান্ড্রিজ গিমেনো (স্পেন) এবং পাঞ্চো গঞ্জালেস (আমেরিকা)। বাকি ৩ জন অপেশাদার খেলোয়াড়—বি জোভানোভিক (যুগোশ্লাভিয়া), আয়ন টিরিয়াক (রুমানিয়া) এবং টমাস কোচ (ব্রেজিল)। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে শেষ পর্যন্ত সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন এই চারজন পেশাদার খেলোয়াড়—রড লেভার, কেন রোজওয়াল, পাঞ্চো গঞ্জালেস এবং এ্যান্ড্রিজ গিমেনো। কোয়ার্টার ফাইনালের চারটি খেলার মধ্যে এই দুটি খেলা উত্তেজনায় এবং ঘটনাবৈচিত্র্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার বনাম রুমানিয়ার অপেশাদার খেলোয়াড় আয়ন টিরিয়াক এবং আমেরিকার পাঞ্চো গঞ্জালেস বনাম অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন। বিশ্বের ১নং পেশাদার খেলোয়াড় রড লেভারের বিপক্ষে টিরিয়াক ১ম ও ২য় সেটে ৪-৬ ও ৪-৬ গেমে জয়ী হয়ে শেষ পর্যন্ত পরবর্তী তিনটি সেটে পরাজিত হন। গঞ্জালেস বনাম এমার্সনের খেলা পাঁচ সেটে নিষ্পত্তি হয়। এমার্সন ৩য় ও ৪র্থ সেটে যথাক্রমে ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে জয়ী হয়ে খেলার ফলাফল সমান করেন, কিন্তু ৫ম সেটে ৪-৬ গেমে হেরে যান। প্রবীণ গঞ্জালেস (বয়স ৪০) দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে পেশাদার খেলায় হাত পাকিয়েছেন। অপরদিকে এমার্সন (বয়স ৩১) মাত্র দু'মাস আগে পেশাদার খেলোয়াড়দের দলে ঢুকেছেন।

সেমি-ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিংগলস সেমি-ফাইনালের চারজন পেশাদার খেলোয়াড়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ছিল দু'জন এবং একজন করে আমেরিকা এবং স্পেনের। শেষ পর্যন্ত ফাইনালে উঠেছিল অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার এবং কেন রোজওয়াল। রড লেভারের হাতে কেন রোজওয়াল। রড লেভারের হাতে আমেরিকার গঞ্জালেস এবং রোজওয়ালের হাতে এ্যান্ড্রিজ গিমেনো পরাজিত হন।

মেয়েদের সিংগলস সেমি-ফাইনালে চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে দু'জন ছিলেন পেশাদার এবং দু'জন অপেশাদার। ফাইনালে দু'জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন ছিলেন পেশাদার (শ্রীমতী জোন্স)। নান্সি রিচি (আমেরিকা) পরাজিত করেন পেশাদার খেলোয়াড় শ্রীমতী বিলি জিন কিংকে

(আমেরিকা) এবং পেশাদার খেলোয়াড় শ্রীমতী এ্যান জোন্স (বৃটেন) পরাজিত করেন শ্রীমতী ডু প্লোয়িকে (দক্ষিণ আফ্রিকা)।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিংগলস : কেন রোজওয়াল (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-১, ২-৬ ও ৬-২ গেমে স্বদেশের রড লেভারকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : কেন রোজওয়াল এবং ফ্রেড স্টোলে (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-৪ ও ৬-৩ গেমে রড লেভার এবং রয় এমার্সনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : নান্সি রিচি (আমেরিকা) ৫-৭, ৬-৪ ও ৬-১ গেমে শ্রীমতী এ্যান জোন্সকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : শ্রীমতী এ্যান জোন্স (বৃটেন) এবং ফ্রাঁসোয়াজ ডুর (ফ্রান্স) ৭-৫, ৩-৬ ও ৬-৪ গেমে শ্রীমতী বিলি জিন কিং এবং রোজমেরী ক্যাসেলকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : শ্রীমতী ফ্রাঁসোয়াজ ডুর এবং জ' ক্লোদ বার্কলে (ফ্রান্স) ৬—১ ও ৬—৪ গেমে শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) এবং ওয়েন ডেভিডসনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

আই এফ এ-র ৭৫ বৎসর পূর্তি

ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে কলকাতার ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের (আই এফ এ) যথেষ্ট অবদান আছে। এক সময়ে ভারতীয় ফুটবল খেলার আসরে এই আই এফ এ ছিল সর্বময় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক ফুটবল আসরে তাদের অনুমোদিত ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ফুটবল নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এই আই এফ এ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৩ সালে। ১৯৬৮ সালে তার সুদীর্ঘ ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে উৎসব এবং বৈদেশিক ফুটবল দলের সঙ্গে প্রদর্শনী ফুটবল খেলার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তারই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ২রা জুন মোহনবাগান এবং ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের এজমালি মাঠে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

১৮৯৩ সালে মাত্র ২০টি ক্লাব নিয়ে আই এফ এ তার কর্মজীবন সুরু করে। বর্তমানে তার অধীনে আছে ২৭৮টি ক্লাব, ১৬টি জেলা এসোসিয়েশন, ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫টি অফিস ফেডারেশনের অনুরূপ সংস্থা। ভারতবর্ষের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের অনুমোদিত একমাত্র সংস্থা এই আই এফ এ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন গঠনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল।

আগা খাঁ হকি কাপ

বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত আগা খাঁ হকি টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে বোম্বাইয়ের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ('এ' দল) ১—০ গোলে এ বছরের বেটন কাপ বিজয়ী মোহনবাগানকে পরাজিত করে আগা খাঁ কাপ জয়ী হয়েছে। পূর্বের বি বি এ্যাণ্ড সি আই রেলওয়ের নাম পরিবর্তন করে বর্তমান ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে নামকরণ হয়েছে। ১৯২৪ এবং ১৯৪০ সালে বি বি এ্যাণ্ড সি আই রেলওয়ে আগা খাঁ কাপ জয়ী হয়েছিল এবং ১৯৫৭ সালে ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে রাণার্স-আপ হয়েছিল। অপরদিকে মোহনবাগান ক্লাব ১৯৬৪ সালে যুগ্মভাবে (পাঞ্জাব পুলিশ দলের সঙ্গে) আগা খাঁ কাপ পেয়েছিল।

মোহনবাগান দলের দুই প্রখ্যাত খেলোয়াড়—ইনসাইড ফরোয়ার্ড ইনামুর রহমন এবং লেফট আউট মুখোপাধ্যা আহত থাকায় দু'দিনেরই ফাইনাল খেলায় অংশ গ্রহণ করেননি।

প্রথম দিনের ফাইনালের প্রথমার্ধে মোহনবাগান প্রথম গোল দিয়ে ওয়েস্টার্ণ রেল দলকে কোণঠাসা করেছিল। তারা বহু গোলের সুযোগ নষ্ট না-করলে প্রথম দিনেই তারা জয়লাভের গৌরব লাভ করতো। খেলা শেষ হবার ৯ মিনিট আগে পর্যন্ত মোহনবাগান ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ২৬ মিনিটের মাথায় রেল দল গোল শোধ দিয়ে শেষ পর্যন্ত খেলা ড্র করে। দ্বিতীয় দিনে মোহনবাগান সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি। বিরতির ৭ মিনিট আগে পেনাল্টি কর্ণার থেকে ইনসাইড রাইট গুরুবক্স সিং জয়সূচক গোলটি দেন।

কলকাতার ফুটবল মাঠের সেই চিরপরিচিত দৃশ্য—শহরের অগণিত আবালবৃদ্ধের নির্দোষ আনন্দ লাভের অন্যতম খোরাক।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

অবশেষে বহু প্রত্যাশিত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা গত ৮ই জুন থেকে আরম্ভ হয়েছে। সাধারণতঃ মে মাসের গোড়ার দিকে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা সুরু হয়ে যায়। জটিল পরিস্থিতির দরুন খেলা আরম্ভ হতে দেরী হল। এবছরের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ফিরতি খেলার কোন ব্যবস্থা নেই। এটি চিরাচরিত প্রথার মস্ত বড় ব্যতিক্রম। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা আরম্ভ হয়েছে ১৮৯৮ সালে। লীগ প্রতিযোগিতার বিগত ৭০ বছরের ইতিহাসে ফিরতি খেলা বাদ দিয়ে কখনও প্রতিযোগিতার তালিকা এভাবে তৈরী হয়নি। আই এফ এ কর্তৃপক্ষের এই নতুন ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। তাদের বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। অনেক কথা চালা-চালির পর শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে, যোগদানকারী দলগুলি পরস্পরের সঙ্গে একবার করে খেলবে। এইরকম খেলার পর লীগ তালিকার উপরের প্রথম চারটি দলকে নিয়ে 'সিঙ্গল-লেগ' লীগ খেলা হবে। এই চারটি দলের মধ্যে সর্বাধিক পয়েণ্ট অর্জনকারী দলই শেষ পর্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়ান হবে। লীগ খেলার ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ এই সব সমস্যা সমাধানের নীতিও ঘোষণা করেছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের দাবির আংশিক পূরণ হলেও তারা প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে স্থির করেছে।

ঢাকের বাদ্যির মতই কলকাতার মাঠে ফুটবলের পদধ্বনি আবালবৃদ্ধকে মাতিয়ে তুলে। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার সূচনা থেকেই তার আরম্ভ।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ
১ম খণ্ড

৭ম সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 21st. June, 1968 শুক্রবার, ৭ই আষাঢ়, ১৩৭৫ **40 Paise.**

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক

প্রচ্ছদ : শ্রীশ্যামল দত্ত রায়

পত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও চলচ্চিত্র শিল্প প্রসঙ্গে

গত ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত 'অমৃতে' প্রেক্ষাগৃহ বিভাগে নান্দীকারের 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও চলচ্চিত্র' প্রসঙ্গে নিবন্ধটি মনোযোগসহকারে পড়ে অত্যন্ত ভাল লাগলো। এজন্য অমৃত সম্পাদক ও নান্দীকর মহাশয়কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এতদিন আমার ধারণা ছিল যে শুধু ভারত সরকারই পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সর্বক্ষেত্রেই উদাসীন ভাব দেখাতো।

কিন্তু নান্দীকর মহাশয় যে অমূল্য তথ্য পাঠকসমাজের কাছে উন্মোচন করেছেন তাতে আমার ধারণা সমূলে পাল্টে গেল। আজকে সত্যি ভাবতেও আশ্চর্য হতে হয় যে রাজ্যে কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য-শিল্প, খেলাধুলো, চাকরী, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রেই আজকে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যাকাশ মসীলিপ্ত। রাজ্যের এই অবস্থার মধ্যে রাজ্যসরকার কিভাবে উদাসীন থাকতে পারেন?

পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্পের উপর যে কাল মেঘ ঘনিয়ে এসেছে রাজ্য সরকার একটু যদি চিত্রশিল্পের প্রতি সহানুভূতি দেখাতেন তবে নিশ্চয়ই আজ সিনেমা ধর্মঘট হোত না। এই যে ধর্মঘট হচ্ছে তাতে কারা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে কথা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার একবার ভেবে দেখেছেন? যদি ভাবতেন তাহলে নিশ্চয়ই তাদের অনমনীয় ভাব শিথিল করে ধর্মঘটীদের দাবীদাওয়াগুলো সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনার জন্য তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হতেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি সিনেমা ধর্মঘটের অবসানকল্পে আশু মীমাংসার জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণ না করেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রশিল্পের উপর ঘোর দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে। রাজ্য সরকারের প্রতি বিশেষ অনুরোধ তাঁরা যেন অচিরেই একটা মীমাংসা করেন।

পরিমল বিশ্বাস,
গৌহাটি—১১, আসাম।

প্রেক্ষাগৃহ প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকায় 'প্রেক্ষাগৃহ' নিঃসন্দেহে সিনেমা সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠক সাধারণকে প্রচুর আনন্দ দিয়ে থাকে। সম্প্রতি বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পে যে সংকট দেখা দিয়েছে এবং তা দিন দিন যেমন প্রকট হয়ে উঠছে তার জন্যে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারছি না। বাংলা ছায়াছবি বিশ্বের দরবারে একটা স্থান করে নিতে পেরেছে, এর জন্যে আমরা গর্ব অনুভব করি। কিন্তু এমনি সংকট চলতে থাকলে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়।

শোনা যাচ্ছে সরকার প্রতিটি সিনেমা হলে বাংলা ছায়াছবি প্রদর্শনের সময় নির্দিষ্ট করে দেবার কথা ভাবছেন—সরকার যদি এটাকে আইনে পরিণত করেন, তবে বাংলা সিনেমাপ্রেমীদের ধন্যবাদার্হ হবেন। সবচেয়ে দুঃখের কথা বাঙালীরা বাংলা ছবি দেখেন না। আজ বাংলাদেশে বাংলা ছবি যেন বিদেশী ছবি। সবচেয়ে অশ্চর্য হই যখন দেখি শহর কোলকাতায় অধিকাংশ সিনেমা হলে বাংলা নয় এমন ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে (অবশ্য সিনেমা সংকটের জন্যে বর্তমানে সব হলই বন্ধ(?)। কিন্তু কেন এটা হবে? আমাদের মনে হয় এমন অনেক দর্শক আছেন যাঁরা বাংলা ছবির অভাবে হিন্দী বা অন্য কোন দেশের ছবি দেখেন। তাই বলে আমাদের বক্তব্য এই নয় হিন্দী ছবি বয়কট করা হোক। পাঁচ দশ বছর আগে বাংলা ছবি প্রচুর সংখ্যায় মুক্তি পেয়েছে কিন্তু বর্তমানে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা কমন্তুমান। এই সংকটের দরুন বর্তমান বছরে ছবির সংখ্যা আরও কমে যেতে বাধ্য।

কি নিয়ে বিরোধ, কেন বিরোধ—সে সম্পর্কে খুঁটিনাটি কিছু জানা নাই। তবে এটুকু বিশ্বাস করি এই সংকটের একদিন অবসান হবে। যার মীমাংসা দুদিন পরে হবেই—সেটা কেন দুদিন আগে হবে না? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর মীমাংসা হওয়া উচিত। সরকার পক্ষকে প্রধান ভূমিকা নিতে হবে। অন্যান্য পক্ষকেও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ইতিমধ্যে দেখছি কোলকাতার বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সিনেমার এই সংকটের দরুন বিচলিত হয়েছেন। এ সম্বন্ধে তাঁরা তাঁদের মতামত রাখছেন। আমাদের এই চিঠির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো—আমরা মফস্বলের সিনেমানুরাগীরাও সিনেমার এই সংকটে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। 'সিনেমা-সংকটের অবসান হয়েছে—সমস্ত দর্শককুল হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো'—এই সংবাদ আপনার 'প্রেক্ষাগৃহ' আমাদের কাছে পেঁছে দিক।

সুধীরকুমার পান
মৃণালকান্তি পাঁজা
কমলকুমার পাঁজা
দেবীপুর, বর্ধমান।

এ কালের ছোটগল্প প্রসঙ্গে

গত সাতাশে বৈশাখ সংখ্যার অমৃতে শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় লিখিত 'একালের ছোটগল্প' শীর্ষক আলোচনাটি পড়লাম এবং প্রকৃত গল্প-হয়ে ওঠা সম্বন্ধে তাঁর সংগে একমতও আমি। কিন্তু একালের ছোটগল্পগুলি ক্রমবিবর্তনের ধারায় ভালো হচ্ছে, কি মন্দ হচ্ছে, সে ব্যাপারটি পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি তাঁর লেখায়।

কারণ রবীন্দ্রনাথের যুগের একটি নিটোল কাহিনীর রূপদান ধারা থেকে, প্রমথ চৌধুরীর কৃশকায় মার্জিত সম্পূর্ণ ঘটনার উপস্থাপনের পথ বেয়ে এবং কল্লোল-কালীন মহাযুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় অতি বাস্তবতার প্রলেপরঞ্জিত যাত্রাপথ অতিক্রম করে বর্তমান ছোটগল্প যে নিত্য-কার খুঁটিনাটি বিবরণ বা টুকরো টুকরো ঘটনার বিশ্লেষণ নিয়ে নিরেট নিটোলতার পথ পরিত্যাগপূর্বক ভিন্ন এক শিল্পরূপের পথে পাড়ি জমাচ্ছে, তা কতোখানি গুণাগুণ মিশ্রিত, তার প্রকৃত পর্যালোচনা পেলাম না অচিন্ত্যবাবুর লেখায়। অথচ একালের ছোটগল্প আলোচনায় ঐ রকম আলোচনা আশা করা কি খুব কিছু অসংগত? আপনার পত্রিকার নিয়মিত পাঠক হিসাবে এ প্রশ্ন আনলাম। তবে এতে যদি কোনো ত্রুটি ঘটে থাকে, মার্জনা করবেন।

চিন্তা চিন্যা,
চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান।

সাহিত্য সাময়িকী

অমৃত ৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় অভয়ংকর রচিত 'সাহিত্য সাময়িকী' আলোচনাটির জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ। মোটামুটি তিনি সাময়িকপত্রের একটা সালতামামি করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমার সবিনয় বক্তব্য : এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাকে তিনি শুধুমাত্র 'স্মৃতিশক্তি' এবং 'হাতের কাছে পাওয়া' পত্রপত্রিকার উপর নির্ভর করায় নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব সূচিত করেছে।

অভয়ংকর 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' 'চতুরঙ্গ'-এর মতন ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা দুটির একবারও উল্লেখ করেন নি। সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়'-এর পর তিনি ধারাবাহিকতা বর্জন করে একেবারে সাম্প্রতিক কতিপয় পত্রিকার নাম ও অনাবশ্যক দীর্ঘ লেখক-তালিকা দাখিল করেছেন! 'রবীন্দ্র-ভারতী'-রই বা উল্লেখ নেই কেন? অভয়ংকর যদি আরো একটু মনোযোগী হতেন তাহলে তিনি 'চতুষ্কোণ' নামক মননশীল মাসিকটির উল্লেখ করতে বিস্মৃত হতেন না! আরো বিস্মৃত হতেন না বাংলা ভাষায় একমাত্র গল্পপত্র 'শুকসারী'র নামোচ্চারণ করতে! অথবা ত্রিমাসিক 'বৈতালিক'-এর নাম করতে! 'কবি ও কবিতার' উল্লেখ থাকলে 'সীমান্ত' 'কৃত্তিবাস' 'কবিতা-সাপ্তাহিকীর'ই বা উল্লেখ থাকবে না কেন?

আশা করি আমার এই পত্রটি প্রকাশ করে অভয়ংকরের মনোযোগ আকর্ষণ করতে আমাকে সাহায্য করবেন।

ত্রিদিবেশ রায়,
কলিকাতা—৬

অমৃত

সম্পাদকীয়

কলংকের ভারী বোঝা

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা বিষয়ে যে-নোট তৈরী করেছে তাতে আমাদের উদ্বিগ্ন ও লজ্জিত হবার কারণ আছে। এই সপ্তাহেই শ্রীনগরে জাতীয় সংহতি পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কী ভাবে রক্ষা করা যায় তা হবে বর্তমান অধিবেশনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মের লোকের বাস। পরাধীনতার আমলে যখনি কোন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখা দিত তখন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ চক্রান্তের দিকে আঙুল দেখিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতাম। চক্রান্ত ছিল নিশ্চয়ই এবং সে চক্রান্তের ফলে দেশ ভাগও হয়েছে। তাতে সম্প্রীতি বাড়ে নি, বরং কমেছে। গোড়ার দিকে পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের ওপর যখন একটানা অত্যাচার চলেছিল তখন তার প্রতিক্রিয়ায় এদেশেও উত্তেজনা ছড়াত, বিনষ্ট হত সম্প্রীতি। কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নোটে দেখা যাচ্ছে যে, পাকিস্তানীদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবই এদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির একমাত্র কারণ নয়। অন্যান্য কারণ অর্থাৎ সেই গো-হত্যা, মসজিদের সামনে বাজনা, উৎসব নিয়ে কলহ, নারীঘটিত ব্যাপার, জমি নিয়ে ঝগড়া ইত্যাদি ষোল আনায় বর্তমান আছে যা নাকি বৃটিশ আমলেও ছিল। আরও দেখা যাচ্ছে যে, দেশের যে-রাজ্যগুলোতে মোটামুটি সাম্প্রদায়িক মনোভাব এতদিন সুস্থ ছিল ইদানীংকালে সেখানেও সামান্য কারণে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটছে। কেরলে বা মহীশূরে এর আগে বড় রকমের কোন সাম্প্রদায়িক কলহ ঘটে নি। সম্প্রতি এই দুটি রাজ্যেও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটায় দেশবাসী উদ্বেগ বোধ করছেন। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত সংঘর্ষ বাধলে দেশের ভিতরে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির যে-আশংকা করা হয়েছিল তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। বরং সে বৎসর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবোধই ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে ভারতের জয়লাভের প্রধান শক্তি। সরকারী হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি মোটামুটি ছিল ভাল। ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সংখ্যালঘু নিপীড়নের প্রতিক্রিয়ায় দেশের কয়েকটি স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। ১৯৬৬, '৬৭, '৬৮ এই তিন বছরই সেদিক থেকে দুর্বৎসর। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত নির্বাচনের পর কয়েকটি রাজ্যে অকংগ্রেসী দল শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাঁরাও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দমনে খুব তৎপরতার পরিচয় দিতে পারেন নি। গত বৎসর রাঁচীর হাঙ্গামা দমনে বিহারের অকংগ্রেসী সরকারের ব্যর্থতা আশা করি সকলেরই মনে আছে।

সুতরাং এই ব্যাধির কারণ কি তা আমাদের খোঁজ করে দেখতে হবে। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, দেশে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু উভয় সম্প্রদায়েই সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও অন্ধ বিদ্বেষ প্রচারের লোকের অভাব নেই। কিছু কিছু রাজনৈতিক দল আছে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই যারা সাম্প্রদায়িকতা প্রচারে অনুৎসাহী নয়। ভেদবুদ্ধিই তাদের রাজনীতির সম্বল। এই ধরনের দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় সরকার বহুদিন ধরেই চিন্তা করছেন। নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণও করা হয়। কিন্তু সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ করা এখনও সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সাম্প্রদায়িকতা প্রচারে এবং উস্কানি দিতে এদের জুড়ি খুব বেশি যে নেই তা বোধ হয় সরকারের অজানা নয়।

এ' ছাড়াও সামাজিক কারণ রয়েছে, আছে শিক্ষার ত্রুটি। কৃষিভিত্তিক সমাজে মোটামুটি একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল। শিল্পের প্রসারের ফলে সমাজজীবনে একটা আলগা ভাব এসেছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও পারস্পরিক অপরিচয়ের পাঁচিল উঁচু হয়ে ওঠার দরুণ সহজেই বিদ্বেষ ছড়ানো বা সংস্কারকে মাথা চাড়া দিয়ে তোলা সহজ। তাছাড়া অভাব, বেকারী ইত্যাদি কারণেও মানুষের মনের স্থৈর্য অল্পেতেই হারিয়ে যায়। তখন প্রতিবেশীকে আর প্রতিবেশী মনে হয় না। তাছাড়া স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের চক্রান্ত তো আছেই।

অথচ ভারতবর্ষে আমরা যে-রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেখানে ধর্মীয় গোঁড়ামির কোন স্থান নেই। এই রাষ্ট্রে সকল ধর্মের সমান অধিকার স্বীকৃত, সকল মানুষের রয়েছে সমান নাগরিক অধিকার। তা সত্ত্বেও বার বার এই আদর্শ মুষ্টিমেয় কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে আহত হচ্ছে। তা হতে দেওয়া আমাদের গোটা জাতির পক্ষেই বিপজ্জনক। জাতীয় সংহতি পরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা যোগ দেবেন। তাদের সকলের সহযোগিতা এই কাজে খুবই প্রয়োজনীয়। তবে আগেও দেখা গেছে যে, আলোচনা বৈঠকের সিদ্ধান্ত কার্যে প্রয়োগ করবার সময়ে এতটা উৎসাহ থাকে না যতটা থাকে আলোচনায়। এর জন্য শুধু সরকারী যন্ত্রকেই কাজে লাগালে কাজ হবে না, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য ত্যাগ স্বীকারে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানকে সঙ্গে নিতে হবে দেশের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্য। এ কাজ খুবই জরুরী। কারণ, মানুষের বহু সৎপ্রচেষ্টা এবং সদিচ্ছা অন্ধবিদ্বেষ ও গোঁড়ামির চক্রান্তে ব্যর্থ হয়। আমাদের ক্ষেত্রে তা যেন না হয়।

ঝিনুক খুলে মুক্ত

সুশীল রায়

দুটি ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে রাজলক্ষ্মী।

কয়েকদিন ধরে ওদের অনেক খোঁজ-খবর করে কোনো কিনারা করতে না পেরে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আদিত্য।

পাড়াপ্রতিবেশীদের সান্ত্বনায় ও সমবেদনায় ও আরো বেশি ক্লান্ত।

আপিসে সময়টা তবু কাজে-অকাজে কেটে যায়। আপিসের ছুটি হবার সময় হলেই আতঙ্ক বোধ করে আদিত্য। আবার ঐ ফাঁকা বাড়িতে গিয়ে তালা খুলে তাকে ঢুকতে হবে—এই তার আতঙ্ক।

আগে সিগারেট খেত, কিছুদিন থেকে সিগারেট ছেড়ে সে বিড়ি খেতে আরম্ভ করেছে। ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বিড়ির ধোঁয়া শূন্যে ছুঁড়তে ছুঁড়তে আদিত্য নিজের মনেই বলে ওঠে—লক্ষ্মী। মনে-মনেই সে বলেছে, কিন্তু হঠাৎ তার গলা দিয়ে শব্দ বেরিয়ে গেল, নিজের গলার শব্দে নিজেই সে চমকে উঠল।

জীবনটা যে এমন হয়ে যাবে, এ-কথা কে ভেবেছিল দশ বছর আগে? দশ বছর আগে সে ছিল ব্যাচিলার, দশ বছর পরে আজ আবার সে ব্যাচিলার। কিন্তু ঐ দুটো অবস্থার মধ্যে এ যে একটা আকাশ-পাতাল প্রভেদ!

আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল আদিত্য। সত্যি, গেল কোথায় ওরা? আচ্ছা যাদু জানে তো ঐ মেয়েটা। একজনের পক্ষে নিজেকে লুকিয়ে রাখাই দায়, তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে কী করে গা-ঢাকা দিল রাজলক্ষ্মী।

সংসারটা বেশ সচ্ছলই তো ছিল। একে-একে তিনটি ছেলেমেয়ে হল, তাতেও এমন কিছু অনটন হবার কথা না। তাদের মধ্যে যে অশান্তি ও খিটিমিটি বাধল তা তো ঐ অনটনের জন্যেই! অনটনই বা হবে না কেন। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে হু-হু করে।

এই তো মাসখানেক আগের কথা। বটকৃষ্ণ এসেছিল বর্ধমান থেকে। কলকাতার হালচাল দেখে তো অবাক। বলেছিল, "কলকাতার লোকের টাকা ইলাস্টিক নাকি রে? টানলেই বুঝি বেড়ে যায়?"

"কি রকম?" জিজ্ঞাসা করেছিল আদিত্য।

"রকম তো দেখছি মজারই। চার টাকা কিলো দরেও চাল কিনছে লোকে। টাকা পাচ্ছে কোথায়, আসছে কোত্থেকে!"

আশ্চর্য প্রশ্ন করেছে বটকৃষ্ণ। সত্যি,

লোকের আয় বাড়ছে না, কিন্তু ব্যয় বাড়ছে, রোজ বেড়ে চলেছে; তবু লোকে চালিয়ে যাচ্ছে কি করে—এটা ভাববারই কথা বটে।

আদিত্যদের বয়স যখন অল্প ছিল, তখন তারা চার টাকায় ভালো চাল কিনেছে এক মণ; দু আনায় কিনেছে এক সের খাঁটি-মুশুরি, দশ আনা বারো আনায় কিনেছে এক সের টাটকা পোনা। এসব কথা আজকালকার ছেলেমেয়েরা বিশ্বাস করবে না। তা না করুক, তাদের বিশ্বাস করাতে চায় না আদিত্য। কিন্তু সে যে বাঁচতে চায়, ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে চায়।

বটকৃষ্ণের কথামত টাকা যদি সত্যিই ইলাস্টিক হত, তাহলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে এভাবে চম্পট দিত না রাজলক্ষ্মী। সত্যি, ব্যাপারটা যে কিভাবে ঘটে গেল, তা ভাবতেই পারছে না আদিত্য।

রাজলক্ষ্মী তো রাজলক্ষ্মীই। লক্ষ্মীর মতই তার চেহারা, লক্ষ্মীর মতই তার স্বভাব। আর পাঁচজনের নাম যেভাবে রাখা হয়, তার নামও সেইভাবেই নিশ্চয় রাখা হয়েছিল; কিন্তু চেহারার সঙ্গে স্বভাবের সঙ্গে সেই নামের যে এমন মিল হয়ে যাবে তা নিশ্চয় কেউ ভাবেনি। অথচ মিলটা হয়ে গিয়েছিল—এ-কথা কেবল আদিত্যর কথা না, এ-কথা সবাই বলেছে, সকলেই স্বীকার করেছে।

সত্যি, অপরূপ রূপ রাজলক্ষ্মীর। যেমন তার শরীরের গঠন, তেমনি শরীরের গড়ন; যেমন টানা-টানা চোখ, তেমনি টানা-টানা ভুরু। গায়ের রং দুধে-আলতায় অবশ্য নয়, কিন্তু বেশ মাজা রং। সব মিলিয়ে সত্যিই সে লক্ষ্মী—রাজলক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী হওয়াই উচিত ছিল তার। বড়বাড়ির বউ হওয়ারই তার কথা। কিন্তু অমন একটা মেয়ে আদিত্যর ভাগ্যে যে জুটে গেল তারও কারণ নিশ্চয় আছে।

লক্ষ্মীতে আর সরস্বতীতে বিরোধ যে আছে তার একটা মস্ত প্রমাণ এই রাজলক্ষ্মী। সরস্বতীর ধারে-কাছে কখনো যায়নি সে। নিরক্ষর হয়তো সে নয়, নিজের নামটা লিখতে পারে, কিন্তু নিজের নামের বানানটা একটু-আধটু ভুল করে ফেলে।

হেসে বলত, "কী নামেরই ছিরি। বানান লিখতে কলম ভাঙে। কেন, অলকা অমলা কমলা বিমলা—এসব নাম কি নাম না?"

আদিত্য তার হাসিতে যোগ দিয়ে বলত, "নিজের নাম নিয়ে অত অসন্তুষ্ট হয়ো না লক্ষ্মীটি। দেখ, তোমাকে লক্ষ্মীটি বললাম, তোমার নামই বললাম, কিন্তু সেই-সঙ্গে কেমন আদরও জানানো হয়ে গেল। হল না? তবে, ও-নামে দোষ হল কোথায়?"

না। দোষ কিছু নেই। দোষ হল ভাগ্যের। রোজ ঐ এক কথা নিয়ে আদিত্যর রসিকতা তার ভালো লাগে না। মনে যদি অতই তার দুঃখ, তাহলে নিয়ে এলেই হত লেখাপড়া-জানা একটা পণ্ডিত মেয়েকে। কে তবে বাধা দিতে যেত তাকে?

বাধা কেউ দিত না বটে। কিন্তু এই রূপের সঙ্গে আবার যদি যোগ হয়ে যেত অমন গুণ, তবে এই সরকারী দপ্তরের এই ক্ষুদ্র কেরানীটি কি হালে পানি পেত। একেবারে নস্যাৎ করে দিত তাকে তাহলে সেই মেয়ে। আর, অমন মেয়ে সে পেতই বা কী করে? তার চেয়ে যা হয়েছে, এই বেশ হয়েছে।

সত্যি, বেশ হয়েছে। মা নেই, বাবা নেই, ভাই নেই, বোন নেই—এমন যে একটা লক্ষ্মীছাড়া জীব আদিত্য, তার জীবনে লক্ষ্মী এসেছে।

একা-একা থাকত আদিত্য একটা মেস-বাড়ির একটা ছোট্ট ঘরে—ঘরটা ছিল অনেকটা চিলেকোঠার মত। কারো সঙ্গে বেশি মিশতে পারত না, একা-একাই থাকত। অনেকটা নিঃসঙ্গই ছিল সে।

তাদের মেসেরই বাসিন্দে বিপিন-বিহারীবাবু ছিলেন মেসের প্রায় সকলেরই অভিভাবকের মত। তাঁরই উদ্যোগে বন-হুগলীর এই পরমাসুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল আদিত্যর।

মেসবাড়ি ছেড়ে পটলডাঙায় একটা দেড় কামরার বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেস-জীবনে ইস্তফা দিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করল আদিত্য।

সে আজ বারো বছর আগের কথা।

নতুন সংসার বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে তারা আরম্ভ করল জীবন। দুটি প্রাণীর পক্ষে এই দেড়খানি ঘর অনেক। মেসে তার একার যে-খরচ পড়ত, প্রায় সেই খরচেই তাদের দুজনের বেশ কুলিয়ে যেতে লাগল। অতএব বেশ সচ্ছল সংসারই বলা যায়।

কিন্তু অবস্থা ক্রমশই কেমন জটিল হয়ে উঠতে লাগল। বছর-তিনেকের মধ্যেই হল একটি বাচ্চা, তার দু বছর পরে আর একটি, আবার বছর-আড়াই বাদে আর একটি।

যে দেড়খানা ঘর ছিল অনেক, সেই জায়গাই এখন যেন হয়ে দাঁড়াল পায়রার খোপ। যে আয়ে কুলিয়ে যেত বেশ সচ্ছল ভাবেই, সাত-আট বছরে আয় কিছু বাড়া সত্ত্বেও প্রত্যহ লেগে গেল অনটন। যে আয় বাড়ল, তা কারো গায়ে লাগল না। কেবল আয়ই যে বাড়ল এমন নয়, সেই সঙ্গে জিনিসপত্রের দামও বাড়ল অনেক।

চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগল আদিত্য।

রাজলক্ষ্মী কোলের মেয়েটাকে পাথাল-কোলে ফেলে তাকে বার্লিজল খাওয়াচ্ছিল, ছেলেদুটি পাশের ছোট ঘরটায় হুটোপাটি করছিল। চৌকির কোণে উদাসভাবে বসে আদিত্য অনেকক্ষণ দেখল দৃশ্যটা। তারপর একটা শব্দ করল, 'হুঁ!'

ঝিনুক বাজিয়ে-বাজিয়ে মেয়েটাকে শান্ত করছিল রাজলক্ষ্মী। হঠাৎ আদিত্যর ঐ শব্দ শুনে বলল, "কি হল?"

উঠে দাঁড়াল আদিত্য, বলল, "না, কিছু না।"

আদিত্য একটু কবিত্বই করল বুঝি, একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে আবৃত্তি করল দেড়টি লাইন: "দারিদ্র্য অসহ—পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ।"

"ওর মানে কি? জায়া মানে কি গো।"

আদিত্য দুঃখের হাসি হাসল, বলল, "জায়া মানে তুমি। জায়া মানে জ্বালা। এর থেকে আমার সেই মেসের জীবনই ছিল ভালো। ঐ বিপিনবাবুই যত নষ্টের মূল। কেন, বনবাদাড় থেকে সোনার টিয়ে ধরে আনবার দরকারটা কি ছিল তাঁর। বন-হুগলী—"

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য হয়ে গেল। এভাবে তার সঙ্গে কখনো তো কথা বলেনি আদিত্য। আজ তার হঠাৎ হল কি?

হঠাৎ কিছু হয়নি আদিত্যর। কিছুদিন থেকেই সে মনে-মনে গুমরাচ্ছিল। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার কথা সে মানে, কিন্তু দুধের বদলে বার্লিজল দিয়ে যে বাচ্চার পেট ভরাতে হবে, এ-কথা কখনো সে ভাবেনি। আজ ঐ দৃশ্যটা দেখতে-দেখতে তার শরীর জ্বলে উঠল, মাথায় আগুন চেপে গেল। মুখ দিয়ে অনেক কথা একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

কোল থেকে নামিয়ে মেঝের উপর বাচ্চাটাকে শুইয়ে দিয়ে কেঁদে ফেলল রাজলক্ষ্মী, বলল, "আমাকে জ্বালা বললে। আমাকে বন থেকে নিয়ে এসেছ বললে। আমাকে অপমান করলে। কই, কখনো তো এমন কথা আগে বলতে না। কি দোষ করলাম আমি?"

বিরক্ত হয়ে আদিত্য বলল, "গেঁয়ো মেয়ের মত অমন প্যান-প্যান করে কেঁদো না। চুপ করো।"

চুপ করল রাজলক্ষ্মী। চুপ করে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু তার শরীর যেন জ্বলে-পুড়ে যেতে লাগল।

আদর্শ পরিবার আদিত্যর। তিনটি সন্তান তার—দুই ছেলে, এক মেয়ে। কিন্তু এই আদর্শে এগুলো কতটা? এইটেই সে ভাবে কেবল। নিজের উপরেই তার রাগ হয়, নিজের আচরণের জন্যে অনুতাপও তার হয়। রাগের মাথায় অনেক কথা বলে সে রাজলক্ষ্মীকে; কিন্তু রাজলক্ষ্মী নিশ্চয় বোঝে না যে, এসব কথা সে কেন বলে। তার রাগ যে রাজলক্ষ্মীর উপরে নয়, নিজের ভাগ্যের উপরেই—এত কথা গুছিয়ে সে বলতে পারে না। তার ফলে তাকে ভুল বুঝতে আরম্ভ করে রাজলক্ষ্মী। সংসারের আবহাওয়াটা যতটা তেতো হয়ে উঠবার কথা, তা হয়ে ওঠে।

দিন কেটে যায় এইভাবে। বছরও কাটে। সংসারের শান্তি বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। যদি-বা যায় তার দামও খুব চড়া।

অপরাধীর মত মুখ করে রাজলক্ষ্মী নিজের কাজ করে যায়, ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

আদিত্যর চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, রাজলক্ষ্মী আছে ঠিক আগেরই মতন। সেই আগের মতই গঠন, আগের মতই গড়ন। ব্যাপারটা মজারই বটে। আড়চোখে এক-একবার নিজের স্ত্রীর চেহারাটা সে চুরি করে দেখে নেয়, যেন পরস্ত্রীর রূপ দেখে নিচ্ছে, এইরকম সতর্ক ভাবে।

একদিন রাজলক্ষ্মী বলে ফেলল কথাটা।

সন্ধ্যার সময় আদিত্য ফিরল আপিস থেকে, তাকে চা আর পাঁপড়-ভাজা দিল রাজলক্ষ্মী। ঘরের এক কোণে বসে-বসে আদিত্য খাচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে বিছানার চাদর পাততে পাততে রাজলক্ষ্মী বলল, "আমি একটা চাকরি নেব।"

চমকে ওঠবার মতই কথা। আদিত্য একটু চমকাল। কিন্তু কিছু বলল না। অনেকক্ষণ পরে শব্দ করল "হুঁ!"

রাজলক্ষ্মী বলল. "সত্যি বলছি কিন্তু। ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে হবে না? ইস্কুলে ভর্তি করতে হবে না?"

পেটে বোমা মারলে যার মুখ দিয়ে ক অক্ষর বের হয় না, সে করবে চাকরি। কত লেখাপড়া-জানা ছেলেমেয়ে কাজ পাচ্ছে না, আর উনি পাবেন কাজ।

"আমি কিন্তু কথা দিয়ে দিয়েছি। কাজটা নেব।"

আকাশ থেকে পড়ল আদিত্য, কাজ যে দেবে কথা দেওয়ার অধিকার তার—এই তো জানে আদিত্য। কিন্তু এ আবার কি বিপরীত কথা! কথা দিয়ে দিয়েছে রাজলক্ষ্মী!

আদিত্য জিজ্ঞাসা করল, "কি কাজ?"

"দুধের কাজ।"

"তার মানে?"

"দুধ বেচব। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে দুধের খদ্দের জোটাব। মানিকতলায় একটা খাটাল আছে—"

ধমক দিয়ে বাধা দিয়ে উঠল আদিত্য, বলল, "ওকে খাটাল বলে না। ওকে বলে ডেয়ারি।"

"তা হবে। আমি ঐ কাজ নেব।"

কিছুক্ষণ ভাবল আদিত্য, তারপর বলল, "ছেলেমেয়েদের দেখবে কে?"

"ওদের ঘুম পাড়িয়ে ঘরে তালা দিয়ে যাব।"

আদিত্য আর কোনো কথা বলল না। কিন্তু ব্যাপারটা তার কাছে খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হল। ওরা বন্দী হয়ে থাকবে এই পায়রার খোপের মধ্যে। কান্নাকাটি করলে, ক্ষিদে পেলে কী করবে ওরা—এ-কথা রাজলক্ষ্মী ভেবে দেখেছে তো?

রাজলক্ষ্মী কতটা কি ভেবেছে তা বোধহয় রাজলক্ষ্মী নিজেও জানে না। সে একটু মরীয়া হয়ে উঠেছে। তাকে বাঁচতে হবে, বাচ্চাদের বাঁচাতে হবে। সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। তারই চেষ্টায় সে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

রোদেশরোদে ঘুরে বাড়িতে-বাড়িতে গিন্নীদের কাছে গিয়ে হাজির হয় রাজলক্ষ্মী।

মেয়েটি বেশ সরল, শহুরে-পনা নেই একটুও। কোনো কোনো গিন্নী তার কথা শুনে হাসে, কেউ-বা তার চেহারার তারিফ করে, কেউ কর্তার সঙ্গে কথা না বলে পাকা কথা দিতে চায় না। কিন্তু তার হাঁড়ি-হেঁশেলের কথা শোনার জন্যে আগ্রহ দেখায় খুব। 'ছেলেমেয়ে ক'টি, কর্তা কি কাজ করে' ইত্যাদি প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু বেশ সন্দেহের চোখেই তাকায় তার দিকে।

রাজলক্ষ্মী অকপটেই নিজের সব কথা বলে, কিন্তু তার কথা সকলে তেমন-যেন বিশ্বাস করে না। তারা ঠিক ধরে নেয় এর ভিতর কিছু রহস্য আছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও কিছু কিছু কাজ জোগাড় হয় রাজলক্ষ্মীর। কমিশনের টাকা যখন আদিত্যকে দেয় আদিত্য তখন একটু হাসে, বলে, "তবে রোজগার করতে শিখলে?"

আদিত্যর ঐ কথা বলার ভঙ্গীটা যেন কেমন। আদিত্যর মুখের দিকে সে তাকায়, কিন্তু কিছু বলে না।

বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের এক মহিলার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে রাজলক্ষ্মীর। মস্ত বড় বাড়ি। খুব বড়লোক। কী বন্-বন্ পাখা ঘোরে ঘরে, কী দামী-দামী চেয়ার, কী মোটা মোটা গদি! রাজলক্ষ্মী চেয়ে-চেয়ে দেখে আর অবাক হয়ে যায়। এত শৌখিন মানুষ ইনি, এত টাকার মানুষ কিন্তু এতটুকু দেমাক নেই। বলেন, "ঐ দ্যাখ্ না, বাগানের দিকে দু-তিনটে ঘর খালি পড়ে আছে, দরকার হলে আসবি, ওখানেই থাকবি। ভাড়া গুনতে কষ্ট হলে ভাড়া গুনবি কেন খালি খালি?"

পথে ঘুরতে ঘুরতে যখন তেষ্টা পায়, তখন ঐ বাড়িতে এসে সাদা-আলমারীর ঠাণ্ডা জল খায় রাজলক্ষ্মী।

মহিলাটি বলেন, "লক্ষ্মী! লক্ষ্মী মেয়ে! দুধের কাজে কেমন পাচ্ছ বাছা?"

একটু বাড়িয়ে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু তা পারল না, সত্যি কথাই বলল রাজলক্ষ্মী, বলল, "দেড় টাকা মতন হয়।"

"আহা হা! ঐ টাকায় কি হবে? আর অন্য রাস্তাই বা কই!"

রাজলক্ষ্মীও ভাবে ঐ কথাই। যদি পাওয়া যেত আরো কোনো রাস্তা, তাহলে সে চেষ্টা করত। রোজগার করার জন্যে কতজনই তো কত কষ্ট করে। কোনোরকম কষ্ট করতে সে অরাজী না। সে চায় টাকা। সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চায় রাজলক্ষ্মী। সংসারের শ্রী ফিরিয়ে আনতে চায়।

পঞ্চানন ঘোষ লেনে এর আগেও কয়েকটা বাড়িতে সে গিয়েছে। আজ আবার সে ঐ গলিটার মধ্যে ঢুকল। ঘরে-ঘরে দরজা বন্ধ। কড়া নেড়ে নেড়ে সে অনেককে বিরক্ত করল। কাজ তো হলই না, গালমন্দ খেয়ে চলে আসছে, এমন সময়ে সামনের বাড়ির জানলা দিয়ে একজন ভদ্রলোক উঁকি দিয়ে তাকে দেখলেন। বললেন, "কি চাই?"

রাজলক্ষ্মী থমকে দাঁড়াল, ভদ্রলোক তাকে ইশারা করে অপেক্ষা করতে বললেন, তারপর দরজা খুলে দাঁড়ালেন। কানের কিনারে চুলে পাক ধরেছে, মুখে পাইপ, পরনে পাজামা।

রাজলক্ষ্মী এগিয়ে গেল। ভদ্রলোক তার আপাদমস্তক বেশ ভালোভাবে দেখলেন, তারপর বললেন, "কিছু বেচতে এসেছ নাকি?"

রাজলক্ষ্মী সংক্ষেপে বলল, "দুধ।"

"হোয়াট? কি বললে?"

রাজলক্ষ্মী বিস্তারিতভাবে বলল সব কথা।

ভদ্রলোক বললেন, "আচ্ছা দেখব। ধর্মতলার দিকে যেতে পারবে? ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, যদি পার ওখানে এস বিকেল তিনটে-চারটের সময়, একটা ব্যবস্থা হবে।"

রাজলক্ষ্মীকে তিনি ঘরের মধ্যে ডেকে নিলেন। মস্ত টেবিলের ওপাশে গিয়ে বসে টেবিলের আলো জেলে ঘরের অন্ধকার একটু পাতলা করে নিলেন। বললেন, "ইউ মাস্ট হ্যাভ এ বেটার জব।"

নিজের মনেই কথা বললেন তিনি, তারপর রাজলক্ষ্মীর হাতে ঠিকানাটা দিয়ে বললেন, "আমার নাম বি বি বর্কসি। ওখানে গিয়ে বলবে বক্সি সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওখানে আমার স্টুডিয়ো আছে। ভালো কাজ তোমাকে পেতে হবে।"

কিছুই বুঝল না রাজলক্ষ্মী, কিন্তু আশায় তার বুক ভরে উঠল।

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে একটা সিঁড়িতে পা দিয়ে একবার সে পিছন ফিরে তাকাল। বি বি বর্কসি তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। খুব ভালো লাগল রাজলক্ষ্মীর, ভদ্রলোক লোকটি যে ভালো, এতে তার কোনো সন্দেহ নেই। ক'জন আছে এ সংসারে যারা নাকি নিজের থেকে ডেকে নিয়ে এমন আশ্বাস দিতে পারেন! ধর্মতলায় সে যাবে, সেখানে গেলে নিশ্চয় বেশ বড়-রকমের অর্ডার পাবে সে।

বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট এখান থেকে একেবারে কাছে। সেখানে সে গেল তার মনোদির কাছে। মহিলাটির নাম আগে বলা হয়নি, তাঁর নাম মনোরমা। রাজলক্ষ্মী তাঁকে কিছুদিন থেকে দিদি বলছে, বলছে—মনোদি।

মনোদির কাছে গিয়ে হাজির হয়ে সে বলল, "জানেন, এবার খুব বড়-একটা অর্ডার পাব।"

খুঁটিনাটি করে সব কথা এখনই সে বলল না, তার ইচ্ছে—কাজটা আগে পেয়ে নিয়ে তার পর সব কথা খুঁটিনাটি করে বলা।

আদিত্যকেও সে সব কথা বলেনি, কেবল বলেছে, "দেখ-না, এবার একটা মস্ত অর্ডার পাব।"

কথাটা শুনে আদিত্যর উল্লাস ক'রে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু সে মুখ ভার ক'রে গম্ভীর হয়ে শুনে কেবল বলল, "হুঁ!"

কী যে হয়েছে আদিত্যর তা ভগবানই জানেন। কেবল গম্ভীর হয়ে থাকতে শিখেছে, কেবল রেগে উঠতে শিখেছে—এ ছাড়া আর যেন ওর কাজ নেই।

কয়েকদিন ধরে আদিত্য কেমন-যে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে রাজলক্ষ্মীর দিকে। হঠাৎ সেদিন বলেই ফেলল আদিত্য, "কি, ব্যাপার কি! চোখে-মুখে একটু যেন জেল্লা দেখছি, ভ্যানিটি ব্যাগ কেনা হয়েছে দেখছি। বেশ দু হাতে টাকা লুটছ বলে মনে হচ্ছে যেন! বাচ্চাদের জন্যে তো বেশ জামা ফ্রকও এনেছ দেখছি। এত পাচ্ছ কোত্থেকে?"

রাজলক্ষ্মী একটু ঢোক গিলে নিল, বলল, "ঐ যে বললাম সেদিন, বললাম-না বেশ মোটা কাজ পাব। সে কাজ পেয়েছি।"

"সংসারের অবস্থা তবে একেবারে পাল্টে দেবে বলেই ঠিক করেছ। কি বল! যত-সব।"

রেগে উঠল রাজলক্ষ্মী, রেগে সে বড় একটা ওঠে না, কিন্তু আজ সে রেগে উঠল, বলল, "অক্ষম লোকরা একটু হিংসুকই হয়।"

"কি বললে?" অগ্নিশর্মা মূর্তি ধ'রে দাঁড়াল আদিত্য।

ঘরের কোণে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসল ছেলেমেয়েরা। তাদের মুখের দিকে চেয়ে রাজলক্ষ্মীর কান্না পেল। যাদের জন্যে সে এত কষ্ট করে চলেছে, সব লজ্জা সব সংকোচ ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছে, তাদের যদি সুখী করতে সে না পারল, তাহলে মিথ্যাই তার এই চেষ্টা, মিথ্যা তার এত কষ্টস্বীকার।

মনোদিকে সে আগেই কিছু-কিছু বলেছে, আজ গিয়ে সে সব কথা খুলে-মেলেই বলল। বলল, "জানেন, মনোদি, কাজটা শুনতে খারাপ, কিন্তু কাজটা কি সত্যি খারাপ? ওখানে সকলেই বেশ ভদ্র, কেউ কোনোদিন এতটুকু অশ্রদ্ধা করেনি, অসম্মান করেনি, এতটুকু বেয়াড়াপানা করে না। প্রথম-প্রথম একটু লজ্জা করত, কিন্তু ক্রমে তা কেটে গিয়েছে। এখন বেশ সহজেই পারি—"

মনোদি বললেন, "আজ খুলে বললে, সব বুঝলাম। কিন্তু যখন আবছা করে ঝাপসা করে বলতে—তখনই কি বুঝতে পারিনি? খুব পেরেছি। তোমার শরীরের যা গড়ন, আর যা গঠন—আমারি ইচ্ছে হয়, আমিও ছবি আঁকি।"

কথাটা বলেই মনোদি সোফার মধ্যে গড়িয়ে পড়লেন, হাসতে লাগলেন। বললেন, "বাড়িতে খুব অশান্তি বেধেছে তো? ওসব কিছু না। স্বামীকে একটু বেশি করে আদর করবি, বুঝলি? ওতেই ওদের মন গলে যাবে। বউয়ের কাছে হেরে যাচ্ছি দেখলেই স্বামীরা ক্ষেপে যায়। ও কিছু না।"

কিন্তু ও কিছু না কেন। ওটা যে ভীষণ কিছু!

সেদিন রাজলক্ষ্মীর ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছে। ফিরে এসে দেখে খাঁচার বাঘের মত রাস্তায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে আদিত্য। দরজায় তালা দেওয়া, ছেলেমেয়েরা জানলায় বসে। ঘরে ঢুকতে না পেরে আদিত্য ক্ষেপে আগুন হয়ে আছে।

সেই রাত্রেই বেধে গেল কুরুক্ষেত্র। পাড়ার লোক জুটে গেল। লজ্জায় মাথা কাটা যেতে লাগল রাজলক্ষ্মীর। মনে-মনে কি সব প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেলল রাজলক্ষ্মী।

পরদিন আদিত্য আপিসে বেরিয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পরে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে রাজলক্ষ্মী কোথায় চলে গেল কেউ তা জানে না।

দুটি ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল রাজলক্ষ্মী।

কয়েকদিন ধ'রে অনেক খোঁজ করেছে আদিত্য। কিন্তু কোনো কিনারা করতে পারেনি। দিন কয়েক সে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে ছিল, মনে-মনে বলেছিল—'যাক, চুলোয় যাক'; কিন্তু তার পরেই তার রোখ চেপে গেল, খুঁজে সে বা'র করবেই।

আদিত্য উঠে-পড়ে লাগল।

কোনোদিন আপিস কামাই করে, কোনোদিন আপিস থেকে অসময়ে বেরিয়ে পড়ে সে খুঁজে-খুঁজে সারা হয়ে যেতে লাগল। রাজলক্ষ্মীর জন্যে না হোক তার ছেলেমেয়ের জন্যে সে তো একটু ভাববেই। এ কথা রাজলক্ষ্মী একবারও ভেবে দেখল না--এটা আদিত্যর মস্ত আক্ষেপ।

মানিকতলার সেই—যাকে রাজলক্ষ্মী বলেছিল খাটাল—আদিত্য সেখানে গিয়েছে। রাজলক্ষ্মী ওদের কাজ করে সে খবরও পেয়েছে, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর কোনো খোঁজ পায়নি।

হঠাৎ সেদিন দুপুরবেলা মৌলালির মোড়ের কাছে দূর থেকে কাকে যেন দেখতে পেল আদিত্য। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল তার। ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে ঐ তো চলেছে—হ্যাঁ, ঠিক—ঐ তো চলেছে রাজলক্ষ্মী! হঠাৎ চেনা কষ্টই বটে, বেশ চাল হয়েছে, বেশ চটক হয়েছে।

ভিন্ন ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল আদিত্য। অনেকটা হাঁটল। তারপর দেখল, একটা মস্ত বাড়ির গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল রাজলক্ষ্মী।

এক্ষুনি নিশ্চয় কাজ সেরে বেরিয়ে আসবে ভেবে আদিত্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইল। বেরিয়ে এলেই ওকে ধরবে আদিত্য।

কিন্তু কই, বেরিয়ে আসছে না রাজলক্ষ্মী। এক ঘণ্টার উপর হয়ে গেল, তবু সে আসছে না দেখে আদিত্য সাহসে ভর করে ভিতরে ঢুকে গেল।

বিরাট বাড়ি। খুব নিরিবিলি, খুব ঠাণ্ডা। দেয়ালে-দেয়ালে মস্ত মস্ত ফ্রেমে বাঁধানো নানা রকম ছবি। বারান্দায় অনেক পাথরে নারীমূর্তি বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

একতলায় লোকজন নেই। শুধু ঐ মূর্তি, শুধু ঐ ছবি। আদিত্য ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল।

উপরে উঠে বারান্দা পার হতেই দূরে দরজার কাছে কয়েক পাটি জুতো দেখতে পেয়ে সে সেইদিকে এগুলো।

দরজার সামনে পৌঁছে সে অবাক! হতভম্ব হয়ে গেল আদিত্য।

ছোট ছোট টেবিলে বসে কারা মাথা নীচু করে কি সব আঁকছে, আর, আর, আর—অল্প উঁচু প্লাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি নগ্ন নারীমূর্তি। পাথরের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কে এ? নিজেকে বেকুব মনে হল আদিত্যর।

এমন আশ্চর্য সুন্দর দেখতে ঐ মূর্তিটি, অমন ফিগার, অমন ফিচার—আগে কখনো দেখেনি আদিত্য। কখনো তো এর আগে সে লক্ষ্যই করেনি।

আদিত্যর শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগল। মাথাও ঘুরতে লাগল আদিত্যর।

বারান্দায় একটা শব্দ শুনে ঘরের সকলে ছুটে এল বাইরে।

আজ দুপুরের দিকে শিবনাথ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙতে দেখলেন ঘরের ভেতর আলোর রঙ ফিকে হয়ে এসেছে, দেয়ালের গায়ে মলিন রোদ। বাইরে তাকালেন একবার, সজনে গাছের পাতা দুলছে, টুকরো টুকরো মেঘ ভাসছে আকাশে। শিবনাথ আচ্ছন্নের মত দেখতে থাকলেন সব কিছু; ঘরের দেয়াল, সজনে পাতায় বেলাশেষের রোদ আর কার্তিকের মলিন আকাশ। বুকেব ভিতর যেন খুব চাপা শব্দ উঠতে থাকল. কী যেন মনে করতে চেষ্টা করলেন তিনি, ভুলে যাচ্ছেন বারবার, শিবনাথ জানলার পর্দা তুলে দিলেন। কাছে কেউ নেই, থাকলে, জিজ্ঞেস করতেন, হয়ত এক গ্লাস জল খেতে চাইতেন। কিন্তু কিছু করতে যেন ইচ্ছে হচ্ছে না এখন, যেন আসন্ন সন্ধ্যার বিষাদ তাঁর রক্তের ভেতর ছড়িয়ে পড়ছে। চুপ করে বসে রইলেন তিনি।

অন্য দিন ঘুমিয়ে পড়েন না, আজ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বোধহয় ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, খুব অস্পষ্ট, স্বপ্নটা মনে করতে চেষ্টা করলেন। যেন এক নির্জন প্রান্তরে একা দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, জ্যোৎস্নার আলোয় যেন তাঁর হাত-পা সব গলে গলে পড়ছে, সামনেই এক ভাঙা মন্দির...। আর কিছু স্পষ্ট মনে করতে পারছেন না এখন, কেমন যেন অসহায় বোধ করলেন নিজেকে। গলার ভেতরটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে, চোখ জ্বালা করছে। ঘরে হাওয়া নেই, শব্দ নেই, সেই স্বপ্নের প্রান্তরের নির্জনতা এখন ঘরের দেয়ালে, জানলায়, তাঁর বিছানায়...শিবনাথ কী ভয় পাচ্ছেন?......

অন্যদিন বসে থাকেন বারান্দার ইজি-চেয়ারে। মাঝে মাঝে সিগারেট ধরান; ভাল লাগে না, ছুঁড়ে ফেলে দেন, বারান্দার কোণ থেকে টিকটিকি ডেকে ওঠে, নীচে রাস্তা দিয়ে ক্লান্ত লয়ে হেঁকে যায় ফিরিওয়ালা—আইস-ক্রীম-সন্দেশ!...তিনি টের পান সব কিছু। তাঁর মনে হয় সমস্ত দিন যেন দুর্বল রোগীর মত ঝিমিয়ে আছে এই বাড়িটা। পুরনো আমলের বাড়ি। ছাদের কোণ থেকে চড়ুইয়ের ডানার শব্দ শোনা যায়, নির্জন দুপুরে চুন-বালি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে, উঠোনে পাতা ঝরে পড়ে। বুঝতে পারেন লতিকা এখন তার ঘরে ঘুমিয়ে আছে। কোথাও শব্দ নেই, এ বাড়ির কোথাও একটা পা যেন ঘুরে-ফিরে বেড়ায় না, মাঝে মাঝে সিঁড়ির অন্ধকার থেকে বেড়াল ডেকে ওঠে। আর ইজিচেয়ারে বসে বসে দেখেন—সজনে গাছের ডাল থেকে রোদ নেমে এসে এই বারান্দায় আশ্রয় নেয়; বারান্দার রেলিং থেকে পাখি উড়ে যায়। হাওয়ায় ঘরের পর্দা কেঁপে ওঠে, শরীরটাকে আরও শ্লথ করে দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে হলুদ আলোর বৃত্তটি দেখতে থাকেন। চোখ বুজে রোদের গন্ধ টের পান শিবনাথ। বুঝতে পারেন—আর একটু পরেই লতিকার পায়ের শব্দ টের পাবেন তিনি। সদ্য ঘুম ভাঙা লতিকার মুখের দিকে তাকালে শিবনাথ যেন নিজেকে আরও দুর্বল মনে করেন।

—শিবুদা, আপনার হরলিকস খাবার সময় হয়েছে। শিবনাথ তাকিয়ে থাকেন, লতিকার শরীর যেন বিকেলের আলেয় চোখের সামনে জ্বলে ওঠে, শিবনাথের হাত কেঁপে ওঠে। শরীরের সমস্ত কোষে কোষে, চৈতন্যের অতলান্ত প্রদেশে, কী এক দ্রুত ধাবমান উত্তেজনা টের পান তিনি;—বোধহয় যতক্ষণ রোদ আছে ততক্ষণই পরমায়ু আছে আমার...ইচ্ছে হয় লতিকাকে কাছে বসতে বলেন, ইচ্ছে হয় লতিকার হাত বুকের

ওপর তুলে নিয়ে বুকের অতল থেকে উঠে আসা ভয়কে চাপা দেন তিনি।

শিবনাথ বারান্দায় এসে দাঁড়ান। আর আলো নেই। সজনে গাছ থেকে পাখিদের কলরব ভেসে আসে। শিবনাথ ঝুঁকে পড়ে বাস্তব দেখেন। একটি মেয়ের সঙ্গে চোখা-চোখি হল। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, ও কী কারো জন্যে অপেক্ষা করছে? শিবনাথ জানেন, শৈলেন তাঁকে শ্রদ্ধা করলেও লতিকা তাকে ঘৃণা করে, এড়িয়ে চলে তাঁকে। লক্ষ্য করেছেন তিনি। লতিকার চোখের দৃষ্টিতে যেন এক ধরনের অবজ্ঞা আর সন্দেহ মিশে থাকে।

'দিন-রাত ঘরে বসে না থেকে একটু বাইরে ঘুরে আসুন না।'

শিবনাথ বোকার মত , মাথা নাড়েন—'হ্যাঁ, এই যে যাই'।...লতিকা চুলে ফিতে জড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, শিব-নাথের ইচ্ছে হয় ওর চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দেন, ওর পিঠের ওপর হাত রাখেন।

—'বুড়ো বয়সে একটু চলাফেরা করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে'।

—তুমি ঠিকই বলেছ, শিবনাথ হাসেন।

লতিকার সন্দেহকে হেসে উড়িয়ে দেয় শৈলেন।

—'তোমার অকারণ ভয় লতিকা, শিবুদা অন্যধরনের মানুষ'।

লতিকার মুখের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে, 'পুরুষ মানুষের সব জিনিস তোমরা বোঝ না। আসলে......'

সেদিন দুপুরে আমাকে হঠাৎ ডেকে তুলে পোস্টকার্ড চেয়েছিল তোমার ভাল মানুষ দাদাটি।

—তাতে কী, শৈলেন হাসে স্ত্রীর কথায়।

লতিকার যেন দুঃস্বপ্নের মত মনে পড়ে যায় কিছুদিন আগের একটা ঘটনা। বৃষ্টির শব্দ উঠেছিল, জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল ঘরে, আর বৃষ্টির অলস খুশি যেন লতিকার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। শৈলেনের হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছিল লতিকা। তারপর...যেন স্বপ্নের ঘোরে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল লতিকা, শৈলেনের চোখে অপরাধীর ছায়া, অস্বস্তিতে লতিকার গলার ভেতর শুকিয়ে আসে, শিথিল কাপড় তুলে আনে সে, আর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যেন দম ফেলেন শিবনাথ—'বাতের ব্যথাটা বড় কষ্ট দিচ্ছে, আমার মালিশের শিশিটা'...

— সে তো আপনার ঘরে, আলমারির পাশের কুলুঙ্গিতে, লতিকার গলা কর্কশ হয়ে ওঠে।

—তাই তো...তাই তো...বুড়ো মানুষ, কিছু মনে থাকে না আজকাল, খুব মৃদু-স্বরে, যেন ঘুমের মধ্যে ঠোঁট নড়ছে, এমন ভাবে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন শিবনাথ। পেছনে দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়। অন্ধকার বারান্দায় ইজিচেয়ারে ফিরে এসে হাঁপাতে থাকেন শিবনাথ, বুক কাঁপতে থাকে, চারপাশে বৃষ্টির অবিরাম শব্দ...অন্ধকার...তিনি একা।

এখন আর আলোর আভাসটুকুও চোখে পড়ে না। হেমন্তের ছোট বিকেল শেষ হয়ে গেল, বাইরে যেন পাতলা কুয়াশা ইতি-মধ্যেই নামতে শুরু করেছে, পথের মানুষ আর আলাদা করে চেনা যায় না। একটু পরেই করপোরেশানের লোক রাস্তার আলো জেলে দিয়ে যাবে। শিবনাথ বুকের ওপর হাত চেপে ধরেন। এই সন্ধ্যার আকাশ, কুয়াশার আড়ালে ওই গাছপালা এই বাড়ি, সব যেন চোখের সামনে দুলে ওঠে। শিবনাথ শুনতে পেলেন সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। শৈলেন আর লতিকা বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে। প্রসাধনের মৃদু সুবাস পেলেন তিনি। সমস্ত একাগ্রতা চোখে জ্বালিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। লতিকার হাত ধরে ট্যাক্সিতে তুলল শৈলেন, ট্যাক্সির শব্দ হল, দরজা বন্ধ করে দিল লতিকা। শিবনাথের মনে হল লতিকার মুখ আজ যেন বড় বেশি উজ্জ্বল, ওর শাড়ির রঙ বড় বেশি লোভনীয়, ছোট জামা পরেছে লতিকা, বুক পিঠের মসৃণ ভঙ্গি যেন শাড়ির আড়ালে চেপে রাখতে চাইছে না লতিকা। শিবনাথ রেলিং ধরে ঝুঁকে দেখতে থাকলেন। এতবড় বাড়িতে এখন তিনি একা। আবার কী বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বেন তিনি। বড় দুর্বল মনে হল নিজেকে, ইচ্ছে হয় কোথাও বসে এখন বিশ্রাম করেন, তাঁর তপ্ত কপালে কারও নরম হাত নেমে আসুক শিবনাথ ঘুমোতে চান সেই নির্ভয় আশ্রয়ে মাথা রেখে।

স্পন্দমান, ঘনিষ্ঠ দুটি শরীর নিয়ে ট্যাক্সিটা এতক্ষণে বড় রাস্তা ছাড়িয়ে বোধ-হয় অনেক দূরে চলে গেছে; অনেক দূরে—যেখানে এই ক্লান্ত বিকেলে যাবার সাহস নেই তাঁর। মুখের ওপর হাত এনে শরীরে উত্তাপ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন তিনি। মুখে হাওয়া লাগছে, চোখ বুজে ভাবতে থাকেন—এখন ড্রাইভারের স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টির আড়ালে হয়ত শৈলেনের হাত লতিকাকে স্পর্শ করছে—আকাশের সমস্ত রঙ যেন এখন লতিকার শাড়িতে জ্বলে উঠেছে, লতিকা কী আকাশ দেখছে এখন?...

—এই, কী হচ্ছে, সামনে ড্রাইভার রয়েছে না?......

শিবনাথ যেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনার সম্মিলিত হাসির শব্দ শুনতে পান। এই তো সময়; এখন শৈলেনের সমস্ত শরীরে যেন এক সর্বনাশ পাক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

যাঃ একেবারে যেন রাক্ষস! লতিকা হেসে ফেলে শৈলেনের ছেলেমানুষী দেখে।

—কোথায় কর্কশ শব্দে একটা গাড়ি থেমে যায়, শক্ত হাতে রেলিং ধরে শিবনাথ যেন নিজেকে সামলে নেন। নাঃ এ অন্যায়, এভাবে ভাবা আমার উচিত নয়, শৈলেন আমার—

একটু একটু যেন শীত করছে শিবনাথের। চোখ জ্বালা করছে, মুখের ভেতর যেন কোন স্বাদ নেই। কার্নিশের ওপরে একটু আগে যে দুটি পাখি এসে বসেছিল, তারা আবার উড়ে চলে গেল। দিন-শেষের অবসাদ যেন ঘুমের মত জড়িয়ে ধরছে শিবনাথকে। নীচের দিকে তাকালেন একবার—রোজ যে লোকটা পথের আলোগুলো জ্বালাতে আসে, মই কাঁধে সেই লোকটাকে হেঁটে যেতে দেখলেন শিবনাথ, ইচ্ছে হল, একবার ছুটে গিয়ে লোকটাকে বলেন—সব ঝাপসা হয়ে আসছে, আমাকে একটা আলো দিতে পারো? আমি চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখবো...চোখের সামনে...

সিঁড়িতে কী পায়ের শব্দ হচ্ছে? কেউ কী ওপরে উঠে আসছে? শিবনাথ চমকে ওঠেন। যদি লতিকার বন্ধু হয়?...মনে পড়ল একদিন দুপুরে একটি মেয়ে এসে-ছিল, লতিকা বাড়ি ছিল না, মেয়েটাকে বড় পরিচিত মনে হয়েছিল তাঁর।

লতিকা হয়ত এখুনি এসে পড়বে, তুমি বসো...শিবনাথ টের পেয়েছিলেন মেয়েটির অস্বস্তি বাড়ছে: 'না , থাক, অন্য আর একদিন আসবো, লতিকাকে বলবেন...' এখন আর মেয়েটির নাম মনে করতে পারলেন না তিনি, শুধু মনে পড়ল, মেয়েটির চিবুকে যেন কী গোপনতা লেগে ছিল, তিনি কী হাত ধরেছিলেন তার?... তবে কী সে বুঝতে পেরেছিল, কী চাইছেন শিবনাথ?

রাস্তার উল্টোদিকের মুখোমুখি বাড়িটার দিকে চোখ পড়ল তাঁর। জানলার পর্দা নেই। শিবনাথ আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন সেই জানলার দিকে। রোজ তাকান। ঠিক এই সময়, এইখানে দাঁড়িয়ে। শিবনাথ জানেন জড়পিণ্ডের মত এখনও মেয়েটি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কী যেন নাম তার, মল্লিকা? করবী? স্বপ্না?...শিবনাথের হাসি পেল। এক আশ্চর্য পরিচয় আছে তাদের দুজনার মধ্যে। 'কেমন আছেন আপনি?' দেখা হলেই মেয়েটি কুশল সংবাদ নেয়। অথচ, এখন এই বারান্দায় রেলিং ধরে তিনি যেন কী সব অপেক্ষায় আছেন। তিনি জানেন, অনেক

রাত করে মেয়েটি বাড়ি ফেরে, সিঁড়িতে ওঠবার সময় তার পা ঠিক থাকে না, শিবনাথ টের পান সেই মধ্যরাতে বাথরুমে জলের শব্দ, মেয়েটি তখন স্নান করে। আর এখন এই অবেলায় অকাতরে ঘুমিয়ে আছে সে। তন্ময় হয়ে দেখতে থাকলেন শিবনাথ, শরীরের প্রতিটি রেখা, বাহুর ভঙ্গিতে যেন এক অলসতার ঢল নেমেছে মেয়েটির। শিবনাথের বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে রক্তের ভেতর ছুটে যায়। রেলিং-এর ওপর হাত আরও ছড়িয়ে দেন, যদি পারা যেত, যদি পারা যায়, ওই চুলের অন্ধকারে নিজের অস্তিত্বকে ডুবিয়ে দিতে...। লক্ষ্য করলেন তিনি মেয়েটির একটি পা বিছানা থেকে ঝুলে পড়েছে, বুক পাশে হেলে যেন বড় অসমান হয়ে গেছে, একটা হাত ছড়ানো বুকের ওপর। শিবনাথ ঠোঁট স্পর্শ করেন, বারান্দায় পায়চারী শুরু করেন. এখন শুরু হয়ে গেছে. সেই পুরনো খেলা শুরু হয়ে গেছে তার দেহের প্রতিটি কোষে কোষে।

মাঝে মাঝে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে মেয়েটি। শিবনাথ দেখেছেন আকাশের আলোয় তার মুখ যেন আশ্বিনের প্রতিমার মত উজ্জ্বল।

—ভাল আছেন? হাসছে মেয়েটি।

শিবনাথ মাথা নাড়েন।

—আজ বেরোলেন না, একা বুঝি? লতিকা বৌদি বুঝি বাড়ি নেই?

শিবনাথ অন্যমনস্ক, কথা খুঁজে পান না।

—আপনার ব্যথাটা এখন কেমন?...

ঘামতে শুরু করেন তিনি, ইচ্ছে হয়, এই দেয়াল ভেঙে, কোথাও ছুটে যান, কারো নাম ধরে চীৎকার করে ওঠেন। কী হয়, যদি এখন তিনি মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়ান?...যদি বলেন—আমাকে তোমার ভয় করে না? যদি বলেন—চল এখন কোন প্রান্তরের শেষসীমায় যেখানে মন্দিরের ঘন্টার শব্দ বাজছে, যেখানে সূর্যের রঙ ছড়িয়ে আছে যুবতীদের শরীরে, মুখের রেখায়, সেইখানে আমরা চুপ করে বসে থাকি?...না না—হয় না...কিছুতেই হয় না, শিবনাথ নিজের ভুল বুঝতে পারেন। মেয়েটির ঘরে গেলে হয়ত হেসে বলবে, বসুন, বাবাকে ডেকে দিচ্ছি, কিম্বা বলবে—জল খাবেন আপনি?...

দেয়ালগুলো যেন চোখের সামনে নড়ে উঠলো। হাওয়ায় শীত। বুকের মধ্যেও কী কুয়াশা উঠে আসছে?...তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলেন শিবনাথ। সমস্ত ঘরে পাতলা অন্ধকার, হাওয়ায় ক্যালেন্ডারে শব্দ চলছে। আলো জ্বাললেন তিনি। শিবনাথ দম নিলেন, জল খেলেন গ্লাস থেকে। আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন শিবনাথ, ঝুঁকে পড়ে কী যেন খোঁজার চেষ্টা করলেন। ছায়া দুলে উঠল : আর কেন শিবনাথ, বুঝতে পারছ না বেলা পড়ে গেছে, সাতান্নটা বছর চলে গেছে। শিবনাথ দেখতে থাকেন নিজেকে, বড় অপরিচিত মনে হয়, কার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি?...চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, চোখের রঙ এখন ধূসর, কানের দু পাশ শাদা হয়ে গেছে, আর সেই মুহূর্তে শিবনাথের মনে হল ঘরে হাওয়া নেই, কোন শব্দ নেই, যেন এক অন্ধকার গুহায় কে তাকে ফেলে রেখে গেছে, দেয়ালগুলো এত বড় কেন? আলোটা ক্রমাগত দুলছে কেন? 'শিবনাথ, বুঝতে পারছ না সাতান্নটা বছর...'

এখন মনে পড়ল কাল রাতে তাঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, চোখ মেলে তাঁর মনে হয়েছিল যেন তিনি একা সমুদ্রে ভাসছেন। শুনতে পেয়েছিলেন পথ দিয়ে শবযাত্রা চলে যাচ্ছে। শিবনাথ উঠে বাইরে এসেছিলেন, কিছু দেখতে পান নি তিনি। শুধু একটা শব্দের তরঙ্গ তাঁর ঘরে, বিছানায়, শরীরের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল আলো জ্বালতেও ভয় হয়েছিল তাঁর এখন কার্তিকের শেষ, হাওয়ায় বেশ হিম ঝরছে, তবু যেন তাঁর গরম লেগেছিল, মনে হয়েছিল—দেয়ালের পাশ থেকে উমা হেসে উঠল; সুরেমার কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলেন শিবনাথ। একের পর এক যেন স্বপ্নের দৃশ্য ভেসে যায় চোখের ওপর দিয়ে। তাড়াতাড়ি ছাদে চলে এলেন তিনি।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় দেখতে পেলেন শৈলেনের ঘর বন্ধ। শৈলেন ঘুমিয়ে আছে। লতিকা ঘুমিয়ে আছে। মনে হয়, বাড়িটাও আর জেগে নেই। শুধু তিনি একা ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন, বড় দীর্ঘ সময় যেন তিনি জেগে আছেন। বড় দীর্ঘ সময়...

বুঝতে পেরেছিলেন, এখন মধ্যরাত্র। কার্তিকের কুয়াশা আর মৃদু জ্যোৎস্নার গন্ধ পাচ্ছিলেন তিনি। মিহি জ্যোৎস্নার আলোয় যেন তাঁর শরীর ভাসতে থাকল। হাত, পা, মুখ সব...নীচে তাকালেন, নির্জন পথ। আকাশ যেন অনেক নেমে এসেছে। চোখ বুজলেন শিবনাথ। সব মনে পড়ে যায়; মনে পড়ছে এখন।

তাঁর কথা শুনে মা হেসে ফেলেছিলেন। 'তুই উমার কথা বলছিস? ও তো তোর চেয়ে পাঁচ-ছ বছরের ছোট, এখনো একলা শুতে ভয় পায়। আর উমাকে বলেছিলেন—তোর শিবুদা আবার রাগ করবে কী রে? ও তো একদম ছেলেমানুষ, আমাকে এখনো ভাত মেখে দিতে হয়। জানিস, শিবু ক্লাসের সবচেয়ে সেরা ছাত্র, পরীক্ষায় বরাবর ফার্স্ট হয়।"

এখন পরিষ্কার মনে পড়ে না, উমা কেন তাঁদের বাড়িতে ছিল। বোধহয় মার কাছে শুনেছিল কী রকম যেন দূর-সম্পর্কের একটা আত্মীয়তা আছে ওদের সঙ্গে। এতদিন সে এক নিজের জগতের মধ্যে যেন ঘুমিয়ে ছিল। এতদিন।...

উমা বলত—'এই যে ভাল ছেলে, দিন-রাত পড়লে অসুখে পড়বে যে?...'

—না পড়লে মানুষ হব কী করে?

—বাবা, কী শক্ত শক্ত কথা!...আমাকে একটু অঙ্ক শিখিয়ে দেবে? অঙ্কে আমি একেবারে রসগোল্লা...উমা চোখ ছোট করে তাকিয়েছে তার মুখের দিকে।

—'বেশ দেবো', শিবনাথ জবাব দিয়েছে। মনে পড়ছে, একবার ভাদ্র মাসের ভরা নদীতে প্রায় ভেসে যাচ্ছিল উমা। ভাল সাঁতার জানত না; জল থেকে যখন উমাকে তুলে এনেছিল সে তখন...

পরে উমা এক সময় জানতে চেয়েছিল—আমি যদি মরে যেতাম?...

—মরবে কেন? ছোট জবাব দিয়েছিল সে।

আর এখন মনে পড়ে সেই নির্জন দুপুরে, যখন চারিদিক নিঝুম দেখে কাঠ-বেড়ালি নেমে এসেছিল মাটিতে, যখন শূন্যে চিলেরা ঘুরপাক খায়, তখন চিলেকোঠার ঘর থেকে উমা তাকে ডেকেছিল,—এই অঙ্কগুলো একটু বুঝিয়ে দেবে? শিব-নাথের শরীর এখন যেন কেঁপে উঠলো; কী করেছিল উমা?...

শিবনাথ কিছু বোঝার আগেই তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিল উমা—তুমি একটা...তুমি... তুমি...বুকের মধ্যে মাথা লুকিয়েছিল উমা। আর বিহ্বল শিবনাথের মনে হয়েছিল চার-পাশে হাওয়া নেই, পৃথিবী যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে তার চোখের

সাজসে। টের পেয়েছিল তার শরীরের মধ্যে উমার শরীর যেন গলে যাচ্ছে ক্রমশ, মুখ দিয়ে চোখ দিয়ে যেন আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপ ছুটে যাচ্ছে, মনে হয়েছিল, সে যেন স্বপ্নের ভেতর ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছিল সে।

কিন্তু কিছুই শেষ পর্যন্ত গোপন থাকে নি। থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ শিবনাথ জেনে গিয়েছিল সে পুরুষ, আর উমা বুঝতে পেরেছিল কেন সমস্ত দুপুর শিবনাথ বাগানে শুয়ে থাকে। কিন্তু উমাকে শেষ পর্যন্ত চলে যেতে হয়েছিল। মা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মনে আছে, উমা প্রথম দিনের মতোই সহজ গলায় বলেছিল—তোমার ভালই হল। গুড বয় তুমি, মন দিয়ে পড়াশুনো করে একদিন একটা রঙিন পুতুল নিয়ে এসো ঘরে. আমার মত বোকা মেয়ে দিয়ে তোমার...

কোথায় কুকুর ডেকে উঠলো। শিবনাথ বুঝতে পারলেন, তিনি এখন মধ্যরাতে একা ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। কোথায় আছে উমা? বেঁচে আছে?... এখন কী খুব মোটা হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে?... শিবনাথ অনেকটা হাওয়া টেনে নিলেন বুকের মধ্যে।

কিন্তু একদিন নির্জন দুপুরে যে সর্বনাশ তার রক্তের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রচণ্ড জ্বালা নিয়ে কলকাতায় পড়তে এসেছিল সে। সে ভাল ছেলে, তাকে মানুষ হতে হবে। শিবনাথ যেন বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল একটু একটু করে। কোনো মেয়েকে দেখলে বুক কাঁপতো তার ; কথা বলতে গেলে শরীর ঘেমে যেতো, রাতে ঘুম ভেঙে যেতো, মনে হতো দরজার আড়াল থেকে উমা হাসছে—এই যে গুডবয়, তোমার সাহস জানা আছে আমার! মায়ের মাথা ভাত খেয়েই জীবন কাটিয়ে দাও তুমি।...আমি হেরে গেছি, ভয়ানকভাবে হেরে গেছি।... চীৎকার করে উঠতো সে। জানলায় হাওয়া, ঘরে অন্ধকার। আর কিছু নেই।

বন্ধু পরিতোষ বলেছিল, চল, সামনে ছুটি আছে, বেড়িয়ে আসবি আমাদের দেশের বাড়িতে। তোর ভাল লাগবে, তাছাড়া আমার বোন সুরমা খুব ভাল গান গায়। দিনগুলো বেশ কাটবে, সারাদিন 'মেসে'র অন্ধকারে একা থাকিস তুই...মনে মনে শিবনাথ হেসেছিল। এইবার আমি প্রস্তুত। আমার আর কোনো ভয় নেই।

পরিতোষ আলাপ করিয়ে দিয়েছিল—আমার বোন সুরমা; আর এ আমার বন্ধু শিবনাথ, খুব ভাল ছাত্র চমৎকার এসরাজ বাজায়।... সুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে শিবনাথের হঠাৎ মনে হয়েছিল শ্রাবণের সন্ধ্যার ক্লান্ত বিষাদ যেন ছড়িয়ে আছে সেই মুখে, কী রকম যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে; তারপরই চোখে পড়েছিল সুরমার মসৃণ হাত, সুরমার বুক যেন ভরে আছে গোপন বেদনায়। শুধু মুখে হেসে বলেছিল, 'পরিতোষ কিন্তু এখানে আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে আপনার গান শোনাবে বলে।'

সত্যিই দিনগুলো বড় সুন্দর লেগেছিল তখন। নৌকোতে তারা তিনজন নদীতে বেড়াতে যেতো বিকেলে। বর্ষার দুরন্ত নদী। ঘুরতে ঘুরতে জল কোথায় চলে যায়, মাঝে মাঝে পাড়ের মাটি ভেঙে পড়ার শব্দ. অনেক দূরে দুয়েকটি নৌকো দেখা যায়, ওপারের গাছপালা সব যেন ছবির মতো মনে হয়, সমস্ত আকাশে সজল মেঘ, তার ছায়া পড়েছে জলে, সুরমা গান শুনিয়েছিল —'আমার সকল রসের ধারা

তোমাতে আজ হোক না হারা'...

পরিতোষকে প্রশ্ন করেছিল—'তোদের এদিকে শিকার-টিকারের সুযোগ নেই? থাকলে, চল না একদিন ঘুরে আসি। পরিতোষ হেসে উত্তর দিয়েছে—আছে, মাইল পাঁচেক দূরে জলার ধারে, বুনো হাঁস আর হয়তো মাঝে মাঝে দু' একটা হরিণের দেখা মিলতে পারে।

আর শিবনাথকে শিকারে গিয়ে গুলী করতে দেখে সুরমা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করেছিল—'আপনি রক্ত এত ভালবাসেন?' শিবনাথ কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখেছে সুরমাকে, তারপর হেসে বলেছে, হ্যাঁ, এসরাজে 'জয়জয়ন্তী' বাজাতে ভালবাসি আবার মৃত্যুযন্ত্রণায় গুলীবিদ্ধ পাখিগুলো যখন ছটফট করতে থাকে, আমার তখন হাততালি দিতে ইচ্ছে করে......

মনে আছে, সুরমার হাত চেপে ধরে কাতরকণ্ঠে বলেছিল—'আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবে তুমি?'

—যদি ধরা পড়ে যাই? সুরমার চোখ চকচক করে উঠেছে।

—না, ধরা পড়বে না। শিবনাথের নিঃশ্বাস যেন পুড়িয়ে দিচ্ছিল সুরমাকে।

তারপর দীর্ঘরাত সে অপেক্ষা করেছে নদীর ঘাটে। জ্যোৎস্নার টুকরো ভাসছে নদীর জলে, কোন অদৃশ্য যাদুকর যেন পৃথিবীকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে, মাঝে মাঝে রাতের মন্থর হাওয়া, জ্যোৎস্নায় নিজেকে যেন বড় অপরিচিত মনে হতে থাকে শিবনাথের, কোথাও একটু শব্দ হলেই সতর্ক হয়ে ওঠে শিবনাথ—এই বুঝি এসেছে!...

—না, সুরমা আসেনি। অনুভবহীন শরীরটাকে কোনোরকমে সে আবার কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। কয়েকদিন বাদে এসেছিল পরিতোষের চিঠি—'বনেদী রক্তের অহংকার আমাদের পরিবারেও কিছু আছে, খবরটা যে বাবা জানতে পারেন নি, সেটা তোমার সৌভাগ্য, না হলে এতদিনে 'কমল দীঘি'র জলের অতল অন্ধকারে তোমার দেহটার ঠিকানা হারিয়ে যেতো। আর একটা কথা, সুরমা যে শেষ পর্যন্ত ভুল বুঝতে পেরেছিল, এটা তোমার জানা দরকার। খুব তাড়াতাড়ি সুরমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।...

না রাগ নয়, অপমান নয়, কেমন যেন নিজেকে খুব নিশ্চিন্ত মনে হয়েছিল শিবনাথের। দেয়াল কাঁপিয়ে হেসে উঠেছিল, —এইবার, এইবার শিবনাথ তুমি তৈরী হয়ে নাও। বহু সন্ধানের পর একদিন খুঁজে বার করেছিল সুরমাকে।

—কী চান আপনি?... সুরমার গলা কেঁপে উঠেছিল।

—তুমি জানো না?...

—আপনার হাত কাঁপছে কেন? চোখ এত লাল হয়ে উঠেছে কেন? আপনি কী অসুস্থ?...

শিবনাথ এগিয়ে গিয়েছিলেন সুরমার দিকে; সুরমা বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবে, আপনি দয়া করুন আমাকে, আমার স্বামী আমাকে বিশ্বাস করেন...আমি...

—একদিন আমিও বিশ্বাস করেছিলাম। শিবনাথের শরীরে যেন আগুন ধরে গেছে, আঙুলগুলো যেন সাঁড়াশির মতো উঠে আসছে সুরমার গলায়।

সুরমা কেঁদে ফেলেছিল—আমি একা নই শিবনাথবাবু—মা হতে চলেছি

আমি!... শিবনাথ দেখতে পেলেন দেয়াল-গুলো যেন অনেক দূরে সরে গেছে, সুরমা যেন কুয়াশার আড়ালে চলে গেছে, শুনতে পেলেন কে হাসছে—'এই যে ভেরী গুডময়' ...ছুটে পালিয়ে এসেছিলেন তিনি। সামনে বিরাট পথ।, যেন কোথাও শব্দ নেই, যেন দীর্ঘদিন তিনি পথ ভুল করে হেঁটে যাচ্ছেন।

এত অন্ধকার কেন?... চেঁচিয়ে উঠলেন শিবনাথ।

শিবনাথ চমকে উঠে দেখতে পেলেন ঘরে আয়নার সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, আলো জ্বলছে ঘরে। বুকের শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। ইচ্ছে হলো কারো নাম ধরে ডাকেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন বাড়ি ফাঁকা। শৈলেন আর লতিকা তো কখন বেড়াতে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন শিবনাথ। রাস্তার ঠান্ডা হাওয়া এখন বেশ ভাল লাগলো। হেমন্তের কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন। শিবনাথ হাঁটতে থাকলেন। দু'একটি লোক এখনো চুপ করে বসে আছে বেঞ্চিতে, কুকুর নিয়ে ঘুরছে একটি মেয়ে। গাছের আড়ালে বসে আছে দু'টি ছেলেমেয়ে।...

শিবনাথ টের পেলেন আবার তাঁর রক্তের ভেতর সেই খেলা শুরু হয়ে গেছে। শিবনাথ যেন ছুটতে আরম্ভ করলেন। কোথায় যেন আমাকে যেতে হবে, শিবনাথের ঠোঁট নড়ে উঠলো।

পথ দিয়ে দ্রুতগতিতে ট্যাক্সিটা ছুটতে থাকে। মাথা নীচু করে বসে থাকেন শিবনাথ। ওর শাড়িটা বাদামী কী হলুদ, দেখার কোনো ইচ্ছে হলো না তাঁর। কাছে সরে এল মেয়েটি। শিবনাথের চোখে পড়ল মেয়েটির মুখে ক্লান্তি, শরীরে কোথাও যেন রক্ত নেই।

—তোমার নাম কী? শিবনাথ প্রশ্ন করলেন।

মেয়েটি শব্দ করে হাসল; কোনো নাম নেই আমার, যে নামে খুশি ডাকতে পারেন। শিবনাথ মেয়েটির মুখ থেকে নেশার গন্ধ পেলেন।

—বাবুর বুঝি ঘরে বৌ নেই?... মেয়েটি শিবনাথের শরীর স্পর্শ করল।

—আপনার বুঝি অনেক পয়সা? শিবনাথের বুকে হাত রাখল মেয়েটি। আমি তো ইচ্ছে করলেই ওকে... আমি তো এখন ..শিবনাথ আর একবার তাকালেন মেয়েটির দিকে, আর সেই মুহূর্তে শিবনাথ যেন আর্তনাদ করে উঠলেন—'আমি বাড়ি যা—ব!'...

হাতের মুঠোয় টাকাটা গুছিয়ে নিয়ে মেয়েটা অন্ধকারে মিশে গেল।

শিবনাথের পা টলছে এখন। সিঁড়ি অন্ধকার। এইমাত্র সামনের বাড়ির আলো নিভলো, জানলা বন্ধ হয়ে গেল। শিবনাথ প্রার্থনা করলেন যেন কোথাও একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে, যেন কোথাও শব্দ হয়...

—কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?... সিঁড়ির মাথায় আলো জ্বালিয়ে লতিকা দাঁড়িয়ে আছে। শিবনাথ একবার তাকালেন সেদিকে। মনে হলো, ওই আলোর বৃত্তে কে যেন কতদিন ধরে তাঁর জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে দিলেন শিবনাথ, ঠোঁট নড়ছে এখন, কিন্তু কিছুতেই যেন সিঁড়িগুলো আর শেষ করতে পারলেন না তিনি।

বিচিত্র

অঙ্গরাগ

উল্কি

বনবিহারী মোদক

রসিক-নাগর শ্রীকৃষ্ণ, উল্কিওয়ালা সেজে গোপবধূদের ডেকে ডেকে গান গেয়ে চলেছেন। রূপদক্ষ এই মহাকুশলীর দ্বারা উল্কি আঁকিয়ে নিয়ে, নিজেদের বরতনুকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার লোভে, ব্রজের রূপবতীরা দলে দলে ছুটে আসছে তাঁর কাছে—উত্তরপ্রদেশের পল্লী অঞ্চলে এই লোকসংগীত আপনি আজও শুনতে পাবেন।

বিশাল এই উপমহাদেশের যে-কোন অংশে, যে-কোন বড় মেলাতে আরেকটি দৃশ্যও আপনার চোখে পড়বে। অতি ছোট্ট ঝুপড়ি দোকান; কিসের বিকিকিনি, তাও বোঝার উপায় নেই। কিন্তু মেয়েছেলের অসম্ভব ভীড় সেখানে। প্রথমে মনে হবে—নিশ্চয়ই বেলোয়ারী চুড়ির দোকান। কিন্তু না; অনুমানটি আপনার একেবারেই ভুল। দেখুনই না ঠেলে-ঠুলে একটু উঁকি-ঝুঁকি মেরে। রঙীন ছবি ও নানারকম নক্সা-আঁকা, ছোট-বড় অনেকগুলো জীর্ণ ও মলিন বোর্ড সাজান রয়েছে। নীচু হয়ে ঝুঁকে বসে, একজন [illegible]কে কি যেন করছে: খুকী থেকে বুড়ী পর্যন্ত সব বয়সের মেয়েরা সত্যি সত্যিই একেবারে ছেঁকে ধরেছে ওকে। তবুও যদি ব্যাপারটা বুঝতে না পারেন, তাহলে সরে আসুন এপাশে। ঐ যে গোল-গাল বউটি বাঁ হাতখানা চিৎ করে ধরে, খুশী-উপচে-পড়া মুখে সখীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভীড় ঠেলে বেরুচ্ছে: ওর দিকে চেয়ে দেখুন। যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট মুখখানি ওর রাঙা হয়ে উঠেছে, হয়ত বা চোখে একটু জলও, কিন্তু যন্ত্রণাকাতর সেই মুখেই আবার পরিতৃপ্তির হাসির ঝিলিক। উঁহু, ব্যথা পেয়ে খুশী হওয়াটা মেয়েদের স্বভাব কি না—সে সব মনস্তাত্ত্বিক চিন্তায় আপাতত আমাদের কোন দরকার নেই। আপনি শুধু ওর বাঁ হাতখানা লক্ষ্য করুন। হ্যাঁ, কোমল চামড়া ফুঁড়ে ফুঁড়ে কেষ্ট-রাধিকার আলিঙ্গনাবদ্ধ যুগলমূর্তি এঁকে দেওয়া হয়েছে। এটাই উল্কি। রক্ত ও রস গড়িয়ে পড়ছে দেখে, আজ ওটাকে বীভৎস আত্ম-নিগ্রহ বলে মনে হচ্ছে বটে, তবে ক্ষতটা কিন্তু দু-চারদিনের বেশী থাকবে না। চামড়াটা তখন মসৃণ হয়ে যাবে, ছবিটা কিন্তু চিরজীবন স্পষ্ট ও অবিকৃতই থাকবে।

সন্ধ্যের পরে, মেলার ভীড়টা একটু হাল্কা হলে, ছোটখাট দোকানগুলোর যে-কোন একজন দোকানীর কাছে বসে গল্প শুরু করুন। জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন—উল্কির এই সব দোকানের মত এমন রমণীমোহন ব্যবসা গোটা মেলাটায় আর দ্বিতীয় নেই। শুধু দু-একজন নয়, বড় বড় মেলায় অন্তত বিশ-পঁচিশজন উল্কি-ওয়ালা আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। আদিবাসীদের এলাকা হলে তো কথাই নেই; অন্য সব দোকানের চেয়ে উল্কির দোকান সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠও হতে পারে।

শুধু আদিবাসী বা গেঁয়ো মেয়েদের কথাই বা বলি কেন? আধুনিকারাও কি আর একেবারে বাদ যান? লুকিয়ে-চুরিয়ে ওঁরাও এক-আধজন ছোট উল্কি নেন বৈকি। শান্তিনিকেতনে রবি-বাউলের পৌষ মেলায়, সজ্জা-সচেতন ও বিদুষী অতি-আধুনিকাদের দু-একজনকেও গোপনে গোপনে উল্কি করিয়ে নিতে দেখেছি। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, সে-উল্কি কেষ্ট-রাধিকার নয়। সে-উল্কি তারকা-চিহ্নের মত ছোট্ট একটি ফুল বা নক্সামাত্র।

॥ ২ ॥

মেলাতে এর যত সমাদরই দেখা যাক, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে উল্কির রেওয়াজ সারা বিশ্বেই আজ ক্রমক্ষীয়মান। তবে, এরকম হীনদশা কিন্তু এর বরাবর ছিল না। আগেকার দিনে বিশ্বের সর্বত্র এবং সমাজের সর্বস্তরেই, উল্কি ও বর্ণানুলেপন ছিল জীবনচর্যারই অপরিহার্য একটি অঙ্গস্বরূপ। অন্য যে কোন প্রথা ও ক্রিয়াকর্মের তুলনায় উল্কির গুরুত্ব আদিম সমাজে বেশী বই কম ছিল না।

মিশরের মামীর দেহে যেসব বর্ণালিম্পন পাওয়া গিয়েছে, তার সবগুলোই যে মৃত্যুর পর দেহ-সংরক্ষণের সময়েই এঁকে দেওয়া হয়েছিল, তা নয়। জীবদ্দশাতেই এদের দেহে কিছু কিছু স্থায়ী চিহ্ন ও নক্সা, আঁকা বা ক্ষোদিত থাকত—বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আজ আর এ সম্পর্কে কোন মতপার্থক্য নেই। প্রাক-রোমীয় যুগের আদিম ইংলণ্ডের 'দ্রুয়িদ'-রাও আপাদমস্তক উল্কি আঁকত। আমাজন বনভূমির আদিবাসী 'বানিভা'-রা ওঝাগিরি শিক্ষানবিশীর সময় সমস্ত শরীরে এঁকে নিত রক্তরাঙা, বীভৎস ও রকমারী সব উল্কি। এদের মধ্যে এ-সব প্রথা এখনও পুরোমাত্রায়ই চালু আছে।

আফ্রিকার 'য়োরুবা' আদিবাসীদের মধ্যে, মেয়েদের মুখে দেখা যেত আজব এক ধরনের উল্কি। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে, উপরে-নীচে লম্বভাবে এ উল্কি আঁকা হত; এগুলোর রঙ হত তামাটে পাটকিলে। ঐ মহাদেশেরই আরেকটি দুর্ধর্ষ উপজাতি হল 'কিকুয়ু'। নানারকম নক্সাওয়ালা চিত্র-বিচিত্র উল্কি আঁকিয়ে এদের যোদ্ধারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করত। পশ্চিম এশিয়ার অনেক সুপ্রাচীন ধর্মে, স্ত্রীলোকের পক্ষে উল্কি ছিল ধর্মেরই অপরিহার্য অঙ্গ। নাইজিরিয়ার খণ্ড জাতিসমূহের অধিকাংশের মধ্যেও ঐ একই রীতি প্রচলিত ছিল। নাইজিরিয়ার 'ইবো' উপ-জাতিদের নববধূকে যে রকম কারুকার্যময় উল্কি দিয়ে সাজান হত, বধূসজ্জার সে রকম জটিল ও সময়সাপেক্ষ রীতি সমগ্র মানব-ইতিহাসেই অভূতপূর্ব! আফ্রিকার প্রাচীন কোনিন-রাজ্যের রাজকর্মচারীরা আবার তাদের পদমর্যাদার ক্রম অনুসারে উল্কি আঁকাত। সে উল্কিও ছিল রীতিমত কলাকৌশলময় ও জটিল।

ঐসব আদিম সমাজে, স্মরণাতীত যুগ থেকেই উল্কি নেওয়া হত কেন? আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষণার আলোকে এ প্রশ্নের যেসব উত্তর আজ জানা গেছে, সেগুলো একদিকে যেমন কৌতূহলোদ্দীপক,

অন্যদিকে তেমনই বহুবিচিত্র। সে সবের মধ্যে নিম্নোক্ত কারণগুলোই হল উল্লেখ্য ঃ

১) কৌমচিহ্ন (totem) হিসেবে, ২) অপদেবতার কুপ্রভাব মোচনের উদ্দেশ্যে, ৩) কৈশোর পেরিয়ে যৌনজীবনে উত্তরণের ছাড়পত্ররূপে, ৪) ঘটনা, অবস্থা প্রভৃতির স্মারকচিহ্ন হিসেবে, ৫) ক্রীতদাসের কারবারী শিশুচোরেরা, বিদঘুটে আঁক-জোকওয়ালা কুৎসিত ছেলেমেয়ে চুরি করতে চাইবে না—এই আশায়, ৬) বিশেষ কোন উপজীবিকার জ্ঞাপকচিহ্ন হিসেবে, ৭) রঙগুলোর ভেষজগুণ বা নক্সার নিরাময়কারকতায় বিশ্বাস হেতু, ৮) ওঝাশ্রেণীর কুলগুরুর অধীনে, গ্রামের বাইরের শিক্ষণ-শিবিরে বসবাসের সময়, বিদ্যার্থীচিহ্ন হিসেবে, ৯) পূর্বপুরুষের ভূতপ্রেত বা অপদেবতাদের কোপে ব্যাধিগ্রস্তদের পৃথকীকরণের (আধুনিক কোয়ারেন্টাইনের অনুরূপ) সুবিধার্থে, ১০) হারানো সন্তান খুঁজে বের করার বা সনাক্তীকরণের চিহ্ন হিসেবে, ১১) প্রচলিত লোকাচারমতে শালীনতারক্ষা ও লজ্জানিবারণের উদ্দেশ্যে, ১২) ব্যাধি ও মৃত্যু দেবতার অরুচিকর খুঁত-চিহ্ন হিসেবে, ১৩) উল্কিধারিণী নারীরা বহু সন্তানবতী হবে—এই বিশ্বাসে, ১৪) যৌন-আবেদন ও সম্ভোগশক্তি বাড়ানোর আশায়, ১৫) আবার, নিছক অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা হিসেবেও।

নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানে, এই সব কারণের গুরুত্ব প্রণিধানযোগ্য। এখানে আমরা অতি সংক্ষেপে এগুলোর পর্যালোচনা সেরে নেব ঃ

১। আদিবাসীদের প্রতিটি গোষ্ঠীই কোন-না-কোন পশুপাখী বা বৃক্ষের প্রতীক-চিহ্নের সঙ্গে কৌলিক সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। নিজেদের বংশধারা এবং অস্তিত্বকেও এরা ঐ সব জীববিশেষ বা তদ্জাত চিহ্নবিশেষের উত্তরপুরুষ বলেই বিবেচনা করে। বস্তুত, কোন পশুপাখী বা গাছকে আদিমতম কুলপতিজ্ঞানে পুজো করার রীতিকে মানব সভ্যতার আদি institution রূপে গণ্য করা চলে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে, পূর্বপুরুষ বা আদিস্রষ্টার ঐ চিহ্নের প্রতি অবিচল আনুগত্য ও মান্যতা প্রদানই হল কৌম-জনজীবনের চিরাচরিত সংস্কার ও অমোঘ বিধি। এইগুলোকেই বলা হয় কৌমচিহ্ন বা 'টোটেম'। আদিবাসী সমাজে প্রচলিত উল্কি, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই টোটেমেরই রূপারোপ মাত্র।

২। রোগ-ব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্বিপাক প্রভৃতি সম্পর্কে অবোধ একটা ভীতির ভাব, আদিম মানবগোষ্ঠীকে সর্বদাই অদৃষ্ট-নির্ভর করেছে। যুক্তির কার্যকারণসূত্র দিয়ে, যে সব ঘটনা ও দুঃখের হেতু মানুষ বুঝতে পারত না, তার সবগুলোকেই সে অশুভকারক দৈবীশক্তির ক্রিয়া ভেবে শঙ্কিত হত। কুসংস্কারজাত নানারকম তুক্-তাকের দ্বারা সে ঐসব অপদেবতার তুষ্টিবিধানের চেষ্টা করত। শরীরে উল্কিচিহ্ন থাকলে, ঐসব অশুভশক্তি আর তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না—উল্কির বহুল প্রচলন ও লোকপ্রিয়তার মূলে এই বিশ্বাসও নিঃসন্দেহেই কার্যকর ছিল।

৩। আমাদের সমাজে বিয়ের আগে যে গায়ে-হলুদ হয়, দাম্পত্যজীবনে প্রবেশের অনুষ্ঠানে, সেটা অনেকটা ছাড়পত্রেরই মত। ঠিক অনুরূপ প্রথা কোন-না-কোন রূপে এখনও প্রায় সারা পৃথিবীতেই আছে। এর সূত্র অনুসরণ করে সুদূর অতীতের দিক ফিরে তাকালে আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করব যে—পুরুষ ও নারীর যৌবনপ্রাপ্তি ও দাম্পত্য অধিকারের স্বীকৃতি জানাতে, আদিম মানবগোষ্ঠী এই উল্কিকেই তখন সংকেতার্থে ব্যবহার করত। উল্কি ধারণের অধিকার লাভ করলে, তবেই তরুণ-তরুণীরা সাবালক-সাবালিকারূপে সমাজে স্বীকৃতি পেত। কৌমার্যের কঠোর বিধি-নিষেধ থেকে অব্যাহতি পাবার একমাত্র উপায় ছিল, বহুবাঞ্ছিত এই উল্কি-ই।

৪। অতীত স্মৃতির রোমন্থনে আনন্দ লাভ, মানুষের স্বভাবধর্ম। স্মরণীয় কোন ঘটনা বা অবস্থার স্মারকচিহ্ন হিসেবেও মানুষ সে সময় উল্কি আঁকিয়ে নিত। উল্কির চিরস্থায়ী চিহ্ন, সেসব স্মৃতিকে তার মনে চিরজাগরূক রাখত।

৫। মানুষ বেচা-কেনাটা, যখন পোষা জন্তু-জানোয়ার বেচা-কেনার মতই অতি-সাধারণ এবং নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল, তখন ক্রেতা ও বিক্রেতা দু-তরফেরই লক্ষ্য থাকত সুঠাম-সুন্দর ছেলেমেয়ের ওপর। সন্ত্রস্ত বাপ-মা তাই শিশুবয়সেই সন্তানদের উল্কিভূষিত ও কিম্ভুতকিমাকার করে রাখত; ছেলে-ধরারা যাতে ওসব বাচ্চার দিকে ফিরেও না তাকায়।

৬। নিজেদের পরিচয় ও ক্ষমতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে, আদিম সমাজের গোষ্ঠী-পতি, যোদ্ধা, সর্দার, ওঝা, পুরুত প্রভৃতিরা তখন আলাদা আলাদা চিহ্ন ধারণ করত। উল্কির আঁক-জোক চিরস্থায়ী হওয়ায়, একাজেও উল্কিই ছিল সর্বাধিক সমাদৃত।

৭। নানারকম উদ্ভিজ্জ রস ও অন্য যে সব উপকরণের সহযোগে উল্কি আঁকা হত, তার সবগুলোতেই রোগ-নিরাময়কারক ভেষজগুণ ছিল বলে মানুষ বিশ্বাস করত। এ বিশ্বাসকে কিন্তু ভ্রান্ত বলা চলে না। বস্তুত, যেসব ওষুধের ব্যবহার সুপ্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে, আধুনিক বিজ্ঞান তার অধিকাংশের মধ্যেই মহোপকারী ভেষজ-গুণের সন্ধান পেয়ে বিস্মিত হয়েছে। উল্কি আঁকবার রস ও রঙগুলোর মধ্যেও তাই রোগনিরাময়কারী গুণ থাকাটা আশ্চর্য কিছু নয়। উল্কির সমাদরের এটিও ছিল অন্যতম একটি কারণ।

৮। জনবসতির বাইরে অথচ অনতি-দূরে, সুপরিসর একটি ঘরে আদিম সমাজের বালক ও কিশোরেরা তাদের গোষ্ঠীর রীতি-নীতি ও ক্রিয়াকাণ্ডের তালিম নিত। ঠিক অনুরূপ আরেকটি বড় ঘরে থাকত বালিকা ও কিশোরীদের শিক্ষণ-শিবির। দীর্ঘকালস্থায়ী সেই তালিম সাফল্যের সঙ্গে শেষ করতে না পারা পর্যন্ত, সমাজজীবনে ওদের কারুরই কোন প্রবেশাধিকারই ছিল না। আদিবাসী কৌম-সমাজগুলোতে এ প্রথা আজও আছে। শিবিরবাসী ছেলেমেয়েরা এই সময় তাদের দেহে যেসব উল্কি আঁকাত, বিদ্যার্জনে সেগুলোর শুভপ্রভাব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলেরই ছিল সুদৃঢ় বিশ্বাস।

৯। প্রকৃতির রুদ্ররোষের মুখে অসহায় মানুষ সে যুগে শুধু যে রোগকে ভয় পেত, তাই-ই নয়। রোগীকেও সে সভয়ে এড়িয়ে চলতে চাইত। ভয়তাড়িত সংস্কারবশে, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তদের ওরা পৃথক করে রাখত। অপদেবতার যে রোষ-দৃষ্টির ফলে, রুগ্ন লোকটির এ-হেন দুর্দশা, সে-রোগীর সংস্রব এড়িয়ে চললে, অপদেবতার সেই কোপ থেকে সে-ও অব্যাহতি পাবে, আরও আর অসুখবিসুখের ভয় থাকবে না—ভ্রান্ত এই কুসংস্কারই ওদের এই হৃদয়হীন কাজে প্রবৃত্ত করত। এখনকার কোয়ারেন্টাইনের মত, ঐ পৃথকীকরণের সুবিধার্থে, উল্কিকে তারা বিপদসূচক ডেঞ্জার-সিগন্যাল হিসেবেও কাজে লাগাত। ঐ উল্কি দেখামাত্রই সবাই বুঝত—'লোকটি বিপদজনক ব্যাধিগ্রস্ত, এর থেকে দূরে থাকতে হবে।'

১০। দেহের স্থায়ী চিহ্নই যে মানুষ সনাক্ত করার সেরা উপায়—আদিম মানব-সমাজ একথাটা যখন নিঃসন্দেহে বুঝতে শিখল; চিরস্থায়ী সনাক্তীকরণচিহ্ন হিসেবে উল্কির লোকপ্রিয়তা শুরু হল তখন থেকেই।

১১। নিজের নিরাবরণ দেহটা অন্য দশজনের চোখের সামনে আনতে মানুষ প্রথম যেদিন লজ্জা অনুভব করল, গাছের পাতা আর বাকল দিয়ে দেহ ঢাকবার কায়দাটা তখনই কিন্তু সে রপ্ত করতে পারে নি। মাটি, পাথরের গুঁড়ো, গাছপালার রস—এসব মিশিয়ে, নিজের দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গকে গাঢ় রঙে ঢেকে দেওয়াটাই হল অঙ্গাবরণ সৃষ্টির প্রয়াসে তার প্রথম অপটু পদক্ষেপ। লিটল্ আন্দামানের 'ওঙ্গে'রা আজ পর্যন্ত এইভাবেই লজ্জা-নিবারণ করে আসছে। আদিম ও অকুশলী বর্ণানুলেপনই কালক্রমে পরিবর্তিত হল নক্সাদার উল্কিতে।

১২। খুঁতযুক্ত পশু, বলিতে লাগে না। সেইরকম, খুঁতযুক্ত মানবদেহও দেব-ভোগ্য নয়—এই বিশ্বাসেও মানুষ তখন চিরস্থায়ী কলঙ্কচিহ্ন দিয়ে শরীর লাঞ্ছিত করে রাখত। দেবতা ও অপদেবতারা যাতে সেই দেহটির প্রতি প্রলুব্ধ না হন—এই-ই ছিল সে উল্কির উদ্দেশ্য। সহজ কথায় বলা যায় যে, যমের লোলুপ দৃষ্টিতে ছেলে-মেয়েকে অরুচিকর ও ঘৃণার্হ করে তোলার জন্যেও সে যুগের মা-বাবা তাদের নিজ নিজ সন্তানের শরীরে উল্কি আঁকাত।

১৩। প্রজননশক্তির বৃদ্ধিই ছিল আদিম সমাজের প্রধানতম কাম্য বিষয়। মানববংশ-বৃদ্ধি, শিকারের জন্তু-জানোয়ার ও গৃহ-পালিত পশুর প্রাচুর্য, জমির ফসলবৃদ্ধি—প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাঁচার তাগিদে এই-গুলোই ছিল সে যুগের মানুষের প্রথম প্রার্থনা। ইন্দ্রজাল সবকিছুর প্রজনন-শক্তিকে বাড়িয়ে তুলবে—এই-ই ছিল তখন-

কার বিশ্বাস। শিকার-নির্ভর জনগোষ্ঠী এবং কৃষিজীবী সমাজও এই কামনা নিয়েই নিজের নিজের বিশ্বাসমাফিক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করত। দেহে ঐন্দ্রজালিক উল্কি-চিহ্ন আঁকা থাকলে, সে-নারী বহু সন্তানবতী হবেই—এই বিশ্বাসই সে যুগের নারীসমাজে উল্কিকে বহুল-প্রচলিত করতে সাহায্য করেছিল।

১৪। যৌন সম্ভোগের অধিকতর শক্তি লাভের আশায় মানুষের গোপন প্রচেষ্টার ব্যাকুলতাটা, মানবমনের স্বভাবধর্মের গভীরে নিহিত। এ ব্যাপারে দেশ-কাল-পাত্রের কোন ভেদ নেই। দেহের যৌন আবেদন বাড়িয়ে, অপর পক্ষকে আকৃষ্ট করার বাসনাও ঠিক তেমনি। একালের বাজীকরণ, স্তম্ভন বা কবচ-তাবিজের মত, সেযুগে উল্কি ছিল ঐ একই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত অন্যতম গূঢ় প্রক্রিয়া। তুক-তাক, বশীকরণ প্রভৃতিতে যেমন প্রতীক নক্সা ও সংকেত-চিত্র ব্যবহৃত হয়, উল্কির চিত্রকল্পেও তদ্রূপ বাঞ্ছিত যৌন-ইচ্ছাপূরণের গুণ আরোপিত হত। এ ব্যাপারে উল্কির অমোঘ কার্যকারিতায় বিশ্বাস ছিল সর্বব্যাপী।

১৫। অন্যের চোখে নিজেকে সুন্দর দেখাক—এ কামনা মানুষের চিরকালের। শুধু নারী নয়, পুরুষের মনেও এই গোপন বাসনা চিরদিনই আছে। নিজের রূপসজ্জা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক প্রিয়জনের চোখে তা ভাল লাগুক—এই আশা নিয়ে, মানুষ চিরকাল কতরকমের
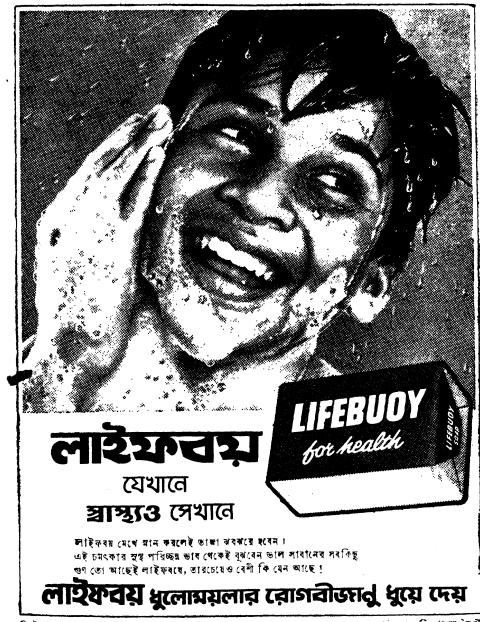
কতশত উপচার দিয়ে নিজেকে সাজাচ্ছে। স্থায়িত্বের বিচারে সাজসজ্জার অন্য সব উপচার ক্ষণস্থায়ীমাত্র। উল্কি কিন্তু একটিবার আঁকানো হলে," চিরজীবনের বিশ্বস্ত নিত্যসঙ্গী। আধুনিক বিজ্ঞান, সজ্জা-প্রকরণের নিত্য নতুন বিলাসোপকরণ সহজলভ্য করার আগে পর্যন্ত সামান্য গোটাকতক উপকরণই ছিল সাজসজ্জার কাজে মানুষের একমাত্র পুঁজি। সে-আমলে, উল্কি ছিল একাই একশ। তাই, অন্য কোন কারণের জন্যে হোক বা না-ই হোক, অন্তত অঙ্গসজ্জা ও অলংকরণের জন্যেও উল্কির সমাদর ছিল বিশ্বব্যাপী।

॥৩॥

প্রাচীন উপজাতিসমাজে উল্কির বহুল প্রচলন এবং তার যেসব কারণ আমরা আলোচনা করলাম, সেগুলোর ভাব-উৎসের সন্ধান মিলবে আদিম পূজা-পদ্ধতির মধ্যে। আদিম মানবসমাজে পূজার্চনার প্রধান ধারা ছিল তিনটি :

(ক) টোটেমপূজা

(খ) ইন্দ্রজাল

এবং (গ) সূর্যোপাসনা

সুপ্রাচীন এই পূজাপদ্ধতিগুলোর প্রত্যেকটিতেই উল্কির কোনো-না কোনো প্রাক্-রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের অথর্ববেদেও তাই উল্কির সূচনাকালীন প্রাক্‌রূপের সুস্পষ্ট আভাস বর্তমান। অথর্ববেদের মতে—গৃহে প্রিয় অতিথিজনের সমাগম হলে, 'অভ্যঞ্জন', 'আজ্য', 'আলঞ্জন' (১) প্রভৃতি যেসব অঙ্গানুলেপন দিয়ে তাঁদের তুষ্টিবিধান করা হত, সেগুলোকে উল্কির সূচনাকালীন প্রাক্-রূপ বলে চিনে নিতে মোটেই অসুবিধে হয় না।

এরপর তান্ত্রিকযুগের ভারতীয় সমাজে আমরা দেখতে পাই অপেক্ষাকৃত জটিল ও বৈচিত্র্যময় রূপচর্চারীতি এবং সৌখিন বিলাসসম্মত প্রসাধনকলা। বলা বাহুল্য, তত্দিনে উল্কি তার নিজস্ব আসন সুদৃঢ়ভাবে দখল করে নিয়েছে। সে যুগের বিচিত্র বর্ণানুলেপন ও উল্কি-অংকনের মধ্যে, 'তন্ত্রসার'-এ ৬৪টি বিভিন্ন উপচার ও অংকনরীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে কয়েকটিকে তো আধুনিক রুচির বিচারেও রীতিমত বৈপ্লবিক বলা চলে! যথা—বালাঞ্জনম্, অধরযাবকম্, মৃগমদ, তিলকরতম্, চিত্রপদকম্, রোচনা।

বালাঞ্জনম্ আঁকানো হত শিশু ও বালক-বালিকাদের মুখে। যুবতীরা তাঁদের অধর ও ওষ্ঠে নিতেন অধরযাবকম্। এগুলোর সূক্ষ্ম শিল্পসৌষ্ঠব ও প্রতীকী কারুকার্য শুধু যে তাঁদের মুখশ্রীকেই নয়নরম্য করত, তাই-ই নয়। পরন্তু ও'দের কমনীয় বরতনুর যৌন আবেদনও ওতে অনেকটাই বেড়ে যেত।

কালক্রমে এইসব বর্ণালিম্পন ও উল্কি এক এক শ্রেণীর নায়ক-নায়িকার বিশেষ বিশেষ হৃদয়ভাবের দ্যোতক হয়ে দাঁড়াল; প্রেমবাসনা ও সম্ভোগলীলাবিলাসের এক-একরকম ভাব-তাৎপর্যজ্ঞাপক পরিচিতিতে চিহ্নিত হল। এর চরম উৎকর্ষ দেখা গেল বৈষ্ণবকাব্যে। এমনকি কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো পরমভক্ত দার্শনিকের কৃষ্ণ-প্রেম-বিশ্লেষণেও ধরা পড়ল, অঙ্গরাগের বাহ্যিক রূপৈশ্বর্যের আড়ালের সেই গূঢ় ভাব-তাৎপর্য :

"কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর।।" ২

অঘোরপন্থী তান্ত্রিকদের গুহ্য সাধনায়, উল্কি লাভ করেছিল আরেক ধরণের স্বীকৃতি। রক্তপট্টাম্বর, রক্ততিলক কারণ-বারি প্রভৃতির মতো, সাধনসঙ্গিনীর দেহ-স্থিত উল্কির আলিম্পনও ও'দের কাছে ছিল ক্রিয়াপ্রকরণের অপরিহার্য একটি বীজ-মুদ্রাস্বরূপ। বস্তুতঃ, এ'দের এই সব গুহ্য ক্রিয়াকাণ্ডের সূত্র ধরেই, পশ্চিম বাংলার বাগদী, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অন্ত্যজবর্ণের মেয়েদের মধ্যে উল্কি আজও টি'কে থাকতে পেরেছে।

ধর্মীয় আচারের অঙ্গ হিসেবে উল্কির ব্যবহারের আরেকটি দৃষ্টান্ত মেলে প্রাচীন ইহুদীদের মধ্যে। এদের সুন্নতের (লিঙ্গাগ্রক ছেদের ধর্মীয় প্রথা, circumcision) সময়ও উল্কির-চিহ্নের অনুরূপ স্থায়ী চিহ্ন এ'কে দেওয়া হত। ইহুদীজাতির যে দু-একটি অনুন্নত শাখাগোষ্ঠী অল্প কিছু-দিন আগে পর্যন্ত যাযাবর জীবন যাপন করত, তাদের মধ্যে এ-প্রথা নাকি আজও বিদ্যমান।

প্রাচীন মিশরে যে সব নর্তকী ও বারবিলাসিনী, ফারাওদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করত, বিশিষ্ট রত্নালংকারের সঙ্গে, সৌভাগ্যজ্ঞাপক উল্কিও ছিল তাদের পরম বাঞ্ছিত ও সমাদরের বস্তু।

প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার গৌরবদীপ্ত দিনে, মহান সম্রাট হাম্মুরাবি ব্যভিচার, চৌর্য প্রভৃতি অপরাধের জন্য যে সব শাস্তির বিধান লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন, তাতেও দেখা যায়—দুষ্কৃতকারীর অঙ্গচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের প্রকাশ্য কোনো অঙ্গে দুষ্কৃতিজ্ঞাপক স্থায়ী চিহ্নলাঞ্ছনের সুস্পষ্ট নির্দেশ! সে সব চিহ্ন, উল্কি বা তার সগোত্র ছিল কিনা—কে বলবে?

॥৪॥

প্রধানতঃ অতীতযুগের কথা নিয়েই এপর্যন্ত আলোচনা করা গেল। পরবর্তী যুগে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে উল্কির বহুল ব্যবহারের দিকেও এবার আমাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ করতে হবে।

কলকাতার হেস্টিংস এলাকার দিকে একবার একটু ঘুরে আসি চলুন। জাহাজী দপ্তরগুলোর কাছে-কিনারে বা গঙ্গার ধারে অনেক ভিনদেশী নাবিক দেখা যাবে। সুধী পাঠক, ওদের বাঁ-হাতগুলো একটু লক্ষ্য করুন। অধিকাংশেরই হাতে জ্বল-জ্বল করছে রকমারী সব উল্কি! যাদের বাঁ-হাতে নেই, খুঁজলে তাদেরও শরীরের কোথাও-না-কোথাও উল্কি অবশ্যই দেখা যাবে—এটা প্রায় নিঃসন্দেহেই ধরে নিতে পারেন।

স্পেন-পর্তুগালের নিত্য নব অভিযানের মধ্যে দিয়ে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে নৌবিদ্যার যে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়েছিল, তারপর থেকে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত পশ্চিমের দুঃসাহসী মানুষেরা দরিয়ার সঙ্গে মিতালীর স্বপ্ন দেখেছে। নব নব দিগন্তের সন্ধানে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, বিঘ্ন-বিপদ ও ঝড়-তুফানের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ওরা পাঞ্জা কষেছে। বিপদ ও অজানার প্রতি দুর্দমনীয় এই অভীপ্সা থেকেই জন্ম নিয়েছে—বিশিষ্ট একটা জীবনবোধ আর মনোভঙ্গী। জ্ঞানে-প্রজ্ঞায় ওরা গরীয়ান ছিল না ঠিকই, কিন্তু বদ্ধ গৃহকোণের "লাভ-ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ ভাগ, কলহ সংশয়" থেকে, উদাসী মনটিকে ওরা সত্যিই টেনে নিতে পেরেছিল দিগন্ত-ছোঁয়া আকাশ আর সীমাহীন সাগরের উদাত্ত ইশারার দিকে। উপনিষদের "চরৈবেতি" আহ্বানকে মননের আলোয় আত্মস্থ করে নেবার অধিকার ওদের ছিল না বটে; কিন্তু ঘর ছাড়ার, নোঙর তোলার ডাক ওদের রক্তে যে চঞ্চলের উন্মাদনা জাগিয়ে তুলত, তার মধ্যে সত্যিই কোনো ফাঁকি ছিল না।

তবে কি গৃহজীবনের বন্ধনের সঙ্গে কোনো যোগসূত্রই ওদের ছিল না? কিছু নিশ্চয়ই ছিল এবং সেই কিছুর একটা হল উল্কি। রোদে-পোড়া রুক্ষ শরীরে একটুখানি ঐ চিহ্ন থেকেই, বিরল অবসর মুহূর্তে ওরা খুঁজে পেত প্রিয়ার অশ্রু আর শিশুর হাসি-মাখানো গৃহজীবনের মধুর স্মৃতি। সমুদ্রযাত্রার দীর্ঘ পথে, দূরদেশের কোনো কোনো বন্দরেও হয়ত জুটে যেত ক্ষণিকের ভাল-লাগা দরদী মনের মানুষ! কিন্তু হায়, সবই দুদিনের। তারপরেই তো আবার বাঁধন খোলার পালা। ঐ দিনকটির সুখস্মৃতিকেও ওরা তাই ধরে রাখতে চাই অতি-নগণ্য ঐ উল্কি-চিহ্নের মধ্যে দিয়ে।

নাবিকদের মধ্যে যে সব উল্কির প্রচলন দেখা গেছে, সমাজের সাধারণ মানুষের গৃহীত উল্কির সঙ্গে তার কিন্তু কোনো মিলই নেই। মাঝি-মাল্লা-লস্কর-সারেংদের উল্কি যেন আলাদা আরেক জগতের জিনিস। আজব ছবি আর বিচিত্র রূপ-কল্প নিয়ে, এ-উল্কি যেন রহস্যঘেরা সাগর আর দুর্জ্ঞেয় এই জীবনকে একই গ্রন্থিবন্ধনে বাঁধতে চেয়েছে। নোঙর, ক্যাপস্টান (নোঙরের শিকল বা কাছি গুটোবার কল) প্রভৃতির সঙ্গে সেখানে মিলবে পতাকা, পাল-তোলা জাহাজ, এমনকি কম্পাসও! শুধু কি তাই? সী-গল, অ্যালবাট্রস, সী-হক প্রভৃতি সামুদ্রিক পাখীরাও সেখানে অবাধ বিহার। ইয়াংকী জাহাজীদের হাতে বেশী দেখা যাবে ওদের প্রিয় জাতীয় প্রতীক—ঈগল। হাল আমলে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু আধুনিক রুচির নক্সা—বিকিনি বা সাঁতারের পোষাক-পরা নগ্নপ্রায় তন্বী রূপসী; প্রিয়ার নাম বা নামের আদ্যাক্ষর-অঙ্কিত হরতন (হৃদয়-দ্যোতক); কখনও বা তীর-বিদ্ধ হরতন, অর্থাৎ বিশেষ একজনের প্রেম যেন তীরের মতো বিঁধে,

১ অথর্ববেদ—৬।১১৫।৩; ৬।১২৪।৩; ৯।৬।১১

২ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা; ৮ম পরিচ্ছেদ
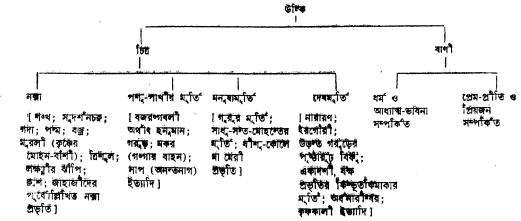
হৃদয়ে একেবারে অনড় হয়ে গেঁথে রয়েছে!

নাবিকদের ছন্নছাড়া দরিয়া-জীবনের সঙ্গে উল্কি যেমন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনসূত্রে জড়িয়ে রয়েছে, মধ্যযুগীয় সেনা-জীবনেও ঠিক তদ্রূপই ছিল। গৃহপরিজনের সুখ-সান্নিধ্য ছেড়ে, ওদেরও দীর্ঘকাল দূরে দূরেই থাকতে হত; কখনও রণাঙ্গনে মৃত্যুর মুখোমুখি, কখনও বা সেনা-নিবাসের দুঃসহ কঠোরতা ও বিধি-নিষেধের মধ্যে। প্রতি মুহূর্তের অনিশ্চয়তাময় এই রকম জীবনে, যা-হোক একটা চিহ্ন নিয়ে স্মৃতি-রোমন্থনের জন্যে ওদের মনের গভীরেও ছিল অবুঝ একটা কাঙালপনা। উল্কির মাধ্যমে প্রিয়জনের নাম, গ্রামের গীর্জা, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন বা গ্রামের অন্য কোনো স্মৃতিচিহ্ন—এগুলো ওরা পরম যত্নে ধরে রাখত। যেসব সামন্ত বা রাজার সৈনিক হিসেবে ওরা লড়াই করত, তাঁদের পতাকা বা ক্রেস্ট-ও অনেকের উল্কিতে আঁকা থাকত। একদিকে এটা হত আনুগত্যের অঙ্গীকার; অন্যদিকে রণক্ষেত্রে ওদের দেহ-পাত হলে, এ-উল্কি ওদের লাশ সনাক্ত-করণেও সাহায্য করত। মধ্যযুগীয় নাইট-রাও তাদের সুকঠোর শিভালরী ও গোঁড়া একনিষ্[illegible]প্রকাশ হিসেবে, পরম সমাদরে উল্কি গ্রহণ করত।

এছাড়া আর একটি ক্ষেত্রেও উল্কির প্রচলন তখন হামেশাই দেখা যেত। পূর্ব-জীবনে অনেক পাপ-কাজ করে, শেষে অনুতপ্তচিত্তে যারা গীর্জার শরণ নিত, তারাও তাদের বুকে বা হাতে এঁকে নিত ক্রুশচিহ্ন বা গীর্জার প্রতীক-চিহ্ন। অনু-শোচনার তাপদগ্ধ জীবনে, এটা ছিল ওদের ঈশ্বর-শরণের আকুতিরই করুণ প্রকাশ।

॥৫॥

উল্কি কিভাবে আঁকা হয়—সেটাও এই ফাঁকে দেখে নেওয়া দরকার। আগেকার দিনে প্রথাটা ছিল অতি সাদাসিদে। সূঁচ বা ধারালো যে-কোনো অস্ত্র দিয়ে শরীরের উদ্দিষ্ট স্থানটি ফুঁড়ে বা অল্প অল্প কেটে, তার ওপর 'কেশুত্তে' পাতার রস লাগিয়ে দেওয়া হত। জামগাছের ছাল এবং হরতুকীর কষ, রান্নাঘরের কালি-লাগা মাকড়সার ঝুল—এসবের সংযোগে তৈরী কালিও ঐ কাজে ব্যবহৃত হত।

বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে এই রঙটা করা হত 'দুধিয়া' নামক একরকম বুনো পাতার রস দিয়ে। এর রসটা দেখতে দুধের মতো সাদা বলেই এর নাম 'দুধিয়া'। এই সাদা রঙটা শুকোনোর পর কালচে নীল হয়ে যায় এবং রঙও পাকা হয়। উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা এর সাহায্যে গাল এবং চিবুকেও উল্কি আঁকায়। উত্তর প্রদেশে একে বলে 'লীলা গোদনা', বিহারে বলা হয় শুধু 'গোদনা'। 'গোদনা' কথাটির অর্থ হল—খোদাই করা। ঐসব অঞ্চলের গ্রামবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস—গোদনা আঁকানোটা বসন্ত প্রভৃতি ভয়াবহ রোগের অব্যর্থ একটি প্রতিষেধক।

এখন কিন্তু সূঁচ না বিঁধিয়ে বা না কেটেও উল্কি নেওয়া যায়। মেয়েরা নিজে নিজে নেবার সময় এখনও অবশ্য ঐ যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতিতেই উল্কি তোলে। তবে মেলাতে কিন্তু আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে উল্কি আঁকার দোকান বসে। সেখানে ব্যাটারী-চালিত ছোট্ট হাত-যন্ত্র বা ড্রিলের সাহায্যে চামড়ার ওপর গোল-গোল গর্ত করা হয়। তার ওপর স্পিরিট-মেশানো গাঢ় রঙ লেপে দিলেই কাজ শেষ। ড্রিলের সাহায্যে ফুঁড়লে যন্ত্রণা হয় কম, তার ওপর কালিতে স্পিরিট থাকায় ক্ষতস্থানটা ঠান্ডাও লাগে। ক্ষতটা দিনকয়েকের মধ্যেই শুকিয়ে যায়; নক্সাটাও জ্বল-জ্বলে, স্পষ্ট ও চিরস্থায়ী হয়।

নক্সার ক্ষতটার ওপর যে রঙটি প্রলেপ দেওয়া হয়, সাধারণতঃ তাতে তিনটি উপাদান থাকে :

১। Carmine (লাক্ষা-নিঃসৃত রস)
২। Orcanet
৩। Vermilion (পারদের রক্তিমাংশ)

শেষোক্ত এই বস্তুটি কিন্তু শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। মেলায় গৃহীত উল্কিতে এই জন্যেই অনেক সময় ঘা হতে দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ঘা হয় অত্যন্ত দুরারোগ্য এবং দ্রুত পচন-শীল। এক-আধটি প্রাণহানিও যে এর ফলে না ঘটে, এমন নয়। এই জন্যেই, পুরোনো রীতিতে ভেষজ-রস-সংযোগে উল্কি আঁকানোটা যন্ত্রণাদায়ক হলেও নিরাপদ।

উল্কি বহু রকমেরই হয়। ওপরের ছক অনুযায়ী কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে নিলে, প্রতিটি বিভাগের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে স্পষ্ট হবে :

বাণী-লেখা উল্কিগুলোর মধ্যে মানব-মনের অনেক বিচিত্র ভাব-কল্পনার অকপট পরিচয় ধরা পড়ে। গোটাকয়েক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে—মনের কত কামনা-বাসনাকেই মানুষ স্থায়ী স্মৃতি হিসেবে আঁকড়ে ধরতে চায়। ধর্ম ও আধ্যাত্মভাবনা সম্পৃক্ত উল্কির মধ্যে একদিকে দেখি :

॥ক॥ "ভজ নিতাই-গৌর রাধে-শ্যাম।
জপ হরেকৃষ্ণ হরেনাম॥"

॥খ॥ "ব্যোম্ শঙ্কর, হর হর মহাদেব"

॥গ॥ "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম,
রাম রাম হরে হরে॥"

॥ঘ॥ "দয়াল নিতাই এসেছে নাম—
গৌরহরি হরি বোল।"

অথবা

॥ঙ॥ "ওঁ জয়দুর্গা শিবরাম হরে হরে।
ওঁ কৃষ্ণ-কালী রাম রাম হরে হরে॥"

ইত্যাদি জপের নাম; অন্যদিকে তারই পাশাপাশি পাই :

১। "দয়াল গুরু হে, আমি ওপারের কথা
ভাবলাম কই?"

২। "সাধুসঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে প্রেম-প্রীতে
মুড়ায়ে মাথা,
গুরু-কল্পতরু জড়িয়ে ধরো,
ওরে আমার ভক্তিলতা।"

৩। "ও ভোলা মন—
ভুলিসনে তোর সাধন।"
অথবা

৪। "দয়াল গুরু হে,
এ-পাপীরে পারের সন্ধান দিবে কে?"

প্রেম-প্রীতি ও প্রিয়জন সম্পর্কিত উল্কিতে মানবহৃদয়ের অনেক গোপন বেদনা ও বাসনার অভিব্যক্তি মূর্ত হয় :

ক। "সই গো—
এ-মধু ফাল্গুনে
বঁধুয়ার সনে
গোপন কথাটি কইব।"

খ। "যাও পাখী, বোলো তারে—
সে যেন ভোলে না মোরে।"

বলা বাহুল্য, এর ঠিক পাশেই আঁকা থাকে উড্ডীয়মান একটি পাখীর ছবি ঃ

গ। "মনে রইলো"

অথবা

ঙ। "চাতক থাকে মেঘের আশে,
মেঘ বরষায় অন্য দেশে।"

মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্তই এখানে দেওয়া গেল। আরও বহুরকম কথাই এই শ্রেণীর উল্কিতে থাকে; তথাকথিত "আধুনিক" বাংলা গানের কলিও তাতে বাদ যায় না। অজ পাড়াগাঁয়ের ঝাঁকড়া-চুলো কলির কেষ্ট টাইপের রসিকনাগররা আদিরসের রগরগে খিস্তিও উল্কিরূপে সগৌরবে বহন করেন! বিট্‌ল ও হিপি-অনুরাগী শহুরে তরুণরা কেউ কেউ আবার দুর্বোধ্য সব বাণীর পাশাপাশি, ধূমায়মান গাঁজার কল্কে, সুরা ও সাকী এসবও সযত্নে আঁকিয়ে নেন!

॥ ৬ ॥

আর্থার কোনান ডয়েলের অমর সৃষ্টি গোয়েন্দাপ্রবর শার্লক হোম্‌স শুধু উল্কি দেখেই বলে দিতে পারতেন—সে-উল্কি কোন দেশে আঁকানো, কী তার সংকেতার্থ। তাঁর মতো অঘটন-ঘটন-পটু না হলেও, এ-যুগের নৃতত্ত্ববিদ্ ও সমাজবিজ্ঞানীরাও নির্ভুলভাবেই বলতে পারেন—কোন্ উল্কি উপজাতির চিহ্ন, কোন্ উল্কি গোষ্ঠীচিহ্ন, কোন্‌টা আবার পরিবারের চিহ্ন! শুধু কি এই! আরও আছে; যেমন—কেউ অক্ষয় করে রাখতে চায় নিজেরই নাম, কোনো স্বামী-সোহাগিনী আবার বুকে এঁকে রাখে পতিদেবতার নাম! লাল রঙের উল্কি সূচনা করত জীবনের মধু-বসন্ত এবং পরিণয়; হলুদ উল্কি নাকি ত্বরান্বিত করত রোগ-নিরাময়কে; আবার সর্ব অবস্থার অঙ্গ-সজ্জার জন্যে সমাদৃত হত নীল রঙের উল্কি! আমাদের আধুনিক কালের 'রাখী'-র মতো, বিবদমান গোষ্ঠীগুলো, লড়াইয়ের পর সন্ধি ও সৌভ্রাত্রজ্ঞাপক উল্কিও ধারণ করত।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজে, সন্তানের পিতৃ-পরিচয় রক্ষা করাটা ছিল অতি দুরূহ। এক-একজন পিতার সন্তানকে এক-একরকমভাবে উল্কি-চিহ্নিত করে, বহু-সন্তানের জননী পরিবারকর্ত্রীরা তখন নিজের ছেলেমেয়ে-গুলোকে সঠিক হিসেবের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করত।

ষাঁড় যেমন মহাদেবের নামে দেগে ছেড়ে দেওয়া হয়, বদরাগী ও অনিষ্টকারী দেবতা-দের তুষ্টিবিধানের আশায় শিশুদেরও ঠিক ঐভাবেই উল্কিলাঞ্ছন-সহযোগে উৎসর্গ করা হত। বড় হয়ে এরা অনেকটা সমাজ-বহি-র্ভূতের মতো জীবন কাটাত। এরা কোনো অন্যায় করলেও, কেউ এদের বিশেষ কিছু বলতে সাহস করত না, কারণ এরা যে দেবতার প্রসাদী!

ভূত-প্রেত তাড়ানোর জন্যে, আদিবাসী-দের গাঁয়ের বাইরে মূর্তি ও নক্সা-খোদাই কাঠ বা পাথর পোঁতা হত। বাড়ীর উঠোনের প্রবেশপথে, এমন কি ঘরের দরজার দু-পাশেও ঐরকম চিহ্ন, নক্সা ও বর্ণলিম্পন আঁকা হত। মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো দু-একটি ছেলের শরীরেও ঠিক অনুরূপ নক্সার উল্কি দেগে, ঐ উদ্দেশ্যে তাদেরও মূল জনবসতির বাইরে বাইরে থাকতে বাধ্য করা হত।

বৈষ্ণবদের চন্দনযাত্রা উৎসব বা তিলক কুঙ্কুম প্রভৃতি অঙ্গরাগের ব্যবহারের মতো, দেবতার প্রীত্যর্থে অঙ্গানুলেপন ও উল্কি নেওয়ার উৎসবও উপজাতি সমাজে যথেষ্টই চালু ছিল।

এসব উল্কি শুধু যে হাতের উপরেই আঁকা হত, তা নয়। গালে, চোখের ঠিক নিচটাতে, কপালে—কোনো অঙ্গেরই রেহাই ছিল না। উল্কিরও ছিল কত রকমফের, কত জাত! কোনোটা হত গহনার মিনা-র মতো খোদাই; কোনো কোনো উল্কির নীচের মাংসকে আবার চিরদিনের মতো ফুলিয়ে উঁচু করে তোলা হত! উল্কিযুক্ত সেই ফোলানো অংশকে আবার বিশেষ বিশেষ ছাঁচে চাপ দিয়ে রেখে, বিশেষ বিশেষ আকার দেওয়া হত!

এত রকমের এত সব উল্কি আঁকাটাও খুব সহজ কাজ ছিল না। ঐসব আদিম সমাজে এই কারণেই, ওঝা, পুরুত প্রভৃতির মতো, পেশাদার উল্কি-অঙ্কনকারীও থাকত। এদের কাজের কদরও ছিল যথেষ্ট, পারি-শ্রমিকও ছিল রীতিমত ঈর্ষার যোগ্য। সর্দার, ওঝা, পুরুত প্রভৃতির মতো, এ-পেশাটিও ছিল বংশানুক্রমিক।

এই উল্কি-আঁকিয়েদেরই প্রায় অনুরূপ একটা শ্রেণী আমাদের দেশের যাযাবর বেদে-দের মধ্যেও দেখা যেত। মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেও বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এদের বীভৎস উল্কি-চিকিৎসা দিব্যি চালু ছিল। পুরনো গেঁটে বাত সারানোর জন্যে, এরা লোহা আগুনে পুড়িয়ে টক্‌টকে লাল করে, রোগীর উরু বা কোমরে সজোরে সেটা চেপে ধরত! এক পলক পরে, লোহাটা সরিয়ে নিয়ে কি-সব পাতার রস দিয়ে ক্ষতটা শক্ত করে বেঁধে দিত। ঠিক তিনদিন পরে বাঁধনটা খুলে ঘা-টা ওরা পরিষ্কার করে দিত এবং জড়ি-বুটির ওষুধ ও কাঠের একটা গুলি ক্ষতের মধ্যে ভরে দিয়ে, আবার টাইট করে বেঁধে রাখত। এরপরও ওরাই প্রত্যহ ঘা-টা পরিষ্কার করত এবং গুলি ও ওষুধসহ আবার বেঁধেও দিত। ক্ষতটা যাতে তাড়া-তাড়ি শুকোতে না পারে, সেই চেষ্টাই সর্বতোভাবে করা হত। যত পুঁজ বের করা যাবে, বাতের বেদনাও ততই নির্মূল হবে—এই-ই ছিল সংশ্লিষ্ট সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস।

এরপর দীর্ঘ ৩।৪ মাস ধরে, বিরাট ঐ ঘা-টা ওরা একটু একটু করে কমিয়ে আনত। শেষদিকে ক্রমে ছোট আকারের কাঠের গুলি ভরা হত। ক্ষতস্থানটা শুকিয়ে যাওয়ার পর, সামান্য একটু গর্ত এবং বিরাট একটা গোল দাগ চিরদিনের মতো থেকে যেত। গোটা জায়গাটার ওপর উল্কির মতো আঁকা থাকত বেশ স্পষ্ট একটা ত্রিশূল, স্বস্তিকা, বজ্রচিহ্ন অথবা কড়ি! এ-উল্কি কিন্তু সুঁচ ফুটিয়ে করা হত না। শুধু লতা-পাতার ওষুধ দিয়ে দিয়েই, কি কায়দায় যে ওরা চিরস্থায়ী ঐ উল্কিটা দেগে নিত, তা ওরাই জানে! রাক্ষুসে এই চিকিৎসা-প্রণালীতে এটাও ছিল ওদের ট্রেড সিক্রেট। তবে, আশ্চর্য এই যে, বাতের দুরারোগ্য বেদনাটা কিন্তু সত্যি সত্যিই এতে সেরে যেত।

* * *

জাপানে উল্কি এখনও সুকুমার শিল্প হিসেবে সমাদৃত। পূর্বকালের মতো এখনও সেখানে মনোরম উজ্জ্বল গোলাপী রং-এ উল্কি আঁকা হয়। সে-উল্কির চাহিদা এবং জনপ্রিয়তাও কম নয়। জাপানীদের পীতাভ গাত্রচর্মে সে-উল্কিও দেখায় নয়নাভিরাম।

চীনদেশে বেশী দেখা যেত মাছের উল্কি। এরও আঁশগুলো আঁকা হত হাল্কা গোলাপী রং-এ। ড্রাগন প্রভৃতি কিম্ভূত-কিমাকার কাল্পনিক জন্তুও চীনা উল্কি-শিল্পীদের কুশলী হাতের যাদুতে অপরূপ বর্ণসুষমা নিয়ে ফুটে উঠত। সূক্ষ্ম কারু-কাজ এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণসমাবেশের জন্যে প্রাচ্যের এই দুটি দেশের উল্কি এখনও উচ্চ-মানের শিল্পকর্মরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।

উল্কির প্রচলন সর্বত্রই এখন কমে আসছে। আলোকপ্রাপ্ত নব্য আফ্রিকানরা তো বায়-বহুল প্লাস্টিক সার্জারীর দ্বারাও উল্কি উঠিয়ে ফেলতে দ্বিধা করছে না। তবু, বিশিষ্ট এই শিল্পধারাটি ভবিষ্যতে যে একেবারেই অবলুপ্ত হয়ে যাবে—এমন আশংকারও সঙ্গত কোনো কারণ নেই। আধুনিকতার হাওয়া সত্যিই যদি অঙ্গ-রঞ্জনীগুলোকে পুরোপুরি বাতিল কোরে ফেলতে পারত, উত্তর ভারতের খানদানী ঘরের শিক্ষিতা তরুণীরাও তাহলে নিশ্চয়ই আর মেহেদি দিয়ে হাত রাঙাতেন না!

এছাড়া, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের দিকে চেয়ে দেখলেও আমরা আশ্বস্ত হতে পারি যে—উল্কি কোনোদিনই বোধহয় একেবারে লোপ পেয়ে যাবে না। নেপালীভাষায় "বেল্ বুট্টা" নামে অভিহিত এই রূপশিল্পটির লোকপ্রিয়তা শুধু যে অটুটই আছে, তাই-ই নয়। মনে হয়, এটির সমাদর ওদেশে ক্রমে বেড়েই যাবে। অতএব এ-আশাটুকু আমরা নিশ্চিতভাবেই করতে পারি যে—অতীতের মতো, উল্কি ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই প্রচলিত থাকবে। অনাগত দিনের বরবর্ণিনীরাও সাদর অনুরাগে একে অঙ্গে ধারন করবেন।

বহুবিচিত্র শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'নাট্যমন্দিরে'র থিয়েটারের পোস্টারে "অপরাজেয় কথা-শিল্পী" বিশেষণে ভূষিত করা হয়। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র আজও অপরাজেয়, অবশ্য তাঁকে সিংহাসন থেকে টেনে নামানোর অপচেষ্টা যে চলছে না তা নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র শুধু কি কথাশিল্পী হিসাবেই অপরাজেয়? মানুষ এবং সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন আজও হয় নি। শরৎচন্দ্রের জীবন ও কর্মের পুনর্বিচার প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্র গরীব ঘরের ছেলে। পরানুগ্রহে কোনক্রমে কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছে: ১৮৯৪-এ আঠারো বছর বয়সে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ, ১৮৯৫-এ এফ এ ক্লাসে ভর্তি হওয়া এবং ১৮৯৬-এ পড়াশোনা ত্যাগ ও বেকারত্ব পার হয়ে বনালী স্টেটে চাকরী গ্রহণ। এই ত যুবক শরৎচন্দ্রের গোড়ায় ইতিহাস। আনুষ্ঠানিকভাবে যথাযোগ্য বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ তাঁর হয় নি। শরৎ-চন্দ্রের বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বজগৎ, আর সেই জগতের সাধারণ মানুষ তাঁর শিক্ষক। এইভাবে হাতে-কলমে লেখাপড়া শিখে শরৎচন্দ্র মানুষ হয়েছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন এবং একটি বিশেষ কালের বাংলায় চিত্তরঞ্জন, প্রমথ চৌধুরী, অতুলপ্রসাদ, সুভাষচন্দ্র স[illegible]শুতোষ, শ্যামাপ্রসাদ, নির্মলচন্দ্র, শিশির ভাদুড়ী, কিরণশঙ্কর প্রভৃতি চিন্তা-বিদদের কাছে সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

শরৎচন্দ্রের এই যে সম্মান লাভ, এই যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা এর মূলে আছে মুখ্যত তাঁর সাহিত্যকর্ম আর পরোক্ষভাবে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, সত্যকথা বলার দুঃসাহস শিশুর মত সারল্য আর দেশভক্তি। এই উক্তির কিছু প্রমাণ ছড়ান আছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'শরৎচন্দ্রের রচনাবলী'র নতুন সংস্করণ। এই গ্রন্থ ১৩৫৮ সালে সর্বপ্রথম ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "শরৎচন্দ্রের যুগ বৃহত্তর রবীন্দ্র-যুগেরই সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত। এতদ্‌সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের সাধারণ জনপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ইহার সাক্ষ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের গল্প বলার ভঙ্গীতে ও ভাষায় অপূর্ব যাদু ছিল। তিনি কথা-সাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক ছিলেন।"

ব্রজেন্দ্রনাথের উক্তির প্রতিবাদ চলে না। এই কথার পর তিনি শরৎচন্দ্রের মনীষার কথা উল্লেখ করেছেন। শরৎচন্দ্রের মননশীল রচনা সংখ্যায় কম হলেও তা গুরুত্বে উপেক্ষণীয় নয়। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে স্মরণ করবেন।

এই 'অপ্রকাশিত রচনাবলী'র মধ্যে শরৎচন্দ্রের মনীষার পরিচয় ছড়ান আছে। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় তেরো বছর পরে গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়ান শরৎচন্দ্রের যে সব রচনাবলী গ্রন্থা-কারে প্রকাশিত হয় নি তা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। সেই সময় তিনি লিখে-ছিলেন—'পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত শরৎ-চন্দ্রের সকল রচনাই যে নিঃশেষে বর্তমান গ্রন্থে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, একথা জোর করিয়া বলিতে পারি না।' এই উক্তিটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণে সেই জাতীয় আরও কিছু রচনা সংগ্রহ করে প্রকাশ করা উচিত। যেমন এই গ্রন্থে 'রসচক্র' বারোয়ারী উপন্যাসের অংশ আছে কিন্তু 'বারোয়ারী' উপন্যাস ও 'ভালমন্দ' উপন্যাসের যে পরিচ্ছেদ শরৎচন্দ্র লিখিত তা বাদ গিয়েছে।

ব্রজেন্দ্রনাথের পূর্বে শরৎচন্দ্রের এই জাতীয় কিছু রচনা 'স্বদেশ ও সাহিত্য' নামক সন্দর্ভ সংগ্রহে (১৯৩২ আগস্ট) প্রকাশিত হয়। সেই কারণে সেই সব রচনা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। তবে, এই গ্রন্থের পাঠকের পক্ষে ধারাবাহিকত্ব অনু-সরণ করতে হলে 'স্বদেশ ও সাহিত্যে' প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী একযোগে পাঠ কর্তব্য।

শরৎচন্দ্রের দুখানি অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণ' ও 'আগামী কাল' এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শরৎচন্দ্র বোধ করি পৃথিবীর একমাত্র সাহিত্যকার যিনি রচনার পর দীর্ঘকাল এই জগতে বিচরণ করলেও আলস্য বা অন্য কোন কারণে দুইখানি উপন্যাস অসমাপ্ত রেখে গেছেন। অথচ তাগিদ দেওয়ার মত প্রকাশক, সম্পাদক ও ভক্তের অভাব ছিল না। রাধারাণী দেবী শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়' (যা এমনই অসমাপ্ত ছিল) গ্রন্থটি শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর শেষ করেন—'জাগরণ' ও 'আগামী কাল' সেইভাবে হয়ত শেষ করার মত লেখক পাওয়া যেত, তবে এখন সেরকম লেখক বিরল।

শরৎচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত সাহিত্যিক ও সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর অনতিকাল পরে 'বাতায়ন' সাপ্তাহিক পত্রের দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। এই সংখ্যা দুটিতে শরৎচন্দ্র সংক্রান্ত অনেক তথ্য ও রচনা প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের কিছু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও চিঠিপত্র (ফরোয়ার্ড-লিবার্টি পরিচালিত) 'নবশক্তি' পত্রিকায় শরৎ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গবেষকগণ এই পত্রিকাটির সন্ধান করতে পারেন।

শরৎচন্দ্রের 'আত্মকথা' নামক যে অংশটি শ্রীকান্তের ইংরাজী অনুবাদে প্রকাশিত—শরৎচন্দ্রের ইংরাজী বিবৃতি ও তার অনুবাদ এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বাংলা অনু-বাদটি শরৎচন্দ্রের নয়, এই অনুবাদ 'বাতায়ন' সম্পাদকের অনুরোধে শরৎস্মৃতি সংখ্যার জন্য অন্য একজন সাহিত্যিক করে-ছিলেন।

শরৎচন্দ্র যে কি অসাধারণ সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে 'নারীর লেখা', 'কানকাটা', 'সমাজ-ধর্মের মূল্য' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে। এগুলি শরৎচন্দ্রের সুগভীর মননশীলতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। শরৎচন্দ্রের রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য শ্লেষ ও রসিকতারও অজস্র পরিচয় এই প্রবন্ধের মধ্যে ছড়ান।

মহাত্মাজীর প্রতি শরৎচন্দ্রের যে শ্রদ্ধা ছিল তার পরিচয় 'মহাত্মাজী' (পৃ ৬৯), কিন্তু মতপার্থক্য 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা', 'সত্যাশ্রয়ী' প্রভৃতি প্রবন্ধে পরিস্ফুট।

সাহিত্যিকদের প্রতি শরৎচন্দ্রের কি অসীম শ্রদ্ধা ছিল তা নিচের উধৃতি থেকে

বোঝা যাবে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় ব্রজদুর্লভ হাজরা নামক কোন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি তরুণ লেখকদলকে আক্রমণ (কল্লোল ও কালি-কলমের লেখকবৃন্দ) করে রস ও রুচির আলোচনা করেন। শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়ে ১৩ই আশ্বিন ১৩৩৪ 'আত্মশক্তি'তে লিখেছিলেন—

"লোকটি জানেও না (ব্রজদুর্লভ) যে দারিদ্র্য অপরাধ নয়, এবং সর্বদেশে ও কালে ইহারা অনশনে প্রাণ দিয়াছে বলিয়াই সাহিত্যের আজ এতবড় গৌরব।

ব্রজদুর্লভবাবু না জানিতে পারেন কিন্তু 'প্রবাসী'র প্রবীণ ও সহৃদয় সম্পাদকের ত একথা অজানা নয় যে, সাহিত্যের ভাল-মন্দর আলোচনা ও দরিদ্র সাহিত্যিকের হাঁড়ি-চড়া না-চড়ার আলোচনা ঠিক এক বস্তু নয়। আমার বিশ্বাস ইঁহার অজ্ঞাতসারে এতবড় কটূক্তি তাঁহার কাগজে ছাপা হইয়া গেছে এবং এজন্য তিনি ব্যথাই অনুভব করিবেন, এবং হয়ত, তাঁহার লেখকটিকে ডাকিয়া কানে কানে বলিয়া দিবেন—বাপু মানুষের দৈন্যকে খোঁটা দেওয়ার মধ্যে যে রুচি প্রকাশ পায় সেটা ভদ্রসমাজের নয় এবং ঘটি চুরির বিচারে পরিপক্বতা অর্জন করিলেই সাহিত্যের 'রসের' বিচারে অধিকার জন্মায় না। এ দুটোয় প্রভেদ আছে কিন্তু সে তুমি বুঝিবে না।"

অন্যত্র 'ভাগ্যবিড়ম্বিত লেখক-সম্প্রদায়' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—"এই যে সব সাহিত্যিক দেশের জন্য প্রাণপণ করছেন, তাঁদের পুরস্কার হয়েছে শুধু লাঞ্ছনা আর দারিদ্র্য। প্রভূত ধন-সম্পত্তি অর্জন করে বিত্তশালী ও ধনবান হতে তাঁরা চান না, তাঁরা চান শুধু নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় লিখিবার মত একটুখানি অনুকূল আব-হাওয়া, অথচ তাঁরা তাও পান না। আজীবন শুধু ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়েই তাঁদের কাটাতে হয়, যাঁদের কল্যাণকামনায় তাঁরা জীবন উৎসর্গ করলেন তাঁরা একবার সেদিকে ফিরেও তাকায় না।

দেশের লোক তাদের দেয় না কিছু, অথচ তাদের কাছ থেকে চায় অনেক। কোথাও কেউ যদি একটু খারাপ লেখা লিখেছে, অমনি তাঁর সমালোচনার বিষে আর নিন্দার তীক্ষ্ণ শরে তাকে জর্জরিত হতে হয়।

এই অতিনিন্দিত গল্পলেখকদের দৈন্যের সীমা নেই।"

(বাতায়ন — ১৩৪৪)

শরৎচন্দ্রের রচনা আরো উদ্ধৃতিদানের লোভ হয়। এই যুগে এই জাতীয় সহানুভূতিভরা সাহসোক্তি শোনা যায় না। সাহিত্যিকদের প্রতি দরদী সাহিত্যিক আজ বিরল।

এই গ্রন্থে 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ' 'মুসলমান সাহিত্য', 'সাহিত্যের আর এক দিক' প্রভৃতি প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের অপর শরিক মুসলিম সমাজের সাহিত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। মুসলিম পাঠক তাঁকে অনুযোগ জানায় বলে "আপনারা আমাদের টেনে নিন। স্নেহের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা বলুন।" এর জবাবে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—একথা আমি জানি, কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভাল কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এ ত তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে, যা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। তারচেয়ে যা আছে, সেই ত নিরাপদ।" এ'র নাম শরৎচন্দ্র, যা ভাল বুঝতেন বলতেন, মন রাখা কথা নয়, নিজের ক্ষয়-ক্ষতির দিকে তাকিয়ে নয়। কোনরকম প্রাপ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে নয়, তাই মহাত্মাজী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁর যাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র তাঁদের সম্পর্কেও তিনি যা যোগ্য বিবেচনা করেছেন তা বলতে পেরেছেন।

শরৎচন্দ্রের এই 'অপ্রকাশিত রচনাবলী' বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। এই সুমুদ্রিত গ্রন্থটিতে কয়েকটি মারাত্মক ছাপার ভুল আছে, যা এই জাতীয় গ্রন্থে থাকা অনুচিত। শরৎচন্দ্রের একখানি ছবি থাকলে ভাল হত।

—অভয়ংকর

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী

(সংকলন) — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রকাশক—বাক সাহিত্য। কলেজ রো। কলিকাতা—৯। দাম আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

ভারতীয় সাহিত্য

শ্রীনগরে সাহিত্যবাসর ॥

সম্প্রতি বসন্ত উৎসব উপলক্ষে শ্রীনগরে একটি চিত্রপ্রদর্শনী এবং মুশায়রা অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন 'জম্মু ও কাশ্মীর আকাদমী'। শ্রীনগরের 'টুরিস্ট রিসেপসান সেন্টার হলে' যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়, তাতে ৩১ জন শিল্পীর ৫২টি ছবি প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়াও শিশু-শিল্পীদের ২৫টি ছবিও অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়।

'মুশায়রা'র উদ্বোধন করে শ্রীজগন্নাথ আজাদ। কাশ্মীরের প্রায় ১৫ জন কবি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

শিশুসাহিত্যের পুস্তক প্রদর্শনী ॥

মাদ্রাজে একটি শিশুসাহিত্যবিষয়ক পুস্তকের প্রদর্শনী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন মাদ্রাজের শিক্ষামন্ত্রী। তিনি তাঁর ভাষণে শিশু-সাহিত্য রচনার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা ছিলেন মাদ্রাজের 'শিশুসাহিত্য লেখক সংস্থা'। এই সংস্থার পক্ষ থেকে ভারতীয় শিশুসাহিত্য লেখকদের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ চলেছে।

অমৃত প্রিতম

ভারতবর্ষে যে সমস্ত মহিলা কবি ও লেখক আছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী অমৃত প্রিতম অন্যতম। এ পর্যন্ত তাঁর ৩৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে কবিতা, গল্প, উপকথা, জীবনকাহিনী ও উপন্যাস।

১৯১৯ সালের ৩১ আগাস্ট অবিভক্ত পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালায় (বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্থানে) তাঁর জন্ম হয়। অতি অল্প-বয়সেই তিনি তাঁর মাকে হারান। বস্তুতপক্ষে পিতা শ্রীকর্তার সিং হিতকারীর অনু-প্রেরণাতেই তিনি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। মাত্র পনের বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। এক পুত্র এবং এক কন্যার তিনি জননী। ১৯৫৩ সালে তিনি 'সাহিত্য আকাদমী' পুরস্কার লাভ করেন। ভারতীয় মহিলা লেখকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই সম্মানে ভূষিত হন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম "অমৃত লহরে"। প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। ভারতীয় এবং বিদেশী ভাষাতেও তাঁর অনেক রচনা অনূদিত হয়েছে। ইংরেজিতে যাঁরা তাঁর কবিতা অনুবাদ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, খুশবন্ত সিং, প্রভাকর মারওয়ে, চার্লস ব্রাশ, হরভাজন সিং। শ্রীমতী প্রিতমও বহু কবিতার পাঞ্জাবী অনুবাদ করেছেন। মাত্র ক'দিন আগে তিনি নয়াদিল্লীর সাহিত্য আকাদমী ভবনে সাম্প্রতিক যুগোশ্লাভিয়া হাঙ্গেরী ও রুমানিয়ার কবিতার অনুবাদ পাঠ করেন।

সম্প্রতি 'অমৃত'র প্রতিনিধি তাঁর সংগে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। সমকালীন সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। পাঠকের সুবিধার্থে এই সাক্ষাৎ-এর বিবরণ প্রশ্নোত্তর আকারেই লিপি-বদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ—কবি সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ—কবি সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে। পরস্পরের সংগে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে—এটাও কি কম? তাছাড়া ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে, যেখানে পরস্পরের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুই জানি না, সেখানে সাহিত্য বা কবি সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা খুবেই বেশি। আমাদের ভাষা আলাদা হলেও সমস্যা তো একই। বিভিন্ন প্রদেশের কবি এবং লেখকরা কি ভাবছেন, সে সম্বন্ধে জানবার একটা সুযোগও ঘটে এই ধরনের সম্মেলনে।

প্রশ্ন ঃ—অনেকে বলেন, কবিতার যথার্থ অনুবাদ হয় না। এ সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন?

উত্তর ঃ—কবিতার অনুবাদের অনেক সমস্যা আছে ঠিকই। ভাল কবিতার ভাল অনুবাদ হবে, একথাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। তবে অনুবাদ ছাড়া পরস্পরকে জানবার আর কি উপায় আছে?

অমৃত প্রিতম

প্রশ্ন ঃ—রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?

উত্তর ঃ—মূল ভাষায় আমি পড়ি নি। অনুবাদের মাধ্যমেই আমি পড়েছি। আমার গীতাঞ্জলি খুব ভাল লাগে নি। তবে রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাই আমাকে মুগ্ধ করেছে।

প্রশ্ন ঃ—আধুনিক পাঞ্জাবী তরুণ কবিদের কার কার রচনা আপনার ভাল লাগে।

উত্তর ঃ—ডঃ হরভাজন সিং এবং শিবকুমারের লেখা আমার সবচেয়ে প্রিয়। শিব-কুমারের লেখায় 'বীট' কবিদের প্রভাব আছে সত্য—কিন্তু ভাল লাগে, কারণ সে মনে-প্রাণে বর্তমান সমাজজীবনকে অনুভব করতে পেরেছে। যাঁরা অনুভব না করে কেবল অনুসরণ করতে চান, তাঁদের রচনা প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ঃ—আধুনিক বাংলা সাহিত্য আপনার কেমন লাগে?

উত্তর ঃ—পড়ি নি। কেবল নাম শুনেছি কয়েকজনের। অনেকের লেখাই পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু অনুবাদ না পেলে পড়ব কেমন করে?

প্রশ্ন ঃ—বাংলায় কি আপনার কোনও লেখা অনূদিত হয়েছে?

উত্তর ঃ—শুনেছি দুই-একটা হয়েছে। বাংলায় অনুবাদ হলে আমি সত্যি খুশি হব। আমার লেখা অনেক ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে, কিন্তু বাংলায় তেমন হয় নি। সুযোগ পেলে আমিও বাংলা থেকে পাঞ্জাবীতে অনুবাদ করব। সাহায্য পেলে আমার সম্পাদিত "নাগমণি" পত্রিকার একটি সংখ্যাও বাংলা সাহিত্যের উপর করতে পারি।

বিদেশী সাহিত্য

সিজার পাভেসের রচনা সংগ্রহ ॥

ইতালীয়ান সাহিত্যের প্রচুর অনুবাদ হয় ইউরোপ ও আমেরিকায়। কিন্তু পাভেসের লেখা সম্পর্কে এই দুই দেশই উদাসীন। বিদেশী ভাষায় তাঁর গল্প-উপন্যাসের অনুবাদ হয়েছে সামান্যই।

অথচ একদা তিনি তাঁর স্বদেশে স্বতন্ত্রবাদের বেশ কিছুসংখ্যক গ্রন্থ লিখে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কোনপ্রকার বাঁধাধরা পথ ও পদ্ধতিকে অনুসরণ করে তিনি লেখা শুরু করেন নি। সৃজনশীলতায় তিনি ছিলেন অনন্য পুরুষ।

আজ থেকে আঠারো বছর আগে ১৯৫০ সালে তাঁর মৃত্যু হয় অস্বাভাবিকভাবে। মনোবিকারে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে।

সম্প্রতি বিদেশের প্রকাশকরা তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এই উৎসাহের প্রাথমিক ফলশ্রুতি হিসেবে আমেরিকা থেকে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম 'সিলেকটেড ওয়ার্কস অব সিজার পাভেসে'।

পাভেসের চারটি ছোট উপন্যাসের অনুবাদ এই নির্বাচিত সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। চারটি উপন্যাসই অ্যান্টিরোম্যান্টিক, ভাবালুতাবর্জিত এবং যুক্তিবাদী মনস্তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ক্লড সিমোন ॥

আধুনিক ফরাসী সাহিত্যে ক্লড সিমোন একটি পরিচিত ও জনপ্রিয় নাম। আঙ্গিক প্রকরণ, গঠনকৌশল ও চরিত্র-চিত্রণে তিনি সম্পূর্ণ নতুন ধারার প্রবর্তক। গতানুগতিক কাহিনীকথনে তাঁর তৃপ্তি নেই। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ব্যাপারে তিনি সচেতন। শব্দ ব্যবহারে সতর্ক।

ইদানীং তিনি গল্প-উপন্যাসের আঙ্গিককে পারিবারিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সংগে নিজের ও পরিবারের সম্পর্কটিও স্থাপিত হওয়া দরকার। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষারই সাম্প্রতিক ফলশ্রুতি 'হিস্টয়ের' নামে একটি গ্রন্থ।

এটি উপন্যাস নয়। পারিবারিক জীবনের ছোট-ছোট অসংখ্য ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি কাহিনীই চিত্রপ্রধান, মনোরম, এবং পরস্পরবিচ্ছিন্ন। এদিক থেকে গ্রন্থটির 'ইতিহাস' নাম হয়তো সার্থক হয় নি।

এই গ্রন্থের ভাষা শান্ত, মিষ্টি ও লিরিক্যাল। বর্ণনার মধ্যে কোনপ্রকার বাহুল্য নেই। প্রতিটি ঘটনাই স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক। প্রতিটি অংশই তাই সাধারণ পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছে। রবীন্দ্র-নাথের 'জীবনস্মৃতি'কে প্রায় এর সমশ্রেণীর রচনা বলা যায়।

আইরীশ উপন্যাস ॥

পরলোকগত প্রখ্যাত আইরিশ লেখক ফ্লান ও'ব্রিয়েন কয়েকটি উপন্যাস লিখে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। সমালোচকেরা তাঁকে জয়েসীয়ান ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক বলে মনে করেন।

প্রায় ২৮ বছর আগে, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি 'দি থার্ড পুলিশম্যান' নামে একটি উপন্যাস লেখেন। পৃথিবীর বহু দেশে উপন্যাসটি সমাদৃত হয়। কিন্তু মার্কিন-দেশে তার কোনো প্রচার হয়নি।

সম্প্রতি আমেরিকা থেকে এই উপন্যাসটির একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

ঝিনুক খুলে মুক্ত

সুশীল রায়

দুটি ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে রাজলক্ষ্মী।

কয়েকদিন ধরে ওদের অনেক খোঁজ-খবর করে কোনো কিনারা করতে না পেরে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আদিত্য।

পাড়াপ্রতিবেশীদের সান্ত্বনায় ও সমবেদনায় ও আরো বেশি ক্লান্ত।

আপিসে সময়টা তবু কাজে-অকাজে কেটে যায়। আপিসের ছুটি হবার সময় হলেই আতঙ্ক বোধ করে আদিত্য। আবার ঐ ফাঁকা বাড়িতে গিয়ে তালা খুলে তাকে ঢুকতে হবে—এই তার আতঙ্ক।

আগে সিগারেট খেত, কিছুদিন থেকে সিগারেট ছেড়ে সে বিড়ি খেতে আরম্ভ করেছে। ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বিড়ির ধোঁয়া শূন্যে ছুঁড়তে ছুঁড়তে আদিত্য নিজের মনেই বলে ওঠে—লক্ষ্মী। মনে-মনেই সে বলেছে, কিন্তু হঠাৎ তার গলা দিয়ে শব্দ বেরিয়ে গেল, নিজের গলার শব্দে নিজেই সে চমকে উঠল।

জীবনটা যে এমন হয়ে যাবে, এ-কথা কে ভেবেছিল দশ বছর আগে? দশ বছর আগে সে ছিল ব্যাচিলার, দশ বছর পরে আজ আবার সে ব্যাচিলার। কিন্তু ঐ দুটো অবস্থার মধ্যে এ যে একটা আকাশ-পাতাল প্রভেদ!

আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল আদিত্য। সত্যি, গেল কোথায় ওরা? আচ্ছা যদু জানে তো ঐ মেয়েটা। একজনের পক্ষে নিজেকে লুকিয়ে রাখাই দায়, তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে কী করে গা-ঢাকা দিল রাজলক্ষ্মী!

সংসারটা বেশ সচ্ছলই তো ছিল। একে-একে তিনটি ছেলেমেয়ে হল, তাতেও এমন কিছু অনটন হবার কথা না। তাদের মধ্যে যে অশান্তি ও খিটিমিটি বাধল তা তো ঐ অনটনের জন্যেই! অনটনই বা হবে না কেন। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে হু-হু করে।

এই তো মাসখানেক আগের কথা। বটকৃষ্ণ এসেছিল বর্ধমান থেকে। কলকাতার হালচাল দেখে তো অবাক। বলেছিল, "কলকাতার লোকের টাকা ইলাস্টিক নাকি রে? টানলেই বুঝি বেড়ে যায়?"

"কি রকম?" জিজ্ঞাসা করেছিল আদিত্য।

"রকম তো দেখছি মজারই। চার টাকা কিলো দরেও চাল কিনছে লোকে। টাকা পাচ্ছে কোথায়, আসছে কোত্থেকে!"

আশ্চর্য প্রশ্ন করেছে বটকৃষ্ণ। সত্যি,

কাউড্রের বিদায়ে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা আনন্দে লাফ দেন। ধৈর্যের পাথর হয়ে খেলেছিলেন ইংল্যান্ডের ওপনিং ব্যাটসম্যান জিওফ বয়কট—তাঁর ৩৫ রান উঠেছিল দীর্ঘ ২০৩ মিনিটের খেলায়।

অস্ট্রেলিয়া এই দিনের বাকি সময়ের খেলায় দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ৬০ রান তুলেছিল।

চতুর্থ দিনে ২২০ রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। লাঞ্চের সময় তাদের রান ছিল ১৮৮ (৫ উইকেটে)। লাঞ্চের পরের খেলায় তারা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়—বাকি ৫টা উইকেটে মাত্র ৩২ রান উঠেছিল। তাদের প্রথম ইনিংসের খেলারই পুনরাবৃত্তি। প্রথম ইনিংসের শেষ ৬টা উইকেটে ৩৮ রান উঠেছিল। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় মারাত্মক বল করেন প্যাট পোকক (৭৯ রানে ৬টা উইকেট)।

ইংল্যান্ড ৪১২ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। খেলার এ-অবস্থায় তাদের জয়লাভের জন্যে যে ৪১৩ রানের প্রয়োজন হয়, তা সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। এই দিনের খেলায় ইংল্যান্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১৫২ রান সংগ্রহ করেছিল। ফলে পরাজয়ের হাত থেকে ছাড়ান পেতে তাদের আরও ২৬০ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে ছিল একদিনের পুরো খেলা এবং পাঁচটা উইকেট।

পঞ্চম দিনের লাঞ্চের আগে ২৫৩ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়—অস্ট্রেলিয়া ১৫৯ রানে জয়ী হয়। আফ্রিকান খেলোয়াড় বেসিল ডি' অলিভেরা শেষপর্যন্ত ৮৭ রান করে অপরাজিত থেকে যান।

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার সদ্য সমাপ্ত ১৯৬৮ সালের (১১ জুন) প্রথম টেস্ট খেলাটির তাৎপর্য : (১) এই খেলাটি ছিল, ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ১৯৯তম টেস্ট, এই দুই দেশের (২) ইংল্যান্ডের মাটিতে ৯২তম এবং (৩) ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ২০তম টেস্ট খেলা।

দুই দলের খেলোয়াড়বৃন্দ

(ব্যাটিংয়ের ক্রমিক অনুযায়ী নাম)

অস্ট্রেলিয়া : বিল লরী (অধিনায়ক), আয়ান রেডপাথ, বব কাউপার, ডগ ওয়াল্টার্স, পল শিহান, আয়ান চ্যাপেল, বেরী জার্ম্যান, নীল হক, গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি, জন গ্লীসন এবং এ্যালান কনোলী।

ইংল্যান্ড : জন এডরিচ, জিওফ বয়কট, কলিন কাউড্রে (অধিনায়ক), টম গ্রেভনী, ডেনিস এমিস, বব বারবার, বেসিল ডি' অলিভেরা, এ্যালান নট, জন স্নো, কেন হিগস এবং প্যাট পোকক।

এক ঐতিহাসিক অভিনন্দন : উইম্বলেডন টেনিস কোর্টে নিগ্রো মহিলা খেলোয়াড় কুমারী এ্যালথিয়া গিবসনকে (আমেরিকা) তাঁর ১৯৫৭ সালের উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব জয়ের পুরস্কার হাতে পাওয়ার পর ফাইনাল খেলার শ্বেতাঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বিনী কুমারী ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) অভিনন্দন জানাচ্ছেন। ১৯৫৭ সালের সিঙ্গলস ফাইনালে কুমারী গিবসন ৬-৩ ও ৬-২ গেমে কুমারী ডার্লিন হার্ডকে পরাজিত করেন এবং কুমারী ডার্লিন হার্ডের জুটিতে ডাবলস খেতাব জয় করেন। নিগ্রো পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র কুমারী গিবসনই এ-পর্যন্ত উইম্বলেডন খেতাব পেয়েছেন—উপর্যুপরি ২ বার সিঙ্গলস (১৯৫৭-৫৮) এবং উপর্যুপরি ৩ বার ডাবলস (১৯৫৬-৫৮)।

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা

বিশ্ব-বিশ্রুত উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার ৮২তম বার্ষিক অনুষ্ঠান আগামী ২৪শে জুন থেকে অল-ইংল্যান্ড টেনিস ক্লাবের ঐতিহাসিক উইম্বলেডন কোর্টে আরম্ভ হচ্ছে। আন্তর্জাতিক টেনিস আসরে প্রধান দুটি প্রতিযোগিতার নাম—পুরুষদের দলগত 'ডেভিস কাপ' প্রতিযোগিতা এবং পুরুষ ও মহিলাদের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান নিয়ে এই উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতা। এই দুই প্রতিযোগিতার খেতাব বিশ্বপর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই দুই প্রতিযোগিতার সুমহান ঐতিহ্য এবং বিপুল জনপ্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বপর্যায়ে পৃথক লন টেনিস প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করেন না।

ঐতিহ্য এবং প্রাচীনত্বের দিক থেকে এই উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন অনুষ্ঠান নেই। বিশ্বের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কাছে ইংল্যান্ডের লর্ডস ক্রিকেট মাঠ যেমন মহা-তীর্থস্থান তেমনি টেনিস খেলোয়াড়দের

কাছে লণ্ডন-শহরতলী উইম্বলেডনের অল-ইংল্যান্ড টেনিস ক্লাবের সুরম্য টেনিস কোর্ট। এখানে শুধু খেলার সুযোগ পেয়েই খেলোয়াড়দের জীবন ধন্য হয়, খেতাব জয় হাতে ভূস্বর্গ পাওয়ার সমান। স্থান মাহাত্ম্যে প্রতিযোগিতার সরকারী 'অল-ইংল্যান্ড লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ' নামটা ডুবে গিয়ে সেখানে উইম্বলেডন লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ নামে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। উইম্বলেডনের আন্তর্জাতিক খ্যাতি শুধু টেনিস খেলা নিয়ে নয়। উইম্বলেডনের আর এক বিশেষ আকর্ষণ তার মনোহারিত্ব—তরুছায়ায় পরিবেষ্টিত স্নিগ্ধ পরিবেশ। মনোহারিত্ব এবং স্বাচ্ছন্দ্যের স্বর্গ এই উইম্বলেডন টেনিস কোর্টের যেমন বিশ্বজোড়া খ্যাতি তেমনি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। এইখানেই শেষ নয়। খেলার দিনগুলিতে মহিলাদের বিচিত্র সাজ-সজ্জা, পরিপাটি প্রসাধন, কাকলি কণ্ঠে বাক্যালাপ এবং চটুল হাস্য-রোল—সমস্ত মিলিয়ে উইম্বলেডনের খেলার আসর যে মোহিনীরূপ ধারণ করে তার আকর্ষণ উপেক্ষা করার মত বে-রসিক লোক খুব কমই আছেন। উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় টিকিটের চাহিদা কোন সময়েই পূরণ করা যায় না। টিকিটের মূল্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েও হাজার হাজার টেনিস-অনুরাগী শেষ পর্যন্ত হতাশ হন।

অবিস্মরণীয় নাম

উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৯২ বছরের ইতিহাসে (১৮৭৭-১৯৬৮) কয়েকটি অবিস্মরণীয় নাম : ইংল্যান্ডের কুমারী চারলোট ডড্, উইলিয়াম এবং আর্নেস্ট রেনশ (দুই ভাই), আর এফ এবং এইচ এল ডোহার্টি (দুই ভাই) এবং ফ্রেড পেরী ; আমেরিকার কুমারী এলিজাবেথ রায়ান, কুমারী হেলেন উইলস-মুডী, উইলিয়াম টাটেম টিলডেন এবং ডোনাল্ড বাজ ; ফ্রান্সের মাদমোয়াজেল সুজান লংলং এবং 'ফোর মাস্কেটিয়ার্স'—জ' বোরোত্রা, রনে লাকোস্ত, জাক ব্রুনো এবং অঁরি কশে ; অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার।

১৯৬৮ সালের ৮২তম উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা উপলক্ষ করে এই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল। এতদিন এই প্রতিযোগিতা ছিল শুধু অপেশাদার খেলোয়াড়দের জন্যে। এ বছর পেশাদার খেলোয়াড়দের যোগদানের ফলে প্রতিযোগিতার রক্ষণশীল নীতির যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনি খেলা দেখার আকর্ষণ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় ৩১৩ জন খেলোয়াড়দের মধ্যে বিগত দিনের এই সাতজন উইম্বলেডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান আছেন—পেরুর এ্যালেক্স ওলমেডো, স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা, অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাংক সেজম্যান, রড লেভার, রয় এমার্সন, জন নিউকম্ব এবং লিউ হোড।

১৯৬৮ সালের প্রতিযোগিতায় যে-সব খ্যাতনামা পেশাদার খেলোয়াড় পুরুষ বিভাগে যোগদান করবেন তাঁদের নাম—অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার, কেন রোজওয়াল, রয় এমার্সন, ফ্রেড স্টোলে, লিউ হোড, জন নিউকম্ব এবং টনি রোচ, আমেরিকার প্যাঞ্চো গঞ্জালেস এবং ডেনিস রলস্টন, স্পেনের এ্যান্দ্রিজ গিমেনো, বৃটেনের রগার টেলর, যুগোশ্লাভিয়ার নিকোলা পিলিক এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লিফ ড্রিসডেল। এঁদের মধ্যে লিউ হোড (১৯৫৬-৫৭), রড লেভার (১৯৬১-৬২) এবং রয় এমার্সন উপর্যুপরি দু'বার করে উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন। মহিলা বিভাগে পেশাদার খেলোয়াড়দের উল্লেখযোগ্য নাম—১৯৬৭ সালের 'ত্রিমুকুট' খেতাব বিজয়িনী শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা), এ্যান জোন্স (বৃটেন), রোজমেরী ক্যাসেলস (আমেরিকা) এবং শ্রীমতী ফ্রাঁসোয়াজ ডুর (ফ্রান্স)।

বিবিধ রেকর্ড

সর্বাধিক যোগদান : ২৯ বার—জ' বোরোত্রা (ফ্রান্স)। তিনি উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করেন ১৯২২ সালে এবং শেষ খেলেন ১৯৫৮ সালে। এই ১৯২২ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে দু' বছর (১৯৪৬-৪৭) তিনি অংশ গ্রহণ করেননি। দ্বিতীয় যুদ্ধের জন্যে ৬ বছর (১৯৪০-৪৫) খেলা হয়নি।

সর্বকনিষ্ঠা চ্যাম্পিয়ান : কুমারী চারলোট ডড্ (জন্ম ১৮৭১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর)। ১৮৮৭ সালে যখন তিনি সিঙ্গলস খেতাব পান তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে তিনিই সবথেকে কম বয়সে উইম্বলেডন খেতাব জয় করেছেন।

সর্বকনিষ্ঠ পুরুষ চ্যাম্পিয়ন : উইলফ্রেড ব্যাডলি (জন্ম ১৮৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী)। ১৮৯১ সালের ৪ঠা জুলাই সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৯ বছর ৫ মাস ২৩ দিন।

সর্বকনিষ্ঠ ডাবলস চ্যাম্পিয়ান: অস্ট্রেলিয়ার লুই হোড (জন্ম ১৯৩৪, ২৩ নভেম্বর) এবং কেনেথ রোজওয়াল (জন্ম হোডের থেকে ৩ সপ্তাহ আগে)। ১৯৫৩ সালে ডাবলস খেতাব জয়ের সময় তাঁদের বয়স ছিল আঠার বছর।

সর্বাধিক খেতাব জয় : ১৯টি—কুমারী এলিজাবেথ রায়ান (আমেরিকা)—মহিলাদের ডাবলস খেতাব ১২টি (৫জন জুটির সহযোগিতায়) এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব ৭টি (৫জন জুটির সহযোগিতায়)। কুমারী রায়ান প্রথম খেতাব পান ১৯১৪ সালে এবং শেষ ১৯তম খেতাব ১৯৩৪ সালে।

সর্বাধিক খেতাব জয় (পুরুষদের পক্ষে) : ১৪টি—উইলিয়ম সি রেনশ (ইংল্যান্ড) —৭টি সিঙ্গলস খেতাব এবং ৭টি ডাবলস খেতাব (যমজ ভাই আর্নেস্ট রেনশ-র সহযোগিতায়)।

সর্বাধিক সিঙ্গলস খেতাব জয় : ৮টি—আমেরিকার কুমারী হেলেন উইলস-মুডী (বিবাহিত জীবনে শ্রীমতী রোয়ার্ক)। ১৯২৭ সালে প্রথম খেতাব এবং ১৯৩৮ সালে তাঁর ৮ম খেতাব পান।

সর্বাধিক পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয় : ৭টি—উইলিয়ম সি রেনশ (ইংল্যান্ড)।

সর্বাধিক উপর্যুপরি খেতাব জয় : পুরুষদের সিঙ্গলস : ৬ বার (১৮৮১-৮৬) —উইলিয়ম সি রেনশ (ইংল্যান্ড)।

মহিলাদের সিঙ্গলস : ৫বার (১৯১৯-২৩) —মাদমোয়াজেল সুজান্ লংলং (ফ্রান্স)

সর্বাধিক পুরুষদের ডাবলস খেতাব জয় : ৮টি—দুই সহোদর আর এফ এবং এইচ এল ডোহার্টি (ইংল্যান্ড)

সর্বাধিক মহিলাদের ডাবলস খেতাব জয় : ১২টি—এলিজাবেথ রায়ান (আমেরিকা)

সর্বাধিক মিক্সড ডাবলস খেতাব জয় : ৭টি—কুমারী এলিজাবেথ রায়ান (আমেরিকা)।

বিদেশী খেলোয়াড়দের প্রথম জয়

পুরুষদের সিঙ্গলস : ১৯০৭ সালে নরম্যান ব্রুকস (অস্ট্রেলিয়া)

মহিলাদের সিঙ্গলস : ১৯০৫ সালে কুমারী মে সাটন (আমেরিকা)

স্বামী-স্ত্রীর মিক্সড ডাবলস খেতাব জয় : শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা এল এ গডফ্রি (১৯২৬ সালে) ; প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র নজির।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে দুই বোন : —লিলিয়ান এবং মাউড ওয়াটসন (১৮৮৪ সালে)। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র নজির। এই খেলায় কুমারী মাউড ওয়াটসন সিঙ্গলস খেতাব জয় করেন।

দুর্লভ 'ত্রিমুকুট' সম্মান

উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৫৫ বছরের (১৯১৩-৬৭) ইতিহাসে একই বছরের আসরে তিনটি খেতাব জয়ের সূত্রে দুর্লভ 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন মাত্র ৮জন খেলোয়াড় (মহিলা ৫জন এবং পুরুষ ৪জন) মোট ১২ বার।

সুজান্ লংলং (ফ্রান্স) : ৩বার (১৯২০, ১৯২২ ও ১৯২৫)

এলিস মার্বেল (আমেরিকা) : ১ বার (১৯৩৯) ; লুই ব্রাউ (আমেরিকা) : ২ বার (১৯৪৮ ও ১৯৫০) ; ডরিস হার্ট (আমেরিকা) : ১ বার (১৯৫১) ; বিলি জিন কিং (আমেরিকা) : ১ বার (১৯৬৭)

ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা) : ২ বার (১৯৩৭-৩৮)

ববি রিগস (আমেরিকা) : ১ বার (১৯৩৯)

ফ্র্যাংক সেজম্যান (অস্ট্রেলিয়া) ১ বার (১৯৫২)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

৮ম বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

১০ম সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 12th July, 1968. শুক্রবার, ...শে আষাঢ়, ১৩৭৫ 40 Paise.

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : গণেশ পাইন

কালীঘাটের চিত্রকর

অমৃত ৭ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীশ্রীশচন্দ্র চিত্রকরের পত্রের প্রতিবাদে কালীঘাটের চিত্রকর সমিতির পক্ষ থেকে এই পত্র লিখিত হচ্ছে। শ্রীশ চিত্রকর তাঁর পিতা স্বর্গত রজনীকান্ত চিত্রকরকে কালীঘাটের শেষ পটুয়া হিসাবে দাবী করেছেন। এটা সত্য নয়। ১৯৬৫ সালে বেতারজগতে (১৬—২০ নভেম্বর) প্রকাশিত শ্রীঅহিভূষণ মালিকের সঙ্গে রজনীকান্ত চিত্রকরের এক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। রজনীকান্ত চিত্রকর সেখানেও দাবী করেন যে, তিনিই কালীঘাটের শেষ পটুয়া। কালীঘাট চিত্রকর সমিতির তরফ থেকে আমরা কয়েকজন প্রতিবাদ পেশ করার জন্য শ্রীঅহিভূষণ মালিক মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আপন অজ্ঞতা অকপটে স্বীকার করেন এবং আমাদের অনুরোধে কালীঘাটে চিত্রকর সমিতির কার্যালয় পরিদর্শন করতে আসেন। তাঁর নিকট আমরা পুরাতন কাগজপত্র পেশ করি এবং আমাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর সামনে বসে কালীঘাটের প্রথাগত পদ্ধতিতে পট এঁকে প্রমাণ করে যে কালীঘাটে আজও একাধিক শক্তিশালী চিত্রকর জীবিত। তিনি নিঃসন্দেহ হয়ে ১৮ই পৌষ ১৩৭২ দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় বর্তমান কালীঘাটের চিত্রকর সমাজ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। মার্কাস স্কোয়ারে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে ১৯৬৬ সালে কালীঘাটের জীবিত পটুয়াদের চিত্রকলার একটি প্রদর্শনীতেও প্রমাণিত হয়েছে যে কালীঘাটে একাধিক শক্তিশালী পটুয়া আজও জীবিত।

শ্রীমালিক বোম্বাই-এর Illustrated Weekly of India পত্রিকায় (Sunday March 31, 1968) লিখেছেন কালীঘাটের চিত্রকর সমাজের কথা। কি নিদারুণ অবস্থায় আজ চিত্রকর সমাজ বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ করছে তা চাক্ষুষ না দেখলে কেউ বুঝতে পারবেন না। প্রতি ঘরে যক্ষার প্রকোপ, সেকথা শ্রীমালিক উল্লেখ করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কলকাতার কড়চা' শীর্ষক স্তম্ভেও মুমূর্ষু চিত্রকরদের কথা উল্লেখ হয়েছে।

আমরা কালীঘাট চিত্রকর সমিতির পক্ষ থেকে দৃঢ়কণ্ঠে জানাচ্ছি কালীঘাটের শেষ পটুয়া রজনীকান্ত চিত্রকর নন। একথা প্রমাণের জন্য আমরা সবসময়েই প্রস্তুত।

জহর চিত্রকর
পার্বতী চক্রবর্তী লেন
কলকাতা—২৬

॥ সোনার ডালের ভারে ॥

অমৃতের ১৪ই আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি সুন্দর হয়েছে, তবে কয়েক জায়গায় তথ্যগত বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। আইনের দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র অন্যকোন রাষ্ট্র বা কোন বিদেশীকে ৩৫ ডলার হারে সোনা বিক্রয় করতে বাধ্য নয়, একটি বিখ্যাত পত্রিকার মতে—'

"Our policy of selling gold is just that—a policy."

৫৮৩ পৃঃ ৩য় অনুচ্ছেদে শ্রীমুখোপাধ্যায় যে প্রতিশ্রুতির কথা বলেছেন সেটা আইনগত বাধ্যবাধকতা নয়। এই পৃষ্ঠার ৫ম অনুচ্ছেদে ডলারের অবনতির দ্বিতীয় কারণটিও খুব ঘোরাটে। এটা ঠিক যে কমন মার্কেট দেশগুলি তাদের মজুদ ভান্ডারের জন্য ডলারকে সোনাতে পরিবর্তিত করে নেয়। কিন্তু এই দেশগুলিতে বিনিয়োগের কাজে ডলারের কদর কমে নি। এরা এখনও ছুটে যায় নিউইয়র্কের টাকার বাজারে ডলার কর্জ করার জন্য। জনসন-শাসনই বরং ইদানীং কঠোরভাবে ইউরোপগামী এই ডলার প্রবাহকে বন্ধ করতে তৎপর। এই পৃষ্ঠারই ৮ম অনুচ্ছেদে লেখক 'জাতীয় আয়ব্যয়' বলতে সম্ভবত 'বৈদেশিক বাণিজ্যের আয়ব্যয়কে' বোঝাচ্ছেন, কিন্তু দুটো একই জিনিস নয়। এটা ঠিক যে বিশ্ববাণিজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, মোট লেনদেনে কন্টিনেন্টের বৈদেশিক বাণিজ্যের বর্তমান উদ্বৃত্ত যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতিরই অপর পিঠ। কিন্তু তাই বলে এটা বলা নেহাতই ভুল যে '... কন্টিনেন্টের অর্থনৈতিক জোয়ার মানে হলো আমেরিকার অর্থনীতিতে ভাঁটা'। এ দুটি অর্থনৈতিক এলাকা একে অপরের জোয়ারকে বর্ধিত করে। এক এলাকার জোয়ার অন্য এলাকায় ভাঁটার সৃষ্টি করে না।

কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত সব সময় সে দেশের অর্থনৈতিক জোয়ারের পরিচায়ক নয়। আমেরিকায় অনেকবারই বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক ভাঁটার সময়।

মাণিক সাহা
অধ্যাপক, করিমগঞ্জ কলেজ,
আসাম

আলেকজান্ডার হ্যামিলটনের দেখা কলকাতা প্রসঙ্গে

অমৃত-এর ৭ম সংখ্যায় নারায়ণ দত্তের 'আলেকজান্ডার হ্যামিলটনের দেখা কলকাতা'র বিবরণে ইংরেজের বেনিয়া চরিত্রের সুন্দর রূপটি বেশ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এদেশে বাণিজ্য করতে এসে ইংরেজ রাজপুরুষেরা যে কোনরকম ছলাকলার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেন নি সেকথা নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁদেরই জাতভাই নিজেদের চরিত্রস্বরূপ উদ্ঘাটনে যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা অবিশ্বাস্যরকম সত্য। নিজেদের দোষ-ত্রুটির এরকম প্রামাণ্য বিবরণ দিতে গিয়ে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন কোথাও কোনরকম ফাঁক রাখেন নি আর [illegible] নিজেদের মধ্যে ছলচাতুরীর প্রকাশেও তিনি কোন কুন্ঠা দেখান নি। একই জাতির এরকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলনা-বিরল। অবশ্য এধরনের আরো ঘটনা আমাদের জানা আছে। লর্ড ক্লাইভ এবং লর্ড হেস্টিংসের সকল কুকীর্তির বিচার করেছিলেন তাঁদেরই স্বজাতি। সেকথা অবশ্য এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মোদ্দা কথা হচ্ছে, কলকাতা সম্পর্কে অনেক তথ্য আমাদের অজানা রয়ে গেছে। কলকাতার গোড়াপত্তনের যুগের অনেক তথ্য লুকিয়ে রয়েছে এধরনের নানা বিবরণে। শুধু বিদেশী শাসকচরিত্র জানার জন্যেই নয়, নিজেদেরও প্রয়োজন এসব তথ্য জানা। এতে যে শুধু ইংরেজদের আচার-আচরণ সম্বন্ধেই জানা যাবে তা নয়। এসময়কার দেশীয় আচার-ব্যবহার এবং মনোভাব সম্বন্ধেও প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যাবে।

কোম্পানী শাসনের শুরুতে এদেশের লোকেরা প্রায় নির্দ্বিধায় তাদের অধীনে চাকরী নিয়েছে। আর চাকরী মানেই হুকুম তামিল করা। কারণ, শুরুতে সেরকম কোম্পানী-বিরোধিতা সাধারণ লোকের মধ্যে দানা বাঁধেনি। এরকম মনোভাবের আসল উৎস কি, তা সঠিকভাবে নিরূপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদেশী আধিপত্য বিস্তারের মুখে সাধারণ লোক দেশের রাজা বা নবাবের উপর বরাত দিয়েই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছে। নিজেরা এর কোন প্রতিবাদ করেননি। বহিরাগত শক্তির নিকট নিঃসর্তে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু কারণ অনুসন্ধান আজো পর্যন্ত হয়নি। আর হলেও তা সাধারণের অজ্ঞাত রয়ে গেছে। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই আজ সে তথ্য সকলের জানা প্রয়োজন। একজন ইংরেজ নিজেদের চরিত্র বিশ্লেষণে যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন আমরাই বা সেক্ষেত্রে পেছিয়ে থাকব কেন?

সোফিয়া খাতুন
বর্ধমান

॥ বিদেশী ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পী ॥

আমার লিখিত 'বিদেশে ভারতীয় সংগীত-শিল্পী' প্রবন্ধের (৬২৪ পৃষ্ঠায় ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যায়) প্রথম কলমের তৃতীয় ও ষষ্ঠ লাইনে আতা হোসেনের স্থানে এনায়েৎ হোসেন হবে। সম্ভবতঃ আমার শ্রুতি লিখনের কলমটি আমার বক্তব্য ঠিক ধরতে পারেনি। অনুগ্রহ করে পরবর্তী সংখ্যায় ভ্রম সংশোধন করে বাধিত করবেন।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
[illegible] ২৯

সম্পাদকীয়

একটি অমীমাংসিত সমস্যা

আসামের সমতল আর পাহাড়ের সমস্যা এখনো মেটে নি। সমস্যাটি পুরনো। জওহরলাল নেহরুর সময় থেকেই আসামের পাহাড়ী এলাকার অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনাধিকারের প্রশ্নটি নানাদিক দিয়ে বিচার-বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। যেমন হয়, সরকারের চালটা গদাইলস্করী। সদিচ্ছা থাকলেও তা কার্যে রূপায়িত করতে সময় লাগে, দেখা দেয় নানা পক্ষের ওজর-আপত্তি। স্কটিশ ধাঁচ নিয়ে একবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সে সময়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গণ্যমান্যরা আপত্তি জানিয়েছিলেন। তারপর নেহরু গত হলেন, শাস্ত্রীজী প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিনি গোটা সমস্যাটা আবার বিচার করবার জন্য পটাশকর কমিশন বসালেন। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের আগেই শাস্ত্রীজী লোকান্তরিত হলেন। কিন্তু এদিকে আসামের পাহাড় এলাকায় বিক্ষোভ অনেক দূর প্রসারিত। পটাশকর কমিশনের রিপোর্ট তাদের খুশী করতে পারে নি, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকেও না। শ্রীমতী গান্ধী পাঠালেন শ্রীঅশোক মেহতাকে এই জটিল প্রশ্নের সুরাহা করবার জন্য। তিনি একটি রিপোর্ট দিলেন তাতে আসামকে খন্ড ছিন্ন না করতেই সুপারিশ করা হল। বিরোধ মিটল না।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আসামের পার্বত্য নেতাদের অনেকবার দফায় দফায় আলোচনা হল। আলোচনাতে একটি বিষয় পরিষ্কার হল যে, পার্বত্য এলাকার অধিবাসীরা আসামকে ফেডারেশন করে তার অঙ্গরাজ্য হিসাবে থাকতে রাজী। যদি তা না হয় তবে পৃথক পার্বত্য রাজ্যই একমাত্র সমাধান এই ইঙ্গিত তাঁরা দিলেন স্পষ্ট ভাষায়। কেন্দ্রীয় সরকারও রাজী হলেন আসামকে ফেডারেল রাজ্য হিসেবে পুনর্গঠন করতে। কিন্তু আসামের সমতলবাসীরা এই পরিকল্পনায় রাজী হতে পারলেন না। তাঁরা বললেন, এতে আসামের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, পার্বত্য এলাকায় বিভেদবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। এই পর্যন্ত এসে আবার কেন্দ্রীয় সরকার থমকে দাঁড়ালেন।

পার্বত্য নেতৃসম্মেলনে নেতারা এই বিলম্বিত প্রয়াসকে সহজভাবে নিতে পারলেন না। যদিও পার্বত্য এলাকার ইতিমধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অনেকদূর প্রসারিত হয়েছে তাহলেও তাদের প্রত্যাশার তুলনায় সে-অধিকার নাকি অনেক কম। দ্বিতীয়ত কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আসামের এই সমস্যার জট খুলতে না পারায় স্বভাবই ক্ষোভ দেখা দিল পার্বত্য নেতাদের মনে। প্রতিবাদে তাঁরা বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। হুমকি দিলেন যে, সন্তোষজনক সমাধান না করতে পারলে স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে পার্বত্য নেতারা অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ নেবেন।

সম্প্রতি গারো পাহাড়ের তুরাতে পার্বত্য নেতৃসম্মেলনের যে-বৈঠক সমাপ্ত হয়েছে তাতে তাঁরা আপাতত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে তাঁদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা বলেছেন যে, সংসদের আগামী অধিবেশন পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করবেন যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্যা সমাধান করতে পারেন। নয়াদিল্লীর খবরে জানা যায় যে, আগস্ট মাসে সংসদের অধিবেশনে আসাম পুনর্গঠনের একটি বিল পেশ করা হবে। বিলটির বয়ান কী তা জানা যায় নি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাতেও আসামের পুনর্গঠন বিষয়ে ঢের মতানৈক্য আছে বলে শোনা যায়। এক পক্ষ কিছুতেই আসামের খন্ড-বিচ্ছিন্নতা হতে দিতে রাজী ন'ন। তাঁদের বক্তব্য এই যে, এতে ভারতের পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হবে। আসামের সঙ্গে তিনটি আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। তাদের মধ্যে দুটি দেশই শত্রুভাবাপন্ন। সুতরাং স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্য দিলে সীমান্তের ওপার থেকে গোলযোগের উস্কানির সুযোগও বাড়বে। অপর পক্ষের বক্তব্য এই যে, সমস্যাটি সমাধান না করে ঝুলিয়ে রাখলে অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে শত্রুরা আরও বেশী নষ্টামি করবে। তাছাড়া পার্বত্য অধিবাসীরা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার চাইছেন। দেশের নিরাপত্তার জন্য তাঁদের উদ্বেগ বা আগ্রহ সমতলবাসীদের চেয়ে কম, একথা ভাববারই বা কারণ কি?

যাই হোক, আসামের সমস্ত অধিবাসীকেই তাঁদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পেরিয়ে তার বহুজাতি ও বহুভাষী অধ্যুষিত রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলের দিকে। একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, পার্বত্য নেতৃসম্মেলন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন বলেই তাঁদের আন্দোলন করার কোন শক্তি নেই। বরং একথা ভাবা উচিত যে, পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা চরম পন্থায় বিশ্বাসী (যেমন মিজো পাহাড়ে ও নাগাল্যান্ডে) তারা এবারের সম্মেলনে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি। এখনও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হবে বলে তাঁরা আশা করেন। [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] এই সুযোগ যেন ব্যর্থ হতে না দেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তিন

তীর্থংকরের আশংকা যে অমূলক সে প্রমাণ পরের দিনই পেলো তীর্থংকর।

সকালবেলা জগন্নাথের মন্দির দেখতে গিয়েছিল সে। দেখে ফিরছিলো বাজারের পথ ধরে। এমন সময় দেখা হয়ে গেল রমলাদের গোটা পরিবারটার সঙ্গে।

রমলা ওকে দেখে পরিচিতের হাসি হাসতেই তীর্থংকর এগিয়ে গিয়ে প্রথম কথা বললো : "মন্দির দেখে ফিরছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ। আপনি?"

"আমিও তাই।"

"জগন্নাথের মন্দির আমাদের আগেই দেখা হয়ে গেছে একবার। এই নিয়ে দু'বার হল।" জানালো রমলা।

"আমার কিন্তু এই প্রথম।" উত্তর দিলো তীর্থংকর।

রমলার মায়ের সঙ্গেও পরিচয় হতে দেরী হল না। তাঁর সঙ্গে মাসীমা-বোন-পো'র সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললো সে।

অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে যোগমায়া অভ্যস্ত নন। তা সে পুরুষ ছেলের বয়েসী হোক আর বাবার বয়েসীই হোক। কিন্তু তীর্থংকর এত বেশি সপ্রতিভ যে, তাকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল।

পথে চলতে দু'ধারে সারি-সারি দোকান। যে কোনো দোকানের সামনেই কোনো জিনিস কিনতে দাঁড়ান [illegible], তীর্থংকর এগিয়ে গিয়ে সেই জিনিসের দরদাম করতে সুরু করে, দাম ঠিক হলে পকেট থেকে টাকাও বের করে।

টাকা অবশ্য তাকে কোথাও দিতে দেয় না রমলা। বরং কেনাকাটা শেষ হবার পর এক ফাঁকে বলে : "আপনি বারবার টাকা বার করছিলেন কেন বলুন তো? জিনিস কিনবো আমরা, দাম দেবেন আপনি, এ তো আর হতে পারে না?"

"হতে পারে না, না? মা, মাসীমা, এসব সম্পর্ক জন্মসূত্রে ছাড়া পাওয়া যায় না!" কেমন যেন দেখালো তীর্থংকরের মুখ।

কথাটার মধ্যে বিষাদ ছিলো, ব্যঙ্গও ছিলো। কিন্তু হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলো না রমলা।

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। তারপর তীর্থংকর নীরবতা ভঙ্গ করে আলাপ সুরু করলো মণিলা আর কনকের সঙ্গে।

জিজ্ঞেস করলো : "এখানে কেমন লাগছে তোমাদের? ভালো?"

"খুব ভালো।" উত্তর দিলো কনক।

"আমারো খুব ভালো লাগছে।" সায় দিলো মণিলা।

"এখানে আসার পর কি কি দেখলে?"

"জগন্নাথের মন্দির, স্বর্গদ্বার ঘাট, সোনার গৌরাঙ্গ..."

দু'ভাইবোনে পাল্লা দিয়ে ফিরিস্তি দিতে লাগলো।

"ভুবনেশ্বর গেছ?" জিজ্ঞেস করলো তীর্থংকর।

"না।"—ওদের হয়ে যোগমায়াই উত্তর দিলেন—"এখনো যাওয়া হয় নি। তবে পরে যাবো।"

"আপনারা এখানে ক'দিন থাকবেন?"

"আরো দিন-দশেক তো থাকবার ইচ্ছে আছে, দেখি কি হয়।"

রমলা দলের পিছনের দিকে ছিল। সেখান থেকে তীর্থংকরের উদ্দেশ্যে বললে : "আপনি কত দিন থাকছেন এখানে?"

"আমার কিছু ঠিক নেই।"—উত্তর দিলো তীর্থংকর—"দিন কুড়িকের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, ইচ্ছেমত ঘুরবো বলে। যদি এখানে ভালো লাগে, তবে সমস্ত ছুটিটাই এখানে কাটিয়ে দেবো। নইলে অন্য কোথাও যাবো।"

"ভুবনেশ্বর, কোনারক যাবার প্রোগ্রাম আছে?"

"নিশ্চয়। কালই ভুবনেশ্বর যাবো ভাবছি। ভুবনেশ্বরটা হয়ে গেলেই কোনারক।"

একটু থেমে তীর্থংকর আবার বললো : "আপনারা কবে যাচ্ছেন ভুবনেশ্বরে?"

"এখনো কিছু ঠিক করি নি..." বললো রমলা।

"তা কালই চলুন না। যদি অবিশ্যি অসুবিধে কিছু না থাকে।"

"তুমি কি বলো, মা?" মায়ের দিকে চাইলো রমলা।

"আমার কোনো আপত্তি নেই"।—উত্তর দিলেন যোগমায়া—"কাল যদি সুবিধে হয় তো কালই চলো।"

কনক-মণিলা হৈ-হৈ করে উঠলো : [illegible]

"তবে কালই যাওয়া যাবে।" বলে হাসলো রমলা।

হাঁটতে হাঁটতে অলকনন্দা হোটেল এসে গেল।

রমলা তীর্থংকরকে আমন্ত্রণ জানালো, তাদের ঘরে আসতে। বললে ঃ "আসুন, ভুবনেশ্বর যাবার প্রোগ্রামটা ঠিক করা যাক।"

অল্ রাইট।" বলে তীর্থংকর ওদের ঘরে এলো।

• • • •

পরদিন ভুবনেশ্বর।

ভারী সুন্দর, গাছপালার ছায়ায় শীতল জায়গাটি। বিদায়ী বর্ষার স্নিগ্ধতাটুকু এখনো ছড়িয়ে আছে আকাশে বাতাসে।

উদয়গিরি আর খণ্ডগিরি। ছোট ছোট দুটি পাহাড়—সবুজ বনানী ঘেরা।

লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগলো অনিলা মণিলা কনক। তাদের পিছনেই রমলা। তারও পিছনে—বেশ একটু তফাতে যোগমায়া আর তীর্থংকর। যোগমায়ার হাত ধরে উঠতে সাহায্য করছে সে। তাই সবার থেকে পিছিয়ে পড়েছে।

খানিক ওঠার পর একটা ছোটমত গুম্ফা মিললো। তারই ছায়ায় এসে দাঁড়ালো সবাই।

গুম্ফার দেওয়ালে প্রাচীন, দুর্বোধ্য লিপিতে কি সব লেখা। তার পাঠোদ্ধার করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

অদ্ভুত ঐ অক্ষরগুলির দিকে চেয়ে রমলা ভাবছিলো, এগুলি কি ব্রাহ্মীলিপি? কি লেখা আছে ওখানে?...

"উদ্ধার করতে পারছেন কিছু?" জিজ্ঞেস করলো তীর্থংকর।

"নাঃ।"—হাসিমুখে এদিকে ফিরলো রমলা—"একবার ব্রাহ্মীলিপি পড়তে শিখেছিলুম কিছু-কিছু, কিন্তু এখন আর সেসব মনে নেই। তাছাড়া পাথরের ওপর লেখা—তাও আবার অস্পষ্ট। এটা ব্রাহ্মী বটে কি না কে জানে। খরোষ্ঠীও হতে পারে।"

"খরোষ্ঠী? সেটা আবার কি বস্তু?"

"তেমন ভয়ানক বস্তু কিছু নয়" —হেসে উঠলো রমলা— "প্রাচীন ভারতে দুরকম লিখনরীতি ছিল। এক বাঁদিক থেকে—যার নাম হল ব্রাহ্মী, আরেক ডান-দিক থেকে—যার নাম খরোষ্ঠী। খরোষ্ঠী অক্ষর কেমন সে সম্পর্কে অবশ্য আমার কোনো ধারণাই নেই।"

"প্রাচীন ভারত সম্পর্কে আপনার স্টাডি আছে দেখছি!"

"ছাই স্টাডি। ছেলেবেলায় ভাবতুম ফাহিয়ান হিউয়েনসাঙ্-এর মত পরিব্রাজক হব, দেশে-দেশে ঘুরে প্রাচীন সভ্যতা আর সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করবো, ঘুরবো মঠে মন্দিরে মসজিদে—পাহাড় জঙ্গল-মরু-ভূমিতে! সেসব স্বপ্ন কোথায় গেল। হলুম কিনা প্রাইভেট ফার্মের কেরানী!"

"আপনি তো কেরানী নন, আপনি তো অফিসার।"

"ঐ হল। কাজ তো সেই একই—ফাইল ঘাঁটা।"

"তা অবশ্য বলতে পারেন।"

আরো একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার ওপরে উঠতে লাগলো সবাই।

সবার আগে ছুটে ছুটে পাহাড়ের মাথায় উঠলো মণিলা। তার পরেই কনক। ওরা দুজন চেঁচিয়ে বলতে লাগলো ঃ "তোমাদের কি এবারে কপিকল্ দিয়ে তুলতে হবে নাকি? এইটুকুই উঠতে সব হাঁফিয়ে উঠেছ!"

খানিক নীচে থেকে অনিলা জবাব দিলো ঃ "থাম্ থাম্, আর ফাজলামি করতে হবে না! ছোটবয়সে সবাই অমন পারে।"

"আমি ফার্স্ট! আমি সব আগে উঠেছি। আমি হচ্ছি শেরপা টেনজিং।" বললো মণিলা।

"আর আমি হচ্ছি এডমণ্ড হিলারি।" —বুক চাপড়ে ঘোষণা করলো কনক। তারপর যোগ করলো ঃ "আমি বড় হলে মাউণ্টেনীয়ার হব!"

"আমিও।" কোনো দিকে কনকের চাইতে পিছনে পড়ে থাকতে রাজী নয় মণিলা।

"দূর! তুই তো মেয়ে। বড় হলে তুই আর পাহাড়ে উঠতে পারবি না।" বললো কনক।

"ইস্! মেয়েরা বুঝি পাহাড়ে উঠতে পারে না? আজকাল তো মেয়েরা সবকিছু করছে। ডাক্তার হচ্ছে, ইঞ্জিনীয়ার হচ্ছে, আর পাহাড়ে উঠতে পারবে না? জিজ্ঞেস করে দেখ্ না ছোড়দিকে।"

"আরে ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার হতে তো আর গায়ের জোর লাগে না!"—মুরুব্বীর ভঙ্গিতে বললো কনক—"গায়ের জোরে মেয়েরা কোনো দিনই পারবে না ছেলেদের সঙ্গে!"

অনিলা ততক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মণিলা জিজ্ঞেস করলে ঃ "আচ্ছা ছোড়দি, মেয়েরা পাহাড়ে উঠতে পারে না? বড় বড় পাহাড়ে? মেয়েরা কি মাউণ্টেনীয়ার হতে পারে না?"

"কেন পারবে না! দার্জিলিঙের মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিট্যুটে তো প্রতি বছর কত মেয়ে যাচ্ছে মাউণ্টেনীয়ারিং শিখতে। এই তো সেদিন একটা দল উঠল মৃগ-থুনীতে। কুড়ি বাইশ হাজার ফুট আজকাল এদেশের মেয়েরাই উঠছে। ওদেশের মেয়েরা আরো অনেক বেশি উঁচুতে উঠেছে এর আগেই।"

"কিন্তু এভারেস্টে কোনো মেয়ে উঠেছে কি?" মণিলার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো কনক।

কথাটা শুনতে পেয়ে গেল অনিলা। বললে ঃ "এখনো ওঠে নি, কিন্তু উঠবে একদিন। মেয়েরা তো বেশি দিন এ লাইনে আসে নি!"

অল্পক্ষণের মধ্যে বাকী সকলেও উঠে এল ওপরে। যোগমায়া বললেন ঃ "আমি এখানে একটু বসি।"

কনক বাহাদুরি দেখিয়ে বললে ঃ "আমি এখন আরো দুবার এই পাহাড়টা ওঠা-নামা করতে পারি।"

মণিলা বলে উঠলো ঃ "আমিও পারি।"

"ছোট বয়েসে সবাই পারে।"—হাসতে হাসতে বললো তীর্থংকর—"কিন্তু যখন তোমরা মাসীমার মত বুড়ো হবে, তখন তিনতলা একটা বাড়ীর সিঁড়ি ভাঙতেই হাঁপিয়ে পড়বে।"

কিছুক্ষণ বসবার পর তীর্থংকর বললে ঃ "এবার আপনি নামতে পারবেন? ওঠার চাইতে নামা অনেক সহজ হবে। দেখবেন অতো কষ্ট হবে না।"

"হ্যাঁ, এবার যেতে পারবো।"—বলে উঠে পড়লেন যোগমায়া। তারপর যোগ করলেন ঃ "একটু বিশ্রাম নিয়ে চললে পরে আর কিছু কষ্ট হয় না। এক নাগাড়ে জোরে চলতে গেলেই হাঁপিয়ে পড়ি।"

পাহাড় থেকে নীচে নামতে বেশি সময় লাগলো না কারোরই।

তারপর আবার ভুবনেশ্বর। সেখানে গিয়ে ভোজনপর্ব।

ওয়েটিং-রুমে খাওয়া-দাওয়া সেরে প্ল্যাটফরমের ওপর এদিক ওদিক ঘুরে

বেড়াতে লাগলো কনক আর মণিলা। সেই সঙ্গে রমলা আর তীর্থংকরও।

প্ল্যাটফরমের একান্তে একটা গাছ। তারই কাছে বসে একটা লোক শালপাতায় করে রুটি-তরকারী খাচ্ছে আর কাছেই কুণ্ডলী-পাকানো একটা কুকুরের উদ্দেশ্যে রুটির টুকরো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রমলা বললে : 'মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ কতো সামান্য। আমাদেরই মত ওদের খিদে পায়। আমাদেরই মত ওরাও শ্রাবণ-ভাদ্রের বৃষ্টিতে মাথা বাঁচাবার জন্যে একটুখানি শুকনো আশ্রয় খোঁজে। অথচ ওদের কথা আমরা খুব কম সময়ই মনে রাখি। রান্নাঘরে একটুকরো মাছ কি একটুখানি দুধের খোঁজে এলে বেড়াল বেচারাকে লাঠি মেরে তাড়াই।'

'তাই তো বলা হয়—নেচার্ রেইন্‌স্ ইন' টুথ্ অ্যান্ড ক্ল!—উত্তর দিল তীর্থংকর —'অন্যকে শোষণ করে তবেই আমরা বাঁচতে পারি। একবার ভেবে দেখুন, ইলিশ মাছের ঝাল, গলদা চিংড়ির মালাই-কারি, মাংসের কোর্মা কিংবা কাবাবের কথা শুনলে আমাদের জিভে জল আসে। কিন্তু জীব-জন্তুদের দিক থেকে দেখলে, ব্যাপারটা কিরকম স্থূল, বীভৎস দেখায় বলুন তো? আমাদের দেহকে পুষ্ট করবার জন্যেই কি ওদের জন্ম? নিজেদের জন্যে বাঁচবার কি ওদের কোনো অধিকারই নেই?'

'আসল কথা হচ্ছে এক্‌স্‌প্লয়টেশন্ জিনিসটা জীবমাত্রেরই মজ্জাগত।' বললো রমলা—'উদ্ভিদ্‌ভোজী প্রাণীদের এক্‌স্‌-প্লয়েট করে আমিষাশী প্রাণীরা, দুর্বল মানষকে এক্সপ্লয়েট করে সবল মানুষ, গরীবকে করে ধনী, নারীকে করে পুরুষ। আওয়ার এক্‌জিস্‌টেন্স ইট্‌সেল্‌ফ্ ইজ্ এ চেইন্ অব এক্‌সপ্লয়টেশন্!'

'বড়দি, ট্রেন আসতে আর কতো দেরী আছে?' হঠাৎ মণিলা এসে দাঁড়ালো।

ঘড়ি দেখে রমলা বললো : 'আর মিনিট পনেরো হবে।

মাকে জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নিতে বলো।' তারপর তীর্থংকরের দিকে ফিরে বললো : 'কুলিটা কোথায় গেল? ঠিক সময় আসবে তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেজন্য কোনো চিন্তা নেই।' —এদিক ওদিক তাকালো তীর্থংকর—'ঐ তো বসে আছে টবের বাক্সের ওপর। সময় হলে আপনি এসে যাবে।'

যথাসময়ে ট্রেন এল।

কুলিটা এসে মালপত্র উঠিয়ে দিলো গাড়ীতে। রমলারা উঠে বসলো একটা সেকেন্ড ক্লাস কামরায়। তীর্থংকর উঠলো।

ট্রেনে সেকেন্ড ক্লাসে যাওয়া তীর্থংকরের এই প্রথম। বরাবর সে ফার্স্ট-ক্লাসেই যাতায়াত করেছে। কখনো বা এয়ার-কন্ডিশন্‌ড্ কোচে। কিন্তু এখন—রমলাদের সঙ্গে এই একযোগে বেড়াতে এসে আলাদা কামরায় ওঠা ভালো দেখাবে না। তাই সেকেন্ড্ ক্লাসেরই টিকিট কেটেছে তীর্থংকর—যাওয়া আসা দুটো পথেই।

রমলার মনটা কিন্তু-কিন্তু করছে। যে কখনো সেকেন্ড্ ক্লাসে যায় না তাকেও সেকেন্ড্ ক্লাসে যেতে হচ্ছে—রমলাদের মান রাখবার জন্যে। বারবারই শুধু মনে হচ্ছে—ওরা সমান নয়। বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। অসমানে অসমানে কি হয়? ঐ প্রশ্নটাই যেন বারবার বেজে উঠছে ট্রেনের ঝক্‌ঝক্ শব্দে...

দেখতে দেখতে পুরী স্টেশন এসে গেল।

*   *   *   *

আজকের রাতটি বড় সুন্দর।

জ্যোৎস্না-উদ্বেল সমুদ্র বারবার উচ্ছ্ব-সিত আবেগে ভেঙে ভেঙে পড়ছে চন্দ্রস্নাত দীর্ঘ বালুসৈকতে। ওপরে অবারিত আকাশ জুড়ে হাঁসের পালকের মত হাল্‌কা শাদা মেঘের নিরন্তর আসা-যাওয়া সোনালী চাঁদের আশপাশ দিয়ে। পূর্ণ চাঁদের চার-দিক ঘিরে বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল-হলুদ আলোর বৃত্ত।

মুগ্ধ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলো তীর্থংকর।

এমন রাতে কত কথাই মনে পড়ে। ঐ যে ছোট্ট ছোট্ট শাদা মেঘগুলো নিরন্তর ভেসে ভেসে চলেছে প্রসারিত নীলিমার পথ বেয়ে—ওদের দেখলে মনে হয় যেন নীল সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় ভেসে চলা ফেনশুভ্র রাজহংসী নাও—কোনো রাজ-কন্যার বার্তা বয়ে নিয়ে চলেছে অনেক দূরে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে কোনো কল্পরাজ্যের ঘাটে......

পুরুষমাত্রেরেই কল্পনায় এমন একটি রাজকন্যা আছে। তীর্থংকর তো সাধারণ মানুষ; কিন্তু অসাধারণ মানুষ যারা, তাদের মনেও থাকে রাজকন্যার স্বপ্ন।

হ্যাঁ, এইজন্যেই তীর্থংকরের মন ভুলিয়েছিলো মরিয়ান। মরিয়ানের কোনো গুণ ছিলো না, ছিলো শুধু রূপ। ছিলো দেহের আর সমাজের ঐশ্বর্যসম্ভার। তাই দেখে পাগল হয়েছিলো তীর্থংকর। মরি-য়ানের নাম দিয়েছিলো প্রিন্সেস্।

মরিয়ান ছিলো তীর্থংকরের জীবনের প্রথম প্রেম—তার প্রথম যৌবনের বিকশিত স্বপ্ন। সে স্বপ্ন সেদিন চুরমার হয়ে গেলো রূঢ় বাস্তবের আঘাতে, তারপর আর কোনো-দিন মেয়েদের সঙ্গে সত্যিকার গভীর সম্পর্ক গড়বার চেষ্টা করেনি তীর্থংকর......

'কি ভাবছেন?' রমলা এসে দাঁড়ালো।

'ঠিক ভাবছিলুম না কিছু।'—এদিকে ফিরলো তীর্থংকর বারান্দার রেলিঙে পিঠ দিয়ে—'তবে অনেক কথা মনে পড়ছিলো। বিশেষ হার্ভার্ড্-এর কথা।'

এইখানে তীর্থংকর একটু থামলো। রমলা কোনো কথা বললো না। বুঝলো তীর্থংকরের মন এখন বিচরণ করছে অতী-তের কোনো সুখ-স্বপ্নময় কুঞ্জবনে......

হার্ভার্ড। কথাটি এমন সন্তর্পণে, চোখে এমন এক মোহাবেশ নিয়ে উচ্চারণ করলো তীর্থংকর যেন মনে হল কোনো অতি-পবিত্র এক তীর্থক্ষেত্রের নাম করছে ও। যেমন কোনো ভক্ত-খৃস্টান প্রাণের সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে উচ্চারণ করে—বেথ্‌লেহেম্!

'হার্ভার্ডে গিয়ে আমি প্রথম জানতে পারি জীবন কাকে বলে। তার আগে—এদেশে থাকতে—আমি ছিলুম শুধু বইয়ের পোকা!' আস্তে আস্তে বললো তীর্থংকর। —থেমে থেমে যোগ করলো : হার্ভার্ডেই আমি পেয়েছিলুম প্রফেসর রিচার্ডসন্‌কে পেয়েছিলুম আর্থার জোন্‌স্‌কে, আর পেয়েছিলুম......মরিয়ানকে!'

মরিয়ান! এই প্রথম একটি মেয়ের নাম শুনলো রমলা তীর্থংকরের মুখে। কিন্তু কই, কোনো ঈর্ষার অনুভূতি তো আসছে না রমলার মনে! তবে কৌতূহল জাগছে। একটা বন্ধ বই দেখলে যেমন কৌতূহল জাগে, মনে হয়—দেখি না উল্টে কি আছে। কিন্তু মানুষের মন তো প্রাণহীন বই নয়, মুদ্রিত ফুলের কুঁড়ি। জোর করে পাপড়ি খুলতে গেলে ছিঁড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। ফুল ফোটে না। তাকে স্পর্শ না করলেই সে আপনি ফোটে যখন সময় আসে।

তাই কোনো প্রশ্ন করলো না রমলা।

তীর্থংকর বলতে লাগলো : 'প্রফেসর রিচার্ডসন্‌কে দেখেই আমি জানলুম সাধনা কাকে বলে। অর্থের জন্যে নয়, প্রতি-পত্তির জন্যে নয়, জ্ঞানের জন্যেই জ্ঞানের অনুসন্ধান—সে জিনিস এখানে থাকতে কোনো প্রফেসরের মধ্যে আমি দেখিনি। আর ...আর্থার জোন্‌স্‌কে দেখে জানলুম আর্ট অব্ লিভিং কাকে বলে। রাইডিং, রোয়িং, হান্টিং—সব কিছুতে পারদর্শী আবার ওদিকে ইউনিভার্সিটির নামকরা ছাত্র। জোন্‌স্ আমায় বলতো : 'জানো ঘোষ, তোমাদের ভারতীয়দের জীবন আর ব্যক্তিত্ব হয় সাধারণতঃ একপেশে। যে স্কলার সে শুধু স্কলারই, যে প্লেয়ার সে শুধু প্লেয়ারই। পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা তোমরা করো না। কেন? জীবনে একদিকে বড় হতে গেলেই কি অন্যদিকগুলোকে সম্পূর্ণ অব-হেলা করতে হবে? আমাকে দেখো, আমি পড়াশুনোও করি, আবার খেলাধুলোও যথেষ্ট করি। আমার বান্ধবীর সংখ্যা কম নয়। ...সেই জোন্‌সকে দেখে আমার চোখ খুললো। ওর কাছেই শিখলুম রোয়িং, রাইডিং, ওর সঙ্গেই যেতে লাগলাম হান্টিং এক্‌স্‌পীডিশনে। এমনি সময় একদিন পরি-চয় হল মারিয়ানের সঙ্গে। মারিয়ান ছিলো আমারই ক্লাসমেট্। সেই হিসেবে একটু-আধটু আলাপ আগে থেকেই ছিলো। কিন্তু পরিচয় ছিলো না। এবার সেই পরিচয়। ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম রেস্তেরাঁয় সিনেমায় অপেরা-হাউসে আর্ট-গ্যালারীতে, কখনো বা নদীর ধারে বনের পাশে। অন্যান্য যেসব মেয়ের সঙ্গে একটুআধটু বন্ধুত্ব ছিলো ঘুচে গেলো আস্তে আস্তে, আমার সমস্ত দিনরাত্রির একমাত্র সঙ্গী হয়ে উঠলো মরিয়ান। লম্বা ছুটির সুযোগ পেলেই ওকে নিয়ে চলে যেতুম কোনো দ্বীপে, ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে কাটিয়ে দিতুম স্বপ্নোচ্ছল দিনরাত্রিগুলো। বসন্তের রাতগুলোতে সারা রাত জাগতুম, বোটে চড়ে ঘুরে বেড়াতুম দ্বীপের আশেপাশে—জলের ধারে বনের ছায়া জ্যোৎস্নালোকে অদ্ভুত দেখাতো......"
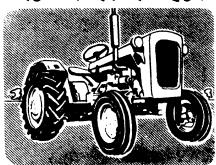
বলতে বলতে জ্যোৎস্না-স্নাত, উচ্ছল সমুদ্রের দিকে তাকালো তীর্থংকর, কিছুক্ষণ আপন মনে চেয়েই রইলো সেদিকে।

কোনো দ্বীপে গিয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতুম! কতো সহজে বললে তীর্থংকর। কিন্তু রমলা? রমলা কি কল্পনা করতে পারে কোনো পুরুষের সঙ্গে এমনিভাবে থাকা—বিবাহ-বন্ধন ছাড়াই? না, রমলা তা পারে না। কিন্তু নিজে করতে পারে না বলেই কি কোনো ব্যাপারকে ছি-ছি করতে হবে? বীফ দেখলে রমলার শরীর ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, কিন্তু তাই বলে কি সে বলতে পারে বীফ খাওয়াটাই পাপ? না তা পারে না। মানুষের আদর্শ বা নীতির মাপকাঠিকে কোনো বিশেষ মানুষের এমনকি কোনো বিশেষ দেশের বা সমাজের আচার-ব্যবহারের মাপে ছেঁটে নিতে নেই। কোনো কাজ সত্যিই ভালো কি মন্দ তার বিচার করতে হবে বিশ্বজনীন মানদণ্ডে। শুধু তাই নয়, মানুষকে কেবল বিচার করলেই চলবে না, তাকে ক্ষমাও করতে হবে। খ্রাইস্ট যথার্থই বলেছিলেন—'জাজ নট দ্যাট ইয়ে বী নট্ জাজ্ড্!' মানুষ মাত্রেরই ত্রুটি আছে। অপরকে বিচার করার আগে নিজেকে বিচার করাই ভালো। নৈতিক বিচার যদি করতেই হয়, তবে কঠোর হতে হবে নিজের প্রতি, আর সহনশীল হতে হবে পরের বেলায়। সেইটেই মানবীয় বিচারের আদর্শ...

'এমনি করে অনেক দিন কাটলো।'—আবার সুরু করলো তীর্থংকর—'মারিয়ানের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে এবিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই রইলো না। শুধু তাই নয়, তখন আমার মনের এমন একটা অবস্থা যে—আই ডিড্ নট্ ওয়ান্ট্ টু-মিস্ এ সিঙ্গল লুক অব্ হার আইজ্, এ সিঙ্গল্ স্মাইল্ অব্ হারস্... এমনি অবস্থায়—হঠাৎ একদিন জোনস্ এর কাছে শুনলুম মারিয়ান নাকি কলম্বিয়ার একটি ছেলের সঙ্গে এন্‌গেজ্‌ড্ হয়ে গিয়েছে। অথচ, আশ্চর্য এই যে মারিয়ান নিজে আমায় কিছুই বলেনি!'

'তারপর?' আপনার অজান্তেই প্রশ্নটা কখন বেরিয়ে এল রমলার মুখ দিয়ে। কোনো কৌতূহল তার ব্যবহারে প্রকাশ করবে না এ প্রতিজ্ঞা ভেঙে গেল।

'তারপর?'—হাসল তীর্থংকর— 'তারপর আর কি! আমি নিজেই একদিন মারিয়ানকে জিজ্ঞেস করলুম কথাটা। মারিয়ান বললে আমি যে খবর শুনেছি তা সত্যি। আমি তখন কনগ্র্যাচুলেশন্‌স্ জানালুম ওকে।'

'খুব আশ্চর্য!'—প্রায় আস্ফুটেই বললো রমলা—'ঐ অবস্থায় কংগ্র্যাচুলেশন্‌স্? কোনো অভিযোগ করলেন না?'

'অভিযোগ কিসের? কোনো কন্ট্রাকট্ তো আমাদের মধ্যে হয়নি! আমেরিকান ছেলেমেয়েদের কাছে শয্যাসঙ্গী হওয়া মানেই ভালোবাসা বা বিবাহ-পূর্ব প্রস্তুতি নয়। আর ধরুন যদি কন্ট্রাক্ট্ হতও, তাহলেও কি আমার পক্ষে সম্মানজনক হত এমন একটা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করতে যাওয়া? সেটা কি মধ্যযুগীয় সেন্টিমেন্টালিজম হত না? মানুষের মন তো জড়বস্তু নয় যে ঝগড়া মারামারি করে তার ওপর অধিকার সাব্যস্ত করবো!"

"সেকথা ঠিক। কিন্তু ক'জন তা বোঝে?"

"জানেন, আমাকে আজও মারিয়ান চিঠি লেখে। হার্ভার্ডে যতদিন ছিলুম ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কটুকু বরাবরই বজায় ছিলো।"

"আপনি আশ্চর্যরকম ক্ষমাশীল বলতে হবে।"

এবারে জোরে হেসে উঠলো তীর্থংকর "আমি ক্ষমাশীলও নই, উঁচুদরের প্রেমিকও নই। মারিয়ানের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি সে শুধু আমার চরিত্রের ওপর পাশ্চাত্য আবহাওয়ার প্রভাবে। জীবনকে ওরা সহজ-ভাবে নিতে জানে। যত বড় বিপর্যয়ই ঘটুক, ফর্ম্যালিটিতে ওদের ত্রুটি হয় না। জীবনের পরাজয়কে ওরা পরাজয় বলে মেনে নিতে চায় না, আবার দাঁড়িয়ে ওঠে, আবার ঝাঁপ দেয় নতুন জীবনের সন্ধানে।"

"জিনিসটা খুবই ভালো, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা পারি কই? প্রেমে ব্যর্থ হলে আমরা মনে করি জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল।"

"তার কারণ জীবন সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব সংকীর্ণ। আমরা যে মরে বেঁচে থাকি। বাঁচার মত বাঁচি কখন? আমাদের জীবনটা যে কেবল নিষেধে ভরা—এ কনটিনুয়াস ডিনায়াল অব লাইফ। এত অল্প নিয়ে থাকি যে তার থেকে কণামাত্র গেলেও বুক হাহাকার করে ওঠে। কিন্তু জীবন যদি এখানে হত অবাধ, অবারিত, তবে সামান্যর জন্যে আমরা এমন আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি করতুম না। আমরাও বীরভাবে বরণ করতে পারতুম অনেক ক্ষয়-ক্ষতিকে।"

হঠাৎ হাতের ঘড়ি দেখে রমলা বললে, "আচ্ছা, এবার যাই, কেমন? খাবার সময় হয়ে এল প্রায়।"

"ওঃ সরি!"—অপ্রস্তুত হল তীর্থংকর—"তখন থেকে বকেই চলেছি কেবল, ঘড়ির দিকে তাকাইনি। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলুম, কিছু মনে করবেন না।"

"না না, সময় নষ্ট কি! আই এনজয়েড ইট ভেরি মাচ!"

"কাল আবার দেখা হচ্ছে তো?"

"হবে না কেন? অন্তত এখানে যে কটা দিন আছি, সে কটা দিন দেখা হবে।"

"কেন, কলকাতায় ফিরবার পর আর দেখা হবে না বুঝি?"

রমলা চুপ করে রইলো।

"কোনো বাধা আছে?" জিজ্ঞেস করলো তীর্থংকর।

"নাঃ, বাধা আর কি!"

"তাহলে, কলকাতায় ফিরবার পরও আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে তো? দেখাশোনা হবে তো?"

"আপনি যদি চান, হবে!" খুব আস্তে, প্রায় অস্ফুট গলায় বললো রমলা।

"আচ্ছা, আজ আর আপনাকে ধরে রাখবো না। গুড নাইট।"

"গুড নাইট।"

।। চার ।।

দেখতে দেখতে ছুটির দিনগুলো শেষ হয়ে গেল।

আবার কলকাতা। আবার সেই পুরনো, বাঁধা ছকের জীবন।

ফাইলের গাদার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে কাজ করছিলো রমলা, এমন সময়—

এমন সময় টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠলো—ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং......

রিসিভার তুলে নিলো রমলাঃ "হ্যালো, মিস মুখার্জী হিয়ার।"

গুড মর্নিং। আমি ঘোষ কথা বলছি।" সাড়া এল ওদিক থেকে।

এ যে তীর্থংকরের গলা। চিনতে এক মুহূর্তেও সময় লাগলো না রমলার। ভদ্রলোক দেখা যাচ্ছে পুরীর কথা ভোলেননি তবে!

"আপনি বোধহয় আমার কথা ভুলেই গেছেন।" প্রাথমিক ভদ্রতা-বিনিময়ের পর বললো তীর্থংকর।

"তা যদি বলেন তবে আপনি আমার স্মৃতিশক্তির ওপর অবিচার করছেন। ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট যদিও কোনোদিন ছিলুম না আমি, তবু এতটা শর্ট মেমারিও আমার নয় যে চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই কোনো ব্যাপার ভুলে যাবো।"

"আমার পক্ষে সেটা সৌভাগ্য বলতে হবে।" উত্তর এল ওদিক থেকে।

আরো দু-চারটে কথা। তারপর দেখা করবার প্রস্তাব। কোথায় এবং কখন? ব্রিটিশ কাউন্সিলে, না ইউ এস আই এস-এ?

স্থান এবং সময় ঠিক করার পর ফোনটা নামিয়ে রাখলেন রমলা।

পরদিন যথাসময়ে যথাস্থানে গিয়ে উপস্থিত হল রমলা।

তীর্থংকর আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলো। আমেরিকান লাইব্রেরীর এককোণে বসে বসে ওল্টাচ্ছিলো একখানা সচিত্র ম্যাগাজিনের পাতা।

রমলা ঠিক যে মুহূর্তে লাইব্রেরী হলে প্রবেশ করলো ঠিক সেই মুহূর্তে তীর্থংকর মুখ তুলে সেইদিকে তাকালো। চোখাচোখি হতেই হেসে ফেললো রমলা। সে হাসি অবশ্য খুব প্রস্ফুট হাসি নয়, ঠোঁটের ওপর তার আভাস দেখা যেতে না যেতেই মিলিয়ে গেল।

তবু তীর্থংকরের মনে হল। এমন মধুর হাসি আর কখনো সে দেখেনি। তার সমস্ত সত্তায় কি এক ভালো-লাগার সৌরভ বিছিয়ে দিলো সে হাসি।

রমলা পাশে এসে বসতেই তীর্থংকর বললেঃ "লেট্‌স্ গো আউট। উয়ি কানট্ টক্ হিয়ার।"

"ঠিক আছে, চলুন।" ফিসফিসিয়ে উত্তর দিলো রমলা।

গেটের বাইরে, রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে তীর্থংকরের আকাশ-নীল স্ট্যাণ্ডার্ড গাড়ীখানা। ছোট্ট গাড়ী, বেশ ছিমছাম। দেখে ভালো লাগলো রমলার।

গাড়ীর দরজা খুলে তীর্থংকর বললেঃ "আসুন।"

এই প্রথম একলা গাড়ীতে অনাত্মীয়, প্রায়-অজানা একজন পুরুষের পাশে বসলো রমলা। ভিতরে ভিতরে কেমন যেন একটা দ্বিধা, একটা সঙ্কোচ। একটা ভয়ও। কে জানে লোকটি আসলে কেমন। কোনো মন্দ উদ্দেশ্য নেই তো? ব্যাগের মধ্যে একটা ছুরি অবশ্য আছে রমলার। সেটাই যা ভরসা। তেমন তেমন কোনো বিপদ এলে ছুরিটা ব্যবহার করতে পারবে রমলা। সেটুকু সাহস, সেটুকু আত্মবিশ্বাস তার আছে।

স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে তীর্থংকর বললেঃ "আমার ইচ্ছে, একটা লং ড্রাইভ দেবো। আপনার কোনো আপত্তি আছে?"

"আজ বরং কাছাকাছি কোথাও গেলে হয় না? এই ধরুন ভিক্টোরিয়া পার্ক।"

"ইউ আর অ্যাফ্রেইড! আরন্ট্ ইউ?"—হেসে ফেললো তীর্থংকর—"ভয় নেই। যদিও আমি পিউরিটান্ নই, ইউ ক্যান্ টেক্ মী ফর্ এ জেন্টল্‌ম্যান।"

"না না, ভয় কিসের?"—অপ্রস্তুত হল রমলা—"কোন দিকে যেতে চান?"

"ধাপার মাঠ পেরিয়ে কয়েক মাইল।"

"ধাপা? সর্বনাশ। সে তো ভীষণ নোংরা জায়গা। ওদিকে যেতে চান কেন?"

"ধাপাটা নোংরাই বটে। কিন্তু ওটা পেরিয়ে খানিক দূর গেলে ভালো জায়গা পাওয়া যাবে।"

"কিরকম জায়গা?"

"মাঠ আছে, গাছপালা, জল আছে। নাউ, লেট্ আস্ স্টার্ট।"

গাড়ী চালাচ্ছে তীর্থংকর চোখ সামনে রেখে। কিন্তু কথা বলছে অনর্গল। আমেরিকায় নিজের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলছে, আবার দু-একটা প্রশ্ন করছে মাঝে মাঝে। কোনোরকমে হুঁ-হাঁ করে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে রমলা। কিন্তু তার চোখ বাইরের দিকে। ধাপা কতদূর? আবার ধাপা পেরিয়েও যাবে বলেছে লোকটা। কে জানে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে শেষ পর্যন্ত।

জানলা ঘেঁষে কাঠ হয়ে বসে আছে রমলা। পাছে তীর্থংকরের সঙ্গে গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি হয়ে যায় কোনো সময়। তীর্থংকর অবশ্য তার কাছ ঘেঁষবার জন্যে কোনোরকম অশোভন চেষ্টা করছে না। এটা একটা আশ্বাসের কথা।

এক জায়গায় গাড়ী থামিয়ে একটা পারমিট নিলো তীর্থংকর। ধাপা পেরিয়ে যেতে হলে নাকি এটা লাগে।

বুকের ভিতর দুরুদুরু করছে রমলার। এদিকে কোনোদিন আসেনি সে। এখনো পর্যন্ত মধ্য কলকাতার সমস্ত রাস্তাঘাটই ভালোরকম চেনে না বলতে গেলে। উত্তর কলকাতা বা দক্ষিণ কলকাতার তো কথাই নেই।

ধাপার মাঠে মানুষ খুন করে ফেলে দেয়ার কথা বেশ কয়েকবার শুনেছে রমলা। আর এ যা নির্জন জায়গা, তার মনে হচ্ছে এখানে কাউকে গলা টিপে মেরে ফেলে রেখে গেলেও কেউ জানতে পারবে না। কে জানে তার পাশে-বসা এই লোকটির সেরকম কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না। পাশ্চাত্য দেশের বেশ কয়েকটি বীভৎস ঘটনার কথা বাংলা পত্রিকায় পড়েছে সে। কোনোকোনো পুরুষ আছে যাদের যৌন-বিকৃতি এমন এক পর্যায়ের যে তারা মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করার পরই তাদের হত্যা করে ফেলে। এই ধরনের একটি পুরুষ প্রায় একুশ-বাইশটি মেয়েকে হত্যা করার পর ধরা পড়ে, আর ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত ভদ্রসমাজে সজ্জন বলেই পরিচিত ছিল সে। এই কেসটির কথা মাত্র কিছুদিন আগেই কোথায় যেন পড়েছিলো রমলা। গল্প নয়, সত্য ব্যাপার।......এমন ধরনের যৌনবিকৃতি যে এদেশেও কোনো লোকের মধ্যে থাকতে পারে না এমন কথা কি জোর করে বলা যায়?......

ধাপা পার হয়ে গাড়ীটা ছুটে চলেছে বেগে। কাছাকাছি কোথাও থামবার ইচ্ছে তীর্থংকরের আছে একথা রমলার মনে হচ্ছে না। এতদিনের পরিচিত পুরুষটিকে এই মুহূর্তে যেন সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা, ভীতিপ্রদ মনে হচ্ছে। রমলার এই মুহূর্তে মনে হয় পুরুষের তুলনায় মেয়েরা অনেক সাদাসিধে, পেটে কথা চেপে রাখতে তারা খুব কমই পারে। পুরুষই বরং দুর্জ্ঞেয়-চরিত্র।

গাড়ীর স্পীড ক্রমেই বেড়ে উঠছে। আর কতদূর যাবে তীর্থংকর? ভয় পেয়ে প্রায় চেঁচিয়েই উঠলো রমলাঃ "স্টপ্, স্টপ্!"

আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী স্লো-ডাউন করলো তীর্থংকর, একটুখানি এগিয়ে গিয়েই থেমে গেলো।

গাড়ীতে রমলাকে বসিয়ে রেখে নেমে পড়লো তীর্থংকর এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলো কোথায় বসার জায়গা একটু পাওয়া যায়।

এ জায়গাটা একেবারে নির্জন নয়। এক আধটা লোক দু-একটা কুলী-কামিন দেখা যাচ্ছে এখানে-ওখানে। পথের এক-পাশ দিয়ে উঁচু জমি চলে গেছে বরাবর, আরেক দিকে গোটা কয়েক মাঝারি আকারের দীঘি—নাকি ওগুলো জলা?... জলাশয়গুলোর মাঝখানে কিন্তু যোগাযোগ রয়েছে—ওগুলো একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়।

একটু ঘুরে এসে তীর্থংকর ডাকলোঃ "আসুন।"

রমলা নেমে পড়লো।

জলাশয়গুলোর দিকে যেতে হলে একটা সরু মাটির পথ দিয়ে যেতে হবে। সে পথের মুখেই একটা গেট। গেটের মাথায় লেখা আছে প্রবেশ-নিষেধ-জ্ঞাপক নির্দেশ।

তীর্থংকর কিন্তু সেটা গ্রাহ্য করলো না। এগিয়ে গেল সামনে। দুটি লোক বসে বসে গল্প করছিলো একটা চার-পাইয়ের ওপর। তাদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললে "আপনারা কি চান?"

"আমরা এদিকে বেড়াতে এসেছি।"—উত্তর দিলো তীর্থংকর—"ঐ জলের ধারে ওখানে গিয়ে বসতে চাই। আপনাদের কোনো আপত্তি আছে?"

একটু কি ভেবে নিয়ে লোকটি বললেঃ "ঠিক আছে, চলে যান।"

জমির আলের মত সরু একফালি ঘেসো জমি চলে গেছে খানিকদূর দুই জলাশয়ের মাঝখান দিয়ে। সেখানে ঐ ছুঁচলো জমির মুখটুকু শেষ হয়েছে সেখানে দুদিকের জল একাকার হয়ে গেছে মিশে। এই সংকীর্ণ ভূমিরেখাটির ওপরেও গোটা কয়েক খেজুরগাছ এবং আরো দু-চারটে অচেনা গাছ। এসবের মাঝখান দিয়ে কোনোমতে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চললো রমলা, তীর্থংকরের পিছুন পিছুন।

এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লো তীর্থংকর। প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বার করে বিছিয়ে দিলো ঘাসের উপর, রমলাকে উদ্দেশ করে বললোঃ বসুন।

"আপনি কিসে বসবেন?" জিজ্ঞেস করলো রমলা।

"আমার কিছু লাগবে না।

"তাহলে আমারও কিছু লাগবে না। এমনি মাটিতে আমি অনেক সময়েই বসি পার্কে-টার্কে।"

"তা হোক, এখন ওটাতেই বসুন।" যেমন করে বড়রা বাচ্চাদের বলে, অনেকটা সেইরকম গার্জিয়ানের ভঙ্গিতে নির্দেশটা দিলো তীর্থংকর। আর শিশুর মতই সেটা পালন করলো রমলা।

আশ্চর্য! এখন আর রমলার বিশ্বাস হতে চাইছে না যে এই মানুষটিকেই একটু আগে ভীতিপ্রদ মনে হয়েছিল তার। কতো সম্ভব-অসম্ভব ভয়াবহ কল্পনা জেগে উঠেছিল একেই কেন্দ্র করে!......

সামনে স্বচ্ছ জল টলটল করছে আশ্বিনের মিঠে, নরম রোদ্দুরে। বাঁকা খেজুরগাছের ছায়া দুলছে কিনার-ঘেঁষা জলের বুকে। বড় বড় লম্বা ঘাসের মাথায় গাঢ় সবুজ ফড়িং একবার বসছে, একবার উড়ছে আবার বসছে......

"কেন জানি না, জল—আর জলের পাশে গাছ—আমার খুব ভালো লাগে।" বলতে বলতে একটা মোটা ঘাস ছিঁড়লো তীর্থংকর, সেটা চিরতে লাগলো ফালি ফালি করে।

রমলার মনে পড়লো ছেলেবেলার গ্রামে থাকতে এমনি ঘাস চিরে ত্রিভুজ তৈরী

করা ছিলো তার প্রিয় খেলা। এই বিশেষ ধরনের ঘাস দেখলেই সে ওই করতো। কেন যে এত আনন্দ পেতো এই সামান্য খেলায়, আজ আর তা বুঝতে পারে না রমলা। আর সেই ফড়িং ধরে ধরে বাড়ীর পোষা পাখীটার মুখে গুঁজে দেয়া। মনে আছে ফড়িং ধরার কাজে সে ছিলো রীতি-মত এক্সপার্ট। কোনো ছেলেও তার সঙ্গে পারতো না। এমন পা টিপে টিপে সে যেতো, এমন অব্যর্থ ছিলো তার লক্ষ্য, কোনো ফড়িং তার চোখে পড়লে আর তার হাত এড়াতে পারতো না। আজ তার মনে হয়, কি নিষ্ঠুরই না ছিলো তার এই অভ্যাস। কিন্তু সেই ছেলেবেলায় এই নিষ্ঠুর, বিশ্রী দিকটা কোনোদিন চোখে পড়েনি। আশ্চর্য!......

"আপনি তো এদিকে আসতেই চাই-ছিলেন না, কিন্তু এখন কেমন লাগছে জায়গাটা?" প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলো তীর্থঙ্কর।

"মন্দ নয়!" একটু অন্যমনস্কভাবেই উত্তর দিলো রমলা।

"কি ভাবছেন বলুন তো?"

"কই, কিছু না!"

"কিন্তু আপনার কথাবার্তা ভাবভঙ্গী দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। গাড়ীতে উঠে থেকেই তো গম্ভীর হয়ে গেলেন কেমন, সারাটা পথ যেন এলেন কাঠ হয়ে। এখনো দেখছি যেন—আউট অব হিউমার!"

এবার সহজ হতেই হল রমলাকে। হেসে বললো : "আপনি যা ভাবছেন সেসব কিছু নয়। শুধু এই শান্ত, স্তব্ধ দুপুরের নৈঃশব্দ্যটাকে ভাঙতে ইচ্ছে করছে না। এমন এক প্রশান্তির মাঝখানে বসে বেশি কথা বলা মনে হচ্ছে যেন একটা স্যাক্রিলেজ। আপনার কি মনে হয় না, সাইলেন্স হ্যাজ এ মিউজিক অব ইটস্ ওন?"

"উঃ, বড্ড ভাবুক আপনি। আপনার মত মানুষের কথা বইতেই পড়েছিলুম এতদিন। বাস্তবেও যে আছে এ-কথা না দেখলে বিশ্বাস করতুম না। একেক সময় ভাবি—" কথাটা শেষ না করেই হঠাৎ থেমে গেলো তীর্থঙ্কর।

"কি ভাবেন?" দীর্ঘপক্ষ্ম, বড় দুটি চোখের পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো রমলা।

"বলবো? ভাবি, আপনি সংসার করবেন কেমন করে?"

"সংসার করা বলতে আপনি কি বোঝেন? এখন কি আমি সংসারী নই? আমি কি আশ্রমবাসী?"

"না, সে অর্থে আমি বলছি না। আমি বলছি বিবাহিত জীবনের কথা। বিয়ে করলে পরে সংসার মানুষের কাছ থেকে বেশি দাবী করে। তার স্বতন্ত্র সত্তার অনেকখানিই গ্রাস করে নেয়।"

"তা যদি হয়, তবে আমি বিয়ে করবো না।"

"চিরদিন কি এ-মনোভাব রাখতে পারবেন?"

"পারবো। আপনি আমাকে জানেন না, কিন্তু আমি নিজেকে জানি। লিবার্টি ইজ দি ব্রেথ্ অব মাই লাইফ!"

একটু চুপ করে থেকে তীর্থঙ্কর বললে : "আপনার জীবনে কি ভালোবাসার প্রয়োজন নেই?"

"আছে বৈকি। কেন থাকবে না? কিন্তু যে-পুরুষ আমাকে খাঁচার পাখী করে রাখতে চাইবে, সে তো আমায় যথার্থ ভালোবাসবে না। আমি চাই সত্যিকার প্রেম—যে-প্রেম মানুষের পায়ে শেকল বেঁধে রাখে না।"

"তোমার চাওয়া বড্ড বেশি, রমলা!" মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেল তীর্থঙ্করের।

আর সঙ্গে সঙ্গেই শিউরে উঠলো রমলার সমস্ত শরীর। এ কোথায় এসে পড়েছে তারা! মনে হচ্ছে যেন মুখোমুখি চরম একটা মোকাবিলা করতে বসেছে দুজনে, এখান থেকে আর পালাবার পথ নেই।

"আমার চাওয়া যদি কারো কাছে বড্ড বেশি মনে হয়, তার চলে যাবার পথ খোলাই আছে। আমি তো কখনো কাউকে বাঁধতে চেষ্টা করিনি!" বলতে গিয়ে মুখ লাল হয়ে উঠলো রমলার।

"না। তুমি কখনো কাউকে বাঁধতে চেষ্টা করো না। সে দোষ তোমাকে শত্রুতেও দিতে পারবে না। কিন্তু তার প্রধান কারণ এই যে, তুমি কখনো কাউকে ভালো-বাসোনি। আর বোধহয় ভবিষ্যতেও বাসবে না।"

তীর্থঙ্করের মুখ থেকে বার হওয়া এতবড় রূঢ় মিথ্যাটার কোনো প্রতিবাদ করতে পারলো না রমলা। ভয় হল, প্রতিবাদ করতে গেলেই সে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করে ফেলবে। দুজনের মাঝখানে এখনো যেটুকু আড়াল আছে, সেই শেষ আড়াল-টুকুও ভেঙে যাবে।

খানিক চুপ করে থাকার পর যথাসম্ভব নির্লিপ্ত সুরে রমলা বললো : "ভালোবাসা কি অতো সহজ? একটি মানুষকে ভালো করে জানতে হবে, চিনতে হবে, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীতে তার সঙ্গে সত্যি সত্যিই মিল আছে কিনা দেখতে হবে, তবে তো ভালোবাসা যাবে। ভালো করে কাউকে পরীক্ষা না করেই ভালোবাসতে শুরু করলে পরে দুঃখ পেতে হয়।"

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন ভালোবাসা একটা অর্ডারী মাল। একটা বিশেষ সময় বিশেষ জায়গায় গিয়ে খুট্ করে একটা বোতাম টিপবে, আর সঙ্গে সঙ্গেই মেশিনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে প্যাকেটে মোড়া ভালোবাসা!" তীর্থঙ্করের কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে একটা চাপা রাগ যেন ফুটে বেরোতে চাইছিলো। একটু চুপ করে থেকে তীর্থঙ্কর আবার বললে : "একে আমি ভালোবাসবো, এমনি মনে করে কেউ ভালোবাসতে পারে না। ইট কামস্ উইদাউট দি উইল। ইউ মিস্ এ পার্সন। নট দ্যাট ইউ ওয়াণ্ট টু ডু এনিথিং। বাট ইউ মিস্ দি স্মাইল, ইউ মিস্ দি ভয়েস্......" আর বলতে পারলো না তীর্থঙ্কর। একটা কি কষ্ট যেন ওর কণ্ঠরোধ করে দিলো।

(ক্রমশঃ)

আদিম রিপু

সুভাষ সিংহ

লোহার গরাদ দু হাতে শক্তভাবে চেপে ধরল মুক্তো। আস্তে আস্তে রাখালের রোগা শরীর দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওই ভয়ানক ঘটনার পর ভেবেছিল রাখাল আর তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। কিন্তু আশ্চর্য রাখাল! নিয়মিতভাবে তার সঙ্গে দেখা করে। কথা বলে কদাচিৎ। শুধু তাকিয়ে থাকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে। সে দৃষ্টিতে কী আছে কে জানে। মুক্তো বুঝতে পারে না। শুধু জলভরা চোখে তাকিয়ে থাকে রাখালের দিকে। চার জোড়া চোখ পরস্পরকে নির্নিমেষে দ্যাখে।

মুক্তোর দু চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। নিজেকে সামলাতে না পেরে গরাদে মাথা ঠুকে অস্ফুট আর্তনাদে ভেঙে পড়ল সে, 'আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ। শরীরের জ্বালায় ছটফট করে মরেছি। গুন্ডাদের হাতছানিতে ভুলেছিলাম। পাপপুণ্য ভুলে অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছি!'

মেঘের ডাকে চমকে উঠল মুক্তো। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘনঘন। একটু পরে প্রবল

গর্জন আর সেই সঙ্গে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। টলতে টলতে ফিরে এল সে আপন জায়গায়। ছোট্ট অপরিসর ঘর। আলো-বাতাস এ ঘরে প্রায় ঢোকে না বললেই চলে।

অবসন্ন শরীরে শুয়ে পড়ল মুক্তো। বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে তার দু চোখ বুজে এল। চোখের সামনে ভেসে উঠল ফেলে আসা আনন্দ ও বিভীষিকাময় টুকরো টুকরো কয়েকটি দৃশ্য...।

* * *

মনে আছে মুক্তোর ওস্তাদের সামনে রাখাল কেমন নির্জীব হয়ে থাকত। ঝড়ের মত ওস্তাদ একদিন এসে উপস্থিত। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে মুক্তো রাখালের ফ্যাকাসে রক্তশূন্য মুখ লক্ষ্য করেছে। অতিকষ্টে সে হাসি চেপেছে। কে এই ওস্তাদ? ইয়া প্রকান্ড বুকের ছাতি। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারা। ওর পাশে রাখালকে মনে হয়েছে একটা বামন। সেই প্রথম দেখাতেই তার সর্বনাশের কারণ ছিল কিনা জানে না। এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল ওস্তাদের দিকে।

রাখাল একটু পরে এসে ওকে নিয়ে যায় ওস্তাদের সামনে। মুক্তো নত হয়ে প্রণাম করতে গেলে ওস্তাদ দু পা সরে বলেছে, থাক। বেঁচে থাক, সুখী হও!

হাসি পেয়েছিল মুক্তোর ওস্তাদের ভড়ং দেখে। ওস্তাদের চোখের দিকে একবার তাকিয়েই সে অনেকটা আঁচ করতে পেরেছে। মুখ্যু মেয়েমানুষ হলেও পুরুষের ভাষা বুঝতে তার এতটুকু অসুবিধে হয় নি। আরও বুঝেছিল নিতান্ত নিরুপায় হয়ে রাখাল বন্দোবস্তটা মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ ওস্তাদ কয়েকদিন থাকতে চায়। পুলিশ পিছনে লেগেছে। অতএব নিরাপদ আশ্রয় দরকার।

তবু রাখাল বলেছে, তোমার অসুবিধে হবে ওস্তাদ এখানে থাকতে। ঘরদোর নেই। বাইরের এই ছোট ঘরটায় কী তুমি থাকতে পারবে?

—তুই শালা ভদ্দরলোক বনে গেছিস রাখাল। চিনিস না আমাকে? বলে পিঠ চাপড়ে বলেছে, যা যা ঘুমো গে। সারা রাত নাইট ডিউটি দিয়ে ফিরেছিস।

রাখালের বিরুদ্ধে মুক্তোর অভিযোগ দিন দিন বেড়ে উঠছিল। পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে সুখ কাকে বলে জানে নি সে। ফুটপাথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিল রাখাল তাকে সেই বয়সে যখন তার দেহের দু কূল ছাপিয়ে যৌবনের জোয়ার উপচে পড়ছে। কালিঘাটে ঠাকুরের সামনে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছে তাকে। বুড়ো বাবা-মা আজ বেঁচে আছে কিনা জানে না সে। রাখালের তখন এখনকার মত শুকনো চেহারা নয়। রীতিমত কাপ্তেন। পয়সার ছড়াছড়ি। যখন টাকা ফুরিয়ে এল, মেজাজ খারাপ হল রাখালের। কারখানায় চাকরী নিল। মাইনে কত পেত মুক্তো কোনদিন জানতে পারে নি। তবে দেখেছে প্রায় রোজ রাত্রেই মদ খেয়ে বাড়ি ফিরত রাখাল। তারপর ঝগড়া মারামারি। নতুন ঘর-সংসারের স্বপ্ন ততদিনে মুছে গেছে মুক্তোর চোখের সামনে থেকে।

নাইট ডিউটিতে বেরিয়ে যাবার আগে রাখাল যে রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল তাতে মুক্তো ঘাবড়ে যায়। এর আগে দু-একটা কথা হয়েছে। রাখাল নীচু গলায় উষ্মা প্রকাশ করেছে। মুক্তো কোন জবাব দেয় নি। কেননা কথা বললে আরও গালা-গালি শুনবে। হয়ত মারধোরও করতে পারে। কয়েকবার রাখাল ওর গায়ে হাত তুলেছে। অনেকবার ভেবেছে পালিয়ে যাবে সে কারও সঙ্গে। শুধু ভাবাই সার। ভরসা হয় না। অনেকে লোভ দেখায়। কিন্তু সে অতীতের কথা ভেবে...। রাখাল পাঁচ বছর আগে তাকে না আনলে, এতদিনে শকুনে তার মাংস ছিঁড়ে খেত! যখনই একথা মনে পড়ে তখন আর রাখালকে ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবতে পারে না।

ওপাশের বস্তি থেকে বুড়িমা এসে শোয় ওর সঙ্গে। এটা রাখালের বন্দোবস্ত। যুবতী স্ত্রী একা খালি ঘরে রাত কাটাবে সেটা চায় না সে। মুক্তো বুড়িমার নাক ডাকার শব্দ শুনল। বাইরে বৃষ্টি। রাখাল বেরিয়ে যাবার পর শুরু হয়েছে। অসহ্য গরমের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। কিন্তু ঘুম আসছে না দু চোখে। কত রাত হল খেয়াল করতে পারল না মুক্তো।

হঠাৎ দরোজায় মৃদু টোকার শব্দ! মুক্তো চমকে উঠল। অস্ফুট স্বরে ওর নাম ধরে ডাকছে ওস্তাদ। সমস্ত শরীরে এক ধরনের শিরশিরানি অনুভব করল সে। এত রাতে কী চায় ওস্তাদ? উঠবে কিনা একবার ভাবল। নাকি ঘুমের ভান করে চুপচাপ শুয়ে থাকবে। বুড়িমা তেমনি নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। ওকে কী ডেকে তুলবে? থাক, বেচারীকে আর কাঁচা ঘুম থেকে জাগাবে না। দেখাই যাক না কী চায় ওস্তাদ। হয়ত জলটল নেই বা অন্য কোন দরকার থাকতে পারে। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মুক্তো সন্তর্পণে মশারি তুলে বাইরে এল। শাড়ি ঠিকঠাক করে নিঃশব্দে খিল খুলে দরোজা সামান্য ফাঁক করল।

—ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে মুক্তো। এক গ্লাস জল দেবে?

হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় ওস্তাদকে দেখছিল মুক্তো! দু চোখ লাল। মাথা নীচু করে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে সে। টের পেল একদৃষ্টিতে ওস্তাদ তাকিয়ে। ছটফট করে উঠল সে। কী জাদু আছে কে জানে ওই চোখে! আবার সে চোখ তুলে তাকাল। ততক্ষণে তার সমস্ত দেহে কাঁপুনি শুরু হয়েছে।

—ঘুম আসছে না মুক্তো। নীচু গলায় ওস্তাদ বলল, যা মশা তোমাদের এখানে। মশারিটা একটু ঝেড়ে দেবে?

জলের গ্লাস ওস্তাদের হাতে তুলে দেয় মুক্তো। আঙুলে ছোঁয়া লাগে। তপ্ত স্পর্শ। মনে হল তার আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছে দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায়।

মুক্তো কথা বলতে যায়। পারে না। গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোল না। ওস্তাদ কী মিটমিট করে হাসছে? আবদার দ্যাখ! এই মাঝ রাতে মশারি ঝেড়ে দিতে হবে। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। সে নিঃশব্দে ওস্তাদের মশারি তুলে পাখা দিয়ে হাওয়া করল। কোথায় মশা? সে সব বুঝতে পারল। পিছনে ওস্তাদ দাঁড়িয়ে। কাঁধের ওপর গরম নিঃশ্বাস। কেঁপে উঠল সে। ঘুরে দাঁড়াল ওস্তাদের মুখোমুখি।

মাথা নীচু করে মুক্তো ফিসফিস গলায় বলল, এবার যাই আমি। বলে সে পাশ কাটিয়ে বেরোতে যাবে অমনি খপ করে ওর ডান হাত ধরে ফেলল ওস্তাদ। তারপর জোরে এক টান মারতেই সে ওর বিশাল বুকের মাঝখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

কয়েক মুহূর্ত মুক্তো স্থির হয়ে রইল। যেন ওর জ্ঞান লোপ পেয়েছে। একটু পরে সে ছটফট করে উঠল ওস্তাদের কঠিন আলিঙ্গনের ভিতর। চিৎকার করতে পারল না। ডান হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরেছে ওস্তাদ। অনেকক্ষণ ছটফটানীর পর মুক্তো ঢলে পড়ল ওস্তাদের বুকের ওপর।

—দরোজা খোলা ওস্তাদ। বন্ধ করে আসি।

ওস্তাদ ওকে মশারির ভিতর ঠেলে দিতেই মুক্তো ছিটকে পড়ল বিছানার ওপর। নিজেই দরোজা ভেজিয়ে ফিরে এল ওস্তাদ। মুক্তো দু চোখ বন্ধ করল। ওস্তাদের কঠিন হাত ওর দেহের ওপর ঘুরে বেড়ায়। মুক্তোর দেহ মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে। ওর মনে হল স্বপ্নময় এক দেশে সে উপস্থিত হয়েছে। আস্তে আস্তে সে নিজের অজ্ঞাতসারে দু হাত দিয়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল ওস্তাদকে। তারপর ওরা পরস্পরকে অসংখ্যবার চুম্বন করল। প্রতিটি চুম্বনে মুক্তোর সমস্ত শরীরে ঢেউ খেলে যায়। ঘনঘন নিঃশ্বাস নেয় সে।

দমবন্ধ হয়ে আসতে চায় মুক্তোর। আর যেন সে সহ্য করতে পারছে না। তবু সে আরও প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরল ওস্তাদকে। ওকে যেন পিষে ফেলতে চাইছে। সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ শিহরনের মত আনন্দ ছড়িয়ে

পড়ছে। মুক্তো কান্নায় স্বরে কী যেন বলতে থাকে। জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে থাকে সে।

পরের দিন সকালে বাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণ কাঁদল মুক্তো। দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদল। শেষ রাতে বুড়িমার পাশে এসে শুয়েছে। তার আগে ওস্তাদের কাছ থেকে ছাড়া পায়নি। তারপর আর ঘুম আসেনি। ভোর পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়েছে। মাঝে মাঝে তাকিয়েছে বুড়িমার দিকে। শুনেছে ওর গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস।

বুড়িমার কথা ওস্তাদকে বলেছিল মুক্তো। ওস্তাদ ওর বুকে মুখ রেখে সামান্য হেসে বলেছে, মেরা নাম হ্যায় ওস্তাদ। কাঁচা কাজ করি না। বুড়িকে যা বলবো তাই শুনবে। বুঝলে মুক্তোরাণী, শালার টাকা দিয়ে কী না হয়!

গায়ে জল পড়তেই শিউরে উঠল মুক্তো। সমস্ত শরীরে ব্যথা। রাত্রে উত্তেজনায় মুহূর্তে কিছু টের পায়নি। এখন চোখে পড়ল সারা দেহে দাগ। ওস্তাদ কোন জায়গা বাকি রাখেনি। কামড়ে খিমচে দলে পিষে ওকে যেন ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। একটা আস্ত ডাকাত। ঝড়ের মত এসে এক রাতে তার সব ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নিয়েছে!

মুক্তো রান্নাঘর থেকে বেরোল না। রাখাল ফেরার সময় বাজার করে এনেছে। ওর দিকে তাকাতে পারছিল না। সকালবেলায় ওস্তাদের সামনে চা দিতে গিয়ে থরথর করে কেঁপেছে। একবার শুধু তাকিয়েছিল। পরম হাসিতে ওস্তাদ অভ্যর্থনা জানিয়েছে। ওর হাত থেকে চা নেওয়ার সময় নীচু গলায় বলেছে, 'তোমার বড় কষ্ট মুক্তো, না? আমি সব বুঝতে পারি।' বলে ওর হাত ধরতে গেলে পালিয়ে এসেছে সে। তারপর আর ওঘরে যায়নি।

—আমার শরীর ভাল লাগছে না মুক্তো।

রাখালের দুচোখের নীচে কালো দাগ। রাত্রি জাগরণের চিহ্ন স্পষ্ট। ইস কী রোগা দেখাচ্ছে! এত মদ খেলে শরীর ঠিক থাকে কী করে। ধীরে ধীরে ওর শরীর ভেঙেছে। সেইসঙ্গে মেজাজ হয়েছে রুক্ষ। মুক্তো এখন কিছু বলে না। চুপচাপ থাকে। দীর্ঘদিন অবহেলা আর গঞ্জনা সহ্য করে এসেছে। ফলে রাখালের প্রতি কোন দয়ামায়া নেই। তবু অসুখ-বিসুখ হলে মুখ ফেরাতে পারে না। অন্য মেয়েছেলের পাল্লায় পড়লে রাখাল এতদিনে জব্দ হয়ে যেত।

দুপুরবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল মুক্তো। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। ওঘরের আলোচনা শুনতে পেল। অনেকটা তর্জন-গর্জনের মত শোনাচ্ছে। ওদের মধ্যে ঝগড়া সুরু হল নাকি? ওস্তাদ জোরে জোরে কী যেন বলছে। ভয় পেল মুক্তো। কোনমতেই ওস্তাদকে সহ্য করতে পারছে না রাখাল। সে বিছানা ছেড়ে নেমে এল। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওদের কথা কাটাকাটি শুনতে লাগলো।

—তোর মতলব কী শুনি রাখাল? ওস্তাদের কণ্ঠস্বর রীতিমত কঠিন, শালা আজ আমাকে সহ্য করতে পারছিস না! সেদিন লুটের মালের বখরা নিয়ে ভেগে গেলি। একবার আমাকে জানাসনি পর্যন্ত। খেতে পেতিস না, দয়া করে দলে টেনেছিলাম। নেমকহারাম, সব ভুলে গেছিস?

—কিছুই ভুলিনি ওস্তাদ। রাখাল একেবারে ভেঙে পড়ল, তুমি চলে যাও! এখানে পুলিশের হামলা হতে পারে। তোমার থাকবার জায়গার অভাব হবে না। দ্যাখ, আমি ভাল হয়ে গেছি। বিয়ে থা করে ঘর-সংসার করছি। আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও। বলে সে ওস্তাদের পা জড়িয়ে ধরতে যায়।

বিকৃত হাসিতে ওস্তাদের চোখ-মুখ ভয়াবহ হয়ে ওঠে, পা ছাড় রাখাল। তুই বউকে জড়িয়ে নাক ডেকে ঘুমোবি—আর আমি শালা পুলিশের তাড়ায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে বেড়াব...। তুই একটা বেজম্মার বাচ্চা, স্বার্থপর রাখাল!

—মুখ সামলে কথা বল! রাখাল নিরুপায় আক্রোশে মাথার চুল দুহাতে শক্তভাবে চেপে বলে, তুমি এখান থেকে যাবে কিনা বল। নইলে...। ওর দুচোখের বন্যভাব দেখে মুক্তো শিউরে উঠল। মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগল। তুমি আমাকে বাঁচাও। দয়া কর!

—নইলে কী করবি? ওস্তাদ হিংস্রভাবে একবার রাখালের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, যা ঘুমো গে। দ্যাখ, আর একটা কথাও বলিস না রাখাল। চলে যা এখান থেকে।

মুক্তো তাড়াতাড়ি সরে যায়। রাখাল ঘরে ঢুকছে। সে দুচোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান করল। টের পেল রাখালের অশান্ত পদচারণা।

বিকেলে চা দিতে এসে মুক্তো ঘাবড়ে যায়। চিৎ হয়ে শুয়ে রাখাল। দুচোখ বোঁজা। বিড়বিড় করে ঠোঁট নড়ছে। বলছিল শরীর খারাপ। তবে কী জ্বরটর হল নাকি। কপালে হাত দিল সে। বেশ গরম। কত ডিগ্রী জ্বর উঠেছে কে জানে।

—ওঠো। চা খাবে না?

রাখাল তাকায়। দুচোখ লাল। কী অদ্ভুত ওর তাকানোর ভঙ্গি। মুক্তো চোখ নত করল। রাখাল কী ভাবছে যদি সে একবার জানতে পারত!

—একটু জল দাও মুক্তো।

—তোমার যে গা পুড়ে যাচ্ছে। মুক্তো জলের গ্লাস রাখালের মুখের সামনে ধরে, একবার ডাক্তারের কাছে যাব।

—না। আমার কাছে এসে বসো। মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।

নীরবে রাখালের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় মুক্তো। কিছুক্ষণ পর শুনল ওস্তাদ ওর নাম ধরে ডাকছে। রাখাল তেরচা চোখে ওর দিকে তাকাল। ওই আবার ডাকছে ওস্তাদ। অন্যদিকে তাকিয়ে মুক্তো ভাবল যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে লোকটার!

—যাও। দ্যাখ কী চায় ওস্তাদ। রাখালের মুখ কদাকার দেখায়, এভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করে না মুক্তো। এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল!

মুক্তো যেন মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু সেই বা কী করতে পারে। ফের ডাকাডাকি সুরু হবে ভেবে মাথা নীচু করে বাইরের ঘরে এল। পর্দা টেনে দিতে ভুলল না।

—ডাকছো কেন ওস্তাদ। ওদিকে ঘরের মানুষটা জ্বরে ছটফট করছে। এভাবে ডেক না। খারাপ দেখায়।

—এদিকে এসো মুক্তো। ওস্তাদ দুহাত বাড়িয়ে বলে, সকাল থেকে তুমি শুধু এড়িয়ে যাচ্ছ: কী অপরাধ করলাম?

দুহাতে মুখ ঢেকে মুক্তো অস্ফুট কান্নায় ভেঙে পড়ল, আমাকে রেহাই দাও ওস্তাদ। তোমার দুটি পায়ে পড়ি! তুমি

চলে যাও। আর আমাকে জাগিয়ে নিয়ে যেয়ো না।

মুক্তো পালাতে পারল না। ততক্ষণে ওস্তাদ ওকে নিবিড়ভাবে জাপটে ধরেছে। তারপর ওর হাত সরিয়ে চোখের ওপর পর পর অনেকগুলি চুম্বন করল। মুক্তো অসহায় পাখির মত ছটফট করতে থাকে। রাখালের কথা ভেবে ফিসফিস করে বলে, ছেড়ে দাও। ছিঃ তুমি একটা পশু। এর চেয়ে আমাকে মেরে ফেলো। হ্যাঁ, ছোরা বসাও এই বুকে!

—ছোরা বসাবো মুক্তো, তোমার বুকে নয়। বলে ওস্তাদ ওর ঠোঁটে প্রচণ্ড চুম্বন করে বলল, এখন আর পালাবার কোন উপায় নেই। তোমার আমার মাঝখানে কেউ থাকবে না।

—ছাড় ওস্তাদ। ওই শোন রাখাল ডাকছে। তোমার কী একটুও দয়ামায়া নেই? কী চাও তুমি?

—কী চাই! ওস্তাদের কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে ওঠে, মুক্তো চল আমরা পালিয়ে যাই। আজ রাতেই। রাখাল তোমাকে কিছু দিতে পারবে না। কী আছে ওর! আমার কাছে তুমি সব পাবে।

—আস্তে। মুক্তো ওস্তাদের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, তা হয় না। আর আমাকে লোভ দেখিয়ো না। বলে সে আপ্রাণ চেষ্টা করল ওস্তাদের কঠিন আলিঙ্গন থেকে বেরিয়ে আসতে। পারল না। নীরব কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

—যাও। আমার কথা মনে থাকে যেন।

আঁচল দিয়ে দু'চোখ মোছে মুক্তো। তারপর হাঁপাতে থাকে। কোঁচকানো শাড়ি ঠিকঠাক করে। ব্লাউজের বোতাম আটকায়। কপালের ওপর থেকে চুল সরায়। ঠোঁট জ্বালা করছে। বোধহয় কেটে গেছে। মুখ ঘুরিয়ে একবার ওস্তাদের দিকে তাকাল। অসভ্যের মত হাসছে। চোখাচোখি হতে মুচকি হাসল ওস্তাদ। মুক্তো মনে মনে বলল, 'ছি! আস্তে আস্তে কোথায় সে নেমে যাচ্ছে। ওস্তাদের স্পর্শে সে এভাবে অবশ হয়ে ওঠে কেন! কেন মনে হয় বিশ্বসংসার বলতে কিছু নেই!'

ঘরে পা দিতেই রাখাল রুক্ষস্বরে বলল, এতক্ষণ কী করছিলে? বলে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুক্তোর সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।

মুক্তোর মনে হল ওর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। মাথা ঘুরছে। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে ধীর গলায় বলল, চা করে দিলাম ওস্তাদকে। কথা বল না। ঘুমোতে চেষ্টা কর।

রাখাল আর কিছু বলল না। ওর জ্বর আস্তে আস্তে বাড়ছে। মাথার কাছে বসে মুক্তো কপালে জলপটি লাগায়। ক্রমশ সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। হ্যারিকেন ধরায় সে। একা মানুষ সব দিক দেখতে হবে। উনুনে ধরিয়ে রাত্রের রান্না সারে। মাঝে মাঝে রাখালের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। জলপটি পাল্টায়। এখন ওর কোন জ্ঞান নেই। ওর শীর্ণ মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মুক্তো।

খাওয়ার সময় ওস্তাদ বেশি কথা বলে না। ওর মনের কথা জানবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে মুক্তো। গম্ভীর মুখে কী এত ভাবছে? নানারকম চিন্তা আসছে মাথায়। শেষকালে থাকতে না পেরে সে প্রশ্ন করল, কার ধ্যান করছো ওস্তাদ?

—তোমার। দিনরাত্ত এখন এই এক চিন্তা। ওস্তাদ গভীর চোখে তাকাল, মনে আছে তো মুক্তো। কাল খুব ভোরে...কাক-পক্ষী টের পাবে না। তারপর শালা দূরে কোথায়ও...দুদিন ভাল-মন্দ কিছু পেটে পড়লে তোমার শরীর যা হবে না...! লোভ আর কামনায় ওর মুখ চকচক করে ওঠে।

—ছি ওস্তাদ! এসব কথা বলতে নেই। শুনলে পাপ হবে।

—কীসের পাপ! এই যে দিনের পর দিন রাখালের লাথি খেয়ে পড়ে রয়েছো, এই তো পাপ।

—তবু রাখাল আমার স্বামী। ফুটপাত থেকে ও আমাকে তুলে এনেছে। নইলে এতদিনে আমার কী যে দশা হোত...।

—তাই বলে সারাজীবন একটা কাপুরুষের কাছে পড়ে থাকবে? আমি জানি মুক্তো তোমার মন কী চায়। এক রাতেই তোমাকে চিনেছি আমি!

—আমিও। মুখ টিপে হাসল মুক্তো। ডিবরির অস্বচ্ছ আলোয় ওর রহস্যময় হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে যায় ওস্তাদের। মনে হয় মুক্তোর জন্যে ও সব করতে পারে। বিধাতা যেন মুক্তোকে তিল-তিল করে সৃষ্টি করেছে: এমন উপচে পড়া যৌবন নিয়ে রাখালকে আঁকড়ে থাকতে চায় কীসের আকর্ষণে মুক্তো? শুধু এটাই ওস্তাদের কাছে পরম বিস্ময়।

হাত-মুখ ধুয়ে পান নেবার সময় মুক্তোর গাল টিপে ওস্তাদ বলল, তাড়াতাড়ি এসো। আমি আর পারছি না!

—তুমি কী পাগল হয়ে গেলে ওস্তাদ! মুক্তো দু'হাত দিয়ে বুক আড়াল করে বলে, এমন পাপ আমার সইবে না। আমার যে নরকে ঠাঁই হবে না!

—ভুলে যাও স্বর্গ নরকের কথা। মুক্তো, আমি কিন্তু জেগে থাকবো।

ওস্তাদ চলে যায়। মুক্তো রান্নাঘরে পা ছড়িয়ে বসে থাকে। সামান্য কিছু মুখে দেয়। খাবে কি, গলা দিয়ে কিছু নামতে চায় না। ওস্তাদের কথা হাসি চোখের ইসারা বারবার মনে পড়ছে।

আস্তে আস্তে রাত বাড়ে। দরোজা বন্ধ করে রাখালের মাথার কাছে বসে থাকে মুক্তো। জ্বর অনেকটা কমেছে মনে হল। কিছু খেতে চায় না তবু জোর করে বার্লি খাইয়েছে। এখন চুপচাপ ঘুমোচ্ছে রাখাল।

সত্যি ওস্তাদ মিথ্যে কথা কিছু বলেনি। রাখাল ওর শরীর বা মন কোন কিছুর খবর রাখেনি। বরং তাচ্ছিল্য করেছে সব সময়। বাকী জীবনও কী এভাবে তিল-তিল করে নিজেকে বঞ্চিত করবে? কীসের পাপ সে যদি ওস্তাদের সঙ্গে পালিয়ে যায়? ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল ওস্তাদের সবল বাহু, বিশাল রোমশ বুক আর সেই রাতের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা...।

কখন যেন ঘুমে ঢলে পড়েছিল মুক্তো। একটা বিশ্রী স্বপ্নে ঘুম ভেঙে যায়। ঘাম শিরদাঁড়া বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। লাফ দিয়ে উঠে বসল সে। মৃদু করাঘাতের শব্দ। চমকে উঠল মুক্তো। সভয়ে রাখালের দিকে একবার তাকাল। নিঃশ্বাস ফেলছে জোরে জোরে রাখাল। নিশ্চিন্ত হল সে। আবার ধৈর্যহীন করাঘাত।

নিঃশব্দে দরোজা খুলে বেরিয়ে এল মুক্তো। তারপর দরোজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে মুখোমুখি হল ওস্তাদের। সামনে যেন একটা বাঘ! রক্তের স্বাদ পেয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছে। মিটমিট করে হ্যারিকেন জ্বলছে। চারিদিকে স্তব্ধতা।

—আজ থাক। মুক্তো নীচু গলায় বলল, রাখাল যে কোন সময় জেগে উঠতে পারে। কী দুঃসাহস তোমার!

ওস্তাদ এগিয়ে আসছে দেখে মুক্তো সরে যায়। কিন্তু কোথায় পালাবে! তবু সে ঘরের এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে। ওস্তাদের প্রসারিত হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এক সময় সে হাঁপিয়ে উঠল। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। তাকে দেয়ালের সঙ্গে চেপে জড়িয়ে ধরল ওস্তাদ। সে দু'হাত দিয়ে মরীয়া হয়ে চেষ্টা করল ওস্তাদকে সরিয়ে দিতে।

—না, না, না! চিৎকার করতে যায় মুক্তো। একটা কঠিন হাত ওর মুখ চেপে ধরে। তারপর অন্ধকার। ওকে টেনে হিঁচড়ে বিছানায় নিয়ে আসে ওস্তাদ। ছটফট করতে থাকে মুক্তো। হাত-পা ছোঁড়ে। শেষে এক কাণ্ড করে বসল। মাথার ঠিক থাকে না। ওস্তাদের ডান বাহু সজোরে কামড়ে ধরে সে।

অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে উঠল ওস্তাদ। মুক্তো দু'হাত দিয়ে ঠেলে দিল ওকে। তারপর মশারি তুলে বাইরে এল। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করতে যায়। পারে না। এক ধাক্কায় সে ছিটকে যায় অনেকটা দূরে। ওস্তাদ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

প্রতিহিংসাপরায়ণ একটি মুখ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। মুক্তো সভয়ে পিছিয়ে যায়। এ কী! বিস্ফারিত চোখে দেখল রাখালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে উদ্যত ছোরা হাতে ওস্তাদ। সেই হাত ধীরে ধীরে নেমে আসছে। আস্তে আস্তে নামছে। আর একটু হলেই...।

একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল মুক্তোর গলা চিরে। সবেগে সে ছুটে

এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওস্তাদের ওপর। তারপর সুরু হয় ধস্তাধস্তি। ওস্তাদের ডান হাত শক্ত হাতে চেপে ধরল মুক্তো। বুকের ওপর পর পর চড় কিল ঘুষি, ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরোল। রাখালের চিৎকার শুনল সে।

ঠিক কিভাবে ওস্তাদের বুকে আমূল ছোরা বসে যায়—আজ পর্যন্ত মুক্তো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারল না। পরে এ সম্পর্কে অনেকবার ভেবেছে। কিন্তু ব্যাপারটা এখনও তার কাছে রীতিমত অস্পষ্ট। শুধু কানে এসেছে বীভৎস আর্তনাদ। স্তম্ভিত, চোখে দেখেছে ওস্তাদের ভারী শরীর মেঝেয় লুটিয়ে। রক্তে ভেসে গেছে অনেকটা জায়গা। ওস্তাদের বুকের ওপর থেকে আস্তে আস্তে উঠে বসেছে মুক্তো। শাড়ির আঁচল ব্লাউজ রক্তে ভেজা। কখন ঘরে লোকজন ঢোকে, কখন পুলিশ আসে; তাকে কে বা কারা পোষাক পাল্টে দেয়, চিৎকার করে রাখাল কী বলে, আজ কিছু মনে নেই মুক্তোর। শুধু মনে পড়ে মেঝেতে কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছে বিরাট এক লাশ। মুক্তো বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারেনি। দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকেছে।

তারপর এসেছে এই কয়েদখানায়, যেখানে এসে রাখাল তার সঙ্গে দেখা করে—যেখানে থাকতে হবে তাকে দশ বছর। দ-শ-বছ-র!
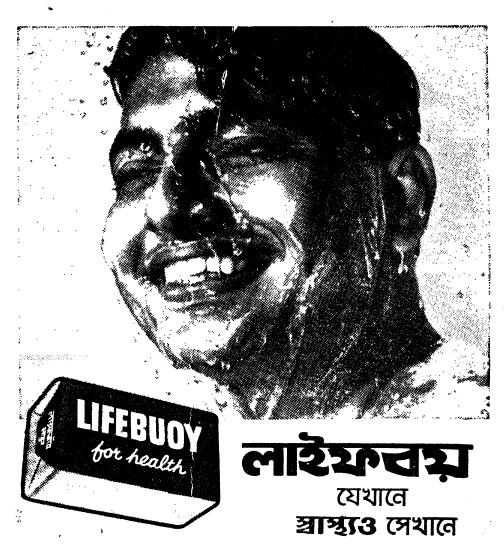
লাভার্স লেন। চারপাশের তুমুল অন্ধকার এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে পাহাড়ী চিতার মতো দুটো হেড্‌লাইট ছুটে এলো। একটা টার্ন নিয়ে ব্রেক কষতেই বাদামী জাগুয়ার গাড়ীটা ভীষণভাবে থরথরিয়ে উঠে থেমে গেল। ল্যাম্পপোস্টের ঠিক নীচে দাঁড়ানো ছায়ারূপিণীর এতক্ষণে পাথুরে শরীরে যেন অনেকগুলো ব্যাটারি চার্জ করা হল। সিরসিরে আবীরের মত গুঁড়ো নীলচে আলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল নাকের ডগায়, কানের লতিতে, থুতনির ভাঁজে, কাঁচুলির কারসাজিতে ফেঁপে ওঠা বুকের দুই গোলার্ধে। গাড়ীর পেছনের লাল বাতি জ্বলে ওঠা ও হেড্‌লাইট দুটো নিভে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনটি চক্‌চকে মাতাল দরজা খুলে লাফ দিয়ে নেমে মেয়েটির গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। ট্রাম লাইনের ওপারের বৃদ্ধ বটের মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক রাতচরা ডাঁশ ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। তিনটি চক্‌চকে মাতালের ছ'টি হাত মেয়েটিকে অবলীলায় সাপ্‌টে তুলে নিয়ে গাড়ীর ভেতরে ছুঁড়ে দিল। ক্ষ্যাপা পশুর গলায় রাগী গিয়ার-বক্স্ দু-চারবার গর্‌-গর্‌ করে গর্জে উঠতেই সুঁই করে গাড়ীটি একটু হেলে আবার লাভার্স লেনেই ঘুর নিল। মনে হল, গাড়ীর উইন্ড-স্ক্রীনে কোনো বয়াটে ছোকরা ঢিল ছুঁড়েছে বুঝিবা—এমনই ঝনঝন কাঁচ ভাঙার শব্দে কামিনী-কন্ঠের আর্তনাদে থান ইঁটের মতো চারপাশের ভারী নৈঃশব্দ্য ছিঁড়ে ছিটিয়ে একাক্কার হয়ে গেল। একটা খশ্‌খশে গলায় চাপা গর্জন ফুঁসে উঠল, 'ছোনে, মুখে রুমাল গুঁজে দে।'

পরের দিন সকালের খবরের কাগজে 'লাভার্স লেনে নৃশংস হত্যাকান্ড' শীর্ষক একটি বক্স-আইটেম হয়ে গেল ঐ হতভাগিনী পতিতাটি। গলির মোড়ে সারা শরীরে যত্রতত্র ছুরির জখম নিয়ে রক্ত, কাদা ও চোখের জলে মাখামাখি হয়ে ওর লাশ পড়েছিল। ঐ একটি মেয়ের খুনের কিনারা করতে সমস্ত লালবাজার ঘেমে নেয়ে একশা—অথচ কেমন বেমালুম বাতাসে বাতাস হয়ে মিশে রইল আততায়ীরা।

কথায় বলে দিনের ঘরণী রাতের বাঘিনী। কিন্তু রাতের শহর বাঘিনীর চেয়েও ক্ষিপ্র, সুন্দর, অথচ ভয়াবহ। প্রতি সংখ্যায় কলকাতার এক-এক অঞ্চলের রাত্রি-রহস্য উদ্ঘাটিত হবে এই বিভাগে।

লাভার্স লেন—স্বয়ং জব চার্নক এই গলির নাম রেখেছিলেন কিনা জানি না। এ গলিকে ঘিরে রয়েছে দাঙ্গা, ছোরা চালাচালি, খুনের গা-কাঁটা-দেয়া, ঝুঁড়ি ঝুড়ি গল্প—সত্যি, হাফ্‌-সত্যি আর স্রেফ ফ্যান্টাসি মিলিয়ে। অলিম্পিয়ায় রঙিন দ্রব্য টানতে টানতে মেদো মাতাল পিটার একটির পর একটি কাহিনী আমাকে বলে যাচ্ছিল। ঘোর অমাবস্যা এসে এ গলির ঘরবারান্দা রোয়াক কালো রং গুলে ছয়লাপ করে দিলে নাকি থেরেসা অ্যালাবাসটার বলে একটি ইহুদি মেয়ের প্রেতের হাইহিল জুতোর খুরের শব্দে খট্‌খটিয়ে ওঠে। মধ্যরাতের দরজায় দরজায় তার নক্‌ করে ফেরার শব্দ শোনা যায়। অথবা, শুক্লপক্ষের প্রতি ত্রয়োদশীতে বুড়ী মার্ঘেরিটার ফ্ল্যাটের ছাদ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মধুচন্দ্রিমার পয়লারাতে যে নবীন দম্পতি আত্মহত্যা করেছিল, তাদের মিলিত 'হেলপ্‌, হেল্‌প্‌' আর্তনাদ শোনা যায়। এই গলির-ই কোনো এক সর্বনেশে বাঁক থেকে উঁচিয়ে ওঠা পিস্তলের ঠান্ডা নল গর্জে উঠে একই সঙ্গে একটি স্কুটারের টায়ার ও তরুণ পাঞ্জাবী আরোহীর হৃৎপিন্ড ফর্দাফাই করে দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল পেছনের সিটে বসে থাকা দিনের সেল্‌সগাল ও রাতের কলগার্ল একটি ইউ-

রোশিয়ান যুবতীকে। ভোরবেলার দুঃস্বপ্নের মতো লাভার্স লেনের আনাচে কানাচে ইতস্তত পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল এক-জন তরুণীর গোলাপী পুরুষ্টু দুই পা, ছেঁড়া হাত আর লাল রিবন বাঁধা মুখের টুকরো টুকরো অংশ। দুটো বড়ো পেগ নিট্ টেনে চোখমুখ কুঞ্চিত ক'রে কোহলের উপ্‌চে ওঠা ঝাঁঝ সামলে নিয়ে পিটার কনক্লুড্ করলো, 'লাভার্স লেন ইস্ স্যাডি-সট্‌স্ প্যারাডাইস।'

ভালো লাগছিল না কিছু। মাঝারি গোছের চাকরি আমার, সামান্য উদ্বৃত্ত জমিয়ে ফি শনিবার একটু জম্পেশ করে নেশা করি। কি দরকার ছিল ঐ পিন্‌খাড়ু চেহারার চালিয়াৎ পিটারের আমার কতো কষ্ট করে আনা আমেজ আল্‌টু বাল্‌টু গপ্‌পো মেরে ধ্বসিয়ে দেয়ার। ওর ব্যাঙের মত বিচ্ছিরি থ্যাব্‌ড়া নাকে ঘুঁষি ঝাড়তে ইচ্ছে করছিল। খুব কষ্টে নিজেকে সামলে আধ-খ্যাঁচড়াভাবে পিটারকে শুভরজনী জানিয়ে তর্-তর্ পায়ে ফুটপাতে এসে দাঁড়ালাম। হয়তো রাস্তা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে-ছিলাম। খয়েরি ফিতের মতো একটা প্যাকার্ড সাঁৎ করে ইঞ্চিকয়েকের জন্য আমাকে নির্ঘাৎ বাঁচিয়ে ছুটে যেতেই কিছুটা হুঁশ এলো। ভালো লাগছিল না চারপাশ। কারণ আমার কানে একঘেয়ে পিন-আটকানো রেকর্ডের মতো বাজছিল বুড়ো পিটারের শ্লেষ্মাজড়িত গলার শব্দ, 'লাভার্স লেন ইস্ স্যাডিসট্‌স্ প্যারাডাইস্ ......স্যাডিসট্‌স্ প্যারাডাইস্।' ছেলেবেলার মাঝরাত্তিরে আল্‌টপকা দেখে ফেলা ও তার-পর নিয়মিত দেখা পাশের বাড়ীর একটি ঘরের ভেতরকার ছবি কোত্থেকে ভু-উ-শ্ করে ভেসে উঠল। এক বিখ্যাত নট প্রতি-রাত্রে বেহদ্দ নেশা করে বাড়ী ফিরতেন এবং প্রতি রাত্রে তাঁর স্ত্রী (এখন জেনেছি রক্তাক্ত) হান্টার দিয়ে আগাপাশতলা চাবকে তাঁর নেশাকে আর-ও জমাট করে তুলতেন। বারো বছর বয়সেই পেকে পিপুল হয়ে গিয়েছিলাম, মুখ দিয়ে খিস্তির খই ফুটতো। ঘুমের ভান করে বিছানায় শুয়ে থাকতাম, বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চিলেকোঠায় বেড়াল-পায়ে উঠে যেয়ে ঘুল-ঘুলিতে প্রায়ই চোখ রেখে দেখতাম, মদ্য-পানরত সূর্যের মতো সেই লাল টকটকে চেহারার অভিনেতাটি কিভাবে সারা দেহে চাবুকের দাগ নিয়ে রোখা জানোয়ারের মত ঝাঁপিয়ে পড়তেন তাঁর পীড়নকারিণীর ওপর, আর তারপর—। অবশেষে মা একদিন সব জানতে পেরে আমাকে বে-ধড়ক ঠেঙিয়ে-ছিলেন। সাহেবপাড়ার এতোলবেতোল বাতাসে পিছু পিছু তাড়া করে ফেরা পিটারের শেষ উক্তিটির সঙ্গে শৈশবের সেই নিষিদ্ধ ছবি বারবার অস্বস্তিকর হয়ে মিশে যাচ্ছিল।

হাঁটতে হাঁটতে কখন কিড্ স্ট্রিটের মোড়ে এসে পড়েছি খেয়াল নেই। শরীরটাকে একটু টান করে ফ্যাকাশে বাতিঅলা পোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে সিগ্রেট ধরাতে গিয়েই হঠাৎ অবিশ্বাস্য মেয়েলি গলায় শুনলাম, 'দেশলাইটা একটু দেবেন?' যেন ঐ ল্যাম্পপোস্ট থেকেই তীব্র বৈদ্যুতিক শক্ ছড়িয়ে গেল সারাদেহে। তাকিয়ে দেখি আলোর বৃত্তের ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে একটি শরীরী প্রতিমা। ঝিরঝিরে আবীরের মতো গুঁড়ো নীল্‌চে আলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ওর নাকের ডগায়, কানের লতিতে, থুতনির ভাঁজে, কাঁচুলির কারসাজিতে ফেঁপে ওঠা বুকের দুই গোলার্ধে।

তাড়াতাড়ি আমি সামনের দিকে পা চালিয়ে দিলাম।

—নিশানাথ

প্রেমের ঋণ পরিশোধ

প্রতিবেশী সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেক কম। তার প্রধানতম কারণ ভারতের অন্য অঞ্চলের ভাষা শিক্ষার প্রতি আমাদের তেমন আগ্রহ নেই। অথচ দেখেছি পাশাপাশি যেসব ভাষাগোষ্ঠীর রাষ্ট্র আছে সেখানকার মানুষ বাংলা ভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, এমন কি অতি সাম্প্রতিককালে কোন বাঙালী লেখকের গল্প বা উপন্যাসের চাহিদা অধিক তাও তাঁদের অজানা নেই। আমাদের পত্র-পত্রিকায় কিন্তু প্রতিবেশী সাহিত্যের লেখকদের নিয়ে বাড়াবাড়ির অন্ত নেই। যাঁর মূল্য হয়ত কানাকড়িও নয়, তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে লম্বা চওড়া প্রবন্ধ লিখি। তিনি এই সব অঞ্চলে অনুগ্রহ করে পদধূলি দিলে তাঁর কাছ থেকে বাণী নিই এবং বাংলা সাহিত্য বা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে আধুনিকদের সম্পর্কে তাঁদের মতামত ভিক্ষা করি। অর্থাৎ কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি করি। সব হাতির মাথায় যেমন মুক্তা নেই, তেমনই সব আঞ্চলিক লেখকই (সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃক পুরস্কৃত হলেও) মহৎ লেখক নন। অবজ্ঞা করাও যেমন অনুচিত তেমনই অতি উচ্ছ্বাসও অতিশয় গর্হিত।

এই স্তম্ভে ইতিপূর্বে 'সার্চ লাইট' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক সুভাষচন্দ্র সরকার মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রসংগে দেখিয়েছি যে, এইসব 'খ্যাতিমান'রা কি পরিমাণ অজ্ঞ, অথচ অবলীলাক্রমে যে কোনো রকম মতামত দিতে এঁদের বাধে না। এঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষায় দক্ষ। এঁদের প্রচার কৌশল অসামান্য, এবং একটি ক্ষুদ্র আঞ্চলিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এঁদের জয়ঢাক বাজানোর জন্য লোকজনেরও অভাব হয় না। মাঝে মাঝে নমুনাস্বরূপ প্রতিবেশী সাহিত্যের কিঞ্চিৎ স্বাদ গ্রহণ করা তাই প্রয়োজন। অপরের মুখে ঝাল খাওয়া মোটেই স্বাস্থ্যকর বলা যায় না। ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে জড়িয়ে থাকা কোনো ক্ষেত্রেই কল্যাণের সূচনা করে না।

সম্প্রতি কিছু কিছু আঞ্চলিক রচনা (অনুবাদের মাধ্যমে) আমাদের পড়ার সুযোগ হয়েছে, সুবিধামত তার কিছু পরিচয় মাঝে মাঝে দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে। শ্রীমতী অমৃত প্রীতম (১৯১৯) একজন পাঞ্জাবী লেখিকা। পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর জন্ম হয়। সাহিত্য সাধনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে 'সাহিত্য আকাদেমি'র সাহিত্য-পুরস্কার পেয়েছেন। ভারতীয় মহিলা লেখিকাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই সম্মানের অধিকারিণী। এ তাবৎ তাঁর প্রায় পঁয়ত্রিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা, গল্প, উপকথা, জীবনী, উপন্যাস সকল বিভাগেই তিনি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন বলে শোনা যায়।

শ্রীমতী অমৃত প্রীতমের একটি উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ 'ডক্টর দেব' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণ গুজরাল এই অনুবাদ করেছেন। সমগ্র কাহিনীটি সংক্ষেপে বিধৃত করা যাক—

নায়িকা মমতা, ডাঃ দেবের প্রিয়তমা। এই উপন্যাসে কল্পলোকের আরো অনেক পাত্র-পাত্রী, কিন্তু মমতা হলেন মধ্যমণি। ঘটনা সংস্থাপন কিছুটা নাটকীয় কিছুটা উপকথা জাতীয়। মমতা, উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়ে। ডাক্তার দেবের সংগে তার প্রণয় হয় একটি শৈলনিবাসে। এই প্রণয়ের ফলে একটি অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়। মমতার মনে অবশ্য মধ্যবিত্তসুলভ মনোবৃত্তির তেমন গোঁড়ামি নেই। বাপ-মা তাকে যখন বিবাহ দিলেন, তখন তার আপত্তি ছিল, কিন্তু বাপ-মার ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে হয় এবং এই আইনসম্মত স্বামী-দেবতা তাকে একটি কন্যা সন্তান উপহার দেন। তবে মমতার এই নতুন সংসারে স্ত্রীর ভূমিকায় এতটুকু মন লাগছিল না। সে তার বৈধ স্বামী জগদীশচন্দ্রকে ভালোবাসে না। শেষ পর্যন্ত একেবারে মরিয়া হয়ে স্বামী এবং কন্যাকে ত্যাগ করে বাকী জীবনটা স্কুলমাস্টারী করে কাটাবে স্থির করে একদিন সংসার থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এই উপন্যাসের পরবর্তী অংশে অবশ্য এই বানপ্রস্থের জীবনের তেমন উল্লেখ নেই। তবে উপন্যাসের অন্য পাত্র-পাত্রীরা তার কথা উল্লেখ করে আলোচনা সজীব রাখে।

এদিকে ডাক্তার দেব জীবনে আর বিবাহ করলেন না। অতৃপ্ত প্রেম তাঁকে অসুখী করেছে, ব্যক্তিগত জীবন তাই বেদনায় ভরা।

মমতার স্বামী জগদীশচন্দ্র তার স্ত্রীর এই গৃহত্যাগের ব্যাপারটি নিয়ে মোটেই হৈ-চৈ করতে রাজী নন। বরং কন্যাকে যথেষ্ট যত্নসহকারে মানুষ করতে

লাগলেন, যেন এইভাবেই তিনি প্রথমা স্ত্রীর স্মৃতিটুকু অনির্বাণ রাখার প্রয়াস করলেন।

তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন এই উল্লেখ থাকলেও সেই মহিলা উপন্যাসে অনুপস্থিত।

অবৈধ সন্তানটি পরিশেষে দেখা গেল যে, নিষ্ঠুর সমাজের কাছ থেকে তেমন রূঢ় আচরণ ভোগ করে নি। এর কারণ, ডাক্তার দেব হাসপাতাল থেকে তাঁর অবৈধ সন্তানটিকে নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর এক সন্তান-সন্ততিহীন বন্ধুকে দান করেছিলেন, সেখানেই সেই শিশু দিনে-দিনে পরমানন্দে বেড়েছে, আর একজন পাতানো কাকা এই শিশুটির দিকে সদা-জাগ্রত চক্ষু মেলে রেখেছেন।

ডাক্তার দেব সুপুরুষ। সুদর্শন এই মানুষটি পেশাদার প্রেমিক হয়ে উঠতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে মমতার স্মৃতি অন্তরে বহন করছেন। ডাক্তার দেবের মানব-কন্যা রাজকুমারী তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসে, কিন্তু যখন জানল যে কোনো ঘনিষ্ঠতা সম্ভব নয় তখন সে দেহাতীত প্রেমের 'পিটুলি গোলা' পান করেই অশ্বত্থামার মত সন্তুষ্ট থাকে। দেহাতীত প্রেম রাজকুমারী ও ডাক্তার দেবকে ভুলিয়ে রাখলেও তাদের সন্তানকে এই দিয়ে ভোলানো গেল না। ফলে রাজকুমারীর কন্যার সঙ্গে একদিন ডাক্তার দেবের সেই অবৈধ সন্তানের বিবাহ হয়ে গেল। প্রেমের ঋণ পরিশোধও বলা যায়।

শ্রীমতী অমৃত প্রীতমের উপন্যাসের এই হল কাহিনী অংশ। একে অবশ্য নৃত্য-নাট্য বা নাটকও করা যায়। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রাবলী যে যার 'পার্ট' মুখস্থ করে যেন বলে গেছে। দেশ বিভাগের পটভূমিকা নাটকের দৃশ্যপট। পাত্র-পাত্রীর জীবনের উত্থান-পতনের মধ্যে যে গভীর বিপর্যয় দেশ বিভাগের চেয়েও তার গভীরতা অনেক বেশী। দেশ বিভাগ বিচ্ছিন্ন প্রেমিক-প্রেমিকাকে অবশ্য একত্রিত করেছে, কিন্তু তার ফলে তাদের জীবনের গতি পরি-বর্তিত হয় নি।

শ্রীমতী অমৃত প্রীতমের কিছু কবিতার ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করেছি। গল্প বা উপন্যাস আগে পড়িনি। যখন এই গ্রন্থটি অনুদিত হয়েছে ইংরাজী ভাষায় তখন ধরে নিতে হবে, অনুবাদক বা প্রকাশক গ্রন্থটির মূল্য বুঝেই তা অনুবাদ করেছেন। সুতরাং এই গ্রন্থটিকে শ্রীমতী অমৃত প্রীতমের রচনার একটি নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

'অমৃত' পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে কাহিনীটি বিধৃত করা গেল কোনো মন্তব্য না করে। এই কাহিনীটির সঙ্গে বাংলা তুলনামূলক বিচার করলে একটা নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে তাঁরা উপনীত হতে পারবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

বাংলা ছোটগল্প এবং উপন্যাস অনেক-খানি পরিণতি লাভ করেছে। গত দশ বছরে বাংলা সাহিত্যে অন্ততঃ একশতখানি উল্লেখযোগ্য গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা খ্যাতনামা তাঁদের কথা না ধরে সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা নবাগত তাঁদের রচনার মধ্যেও কি পরিণত দৃষ্টিভঙ্গী এবং নতুন রীতির পরিচয় নেই? বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি, নিজের ঘরে কি অমূল্য সম্পদ আছে তা না দেখে আমরা অপরের কাছে কাঙালের মত হস্ত প্রসারিত করি একথা অস্বীকার করা যায় না।

—অভয়ঙ্কর

DOCTOR DEV : By Amrita Pritam : Translated by Sri Krishna Gujral Published by: Hind Pocket Books. Delhi Price Rupees two only.

ভারতীয় সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব ॥

গত ২৭শে জুন নৈহাটি-কাঁটালপাড়ায় কল্যাণী সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নৈহাটি শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন।

শ্রীতাপস চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের পর সভার কাজ শুরু হয়। পরি-ষদের শাখা-সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে তাঁর স্বাগত ভাষণে ঋষি বঙ্কিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপ দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে দাবি জানান। তিনি আর এক প্রস্তাবে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের নামে একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্যে আবেদন জানান।

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন, বর্তমান অবক্ষয়ের যুগে বঙ্কিম-চন্দ্র প্রদর্শিত পথই অনুসরণীয়, এতেই আসতে পারে সমাজ-জীবনে কল্যাণ। সভা-পতি শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর বঙ্কিম-প্রতিভা নিয়ে এক বিশ্লেষণী আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমের যে পথ দেখিয়েছেন তা নতুন আদর্শে আলোকিত। তিনি আরো বলেন, বাংলা-সাহিত্যের সেই অবহেলিত যুগে বঙ্কিমচন্দ্র নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন। কমলাকান্তের মধ্য দিয়ে সাহিত্যসম্রাট বাঙালী জাতির দোষ-ত্রুটি দুর্বলতার দিকে আমাদের নজর ফিরিয়ে-ছিলেন।

মধুসূদন স্মৃতিসভা ॥

গত ২৯ জুন মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিরোধান দিবস পালিত হল কলকাতা লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ কবির স্মৃতি-সৌধের নিকট। ক্যালকাটা লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ কবির আবক্ষ মর্মরমূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসন্তোষকুমার বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ কবির জীবনদর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় এক প্রস্তাবে মহাকবির স্মরণে অবাঙালীদের মধ্যে বাংলাভাষা প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক একটি মধু-সূদন স্মৃতি পুরস্কার দেবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেদিন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলেও একাধিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়।

বার্ণপুরে সাহিত্য সভা ॥

সম্প্রতি ভারতী-ভবনের ৪৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বার্ণপুরে অনুষ্ঠিত হল এক আকর্ষণীয় সাহিত্যসভা। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসমরেশ বসু। শ্রীমতি নন্দী এই সাহিত্য বাসরের উদ্বোধন করেন।

শ্রীনন্দী তাঁর ভাষণে তরুণ লেখকদের প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি লাভের ক্ষেত্রে নানা ধরনের বাধার কথা উল্লেখ করেন। শ্রীসমরেশ বসু তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। শ্রীঘোষ তাঁর ভাষণে আমাদের

দেশে সামাজিক বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন এই বৈষম্যের চেহারা সাহিত্যে দেখা যাবেই।

সোভিয়েট প্রত্যাগত ভারতীয় লেখক ॥

তিন সপ্তাহব্যাপী সোভিয়েট রাশিয়া সফর শেষ করে গত সপ্তাহে দেশে ফিরে এসেছেন খ্যাতনামা বাঙালী নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়, হিন্দী কবি ডঃ এইচ আর বচ্চন, মারাঠী নাট্যকার শ্রীভাবে ও মালয়ালম লেখক শ্রীকে কে নায়ার। এ'রা সকলেই গত' বছর সোভিয়েট ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার লাভ করেন।

কবি পরিচয়

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রচারে দেব-কুমার বসুর নানাবিধ উদ্যম সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। সম্প্রতি তিনি সাম্প্রতিক বাঙালী কবিদের একটি পরিচায়িকা গ্রন্থ প্রকাশ ও সম্পাদনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সকল কবির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা নানা কারণেই অসম্ভব। সেজন্যে তাঁর আবেদন, কবিরা যেন অনুগ্রহ করে তাঁর ঠিকানায় নিম্নোক্ত তথ্যাদি পাঠিয়ে এই কাজে সহায়তা করেন।

(১) কবির নাম ও জন্মতারিখ, (খ) প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : প্রকাশের কাল ও প্রকাশকের নাম, (৩) অন্যান্য কাব্য-গ্রন্থের নাম ও প্রকাশ বর্ষ, (৪) অন্যান্য সাহিত্যকর্ম, (৫) প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম, তারিখ ও যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার নাম ও সংখ্যা, (৬) কোথাও কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে কিনা, সম্ভব হলে তার পূর্ণ বিবরণ। যোগা-যোগের ঠিকানা : দেবকুমার বসু, ১৯ পান্ডিতিয়া টেরেস, কলকাতা—২৯।

ভারতীয় কবিতা সম্পর্কে ॥

"বাংলা ভাষাতেই একমাত্র এখন কবিতার এক অভূতপূর্ব বিকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পৃথিবীর কোথাও বোধ হয়, বর্তমানে কবিতার জন্য এত আন্তরিকতা নেই।" —বলেছেন প্রখ্যাত রুশ কবি শ্রীমতী কাজাকোভা ও শ্রীসুলেইমানভ। কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনে' উপস্থিত থেকে এ'রা কবিতা পাঠ করে-ছিলেন। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা এই সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনে যোগদানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এই সম্মেলনে যোগ দিতে পেরে তাঁরা খুবই খুশি হয়েছেন।

বিদেশী সাহিত্য

নাইজেরিয়ায় বিদেশী উদ্যোগ ॥

নাইজেরিয়ার সমাজ বহু বিচিত্র। বিবিধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে এই দেশটি গঠিত। ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের প্রভাবে এই দেশটির জাতীয়-ঐতিহ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অধ্যাপক পল ও প্রোয়েল 'ফরেন এন্টারপ্রাইজেস ইন নাইজেরিয়া : লজ অ্যান্ড পলিসিস' নামে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলো-চনা করেছেন।

অধ্যাপক পল ও প্রোয়েল লিখেছেন, এই দেশটির যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বর্তমানে বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু তার মৌল জীবনপ্রত্যয়ের কোন রূপান্তর ঘটেনি। তাঁদের মতে, ভৌগোলিক অবস্থান, বিপুলা-য়তন, পারস্পারিক বৈপরীত্য ও বহুমুখি-তার জন্যই নাইজেরিয়ার বিকেন্দ্রীয়করণ অপরিহার্য।

ভারতকে বৃটেনের উপহার ॥

গত ১৭ই জুন নয়াদিল্লীর এক অনু-ষ্ঠানে বৃটিশ হাইকমিশনার মিঃ জন ফ্রিম্যান চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্টের ডাঃ বি সি রায় শিশু-গ্রন্থাগারে জন্য নবরইটির বেশি শিশু-পাঠ্য বই উপহার দেন। দিল্লীর লেঃ গভর্ণর ডঃ এ এন ঝা 'বৃটেনের জনগণ প্রেরিত এই উপহার' গ্রহণ করেন।

দু বছর আগে মিঃ ফ্রিম্যান এই প্রতি-ষ্ঠানটি পরিদর্শন করেন। তখন তিনি কিছু বই উপহার দেবার কথা চিন্তা করেন। বলা-বাহুল্য, এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মিঃ ফ্রিম্যান তা প্রকাশও করেন।

প্রদত্ত গ্রন্থগুলি ৬ থেকে ১২ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্যে লেখা। এর মধ্যে রয়েছে গল্পের বই, বিজ্ঞান ও ইতিহাস, অভিধান এবং ১৩ খন্ড অক্সফোর্ড জুনি-য়ার এনসাইক্লোপিডিয়া। চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্টের একজিকিউটিভ ট্রাস্টি শ্রীশংকর পিল্লাই মিঃ ফ্রিম্যানকে এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ উপহার দেন। মিসেস ফ্রিম্যানকে একটি রাজস্থানী ও একটি কেরালার পুতুল উপহার দেওয়া হয়।

প্রখ্যাত সেবা প্রতিষ্ঠান 'অক্সফ্যাম' চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট প্রকাশিত দু লক্ষ টাকা মূল্যের গ্রন্থ বৃটেনে বিক্রয় করেছেন। এর ফলে 'অক্সফ্যাম' ও চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট—উভয়েই উপকৃত হয়েছে।

টলস্টয়ের জীবনী ॥

সম্প্রতি হেনরি ট্রয়েট টলস্টয়ের একটি জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন। বহু মূল্যবান তথ্য ও দলিল-চিত্র এই গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত টলস্টয়ের জীবনীগ্রন্থের মধ্যে এই বইটি সব চাইতে প্রামাণিক ও মূল্যবান বলে কেউ কেউ ঘোষণা করেছেন।

লেখক এই গ্রন্থে টলস্টয়ের জীবনের বহু অবিস্মরণীয় ও অনতিপ্রকাশিত মুহূর্তকে জীবন্ত করে তুলছেন। ইংরেজ-ভাষী পাঠক-পাঠিকারা এই গ্রন্থটি পড়ে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে অনেকের বিশ্বাস।

তরুণ কানাডিয়ান কবি ॥

ক্যানাডিয়ান তরুণ কবিদের মধ্যে এফ আর স্কট নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। আঞ্চলিক পটভূমিতে তিনি কবিতা লেখেন। কোনোপ্রকার ভাববাদী জটিলতা তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায় না। বাস্তবকে তিনি সহজ, সরল এবং খোলাচোখে নিয়ে দেখতে চান। আধুনিককালের কবিদের মধ্যে তিনি বিশেষ ভাবে সমাজভাবনায় ভাবিত। কবিব্যক্তিত্বের দিক থেকে তাঁকে অনেক সমালোচক মেধাবী, বুদ্ধিমান ও আশাবাদী আখ্যা দিয়ে থাকেন।

সম্প্রতি তাঁর নির্বাচিত কবিতার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে তাঁর রাগী, বিদ্রূপাত্মক ও যুক্তিপূর্ণ কবিতা-গুলিই গৃহীত হয়েছে। কোন কোন সমা-লোচক এইসব কবিতায় কোনোপ্রকার বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সন্ধান পাননি বলে দুঃখিত হয়েছেন। অনেকের মতে, এ সংক-লনটি নন্দনতাত্ত্বিক সমালোচনার উর্ধ্বে' স্থানকাল, ন্যায়-অন্যায় ও সামাজিক ভ্রান্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রায়শ তাঁরই দায়িত্ব-

বোধের দ্বারা বিশ্লেষণযোগ্য। বেশির ভাগ কবিতাই স্বকালের ওপরে লেখা এবং নীতি-উপদেশাত্মক।

ইথিওপিয়ার সমাজ-সংস্কৃতি ॥

প্রাচীন ইথিওপিয়ায় 'কেনে' নামে এক ধরণের জনপ্রিয় কবিতার প্রচলন ছিল, যার প্রতিটি পংক্তি প্রায় বিপরীত অর্থে অর্থবান। একটি অর্থ প্রকাশ্য ও সরল অপরটি ভাবময় ও বিদ্রোহাত্মক। সমালোচকেরা প্রকাশ্য অর্থটিকে নির্দোষ এবং মোমের সঙ্গে তুলনা করেন। মোম যেন কোমল, রমণীয়, তেমনি 'কেনে' জাতীয় কবিতার পাঠক প্রাথমিকভাবে একটি তৃপ্তিজনক অনুভবের আস্বাদ লাভ করেন। কিন্তু নিহিতার্থটির প্রতি যখনই পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়—তখন কবির সমস্ত সারল্যকে বিদ্রূপ ও আক্রমণের সহনীয় ছদ্মবেশ বলে মনে হয়। কখনো কখনো এ জাতীয় কবিতার সূত্রপাত হয় করুণা থেকে, কিন্তু শেষ হয় আদালতে।

সম্প্রতি ডোনাল্ড এ লেভিন তাঁর 'ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ইনোভেশন ইন ইথিওপিয়ান কালচার' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। মিঃ লেভিনের মতে, এই বৈপরীত্য শুধু ইথিওপিয়ান কবিতারই বৈশিষ্ট্য নয়, বরং একে তার দ্বিধাবিভক্ত সামাজিক অভিব্যক্তিরও নির্দেশক বলা যায়। আদিবাসীবহুল এই দেশটির সমাজ-জীবনের প্রকাশ্য-স্তরে সরলতা ও প্রাকৃতিক পরিমন্ডলের প্রভাব সকলকেই আকৃষ্ট করে। আর গোপনস্তরে প্রচন্ড অসন্তোষ, অপমান ও পুঞ্জীভূত ঘৃণা জনজীবনকে সংগ্রামী করে তুলেছে।

লেভিন এই গ্রন্থে, ইথিওপিয়ান কবিতার অন্যান্য দিক সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যেই তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এই বইতে তিনি ইথিওপিয়াকে ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন।

সৌখীন প্যান্ডিত্য প্রকাশের জন্য লেখক এই বইটি লেখেননি। এরজন্যে তিনি ১৯৫৮ থেকে ৬১ সাল পর্যন্ত ইথিওপিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরেও তাঁকে যেতে হয়েছে। প্রাচীন পর্যটকদের বিবরণী, ইথিওপিয়ান সাহিত্য, সাক্ষাৎকার, প্রশ্নোত্তর, জিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে তিনি এই মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এই দেশটির এক চতুর্থাংশ হলো এথনিকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আমহারা জাতির লোক। তিনি বলেন, "ওখানে বাসকালে আমি ঐতিহ্যপূর্ণ আমহারা জীবনে মুগ্ধ হই।"

নতুন বই

ছোটদের বিশ্বকোষ —প্রথম খন্ড। সম্পাদক : ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য এবং পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ। ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম বারো টাকা।

সভ্যতার গতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নতুন সত্যের উপলব্ধিতে তার সীমা ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। আজকের শিক্ষিত মানুষের পক্ষে প্রয়োজন এই সত্যের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলা। সত্যিকার মানুষ হওয়ার জন্য ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান বই তুলে দিতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন দেশে বিশ্বকোষ রচনা করা হয়েছে এবং এখনও হোচ্ছে। বাঙলা ভাষায় এই ধরণের বইয়ের একান্ত অভাব, না হলেও কম তা স্বীকার করতেই হবে।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বাঙলা ভাষার ছোটদের বিশ্বকোষ রচনায় পথিকৃৎ। কিন্তু তাঁর পরলোকগমনের পর এ বিষয়ে কাজ বেশীদূর এগোয়নি। সম্প্রতি 'ছোটদের বিশ্বকোষে'র প্রথম খন্ড প্রকাশিত হওয়ায় এদিকে নতুন সংযোজন ঘটল। আরো কয়েকটি খন্ড প্রকাশিত হবে। প্রথম খন্ডে যে সমস্ত বিষয়-বস্তু বাদ পড়েছে সেগুলি পরবর্তী খন্ডে থাকবে।

'ছোটদের বিশ্বকোষে'র লেখকরা প্রত্যেকেই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং শিশু-সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক। তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে দুরূহ বিষয়গুলিকে ছোটদের উপযোগী করে পরিবেশন করা। বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, কুঞ্জবিহারী পাল, সন্তোষ বসু, পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুকমল দাশগুপ্ত, ধীরেন্দ্রলাল ধর, অমলেন্দু সেন, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ননীগোপাল মজুমদার অমলকুমার মিত্র, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। এ'দের আলোচনা একদিকে যেমন সহজবোধ্য তেমনি চিত্তাকর্ষক। সেই সঙ্গে রয়েছে তথ্যের নির্ভুলতা। মহাকাশের কথা, পৃথিবীর কথা, গাছপালার কথা, জীবজন্তুর কথা, মানুষের কথা, দেশ-বিদেশের কথা, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, মহাশূন্য, দেশবিদেশের কথা, ইতিহাসের কথা, সাধারণ বিজ্ঞানের কথা, ইতিহাসের কথা, ভাষা ও লিপির কথা, দেশ-বিদেশের ছড়া, বিশ্ব-সাহিত্যের ছড়া, বিশ্ব-সাহিত্যের কথা, খেলাধুলো, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের মনোরম ও আকর্ষণীয় আলোচনায় বর্তমান গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, কুঞ্জবিহারী পাল, সন্তোষ বসু অমলেন্দু সেন বিশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায় এবং ননীগোপাল মজুমদার। অসংখ্য রঙিন চিত্র, আলোক-চিত্র এবং রেখাচিত্রের ব্যবহারে গ্রন্থখানির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ছবি এঁকেছেন পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, বরদাপ্রসন্ন দাস এবং সিতাংশুনাথ সেনগুপ্ত। গ্রন্থখানির অঙ্গসজ্জা এবং পরিপাট্য প্রকাশকের সুরুচির পরিচয় স্পষ্ট।

—কমল চৌধুরী

নতুন ফুলের স্বপ্নে (কাব্যগ্রন্থ)—বরুণ মজুমদার। সাত্ত্বিক সাহিত্য সংস্থা, ১২০।১ রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর, হাওড়া। দু' টাকা।

বরুণ মজুমদার ষাটের কবি। গত কয়েক বছর ধরে তিনি কবিতা লিখছেন। তাঁর কবিতার মৌলপ্রেরণা বর্তমান সমাজ ও সুস্থ মানবীয় প্রেম। এই কাব্যগ্রন্থে কবির বত্রিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে।

বাস্তবের রূঢ় সংঘাতে কবি বিচলিত নন। জীবনের বিবিধক্ষেত্রে তাঁর অনুসন্ধিৎসা প্রায়শ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। প্রেমে তিনি উদাসীন নন, বরং প্রতীক্ষারত। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অত্যন্ত গভীর। তাই তাঁকে বলতে শোনা যায়—"সব স্মৃতি মুছে যায়, বেঁচে থাকে মানুষের নাম" কিংবা "বেঁচে থাক চিরদিন মানুষের এ পবিত্র নাম"—ইত্যাদি।

অবশ্য কবিতার ব্যাপারে কবির এখনো কোনো স্থির বিশ্বাস গড়ে ওঠেনি। তাঁর বহু কবিতায় পূর্বসূরীদের মুখ উঁকি দেয়।

শব্দ ও ছন্দের ব্যাপারে তিনি কিছুটা পুরোনোপন্থী। আশা করা যায়, এসব দোষত্রুটি মুক্ত হয়ে কবি অচিরেই স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

বর্তমান যুগের দর্শনচিন্তা

(প্রবন্ধ) — অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা—৯। চার টাকা।

দর্শনশাস্ত্রের ওপর বাংলাভাষায় বই লেখা হয়েছে খুবই কম। অথচ দার্শনিক ভিত্তিতে আলোচনা-সমালোচনার প্রয়াস প্রায় প্রতিটি সাহিত্যসাময়িকীর পাতা ওল্টালেই নজরে পড়ে। সাধারণ শিক্ষিত পাঠক একালের প্রখ্যাত দার্শনিকদের নামের সঙ্গে পরিচিত হলেও. একথা দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে. বহুআলোচিত দর্শন-চিন্তাসমূহের সঙ্গে বহু পাঠকের কোনো সুস্পষ্ট পরিচয় নেই।

শ্রীযুক্ত অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বর্তমান যুগের দর্শনচিন্তা' গ্রন্থে আধুনিক-কালের প্রায় প্রতিটি দার্শনিক মতবাদকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করেছেন। অপ্রাসঙ্গিকবোধে তিনি পৃথিবীর পুরোনো ভাববাদী দর্শনকে এড়িয়ে যাননি; বরং দেখিয়েছেন কীভাবে তারই প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হলো জড়বাদী দর্শন। এই জড়বাদী দর্শনের আবার দুটো দিক—প্রকৃতিবাদ ও প্রয়োগবাদ। লক্ষ্য করার বিষয়, জানি আর না জানি, আমরা কোন না কোনভাবে এক বা একাধিক দর্শনচিন্তার দ্বারা লালিতপালিত ও নিয়ন্ত্রিত। বিভিন্ন দর্শনচিন্তা একালের মানুষকে নানাভাবে স্পর্শ করে আছে। উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত য়ুরোপ-আমেরিকার দর্শনচিন্তায় ভাববাদেরই প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। অবশ্য তারই প্রায় সমকালে প্রকৃতি ও প্রয়োগবাদ ক্রমশ মানব-জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তারে উদ্যত হয়েছিল। বিশ শতকে মার্কসীয় দর্শনের বিকাশ ঘটে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সহজ উদাহরণসহ অস্তিত্ববাদ, কার্যকারিতা-বাদ, যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ, মার্কসবাদ প্রভৃতি দার্শনিক মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে জি ই মুর, বার্ট্রান্ড রাসেল, স্যামুয়েল আলেকজান্ডার, হোয়াইটে হেড, হেগেল, কান্ট, উইটগেনস্টাইন, সার্ত্রে, কার্ল মার্কস প্রমুখ দার্শনিকদের সম্পর্কে নিরপেক্ষ আলোচনা করেছেন।

সাগরনগর (ভ্রমণোপন্যাস)—কুমারেশ ঘোষ। বাক সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা —৯। দাম : পাঁচ টাকা।

সাম্প্রতিককালে উপন্যাসের পটভূমি বিস্তৃত হয়েছে বহুল পরিমাণে। এবং তারই ফলশ্রুতিতে আঞ্চলিক সাহিত্যের পরিধি সঙ্কোচিত হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। আন্ত-র্জাতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাস লেখা হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি ভাষায়। কুমারেশ ঘোষ এ উপন্যাসটি লিখেছেন জাহাজী পটভূমিতে। স্থলভাগের মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ কম। উপন্যাসটির সূত্রপাত হয়েছে লন্ডন বন্দরের বর্ণনা দিয়ে। যাত্রীদের কোলাহল, বিচ্ছিন্ন সংলাপ ও কুলিদের 'নির্বিকার' উদাসীনতা প্রতিটি বন্দরের একটি বাস্তব রূপ। তারপর ঘননীল সমুদ্র। প্রতিটি সহযাত্রী ক্রমে পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে নতুন পরিবেশে। জাহাজের কেবিন তাদের ঘর আর পাটাতন সর্বজনীন মিলনক্ষেত্র। বেশ সরস, সাবলীল, ও কৌতূহলোদ্দীপক ভঙ্গিতে লেখক এক একটি ঘটনার ওপর আলোকপাত করেছেন। সব কিছু মিলিয়ে একটি সমুদ্র-পরিবেশ। যাঁরা কুমারেশবাবুকে জানেন এবং তাঁর পূর্ব-রচনার সঙ্গে পরিচিত—তাঁরা এ উপন্যাসে তাঁকে নতুনভাবে আবিষ্কার করবেন।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

অভিনয়দর্পণ (মে-জুন ১৯৬৮)—প্রধান সম্পাদক : ঋত্বিক ঘটক। ১৩১ হরিশ মুখার্জি রোড। কলকাতা—২৬। দাম দেড়টাকা।

সম্প্রতিকালে নাট্যচর্চা এদেশে বেশ বিস্তার লাভ করেছে। মঞ্চে এবং রচনার মধ্য দিয়ে এর যে বিস্তৃতরূপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য। মঞ্চ বিষয়ক পত্র-পত্রিকার অভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কয়েকটি বেশ ভাল পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু কিছুকাল পরেই বন্ধ হয়ে যায়। যা আছে তাও অনিয়মিত। এক্ষেত্রে প্রখ্যাত পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের সম্পাদনায় 'অভিনয়দর্পণে'র প্রকাশ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সংখ্যায়, লিখেছেন সুচিত্রা সেন, গুরুদাস ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, কিরণ মৈত্র, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, রুদ্র-প্রসাদ সেনগুপ্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, পবিত্র সরকার এবং আরো অনেকে। অভিনয়দর্পণ নিয়মিত প্রকাশ পেলেই সুখী হবো।

উত্তরণ (বৈশাখ ১৩৭৫)—সম্পাদক কিরণ-শংকর সেনগুপ্ত।। ২।৮২ নাকতলা গভর্ণমেন্ট স্কীম, কলকাতা ৪৭।। এক টাকা।

উত্তরণের এ সংখ্যাটি গর্কি জন্ম-শত-বার্ষিকী সংখ্যারূপে প্রকাশিত। গর্কির তিনটি অনুবাদ ছাড়াও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যা-য়ের লেখা 'ম্যাকসিম গর্কি : একটি প্রতিবাদ' শীর্ষক নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। সাম্প্রতিক কবিতার নানা সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি নিবন্ধ লিখেছেন—কিরণশংকর সেনগুপ্ত, বাসুদেব দেব, বিজয়কুমার দত্ত প্রমুখ কয়েক-জন। কবিতা লিখেছেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানস রায়চৌধুরী, বঙ্কিম মাহাত, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, রাম বসু, অন্নদাশংকর রায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শোভন সোম এবং আরো কয়েকজন।

শ্রীমতী (বিশেষ সংখ্যা)—সম্পাদিকা শ্রীমতী আভা পাকড়াশী।। ২৯ ওয়াটার্লু স্ট্রীট কলকাতা—১।। দু টাকা।

শ্রীমতীতে বাংলাদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকেরা নিয়মিত লিখে থাকেন। এ সংখ্যায় কয়েকটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও স্মৃতিচিত্র লিখেছেন—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, প্রতিমা দেবী, শান্তিদেব ঘোষ, হাসি বসু, চিত্রা গুহ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও অশোক ভট্টাচার্য। গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, আভা পাকড়াশী ও গোতম গুহ। কবিতা লিখেছেন—দিনেশ দাশ, মণীন্দ্র রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, দুর্গাদাস সর-কার, জয়ন্তী সেন এবং আরো কয়েকজন। কয়েকটি গল্পের অনুবাদও ছাপা হয়েছে।

লেখা ও রেখা (মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪—সম্পাদক : ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। অক্ষয় গ্রন্থাগার, শান্তিপুর, নদীয়া। দাম একটাকা।

'লেখা ও রেখার' বর্তমান সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ মৈত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব দেব। ফেদেরিকো গার্সিয়া লর্কা-র কবিতা অনুবাদ করেছেন মণীশ ঘটক। গল্প লিখেছেন শংকর চট্টোপাধ্যায় এবং অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। তাছাড়া অন্যান্য যারা লিখেছেন বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল চক্রবর্তী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, কালীচরণ ঘোষ, কবিরুল ইসলাম।

যুযুৎসা [দ্বিতীয় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, মার্চ, ১৯৬৮]—সম্পাদক—জয়ন্তকুমার। ৫ বি মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলকাতা—৭ দাম—এক টাকা।

আঙ্গিকে ও রুচিতে যুযুৎসা হিন্দী সাহিত্যজগতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকার অধিকারী। আধুনিক বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কেও পত্রিকাটি উৎসাহী। সুকান্ত, নজরুল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, গণেশ বসু প্রমুখ অনেকের কবিতার অনুবাদ তারা প্রকাশ করেছেন। প্রখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক-দের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধে বর্তমান সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

তুলি—সম্পাদক : তপনকুমার দে। ৪বি দুর্গাপুর লেন। কলকাতা—২৭। দাম —১·২৫ পয়সা।

চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা। গল্প, কবিতা, নামাধরদের রচনা এবং ছবি আছে।

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সঙ্গে কি না বলা যায় না, মহাপুরুষ যাঁকে বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভুমুর দেখা হয়েছিল সেইদিনই।

গানাদোর সামান্য পরিচয় কয়া-র কাছে পাবার পর কেন যে রাজপুরোহিতের চোখে একটা ঝিলিক দেখা গিয়েছিল তা একটু যেন বোঝা গিয়েছিল এবার।

ভিলিয়াক্ ভুমু আতাহুয়ালপারই দলের লোক। ইংকা নরেশের অধীন হলেও তাওয়ানতিনসুইয়ুর ধর্মজগতের প্রধান হিসেবে ক্ষমতা তাঁর অশেষ। বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভ্যুত্থানে তাঁর ভূমিকাটা কারুর চেয়ে ছোট হবে না।

গানাদো তাই হুয়াসকারকে মুক্তি দেবার প্রয়োজন বোঝাতে তাঁর পরিকল্পনাটা রাজপুরোহিতকে একটু বিশদভাবেই জানিয়েছিলেন।

শুনতে শুনতে স্পষ্টই উত্তেজিত হতে দেখা গিয়েছিল রাজপুরোহিতকে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথাই তিনি জানতে চেয়েছিলেন গানাদোর কাছে। তারই মধ্যে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—যে বিদেশী শয়তানদের বিরুদ্ধে পেরুবাসীদের জাগাতে চাচ্ছেন, আপনি নিজেও তাদেরই একজন। এ দেশকে উদ্ধার করায় আপনার কি স্বার্থ?

গানাদো খানিক চুপ করে থেকেছেন। তারপর ঈষৎ গম্ভীর স্বরেই বলেছেন, যদি বলি পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

রাজপুরোহিতের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠতে দেখে একটু হেসে তৎক্ষণাৎ আবার বলেছেন, —না, না, সত্যিকার স্বার্থ যে কি তা-ত বুঝতেই পারছেন। নিজের দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার দাম হিসেবে আপনাদের কাছে বড়গোছের ইনাম চাই। ধরুন দেশে নিয়ে যাবার মত এক জাহাজ সোনা।

না।—তীক্ষ্নদৃষ্টিতে গানাদোর দিকে চেয়ে রাজপুরোহিত মাথা নেড়ে বলেছেন,—তা হতে পারে না। এ বিশ্বাসঘাতকতার পর সোনার জাহাজ নিয়ে ফেরবার দেশ আর আপনার থাকবে না। এইখানেই আপনাকে জীবন কাটাতে হবে।

তাই না হয় কাটাব। প্রসন্ন মুখে বলেছেন গানাদো,—থাকবার পক্ষে এ তো সত্যি সোনার দেশ! শুধু এর অভিশাপটা না দূর করলে নয়। তারই জন্যে হুয়াস-কারের কাছে এখুনি যাওয়া দরকার। আমাদের জন্যে সেই ব্যবস্থাই করুন, এই অনুরোধ। কাল সকালেই যেন আমরা রওনা হতে পারি।

কাল সকালেই? —বেশ একটু চিন্তিত দেখা গেছে রাজপুরোহিতকে।

নিজের মনে কি যেন তোলাপাড়া করে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত বাদে দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলেছেন,—না, কাল সকালে আপনাদের পাঠানো সম্ভব নয়। প্রস্তুত হবার জন্যে সময় দিতে হবে আর একটু।

প্রস্তুত আবার কিসের জন্যে হবেন! —গানাদো একটু অবাক হয়ে বলেছেন,—এ তো আপনারই এলাকা। আমাদের সৌসা যাবার অনুমতিটা শুধু দিলেই হবে।

না, শুধু তাই দিলেই হবে না। —গম্ভীরভাবে বলেছেন রাজপুরোহিত,—আমার অনুমতি নিয়ে আপনারা সৌসা গিয়ে পৌঁছোতে পারেন। সেখানে হুয়াসকার ওই মুইস্কা মেয়েটিকে আতা-হুয়ালপার দূতী বলে বিশ্বাস করবেন ধরে নিচ্ছি, ধরে নিচ্ছি যে আতাহুয়ালপার প্রস্তাবে তিনি রাজী হবেন কিন্তু তাতেই তাঁর বন্দীত্বের শিকল ত' আপনা থেকে খসে পড়বে না! সৌসা দুর্গকারার দরজাও খুলে যাবে না ভোজবাজিতে!

রাজপুরোহিত যুক্তি যা দেখিয়েছেন তা অগ্রাহ্য করবার নয়। তবু গানাদো একটু মৃদু প্রতিবাদ না করে পারেন নি। বলেছেন একটু হেসে,—আপনার আদেশই ত' সেই ভোজবাজি। আমাদের সৌসা যাবার অনুমতি যেমন দিচ্ছেন, সেই সঙ্গে আমাদের সায় পেলে হুয়াসকারকে যাতে মুক্তি দেওয়া হয়, সে হুকুমও পাঠিয়ে দিন।

ব্যাপারটা কি এত সোজা!—এবার একটু অধৈর্যই প্রকাশ পেয়েছে রাজপুরোহিতের কণ্ঠস্বরে,—ফাঁস দেবার দড়ি গলায় পরিয়ে এককলমায় তাকে ফুলের মালা বানানো যায় না। হুয়াসকারকে পরম শত্রু হিসেবে আগলানো যাদের ধর্মকাজ বলে বুঝিয়েছি তারা হঠাৎ আমার উল্টো হুকুমে বেঁকে

দাঁড়াবে না তার ঠিক কি! খেলার ঘ্‌টি ঘ্‌রিয়ে সাজাবার তাই সময় চাই একট্‌। বেশী নয়, ধৈর্য ধরে দ্‌ চারটে দিন কোরি-কাণ্চার অতিথি হয়ে আয়েশ করুন। সব ব্যবস্থা পাকা করে তারপরই আপনাদের সোনা পাঠাচ্ছি।

দ্‌'চারদিন অপেক্ষা করা মানে যে কি বিপদের ঝক্কি নেওয়া, তা ব্‌ঝিয়ে গানাদো এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি। বরং রাজপ্‌রোহিতের য্‌ক্তি যেন অকাট্য বলেই নেনে নিয়ে খ্‌শি ম্‌খে বিদায় নিয়ে গেছেন।

স্‌র্যবেদিকার কক্ষ থেকে নিজেদের আস্তানায় কিন্তু তিনি ফিরে যান নি। দ্‌রদ্‌রান্তরের প্‌জারিণীদের জন্যে কোরি-কাণ্চায় যে কয়েকটি পৃথক অতিথিশালা আছে তারই একটিতে গিয়ে 'কয়া'র সঙ্গে প্রথমে দেখা করেছেন। সোনাবরদারের ছদ্মবেশ ছাড়বার পর থেকে কয়া দ্‌র অণ্চলের তীর্থযাত্রিণী হিসেবে অতিথিশালাতেই আশ্রয় নিয়েছে।

'কয়া'র সঙ্গে দেখা হওয়ার পর গানাদো প্রথমে রাজপ্‌রোহিতের সঙ্গে তাঁর যা আলাপ হয়েছে তার বিবরণ দিতে দিতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন,—এই তাভানতিনস্‌য়্‌কে আবার পবিত্র করে তুলতে চাও কয়া?

এ প্রশ্ন কেন?—গানাদোর দিকে বিম্‌ঢ় ব্যাকুল দ্‌ষ্টি তুলে জিজ্ঞাসা করেছে কয়া।

কারণ তা করতে চাইলে চরম আত্মবলির জন্যে এবার তোমায় প্রস্তুত থাকতে হবে।—বলেছেন গানাদো,—সে সংকল্পের সাহস আছে কিনা তাই জানতে চাই।

সাহস আছে।—সরল স্নিগ্ধ স্বরে বলেছে কয়া,—কিন্তু নিজের মনকে ত' কেউ সত্যি চেনে না। যথার্থ পরীক্ষার দিনে এ সাহস কতখানি থাকবে এখন কি করে বলব: তব্‌ কি আমায় করতে হবে বলো। যারা আমাদের এই পবিত্র দেশকে ধর্ষণ করেছে তাদের পাপস্পর্শ দ্‌র করবার জন্যে যা তুমি বলবে তাই করতে আমি প্রস্তুত।
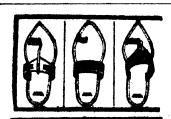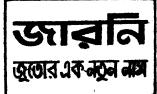
তাহলে শোনো কয়া,—বিষন্ন গম্ভীর স্বরে বলেছেন গানাদো,—তোমাকে প্রায় অসাধ্য কাজেই পাঠাচ্ছি। সৌসায় হ্‌য়াসকারের কাছে একাই তোমায় যেতে হবে। যেতে হবে একা শ্‌ধ্‌ নয়, রাজপ্‌রোহিতের অন্‌মতি ছাড়া এবং আজ এখনই।

প্রতিবাদ করেনি কয়া, কোনো প্রশ্ন তোলে নি এ আদেশ নিয়ে। গানাদোর ম্‌খের দিকে পরম নির্ভরতার দ্‌ষ্টিতে চেয়ে শ্‌ধ্‌ বলেছে,—তাই যাচ্ছি। তুমি কি এখানেই থাকবে?

না, বোধহয়।—একট্‌ তিক্ত হাসি ফ্‌টে উঠেছে গানাদোর ম্‌খে, যতদ্‌র ব্‌ঝতে পেরেছি আমাকে আরো নিরাপদ জায়গায় রাখবার আয়োজনই করছেন তোমাদের রাজপ্‌রোহিত।

পরিহাসের স্‌রে বলা কথা। কিন্তু তারই মধ্যে কি যেন একটা অন্‌ভব করে শঙ্কিত কাতরতা ফ্‌টে উঠেছে কয়ার দ্‌-চোখে। ব্যাকুলভাবে বলেছে,—কি তুমি বলতে চাইছ আমি ব্‌ঝতে পারছি না।

বোঝবার মত করেই তাহলে বলি,—গম্ভীর হয়ে উঠেছে এবার গানাদোর ম্‌খ আর গলার স্বর,—কত বড় শক্তির বির্‌দ্ধে আমাদের য্‌ঝতে হবে তা তোমার জেনে রাখাই উচিত।

সময় অল্প, তব্‌ গানাদো কয়াকে যা একট্‌ জানিয়েছেন তা এই—তাভানতিনস্‌য়্‌র এই চরম দ্‌র্ভাগ্যের দিন রাজপ্‌রোহিত ভিলিয়াক ভ্‌ম্‌ তাঁর নিজের কাজে লাগাবার জন্যে কোনো গভীর শয়তানির খেলা খেলছেন বলে গানাদোর দ্‌ঢ় বিশ্বাস হয়েছে। কাক্সামালকায় আতাহ্‌য়ালপা আর সৌসায় হ্‌য়াসকার বন্দী থাকায় নিজের চাল তিনি নির্বিঘ্নে সাজাতে পেরেছেন। এ দ্‌জনকেই ডিঙিয়ে বিদেশী শত্র্‌র সাহায্যে পের্‌তে সর্বেসর্বা হওয়াই তাঁর স্বপ্ন। রাজপ্‌রোহিত ত' আছেনই, তার ওপর ইংকা নরেশই বা নয় কেন? ইংকা রাজরক্ত তাঁর শরীরেও আছে। সেদিক দিয়ে কোনো বাধা নেই। অন্য বাধা দ্‌র করবার ব্যবস্থাও স্‌কৌশলে তিনি অনেক আগেই শ্‌র্‌ করেছেন। হ্‌য়াসকার নিজের ম্‌ক্তি কেনবার জন্যে আতাহ্‌য়ালপার চেয়েও বেশী সোনা ঘ্‌ষ দেবার প্রস্তাব বিদেশীদের সেনাপতির কাছে গোপনে পাঠান। এ প্রস্তাবের খবর কিন্তু আতাহ্‌য়ালপারও অগোচর থাকে না। হ্‌য়াসকার সৌসায় বন্দী হয়েও কেমন করে তাঁর এ প্রস্তাব পাঠাবার স্‌যোগ পেলেন, আর সে গোপন প্রস্তাবের খবর আবার সঙ্গে সঙ্গে আতাহ্‌য়ালপার কাছেও কেমন করে পৌঁছলো ভাবতে গিয়ে তখনই গানাদো একট্‌ সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন। সে সন্দেহ ভুল নয় বলে এখন জেনেছেন। রাজপ্‌রোহিত নিজেই এক ঢিলে দ্‌' পাখি মারার এ ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ব্যবস্থায় যা আশা করেছিলেন তার উল্টো ফল দেখে ভিলিয়াক ভ্‌ম্‌ বেশ অস্থির হয়েছেন। দ্‌ই ভাই-এর পরস্পরের ওপর আক্রোশ হিংসা চরমে ওঠবার বদলে আতাহ্‌য়ালপার কাছ থেকে এরকম মিলনের প্রস্তাব আসবে রাজপ্‌রোহিত ভাবতে পারেন নি। তাঁর অনেক পাকা ঘ্‌টি তাতে কেঁচে গিয়েছে। নতুন করে তাঁকে আবার চাল ভাবতে আর সাজাতে হবে। আতাহ্‌য়ালপার প্রস্তাব হ্‌য়াসকারের কাছে পৌঁছোতে দিতে তিনি চান না। সেই জন্যেই প্রস্তুত হবার ছ্‌তো করে সময় নিয়েছেন। কিন্তু সময় এক-ম্‌হ্‌র্ত আর নষ্ট করা চলবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হ্‌য়াসকারের হাতে আতাহ্‌য়ালপার কিপ্‌ পৌঁছে দিতেই হবে। *গানাদোর নিজের পক্ষে সৌসা যাওয়া আর সম্ভব নয়।* গেলে ধরা পড়তে হবে। রাজপ্‌রোহিত তাঁর ওপর কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নিশ্চয় করেছেন। যতদ্‌র বোঝা যাচ্ছে তাঁকে বন্দী করবার মতলবই তাঁর আছে। অতিথিশালায় এখনই রাজপ্‌রোহিতের অন্‌চরেরা হয়ত মোতায়েন হয়ে আছে সে উদ্দেশ্যে। গানাদোকে বাদ দিয়ে কয়াকে একাই তাই সৌসা যাবার দ্‌ঃসাধ্য ভার নিতে হবে। কেমন করে কয়া সেখানে যাবে, রাজপ্‌রোহিতের অন্‌চরদের পাহারা ও দ্‌ষ্টি এড়িয়ে কিভাবে হ্‌য়াসকারের সঙ্গে গোপন সাক্ষাতের স্‌যোগ করে নেবে সে বিষয়ে কোনো পরামর্শ গানাদো দিতে পারবেন না। যা কিছ্‌ উপায় নিজেকেই ভেবে বার করতে হবে কয়াকে। চরম লাঞ্ছনার দিনের আগে কন্যাশ্রমের বাইরে কখনো যে পা দেয় নি তার ওপর এ দাবী যে নিষ্ঠ্‌র অযৌক্তিক তা গানাদো জানেন কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো পথ এখন নেই। রাজপ্‌রোহিতের কুটীল চক্রান্তে এ পরিকল্পনা যদি ব্যর্থ হয়, হ্‌য়াসকার আর আতাহ্‌য়ালপাকে মিলিত করবার এই পরম স্‌যোগ যদি তারা না নিতে পারে, তাহলে পের্‌র উদ্ধারের আশা আর ব্‌ঝি নেই। অসম্ভব জেনেও কয়াকে তাই গানাদো এ কাজে পাঠাচ্ছেন। ম্‌ত্যু, আর তার চেয়েও বড় দ্‌র্ভাগ্য এ দ্‌ঃসাহসের প্‌রস্কার হতে পারে জেনেই যেন কয়া এ ভার নেয়।

শেষ কথাগ্‌লো বলতে বলতে গানাদোর

কণ্ঠস্বর কি একটু রুদ্ধ হয়ে এসেছে আপনা থেকে।

মুখের ভাবে কিন্তু কোনো আবেগই তিনি ফুটতে দেন নি। প্রায় কঠিন মুখে সমস্ত বক্তব্য শেষ করে নিজের আলখাল্লা গোছের পোশাকের ভেতর থেকে ভিকুনার পশমী কাপড়ে বোনা একটি ছোট থলি তিনি কয়ার হাতে দিয়ে বলেছেন,—হুয়াসকারের কাছে যদি পৌঁছোতে পারো কোনরকমে, তাহলে শুধু আতাহুয়ালপার কিপু দেখে তিনি তোমায় বিশ্বাস নাও করতে পারেন। আতাহুয়ালপার নিজস্ব গ্রন্থি চিহ্ন হুয়াস-কার জানেন না, জানবার কথা নয়। তুমি যে যথার্থই আতাহুয়ালপার দূতী, আর আতাহুয়ালপার কোনো কপট উদ্দেশ্য যে নেই, তার প্রমাণ এই থলির মধ্যেই রইল। এই তোমার সত্যকার অভিজ্ঞান। এ অভিজ্ঞান দেখলে তোমাকে বা আতা-হুয়ালপাকে আর অবিশ্বাস করা যে হুয়াসকারের পক্ষে সম্ভব নয় এইটুকু নিশ্চিৎ বলে জেনো। এ অভিজ্ঞান যেন না হারায়।

যা বলবার সবই বলা হয়েছে। এইবার পরস্পরের কাছে বিদায় নিলেই হয়। তবু গানাদো কয়েক মুহূর্ত যেন স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকেন। কয়াও নিস্পন্দ নীরব।

হঠাৎ ভেতরের কি যেন এক অস্থিরতায় গানাদো একেবারে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। কয়ার হাত থেকে থলিটা প্রায় ঝট্‌কা দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে উত্তেজিত গলায় বলেছেন,—না কয়া কোথাও তোমাকে যেতে হবে না। আতাহুয়ালপা আর হুয়াসকারের ভাগ্যে যা থাকে থাক্‌ পেরুর পরিণাম যা হয় হোক্‌, তা রোধ করবার এই বাতুল নিষ্ফল চেষ্টায় তোমাকে এমন করে আত্মবলি দিতে পাঠাবার কোনো অধিকার আমার নেই। তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাকো কয়া। দরকার বোধ করলে রাজপুরোহিতের আশ্রয়ও তুমি চাইতে পারো। তুমি সব চক্রান্তের বাইরে, নির্দোষ নিরপরাধ আমারই হাতের পুতুল মাত্র বুঝে তিনি নিশ্চয় তোমায় কোনো শাস্তি দেবেন না। আমি এবার চলি। তোমার দেখা পাওয়ার পর স্বপ্নের মত যে কটা দিন আমার কেটেছে তার জন্যেই ভাগ্যের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

গানাদো ফিরে দাঁড়িয়ে এক পা বাড়াবারও সময় পান নি! কয়া এসে তাঁর হাত ধরে ফেলেছে।

পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দুজনের কেউই কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারেন নি। হাতও ছাড়েন নি কেউ কারুর।

কয়াই স্নিগ্ধ স্বরে প্রথমে বলেছে,—ও থলি আমায় দাও।

চোখ তার সজল মুখে অদ্ভুত একটি হাসি।

এ থলি নিয়ে কি হবে কয়া?—গলার স্বর অকম্পিত রাখবার চেষ্টা করেছেন গানাদো,—তোমায় যেতে দিতে আমি পারি না। উদয়সাগরের তীরের মানুষ হয়ে তোমায় একবার উদ্ধার করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে বলে তোমার মৃত্যুদণ্ড আমার হাতে নেই। তোমার পিতামহের গণনাই নিষ্ফল।

তাঁর গণনার কতটুকু আর তুমি জানো! —বিষণ্ণ একটি হাসি মুখে নিয়ে বলেছে কয়া, —মনে করো তাঁর গণনা সফল করতেই আমায় যেতে হবে! তা ছাড়া সূর্যকন্যা হিসেবে স্রষ্টা বলে ভাবানতিনসূয়ু-র জন্যে প্রাণ দেবার অধিকারও কি আমার নেই?

এর উত্তরে আর কিছু বলতে পারেন নি গানাদো। নীরবে অভিজ্ঞানের থলিটি কয়ার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ফিরিয়ে দিয়ে আর সেখানে দাঁড়ান নি।
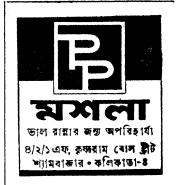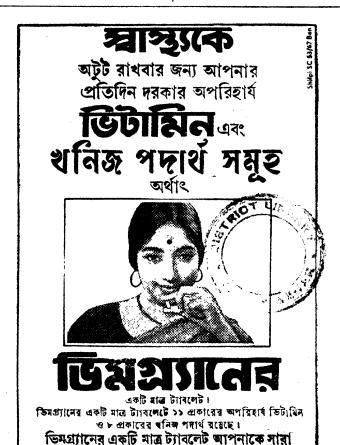
(ক্রমশঃ)

রাজধানীর ইতিকথা

নিমাই ভট্টাচার্য

পার্কে গিয়ে হাওয়া খাবার বা চিনে-বাদাম চিবুবার সময় নেই। তবুও যখন ঐ পার্কগুলোর পাশ দিয়ে যাই দুর্গন্ধে নাক জ্বালা করে ওঠে। দুর্গন্ধ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুর্গন্ধ। ঐ গোলাপের দুর্গন্ধ!

সন্ধ্যার অন্ধকার নামার পর হাওড়া থেকে দিল্লী মেলে চাপলে হবে না। সকাল-বেলায় ঐ জঘন্য তুফান এক্সপ্রেসে চাপুন। জানলার ধারে বসে বসে দু পাশের মানুষগুলোকে দেখুন। ভাল করে দেখুন। বাংলা-বিহারের মানুষগুলোকে দেখুন। পরের দিন দিনের বেলায় উত্তরপ্রদেশের মানুষগুলোকে দেখুন। ভাবতে কষ্ট লাগবে এরা মানুষ! নেংটি পরা ঐ কঙ্কাল-গুলো মানুষ? ঐ যে বাংলা দেশের পানা-পুকুরের জল খেয়ে যারা বেঁচে আছে, বিহার-উত্তরপ্রদেশে যারা এই গ্রীষ্মে এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার করে, যাদের যুবতী কন্যা আর প্রৌঢ়া স্ত্রী কোনমতে এক টুকরো কাপড় দিয়ে লজ্জা নিবারণের ব্যর্থ মিথ্যা প্রচেষ্টা করছে, তারা মানুষ?

অত দূরে কেন, একেবারে দিল্লীর কাছে চলে আসুন। ঠিক যমুনার ওপারে সাহদরার ওদিকে চোখ বুলিয়ে নিন। দেখবেন বর্ষার জলে রাস্তা-ঘাট ডুবে গেছে, ভেসে গেছে ঘর-বাড়ী। শোবার ঘরে, রান্না ঘরেও এক হাটু জল। পচা নালা-নর্দমার জল। সারা বর্ষাকাল এমনি থাকবে। ঐ পচা নালা-নর্দমার জলের মধ্যেই সাহদরার লক্ষ মানুষ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বেঁচে থাকে। পুরান দিল্লীর অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়ান। দেখবেন, তারা নিঃশ্বাস নেয় না, শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

দরিয়াগঞ্জ পিছনে ফেলে দিল্লী গেট ছাড়াবার পরই শুরু হল নতুন দিল্লী। ক্যাপিটাল অফ ইণ্ডিয়া। ব্যস। এবার যাঁহা মরজি ঘুরে বেড়ান। কনট প্লেস, কার্জন রোড, পার্লামেন্ট স্ট্রীট, বারাখাম্বা রোড, মথুরা রোড, তুঘলগ রোড, লোদী রোড, মেহেরলী রোড, রিঙ রোড, পুসা রোড। যেখানে খুশি সেখানে যান। পান্ডারা রোড, শাহজাহান রোড, ভারতী নগর, লোদী এস্টেট, রবীন্দ্রনগর, গলফ লিঙ্ক, জোড়বাগ, চানক্যপুরী, বিনয় মার্গ। ডান-দিক, বাঁ-দিক দেখুন। বড় বড় সাহেব-সুবাদের পাড়া। আরো ঘুরে বেড়ান। নিজামুদ্দীন, জংপুরা, ডিফেন্স কলোনী, সাউথ এক্সটেন-শনের ফ্যাশানেবল পাড়া থেকে চলে যান নতুন আভিজাত্যের কৈলাস বা হাউসখাস।

চমকে যাবেন। শিউরে উঠবেন অপব্যয় দেখে। ব্যক্তিগত মানুষের নয়, সরকারী ও জনসাধারণের অর্থের অপব্যয় দেখে গা জ্বালা করবে। দু-চারটে রাস্তা ছাড়া অধি-কাংশ রাস্তাতেই সারাদিন মানুষ বা গাড়ী-ঘোড়ার চলাচল নেই বললেই চলে। তাতে কি হল? বড় বড় মসৃণ রাস্তা না হলে ভাল দেখায়। রাস্তার ধারে নর্দমার পাশে দু-চার ফুট জায়গায় মাটি দেখা যাচ্ছে। ছি, ছি, একি লজ্জার কথা। ঢেকে ফেলো মাটি। কত লক্ষ টাকা ব্যয় করে রাজধানী দিল্লীর এই রাস্তার ধারের মাটি ঢাকা হচ্ছে, কত কোটি কোটি ইঁট যে অপ-ব্যবহার করা হচ্ছে, তা ভগবানও জানেন না। নিউ দিল্লীর রাস্তায় ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার মানুষ দুর্লভ। কুচ পরোয়া নেই। ভাল করে, সুন্দর করে ফুটপাথ বানাও। পিচ দিয়ে বানাও, সিমেন্ট দিয়ে বানাও। রাস্তার ধারের ঐ পুরান পাথরের বর্ডার? বড় বেমানান! বড় চোখে লাগে। দূর করে দাও ঐ পাথরগুলোকে। ডিজাইন করা কংক্রীটের স্ল্যাব বসাও। রাস্তার ধারের ঐ বড় বড় গাছগুলোর চারপাশে কোন বর্ডার নেই? কি সর্বনাশের কথা। সিমেন্ট দিয়ে ঘিরে দাও। সিমেন্ট? হ্যাঁ, সিমেন্ট। তবে কন্ট্রাকটাররা অত পারে কি? তারা চুন-বালি দিয়ে কাজ সারছে। আর ঐ ছোট ছোট গাছগুলো? স্টিলের আর কংক্রীটের পুরান বেড়াগুলোকে ফেলে দিয়ে নতুন ডিজাইনের বেড়া দেওয়া হল। কনট প্লেসে রাস্তার ধারে স্টীল টিউবের রেলিং দেওয়া ছিল। বেশ ভালই ছিল। না, না, এক জিনিস অত দিন দেখতে খারাপ লাগে? ড্রইংরুমগুলো কি চোখে পড়ে না? দেখেন না মাঝে মাঝে পর্দা, ফার্নিচার বা ডিজাইন পাল্টান হয়। কনট প্লেসের স্টীল টিউবের রেলিং আর নেই। কংক্রীট আর স্টীলের কম্বিনেশন করে নতুন ডিজাইনের রেলিং দেওয়া হয়েছে।

আরো ঘুরে বেড়ান। প্রেমসে ঘুরে বেড়ান। দিল খুলে দেখে নিন আমাদের রাজধানী।

দেখছেন কৃষি ভবনের সামনে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের পাশে ফুটপাথে ছোট্ট একটা ফুলের বাগান? আর ঐ পাশের সুন্দর জায়গাটা? ওটা কার-পার্কিং-এর জন্য তৈরী হয়েছে। রাস্তার ওপাশে কিছু দেখতে পারছেন? ওটা একটা নামকরা ক্লাব। এয়ার কন্ডিসন্ড বাড়ী থেকেও যাদের গরম যায় না, তারা এখানে এসে নীল জলে সাঁতার কাটেন, কোল্ড বিয়ার খান। অথবা লাইম কর্ডিয়াল-জিন বা সোডা-হুইস্কীতে আইস-কিউব দিয়ে মনটাকে, দেহটাকে শান্ত করেন। প্রধানত ওদের জন্যই লাখ লাখ টাকা দিয়ে কার-পার্কিং-এর এই ময়নাপুরী বানান হয়েছে। কেন ঐ মন্দিরের সামনে কার-পার্কিং? প্রায় আমেরিকার ডিসনেল্যান্ড। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল হলের চাইতে এই কার-পার্কিং অনেক বেশী চমকপ্রদ।

আর?

আর নিউ দিল্লীর হাজার হাজার পার্কগুলো দেখেছেন? এত পার্ক, এত খোলা জায়গা যে বেড়াবার লোক পাওয়া দুষ্কর। তা হোক। সাজাও, ভাল করে সাজাও। ড্রইংরুমের মত সাজাও। আবার গোবী সেনের লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালা হল। আরাবল্লী পাহাড়ের বিলীয়মান স্মৃতির পর গড়ে ওঠা এই আধা-মরুভূমির দিল্লীর হাজার হাজার পার্ককে সবুজ ঘাসে মুড়ে দেওয়া হল। রং-বে-রংয়ের লোহার বেড়া দেওয়া হল। আর হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ গোলাপ গাছ লাগান হল।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে ইলুমিনেটেড ঝলমল করা সাইনপোস্ট লাগান হয়েছে।

আরো কত কি হচ্ছে। গ্রামের নিঃস্ব, দরিদ্র মানুষ যেভাবে যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে মেয়েকে বিয়ে দেবার জন্য বেনারসী পরায়, গহনা পরায়, ফুল-চন্দনে সাজিয়ে বরপক্ষের মনোরঞ্জন করে, ঠিক তেমনি করে রাজধানী দিল্লীকে বিয়ের কনের মত সাজান হচ্ছে। দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, পরতে পারছে না, চাষের জল পাচ্ছে না, হাসপাতালে ওষুধ পাচ্ছে না, তাতে কি হল? ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, এম, এস-সি, পি এইচ-ডি বেকার হয়ে রাস্তায় ঘুরছে, তাতে ঘাবড়া-বার কি আছে? তাই বলে রাজধানীকে নোংরা করে রাখা যায় না। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ বিদেশী আসা-যাওয়া করছে, ওরা বলবে কি? ভাববে কি? ঘরে কিছু থাক আর নাই থাক, জামাইকে তো শুধু নুন-ভাত দেওয়া যায় না।

তাইতো ঐ পার্কের পাশ দিয়ে যাবার সময় গোলাপের গন্ধে আমার নাক জ্বালা করে, দুর্গন্ধ লাগে। এক একটা গোলাপের মধ্য দিয়ে এক-একটা কেন, হাজার হাজার মানুষের ব্যর্থ-করুণ মুখগুলো যেন আমার সামনে ভেসে ওঠে।

রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর সোমবার ধাপা অঞ্চলে গিয়ে কলকাতা শহরের আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন

দেশে বিদেশে

দীর্ঘ টালবাহানার পর এখনো দ্বিধা

দীর্ঘ এক বছর টালবাহানা করার পর ভারত সরকার অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, প্রাক্তন দেশীয় নৃপতিদের ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাতিল করা হবে। গত ৩ জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আভ্যন্তরীণ বিষয়ক কমিটি এই সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন।

কিন্তু সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে তাঁরা নিজেদের মনের দ্বিধা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। তাই সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন নৃপতিদের সঙ্গে আরেকবার আলোচনা করে আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করবেন। কেননা সরকার মনে করছেন, সরাসরি ভাতা ইত্যাদি বাতিল করলে রাজন্যবর্গকে নিদারুণ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে।

ভারত সরকারের এই মনোভাবের কারণ দুর্বোধ্য। এক বছর আগে, ১৯৬৭ সালের জুন মাসে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে রাজন্য-ভাতা বিলোপের দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী চ্যবন সেই সময়েই এই দাবী নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছিলেন। তারপর একাধিকবার তাঁর সঙ্গে রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেক বারই রাজন্য প্রতিনিধিগণ ভারত সরকারের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তোলেন।

রাজন্যবর্গের প্রধান যুক্তি ঃ এই ভাতা ভারত সরকার দয়া করে দিচ্ছেন না : ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য-গুলির ভারতে যোগদানের সর্ত হিসেবে এই ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এখন যদি এই ভাতা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় তাহলে ভারত সরকার রাজন্যবর্গের সঙ্গে চুক্তির খেলাপ করবেন।

গত ডিসেম্বর মাসে শ্রীচ্যবনের সঙ্গে রাজন্যবর্গের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। সেই সময়েই শ্রীচ্যবন ভাতা বিলোপের একটা পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেন। শ্রীচ্যবন জানিয়েছিলেন, রাজন্যবর্গকে একটা থোক টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হবে। ঐ টাকার কিছু অংশ নগদে আর বাকীটা কিস্তিতে দেওয়া হবে। কিস্তির মেয়াদ পনেরো থেকে কুড়ি বছরের বেশী হবে না।

বিকল্প হিসেবে বলা হয়েছিল রাজন্য ভাতাকে আয়কর, মৃত্যুকর ইত্যাদির আওতায় আনা হবে।

কিন্তু কোন প্রস্তাবই রাজন্যবর্গকে খুশি করতে পারে নি। তাঁদের এক কথা, ভারত সরকার এইভাবে চুক্তির মর্যাদার হানি করতে পারেন না এবং এই ধরনের কোন প্রস্তাবে তাঁরা রাজী হতে পারেন না।

বরদার মহারাজা রাজন্যবর্গের মনোভাবকে আরও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। সাংবাদিকরা শ্রীচ্যবনের প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'কেউ যদি আপনার কাপড় খুলে নিতে চায় তাহলে আপনার মনের অবস্থা কি রকম হয়?'

তারপর ২৯ মে রাজন্যবর্গের 'ট্রেড ইউনিয়ন' কংকর্ড অব প্রিন্সেস-এর সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আরেক দফা আলোচনা হয়। সেই সময়েও রাজন্য প্রতিনিধিগণ [illegible]

যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় তাঁদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কংগ্রেস দলের তা ভাঙবার কোন অধিকার নেই। তাঁরা আরও বলেন, সরকার রাজনৈতিক কারণে তাঁদের হেনস্তা করতে চাইছেন।

রাজন্যবর্গ যতদূর সম্ভব স্পষ্টভাবেই তাঁদের মতামত জানিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ ভারত সরকার তা বুঝতে পারছেন না, এটা বড়ই বিচিত্র। রাজন্যবর্গের সঙ্গে নতুন করে আলোচনা চালিয়ে কতদূর যেতে পারবেন বলে মনে করেন? হয়ত এবার সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে গৃহীত হয়ে যাওয়ায় রাজন্যবর্গ শেষ পর্যন্ত একটা পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থায় রাজী হলেও হতে পারেন। শ্রীচাবন এই রকম একটি পরিকল্পনা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে আগামী কুড়ি-পঁচিশ বছরে ৬৩ কোটি টাকা পর্যায়ক্রমে রাজন্যবর্গকে দিয়ে সইয়ে সইয়ে ভাতা বিলুপ্ত করা হবে। যাঁরা অল্প ভাতা পেয়ে থাকেন তাঁদের ভাতার টাকায় হাত দেওয়া হবে না।

কিন্তু কথা হচ্ছে, রাজন্য ভাতা যদি একটা আপত্তিকর বোঝা হয়ে থাকে, তাহলে আরও কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে এই বোঝা বয়ে বেড়ানোর অর্থ কি? আর ভাতা যখন রাজন্যবর্গের মৌলিক অধিকার নয় তখন ক্ষতিপূরণের প্রশ্নই বা তোলা হচ্ছে কেন? রাজন্য ভাতা ভারতের গণতান্ত্রিক সংবিধানের বিরোধী। প্রত্যেক নাগরিকের সমানাধিকারের যে আদর্শ এই সংবিধানে স্বীকৃত তা এর দ্বারা নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘিত। এই ভাতা এক দল সামাজিক পরগাছার সৃষ্টি করেছে এবং তাদের হাতে বছরে পাঁচ কোটি টাকার অনার্জিত আয় তুলে দিয়ে একটা বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। অথচ ভারত সরকার সামাজিক ন্যায়বিচারের সমস্ত দাবী উপেক্ষা করে ঐ সুবিধাভোগী শ্রেণীকে আরও কুড়ি-পঁচিশ বছর জিইয়ে রাখার জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছেন। তাঁদের এই আচরণ রাজন্যবর্গের প্রতি তোষামোদের পর্যায়ে পড়ে। যে নীতির প্রশ্ন তুলে তাঁরা রাজন্য ভাতা বিলোপ করতে চাইছেন, এই আচরণ সেই নীতির সঙ্গে কোনমতেই খাপ খায় না।

সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার যখন শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, রাজন্য ভাতা বাতিল করা হবে, তখন ঐ সিদ্ধান্ত যত শীঘ্র সম্ভব কার্যকর করার জন্যে তৎপর হওয়াই তাঁদের কর্তব্য। নীতির সমর্থন যখন তাঁদের পেছনে আছে এবং আইনগত কোন বাধাই যখন এ ব্যাপারে নেই আর সংবিধান সংশোধনের জন্যে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন পাওয়াও অসুবিধা হবে না, তখন এক বছর টালবাহানার পর আরও কালক্ষেপ করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

দ্যগলপন্থীদের জয়

দেশব্যাপী দ্যগল-বিরোধী আন্দোলনের পর ফ্রান্সে যে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল, তার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল, দ্যগলপন্থীরাই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন। রিপাবলিকান ফ্রান্সের ইতিহাসে কোন দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের ঘটনা এই প্রথম।

ফরাসী ন্যাশন্যাল এসেম্বলির ৪৮৭টি আসনের মধ্যে দ্যগলপন্থীরা ৩৫৮টি আসন লাভ করেছেন। গত এসেম্বলিতে দ্যগলপন্থীরা এবং তাঁদের সমর্থক ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিপাবলিকানরা মিলিতভাবে মাত্র ২৪২টি আসনের অধিকারী ছিল।

এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দ্যগলপন্থীরা তাঁদের নীতি যথেচ্ছভাবে রূপায়িত করতে পারবেন। প্রেসিডেন্ট দ্যগল এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সাম্প্রতিক গোলমালের পর তাঁর সরকারকে এখন 'কঠোর নীতি' অনুসরণ করতে হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী মঁ জর্জ পঁপিদু বলেছেন: 'ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে খুব কঠিন হবে।'

চূড়ান্ত ফলাফলে অন্যান্য দলের প্রাপ্ত আসনের সংখ্যা এই রকম: বামপন্থী ফেডারেশন ৫৭; কমিউনিস্ট ৩৪; মধ্যপন্থী ২৭; অন্যান্য ৯।

এই বিপুল জয় পর্যবেক্ষক মহলকে বিস্মিত করেছে। আর কোন মন্তব্য খুঁজে না পেয়ে বামপন্থী ফেডারেশনের নেতা মঁ মিত্তেরাঁ প্রেসিডেন্ট দ্যগল ও প্রধানমন্ত্রী পঁপিদুর বিরুদ্ধে 'রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারচুপি'র অভিযোগ এনেছেন।

তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী কার্যত ফরাসীদের এই মর্মে হুমকি দিয়েছিলেন যে, বামপন্থীরা হচ্ছেন সন্ত্রাসবাদী আর তাঁরা নিজেরা ভাল মানুষ, এই দলের মধ্যে তাদের বেছে নিতে হবে। সুতরাং ফরাসীরা কিছুটা ভীত হয়ে দ্যগলপন্থীদের ভোট দিয়েছে। এটা ঠিক যুক্তিসঙ্গত ভোট নয়।

মঁ পঁপিদু অবশ্য এই কথাও বলেছেন যে, এই বিপুল জয়ের ফলে সরকারের ওপর কতকগুলি দায়িত্বও এসে চেপেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হল ক্ষমতা অপব্যবহার না করার দায়িত্ব।

পঁপিদু সরকার শিক্ষার ও শিল্পের ক্ষেত্রে আমূল সংস্কারসাধন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সংস্কারের উদ্দেশ্য হল ছাত্র ও শ্রমিকদের নিজেদের ব্যাপারে আরও বড় ভূমিকা গ্রহণের অধিকার দেওয়া।

বৈষয়িক

প্রসঙ্গ

ইস্পাতের দাম

সরকারী ও বেসরকারী ইস্পাত কারখানাগুলি নিয়মিতভাবে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির যে দাবী তুলেছে সেই দাবী কেন্দ্রীয় সরকার নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন। কোন্ ধরনের ইস্পাতের দাম কতখানি বাড়তে দেওয়া হবে, শুধু সেই বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত এখন বাকী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মূল্য, উৎপাদন ও রপ্তানীবিষয়ক সাব-কমিটি প্রশ্নটি বিবেচনা করে এই সম্পর্কে বিস্তারিত প্রস্তাব রচনা করার জন্য সেক্রেটারিদের কমিটির কাছে বিষয়টি পাঠিয়েছেন। সেক্রেটারিদের কমিটির সুপারিশ পাওয়ার পর মন্ত্রিসভা ইস্পাতের দর চড়াবার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলবেন।

দর চড়াবার সপক্ষে ইস্পাত উৎপাদনকারীদের যুক্তি হল, কয়লা, আকরিক লোহা ও শ্রমিকদের বেতন বাবদ খরচ বেড়ে যাওয়ায় এই মূল্যবৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড সমেত ইস্পাত উৎপাদনকারীরা প্রথমে দাবী করেছিলেন, প্রতি মেট্রিক টনে ১০৬ টাকা করে দাম বাড়াতে দিতে হবে। পরে তাঁরা এই দাবী নামিয়ে প্রতি মেট্রিক টনে ৮১ থেকে ৮৩ টাকা পর্যন্ত দাম বাড়াতে চেয়েছেন।

ভারত সরকারে যেসকল বিভাগ অধিক পরিমাণে ইস্পাত ব্যবহার করেন তাঁরা এই মূল্যবৃদ্ধির দাবীর তীব্র বিরোধিতা
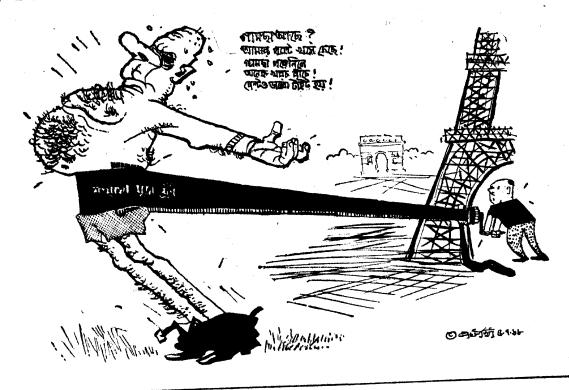
করছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রেলওয়ে বছরে প্রায় দশ লক্ষ মেট্রিক টন ইস্পাত ব্যবহার করে থাকেন। ইস্পাত কারখানাগুলির দাবী মেনে নিতে হলে তাঁদের বাৎসরিক খরচ বেড়ে যাবে দশ কোটি টাকা। বিদেশে যে ইস্পাত রপ্তানী করা হয়, তার দরুন ভারত সরকার ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত 'সাবসিডি' দেন। দেশের ভিতরে ইস্পাতের দাম আরও বাড়লে এই 'সাবসিডি' আরও দশ শতাংশ মত বাড়িয়ে দিতে হতে পারে। এই বছর মোট ৮৮ কোটি টাকার ইস্পাত বিদেশে রপ্তানী করা যাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। এর দরুন রপ্তানীকারকদের সরকারের কাছে পাওনা হয় (ইস্পাতের বর্তমান মূল্যের ভিত্তিতে) ২০ কোটি টাকা। ইস্পাতের দাম বাড়ালে সরকারের দেয় অংশের পরিমাণ আরও অন্ততঃ ২০ কোটি টাকা বাড়বে। একটি হিসাবে প্রকাশ যে, এইভাবে যদি সব সরকারী বিভাগের বাড়তি খরচের হদিশ নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে, জাতীয় বাজেটে মোট ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ এবছরের অবশিষ্ট কয়েক মাসের জন্য দাঁড়াবে ২০ কোটি টাকা আর পুরো এক বছরের জন্য প্রায় ২৭ কোটি টাকা। মুদ্রাস্ফীতির দিক দিয়ে এই সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির পরিণাম কি হবে সেকথা বিবেচ্য।

বেসরকারী শিল্পের মুখপাত্ররা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, এইসময়ে ইস্পাতের দাম চড়ালে শিল্পে মন্দা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে। ওয়াগননির্মাণ শিল্পে মন্দার ভাব দূর হয়ে সবে যে চাঙ্গা ভাব ফিরে আসতে শুরু করেছিল তাতে ভাটা পড়ার সম্ভাবনা। কেননা, আর্থিক টানাটানির জন্য রেলওয়ে বাধ্য হয়েই ওয়াগনের অর্ডার কমিয়ে দিতে পারেন।

অনুরূপভাবে, গত দুই মাসে গৃহনির্মাণ শিল্পেও যে চাঙ্গা ভাব ফিরে আসছিল তার পথে কাঁটা পড়বে। ইস্পাতের ইমারতী জিনিসের দাম চড়ে গেলে বাড়ীঘর তৈরী কমে যাবে। বাড়ী ভাড়ার হার যে পড়তির দিকে যাচ্ছিল সেখানেও আবার পাল্টা স্রোত বইতে থাকবে।

রেলওয়ে ওয়াগন ও ইস্পাতের তৈরী অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রে অবশ্য ইস্পাতের মূল্যবৃদ্ধির কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা নয়। কেননা, এইসব রপ্তানী পণ্যের জন্য যে ইস্পাত প্রয়োজন হয় সেটা উৎপাদনকারীরা আন্তর্জাতিক দামে পান। কিন্তু ভারতীয় ইস্পাতের দাম যদি আন্তর্জাতিক দামের তুলনায় আরও চড়ে যায় তাহলে সরকারী 'সাবসিডির' পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়াতে হবে।

এক সময়ে ভারতীয় ইস্পাত সুলভ বলে প্রসিদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের খনিতে যে আকরিক লোহা পাওয়া যায় সেটা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ধরনের। এদেশের শ্রমিকদের মজুরীর হার শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক কম। এই অবস্থায় ভারতীয় ইস্পাতের দাম অন্যান্য দেশের তুলনায় কম হওয়ারই কথা। কিন্তু আসল ঘটনা ঠিক তার বিপরীত। ভারতবর্ষ এখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে চড়া দামের ইস্পাতের দেশে পরিণত হতে চলেছে। এই বিভ্রাটের মূল কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত শিল্পে অব্যবস্থা, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী লোক নিয়োগ ইত্যাদি। হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড নিজেদের সংগঠনের এইসব ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করতে না পারলে ভারতবর্ষের ইস্পাত শিল্প দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারবে না। দাম বাড়িয়ে সাময়িকভাবে ইস্পাতশিল্পের লোকসান পূরণ হতে পারে; কিন্তু তাতে সমগ্রভাবে অর্থনীতির উপর যে প্রতিক্রিয়া হবে তাতে বর্তমান অবস্থায় পরিণাম খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা।

ইস্পাত শিল্পের মুখপাত্ররা অবশ্য বলেন, ভারতবর্ষে ইস্পাতের চড়া দামের জন্য দায়ী হচ্ছেন সরকার। কারণ ইস্পাতের উপর সরকার যে চড়া হারে উৎপাদন শুল্ক আদায় করে থাকেন তাতেই ইস্পাতের দাম বেড়ে গেছে। ইস্পাত শিল্পের একজন মুখপাত্রের ভাষায়, ইস্পাত নির্মাণে ভারতবর্ষ উচ্চমূল্যের দেশ নয়। ইস্পাতের দামের শতকরা ২০ ভাগ হচ্ছে উৎপাদনশুল্ক। এটা হিসাবে ধরলে বোঝা যাবে, ভারতবর্ষে ইস্পাত শিল্পে উৎপাদনের খরচ কম।

সিপাহী বুলবুল

অঙ্গার শিখ-বংশ

অজয় হোম

বুলবুলি

বোগেনভিলিয়া থেকে রঙ্গনগাছ। রঙ্গন থেকে কামিনী, কামিনী থেকে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা খেজুরগাছটার উপর। সেখান থেকে রক্তকরবীর ডালটাকে বার কয়েক দোলা দিয়ে উড়ে গিয়ে বসে বড়ো তেঁতুল-গাছটার এক ডালে। বসেই ছোট্ট কালো ঝুঁটিটা নাড়া দিয়ে ডাকে—টিউ—টু-টুল্। নজরুলের সেই গানের কলিটা মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে ওঠে—'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্ নে আজি দোল্।'

একটি নয় দুটি বুলবুলি অস্থির হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। একে অপরের সঙ্গে ওড়া-ওড়ির খেলা খেলছে। কে যে পুরুষ কে যে স্ত্রী তা চেনা যায় না। দুজনেই একরকম দেখতে।

এই কালো ঝুঁটি থেকেই বংশের নাম—অঙ্গারশিখ-বংশ (পাইকনোনোটিদি)। ঝুঁটির ছোটোবড়ো নানা তারতম্য আছে। কয়েকজনের আবার ঝুঁটি নেই—অচুড়। অঙ্গারশিখ (পাইকনোনোটাস), উচ্ছিখ (হাইপসিপেটেস), কেশি (ক্রিনিগার) ও পৃথুচূড় (স্পিজিক্সস) এই চারটি গণে দন্ডচারীবর্গের অন্তর্গত অঙ্গারশিখ-বংশ বিভক্ত।

অঙ্গারশিখ গণে ১১টি প্রজাতি তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমতলে দেখা যায় ৩টি। উচ্ছিখ অর্থাৎ উঁচু-শিখা গণে ৬টি প্রজাতি। তার ভিতর একটিকে দেখা যায় দার্জিলিঙ জেলার পার্বত্য অঞ্চলে। অপরটি সমগ্র হিমালয় জুড়ে। বাকি ভারতের বিভিন্ন স্থানে। যাদের ঘাড়ের পিছনে সরু সরু চুলের মতো পালক সেই কেশি গণে প্রজাতি একটি—সাদা গলা (হোয়াইট থ্রোটেড) বুলবুল (ক্রিনিগার ফ্লাভিওলাস)। বাসস্থান—হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চল থেকে পূবে নেপাল হয়ে আসাম, ত্রিপুরা এবং পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে ৬ হাজার ফিটের মধ্যে। পৃথুচূড় অর্থাৎ মোটা লম্বা ঝুঁটির গণেও প্রজাতি একটি—চটক-চঞ্চু (ফিঞ্চবিলড্) বুলবুল (স্পিজিক্সস কানিফ্রন্স)। বাসস্থান—আসামে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে পার্বত্য অঞ্চল ও পূর্ব পাকিস্তান, পূবে চিন পাহাড় এবং আরাকান ৩ থেকে ৭ হাজার ফিটের মধ্যে। ডঃ সত্যচরণ লাহা মহাশয়ের অপূর্ব সংগ্রহে পানিহাটির বাগানে চাক্ষুষ সাক্ষাৎলাভ করেছি।

কালো বুলবুল

কালো বুলবুল (পাইকনোনোটাস কাফের) আমাদের অতি পরিচিত পাখি। হিন্দি নাম—বুলবুল, গুলদুম। ইংরেজি—রেডভেণ্টেড বুলবুল, কমন বুলবুল।

কালো বুলবুল লম্বায় ৮ ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই রকম দেখতে। মাথা ও গলা চকচকে কালো। মাথার উপর ছোটো ঝুঁটি কালো। সারা শরীর এবং মোড়া অবস্থায় ডানা পাটকিলে। ডানায়, পিঠের উপরের

অংশে ও বুকের প্রতিটি পালকের আগায় খুব সরু শাদা পটি থাকায় মাছের আঁশের মতো দেখায়। তলপেট ও লেজের তলা এত ফিকে যে প্রায় শাদাই। লেজের ডগা পার্টিকলে, সেটা গাঢ় হয়ে এসে শেষপ্রান্ত শাদা। ডানারও কতক যেগুলি একদম ধারের পালক তা শাদা। তলপেটের শেষে লেজের তলা টুকটুকে লাল। কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল। চঞ্চু ও পা কালো।

বাসস্থান—৪ হাজার ফিটের ভিতর সমগ্র ভারত, পূর্ব পাকিস্তান, সিংহল এবং ব্রহ্মদেশ। পশ্চিম পাকিস্তানে ক্বচিৎ দেখা যায়। ৭টি উপজাতি। আকারের তারতম্য ও পালকে কতকটা কালো অংশ এছাড়া উপজাতির তফাৎ বোঝা বড়ো শক্ত। পশ্চিম অঞ্চলের যে উপজাতি (পা কা ইণ্টারমিডিয়া) তাকে দেখা যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, কাশ্মীর থেকে কোহাট, সেখান থেকে সল্ট রেঞ্জের পাদদেশ দিয়ে কুমায়ুন। ৪ হাজার ফিটের মধ্যেই থাকে, ৫ সাড়ে ৫ হাজার ফিটেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। দ্বিতীয় উপজাতি (পা কা হুমায়ুনি)—পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধু প্রদেশ, মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, রাজস্থান, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র, বোম্বাইয়ের খান্দেশ এবং পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ। খেতখামার ছাড়াও কাঁটাগাছ বিশেষত বাবলার জঙ্গল এদের পছন্দ। তৃতীয় উপজাতি (পা কা কাফের)—বোম্বাইয়ের খান্দেশ থেকে গোয়ার ভিতর দিয়ে কেরালা, মহীশূর, মাদ্রাজ ও অন্ধ্রে গোদাবরীর তীর পর্যন্ত। চতুর্থ উপজাতি (পা কা হেমরহাউসাস)—সিংহল। পঞ্চম উপজাতি (পা কা স্যাটারাটাস)—গোদাবরী নদীর উত্তর থেকে উড়িষ্যা ও পূর্ব মধ্যপ্রদেশ। ষষ্ঠ উপজাতি (পা কা বেঙ্গলেনসিস)—পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান, আসাম, নেপাল, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ ও বিহার। সপ্তম উপজাতি (পা কা স্ট্যানফোর্ডি)—আসামের নাগা পর্বত, উত্তর ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিম ইউনান।

খাদ্য—নানারকম ছোটো ফলপাকুড়, কীটপতঙ্গ ও ফুলের মধু। মটর বা কড়াইশুঁটির দানা খুব প্রিয়। একারণে এইসব খেতের শস্যের কিছু ক্ষতি হয়। তা সত্ত্বেও বলব যেসব পোকা খেতের অনিষ্ট করে সেগুলো খেয়ে আবার বেশ কিছুটা ভারসাম্যও বজায় রাখে।

কালো বুলবুলের বসবাস মানুষজনের গা ঘেঁষে। কাক-চিল-চড়াই-শালিকের পরেই বুলবুলি। এমন কোনো বাগান নেই যে বাগানে কালো বুলবুল দেখা যায় না। ঘন জঙ্গল থেকে আরম্ভ করে প্রায় উন্মুক্ত প্রান্তরে এদের সঙ্গে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ ঘটে।

গাছ থেকে মাটিতে নামে না বললেই হয়। পা এদের ছোটো এবং কমজোরী বলে মাটিতে ভালো করে হাঁটতে পারে না। একমাত্র কোনো খাদ্য মাটি থেকে তুলতে হলে গাছ থেকে নামে। ওড়াটা খুব দ্রুত। কিন্তু একটানা বেশিদূর উড়ে যায় না।

শ্বেত-ভ্রূ বুলবুল

ওড়ার সময়ে ডানার ঝাপটের আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যায়।

জোড়ে ছাড়া কালো বুলবুলকে দেখা যায় না। একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না এতই এদের মধ্যে ভালোবাসা। পুরোপুরি সংঘচারী না হলেও সময়ে সময়ে বুলবুলের ঝাঁক আমাদের নজরে পড়ে। এটা ঘটে যেখানে তাদের পছন্দ মতো খাদ্যের প্রাচুর্য দেখা দেয়, কিংবা কোনো বড়ো গাছে অনেক জোড়া যখন একসঙ্গে বাসা বাঁধে।

এক-এক সময় বিশেষতঃ বেলা শেষে গোধূলিতে দেখা যায় কালো বুলবুল কেবল পোকা ধরায় মত্ত। গাছ বা ঝোপের ডগায় বসে থেকে হঠাৎ শূন্যে উড়ে পতঙ্গ ধরে ফিরে আসে বারে বারে একই ডালে তখন দেখতে বেশ লাগে।

কালো বুলবুল স্বভাবে বড়োই চঞ্চল। তার উপর আবার ঝগড়াটে এবং লড়াইবাজ। এই কারণে বুলবুল পোষার একটা রেওয়াজ আছে ভারতবর্ষে। মোগল আমল থেকেই মনে হয় ভারতে বুলবুল পোষার প্রচলন। বহু স্থানে মোরগ বা তিতিরের লড়াইয়ের মতো দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রতিযোগিতা চলে। নিজামী হায়দ্রাবাদে ও লখনৌ শহরে নবাবীগন্ধী সৌখীন ধনীদের মধ্যে মোটা অঙ্কের বাজির মাধ্যমে বুলবুল লড়াই এক-সময় খুবই চালু ছিল। কলকাতাও বাদ যায় নি। বর্তমানে ধনীদের মধ্যে সে খেয়াল আর দেখা যায় না। অবশ্য এখন সেসব খেয়ালী ধনীও নেই, সখও নেই। দরিদ্র একশ্রেণীর মধ্যে বুলবুলের লড়াই কিন্তু এখনও দেখা যায়। শীতের দুপুরে গড়ের মাঠে বা অন্যত্র মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। এর উপর বাজি ধরাও হয়। ভালো লড়াইয়ে বুলবুলের মালিককে দেখেছি বেশ দু'পয়সা কামাতে।

কালো বুলবুলের গলার আওয়াজে একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। যদিও সেই মিষ্ট আওয়াজ মাত্র এক দুই বা তিন স্বরগ্রামের। পর্দার উপর পর্দা বা লহরীর উপর লহরী তান বা সুদীর্ঘ শিস এদের কণ্ঠে নিসৃত হয় না। অর্থাৎ বুলবুল গান গায় না, সারাদিন অবিরাম মিষ্টি এবং

সুশ্রাব্য ডাক ডাকে। অথচ বুলবুলের গানের গল্প ও প্রশংসা শুনে আসছি নানা দেশের কবিতায় বয়েৎ-এ, পারস্যদেশীয় কাব্যে গাথায়। বুলবুল ও গোলাপ পারস্যদেশীয় কাব্যে অঙ্গাঙ্গী সঙ্গী। অবশ্য পারস্য-সাহিত্যে যে গুলেচুমী বুলবুলের উল্লেখ আছে তা সম্পূর্ণ আলাদা জাতের পাখি—শকুন্তাল বা শত্রুপাতুক-বংশের অন্তর্গত 'নাইটিঙ্গেল' গণের 'বুলবুল-এ-বস্তা' (এরিথাক্যাস মেগারহাইঙ্কস হাফিজি)। বুলবুল-এ-বস্তা সত্যিকারের গাইয়ে পাখি। পশ্চিম পাকিস্তানে কোয়েটা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত শীতকালে বেড়াতে এলেও ভারতে এই নাইটিঙ্গেল দেখা যায় না। বার দুই মাত্র বিহারে তরাই অঞ্চলে (আউধ তরাই) দেখা গিয়েছিল। তবে বুলবুল-এ-বস্তার কয়েকটি জাতিকে আমরা দেখতে পাই।

কালো বুলবুলের প্রজননের সময় মে থেকে অগাস্ট। কিন্তু মে-জুন মাসেই ডিম পাড়ে বেশি। খুব সম্ভবত এরা বছরে দুবার ডিম পাড়ে। বাসা তৈরি করে শুকনো ঘাসের গোড়া, খুব সরু শিকড়, ঘোড়ার চুল, শুকনো পাতা, গাছের ছাল দিয়ে পেয়ালার আকারে। কখনও কখনও বাসার বাইরেটা মোড়ে মেঠো মাকড়সার জাল দিয়ে। সাধারণতঃ ৩ থেকে ১০ ফিটের মধ্যেই কোনো ঝোপ বা গাছে বাসা বানায়। সময় সময় ৩০-৪০ ফিট উঁচুতেও বাসা বেঁধেছে। ডিম ফোটানো ও বাচ্চা প্রতি-পালনে পরস্পরকে এরা সাহায্য করে। ডিমের সংখ্যা ২ থেকে ৩, কখনও বা ৪টি। মসৃণ ও ভঙ্গুর গোলাপী-শাদা ডিম; তার উপর লাল, পাটকিলে-লাল এবং বেগুনী-লালের নানা আকারের ছোপ ও ছিট। ডিমের মাপ—লম্বায় ০·৯০, চওড়ায় ০·৬৫ ইঞ্চি।

সিপাহী বুলবুল

কোলাঘাটে রূপনারায়ণ নদীর উপর যে সুন্দর ডাকবাংলোটা আছে সেখানে গিয়ে পেঁছেছি দুপুরবেলা। পরদিন সকাল-বেলায় জায়গাটাকে ভালো করে চেনার জন্যে এদিকওদিক ঘুরতে বেরিয়েছি। দক্ষিণ-মুখো চলেছি। বাঁয়ে রূপনারায়ণ। পথে পড়ল একটা বাঁশঝাড়। ঝাড়টার প্রায় গা-লাগোয়া কয়েকটি জবাফুলের গাছ। গাছগুলোর বেশ বয়েস হয়েছে। ডালগুলো মোটা। উঁচুও দেড়-মানুষটাক। তারই উপরদিকের সরু ডালে এসে বসল একটি পাখি। টিপটাপ ছিমছাম সচকিত, যাকে বলে স্মার্ট। উপরটা গাঢ় পিঙ্গল, তলা সবটা শাদা। গালের দুপাশ শাদা কিন্তু ঠিক চোখের নিচেই টুকটুকে লাল গাল-পাট্টা। লেজের তলাতেও টুকটুকে লাল। মাথায় ঝুঁটি যেন সঙ্গিন খাড়া। পাখিটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কোনো জ্যাঁদার্ম অর্থাৎ ফরাসী সৈনিকের কথা মনে পড়ল। ভাব-ভঙ্গীটা সেইরকমেরই।...

পাখিটার নাম—সিপাহী বুলবুল (পাইকনোনোটাস জোকোসাস), কানাড়া বুলবুল, চীনে বুলবুল। হিন্দি—পাহাড়ী বুলবুল। ইংরেজি—রেডহুইস্কার্ড বুলবুল অঙ্গারশিখ গণের এক প্রজাতি। পূর্বে শুঙ্গক (ওটোকম্পসা)-গণের মধ্যে ধরা হতো।

সিপাহী বা চীনে বুলবুল লম্বায় ৮ ইঞ্চি। ছিপছিপে গড়নের স্ত্রী-পুরুষ একই রকম দেখতে। গালের দুপাশ সাদা, তার উপরে ঠিক চোখের তলায় টুকটুকে লাল খোঁচা খোঁচা সরু পালক। মাথার উপর ঝুঁটি কিরীটের মতো সরু ও লম্বাটে। ঝুঁটি ও মাথা কালো এবং গালে সাদা অংশের তলায় সরু কালো একটা লাইন চঞ্চু পর্যন্ত টানা। ডানা পিঠ ও লেজের পাটকিলে রঙটা একটু গাঢ়। লেজের তলায় মাঝের কয়েকটা পালক ছাড়া বাকি সাদা। গলা বুক ও পেট সাদা। বুকের দুপাশে ডানা ঘেঁষে পাটকিলে আভা। তলপেটের শেষে টুকটুকে লাল। কনীনিকা পিঙ্গল। চঞ্চু ও পা কালো।

বাসস্থান—৬ হাজার ফিটের মধ্যে ভারত, পূর্ব পাকিস্থান, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ থেকে দক্ষিণ চীন, হংকং। সিংহল ও পশ্চিম পাকিস্থানে এদের দেখা যায় না। পাঁচটি উপজাতি। প্রথমটি (পা জো পাইরহোটিস) পূর্ব-পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, নেপাল এবং বিহারের নিম্নভূমিতে। দ্বিতীয়টি (পা জো আবু-য়েনসিস) দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান। তৃতীয়টি (পা জো ফুস্কিকউডেটাস) পশ্চিম ভারতে তাপ্তী নদী থেকে দক্ষিণে কন্যা-কুমারিকা, মাদ্রাজে সালেম জেলা থেকে মধ্যপ্রদেশের পূবে পাঁচমারী, চিকালদা। চতুর্থ (পা জো এমেরিয়া) পূর্ব মাদ্রাজ, অন্ধ্র, উড়িষ্যা থেকে পূবে পশ্চিমবঙ্গ। পঞ্চম (পা জো হুইস্টলেরি) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

খাদ্য—নিরামিষ ও আমিষ উভভোজী। পোকা-মাকড়ে যেমন আসক্তি, ফলের প্রতি তেমনই। বড়ো ফল পাকবার আগেই এদের হাত থেকে নিস্তার পায় না। ছোটো ফল পাকা অবস্থায় এক-এক সময় সদলবলে এসে তছনছ করে। মাঝে মাঝে তাল গাছে বাঁধা হাঁড়ির কানায় বসে রস বা তাড়ি খেতেও দেখা যায়।

সিপাহী বুলবুল আচার ব্যবহারে প্রায় কালো বুলবুলের মতোই। খুব ঘন জঙ্গল পছন্দ করে না। মানুষের বসতি ঘেঁষে বাগান, বাঁশঝাড়, খেতের ধার, ঝোপেঝাড়ে আস্তানা গাড়ে। স্ফূর্তিবাজ এবং কালো বুলবুল অপেক্ষা প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর। কালো বুলবুলের মতোই এদের ডাক। তবে ডাকটা জোরে এবং অপেক্ষাকৃত কিছুটা মিষ্টত্বের আভাস তাতে থাকে। একটু নিরিবিলি পছন্দ করে বলে পশ্চিম বাংলায় দু-জাতকে পাশাপাশি বিচরণ করতে সহজে নজরে পড়ে না। তবে এর ব্যতিক্রম যে ঘটে না তা নয়।

কালো বুলবুলের ন্যায় সিপাহী বা চীনে বুলবুল কিন্তু অত ঝগড়াটে নয়। তবে সমষ্কবিশেষে লড়তে মোটেই পিছপাও হয় না। লক্ষ্য করেছি প্রজননকালে নিজের এলাকা যাতে হাতছাড়া না হয় তার জন্যে প্রবল লড়াই চালাতে।

সিপাহী বুলবুলের প্রজননকাল ফেব্রুয়ারী থেকে অগাস্ট। স্থানবিশেষে হেরফের ঘটে। বাসা কালো বুলবুলের ন্যায় তবে ওদের পেয়ালা আকারে বাসার তলায় আস্তরণ বিছায় শুকনো পাতা এবং ফার্ন জাতীয় গাছের পাতা দিয়ে। মাটি থেকে ৬ ফিটের মধ্যে বাসা করতে বেশি লক্ষ্য করেছি। সময়ে সময়ে গেরস্তবাড়ির মাটির দেওয়ালে বা খড়ের চালের তলায় বাসা দেখা যায়। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই বাসা বানান থেকে সন্তানপালনের যাবতীয় দায়িত্ব বহন করে। ২ থেকে ৪টি ভঙ্গুরে অল্প চকচকে গোলাপী বা খুব ফিকে গোলাপী খোলায় উপর নানাভাবের লাল ও কয়েকটি বেগুনীর ছিট ও ছোপের ডিম পাড়ে। ১৪-১৫ দিনের ভিতর ডিম ফুটে ছানা বার হয়। ডিমের মাপ—লম্বায় কালো বুলবুলের চেয়ে একটু ছোট ০·৮৫, চওড়ায় ০·৬৫ ইঞ্চি।

শ্বেতভ্রূ বুলবুল

নামটি দেওয়া পাখিতত্ত্ববিদ প্রদ্যোৎ-কুমার সেনগুপ্তের। চলতি বাংলা করলে দাঁড়ায়—সাদা ভুরু বুলবুল (পা ল্যুটি-ওলাস)। বাংলায় এর নামকরণ কখনও হয় নি। হিন্দিতেও নেই। ইংরেজি—হোয়াইট ব্রাউড বুলবুল। তেলেগু—পোডা-পিগলি। সিংহলী নামটি বেশ মজার—গুলগুলুরা।

এতেই বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গে পাখি-টিকে বিশেষ দেখা যায় না। আমি দেখি শালবনী-গড়বেতার মাঝে জঙ্গলে এপ্রিল ১৯৫০। পক্ষিতত্ত্বের বইতে মেদিনীপুর জেলাতেই দেখা যায় বলে লেখা থাকাতে প্রথম দর্শনে আশ্চর্য হই নি।

পাখিটা গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে ঘুরে বা উড়ে উড়ে পোকা ধরছিল। ফণিমনসার কাঁটা-ঝোপ ও লতার জন্যে গাছটার তলায় যাওয়া গেল না। বেশ জোরে পর পর কয়েকটা বুলবুল মার্কা পরিস্কার স্বরগ্রামে ডাকছিল অবিশ্রান্ত-ভাবে। এত তাড়াতাড়ি যে মাঝে মাঝে স্বরে স্বরে বেধে যাচ্ছিল। শেষ করছিল ভর-পাওয়া সজোরে একটা ডাক ডেকে। বার-দুই অর্ধস্ফুট স্বরে চারু আর অস্পষ্ট স্বরে একটা ডাকও দেয় নি। ফিকে সবুজ-হলুদ রঙের ছোট্ট পাখি। চোখের উপরও ও তলাতে সাদা টান সুতরাং চিনতে ভুল করি নি।

সাদা ভুরু বুলবুল লম্বায় ৭ ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই রকম দেখতে। অঙ্গার-শিখগণ কিন্তু এদের ঝুঁটি নেই—অচূড়। উপরের পালক নিষ্প্রভ পাটকিলে আভাযুক্ত জলপাই-সবুজ; মাথায় রঙটা ফিকে কিন্তু ডানার রঙ খুব গাঢ়। কোমর হলদেটে। দুটো সাদা টান, একটা চঞ্চু থেকে চোখের উপর দিয়ে অপরটি চোখের তলা দিয়ে। চিবুকে হাল্কা হলুদ। গলা বুক পেট ফিকে ছাইয়ের উপর হলুদের আভা। লেজের কাছে এসে হলুদ ভাবটা প্রকট। বুকের উপর কয়েকটা পাটকিলে-ছাই হাল্কা সরু টান। কনীনিকা লাল। চঞ্চু কালো। পা গাঢ় সীসে।

বাসস্থান — গুজরাটের ক্যাম্বে উপ-সাগর থেকে মধ্যভারত, পূবে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং সমগ্র দক্ষিণ ভারত।

কালো বুলবুল

সিংহলে একটি উপজাতিকে (পা লা্ ইনসুলিই) সাড়ে ৩ হাজার ফিটের মধ্যে দেখা যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গদেশ অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলা রেকর্ড করা থাকলেও পক্ষিতত্ত্ববিদ ডঃ সত্যচরণ লাহা বর্ধমানের ২০ মাইল পুবে সাতগাছিয়ায় দেখেন জুন ১৯৫৫। বীরভূমে শান্তিনিকেতনে জুন ১৯৫৬ দেখেন প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়। বীরভূম-বর্ধমানে যখন দেখা গেছে তখন হুগলী চব্বিশ পরগণাতেও দেখা গেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

খাদ্য--বট-পিপুল ইত্যাদি ছোট-বড় ফল, মাকড়সা ও বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ এবং ফুলের মধু।

শ্বেতভ্রু খুব ঘন জঙ্গলে বসতি করে না। তবে জঙ্গলের বা খেতের ধারে যে সব ঝোপঝাড় থাকে সে সবই পছন্দ। গাঁয়ের ধারে ফণিমনসা বা বাবলার ঝাড়ে আসতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। আড়ালে আবডালে জোড়ায় থেকে গলা ছেড়ে ডাকাডাকি করে। সে কারণে সাদাভুরু বুলবুলকে দেখতে পাওয়ার চেয়ে ডাক শোনা যায় বেশি।

শ্বেতভ্রুর প্রজননকাল এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর। বাসা বানায় ঘন ঝোপের ভিতর ২ থেকে ৪ ফিটের মধ্যে। বাসা পেয়ালার আকারে কিন্তু খুব পরিপাটি নয়। উপ-করণ—ছোট কাঠি, ঘাসের গোড়া, নারকেল ছোবড়া, চুল বা লোম। ২ থেকে ৩টি অল্প মসৃণ পাতলা খোলা ফিকে গোলাপীর উপর লালচে পাটকিলের ছিট ও ছোপযুক্ত ডিম পাড়ে। ডিমের মাপ—লম্বায় ০·৯, চওড়ায় ০·৬ ইঞ্চি।

অন্যান্য বুলবুল

দার্জিলিঙ জেলায় এবং তার আশে-পাশে যে দু-একটা বুলবুল দেখা যায় তারা হল—

১। কুন্দগাল বুলবুল (পা লিউকো-গেনাইস)। পাখিওয়ালারা বলে—উল্টাঝুটি বুলবুল। লেপচা—মাঙ্গালিও-কুর। ইংরেজি—হোয়াইট চিকড্ বুলবুল।

লম্বায় ৮ ইঞ্চি। মাথা ও ঝুটি পাট-কিলে। ঝুটি উল্টো দিকে ভাঁজ খেয়ে সামনের দিকে সাপের ফণার মত ঈষৎ ঝোলা। চঞ্চুর শেষে চোখের ঠিক উপরে ঝুটির নিচে সাদা টান। মাথার দু পাশ কালো, তার মাঝে অর্থাৎ কানের চারপাশে কুন্দফুলের ন্যায় সাদা। সারা দেহ ও ডানা জলপাই-পাটকিলে। দেহের উপর দিকটা নিম্নাংশ অপেক্ষা বেশ গাঢ়। তলপেটের কাছটা খুবই ফিকে। তলপেটের নিম্নাংশে উজ্জ্বল হলুদ ছোপ। লেজের গোড়া পিঙ্গল, শেষটা কালচে, মাঝের দুটো পালক ছাড়া সব পালকের আগা সাদা।

বাসস্থান — আফগানিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান, হিমালয়ের কোল ঘেঁষে কাশ্মীর থেকে আসাম। একটি উপজাতিকে (পা লি লিউকোটিস) দেখা যায় সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট, রাজস্থান, পূর্ব পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং উত্তর-মধ্যপ্রদেশ। নাম তার—কানধলা বুলবুল। ইংরেজি—হোয়াইটইয়ার্ড বুল-বুল। কানধলার ঝুটি কালো এবং একটু ছোট। শীতের শেষে ফেব্রুয়ারীতে বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া) একবার লক্ষ্যপথে পড়েছে। ডাকটা বেশ মিষ্টি। টুইক-টা টুইংক...টুইট-টিউ। খানিকক্ষণ শুনলে মনে হয় যেন বলছে—কুইক-আ ড্রিঙ্ক উইথ ইউ।

২। ডোরাকাটা সবুজ বুলবুল (পা স্ট্রায়াটাস)। লেপচা — লেপচা-প্লেক-ফো। ইংরেজি—স্ট্রায়াটেড গ্রীন বুলবুল।

লম্বায় ৯ ইঞ্চি। মাথার খাড়া ঝুটির পালকগুলি উজ্জ্বল সবুজ। উপরের সমস্ত পালক জলপাই-সবুজ থেকে ক্রমে ধূসরাভ। মাথা, চিবুক ও গলায় জলপাই-সবুজের উপর সাদা ছোট টান। বুক হাল্কা হলুদ। লেজের তলা উজ্জ্বল হলুদ। কনীনিকা লাল। চঞ্চু গাঢ় শিং রঙা প্রায় কালো। পা সীসে রঙা।

বাসস্থান—৪ থেকে ৮ হাজার ফিটের মধ্যে দার্জিলিং, নেপাল, ভুটান থেকে আসামের খাসি পাহাড়, উত্তর কাছাড়, মণি-পুর এবং চীন পর্বত।

৩। লালপেট বুলবুল (হাইপসিপেটেস ভাইরেসেনস্)। লেপচা—চিচিরাম, চিন-চিওক-ফো। ইংরেজি—রুফাসবেলীড্ বুল-বুল। উচ্ছুখ গণের অন্তর্গত।

লম্বায় ৯ ইঞ্চি। বুক উজ্জ্বল লালচে-পাটকিলে। পেট সাদার উপর লালচে ভাব। লেজের তলা হলুদ। কপাল, মাথার চাঁদি ও ঘাড় উজ্জ্বল পিঙ্গল, বাকি উপরের পালক জলপাই-সবুজ। লেজ জলপাই-সবুজ। কনীনিকা লালচে। চঞ্চু নীলাভ-ধূসর। পা হলদেটে পিঙ্গল।

বাসস্থান—হিমালয়ের ৭ হাজার ফিটের মধ্যে মুসৌরী অঞ্চল থেকে আসাম হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য অঞ্চল।

৪। হিমালয়ের কালো বুলবুল (হা ম্যাডাগাসকারিয়েনসিস)। হিন্দি — বন বকরা। লেপচা—ফাক্ক-ফো। ইংরেজি—ব্ল্যাক বুলবুল।

লম্বায় ১০ ইঞ্চি। পিছন থেকে প্রথম যখন দেখি তখন মনে হয়েছিল এক জাতের ফিঙেই বুঝি। মাছলেজটা একটু ভোঁতা। ঘাড় ফেরাতেই বুঝলাম উচ্ছুখ গণের পাখি। ছাই-ধূসর রঙ। উপর দিকটা গাঢ়। পেট থেকে নিচটা সাদাটে। মাথার উপর উসকো-খুসকো ঝুটি কালো। চঞ্চুর গোড়া থেকে কালো দাগ কানের চারপাশ ঘুরে এসেছে। কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল। চঞ্চু ও পা উজ্জ্বল প্রবাল-লাল। নখর পাটকিলে শিং রঙা।

বাসস্থান — পশ্চিম পাকিস্তান, হিমা-লয়ের পাদদেশে ২ থেকে ১০ হাজার ফিটের মধ্যে কাশ্মীর থেকে আসাম।

পরীক্ষার পর পরীক্ষা

প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় প্রথম হবার খবর পেয়ে সারা জর্জ সরাসরি বলে ফেললো 'এ খবর আমি আশা করিনি।' আর হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় 'এবারের বিস্ময়' মালবিকা চক্রবর্তীর প্রথম হওয়ার খবর শুনে চোখে আনন্দাশ্রু নিয়ে তার ঠাকুরমা মন্তব্য করলেন, 'মালবিকা যে প্রথম হবে তা আমি জানতাম।' বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল মনোভাব পার হয়ে আজ মালবিকা ও সারা স্বস্থানে উজ্জ্বল। শুধু এ দুজনই নয়, সারার সঙ্গে আছে ঊষা, উমা, শাশ্বতী, বিভা, শ্যামলী, জয়ন্তী, সুমিতা, রঞ্জিতা আর মালবিকার সঙ্গীসাথীর তালিকা বিরাট। আর্টসের পুরোপুরি দশটি স্থানই তাদের অধিকারে। কমার্সে দশটির মধ্যে পাঁচটি স্থান তারা ছিনিয়ে নিয়েছে। পাশের হারেও মেয়েরা ছেলেদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। ছেলেরা যেখানে পাশ করেছে

হায়ার সেকেন্ডারী কমার্সে তৃতীয় মিতা মুখার্জী

প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় আর্টসে সপ্তম শাশ্বতী চক্রবর্তী

সারা জর্জ

প্রি-ইউনিভার্সিটি আর্টসে ষষ্ঠ উমা মিত্র

হায়ার সেকেন্ডারী আর্টসে অষ্টম তপতী চট্টোপাধ্যায়

৫৫·১ ভাগ সেখানে মেয়েদের পাশের হার হলো ৬২·৬৩ ভাগ। আরো উল্লেখযোগ্য হলো এবারের 'বিরাট বিস্ময়' মালবিকা। এত দিন হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় সব গ্রুপ মিলিয়ে প্রথম দশজনের শীর্ষে শোভা পেত বিজ্ঞান ছাত্রছাত্রীর নাম, সে ইতিহাস ভেঙে মালবিকা এবার বিজ্ঞানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রথম স্থান দখল করেছে। এবারের মত এমন বিরাট এবং ব্যাপক সাফল্য তাই তুলনাহীন। সারা আর মালবিকার সঙ্গে সফল সকল ছাত্রী গড়ে তুললো এক নয়া ইতিহাস, যার যোগ্য প্রত্যুত্তর নিহিত রইলো ভবিষ্যতের গর্ভে।

একদিন দারুণ বেদনাসহ পথ বয়েই নারীশিক্ষার প্রথম ভিৎ রচিত হয়েছিল। সেদিন অন্যান্য সবকিছুর মতই বিপক্ষ দল ছিল ভীষণ জোরদার। তারা রব তুলেছিল, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে জাত রসাতলে যাবে। কিন্তু যার রসাতলে যাবার সে ছাড়া আর কেউ যায় নি। বরং এই সামাজিক বয়কটযুক্ত বিরোধিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরাই পাচ্ছেন পথ প্রদর্শকের সম্মান। বিরুদ্ধবাদীদের সবাই ভুলে গেছে। সাফল্যের শতদল সেই সূচনার মহান ইতিহাসের অর্ঘ্যস্বরূপ। পুরুষ পরম্পরায় আমরা এই ঋণ শোধ করে চলেছি এবং নতুন অর্ঘ্য নিবেদন করে পূর্বসূরীদের স্মরণ করছি। তাঁদের বেদনার রক্তপলাশ আমাদের সাফল্যমণ্ডিত দীপ্ত-প্রাণের হর্ষমুখে নতুন মহিমায় উদ্ভাসিত। বারে বারে এই মুহূর্তটি যখন ঘনিয়ে আসে তখন বিপুল প্রতীক্ষা আর ধৈর্যে আমরা অধীর হয়ে প্রহর গুনি। প্রত্যাশা পূরণের থরথর বেদনার এক ঝলক বিপুল আনন্দ বীরবিক্রমে এসে আছড়ে পড়ে। মন উল্লাসে মত্ত হয়—আনন্দ পাগলা হাতীর মত বাঁধন হারা হয়ে ছোটে। নয়া কাহিনী এবং নতুন দিগন্তের প্রত্যাশায় প্রায় অধিকাংশ বৎসরই বিস্তৃত অধ্যায় সংযোজিত হচ্ছে। তাই ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আরো বিপুল মনে হওয়াই স্বাভাবিক। দায়িত্ব কখনো ফুরিয়ে যায় না, কর্তব্য শেষ হয় না। বরং তা আমাদের ঘাড়ে সেকথা মনে রেখেই আমাদের চলতে হবে।

কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় বর্তমানে বন্দ হয়ে থাকলে আসল বাস্তবকেই এড়িয়ে যাওয়া হবে। তাই সম্ভাবনার কথা ভেবে উল্লাসে ফেটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের একটু সংযত সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে সব জিনিসটা একবার ভেবে নিতে হবে।

এই লেখা বেরোনোর অনেক আগেই সাফল্যমণ্ডিত মেয়েরা কলেজে-কলেজে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে একটু জায়গা করে নেবার জন্য। এ আমাদের প্রতি বৎসরের অভিজ্ঞতা। তবু একবার সময়ে ঝালাই করে নেওয়া প্রয়োজন। কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য চারদিকে বেশ ব্যস্ততার ভাব। কারণ বিলম্ব হলেই হতাশ হতে হবে। মেয়েদের নাকের উপর কলেজের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। নোটিশ ঝুলবে। আর সীট নেই। এসব ঝামেলা এড়ানোর জনাই এত ব্যস্ততা। তবু শেষ রক্ষা হবে কিনা কেউ বলতে পারে না। শেষ মুহূর্তে দেখা যাবে অনেককেই কলেজ ভর্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে চুপচাপ বসে পড়তে হয়েছে। কয়েক বছর ধরেই এরকম ঘটনা ক্রমান্বয়ে ঘটে চলেছে। তাই এবার তার খুব একটা ব্যতিক্রম হবে এ রকম ভরসার কোন সূক্ষ্মতম সূত্রেরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। বরং সমস্যা আরো দিনকে দিন কি রকম গভীর হয়ে যাচ্ছে, এর যেন কোন পার কূল পাওয়া যাচ্ছে না।

পরীক্ষায় পাশ করার পর এ রকম আর একটি পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সবাই প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে পড়ে। মা-বাবারও ভাবনা কম নয়। উচ্চশিক্ষার দরজা যখন খুলেছে তখন এ সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করতে চায় সবাই। কিন্তু সে পথে মস্ত বড় প্রতিবন্ধক কলেজে কলেজে স্থানাভাব। আসলে সমস্যা এখানে নয়। শহরে যতগুলো

কলেজ আছে তারা সাধ্যমত ছাত্রীদের জায়গা করে দিচ্ছে। এদের পক্ষে ক্রমবর্ধমান ছাত্রীর চাপ সামলানো সম্ভব নয়। সে জন্য প্রয়োজন আরো কলেজ।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শহরে ও মফঃস্বলে অনেক কলেজ গড়ে উঠেছে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা কোন সময়েই যথেষ্ট নয়। প্রতি বৎসর যত ছাত্রী বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদের অর্ধেক সংখ্যকের সংকুলানও এর দ্বারা সম্ভব নয়। অথচ নতুন কলেজ গড়ে তোলা ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, এ বাস্তব সত্যটুকু উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু সে অনুপাতে নতুন কলেজ হচ্ছে কোথায়? এক বৎসরে যত ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়, তার শতকরা পঞ্চাশ জন কলেজে ভর্তি হয় কিনা সন্দেহ। যদি সংখ্যাটার ঈষৎ হেরফের হয় তাহলে অবস্থা যে কি হবে তা ভেবে ওঠা দায়। তাই সমস্যার আশু সমাধানের জন্য সমস্ত কলেজে কো-এডুকেশন চালু করা প্রয়োজন। মফস্বলের অনেক কলেজেই এ নিয়ম চালু আছে। শহরের অনেক কলেজে মর্ণিং-য়ে মেয়েদের পড়ার ব্যবস্থা আছে। একই সঙ্গে যদি ডে-শিফটে কো-এডুকেশন চালু করা হয় তবে সমস্যার কিছুটা গতি হয়। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সাহায্যে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হলে তাতে তীব্রতা বাড়বে বই কমবে না। তাই স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে এক্ষেত্রে এগুতে হবে।

যদি বা কোন রকমে কলেজে সীটের ব্যবস্থা করা গেল সঙ্গে সঙ্গে এসে যায় হোস্টেলের প্রশ্ন। প্রচুর মেয়ে কলকাতার বাইরে থেকে এখানে পড়তে আসে। অনেকেরই থাকার জায়গা নেই, যাদের আছে তারা অবশ্য ভাগ্যবান। কিন্তু যাদের সে রকম ব্যবস্থা নেই তাদের হোস্টেলের মুখ চেয়েই শহরে পড়তে আসতে হয়। কিন্তু সেখানে সব সময় ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই রব।

এত বড় শহরে হোস্টেলের সংখ্যা গুণতে শুরু করলে আঙুলও লজ্জা পাবে। তাই সে চেষ্টায় বিরত থেকে শুধুমুখে বলা যাক যে, হোস্টেলের সংখ্যা নিতান্তই কম। বাধ্য হয়েই প্রতিবছর বহু মেয়েকে হোস্টেলে সীট পাওয়ার আশায় বিমুখ হতে হয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মেয়েদের জন্য যে গুটিকয় হোস্টেল আছে সেখানে আসন বাড়াবার আর কোন উপায় নেই জেনেও কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে এক রকম উদাসীনই বলা চলে। অথচ শহরে মেয়েদের হোস্টেল বাড়ানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করে বসে আছে। কিন্তু এতাবৎ কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে বলে শোনা যায় নি। ক্রমবর্ধমান সমস্যার মুখে এ রকম নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার কি অর্থ হয় তা ঠিক আমাদের বোধগম্য নয়। প্রতিবছর যেসব মেয়ে কলকাতা থেকে পড়াশোনার আশায় ব্যর্থ হচ্ছে তাদের মুখ চেয়ে এ ব্যাপারে এখনি ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আর চুপ করে থাকাও সমীচীন হবে না।

তারপর যে কথাটি স্বাভাবিকভাবে এসে যায়, তা হোল বৃত্তিশিক্ষার প্রসঙ্গ। ডাক্তারী ইঞ্জিনীয়ারিং ও পলিটেকনিক শিক্ষার ব্যাপারে মেয়েদের বিশেষ কোন ব্যবস্থা আজও হয় নি। সীমিতসংখ্যক বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের একই সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা। কিন্তু ছেলে বা মেয়ে কারো পক্ষে এই ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। কারণ, স্থান অসংকুলান এখানেও বিরাট সমস্যা। অথচ এ জন্য কোন ব্যবস্থাই হয় নি। যতদূর জানা আছে, সারা দেশে একমাত্র দিল্লীতেই মেয়েদের একটি মেডিক্যাল কলেজ আছে। ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষায় এরকম ব্যবস্থা খুব সম্ভব নেই। তবে পলিটেকনিকে কলকাতায় মেয়েদের একটি প্রতিষ্ঠান আছে। অথচ সবাই স্বীকার করবেন যে, বৃত্তিশিক্ষায় মেয়েদের আগ্রহ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু কার্যকরী ব্যবস্থার এখানেও তেমনি অভাব। একটু খোঁজ নিলেই বোঝা যাবে যে, আগের চেয়ে মেয়েদের বিজ্ঞান পড়ার আগ্রহ অনেক বেড়েছে। এর অন্যতম কারণ অবশ্যই বৃত্তিশিক্ষা। সে জন্য চাই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা। দেশে বৃত্তি শিক্ষার কলেজ আরও বাড়ানোর প্রচুর প্রয়োজন আছে। আবার আলাদাভাবে মেয়েদের জন্যও বৃত্তিশিক্ষার কলেজ গড়ে তোলা যেতে পারে। মেয়েরা বৃত্তিশিক্ষা লাভ করুক, এটা আমরা সকলেই চাই। তাই সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও অবলম্বন করা দরকার। না হলে আমাদের সকল সদিচ্ছা মাঠে মারা যেতে বাধ্য।

সম্ভাবনার স্বপ্ন আমরা দেখি ক্ষতি নেই এবং দেখাই স্বাভাবিক কিন্তু সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা কই? কলেজ, বৃত্তিশিক্ষার কলেজ আর হোস্টেল সবই তো বাড়ন্ত। তবে স্কুলের দোরগোড়া পেরিয়ে মেয়েরা দাঁড়াবে কোথায়? তাহলে কি পরীক্ষায় পাশ করাই বিড়ম্বনা? আপাতদৃষ্টিতে এরকম মনে করা স্বাভাবিক। মেয়ে পাশ করলে কলেজের খরচা জোগানোর চিন্তায় মা-বাবার চোখে যখন ঘুম থাকে না তখন এই বাড়তি চিন্তায় আরো বিব্রত হওয়ার হাত থেকে তাঁরা রেহাই পাবেন কবে? এর কোন ব্যবস্থা না হলে পূর্ব-সূরীদের ঋণ শোধ করে স্বপ্নসৌধ গড়ে তোলাও অলীক হয়ে যেতে বাধ্য।

মহারাষ্ট্রের ঘরকন্না

উঁচু-নীচু পাহাড়ের কোলে পশ্চিম-ভারতের রূপসী নগরী পুনা। এখানে এসেই প্রথম চোখে পড়েছে মহিলাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য। এ'রা পুরুষের সঙ্গে তাল রেখে সাইকেল, স্কুটার বা মোটরগাড়ী চালান, কাছা দিয়ে শাড়ী পড়া, গলায় সোনার চেনে গাঁথা কালো পুঁতির মালার ব্যবহার।

বোম্বাই মহারাষ্ট্রের রাজধানী হয়েও বড় বেশী সর্বভারতীয়। সেখানে মারাঠীদের বৈশিষ্ট্য বড় একটা নজরে পড়ে না। মহারাষ্ট্রের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি পুরোপুরি বজায় রয়েছে পুনা শহরে। মারাঠীদের জানতে হলে আসতে হয় এখানে। শহরের নাম মারাঠী উচ্চারণে 'পুনে'। পুনা মহারাষ্ট্রের শুধু সংস্কৃতি কেন্দ্রই নয়, প্রাণস্বরূপ। এখানকার শিক্ষানুষ্ঠান ও গবেষণামন্দিরগুলো বিদ্বানসমাজে সুপরিচিত।

এখানে এসেই স্থানীয় একটি নামে একটি মেয়েকে বাড়ীর কাজকর্ম করবার জন্য পেয়েছিলাম। সে আমাকে 'বাঈ' বলে ডাকায় একটু চমকে উঠেছিলাম। আসাম থেকে সবেমাত্র এসেছি। সেখানেও এই শব্দটি চালু রয়েছে। তবে, পূর্ব-আসামে ঝি-দের বলা হয় 'বাই' আর পশ্চিম আসামে দিদিকে বলে 'বাই'। এখানে মহিলামাত্রেই 'বাঈ'। অতি উচ্চস্তরের লোক থেকে শুরু করে সর্বসাধারণ পর্যন্ত সবাই সব মহিলাকে এই বলেই সম্বোধন করে থাকে। আমাদের দিকে মহিলাদের মেমসাহেব, মা, দিদি বা বৌদি বলে ডাকা হয়। এখানে জাতি-বর্ণ-শ্রেণীভেদহীন এই সম্বোধন আমার প্রথম দিন থেকেই তাই খুব ভাল লেগেছিল। এ'রা মাকে 'আঈ' বলেন। আসামেরও কোন কোন অঞ্চলে মাকে 'আই' বলা হয়।

কিছুদিন পর আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম। ঘোমটার প্রচলন শুধু নীচু-শ্রেণীর বৌদের মধ্যে। ভদ্রপরিবারের মেয়েরা ঘোমটা দেন না। অবশ্য আগেকার দিনের

রাজা-মহারাজাদের বাড়ীর মহিলাদের মধ্যেও নাকি এ-প্রথা চালু ছিল। এখানকার বিয়ের কনেও অনবগুন্ঠিতা। দক্ষিণ ভারতেও তাই। শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, বা ভাসুরের সামনে মাথায় কাপড় না-থাকা মেয়েদের বাড়ীর বৌ কি মেয়ে চট করে বোঝা যায় না। এ প্রথা নেই বলেই বোধ করি মারাঠী মেয়েরা এত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন—ঠিক পুরুষের মত। এ'রা অত্যন্ত সাহসী ও বাইরের সবরকম কাজ-কর্মে পটিয়সী। সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় বাইরের ও ভিতরের কাজ সবই মেয়েরা করেন। স্বামীরা শুধু চাকুরীই করেন। হাট-বাজার, র‍্যাশন, ব্যাংক—কোনকিছুর চিন্তাই পুরুষদের করতে হয় না।

মারাঠী মহিলারা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এ'দের রান্নাঘরটি দেখবার মত। আমরা সাধারণত রান্নাঘরের চাইতে অন্য ঘরগুলো গুছিয়ে রাখতে ভালবাসি। বাড়ী তৈরী করার সময় রান্নাঘরের জন্য রাখি সামান্যতম জায়গা। কলকাতার ফ্ল্যাট-বাড়ীগুলোর রান্নাঘরে তো একজনের বেশী দুজনের নড়াচড়ার জায়গা নেই। এখানে রান্নাঘরের মর্যাদা অন্য ঘরের চাইতে একটু উঁচুতে বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। তাই বাড়ীতে ক'খানা ঘর আছে বললে রান্নাঘরটিকেও গুনতিতে ধরা হয়। এ'রা গুছিয়ে রাখেন এই ঘরটিকেই। চাল, ডাল, আটা, ময়দা যাবতীয় জিনিসপত্র রাখবার জন্য এখানে পিতল এবং অবস্থাপন্ন ঘরে স্টেনলেস স্টীলের কৌটো ব্যবহার করা হয়। রান্না করা হয় কলাইকরা পিতলের বাসনে। খাবার বাসন সব স্টীলের। অবশ্য পিতলের থালাবাটির ব্যবহারও কম নয়। কৌটো থেকে শুরু করে যাবতীয় বাসনপত্রাদি ঘসে-মেজে সবসময় চকচকে রাখা হয়। ও'দের তুলনায় বাঙালীবাড়ীর বাসনপত্র স্বল্প বলে এখানকার ঝিয়েরা আড়ালে নিন্দেও করে। তাছাড়া, এ'রা এলুমিনিয়মকে একটু নীচু চোখে দেখেন। আমাদের রান্নাঘরে আবার এ জিনিসটির একচ্ছত্র আধিপত্য। এখানে মেয়ের বিয়েতে অন্যান্য বাসনের

সঙ্গে পিতল বা স্টীলের কৌটো, জলের ড্রাম প্রভৃতি দিয়ে থাকেন। আত্মীয়স্বজন বা নিমন্ত্রিতেরাও বিয়ে বা অন্য উৎসবে বাসন দিতেই ভালবাসেন। এখানকার বাসনের বাজারে গেলে খালি হাতে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। বাংলাদেশের খাগড়া এবং আসামের সর্থেবাড়ীর কাঁসার বাসনের মত মহারাষ্ট্রে পুনার বাসন প্রসিদ্ধ।

বাসন ছাড়াও মারাঠীদের রান্নাঘরে রয়েছে নানারকমের জিনিসপত্র—কাপ-প্লেট ও থালাবাটির স্ট্যান্ড, চীনেবাদাম গুঁড়ো করার যন্ত্র, নারকেল কোরানোর যন্ত্র; নানারকম মোটা মিহি চালনী; তরি-তরকারী কাটবার নানারকমের ব্যবস্থা; পিঠে গড়ার ও লুচি গোল করে কাটার ছোটখাটো যন্ত্র এবং আরও অনেক কিছু। অধিকাংশ বাড়ীতেই এগুলো আছে, একটু অবস্থাপন্ন হলে আধুনিক প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থাই এ'দের রান্নাঘরে দেখা যায়। রান্নাবান্নাও সাধারণত গ্যাসের উনুনে করা হয়। কয়লা ও জ্বালানীকাঠের স্বল্পতার জন্য সাধারণ লোকেরা কেরোসিন স্টোভ ও কাঠ-কয়লা উনুন ব্যবহার করেন। এ'রা বড় মেটেরিয়ালিস্টিক। কিছুদিন আগে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে কিছু টাকা-পয়সা খরচ করেছিলাম বলে দু-একজন মারাঠী মহিলা আক্ষেপ করে বললেন—

'এ পয়সায় তুমি ফ্রিজ কিনতে পারতে।'

দেশভ্রমণে শখ এ'দের খুবই কম। আমার বাড়ীতে প্রয়োজনীয় আধুনিক জিনিসপত্রের অভাব সত্ত্বেও কি করে দেশ-ভ্রমণে টাকা খরচ করতে পারলাম কিছুতেই এ'দের বোধগম্য হয় না। আমি অবশ্য বলেছি ও'দের, "তোমরা মেটেরিয়ালিস্টিক, পূর্ব-ভারতীয়রা রোমান্টিক।"

রান্নাঘরে রান্না করবার জায়গাটি একটি উঁচু প্ল্যাটফর্ম—যাকে এখানে বলা হয় 'ওয়াটা'। ওয়াটা থাকায় দাঁড়িয়ে রান্না করতে হয়। এ'রা বলেন ওয়াটার প্রচলন বেশী দিনের নয়। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে এ'দের রান্নার প্রচুর মিল আছে। এ'রাও কারীপাতা, নারকেল-কোরা, তেঁতুল ও লংকা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেন। দুপুর ও রাত্রের খাবারের সঙ্গে এ'রা ভাত ও রুটি দুই-ই খান। ভাতের পরিমাণ র‍্যাশনের আগের কালেও কম ছিল। গমের রুটি ছাড়া মারাঠীরা জোয়ার ও বাজরার রুটিও মাঝে-মাঝে খেয়ে থাকেন। জোয়ারের রুটিকে বলা হয় ভাখ্রী। গরীবেরা ভাখ্রীই বেশী খান, কারণ এতে ঘি বা তেলের দরকার নেই। মারাঠীরা গমের রুটির আটা মাখার সময় প্রচুর তেল ব্যবহার করেন ও সেঁকবার পর ঘি মাখিয়ে রেখে দেন। সাধারণত ডাল-তরকারী দিয়ে রুটি খাওয়ার পর দই বা ঘোল দিয়ে ভাত খাওয়া হয়। আর দইয়ের সঙ্গে চলে চিনি বা গুড় নয়, নুন। কখনো কখনো আবার তাতে লংকা বা আচার চটকে নেয়া হয়।

...আমি তখন দিল্লীর মিরান্ডা হাউস হস্টেলে নবাগতা। হঠাৎ আমার দক্ষিণ-দেশীয় রুম-মেট রুক্মিণী এসে বিছানায় গড়িয়ে-গড়িয়ে হাসছে। কিছুতেই হাসি থামে না। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলল—"ভারতী দইয়ের সঙ্গে চিনি খাচ্ছে।"—আবার দমফাটা হাসি।

আমি হতবাক। মেদিনীপুরের ভারতী দইয়ের সঙ্গে চিনি খাচ্ছে তো হাসির কি হল? ধীরে ধীরে ব্যাপারটা বোধগম্য হয়েছিল। আসাম ও বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের সর্বত্র নুন দিয়ে দই খাওয়া হয়।

...এ'দের রান্নায় ভীষণ ঝাল। খেতে খুবই ভাল লাগে, তবে অল্প দিনের জন্য। সব তরকারীতে একই ফোড়ন—সরষে আর জিরে—, আর একই মশলা। পৃথিবীর প্রায় সবরকম মশলা ভেজে গুঁড়ো করে রাখা এই মশলার নাম কালামশলা। বাংলাদেশে এক লাউ দিয়েই ঘণ্ট, ছেঁচকি, সুক্তো ইত্যাদি নানা স্বাদের তরকারী রান্না করা হয়। বাংলাদেশের মত এত বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার ভারতবর্ষে আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না।

পুনার মহিলারা রান্নাঘরটি যেমন সাজিয়ে রাখেন, তেমনই সারাদিন রান্নাঘরের জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে ভালবাসেন। দুপুরবেলা মেয়েদের কাজ হল গম, চাল, ডাল থেকে মশলাপাতি, এমন কি লবণ পর্যন্ত ঝেড়ে-বেছে পরিষ্কার করা। খাদ্য সংরক্ষণেও এ'রা দক্ষ। গমে রেড়ির তেল, চালে বোরিক পাউডার, চিনিতে লবঙ্গ রেখে এ'রা অনেক দিন পর্যন্ত এগুলোকে পোকার হাত থেকে রক্ষা করেন। ময়দা ও সুজি একটু গরম কড়াতে নাড়া-চাড়া করে ঠাণ্ডা হলে পর কৌটোতে ভরে রাখেন। অনেক মাস পর্যন্ত তাতে পোকা হয় না।

এখানকার গৃহিণীরা বাজার থেকে গুঁড়ো জিনিস কেনা পছন্দ করেন না। গম, ছোলার ডাল ইত্যাদি ঝেড়ে-বেছে পরিষ্কার করে কলে আটা, সুজি বা বেশন করিয়ে আনেন। মশলার বেলাও একই কথা। এছাড়া, আচার, পাঁপড় ও গম বা আলু দিয়ে নানারকম শুকনো খাবার এ'রা তৈরী করে রাখেন। রান্নাঘর সম্পর্কীয় কাজকর্ম করেই সারা দুপুরটা এ'রা কাটান। সেলাই করা, উলবোনা, সুচের কাজ ইত্যাদির দিকে কারু বিশেষ মনোযোগ নেই। বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে এখানে এ'দের তফাৎ।

শীত গ্রীষ্ম সবসময়ই গরম জলে স্নান করা এখানকার প্রচলিত রীতি। মহিলারা রোজ স্নানের সময় চুল ভেজান না। তাই এলো চুলে এখানে কাউকে দেখা যায় না। স্নানের জল গরম করবার জন্য স্নানঘরে একটি বড় পাত্র থাকে—যার স্থানীয় নাম বাম্বু। অনেকটা সামোভারের মত। পাত্রটিতে জল ভরে রাখা হয়। এর মধ্যখানে একটি মোটা নলে থাকে জ্বলন্ত কয়লা। এর ফলে পাত্রটির জল গরম হয়। আজ-কাল অবশ্য বাড়ীতে অনেকে বিদ্যুৎচালিত 'গিজার' ব্যবহার করছেন।

—ভারতী গুহ

ঘড়ি

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

পিকাসো একবার প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা, তোমরা কেউ কোন সাধুকে ঘড়ি পরতে দেখেছ? যাঁকে এই প্রশ্ন করেছিলেন তিনি নিশ্চয় মনে মনে এই দৃশ্য কল্পনা করে কৌতুক অনুভব করেছিলেন। তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল পর্বতের গুহাকন্দর থেকে জটাবল্কলধারী সাধু আসবেন সমতলে, তার মণিবন্ধে শোভা পাচ্ছে একটি সুদৃশ্য ঘড়ি। তা সাধুরা ঘড়ি ব্যবহার করুন বা না করুন, এ পৃথিবীর পাপীতাপীরা প্রত্যেকেই তাদের কব্জিতে একটি সুদৃশ্য ঘড়ি বেঁধে চলাফেরা করতে ভালবাসেন, মানুষের মত বেঁচে থাকতে হলে খাদ্য বস্ত্র আশ্রয়ের সঙ্গে আরও এক অপরিহার্য উপকরণ একটি ঘড়ি।

মানুষের সভ্যতার আদি থেকে ঘড়ির বিবর্তন এ নিবন্ধের আলোচ্য নয়। ঘড়ি বলতেই আজও আমরা যে দেশের ঘড়ির কথা ভাবি সে দেশটি হল সুইজারল্যান্ড। যদিও সোভিয়েটের সঙ্গে প্রতিযোগিতার দাপটে সুইজারল্যান্ডের ঘড়ির রপ্তানী বাণিজ্য সংকুচিত হয়ে পড়েছে (আমাদের দেশেও এইচ এম টির ঘড়ি কয়েক বছরের মধ্যেই উল্লেখ্য পাল্লা দেবে নিশ্চয়ই, যদিও দেশের বাইরে পাড়ি জমাতে আমাদের এইচ এম টি ঘড়ির বিলম্ব ঘটবে), তবু নির্মাণ-সৌকর্যে, যান্ত্রিক নিপুণতায়, উপরন্তু জনপ্রিয়তায় সুইস ঘড়ি আজও বিশ্বের মানুষের কাছে আদরণীয় এক সামগ্রী। আর তাই দেশে দেশে সুইস ঘড়ি আমদানীর পথে যত কাস্টমসের নিষেধাজ্ঞাই থাকুক, চোরাপথে সুইস ঘড়ির বেচাকেনা কোন দেশই বন্ধ করতে পারেনি।

সুইসদের ঘড়ির ব্যবসা বেশী দিনের নয়। আজ থেকে তিনশ বছর আগে এক ইংরেজ ভদ্রলোক সুইজারল্যান্ডের জুরা পর্বতমালার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কথিত আছে পর্বতমালা সন্নিহিত লা সাগলে নামের একটি গ্রামে ও'র ঘড়িটি যায় বন্ধ হয়ে। ওখানকারই এক কামার ড্যানিয়েল জিন রিচার্ডকে পাকড়াও করে ঘড়িটি মেরামত করতে পারবে কিনা জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজ ভদ্রলোক। ড্যানিয়েল জিন রিচার্ডের জীবনে এর আগে ঘড়ি বলে কোন বস্তুর সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও, ঘড়িটা দেখে আগ্রহ বোধ করল সে। হাতের কাজে দক্ষ ওখানকার বাসিন্দারা, তাই সুইস কর্মকার ড্যানিয়েলের ঘড়িটি চালু করতে বেশী বেগ পেতে হল না। ইংরেজ ভদ্রলোক জুরা ছেড়ে চলে গেলে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে ড্যানিয়েল জিন রিচার্ড পরে নিজের জন্যে একটা ঘড়ি বানিয়ে ফেলল। ড্যানিয়েল জিন রিচার্ডের এই ঘড়িটিই হল প্রথম সুইস ঘড়ি। এরপর জুরার প্রত্যেকটি মানুষ ঘড়ি তৈরী করতে লাগল নিজেদের জন্যে ড্যানিয়েলের ঘড়ি দেখে দেখে। শীতকালে যখন চাষবাসের কাজ থাকে না তখন এই সুন্দর কাজ করে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করে নিতে কেই বা রাজী না হবে। সুইজারল্যান্ডে ঘড়ি ব্যবসায়ের এই হল পত্তনের কাহিনী।

ঘড়ি একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র, এক লক্ষাংশ অশ্বশক্তিসমন্বিত একটি ঘড়ির ব্যালান্স হুইল প্রতি দিনে ৮৬৪,০০০ বার সামনে পেছনে ঘোরে ঘন্টায় প্রায় ষাট মাইল বেগে। মাটিতে আছড়ান, জলে ফেলে রাখুন অথচ প্রভুভক্তের মত আপনাকে নির্ভুলভাবে সময় জানিয়ে দেবে। সূক্ষ্ম বলেই ঘড়ি শুধু দামী নয়, দামী এই জন্যে তার নির্ভুল সময় বলে দেবার দক্ষতায়। এক পাউন্ড স্টীলের দাম হয়ত ছত্রিশ টাকা হতে পারে কিন্তু সেই এক পাউন্ড স্টীল থেকে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হেয়ারস্প্রিং তৈরী হবে তার দাম স্বাভাবিক কারণেই হয়ে যায় বত্রিশ হাজার টাকার মত।

সুইস ঘড়ির কারখানায় বর্তমানে প্রায় সত্তর হাজার লোক কাজ করে। তাছাড়া কিছু সাধারণ মানুষও নিজেদের বাড়ীতে ঘড়ি ও যন্ত্রপাতি তৈরী করে থাকে। ঘড়ি নির্মাণে দক্ষতা প্রয়োজন বলেই ঘড়ির শ্রমিকরা অন্য শ্রমিকদের তুলনায় বেশী পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। ইউরোপে শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের চেয়েও এই পরিমাণ অনেক বেশী।

অবিশ্যি ঘড়ির কারখানায় কাজ করা খুব সহজ নয়। কথা বলা চলে না। চলে না ঘড়ির কাছাকাছি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ফেলাও। হাঁচো করে হাঁচবেন বা মনের সুখে হাই তুলবেন, ব্যাস ঘড়ির নির্ভুল সময় দেখানোর ব্যাপারটায় ক্ষতি হয়ে যাবে তাতে। ধূমপান নিষিদ্ধ। মেয়েশ্রমিকেরা এসেন্স ব্যবহার করবে না। কাজে বসবার আগে জুতো খুলে পায়ের ধুলো ঝেড়ে আসতে হবে। ঈশ্বর আরাধনার মত সময়কে হাতে বন্দী করার এই গুরুদায়িত্বে সুইস ঘড়িবাবুদের কম কৃচ্ছ্রসাধনা করতে হয় না।

ঘড়িতে হেয়ারস্প্রিং লাগানোর কাজে মেয়েরা দক্ষ বলে, মেয়েদের এই কাজ দেওয়া হয় আর পুরুষরা করে স্ক্রু লাগানোর কাজ। অনুমান করতে পারেন এই স্ক্রুগুলো কত ছোট। একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। একটা দর্জীর কাজে ব্যবহৃত আঙ্গুলঢাকায় পঞ্চাশ হাজার স্ক্রু আটকানো যায়, এমনই ছোট এই স্ক্রুগুলো।

কারখানাগুলিতে দক্ষ শ্রমিক যোগান দেবার জন্যে শিক্ষানবিশদের জন্যে স্কুলের ব্যবস্থা রাখতেই হয়।

কারণ ঘড়ির কাজ করতে হলে শুধু ধৈর্যই যথেষ্ট নয়, একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকা চাই। এই স্কুলে হেয়ারস্প্রিং লাগানোর শিক্ষা পনের মাসে হয়ে থাকে, কিন্তু কুশলী ঘড়িনির্মাতা হতে হলে প্রায় ছ' সাত বছরের শিক্ষা চাই।

স্কুলে ভর্তি হবার পথেও বাধা আছে। ঘড়ি নির্মাণ করতে সত্যিই তার স্বভাবে কুলোবে কিনা তা আগে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে তবে স্কুলে ভর্তি করা হয়। এই পরীক্ষাগুলি মূলতঃ ঘড়ির কাজের অনুরূপ হয়ে থাকে যেমন কোন গর্তে কোন স্ক্রুটি লাগবে তা সহজে বুঝে নেওয়া, একটা ড্রইং-এর মত কোন লোহার তার বাঁকানো, সমান মাপ ও আয়তনের বস্তু নিরূপণ করার ক্ষমতা ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে একটি করে ছোট লেদ মেশিন দেওয়া হয়। সেই মেশিন থেকেই তার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী করে নিতে হয়। ক্রনোমিটার তৈরী করার কাজে তাদের হাতে-খড়ি, শিক্ষা শেষ হয় নিজের হাতে তৈরী ঘড়িতে।

সুইস ঘড়ির রপ্তানী বাণিজ্য কমে গেলেও সুইজারল্যান্ড হতাশ হয়নি। ক্রমাগতঃ ঘড়ির নির্মাণ কুশলতায় তারা অন্য দেশকে পরাস্ত করার সাধনায় ব্যস্ত। ঘড়ির নির্ভুল সময় দেবার জন্য যন্ত্রপাতির ক্ষয় নিবারণে সুইসরাই প্রথম ঘড়িতে জুয়েল ব্যবহার করে। আধুনিক হেয়ারস্প্রিং যে নিকেল ও স্টীলে তৈরী হয়ে আরও ভালো কাজ দিচ্ছে এটাও তাদের আবিষ্কার। স্বয়ংক্রিয় ঘড়িও বহুল-প্রচলিত তাদেরই অধ্যবসায়ে। স্বয়ংক্রিয় ঘড়ির ভেতরে একটি ভারী বস্তু ঘড়ির মালিকের সামান্য নড়াচড়ায় পেন্ডুলামের মত যে নড়ে ওঠে, ঘড়িটাকে সর্বদা গতিশীল করে রাখতে পারে এটাও সুইসদের আবিষ্কার।

এছাড়া দূরত্ব মাপার জন্য ঘড়ি, রোগীর নাড়ী দেখার জন্য ঘড়ি, সৌর ও চান্দ্রসময় দেখার জন্যে ঘড়িও তারা তৈরী করেছে। অলিম্পিক খেলাধুলোয় তাদের তৈরী ফটো-ফিনিশ ঘড়ি নিখুঁত যান্ত্রিকভাবে সময়ও ধরে রাখে।

দেওয়াল ঘড়ি, টাইমপিস, কব্জিঘড়ি ছোটবড় অনেক ঘড়িই বেরিয়ে আসে সুইস ঘড়ির কারখানা থেকে। শোনা গেছে সবচেয়ে ছোট ঘড়ি যা তারা তৈরী করেছে তা হল একটা দেশলাইয়ের কাঠির বারুদের মত আকারের।

সব ঘড়িই স্লো, ফাস্ট্ যায়, যান্ত্রিককুশলতায় সেরা হলেও সুইস ঘড়িও। তাই নির্ভুল সময় দেবে, আর সর্বংসহ এমনি ঘড়ি তৈরী করার কাজে এখন সুইসরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইলেকট্রনিক ঘড়ি বা ট্রানজিস্টার ঘড়িও তৈরী করেছে তারা। বেতার বিজ্ঞানে ট্রানসিসটার যেমন নতুন এক সম্ভাবনা, তেমনি নির্ভুল সময় জানাবার কাজে একদিন ট্রানসিসটার ঘড়িও নতুন হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

ঘড়িয়াল সুইসরা তাদের কুশলতা আরও বাড়িয়ে যাক তাতে সকলেরই লাভ।

সুইসদের ঘড়ির মত আমরা আশা করব আমাদের এইচ এম টি-ও আরও ভালো, আরও সুলভ হোক। আর সবকিছুর জন্যেই আমাদের লাইন দিতে হলেও, ঘড়ির জন্যে নাই বা লাইন দিলাম।

আচার্য শংকর

প্রভাসচন্দ্র সেন

শংকরাচার্যের জন্ম দক্ষিণ ভারতের কেরল প্রদেশে। কালাড়ি নামক গ্রামে ৬৮৬ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন নম্বুরী ব্রাহ্মণবংশে তিনি আবির্ভূত হন। তাঁর পিতা ছিলেন শিবগুরু স্বধর্মনিষ্ঠ যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ। বৃদ্ধবয়সেও পুত্র না হওয়ায় তিনি গ্রামের নিকটস্থ বৃষপর্বতে কেরলরাজ প্রতিষ্ঠিত শিবালয়ে সস্ত্রীক মহাদেবের আরাধনা করেন। এক বৎসর পরে ভগবান শংকর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে স্বপ্নে অভীষ্ট বর প্রদান করলে শিবগুরু পুত্রলাভ করেন। ইনিই জগদ্বিখ্যাত আচার্য শংকর।

শিশুকাল থেকেই শংকর ছিলেন অসাধারণ মেধাবী ও শ্রুতিধর। তিন বৎসর বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। স্বামীর অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য শংকরের মাতা পাঁচ বৎসরে উপনয়ন দিয়ে পুত্রকে শাস্ত্রাভ্যাসের জন্য গুরুগৃহে পাঠান। অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন শংকর দুই বৎসরেই সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করে গুরুর আদেশে গৃহে ফিরে আসেন।

গুরুগৃহে অবস্থান কালে শংকর একদিন এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষায় যান। ব্রাহ্মণী গৃহে কিছু না থাকায় তাকে একটি আমলকী ফল দেন এবং নিজেদের দারিদ্র্যের কথা জানান। ব্রাহ্মণীর দুঃখে বিগলিত হয়ে শংকর কাতর প্রাণে লক্ষ্মীদেবীর স্তব করেন এবং ব্রাহ্মণীকে আশ্বস্ত করে গুরুগৃহে ফিরে আসেন। সেই রাত্রেই দেবীর কৃপায় ব্রাহ্মণীর প্রচুর ধনলাভ ঘটে। আচার্য শংকরের জীবনী-লেখক মাধবাচার্য "শংকর-দিগ্বিজয়" গ্রন্থে লিখেছেন যে ঐ রাত্রে ব্রাহ্মণীর গৃহে সুবর্ণ আমলকীর বৃষ্টি হয়েছিল।

গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তন করবার কিছুদিন পরে আর একটি অলৌকিক ঘটনায় শংকরের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শংকরের মাতা প্রতিদিন আলোয়াই নদীতে স্নান করতে যেতেন। একদিন গ্রীষ্মকালে স্নান করে ফেরবার পথে প্রচন্ড রৌদ্রে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। মাতার বিলম্বে শংকর তার অনুসন্ধানে গিয়ে দেখেন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। সেবা-শুশ্রূষার পর তিনি সংজ্ঞালাভ করেন। মাতাকে ঘরে নিয়ে আসেন শংকর। কাতরভাবে তিনি শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন নদী যেন তাঁদের বাটীর নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয়। অতি আশ্চর্যের বিষয় কিছুদিনের মধ্যেই আলোয়াই নদীর গতি পরিবর্তিত হয়ে শংকরের বাটীর পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।

একদিন কয়েকজন জ্যোতিষী আসেন শংকরের বাড়ীতে। তারা শংকরের কোষ্ঠী-বিচার করে বলেন যে, শংকর অতি অল্পায়ু হবে, আট বছর বয়সে তার মৃত্যুযোগ আছে। শংকরের মনে তখন জাগে সন্ন্যাসগ্রহণের ইচ্ছা। তিনি মাতাকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু বিধবা মাতা একমাত্র সন্তানকে কিছুতেই অনুমতি দিলেন না। কয়েকদিন পরে আলোয়াই নদী পার হয়ে আসছিলেন শংকর। হঠাৎ তাঁকে একটি কুমীর আক্রমণ করে। শংকর সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে থাকেন। বৃদ্ধা মাতা বা অন্য কেউই জলে এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করতে পারলে না। সেই অবস্থায় দূর থেকে মাতাকে শংকর বললেন,—"মা, সন্ন্যাস গ্রহণ করে মৃত্যু হলেও সদ্গতি হয়, আপনি আমাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিন।" পুত্রের কল্যাণের জন্য মাতা অনুমতি দিলেন। বিধাতার ইচ্ছায় কুমীর শংকরকে ছেড়ে গেল। এই ঘটনার কিছুকাল পরে মাতাকে অনেক বুঝিয়ে এবং তার মৃত্যুকালে এসে দেখা দেবেন ও ভগবদ্দর্শন করাবেন প্রতিজ্ঞা করে শংকর গৃহত্যাগী হলেন।

গুরুগৃহে শাস্ত্রপাঠকালে শংকর গুরুর নিকট শুনেছিলেন মহর্ষি পতঞ্জলি গোবিন্দপাদ নামে নর্মদাতীরে এক গুহায় বহুকাল সমাধিস্থ আছেন। আট বছরের বালক সদ্গুরুলাভের আশায় মাসাধিককালে পদব্রজে দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে নর্মদাতীরে সেই গুহাদ্বারে উপস্থিত হলেন। গুহা প্রদক্ষিণ করে যোগীকে ভক্তিভরে স্তব করতে থাকেন। গোবিন্দপাদের সমাধি ভঙ্গ হোল। তিনি শংকরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তাকে দীক্ষিত করলেন। শংকরকে নিজের কাছে রেখে জ্ঞান ও যোগসাধনের উপদেশ দিতে থাকেন। গুরুর উপদেশে শংকর অল্পকাল মধ্যেই যোগসিদ্ধি ও পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হন। গোবিন্দপাদ তখন শিষ্যকে সন্ন্যাস দান করে বললেন—বৎস, তুমি কাশীধামে গমন কর এবং বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করে বৈদিক ধর্ম প্রচার কর। শংকর কাশীতে বিশ্বেশ্বরের দর্শন লাভ করেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনা করবার জন্য তার উপর প্রত্যক্ষ আদেশ হয়।

শংকরাচার্য কাশী থেকে বদরিকাশ্রমে যান। বার বৎসর বয়সে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-রচনা শেষ করে অধ্যাপনা সুরু করেন। ক্রমে রচনা করেন দশোপনিষদের ও গীতার ভাষ্য এবং বহু গ্রন্থ। আচার্য শংকরের প্রথম শিষ্য সনন্দন। তিনি পরম গুরুভক্ত ছিলেন বলে আচার্য তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এজন্য অপর শিষ্যরা ঈর্ষান্বিত হল। একদিন শংকরাচার্য শিষ্যদের সনন্দনের গুরুভক্তির পরিচয় ও শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নদীর অপর পারে অবস্থিত সনন্দনকে এপার থেকে আহ্বান করলেন। গুরুভক্ত শিষ্য গুরুদেবের আহ্বানে নদীর ব্যবধান লক্ষ্য না করেই দ্রুতবেগে আসতে থাকেন। গুরুভক্তির কি অপার মহিমা! সনন্দনের প্রতি পদক্ষেপে নদীবক্ষে এক-একটি পদ্ম-প্রস্ফুটিত হতে লাগল। তিনি তাদের ওপর দিয়ে অনায়াসে নদী পার হয়ে আচার্যের নিকট উপস্থিত হলেন। সেই সময় থেকে তার নাম "পদ্মপাদ" হল।

বদরিকাশ্রমে চারি বৎসর অবস্থান করে শংকরাচার্য কাশীধামে ফিরে আসেন। সেখানে তিনি শিষ্যদের শিক্ষাদান এবং শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করে বৈদিক ধর্ম প্রচার শুরু করলেন। এই সময়ে ব্রহ্মসূত্রপ্রণেতা ব্যাসদেব শংকরের সঙ্গে শাস্ত্রবিচার করবার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হন। অষ্টাহকাল শাস্ত্রালোচনা ও তর্ক করবার পর ব্যাসদেব সন্তুষ্ট হয়ে নিজ মূর্তিতে দর্শন দেন। তিনি শংকরকে আশীর্বাদ করে বললেন—"তোমার ভাষ্য উৎকৃষ্ট হয়েছে। তুমি শংকরের অবতার। তুমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হও। [illegible] ধর্মাবলম্বী আচার্যদের বিচারে পরাস্ত করে ধর্মের গ্লানি থেকে সনাতন ধর্ম রক্ষা কর এবং বেদান্তমত প্রচার কর। ধর্মসংস্থাপনের জন্য তোমার আয়ু বত্রিশ বর্ষ পর্যন্ত বর্ধিত হল।"

শংকরাচার্য শিষ্যগণের সঙ্গে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়লেন। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমগ্র ভারতের বিভিন্ন মতাবলম্বী প্রতিপক্ষদের পরাস্ত করে [illegible] সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষা এবং অ[illegible] বেদান্তমত প্রচার করেন। নাস্তিক [illegible]বাদ, জৈনমত, পাশুপত, ভৈরব, কাপালিক প্রভৃতি মতবাদ বিধ্বস্ত করেন। তিনি প্রথমে মগধের মীমাংসকাচার্য কুমারিল ভট্টের শিষ্য মণ্ডন মিশ্রকে বিচারে পরাস্ত করে স্বমতে নিয়ে আসেন। এই মণ্ডন মিশ্রই সুরেশ্বরাচার্য নামে শংকরের প্রধান শিষ্য হয়েছিলেন। তারপর শংকর মহারাষ্ট্রে ও শ্রীশৈলে শৈব ও কাপালিক প্রভৃতি মতবাদীদের পরাস্ত করেন। শ্রীশৈলের একটা ঘটনা স্মরণযোগ্য। উগ্রভৈরব নামে একজন কাপালিক শংকরকে ভৈরবের নিকট দেহদান করে সিদ্ধিলাভের অনুরোধ জানান গোপনে। শংকর রাজী হন। উদারহৃদয় দেহজ্ঞানশূন্য শংকরাচার্য কাপালিকের বলিস্থানে উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, "আমি সমাধিস্থ হলে আমার মস্তক বিচ্ছিন্ন করবে।" এদিকে আচার্যকে দেখতে না পেয়ে নৃসিংহদেবের ভক্ত পদ্মপাদ গুরুদেবের অমঙ্গল আশংকা করে দেবতার নিকট প্রার্থনা সুরু করলেন গ্রহমুক্তির। ভগবান নৃসিংহদেব পদ্মপাদের শরীরে আবিষ্ট হয়ে মুহূর্তমধ্যে বলিস্থানে ছুটে গেলেন। শংকরাচার্যের ওপর উদ্যত খড়্গ মুণ্ডচ্ছেদ করল কাপালিকের।

আচার্য শংকর দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে

যেখানে যেখানে গিয়েছিলেন সেই সমস্ত জায়গায় লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও মন্দির নির্মাণ করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করান। বদরীনাথে নারদকুণ্ড থেকে বদরীনারায়ণের মূর্তি এবং হৃষীকেশে গঙ্গাগর্ভ থেকে বিষ্ণু-বিগ্রহ উদ্ধার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। দাক্ষিণাত্যের কামাখ্যা দেবীর মন্দির তাঁর প্রতিষ্ঠিত। পুরীধামে যবনের অত্যাচারে পাণ্ডারা জগন্নাথ বিগ্রহের উদরস্থিত রত্ন-পেটিকা লুকিয়ে রাখেন চিল্কা হ্রদের তীরে। কালক্রমে ঐ স্থান বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়ে যায়। শংকর যোগবলে ঐস্থান নির্ণয় ও রত্ন-পেটিকা উদ্ধার করে তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

শংকরাচার্য ভারতের চার প্রান্তে চারিটি মঠ নির্মাণ করিয়ে প্রত্যেক মঠে বিগ্রহ স্থাপন করে পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের মহীশূর প্রদেশে তুঙ্গভদ্রার তীরে শৃঙ্গেরী মঠ এবং ঐ মঠে সরস্বতী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পুরীধামে গোবর্ধন মঠ এবং তারপর উজ্জয়িনীতে ভৈরবদের অত্যাচার দমন করে প্রতিষ্ঠা করেন দ্বারকায় সারদা মঠ। শাক্তদের দুর্নীতি দূর করেছিলেন কামরূপের অভিনব গুপ্তকে পরাজিত করে। কামরূপে আচার্যের শরীরে ভগন্দর রোগের সৃষ্টি হয়। পদ্মপাদ নৃসিংহমন্ত্র জপ করে ঐ রোগ আচার্যের শরীর থেকে অভিনব গুপ্তের দেহে সঞ্চারিত করে গুরুদেবকে রোগমুক্ত করেন। অনন্তর শংকরাচার্য মিথিলা ও কাশ্মীর হয়ে বদরিকাশ্রমে গিয়ে বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকট জ্যোতির্মঠ স্থাপন করেন। শৃঙ্গেরী মঠে সুরেশ্বরাচার্য, গোবর্ধন মঠে পদ্মপাদাচার্য, সারদা মঠে হস্তামলকাচার্য এবং জ্যোতির্মঠে তোটকাচার্য—এই চারজন মঠাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। সুরেশ্বর ও পদ্মপাদের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। অপর দুইজন সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি হোল :—

হস্তামলকাচার্য—তের বৎসর বয়স পর্যন্ত ছিলেন অত্যন্ত বোবা। পিতার সঙ্গে একদিন শংকরের কাছে গিয়ে তাকে প্রণাম করেন ও 'হস্তামলক' স্তোত্র পাঠ করে নিজের পরিচয় দেন। ইনি শংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাই নাম হোল হস্তামলকাচার্য। শংকর ঐ স্তোত্রের ভাষ্য রচনা করেছিলেন।

তোটকাচার্য—ইনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন আচার্যের শৃঙ্গেরী মঠে অবস্থানকালে। এর নাম ছিল গিরি। গিরির বিদ্যাবুদ্ধি অল্প ছিল, কিন্তু তিনি অত্যন্ত গুরুসেবাপরায়ণ ছিলেন। একদিন শাস্ত্রব্যাখ্যাকালে ইনি গুরুর বস্ত্র ধৌত করতে যাওয়ার জন্য অনুপস্থিত থাকায় শংকর তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যরা গিরিকে মূর্খ বলে আচার্যকে অপেক্ষা করতে নিষেধ করেন। তখন শংকরাচার্যের কৃপায় গিরির ব্রহ্মবিদ্যার স্ফুরণ হয়। গিরি তোটক ছন্দে গুরুদেবের স্তব করতে করতে আগমন করেন। আচার্য এইরূপে পদ্মপাদ প্রভৃতিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই অবধি গিরি তোটকাচার্য নামে প্রসিদ্ধ হন।

আচার্য শংকর তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী—এই দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা এবং 'মঠাম্নায়' নামে মঠ ও সন্ন্যাসীদের বিধিনিষেধসূচক আইন-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করে এঁদের পূর্বোক্ত মঠচতুষ্টয়ের অধীনে নিয়ে আসেন। পরিশেষে কেদারনাথে প্রত্যাবর্তন করে বত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি অতিমানবলীলা সংবরণ করেন।

শংকরবিরচিত কয়েকটি প্রধান গ্রন্থ ও রচনাবলীর নাম :—

১। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বা শারীরক মীমাংসা। ২। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ও নৃসিংহতাপণী উপনিষদ-সমূহের ভাষ্য। ৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভাষ্য। ৪। সনৎসুজাতীয় ভাষ্য। ৫। বিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্য। ৬। হস্তামলক ভাষ্য। ৭। বিবেকচূড়ামণি। ৮। আনন্দলহরী। ৯। উপদেশসাহস্রী। ১০। অপরোক্ষানুভূতি। ১১। প্রবোধসুধাকর। ১২। যোগতারাবলী। ১৩। মণিরত্নমালা। ১৪। গঙ্গা, যমুনা, ভবানী, দক্ষিণামূর্তি, শিব, বিষ্ণু ও গণেশাদি দেবদেবীর স্তোত্র। ১৫। মোহমুদ্গর, বোধসার, বাক্যসুধা, দশশ্লোকী, আত্মানাত্মবিবেক ইত্যাদি।

আচার্য শংকর সম্বন্ধে কেউ কেউ অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। তাঁর সম্বন্ধে কিছু না জেনে এবং তাঁর রচিত উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভাষ্য এবং গ্রন্থাদি না পড়েই তারা শংকরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাস্তিক বলতে কুণ্ঠিত হননি। এর মূলে ভাস্কর, মাধব, নিম্বার্ক এবং বৈষ্ণব মতবাদীদের ভ্রান্ত ধারণা ও উক্তি এবং প্রধানতঃ পদ্মপুরাণের দুই-চারটি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক।

প্রথমে নবম শতাব্দীতে ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্যই মায়াবাদকে অর্থাৎ অদ্বৈতবাদকে "মহাযানিক বৌদ্ধগাথায়িত" বলে মন্তব্য করেন। পরে একাদশ শতকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্কাচার্য এবং বিশিষ্টাদ্বৈত-

বাদী রামানুজাচার্য অদ্বৈতমতকে তীব্র আক্রমণ করেন ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে। কিন্তু শঙ্করের বিরুদ্ধে তারা প্রায় নীরব। দ্বাদশ শতাব্দীতে দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য তাঁর ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্যে বরাহপুরাণের প্রক্ষিপ্ত বচন উদ্ধৃত করে অদ্বৈত বেদান্তকে কটাক্ষ করেন 'বিষ্ণুবিরোধী মোহশাস্ত্র' নামে। তিনি 'মহাভারত তাৎপর্যনির্ণয়' গ্রন্থে ভীম ও মণিমান দৈত্যের উপাখ্যান লিখে শঙ্করা-চার্যকে বর্ণনা করেছেন বিষ্ণুবিদ্বেষী ও দৈত্যের অবতারস্বরূপে। শঙ্করের গ্রন্থা-বলীতে কিন্তু কোথাও বিষ্ণুবিদ্বেষের আভাস পাওয়া যায় না। বরং শঙ্করবিরচিত বিষ্ণুস্তোত্র ও বিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্য তার প্রগাঢ় বিষ্ণুভক্তির পরিচায়ক। পরিশেষে ষোড়শ শতাব্দীতে সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁর 'সাংখ্যপ্রবচন' ভাষ্যে পদ্মপুরাণের প্রক্ষিপ্ত শ্লোক উল্লেখ করে মায়াবাদকে অবৈদিক বলেন। তার প্রায় সমসাময়িক অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী শ্রীজীব গোস্বামী 'ষট্‌সন্দর্ভ' গ্রন্থে অদ্বৈতমত খণ্ডনের প্রয়াস করেছিলেন। তিনি কিন্তু উক্ত গ্রন্থে শঙ্করা-চার্যকে শঙ্করের অবতার বলেছেন।

বস্তুতঃ 'একং সদ্‌ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (ঋগ্বেদ), 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌' (ছান্দোগ্য), 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' (কঠ) প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবেদান্তকে নাস্তিক শাস্ত্র বলা কিরূপে যুক্তিসংগত হতে পারে? আচার্য শঙ্কর বেদান্তদর্শনের ১।২।১৮ থেকে ২।২।৩২ পর্যন্ত সূত্র-গুলির ভাষ্যে বৌদ্ধদের সর্বাস্তিবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ খণ্ডন করেছেন। ঐ সূত্রগুলির ভাষ্য পড়লে বোঝা যায় তিনি কিরূপ শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রবল যুক্তিদ্বারা নাস্তিক ও অশাস্ত্রীয় বৌদ্ধমত নিরস্ত করেছিলেন। সে-সময়ে বৌদ্ধধর্মকে ভারত-বর্ষ থেকে নির্বাসন প্রচেষ্টায় এবং বিধর্মী-দের নিরস্ত করে সনাতন বৈদিক ধর্ম রক্ষা করায় তাঁর অকৃত্রিম কীর্তিগাথা ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। এই ধর্মসংরক্ষক শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাস্তিক বলে নিন্দা করা হলে বিস্মিত হওয়া ছাড়া আর কিবা হতে পারে?

শঙ্করাচার্য একাধারে মহাজ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত। তিনি যে জ্ঞানরাজ্যের সার্বভৌম সম্রাট ছিলেন তা অবিসংবাদিত। শঙ্কররচিত 'যোগতারাবলী' গ্রন্থে তিনি যোগমার্গের প্রাধান্য দিয়া গেছেন। এই গ্রন্থে তিনি সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ী, প্রাণায়াম, জালন্ধরাদি মুদ্রা, সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী, ষট্‌চক্র ও নাদানুসন্ধান সমাধি প্রভৃতির কথা বর্ণনা করেছেন। আচার্য শঙ্কর যে মহাযোগী ছিলেন, সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গুরু গোবিন্দপাদের নিকট অবস্থিতিকালে একদা নর্মদায় জল-প্লাবন হয়। নদীর জল স্ফীত হয়ে তীর-বর্তী গুহাদি ভাসিয়ে গোবিন্দপাদের গুহা-মধ্যে প্রবেশের উপক্রম করে। যোগী তখন সমাধিস্থ। শঙ্কর গুরুদেবের সমাধির বিঘ্ন হবে আশঙ্কা করে গুহার মুখে একটি কলস স্থাপন করলেন। জলস্রোত কলসমধ্যে প্রবেশ করতে লাগল কিন্তু তার একবিন্দুও গুহার মধ্যে প্রবেশ করল না। এই জল-স্তম্ভন শঙ্করের যোগসিদ্ধির পরিচায়ক। শঙ্করাচার্য যখন মগধদেশে মণ্ডন মিশ্রকে শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করেন তখন তার পত্নী উভয়ভারতী দেবী শঙ্করকে কাম-শাস্ত্রবিচারে আহ্বান জানান। এই মহা-বিদুষী নারী তাঁদের বিচারকালে মধ্যস্থা ছিলেন। স্বামীর পরাজয় দেখে তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী ও কামশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ শঙ্করকে পরাস্ত করবার জন্য অবলম্বন করেছিলেন এই কৌশল। শঙ্কর তখন যোগ-শক্তি প্রভাবে এক মৃত রাজার শরীরে প্রবেশ এবং কামশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে বিচারে জয়লাভ করেন। পরকায়প্রবেশ যোগদর্শনোক্ত অষ্টসিদ্ধির একটি যোগ-সিদ্ধি।

আচার্য শঙ্কর ভক্তিকে জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলেছেন তার 'বোধসার' গ্রন্থেঃ "ভক্তি ব্যতীত শত শত উপায় দ্বারাও জ্ঞান-লাভ করা যায় না। প্রথমে ভগবদ্ভক্তি, তা থেকে জ্ঞান এবং জ্ঞান হলে মুক্তিলাভ এই সাধারণ ক্রমানুসারে হয়ে থাকে।" তিনি 'বিবেকচূড়ামণি'তে বলেছেন — "মোক্ষের কারণস্বরূপ উপায়গুলির মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।"

ভক্তেরা যে ঐকান্তিক ভক্তিদ্বারা শ্রীহরির দর্শনলাভ করেন, সে সম্বন্ধে শঙ্কর 'প্রবোধসুধাকর' গ্রন্থে লিখেছেন— "যদিও গগন শূন্যাকার তথাপি মেঘরূপে চাতকের এবং সুধাংশুরূপে চকোরের দৃঢ়-ভাববশতঃ আশা পূরণ করে থাকে। সেই-রূপ দৃষ্টি, বাক্য ও মনের অগোচর হলেও শ্রীহরি অহেতুক কৃপাপূর্বক ভক্তপুরুষের পক্ষে বিপুল সত্ত্বা আনন্দসুধায় ফলবান হয়ে থাকেন।" আচার্য শঙ্কর মহাভারতের অনুশাসন-পর্বের অন্তর্গত 'বিষ্ণুসহস্র-নামের' উপর ভাষ্য রচনা করে নামমাহাত্ম্য ও হরিভক্তি প্রচার করে গেছেন।

শঙ্কররচিত দেবদেবীর সুললিত স্তোত্রগুলি তার প্রগাঢ় ভক্তিভাবের পরি-চায়ক। তিনি সকল দেবতাকে সমভাবে ভক্তি করতেন।

শঙ্করাচার্য যে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুরাগী ছিলেন, তা শ্রীজীব গোস্বামী 'তত্ত্বসন্দর্ভ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শঙ্করের কুলদেবতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। শঙ্করের কৃষ্ণভক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর 'প্রবোধসুধাকর' গ্রন্থ। এতে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার অধিকাংশই বর্ণনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণই যে নির্গুণ ব্রহ্ম তা তিনি এই গ্রন্থের 'সগুণনির্গুণয়োরেক্য-প্রকরণম্‌'-এ দেখিয়েছেন।

আচার্য শঙ্করের জীবন জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সমন্বয়ের অপূর্ব দৃষ্টান্ত। অদ্বৈত-বাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তার আ-সমুদ্রহিমাচল পরিভ্রমণ ও বিভিন্ন মতবাদী আচার্যদের বিচারে পরাস্ত করে স্বমতে আনয়ন, প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য ও নানা গ্রন্থ প্রণয়ন এবং ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করে দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্র-দায়ের প্রতিষ্ঠা তার অতুলনীয় কীর্তি। জীবিতকালেই তার কীর্তিকলাপ সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ব্রহ্মসূত্রের প্রসন্নগম্ভীর অধ্যাসভাষ্যে শ্রুতিবাক্যের যুক্তিপূর্ণ অপূর্ব সমন্বয় অদ্বিতীয়। এই ভাষ্যের মধ্যে তিনি অন্যান্য দার্শনিক মত যেভাবে খণ্ডন করেছেন, তা তার অলৌকিক প্রতিভার নিদর্শন। শঙ্করাবতার আচার্য শঙ্করের জীবনসুষমায় স্নাত হলে আশার তৃপ্তি, জীবনের পূর্ণতা, প্রাণের বল, হৃদয়ের তেজ, বুদ্ধির স্ফূর্তি এবং সর্বোপরি মানবের পরিপূর্ণ আত্মদর্শন লাভ হয়। আচার্য শঙ্করের মত মহাপুরুষ পৃথিবীতে বিরল।

ভগিনী নিবেদিতা শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে বলেছেন—

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা শঙ্করাচার্যের মহিমা ধারণা করতে অক্ষম। অতি অল্প-কালের মধ্যেই তিনি দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেছিলেন। তিনি স্বল্পকালমধ্যে এরূপ গভীর সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেন যে, একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক সাহিত্য রচনা করে ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর হৃদয়ে আধিপত্য স্থাপন করেছেন। দীর্ঘ বারশত বৎসরকাল তার এই মহিমাকে পারেনি কেউ বিচলিত করতে। তিনি এমন স্তোত্র রচনা করেছেন যার গম্ভীর মাধুর্য বিদেশীদের অনভ্যস্ত কর্ণেও নিঃসন্দেহে অনুভূত হয়ে থাকে। আমরা এই মহত্ত্বের ভূয়সী প্রশংসা করতে পারি কিন্তু তা আমাদের বোধগম্য নয়।

এই প্রবন্ধ রচনায় বেদ, উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

১। পঞ্চদশীর বেদান্তরহস্য —
শ্রীকুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায়।
২। বেদান্তদর্শনের ইতিহাস —
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী।
৩। আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ —
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৪। শঙ্করগ্রন্থমালা —
মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন।
৫। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস —
ডঃ সুরেন্দ্র দাশগুপ্ত।

পথে ও পথের প্রান্তে

আমার-আপনার চুল কিম্বা দাড়িকে মাইক্রোসকোপে ঠিক পেনসিলের মত দেখায়। বাইরেটা রঙীন, ভিতরটা কাঠ এবং আরও ভিতরে একটা কালো শিস।

এ পর্যন্ত একটি মাত্র মানুষের চুলে একটার বদলে দুটো কালো শিস পাওয়া গেছে। এই বিস্ময়কর বস্তুটি বিশ্বের নজরে আনেন বাঙলা দেশেরই একজন বিজ্ঞানী এবং এই আবিষ্কার একটি ভয়ঙ্কর হত্যাকান্ড কিনারা করতে সাহায্য করে।

মেডিকেল কলেজের কেমিস্ট্রি সেকশনের তিনতলায় রাজ্য সরকারের ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি। কথা হচ্ছিল তার নতুন ডিরেক্টর ডঃ ষষ্ঠী চৌধুরীর সঙ্গে।

ছোটখাট ধরনের অতি সাধারণ একটি মানুষ, কোথাও আহামরিত্ব খুঁজে পাবার জো নেই। দেখে বুঝতেই পারবেন না যে, এই মানুষটার ফরেনসিক দুনিয়ায় রীতিমত নামডাক আছে।

ডঃ চৌধুরী তখন দিল্লীতে সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরির এক্সপার্ট। একজন সর্দারজি হঠাৎ খুন হয়ে পুলিশকে ভীষণ বিপদে ফেলে দিলেন। খুনী কোন প্রমাণই রেখে যায় নি। পুলিশের সম্বল খুনীর কয়েক গাছা চুল যা খুন হবার আগে সর্দারজি ধরে রেখেছিলেন। সেই চুল চলে এল ডঃ চৌধুরীর কাছে।

সর্দারজি যখন খুন হন তখন তাঁর বাড়িতে কেউ ছিলেন না। বিপত্নীক সর্দারজি তাঁর দুই ছেলের সঙ্গে বসবাস করতেন, খুন হবার দু দিন আগে তাঁরা কোথায় যেন চলে গেছেন। সব পথ বন্ধ দেখে পুলিশ আন্দাজে দুজন দাগি আসামীকে গ্রেপ্তার করলে।

এদিকে ডঃ চৌধুরী মাইক্রোসকোপে চুল-পরীক্ষা করে বুঝলেন, এ চুল নয়, দাড়ি। পুলিশের কাছে জানতে চাইলেন, যাদের ধরেছ, তাদের কি দাড়ি আছে? পুলিশ জেলখানায় গিয়ে দেখলে তাদের দাড়ি নেই। দাড়ি না থাকায় কোয়ালিফিকেশনে ইতিহাসে সেই সর্বপ্রথম দুজন দাগি আসামী কারামুক্তি পেল।

এদিকে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে পুলিশের সন্দেহ গিয়ে পড়ল সর্দারজির দুই ছেলের উপর। তাদের গ্রেপ্তার করা হল। ডঃ চৌধুরী তাদের দাড়ি আছে কি না জানতে চাইলেন। বলাবাহুল্য উত্তরটা হল হ্যাঁ-ধর্মী।

তারপর কয়েকগাছা দাড়ি পেতেই ডঃ চৌধুরী অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা শুরু করলেন। সব চুলই তিনতলা : একতলায় মেডুলা, দোতলায় কোরটেক্স এবং তিনতলায় কিউটিকল। পেনসিলের বাইরের রঙ, ভিতরের কাঠ এবং আরও ভিতরে শিসের সঙ্গে এর তুলনা চলতে পারে।

ডঃ চৌধুরীর মাইক্রোসকোপ খুনির হাতের মুঠোর চুলে বিস্ময়কর একটি উপাদান লক্ষ্য করলেন। বেশ কয়েকটা চুলে দুটো করে কিউটিকল। দিল্লীর ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি ডঃ চৌধুরীর কথামত এই অভিনব চুলের কথা সারা বিশ্বের ফরেনসিক এক্সপার্টদের জানিয়ে দিল। জবাবে সকলেই একবাক্যে জানাল এমন বিদঘুটে চুলের দেখা তো দূরের কথা, শোনেননিও তাঁরা।

> সারাদিন পথে ও পথের প্রান্তে ছোট-বড়-মাঝারি কত ঘটনাই আমাদের চোখে পড়ে। দেখেও সব সময় ঠিক খেয়াল করে দেখি না। এই বিভাগে তিক্ত-মধুর সেই ধরনেরই কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হবে প্রতি সংখ্যায়।

দুই ছেলের দাড়ি পরীক্ষা করার সময় দেখা গেল বড়জনের দাড়ির কয়েক গাছা চুলে ঐ রকম দুই দাগী মেডুলা। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হয়ে গেল গুণধর ছেলেই সর্দারজিকে গলা টিপে হত্যা করেছে।

ডঃ চৌধুরী এই ব্যাপারটি নিয়ে যে পেপার লিখেছেন ১৯৬৬ সাল অবধি ভারতের যে কোন কাগজে প্রকাশিত ফরেনসিক বিষয়ক নিবন্ধের মধ্যে তা সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে। এজন্যে ভারত সরকার ইণ্ডিয়ান আকাদেমি অব ফরেনসিক সায়েন্সেস-এর মাধ্যমে ডঃ চৌধুরীকে এই সেদিন বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেছেন।

এখন এই ডঃ চৌধুরীর হাতে এসেছে পার্ক স্ট্রীটের ডাকঘর ডাকাতির ব্যাপারটা। অভিশপ্ত মেল ভ্যানটি তিনি পরীক্ষা করেছেন। তারপর কলকাতা পুলিশের কাছে তাদের পরীক্ষার সকল ফলাফল জানতে চেয়েছেন। 'এবার তো দাড়ি নেই' বললেন তিনি, 'দেখি, অন্য কিছু পাই কিনা।'

●

তালতলা-বেলতলা-নেবুতলার কলকাতার এক কোণে আমড়াতলা এখনও টিমটিম করে জ্বলছে। মধ্যাহ্নে অন্ধকারাচ্ছন্ন এই আমড়াতলার ঐশ্বর্যে কিন্তু সীমা-পরিসীমা নেই। সরু গলিগুলো সারাদিন মানুষ গিজগিজ করছে; গাড়ি চালান তো পরের কথা, গা বাঁচিয়ে পায়ে হেঁটে চলাও প্রায়-অসম্ভব। তবুও ওরই মধ্যে লরি আর ঠেলার ঠেলাঠেলির বিরাম নেই। অথচ এই পট্টিতে, এখনও একটা দেশলাইয়ের বাকসের মত খুপরি ভাড়া করতে গেলে পাঁচ-সাত হাজার টাকার সেলামি দিতে হয়। সিঁড়ির নিচে কয়েক হাতের এমন একটা কামরা দেখলাম।

আমড়াতলা কলকাতার মশলা মহল্লা। শুধু কলকাতা নয়, গোটা পশ্চিম বাংলার সঙ্গে আসামের মশলা চাহিদা মেটায় এই আমড়াতলা। মাসকাবারি বাজারে আপনার বাড়িতে এন্তার মশলা আসে মুদির দোকান থেকে। মুদিকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, তাঁকে সব-কিছু আনতে হয় এই আমড়াতলা থেকে।

শ' দুই মশলা আড়তদারের আবাস এই আমড়াতলা। আগে প্রবাসী কাঁথওয়াড়বাসীদের রাজত্ব ছিল, এখন রাজস্থানীরা সে স্থান দখল করে নিয়েছেন। বাঙালী আড়তদারদের সংখ্যা চার-পাঁচজন, তবে তাঁরা এখনও মাথার মণি হয়ে বসে আছেন।

নিতাই সাহার গুদামে কথা হচ্ছিল মশলা ব্যবসার সম্পর্কে। খুরিতে করে এক ছোকরা চা দিয়ে গেল। শুনলাম, এক-একটি গদিতে প্রতিদিন সে শত শত খুরি চা বিক্রি করে। অখাদ্য চা, কিন্তু দাম কুড়ি পয়সা। আমড়াতলার আকাশে-বাতাসে পয়সা উড়ে বেড়ায়, চাবিক্রেতাও তার ভাগ পান।

নিতাই সাহার গুদামটি ছোট, কিন্তু ব্যবসায়ী তিনি ছোট নন। দেশবিভাগের পরে এসেছেন, ইতিমধ্যেই গাড়ি কিনেছেন। বছরে কোটি টাকার মশলা বিক্রি করেন। দু কোটির অধিপতিও এখানে আছেন! শ্রীসাহার ছোট গুদামে সবসময়ে তিন হাজার বস্তা মশলা থাকে, এ ছাড়া থাকে শালিমারে হাজার দেড়েক বস্তা।

নিতাই সাহা বললেন, রেশনিং চালু হবার পর মশলার ব্যবহার কমে গেছে। বাঙালী যদি ভাতই না পেল, তবে মশলা লাগবে কোন কাজে? তবে, আনন্দের কথা এই যে, মশলার ব্যাপারে ভারতবর্ষ এখন প্রায়-স্বয়ংসম্পূর্ণ. চাই কি রপ্তানী করতেও পারে—কিছু করেও থাকে। সিঙ্গাপুরে ভারতীয় গাছ-গাছড়া প্রভৃতি রপ্তানি হয় এই আমড়াতলা থেকেই।

হলদি, ট্যাপিওকা গ্লোবিউল অর্থাৎ সাবুদানা, ব্লাক পেপার অথবা গোল মরিচ, শুকনা লঙ্কা, জিরা, ছোট ও বড় এলাচ, খয়ের, এরারুট প্রভৃতির পাহাড় দেখতে পাবেন আমড়াতলার আড়তে আড়তে। একটা পরিবর্তন লক্ষণীয়ঃ দেশবিভাগের পর সকলেই, এমন কি আমড়াতলাতেও, বিক্রয়যোগ্য পণ্যের নাম ইংরেজিতেই বলে থাকেন।

কলকাতাকে মশলা যোগায় প্রধানত দক্ষিণ মুল্লুকই। গত মাসে মাদ্রাজ থেকে চোদ্দ হাজার বস্তা গোটা হলুদ এসেছে, সালেম থেকে এসেছে তিরিশ ওয়াগন ট্যাপিওকা গ্লোবিউল। কেরলের অ্যালেপ্পি আর কালিকট থেকে লরিতে করে ফী মাসে হাজার পাঁচেক বস্তা গোলমরিচ আসে। টিউটিকরিন আর গুন্টুর থেকে এলেও লঙ্কার জন্যে পাটনা আর পশ্চিমবঙ্গের কালিয়াগঞ্জই খ্যাত। কলকাতার শুকনা লঙ্কার চাহিদা হাজার কুড়ি বস্তা হবে। রাজস্থান আর ভরতপুর মাসে হাজার পাঁচেক দেড় মণী বস্তার জিরে পাঠায়। ছোট এলাচের জন্য আমরা মালাবারের দিকে তাকিয়ে থাকি, কিন্তু কালিম্পং-এর বড় এলাচ বিশ্ববিখ্যাত। দূর এবং মধ্য-প্রাচ্যের বাজারগুলিতে কালিম্পং এলাচের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি। পাকিস্থানে কালিম্পং এলাচ প্রচুর পাচার হচ্ছে মাসে মাসে। কলকাতার মাসিক এলাচ চাহিদা হাজার দেড় মণী বস্তা। জনকপুর, হলদিবাড়ি, কানপুর আর নৈনিতাল ফী মাসে কলকাতাকে কম করে দেড় হাজার পেটি খয়ের খাওয়ায়। কোচিন থেকে হাজার দুই বস্তা সুপারি আসে লরিপথে।

আগে সাবু-সুপুরি আসত সিঙ্গাপুর থেকে। এখন দারচিনি, লবঙ্গ, আর কিছু ধুপধুনা ছাড়া মশলার জন্যে আমাদের বাইরের দিকে তাকানোর দরকার নেই। সোডার জন্যে আর বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয় না, যা আছে তা থেকে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব। গোলমরিচ এখন ভারতের অন্যতম রপ্তানি পণ্য।

দিশী মাল, তাই দাম কমে গেছে। তাতে একটা ভাল ফল হয়েছে ভেজাল কমে গেছে। নিতাই সাহা স্বীকার করলেন, আগে অসৎ ব্যবসায়ীরা হলুদের গুঁড়োয় করাতের গুঁড়ো, জিরেতে রঙ করা ঘাসের বিচি, চিটেগুড়ের সঙ্গে আঠা, আর রঙ লাগিয়ে পেপের বিচি মিশিয়ে তৈরি হত গোলমরিচ।

এখন জানাজানির মধ্যে হলদির গুঁড়োর মধ্যে গম মেশান হয়। নিতাই সাহা হাসতে হাসতে বললেন, তাতে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা থাকে না।

আমরা থাকতেই দেখলাম বস্তার পর বস্তা মশলার বস্তা মাথায় নিয়ে কুলিরা এদিক-ওদিক যাচ্ছে। প্যান্ট পরা একজন ভদ্রলোক 'বোঙা' মেরে দেখছেন, ঠিক ঠিক মাল যাচ্ছে কি না। আমড়াতলায় এই ব্যাপার চলছে যুগ যুগ ধরে।

কলকাতার চেহারা কত পালটে গেছে। কিন্তু আমড়াতলা যে কে সেই। এখানে সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। সেই সাবেকি সব রাস্তা আগেরই মত যা কথায় কথায় জলে ডুবে যায়। এ এলাকায় কলের জল নেই, টিউবওয়েল নেই, পাবলিক ইউরিনাল নেই। আমাদের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দারা মর্তে এলেও চিনতে পারবেন তাঁদের পরিচিত আমড়াতলার স্বল্প পরিসর সড়কগুলো।

অথচ আমড়াতলা থেকেই রাজ্য সরকার সবচেয়ে বেশি পরিমাণের বিক্রয়কর পান। কিছু না পেয়েও আমড়াতলা কিন্তু অখুসি নয়। একদিনের জন্যেও এখানে কেউ ইনকিলাব শুনতে পাননি। লক্ষ্মীর সাধনা এমন নীরবেই বুঝি করতে হয়।

●

কলকাতার জনসংখ্যা যদি ৩০ লাখ হয়, জানবেন তার সাত লাখই বস্তিতে বসবাস করেন। প্রতি একশত জনে চব্বিশজনই বস্তিবাসী। শহরের কলেরা আক্রমণের দুইয়ের তিন অংশ আসছে বস্তি এলাকা থেকে, যদিচ শহরের মোট বাড়ির সাড়ে পাঁচ শতাংশ মাত্র বস্তিবাড়ী।

কলকাতায় বস্তিবাসী পরিবারের সংখ্যা প্রায় দু লাখ। এঁদের প্রত্যেকের জন্যে বাড়ি অথবা ফ্ল্যাট করতে হলে কম করে একশ পঁচিশ কোটি টাকা লাগবে!

সি-এম-পি-ও'র একজন বস্তিবাসী কর্মচারী সেদিন কাগজপত্র ঘেঁটে উপরের তথ্যগুলো জানিয়ে বললেন, সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না!

অঃ চঃ

!! ৩৪ !!

বৃন্দাবনে সুরবালার এক গুরুভাই থাকেন। গুরুদেব যাওয়ার সময়ই তাঁর ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলেন—বঙ্কুবিহারীর মন্দিরের কাছে মণিপাড়ায় তাঁর কুঞ্জ—সেইখানে গিয়েই উঠল ওরা। আধাসন্ন্যাসী লোকটি, আত্মীয়স্বজন বিষয়সম্পত্তি সব ত্যাগ করে এসেছেন। রঙপুরের কাছে কোথায় বাড়ি—বিয়ে-থা করেন নি, অকৃতদার, তাই বলে ভেখ্‌ও নেন নি। এখানে অনেকেই নাকি ভেখ্ নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিল কিন্তু গুরু কিছু বলেন নি বলে উনি সে চেষ্টা করেন নি। গৃহস্থ-জীবনে উকীল ছিলেন, বেশ নাকি ভাল উকীলই ছিলেন—কিন্তু বেশী দিন ওকালতি করার ইচ্ছা ছিল না। বরাবরই লক্ষ্য ছিল, কোথাও গিয়ে ভগবানের পূজোর্চনা নিয়ে দিন কাটাবেন, আর সেইটুকু সঙ্গতি না হওয়া পর্যন্ত ওকালতি বা রোজগার করবেন।

তাই ‥রেছেনও, যথেষ্ট টাকা জমতেই ওকালতি ছেড়ে দিয়েছেন। পৈতৃক সম্পত্তিও অনেক ছিল। সে সব ভাই ভাইপোদের লিখেপড়ে দিয়ে চিরদিনের মতো দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন—আর কখনও যান নি। তারা আসে মধ্যে মধ্যে—আত্মীয়স্বজনরা, তখন আদর যত্নের কোন ত্রুটি করেন না—কিন্তু তারপর, এখান থেকে চলে গেলে আর খোঁজ রাখেন না। চিঠিপত্রও দেন না কাউকে। ওরা দিলেও উত্তর দেন না। বৈষয়িক প্রশ্নের তো কথাই নেই—নিছক কেউ কুশল প্রশ্ন করলে একখানা খালি পোস্টকার্ডে প্রশ্নকর্তার নাম ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দেন। আর কিছুই লেখা থাকে না তাতে—উনি বলেন, ‘আমার হাতের লেখা দেখেই তো বুঝবে আমি ভাল আছি। নইলে লিখলুম কেমন করে?’

ভদ্রলোকের নাম আনন্দ; সস্নেহে ‘প্রেমানন্দ বাবা’ বলে উল্লেখ করেন গুরুদেব। বলেন, ‘বাবা আমার খাঁটি সোনা, অমন বিশুদ্ধ বৈরাগ্য আমি দেখিনি। বললেই বিষয়কর্ম যেটুকু দরকার করে—দরকার হলে তো করেই—কিন্তু বিষয়ের নেশায় পেয়ে বসে না ওকে, আসক্তি ওর ধারে কাছে কোথাও নেই। ওর ভেখ্ নেবার প্রয়োজন নেই—ওসবের অনেক উর্ধ্বে চলে গেছে ও।’

স্থানীয় ব্রজবাসীরাও ভালবাসে ও'কে, বলে আনন্দবাবা। ভেখ্ না নিলেও বাঙালী বৈরাগীরা বাবাজী বলে উল্লেখ করে। অবশ্য পাড়াটা পান্ডাদেরই পাড়া, আনন্দবাবা বলেন, ‘ব্রজবাসীদের শ্রদ্ধাভক্তি, এদের অনুষ্ঠানের আড়ম্বর নেই, এরা ঠাকুরকে সোজাসুজি ভালবাসে। বাঙালীদের বড় আড়ম্বর আর জাঁক—নিন্দে করছি না, কার মধ্যে কী আছে তা কে-ই বা জানে, আমার কিন্তু ব্রজবাসীদের সঙ্গই ভাল লাগে। মদনমোহন যে কেন পেক্কোনির বাড়ি লুকিয়ে ছিলেন তা বুঝতে পারি। পাইখানার কাপড় ছাড়ত না। হাতে মাটি করত না—সেই হাতে সেই কাপড়েই ভোগ রেঁধে বলত, “আও লালা, খা লেও”! পুজো আরতির তো বালাই-ই ছিল না—তবু ঠাকুর আমার তার প্রেমেই মশগুল হয়ে ছিলেন। সেইজন্যেই এ পাড়ায় কুঞ্জ স্থাপনা করা।’

কুঞ্জ ঠিকই—ঠাকুরঘরও আছে—তবে তাতে কোন বিগ্রহ নেই। একটি সাধারণ কাঠের সিংহাসনে এক খন্ড গোবর্ধন শিলা—অর্থাৎ গোবর্ধন পাহাড়ের এক টুকরো পাথর। তাইতেই পুজো আরতি ভোগ নিবেদন করা হয়। আনন্দবাবা বললেন, ‘এখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেও গোবর্ধন শিলা রাখতে হয়—নইলে ঠাকুর পুজো নেন না। এখানকার এ-ই নিয়ম। ব্রজবাসীদেরও ঘরে ঘরে শুধু এই গোবর্ধন শিলা—ও'কেই তারা খাবার নিবেদন করে প্রসাদ পায় প্রত্যহ। আত্মবৎ সেবা, যা খায় তাই নিবেদন করে।... তা তাই যদি হবে, তাহলে আর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে লাভ কি?...... ‘বিগ্রহ থাকলেই সাজাতে ইচ্ছা করবে, তাহলেই টাকার দরকার—লোভ হবে টাকা কামিয়ে ভাল জিনিস কিনে এনে সাজাই। আড়ম্বর ঝঞ্ঝাটও অনেক বাড়বে। তাছাড়া বিগ্রহের যেসব দুর্দশা দেখি এখানে। আমি যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ হয়ত সেবার খুব একটা ত্রুটি ঘটবে না, কোনমতে জল তুলসীটা দিতে পারব অন্তত, তারপর? যখন থাকব না তখন সে বিগ্রহ কে দেখবে? এ তবু জানি,—আশপাশে যেসব ব্রজবাসীরা আছে তারাই কেউ উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেদের শিলার পাশে কি কোন কুলুঙ্গীতে ফেলে রাখবে—দুপাতা তুলসীও পাবে নিয়মিত।’

তারপরই, সুরোর মুখের বিবর্ণতা লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, ‘তাই বলে তোমাকে আমি নিরুৎসাহ করছি না বোন, কারণ আমি জানি তোমার বিগ্রহই দরকার। তোমার বাৎসল্যের সাধনা। তুমি চাও তোমার ঠাকুরকে সন্তানরূপে পেতে। তোমার কথা গুরুদেব আমাকে বলেছেন—কবে নাগাদ আসবে, তাও। বলেছিলেন, সংসার একবার শেষ কামড় না দিয়ে ছাড়বে না তো—দুচার দিন আরও দেরি হবে তাই। তবে ও বেটির ওপর ব্রহ্মময়ীর কৃপা আছে—কাটিয়ে বেরিয়ে আসবে ঠিক।’...

আনন্দবাবার ওখানে আতিথেয়তার কোন ত্রুটি হল না। অবশ্য দেরিও করলেন না তিনি, অনাবশ্যক অকারণ আদর আপ্যায়নে। গুরুবাক্যে তাঁর অচল আস্থা—সুরবালা আসবে নিশ্চিত জেনেই—যে কাজে আসছে সেটাও এগিয়ে রেখেছিলেন। কিরণরা পৌঁছবার পরের দিনই বিকেলে ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বললেন, ‘এ পুরনো শহরে তোমার সুবিধে হবে না বোন—একেবারে বেপোট জায়গা। গোবিন্দ গোপীনাথ গোপেশ্বর—সব জায়গা থেকেই কাছে হয়, অথচ রাস্তার ওপরে এমন একটি জায়গা দেখে রেখেছি। একটা পুরনো বাড়িও আছে একতলা, তার সঙ্গে কাঠা দুই আড়াই জমি—জমিটা একটু লম্বাটে ধরনের। তা হোক—ভেতর দিকে মন্দির করে রাস্তার ওপর বসবাসের মতো একটু আস্তানা করে নিতে পারবে। পুরনো বাড়িও ভাঙবার দরকার নেই, পুজোরী রাখতে হবে, অন্য লোকজনও থাকবে, ভাঁড়ার আছে রান্না আছে। ঠাকুরের জিনিস-পত্র—দোল ঝুলনের পোশাক-আশাক আসবাব রাখার একটা ঘর চাই—ঐ মহলটা সারিয়ে সুরিয়ে নিলে সব কাজ চলে যাবে। চাইকি ওর দোতলায় একখানা ঘর করে রাখলে অতিথি অভ্যাগত কেউ এলে দু-একদিন থাকতেও পারবে!’

‘মোটে দু' কাঠা আড়াই কাঠা জমি!’ সুরবালা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়, ‘বাগান-টাগান' করতে পারব না?’

'বাগান করার মতো জমি শহরের মধ্যে আর কোথায় পাবে বোন? ঐ রাধাবাগটাগ—শহরের বাইরে—যেখানে গোয়ালিয়রের ঠাকুরবাড়ি হয়েছে, যমুনার ধারে—পেতে পারো। কিন্তু তুমি একা সেখানে থাকতে পারবে না, ওখানে দিনের বেলায় বাঘ বেরোয়, তেমনি চোর ডাকাতের ভয়। তাছাড়া মন্দির করছ, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করছ—সাজাবে গোজাবে, দু'চারজন দর্শন করতে আসবে—সে সাধও তো একটা আছে। ওখানে কে দর্শন করতে যাবে? পূজারীই কেউ থাকতে রাজী হবে না হয়ত।... এ একেবারে খাঁই জায়গা। একদিকে লালাবাবুর মন্দির, ওখান থেকে ঢিল ছুঁড়লে এখানে এসে পড়বে—ঐটেই যমুনা পুলিন গোপেশ্বর যাওয়ার সড়ক, সামনেই ব্রহ্মকুণ্ড—গোবিন্দ মন্দির, সাক্ষীগোপালের পুরনো মন্দির, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সমাধি—সব হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে বলতে গেলে। গোপীনাথের ঘেরা রেঠিয়া বাজার—এও এমন কিছু দূরে নয়, ঘরে বসে শেঠীদের মন্দির দেখবে। সোনার তালগাছ শুনেছ তো? তালগাছ অবিশ্যি নয় আসলে অরুণ স্তম্ভ। দাক্ষিণীদের মন্দির তো ওখানে, অরুণ স্তম্ভ একটা থাকবেই। যাইহোক, তিন মন্দির—গোবিন্দ কৃষ্ণচন্দ্র আর শ্রীরঙ্গজী—থেকে নহবৎ বাজবে, বসে বসে শুনবে।'

এর পর আর জমি দেখার কিছু ছিল না। তবু দেখল ওরা। আনন্দবাবা পাকা লোক। দামদস্তুরও ঠিক করে রেখেছেন, মোট চার হাজার টাকা পড়বে, বাড়ি জমি সবশুদ্ধ।

সুরো ঘুরে ঘুরে আশপাশ পাড়া সব দেখল। ঠিকই বলেছেন আনন্দবাবা, মন্দির করার মতোই জায়গা। দুবেলা হাজার হাজার যাত্রী এই পথে যাতায়াত করে মেলার সময়। এমনিও প্রত্যহ বহু যাত্রী যায় এই পথ দিয়ে—তাদের মধ্যে কেউ কি আর ঢুকে দেখবে না তার ঠাকুর? সুরবালা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দেখল, গোবিন্দ মন্দিরের দিক থেকে কত যাত্রী যাচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির আর গোপেশ্বর মহাদেব দর্শন করতে।

জায়গাটা পছন্দ করার আরও একটা কারণ ঘটল। পুরনো বাড়িটার সামনে থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে। অতি জরাজীর্ণ মাটির গাঁথুনি বাড়ি—হঠাৎ যেন তার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগল আপনা-আপনিই। মনে হল কার নিঃশ্বাস এসে লাগল তার গালে।... বাগানবাড়িতে থাকার সময় বিকেলে যখন একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাজাবাবুকে ভাবত—তিনি পা টিপে টিপে এসে কখন পিছনে দাঁড়াতেন সে টেরও পেত না এক এক দিন—একেবারে গালের কাছে তাঁর মুখটা এনে এইরকম গরম নিঃশ্বাস গালে এসে লাগত, চমকে চেয়ে দেখত তিনি ওর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন—

ভাবতে ভাবতেই চোখে জল এসে গেল সুরোর। তার মধ্যেই শুনল আনন্দবাবা বলছেন, মন্দির করলে এই বাড়ির লাগোয়া ঠিক এইখানটায় করতে হয়—কী বল ভাই কিরণ—য়্যা? তাহলে ভেতর দিয়ে দরজা রাখলে এ বাড়ি পুরোটা কাজে লাগানো যাবে। রান্না ভাঁড়ার—ঠাকুরের আসবাবের ঘর—প্রত্যেকটা থেকেই ভেতর দিয়ে আসা চলবে মন্দিরে। রাস্তার দিকে মন্দির করলে এতদূর থেকে সব বওয়াবওয়ি—সে বড় অসুবিধে।'

কিরণ বলল, 'কিন্তু রাস্তা থেকে মন্দির দেখা যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই। এই সোজা চত্বর থাকবে, সদর পর্যন্ত। দোর খোলা থাকলে বিগ্রহ অবধি দেখা যাবে। সে সব প্ল্যান আমার করা হয়ে গেছে। কী বলো বোন—তুমি কি বলছ?'

'আপনি বায়না করে ফেলুন দাদা, সম্ভব হলে আজই। আর মন্দির? হ্যাঁ, এইখানেই হবে। ঠাকুরের তাই ইচ্ছা দেখলুম।'

সে ইচ্ছা কীভাবে প্রকাশ পেল অনধিকারবোধেই পুরুষ দুজন সে প্রশ্ন করলেন না। সুরবালার চোখে জল দুজনের কারুরই নজর এড়ায় নি—যে যার নিজের মতো ব্যাখ্যা করে নিলেন সে অশ্রুর।

একেবারে দুশো-এক টাকা বায়না দিয়ে দলিল তৈরী করতে বলে সুরোরা কলকাতায় ফিরে এল। বাড়ি কে তৈরী করাবে সে প্রশ্নও উঠেছিল, দেখা গেল আনন্দবাবা সে ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। ওঁর বাড়ি যে করিয়েছিল—ঠিকেদার মিস্ত্রী একজন। সেই রাজী হয়েছে করতে বা করাতে। আনন্দবাবাও অবশ্য পুরনো একখানা ঘরসুদ্ধ ঐ জমি কিনেছিলেন তবে সেটা ভেঙে সবই নতুন করে করিয়েছেন। আনন্দবাবা বললেন, 'লোকটা কাজের, কাজ বোঝে—বুঝে নিতেও পারে। হামেহাল দাঁড়িয়ে থেকে লোককে খাটায়, সেই সঙ্গে নিজেও খাটে—ফাঁকি দিতে পারে না কেউ। না, সেদিকে কোন অসুবিধে হবে না, তবে হিসেবে একটু আধটু—তা ও আমি ধরি না, কলকাতার কনট্রাক্টর দিয়ে করাতে গেলে তারা একদফা বলে নেয় আর একদফা না বলে নেয়। তারচেয়ে ঢের কম লোকসান হবে একে দিলে।'

সেই ব্যবস্থাই পাকা করতে বলে দিলে সুরো। তার আর তর সইছে না যেন। কবে মন্দির শেষ হবে, কবে ঠাকুর বসবেন—সে যেন বহুদিনের ব্যাপার।

'ঐ মিস্ত্রীকে কিছু বেশী দোষ বললে তাড়াতাড়ি করে না—হ্যাঁ দাদা?' বার বার প্রশ্ন করে সে।

আনন্দবাবাও বার বারই বোঝান, 'এখন থেকেই বেশী দোষ বললে থৈ পাবে না বোন। মনে মনে যখন সব কিছু ভগবানকে উৎসর্গ করেছ—তখন সব টাকাই এখন তাঁর। নষ্ট করবার অধিকার তোমারও নেই।'...

বিগ্রহ কোথায় হবে? প্রশ্ন করলেন আনন্দবাবা।

জয়পুরী বিগ্রহ এখানে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সে হয়ত সুরবালাদের মনে লাগবে না, মন খুঁৎখুঁৎ করবে—তার চেয়ে আগে কলকাতাতেই দেখুক, নয়ত কাশী। ওঁর আরও একজন গুরুভাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন—সুন্দর মূর্তি, দেখলেই মনে হয় বুকে করে নিয়ে আসি—তিনি যেখান থেকে করিয়েছেন সেখানকার ঠিকানাও দিয়ে দিলেন। কষ্টিপাথরের শ্রীকৃষ্ণ হবেন, অষ্টধাতুর রাধা। শ্বেতপাথরেও হতে পারে রাধা—তা সে যেমন সঙ্গতি ও অভিরুচি। বাঁশী, মুকুট, বালা, রাধিকার একটা নথ সোনার। বাঁশীর একটা 'ঠেকো' চাই—ইচ্ছে করলে সোনারও করা যেতে পারে, নয়তো রুপোর। বড়ই চোরের দেশ—অকবর বাদশা বৃন্দাবনের নাম দিয়েছিলেন ফকিরাবাদ—নিঃস্ব ভিক্ষুকের দেশ। কাজেই চোরও বেশী, চোখের সামনেই নাকি ঘুরে বেড়ায়—সুতরাং বেশী সোনা না রাখাই ভাল।

'বাঁশীর ঠেকোটা কি?' কিরণ প্রশ্ন করে।

হাসেন আনন্দবাবা, 'প্রভুর আমার নবনীত কোমল দেহ, অতক্ষণ অত বড় বাঁশী ধরে থাকলে হাত ব্যথা করতে পারে—ভক্তদের অন্ততঃ তাই মনে হয়—সেইজন্যে ঐ ঠেকোর ব্যবস্থা। অবশ্য সব জায়গায় নেই—তবে করিয়ে রাখা ভাল। এরপর মন খারাপ লাগবে।'

টাকা এখনই অনেক চাই। বাড়ির দলিল লেখানো রেজেস্ট্রী খরচা অন্য সব খরচ নিয়ে সাড়ে চার হাজারের ধাক্কা, এ ছাড়া পুরনো বাড়ি মেরামত, সামনের বাড়ি তৈরী, মন্দির—এর জন্যেও বেকসুর ছ' সাত হাজার টাকা লাগবে। তার ওপর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার খরচ আছে—যাগযজ্ঞ ব্রাহ্মণ-ভোজন, সেও কম নয়।

তার মানে এখনই দশ হাজার হাতে করে আসতে হবে, আরও চার পাঁচ হাজারের সংস্থান রাখা চাই। আনন্দবাবা বলে দিলেন টাকাটা নগদ না এনে হুণ্ডী করিয়ে আনতে, কার নামে হুণ্ডী হবে তাও বলে দিলেন। হুণ্ডী করা থাকলে আর পথে

খোয়া যাবার কি এখানে ডাকাতি হবার ভয় থাকে না।

ট্রেনে ফিরতে ফিরতে কিরণকে প্রশ্ন করল সুরো, 'টাকাটা কিভাবে তুলব বলো তো? পোস্টআপিসে যা আছে সামান্য, হাজার তিনেকের বেশী হবে না। কোম্পানীর কাগজগুলো ভাঙিয়ে নেব? নগদ বাড়িতে যা আছে—টাকা আর গিনি মিলিয়ে—ওতে হাত না দেওয়াই ভাল। বিপদ-আপদ আছে, যার দরকারে লাগতে পারে—কী বলো?'

কিরণ এ পর্যন্ত ওর বিষয় আশয়ের কথায় কখনও মাথা গলায় নি। তাই বলে এখন অকারণ সংকোচও করল না। জনহীন ইণ্টার ক্লাসের কামরা—পর কেউ শোনবারও সম্ভাবনা ছিল না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবই জিজ্ঞাসা করল—কী আছে, কত আছে!

সুরবালাও সব বলল। তিনখানা বাড়ি, গহনা, কোম্পানীর কাগজ—যা যা আছে মোটামুটি সব জানাল। এমন কিছু বলবার মতো ঐশ্বর্য নয়—তবে একেবারে অকিঞ্চিৎকরও নয়। ওর নিজের উপার্জনেরও কিছু ছিল, এই ক' বছরে রাজাবাবুও বিস্তর দিয়েছেন। নিজে থেকেই দিয়েছেন। আরও দিতেন—সুরবালাই বার বার বাধা দিয়েছে, 'এত কেন? এত বাড়াবাড়ির কী আছে!' রাজাবাবু হয়ত জবাবে হেসে বলেছেন, 'কেন—সে কথা বললে তো তুমি আমাকে মারধোর শুরু করবে। বলি, ভবিষ্যতের ভাবনা তো আছে?' 'বেশ তো' সমান তালেই জবাব দিয়েছে সুরো, 'একেবারে তো পথে বসার মতো অবস্থায় নেই; সেদিন যদি আসেই কোনদিন—নুন-ভাতের সংস্থান তো থাকবে। তুমি যদি না থাকো—সুখেভোগেই বা আমার কি দরকার?'

খুশী হয়েছেন রাজাবাবু, তৃপ্ত হয়েছেন। কৃতার্থ বোধ করেছেন। সেই সঙ্গে বাধা উপেক্ষা করেও নানা ছুতোয় মধ্যে মধ্যে দিয়েছেন এটা ওটা। নিজের জন্মদিনে, পুজোয়, সরস্বতী পুজোয়,—এমনি নানা উপলক্ষ ধরে নব নব অলঙ্কার ও কোম্পানীর কাগজ উপহার দিয়েছেন। ইদানীং নাকি বাড়িও খুঁজছিলেন আর একটা। ওরা আগে যে বস্তিতে ছিল মতির বাড়ির পিছনে—সেটারও দরদস্তুর করছিলেন। ওকে বলেন নি, নিস্তারিণীর কাছে বলছেন শুনতে পেয়েছে সুরো, পাবনা থেকে ফিরে এসে যা হয় স্থির করে ফেলবেন। বস্তিটা যদি পান তো ঐটেই কিনে—ওদের সেই ঘরটা বাঁচিয়ে রেখে বাকী জমিতে বিরাট অট্টালিকা তুলবেন—রাজাবাবুদের বাড়ির মতো, মানে মতির বাড়ির জুড়ি। কোন বড়লোককে ভাড়া দিলে চাই কি মাসে চার পাঁচশো টাকা ভাড়া উঠতে পারে। আর বস্তিটা যদি না-ই পান তো জোড়াগির্জের কাছে একটা বাড়ি দেখেছেন—সেইটেই কিনে নেবেন; এক ইহুদী সাহেবের বাড়ি, একঘর সাহেব ভাড়াটে আছে—ভাড়াটেও খুঁজতে হবে না। শ' আড়াই টাকা ভাড়া দেয়—ভাড়া বেশী নয়, তবে ভাড়া বাঁধা, মাসের তিন তারিখ পেরোতে দেয় না। ইত্যাদি—

সোনার স্বপ্ন সে সব। বাড়িটা হল না বলে দুঃখ নয়—সে জন্যেও স্বপ্নটা সোনার মনে করে না। তিনি থাকলে তবেই সে বাড়ির মূল্য। তা নয়, এই চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে যে সীমাহীন স্নেহ ও সতত-জাগ্রত চিন্তা আছে, সেইটেই সোনা ওর কাছে। ক্ষোভের কারণ সেই মানুষটার অভাব। আজ যে এতটা অসহায় মনে হচ্ছে, সব চিন্তা নিজেকে করতে হচ্ছে—তার মূলে সেই একটি মানুষেরই অনুপস্থিতি। নিজের জন্যে চিন্তা করার অভ্যাসটা একেবারেই হারিয়ে গেছে যে গত ক' বছরে।...

কিরণ সব শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, 'ও গয়নাগুলো সম্বন্ধে তোমার কি খুব মায়া আছে?'

'না, দু' একটা বাদে কোন গয়নার ওপরই মায়া নেই আর। সেগুলো তাঁর খুব প্রিয় ছিল, যেগুলো বার বার আমাকে পরতে বলতেন, বলতেন সেগুলোতে নাকি ভাল দেখায় আমাকে—সেগুলোর ওপর একটু মায়া আছে। তাছাড়া আর মায়া কিসের। আর তো পরব না ওসব।'

'পরবে না—একেবারে স্থির? এর পর যদি পরার ইচ্ছে হয়?'

'না, হবে না। মা যদ্দিন আছে তদ্দিন এই বালা দুটো থাকবে—নইলে মা কান্না-কাটি করে চেঁচামেচি করবে—তারপর আর তাও পরব না। লোকে যা ভাবে ভাবুক, আমি জানি আমি বিধবা হয়েছি। বামুনের মেয়ে—আমাদের ঘরে কি বিধবা হলে গয়না পরে কেউ?'

'তা হলে ঐ গয়নাগুলোই বেচে দাও। কোম্পানীর কাগজ থেকে নিয়মিত সুদ আসে। আর ও যখনই বেচতে যাবে—টাকা পাবে। রাখারও কোন হাঙ্গামা নেই। গয়না থেকে এক পয়সা আয় নেই, অথচ বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে, নিত্য দুশ্চিন্তা। যা রাখবার তা রেখে বাকী বেচে দাও, তোমার এসব খরচ উঠে গিয়েও ঢের টাকা হাতে থাকবে—চাই কি পোস্ট আপিসে রাখতে পারো, কিম্বা আর দু' একখানা কোম্পানীর কাগজ কিনতে পারো।'

আচ্ছা, আনন্দদাদা যে বললেন, সব সম্পত্তি সরকারের ঘরে জমা করে দিতে, তাদেরাই ট্রাস্টি করতে—তুমি কি বলো? সে রকম কি হয়?'

'তা জানি না। হলে সে-ই সবচেয়ে ভাল। মেয়েছেলের নিজের হাতে কিছু না রাখাই ভাল। কে কখন ঠকিয়ে নেবে তার তো ঠিক নেই।'

'কেন, তোমার নামে যদি সব গচ্ছিত করে দিই?'

সুরো কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে।

'না। আমি রাজী হবো না তাতে। কারুর নামেই গচ্ছিত করে দেওয়া ঠিক নয়। যে যত বিশ্বাসীই হোক, মৃত্যুর তো কোন বাঁধাধরা হিসেব নেই। আর মরবার পর তার ওয়ারিশরা কি করবে তা কে জানে। দেবোত্তর সম্পত্তি—লেখাপড়া করে দাও, সরকারকে ট্রাস্টী করো—তুমি সেবাইত হও—আনন্দ-দাদা যা বললেন ও-ই সেরা যুক্তি।'

আরও কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে শুধোয় সুরো, 'তোমার কি কিছুতে লোভ নেই? মেয়েমানুষ আর টাকা—এ দুটোয় তো বেশির ভাগ পুরুষের লোভ!'

যেন চমকে ওঠে কিরণ, 'কে বললে লোভ নেই? লোভ আছে বলেই তো—'। তার পরই মনে হয় নিজেকে সামলে নিয়ে অন্য প্রসঙ্গে জোর দেয়। 'টাকার লোভ নেই তা-ই বা বলি কি করে?. তবে তোমার ও কটা টাকাতে আর কতটুকু বড়লোক হবো বলো? মোটা টাকার প্রলোভনের সামনে কতদিন সাধু থাকতে পারি—সেটার পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত নির্লোভ এমন কথা বলতে পারি না।'

বেশ ধীরভাবেই বলে কিরণ—কিন্তু কে জানে কেন সুরো তেমন অবিচলিত থাকতে পারে না, সে প্রাণপণে বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে থাকে।

(ক্রমশঃ)

সন্ধি স্থাপন ॥ শংকর চট্টোপাধ্যায়

হাত বাড়ালেই হাত
সেতু ভাবলেই 'নদী'
ভাগে এমন কম পড়লে চলবে কেন?
ক' কিলো ওজনদার মাংস আর একটা নরম গরম কাঠামো
প্রয়োগ বলতে সেই জলসেচের সর্ত
ছাঁদ পেটানো ঘর আর ছেঁড়া বালিশের জিম্মাদারী
এরই নাম বলবে 'জন্ম জীবন'।

ভাগে এমন কম পড়লে চলবে কেন?
বরাদ্দ বাড়াও
ধুলো ছেড়ে আসন পিঁড়িতে বসতে দাও
জন্মসত্ত্ব চাই যে
ছাউনি ছেড়ে দালানকোঠা।
কুয়াশাটিকায় ভাসতে গেলে
দু-একবারের মেরি-গো-রাউন্ড।
অন্তত প্রমাণ হিসাবে কাঁচ বসানো আলমারি একটা
গীতবিতানের বাঁধানো কপিটা চাই মাথার কাছে,
কিছু না জুটলে অন্তত ঝোল ভাতের বন্দোবস্ত।

ভাগে আমার কম পড়লে চলবে কেন?
আমি তো আর যেমন তেমন শিকার নই
তোমার খাস দখলের তসিলদার
শীতের পশম, কুরুসকাঠি
আমার ভাগে কম পড়লে চলবে কেন?

দুঃখের সংসারে ॥ কবিরুল ইসলাম

দুঃখের সংসারে
কে আছো বন্ধুর মতো? কাকে
সব কথা বলা যায়, প্রসাধনহীন
ভালোবাসা, মধ্যবিত্ত দিন
সমর্পণ করা যেতে পারে
সব, দ্বিধাহীন।

কে আছো বন্ধুর মতো দুঃখের সংসারে
প্রসাধনহীন মুখ দেখাতাম যাকে
কে আছো, আছো কে
মধ্যদিন চোখের আলোকে?

কে আছো বন্ধুর মতো আদিগন্ত, আদিঅন্তহীন!

বিজ্ঞানের কথা

মানুষ কি পৃথিবীর হাওয়া বদলে দিচ্ছে
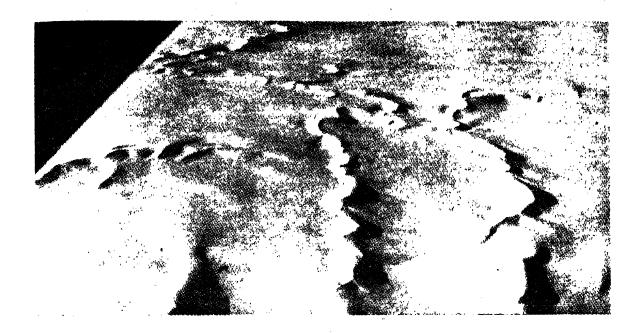
সৃষ্টির আদিকালে পৃথিবীর আবহাওয়া যেরকম ছিল, আজ তা বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের মূলে আছে মানুষের অনেকখানি হাত। সাধারণ লোকের কাছে এ-কথাটা অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি পৃথিবীর বর্তমান আবহাওয়া পর্যালোচনা করি, তাহলে বিজ্ঞানীদের কথার সারবত্তা উপলব্ধি করতে পারব।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় আমরা অনেক কাজ করে থাকি। তার মধ্যে কিছু ইচ্ছাকৃত, কিছু অনিচ্ছাকৃত। ইচ্ছাকৃতভাবে যা কিছু আমরা করি, তাতে বিশেষ কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় না। কিন্তু না জেনেশুনে যা আমরা করি তা অনেকসময় সমস্যাবিশেষ হয়ে দাঁড়ায়। যতক্ষণ না আমরা উপলব্ধি করি যে আমরা না জেনেশুনে করে চলেছি তার প্রতিক্রিয়া আমাদের এবং আমাদের সন্তানসন্ততি ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ওপর কিরকম হতে পারে, ততক্ষণ এই সমস্যা সম্পর্কে আমরা তেমন সচেতন হই না।

আদিম মানুষেরা যেদিন চর্ম পরিধান করে দেখেছিল তার দ্বারা দেহ গরম রাখা যায়, সেদিন থেকেই মানুষ আবহাওয়ার পরিবর্তনে হস্তক্ষেপ করেছে। পরবর্তীকালে গুহাবাসী মানুষ যখন গৃহনির্মাণ করতে শিখল, তখন একটা নির্দিষ্ট এলাকায় আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটল। এরপর মানুষ বৃক্ষ রোপণ করে আরও বিস্তৃততর এলাকার আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটালো। কারণ গাছপালাশূন্য উন্মুক্ত অঞ্চলের আবহাওয়া থেকে গাছপালাপূর্ণ অঞ্চলের আবহাওয়া ভিন্নধরনের। চাষাবাদের জন্যে মানুষের সেচব্যবস্থাও বিস্তৃততর এলাকা জুড়ে আবহাওয়ায় পরিবর্তন ঘটায়।

সাম্প্রতিককালে আমরা কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের কথা শুনছি। সিলভার অক্সাইড-এর সাহায্যে এই কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানো হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, উপযুক্ত পরিবেশে যদি প্রত্যেক মেঘে সিলভার অক্সাইড কেলাস সঞ্চারিত করা হয়, তাহলে বৃষ্টিপাত শতকরা ১০ ভাগ বাড়ানো যায়। আর শত শত বর্গমাইলব্যাপী এলাকায় এর সুফল পাওয়া যাবে। এসবই হল মানুষের ইচ্ছাকৃত কাজের ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন।

কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবেও মানুষ আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। সেটা ঘটে কিভাবে? বিজ্ঞানীরা বলে, যেদিন থেকে মানুষ অরণ্য ছেড়ে শহরে পত্তন করেছে, সেদিন থেকেই এই অনিচ্ছাকৃত পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত হয়েছে। ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। মানুষ যখন শহর গড়ে তখন তাকে জলাভেদ্য বাড়ি তৈরী করতে হয়। এবং পাকা রাস্তাও তৈরী করতে হয়। এর ফলে শহর এলাকার শতকরা প্রায় ৫০-৬০ ভাগ হয় জলাভেদ্য। তাছাড়া, গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরে গাছপালা ও সবুজ ঘাস কম বলে তারা শহরে বাতাসে কম জলীয় বাষ্প মোচন করে। এর ফলে শহরে বাতাস হয় শুষ্ক এবং পায়ের তলার জমি গ্রামাঞ্চলের চেয়ে হয় বেশি শুষ্ক। পথেঘাটে যে ধুলোবালি জমে তা শহরের কলকারখানার চিমনি থেকে নির্গত ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যায়। এতে শহরের বাতাসের সংযুতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। উন্মুক্ত গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরের বাতাসে ১০ থেকে ১০,০০০ গুণ ধূলিকণা থাকতে পারে। শহরের বাতাসে ভাসমান এই ধূলিকণা শহরে আপতিত সূর্যকিরণের পরিমাণ ও গুণাগুণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরে গড়পড়তায় শতকরা ৩০ ভাগ সূর্যকিরণ ও ৯০ ভাগ আল-ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি কম পড়ে।

পার্শ্ববর্তী উন্মুক্ত এলাকার চেয়ে শহরে বেশি কুয়াশা সৃষ্টি হয় এবং শতকরা ১০ ভাগ বেশি বৃষ্টি হয়। আমরা জানি, ধূলিকণাকে কেন্দ্র করে জলীয়কণা বৃষ্টিরূপে ধরাপৃষ্ঠে বর্ষিত হয়। রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে যখন কলকারখানা বন্ধ থাকে, সেসব দিনে অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাত হয়। কলকারখানা থেকে সেসব দিনে

ধোঁয়া কম নিঃসৃত হয় বলেই বৃষ্টিপাত কমে যায়।

উন্মুক্ত গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে শহরের তাপমাত্রারও তারতম্য দেখা যায়। শহরের, কংক্রিটের ফুটপাত দিনের বেলায় তাপ শোষণ করে এবং রাত্রিবেলায় সেই তাপ বিকিরণ করে। একারণে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরে রাত্রিবেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি।

পৃথিবীতে যতই নতুন নতুন শহর গড়ে উঠছে, ততই পৃথিবীর বিস্তৃততর অঞ্চল জুড়ে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে। দূরদূরান্তের বড় বড় শহরের মধ্যে যোগাযোগ রাখবার জন্যে গ্রামাঞ্চলের ভেতর দিয়ে যে বিরাট রাজপথ গড়ে তোলা হচ্ছে তার প্রভাব গ্রামাঞ্চলের আবহাওয়ার ওপরও পড়ছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, বনের গাছপালা অবিবেচকের মতো কেটে ফেলার ফলেও পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁরা মনে করেন, আজ যেসব অঞ্চলকে আমরা শুষ্ক মরুভূমি দেখি, একদিন সেসব অঞ্চলও শস্যশ্যামলা ছিল।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজপুতানা মরুভূমি সম্পর্কে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় বর্তমানে এক ব্যাপক গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। পৃথিবীর অন্যান্য মরুভূমি যেভাবে সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে রাজপুতানা মরুভূমি ঠিক মেলে না। আবহতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করলে রাজস্থানের এই অঞ্চল অর্ধ-বিশুষ্ক হওয়া উচিত ছিল, মরুভূমির মতো বিশুষ্ক হওয়া উচিত নয়। রাজপুতানা মরুভূমির দক্ষিণাংশে বছরে প্রায় চার ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় আর উত্তরাংশে হয় বছরে প্রায় পনের ইঞ্চি। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে, যদি তার সবটাই বৃষ্টিপাতরূপে বর্ষিত হত, তাহলে প্রায় চার সেন্টিমিটার গভীর জল হত। পৃথিবীর অধিকাংশ মরুভূমিতে এই জলের পরিমাণ প্রায় এক সেন্টিমিটার। আর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত অঞ্চলে এই জলের গভীরতা প্রায় পাঁচ সেন্টিমিটার। রাজপুতানা মরুভূমি এদিক থেকে অদ্ভুত মনে হয়। কারণ পানামা, অ্যামাজন উপত্যকা বা কঙ্গোর প্রচুর বারিপাত অঞ্চলের মতো এই মরুভূমির ওপরকার বায়ুতে সমপরিমাণ জলীয় বাষ্প দেখা যায়।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে—রাজপুতানা মরুভূমিকে আমরা কি প্রকৃতপক্ষে 'মরুভূমি' বলতে পারি? সাধারণত মরুভূমি হচ্ছে এমন এক অঞ্চল যেখানে বায়ু নিমজ্জিত হয় বা নিচে নেমে আসে। বায়ু যখন নিচে নেমে আসে, তখন উচ্চতর চাপের স্তরে তা সঞ্চারিত হয় এবং এই চাপ বায়ুকে সংনমিত করে। সংনমনের ফলে বায়ু গরম হয়ে ওঠে এবং তার ফলে জলীয় বাষ্প ধরে রাখার ক্ষমতা তার বেড়ে যায়। কিন্তু সেখানে জলীয় বাষ্প সংযোজিত না হওয়ায় বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে যায়। অর্থাৎ বায়ু ক্রমশ উষ্ণতর হয়ে ওঠে।

ডঃ পি কে দাস নামে জনৈক ভারতীয় গবেষক রাজস্থান অঞ্চলের ওপরকার বায়ুর নিমজ্জন পরিমাপ করেছেন। কি পরিমাণ বায়ু নিমজ্জিত হয় এবং পর্যবেক্ষিত নিমজ্জন-হার বজায় রাখার জন্যে কি পরিমাণ বিকিরণগত শীতলীকরণের প্রয়োজন তা তিনি পরিমাপ করে দেখেছেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন এই বায়ুতে সাধারণ উপাদানগুলি সবই বিদ্যমান আছে—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন, জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং স্বল্প পরিমাণ ওজোন। এইগুলির মধ্যে শেষোক্ত তিনটির বিকিরণগত বিশেষ প্রভাব আছে। এইসব উপাদান সম্বলিত বায়ু কত তাড়াতাড়ি শীতল হবে তা ডঃ দাস পরিমাপ করেছিলেন। কিন্তু পর্যবেক্ষিত নিমজ্জনগতি অনুযায়ী শীতলীকরণের যা হার হওয়া উচিত তার সঙ্গে ডঃ দাসের হিসাব ঠিক মেলে না। পরবর্তীকালের গবেষণায় প্রকাশ পায়, ডঃ দাস বায়ুর বিকিরণগত শীতলীকরণের ওপর ধূলিকণার প্রভাব বিবেচনা না করায় রাজস্থানের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে ও'র হিসাব মেলে নি।

এখন কথা হল, রাজস্থানের ওপর কি পরিমাণ ধূলিকণা আছে? ১৯৬৬ সালের বসন্তকালে সম্পাদিত এক পর্যবেক্ষণে জানা যায়, উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রতি বর্গমাইলে সাড়ে ৫ টন পরিমাণ সূক্ষ্ম ধূলিকণা ছড়িয়ে আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে ধোঁয়াটে শহরের ধূলিকণার পরিমাণের চেয়েও এই পরিমাণ বেশী। বায়ুর নিমজ্জন-হার শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধির পক্ষে ধূলিকণার এই পরিমাণ যথেষ্ট।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের বায়ু থেকে এই ধূলিকণা ছেঁকে ফেলার যদি কোনো উপায় থাকত তাহলে কি হত? বায়ুর ধোঁয়াটে ভাব কমে যেত, বায়ুর নিমজ্জন কম ঘটত, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বাড়ত এবং এই অঞ্চল এত বিশুষ্ক হত না।

কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতে এত ধূলিকণা এল কোথা থেকে? আমরা জানি, সাধারণত উৎসের কাছেই ধোঁয়া বা ধূলিকণার পরিমাণ হয় সবচেয়ে বেশি ঘন। ভারত, পারস্য, আরব এবং ব্রহ্মদেশের ওপর দিয়ে বিমানে উড়ে যাবার সময় দেখা যায়, মরুভূমির ওপরই ধূলিকণার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ঘন। এই পর্যবেক্ষণ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, স্বয়ং মরুভূমিই হচ্ছে ধূলিকণার উৎস। বস্তুত, মরুভূমি অঞ্চলে ঘূর্ণির আকারে ধূলিকণাকে উড়তে দেখা যায়।

রাজস্থান অঞ্চলে সেচব্যবস্থা নেই বললে চলে। মরুভূমি অঞ্চলের মাঝখানে কৃষকরা বছরে একর প্রতি মাত্র ৩০ পাউন্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য কোনোক্রমে উৎপাদন করে। এই উৎপাদন-হার অতি শোচনীয়। এর দ্বারা মানুষের জীবন সর্বনিম্ন মানেই বজায় রাখা যেতে পারে।

ভারতের এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ সাল পর্যন্ত হরপ্পাবাসীরা বাস করত। এই অঞ্চলেই হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। আজ যেখানে আমরা মরুভূমি দেখতে পাই, সেকালে সেখানে বিরাজ করত শস্যশ্যামল প্রান্তর।

সেকালে হরপ্পাবাসীরা কি করে এত উচ্চমানের চাষাবাদ বজায় রাখত? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না, তবে অনুমান করতে পারি। আমরা ধরে নিতে পারি, হরপ্পাবাসীরা শ্যামল অঞ্চলে চলে আসে এবং সেখানে চাষাবাদ শুরু করে। তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ শস্যাদি উৎপাদন করত এবং তাদের গবাদি পশুদের বিচরণের জন্যে পর্যাপ্ত ঘাসপূর্ণ প্রান্তর ছিল। হরপ্পাবাসীরা তাদের জনসংখ্যা, গবাদি পশুর সংখ্যা এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি করেছিল। তারা বিস্তৃততর এলাকায় ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করতে থাকে। তার ফলে জমির ওপর ঘাস ক্রমশ নষ্ট হয়ে যায় এবং বাতাসে ধূলিকণা ছড়াতে থাকে। এই ধূলিকণা বায়ুর নিমজ্জন-হার পরিবর্তন করে এবং তার ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল মরুসদৃশ হতে থাকে। আবহাওয়া বিশুষ্কতর হওয়ায় ক্রমবর্ধমান জনতার খাদ্যের চাহিদা মেটাবার জন্যে লোককে আরও কঠিন পরিশ্রম করে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টা করতে হয়। তার মানে আরও বেশি জমি কর্ষিত হয় এবং বাতাসে আরও বেশি ধূলিকণা উৎক্ষিপ্ত হয়।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে হরপ্পার অধিবাসীরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাদের বিলোপ সম্পর্কে একটি মতবাদ হচ্ছে, উত্তর দিক থেকে আর্যরা এসে তাদের বন্দী করে সেখানে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই মতবাদ গ্রহণের একটা অসুবিধা হচ্ছে, হরপ্পাবাসীদের বিলোপের পর এক হাজার বৎসরকাল আর্যরা সেখান থেকে স্থানান্তরে যায় নি। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খৃঃ পূঃ ৫০০ বৎসর পর্যন্ত এক হাজার বৎসরকাল এই স্থান পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল।

যে জাতির লোকেরা শুধু একই স্থানে থেকে যায় তারা ব্যাপক কৃষিক্ষেত্র গড়ে তুলতে পারে না। একদল বিজ্ঞানী মনে করেন, হরপ্পাবাসীরা একই স্থানে থেকে জমির অসদ্ব্যবহার করে এবং কালক্রমে সেই জমিকে মরুভূমিতে পরিণত করে। হরপ্পাবাসীদের বিলোপের পর এক হাজার বৎসরকাল প্রকৃতিদেবী জমির ক্ষত নিবারণ কিছু পরিমাণে করেছিলেন, কিন্তু হাজার বছর আগের অবস্থায় তা ফিরিয়ে আনতে পারেন নি।

হরপ্পাবাসীরা যদি জমির অসদ্ব্যবহার ও তার উৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট করে মরুভূমির সৃষ্টি করে থাকে, তাহলে কি বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করে রাজপুতানা মরুভূমিকে

উর্বর করে তোলা যায় না? এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই ভারত সরকার উইস্‌কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় একটি গবেষণা কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। রাজপুতানা মরুভূমিকে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে কিভাবে আবার উর্বর শস্যশ্যামল করে তোলা যায় সেবিষয়ে এই প্রকল্পের গবেষকরা নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন।

বিজ্ঞানীরা কিভাবে এই 'অসাধ্য সাধন' করবেন তা আমরা জানি না। তবে কিছু আভাসইঙ্গিত তাঁরা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, ধরা যাক কোনো উপায়ে মরুভূমির কোনো স্থানে ঘাস জন্মানোর ব্যবস্থা করা হল। রাজস্থানে কোনো কোনো সময় বৃষ্টিও হয়। ঘাসবীজকে বিস্তৃত এলাকায় বপন করা যেতে পারে (বিমানের সাহায্যে হতে পারে)। বৃষ্টি হলে এই ঘাস-বীজ জমির অভ্যন্তরে মূলে প্রবেশ করিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তারপর ক্রমশ বিস্তৃত এলাকা ঘাসে ঢেকে যাবে। ঘাস হলে বায়ুতে ধূলিকণা কম হবে। বায়ুতে ধূলিকণা কমলে বায়ুর নিমজ্জন কমবে এবং তার ফলে বেশি বৃষ্টিপাত হবে। আর বৃষ্টিপাত বেশি হলে ঘাসও বেশি জন্মাবে। ঘাস বেশি হলে বায়ুতে ধূলিকণা আরও কমে যাবে। এইভাবে রুক্ষ বিশুষ্ক মরুভূমিকে শস্যশ্যামল প্রান্তরে পরিণত করা যেতে পারে। যত সহজে এসব কথা বলা হল, আসল ব্যাপার তত সহজ হবে না এবং শুধুমাত্র ঘাস নয় আরও আনুষঙ্গিক অনেককিছু সমস্যা আছে যা সমাধান করতে হবে। তবে রাজপুতানা মরুভূমিতে এই গবেষণা প্রকল্প সফল হলে সারা পৃথিবীতে এই পন্থা অনুসরণ করা যাবে এবং পৃথিবীর বহু অনুর্বর বিশুষ্ক অঞ্চল আবার উর্বর শস্যশ্যামল হয়ে উঠবে।

ভাইরাসজাত সংক্রমণ প্রতিরোধের হাতিয়ার 'ইণ্টারফেরন'

ভাইরাসজাত নানাবিধ ব্যাধির সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল মাথা ঘামাচ্ছেন। তাঁরা এমন একটি প্রতিরোধকের সন্ধান করছেন যার দ্বারা সর্বপ্রকার ভাইরাস-ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। সম্প্রতি তাঁরা 'ইণ্টারফেরন' নামে এমনি একটি প্রতিরোধকের সন্ধান পেয়েছেন। দেহাভ্যন্তরের কোষ থেকে এই 'ইণ্টারফেরন' উৎপন্ন হয়।

বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক পাঁচশোর বেশি ভাইরাস আছে। দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাণীদেহে কোনো একপ্রকার ভাইরাসের অনুপ্রবেশের ফলে তার প্রতিরোধক অ্যাণ্টিবডি গড়ে ওঠে। যে ভাইরাসের দরুন এই অ্যাণ্টি-বডি সৃষ্টি হয়, কেবলমাত্র সেই ভাইরাসকে তারা প্রতিরোধ করতে পারে। অ্যাণ্টিবডির এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই বর্তমানে সর্বপ্রকার ভ্যাকসিন প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। সবরকম জানা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যদি সবরকম ভ্যাক্‌সিন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়, তাহলেও মানুষকে হাজারটা ভ্যাক্‌সিন নিতে বলা অবাস্তব হবে। তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্যে বিজ্ঞানীরা অন্য পন্থার সন্ধান করছেন।

তিরিশ বছর আগে বিজ্ঞানীরা একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন। যদি দুটি ভিন্নরকম ভাইরাস প্রাণীদেহে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়, তাহলে তাদের মধ্যে একটি অপরটির বৃদ্ধি রোধ করে। এর কারণ হিসাবে বলা হয়, প্রথম ভাইরাসটি দেহমধ্যে এমন এক বিশেষ ধরনের এজেণ্ট সৃষ্টি করে যা দেহাভ্যন্তরের কোষসমূহকে অপরাপর ভাইরাসের অনুপ্রবেশ ও বিস্তারের বিরুদ্ধে রক্ষা করে।

এই ঘটনাকে 'ব্যভিচার' (ইণ্টারফেয়ারেন্স) বলে অভিহিত করা হয় এবং প্রতিরোধক এজেণ্টকে বলা হয় 'ইণ্টারফেরন'। ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বিভিন্ন প্রাণীর দেহে সম্ভাব্য সকল প্রকার ভাইরাসের সংক্রমণের পর তাদের দেহে ইণ্টারফেরন সৃষ্টি হয়। পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন ইত্যাদি পরিচিত সবরকম অ্যাণ্টিবায়োটিকস-এর চেয়ে ইণ্টারফেরন বেশি কার্যকর।

বিশুদ্ধ অবস্থায় ইণ্টারফেরন হচ্ছে একটি অপেক্ষাকৃত সরল প্রোটিন যা উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে। দীর্ঘ সময় ৬৫ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ইণ্টারফেরন অবিকৃত থাকে, কিন্তু এই তাপমাত্রায় পরিচিত প্রোটিনের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়। দেহাভ্যন্তরের কোষ থেকে ইণ্টারফেরন উৎপন্ন হয় বলে এর কোনো বিষক্রিয়া নেই। এটা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এই বিষক্রিয়ার দরুন বহু ভাইরাস-প্রতিরোধক ভেষজ বিশেষ কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও বাতিল করতে হয়।

সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে, প্রায় সবরকমের কোষই ইণ্টারফেরন উৎপন্ন করতে পারে। মানুষের রক্ত এবং অন্যান্য প্রাণীর অঙ্গ থেকে ইণ্টারফেরন পৃথক করা গেছে। দেহাভ্যন্তরে ইণ্টারফেরন কিভাবে কাজ করে, তা এখনও যথাযথভাবে জানা যায়নি। আমরা জানি দেহাভ্যন্তরে ভাইরাসের যে বিস্তার ঘটে, সেটা জটিল প্রণালী এবং পর্যায়ক্রমে তা ঘটে থাকে। প্রথমে ভাইরাস কোষে সংযুক্ত হয় এবং তারপর অনুপ্রবেশ করে। এরপর প্রত্যেক ভাইরাস থেকে নিউক্লিয়িক অ্যাসিড নির্গত হয়।

এই নিউক্লিয়িক অ্যাসিড থেকে ভাইরাসের পরবর্তী উপজাত উপাদানগুলি সৃষ্ট হয়। প্রোটিন ও নিউক্লিয়িক অ্যাসিড উপাদানগুলি সৃষ্ট হবার পর তাদের সম্মিলনে নতুন ভাইরাস গড়ে ওঠে। নিয়ম হচ্ছে, আক্রান্ত কোষগুলিকে বিনষ্ট করে ভাইরাসের বিস্তার ঘটে। কিন্তু ইণ্টারফেরন যদি দেহমধ্যে প্রবিষ্ট করানো হয়, তাহলে অতি দ্রুত সেটি কোষের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে ভাইরাসকে প্রতিরোধ করবে। এই প্রতিরোধক এজেণ্টটি ভাইরাসের ওপর সরাসরি কোনো কাজ করে না, তবে কোষসমূহের মধ্যে ভাইরাসের বিস্তারের একটি পর্যায় অবদমিত করে দেয়। ইণ্টারফেরন নতুন প্রোটিনের সংশ্লেষণের সূত্রপাত ঘটায়।

অ্যাণ্টি-বডি এবং ইণ্টারফেরন উভয়েই ভাইরাসের কার্যকারিতা প্রতিরোধ করে। কাজেই তাদের মধ্যে একটা তুলনা করা যেতে পারে। অ্যাণ্টি-বডি কোনো নির্দিষ্ট ভাইরাস প্রতিরোধ করতে পারে, পক্ষান্তরে ইণ্টারফেরন প্রায় সবরকম ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর। ভাইরাস দেহমধ্যে অনুপ্রবেশ করার সাধারণত এক বা দু' হপ্তা পরে অ্যাণ্টি-বডি গঠিত হয়, কিন্তু ইণ্টারফেরন গঠিত হয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। এছাড়া, অ্যাণ্টিবডি এক বিশেষ ধরনের কোষ থেকে গঠিত হয়, পক্ষান্তরে ইণ্টারফেরন সবরকম কোষ থেকেই উৎপন্ন হয়। অ্যাণ্টি-বডি কোষের বাইরের ভাইরাসগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, আর ইণ্টারফেরন কোষে অনুপ্রবিষ্ট ভাইরাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। একারণে অ্যাণ্টি-বডি প্রধানত সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে। ইণ্টারফেরনের কার্যকারিতা আরও ব্যাপক।

ইতিমধ্যেই কয়েকটি ক্ষেত্রে ইণ্টারফেরন ব্যবহারে সাফল্য লাভ করা গেছে। বিভিন্ন প্রাণীর দেহ থেকে পৃথকীকৃত ইণ্টারফেরন ব্যবহার করে হারপেস্ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে এবং লিউকেমিয়া চিকিৎসায় সুফল পাওয়া গেছে। মানুষের রক্ত থেকে প্রাপ্ত ইণ্টারফেরন বিবিধ ভাইরাস-রোগের বিরুদ্ধে বিশেষ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। সাইটোমেগালয়া ভাইরাস আক্রান্ত নবজাত শিশুদের রোগ-চিকিৎসায় ইণ্টারফেরন ব্যবহারে সুফল লাভ করা গেছে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, ক্যান্সার প্রতিরোধে ও তার চিকিৎসাতে ইণ্টারফেরন কার্যকর হতে পারে। ইণ্টারফেরন সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ায় বর্তমানে ব্যাপক গবেষণা চলছে। ইণ্টারফেরনের কার্যকারিতার যে বিস্তৃততর ক্ষেত্র এবং তার বিষক্রিয়াশূন্যতার যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তা থেকে এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে না, ভবিষ্যতে ভ্যাক্‌সিন এবং সিরামের স্থান একদিন হয়তো ইণ্টারফেরনই অধিকার করবে।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিযন্ত্র

কাহিনী

স্টিফেন
ৎ-সোয়াইথ
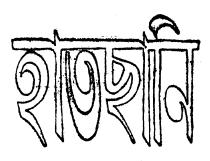
নেপলাসে জাহাজ থেকে মাল খালাস করা হচ্ছিল ১৯১২-র মার্চ মাসের একটি উত্তপ্ত দিনে আর সেইদিন যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল তা নিয়ে খবরের কাগজে অনেক-রকম উদ্ভট ও কল্পনাপ্রসূত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই জাহাজের আমি একজন যাত্রী ছিলাম এবং আর সবায়ের মত এই বিস্ময়কর ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে আমি দুদণ্ড শান্তিলাভের অভিপ্রায়ে তীরে নেমেছিলাম। দুর্ঘটনার সমস্ত বিবরণ আমার জানা ছিল। আজ মনে হয় নীরবতা ভেঙে সে সব কথা স্পষ্ট করে প্রকাশ করাই শ্রেয়!

সেইকালে আমি মালয়ে বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় বাড়ি থেকে জরুরী সংবাদ পেয়ে সিঙ্গাপুর থেকে 'উটন' জাহাজে কোনোমতে একটু স্থান সংগ্রহ করে পাড়ি দিলাম। ইঞ্জিনের পাশে আলো ও বাতাস-হীন ক্ষুদে কেবিন, বিশ্রী গরম, অন্ধকার এর ওপর নানারকমের বিরামবিহীন হট্টগোল। আমার লগেজপত্র গুছিয়ে রেখে তাই ওপরের ডেকে উঠে এলাম। ডেকে উঠে মনোরম দক্ষিণা বাতাসে দেহ ও মন শান্ত হল। এইভাবে পর পর তিনদিন আমি সমুদ্রের নীল জলের দিকে চেয়ে বসে থেকেছি আর সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করেছি। তিনদিন এইভাবে কেটেছে, কিন্তু তৃতীয় দিনে সাংহাই থেকে কয়েকজন ইংরেজ মেয়ে উঠে গ্রামোফোনে নাচের সুর বাজিয়ে এমনই উৎকট নৃত্য করছিল যে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। কোলাহল এড়ানোর অভিপ্রায়ে ওপরে ওঠা, সেই কোলাহল এখানে প্রবল।

লাঞ্চ শেষ করে দু' বোতল বীয়ার টেনে ভাবলাম এইবার ঝামেলা থেকে মুক্তি পাব। একটু ঘুমিয়েছিলাম, ঘুম যখন ভাঙলো তখন দেখি বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে। ঘরটাও গরম। ঘর্মসিক্ত দেহটাকে ঠাণ্ডা করার মানসে ঘরের পাখাটা চালিয়ে দিলাম। ওপরে সেই নাচ-গান-হল্লাও আর শোনা যায় না। শুধু-জাহাজের কলকব্জার আওয়াজ ছাড়া আর কোনো গোলমাল নেই।

আমি ডেকে উঠে আর কাউকে দেখলাম না। আকাশ তারায় তারায় ভরা। বাতাসে নৈশ শীতলতা। একটা ডেক চেয়ারও খালি নেই। সব অধিকৃত। চুপচাপ নৈশ মাধুরী উপভোগ করি। এমন সময় একটা কাশির আওয়াজ কানে এল। ভালো করে তাকিয়ে চশমার কাঁচের ম্লান জ্যোতি লক্ষ্য করলাম। আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে জার্মান ভাষায় বলি, মাফ করবেন। তিনিও জার্মান ভাষাতেই বললেন, না, না, তাতে কি!

সেই অপরিচিত ভদ্রলোক আমার দিকে ভালো করে দেখলেন। অনেকক্ষণ নীরবতার পর আমি 'গুডনাইট' বললাম এবং তিনি প্রতিনমস্কার জানালেন। তারপর একটু দ্রুতলয়ে বললেন, মাফ করবেন। একটা ব্যক্তিগত শোকাবহ ব্যাপারে আমার মনটা আচ্ছন্ন। আমার এই জাহাজে অবস্থিতির সংবাদটা আর কাউকে বলবেন না।

এই বলে তিনি হঠাৎ থামলেন। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম—এই অনুরোধ আমি রাখব, তা ছাড়া এখানে আমার কোনো পরিচিত প্রাণী নেই। কি জানি, সেই রাতে ভালো ঘুম হল না।

মানুষটির আকর্ষণ ছিল। তার পর দিন বারবার তাঁর কথা মনে হতে থাকে। লোকটিকে দেখার জন্য আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল। অনেক রাতে যখন ঘুম ভাঙল ঘড়িটার দিকে লক্ষ্য করে দেখি তখন রাত দুটো। তাড়াতাড়ি ডেকে উঠে গেলাম।

লক্ষ্য করে দেখি পাকানো কাছির পাশে পাইপ ধরিয়ে তিনি তেমনই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি কাছে গিয়ে তাঁর এই সমাহিত ভাব দেখে ভাবলাম এখন বরং চলে যাই, কিন্তু আমি পালাবার উপক্রম করতেই তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন : এই যে আসুন। আমাকে দেখে পালাচ্ছেন কেন?

আমি বললাম, আপনি আত্মমগ্ন হয়ে আছেন, বিরক্ত করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তিনি বললেন, না আপনার সঙ্গ আমার ভালো লাগবে। আসুন একটা সিগারেট নিন।

[Stetan Zweig (বাংলা ভাষায় "স্টিফেন জুইগ" এই বিকৃত নামে পরিচিত) ১৮৮১ খৃস্টাব্দে ভিয়েনায় জন্মগ্রহণ করেন। ৎসোয়াইথ -মাত্র উনিশ বছর বয়স থেকে লিখতে সুরু করেন এবং প্রথম রচনা থেকেই খ্যাতিলাভ করেন। সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে তিনি জীবনী রচনা করেছেন বেশী—'মেরী আতিনেত', 'ইরাস মস অব রটারডাম', 'আমেরিগো' এবং 'বালজাক'। তাঁর 'দি রয়্যাল গেম', 'বিজয়ার অব পিটি' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি পৃথিবীখ্যাত। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে নাৎসী অত্যাচারে অস্ট্রিয়া থেকে পালিয়ে ব্রেজিলে বসবাস করেন এবং সেখানেই ১৯৪২ খৃস্টাব্দে আত্মহনন করেন। স্টিফেন ৎসোয়াইথ জীবনধর্মী অতিবাস্তব কাহিনী রচনায় একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তক]

দেশলাই-এর আলোতে ভদ্রলোকের মুখটি ভালো করে দেখলাম। আমরা একটা কাছের ঝাণ্ডিলের কাছে বসেছিলাম। তিনি তখন কথা বলার মত মনে ছিলেন। আমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আপনি ক্লান্ত ন'ন ত?

আমি যখন জানালাম যে আমি মোটেই ক্লান্ত নই তখন তিনি বেশ স্পষ্ট গলায় পরিষ্কার ভংগীতে আরম্ভ করলেন : আমি একজন চিকিৎসক আর কাহিনীটা আমাকে নিয়েই গড়ে উঠেছে আপনাকে এই ধরে নিতে হবে। আমি একটু পরিমাণে বেশী পান করেছি। তাহাতে মাত্রাটা একটু বাড়ে। তবে সুরা আমাকে উত্তেজিত করে'নি।

পূর্বাঞ্চলে আবার একটু-আধটু না পেটে পড়লে চলে না। সাত বছর দেশীয় লোকজন আর জীব-জন্তুর মধ্যে কাটাতে হয়েছে। মাথার ঠিক থাকে? এতকাল পরে একজন স্বদেশীকে দেখলে মনের দরোজা খুলে যায়।

সেই অন্ধকারেই বোতল থেকে সুরা ঢেলে নিয়ে আমাকে এক পাত্র নিবেদন করলেন। দ্বিতীয় গ্লাস না থাকায় উনি বোতলেই মুখ লাগিয়ে টেনে নিলেন।

ততক্ষণে আড়াইটে বেজে গেল। একটু সামলে নিয়ে ভদ্রলোক শুরু করলেন—

আপনাকে সব কথা যেমনটি ঘটেছে ঠিক সেইভাবেই আগাগোড়া বলব। ডাক্তারী পেশার ফলে নানারকম রোগী আসত, দেহের গোপন অংগ কুৎসিত ব্যাধির জন্য আমাকে দেখাত চিকিৎসার প্রয়োজনে। এইসব বীভৎস দৃশ্য দেখে দেখে আমার সুরুচির বালাই নিঃশেষিত হয়ে গিছল। জানেন, য়ুরোপের মানুষকে যদি বড় শহর থেকে ছোট কোনো অঞ্চলে যেতে হয় তাহলেই তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে, কেউ কেউ বেশী করে সুরা পানের দিকে ঝোঁকে। বাড়ির টানে কেউ আকুল হয়। দিনযাপনের গ্লানি দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

ডাক্তারি পড়েছিলাম জার্মানীতে, পরীক্ষায় পাশ করার পর লাইপজীগে একটা ক্লিনিকে কাজ পাই। যখন বেশ পসার জমে উঠেছে তখন একটা স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ি। একটি রমণীর আমি প্রায় ক্রীতদাস হয়ে পড়ি, তার প্ররোচনায় পড়ে হাসপাতালের ক্যাস ভেঙে ধরা পড়ি। আমার খুড়োমশাই টাকাটা পরিশোধ করে আমাকে বাঁচালেন বটে, তবে লাইপজীগে আমার আর কোনো কাজ জোটানো গেল না। তখন একটা সংবাদ পেলাম ডাচ সরকারের উপনিবেশে চাকরী হওয়া সম্ভব। সেই চেষ্টা করে সফল হলাম। দশ বছরের কনট্রাক। অনেক টাকা আগাম পেলাম। খুড়োর ঋণ শোধ করে বাকী অর্থ লাইপজীগের একটি তরুণী বান্ধবীর হাতে দিয়ে কপর্দকহীন হয়ে য়ুরোপ ছাড়লাম। আপনি ঠিক যেখানটিতে বসে আছেন, সেদিন আমিও ঐখানে বসে দিন কাটিয়েছি।

ডাচ সরকার আমাকে ব্যাটাভিয়া বা যে সব জায়গায় য়ুরোপের মানুষ আছে সেইসব জায়গায় কাজ না দিয়ে একটা ছোট্ট অঞ্চলে পোস্ট করে দিলেন। সেখানে কয়েকজন সরকারী কর্মচারী আর একটা টাাস জাতীয় সম্প্রদায়ের বসবাস। সবই সয়। কালক্রমে সেখানকার পরিবেশ আর প্রকৃতি সয়ে গেল।

এই কলোনির শাদা চামড়ার মানুষ-গুলো আমার ভালো লাগত না। মদের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে চুপচাপ থাকতাম। হাতে কাজ না থাকলে আকাশ-পাতাল ভাবতাম। কনট্রাকট শেষ হতে তখন বছর দুই বাকী। তারপর অবসর নিয়ে য়ুরোপে ফিরে নিশ্চিন্ত জীবন কাটানো যেত!

ঠিক এই সময় একটা কাণ্ড ঘটল। এমনই সব চুপচাপ। ভদ্রলোকও নীরব। হয়ত ঘুমিয়ে পড়লেন ভাবছি। এমন সময় তিনি একটা হুইস্কির বোতল তুলে ধরলেন। রাত তখন তিনটে বেজে গেছে। তিনি আবার সুরু করেন :

সেই হতভাগা জায়গায় আমি মাকড়সার মত আটকে রইলাম। বর্ষা প্রায় শেষ। একটি সপ্তাহ ধরে বৃষ্টির আওয়াজ শুনেছি। কোনো য়ুরোপীয় মানুষের মুখ দেখিনি। বন্ধু বলতে এই হুইস্কির বোতল আর স্থানীয় চাকর-বাকর। যখন কোনো গল্প-উপন্যাসে য়ুরোপের সুসজ্জিত শহর কিংবা য়ুরোপের সুন্দরীদের কথা পড়তাম তখন আকুল হতাম। আপনি একজন পর্যটক। আপনি সহজেই বুঝবেন এই পরিবেশে মানসিক অবস্থা কেমন হয়। শাদা চামড়ার মানুষ এমন ক্ষেপে যায় যে অনেক সময় এলোমেলো কথা বলে। আমিও একদিন এইরকম মানসিক পরিস্থিতিতে টেবিলে একটা ম্যাপ ফেলে আমার সম্ভাব্য যাত্রার কথা ভাবছি এমন সময় আমার চাকর এসে বলল—একজন য়ুরোপীয় ভদ্রমহিলা আমার দর্শনপ্রার্থী।

তাজ্জব ব্যাপার! কোনো গাড়ি-ঘোড়ার আওয়াজ নেই, তিনি এলেন কোথা দিয়ে? কি উদ্দেশ্য কে জানে। আমি তাড়াতাড়ি সাজ-সজ্জা সামলে নিলাম। কে এই মহিলা? এই বসতিহীন অঞ্চলেই বা কি প্রয়োজন।

বাইরের ঘরে গিয়ে দেখি তিনি চেয়ারে বসে আছেন। একটি চীনা ছোকরা, তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে। মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিবাদন জানালেন। লক্ষ্য করলাম তাঁর মুখটা একটা পাতলা কাপড়ে ঢাকা। আমাকে তিনি ইংরাজীতে বললেন, আগে থাকতে আপনাকে খবর দিতে পারিনি মাফ করবেন। এখান দিয়ে যেতে যেতে মনে পড়ল আপনি এখানেই থাকেন। আপনার ত' খুব নাম—তা সন্ন্যাসীদের মত এখানে পড়ে আছেন কেন? শহরে চলুন না!

কিন্তু আমাকে কোনো জবাব দেওয়ার অবকাশ না দিয়ে তিনি একটানা কথা বলতে লাগলেন। তাঁর আচরণে একটা নাভাস ভংগী। একটা কোনো কারণেই তিনি এইভাবে কথার ঝড় তুলেছেন। তিনি আত্ম-পরিচয় গোপন রেখেছেন, হয়ত তিনি সুস্থ নন, কিন্তু সেই অসুখটা মনোবিকার নয় ত'?

কথায় কথায় তিনি আমাকে বিপর্যস্ত করে ফেললেন। আমি তাঁকে আহ্বান করে ওপরে তুললাম। সবতাতেই তিনি আশ্চর্য হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন। কী সুন্দর বাড়ি। কি সব বই, মনে হয় যেন সবগুলি পড়ি। এই বলে তিনি বইগুলির কাছে গিয়ে মলাটের ওপরকার নাম লক্ষ্য করতে থাকেন। আমি চা পানের আমন্ত্রণ জানাতে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আমার তেমন সময় নেই আজ। আপনার এইসব বই-টই দেখে মনে হয় যে আপনি ফরাসী ভাষায় সুপরিচিত। আমাদের ডাক্তার কিন্তু খালি ব্রিজ খেলতেই পারেন, আর কোনো গুণ নেই। আবার সেই সংগেই বই থেকে মুখ না ফিরিয়ে বললেন—পথ দিয়ে যেতে যেতে মনে হল একটা ব্যক্তিগত সমস্যা বিষয়ে আপনার অভিমত নেওয়া যাক। আজ বুঝি খুব ব্যস্ত? আমি না হয় অন্য কোনোদিন আসব।

আমি বললাম, যখনই প্রয়োজন হবে আসবেন দ্বিধাহীনচিত্তে।

আমার দিকে না ফিরেই সেলফের বই নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন—তা, অসুখটা তেমন গুরুতর কিছু নয়, মেয়েলী ব্যাপার, মাথা ধরে, একটু বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরে এই আর কি। আজই ত' সকালে মোটরে যাওয়ার সময় হঠাৎ কেমন অজ্ঞান হয়ে গেলাম। ভাগ্যিস আমার ছোকরাটা সংগে ছিল, ও ধরে ফেলল, নইলে ত' পড়ে যেতাম। একটু জল খেয়ে ঠাণ্ডা হলাম। আপনার কি মনে হয় গাড়ির স্পীড বেশী ছিল?

আমি বললাম—এ প্রশ্নের সোজাসুজি জবাব দেওয়া কঠিন, আপনার কি মাঝে মাঝে এমন হয়?

তিনি বললেন, আগে হয়নি। গেল হপ্তায় দুবার হয়। আজকাল সকালে বড় কাহিল মনে হয়।

এই বলে তিনি আবার আলমারির বই পরীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর চলাফেরা স্বাভাবিক নয়। আমি জবাব না দিয়ে দেখতে লাগলাম। তাঁর এই উপস্থিতি আমার কাছে বেশ লাগছিল।

ভদ্রমহিলা বললেন—তাহলে কি করবেন, আপনি রাজী। এমন কোনো কঠিন রোগ নয়।

আমি বললাম—পরীক্ষা করতে হবে। দেখা যাক জ্বর-টর আছে কিনা। নাড়ি দেখব।

আমি একটু এগোতেই উনি দু' পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন—না, না, জ্বরটর নেই। আমি টেমপারেচার দেখি। হজমের বিঘ্ন নেই।

স্পষ্ট বোঝা গেল, তিনি কিছু বলতে চান, বলতে পারছেন না। সুদীর্ঘ পথ মোটরে এসেছেন ফ্লবেয়ার সাহিত্য নিয়ে আমার সংগে আলোচনার খাতিরে নয়। আমিই নীরবতা ভেঙে বলি—মাফ করবেন, কয়েকটি প্রশ্ন আছে।

উনি বললেন—বেশ ত! ডাক্তারের কাছে সেই কারণেই ত' আসা। এই বলে আবার সেইভাবে বই দেখতে সুরু করলেন।

প্রশ্ন করলাম—আপনার সন্তানাদি কি জানতে পারি?

তিনি জানালেন যে তাঁর একটি সন্তান আছে। আমি আবার প্রশ্ন করি—প্রথমবার এইসব লক্ষণ দেখা গিয়েছিল নাকি?

উত্তেজিত ভংগীতে তিনি জানালেন—আগে এই লক্ষণ ছিল।

আমি তখন বললাম, তাহলে আমার অনুমানই নির্ভুল। একথায় তিনি বললেন, হাঁ। এরপর আমি তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য পাশের কামরায় যেতে বলায় তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তার দরকার নেই। আমি বেশ বুঝি কি হয়েছে।

এরপর আর এক পাত্র হুইস্কি টেনে ভদ্রলোক বললেন—একে ছটফট করে কাল কাটে, মনে শান্তি নেই, এমন সময় এই মহিলার আবির্ভাব। দীর্ঘকাল পরে শাদা চামড়ার রমণীকে চোখে দেখলাম। আগে ভেবেছিলাম তিনি নিছক আলাপ করতে এসেছিলেন, এখন দেখছি ব্যাপারটি জটিল। এর আগেও চোখের জল নিয়ে অনেক রমণী ভারমুক্ত হওয়ার আশায় আমার কাছে এসেছে, কিন্তু ইনি অন্য প্রকৃতির। দৃঢ় দীপ্ত ভংগী। যেন ভ্রুকুটিবিভঙ্গেই তিনি কাজ হাসিল করবেন। আমার মনে একটা কুটিল বাসনা উদিত হল। তাই যেন বুঝতে পারছি না এমন ভাব করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি বললেন—আমার হার্টটা একটু গোলমাল করছে। আমি যেই স্টেথিস্কোপটা টানতে গেছি তিনি বললেন: দেখুন আমার অস্বস্তি হার্টে, আপনার পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন। এখন আপনি বাঁচান।

আমি বললাম—তার আগে আপনার মুখের ঐ আবরণ সরান। ডাক্তারের কাছে কি কেউ মুখ লুকোয়?

আমার সামনে বসে পড়ে এতক্ষণে তিনি ওড়নাটি খুলে ফেললেন। অনেকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি পরিপূর্ণ যৌবন। তিনি আবার সেই নার্ভাস ভংগীতে বললেন—আমার প্রয়োজনটা নিশ্চয়ই বুঝেছেন?

—বুঝেছি, আপনি এই সবের হাত থেকে মুক্তি চান, তাই নয়? তবে কি জানেন এসব ব্যাপারে দুপক্ষেরই বিপদ আছে। অপারেশন করাটা যে আইনসংগত হবে না, তা হয়ত জানেন?

—জানি। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে এসব অপারেশন রীতিগত বৈধ বিবেচিত হয়। আপনি ডাক্তার, কি করা উচিত তা আপনি জানেন।

এতখানি দৃঢ়তার সংগে বললেন যে আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম। কিন্তু কিছুতেই তাঁর প্রভাবে পড়তে চাই না। আমি তাই বললাম—অন্য ডাক্তারের সংগে একটু কনসালট করা দরকার।

তিনি বললেন—বৃথা! আপনিই ব্যবস্থা করুন।

আমি বললাম—তা আমার কাছে এলেন কেন?

—আপনি জনসমাজের বাইরে আছেন, আপনাকে আমি এর জন্য যথেষ্ট অর্থ দেব।

টাকার পরিমাণ অনেক। টাকাটা তিনি এই শর্তে দেবেন যে আমি এই ডাচ কলোনি ছেড়ে চিরতরে চলে যাব। তার জন্য তিনি আমার পেনসন বাবদ ক্ষতির টাকাও দেবেন। অর্থাৎ তিনি টাকা দিয়ে আমাকে কিনতে চান।

আমার শরীরে একটা কামনার আগুন জ্বলে উঠল। মেয়েটির ওপর ঘৃণা হল, যেন একটা বিষধর নাগিনী আমাকে ছোবল মেরেছে।

একটু থেমে ভদ্রলোক আর একবার হুইস্কি টেনে বললেন—

আমি তেমন ভালো লোক নই বটে, তবে আগে অনেকের উপকার করেছি। কিন্তু আমার তখনকার সেই প্রবৃত্তি নিয়ে এঁকে দেখে অবধি আমার হৃদয়ের পাশব প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠল। কথাপ্রসংগে জানলাম মাস তিনেক আগে একদিন কামের তাড়নায় এই অবাঞ্ছিত শিশুর জনককে তিনি আত্মসমর্পণ করে আজ বিপন্ন। আমার অংগে যে যৌনআবেগ প্রবল হয়েছিল তা নয়, এই দর্পিতা মানবীকে জয় করার একটা প্রবল বাসনা আমার মনে জাগে।

আমি বললাম—শুধু টাকা নিয়ে এ কাজ আমি করতে চাই না। আমি যারা প্রার্থনা নিয়ে আসে তাদের শুধু সাহায্য করি।

তিনি বললেন—তাহলে আমাকেও কি সাহায্যভিক্ষা করতে হবে? তা সম্ভব নয়। তার চেয়ে মৃত্যু অনেক বাঞ্ছনীয়।

এবার আমি সোজাসুজি বললাম—আমি যে কি চাই নিশ্চয়ই বুঝেছেন, আমাকে সন্তুষ্ট করলে আপনাকে সাহায্য করব!

মহিলাটি তাচ্ছিল্যভরে হাসলেন। আমি অতি ক্ষুদ্র হয়ে গেলাম। বললাম—বেয়াদবি মাফ করবেন।

তিনি যাওয়ার সময় বলে গেলেন—আমাকে আপনি যদি অনুসরণ করেন তাহলে বিপদে পড়বেন। এই বলে তিনি তখনই চলে গেলেন। সমস্ত ঘরে একটা নীরবতা বিরাজ করতে থাকে। ভাবলাম—তাঁকে ঘরে এনে গলাটা টিপে ধরি।

আমার সাইকেলটা নিয়ে অনুসরণ করতে গেলাম, কিন্তু সেই চীনা ছোকরাটাকে দিয়ে এমন বাধা সৃষ্টি করল যে আমি কিছু করার আগেই তিনি মোটরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মাঝখান থেকে আমি বেকুব বনে গেলাম। অথচ এখানকার বিদেশীদের হাতে গোনা যায়, তাঁকে সন্ধান করা কঠিন হবে না।

জানা গেল তিনি এই প্রদেশের রাজধানী থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে থাকেন। একজন ডাচ ব্যবসায়ীর সংগে তাঁর বিবাহ হয়েছে, ভদ্রলোক মাস পাঁচেকের জন্য আমেরিকায় গেছেন। আমি যেন বিকারগ্রস্ত রোগীর মত হয়ে গেলাম। মালয়ের বাসিন্দারা একরকম মানসিক রোগে ভোগে তখন তারা অবলীলাক্রমে খুন পর্যন্ত করে, খুনের পর খুন করে যায়। শেষকালে এই ব্যাধিগ্রস্তকে গুলি করে মারতে হয়। আমিও এমনই বিকারগ্রস্তের মত মহিলার পিছু নিলাম। অতি কষ্টে তার পরদিন মহিলার বাড়িতে পৌঁছে কার্ড পাঠালাম। তিনি দেখা করলেন না, বললেন অসুস্থ।

ওঁর বাড়ির সামনেই একটা হোটেলে উঠলাম। প্রচুর হুইস্কি টানলাম তারপর ভেরনল ট্যাবলেট চড়িয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। প্রায় ভোর হয়ে এসেছে—এমন সময় জাহাজের ঘণ্টা বাজল। ঘুম ভেঙেই তিনি আবার সুরু করলেন—

আমি যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন আমার সারা অংগ জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত। জাহাজঘাটায় গিয়ে শুনলাম ওঁর স্বামী শনিবার ফিরবেন। স্থির করলাম তার আগেই মহিলাটিকে আমি সংকট থেকে মুক্তি দেব। এখন আর আমার অন্য কামনা নেই।

কোনো মতেই মহিলাটির সংগে দেখা করা গেল না। এই অচেনা শহরে সময় আর কাটে না। ডাচ রেসিডেন্ট একটা মোটর অ্যাকসিডেন্টে আহত হয়েছিলেন, তাঁর চিকিৎসা করেছিলাম আমি। তাঁর সংগে দেখা করে আমাকে বদলি করার অনুরোধ জানালাম। তিনি আমার মুখচোখের ভাব দেখে বললেন—একজন বদলি ডাক্তার পেলেই তিনি আমাকে ছুটি দেবেন। আমি একেবারে মরিয়া। তিনি বোধহয় সেই ভংগী লক্ষ্য করে বললেন—আপনি ত' কখনও ছুটি নেননি, একেবারে সন্ন্যাস জীবন চলছে আপনার। আজ সন্ধ্যায় আসুন না একটা ভোজসভায়, এখানকার সবাই প্রায় থাকবেন।

মনে মনে ভাবলাম সেই মহিলাটিও আসতে পারেন। তাড়াতাড়ি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। হাজির হলাম রাজভবনে সবায়ের আগে, প্রায় মিনিট কুড়ি চুপ-চাপ বসে, কেউ কেউ সস্ত্রীক এলেন। রেসিডেন্ট আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। ক্রমে নার্ভাস হয়ে পড়তে থাকি। এমন সময় সেই মহিলার আবির্ভাব। তাঁর পরনে পীত গাউন বেশ দেখাচ্ছিল। সকলের সংগে হাসি-খুশি মাখা কথা বললেও তাঁর ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে বুঝলাম। আমি ওঁর কাছে গেলাম। উনি দেখেও দেখলেন না। মুখের হাসি দিয়ে ভেতরের যন্ত্রণা ঢাকার চেষ্টা। আর তিন

দিন পরে স্বামী ফিরছেন আর আমি ও'র জন্য চিন্তা করছি। নাচ সুরু হতে তিনি একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের হাত ধরে যাওয়ার সময় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এই যে ডাক্তার! নমস্কার!

এই কথায় আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম। তবে কি তিনি ক্ষমা করেছেন। নাচের সময় তাঁর মুখে হাসি দেখে ভাবলাম, আমাদের কথাবার্তাগুলি তাঁর মানসপটে জেগে উঠেছে। নাচের মধ্যে বার বার তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমি অতিথিদের ভেতর দিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাকিয়ে রইলাম। তিনি হঠাৎ বললেন—মাফ করবেন। আমার শরীরটা ভালো নেই। এবার যাই।

ঘর থেকে তিনি যাবার সময় আমি তাঁর পিছু নিলাম। ঘরভরা লোক আমার দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে রইল। আমি তাঁর হাতটা ধরতেই তিনি পিছন দিকে তাকিয়ে বললেন—ও আমার বাচ্চার ওষুধের কথা। আপনারা হলেন বৈজ্ঞানিক। তাঁর এই মনের জোর দেখে আমি বিস্মিত হয়ে তাড়াতাড়ি একটা ঝুটো প্রেসক্রিপসান বানিয়ে দিলাম।

তিনি আমাকে এইভাবে বাঁচালেন। কিন্তু আমার ওপর তাঁর নিদারুণ ঘৃণা, পথের কুকুরের চাইতেও আমাকে অধম মনে করেন। আমি ঘরে ফিরে বেশ একটা কড়া ডোজ হুইস্কি টেনে নিলাম। তারপর নিঃশব্দে পালিয়ে এলাম। একটা যদি পিস্তল থাকত। কিন্তু আত্মহত্যা সহজ নয়। ভদ্রমহিলাটিকে সাহায্য করা দরকার, ও'র স্বামী যে এলেন বলে। জানাজানি হলে মহিলাটির যে আর কোনো উপায় থাকবে না।

আমি একখানি চিঠি লিখলাম। জানালাম তাঁকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই এসেছি, কাজ শেষ হলে চলে যাব, জবাব না পেলে আত্মহত্যা করব।

জবাব এল। তিনি লিখেছেন—দেরী হয়ে গেছে। তবে হয়ত একেবারে শেষকালে আপনার সাহায্য দরকার হবে, ততক্ষণ অপেক্ষায় থাকুন।

'না জানি কার দেখিয়াছি মুখ পেয়েছি তাহার চিঠি' এই মনোভাব নিয়ে সেই চিঠিখানিতেই বারবার চুমা খেলাম। তারপর যেন চেতনাহারা হয়ে পড়লাম। এইভাবে প্রায় তিন চার ঘণ্টা কাটল। সন্ধ্যার সময় দরজায় একটা ধাক্কা পেয়ে খুলে দেখি সেই চীনা ছোকরা দাঁড়িয়ে। সে বলল—তাড়াতাড়ি আসুন। দেরী চলবে না।

আমি তার পিছন পিছন একটা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। কিন্তু কিছুতেই ছেলেটার মুখ থেকে কথা বার করা গেল না। বিশ্বাসী লোক বটে। এদিকে গাড়োয়ান ঘোড়া দুটোকে এমনই চাবুক হাঁকাতে লাগল যে আশ-পাশের লোক ভয়ে ছুটতে লাগল।

য়ুরোপীয় টাউন পার হয়ে চীনা আস্তানায় এসে পৌঁছলাম। নোঙরা সরু গলি, বিশ্রী গন্ধে ভরা। কয়েকটা আফিং-এর আড্ডা, বেশ্যাপল্লী। এই রকম একটা ঘরে ধাক্কা দিতেই একটা চীনা মেয়ে বেরিয়ে এলো। সে নিয়ে গেল একটা সংকীর্ণ গলি দিয়ে একটা অন্ধকার ঘরে, ভিতর থেকে একটা যন্ত্রণাদায়ক চীৎকার। চীনা ছোকরাটি কেঁদে ফেলল। আমি ঘরে ঢুকে দেখি সেই মহিলাটি একটা নোঙরা মাদুরে শুয়ে যন্ত্রণায় আকুল হয়ে উঠেছেন, অন্ধকারে মুখটা দেখা যাচ্ছে না। গায়ে হাত দিয়ে অনুভব করলাম বেশ জ্বর। আমার কাছে সাড়া না পেয়ে তিনি এই হাতুড়ে চীনা দাই-এর শরণ নিয়েছিলেন, তারপর এই অবস্থা। আমার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তিনি অশিক্ষিতা চীনা দাই-এর হাতে মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত হয়েছেন।

অনেক কষ্টে একটি হ্যারিকেন জোগাড় করে আনল সেই চীনা দাইটা। মনে হল তাকে হত্যা করি। সেই ম্লান আলোয় দুর্ভাগা মহিলার রোগজর্জর দেহটা দেখলাম। মাথা ঠাণ্ডা করে চিকিৎসা করাটাই এখন বড়ো কাজ। একদিন যে রমণীর রূপলাবণ্য আমাকে লালসায় উন্মত্ত করেছিল আজ চোখের সামনে তার নগ্ন দেহটা দেখে শরীরে কোনো শিহরন নেই। যেভাবে অবিরাম স্রাব হচ্ছে কিভাবে সেই রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায় এই আমার চিন্তা। অপরিচ্ছন্ন সেই পরিবেশে এক টুকরো পরিষ্কার ন্যাকড়া বা একটু জল পাওয়ার উপায় নেই।

আমি রোগিণীকে বললাম, এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তিনি প্রবল বাধা দিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, এখানে আমার মৃত্যুও বরণীয়, কেউ জানবে না। আপনি বরং বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চলুন।

কোনোমতে একটা খাটিয়া করে তাঁকে এনে গাড়িতে তুললাম। বুঝলাম আর তেমন আশা নেই। এখন তিনি জীবন-মরণের সীমানায় এসে পৌঁছেছেন।

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক আমার হাত-দুটি সজোরে চেপে ধরে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর বেশ জোরলগায় বললেন, আপনি ত' একজন পর্যটক। মৃত্যুযন্ত্রণা কাকে বলে জানেন? মৃতকল্প মানুষ কিভাবে বাঁচার জন্য লড়াই করে দেখেছেন? আপনি সাধারণ ভবঘুরে এসব কি জানবেন। আমি ডাক্তার, আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি। সেদিনও দেখলাম। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কোনো অনুরোধই তিনি শুনলেন না। আর আমি সেই মৃত্যু বসে বসে দেখলাম।

আমাদের কেন মরণ হল না। সেই চীনা ছেলেটি মাটিতে বসে প্রার্থনা করছে, সে রক্ত দিতেও প্রস্তুত, আমিও দিতে পারতাম। কিন্তু তাতে ক্লেশ বাড়ত।

অতি ভোরে রোগিণী চোখ মেলে তাকালেন, সেই দৃষ্টি নম্র, অহঙ্কারের লেশ নেই। আমাকে দেখে একটু যেন কুণ্ঠিত হলেন। হয়ত পূর্বস্মৃতির পীড়া। তারপর উঠে বসার চেষ্টা করলেন—আমি বাধা দিয়ে শান্ত হতে বললাম। তিনি জড়ানো জড়ানো গলায় বললেন—এসব কথা যেন কোনোমতে প্রচার না হয়।

আমি কথা দিলাম, কেউ জানবে না। তিনি তবু কেমন অশান্ত। কোনোরকমে তিনি বললেন : আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, কেউ যেন একথা না জানতে পারে।

আমি শপথ করে প্রতিশ্রুতি দিলাম। তিনি বোধহয় আমাকে মার্জনা করেছেন। আবার কি বলতে চাইলেন কিন্তু সব শেষ। তিনি দিন শেষ হওয়ার আগেই চলে গেলেন।

জাহাজের চারপাশে তখনও রাতের জড়িমা। একটু একটু করে আকাশ ফরসা হচ্ছে। আকাশের তারা মুছে যাচ্ছে। এখন দিনের আলোয় দেখা গেল ভদ্রলোকের মুখ-খানা নিদারুণ ক্লেশে ও বিষাদে ম্লান।

গল্পের জের টেনে তিনি বললেন—কি ভীষণ অবস্থা কল্পনা করুন। তিনি নেই। মৃতদেহ আগলে আমি বসে আছি। সেখান থেকে উঠি তার উপায় নেই। কথা দিয়েছি। সমাজে মহিলাটির দারুণ সম্মান, আগের-দিন রাজভবনে ভোজসভায় তিনি নৃত্য করেছেন। ঘটনাটি জানাজানি হলে সবাই মৃত্যুর কারণটা জানতে চাইবে, জানার চেষ্টা করবে। চীনা ছোকরাকে বললাম—মনিব-গিন্নীর শেষইচ্ছা এসব যেন কেউ না জানে, সে কি তুমি জানো? সে যে জানে তা জানালো। ঘরদোর এমনভাবে সাফ করলো যে কোনোরকম সন্দেহের চিহ্ন রইল না।

আমি স্থির করলাম স্থানীয় কোনো অসুখের সার্টিফিকেট দেব। কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করতে বললাম—চীনা ছোকরাকে দিয়ে উনি আমাকে কল দিয়েছেন।

আমাকে বদলী করার অধিকারী বড় ডাক্তার এলেন। তিনি আমাকে সুনজরে দেখতেন না আমার চিকিৎসাখ্যাতির জন্য। তিনি এসে প্রশ্ন করলেন—মাদাম ব্ল্যাংক কি বেঁচে নেই!

আমি বললাম—আজ ভোর ছ'টার সময় মারা গেছেন।

—আপনাকে কখন 'কল্' দিয়েছিলেন।
—কাল সন্ধ্যায়।

—আপনাকে 'কল্' দিলেন কেন! আমি ও'র ডাক্তার।

আমি উত্তরে বললাম—হয়ত সময় কম ছিল, কিংবা আমার ওপর বিশ্বাস ছিল। তিনি বলেছিলেন, আর কাউকে যেন না ডাকি!

—বেশ, আপনার কাজ আপনি করেছেন। এখন আমাকে পরীক্ষা করতে দিন। এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণটা কি দেখি!

আমার মুখে কোনো উত্তর নেই। তিনি পরীক্ষা করতে যাচ্ছেন এমন সময় আমি বললাম—আমার কাছেই সব শুনুন। মাদাম ব্ল্যাক একজন হাতুড়ে চীনা দাইকে দিয়ে গর্ভপাত করাতে গিয়ে এই অবস্থায় পড়েছেন। আমাকে যখন ডাকলেন তখনই অবস্থা বেশ খারাপ, অনেক চেষ্টাতেও কিছু হল না। তিনি মরার আগে আমাকে দিয়ে শপথ করে নিয়েছেন যে, এই কলংক যেন কেউ না জানে।

—আর আপনার সেই কলংক আমি চেপে যাব।

আমি বললাম—দেখুন। এ অন্য কোনো ব্যক্তির কাজ। আমি এর জন্য দায়ী হলে বেঁচে থাকতাম না এতক্ষণ। আপনি বেশী বাড়াবাড়ি করবেন না, তাতে আমিও কষ্ট পাব।

—আপনি যে আমাকে হুকুম তামিল করতে বলছেন দেখছি। ওসব জাল সার্টিফিকেট দেওয়া আমার ব্যবসা নয়।

আমি বললাম—তা না দিলে, আপনি এ ঘর থেকে প্রাণ নিয়ে যেতে পারবেন না। আমি খালি পকেটে হাত দিয়ে পিস্তল টানবার চেষ্টা করতে তিনি পিছিয়ে গেলেন।

আমি বললাম—আপনি একটা সার্টিফিকেট দিন যে, কোনো ছোঁয়াচে রোগে হৃদয়যন্ত্রের কাজ বন্ধ হওয়াতে মৃত্যু হয়েছে। আমি এই দেশ ছেড়ে চলে যাব, নয়ত আপনি যদি বলেন ও'র দেহ সমাধিস্থ হলে আত্মহত্যা করব।

ভদ্রলোক একটু ভীত হয়েছিলেন। বললেন, আমি কখনও জাল সার্টিফিকেট দিই নি। ওটা অধর্ম হবে।

আমি বললাম—আপনার কথা ঠিক। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অন্য। মৃতের সম্মানটা দেখুন। জীবিত মানুষটার কথাও ভাবুন।

শেষ পর্যন্ত তিনি সম্মত হলেন। আমরা একটা সার্টিফিকেট তৈরী করলাম। তারপর তিনি বললেন, তবে আপনি কিন্তু এ দেশ ছেড়ে যাবেন। আমি বললাম—সে কথা ত' দিয়ে রেখেছি।

পাকা লোক। তিনি বললেন, মাদাম ব্ল্যাকের স্বামী মৃতদেহটা বোধ হয় ইংলণ্ডে নিয়ে যাবেন। আপনি ভাববেন না, আমি কফিনটা ভালো করে শীল করে দেব। এসব গরমের দেশ। মৃতদেহ রাখা যায় না।

এতক্ষণে তিনি আমার বন্ধু হয়ে গেছেন। তাঁর মনে অনেক শান্তি। আমি চলে গেলে তাঁর ব্যবসা জোরদার হবে। তিনি হ্যাণ্ডসেক করে বললেন—আশাকরি সুস্থ হয়ে উঠবেন তাড়াতাড়ি।

উনি হয়ত আমাকে পাগল ভেবেছেন। উনি চলে যাওয়ার পর আমি সেই মৃতদেহের পাশে অচৈতন্য হয়ে পড়লাম। অনেক পরে চীনা ছোকরাটি বলল, কে একজন এসেছেন।

আমি বললাম—কারো আসা চলবে না। চীনাটা কি বলতে যাচ্ছিল। আমি বললাম, কে এই ভদ্রলোক?

চীনা বলল—সেই লোকটি। বাকী কথাটুকু লজ্জায় আর বলা হল না।

বুঝলাম, এই লোকটি কে। আমি এর কথা বিস্মৃত হয়েছিলাম। আগে হলে হয়ত ওকে ছিঁড়ে ফেলতাম, ওই ত প্রেমিক। পাশের ঘরে লোকটিকে দেখলাম। অল্প বয়স। তাঁর দেহে একটা কোমলতা। আমাকে নমস্কার জানাতে তার হাত কাঁপছে। ভাবলাম ওকে আলিঙ্গন করি। প্রেমিকের সকল লক্ষণ তার মধ্যে বর্তমান। এমন পুরুষকে এড়ানো কঠিন।

জলভরা চোখে সে বলল—আমি একবার মাদাম ব্ল্যাককে দেখব। তার কাঁধে হাত রেখে নিয়ে গেলাম যে ঘরে মৃতদেহ রাখা রয়েছে। ছেলেটি আমার মুখের দিকে কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে তাকায়। আমরা দুজনেই একজনকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে পড়েছি। সান্ত্বনার ভঙ্গীতে আমি ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম। সে বলল, ডাক্তার, উনি কি আত্মহত্যা করেছেন? না আর কেউ আছে এর পিছনে? পরশুদিন রাজভবনে ও'কে দেখেছি, আর এর ভেতর এমন কান্ড!

আমি আসল ব্যাপার ভাঙলাম না। আমি কি সূত্রে জড়িত তা জানালাম না। ছেলেটির সঙ্গে এর পরও দুদিন ধরে আমার আলোচনা হয়েছে।

কফিন আঁটার পর, মহিলার স্বামী এসে পৌঁছলেন। ভদ্রলোক আমাকে খুঁজেছিলেন, কিন্তু আমি দেখা করতে পারিনি। মহিলাটির প্রেমিক আমাকে একটা ছদ্মনামে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে দিয়েছে। সেই পাসপোর্ট নিয়ে আমি সিঙ্গাপুরের জাহাজে উঠেছি। টাকাকড়ি সব আমার পড়ে রইল।

কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, আমি জাহাজে ওঠার পর দেখি কপিকলে করে একটি কফিন তোলা হচ্ছে। তখন অনেক রাত। মনে হল আমি যেমন সেই মহিলাটিকে অনুসরণ করেছিলাম এখন মৃতদেহটা আমাকে অনুসরণ করছে। কফিনের পাশে ভদ্রমহিলার স্বামী দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোক দেহটা ইংলণ্ডে পরীক্ষা করাবেন বুঝলাম। আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি কিছুতেই ভদ্রলোককে জানতে দেব না তাঁর স্ত্রীর আসল মৃত্যুর কারণ কি।

এই পর্যন্ত বলে তিনি আমাকে বললেন, বুঝেছেন কেন আমি জাহাজের কলরব সইতে পারি না। খালি সেই কফিনের কথা ভাবছি। আমি ও'র নাম কলঙ্কিত হতে দেব না।

উনি উঠে পড়লেন। সুরার ঘোরে ওঁর চোখ জ্বলছে। দিনের আলোয় বোধ হয় আমার কাছে সব কথা বলেছেন বলে একটু লজ্জা অনুভব করলেন।

আমি বললাম—সন্ধ্যার পর আমার ঘরে আসুন না।

তিনি জবাবে বললেন—আমার একাই একা-একা থাকতেই ভালো লাগে। আর জানেন, ভাববেন না আপনাকে এসব বলে আমি বুকের ভার হালকা করলাম। এতদিন চাকরী করেও আমি আজ ভিখারী। জার্মানীতে ভিক্ষে করতে হবে পথে পথে। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বেশ ভালো লাগল।

দিনের আলোয় অপরিসীম লজ্জায় তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন বুঝলাম। বললেন, জানেন, আপনার কাছে বুক হালকা করার চেয়ে এই রিভালবারটা আমাকে অনেক শান্তি দেবে।

আর কিছু না বলে তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন।

আবার তাঁকে খুঁজেছিলাম ডেকের ওপর মধ্যরাতে। দেখতে পাই নি। দেখলাম মাদাম ব্ল্যাকের স্বামী সেই ডাচ ভদ্রলোককে। তিনি আপন মনে ডেকে পায়চারী করছেন।

নেপলসে জাহাজ এসে পৌঁছাল, অনেক যাত্রী নেমে গেলেন। আমিও নেমে ওপেরায় নাচ দেখলাম, একটা ভালো কাফেতে ডিনার খেলাম তারপর জাহাজে ফেরার পথে একটা কলরব শুনলাম, মাঝিরা টর্চ জেলে কি খুঁজছে। কি যে ব্যাপার কে জানে!

জেনিভায় জাহাজটা যখন এল একখানা সংবাদপত্র পাঠ করতে গিয়ে সংবাদটা নজরে পড়ল। অন্ধকারে একটি কফিন নামিয়ে দেশী নৌকায় করে যখন পার করা হচ্ছিল তখন একজন উন্মাদ জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ে, ফলে নৌকাটি উল্টে যায়, কফিনটা অদৃশ্য হয়, এই নৌকায় যাঁর কফিন সেই মহিলার স্বামীও ছিলেন, তিনি এবং অন্যান্য যাত্রীরা অবশ্য আশ্চর্যরকম বেঁচে গেছেন। সেই সঙ্গে আর এক খবর নেপলস বন্দরের কাছে একটি অজ্ঞাত পরিচয় মানুষের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, তার মাথায় রিভালবারের গুলির আঘাতচিহ্ন রয়েছে।

দুটি ঘটনা পরস্পর যুক্ত বলে অবশ্য সংবাদপ্রেরক মনে করেন না।

এই সংবাদ পাঠ করার সময় বার-বার সেই ভদ্রলোকটির বিষাদ মলিন মুখখানি আমার চোখে ভেসে উঠতে লাগল।

—ইন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক সংক্ষেপিত ও অনূদিত।।

(১০২)

নরোত্তম দত্ত

আকুমারব্রহ্মচারী, সর্বতীর্থদর্শী ও **পরমভাগবতোত্তম।**

রাজসাহি জেলার রামপুর-বোয়ালিয়ার **ছয় ক্রোশ উত্তর**-পশ্চিমে খেতুরিতে মাঘী পূর্ণিমায় আবির্ভাব। পিতা কৃষ্ণানন্দ, মাতা নারায়ণী। জেঠা পুরুষোত্তম, জেঠতুতো **ভাই** সন্তোষ।

কৃষ্ণানন্দ মুসলমান জায়গিরদারের **অধীনে একটি ক্ষুদ্র** রাজ্যের রাজা। যদিও **রাজ্যভার কৃষ্ণানন্দের** উপর, কৃষ্ণানন্দ আর পুরুষোত্তম দুই ভাইয়েরই সমান রাজ-সম্মান।

কানাইর নাটশালাতে পৌঁছে নৃত্য **কীর্তন করতে-করতে** মহাপ্রভু 'নরোত্তম' **বলে ডাক দিয়ে ওঠেন** আর পদ্মায় স্নান করতে নেমে পদ্মাবতীকে বলে যান, তোমাকে প্রেম দিয়ে **যাচ্ছি, যথাকালে** নরোত্তম এলে **তাকে এই বিত্ত** দিয়ে দিও।

নরোত্তম কোথায়?

সে এখনো ভূমিষ্ঠ হয় নি। আগে **জন্মাক**, বড় হয়ে জলে নামতে শিখুক, ঠিক আসবে সে এখানে স্নান করতে।'

তাকে আমি চিনব কিসে?

তার গাত্রস্পর্শে। যার গাত্রস্পর্শে তুমি **বেশি উজ্জ্বল হবে, জানবে সেই নরোত্তম।**

অন্নপ্রাশনের সময় নরোত্তম **কিছুতেই অন্ন মুখে নিল না।** তখন তাকে বিষ্ণু-নৈবেদ্য **এনে দেওয়া হল। আনন্দে তাই সে** নিল **হাত** বাড়িয়ে।

জেঠা পুরুষোত্তম বললে, আজ থেকে **কৃষ্ণের প্রসাদ ছাড়া আর কিছু** ওকে খেতে **দিও না।**

বাল্যকাল থেকেই নরোত্তমের বৈরাগ্য-**ভাব। তার উপর পূজারী ব্রাহ্মণ** পূজাশেষে **রোজ** তাকে **চৈতন্যলীলা** শোনায়। মন **বৈরাগ্যে আরও বেশি গাঢ় হয়।** তারপর কিশোর বয়সে — নরোত্তমের বয়স তখন বারো — স্বপ্নাদেশে পদ্মায় স্নান করতে **নেমে দেখল নদী সহসা উত্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। এ নদীর জলোচ্ছ্বাস**, না, নরোত্তমের **প্রেমোচ্ছ্বাস! শুধু** তাই নয়, প্রেম পেয়ে তার গায়ের **শ্যামবর্ণ** গৌর **হয়ে** গেল। মনে হল এক গৌরবর্ণ শিশু তার মধ্যে প্রবেশ করে তাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। বৈরাগ্যে আরও গম্ভীর **হল** নরোত্তম।

তার ঔদাসীন্য দেখে তার বাপ-জেঠা বিয়ের **কথা ভাবল। লাগল পাত্রী** খুঁজতে।

নরোত্তম ঠিক করল বৃন্দাবন **পালাব।**

কিন্তু পালাবে কী করে? তাকে পাহারা **দেবার জন্যে প্রহরী রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রেমদাতা মহাপ্রভু কি পালাবার পথ করে** দেবেন না?

কদিন পরে জায়গিরদারের আশোয়ার এসে হাজির—সদরে **পুরুষোত্তম** ও কৃষ্ণানন্দের তলব হয়েছে। তারা দুজন চোখের আড়াল হলেই অনায়াসে প্রহরীদের চোখে ধুলো দিল নরোত্তম। গৃহত্যাগ করল।

কাশী মথুরা হয়ে নরোত্তম পৌঁছল বৃন্দাবন। সহায় নেই, সম্বল নেই, আশ্রয় নেই, আশ্বাস নেই, তবু বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। রাজৈশ্বর্য উপেক্ষা করে এসেছে তার **জন্যেও মনস্তাপ নেই। বৃন্দাবনে** পরমানন্দ **আছেন এই** যথেষ্ট।

উদাসীন অকিঞ্চন বৈষ্ণব কেউ বৃন্দাবনে এলেই জীব গোস্বামী তার ভার নেয়। এক্ষেত্রে **নরোত্তমকেও জীব গোস্বামীই** আশ্রয় দিল।

ক্রমে মিলল এসে শ্রীনিবাস।

রাঘব গোস্বামীর সঙ্গে নরোত্তম ও শ্রীনিবাস সমগ্র মাথুর মণ্ডল পরিক্রমা **করল। সকল সাধু-বৈষ্ণবের সঙ্গে নরোত্তমের** পরিচয় **হল।** কিন্তু লোকনাথ **গোস্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্রই তার চরণে** আত্ম-**সমর্পণ করল নরোত্তম। প্রার্থনা** করল, আমাকে দীক্ষা দিন।

লোকনাথ বললে, আমার কোনো শিষ্য নেই। **আমি কাউকে দীক্ষা দিই না।**

নরোত্তম লোকনাথের কুঞ্জের কাছে বাসা নিল। জীবের কাছে পড়তে লাগল **গোস্বামী**-গ্রন্থ আর অগোচরে লোকনাথের সেবায় মন দিল। নীচ সেবাকেও বরণ করে নিল।

লোকনাথ **সাধন-ভজনে** ডুবে থাকে, লক্ষ্যও করে না কে তার জন্যে শৌচ-মৃত্তিকা তৈরি করে রাখছে। একদিন প্রত্যুষে ঘুমে থেকে উঠে নরোত্তমকে ধরে ফেলল—'মৃত্তিকা শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে।' জিজ্ঞেস করল, তুমি এ কাজ করছ কেন? কে করতে বলেছে?

কেউ বলে নি। আমি নিজের থেকেই করছি। তুমি আমাকে শিষ্য বলে মেনে না নিলেও আমি তোমাকে গুরু বলে মানছি। তুমি প্রভু, আমি দাস।

লোকনাথ আরেক দিন দেখল খুব **ভোরে তার অঙ্গনে কে ঝাঁট দিচ্ছে।**

অন্ধকার তখনো ভালো করে কাটে নি, লোক চেনা যাচ্ছে না, লোকনাথ হাঁক দিল: কে?

নরোত্তম।

লোকনাথের চিত্ত দ্রবীভূত হল। রাজার ছেলে গুরুসেবায় ঝাড়ুদার সেজেছে, মেথর সেজেছে। লোকনাথের সংকল্প ভঙ্গ হল। নরোত্তমকে দিল মন্ত্রদীক্ষা।

অল্পদিনেই বহুশাস্ত্র আয়ত্ত **করল নরোত্তম।** সমস্ত অগ্রণী বৈষ্ণবের অনুমতি নিয়ে জীব **নরোত্তমকে 'শ্রীমহাশয়'** বা 'শ্রীঠাকুরমহাশয়' উপাধি দিল।

মথুরা-পরিক্রমা সমাপ্ত হয়েছে এবার গৌড়ে ফিরে যাও। আদেশ **করল জীব গোস্বামী। প্রচার-প্রকাশের জন্যে নিয়ে যাও গ্রন্থাবলী।**

কাঠের **সিন্দুকে করে** বই **যাচ্ছে** গরুর গাড়িতে। সঙ্গে **যাচ্ছে** তিনজন, দুজন **জীবের দুই বাহু**, নরোত্তম আর শ্রীনিবাস, তৃতীয়**জন শ্যামানন্দ।**

যাত্রাকালে লোকনাথ নরোত্তমকে বলে **দিল, বিয়ে করবে না, তেল মাখবে** না, মাছ খাবে না, রাধাকৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণবসেবা করবে **আর কীর্তন প্রচার করে বেড়াবে।**

বিষ্ণুপুরের অঞ্চলে পৌঁছুলে গ্রন্থসম্পদ অপহৃত হল। এত বড় বিপর্যয়েও শ্রীনিবাস ধৈর্য হারাল না। নরোত্তমকে বললে, তুমি খেতুরিতে চলে যাও আর শ্যামানন্দকে তোমার সঙ্গে নিলেও পরে উড়িষ্যায় পাঠিয়ে দিও। আমি গ্রন্থ-উদ্ধার না করে ফিরব না।

তারপর যখন গ্রন্থ উদ্ধার হল তখন শ্রীনিবাস লোক দিয়ে সংবাদ পাঠাল খেতুরিতে।

নরোত্তমের অভাবে তখন খেতুরির রাজা সন্তোষ দত্ত। গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ শুনে সে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত। 'করিল মঙ্গলক্রিয়া বিবিধ বিধানে।' সন্তোষের এই আচরণ সকলের প্রীতিপ্রদ হল। রাজা হলে কী হবে, সন্তোষ নরোত্তমেরই ভাই।

শ্যামানন্দ উৎকলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল আর নরোত্তম প্রবেশ করল নবদ্বীপে।

প্রবেশপথে অশ্বত্থবৃক্ষের নিচে এক প্রাচীন বিপ্রের সঙ্গে দেখা। আগন্তুক দেখে বিপ্র কৌতূহলী হল। তোমার নাম কী, কোত্থেকে আসছ?

নরোত্তম তার নাম বলল, পরিচয় দিল। বিপ্র বুঝল এ নিঃসংশয় নিমাইয়ের কৃপা-পাত্র! নইলে এমন শ্রী হয়, চিত্তে এত আর্দ্রতা!

আমাকে নবদ্বীপের কথা বলুন।

গৌড়পৃথ্বী সকল তীর্থের শিরোমণি-স্বরূপ। কেন? যেহেতু সে নবদ্বীপ নগরীকে ধারণ করে আছে। নবদ্বীপ নগরী মহীয়সী কেন? যেহেতু সেখানে কনকবররুচি ঈশ্বর বা গৌরসুন্দরের অবতার। গৌরা-বতারের বৈশিষ্ট্য কী? গৌরাবতারে ভক্তি-দেবী মূর্তিমতী হয়ে নগরে-নগরে জনে-জনে আত্মপ্রকাশ করছেন।

ব্রাহ্মণ বললে, যে অশ্বত্থগাছের নিচে তুমি বসেছ এখানেই নিমাই তার শিষ্যদের নিয়ে কত শাস্ত্রচর্চা করেছে। এখানে এখনো সে শিষ্যদের নিয়ে বিহার করে দেখতে পাই মাঝে মাঝে।

আরও বললে সব লীলাকথা। বললে, বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী দেহ রেখেছেন, শ্রীবাসও অপ্রকট।

তারপর মায়াপুরের পথ দেখিয়ে দিল ব্রাহ্মণ। ওখানেই জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ি।

সেখানে প্রথমে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে নরোত্তমের দেখা হল। তারপর দেখা হল ঈশানের সঙ্গে। শচী-ভৃত্য প্রভু-প্রিয় ঈশান। দামোদর পণ্ডিত কাছে এসে দাঁড়াল। তোমাকে দেখতে বড় সাধ ছিল। শ্রীবাসের ছ ভাই শ্রীপতি শ্রীনিধিও এসে আশীর্বাদ করল।

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে নরোত্তম শান্তিপুরে গেল। দেখল প্রভুর মন্দিরে অচ্যুতানন্দ নির্জনে বসে আছে। ক্ষীণ দেহ, শোকখিন্ন। দু হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিল নরোত্তমকে। বললে, তোমাকে এখানে বেশি দিন আটকাব না, তুমি যত শিগগির পারো নীলাচলচন্দ্রকে দেখে এস।

হরিনদী গ্রামে গঙ্গা পার হয়ে অম্বিকা-কালনায় গেল নরোত্তম। সেখানে হৃদয়-চৈতন্যের থেকে আশীর্বাদ নিল। সেখান থেকে গেল সপ্তগ্রামে, নিত্যানন্দের বিহার-ক্ষেত্রে। উদ্ধারণ দত্তেরও তখন সঙ্গোপন হয়েছে। সপ্তগ্রাম থেকে গঙ্গাতীরের পথ ধরে চলে এল খড়দহে। খড়দহে বসুধা ও জাহ্নবী ঠাকুরাণী কয়েক দিন ধরে রাখল নরোত্তমকে। কৃষ্ণকথারসে রাত-দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল কেউ বুঝতেও পারল না। যাবার সময় কথা বলতে গিয়ে কাঁদতে লাগল বীরভদ্র। আশীর্বাদ করতে এসে মহেশ পণ্ডিতেরও সেই দশা। খানাকুলে যাবার পথ কী? পরমেশ্বরী দাস পথ দেখিয়ে দিল।

'নীলাচল পথের পথিক নরোত্তম।
যথা ভক্ত লয় তথা করয়ে গমন।'

খানাকুলে অভিরাম ও মালিনীর আশীর্বাদ নিয়ে নরোত্তম নীলাচলের পথ ধরল।

অবিশ্রান্ত দ্রুত হেঁটে অল্পদিনেই পৌঁছে গেল নীলাচল।

ভক্তিময় কলেবর, দুই দীর্ঘ নেত্রে পুঞ্জিত অশ্রু, নরোত্তমকে দেখেই গোপীনাথ আচার্য চিনতে পারল। আজ তুমি আসবে সকাল থেকেই এ কথা মনে হয়েছে। যাও আগে জগন্নাথ দর্শন করে এস। শিখি মাহিতী নিয়ে গেল মন্দিরে।

তারপর টোটা-গোপীনাথে গেল গদা-ধরের অবস্থান-ক্ষেত্র দেখতে। এইখানে বসে গদাধর ভাগবত পড়ত আর এইখানে বসে প্রভু তা শুনতেন। দেখল হরিদাস-ঠাকুরের সমাধিক্ষেত্র। কাশী মিশ্রের ভবনে গোপাল গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। দেখা পেল বাণীনাথের, কানাই খুটিয়ার। মঙ্গরাজের, মামু গোস্বামীর।

তারপর পুরী-পরিক্রমা শেষ করে নরোত্তম গেল নৃসিংহপুরে, সেখানে শ্যামা-নন্দ আছে। সমস্ত বার্তা জানিয়ে শ্যামা-নন্দকে বললে নীলাচলে যেতে, আর নিজে প্রত্যাবর্তনের পথ ধরল। থামল এসে শ্রীখণ্ডে। নরহরি সরকার ঠাকুরকে দর্শন করল। দেখল গৌরাঙ্গ বিগ্রহ। সেখান থেকে গেল যাজিগ্রামে, মিলল শ্রীনিবাসের সঙ্গে।

শ্রীনিবাস বললে, শিগগির খেতুরিতে ফিরে যাও। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করো। ভক্তি-ধর্ম প্রচার করো।

কাটোয়ায় গদাধর দাসের সঙ্গে দেখা করে একচক্রায় নিত্যানন্দের লীলাস্থলকে প্রণাম করে নরোত্তম খেতুরিতে ফিরে এল।

অধম দুর্জনের দল ভক্তিতে মহামত্ত হয়ে উঠল। 'খণ্ডিলা পাষণ্ড মত ভক্তি প্রকাশিয়া।'

গোপালপুরের কাছাকাছি এক গ্রামে থাকে এক ভাগ্যবন্ত লোক, নাম বিপ্রদাস। তার গৃহে ধান্য-সর্ষপের এক গোলা আছে, তার মধ্যে বিষধর সাপের বাসা, কারু সাহস নেই কাছে এগোয়। বাইরে থেকেই সর্প-গর্জন শোনা যায়।

একদিন রজনী প্রভাতে নরোত্তম এসে হাজির। বিপ্রদাসকে বললে, গোলার দরজা খোলো আমি ভিতরে ঢুকব।

বিপ্রদাস শতহস্তে নিষেধ করল, অমন কাজ করবেন না, ভয়াবহ সাপ আছে ভিতরে।

চিন্তা কোরো না। সাপ পালিয়ে যাবে।

বৃহৎ গোলা-দ্বার উদ্ঘাটিত হল। সাপ কোথায়? ভিতরে আছেন প্রিয়াসহ গৌরাঙ্গ-সুন্দরের বিগ্রহ।

বিগ্রহ-উদ্ধারের পর তার প্রতিষ্ঠার আয়োজনে ব্যস্ত হল নরোত্তম। প্রতিষ্ঠার জন্যে সিংহাসন তৈরি করো। সিংহাসনের জন্যে শ্রীমন্দির।

এই আয়োজনের প্রধান উদ্যোক্তা নরোত্তমের জেঠতুতো ভাই, রাজা সন্তোষ দত্ত।

সেইদিন থেকেই খেতুরিতে মহোৎ-সবের বাজনা বেজে উঠল। হল কীর্তনের শুভারম্ভ।

সে এক বিরাট উৎসব। সারা বাংলার বৈষ্ণব সমাজ সমবেত হল খেতুরিতে। এত বৃহৎ সমাবেশ বাংলা দেশে আর কখনো কোথাও ঘটে নি। ভক্তদের জন্যে অসংখ্য বাসা তৈরি করাল সন্তোষ, পদ্মায় নৌকোর ব্যবস্থাও প্রভূত প্রচুর। কত কত খোল করতালই তৈরি করাল আর খাদ্যদ্রব্যের সংস্থানও কী অপরিমেয়। কী বিশাল সংকীর্তনস্থলী, কী অপূর্ব বেদীসজ্জা আর কী নয়নমনোহর মন্দির। সন্তোষ শুধু রাজা নয়, রাজার মত রাজা।

এল শ্রীনিবাস, গোকুল, দেবীদাস, গোবিন্দদাস—এল জাহ্নবা ঠাকুরাণী। এল রঘুনন্দন, এল বল্লভ দাস। কত কত মহান্ত, তার অন্ত নেই। বাদক নর্তক গায়ক কথক তারও বা কে গণনা করে? মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে ছয় সিংহাসন ছয় বিগ্রহের অভিষেক হল। আগের পাওয়া গৌরাঙ্গবিগ্রহ আর নতুন বিগ্রহ পাঁচটি — বল্লভীকান্ত, ব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকান্ত আর রাধারমণ। যথা-বিহিত মন্ত্রে শ্রীনিবাস অভিষেক করল আর নরোত্তম গোকুল বল্লভ দেবীদাসকে নিয়ে সংকীর্তন সমুদ্রে উতরোল করে তুল্ল। অনিবন্ধ গীতে কত স্বরালাপ, কত গমক-মন্দ্র, কত মূর্ছনা, কত বা বিচিত্র ভনিতা। 'রাগিনী সহিত রাগ মূর্তিমন্ত কৈলা।' মহাপ্রভুর সঙ্গীত-আসরে যে পুলকাবেগ উথলে উঠত এখানে এখনো বুঝি সেই ভাববন্যা। তবে কি সপার্ষদ মহাপ্রভুই এলেন বিলাস করতে?

খেতুরির এই মহামিলনোৎসবই ভক্তি-ধর্মের স্রোতকে সারা বাংলায় উজ্জীবিত করে তুলল। এই উৎসব নিয়মিত চলল প্রতি বৎসর।

উৎসবান্তে নরোত্তম খেতুরিতেই থেকে গেল। সমপ্রাণ-সখা রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে বসে শাস্ত্রালোচনা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও নামসংকীর্তন নিয়ে মেতে রইল। বিপ্র-বৈষ্ণব একত্রে বসে পাঠ নিতে লাগল।

শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র পড়াচ্ছে পাছ-পাড়া গ্রামের বৈদিক ব্রাহ্মণ গুরুদাস ভট্টাচার্য দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে নরোত্তমের নিন্দা করতে লাগল। ভক্তনিন্দার ফল হাতে-হাতে পেল গুরুদাসের কুষ্ঠ হল। তখন উপায়ান্তর না পেয়ে নরোত্তমের কৃপা প্রার্থনা করল। নরোত্তম তাকে প্রেমালিঙ্গন দিল। প্রেমালিঙ্গন দিতে গুরুদাসের আপত্তি হল না। দেখল রোগমুক্ত হয়ে গিয়েছে।

গোয়াসের শিবাই আচার্যের দুই ছেলে—হরিরাম ও রামকৃষ্ণ। বাপের কথায় পদ্মাপারের হাটে ছাগ-মেষ কিনতে এসেছে—ভবানীপুজোর জন্যে। কেনাকাটা করে সবে ফিরছে, নরোত্তম ও রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। জীবহিংসা অন্যায়, অসঙ্গত — দু ভাইকে বোঝাল নরোত্তম। দু ভাইয়ের মন গলে গেল, ক্রীত পশু ছেড়ে দিয়ে চলে এল খেতুরিতে। নরোত্তমের কাছে দীক্ষা নিয়ে বসল। গোয়াসে ফিরে সরাসরি বাপের সামনে হাজির হতে সাহস হল না। বলরাম কবিরাজের বাড়িতে রাত কাটাল।

প্রভাতে দেখা হতেই শিবাই আচার্য দুই ছেলেকে নিদারুণ তিরস্কার করল। ব্রাহ্মণ হয়ে শূদ্রের কাছে দীক্ষা! ডাকো নরোত্তমকে, পন্ডিতসমাজের সামনে, দেখি কেমন তার শাস্ত্রব্যাখ্যা।

হরিরাম বললে, পন্ডিতসমাজকে ডাকুন, গুরুর আশীর্বাদে আমিই তাদের পরাস্ত করতে পারব।

তখন মিথিলা থেকে দিগ্বিজয়ী পন্ডিত মুরারিকে আনাল শিবাই। নরোত্তম পর্যন্ত যেতে হল না, বলরাম কবিরাজই তাকে পরাভূত করল।

সকলে তখন বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্য স্বীকার করে নিল।

কিন্তু গাম্ভীলার গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী নিরস্ত হয় না। সর্ববিদ্যাবিশারদ বলে তার খ্যাতি। সেও নরোত্তমের সংস্পর্শে এসে নিরবধি-সংকীর্তনে মগ্ন হয়ে গেল। প্রেম-ধনে ধনী হয়ে উঠল আর তারই ফলে শত শত শিষ্যর নিত্যকার অন্ন জোগানোর ভার নিল। নাম হল চক্রবর্তী-ঠাকুর।

ভগবতী-পাঠক জগন্নাথ আচার্যও নরোত্তমের বশীভূত হল।

পক্কপল্লীর নরসিংহ, তার সভায় অনেক ব্রাহ্মণ-পন্ডিত, সর্বশ্রেষ্ঠ রূপনারায়ণ। রাজসভায় এক ব্রাহ্মণ এসে নালিশ করল নরোত্তম কুহকবলে বিপ্রদের বৈষ্ণব করে ফেলছে, এর প্রতিবিধান প্রয়োজন। রাজা বললে, আমিই নরোত্তমের সম্মুখীন হব। সে পশুবধ বন্ধ করে দিচ্ছে, তান্ত্রিক ক্রিয়া হতে দিচ্ছে না, এরও প্রতিকার চাই। রূপ-নারায়ণ, তুমিও আমার সঙ্গে চল।

রাজপন্ডিত ও আরো পন্ডিত নিয়ে খেতুরির দিকে যাত্রা করল রাজা।

রাজা ও তার লোকজন কুমারপুরে বিশ্রাম করছে, কয়েকজন কুম্ভকার ও বারুজীবী তাদের পণ্য বেচতে এল। কিন্তু এ কী আশ্চর্য, গ্রাম্য বেপারী, কী চমৎকার সংস্কৃত বলছে!

তোমরা এত সুন্দর সংস্কৃত শিখলে কোথায়?

খেতুরির মন্দিরের কাছে আমরা বেসাতি করি, ওখানকার বৈষ্ণব পন্ডিতদের সংস্পর্শে এসেই আমাদের এই যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যালাভ।

রাজার লোকজন মুগ্ধ হয়ে গেল। রাজাকে গিয়ে বললে, আগে খেতুরির বারুই-কুমোরদের সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা করে পরে যেন তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন নরোত্তমকে।

কী, এত বড় কথা। ডাকো ওসব বেপারীদের। দেখি কেমন তাদের শাস্ত্রজ্ঞান।

এ বেপারীরা আর কেউ নয়, ছদ্মবেশে রামচন্দ্র কবিরাজ, চক্রবর্তী-ঠাকুর, হরিরাম রামকৃষ্ণ আর জগন্নাথ। রূপনারায়ণ এদের সঙ্গে তর্কে এঁটে উঠল না, আর সব পন্ডিতেরাও স্তব্ধ হল।

তখন রাজা নরসিংহ সদলবলে খেতুরিতে গিয়ে নরোত্তমের চরণে শরণ নিলে।

জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়ও দীক্ষা নিল নরোত্তমের কাছে। হরিশ্চন্দ্র নাম বদলে নতুন নাম হল হরিদাস।

রাজমহলের রাজা রাঘবেন্দ্র রায়, তার দুই ছেলে — চাঁদ আর সন্তোষ। চাঁদ রায় ডাকাতি করে বেড়ায় বাদশার খাজনা দেয় না অথচ পরের ধন লুঠ করে। সন্তোষও তার অনুগামী। 'শক্তি-উপাসনা সদা মৎস্য মাংস খায়। পরস্ত্রী ঘরম্বার লুটি লঞা যায়।'

চাঁদ রায়ের ঘোরতর অসুখ হল। আর বুঝি বাঁচে না।

বাপকে বললে, বদ্যি কবিরাজ ছাড়ো, নরোত্তমকে লেখ সে এসে মন্ত্রদীক্ষা দিলেই আমি ভালো হব।

নরোত্তমের কাছে চিঠি গেল। সে দ্বিরুক্তি না করে চলে এল রাজমহলে। দস্যুকে মন্ত্রদীক্ষা দিলে। চাঁদ রায় সুস্থ হয়ে উঠল।

কিছুদিন পরে নৌকো করে যাচ্ছে চাঁদ রায়, পাঠানের পেয়াদারা এসে তাকে পাকড়াও করলে। সে যে ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছে, সে যে এখন চলেছে গঙ্গাস্নানে এ খবর তাদের জানা নেই। চাঁদ রায় বাধা দিল না, নম্রমুখে নবাবের সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, যে জরিমানা করবেন তা বিনা আপত্তিতে দিয়ে দেব।

তোমার অপরাধের শাস্তি জরিমানায় শোধ হবে না। দেখতেই পাবে কী হয়।

'তলঘরে' বন্দী হল চাঁদ রায়। তারপর তাকে এক মত্ত হাতির পায়ের কাছে ফেলে দেওয়া হল। চাঁদ রায় দু হাতে হাতির শুঁড় ধরে দুর্বার শক্তিতে এমন টান মারল যে হাতিই ভূপতিত হল। চাঁদ রায়কে কে আর তখন শাস্তি দেয়!

নবাবের পেয়াদারা হতভম্ব। স্বয়ং নবাবের চক্ষুস্থির।

এই বিপুল শক্তি তুমি কোথায় পেলে? চাঁদ রায়কে জিজ্ঞেস করল নবাব।

নরোত্তমের কাছ থেকে। এ শক্তি তাঁরই কৃপাশক্তি — নামশক্তি।

নবাব চাঁদ রায়কে ছেড়ে দিল। পরে দিল নতুন পরগণা। যাও নিজের রাজ্য স্বচ্ছন্দে ভোগ করো।

নরোত্তমের নাম — গৌরহরির নাম — দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তবু তার শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণকে দীক্ষাদান — সংস্কারান্ধের দল মেনে নিতে চাইল না, ঘোঁট পাকাতে লাগল। তখন বসল আরেক ধর্মসভা। সব বাংলার অগ্রণী পন্ডিতদের আনা হল নিমন্ত্রণ করে। এল শ্রীনিবাস, এল বীরভদ্র সাধনসঙ্গী রামচন্দ্র তো পাশেই আছে। সে সভায় বিরুদ্ধবাদীদের মত ধূলিসাৎ হয়ে গেল। নরোত্তমই যে 'দ্বিজ' — [illegible] সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হল।

ব্রাহ্মণের গলে পৈতা সর্বলোকে দেখে
সাধকের হৃদে পৈতা সদা থাকে গোপে।।
তৈছে নরোত্তম গোসাঞি সবার আজ্ঞামতে।
হৃদয় চিরি দেখাইল শ্রীযজ্ঞোপবীতে।।

কার্তিক মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে গাম্ভীলায় অর্ধগঙ্গাজলে নরোত্তম স্বেচ্ছায় অপ্রকট হল।

নরোত্তম কীর্তনসাধক, পদকর্তা ও গ্রন্থকার। যেমন সুকবি তেমনি সুগায়ক। নরোত্তমের প্রার্থনা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার।।
সেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছে আপনি শ্রীহরি।।
ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী নন্দের নন্দন।
নরোত্তম কহে এই নামসংকীর্তন।।

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

ডাক্তারখানা—সমুদ্রের নীচে!

সমুদ্রের নীচে এক আশ্চর্য ডাক্তারখানা আছে যেখান থেকে রকমারী ওষুধ ছাড়াও ক্যানসার সারাবার মোক্ষম দাওয়াইও মিলতে পারে!

'বিষে বিষে বিষক্ষয়' কথাটা আমরা প্রায় সবাই শুনেছি কাজেই যদি কেউ বলেন সামুদ্রিক প্রাণীর দেহ থেকে নির্গত বিষে অব্যর্থ ওষুধ তৈরি হতে পারে তাহলে চমকে ওঠবার মত কিছু নেই! এই নিয়ে বহুগুণিও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এইটাই আজ 'ঘটনা'।

অনেকের ধারণা সামুদ্রিক প্রাণী কামড়ালে কিংবা চোট দিলে আমাদের শরীরে বিষাক্ত ঘা হতে পারে—আবার অনেকে পরখ করে দেখেছেন 'বিষাক্ত-ঘা-তৈরি-করতে-সক্ষম' সেই সামুদ্রিক প্রাণীটিকে যদি আমরা উদরস্থ করে ফেলি তবেই তা বিষাক্ত হতে পারে—তার আগে নয়। শেষোক্ত ধারণাটি সম্পর্কে প্রাচীন মিশরীয় ও গ্রীক ভোজনরসিকেরা একমত। এবং এই ধারণাটিই অতঃপর রোমান, বিজানটাইন এবং আরব্য লেখকগোষ্ঠী দিকে দিকে প্রচার করেছেন।

প্লিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'স্টিন-গ্রে নামক সামুদ্রিক প্রাণীটি গাছের গোড়ায় স্রেফ হুল ফুটিয়ে একটা আস্ত গাছ সাবড়ে দিতে পারে।'

প্রাণীবিদ্যার যেকটি এলাকায় কুসংস্কার, উদ্ভট কল্পনা ও ঘটনা তথা আবিষ্কারের জন্যে দায়ী, সামুদ্রিক প্রাণীর বিষ সম্পর্কে বোধ হয় তার চেয়ে অনেক বেশি মিশ্রণ করা হয়েছে উদ্ভট কল্পনা ও অতিরঞ্জনকে নব্বুই ভাগ প্রাধান্য দিয়ে।

সামুদ্রিক প্রাণীর দেহ থেকে নির্গত বিষ, যাকে ইংরিজিতে 'মেরিন টকসিন' বলে, সেই বিষে সম্পৃক্ত হবার পর অনেকে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছেন বলেই হয়ত অতিরঞ্জনকে বেশি করে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া, পৃথিবীর ভয়ংকর ও সাংঘাতিক সামুদ্রিক প্রাণীরা ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমী এলাকায় নির্বিবাদে ঘর-সংসার করে চলেছে—এই ধারণা প্রচার করছেন নাবিক, প্রকৃতিতত্ত্ববিদ ও মিশনারীর দল। ফলে, কিংবদন্তী ও গল্প-গাথায় সামুদ্রিক প্রাণী সম্পর্কে নানা রকমের কাহিনী ভয়াবহভাবে প্রচলিত হয়েছে।

অন্য দিকে, উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে যারা বাস করে তারা আবার সামুদ্রিক প্রাণী সম্পর্কে ভীষণ কোন ধারণা পোষণ করে না।

উত্তর কুইন্সল্যান্ডের আদিবাসীরা তাদের যে কোন উৎসবে মোম দিয়ে সিনানসিজা — সর্বাধিক বিষাক্ত সামুদ্রিক মাছের একটি অতিকায় মডেল তৈরী করে। তারপর একজন সেই মডেলটির শিরদাঁড়ায় ওঠবার চেষ্টা করে এবং নানা রকম কায়দা-কৌশল-কসরৎ দেখান শুরু করে—অতঃপর মাছের আক্রমণে তার শরীরে কোথায় কিভাবে আঘাত লাগতে পারে তা অবিকল দেখিয়ে যায়।

চিকিৎসাশাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে উদ্ভট কল্পনাগুলি এমনভাবে পেঁছে গেছে যে, তা থেকে আসল ঘটনা আবিষ্কার করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা জায়গা থেকে বিষাক্ত সামুদ্রিক প্রাণী সংগ্রহ করাটাও অনুরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। তার ওপর, এই সব প্রাণীদের নাম এক এক জায়গায় এক এক রকম—এবং অনেক প্রাণীর নাম জীবতত্ত্ববিদেরও অজানা। কাজেই কোনটা কোন প্রাণী তা পর্যায়ক্রমে সনাক্তকরণও বেশ দুরূহ। এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রাণী কিভাবে বিষ নির্গত করে তা ধরাটাও বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এ পর্যন্ত ফরাসী জীবতত্ত্ববিদ জে গ্রেভিন, এ রটার্ড ও এম ফিসালিকস; ইংরেজ এইচ মুইর, রুশ ই এন পাভলভস্কি এবং সম্প্রতি দুজন আমেরিকান বি হ্যালসটেড ও এফ রাসেল-এর বহুগুণিত গবেষণায় বিষাক্ত সামুদ্রিক প্রাণী সম্বন্ধে যা কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে বিজ্ঞান-ভিত্তিকভাবে বহু ঘটনা পরিষ্কার হয়েছে।

সামুদ্রিক প্রাণীর বিষ নিয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক সভা আহ্বান করা হয় ১৯৫৪-য়। তারপর এই কয়েক বছরের মধ্যে রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র ও প্রাণী-বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন শাখার কর্মীরা সামুদ্রিক প্রাণীর বিষ সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছেন। এঁদের উদ্যমে মেরিন টকসিন-এর জৈবিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনেক তথ্য সংযোজিত হয়েছে—এঁরা ঘোষণা করেছেন অব্যর্থ ঔষধ প্রস্তুতের জন্যে সামুদ্রিক প্রাণীর বিষ (মেরিন টকসিন) একটি অসাধারণ অবদান।

টকসিন সম্পর্কে মোটামুটিভাবে জানা যায় যে, এক জীবদেহ কিংবা উদ্ভিদদেহ থেকে যে বিষ অন্য জীবদেহে প্রবেশ করলে মারাত্মক বিষক্রিয়া শুরু করে—তারই নাম টকসিন। সমুদ্রের বিভিন্ন প্রাণী এই টকসিনের সাহায্যে আক্রমণ করে কিংবা আত্মরক্ষা করে। তারা তাদের শরীরের একটি বিশেষ অংশ দিয়ে এই বিষাক্ত টকসিন অনুপ্রবেশ করায় অন্য জীবদেহে। কেউ কেউ মুখ দিয়ে টকসিন ক্ষরণ করে শিকারকে স্থানুবৎ করে দিতে পারে; অনেকে আবার শুধু আত্মরক্ষার তাগিদে শিরদাঁড়া, মাথা, শুঁড় অথবা লেজে টকসিন মজুত রাখে দরকার মত ব্যবহারের জন্যে।

আবার অন্য পক্ষে, অনেক সামুদ্রিক জীব ও গাছ-গাছড়ার মধ্যে যে টকসিন থাকে তার বহিঃপ্রকাশের কোন পথ থাকে না—এবং যেহেতু সাধারণভাবে ওগুলি সদাই বিষাক্ত সেই হেতু অন্য কোন জীব ওগুলি উদরসাৎ করলেই টকসিনের প্রতিক্রিয়া শুরু হয় সঙ্গে সঙ্গে।

অনেক সামুদ্রিক জীব প্রাপ্তবয়স্ক হলে সমুদ্রের তলে স্ব স্ব এলাকায় এমনভাবে টকসিন নির্গত করে সর্বক্ষণ যে অন্য জীবদেহ নির্গত টকসিন সেই এলাকায় নির্বিষ হয়ে পড়ে!

কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে টকসিন এক একটি জীবদেহে এক এক রকম। আলগে, মাইক্রোসকোপিক প্ল্যাঙ্কটন

লেটস, স্পঞ্জ, হাইড্রয়েড, গোরগোনিয়ানস (অনেক মাথা!), অ্যানিমোনস, জেলি ফিস, ওয়র্মস, মোলাসকস, স্টার, সী আরচিন, কিউকামবার ইত্যাদি মাছ ও সামুদ্রিক সরীসৃপে এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের টকসিন ভিন্ন ধরনের ও ভিন্ন গুণের।

পাফার মাছ যে কোন সমুদ্রে পাওয়া যায়। পাফারের টকসিন থাকে তার শিরায় ও স্নায়ুকেন্দ্রে। পাফার খেয়ে অনেকেরই মৃত্যু হয়েছে। এই মাছ চেনা যায় খুব সহজে। অজস্র জলে পেট ভরতি করে পাফার যখন ভেসে ওঠে তখন তার যকৃৎ থেকে ধীরে ধীরে টকসিন বেরত থাকে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই মাছের মাসে কোন টকসিন থাকে না! জাপানের একটি প্রিয় খাদ্য পাফার। জাপানীরা বিশেষভাবে শিক্ষিত রাঁধুনি দিয়ে এই মাছ রান্না করায়! পাফার-এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে টিট্রোডোটকসিন থাকার ফলে ঔষধপত্রে এর ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে।

গ্যাসট্রোইনটেসটিনাল পীড়ার প্রতিষেধক হিসেবে বেশির ভাগ ওষুধে আজকাল সিগুয়েটেরা মাছের বিষাক্ত টকসিন ব্যবহার হচ্ছে।

দুঃস্বপ্নের অতিকায় মাছ মুগিল সিফালাস মানুষের পক্ষে হজম করা দুঃসাধ্য হলেও—কয়েকটি মারাত্মক রোগ সারাতে বোধহয় এর জুড়ি নেই!

কোন কোন সামুদ্রিক প্রাণী শুধুমাত্র তাদের প্রজনন পথ নিরাপদ রাখার জন্যে যে টকসিন নির্গত করে তাতে করে তাদের ডিম্বানু পর্যন্ত টকসিন নিষিক্ত হয়ে পড়ে, ফলে মনুষ্যদেহ পঙ্গু হয়ে যেতে পারে ওই জাতীয় মাছ খেলে কিন্তু রাসায়নিক মিশ্রণে প্রমাণ পাওয়া গেছে এই জাতীয় টকসিন মনুষ্য স্নায়ুর যে কোন পীড়া নিরাময় করতে অব্যর্থ।

আশ্চর্যের ব্যাপার একটি মাত্র টকসিন নানা সময় ও নানা অবস্থায় ভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। আমাজানের ভারতীয়রা ব্রো গানের তীরে সামুদ্রিক গাছ-গাছড়া থেকে সংগৃহীত যে বিষ ব্যবহার করে তাতেও প্রচুর পরিমাণে টকসিন থাকে।

সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে স্পঞ্জ, গোরগোনিয়ান ও অ্যানিমোন বিষাক্ত বলে বিবেচিত হওয়ায় অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী তাদের উদরসাৎ করার চেষ্টা করে না। অ্যানিমোন জাতীয় রোডাক্‌টিস হোয়েসি ভক্ষণের ফলে অনেক মানুষ মারা পড়েছে, কিন্তু লাল-দাড়িওয়ালা মাইক্রোসিরানা প্রোলিফেরা মাছ থেকে একটোনিন আলাদা করার পর যা পাওয়া গেছে তা যে কোন মানুষী রোগের পক্ষে ধন্বন্তরী! এক কথায়, এই সব সামুদ্রিক প্রাণীর দেহ থেকে বিভিন্ন ধরনের টকসিন সংগৃহীত করার পর নানা ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সংমিশ্রণে অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান পাওয়া যায়।

দক্ষিণ সাগরের দ্বীপে এমন কিছু সামুদ্রিক মাছের খবর পাওয়া গেছে যা শুকনো করে গুঁড়িয়ে নিয়ে চার হিসেবে জলে ফেললে অন্য মাছ সহজেই ধরা যায়—এই ধরনের মাছ সাধারণত সী কিউকামবার নামে পরিচিত। এই মাছের মুখ টিপে ধরলে যে লালা নির্গত হয় তা অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের পক্ষে বিষাক্ত হলেও মনুষ্য দেহের টিউমার সারাতে অদ্বিতীয়। সী কিউকামবারের টকসিন ছাড়া টিউমার-প্রতিষেধক-টকসিনসম্পন্ন অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীরও খবর পাওয়া গেছে।

কোন কোন সামুদ্রিক প্রাণীর কামড়ে মানুষের মৃত্যু হয় তৎক্ষণাৎ, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই জাতীয় প্রাণীর মুখের মধ্যে না যাওয়া পর্যন্ত একটি মাছেরও মৃত্যু হয় না অথচ এর সামান্য স্পর্শে অকটোপাশের মত প্রাণী মারা যায়! ভয়ংকর এই সামুদ্রিক প্রাণীর টকসিনে মারাত্মকভাবে আহত কিংবা পীড়িত যে কোন ব্যক্তির মাংস পেশী ও শিরা পুনরায় সঞ্চালন করা সম্ভব হয়। ঔষধের ক্ষেত্রে এই টকসিনের অবদান আগামী দিনে সর্ব-বৃহৎ হবে বলে আশা করা যায়।

স্টিন গ্রে, স্টোন, জেব্রা, টইভারস অথবা বেড়াল-মুখো মাছ ক্যানফিস তাদের টকসিন মজুত রাখে শিরদাঁড়া ও ডানার আশ-পাশে। স্টিন গ্রে মাছের শিরদাঁড়া কাঁটা তারের মত—ল্যাজ চাবুকের মত। আক্রমণ করার সময় স্টিন গ্রে শিকারকে কাঁটাতারওলা শিরদাঁড়ার সঙ্গে আটকে রেখে ল্যাজের ঘায়ে টকসিন বের করে জেব্রা আবার কামড় না দিয়ে টকসিন বের করতে পারে না। এদের কামড় থেকে যে কোন রক্ত চাপে ভোগা মানুষের রক্ত চাপ হ্রাস হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে!

শরীরে ব্যথা দেওয়ার জন্যে কিংবা কমাবার জন্যে নানা ধরনের মিশ্রণ মেরিন টকসিন থেকে তৈরি হচ্ছে আজকাল।

অনেক টকসিনে আবার এ[illegible] প্রোটিন পাওয়া যায় যে, তাই দিয়ে কৃত্রিম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা খুব সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মরফিন, অ্যাট্রোফিন, ক্যুরের টেরেসট্রিয়াল গাছ-গাছড়া থেকেই পাওয়া গেছে এবং পৃথিবীর বহু ওষুধ-বিষুধ আজ পর্যন্ত ওগুলি থেকেই তৈরি হলেও বর্তমানে মেরিন টকসিনের ব্যবহার অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে চলেছে।

স্নায়ুর যে কোন পীড়ায়, হৃদয়ের কাছে যে টুকরো মাংস পেশী আছে তার সংকোচন-প্রসারণের জন্যে, রক্তচাপ কমাবার জন্যে, শিরদাঁড়ার ধুলোর মত টুকরো টুকরো অচল অংশ সচল করার জন্যে, টিউমারের স্ফীতি কমাবার জন্যে টকসিন আজ অব্যর্থ।

জীব জগতের সমস্ত রোগ নিরাময়ের চাবি-কাঠি একদিন মেরিন টকসিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

বার্গম্যান

জাঁ লুক গদার

ভিসকন্তি

পৃথিবীর দশটি শ্রেষ্ঠ ছবি?

গুরুদাস ভট্টাচার্য

চলচ্চিত্রের বয়স আনুমানিক সত্তর-অধিক দুই। তার এই বাহাত্তুরে তারুণ্যেই, দেশে-বিদেশে বড়ো-মেজো-সেজো-ছোট হাজার হাজার ছবি উঠেছে—কোনটা হিট, কোনটা ফ্লপ, কোনটার চিরকালের মতো অসূর্যম্পশ্যা। এই জ্যাম ভিড়ের মধ্যে থেকে নিখুঁত চুলচেরা বাছাই করে 'দশটা শ্রেষ্ঠ ছবি'?—মানুষ তো হনোজ দূর অস্ত, সর্বশক্তিমান ইলেকট্রনিক কমপ্যুটারেরও মাথা খারাপ হয়ে যাবে!

কিন্তু হায়, মানবসন্তানের ব্রেন অটোমেশন যন্ত্রের চেয়েও জটিল, এবং একগুঁয়ে, জঙ্গী, নাছোড়বান্দা! যতো মাথা খারাপ, ততোই তার মাথাব্যথা, ততোই ভেকপ্রলম্ফী উল্লাস। সুখে যতো যন্ত্রণা, ততো তার আনন্দ। অতএব, ১৯৫২ সালের ব্রাসেলস-এ পরিকল্পনা নেওয়া হল—দশটি শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক ছবি বাছাইয়ের। দায়িত্ব নিলেন কতিপয় বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক। ছ'বছর পরে, পুনশ্চ। বিচারক: চলচ্চিত্র ঐতিহাসিকগণ। রাশিয়ার সাগেই আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটলশিপ পটেমকিন'কে "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি" বলে তাঁরা রায় দিলেন। ক্রমে, খেলাটা জমে উঠল। অন্যান্য সংস্থা, এমন কি চলচ্চিত্র-পত্রিকাগুলিও ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মাঠে নেমে পড়ল।

১৯৬২। এবারে নির্বাচনের ভার দেওয়া হল গনাগনতি একশোজন সমালোচককে। বিজ্ঞ ক্রিটিকদের জ্ঞান দেবে, এমন বুকের পাটা কার! তাই, কোন বাঁধাধরা নিয়ম-নিরিখ নয়, ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হল তাঁদের ব্যক্তিগত ভালো-লাগা-মন্দলাগার ওপর। ফলে, যা হবার তাই ঘটল— বিস্তর ঝঞ্ঝাট বেড়ে গেল, সেই সঙ্গে এন্তার মজাও।

একশো সমালোচকের মধ্যে অংশ নিলেন ৭০ জন। বাকি তিরিশজন রিপ্লাই কার্ডই মেরে দিলেন! সাড়া দেওয়া উত্তরগুলিও সাড়া জাগানো। একজন লিখলেন: 'সাংঘাতিক ভালো লাগছে মশাই'; একজন লিখলেন: 'কঠিন অবাস্তব অসম্ভব'; একজন: 'আচ্ছা একটা বেমক্কা বেফাঁদা ঝামেলা বাধিয়েছেন! কিভাবে বিচার করব, তার ফর্মুলাটাই দাঁড় করাতে পারছি না'; আর একজন: 'সারা জীবন ধরে ১৩ হাজার ছবি দেখেছি, আমার ফর্মুলাটা—'।

বাণে-বাণ ধুন্ধ পরিমাণ। চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করতে গিয়ে উদ্যোক্তারা টন টন ঘাম ঝরালেন। পজিশন ঠিক করতে গিয়ে শিবনেত্র হবার দাখিল। পয়লা মওকা কার? কে প্রথম? ফ্রান্সের অঁরি আজেল লিখলেন: কেন—'সানরাইজ'; আমেরিকার গিদিওন বাখম্যান: উহুঁ—'লাভেনতুরা'; ব্রিটেনের পিটার বেকার: কভি নেহি—'স্ট্রাইক'; ডেনমার্কের ইব মন্টী: ধ্যেৎ—'শোলডার আর্মস'; পূর্ব জার্মানীর ইনজো পাটালা: আরে দূর—চ্যাপলিনের মিউচুয়াল পর্বের ছবি।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি নিয়েও ইত্যাকার মতান্তর লক্ষ্য করার মতো। ব্রিটেনের জন গিলেট তাঁর তালিকায় 'পথের পাঁচালী'কে দিলেন ষষ্ঠ স্থান; ফিনল্যান্ডের আইটো ম্যাকিনেনে করলেন দ্বিতীয়। ব্রিটেনের ডেরেক হিল ঘোষণা করলেন 'অপু-ত্রয়ী' দ্বিতীয়; কিন্তু আমেরিকার আর্থার নাইটের হিসেব—মোতাবিক—৮ম!

সব দেখেশুনে জনৈক চলচ্চিত্র অনুরাগী লিখলেন: 'এ ধরনের সর্বে-বাছাইয়ে ছবির কিছু এসে যায় না, তবে নির্বাচক সমালোচকদের চরিত্রগুলো বেমালুম ধরা পড়ে।'

কথাটা খুব মিথ্যে নয়। বিচারকরা তালিকার লেজুড় যেসব ফুটনোট পাঠিয়েছেন, সেগুলোই এর প্রচণ্ড প্রমাণ। ফ্রান্স থেকে লোতে আইনার মন্তব্য করেছেন: 'আপনাদের ওই শ্রেষ্ঠ-ফ্রেষ্ঠ-র ধার ধারি না। যে দশখানা ছবি আমার পুনঃ পুনঃ দেখতে ইচ্ছে করে, ভালো লাগে, তাদেরই ঠিকুজী পাঠালাম। ব্যস!' ব্রিটেনের ইয়শ বিলিংস: 'আমি মশাই ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় একেবারে গুবলেট; এবং ভাষা না বুঝে বিদেশী

সবাক ছবির গুণাগুণ বিচার যে কী করে সম্ভব, তা আমার মুণ্ডুতে ঢোকে না।' ইতালীর সিজারে কাসভেল্লো: 'দশটা ছবির লিস্ট পাঠালাম; তবে শুধুই দশটা ভাববেন না। ওদের পরিচালকের আরও অনন্যমন্য ছবিও বোঝাচ্ছে। যেমন ধরুন, 'সেভসকী'র নাম দিয়েছি; তার মানে, আইজেনস্টাইনের 'পটেমকিন'ও ওর মধ্যে আছে।' (বুঝুন ব্যাপার!) পোল্যাণ্ডের লিও' বুকোনিয়েক: 'নামী ছবি মানেই কিন্তু দামী ছবি নয়। এমন অনেক ছবি আছে, যারা অনামিকা, যা আমরা দেখি নি, অথচ হয়তো তারাই পয়লা সারির সেরা ছবি। অতএব—'। ফ্রান্সের জ্যাঁ কিভাল: 'ইস, তালিকাটা একদম বিতিকিচ্ছিরি হয়ে গেল। আসল ছবিগুলোই দেখছি বেবাদ বাদ পড়ে গেছে! না মশাই আগামী দশ বছরের মধ্যে আর এ-গাড্ডায় পা দিচ্ছি না।' ডিলিস পাওয়েল: গত হপ্তায় হয়তো 'হিরোশিমা মন আমুর' বা 'উমবার্টো ডি'কে ভোট দিতুম, পরের হপ্তায় সম্ভবত 'রোকো আর তার ভাই' দেব। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে: দুনিয়ার আদ্দেক সেরা ছবি নির্ভেজাল কমেডি। আবার, সামনের হপ্তায় কাকে ভোট দেব, জানি না।' সবার ওপর টেক্কা দিয়েছে ইব মন্টির ঝাঁঝালো টীকা: 'শেষ পর্যন্ত শিল্পকেও যদি (বিকিনি পরে) বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় নামতে হয়—'।

ঝানু সমালোচকদের এহেন ফুলঝুরি-মন্তব্যে বেহেড হয়ে গিয়ে জনৈক হেড বারম্যান ডায়রীতে লিখেছিলেন: 'আমার সুচিন্তিত অভিমত—একমাত্র কার্টুনই সত্যিকারের চলচ্চিত্র!'

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ফাইনালিস্ট-দের একটা ফাইনাল লিস্ট তৈরি হল। এক-একটা পজিশনে একাধিক ছবিকে ঠাঁই দিতে হল। সব মিলিয়ে ঠিকুজিটা এই রকম দাঁড়াল: ১। সিটিজেন কেন (পরিচালনা: অরসন ওয়েলস); ২। লাভেন-তুরা (আন্তনিওনি); ৩। লা রেলে দ্য জ্যু (রেনোয়া); ৪। গ্রীড (স্ট্রোহাইম), উগেৎসু মোজোগাতারি (মিৎসোগুচি), ৫। ব্যাটলশিপ পটেমকিন (আইজেনস্টাইন), বাইসিকল থীভস (ডি সিকা), আইভান দ্য টেরিবল (আইজেনস্টাইন): ৯। দি আর্থ ট্রেমবলস (ভিসকন্তি): লাতালান্তে (জ্যাঁ ভীগো)।

১৯৫২-য় 'বাইসিকল থীভস' ১ম হয়েছিল, ৫৮-য় ২য়, এবারে ৬২-তে ৬ষ্ঠ! 'পটেমকিন' ৫২-য় ৪র্থ, ৫৮-য় ১ম, ৬২-তে ৬ষ্ঠ! অর্থাৎ ইতিমধ্যে নতুন নতুন শক্তিমান পরিচালকের আবির্ভাব হয়েছে: মূল্যায়নের মানদণ্ডও গেছে বদলে; বিচারকমণ্ডলীও ভিন ঘরানার।

এ তালিকাতেও কুলোয়নি—'রানার্স আপ'-এর আর একটা দুসরা তালিকাও করতে হয়েছে আরও ২৩টা ছবি নিয়ে। এই লিস্ট-এর প্রথম গ্রুপে অ্যালা রেনের 'হিরোশিমা' ১ম, তারপরেই সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'। তার নীচে-নীচে চ্যাপলিন, কুরোসাওয়া, বুনুএল, ড্রেয়ার, ওজু, রেস'—অর্থাৎ বাঘা বাঘা পরিচালকের দুর্ধর্ষ ছবি। একেবারে শেষে—বেয়ারিম্যানের ওআইলড স্ট্রবেরীজ'!

পূর্বাহ্ণে জনৈক সমালোচক লিখেছিলেন: 'দশটা শ্রেষ্ঠ ছবি? বোগাস। একশোটায় যদি কুলোয়, সেই বহু মানি।' একশোটা না হলেও, তার একের তিন অর্থাৎ ৩৩টা ছবিকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। তাও গ্রুপ করে করে। ক্রম-সংখ্যার এলোমেলো চেহারাটা লক্ষণীয়।

এতো গেল 'শ্রেষ্ঠ ছবি', ভালো ছবির বাছাবাছি। এখন, কেউ যদি ফস করে শুধোয়: 'মহোদয়গণ, শ্রেষ্ঠ বিরক্তিকর ছবি কোনগুলো?'—তবে, তাহলে তার 'হলেও হতে পারে বধূ' নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলবে, আর আত্মীয়-স্বজনরা তাকে তড়িঘড়ি রাঁচী পাঠাবার ব্যবস্থা করবে! জানি না—হয়তো, হয়তো নয়। কারণ—প্রশ্নটা সত্যিই রাখা হয়েছিল, এই বাৎসরিক ভোটাভুটিতেই: 'শ্রেষ্ঠ বিরক্তি-উৎপাদক ছবি'।

প্রসঙ্গত, লন্ডনের ডেরেক কক্স লিখেছিলেন: 'জুফোর জুলে অ্যান্ড জিম' একটা বাজে, রদ্দি ছবি; নায়িকার চরিত্রে জাঁ মোরো একেবারে বেমানান; পুরুষ দুটো তো নিছক ডামী। বার্গম্যানের 'ওআইল্ড স্ট্রবেরিজ' ফাঁপা, বাচাল, সেন্টিমেন্টে ঠাসা; ও'র 'সেভেনথ সীল'ও তাই। 'লাইমলাইট'—চ্যাপলিনের শেষ তিনটে ছবিই ভয়াবহ। 'আই কনফেস'—ওটাকে অনুগ্রহ করে সিন্ধুকেই রেখে দিন; ওই ওর যথার্থ স্থান—আজ্ঞে হ্যাঁ।'

আর কথা না বাড়িয়ে এবার 'শ্রেষ্ঠ বিরক্তিকর ছবি'র নামাবলীটা দেখা যাক। দীর্ঘ নামপত্র; কয়েকটার উল্লেখ করছি: আর্থ, সেভেনথ সীল, বার্থ অফ এ নেশান, দি আর্থ ট্রেমবলস, লা নত্তে, ক্যাবিনেট অফ ডাঃ ক্যালিগরী, হিরোশিমা মন আমুর, দ্য গোর্কী ট্রিলজী, আইভান দ্য টেরিবল, ওআইলড স্ট্রবেরীজ, লাভেন-তুরা, ইল ত্রিদো, অকটোবর, সেনসো, গন উইথ দি উইন্ড, ব্যাটলশিপ পটেমকিন, দ্য টেসটামেন্ট অফ অরফী, এ কিংগ ইন ন্যু ইয়র্ক, ফ্রেঞ্চ ক্যান ক্যান, এবং হ্যাঁ—অপুর সংসার। ইত্যাদি। মজার ব্যাপার—শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্বাচিত ছবির অনেকগুলোই এই তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে!

এছাড়া, আরও এক ধরনের ছবির বাছাই হয়েছিল: জনপ্রিয় খারাপ ছবি'। এই লিস্টটি আলো করে আছে যারা, তাদের অধিকাংশই সাহেবপাড়ায় (!) দেখা জনসমৃদ্ধ ছবি। যথা: মার্কস ব্রাদার্স গো ওয়েস্ট, সাউথ প্যাসিফিক, লস্ট হোরাইজন, বেনহুর, সাইকো, ফ্রাংকেনস্টাইন, র‍্যান্ডম হারভেস্ট, এ স্টার ইজ বরন, দ্য কিংগ অ্যান্ড আই, দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট সেভেন, এমন কি—ব্ল্যাক অরফিউস, উনে ফেমে এ উনে ফেমে। এবং ইত্যাদি।

পত্র-পত্রিকার দৌলতে সাধারণ দর্শক-পাঠকও এই ঝাড়াই-বাছাইয়ের অংশীদার হয়েছিলেন। তাঁরা যে নাম-সংকীর্তন করেছেন, শোনবার মতো! কিন্তু তার চেয়েও বেহদ্দা ইন্টারেস্টিং তাঁদের সটীক মন্তব্যগুলি।

একজন লিখেছেন: 'মহাকালই শিল্প-বিচারের শেষ সুপ্রীম কোর্ট; আমি তাঁর গোলামস্য গোলাম, অধমেরও অধম। কালের বিচারে যারা দাঁড়াবে, তারাই আমার প্রিয়।' আর একজন: 'আমার লিস্ট যে মশাই অসীম হয়ে উঠল; যবনিকাটা কোথায় টানব, বুঝতেই পারছি না!' অন্যজন: 'আচ্ছা খেলায় চুবিয়েছেন মশাই—বেধড়ক আনন্দ পেলাম।' আবার একজন: 'সবিনয় নিবেদন—ঘাম, চোখের জল আর রক্তে ভেজা এই আমার নির্বাচিত দশমিক তালিকা: গ্রহণান্তে বাধিত করুন।' অন্য আরেকজন: 'আহা, দারুন মজা পাচ্ছি!' আবারো আর একজন: 'মজা! বিনা নোটিশে অফিস কামাই, মুখে দাড়ি গজিয়ে সুন্দরবন, মাথায় অর্ধেক চুল সাফ হয়ে ধু-ধু মরু: তার ওপর আমার অমন জেল্লাদারী বউ, মশাই ডাইভোর্সের জন্যে উকিলের চিঠি—হা ঈশ্বর!'

এ চিঠির জবাব নেই।

প্রেক্ষাগৃহ

দেশী ছবির খবর

বাংলা ছবি এখন অনেক মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। প্রেক্ষাগৃহের অভাবে ছবিগুলি মুক্তি পাচ্ছে না। অথচ চলচ্চিত্র-নির্মাণের কাজ থেমে নেই। স্টুডিও পাড়ায় নতুন ছবির দৃশ্যগ্রহণ চলছে। মুক্তি-আসন্ন ছবিগুলির নাম জানিয়ে রাখি।

সতীর্থ প্রোডাকসন্সের **'তিন ভুবনের পারে'** চিত্রটি মুক্তিপ্রতীক্ষিত। সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য এবং পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন পরিচালক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা এবং আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ শেষ করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত ও রামানন্দ সেনগুপ্ত। বাংলা ছবিতে এই প্রথম নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তনুজা। এ ছবির অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন সুমিতা সান্যাল, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, পদ্মা দেবী, অপর্ণা দেবী, রবি ঘোষ, তরুণকুমার, অশোক মিত্র, চিনু রায়, সুকুমার ঘোষ এবং নবাগত অরূপ বসু। রুমা ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে **'সাবরমতী'** ছবিটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত শ্রীলোকনাথ চিত্রমন্দিরের পক্ষ থেকে ছবিটি পরিচালনা করেছেন হীরেন নাগ। ছবির প্রধান চরিত্রাবলীতে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, দীপ্তি রায়, ছায়া দেবী, তরুণকুমার, প্রশান্তকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রূপম মজুমদার। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স পরিবেশিত এ ছবির সংগীতপরিচালনা করেছেন হেমন্ত মল্লিক।

অনিমা চিত্রমন্দিরের সংগীতমুখর চিত্রটির নাম **'চিরদিনের'** গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত এ কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছেন পরিচালক অগ্রদূত। নচিকেতা ঘোষ সুরকৃত এ ছবির প্রধান শিল্পীরা হলেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, কমল মিত্র, সুমিতা সান্যাল, গীতা দে, বঙ্কিম ঘোষ এবং নবাগত অরূপ বিশ্বাস। ইস্টার্ণ ফিল্ম একসচেঞ্জ ছবিটির পরিবেশক।

রহস্য চিত্রের তালিকায় মুক্তিপ্রতীক্ষিত যে চিত্রটি রয়েছে তার নাম **'কখনো মেঘ'**। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অগ্রদূত। প্রশান্ত দেব রচিত এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে রূপদান করেছেন উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, বঙ্কিম

জনপ্রিয় অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায় — ফটো : অমৃত

ঘোষ, তরুণ মিত্র, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং জহর রায়। ডি লক্স পরিবেশিত এ ছবির সংগীতপরিচালনা করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

মংগল চক্রবর্তী পরিচালিত 'তিন অধ্যায়' ছবিটি মুক্তিপ্রতীক্ষায় রয়েছে। শৈলেশ দের কাহিনী অবলম্বনে রচিত চিত্রনাট্যে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, অজয় গাংগুলী, জহর রায়, ছায়া দেবী, বঙ্কিম ঘোষ, রবীন মজুমদার, জয়শ্রী সেন ও বিদ্যা রাও। গোপেন মল্লিক ছবিটির সুরকার। পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন অপ্সরা ফিল্মস।

শ্রীকৃষ্ণ ফিল্মসের রঙিন হিন্দী ছবি 'কাঁহি দিন কাঁহি রাত' বর্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষিত। ছবিটির প্রযোজক এবং পরিচালক হলেন দর্শন। ছবির প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন বিশ্বজিৎ, স্বপ্না, হেলেন, প্রাণ, নাদিরা, মালিকা, অসিত সেন, মোহন চটি, মনমোহন এবং জনিওয়াকার। ওপি নায়ার ছবির সংগীত-পরিচালক।

পরিচালক যশ চোপড়া তাঁর নতুন ছবি 'আদমী অউর ইনসান'-এর চিত্রগ্রহণ রাজকমল স্টুডিওয় শুরু করেছেন। ছবিতে অভিনয় করছেন ধর্মেন্দ্র, সায়রা বানু, মমতাজ, ফিরোজ খান ও অজিত। সংগীতপরিচালক রবি এ ছবির সুরসৃষ্টি করছেন।

পুষ্প পিকচার্সের 'ইজ্জৎ' ছবিটির একটানা দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল ফিল্মীস্থান এবং রাজকমল স্টুডিওয়। টি প্রকাশ রাও পরিচালিত এ ছবির বিশিষ্ট

'অপরিচিত' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন

চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন ধর্মেন্দ্র, জয়-ললিতা, তনুজা, বলরাজ সাহানি, ডেভিড, মেহমুদ, মনমোহন কৃষ্ণ, ললিতা পাওয়ার এবং জনি হুইস্কী। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল ছবিটির সুরকার।

পরিচালক দুলাল গুহ সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন 'ধরতি কহে পুকার কে' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল সুরকৃত এ ছবির কয়েকটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন জীতেন্দ্র, নন্দা, সুজিতকুমার, সঞ্জিবকুমার, অভি ভট্টাচার্য, দুর্গা খোটে, জগদীপ, নিবেদিতা, কনহৈয়ালাল, অসিত সেন ও তরুণ বসু।

সিনে রীতার প্রথম নিবেদন 'মুক্ত বিহংগ' চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য পরিচালক গংগাপদ দাস বীরভূম অঞ্চলে দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় রওনা হয়েছেন। এর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন —সুস্মিতা সান্যাল, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, শিশির চক্রবর্তী, মোহন সিং এবং নবাগতা অরুণা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতিকণা ঘোস।

চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, গীতরচনা এবং সংগীত-পরিচালনায় আছেন যথাক্রমে—সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন দাস, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীপদ সেন। নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হচ্ছেন মান্না দে, শিপ্রা বোস, গীতা দাস। চিত্রটির প্রযোজক হলেন হীরক ঘোষ এবং প্রধান কর্মসচিব হলেন শম্ভু মুখোপাধ্যায়।

টেকনিসিয়ান স্টুডিওর লন ও বাইরের খোলা জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড এক বৈষ্ণব আখড়ার সেট পড়েছে চারুচিত্র নিবেদিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত (৪র্থ পর্ব) অবলম্বনে রচিত 'কমললতা' ছবির জন্য দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বহুমূল্য এই সেটের কিছু ক্ষতি হলেও তাকে মেরামত করে পূর্ণগতিতে এখন কাজ এগিয়ে চলেছে। হরিসাধন দাশগুপ্তের পরিচালনায় এ পর্যায়ের স্যুটিংয়ে অংশ নিচ্ছেন সুচিত্রা সেন, উত্তমকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, বুলুই ব্যানার্জি, মিতা মুখার্জি ও অন্যান্য আরও কয়জন।

অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত এ আর সি প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় নিবেদন ডঃ নমিতা চক্রবর্তীর বহুপঠিত ও বহুল প্রচারিত উপন্যাস 'শাশ্বতী' অবলম্বনে 'প্রথমা'র চিত্রনাট্য রচনার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এঁর 'অদ্বিতীয়া' আসন্ন মুক্তিপথে। অদ্বিতীয়ার সংগীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এই ছবিরও সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন বলে জানা গেছে শীগ্‌গির ছবিটির মহরৎ ও চিত্রগ্রহণ শুরু হবে। নায়িকা চরিত্রের জন্য নতুন মুখের সন্ধান চলছে। এম-এ ফিল্মস ছবির বিশ্ব-পরিবেশন-স্বত্ব গ্রহণ করেছেন।

বিদেশী ছবির খবর

চেকোশ্লাভাকিয়ার তরুণ পরিচালক জারি মেনজেল (এ বছরে অস্কারে পুরস্কৃত)-এর যে নতুন ছবি সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে নাম তার 'ইণ্ডিয়ান সামার'। একজন সুইমিং পুলের মালিক, আরেকজন মেজর ও অপর এক বন্ধু এই তিনজন ও সার্কাসের এক তরুণীকে নিয়ে ঘটনার বিস্তার। তিনজনের কাছেই সে ধরা দিয়েছে বিভিন্ন দিনে, তিনটে রূপে তার কাছে ধরা পড়েছে তিনজনের। সবশেষে মেজরের কাছে সে দেহগত ব্যাপারটায় উদাসীন আর নিস্পৃহ থাকতে চেয়েছে! কিন্তু মেজরের উত্তেজিত কামনা তাকে স্থির থাকতে দেয় নি। অথচ যখন মেয়েটি দেহ দান করল মেজরকে তখন সে যেন আর আগের মত জেগে উঠতে পারে নি, ঝিমিয়ে পড়েছে। তার এই অকৃতকার্যতা শারীরিক নয় মানসিক। মেনজেল এর অপূর্ব পরিচালনা ছবিতে একটা কাব্যিক ছন্দের সৃষ্টি করেছে। ছবির নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেছেন রোজমারি লেস্তো। ইতিমধ্যে ছবিটি স্বদেশে পুরস্কৃতও হয়েছে।

* * * *

প্রযোজক দিনো দা লরেন্তিস 'ওয়াটার্লু' ছবির পরিচালনার ভার দিয়েছেন জন হাস্টনের ওপর। হাস্টন সম্প্রতি রাগেই বন্দরচুকের 'ওয়ার এণ্ড পীস' দেখার পর তাঁর ছবির ব্যাপারে আলোচনা করেছেন বন্দরচুকের সঙ্গে। 'ওয়ার এণ্ড পীসে'র যুদ্ধের দৃশ্যে তিনি মস্কো ও বোরদিনো যুদ্ধের অনেক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, 'ওয়াটার্লু' ছবিতেও সেগুলোর প্রয়োজন হবে এবং হাস্টন স্থির করেছেন যুদ্ধের কিছু দৃশ্য তিনি রাশিয়াতেই তুলবেন। এ ছবির প্রধান দুটি চরিত্র নেপোলিয়ন ও ওয়েলিংটনের ভূমিকায় আছেন রড স্টিগার ও পিটার ও'টুল'।

* * * *

নাম মাইসেনকো স্ট্রবেক। জন্মেছেন ১৯২৫য়ে, এখন নেশা এবং পেশা ছবি পরিচালনা। জাতিতে যুগোশ্লাভিয়ান। স্কুলের পাট চুকিয়ে বাবা-মার কথামত লক্ষ্মী ছেলেটি হয়ে ইউনিভার্সিটিতে ঢোকেন ল' পড়তে, একুশ বছর বয়সে এক সিনেমা কোম্পানীর প্রচার বিভাগে কাজ নেন। রক্তে সে শিল্পী না হলেও মনে মনে সে শিল্পী। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এক ফিল্ম কোম্পানীর এডিটিং বিভাগে ছবি কাটা-জোড়ার কাজ নিলেন। সেই ফাঁকে ১৯৪৮য়ে একটা অল্প দৈর্ঘ্যের ছবিও দাঁড় করিয়ে ফেললেন ভদ্রলোক। প্রথম ছবিটা যে আহামরি কিছু একটা হয়েছিল তা নয়—তবে ঐ থেকে শুরু। তারপর এক নাগাড়ে নিজের চিত্রনাট্যে বেশ কয়েকটি ছোট ছবি করলেন। তার মধ্যে কয়েকটা আবার পুরস্কার-টুরস্কারও পেয়েছিল। নিজের দেশেই যুগোশ্লাভ চিত্র উৎসবে তার 'ইন দি হার্ট অফ কসমেট' (১৯৫৪), 'ইট রিয়্যালী উড্‌বি অফুল' (১৯৫৮), 'টু দি রেস্কো অফ দি বোনস' (১৯৬০), 'হ্যাপী নিউ ইয়ার' (১৯৬১) ও 'দি রেনস্ অফ মাই আর্থ' (১৯৬৪) পুরস্কৃত ও বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছে। এডিনবরা ও কাঁ উৎসবে তাঁর ছবি সম্মানিত হয়েছে। এতদিন শুধু ছোট ছবিই করেছেন, প্রথম কাহিনী চিত্র করলেন ১৯৫৬র। নাম 'প্যাসেঞ্জার্স ফ্রম স্প্লেনডিড'। নিজের চিত্রনাট্যে তৈরী তাঁর প্রথম কাহিনী চিত্র হল ১৯৬২তে, নাম 'ক্লাস ভি.৩ ওয়াজ কল্ড'। এ ছবির জন্যও তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন। আবার পাঁচ বছর বাদে গত বছর করলেন 'অডিট অফ স্টেপ'। বার্লিন উৎসবে যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষ থেকে এ ছবিই প্রতিযোগিতা করেছে উৎসবে। স্ট্রবেক নাস্তিক না হলেও আশাবাদী। 'অডিট অফ স্টেপ'-এর প্রতিটি ফ্রেম অন্তত সেই কথাই নাকি বলে। সামাজিক সমস্যা তাকে পীড়িত করে বড় বেশী। তাই তার ছোট-বড় সব ছবিতেই সমাজ প্রাধান্য পায় বেশী।

* * * *

গত কার্লোভি ভেরী চলচ্চিত্র উৎসবে যুগোশ্লাভিয়ার যে ছবিটা অনেকের কাছেই নতুন ঢেউ বলে মনে হয়েছে সেটি হল লাদিস্লাভ হেলজ-এর 'লেস অফ কনফিডেন্স'। ঠিক চিত্রজগতের মধ্যেও যে দ্রুত কতগুলো পরিবর্তন হয়ে গেল তার কারণ এ ছবি দেখলে কিছুটা আঁচ করা যায়। লস অফ কনফিডেন্স হয়ত সত্যিই আত্মবিশ্বাস হারানোর ছবি। ছবির নায়ক সমাজের জন্য, দেশের জন্য সব দিয়েছে। নিজের বলে কিছু রাখে নি। আত্ম সুখ সম্ভোগের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আর পাঁচজনের জন্য সব দিয়ে গেছে। নিজের মেয়েকেও সে সুখী করতে চেয়েছে। তাই তাকে সে একটা ভাল চাকরীর অফার দেয়, কিন্তু লেখাপড়া শেখা মেয়ে বাবার সেই কাজ প্রত্যাখ্যান করে। বলে যে তার বাবা নামী লোক বলেই অতবড় উচ্চ পদটা সে পেল। একথা সবাই বলবে—এটা তার শুনতে ভাল লাগবে না। মেয়ের কাছ থেকে নিরাশ হবার পর সবচেয়ে প্রচণ্ড আঘাত তার সহকর্মীর কাছ থেকে। যাদের সে হাতে-কলমে গড়েছে, যাদের সে নিজের শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে, তাদেরই একজন পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক বিশ্রী ধরনের ব্যাপারে। সমাজের প্রতি মানুষের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে তখন ফিরে এল তার নিজের গ্রামে। এতদিনে সে বুঝল সবুজ হলেই তা সুন্দর হয় না। যদিও সবুজ। নতুন চিন্তার উদ্ভব হল তার মধ্যে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে সে আর তা ফিরে পেল না হয়ত-বা আজকের এই মর‍্যাল ভ্যালুজহীন জগতে আর সে তা ফিরে পাবেও না।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' চিত্রে তপেন চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ

(সাত)

"ছাদের এক কোণে চাঁদের আলোয় বসিয়া আন্নাকালী একরাশ গাঁদাফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে" ললিতা তাহার নিকট হইতে একগাছি বড় মালা লইয়া কবাটের কাছে আসিয়া দেখিল, শেখর একমনে লিখিতেছে......তাহাকে চমকিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে সে মালা ছড়াটা সাবধানে শেখরের মাথা গলাইয়া গলায় ফেলিয়া দিয়াই চৌকির পেছনে বসিয়া পড়িল।"

শেখর—ওকি করলে ললিতা!

ললিতা—কেন, কি?

শেখর—জানো না কি? কালীকে জিজ্ঞেস করে এসো, আজকের রাত্তিরে গলায় মালা দিলে কি হয়। এখন ললিতা বুঝিল। চক্ষের নিমেষে তাহার সমস্ত মুখ ভীষণ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল. সে—না, কখ্খোনো না—কখ্খোনো না, বলিতে বলিতে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।......ইতিপূর্বে যে উপায়ে মালাটা শেখরের গলায় পরাইয়া দিয়াছিল, ঠিক সেই উপায়ে সেই গাঁদাফুলের মালাটাই তাহার নিজের গলায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কান্নায় তাহার কন্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তবু সে জোর করিয়া বিকৃতস্বরে বলিল, কেন এমন করলে?

—তুমি করেছিলে কেন?......ললিতা আর প্রত্যুত্তর করিল না. মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাতলে দুইজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিল। শুধু নীচ হইতে কালীর মেয়ের বিয়ের শাঁখের শব্দ ঘন ঘন শোনা যাইতে লাগিল।"

(আট)

"দিনচারেক পূর্বে তিনি (গুরুচরণ) যথারীতি দীক্ষাগ্রহণ করিয়া "ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন......সেই সংবাদটা নানা বর্ণে বিচিত্র হইয়া গোঁড়া হিন্দু নবীনের শ্রুতিগোচর হইয়াছে।......এই সংবাদ দূরপ্রবাসে বসিয়া ভুবনেশ্বরী শেখরের মুখে শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া......রাত্রে শেখরের আহারের সময় মা উপস্থিত ছিলেন, দুই-একটা কথার পর বলিলেন, ওদের গিরীনবাবুর সঙ্গেই ললিতার বিয়ে দেবার কথা হচ্ছে।......

ললিতা বলিল,......সে যাক। সব শুনেচ' ত, এখন তোমার কি হুকুম তাই বল। শেখর বিস্ময়ের স্বরে কহিল, আমার হুকুম! আমার হুকুমে কি হবে? ললিতা শঙ্কিত হইয়া মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?—তা বইকি ললিতা? আমি কার ওপর হুকুম দেবো?—আমার ওপর, আবার কার ওপর দিতে পার?......আমাকে বিক্রী করার অধিকার তাঁর (মামার) নেই, বিক্রীও করেন নি। এ অধিকার আছে শুধু তোমারি......"

(নয়)

"শেখর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আর একবার অস্ফুটে আবৃত্তি করিল, কি করা যায়। সে ললিতাকে বেশ চিনিত,—তাহাকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে—একবার যাহা সে নিজের ধর্ম বলিয়া বুঝিয়াছে, কোনোমতেই তাহা ত্যাগ করিবে না। সে জানিয়াছে সে শেখরের ধর্মপত্নী; তাই আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে অসঙ্কোচে বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া অমন করিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিল।"

(দশ)

"ঘরে আসিয়া কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সহস্রবার মনে পড়িল, আজ সে (শেখর) নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে গিরীনই ও বাড়ীর পরম বন্ধু, সকলের আশা ভরসা এবং ললিতার ভবিষ্যতের আশ্রয়। সে কেহ নহে......সন্ধ্যার পর......কালীর হাত ধরিয়া ললিতা ঘরে ঢুকিল। কালী বলিল, বাবাকে নিয়ে আমরা মুঙ্গের যাব—সেখানে গিরীনবাবুর বাড়ী আছে। তিনি ভালো হলেও আমাদের আর আসা হবে না......ললিতা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেইখানেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।. শেখর তাহার ভালমন্দ ও আত্মমর্যাদা লইয়া বিবর্ণ পান্ডুর বিহ্বল হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া রহিল।"

(এগার)

"গুরুচরণের ভাঙ্গা দেহ মুঙ্গেরের জলহাওয়াতেও আর জোড়া লাগিল না। বৎসরখানেক পরেই তিনি দুঃখের বোঝা নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।...এ বাড়িতে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিল। নবীন রায় হঠাৎ মারা গেলেন। ভুবনেশ্বরী শোকে দুঃখে পাগলের মত হইয়া বড় বধূর হাতে সংসার সঁপিয়া দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন;...... ললিতার বিষাক্ত স্মৃতিটাকে পুড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া দিবে শপথ করিয়া সে হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘৃণার দাবানল জ্বালাইয়া দিল। দাহনের যাতনায় সে তাহাকে মনে মনে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করিল, এমনকি কুলটা পর্যন্ত বলিতে সঙ্কোচ করিল না।"

(বারো)

"ললিতা গলায় আঁচল দিয়া মাকে প্রণাম করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সেও (শেখর) উঠিয়া আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল এবং উভয়ে একত্রে মায়ের পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া, শেখর নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। ভুবনেশ্বরীর দুই চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সিন্দুক খুলিয়া নিজের সমস্ত অলঙ্কার বাহির করিয়া তাহাকে পরাইতে পরাইতে একটু একটু করিয়া সবকথা জানিয়া লইলেন। সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, তাই বুঝি গিরীনের কালীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে?"

বহুপঠিত শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' উপন্যাসের সারাংশ গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করার মত উল্লেখ করলাম। অজয় করের পরিচালনায় এ ছবির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। বিভিন্ন চরিত্রচিত্রণে রয়েছেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি (শেখর), মৌসুমী চ্যাটার্জি (ললিতা), শমিত ভঞ্জ (গিরীন), রোমি চৌধুরী (চারুবালা), নীরা মালিয়া (আন্নাকালী), বিকাশ রায় (গুরুচরণ) ও আরও অনেকে। ছবিটির সঙ্গীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রযোজক চিত্রাঞ্জলি লিমিটেড।

মঞ্চাভিনয়

'প্রথম কদম ফুল' চিত্রে তনুজা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

একদিকে অন্তরের প্রেমের গভীরতা অন্যদিকে সংগ্রামমুখর জীবনের অশ্রান্ত জটিলতা, এই দুয়ের মাঝে যে দুস্তর ব্যবধান তাই নিয়েই প্রতিটি আবর্তে অন্তঃসংঘাত, প্রহার প্রহরে কান্নার আন্দোলন। সুব্রত ভালোবেসেছিল কাবেরীকে, অন্তরঙ্গতার নিবিড়তায় স্বপ্ন দেখেছিল শহর কোলাহলের মুখরতা থেকে দূরে একটি স্নিগ্ধ স্বপ্নছোঁয়া সুখের নীড় রচনা করবে। কিন্তু আকস্মিকভাবে আবেগ আর উপলব্ধির মদির মুহূর্তে সংঘাতের সূচনা হোল। সুব্রত এতদিন যে পরিচয় কাবেরীর কাছে লুকিয়ে রেখেছিল তারই প্রকাশ হোল। ওদের দুজনের জীবনজটিলতার সীমা হোল প্রসারিত, বেঁচে থাকার তাগিদে আর বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মেটাতেই হয়তো দুজনের পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। সুব্রত বিয়ে করতে বাধ্য হোল 'সুপর্ণা' নামে এক আধুনিকাকে আর কাবেরী 'সত্যব্রত'কে। এরপরেই শুরু হোল চরমতম অন্তর্দ্বন্দ্ব, সুখ কারো জীবনে এলো না, সত্যব্রতকে আত্মঘাতী হোতে হোল, জীবিকার্জনের তাগিদে নেমে আসতে হোল কাবেরীকে। এই জীবনজটিলতা আর অন্তর্সংঘাতের পটভূমিতেই গড়ে উঠেছে অমল নাগের নাটক 'মৌনমেঘ'। সম্প্রতি 'মুক্ত অঙ্গনে' 'শুভম' নাট্যসংস্থা এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন।

নাটকটির মধ্যে যে কাহিনী ছিল তা সবারই মনকে আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে দৃশ্যবিন্যাসের শৈথিল্যে কাহিনীর গভীরতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

নাট্যকার ঘটনাগুলোকে ঠিকমতো একটি অখণ্ডতায় রূপ দিতে পারেননি, তাই কিছু কিছু জায়গায় প্রশ্নের অবকাশ থেকে গেছে।

এই নাটকের সার্থক মঞ্চরূপায়ণে প্রতিটি শিল্পীর অভিনয়ে যে প্রাণধর্মিতার পরিচয় নিহিত থাকা উচিত ছিল তা থাকেনি, তাই সংঘবদ্ধ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক একটা ঐক্য গড়ে উঠতে পারেনি। এ ব্যাপারে নাট্য-নির্দেশকের আরো অনেক বেশী সচেতন হওয়া উচিত ছিল। তবুও দু-তিনজন শিল্পী আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনয় করে তাঁদের চরিত্রে প্রাণ এনেছেন। কয়েকটি মুহূর্তে 'কাবেরী' চরিত্রে অনিস্মরণীয় অভিনয় করেছেন মমতা চ্যাটার্জী, স্বামী সত্যব্রতের আত্মধিক্কারের মুহূর্তে তাঁর সাক্ষ্য প্রতিভা পরিস্ফুট হয়েছে। 'সুব্রত' ও 'সুপর্ণা' চরিত্রের মর্মকথা উপলব্ধি করতে পেরেছেন জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বেলা রায় চরিত্ররূপায়ণে স্পষ্টতা পেয়েছে। সত্যব্রতের হৃদয়ের বেদনা আর অন্তর্দাহকে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। কাবেরীর পাশে 'সত্যব্রত'র ভূমিকায় প্রভাত বসুর অভিনয়ও সংযত মনে হয়েছে। প্রতিমা চক্রবর্তীর 'শ্যামলী' ও কুমারেশ দত্তের 'শুভব্রত' মনে কোন ছাপ রাখেনি।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন জ্যোতিষ ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত, সমীর চক্রবর্তী, মৃণাল ঘোষ, পঙ্কজ কোটিয়া কার্তিক মালাকার, শচীন আঢ্য, গিরিজা মুখোপাধ্যায়।

পালাবদল

এক মুঠো অন্নের জন্য যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে, পেটপুরে খেতে পায় না, অত্যাচার সহ্য করতে হয় দিনের পর দিন, সেই সব গ্রামের চাষীদের মনে জেগেছে বিদ্রোহের দুরন্ত উদ্যম। যারা তাদের চাল, ধান আটক রেখে প্রতিটি মুহূর্তে চরমতম অত্যাচারে জর্জরিত করে তোলার চেষ্টা করে, সেই সব জোতদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তারা আজ সংঘবদ্ধ হয়েছে। এই পটভূমিকাকেই ঘিরে চিত্তরঞ্জন দাসের 'পালাবদল' নাটকটি রচিত হয়েছে। সম্প্রতি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'সীমান্তিক' শাখার শিল্পীবৃন্দ 'মিনার্ভায়' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন।

প্রতিটি শিল্পীর অভিনয়ে স্বচ্ছন্দতা ছিল বলে সামগ্রিক অভিনয়ের গতি কোথাও স্তিমিত হয়নি। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন: সৌমিত্র চক্রবর্তী, মণীন্দ্র চক্রবর্তী, হারান চক্রবর্তী, আশীষ মুখোপাধ্যায়, ক্ষমা চক্রবর্তী, অমল নাথ, নীতীশ চৌধুরী, অসিত দাশগুপ্ত, সুখেন চক্রবর্তী, অনিল ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন দত্ত, জীবেন চক্রবর্তী, হেমেন ঘোষ, প্রসাদ বসু, দীপক চক্রবর্তী, বেণু বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না ঘোষ। আলোকসম্পাত ও আবহসঙ্গীত সবসময়েই নাটকের মূল সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পেরেছে।

মেঘে ঢাকা তারা

সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র আরক্ষা বিভাগের সাংস্কৃতিক পরিষদের শিল্পীবৃন্দ 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলেন শক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা' নাটকটি। দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামের ভিত্তিতে রচিত এই নাটকের অভিনয়ে শিল্পীবৃন্দ সেদিন উন্নত ধরনের অভিনয়-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রফুল্ল দাসের নির্দেশনায় সূক্ষ্ম শিল্পভাবনার ইঙ্গিত আছে।

বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিয়েছিলেন মমতা চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির সাহা, রূপেন দেব, রাণাপ্রতাপ ঘোষ, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল ভট্টাচার্য, দেবব্রত হালদার, কৃষ্ণদাস মণ্ডল, মানিক চক্রবর্তী, শান্তনু সেনগুপ্ত, মিতালী দাস, সন্তোষ চক্রবর্তী,

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোকা গঙ্গোপাধ্যায়।

কখন যে বসন্ত এলো

রূপতীর্থ' প্রযোজিত নাটক 'কখন যে বসন্ত এলো' আগামী রবিবার (১৪ জুলাই) সন্ধ্যা সাতটায় প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে পরিবেশিত হবে। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন শ্রীমানবকুমার।

লোকরঞ্জন শাখার নাট্যোৎসব

রবীন্দ্রসদনে লোকরঞ্জন শাখার চারদিন-ব্যাপী নাট্যোৎসব শুরু হয়েছিল রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' দিয়ে। নৃত্য-গীতোচ্ছল এই গীতিনাট্য যে একেবারেই মনকে স্পর্শ করতে পারেনি তার কারণ, নৃত্য অথবা সংগীত কোনোটিই যথাযোগ্য মানে পৌঁছয়নি। একক নৃত্যে শ্রীমতী উৎপলা ভট্টাচার্য আংশিক দক্ষতা প্রদর্শন করলেও নায়িকা শ্যামার জীবনবৈচিত্র্য, উদ্বেল বাসনা, দ্বন্দ্বমথিত হৃদয়ের হাহাকার ও কারুণ্য এতগুলি সুবিস্তীর্ণ ভাবব্যঞ্জনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নৃত্যাভিনয় রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

সমগ্র নৃত্যনাট্যের মধ্যে একটি সমবেত লোকনৃত্য (আসামী লোকনৃত্যের ছাঁচ) ও "প্রেমের জোয়ারে" নৃত্যদুটি উপভোগ্য হয়েছে।

সংগীতাংশ আরো দুর্বল। গাইলেই জমে যায় এমন আকর্ষণীয় সংগীতের অজস্রতায় "শ্যামা" ঐশ্বর্যময়ী। কিন্তু একটি গানও মন ভরাতে পারেনি। সবচেয়ে মারাত্মক হলো 'শ্যামা'-পরিবেশিত একটি গানের, তালভঙ্গ।

সজ্জাপরিকল্পনায় কোনো সুরুচির পরিচয় ছিল না। আলোকসম্পাত মাঝামাঝি।

তুলনামূলক বিচারে বরং নৃত্যনাট্যের চেয়ে নাটকদুটির সুষ্ঠুসুন্দর পরিবেশনা ঘটেছে। রসরাজ অমৃতলালের "বিবাহ-বিভ্রাট" এবং মন্মথ রায়ের "মহাউদ্বোধন" যথাযোগ্য রসে প্রতিষ্ঠিত।

বিবাহ-বিভ্রাটে তখনকার যুগের একটি সমাজ-আলেখ্য কৌতুকে কারুণ্যে আনন্দে বিষাদে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

মহা উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দের মহান জীবনের এক মর্মস্পর্শী রূপায়ণ।

এই উৎসব সভার জন্য প্রযোজক শ্রীঅজিত গুপ্ত ধন্যবাদার্হ।

জোনাকী পরিবেশিত 'ক্ষীরের পুতুল'

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান জোনাকী-নিবেদিত অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল' সম্প্রতি ত্যাগরাজ হলে মঞ্চস্থ হয়। কয়েকজন শিশুশিল্পীর প্রাণবন্ত নৃত্য, অভিনয় সংগীতে এই নৃত্যনাট্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রধর্মী আখ্যানে নাট্যরূপদান ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী ভারতী গুহ।

রূপকথার সেই নিত্যনতুন, চিরপুরাতন সুয়োরাণী ও দুয়োরাণীর কাহিনী। একজনকে রাজা ভালবাসেন। তাই বিদেশ থেকে তার জন্য আনেন হাতের বালা, পায়ের মল। দুয়োরাণী রাজার ভালবাসার বঞ্চিত। অতএব তার জন্য আসে মুখপোড়া বাঁদর। সেই বাঁদরই দুয়োরাণীর স্নেহে যত্নে সন্তানোপম হয়ে ওঠে। মার দুঃখ দূর করবার জন্য তার উদ্বেগ ও চেষ্টার অবধি নেই।

কৌতুকে, স্নেহে, অসহায় ছোট্ট প্রাণের ব্যাকুলতায় গল্পের বাঁদরকে সত্যিকারের বাঁদরে পরিণত করেছিল শিশুশিল্পী শর্মিলা গুহ।

আবার সুয়োরাণীর হিংসাকুটিল স্বার্থপরতা রূপায়ণে আর এক শিশু-শিল্পী শকুন্তলা রায়ও কম যাননি।

এঁরা ছাড়াও ক্ষীরের পুতুলকে যাঁরা নির্মল আনন্দের উৎস করে তুলেছিলেন তাঁরা হলেন সমরেশ বসু, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, দেবাশীষ গুহ, পৃথা সেন, দেবযানী মল্লিক, কেকা মিত্র, অরুণিমা চৌধুরী, রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর দাস, পুষ্কর দাশগুপ্ত, অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় আরও অনেকে। নৃত্যাংশে ছিলেন ঊর্ণা ভট্টাচার্য, অনীতা ভট্টাচার্য, শিবানী মুখোপাধ্যায়, অনিন্দিতা অধিকারী ও সুস্মিতা ভট্টাচার্য। নেপথ্যসংগীতে ছিলেন জয়ন্তী ভট্টাচার্য ও কেকা চট্টোপাধ্যায়। কথক নাচে প্রশংসা অর্জন করেছিল সুমিতা গুহ রায়। মঞ্চ ও সাজসজ্জায় ছিলেন অলোক দত্ত।

সাধনার "শাপমোচন"

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সাধনার সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে মহাজাতি সদনে একটি বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভাপতি ছিলেন সংগীতাচার্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভাপতি কর্তৃক সমাবর্তনী ভাষণ ও উপাধিপত্র বিতরণের পর শাশ্বতী ঘোষ ও তপতী ঘোষ সেতার বাজিয়ে শোনা।

পরিশেষে শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের "শাপমোচন" মঞ্চস্থ হলো। সংগীতাংশ আশানুরূপ না হলেও কমলিকার ভূমিকায় লিপিকা গুপ্ত এবং অরুণেশ্বরের চরিত্রে তপতী দত্ত নৃত্য ও অভিনয়ে তাঁদের চরিত্র-চিত্রণ সার্থক করে তুলেছিল। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে আকাশবাণীর শিল্পী শরবিন্দু দত্ত ও দীপালি দত্তর গ্রন্থনা।

আলোকনির্দেশনায় ও আলোকসম্পাতে জগৎ মিত্র ও শিবনাথ ব্যানার্জি তাঁদের কাজ মোটামুটি সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন।

বাণীমন্দির পাঠাগারে এবং ইন্দ্রজিত

বালিতে বাণীমন্দির পাঠাগারের ২৪-তম সাংস্কৃতিক উৎসব উপলক্ষে বাদল সরকারের "এবং ইন্দ্রজিত" শ্রীবিনয় গোস্বামীর সুষ্ঠু পরিচালনায় সভাগণ কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়। পরিচালনা ছাড়াও শ্রীগোস্বামী লেখকের ভূমিকায় অভিনয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ রূপদান করেছেন সুমিতা চ্যাটার্জি, গীতশ্রী মুখার্জী, কেয়া গোস্বামী, অসীম গোস্বামী, মুকুল চট্টোপাধ্যায়, অশোক গোস্বামী ও সুনীল গোস্বামী। আবহ-সংগীতে দক্ষতা প্রদর্শন করেন প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় ও বিনু দত্ত। সব মিলিয়ে নাটকটি খুব উপভোগ্য হয়েছে।

ত্রিবেণী টিস্যুতে নাট্যানুষ্ঠান

গত ২৯ জুন শনিবার টিস্যুস এমপ্লয়িজ ক্লাবের সভাবৃন্দ কিরণ মৈত্রের 'বারোঘণ্টা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। সমস্যা-জর্জরিত এক মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করেই নাটকটি রচিত। দলগত অভিনয়, পরিচালনা ও মঞ্চসজ্জার চমৎকারিত্ব এই নাটকটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। অভিনয়ে প্রথমেই যিনি দর্শকদের একতরফা তা[illegible] কুড়িয়েছেন তিনি হলেন চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়। মনের দুঃখ, কষ্ট, অভাব-অভিযোগকে হাসি তামাসায় ঢেকে যে চরিত্রটি সবসময়ই অন্তর্জ্বালায় জ্বলেছেন সেই কেন্দ্রবিন্দু অনিলের চরিত্রটি আশ্চর্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যার চরিত্রে ফ্লোরা শীল সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। নাটকের আর এক কেন্দ্রবিন্দু এই চরিত্রটি সুন্দর অভিব্যক্তির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন এই অভিনেত্রী। অমিয় ও অন্ধ সুনীলের চরিত্রে প্রদীপ মুখার্জী ও সজল চক্রবর্তী সুন্দরভাবে তাঁদের জ্বালাযন্ত্রণা ব্যক্ত করেছেন। জগতের ভূমিকায় প্রবীর ব্যানার্জী সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। এছাড়া লতা দেশাই, অমলেশ্বর [illegible]সাদ, তপন মজুমদার, বাসুদেব ঘোষ, সুনীল মজুমদার, নিতাই নিয়োগী, মাঃ প্রদীপ দাশগুপ্ত, সুনীল দে ও জহর নাথও সুন্দর অভিনয় করেন। মঞ্চসজ্জা ও পরিচালনায় নিত্যানন্দ মুখার্জী, পঙ্কজ মুখার্জী ও অজিত চক্রবর্তী অবশ্যই কৃতিত্ব দাবী করতে

পারেন। অভিনয়ের পূর্বে নাট্য সম্পাদক শ্যামা মুখার্জী সবাইকে ধন্যবাদ দেন।'

শুভময়ের নতুন নাটক

'শুভময়' নাট্যসংস্থার শিল্পীসদস্যরা আগামী ১৯ জুলাই দুটি ভিন্নস্বাদের একাংকিকা মঞ্চস্থ করছেন মুক্ত অঙ্গনে সন্ধ্যা সাতটায়। নাটক দুটি হোল—(১) 'মানবতার খাতিরে' নাট্যকার শ্রীচিত্ত ঘোষাল, (২) রুপার্ট ব্রুকের 'লিথুয়েনিয়া' অবলম্বনে বিভূতি মুখার্জি অনূদিত 'কেয়াকুঞ্জ'। সংস্থার নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী 'মিছিলে মিছিলে সূর্য' নাটকের অভিনয় অনিবার্য কারণবশত মঞ্চস্থ করতে পারছেন না সদস্যরা। অতি শীঘ্রই নাটকটির নিয়মিত অভিনয় শুরু হবে। একাংকিকা দুটির নির্দেশনায় আছেন শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ।

ইউ বি আই-এর 'কেয়াকুঞ্জ'

কয়েকদিন আগে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার শিয়ালদহ শাখার কর্মচারীরা "কেয়াকুঞ্জ" নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। পরিচালনায় ছিলেন নির্মল ঘোষ, বিভিন্ন ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন সর্বশ্রী অরুণ সর্বজ্ঞ, সুবোধ চ্যাটার্জী, শর্বরী মুখার্জী, তুষার চক্রবর্তী ও উমা পালচৌধুরী।

শিশু স্বর্গ

আগামী রবিবার (১৪ জুলাই) সকাল ন'টায় মহাজাতি সদনে শিশু স্বর্গের অনুষ্ঠানে নতুন প্রতিভা ছাড়া, যাদুকর এস কে সাহার যাদু প্রদর্শনী ও কচি সংসদের 'মেজদিদি' নাট্যানুষ্ঠান হবে।

কুলটি উদয় চক্র

সম্প্রতি কুলটি সম্মিলনী, বার্ণপুর ভারতী ভবন, আসানসোল সুভাষ ইনস্টিটিউট ও চুরুলিয়া প্রমীলা মঞ্চে 'কুলটি উদয় চক্র' শ্রীসমীপেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর পরিচালনায় "পূজারিণী" ও "কাবেরী তীরে" নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। একক সংগীতে কুমারী অদিতি মুখোপাধ্যায় ও নৃত্যে কুমারী শম্পা লাহিড়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রূপতরঙ্গের রবীন্দ্র-নজরুল-জয়ন্তী

রূপতরঙ্গ নাট্যসংস্থা সম্প্রতি রবীন্দ্র-নজরুল-জয়ন্তী পালন করলেন সংস্থার কক্ষে। সংগীত, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তি ও নাটকাভিনয় ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ।

আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী কবিতা প্রামাণিক, কমলা প্রামাণিক, শ্রাবণী সেন, অশোক বিশ্বাস, অমিতবরণ প্রামাণিক। সংগত ও যন্ত্রসংগীতের আসরে ছিলেন শ্রীমতী কমলা প্রামাণিক, অশোক বিশ্বাস, শ্রীজগাই পাল, রেখা বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ওপর আলোচনা করেন শ্রীঅংশুমান প্রামাণিক,

অতনু ও শ্রীমতী অরুণা বোস, অনুষ্ঠানের শেষ আকর্ষণ—শ্রীঅংশুমান প্রামাণিক রচিত ও নির্দেশিত "ঝরা কলি" এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্র সার্থক রূপায়ণে ছিলেন—জগাই পাল, অশোক বিশ্বাস, অমিতবরণ প্রামাণিক, শ্রাবণী সেন, কমলা প্রামাণিক ও শ্রীঅংশুমান প্রামাণিক।

কবর থেকে বলছি

গত ৮ই জুলাই সোমবার গান্ধার সংস্থা তাঁদের নতুন নাটক মধু গুপ্তের 'কবর থেকে বলছি' সন্ধ্যা ৭টায় মুক্ত-অঙ্গনে মঞ্চস্থ করলেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন প্রতিমা দাশগুপ্ত, মঞ্জুলা মুখার্জি, লতিকা দাশগুপ্ত, অনিল ব্যানার্জি, বিশ্বনাথ মুখার্জি, প্রণব রায়, অরুণ গুপ্ত ও সীতানাথ চৌধুরী।

মিলন আসরের সাজাহান

শ্রীমণি ঘোষের পরিচালনায় মিলন আসরের প্রথম অভিনয় ডি এল রায়ের 'সাজাহান' ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে ২৩ জুন সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে দারার ভূমিকায় শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় অপূর্ব অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। সাজাহান, ঔরংজীব, দিলদার এবং স্ত্রী ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত। এই আসরের উন্নতির আশা রাখি।

দর্পণের নাট্যানুষ্ঠান

নাট্যগোষ্ঠী 'দর্পণ' তাঁদের চতুর্দশ বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে ১৩ই জুলাই প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে 'পোস্টমাস্টার' (গল্প : রবীন্দ্রনাথ) এবং 'বশীকরণ' (রবীন্দ্রনাথ) এ দুটি নাটক মঞ্চস্থ করছেন। পূর্বের প্রযোজনাগুলিতে এঁদের অভিনয় নিপুণতার স্বাক্ষর বহন করে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের 'বশীকরণ' এঁদের নবতম রবীন্দ্র-নাট্য প্রয়াস। অভিনয়ে অংশ নিচ্ছেন অশোক বসাক, শ্যামলী দাশগুপ্ত, শিব ঘোষ, উমা গুহ, তপন চট্টোপাধ্যায় ও সুদাম রাহা। সংগীত নির্দেশনায় রয়েছেন অশোক বসাক এবং নির্দেশনায় রয়েছেন নাট্যকার-পরিচালক অজিত সেন।

থিয়েটার ওয়ার্কশপ

১১ই জুলাই '৬৮ তারিখে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' তৃতীয় বছরে পদার্পণ উৎসব উপলক্ষে থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর কর্মিবৃন্দ আসছে ১২ই জুলাই মুক্ত অঙ্গনে 'ছায়ায় আলোয়' নাটকের ২৫শ অভিনয় ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। গত দু'বছরে দুটি পূর্ণাংগ নাটক 'ললিতা' ও 'ছায়ায় আলোয়' এবং দুটি একাঙ্ক 'জংলী' ও 'ভিয়েতনাম' প্রযোজনা করে এই নাট্যসংস্থা নাট্যরসিক মহলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। এঁদের পরবর্তী নাটক কিছুদিনের মধ্যেই প্রস্তুত হবে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

অর্থ দিয়ে অনর্থ

সম্প্রতি 'সংলাপী'র শিল্পীবৃন্দ শক্তিব্রত চৌধুরীর 'অর্থ দিয়ে অনর্থ'

নাটকটি সার্থকভাবে মঞ্চস্থ করেছেন। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন—অলোক আঢ্য, শান্তিব্রত চৌধুরী, অসীম দাস, দিলীপ মিত্র, সরোজ দাস, শংকর দলুই, মিহির চক্রবর্তী, কিশোর দত্ত, বিমল বিশ্বাস, অশোক ঘোষ, সনাতন কড়ুই, রাধারমণ ঘোষ, রাধানাথ দত্ত, বাসু দাস।

প্রতিযোগিতা

'চন্দননগর নাট্য সংস্কৃতি পরিষদ' আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাট্য প্রতিযোগিতা আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে। যোগদানের শেষ তারিখ ২১শে জুলাই। যোগাযোগের ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক, নাট্য সংস্কৃতি পরিষদ, মুরপাড়া, বাগবাজার, চন্দননগর।

●

বিবিধ সংবাদ

অভিশপ্তা উর্বশী

নীতিশচন্দ্র ঘোষের প্রযোজনায় ফিল্ম স্মরণীর বলিষ্ঠ নিবেদন মহাকবি গিরিশ-চন্দ্র ঘোষের বিজয়-বৈজয়ন্তী 'পাণ্ডব গৌরব' অবলম্বনে 'অভিশপ্তা উর্বশী'র প্রাথমিক কাজ সমাপ্তিমুখে। এই ব্যয়বহুল চিত্রটির পরিচালনায় আছেন গৌর শী, সুর-রচনায় কালোবরণ।

বহু খ্যাতনামা শিল্পীসমন্বয়ে সঙ্গীত-বহুল ছবিটির চিত্রগ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ শীঘ্রই শুরু হবে।

শুভময় অরণোৎসব অনুষ্ঠান

'শুভময়' নাট্যগোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ সংস্থার তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের আয়োজন করেছিলেন সাতাশে জুন মহাবোধি সোসাইটি হলে। এই উপলক্ষে নাট্য-আলোচনা যোগদান করেছিলেন শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দুজনের আলোচনাই ছিল মূলত নবনাট্য আন্দোলনে নাট্যকারদের বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণের প্রতি দাবী জানিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রগতিমূলক নাটক লেখার চেষ্টাকে জোরদার করা। সম্পাদকের বিবৃতিতে জ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান—আগামী বছর হতে এই নির্দিষ্ট দিনে সংস্থার পক্ষ থেকে গুণীজন সম্বর্ধনা এবং অপেশাদার শিল্পীগোষ্ঠীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পীকে শুভময় পুরস্কার দেওয়া হবে। অনুষ্ঠান সভাপতি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র উভয়েই সময়োচিত মনোজ্ঞ ভাষণে আধুনিক নাটকের দুটির কথা উল্লেখ করেন। ইদানীংকালে নাটকের মধ্যে প্রকৃত জীবনবোধের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে কিন্তু তার পরিবর্তে প্রাধান্য লাভ করেছে অপরিসীম দুর্বোধ্যতা ও অসংলগ্নতা। এই অবস্থায় নাট্যকারদের নতুন চিন্তাধারা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে যাতে জীবন ও সমাজ গঠনমূলক সার্থক নাট্যসৃষ্টি হয়। টেকনিকের পরিবর্তে জীবনের ব্যথা-বেদনার মধ্যে দিয়ে নতুন দিগন্তের দুয়ার খুলুক। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন প্রভাতভূষণ, শিখা চক্রবর্তী, গৌরী গাঙ্গুলী, সন্ধ্যা চক্রবর্তী, সুধাংশু-শেখর নাথ। পল্লীগীতি পরিবেশন করেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়। ইংরেজিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে দর্শকদের চিত্ত জয় করেন সুশীল নন্দন। সুকান্ত এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন যথাক্রমে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্ত ভট্টাচার্য। সবশেষে মূকাভিনয় ছিল অনুষ্ঠানের অনতম বিশেষ আকর্ষণ এবং সেদিক দিয়ে শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য সার্থক। শ্রীচিত্তরঞ্জন মিত্রের মঙ্গলাচরণ পাঠ দর্শকচিত্তে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রাখতে পেরেছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল।

বোরহামপুর গ্রামে নজরুল জন্ম-জয়ন্তী

গত ২ জুন ২৪ পরগণা জেলার বোরহামপুর গ্রামে নওরোজ কিশোর কল্যাণ সংসদের উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামের ৬৯তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কিশোর কল্যাণ পরিষদের স্কুল কেন্দ্রের অন্যতম পরিচালক শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অনুষ্ঠানে নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করেন আবদুল মজিদ এবং নজরুল গীতি পরিবেশন করেন শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সম্প্রদায়। নজরুল সম্পর্কে আলোচনা করেন নুরুল ইসলাম, প্রধান অতিথি এবং সভাপতি। এই উপলক্ষে আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীভদ্র। সংসদের পক্ষ থেকে একটি স্মারক-পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

নজরুল জয়ন্তী

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ নজরুল জন্মভূমি চুরুলিয়ায় নজরুল একাডেমি আয়োজিত বিদ্রোহী কবির ৬৯তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসবে 'কুলটি উদয় চক্র' নজরুলের 'কাবেরী তীরে' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করে অসামান্য শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। পরিচালনার কৃতিত্ব শ্রীযুক্ত সমীপেন্দ্র লাহিড়ীর।

গত ৮, ১৩ ও ২৮ মে যথাক্রমে কুলটি সম্মিলনী রঙ্গমঞ্চে, বার্ণপুর ভারতী ভবন রঙ্গমঞ্চে ও আসানসোল সুভাষ ইনস্টিটিউট রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্ত সমীপেন্দ্র লাহিড়ীর পরিচালনায় 'কুলটি উদয় চক্র' রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' নৃত্য-নাট্য মঞ্চস্থ করে কলা-রসিকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। নৃত্যনাট্যটির সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, আবহ-সংগীত সব কিছুতেই অসামান্য শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

চলচ্চিত্র প্রচারজীবী সঙ্ঘ :

বাঙলাদেশের সিনেমার সঙ্গে জড়িত প্রচারবিদ, বিজ্ঞাপন-অঙ্কনশিল্পী, যানার অঙ্কনশিল্পী ও তাঁদের সহকারীগণ: সিনেমার হোর্ডিং-এর ব্যবসা যাঁরা করেন, যাঁরা প্রাচীরপত্র লাগান, বৈদ্যুতিক আলোক-সজ্জা, নিয়নলাইট ফ্লোরেসেন্ট-টিউব বক্স ও পুষ্পসজ্জা দিয়ে চিত্রগৃহগুলিকে শোভিত করেন, যাঁরা সিনেমা-ছবির স্থির-চিত্র তোলেন তাঁরা সকলে একত্র হয়ে 'চলচ্চিত্র প্রচারজীবী সঙ্ঘ' নামে একটি সঙ্ঘ গঠন করেছেন।

এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হল চলচ্চিত্র প্রচারশিল্পকে উন্নত করার চেষ্টা এবং সঙ্ঘের সভ্যদের অসময়ে ও কোন অসুবিধায় সাহায্য করা।

গেল শনিবার সন্ধ্যায় প্রায় একশতজন সভ্যের উপস্থিতিতে এই সঙ্ঘের কর্ম-নির্বাহকমণ্ডলী নির্বাচিত হয়।

সভাপতি : ফণীন্দ্র পাল
সহঃ সভাপতি : পূর্ণেন্দু পত্রী
সম্পাদক : সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সহ-সম্পাদক : অনুপ কর্মকার ও এস, এস, কমল
কোষাধ্যক্ষ : সুকুমার ঘোষ।

কার্যনির্বাহকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্য : বাগীশ্বর ঝা, বিমল মুখোপাধ্যায়, রবি বসু, পঞ্চানন দত্ত, কালী কর, সমর গঙ্গোপাধ্যায়, গোরা রায়, জয়দেব রায়, গোবিন্দ দাস, বিজন মিত্র, আর, এন, সিন্‌হা এবং অম্বিকাপ্রসাদ। সঙ্ঘের অফিস : ৭৭।২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা।

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির পোলিশ চলচ্চিত্রোৎসব :

দিল্লীস্থ পোলিশ দূতাবাসের সহ-যোগিতায় নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি আয়োজিত "পোলিশ চিত্রোৎসব" আসচে ১৫, ১৬ ও ১৭ জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় আকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ অনুষ্ঠিত হবে। ছবিগুলির নাম : 'বারথ সার্টিফিকেট', 'লোটনা' —প্যাসেঞ্জার ও প্যানিক অন দি ট্রেন"।

মধুচক্র সাহিত্য সংসদের উৎসব

শেওড়াফুলি মধুচক্র সাহিত্য সংসদের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ৮ ও ৯ জুন।

প্রথম দিন সংসদের সংগীত শিক্ষায়তন 'স্বরবিতান'-এর শিল্পীবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' মঞ্চস্থ করে। রাজার ভূমিকায় শ্রীগোপিকামোহন চট্টো-পাধ্যায়ের অভিনয় আকর্ষণীয় হয়, অন্যান্য ভূমিকায় প্রিয়ব্রত নন্দ, অশোক দে, গীতিকা চৌধুরী, পম্পা মজুমদার প্রশংসা পান। পরিচালনায় ছিলেন সলিল ঘোষ ও অমল গুপ্ত।

দ্বিতীয় দিন সংসদের পুরস্কার বিতরণী উৎসবে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, বিতর্ক, বক্তৃতা, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃতদের সম্মানিত করা হয়।

জলসা

ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁ স্মৃতিবাসর

গত ২২ জুন ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁর এক স্মৃতিসভা আহ্বান করা হয় মহারাষ্ট্র নিবাস হলে। আহ্বায়ক ওস্তাদ মহিনুদ্দিন ডাগার মেমোরিয়াল ফান্ডের সভাবৃন্দ।

বক্তৃতায় ভারাক্রান্ত মন করে ওস্তাদ আমিনুদ্দিন দাগারের প্রায় ৪ ঘন্টাব্যাপী একক আসরে ধ্রুপদ পরিবেশন অনুষ্ঠানটিকে গাম্ভীর্য ও মর্যাদাসম্পন্ন করেছে।

ওস্তাদ আমিনুদ্দিন দাগার তাঁর নিজস্ব ঘরাণার ঐতিহ্যপূর্ণ গায়কীর এক উজ্জ্বল উদাহরণ পেশ করলেন। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কল্পনার এ হেন মিলন বিরল। আসর সুরু হলো 'মালকোষ' রাগ দিয়ে। মালকোষের দৃপ্ত ওজসের ওপর 'মেঘ' রাগের সজল ঝাপটার স্নিগ্ধ মধুর ছবিখানি ভোলার নয়।

এই ধ্রুপদ শুনতে শুনতে নতুন করে অনুভব করলাম ভারতীয় সঙ্গীত আধ্যাত্মিক ও সৃষ্টিশীল। প্রতিটি রাগভাবের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও শিল্পীর মনের রঙে রাঙিয়ে নবসৃষ্টির পটভূমিকায় তাকে আহ্বান করা যায়।

'মালকোষে'—বিভিন্ন বিস্তার ও বোলতানের পর যতবার মধ্যমে দাঁড়াচ্ছেন মনে হচ্ছে যেন দীর্ঘ তপস্যার শেষে বৈরাগ্যময় শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন কোন তপঃসিদ্ধ সাধক। এরপরই শিল্পীর গানের দাক্ষিণ্যে আকাশ-ভরা পুঞ্জীভূত বেদনার মেঘভার যেন শ্লথগতিতে জমা হতে লাগল শ্রোতার চিত্তে। শুধুমাত্র আরোহী অবরোহী ও বিভিন্ন স্বরসমন্বয় নয়। মনে হোল ভারতীয় রাগসংগীত যেন অমোঘ শক্তির প্রত্যক্ষ সজীব স্পর্শ। এ স্পর্শ মানুষকে বিহ্বল না করে পারে না।

শুদ্ধ, শান্ত ধ্রুপদী আঙ্গিকে একাধারে স্বাধীনতার মুক্ততায় ও সংযমের শাসনে 'মেঘ'-এর বিস্তার হলো। খাণ্ডারবাণীর বজ্র-বিদ্যুৎ সংহত হলো শুদ্ধ বাণীর নিরঞ্জন শুভ্রতায়। সা ধা নি সা ন পা ন সব সরপ, মরস—পমরসা—এই কটি পর্দার কত রকম সমন্বয়ে কত নানারঙা ছবি ফুটিয়ে তুললেন কখনও উদাস, কখনও চঞ্চল, কখনও বিষন্ন আকৃতি।

আসর শেষ হলো করুণ 'ভৈরবী' দিয়ে। সংগতে ছিলেন বিটলদাস গুজরেটী।

এই রকম একক আসন না হলে এ গান এমন করে উপভোগ করা সম্ভব হতো না।

"নটনারায়ণী"র রথোৎসব

রথযাত্রা উপলক্ষে প্রখ্যাতা শিল্পী শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী . প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা দিবসে নট-নারায়ণী সংঘ পরিচালিত এক সরস সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হলো মতিলাল নেহরু রোডে।

শ্রীকৃষ্ণকালী ভট্টাচার্যের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও জগন্নাথ মুখার্জির উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভা শুরু হলো।

অনুষ্ঠানের সভাপতি কলকাতা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীডি এন সিংহ তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে সাকার পুজা ও তার অংশপর্ব পুরাণ, উপনিষদের দৃষ্টান্ত দিয়ে চিত্তগ্রাহী করে তুলেছেন।

সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠানে শ্রীজগন্নাথ মুখার্জি যদুভট্ট রচিত একটি ধ্রুপদ পরিবেশন করেন। আরাধনা [illegible] ভক্তিব্যঞ্জিত ভজন, রুচিরা মুখার্জির দুটি গান এবং মঞ্জুশ্রী তফাদারের স্ব-রচিত একটি ভজন উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করেছিল। বাণী ঠাকুরের সময়োপযোগী কয়েকটি সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত এই আসরের অন্যতম আকর্ষণ। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন নীরদ কুণ্ডু ও অমিয় ভট্টাচার্য। সর্বশেষে সঙ্গীতশাস্ত্রী কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সুরশৃঙ্গারে 'সুরদাসী মল্লার' বাজিয়ে ভাবগম্ভীর পরিবেশে আসরের সমাপ্তি ঘটালেন।

শ্রীমতী যমুনা বড়ুয়া, দীপ্তি রায় এবং চলচ্চিত্র ও শিল্প জগতের বহু বিশিষ্ট অতিথি এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি অদ্রিজানাথ মুখার্জি ও বিশেষ অতিথি রঞ্জিৎ গুপ্ত তাঁদের ভাষণে এই পরিবেশ রচনার জন্য বিশেষ অভিনন্দন জানান গৃহকর্ত্রী চন্দ্রাবতী দেবীকে।

—চিত্রাঙ্গদা

১৯৩৮ সালের লর্ডস মাঠ

এই সেদিন ইংল্যান্ডের লর্ডস মাঠে অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ডের টেস্ট খেলা হয়ে গেল। এই খেলায় হার-জিত নিয়ে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এই খেলায় ইংল্যান্ডেরই জেতার সম্ভাবনা বেশী ছিল। অন্তত খবরের কাগজের মারফত অনুমান করতে কষ্ট হল না যে, দর্শকরা যথেষ্ট আনন্দ ও উত্তেজনার খোরাক পেয়েছিলেন।

আমার জীবনেও এই লর্ডস মাঠে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলা দেখার সুযোগ এসেছিল। এই খেলা দেখতে গিয়ে বহু কষ্ট এবং দুর্ভোগ সহ্য করতে হলেও তা নিয়ে কোনদিন আক্ষেপ করতে হয়নি।

এখনও সেই কথাই বলব—

রাজপুতানা দলের হয়ে আমার ইংল্যান্ড সফর। আর সেই অবসরেই লর্ডস মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ [illegible] উনিশশ আটত্রিশ সালের [illegible]

যেখানে তিনমাস আগে থেকে টিকিট [illegible] সেখানে ইচ্ছে থাকলেই হঠাৎ খেলা দেখা যায় না। তবে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষরা সফররত রাজপুতানা ক্রিকেট দলটিকে মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেননি। দিয়েছিলেন পনেরটি টিকিট। অথচ আমরা দলে একুশজন। ছজন বাদ গেলেন। তারমধ্যে বাংলার কার্তিক বসু এবং [illegible] নাম করার মত ছিলেন বিজয় হাজারে। তবে দলের বিচক্ষণ খেলোয়াড় রামজীই (বিখ্যাত খেলোয়াড় অমর সিংয়ের বড়ভাই) ছিলেন রাজপুতনা দলের সর্বময় কর্তা। ক্যাপ্টেন না হয়েও তিনি দলের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ মাথায় পেতে নিতেন। আর এ হেন রামজীই আমাদের টিকিট না দিতে পারার জন্যে একান্তে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে কাজ হাসিল করেছিলেন।

অগত্যা খেলা দেখতে হল ডেলি টিকিটে। আগের দিন লর্ডস মাঠের হাল-চাল দেখে এলাম। ওখানেও রাত থাকতে লোকে লোকারণ্য। এখানে সেখানে ক্যাম্প। গান-বাজনা হৈ হৈ, চেঁচামেচি। যেন মেলা বসেছে। কিন্তু লাইন কোথায়? শুনলাম পরের পর কে কার পেছনে দাঁড়াবে আগেভাগে তা নাকি ঠিক করা আছে। এর জন্যে হা-হুতাশ কারও নেই বটে তবে হুড়োহুড়ি খুব বেশী। উত্তেজনা আরও বেশী। খেলায় যে টিকিটের টান পড়বে সেকথা বলাই বাহুল্য। হোটেল-রেস্তোরা, রেস্ট হাউস, গেস্ট হাউস ভর্তি হতে কি বাকি ছিল কিছু! খেলার আলোচনায় সবাই মশগুল। সর্বত্রই এক কথা। বলত কে জিতবে? ইংল্যান্ড না অস্ট্রেলিয়া? বিচিত্র সমাবেশ। পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে। দুই দলের নায়ক—হ্যামন্ড এবং ব্রাডম্যানের আঁকা-বাঁকা স্কেচ ঝুলছে মাঠের চারধারে। আসর জমজমাট। লর্ডস মাঠের খেলা দেখবার জন্যে লর্ডস-দেরই আনাগোনা বেশী। রাজ-রাজেশ্বরী এবং সভাবৃন্দেরা মাঠে হাজির হবেন। এই রীতি-নীতি বহুদিন থেকে চলে আসছে। এবং তারই জন্যে খেলার দিন রাজমহলের ও রাজরাণীর বিশেষ প্রোগ্রাম বাতিল থাকে।

ভোর ছটায় উঠে লাইনে দাঁড়াব টিকিটের জন্যে এই ব্যবস্থা করেই তাড়াতাড়ি হোটেলের খাওয়া সেরে বিছানা নিলাম।

ঠুক ঠুক করে দরজায় ঘা পড়তেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। মাঝরাতে কে আবার ডাকে! দরজা খুলতেই হেড ওয়েট্রেস দুটো খাবার প্যাকেট আমার হাতে তুলে দিলেন। চুপি চুপি বললেন : "এখানকার হালচাল ত জান না। সারাদিন না খেয়েই কেটে যাবে।" মুচকি হেসে বললেন : "লর্ডস মাঠের খেলা দেখলেই কি পেট ভরবে?" কথা বলতে বলতেই গোটাকতক আপেল আমার স্লিপিং গাউনের পকেটে ভরে দিলেন। ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বললাম : "ওয়েট্রেস তোমার সহৃদয়তার কথা কোনদিন ভুলব না।" পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করতেই ওয়েট্রেসের মুখ শুকিয়ে গেল। বেশ গম্ভীর হয়েই বললেন : "তুমি কি মনে কর অর্থের লোভে মাঝরাতে ডেকে এগুলো দিতে এসেছি। ছেলেমানুষ আর কাকে বলে!" মাথায় ঠোক্কা মেরে ওয়েট্রেস বললেন : "যাও যাও দেরি করো না শুতে যাও। ভোর ছটার মধ্যে না বেরুলে লর্ডস মাঠের টিকিট মিলবে না বলে রাখছি তোমাকে ও চিনিনা। লেট [illegible] কোথাকার।" কথাটা আমাদের কাছে [illegible] শোনা। হাসতে হাসতে বিদায় জানালাম হেড ওয়েট্রেসকে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁর কথাই ভাবছিলাম। না জানি ঐ [illegible] বছরের মহিলা ওয়েট্রেসটি আমায় কি চোখে দেখেছিলেন।

ভোর ছটায় টিউব রেলে চেপে সেন্ট জন উড স্টেশনে নেমে পড়ি। মাত্র দশ মিনিটের পথ। লর্ডস মাঠ স্টেশনের নাকের ডগায়।

মাঠে যথারীতি লাইন বেড়ে গেছে। কোথায় যাব কোথায় দাঁড়াব কিছুই ঠাহর করতে পারছি না। আনমনা হয়ে দেখছি এক ব্যাঞ্জোবাদককে। তার একটা হাত নেই। শুধু এক হাতেই বাজনা বাজিয়ে ভিক্ষা মেগে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ এক বৃদ্ধার ডাকে ফিরে তাকালাম। বৃদ্ধাটি বললেন : আপনি যে ভারতীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। টিকিট আপনার নেই—আমারও নেই। আমি অবশ্য যাব না। যাবে ঐ নাতি দুটি। ঐ যে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে।" দূরে নাতিদুটোকে দেখিয়ে দিয়ে বৃদ্ধাটি অনুনয় করে বললেন "নাতিদুটোকে একা ছাড়তে ভয় হয়। তুমি যদি ওদের সঙ্গে থাক তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।" বৃদ্ধাকে আশ্বস্ত করলাম। বললাম, "বেশ তাই হবে।"

বৃদ্ধাটি খুশী হয়ে আমার হাত দুটো ধরে বললেন, "আমায় বাঁচালে। তবে খেলার শেষে নাতিদুটোকে আমার হাতে তুলে দিতে ভুলে যেও না কিন্তু। আমি থাকব ঐ পাইন গাছটার নীচে।"

সুযোগ জুটে গেল লাইনে দাঁড়াবার। বৃদ্ধার নাতিদুটো সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বেশ গল্প জুড়ে দিল। খেলার গল্প। ডন আর হ্যামন্ডের গল্প। বলত কে জিতবে? বললাম : কি করে বলি বলত? তবু ইংল্যান্ড এবারে জিতবে, তাই না? [illegible]

[illegible] বিশ্বাস [illegible] [illegible] অন্য দায় দিল। এইভাবে সেইদিন সকলে খেলা দেখত, জানি না এখন কিভাবে দেখে।

অবশেষে ডন আর হ্যামন্ড নামলেন মাঠে টস করতে। হঠাৎ যেন সকলের ঘুম ভাঙ্গল। সকলের মুখে এক কথা—ওয়েলকাম ডন ব্র্যাডম্যান। রাজ-রাণীরাও হাত তুলে ব্র্যাডম্যানকে অভ্যর্থনা জানালেন। ব্র্যাডম্যানের নামে যাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, যার দাপটে ইংল্যান্ড অস্থির, সেই হেন ইংল্যান্ড ক্রীড়ারসিকরাই ডনের একান্ত প্রিয়। বিপক্ষ দলের এই ডনই ছলেন যত-কিছু অনর্থের মূলে। দলের একাই যেন একশ। তবু ডন বলতে লক্ষ লক্ষ লোকের মুখে নাল পড়ে। ডন খেলতে নামলে আনন্দে নেচে ওঠে সবাই। আউট হলে মুখ শুকিয়ে যায় তাদের। টসের রেজাল্ট পেতে দেরী হল না। টস্ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হ্যামন্ড ব্র্যাডম্যানের পিঠ চাপড়ে দিলেন। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে পড়লেন। সবায়ের মুখে এক কথা। ইংল্যান্ড ওয়ান্ দি টস্। বন্ধুর নাতিদুটো ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—কি স্যার, বুঝলেন না ব্যাপারটা। হ্যামন্ড পিঠে হাত রেখে নিশ্চয়ই বলেছিলেন : ব্যাড লাক ডন্। ছেলেদুটোর কথা শুনে হেসে ফেললাম।

কথা শেষ হতেই কতকগুলি তকমা-পরা লোক মাঠের চারধারে প্লাকার্ড হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তাতে লেখা—'ইংল্যান্ড ওয়ান্ দি টস্'। কিছুক্ষণের মধ্যেই আর একপ্রস্থ লোক বেরিয়ে পড়ল ইংল্যান্ডের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে। দর্শকরাও সঙ্গে সঙ্গে নোট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে পড়েছিলাম। আরও অবাক হলাম কতকগুলি কুশনবয়কে দেখে। ছেলেগুলি কুশন বেচছে। চল্লিশ-পঞ্চাশটি করে কুশন এক একজন ছেলের কাঁধে। সে ভারে তারা নুয়ে পড়ছে। স্টেডিয়ামের এক এক প্রান্ত থেকে এক এক সাহেবের ডাক পড়ছে কুশনের জন্যে। আর ছেলেগুলোও এক হাতে কায়দা করে ছুঁড়ে ঠিক লোকের হাতের গোড়ায় ফেলে দিচ্ছে। কি অব্যর্থ লক্ষ্য তাদের। এলোমেলোভাবে ছোঁড়া কুশনের দাম কুড়োতে তারা বেশ ওস্তাদ। অন্ততঃ দশ-পনের গজের মধ্যে পয়সা পড়লে কুশনবয়রা ঠিক হাতে লুফে নেবে। মাঠের এই পরিবেশ দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়েছিলাম।

ব্র্যাডম্যান দলবল নিয়ে নেমে পড়লেন। প্রথম মুহূর্তেই উত্তেজনা। অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার ম্যাকরমিক ইংল্যান্ডের প্রথম তিনজনকে ঘায়েল করলেন। তাঁরা হলেন হাটন, এডরিচ এবং বার্নেট। অগত্যা হ্যামন্ড বড় ফাঁপরে পড়লেন। কিন্তু ভেঙ্গে পড়লেন না। বুঝি বিপর্যয়ের মুখে ভেঙ্গে পড়া তাঁর সাজে না। অন্ততঃ ঘন ঘন বাইনাকুলার দিয়ে হ্যামন্ডকে যা দেখেছিলাম তার বর্ণনা কেমন করে সব বুঝতে পারছি না। হিংস্র [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] নেবার জন্যে জিঘাংসা মূর্তি তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল। যে ম্যাকরমিক বিপর্যয় ডেকে এনেছিলেন তিনিই সবচেয়ে বেশী পর্যুদস্ত হলেন হ্যামন্ডের কাছে। অথচ সেই যুগে ম্যাকরমিক একজন ডাকসাইটে ফাস্ট বোলার। তাছাড়া বিল ওরাইলের মত জগৎবিখ্যাত বোলারকেও হ্যামন্ড তুচ্ছ জ্ঞান করলেন। ওরাইলের বলে হ্যামন্ডের মার দেখে বন্ধু কার্তিক বসুকে বলে উঠেছিলাম—'ওরাইলে যদি বিশ্বের সেরা বোলারই হবেন তবে একটানা হ্যামন্ডকে ফুলটস এবং ওভারপীচ বল দিয়ে যাচ্ছেন কেন?' কার্তিক বসু ইসারায় চুপ করতে বললেন। মুখখানা রাঙ্গা করে বলে উঠলেন, 'আস্তে কথা বল। দেখছ না ওরাইলের বলগুলি হ্যামন্ড এগিয়ে ওভার-পীচ করে নিচ্ছেন।' একবার এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে তিনি বললেন : 'এমন খেলা জীবনে আর দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ আছে।' কথাটা যে কত সত্যি তার প্রমাণ পেলাম তার দ্বিতীয় স্পেলের বোলিং দেখে। যে ওরাইলে হ্যামন্ডকে ধাতে আনতে পাচ্ছিলেন না সেই ওরাইলেরই পিঠ চাপড়ে অধিনায়ক ব্র্যাডম্যান বুদ্ধি বাতলালেন। ব্র্যাডম্যানের কাছে ওরাইলী দশাশয়ী আর লম্বায় ছ ফুট তিন ইঞ্চির ওপর। এ হেন ওরাইলীর পিঠে কি ছোট-খাট ব্র্যাডম্যানের হাত পৌঁছয়? কিন্তু বুদ্ধিতে ব্র্যাডম্যান হার মানালেন হ্যামন্ডকে। লেগ ট্র্যাপের বোলিংয়ে ওরাইলী হ্যামন্ডকে জব্দ করলেন।

ব্র্যাডম্যান কিছুটা খর্বকায়। কিন্তু আঁটসাট। ফিল্ডিংয়ে তাঁর জুড়ি নেই। কভার পয়েন্ট থেকে বল কুড়িয়ে বোলারস এন্ডে বল ছোড়েন। বোলাররা হাত-পা গুটিয়ে সরে থাকেন। হয়ত হাতে লাগবার ভয়ে। নয়ত ব্র্যাডম্যানের লক্ষ্য অব্যর্থ এই ভেবেই কেউ হাত বাড়ান না। তবে ব্র্যাডম্যানের নিশানা কখনও ভুল হয় নি।

এত সত্ত্বেও হ্যামন্ড রান করলেন ২৪০। এবং পেইনটার আউট হন নিরানব্বুই রানে। প্রথম ইনিংসে মোট রান দাঁড়ায় ৪৯৪।

অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসে কিন্তু ব্র্যাডম্যান সুবিধে করতে পারলেন না। ভেরিটির বলে লেট কাট করতে গিয়ে প্লেডন হয়ে যান মাত্র আঠারো রানে। স্বভাবতঃই দলের হাল ধরা দায় হয়ে পড়ে। তার ওপর বৃষ্টি। ভেজা মাঠে দুর্দান্ত বোলার ফার্নেশ ভীষণ মূর্তি ধরলেন। বাম্পারের আঘাতে বিল ব্রাউনকে অস্থির করে তুললেন। কিন্তু এত সত্ত্বেও ব্রাউন উইকেট ছাড়েন নি। শেষ পর্যন্ত ওরাইলীর জুটিতে ব্রাউন যে মরণপণ লড়াই করেছিলেন তার তুলনা পাওয়া ভার। ওরাইলীকে 'ম্যাচ [illegible]' বলা হত।

ওরাইলীর ছয়ক্কার সেদিন দর্শনীয় হয়েছিল। সেদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা আরও মনে পড়ে। ওরাইলীর ক্যাচ ফেলেছিলেন ওয়েলার্ড। পরপর দুটি ক্যাচ ফেলার পরও দর্শকরা ক্ষুব্ধ হন নি। বরং বলেছিলেন—"হেই সমারসেট ওয়েলার্ড, বেটার লাক নেক্সট টাইম।"

অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসে ফিঙ্গলটন মাত্র ৪ রানে আউট হন। ওয়েলার্ড প্রথম বলেই ব্র্যাডম্যানকে বিট করলেন। ব্র্যাডম্যান একটু নড়ে-চড়ে উঠলেন। প্রথম বলেই আচমকা ঠকে গিয়ে বেশ লজ্জায় পড়েছিলেন। কিন্তু ওয়েলার্ডকে ভাল বোলিং-এর তারিফ করতে ভোলেন নি। অপর প্রান্তে ব্রাউন খুঁড়িয়ে চলছেন। প্রথম ইনিংসের আঘাত তখনও তাঁর শরীরে জেঁকে বসে আছে। ব্র্যাডম্যান ওয়েলার্ডকে পাল্টা জবাব দিলেন পর পর চারটি বাউন্ডারী মেরে। পরক্ষণেই ব্রাউনের অবস্থা দেখে ছুটে একটি রান নিলেন। কেননা অপর প্রান্তে ফার্নেস যাতে কোন বিপর্যয় না আনতে পারে। ফার্নেস ব্র্যাডম্যানকে বাম্পার দিলেন। ব্র্যাডম্যান তারও যোগ্য জবাব দিলেন। হুক সট করলেন টেনিসের চাপার মত করে। কিন্তু বল একটুও উঠল না। পায়ের গোড়ায় পীচ খেয়ে বাউন্ডারীর সীমানায় সে বল আছড়ে পড়ল। এমন হুক সট কখনও দেখি নি।

এডরিচ লেগ কাটার বল করলেন। ব্র্যাডম্যান কখনও পিছিয়ে কখনও এগিয়ে মারছেন। তবে কাট সট বেশী। ব্র্যাডম্যান ক্রমান্বয়ে দুজন স্লিপের মাঝখান দিয়েই মেরে যাচ্ছেন। এমনি আর একটি মার মারতে গিয়ে দেখেন স্লিপ ফিল্ডার দুজন একটু নড়ে-চড়ে দাঁড়িয়েছেন। ব্র্যাডম্যান সেটা জানতেন না। কিন্তু তার জন্যে তাঁর কোন অসুবিধে হয় নি। তিনিও একটু ভেবে নিয়ে কাট মারলেন যেখান থেকে স্লিপ ফিল্ডাররা সরে দাঁড়িয়েছিলেন। মারার সঙ্গে সঙ্গেই ব্র্যাডম্যান স্লিপ ফিল্ডার হ্যামন্ডের দিকে চেয়ে চোখ টিপলেন। হ্যামন্ড সে ইসারার জবাবও দিলেন। হাত চাপড়ে বাহবা জানালেন।

শেষ পর্যন্ত ব্র্যাডম্যানকে রোখা ইংল্যান্ডের সাধ্যে কুলোয় নি। সারা দিনটা তিনি ব্যাট করেন। কখনও ধীর, মন্থর, কখনও বেপরোয়াভাবে। দলের দিকে চেয়ে তিনি খেললেন এক চমকপ্রদ ইনিংস।—নট আউট ১০২ রান। খেলার ফলাফল শেষ পর্যন্ত ড্র যায়।

আজকের লর্ডস মাঠের চেহারার কিছু বদল হয়েছে কিনা জানি না। তবে লর্ডস মাঠের ঐতিহ্য চিরকাল থেকে যাবে। আটতিরিশের লর্ডস মাঠে হ্যামন্ড-ব্র্যাডম্যানের খেলা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯৬৮ সালের প্রথম 'মুক্ত' উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিংগলস খেতাব বিজয়ী বিশ্বের এক নম্বর পেশাদার খেলোয়াড় রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) তাঁর পুরস্কার হাতে দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন। ইতিপূর্বে রড লেভার উপর্যুপরি দু' বছর (১৯৬১-৬২) এই প্রতিযোগিতায় সিংগলস খেতাব জয়ী হয়েছিলেন।

খেলাধুলা

দর্শক

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা

মহান ঐতিহ্য, জাঁকজমক, ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্বের খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের যোগদান—এইসব দিক বিচার করে ইংল্যাণ্ডের উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতাকে নিঃসন্দেহে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস আসর বলা যায়। ১৯৬৮ সালের ৮২তম উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতি-যোগিতায় বর্তমান বিশ্বের এক নম্বর পেশাদার খেলোয়াড় রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয়ী হয়েছেন। এই নিয়ে লেভার এই প্রতিযোগিতায় তিন-বার সিংগলস খেতাব পেলেন—অপেশাদার খেলোয়াড়-জীবনে পেয়েছিলেন উপর্যুপরি দু'বার (১৯৬১-৬২)।

শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) মহিলাদের সিংগলস খেতাব জয়ের সূত্রে উপর্যুপরি তিন বছর (১৯৬৬-৬৮) এই খেতাব পেলেন। যুদ্ধোত্তর কালের প্রতি-যোগিতায় (১৯৪৬-৬৮) তাঁকে নিয়ে তিনজন খেলোয়াড় উপর্যুপরি তিন বছর মহিলাদের সিংগলস খেতাব পেয়েছেন। অপর দু'জনও আমেরিকার—লুই ব্রাউ (১৯৪৮-৫০) এবং মরীন কনোলী (১৯৫২-৫৪)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যুদ্ধোত্তর কালের প্রতিযোগিতায় কোন খেলোয়াড় উপর্যুপরি তিনবার পুরুষদের সিংগলস খেতাব পাননি।

এ বছর প্রথম 'মুক্ত' উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিংগলস ফাই-নালের দু'জন খেলোয়াড়—রড লেভার এবং টনি রোচ ছিলেন পেশাদার, ন্যাটা এবং অস্ট্রেলিয়ারই খেলোয়াড়। উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় এইটি ছিল লেভারের পঞ্চম ফাইনাল খেলা। অপরদিকে টনি রোচের প্রথম। লেভার স্ট্রেট সেটে (৬-৩, ৬-৪ ও ৬-২ গেমে) রোচকে পরাজিত করে সিংগলস ট্রফি এবং নগদ পুরস্কার ৪,৮০০ ডলার পান।

মহিলাদের সিংগলস ফাইনালে ১নং বাছাই এবং পেশাদার খেলোয়াড় শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) স্ট্রেট সেটে (৯-৭ ও ৭-৫ গেমে) ৭নং বাছাই [illegible]

...পেশাদার খেলোয়াড় কুমারী জুডি ...ার্টকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন। ...রী টেগার্টের পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল ...লা।

পুরুষ বিভাগের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ...ইনাল খেলায় ৮জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ...শাদার এবং অপেশাদার খেলোয়াড় সমান- ...ন ছিলেন। আবার এই আটজনের মধ্যে ...াই খেলোয়াড় ছিলেন ৬জন (১নং, ...ং, ১০নং, ১২নং, ১৩নং এবং ১৫নং) ...ং অবাছাই ২জন। দেশ-ভিত্তিক হিসাবে ...আমেরিকার ৪জন, অস্ট্রেলিয়ার ২জন ...ং একজন করে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ...ল্যাণ্ডের খেলোয়াড়। সেমি-ফাইনালে ...লেছিলেন ২জন পেশাদার এবং ২জন ...পেশাদার। সেমি-ফাইনাল খেলায় ৪জন ...লোয়াড়ের মধ্যে বাছাই খেলোয়াড় ছিলেন ...নজন (১নং, ১৩নং এবং ১৫নং) এবং ...াছাই ১জন। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ারই ...জন পেশাদার খেলোয়াড় উঠেছিলেন এবং ...াই তালিকায় তাঁদের স্থান ছিল যথাক্রমে ...ং এবং ১৫নং।

মহিলা বিভাগের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ...ইনালে যে ৮জন খেলেছিলেন তাঁদের ... বাছাই খেলোয়াড় ছিলেন ৭জন (১নং ...ং, ৩নং, ৪নং ৬নং, ৭নং এবং ৮নং) ...ং অবাছাই খেলোয়াড় ১জন। সুতরাং ... যায়, মহিলা খেলোয়াড়রা ক্রমপর্যায় ...লিকা রচয়িতাদের মুখ রক্ষা করেছেন— ...লিকায় নির্বাচিত ৮জনের মধ্যে একজন ...নং) বাদে সকলেই কোয়ার্টার ফাইনালে ...ছিলেন। পুরুষ বিভাগের কোয়ার্টার ...নালে আমেরিকার খেলোয়াড়দের সংখ্যা ...ী ছিল, অপরদিকে মহিলাদের ...গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার ...লোয়াড়রা প্রাধান্য রেখেছিলেন। মোট ...নের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ছিল ৩জন, ...মেরিকার ২জন এবং ১জন ক'রে ফ্রান্স, ...ন এবং ব্রেজিলের খেলোয়াড়। সেমি- ...নালের চারজনই ছিলেন বাছাই খেলো- ... (১নং, ৩নং, ৪নং এবং ৭নং)— ...মেরিকার ২জন এবং ১জন করে ...ট্রেলিয়া এবং ইংল্যাণ্ডের। ফাইনালে ...ছিলেন আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার ...য়াড়—১নং এবং ৭নং বাছাই।

...ই এবং পেশাদার খেলোয়াড়দের বিপর্যয়

পুরুষ বিভাগের ক্রমপর্যায় তালিকার ... খেলোয়াড় রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ...লসের খেতাব জয়ী হয়ে তাঁর পদ- ...া অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কিন্তু ২নং থেকে ... বাছাই খেলোয়াড়রা কোয়ার্টার ফাই- ...ই উঠতে পারেননি। লোকের দৃঢ় ধারণা ... পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে বর্তমান ...র ১নং পেশাদার রড লেভার (অস্ট্রে- ...) এবং ২নং পেশাদার কেন রোজওয়াল ...বন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ...লে ১নং বাছাই রড লেভারের ...বন্দী হয়েছেন ১৫নং বাছাই টনি ... (অস্ট্রেলিয়া)। ২নং বাছাই কেন ...ওয়াল (অস্ট্রেলিয়া) ৪র্থ রাউণ্ডে ... বাছাই টনি রোচের কাছে, ৩নং বাছাই আঁদ্রে জিমেনো (স্পেন) ৪র্থ রাউণ্ডে অবাছাই অপেশাদার খেলোয়াড় রে মুরের (দক্ষিণ আফ্রিকা) কাছে, ৪নং বাছাই এবং গত বছরের সিঙ্গলস খেতাব বিজয়ী জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) ৪র্থ রাউণ্ডে ১৩নং বাছাই অপেশাদার আর্থার এ্যাশের (আমেরিকার নিগ্রো খেলোয়াড়) কাছে, ৫নং খেলোয়াড় এবং ১৯৬৪-৬৫ সালের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া) ৪র্থ রাউণ্ডে ১২নং বাছাই অপেশাদার খেলোয়াড় টম ওকারের (নেদার-ল্যাণ্ডস) কাছে, ৬নং বাছাই এবং ১৯৬৬ সালের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী ম্যানুয়েল শান্তানা (স্পেন) ৩য় রাউণ্ডে অবাছাই অপেশাদার খেলোয়াড় ক্লার্ক গ্রেবনারের (আমেরিকা) কাছে এবং ৭নং বাছাই ও ১৯৫৬-৫৭ সালের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী লুই হোড (অস্ট্রেলিয়া) ৩য় রাউণ্ডে বব হিউটের (বর্তমানে দঃ আফ্রিকার খেলোয়াড়) কাছে পরাজিত হন। এক কথায় অপ্রত্যাশিত ফলাফলের এক চূড়ান্ত নজির।

খেতাবের তালিকায় অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা

১৯৬৮ সালের প্রতিযোগিতায় মাত্র দুটি দেশ খেতাব জয়ী হয়েছে—অস্ট্রেলিয়া ৩টি এবং আমেরিকা ২টি। অস্ট্রেলিয়া চারটি বিভাগের ফাইনালে উঠেছিল: এর মধ্যে পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডাবলসের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রাই পরস্পর খেলেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা এই ৩টি খেতাব পেয়েছেন——পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস। অপরদিকে আমেরিকার খেলোয়াড়রা পেয়েছেন ২টি খেতাব—মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস। গত বছর যাঁরা খেতাব পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে এবারও সেই বিভাগেই খেতাব পেয়েছেন আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিং এবং তাঁর ডাবলসের জুটি কুমারী রোজমেরী ক্যাসলস। এ-বছরের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার খেলোয়াড় বাদে মহিলাদের ডাবলসে ফ্রান্স ও বৃটেন এবং মিক্সড ডাবলসে রাশিয়ার খেলোয়াড়রা খেলেছিলেন। মিক্সড ডাবলসের খেতাব বিজয়ী দু'জনেই ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়—কেন ফ্লেচার এবং শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (কুমারী জীবনের পদবী ছিল স্মিথ)। এই দুই জুটিই ইতিপূর্বে তিনবার (১৯৬৩, ১৯৬৫-৬৬) অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে মিক্সড ডাবলস খেতাব জয় করেছিলেন। এ-বছরের প্রতিযোগিতায় কেন ফ্লেচার হংকংয়ে বসবাস করার সূত্রে হংকংয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য

লেভারের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের ফলে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা গত ১৩ বছরের খেলায় (১৯৫৬-৬৮) মোট ১০ বার এবং গত ৮ বছরে (১৯৬১-৬৮) ৬ বার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হলেন। লেভারকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ১০জন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এপর্যন্ত মোট ১৬ বার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। এখানে উল্লেখ্য, উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় বিদেশী খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব প্রথম জয়ী হন অস্ট্রেলিয়ার নরম্যান ব্রুকস, ১৯০৭ সালে। যুদ্ধোত্তর কালের ২৩টি প্রতিযোগিতায় (১৯৪৬-৬৮) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ১১ বার, আমেরিকা ৯ বার এবং একবার করে ফ্রান্স (১৯৪৬), ইজিপ্ট (১৯৫৪) এবং স্পেন (১৯৬৬)।

পেশাদার বনাম অপেশাদার

১৯৬৮ সালের প্রতিযোগিতায় পেশাদার খেলোয়াড়দের প্রথম যোগদানের ফলে পেশাদার এবং অপেশাদার খেলোয়াড়দের মধ্যে কোন্ দল বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেবে তা নিয়ে সারা পৃথিবীর টেনিস মহলে জোর জল্পনা-কল্পনা চলেছিল।

১৯৬৮ সালের পাঁচটি বিভাগের ফাইনালে যে ১৬ জন খেলোয়াড় খেলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পেশাদার খেলোয়াড় ছিলেন ১১ জন এবং অপেশাদার ৫ জন। —মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে ১ জন এবং মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে ৪ জন। শেষপর্যন্ত পাঁচটি খেতাবের চারটি খেতাব পেয়েছেন পেশাদার খেলোয়াড়রা। দুই অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং কেন ফ্লেচার (হংকং) মিক্সড ডাবলস খেতাব [illegible] অপেশাদার খেলোয়াড়দের [illegible] করেছেন।

শ্রীমতী বিলি [illegible] কিং

আন্তর্জাতিক টেনিস আসরের শীর্ষাসনে আজ শ্রীমতী বি[illegible]জিন কিং। যে উইম্বলেডন খেতাব জয়ের [illegible] টেনিস খেলোয়াড়রা আন্তর্জাতিক [illegible] পান, তা তিনি একাধিকবার নানা [illegible] পেয়েছেন। আন্তর্জাতিক টেনিসে তাঁর আবির্ভাব অনেকটা ধূমকেতুর মত। আন্তর্জাতিক টেনিস খেলায় অঘটনঘটন-পটীয়সী হিসাবে তাঁর যথেষ্ট নাম ডাকও আছে। অনেকগুলি নজিরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নজির : কুমারী বিলি জিন মোফিট (কুমারী জীবনের নাম) ১৯৬২ সালের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রথম রাউণ্ডের খেলাতেই সে-বছরের ১নং বাছাই খেলোয়াড় কুমারী মার্গারেট স্মিথকে ১—৬, ৬—৩ ও ৭—৫ গেমে পরাজিত করে রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। একজন অবাছাই খেলোয়াড়ের হাতে প্রথম রাউণ্ডের খেলাতেই ১নং বাছাই খেলোয়াড়ের পরাজয়ের নজির উইম্বলেডনের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে আর নেই। ১৯৬১ সালে মহিলাদের ডাবলসের ফাইনালে তিনি তাঁর মাত্র ১৭ বছর বয়সে কুমারী কারেন হাণ্টজের সহযোগিতায় ৩নং বাছাই জুটি মার্গারেট স্মিথ এবং লেহানকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করে উইম্বলেডনের ডাবলস খেতাব পেয়েছিলেন। অথচ বাছাই তালিকায় তাঁর জুটির কোন স্থানই ছিল না।

টেস্ট ক্রিকেটে ক্যাচ ধরার বিশ্বরেকর্ডের দৃশ্য : লর্ডস মাঠে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় জ্যাক গ্লিসনের (অস্ট্রেলিয়া) 'ক্যাচ' ধরে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে (ছবির ডানদিকে) তাঁর ১১১তম 'ক্যাচ' ধরার সূত্রে টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক 'ক্যাচ' ধরার বিশ্ব-রেকর্ড করছেন।

কুমারী জীবনে তাঁর নাম ছিল বিলি জিন মোফিট। বর্তমান বয়স ২৪। ক্যালিফোর্ণিয়া স্টেট ইউনিভারসিটির ইতিহাসের ছাত্রী। পিতা ইঞ্জিন ড্রাইভার। স্বামী লারি কিং আইনের ছাত্র।

উইম্বলেডন খেতাব জয়

সিঙ্গলস : উপর্যুপরি ৩বার (১৯৬৬-৬৮)
ডাবলস : ৫বার (১৯৬১-৬২, ১৯৬৫, ১৯৬৭-৬৮)
মিকস্‌ড ডাবলস : ১বার (১৯৬৭)
'ত্রিমুকুট' সম্মান : ১বার (১৯৬৭)

রড লেভার

ইতিপূর্বে রড লেভার তাঁর অপেশাদার খেলোয়াড়-জীবনে উপর্যুপরি চারবার (১৯৫৯-৬২) উইম্বলেডনের সিঙ্গলস ফাইনালে উঠে উপর্যুপরি দু'বার (১৯৬১-৬২) সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৫৯ সালের ফাইনালে এ্যালেক্স ওলমেডো (আমেরিকা) এবং ১৯৬০ সালের ফাইনালে নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) তাঁকে পরাজিত করেন।

১৯৬১ **সালের ফাইনাল :** রড লেভার ৬-৩, ৬-১ ও ৬-৪ গেমে ম্যাকিনলেকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন। এই খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হ'তে মাত্র ৫৫ মিনিট সময় লেগেছিল—সর্বাপেক্ষা কম সময়ে পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনাল খেলা শেষ হওয়ার রেকর্ড।

১৯৬২ **সালের ফাইনাল :** রড লেভার ৬-২, ৬-২ ও ৬-১ গেমে মার্টিন মুলিগানকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

১৯৬২ সালে 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব জয়

১৯৬২ সালে বিশ্বের চারটি প্রধান টেনিস প্রতিযোগিতায় (অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে রড লেভার দুর্লভ 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব জয় করেন।

অস্ট্রেলিয়ান সিঙ্গলস : রড লেভার ৮-৬, ০-৬, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে রয় এমার্সনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ফ্রেঞ্চ সিঙ্গলস : রড লেভার ৩-৬, ২-৬, ৬-৩, ৯-৭ ও ৬-২ গেমে রয় এমার্সনকে পরাজিত করেন।

উইম্বলেডন সিঙ্গলস : রড লেভার ৬-২, ৬-২ ও ৬-১ গেমে মার্টিন মুলিগানকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

আমেরিকান সিঙ্গলস : রড লেভার ৬-২, ৬-৪, ৫-৭ ও ৬-৪ গেমে রয় এমার্সনকে পরাজিত করেন।

ভারতবর্ষের খেলা

ভারতবর্ষের তিনজন খেলোয়াড়ই—রমানাথন কৃষ্ণান, জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লাল প্রথম রাউন্ডের খেলায় পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেন। ভারতবর্ষের ডাবলসের জুটি কৃষ্ণান এবং জয়দীপ মুখার্জি দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রথম রাউন্ডের ডাবলসের খেলায় যোগদান করেননি। অপর ভারতীয় ডাবলস জুটি নরেশকুমার এবং প্রেমজিৎ লাল দ্বিতীয় রাউন্ডে পরাজিত হন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : ১নং বাছাই এবং পেশাদার রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-৪ ও ৬-২ গেমে ১৫নং বাছাই এবং পেশাদার খেলোয়াড় টনি রোচ (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : ১নং বাছাই এবং পেশাদার শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) ৯-৭ ও ৭-৫ গেমে ৭নং বাছাই এবং অপেশাদার খেলোয়াড় কুমারী ... টেগার্টকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : ৪নং বাছাই এবং পেশাদার জুটি জন নিউকম্ব এবং টনি রোচ (অস্ট্রেলিয়া) ৩-৬, ৮-৬, ৫-৭, ১৪-১২ ও ৬-৩ গেমে ২নং বাছাই এবং পেশাদার জুটি কেন রোজওয়াল এবং ফ্রেড স্টোলে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : গত বছরের বিজয়ী শ্রীমতী বিলি জিন কিং এবং কুমারী রোজমেরী ক্যাসলস (আমেরিকা) ৩—৬, ৬—৪ ও ৭—৫ গেমে কুমারী ফ্রাসোয়াজ ডুর (ফ্রান্স) এবং শ্রীমতী এ্যান জোন্সকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

মিকস্‌ড ডাবলস : শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট এবং কেন ফ্লেচার (হংকং) ৬-১ ও ১৪—১২ গেমে আলেকস মেট্রেভেলী এবং ওলগা মোরোজোভা (রাশিয়া) পরাজিত করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা	২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৮ম বর্ষ
১ম খণ্ড

১১শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 19th July, 1968. শুক্রবার, ৩রা শ্রাবণ, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীধ্রুব রায়

সাহিত্য সাময়িকী

১৪ জুনের অমৃতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগে—অভয়ংকর লিখিত সাহিত্য সাময়িকী লেখাটির জন্যে ধন্যবাদ জানাই লেখককে। শ্রীজীবনময় দত্ত কলকাতা ছাড়া বাইরের আরও কয়েকটি পত্রিকার নাম জানিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বাইরের আরও কয়েকটি খুবই ভাল পত্রিকার নাম জানাচ্ছি, আপনি যদি প্রকাশ করেন, খুশী হব। হাজারীবাগ জেলার বেরমো থেকে প্রকাশিত "মৈত্রী" মাসিক পত্রিকাটি আমার মতে সকল প্রবাসী পত্রিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বারাণসী থেকে প্রকাশিত 'শিল্পশ্রী' ও 'বর্ণালী'র নাম উল্লেখ করার মত। মেদিনীপুরের 'বেদুইন' মাসিক পত্রিকাটি উঁচুদরের। এই পুরুলিয়া থেকে ৩টি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়—'অগ্রদূত', 'মুক্তি', ও 'নবারুণ'।

বিশ্বজিৎ ঘোষ
পুরুলিয়া পলিটেকনিক হোস্টেল
পুরুলিয়া।

সাহিত্য সংস্কৃতি

১৪ জুন অমৃতের 'সাহিত্য সংস্কৃতি' বিভাগে অভয়ংকর সাহিত্য-সাময়িকী সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু তিনি তাঁর বক্তব্য একমাত্র কোলকাতার সাময়িকী পত্রিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে প্রবন্ধটিকে খুব সংক্ষিপ্ত করতে চেয়েছেন। সারা পশ্চিম বাংলার সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে পরিচিতি দিয়ে সাহিত্য মূল্যায়নের চেষ্টা করলে মফস্বলের পত্রিকাগুলোও এতে সংযোজিত হয়ে প্রবন্ধকে নিঃসন্দেহে দীর্ঘ করবে। এই আলোচনার [illegible] দীর্ঘতম প্রবন্ধের ভয়ে তিনি [illegible] লিখে কাজ সংক্ষেপ করেছেন।

উত্তর বাংলার কুচবিহার থেকে 'ত্রিবৃত্ত' ও 'আধুনিক সাহিত্য', জলপাইগুড়ি থেকে 'প্রান্তিক' ও 'স্ফূর্তি', শিলিগুড়ি থেকে 'কথা ও [illegible]', রায়গঞ্জ থেকে 'অভিযান', বালুরঘাট থেকে 'মধুপর্ণী' ও 'কঙ্কন'-মালদহ থেকে 'মুক্তমেঘ' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। অভয়ংকরের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁর আগামী প্রতিশ্রুত দীর্ঘ প্রবন্ধে শুধু উত্তর বাঙলার কেন সকল মফস্বলের পত্রিকাগুলিই যেন মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়। মফস্বলের পত্রিকাগুলি সংগ্রহে অসুবিধা হয় খুবই সত্য কথা, কিন্তু তিনি যেহেতু একটি বিভাগের সম্পাদনা করে থাকেন সেইহেতু অমৃতের উক্ত বিভাগের মাধ্যমেই তো মফস্বলের পত্রিকাসম্পাদকের কাছে পত্রিকা পাঠানোর অনুরোধ জানাতে পারেন।

এবিষয়ে অভয়ংকরকে ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাই।

রণজিৎ দেব
ত্রিবৃত্তসরণী কুচবিহার

সাহিত্য-সাময়িকী প্রসঙ্গে

৫ই জুলাই এর 'অমৃত' এ অভয়ংকর লিখিত উক্ত নামীয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনময় দত্ত'র পত্রটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শ্রীদত্ত একথা নিশ্চয় জানেন যে এককালে বিহারের প্রধান সাহিত্য-চর্চার কেন্দ্র ছিল ভাগলপুর ও রাঁচি। এখান থেকে বহু পত্র-পত্রিকাই বেরিয়েছে, এখনও বেরোয়। পত্রলেখক রাউরকেল্লার নাম উল্লেখ করেন নি। সেখান থেকে 'কোয়েল' ও আরও একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়—যা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বম্বে, সুদূর রেঙ্গুন এও 'প্রগতি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এমনকি আন্দামানেও প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য-প্রীতি উপেক্ষনীয় নয়। এক সময়ে বিহার অঞ্চলে সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিকদের আগমন হতো। বর্তমানে এখান থেকে 'স্বৈরথ' ছাড়াও 'আলিম্পন' ইত্যাদি পত্র প্রকাশিত হয় তাছাড়া ইংরিজী ভাষাতেও Highlands View সাময়িকীটি প্রকাশিত হচ্ছে। দানাপুরের 'অর্ঘ্য', পাটনার 'বাসর' ও 'সঞ্চিতা' এবং দিল্লীর 'ইন্দ্রপ্রস্থ' তো প্রত্যক্ষ দেখেইছি।

আশাকরি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হবে।

নমস্কারান্তে
বিনীত
শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক : 'কাঁচাহাতের কাগজ'
রাঁচি—৪

রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার

ভারতীয় সংগীত তথা বিশ্বসংগীতের আসরে রবীন্দ্রসংগীত এক বিস্ময়কর বস্তু। আমাদের বাংলাদেশের পরিবেশে এর ভাববস্তু সমৃদ্ধ হয়েছে। আমরা বাঙালী হিসেবে গর্ববোধ করি এই জন্য যে রবীন্দ্রসংগীত বাংলাভাষাতেই রচিত। কথার সঙ্গে সুরের মিলনের গভীর সামঞ্জস্য রবীন্দ্রসংগীতকে এত প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

বর্তমানে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার অনেক বেড়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রসংগীতের সেই সূক্ষ্মভাবকল্পনা দিনে দিনে বর্তমান রবীন্দ্রসংগীতের গায়কি থেকে বিদায় নিচ্ছে। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র-সংগীতের প্রচার ইদানীং অনেক কমে গেছে। রবীন্দ্রসংগীতের অনেক শিল্পী আছেন যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রসংগীত গাইতে গেলে উচ্চাঙ্গ সংগীতের কথা আসে কেন? আদর্শবাদী অনুশীলনকারীরা রবীন্দ্রসংগীতে বিভিন্ন উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব সহজেই অনুমান করতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে তাঁর গানের প্রচার কম হোক, কিন্তু গানের শুদ্ধতা বজায় থাক। তাঁর গান বিকৃত হবে এ তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না। গানের মধ্যে সংবেদনশীলতাকে তিনি সর্বোচ্চ স্থান দিতেন। এ প্রসঙ্গে কবির একটি কথা মনে পড়ছে—"...গানের সুরে যখন অন্তঃকরণের সমস্ত তন্ত্রী কাঁপিয়া ওঠে তখন অনেক সময় আমার এই দৃশ্যমান জগত যেন আকার-আয়তনহীন বাণীর ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে।" এই "আকার-আয়তনহীন বাণীর ভাব-"ই রবীন্দ্রসংগীতের ভাব। শিল্পীর গায়কি এই ভাবকে জাগরিত করবে। আজকাল শিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধানী নন। অন্যান্য সংগীতের চেয়ে রবীন্দ্রসংগীতে এক বিশেষ সচেতনতার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রকাব্যের যথাযথ অনুশীলন করতে হবে রবীন্দ্র-সংগীত শিল্পীকে। এইসব বিকৃত রবীন্দ্রসংগীতের পরিবেশন রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাবের পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের উপর যথেচ্ছাচারকে আপন কন্যার বিবাহোত্তর লাঞ্ছনা জীবনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বহুবার তিনি শিল্পীদের এ সম্বন্ধে সুচেতন করে দিয়েছেন। কিন্তু আজ রবীন্দ্রসংগীত যেমন বিশ্বজনের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে, তেমনি এই অমূল্য বস্তুটির বিকৃতিও ক্রমবর্ধমান হচ্ছে। আজকাল রবীন্দ্রসংগীত অনুশীলন করার সুযোগ বহুবিধ—যেমন ৬০ খণ্ডে বিভক্ত রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি, বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী ইত্যাদি।

সত্যিকারের গুণী রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞগণ এই বিকৃতমহলের কাছে অপরিচিত। তাই যে সব শিল্পীগণ "বাজারে" পরিচিত, তাঁদের এ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রজীবনাদর্শকে শেখাতে হবে। তা না হলে আগামীদিনে এমন সময় আসবে যখন এই বাংলাদেশেই রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসংগীত সম্পূর্ণ বিস্মৃতিপ্রায় বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

শ্রীকান্ত রায়চৌধুরী
কলিকাতা-৩০।

অমৃত

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞানের হাতেই চাবিকাঠি

বিজ্ঞানের যুগে বাস করে তার সর্বব্যাপী প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মানুষের মনীষালব্ধ জ্ঞান আজ সমগ্র মানবজাতির উত্তরাধিকার। স্বাদেশিকতার ভ্রান্ত মোহে কখনো কখনো বিজ্ঞানকে দেশবন্দী করে রাখার চেষ্টা হয়েছে। নাৎসী আমলে জর্মনীতে বিজ্ঞানের বিকৃতি এবং জাতিবৈরিতাবশত বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীদের বিতাড়নের কলংকজনক স্মৃতি আজও পৃথিবীর মানুষের মনে জাগরূক। তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মানুষের শুভবুদ্ধি এবং তার কল্যাণের প্রেরণাই জয়ী হয়েছে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মানুষ একদিক দিয়ে পরম সৌভাগ্যবান যে, মানুষ দীর্ঘকাল ধরে যা শুধু কল্পনা করেছে, প্রকৃতি বিজয়ের সেই চাবিকাঠি অনেকাংশে আজ তার করায়ত্ত। আধিব্যাধির বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রাম থেকে শুরু করে মহাকাশ বিজয়ের শুভলগ্ন বিজ্ঞানই ত্বরান্বিত করেছে।

অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলছে বিজ্ঞান। তার দুই রূপই আজ প্রকট। একদিকে বিজ্ঞান তৈরী করছে নিতানুতন মারণাস্ত্র। পরমাণু বিদারণের কৌশল আয়ত্তে আনার পর এক মহাশক্তির দুয়ার উন্মোচিত হয়ে গেছে মানুষের সামনে। মানুষ তাকে কীভাবে ব্যবহার করবে এ নিয়ে চলছে বিতর্ক। বিজ্ঞানের হাতেই আজ মানবসভ্যতার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। কালান্তক রোগের আক্রমণ থেকে বিজ্ঞান আজ মানুষকে রক্ষা করছে। মৃত্যু, জরা, মহামারীর বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের সার্থক সংগ্রাম মানুষকে বাঁচারই নিশ্চিত আশ্বাস এনে দিয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞানের কল্যাণরূপকেই আমরা আরও সুন্দর, আরও সার্থকভাবে দেখতে চাই।

ভারতবর্ষেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় নূতন সমাজ গড়ে তোলার এক মহান প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানসাধনাও মহৎ ঐতিহ্যপূর্ণ। আচার্য জগদীশ বসু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য সি ভি রামণ, ডাঃ মেঘনাথ সাহা, ডঃ হোমি ভাবা প্রমুখ বিজ্ঞানসাধকদের নিরলস প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচেতনা এবং বাস্তবে তার প্রয়োগের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়েছে। স্বাধীন হবার পর বিজ্ঞানসাধনা প্রসারের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তরুণ প্রতিভা সন্ধান করে তাঁদের গবেষণার সুযোগ দিচ্ছেন সরকার। আমাদের যে-সমস্ত বিজ্ঞানী বৃহত্তর সুযোগ পেয়ে বিদেশে আছেন তাঁদেরও স্বদেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য সরকারের তরফ থেকে আন্তরিকভাবে চেষ্টা হয়েছে। কেননা, ভারতবর্ষকে উন্নত করতে হলে সর্বাঙ্গকভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগ চাই। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে। তার সার্থকতার মূলে আছে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়াস।

আজকের যুগে জাতীয় উন্নতির সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার পথ আজ প্রশস্ত। উন্নয়নশীল দেশগুলি সেই সহযোগিতা গ্রহণ করে তাদের দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত ও বঞ্চিত অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ, আজ একথা সকল জাতিই বুঝতে পারছেন যে, শান্তির মতোই সমৃদ্ধি অবিভাজ্য। পৃথিবীতে কিছু জাতি সুখে-সমৃদ্ধিতে বসবাস করবে আর কিছু জাতি বঞ্চনার অন্ধকারে দিনাতিপাত করবে, এই অসম ব্যবস্থা কিছুতেই স্থায়ী হতে পারে না। অন্যদিকে সামগ্রিক সহযোগিতার দ্বারা পৃথিবীর পুঞ্জীভূত দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা যত তাড়াতাড়ি দূর করা সম্ভব একক প্রচেষ্টায় কোনো জাতির পক্ষে তা সম্ভব নয়।

এই কারণেই বিজ্ঞানের আশীর্বাদ পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে হলে বিশ্বের সমস্ত জাতির মধ্যে চাই সহযোগিতা ও মৈত্রীর ভাব। অন্যদিকে বিজ্ঞানকে মারণাস্ত্র তৈরীর হীন দাসত্ব থেকে দিতে হবে মুক্তি। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে সে কারণেই বিশ্বনিরস্ত্রীকরণ ও শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতির প্রতি সুদৃঢ় ও অবিচল সমর্থন জানানো হচ্ছে। বিজ্ঞান মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন সুযোগ আর আসেনি যখন বিজ্ঞানের সহায়তায় প্রকৃতিকে জয় করে তার শক্তি ও সম্পদ মানুষের কল্যাণে সর্বাঙ্গীণভাবে নিয়োগ করা সম্ভব। নিতানূতন বিস্ময় তুলে ধরছে বিজ্ঞান আমাদের সামনে। আমরা সেই বিস্ময়ের সেতু ধরে শান্তি ও সমৃদ্ধিরউপত্যকায় প্রবেশ করতে চাই। বিজ্ঞানই আমাদের পথপ্রদর্শক। ইয়োরোপ-আমেরিকা বিজ্ঞানের সহায়তায় দেড়শ-দুশো বছরেরমধ্যে জীবনযাত্রার মান এক অকল্পনীয় স্তরে নিয়ে গেছে। ভারতবর্ষ কি এই শতাব্দীর মধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে সকল মানুষকে খাদ্য, জীবিকা ও বাসস্থানের ন্যূনতম প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারবে না?

ভারতে বিজ্ঞান গবেষণা

বিজ্ঞানের ঢেউ সর্বত্র লেগেছে। শুধু পশ্চিম জগতেই নয়, আমাদের দেশেও বিজ্ঞানের সাধনা বহু পুরাতন। ঐতিহাসিক যুগ বাদ দিলেও পশ্চিমী বিজ্ঞান এ-দেশে শতবর্ষ পূর্ণ করেছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রামানুজন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা পুরানো দিনে নতুন বিজ্ঞানের ভিত্তি দিয়েছেন।

ভারতে এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবস্থা কী? এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, আরো চলছে। শুধু বিজ্ঞানীরাই যে গবেষণার অবস্থা জানতে চান তা নয়। জনসাধারণ জানতে ইচ্ছুক, সরকার জানতে চান, শিল্পপতিরা নানা মন্তব্য করেন, সাংবাদিকরা এ নিয়ে সম্পাদকীয় স্তম্ভ লেখেন। সরকারী অর্থে পুষ্ট বিজ্ঞান করদাতা জনসাধারণের কাছে দায়ী। বিজ্ঞানের সাধনা পরিব্যাপ্ত হচ্ছে কিনা, গবেষণা ঠিক পথে চলছে কিনা, গবেষণার ফল দেশকে সমৃদ্ধ করছে কিনা—এ-সবের হিসাব অবান্তর নয়।

কিন্তু বিজ্ঞানের ফলাফল কী দিয়ে বিচার হবে সেটাই এখন কেউ পরিষ্কার করে বলতে পারেন না। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, গুণাগুণ, কার্যকারিতা মাপা কঠিন। সঠিক মাপকাঠি তৈরী হয়নি। বহুদেশে বিজ্ঞান মাপবার চেষ্টা হচ্ছে; বিজ্ঞানকেই বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার চেষ্টা চলছে। এও এক বৈজ্ঞানিক গবেষণা। এর নাম বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, ইংরেজী নাম সায়ান্স অফ সায়ান্স।

স্থূলে মাপকাঠি কিছু ঠিক হয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসার হচ্ছে কিনা তার একটা হদিস পাওয়া যায় খরচের হিসাবে। আর একটি, গবেষক বিজ্ঞানীর সংখ্যার মাপকাঠিতে।

কমলেশ রায়

গবেষণার ব্যয়বরাদ্দ : দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রায় সব টাকাই আসে সরকার থেকে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় কতকগুলি জাতীয় সংস্থা আছে। যেমন, কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (গোটা-ত্রিশেক জাতীয় গবেষণাগার এর আওতায়), পরমাণুশক্তি সংস্থা, প্রতিরক্ষা-বিভাগের গবেষণাগার-গুলি, ভারতীয় কৃষি-গবেষণা ও স্বাস্থ্য-গবেষণা সংস্থাদ্বয়। এছাড়া রেল-বিভাগের গবেষণা-সংস্থা, ভূতত্ত্ব ও খনিজ সন্ধান, সেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের গবেষণা, মৎস্য ও পশু-বিভাগ, প্রত্নতত্ত্ব, নৃ-বিদ্যা ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় আসে। পাঁচ বছর আগে (১৯৬২-৬৩) এসব কেন্দ্রীয় গবেষণা-সংস্থাগুলির বাৎসরিক মোট খরচ ছিল তেত্রিশ কোটি টাকা। ঐ সময় প্রাদেশিক সরকারের গবেষণা সংস্থাগুলির ব্যয়-বরাদ্দ ছিল ছয় কোটি টাকার মতো। প্রাদেশিক সরকারের রিসার্চ বিভাগ মূলত কৃষি-সেচ-পশুপালন সম্পর্কিত। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের গবেষণাগারে যা-কিছু ব্যয় হয়, তা অপেক্ষাকৃত সামান্য। বে-সরকারী ক্ষেত্রে গবেষণার ভার নগণ্য। মোটামুটি ধরা যায়, পাঁচ বছর আগে ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার খাতে বছরে চল্লিশ কোটি টাকা খরচ ছিল, কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ইত্যাদি মিলিয়ে। বর্তমানে বাৎসরিক ব্যয় একশ' কোটি টাকার কাছাকাছি উঠেছে। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভাগে পড়ে জাতীয় আয়ের ২০০ ভাগের এক ভাগ বা এক-শতাংশের অর্ধভাগ (০·৫ শতাংশ)।

অনেকে বলেন, এই ক্ষুদ্রাংশ গবেষণার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অন্যেরা বলেন, এই অর্থের সদ্ব্যবহার হলেই যথেষ্ট উপকার হবে। দুপক্ষেরই যুক্তি আছে।

উন্নত দেশগুলি গবেষণার খাতে অনেক বেশী খরচ করে। আমেরিকায় ব্যয়ের অনুপাত তাদের জাতীয় আয়ের শতকরা সাড়ে তিন ভাগ (৩·৫ শতাংশ)। অন্য অনেক দেশ-ই জাতীয় আয়ের এক-শতাংশের বেশী গবেষণায় ব্যয় করে।

তালিকা ১ : সর্বভারতীয় গবেষণাক্ষেত্রে ব্যয়ের অনুপাত

গবেষণাক্ষেত্র	শতকরা ব্যয়
কৃষি, পশু, মৎস্য, সেচ	২৫
বিজ্ঞান ও শিল্প	২২
পরমাণুশক্তি	২০
ভূতত্ত্ব ও খনিজ উন্নয়ন	১০
চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য	৮
অন্যান্য	১৫
	১০০

যদিও বর্তমানে আমাদের দেশে গবেষণার খাতে বাৎসরিক খরচের অঙ্ক অনেক বেড়েছে, মূল্যবৃদ্ধি বিবেচনা করলে সে-টাকায় বেশীদূর যাওয়া যায় না। তাছাড়া অনেক যন্ত্রপাতি এখনও বিদেশ থেকে কিনতে হয়। ডি-ভ্যালুয়েশনের ফলে সেসব অগ্নিমূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবেষণা-গারের এবং গবেষক বিজ্ঞানীদের সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়েছে। এইসব কারণে বিজ্ঞানীদের মাথাপিছু গবেষণার যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিশেষ উন্নতি হচ্ছে না।

অল ইন্ডিয়া ইনস্টিট্যুট অফ মেডিকেল সায়েন্স (নিউ দিল্লী)
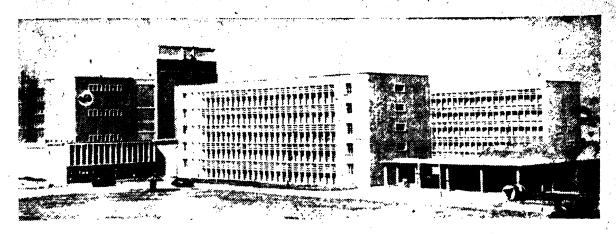
বিজ্ঞানী গবেষকদের সংখ্যা : দেশে বর্তমানে মোটামুটি ষাট হাজার বিজ্ঞানী গবেষণার কাজে নিযুক্ত। এ'দের মধ্যে অর্ধেকের একটু বেশী অপেক্ষাকৃত উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত, যেমন, বিজ্ঞানে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রীধারী বা ইঞ্জিনীয়ারিং ও ডাক্তারীতে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। অন্যেরা বি এস-সি বা ডিপ্লোমাধারী, এ'রা বেশীর ভাগই গবেষণায় সহকারী হিসাবে কাজ করেন। নীচের তালিকায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মোট সংখ্যা ও তাঁদের মধ্যে কতজন গবেষণায় নিযুক্ত তার মোটামুটি হিসাব দেওয়া হলো।

তালিকা ২ : বিজ্ঞানী ও গবেষকের সংখ্যা

বিজ্ঞানী (ক্ষেত্র ও	শিক্ষামান)	মোট সংখ্যা	গবেষণায়
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট	(বিজ্ঞান)	১০৫,০০০	২২,০০০
বি, এস-সি	(বিজ্ঞান)	৩২৫,০০০	১৫,০০০
বি, এস-সি	(কৃষি ও পশু)	৪৫,০০০	৫,০০০
ইঞ্জিনীয়ারিং	(ডিগ্রী)	১২৫,০০০	৭,০০০
ইঞ্জিনীয়ারিং	(ডিপ্লোমা)	১৭০,০০০	৫,০০০
চিকিৎসা	(ডিগ্রী)	৭০,০০০	৫,০০০
চিকিৎসা	(ডিপ্লোমা)	৩০,০০০	১,০০০
	মোট	৮৭০,০০০	৬০,০০০

গত দশ বছরে গবেষকের সংখ্যা পঁচিশ হাজার থেকে ষাট হাজারে উঠেছে।

আর্থিক উন্নয়নে বিজ্ঞান :

বিজ্ঞানকে কার্যকরী করতে হলে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক দেওয়া দরকার। অতীতে বিজ্ঞানের গবেষণা সীমাবদ্ধ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে। অধ্যাপকরা সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, শিল্প-ও-বিজ্ঞানের যোগাযোগের কথা ভাবতেন না। জগতের বিজ্ঞানী মহলে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সুনাম যথেষ্ট হয়েছে, নিছক বিজ্ঞানী হিসাবে। কিন্তু বিজ্ঞানের মারফৎ দেশের শিল্প ও আর্থিক উন্নতি বিশেষ হতে পারে নি।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সবাই যে বিজ্ঞান মন্দিরে ধ্যানস্থ থাকতেন তা নয়। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই ভারতে বৃহৎ শিল্প ও আর্থিক উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের প্রস্তুত হতে বলেছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রসায়ন শিল্পের বনিয়াদ তৈরী করে গিয়েছেন। হোমী ভাবা যন্ত্রশিল্প, পরমাণুজাত বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি ব্যবহারিক বিজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আজ বহু বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার অর্থপ্রসূ গবেষণায় নিযুক্ত।

গবেষণার হাওয়া যথেষ্ট বদলেছে। ফলপ্রদ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের গবেষণায় বর্তমানে খুবেই জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সরকারী গবেষণাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জন্যই। অনেকে অভিযোগ করেন, সেখানেও অনেক সূক্ষ্ম ও মৌলিক বিজ্ঞানের কাজ চলছে যা অর্থকরী নয়। অন্যেরা বলেন, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের রেওয়াজ এতই বেড়ে চলেছে যে মৌলিক বিজ্ঞান মরতে বসেছে। মৌলিক বিজ্ঞানের মৃত্যু হলে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বাঁচবার আশা নেই। মৌলিক বিজ্ঞানের রসই ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রাণ।

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের গবেষণায় এখন প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। সেই অনুপাতে দেশের শিল্প বাণিজ্য ও আর্থিক উন্নতি হচ্ছে কিনা তা নিয়ে অনেক বিতর্ক চলেছে। প্রশ্ন, গবেষণায় কোটি কোটি টাকা ঢেলে আমরা কী পেয়েছি? গবেষণালব্ধ জ্ঞান বা আবিষ্কার কি আমাদের শিল্পপতিরা গ্রহণ করছেন? ইত্যাদি।

ভারতে ব্যবহারিক বিজ্ঞান বা শিল্প সংক্রান্ত গবেষণার ইতিহাস ২০-২৫ বছরের বেশী নয়। শিল্প সংক্রান্ত গবেষণার পাশ দিয়ে বিদেশী যন্ত্রপাতি কলকারখানা এসে পড়েছে, এবং বিদেশী সাহায্যের মারফৎ আমাদের শিল্প ও উৎপাদন বেড়ে চলেছে। ফলে দেশী পদ্ধতির চাহিদা কম। শিল্পপতিরা দেশী আবিষ্কার বা পদ্ধতি গ্রহণ করাকে ঝুঁকি নেওয়া মনে করেন। এটা শুধু বেসরকারী শিল্পপতিরাই মনে করেন তা নয়, সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও বিদেশী সাহায্য ও বিদেশী পদ্ধতি এবং উৎপাদনের কলকারখানা গ্রহণ করতে উদগ্রীব।' অথচ সরকারের খরচেই নানা আবিষ্কার দেশে হচ্ছে। 'ঝুঁকি নিতে চাই না, যা চলতি (বিদেশে) সেটা নেওয়াই নিরাপদ' এটাই যদি বিবেচ্য হয় তাহলে দেশে ব্যবহারিক গবেষণার স্থান কোথায়? সজাগ ও বলিষ্ঠ মনোবৃত্তির অভাবে আমরা বিদেশী যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির দাস হয়ে

পড়েছি। এই দাসত্ব শুধু জাতীয় অবমাননা নয়, আর্থিক ক্ষেত্রে ঘোর ক্ষতিকর। বিদেশীদের কাছে দেনার দায়ে দেশ বিকিয়ে যেতে বসেছে। আমাদের জাতীয় দারিদ্র্য ও বেকারত্বের মূলে রয়েছে এই নির্বিচার বৈজ্ঞানিক পরাধীনতা ও দাস মনোবৃত্তি।

নানারূপ স্বার্থ সংঘর্ষের মধ্য দিয়েও ভারতীয় গবেষণা দেশকে কতটা লাভবান করতে পেরেছে তার বিচার যথাযথভাবে করলে নিরাশ হতে হয় না।

কয়েকটি উদাহরণ : প্রথমে বীক্ষণ কাঁচের কথা ধরা যাক। বীক্ষণ কাঁচ ক্যামেরা, দূরবীণ এবং যাবতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগে নিরীক্ষণের যন্ত্রে ব্যবহার হয়। তাছাড়া রোগের বীজাণু দেখতে, জমি জরীপ করতে, শিল্পজাত দ্রব্যের পরীক্ষায়, এবং স্কুল কলেজে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বীক্ষণ যন্ত্র দরকার হয়। বীক্ষণ কাঁচ সাধারণ কাঁচ নয়, এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক কারচুপী বহু আছে। পৃথিবীতে ৬-৭টি দেশ মাত্র বীক্ষণ কাঁচ তৈরী করতে জানে। এ পদ্ধতি কেউ কাউকে বলে না। ভারতীয় গবেষণার ফলে কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ বীক্ষণ কাঁচ তৈরী করতে পেরেছে। ১৯৬০ থেকে কলকাতায় গ্ল্যাস এন্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট ২৫-২৬ জাতের বীক্ষণ কাঁচ তৈরী করে প্রতিরক্ষা বিভাগ এবং বীক্ষণ যন্ত্র নির্মাতাদের সরবরাহ করছে। টাকার হিসাবে কতটা লাভ হয়েছে তা আমার জানা নেই। কিন্তু বীক্ষণ কাঁচের অপরিসীম প্রয়োজনীয়তার এবং এর অভাবে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকার কথা ভাবলে এর মূল্য অসীম বলেই মনে হবে। দেশে যদি বীক্ষণ কাঁচ তৈরী না হত এবং আন্তর্জাতিক অঘটনে যদি কখনও আমদানী বন্ধ হত তাহলে দেশের শিক্ষা, শিল্প, চিকিৎসা ও প্রতিরক্ষা বিভাগ পঙ্গু হতে দেরী হত না। ভারতীয় গবেষণা সেই দুঃস্বপ্ন থেকে দেশকে বাঁচিয়েছে।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব টেকনোলজি : জোয়াই (বোম্বাই)

ভারতবর্ষে কয়লা আছে। সব কয়লাই সমান কাজের নয়, ভাল-মন্দ আছে। উনান জ্বালাতে সব কয়লাই চলতে পারে। লোহা গলাতে বাছ-বিচার করতে হয়। তেমনি ইঞ্জিনে বা পাওয়ার হাউসের ব্যবহারে সব কয়লা চলে না। অনেক অচল কয়লা ধুয়ে কয়লার সঙ্গে মিশিয়ে সচল করে নেওয়া যায়। এর জন্য বিজ্ঞানের গবেষণা চাই। জিয়ালগোরায় (ধানবাদ) একটি গবেষণাগার আছে কয়লা ও জ্বালানী সংক্রান্ত ব্যাপারে। তাঁদের গবেষণার ফলে কোটি কোটি টাকার নিকৃষ্ট কয়লা কাজে আসছে। এটা দেশের লাভ। গবেষণাগারের হিসাবের খাতায় এর হদিস পাওয়া যাবে না।

মোষের দুধ থেকে শিশুদের গুঁড়ো দুধ বা বেবীফুড তৈরী হতে পারে না বলেই সবার জানা ছিল। ভারতীয় গবেষণার

ট্রম্বে ফার্টিলাইজার প্লান্ট
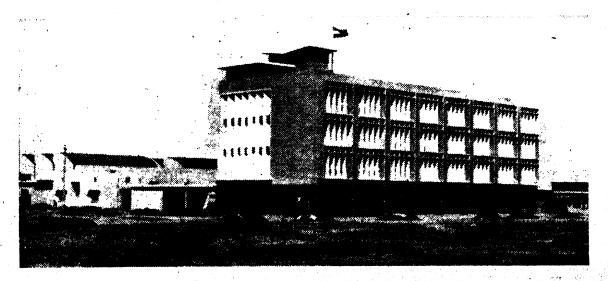
ফলে এক পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে যাতে মোষের দুধের দোষ কাটিয়ে গরুর দুধের মতই বেবীফুড করা যায়। আমাদের দেশে এমনিতেই দুধের ঘাটতি, তার ওপর গরু-মোষের দুধের বাছবিচার করতে হলে বেবীফুড তৈরী করাই দায় হয়ে পড়ে। এই পদ্ধতি বেবীফুড উৎপাদনের নতুন পথ খুলে দিয়েছে।

তামা ও নিকেল ধাতু দেশে বেশী পাওয়া যায় নি। খুঁজলে পাওয়া যাবে মনে হয়। ভূতত্ত্ব বিভাগ সেই খোঁজে লেগে আছে। যতদিন যথেষ্ট খনি আবিষ্কার না হয় ততদিন তামা ও নিকেল ধাতু বুঝে-শুনে খরচ করতে হবে। অনেক প্রয়োজনীয় শিল্পে নিকেল ও তামার দরকার হয়। খুচরা পয়সার মুদ্রা তৈরী করতে বহু টন তামা ও নিকেল আটকে রাখা হত। গবেষণার ফলে অন্যান্য ধাতু ও মিশ্র ধাতু ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে, ফলে তামা ও নিকেলের ঐ বাজে খরচ বন্ধ হয়েছে।

পাকা রাস্তা তৈরী করতে কত খরচ পড়ে জনসাধারণের ধারণা নেই। চওড়া পাকা রাস্তা তৈরী করতে মাইল প্রতি প্রায় এক লক্ষ টাকা লাগে। হাজার মাইল রাস্তা কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। সস্তা করতে হলে রাস্তার জমি, মাল-মশলা ও নির্মাণ পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক গবেষণা দরকার। দিল্লীতে রোড রিসার্চ বিভাগ গবেষণা করে সস্তায় মজবুত রাস্তা তৈরীর উপায় আবিষ্কার করেছেন। এতে বহু কোটি টাকা বাঁচবে।

প্রতিরক্ষার জন্য দ্রুতগতি ক্যামেরা চাই। গোলা-গুলী ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবি নিতে হয়, যাতে বোঝা যায় ঠিক নিশানায় যাচ্ছে কিনা। প্রতি সেকেণ্ডে হাজার ছবি তোলা দরকার। প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন বিজ্ঞানী এরকম দ্রুত ক্যামেরা উদ্ভাবন করে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। প্রতিরক্ষায় এই ভারতীয় উদ্ভাবনের মূল্য অপরিসীম।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক, টেলিভিশন ইত্যাদির গবেষণা ও উৎপাদন যথেষ্ট এগিয়েছে। আরও এগুতে হবে।

পশুর চামড়া ট্যান করলে ব্যবহারযোগ্য হয়। ট্যানের মশলা বিদেশ থেকে আসত। মাদ্রাজে এক গবেষণাগার দেশী মশলা ও পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। অন্য এক গবেষণাগার ব্যবহারের অযোগ্য কাঠের কুচি জমিয়ে সুন্দর শক্ত তক্তা (হার্ডবোর্ড) তৈরীর পথ দেখিয়েছে।

উদাহরণ বাড়ানোর দরকার নেই। বক্তব্য এই যে, মৌলিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের গবেষণা দেশের পক্ষে অপরিহার্য। রাজনীতিক অর্থে ভারত স্বাধীন হয়েছে, অর্থনীতি সংজ্ঞায় আমরা এখনও পরমুখাপেক্ষী। আর্থিক স্বাধীনতা আনতে হলে স্বাবলম্বী হতে হবে বিজ্ঞানে ও শিল্পে। গবেষণা বাড়াতে হবে, গবেষণার ক্ষেত্র বহুমুখী করতে হবে। গবেষণাক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি বা অপচয় যদি কিছু থাকে তা সংশোধন করতে হবে এবং আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলতে হবে। ব্যয়বরাদ্দই প্রগতির একমাত্র মাপকাঠি নয়, সেকথা সত্য, কিন্তু গবেষণাক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দ না বাড়লে দেশের বহুমুখী সমস্যার সমাধানের কাজ এগুবে না। গবেষণাক্ষেত্রে লাভ-লোকসানের চুলচেরা হিসাবে আমরা ব্যস্ত, অথচ ভুলে যাই বিজ্ঞানের লাভ-লোকসানের প্রকৃত বিচার বড়ই কঠিন। টাকা-পয়সার লাভ-লোকসানের খতিয়ান নিশ্চয়ই হতে পারে, কিন্তু অন্য দিকটা আমরা বেমালুম ভুলে যাই। বিজ্ঞানের গবেষণা যদি আমাদের না থাকত তাহলে আমাদের স্বাবলম্বী হবার আশার কথা বলবারই কেউ থাকত না। আজ বিজ্ঞানীরা বলতে পারছেন 'আমাদের সুযোগ দাও। আমরা জানি কোনটি কী! 'টেকনোলজি' এমন কিছু অলৌকিক হাতী-ঘোড়া নয়।' এই আস্থা এসেছে ভারতীয় গবেষণার প্রসারের ফলে। এই প্রসার, এই আস্থা, এই স্বদেশপ্রেম বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

পারমাণবিক শক্তি

সনৎ বিশ্বাস

বিংশ শতাব্দীর এই পারমাণবিক যুগে বিশ্বের প্রধান শক্তিশালী সৃষ্টিধ্বংসকারী অস্ত্রনির্মাণের প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র,—মানবসভ্যতা আজ বিপর্যয়ের পথে। কিন্তু এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর কুটিল পরিবেশের মধ্যেও সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাসী ভারতবর্ষ যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ না করে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে পারমাণবিক গবেষণা করে চলেছে।

ভারতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সরকারীভাবে পারমাণবিক গবেষণার প্রয়োজন স্বীকৃত হয় ১৯৪৮ সালে—আণবিক শক্তি কমিশনের প্রতিষ্ঠার দ্বারা। প্রারম্ভে এই কমিশন ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের উপদেষ্টা হিসেবে যুক্ত থাকে। কিন্তু পরে ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার পরমাণু শক্তিকে কল্যাণকর কাজে নিয়োগ করার এক সুনির্দিষ্ট সরকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করায় জাতীয় জীবনে এই পারমাণবিক শক্তি কমিশন এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এই বৎসরই ভারত সরকারের উদ্যোগে ট্রম্বেতে পারমাণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি সারা ভারতের বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র। এই কেন্দ্রে ১৫৫০ জন বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ার এবং ৭০০০ জন কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন। ট্রম্বের গবেষণাকেন্দ্রের প্রথম প্রচেষ্টা একটি ইলেকট্রনিক বিভাগের সূচনা, সেটি আজ বৃহৎ আকার ধারণ করেছে। এর পর জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার অধীনস্থ পারমাণবিক ধাতু বিভাগটি পারমাণবিক শক্তি কমিশন গ্রহণ করেন। এই বিভাগটির কাজ দেশে বিভিন্না-ঞ্চলে থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রমুখ পারমা-ণবিক ধাতুগুলির অনুসন্ধান করা। ট্রম্বেতে
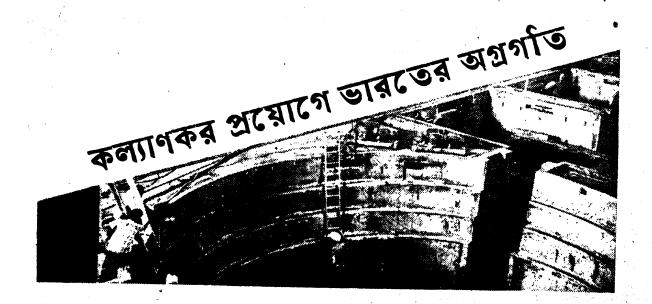
কল্যাণকর প্রয়োগে ভারতের অগ্রগতি

স্থাপিত হয়েছে থোরিয়াম পরিশোধন কেন্দ্র —এই কেন্দ্রে থোরিয়ামকে U ১১৩-তে) রূপান্তরিত করার চেষ্টা চলছে। উল্লেখযোগ্য এই যে, এই থোরিয়াম পরিশোধন-কেন্দ্রটি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ।

১৯৫২ সালেই কোচিনের নিকট আলওয়ে নামক স্থানে আর একটি ধাতু পরিশোধনকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই কেন্দ্রটি এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম পরমাণু-শক্তি উৎপাদনের উপযোগী ইউরেনিয়ম উৎপাদনকারী। এ ভিন্ন জামসেদপুরের কাছাকাছি সদুগুড়া নামক স্থানে সম্পূর্ণ ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ারদের সহ-যোগিতায় একটি ইউরেনিয়ম মিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় হাজার টন। এইভাবে পারমাণবিক ধাতু বিভাগের অধীনে দেশের বিভিন্ন স্থানে উন্নততর পরিশোধনকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, গ্রাফাইট, বেরিলিয়ম, প্রমুখ মডারেটিং মেটিরিয়ালে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ তো বটেই—উপরন্তু এই মডারেটিং মেটিরিয়াল বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হচ্ছে।

পরমাণু গবেষণায় ভারতের অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনার আগে বিশ্লেষণ করা যাক পরমাণুশক্তিকে ধ্বংসমূলক কাজে ব্যবহার না করে কিভাবে জনগণের হিত-কারী কার্যে প্রয়োগ করা যায়। প্রথমত কয়লা ও খনিজ তেলের সাহায্য বিনা কোন পরমাণুশক্তির দ্বারা পারমাণবিক রি-অ্যাকটরের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব এবং এই বৈদ্যুতিক শক্তিকে দেশউন্নয়নকারী বহু পরিকল্পনায় কাজে লাগান যায়। দ্বিতীয় পারমাণবিক

বোম্বাইয়ের কাছে পরমাণু শক্তিচালিত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র
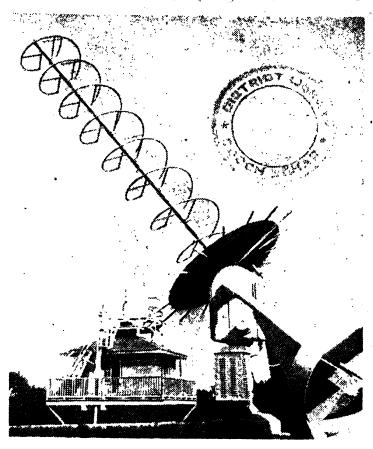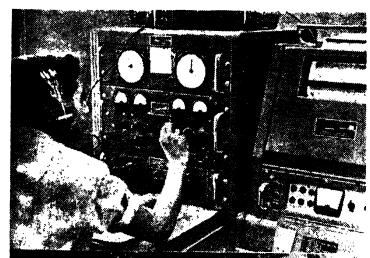
মহাশূন্য থেকে প্রেরিত বার্তা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে পাঠ করা হচ্ছে

গবেষণাকেন্দ্রে ইলেকট্রনের সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে যেগুলির প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তৃতীয়ত পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্রে প্রস্তুত রেডিও-আইসোটোপের ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষি, সেচ ও আবহাওয়া গবেষণাক্ষেত্রে যুগান্তর আনা যায়। আমাদের ভারতবর্ষেও পারমাণবিক শক্তিকে জাতীয় জীবনের নানাদিকে কাজে লাগানোর গবেষণা চলছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য অর্জন করা গেছে।

বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে তারাপুর শক্তিকেন্দ্র। অপেক্ষাকৃত কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদনে এই কেন্দ্র বিশেষ সফলতা লাভ করেছে। ভারতের মত দরিদ্র দেশে কোন নতুন পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করা আবশ্যক ব্যয় সম্বন্ধে। হিসাব করে দেখা গেছে যে,

তারাপুর অঞ্চলে কয়লাচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের খরচ পড়ত প্রতি কিলোওয়াট পিছু ৩·৬৯ পয়সা। তারাপুরে পারমাণবিক কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুতের খরচ হবে প্রতি কিলোওয়াট পিছু ৩·২২ পঃ। দেশের যেসব অঞ্চলে কয়লা বা তেল নেই সেই সব অঞ্চলে কমখরচে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পরমাণুশক্তিই ভরসা। এই সব কারণেই রাজস্থানের রাণাপ্রতাপ সাগর নামক স্থানে একটি পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতেও কয়লা ও তেলের অভাবের জন্য সেখানে সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে মাদ্রাজের কাছে কাল-পাক্কাম নামক স্থানে ভারতের তৃতীয় পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করার কথা হয়েছে। এভিন্ন ওখানে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হবে। এই কেন্দ্রে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে রূপান্তরিত করার জন্য বিশেষ গবেষণা করা হবে। এই প্রচেষ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশে পানীয় জলের অভাব ও অনাবৃষ্টির জন্য কৃষিকাজ বিশেষ ব্যাহত হয়ে থাকে। এই প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হলে পানীয় জলের অভাব মিটবে, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

ভারত ও ক্যানাডার মধ্যে এক চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয়েছে শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে ক্যানাডা ভারতকে ক্যানডু ধরনের রি-অ্যাক্টর সরবরাহ করবে। এই কেন্দ্রে স্বাভাবিক ইউরেনিয়ম যা এদেশে প্রচুর পাওয়া যায়, জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এই কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ রাজস্থান বিদ্যুৎ পর্ষদ দ্বারা সারা রাজ-স্থানে সরবরাহ করা হবে। আশা করা যায়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই তারাপুরে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র সমগ্র মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও ভারতের পশ্চিম উপকূলের ব্যাপক অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্য গড়ে ওঠার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে।

এইবার পরমাণুশক্তি দ্বারা বিদ্যুৎ-উৎপাদন ভিন্ন জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছি সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। আজকের দিনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম হিসাব ও পরিমাপের জন্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ট্রম্বে পারমাণবিক কেন্দ্রে একটি পৃথক ইলেকট্রনিক বিভাগ রয়েছে এবং এখানে উন্নততর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হচ্ছে। ইলেকট্রনিক বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণাও এখানকার বিজ্ঞানীরা করে চলেছেন। এখানে প্রস্তুত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কন্টামিনেসন মনিটর, স্ট্রোবোস্কোপস, গ্যামারে স্পেকট্রোমিটার, মাল্টিপারপাস, অসিলোস্কোপ ইত্যাদি।

ট্রম্বেতে রেডিওকেমিস্ট্রি, রেডিও-মেটারলজি সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। এই পারমাণবিক কেন্দ্রে উৎপাদিত রেডিও-আইসোটোপের ব্যাপক ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবহাওয়া নির্ণয়, কৃষি, সেচ ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেডিও-আইসোটোপের ব্যবহার এক যুগান্তর এনেছে। ট্রম্বেতে একটি স্বতন্ত্র হেলথ ফিজিকস ডিপার্টমেন্ট রয়েছে এবং সম্প্রতি একটি রেডিয়েশন মেডিসিন সেন্টার খোলা হয়েছে।

রোগনির্ণয় ক্ষেত্রে রেডিও-আইসোটোপের ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে। থাইরয়েড, কিডনী, লিভার ও ব্রেন টিউমারের নানাবিধ ডাক্তারী পরীক্ষায় রেডিও-আইসোটোপ ব্যবহার করা হচ্ছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে ভিন্ন শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রেও রেডিও-আইসোটোপের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। কারখানায় উৎপাদিত লোহা, প্লাস্টিক, কাগজ ও অ্যালুমিনিয়মের পাতের পুরুত্ব সমানভাবে বজায় রাখার কাজে রেডিও-আইসোটোপ বিশেষ কার্যকরী। বড় বড় বাঁধে ফাটল বা অনুসন্ধানের কাজে রেডিও-আইসোটোপ বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়েছে। অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে কোচিন বন্দর ও হুগলী নদীর জলের গভীরতা জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত বজায় রাখার কাজে রেডিও-আইসোটোপের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। খাদ্যসংরক্ষণ ও বীজাণুমুক্তকরণ কাজে কিভাবে এর সাহায্য গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা চলছে ট্রম্বে পারমাণবিক কেন্দ্রে। এই গবেষণা সফল হলে এই গরম দেশেও শীতের দেশের মত মাছ, ফল প্রভৃতি পচনশীল খাদ্য সংরক্ষিত করা যাবে, ফলে খাদ্যঅপচয় বন্ধ হবে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে উৎপাদিত রেডিও-আইসো-টোপের ব্যবহার দ্বারা আমরা কতভাবে উপকৃত হচ্ছি।

ভারতে পারমাণবিক শক্তির গবেষণা ও ব্যবহার গত দশ বৎসরে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমরা পারমাণবিক শক্তিকে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার না করে জনকল্যাণের কাজে ব্যবহার করেছি। তারাপুর, ট্রম্বে ও অন্যান্য পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রগুলি তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য ডাঃ হোমী ভাবার অক্লান্ত কর্ম-প্রচেষ্টা। ভারতের পারমাণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে এঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতের এই বিশ্ববিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানীর স্বপ্ন ও আদর্শ ছিল পরমাণু শক্তির সাহায্যে এই অনুন্নত ও গরীব দেশের মানুষের কল্যাণ সাধন করা। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আজ ভারতের অসংখ্য পরমাণুবিজ্ঞানী ও কর্মীরা বিভিন্ন কেন্দ্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, কারণ তাঁরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, বিজ্ঞানের কাজ ধ্বংস নয়, বিজ্ঞানের কাজ মানবসমাজের কল্যাণসাধন।

বসু বিজ্ঞান-মন্দির

কলকাতায় বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র

কল্যাণ বসু

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের পক্ষে অবিমিশ্র অভিশাপই নয়। অন্তত দু'-একটি ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ ভারতের জন্য আশীর্বাদ বহন করে এনেছিল। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে তো বটেই। এক-রকম ঐ সময়ের পর থেকেই ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ে উৎসাহদানে সরকার উদ্যোগী হন। দেশে বর্তমানে সরকারী উদ্যোগে গঠিত এ-ধরনের সংস্থার সংখ্যা প্রায় ২৯৩।

দেশে গবেষণামূলক সংস্থা বৃদ্ধি এবং গবেষণামূলক কাজের সুযোগ বাড়াবার জন্য পরিকল্পনা কমিশনও এ-ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একটি হিসেবে দেখা যায়, দেশে ক্রমশই গবেষণামূলক কাজ এবং গবেষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষক ও কারিগরী বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ছিল ৯০০০, তৃতীয় পরিকল্পনায় এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫,০০০। তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে ভারতে বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার জন্য মোট খরচা হয়েছে ১৪৫০ মিলিয়ন টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ হয়েছে ১৪০ কোটি টাকা।

ভারতীয় গবেষণাকে আরও কার্যকর করে তোলার জন্য পরিকল্পনা কমিশন 'সাইনটিফিক রিসার্চ অ্যান্ড রিসার্চ ট্রেনিং' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন। গবেষণা কেন্দ্রসমূহের সহযোগিতায় গবেষকদের দিকনির্দেশ করবার জন্য এই নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে ভারতীয় গবেষক ও অধি-স্নাতক শ্রেণীর ছাত্ররা আধুনিক গবেষণাগার এবং আধুনিক গ্রন্থাদির সুযোগ গ্রহণে প্রায়ই বঞ্চিত। এঁদের এই অভাব দূর করার জন্য পরি-কল্পনা কমিশন বিদেশে প্রকাশিত প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করার প্রস্তাব করেছেন। কাউন্সিল অব সাইনটিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ-এর উপসংস্থা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সাইনটিফিক ডকুমেন্টেশন সেণ্টারের ১৯৬৮-৬৯ সালের কার্যসূচীতে ঐ নতুন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সমৃদ্ধিশালী নতুন ভারত গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার পর সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টার ফলিত বিজ্ঞান, শুদ্ধ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, কারিগরী বিজ্ঞান, ভেষজ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশে বহু গবেষণা-মূলক সংস্থা গড়ে উঠতে থাকে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সহযোগিতায় ভারতে কিছু কিছু উদ্যোগ সফল হলেও, অনেক বিষয়ে কিন্তু এখনো কোন দেশের সহযোগিতা লাভ সম্ভব হয়নি। এ-প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা-বিষয়ক কিছু দ্রব্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন 'অপটিক্যাল গ্লাস'। পৃথিবীর মাত্র ছ'টি রাষ্ট্র এর উৎপাদনে সক্ষম এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই এর উৎপাদন-কৌশল গোপন করে রেখেছেন। এমনকি, এই বিশেষ ধরনের কাচ তৈরি করার যন্ত্রাদি এবং ছক বিশ্বের বাজারে পাওয়া যায় না। 'গান-সাইট', 'মাই-ক্রোস্কোপ', 'টেলিস্কোপ', 'ইণ্টারফেরো-মিটার', 'থিওডোলাইটিস', 'ক্যামেরা', 'বায়না-কুলার', 'রেঞ্জ-ফাইণ্ডার', 'ডাইরেক্টর' প্রভৃতির জন্য অপটিক্যাল গ্লাস অপরিহার্য। প্ল্যানিং কমিশনের নির্দেশে কলকাতাস্থ 'সেণ্ট্রাল গ্লাস ও সিরামিক ইনস্টিট্যুট' এই কাচ উৎপাদনের কাজে হাত দেন। ১৯৬১ সালে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করে সম্পূর্ণ ভারতীয় গবেষকদের চেষ্টায় এবং ভারতীয় সরঞ্জামে ভারতই আজ অমূল্য বস্তুটি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে অস্তিত্ব রক্ষায় গবেষণার এই গুরুত্ব ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরই আন্তরিক ইচ্ছা এবং নির্দেশে স্বাধীনতা লাভের এক বছর পর 'বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তরে'র জন্ম হয়। স্বাধীনতা লাভের আগে ভারতে সরকারী উদ্যোগে যে-ক'টি গবেষণামূলক সংস্থা গড়ে

সায়েন্স কলেজ

উঠেছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়েই সে-সব গড়ে তুলেছিলেন। যেমন 'কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ' 'বোর্ড অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' প্রভৃতি। অবশ্য প্রাক্-স্বাধীন কালে বে-সরকারী উদ্যোগে বেশ কয়েকটি গবেষণা-মূলক সংস্থা গড়ে ওঠে। প্রথমেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কিত এই সংস্থাটি বর্তমানে সরকারী সহযোগিতা পাচ্ছে। এছাড়া ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুট, ১৮৭৬ সালে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স', 'ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অব সায়েন্সেস' এবং 'এশিয়াটিক সোসাইটির' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নোবেল প্রাইজ-বিজয়ী বিজ্ঞানী অধ্যাপক সি ভি রমন ১৯০৭ সালে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সে' যোগদান করেন এবং এখানকার কাজের জন্যই তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পান। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহাও এই গবেষণাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ভারতের গবেষণা-কেন্দ্রসমূহের মধ্যে কলকাতায় অবস্থিত আছে এশিয়াটিক সোসাইটি, বসু বিজ্ঞান মন্দির, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অব সায়েন্সেস, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিট্যুট, ইনস্টিট্যুট অব কালটিভেশন অব সায়েন্স, ইনস্টিট্যুট অব এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন, ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুট প্রভৃতি সংস্থা। 'অমৃত'-এর পূর্ববর্তী সংখ্যাসমূহে কলকাতার কয়েকটি গবেষণা-মূলক সংস্থা সম্পর্কে আলোচনা এবং রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই লেখায় ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুট এবং সেন্ট্রাল সিরামিক অ্যান্ড গ্লাস ইনস্টিট্যুট সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাতের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলতে গেলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে শুরু করতে হয়। সে-সময় কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশের একক প্রচেষ্টাতেই একরকম এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। পরিসংখ্যান-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনে মূলত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুটের জন্ম। ১৯২৮ সালে প্রথম স্ট্যাটিস্টিক্যাল ল্যাবরেটরীর পত্তন হয় এবং তখন থেকেই প্রায় দু' হাজার পাঁচশ' টাকা বাবদ বাৎসরিক গবেষণামূলক গ্রান্ট এই সংস্থা তৎকালীন কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ নামক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পেতো, কৃষি-গবেষণা ব্যাপারে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে। এইভাবে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাব মারফৎ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুটের জন্ম হয়। এই জনসভার চেয়ারম্যান ছিলেন ইনস্টিট্যুটের প্রথম প্রেসিডেন্ট স্যার আর এন মুখার্জি। ১৮৬০ সালের সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশনের ২১ ধারা অনুসারে ১৯৩২ সালের ২৮ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটিকে রেজেস্ট্রিভুক্ত করা হয়। ১৯৫৯ সালের 'ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুট অ্যাকট' শীর্ষক ধারা ইনস্টিট্যুটের অগ্রগতির ব্যাপারে আরেকটি নতুন পদক্ষেপ। এই নতুন গৃহীত ধারার স্বীকৃতির মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় গুরুত্ব দেওয়া হলো। ১৯৬০ সালের জুলাই থেকে এখানে ব্যাচিলার অব স্ট্যাটিস্টিক্স এবং মাস্টার অব স্ট্যাটিস্টিক্স ডিগ্রী চালু হয়। পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য পড়াশুনার বন্দোবস্তও পরে করা হয়।

ইনস্টিট্যুটের প্রধান কয়েকটি উদ্দেশ্য হলো জাতীয় উন্নতি সম্পর্কিত বিষয়ের পরিকল্পনা করা, সেইসব বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যকে প্রচার করা এবং সঠিক পরিসংখ্যান নেওয়া। এছাড়া জনকল্যাণকর কাজে, বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের কাজে, অনুসন্ধান ব্যাপারে, উৎপাদক দ্রব্যাদি উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালকমণ্ডলীর কার্যাবলীর উন্নতি সম্পর্কে বিশেষভাবে পরিকল্পনা এবং গবেষণা করা এই ইনস্টিট্যুটের অন্যান্য মূল উদ্দেশ্য।

এই ইনস্টিট্যুটের কর্মচারিগণ প্রথম থেকেই অর্থনীতি ও সমাজ-সম্পর্কিত পরিসংখ্যান পদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপারে যতটা সম্ভব সরকারী কেন্দ্রগুলির সাহায্য নিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালের প্রচণ্ড বর্ষার,
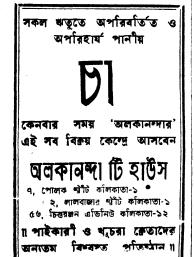
উত্তরবঙ্গ ও উড়িষ্যায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ সালে পরিসংখ্যান দিয়ে এ'রা দেখালেন উড়িষ্যা অঞ্চলের বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার প্রজেক্‌ট'এর সমন্বিধসাধন--দুই-ই সম্ভব। এই হিসেব অনুসরণ করেই ১৯৫০ সালের হীরাকুদ হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক প্রজেক্‌ট স্থাপিত হয়েছিল।

১৯৩০ সালে ভারতে কৃষি উন্নতি সাধনের প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধার জন্যে ইনস্টিটিউটের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ল্যাবরেটরী ভারত সরকারের কাছ থেকে কিছু সাহায্য নিয়ে 'ফিসারিয়ান' প্রথার প্রবর্তন করেন। এর পরই ইনস্টিটিউট সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি পায়। ১৯৩৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'সংখ্যা : দি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব স্টাটিস্টিকস' প্রকাশিত হয়।

জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান বের করার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। ১৯৪১ সালে ভারতের জনসমষ্টির পরিসংখ্যান গ্রহণ প্রাথমিক-পর্ব হিসেবে নেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালে নয়াদিল্লীতে ইনস্টিটিউট 'সেণ্ট্রাল স্টাটিস্টিক্যাল ইউনিট' নামে একটি শাখা খোলে। ১৯৫৪ সালে ইনস্টিটিউট পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া রূপায়ণে সাহায্য করে। সেই থেকে স্টাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট পরিকল্পনা কমিশন ও অন্যান্য সরকারী সংস্থার সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ে গবেষণা ও সমীক্ষা গ্রহণের কাজ করে চলেছেন।

জাতীয় গবেষণাগার সেণ্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের শিল্পপতি, উৎপাদক, বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সঙ্গে ইনস্টিটিউট আলোচনার মাধ্যমে দেশের প্রয়োজন মাফিক গবেষণা ও নতুন নতুন উদ্ভাবনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। অবশ্য মূল লক্ষ্য : বিদেশ থেকে বিভিন্ন শিল্প ও উৎপাদনে প্রয়োজনীয় যে-সব দ্রব্য আমদানী করতে হয়, দেশেই তার বিকল্প উদ্ভাবন করা এবং প্রতিরক্ষার কাজে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনের উপায় বার করা।

সাম্প্রতিক কালে সেণ্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট যে-সব জিনিস উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করেছে, তার মধ্যে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনের দিক থেকে নাম করা যেতে পারে : (১) অপটিক্যাল গ্লাস। আগেই বলেছি পৃথিবীর মাত্র ছ'টি দেশে অপটিক্যাল গ্লাস তৈরী হয়। চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে ইতিমধ্যেই ২৫ ধরনের অপটিক্যাল গ্লাস তৈরী করা হয়েছে।

(২) ট্যাঙ্ক পেরিস্কোপ প্রিজম্‌। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় এর প্রয়োজন খুব বেশী অনুভূত হয়েছিল।

(৩) এটোমিক রেডিয়েশন শিল্ডিং উইনডোজ।

(৪) সিনথেটিক কোয়ার্টজ সিঙ্গল ক্রিসটালস। ইলেকট্রনিক শিল্পে এর প্রয়োজন খুব বেশী। ইলেকট্রনিক শিল্পের জন্য নানা ধরনের কাচও এখানে তৈরী করা হয়েছে।

আর আমদানী ক্ষেত্রে বিকল্প উদ্ভাবনের দিক থেকে ইনস্টিটিউট যে-সব জিনিস বার করেছে তার মধ্যে আছে : (১) অব্যবহৃত মাইকা থেকে হিট ইনসুলেটিং ব্রিকস। ভারতীয় উৎপাদকেরা গত বছর মার্চ মাসের মধ্যে প্রায় ১·১৪ কোটি টাকার 'মাইকা ব্রিক' উৎপাদন করেছে।

(২) গ্রাইণ্ডিং হুইলস ফর সেফ্‌টি রেজর ব্লেডস, (৩) গ্লাস এনামেলস, (৪) অটোক্লেভ প্লাস্টার অব প্যারিস এবং বিশেষ ধরনের কিছু গ্লাস ও সিরামিক।

নতুন উদ্ভাবনের মধ্যে আছে ফোন গ্লাস, কেমিক্যালি টাফ্‌ন্ড গ্লাস প্রভৃতি

ভারতের কৃষি-উন্নয়নে বিজ্ঞান

কুঞ্জবিহারী পাত্র

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আমাদের দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন যে-সব কারণের জন্যে অনেক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে, তার প্রধানতম কারণ হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করা। এই সেদিন পর্যন্তও আমাদের দেশের চাষীদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণাও ছিল না। ভাগ্য এবং বিধাতার উপর নির্ভর করে ভারতীয় চাষী সেকেলে ধরনের উপায়ে জমি চাষ করত, না ছিল জমিতে জলসেচের কোন কৃত্রিম ব্যবস্থা, না ছিল জমিতে কোন সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা। তাছাড়া ছিল গাছের নানারকম রোগব্যাধি এবং অন্যান্য কীট-শত্রুর হাত থেকে শস্য রক্ষা করারও কোন ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল না। আজ আমাদের দেশের চাষীদের মধ্যে একটা নবজাগরণের জোয়ার এসেছে। আজ আর তাকে একমাত্র মেঘের উপর বৃষ্টির জন্য নির্ভর করে থাকতে হয় না, বিজ্ঞান তার জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা করেছে। যে-জমিতে কোন-দিন কোন চাষ-আবাদের সম্ভাবনা ছিল না, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সে রুক্ষ জমিতে ফলছে সোনার ফসল। পার্বত্য প্রদেশে পাঞ্জাব-হরিয়ানার গম উৎপাদনের প্রাচুর্যই সেখানে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে! মাঠের ফসলে কীটশত্রুর বা অন্য কোন রোগব্যাধির আক্রমণ শুরু হলে আজ আর চাষী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে না; সে ছোটে স্প্রেয়ার কিনে ডি-ডি-টি, ফলিডল ছিটাতে। একবার যে-জমিতে ভাল ফসল হল না, সে-জমিকে সে অবহেলা করে ফেলে রাখে না; রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে সে দ্বিগুণ উৎসাহে চাষের কাজে লেগে যায় আবার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করে দেশের খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৫১-৫২ সালে ছিল যেখানে ৫৫০ লক্ষ টন তা ১৯৬৪-৬৫ সালে দাঁড়িয়েছে ৮৯০ লক্ষ টনে। বর্তমান বছরে এই সংখ্যা ৯৫০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অনুরূপভাবে খাদ্যশস্য ছাড়া কৃষিজাত অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদনও অনেক পরিমাণে বেড়েছে। হিসেবে দেখা যায় যে, গত আঠারো বছরে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন গড়ে শতকরা তিন ভাগ করে বেড়ে গিয়েছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষবাস বলতে কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থাকেই বুঝায়. (১) উন্নত জাতের এবং নীরোগ বীজ ব্যবহার, (২) চাষের জমি ঠিক ঠিক মত তৈরী করা, (৩) জলসেচের ব্যবস্থা করা, (৪) জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার (ফার্টিলাইজার এবং ম্যানিওর) ব্যবহার এবং (৫) বৈজ্ঞানিক উপায়ে শস্য রক্ষা করা। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্য নিয়ে উপরোক্ত ব্যবস্থা কয়টির দিকে দৃষ্টি দিতে পারলে জমির ফলন নিশ্চিতরূপে বেড়ে থাকে।

খাদ্যশস্যের উৎপাদনের ব্যাপারে জলই সম্ভবত সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু। জলের সাহায্য ছাড়া গাছ তার কোন খাবারই আত্মস্থ করতে পারে না। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনমত জল সরবরাহ করতে পারলে উৎপাদন বাড়ে শতকরা ২৭ ভাগ। কৃষি-জমিতে জলের প্রাকৃতিক উৎস ছিল এতদিন বৃষ্টি। কিন্তু বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। অতি-বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি—উভয়ই চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। কাজেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা, খাল পরিকল্পনা, গভীর নলকূপ পরিকল্পনা প্রভৃতির সাহায্যে লক্ষ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন অংশে যেসব সেচ-পরিকল্পনা কার্য-কর করা হয়েছে, তার মধ্যে পাঞ্জাবের ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা, রাজস্থানের রাজস্থান খাল পরিকল্পনা, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের চম্বল পরিকল্পনা, বিহারের কোশী পরিকল্পনা, বিহার এবং পশ্চিম-বাংলার দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, পশ্চিমবাংলার ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা, উড়িষ্যার হীরাকুদ, অন্ধ্রপ্রদেশের তুঙ্গভদ্রা এবং নাগার্জুনসাগর পরিকল্পনা উল্লেখ করবার মতো। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ নানারকম সেচ-পরিকল্পনার সাহায্যে বর্তমানে দেশের কৃষি-জমির শতকরা ২২ ভাগে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা হিসেব করে বলেছেন যে, বর্তমান ধরনের সেচ-পরিকল্পনা সাহায্যে কৃষি-জমির আরও শতকরা ১৩ ভাগ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। সোজা কথায় বলা চলে, কৃষি-জমির তিন ভাগের দু' ভাগ পরিমাণ জমিই জলসেচ পরিকল্পনার বাইরে থাকবে। এ-সব জমিতে বৃষ্টিজলের সাহায্য নিয়ে এমন সব শস্যের চাষ করতে হবে যে, কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা না থাকলেও শস্য উৎপাদন যেন কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়।

রাঁচির কৃষি-গবেষণা ইনস্টিটিউট সম্প্রতি এমনি ধরনের একটি পরীক্ষায় অদ্ভুত সাফল্য অর্জন করেছেন। বিহার প্রদেশের ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগণায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ একর জমির মাটি অম্ল-ভাবাপন্ন। এ-সব জমিতে রীতিমত জল-সেচের ব্যবস্থাও সম্ভব নয়। এ-সব জমিতে 'গোরা' নামে শুকনো জমিতে উৎপাদন-যোগী এক রকমের ধান, বাজে জাতীয় জোয়ার প্রভৃতির সামান্য সামান্য চাষ হত। স্বাভাবিকভাবেই পুরানো দিনের কৃষি-পরিকল্পনাকারীরা এ বিরাট জমিটাকে খরচের খাতায় লিখে দিলেন, "না, এ জমি চাষবাসের একেবারেই অনুপযুক্ত। ভবিষ্যতেও এর কোন আশা নেই।" এগিয়ে এলেন কৃষি-গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিকরা। তাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চলল ক্ষেতে হাতে-কলমে কৃষির কাজ। ফল হল আশাতীত। তাঁরা বললেন, উপরি জলসেচের ব্যবস্থা ছাড়াই এ-জমিতে হিসেবমত লাইম এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে পারলে তুলা, চীনাবাদাম, সোয়াবিন, সংকর-জাতীয় জোয়ার ও বজরা, অড়হর প্রভৃতি চমৎকারভাবে চাষ করা যায়, এবং উৎপাদনও হবে আশাতীতরূপে অধিক পরিমাণে। অনুরূপভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের এক বিরাট অংশের জমিতে (যেখানে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়) স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের সাহায্য নিয়েই নানা জাতের কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের দেশে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের সাফল্য অনেকটাই নানা ধরনের সার ব্যবহারের জন্যেই। হিসেবে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র সার ব্যবহার করলেই কৃষিউৎপাদন শতকরা ৩১ ভাগ বেড়ে যায়। আগেকার দিনে এদিকটায় তেমন নজর দেওয়া হয়নি। কারণ, জমির উপর লোকসংখ্যার চাপ এখনকার চেয়ে তখন অনেক কম ছিল। ফলে প্রতি বছরই কিছু কিছু নতুন জমিতে চাষ-আবাদ করা হত। একই জমিতে বার বার চাষ করলে স্বাভাবিক কারণেই গাছের খাদ্যের ঘাটতি পড়ে। সে-অভাব পূরণ করা এবং ফলন বাড়ানোর জন্যে নানাধরনের সার ব্যবহার আজ অপরিহার্য। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেছেন যে, গাছের খাবার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এর মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সে জোগাড় করে বায়ু এবং জল থেকে। গাছের প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য তিনটি—নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাসিয়াম। দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যের মধ্যে রয়েছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগ-নেসিয়াম এবং গন্ধক; তাছাড়া সামান্য পরিমাণে লোহ, জিংক, বেরোন, কপার, ম্যাংগানিজ, মলিবডেনাম এবং ক্লোরিনও গাছের খাদ্য। এর সবরকম পদার্থই গাছ সংগ্রহ করে মাটি, সার, পচা সার প্রভৃতি
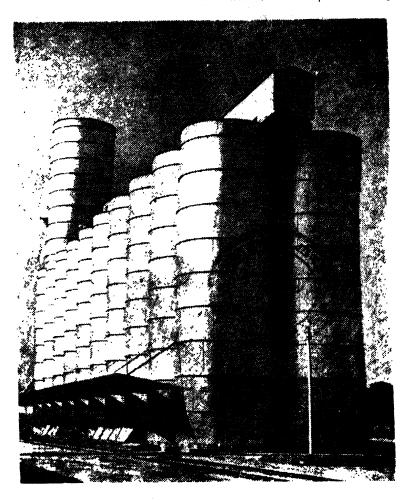
ফসলকে বীজাণু-মুক্ত করবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মাটি নিয়ে গবেষণারত বিশেষজ্ঞ দল

থেকে। কৃষি-জমিতে প্রয়োজনমত সার ব্যবহার করে পৃথিবীর নানা দেশ অসাধ্য সাধন করেছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে আমাদের দেশে হেক্‌টার প্রতি কৃষি-জমিতে গড়ে ৪·৪ কেজি সার ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে নেদারল্যাণ্ডে ব্যবহৃত হয়েছে ৫৫৭ কেজি সার। কৃষিতে উন্নত অন্যান্য দেশের চিত্রও অনেকটা নেদারল্যাণ্ডেরই কাছাকাছি। কাজেই উপযুক্ত পরিমাণে সার ব্যবহার করতে পারলে আমাদের দেশের কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন অনেকাংশেই বাড়ানো সম্ভব হবে। এ-ব্যাপারে আমাদের দেশে যে উল্লেখ-যোগ্য কাজ হচ্ছে, তা বলা চলে। ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সার উৎপাদনের জন্যে দুটি কারখানা চালু রয়েছে আমাদের দেশে নাঙ্গাল এবং রুরকেল্লায়; বিহারের সিন্দ্রিতে অ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট তৈরী হচ্ছে। ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড, অ্যামো-নিয়াম ফসফেট প্রভৃতিও আমাদের দেশে তৈরী হচ্ছে। সার হিসেবে খৈল ব্যবহারেরও প্রচলন রয়েছে আমাদের দেশে। চীনাবাদাম, সরষে, নিম প্রভৃতির খৈল সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, একর-প্রতি ১৫০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়াম সাল-ফেট ব্যবহার করে ১৫৫ পাউণ্ডের বেশী বজরার ফলন সম্ভব হয়েছে; ঐ পরিমাণ সালফেট ব্যবহারে ধানের ফলন পাওয়া গেছে একরে ৫১৪ পাউণ্ড। এর উপরে ২০০ পাউণ্ড সুপার ফসফেট ব্যবহার করে দেখা গেছে যে, ধানের ফলন একরে আরও ২৭৫ পাউণ্ড বেড়েছে এবং বজরার ফলন বেড়েছে ২০৮ পাউণ্ড। পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে দেখা গেছে যে, গড়ে প্রতি ৫ পাউণ্ড অ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহারে ৮ পাউণ্ড বেশী গম পাওয়া যায় জমি থেকে। বিহারের পুসায় ১৫ বছর ধরে একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, একর-প্রতি ২৫০ পাউণ্ড সুপার ফস-ফেট ব্যবহার করে গম উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৯৩ ভাগ বেড়ে গেছে। বিহারের চম্পারণ জেলার একটি পরীক্ষায় দেখা যায়, একই সঙ্গে অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট এবং মিউরিয়েট অফ পটাস ব্যবহার করে প্রতি একর জমি থেকে ২·২ টন বেশী আখ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। পশ্চিম-বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের বহু জমিতে লাইম ব্যবহার করে আশাতীত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। মহারাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চলের চাষের জমিতে কপার সার ব্যবহার করে ধানের ফলন বেড়েছে শতকরা ৩৫ থেকে ৮৫ ভাগ।

পচা সার, সবুজ সার প্রভৃতিও জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করতে পারলে ফলন বাড়ে সেকথা আগেই উল্লেখ করেছি। জমিতে শন, ধইনচা, সেসবানিয়া, মটর প্রভৃতি চাষ করলে সবুজ সারের কাজ হয় এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে। একই সঙ্গে সবুজ সার এবং ফসফেট সার প্রয়োগ করে বিহারে ধানের ফলন শতকরা ৯৬ ভাগ এবং গমের ফলন শতকরা ৩২৭ ভাগ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। ঐ একই উপায়ে মাদ্রাজে ধানের চাষ বেড়েছে শতকরা ৬৬ ভাগ এবং উত্তর প্রদেশে গমের চাষ বেড়েছে শতকরা ৫৩ ভাগ। বিহারের পুসায় পচা সার নিয়ে যে পরীক্ষাকার্য চলেছে তা থেকে দেখা যায় যে, অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগে গমের ফলন বেড়েছে শতকরা ৭ ভাগ, খৈল প্রয়োগে বেড়েছে শতকরা ৯৩ ভাগ এবং পচা সার (ফার্মাইয়ার্ড ম্যানিওর) প্রয়োগে বেড়েছে শতকরা ১৫১ ভাগ। পরীক্ষাটি থেকে পচা সারের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। অথচ আমাদের দেশে পচা সারের কি দারুণ অপচয় হয়! একটি হিসেবে দেখা গেছে যে, ভারতের বড় শহরে যে ময়লা জমে তার ভিতর দিয়ে ৬১ হাজার টন নাইট্রোজেন, ৫২ হাজার টন ফসফরাস পেন্টকসাইড এবং ৭১ হাজার টন পটা-সিয়াম অক্সাইড নষ্ট হয়ে যায়। শহরের ময়লানিকাশের পাইপগুলো দিয়ে যে আবর্জনা ও ময়লা জল বয়ে যায় তার পরিমাণ ৭০ কোটি গ্যালন। এর মধ্যে রয়েছে ৮০ টন নাইট্রোজেন, ১৬ টন ফস-ফরাস পেন্টকসাইড. ৪৮ টন পটাসিয়াম অকসাইড এবং ১৩০০ টন জৈব পদার্থ। তার উপর এই পরিমাণ জল দিয়ে দুই লাখ ১০ হাজার একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

কিন্তু কোন জমিতে কি ধরণের চাষ ফলপ্রসু হবে, কি ধরণের সার ব্যবহার করতে হবে, সে সব জানতে হলে মাটির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হওয়া প্রথমেই দরকার। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন যে, ভারতবর্ষে ৮ রকমের মাটি দেখা যায়; (১) লাল মাটি—মাদ্রাজ, মহীশূর, মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যাঞ্চল, মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণাঞ্চল এবং উড়িষ্যার দক্ষিণাঞ্চলের মাটি। এ মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস্‌, লাইম ও জৈব পদার্থ খুবই কম; কিন্তু সবুজ সার, পচা সার, রাসায়নিক সার প্রয়োগ এবং জলসেচের ব্যবস্থা করলে ফসল ভাল হয়। (২) ল্যাটেরাইট মাটি—অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণাঞ্চল, মহীশূর, কেরালা, মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং আসামের পাহাড়ের উপরকার মাটি। (৩) কালো মাটি—মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং মাদ্রাজের দক্ষিণাংশ। এ মাটিতে সার প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়। এসব অঞ্চলে ভাল তুলা চাষ হয়। (৪) পাললিক মাটি—নদীর অব-বাহিকার মাটি। নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সার প্রয়োগে ধান, গম ও আখের চাষ ভাল হয়। (৫) বন এবং পাহাড়ে মাটি—ভারতের শতকরা ১৭ ভাগই হল পাহাড় মাটি। বনজ সম্পদ ভাল জন্মে এ মাটিতে। (৬) মরুভূমির মাটি—পাঞ্জাব ও রাজস্থানের জমির প্রধান অংশই হল এ-ধরণের। জল-সেচের সুবন্দোবস্ত করলে এ জমি চাষের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়। (৭) লবণাক্ত এবং ক্ষার জাতীয় মাটি—পাঞ্জাব, বিহার, রাজ-স্থান ও বিহারের একটি প্রধান অংশই এ ধরনের। জলনিকাশের ব্যবস্থা ভাল করতে পারলে এসব জমিতে ভাল ফসল হয়। (৮) পিট ও জলাভূমির মাটি—কেরালা, বিহার এবং পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের মাটি। জলনিকাশের ব্যবস্থা এবং সার প্রয়োগে ভাল ধান উৎপাদিত হয় এসব জমিতে।

মাটি কোন জাতের, কি কি রকমের সার ব্যবহার করতে হবে, কি পরিমাণ জল-

সেচ প্রয়োজন—এসব জানবার জন্যে ভারতের বিভিন্ন শহরে অনেকগুলি মাটি পরীক্ষার জন্যে পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়েছে।

বেশী ফলনশীল এবং নীরোগ বীজ ব্যবহার করে কৃষিজাত দ্রব্যের ফলন শতকরা ১৩ ভাগ বাড়ানো যায়। আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি কৃষিজাত দ্রব্যের জন্যে ভাল জাতের বীজ ব্যবহার ক্রমে ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। আশা করা যায় যে, চতুর্থ পরিকল্পনাকালের মধ্যে ৩৩০ লক্ষ একর জমিতে উন্নত জাতের বীজ বপন করা সম্ভব হবে। উ'চু জাতের ভাল বীজ লাগিয়ে ভাল ফলন পেতে হলে সার ব্যবহারের পরিমাণও অনেক বাড়াতে হয়। এসব বীজ যে কেবল বেশী ফলন দেয় তাই নয়। এসব ক্ষেত্রে ফসল ফলতে সময়ও লাগে অপেক্ষাকৃত কম। ফলে একই জমিতে দুটি বা তারও বেশী ফসল ফলানো সম্ভব হয়েছে। তাইচুং নেটিভ ওয়ান এমনি জাতের একটি ধান। এর আদি নিবাস ফরমোজা দ্বীপের তাইওয়া। এর প্রধান গুণের মধ্যে রয়েছে যে, এ-ধানে বেশী সার প্রয়োগ করলে ফলন বাড়ে, খরাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এর আছে অর্থাৎ খরায় এর তেমন কোন ক্ষতি করতে পারে না, বছরের প্রায় সবসময়েই এর চাষ চলে এবং উ'চুতে গাছগুলো বেশ ছোট আকারের হয়। পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা এবং আসামে যে পরীক্ষাকার্য করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, একর প্রতি এ-ধানের ফলন প্রায় ৩,৫০০ পাউন্ড। তাইচুং ছাড়া জাপান থেকে আনা এক ধরনের ধান চাষের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে। বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিম বাংলার রানাঘাটে এ-জাতীয় ধান উৎপাদনের যে পরীক্ষা চলেছে তাও আশাপ্রদ। কটকের সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট জাপানী ধানের সঙ্গে ভারতীয় ধানের সংমিশ্রণে যে শংকর বীজ উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে তার ফলন একর-প্রতি ৩,৫০০ থেকে ৪,০০০ পাউন্ড। অথচ আমাদের দেশী ধানের ফলন একর-প্রতি ১০০০ পাউন্ডের কোনক্রমেই বেশী নয়।

নানারকম রোগব্যাধি, কীট-শত্রু প্রভৃতির আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করতে না পারলে উৎপাদন ব্যাহত হবেই। এদিকেও বর্তমানে নজর দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া ফসল ঘরে তোলার পরও নানারকম কীট-পতঙ্গের আক্রমণে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়; গোলাজাত করার সময়ও ঘটে নানাধরনের ছত্রাক প্রভৃতির আক্রমণ। এসব থেকে ফসল এবং উৎপাদিত শস্য রক্ষা করার জন্যে আজকাল নানাধরনের পেস্টিসাইড, ফাংগিসাইড প্রভৃতি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজিকাল রিসার্চ লেবরেটরী যে কাজ করে চলেছে তা নানাদিক দিয়েই উল্লেখ করার মত। যেসব রাসায়নিক দ্রব্য এ কাজে ব্যবহার করা হয় তা তৈরী করার ব্যাপারে অ্যালকালি অ্যান্ড কেমিক্যাল করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া, টাটা কেমিক্যালস, ট্রিভাঙ্কোর কেমিক্যালস, টাটা ফিসন্স, ইন্ডোফিল, পেস্টিসাইডস্ লিমিটেড

উত্তর প্রদেশ এগ্রিকালচারাল য়্যুনিভার্সিটি
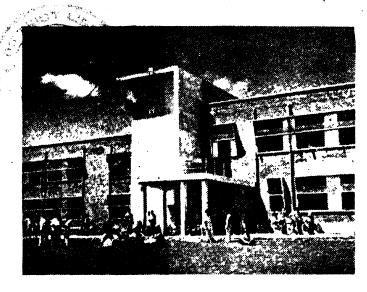
প্রভৃতি কোম্পানীগুলির নাম উল্লেখ করতে হয়।

আগাছার অত্যাচারে চাষীকে অনেক সময় অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। স্বাভাবিক কারণেই আগাছার বৃদ্ধি বেশী; তার উপর নিবিড় চাষের সময় জমিতে অধিক পরিমাণে সার-জল ব্যবহার করলে আগাছার বৃদ্ধি আরও তাড়াতাড়ি। প্রধানত তিনটি উপায়ে আগাছার অত্যাচার বন্ধ করা হয়: (১) নিড়েনের ব্যবস্থা করা। এ সময় 'হো' ব্যবহার করা যায়; (২) নীলোয়ার জোয়ার, শন, মিষ্টি আলু প্রভৃতির চাষ করে, এবং (৩) রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহার করে। অনেক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য আগাছা মারার কাজে ব্যবহার করা হলেও পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 'টু-ফোর-ডি' রাসায়নিক পদার্থটি খুবই কার্যকরী। এ সম্বন্ধেও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে দেশের বিভিন্ন অংশে।

ভূমিক্ষয় নিবারণ করতে না পারলে চাষের কাজ নানাভাবে ব্যাহত হয়। ভূমিক্ষয় ঘটে জল ও বায়ুর তাড়নায়। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ভূমিক্ষয় বন্ধের কাজে ঘাস ও কলাই চাষ খুবই উপযোগী। তাছাড়া জমির উর্বরা শক্তি বাড়ানো, ঘাসের চাপড়া তৈরী করে যেসব ফসল তার চাষ করা, কনট্যুর চাষের ব্যবস্থা প্রভৃতি করতে পারলে ভূমিক্ষয় নিবারণ হয়। মহারাষ্ট্রের শোলাপুর জেলায় প্রায় দশ বছরের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সেখানে স্থানীয় এক জাতের ঘাস, চীনাবাদাম, জোয়ার (রবি), বজরা প্রভৃতি সময়মত চাষ করে ভূমিক্ষয় বন্ধ করা হয়েছে। উত্তর দেশের লক্ষ্মৌ জেলায় কন্ট্যুর পদ্ধতিতে আখের চাষ করে ভূমিক্ষয় বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। শোলাপুরের সয়েল কনজারভেসন গবেষণাকেন্দ্রে স্ট্রিপ পদ্ধতিতে বজরা এবং তুর চাষ করে সেখানকার ভূমিক্ষয় বন্ধ তো হয়েছেই, উপরন্তু সেখানকার জমির উৎপাদিকা শক্তিও অনেক বেড়ে গিয়েছে। পাঞ্জাবের পাতিয়ালা অঞ্চলে গাছপালা লাগিয়ে, গোচারণের কাজ সীমাবদ্ধ করে, কন্ট্যুর খাল খনন এবং ছোট ছোট বাঁধ তৈরী করে লক্ষ লক্ষ একর জমির ভূমিক্ষয় বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম সে-সব জায়গায় শুকনো পদ্ধতিতে চাষের কাজ বা ড্রাই ফার্মিং করা চলতে পারে। এসম্বন্ধে যোধপুরে অবস্থিত ডেজার্ট অ্যাফরেস্টেশন অ্যান্ড সয়েল কনজারভেসন স্টেশন যে কাজ করেছে তা উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্র, মহীশূর, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে ভূমিক্ষয় বিষয় গবেষণাকার্য চলছে। পশ্চিম বাংলার বিশ্বভারতীতে, গুজরাটের সৌরাষ্ট্রে এবং মধ্যপ্রদেশেও শুকনো পদ্ধতিতে চাষের পরীক্ষা-কার্য চলছে।

ভারতে বর্তমানে খাদ্যাভাব ঠিকই, কিন্তু ফলিত বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগে উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্যাভাব ঘোচানো একেবারেই কি অসম্ভব? নিরাশ হওয়ার কারণ দেখি না, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে আর দশটা দেশ যেখানে অসাধ্য সাধন করেছে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা কি তা থেকে পিছিয়ে থাকতে পারেন?

স্যাকারিন প্রস্তুতের যন্ত্র

ভেষজ-বিদ্যায় ভারত

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি বলেছেন—

'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই,
চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য,
আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।'

বর্তমানে আমাদের সমস্যাসংকুল দেশে কবির আকাঙ্ক্ষিত জীবনের এই পরম পাথেয়গুলির একান্ত অসদ্ভাব। তবু একথা আজ নিঃসংশয়ে বলা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও রোগ মহামারীতে মৃত্যুর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। এর মূলে আছে সাধারণভাবে ভেষজ-বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি এবং আমাদের দেশে ভেষজ শিল্প ও গবেষণার ক্রমোন্নতি।

প্রাচীনকালে ভারত যে ভেষজ-বিজ্ঞানের পুরোভাগে ছিল তার নিদর্শন চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিককালে ভারতে ভেষজ-শিল্পের সূচনা খুব বেশিদিনের নয়।

এদেশে আধুনিক ভেষজশিল্পের সূত্রপাত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। যদিও ১৮৩৫ সালে এদেশে সর্বপ্রথম মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয় কলকাতায়, কিন্তু ভেষজবিদ্যা চর্চার জন্যে কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়নি সে সময়। তৎকালীন শাসকবর্গ মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে কেন যে ভেষজ-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেননি তার কারণ স্পষ্টই বোঝা যায়। তাঁরা চেয়েছিলেন, মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয়েরা বিদেশ থেকে আমদানীকৃত ভেষজ ব্যবহারের ব্যবস্থাপত্র দিন। সেই সঙ্গে ছিল এদেশীয় ভেষজ সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এগিয়ে এলেন বিদেশী ভেষজের ওপর এই পরনির্ভরতা দূরীকরণের জন্যে। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করে তিনি আধুনিক ভারতে ভেষজ-শিল্পের সূত্রপাত করলেন। তাঁর পথ অনুসরণ করে পশ্চিম ভারতে টি কে গজ্জার এবং রাজমিত্র বি ডি আমিন ভেষজশিল্পে অবতীর্ণ হলেন। এদেশে দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখকষ্ট দেখে তাঁদের মনে শান্তি ছিল না। তাঁরা দেখেছিলেন—একদিকে যেমন দরিদ্র দেশবাসীর দামী বিদেশী ভেষজ কেনার সামর্থ্য নেই, অপরদিকে তেমনি যথোপযুক্ত চর্চার অভাবে এদেশীয় ভেষজবিদ্যার ক্রমশ অবনতি ঘটেছে (সংস্কৃত কলেজে যে আয়ুর্বেদ চর্চা হত তা-ও তখন বন্ধ হয়ে গেছে)। তাই তাঁরা এদেশীয় উপকরণ দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম দামের ভেষজ প্রস্তুতে ব্রতী হলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কল্যাণহস্তে ভারতীয় ভেষজশিল্পের এই যে শুভ সূচনা হল তা নানা বাধাবিপত্তি ও অসুবিধার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল। এই সময় ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মারাত্মক কালাজ্বর নিরাময়ের ভেষজ 'ইউরিয়া স্টিবামিন' আবিষ্কার করে ভারতীয় ভেষজ-বিজ্ঞানীদের মনে নবপ্রাণ সঞ্চার করলেন। নিজেদের ক্ষমতার প্রতি তাঁদের আস্থা ফিরে এল এবং দেশীয় ভেষজ প্রস্তুতে তাঁরা প্রেরণা পেলেন। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সেবার আদর্শ

নিয়ে কয়েকটি ভেষজ-প্রতিষ্ঠান তখন স্থাপিত হল।

এমন সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণ-দামামা বেজে উঠল। বিদেশ থেকে ভেষজ-দ্রব্যের আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। ফলে ভারতীয় ভেষজের নাম শুনলে নাসিকা পক্ষে সুযোগ উপস্থিত হল। আগে যাঁরা ভারতীয় ভেষজের নাম শুনলে নাসিকা-কুঞ্চন করতেন, বিদেশী ভেষজের অভাবে তাঁরাও ভারতীয় ভেষজ ব্যবহার করতে নির্দেশ দিলেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর বিদেশী ভেষজসমূহের আমদানি আবার শুরু হল এবং দেশীয় ভেষজদ্রব্যের চাহিদা কমে গেল। এই সময় ভারতীয় ভেষজ প্রস্তুতকারকেরা সিরাম, ভ্যাকসিন, ইথার, ক্লোরোফরম, ন্যাপথলিন, শল্যচিকিৎসায় ব্যবহৃত সার্জিক্যাল ড্রেসিং ইত্যাদি প্রস্তুতে অবতীর্ণ হলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় ভেষজশিল্প আরও সম্প্রসারিত হল। যুদ্ধের সময় আমদানীকৃত বিদেশী ভেষজ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ভারতীয় ভেষজ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তখন সামরিক বিভাগের চাহিদা মিটিয়েও দেশের জন-সাধারণের চাহিদা মেটাতে লাগলেন। নানা-রকম উপক্ষারজাত ভেষজ কেমন ক্যাফিন, এফিড্রিন, স্যানটোনিন, স্ট্রিক্নিন, মরফিন, এমিটিন, অ্যাট্রোপিন এবং তাদের লবণ সাইট্রেট, ল্যাকটেট ইত্যাদি তাঁরা এই সময় প্রস্তুত করতে শুরু করেন। এছাড়া পেটের অসুখ ও আমাশয় নিরোধক ভাও-ফরম জাতীয় ভেষজ, কুষ্ঠনিরোধক ভেষজ ডি ডি এস, যক্ষ্মাপ্রতিরোধক ভেষজ, আর্সে-নিকজাত ভেষজ ইত্যাদি প্রস্তুতে তাঁরা অগ্রণী হন এবং তাঁদের প্রস্তুত ভেষজ-গুলির কার্যকারিতা বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ভারতীয় ভেষজশিল্প ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হতে লাগল এবং ভারতীয় ভেষজ-দ্রব্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। ভারতীয় ভেষজদ্রব্য নিম্নমানের বলে আগে যাঁরা অবজ্ঞা প্রকাশ করতেন তাঁরাও ক্রমে ভারতীয় ভেষজদ্রব্যের কার্য-কারিতায় আস্থা স্থাপন করলেন।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে ভেষজ-শিল্পের এক নবযুগ সূচনা হল। জাতীয় সরকারও এদেশীয় ভেষজশিল্পের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। পুনার পিম্-প্রিতে স্থাপিত হল অ্যান্টিবায়োটিকস্ প্রস্তুতের কারখানা হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়ো-টিকস্। এখানে প্রধানত পেনিসিলিন প্রস্তুতের জন্যে কাজ শুরু হয় এবং তারপর অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিকস্ প্রস্তুত হতে থাকে। কয়েকটি বেসরকারী ভেষজ প্রতিষ্ঠানও পেনিসিলিন প্রস্তুতে অব-তীর্ণ হন। এরপর দেশের নানা-প্রান্তে বহু ভেষজ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং তাঁরা নানারকম ভেষজদ্রব্য প্রস্তুত করছেন। এবিষয়ে বাংলাদেশে যে কয়টি প্রতিষ্ঠান সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছে তাদের মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, বেঙ্গল ইমিউনিটি, ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মা-সিউটিক্যাল, স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল, দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স ও স্ট্যাড্মেড-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু একটা কথা আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, যে বাংলাদেশ ভারতে ভেষজ-শিল্পের পথিকৃৎ আজ তার স্থান দ্বিতীয়। আজ ভারতে ভেষজশিল্পের ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র বা বোম্বাই-এর স্থান সর্বপ্রথম। সারা ভারতে ২৬৮টি প্রধান ভেষজ-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১১২টি আছে মহারাষ্ট্রে এবং ৭৩টি আছে পশ্চিমবঙ্গে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিদেশী খ্যাতনামা ভেষজ-প্রতিষ্ঠানের সহ-যোগিতায় ভারতে যে সব ভেষজ-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে তার অধিকাংশই মহা-রাষ্ট্রে।

এদেশে ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া অনু-সরণে ভেষজদ্রব্য প্রস্তুত শুরু হয় এবং আজও অধিকাংশ ভেষজ বি পি অনুযায়ী প্রস্তুত হয়ে থাকে। ভারতের নিজস্ব ফার্মা-কোপিয়া প্রথম প্রকাশিত হয় স্বাধীনতা-লাভের পর ১৯৫৫ সালে এবং তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৬ সালে। একথা আমাদের সকলেরই জানা, ভারতে বহু বনৌষধি পাওয়া যায়। সর্পগন্ধার ভেষজগুণ আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত। এছাড়া ইপিকা, এফিড্রিন, বেলাডোনা, নকস্ভোমিকা ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ ভেষজগুলি নানা রোগনিরাময়ে বিশেষ কার্যকর। বর্তমানে ভারতে এই ভেষজ-উদ্ভিদগুলির চাষ এত বেড়ে গেছে যে ভারত তার নিজের চাহিদা মিটিয়েও বহি-র্ভারতে রপ্তানি করতে পারে।

কিন্তু ভারতে যে অসংখ্য বনৌষধি আছে তার সব কটির গুণাগুণ ও কার্যকারিতা এখনও পর্যন্ত ঠিকমতো পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। এবিষয়ে গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। দুঃখের সঙ্গে আজ বলতে হয়, ভেষজ গবেষণার ক্ষেত্রে ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। এদিকে যেমন সরকারের তেমনি বেসরকারী ভেষজ শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারগুলির দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এবিষয়ে আমাদের দেশে গবেষণা যে একেবারে হচ্ছে না তা বলি না। কিন্তু যা হচ্ছে তা আশানুরূপ নয়। বছর দুই-তিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত মৃগীরোগের প্রতিষেধক 'মার্সেলিন' এবং ডঃ দুর্লভচন্দ্র

সেরাম অ্যালবুমিন ভর্তি করার পদ্ধতি

রায় আবিষ্কৃত 'জহওরীন' নিয়ে বেশ-কিছু হৈচৈ শোনা গিয়েছিল। কিন্তু তারপর সেগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশেষকিছু শোনা গেল না। এবিষয়ে আমাদের দেশে যা অভাব মনে হয় তা হল ব্যাপক গবেষণা ও দলগত সংহতির। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গবেষণাগারে অনেকে ভেষজ-উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী পাচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের গবেষণার ফল দেশের মানুষের কাজে তেমন লাগছে না। এর কারণ যা তাঁরা গবেষণা করেন তা তত্ত্বগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার তেমন গুরুত্ব নেই। ভেষজ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিও গবেষণার দিকে তেমন গুরুত্ব দিতে চান না। নতুন নতুন ভেষজ আবিষ্কারের জন্যে যে ব্যাপক গবেষণা ও অর্থব্যয়ের প্রয়োজন সে বিষয়ে তাঁরা কুণ্ঠিত। সরকারও এবিষয়ে তেমন প্রেরণা দিচ্ছেন বলে মনে হয় না। সরকার বিদেশী রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ভেষজদ্রব্য প্রস্তুতের জন্যে চুক্তি সম্পাদন করছেন, কিন্তু এদেশীয় উপকরণ নিয়ে নতুন নতুন ভেষজ আবিষ্কার করা যায় কিনা সেদিকে তেমন অর্থব্যয় করছেন না এবং যথোপযুক্ত উৎসাহও দিচ্ছেন না। আমাদের মনে হয়, বিদেশী ভেষজ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এদেশে ভেষজ প্রস্তুতের দিকে তেমন দৃষ্টি না দিয়ে বরং এদেশীয় ভেষজ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে এদেশের উপকরণের সাহায্যে নতুন ভেষজ আবিষ্কারের জন্যে সরকারের বেশি উৎসাহ দেওয়া উচিত। অবশ্য সরকার পরিচালিত গবেষণাগারগুলিতে ইতিমধ্যে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। কলকাতায় অবস্থিত ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট ফর বায়োকেমিস্ট্রি অ্যাণ্ড এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন-এ কলেরা রোগ প্রতিরোধের এমন একটি ভ্যাক্সিন আবিষ্কৃত হয়েছে যা মুখ দিয়ে ব্যবহার করা যায়। মানুষের ওপর এই ভ্যাকসিনটির প্রাথমিক পরীক্ষায় সুফল পাওয়া গেছে এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহারের জন্যে বিস্তৃত গবেষণা বর্তমানে চলছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রক্তের বিকল্প হিসাবে সেরাম অ্যালবুমিন উদ্ভাবিত হয়। আকস্মিক দুর্ঘটনায় রক্তপাতে, অগ্নিদাহে, প্রোটিন অপুষ্টিতে ও শকে এই সেরাম অ্যালবুমিন রক্তের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা চলে। লখনৌস্থিত কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগার সামরিক বাহিনীর চাহিদা মেটাবার জন্যে এই সেরাম অ্যালবুমিন প্রস্তুত করছেন।

ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে সরকার বিশেষ উদ্বিগ্ন। মৌখিক জন্মনিরোধক ভেষজ আবিষ্কারের জন্যে সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন। এবিষয়ে আশাপ্রদ সংবাদ হচ্ছে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে একটি ভেষজ-উদ্ভিদ ব্যাপকভাবে জন্মায় যা থেকে 'স্যাপোজেনিন' নামে একটি উপকরণ পাওয়া গেছে যা দিয়ে জন্মনিরোধক ভেষজ সংশ্লেষণ করা যেতে পারে। এই ভেষজ-উদ্ভিদ থেকে স্টেরয়েডজাত হর্মোন প্রস্তুতেরও উপকরণ পাওয়া যায়। কাশ্মীর-জম্মুর আঞ্চলিক গবেষণাগারে এই ভেষজ-উদ্ভিদের কাণ্ড থেকে প্রাপ্ত মূল উপকরণ 'ডায়োসজেনিন' প্রস্তুতের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। আমরা তাই গভীর প্রত্যাশা নিয়ে বলতে পারি, এদেশে ভেষজশিল্প ও গবেষণার প্রতি সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি যথোপযুক্ত দৃষ্টি দেন তাহলে এদেশীয় উপকরণ দিয়েই আমরা বহু মূল্যবান ভেষজ প্রস্তুত করতে পারব।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি

দিলীপ বসু

প্রায় ২৩ বছর পূর্বে ১৯৪৫-এর আগস্ট মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ব্যবধান ২১ বছরের; আনন্দের কথা, ঐ ব্যবধান আমরা ইতিমধ্যেই পার হয়ে এসেছি।
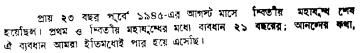
১৯৪৫-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তে আমরা দেখলুম, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির প্রথম নিদর্শন—কি ধ্বংসের কি কল্যাণের কাজে মানুষের বিজ্ঞান ১৯৩৯ সালের জগতকে বহু পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। আর এই গত ২৩ বছরে সেই বৈজ্ঞানিক প্রগতির গতিবেগ ত্বরান্বিত। তবে দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে, কেবলমাত্র কল্যাণের কাজে নয়, মানববিধ্বংসী ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের 'উন্নতি'-তেও মানুষের বিজ্ঞানের আজ অপ্রতিহত অগ্রগতি। বিজ্ঞানসমুদ্র মন্থন করে হলাহল আমাদের সামনে উপস্থিত (বিশেষ করে অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমার আমরা উল্লেখ করতে চাই এই প্রসঙ্গে), অন্যদিকে কল্যাণের পূর্ণকুম্ভ নিয়ে লক্ষ্মীর উদয় (পরমাণুর গভীর অভ্যন্তরে, তার কেন্দ্রকে অপরিমেয় শক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে, এক মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা আজ অব্যাহত)—এর মধ্যে মানুষের চিরন্তন শুভ-বুদ্ধি যে কল্যাণকেই বেছে নেবে, এ-প্রত্যয় আমাদের নিশ্চিত। "মানুষের উপরে বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষপর্যন্ত রক্ষা করবো।"

১৯৪৫-এর জগৎ

পরমাণুর অভ্যন্তরে কেন্দ্রককে সামান্যতম ভাঙতে পারলেও কতো শক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে, তার মাত্র বিধ্বংসী রূপটুকু আমরা দেখেছিলুম ১৯৪৫-এ।

চিকিৎসা-জগতে যে অ্যানটি-বায়োটিকসের প্রচলন আজ ঘরে ঘরে, তা' তখনও প্রায় অজ্ঞাত। ফলে ডায়াবেটিস, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি থেকে অস্ত্রোপচার-জনিত সেপটিক বা দূষিত ঘা, সবই হত তখন মারাত্মক, এবং তেমনভাবে জটিল হয়ে উঠলে তাতে রোগীর প্রাণনাশও ছিল অনিবার্য।

মানুষ তখন সবে এরোপ্লেনকে আয়ত্ত করে আকাশের (অর্থাৎ বায়ুমন্ডলের) তলাকার ভাগকে মাত্র জয় করতে পেরেছে। মোটামুটি শব্দের গতিবেগ থেকে কম, ঘন্টায় ৬০০।৭০০ মাইল বেগে ভূপৃষ্ঠের ২০,০০০/৩০,০০০ ফিট উঁচু দিয়ে নিরাপদে এরোপ্লেন উড়ে যেতে পারে তখন। তার উপরের অঞ্চল ছিল অনধিগম্য। বায়ুমন্ডল বা আকাশ পেরিয়ে মহাকাশে যাওয়া তখনও বৈজ্ঞানিক কল্পনা-কাহিনীর (সায়েন্স-ফিকশন)- মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ।

তেমনি সমুদ্রের তলদেশেও গতিবিধি ছিল তার একেবারে সীমাবদ্ধ। সমুদ্রে মহাদেশীয় পাটাতনে (continental shelf) যে প্রচুর খনিজ সম্পদ ও রত্নরাজি রয়েছে, সেটা, তখনও তার আয়ত্তের বাইরে। দুই মেরুদেশে, বিশেষ করে কুমেরুতে, মানুষের পায়ের চিহ্ন তখনও পড়েনি। হিমালয়ের সর্বোচ্চতম গিরিশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় ওঠা তখনও সম্ভব হয়নি। সাহারা মরুভূমির বেশ কয়েক জায়গা তখনো একেবারে দুরধিগম্য। এক কথায়, পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ জল মানুষের আয়ত্তের বাইরে, বাকি এক-ভাগ স্থলের মাত্র অর্ধেক মানুষের বাস-যোগ্য। আজো অবস্থা প্রায় একই হলেও আমাদের বাসভূমি পৃথিবী আজ আর আমাদের কাছে অজানা নয়; আর পৃথিবীর বাতাবরণ বা আকাশ পেরিয়ে মানুষ আজ মহাকাশে উপনীত।

তেমনি বস্তু-রহস্যও আজ ক্রমশই আমাদের কাছে উদ্ভাসিত। গালিভারের লিলিপুট ও ব্রবডিগন্যাগদের (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ) মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু ও অতিকায় গ্রহ-নক্ষত্রাদির জগৎ—দুই-ই ক্রমশ আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। মজার কথা যে, এই দুইয়ের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে, নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা বা অ্যাস্ট্রো-পদার্থবিদ্যাতে আশ্চর্য মিল পাওয়া যাচ্ছে। তেমনি ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ ও রেডিও-টেলিসকোপের সাহায্যে আমাদের 'অন্তর্দৃষ্টি' ও বহির্দৃষ্টি, দুই-ই খুলে গেছে। স্বল্প পরিধিতে ১৯৪৫ এর উত্তরকালের এই নবলব্ধ জ্ঞানের কিছু পরিচয় নেওয়া যাক।

নতুন জ্ঞান

১৯৪৫-এর সময়ে অ্যাটম (গ্রীক নামানুসারে এর অর্থ 'অবিভাজ্য') বা পরমাণুকে তখন ভেঙে আমরা সবেমাত্র ধনাত্মক তড়িতাবিষ্ট প্রোটনের চতুর্দিকে ঋণাত্মক তড়িতাবিষ্ট ইলেকট্রন কণিকা এবং কেন্দ্রকে (নিউক্লিয়াসে) তড়িৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন কণিকার সন্ধান পেয়েছি। যেখান থেকে অগ্রসর হয়ে বহু কণিকাসমূহের সন্ধান আজ পাওয়া গেছে, যারা বিশিষ্ট পরিমানের তেজোসম্পন্ন। আবার আমাদের উল্টো জগতের, অর্থাৎ ধনাত্মক ইলেকট্রন বা পজিট্রনের কথাও আমরা জানি, যা থেকে বৈজ্ঞানিকরা কল্পনা করেন—এই ব্রহ্মান্ডেই আমাদের উল্টো গঠনতন্ত্র নিয়ে 'বিপরীত জগৎ' রয়েছে। আমাদের সোজা ও বিপরীত জগতের মধ্যে সংঘর্ষ বা মোলাকাত হলে সবটাই তেজঃপুঞ্জে পর্যবসিত হতো।

আমরা অবশ্য এখনও সঠিক বলতে পারি না, প্রোটন ও ইলেকট্রন কণিকা, না তেজঃপুঞ্জ, এবং বস্তুর সঠিক গঠনতন্ত্র কি?

অ্যানটি-বায়োটিকসের কল্যাণে বহু রোগীকে জয় করা গেলেও ক্যানসার ও হৃৎপিণ্ডের বা মস্তিষ্কের থ্রমবসিস রোগকে আমরা এখনও জয় করতে পারিনি। ক্যানসারের উৎপত্তির কার্যকারণ নিয়ে বহু তর্ক আছে, তাছাড়া রেডিয়ামের দ্বারা এই রোগকে রুখে দেওয়া সম্ভব হলেও একেবারে সারানো সম্ভব হয়নি।

তেমনি, থ্রমবসিস বা আর্টারীতে রক্ত কেন জমে যায়, অর্থাৎ আমাদের রক্তের রাসায়নিক উপাদানে এমন কোন্ বস্তুর উৎপত্তি হলে রক্ত জমে থ্রমবাস গড়ে উঠে, এবং তার প্রতিষেধকই বা কি—আমরা তা এখনও জানতে পারিনি।

প্রসঙ্গত, অস্ত্রোপচার করে একজনের প্রায়-অকেজো হৃৎপিন্ডকে বদলে আর একজন মুমূর্ষু লোকের তাজা হৃৎপিন্ড (দ্বিতীয় লোকটি প্রায় মৃত, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের ক্ষয়জনিত কারণে নয়) জুড়ে দেবার কাজ প্রায়ই চলেছে। এতে বহু নতুন প্রশ্ন আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় লোকটি মুমূর্ষু (ধরুন, মোটর-দুর্ঘটনাতে মারা যাবেই), কিন্তু তথাপি সে মারা যাবার পূর্বেই তার হৃৎপিন্ডকে কেটে সরিয়ে নিতে হবে, কারণ একবার মারা গেলে, অর্থাৎ হৃৎপিন্ডটি থেমে গেলে, সেটিকে আর একজনের দেহে বসিয়ে দিলেও আর কোনো কাজে লাগবে না। তার মানে কিন্তু দ্বিতীয় লোকটিকে **জীবিত অবস্থাতেই ...মেরে ফেলা হচ্ছে।** অবশ্য দ্বিতীয় লোকটি মারা যাবেই, এরকম নিশ্চিত পরিস্থিতি থাকলে তবেই তার আত্মীয়স্বজনের অনুমতি নিয়ে ... হৃৎপিন্ড বদলের কাজটি করা সম্ভব। তথাপি?

সমুদ্রের তলদেশে মানুষ আজ প্রায় অফুরন্ত খনিজসম্পদ ও খাদ্যের সন্ধান পেয়েছে। অবশ্যই তাকে সংগ্রহ করতে যে বিরাট শক্তির প্রয়োজন, সেটা উপস্থিত আমাদের করায়ত্ত নয়। কিন্তু ঠিক এই-খানেই এসে পড়ছে, পারমাণবিক শক্তির কথা। পরমাণুর অভ্যন্তরে কেন্দ্রকে রয়েছে অফুরন্ত শক্তি। পরমাণু-কেন্দ্রককে বিভাজন করে দারুণ তাপমাত্রার সৃষ্টি করে আমরা ধ্বংস করতে পারি, কিন্তু সেই অতি-উচ্চ তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল করে মানুষের কল্যাণের কাজে আমরা এখনো পুরোপুরি লাগাতে পারি না।

আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে আমরা বলতে পারি, আমাদের দেশে ট্রম্বেতে পারমাণবিক রি-একটারের সাহায্যে এই গঠনমূলক প্রচেষ্টাতেই আমাদের বিজ্ঞানীরা আজ

নিবন্ধ। এই সূত্রে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ডঃ ভাবার কথা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবো।

মহাকাশে অগ্রগতি

এই দশকের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ অগ্রগতি অবশ্য মহাকাশে। যে মাটির মানুষ এতোদিন পৃথিবীর জল-মাটি-বাতাসে আবদ্ধ ছিল, সে প্রথম বায়ুমণ্ডল বা আকাশের ওপারে মহাকাশের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে নিজের বাসভূমি পৃথিবীকে নতুন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেরেছে। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ অতি নিবিড়; সূর্যজাত অতি-বেগুনী রশ্মি, তড়িতাবিষ্ট কণিকা-স্রোত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। তেমনি মহাকাশের গহন অভ্যন্তর থেকে নির্গত মহাজাগতিক রশ্মির আসল চেহারা ও গঠনতন্ত্র এই সর্বপ্রথম আমরা বায়ুমণ্ডলের ওপারে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ধরতে পেরেছি। তাতে কেবল মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে নয়, ছোট্ট অতি-ক্ষুদ্র পরমাণুর গঠনতন্ত্র সম্পর্কে নতুন জ্ঞানলাভ করাও আমাদের সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর নতুন চেহারা জেনেছি আমরা—কমলালেবুর মতো নয়, খানিকটা বিলাতী ফলের মতো, অর্থাৎ উত্তরে বেশ খানিকটা অংশ উঁচু হয়ে আবের মতো ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে, আর দক্ষিণে তারই পাল্টা অংশটা খেয়েছে টোল। ভূবিজ্ঞান শাস্ত্রের বহু মীমাংসাকে এবার নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে।

মানুষ এবারে চাঁদের পথে পা বাড়িয়েছে, এবং এখনকার হিসাবমতো ১৯৭০ সাল নাগাদ আমরা চাঁদে সশরীরে হাজির হবো। চাঁদে নিরাপদে অবতরণ করে আবার নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের জন্য সর্বসাকুল্যে যে দারুণ গতিবেগের দরকার, তাকে সংগ্রহ করতে হলে পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে ২,৪০,০০০ মাইল ব্যবধানের কোনো অন্তবর্তী অঞ্চলে একটি মহাকাশ স্টেশন তৈরী করা দরকার। এই স্টেশন প্রস্তুতির কাজে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে।

তেমনি সন্দেহ ছিল, চাঁদে হয়তো নিরাপদে অবতরণের উপযোগী শক্ত জমি পাওয়া যাবে না। একাধিক স্বয়ংক্রিয় ব্যোমযানকে চাঁদে ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়ে আমরা সে সমস্যাকে সমাধান করেছি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, চাঁদে আমরা যাবো কেন? কেবলই কি কৌতূহল চরিতার্থ করতে?

অবশ্যই কেবল সেটাই একমাত্র উদ্দেশ্য হলেও কিছু দোষণীয় হতো না। অজানাকে জানবার ও জয় করবার অদম্য প্রেরণা না থাকলে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতি কি বন্ধ হয়ে যেতো না?

কিন্তু না, চাঁদে আমরা যেতে চাই, কারণ চাঁদ যেন আমাদের "পৃথিবীর শৈশব"। একমাত্র চাঁদে গেলেই পৃথিবীর শৈশবের চেহারাটাও যেমন আমাদের কাছে ধরা পড়বে তেমনি আমরা বুঝতে পারবো, এই পৃথিবীর তথা সূর্যের চারধারে গ্রহাদির তথা সৌরজগতের উৎপত্তি হলো কি করে?

বায়ুমণ্ডলের আঘাতে পৃথিবীর জন্ম-লগ্নের ও শৈশবের সব চিহ্নই বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত। চাঁদে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই, সুদূর অতীতে চাঁদের জন্মের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার ছোট আয়তনের জন্য সমস্ত বায়ুমণ্ডল সে হারিয়েছে। অথচ খানিকটা হিসাব ও যুক্তির সাহায্যে আমরা জানি, চাঁদ ও পৃথিবীর জন্ম প্রায় একই লগ্নে, একই সঙ্গে। অর্থাৎ, সঠিকভাবে

মহাশূন্যের পথে
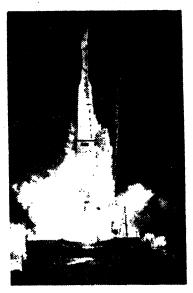
বলতে হলে চাঁদ পৃথিবী উপগ্রহ নয়, চাঁদ ও পৃথিবী যেন যমজ গ্রহ, তবে আকারে চাঁদ পৃথিবীর চারভাগের একভাগ মাত্র, চাঁদের ব্যাস মাত্র ২,১৬০ মাইল, যেখানে পৃথিবীর প্রায় ৮,০০০ মাইল।

চাঁদে পৌঁছে 'আদিম পৃথিবী'কে যেমন আমরা নতুন করে খুঁজে পাবো, তেমনি বায়ুশূন্য চাঁদের অপেক্ষাকৃত কম মাধ্যাকর্ষণে (ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র) বহু নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব হবে। অবশ্যই চাঁদে পৌঁছেই আমাদের যাত্রা শেষ নয়, সুরু। এরপর মঙ্গলে, শুক্রে, গ্রহে গ্রহান্তরে—এ যাত্রার শেষ নেই।

সাহিত্যে বিজ্ঞান

সাহিত্যে বিজ্ঞান

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিরোধটা নাকি এতই বেশী যে প্রায় সতাসতীন সম্পর্ক!

কিন্তু বিচক্ষণেরা সব ভাবিত হয়ে পড়েছেন। মানুষের সভ্যতার পেছনে দুটি আছে বেগ। এমন বিপরীত সে দুটি যে, দোটানায় সভ্যতাই বুঝি যায়।

দুই-এর মধ্যে বোঝাপড়া হবার নয়, রফা হওয়াও নাকি নেহাৎ গোঁজামিল। অবস্থাটা এমন যেন সতীন যে এক-কে ধরলে আর একেকে ছাড়তে হয়। একসঙ্গে দুজনকে নিয়ে ঘর করা চলে না।

বিজ্ঞান আর শিল্প-সাহিত্যের কথাই যে বলছি তা বলা বাহুল্য।

বিজ্ঞান মানুষকে কি না দিয়েছে! যা দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী দিতে পারে ও দেবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সবাই মিলে নিশ্চিন্ত, নিরাপদ, স্বচ্ছল শুধু নয়, যাকে বলে সুখের স্বর্গে বাস করা তাও সম্ভব হতে পারে বিজ্ঞানের দৌলতে।

কিন্তু সত্যি হচ্ছে কি?

চোখ মেলে আজকের দুনিয়ার চারিদিকে চাইলে, হচ্ছে আর হচ্ছে না দুটো বিরোধী উত্তরই মিলবে।

হচ্ছে, একথা যেমন একেবারে মিথ্যে নয়, হচ্ছে না-ও তেমনি প্রত্যক্ষ সত্য।

না হবার কারণ আমাদের নিজেদের মধ্যেই আছে কি না সেইটেই বুকে হাত দিয়ে একবার বিচার করবার চেষ্টা করা দরকার।

কিন্তু করবে কে? সেই বিজ্ঞান? না ধর্ম?

নিজের ব্যাধির নিদান বিজ্ঞানের কাছে আশা না করাই ভালো। আর দর্শনও সব কিছুতে ধোঁয়াটে ধাঁধা দেখতে চায়।

বিচার করবে তাহলে সাহিত্য। বিচার না বলে বিবেচনা বললে সামান্য একটু কথার মারপ্যাঁচই শুধু নয়, মানেটা আর একটু পরিষ্কার হয় বোধহয়।

বিচার বিবেচনা যাই বলি সাহিত্যকে বিজ্ঞানের মুখোমুখী হতেই হচ্ছে। এই মুখোমুখী হওয়া কি বিপক্ষের মত? সত্যিই দুই সংস্কৃতি কি দ্বিমুখী বেগে মানুষের জীবন আর সভ্যতাকে বানচাল করতে চলেছে? বিজ্ঞানের হাতে অশেষ বর থাকা সত্ত্বেও মানুষকে বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে তার ভেতরকার আর এক প্রেরণার অনিবার্য বিরুদ্ধতায়? দুই বেগ এমনই বিপরীতমুখী যে তাদের সামঞ্জস্যে মানুষের পূর্ণতার সাধনা নিরর্থক?

বিজ্ঞানের একচ্ছত্র প্রাধান্যের দিনে বিজ্ঞান-কেন্দ্রিক পাশ্চাত্য জগতে সাহিত্য-শিল্পের মতিগতি দেখে সেইরকম একটা সন্দেহ হওয়া অসম্ভব নয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সব কিছুই অমোঘ নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা, সেখানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গণিতের সিদ্ধান্ত সমস্ত সৃষ্টিরহস্যের অপরিবর্তনীয় বিধানসূত্র যত নির্ভুল-ভাবে সম্ভব ধারণাগোচর করতে তৎপর। বিজ্ঞানের পথ ঋজু কঠিন অস্খলিত। তাতে এক তিল শৈথিল্যের অবসর নেই। বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যশিল্পে সেই জন্যেই কি একটা উদ্দাম উন্মত্ত সমস্ত বিধি-নিষেধ-ভাঙা, সবরকম যুক্তি-শৃঙ্খলা-বিদ্বেষী বাতুলতার প্রশ্রয় দেখা যাচ্ছে? শিল্পসাহিত্যের প্রেরণার যা উৎস মানুষের সেই গহন সত্তা বিজ্ঞান-দৃষ্টি-বিমুখ বলেই কি আধুনিক বিজ্ঞান-শাসিত জগতের ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তার এই অন্তিম অসহায় আস্ফালন?

কথাটা আংশিকভাবে সত্য হওয়া যে সম্ভব তা অস্বীকার করা কঠিন।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় আনুষঙ্গিক একটা নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতা যে আমাদের জীবনে অশুভ ছায়া ফেলেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিল্পে সাহিত্যে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও স্বাভাবিক কিন্তু তাই থেকে বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পসাহিত্যের মৌলিক দৃষ্টি-বিভেদ সূচিত হয় না। বিজ্ঞানের যুক্তি-শৃঙ্খলা ভিন্ন বলে শিল্পসাহিত্যের জগৎ প্রলাপ-বিলাসের স্বর্গ নয়।

অনাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখলে শিল্পসাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যে যথার্থ মৌলিক বিরোধ নেই। বিজ্ঞান-দৃষ্টি প্রথম ক্ষীণ উন্মেষের সময় থেকে শিল্পসাহিত্যভাবনাকে সহচর হিসাবে অনুরঞ্জিতই করে এসেছে।

আমাদের যুগের কাছে বিজ্ঞান তার বিচিত্র বিস্ময়-সমারোহ নিয়ে একটি সুদূর স্বতন্ত্র চেহারা নিলেও বিজ্ঞান বলতে মূলত যা বোঝায় সেই জানা ও বোঝার ব্যাকুলতা সভ্যতার প্রথম পদক্ষেপ থেকেই প্রকাশ পেয়েছে।

জানা আর বোঝার ব্যাকুলতা ত বটেই, সেই সঙ্গে আর একটি অস্ফুট ধারণাও বিজ্ঞান-চেতনার প্রথম উন্মেষের দ্যোতক। এ ধারণা হল এই যে সৃষ্টির সব কিছু ব্যাপারের মধ্যে কোনো এক অদৃশ্য অমোঘ বিধান কাজ করে যাচ্ছে, সৃষ্টি কারো খামখেয়াল নয়।

বিজ্ঞান তার রাজসিংহাসন পাবার বহু আগে, প্রায় ভূমিষ্ঠ হবার সময়েই বলা চলে এ ধারণার স্বাধীন প্রকাশ সাহিত্যেও দেখা গেছে আশ্চর্যভাবে।

জিয়রদানো ব্রুনো যে বছর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন সেই ১৬০০ খৃষ্টাব্দই আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জন্মকাল বলে ধরা যেতে পারে। তার আগে বৈজ্ঞানিকের সাক্ষাৎ যে পশ্চিমের ইতিহাসে মেলে না এমন নয়। সুবিখ্যাত আর্কিমিডিস মারা গিয়েছেন খৃস্টপূর্ব ২১২তে, অ্যারিস্টটল তারও আগে খৃস্টপূর্ব ৩৮৪ থেকে ৩২২ পর্যন্ত বিজ্ঞান-ভাবনার নিদর্শন রেখে গেছেন। কিন্তু এ সবই বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান-প্রতিভার স্ফুরণ। মানুষের সভ্যতাকে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি তখনো প্রভাবিত করে নি। এক বা একাধিক অজ্ঞেয় দৈবশক্তির খামখেয়ালেই সৃষ্টি পরিচালিত এ অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অমোঘ বিশ্ববিধানের ধারণা তখনো অচল।

এই ধারণা কিন্তু ভিন্ন চেহারায় বহু পূর্বে অ্যারিস্টটলের মৃত্যুরও প্রায় একশ বছর আগে সাহিত্যে প্রথম ধ্বনিত হয়েছে। ধ্বনিত হয়েছে প্রাচীন গ্রীসের আদি নাট্যকারদের পরমাশ্চর্য নাট্যসৃষ্টিতে।

> "The pilgrim fathers of the scientific imagination as it exists today are the great tragedians of ancient Athens, Aeschylus, Sophocles, Euripides. 'Their vision of fate, remorseless and indifferent, urging a tragic incident to its inevitable issue is the vision possessed by science. Fate in Greek Tragedy becomes the order of nature in modern thought'

উক্তিটি যার তার নয়, আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেডের।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির প্রচ্ছন্ন আভাস সাহিত্যের আদিপর্বেই পাওয়া গেলেও, সৃষ্টির যাদুকরী ব্যাখ্যাই জনচেতনার রাজপাটে বসে থেকেছে বহুকাল।

খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বিজ্ঞান-দৃষ্টি ক্রমশ বিদ্বৎসমাজে প্রসারিত হতে শুরু করেছে বটে কিন্তু সাহিত্য-চিন্তার মূলে তখনো তা ঠিক পৌঁছেছে বলে মনে হয় না। ইংরাজী-সাহিত্যের কথাই ধরি। মিলটন সপ্তদশ শতাব্দীরই মানুষ হলেও বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদের কোনো প্রভাব তাঁর মধ্যে নেই বলেই পণ্ডিতেরা মনে করেন। প্রায় একশ বছর বাদে শেলী কিন্তু পৃথিবী আর চন্দ্রের আলাপে পৃথিবীর ভাষণ [illegible],

> 'I spin beneath my pyramid of night,
> Which points into the heavens—dreaming delight,
> Murmuring victorious joy in my enchanted sleep;
> As a youth lulled in love-dreams faintly sighing,
> Under the shadow of his beauty lying,
> Which round his rest a watch of light and warmth doth keep.'

রোমাণ্টিক ভাবাবেগের কবিতা, কিন্তু বিজ্ঞানসচেতনতা ছাড়া এ কবিতা যে লেখা সম্ভব হত না, শেষ লাইনটিই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। রাত্রির পিরামিডকে ঘিরে আলো আর উত্তাপের পাহারা—এ চিত্রকল্প স্পষ্টই বিজ্ঞান থেকে নেওয়া। বিখ্যাত এক বৈজ্ঞানিক মনীষীই স্বীকার করেছেন যে মনশ্চক্ষে সঠিক জ্যামিতিক একটি নক্সা না থাকলে বিজ্ঞানের রাজ্য থেকে এ রূপকল্পনা কাব্যে আমদানী করা সম্ভব হত না।

এই একটিই নয় শেলীর মধ্যে বিজ্ঞান-নির্ভর কল্পনার অজস্র উদাহরণ খুঁজলে পাওয়া যাবে।

ওই Prometheus unbound কবিতাতেই পৃথিবীর আক্ষেপে যখন তিনি লেখেন
'The vaporous exultation not to be confined'
তখন তা যে কাব্যভাষায়
"The expansive force of gases'—
-এর অনুবাদ
তা বুঝতে খুব অসুবিধা হবার কথা নয়।

শেলী আর তাঁর সমসাময়িক কবি সাহিত্যিকদের লেখায় অল্পবিস্তর যা পাই তা কিন্তু একদিক দিয়ে বলতে গেলে সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের অনুপ্রবেশের বেশী আর কিছু বোধহয় নয়। বিজ্ঞান-সত্যে সাহিত্য-চিন্তার ভিত্তিমূলই নতুন করে পাতা তাতে শুরু হয় নি। সে যুগান্তরের সূত্রপাত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ডারউইন-এর বিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিবর্তনবাদ মানুষের চিন্তাভাবনা কল্পনার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছে ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। বিবর্তনবাদের এধারে ওধারে মানুষের চিত্তভূমি নিশ্চয় ভিন্ন কিছু নয়, কিন্তু তার মনোজগতে অলঙ্ঘ্য এক ব্যবধান সেইখান থেকেই শুরু।

বিজ্ঞানের যুগান্তকারী পদক্ষেপ তার আগেই শুরু হয়েছে। সার আইজাক নিউটন মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন সপ্তদশ শতাব্দীতে। সংক্ষেপে যা prencipia বলে পরিচিত তাঁর সেই অসামান্য গবেষণাগ্রন্থ বিজ্ঞানজগতের নববেদ হয়ে উঠেছে ১৬৮৭ খৃস্টাব্দে প্রথম প্রকাশের পর থেকে। কিন্তু সাহিত্যজগতের মূল ধরে নাড়া দেবার মত আলোড়ন তা আনে নি। নিউটোনীয় সিদ্ধান্ত প্রায় নাটকীয় উত্তেজনা জাগিয়ে যাতে খণ্ডিত এ যুগের সেই আপেক্ষিকবাদের তত্ত্ব ও আধুনিক ক্বান্টা-মনের দিগন্তে কোথাও কোথাও একটা রহস্য-কুহেলী বিস্তারের বেশী খুব কিছু করেছে বলে মনে হয় না। বিশুদ্ধ গণিতাশ্রয়ী বলেই এ সব বিজ্ঞানচিন্তার সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। সে দিক দিয়ে বিবর্তনবাদের পর, বিজ্ঞানজগতের কোনো ঢেউ যদি সাহিত্যজগতে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে থাকে তার উৎস হল মার্কস-এর একটি বই ডাস ক্যাপিট্যাল। স্বপক্ষে বিপক্ষে এমন তুমুল কলহ-কোলাহল আর কোন বিজ্ঞান-ভিত্তিক নিবন্ধ এ যুগে অন্তত তোলে নি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে, অনুকূল ও প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ায় এ বইটি এ যুগের সাহিত্যচিন্তায় এমন একটি জায়গা অধিকার করে আছে যা কোনো দিক দিয়েই উপেক্ষণীয় নয়। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ-তত্ত্বের এ সূত্রে উল্লেখের কথা মনে হতে পারে, কিন্তু প্রথম আবির্ভাবে উত্তেজনা-বিলাসীদের কাছে যতটা চমক দেওয়া সাড়া তুলেছে, স্বজনবৈরিতায় শৈশব না পার হতেই বহুবিভক্ত হয়ে যথার্থ বিচক্ষণ বিদগ্ধ সমাজে ততটা সম্মানের আসন অধিকার করে থাকতে পেরেছে কি না সন্দেহ।

বিজ্ঞানের একটি ব্যবহারিক দিক আছে। আজকের দিনে আমাদের জগতে তার সেই আলাদিনের জিন-রূপী মূর্তিই আমরা উপাস্য করে তুলেছি। বিশুদ্ধ তত্ত্ব থেকে প্রযুক্তিবিদ্যায় নেমে তা আমাদের পক্ষে যে রকম বরদ হয়ে উঠেছে তা কতটা সৌভাগ্য আর কতখানি অভিশাপ বলে চিনব সে বিবেচনা সাহিত্যকে করতে হবে বলে এ আলোচনা শুরু করেছি। শেষও করছি সেই প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে।

আলাদিনের জিন হিসেবে বিজ্ঞান আমাদের দুয়ারে বাঁধা থাকে থাকুক, কিন্তু তাকে কোন ধান্দায় কতদূর পাঠাব সে হুঁশিয়ারী যদি নিরর্থক মালিকানার কোঁকে হারাই তাহলেই সর্বনাশ। এ সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে পারে প্রাণীবিশেষ হিসেবে মানুষের সুস্থ আনন্দ-চেতনা। এ সুস্থ আনন্দ-চেতনাই যথার্থ সাহিত্যের আধার ও অন্বিষ্ঠ।

বিজ্ঞানের অন্ত্যজ রূপের সঙ্গে সাহিত্যের যেখানে বিরোধ সেখানে প্রতিকার প্রতিবাদের পথ ধ্বংসধেয়ানী বাতুল প্রলাপ-মত্ততা কিন্তু নয়। বর্তমানকালের শিল্প-সাহিত্য জীবনের এই একটি সংক্রামক ব্যাধি-বিকারের লক্ষ্য তার মূল ধরে নিরাময় করতে হলে সাহিত্যকে তার স্বধর্মে অটল থাকতে হবে। সে সাহিত্য-ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞান-দৃষ্টির কোনো বিরোধ নেই। সত্যকার বিজ্ঞান-দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য তার দীপ্ত স্বচ্ছতা, তা সত্যকে নির্লিপ্তভাবে সন্ধান করবার ও নির্বিকার নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করবার দীক্ষা দেয়। সাহিত্যের আর যাই থাক এদিক দিয়ে ভিন্ন আদর্শ নেই।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তীর্থঙ্কর ওকে ভালোবাসে! একথা আর এতটুকুও অস্পষ্ট রইলো না রমলার কাছে। যদিও তীর্থঙ্কর ধনী পরিবারের ছেলে, যদিও সে ইচ্ছে করলেই সম্ভ্রান্ত ঘরের অতি সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে পেতে পারে, তবুও সে রমলার মত নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়ের কাছে আজ প্রার্থী হয়ে এসেছে। এমন ভাগ্য ক'টা মেয়ের হয়?...

তবু কিন্তু রমলা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলো না যে সেও ভালো-বেসেছে। এমন কি আভাসেও জানাতে পারলো না যে এ পর্যন্ত সে যা বলেছে সবই তার থিয়োরি মাত্র, তার মন যে সব সময় ঠিক ঐরকম হিসেব করে চলে, তা নয়। মনের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করেই রমলা আজ পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছে তার স্বাতন্ত্র্য, তার স্বাধীন সত্তা। যে আদিম নারী পুরুষের হাতে সর্বস্ব বিসর্জন দিতে চায় সেই আদিম নারী কি তার ভিতরেও নেই? আছে বৈকি। আছে। কিন্তু তাকে মাথা তুলতে দেয় না রমলা কোনোদিন। সবলে তাকে চাপা দিয়ে রাখে বুদ্ধি আর যুক্তির কঠিন আস্তরণের নীচে। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই কি তাকে নির্বিচারে আত্মসমর্পণ করতে হবে একটি পুরুষের কাছে?

দেখতে দেখতে আশ্বিনের বেলা গড়িয়ে এলো। স্তিমিত দিনের মন-কেমন-করা রোদ্দুর ঝিলমিল করে খেজুর গাছের পাতায় পাতায়, লম্বা ঘাসের ঝোপে উড়ে বেড়ানো, সাদায়-কালোয় মেশানো প্রজাপতির পাখায়, ঝিরঝিরে হাওয়া লেগে জলের বুকে ওঠা ছোট্ট ছোট্ট ঢেউয়ের দীর্ঘ সারিতে।

অনেক, অনেক কথা বলবার ছিলো। দুজনেরই। কিন্তু সে সব কথা কিছুই বলা হল না।

গুমোট আবহাওয়াটা দূর করবার জন্যে আলোচনার মোড় ঘোরাতে চাইলো রমলা। বললে: "ব্যক্তিগত আলোচনা বাদ দিয়ে, আমরা কি অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারি না?"

এদিকে মুখ না ফিরিয়েই তীর্থঙ্কর বললে: "কোন্ বিষয়ে কথা বলতে চাও, বলো।" তার কণ্ঠস্বরে নিস্পৃহ সুদূরতা আর গাম্ভীর্য।

এমনতরো উত্তরের পরে আর আলাপ জমাবার চেষ্টা বৃথা। তাই চুপ করে বসে রমলা আপন মনেই ছিঁড়তে লাগলো ঘাসের শন।

খানিক চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ উঠে পড়লো তীর্থঙ্কর। বললে: "লেট্স্ গো।"

* * * *

রমলার উপর রাগ করেই সেদিন তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছিলো তীর্থঙ্কর, একথা সত্যি। নইলে আরো কিছুক্ষণ বসবার ইচ্ছে তার ছিলো, অন্তত যতক্ষণ না বিকেল চারটে বাজে।

কিন্তু সে রাগ দু'এক দিনের বেশি রাখতে পারলো না তীর্থঙ্কর। আবার সে রিসিভার তুলে নিলো। আবার রমলার অফিসঘরে টেলিফোন বেজে উঠলো: ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং।...

দু' একটি কথায় সেদিনের ব্যবহারের জন্যে দুঃখপ্রকাশ করলো তীর্থঙ্কর। করলো অবশ্য স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়েই। নইলে রমলার সঙ্গে আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যায় না।...

আবার একটি লম্বা ড্রাইভ।

এবার শুধু জায়গাটিই রমলার অচেনা নয়, নামটিও অচেনা। হেয়ারউড্ পয়েন্ট।

এটা নাকি বিখ্যাত পিক্নিকের জায়গা, অনেকেই আসে এখানে। বলেছে তীর্থঙ্কর। কিন্তু রমলার জীবনে পিক্-নিকের সুযোগ ক'বারই বা এসেছে? কলকাতার কাছাকাছিই যে কত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে ষাট সত্তর মাইলের মধ্যে, তা কি জানতো রমলা? এখন এই সঙ্গীটির দৌলতে জানতে পারছে।

গাড়ী ছুটেছে হু হু করে। প্রথমে কলকাতা ছাড়িয়ে শহরতলী। তারপর— শহরতলীও পড়ে রইলো পিছনে। এখন পথের দু'ধারে শুধু এলায়িত প্রান্তর, তালবন, বাঁশঝাড়, কৃষ্ণচূড়ার [illegible]

মজা পুকুর, এখানে ওখানে ছড়ানো আম জাম কলা নারকোলের গাছ। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে গ্রামের ঘরবাড়ী, দোকান, বাজার...

অনেকখানি পথ পেরিয়ে এসে গাড়ী থামলো।

"এই হেয়ারউড্ পয়েন্ট।" বললো তীর্থঙ্কর।

সামনে দিগন্তপ্রসারী, রোদ-ঝলমল জলরাশি ফেনাহীন, দীর্ঘ তরঙ্গভঙ্গে অপরূপ। কলকাতার গঙ্গার বাঁধানো ঘাট আর নৌকা-জাহাজ-সমাচ্ছন্ন বুক দেখে দেখে ক্লান্ত চোখ নদীর এই বিপুল বিস্তারের সামনে এসে একটা বিস্ময়ের ধাক্কা খায়।... মানুষের সভ্যতা এখানে প্রকৃতির পায়ে লোহা-চুন-সুরকির বেড়ি পরায়নি দেখে ভারী একটা আরাম পেলো রমলা। আঃ! ঐ অবারিত নদীবক্ষের উপর দিয়ে ছুটে আসা ঝর্ঝরে বাতাসে কি স্নিগ্ধ শীতলতা, কি প্রগাঢ় প্রশান্তির স্পর্শ...

দু'ধারে ছোট ছোট ক্ষেত। নদীর ধার ঘেঁষে এক সার সরু সরু অচেনা গাছ দেখা যায় কিছু দূরে। দীর্ঘ সৈকতভূমি নির্জন, নিরালা। কদাচিৎ দু'-একটা গ্রাম্য লোক ভিজে মাটির উপর দিয়ে যায় আসে। ওদের পদচিহ্ন আঁকা হয় কাদা-কাদা মাটিতে, হয়তো এ চিহ্ন নিঃশেষে ধুয়ে যাবে পরবর্তী জোয়ারের সময়।

নদীর পাড় বরাবর ক্ষেত। ক্ষেতের ওপারে মেটে ঘর খানকয়েক দেখা যাচ্ছে ঘন-হয়ে-ওঠা গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে। এদিকে রুপোলী জলের ঢেউ এসে লাগছে তীরভূমির গায়ে—ছলাৎ, ছলাৎ...।

"কেমন লাগছে এ জায়গাটা?" ক্ষেতের আলের ওপর পা টান করে বসে জিজ্ঞেস করলো তীর্থঙ্কর।

"খুব ভালো। আপনি তখন বলছিলেন না এটা একটা প্রসিদ্ধ পিক্‌নিকের জায়গা? আমাদের ভাগ্য ভালো যে আজ কোনো দল পিক্‌নিক্ করতে আসেনি। তাহলে এতক্ষণ গোলমাল হৈচৈয়ে ভরে যেতো জায়গাটা।" উত্তর দিলো রমলা।

"তুমি এমন মানব-বিদ্বেষী কেন বলো তো?"

"মানব-বিদ্বেষী? কেন, সে রকম কি লক্ষণ দেখলেন?"

"এই তো যথেষ্ট লক্ষণ। তুমি সব সময়ই নির্জনতা পছন্দ করো, পাঁচটা মানুষকে এক জায়গায় জমতে দেখলেই পালাবার পথ খোঁজো, এটা নিশ্চয়ই মানব-সমাজের প্রতি তোমার প্রীতির লক্ষণ নয়।"

"আমি সোশ্যাল নই, একথা ঠিকই। কিন্তু তাই বলে আমি সিনিক্‌ও নই। আমি মানবজাতিকে ভালোবাসি, তার কল্যাণ কামনাও করি।"

"ইউ লাভ্ ম্যানকাইণ্ড অ্যাজ ইট শুড্ বী, নট্ অ্যাজ ইট ইজ। মানুষের একটা আদর্শ রূপ আছে তোমার কল্পনায় তুমি সেটাকেই ভালোবাসো। মানুষের যে দৈনন্দিন, বাস্তব রূপ তাকে তুমি ভালো-বাসো না। বলো তো, আজ পর্যন্ত কোনো জীবিত মানুষকে তুমি সত্যিকার শ্রদ্ধা করতে পেরেছ? কোনো মানুষকে দেখে তোমার মনে হয়েছে, এর জীবনটা সুসম্পূর্ণ বা সন্তোষজনক?"

"না।"

রমলার উত্তর শুনে হা-হা করে হেসে উঠলো তীর্থঙ্কর। বললে : "কোনো মানুষকে দেখেই তুমি কোনোদিন স্যাটিস্-ফায়েড্ হবে না। তোমার আদর্শ পুরুষ হচ্ছে বিদ্যাসাগর, নিউটন, লেনিন আর বীটোফেনের একটা জগাখিচুড়ি।"

রমলার কান আর গাল লাল হয়ে উঠলো ওর এই ঠাট্টায়। ঘুরিয়েফিরিয়ে কি তাকে ছেলেমানুষ, অপরিপক্কই বলতে চাইছে না তীর্থঙ্কর?

"আপনি যতটা ভাবছেন, ততটা ইম্‌ম্যাচিওর আমি নই।"— একটু বিরক্ত স্বরেই বললো রমলা : "কিন্তু মিনিমাম্ যে আদর্শবাদিতাটুকু মানুষের মধ্যে থাকা উচিত তা না দেখলে কাউকে শ্রদ্ধা করবো কি করে? হ্যাঁ, এটা হয়তো ঠিক যে আমি যে পুরুষকে পুরুষ মনে করি সে হাজারের মধ্যে একজন।"

"হাজার?"—ভুরুজোড়া উপরে তুললো তীর্থঙ্কর : "মিলিয়নের মধ্যেও নয়, ট্রিলিয়নের মধ্যে একজন। ইউ এক্‌স্‌পেক্‌ট টু মাচ্।"

কথায় কথা বাড়ে শুধু। কাজ এগোয় না। নারী আর পুরুষ দু'জনেই যদি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল হয়, তবে বহু ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটে থাকে। দু'জনেই হতে চায় সহজ সরল, চায় সমস্ত যুক্তি-তর্ক-আইডিয়ার বাধা ঠেলে কাছাকাছি আসতে, কিন্তু পারে না। এর চাইতে আদিম মানুষ অনেক ভালো ছিলো, ভাবে রমলা। কতো অবলীলায় তখন স্থাপিত হত মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ!

তীর্থঙ্কর ভাবে, বড় বেশি বই পড়ে পড়ে রমলার বুদ্ধিটা হয়েছে ধারালো, আর অনুভূতির দিকটা হয়ে গেছে ভোঁতা। রমলা যদি সহজ, সাধারণ মেয়ে হত!..... তীর্থঙ্কর এই মুহূর্তে ভুলে যায় যে রমলা সহজ, সাধারণ হলে এমন তীব্র আকর্ষণ সে অনুভব করতো না তার প্রতি। দুর্জ্ঞেয়া, রহস্যময়ী বলেই এমন চুম্বকের মত টানছে তাকে!...

"এসো, কিছু খেয়ে নেয়া যাক।" বলে গাড়ীর কাছে গিয়ে ভিতর থেকে খাবারের বাক্স বার করে নিয়ে এল তীর্থঙ্কর।

খাওয়া, গল্প, হাসির মধ্যে সময় যে কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল খেয়ালই রইলো না দু'জনের। যখন বেলা প্রায় পড়ে আসছে তখন তীর্থঙ্কর চমকে উঠে বললে : "চলো, এবার যাওয়া যাক। অনেকটা পথ তো।"

সত্যিই অনেকটা পথ। কলকাতার ভিতরে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। এসপ্লানেডের কাছকাছি আসতে রমলা বললে : 'আমায় এখানে নামিয়ে দিন।'

"এখানে কেন? তোমায় বাড়ী পর্যন্তই পৌঁছে দিয়ে আসবো।"

"না, পাড়ার লোকে আমাদের একসঙ্গে দেখবে, আমি তা চাই না।"

"কিন্তু এখান থেকে তুমি যাবে কিসে? বাসে? খুব ভিড় হবে এখন তোমার যেতে কষ্ট হবে।"

"রোজই তো ভিড় ঠেলে বাসে অফিস যাই আর আসি। ও কষ্ট আমাদের সয়ে গিয়েছে। গাড়ী চড়ার সৌভাগ্য আর আমাদের জীবনে ক'দিন ঘটে বলুন?"

রমলাকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে তীর্থঙ্কর নিজের কণ্ঠস্বর খুব বিনীত আর মোলায়েম করে বললে : "তোমার ইচ্ছে এখানেই তোমায় নামিয়ে দিই, কি বলো?"

"হ্যাঁ। তাহলে খুব ভালো হয়।" বলে নামবার জন্যে প্রস্তুত হল রমলা।

"কিন্তু আমার প্রোগ্রাম তো অন্যরকম। আমি ভাবছি তোমায় এখন বাড়ী নিয়ে যাবো। খানকয়েক রেকর্ড শোনাবো। তারপর তোমায় ছেড়ে দেবো। এমন সন্ধ্যেটা একলা কাটাতে পারবো না।"

"কই, আগে তো একথা বলেননি। আমি তো ছ'টা সাড়ে ছ'টার মধ্যে বাড়ী ফিরবো এরকমই ঠিক করে রেখেছি।"

"সব কথাই যে আগে থাকতে বলে রাখতে হবে, এমন কি মানে আছে। মানুষের মুড্ চেঞ্জ করতেও তো পারে।"

"তা পারে। কিন্তু আপনার মুডের সঙ্গে আমার মুড্ যে মিলবে এমন তো কোনো মানে নেই।" বলতে বলতেই একটু কঠোর হয়ে উঠলো রমলা। পরক্ষণেই গাড়ীর গতি লক্ষ্য করে বলে উঠলো : "একি? এ কোন্ দিকে যাচ্ছেন?"

"আপাতত আমার বাড়ীর দিকে যাচ্ছি।"

"এখন আমি বাড়ী যাবো। আমায় নামিয়ে দিন। আপনার বাড়ী আমি যাবো না।"

"যাবে কি না যাবে সেটা নির্ভর করছে আমার ইচ্ছের উপর। তোমার উপর নয়।"

"আপনি আমার ওপর জোর করছেন?"

"করছি। কারণ ছোট থেকে জোর খাটাতেই আমি অভ্যস্ত। বিশেষ করে মেয়েদের ওপর। অন্যের জোর জবরদস্তি সহ্য করতে আমি অভ্যস্ত নই।"

"যদি আমি গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ি?" ভয় দেখালো রমলা।

"চেষ্টা করে দেখো।" বলতে বলতেই বাঁহাতে রমলার ডানহাতখানা চেপে ধরলো তীর্থঙ্কর।

অনেক চেষ্টা করেও হাত ছাড়িয়ে নিতে পারলো না রমলা। পরাজয়ের বেদনায় আর লজ্জায় চোখে জল এসে গেল তার।

হাতের মুঠোটা খানিক আল্‌গা করে দিয়ে হাসতে হাসতে তীর্থঙ্কর বললে : "এই তো ছোট্ট, কচি, নরম একখানা হাত। এখুনি গুঁড়িয়ে ফেলতে পারি। আর আমার হাতের জোর দেখলে তো? তোমার সমস্ত দেহের শক্তি দিয়েও আমার বাঁ-হাতের মুঠিটা খুলতে পারলে না। যারা, প্রকৃতি যাদের ফুলের মত নরম করে গড়েছে,

তাদের এত অহংকার, এত শক্তির দম্ভ কেন? জোর করে পাল্লা দিলেই কি তোমরা পুরুষের সমকক্ষ হতে পারবে বলে মনে করো?"

একটু থেমে তীর্থঙ্কর আবার যোগ করলো : "বরং আমাকে তোয়াজ করে দেখো, তোমার ইচ্ছে পূরণ হতেও পারে। যদি কাঁদাকাটা করে আমার মন গলাতে পারো, তবে না হয় এখুনি আবার গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমায় এসপ্লানেডে নামিয়ে দিয়ে আসি।"

মেয়েদের দুর্বলতা আর অসহায়তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে তীর্থঙ্কর। এই মুহূর্তে ঈশ্বরের উপর রাগ হল রমলার। তিনি সব দিক থেকেই পক্ষপাত দেখিয়েছেন পুরুষের উপর। এমনভাবেই সৃষ্টি করেছেন দুটি জাতের যেন একটি আরেকটির উপর অবাধে রাজত্ব করতে পারে।

রমলাকে নিরুত্তর দেখে তীর্থঙ্কর বললে : "যাক্, বোঝা যাচ্ছে আমার দয়া ভিক্ষা করতে তুমি রাজী নও। ঠিক আছে, তবে আমার বাড়ীতেই চলো আপাতত।"

মিনিট কয়েকের মধ্যেই নিউ আলিপুরের একান্তে নিজের বাড়ীর সামনে এসে গেল তীর্থঙ্কর। গাড়ী থামিয়ে রমলাকে বললে : "তুমি নামো। আমি গাড়ীটা গ্যারাজে রেখে এখুনি আসছি।"

রমলা দাঁড়িয়ে রইলো কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত। তীর্থঙ্করকে এখন আর ঠিক ভয় করছে না তার, যেমন করেছিল থাপা পেরিয়ে যাবার সময়। কিন্তু ওর ইচ্ছের এই জবরদস্তির সামনে মাথা নোয়ানোও পীড়াদায়ক। চারদিকে তাকিয়ে যতদূর দেখা যায় বাস্-স্ট্যান্ডের কোনো হদিশ মিলছে না। এ অঞ্চলও রমলার মোটেই পরিচিত নয়। তার উপর এখন সন্ধ্যার অন্ধকার চারদিকে নামছে ঘন হয়ে। রাস্তাটাও একেবারে নির্জন। কাউকে জিজ্ঞেস করে যে বাস-রাস্তার হদিশ পাবে এমন সম্ভাবনা নেই। জিজ্ঞেস করতে হলে এক তীর্থঙ্করকেই জিজ্ঞেস করতে হয়। কিন্তু নাঃ। ওর অনুকম্পা ভিক্ষা করবে না সে কোনোমতেই। বরং দেখা যাক্ লোকটার স্পর্ধা কতদূর পর্যন্ত গড়ায়। যদি তেমন কিছু ঘটে, ব্যাগে ছুরি তো আছেই। বাহুবল নয়, বুদ্ধি এবং কৌশলের উপর নির্ভর করবে রমলা।...

"এসো।"

রমলার চমক ভাঙলো তীর্থঙ্করের ডাকে।

বাড়ীর ভিতরে সে যাবে, না যাবে না? ভিতরে যেতে যেমনি অনিচ্ছা, তেমনি কৌতূহল। মানুষটাকে পুরোপুরি জানবার আগ্রহ প্রবল। আবার ওর পুরুষত্বের গর্বকেও ভেঙে চূর্ণ করে দিতে মন চাইছে।

"এসো।" আবার ডাকলো তীর্থঙ্কর। এবার ওর গলার সুরে, চোখের চাউনিতে মৃদু হাসির সঙ্গে একটা গভীর স্নেহের আমেজ।

রমলার মনটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো। তীর্থঙ্কর কি তার সঙ্গে শুধুই দুষ্টুমি করছে, তাকে ছেলেমানুষ ভেবে? দেখাই যাক শেষ পর্যন্ত।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল ওরা। দোতলাতেই তীর্থঙ্করের ফ্ল্যাট। সামনেই ড্রয়িং রুম। রমলাকে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে পাশের ঘরে গেল তীর্থঙ্কর।

আশপাশে তাকিয়ে মনে হচ্ছে না এ ফ্ল্যাটে আর কেউ থাকে। রমলার মনে পড়লো পুরীতেই তীর্থঙ্কর বলেছিল ওর বাবা-মা কেরালায় সেট্‌ল্‌ড্, সেখানেই বাড়ীঘর জমিজমা। এখানে ও একলাই থাকে।... কিন্তু একটা চাকর-বাকরও কি নেই?

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল তীর্থঙ্কর। বললে : "তুমি কখনো স্টেরিও দেখেছ?"

না। স্টেরিও দেখেনি রমলা। শুধু নামই শুনেছে কানে। আরও শুনেছে, কলকাতায় খুব বেশি লোকের ঘরে স্টেরিও নেই।

তীর্থঙ্করের প্রশ্নের জবাব কিন্তু দিলো না রমলা। মনে মনে হাসলো

তীর্থঙ্কর। এতক্ষণ শুধু চটানো গেছে। এবার একটু মান ভাঙাতে হবে।

"তোমায় স্টেরিও শোনাবো।" বলে পাশের ঘর থেকে দুটো ছোট্ট রেডিও-অত-দেখতে বস্তু বয়ে নিয়ে এল তীর্থঙ্কর, তারপর সে দুটোকে বসিয়ে দিলো দরজার দু'পাশে। বস্তু দুটোর সঙ্গে তারের যোগাযোগ রয়েছে ঐ ঘরের ভিতর রাখা কোনো যন্ত্রের সঙ্গে। সেটা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে না রমলা।

"দেখো, এ রেকর্ড তোমার পছন্দ কিনা।" বলে একটা রেকর্ড সামনে এনে ধরলো তীর্থঙ্কর।

গোটা আষ্টেক ইংরেজী গানের সূচী রেকর্ডের উপরে লেখা। কিন্তু এ সূচী দেখে রমলা কি করবে? আধুনিক পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে তার পরিচয় বিশেষ নেই। গোটা তিনেক নাম এর মধ্যে চেনা ঠেকছে। বাকীগুলো অচেনা।... যে যুগের সংগীতের সঙ্গে রমলার অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে সে হচ্ছে বিগত যুগ।

রেকর্ডটার উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রমলা চুপ করে রইলো, কোনো মন্তব্য করলো না।

একটু বাদেই স্টেরিওটায় বেজে উঠলো পাশ্চাত্য যন্ত্রসংগীতের উন্মাদনাময়, গভীর ঝঙ্কার...

এমন সুরঝঙ্কার রমলা কখনো শোনেনি এর আগে। কি আশ্চর্য! মনকে ঘুম পাড়িয়ে দেহের রক্তকণিকাগুলিকে জাগিয়ে তুলছে যেন এক অদ্ভুত মাদকতার স্পর্শে। এ স্বনন যেমনি মিষ্টি, তেমনি তীব্র, তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। সম্ভোগময়ী রাত্রির সমস্ত নির্যাসটুকু যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে সংগীতের মধ্যে।

আস্বচ্ছ, শাদা বাল্বের মৃদু আলো ঘরে। ঘরের দেয়াল হাল্কা নীল। সবে মিলিয়ে এক অদ্ভুত মোহময় পরিবেশ।

রমলা তাকিয়ে আছে মোজেইকের কাজ-করা মেঝের দিকে। আর তীর্থঙ্কর তাকিয়ে আছে রমলার দিকে।

ঐ ভাবময় চোখ, লাবণ্যমণ্ডিত মুখ, ঐ পেলব, কোমল নারীদেহ—সব—সমস্ত কিছুকে সম্পূর্ণ অধিকার করতে ইচ্ছে করে তীর্থঙ্করের। মনে হয়, ঐ অনাঘ্রাত সৌন্দর্যের প্রতিমাকে চিরে চিরে দেখে ভিতরে কি রহস্য লুকিয়ে আছে। সমস্ত দেহের শিরায় শিরায় জেগে উঠতে থাকে চঞ্চল পুরুষরক্ত। ইচ্ছে করে ঐ আধফোটা কুঁড়ির মত দুটি ঠোঁটকে কামড়ে, শুষে সমস্ত রস বার করে নিয়ে আখের ছিবড়ের মত করে ফেলে দেয়, দুই সবল হাতের নির্মম পেষণে নিষ্পিষ্ট করে ফেলে ঐ লতার মত বাহু, ঐ অশোকগুচ্ছের মত কোমল অথচ উদ্ধত দুটি বুক, ঐ শীর্ণ-কটিদেশ, ঐ দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ!—ভেঙে চুরমার করে দেয় অক্ষত কৌমার্যের ঐ মূর্তিমতী অহঙ্কারকে!

নিজের অজান্তেই কখন তীর্থঙ্করের চোখ জ্বলে ওঠে।

আর সেই মুহূর্তেই হঠাৎ এদিকে চোখ তুলে তাকায় রমলা।

তীর্থঙ্করের জ্বলজ্বলে, একাগ্র-দৃষ্টিতে সভয়ে শিউরে ওঠে রমলা। ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে থরথর করে। প্রায় অজান্তেই সামনের টেবিল থেকে টেনে নেয় নিজের ব্যাগটা, যার মধ্যে ভরা আছে তার আত্মরক্ষার উপায়, শেষ অস্ত্র! তীর্থঙ্করকে ভালোবাসে রমলা। সেই তার জীবনে প্রথম পুরুষ যার এত কাছাকাছি সে এসেছে। তাই বলে পুরুষের স্বৈরাচারের বলি হবে না সে।

তীর্থঙ্কর কিছুই করলো না। আপনা থেকেই তার দৃষ্টি নরম হয়ে এল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে : 'তোমার ভয় নেই, রমলা। তোমার কাছে আমি হেরে গেছি।' বলেই উঠে গেল পাশের ঘরে।

কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এল তীর্থঙ্কর, ট্রেতে করে আমলেট, কাজুনাটস আর গরম কফি নিয়ে। বললে 'খাও।'

খিদে সত্যিই পেয়েছিলা। তবু রমলা একবার বললে : 'আপনি খান। আমার খিদে পায়নি।'

'যদি না খাও, বুঝবো আমার উপর রাগ করেই খাচ্ছো না। কিন্তু যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, আমি না হয় ক্ষমাই চাইছি তোমার কাছে।...অতিথিকে শুধু-মুখে রাখতে নেই, এটা একটা প্রাচীন ভারতীয় প্রথা।'

'আমি অতিথি কি করে হলুম?'—বিদ্রূপ করতে ছাড়ল না রমলা—'আপনি তো আমায় গায়ের জোরে নিয়ে এসেছেন।'

'মেনে নিচ্ছি তোমার অভিযোগ।'—হাসলো তীর্থঙ্কর — 'কি করলে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে বলো, তাই করতে রাজী আছি।'

'আপনি কি ঠাট্টা করছেন আমায়?'

'না।'—সহসা গম্ভীর হয়ে উঠলো তীর্থঙ্কর —'আজ যদি তুমি মনের মধ্যে এতটুকুও রাগ রেখে আমার বাড়ী থেকে চলে যাও, রাত্রে আমার ঘুম হবে না।'

এমনভাবে কথাগুলো বললো তীর্থঙ্কর, মনে হল না এর মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র থাকতে পারে।

তীর্থঙ্করের দিকে তাকিয়ে কেন জানি রমলার মনটা নরম হয়ে এল হঠাৎ। বললে : 'আসুন, দু'জনেই সুরু করি।'

'আঃ, বাঁচলুম।' ওমলেটে ছুরি-কাঁটা লাগালো তীর্থঙ্কর।

খাওয়া যখন ওদের শেষ হল তখন রেকর্ডের বাজনাও থেমে গেছে।

"তোমাদের বাড়ীতে ভাববে না তো? খুব কি দেরী হয়ে গেল?" জিজ্ঞেস করলো তীর্থঙ্কর।

"নাঃ। রোজ তো অফিসের পর একটু দৌড়ে দৌড়েই বাড়ী ফিরি। রাত ন'টা পর্যন্ত কেউ ভাববে না। তার বেশি দেরী হলে অবশ্য আলাদা কথা।"

"তাহলে আরেকটু বোসো। তারপর চৌরঙ্গীর কোনো হোটেলে গিয়ে দু'জনেই ডিনার খেয়ে নেবো একসঙ্গে। ঐ পথে তোমার বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েও আসবো।"

"না, আজ এখনি বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছে। শরীরটা কেমন ক্লান্ত লাগছে।"

"তবে চলো।" বলে উঠে পড়লো তীর্থঙ্কর।

গাড়ীতে উঠে সারাটা পথ প্রায় নীরবতায় কাটলো। এস্প্লানেড নয়, শ্যামবাজারের কাছাকাছি এসে গাড়ী থামালো তীর্থঙ্কর।

রমলাদের বাড়ী এখান থেকে আরও কিছু দূরে। কিন্তু সে পথটুকু আর গাড়ীতে যেতে চায় না রমলা।

সামনেই বাস্-স্টপ্। সেখান পর্যন্ত রমলাকে এগিয়ে দিয়ে তীর্থঙ্কর বললে : "আবার কবে দেখা হচ্ছে?"

"আমার অফিসে ফোন কোরো, তখন বলবো।" নিজের অজান্তেই 'আপনি' থেকে 'তুমির' স্তরে নামলো রমলা।

"সোমবার তোমায় ফোন করবো। আচ্ছা, গুড্ নাইট্।"

"গুড্ নাইট্।" বললো বটে রমলা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, তীর্থঙ্কর এতটা কায়দাদুরস্ত না হলেই বোধহয় ভালো হত। বার বার গুড্ মর্ণিং, গুড্ আফটারনুন্, গুড্ ইভ্নিং আর গুড্ নাইট শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

দরজা

নির্ম্মলেন্দু গৌতম

নিরঞ্জন বেশ খানিকটা সময় ধরে উঠবার চেষ্টা করে অবশেষে উঠে পড়লো। কিন্তু খুব সাবধানে উঠতে হলো নিরঞ্জনকে। ছবি চলছে, এ সময় মাথাটা উঁচু হলেই চেঁচিয়ে উঠবে লোক। সুতরাং মাথা নামিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে হলের বাইরে বেরুতে হলো নিরঞ্জনকে।

ছবিটা একেবারেই ভালো লাগছিলো না নিরঞ্জনের। খানিকটা সময় কাটাবার ইচ্ছায় নিরঞ্জন ছবি দেখতে ঢুকে পড়েছিলো। এখন মনে হচ্ছে একটা পার্কে বসে থাকলে অথবা হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা চলে গেলে নিরঞ্জনের খুব ভালো লাগতো। সাধারণত নিরঞ্জন তাই করে থাকে। আজকে কি ভেবে সিনেমার টিকিটখানা কিনে ফেলেছিলো।

হলের বাইরে এসে ঠান্ডা হাওয়ায় নিরঞ্জন আরাম বোধ করলো। হলের ভেতর যেন গরম লাগছিলো নিরঞ্জনের। এখন বাইরে এসে কথাটা মনে হচ্ছে। ছবিটা এতো খারাপ লাগছিলো যে হল থেকে কি করে বাইরে আসা যায় সে কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছিলো না নিরঞ্জন।

ফুটপাথে নেমে নিরঞ্জন আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকলো। মুখ মুছলো রুমাল বের করে। কপালে কয়েক বিন্দু ঘাম জমে

উঠেছিলো। হাঁটতে হাঁটতেই হঠাৎ নিরঞ্জন অনুভব করলো, ঠাণ্ডা বাতাসটা একটু বেশী ঠাণ্ডা। অথচ এতো ঠাণ্ডা হবার কথা নয়। আরো খানিকটা হেঁটে বাস-স্টপে এসে দাঁড়ালো নিরঞ্জন। বাতাসকে ভেজা মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দিকে তাকালো। কিন্তু আলোর মধ্য দিয়ে আকাশকে দেখতে পেলো না। তবু নিরঞ্জনের মনে হলো বৃষ্টি এখুনি নামবে।

একটু ভয়ে ভয়েই নিরঞ্জন তীক্ষ্ণ চোখে ফের আকাশের দিকে তাকালো। বৃষ্টি এখুনি নামবে। নিরঞ্জন একটু যেন বিপন্ন বোধ করলো। বাড়িতে ফেরবার জন্যে এখুনি বাসে উঠলেও অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিটের আগে নিরঞ্জন বাড়িতে পৌঁছুতে পারবে না। এর মধ্যে হয়তো আকাশ ভেঙে নামবে। বাস-স্টপের কাছাকাছি কোথাও নিরঞ্জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে অনেকক্ষণ। আকাশ দেখতে পাচ্ছে না নিরঞ্জন। তবু নিরঞ্জনের মনে হলো, বেশ কিছুটা না ঝরিয়ে মেঘ ফুরোবে না। এ বৃষ্টি অসময়ের বৃষ্টি নয়। মেঘগুলো সাজসজ্জা সেরেই এসেছে। ফুরিয়ে যাবার ভয় সম্ভবত তাদের নেই।

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে অল্পসময়ের মধ্যেই এসব কথা ভেবে ফেললো নিরঞ্জন। ঠাণ্ডা বাতাসটা ভারী হয়ে উঠেছে এর মধ্যেই। রাস্তায় ট্রাম বাস ট্যাক্সি-গুলোকে নিরঞ্জনের ব্যস্ত মনে হচ্ছে। বাসস্টপেও প্রত্যেকে আসন্ন বৃষ্টির জন্যে সম্ভবত অসম্ভব অধৈর্যভাবে দাঁড়িয়ে। নিরঞ্জনের যদি একটা বর্ষাতি থাকতো, নিরঞ্জন নিশ্চয়ই এসব উপভোগ করতো। কিন্তু আপাতত ভেজার ভয়টা নিরঞ্জনকে চিন্তিত করে ফেললো ভীষণভাবে। নিরঞ্জন একান্তভাবেই একটা উপায় খুঁজতে থাকলো মনে মনে।

ঠিক এই সময় নিরঞ্জনের মনে পড়লো সুধাময়ের কথা। এই বাসস্টপ থেকে সুধাময়ের বাড়ি দেড় মিনিটের পথ। নিরঞ্জন ইচ্ছে করলেই সেখানে একটা বর্ষাতি পেতে পারে। আর দেড় মিনিটের মধ্যে নিশ্চয়ই বৃষ্টি নামবে না।

তবু নিরঞ্জন ফুটপাথ ধরে বেশ বড়ো বড়ো পা ফেলে হাঁটতে শুরু করলো। একবার পেছন ফিরে দেখলো বাস এসেছে কিনা। বাসস্টপের মানুষগুলোকে হঠাৎ সেই মুহূর্তে খুব অসহায় মনে হলো। আর ফিরে দাঁড়িয়ে দু-পা হাঁটতেই কথাটা ভুলে গেলো নিরঞ্জন।

দেড় মিনিটে না হলেও খুব তাড়া-তাড়িই সুধাময়ের বাড়িতে এসে পৌঁছুলো নিরঞ্জন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাল্কা চালের বৃষ্টি শুরু হলো। বারান্দায় উঠে এলো নিরঞ্জন। একটু উঁচু গলায় ডাকলো সুধাময়কে।

ভেতরে আলো জ্বলছিলো। এবার বাইরের ঘরে আলো জ্বললো। দরজা খুলতেই আলোয় মাখামাখি হলো নিরঞ্জন। সুধাময় নয়, সুধাময়ের বোন মীরা দরজা খুলেছে।

মীরা বললো, 'দাদা নেই তো।'

নিরঞ্জন কি বলবে তা দ্রুত ভাবলো একবার। পেছন ফিরে বাইরের হাল্কা চালের সেই বৃষ্টিটাকে দেখলো। তারপর মীরার দিকে ফিরে বললো, 'অনেকক্ষণ বেরিয়েছে বুঝি।'

মীরা চোখ কুঁচকে সময়টুকুকে আন্দাজ করতে চাইলো। তারপর বললো, 'এই মিনিট পঁচিশেক হলো গেছে। বৌদিও সঙ্গে গেছে।'

এখন মীরা তাহলে একা। অবশ্য ওদের পুরোনো একজন ঝি আছে। ফের পেছন ফিরে একবার বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে দেখে নিরঞ্জন বললো, 'হঠাৎ বৃষ্টি নেমে পড়লো বলে খুব মুশকিলে পড়ে গেছি।'

হাসলো মীরা। নিরঞ্জনের অসহায় অবস্থায় মীরা সম্ভবত মজা পেলো। বললো, 'যা গরম যাচ্ছে, ঝমঝম করে খুব খানিকটা বৃষ্টি হওয়া উচিত। আমার খুব ভিজতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু।'

নিরঞ্জন বললো, 'ভেজার ইচ্ছেটা অন্যায় নয়।'

'দাঁড়িয়ে না থেকে ভেতরে বসুন না।' মীরা দরজাটা ছেড়ে দিয়ে বললো।

এবার ঘড়ির দিকে তাকালো নিরঞ্জন। বললো, 'যতো বসবো, বৃষ্টি ততো জমে উঠবে। অনেকটা রাস্তা আবার আমায় যেতে হবে।'

মীরা বললো, 'বৃষ্টির মধ্যে তো আর যেতে পারছেন না?'

হঠাৎ ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হলো নিরঞ্জন। বর্ষাতির কথা না বলে বসতে ইচ্ছে হলো। এবার নিরঞ্জন বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ঘন আর জোরালো হয়েছে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি।

নিরঞ্জন মীরার দিকে তাকালো। গরমের জন্যেই সম্ভবত মীরা একটা নরম রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ পরেছে। নরম রঙের হাল্কা শাড়িতে যতোখানি সম্ভব খোলামেলা রেখেছে শরীরকে। মীরা যদি এখন হঠাৎ বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে মীরাকে অদ্ভুত দেখাবে। বৃষ্টির জন্যে তো মীরা সমস্ত ইচ্ছাকেই সেই দিকে ফিরিয়ে রেখেছে। কাজেই মনে মনে মীরাকে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড় করানো নিরঞ্জনের পক্ষে অন্যায় নয়। নিরঞ্জন সেই দৃশ্যটাকে মনের মধ্যে ভাবতে ভাবতে দুর্বল হলো।

মীরা বললো, 'কী ভাবছেন।'

নিরঞ্জন মিথ্যে করে বললো, 'বাড়িতে ফিরবার কথা ভাবছি। যা জোরে নামছে!'

বর্ষাতির কথাটা নিজের কাছেই এড়িয়ে গেলো নিরঞ্জন।

'আপনার জন্যে চা করি একটু। আপনি বসুন।' মীরা হঠাৎ যেন চঞ্চল হলো।

নিরঞ্জন বললো, 'থাক। চায়ে তেমন ইচ্ছে নেই এখন।'

ভেতরে এসে বসলো নিরঞ্জন।

মীরা যদি এখন হঠাৎ বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়। নিরঞ্জনের ভেতরে কে যেন ক্রমাগত বলতে থাকলো। নিরঞ্জন তার কথা এবং মীরার কথা একসঙ্গে শুনতে বাধ্য হলো বলে নিরঞ্জনের নিজেকে খানিকটা অন্যমনস্ক মনে হলো।

মীরা বললো, 'এদিকে কোথায় গিয়ে-ছিলেন আপনি?'

'একটা ছবি দেখতে। ভালো লাগলো না বলে বেরিয়ে এসেছি আগেই।' পকেট থেকে টিকিটের ছেঁড়া টুকরোটা বের করে হাতের মধ্যে পাকাতে থাকলো নিরঞ্জন।

মীরা হেসে ফেললো কথাটা শুনে। বললো, 'আপনাকে লোকে পাগল বলবে।'

'ওতে ভয় পাই না।'

'আমি ভয় পেতাম কিন্তু। লোকে পাগল বললে হঠাৎ নিজেকে পাগল বলে সন্দেহ হতো।' মীরা হাসলো।

জানালা দিয়ে ঘরের ঝকঝকে আলো ফোকাসের মতো বাইরে পড়েছে। সেই আলোর দিকে তাকালো নিরঞ্জন। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পড়তে পড়তে আলোর মধ্যে ঝলকে উঠছে। নিরঞ্জন অনুভব করলো তার মনের মধ্যেও অর্থাৎ কোনো একটা জায়গা আলোকিত হয়ে উঠেছে, আর বৃষ্টির ফোঁটার মতো একটা ইচ্ছা অনবরত ঝিকিয়ে উঠছে সেখানে।

মীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো। দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যই মীরাকে বেশী আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। নিরঞ্জন ভাবলো, মীরার সঙ্গে সে ভালোবাসার কথা বলতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে মীরার সঙ্গে ভালো-বাসা করবার এই ভাবনা, নিরঞ্জন স্পষ্টই ভাবলো, এই ভাবনার পেছনে শুধু কিছু ইচ্ছা আছে। মীরার শরীরটা এখন পানের দোকানের ক্যালেণ্ডারের মেয়েদের ছবির মতো দেখাচ্ছে। সবাই পান কিনতে গিয়ে সেই ক্যালেণ্ডারের দিকে হাঁ করে তাকায় সবাই। নিরঞ্জনও তাকায়। তাকাবার পেছনে ভালোবাসা নেই। যা আছে তা নগ্ন করে বললে কেমন বিশ্রী এবং অশ্লীল শোনায়। মনটা একটা আশ্চর্য জায়গা, যেখানে আমরা যে কোনো কথা ভাবতে পারি। নিরঞ্জন ভাবলো।

মীরাকে এক সময়ে ক্যালেণ্ডারের ছবি ভেবেই নিরঞ্জন উঠে পড়বার জন্য ব্যস্ত হলো। কিন্তু রক্তের মধ্যে উত্তেজিত একটা প্রবাহ ক্রমাগত মাথার মধ্যে আঘাত করতে

ক্রমশঃ নিরঞ্জনের মধ্যে জ্বরের মতো একটা দাহের সৃষ্টি হতে থাকলো।

মীরা বললো, 'বাইরে বৃষ্টি পড়ছেই দেখছি।'

নিরঞ্জন বললো, 'অন্তত তোমার ছাতাটা আমায় ধার দিতে হবে।'

বিস্ময় প্রকাশ করলো মীরা। বললো, 'সেকি লেডিজ ছাতা মাথায় দিয়ে যাবেন নাকি!'

'মাথাটা তো বাঁচবে।' নিরঞ্জন বললো।

মীরা হেসে বললো, 'তাহলে আমার আর আপত্তি কি! দাঁড়ান, আমি এনে দিচ্ছি ছাতা। অবশ্য আমারটা ছাড়া অন্য ছাতা নেইও।

ফিরে ভেতরের দিকের দরজার পর্দাটা সরিয়ে মীরা চলে গেলো।

নিরঞ্জন দরজা দিয়ে বাইরে তাকালো। অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। থামবে কখন সম্ভবত তার ঠিক নেই। সুধাময় এবং তার স্ত্রীর ফিরতে হয়তো দেরী হবে। সুধাময় একলা হলে হয়তো ফিরতে পারতো। কিন্তু স্ত্রীকে নিয়ে এই বৃষ্টির মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরবে না।

নিরঞ্জন আরো খানিকটা সময় বসলে পারতো। বৃষ্টিটা যদি খানিকটা ধরে আসে, তাহলে কাকভেজা ভিজতে হবে না। নিরঞ্জন ভাবলো মনে মনে। কিন্তু মাথার মধ্যে জ্বরের মতো সেই দাহ ক্রমশ তাকে অধৈর্য এবং বিপন্ন করে তুলছে। স্পষ্ট ভাবে মীরাকে আর দেখতে পাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে মীরার শরীরটাকে।

ছাতা নিয়ে ঢুকলো মীরা।

'আপনার যা লম্বা চওড়া চেহারা, তাতে মাথাটাই বাঁচবে শুধু।' মীরা হেসে বললো।

নিরঞ্জন ভাবলো, কোটি কোটি বৃষ্টির ফোঁটা অবিশ্রাম ঝরে যদি তার মাথাটাকে একটা হ্রদ তৈরী করে দিতো, তাহলেই নিরঞ্জন এখন বোধহয় সুখ পাবে।

ভাবতে ভাবতে হাত বাড়িয়ে নিরঞ্জন ছাতাটা নিলো।

'সুধাময় এলে বোলো, আমি এসে-ছিলাম।' পায়ে পায়ে দরজায় এসে দাঁড়ালো নিরঞ্জন।

মীরাও এগিয়ে এলো। বাল্বটা এবার মীরার ঠিক মাথার ওপর ঝুলছে। মীরার চোখের ওপর দিয়ে আলো নেমে হালকা ছায়া আর আলোয় মীরাকে অনন্তযৌবনা মনে হচ্ছে। জ্বর জ্বর উত্তাপটা নিয়ে ধুত্ত গলায় নিরঞ্জন বললো, 'চলি।' তারপর দরজা পেরিয়ে ছাতাটা খুলেই বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়লো।

পরদিন সকাল বেলাতেই নিরঞ্জনের ছাতাটা ফিরিয়ে দেয়া উচিত ছিলো। অথচ ফিরিয়ে দিতে যাওয়ায় একটু যেন লজ্জা পাচ্ছে নিরঞ্জন। কিন্তু সকালবেলায় যে নিরঞ্জন ফিরিয়ে দিয়ে আসবার মতো সময় করেই উঠতে পারেনি একটু দেরীতে ঘুম ভাঙবার জন্য। গতকাল ভিজে ঠান্ডা লেগেছে নিরঞ্জনের। লেডিজ ছাতার জন্য সমস্ত শরীর ভিজে চুপসে গিয়েছিলো। অফিসে বন্ধুদের পরামর্শে দুটো ট্যাবলেট কিনে খেয়েছে দুপুরবেলায়। আপাতত নিরঞ্জনের নিজেকে খানিকটা ঝরঝরে লাগছে।

আকাশটা আজকে পরিস্কার। কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। ছাতাটা হাতে করে রাস্তায় বেরিয়ে নিরঞ্জনের খুব অস্বস্তি হচ্ছে। একবার মনে হলো ফিরে গিয়ে ছাতাটা কাগজে মুড়ে নিয়ে আসে। কিন্তু ব্যাপারটাকে আদৌ পছন্দ হলো না। ছাতাটাকে যথাসম্ভব লুকিয়ে নিরঞ্জন হাঁটতে থাকলো বাসস্টপের দিকে।

ভাগ্য ভালোই, নিরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে বাস পেলো একটা। বাসে উঠে ছাতাটা সবার চোখের আড়াল করতে চেষ্টা করলো। নিরঞ্জন অনুভব করলো, সেজন্যে তাকে খানিকটা বিপন্ন এবং দুর্বল দেখাচ্ছে। বাসের মধ্যে নিরঞ্জন যতোটা থাকলো, ততোটা সময় নিজের দিকেই তাকিয়ে রইল। ছাতাটা নিতে গতকাল ওর খারাপ লাগছিলো, তবু চারিদিকে অজস্র বৃষ্টির মধ্যে ছাতা-বর্ষাতির মধ্যে সেটা মানিয়ে যাচ্ছিলো। আজকে পরিচ্ছন্ন আকাশ এবং উজ্জ্বল এই সন্ধ্যায় কেবল সে-ই ছাতাটা বহন করছে।

বাস থেকে নামবার পর পাশে গা ঘেঁষে হঠাৎ খিল-খিল হাসি শুনে চমকে উঠলো নিরঞ্জন। ফিরে দেখলো মীরা হাসছে। সাজ-সজ্জায় অন্যরকম লাগছে যেন।

নিরঞ্জন এক মুহূর্ত মীরাকে দেখে ছাতাটা বাড়িয়ে ধরে বললো, 'সকালবেলা সময় পাইনি একেবারে।'

হাত বাড়িয়ে ছাতাটা নিলো মীরা।

'ছাতাটা লেডিস বলে খুব লজ্জা পাচ্ছিলেন কিন্তু। বাসে আপনাকে দেখে আমার হাসি পাচ্ছিলো সেজন্যে।' মীরা অল্প অল্প হাসছে।

নিরঞ্জনের জ্বর জ্বর বোধটা মাথা থেকে সমস্ত শরীরে ছড়াচ্ছে। নিরঞ্জন অত্যন্ত অশোভনভাবে মীরার শরীরের দিকে তাকালো।

'লেডিজ সঙ্গে থাকলে কিন্তু আপনারা বুক ফুলিয়ে হাঁটেন, কিন্তু লেডিজ ছাতা থাকলেই কেমন চুপসে যান। দাদাকেও দেখেছি এমন লজ্জা পেতে। অথচ রোজ সন্ধ্যায় বৌদিকে নিয়ে না বেরোলে চলেই না দাদার।' সমস্ত শরীর দুলিয়ে মধ্যে একরাশ আনন্দের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে মীরা হাসলো।

চারিদিকে গাড়ি-ঘোড়া-ভিড় মানুষের ভিড়। ফুটপাথে তাদের গা ঘেঁষে চলেছে অজস্র লোক। ঝলমলে আলোয় সন্ধ্যার জগতটাকে নিরঞ্জনের মোহময়ী বলে মনে হলো।

নিরঞ্জন বললো, 'এখানে না দাঁড়িয়ে আমরা বরং একটু ফাঁকায় যেতে পারি।'

মীরা বললো, 'তার চাইতে বাড়িতে চলুন। আমার ঘরে বসবেন। ফ্যান চালাতে হয় না আমার ঘরে। দারুণ বাতাস আসে জানলা দিয়ে। রাত্রে আমি জানালা খুলে ঘুমোই।'

অন্তরঙ্গ গলায় নিরঞ্জন বললো, 'সেই ভালো।'

দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে থাকলো। নিরঞ্জন মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ছুঁতে থাকলো মীরাকে। মীরা কি ভাবছে নিরঞ্জন তা জানে না। কিন্তু নিরঞ্জন স্পষ্টই অনুভব করলো, নিজে ক্রমশ শরীরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

বাড়িতে পৌঁছে মীরা সটান নিজের ঘরে এলো। নিরঞ্জনও এলো মীরার ঘরে। সুধাময় কিংবা তার স্ত্রী বাড়িতে নেই। মীরা তো আগেই বলেছে, সন্ধ্যেবেলায় দুজনে বেরুবেই। মীরা জানে দাদা এবং বৌদি সন্ধ্যেয় বাড়িতে থাকে না। জেনেই নিরঞ্জনকে ডেকে এনেছে। বাইরের ঘরে নয়, মীরার নিজের ঘরে। যেখানে জানালা দিয়ে প্রচুর বাতাস আসে।

ঘরে ঢুকেই ছাতাটা একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রাখলো। তারপর নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি বসুন।'

একটা চেয়ার টেনে নিরঞ্জন বসলো। মীরা এগিয়ে জানালা খুলে দিতে থাকলো একটা একটা করে। সবগুলো জানালা খুলে একটা জানলার দিকে পিঠ ঠেকিয়ে টান হয়ে দাঁড়ালো মীরা। বললো, 'দেখলেন তো জানালা খুললে দারুণ বাতাস আসে ঘরের মধ্যে।'

নিরঞ্জন হাসতে চেষ্টা করে বললো, 'হুঁ।'

মীরার চোখ থেকে নিরঞ্জন চোখ সরাতে পারছে না। অথচ মীরার টান টান করা শরীরের দিকে তাকাবার জন্য নিরঞ্জনের অসম্ভব ইচ্ছে হচ্ছে।

মীরা বললো, 'কাল অনেক রাতে দাদা বৌদি ফিরেছেন। আপনি আরো খানিকটা বসলে, ভালো লাগতো। কী নির্জন লাগছিলো আপনি চলে যাবার পর।'

'আমি নিজেও তো নির্জন হয়ে গেছিলাম।'

হাসলো মীরা। বললো, 'দুজন পাশা-পাশি নির্জন হয়ে বসে থাকলেও নির্জনতা থাকে না সেখানে। আমরা তো পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারি।'

নিরঞ্জন বললো, 'তা সত্যি।'

মীরা বললো, 'আপনি তো খুব ভিজেছিলেন। যা ছোটো ছাতা। জানেন মেয়েদেরও ছেলেদের মতো বিরাট ছাতা হওয়া উচিত।'

নিরঞ্জন বললো, 'আমারও তাই মনে হয়।'

দ্রুত একবার সমস্ত ঘরখানা দেখে নিলো নিরঞ্জন। ঝকঝকে ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে চারটা জানালা। পাশে আরেকখানা ঘর। পার্টিশানের দরজাটাতে পর্দা ঝোলানো। নিরঞ্জনের সামনে একখানা খাটে পরিপাটি করে বিছানা পাতা। খাটের ওপরে দেয়ালে মীরার অতিক্রান্ত কৈশোরের উজ্জ্বল একখানা ছবি। যে দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে নিরঞ্জন, সে দরজার বাইরে ছোট্ট একটুকরো উঠান এবং উঠানের ওদিকে রান্নাঘর।

মীরা বললো, 'আপনি একটু সময় বসুন। আমি বেড়িয়ে আসা শাড়িটা ব্লাউজটা পালটে আসি। ঘামে সব ভিজে আছে।'

জানালা থেকে সরে এলো মীরা।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে নিরঞ্জন বললো, 'আচ্ছা।'

মীরা পর্দা সরিয়ে ওঘরে ঢুকলো। বড়ো একটা আয়না পর্দার ফাঁক দিয়ে দরজার সোজাসুজি চোখে পড়লো নিরঞ্জনের। মীরা ওঘরে ঢুকতেই পর্দাতে আয়নাটা আড়াল হলো। না, আড়াল হলো না। নিরঞ্জন অনুভব করলো, তার দুটো চোখ কখন আয়না হয়ে গেছে। আর তাতেই প্রতিফলিত হচ্ছে মীরা।

মীরা গুনগুন করে একটা গান গাইছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে নিরঞ্জন। ক্রমে নিরঞ্জনের নিজেকে অধৈর্য মনে হতে থাকলো। কিসের জন্য নিরঞ্জন এতো অধৈর্য হচ্ছে মনের মধ্যে তা অনেক কষ্টে আড়াল করে রাখলো। অস্থিরভাবে দুবার নড়লো। তারপর পর্দার দিকে চোখ রেখে খানিকটা ক্যাজুয়্যালে গলায় মীরাকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'সুধাময়ের সঙ্গে বোধহয় আজও দেখা হলো না।'

'গরমের দিন তো, রাত করে বেড়িয়ে ফেরে।' কথা বলতে বলতে মীরা বোধহয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্লাউজের বোতাম আঁটছে। টিপ বোতাম লাগাবার শব্দ পেয়েছে নিরঞ্জন।

চেয়ারে আধো ঝুঁকে নিরঞ্জন বললো, 'গরমের দিনে তাড়াতাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হয় না। আমিই তো মাঝে মাঝে কোনো পার্কে কিংবা ময়দানে এসে অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়ে যাই।'

মীরা বললো, 'আমাদের মেয়েদের বড় অসুবিধে।'

নিরঞ্জন অনুভব করলো, মীরা কথাটা বলে নিজেকে আয়নায় দেখছে।

এতোক্ষণ সিগারেট ধরালো নিরঞ্জন। এবার একটা সিগারেট ধরালো।

অল্প সময়ের মধ্যেই মীরা পর্দা ঠেলে ঢুকলো। মীরাকে হঠাৎ যেন আরো কমবয়সী এবং মোহময়ী মনে হচ্ছে। নিরঞ্জন মীরার দিকে তাকিয়ে সিগারেটটা টানতে গিয়ে গোড়াটাকে একেবারে ভিজিয়ে ফেললো। একবার সিগারেটটার দিকে তাকিয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো জানালা দিয়ে।

মীরা বিছানার এক কোণায় বসে হাসতে হাসতে বললো, 'কাল লেডিজ ছাতা নিয়ে গেছেন শুনে দাদা আর বৌদি খুব হেসেছে কিন্তু।'

নিরঞ্জন আস্তে আস্তে হাসলো। বললো, 'ভাগ্যে তবু লেডিজ ছাতা ছিলো।'

মীরা বললো, 'তা সত্যি! আমিও হঠাৎ বেরিয়ে পড়তে পারতাম তো।'

বলে একটু থেমে লাফিয়ে উঠলো মীরা। বললো, 'তাইতো, চা করতে বলবার কথা ভুলেই গেছি।'

লাফিয়ে নামবার সঙ্গে সঙ্গে মীরা যেন দামিনীর মতো ঝলকে উঠলো। নিরঞ্জন সেদিকে তাকিয়ে না থাকবার আর সুযোগ পেলো না।

মীরা দরজা দিয়ে বারান্দার দিকে যেন কি বলতে থাকলো। নিরঞ্জন তা শুনতে পেলো না। নিরঞ্জনের চোখের মধ্যে বাকী চারটি ইন্দ্রিয় কেন্দ্রীভূত হলো। দরজা দিয়ে ঘরের সমস্ত আলো-টুকু মীরার পিঠের ওপর আছড়ে পড়েছে। লাফিয়ে নামবার সময় মীরার ব্লাউজের পেছনের বোতাম কয়েকটা খুলে নরম পিঠটা অনাবৃত হয়ে গেছে। নীচের সরু ছোটো জামাটার সরু স্ট্র্যাপটা ডুবে আছে সেই নরম পিঠের মধ্যে।

এবার একটা দরজা পেরোলেই নিরঞ্জন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিজের শরীরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে সেই শরীরকে মুক্তি দিতে পারে। নিরঞ্জন যথার্থই যেন আলোর মতো দ্রুত কেন্দ্রীভূত হতে থাকলো।

কিছু একটা অনুভব করে হঠাৎ মীরা বাঁ হাতটা পিঠে ঠেকিয়ে দু হাতে বোতামগুলো লাগিয়ে ফেললো একটা একটা করে। পিঠের ওপর আঁচলটা সামান্য টেনে দিলো। তারপর রক্তাক্ত মুখে নিরঞ্জনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে দরজা পেরিয়ে ভেতরে এলো।

শিথিল শরীরে চেয়ারের ওপর খানিকটা ঝুঁকে বসলো নিরঞ্জন। নিজের শরীরের মধ্যেই নিজের কেন্দ্রীভূত শরীরটা ভেঙে লক্ষ টুকরো হলো। মীরার সলজ্জ রক্তাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সেই টুকরো-গুলো পুলকিত হলো, রোমাঞ্চিত হলো। নিরঞ্জন অনুভব করলো, সেই লক্ষ লক্ষ রোমাঞ্চিত, পুলকিত টুকরোগুলো বিরাট মিছিল সাজিয়ে এবার তাকে আনন্দ লোকের দিকে নিয়ে চলেছে!!

সাগর পারের চিঠি

এস ডি এস
ছাত্র ইউনিয়ন
অফিস

দিলীপ
মালাকার

অনেককাল পরে কলকাতার বর্ষা দেখলাম। ইউরোপে বৃষ্টি হয়, কিন্তু বর্ষা হয় না। শীত-বসন্ত-শরতে বনানুমতিতে, জানান না দিয়ে হঠাৎ ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়ে। টাপুর-টুপুর করে নয়। ইউরোপের ঝির-ঝিরে বৃষ্টিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। বর্ষা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। যেদিন কলকাতা ছাড়ব তার চারদিন আগে থেকে বর্ষামঙ্গল কাব্য শুরু হয়ে গেছে। প্রথম কদিন ভালই লেগেছিল। কিন্তু......কিন্তু......যেদিন কলকাতা ত্যাগ করব, সেদিনের ভাসমান কলকাতা শহরের দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তার কারণ অনেকগুলো। প্রথমত, প্যারিসের ছাত্রশ্রমিক বিক্ষোভের দরুন প্যারিসের বিমানবন্দর বন্ধ ছিল দিন বিশেক। বিমানের টিকিট নিয়ে প্রতীক্ষায় ছিলাম বিমানবন্দর খুললেই বিমানে উড়ব। বিমানবন্দর খুললে কী হবে, ফরাসী মুদ্রা সংকট দেখা দেওয়ায় আরেক বাধার সৃষ্টি হল। যাই হোক যেদিন যাবার দিন নির্ধারিত করলাম তার পরের দিন শুনলাম বি ও এ সি বিমান কোম্পানীর পাইলটরা ধর্মঘট শুরু করবে সেই রাত্রে। আরেক দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরল আমায়! আমি ঠিক করেছিলাম যে মাত্র ন'ঘন্টার বিমানভ্রমণে কলকাতা থেকে ফ্রাংকফুর্ট পৌঁছব। জার্মানীর হালচাল বিশেষ করে জার্মান ছাত্র আন্দোলন দেখে প্যারিস পৌঁছব দিন পাঁচেক পরে। দুর্ভাবনায় নির্ভর করে বিমান কোম্পানীর অফিসে-অফিসে ঘোরাঘুরি করেছি কদিন। যেদিন কলকাতা ছাড়ব সেদিন সকালবেলা পর্যন্ত বি ও এ সি বিমান কোম্পানী জানিয়েছিল, তাদের বিমান কলকাতা থেকে ফ্রাংকফুর্ট ঠিক নির্ধারিত সময়ে ছাড়বে ও পৌঁছবে। আমি তাদের ভরসায় নাকে সরষে তেল দিয়ে দিবা নিদ্রা দিচ্ছিলাম। দেখা-সাক্ষাতের পাট চুকোনো প্রায় শেষ হয়ে গেছে। বিকেলে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এক পিওনের ডাকে ঘুম ভাঙালো। তখন বর্ষণ হচ্ছে মুষল ধারায়। বিমান কোম্পানী জানিয়েছে যে, তাদের বিমান যাবে না। তারা আমার জন্যে লুফৎহানসা কোম্পানীর বিমানে জায়গা ঠিক করে রেখেছে। রাত সাতটায় বিমান ছাড়বে। সাতটায় দমদম। সিটি আফিসে ছ'টায়। তথাস্তু বলে পিওনের খাতায় সই মেরে তৈরী হয়ে নিলাম। বাক্সে যা ছিল তাই নিয়ে ট্যাক্সি খুঁজতে বেরোলাম।

গ্রীষ্মকালে অনেকবার গেছি ভেনিসে বেড়াতে। ভেনিস আর দশটা শহরের মতন শহর বটে, কিন্তু তার রাস্তাঘাটে যে যা চাকচক্যমান কিছু ঘটর ঘটর করে চলে না বলেই আমার আরো ভাল লাগে। রাস্তার বদলে সেখানে খাল আর খাল। খালের বুকে সেকালে ডিঙি নৌকো পারাপার করত। এখনও কিছু ডিঙি যার কাব্যময় নাম গণ্ডোলা দেখা যাবে। তবে তাদের অস্তিত্ব দিনে দিনে কমে আসছে। পংশ বৃদ্ধি কমছে বলে। তার জায়গায় এসে জুড়েছে মোটর বোট। ট্যাক্সির বদলে মোটর বোট ঘুরে বেড়ায় দিন-রাত। কিন্তু বর্ষায় কলকাতায় রাস্তাঘাট দেখে ভেনিসের কথা বার বার মনে পড়ল। সেন্ট্রাল এভিনুতে ট্যাক্সি ডুবে যাবার আশংকায় আশে-পাশের গলিতে ঢুকে ভাসতে ভাসতে চলল আমার ট্যাক্সি। ভি আই পি রোডের মোড়ে এসে আবার ডুবুডুবু ভাব হল ট্যাক্সিটার। ভি আই পি রোডের মুখে দাঁড়িয়ে পায় হল ট্যাক্সিটা। ভেনিসের লোকেরা দেখলে বাহবা দিয়ে উঠত। হয়ত হাততালি দিয়ে বলত "আঞ্জিআমো"। অর্থাৎ এগিয়ে যাও। আঞ্জিআমো, আঞ্জিআমো, আমরা এগিয়ে গেলাম দমদম বিমান বন্দরে। মালপত্তর ওজন করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়েছি। কাঁধে হাত পড়ল। তাহলে তুমি যাচ্ছই। এক পুরোনো বন্ধুর কণ্ঠস্বর। না গিয়ে কি উপায় আছে? বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। বৃষ্টির ওপর গোঁসা করে দেশ ছাড়ছ? না, না, আবার আসব।

কাস্টমের ঝামেলা কাটিয়ে পুলিশের ঝামেলা মেটাতে গিয়ে এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে মোলাকাৎ। কি দাদা চললে আবার। সেই পুরোনো উত্তর। পুলিশ কাউন্টার থেকে আর্দ্রতা মিশ্রিত করুণ স্বর কানে এলো। আবার যাচ্ছেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। সাংবাদিক বন্ধুটি আঙুল দেখিয়ে বলল, জানেন ওই, ওইখানে দুদিন আগে প্যানামের একটা বোয়েং বিমান আছাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। অনেক জখম হয়েছিল। আপনার ভয় করে না? কি আর বলব। তবুও বলতে হল, বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর আর ভয় থাকে না। তাই তো বারে বারে বিমানে উড়ি। বিমান ভেঙে পড়লে হয় বাঁচব না, মরব। দুটোর একটা হবে। কথায় কথায় সময় কেটে গেল। বিমানে চড়ার ডাক এলো।

বিমানে বসে দুশ্চিন্তায় মনটাকে ছেয়ে ফেলল। ভেবেছিলাম ন'ঘন্টায় কমেট বিমানে ফ্রাংকফুর্ট পৌঁছব। না কোথায় বোয়িংএ শেষ পর্যন্ত বার ঘন্টায়। তিন ঘন্টা স্রেফ লোকসান। কিন্তু ভাবলে গায়ে জ্বর আসে যে এখন সুয়েজ খাল অচল তাই একমাস লাগে ইউরোপ থেকে ভারতে

পে'ছিতে। সুয়েজ খাল খোলা থাকলে বার দিন লাগে। বার দিনের জায়গায় বার ঘণ্টা। তাও সবুর সয় না আজকাল। শুনেছি সামনের বছর থেকে ইউরোপ থেকে ভারতে পে'ছিতে লাগবে সুপারসনিক বিমানে সাড়ে ছ' ঘণ্টা। তিন ঘণ্টা হলে আরও ভাল হয়। যে সময় লাগে কলকাতা থেকে বর্ধমান যেতে।

গতি আরও গতি। গতির কথা মনে মনে ভাবছিলাম। পাশের সীটে সহযাত্রীর কথায় সম্বিত ফিরল। কি ভাবছ। খেয়ে নাও। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তার আগে বরং কিছু পান করে নাও। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশা। কী বল। কখন যে প্লেনটা ধুপ করে পড়বে কে জানে। আমি বললাম তোমরা আমেরিকানরা আবার কবে থেকে বৈরাগী হলে। হঠাৎ বৈরাগ্য কেন। উত্তরে সহযাত্রী বলে, কেন আবার। দেখছ না আমার গায়ে মাত্র একটি জামা। অন্য হাতের এই অ্যাটাচি কেশটাই সম্বল। আমি বলি, কেন, তুমি বুঝি এক জামা কাপড়ে শখ করে বেড়াতে বেরিয়েছ? তোমরা আমেরিকানরা সব পার। সহযাত্রী সখেদে বলে, না, না, তা নয়। এই তো তিনদিন আগে তোমাদের কলকাতায় নামব বলে প্লেনে বেল্ট এ'টে সীটে বসে আছি। কে যেন গোঁত্তা মারল। দেখি এদিকের ওদিকের সীটগুলো ছিটকে পড়েছে। সামনেই দেখি ইমারজেন্সি এক্সিট লেখা। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে লাফ মারি। গিয়ে পড়লাম কাদার বুকে। প্যান আমেরিকানের প্লেনটা নেমেছিল ঠিকই। কিন্তু কোথায় কী হল জানি না। এক গোঁত্তা মারল। তারপর সব হুড়মুড়। এরই নাম কপাল। বে'চে গেলাম এ যাত্রায়। কাদায় নেমে দেখি প্লেনের পেছন দিকটা জ্বলছে। সামনের দিকেও। বর্ষাকে এত গাল মন্দ দাও তোমরা। ওই বর্ষার কাদা না জমলে আমাদের প্লেনটা এক ধাক্কায় গুড়ো হয়ে যেত। আর আমাদের হাড়গোড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হত। তাই ভাবছি জীবনটা যখন ফিরে পেয়েছি, তখন একটু পেট ভরেই খাই। আবার কখন কী হয় কে জানে। আমাদের পেছনের সারির সীটের পেছনে ছিল একটি লাজুক মুখ। তার উদ্দেশ্যে জন চেঁচিয়ে বলে গেল, হে জো এখনও আমরা বে'চে। এবার বাড়ী পে'ছিব। দেশে গিয়ে টেলিফোন করিস। পেছন থেকে উত্তর এলো ইয়েস জন, সিওরলি। আমরা তো এখনও বে'চে। বাড়ীতে পে'ছেই টেলিফোন করো। তাহলে বুঝব যে আমরা জীবন নিয়ে দেশে পে'ছেচি।

দমদমে দুর্ঘটনায় পতিত বিমানে যাত্রী ছিল অনেকে। তাদের কেউ কেউ আমাদের প্লেনে চড়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট যাচ্ছিল। সেখান থেকে আরেক প্লেনে চড়ে তারা আমেরিকার দিকে পাড়ি দেবে। এরা দুজনেই ফিলিপাইনস্‌এ কাজ করে। কলকাতা হয়ে দেশে ফিরছিল।

কেমন করে তাদের বিমান দুর্ঘটনার মুখে পড়ে, কেমন করে তারা প্রাণ বাঁচাল, তার ইতিহাস বর্ণনায় তাদের উৎসাহ দেখলাম না। তারা যে প্রাণে বে'চেছে এটাই যথেষ্ট তাদের কাছে। জীবনের আশা ত্যাগ করে তারা জানলা ভেঙে ছুটেছিল। যারা পারেনি, তারা ওখানেই সমাধি লাভ করে। জন আমায় উৎসাহের সঙ্গে জানায়, জানো, কত জিনিস নিয়ে ফিরছিলাম আমার স্ত্রী ও মেয়ের জন্যে? বাক্স-প্যাটরা কী ছিল প্লেনের পেটের নিচে। ওগুলো এক গোঁত্তা খেয়ে কাদা-মাটিতে মিশে গেছে। যা গেছে তা গেছে। কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনেছি। এই দেখো ইয়া বড়া ভোজালি, পেতলের কাজকরা আলো। আমি বললাম এগুলো কিনলে কেন?

প্রাণে যে বে'চেছি এই যথেষ্ট। তারপর মরণ ফাঁড়াটা যখন ভারতের মাটিতে কেটেছে তখন ভারতের কিছু দর্শনীয় জিনিস কিনে বাড়ীর ড্রইংরুমে সাজিয়ে রাখব। দুর্ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন।

বিমান দুর্ঘটনার হাত থেকে বে'চেছে আরেক আমেরিকান। তার নাম আগেই বলেছি। জো কিন্তু সর্বদাই হাস্য মুখ। বয়স অল্প। তার দুর্ভাবনা কম। জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য। এমনি তার মনের ভাব। মৃত্যু হয়নি সে তো সুখবর। বে'চেছে তো আরও ভাল খবর। তাই নিয়ে এত মাতামাতি কেন। সে হাসি মুখে চলেছে ওহাইওর এক অজানা গ্রামে। সেখানে তার বাবা-মা অপেক্ষা করছে তার জন্যে। ওকে জ্যান্ত দেখে তার মা-বাবা খুব খুশী হবে, তাতেই তার আনন্দ। ও কথায় কথায় আমায় বার বার বলছিল, ও এখনও বে'চে আছে। মরেনি। সে নতুন আশা নিয়ে বাড়ী ফিরছে। কিন্তু দুজনের মুখেই আমি দেখেছি নতুন আশার আলো। তারা যমের ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছে। তাতেই তাদের আনন্দ। সেই আনন্দেই জন আমায় বার বার অনুরোধ করতে লাগল, আরে এক পাত্র খেয়েই দেখ না ভালই লাগবে। তার ওপর দামে যা শস্তা। সে কিন্তু একের পর এক করে হুইস্কি—সোডার অর্ডার দিয়ে চলেছে। আর বলছে আঃ কি আরাম এখনও বে'চে আছি।

কথায় কথায় আড়াই ঘণ্টা কেটে গেল। ভারতবর্ষ ত্যাগ করে কখন যে পাকিস্তানে পে'ছেচি তা মালুম হয়নি। করাচিতে নেমে দেখি অবাক কাণ্ড। কোথায় কলকাতার বর্ষা প্যাচপেচে গরম। করাচির শুকনো গরমে পোষাকের আর্দ্রতা শুকিয়ে গেল। বছর দশেক আগে করাচির বিমান বন্দরে একবার নেমেছিলাম শেষ বারের মতন। তখন সবে মাত্র মার্শাল আয়ুব খানের রাজত্ব শুরু হয়েছে। দশ বছর পর করাচি বিমান বন্দরে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সেটা লক্ষ্য করার মতন। যে কোনো ইউরোপীয় বিমান বন্দরের অট্টালিকার মতনই অতি আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে সুসজ্জিত। সবটাই প্রায় এয়ার-কণ্ডিশাণ্ড। দোকান-পাট সব ফিটফাট। দেখে ভালই লাগল। কলকাতা বিমান বন্দরের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ইউরোপের কোনো মফস্বল শহরের বিমান বন্দর কলকাতা বিমান বন্দরের অট্টালিকার চেয়ে অনেক সুদৃশ্য। সে বিষয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে পারবে না। থাকুগে কলকাতা। রাজধানী দিল্লীর বিমান বন্দরটা এখনও অভিজাত বা ভদ্রলোকের পাতে দেবার মতন হল না কেন? দিল্লীর চোখের মণি বম্বের বিমান বন্দর কিন্তু করাচির চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়। বরং অনেক নিকৃষ্ট। ইউরোপীয়দের কাছ থেকে যখন আমরা কিছুই শিখলাম না, তখন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে অন্তত কিছু শিখতে পারি।

করাচি থেকে দাহারাণ পে'ছিবার পথে বেশ ঝিমুনি আসছিল। দাহারাণে মাত্র পনর মিনিট থামে আমাদের বিমান। কেউ নামল না বরং উঠল গোটা আটেক প্রাণী। অধিকাংশই আরব। তারা যাচ্ছিল কাইরোতে। দুজন আমেরিকান। দাহারাণে পেট্রল খনি। আমেরিকানরাই কর্তাগিরি করে। তাছাড়া এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে আমেরিকান সামরিক ছাউনি। আমাদের সীটের পাশেই এসে বসল এক ঢ্যাঙ্গা আমেরিকান। প্লেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এয়ার হোস্টেসকে হুকুম করল এক গেলাস হুইস্কি দিতে। রাত তখন দেড়টা। এক গেলাস হুইস্কি শেষ করে ঢ্যাঙ্গা আমেরিকান উসখুস করতে লাগল। আঃ কি গরম। আবার এয়ার হোস্টেসকে ডেকে এক বোতল ঠাণ্ডা বিয়ার দিতে অনুরোধ জানাল। গায়ে পড়ে আমাকে জানাল, কি শস্তা এদের স্কচ। মাত্র ২০ সেণ্ট। টুয়েণ্টি ডাইমস্। নট্ ইভন এ কোয়ার্টার। হে, ইউ ওয়াণ্ট এ গ্লাস? আমি বল্লাম এই ভর রাতে তুমি খাও বাবা। আমি ঘুমোই।

বিমানে যে হুইস্কি এত শস্তা তা ওর জানা ছিল না। তাই শস্তা বলেই সে আরও গোটা চারেক হুইস্কির অর্ডার দিল। আমি বাংলায় বল্লাম, খাও বাপু খেয়ে নাও। প্লেনটা চিৎপটাং হয়ে মাটিতে না পড়ার আগে যত পারো খেয়ে যাও। সাধ মেটাও। আমার বাংলা শুনে ঢ্যাঙ্গা আমেরিকান আমতা আমতা করে বলল তুমি আরবি ভাষায় আমায় গালাগালি দিচ্ছ না তো। আমি বললাম, আরে রাম রাম, গাল দোব কেন। বললাম, প্রাণ ভরে খাও। আমরা যখন এক প্লেনে যাচ্ছি, কখন কি হয় বলা যায় না তো। আমার কথায় সায় দিয়ে ঢ্যাঙ্গা আমেরিকান জানায়, ওঃ দ্যাট্স্। তাই বল। গড় গড় করে সে বলে চলল, আমার ডাক নাম হার্বার্ট, সংক্ষেপে হার্ব। ক্যালেফোর্ণিয়ার সমুদ্র-পকুলের কোস্ট গার্ড। সামরিক বাহিনীতে কাজ করি। এক কালে বিমান চালাতাম। এখনও দরকার হলে চালাই। জানো? এই দাহারাণের কাছে মরুভূমিতে বেশ ছিলাম। বললে ছুটিতে দেশে যাও। ঘর সংসার দেখ গিয়ে। আমার আবার ঘর-সংসার কি? এর মধ্যে হার্ব এর গোটা ছয়েক হুইস্কি ও এক বোতল বিয়ার পান শেষ হয়েছে।

ইউ নো বয়। আমার পেনসিলভেনিয়ার জঙ্গলে যেতে ভাল লাগে না। সেখানে গেলেই এক দঙ্গল আত্মীয় ঘিরে ধরবে। খালি জিজ্ঞাসা করবে কেমন আছি। কেমন লাগছে। কতদিন থাকব। এই সব

বিক্ষোভকারী জার্মান ছাত্রদল

পিত্তি জ্বালান প্রশ্ন। ওসব ভাল লাগে না। সেই পুরোনো মুখ দেখব। দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। তার চেয়ে মন্দ ছিলাম না এখানকার সামরিক ছাউনিতে। কাজকর্ম কম। খেতাম-দেতাম আর সামরিক ছাউনির পাশে আমাদের জন্যে বিশেষভাবে পোষা এক দঙ্গল মেয়েদের বাজার ছিল। হ্যাঁ, বাজারই বটে। সব দেশের মেয়ে পাওয়া যেত সে বাজারে। তাদের দরও বাজার বুঝে। দেড়শ ডলার মাইনের অর্ধেকটা ওখানে খরচ করতাম। বেশ সুখে ছিলাম। এখন যাও বাড়ী যায়। ঢ্যাঙ্গা হার্ব-এর বক-বকানিতে বিরক্ত হয়ে তার দেশের লোক জন এয়ার হোস্টেসকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল ফার্স্ট ক্লাসে কোনো সীট খালি আছে কিনা। নেই শুনে পেছনের দিকে তাকাতে লাগল যদি কোথাও একটা খালি সীট থাকে। বোধ হয় কোথাও একটা খালি সীট লুকিয়ে ছিল। সন্ধান পেয়েই জন সেখানে উধাও হয়ে গেল।

আজ্ঞা মাতালের পাল্লায় পড়া গেল। বকর বকর করে এবার আমেরিকানদের শ্রাদ্ধ শুরু করে দিল। আমি ওর কথায় কান দিচ্ছি না জেনে ও আমায় জিজ্ঞাসা করল আমি ইংরেজী জানি কিনা। আমি জানালাম, অল্প জানি। ও বলল, দ্যাটস অল। এ লিটল। তাতেই চলবে। আমি দেখলাম এক্ষেত্রে মাতালের বকর বকর শোনার চেয়ে বোকা বনলে তবে রেহাই। নইলে অনেক কষ্ট। আমাকে নাক ডাকাতে দেখে ও বার-এর দিকে এগুলো। শুনলাম সেখানে গিয়েই ঢ্যাঙ্গা হার্ব গোটা পাঁচেক হুইস্কি আবার নিয়েছে। খানিক বাদে আমার পাশে এসে বসে আবার বলতে শুরু করল—জানো এই কাইরোর ওপর দিয়ে কতবার উড়ে গেছি কিন্তু কখনো নামিনি। এবার তো নামছি কিন্তু ব্যাটারা শহর দেখতে দেবে না। আমি কোনো উত্তর না দিয়ে বেল্ট বাঁধলাম। নামতে হবে কাইরোতে। রাত তখন তিনটে কি চারটে হবে ঢ্যাঙ্গাটা সীটেই বসে রইল। আমি, জন, জো সবাই মিলে কাইরোর এয়ার পোর্টে নেমে টুকিটাকি সব জিনিস কিনলাম। কাইরোর এয়ার পোর্ট অনেকবার নেমেছি-উঠেছি। বছর কয়েক আগে কাইরোতে ছিলাম মাত্র বারদিন। কাইরো আমার ভাল লাগে। লোকগুলোর চেহারায় দিশি দিশি ভাব। কিন্তু শহরটা ইউরোপীয় ধাঁচের। কাইরো এয়ার পোর্টটা সব সময়েই বেশ জমজমাট। কত দেশের যে প্লেন ঘণ্টায় কতবার নামে ওঠে তার হিসেব নেই। এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপের বিমান-গুলোর একটা বড় জংশন।

প্লেনে উঠে দেখি ঢ্যাঙ্গা হার্ব বার-এ বসে। হুইস্কি গিলছে ওই রাত চারটায়। প্লেন ছেড়ে দিলে একজন এয়ার হোস্টেস আর এক স্টিউয়ার্ড ঢ্যাঙ্গাকে ধরে এনে সীটে বসিয়ে দিল। আমি তখন ঘুমের ভান করে নাক ডাকছি। নইলে ওর কথার চপেটাঘাতে আমায় অতিষ্ঠ হতে হত। ঘণ্টা দেড়েক বাদে দেখি ও ব্যাটা ঢুলছে। সেই ফাঁকে আমি একটা সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করতেই ঢ্যাঙ্গা আমায় বলে উঠল এবার আমরা নামব কোথায়? আমি জানালাম, রোমে। অ্যাঃ রোমে। রোম আমি দেখিনি। আমি বললাম, রোম আমি অনেকবার দেখেছি। ও তাই নাকি। তবে রোমে নাম। আমায় রোমটা ভাই দেখিয়ে দেও। কেমন শহর রোম? আমি বললাম, খুব সুন্দর। ও তাহলে রোমের জন্য কিছু পান করা যাক। তক্ষুনি সে হুকুম করল এয়ার হোস্টেসকে, হুইস্কি লে-আও। এয়ার হোস্টেস জানায় যে এখন আর না খেলেই ভাল হত। রেগে জানায় হার্ব, ভাল হবে কি মন্দ হবে তাতে তোমার কি? আমি পয়সা দিয়ে খাব। লে-আও বলছি। নইলে ভাল হবে না। অগত্যা তাকে আরও গেলাস দিয়ে গেল।

রোমে বিমান থামল সাড়ে ছটায়। আমরা নামলাম। ঢ্যাঙ্গা আমেরিকান সীটে বসে ঝিমুচ্ছে তখন। রোম থেকে ফ্রাঙ্ক-ফুর্টের পথে চলেছি। এক দঙ্গল ইতালিয়ান এসে বসল আমাদের আশে-

পাশে। জন সেই ফাঁকে অন্যত্র সীট বেছে নিয়েছে। আমাকে দেখে হার্ব জিজ্ঞাসা করল এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমি জানালাম, ফ্রাঙ্কফুর্টে। অ্যাঁ ফ্রাঙ্কফুর্টে? আমি যুদ্ধের পরে ওখানে ছিলাম এক বছর আমেরিকান সামরিক ছাউনিতে। আমার কথাটা সত্যি কিনা পরখ করার জন্যে পাশের ইতালিয়ানটাকে জিজ্ঞাসা করল। ইতালিয়ানগুলো তখন জার্মান এয়ার হোস্টেসের রূপের সৌন্দর্য চর্চা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। জার্মান এয়ার হোস্টেসের পা নাকি তাদের খুব মনের মতন। ইউরোপে কিন্তু মেয়েদের সরু পা সৌন্দর্যের পরিমাপে ভাল বলে পুরুষরা মনে করে। অবশ্য দেহের অন্য অংশগুলো তাই বলে বাদ যায় না। হার্ব এর মাতলাম ভাব দেখে ওরা স্রেফ ইতালিয়ান ভাষায় অকথ্য গাল দিতে শুরু করে দিয়েছে। বলছে, চুলোয় যেতে চাস যা না। আমাদের জ্বালাতন করিস কেন।

ইতালিয়ানদের কাছ থেকে সহানুভূতি না পেয়ে আবার আমার কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করতে শুরু করল হার্ব। ভাই আমায় ফ্রাঙ্কফুর্টে থাকবার ব্যবস্থা করে দেবে। আমার কাছে এখনও দেড়শ ডলার আছে। দিন দুই থাকব। চাই কি ভাল মেয়ে পেলে একদিনেই দেড়শ ডলার দিয়ে দেব। জানো অনেককাল আগে ইংগ্রিড বলে এক বান্ধবী ছিল ফ্রাঙ্কফুর্টে। তাকে আমি আর্মি র‍্যাশনের খাবার-দাবার দিয়ে দিতাম। সে আমার খুব যত্ন করত। একবার নামতে দিলে ফ্রাঙ্কফুর্ট খুঁজে ইংগ্রিডকে বার করতামই। ওর কথায় সহানুভূতি জানিয়ে বললাম, বেশ তো তোমায় পাশপোর্ট থাকলে আর ভিসা থাকলে যতদিন খুশি থাকতে পারবে। অ্যাঁ ভিসা লাগবে। আমার যে পাশপোর্ট নেই।

আমি জানাই, পাশপোর্ট নেই তবে তুমি বিদেশে এলে কি করে?—এই দেখ আমার মিলিটারি আইডেন্টিটি কার্ড। এটাই তো আমার সম্বল। আমাদের কোস্টাল গার্ডদের ওরা পাশপোর্ট দেয় না। দাও না ভাই একটা ব্যবস্থা করে। একটা ভিসা জোগাড় করে দাও না।

আমি দেখলাম মাতালের যে অবস্থা হয়েছে তাতে ও নামবে কি করে। ফ্রাঙ্ক-ফুর্ট নামবার আগে হার্ব আরেকবার আমার অনুরোধ করল যাতে তাকে ফ্রাঙ্কফুর্ট দেখার ব্যবস্থা করতে পারি। আমি বললাম যে, তোমার তো আমেরিকা যাবার প্লেন ধরতে হবে। ঢ্যাঙ্গা হার্ব এবার কেঁদে ফেলল ঝর-ঝর করে। আমি পেনসিলভেনিয়া যেতে চাই না। আমি ফ্রাঙ্কফুর্টে ইংগ্রিডকে খুঁজব। দেড়শ ডলার দিয়ে একরাত স্ফূর্তি করব। আমেরিকা গেলে আবার সেই মিলিটারি জীবন শুরু। আর ভাল লাগে না, বলে কোঁকাতে লাগল। আমি দেখলাম নেশা বেশ জমেছে ওর। লুফটহানসা কোম্পানী ওর একটা ব্যবস্থা করবে। সেই ভরসায় ফ্রাঙ্কফুর্টে নেমে মালপত্তর খালাস করে ট্যাক্সির খোঁজে ছুটলাম।

বিমান বন্দর থেকে শহরের দিকে এগুচ্ছি আর দেখছি মুশলধারায় বৃষ্টি আমাদের দিকে তেড়ে আসছে। আমি মনে মনে বলছি, এক বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাব বলে কলকাতা ছাড়লাম, এবার ফ্রাঙ্ক-ফুর্টের বৃষ্টি আমার বৃষ্টির ওপর বিরক্তি আরও বাড়িয়ে দিল। ট্যাক্সি ড্রাইভার বলে, গতকাল কি সুন্দর রোদ্দুর উঠেছিল। যেন গ্রীষ্মকাল। আজ যেন হঠাৎ মেঘটা ঘোলাটে হয়ে গেল সকালে। বৃষ্টি হওয়া ভাল নইলে ফসল হবে কেমন করে।

মিনিট পনরর মধ্যে হোটেলে এসে গেলাম। এদেরও 'অটোবান' আছে যার সবার নাম আমাদের কলকাতায় ভি আই পি রোড। আমাদের ভি আই পি রোডের কথা না বলাই ভাল। অটোবান-এ গাড়ীর গতি কম করে ঘন্টায় একশ কিলোমিটার। কেউ কেউ দেড়শ কিলোমিটার গতিতেও চালায়। সিমেন্টের রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে গাড়ী চালাবার জন্যে। ঠেলাগাড়ী, বা গরুগাড়ীর জন্যে নয়। আমাদের হল ডেমোক্রেসীর রাজত্ব, পাঁচশ বছরের পুরোনো মোটরগাড়ীর পাশে পাশে গণতন্ত্র বজায় রেখে চলে গরুর গাড়ী, ঠেলাগাড়ী, রিক্সা, সাইকেল ইত্যাদি। এ দৃশ্য শুধু কলকাতাতে দেখা যাবে। অন্য কোথাও নয় (জার্মানীর অটোবান কয়েক গজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমস্ত জার্মানী জুড়ে হাজার বিশ কিলোমিটার। জার্মানীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিমেষের মধ্যে গাড়ী হাঁকিয়ে পোঁছন যায়। গরুর গাড়ী ঠ্যালা-গাড়ীর ঝামেলা নেই।

ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমান বন্দরে আমাকে বছরে দু-তিনবার নামতে উঠতে হয়। ফ্রাঙ্কফুর্টের ঐশ্বর্য কত বেড়েছে, গগন-চুম্বী অট্টালিকার সে সব হিসেব দিতে এবার আমি রাজি নই। ফ্রাঙ্কফুর্ট আমার পরিচিত শহর। কাজের জন্যে অনেকবার এই শহরে আসতে হয়েছে। যাকগে। হোটেলে পোঁছে হাত-মুখ ধুয়ে আমার এক পুরোন সাংবাদিক বন্ধুকে টেলিফোন করলাম। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে নারী কণ্ঠ ভেসে এলো। বুঝলাম বন্ধু স্ত্রী হেলগা। কোনো ভূমিকা না করে নিজের ডাকনামটা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তার স্বামীবাবু, হার হান্স কি ঘুমোচ্ছে না জার্মান ছাত্র বিপ্লবের আগুনে হাত গরম করছে? অবধারিত জার্মান উচ্চারণ করল সে, আখ্ জো, ওঃ বিপ্লব। আমি বললাম, হ্যাঁ তোমাদের ছাত্র বিপ্লব দেখতে এসেছি। তুমি দয়া করে হান্সকে ডেকে দাও। হান্স টেলিফোনে এলো। কোনো ভনিতা না করে বলল, সন্ধ্যেবেলায় রেস্তোঁরায় আড্ডা মারতে মারতে বিপ্লবের হিসেব শুনবে। আমি বললাম, তাই সই। তোমার অফিস থেকে টেনে নিয়ে আসব। আচ্ছা তাই। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে উত্তর এলো।

ফ্রাঙ্কফুর্টে সেদিন ছুটির দিন। দোকানপাট-অফিস প্রায় সবই বন্ধ। খাওয়া সেরে বিশ্রামের পর ফ্রাঙ্কফুর্টের চৌরঙ্গি-পার্ক স্ট্রীট কাইজার স্ট্রাস দিয়ে হাঁটছি। হিন্দিভাষী দেশওয়ালি ভাই নিজে যেচে আলাপ জুড়ে দিল। কবে এসেছি, কতদিন থাকব ইত্যাদি। জিনিসপত্র কিনতে হলে অমুক দোকানে যেও সস্তায় পাবে। এক কাইজার স্ট্রাসের ওপরে ওপাশে গোটা তিনেক ভারতীয় দোকান রয়েছে। একটি পাকিস্তানী। সস্তার নামে এরা ভারতীয় ট্যুরিস্টদের গলা কাটে। বিদেশে ভারতীয় দেখলে কার না সহানুভূতি বাড়ে। কিন্তু এই সব ভারতীয় দোকানদাররা সহানুভূতির সুযোগ নিয়ে বাজে ব্যবসা পেতে থাকে।

ছুটি-অ-ছুটির দিনে সংবাদপত্র অফিস কোনো দেশেই বন্ধ থাকে না। যেমন থাকে না শ্মশানঘাট। টেলিপ্রিন্টার মেসিনের খটাখট আওয়াজ কখনো স্তব্ধ হয় না। হয় না তার পাশে ঘুরে বেড়ান সাংবাদিকদের। সেই ছুটির দিন 'ফ্রাঙ্ক-ফুর্টের রুন্ডশাউ' খবরের কাগজের অফিসে হানা দিয়ে সাংবাদিক বন্ধু হান্সকে পাকড়াও করলাম। 'নিউজ ডেস্ক'এর কর্মরত সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল হান্স। এক ছোকরা সাংবাদিক বলে উঠল, গত একশ বছরে জার্মানীতে চার-চারটে মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে। যুদ্ধগুলো তো এক-একটা বিপ্লব। সে যুদ্ধ ও বিপ্লব জার্মান সমাজে ঘটেছে কত পরি-বর্তন। তাছাড়া জার্মান দার্শনিকরা তো চিরকালই বিপ্লব দর্শন রপ্তানি করেছে। দেখ না কার্ল মার্ক্স। এক মার্কস-এঙ্গেলস জগতে আধভাগেই বিপ্লব ঘটিয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে জার্মানীতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। জার্মানীর একটা অংশ তো আজ কমুনিস্ট। বাকীটাতে তরুণ সমাজ সন্তুষ্ট নয়। তারা পুরোনো চিন্তাধারা, পুরোনো সমাজের শাসন ভাঙতে চায়। তারই অগ্রদূত একালের চিন্তাশীল ছাত্র সমাজ। খবরের কাগজের অফিসে আর কি বিপ্লব দেখবে। বরং কাল বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করে এসো। শুনে এসো তাদের কথা।

কথায় কথা বাড়ছিল। সেই স[illegible] বেলাও বেড়ে যায়। হান্সকে টেনে অফিস-পাড়ার এক রেস্তোঁরায় এনে হাজির করলাম। রেস্তোঁরায় আড্ডা আরও ভাল জমবে যদি হেলগা ওরফে হান্স পত্নী এসে আমাদের আড্ডায় যোগ দেয়। হেলগাকে টেলিফোনে নেমন্তন্ন জানালাম। সে বললে পনর মিনিটের মধ্যে আসছি। আমরা রেস্তোঁরায় পনর মিনিটের জায়গায় প'য়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষায় ছিলাম। হেলগার কোনো পাত্তা নেই।

আমাদের আলোচনা চলছিল জার্মান ছাত্রদের ধর্মঘট নিয়ে। হান্স বলল যে, ১৯৪৯ সালের পর থেকে জার্মানীতে শ্রমিক ধর্মঘট হয়নি বললেই হয়। গত বছর থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট শুরু করে। তবে নিয়মিত নয়। মাঝে মাঝে হয়েছে দু-এক দিনের জন্যে! কখনো ভিয়েৎনাম, কখনো বা শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে। আমাদের গভীর আলোচনায় আকৃষ্ট হয়ে পাশের টেবিলের

দুই ভদ্রলোক নিজে থেকেই আলোচনায় যোগ দিল। দুজনই যুবক। বয়স ত্রিশের কোঠায়। দুজনেই ব্যাঙ্কের চাকুরে। একজন তো ফেটে পড়ল। আরে মশাই রাখুন ছাত্র বিপ্লব। বছর পাঁচেক আগেও তো আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম! ছাত্রাবস্থায় সবাই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পাশটাশ করে চাকরি পেলে সব বিপ্লব ভুলে যায়। তবে এখনকার ছাত্ররা একটু বেশী বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে। এরা কম্যুনিস্টদেরও অধম। এদের এক কথা ভিয়েৎনামে শান্তি আন, দুনিয়ার ছাত্রদল এক হও। এক হও বললেই কি এক হয়? যত নষ্টের গোড়া ওই বার্লিনের ছাত্ররা। ওরাই প্রথম অসন্তোষ আন্দোলন শুরু করে। পাশেই রয়েছে কম্যুনিস্ট সরকার। তারাই ইন্ধন জোগায়।

আমাদের আলোচনায় উত্তাপ বেড়েই চলেছিল। তার ওপর সন্ধে থেকে বেশ গরম পড়ছিল। ঠান্ডা বিয়ারে চুমুক দিয়ে আরাম। কিন্তু পেটে গেলে শরীরটাকে গরম করে। গরমে আরও গরম বাড়ে। বন্ধু পত্নী হেলগা ততক্ষণে এসে উপস্থিত। কোথায় গাড়ীর ভিড়ে ওর গাড়ী আটকে গিয়েছিল ইত্যাদি বলে সে মাফ চাইল। আমরা বুঝলাম তার সাজগোছ করতেই সময় কাবার হয়েছে। ডিনার সেরে হেলগা প্রস্তাব করল, চল যাই রাত্রির ফ্রাংকফুর্ট দেখি গিয়ে। অমন সু-প্রস্তাবে কে না রাজি হয়। বড় রাস্তার অপর প্রান্তে ছোট

রাস্তা মোজেল স্ট্রাস ধরে এগুচ্ছি, কিছু দূর এদিকে যা চোখে পড়ল, তা ভুলবার নয়। দেখি দুটো মেয়ে হন হন করে ছুটছে। তাদের দিকে একজন পথচারী তাকিয়ে আছে। কয়েকটা গাড়ীর চালক হর্ণ দিচ্ছে। একটি মেয়ের দেহে মিনি স্কার্টের ছোট্ট পোষাক। ঠিক টপলেস নয় তবে শুকের কাছে অর্ধেক কাটা জামা আর স্কার্টটা কোমর থেকে সামান্য নিচে নেমেছে। এই পোষাকের অধিকারিণী তার ওপর স্বয়ংসম্পূর্ণ সুন্দরী। তার সঙ্গীটি কিন্তু পুরো পোষাকে। এক পথচারী বলছিল এই রকম পোষাক পরে বেরুলে কার না উত্তেজনা বাড়ে। আর উত্তেজনার মাথায় একটা কেলেঙ্কারি করলে তার জন্যে দায়ী কে। আমার বন্ধু কিন্তু দার্শনিকের মতন মন্তব্য করল, "এরই নাম ক্রুদ্ধ তরুণ সমাজ। বুড়োদের রাস্তায় সনাতন নীতি ভাঙবে বলেই এই সব তরুণীরা আজ যেমন খুশি পোষাক পরে রাস্তায় বেরোয়। আমার মনে হয় এরা দুজনে বাজি ধরে বেরিয়েছে। হয়ত কোনো পার্টিতে যাচ্ছে।" "বন্ধু পশ্চী হেলগা কিন্তু নাক সিঁটকায়।

অমন সুদৃশ্য দেখার পর আমরা এলবে স্ট্রাসে এসে পৌঁছেচি। এপাড়ায় শুধু নাইট ক্লাব, ক্যাবারে আর কাফেতে ভর্তি। যেন প্যারিসের পিগাল পাড়া। নাইট ক্লাবের সামনে ফুটপাথে পায়চারি করছে একদল মেয়ে। এরা খদ্দের খুঁজছে। কাফেতেও তাই। বিচ্ছিন্নভাবে বসে আছে খদ্দেরের আশায় বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা। এদের নিয়েই ফ্রাঙ্ক-ফুর্টের নৈশ জীবন। এদের বেশীর ভাগ খদ্দের হল বিদেশী ট্যুরিস্ট আর আমেরিকান সৈনিক।

পরের দিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় পৌঁছে দেখি দলে দলে ছাত্র-ছাত্রী চলেছে পোর্টফোলিও ব্যাগ নিয়ে। এদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম ছাত্র ইউ-নিয়নের অফিসটা কোথায়। ছেলেটা বলল, সার আমি তো এই সবে ঢুকেছি। এখনও ইউনিয়নে মেম্বার হইনি। ওদের অফিস কোথায় তা ত জানি না। তবে চলুন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানাব। পথে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম ছাত্রটি কি বিষয়ে পড়ে ইত্যাদি। অঙ্কের প্রথম বার্ষিকী ছাত্র। নাম তার রলফ।

জানেন জার্মানীতে বিপ্লব-টিপ্লব হবে না। আমরা যদিও চাই। তবে হ্যাঁ শিক্ষাজগতে সংস্কার না হলে একটা অঘটন ঘটবে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। শুধু আমাদের ছাত্র বলে উপেক্ষা করা চলবে না। আমাদের অনেকেই রাজনীতি চর্চা বা সক্রিয়ভাবে কোনো দলে কাজ করে না বটে কিন্তু তাই বলে নিশ্চেষ্ট নয়। আমরা কম্যুনিস্ট দলের বিরুদ্ধে, কিন্তু আমরা চাই পশ্চিম জার্মানীতে কম্যুনিস্ট দলকে আইনসঙ্গতভাবে কাজ করতে দেওয়া হোক। এখনকার সোস্যালিস্ট আর ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট দলের কোনো মূল পার্থক্য নেই। দুই দলেরই প্রায় এক নীতি। আমরা সুষ্ঠু গণতন্ত্র। গণতন্ত্র উপভোগ করতে হলে বিরোধী দলের সমালোচনা চাই। নইলে গণতন্ত্র সার্থক হয় না। জার্মান জনসাধারণ বিপ্লব চায় না। তবে আমরা এটা ভাল করে বুঝিয়ে দেব, যুদ্ধের জন্যে, সামরিক বাহিনীর জন্যে অত অর্থ ব্যয় না করে সে অর্থ শিক্ষা সংস্কার ও সংস্কৃতিতে ব্যয় করা উচিত।

রলফের কথা শুনতে শুনতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রধান অট্টালিকার সামনে এসে হাজির হয়েছি। আমাদের খোঁজাখুঁজিতে একটি ছাত্রী এগিয়ে এলো। জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের কি সাহায্য করতে পারি। আমরা বললাম, ছাত্র ইউনিয়ন অফিস খুঁজছি। ও। ছাত্র-বিপ্লব দেখতে এসেছেন। চলুন, দেখি নেতারা এখানে আছে কিনা। ছাত্রীটি তার এক ছাত্র বন্ধুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল যে, ছাত্র-নেতাদের সাক্ষাৎ এখন মিলবে কিনা।

রলফ বললে, তার ক্লাস এখনই শুরু হবে, সুতরাং আজকের মতন তাকে ছাড়তে হবে। সে বিদায় নিয়ে চলে যেতেই ছাত্রীটি আমাকে তার বন্ধুসহ নিয়ে চলল সামনের একটি কাফেতে।

ওখানে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল কোনো নেতা নেই। তারা অফিসে। আমরা আপা-তত কাফেতে বসে গল্পগুজব জমাতে শুরু করলাম। আলাপ-পরিচয়ে জানলাম ছাত্রীটির নাম ডরিস, ধনবিজ্ঞানের চতুর্থ বার্ষিকী ছাত্রী, আর তার বন্ধুর নাম সিগফ্রিড, সেও ধনবিজ্ঞানের ছাত্র।

ডরিস বলছিল, জার্মান ছাত্ররা আজ হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের আগে হিটলারী শাসনে তারা যেমন সন্তুষ্ট ছিল না, তেমনি যুদ্ধের পরে গতানুগতিক জীবনধারণে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। একালের ছাত্ররা ছোট্ট শিশুটি নয়। তারাও আন্তর্জাতিক রাজ-নীতি বোঝে ভাল। জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয় জগতে পরিবর্তন আসা উচিত। অধ্যাপকরা এক-একটি অটোক্র্যাট। তাদের কড়া শাসন-নীতির অবসান চাই। আর তাছাড়া জার্মানীতে কোনো সরকার-বিরোধী পার্টি বলে কোনো বামপন্থী দল নেই। একালের ক্রুদ্ধ জার্মান ছাত্ররাই সরকার-বিরোধী। আমাদের শুধু বালখিল্য আন্দোলন বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। সমাজে আমরাও স্বীকৃতি চাই। এই দেখুন না হিটলারের আমলে জার্মান মেয়েদের দাবিয়ে রাখা হত। যুদ্ধের পরে জার্মান মেয়েরা অনেক স্বাধীন। আর এখনকার ছাত্রী সমাজের তো কথাই নেই। পুরোনো সামাজিক আইন-কানুন আমরা ভাঙবোই-ভাঙবো।

ডরিসের বক্তৃতা শুনতে আমার ভালই লাগছিল, কিন্তু এদিকে সময় উতরে যাচ্ছে বলে তাগাদা দিলাম ছাত্র ইউনিয়ন অফিস হানা দিতে হবে বলে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশী দূরে নয়। ইজিপ্ট স্ট্রাসের একটি বাড়ী চারতলায় এস ডি এস (সোস্যালিস্টার ডয়শের স্টুডেন্টস্ বুন্ড) ছাত্র ইউনিয়ন অফিস। অফিসে চারটে ঘর। চারধারে খাতাপত্র, বই, হ্যান্ডবিলে ছড়ান। দেয়ালে বড় বড় পোস্টার ছবি ট্রটস্কি ও চে গুয়েভে-রার। টেবিলে বসে যারা কাজ করছিল, তাদের জামায় ঝুলানো ট্রটস্কির ব্যাজ। এদের একজন বলল, চলুন, সামনের কাফেতে বসে কথা বলা যাবে। এখানে আলোচনা করতে বসলে আমার সহকর্মীদের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে।

যে-কাফেতে ঢুকলাম, সেখানে লম্বা চুলওয়ালা আরও কয়েকজনকে দেখলাম। চেহারায় বোঝা যায় যে, তারা বামপন্থী-বিদ্রোহী ছাত্রের দল। ছাত্র-নেতা পিটার বলছিল যে, তাদের এস ডি এস ছাত্র ইউ-নিয়ন এখন জার্মানীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী ছাত্র-সংস্থা। সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে বটে ১৯৫২ সালে, তবে ১৯৬০ সালে ওদের সঙ্গে রাজনৈতিক বনিবনা না হওয়ায় তারা স্বাধীন ছাত্র-সংস্থা গঠন করে। ১৯৬২ সাল থেকে এটি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এস ডি এস মনে করে যে, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা বামপন্থী নয়। তারা ছাত্রদের জন্যে বিশেষ কিছু করতে রাজী নয়। জার্মানীর শিক্ষাব্যবস্থায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কার করতে হলে ছাত্রদের বাদ দিয়ে করা চলবে না। এস ডি এস তাদের হয়ে আলোচনা চালিয়ে যাবে। রাজ-নীতিতে তারা কম্যুনিস্ট পার্টি বিরোধী, কিন্তু ভিয়েৎনামে আমেরিকানদের হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না। তারা চায় সহ-অবস্থান নীতি। জার্মানীতে সোস্যালিস্ট সমাজ গড়তে ছাত্রসমাজ এগিয়ে আসবে এবং তার জন্যে প্রয়োজন হলে তারা বিপ্লবের পথে এগুতেও পেছপা হবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাদের বিপ্লব কবে শুরু হবে এবং কবেই বা সার্থক হবে। উত্তরে পিটার বলে, হয় ছ' মাসে নয় ছ' বছরে, নইলে আরও বিশ বছর অপেক্ষা করব। তবে বিপ্লব হবেই এবং জার্মানীর পরিবর্তন হবেই। সংগ্রাম আমরা চালিয়ে যাব। জার্মানীর এস ডি এস ইউনিয়নের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করেছে প্যারিসের ছাত্ররা। তারা কৃতকার্যও হয়েছে। জার্মান ছাত্ররা শুধু অর্থনৈতিক বা সমাজনৈতিক পরিবর্তনই চায় না, তারা বিশ্বের যেখানে যেখানে দারিদ্র্য-বুভুক্ষা রয়েছে, তাদেরও সাহায্য করতে এগিয়ে যাবে।

ওদের কথায় বুঝলাম ওরা আদর্শবাদী। ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা চোদ্দ হাজার কিন্তু এস ডি এস ইউনিয়নের সদস্য-সংখ্যা মাত্র চার হাজার। জার্মানীর বিভিন্ন প্রদেশে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-বিক্ষোভ, আন্দোলন দেখা দিয়েছে, তার সবটাই এই ছাত্রসংস্থা সংগঠন করেছে। জার্মান সরকার এ-বিষয়ে খুবই চিন্তিত। কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র মন্তব্যে বলেছে যে, এরই কি নাম জার্মান বিপ্লব? জার্মান ছাত্ররা কোনো অঘটন ঘটালে আমরা বিস্মিত হব না। সেই ছাত্রবিপ্লবের সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের ছাত্রসংস্থার যোগাযোগ রয়েছে। সুতরাং তার পরিণতি ইউরোপ জুড়ে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

উৎখনন

ক্রীস্টোফার ঈশারউড এ-যুগের একজন বিদগ্ধ মনীষী। তিনি যে-দেশের মানুষ, সে-দেশ অধ্যাত্ম-জগতের প্রতি তেমন আগ্রহশীল নয়। জড়বাদী সেই পরিবেশ বিজ্ঞানকেই ঈশ্বর জ্ঞান করে। তত্ত্বজ্ঞান সেখানে অন্বিষ্ট নয়। ভক্তিবাদের চেয়ে যুক্তিবাদ সেই জগতে সহজগ্রাহ্য। ঈশারউড ত্রিশের দশকের অ্যাংরি ইয়ং ম্যান দলভুক্ত। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অডেন, স্পেনডার, আলডুস হাকস্‌লী প্রভৃতির নাম বিশ্বখ্যাত।

যে ঈশারউড সেইকালে ফ্রয়েডকে নতুন যুগের ত্রাণকর্তা বলে ঘোষণা করেছিলেন, তিনিই ধর্মকে বিশ্বাস করে বলেছেন—ধর্ম ধার্মিকদের রক্ষা করে, একমাত্র ধর্ম—

"Can make life livable and supremely significant by translating it into terms of a timeless, transcending Meaning."

ধর্ম জীবনকে বাঁচার যোগ্য করে তোলে। অনন্তের পথে অতীন্দ্রিয় অর্থময় হয়ে ওঠে। বোধির সন্ধানে ঈশারউড যে পরিক্রমা শুরু করেছিলেন দীর্ঘকাল আগে—ধীরে ধীরে সেই পথ অতিক্রম করে তিনি বর্তমানে একটি স্তরে উপনীত হয়েছেন।

আত্মজীবনীর মাধ্যমে লেখকরা তাঁদের অতীতের মূল্যায়ন চেষ্টা করেন, যে-অতীত একটা সংহত সচেতনত্বের পথে জীবনকে অগ্রসর করে নিয়ে এসেছে, সেই জীবনের অভিজ্ঞতার কথাই এই গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। ক্রীস্টোফার ঈশারউডের 'এক্‌সহিউমেশান' নামক সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থটি সংসিদ্ধি বা পূর্ণতার পথে পৌঁছানোর পিছনে যে-সংগ্রাম তারই ইতিহাস। সুসমঞ্জস বা 'বিকমিং' নিরন্তর 'বিং' বা সত্তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সাধনা করে।

ঈশারউডের এই সংকলন গ্রন্থে কয়েকটি গল্প, সমালোচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি যা গত চল্লিশ বছর ধরে লিখিত হয়েছে, তা সংগৃহীত হয়েছে। লেখকের মতে—

"Just a lot of bits and pieces, fragments of an autobiography, which tells itself indirectly by means of exhibits."

এই সংগ্রহের মধ্যে তাই একজন আস্তিক্যবাদীর জীবনের অগ্রগতির ইতিহাস পাওয়া যাবে। তিনি অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও সাধনার ধারা তাঁর অন্তরকে আকুল করেছে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনে বিশ্বাসী।

এই গ্রন্থ তাই আত্মানুসন্ধানের ইতিহাস। মোক্ষ নয় বোধির সন্ধানে তিনি জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছেন। যে-জগতে আমরা বাস করি, তার ট্রাজেডি সম্পর্কে তিনি সবিশেষ সচেতন। কিন্তু এই সচেতনত্ব তাঁকে হতাশার পথে নামিয়ে নিয়ে যায়নি। এই ট্রাজেডি তাঁকে সংগ্রামের শক্তি দিয়েছে এবং তাঁকে সেই পথের সন্ধান দিয়েছে যে-পথ অতিপ্রাকৃত-সচেতনত্বের দিকে নিয়ে গেছে।

এই কারণে ঈশারউড সাহসকে শ্রদ্ধা করেন, যে-সাহস শুধু শৌর্যমণ্ডিত শুধু তাই নয়, যে-সাহস মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে সহায়তা করে, সেই সাহসও তাঁর শ্রদ্ধার বস্তু। এই সাহস হয়ত তেমন চমকপ্রদ কিছু নয়, হয়ত শৌর্যহীন, কিন্তু এই সাহস—

"Shines most brightly in the midst of weariness, boredom, ill-health, and loneliness."

ঈশারউডের এই কথাগুলি জীবন-সংগ্রামে বিধ্বস্ত যে সাধারণ মানুষ নানা দিক থেকে খঞ্জ তার পক্ষে বিশেষ প্রেরণাদায়ক।

বদ্‌লেয়র, ভ্যান গগ, ক্লাউস হান প্রভৃতি যাঁরা দুঃখভোগ করেছেন, যাঁরা পরিক্রমণ করেছেন নোঙরহীন নৌকার মত নিরুদ্দেশের পথে এবং শেষপর্যন্ত নিজেদের প্রয়োজন এবং রুচিমাফিক একফালি সুখ ও শান্তির ছায়াঘেরা মাটির সন্ধান পেয়েছেন, তাঁরা ঈশারউডের কাছে পরম শ্রদ্ধেয়।

এই সূত্রে ঈশারউড বলেছেন :

—the artist challenges and forces is to re-examine our in-grown habits of perceiving and feeling— I therefore commend the books which give you fresh courage to live your own life and new eyes with which to examine its meaning.

প্রকৃতপক্ষে ঈশারউডের কাছে সমালোচনা এবং আর্ট তখনই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন তা মানুষের নিজস্ব মূল্যায়নে সহায়তা করে এবং নিজস্ব ব্যক্তিসত্তাকে সেই ছাঁচে গড়ে তুলতে পারে।

এই গ্রন্থে ঈশারউডের একটি গল্প আছে 'দি উইসিং ট্রী'। এই গল্পে ঈশারউড কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই তত্ত্বকে সমর্থন করেছেন।

যে-তত্ত্ব অনুসারে বাল্যস্মৃতি মানুষের বাকী জীবনটাকে পরিপুষ্ট করতে পারে।

বাল্যস্মৃতির স্তন্যপান করে বয়স্ক মানব-শিশু বেঁচে থাকতে পারে। 'কল্পতরু' টি কাহিনীটি তাঁর খুড়ো তাঁকে বলেছিলেন। বয়স্ক মানুষের উপকথা, তার ব্যক্তিসত্তার অংশবিশেষ—ঈশারউডের মতে—

"insparably terrible and grand—"

এতস্বারা যে-শক্তি মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার চিত্রকল্প তাঁর মনে জাগ্রত করে। তিনি বলেছেন—

> "It was his father and mother, its roots held the world together, and its branches reached behind the stars. Before the beginning, it had been—and it would be always—"

এই মন্ত্রগুপ্তি হৃদয়ে নিয়ে নায়ক তাঁর প্রজ্ঞায় প্রজ্ঞাবান, তাঁর শক্তিতে শক্তিমান।

সাধুসন্তের মত তিনি পর্যটন করেছেন এবং তার ফলে পৃথিবী তাঁকে 'কিঞ্চিৎ ছিটগ্রস্ত' (ক্রেজি) ঠাউরেছে। কিন্তু এই জ্ঞানই তাঁকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে শৃঙ্খলাশীলতার সমন্বয় সাধনে সামর্থদান করেছে, তিনি বলেছেন—

> "for even as an old man, his heart was still the heart of that little child who stood breathless in the moonlight beneath the great tree, and thrilled with such wonder and awe and love that he utterly forgot to speak his wish."

এই শান্তির সন্ধানেই ঈশারউড স্বামী প্রভবানন্দের প্রভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনে আকৃষ্ট হয়েছেন। মনে হয়, ইতিমধ্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের যে আশ্চর্য জীবনী রচনা করেছেন (অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃক ১৯৬৫-তে প্রকাশিত) তা হয়ত ঈশারউডের শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্য-চর্চার প্রথম ফসল। শ্রীরামকৃষ্ণকে নায়ক করে তাঁর একখানি উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা আছে।

ঈশারউড মনে করেন, তাঁর মহর্ষি একজন অতি-সাধারণ মানুষ হিসাবে চিত্রিত হবেন—

> "The evolving saint does not differ from his fellow humans in kind but only in degree and that the average men and women of this world are searching, however, unconsciously, for that same fundamental reality."

এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি এইচ জি ওয়েলস যে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সত্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন, তার নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে ওয়েলস

> "failed to accept the validity of the mystical experience, to recognise its central importance in the scheme of human evolution."

বর্তমান যুগে যখন ওয়েলসকে প্রথমতম 'আউটসাইডার' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তখন ঈশারউডের এই উক্তি কিঞ্চিৎ উদ্ভট মনে হতে পারে, কিন্তু ঈশারউডের আদর্শ, বিশ্বাস ও মনোভংগীর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা এই মন্তব্য সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই উত্থাপন করবেন না। ঈশারউডের মধ্যে কোনোরকম ধর্মীয় অন্ধত্ব এবং গোঁড়ামি নেই। প্রতিটি ধর্মীয় বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত প্রভৃতির পরীক্ষা করার যে বাসনা তাঁর অন্তরে, তার ফলে তিনি পাঠককে এমন এক মানসিকতার মধ্যে নিয়ে যান যে, অন্ততঃ সাময়িকভাবে নিজস্ব বিশ্বাস এবং মতবাদ তাঁকে পরিহার করতে হয়। শুনতে হয় সেই মানুষের কণ্ঠস্বর যিনি বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে এসেছেন এবং শেষপর্যন্ত অতীন্দ্রিয় জগতে অতি-প্রাকৃতের মধ্যে শান্তি ও সুখের সন্ধান পেয়েছেন। ঈশারউডের কাছে মহর্ষিরা 'হিস্টরিক্যাল ফেনোমেনা'। তিনি অধ্যাত্ম সত্য যে অপরকে সম্প্রসারিত করা চলে না তা বিশ্বাস করেন, এই সত্যকে উপলব্ধি করতে হয় প্রত্যক্ষ সিদ্ধির মাধ্যমে। কিন্তু শুধু এই কারণে কোনো মানুষের পক্ষে বাধা নেই—

> "from trusting in Christs' personal integrity and in the authenticity of his revelation, as far as chriot himself in concerned."

এই খণ্ডে 'দি গীতা অ্যান্ড ওয়ার' নামে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণ কথিত শ্রীমদ্ভগবদগীতায় যাঁরা বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান তাঁদের কাছে এই পরিচ্ছেদটি বিশেষ উপভোগ্য হবে। ঈশারউডের মতে গীতা—

> "deals with the whole nature of action, the meaning of life, and the aim for which man must struggle, here on earth.

মহাভারতের পরিপ্রেক্ষিতে গীতার বিচার করা প্রয়োজন, তাহলেই বোঝা যাবে যে, গীতার মূল্য দ্বিবিধ—

> "—the relative and the absolute."

শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ আবার স্বয়ং ভগবান—একাধারে দুই সত্তা।

অন্ধকার, নৈরাশ্য, দুঃখবাদের এই বিষাদময় হতাশাকর মুহূর্তে ঈশারউডের কণ্ঠস্বর চিত্তে স্বস্তি ও শান্তি দান করে। তিনি সাহস করে দৃঢ়গলায় স্বর্গ ও শান্তির সম্ভাবনা ঘোষণা করেছেন—এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

EXHUMATIONS: By CHRISTOPHER ISHERWOOD. Published by: METHUEN & COMPANY LTD., (London) Price: 30 Shillings only.

ভারতীয় সাহিত্য

নরসিংহদাস পুরস্কার ॥

ভারতীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রীকমলেশ রায়ের পরিচয় নতুন করে না দিলেও চলে। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার জন্যে তিনি বাঙালীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

গত বছর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'বিশ্ব-বিজ্ঞান' বইটি। সাধারণ পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতির বিষয়টি অত্যন্ত সহজ ভাষায় তিনি এই গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ বছর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৬৭ সালের 'নরসিংহদাস বাংলা পুরস্কারে'র জন্যে মনোনীত করেছেন। ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে শ্রীরায়কে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। ভারতীয় বিজ্ঞান লেখক সমিতির সভাপতি শ্রীকমলেশ রায় ইতিপূর্বে বিজ্ঞান সম্পর্কিত একাধিক জনপ্রিয় বাংলা ও ইংরেজি বই লেখেন।

নজরুলের নামে ডাকটিকিট ॥

পাকিস্তান সরকারের ডাক ও তার বিভাগ বিদ্রোহী কবির সম্মানার্থে এ বছর আকর্ষণীয় স্মারক ডাকটিকিট প্রবর্তন করেছেন। ১৩ পয়সা দামের এই স্ট্যাম্পে নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতি এবং তাঁর বহু পঠিত 'সাম্যবাদী' কবিতার অবিস্মরণীয় তিনটি ছত্র মুদ্রিত হয়েছে।

পরলোকে 'ধনেশ্বরী'র লেখক ॥

গত ৯ জুলাই বিশিষ্ট মারাঠী লেখক ও শিক্ষাবিদ এস ভি দান্দেকর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

চিরকুমার এই সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত। এ পর্যন্ত তিনি ৯টি গ্রন্থ লিখেছেন। এর মধ্যে বেশির ভাগ বই-ই ধর্ম সম্পর্কিত। দান্দেকরের সবচেয়ে আলোড়নকারী গ্রন্থ হল 'ধনেশ্বরী'। তিনি সায় পরশুরামভাউ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

চলচ্চিত্রে বাঙলা সাহিত্য ।।

ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে বাঙালী সাহিত্যিকদের অবদান নিঃসন্দেহেই গৌরবজনক। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ভারতীয় ছবির আজ যে সুনাম, তার পেছনেও বাঙালী গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক শ্রীআর ডি বনশাল বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন যে, বাঙালীরা পড়ুয়া। তাঁরা বাঙালী ঔপন্যাসিকদের যেমন সম্মান করেন, তেমনি তাঁদের বই কিনে পড়তে পেছপা হন না। বাঙালী গল্পলেখক ও

কথাসাহিত্যিকদের রচনার উপর ভিত্তি করে যে সব চলচ্চিত্রের কাহিনী তৈরি হয়, সেই সব ছবি দেখতে তাঁরা বিশেষ আগ্রহী হন। স্বাভাবিকভাবেই সেই সব ছবি আকর্ষণীয় ও সাফল্য লাভ করে। প্রসঙ্গত তিনি জানান, এ ধরনের ঘটনা হিন্দী লেখকদের বেলায় দেখা যায় না। হিন্দী সাহিত্যের পাঠকেরা ঠিক বাঙালীদের মতো গভীর আগ্রহসহকারে তাঁদের বই পড়েন না।

পরলোকে কানাড়ী কবি ॥

প্রখ্যাত কানাড়ী কবি, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ শ্রীকামেলগদল শঙ্কর ভাট ৬৪ বৎসর বয়সে সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। কানাড়ী ভাষায় এপর্যন্ত তাঁর ২০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত কানাড়ী সাপ্তাহিক "রাষ্ট্রবন্ধু" পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং দীর্ঘ ২৫ বৎসর পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছেন। ১৯৫৩ সালে তিনি নীতিগত কারণে পত্রিকাটির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন এবং আর একটি নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই প্রকাশ করেন। এই সাপ্তাহিকটির নাম "রাষ্ট্রমন্ত্র"। ১৯৬৫ সালে কারওয়ারে অনুষ্ঠিত 'কানাড়ী লেখক সম্মেলনের' তিনিই ছিলেন সভাপতি। 'নালমে' নামে প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থটি কানাড়ী সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে "দেবতা মনুষ্য" সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় বাংলা সাহিত্য ॥

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগে অবস্থিত 'ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠানটি প্রাচ্য-সাহিত্যের প্রচারে বিশেষভাবে অগ্রণী। এই ইনস্টিটিউটে বহু জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিত মানুষ প্রাচ্য বিষয়ে গবেষণা করে থাকেন। বিগত ছাত্রিশ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসেবে 'আর্কিভ ওরিয়েন্টালনী' নামে একটি মূল্যবান বার্ষিকী প্রকাশিত হয়ে আসছে। সম্প্রতি তার একটি সংখ্যা (বর্ষ ৩৬) প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় বাংলা নাটকের আদি যুগ সম্পর্কে দুসান জ্ঞাভিতেল-এর লেখা 'দি বিগিনিংস অব দি মডার্ন বেঙ্গলী ড্রামা, ১৮৫২—১৮৮০' নামে একটি সুদীর্ঘ মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটির জন্য মিসেস দুসান ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ও হেমেন্দ্রকুমার বসুর 'বাংলা নাটক ১৮৫২—১৯৫৭' কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। বিশেষত প্রবন্ধটির পরিশিষ্টে বাংলা নাটকের যে দীর্ঘ পঞ্জীটি দেওয়া হয়েছে তা হেমেন্দ্রকুমার বসুর গ্রন্থ থেকেই গৃহীত।

পরলোকে আইন গ্রন্থের লেখক ।।

গত ৫ জুলাই প্রবীণ আইন-গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ পরলোকগমন করেন। আইন বিষয়ক বই লিখে তিনি একসময় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তাঁর আইন-গ্রন্থের সংখ্যা হল পাঁচ। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট অ্যাডভোকেট ছিলেন।

সাহিত্যিকের সম্বর্ধনা ।।

সম্প্রতি প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানান বেহালার পঞ্চানন সেবা সঙ্ঘ। জর্জ বার্নার্ড শ', বিশ্ব সাহিত্যের লেখক, এইচ জি ওয়েলস প্রভৃতি বহু গ্রন্থের লেখক; অসংখ্য বইয়ের অনুবাদক ও 'বৈতানিক' সম্পাদক শ্রীমুখোপাধ্যায়ের এই সম্বর্ধনা সভায় বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশী সাহিত্য

ম্যালকম লরী ॥

একদা প্রতিশ্রুতিয়ান আশাবাদকে আশ্রয় করে মার্কিনী লেখক ম্যালকম লরীর একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন। সেদিন তাঁর প্রয়াস ছিল নিরন্তর অভিযানের, কিন্তু ভয়ানক সংশয় ও অন্তর্দ্বন্দ্বের পীড়নে তিনি সারাজীবন কেবল ক্ষতবিক্ষতই হলেন—পথের সন্ধান পেলেন না। এই সময়ে তিনি লিখলেন তাঁর প্রখ্যাত উপন্যাস 'আন্ডার দ ভলকানো' (১৯৪৭)।

এই উপন্যাসে লরীকে চেনা যায় একজন আবিষ্ট-প্রতিভারূপে। অত্যধিক মদ্যপানে তখন তিনি আচ্ছন্ন। মনে হয়, অন্ধকারের মধ্যে তিনি নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছেন—আলো চাই, আলো। এই আলোর ব্যাকুলতায় উপন্যাসটি আত্মকরুণার পরিবর্তে ট্রাজেডির সমপর্যায় কাহিনীর সৃষ্টি করেছিল। এই ব্যাকুলতা তাঁর পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাস (আলট্রামেরিন ও লুনারকস্টিক), ছোটগল্পের সংকলন (হিয়ার আস ও লর্ড ফ্রম হেভেন দাই ডুয়েলিং প্লেস) কিংবা কবিতাবলীর ভেতরে লক্ষ্য করা যায় না।
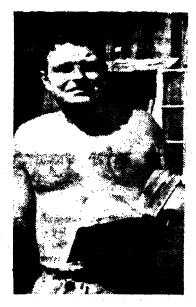
ম্যালকম লরী

১৯৫৭ সালে তিনি উপকথার নায়কের মতো এক মদ্যপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মারা যান। এর আগেও তিনি একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন ১৯৪৬ সালে। এই মানসিকতাই তাঁকে জীবন সম্পর্কে বিপর্যস্ত ও বেপরোয়া করে তোলে। মৃত্যুকালে তিনি তিনটি অসমাপ্ত উপন্যাস, ছয়-সাতটি অপ্রকাশিত গল্প, ৭০৫ পৃষ্ঠার টাইপ করা পান্ডুলিপি ও কয়েক শ কবিতা রেখে যান। তাই নিয়ে এখন দ্বিতীয় স্ত্রী মার্গারেট বোনার-এর সঙ্গে সম্পাদক ডগলাস ডে-র তিক্ততা চলছে। উভয়েই এখন এইসব অপ্রকাশিত রচনার প্রকাশস্বত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে লিপ্ত।

সম্প্রতি, লরীর মৃত্যুর প্রায় দশ বছর পরে 'ডার্ক অ্যাজ দি গ্রেভ হোয়েয়ার-ইন মাই ফ্রেন্ড ইজ ডেড' নামে একটি উপন্যাস বেরিয়েছে। ১৯৪৫-এর শেষদিক থেকে ১৯৪৬ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত কিছুকাল তিনি মেক্সিকো ভ্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি যেসব ঘটনা ডায়েরীর পাতায় লিখে যান—তাই বর্তমানে উপন্যাসের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। লরী অবশ্য লেখার পর

এই দিনপঞ্জীগুলিকে পড়ে খুশী হয়ে বলেছিলেন, 'মাই গড, উই হ্যাভ এ নভেল হিয়ার।'

এই উপন্যাসটির সর্বত্র সঞ্চারিত হয়েছে একটি বিপুল উত্তাপ, অস্থিরতা ও উন্দামতার মনোভাব। একজন দান্তেনীয়ান তীর্থযাত্রীর মতো লরীও যেন মদ্যপানাসক্ত হয়ে নরকদর্শনের জন্য উন্মুখ। লেখক নিজেও জানেন না, কোন্ দিকে তার মুক্তির পথ, আর কোন্ দিকে অনন্ত নরক-যন্ত্রণা। এই সংশয়ের কথা উপন্যাসটির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

একসময় সর্বনাশা ভয় তাঁকে পেয়ে বসেছিল, যার জন্য তিনি ঘর ছেড়ে বাইরে পর্যন্ত বেরোতেন না। মেক্সিকো বাসের সময় তিনি তাঁর এক পুরোনো বন্ধু জুয়ান ফার্ডিনান্ডো মার্টিনেজ-এর দেখা পান। ভদ্রলোক ছিলেন মাতাল এবং দার্শনিক প্রকৃতির মানুষ। তিনি জীবন-মৃত্যুর স্বরূপকে দর্পণের ওপরে দুটি নিষ্প্রভ নক্ষত্রের প্রতিফলনের সঙ্গে তুলনা করতেন। উন্দামতার সময় জানা গেলো, জুয়ান ছয় বছর আগে মারা গেছেন। উপন্যাসটি সমাপ্ত হয় পাকা গমের ক্ষেতের ওপরে ক্রমশঃ আলো নিষ্প্রভ হয়ে আসার বর্ণনা দিয়ে।

নাৎসী আক্রমণ ॥

নাৎসী আক্রমণ ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। পৃথিবীতে যুদ্ধ বহুবার হয়েছে। কিন্তু মানুষ যে ক্ষমতার লোভে এতটা মানববিদ্বেষী হয়ে উঠতে পারে তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে অনুমান করা যায়নি। এমন ব্যাপক নরহত্যা, নির্বিচার অরাজকতা আধুনিককালে আর কখনো ঘটেনি।

সম্প্রতি নোরা লেভিন 'দি হলোকাস্ট' নামে একটি উপন্যাসে সেই বিভীষিকাময় রক্তাক্ত দিনগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। আর্থার ডি মোর্স-এর 'হোয়াইল সিক্স মিলিয়ন ডায়েড' উপন্যাসটিও নাৎসী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা।

উপন্যাস দুটি পশ্চিমী দুনিয়ায় বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ঘটনাকাল থেকে সরে এসে এখন মানুষ আবার জিঘাংসাপরায়ণ হয়ে উঠছে। কেউ নগর সভ্যতার চাপে বিপর্যস্ত, কেউ স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। দেশে-বিদেশে অস্থিরতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তিমূলেও ফাটল দেখা দিয়েছে নানাভাবে। তবু শান্তিকামী মানুষ—এসবের ঊর্ধ্বে যেতে চায়; প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলার জন্যও কেউ কেউ চেষ্টা করছেন। হয়তো সেজন্যেই আর কেউ আন্তরিকভাবে যুদ্ধ চায় না। যুদ্ধের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই ক্লান্ত এবং বীতশ্রদ্ধ। সমালোচকেরা নানাদিক থেকে বই দুটিকে বিশ্লেষণ করেছেন।

বর্তমানে উপন্যাস দুটির চাহিদা ক্রমবর্ধমান।

ভ্যানিটি অব দুলুয়জ ॥

জ্যাক কেরুয়াক-এর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'ভ্যানিটি অব দুলুয়জ'-এর কাহিনীভাগ চলমান মার্কিনী জীবনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই উপন্যাসটির নায়ক একজন তরুণ বীট কবি। লেখক সম্প্রতিককালের উন্মাদনা ও উত্তেজনাকে তাঁর উপন্যাসের মুখ্য বিষয় হিসেবে বর্ণনা করতে চেয়েছেন।

একজন উচ্ছন্নে যাওয়া পুরুষ আত্মকথনের ভঙ্গিতে সমস্ত কাহিনীটি বলে গেছে। অবশ্য সমাপ্তিতে সে আর বীটরূপে চিহ্নিত নয়। সে নিজের ভুল-ত্রুটিকে বুঝতে পেরে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর, নির্দোষ জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছে।

যৌনতা ও অশ্লীলতার পক্ষে ॥

চারদিক থেকে আক্রান্ত এবং নিন্দিত হলেও অশ্লীল কিংবা যৌনসাহিত্যের প্রচার কমেনি। বরং যাঁরা নিন্দা করেন বোধহয় তাঁরাই এ প্রকার কাব্যসাহিত্যের সব চাইতে বড় পৃষ্ঠপোষক। কেন না, নিন্দা করতে হলে পড়তে হয়, এবং পড়তে হলে বই কিনতে কিংবা সংগ্রহ করতে হয়।

তাছাড়া, যাঁরা এ ধরনের সাহিত্য লিখে নাম করেছেন—তাঁরাও ব্যাপারটা নিয়ে ভাবিত নন। সমাজসংগতভাবে তাঁরা মাঝে মাঝে বিবেকের দংশনও অনুভব করেন। তখন প্রকাশ্যে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে দু-চারটে বিরুদ্ধ মন্তব্য করে বসেন। কিন্তু নেশাটাকে ছাড়েন না সম্ভবত অর্থ ও জনপ্রিয়তার লোভে।

কিন্তু নরম্যান পোধোরেজ সেরূপ বিচলিত প্রকৃতির মানুষ নন। তিনি বহু সাহিত্য সমালোচনা করেছেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলি বিদগ্ধ মহলেও বহুল আলোচিত। 'কমেনটারি' নামে একটি পত্রিকার তিনি সম্পাদক। সাহিত্যে যৌনতা ও অশ্লীলতার বিষয়ে তিনি বেশ উদার। যাঁরা এযুগের সাহিত্যকে নিন্দা করেন, তাঁদের তিনি শুচিবায়ুগ্রস্ত বলে মনে করেন। বরং সাহিত্যে এই সব বিষয়ের গোপনীয়তাকে তিনি অনাবশ্যক নোংরামি আখ্যা দেন।

সম্প্রতি 'মেকিং ইট' নামে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নরম্যান বর্তমান কালকে অর্থ, সম্মান ও প্রতিপত্তির যুগ বলে মনে করেন।

রাজনৈতিক নাটক ॥

সম্প্রতি থিয়োডর এইচ হোয়াইট-এর লেখা 'সিজার অ্যাট দি রুবিকন : এ প্লে অ্যাবাউট পলিটিকস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকার একজন সাংবাদিক। প্রত্যক্ষ রাজনীতির কলা-কৌশল, প্রচার ও প্রতিপত্তির স্বরূপ তাঁর জানা।

এই গ্রন্থে লেখক রাজনীতিকদের দ্বারা মানুষের নিয়ন্ত্রণ ও জনতাসৃষ্টির কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে। অতীত ইতিহাসের বিষয়টি তিনি উপেক্ষা করেননি।

গ্রন্থটি তথ্যবহুল এবং মূল্যবান।

সম্মানিত কবি দলমাতোভস্কি

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত হলেন সোভিয়েত রাশিয়ার অন্যতম প্রধান কবি ইয়েভগিন দলমাতোভস্কি। তিনি প্রধানত যুবকদের কাছেই জনপ্রিয়। তা সত্ত্বেও বলা যায়, দালমাতোভস্কি শুধুমাত্র যুবকদের জন্যেই কাব্যসাধনা করেননি। আসলে তাঁর লেখায় যৌবনের সুরটাই আমাদের কানে বেশি করে লাগে। তাই অল্পবয়সী ছোকরা থেকে শুরু করে ভারিক্কী কিংবা হাল্কা-মেজাজী সববয়সী পাঠকের কাছে তিনি প্রিয়। কাব্যগ্রন্থের কাটতিও হয় রেকর্ডসংখ্যক। কোন নতুন বই বেরোলে দেখা যায়, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেই সংস্করণটি ফুরিয়ে গেছে, একেবারে হটকেকের মতোই।

দলমাতোভস্কির প্রথম কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছিল আজ থেকে ঠিক বছর বত্রিশ আগে। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'আমাদের বিষয়ে কবিতা' বইটি। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর সব কাব্যগ্রন্থে দেখা যায় যৌবনের জয়যাত্রা। আর এখানেই রয়েছে তাঁর জনপ্রিয়তার আসল চাবিকাটি।

অক্টোবর বিপ্লবের ঠিক দু বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নির্ভেজাল ঘটনাবহুল জীবন বলতে যা বোঝায় দলমাতোভস্কি হলেন ঠিক তারই অধিকারী।

তিনি হলেন রুশ কবিতায় তিরিশ দশকের প্রধান কবি। গোটা রুশ দেশে যে বিপ্লব ঘটে যায় ১৯১৭ সালে, তার সর্বাত্মক প্রভাব দেখা যায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে। সাহিত্য-শিল্পও এর থেকে বাদ পড়ল না। সোভিয়েতবাসীদের চোখে তখন আরেক স্বপ্ন। এর হাওয়া এসে লাগল কবিতায়। চিন্তা-ভাবনায় আমূল পরিবর্তন হলো। কবিতায় পুরোনো রীতির বদলে দেখা দিল নতুন বাকভঙ্গি। সব কিছুই কেমন যেন সতেজ ও টাটকা। একেবারে নতুন স্বাদ পাওয়া গেল কবিতায়। দলমাতো-ভস্কির কবিতা এই যুগবদলের কথাই ঘোষণা করল। তাই অচিরেই তিনি কবিতা-প্রিয় রুশবাসীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। আজো এতে ভাঁটা পড়েনি।

দলমাতোভস্কির কাব্যচিন্তা আজো বেশ সাদাসিধে। তাই দেখা যায়, সাধারণ মানুষের রোজনামচা এখনো তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য। বিভিন্ন টানাপোড়েন ও নানামুখী ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর লেখা সর্বদাই জীবন্ত।

আসলে তাঁর কবিতায় রয়েছে সংঘর্ষ-ময় জীবনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। হিটলারের নাজী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা আজো তাঁর শিরায় শিরায়। তিনি বন্দী হয়েছিলেন জার্মান বাহিনীর হাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে জেলে পুরে রাখা কিংবা গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যাওয়া সেনাবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে বন্দী-শিবির থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন নাটকীয়ভাবে। সেও প্রায় আড়াই যুগ আগের কথা। এরপর ফিরে গেলেন মুক্তি-ফৌজের কাছে। যোগ দিলেন সেনা-বাহিনীতে। এই যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি আজো তাঁর কবিতার সম্পদ। এদিক থেকে সমবয়সী কবিদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে শক্তিমান।

কবি দলমতোভস্কি
বছরতিনেক আগে কলকাতায় যখন তিনি আসেন তখন এই ছবিটি গৃহীত।

দলমাতোভস্কির জনপ্রিয়তার পেছনে আর একটি প্রধান কারণ তাঁর কবিতার গীতিময়তা।

এ পর্যন্ত তাঁর শতাধিক কবিতায় সুর আরোপিত হয়েছে। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় তাঁর সুরদেওয়া কবিতা এক সময় মুক্তির আকুতি তীব্র করেছিল। বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী গ্যাগারিন একবার বলেছিলেন, আমি যখন মহাকাশ-যান থেকে পৃথিবীর পিঠে নেমে আসছি তখন দালমাতোভস্কির গানই ছিল আমার একমাত্র সঙ্গী।

গত ছ-সাত বছর ধরে তিনি বহু দেশ ঘুরেছেন। আফ্রিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও তাঁর 'হৃদয়স্বরূপ আফ্রিকা' কাব্যগ্রন্থে নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে।

সব শেষে বলা যায়, দলমাতোভস্কি হলেন মায়াকভস্কিরই সার্থক অনুসারী।

—অরুণ দত্ত

নতুন বই

সাত মহাল : (কাব্যগ্রন্থ) — সুনীলচন্দ্র সরকার। প্রকাশক : পুলিনবিহারী সেন, ৫৪বি হিন্দুস্থান পার্ক, কল-কাতা—২৯। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ কলকাতা—১২। ৪·০০।

সুনীলচন্দ্র সরকার কবিতা লিখছেন প্রায় তিন দশক ধরে। সাত মহালে কবির ১৯৪৬-পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে। তাঁর কবিব্যক্তিত্বকে বুঝতে হলে, রবীন্দ্রানুশীলনে বিশুদ্ধ, আধুনিক কবি-মানসিকতাকে বোঝা দরকার। একদা ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কবিতার সুর ও স্বরস্বাতন্ত্রে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে অনেক সময় অমিয় চক্রবর্তীর কথা মনে পড়ে। হয়তো এঁরা দুজনেই একই পরিমণ্ডলের কাছা-কাছি মানুষ।

এই কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন মহালের বিভিন্ন নাম, যথাক্রমে মিলিতা, আনন্দা লিখন, নদীশয্যা, পালাকীর্তন, সীমান্তিকা, সার্বজন্য ও শেষদান। প্রথম ছয়টি মহালে রয়েছে ৬৯টি কবিতা এবং সপ্তম মহালে একটি কাব্যনাট্য। শব্দব্যবহারে তিনি বিনীত, শান্ত এবং নিম্নকণ্ঠ। কোনপ্রকার বাহুল্যকে তিনি প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নন। অনেকগুলি কবিতা চিত্রপ্রধান, অধিকাংশ কবিতাই বাংলা দেশের সজল রোম্যান্টিকতায় ঈষৎ আন্দোলিত। সহজেই বোঝা যায়, কবি শ্রমশীল এবং মার্জিত মননে বিশ্বাসী। তাঁর আবেগ কখনো রুচির অনুশাসন অস্বীকার করে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় নি। এখানেই তাঁর অনন্যতা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষ বাস্তবের কোনো সংঘাত কিংবা উত্তেজনা নেই—সমাজ এবং মানবতাবোধের স্বাক্ষর আছে। কোনো কোনো কবিতায় মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও অন্ত-রঙ্গ সৌহার্দের উচ্চারণ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর মন তীব্রতর অর্থে বন্ধনবিরক্ত না হলেও, মুক্তিকামী—বস্তুবস্তুর স্পর্শে উদাসীন ও নিরাসক্ত। এবং তাঁর সংসারাসক্তি কোনো গৃহীর সন্তুষ্টি নয়, আজন্ম সন্ন্যাসীর দূরদৃষ্টি আকর্ষণ।

উদাহরণ হিসেবে 'সিঁড়ি' কবিতার কয়েকটি পংক্তি স্মরণ করা যেতে পারে।

ঘরের পথের মাঝখানে এ
　　সীমান্ত প্রদেশ।
এখান থেকে ঘরের আরাম
লাগে যেন আলগা স্নেহের মতো
এখান থেকে পা বাড়ালেই পথ।
ঘরের শাসন পথের নির্বাসন
থেমেছে ওর এপারে ওপারে,
নেই এটাতে অভিজাতের লোভ,
　　ভিখিরীদের ভয়।

শ্রীযুক্ত সরকার কিছুটা দার্শনিক মননে বিশ্বাসী। এই কাব্যগ্রন্থের বহু পংক্তিতে সেই বিশ্বাসের শান্ত অনুকম্পন অবশ্যশ্রুত।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। ছাপা বাঁধাই চমৎকার।

সাহিত্য সন্দর্শন : (আলোচনা)—শ্রীশচন্দ্র দাশ। ৫৬।১ আপার সার্কুলার রোড। কলকাতা-৯। দাম নয় টাকা।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র দাশের 'সাহিত্য সন্দর্শন' একখানি বহুল প্রচারিত গ্রন্থ। বেশ কয়েকটি সংস্করণ হয়েছে। সাহিত্যজাত

মজুমদার এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে বলেছিলেনঃ 'প্রাথমিক জ্ঞানের জন্য ইহাতে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট; কারণ গ্রন্থখানির মধ্যে সাহিত্যবিচারের প্রয়োজনীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ই প্রস্তাবিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। প্রাচীন থেকে আধুনিক কালের বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচকদের মতকে সামনে রেখেই আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার অনেক জায়গায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিচারের মূলতত্ত্বগুলির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। বিতর্কমূলক বিষয়ে নিজের যুক্তির ওপর নির্ভর করে মত দিয়েছেন। অনেক সময় তার সঙ্গে একমত না হতে পারলেও গ্রন্থকারের দুঃসাহসিক মনের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আর্ট সাহিত্য, কবিতা, সাহিত্যে রসতত্ত্ব, গীতি-কবিতা, বস্তুনিষ্ঠ ও তন্ময় কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ সাহিত্য, সমালোচনা, গদ্য-সাহিত্য, রোমান্টিসিজম ও ক্ল্যাসিসিজম, সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্র, সাহিত্যে রস-সর্বস্বতানীতি, বাণী-ভঙ্গি, হাস্যরস, সাহিত্যে সার্বলিমিটি, সাহিত্যে মিস্টিসিজম, বাংলা কবিতার ছন্দ—আর্ট ও নীতি, গদ্য-কবিতা এবং মহৎকাব্য প্রভৃতি বিষয়গুলির বিস্তৃত বিশ্লেষণ বর্তমান গ্রন্থখানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিস্তৃত বিশ্লেষণে সমস্ত আলোচনার মধ্যে গভীর অনুসন্ধান এবং সাহিত্যমনের পরিচয় স্পষ্ট।

ON THE MOTHER DIVINE BY PASUPATI: Published by Phanibhusan Nath, Matri Mandir, Prafullanagar, P.O. Kalyangarh 24 Parganas. Priced Rs. 8.00 only.

শ্রীমা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : সাক্ষাৎ জগজ্জননী; পৃথিবীর সন্তানদের দুঃখতাপ হরণের জন্যে উনি দেহধারণ করেছেন। উনি চিৎশক্তির ঐশ্বরিক প্রকাশ।

প্যারিসের ধনীগৃহে জন্মগ্রহণ করে একজন নারী কি বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেন সম্পূর্ণভাবে দৈবচালিত হয়ে ধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাযুজ্যলাভে সমর্থ হন এবং প্রায় ছত্রিশ বছর বয়সে দৈবপ্রেরিত ভাবে শ্রীঅরবিন্দ সকাশে উপনীত হয়ে নিজের জ্ঞান কর্ম ও ঐশী শক্তির প্রয়োগে অরবিন্দ আশ্রমের গোড়া-পত্তন থেকে তাকে বর্তমানের বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন ও আশ্রম-বাসিন্দাদের কাছে মহাশক্তির আধার কল্যাণদাত্রী জননীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হন, তার একটি পূর্ণাঙ্গীন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে "অন দ মাদার ডিভাইন" নামক ইংরাজী গ্রন্থটিতে। লেখক সবিনয়ে স্বীকার করেছেন তাঁর ভাষার দুর্বলতা; কিন্তু এ সত্ত্বেও বিষয়গুণে সমগ্র পুস্তকটিই শ্রীমা সম্পর্কে যাঁরা জানতে উৎসুক, তাঁদের কাছে নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য। শ্রীমা'র আলোক-চিত্রসংবলিত জ্যাকেটটি পুস্তকখানিকে একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

সোলেমানপুরের আয়েশা খাতুম ॥

(গল্পগ্রন্থ)—আবদুল আজীজ আল-আমান। হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। ৩-০০।

সোলেমানপুরের আয়েশা খাতুন তরুণ গল্পকার আব্দুল আজীজ আল-আমানের প্রথম গল্প সংকলনের দ্বিতীয় মুদ্রণ। অধিকাংশ গল্পই নিম্নবিত্ত গ্রামীণ মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কোনো কোনো গল্পে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্তরঙ্গ সহানুভূতির স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে। বিশেষত গ্রামবাংলার মাঠ-ঘাট, বন-জঙ্গল, ও পাখি-পাখালির উজ্জ্বল বর্ণনা পাঠকের মনকেও মোহাবিষ্ট করে। 'দশ টাকার হালিমা' 'ওমর শেখ', 'চন্দন কাঠের ধোঁয়া', 'সোলেমানপুরের আয়েশা খাতুন' প্রভৃতি গল্পগুলি মানবীয় আবেদনে সুন্দর।

যাঁরা গল্প ভালোবাসেন তাঁদের কাছে সংকলনটি ভালো লাগবে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

শুকসারী (পঞ্চম বর্ষ ১৩৭৫)—সম্পাদক মিহির আচার্য। ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪। দাম এক টাকা।

শুকসারী একমাত্র গল্প-পত্রিকা। বর্তমান সংখ্যাটি পূর্ববাংলার চৌদ্দটি নির্বাচিত গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন হায়াৎ মামুদ, আবু কায়সার, সরদার জয়েনউদ্দিন, রশীদ হায়দার, আনিস চৌধুরী, হাসান আজিজুল হক, জহির রায়হান, সৈয়দ শামসুল হক, শওকত আলী, আনোয়ারা সৈয়দ-হক, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, জাহানারা হাকিম, আবুল হাসান, জিয়া হায়দার। এ'রা প্রত্যেকেই পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিনিধিস্থানীয়। সম্পাদক শ্রীমিহির আচার্য একসঙ্গে এ'দের লেখা প্রকাশ করে পাঠকসমাজের ধন্যবাদ লাভ করেছেন।

প্রয়াস (জুলাই ১৯৬৮)—বিভূতিভূষণ রায়-চৌধুরী কর্তৃক কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

প্রয়াস ডাইরেক্টরেট অব ড্রাগস কন্ট্রোল এমপ্লয়ীজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যদের সাংস্কৃতিক মুখপাত্র। সম্পূর্ণ সংখ্যাটি সাইক্লোস্টাইলে মুদ্রিত। কয়েকটি ছবিও আছে। এ সংখ্যায় লিখেছেন—সুকুমার ঘোষ, নাম গুপ্ত, অনিল দত্ত, আনন্দ ভট্টাচার্য, কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, তপন ভট্টাচার্য, অভীশকুমার সোম, লোকনাথ প্রামাণিক ও অমলকুমার চক্রবর্তী।

কালপ্রতিমা (৫ম সংকলন)—বাসুদেব দেব সম্পাদিত। পোঃ চারোরিয়া (ভায়া কলকাতা-২৭), ২৪ পরগণা। এক টাকা।

মফস্বল থেকে প্রকাশিত হলেও এই অনিয়মিত কবিতার পত্রিকাটিতে কলকাতার কবিরাই কবিতা লিখে থাকেন। এ সংকলনে লিখেছেন—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সুখেন্দু মল্লিক এবং আরো কয়েকজন। কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা আছে।

মধুপর্ণী (তৃতীয় বর্ষ। প্রথম সংখ্যা ১৩৭৫)—সম্পাদক সুধীর করণ। পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ। বালুরঘাট। পশ্চিম দিনাজপুর। দাম এক টাকা।

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ নিয়ে মধুপর্ণীর বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে।

পালকী (বিশেষ সংখ্যা ১৩৭৫)—সম্পাদক-মণ্ডলী সম্পাদিত। ১৫৭বি ধর্মতলা স্ট্রীট কলকাতা-১৩। দাম—দু' টাকা।

সাহিত্য-সিনেমা-নাটক ক্রীড়া বিষয়ক এই দ্বিমাসিক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় কয়েকটি ছোট গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ফিচার, কবিতা নিবন্ধ চলচ্চিত্র আলোচনা আছে। দুটি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন কুমারেশ ঘোষ এবং অজাতশত্রু। বড় গল্প লিখেছেন সলিল সেন এবং রাজকুমার মৈত্র। সুব্রত ত্রিপাঠীর আঁকা প্রচ্ছদটি সুদৃশ্য।

গৌড়দেশ (নববর্ষ ১৩৭৫) — সম্পাদক নিমাইচাঁদ কুমার। ২৩৮ মানিকতলা মেন রোড, ফ্ল্যাট নং ৫, কলকাতা—৫৪।

আঞ্চলিক ঐতিহ্যাশ্রয়ী পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় কম। 'গৌড়দেশ'—দু-একটি সংখ্যায় উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ঐতিহ্য বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেছিল। এ সংখ্যায় লিখেছেন—দীপনারায়ণ সিংহ, অনিলচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, মহম্মদ সাইদ মিঞা, বিনয়কুমার ঝা, সরোজেন্দ্রনাথ দত্ত, কমলা মিশ্র, অঞ্জলি চৌধুরী, শিবেন্দুশেখর রায়, নিষ্পাপ চৌধুরী ও আরও দু-একজন।

রাতের শহর
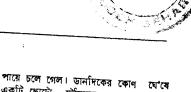
হোটেল একস্। খুবই আকস্মিকভাবে এখানে আসা। সন্ধ্যে সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ সাহেবপাড়া দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হ্যারিংটন স্ট্রীটের মোড়ে এসে পড়েছি, হঠাৎ অরূপের সঙ্গে দেখা। ওর গায়ে ধূমপানরতা নগ্ন যুবতী আঁকা টি-শার্ট, র-কটনের ট্রাউজার্স, ঠোঁটে একটা পেল্লাই চুরুট। প্রায় মাটি ফুঁড়ে এসে দাঁড়াল আর কি! 'কোথায় ছিলি এ্যাদ্দিন' জিজ্ঞাসা করতেই মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ ক'রে অরূপ ছড়া কাটল, 'গিয়েছিলাম হাজারি-বাগ, মারতে দুটো মাঝারি বাঘ।' খুব অবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম, 'ডেফিনিট্‌লি তোর লেখা নয়—বেড়ে ছড়া তো!' একটুও বিচলিত না হয়ে অরূপ বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস'? 'নুনা কোথায় আর—এই এমনি একটু' এড়াতে চেষ্টা করলাম ওকে। 'বাদ দে। চল্ একটু ডবলিউ স্কোয়ার করে আসি।' ডবলিউ স্কোয়ার মানে ওয়াইন অ্যান্ড উওম্যান। মদ মেয়েছেলে। আমি নিরুৎসাহে মাথা নাড়তে ও বলল, 'এ্যাট-লিস্ট প্রথমটা। চল্!' আমার উত্তরের কোনো পরোয়া না করেই হাতছানি দিয়ে একটা ছুটন্ত ট্যাক্সি ডাকল।

একটা রং জ্বলে যাওয়া হলদেটে বাড়ী। মাথার ওপর ফ্যাকাশে বেগুনী আলোয় লেখা 'হোটেল একস্'। লম্বা অন্ধকার করিডোর পেরিয়ে ঘন কালো রঙের সুইং-ডোরের কাছে এসে দাঁড়াতেই দরজাটা ঈষৎ ফাঁক হ'ল ও একটি ছুঁচোপানা মুখ আত্মপ্রকাশ করল। আমাকে দেখে তার মুখে স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে উঠল। অরূপ পেছন থেকে এগিয়ে এসে ওর কানে কানে কি বলতেই একটু ইতস্তত করে লোকটি দরজা মেলে ধরল। নীল পাখি আঁকা পর্দা উড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে চড়া পাটে বাঁধা একটি তীক্ষ্ণ সোপ্রানো কানে এসে বিঁধল—দেয়ার ইজ এ গোল্ড্ মাইন্ ইন দা স্কাই।' ঘর ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। চোখ জ্বালা করছিল। আমার হাতের মুঠোয় একটু চাপ দিয়ে ফিসফিসিয়ে অরূপ বলল, 'এগিয়ে আয়'। কাঁধ আর জেদি উঁচু বুক দিয়ে ছোটোখাটো ঠেলা দিয়ে একটি গোয়ানিজ-মতন যুবতী খুব স্বাভাবিক পায়ে চলে গেল। ডানদিকের কোণ ঘেঁষে একটি ছোটো টেবিলের দুপাশে বসলাম। ধীরে ধীরে ঘরের ভেতরটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

একটু ভালো করে ঠাহর করলেই বোঝা যায় হোটেলটি আসলে নানা দেশের নানা জাতের জাহাজীদের আড্ডা। কাফ্রী, ইয়াংকী, চীনে থেকে শুরু করে হরেক কিসিমের মাল্লায় একমুঠো ঘরটা গিজ্-গিজ্ করছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে লোহার ফ্রেমে বাঁধানো একটা বড় বোর্ডের চারপাশে অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীল লাল বল স্ট্রাইক্ করে জুয়ো খেলছে—বোধহয় ক্যাজিনো বোর্ড। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড হল্লা গুল্লা হচ্ছে, উড়ন্ত লাথি আর এলোপাথারি ঘুষো-ঘুষিতে যার শেষ। ডালিমের মতো একটি ইউরেশিয়ান মেয়েকে একহাতে বগলদাবা করে আর এক হাতে বাইশ আউন্সের ঢাউস মাপের হুইস্কির বোতল গলায় উপুড় করে ঢালার ফাঁকে ফাঁকে এক দশাশই হাবসী ছোকরা বিটকেল গলায় চেঁচিয়ে 'ইয়াম্রালাম-গা' গাইছে। একটি লোক প্রচণ্ড নেশায়

মেঝের কার্পেটের ওপর মুখ থুবড়ে শুয়ে আছে। কলার আর চুলের মাঝখান দিয়ে ওর গলদা চিংড়ির মত লাল টকটকে ঘাড় দেখা যাচ্ছে। একটি ফর্সা যুবকের কাঁধ ধরে বিনাভূমিকায় ঝুলতে ঝুলতে খুবই সুখী সুখী মুখে মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের একটি মেয়ে হঠাৎ হঠাৎ খুব জোরে শিস দিয়ে উঠছে। হাঁ হয়ে দেখছিলাম চারপাশে, অরুপের কনুয়ের ঠোকা খেয়ে দেখি, উচ্চতায় বড়জোড় সাড়ে তিন ফিট, তিরিশ থেকে ষাট যে-কোন বয়স হতে পারে এমন একটি ধুন্ধুমার চেহারার বামন ছোটো ট্রেতে করে সোডা, ওলন্দ ল্যাগলার আর ভিনিগারে ডুবিয়ে রাখা কিছু পেঁয়াজ এনে টেবিলের ওপর রাখল। ওর দিকে ভালো করে তাকানোর আগেই লোকটি হাশিশ্-চণ্ডু চরসের পুরু ধোঁয়ার আড়ালে মিলিয়ে গেল।

ঘরের বাঁদিকে একটি ছোট স্টেজ। স্টেজ না বলে ফ্লোর বলা উচিত। খুব একটা ধরা-বাঁধা কোনো প্রোগ্রাম নেই, কেউ পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়ান বাজাচ্ছে, কেউ পপ গাইছে, কেউ বা দু-চারজন জুটিয়ে অর্কেস্ট্রা গোছের কিছু জমিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। যারা মদ খাচ্ছে, জুয়ো খেলছে বা নারীচরিত্রের তম্বির করছে, তাদের এসব ব্যাপারে বড়ো একটা উৎসাহ নেই। যে যার মতো কাজ করে যাচ্ছে আর কি।

তিনটে পরপর স্ট্রেইট খেয়েছি, কিরকম একটা ঝিমুনি আসছিল। এরই ভেতর কথন কানে ভেসে এলো—প্রেজেন্টিং আওয়ার ফাইনেস্ট ফ্লোর শো উইথ দ্য ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স অব ব্লণ্ড বম্বশেল, ইন ব্লুজ অ্যাণ্ড লাভলি লুসি মার্ভিন। ভালো করে চেয়ে দেখি সবকটি মোদো, চণ্ডুখোড় বা জুয়াড়ী ভালোমানুষের মতো যে যার সিটে বসে একটু আগে ঘোষিত সেই ব্লণ্ড বম্বশেল্ মার্ভিনের জন্য অপেক্ষা করছে।

ধীরে ধীরে ঘরের আলোগুলো নিভে এলো। স্টেজের পর্দা নেমে আসার পর যেন বহুদূর থেকে একটি বিষণ্ণ গানের সুর ভেসে আসতে লাগল—আই মে বি গুড অর আই মে বি ব্যাড্, আই মে বি সিরিয়াস অর আই মে বি স্যাড্—দ্যাট অল ডিপেণ্ড অন য়ু। গান শেষ হতে নরম পর্দায় ওয়াল্জ-এর ঢেউয়ে ঢেউয়ে পর্দা উঠল। পেছনের শাদা পর্দায় দুটি পাইথন লাল টকটকে সূর্যকে গিলে খেতে চাইছে। একটি শাদা আলোর বৃত্ত গিয়ে উইংসের ভেতর থেকে লুসি মার্ভিনকে নিয়ে এল।

অসম্ভব তীব্র আর উদ্ধত যৌবন মার্ভিনের। নাচের বাজনা ধীর লয় থেকে যতই জোরালো, দ্রুত হচ্ছিল, ট্রমবোন্, ম্যারাকাস, চেলো যতোই ঝমঝমিয়ে বাজছিল মার্ভিনের নাচ ততোই নির্মম হয়ে উঠছিল। ওর জুতোর গোড়ালির নীচে ঘরময় লোকের লোভ, ব্যর্থতা, কামনা সব যেন শব্দ করে ফেটে যাচ্ছিল।

নাচতে নাচতে মার্ভিন যখন ঘূর্ণি হয়ে গেছে, হঠাৎ ভীষণ জোরে কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি যে খালাসীটি নেশায় বুঁদ হয়ে মেঝের কার্পেট কামড়ে শুয়েছিল, সে একটা বোতলের ভাঙা মাথা ছুরির মতো হাতের তেলোয় আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারা শরীর কাঁপছে। হঠাৎ গাঁক-গাঁক ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো, 'মার্ভিন, ইন্‌ফ্যারনাল বিচ্—আই স্যাল গিভ্ এ নাইস্ কিক্ অন ইয়োর ব্লাডি বট্‌ম্।'

মনে হল এক মুহূর্তের জন্য পৃথিবী থেমে গেছে। শুধু এক মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই জন তিনেক ওয়েটার ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হঠাৎ অরূপ উঠে ওদের ঠেলে-ঠুলে সরিয়ে লোকটিকে আমাদের টেবলে নিয়ে এল। কোনদিকে না তাকিয়ে দুটি ডবল পেগ্ নিট্ টেনে নিয়ে লোকটি কিছুক্ষণ গুম্ মেরে বসে রইল। তারপর টেবলে মাথা নামিয়ে হন্যে কুকুরের মত বেজায় বাজখাই গলায় হু-হু করে ডুকরে উঠল, 'বিলিভ মি, শি ইজ মাই ডটারস্ মাদার। ইভন্ লাস্ট মান্থ শি ওয়াজ উইথ মি, ইন মরিসাশ। নাউ শি ইজ উইথ ব্যাস্টার্ড ড্যানি।' হঠাৎ এক ঝটকায় লাফিয়ে উঠে সে। 'আয়্যাল কিল্ য়ু... আয়্যাল কিল্ য়ু' বলে চীৎকার করতে করতে একটা জ্যা-মুক্ত তীরের মতো স্টেজের দিকে ছুটে গেল। আমার দুকানে তখন ভয়ংকর জোরে সবক'টি চেলো, ট্রম্‌বোন্, ট্রাম্পেট্, ম্যারাকাস্ পাগলের মতো বেজে চলেছে।

—নিশানাথ

রাজধানীর ইতিকথা

নিমাই ভট্টাচার্য

আমি-আপনি একমুঠো অ্যামেরিকান গম জোগাড় করে কোনমতে উদরের আগুন নেভাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। আমরা এমন অপদার্থ অকর্মণ্য যে বৌ-ছেলেমেয়েদের প্রতি নিতান্ত সাধারণ ও জরুরী কর্তব্য পালন করতেও ব্যর্থ হচ্ছি। আর উঠতে-বসতে সকাল-সন্ধ্যায় ফ্যামিলী প্ল্যানিং-এর উপদেশ শুনছি। নেতাদের গালাগালি শুনছি, জানপ্রাণ লড়িয়ে পরিশ্রম কর।

জানও লড়িয়ে দিচ্ছি, প্রাণও লড়িয়ে দিচ্ছি কিন্তু হতচ্ছাড়া অদৃষ্ট একমুঠো অ্যামেরিকান গম ছাড়া আর কিছু দিতে চায় না। বৌ অদৃষ্ট ফেরাবার জন্য ব্রত-উপবাস করতে করতে শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেল। ঘরের দেওয়ালে মা-কালীর ফটো ঝুলিয়ে প্রণাম করতে করতে রোজ কপাল ফুলিয়ে দিচ্ছি, ডান হাতে, বাঁ হাতে গলায় যেখানকার যত কবজ-মাদুলী লটকিয়ে দিয়েছি কিন্তু তবুও অদৃষ্টের কোন পরিবর্তন হলো না। হাওয়া অফিসের ফোরকাস্ট যেমন কস্মিনকালেও ঠিক হয় না, ঠিক তেমনি আমাদের অদৃষ্টের হাওয়া অফিস—জ্যোতিষীর কথাও কপালের পাশ দিয়ে স্লিপ করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

শুধু আমার আপনার নয়, গোটা দেশের শত-সহস্র লক্ষ-কোটি মানুষের একই অভিযোগ। অদৃষ্টের গুরুজীকে ঠকিয়ে সাইড ইনকাম্ করার জন্য কেউ টিউশানি করছেন, কেউ অফিসপাড়ার উল্টোদিকে অফিসের পর হকার হয়েছেন, কেউ বা ভোরবেলায় বেপাড়ায় খবরের কাগজ বিলি করছেন কিন্তু তবুও যে তিমিরে, সেই তিমিরেই পড়ে আছি সবাই।

অথচ দাদারা? আমাদের পলিটিক্যাল দাদারা! সব এক একটি আলাদীন! এক একবার টেলিফোন করছেন আর বলছেন, চিচিং ফাঁক। অমনি ম্যাজিকের মত কাজ হচ্ছে।

সাধু-সন্ন্যাসীর দেশ ভারতবর্ষে সর্বত্যাগী পলিটিক্যাল দাদাদের বড় সম্মান, বড় আদর। দেশের লোক দাদাদের জন্য পাগল। সর্বত্যাগী এই সব পলিটিক্যাল সন্ন্যাসীদের সেবা করার জন্য কত মানুষ উন্মুখ। রাজধানী দিল্লী হচ্ছে এই সব দাদাদের যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী। নেহরু যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন দাদারা এখানে বিশেষ কল্কে পেতেন না। দু'চার দিনের জন্য আসা-যাওয়া করতেন মাত্র। এখন নেহরু নেই। দেশটা রসাতলে দেবার জন্য দাদাদের অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব। বছরের বারো আনা সময়ই দাদারা দিল্লী থাকেন। ইলেকশনের পর হাওয়া পাল্টে গেছে। তুঙ্গভদ্রা বা দুর্গাপুর প্রজেকটের গেস্ট হাউসে বসে চিত্তবিনোদন করা আর নিরাপদ নয়। দাদারা তাই আজকাল দিল্লীতেই বেশী সময় কাটান।

দিল্লীতে দাদারা বেশ কাটান। দাবী-দাওয়া মিছিল-ধর্মঘট বা ইনকিলাব জিন্দাবাদের নোংরামি নেই। প্রায় বিনা ভাড়ায় সরকারী বাংলো। সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে লন। লনের চারপাশে ফুলের জলসা। দাদাদের ব্রেনে এই ফুলের হাওয়া লাগছে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা।

দাদারা এক একটি স্বামীজি। চাকরি-বাকরি-বিজিনেশ? পাগল? দেশের কথা ভাবতে ভাবতে যাঁরা মাথার চুল পাকালেন, তাঁরা নিজের স্বার্থে চাকরি-বাকরি-বিজিনেশ? নৈব নৈব চ। তবে দাদারা আলাদীন। টেলিফোন তুলে হাঁচি-কাশি দিলেই চিচিং ফাঁক। ভক্তের দল দাদাদের মনের কথা জানতে পারে। নৈবেদ্য নিয়ে আসে দাদাদের শ্রীচরণে। ভারতবর্ষের মানুষ বড় ভক্ত। গুরুর জন্য তাঁরা সর্বস্ব বিলিয়ে বিকিয়ে দিতে পারে ও দেয়। আমি-আপনি একমুঠো অ্যামেরিকান গম জোগাড় করতেই জেরবার হয়ে যাচ্ছি কিন্তু শিষ্য-শিষ্যাদের জন্য দাদাদের ওসব নোংরা চিন্তা করতে হয় না। দাদারা 'ব্যোম হর হর মহাদেব' করে দেশসেবার নেশায় মশগুল।

কলিকালে ভক্তি কোথায়? তবুও যদি সত্যিকার গুরুভক্তি দেখতে চান, দিল্লী আসুন। দাদাদের দেখে যান। ভক্তের দল দাদাদের বাংলো বাড়ী, এয়ারকণ্ডিসনার, ফ্রিজ, মোটরগাড়ী, চাকর-বাকর ড্রাইভার, বাগানের মালী—সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন। কিছু কিছু দাদা আছেন যাঁরা দেশের খাদ্য সমস্যার জন্য বড়ই চিন্তিত। আমাদের অভুক্ত রেখে পেটভরে অ্যামেরিকান গম খেতে দাদাদের চোখে জল আসে। ভক্তদের চাপে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু'চার টুকরো চিকেন আর আট টাকা কিলোর আঙুর ছাড়া কিছু খেতে পারেন না। দাদাদের এই কষ্ট, ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের দুঃখে দাদাদের এই সমবেদনা নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাদাদের ঐ চিকেন রোস্ট আর আঙুর খেয়ে সারারাত কাটান যে কি মর্মান্তিক তা ভাষায় বোঝান মুস্কিল। যাইহোক দু'চারজন দাদা কেরলে আর বাংলাদেশে বেশী চাল পাঠাবার জন্য ভক্তদের বলেছেন, গ্রো মোর ফুড। দাদাদের লনের এক কোণায় ছ'টি বেগুন, দশটা ঢ্যাঁড়স, একুশটা আলু গাছ ও সাতাশটা টমাটো গাছ লাগান হয়েছে। ওখলা থেকে ভক্তের অ্যাম্বাসেডর গাড়ী চড়ে সার আসছে, একশ' দশ টাকা মাইনের মালী সেই সার ছড়াচ্ছে সারাদিন। জমিত ভাড়া আর সব খরচ-পত্তর ধরলে এককিলো আলুর দাম পড়বে টাকা পাঁচেক। কিন্তু তা হোক। গ্রো মোর ফুড তো হচ্ছে।

সত্যযুগে, ত্রেতা যুগে মুনি-ঋষিরা নাকি উড়ে বেড়াতে পারতেন। আমাদের দাদারাও পারেন। গ্যাঁটের একটি পয়সা খরচা না করেও দাদারা ক্যারাভেলে উড়ে বেড়ান ভক্তের ভক্তির জোরে। দাদারা কি ভেল্কিই না জানেন! দাদারা আমাদের বৌ-ছেলে-মেয়েদের চিন্তায় একটু ফরেন-টরেন যেতেও পারেন না, কিন্তু স্রেফ দেশ-ভক্তির জোরে, সাধনার বলে ফরেন দাদাদের কাছে আসে। জাপানী ট্রানজিসটার, জার্মান ক্যামেরা, অ্যামেরিকান বাইনোকুলার, সুইস ঘড়ি, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান গুডস্, সবকিছু পাওয়া যাবে দাদাদের কাছে।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের মত দাদারা টাকা স্পর্শ করতে পারেন না। তাছাড়া দাদাদের কাছে টাকা মাটি, মাটি টাকা। দাদাদের ফতুয়ার পকেটে হাত দিন, ব্রিফকেশ খুলুন। কোথাও একটি অশোকস্তম্ভ নিকেলের মুদ্রাও পাবেন না। ভক্ত থাকলে ভগবানের কি চিন্তা বলুন? কিছু না।

কত গভীর দেশপ্রেম, কত জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা, কত মানুষের আশীর্বাদ, পিতৃপুরুষের কত সৌভাগ্য থাকলে দাদা হওয়া যায় জানেন? ব্রত-উপবাস কবচ-মাদুলী ছেড়ে দিয়ে কবে যে সারা জাতটা দাদাদের ভজনা করে দেশের কল্যাণ করবে, তাই এখন আমার নিশি-দিনের চিন্তা।

সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনুমান ভুল হয় নি গানাদোর। যে অতিথিশালায় সোনাবরদার হিসেবে তাঁরা আশ্রয় পেয়েছিলেন তার দরজায় সত্যিই রাজপুরোহিতের অনুচর প্রহরীরা তখন খাড়া হয়ে আছে।

রাজপুরোহিতের সূর্যবেদিকার কক্ষ থেকে বার হয়ে সে আস্তানায় ফিরে গেলে এ প্রহরীদের সঙ্গে তাঁর দেখা হত। রাজপুরোহিত বেশীক্ষণ অপেক্ষা করেন নি। গানাদো বিদায় নিয়ে চলে যাবার খানিক বাদেই তাঁর অনুচরদের পাঠিয়েছেন।

অনুচর প্রহরীরা অতিথিশালায় এসে জোর-জুলুম কিছু করে নি। অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গেই সোনাবরদারদের নায়ক গানাদোর কাছে রাজপুরোহিতের একটা অনুরোধ জানাতে চেয়েছে। রাজপুরোহিত বিশেষ জরুরী কোন প্রয়োজনে গানাদোর সঙ্গে এখনি আর একবার দেখা করতে চান। প্রহরীরা তাই গানাদোকে সসম্মানে নিয়ে যেতে এসেছে।

কিন্তু গানাদো ত এখানে নেই। —অতিথিশালা থেকে বেরিয়ে এসে পাউললো টোপাই প্রহরীদের প্রধানকে বলেছেন,—তিনি ত রাজপুরোহিতের সঙ্গেই দেখা করতে গেছেন।

হ্যাঁ গেছলেন।—বিমূঢ়ভাবে বলেছে প্রহরী-প্রধান,—দেখা শেষ করে চলেও এসেছেন অনেক আগে। এতক্ষণে ত তাঁর ত এখানেই ফিরে আসবার কথা।

ফিরে কিন্তু গানাদো আসেন নি। নিরুপায় হয়ে প্রহরী-প্রধান পাউললো টোপাকেই রাজপুরোহিতের কাছে নিয়ে গেছে। পাহারায় দাঁড় করিয়ে গেছে কয়েক-জন অনুচরকে গানাদো যদি ফিরে আসেন সেই ভরসায়।

প্রহরীদের দাঁড়িয়ে থাকা-ই সার হয়েছে। গানাদোর দেখা তারা পায় নি। ওদিকে পাউললো টোপাকে তখন অস্থির হয়ে উঠতে হচ্ছে রাজপুরোহিতের জেরায়।

গানাদো এখনো অতিথিশালায় ফেরেন নি কেন? এখান থেকে আর কোথায় তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব?

পাউললো টোপা সরলভাবেই এ বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতা জানিয়েছেন। তাতে রেহাই মেলে নি। এবং আরো কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে।

বিদেশী শত্রুদেরই একজন হওয়া সত্ত্বেও গানাদো তাঁদের দলপতি হয়েছেন কি করে?

আতাহুয়ালপার এত গভীর বিশ্বাস তাঁর ওপর কেমন করে জন্মাল যে তাঁরই পরামর্শ নিয়ে এমন বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রের মধ্যে নিজেকে জড়িয়েছেন?

পাউললো টোপা এসব প্রশ্নের উত্তর যতটুকু জানতেন তাও দেন নি। রাজপুরোহিতের গলার স্বর আর চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু তিনি পেয়েছেন যা তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন যে, ইংকা নরেশ আতাহুয়ালপার আদেশ পালন করতেই সোনাবরদার দলের সঙ্গে তিনি এসেছেন। গানাদো সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই।

রাজপুরোহিত বিশ্বাস করেন নি সে কথা। পাউললো টোপার কাছ থেকে কোন কথা বার করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বন্দী করেছেন। সেই সঙ্গে প্রহরী-দের আদেশ দিয়েছেন যেমন করে হোক গানাদোকে খুঁজে আনবার।

গানাদোকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় নি। কোরিকাঞ্চার মন্দির-নগর তোলপাড় করে ফেলেছে রাজপুরোহিতের অনুচরেরা। সেখানে অন্তত তিনি নেই।

কোরিকাঞ্চায় না থাকলে কুজকো নগরেই কোথাও তিনি গা ঢাকা দিয়ে আছেন নিশ্চয়। সেইখানেই তাঁর খোঁজ করা দরকার। কিন্তু কুজকো শহরে তাঁর সন্ধান করা বেশ একটু কঠিন হয়ে পড়েছে তখন রেইমি-র উৎসবের দরুণ।

সূর্যদেবের উত্তরায়ন একেবারে আসন্ন। রেইমির উৎসবের আয়োজন তার আগে থাকতেই শুরু হয়ে গেছে। দূর-দূরান্তর থেকে এ উৎসবে যোগ দিতে যারা কুজকোয় এসে জড় হয়েছে তাদের ভিড়ে নগরে চলা ফেরাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লুকিয়ে থাকতে চাইলে এ জনারণ্যে কাউকে খুঁজে বার করা অসম্ভব।

গানাদোর খোঁজ না পেয়ে অত্যন্ত অস্থির উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন রাজপুরোহিত। গানাদো কি তাহলে কুজকো ছেড়ে সৌসার দিকেই গেছে? না, তা অসম্ভব। প্রথম দিন থেকেই সৌসার পথে তিনি কড়া পাহারা রেখেছেন।

তাঁর কাছে আতাহুয়ালপার দূতী হয়ে যে এসেছিল সেই মাইস্কা মেয়েটির কথা এবার মনে পড়েছে তাঁর। দলপতি গোমেসের কারুর সাহায্য ও নির্দেশ না পেলে তার মত অবলা অসহায় একটি মেয়ের যে কিছু করবার ক্ষমতা নেই তা জেনেই এ পর্যন্ত তাকে হিসেবের মধ্যে ধরেন নি।

এবার কিন্তু তাকেও প্রয়োজন বলে হয়েছে। পাউললো টোপা চরম উৎপীড়নেও [illegible]

প্রলোভনেও আতাহুয়ালপার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতায় সম্মত করা যায় নি তাঁকে।

পাউললো টোপার বেলা যা বিফল হয়েছে ওই মুইস্কা মেয়েটির বেলা তা সফল হতে বাধা। শুধু উৎপীড়নের ভয় দেখিয়েই মেয়েটির কাছে কথা যা আদায় করবার করা যাবে নিশ্চয়। তাছাড়া তাকে টোপ করে গানাদোর মত ধুরন্ধরকে ধরা হয়ত শক্ত হবে না। ইতিপূর্বে এ কৌশলটা কেন মাথায় আসে নি ভেবে আফশোষ হয়েছে রাজপুরোহিতের।

এইবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মত সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ঘা খেয়েছেন রাজপুরোহিত। মুইস্কা মেয়েটি কোথায় আশ্রয় নিয়েছে তা তাঁর জানা। দূর-দূরান্তের তীর্থযাত্রিনীদের সেই অতিথি-শালায় কিন্তু তাকে পাওয়া যায় নি। জানা গেছে যে গানাদো যেদিন থেকে নিরুদ্দেশ মেয়েটিকেও সেই দিন থেকে অতিথিশালায় আর দেখা যায় নি। তীর্থযাত্রিনীদের অতিথিশালায় থাকা না থাকা তাদের স্বেচ্ছাধীন বলেই এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছু পায় নি কেউ।

মুইস্কা মেয়েটি কি তাহলে গানাদোর সঙ্গেই কুজকো শহরে রেইমি উৎসবের ভিড়ে আত্মগোপন করে আছে?

রাজপুরোহিত তাঁর অনুচরদের প্রাণ-পণে এ দুজনের সন্ধান করতে বলেছেন। নিজে কিন্তু তিনি এ সন্ধানের ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। তাভানতিনসুয়ুর প্রধান পুরোহিত হয়েও চিরদিনের বিধি লঙ্ঘন করে রেইমি উৎসবের আগেই দুজন বিশ্বাসী অনুচর নিয়ে তিনি কোরিকাঞ্চা শুধু নয় কুজকো শহরই গোপনে ত্যাগ করেছেন।

কি তাঁর গন্তব্য তা অনুমান করা কঠিন নয়। হুয়াসকার যেখানে বন্দী সেই সোসা দুর্গই তাঁর লক্ষ্য।

প্রথমে যত অস্থির উত্তেজিতই হয়ে থাকুন রওনা হবার পর রাজপুরোহিতের মনে বিশেষ কোনো উদ্বেগ আর থাকে না। অসম্ভবও যদি সম্ভব হয়ে থাকে তবু তাঁর ভাবনা করবার কিছু নেই। কুজকো থেকে সোসায় এমন গুপ্ত গিরিপথ আছে যা ডাক হরকরাদেরও অজানা। সে গুপ্ত-পথের বিশেষ দিশারী রক্ষী আছে। ইংকা নরেশ, সেনাপতি ও রাজপুরোহিত, এই তিন ইংকা শ্রেষ্ঠ ও তাঁদের চিহ্নিত কোন প্রতিনিধিকে ছাড়া আর কাউকে এ পথ চিনিয়ে তারা নিয়ে যাবে না। সুতরাং সাধারণ সরকারী রাস্তায় যদি কেউ সমস্ত সতর্ক পাহারা এড়িয়ে এগিয়ে যেতে পেরেও থাকে তবু তার অনেক আগে তিনি গুপ্ত-পথে সোসায় পৌঁছে যাবেন।

হুয়াসকারের কাছে আতাহুয়ালপার প্রস্তাবই কোনদিন আর পৌঁছোবে না।

যা অসম্ভব অবিশ্বাস্য তাই কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। কন্যাশ্রমের বাইরের পৃথিবী যার কাছে চন্দ্রলোকের মত অজানা [illegible] একটি [illegible] মেয়ে অসাধ্য সাধন করে আতাহুয়ালপার প্রস্তাব সত্যিই পৌঁছে দিয়েছে হুয়াস-কারের কাছে।

শুধু গুপ্ত গিরিপথই তার কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায় নি, সোসার সদাসতর্ক প্রহরীরা তাকে বাধা দেবার বদলে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করেছে, আর হুয়াসকার আতাহুয়ালপার দূতী হিসেবে তাকে অবিশ্বাস করবার কথা কল্পনাও করেন নি।

এ অলৌকিক ব্যাপার কেমন করে সম্ভব হল?

রাজপুরোহিত সোসায় পৌঁছে স্তম্ভিত হয়ে সেই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে-ছেন।

সোসা দুর্গে উপস্থিত হবার পর প্রথমেই তিনি হুয়াসকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছলেন। সেখানে প্রেতমূর্তি দেখবার মত তিনি চমকে উঠেছেন। সেই মুইস্কা মেয়েটিকে আর যেখানে হোক হুয়াসকারের কাছে দেখবার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। ভেতরে ভেতরে যত বিচলিতই হোন, বাইরে নিজেকে সম্পূর্ণ সংযত রেখে হুয়াসকারের মুখে আতাহুয়ালপার প্রস্তাবের কথা ধৈর্য ধরে তিনি দ্বিতীয়বার শুনেছেন। হুয়াসকার যে এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মত তা বুঝতে রাজপুরোহিতের দেরী হয় নি।

সব কিছু শোনবার পর প্রথমেই তাই তিনি প্রশ্ন করেছেন,—এ প্রস্তাব স্বয়ং আতাহুয়ালপাই পাঠিয়েছেন বলে আপনি বিশ্বাস করেন?

এ রকম প্রশ্নে বেশ একটু বিস্মিত হয়ে হুয়াসকার বলেছেন,—নিশ্চয় করি!

শুধু ওই 'কিপু'টি দেখে?—চেষ্টা করেও রাজপুরোহিত তাঁর গলার স্বর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রাখতে পারেন নি,—কেমন করে জানছেন যে ও কিপু জাল নয়? এই সম্পূর্ণ অজানা মেয়েটি যে আমাদের প্রতারণা করতে আসে নি তার প্রমাণ কি?

যার চেয়ে বড় প্রমাণ আর হতে পারে না সেই প্রমাণই ও দিয়েছে।—হুয়াসকার গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে একটু হেসে বলেছেন,—তাছাড়া ওর দিকে একবার চেয়ে দেখলেই বুঝবেন, তাভানতিসুয়ু-র পবিত্র-তম গিরিসাগর টিটিকাকার জলের মত অন্তর ওর স্বচ্ছ। কোন প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করা যায় যে, সেখানে প্রতারণা থাকতে পারে না।

শুধু ওই রূপ দেখেই তাহলে ভুলে-ছেন?—রাজপুরোহিত ভিলিয়াক উমুর গলা তিক্ত বিদ্রূপে একটু তীক্ষ্ণ হয়েছে,—ওর মুখে ইংকা রাজভাষা শুনে মনে করেছেন ও সত্যিই মুইস্কা বংশের কুমারী।

মুইস্কা বা ইংকা না হলে এ ভাষা ত কারুর পক্ষে জানা সম্ভব নয়।—রাজ-পুরোহিতের অন্যায় সন্দেহে একটু কৌতুকই বোধ করেছেন হুয়াসকার,—তা ছাড়া ওর বংশপরিচয়ের কথা এখানে অবান্তর নয়?

না নয়।—জোর দিয়ে বলেছেন রাজ-পুরোহিত। মিথ্যা বংশপরিচয়ের মধ্যেই ওর প্রতারণার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ইংকা রাজ-ভাষা ওর মুখে শুনে ভুলবেন না। যেদিন থেকে এ পবিত্র দেশ বিদেশী পাষণ্ডদের পায়ের স্পর্শে কলুষিত হয়েছে সেদিন থেকে মানুষের বুকে সত্যের আর ধর্মের দীপ নিভে গেছে। কুইচুয়ার বদলে পবিত্র রাজভাষা অশুচি জিহ্বায় উচ্চারণ করতে সাধারণ প্রজার আর বুক কাঁপে না। বিদেশী পাষণ্ডরা দেশদ্রোহী এদেশের কুলাঙ্গার-দের এ ভাষা শেখবার সুযোগ করে দিচ্ছে চর হিসেবে নিয়োগ করবার জন্যে।

হুয়াসকার একটু হেসে এ উত্তেজিত ভাষণে বাধা দিয়েছেন,—আপনি বলতে চান এ মেয়েটি সেই রকম [illegible] শত্রুর চর!

হ্যাঁ তাই বলতে চাই!—হুয়াসকারের কৌতুকের স্বরে রাজপুরোহিত আরও উত্তেজিত হয়েছেন,—মুইস্কা কুমারী বলে ও নিজের পরিচয় দিচ্ছে। ইংকা আর মুইস্কা কোনো পরিবারেরই কুমারী আমা-দের অজানা নয়। কোথাকার কোন মুইস্কা বংশে ওর জন্ম আমি জানতে চাই। জানতে চাই এই বয়সে এই কঠিন দৌত্যের ভার ও কেমন করে পেল!

রাজপুরোহিতের এ তীব্র আক্রমণের সামনে মেয়েটি যেন একটু বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, লক্ষ করেছেন হুয়াসকার।

রাজপুরোহিতের দৃষ্টিতেও তা এড়ায় নি। আরো নির্মম তীব্রতার সঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন,—নিজের কোনো নাম এ পর্যন্ত ও যে জানায় নি তা লক্ষ করেছেন? নিজের নামটুকু জানাতে কেন ওর এ দ্বিধা!

দ্বিধা হবে কেন!—মেয়েটির একেবারে পাণ্ডুর হয়ে আসা মুখের দিকে চেয়ে স্বতস্ফূর্ত মমতায় তার পক্ষ নিয়ে বলেছেন হুয়াসকার,—নাম বলার প্রয়োজন হয় নি বলেই বলে নি।

একটু থেমে সাহস দিয়ে বলেছেন আবার, বলো, কি নাম তোমার?

মেয়েটি বিপন্ন কাতর দৃষ্টি মেলে হুয়াসকারের দিকে নীরবে চেয়ে থেকেছে শুধু। কিছুই বলতে পারে নি।

বল তোমার নাম।—একটু [illegible] স্বরে হুয়াসকার আবার তাকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করেছেন।

হিংস্র উল্লাসে দীপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ-পুরোহিতের মুখ। নিষ্ঠুর শাণিত দৃষ্টিতে যেন শিকারকে বিদ্ধ করে তিনি বলেছেন,—নাম ও বলবে না। কারণ ও জানে মিথ্যা নাম দিয়ে ও পরিত্রাণ পাবে না। শুধু নামটুকু পেলেই কুলজি মিলিয়ে ওর প্রতারণা আমি প্রমাণ করে দেব। নাম বলবার সাহস তাই ওর নেই।

নিশ্চয় আছে।—এতক্ষণে একটু অধীরতা প্রকাশ পেয়েছে হুয়াসকারের কণ্ঠে। স্নেহের স্বরে বলেছেন,—বলো তোমার নাম, দ্বিধা কোরো না।

(ক্রমশঃ)

মস্কো থেকে দুঃসংবাদ

১৯৬২ সালের অকটোবর মাসে ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি একবার বাস্তবতার রূঢ় আঘাত পেয়েছিল। সেদিন দেশের উত্তর সীমান্তে চীনাবাহিনীর করাঘাতে ভারত-চীন মৈত্রীর দীর্ঘলালিত স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল। এবারকার আঘাত অবশ্য তত বড় আকারের নয়। কিন্তু যেহেতু এই দ্বিতীয়বার আঘাত এল এবং সেটা এল এমন একটা দেশ থেকে যাকে আমরা অসহায়ের প্রায় শেষ সহায়ের মত অবলম্বন করেছিলাম সেহেতু বেদনাটা বড় হয়ে বাজছে।

মাত্র মাস দুয়েক আগে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন যখন পাকিস্থানে সফর করে গেলেন তখন আমরা জেনেছিলাম, পাকিস্থান রাশিয়ার কাছে যে সামরিক সাহায্য চেয়েছে সেটা দিতে রাশিয়া অস্বীকার করেছে—প্রধানত ভারতবর্ষের জন্য তার বন্ধুত্বের স্বার্থেই। এখন বোঝা যাচ্ছে, আমাদের সেই জানাটা যতখানি আমাদের কামনার অনুগামী ছিল ততটা আসল অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। এখনও পরিষ্কার নয়, সোভিয়েট রাশিয়া ঠিক কি পরিমাণ ও কি ধরনের অস্ত্র দিয়ে পাকিস্থানকে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে। পাকিস্থান এ বিষয়ে নীরব। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী এখনও আশ্বাস দিচ্ছেন, তাঁর দেশ এমন কিছু করবে না যাতে ভারতের সঙ্গে তাঁর দেশের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী একথা গোপন রাখেন নি যে, রাশিয়া তাঁকে ইঙ্গিত দিয়েছে, সে পাকিস্থানকে কিছু কিছু অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে। যদিও এই সকল অস্ত্রের কোন তালিকা রাশিয়া ভারতবর্ষকে দেয় নি তথাপি শ্রীমতী গান্ধী এবিষয়ে নিশ্চিত যে, এই সাহায্যকে "প্রতীক" বলা যায় না।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর দ্বারা এই সংবাদ সমর্থিত হওয়ার আগেই কিন্তু সংবাদপত্রে পাকিস্থান সম্পর্কে রাশিয়ার এই নীতিবদলের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। শনিবার ৬ই জুলাই নয়াদিল্লীতে ভারপ্রাপ্ত সোভিয়েট দূত নিকোলাই স্মিরনভ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের লেখা একটি চিঠি তাঁকে দেন। সেই চিঠিতে কি আছে সেকথা প্রকাশ পায় নি। কিন্তু সেখান থেকেই সংবাদপত্রের জল্পনাকল্পনার সূত্রপাত। রবিবার ৭ই জুলাই শ্রীমতী গান্ধী এলেন চন্দ্রপুরে ডি ভি সি-র একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। উদ্বোধন সেরেই তিনি বিমানে পাড়ি দিলেন—চন্দ্রপুরে ভোজসভা ও অন্যান্য সব অনুষ্ঠান বাতিল করে। রবিবার রাত্রে নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্র সাবকমিটির সভা বসল। পরের দিন রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হোসেনের সোভিয়েট রাশিয়ায় সরকারী সফরে যাওয়ার কথা। তাঁর সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীরাজেশ্বর দয়ালেরও যাওয়ার কথা। প্রকাশ, মন্ত্রিসভার সাবকমিটিতে প্রস্তাব এল, সোভিয়েট রাশিয়ার আচরণের প্রতিবাদে রাষ্ট্রপতির রাশিয়া সফর বন্ধ রাখা হোক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর আপত্তিতে সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল। স্থির হল ডঃ রাষ্ট্রপতি

লণ্ডনে অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকী উৎসব উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত ৩রা জুলাই ওয়াল্ডর্ফ হোটেলে আয়োজিত ভোজসভায় ভাষণ দিচ্ছেন পত্রিকা সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। ছবিতে মাননীয় গেভিন অ্যাস্টর, স্যর হ্যারি ব্রিটেন, ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রীদ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে।

ও পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী রাশিয়াতে গিয়ে পাকিস্থানকে সোভিয়েট অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করবেন। সেখানে তাঁদের বক্তব্য কি হবে সে বিষয়ে মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে তাঁদের অবহিত করে দেওয়ারও সিদ্ধান্ত স্থির হল।

মঙ্গলবার ৯ই জুলাই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে সরকারী সূত্রে সংবাদটির সমর্থন পাওয়া গেল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আসামে গিয়েছিলেন সেখানকার বন্যা পরিস্থিতি দেখতে। আসাম থেকে ফেরার পথে গৌহাটীতে তিনি সাংবাদিকদের বললেন, পাকিস্থানকে রাশিয়ার অস্ত্রসাহায্য দিতে সম্মত হওয়ার সংবাদে একটা "বিপজ্জনক পরিস্থিতি"র সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সেখানে আরও বলেন যে, ১৯৬৫ সালে পাকিস্থানী হামলার সময় থেকেই ভারত একথাটা জোর করে বলে এসেছে যে, বিদেশী অস্ত্রসম্ভার থাকার ফলেই পাকিস্থান ভারতের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী একথাও উল্লেখ করেন যে, ভারতকে পাকিস্থানের সঙ্গে এক সারিতে দেখানো খুবই অন্যায়। কেননা, পাকিস্থান আক্রমণকারী, ভারত কোন দেশের বিরুদ্ধেই কখনও হামলা করে নি।

গৌহাটী থেকে বিমানে দমদমে পৌঁছে তিনি আবার সাংবাদিকদের সঙ্গে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, পাকিস্থানকে রাশিয়ার অস্ত্রসাহায্য দেওয়ার কথায় "আমি খুশী নই।" রাশিয়া যে অস্ত্র দেবে পাকিস্থান তার অপব্যবহার করলে রাশিয়া তাকে সামলাতে পারবে কিনা সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সন্দেহ আছে।

পাকিস্থানের সেনানায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে এক সামরিক প্রতিনিধি দল কয়েকদিন আগে সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। তাঁরা রাশিয়ার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি পরিদর্শন করেন এবং সোভিয়েট সেনাবিভাগের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এইসব কথাবার্তার ফলাফল কি হল সেটা কোন পক্ষই প্রকাশ করেন নি। ভারতের রাষ্ট্রপতি যেদিন (সোমবার ৮ই জুলাই) রাশিয়ায় গেলেন সেদিনই পাকিস্থানের সামরিক প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে এলেন। দেশে ফিরেও তাঁরা মুখ খুললেন না।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যেসব ভারতীয় সাংবাদিক রাশিয়ায় গিয়েছিলেন তাঁরা সেখানে এই সংবাদের সমর্থন সংগ্রহ করার চেষ্টা করছিলেন। বুধবার ১০ই জুলাই তাঁরা একটি অনুষ্ঠানে সেই সুযোগ পেলেন। প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনকে তাঁরা এই বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। কোসিগিন সংবাদটির সমর্থন করলেন না, অস্বীকারও করলেন না। তিনি শুধু বললেন যে, পাকিস্থানকে রাশিয়ার অস্ত্রসাহায্য দেওয়ার মত ব্যাপারে রাশিয়ার তরফে একটা মূল বিবেচ্য বিষয় হবে ভারতের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। তিনি আরও বললেন, "আমরা জানি যে, ভারতবর্ষে ও অন্যত্র এমন কিছু কিছু লোক আছে যারা আমাদের দুই দেশের মধ্যে ফাটল ধরাতে চায়। আমাদের সম্পর্ক ক্ষুন্ন করার জন্য তারা নবরকমের গল্প বানাবে।" কিন্তু তিনি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, সোভিয়েট-ভারত সম্পর্কে ঘুন ধরাতে পারে এমন

কোন শক্তি নেই এবং যারা এই সম্পর্কের বিরোধিতা করবে তারা পর্যুদস্ত হবে।

কিন্তু, ইতিমধ্যে, ভারতবর্ষের জনমতে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। যদিও নয়াদিল্লীতে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে, পাকিস্থানকে রাশিয়ার অস্ত্রসাহায্যের ফলে ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতির কোন পরিবর্তন ঘটবে না তথাপি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই ঘটনা ভারতবর্ষের জনমতকে একটা প্রচন্ড ধাক্কা দিয়েছে। এর পর থেকে ভারতবর্ষ আর কি সোভিয়েট রাশিয়ার বন্ধুত্বের উপর আগেকার মত নিঃসংশয় আস্থা রাখতে পারবে? কাশ্মীর প্রশ্নে সোভিয়েট রাশিয়ার সমর্থন কি ভবিষ্যতে তেমনি সুনিশ্চিত থাকবে?

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মহলে এইসব প্রশ্নের ছায়াপাত ঘটছে।

কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি বেঙ্কট সুব্বায়া বলেছেন, দেশের পররাষ্ট্রনীতি আবার নূতন করে বিবেচনা করতে হবে।

স্বতন্ত্র দলের শ্রী মিনু মাসানি বলেছেন, "আমি একথা বলছি না যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি আমাদের শত্রু-ভাবাপন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু এটা আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, সোভিয়েট রাশিয়া এখন ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলছে।"

জনসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুন্দর সিং ভাণ্ডারী বলেছেন, সোভিয়েট রাশিয়ার এই কাজকে ভারতবর্ষের পক্ষে "অমিত্রোচিত" বলে ঘোষণা করা হোক।

প্রজা সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীনাথ পাই বলেছেন যে, বিশ্বাসপ্রবণ ভারত সরকার গতিশীল ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ না করে পরের দাতব্যের উপর নির্ভর করে এসেছেন। আজ সে সকলের উপহাসাস্পদ হয়েছে।

এই সংবাদে দুই কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। কম্যুনিস্ট নেতাদের এই সম্পর্কে পরিষ্কার মন্তব্য করা সম্ভব হচ্ছে না। দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী সি রাজেশ্বর রাও এই সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার কাজের সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। বামপন্থী কম্যুনিস্ট নেতা শ্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ বলেছেন যে, ভারতবর্ষের প্রতি যে দেশ বন্ধুভাবাপন্ন নয় সে দেশ অস্ত্র পাওয়ায় ভারতের একজন নাগরিক হিসাবে তিনি খুশি নন। কিন্তু তিনি দেশবাসীকে শান্ত ও সহিষ্ণু হতে বলেন এবং ভারতবর্ষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কোন দেশ যদি ভারতবর্ষের বন্ধু নয় এমন কোন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় তাহলে ন্যায়সঙ্গতভাবে আপত্তি করার কি আছে সেকথা বিবেচনা করতে বলেন।

স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হোসেন এই বিষয়ে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি মস্কোতে এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, "আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্বের মধ্যে যাতে সামান্যতম ছায়া পড়তে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।"

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে একটি পত্র লিখে আশ্বাস দিয়েছেন, ভারত-রুশ সম্পর্ক নষ্ট হয় এমন কিছু তাঁরা করবেন না।

কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্থানকে অস্ত্রসাহায্য দিতে সম্মত হল কেন? ভারতবর্ষের পক্ষে ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পক্ষে এই ঘটনার তাৎপর্য কি?

প্রথম কথা হচ্ছে, পাকিস্থান সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার নীতি গত কয়েক বছর ধরেই ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। ক্রুশ্চেভের আমলে ভারতবর্ষ যেমন পাক-ভারত বিরোধের ক্ষেত্রে বিনা দ্বিধায় সোভিয়েট সমর্থনের উপর ভরসা করতে পারত এখন আর সেটা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের আমলে রাশিয়া শুধু পাকিস্থানের সঙ্গেই নয়, তার দক্ষিণ সীমান্তবর্তী অন্যান্য মুসলিম রাজ্যগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য, তার সীমান্তবর্তী এই রাষ্ট্রগুলির উপর মার্কিন প্রভাব হ্রাস করা। পাকিস্থানের ক্ষেত্রে আর একটি উদ্দেশ্য সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, সেখানে চীনের প্রভাব বাড়ছে—যেটা সোভিয়েট রাশিয়ার পছন্দ হওয়ার কথা নয়। পাকিস্থানকে সোভিয়েট রাশিয়ার অস্ত্রসাহায্য দিতে অস্বীকার করার অর্থ হবে তাকে আরও বেশী করে চীনের দিকে ঠেলে দেওয়া—এই যুক্তি ইদানীংকালে ক্রেমলিনের মনে ধরে থাকতে পারে।

১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ সোভিয়েট রাশিয়ায় সফর করতে যান। এই প্রথম পাকিস্থানের একজন রাষ্ট্রপ্রধান রাশিয়ার আমন্ত্রণে সে-দেশে গেলেন। এর পর গত কয়েক বছরের মধ্যে পাকিস্থানের বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল নূর খাঁর নেতৃত্বে একটি সামরিক প্রতিনিধি দল রাশিয়ায় ঘুরে এসেছেন, প্রেসিডেন্ট আয়ুব দ্বিতীয়বার সে দেশে সফর করে এসেছেন, রাশিয়ার বাণিজ্য প্রতিনিধি দল পাকিস্থানে এসেছেন এবং, সর্বশেষে, স্বয়ং সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী পাকিস্থানে ঘুরে গেছেন। এইসব যোগাযোগের ফলে পাকিস্থান বৈষয়িক ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে ব্যাপকতর সাহায্যের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। একদিকে, সিয়াটো ও সেন্টোর সদস্য হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার আঁতাতকে এবং অন্যদিকে চীনের সঙ্গে তার মিতালিকে পাকিস্থান অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে ব্যবহার করে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে নিকটতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে গেছে।

গতবার সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী যখন পাকিস্থান সফরে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেনারেল সিদোরোভিচ। এই রাশিয়ান সামরিক অফিসার বিদেশে রুশ অস্ত্রসাহায্য দেওয়ার বিষয়টি দেখাশুনা করেন। পাকিস্থানে এঁর উপস্থিতি দেখেই ভারতবর্ষের বোঝা উচিত ছিল। জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে রাশিয়ায় যাওয়ার আমন্ত্রণ এবং সেখানে তাঁর কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি পরিদর্শন করার পর ভারতের সন্দেহ আরও দৃঢ় হওয়া উচিত ছিল।

এ বিষয়েও ভুল নেই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সোভিয়েট রাশিয়াও অস্ত্রসাহায্য দেওয়াটাকে আন্তর্জাতিক কূটনীতির অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং এজন্য প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতাকে উস্কিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না। গত বছর আলজেরিয়াকে রাশিয়া অস্ত্রসাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর মরক্কো অস্ত্রসাহায্যের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হয়েছিল। এই সেদিন রাশিয়া ইরানকে অস্ত্রসাহায্য দিতে সম্মত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে সোভিয়েট রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ সংক্রান্ত চুক্তি করার পরও এবং নিরস্ত্রীকরণের জন্য পর্যায়ক্রমিক আলোচনা আরম্ভে রাশিয়া প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও এই সামরিক সাহায্য দানের আন্তর্জাতিক কূটনীতি এখনও চলছে। গত ১লা জুলাই তারিখেই সোভিয়েট সরকারের একটি বিবৃতিতে নিরস্ত্রীকরণের পথে কয়েকটি পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বিবৃতির একাংশে বলা হয়েছে, "আঞ্চলিক নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা অবলম্বনের এবং পশ্চিম এশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অস্ত্রসজ্জা হ্রাস করার প্রস্তাবগুলিও সোভিয়েট সরকার সমর্থন করেন।" সোভিয়েট রাশিয়ার এই প্রস্তাব এখনও প্রস্তাব মাত্রই রয়ে গেছে। অথচ এরই মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছে যে, সে ইজরায়েলকে ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করবে এবং অন্যদিকে, সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্থানকে অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এতে আঞ্চলিক নিরস্ত্রীকরণের পথ সুগম হবে না; বরং অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বাড়বে।

পাকিস্থান সোভিয়েট রাশিয়ার কাছ থেকে কি ধরনের অস্ত্রশস্ত্র পাবে সেটা এখনও জানা যায় নি। তবে, এটা জানা আছে যে, সে চীনের কাছ থেকে রাশিয়ায় তৈরী যেসব ট্যাঙ্ক ও বিমান পেয়েছে তার যন্ত্রাংশ রাশিয়ার কাছ থেকে চায়। তাছাড়া, ভারতবর্ষ রাশিয়ার কাছ থেকে যে ধরনের সামরিক বিমান পেয়েছে সে ধরনের বিমান তারও চাই বলে পাকিস্থান রাশিয়ার কাছে বায়না ধরেছে। যদি পাকিস্থান সত্যি সত্যি সোভিয়েট রাশিয়ার মন গলাতে পেরে থাকে, তাহলে সেই হবে পৃথিবীর একমাত্র দেশ যে এক সঙ্গে আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের মত তিনটি পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন দেশ থেকে বৈষয়িক ও সামরিক সাহায্য পাচ্ছে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

কেন্দ্রীয় সাহায্যের প্রশ্ন

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রাজ্যগুলির প্রতি যে অর্থ সাহায্য এসে থাকে, তা অপ্রতুল ও বৈষম্যমূলক এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। গত সাধারণ নির্বাচনের পর কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেস-বিরোধী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এই অভিযোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং সাহায্য বন্টনের নীতি ও পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্যে দাবী উঠতে থাকে।

এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনার জন্যে গত ১১ ও ১২ জুলাই নয়াদিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কেন্দ্রীয় সাহায্য সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক বসে। দুদিন ধরে আলোচনার পরেও অবশ্য কি কি মানদন্ডের বিচারে কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া হবে সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ তার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান হাতের কাছে ছিল না। পরিকল্পনা কমিশন এই পরিসংখ্যান রচনা ক'রে কমিটির হাতে দিলে তারপর আবার কমিটির বৈঠক বসবে। তবে ঐ দুদিনের বৈঠকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই প্রশ্নটি সম্পর্কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মনোভাব কত তীব্র তার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে কেরলের সরকারের দেওয়া স্মারকলিপি থেকে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, এক, কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে রাজ্যের জন্য পরিকল্পনার ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে; দুই, ঋণ ও সাহায্যের একটা অংশ মৌলিক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের জন্যে বেঁধে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বাকী অংশটা খোলা রাখতে হবে যাতে রাজ্য সরকার নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী টাকা খরচা করতে পারে; তিন, রাজ্য পরিকল্পনার জন্য যে কেন্দ্রীয় সাহায্য পাওয়া যায় তার অর্ধাংশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে দিতে হবে, বাকী অর্ধাংশ গত বছরে কেন্দ্রীয় ও বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ইত্যাদি বিচার করে বিতরণ করতে হবে; চার, সেই সঙ্গে রাজ্যের মাথাপিছু আয়, খাদ্য প্রভৃতি জনসাধারণের মৌলিক প্রয়োজনের জিনিস উৎপাদনের ব্যাপারে ঘাটতি, রপ্তানীকৃত প্রাথমিক দ্রব্যের মূল্যের ওঠানামা, রাজ্য সরকারের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা, গত দশ বছরে পরিকল্পনার জন্য সম্পদ সংগ্রহে রাজ্যের অভিজ্ঞতা, এবং যে-সব কেন্দ্র-পরিচালিত পরিকল্পনা রাজ্য সরকারকে হস্তান্তর করা হবে সেগুলির বকেয়া কাজের হিসাব ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, কেন্দ্রীয় সাহায্য কি পরিমাণে পাওয়া যাবে তার ওপরেই সুসম আঞ্চলিক উন্নয়ন নির্ভর করছে। সুতরাং এই সাহায্যকে কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলির বরাদ্দের পরের বকেয়া ব্যাপার হিসেবে দেখলে চলবে না, পরিকল্পনার লক্ষ্য, দৃষ্টিভংগী ও অগ্রাধিকারের কথা এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের আপেক্ষিক দায়িত্বের কথা মনে রেখে নির্ধারণ করতে হবে।

কমিটির বৈঠকে সকলেই একমত হন যে, জনসংখ্যা, মাথাপিছু আয় ও কর আদায়ের প্রচেষ্টার কথাই প্রধানত বিচার করে কেন্দ্রীয় সাহায্য বন্টন করা উচিত। তবে বিশদ সিদ্ধান্ত নেওয়া পরিসংখ্যান সংগ্রহ সাপেক্ষে স্থগিত রাখা হয়েছে।

এটা ঠিক হয় যে, অর্থসাহায্যকারী সংস্থা, ব্যাঙ্ক, লাইসেন্সিং সংস্থা প্রভৃতির কাজ আঞ্চলিক অসাম্য দূর করার দিকে লক্ষ্য রেখেই পরিচালিত হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির স্থান নির্বাচনও এই ভিত্তিতেই হওয়া দরকার। সেই সঙ্গে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, অতীতের বিনিয়োগের পরিমাণও এই প্রকল্পগুলির স্থান নির্বাচনের সময় মনে রাখা হবে। এসম্পর্কে কমিটির একটি বিশেষ বৈঠক বসবে।

পরিকল্পনা কমিশন কেন্দ্রীয় সাহায্যের একটা অংশ নিজের কাছে রেখে দেবেন। তা দিয়ে খরা, বন্যা ও বেকার সমস্যা ইত্যাদি সমস্যার মোকাবিলা করা হবে।

যে যে রাজ্যে দুর্গতদের দরুন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যয় বেড়ে যায়, সেইসব রাজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা দেখানো হবে।

কমিটির আরেকটি সিদ্ধান্ত হ'ল তিরিশটিরও বেশি প্রকল্পকে কেন্দ্রীয় তালিকা থেকে বাদ দেওয়া। বর্তমানে নব্বইটিরও বেশি প্রকল্প কেন্দ্রীয় প্রকল্প হিসাবে বিভিন্ন রাজ্যে চালু আছে। কমিটি নীতিগতভাবে একমত হন যে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সংখ্যা যত কম রাখা যায় ততই মঙ্গল। কেবল গবেষণা, সমীক্ষা, নমুনা প্রকল্প ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি কেন্দ্রের হাতে রাখা যেতে পারে।

কমিটি এই সিদ্ধান্তও নেয় যে, রাজ্যগুলিকে মোট যে সাহায্য দেওয়া হবে সেটা পাঁচসালা ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। বার্ষিক সাহায্য যা-ই হোক না কেন, মোট সাহায্য যেন ঠিক থাকে। এবং এই সাহায্য আগে থেকেই ঠিক ক'রে দিতে হবে। সাহায্য ও ঋণের মধ্যেও একটা পার্থক্য। ঋণ কেবল মূলধনী প্রকল্পের জন্যে দিতে হবে; বাকী সকল প্রকল্পের জন্যে দিতে হবে সাহায্য।

জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সাহায্য যেসব রাজ্য চায় তাদের মধ্যে আছে মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার মাদ্রাজ। কেরল চায় জনসংখ্যার ঘনত্বের ভিত্তিতে সাহায্য চায়। জম্মু ও কাশ্মীর, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, ওড়িশা ও মহীশূরের কাছে জনসংখ্যার ভিত্তি পছন্দ নয়। কারণ তাতে তাদের ভাগ্যে অংশ পড়বে কম।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গহনা বিক্রীর প্রস্তাবে আর একদফা চেঁচামেচি শুরু করে নিস্তারিণী। একে-ওকে গিয়ে ধরে, ছুটে মতির বাড়ি চলে যায়, নানুকে ডেকে পাঠায়, 'ওকে বুঝিয়ে বল তোরা, এখনই ওসব বিক্রী করার কি তাড়া পড়ে গেল!'

তার আর্তি আর আকুলতা দেখে মনে হল গহনাগুলো তারই বুকের পাঁজর এক একখানা। কিন্তু সুরো তাতে কান দিল না, সে মন স্থির করে ফেলেছে। কিরণের যুক্তি তার মনে লেগেছে। এগুলো শুধুই দায়িত্ব আর দুশ্চিন্তার কারণ। এ থেকে কোন আয় নেই। বরং বেচে নগদ টাকা করে কোথাও আমানত রাখলে লাভ আছে। মাকে সেই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করে সুরো, বলে, 'চুরি গেলে ডাকাতি হলে একনিমেষে চলে যাবে সব। এমনিই ঢের জানাজানি হয়ে গেছে। এতদিন অত জানত না—কী গয়না আছে না আছে—সে তবু একরকম ছিল। আমি তো কোনকালেই মাসির মতো অত গয়না পরিনি। কিন্তু এখন এটা চাউর হয়ে গেছে ঠিকই যে আমার সিন্দুকে গিনি আর গয়না বিস্তর আছে। এই চাকর দারোয়ানরাই যে মেরেধরে একদিন নিয়ে যাবে না—তা জানছ কি করে?'

কিন্তু যুক্তি কোনদিনই নিস্তারিণীর মাথায় ঢোকে না, আজও ঢুকল না। সে চোখের জল ফেলে যেতেই লাগল। সুরবালার মাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে না আর, অথচ উপায়ও আর কিছু খুঁজে পায় না। টাকা গহনা তার কোন ভোগে আসবে না ঠিকই—তবু একটা অপরিমিত আকাঙ্ক্ষা, সুরোর জন্যেই আকাঙ্ক্ষা। এর শেষ নেই। খোকা—ওর ভাই গণেশ ওকে একটা গল্প বলেছিল অনেকদিন আগে, সেটাও মাকে শোনাল। সেই অনেকদিন আগে—যীশুখৃষ্টেরও জন্মের আগে—কে একজন খুব ধনী রাজা ছিলেন, ক্রীসাস না কি যেন খটোমটো নাম, তাঁর খুব টাকা ছিল। টাকারই নেশা তাঁর, ঐশ্বর্যের নেশা। সবচেয়ে নেশা ছিল হীরে জহরতের, ছলে-বলে-কৌশলে দামী পাথর—হীরা মুক্তো পান্না সংগ্রহ করা ছিল সবচেয়ে শখ। যোগাড় করেও ছিলেন ঢের, আর সেজন্যে তাঁর গর্বেরও শেষ ছিল না। একবার সোলোন বলে এক গ্রীক পণ্ডিতকে ডেকে এনে তিনি নিজের ধনভাণ্ডার দেখিয়ে সগর্বে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আপনি তো বহু দেশ ঘুরেছেন, এত দামী পাথর আর কোথাও দেখেছেন?'

পণ্ডিত উত্তর দিয়েছিলেন, 'মেলাই দেশ যাবার দরকার কি? আমার বাড়ির পাশে এক কুঁড়ে ঘরে এক বুড়ি থাকে—তার একটা জাঁতা আছে, সে জাঁতার পাথর দুটো আপনার এই হীরে-জহরতের থেকে ঢের দামী। সেই জাঁতা ঘুরিয়ে গম পিষে সে ছটা পেট চালায়, আপনার পাথর দিয়ে এক পয়সা আয় হয় না— বরং পাহারা দিতে বেশ কিছু খরচ আছে। ও পাথর থেকে সম্পদ আসে—এ থেকে বিপদ।'

কথাটা রাজার ভাল লাগে নি, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আর কোনদিন সে পণ্ডিতকে সভায় ডাকেন নি। এদিকে ক্রীসাসের এই খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল, সেই লোভে আর এক রাজা এঁর রাজ্য আক্রমণ করলেন। টাকা টাকা করে পাগল হয়ে ছিলেন ক্রীসাস, দেশরক্ষা বা সেনা-বাহিনী শিক্ষিত করার কোন চেষ্টাই করেন নি—তিনি প্রথম যুদ্ধেই হেরে গিয়ে বন্দী হলেন। সে ভাণ্ডার তো লুঠ হয়ে গেলই, বিজয়ী রাজার বিশ্বাস হল যে, আরও কোথাও কিছু লুকনো আছে—সেই গুপ্ত ভাণ্ডারের সন্ধান পাবার জন্যে ক্রীসাসের ওপর নির্যাতন চালাতে লাগল। অথচ সত্যিই আর কোথাও কিছু ছিল না, ক্রীসাস বার বার সে কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন, দিব্যি গাললেন। সে রাজার কিন্তু কথাটা বিশ্বাস হল না, তিনি রেগে আগুন হয়ে হুকুম দিলেন, ক্রীসাসকে একটা চিতায় চড়িয়ে তাতে আগুন লাগাতে। বললেন, 'একটু একটু করে পুড়তে শুরু করলেই প্রাণের ভয়ে আর যন্ত্রণায় ঠিক বলে দেবে কোথায় কি আছে।'

ক্রীসাসকে যখন চিতায় তোলা হচ্ছে তখন তাঁর মনে পড়ে গেল সোলোনের কথা-গুলো—তিনি বেশ চেঁচিয়েই সোলোনের নাম স্মরণ করতে লাগলেন। মরবার সময় লোকে ভগবানকে ডাকে, ক্রীসাস ঈশ্বরের নাম না করে সোলোনকে ডাকছেন কেন—কৌতূহল হতে বিজয়ী রাজা চিতায় আগুন লাগাতে নিষেধ করে কারণটা জানতে চাইলেন ক্রীসাসের কাছে। তারপর অবশ্য, ক্রীসাসের মুখে সোলোনের কাহিনী শুনে, তিনিও সেই অসার এবং বিপজ্জনক ঐশ্বর্যের জন্যে এতগুলো লোকের প্রাণ-হানি করেছেন এখনও একটা রাজাকে মারতে যাচ্ছেন বুঝে — লজ্জিত হয়ে ক্রীসাসকে ছেড়ে দিলেন।...

কাহিনী শেষ করে সুরবালা আবারও বোঝাতে চেষ্টা করল, গহনা লোহার সিন্দুকে পড়ে থাকলে এক পয়সা আয় দেয় না—উপরন্তু দুশ্চিন্তা ও বিপদের কারণ হয়। কিন্তু এসব কোন কথাই নিস্তারিণীর মাথায় ঢুকল না। যেন মহাসর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে একটা—এবং তার প্রতি এটা কন্যার একটা আক্রোশ—মুখের এই ভাব করে বসে চোখ মুছতে লাগল।

সোনার গহনা বিক্রীর খুব অসুবিধা হল না। মতির সেকরা, রাজাবাবুর সেকরা দুজনকেই জানা ছিল। তারা এসে কাঁটায় ফেলে ওজন করে নিয়ে গেল সব। এত সোনা নিক্তিতে ওজন করতে দিন পুইয়ে যাবে—তাই কাঁটা এনে টাঙ্গাল ওরা। সবই ধরে দিল বলতে গেলে—রাখল শুধু বালা, এক ছড়া হার—আর সেই শশীবৌদির দান সরু হার ছড়া; মায়ের পছন্দের কয়েক গাছা চুড়ি, আর মতির দেওয়া প্রথম বয়সের দু-একখানা গহনা। নিতান্তই ফঙ্গবেনে গহনা সে সব, কিছুই এমন দাম পাবে না—অথচ ওর অন্য মূল্য আছে সুরোর কাছে। টাকার হিসেবে এ জিনিসের দাম কষা যায় না।

টাকা কমই পেল অবশ্য। সেকরাদের বিচিত্র হিসেব—রসান ওঠে নি যে সব কর-করে নতুন গহনা, তারাই করে দিয়েছে—কোন কোনটা একবারের বেশী গায়েই ওঠে নি—দু-একখানা বোধহয় আদৌ পরা হয় নি; সে সব ফর্দ এখনও আছে—তবু পান-মরা, গালাই, পোদ্দারি প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র খাতে বাদ দিয়ে ভরিকরা মাত্র চোদ্দ টাকা দাম দিয়ে গেল ওরা। এমন কি গিনি হারও—ধারে ধারে জোড়ার অজুহাতে সব সোনাটার ওপর গালাই আর পান-মরা ধরে নিল।

অথচ উপায়ই বা কি! কিরণ বলল, 'এ ওরা নেবেই। এই ওদের ব্যবসা। পোদ্দারের দোকানে গেলে আরও বেশী নিত।'

'কিন্তু ওরাই তো করেছে! এই তো সেদিনকার কথা সব। এখনও তো রসান ওঠে নি। আর ওরা কি সত্যিই এসব

গালাবে ভাবছ?' সুরো করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

কিরণের এ ধরনের ব্যাপারে স্থৈর্য ঢের বেশী। সে বলে, 'সে যদি ওরা কাউকে ধরে বেচতে পারে তাহলে আলাদা কথা। তবে তারও মেহনতানা আছে বৈকি। তাছাড়া অত ভাবতে গেলে চলবে কেন, ও ওদের একটা নিয়ম করে নিয়েছে—সকলেই নেবে এ মুনাফা। এ এখন ওদের হক্কের পাওনায় দাঁড়িয়ে গেছে।'...

সোনার গহনা তবু একরকম—জড়োয়া-গুলো নিয়েই বিপদ বাধল। কোনটা কার কাছ থেকে কেনা—সুরো জানেও না। নাম-করা জহুরী লাবচাঁদ মতিচাঁদের দোকানে গেল কিরণ—তাঁরা অবিশ্বাস্য রকমের কম দাম দিতে চাইলেন।

হয়ত সেই দামেই বেচতে হত শেষ পর্যন্ত কিন্তু হঠাৎ ভগবানই বোধ করি একটা সুরাহা করে দিলেন।

শ্যাম বড়াল—বিখ্যাত য়্যাটর্নী, রাজা-বাবুর সম্পর্কে বেয়াই হন—একদিন দেখা করতে এলেন। প্রথমেই বেয়ান বলে সম্বোধন করলেন, জেঁকে বসলেন, পান-তামাক চেয়েই নিলেন একরকম। রাজা-বাবুর মৃত্যুর সময় তিনি এখানে ছিলেন না—বোম্বেতে গিয়েছিলেন, নইলে এত-খানি অবিচার অপমান কিছুতেই হতে দিতেন না—বার বার সেইটে জানিয়ে দিলেন।

'আর কেউ না জানুক আমি তো জানি—তিনি আপনাকে তাঁর স্ত্রী বলেই মনে করতেন। আপনাকে ওরা—ছিঃ ছিঃ!'

বিশাল দেহ ভদ্রলোকের, বিখ্যাত বিরাট গোঁফ।

পয়সাওলা লোক, নামকরা য়্যাটর্নীও।

এ'র কিছু প্রশংসাও শুনেছে রাজা-বাবুর মুখে। মক্কেলদের কাছ থেকে দুয়ে পয়সা নেন বটে তবে দয়ে মজান না। যে মক্কেল পয়সা দেয় ঠিক ঠিক—তার জন্য ষোল আনা খাটেন, কখনও কখনও আঠারো আনাও খেটে দেন। আর নিজের ক্ষতি না করে যদি পরোপকার করা সম্ভব হয় তো করেন, যথাসাধ্য। তবে একটি দোষের কথাও বলে গিয়েছেন রাজাবাবু, সব সময় নাকি অন্তত তিনটি রক্ষিতা না হলে চলে না এ'র।

প্রথমটা তাই একটু সন্দেহের চোখেই দেখেছিল সুরবালা। মতলবটা আঁচ কর-বার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কথাবার্তায় কোথাও সে রকম কোন জাল ফেলার চিহ্ন দেখে একটু একটু করে নরম হল। 'আপনার কোন দরকার পড়লে অবিশ্যি জানাবেন—কোন সঙ্কোচ করবেন না।' এই আশ্বাসের পর নিজের প্রয়োজনের কথাটা খুলে ও বলল।

তা শ্যাম বড়াল করলেনও ঢের। এতটা অপর কেউ পারত না। ঝামাপুকুরের কুমার কন্দর্প মিত্র জহরতের বড় সমঝদার; কোন পাথরের কত দাম হতে পারে, কত হওয়া উচিত—তা তাঁর কাছ থেকে যাচাই করে নিয়ে যায় জহুরীরা, তার জন্যে রীতিমত ফী দেয়। বেলা বারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠে (সারা রাত জেগে কাটে বলতে গেলে, রাত একটা নাগাদ 'বাইরে' থেকে ফিরে—আহ্নিক পুজো স্নানাহার করতে করতে রাত চারটে বেজে যায় শুতে) স্নান পুজো জলযোগ সেরে তিনটে নাগাদ আফিসে বসেন, সেই সময় জহুরীরা ভিড় করে আসেন—এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার মধ্যে কোন দিন পাঁচশ, কোন দিন সাতশ, কোন দিন বা হাজার টাকাও কামিয়ে নিয়ে উঠে যান।

তাঁকেই গিয়ে ধরলেন শ্যামবাবু। তাঁরও কিছু দিন সুরোর দিকে নজর ছিল—সেই কারণেই হোক অথবা শ্যামবাবুর পীড়া-পীড়িতেই হোক — তিনি জড়োয়া গহনার পাথর খুলিয়ে পাথরের দামে বেচিয়ে দিলেন, সোনা—জড়োয়া গহনার সবই মরা-সোনা—সোনার দামে। তাতে সব জায়গায় এমন কিছু ইতর বিশেষ হল না, কারণ—শ্যামবাবু বুঝিয়ে দিলেন—জহুরীরা খুচরো খদ্দেরের কাছে কুচো পাথরের নুনপক্ষে চার গুণ দাম ধরে। আর তেমনি সেটিংয়ের খরচাও—পাথরের দামের সমান দর ধরে নেয় তারও—সেখানেও চতুর্গুণ লাভ থাকে। তবে হীরেগুলোর বেলায় অনেকখানি লাভ হল, আর অন্য বড় পাথর যা দু-একখানা ছিল—তাতেও।

বেচল না শুধু তিন-চারটে জিনিস। একটা হীরের নেকলেস, তার লকেটের ভেতর কুঁচো হীরে দিয়ে রাজাবাবুর নাম লেখা ছিল—'রাধিকা'; আর একটা চুনির আংটি, তাতে স্প্রিং টিপলে ভেতরে কৌটোর মত জায়গা হয়—তাতে রাজাবাবুর কয়েক গাছি মাথার চুল ছিল; প্রথম যেদিন বাগান বাড়িতে গিয়েছিল সেদিন যে আংটিটা পরিয়ে দিয়েছিলেন রাজাবাবু সেইটে; এ ছাড়া একটা জড়োয়া টায়রা আর একটা মুক্তোর কণ্ঠী। এ দুটো নাকি রাজাবাবুর বড় প্রিয় ছিল। সুরবালা কিরণকে বলল, 'তাই বলে আমিও রাখব না অবিশ্যি, একটা রইল তোমার মেয়ের জন্যে, আর একটা দোব তোমার বৌমাকে। তাঁর প্রিয় জিনিস—গালাতে কি খুলতে দিতে কষ্ট হয়। তার চেয়ে জানাশুনো কোন স্নেহের পাত্র কেউ পরলেও শান্তি।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'ঐ যে দুটো জিনিস রাখলুম—তাও মনের ভুল বৈ কিছু তো নয়। পরবও না কোনদিন, আর শুধু হাতে হীরের নেকলেস পরলে লোক পাগল বলবে—তা নয়, তোলাই থাকবে, অবিশ্যি যদি চুরি ডাকাতিতে না যায়। ভবিষ্যতে একদিন কেউ হয়ত পাবে। তোমাকে বংশ-পরম্পরায় সেবাইত করব ঠাকুরের—যদি তোমার ছেলে গণ্ডগোল না করে, সব দায়িত্ব নেয় ঠিক ঠিক—এও তোমার ছেলেই পাবে।...না হয় যে পাবে, যার হাতে যাবে—সে যা খুশি করবে। হয়ত কেউ তার মেয়ে-মানুষকে দেবে, নয়ত বেচে মদ খাবে।... মরুক গে, আমি তো তখন আর দেখতে আসব না!'

বলতে বলতে ঈষৎ ভার হয়েই আসে তার গলা।

শ্যামবাবু আরও ঢের সাহায্য করলেন। বিষয়-সম্পত্তি দেবোত্তর করা, সরকারকে ট্রাস্টি করবার জন্যে লেখালেখি করা—দলিল-দস্তাবেজ তৈরী সবই তিনি করিয়ে দিলেন। বিগ্রহ এখানেই একজনকে দিয়ে তৈরী করান হয়েছিল, সমস্যা উঠল তার নাম নিয়ে। আনন্দবাবা বলেছিলেন—প্রতিষ্ঠাতার নামের আদ্যক্ষর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নামের কোথাও না কোথাও থাকা নাকি বৃন্দাবনের রেওয়াজ, সুতরাং সু অক্ষরটা দিয়ে একটা নাম করতে। সুরবালা বললে, 'না না—ছিঃ!...আমি কী একটা মানুষ—তাই আমার নাম জড়ানো থাকবে ঠাকুরের নামের সঙ্গে! এত আস্পদ্দা আমার নেই। ঠাকুর যদি চরণে স্থান দেন তাই ঢের—নাম জড়িয়ে রেখে কি হবে!... অন্য কোন নাম দিতে হবে। তা এত তাড়াই বা কি, ধীরে-সুস্থে ভাবলেই হবে।'

শ্যামবাবু বললেন, 'না — নামটা আগে চাই। নইলে দলিল করা যাবে না। বিগ্রহের নামেই সম্পত্তি সব উৎসর্গ করা হচ্ছে তো!'

আরও একটা কথা বললেন তিনি, বাড়ি ঘরের হাঙ্গামা সরকার বইতে রাজী হবে না। নগদ টাকা আমানত করে দিলে নিতে পারে। বাড়ি বেচে কোম্পানীর কাগজ বেচে আমানত করতে হবে।

—ক্রমশঃ

নতুন অধ্যায়

এই সেদিনও ছিল, আজ আর নেই, পরীক্ষায় পাশ করলেই হাতে হাতে চাকরি মিলতো। অনেক সময় আবার পাশ করারও প্রয়োজন ছিল না, চাকরি পাওয়া না পাওয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতো মর্জির উপর। চাকরি করার ব্যাপারে সেদিন পুরুষদের অনাগ্রহ এত প্রবল ছিল যে মেয়েদের তো কথাই নেই। তবু সকল বাধা-সংকোচ জয় করে মেয়েরা যেদিন বৃহত্তর জগতের মুখোমুখি দাঁড়ালো সেদিন তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়লো চাকরির। আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিজয়ী হবার এটাই ছিল বোধহয় সর্বশেষ সত্য। তাই চাকরির মাধ্যমে তারা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজলো।

জীবন ও জীবিকার সংস্থানে চাকরি হলো প্রথম হাতিয়ার। তারপর থেকে ইতিহাস দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়েছে আমাদের অগ্রগতি। কিন্তু অগ্রগতি বিস্তর হলেও সমস্যার পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে। সেদিনের মত সুযোগ আজ আর নেই। হাত বাড়ালেই গাছের পেয়ারা পেড়ে নেওয়ার মত চাকরি পাওয়া আজ একান্ত দুর্লভ। ●আরো দু-দিন পরে এসব তো গল্পকথা হয়ে যাবে। কেউ কেউ আশা করেন, স্কুল বা কলেজের চৌকাঠ ডিঙোতে পারলেই চাকরির নাগাল পেয়ে যাবো। কিন্তু আজ তাও সম্ভব হচ্ছে না। অনেক মাথা কুটে তবে এই দুর্লভ ভাগ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এর মধ্যে নির্দিষ্ট দিন বা সময়ের গ্যারান্টি দেওয়া একরকম অসম্ভব। ভাগ্য প্রসন্ন হলে তবেই শিকে ছিঁড়বে। অবস্থার গতিকে নিতান্ত অ-পৌরুষেয় সেই ভাগ্যের উপর বরাত দিয়েই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

চাকরিতে ছেলেদের ভিড় বলাই বাহুল্য, মেয়েদের ভিড়ও আজ উপছে পড়ছে। তাই মেয়েদের চাকরি করতে আসার প্রাথমিক 'ইলিউসন' সবাই কাটিয়ে উঠেছে। বরং সকলেই চাইছে নিজের নিজের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে জয়যুক্ত হতে। চাকরিক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ ক্রমেই তাই লোপ পাচ্ছে।

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা সকলের পক্ষেই সমস্যা। এতে মেয়ে-পুরুষ বিচার অনেকটা নির্বোধের কাজ। পুরুষের পক্ষে যেমন তেমনি নারীর পক্ষেও আর্থিক টানাপোড়েন সহস্র জটিলতার সৃষ্টি করে চলেছে। এজন্য দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসবার উপায় নেই। কোন এক অলস মুহূর্তে চোখ বুজে এলে এক সমস্যার সহস্ররূপ আমাদের বিপর্যস্ত করে তোলে। নিদ্রা ছুটি নেয়। শুধু নিদ্রা নয়, প্রতিটি মুহূর্তে এই অস্বস্তিকর চিন্তা আমাদের তাড়া করে ফেরে। তাই এ থেকে মুক্তির উপায়-চিন্তা আমাদের সকলের।

কিন্তু এখন শুধু চিন্তার পথটাই খোলা আছে। হাতের কাছে চিন্তার সমাধানের পথ একেবারে রুদ্ধ। সবাই চাকরির জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছি, ভিড় বাড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পাওয়ার আশা বা সম্ভাবনাও জিরো পাওয়ারে নেমে আসছে। তবু আমরা সে পথেই সোনালি সম্ভাবনার উজ্জ্বল আলোক-রেখার সুন্দর সমাবেশ কল্পনা করছি। এভাবে কত দিনের যে অপচয় হচ্ছে তার হিসাব আর কে রাখে। তবু স্বপ্ন দেখার আমাদের শেষ নেই। স্বপ্ন দেখতে দেখতে সেই সু-মুহূর্তটি একদিন যখন হাতের নাগালে পেয়ে যাবো, সেদিন উপলব্ধি করবো, নগ্ন বাস্তব দারুণ ভ্রূকুটি হেনে অট্টহাসিতে আমাদের বিদ্রূপ করছে। আর চারদিক সামলাতে আমরা হিমসিম খাচ্ছি।

আজও শুনতে হয় এবং শুনে রীতিমত অবাক মানতে হয় যে, অনেক বিজ্ঞজন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন মেয়েদের চাকরি করার কোন প্রয়োজন নেই। তাদের মতে, মনের মত সাজপোষাক, প্রসাধন আর স্ফূর্তিস্ফার্তার জন্যই চাকরিতে মেয়েদের এত ভিড়। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত নিজের ইচ্ছেমত চলার জন্যই ওরা চাকরি করতে আসে। উদ্দেশ্য অবশ্য এই সুযোগে কিছু টাকা-পয়সা জমিয়ে নেওয়া। এছাড়া আর কোন মহৎ কর্তব্য বা দায়িত্ব তাদের নেই। বাড়িতে এক পয়সাও ঠেকায় না। মা-বাবাকেও মেয়ের দায়িত্ব বইতে হয় না, এটুকুই যা সোয়াস্তি।

এসব কথায় রীতিমত তাজ্জব বনতে হয়। বিজ্ঞজনদের সাংসারিক ধারণা কোন সময়ই পটুত্ব লাভ করতে পারলো না এটাই যা দুঃখের। এরকম মতামত অক্লেশে ব্যক্ত করার পর বাস্তবজ্ঞান তাদের আছে কিনা এবং থাকলেও কতটুকু আছে তা যাচাই করে দেখতে ইচ্ছে হয়। বাধ্য হয়েই তাদের বুদ্ধির উপর ভরসা হারাতে আমরা বাধ্য। হচ্ছেও তাই।

মেয়েদের চাকরিতে ঘোরতর আপত্তির আর একটি কারণ বিয়ের পরই তারা চাকরি ছেড়ে দেয়। কিন্তু সবাই একবার নিজের নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঝালাই করে দেখুন বিয়ের পর কটি মেয়েকে তারা চাকরি ছাড়তে দেখেছেন এবং শতকরা কোন দশমিকে তাদের হিসাব হয় কিনা। বাক্যবাগীশরা নিজেদের কর্ম-ক্ষেত্র যাচাই করলেই এর সত্যতা উপলব্ধি করবেন। বিস্তর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। মেয়েদের সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ যে, চাকরি করে তারা এক পয়সাও বাড়িতে দেয় না। পরিবর্তে বিলাস-ব্যসনেই সব ফুঁকে দেয়। মধ্যবিত্ত পরিবার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা থাকলে এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্য করা চলে না। সকলের আয় ছাড়া সংসার চালানো প্রায় অসম্ভব। একজনকে বেকার বসিয়ে খাওয়ানোর লগ্ন অনেকদিন গত হয়েছে। সবাই যদি সংসারে কিছু সাহায্য করতে পারে তাহলে ভার অনেকটা লাঘব হয়। বাড়ির মেয়েও এই মনোভাব নিয়েই চাকরি করতে যায়। যতদিন সম্ভব সংসারে কিছু সাহায্য করাই তার আন্তরিক বাসনা। তাই বলছিলাম, নিজের সংসারের দিকে তাকিয়েও কি এরকম আবোল-তাবোল মন্তব্য করা চলে? ছেলে যদি সংসারের উন্নতি চায় তাহলে একই বাসনায় মেয়ের দোষ কোথায়? কিন্তু নিতান্ত হতাশ-চিত্তেই স্বীকার করতে হয় যে, নারী জয়ধ্বজা মুখে বহন করলেও অন্তরে মেনে নিতে পারিনি এবং এই বিশ শতকের শেষাশেষি পৌঁছেও নয়।

অবশ্য পাশাপাশি সুস্থ মনোভাব যে নেই তা নয়। বরং এরকম মনোভাব আছে বলেই বিজ্ঞজনদের এরকম খেয়ালিপনার

হাত থেকে রেহাই পেয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। না হলে কবেই গোটা সংসার এক বিরাট পাগলা গারদে রূপান্তরিত হতো। কিন্তু তা হয়নি এটাই যা ভরসার কথা। তাই একবার প্রাণ খুলে এদের (অতি বিজ্ঞজন-দের) উদ্দেশ্যে বলতে ইচ্ছে হয়, ঠুলি পরে নয় সাদা চোখে সবকিছু দেখে বিচার করুন।

অনেকে মানতে না চাইলেও একথা সত্যি যে, চাকরির 'কিউতে' মেয়েদেরও আজ অপেক্ষা করতে হয়। সাধারণ চাকরির কথা বাদ দিলে কতগুলি অবশ্য মেয়েদের একচেটে। কিন্তু সেখানেও ঠাঁই খুব একটা নেই। সর্বত্রই সেই প্রতীক্ষার পালা। এক-দিকে সংসারের চাপ, অন্যদিকে নিজের সমস্যা—চাকরি না পাওয়ার ভার তাই সহজেই অনুমেয়। এ অবস্থায় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বিকল্প কোনকিছু ভাববার।

বিকল্প সেই চিন্তাধারার ছোঁয়াচ ইতিমধ্যেই অনেককে স্পর্শ করেছে। চাকরি ছেড়ে কেউ কেউ আজ নেমে আসছেন ব্যবসার আঙিনায়। ভেতর থেকে হাল ধরে রাখা নয়, প্রকাশ্যেই তারা ব্যবসায় নিজেদের পটুত্ব প্রমাণ করতে চায়। এরকম একজনের দেখা পেলাম কাপড়ের স্টলে। কৌতূহল না চাপতে পেরে সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসলাম, স্টল কি আপনি চালাচ্ছেন। ছোট্ট উত্তরে তিনি জানালেন, আজ কয়েক বছর ধরে এ দোকান আমিই চালাচ্ছি। তারপর আরো কিছু কথা হলো। যার সারার্থ কিনা, ব্যবসায়ে বাঙালী মেয়েরা পিছিয়ে থাকতে চায় না এবং সুযোগ পেলে যে কোন ব্যব-সায়ে তারা যে কারো সংগে পাল্লা দিতে পারে একথা উপলব্ধি করেই তিনি দোকান নিজে চালাতে মনস্থ করেছেন। তারপর থেকেই তিনি নিয়মিত দোকানে বসছেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর বাচ্চা বাচ্চা ছেলে নিয়ে তিনি একসময়ে যে বিপদে পড়েছিলেন আজ তা থেকেও অনেকটা রেহাই পেয়েছেন। তিনি চান, আরো মেয়ে এপথে এগিয়ে আসুক। তবেই ব্যবসায়ে মেয়েদের হাত আরো শক্ত হবে।

এরকম আরো কয়েকজন রয়েছেন, দর্জি দোকান চালাচ্ছেন। এই সেদিনও এদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। আজ কিন্তু তাঁরা আর নিঃসঙ্গ নন। দেখাদেখি অনেকেই নেমে পড়েছেন ব্যবসায়ে। এমনি কয়েক-জনকে হয়তো দেখতে পাবেন স্টেশনারী দোকানে। মালপত্র বেচাকেনা থেকে সবই তারা করছে। কর্মজগতের বিস্তৃত অঙ্গনে মেয়েরা আজ নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এরকম যতই দেখি ততই আশার সঞ্চার হয়। বাঙালী মেয়েদের রুচিতে এরকম পরিবর্তনে সবাই সুখী হবেন। আমরা যে মুহূর্তে ছেলেদের চাকরির মোহ ছেড়ে ব্যবসায়ে উৎসাহ দিচ্ছি, ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েদের এরকম স্বতঃ-স্ফূর্ত প্রয়াস আমরা ঠিক ভাবতে পারিনি। অথচ এরকম একটা 'অচিন্তানীয়' জিনিস সফল হতে চলেছে। চাকরির কিউ ছেড়ে ব্যবসায়ে বাঙালী মেয়েদের প্রবৃত্তি তীব্রতর হোক—এটাই আমাদের আজকের প্রার্থনা।

প্রমীলা

আমাদের অবাঙালী বন্ধুদের প্রতি

'আমরা যাদবপুরে খুব সুবিধেজনক একটা ফ্ল্যাট পেয়ে গেছি,' জনৈকা অবাঙালী বান্ধবী একদিন আমাদের জানালেন। ভাড়া মোটে দুশো টাকা। অথচ বড় বড় ঘর, ব্যালকনি, তিনটে বেডরুম, প্রভৃতি অনেক সুবিধে আছে।'

'তা কি করে সম্ভব হল?' আমরা সমস্বরে প্রশ্ন করলাম। 'আমরা তো ফ্ল্যাট খুঁজে খুঁজে হয়রান। কই এরকম কিছু তো আমাদের দৃষ্টি বা কর্ণগোচর হচ্ছে না।'

'তোমরা কি করে পাবে?' বন্ধুটি মুখ ব্যাজার করে বললেন। 'তোমরা যে বাঙালী। তোমাদের দেশের বাড়ীওয়ালারা আজকাল আর বাঙালীদের বাড়ীভাড়া দিতে চান না।'

বাংলা দেশে, বাঙালী বাড়িওয়ালা, বাঙালীদের বাড়িভাড়া দিতে চান না। অথচ চলতি হারের নীচে অবাঙালীদের বাড়িভাড়া দিতে চান। এর চেয়ে মজার খবর আর কি হতে পারে?

—'এ শুধু আজকে কেন?' আমার বন্ধুটি এ বিষয়ে আরও আলোকপাত করলেন, 'অনেকদিন থেকেই দিচ্ছেন না। বালিগঞ্জের গৃহমালিকরা তো অনেকদিন থেকেই বাঙালীর বদলে দক্ষিণ ভারতীয়কে বাড়ি দিয়ে আসছেন। বাঙালীরা নাকি ভাড়া ঠিকমতন দেয় না। ধোঁয়া ও মশলার অতি ব্যবহারে তারা রান্নাঘরের দেয়াল মলিন করে ফেলে; অতিরিক্ত বাটনা বেটে মেঝে বিবর্ণ করে ফেলে—এ সব অভিযোগ তো কবে থেকেই শুনছি বাড়িওয়ালাদের মুখে।'

'হুঁ, বুঝতে পারছি—আমরা লোক খুব খারাপ,' আমি গম্ভীর মুখে বললাম।

'আরে, তোমাদের কথা আলাদা,' বন্ধু সহাস্যে বললেন। 'তোমরা কেন অন্য বাঙালীদের মত হতে যাবে! তোমরা তো বাংলার বাইরে মানুষ হয়েছ। সেইখানেই তোমাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে।'

—একথা ঠিক যে সাধারণভাবে বিচার করতে গেলে কলকাতার বাঙালীদের থেকে অবাঙালীদের অবস্থা অনেক ভাল। কাজেই বাড়িভাড়া তাঁরা নিয়মিত দিতে পারেন। কথার মূল্যও হয়তো তাঁদের অনেক বেশি। তাই বলে বাঙালী বাড়ি-ওয়ালাদের এমন পক্ষপাতিত্ব এবং সেই পক্ষপাতিত্ব তাঁরা সরবে ঘোষণা করে থাকেন— এমন কি অবাঙালীদের কাছেই, এটা কেমন লাগে বলুন!

আমরা সবাই ভারতবাসী—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভাষা এবং অন্যান্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা সবাই একই দেশের লোক। তাই বলে একজন বাঙালী একটি অন্য প্রদেশের লোকের সামনে গোটা বাঙালী সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করছেন, এরকম শুনলে মনটা খুব উল্লসিত হয়ে ওঠে না।

এই প্রবৃত্তি আজকাল অনেক জায়গাতেই দেখতে পাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ, বিশেষ করে বম্বে বা দিল্লি থেকে আগত বাঙালীদের মধ্যে এটি সব-চেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

কোন পাশ্চাত্য দেশ থেকে আগত বাঙালীদের তো কথাই নেই। তাঁদের দেশ, বিশেষ করে তাঁদের প্রদেশবাসীদের গায়ের রং নিয়ে পর্যন্ত তাঁরা খুঁতখুঁত করেন। সেইজন্যই বুঝি কিছুদিন পাশ্চাত্য দেশে থাকার পর অনেক বাঙালীই বিদেশী মেয়ে বিয়ে করে ফেলেন এবং চিরকালের মত ঐ দেশে থেকে যেতে চান। সেই সদ্য আগত মানুষটি অবশ্য কিছুদিন নিজের দেশে বাস করার পর, তাঁর বহির্মুখী মনকে অনেক সময় খানিকটা সংযত করতে পারেন। তাঁর মতামতের সুতীক্ষ্নতাও খানিকটা দমিত হয়।

কিন্তু লক্ষ্যের বিষয় এই যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক/বিদেশকে ঠিক ঐ

রকম ভালবেসে ফেলেন না। নিজের দেশ, বিশেষ করে প্রদেশ তাঁর কাছে সমান প্রিয়ই থাকে। অন্যের সামনে তাকে তিনি অযথা হেয় করতেও চান না।

সে যাই হোক—'কলকাতা বড় নোংরা ও প্রাচীনপন্থী। কলকাতার রাস্তায় বেরোলেই নোংরা চেহারার মানুষ আর আবর্জনার স্তূপ দেখা যায়। নিউ আলিপুরের মত জায়গাতেও ঘরে ঘরে কয়লার উনুন জ্বলছে। গ্যাস কাকে বলে এরা জানেও না।...এখানকার বাড়িগুলি বড় সেকেলে। দিল্লি ও বম্বের মত আধুনিক নয়।' —এই ধরনের উক্তি যদি বাঙালীরাই অবাঙালীদের সামনে করে বসেন, তবে কি অবাঙালী বাঙালীদের এবং কলকাতা তথা বাংলাদেশ সম্বন্ধে অতি হীন ধারণা পোষণ করবেন না?

যে সব বাঙালী তাঁদের জাতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উচ্চতর মান এবং আরও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়াসী, তাঁদের উচিত সমালোচনায় বৃথা সময় নষ্ট না করে, জাতির হিতের জন্য নানারকম উন্নতিমূলক প্রচেষ্টায় নিজেদের নিয়োগ করা। অন্ততপক্ষে সেই আলোচনাগুলি তাঁরা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন।

"কলকাতার মেয়েরা চেহারা, চালচলন ও পোষাকের ব্যাপারে বড় সাবেকী আর 'আনস্মার্ট'। 'ফ্যাশানের' কোন খবরই রাখে না" বা "কলকাতার লোকেরা শুধু কেরানী ছাড়া আর কিছু হবার যোগ্যতা রাখে না।" বাঙালীদের কাছ থেকেই উৎসাহ পেয়ে অবাঙালীরা আজকাল অতি খোলাখুলিভাবেই, এই সব কথা বলে থাকেন। এও তাঁদের মুখে আমি শুনেছি 'বাঙালীরা বড় পরশ্রীকাতর। অন্যের সম্বন্ধে এদের বড় সন্দেহ ও কৌতূহল।'

এ সব কথাই হয়তো সত্যি। কিন্তু বাঙালীরা যখন অন্যের কাছে এ সব বলেন, তাঁদের যতই উদার ও অ-প্রাদেশিক মনে হোক, এও উপলব্ধি করা যায় যে তাঁদের নিজেদের মধ্যে কোন মিল বা একতা নেই। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তাঁরা আজ হারিয়েছেন; সেই সঙ্গে স্নেহ, মমতা আর সহানুভূতিও।

অবাঙালীদের মুখে আবার এই ধরনের উক্তি আমাদের কানে বড় নির্মম ও রূঢ় শোনায়। কলকাতার একটি বড় হোটেলে এক বিরাট পার্টিতে, আমি একজন শিক্ষিত অবাঙালী ভদ্রলোককে অসংকোচে বলতে শুনেছি, 'বাঙালীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে কোনদিনই কিছু বুঝবে না। ওরা বড় কর্মবিমুখ।' তিনি বুঝলেন না সেদিন তাঁর কথায় কত বাঙালী অতি কঠোরভাবে আঘাত পেলেন। তাঁর কথা যদি সত্যি হয়েও থাকে, অপ্রিয় সত্য অনেক সময়েই ভদ্রতাবিরোধী। তাঁর নিজের প্রদেশ সম্বন্ধে, অন্য প্রদেশবাসীর মুখে এই রকম বিরূপ মন্তব্য কিন্তু তিনি কিছুতেই নীরবে সহ্য করতেন না! কিন্তু বাঙালীরা নিজেদের মধ্যে যতই বিবাদ করুক, অন্যের মুখে নিজেদের প্রতি অবজ্ঞা বা অপবাদ তারা খুব ধৈর্যের সঙ্গে এবং বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারে! আশ্চর্য এই স্বভাব আমাদের।

বাংলার স্বর্ণযুগ বহুদিন হল পার হয়ে গেছে। আজকাল সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, সমাজ-সংস্কার, কোন ক্ষেত্রেই আর হয়তো সেরকম শক্তিমান, কালজয়ী, যুগ-প্রবর্তক প্রতিভার দেখা পাওয়া যায় না। তার উপর, কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল, এবং হয়তো এখনও আছে, উদ্বাস্তু সমস্যা। রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা, সমগ্র দেশ জুড়ে রয়েছে দারিদ্র্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা। আমাদের যদি অবনতি ঘটে থাকে, বা উন্নতি না হয়ে থাকে তার কারণও যথেষ্টই রয়েছে।

আমরা যে পরিমাণে পিছিয়ে গেছি, ভারতের অন্যান্য অনেক রাজ্য, হয়তো ঠিক সেই অনুপাতে এগিয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রেও হয়তো তাঁরা আমাদের মত বিপর্যস্ত ও বিড়ম্বিত হননি। সুতরাং সব দিক দিয়েই তাঁরা অনেক বেশি সুষ্ঠুভাবে জীবনটাকে চালনা করতে পারছেন।

কিন্তু এটা তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, প্রকাশ্যভাবে আমাদের অভাবগুলি নিয়ে সমালোচনা করলে আমরা মনে দুঃখ পেতে পারি। বাঙালী স্বভাবতই স্পর্শকাতর; তাছাড়া বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁরা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে অনেকাংশেই সে, হয়তো নিরুপায়, তবু প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও সে হাল ছেড়ে দেয় নি।

তাঁদের একথাও স্মরণে রাখা উচিত যে অন্য প্রদেশে গিয়ে বা অন্য প্রদেশবাসীর সামনে, আমরা, সাধারণত কোনও বিরূপ বা কঠোর মন্তব্য করি না (যদিও নিজের জাতীয় দুর্বলতাগুলি অন্যের সামনে মেলে ধরতে আমরা একটুও দ্বিধা বোধ করি না)। আমাদের দুর্দিন যতই ঘনিয়ে আসুক না কেন, এই সূক্ষ্ম বোধগুলি আমাদের স্বভাব থেকে বোধহয় কোনদিনই লুপ্ত হবে না।

বরঞ্চ অবাঙালীদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের সদগুণগুলি সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়েছি, এবং অনেক সময়ে সেগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি। উত্তরপ্রদেশবাসীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রাণের প্রাচুর্য, বম্বেবাসীর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, ভদ্রতা ও মার্জিত ব্যবহার, পাঞ্জাবীদের কর্মতৎপরতা, দক্ষিণ ভারতীয়ের উচ্চশিক্ষিত মন, মেধা ও কলানৈপুণ্য, এসবে কি আমরা অতি প্রকাশ্যভাবেই উদ্বুদ্ধ হই না?

অবাঙালীরাও কি তেমনি পারেন না আমাদের দোষগুলি বাদ দিয়ে আমাদের গুণগুলি অনুসন্ধান করে, তার মধ্যে প্রেরণার উৎস পেতে?

কলকাতায় বহুদিন যাবৎ এবং বংশানুক্রমে বাস করছেন এমন অনেক অবাঙালীই তো তাই পেরেছেন, আর বাঙালীদের হয়তো তাঁরা অনেকটা চিনতেও শিখেছেন। বাঙালীদের সহৃদয়তা, আন্তরিকতা ও বন্ধুভাব তাঁদের চিত্ত জয় করেছে, এবং আমাদের সহজ, সরল ব্যবহার, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, ভাবপ্রবণতা, এসবও তাঁদের মুগ্ধ করেছে তা আমরা টের পাই। কলকাতার বিশালতা, তার বৈচিত্র্য, তার বিরাট ঐতিহ্য, সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে নানা সংস্কৃতিমূলক ও গঠনমূলক কার্যধারা, সঙ্গীত ও সাহিত্যে উচ্চমানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান, প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা গর্ব অনুভব করেন। নবাগত অবাঙালীরাও কি পারেন না তাঁদের এই মনোভাব অনুসরণ করতে! তাহলে তাঁদেরও আর একথা মনে হবে না যে বাংলাদেশে ও তার রাজধানী কলকাতার গৌরব করার মতো কিছু নেই, তখন তাঁরা বরং এ কথাটাই হৃদয়ঙ্গম করবেন যে অনেককিছু হারিয়েও এখনো এই হৃতশ্রী আর বিশৃঙ্খল কলকাতাই ভারতের সাংস্কৃতিক জগতের প্রাণকেন্দ্র!

—জয়া চক্রবর্তী

Blue Seal TALC
আপনার সারা গা শুচি-স্নিগ্ধ রাখবে—
হালকা হাওয়ার মতো সোহাগ জড়ানো,
ও-ডি-কলোনের মতো গন্ধমধুর এই পাউডার
ব্লু সীল ট্যাল্‌ক হেক্সাক্লোরোফিন যুক্ত
এই পাউডার যেমন মোলায়েম ও আরামের তেমনি
ব্লু সীল ট্যালকই আপনার চাই। আমাদের এই গরমের দেশে গায়ের
জীবাণুর হাত থেকে সারা গা বাঁচিয়ে রাখে □ ঘাম আটকানো দায়, আর ঐ ঘাম থেকেই গায়ে দুর্গন্ধ হয় যার মূলে থাকে একরকম
জীবাণু। ব্লু সীল ট্যাল্‌ক আপনার ত্বক এই জীবাণুর হাত থেকে বাঁচায়, কেননা এতে
আছে হেক্সাক্লোরোফিন, যা গায়ের দুর্গন্ধ দূরকারী হিসেবে সারা দুনিয়ায় স্বীকৃতি
পেয়েছে □ সুরভিত ব্লু সীল ট্যাল্‌ক সারাদেহে নিয়মিত ছড়িয়ে দিন...আপনাকে
তাজা রাখবে, আরাম দেবে এবং জীবাণুর হাত থেকে আপনার ত্বককে বাঁচাবে।
ব্লু সীল ট্যাল্‌ক—চীজব্রো-পণ্ডস ইনক-এর তৈরী আর একটি উৎকৃষ্ট ট্যালক
চীজব্রো-পণ্ডস ইনক (সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

শিল্পী : সমরেশ চৌধুরী

প্রদর্শনী পরিক্রমা

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে শিল্পী গোপাল ঘোষ ২৬ জুন থেকে ১ জুলাই তাঁর জল-রঙের ছবির একটি প্রদর্শনী করলেন। প্রায় পঞ্চাশখানির মত ছবি। দু-তিনখানি পুরোনো নব্যভারতীয় প্রথায় আঁকা ছবি ছাড়া সবই প্রায় সদ্যাঅঙ্কিত। পুরনো ছবির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের রীতিতে আঁকা ওয়াশের ছবি চমৎকার লাগল। সদ্যআঁকা ছবিগুলি সবই প্রায় নিসর্গ দৃশ্য, কুটীর, পাখি, পার্বত্য দৃশ্য, নদীবক্ষে নৌকা বা নিঃসঙ্গ গাছ। তুলি চালনার ক্ষিপ্রতা যত বেশী চোখে পড়ে ছবি তৈরীর দিকে গভীর চিন্তা তত বেশী নজরে আসে না। এ যেন জরুরী প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি ছবি শেষ করার দায়িত্ব পালন। এই ক্ষিপ্রতা কোথাও কোথাও নিছক ক্যালিগ্রাফি এবং এক ধরনের বিমূর্ত রীতি ঘেঁষা ছবি সৃষ্টি করেছে। যেমন ২৩ নম্বরের কুঁড়ে-ঘরের ছবি। ৭ নম্বরের ছবির পাহাড় ও বলাকাশ্রেণীর সজ্জায় কম্পোজিশনের একঘেয়েমি কাটাবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। একটি মাত্র নৌকার ছবি ছাড়া বাকিগুলি সবই যেন প্রায় ফুটপাথের রেলিং-এর সেই একরঙা ছবির মত পানসে হয়ে এসেছে। কোথাও আবার পর্ণকুটির বা দিগন্তবিস্তৃত মাঠের ছবি বা তরুশ্রেণীর ছবিতে রঙের মোটা ছাপের জোরালো চিহ্নটুকুই কিছুটা মুন্সিয়ানার ছাপ দিয়ে ছবি তৈরীর কর্তব্য সমাধান করেছে। প্রচুর ছবি, উজ্জ্বল রঙ কিন্তু সমগ্র প্রদর্শনী দেখার পর মনের তৃপ্তি ঘটে না। মনে হয় এত তাড়ার কি প্রয়োজন ছিল।

●

সমরেশ চৌধুরী আর সুবল সাহা অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ২৯ জুন থেকে ৭ জুলাই তাঁদের ভাস্কর্যের এক যৌথ প্রদর্শনী করলেন। এঁরা দুজনেই সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয় থেকে শিল্পশিক্ষা লাভ করেছেন। সুবলচন্দ্র সাহা বর্তমানে সেখানেই শিল্প-শিক্ষকতা করছেন এবং সমরেশ চৌধুরী কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিল্প-শিক্ষকতার কাজ করছেন; তাছাড়া তিনি অ্যাকাডেমি স্টুডিওর পরিচালনার দায়িত্বও পালন করে থাকেন। এঁদের উভয়ের কাজের মধ্যেই আধুনিক ভাস্কর্যের এতরকম স্টাইলের ছাপ পাওয়া যায় যে, উভয়ের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব খুঁজে বার করা শক্ত হয়ে পড়ে। হেনরী মুর, ব্রাঙ্কুসি রামকিঙ্কর এবং আরো অনেকের কাজের অনুরূপ কাজ দেখতে পাওয়া গেল। সমরেশ চৌধুরীর দু-একটি মুখাকৃতি, 'টর্সো' এবং 'ফিগার...১' উল্লেখযোগ্য। সুবল সাহার কাজের মধ্যে 'বুল' মূর্তিটিই সবচেয়ে বলিষ্ঠ বলে মনে হয়। মহাত্মা শিশিরকুমার, শরৎচন্দ্র ও জওহরলাল নেহরুর ছোট প্রতিকৃতিগুলি 'টর্সো...১' মন্দ হয় নি।

●

দেরাদুনের দুন স্কুলের শিল্পশিক্ষক এবং একদা ক্যালকাটা গ্রুপের অন্যতম শিল্পী রথীন মিত্রের ত্রিশখানি স্কেচ ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টারে ৩ জুলাই থেকে সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শিত হল।

সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপনান্তে শ্রীমিত্র ১৯৪৯ সালে ক্যালকাটা গ্রুপে যোগ দেন। পরে কলকাতায় ও ভারতের বিভিন্ন শহরে এবং ভারতের বাইরেও তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। নিসর্গ দৃশ্যের প্রতি আকর্ষণে শিল্পী নানা দেশ ভ্রমণ করেছেন। তারই কিছু নিদর্শন বর্তমান প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে। বেনারস, লক্ষ্ণৌ, দেরাদুন, মুসৌরি, কাশ্মীর প্রভৃতি জায়গার শহর ও পার্বত্য দৃশ্য কলমের সরল রেখায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তিনি।

●

৮ থেকে ১৮ জুলাই কেমাল্ড গ্যালারীতে সোমনাথ হোড়ের ছাব্বিশখানি এচিং-এর প্রদর্শনী হচ্ছে। নবীন গ্রাফিক-শিল্পীদের মধ্যে সোমনাথ হোড়ের পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই। বেশ কিছুকাল যাবৎ তিনি দিল্লী, বরোদা ও শান্তিনিকেতনে শিল্প শিক্ষকতা করেছেন। স্বদেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়েছে।

নবীন গ্রাফিক শিল্পধারার অন্যতম প্রধান লক্ষণ যে আঙ্গিকের উৎকর্ষতা, সে দিকে শিল্পীর দৃষ্টি সজাগ, এবং এদিক দিয়ে তাঁর সবকটি ছবিরই কারুকার্যের মান অতি উন্নত। বিষয়বস্তু বা ভাবের দিক দিয়ে বৈচিত্র্য বা নূতনত্বের ছাপ ততটা বিস্ময়কর কিছু না হলেও 'ড্রিম', 'এনচান্টমেন্ট' কিম্বা 'দি ফ্লাওয়ার' বা 'গ্রিফ' ছবিগুলির বিশিষ্ট মুড ভাল লাগে। 'চাইল্ড' এবং 'লোটাস' ছবির আঙ্গিকের বাহাদুরী লক্ষ্য করার মত। শ্রীহোড় পুরোপুরি বিমূর্ততার দিকে না ঝুঁকে ফিগারেটিভ ধারাটাকে আধুনিক প্রকাশভঙ্গীর মত করে ব্যবহার করায় অনেক সময় দুর্বোধ্যতার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন।

—চিত্ররসিক

শিল্পী : রথীন মিত্র

অভিযুক্ত

কাহিনী

গী দ্য ম'পাসা

আমি লাবার্বেকে বললাম—এইমাত্র তুমি ছ'টি অক্ষর উচ্চারণ করলে শূকর মোরীন—আচ্ছা, মোরীনের নামের আগে এই 'শূকর' বিশেষণটি বাদ দিয়ে কখনো উল্লেখ শুনি না কেন?

লাবার্বে, একজন ডেপুটি, এই কথায় আমার মুখের দিকে পেঁচার মত চোখ করে তাকিয়ে বলল—তুমি লা রোশেলের লোক হয়ে মোরীনের কাহিনী জানো না বলতে চাও? অতঃপর লাবার্বে তার হাতটি রগড়ে নিয়ে বলতে শুরু করে—

—মোরীনকে ত' জানো? না, জানো না? কোয়ে দ্য লা রোশেলে তার প্রকাণ্ড কাপড়ের দোকান?

—হাঁ, হাঁ, খুব জানি।

—বেশ, তারপর শোনো, ১৮৬২ কিংবা ৬৩ হবে মোরীন প্যারিসে এক পক্ষকাল ফুর্তি করে কাটানোর উদ্দেশ্যে গেল। কিন্তু তার অছিলা হল নতুন মালপত্র সংগ্রহ করতে হবে। আর একটি গ্রাম্য দোকানদারের পক্ষে প্যারিসে পনের দিন কাটানো যে কি ব্যাপার বুঝতেই পারো, রক্ত একেবারে টগবগ করে ওঠে। প্রতি সন্ধ্যায় থিয়েটার, স্ত্রীলোকদের পোষাক গায়ে এসে খস্‌খস্ করে লাগে। আর বিরামবিহীন উত্তেজনা, একেবারে পাগল হয়ে যাওয়ার জোগাড়। আঁটসাঁট পোষাক-পরা নর্তকী, খাটো পোষাকে সজ্জিত অভিনেত্রী, সুডৌল পদযুগল, পরিপুষ্ট কাঁধ, সবই প্রায় নাগালের মধ্যে। শুধু সাহস করে ধরাছোঁয়া যায় না। আর খাওয়া-দাওয়ার এমনই ব্যবস্থা যে কদাচিৎ কদন্নের স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। প্যারিস ছাড়বার সময় হৃদয়টা কানায় কানায় উচ্ছল হয়ে থাকে আর মনের ভেতরে জেগে থাকে চুম্বনের তৃষ্ণা। ঠোঁটের আগায় যে কামনা ঝরে পড়ে তার আস্বাদে আকুল হয়ে থাকে সমস্ত দেহমন-প্রাণ।

এইরকম মানসিক অবস্থায় মোরীন লা রোশেলে ফেরার জন্য আটটা-চল্লিশের রাতের গাড়ির টিকিট কাটল। স্টেশনের ওয়েটিং রুমের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো মোরীন পায়চারী করতে থাকে, এমন সময় তাকে সহসা থামতে হল। চোখের ওপর একটি তরুণী এক বৃদ্ধাকে প্রীতিভরে চুম্বন করছে। মোরীন মৃদু গলায় আওড়ায়—হা ভগবান! কি আশ্চর্য সুন্দরী মেয়েটি!

মেয়েটি বৃদ্ধাকে বিদায় জানিয়ে 'গুড-বাই' উচ্চারণ করে ওয়েটিং রুমের ভেতর ঢুকল, মোরীন তাকে অনুসরণ করল, মেয়েটি তারপর যখন প্লাটফর্মে বেরিয়ে পড়ল, মোরীনও পিছু নিল; এরপর মেয়েটি ট্রেনের একটি খালি কামরায় দেখে উঠে পড়ল; মোরীনও সেই কামরাতেই গিয়ে উঠল। এক্সপ্রেস ট্রেনে যাত্রীর সংখ্যা বেশী ছিল না, ইঞ্জিনের বাঁশী বাজল, ট্রেন ছাড়ল। উভয়ে একা। মোরীন ত' চোখ মেলে মেয়েটিকে গিলতে লাগল। মেয়েটির বয়স উনিশ কিংবা কুড়ি হবে, গায়ের রঙ উজ্জ্বল, দীর্ঘাঙ্গী, আর দেখতেও চমৎকার সুশ্রী। মেয়েটি পায়ে একটি রেলগাড়ির কম্বল জড়িয়ে তার সীটে দেহটা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

মোরীন মনে মনে প্রশ্ন করে—কে এই রমণী? তার মনে হাজার রকমের অনুমান, হাজার পরিকল্পনা ঘুরপাক খেতে থাকে। সে আত্মগত হয়ে ভাবে—ট্রেনযাত্রায় ত' কত-নব আশ্চর্য ঘটনা ঘটে, হয়ত আমার অদৃষ্টে এইবার ঘটবে। কে জানে? এই জাতীয়

ভাগ্যোদয় যখন ঘটে, তখন দ্রুততালেই ঘটে, হয়ত আমাকে কিঞ্চিৎ উদ্যমশীল হতে হবে। দাঁতন কি বলেননি—"ঔদ্ধত্য, আরো ঔদ্ধত্য, সর্বদাই ঔদ্ধত্য"। দাঁতন যদি নাই বলে থাকেন, মিরাবো বলেছেন, তাতে কিছু এসেটেসে যায় না। আমার আবার যে ঔদ্ধত্যের অভাব, সেইখানেই মুশকিল। ও যদি সব জানা যেত, যদি মানুষের মনের ইচ্ছা বুঝে নেওয়া যেত। আমি বাজী রেখে বলতে পারি, প্রতিদিনই মানুষের সামনে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয় শুধু জানা যায় না। একটু সামান্য অঙ্গভঙ্গীতেই হয়তো জানা যাবে ও কি চায়।

"এরপর সে এমন সব সমন্বয় কল্পনা করতে থাকে তার ফলে বিজয় সুনিশ্চিত। সে কয়েকটা শৌর্যপূর্ণ কীর্তি কল্পনা করে, কিংবা মেয়েটির জন্য সামান্য কিছু সেবাযত্ন, একটা প্রাণোচ্ছল সংলাপ, যার পরিণতিতে সেই ঘোষণা—যার পরিণতিতে—মানে যা কল্পনা করা যায়—

"কিন্তু কোনো সুযোগই মেলে না; কোনো ছল-ছুতো নয়। মোরীন অনুকূলপরিস্থিতির প্রতীক্ষায় থাকে, আর এদিকে হৃদয় বিধ্বস্ত এবং মন আথাল-পাতাল। রাত্রি অবসান হল, সুন্দরী মেয়েটি তখনও নিদ্রামগ্ন, আর মোরীন তার নিজের সর্বনাশের চিন্তায় মগ্ন। প্রভাত হল, অচিরে প্রথম সূর্যরশ্মি আকাশে ভেসে উঠল, টানা সুস্পষ্ট কিরণ লেখা ঘুমন্ত মেয়েটির মুখে প্রতিফলিত হল, ফলে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে উঠে বসে পল্লীর দৃশ্য দেখল, তারপর মোরীনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। বেশ খুশি-

খুশি মেয়ের মতই হাসল। তার মুখে একটা আকর্ষণীয় উজ্জ্বলতা। মোরীন কেঁপে উঠল। নিঃসন্দেহে এই হাসি তারই উদ্দেশে। এ এক সুস্পষ্ট আমন্ত্রণ। এই ইঙ্গিতটুকুর অপেক্ষায় সে ছিল। এই হাসির ভাষার পাঠোদ্ধার করে জানা যায়—কি মূর্খ! কি বোকারাম! কি হাঁদা, কি গর্দভ রে বাবা! সারারাত একেবারে খাম্বার মত বসে কাটালে!—আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, আমি কি সুন্দরী নই? আর তুমি ঐভাবে সারারাত বসে রইলে? এমন এক লাবণ্যময়ী মেয়ের সঙ্গে একা কাটালে? কি হাঁদারাম তুমি!

মেয়েটি তখনও হাসছে। মোরীন ওর দিকে তাকিয়ে দেখল তখনও হাসছে। এখন আর মৃদু হাস্য নয়, বেশ জোরেই হাসতে থাকে। একটা যুৎসই কিছু বলার জন্য উসখুস করে মোরীন। যা হয় একটা কিছু। কিন্তু কিছুই সে ভেবে পায় না, একেবারে

কিছু নয়। তারপর সে কাপড়ওয়ালার সাহস সঞ্চয় করে মনকে সম্বোধন করে বলে—যা হয় হোক গে, যা থাকে কপালে—এই ভেবে সে সহসা, এতটুকু ইঙ্গিত না দিয়ে, সোজা ওর দিকে এগিয়ে গেল, বাহু প্রসারিত, ঠোঁটদুটি কুঞ্চিত এবং মেয়েটাকে বেশ করে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে বসল।

মেয়েটি ত' ঠিকরে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করতে থাকে—কে কোথায় আছো, রক্ষা করো। বাঁচাও!

আতংকে সে প্রাণপণে চীৎকার করে, তারপর সে কামরার দরজা খুলে, বাইরে তার হাত নাড়তে থাকে। এরপর ভয়ে দিশে-হারা হয়ে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ার উদ্যোগ করে। এদিকে মোরীন বিভ্রান্ত হয়ে সুনিশ্চিত ধারণা করেছে যে, মেয়েটি লাফিয়ে পড়বেই, তাই তার স্কার্টের প্রান্ত ধরে টেনে খালি বলতে থাকে—"ও! মাদাম! ও! মাদাম—"

গাড়ির স্পীড কমল, তারপর একেবারে থেমে গেল। তরুণীর এই আকুল আবেদনে দুজন গার্ড দৌড়ে এল। মেয়েটি ত' তাদের বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। সে শুধু বিড়-বিড় করে বলে—'ঐ লোকটা, আমাকে—, আমাকে ঐ লোকটা—' তারপর সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

মোজে স্টেশনে পেঁছাতে দারোগা এসে মোরীনকে গ্রেপ্তার করল। পাশবিকতার শিকারের চৈতন্য সঞ্চারিত হতে সে তার অভিযোগ সবিস্তারে বলল, আর পুলিশ সব লিখেটিখে নিল। হতভাগ্য কাপড়ওলা গভীর রাতে বাড়ি ফিরতে পারল, তার কপালে তখন প্রকাশ্য স্থানে শ্লীলতাহানির দায়ে মামলা দায়ের হয়েছে।

।। দুই ।।

"আমি সেই সময় 'ফানাল দ্য সারেনতে' পত্রিকার সম্পাদক, মোরীনের সঙ্গে প্রতি-দিন কাফে দু কমার্সে আমার দেখা হত। এই দুঃসাহসিক দুর্ঘটনার পরদিন ও আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। কি যে করবে তার কুলকিনারা পাচ্ছিল না। আমিও আমার মতামত তার কাছে গোপন করিনি, তবে ওকে এ-কথাও বললাম: "তুমি একটি আস্ত শুকর বই কিছু নয়, কোনো ভদ্র-মানুষ এরকম কাণ্ড করে না।"

"সে কাঁদতে থাকে। ওর স্ত্রী ওকে ধরে ঠ্যাঙানী দিয়েছে, ওর ব্যবসাপত্র মাটি হওয়ার জোগাড়, ওর নাম একেবারে গাড্ডায় পড়ে গেল, ওর সম্মান মর্যাদা সব ধুলিসাৎ। বন্ধুবান্ধবরা অসন্তুষ্ট হয়ে ওর দিকে আর তাকায় না। পরিশেষে, আমার মনে করুণা হল, আমি আমার সহযোগী বন্ধু রিভেটকে পরামর্শের জন্য ডাকলাম। রিভেট লোকটি বড় শ্লেষপরায়ণ, তবে ভারী বুদ্ধিমান ক্ষুদে মানুষ।

"রিভেট পরামর্শ দিল পাবলিক প্রসি-কিউটারের সঙ্গে দেখা করতে, তিনি আমার বন্ধু। মোরীনকে তাই বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম, তারপর ছুটলাম সেই হাকিমের কাছে। তিনি বললেন—যে-মেয়েটির এইভাবে শ্লীলতা-হানি ঘটেছে, তার বয়স কম, মামজেল আঁরিয়েত বোনেল তার নাম। সে সম্প্রতি প্যারিস থেকে গভর্নেসের সার্টিফিকেট পেয়েছে। মোজে ওর মামা-মামীদের সঙ্গে ছুটি কাটিয়েছে। এ'রা খুব সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। ফলে মোরীনের কেসটি বেশ গুরুতর আকার ধারণ করেছে, কারণ মামাই নালিশ ঠুকেছেন। পাবলিক প্রসিকিউটার অবশ্য শেষপর্যন্ত মামলাটি ছেড়ে দিতে রাজী আছেন যদি অভিযোগ প্রত্যাহৃত হয়, আমাদের সেই চেষ্টা করতেই তিনি বললেন।

"আমি মোরীনের বাড়ি গিয়ে দেখি, বেচারী উত্তেজনা এবং লাঞ্ছনায় পীড়িত হয়ে পড়েছে। ওর দীর্ঘাঙ্গী বিশালাকৃতি কিঞ্চিৎ দাড়িবিশিষ্ট স্ত্রী ত' দিনরাত মোরীনকে গাল পাড়ছে। আমাকে মোরীনের কামরাটা দেখিয়ে দিয়ে চড়া গলায় বলল : ও, আপনি সেই শুকর মোরীনকে দেখতে চান, ঐ যে সোনার চাঁদ শুয়ে আছেন।

"তারপর কোমরে হাতদুটো রেখে বিছানার সামনে বসল। আমি মোরীনকে অবস্থাটা কেমন দাঁড়িয়েছে বললাম। মোরীন আমাকে অনুনয় করে বলল—তুমি ভাই ওর মামা-মামীদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করো। কাজটা বেশ কঠিন, আমি তবু ভার নিলাম। আর হতভাগা মোরীন বারবার বলতে থাকে—বিশ্বাস করো ভাই, আমি ওকে চুমো খাইনি। সত্যি বলছি, ওসব করিনি। আমি দিব্য গেলে বলতে পারি।

"আমি জবাবে বললাম, ও একই ব্যাপার। তুমি একটি আস্ত শুকর ছাড়া আর কিছু নও।—ও আমাকে যথাযোগ্য কাজে লাগানোর জন্য আমার হাতে এক হাজার ফ্রাঁ দিল। আঁরিয়েতের বাড়ি আমার একা-একা যেতে সাহস হল না, তাই রিভেটকে অনেক বলে-কয়ে সঙ্গে নিলাম। রিভেট রাজী হল, তবে বলল যে, এখনই চলো, কারণ, বিকালের দিকে লা রোশেলে তার কি একটা কাজ আছে।

"অতএব ঘণ্টাদুই পরে আমরা একটি চমৎকার পল্লী-আবাসের দোরে গিয়ে ঘণ্টা বাজালাম। একটি সুন্দরী মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল, নিঃসন্দেহে এই মেয়েটিই সেই তরুণী। আমি রিভেটকে মৃদু গলায় বললাম, এতক্ষণে মোরীনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি।

"মেয়ের মামা মঁসিয়ে তনোলে আমাদের 'দি ফানাল' পত্রিকার একজন গ্রাহক এবং আমাদেরই ধর্ম-সম্প্রদায়ের। একেবারে উদার বাহু মেলে তিনি অভ্যর্থনা করলেন, অভি-নন্দিত করলেন এবং আমাদের আনন্দ কামনা করলেন। তাঁর গৃহে একজোড়া সম্পাদককে পেয়ে তিনি ভারী খুশি। আর রিভেট আমাকে চুপি চুপি বলল—মনে হয় শুয়োর মোরীনের ব্যাপারটা আমরা মীমাংসা করতে পারব।

তাঙ্গীটি ঘর থেকে চলে গিয়েছে, আমি এই অবসরে সেই অস্বস্তিকর বিষয়টি উত্থাপন করলাম। আমি তাঁর চোখের ওপর কেলেঙ্কারীর ছবিটা তুলে ধরলাম। এইরকম একটা ব্যাপার জানাজানি হলে তরুণী মেয়েটির সুনাম অনেক কমে যাবে। কেউই একটা সামান্য চুম্বনেই যে ঘটনার অবসান ঘটেছে, তা বিশ্বাস করবে না। ভদ্রলোক ভালোমানুষ, তিনি কিছুতেই প্রতিশ্রুতি করতে পারছিলেন না। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করে তিনি কিছু বলতে পারবেন না। স্ত্রী বাড়ি নেই, সেই সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরবেন। সহসা তিনি বিজয়ীর দীপ্ত ভঙ্গীতে বললেন, দেখুন। আমার মাথায় একটা চমৎকার আইডিয়া এসেছে। আপনারা আজ রাতে এখানে থাকবেন, এখানেই শোবেন। তারপর আমার স্ত্রী ফিরে এলে আশা করি একটা নিষ্পত্তি করতে পারব।

"রিভেট প্রথমটা আপত্তি করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শুকর মোরীনকে বিপদ-মুক্ত করার অভিপ্রায়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল। মাতুল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ভাগ্নীকে ডাকলেন। প্রস্তাব করলেন যে অতঃপর আমরা বাগানে বেড়াব—মুখে বললেন : গুরুতর বিষয়াবলী সকালে আলোচনা করা যাবে।"

রিভেট আর উনি রাজনীতি আলোচনায় মেতে উঠলেন, আর আমি এবং সেই মেয়েটি একটু পিছিয়ে পড়লাম। মেয়েটি সত্যি চমৎকার। অতি চমৎকার। অতিশয় সতর্কতা-সহকারে আমি তার ট্রেন-অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম, ওকে আমার দলে টানার চেষ্টা করলাম। মেয়েটি মোটেই বিভ্রান্ত না হয়ে আমার কথাগুলি বেশ মন দিয়ে শুনতে লাগল। আগাগোড়া ব্যাপারটি সে উপভোগ করেছে অনেকটা এইরকম ভাব।

আমি ওকে বললাম, ভেবে দেখুন মামজেল সমস্ত ব্যাপারটি আপনার পক্ষে কতখানি অপ্রীতিকর হবে। আপনাকে আদালতে হাজির হতে হবে। সবাই তেরছা চোখে আপনার দিকে চেয়ে থাকবে, সকলের সামনে আপনাকে এজেহার দিতে হবে সাধারণের সামনে রেলের কামরার সব ঘটনা খুলে বলতে হবে। আমরা আপোষে কথা বলছি জানবেন। আপনার কি মনে হয় যে, লোকজন ডাকাডাকি করার চেয়ে ঐ হতভাগা মচ্ছারটাকে যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে আপনার পক্ষে কামরা পালটানোই ভালো ছিল?

"মেয়েটি হাসতে লাগল, তারপর জবাবে বলল, আপনি যা বলছেন সবই ঠিক কথা, কিন্তু কি আর করার ছিল! আমি ভয় পেয়েছিলাম। আর ভয় পেলে কেউ কি কোনো যুক্তির ধার ধারে? অবস্থাটা যে-মুহূর্তে বুঝেছি, তখনই মনে মনে দুঃখ বোধ করেছি, হাঁকডাক করেছি বলে। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। জানেন, ইডিয়টটা আমার ঘাড়ের ওপর একেবারে পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল, কথা নেই বার্তা নেই, চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। ও যে কি চায় আমার কাছে, তা-ও আমি জানতাম না।

"মেয়েটি আমার মুখের দিকে সোজা তাকালো, তার এতটুকু নার্ভাস ভঙ্গী নেই, আতংকের ভাব নেই। আমি মনে মনে বললাম, মেয়েটা মজার মেয়ে, শুয়োর

মোরীন কি ভুলটাই না করেছে। আমি রসিকতা করে বলতে লাগলাম, 'মামজেল স্বীকার করুন যে, বেচারী ক্ষমার যোগ্য। আপনার মতো এমন একটি সুন্দরী মেয়ের সামনে বসে চুমা খাওয়ার বৈধ আবেগ সহজেই উদিত হবে এ আর বিচিত্র কি!

"মেয়েটি এই কথায় আরো বেশী হাসতে লাগল—তার দাঁত দেখা গেল। সে বলল—মঁসিয়ে, কামনা আর ক্রিয়ার মধ্যে কিঞ্চিৎ দূরত্বের স্থান আছে। কথাটা একটু মজার, বেশ স্পষ্টও নয়। আমি একেবারে হঠাৎ বলে উঠলাম, বেশ ধরুন আমি যদি এখন আপনাকে চুমা খাই, আপনি কি করবেন?

"মেয়েটি একটু থেমে আমার আপাদ-মস্তক দেখে নিল, তারপর বলল, ওঃ, আপনি! সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার!

"আমি বেশ পরিষ্কারই জানতাম যে, ব্যাপারটি এক নয়, কারণ, আমাকে আমার পাড়ার সবাই 'সুদর্শন লাবারবে' বলত। তখনকার কালে আমার বয়স সবে ত্রিশ। তবু আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, দয়া করে বলুন কেন?

"মেয়েটি কাঁধ নেড়ে বলল, এত সোজা! আপনি ত' আর ওর মত নির্বোধ নন—তারপর আমার দিকে চটুলভঙ্গীতে তাকিয়ে বলল, আর দেখতেও অমন কুৎসিত নন।

"আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কোনো-রকম নড়াচড়ার উদ্যোগ করার আগেই আমি ওর গালে একটি ভরাট চুমা বসিয়ে দিলাম।

মেয়েটি লাফিয়ে সরে গেল। তখন অবশ্য অনেক দেরী হয়ে গেছে। তারপর বলল, আপনি ওর মত লাজুকও নন। তবে, আর এরকম করবেন না কিন্তু।

"আমি বেশ অপরাধীর মত মুখ করে একটু নীচু গলায় বললাম, ওঃ মাদমজেল! আমার যদি কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে সে হল মোরীনের মত সমান অভিযোগে ম্যাজিস্ট্রেটের কাঠগড়ায় হাজির হওয়া।

"সে প্রশ্ন করল, কেন?

"আমি তার মুখের পানে বেশ ধীরভাবে তাকিয়ে বললাম, কারণ, জীবিত-প্রাণীদের মধ্যে আপনি এক অত্যাশ্চর্য সামগ্রী। আপনার প্রতি বলপ্রয়োগ করা আমার পক্ষে সম্মান ও গৌরবের বস্তু। আর আপনাকে দেখার পর, সবাই বলাবলি করবে—লাবারবের যা হয়েছে সে তার প্রাপ্য—তবে লোকটা ভাগ্যবান বটে।"

"মেয়েটি আবার প্রাণভরে হেসে উঠল, বলল—আপনি ত' ভারী মজার মানুষ! এই 'মজার' কথাটি শেষ করতে না করতেই আমি তাকে আমার দুটি হাতে জড়িয়ে যেখানে একটু ফাঁকা জায়গা পেয়েছি, সেখানেই নিবিড়ভাবে চুমা খেতে লাগলাম, কপালে, চোখে, মাঝে মাঝে ঠোঁটে, গালে, প্রকৃতপক্ষে মাথার প্রায় সর্বত্র, যেসব অংশ অনাবৃত রাখতে বাধ্য হয়েছিল, সেইসব জায়গায়, তার বাধা সত্ত্বেও, অন্য অংশেও তার প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিলাম।

"অবশেষে সে আপনাকে মুক্ত করে নেয়, তারপর লজ্জারাঙা মুখ বেশ ক্রোধভরে বলল—মঁসিয়ে, আপনি অতি অভদ্র, আপনার কথায় কান দিয়েছি বলে আমি দুঃখিত।"

"আমি কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হয়ে ওর হাত-দুটি ধরে আমতা আমতা করে বলি—আমি মাফ চাইছি মামজেল। আমি আপনাকে বিরক্ত করেছি, আমি পশুর মত কাজ করেছি। আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না, আপনি যদি জানতেন—"

"আমি একটা অজুহাত সৃষ্টি করার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম, কয়েক মুহূর্ত পরে মেয়েটি বলল—আমার জানবার কিছুই নেই মঁসিয়ে। ইতিমধ্যে আমি একটা অছিলা খুঁজে পেলাম—আমি বললাম—মামজেল, আমি আপনাকে ভালোবাসি।

"মেয়েটি সত্যি অবাক হয়ে গেল। সে আমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল, আর আমি বলতে লাগলাম—হাঁ, মামজেল! আমার কথাটা দয়া করে শুনুন, আমি মোরীনকে চিনি না, তার জন্য আমার কিঞ্চিৎমাত্র মাথাব্যথা নেই। তার যদি বিচার হয় এবং তাকে যদি ইতিমধ্যে জেলখানায় আটক করে, তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। গত বছর আমি আপনাকে এইখানে দেখেছি, আর সেই অবধি এমনই আকুল হয়ে আছি যে, আপনার চিন্তা আমাকে এক মুহূর্ত নিষ্কৃতি দেয়নি। আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমার কিছুই এসে যায় না। আপনাকে আমার পরম রমণীয় মনে হয়েছে, আপনার স্মৃতি আমাকে এমনই পেয়ে বসেছে যে, আর একবার আপনাকে দেখার বাসনা ছিল, তাই ঐ নীরেট মোরীনের ব্যাপারটিকে ছুতো করে আমি এইখানে এসেছি। ঘটনাচক্রে আমি যথাযোগ্য সম্মান রাখতে পারিনি, তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

"আমার চোখে সে বোধহয় সত্যের সন্ধান পেল, তাই আবার হাসার উদ্যোগ করল। সে মৃদু গলায় বলল—আপনি একটি প্রকান্ড ভন্ড! আমি কিন্তু আমার হাত দুটি তুলে বেশ আন্তরিকতার সুরে বললাম—(আমার বিশ্বাস সত্যি আন্ত-রিকতা ছিল)—শপথ করে বলছি আমি সত্য কথা বলছি!

"সে শুধু বললে—তাই নাকি!

"আমরা দুজনে একা, পুরোপুরি একাকী। রিভেট আর ওর মামা বাঁকের মাথায় অদৃশ্য হয়েছেন। আমি ওর প্রতি আমার প্রেম ঘোষণা করলাম। আমি ওর হাত দুটি মুচড়ে এবং চুম্বন করে যখন প্রেম বিঘোষিত করছি ও তখন সেই প্রায় নতুন এবং গ্রহণযোগ্য কথাগুলি কতটা বিশ্বাস করা যায় তা ঠিক না বুঝতে পেরে শুনে যেতে লাগল। পরিশেষে, আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, এবং যা উচ্চারণ করছিলাম প্রকৃতপক্ষে সেই আমার বিশ্বাস মনে হল। আমার মুখ বিবর্ণ, উদ্বেগাকুল, আমার দেহ কম্পমান, আমি ধীরভাবে ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম বেশ নরম গলায় কথা বলতে থাকি, কানের পাশের কুঞ্চিত কেশ দামের ফাঁকে চুপি চুপি কথা বলি। ও যেন মৃত! এমনই গভীর চিন্তায় ডুবে আছে, মনে হয় ওর যেন প্রাণ নেই।

"তারপর, ওর হাত আমার হাত ধরল, চেপে ধরল, আর আমি অতি ধীরে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরি, প্রথমে কম্পিত কলেবর, তারপর বেশ দৃঢ়ভাবে কঠিন বাহুর বাঁধনে বাঁধলাম। ও একটুও নড়ছে না এখন, আমি ঠোঁট দিয়ে ওর গাল স্পর্শ করলাম, আর সহসা আমার ঠোঁটে বিনা চেষ্টায় ওর ঠোঁট এসে পড়ল। অতি প্রলম্বিত চুম্বন, সুদীর্ঘ চুম্বন! হয়ত আরো কিছুক্ষণ এইভাবে চলত, কিন্তু ঠিক পিছনেই একটা হম্! হম! আওয়াজ পেয়ে সচকিত হলাম। মেয়েটি ত ঝোপের ভেতর পালাল। মুখ ফিরিয়ে দেখি রিভেটটা এদিকে আসছে। সে না হেসেই বলে উঠল—বেশ! এইভাবেই তা হলে শুকর মোরীনের মামলাটা নিষ্পত্তি করছ!

"আমি বেশ অহমিকা ভরে বললাম—ভায়া হে। সব দিক থেকেই চেষ্টা করতে হয়। তা তুমি মামার সঙ্গে কি ব্যবস্থা করলে? তাঁকে ঠান্ডা করেছ? ভাগ্নীর ভার আমার হাতে।

"সে বলল—আমার সেই রকম সৌভাগ্য এখনও হয়নি।

"এই কথার পর আমি ওর হাতটি ধরে বাড়ির ভিতর চললাম।

।। তিন ।।

"রাতের ডিনার আমার মাথাটা একেবারে খারাপ করে দিল। আমি বসেছিলাম মেয়েটির ঠিক পাশে। আমার হাত নিরন্তর টেবল ক্লথের তলা দিয়ে ওর হাত স্পর্শ করতে থাকে, আমার পা ওর পায় ছোঁয়, আর আমাদের দুজনের কেবল দৃষ্টি বিনিময় চলে।

"ডিনারের পর আমরা কিছুক্ষণ চাঁদের আলোয় বেড়ালাম, আর যত রকমের বাছা বাছা মিঠে কথা উদ্ভাবন করা সম্ভব হল তা কানে কানে শোনালাম। প্রতি মুহূর্তে চুমা খেলাম। আমার ঠোঁট ওর ঠোঁট দিয়ে ভিজিয়ে নিলাম। ওদিকে তার মামা এবং রিভেট বিতর্কে মেতেছেন, তাঁরা চলেছেন আমাদের পুরোভাগে। আমরা বাড়ির ভিতর ফিরতেই একজন একখানি টেলিগ্রাম নিয়ে এল। সেই টেলিগ্রামে সংবাদ এসেছে যে মামী ঠাকরাণী পরদিন সকাল সাতটায় প্রথম ট্রেনেই ফিরবেন।

"মাতুল বললেন, উত্তম আঁরিয়েৎ, ভদ্র-লোকদের শোবার ঘর দেখিয়ে দাও।

"রিভেটকেই প্রথমে ঘর দেখিয়ে দিল। রিভেট আমার কানে কানে বলল, তোমার ঘরখানাই প্রথম দেখালে কিন্তু কিছু এসে যেত না।

"এরপর মেয়েটি আমাকে আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গেল। যেই আমরা উভয়ে একা হলাম, আমি আবার তাকে আমার বাহুডোরে বাঁধলাম। ওর প্রতিরোধ প্রচেষ্টা রোধ করে সর্বপ্রকারে অনুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করলাম। ও যখন

অনুভব করল যে আর প্রতিরোধ সম্ভব নয়, তখন আমার ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

'আমি বিছানায় অতিশয় হতাশ, উত্তেজিত এবং নির্বোধের ভঙ্গীতে পড়ে রইলাম। কারণ আমার যে ঘুম তেমন হবে না তা বুঝেছিলাম। কি করে যে এমন ভুল করলাম তাই ভাবছি এমন সময় দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। জানতে চাইলাম—কে—? ও জবাব দিল—আমি।

"আমি তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় ঠিক করে উঠে দরজা খুললাম। ও বলল—একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি, কাল প্রভাতে কি চাই চা, চকোলেট না কফি?

'আমি আবদারের ভঙ্গীতে ওকে জড়িয়ে ধরে অজস্র চুম্বনে সারা অঙ্গ ভরে দিলাম, আর মুখে বললাম—আমি থাব—। আমি থাব!

'ও কিন্তু আমার বাহুডোর থেকে আপনাকে মুক্ত করল। আমার বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে অদৃশ্য হল। আমি অন্ধকারে একা ফুঁসতে থাকি। দেশলাই খোঁজার চেষ্টা করলাম, পেলাম না। অবশেষে দেশলাই পেলাম, তারপর বাতিটা হাতে নিয়ে অর্ধ-উন্মাদের মত বারান্দায় বেরিয়ে পড়লাম।

"কি করতে যাচ্ছি? কোনো যুক্তিতেই আমি প্রবোধ মানি না। শুধু ওকে খুঁজে বার করতে চাই, বার করবোই। কিছু না ভেবে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম—কিন্তু সহসা নিজের কথা চিন্তা করলাম। 'যদি, আমি মাতুলের ঘরে গিয়ে পড়ি, তাহলে কি কৈফিয়ৎ দেব! থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, মাথাটা একেবারে ফাঁকা, বুকের ঢিপ ঢিপ শোনা যায়।

'কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা জবাব খুঁজে পেলাম, বলব, রিভেটের ঘরখানা খুঁজছিলাম। একটা জরুরী কথা মনে পড়েছে সেই বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। তারপর সব দরজাগুলি পরীক্ষা করতে থাকে, ওর ঘরের সন্ধানে। অবশেষে একটা হাতল ধরে ঘুরিয়ে খুলে ফেলে ভেতরে ঢুকলাম। এই ঘর আঁরিয়েতের। সে বিছানায় বসে ছিল, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, চোখে তার জল।

"আমি বললাম : মামজেল! আমি পড়ার জন্য একটা বই চাইতে ভুলে গেছি—'

"এরপর কি বই যে আমি পড়েছিলাম সে বৃত্তান্ত তোমাকে বলব না, তবে সে এক অত্যাশ্চার্য রোমান্স। কবিতার দিক থেকে দিব্যতম। আর প্রথম পৃষ্ঠাটি ওলটাতেই সে আমাকে যতগুলি খুশি সবকটি পৃষ্ঠাই খুলতে দিল, এতগুলি পরিচ্ছেদ শেষ করলাম যে আমাদের বাতি প্রায় নিঃশেষিত।

"তারপর ওকে ধন্যবাদ দিয়ে চোরের মত আমার ঘরে ফিরছি এমন সময় একটা পুরুষ পুরুষের হস্ত আমাকে পাকড়াও করল। আর সেই লোকটির কণ্ঠ চাপা-গলায় বলল—তাহলে মোরীনের ব্যাপারটি এখনও ঠিক নিষ্পত্তি করতে পারোনি!

এই কণ্ঠস্বর রিভেটের।

"পরদিন প্রাতে সাতটার সময় ও স্বয়ং আমার জন্য এক কাপ চকোলেট নিয়ে এল। এই জাতীয় চকোলেটের স্বাদ জীবনে আর পাইনি। নরম, ভেলভেট সদৃশ, সুগন্ধি এবং সুস্বাদু। কাপ থেকে ঠোঁট আর ওঠাতেই পারি না। ও ঘর ছেড়ে না যেতেই রিভেট এসে ঢুকে রাগতকণ্ঠে বলল, তুমি যদি এইভাবে চালাও তাহলে শুয়োর মোরীনের ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যাবে।"

"বেলা আটটায় মাতুলানী এলেন। আমাদের আলোচনা সংক্ষিপ্ত। কারণ ও'রা অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলেন। আর আমি সেই পল্লীর দরিদ্র সাধারণের জন্য পাঁচশো ফ্রাঁ দান করলাম।

"ও'রা আমাদের সেই দিনটা থাকতে বললেন, কোথায় কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। আঁরিয়েত ইঙ্গিত করল থাকার জন্য, মাতুলের পিছনে দাঁড়িয়ে। আমি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম, কিন্তু রিভেটটা যাওয়ার জন্য একেবারে ছটফট করতে লাগল। আমি তবু ওকে একান্তে ডেকে অনেক অনুনয় করলাম কিন্তু ও একেবারে মরীয়া আর বলতে লাগল—শুয়োর মোরীনের ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট হয়েছে আর নয়। বুঝলে? আর নয়!

"অবশ্য আমিও যেতে বাধ্য হলাম। আমার জীবনের সে এক দুর্বিষহ মুহূর্ত। যতদিন বাঁচি ততদিন এই ব্যাপারটি চালিয়ে যেতে আমি রাজী ছিলাম, রেল গাড়িতে উঠে নীরবে মেয়েটির সঙ্গে করমর্দন করলাম। তারপর আমি রিভেটকে বললাম—তুমি একটি বর্বর।

সে উত্তরে বললে, ভায়া হে তুমি আমাকে ভীষণ উত্তেজনার মুখে ফেলেছিলে।

"ফানাল" অফিসে পৌঁছে দেখি, রীতিমত একটা জনতা আমাদের প্রতীক্ষায় ভীড় করে দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখে সকলে সমস্বরে বলে উঠল—আপনারা কি শুয়োর মোরীনের ব্যাপারটির মীমাংসা করেছেন? সমগ্র লা রোশেলবাসী এই ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে আছেন দেখছি। আর রিভেট রেলযাত্রার মধ্যে যার মেজাজটা এতক্ষণে অনেক নরম হয়েছে হাসি রোধ করা তার পক্ষে কঠিন হল। সে বলল—'হাঁ, আমরা একটা ব্যবস্থা করেছি, তার জন্য ধন্যবাদ লাবার্বের প্রাপ্য।'

এরপর আমরা মোরীনের বাড়ি গেলাম।

"মোরীন একটা আরামকেদারায় বসে-ছিল। তার পায়ে মশিনার পুলটিস বাঁধা, মাথায় ওডিকলোনের পুলটিস—দুঃখে জ্বালায় বেচারী মৃতকল্প। মৃত্যুর মুখে পৌঁছে মানুষ যেমন খুক্ খুক্ করে কাশে, মোরীন সেই রকম কাসছে। কেউ জানে না কিভাবে কাসিটা এল। আর স্ত্রী যেন বাঘিনী, পারে ত' ওকে জীবন্ত গিলে ফেলে। আমাদের দেখেই ভীষণভাবে ওর হাত আর হাঁটু কাঁপতে থাকে, আমি তাই তৎক্ষণাৎ বললাম—"সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, বুঝলে বিটকেল মিনসে। তবে আর কদাপি এই কর্ম কোরোনা।"

"ওর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ, উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত দুটি এমনভাবে চুম্বন করতে থাকে যেন আমি কোনো রাজপুত্র। কাঁদতে কাঁদতে প্রায় মূর্চ্ছাগ্রস্ত হয়ে রিভেটকে জড়িয়ে ধরে, এমনকি মাদাম মোরীনকে চুমা খেয়ে বসল। তিনি ওকে এমন ধাক্কা দিলেন যে সে টলতে টলতে আবার চেয়ারে বসে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলে ওকে সবাই শূকর মোরীনটা বলে উল্লেখ করে, আর এই কথাটি প্রতিবারই ওর বুকে তরবারির আঘাতের মত বাজে। পথ চলতে কোনো ছোকরা যখন 'শূকর' কথাটি উচ্চারণ করে ও সচকিত হয়ে সেদিকে তাকায়। ওর বন্ধুরাও বীভৎস রসিকতা করত। খাওয়ার সময় পাতে 'হ্যাম' পরি-বেশিত হলেই বলত—তোমার টুকরো চিবুচ্ছি।

এই ঘটনার দু'বছর পরেই বেচারী মারা গেল।

'আর আমি? ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন চেম্বার অব ডেপুটিসের (রাজ্যসভা) সদস্য-পদ প্রার্থী তখন একদিন ফ'সেরের নতুন নোটারী মঁসিয়ে বেলোনকলের বাড়ি ভোটপ্রার্থী হয়ে গেলাম। একটি দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী, ধনবতী মহিলা আমাকে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে বললেন—আমাকে বোধহয় চিনতে পারছেন না?

আমি আমতা আমতা করে বলি, মাদাম, ঠিক চিনতে পারছি না।

—আঁরিয়েত বোনেল?

এই কথা শুনে আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি বললাম, আঃ—! অথচ তিনি বেশ স্বচ্ছন্দে কথা বলতে লাগলেন এবং সহাস্য আননে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আঁরিয়েত ওর স্বামীর কাছে আমাকে রেখে চলে যেতেই ভদ্রলোক আমার হাত দুটি চেপে ধরে প্রায় মুচড়ে দেওয়ার উদ্যোগ করে বললেন, অনেকদিন ধরেই আপনার সঙ্গে দেখা করার বাসনা। আমার স্ত্রী আপনার কথা প্রায়ই বলেন। আপনি যে কি কৌশলে এবং ক্লেশ সহকারে সেই ব্যাপারে বাঁচিয়েছিলেন—। একটু ইতস্ততঃ করে তিনি গলার স্বরটি নামিয়ে বললেন, যেন একটা নোংরা খারাপ কথা বলছেন এমন ভঙ্গীতে বল্লেন—সেই যে শূকর মোরীনের সেই ব্যাপরাটা।"

বিদ্যা রাও   ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র শিল্প সংরক্ষণ সমিতি বনাম বাংলা ছবিঘরের মালিকবৃন্দ

১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার গঠিত চলচ্চিত্রশিল্প অনুসন্ধান সমিতির (ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটির) সদ্যপ্রকাশিত রিপোর্টটি অনুধাবন করলে এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না যে, কমিটি ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশনকে এই রাজ্যের চলচ্চিত্রশিল্পের একমাত্র প্রতিনিধি সংস্থা বলে স্বীকার করে নিয়েও কমিটি প্রস্তাবিত চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদকে (ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ডকে) ঐ সংস্থার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আনীত আপীল শুনানীর সালিসি-সভা বা ট্রাইবিউন্যাল হিসেবে কাজ করবার জন্যে সুপারিশ করেছেন। এনকোয়ারী কমিটি স্পষ্টই অনুভব করেছেন, প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শক, এই তিন শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে যে-সংস্থাতে শেষের শ্রেণীরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ সভার বিচারে প্রথম দুটি শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবারই সম্ভাবনা সর্বাধিক। এবং যে সব ক্ষেত্রে ভোটাভুটির ফলে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষিত হবে না, সেই সব ক্ষেত্রে সালিসি করতে হবে ঐ প্রস্তাবিত ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ডকে।

যদিও শোনা যাচ্ছে যে, প্রস্তাবিত ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ডকে রূপায়িত করতে আমাদের রাজ্যসরকার বদ্ধপরিকর, তবুও একথাও অনস্বীকার্য যে, এই বোর্ড গঠিত হয়ে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করবার আগে গঙ্গানদী দিয়ে বহু কিউসেক জল প্রবাহিত হয়ে যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাংলা ছবির প্রযোজনার ক্ষেত্রে এমন সংকট নাকি দেখা দিয়েছে, যার মোকাবিলা করবার জন্যে জন্মগ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতি আজ থেকে মাত্র মাস তিনেক আগে গেল এপ্রিল মাসের ৬ তারিখে। এই সমিতিতে যোগদান করেছেন বহুসংখ্যক প্রযোজক, পরিবেশক,

চিত্রাভিনেতা, চিত্রাভিনেত্রী, কলাকুশলী ও চিত্রপ্রযোজনাকার্যে ব্যাপৃত অন্যান্য কর্মী, স্টুডিও মালিক, ল্যাবরেটরী-মালিক প্রভৃতি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র প্রযোজনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের একটি বিরাট অংশ। সমিতির উদ্দেশ্য এর নামেই প্রকাশ—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চলচ্চিত্রশিল্পকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে একে সুস্থ, স্বচ্ছন্দ জীবন-ধারণে সাহায্য করে শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এই সমিতির একমাত্র লক্ষ্য বলে প্রকাশ।

সমিতি-প্রচারিত বিবৃতি থেকে জানা যায়, এই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এঁরা যে স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন, তাতে এঁদের পাঁচটি চাহিদা ছিল :

১। ১৯৬১ সালের আদমশুমারের ভিত্তিতে এই রাজ্যের যে-সব অঞ্চলে জন-সংখ্যার শতকরা তিরিশ ভাগেরও বেশী বাংলা ভাষাভাষী, সেই সব অঞ্চলের চিত্র-গৃহগুলিতে নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে বাংলা ছবি আবশ্যিকভাবে দেখাবার জন্যে আইনগত ব্যবস্থা করতে হবে :

বাঙলা ভাষাভাষীর শতকরা সংখ্যা	বাৎসরিক প্রদর্শনী সময়ের শতকরা অংশ
৩০% এর নীচে	শূন্য
৩০ থেকে ৫০%	৩০%
৫১ থেকে ৭০%	৫০%
৭১% থেকে উর্ধ্বে	৭৫%

২। যে-সকল চিত্রগৃহে ইংরেজী ছাড়া অন্য কোনো ভাষার ছবি আদৌ দেখানো হয় না, সেই-সব গৃহে ভারতীয় ছবির জন্যে অন্তত ৩০% প্রদর্শনী সময়ের ব্যবস্থা করতে আইনের সাহায্যে।

৩। মাত্র পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত ছবির প্রদর্শনীর জন্যে সারা পশ্চিমবঙ্গে নতুন চিত্রগৃহ ও সামাজিক সম্মেলন গৃহ বা কমিউনিটি থিয়েটার নির্মাণের জন্য আশু সরকারী অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। এই সব নবনির্মিত গৃহে সেন্সার তারিখের ভিত্তিতে ছবিগুলি মুক্তিলাভ করবে।

৪। উন্নয়নকর বা ডেভেলপমেন্ট সেস, এই যথার্থ নামের পরিবর্তে রাজ্যসরকার চিত্রপ্রদর্শকদের কাছ থেকে প্রদর্শনী-কর বা শো-ট্যাকস নাম দিয়ে যে-অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে থাকেন, সেই অর্থের সমুদায় পরিমাণ রাজ্যের চিত্রশিল্পের জন্যে ব্যয় করতে হবে।

৫। চিত্রশিল্পের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে অবিলম্বে একটি পরামর্শ সমিতি গঠন করতে হবে, এই সমিতি পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্পের সকল বিষয়ে রাজ্যসরকারকে পরামর্শ দেবেন।

নিউ থিয়েটার্সের ভূতপূর্ব কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকারের নেতৃত্বে এই সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ রাজ্যপাল ধর্মবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমিতির দাবিগুলি সম্পর্কে সরকারকে যথোচিত বিবেচনার জন্যে অনুরোধ জানান। সরকার যে সমিতির প্রস্তাব ও দাবিগুলির যৌক্তিকতা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কিছুটা অবহিত হয়েছেন, তার প্রমাণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চিত্রগৃহগুলিতে বাংলা দেশে প্রস্তুত ছবিগুলির প্রদর্শনী আবশ্যিক করা বিষয়ে প্রেসনোট প্রচার করেছেন।

কিন্তু সংরক্ষণ সমিতি জানিয়েছেন তাঁদের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে গিয়ে যাঁদের প্রকান্ড বাধাস্বরূপ মনে করছেন, তাঁরা হচ্ছেন এই শহর কলকাতার সেই সব চিত্র-গৃহের মালিক, যে চিত্রগৃহগুলিতে বাংলা ছবি মুক্তি পেয়ে থাকে। বাংলা ছবির মুক্তি নিম্নলিখিত ছ'টি গৃহ-শৃঙ্খলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ : (১) মিনার, ছবিঘর ও বিজলী, (২) উত্তরা, পূরবী ও উজ্জ্বলা; (৩) রূপবাণী, অরুণা ও ভারতী; (৪) প্রাচী ও ইন্দিরা; (৫) রাধা, পূর্ণ ও আলোছায়া এবং (৬) বীণা ও বসুশ্রী।

বাংলা ছবির এইসব 'রিলি চেন'এর মালিকেরা ছবির মুক্তির জন্যে পরিবেশক সংস্থার (প্রযোজকদের সঙ্গে তাঁরা সম্পর্ক রাখেন না; কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজককে চুক্তির সমর্থনকারী বা কনফার্মিং পার্টিরূপে রাখা হয়) সঙ্গে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হন, তাতে নানা শর্তের মধ্যে প্রধান যে একটি শর্ত থাকে, সেটি হচ্ছে সাপ্তাহিক গৃহ-সংরক্ষণী অর্থ বা হাউস প্রোটেকসন' সম্পর্কে। এই শর্তে পরি-বেশককে দিয়ে অঙ্গীকার করানো হয় যে, কোনো একটি সপ্তাহে টিকিট বিক্রী থেকে প্রমোদকর বাদে যে টাকা পাওয়া যাবে, সাধারণভাবে তার ৫০% প্রদর্শকের প্রাপ্য হলেও এই টাকাটা যেন কোনো ক্রমেই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের কম না হয়।

সমিতি প্রচারিত 'প্রেসহ্যান্ডআউট' থেকে আরও জানা যায় যে, সম্প্রতি ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বাঙলা ছবির প্রযোজকদের এক প্রতিনিধিদল প্রদর্শকদের এক প্রতিনি

অগ্রদূত পরিচালিত কখনো মেঘ চিত্রের একটি দৃশ্যে অঞ্জনা ভৌমিক ও উত্তমকুমার

লর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের সহানু-তশীল বিবেচনার জন্যে নিম্নলিখিত রটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছিলেন :

১। বাঙলা ছবির মুক্তির পথ সুগম রবার জন্যে বর্তমানের ছ'টি রিলিজ 'চেন' ড়া আরও দু'টি 'চেন' ঠিক করে দিতে বে। (এখানে উল্লেখ্য, শহরের উত্তরাঞ্চলে বস্থিত 'মিত্রা'র নাম আগে ছিল চিত্রা বং জন্মকাল থেকে নতুন নামকরণের াগে পর্যন্ত এটি বাঙলা ছবিরই প্রদর্শনী-হ ছিল। এ ছাড়া দর্পণা, হিন্দ, প্রিয়া, মনকা প্রভৃতি চিত্রগৃহ প্রধানত বাঙালী-অধ্যুসিত অঞ্চলেই অবস্থিত)।

২। সাপ্তাহিক গৃহ-সংরক্ষণী বা হাউস প্রোটেকসন গ্রহণের প্রথা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে। (উল্লেখ্য, টিকিট বিক্রয়লব্ধ আয় কিছুমাত্র না বাড়ালেও ব্যয়বৃদ্ধির অজুহাতে এই অর্থের পরিমাণ ১৯৫২ সালের তুলনায় বর্তমানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিগুণ, এমন কি আড়াইগুণ করা হয়েছে।)

৩। প্রমোদকর বাদে টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৫০% প্রদর্শকের প্রাপ্য বলে ধার্য করতে হবে। ছবির প্রদর্শনী চালু রাখার জন্যে সাপ্তাহিক নিম্নতম বিক্রয়ের পরিমাণ বা হোল্ড ওভার-এর অর্থ ভারতীয় সংবাদ-চিত্র প্রদর্শনের জন্য ভারত সরকারকে দেয় সাপ্তাহিক অর্থের হিসাবে চিত্রগৃহের গড়-পড়তা যে সাপ্তাহিক আয় হবে, তার ৬০% ভাগ বলে ধরতে হবে।

৪। ছবির মুক্তির ব্যাপারে চিত্রগৃহের মালিকেরা নিজেদের ইচ্ছামত একটি এবং সংরক্ষণ-সমিতি নির্ধারিত একটি—এইভাবে পালা করে একের পর এক ছবির মুক্তি দেবেন। (এইভাবেই ছবিঘরের মালিকদের পছন্দসৈ তারকাহীন অসংখ্য ছবিকে মুক্তি-দান করা সম্ভব হবে।)

সমিতি অভিযোগ করেছেন যে, এই প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে আলোচনা শেষ হবার আগেই প্রদর্শকদের প্রতিনিধিদল নিতান্ত উপেক্ষাভরে সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান। অতঃপর ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রযোজক শাখা একটি সর্ববাদিসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে সকলকে নির্দেশ দেন যে, চিত্রগৃহের কর্মচারীদের অনুষ্ঠিত সিনেমা ধর্মঘট মিটে গিয়ে (বেংগল মোশান পিকচার এমপ্লয়ীজ ইউ-নিয়ন এখনও ধর্মঘট মিটে গেছে বলে কোনো রকম ঘোষণা করেননি এবং কিছু-সংখ্যক চিত্রগৃহে এখনও ধর্মঘট চালু রয়েছে।) স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবার তিন সপ্তাহ অতীত হবার আগে যেন কোনো ছবির মুক্তিদান করা না হয়।

সংরক্ষণ সমিতি ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা তাঁদের গৃহীত প্রস্তাবকে কার্যকর দেখতে বদ্ধপরিকর। এবং দেখা যাচ্ছে কয়েকটি চিত্রগৃহের সামনে সমিতির পক্ষ থেকে কিছুসংখ্যক পরিচালক, শিল্পী, পরি-বেশক-প্রযোজক, কলাকুশলী প্রভৃতি দর্শকদের অনুরোধ করছেন টিকিট না কেনবার জন্যে এবং তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে কেউ কেউ বক্তৃতাও দিচ্ছেন।

অপর দিকে কলকাতার বাঙলা ছবির প্রেক্ষাগৃহসমূহের পরিচালকমন্ডলী সমিতির বহু উক্তিরই প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের ৩২০টি চিত্রগৃহ ১৫৩টি কেন্দ্রে অবস্থিত এবং প্রতিটি কেন্দ্রেই নিয়মিতভাবে বাংলা ছবি দেখানো হয়। তাঁরা আরও বলেছেন, 'সংরক্ষণ সমিতির রিলিজ কমিটি চিত্রপ্রদর্শকদের ক্ষেত্রে পছন্দমত ছবি নির্বাচনের স্বাধীনতা দিতে নারাজ।' প্রশ্ন করেছেন, "দর্শকদের স্বার্থে ভাল ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা কি প্রদর্শকদের নৈতিক দায়িত্ব নয়?" এবং অভিযোগ করেছেন, "সমিতির উক্তি অনু-যায়ী একই মূল্যে নিম্নমানের ছবিও দেখাতে হবে।" তাঁরা জানিয়েছেন, প্রযো-জকদের অনুরোধেই প্রেক্ষাগৃহের খরচ অনুযায়ী প্রোটেকশান প্রথার প্রবর্তন হয় এবং সেজন্যে লভ্যাংশ সামান্য কমে গেলেও ছবিগুলি দীর্ঘদিন চলার সুযোগ পায় এবং প্রযোজক লাভবান হন। এবং শতকরা ২৫ ভাগ নয়, তাঁরা লাভের অংশ পান শতকরা ৪৭ ভাগ।" তাঁরা ছবির সংখ্যা কমে যাবার তিনটি মূল কারণ দেখিয়েছেন : (১) পূর্ব পাকিস্তানে বাঙলা ছবির প্রদর্শন ১৯৫১ সাল থেকে নিষিদ্ধ হয়ে যায়, (২) ছবি নির্মাণে অর্থবিনিয়োগ-কারীদের পশ্চাদপসারণ এবং (৩) নির্মাণ-ব্যয় বৃদ্ধি।

একদিকে সংরক্ষণ সমিতি এবং অপর দিকে বাঙলা ছবির প্রেক্ষাগৃহসমূহের পরি-চালকমন্ডলীর মধ্যে বিরোধের ফলে বাংলা ছবির প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই অচলাবস্থার আশু অবসানের প্রয়োজন। এবং এর জন্যে সম্ভবত উভয় পক্ষেরই শুভবুদ্ধির যেমন আবশ্যকতা আছে, তেমনই হয়ত দরকার আছে সরকারী বা বেসরকারী উভয় পক্ষের আস্থাভাজন কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা।

সলিল দত্ত পরিচালিত অপরিচিত ছবির একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায়, হারাধন ব্যানার্জি ও সৌমিত্র চ্যাটার্জি

চিত্র সমালোচনা

আগ (হিন্দী) : ডিম্পল ফিল্মস-এর নিবেদন; ৩৯০৮·৭৫ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ, কাহিনী, প্রযোজনা ও পরিচালনা : নরেশকুমার; সংলাপ : ইশান রাজভী; সঙ্গীত-পরিচালনা : ঊষা খান্না; গীতরচনা : আসাদ ভোপালী এবং ইন্দীবর; চিত্রগ্রহণ : বাবুভাই উদেশী; শব্দানুলেখন যতীন্দু কাত্রাক; শিল্পনির্দেশনা : মঞ্জুর; সম্পাদনা : গোবিন্দ দাইর্বাদ; নৃত্যপরিকল্পনা : হার্মান ও বদ্রীপ্রসাদ; নেপথ্য কন্ঠসঙ্গীত : মহীন্দ্র কাপুর, আশা ভোঁসলে ও হেমন্ত কুমার; রূপায়ণ : ফিরোজ খান, মমতাজ, জীবন, অরুণা ইরাণী, মোহন চোটি, মনোহর দীপক, বিপিন গুপ্ত, রণধীর, মদন পুরী, সুন্দর, টুনটুন, অচলা সচদেব, শ্যামা প্রভৃতি। মোশান পিকচার্স ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল ৫ই জুলাই শুক্রবার থেকে সোসাইটি, গ্রেস, খান্না, কালিকা, প্যারামাউন্ট, ভবানী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ নেওয়া চলে না আজকের সভ্য যুগে। যদি কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করে থাকে, তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের কর, অপরাধীর অপরাধ প্রমাণ করতে পারলে তার শাস্তি হবে—বর্তমান সভ্যতা এই কথাই বলে। নইলে দেশে থানা, পুলিশ, আদালত, সরকার আছে কেন? কিন্তু **আগ**-এর আবেগপ্রবণ নায়ক শঙ্কর এই পথের পথিক হতে পারেনি। তার বোবা (কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কালা নয়!) বোন সুন্দরী দুর্গার হত্যাকারী শয়তান জমিদার মহজনকে সে নৃশংসভাবে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিল। এবং পুলিশের হাত এড়িয়ে সে গিয়ে পড়েছিল লুটেরা ডাকাত দলে। ডাকাত সর্দারের আকস্মিক মৃত্যুর পরে তাকেই সকলে বরণ করে নিল দলপতির পদে। এর পর থেকে সে সদলবলে ঘোড়ায় চেপে ডাকাতি করত ধনীগৃহে এবং লুণ্ঠিত অর্থ, অন্নবস্ত্র সে বিতরণ করত গরীব গ্রামবাসীদের ভিতরে; তারা তাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করত। কিন্তু এরই মধ্যে শঙ্করের মন পড়ে থাকত তার স্নেহময়ী দুঃখিনী মায়ের কাছে, আ... প্রেমাস্পদা সেই ছুরিকাঁচি শান-দেওয়া পারো... কাছে। এদের সে দেখতে চাইত, কাছে পেতে চাইত। মাকে সে শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু পারোকে নিয়ে আসতে গিয়েই সে পড়ল বিপদে। সদ্য বিবাহিত পারোকে তার স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনবার চেষ্টায় পারো হল তার স্বামীর রিভলভারের গুলি দ্বারা আহত আর সে নিজে পশ্চাদ্ধাবনরত পুলিশ অফিসারের গুলি দ্বারা ক্ষতবিক্ষত। তবু সে তার বিশ্বস্ত অশ্বপৃষ্ঠে করে পুলিশের হাত ছাড়িয়ে নিজের পার্বত্য গুহায় ফিরে এসেছিল; কিন্তু বেশীক্ষণ বেঁচে থাকতে পারেনি ওরা দুজনেই।

গ্রাম্য ঘোড়দৌড়, পশ্চাদ্ধাবনরত জীপগাড়ীকে পরাস্ত করে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন প্রভৃতি বহু উত্তেজক দৃশ্যে এই রঙ্গীন ছবিটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এ ছাড়া জীবন, মোহন চোটি, সুন্দর, টুনটুন এবং নায়িকা পারো বেশে মমতাজ ছুরিকাশানওয়ালীরূপে দর্শকদের হাস্যমুখর করে তুলেছেন। কিন্তু 'আগ' ছবির যে বৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করেছে, সে হচ্ছে এর বিয়োগান্ত সমাপ্তি। হিন্দী ছবিসুলভ মিলনান্ত না করে বাংলা দেবদাস, শাপমুক্তি প্রভৃতির মতো জ্বলন্ত চিতার দৃশ্যে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটানো আমাদের রীতিমত অবাক করেছে। কাহিনীকার-প্রযোজক-পরিচালক নরেশকুমারের দুঃসাহসিকতা প্রশংসনীয়।

অভিনয়ে নায়িকাবেশে মমতাজ, নায়ক শঙ্কররূপে ফিরোজ খান, নায়কের মা ও বোনের ভূমিকায় যথাক্রমে অচলা সচদেব এবং অরুণা ইরাণী, নর্তকী বাইজীবেশে শ্যামা, কনেস্টবল ও তার বৌরূপে যথাক্রমে সুন্দর ও টুনটুন, দস্যু-সর্দারবেশে বিপিন গুপ্ত, যুবতী নারীলোভী মহাজন বেশে জীবন ও তার সহকারী মুনশীরূপে মোহন চোটি প্রভৃতি সকলেই প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি উচ্চ মান রক্ষিত হয়েছে। বহির্দৃশ্যগুলির চিত্রগ্রহণ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ছবিটির আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এর নিপুণ সম্পাদনা, যা ছবিটিকে চমৎকার গতিসম্পন্ন রেখেছে। আটখানি গানেরই সুর সুপ্রযুক্ত। ঘটনানুযায়ী শব্দ-ব্যঞ্জনা ছবিটিকে বাঙ্ময় করে তুলতে সাহায্য করেছে।

ডিম্পল ফিল্মস-এর রঙ্গীন বিয়োগান্ত ছবি 'আগ' অভিনবভাবে উত্তেজনাপূর্ণ এবং মানবিক আবেদনে ভরপুর বলে দর্শকদের খুশি করবে।

—নান্দীকর
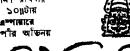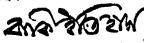
দেশী ছবির খবর

হিন্দী ছবির নায়িকা তনুজা এখন বেশ কয়েকটি বাংলা ছবিতে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন। এবং বাংলা দেশের দর্শকদের কাছে শ্রীমতী ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন। ইতিপূর্বে তনুজা অভিনীত বাংলা ছবি 'দেয়া নেয়া', 'দোলনা' এবং 'এন্টনী ফিরিঙ্গী' মুক্তি পেয়েছে। বর্তমানে তনুজা 'তিন ভুবনের পারে' এবং 'প্রথম কদম ফুল' ছবি দুটিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিপরীতে অভিনয় করছেন। সম্প্রতি চিত্রযুগের নতুন ছবি 'পিতা পুত্র'-র নায়িকা-চরিত্রে তনুজা রূপদান করছেন। এ ছবির নায়ক-চরিত্রে রয়েছেন নবাগত স্বরূপ দত্ত। ছবিটির পরিচালক হলেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করছেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায়।

বর্তমান ক্ষুধার্ত সমাজে যে অন্যায় আর পাপ ছড়িয়ে পড়েছে, মা হয়ে যে নিজের মেয়েকে সর্বনাশের পথে এগিয়ে দিচ্ছে, শিক্ষিত তরুণ আজ হতাশায় অসত্যের পথ বেছে নিচ্ছে, সেই সমাজের অন্ধকারের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে 'বাঘিনী' ছবির চিত্রনাট্য। সমরেশ বসুর বহুপঠিত এই জনপ্রিয় উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন বিজয় বসু। গিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত এস এম ফিল্মসের এ ছবিতে রূপদান করেছেন সন্ধ্যা রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, রুমা গুহ-ঠাকুরতা, অজয় গাঙ্গুলী, রবি ঘোষ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তরুণ-কুমার, বঙ্কিম ঘোষ, ছায়া দেবী, রেণুকা রায়, শর্মিতা বিশ্বাস এবং রাখী বিশ্বাস। সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত এ ছবিটি মুক্তিপ্রতীক্ষিত।

আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে 'চেনা অচেনা' ছবিটি পরিচালনা করছেন হীরেন নাগ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরা-রোপিত চিত্রারঙ্গের এ ছবিতে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুস্মিতা সান্যাল, বিকাশ রায়, ছায়াদেবী, বিদ্যা রাও, বঙ্কিম ঘোষ এবং গণেশ নাগ। চণ্ডীমাতা ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

বি পি পিকচার্সের মুক্তি প্রতীক্ষিত 'আলেয়ার আলো' ছবিটির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টো-পাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, রাধামোহন ভট্টাচার্য, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, জহর রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও অনুপকুমার। গোপেন মল্লিক সুরকৃত এ ছবিটির পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী।

বিশ্বনাথ প্রসাদ প্রযোজিত এবং সুন্দর দর পরিচালিত নির্মল পিকচার্সের 'রূঠা না কর' ছবিটির বহির্দৃশ্য গ্রহণ সম্প্রতি কাশ্মীর অঞ্চলে শুরু হয়েছে। ছবিতে অভিনয় করছেন শশি কাপুর, নন্দা, নাজ, অরুণা ইরাণী এবং রাজেন্দ্র-নাথ। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন সি রামচন্দ্র।

ছবির নামকরণ ইংরেজীতে রাখা হলেও আসলে এটি হিন্দী ছবি। নাম 'সুইট হার্ট'। এই রঙিন হিন্দী ছবিটির প্রযোজক এবং পরিচালক হলেন সুরজ প্রকাশ। সম্প্রতি আর কে স্টুডিওয় ছবির অন্তর্দৃশ্য গৃহীত হল। এ মাসের শেষে ছবির বহির্দৃশ্য ইউরোপে গৃহীত হবে। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন আশা পারেখ, শশি কাপুর, কমল কাপুর, শম্মি কাপুর এবং জীবন জলিল। কল্যাণজী-আনন্দজী ছবিটির সুরকার।

সি এল রাওয়াল পরিচালিত রাওয়াল ফিল্মসের রঙিন ছবি 'আম্রু' বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। সোনিক-ওমি সুরকৃত এ ছবির মুখ্য শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন অশোককুমার, ভিমি, দীপককুমার, রেহমান, শশিকলা, ললিতা পাওয়ার, লীলা নাইডু, জীবন, মুকরী, সুন্দর ও নিরুপা রায়।

পরিচালক বাপি সোনি তাঁর নতুন রঙিন ছবি 'প্যায়ার হি প্যায়ার'-এর রোমাঞ্চ-মধুর সংগীত-দৃশ্যটি রাজকমল স্টুডিওয় গ্রহণ করলেন। এই অংশে ছিলেন নায়ক ধর্মেন্দ্র এবং নায়িকা বৈজয়ন্তীমালা। এছাড়া ছবির অন্যান্য চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন মেহমুদ, প্রাণ, হেলেন, ধুমল, মদন পুরী, সাপ্রু ও সুলচনা চ্যাটার্জী।

বিদেশী ছবির খবর

১৯৬৬ সালের কাঁ উৎসবে ফিপ্রেস্‌শি পুরস্কারে ও গত বছর বার্লিনে সমালোচক-দের পুরস্কারে সম্মানিত 'ইয়ং টরলেস' ছবির পরিচালক ভোল্‌কর স্কলর্ণডর্ফ ষষ্ঠ শতাব্দীর ব্যাকগ্রাউন্ডে লেখা বিখ্যাত উপ-ন্যাস 'মাইকেল কোলহস'-কে চিত্রায়িত করছেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার খ্যাতিলাভ

স্টুডিওর ছবির কাজ শুরু হয়ে গেছে ইতি-মধ্যে। এলিয়ট ক্যাসনার, জেরী গ্রেসন প্রযোজিত এ-ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন ডোউজওয়ার্নার, অ্যানা কারিনা, অ্যানিটা অ্যালেনবর্গ ও আরও অনেকে।

শুধুমাত্র আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই চিত্র ব্যবসায়টা বড় মন্দা যাচ্ছে। গত বছরের হিসেব অনুযায়ী ভারত অবশ্য চিত্র-প্রযোজনার ব্যাপারে দ্বিতীয় স্থান নিয়ে আছে। তবুও সাম্প্রতিক বোম্বাই চিত্রজগতের ধর্মঘট, বাংলা চলচ্চিত্রের দুরবস্থার কথা ভেবে আশঙ্কিত হই আমরা। স্বাভাবিক। তবুও এদেশে এখনও টেলি-ভিশন আসেনি। ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে সিনেমাগৃহের সংখ্যা যেভাবে কমে গেছে, তা তাদের পক্ষেও সুখকর নয়। ইতালীতে ১৯৫০য়ে চিত্রগৃহ ছিল যেখানে ৫০০০, এখন সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৭৭১য়ে। আমেরিকায় ১৯৫৪তে ছিল ১৮,৪৯১টি ছবিঘর আর এখন আছে ১৩,৬২৩টা। ইংল্যাণ্ডে ১৯৫০তে ছবিঘর ছিল ৪,৫৮৪টা আর সে-সংখ্যা ১৯৬৭তে এসে দাঁড়িয়েছে ১,৮০৫য়ে। কি ব্যাপার বুঝুন? অবশ্য এর উল্টো ব্যাপারটাও ঘটেছে কয়েক জায়গায়। যেমন জাপানে চিত্র-গৃহের সংখ্যা বেড়ে ২,৫৭৫ থেকে হয়েছে ৪,২৯৬, ফ্রান্সে হয়েছে ৫,০০০ থেকে ৫,২৮৩, স্পেনে হয়েছে ৩,৯০০ থেকে ৭,৩৯৫, জার্মানীতে হয়েছে ৩,৯০০ থেকে ৪,৭৮৪। যাই হোক, মোট কথা সাগরপারের 'বিলেত' দেশগুলোতেও চলচ্চিত্র শিল্প বেশ খোসমেজাজে চলছে না।

চেক চিত্রপরিচালক মার্টিন এরিক নতুন ছবির কাজ সম্প্রতি শুরু করেছেন। নাম 'দি বেস্ট ওম্যান অফ মাই লাইফ'। প্রাগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেতা জিরি যোভাক ছবির প্রধান চরিত্রে নামছেন। এরিকের এই পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির চিত্রনাট্য করেছেন জারোস্লাভ দিৎল্। ছবির আলোকচিত্রগ্রহণে থাকছেন বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান জাঁ রোধ। প্রাগের স্টুডিওয় ছবির কাজ বেশ কিছুদূর এগিয়েছে ইতিমধ্যে।

ইউনিভার্সালের নতুন ছবি 'সিক্রেট সিরোমানি' পরিচালনা করবেন স্থির হয়েছে যোশেফ লজি। একটি তরুণী ও তার সংগে তার পালক এক দেহোপজীবিনীর সম্পর্কের ঘটনা নিয়ে কাহিনীর বিস্তার। ছবির ও-দুটি চরিত্রের জন্য বিশেষ করে পোষাক, হেয়ারড্রো ও অন্যান্য ব্যাপারে ঢালাওভাবে সাজাবার আদেশ হয়েছে। মার্কো ভেনোভির লেখা অবলম্বনে এ-ছবির চিত্রনাট্য করেছেন জর্জ ট্যাবরয়। প্রধান চরিত্রদুটিতে থাকছেন মায়া ফারো, এলিজাবেথ টেলর ও অন্য আরেকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন রবার্ট মিচাম।

চল্লিশ দশকের হলিউডের শ্রেষ্ঠ অভি-নেতা ড্যান ডুরেয়া তাঁর মুলহল্যাণ্ড ড্রাইভ-এর বাড়ীতে গত জুন মাসের প্রথম দিকে দেহত্যাগ করেছেন। স্নানঘরে তাঁর প্রাণহীন দেহ পাওয়া যায়। অবশ্য বেশ কিছুদিন যাবৎ তিনি অসুখে ভুগছিলেন। হলিউডে আজ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে যে ধরাধরি, ছাড়াছাড়ির ব্যাপার চলছে, তার শুরু ইনিই করেন তখন। মেয়েখেকো হিসাবে ড্যানের বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। তাঁর জীবনের ব্রেক আসে ব্রডওয়ের নাটক 'দি লিটল ফক্সেজ' দিয়ে। সর্বশেষ যে-ছবিতে তিনি তাঁর অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, সেটি হল টিভির জন্য তোলা 'পিটন প্লেস' ছবির এডি জ্যাক চরিত্র। ও'র স্ত্রী শ্রীমতী হেলেন ব্রায়ানও মারা গেছেন গত বছর। ছেলে পিটার অভিনেতা।

বিবিধ সংবাদ

শিশু স্বর্গ—মনোরম শিশু আসর

শিশু স্বর্গের অনুষ্ঠান বসছে গত এক বছর মহাজাতি সদনে, মাসে দুবার নিয়মিত-ভাবে এবং অল্প প্রবেশমূল্যে। এ'দের প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান পালিত হল, গত ৯ই জুন মহাজাতি সদনে। আনন্দের কথা সেই সভায় সেদিন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই স্বীকার করে গেছেন, এত অল্প মূল্যে, শিশুদের জন্য এই ধরনের নিয়মিত অনুষ্ঠান করে যাওয়া, আমাদের দেশে কদাচিৎ দেখা গেছে। উৎসবসূচীতেও কোন বাহুল্য ছিল না, ছিল না কোন মাল্যদান বা দীপ জ্বালান। যদিও সেদিন সভার উদ্বোধন করেছিলেন, কলকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র আর প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক শ্রীঅপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। মেয়র শ্রীগোবিন্দ-চন্দ্র দে দুঃখ করে বললেন, এখানে শিশুদের আনন্দদানের পরিকল্পনা, বিদেশীদের তুলনায় খুবই নগণ্য এবং অপ্রতুল। শিশু স্বর্গের আনন্দ আসরকে তাই তিনি অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই আনন্দদানের ব্যবস্থা যত অল্পই হোক, তবুও এটি একটি মহৎ দৃষ্টান্ত। কারণ শিশুরা এখানে অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। আর পেয়েছে আনন্দ আসরে নিজেদের প্রকাশের সুযোগ।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক শ্রীঅপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, নাট্য সম্মেলন গত এক বছর কোন সাহায্য ব্যতিরেকেই এই প্রতিষ্ঠানকে চালিয়ে এসেছেন শিশুদের আনন্দবিধানের জন্য, নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তিনি এই প্রসঙ্গেই বলেন, নাট্য সম্মেলন বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাজ সাধারণকে উৎসাহিত করবে, তাঁরাই এগিয়ে আসবেন শিশু স্বর্গকে বাঁচাবার এবং চলার পথকে সুগম করবার প্রচেষ্টা নিয়ে, এবং দেখা যাচ্ছে এখনই অনেকে এগিয়ে এসেছেন এর মঙ্গলবিধানের জন্য। সব শেষে উৎসব সভাপতি বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র শিশু স্বর্গের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, মহাজাতি সদন অছি পরিষদও এই শিশু স্বর্গের উন্নতিবিধানে আগ্রহী। মাত্র পনের পয়সার প্রবেশ মূল্যের বিনিময়ে সর্বস্তরের শিশুদের জন্য এই আনন্দবিধানের ব্যবস্থা তাঁকে খুশী করেছে। তিনি বলেন, নাট্য সম্মেলনের পক্ষে শিশুস্বর্গ গঠনের প্রয়াস সম্পর্কে বলা হয়েছে, বড়দের আমোদ-প্রমোদের অংশ যা শিশুদের গ্রহণ করতে হয়, সেটা তাদের নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। তাই তাদের মানসিক গুণাবলী বিকাশের সহায়তায় নিজেরা কষ্ট স্বীকার করেও এই প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়ে, তিনি নাট্য-সম্মেলনকে, শিশুদের নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্যও সচেষ্ট হতে বলেন। এরপর অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই শিশু স্বর্গের নবতম উৎসাহী ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীমনোতোষ ঘোষাল তাঁর দান, টফি-বিতরণ আরম্ভ করেন শিশু এবং উপস্থিত সকলের মধ্যে। সকলেই এতে বিস্মিত ও খুশী হন।

সেদিনকার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে-ছিলেন শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। আবৃত্তিতে ছোট্ট মেয়ে পাপিয়া দাস ও গোপা দাশগুপ্তা, মূকাভি-নয়ে শ্রীমান অলোকজ্যোতি পন্ডিত। সমবেত অনুষ্ঠানে শিশু সংঘ (দর্জিপাড়া) আর 'লিটল্ বিটলস্'। সবশেষে মনভোলান গীতি-নৃত্যনাট্য 'বর্ণপরিচয়' পরিবেশন করলেন ছন্দম গোষ্ঠী।

ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেল :

সঙ্গীতানুরাগীদের সুস্থ পরিবেশে সংগীত পরিবেশনের পরিকল্পনা নিয়ে ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেলের জন্ম। এই সংস্থার উদ্যোগে আজ ১৯ থেকে ২১ জুলাই তিন দিনব্যাপী রবীন্দ্র সদনে একটি সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনে যাঁরা অংশ গ্রহণ করছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন : কুমার গন্ধর্ব (দেওয়াস), সিদ্ধেশ্বরী বাঈ (কাশী), পন্ডিত জয়সরাজ, হাফিজ আহমেদ, এম আর, গৌতম, মৃদঙ্গবাদক ফাল্গুনমণি, বীণাবাদক চিত্তিবাবু, বেহালাবাদক বসন্ত রাণাডে, তবলিয়া কিষেণ মহারাজ, স্বরোদ-বাদক রাধিকামোহন মৈত্র, সেতারবাদক বলরাম পাঠক এবং কথক নৃত্যবিদ বিরজু মহারাজ।

মুনাওয়ার আলির সাংবাদিক সম্মেলন

গেল ১৫ই জুলাই সোমবার পরলোক-গত বড়ে গোলাম আলি খাঁসাহেবের পুত্র মুনাওয়ার আলি পার্ক সার্কাসে তাঁর বাস-গৃহে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন।

মন মানে কই!

অজয় বসু

বর্ণসংকর বেসিল ডি অলিভিয়েরা (সংক্ষেপে ডলিভিয়েরা) আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে এক বিতর্কিত চরিত্র।

ডলিভিয়েরার বাস দক্ষিণ আফ্রিকায়। গায়ের রং ধবধবে সাদা নয়। তাই দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে ময়দানে তিনি শ্বেত সম্প্রদায়ের কৌলিকগত উন্নততর ক্রিকেট খেলার সুযোগ, সুবিধা ও অধিকার পাননি। কিন্তু সহজাত দক্ষতা ছিল। তাই সুযোগ-বঞ্চিত থেকেও ডলিভিয়েরা নিজের চেষ্টাতেই নিজেকে একজন উঁচু খেলোয়াড়-রূপে গড়তে পেরেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার অজ্ঞাত ক্রীড়াঙ্গনে অখ্যাত কৃষ্ণকায় সতীর্থদের সঙ্গে খেলতে খেলতেই ক্রিকেটে তাঁর হাত পাকে এবং সেই পাকা হাতের সন্ধান পেয়ে একদিন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা বাইরের মুলুকে তাঁর নাম ছড়িয়ে দেন। তখন অনেকেই সুপারিশ জানান, ডলিভিয়েরাকে জাতীয় দলে জায়গা দিলে দক্ষিণ আফ্রিকার শক্তি বাড়বে।

কিন্তু চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী! বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট কর্তারা সে সুপারিশে কান পাতেন নি। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা হয়েও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দলে ডলিভিয়েরা ঠাঁই পাননি।

দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচকমণ্ডলী যেদিন ডলিভিয়েরার দাবী নস্যাৎ করে দেন সেদিন থেকেই ডলিভিয়ারাকে ঘিরে ক্রিকেট মহলে ..তর্ক চলে আসছে। আজও এই বিতর্কে দাঁড়ি পড়েনি।

স্বদেশে সুবিচার মিললো না দেখে ডলিভিয়েরা ক্রিকেট খেলতে ইংলণ্ডে চলে আসেন। বিত্তবান পরিবারের সন্তান নন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ইংলণ্ডে পাড়ি জমাবার পাথেয়ও ছিল না। বন্ধু-বান্ধব, গুণমুগ্ধরা চাঁদা তুলে পাথেয় যোগাড় করে দিলে তবেই ডলিভিয়েরা ইংলণ্ডে আসতে পারেন।

ইংলণ্ডে আসার পর ডলিভিয়েরার নাম যশ আরও বাড়ে। উস্টার্স কাউন্টি ক্লাব তাঁকে সাদরে বরণ করে নেয়। ইংলণ্ডের টেস্ট দলেও তাঁর জায়গা হয় এবং এম-সি-সি'র প্রতিনিধি হিসেবেও তিনি বিদেশ পরিক্রমার সুযোগ পান। এপর্যন্ত বেশ চলছিল। ডলিভিয়েরার ভাগ্যের চাকাও বুঝি ঘুরে যেতে বসেছিল। কিন্তু এম-সি-সি'র আর এক সফরের মুখেই আবার ডলিভিয়েরাকে পুরানো বিতর্কের মুখোমুখি ঠেলে দেওয়া হয়।

এবার এম-সি-সি যাবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেই দলের সদস্য হিসেবে ডলিভিয়েরার স্বদেশ যাবার সম্ভাবনা যতোই থাকুক না কেন, বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা কিছুতেই সফরকারী এম-সি-সি দলে একজন 'কালার্ড' ক্রিকেটারের উপস্থিতি মেনে নেবে না। অতীতে ভারতীয় রাজকুমার দলীপ সিংজীর ইংলণ্ডের পক্ষে খেলার প্রস্তাবেও দক্ষিণ আফ্রিকা বিরোধিতা করেছিল। তবে সে বিরোধীতার অস্তিত্ব ছিল গোপন।

অধুনা দক্ষিণ আফ্রিকা আরও নির্লজ্জের মতো খোলাখুলিই বর্ণবিদ্বেষের প্রশ্রয় দেয়। সরকারের নির্দেশেই দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে ময়দানে সাদা-কালোয় খেলার উপায় নেই। ক্লাব হাউসে মেলা-মেশার বা গ্যালারিতে একত্রে বসে খেলা দেখাও নিষিদ্ধ। কাজেই 'কালার্ড' হয়ে ডলিভিয়েরা এম-সি-সি'র একজন হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেন কি করে! তিনি যেতে চাইলেও দক্ষিণ আফ্রিকা তাঁকে সফর করতে দেবেন কেন!

অনুমান করা যায় যে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট কর্তারা এম-সি-সি'কে নেপথ্যে অবস্থাটা জানিয়ে ডলিভিয়েরাকে সফর-কামী দল থেকে বাদ রাখার জন্যে অনুরোধ করেছেন। এম-সি-সি'ও একাজে বর্ণ-বিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার সুযোগ্য স্যাঙ্গাত। মুখে যতোই সাধু সংকল্প উচ্চারণ করুক না কেন, এম-সি-সি কাজের হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সমর্থন করে আসছে। তাই বর্ণবিদ্বেষ আঁকড়ে ধরেও এবং কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলার পরও দক্ষিণ আফ্রিকার বেসরকারী টেস্ট ক্রিকেটে খেলার অধিকার বজায় থেকে গিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা আর এম-সি-সি'র যোগসাজসে ডলিভিয়েরা সফরকামী এম-সি-সি দল থেকে ছাঁটাই হবেনই। ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রও প্রস্তুত করা হচ্ছে। এই প্রস্তুতির লক্ষণ ডলিভিয়েরা সম্পর্কে এম-সি-সি অনুসৃত সাম্প্রতিক রীতিনীতিতে।

ডলিভিয়েরা এম-সি-সির সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়েছিলেন। সফরশেষে এম-সি-সি দল স্বদেশে ফেরার পর দলপতি কাউড্রে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, ডলিভিয়েরা আর কোনোদিন সফরকারী দলে থাকতে পারবেন না।

কেন? কি তাঁর অপরাধ?

ডলিভিয়েরার অপরাধ, তিনি নাকি সময়ের আগে একদিনের ভোজসভা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভোজসভা ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে ডলিভিয়েরা অধিনায়কের অনুমতি নিয়েছিলেন কিনা, তিনি অসুস্থ বোধ করছিলেন কিনা, একথা কাউড্রে জানাননি। শুধু বলেছেন যে ভোজসভা ছেড়ে যাওয়ার বেয়াদপী কখনই সহ্য করা হবে না।

তারপর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে প্রথম টেস্টে খেলতে ডলিভিয়েরার ডাক পড়েছিল। সেই টেস্টের এক ইনিংসে ডলিভিয়েরা দলের আর সবার চেয়ে বেশি রানও করেছিলেন। তবু দ্বিতীয় টেস্ট দলে তাঁর আর জায়গা হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাগুলির গভীরে উঁকি দিলেই বোঝা যায় যে, নেপথ্যে আজ এমন কিছু ঘটছে যার পরিণতিতে ডলিভিয়েরা হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকামী এম সি সি দল থেকে ছাঁটাই হয়ে যাবেনই। তাঁকে বাদ রাখতে পারলেই বর্ণবিদ্বেষীর মুখ রক্ষা করা যাবে।

আর সেই চিন্তাতেই এম-সি-সি কর্তৃপক্ষ আজ অতি তৎপর।

যে মানুষটিকে ঘিরে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংলণ্ডের ক্রীড়ামহলে এতো রাজনীতিক মার-প্যাঁচ, তিনি নিজে রাজনীতিক প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। সম্প্রতি তাঁর আত্মচরিত প্রকাশিত হয়েছে 'ক্রাইসিস অব কনসেন্স' নামে।

এই আত্মচরিতে ডলিভিয়েরা বলেছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকায়দের মধ্যে ক্রিকেটে অনেক সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে। সুযোগ সুবিধে না পেলেও, তাঁদের ক্রিকেট অনুরাগ খাঁটি। সুযোগ পেলে তাঁরা জবরদস্ত খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারবেন।

ব্যাস, এইটুকুতেই শেষ। আত্মচরিতের অন্যত্র কোথায়ও তিনি রাজনীতিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেননি। যে রাজনীতির খেসারত তাঁকে সারা জীবন ধরেই দিতে হচ্ছে সে সম্পর্কেও ডলিভিয়েরার লেখনী নিরুত্তর।

অনেক কথা বলেছেন, লিখেছেন ডলিভিয়েরা। নিতান্তই নিজস্ব কাহিনী সে সব। নিজে না বললে হয়তো সে সব কথা অন্যে জানতে পারতো না। কিন্তু জানাজানি হবার পর একটি কাহিনী ঘিরে পাঠকমন ডলিভিয়েরা সম্পর্কে সমবেদনায় অস্থির না হয়ে থাকতে পারে না। সেই কাহিনীই ডলিভিয়েরার বিবেকের কামড়—ক্রাইসিস অব কনসেন্স।

কাহিনীটি শোনা যাক,

ডলিভিয়েরা ইংলণ্ডে এসে ১৯৬৫ সালে উস্টার্স দলে প্রথম খেলেন। প্রথম বছরেই হাজার দেড়েক রান ও আধ ডজন সেঞ্চুরী করাতেই চারদিকেই ধন্য ধন্য পড়েও গেল। কিন্তু পরক্ষণেই এক মোটর দুর্ঘটনা তাঁকে টেনে নিয়ে যায় হাসপাতালের রোগশয্যায়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন বটে, কিন্তু ডান কাঁধের ব্যাথাটা কিছুতেই গেল না। মালিশ, শুশ্রূষা নিয়মিত চলছে তবু উপশমের লক্ষণ নেই। ডলিভিয়েরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। চিন্তার আরও কারণ, উস্টার্স শীগগীরই ওয়েস্ট ইণ্ডিজে খেলতে যাবে।

বেসিল ডি' অলিভিয়েরা

কি যে করবেন ডলিভিয়েরা! কাঁধের ব্যাথার কথা বলে দল থেকে ছুটি নেবেন? না, আহত হাত নিয়েই খেলা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন? উভয়সংকট আর কাকে বলে!

শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন, খেলা চালিয়েই যাবো। নেটে ব্যাট করলেন, খোলা মাঠে ফিল্ডিংও করলেন। কিন্তু যেই বল করার পালা এলো অমনি ধরা পড়ে গেলেন। ডলিভিয়েরা লিখলেন 'বল করার আগে যেই না মাথার ওপর হাত তুলেছি, অমনি মনে হলো যে কে যেন একটি বড়ো লোহা আমার কাঁধের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন।' যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়লেন। ডাক্তার, বৈদ্যি এলো। পরপর কদিন সম্বাহক মালিশ করে দিতে তিনি সুস্থ হলেন।

সুস্থ? না, পুরো সুস্থ তিনি আর কোনোদিন হতে পারেননি। হাত খুলে বলও তিনি কোনোদিন ছোঁড়েন নি। আঘাত লুকোতে স্লিপে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং করেছেন। আউট ফিল্ডে যাবার ডাক পড়েনি বিশেষ। যখন যেতে হয়েছে তখন তিনি বল ছুঁড়েছেন আন্ডারহ্যান্ডে।

কাঁধের এই নড়বড়ে অবস্থা। তবু পরের মরশুমেই ডলিভিয়েরা ইংলণ্ডের পক্ষে চারচারটি টেস্টে খেলার আমন্ত্রণ পেয়েছেন এবং কয়েকটি আসর ব্যাটে বলে মাতিয়েও দিতে পেরেছেন।

কাঁধের ব্যাথার দরুণ ডলিভিয়েরা যে আড়াআড়ি হাত চালিয়ে বল ছুঁড়তে পারেন না, সে কথাটি ইংলণ্ডের নির্বাচকমণ্ডলী, দর্শক ও সাংবাদিককুল, মায় টেস্ট দলের সতীর্থরা পর্যন্ত কোনোদিন বুঝতে পারেন নি।

ডলিভিয়েরা এতোগুলি মানুষকে, ক্রিকেটে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের দৃষ্টিকেও ফাঁকি দিয়েছেন। কিন্তু ও'দের ফাঁকি দিয়ে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেননি। তাই ক্রাইসিস অব কনসেন্সে তাঁকে প্রতিনিয়তই বিবেকের দংশন সহ্য করতে হয়েছে। বিষণ্ণ চিত্তে তিনি লিখছেন, 'আমি যে ষোল আনা সুস্থ ছিলাম না একথা আমার জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকলে কারুরই টেস্টে খেলা উচিত নয়। আমি যা করেছি তার জন্য আজ অনুতাপ করছি। আমি নৈতিক দায়িত্ব পালন করিনি।'

কেন করেন নি? তার কৈফিয়ৎ, "ছেলেবেলায় ভাল করে খেলার সুযোগ পাইনি। ইংলণ্ডে আসার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে যাবার এবং টেস্ট ম্যাচে খেলার সুযোগ যখন পেলাম তখন ভাবলাম যে এ সুযোগ হাতছাড়া করলে হয়তো আর কোনোদিনই ভেসে উঠতে পারবো না। কারুর জীবনেই তো সুযোগ বারবার আসে না। আঘাতের কথা লুকিয়েছি। লুকোনোর ফলে নিজেকে আর অতলে তলিয়ে যেতে হয়নি। কিন্তু তবু মনে করি, কাজটা ভাল করিনি। নিজের বিবেকের কাছে ছোট হয়ে গিয়েছি।"

খোলাখুলি স্বীকারোক্তি। মানতেই হবে যে এই স্বীকারোক্তিতে ডলিভিয়েরার চরিত্রের নেপথ্য দিকটাকে পাঠক ভাল করে চিনতে পেরেছেন।

১৯৬৮ সালের উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব বিজয়িনী শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) তাঁর ফাইনাল খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়ার কুমারী জুডি টেগার্টের কাছ থেকে অভিনন্দন গ্রহণ করছেন। বিশেষ উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালের এই সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে শ্রীমতী কিং উপর্যুপরি তিনবার (১৯৬৬-৬৮) মহিলাদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এবং গত বছর তিনি উইম্বলেডন এবং আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতায় 'ত্রিমুকুট' সম্মান পেয়েছিলেন।

ছাই নিয়ে যুদ্ধ

ক্রিকেটে টেস্ট ম্যাচের প্রথম প্রবর্তন ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার খেলা উপলক্ষ্য করে। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ মাঠে ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলতে নেমেছিল। দুই দেশের এই খেলাই পৃথিবীর মাটিতে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলা প্রসঙ্গেই শুধু 'এ্যাসেজ' কথার প্রচলন। এই দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে যে দল বেশী খেলায় জয়ী হয় তাদের কোন শীল্ড, কাপ বা ঐ জাতীয় কোন ট্রফি পুরস্কার দেওয়া হয় না। টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের বিজয়ী দলকে শুধু কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' খেতাবে পুরস্কৃত করা হয়। এই 'এ্যাসেজ' কথার উৎপত্তির মূলে আছে একটি বেদনাদায়ক ঘটনা।

খেলাধুলা

দর্শক

১৮৮২ সালের ওভালে অস্ট্রেলিয়া নাটকীয়ভাবে ইংল্যান্ডকে যে ৭ রানে পরাজিত করেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে 'এ্যাসেজ' কথার উৎপত্তি। শক্তি এবং খেলার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইংল্যান্ডের জয় ছিল অবধারিত। ইংল্যান্ড যখন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার দান হাতে পায় তাদের জয়লাভের জন্যে তখন মাত্র ৮৫ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে ছিল পর্যাপ্ত খেলার সময়। এক সময় দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেট পড়ে ইংল্যান্ডের ৫০ রান দাঁড়ায়। সুতরাং দুশ্চিন্তার কোন কারণই ছিল না—তখনও হাতে জমা ৮টা উইকেট, যথেষ্ট সময় এবং আর মাত্র ৩৫ রান সংগ্রহ করলেই খেলায় জয়লাভ। কিন্তু ইংল্যান্ডের পক্ষে শেষ পর্যন্ত এই ৩৫ রান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি—৮টা উইকেটের বিনিময়ে তারা মাত্র ২৭ রান তুলে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৭ রানে হেরে যায়। এ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। স্বচক্ষে খেলা দেখেও দর্শকরা খেলার ফলাফল কিছুতেই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারেননি—এমনি ছিল তাঁদের মনের অবস্থা। ক্রিকেট খেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য—খেলার ফলাফল সম্পর্কে অনিশ্চয়তা। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ইংল্যান্ডের এই ৭ রানে পরাজয়ের ঘটনাটি নিঃসন্দেহে তারই এক উজ্জ্বল নজির। এই খেলার ফলাফল ইংল্যান্ডের জনসাধারণের পক্ষে কিন্তু সহজভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ক্রিকেট যে তাদের জাতীয় খেলা। তারও বেশী—ক্রিকেট তাদের জীবনের ধ্যান-ধারণা

এবং নীতিশাস্ত্র। সুতরাং সে খেলায় কিনা এই রকম পরাজয়—জাতীয় আত্ম-মর্যাদায় এক চরম আঘাত। ক্ষোভ, দুঃখ ও বেদনা—সমস্ত মিলিয়ে সারা দেশ জুড়ে বিষাদের গাঢ় ছায়া নেমে আসে। তারই অভিব্যক্তি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পেয়েছিল খেলার পরবর্তী দিনের 'স্পোর্টিং টাইমস' পত্রিকার পৃষ্ঠায়। ইংলিশ ক্রিকেটের অকাল-মৃত্যু স্মরণে এক মর্মস্পর্শী বিলাপ—তার চারদিকে শোক-ব্যঞ্জক কালো বর্ডার। সংবাদের শেষে বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসাবে বলা হয়ঃ "ইংলিশ ক্রিকেটের মৃতদেহটি দাহ করার পর তার 'অ্যাসেজ' অর্থাৎ চিতা-ভস্ম অস্ট্রেলিয়াতে বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে।" এই 'অ্যাসেজ' কথাটি শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়—যেমন ক্রিকেট খেলার সঙ্গে ব্যাট-বলের সম্পর্ক। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলায় নামকরণ হল 'ছাই নিয়ে যুদ্ধ' এবং টেস্ট সিরিজে বিজয়ী দলকে বলা হয় 'অ্যাসেজ' বিজয়ী।

১৮৮২ সালে 'স্পোর্টিং টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত শোক-সংবাদে 'অ্যাসেজ' অর্থাৎ চিতাভস্মের প্রস্তাব ছিল নিছক কল্পনাপ্রসূত। তবে মাত্র ছ'মাসের মধ্যে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ারই টেস্ট খেলা উপলক্ষে 'চিতাভস্ম' ভিন্নভাবে বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। ১৮৮২-৮৩ সালের ক্রিকেট মরসুমে ইংল্যান্ড দল অনারেবল আইভো ব্লিগের (পরবর্তীকালে লর্ড ডার্ণলি) নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া সফরে যে চারটি টেস্ট-ম্যাচ খেলেছিল তার ফলাফল সমান দাঁড়ায়—প্রথম ও চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার জয় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডের জয়। মেলবোর্ণের কয়েকজন ক্রিকেট-অনুরাগিণী তরুণী ইংল্যান্ডের অধিনায়ক আইভো ব্লিগকে একটি মৃৎপাত্র উপহার দিয়েছিলেন। এই মৃৎপাত্রের মধ্যে ছিল দ্বিতীয় টেস্টে ব্যবহৃত উইকেট এবং বেলের চিতাভস্ম এবং মৃৎপাত্রের গায়ে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে একটি গাথা। ১৯২৭ সালে ব্লিগের পরলোকগমনের পর তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে এই স্মারক মৃৎ-পাত্রটি মেরীলিবন ক্রিকেট ক্লাবের হেপাজতে আসে। লর্ডস মাঠের স্মারক সংগ্রহশালায় দর্শকদের প্রধান আকর্ষণই এই ঐতিহাসিক মৃৎপাত্র।

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা একমাত্র নজির

উপর্যুপরি ২ বার 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ ঃ একমাত্র আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ (১৯৩৭-৩৮ সালে)।

উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদানের বছরেই 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভঃ একমাত্র আমেরিকার ববি রিগস (১৯৩৯)।

একই বছরে পুরুষ এবং মহিলাদের সিংগলস খেলায় একটি সেটও না-খুইয়ে খেতাব জয় ঃ ১৯৫৫ সালে পুরুষদের সিংগলসে টনি ট্রাবার্ট (আমেরিকা) এবং লুই ব্রাউ (আমেরিকা)।

সাঁতারের রাণী ফ্রেজার

অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সুইমিং ইউ-নিয়নের কর্মকর্তারা ১৯৬৫ সালে বিশ্ব-বিশ্রুতা সাঁতারু কুমারী ডন ফ্রেজারকে যে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন বর্তমানে সর্ব-সম্মতিক্রমে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কুমারী ফ্রেজার ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক গেমসে যোগদান করতে গিয়ে সেখানের কয়েকটি অসামাজিক ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার এই সুইমিং ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কুমারী ফ্রেজারের দীর্ঘদিনের মনোমালিন্য ছিল। কিন্তু তাঁরা এই তেজস্বিনী বালিকাকে বাগ মানাতে পারেননি। কুমারী ফ্রেজারের পক্ষে ছিল বিরাট জনমত এবং সাঁতারে তাঁর অসাধারণ সাফল্যের সূত্রে বিশ্বজোড়া খ্যাতি। কিন্তু টোকিওর ঘটনা-বলী হাতে পেয়ে অস্ট্রেলিয়ার সুইমিং ইউনিয়নের কর্মকর্তারা তাঁর উপর খড়্গহস্ত হলেন। টোকিওতে অবস্থানকালে কুমারী ফ্রেজার তাঁর চালচলনে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সম্মান যথেষ্ট খর্ব করেছেন—এই অপরাধের জন্য কর্মকর্তারা তাঁর সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, কুমারী ফ্রেজার দীর্ঘ দশ বছরে অস্ট্রেলিয়া এবং আন্তর্জাতিক সাঁতারের কোন আসরে যোগদান করতে পারবেন না। কুমারী ফ্রেজারের সঙ্গে আরও তিনজন অলিম্পিক সাঁতারু নান ডানকান, লিন্ডা ম্যাকগিল এবং মার্লিন ডেম্যান এই রকমের সাজা পেয়েছিলেন। সারা বিশ্বে এই নিয়ে খুব তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠে-ছিল।

বিচিত্র জীবনের গতি এই শ্রীমতী ডন ফ্রেজারের। তিনি যে একদিন বিশ্ববিশ্রুত সাঁতারু হবেন এমন কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেননি। শিশুকাল থেকে ঠান্ডা বাতাস এবং জল যাঁর ধাতে সহ্য হত না, সর্দি-কাশি এবং হাঁপানী পুঁজি নিয়েই যাঁর শরীর, তিনিই কিনা শেষপর্যন্ত 'সাঁতারের রাণী' এবং 'জলের পোকা' আখ্যা লাভ করলেন! রোগ এবং বয়স তাঁর জয়যাত্রার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ১৯৬৪ সালে যখন তিনি টোকিও অলিম্পিক গেমসে যোগদানের জন্যে এলেন, তখন চারদিকে কি হাসির রোল পড়ে গেল। তাঁর তখন বয়স ২৭ এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর হাঁটুর বয়সী। বয়সের এই তারতম্যে তিনি তাঁদের কাছ থেকে 'ঠানদি' সম্ভাষণ পান। এই মহিলার কি অসীম তেজস্বিতা! 'জলে কুমীর এবং ডাঙ্গায় বাঘ'—এই রকম উভয় সংকটের মধ্যে দিয়ে তাঁর খেলোয়াড়-জীবন অতি-বাহিত হয়েছে। কিন্তু তাঁকে কখনও বিচলিত হতে দেখা যায়নি। তিনি সমানে লড়াই করে শেষপর্যন্ত জিতেছেন—জলে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের এবং ডাঙ্গায় সাঁতারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে।

সাঁতারে অসাধারণ সাফল্য

কুমারী ফ্রেজার তাঁর আট বছরের খেলোয়াড়-জীবনে সবশুদ্ধ ৪০ বার সাঁতারের বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দেন। অলিম্পিক গেমসে তাঁর প্রথম যোগদান ১৯৫৬ সালে। উপর্যুপরি তিনটি অলিম্পিক গেমসে (১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬৪) যোগদানের সূত্রে তিনি মোট ৮টি পদক জয় করেন (স্বর্ণ ৪ ও রৌপ্য ৪)।

১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে তাঁর যোগদান সম্পর্কে এক সময় যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। টোকিও অলিম্পিক গেমসের কয়েক মাস আগে ফ্রেজার পরিবার এক শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনায় পড়ে-ছিলেন। এই দুর্ঘটনাতেই কুমারী ফ্রেজারের মা মারা যান এবং কুমারী ফ্রেজার সর্বাঙ্গে ক্ষত এবং আঘাত নিয়ে মাস-দেড়েক হাস-পাতালে শয্যা নিয়েছিলেন। ফ্রেজার পরিবারের মাথায় তখন বিপদের পর বিপদ নেমে এসেছে—কুমারী ফ্রেজারের বাবা কেনেথ ফ্রেজার তিন বছর আগে দেহরক্ষা করেছেন; তারপর এই মোটর দুর্ঘটনায় কুমারী ডন ফ্রেজার তাঁর মাকে হারালেন এবং নিজেও শয্যা নিলেন। কুমারী ফ্রেজারের বয়স এবং তাঁর পারিবারিক ক্ষয়ক্ষতি ও অশান্তির কথা বিবেচনা করে সকলেরই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল কুমারী ডন ফ্রেজারের অসাধারণ খেলোয়াড়-জীবনে এই-খানেই যবনিকাপাত হল—আন্তর্জাতিক সাঁতারে তাঁর নতুন করে কিছু দেওয়ার দিন ফুরিয়ে গেল। কিন্তু কুমারী ফ্রেজার তাঁর ২৭ বছর বয়সে টোকিও অলিম্পিকে শেষ-পর্যন্ত যোগদান করে সারা বিশ্বকে হতবাক করেন। টোকিও অলিম্পিকের সাঁতারের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে স্বর্ণ-পদক জয় করে তিনি উপর্যুপরি তিনবার একই বিষয়ে স্বর্ণপদক জয়ের দুর্লভ সম্মান লাভ করেন। এপর্যন্ত কুমারী ডন ফ্রেজার ছাড়া অপর কোন পুরুষ বা মহিলা অলিম্পিক সাঁতারের কোন একটি বিষয়ে উপর্যুপরি তিনবার স্বর্ণপদক জয় করতে পারেননি। তাছাড়া টোকিও অলিম্পিকে ১ মিনিটের কম সময়ে তিনি দু'বার ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতারের দূরত্ব অতিক্রম করেন—হিটে ৫৯.৯ সেকেন্ড এবং ফাই-নালে ৫৯.৫ সেকেন্ডে। অলিম্পিকে মেয়ে-দের ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতার ১ মিনিটের কম সময়ে অতিক্রম করার নজির আছে একমাত্র কুমারী ডন ফ্রেজারের।

টোকিও অলিম্পিকের বিজয়-মঞ্চে কুমারী ডন ফ্রেজার যখন ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতারের স্বর্ণপদকটি হাতে পান, তখন তিনি হাজার হাজার দর্শকের হর্ষধ্বনির মধ্যে কান্নায় ভেঙে পড়েন। সে-দৃশ্য বহু দর্শকের চোখও সজল করে তুলেছিল। এমন মহা আনন্দের দিনে কুমারী ফ্রেজারের হৃদয়ে গভীর বেদনা এবং শূন্যতা—আজ তাঁর বাবা-মা নেই।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

এই দেখুন এরা। যাকে বলে আবালবৃদ্ধ বনিতা।
আমার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখেরও বেশী।
রান্নায় আমার যে এত হাতযশ—
এই দেখুন তার চাবিকাঠিটা আমার হাতে।
সানরাইজ
গুঁড়ো মশলা। স্বাদে-গন্ধে এর জুড়ি নেই।
খাঁটি নির্ভেজাল জিনিষ। স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে তৈরী।
প্রকাশ ব্রাদার্স
গুঁড়ো মশলার
আদি প্রতিষ্ঠান।
৭৬/এ, নলিনী শেঠ রোড,
PURE POWDER SPICES

৮ম বর্ষ
১ম খণ্ড

১২শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 26th July, 1968. শুক্রবার, ১০ই শ্রাবণ, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীশ্যামল দত্তরায়

সাহিত্যে অশ্লীলতা

অমৃত-এর বার্ষিক সংখ্যায় সাহিত্যের নানান দিক নিয়ে অনেক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আজকের সাহিত্যে যে জটিল সমস্যা এবং প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, বিদগ্ধ প্রবন্ধকাররা তার সমাধানে ব্রতী হয়েছেন। সেজন্য নানা কারণে অমৃত-এর বার্ষিক সংখ্যাটি অভিনন্দনযোগ্য এবং ধন্যবাদার্হ।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। পণ্ডিতদের এই কথাটি অনেকখানি সত্য। সমাজের প্রতিচ্ছবি তো আমরা সাহিত্যের দর্পণে পেয়ে থাকি। অর্থাৎ চলমান জীবন-ধারার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য গড়ে ওঠে।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্তন যে অপরিহার্য, সে কথা বলাবাহুল্য। ধরা যাক, শরৎচন্দ্রের দেবদাস উপন্যাসখানি। এই উপন্যাসের অন্যতম বিশিষ্ট নারী-চরিত্র চন্দ্রমুখী। সে বেশ্যা। শরৎচন্দ্র সুনিপুণভাবেই এঁকেছেন চন্দ্রমুখীর চরিত্র। কিন্তু আজকের পাঠক চন্দ্রমুখীর চরিত্র বিশ্লেষণে ফাঁক পাবেন। কারণ, দেহ-বেসাতি যেখানে বেশ্যার প্রধান সম্বল, সেই দেহ-বেসাতির কোনো স্পষ্ট ছবি লেখক দেন নি। অনেকেই বলবেন, যদি সে রকম ছবি থাকতো উপন্যাসখানি অপাঠ্য হয়ে দাঁড়াতো। অর্থাৎ অশ্লীল-দোষে দুষ্ট হতো। আমি বলি, না, একেবারেই নয়। চন্দ্রমুখী দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে আরো অধিক প্রকট হতো, তাকে আরো স্পষ্ট করে চেনা যেতো। আজকের পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে উপন্যাসখানা psychological analysis হয়ে উঠতো। আজকের যুগটা চায় সবকিছু in detail। এর পেছনে কোন যৌন-বিকৃতি নেই। এর পেছনে আছে analytic curious mind। আমরা এখানে এমিল জোলার বিখ্যাত উপন্যাস নানা'র কথা উল্লেখ করতে পারি। লেখক নানা'র যৌবনপুষ্ট নগ্ন দেহের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রয়োজনবোধে, যৌন-সঙ্গমের ছবি আঁকতেও কার্পণ্য করেন নি। মোরাভিয়া, মোঁপাসা, কুপ্রিণ প্রভৃতি লেখকরা মানবচরিত্রের বিশ্লেষণে অনেক গল্প বা উপন্যাস লিখেছেন, যা আপাত-দৃষ্টিতে অশ্লীল বলেই মনে হয়। কিন্তু সেগুলো কি সত্যি সত্যি অশ্লীল? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে, 'যারে আমি ছোট ভাবি ছোট তারা কই'। উল্লিখিত লেখকদের গল্প উপন্যাসগুলি কি অশ্লীল দোষে দুষ্ট, না প্লটের বক্তব্য খুঁজে না পাওয়ার দরুণই শুধু তাঁরা যৌন-চেতনার ঢাক-ঢুনানি দিয়েছেন? বহুদিন আগে আমাদের ঘরের মেয়েরা পথে বের হতো না, কিন্তু আজ প্রয়োজনের তাগিদে পথে বের হতে বাধ্য হয়েছে। নইলে জীবন চলে না। তেমনি সাহিত্যে যা স্বাভাবিক তা প্রয়োজনবোধে দুঃসাহসী হয়ে মাথা উঁচিয়ে বাহিরে এসেছে। তাই বোধহয় আজকের সাহিত্য এতো উন্নত এবং বিশ্লেষণাত্মক হয়ে উঠছে। সাহিত্য বিকৃত হবার আগে বোধহয় মানসিক বিকৃতি ঘটে। তাই বিকৃতমন সাহিত্যের ব্যাকরণ এবং জীবনের ব্যাকরণের পার্থক্য খুঁজে বেড়ায়, মিল খুঁজে পাওয়া সে-মনের আওতার বাইরে থাকে। রঙিন কাঁচ দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকালে পৃথিবীর রঙটা পালটে যায়, তেমনি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাহিত্য পাঠ করলে, সাহিত্যের স্বরূপও যে সংকীর্ণ এবং বিকৃত হবে—এ তো সহজ কথা।

মানুষের জীবন-পরিধিতে অনেক কিছুই ঘটে, কোনো পূর্ব-প্রস্তুতি সেসব ঘটনার পেছনে সব সময় থাকে না। সাহিত্যিকের দায়-দায়িত্ব হলো যথাযথভাবে সেইসব ঘটনার বিশ্লেষণমূলক পরিবেশন; তার ভাল-মন্দের প্রতি মনোযোগ দেওয়া। লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার উপন্যাসখানা সে-দিক দিয়ে নিষিদ্ধ ভালোবাসার এক নিখুঁত ছবি। পরিবেশন পদ্ধতি অপূর্ব। সৌন্দর্য এবং সংযমের পরিচয় বহন করে উপন্যাসখানি হয়ে উঠেছে অনবদ্য। উপন্যাসখানি সংকীর্ণতাহীন বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলীর অশ্লীল বলে মনে হবে না বলে আমার বিশ্বাস।

সম্প্রতি সাহিত্যের শ্লীল-অশ্লীল প্রসঙ্গে অমর বসু মহাশয় মন্তব্য করেছেন: গল্পকার বা ঔপন্যাসিক যখন কোনো বক্তব্য খুঁজে পান না, তখনই সহজ সুড়সুড়ি দেবার পথটি বেছে নেন। ফলে যৌন কথায় সাহিত্য প্রায় অপাঠ্য হয়ে পড়ে।...এই অশ্লীলতার স্বপক্ষে অনেকেই সাফাই গাইছেন।...সারা জীবনে তাঁরা যা করে উঠতে পারেন নি, এবার রুচি-বিকৃতির পথে সেই বাহবাটুকু আদায় করে নিতে চান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। (অমৃত, চিঠিপত্র বিভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ)।

উপরোক্ত মন্তব্যটির পেছনে কোনো সুষ্ঠু যুক্তি খুঁজে পেলাম না। অমরবসু মহাশয় যদি pornographic literature-এর কথা বলে থাকেন তো আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু সাহিত্য বলতে যা সহজে বোঝা যায়, তার প্রতি মন্তব্যটি যদি করে থাকেন, তবে বলবো, খুব ভুল করেছেন। এই রকম অর্থহীন মন্তব্য শুধু অন্যায়ই নয়, সাহিত্যের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক! সাহিত্যের স্বরূপ এবং প্রকৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি অকারণে বিচারকের আসনে স্বেচ্ছায় বসেন, সেটা বোধহয় নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ। অমরবাবু বোধহয় চান আজকের সাহিত্যে 'পাখী সব করে রব' যুগের একটা continuity থাকে। তাঁর মতে, সাহিত্যে যৌন-সমস্যা নিষিদ্ধ ফল। আমার মনে হয়, অমর বসু মহাশয়ের মত সমালোচকদের জ্ঞান আর উপদেশের মত যদি আজকের সাহিত্য পথ চলে, তাহলে সাহিত্যের আর পথ চলা হবে না। সাহিত্য জীবন আর সমাজকে নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নেমেছে, তাও বন্ধ করতে হবে। সাহিত্যে জমবে শুধু পুনরাবৃত্তির জঞ্জাল। আমি অমরবাবুর দৃষ্টিভঙ্গীকে কালোপযোগী করার জন্য অনুরোধ করবো। তাহলে হয়তো আমার বক্তব্য হৃদয়ংগম করতে সমর্থ হবেন।

— কল্যাণ সিংহ
কুনকুন সিং লেন, পাটনা।

'বাঁচার জন্যে' প্রসঙ্গে

অমৃতের ৭ম সংখ্যায় শিশির নিয়োগী লিখিত বাঁচার জন্যে প্রবন্ধটির জন্য লেখক এবং পত্রিকার সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই। গত একশ বছরে আবিষ্কৃত ওষুধের ইতিহাস প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে হৃদয়গ্রাহী এবং মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

লেখাটির ব্যাপারে আমার কিছু বক্তব্য আছে। লেখক লিখেছেন ১৭৯৮ সালে ডক্টর জেনার বসন্ত রোগের টীকা আবিষ্কার করেন, কিন্তু আমি অন্যত্র দেখেছি ১৭৮৬ সাল।

অনুরূপভাবে লেখকের মতে যদিও পেনিসিলিন আবিষ্কার-এর সাল ১৯২৮, কিন্তু অন্যত্র দেখেছি ১৯৩৮ সাল।

আরেকটা ব্যাপারে মনে খটকা লাগল। ১৯০৮ সালে ভিয়েনার রসায়নবিদ গেল[illegible] যদি সালফানিলামাইড ব[illegible] তবে সালফা ড্রাগের আবিষ্কর্তা হিসাবে ডোমোকের নাম এবং সাল হিসাবে ১৯৩২ সালকে ধরা হয় কেন?

লেখক লিখেছেন—১৯২৩ সালে বিজ্ঞানী রামন (ভারতীয় বিজ্ঞানী সি ভি রামন কী?) দেখালেন যে ডিপথিরিয়া টকিসনের মধ্যে একটু ফর্মালিন মিলিয়ে দিলে বিষক্রিয়ার ভয় থাকে না এবং ১৯২৪ সালে বিজ্ঞানী ডেসকম্বি দেখালেন যে এটা টিটেনাসের টকিসনের বেলাতে প্রযোজ্য। তাহলে রামনের আবিষ্কার কি ভুল?

সবশেষে জানাই যে লেখক টীকার আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সল্ক টীকার কথা লেখেননি। শিশু পক্ষাঘাত রোগ প্রতিষেধক পৃথিবীবিখ্যাত সল্ক টীকা আবিষ্কার করেন আমেরিকার ডাঃ জোনাস সল্ক ১৯৫৫ সালে।

—জিতেন্দ্রনাথ মুখার্জি,
বান্দোয়ান, পুরুলিয়া।

অমৃত
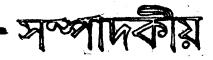
মস্কোর মতিগতি

রাষ্ট্রপতি সম্প্রতি রাশিয়া থেকে ফিরেছেন। এ ধরনের মিত্রতা কি যাত্রা নূতন নয়। জওহরলাল নেহরুর আমল থেকেই রাশিয়ার সংগে ভারতের মিত্রতার সেতু তৈরী হচ্ছে। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ভারতের বৈষয়িক উন্নয়নে গত দশ-পনেরো বছরে রাশিয়া ভারতকে প্রভূতভাবে সাহায্য করেছে। এখনও সেই সাহায্য অবারিত। ইস্পাত কারখানা তৈরী থেকে শুরু করে ভারী যন্ত্রশিল্পের কারখানা নির্মাণ এবং ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে রাশিয়া যে-ভাবে সাহায্য করছে তা অন্য কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের চেয়ে কম তো নয়ই বরং গুণগত বিচারে তার মূল্য অপরিসীম। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সোভিয়েট ইউনিয়ন বড় দুঃসময়ে ভারতবর্ষকে বহুবার নিঃশর্ত সমর্থন জানিয়েছে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, কাশ্মীরের ব্যাপারে, গোয়ার ব্যাপারে এবং আরও অনেক নীতিগত প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের দরবারে বৃহৎ শক্তি হিসেবে রাশিয়ার সরব ও উচ্চারিত সমর্থন কীভাবে পাকিস্থান ও পশ্চিমী কুচক্রীদের স্তব্ধ করে দিয়েছিল। ১৯৬২ সালে চীনের আক্রমণ এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্থানের আক্রমণের সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের বন্ধু হিসেবে আত্মরক্ষা ও শান্তির জন্য যে-চেষ্টা করেছিল আমাদের জন্য তাও আমাদের নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে।

রাষ্ট্রপতি সফর শেষ করে এসে ভারত-রুশ মৈত্রী যে অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত আছে এবং থাকবে সে কথাই বলেছেন। এতে আশ্বস্ত হতে পারলে কোনো চিন্তার কারণ ছিল না। কিন্তু উদ্বেগ দেখা দিয়েছে অন্য কারণে। সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্থানকে অস্ত্রসাহায্য দিতে রাজী হয়েছে, এটা ভারতের পক্ষে দুঃসংবাদ। কিছুদিন আগে পাকিস্থানের স্থলবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে একটি সামরিক মিশন রাশিয়া সফর করে এসেছে। সম্প্রতি একটি রাশিয়ান সামরিক মিশনও পাকিস্থান সফরে এসেছে। উদ্দেশ্য, পাকিস্থানকে যে অস্ত্র দেওয়া হবে তার জমি পরখ করে দেখা। মোট কথা, পাকিস্থান রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র পাচ্ছে। যদিও রাশিয়ার তরফ থেকে বলার চেষ্টা হচ্ছে যে এতে ভারতের ভয়ের কিছু নেই এবং ভারত-রুশ মৈত্রীতে ফাটল ধরবে না এ কারণে। বলা বাহুল্য, এ আশ্বাস যথেষ্ট নয়। আমেরিকাও একই ধরনের [illegible] দিয়েছিল পাকিস্থানকে অস্ত্র দেবার বেলায়। তার ফল কি হয়েছিল তা ভারতবর্ষ জানে ১৯৬৫ সালে অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়ে।

রাশিয়ার মন ভজানো পাকিস্থানের মস্তবড় কূটনৈতিক সাফল্য। অবশ্য একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, ভারতের প্রতি বিরূপতাবশত রাশিয়া পাকিস্থানকে অস্ত্র দিচ্ছে। কিন্তু তাতে ভারতের তো আশ্বস্ত হবার সুযোগ নেই। কারণ, পাকিস্থান একটি ডিক্টেটর শাসিত রাষ্ট্র। সেখানে গণতন্ত্র কণ্ঠরুদ্ধ। প্রগতিবাদী কোনো রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সেখানে নেই। তা ছাড়া আমেরিকার সংগে রয়েছে তার ঘনিষ্ঠ সামরিক আঁতাত। এমন একটি রাষ্ট্রের হাতে রাশিয়া অস্ত্র তুলে দিচ্ছে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে। এবং এই অস্ত্র দিয়ে যে পাকিস্থানের শাসকরা ভারতের উপর আক্রমণ চালাবে না তার কোনো গ্যারান্টি রাশিয়া আদায় করতে পারবে না, কিংবা পারলেও সে-গ্যারান্টির কোনো মূল্য নেই।

ভারতবাসী সে কারণেই গভীর উদ্বিগ্ন। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছে। রাশিয়া এবং আমেরিকা ছিল এতদিন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। আশ্চর্যের বিষয় যে, আজ রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে বহু বিষয়ে সমঝোতার মনোভাব দেখা দিয়েছে। কিন্তু তৃতীয় এক শক্তি দাঁড়িয়েছে চীন। তার হাতে রয়েছে পরমাণু বোমা। রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়েই চীন নিয়ে উদ্বিগ্ন। সম্ভবত চীনকে ঠেকাবার জন্যই আজ রাশিয়া পাকিস্থানেরও দ্বারস্থ হতে দ্বিধা করছে না। কিন্তু চীন ও পাকিস্থান উভয়েই ভারতের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এ ক্ষেত্রে রাশিয়ার মতিগতি ভারতকে স্বভাবতই আরও বিক্ষুব্ধ করে তুলবে। একদল চাইবে যে, ভারত আত্মরক্ষার জন্য আমেরিকার সংগে সামরিক গাঁটছড়া বাঁধুক। কিন্তু তার পরিণাম হবে আমাদের দেশের মাটিতে যুদ্ধ ডেকে আনা, যেমন হয়েছে ভিয়েৎনামে। আমরা তা চাই না। এখন স্বনির্ভরশীলতাই একমাত্র বাঁচার পথ। পরের হাতে অস্ত্র রেখে আমরা কোনোদিনই আত্মরক্ষায় নিশ্চিন্ত হতে পারব না।

আতস কাচ

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

মেডিক্যাল কলেজের ভিতর, বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ফুলের বাগান। আর বাগান মানেই খানিকটা সবুজ, কিছু ফুলটুল, সবুজ ঘাসের গালিচা। ঘুরে ঘুরে বাগানটা দেখছিল সুরেশ্বর। হাতে খানিকটা সময় আছে। হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার্স আরো খানিকটা পরে।

সুরেশ্বরের ইচ্ছে হল বাগানের রেলিংগুলো টপকে সবুজ ঘাসের উপর গিয়ে বসে। নরম ঘাসের উপর শুয়ে নীল আকাশ, মেডিক্যাল কলেজের ঘরবাড়ী এবং লোকজন দেখে। ইচ্ছে করলে ঘাসের একটা শীষ ছিঁড়ে দাঁতের ফাঁকে চিবুবে, কিংবা খরিখটি চেপে ধরে পুরাতন সব স্মৃতি--সিন্দুকের মধ্যে রাখা তীর্থক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করে আনা দুষ্প্রাপ্য সব বস্তুর মতো নাড়াচাড়া করবে। তারপর আবার উঠে বসবে। ততক্ষণে ভিজিটার্সদের আনাগোনা শুরু হবে। সুরেশ্বর তখন অফিসমুখো চঞ্চল কেরানীর মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গ্রীন-ওয়ার্ডের দিকে হাঁটা শুরু করবে। রোগশয্যায় শুয়ে শমিতা নিশ্চয়ই তার আগমনের সময় হয়েছে ভেবে ঘড়ির কাঁটায় সেকেন্ড পর্যন্ত লক্ষ্য করছে।

দিনটা শনিবার। শীতের শেষ হয়ে এল। কিন্তু রোদ এখনও ভারী নিস্তেজ। ভোরবেলায় ঘুমিয়ে থাকা শিশুর মত কচি কোমল। আর কয়েকদিন পরই শীত চলে যাবে। হঠাৎ শীত ফুরিয়ে যাবে ভেবে সুরেশ্বরের খুব খারাপ লাগল। কলকাতায় তো এই একটা মাত্রই ঋতু। শীত শেষ হয়ে গেলে জীবনের সব গীতও যেন শেষ হয়ে গেল। কলকাতার উৎসব, মেলা, নাচগান, নানা আসর, শখের থিয়েটার সবই তো শীতে জমজমাট। গত ছ'মাস ধরে সুরেশ্বর অবশ্য একটা ঋতুই উপভোগ করছে। সে ঋতুটির নাম অভিধানে নেই। সুরেশ্বর ওর নাম দিয়েছে দুঃখ-ঋতু। সত্যি এই ছ'মাসে সুরেশ্বরের যেন নাজেহাল হবার অবস্থা। ডাক্তার - বদ্যি, ওষুধের দোকান আর হাসপাতাল এইসব যেন ভক্তের

মন্দির দর্শনের মত নিত্য দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠেছে তার কাছে।

সুরেশ্বর মেডিক্যাল কলেজের বাগানের ফুলগুলি দেখছিল। বিচিত্র বর্ণের সব ফুল। শাদা, হলদে আরো কি একটা রঙের চন্দ্রমল্লিকা। মেয়েদের খোঁপার মত বড় সাইজের ডালিয়া। ঝোপঝাপ,...বিচিত্র বর্ণের পাতাবাহার গাছগুলি দু'-তিনটি সন্তানের জননীর মত গোলগাল। ইচ্ছে করছিল একটা বড় সাইজের চন্দ্রমল্লিকা ও ছিঁড়ে নেয়। শমিতা ফুল ভালবাসে। মনে হল বৌবাজারের দোকান থেকে কিছু পুষ্প সংগ্রহ করে আনলে ভাল হত। এখন আর সময় নেই—।

রাস্তা দিয়ে একটা ওয়ার্ড-বয় দ্রুত হাঁটছিল। তার হাতে একটা খাতা, কয়েকটা ফর্মগোছের কাগজপত্র। সুরেশ্বর ওর ব্যস্ত-ভাব দেখে কৌতুক অনুভব করল। কে একজন পিছন থেকে বলল ওকে—'এই মতি-রাম, কোথায় ছুটছিস?'

সুরেশ্বর দেখল ওরই মত আর এক-জন ওয়ার্ড-বয় আসছে বিপরীত দিক থেকে।

মতিরাম জবাব দিল—'তাড়া আছে ভাই। আর এম ও সাহেবের কাছে পাস-পোর্ট সই করাতে যাচ্ছি—'

—'পাসপোর্ট?'

—'হাঁ, হাঁ। দেড়ঘণ্টা আগে এক আদমী তো চলে গেল। ওরই পাসপোর্ট।...'

জবাব শুনে সুরেশ্বর খুব মজা অনু-ভব করল। ওয়ার্ড-বয় হলেও ওর রসজ্ঞান টনটনে। ডেথ সার্টিফিকেট না বলে পাস-পোর্ট বলছে যখন। আর ডেথ সার্টিফিকেট তো পাসপোর্টই। এক রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে যাবার অনুমতিপত্র! সুরেশ্বরের মনে হল মারা গেলে শমিতার জন্যও তাকে ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। তার জন্য মতিরাম কিংবা অন্য কেউ অমনিভাবে ছুটোছুটি করবে। শমিতার পাসপোর্ট সই [illegible]য়ে আনবে। লাল কলমে আর এম ও খসখস করে দস্তখত দেবেন।

হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে চমকে উঠল সুরেশ্বর। এই অবেলায় মেডিক্যাল কলেজে ও কে? মানসী মিত্র হঠাৎ মেডিক্যাল কলেজে কেন? খুব দ্রুত তেপান্তর অতীতের মাঠে হাজির হল সুরেশ্বর। আচ্ছা মানসীর সঙ্গে তার কি শুধু পরিচয় ছিল? না, আরো কিছু?...বন্ধুত্ব? ঘনিষ্ঠতা? পাঁচজনে অবশ্য বলত সুরেশ্বর প্রেমে পড়েছে। ওটা লাভ......মাখামাখি অ্যাফেয়ার। কথাটা চিন্তা করে সুরেশ্বর নিজের মনেই হাসল। সুরেশ্বরের সঙ্গে মানসীর তেমন কিছুই হয়নি। প্রেম ভাল-বাসা তো বহুদূর—...।

মানসীর সঙ্গে কতদিন পরে দেখা? সুরেশ্বর দ্রুত হিসেব করল মনে। চার বছর?...হ্যাঁ, চার বছরই হবে। কিংবা পাঁচ বছরের মত। মফস্বলের সেই শহর ছেড়ে কবে কলকাতায় এল মানসী? বাঁকুড়া কলেজের সেই পাখি ডাকা শান্ত দুপুর-গুলি কোথায় কোন্ অতলে ঢাকা পড়েছে।

সুরেশ্বর ভাবল তাকে হঠাৎ দেখলে মানসী কি মনে করবে?

পুরান বান্ধবীর স্মৃতিগুলি নানা রঙের চিত্র। কল্পনায় ফিরিওয়ালার চোঙ-লাগানো ম্যাজিক বক্সের লেন্সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুরেশ্বর বাঁকুড়া কলেজের সেই ছবিগুলি দেখতে চেষ্টা করল। পিছনের সেই আকাশে হেলান দেওয়া শুশুনিয়া পাহাড়,...ছোলা-খাওয়া নধর ভেড়ার গায়ের লোমের মত সবুজ ঘাসের আস্তরণ। ...মিচেল হস্টেল। ...কলেজের পুকুরটা। ছবিগুলি এতদিনে যেন ঈষৎ বিবর্ণ।—...এগিয়ে এসে যেন মানসীই আবিষ্কার করল তাকে। ওর দুটি চোখে সমুদ্রগামী নাবিকের হঠাৎ কোনো সবুজ দ্বীপ আবিষ্কারের বিস্ময়।

—'ওমা, আপনি এখানে!' মানসী এক-গাল হাসল।

সুরেশ্বর অবাক হয়ে মানসীকে দেখল। অনেকদিন পরে পুরান এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে যেমন বিস্ময় ঝরে পড়ে, সুরেশ্বরের তেমনি অবস্থা। সত্যি, মানসীকে যেন চেনা যায় না। দূর থেকে একরকম দেখাচ্ছিল। কাছে আসতেই মনে হল মানসী কি সুন্দর হয়েছে। যেন অনেকক্ষণ শুধু চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় মানসীর দিকে। চোখ ফিরিয়ে নিতে মন চায় না।

সিঁথিতে সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে। আগের দিনের সে মানসী কই? ধানচারার মত পাতলা ছিলছিলে চেহারা নয়। বেশ মোটাসোটা হয়েছে মানসী। বিয়ের পর থেকেই মেয়েরা তো আয়তনে বাড়তে শুরু করে। কিন্তু কতদিন বিয়ে হল মানসীর? ও এখানে কেন?—

সুরেশ্বর হেসে বলল—'আজ অফিসেই আর এক পুরান বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তখন দুপুর, বিকেলবেলায় তোমার সঙ্গে দেখা। হয়ত সন্ধ্যার সময় আর কাউকে পেয়ে যাব—'

মানসী ফিক করে হাসল। 'ভারী মজা, তাই না? একদিনে প্রহরে প্রহরে পুরান সব চেনা-জানাদের সঙ্গে যদি দেখা হতে থাকে!'

সুরেশ্বর বলল—'মেডিক্যাল কলেজে কেন? কলকাতায় কোথায় রয়েছ?...'

—'উনি ভর্তি হয়েছেন যে!' মানসীর মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল।

বলল—'অনেকদিন ধরে ভুগছেন। আট-দশ মাস তো হবেই, বরং বেশী।'

—'অসুখটা কি?' সুরেশ্বর জানতে ব্যগ্রতা দেখাল।

—'সিরোসিস অফ লিভার। ডাক্তাররা বলছেন তাই।—হয়তো সারবে কিংবা—' মানসী করুণ দৃষ্টিতে চাইল।

—'সারবে না তো কি? এতবড় মেডি-ক্যাল কলেজ, বড় বড় সব ডাক্তাররা রয়েছেন। রোগ নিশ্চয়ই সারবে। কোথায় রয়েছেন তোমার স্বামী?—'

মানসী একটা ওয়ার্ডের নাম করল। বলল,—'কিন্তু আপনি কেন মেডিক্যাল কলেজে এসেছেন বললেন না?'

সুরেশ্বর ম্লান হাসল। বলল—'একই ব্যাপার। আমার স্ত্রীকে ভর্তি করেছি এখানে। রিউম্যাটিক হার্টের পেসেন্ট। হয়ত দীর্ঘদিন শুয়ে থাকতে হবে বেডে।'

অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। একটা মালী বাগানের ফুলগুলির পরিচর্যা করতে এসে তার দিকে অবাকদৃষ্টিতে চাইল। কোথা থেকে একটা বল লাফিয়ে এসে পড়ল পায়ের কাছে। সম্ভবত কাছাকাছি কোথাও ছেলেরা ক্রিকেট খেলায় মত্ত। বলটা তাদেরই কারো ব্যাটের শাসনে এতদূর ছুটে এসেছে।

সুরেশ্বর বলল—'অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা। বাঁকুড়া কলেজে পড়তাম বছর-চারেক আগে। কিংবা তারো বেশী।' মনে মনে যেন পুরান অতীতটাকে খুঁজছিল সুরেশ্বর।

লিটকুইজ উইকালির
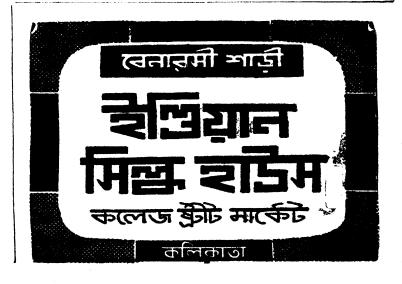
প্রথম চারটি সংখ্যায় আছে

নং ৯৫ : চিত্রে একটি এন্ট্রির আত্মজীবনী। নং ৯৬ : মীমাংসক শব্দের বর্ণানুক্রমিকভাবে ১নং হইতে ৩৪নং পর্যন্ত সকল সূত্রের বিন্যাস। নং ৯৭ : ১নং হইতে ৩৪নং পর্যন্ত লেখকদের নাম। নং ৯৮ : যুগ্ম : বর্ণানুক্রমে মীমাংসা ও সংকলয়িতার শব্দের বিন্যাস।

(২্ টাকা পাঠান ও এই ৪টি সংখ্যা লাভ করুন।)
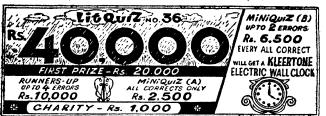
আপনি জয় করতে পারেন

বন্ধের তারিখ

বৃহত্তর বোম্বাইয়ে রক্ষিত বাক্স এবং ডাকযোগে প্রেরিত সমস্ত এনট্রির ক্ষেত্রে

৭ই আগষ্ট, ১৯৬৮, সন্ধ্যা ৬টা

সরকারী সমাধান ষ্টেটসম্যান :—১১-৮-৬৮

পুরস্কারের তালিকা

লিটকুইজ উইকলি এবং ভারত জ্যোতিতে

২৫-৮-৬৮

সমাধান ফেরত পাইবার জন্য আপনার প্রবেশপত্র সহ নিজ ঠিকানা লিখিত ১০ পয়সার পোস্ট কার্ড পাঠান।

১্ টাকা পাঠান এবং **লিট্‌কুইজ উইকলির** ৮টি সংখ্যা লাভ করুন।

৩৬ লিটকুইজের সরকারী ভর্তি ফরম

ADDRESS :—LITQUIZ NO. 36, **ALANKAR, BALARAM ST., BOMBAY-7**

বন্ধের নির্দিষ্ট শেষ তারিখ : বুধবার, ৭-৮-৬৮

দ্রষ্টব্য :—(১) প্রত্যেক কলমে আপনার বাতিল করা শব্দটি কালি দিয়ে কেটে দিন; (২) আপনি যদি সব কয়টি কুপন না পাঠান, তা হলে বাকী কুপনগুলি বাতিল করে দিন; (৩) আপনি যদি **মানি অর্ডারযোগে** প্রবেশমূল্য পাঠান, তা হলে **এই** এনট্রি ফরমের সঙ্গে ডাকঘর থেকে পাওয়া **মানি অর্ডার** রসিদটি অবশ্যই পাঠাবেন। মানি অর্ডার **রসিদ** ছাড়া এনট্রি বাতিল করা হবে; (৪) আই-পি-ও ক্রস করবেন না। **লিট্‌কুইজ** নং ৩৬ - বোম্বাই - ৭-এর অনুকূলে টাকা পাঠান।

	1	Re. 1		2	Re. 1		3	Re. 1		4	Re. 1
1	ADAPTATION	VARIATION	1	ADAPTATION	VARIATION	1	ADAPTATION	VARIATION	1	ADAPTATION	VARIATION
2	DIVINITY	HARMONY	2	DIVINITY	HARMONY	2	DIVINITY	HARMONY	2	DIVINITY	HARMONY
3	ENJOYABLE	TOLERABLE	3	ENJOYABLE	TOLERABLE	3	ENJOYABLE	TOLERABLE	3	ENJOYABLE	TOLERABLE
4	EVENTS	MOVEMENTS	4	EVENTS	MOVEMENTS	4	EVENTS	MOVEMENTS	4	EVENTS	MOVEMENTS
5	HONESTY	HUMILITY	5	HONESTY	HUMILITY	5	HONESTY	HUMILITY	5	HONESTY	HUMILITY
6	LONELY	WEARY	6	LONELY	WEARY	6	LONELY	WEARY	6	LONELY	WEARY
7	MATTER	NATURE	7	MATTER	NATURE	7	MATTER	NATURE	7	MATTER	NATURE
8	MUDDLE	TROUBLE	8	MUDDLE	TROUBLE	8	MUDDLE	TROUBLE	8	MUDDLE	TROUBLE
9	NORMAL	RATIONAL	9	NORMAL	RATIONAL	9	NORMAL	RATIONAL	9	NORMAL	RATIONAL
10	POLITICS	POWER	10	POLITICS	POWER	10	POLITICS	POWER	10	POLITICS	POWER
11	POVERTY	REALITY	11	POVERTY	REALITY	11	POVERTY	REALITY	11	POVERTY	REALITY
12	POWERS	PRAYERS	12	POWERS	PRAYERS	12	POWERS	PRAYERS	12	POWERS	PRAYERS
13	REASONABLE	RESPONSIBLE	13	REASONABLE	RESPONSIBLE	13	REASONABLE	RESPONSIBLE	13	REASONABLE	RESPONSIBLE
14	RELIGIOUS	SUPERFLUOUS	14	RELIGIOUS	SUPERFLUOUS	14	RELIGIOUS	SUPERFLUOUS	14	RELIGIOUS	SUPERFLUOUS
15	SOCIAL	SOUL	15	SOCIAL	SOUL	15	SOCIAL	SOUL	15	SOCIAL	SOUL
16	SPONTANEITY	SPORT	16	SPONTANEITY	SPORT	16	SPONTANEITY	SPORT	16	SPONTANEITY	SPORT
17	TRADITIONS	TRUTHS	17	TRADITIONS	TRUTHS	17	TRADITIONS	TRUTHS	17	TRADITIONS	TRUTHS
18	UNHAPPY	UNSTEADY	18	UNHAPPY	UNSTEADY	18	UNHAPPY	UNSTEADY	18	UNHAPPY	UNSTEADY

SEND FIRST TWO COUPONS & ENTER MiNiQuiZ (A) FREE — No. 36 — SEND FOUR COUPONS & ENTER BOTH MiNiQuiZ (A & B) FREE

MiniQuiZ (A) — 6 CLUES FREE COUPON

ADAPTATION	VARIATION
DIVINITY	HARMONY
ENJOYABLE	TOLERABLE
EVENTS	MOVEMENTS
HONESTY	HUMILITY
LONELY	WEARY

MiniQuiZ (B)

MATTER	NATURE	REASONABLE	RESPONSIBLE
MUDDLE	TROUBLE	RELIGIOUS	SUPERFLUOUS
NORMAL	RATIONAL	SOCIAL	SOUL
POLITICS	POWER	SPONTANEITY	SPORT
POVERTY	REALITY	TRADITIONS	TRUTHS
POWERS	PRAYERS	UNHAPPY	UNSTEADY

৩৬ AMRITA

এই কুইজে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়ম ও সর্তাবলী পালন করতে রাজী এবং প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার চূড়ান্তভাবে ও আইনতঃ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করলাম। প্রত্যেক কুপনের জন্য প্রবেশ মূল্য : ১্ টাকা। সম্পূর্ণ ফরমটির (৪টি কুপন) প্রবেশ মূল্য ৪্ টাকা। আমি এম-ও রসিদ/আই-পি-ও/লিট্‌কুইশ ক্যাশ রসিদ/প্রাইজ কার্ড ও তার নম্বর.................পাঠালাম।

CAPITAL LETTERS IN ENGLISH

NAME ____________________

ADDRESS ____________________

____

এখানে কাটুন ও এই পুরো ফর্মটি পাঠান

ব্লিটস, ষ্টেট্‌সম্যান, অমৃত, দেশ ও বিশ্বামিত্রতে নিয়মিত এণ্ট্রি ফর্ম প্রকাশিত হয়।

মানসী বলল,—'আপনি তো আর কোনোদিন বাঁকুড়ায় গেলেন না। পরীক্ষা দিয়ে সেই যে দেশে গেলেন, আর কোনো খোঁজখবর নেই—।'

—'বারে! তারপরই তো কলকাতায় এলাম।' সুরেশ্বর আত্মপক্ষ সমর্থন করতে এই যুক্তিটাই খুঁজে পেল। একটু পরে বলল—'তোমার তো কলকাতাতেই বিয়ে হয়েছে?'

—'হ্যাঁ', মানসী ঘাড় নাড়ল। 'বছর-দুই হল কলকাতাতে এসেছি। এদের নিজেদের বাড়ী। ব্যবসা রয়েছে একটা—'

অর্থাৎ সুখেই ছিল মানসী। সচ্ছল ঘরে পড়েছিল এই কথাটাই বলতে চেয়েছে। সুরেশ্বর মানসীর মুখের দিকে চাইল একবার। এই পড়ন্ত বেলায় মানসী মিত্রকে দেখে কেমন লাগছে তার? আশ্চর্য! মেয়েরা কি তাড়াতাড়ি বদলায়! মানসীর চোখেমুখে বাঁকুড়া কলেজের কোন স্মৃতি কোথাও লেগে রয়েছে বলে সুরেশ্বরের মনে হল না।...

ঘড়িতে সাড়ে চারটে হল। মানসী একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওর ভাব দেখে সুরেশ্বর হাসল। অসুস্থ স্বামীর জন্য স্ত্রীর উৎকণ্ঠা তো অস্বাভাবিক নয়। আর এই সংসার-সমুদ্রে স্বামী হলেন স্ত্রীর পানসী নৌকো। ফুটো হয়ে গেলে ভরাডুবি হতে কতক্ষণ?

—'এখন ত' রোজই আসছ হাসপাতালে। আমাকে এখানেই পাবে। দেখা হলে কথা বলব—' সুরেশ্বর বিদায় নিল। দুজনের একই দিকে গন্তব্যস্থল নয়। সামান্য কয়েক পা এগিয়ে মানসী বাঁদিকে ঘুরল। সুরেশ্বরকে যেতে হবে আরো খানিকটা এগিয়ে ডানদিকে—।

স্ত্রীর পাশে গিয়ে অন্যমনস্কের মত বসল সুরেশ্বর। এই ছ'মাসে ভীষণ রুগ্ন হয়ে গেছে শমিতা। চোখদুটি ম্লান, মুখটা কি অদ্ভুত লম্বা মনে হয়। কানের কাছে শিরাগুলি কি বিশ্রী প্রকট—।

—'খাওয়া-দাওয়ার খুব অসুবিধে হচ্ছে, তাই না?' শমিতা বলল।

—'অসুবিধে কিসের? ও একরকম চলছে—'

—'ছাই চলছে। তোমার চোখমুখ দেখেই আমি বুঝতে পারি—' শমিতা দুঃখ করল।

—'ডাক্তারবাবু কি বলছেন?'—

—'কি আর বলবেন? আরো কিছুদিন থাকতে হবে হাসপাতালে।' শমিতা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলল।

—'দেখি। যাবার সময় আমি একবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে যাই—।'

খানিকক্ষণ শমিতা চুপ করে রইল। পরে বলল,—'ঘরদোরে ঝাঁটপাট পড়ছে তো?—'

—'সব ঠিক ঠিক হচ্ছে।' সুরেশ্বর ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল।

—'ছাই হচ্ছে!' শমিতা ঠোঁট উল্টে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করল। হেসে বলল—'গিয়ে দেখব যা ঘরদোরের অবস্থা করে

রেখেছে। আমার এক হপ্তা লাগবে ঘর ঠিক করে সাজাতে।—'

সুরেশ্বর যখন মেডিক্যাল কলেজের বাইরে এল, তখন ঘড়িতে সাড়ে ছ'টার মত। প্রায় পৌনে ছ'টার সময় সুরেশ্বর গ্রীন-ওয়ার্ড থেকে বেরিয়েছে। এই প'য়তাল্লিশ মিনিট সময় অবশ্য এই সামান্য পথটুকু হাঁটতে লাগার কথা নয়। কিন্তু সুরেশ্বর ধীর পায়ে হেঁটেছে। সেই ফুলবাগানের কাছে এসে এবং এখানে-সেখানে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে এসেছে। গেটের কাছেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছে সুরেশ্বর। এদিকে-সেদিকে চেয়ে দেখেছে। কিন্তু মানসীকে খুঁজে পায়নি। সম্ভবত অন্য কোন পথ দিয়ে মানসী বাইরে গিয়ে পড়েছে। সুরেশ্বর নিজেকে তাই বোঝাল।

শীতের সন্ধ্যায় কলকাতার সাজগোজ দেখবার মত। আজ ধোঁয়াটোয়া কম। সুরেশ্বর হাঁটতে হাঁটতে গোলদীঘির দিকে এগোল। এখনই বাস ধরে ট্যাংরার সেই ফ্ল্যাট-বাড়ীতে যেতে ইচ্ছে হল না তার। দু'কামরার সেই ফ্ল্যাটটা নিবিড় অরণ্যের মধ্যস্থলের মত জনহীন লাগে তার কাছে। আর ফ্ল্যাটে ফিরে যাওয়া মানেই স্টোভ ধরিয়ে রান্নার হাঙ্গামা করতে হবে। তার চেয়ে আরো কিছুক্ষণ বেড়িয়ে-টেড়িয়ে এখানেরই কোনো হোটেলে আহারপর্ব শেষ করে ন'টা নাগাদ ট্যাংরায় ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।...

গোলদীঘির একটা বেঞ্চে বসে সুরেশ্বর ভাবছিল। শীতের নক্ষত্রখচিত আকাশের রং শ্লেটের মত কালো। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে পড়বার সময় সুরেশ্বর আরো কতদিন এখানে এসেছে। চুপচাপ বসে থেকেছে, কিংবা বকবক করে গল্প করেছে কোনো বন্ধুর সঙ্গে। সুরেশ্বর মানসীর কথা ভাবছিল। এই ক'বছরে কিরকম পরিবর্তন হয়েছে মানসীর। পাতলা ছিপছিপে সেই মেয়েটা কিরকম গোলগাল ভরাভরন্ত হয়ে উঠেছে। বিয়ের পর থেকেই মেয়েরা নাকি বর্ষাদি লাউয়ের মত সতেজে বেড়ে ওঠে। সুরেশ্বর কথাটা ভাবল।

মানসীর সঙ্গে আলাপ টিউশনীর সুবাদে। ওর খুড়তুতো এক বোনকে পড়াতে গিয়েছিল সুরেশ্বর। তাদের বাড়ীতেই ছুটকো-ছাটা আলাপ। মফস্বল শহর। প্রেম-টেম করবার জুৎসই জায়গা মেলা দুস্কর। তাই দেখাশোনা, কথাবার্তা, আলাপ-পরিচয় সবকিছু বাড়ীতে বসে। তারও বেশি হলে আর রক্ষে নেই। মফস্বল শহর। এ-পাড়ায় শাঁখ বাজালে ও-পাড়া পর্যন্ত তা ছড়িয়ে যায়। আর মেয়ে-পুরুষের ঘন ঘন দেখাশোনা করবার সংবাদ কাঁঠালের গন্ধের মত সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়তে এতটুকু দেরী হবে না। সুরেশ্বরের অবশ্য একটা সুবিধে। ষোড়শীকে পড়ানোর নাম করে হস্টেল থেকে বেরুত। বাইরে সাইকেল রেখে ওদের বাড়ীতে ঢুকে অনেক-দিন আশ্চর্য হয়েছে সুরেশ্বর। পড়বার টেবিলে ষোড়শী বসে নেই। মানসী হাসছে—

—'কি ব্যাপার? তুমিই পড়বে নাকি?'—

মানসী ঘাড় নেড়ে সায় দিল। মোটা একটা বই খুলে বলল—'ইকনমিক্‌সের এই চ্যাপ্টারটা বুঝিয়ে দিন। ক্লাশে কি যে পড়ায়। একদম মাথায় ঢোকে না কিছু—'

সুরেশ্বর উত্তর দিল—'ক্লাশে নিশ্চয়ই কিছু শোন না। নইলে বুঝতে পারবে না কেন?'

—'হয়েছে, হয়েছে। আপনি তো খুব ভাল ছেলে। এখন দয়া করে আমাকে একটু পড়ান। নইলে পরীক্ষায় নির্ঘাত ফেল করব।—' মানসী ঠোঁট টিপে হাসল।

এরকম একদিন নয়। বহুদিন। হস্টেলে এসে সুরেশ্বর ভাবত মানসী ভীষণ বোকা। সাধারণ সব থিয়োরীগুলো কিছুতেই ওর মাথায় ঢোকে না। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুরেশ্বরের নাজেহাল হবার অবস্থা—। অনেকদিন ষোড়শীকে পড়ানো হয়নি। আবার ষোড়শীকে পড়ানো শেষ হলে মানসীকে নিয়ে বসেছে। পড়ানো শেষ করে হস্টেলে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছে—।

হঠাৎ সেই দুপুরটার কথা স্মরণ করে শীতের এই সন্ধ্যাতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল সুরেশ্বরের কপালে। কেন তার এমন নির্বুদ্ধিতা হয়েছিল কে জানে! মানসীকে সে ঠিক বুঝতে পারেনি। ওর চোখেমুখে ভুল রেখা পড়েছিল। সুরেশ্বর রেখার সেই বক্রতা বেআন্দাজ করেছিল।

সেদিন দুপুরে ষোড়শীকে পড়াতে গিয়ে আশ্চর্য হয়েছিল সুরেশ্বর। বাড়ীর মধ্যে কোন সাড়াশব্দ নেই। এই ভরদুপুরে মানুষগুলো নিখোঁজ হল কোথায়? ছুটির দিন হলে মাঝে মাঝে দুপুরে এসে ষোড়শীকে পড়িয়েছে সুরেশ্বর। কোনোদিন তো এমন হয়নি।

দরজা খুলে দিয়ে মানসী হাসল। 'আপনার ছাত্রী বেড়াতে গিয়েছে।'

অপ্রস্তুত সুরেশ্বর জবাব দিল—'তাই নাকি? তাহলে চলি এখন—'

—'বারে!' মানসী আব্দারে গলায় বলল,—'আমিই তো এক ছাত্রী আপনার। না হয় মাইনে কড়ি দিই না। তাবলে—' চোখের অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করল মানসী।

—'না, না।' সুরেশ্বর ওকে আশ্বস্ত করল। 'তুমি পড়বে তো চলো। খানিকক্ষণ তোমাকেই পড়িয়ে যাই—'

মানসীর পিছু পিছু ঘরে ঢুকল সুরেশ্বর। বাইরের দরজা বন্ধ করে এসে মানসী হাসল। বলল—'বাড়ীতে কেউ নেই কিন্তু। আমি একা—'

—'তাই নাকি?' সুরেশ্বর নিজেকে কেমন নার্ভাস বোধ করল। বোধহয় মানসীর প্রস্তাবে রাজী না হলেই ভাল হত। কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা মনে হল হাতের মুঠিদুটো। কপালে কি ঘামটাম আছে?

মানসী মিষ্টি হাসল। ষোড়শীর পড়বার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল সুরেশ্বর। বলল—'আজ এ-ঘরে নয়। আসুন না আমার পড়বার ঘরে।...'

ওর পিছু পিছু হাঁটল সুরেশ্বর। মানসীর ঘরটা বাড়ীর বেশ ভিতরে। আসলে এটা মানসীর পড়বার ঘরই নয়। শোবার ঘর। বিছানার উপর সুন্দর একটি বেড-কভার পাতা। টেবিলে ওর বইপত্তর, খাতা-পেন্সিল। ছোট্ট একটা আলনায় মানসীর শাড়ীটাড়ী, গায়ের জামা...অন্তর্বাস।

—'বসুন', মানসী ওকে অনুরোধ জানাল।

এ-ঘরে চেয়ারটেয়ার নেই। অগত্যা বিছানাতেই চেপে বসল সুরেশ্বর। মেয়েদের বিছানায় কেমন অদ্ভুত একটা গন্ধ ছড়িয়ে থাকে। বোধহয় গন্ধটা ওদের চুলের, বাঁস তেলের। সুরেশ্বর অনেকক্ষণ গন্ধটাকে অনুভব করল। নিজেকে কেমন নেশাগ্রস্থ মনে হচ্ছিল তার।

এতদিন পরে ঘটনাগুলো ঠিক পর পর সাজিয়ে ভাবতে পারছে না সুরেশ্বর। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। মনে আছে বিছানা-তেই সামনা-সামনি বসেছিল ওরা। সুরেশ্বর ওকে অনেকক্ষণ ধরে পড়াল। কখন এক-সময় মানসী ওকে নিজের মাথার বালিশটা এগিয়ে দিয়ে বলেছে,—'এর উপর হেলান দিয়ে বসুন।' বালিশটা নিয়ে মানসীর বিছানাতে আধশোয়া অবস্থায় রইল সুরেশ্বর।

তারপর সেই দুর্বলতা। সুরেশ্বর ভাবল, সেদিন যেন অকস্মাৎ তার দেহে জ্বর এসেছিল। নিঃশ্বাসটা কেমন গরম গরম ঠেকল তার। যুবতী মেয়ের সঙ্গে একঘরে অনেকক্ষণ থাকলে কি এমনি হয়?...মানসী খিলখিল করে হাসছিল। অদ্ভুত সব ভঙ্গি করছিল। চোখ দিয়ে কখনো বিস্ময়, কখনো ছদ্ম কোপ, কখনো হাল্কা হাসি প্রকাশ পাচ্ছিল। সুরেশ্বরের মনে হল হঠাৎ সে ভীষণ সাহসী হয়ে উঠেছে। মানসী যেন একটা রঙ-বেরঙের চিত্র-বিচিত্র হাল্কা প্রজাপতি। সুরেশ্বরের মনে হল ছোটবেলায় সে একবার একটা প্রজাপতি ধরবার জন্য বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করেছিল। প্রজাপতিটা মাঠের একদিক থেকে অন্য দিকে উড়ে বেড়াচ্ছিল। বহুক্ষণ ছোটাছুটি করেও সুরেশ্বর সেটাকে ধরতে পারেনি। আজ মানসীকে দেখে তার সেই প্রজাপতির কথাই মনে পড়ছে। প্রজাপতিটা তার সামনে উড়ছে, বসছে...খেলে বেড়াচ্ছে। খিলখিল হাসি দিয়ে তাকে খেলাচ্ছে। কোথা থেকে প্রচন্ড একটা ঘূর্ণীঝড় উঠে তার সমস্ত দেহটাকে ঠেলে তুলল। সুরেশ্বরের মনে আছে সে খেলাচ্ছলে মানসীর হাতের আঙুলগুলি দেখছিল। ঢেঁড়সের মত লম্বা লম্বা আঙুলগুলি। তারপর একসময় সুরেশ্বর ওকে সজোরে টেনে নিতে গেল নিজের বুকে।

ইলেকট্রিকের তারে অজান্তে হাত ঠেকলে মানুষ যেমন চীৎকার করে ওঠে, তেমনি একটা আর্তনাদ বেরুল মানসীর কণ্ঠ থেকে। অমন সুন্দর প্রজাপতির মত ঢং-ঢাং মুহূর্তে যেন একটা বিষাক্ত বিছার মত হয়ে গেল। হাসিখুশী মুখখানা ঘৃণায় বেদনায় কেমন কুৎসিত হয়ে উঠল। চোখ-দুটো দিয়ে এখন বিস্ময় নয়,—বিরক্তির আগুন। দাঁত টিপে মানসী বলল—'ছি, ছি।

আপনার মনে এই মতলব! আমি আপনাকে ভাল ছেলে বলে মনে করতাম।'

অপরাহ্নের স্থলপদ্মের মত মুখখানা শুকনো দেখাল সুরেশ্বরের। মাথা হেঁট করে সে পালিয়ে এসেছিল। হস্টেলে ফিরে সমস্ত বিকেল এবং রাত্রি ধরে ভাবল সুরেশ্বর। কেন সে এমন ভুল করল? মানসীর চোখে সে সবুজ বাতির যে সংকেত দেখেছিল, সেটা কি ভুল?

পুরো সাতদিন নতুনচটির দিকে যায়নি সুরেশ্বর। ওদিকে পা মাড়ায়নি। সেদিনের কথা মানসী যদি কাউকে বলে দিয়ে থাকে! ওর অভিভাবকেরা তাকে বাড়ীতে দেখলে দূর দূর করবেন। সেধে গিয়ে কেন অপমানিত হবে সুরেশ্বর?

কিন্তু মানসী অদ্ভুত। হপ্তা শেষ হবার দিনে সে এসে পথ আগলাল। সুরেশ্বর ভয়ে নির্বাক। পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে নতুন কি বলবে মানসী? সেদিনের জের কি এখনও মেটেনি?

মানসী বলল—'ষোড়শীকে আর পড়াতে গেলেন না যে। তার কি দোষ? আচ্ছা ভীরু পুরুষ তো?—'

সুরেশ্বর আমতা আমতা করে বলল,—'হ্যাঁ। এইবার যাব—'

—'আজ সন্ধ্যেতেই আসুন। আসবেন ঠিক—' মানসী প্রায় আদেশ করল।

মন্ত্রচালিতের মত সন্ধ্যেতেই গিয়ে হাজির হল সুরেশ্বর। ঘরে ষোড়শী একা বসে। পড়াতে পড়াতে একসময় বলল সুরেশ্বর,—'তোমার দিদি কই? মানসীকে দেখছি না—'

ষোড়শী জবাব দিল—'দিদি বলেছে আপনাকে আর ডিসটার্ব করবে না। নিজেই পড়াশুনা করবে। আপনাকে একথা বলতে বলেছে।......'

কথাটা অবশ্য ঠিক নয়। কিছুদিন পরেই মানসী এসেছে। ক্লাশের নোট চাইতে কিংবা কোনো প্রশ্নের উত্তর দেখাতে। সুরেশ্বর ওর দিকে চেয়ে দেখেছে। মানসীর চোখে আগের মতই হাসি। ওকে [illegible] করে সুরেশ্বর আবার ছাত্রীকে নিয়ে বসেছে। পড়ানো শেষ হলে হস্টেলমুখো হতে এক মিনিট দেরী করেনি।

ট্যাংরার ফ্ল্যাটে এসে সুরেশ্বর আকণ্ঠ একটা মোটা চাদরের মধ্যে ডুবে শুয়ে রইল। শেষরাতে বেশ ঠান্ডা পড়ে। এদিকটা ফাঁকা। প্রায় কলকাতার বাইরে। এ ঘরটায় আসবাবপত্র কম। দেওয়ালে শমিতা এবং তার একটা যুগল ফটো। ওদিকে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। নিজে একটা চৌকিতে শোয় সুরেশ্বর। তার বিয়েতে পাওয়া খাটটা শমিতা যাবার পর থেকেই শূন্য রয়েছে।

চৌকিটা অবশ্য অনেকদিন হল পাতা হয়েছে। পরামর্শটা ডাক্তারের। সুরেশ্বরকে প্রায় নিষেধ করে দিয়েছেন ডাক্তার। রিউ-ম্যাটিক হার্টের রুগী খুব দুর্ভাবনার। কোন কারণেই উত্তেজনা হওয়া চলবে না। উত্তেজিত হলেই মুস্কিল। সম্ভব হলে স্বামী-স্ত্রীর আলাদা শোয়া দরকার। সুরেশ্বরের কাঁধে হাত রেখে ডাক্তার হেসেছেন। মুখে বলেছেন—সময় মত সংযমও প্রয়োজন সুরেশ্বরবাবু। সবই আপনার উপর নির্ভর করছে।

চৌকিটায় শুয়ে প্রথমদিকে ঘুম আসত না সুরেশ্বরের, কেমন অস্বস্তিকর মনে হত। নড়লে খাটটা যেন কাতরায়। অনেক-সময় খাটের উপর উঠে বসে সুরেশ্বর শমিতাকে দেখত। ওর বাবার দেওয়া পালংকটায় শোবার অধিকার ওরই। সুরেশ্বর দেখত, চিত হয়ে ঘুমোচ্ছে শমিতা। বুকটা কামারশালার হাপরের মত ওঠা-নামা করছে। সুরেশ্বর ভাবত কবে আবার সুস্থ হয়ে উঠবে শমিতা? কবে সুরেশ্বর ঐ পালংকটায় উঠবার ছাড়পত্র পাবে?

পরদিন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় কার ডাক শুনে সুরেশ্বর পিছনে চাইল। অন্য কেউ নয়,—মানসী। ফুলবাগানের কাছে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে।

—'তুমি! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?—'

'—অনেকক্ষণ। পনেরো মিনিট কিংবা তারও বেশী।—'

সুরেশ্বর হাসল, 'গতকাল তোমার খোঁজ করেছিলাম। মেডিক্যাল কলেজ থেকে কোন ফাঁকে বেরুলে?'

—'ওমা!' মানসী গালে হাত রাখল। 'আমিই তো খুঁজে পেলাম না আপনাকে—।'

দুজনে একসংগে হেসে উঠল।...

রাস্তায় নেমে সুরেশ্বর বলল,—'এখন কোথায় যাবে? বাড়ী?—'

মানসী ঘাড় নাড়ল। 'একটু কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে যাব। আপনি যাবেন আমার সংগে?...'

সুরেশ্বর রাজী। মানসীর পাশে হাঁটতে হাঁটতে সুরেশ্বর বলল—'তোমার স্বামীকে কেমন দেখলে?'

—'আপনার স্ত্রীকে?' চোখ নাচিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল মানসী।

—'শমিতা সেই একই রকম। ডাক্তার বলেছেন সেরে উঠতে বেশ সময় লাগবে।'

মানসী বলল—'ও'রও সেই অবস্থা। লিভারের অসুখ, ওষুধ বন্ধ করে দিলেই তো শেষ নেই। আবার হবে। কিছুদিন ওয়াচ না করে ছাড়বে না।......'

সমস্ত পথ নানা গল্প করল মানসী। ষোড়শীর এখনও বিয়ে হয়নি। অথচ মেয়ে দিনে দিনে সোমত্ত হয়ে উঠেছে। এ বছরই তো বি-এ পরীক্ষা দেবে। সুরেশ্বর কেন একদিনের জন্য বাঁকুড়ায় যায় নি? শহরটা এখন অনেক বড় হয়েছে। অবশ্য কলেজের দিকটা তেমনি। কলেজের মাঠ থেকে শুশুনিয়া পাহাড়টাকে বেশ দেখা যায়। হাতীর মত পাহাড়টা আকাশে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে। সুরেশ্বর কি এপ্রিল মাসে যেতে সময় পাবে? ঐ সময়ই তো কলেজের রি-ইউনিয়ন।

সুরেশ্বর বলল—'ব্যাংকের চাকরীতে ছুটিছাটা বড্ড কম। ছুটি পেলে নিশ্চয় যাব—'

মানসী বলল—'আপনি গেলে আমিও একবার ঘুরে আসি। সংসারে অবশ্য তেমন

ঝুটঝামেলা নেই। পিসশাশুড়ী রয়েছেন। বুড়ো মানুষ হলে কি হবে, সমস্ত সংসারটা ওর নখদর্পণে। আমিও সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত—'

সুরেশ্বর বলল—'তোমার দেওর-ভাসুর আর সবাই?—'

—'সবাই পৃথক। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়ীটা এ'র ভাগে। আমরা থাকি দোতলায়। নীচেটা ভাড়া দিয়ে রেখেছি। মাস শেষ হলেই থোক টাকা কিছু হাতে আসে।'

বাজারে ঘুরে ঘুরে অনেককিছু কিনল মানসী। প্রায় সবই প্রসাধনের সামগ্রী। দু'একটা জিনিসের নামও শোনেনি সুরেশ্বর। শমিতার প্যাঁটরায় এসব বস্তুর কোনোদিন প্রবেশ হয়নি।......বিলাসের খুব কমটুকুই পেয়েছে শমিতা—

মানসীকে ট্রামে তুলে দিয়ে সুরেশ্বর লক্ষ্যহীনের মত কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। আজ আর গোলদীঘিতে ঢুকল না সে। হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদতে এসে একটা হোটেলে ভাত খেল। মাসের শেষ হয়ে আসছে। পকেটের অবস্থা ক্রমেই রুগ্ন হবে। এরপর হয়ত দুবেলাই রান্না করে খেতে হবে তাকে। সেই মাস পয়লার দিনটির দিকে চেয়ে থাকবে সুরেশ্বর। মাইনে পেলে আবার হোটেলে এসে চোব্য-চোষ্য খেয়ে যাবে।

ট্যাংরায় এসে ঘরের জানালাটা খুলে দিল সুরেশ্বর। আজ শীত কম। তবু হাওয়াটা বেশ ঠান্ডা। সুরেশ্বর ঘুমন্ত পৃথিবীটাকে দেখছিল। ঘড়িতে প্রায় সাড়ে দশটা। ট্যাংরায় তো এখনই মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা। নিঃসঙ্গ বিছানাটার দিকে চেয়ে কেমন অদ্ভুত একটা কষ্ট হচ্ছিল সুরেশ্বরের। দেহের একটা আকুতি মনকে ছাপিয়ে উঠেছে। আচ্ছা মানসী নিশ্চয়ই সেই অশান্ত অন্যায় দুপুরটার কথা এতদিনে ভুলে গিয়েছে? সুরেশ্বর নিজের মনকে প্রশ্ন করল, কোন উত্তর পেল না—।

পরের দিনও মানসীর সঙ্গে দেখা। তারপর আরো দুদিন। এই কদিন মানসীর সঙ্গে অনেকদূর হেঁটে গিয়েছে সুরেশ্বর। যাবার পথে মানসী কলেজ স্ট্রীটের দোকান থেকে পছন্দসই জিনিসপত্র কিনল। কোনো-দিন ছিটকাপড়,......কোনোদিন বান্ধবীর ছেলের জন্য সামান্য কিছু উপহার।

হাসতে হাসতে মানসী বলল—'আপনার ছেলেটেলে থাকলে তার জন্যও একটা খেলনা নিতুম।'

সুরেশ্বর ঠাট্টা করে বলল—'তার চেয়ে বলো তোমার নিজের ছেলের জন্য কি কিনতে।......'

মানসী লজ্জা পেয়ে হাসল। ফর্সা মুখটা কেমন চট করে রাঙা হয়ে উঠল। 'আপনার দেখছি বুড়ো পিস-শাশুড়ীর মত কথাবার্তা।......' মানসী কথা শেষ করল।

সুরেশ্বর বলল—'কেন, তোমার পিস-শাশুড়ীর বুঝি খুব নাতির শখ?—'

—'আর বলেন কেন? কোলে কাঁখে ছেলে না এলে তাঁর মতে সে মেয়েই নয়। ছেলে ছেলে করে আমাকে একেবারে অস্থির করে মারেন। এদিকে ওর ভাইপোর কাছে মুখ খুলবার সাহস নেই।.....'

—'কেন, ভদ্রলোকের বুঝি খুব অনিচ্ছে?......'

—'প্রথম প্রথম তাই ছিল। এখন অবশ্য ইচ্ছে অনিচ্ছে দুই সমান।' মানসী দীর্ঘ-একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

তিনদিন মানসীর সঙ্গে দেখা হয়নি। সুরেশ্বর প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফুলবাগানটার কাছে এসে হতাশ হয়েছে। কোথায় গেল মানসী? হাসপাতাল থেকে কি ছাড়া পেয়েছেন ভদ্রলোক? নামধাম জানলে ওয়ার্ডে গিয়ে খোঁজ নিত সুরেশ্বর। কিন্তু মানসীর কাছ থেকে নামটা জেনে নেওয়া হয়নি। রবিবার বলে আজ সকালেই দেখা করতে এসেছে সুরেশ্বর। বিকেলে আর আসবে না। একটা সিনেমা হলে ঢুকবে বলে ভেবেছে। শমিতাকে অবশ্য তা বলা যাবে না। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে আঘাত পাবে শমিতা। ওকে বরং অফিসের বড়বাবুর বাড়ীতে প্রয়োজন আছে কিংবা এই গোছের জুৎসই কোন জবাব দিলেই চলবে—।......

ব্রাড ব্যাংকের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছিল সুরেশ্বর। আজ খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে এসেছে। এখন আর নিজের ডেরার দিকে সে যাবে না। হাঁটতে হাঁটতে সোজা গিয়ে উঠবে ময়দানে। শীতের রোদে পিঠ পেতে শুয়ে থাকবে কোন গাছের ছায়ায়। ইচ্ছে করলে কিছু কিনে খাবে। তিনটের শোতে একটা বিলিতী ছবি দেখে আরো খানিকটা বেড়িয়ে ট্যাংরায় আসবে। সমস্ত প্ল্যানটা সুরেশ্বরের মগজে ভাসছে। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই পরি-কল্পনাটা সে তৈরী করেছে।

হঠাৎ সামনে মানসীকে দেখে সুরেশ্বর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। নাম শুনে মানসী চাইল পিছন ফিরে—। হাসল। বলল—'আপনি! তাই হোক,—আমি ভেবেছিলাম বুঝি অন্য কেউ—।'

—'এই কদিন আসনি যে'—

—'পিসশাশুড়ী এসেছিলেন দুদিন। আমি আর আসতে পারিনি। শরীরটা ভাল ছিল না। আর নিত্যি হাসপাতালে আসা যেন এক বিরক্তি।......' মানসী মুখ বিকৃত করল। ওকে দেখছিল সুরেশ্বর। এই কবছরে বিধাতা যেন মানসীকে ভেঙেচুরে গড়েছেন। সুন্দর দেহশ্রী হয়েছে মানসীর। গাল, গলা শীর্ণ নয়। সর্বত্রই প্রয়োজনমত মেদের প্রসার। সমস্ত মুখে স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা। লম্বা গ্রীবা,—মরালীর মত বাড়িয়ে রয়েছে। ওর পাশে শমিতাকে কল্পনা করে আহত হল সুরেশ্বর। পাখনা মেলা রঙবেরঙের একটা প্রজাপতির পাশে কুঁকড়ে যাওয়া একটা ছোট্ট পোকার মত—......।

—'কোথায় যাবে এখন, বাড়ীর দিকে?' সুরেশ্বর প্রশ্ন করল।

'বাড়ী যেতে ইচ্ছে করছে না।' খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছি,—এখন সমস্ত দুপুর শুয়ে বসে কাটাতে হবে। তার চেয়ে কোন বন্ধুর বাড়ীতে আড্ডা দিয়ে আসি। সময়টা ভাল কাটবে—' কথা শেষ করে মানসী ঠোঁট টিপে হাসল।

—'কার বাড়ী যাবে? কতদূর এখান থেকে?—'

—'কোথায় যাব তাই তো ভাবছি।' মানসীকে চিন্তিত মনে হল, হঠাৎ ফস করে সে বলে বসল—'চলুন না। আপনার বাড়ী থেকেই এক চক্কর ঘুরে আসি। কোথায় থাকেন যেন আপনি, সেই ট্যাংরা না কি যেন—'

সুরেশ্বর অল্প একটু অবাক হল। ঢোঁক গিলে বলল,—'ইয়ে, মানে আমার বাড়ীতে যাবে?—'

—'হ্যাঁ, চলুন না। কেমন ঘরকন্না পেতেছেন দেখে আসি—' মানসী ফিক করে হাসল।

সমস্ত পরিকল্পনার ইতি। সেই ট্যাংরার ফ্ল্যাটে ফিরে চলল সুরেশ্বর। মানসীর পাশে সে হাঁটছিল। অবশ্য খুব একটা খারাপ লাগছিল না তার। মানসীর মত একটি মেয়ের পাশে হাঁটতে খারাপ লাগবার কথা নয়। সুরেশ্বরকে প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল—।

বৌবাজারের মোড়ে এসে মানসী বলল—'পান খাবেন?'

—'পান?'

—'কিনে আনুন না দুটো। ঐ তো দোকান। কেন, আপনার স্ত্রী পান খান না?......'

কোনো উত্তর না দিয়ে হাসল সুরেশ্বর। নিকটবর্তী দোকান থেকে দুটো পান কিনে নিয়ে এল। নিজে একটা নিল, মানসীকে আর একটা দিল। দু-চার মিনিটের মধ্যেই ঠোঁট দুটো টকটকে লাল হয়ে উঠল মানসীর। সুরেশ্বর লক্ষ্য করল—।

ট্যাংরার ফ্ল্যাটে এসে সুরেশ্বর বলল—'বাড়ীটা প্রায় ভূতের আস্তানা হয়ে আছে। শমিতা অসুস্থ হবার পর থেকেই এমনি অবস্থা। ডাক্তার সারাদিন ওকে শুয়ে থাকতে বলেছেন। কখন আর ঘরদোর গোছাবে?......'

সমস্ত ফ্ল্যাটটা ঘুরে ঘুরে দেখল মানসী। শোবার ঘর ভাঁড়ার ঘর,—এমনকি রান্নাঘর পর্যন্ত। ছোট ফ্ল্যাট। দেখতে আর কতক্ষণ সময় লাগবে? ঘুরে ফিরে সুরেশ্বরের ঘরে এসে বসল। ঘর মানে ওদের শোবার ঘরখানা। এদিক-ওদিক চেয়ে মানসী বলল,—'আপনার স্ত্রীর আয়না-টায়না নেই? দিন না একবার।'

খুঁজে পেতে বড়গোছের একটা আয়না এনে দিল সুরেশ্বর। শমিতা এইটার সাহায্যেই চুল বাঁধত। দর্পণের সৃষ্টি প্রসাধনের জন্যই। ভালো একটা আয়নার জন্য কতদিন দরবার করেছে শমিতা। একটা বড় ড্রেসিংটেবিলের ওর খুব শখ। সুরেশ্বর কিনে দিতে পারেনি।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ দেখল মানসী। চুল ঠিক করল। ঠোঁট উল্টিয়ে কি দেখল। সম্ভবত পানের রসে অধর কেমন লাল হয়েছে তাই পরখ করল। আয়নাটা ফিরিয়ে দিয়ে পালংকের উপর চেপে বসল।

সুরেশ্বর বসেছিল নিজের ছোট চৌকিটায়। মানসী সেদিকে চেয়ে ইঙ্গিত করে বলল—'এত বড় পালংক থাকতে আবার চৌকি কেন ঘরে? ওটা বেমানান,—অন্য ঘরে সরিয়ে দেবেন।......'

সুরেশ্বর জবাব দিল—'চৌকিটা আনতে হয়েছে ডাক্তারের পরামর্শে। নইলে—'

মানসী হাসল। এ ঘরের পশ্চিম দিকের জানালাটা খুলে দিলে কলকাতা শহরের বেশ কিছুটা অংশ চোখে পড়ে, অনেক ঘরবাড়ী। কলকারখানা,......কালো চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। রেললাইনের উপর দিয়ে ট্রেন চলেছে। হঠাৎ সেদিকে লক্ষ্য পড়তেই প্রায় নাচের ভঙ্গিতে ছুটে গেল মানসী। তাড়াতাড়িতে বুকের আঁচলটা খসে পড়েছিল। ব্যস্ত হয়ে সেটা সামলাল। জানালার গরাদে গাল চেপে ধরে বলল—'কি সুন্দর দেখাচ্ছে এই ঘরটা থেকে' সত্যি, খুব সুন্দর—'

সুরেশ্বর মানসীকে লক্ষ্য করছিল। ওর ঘাড়, পিঠ,...একটু নীচে নেমে আসা বিরাটাকৃতি খোঁপা। ছাপা শাড়ীটার কিছু অংশ,......দেহের নিম্নভাগ। প্যাঁকাল মাছের মত সরু কোমর।...মানসী কি সুন্দরী?...

হঠাৎ পিছন ঘুরে মানসী বলল—'কি দেখছেন অমন করে?...'

চোখ নামিয়ে সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি বলল—'কিছু না। এমনি—'

—'এমনি?' মানসী খিলখিল করে হেসে উঠল।

ব্যস্ত হয়ে সুরেশ্বর বলল—'তুমি বস একটু। আমি আসছি এখুনি।—'

—'কোথায়?' মানসী বিস্ময় প্রকাশ করল।

—'[illegible]কবার দোকানে যাব। হাজার হোক [illegible]ম অতিথিজন। একটু মিষ্টিমুখ না [illegible] চলে?......'

[illegible]চোখ টিপে একটা নতুন মুদ্রা রচনা করল মানসী। কি যেন ভেবে নিয়ে বলল—'বেশ তো, আসুন,—কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরতে হবে। নইলে অতিথি রাগ করবে।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরল সুরেশ্বর। দোকানটা কাছেই। কিছু মিষ্টি কিনতে আর কত সময় লাগে? কিন্তু ঘরে পা দিয়ে সুরেশ্বর অবাক হল। পালংকের উপর পা বাড়িয়ে বসে নেই মানসী। টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছে। চোখ দুটি বন্ধ। ও কি ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? এরই মধ্যে?

—'মানসী, মানসী।' ওর নাম ধরে দুবার ডাকল সুরেশ্বর। কোন সাড়াশব্দ নেই। পালংকের কাছে এসে দাঁড়াল সে। নির্ঘাত ঘুমিয়ে পড়েছে মানসী। সুরেশ্বর আরো কয়েকবার ডাকল। ভাবল ওর গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দেয়। ইচ্ছে হল, কিন্তু সাহস হল না।

হঠাৎ চোখ খুলে খিলখিল করে হেসে উঠল মানসী। বলল,—'কেমন ঠকিয়েছি বলুন?' আবার হেসে উঠল।

সুরেশ্বর বলল—'যে রকম চোখ বন্ধ করে পড়েছিল, কি করে বুঝব যে তুমি রহস্য করছিলে—'

—'বসুন না এখানে।' মানসী সুরেশ্বরের জামা ধরে টানল।

সুরেশ্বর বসল পালংকের উপর। মানসীর খুব কাছে। দুজনের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য এখন? কতটুকু?......'

এতক্ষণ চিত হয়ে শুয়েছিল মানসী। এবার উপুড় হয়ে শুল। সুরেশ্বরের আরো কাছে। মানসীর পিঠের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়েছিল সুরেশ্বর। কেমন অদ্ভুত লতাপাতার ছবি আঁকা ওর জামাটার গায়ে। কোমরের শাড়ী এবং গায়ের জামাটার মাঝখানে কোমল অনাবৃত দেহের বেশ খানিকটা উঁকি দিচ্ছে।

নিজেকে কেমন জবরতপ্ত মনে হল সুরেশ্বরের। নিশ্বাসটা সম্ভবত গরম হয়ে উঠেছে। জিভটা শুকনো। ঠোঁটটা কি ফুলে উঠল? মনের মধ্যে অবদমিত ইচ্ছার ঘূর্ণীঝড়। অথচ আকণ্ঠ ভয়ের হিম। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডের দ্রুতস্পন্দন শুরু হয়েছে।

'—বাঁকুড়ার কথা মনে আছে আপনার ?' মানসী বালিশে মুখ রেখে বলল, 'সেই যে আপনি ষোড়শীকে পড়াতে আসতেন।—'

কি বলতে চাইছে মানসী? সেই অশান্ত নির্জন দুপুরের কথা কি স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে? কিন্তু সুরেশ্বর তো তারজন্য অনুতপ্ত। বহুদিন নিজের মনে অনুশোচনা করেছে। তবে কেন আবার?...

সুরেশ্বর চেয়ে দেখল। হঠাৎ যেন বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে মানসীর। পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে। আবার চুপসে যাচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত দেহটা চঞ্চল হয়ে উঠতে চাইছে।

সুরেশ্বর পালংক থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠল। সোজা এসে ঢুকল বাথরুমে। জল দিল মুখে, গলায় কানে এবং ঘাড়ের পিছনে।

সেই [illegible] যেন [illegible]। একটু একটু করে নিজেকে [illegible] সুরেশ্বর।

......ঘরে এসে সুরেশ্বর [illegible] খুঁজল। কোথায় গেল মানসী? পালংকের উপরই তো শুয়েছিল। কিন্তু মানসী [illegible] ঘরে নেই।

অবশ্য একটু পরেই মানসী এসে ঢুকল। সুরেশ্বরের দিকে চেয়ে অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে হাসল। বলল—'চলি এবার। বড্ড দেরী হয়ে গেল।'

—'কিন্তু মিষ্টিগুলো তো খেলে না!' সুরেশ্বর অনুরোধ করল।

—'থাক এখন। কিছু মনে করবেন না—মিষ্টিটিষ্টি ভালো লাগবে না খেতে।' তেমনি রহস্য করে মানসী হাসল।

বেশবাস ঠিকঠাক। চুলটুল সব এখন শাসনে। খোঁপাটা বিচ্যুত হয়েছিল। আবার স্বস্থানে এসেছে। কোমরের কাছের সেই অনাবৃত ফর্সা দেহভাগ প্রায় ঢাকা। বেরুবার জন্য তৈরী।

যাবার সময় মানসী বলল,—'আর হয়তো দেখাটেখা হবে না।'

—'কেন?' সুরেশ্বরকে আশাহত দেখাল। 'তুমি মেডিক্যাল কলেজে আসছ না কাল?'

'—ও'কে কাল সকালেই ছেড়ে দেবে। আজই শুনলাম।—' দরজার দিকে এগিয়ে গেল মানসী। চৌকাঠ পেরিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। সুরেশ্বরের দিকে একটা কটাক্ষ বর্ষণ করে হাসল মানসী। কেমন ব্যঙ্গ-মিশ্রিত হাসি। বলল—'আপনি কিন্তু সেই আগের মতই রয়ে গেছেন। তেমনি নার্ভাস আর ভীরু। সাতদিন ভয়ে আপনি ষোড়শীকে পড়াতে যান নি। সে কথা আমি কেমন করে ভুলে গিয়েছিলাম?'......

শমিতার সেই বড় আয়নাটা বিছানায়। সুরেশ্বর নিজের মুখটা দেখছিল। অনেকদিন আগে এমনি এক দুপুরে মানসীদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে সোজা হস্টেলে এসে উঠেছিল সুরেশ্বর। সেদিনকার মতই দেখাচ্ছে মুখখানা।—

দামিনী

সুবোধ বসু
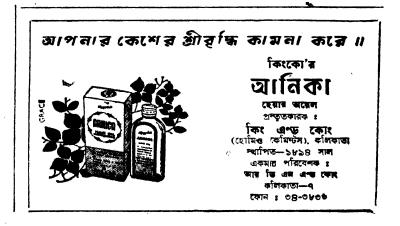
আরেকটু হলেই চাপা পড়ত। আমাদের ড্রাইভার শিউনন্দন পাকা লোক। বাঁ দিকে দ্রুত স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আমাদেরও প্রায় বিপন্ন করে তুলেছিল, কিন্তু খাদে পড়বার আগের মুহূর্তে জোরে ব্রেক কষে অতি কষ্টে বাঁচিয়ে নিল। বিকট আর্তনাদ করে ও প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি।

জরাংডি থেকে ধানবাদের দিকে চলেছি। চমৎকার সুন্দর পথ; এদিকে ওদিকে পাহাড়। পথের ধারে চাষের জমিতে প্রচুর ধান হয়েছে, মরকতমণির মতো চকচক্ করছে। যেখানে চাষের জমি নেই, সেখানে গাছপালা বেশ বন। সবুজের শেষ নেই।

কিন্তু শেষ যে আছে তা টের পাওয়া গেল কোনার নদীর উপরকার ব্রিজ রেল-লাইন পার হয়ে। হঠাৎ পৃথিবী নেড়া হয়ে উঠল। গাড়ি উঠতে লাগল উপর দিকে। যেন কৃষ্ণবর্ণ সাগরের তরঙ্গের চূড়ায়। টার-ম্যাকাডেমের রাস্তায় কে যেন ভুষো মেখে দিয়েছে। বাঁ দিকে কালো পাহাড়, ডাইনে খাদের ওদিকে কালো পাহাড়। গুঁড়ো কয়লার ধুলোয় আর চাঁই চাঁই কয়লায় চারদিক ঢাকা একরকম। ফলে 'কোনটা আসল পাহাড় আর কোন্টা জমা-কয়লার পাহাড় চট্ করে তা বোঝা বেশ কঠিন। জরাংডি থেকে আসার পথে ইতিমধ্যে অনেক কয়লাখনির সাইনবোর্ড নজরে পড়েছে। দুজোড়া লোহার রড বা দুটো ইঁটে-গাঁথা স্তম্ভের উপর একটা করে সাইনবোর্ড ঝোলানো। ভেতর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। আমাদের চোখের আড়ালে খনির অবস্থান ও কার্য-কলাপ। বড় জোর দূরে থেকে তার কপিকলের হুইল ইত্যাদি সরঞ্জাম বা রাস্তায় কয়লাখনির রোপ্-ওয়েতে দোদুল্যমান কয়লাভরা লোহার ঝুড়ি চোখে পড়ে খনির অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। কিন্তু কই, পৃথিবী ও দিগন্ত তো এমন কালো হয়ে ওঠেনি? হঠাৎ এখন আমাদের চারদিক করালী কালীমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উঠল। খাঁড়ার মত ঝল্কে উঠল রৌদ্র। পাহাড়ে পাহাড়ে কালো কুঞ্চিত এলো কেশ পড়ল ছড়িয়ে।

গাড়ি যখন আবার ঢালুতে নামা শুরু করেছে, তখন একটা কয়লাখনির সাইন-বোর্ড এবং তার অনতিদূরে কতগুলি জীর্ণ চেহারার দোকান নজরে পড়ল। এ ধরনের দোকান বহু কয়লাখনির কাছাকাছি গজিয়ে উঠে কুলি-মজুরদের নিত্য প্রয়োজন মেটায়; বেশির ভাগই খাবার দোকান, কিছু বা দর্জি এবং পান-বিড়ির দোকান, মুদির দোকান এইসব। এই দোকানগুলিকে যেন আজ বেশ আত্মীয় বলে মনে হলো। কৃষ্ণবর্ণ রিক্ততার হাত থেকে যেন [illegible]ধার করেছে এরা। প্রায় আনন্দিত [illegible] ছিলাম।

এগুলির কাছাকাছি কোন্ জায়গা থেকে মরিয়ার মত আমাদের চলন্ত গাড়ির সামনে ছুটে এলো মেয়েটা। যেন আত্মহত্যা করতে চায়।

থেমে-পড়া গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল শিউনন্দন। নেমে পড়লাম আমি। এমনকি গৃহিণী অনীতাও সভয়ে ছুটে এলো ধূল্যবলুন্ঠিতার কাছে। গাড়ির ধাক্কা লাগে নি বটে, তবে ভয়ের ধাক্কা লেগেছে। শুয়ে পড়েছে রাস্তায়। চোখ বুজে আছে।

অনীতা ভয় পেয়ে বল্লে, 'দেখনা, শিউনন্দন, কোথাও কেটেছে টেটেছে কিনা। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি? ওটা কি বুকের তলায়? রক্তের দাগ নাকি?......' উত্তেজনায় মেয়েটার ওপর ঝুঁকে পড়ল অনীতা।

'না, মেমসাহেব, ওটা লাল গামছায় জড়ানো একটা বোঁচ্কা।'

শিউনন্দন ইতিপূর্বেই মেয়েটার কাছে উবু হয়ে বসে পড়েছিল, এবার দাঁড়িয়ে উঠে জানাল।

'হুঁশ্ আছে?'

'ঐ তো মিটমিট করে তাকাচ্ছে।'

এই তথ্য প্রকাশ হওয়ার প্রায় সংগে সংগেই যেন লজ্জিত হয়ে প্রথমে উঠে বসল এবং দু'চার সেকেন্ড পরেই দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটি। বছর কুড়ি একুশের তরুণী। পিচের মত কালো কুচ্‌কুচে গায়ের রং। এক রাশ খোলা কালো চুল পিঠে ছড়িয়ে আছে। সিঁথিতে মেটে সিঁদুর ডগডগ করছে। দু'হাতে গালার চওড়া বালা। ধানী রং-এর শাড়ি বেশ আঁট করে পরা।

'ক্যায়া নাম তুমহারা?' অনীতা বিপক্ষের উকিলের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলে।

'কালী। কালী কাহারনী।'

কালী! প্রায় চমকে উঠলাম। 'কালী কাহারনী' এই পুনশ্চটুকু প্রায় পোয়া মিনিট পরে আমার উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করল।

'আরেকটু হলেই চাপা পড়তে যে। এ রকম করে কি ছুটতে হয়?' অনীতা মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলল।

'জরা ফুস্‌রো উত্তার দেংগে?' কালী তিরস্কার কর্ণপাত না করে প্রশ্ন করল। আরক্তিম চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি। যেন ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই।

ফুসরো কয়েক মাইল আগে হাট-বাজার-সমৃদ্ধ জনপদ। আমাদের রাস্তায়ই পড়বে। এ পথের বেশির ভাগ গাড়ীই ফুসরো দিয়ে যায় কালী বোধহয় তা জানে, আর সেজন্য আমাদের গন্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন না করেই সে তার নিজস্ব প্রয়োজনটা জানাল।

অনীতার দিকে তাকালাম। সেও এক-বার আমার মতামত সন্ধানে দৃষ্টিপাত করল। আপত্তি কি, নিয়ে যাই না। পুরুষ মানুষ তো নয় যে, রাস্তার ছোরা বা পিস্তল বের [illegible]' বলবে, 'যা আছে বের করে' দাও[illegible]

[illegible]?' অধৈর্য প্রশ্ন এল কালীর [illegible] থেকে। যেন দু দশ সেকেন্ডও অপেক্ষা করতে পারেনা। আমাদের সম্মতি না পেলে ছুটে কোথাও চলে যাবে।

'ফুসরোতে কে আছে?' অনীতা সাব-ধানতা হিসাবে প্রশ্ন করেন।

'মাঁজী, বাবুজী...'

'এখানে কে আছে?'

'কোই ভী নহী......' পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে অন্য কোনও গাড়ি ধরা যায় কিনা যেন তার সন্ধান করছে। 'তবে এখানে এলে কি করে?' এই ধরণের একটা জেরা করতে যাচ্ছিল অনীতা। আমি বাধা দিয়ে বল্লাম, 'নেবে তো নিয়ে নাও। ওর ইতিহাস জেনে কি হবে। ফুস্‌রো আর ক' মাইলের রাস্তা। কারো দরকার হলে খুঁজে নেবে সেখান থেকে। শুধু শুধু দেরি হয়ে যাচ্ছে...'

ড্রাইভারের কাছে না বসিয়ে নিজের কাছেই বসালে তাকে অনীতা। প্রথমে একটু বিস্মিত হয়েছিলাম। পরক্ষণেই বুঝে নিলাম। স্ত্রী-লোকের কৌতূহল সুবিদিত।

সোজা রাস্তা চলেছে ঢেউ-খেলানো দিগন্তের দিকে। কাছাকাছি শস্যক্ষেত, দূরে পাহাড় বা অরণ্য। খোলার ছাদওয়ালা মাটির বা আস্তর-বিহীন ইটের দেওয়ালের জানালা-বিরল দেহাতি ঘর মানুষের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে; নজরেও পড়ে দু চারজন লোক।

ইতিমধ্যে অনীতার সংগে কালীদেবীর কথাবার্তা অনেকটা সহজ ও অন্তরংগ হয়ে উঠেছে। অতি নিম্নস্বরেই সওয়াল-জবাব চলছে, কিন্তু এতটা কাছে বসে আছি যে, তার মনোভাব বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না।

মাত্র তিন মাস বা তার কিছু বেশি হলো কালী এসেছে এখানকার একটি কলিয়ারিতে। তার স্বামী এই কয়লাখনির মজুর। কুলি-বস্তিতে তার একটা খুপরি আর খানা-পাকাবার জন্য একফালি বারান্দা আছে। যেমন আছে আরও বহু মজদুর-পরিবারের।

মাস পাঁচেক আগে মাত্র কালীর শাদী হয়েছে। তার স্বামীর এর আগে আরও তিনটে বউ ছিল, সব মরে' ফর্শা হয়েছে। বিয়েতে একটুও মত ছিল না কালীর বা তার মার। কিন্তু তা হলে কি হবে। তার স্বামীর মামার কাছ থেকে একবার কালীর বাবা পাঁচ-কুড়ি এক টাকা ধার নিয়েছিল। সেটা সুদে বেড়ে তখন 'ঢাই সো' টাকার ওপর দাঁড়িয়েছে। একদিন পাওনার তাগাদা দিতে এসেই মামাজী প্রস্তাবটি করেন। তার ভাগেনের বউ সম্প্রতি মারা গেছে। তাড়াতাড়ি তার আর একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। কয়-লার খনিতে ভাগ্নে ভালো উপার্জন করে। দৈনিক মজুরি আছে, 'ওভার টৈম' আছে, ভাতা আছে। শস্তায় 'সুহু' পায়, ডাল পায়। বিনা পয়সায় থাকবার কোয়ার্টার পায়। সেই কোয়ার্টারে বিজলীর বাতি পর্যন্ত জ্বলে। এ হেন কৃতি ভাগ্নের এমন বরাত যে তিন তিনটা বউ মরেছে। 'তোমার মেয়ে কালীকে তো বেশ সুলক্ষণা মনে হচ্ছে। ওর সংগে জোড়া মিলিয়ে দিলে কেমন হয়? ভাগ্নের বয়স এমন কিছু নয়। এখনও জোয়ান-মর্দ। সুখে থাকবে মেয়েটা। আর দূরেও এমন নয়। কলিয়ারিটা ক' কোশেরই বা পথ। আর ধর এই বিয়েটা যদি হয়েই যায়, তবে আমি না হয় তোমার বাকি সুদ তামাম মকুব করে' দেব। ভাগ্নের বিয়েতে শত হোক কিছু উপহার তো দিতে হবে?' ইত্যাদি।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই বিয়ে হয়ে গেল কালীর তার চেয়ে প্রায় পঁচিশ বছর বেশি বয়সের পাত্রের সংগে। বয়সের তফাৎটা কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে না। কালীও প্রায় ভুলে যেত, যদি না বিয়ের মাস দেড়েক পরেই তার 'আদমী' তাকে কলিয়ারিতে নিয়ে যাবার জন্য ফিরে আসত। গাঁয়ে ছোট ছোট ছেলে মেয়ের বিয়ে হয়। মেয়েরা কেউ কেউ পাঁচ সাত বছর বাপের বাড়িতেই থেকে যায় বর সাবালক না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু কালীর বর বহু বছর আগেই সাবালক হয়েছে। সে অপেক্ষা করবে না। কালীকে একদিন জোর করেই ধরে নিয়ে গেল সেই কলিয়ারির খুপ্‌রিতে।

চারদিকে শুধু মানুষের ভিড় আর কয়-লার স্তূপ। অস্বস্তিকর মনে হলো এই পরিবেশ কালীর। তবু ঘরকন্নায় মন দিতে হল তাকে. স্বামীর ডিউটি কখনও সকালে, কখনও রাত্তিরে। সন্ধ্যায় ফিরে স্নান করে' রোটী খেয়ে সে চলে যাবে পাড়ায় বন্ধুদের সংগে মজলিশ করতে। অনেক রাতে তাড়ি খেয়ে ফিরে আসবে। আবার যদি রাতের ডিউটি দিয়ে সকালে ফেরে, তবে সারা দুপুর ঘুমোবে। কিন্তু সন্ধ্যায় তাড়ির দোকানে যাওয়া চাই-ই। প্রথম প্রথম বেশি রকম বেসামাল হতো না। কিন্তু ক্রমে মাত্রা বাড়তে লাগল। গালাগালি, ঝগড়া। তারপর প্রহার। কিন্তু কালীও তেজী মেয়ে। গায়ে হাত তোলা সে সইবে না। আক্রান্ত হয়ে সেও একদিন শাড়ির আঁচল আঁটো করে' জড়িয়ে বাঁশ হাতে নিয়ে দাঁড়াল। হুঁশিয়ার হয়ে গেল কালীর 'আদমী'। পাল্টা আক্র-মণের ভয়ে চট্ করে' সে তার হাত তুলতে সাহস করে না। কিন্তু বদলা নিলে সে অন্য দিক দিয়ে। প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে কালী আগেই কানাঘুষা শুনেছিল। বস্তির আরো দু-একটি মেয়ের সংগে আস্‌নাই আছে তার ঘরওয়ালার। এবার তাদের দু' চারজনের সংগে প্রকাশ্যেই প্রকাশ পেতে লাগল যে এই কামিনগুলির স্বামী বা পরি-বার নেই। খনিতে ওরা মজুরী খাটে আর অবসর সময়ে অন্যদের ঘর ভাঙে। ইতি-মধ্যে এদের কেউ কেউ এমনকি কালীর কোয়ার্টারের বাইরে এসে খোঁজ করে' গেছে বাড়ির মালিক হাজির আছে কিনা। যাবার সময় ইংগিতে রসিকতাও করে' গেছে।

বিরাগে কালো হয়ে উঠেছে কালীর মন। এখানকার যে দিকে তাকাও সে দিকেই কালো। চারদিকে কালো কয়লার পাহাড়। কয়লার গ‍ুঁড়োতে কালো রাস্তা, কালোর পোচ-খাওয়া মাটি আর ঘাস। কালো কয়-লায় বোঝাই ট্রাকগ‍ুলি, মাথার উপর তার দিয়ে যাতায়াত করছে কয়লা-বোঝাই লোহার ঝ‍ুড়ি। কাজের শেষে কালো ভূত হয়ে যেন ফিরে আসে কুলি আর কামি-নেরা। কয়লার গ‍ুঁড়ো ঝরতে থাকে এদের গা থেকে। সেই গ‍ুঁড়ো দিয়েই যেন দিনের আলো রাতের অন্ধকারে র‍ুপান্তরিত হয়। সেই কয়লার-পোচ-দেওয়া অন্ধকারে জেগে ওঠে ঝগড়া, মাতালের চিৎকার আর মাদলের একঘেয়ে বাজনা। বিষিয়ে যায় কালীর মন।

এমন সময় একদিন তার আদমী প্রস্তাব করল, কালীকেও টাকা কামাতে হবে। কয়লা কাটতে নামতে হবে খনির ভেতর। প্রস্তাব শ‍ুনে কালী তাজ্জব বনে গেল। এমনিতেই মাটির ওপরে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে চারদিকের কয়লার চাপে, তায় কয়লার বিবরে নামবে? অসম্ভব!

বলা বাহ‍ুল্য, এই নিয়ে ক' দিন খিট-মিট চলল। মারতেও এগিয়ে এসেছিল আদমী, কিন্তু লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে কালীর রণরঙ্গিনী ম‍ূর্তি দেখে পেছিয়ে গেল। গালাগালি দিয়ে বেরিয়ে গেল সে, শাসিয়ে গেল সর্দারের কাছে নালিশ করতে যাচ্ছে।

এই উপলক্ষ্য করে' ব‍ুধ‍ু সর্দারের আনাগোনা হোল ক'দিন। ব‍ুধ‍ু তর্ক করল, বোঝাতে চেষ্টা করল কালীকে। দ‍ু' চারবার চোখ পাকিয়ে রাগও দেখাল। তার আদমীর বয়সীই লোকটা। সারা ম‍ুখে বিশ্রী দাগ। বেঁটে এবং জোয়ান চেহারা। পাকানো এক জোড়া গোঁফ। চোখ লাল। মেয়েরা বলে পাঁড়-মাতাল আর দ‍ুশ্চরিত্র। মোচড় দিয়ে সবার থেকে পয়সা আদায় করে। অথচ প্রতিবারই কালী লক্ষ্য করেছে তার আদমীর সঙ্গে বেরিয়ে যাবার পর রাস্তার বাঁকের ধারে সর্দারই পয়সা বের করে দিচ্ছে তার আদ-মীকে। মদ খাবার জন্য এর ওর কাছ থেকে তার স্বামী প্রায়ই 'উধার' নিয়ে থাকে।

আজ সকালে আবার বচসা শ‍ুর‍ু হয়ে গেল। কয়লা কাটতে আজ যেসব কামিন খনির ভেতরে নামবে, তাদের লিস্টিতে নাম দেওয়া হয়েছে কালীর। কেন সে খাটবে না? সংসারের আয় না বাড়লে খরচ চলবে কি করে? বউয়ের দ‍ু' চারটে র‍ুপোর গয়না না থাকলে কখনও সম্মান থাকে? চাঁদির গয়না! যা দ‍ু একটা ছিল কালীর, তাও কেড়ে নিয়েছে তাড়ি আর হাঁড়িয়ার পয়সা গ‍ুনতে। সে বলছে কিনা চাঁদির গয়না! মাতলামির পয়সা জোগাবার জন্য কালী কয়লার গর্তে নামতে পারবে না। একচোট ঝগড়ার পর তার আদমী কাজে হাজিরা দিতে বেরিয়ে গেল। শাসিয়ে গেল। সর্দারের কাছে গিয়ে নালিশ করবে। উপয‍ুক্ত ব্যবস্থা কর‍ুক সর্দার নিজে।

সর্দারের ভয় এত দেখানো হয়েছে যে, কালী আর তাতে ভয় পায় না। খোদ সর্দারের চোখ-রাঙ্গানিকেও সে থোড়াই পরোয়া করে।

সকাল বেলায় পাড়া একরকম নির্জন হয়ে ওঠে। মেয়েদের রাতের শিফ‍্টে খনিতে নামা নিষেধ, সবাই দিনের শিফ‍্টেই কাজে বেরিয়ে যায়। নির্জনতা ও নৈঃশব্দ্য কালীর ভালো লাগে। আশৈশব নিজের খ‍ুপরি ঝাড়‍ু দিতে দিতে অন্যমনস্কভাবে সে নিজের গাঁ, নিজেদের মাটির বাড়ি, মা, বাবা, ভৈঁস, বকরী আর মাঠ-ভরা ফসলের কথা ভাবছিল। এমন সময় পেছনে জ‍ুতোর আওয়াজ শ‍ুনে চমকে পেছনে তাকাল। দেখল, ঘরের ভেতর এসে ঢ‍ুকেছে ব‍ুধ‍ু সর্দার। চোখ লাল। ম‍ুখ লাল, ভুর‍ু দ‍ুটো ঠেলে উপরে উঠে গেছে। 'যাস নি কেন কাজে? এসব চালাকি এখানে চলবে না। ভাল চাস তো চলে আয়।' একট‍ু ভয় পেয়ে গেল কালী। ব‍ুধ‍ুর দ‍ৃষ্টিটা কি রকম অশ‍ুভ মনে হচ্ছে। আশেপাশের মেয়েরা কেউ বাড়ি নেই যে, সোর করলে ছ‍ুটে আসবে। কিন্তু সাহস সংগ্রহ করে' কালী বলল, 'বাইরে যাও।' দ‍ুই গোঁফের প্রান্ত খাড়া করে তুলে ব‍ুধ‍ু বলল, 'তুই জানিস নে ব‍ুধ‍ু সর্দারকে। অনেক বদমাস মেয়েমান‍ুষকে সে শায়েস্তা করেছে। তোর নাম আছে আজ লিস্টিতে। যেতে তোকে হবেই...' বলে চকিতে সে কালীর একটা হাত বাঘের মত থাব‍ুলে ধরল। শ‍ুধ‍ু তাই নয়। টেনে নিয়ে আসছে নিজের কাছে। দ‍ুই চোখে একটা ক্ষ‍ুধার্ত দ‍ৃষ্টি চকচক্ করছে। 'কাম করবি না তো টাকা আসবে কোথা থেকে? তোর আদমী যে চার কুড়ি তিন টাকা উধার করেছে আমার কাছে তা শোধ হবে কি করে? এ তোকেই শোধ দিতে হবে। এ রকম বা ও-রকম যেমন করেই হোক...উঃ...! হারামী...' আল‍্গা হয়ে গেল ব‍ুধ‍ু সর্দারের ম‍ুষ্ঠি। দ‍ুই পাটি চকচকে দাঁতের ঘর্ষণের মধ্য থেকে কোনও রকমে টেনে বের করে' নিলে নিজের বাহ‍ু। ইতিমধ্যে কালী ছ‍ুটে গিয়ে ঘরের কোণায় রাখা পাকানো বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। ব‍ুধ‍ু সর্দার দ্বিতীয় আক্র-মণের জন্য দ‍ু' পা এগিয়ে এসেছিল। কালীর হাতে বাঁশ উদ্যত দেখে পেছিয়ে গেল সে। তার হাতের দংশিত অংশ থেকে তখন ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত ঝরছে। তা বাঁ হাতের পাতা দিয়ে চাপা দিয়ে সে শাসিয়ে বল্ল, 'এর মজা এখ‍ুনি টের পাবি। আমি যাচ্ছি লোক ডাকতে—চ্যাং দোলা করে' ধরে নিয়ে গিয়ে খনির ভেতর ছ‍ুঁড়ে ফেলে দেবে। তোর কি হাল করা হয়, দেখতে পাবি।' বলে অশিষ্ট অঙ্গভঙ্গি করে' ও অশ্রাব্য গালি বর্ষণ করতে করতে ব‍ুধ‍ু সর্দার ছ‍ুটল একটা আহত নেক‍্ড়ে বাঘের মত।

পলকে সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেল। লাল গামছাটায় নিজের জামা-কাপড় বেঁধে নিয়ে ছ‍ুটে বেরিয়ে এলো কালী। এ রাস্তায় বহ‍ু গাড়ি আর ট্রাক যায় ফ‍ুস‍্রোর দিকে। তার যে কোনও একটায় জায়গা করে' নিতে হবে। নইলে এক জোড়া শয়তানের হাত থেকে আর রক্ষা নেই।......পরমাত্মা অনেক দয়া করে' উদ্ধারকর্তা মিলিয়ে দিয়েছেন, অন্ধকার নরক থেকে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে কালী......

মাইল-পোস্টে দেখছি—ফ‍ুসরো ৩। ফ‍ুসরো আর মাত্র তিন কিলোমিটার দ‍ূরে। অর্থাৎ দ‍ু' মাইলও নয়। কালী তার আগেই টের পেয়ে গিয়েছে। পোঁটলার গিঠ অনা-বশ্যক টেনে সে সিধা হয়ে বসল। উৎস‍ুক দ‍ৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। ঐ তো ফ‍ুস‍্রোর বাজারের দোকান-ঘর, পেট্রোল পাম্প ইত্যাদি নজরে পড়ছে।

ফ‍ুসরোতে আমাদের প্রায় আধঘন্টার মত দেরি হলো। সাবধানতা হিসাবে কিছ‍ু পেট্রোল্ নেওয়া হলো, গাড়ির চাকায় হাওয়া ভরা হলো। তারপর পথের ধারে হাট দেখে অনীতার সাধ হলো তাজা সব‍্জি ক্রয়ের। কালী অবশ্য ফ‍ুস‍্রো পোঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তড়াক করে' নেমে সকৃতজ্ঞ নমস্তে জানিয়ে ছ‍ুট লাগিয়েছিল। আমাদের এ বিলম্বে তার কোনও দেরি হলো না।

আবার ছ‍ুটেছে আমাদের গাড়ি। ফ‍ুস-রোর বসতি ছাড়িয়ে ফাঁকায় এসেছি। দ‍ু দিকে শস্যে ভরা হরিৎ ক্ষেত্র। ডান দিকে দামোদর নদী। ও দিকেই এবার মোড় নেবে আমাদের রাস্তা। দামোদরের টোল ব্রিজ পেরিয়ে ইস্পাত-নগরী মারাফারীর দিকে এগিয়ে যাব। কি স‍ুন্দর ধান ও বজরা হয়েছে এদিকে। চাইলে চোখ জ‍ুড়িয়ে যায়।

'ওটা কে, কালী না?'

অনীতার কথায় তাড়াতাড়ি তার দ‍ৃষ্টি অন‍ুসরণ করে' তাকালাম।

মাত্র দ‍ু' একশো গজ দ‍ূরে কোমর পর্যন্ত উঁচু ধানের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ... থেকে সদ্য ছাড়া পাওয়া গর‍ুর মত ... ভরে ছ‍ুটে চলেছে একটি কালো মেয়ে। পিঠে দ‍ুলছে লাল গামছায় বাঁধা বোঁচকা আর খসে-পড়া বেণী। দ‍ূরে দিগন্তরেখায় দেখা যাচ্ছে চন্দ্রপ‍ুরার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ধোঁয়া-ছাড়া পাওয়ার হাউস অস্পষ্ট ছবির মত। গাঁও-গ্রাম কিছ‍ু নজরে পড়ে না। সব‍ুজ শস্যের তরঙ্গে সব যেন ডুবে গেছে। কিন্তু কালী জানে তার দেহাত কোন দিকে। নিঃসন্দেহে সে ছ‍ুটে চলেছে হরিণীর লাস্যে। আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে তার এই সামান্য কিছ‍ুক্ষণের মধ্যেই। যে রণরঙ্গিনী ম‍ূর্তিতে দ‍ু' দ‍ুটো অস‍ুরে পদদলিত করেছিল, সে ম‍ূর্তি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সোনার রৌদ্রে, সব‍ুজের বন্যায় তার গায়ের কালো রঙ পর্যন্ত যেন বদ‍্লে গেছে। আর সে কালী নয়। সে এখন শ্যামা!

অনীতার ম‍ুখে তৃপ্তির হাসি ফ‍ুটে উঠেছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

একদা বিদেশী সিভিলিয়ানদের কাজ চালানোর সুবিধার জন্য সরকারী আনুকূল্যে কয়েকজন বাঙালী পন্ডিত ও এবং দু-একজন বিদেশী ইংরাজ মিলে বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটা কাঠামো তৈরীর প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। ১৮০১ খৃস্টাব্দে বাংলা গদ্য গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত হয় সেই কাল থেকে ১৯৪১ খৃস্টাব্দ (রবীন্দ্রনাথের দেহাবসান ঘটে এই কালে) পর্যন্ত একটি কালসীমা স্থির করে একশ চল্লিশ বছরের গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশের এক ইতিহাস রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী ও শ্রীযুক্ত বিজিত-কুমার দত্ত। এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি "বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক' নামে ১৩৬৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পূর্বে এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা গদ্যের সূত্রপাত অনেক আগে হলেও সম্পা[illegible] বয় কাজ চালানোর জন্য ১৮০১ খৃস্[illegible] ই বাংলা গদ্যের একটি বিশেষ কাল[illegible]রে গ্রহণ করেছেন।

এই গ্রন্থের দুটি অংশ, একটি বিবৃতি আর অপরটি উদাহরণ। এই পদ্ধতি গ্রহণ করে সম্পাদকদ্বয় বিশেষ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় ১৯৬১ গিরীশ-বক্তৃতায় যে প্রবন্ধ রচনা করেন তার কিয়দংশ "বাংলা গদ্যের একশ চল্লিশ বছর" শীর্ষক সুবৃহৎ বিবৃতি অংশে গ্রথিত হয়েছে। ১৭৬ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিশদ প্রবন্ধটি অতিশয় মূল্যবান। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে যাঁরা আগ্রহশীল শুধু তাঁদের জন্য নয়, বাংলা সাহিত্যের যাঁরা অনুরাগী পাঠক তাঁদের কাছেও গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম।

কিভাবে ভাষা গঠনের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সেই কালের 'অনভ্যস্ত দ্বিধা-গ্রস্ত কলম' অসীম সাহসভরে কাজ সুরু করেছিলেন এবং সেই ভাষা যা একদিন বিদেশী শাসকের রাজকার্য চালনার

শ্রীযুক্ত বিশী মহাশয় ১৫৫৫, ১৭৩০, ১৭৪১, ১৭৬৪, ১৭৯২ খৃস্টাব্দের কয়েকখানি পত্র উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করেছেন। ১৭৯২ খৃস্টাব্দের বৈষ্ণব কড়চায় 'এই তিন কুর্যাত'—কথাটির 'কুর্যাত' কথাটি তিনি লক্ষ্য করতে বলেছেন এবং তিনি বলেছেন "এখনকার দিনে ইংরেজী জানা লোকে যেমন কথার মুখে অনেক সময় বাংলা বাক্যের মধ্যে ইংরাজী ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে, এ তারই অনুরূপ, কেবল ইংরেজির বদলে সংস্কৃত ক্রিয়াপদ 'কুর্যাত'।

আরেকটি পত্রের মধ্যে আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার আছে, কিছু কিছু এই জাতীয় শব্দ উত্তরকালে আমাদের ভাষার মধ্যে যুক্ত হয়ে একাত্ম হয়ে গেছে যেমন 'বাহাল' কথাটি। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে সেইকালে যাঁরা এই সব ভাষা প্রয়োগ করেছেন তাঁরা সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত। কিন্তু বানান বিষয়ে কোনো বাঁধাধরা রীতি ছিল না, 'নবদ্বীপ', 'পন্ডিত', 'অধিকারী' প্রভৃতি 'নবাদ্দিপ', 'পন্ডীত' এবং 'অধীকারি' লিখিত হত। শ্রীযুক্ত বিশী বলেছেন—"লেখকগণ পন্ডিত তবু তাঁরা বিদেশী শব্দ ব্যবহারে কুন্ঠিত হননি।" মনে হয় এই কুন্ঠাহীনতার পিছনে ছিল প্রচলিত রীতি। ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসকে লিখিত পত্রখানির (৮নং) ভাষা বিশেষ কৌতুকপ্রদ। "গোরনর জনরল চারলছ লাট করণওলছ বাহাদোর বিশম সমরাট টৌরকুল কারিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবর মহোগ্র প্রতাপেষু—" নিঃসন্দেহে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচায়ক। 'গোরনর' কথাটি 'গভর্ণর' না শাদা চামড়া বিশিষ্ট নাপুংগ[illegible] তাই বা কে জানে?

'বিবরিয়া' কথাটি কবিতায় চালু আছে গদ্যে দেখা যায় না, কিন্তু 'পরমাপ্যাইত' এখনও চালানো যায় না কি! শ্রীযুক্ত বিশী প্রাচীন পত্রাবলীর নমুনা প্রদান করে

আরবি-ফারসীর যবনী মিশাল ভাষা ও সেই সঙ্গে ইংরাজী শব্দের ফোড়ন কালক্রমে কিভাবে এসে পড়েছে তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। পন্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাঙ্গলা সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে বাঙ্গলাভাষা যে কিভাবে কলিকাতার গঙ্গার দুইধারে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সভ্যলোক এসে বসবাস করেছেন তা যুক্তিসহ লিখেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাই 'বাঙ্গলায় নূতন সমাজের ও নূতন সাহিত্যের সূত্রপাত হইল।' শ্রীযুক্ত বিশী মহাশয় লিখেছেন—

"প্রথমে অজ্ঞাতসারে পরে জ্ঞাতসারে, প্রথমে প্রয়োজনের তাগিদে পরে প্রাণের টানে মধ্যবিত্ত সমাজ যে আত্মপ্রকাশের বাহনকে আবিষ্কার ও সৃষ্টি করে নিল সেটি হচ্ছে বাংলা গদ্য সাহিত্য।"

মধ্যবিত্ত সমাজ প্রাণের টানে প্রয়োজনের খাতিরে এই গদ্য সাহিত্য গড়ে উঠেছে। লেখক বলেছেন প্রথম প্রেরণা দিয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কিন্তু 'বোবা মধ্যবিত্ত সমাজ শশ বিষাণের মতোই অসম্ভব'—তাই মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে গড়ে উঠেছে মধ্যবিত্তের ভাষা, আর সেই মধ্যবিত্ত সমাজও গড়ে উঠেছে ইংরেজের পরোক্ষ প্রভাবে।

যদি মধ্যবিত্ত সমাজ না গড়ে উঠত তাহলে কি হত, কিংবা মধ্যবিত্ত সমাজের অভাবেই যে গদ্য সাহিত্য পদবাচ্য হয়নি তার অন্যবিধ কারণও লেখক নির্দেশ করেছেন, এতকাল পয়ার ছন্দই গদ্যের কাজ সম্পন্ন করত তাই নতুন বাহনের কথা কেউ অনুভব করেনি—

লেখক বলেছেন :

"গদ্যের সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রের ধারক বাহকের সম্বন্ধ। পদ্যের ধারক ছন্দ, বাহক মানুষের স্মরণ শক্তি।"

এই যুক্তি নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য।

আলোচনার সুবিধার জন্য লেখক ১৮০১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত সুবৃহৎ একশ চল্লিশ বছর কালকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন প্রথম ও দ্বিতীয় যথাক্রমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগ, ও সাময়িক পত্র-সংবাদপত্রের যুগ, আর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পর্বগুলি যথাক্রমে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের যুগ।

বাংলা সাহিত্যের যাঁরা অধ্যবসায়ী পাঠক তাঁদের সকলের সঙ্গে এই যুগগুলির মোটামুটি পরিচয় আছে, কিন্তু তার বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসিদ্ধ বিচার হয়ত সর্বদা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীযুক্ত বিশী তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় এই একশ চল্লিশ বছরের বাংলা ভাষার ইতিহাসে উৎসাহী পাঠকদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। গ্রহণযোগ্য যুক্তি এবং ন্যায়সংগত বিচার তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। তিনি অতিশয় সরস বিশ্লেষণে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সমধুর করে পরিবেশন করেছেন সেই কৃতিত্ব কম নয়।

একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে একশ চল্লিশ বছরের ধারাবাহিক বিবরণ পর্যালোচনা করা অতিশয় সুকঠিন কর্ম। প্রচুর তথ্য এবং দৃষ্টান্ত সহকারে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

স্থানাভাববশত অধিকতর বিস্তারিত-ভাবে এই গ্রন্থটির আলোচনা সম্ভব হল না তার জন্য আমরা দুঃখিত। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রযুগ এই তিনটি পর্ব নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আধুনিককালের ইতিহাস গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে বর্তমান বাংলা গদ্য। প্রমথনাথ বিশী যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন এই এই সুবৃহৎ কালটির আলোচনায়। বিশেষত অবনীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে তিনি যে সুবিচার করেছেন তা প্রশংসনীয়।

লেখক পরিশেষে বলেছেন—

"—যে হাত থেকে ঘটনার বলগা খসে পড়েছে সেই হাত এখন ভাষা রীতির ইন্দ্রজালের চাতুরী দেখাতে ব্যস্ত। এক সময় স্টাইল ছিল লেখকের করায়ত্ত। এখন লেখক হয়েছে স্টাইলের করায়ত্ত।"

এই কথাগুলি বিবেচনা সহকারে বিচার করা প্রয়োজন। বর্তমানের এক সাহিত্যিক-ব্যাধির প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করেছেন।

দৃষ্টান্ত বিভাগে রাম বসু (১৭৫৭) থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গ-সরস্বতীর অসংখ্য সুসন্তানের রচনার নমুনা পাওয়া যাবে। তবে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র রায় (নব কমলাকান্ত), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা গদ্যের নমুনা এই গ্রন্থে অনুপস্থিত। পরবর্তী সংস্করণে এই দিকটা বিবেচনা করার সুপারিশ জানাই।

পরিশিষ্ট অংশে কয়েকটি প্রাচীন চিঠিপত্র, দলিল এবং মনোআল-দা-আন-সুম্পাগম, দোম আন্তোনিও, হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন প্রভৃতির প্রাচীন রচনা-রীতির নমুনা সংযোজিত হয়েছে।

এই সুবৃহৎ ও সুমুদ্রিত গ্রন্থটির দাম মাত্র সাড়ে বারো টাকা যথেষ্ট সুলভ মনে হয়।

—অভয়ংকর

বাংলা গদ্যের পদাংক ঃ (সাহিত্য ইতিহাস)— শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীবিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

ভারতীয় সাহিত্য

হিন্দি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ॥

শ্রীবিদ্যানিবাস মিশ্র ও শ্রীসচ্চিদানন্দ হীরানন্দ বাৎসায়নের যুগ্ম প্রচেষ্টায় হিন্দি কবিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ সংকলন আমেরিকা থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনে অনুবাদের জন্য কয়েকজন আমেরিকান সাহিত্যিক বিশেষভাবে সাহায্য করেন। হিন্দি কবিতার নিয়মিত অনুবাদ 'হিন্দি রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু হিন্দি কবিতার একটা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সংকলন এর আগে প্রকাশিত হয়নি। শ্রী এ ভি রাজেশ্বর রাও সম্পাদিত 'ভারতীয় কবিতায়' মাত্র সাতটি হিন্দি কবিতা ছিল। বর্তমান সংকলনটি দীর্ঘদিনের একটি অভাব মেটাবে বলে আশা করা যায়।

এই গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, হিন্দি কবিতার বিশেষ বাগধারা এতে রক্ষিত হয়নি। ভূমিকায় শ্রীবাৎসায়ন লিখেছেন—"এই সংকলনে শুধু এটুকুই আশা করা যায়, ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বিদেশী পাঠকদের মনে একটা কৌতূহল জাগবে। এই গ্রন্থের আর একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন শ্রীযোসেফাইন মাইলস্। তিনি অনুবাদের সমস্যা এবং হিন্দি কবিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

আধুনিক হিন্দি কবিতার আরম্ভ উনিশ শতকে। এই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র। এর পরবর্তী কালে 'ছায়াবাদ' হিন্দির সাহিত্যাকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলে। 'ছায়াবাদ' যুগের অন্যতম হলেন শ্রীমৈথিলিশরণ গুপ্ত, 'নিরালা' এবং শ্রীসুমিত্রানন্দন পন্থ। এই গ্রন্থে মোট ৪৪ জন হিন্দি কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে এবং অধিকাংশ কবিতাই ছায়াবাদী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত। তবে শ্রীমখনলাল চতুর্বেদী এবং শ্রীবালকৃষ্ণ নামবর সিং এই ধারার বাইরে একটি স্বতন্ত্র ধারার কবি। ১৯৫০ সালে হিন্দি কাব্য জগতে আর একটি নতুন ধারার প্রবর্তন হয়। এ'রা 'প্রয়োগবাদী' নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠীর কবিদের মধ্যে শ্রীকুনওয়ার নারায়ণ, শ্রীনামবর সিং, শ্রীসর্বেশ্বর দয়াল শকসেনা এবং শ্রীকীর্তি চতুর্বেদী বিশেষ উল্লেখ্য। এর পরবর্তী সময়ের হিন্দি কবিতার বৈচিত্র্য আরও বেশি।

অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রেই মূলের সঙ্গে সংযোগবিহীন। এবং অনেক ক্ষেত্রেই গদ্যময় হয়ে উঠেছে। তবু বিদেশী পাঠকের কাছে এই গ্রন্থটির আবেদন অপরিসীম। যাঁরা হিন্দি সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তাঁদের কাছে গ্রন্থটি অপরিহার্য বলে মনে করি।

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর সঙ্গে একটি সন্ধ্যা॥

ওড়িশার সাহিত্য জগতে এখন সবচেয়ে পরিচিত নাম হল শ্রীকালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বলতে গেলে সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর সমান খ্যাতি। অনুবাদক হিসেবেও তিনি বিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থও তিনি মাতৃভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর রচনাও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সম্প্রতি সিমলায় 'অমৃতে'র প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই সময় তাঁকে কিছু কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। পাঠকের জ্ঞাতার্থে এখানে প্রশ্নোত্তর আকারেই তা পরিবেশন করা যাচ্ছে।

প্রশ্ন—কবিতার অনুবাদ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

উত্তর—কবিতার অনুবাদ হওয়া দরকার। একথা খুবই দুঃখের যে, একই দেশে বসবাস করা সত্ত্বেও আমরা পরস্পরের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানি না। অথচ ইংরেজি বা আমেরিকান কবিতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত। কবিতার সার্থক অনুবাদ হয় না—একথা সত্য। কিন্তু ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ খুব কঠিন নয়। কেননা,—সংস্কৃত মূলতঃ অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার জননী স্থানীয়। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।

প্রশ্ন—কবিতার বিষয় আঙ্গিককে নির্ধারিত করে—এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

উত্তর—আমি বিশ্বাস করি। এখন কবিতা শুধু 'ফর্ম'-এর উপর জোর দিতে গিয়ে 'ফর্মলেস' হয়ে পড়ছে।

প্রশ্ন—আপনার পরবর্তী ওড়িশী ভাষায় কার কার লেখা আপনার ভাল লাগে?

উত্তর—অনন্ত পট্টনায়ক, রমাকান্ত রথ, শচী রাউত রায়, মায়াধরমান সিং, ব্রজনাথ রথ প্রমুখের লেখা আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

প্রশ্ন—কবি সম্মেলনের কি কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে?

উত্তর—আছে নিশ্চয়ই। পরস্পরকে জানার জন্য এই ধরনের সম্মেলনের গুরুত্ব খুবই বেশি। বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন বা সাহিত্য সম্মেলনের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষকে জানতে হলে এছাড়া আর কোনও পথ নেই।

প্রশ্ন—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আপনার কেমন লাগে?

উত্তর—রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই আমি অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা আমি অনুবাদ করেছি।

প্রশ্ন—সমাজগঠনে শিল্পী-সাহিত্যিকদের কি কোনও ভূমিকা আছে?

উত্তর—কবি ও লেখকদের নিশ্চয়ই আছে। আমি বিশ্বাস করি, এছাড়া সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। লেখকরা কেউ স্বয়ম্ভূ নন। দৃশ্যমান বস্তু-জগতের আলো অন্ধকার তাঁদেরও মনের বীণায় ঝঙ্কার তোলে। লেখকও এক অর্থে সামাজিক মানুষ। তাঁর রচনায় সমাজ-বিবেক পরিস্ফুট হবেই।

তামিল ভাষায় বাংলা কবিতা ॥

তামিল কবিতা পত্রিকা 'কবিথাই'-এর একটি বিশেষ বাংলা কবিতা সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। সম্পাদক 'দোশানি' এর মধ্যেই কয়েকজন বাঙালী কবির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে অতি আধুনিক কবিদের কবিতা এতে সংকলিত হবে বলে জানা গেছে।

বিদেশী সাহিত্য

আন্তর্জাতিক বইয়ের মেলা ॥

সম্প্রতি ওয়ারশতে একটি আন্তর্জাতিক বইয়ের মেলা হয়ে গেল। আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্প্রীতি-সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলাই ছিল এ মেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

কিন্তু এ মেলাটি একই সঙ্গে 'মত দেওয়া ও কলা বেচার' মতো দুটি কর্তব্যই করেছে। এতে সর্বাধিক লাভবান হয় পোলিশ সরকার। এই উপলক্ষে ...ক ও সমাজতান্ত্রিক দেশের বহু ...িক ওয়ারশতে মিলিত হয়েছিলেন। ...দের মধ্যে অনেকেই পোলিশ সাহিত্যের অনুবাদ, ও প্রকাশনার ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকাশক ও গ্রন্থকারের সঙ্গে নানাধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। তার ফলে বিদেশী ভাষায় পোলিশ সাহিত্যের প্রচার লাভজনক ভিত্তিতে করা সম্ভব হয়েছে।

ব্রিয়ান মুর-এর উপন্যাস ॥

মার্কিনী ঔপন্যাসিক ব্রিয়ান মুর তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'আই অ্যাম মেরী ডানে' উপন্যাসে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চাতুর্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। উপন্যাসটি আয়তনে ক্ষুদ্র, সংলাপ ব্যবহারে উজ্জ্বল এবং যুগোপযুগী ভাবনায় স্বতন্ত্র।

এই উপন্যাসে লেখক নিজে পুরুষ হয়েও প্রধান নারী চরিত্রের আঁতের খবর সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। অনেক সময় মনে হয়, লেখক যেন ছদ্মবেশ ধরে এই নারী-চরিত্রটির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। উপন্যাসটি পড়ার পরেও লেখকের এই কৌশল ধরা পড়ে না।

অথচ প্রায়ই দেখা যায়, বহু ঔপন্যাসিক মহিলাদের ছদ্মনামে লেখা শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত আপন পুরুষালি মেজাজকে গোপন করতে পারেন না। এবং শেষ পর্যন্ত নিজের চাতুরী ত্যাগ করে স্বনামে আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা বোধ করেন।

একজন শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের কলমে ব্রিয়ান মুর কোনো অসাধারণ কীর্তি স্থাপন করতে পারেননি। কিন্তু মহিলার বকলমে তাঁর রচনা অসাধারণ।

এই উপন্যাসটির কাহিনী মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর স্থাপিত। মেরী ডানে নাম্নী একজন তেত্রিশ বছর বয়স্কা মহিলার একটিমাত্র দিনের ঘটনা নিয়ে উপন্যাসটি লেখা। মেরী ডানের জীবন সুখে ও অসুখের টানা পোড়েনে গঠিত। তিনি তৃতীয়বার বিয়ে করেছেন একজন চিত্রনাট্যকারকে, যিনি জীবনে খ্যাতি ও সাফল্য অর্জন করেছেন নানাভাবে। ডানের জীবনটাই হলো কতকগুলি ইমোশনাল ঘটনার ধারাবাহিক প্রদর্শনী। কখনো সে হাঁসের মতো মুখ ডুবিয়ে কোনো ঘটনার স্বাদ গ্রহণ করেছে, আবার পরমুহূর্তেই তাকে ত্যাগ করে অন্য বিষয়ে মনোসংযোগ করেছে। অবশ্য পূর্ববর্তী ঘটনার স্মৃতিকে সে ভোলেনি, বরং প্রাক্তন অভিজ্ঞতা নিয়ে সে বর্তমানের রস উপভোগ করেছে।

সাংবাদিকের বিষণ্ণতা ॥

কোনো কাজ করতে হলে সাংবাদিকদের হাতে রাখা চাই। এই মনোভাব পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত নিজের মত কিংবা মতবাদের প্রচার সাপেক্ষ হলে সাংবাদিকদের এড়িয়ে যাওয়া চলে না। বীট এবং হিপিসম্প্রদায়ের তরুণ-তরুণীরা এ সত্যটি মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছে প্রথম থেকেই। সেজন্যেই দেখা যায়, তারা কোন না কোনপ্রকারে যে কোন একজন বা একাধিক প্রভাবশালী সাংবাদিকের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছে।

সম্প্রতি জোয়ান ডিভিয়ন নাম্নী জনৈক মহিলা সাংবাদিক 'স্লাউচিং টুওয়ার্ডস বেথলহেম' নামে একটি বই লিখেছেন। তাতে বীট ও হিপি সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেকগুলি আলোচনা করা হয়েছে।

মিস ডিভিয়ন তাদের দ্বারা অশেষভাবে প্রভাবিত হলেও খুব জোরের সঙ্গে কিছু লিখতে পারেননি। তাঁর লেখার প্রতিছত্রে এক ধরনের নস্টালজিয়ার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। পরিচিত লোকজন, ঘরবাড়ি, মানুষের যাতায়াত ও চলাফেরা—সবই যেন তাঁর বর্ণনায় বিবর্ণ এবং বিয়োগান্তক। কোন প্রচন্ড ক্ষোভ কিংবা ক্রোধ তার লেখায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

বার বার মনে হয়, লেখিকা যেন কোনো অনুপলব্ধ স্বপ্নে বিভোর কিংবা বিস্মৃত-প্রায় নির্দোষ স্মৃতির পুনরুদ্ধারে ভারাক্রান্ত।

ভিভিয়নের বয়স এখন তেত্রিশ বছর। তিনি এককালে 'স্যাটারডে ইভনিং পোস্ট' কাগজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে তার বিভাগীয় লেখিকা। ১৯৬১ থেকে ৬৭ সালের মধ্যে তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রে কুড়িটি প্রবন্ধনিবন্ধ লেখেন। এই গ্রন্থে সেইসব রচনা এক সঙ্গে সংকলিত হয়েছে। অধিকাংশ লেখাই গতানুগতিক, কখনো কখনো অতিকথন দোষে দুষ্ট। সাংবাদিক হিসেবে কানে শোনা কিংবা চোখে দেখা বিষয়ের মন্তব্যহীন বর্ণনা দেওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু লেখিকা বিষয়টিকে সাহিত্যসৃষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। সমালোচকেরা, তাঁর আলোচনাগুলোকে শিল্প-সৃষ্টি বলেই প্রশংসা করেছেন।

কেননা, বীট ও হিপ্পিদের প্রতি লেখিকার সহানুভূতির সুর স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেলেও তাঁদের প্রতি আন্তরিক সমর্থন ছিল না। সেজন্যেই তিনি পাশ্চাত্য যুবক-যুবতীদের রুচিপ্রবৃত্তির বিপজ্জনক উন্দামতার বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করেছেন।

এই গ্রন্থের আলোচনাগুলো লেখার সময়ে তিনি বীটদের সঙ্গে মেলামেশা, আলোচনা করেছেন—তাদের আড্ডায় গিয়ে সময় নষ্ট করেছেন। সানফ্রান্সিসকোতে হিপ্পি সম্প্রদায়ের যে উপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার মিশ্র প্রতিক্রিয়া—ক্রোধ, যন্ত্রণা ও বীভৎসতার আকারে তাঁর সমগ্র অভিজ্ঞতাকে উত্তেজিত করেছে।

অনেক সময় মনে হয়, মিস ভিভিয়ন অনেকটা বাধ্যতামূলক ও জাদুকরী শক্তির নিয়ন্ত্রণে কষ্ট পেয়েছেন। তিনি যতটা সম্ভব ভদ্রস্থ করে এই উচ্ছন্নে যাওয়া সংস্কৃতির বর্ণনা দিয়েছেন কিংবা তাদের উৎসব অনুষ্ঠানের বেলেল্লাপনার সংবাদচিত্র তুলে ধরেছেন। অত্যন্ত দুঃখজনক পরিহাসের সঙ্গে তিনি অহিংসা শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত জোয়ান বীজ'স ইনস্টিটিউট পরিদর্শনের গল্প করেছেন। আবার বিরক্তি প্রকাশ করেছেন হাওয়ার্ড হিউজ সম্পর্কিত উপকথার বর্ণনা দিতে গিয়ে।

মিস ভিভিয়ন সাংবাদিক হলেও গৃহ-কাতর মহিলা। সমাজ ও সংসারের ব্যাপারে তার একটা নারীসুলভ রক্ষণশীলতা আছে। জনওয়েনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত পীড়া বোধ করেছেন। ওয়েন একজন বিদ্যালয়ের তরুণী ছাত্রী। বীট সম্প্রদায়ের কোন যুবক তাঁকে চলচ্চিত্রে নায়িকা করবার প্রলোভন দেখিয়ে কিভাবে নিজেদের দলভুক্ত করেছে—লেখিকা অত্যন্ত করুণভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন। বীট সম্প্রদায়ের একজন যুবক তাকে (ওয়েনকে) নিয়ে ঘরবাঁধার লোভ দেখিয়েছে—সেই "নদীর ধারে যেখানে কার্পাসের গাছ বেড়ে উঠছে" প্রতিনিয়ত।

নতুন বই

স্বামী বিবেকানন্দ ॥ সত্যবান ।। এক-টাকা পঞ্চাশ পয়সা ।। রাজসিক ।। সম্রাট সেন ।। একটাকা পঞ্চাশ পয়সা (বোর্ড বাঁধাই) দু'টাকা ।। কথামালার দেশে ।। শান্তিময় মৈত্র ।। এক টাকা ।। প্রকাশক : লিপিকা। ৩০১১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯।

তিনটি বইই ছোটদের জন্য ছোটদের মত করে লেখা এবং তিনটিই নাটিকা। আমাদের দেশে শিশুসাহিত্য জিনিসটা এখনো পর্যন্ত অনাদৃতের দলে, অথচ এর বহুল ও সর্বাত্মক প্রসার হওয়া প্রয়োজন। সেদিক থেকে প্রকাশক বই তিনটি বের করে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

বিবেকানন্দ সম্পর্কে বড়দের উপযোগী বহু বই আছে, কিন্তু তাতে ছোটদের কী! সেইদিকে দৃষ্টি রেখে লেখক বিশেষভাবে ছোটদের অভিনয় করাবার জন্যেই আলোচ্য বইখানি লিখেছেন। আশা করা যায়, অভিনয়ের মাধ্যমে স্বামীজীর আদর্শ ও বাণী ছোটদের মনের অতি নিকটে আনতে পারবে। একটি মূল গানের ওপরে সমস্ত বইখানি অভিনীত হবার পরিকল্পনা। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, নরেন্দ্র, রাজা হরিশচন্দ্র, নিবেদিতা, অভেদানন্দ প্রভৃতি বহু চরিত্রের উপস্থিতি আছে নাটিকাটিতে। বইখানি আদৃত হবে বলে মনে হয়।

সম্রাট সেনের নাটিকাটি অবলম্বন রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রাজা হবুচন্দ্রের সেই সমস্যা—"মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়/ ধরণীতলে চরণ ফেলা মাত্র?" অর্থাৎ জুতো-আবিষ্কারে শিশু-উপযোগী কাহিনীটি। বেশ ঝরঝরে ভাষায় রাজার 'ভীষণ' সমস্যাটির উপস্থাপনা ও সমাধান হয়েছে। চারপাশে আছে গবুচন্দ্র, রাজবৈদ্য, বৈজ্ঞানিক, নগর-পাল, পণ্ডিত, সেনাপতি, চর্মকার প্রভৃতি চরিত্র। নাটিকার সমাপ্তি সমবেত কণ্ঠে একটি প্রশস্তিগীতি দিয়ে—"জয় জুতো জয় জুতো!" রাজা হবু পর্যন্ত সকলকে ডেকে বলেছেন, 'সমস্বরে বল—জয় জুতো-মহারাজের জয়'।

গেছো ইঁদুর, খরগোশ, কাঠবিড়ালী, শেয়াল, হনুমান ও সিংহ—এদের নিয়ে লেখা নাটক "কথামালার দেশে"। লেখকের প্রদত্ত অভিনয়-নির্দেশনাটি ভাল। নাটিকার সূত্র একটি অবতরণিকাসূচক সমবেত গান দিয়ে। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিখ্যাত 'কথামালা' বইয়ের ক'টি কাহিনী নাটিকাটিতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাতে বই-এর নামের সঙ্গে "কথামালা"-রচয়িতার সম্পর্কটি পরিস্ফুট হয়েছে। বইটির মধ্যে ছোটদের উপযোগী গান আছে, পশু চরিত্রগুলি সুন্দর ফুটেছে এবং আশা করা যায়, নাটিকাটি অভিনয় করে ছোটরা আনন্দ পাবে।

●

কুশল সংলাপ (কাব্যগ্রন্থ)—কবিরুল ইসলাম। পূর্বাশা প্রকাশন। ৩২ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা—৯ ।। সাড়ে তিন টাকা।

যুগাশ্রিত বহিঃপ্রকরণে আসক্ত হলেও কবিরুল ইসলাম শব্দব্যবহারে কিছুটা মধ্যপন্থী। ভাবপ্রকাশে প্রায়শ বিনীত। কবির সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হয়। এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতারই উপজীব্য প্রেম কিংবা স্মৃতি। কবির শৈশব এবং যৌবন এখানে রোম্যান্টিকতার ছদ্মবেশ ধরে খেলা করে। নগরজীবনের ক্লান্তি ও বিষণ্নতার পরিবর্তে তাঁর কবিতায় চিরকালীন বাংলা-দেশের রূপবৈচিত্র্য স্ব-রূপে উপস্থিত। এখানেই তাঁর কবিতা অন্য অনেকের চাইতে স্বতন্ত্র এবং সম্ভাবনাময়। তিনি [illegible] আশাবাদী। পাপ, পুণ্য, বন্ধুত্ব এবং স্বার্থপরতার মিশ্র ভাবনায় পাঠকের অত্যন্ত কাছাকাছি মানুষ। এই কাব্যগ্রন্থে কবির মোট ৪২টি কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রতিটি কবিতাই সুখপাঠ্য এবং হৃদয়স্পর্শী। ফর্ম-এর চাইতে কনটেন্ট-এর দিকে কবির ঝোঁক অত্যধিক। অনেক পাঠকের কাছে তা হয়তো ভালোই লাগবে।

●

চেনা অচেনার ভিড়ে আমার মুখ (কাব্যগ্রন্থ) —সত্য গুহ। গ্রন্থজগৎ, ১৯, পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলকাতা—২৯। দু টাকা।

সত্য গুহ অত্যন্ত অস্থির মেজাজের কবি। যুগ ও জীবনের জটিলতা তাঁর কবিতাকে আশ্রয় করে আবর্তিত। আবহমানের বাংলাদেশ ও একালের সার্বিক জটিলতা তাঁর কবিতার পর্বমূলে বাসা বেঁধেছে। অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারে তাঁর

দক্ষতা অনস্বীকার্য। বিশেষতঃ বরিশাল অঞ্চলের লোকায়ত শব্দভাণ্ডারের উপযুক্ত ব্যবহার তিনি করতে জানেন। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় তিনি যেন অত্যন্ত উদাসীনভাবে তীব্র গতিশীল এক নদীর স্রোতে অবগাহন করছেন। এখানে পাঠক কোনো বিশ্রামের অবকাশ পান না। কবির সঙ্গে পাঠককেও ছুটতে হয় তাঁর ভাবনার পিছু পিছু। তাঁর কবিতার সামাজিক পটভূমি অস্থির হলেও পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রচ্ছদ এঁকেছেন বিশ্বরঞ্জন দে।

●

পতঙ্গের প্রেম (গল্প সংগ্রহ) মায়া বসু প্রণীত। প্রকাশক : স্ট্যান্ডার্ড পাবলিসার্স—কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

বাংলা সাহিত্যের বিরলসংখ্যক মহিলা লেখকদের অন্যতম মায়া বসুর কয়েকটি উপন্যাস রসিকসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। তাঁর রচনার মধ্যে তীক্ষ্ণতার সঙ্গে সরসতার সংমিশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। মায়া বসুর কলম বলিষ্ঠ, অনেক কথা তিনি বেশ দুঃসাহসের সঙ্গে অবলীলাক্রমে ঘোষণা করতে পারেন, সেইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। সাহিত্যে রূঢ় বাস্তবকে রূপায়িত করার প্রয়োজনে কঠোর ভাষার ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। লেখিকা সেইদিক থেকে খুবই সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থে 'পতঙ্গের প্রেম', 'ভূমিকম্প', 'সমুদ্র', 'দ্বিতীয় রজনী' এবং 'দূরবগাহ' গল্পগুলি আমাদের ভালো লেগেছে তার বিষয় বৈচিত্র্যের জন্য। নর-নারীর জীবনের যে বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত লেখিকা অনায়াসে ফুটিয়ে তুলেছেন তা প্রশংসনীয়। তাঁর ভাষা নির্ভার এবং বক্তব্য সুস্পষ্ট। খালেদ চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদপটটি মনোরম।

●

চোখের আলো (উপন্যাস) শংকর মিত্র প্রণীত। প্রকাশক—মিত্রানী, কলিকাতা—তিন। দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা। প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী—কলিকাতা।

শংকর মিত্র কয়েকটি গল্প ও উপন্যাসোপম বড় গল্প লিখে ইতিমধ্যে পরিচিতি লাভ করেছেন। 'চোখের আলোয়' সম্ভবত তাঁর প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসটিতে লেখক যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। 'সকাল', 'দুপুর', 'বিকাল' ও 'রাত্রি' এই চারটি ভাগে উপন্যাসের কাহিনীটি বিধৃত। সর্বাণী ও শংখের জীবনের বিরহ-মিলন কথা কাব্যধর্মী ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে। সর্বাণীর জীবনের ট্রাজেডি লেখক সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন।

●

সুতপা : (উপন্যাস)—রঞ্জন রায়। ডি লাইট বুক কোম্পানী, ১৭৩।৩ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। ৪-০০।

নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আন্তর্জাতিক অভিঘাত এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের তাৎপর্যে সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পাবার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। রঞ্জন রায়ের উপন্যাসটি পড়তে পড়তে অবশ্য এসব কথাকে আত্মসন্তুষ্টির একপ্রকার ছলনা বলে মনে হয়।

এ উপন্যাসের নায়িকা সুতপা,—তার নামেই উপন্যাসের নামকরণ। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে সে গৌতম বসু নামে একজন আদর্শচরিত্র যুবকের সঙ্গে পরিচিত হয়। এবং এই পরিচয়ই ক্রমে রূপান্তরিত হয় প্রেমজ আকর্ষণে। লেখক গতানুগতিক পদ্ধতিতে কাহিনী বলে গেছেন। সংশয়, দ্বন্দ্ব এবং মিলনে উপন্যাসটি সমাপ্ত।

উপন্যাসটির ভাষা ঝরঝরে। একটানা পড়ে যাওয়া যায়। কখনো একঘেয়ে মনে হয় না। সমাপ্তির আকস্মিকতা বাদ দিলে, পড়তে সকলেরই ভালো লাগবে।

●

মেঘের ছায়া জলে : (কাব্যগ্রন্থ)—মৃদুল নিয়োগী। বিশ্বমন্দির প্রকাশনী, ৪৪এ ক্লাইভ কলোনী, কলকাতা-২৮। দু টাকা।

প্রচলিত ছন্দে ও প্রথাগত আঙ্গিক প্রকরণকে মান্য করে মৃদুল নিয়োগী কবিতা লিখে থাকেন। সাম্প্রতিককালের বিতর্কবিভক্ত কবি মানসিকতার মধ্যে তিনি কিছুটা প্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে চান। এই কাব্যগ্রন্থে কবির ঊনচল্লিশটি কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। শব্দ ও অর্থসংগতিতে নৈপুণ্য অর্জিত হলে, কবি ভবিষ্যতে ভালো কবিতা লিখবেন বলে অনুমান।

●

প্রত্যয় (কাব্যগ্রন্থ)—সুকুমার মাইতি। পরিবেশক : লঙ্ঘন, ১।১এ গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা—৬। তিন টাকা।

এই কাব্যগ্রন্থে কবির চব্বিশটি কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। ছন্দের বিচারে প্রায় প্রতিটি কবিতাই ত্রুটীপূর্ণ শব্দ ব্যবহারেও তাঁকে সতর্ক বলে মনে হয় না। হয়তো ভবিষ্যতে তিনি ভালো কবিতা লিখবেন।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

চিত্রভাষ [জুন ১৯৬৮]—সম্পাদক গৌরীশংকর রায় ও জ্যোতি পাঠক।। ৬১, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩॥ একটাকা

উত্তর কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির মুখপত্ররূপে চিত্রভাষ প্রকাশিত হচ্ছে। চলচ্চিত্রের নানা সমস্যা নিয়ে বর্তমান কয়েকটি প্রবন্ধ ও আলোচনা লিখেছেন—উৎপল সেন, আশীষতরু মুখোপাধ্যায়, গৌরীশংকর রায়, অরুণ চৌধুরী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় রবি ঘোষ কল্পতরু সেনগুপ্ত অমিয় সান্যাল ও শিশির ভট্টাচার্য। পত্রিকাটি দ্বিভাষিক। সম্পাদকীয় প্রশংসনীয়।

কণ্ঠস্বর [২য় সংখ্যা]—সম্পাদক সত্য বিশ্বাস।। ৪৯ এল।৭, নারকেল ডাঙ্গা নর্থ রোড, কলকাতা ১১॥ পঁচিশ পয়সা

সংবাদ-সাময়িকীর আকারে কণ্ঠস্বরের এ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে নজরুল-জয়ন্তী উপলক্ষে। তরুণ কবিরা বিদ্রোহী কবির উদ্দেশে কয়েকটি কবিতা লিখে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। কবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা একটি গদ্য লেখাও ছাপা হয়েছে। পত্রিকাটি সকলেরই ভালো লাগবে।

বাতায়ন [জুন ১৯৬৮]—সম্পাদক হরিশ ভাদানী।। ৫দাগা বিল্ডিংস, বিকানীর, রাজস্থান॥ একটাকা পঁচিশ পয়সা

রাজস্থান থেকে প্রকাশিত হিন্দী-সাহিত্য পত্রিকা বাতায়নের এটি সপ্তম বর্ষ। ভারত ও রাজস্থান সরকার কর্তৃক পত্রিকাটি সাহায্যপ্রাপ্ত। বর্তমান সংখ্যায় হিন্দী গল্প কবিতা ছাড়াও একটা উড়িয়া গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও গৌরাঙ্গ ভৌমিকের দুটি বাংলা কবিতার হিন্দী অনুবাদও ছাপা হয়েছে। সম্পাদকের সাহিত্য রুচি প্রশংসনীয়।

যুযুৎসা (গোর্কি সংখ্যা)—সম্পাদক জয়ন্তকুমার। ৫বি মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলকাতা—৭। দু টাকা।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত হিন্দী মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে যুযুৎসার কিছুটা বিশিষ্টতা আছে। পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যাটি গোর্কি সংখ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রখ্যাত হিন্দী লেখকদের সঙ্গে বাঙালি সাহিত্যিকদের লেখার অনুবাদও ছাপা হয়েছে। গোর্কির জীবন ও সাহিত্যের ওপরে অমৃত রায়-এর লেখা আলোচনাটি মূল্যবান। জয়ন্তকুমার গোর্কির কয়েকটি লেখার অনুবাদ করেছেন।

অধুনা—(ষষ্ঠ সংকলন)। সম্পাদক—সুধাংকুর মুখোপাধ্যায়। হালিশহর, ২৪ পরগণা। দাম—পঞ্চাশ পয়সা।

অধুনার এই সংকলনে গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন রত্নেশ্বর হাজরা, জিতেন্দ্র সামন্ত রবীন সুর, তুলসী মুখোপাধ্যায়, প্রভাত চৌধুরী দীপেন রায়, প্রীতিভূষণ চাকী অমল বসু সুধাংকুর মুখোপাধ্যায় ও হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়।

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এখনো কি নীরব থাকবে মেয়েটি!

হুয়াসকার উদ্বিগ্নভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়েছেন। রাজপুরোহিত তাকিয়েছেন হিংস্র ব্যাধের দৃষ্টিতে।

মেয়েটির ঠোঁটদুটি বারকয়েক কেঁপে উঠেছে। তারপর অস্ফুট স্বরে সে যা বলেছে, তাতে বিমূঢ় জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে হুয়াসকারেরও চোখে আর রাজপুরোহিতের কণ্ঠে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি।

আমার নাম কয়া।—বলেছে মেয়েটি।

কয়া!—সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই যেন কথাটা উচ্চারণ করেছেন হুয়াসকার।

এ-নাম এ-দেশের কোনো কুমারী মেয়ের হওয়া সম্ভব?—বিদ্রূপের সঙ্গে একটা তীব্র অভিযোগ ফুটে উঠেছে রাজপুরোহিতের গলায়,—তোমায় এ-নাম দেবার স্পর্ধা কোন্ পরিবারের হয়েছে?

কি বলবে কয়া? এ-নাম কোথায় কে তাকে দিয়েছে স্বীকার করবে? প্রকাশ করবে তার চরম কলঙ্কের কথা? সে যে কন্যাশ্রম থেকে লুণ্ঠিতা সূর্যসেবিকা, সূর্যসেবিকা হিসাবে কোনো নাম যে তার কোনদিন ছিল না, তার জীবনে অভাবিত মুক্তির দূত হয়ে যে দেখা দিয়েছে, এ-নাম যে উদয়-সমুদ্রতীরের সেই আশ্চর্য পুরুষের দেওয়া সবিস্তারে জানাবে কি সে কাহিনী?

কি তার ফল হবে সে ভালো করেই জানে। আর যারই থাক ভ্রষ্টা সূর্যকুমারীর কোনো ক্ষমা নেই তাভানতিনসুয়্যুতে। ইতিহাস যাই হোক কেউ তার কোনো মূল্য দেবে না। আপামর সকলের সে ঘৃণা ও অবিশ্বাসের পাত্রী। স্বয়ং সূর্যদেবের অভিশাপে ছাড়া সূর্যকুমারী কখনো ভ্রষ্ট হতে পারে না এ-রাজ্যের এই [illegible]। কারও সহানুভূতি সে পাবে না। পাপাচারিণী বলে চিহ্নিত হয়ে তার পক্ষে প্রতারণাই স্বাভাবিক বলে সবাই ধরে নেবে।

এমন আশ্চর্য কৌশলে, এত দুঃসাহসে ও অবিশ্বাস্য চেষ্টায় সাজিয়ে তোলা আয়োজন কি শুধু তার জন্যেই ব্যর্থ হয়ে যাবে তাহলে?

কুজকো থেকে সোসায় এসে হুয়াসকারের সাক্ষাৎ পাওয়ার মত অসাধ্যসাধনের পর সার্থকতায় পৌঁছোবার সেতু ভেঙে পড়বে শেষমুহূর্তে। হুয়াসকার তাকে অবিশ্বাস করবেন? দুই রাজভ্রাতার মিলন আর হবে না? বিদেশী শত্রুর কবলমুক্তি থেকে তাভানতিনসুয়্যু উদ্ধারের সব আশা শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে এক মুহূর্তে।

কয়ার পায়ের তলার কঠিন মাটি যেন দুলে উঠেছে। সেই অবস্থাতেই হুয়াসকারের বজ্রকঠিন স্বর সে শুনতে পেয়েছে।

হুয়াসকার যা বলছেন তা আশাতীত অবিশ্বাস্য।

শুনুন ভিলিয়াক উমু।—কঠিন স্বরে বলেছেন হুয়াসকার,—কয়া নামে নিজের পরিচয় যে দিচ্ছে, সে মুইস্কা বংশের কেউ না হতে পারে। কিন্তু পরিচয় ও ইতিহাস যাই হোক আতাহুয়ালপার দূতী হিসেবে তাকে অবিশ্বাস করবার কোনো অধিকার আমাদের নেই। অন্য সবকিছু মিথ্যা হলেও তার দৌত্যের মধ্যে যে-প্রতারণা নেই তার পরম সন্দেহাতীত প্রমাণ সে দিয়েছে বুঝতেই পারছেন। সে প্রমাণ না দিতে পারলে কুজকো থেকে গুপ্ত গিরিপথে সোসায় আসা তার পক্ষে সম্ভব হত না। আর সোসার এ [illegible] নিমন্ত্রণ প্রহরীরাও [illegible] আমার কাছে তাকে উপস্থিত [illegible] দিত না।

[illegible] বলেছেন রাজপুরোহিত,—কিন্তু এতসব অসাধ্যসাধন যা করেছে সেই আশ্চর্য প্রমাণটা চাক্ষুষ একবার দেখতে চাচ্ছি।

তাই দেখুন।—এবার হেসে বলেছেন হুয়াসকার।

কয়া ধীরে ধীরে ভিকুনার পশমে বোনা থলিটি এবার খুলে ধরে যা বার করে এনেছে, সেদিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছেন রাজপুরোহিত।

রাজপুরোহিতের মুখেই শুধু যে কথা সরেনি তা নয়, তাঁর চোখদুটো যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বিমূঢ়বিস্ময়ে।

না, আর সন্দেহ কি, প্রতিবাদের একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি রাজপুরোহিত। নীরবে নতমস্তকে কয়ার এগিয়ে দেওয়া প্রমাণ সন্দেহাতীত বলে মানতে [illegible] হয়েছেন।

কয়ার 'ভিকুনা'র পশমে বোনা [illegible] কি এমন প্রমাণ ছিল যার সামনে সব [illegible] সমস্ত দ্বিধা সংশয় প্রতিবাদই শূন্যে মি[illegible] গিয়েছে?

কুজকোর মন্দিরপুরী কোরিকাঞ্চা[illegible] তীর্থযাত্রিণীদের অতিথিশালায় গানাদো শেষ বিদায় নেবার সময় কয়ার হাতে প্রাণপণ সতর্কতায় রক্ষা করবার উপদেশের সঙ্গে অমূল্য অভিজ্ঞান হিসেবে এটি দিয়েছিলেন আমরা জানি।

কয়া নিজেও প্রথমে পশমের থলি থেকে বার করে সে অভিজ্ঞান যে কি তা দেখতে সাহস করেনি।

সংকটতারণ যাদুদণ্ড হিসাবে এ-অভিজ্ঞান প্রথম ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল কুজকো থেকে সোসা যাবার সংকীর্ণ গিরিপথে।

রেইমির উৎসবের জন্যে সে-পথে দূর-দূরান্তর থেকে তখন উৎসুক জনপদবাসীরা কুজকো নগরে আসছে।

কৃষক-দুহিতার বেশে সেই জনতার ভেতর দিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে কয়ার তেমন অসুবিধা হয়নি।

কিন্তু কৃষক-কন্যার বেশে থাকলেও সমস্ত কুজকোমুখী জনতার মধ্যে বিপরীত পথের একজন যাত্রিণী কতক্ষণ দৃষ্টি এড়িয়ে থাকতে পারে!

রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভমুর গুপ্ত প্রহরীদের একজন তাই সন্দিগ্ধ হয়ে কয়াকে আটক করেছিল। সবাই যখন রেইমি উৎসবের জন্যে কুজকো শহরে চলেছে, তখন উল্টো পথে সে যাচ্ছে কেন এই ছিল প্রহরীর প্রশ্ন।

এরকম প্রশ্নের জন্যে তৈরী ছিল কয়া। বিশ্বাসযোগ্য একটা উত্তরও দিয়েছিল। বলেছিল, তীর্থযাত্রীদের একদলের মুখে তার মা মরণাপন্ন শুনে সে নিজেদের বসতিতে ফিরে যাচ্ছে। আসবার সময় মাকে সামান্য একটু অসুস্থ দেখে এসেছিল। তাঁর এরকম অবস্থা হতে পারে জানলে সে উৎসবে আসত না। কুজকো শহরে রেইমির উৎসবের আনন্দের চেয়ে মার টান বেশী বলেই সে ফিরে যাচ্ছে।

কৈফিয়ৎটা ভালোই দিয়েছিল। মরণাপন্ন মার জন্যে উদ্বেগের অভিনয়েও কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু বিপদ বেধেছিল তারপরই।

কয়ার কথা বিশ্বাস করে সহানুভূতি থেকেই প্রহরী কয়ার গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করেছিল এবার। তাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যই ছিল হয়ত প্রহরীর।

এইবার ধরা পড়েছে কয়া। কাল্পনিক একটা গ্রামের নাম সে কোনোমতে বানিয়ে বলেছিল কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়েছে। সেরকম কোনো গ্রামের অস্তিত্ব নেই জেনে হিংস্র কঠোর হয়ে উঠেছে প্রহরী। কয়াকে তার সঙ্গে সেখানকার 'কুরাকা' অর্থাৎ অঞ্চলপ্রধানের কাছে যেতে হবে এই তার আদেশ।

বিপদ কাটাবার শেষ চেষ্টা করেছিল কয়া। কাক্সামালকা শহরের সেই [illegible]লয় রাত্রির পর থেকে গানাদোর [illegible]নাবরদার সেজে কুজকো এসে [illegible]না পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ তীব্র [illegible]শ্য অভিজ্ঞতা তার এই সময়টুকুর হয়েছে, তারই স্মৃতি সন্ধান করে তার কৈফিয়ৎ সাজিয়েছিল।

বলেছিল,—গ্রামের নাম হয়ত আমি ভুল বলেছি। আমরা 'মিতি মায়েস' দূর কুইটো থেকে সবে এ অঞ্চলে আমাদের বসতি বদল করতে হয়েছে। আমাদের বসতির ঠিক নাম তাই আমার মনে থাকে না।

এ কৈফিয়ৎ সাজানোর মধ্যে কয়ার বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির যথেষ্ট পরিচয় ছিল সন্দেহ নেই। পেরু রাজ্যের সত্যিই একটি প্রথা ছিল এক জায়গার অধিবাসীদের গ্রামকে গ্রাম জনপদ কে জনপদ বহুদূরের আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত করার। ইংকারা প্রজাদের বিদ্রোহের সম্ভাবনা রোধ করবার জন্যেই এ ব্যবস্থা করতেন। অসন্তোষের অংকুর কোথাও আছে সন্দেহ করলে এক জনপদের সমস্ত অধিবাসীদের এমন দূর প্রবাসে সরিয়ে দেওয়া হত, যেখানে সে অংকুরের শিকড় মেলবার সুযোগই নেই। রাজাদেশে এরকম বাধ্যতামূলক বসতি বদল যাদের করতে হত, তাদের নাম ছিল 'মিতিমায়েস'। 'মিতি-মায়েস'দের একটি মেয়ের পক্ষে নতুন বসতির নাম ভুলে যাওয়া খুব অস্বাভাবিকও নয়।

গুপ্ত প্রহরী কিন্তু কয়ার এ কথায় হেসে উঠেছিল নির্মমভাবে। বলেছিল,—কৈফিয়ৎ কুরাকার কাছেই দেবে চলো। তিনি শুনে স্বয়ং রাজপুরোহিতের কাছেই তোমায় পাঠাবেন মনে হচ্ছে। এসো আমার সঙ্গে।

হাত বাড়িয়ে 'কয়া'কে ধরতে গিয়ে চমকে উঠেছিল প্রহরী।

না।—কোনোদিকে কোনো আশা আর নেই জেনে মরিয়া হয়ে উঠে তীব্রস্বরে বলেছিল কয়া,—তোমার সঙ্গে আমি যাবো না, তোমাকেই আসতে হবে আমার সঙ্গে সোসায় যাবার গোপন গিরিপথ দেখাতে। এই আমার আদেশ!

কৃষক-কন্যাবেশী মেয়েটির এ আশ্চর্য রূপান্তরে প্রথমটা সত্যিই বিমূঢ়-বিচলিত হয়ে গিয়েছিল প্রহরী। তারপর নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে ক্রোধে জ্বলে উঠে বলেছে,—তোমার এই আদেশ! তোমার আদেশে সোসার গোপন গিরিপথ দেখিয়ে তোমায় নিয়ে যেতে হবে! কে তুমি?

অযথা প্রশ্ন কোরো না।—এবার শান্ত দৃঢ় হয়ে এসেছে কয়ার কণ্ঠ। তবু তার মধ্যে উদ্বেগের ঈষৎ কম্পন বুঝি সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাকেনি।

এক মুহূর্ত থেমে কয়া আবার বলেছিল, —আমার পরিচয় তোমার জানবার নয়। কেন আমার আদেশ তোমার অলংঘনীয় তাই শুধু দেখো।

ভিকুনার পশমে বোনা থলিটি এবার খুলে ধরেছিল কয়া। খোলবার সময় নিজের অনিচ্ছাতেই তার হাত যে একটু কেঁপে উঠেছিল, সেটা বোধহয় অস্বাভাবিক নয়। কি আছে সে রহস্যময় থলির মধ্যে সে তখনো জানে না। যে অভিজ্ঞান সে দেখাতে যাচ্ছে শত্রুপক্ষের সন্দিগ্ধ প্রহরীর কাছে, তার কোনো মূল্য হবে কিনা তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

রাজপুরোহিতের গুপ্ত প্রহরীর চেয়ে অনেক বেশী উৎকণ্ঠিত কৌতূহল নিয়ে থলিটি থেকে অভিজ্ঞানের নিদর্শনগুলি সে বার করে এনেছিল।

তারপর প্রহরীর চেয়ে অভিভূত হয়ে সেদিক থেকে আর দৃষ্টি ফেরাতে পারেনি।

অভিজ্ঞান হিসাবে এমন কিছু তখন তার হাতে শোভা পাচ্ছে, যা তারও কল্পনাতীত।

এ কল্পনাতীত অভিজ্ঞান নিদর্শন হল কোরাকেংকুর দুটি পালক আর উদয়সূর্যের মত রক্তিম ইংকা নরেশের শিরোশোভা ল্লাণ্টুর একটি টুকরা।

ইংকা নরেশের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির চেয়ে তাঁর অখণ্ড আধিপত্যের এ কটি নিদর্শনের মূল্য কম নয়। কোরাকেংকুর এ পালক পেরুর বিরলতম বস্তু। তাভানাতিনসয়ুর অতি-গোপন দুর্গম একটি মরুশুষ্ক সর্বসাধারণের নিষিদ্ধ অঞ্চলে কোরাকেংকু নামে আশ্চর্য একটি পক্ষীজাতি যুগ যুগ ধরে সযত্নে লালিত হয়ে আসছে। পোষা দূরে থাক্ সে পাখী চোখে দেখবার অধিকারও পেরুর প্রজাসাধারণের নেই। অভিষেকের সময়ে সেই পাখীর দুটি মাত্র পালক প্রত্যেক ইংকাকে শিরোভূষণ হিসাবে দেওয়া হয়। কোরাকেংকুর সেই পালক আর বিশেষ ভিকুনার পশমে বোনা রক্তিম মাথায় জড়াবার বস্ত্র ল্লাণ্টু ইংকা রাজশক্তির সব-চেয়ে সম্মানিত প্রতীক। আর যা-কিছুরই হোক কোরাকেংকুর এ পালকের জাল হওয়া অসম্ভব। স্বয়ং ইংকা নরেশের মত এ পালক দ্বিতীয়-রহিত। রাজশক্তির প্রতীক হিসাবে তাই এ নিদর্শন সমস্ত সন্দেহ সংশয়ের উর্ধ্বে।

এ প্রতীক চিহ্ন আতাহুয়ালপার কাছে গোপনে চেয়ে নিয়ে গানাদো আশ্চর্য দূর-দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। এ প্রতীকচিহ্ন আতাহুয়ালপার কাছে আদায় করা অবশ্য সহজ হয়নি। গানাদোর ওপর আতাহুয়ালপার বিশ্বাস তখন গভীর, তবু এ প্রস্তাব শুনে রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন আতাহুয়ালপা। তীক্ষ্ণ অবিশ্বাসের সুরে সবিস্ময়ে গানাদোর দিকে চেয়ে বলেছিলেন,—কি বলছ কি তুমি! কোরাকেংকুর পবিত্র পাখার পালক আমি তোমার হাতে তুলে দেব প্রতীক-চিহ্ন হিসেবে চরম সংকটে ব্যবহার করবার জন্যে!

হ্যাঁ, সূর্যসম্ভব।—দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন গানাদো,—আর সবকিছু যেখানে বিফল, সেখানে অসাধ্যসাধনের যাদুদণ্ড হিসাবে এই পালকে যে কাজ হবে, আর কিছুতে তা হবার নয়।

কিন্তু,—ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন আতাহুয়ালপা,—এ তো আমাদের সমস্ত সংস্কার আর ঐতিহ্যের অপমান! তাভানাতিনসুয়ুর ইতিহাসে এ পবিত্র প্রতীক কোনোদিন কোনো ইংকা নরেশের হাতছাড়া হয়নি।

শান্তকণ্ঠে একটি উত্তর দিয়েই আতাহুয়ালপাকে নীরব করে দিয়েছিলেন গানাদো। বলেছিলেন, — তাভানাতিনসুয়ুর ইতিহাসে এমন চরম লজ্জার আর দুর্ভাগ্যের দিনও কখনো আসেনি। (ক্রমশঃ)

Blue
Seal
TALC
Blue
Seal
TALC

সঙ্কর্ষণ রায়

পাতালের আলো

॥১॥

স্কুলে ইতিহাসের ক্লাসে একদিন আমাদের ইতিহাসের মাস্টারমশাই বলেছিলেন, আকাশের আলোয় আমাদের দেহ-মনের বিকাশ, কিন্তু মানুষের সভ্যতার বিকাশ পাতালের আলোয়।

পাতালকে আমরা অন্ধকার বলেই জানতাম। কাজেই পাতালের আলো হেঁয়ালির মত লাগল আমাদের কাছে। পাতাল থেকে আলোকপাত কী করে সম্ভব ভাবতে গিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি।

মাস্টারমশাই আমাদের মুখের ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর কথায় আমাদের ধাঁধা লেগেছে। তিনি বললেন, পাতালের আলো হল মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন খনিজ পদার্থ। খনিজ থেকে মানুষ হাতিয়ার পেয়েছে, যে হাতিয়ার তার হাতকে করেছে শক্তিশালী। পেয়েছে সোনা, তামা, রাং, লোহা, সীসা প্রভৃতি ধাতু। পেয়েছে মণি-মাণিক্য, রাঙাবার রং, প্রসাধনের সামগ্রী। খনিজ দিয়েই মানুষের শিল্প-বাণিজ্য, ধন-দৌলত। সভ্যতাকে যদি একটা বড় সৌধ বলে ধরা হয়, তার নির্মাণের উপকরণ হল খনিজ। মানবসভ্যতার পর্যায়গুলি খনিজ বা খনিজ থেকে নিষ্কাশিত ধাতু দিয়ে চিহ্নিত। সভ্যতার সূত্রপাত পাথর দিয়ে। বাইবেলের বুক অফ দানিয়েলস-এ অবশ্য সভ্য[illegible] উষালগ্নকে মৃত্তিকা-লগ্ন বলে করা হয়েছে। মাটি ও পাথরের পর [illegible]তায় এল ধাতুযুগ। তামা, [illegible] লোহা এই তিনটি ধাতু দিয়ে [illegible] হয়েছে মানবসভ্যতার তিনটি যুগ। [illegible]ষে লোহার যুগ। সে যুগ এখনো [illegible]ছ। ধাতুযুগের গোড়া থেকেই সোনাকে [illegible]ছে মানুষ। মানুষের সভ্যতা প্রায় [illegible] গোড়াই স্বর্ণমণ্ডিত। সেই হিসেবে [illegible] ধাতুযুগকে এক স্বর্ণযুগ দিয়ে [illegible]না যায়। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে [illegible] নীচের খনিজ সম্পদ আঁধারের [illegible]র লালিত আলোর মত। বাইরে এসে [illegible]ষর সভ্যতাকে তা আলোয় আলোকময় [illegible]।

[illegible]টারমশাইয়ের কথাগুলো পুরো-[illegible]তে না পারলেও খনিজ [illegible]াধ করেছি। বড় হয়ে [illegible]র্গম গিরি-কান্তার-মরু [illegible] পরিক্রমা করে অনু-[illegible]জ খোঁজার মধ্যে একটা [illegible] নেশার যেন শেষ নেই, [illegible]উত্তেজিত করে। এই নেশার প্রেরণায় অনেক সন্ধানী দুর্গম থেকে দুর্গমতর পথ অতিক্রম করেছেন। আমেরিকায় স্বর্ণসন্ধানীদের গোল্ড রাস-এর পেছনেও এই নেশা সক্রিয়।

খনিজকে ইংরেজীতে বলে মিনরল্। মাইন্ শব্দ থেকে মিনরল্ শব্দটি এসেছে। ইংরেজীর অনুকরণে খনিজ শব্দটিও খনি থেকে জাত। অবশ্য সাধারণভাবে প্রকৃতি-জাত অজৈব বস্তুমাত্রকেই খনিজ বা মিনরল্ বলা হয়—যেমন পাথর, লোহা, তামা, সোনা, রুপা ইত্যাদি। যে বস্তু মূলতঃ প্রাণিদেহ বা উদ্ভিদ থেকে উদ্ভূত, কিন্তু কোটি কোটি বছর ধরে পলিমাটির স্তরের নীচে চাপা পড়ে থেকে পাথরে জমাট বেঁধেছে, তাকেও খনিজ বলে মেনে নেওয়া হয়, যেমন চুনাপাথর, পাথুরে কয়লা বা পেট্রোলিয়াম। জলজ প্রাণীর কঙ্কাল জমে জমাট বেঁধে চুনাপাথরের উৎপত্তি। কয়লাও পেট্রোলিয়াম যথাক্রমে উদ্ভিদ ও সামুদ্রিক প্রাণীর অবশেষ। মিনরল্ শব্দের বিশেষ একটি বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাও আছে। প্রকৃতির বুকে যে বস্তু নির্দিষ্ট গঠন ও রাসায়নিক উপাদান নিয়ে গঠিত তাকে বলা হয় মিনরল্। বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনুযায়ী পরি-ভাষাকাররা মিনরলকে 'মণিক' বলে অভিহিত করেছেন। মণি-মাণিক্যের সংগে মণিকের ভ্রম হতে পারে, তাই খনিজ শব্দটিই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

খনিজকে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞানুযায়ী চিনে নিতে অনেক সময় লেগেছে। সম্ভবতঃ খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর আগে খনিজকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে চেনার চেষ্টা হয়নি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই খনিজ মানুষের ব্যবহারে এসেছে। সভ্যতার প্রথম প্রহরেই মানুষ সোনা আবিষ্কার করেছে, আবিষ্কার করেছে বিবিধ রত্ন। ক্রমে ক্রমে তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা, রুপা, সীসা ইত্যাদি ধাতুযুক্ত খনিজ আয়ত্তে এসেছে প্রাগিতিহাসের মানুষের। মানুষ ইতিহাসের সীমার মধ্যে আসার আগেই অসংখ্য খনিজকে নিজের কাজে লাগিয়েছে।

খনিজ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল কবে থেকে হল তা নির্ণয় করা বিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিকদের অসাধ্য। প্রত্নতাত্ত্বিকরা শুধু এইটুকু বলতে পারেন যে মানুষ যখন থেকে নিজের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, তখন থেকেই খনিজ পদার্থ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রকৃতির বুকে প্রচ্ছন্ন স্বর্ণভাণ্ডারের সন্ধানে নব্য প্রস্তরযুগের মানুষদেরও তৎপরতার প্রমাণ আছে।

ধাতু আবিষ্কারের বহু পূর্ব থেকে মানুষ খনিজের খোঁজে প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে বিচরণ করে আসছে। হাজার হাজার বছর ধরে চলছে এই সন্ধানপর্ব—আজও তার শেষ হয়নি।

খনিজের প্রতি প্রাচীন দার্শনিকদেরও দৃষ্টি পড়েছিল। খনিজের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। প্রায় তিন হাজার বছর আগে ভারত ও চীনের দার্শনিকরা ধাতু সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। তারপর পারস্য ও গ্রীসের পণ্ডিতরা ধাতুসচেতন হলেন। গ্রীসের দার্শনিক অ্যারিস্টটল (খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতক) বলেছিলেন যে সব ধাতুরই উৎপত্তি পারদ ও গন্ধকের সংযোগে ঘটেছে। প্লেটোর মতে মাটি, বাতাস, আগুন ও জল থেকে পৃথিবীর সব বস্তুরই উৎপত্তি ঘটেছে। অ্যারিস্টটল্ বস্তুজগতের মূলে কারণ-স্বরূপ এক সূক্ষ্মদেহী আত্মা বা হোলি ঘোস্ট-এর কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে এই আত্মার সংযোগে যে কোনও বস্তুর রূপান্তর সম্ভব। খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস্ বললেন যে সব বস্তু পরমাণু দিয়ে গঠিত। পরমাণুগুলির বিন্যাস বদলালে বস্তুর স্বরূপও বদলাবে। অ্যারিস্টটল্ ও ডেমোক্রিটাসের বস্তুতত্ত্ব যে কোনও ধাতু থেকেই সোনা উৎপাদনের প্রেরণা দিল।

প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করতেন যে সোনার মূলে বিরাজ করছেন 'তা' নামে দেবতা। তিনি কৃপা করলেই যে কোনও ধাতু সোনাতে রূপান্তরিত হতে পারে। প্রাচীন আলেক্জেন্দ্রিয়াতে ধাতু রূপান্তরের একটি পদ্ধতি পরিকল্পিত হয়েছিল। এই পদ্ধতি অনুযায়ী রূপান্তরের পূর্বে ধাতুর মৃত্যু ঘটানো দরকার। ধাতুকে কালো করে তুললেই নাকি তার কাল হয়। তারপর কালো ধাতুকে রুপা, পারদ, টিন প্রভৃতি ধাতু দিয়ে গরম করলে কালোর মধ্যে আলো ফুটে ওঠে—কালো ধাতু সোনাতে রূপান্তরিত হয়।

আলেক্জেন্ড্রিয়াতে মেরী নামে জনৈক ইহুদী মহিলা সীসা, তামা ও গন্ধককে একত্র পুড়িয়ে একটি কালো বস্তু প্রস্তুত করেছিলেন। এই কালো বস্তুটি মেরীর কালো (মেরীস ব্লাক) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কালো বস্তুটি থেকে সোনা প্রস্তুতের প্রয়াস মেরী করেছিলেন।

কালো ধাতু থেকে সোনা তৈরি করার কৌশল ব্লাক আর্ট নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে অ্যালকিমিকেও ব্লাক্ আর্ট বলা হত।

অ্যালকিমির জনক হলেন খৃস্টীয় অষ্টম শতকের একজন আরবদেশীয় চিকিৎসক, জবীর-ইব্‌ন্-হায়ান। অ্যালকিমির চর্চা আরব থেকে য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

অ্যালকিমির উদ্দেশ্য হল : নিম্নবর্ণের ধাতু (যথা তামা, লোহা ইত্যাদি) থেকে উচ্চবর্ণের ধাতু (যথা সোনা ও রূপা) উৎপাদন এবং একটি সর্বরোগহর ওষুধ আবিষ্কার। সব রোগের নিরাময় শুধু নয়, মানুষকে অমর করে দেওয়ার বাসনাও ছিল অ্যাল্‌কেমিস্টদের। তাঁরা অমৃত বা ইলিক্‌স্যার আবিষ্কারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। জবীর-ইব্‌ন্-হায়ান বিশ্বাস করতেন যে সোনার মধ্যে একটি স্বচ্ছ ঝলমলে লাল রঙের তরল পদার্থ আছে, যার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'টিংচার'। এই টিংচার অন্য কোনও ধাতুতে নেই। টিংচারের সংযোগে যে কোনও ধাতু স্বর্ণমণ্ডিত হবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

প্রাচীন চীনের দার্শনিকেরা পরশ-পাথরের (ফিলসফার্স স্টোন) অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। পরশপাথরের স্পর্শে যে কোনও ধাতু সোনায় পরিণত হবে বলে তাঁদের বিশ্বাস ছিল। চীনেরা এমন একটি ইলিক্‌স্যার-এরও সন্ধান করেছিলেন যার সংযোগে পারদ ও সীসা সোনা বা রূপায় রূপান্তরিত হতে পারে।

অ্যাল্‌কিমির ভেলকিতে যখন দার্শনিক-দের চিন্তা আচ্ছন্ন, তখন খানিকটা আলোর স্ফুলিঙ্গ আমরা কয়েকজন দার্শনিকের লেখার মধ্যে পাই। খৃস্টীয় প্রথম শতকে রোমান দার্শনিক প্লিনি খনিজ পদার্থ-সমূহের বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা বিজ্ঞান-সম্মত না হলেও খনিজগুলিকে চিনে নিতে খানিকটা সাহায্য করে। খৃস্টীয় এগার শতকে বোখারার অ্যাভিসিয়েনা খনিজ পদার্থ-গুলিকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রথম ভাগে ছিল মাটি, দ্বিতীয় ভাগে গন্ধক ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ, তৃতীয় ভাগে লবণ এবং চতুর্থ ভাগে ধাতু।

অ্যাভিসিয়েনার পর একটানা সাত শতক ধরে খনিজ রইল অ্যাল্‌কিমির আওতায়। তারপর ষোড়শ শতকে ইটালির বিরিংগুকিও এবং জর্জিয়াস্ এগ্রিকোলা বৈজ্ঞানিকভাবে খনিজ পদার্থসমূহের বর্ণনা করেন। খনিজ পদার্থগুলিকে এগ্রিকোলা দাহ্য খনিজ, মাটি, লবণ, রস, ধাতু এবং মিশ্র খনিজ, এই ছয় ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করেন।

পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে খনিজ বিচার আরম্ভ হল অষ্টাদশ শতকে। এই কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন রাশিয়ার মিখাইল লমনসভ্ এবং সুইডেনের কে. লিনিয়ুস।

খনিজতত্ত্ব এখন বিজ্ঞানের দখলে। খনিজের জন্য সন্ধান ভূবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চলে। কিন্তু এমন অনেক সন্ধানী আজও পৃথিবীময় খনিজ সন্ধানে প্রবৃত্ত আছেন, যাঁদের বিজ্ঞানের জ্ঞান নেই, কিন্তু সন্ধানের ঝোঁক আছে। সন্ধানের নেশায় তাঁরা বনে-পাহাড়ে বিচরণ করছেন। তাঁদের সন্ধানের ফলে অনেক উল্লেখযোগ্য খনিজের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে।

এমনি এক সন্ধানকারিণীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম আমি সিংভূমের জঙ্গলে। সেখানে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য খনিজের সন্ধান করছিলাম। খোঁজাখুঁজি করতে করতে দুর্ভেদ্য বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম একদিন। সেই বনের মধ্যে হঠাৎ একজন আধাবয়সী য়ুরোপীয় মহিলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বন ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন যেন তিনি। তাঁর পরনে ব্রিচেস্, হাতে হাতুড়ি ও কোমরের বেল্টে কম্পাস। দেখে অনুমান করলাম যে তিনি আমারি মত ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় প্রবৃত্ত, যদিও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

বিমূঢ় বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে ভদ্রমহিলা হেসে ফেললেন। বললেন, অমন করে দেখছেন কী? আমি বনের দেবী বা পেত্নী নই, নিতান্তই সাদামাটা একজন মেয়েমানুষ। আপনারি মত এই জঙ্গলে মিন্‌রল্ প্রস্‌পেক্ট করছি।

মিন্‌রল্ প্রস্‌পেক্ট করছেন! —আমার চোখদুটি কপালে উঠবার উপক্রম হল।

মহিলাটির দু' চোখে কৌতুক উপচে ওঠে। তিনি বললেন, কী করব বলুন, বাবা বুড়ো হয়েছেন—বেরোতে পারেন না। কাজেই তাঁর কাজ আমাকেই করতে হচ্ছে। জিওলজির ছাত্রী অবশ্য নই, বাবার কাছে হাতে-কলমে যেটুকু শিখেছি তাই দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

আমি বললাম, কিন্তু সিংভূমের এই জঙ্গলে আপনারা এলেন কী করে?

খিল খিল করে হেসে উঠে ভদ্রমহিলা বললেন, এলাম কী করে মানে! একটানা বিশ বছর ধরে এখানেই আছি আমরা। আমরা মানে বাবা, মা ও আমি। এই জঙ্গলের মধ্যে আমাদের বাড়ি আছে। আর আছে ছোট ছোট কয়েকটা খনি। সত্যিই ভারি মজাদার সিংভূমের এই জঙ্গলটি। একসঙ্গে এত মিন্‌রল্ এখানে আছে যে অবাক হতে হয়।

—আমি কিন্তু অবাক হচ্ছি আপনাকে দেখে। সভ্যজগৎ ছেড়ে এই পাণ্ডববর্জিত বনে পড়ে আছেন, আপনার মত একজন য়ুরোপীয়ান মহিলার পক্ষে তা কী করে সম্ভব হল ভেবে পাচ্ছি নে।

—জিয়োলজিস্ট হয়েও আপনি অবাক হচ্ছেন! মিন্‌রলে যে কী নেশা আছে সে কী বোঝেন না?

—বুঝি। কিন্তু পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ নেশাটা হৃদয়ঙ্গম করা আমার পক্ষে কঠিন, কারণ আমি একজন পেশাদার জিয়োলজিস্ট।

সোচ্ছ্বাসে হেসে উঠে ভদ্রমহিলা বললেন, আপনি হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলেও নেশাটা আমার নেশাই। এ এক সাংঘাতিক নেশা। এর জন্য সব ছাড়তেও আমি পেছপা নই। জানেন, মিন্‌রলের নেশার জন্য আমি একজন মিলিওনেয়ারকে বর্জন করেছি।

—তার মানে!—ভ্যাবাচাকা খেয়ে আমি বলে উঠি।

—বছর পনের আগে একজন আমেরিকান মিলিওনেয়ার আমাদের অতিথি হয়ে ছিলেন কিছুদিন। তিনি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তখন মিন্‌রলের নেশায় মেতে উঠেছি, কাজেই মিলিওনেয়ারকে রিফিউজ করতে হল।

আমার মুখে আর কথা জোগাল না। নির্বাক বিস্ময়ে ভদ্রমহিলার মুখের পানে চেয়ে থাকি। তিনি যেন মূর্তিমতী পাতাল-কন্যা—মাটির নীচের অন্ধকারের অন্তরঙ্গনে আত্মসমর্পিতা, মানবিক সত্তা যেন বিসর্জন দিয়েছেন।

তিনি বলে চলেন, প্রাচীনকালের খনিজ-সন্ধানীদের অনেক চিহ্ন এখানকার বনে-পাহাড়ে রয়েছে। এখানে অনেক প্রাচীন খনির অবশেষ দেখা যায়, যাদের বয়স তাম্র-যুগের কাছাকাছি। এখানকার লোকেরা তাদের ভুললেও বন-পাহাড় তাদের চিহ্ন বহন করছে। ঘোরাঘুরি করতে করতে চার পাঁচ হাজার বছর আগেকার সেই সন্ধানপর্বের সঙ্গে হাত মেলাই।

আমি প্রশ্ন করলাম, পুরোন খনিগুলো দেখে বেড়াচ্ছেন বুঝি?

—না দেখে উপায় কী বলুন। যা এখন আমি খুঁজছি, প্রাচীন সন্ধানকারীরা চার পাঁচ হাজার বছর আগেই তাদের সন্ধান পেয়েছিলেন। কাজেই তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাচ্ছি।

॥ ২ ॥

হাত ও হাতিয়ার

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, প্রায় দশ লাখ বছর আগে জীবজগতের বিবর্তন-ক্রমে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম মানুষ জৈব সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষ হলেও অন্যান্য প্রাণীদের থেকে তার বিশেষ তফাৎ ছিল না। আদিম মানুষ দিল দে[illegible] দেহের জৈব ধর্মগুলির মধ্যেই [illegible] ছিল তার জীবন। কিন্তু দেহস[illegible] দেহই যে সব নয়, তা বুঝতে [illegible] দেরী হয় নি। কারণ অন্যান্য[illegible] তুলনায় দেহের বলে সে হীন, [illegible] পা, নখ বা দাঁতের মধ্যে আত্ম[illegible] আক্রমণের উপযোগী শক্তির অভাব। [illegible] বা দস্তিদের মত নখ বা দাঁতকে [illegible] যথেচ্ছ প্রয়োগ করতে পারে না, [illegible] ভরসা তার হাত দুটি। আঘাত হ[illegible] এড়াতে হাতই তার সম্বল।

কিন্তু মানুষের হাতের বল[illegible] নয়, বন্য জন্তুদের বলপ্রয়োগের স[illegible] নিতান্তই দুর্বল। বন্য হিংস্র প্রা[illegible] শুধু হাতে হাতাহা[illegible] সফল হয় নি—হাত[illegible] তার হাতিয়ারের প্র[illegible]

আদিম মানুষের [illegible] গুহা। গুহার আধ[illegible] পাথরের আবেষ্টনী তা[illegible] প্রাথরের আশ্রয়ে থাকতে[illegible]

কাঠিন্যের মধ্যে সে আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্রনির্মাণের প্রেরণা পেয়েছে।

মানুষের প্রথম হাতিয়ার তৈরী হল পাথর দিয়ে। প্রথম প্রয়াসে পটুত্বের অভাব ছিল। পাথরকে ভেঙে ছুঁচালো করার চেষ্টা করা হলেও তাতে ভারই ছিল, ধার ছিল না। পাথরের হাতিয়ার নির্মাণের এই আদি পর্বকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেছেন পুরোন প্রস্তরযুগ।

ক্রমশঃ পাথরকে পালিশ করে মসৃণ করার কৌশল আয়ত্ত করল মানুষ। পাথরকে পালিশ করে সে শ্যানিয়ে তোলে—পাথর দিয়ে ধারালো অস্ত্রের ফলা তৈরী করে। পাথর দিয়ে হাতিয়ার নির্মাণের এই নৈপুণ্য মানবসভ্যতায় নয়াপ্রস্তরযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

পাথর দিয়ে হাতিয়ার তৈরী করতে গিয়ে মানুষ ফ্লিন্ট নামে পাথরের সন্ধান পেয়েছে। ফ্লিন্ট কোয়ার্টজ নামক খনিজের সমগোত্রীয়—মজবুত, শক্ত, অথচ হালকা। হালকা হলেও পলকা নয়। তাকে ঘষে ছুরি বা কাস্তের আকার দেওয়া হত।

অস্ত্রনির্মাণে ফ্লিন্ট জনপ্রিয় হলেও অন্যান্য পাথর দিয়েও হাতিয়ার তৈরী করা হত। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে অবসিডিয়ান, অবসিডিয়ান কাঁচের মতই হাল্কা ও ধারালো। কাঁচের জৌলুসও তাতে আছে। কাঁচের মত অবশ্য তা ভঙ্গুর নয়। আগ্নেয়গিরি থেকে অবসিডিয়ানের উৎপত্তি। আদিম মানুষ অবসিডিয়ান ঘষে প্রায় ইস্পাতের ছোরার মত ধারালো ছোরা বানাত। মেক্সিকোর অ্যাজটেক নামে আদিবাসী সম্প্রদায় খৃস্টীয় প্রায় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অবসিডিয়ানের হাতিয়ার ব্যবহার করেছে। নয়াপ্রস্তরযুগের এই হাতিয়ারকে তারা লোহা ও ইস্পাতের যুগেও পরিহার করতে পারে নি।

নয়াপ্রস্তরযুগের পাথরের অস্ত্রের নমুনা প্রত্নতাত্ত্বিকরা পৃথিবীর ... অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছেন। নানা ... কে সংগৃহীত হলেও অস্ত্রগুলি ... ধরনের। প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান ..., সম্ভবত কোনও এক বিশেষ ... তৈরী হোত পাথরের অস্ত্রশস্ত্র। ... ন থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হোত। কোনও এক ... গোষ্ঠীর মধ্যে পাথরের অস্ত্র... র কুশলতা সীমাবদ্ধ ছিল বলে অনুমান করেন।

... শুখৃস্টের আবির্ভাবের প্রায় ছ' ... বছর আগে কৃষিকর্ম মানুষের আয়ত্তে ... তখন ধাতুর ব্যবহার শিখলেও ... হাতিয়ার বর্জন করে নি মানুষ। ... ই মানুষের আস্থা ... অস্ত্র তৈরীর কথা

... আদিম লাঙলের ... ত ফ্লিন্ট-বসানো হাড়। ... র গায়ে থাকতো ছোট ... রো। হাড় ও পাথরের সমন্বয়ে প্রস্তুত লাঙলের ফলা মাটিকে ফালা ফালা করত অনায়াসে।

ক্রমশ ধাতু মানুষের ধাতস্থ হতে পাথরের বদলে ধাতু দিয়ে হাতিয়ার তৈরী হতে থাকে। খৃস্টপূর্ব তিন থেকে চার হাজার অব্দের মধ্যে ধাতুর প্রাধান্য শুরু হয়।

প্রস্তরযুগ এখন দূরস্মৃতি। পাথরের হাতিয়ার এখন জাদুঘরের শোকেসে স্থান পেয়েছে। মানুষের নিত্যব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ধাতু দিয়েই তৈরী হয়।

কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতার অত্যাবশ্যক সব উপকরণ যদিও ধাতুময়, পাথরের অন্তর্নিহিত শক্তি অন্ততপক্ষে পাথর ভাঙার ব্যাপারে এখনো স্বীকৃত। পাথর বা রত্ন পালিশ করতেও পাথরেরই প্রয়োজন।

পাথর বা খনিজকে শান দেওয়া বা পালিশ করার জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় কুরুবিন্দ বা কুরুন্দ, হীরা ও গারনেট।

কুরুবিন্দ চুনি ও নীলার স্বজাতি, কিন্তু স্বচ্ছ নয়। চুনি ও নীলার মত অ্যালুমিনিয়াম ও অক্সিজেনের সমাহার অত্যন্ত কঠোর। তার কঠোরতার দরুন তাকে চূর্ণ করে শান দেবার কাজে লাগানো হয়। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকে অস্ত্র শানাবার এবং রত্ন পালিশ করবার জন্য কুরুবিন্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। সংস্কৃত কুরুবিন্দ থেকেই কোরানড্যাম নামটি এসেছে। আসাম, মাদ্রাজ, মহীশূর ও মধ্যপ্রদেশে প্রচুর পরিমাণে কুরুবিন্দ পাওয়া যায়। বিদেশে দক্ষিণ রোডেশিয়াতে কুরুবিন্দের উৎকৃষ্ট ভাণ্ডার আছে।

সুদৃশ্য গারনেট হোল রত্ন। সাধারণ গারনেটকে তার কঠোরতার দরুন শান দেবার কাজে লাগানো হয়ে থাকে। এ জাতীয় গারনেটের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার আছে মাদ্রাজ, কেরালা, রাজস্থান, বিহার, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশে।

হীরা বস্তুজগতে কঠোরতম। হীরার মধ্যে যা অস্বচ্ছ শ্রেণীর, শক্ত পাথর কাটা বা রত্ন পালিশ করার জন্য তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হীরা কাটতে হীরার গুঁড়োই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এদেশে হায়দরাবাদের অদূরবর্তী গোলকুণ্ডা হীরাতে সমৃদ্ধ ছিল। সেই ভাণ্ডার এখন নিঃশেষ, মধ্যপ্রদেশে পান্নার স্বল্প ভাণ্ডারই এদেশের একমাত্র ভরসা। পান্নায় অস্বচ্ছ জাতের হীরাই বেশী পাওয়া যায়। কঠোরতাই তার সম্বল—পালিশ ও কাটার কাজেই তার ব্যবহার।

পাথরের হাতিয়ারের চলন এখন না থাকলেও হাতিয়ার হিসেবে পাথর হাতে নিতে মানুষ যে দ্বিধাবোধ করে না, তার প্রমাণ বিশৃংখল জনতার মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। বন্দুক দিয়ে গোলা-গুলী ছোঁড়া থেকে শুরু করে ছোরাছুরি চালান, সবেতেই শিক্ষার প্রয়োজন। অশিক্ষিত পটুত্ব দিয়ে সামান্য পেন্সিল কাটা ছুরিকেও ঠিকমত বাগে আনা যায় না। কিন্তু পাথর হাতে তুলতে সকলেই পারে, শিশুর পক্ষেও তা সহজ।

মানুষের হাত যেন হাজার হাজার বছর ধরে প্রস্তরযুগের স্মৃতিকে বহন করছে।

সেদিন সকালে আমার এক সদ্য-বিবাহিত বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখি সে,

তার নবপরিণীতা পত্নীর কোমল কমল-হস্তে একটি পাথরের টুকরো শোভা পাচ্ছে। পাথর দিয়ে কয়লা ভাঙছিলেন তিনি।

আমাকে দেখে বন্ধু বললেন, বিয়ের পরে কয়লা ভাঙার জন্য স্টেনলেস স্টিলের হাতুড়ি কিনে দিয়েছিলাম। কিন্তু হাতুড়ি ইনি হাতেও নিচ্ছেন না।

মুচকি হেসে বন্ধুপত্নী বললেন, আমি কি এঞ্জিনীয়ার না জেলের কয়েদী যে, হাতুড়ি হাতে নেব।

বন্ধু বললেন, কিন্তু হাতুড়ি হাতে নিয়েই তো আমি বেশী সুবিধে বোধ করি।

আমি বললাম, তুমি জেলের আসামী না হলেও স্বামী, কাজেই হাতুড়ি তোমার হাতে সাজে। কিন্তু বৌদির হাত এ পর্যন্ত নিষ্কলঙ্ক। তাতে বিরাজ করছে শুধু প্রস্তরযুগের স্মৃতি।

প্রস্তরযুগের স্মৃতি। তার মানে?—ভুরু কুঁচকে বলে ওঠেন বন্ধুপত্নী।

আমি বললাম, আদিতে আদিম মানুষ পাথরকে হাতিয়ার হিসেবে পেয়েছিল, তার স্মৃতি মানুষের হাত আজও বহন করছে।

॥ ৩ ॥

মৃৎপাত্র

প্রাক-ইতিহাসের মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কৃষির আবিষ্কার। মানুষের সব আবিষ্কারের মধ্যে সেরা এই আবিষ্কারটি হয়েছিল আনুমানিক আজ থেকে প্রায় আট হাজার বছর আগে।

কৃষি মানে শস্য ফলানো। কিন্তু ফলানো ফসলকে ফলের মত কাঁচা খেতে ভাল লাগে না। তাকে আগুনে ঝলসে সহজ-পাচ্য করে নিতে হয়। আগুনের পরশমণি খাদ্যের ভেতরকার কঠোরতাকে কমনীয় করে মানুষের জঠরের উপযোগী করে তোলে। কিন্তু আগুন যত না নরম করে, তার চেয়ে বেশি করে পোড়ায়। কাজেই সোজা-সুজি আগুনে না ছুঁইয়ে আগুনের তাতে কাঁচাকে পাকা করে তোলার কৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা করে মানুষ। তার এই চেষ্টার ফল হল মাটির পাত্রের আবিষ্কার।

মাটির তৈরী প্রাচীনতম যে পাত্র প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের সন্ধানে এসেছে, তা প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছরের পুরোন। প্রথম পাত্র জমাট-বাঁধা কাদা-মাটির আধার মাত্র—তাতে আগুনের ছোঁয়া লাগে নি। আগুনে পোড়ানো পাত্র প্রস্তুত করতে অনেক সময় লেগেছে। সাড়ে ছ' হাজার বছর আগে আগুনে অল্প-স্বল্প ঝলসে মাটির পাত্র তৈরী করেছে মানুষ। আগুনে পুরোপুরি ঝলসানো পাত্র প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছে সে প্রায় ছ' হাজার বছর আগে। আগুন তখন পুরোপুরি মানুষের আয়ত্তে এসেছে। বড় বড় চুল্লী তৈরী করে তার মধ্যে মাটির তৈরী পাত্রগুলিকে সাজিয়ে তাদের আগুনে পুড়িয়েছে সে।

মাটির পাত্র ঝলসাবার চুল্লীর মধ্যেই খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশনের কৌশল আবিষ্কার করেছে মানুষ। পাত্রগুলি মাটির তৈরী হলেও মাটির মধ্যে মাঝে মাঝে তামা, লোহা বা অন্য কোনও ধাতুযুক্ত খনিজের চূর্ণ প্রচ্ছন্নভাবে মিশে থেকেছে। কাঠের অঙ্গার ও আগুন দুয়ের প্রভাবে মাটি পুড়ে জমাট বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত তামা, লোহা বা অন্য কোনও ধাতু মাটি বা খনিজের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। মাটির পাত্রকে আগুনে পুড়িয়ে পাকা করতে গিয়ে মাটির অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছে মানুষ।

মাটির পাত্রের পর কাঁচের পাত্র তৈরী করার কৌশল মানুষের আয়ত্তে এল। প্রথম কাচ ইজিপ্টে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে তৈরী হয়েছিল। কাচ দিয়ে প্রথম প্রথম অলঙ্কার তৈরী করা হত। কাচের পুঁথিকে মালার আকারে গেঁথে গলায় পরত মিশরী মেয়েরা। অলঙ্করণের ক্ষেত্র পেরিয়ে পাত্রস্থ হতে কাচের সময় লেগেছে অনেক।

রকমারি পাত্র প্রস্তুতে কাঁচের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হলেও কাচ কখনো পাত্রবদ্ধ হয়ে থাকে নি। অপাত্রেও তার রকমারি উপযোগিতা। স্বচ্ছতার দরুণ কাঁচ দিয়ে আয়না ও লেন্স তৈরী হয়েছে। জৌলুসে তা হীরা-মানিকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। এখনো অলঙ্করণে তার সমান সমাদর।

সাধারণ মাটি পুড়িয়ে তৈরী করা পাত্র আদিম থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমান সমাদরের সঙ্গে ব্যবহৃত। কিন্তু সাদামাটা মাটিতে মানুষের মন ভরে না, কাজেই সাদা মাটির দিকে তার নজর পড়েছে। সাদা মাটি চীনে মাটি নামে সুপরিচিত। চীনদেশেই তার প্রথম আবিষ্কার। এই মাটির বৈজ্ঞানিক নাম হল 'কেওলিন'। চীনের কাউ-লিং পাহাড়ে খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এই মাটি জনৈক ফরাসী মিশনারীর নজরে পড়ে। পাহাড়ের নামে মাটির নামকরণ করেন তিনি। দেখামাত্র এই মাটিকে পাত্রে রূপান্তরের প্রেরণা পান ফ্রান্স ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশের লোকেরা। তার শুভ্রতা য়ুরোপের সকলের মনোহরণ করেছিল।

য়ুরোপীয়দের গোচরে আসার অনেক আগেই অবশ্য চীনদেশে কেওলিন দিয়ে পাত্র তৈরী করা হয়েছে। সাদা মাটির পাত্রের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরোন নিদর্শন চীনদেশে পাওয়া গেছে।

ভারতে মাটির পাত্র সর্বাধিক সমাদৃত হলেও কাঁচের স্বচ্ছতাও প্রাচীনকালে ভারতীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মহা-ভারতে স্বচ্ছ স্ফটিকের পাত্রের উল্লেখ আছে। সাদা মাটির পাত্রের প্রাচীন নিদর্শন এ পর্যন্ত এদেশে আবিষ্কৃত না হলেও, সাদা মাটি যে প্রাচীন ভারতীয়রা ব্যবহার করতেন তার প্রমাণ পাই আমরা আদিবাসী-দের বাসগৃহে। আদিবাসীরা তাদের ঘর-বাড়ির দেয়ালে সাদা মাটির প্রলেপ দেয় সযত্নে।

আদিবাসীদের মধ্যে আদিম মানুষকে প্রায় অবিকৃতভাবে পাওয়া যায়। তাদের নিত্যব্যবহৃত বস্তুগুলি আদিমতম কাল থেকে তাদের জীবনযাত্রার আবশ্যিক উপ-করণ হয়ে আছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সাদা মাটির শুভ্রতায় তাদের আবাস-স্থল নিঃসন্দেহে সুপ্রাচীন কাল থেকে মণ্ডিত হচ্ছে।

মাটি, চীনামাটি বা কাঁচ দিয়ে তৈরী পাত্র প্রাচীন থেকে আধুনিক সকল মানুষের কাছেই সমান অপরিহার্য। প্রায় চিরকাল মানুষ পাত্রস্থ হয়ে আছে এবং থাকবেও। কাজেই পাত্রের প্রস্তুতিপর্ব তার শিল্পপ্রচেষ্টার মধ্যে বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে।

পাত্র প্রস্তুতের উপকরণগুলির অধি-কাংশ মাটি বা খনি থেকে আহরণ করা হয়। উপকরণগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য হল মাটি। মরু বা পর্বত বাদে পৃথিবীর সর্বত্র মাটি আছে। মাটির বিশেষত্ব হল এই যে, মাটির স্তর থেকে তা যতই নেওয়া হোক না, তার ভাণ্ডার কখনো ফুরাবে না। জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় শিলাস্তরগুলি ক্ষয় হয়ে মাটির স্তরকে সর্বদা সমৃদ্ধ করছে। প্রয়োজনমত যেটুকু মাটি মানু[illegible] নেয়, তার চেয়ে বেশী প্রকৃতি ফে[illegible] অতএব মাটির ভাণ্ডারের শেষ [illegible]

কাঁচের প্রধান উপকরণ হল [illegible] সোডা। তাছাড়া অল্প-বিস্তর [illegible] অ্যান্টিমনি অক্সাইড ইত্যাদির প্র[illegible] বালি ও সোডায় ভারত ও পৃথিবী[illegible] সব দেশই সমৃদ্ধ।

চীনামাটির বাসন তৈরী করতে [illegible] দরকার হয় সাদা চীনামাটি বা কে[illegible] কেওলিন ফেল্ডস্পার নামক খনিজের [illegible] অবশেষ। ভারত কেওলিনে স্বয়ংস[illegible] ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই কেওলিন [illegible] যায়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কেওলিন পা[illegible] বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃ[illegible] রয়েছে।

চীনামাটির উ[illegible] কেওলিনে ফেল্ডস্পা[illegible] স্পার খুব সাধারণ [illegible] প্রচুর পরিমাণে থাকে। [illegible] ফেল্ডস্পার তেমন স[illegible] স্পারকে অবিকৃতরূপে [illegible]

নির্মল শুভ্রতা দেখা যায়, তাতে মুক্তার জৌলুসও ফুটে ওঠে। কোনও কোনও ফেল্ডস্পার তার জৌলুসের জন্য রত্নের মর্যাদা পায়।

সাদা ফেল্ডস্পারের শুভ্রতা এমনি নির্মল হয়ে থাকে যে, তা দিয়ে কৃত্রিম দাঁত তৈরী করা হয়। সম্প্রতি সাদা ফেল্ডস্পার দিয়ে সাদা সিমেন্টও তৈরী করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে স্টেনলেস স্টিলের ওপর আমাদের আসক্তি বেড়েছে। মাটি, চীনামাটি বা কাচের বাসন বাদ দিয়ে অনেকে স্টেনলেস স্টিলের বাসন ব্যবহার করেন। কেটলি, পেয়ালা, থালাবাটি ইত্যাদি সবরকম বাসন স্টেনলেস স্টিলের হলেই যেন মন ভরে তাঁদের।

কিন্তু মাটি, চীনামাটি বা কাচের পাত্র যেন শিল্পীর পট। তাদের গায়ে শিল্পী অনেক সূক্ষ্ম শিল্পসৌকর্য ফুটিয়ে তোলেন। কাজেই মাটি বা কাচের সংগে ধাতু স্থানবদল করবে এমন সম্ভাবনা নেই।

একসময় মধ্যপ্রদেশের সুরগুজা জেলায় অমৃতধারা জলপ্রপাতের ধারে পিক্‌নিক করতে গিয়ে আমার এক বন্ধুর স্ত্রী বলেছিলেন, কাচ বা চীনামাটির বাসন-কোসনে কী প্রয়োজন, স্টেনলেস স্টিল্‌ দিয়েই তো দিব্যি কাজ চলে যায়।

সেদিনের পিক্‌নিকের বাসনের সবই ছিল স্টেনলেস স্টিলের এমনকি চায়ের পেয়ালাও।

বন্ধুপত্নীর কথার উত্তরে মাটি, চীনামাটি ও কাচের স্বপক্ষে কিছু বলতে যাব, এমনসময় একটি আদিবাসী যুবতী আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তার দুচোখে বিমুগ্ধ বিস্ময়।

তার দৃষ্টির লক্ষ্য যে আমরা নই তা তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝতে পারলাম। ইস্পাতের পাত্রগুলির দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছে সে, যেন বিশ্বজোড়া বিস্ময় জড়ো হয়েছে তাদের মধ্যে।

মেয়েটা অমন আদেখলের মত দেখছে !—বন্ধুপত্নী ঝাঁজালো স্বরে ঝঙ্কার ওঠেন।

শুধু বললেন, বোধহয় কখনো স্টেনলেস র বাসন দেখেনি—তাই দেখছে।

স্টেনলেস স্টিল দেখেনি !—বন্ধুপত্নী চোখ কপালে তুলে বললেন।—এমন লোকও আছে নাকি।

—আছে বইকি, এবং তারাই মেজরিটি। শুধু স্টেনলেস্‌ স্টিল কেন, মামুলী তামা, সা, এমনকি অ্যালুমিনিয়ামও দেখেনি মন লোকও বনের মানুষদের মধ্যে গুনতি। বোধহয় এই মেয়েটিও তাদেরি কজন।

বন্ধুপত্নী এবারে নির্বাক হলেন।

মেয়েটির বিস্ময়বিস্ফারিত কালো চোখের বদন আমাকে স্পর্শ করে।

উঠলাম, কিরে, এগুলির

ভুরুদুটি কুঁচকে ওঠে।

এগুলোর একটা নিবি মানে ! নলেস স্টিলের বাসন আপনি চান নাকি ?

আমি বললাম, আহা, অমন করে চেয়ে আছে—নিক না একটা।

আমার কথায় মেয়েটির চোখদুটি প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। সাগ্রহে সে বললে, দেবে আমাকে ?

নিশ্চয়ই দেব।—বলে আমি একটা স্টেনলেস্‌ স্টিলের বাটি তুলে তাকে দিয়ে দিলাম।

স্টেনলেস্‌ স্টিলের বাটিটা হাতে নিয়ে মেয়েটার কালো মুখখানা খুশিতে ঝলমল করলেও বন্ধুপত্নীর ফর্সা মুখখানাতে কালিমার প্রলেপ পড়ে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। অমৃতধারার অদূরে আমাদের ক্যাম্পে আমরা ফিরে গেলাম।

দিনকয়েক বাদে আমি ও আমার বন্ধু জীপে করে চিরিমিরির দিকে যাচ্ছিলাম। ঘন বনের মধ্য দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর সেই আদিবাসী মেয়েটিকে দেখতে পেলাম। একটি পুঁটলি ঘাড়ে করে বনের সড়ক দিয়ে হাঁটছিল সে। তার সংগে একটি আদিবাসী যুবক।

আমাদের জীপটাকে হাত তুলে থামাল তারা। ব্রেক কষে গাড়ি থামাতেই মেয়েটি এগিয়ে এসে আমাকে বললে, তোমাদের গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে যাবে ? সরকারী বড় সড়ক পর্যন্ত যাব আমরা। সেখানে গিয়ে বাস ধরব।

আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছিস ?

মেয়েটি ম্লান হেসে জবাব দিল, চলে যাচ্ছি গাঁ ছেড়ে। গাঁ-বুড়ো আমাকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

তাড়িয়ে দিয়েছে !—আমি সবিস্ময়ে বলে উঠি।—কেন, কী করেছিস তুই ?

—তোমাদের দেওয়া ঐ রুপোর মত ঝলমলে বাটিটা নিয়েছি বলে নাকি আমার জাত গেছে। আমাদের গাঁয়ে হাঁড়ি-বাসন মাটির ছাড়া আর কিছুরেই হয় নি। তামা-পেতলের থালাও কেউ ছোঁয় না। তোমাদের দেওয়া বাটিটা নাকি বিলিতী—ওটা ছুঁলেই পাপ হয়। ওটা নিয়ে আমি ঘরে ঢুকেছিলাম বলে আমাদের ঘরটা ভেঙে ফেলেছে গাঁয়ের লোকেরা। আমার বাবা-মা'র এখন মাথা-গোঁজার ঠাঁই নেই। আবার তাদের ঘর গড়তে হবে। কিন্তু সেই নতুন ঘরে আর আমি ঢুকতে পারব না। গাঁ-বুড়োর হুকুমমত আমাকে মারধর করে কুকুরের মত গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিল।

—তোর সংগে ঐ ছেলেটা কে ? তোর অপরাধে ওকেও শাস্তি দিয়েছে নাকি ?—আমার বন্ধু প্রশ্ন করে।

মেয়েটি আরক্তমুখে সলজ্জ হেসে বললে, না, ও আমার সঙ্গে অমনি যাচ্ছে। কত বারণ করলাম, তবু শুনল না।

মাটির পাত্রে জড়িয়ে পড়ে জড়ীভূত হওয়ার মধ্যে প্রস্তরীভূত হয়ে আছে আদিম প্রস্তরযুগের সংস্কার। আদিবাসীদের সমাজ হয়তো প্রস্তরযুগ পেরিয়ে এগোতে পারে নি। তাছাড়া মানুষের অন্তর্নিহিত মাটির টানও মিটবে না কখনো, মানুষের সভ্যতায় যতই ইতিহাসের পালিশ পড়ুক না কেন। সভ্যতার ঊষাকালের মাটির পাত্র প্রদোষে পারমাণবিক শক্তির যুগেও সমান সমাদৃত ! মানুষের দুর্বুদ্ধিতে পারমাণবিক শক্তি যদি মুক্তি পেয়ে মানবজাতিকে নিঃশেষে ধ্বংস করে, মানুষের স্মৃতির স্বাক্ষর হয়তো আজকের বা আদিমকালের মাটির পাত্র বহন করবে।

॥ ৪ ॥

ভাল-বাসা

মানুষের সবচেয়ে বড় সাধ বাসা বাঁধার। চিরদিনের আবাস নয় জেনেও দুদিক ঘেরা ঘরের প্রতি মানুষের প্রচণ্ড আসক্তি। এই সাধের প্রেরণায় সে সৌধ গড়ে। সাধ্য না থাকলেও মেঘের ওপরে প্রাসাদ গড়ার স্বপ্ন দেখে।

পৃথিবীর প্রথম মানুষ প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে নিজেকে অসহায় বোধ করেছিল। প্রকৃতির কোলে লালিত হলেও প্রকৃতির কবল থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ সে অনুভব করেছিল। তাই আশ্রয় খুঁজেছিল সে।

মানুষের প্রথম আশ্রয় অবশ্য প্রকৃতিরই রচনা। পাহাড়ে প্রাকৃতিক ক্ষয়ের ক্রিয়ায় শিলাস্তর বিশিষ্ট হয়ে গুহা বা গহ্বরের সৃষ্টি হয়। গুহায় নিহিত ছিল মানুষের প্রথম আশ্রয়।

গুহার আধার পাথর দিয়ে ঘেরা। গুহা থেকে ঘর গড়ার প্রেরণা পেল মানুষ। আদিম মানুষের প্রথম ঘর গুহার অনুকরণেই তৈরী হয়েছিল। আদি ঘর-বাড়ির কিছু নিদর্শন ইরাকের জেরিকোতে দেখা যায়। এখানে সাত হাজার বছরেরও আগেকার একটি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। একসংগে জড়াজড়ি করা ঘর-বাড়ি সব পাথরের গড়া। পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে। গ্রামকে ঘিরে আছে পাথরের দেয়াল।

পাথর দিয়ে মানুষ যেমন সৌধ নির্মাণ করেছে, তেমনি সমাধিও রচনা করেছে। মৃতের স্মৃতিকে পাথরের ফলকে চির-স্থায়িভাবে উৎকীর্ণ করে রাখতে চেয়েছে সে।

পাথর ছাড়া মাটি দিয়েও ঘর গড়েছে আদিম মানুষ। মাটি পুড়িয়ে ইঁট তৈরি করার কৌশল আয়ত্ত করতে অবশ্য তার অনেক সময় লেগেছে।

আধুনিক কালে ইঁট, সুরকি ও কংক্রিট্ ক্রমশঃ পাথরের জায়গা নিলেও গৃহনির্মাণে পাথর কদাপি বর্জিত হয়নি। স্থপতিতে পাথরের নিজস্ব মর্যাদা আজও আছে। গৃহনির্মাণে জ্যামিতিক ছক ছাপিয়ে শিল্প-সৌন্দর্যের দাবী উঠতেই পাথরের প্রয়োজন হয়েছে। পাথরের কণায় কণায় উৎকীর্ণ প্রকৃতির ভাস্কর্যকে বাড়ির দেয়ালে এনে সাজানো হয়েছে।

পাথরকে থরে থরে সাজিয়ে আকাশ-ছোঁয়া সৌধ, মন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি রচনা করেছে মানুষ। এই সব পাথরই হল পৃথিবীর অস্থিপঞ্জর। কাজেই প্রায় সর্বত্রই তারা সুলভ।

ব্যাসল্ট্ এমনি একটি পাথর, যা পৃথিবীর অনেকখানি জুড়ে আছে। ভূগর্ভ থেকে নিঃসৃত গলিত লাভা ঠাণ্ডা হয়ে জড়ীভূত হয়ে ব্যাসল্টে রূপ নিয়েছে। রঙ কালো, দানা সূক্ষ্ম। খুব শক্ত হয়ে জমাট বাঁধাতে সহজে তাকে ভাঙ্গা যায় না। পাকা রাস্তা তৈরি করতে বা রেল লাইন পাততে এ পাথর অপরিহার্য। বড় বড় সেতু নির্মাণেও লাগে এ পাথর। সৌধ নির্মাণে অবশ্য তার তেমন সমাদর নেই। কারণ ইচ্ছামত আকারে তাকে কাটা সহজ নয়, তার নিবিড় কালো রঙও অনেকের পছন্দ নয়।

ব্যাসল্ট্ দিয়ে সাধের সৌধ নির্মিত না হলেও প্রাচীন ভাস্করদের ছেনি অপরূপ সব ভাস্কর্য উৎকীর্ণ করেছে তার গায়ে। অজন্তা, ইলোরা, এলিফান্টা, কান্হেরি প্রভৃতি গুহামন্দিরগুলিতে খোদিত ভাস্কর্য ও চিত্রিত বিচিত্র সব দেয়ালচিত্র ব্যাসল্টের কালোকে আলো করেছে।

ভারতে রাজমহল পাহাড়, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র প্রভৃতি প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাসল্টে ঢাকা।

ব্যাসল্টের মত গ্র্যানিট্‌ও পৃথিবীর অনেকখানি অংশকে আবৃত করে আছে। ভূগর্ভে নিহিত গলিত লাভা প্রবল চাপে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে গ্র্যানিটের সৃষ্টি করেছে। গ্র্যানিটের দানাগুলি এমনি সুসংবদ্ধভাবে আছে যে, দেখতে একটি সুন্দর নকশার মত মনে হয়। ধূসর, গোলাপী, লাল, কালো প্রভৃতি নানা রঙের গ্র্যানিট্ পাওয়া যায়। দৃঢ় হলেও তাকে ইচ্ছেমত আকারে কাটা খুবই সহজ। কাজেই মন্দির, মিনার বা প্রাসাদ নির্মাণে গ্র্যানিটের বহুল ব্যবহার হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য মন্দির এবং মন্দিরে স্থাপিত মূর্তি গ্র্যানিট্ দিয়ে তৈরি।

গ্র্যানিট্ ভারতের নানা জায়গায় আছে। কিন্তু মন্দির বা সৌধ নির্মাণের উপযোগী উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গ্র্যানিট্ মাদ্রাজ ও মহীশূরেই পাওয়া যায়।

বালি জমাট বেঁধে বেলেপাথরে রূপান্তরিত হয়। বেলেপাথরের বালির সঙ্গে অল্পবিস্তর চুন ও লোহাও মিশে থাকে। লোহার পরিমাণ বেশি থাকলে বেলেপাথরের রঙ হয় লাল।

বেলেপাথর ব্যাসল্ট্ বা গ্র্যানিটের মত শক্ত নয়, তাকে ইচ্ছেমত আকারে কাটা খুবই সহজ। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রাসাদ বা মন্দির নির্মাণে বেলেপাথরের সমাদর ছিল। প্রাসাদাদি তৈরি করতে এর চেয়ে ভাল পাথর বোধহয় আর কিছু নেই।

ভারতের বহু রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বেলেপাথর আছে। ইমারত তৈরির উপযোগী উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বেলেপাথর বিন্ধ্য পর্বত ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে পাওয়া যায়। পূর্বে গয়া জেলা থেকে পশ্চিমে গোয়ালিয়র পর্যন্ত এই বেলেপাথরের বিস্তার। লোহার পরিমাণ বেশি বলে তার রঙ লাল। আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রির কেল্লা, দিল্লীর জুম্মা মসজিদ ও বহু প্রাসাদ, মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র এবং উত্তর প্রদেশের অনেক স্থানের অনেক ইমারত এই লাল বেলেপাথর দিয়ে তৈরি। পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলি উড়িষ্যার বেলে-পাথর দিয়ে গড়া। প্রাচীন ভারতীয় মন্দির-গুলির অধিকাংশ মূর্তি বেলেপাথর খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে।

স্লেট্ কাদাপাথরের রূপান্তরিত রূপ। ভূগর্ভের তাপে ও চাপে কাদাপাথর কালো বা ধূসর স্লেটের রূপ নেয়। স্লেট্ কঠি[illegible] নয়, আঁচড় দিলেই দাগ পড়ে তাতে[illegible] স্লেট্‌কে স্তরে স্তরে বিশ্লিষ্ট করা সহ[illegible] চাপ দিলেই তা পাতের আকারে ভাগ হ[illegible] যায়। স্লেটের পাত দিয়ে ঘরের ছাদ ছাও[illegible] ও মেঝে মুড়ে দেওয়া চলে।

ভারতে পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের হিমালয় অঞ্চলে স্লেট্ আছে। বিহারে মুঙ্গের জেলার খড়্গপুর পাহাড়ে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর স্লেট্ পাওয়া যায়।

সৌধ বা সমাধি নির্মাণে শ্বেতপাথরের সমাদরের শুরু মোগল বাদশাদের আমল থেকে। শাহ্‌জাহানের তৈরী সৌধ ও সমা[illegible] সবই শ্বেতপাথরে প্রস্তুত[illegible] পুরোপুরি শ্বেতপাথর দিয়ে[illegible]

শ্বেতপাথরের শুভ্রতা স্ব[illegible] রচনা করে। তাজমহলের সৌ[illegible] রয়েছে শ্বেতপাথরে শু[illegible] স্থাপত্যের কুশলতাকে ছাপিয়ে [illegible] পাথরের শুভ্র দ্যুতি।

আধুনিককালেও শ্বেতপাথরের বিশেষ সমাদর আছে। প্রাসাদাদি নির্মাণে তা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। কলকাতায় শ্বেত-পাথরের তৈরী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তাজমহলকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ফরাসীতে শ্বেতপাথরকে বলে মর্মর। ভূগর্ভের চাপ ও তাপের প্রভাবে চুনা পাথর শ্বেতপাথরে রূপান্তরিত হয়। বিশুদ্ধ শ্বেতপাথরের রঙ সাদা। অন্যান্য পদার্থের মিশ্রণে তাতে নানা রকম রঙের নকসা ফুটে ওঠে।

রাজস্থানের যোধপুর, কিষেণগড়, জয়-সলমির, আজমির, জয়পুর, আলোয়ার প্রভৃতি জায়গা এবং মহারাষ্ট্রের কয়েকটি স্থানে শ্বেতপাথর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রাসাদাদি নির্মাণের উপযোগী উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শ্বেতপাথর রাজস্থানেই মেলে। যোধপুরের অন্তর্গত মেকরানার শ্বেতপাথর তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতার জন্য প্রসিদ্ধ। তাজমহল ও ভিক্টোরিয়া মেমো-রিয়েল মেকরানার শ্বেতপাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে।

যে সব পাথরে লোহা ও অ্যালু-মিনিয়ামের পরিমাণ বেশি, জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় তারা ক্ষয় পেয়ে ইঁটের মত লালচে রঙের পাথরে রূপান্তরিত হয়। এই রূপা-ন্তরিত পাথরকে বলে ল্যাটেরাইট। ল্যাটিন ভাষায় later মানে ইঁট। ইঁটের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে এই নামকরণ হয়েছে। ল্যাটেরাইট অনেক জায়গায় মাটির সঙ্গে মিশে মাটির মতই নরম হয়ে থাকে। তাকে খুঁড়ে বের করলে অবশ্য হাওয়া লেগে ক্রমশঃ শক্ত হয়ে ওঠে। চাপ দিলে ভাঙ্গা ল্যাটেরাইটে জোড়াও লেগে যায়।

ঘর-বাড়ি তৈরি করার জন্য ল্যাটেরাইটের ব্যবহার খুবই প্রাচীন। ল্যাটেরাইট দিয়ে [illegible]র গড়ার সুবিধে এই যে, সদ্য খুঁড়ে আনা ল্যাটেরাইট দিয়ে গাঁথনি করার সময় চুন-সুরকির দরকার হয় না। ল্যাটেরাইটের তৈরী ঘর-বাড়ি উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় দেখা যায়।

ল্যাটেরাইটের অনুকরণে মাটি পুড়িয়ে ইঁট তৈরি করার কৌশল খুব প্রাচীনকালেই মানুষের আয়ত্তে এসেছিল। প্রাচীনকালে ইঁটের পর ইঁট সাজিয়ে বিশাল সৌধ পর্যন্ত গড়ে তোলা হত।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধমালা এবং রাজগৃহের মন্দিরগুলি ইঁটের তৈরি। [illegible] বা রাজগৃহে ব্যবহৃত ইঁট অবশ্য [illegible]রণের কি অক্ষর [illegible] মত নয়। এই ইঁট আধু-[illegible]য়ে চ্যাপ্টা এবং আকারে [illegible]

[illegible]রণ ব্যাকুল [illegible] পুড়িয়ে ইঁট করার সামর্থ্য [illegible] কাঁচা মাটি দিয়ে তারা ঘর [illegible]রেছে। [illegible]থর বা ইঁটের স্থায়িত্ব আছে, সময়ের প্রলেপ তাদের ওপরে পড়লেও অতীতের সাক্ষী হয়ে থেকে যায় তারা। কিন্তু মাটির প্রবণতা মাটিতে মিশে যাও-য়ায় অতীতে মাটি দিয়ে যে সব ঘর-বাড়ি গড়া হয়েছিল, তাদের কোন চিহ্ন আজ আর অবশিষ্ট নেই। কাজেই প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রাগৈতিহাসিক মাটির ঘরের ওপরে সবি-শেষ আলোকপাত করতে সমর্থ হননি।

আধুনিককালে অবশ্য মাটির ঘরের তেমন সমাদর নেই। মাটির কাছাকাছি যারা আছে, তারাও সামর্থ্য থাকলে ইঁট বা পাথ-রের পাকা দালান তোলে।

এদেশের গ্রামগুলিতে অবশ্য বেশির ভাগ ঘর-বাড়ি মাটির। দরিদ্র গ্রামবাসিদের অধিকাংশের সহজ নাগালের মধ্যে মাটি ছাড়া আর কিছু নেই বলে তারা মাটিরই ঘর গড়ে। কিন্তু গ্রামগুলি যদি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, গৃহনির্মাণে কাঁচা মাটি বর্জন করে সকলে পোড়া মাটি বা ইঁটের সাহায্য নেবে।

ব্যতিক্রম যে থাকবে না তা নয়। মাটির ঘরের মোহ অনেকের মনকেই আচ্ছন্ন করে আছে।

এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম দেখেছিলাম আমার এক বড়লোক বন্ধুর মধ্যে। বিলাস-ব্যসনের মধ্যে সে মানুষ, কলকাতায় প্রাসাদোপম অট্টালিকায় তার বাস। হঠাৎ সে কলকাতা ছেড়ে শহরের উপকণ্ঠে গ্রাম্য পরি-বেশের মধ্যে মাটির ঘর বানিয়ে সেখানে থাকতে শুরু করে দিল।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, হঠাৎ তোমার মাটির কাছাকাটি হবার শখ হল কেন? দেশের সেবা করবে, না সন্ন্যাস নেবে?

ম্লান হেসে বন্ধু জবাব দিল, খেয়াল আমার নয়, আমার ভাবী স্ত্রীর। বিয়ের পর শহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে মাটির ঘরে থাকতে চায় সে। তার ধারণা শহরে ইঁট পাথরের ঘরে থাকলে মানুষের মন পাথর হয়ে যায়। পাথুরে মন নাকি ভালবাসতে পারে না।

আমি হেসে বললাম, ভালবাসার জন্য মাটি দিয়ে তা হলে ভাল-বাসা গড়ছ!

॥ ৫ ॥

রঙের জন্য

রঙের জন্য মানুষের মন কবে থেকে মজল তা প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলতে পারবেন না। মানুষের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলির মধ্যেও আদি মানুষের রঙের প্রতি আসক্তির চিহ্ন দেখা যায়।

রঙের প্রথম প্রয়োজন প্রসাধনের জন্য। পরিমিতিবোধ আদিম মানুষের বোধের অগম্য ছিল, নিজেদের সর্বাঙ্গ রাঙিয়ে তারা আনন্দ পেত।

কেবলমাত্র নিজেদের রঞ্জিত করে যোল আনা মনোরঞ্জন হয় না। অতএব নিত্য-ব্যবহার্য বস্তুগুলিকেও নানা রঙে চিত্রবিচিত্র করা হতে থাকে। প্রথম যে বস্তুটিতে রঙের প্রলেপ পড়ল, তা হল মাটির পাত্র। প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর আগে মাটির পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। সাদামাটা মাটির পাত্রে মানুষের মন ভরেনি। তাকে নানা রঙে চিত্রবিচিত্র করে তুলতে চেয়েছিল সে।

তারপর বিশুদ্ধ শিল্পের প্রেরণা এল মানুষের মনে। রঙ সম্বন্ধে তার হুঁশ হতেই তার ভেতরকার শিল্পীর সুপ্তি-ভঙ্গ হল। গুহার শিলাপটে আজও চিহ্নিত আছে আদিম মানুষের আদি চিত্রকলা।

আদিতে যেমন, আজও তেমনি মানুষের চোখ ও মন রঙে মজে আছে। প্রকৃতির নানা রঙের বর্ণালী প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে তার অস্তিত্বের মধ্যে।

প্রাচীনকালে গাছপালা, ফুল ও কয়েক-রকম খনিজ পদার্থ থেকে রঙ আহরণ করা হত। আধুনিককালে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম রঙ প্রস্তুত হলেও রঙের উৎস হিসেবে রঙ উৎপাদক খনিজ পদার্থ-গুলিরও বিশেষ সমাদর আছে।

খনিজদের মধ্যে সবচেয়ে রঙদার হল 'ওকার'। ওকার দুই প্রকার হয়ে থাকে লাল ও হলদে। লোহা ও অক্সিজেনের যোগে ওকারের উৎপত্তি। লোহার পরিমাণে তারতম্য অনুযায়ী তার রঙ লাল থেকে হলদে হয়ে থাকে।

ভারতে মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র প্রদেশ ও রাজস্থানে ওকারের খনি আছে এদেশে লাল ও হলদে দুই প্রকার ওকার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতের ওকা[illegible] বিদেশেও রপ্তানি হয়।

রঙের উৎস হিসেবে ওকারের পরেই 'রুটিল' rutile ও 'ইলমেনাইটের নাম করতে হয়। রুটিল হল অক্সিজেন-যু[illegible] 'টাইটেনিয়াম' এবং ইলমেনাইট টাইটেনিয়াম লোহা ও অক্সিজেনের যোগফল। রুটিল [illegible] ইলমেনাইটের টাইটেনেয়াম দিয়ে সাদা রং তৈরি করা হয়। টাইটেনিয়াম থেকে প্রস্তুত সাদা রঙের শুভ্রতা মনোরম এবং আবরণ শক্তি সফেদার চেয়েও বেশি।

ভারত ইলমেনাইটে সমৃদ্ধ। কেরালা ও মাদ্রাজের সমুদ্র-উপকূলে বালির মধ্যে ইলমেনাইট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও উড়িষ্যার সমুদ্র-উপকূলের বালির মধ্যে ইলমেনাইট আছে, তবে স্বল্প পরিমাণে। ইলমেনাইটের সঙ্গে রুটিল[illegible] পাওয়া যায়। তবে তার পরিমাণ ইলমে-নাইটের তুলনায় কম।

ভারতে ইলমেনাইট বা রুটিল থেকে সাদা রঙ তৈরি করার ক্ষীণ প্রচেষ্টা কেরা-লার একটি কারখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বালি থেকে আহরণ করা ইলমেনাইটের প্রায় সবটাই রপ্তানি করা হয়।

বিদেশে ইল্‌মেনাইট বা রুটিলের সমৃদ্ধি রয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নরওয়ে ও অস্ট্রেলিয়াতে।

সাদা রঙের উৎস হলেও ইল্‌মেনাইটের রঙ কালো এবং রুটিলের রঙ বাদামী। ইল্‌মেনাইট ও রুটিল রঙের জন্য প্রধানতঃ ব্যবহৃত হলেও টাইটেনিয়াম নামক ধাতুর উৎস বলেই তার গুরুত্ব বেশি। কিন্তু টাইটেনিয়াম নিষ্কাশন সহজ নয় বলে রঙের জন্যই তার সমাদর। টাইটেনিয়াম অক্সাইড বা অক্‌সিজেনযুক্ত টাইটেনিয়াম হল সাদা রঙের উৎস।

সাদা রঙের অন্যান্য উৎস হল ব্যারাইট (baryte) ও টাল্‌ক।

ব্যারাইট অনেকটা শ্বেতপাথরের মত দেখতে, কিন্তু ঈষৎ স্বচ্ছ এবং ভারী। ভারতের অন্ধ্র ব্যারাইটে সমৃদ্ধ। অন্ধ্র ছাড়া রাজস্থান, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশেও ব্যারাইট পাওয়া যায়। ব্যারাইটে সমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য হল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, মেক্সিকো, কানাডা ও যুগোস্লাভিয়া।

সাদা রঙ তৈরি করতে ব্যারাইট যত না ব্যবহৃত হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় খনিজ তেলের জন্য ড্রিলিং-এ। তা ছাড়া, রবার, কাগজ, কাঁচ ও কয়েক রকম রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করতেও ব্যারাইটের প্রয়োজন হয়।

টাল্‌ক বা স্টিয়াটাইট খনিজ পদার্থদের মধ্যে কমনীয়তম। রঙে সাদা, স্পর্শে খুব মসৃণ। সাদা রঙ ছাড়া টাল্‌ক দিয়ে তৈরি হয় টাল্‌কাম পাউডার। কাগজ, কাপড় ও রবারেও এর ব্যবহার। ভারতে এই খনিজটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। রাজস্থান, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উত্তর প্রদেশে টাল্‌কের ভাণ্ডার আছে। এদেশে উৎপন্ন টাল্‌কের অধিকাংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বিদেশে জাপান, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন টাল্‌কে সমৃদ্ধ।

সাদা রঙ সীসা ও দস্তা থেকেও তৈরি করা হয়। অক্সিজেনের যোগে সীসা ও দস্তা সাদা হয়ে ওঠে। ভারতে সীসা ও দস্তার একমাত্র খনি আছে রাজস্থানের জাওয়ারে, যদিও সীসা ও দস্তাযুক্ত খনিজের ভাণ্ডার রাজস্থানের অন্যান্য অঞ্চল; জম্বু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পশ্চিম বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে রয়েছে। বিদেশে সীসা ও দস্তাতে বিশেষ সমৃদ্ধ হল অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পেরু ও মেক্সিকো।

অ্যান্টিমনি যুক্ত খনিজ স্টিব্‌নাইটকে চোখের সুর্মা হিসেবে সুদূর প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অধুনা অ্যান্টিমনি থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় লাল, হলদে ও সাদা রঙও নিষ্কাশন করা হচ্ছে। স্টিব্‌নাইটের কোন খনি এদেশে নেই। স্টিব্‌নাইটের ভাণ্ডার অবশ্য হিমাচল প্রদেশ ও মহীশূরে রয়েছে।

চোখে চমক লাগাবার মত রঙের উৎস হল ক্রোমিয়াম। ক্রোমিয়াম শব্দের অর্থই হ'ল রঙের রূপ বা দ্যুতি। ক্রোমিয়াম থেকে সোনালী, কমলা ও হলুদ রঙ তৈরি করা হয়। ক্রোমিয়াম-যুক্ত খনিজ ক্রোমাইটে আমাদের দেশ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। বিহার, উড়িষ্যা ও মহীশূরে ক্রোমাইট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বিদেশে ক্রোমাইটে সমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ রোডেশিয়া, ফিলিপাইন্‌স্‌ ও তুরস্ক।

আলোক বিজ্ঞানীদের মতে সব রঙের সমাহার হল কালো রঙ। কালো রঙের জন্য শরণাপন্ন হতে হবে গ্র্যাফাইট নামক খনিজের। গ্র্যাফাইট খুব নরম ও মসৃণ—তার রঙ চিকন কালো। ভারতে গ্র্যাফাইট পাওয়া যায় অন্ধ্র, কেরালা, মহীশূর ও উড়িষ্যাতে। বিদেশে গ্র্যাফাইটে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হল সিংহল, চীন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র।

কালো রঙের আর একটি উৎস হল ম্যাঙ্গানিজ। অক্সিজেনের যোগে ম্যাঙ্গানিজে গাঢ় কালিমার সঞ্চার হয়। কিন্তু ক্লোরিনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলে তার রঙ ব্রোঞ্জের মত হয়ে ওঠে। ম্যাঙ্গানিজ ক্লোরাইড দিয়ে ব্রোঞ্জ রঙে কাপড় ছোপানো হয়। ম্যাঙ্গানিজ-যুক্ত খনিজে পৃথিবীর সমৃদ্ধতম দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান রাশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার পরেই।

সিঁদুরে রঙ পাওয়া যায় পারদ থেকে। গন্ধকযুক্ত পারদ হল সিনাবার নামে খনিজ। সিনাবার থেকে সিঁদুর তৈরি হয়। সিঁদুরের ব্যবহার খুবই প্রাচীন। কাচের পেছনে সিঁদুরে রঙের প্রলেপ দিয়ে আয়না তৈরি করার কৌশলটাও খুব পুরনো। এদেশে সিনাবারের সন্ধান এ পর্যন্ত মেলেনি। স্পেন, ইটালি ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে সিনাবার পাওয়া যায়।

নিবিড় নীল রঙে রাঙাবার জন্য কোবাল্টের প্রয়োজন। কাচে নীলিমা সঞ্চারের জন্য তাতে অল্পবিস্তর কোবাল্ট মেশাতে হয়। রাজস্থানে 'সেহ্‌তা' নামে এক প্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, যাতে কোবাল্ট গন্ধক ও অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। সেহ্‌তার রঙ চমকপ্রদ নীল। জয়পুরে মাটি বা ধাতুর পাত্রে নীল রঙের মিনার কাজ করার জন্য সেহ্‌তা ব্যবহার করা হয়। কোবাল্ট একটি দুষ্প্রাপ্য ধাতু। কোবাল্ট উড়িষ্যা ও রাজস্থানে বিভিন্ন খনিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় অবস্থান করছে। কিন্তু তা নিষ্কাশনের কোন আয়োজন এ পর্যন্ত করা হয়নি। কঙ্গো, উত্তর রোডেশিয়া, কানাডা, মরক্কো এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কোবাল্টে সমৃদ্ধ।

রঙদার খনিজ পদার্থ সংখ্যায় অনেক হলেও সব রঙ তারা দেয় না। সাদা, কালো, নীল, লাল, হলদে প্রভৃতি কয়েকটি রঙ ছাড়া বাদ বাকি রঙের জন্য কৃত্রিম রাসায়নিক পদ্ধতির শরণাপন্ন হতে হয়।

চোখের তৃপ্তি বা মনোরঞ্জন ছাড়া ক্ষয় প্রতিরোধেও সাহায্য করে রঙ। তাই নিত্য ব্যবহৃত সব বস্তুতেই তার ব্যবহার।

রঙের সংযোগে সাদামাটা জিনিসও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। যেখানে সৌন্দর্যচর্চার অবকাশ নেই, সেখানেও রঙ দেওয়া হয় মন ভোলাবার জন্য।

আমাদের প্রতিদিনের অস্তিত্বে রঙ প্র[illegible] নিঃশ্বাসের বায়ুর মত অপরিহার্য। গৃ[illegible] সজ্জা থেকে শুরু করে সাজসজ্জা স[illegible] ঠিকমত রঙ বেছে নেবার জন্য মেহ[illegible] করতে হয়।

কিন্তু মেহনত করলেও মনের মত রঙ কদাচিৎ মেলে। আমার এক বন্ধু ইন্দোরে বেড়াতে গিয়ে তাঁর বান্ধবীর জন্য চান্দেরী শাড়ি কিনেছিলেন। কিন্তু ঠিক যে[illegible] রঙের প্রতি বান্ধবীর পক্ষপাত, শাড়িটি সেই রঙ ঘেঁষে গেলেও ঠিক সেই রঙের হয়নি বলে দুঃখ করে বলেছিলেন যে আমার বন্ধুটি নাকি রঙকানা। ইতিপূ[illegible] আমার বন্ধুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা[illegible] দুজনের বিয়ের সম্ভাবনা[illegible] চলছিল। কিন্তু শাড়িটি যে[illegible] ঘুষার অবসান হল। ব[illegible] বন্ধুকে সোজাসুজি বলে[illegible] যে, একজন রঙকানাকে [illegible] করতে পারবেন না।

দেশেবিদেশে

জাতীয় শিক্ষানীতি

অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার একটি জাতীয় শিক্ষানীতি অনুমোদন করেছেন। দীর্ঘমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এই নীতি রাজ্য সরকারগুলি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সামনে কতকগুলি নিয়ামক আদর্শ তুলে ধরবে।

দেশ স্বাধীন হবার পর এই প্রথম সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হল। এই রকম একটা নীতি চোখের সামনে না থাকায় এতদিন শিক্ষার উন্নয়নের কাজ চলেছে পরিকল্পনাহীনভাবে এবং আশু সমস্যা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। তাতে যেমন সমস্যা মেটে নি, তেমনি জটিলতাও বেড়েছে।

গত বুধবার ১৭ই জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই নীতি সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রচার করেন। শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে এই বিবৃতি রচনা করা হয়েছে। এর লক্ষ্য : সারা দেশে একই রকম শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং আঞ্চলিক [illegible]ষাগুলিকে শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible]র পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম করে তোলা। [illegible] বিবৃতিতে উল্লেখিত নীতির বিষয়গুলি [illegible]মটি এই রকম :

এক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাথমিক [illegible]কাকে চোদ্দ বছর বয়েস পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

দুই, সারা দেশে একই রকম শিক্ষা [illegible]ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। স্কুলের স্তর [illegible]হায়ার সেকেণ্ডারী স্তরসমেত বারো বছর [illegible]হবে। তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স যেমন আছে থাকবে।

তিন, আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে পূর্ণো-[illegible]মে উন্নত করতে হবে যাতে তারা বিশ্ব-[illegible] পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম [illegible]

[illegible]ক স্তরে ত্রি-ভাষা সূত্র [illegible]হবে। এই সূত্র অনুসারে [illegible]াকার একজন ছাত্রকে হিন্দী, [illegible]ক ভারতীয় ভাষা (পারলে [illegible] ভারতীয় ভাষা), ও ইংরাজি [illegible]বে। তেমনি, অ-হিন্দী ভাষী এলাকার একজন ছাত্রকে শিখতে হবে আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী ও ইংরাজি।

পাঁচ, ভারতীয় ভাষাসমূহের বিবর্তনে এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য রক্ষায় সংস্কৃতের অবদানের কথা মনে রেখে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয় স্তরেই সংস্কৃত শিক্ষার উদারতর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

ছয়, ইংরাজি ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষায় সুযোগ-সুবিধা তৈরী করতে হবে।

সাত, হিন্দীকে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করতে হবে।

আট, শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দায়িত্ব অনুসারে তাদের সন্তোষজনক বেতন ও কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষকদের অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে।

নয়, মেয়েদের ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার উন্নয়নের জন্যে বিশেষ চেষ্টা করতে হবে।

দশ, সম্ভাব্য প্রতিভাকে যাতে আগে থেকেই খুঁজে বার করে তাদের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

এগারো, সকলের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ করে দিতে হবে এবং আঞ্চলিক অসাম্য দূর করতে হবে।

বারো, জাতীয় সেবামূলক কাজের অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার অত্যাবশ্যক অংশ করে তুলতে হবে। কৃষি ও শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যার ওপর সর্বদা নজর রাখতে হবে যাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে বেরিয়ে আসা ছাত্রদের সঙ্গে চাকরীর সুযোগ-সুবিধার বিশেষ পার্থক্য না থাকে।

তেরো, প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করে পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি লেখাতে হবে। বইয়ের দাম নীচুর দিকে রাখতে হবে যাতে সাধারণ ছাত্ররাও কিনতে পারে।

চোদ্দ, খেলাধুলা ইত্যাদির উন্নয়ন বৃহৎভাবে করতে হবে।

পনেরো, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বয়স্ক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। সেই সঙ্গে যুবক চাষীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

ষোল, বিজ্ঞানে উন্নততর শিক্ষার ওপরেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। নির্বাচিত কয়েকটি জায়গায় উন্নততম গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

এই নীতি রচনার পেছনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেনের প্রবর্তনা অনেকখানি কাজ করেছে। যদিও একথা ঠিক যে, এ-জন্যে শিক্ষা কমিশনের কোন কোন সুপারিশ তাঁকে সংশোধন করতে হয়েছে।

কমিশন বলেছিলেন, তাঁদের সুপারিশগুলি ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে রূপায়িত করা হোক। কিন্তু কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট কোন সময়-সীমা বেঁধে দেন নি। শিক্ষা দপ্তরের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে এই সময় নির্ধারণ করা হবে। তবে কাজ আরম্ভ হবে চতুর্থ পরিকল্পনার সময় থেকেই।

কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ হল কমিশন বলেছিলেন, এই লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে হলে জাতীয় আয়ের ছ শতাংশ বিনিয়োগ করতে হবে। বিবৃতিতে এ সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়ে কেবল বলা হয়েছে, সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত বিনিয়োগ ক্রমে ক্রমে বাড়ানো যাতে ছয় শতাংশের লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব হয়। প্রকৃত পক্ষে শতাংশ বিনিয়োগের উল্লেখ নিয়েই ক্যাবিনেটের মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল আর তার ফলে নীতি ঘোষণার কিছু দেরী হয়েছিল। এই প্রস্তাবের প্রধান বিরোধী ছিলেন অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই। প্রস্তাবটি সংশোধন করার পরেই কেবল অর্থমন্ত্রী সম্মতি দেন।

ঘোষিত নীতির মধ্যে অবশ্য নতুন কোন প্রস্তাব নেই, কেবল স্কুলের ক্লাস এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া। বিচ্ছিন্নভাবে এই নীতিগুলি একাধিকবার প্রস্তাবিত, আলোচিত, এবং কোথাও কোথাও গৃহীত হয়েছে। তাতে অবশ্য শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অসাম্য ও অরাজকতা দূর হয় নি। বলা হচ্ছে, সেটা হয় নি একটি সর্বভারতীয় নীতির অভাবের দরুন। এখন এই নীতি

রচিত হয়ে গেছে, সুতরাং এখন সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত।

কিন্তু যে কারণে আগেও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করা যায় নি সেই কারণ এখনও রয়েছে। কারণটি হল, টাকার অভাব। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এবারও কেন্দ্রীয় সরকার এড়িয়ে গেছেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সময়-সীমা বেঁধে দেবার প্রশ্ন। এই প্রশ্ন সম্পর্কেও ক্যাবিনেট কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। সুতরাং নীতি ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও কাজের কাজ কতখানি হবে তা সন্দেহজনক।

ইরাকে অভ্যুত্থান

গত বুধবার ১৭ জুলাই এক রক্তপাত-হীন অভ্যুত্থানের ফলে প্রেসিডেন্ট আবদেল রহমান আরেফে.সরকার গদীচ্যুত হন। তার বদলে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন মেজর-জেনারেল আমেদ হাসান আল বকর।

মেজর-জেনারেল বকর 'কম্যান্ড কাউন্সিল অব দি রেভলিউশন-এর নামে ক্ষমতা দখল করেন। বাগদাদ রেডিও কম্যান্ড কাউন্সিলের বিবৃতি প্রচার করে ঘোষণা করে 'জনসাধারণ তাদের আনন্দ প্রকাশ করেছে এবং বিপ্লবের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে।'

প্রেসিডেন্ট আরেফের বিরুদ্ধে অভি-যোগ আনা হয়েছে যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত শাসন ও স্বৈরতন্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন।

মেজর-জেনারেল বকর জানান, তাঁর অভ্যুত্থান বাথ সোস্যালিস্টদের পক্ষীয় এবং তিনি ইরাকের খনিজ তেল সম্পদ সম্পর্কে আগের চাইতে অনেক বেশী 'স্বাধীন' নীতি অনুসরণ করবেন।

এই সামরিক অভ্যুত্থানের পেছনে আছেন পাঁচজন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক নেতাঃ বাগদাদ সামরিক অঞ্চলের কম্যান্ডারের সহকারী জেনারেল সাদ আল হারদান: ফার্স্ট ডিভিশনের কম্যান্ডার জেনারেল নাসিফ সামারাই; সেকেণ্ড ডিভিশনের কম্যান্ডার জেনারেল আদমান আবদেল জলিল; ফিফথ ডিভিশনের কম্যান্ডার জেনারেল মোহম্মদ নুরি খলিল ; ও জর্ডনের ইজরায়েলী সীমান্তে ইরাকী বাহিনীর কম্যান্ডার জেনারেল হাসান আল নাকিব।

১৯৫৮ সালে যে অভ্যুত্থানের ফলে রাজা ফয়জল নিহত হয়েছিলেন এবং ইরাকে রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছিল, জেনারেল বকর তারও উদ্যোক্তাদের একজন ছিল।

জেনারেল বকর দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে মৃদু মস্কো-বিরোধী। কম্যান্ড কাউন্সিলের এক বিবৃতিতে জানানো হয় : নতুন শাসক-গোষ্ঠী আরব দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে সম্ভবপর যা কিছু সব করবে এবং প্যালেস্টাইন ও দখলীকৃত অন্যান্য সমস্ত আরব এলাকা পুনরুদ্ধারে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে।

বিবৃতিতে বলা হয় : 'আমরা অশিক্ষিত, সুযোগ-সন্ধানী, ডাকাত, গুপ্তচর, সাম্রাজ্য-বাদীদের দালাল, ইহুদী-সমর্থক, সন্দেহ-ভাজন, আত্মম্ভরী মুনাফালোভীদের সরকার খতম করতে চাই।'

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

অটোমেশনে অচলাবস্থা

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় শিল্পে ও ব্যবসায়ে কম্প্যুটার যন্ত্র বসিয়ে আধুনিক অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করা উচিত কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতবর্ষের শিল্পপতিরা ও সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক সমাজ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমত পোষণ করেন। শিল্পপতিরা মনে করেন, আধুনিক প্রযুক্তি-বিদ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে, ভারতবর্ষের বৈষয়িক অগ্রগতির হার দ্রুততর করতে হলে অটোমেশনকে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অন্যদিকে, সাধারণভাবে বলতে গেলে, ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন মহলের ধারণা হল যে, অটোমেশন আমাদের বেকার সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। "মানুষখেকো অটোমেশন রুখতে হবে"—এই হচ্ছে তাঁদের জিগির।

ইতিমধ্যে, ভারত সরকারের কয়েকটি বিভাগ, কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কাজের সুবিধার জন্য কম্প্যুটার বসাতে চাইছেন। জীবন বীমা কর্পোরেশন, রেলওয়ে প্রভৃতি সংগঠনে ইতিমধ্যে যন্ত্র বসেও গেছে।

সকল দিক থেকে সামঞ্জস্য করে দেশের সর্বাঙ্গীণ স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অটোমেশন সম্পর্কে সর্বোচ্চ স্তরে একটা নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম বিভাগই কিছুদিন যাবৎ অনুভব করছিলেন যে, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে একটা সমঝোতার দ্বারা প্রশ্নটির মীমাংসা করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এক-শ্রেণীক শ্রমিকদের ভিতর অটোমেশন বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠছে এবং অন্যদিক বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাঁদের অটোমেশনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। ফলে শিল্পে অশান্তির নূতন কারণ দেখা দিচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গত সপ্তাহে নয়াদিল্লীতে স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটির একটি অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছিল প্রশ্নটি বিবেচনা করার জন্য। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, বেশ কিছুটা আলোচনা সত্ত্বেও এবং আলোচনার একটা পর্যায়ে কতকটা ঐক্যমত [illegible] বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত করা [illegible] বৈঠক কার্যত ব্যর্থ হয়ে [illegible] শেষে একদিকে মালিক-[illegible] কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, [illegible] রা শ্রমিকদের সঙ্গে পরামর্শ [illegible] তোয়াক্কা না রেখেই অটোমেশন [illegible] জ চালিয়ে যাবেন এবং অন্য-[illegible] পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে তাঁরা অটোমেশন প্রবর্তনে সর্বতোভাবে বাধা দিয়ে যাবেন।

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীজয়সুখলাল হাতী শুধু এই বলে বৈঠক শেষ করেছেন যে, অটোমেশনের রীতি স্থির করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হবে।

বস্তুতঃ পক্ষে, এই কমিটি নিয়োগ করার প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার এক পর্যায়ে অনেকটা মতৈক্য হয়েছিল। কিন্তু মতভেদ দেখা দেয় এই কমিটির কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অটোমেশন স্থগিত থাকবে কিনা সেই প্রশ্ন। জীবনবীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীএম আর ভিদে বলেন যে, তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানে অটোমেশন স্থগিত রাখতে প্রস্তুত নন। কেননা, পার্লামেন্টারী কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে জীবন বীমা কর্পোরেশনে অটোমেশন চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের প্রয়োগ সাময়িকভাবে মুলতুবী রাখা হবে, এমন কোন প্রতিশ্রুতি তিনি স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটির সামনে রাখতে পারেন না।

স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটির এই অধিবেশনে একমাত্র নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধি শ্রীএস এ ডাঙ্গে ছাড়া আর কেউই অবশ্য সরাসরি সর্বপ্রকার অটোমেশনের বিরোধিতা করেননি। ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং হিন্দ মজদুর সভার প্রতিনিধিরা শুধু এইটুকু বলেন যে, আগে শ্রমিক পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোথাও যেন অটোমেশন চালু করা না হয়। যদিও তাঁরা মনে করেন যে, অটোমেশনের ফলে বেকার সমস্যা বাড়বে তাহলেও তাঁরা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেন যে, বিশেষ বিশেষ কোন ক্ষেত্রে অটোমেশনের প্রয়োজন হতে পারে।

মালিক পক্ষের অন্যতম প্রতিনিধি শ্রীনবল টাটা 'অটোমেশন চালু করার আগে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়েও বলেন যে, শ্রমিকরা তাঁদের এই অধিকারকে যেন অটোমেশন বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ব্যবহার না করেন।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রীবেঙ্কট-রমন, ডঃ ভি কে আর ভি রাও, অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী ডঃ করণ সিং প্রভৃতি দেখাবার চেষ্টা করেন যে, কোথাও কোথাও অটোমেশন অপরিহার্য হতে পারে। ডঃ করণ সিং বিশেষভাবে একথা উল্লেখ করেন যে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে ভারতীয় বিমান পরিবহণ সংস্থাকে কম্প্যুটারের সাহায্য নিতেই হবে। তবে, অটোমেশন চালু করার ফলে আমেরিকায় যেমন মানবিক মূল্যবোধ হ্রাস পেয়েছে আমাদের দেশে যাতে সেরকম না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। ডঃ রাও বলেন যে, অটোমেশনের নীতি স্থির করার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি তৈরী করা উচিত।

মালিক পক্ষের আর একজন প্রতিনিধি শ্রীবাবুভাই চিনয় কমিটিতে তথ্য উপস্থিত করে বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে ৪০ হাজার কম্প্যুটার আছে, পশ্চিম জার্মানীতে আছে তিন হাজার, জাপানে তিন হাজার, গ্রেট বৃটেনে ২৮০০, ফ্রান্স ২২০০ এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় ১৭৫০ সেখানে ভারতে চালু কম্প্যুটারের সংখ্যা মাত্র গোটা তিশেক। আমরা যেখানে এইসব দেশের উচ্চমানের কাছাকাছি পৌঁছবার চেষ্টা করছি সেখানে আমাদেরও কম্প্যুটার যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে।

শ্রমমন্ত্রী শ্রীহাতী বলেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রসর দেশ অটোমেশন চালু করে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন করেছে, জাতীয় সমৃদ্ধি বাড়িয়েছে। ভারতবর্ষকেও এমনভাবে অটোমেশন চালু করতে হবে যাতে এইসব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে; অথচ তার ফলে অন্যান্য দেশে যেসব ক্ষতি হয়েছে সেগুলি এড়ানর জন্য সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

আলোচনার পর হিন্দ মজদুর সভার শ্রীতিলপুলে অটোমেশন সম্পর্কে শ্রমিক পক্ষের মত এইভাবে ব্যক্ত করেন :—

"আমাদের বেকারের সংখ্যা বিরাট এবং পর্যাপ্ত কারিগরী সংস্থান ও মূলধন না থাকায় বিপুল জনশক্তি অব্যবহৃত পড়ে আছে। যতদিন দেশের এই অবস্থা চলবে ততদিন সরকারের নীতি সাধারণভাবে অটোমেশনের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত। কিন্তু যদি বিশেষ বিশেষ কোন ক্ষেত্রে সামাজিক কারণে অটোমেশন প্রয়োজন হয় তাহলে সেসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা যেতে পারে। এই বিশেষ সামাজিক কারণগুলি কি তার নিরিখ স্থির করার জন্য একটি কমিটি বা গোষ্ঠী গঠন করা উচিত এবং সেই নিরিখ যতদিন নির্দিষ্ট না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত অটোমেশন বন্ধ রাখা উচিত।"

এই শেষোক্ত প্রশ্নেই অর্থাৎ আপাতত অটোমেশন শিকায় তুলে রাখার প্রশ্নেই স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটির বৈঠক শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে গেল।

রাজনৈতিক পর্যালোচনা

এখন সকলের চোখ কংগ্রেসের দিকে

যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত শরিকদলগুলি আসন নিয়ে মারামারি শেষ করে এখন কিছুটা শান্ত হয়েছেন। আর অমনি চৌরঙ্গী রোডে কংগ্রেস-ভবনের মধ্যে কোন্দল শুরু হয়ে গেছে। ইণ্টালী নির্বাচনী কেন্দ্রের মনোনয়ন নাকচ করে দিয়েছেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটি। তাঁরা দিল্লীতে বসেই এ-'দুরূহ' কাজ সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু শ্রীবিজয়সিংহ নাহার চক্ষুলজ্জা সরিয়ে ফেলে সরাসরি আক্রমণ করেছেন অতুল্যবাবুকে। তিনি মনে করেন, এই নেতাই 'ষড়যন্ত্র' করে তাঁর প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করে দিয়েছেন। শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়ের কাছে খবর আছে, অতুল্যবাবুর চক্র টাকা-পয়সা ও নানা সাহায্য দিয়ে তাঁর কেন্দ্রে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছেন। আর বর্ধমানের শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর কাছে তো প্রমাণই আছে বর্ধমানে 'অফিসিয়াল গ্রুপ' একটা পাল্টা কংগ্রেস গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তাই এঁরা দুজনে বিজয়বাবুর সঙ্গে মিলে অতুল্যবাবুকে আক্রমণ করার পুরোধায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

কংগ্রেস-ভবনের মধ্যে এই প্রচন্ড ভাঙন' দেখে যুক্তফ্রণ্টের কারো কারোর মধ্যে নতুন উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় আরামবাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে আগে প্রায় স্থির করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বিষয়টা পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছেন।

বাংলাদেশের রাজনীতি আবার নতুন-ভাবে গুলিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ফ্রণ্টের অজয়বাবু বলেছেন গত নির্বাচনের পর নতুন নতুন তিন-চারটা দল হয়েছে। তাই ফ্রণ্টের জয় একেবারে যে সুনিশ্চিত তা বলা যায় না। কিছুটা জটিলতা অবশ্যই বেড়েছে। তবে নতুন তিন-চারটা দলের মধ্যে শ্রীআশুতোষ ঘোষের দল আই এন ডি এফ-এর কথা প্রথমে ধরা যাক। শ্রীঘোষ এর মধ্যে প্রার্থী বলে যে-কয়জনের নাম করেছেন, পরে তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই একের পর এক ঐ সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারপরেও নেতা তারস্বরে চিৎকার করে চলেছেন. 'কংগ্রেস ছাড়া আর কোন পার্টির পক্ষে ২৮০টি আসনে প্রার্থী দেওয়া সম্ভব নয়।'

বাংলা জাতীয় পার্টির পক্ষে এখন পর্যন্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। লোকদল অবশ্য বেশ কিছু সংখ্যক প্রার্থী দিতে পারবেন বলে মনে হয়। তাই রাজনৈতিক মহলের ধারণা যে, নতুন পার্টি-গুলির মধ্যে লোকদল ছাড়া আর অন্য কেউ আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

ফ্রণ্ট থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি নতুন শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছে। ভোটের ব্যাপারে তাঁরা যে কত-খানি সাফল্যমণ্ডিত হবেন, তা বলা না গেলেও একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে, যাঁরা এখন পার্টির ক্ষমতায় আছেন, তাঁরা কম্যুনিস্ট-প্রধান ফ্রণ্টের সঙ্গে সমঝোতা করতে দ্বিধাগ্রস্ত। তবে 'স্ট্র্যাটিজি' হিসেবে তাঁরা ফ্রণ্টের সঙ্গে আসন বণ্টনের কথা বলতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। এস এস পি ও বাংলা কংগ্রেসের নিজেদের মধ্যে কেমন একটা বেমানান সুর শোনা যাচ্ছে। জেলা কমিটির বক্তব্য না শুনে রাজ্য কমিটি ফ্রণ্টের সঙ্গে আসন বণ্টনে স্বীকৃত হওয়ার অভিযোগ তুলে তাঁরা বিদ্রোহের কথা প্রকাশ্যেই বলতে শুরু করেছেন।

তবে কম্যুনিস্ট পার্টি কতগুলি আসন পাবে, তা বলা না গেলেও একটা কথা বোঝা যাচ্ছে যে, এই পার্টির সদস্যদের মধ্যে আসন বণ্টনের ব্যাপারে বোধহয় মনোমালিন্য নেই। বাম কম্যুনিস্ট পার্টি প্রার্থীদের নামের তালিকা ঘোষণা করলেও, তাঁরা নকসাল-বাড়ীদের সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এখন তাঁরা সব শক্তি দিয়ে নকসালবাড়ীদের মুকাবেলা করার চেষ্টা করে চলেছেন।

জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে দাঁড়ি... আজ মনে হচ্ছে, আসন্ন অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের সময় নভেম্বর থেকে পেছিয়ে যাবে না। অতএব সবাই এখন আসরে ... পড়বার তোড়জোড় করছেন।

আজ রাজনৈতিক পার্টি কেন, সাধারণ লোকেদের মনে একই প্রশ্ন, 'কারা জিতবে ... কংগ্রেসের অতুল্যবাবু তো জোর গলা... বলছেন, 'আমরা সরকার গঠন করবো... ফ্রণ্টের নেতাদের মুখে ঐ একই কথা। তাঁ... নাকি জিতবেন। তবে কম্যুনিস্ট পার্টির নে... শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী সেদিন এক ভাল কথা বলেছেন। তিনি হেসে বললেন, কম্যুনিস্ট পার্টি ৩৬টির বেশী জিতবে না। কা... ফ্রণ্ট তাঁদের ৩৬টি কেন্দ্রে প্রার্থী... বলেছেন। তবে লাহিড়ী... "আগস্টের শেষ সপ্তাহে ... দেবো কারা জিতবে?"

কথাটা মন্দ বলেননি। ... হাওয়াটা পরিষ্কারভাবে বো... জোর কত?

— মহেন্দ্র

মার্টিরস সারিয়ান

কমল চৌধুরী

নতুন যুগের শিল্পী

যে কোন সৃষ্টিই হবে ঐতিহ্য অনুসারী। যুগ থেকে যুগে একথা সত্য। বিশেষ করে শিল্প স্বয়ম্ভু নয়। সচেতন বা অচেতন যে ভাবেই হোক না কেন শিল্পী-মাত্রেই পূর্বসূরী মহৎ স্রষ্টার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেনই। অনেক সময় নতুন-যুগের শিল্পী গোপন একাত্মতা বোধ করেন অতীতের অবিস্মরণীয় প্রতিভার সংগে অথবা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেন তার সকৃতজ্ঞ ঋণ। এইসব শিল্পীরা পরবর্তী জীবনে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এমন মৌলিক [illegible] পরিচয় দেন, যা অতি সূক্ষ্ম [illegible] সমালোচকও অস্বীকার করতে পা[illegible]ন। আধুনিকালের জনৈক রুশ-[illegible] দ্বিধাহীনচিত্তে একথা স্বীকার [illegible]

[illegible] কেবল যে চোখে দেখা শিল্পের [illegible] সত্য, তাই নয়। শিল্প অভিধায় [illegible]ত সকল ক্ষেত্রেই এই একই কথা। [illegible] [illegible]no তেমনি লিওনার্দো দা ভিঞ্চির [illegible]ক শিল্প-সৃষ্টিতে দেখতে পাই [illegible]chio কে, আবার বিঠোফেনের প্রথম [illegible] রয়েছে মোৎজার্ট এবং হেইডন। [illegible] ওয়াটার্লু যুদ্ধ বর্ণনায় রয়েছে [illegible] [illegible]ল্যান্ড পীসের স্পষ্ট [illegible]কিরণের কি অক্ষয় [illegible]ালী শিল্পী এই [illegible] ভীত নন। কারণ [illegible]আত্মসাৎ করে মৌলিক [illegible]বে। আর শৈলী বা [illegible] এর ওপর যুগের [illegible]ই। এ-যুগের শিল্পীর [illegible]রেছে। [illegible] মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। লেনিন পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্রকর পাভেল কোরিন তাঁর একটি নিবন্ধে বলেছেন—

> It is essential to study the old masters but never to imitate them, to avoid stylization and to evolve an individual style and manner which lend value and interest to the artists' work."

সোভিয়েত শিল্পীদের অধিকাংশের বিশ্বাস আত্মিক সৌন্দর্যবোধের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ মাধ্যম হল শিল্প। আর সেই সৃষ্টি হবে সকলের পক্ষেই বোধগম্য। মানুষের প্রকৃতির উন্নতিতে এবং মানসিক শক্তির সুন্দরতর বিকাশে শিল্পের ভূমিকা অতুলনীয়। এখানেই শিল্প সৃষ্টির মহত্ব। আর এই মহত্বই নতুন যুগের সোভিয়েত শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

একালের সোভিয়েত শিল্পীদের অধিকাংশই বাস্তব জীবনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন শিল্প-উপাদান। গ্রামের শিশির-ভেজা খামার বাড়ীথেকে যুদ্ধক্ষেত্র, গড়ে ওঠা মাতৃভূমির সুশৃঙ্খল রূপ থেকে গ্রহ-গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন শিল্পীকে অভিভূত করে। একালের মানুষ হিসাবে শিল্পী ভুলে যাননি তার জীবন। তাই শিল্পীর তুলিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে বর্তমান যুগ।

এই নিবন্ধের আলোচ্য সমসাময়িক কয়েকজন সোভিয়েত চিত্রকর ও ভাস্কর। রুশ ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্য প্রজাতন্ত্রগুলির কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীর কাজ সম্পর্কে কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া গেল। এঁদের মধ্যে জন দুই ভারতবর্ষও ঘুরে গেছেন এবং তাঁদের সাম্প্রতিক কাজ গুলিতে ভারত ও ভারতীয় জীবনের বৈচিত্র্য রূপ পেয়েছে।

যেমন, রুশ চিত্রকর সেমিয়ন চুইকফ ও য়ুক্রানীয় ভাস্কর নিকোলাই রিয়াবিনিন।

চুইকফ দু'বার ভারত ঘুরে গেছেন। সম্প্রতি মস্কোয় সোভিয়েত আকাদমি অফ আর্টসে তাঁর যে প্রদর্শনী হয়ে গেল, তাতে অনেকগুলি কাজ ছিল ভারতীয় জীবন ও নিসর্গ দৃশ্যের। যেমন 'হিমালয়', 'ওরা বাঁচতে চায়', 'বোম্বাইয়ের সমুদ্রোপকূল' এবং 'স্বাধীন ভারত'। এই ছবিটি এক মহনীয় ভারতীয় মাতৃমূর্তি। খ্যাতনামা শিল্পী চুইকফ জনগণের শিল্পীর সম্মানে ভূষিত ও সোভিয়েত আকাদমি অফ আর্ট-সের সদস্য। জওহরলাল নেহরু পুরস্কারেও তিনি সম্মানিত।

রিয়াবিনিনও ভারত ঘুরে গিয়েছেন। ইনি হলেন ভাস্কর, জনগণের শিল্পী ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত।

তাঁর একটি ভাস্কর্য কর্ম হল 'আগ্রার নারী', পাথরের খোদাই; কিন্তু যেন অসম্ভব জীবন্ত। রিয়াবিনিন বলেছেন, 'ভারতবর্ষ তার মানুষ ও প্রকৃতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে।' ভারতে থাকাকালীন তিনি অনেক স্কেচ করে নিয়ে গেছেন এবং তা থেকে ভাস্কর্য সৃষ্টির পরিকল্পনা করছেন। এর একটি হল 'জয়পুরের মানুষ'। আর একটি "একজন শিক্ষার্থী"। তিনি একটি বড় কাজেও হাত

এমন একটিও পাখি নেই॥

[illegible] বন্দ্য

এমন একটিও পাখি নেই যাকে বন্দনা করিনি
এমন অমল নদী নেই যাকে শরীরে টানি নি
প্রেমের সমস্ত বিভা আমি রোজ আকাশে ছড়াই
যেন এই বিষবৃক্ষ হয়ে যায় অক্ষত গোলাপ
পূত রৌদ্র যেন হয় প্রেমিকের আরক্ত ভাষণ।

আমি জানি সৃষ্টিকর্তা ভাবুক ও কর্মী উভয়ত
যে প্রান্তরে ধুয়ে গেল সমুদ্রের অবিনাশী ঢেউ
যেখানে তিমি ও মুক্তা খেলে গেছে নীল অন্ধকারে
সেখানে যে হাল দেবে, বীজ বুনবে, তার নাম আদিম সম্রা
এই মাটি, তার মন, আঁতি-পাঁতি, সব তার জানা
প্রণয়ীর মতো সীমাহীন, পরিচিত আবার অচেনা
মিলনে বিরহে তারা এক সত্তা, চিরকাল এক।

আমি বলতে চাই
মাটির 'জো' হলে সেই আদিম কৃষক দেখা দেবে
তাই তার প্রতীক্ষায় আপনাকে কুসুমিত করা
ঢের ভাল, ঢের ভাল সব গাদ তুলে শুদ্ধ হওয়া।

দ্যাখো দ্যাখো পায়রার জন্যে ওরা ছড়িয়েছে ধান
দল বেঁধে তারা সব নেমে আসছে স্বপ্নের মতন
কোমল শান্তির মতো খুঁটে নিচ্ছে স্বচ্ছ মমতায়
কিন্তু যা চিটে তা পড়ে থাকছে মাটিতে ধুলোয়।

আমি জানি শৃঙ্খলিত সাধক এখন
সমুদ্রকে পেতে পারে ধ্যানে
তাকে পেতে পারে জাদুকরী অরণ্যের সুরে
আমি এই হলুদ মাটিকে চিরকাল সোহাগে
রক্তিম করে রাখতে পারবো না তো
আমার মুখের দিকে প্রসারিত অতিকায় বিহঙ্গের ডানা
যতদূর চেয়ে দেখি কেউ নেই কিছু নেই
প্রান্তরের নীলকণ্ঠ বিশালতা ছাড়া কিছু নেই
ভয়ে ও আনন্দে মেশা নিঃসঙ্গতা চমৎকার
লাগছে আমার।

একটি নিঃসঙ্গ তারা॥

অরুন্ধতী সেনগুপ্ত

রাত্রির নীরবতায় ডুবে থেকে
যখন একটি কৃষ্ণচূড়া, শান্ত ঘাস আর পাখি
আর বুকে নিয়ে আকাশ-হৃদয়
অন্ধকারে অসীম নিদ্রায় বধির,
হঠাৎ তুমি জেগে, তখনি
শুনেছ কি কারো কান্না?
অযুত অযুত দীর্ঘশ্বাস?
রাতের অন্ধকারে
নরম ঘাসের বুকে শিশির ঝরিয়ে
শুনেছ কি ঝিল্লিরবে রক্তের স্পন্দন?

শূন্য নীড়ের মত মূক, গোপন সে কান্না—চাপা
বুকের না পাওয়ার অসহ্য বেদনা। এ কান্না
যুগ যুগ ধরে জমে আছে
শিশির-হৃদয়ে, গাছের আশ্বাসে, ত
আহ্নিক গতিতে শ্রান্ত পৃথিবীর

সাক্ষী তার, আমি, আমার শীতল হৃদয়, আর
একটি নিঃসঙ্গ তারা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরবালা বললে, 'তা হবে না। মা থাকতে এ বাড়ি বেচতে পারব না। এখন দেবোত্তর করা থাক তো—তারপর মা যদি আমার আগে যায়—তখন বাড়ি বেচে নগদ টাকা করে নেব।'

কিরণই আর একটা বুদ্ধি দিলে, 'সব জমা দেবার দরকার নেই, কিছু কাগজ নিজে রাখো—যেমন গয়না রাখলে দু-একখানা। সরকারী ব্যবস্থা—কবে কি হবে না হবে—নিজে অমন নিঃস্ব একটা পয়সার আহীন হওয়া ভাল নয়। কিছু নগদ টাকা—পোষ্টাপিসের টাকাটা আর তুলো না—দু-চারখানা গিনি আর কখানা কোম্পানীর কাগজ—এ তুমি জীবন কাল রেখে দাও। নিজস্ব কিছু থাকা ভাল। তোমার তো ছেলেপুলে নেই। মরণকালে যে সেবা করবে তাকে দিয়ে যেয়ো, সেই লোভে লোকে সেবা করবে।'

কিন্তু ঠাকুরের নামের সমস্যাটা থেকেই গেল। নাম না হলে দলিল হবে না। তাও—এখন দলিল রেজেস্ট্রী হবে না, হওয়া উচিত নয়, অন্তত যতদিন না বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তবে তারও আগে নাম চাই।

সুরবালা একবার কিরণের মুখের দিকে চাইল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'তুমি না হলে এসব কিছুই হত না, গুরুদেবকে ডাকার কথাই তো মনে পড়ত না কারুর। আর এই ছুটোছুটি। তোমার জীবনটাই তো নষ্ট করলুম বলতে গেলে। ঠাকুরই তোমার হয়ে থাকুন। তুমি বেয়াইকে বলে এসো — কিশোরীমোহন নাম হবে ঠাকুরের—শ্রীরাধা-কিশোরীমোহন।'

কিরণের কি অক্ষর আগে ধরে কিশোরীমোহন।

কিরণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে, 'না না—কী আশ্চর্য—আমার নাম নিয়ে, যা তা হয় না। না না, তুমি অন্য নাম কিছু ভাবো। তোমার ঠাকুর তোমার নামে প্রতিষ্ঠা হবে—'

বাধা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলে সুরো, 'ভেবেই মনস্থির করেছি। ঠাকুরের নাম নিয়ে কি আর ছেলেখেলা করা যায়? ঐ নাম মনে এসেছে—ঐ নামই থাক। আনন্দদা বলেছেন রেওয়াজ—নিয়ম এমন কথা বলেন নি। ওটা আসলে আত্ম-অহমিকা আত্মপ্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।'

কিশোরীমোহনের নামেই সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করা হল। যতদিন বাঁচবে সুরবালা দেবী তাঁর সেবাইত থাকবে। সুরবালার পর কিরণ। কিরণ অথবা তার ছেলে-নাতি। তবে যদি ইচ্ছা করে—কিরণ বা সুরবালা উইল করে কিরণের বংশধরদের সেবাইতের পদ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে অপর কাউকে সে জায়গায় নিযুক্ত করতে পারবে।

দলিলের খসড়া দেখে সই করে দিলে সুরবালা। তারপর কিরণের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, 'তোমার কাছ থেকে হাত পেতে নিয়েই যাচ্ছি—নিয়ে যেতেও হবে। চিরজীবন ধরে ঋণ জমা হয়ে যাবে শুধু। এক ভরসা ঠাকুর রইলেন—তিনিই শোধ করবেন আমার হয়ে। তিনিই তোমাকে শান্তি দেবেন। তাঁর কাছে এই ভিক্ষাই জানাব।'

॥ ৩৫ ॥

এর মধ্যে বার-দুই বৃন্দাবনে যাওয়া-আসা করতে হল। জমি রেজেস্ট্রী, ভিত্তি-স্থাপন—তাছাড়াও বাড়ির কাজ চলছে—এক-আধবার যাওয়া দরকার। ঝঞ্চাট অনেক। আনন্দবাবার কথামতো টাকা হুণ্ডী করিয়েই নিয়ে গিয়েছিল ওরা—সেখান থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে তিনি তুলে নেবেন। আনন্দবাবাই সব করাচ্ছেন, তবে তাঁর সাফ কথা ঃ 'ঠাকুরের কাজ, গুরুর আদেশ, করছিও সব—মোদ্দা চব্বিশ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে তদ্বির-তদারক করতে পারব না। নিজের আহ্নিকপুজো নিয়মসেবা এগুলো আছে—নিজেই রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ দিই—যাহোক কিছু তো করতেই হয়—সব সেরে তবে যাওয়া। হয়ত কিছু কিছু ঠকবে, সব কাজ মনের মতো হবে না। সেজন্যে তৈরী থেকো। এরপর গাল দিও না যেন।'

সুতরাং দাঁড়িয়ে থেকে না করালেও, এক-আধবার এদের না গেলে চলে না।

কিরণকেই নিয়ে যেতে হচ্ছে। মধ্যে তবু জোর করে আর একবার ওকে বাড়ি পাঠিয়েছিল সুরবালা—তবে সে নামেই। তিন-চারদিন পরেই চলে এসেছে।

কিরণের ওপর এতখানি নির্ভরতা শ্যামবাবুর পছন্দ নয়। 'ওখানে কি হচ্ছে, কতখানি ঠকছ—একটু নজর রাখা দরকার' বার বার উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করেন তিনি। প্রয়োজন হলে তিনিও যে সঙ্গে নিয়ে তত্ত্বাবধান করে আসতে পারেন আকারে-ইঙ্গিতে তাও জানান। তাঁর অবশ্য কলকাতা ছাড়লেই লোকসান—কিছু না হোক আপিসে গিয়ে বসে থাকলেও কম করে দুশোটা টাকা পকেটে আসে দৈনিক—তবু টাকাটাই তো বড় নয়, কর্তব্য বলে একটা কথা আছে তো। কর্তব্য সব স্বার্থের বড়—মানুষের মনুষ্যত্ব তো ঐখানেই।

কিরণ বলে, 'তা ওঁকেই নিয়ে যাও না। হাজার হোক পাকা মাথা। সত্যিই তো আমরা কীই বা বুঝি, কি হচ্ছে না হচ্ছে ওঁরা দেখলে বুঝতে পারতেন।'

সুরো হেসে বলে, 'বেশী পাকা মাথার আমার দরকার নেই। ঝুনো নারকেলের মতো মাথা নিয়ে আমি কি করব? চিবিয়ে খাবার পক্ষে তোমার মতো কাঁচা মাথাই ভাল। দ্যাখো না—প্রতিবাদ করে না—খেলে কৃতার্থ হয়ে যায়। তাছাড়া তুমিও কাঁচা আমিও কাঁচা—এ একরকম বনেছে ভাল। ভুল হয়—কেউ কাউকে দায়ী করব না। ঠকি ঠকব, কী আর করা যাবে তার!'

'কিন্তু উনি তো তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, যা দেখা যাচ্ছে, ওঁকে একবার নিয়ে যেতেই বা দোষ কি? তবু—, যদি এখনও কিছু সংশোধনের উপায় থাকে—'

'ভুল হলে তো শোধরানোর কথা, ভুল হচ্ছে এটাই বা ধরে নিচ্ছ কেন? যাঁর কাজ তিনিই করাবেন। ভুল হয় সেও তিনি বুঝবেন। আর হিতাকাঙ্ক্ষী? হ্যাঁ—যা দেখা যাচ্ছে, ঠিকই বলেছ। দেখাটারই যে এখনও শেষ হয়নি। দ্যাখো এ-বাজারে নিছক নিস্বার্থভাবে পরোপকার করে তোমার মতো —এমন লোক এত সস্তা নয়। তাও—তোমার মধ্যেও একটা স্বার্থ আছে—মোটা কিছু নয়—খুবই সূক্ষ্ম, তবু আছে। ঐ অকারণ পরোপকারটাই আমার ভাল লাগে না, অস্বস্তি বোধ হয়। হয়ত আমার পাপ মন—মতলব ছাড়া বুঝি না, আর মতলবটা বুঝতে পারলে তবু নিশ্চিন্ত হই। জীবনভোর অনেক দেখলুম কিরণবাবু, বুঝলে! বিশেষ

বড়লোক, দেখে দেখে ঘেন্না হয়ে গেছে। আমার চারুদার মতো গরীবদুঃখী হলে তবু বুঝতুম!'...

এই শেষের বার বৃন্দাবন থেকে ফিরে শ্যামবাবুর আর দেখা পাওয়া গেল না। অবশ্য খুব একটা কাজ ছিলও না। যেটুকু বাকী আছে, সেটুকু ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করার আগে হবেও না। ওদিকে যেমন ঘন ঘন আসছিলেন, কাজ না থাকলেও—তাতে এই অনুপস্থিতিটা একটু অস্বাভাবিকই মনে হয়। বিশেষ এর মধ্যে, ওঁর কাছে যা কিছু কাগজপত্র পড়েছিল—দলিল, ট্যাক্সের বিল ইত্যাদি—লোক দিয়ে একদিন সব পাঠিয়ে দিলেন। লোকটি সব বুঝিয়ে দিয়ে রসিদে সই করিয়ে নিয়ে যখন উঠছে, সুরবালা প্রশ্ন করল, 'শ্যামবাবুর কি শরীর খারাপ? না কি কাজের খুব চাপ পড়েছে?'

'কৈ, না তো।' লোকটি বেশ একটু অবাক হয়ে যায়, 'ভালই তো আছেন। কাজেরও তো এমন কিছু বেশী চাপ নেই, যেমন সাধারণত থাকে তেমনিই।...কেন, কিছু বলতে হবে? আসতে বলব একবার?'

'না না, এমনিই জিজ্ঞেস করছিলুম।' সুরো ব্যস্ত হয়ে বলে।

কথাপ্রসঙ্গে মায়ের কাছেও কথাটা তোলে একবার। এমনিই উঠে পড়ে, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তোলা নয়। এবার ফিরে পর্যন্ত একদিনও আসেননি শ্যামবাবু—এই নিয়েই বিস্ময় প্রকাশ করছিল।

নিস্তারিণী হঠাৎ দুম করে বলে বসল, 'সে তো আসতেই চায়। তুমি বললেই আসে। বারো মাস ভূতের ব্যাগার দিতে আর কত আসবে বলো শুধু শুধু?'

'তার মানে?' একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই প্রশ্ন করল সুরবালা। মার কথার ভঙ্গী ও গলার আওয়াজ কোনটাই ভাল মনে হল না। অন্য কোন বক্তব্যের পূর্বাভাস বলেই মনে হল। সে মুহূর্ত-কয়েক মার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ব্যাপারটা আঁচ করার চেষ্টা করে পুনশ্চ পূর্ব প্রশ্নের জের টানে, 'এর ভেতর আমি না থাকতে কিছু বলে গেছেন নাকি—তোমার কাছে? বেগার দিতে চান না—মানে টাকাকড়ি চান কিছু? ফী? ...তা কৈ বলোনি তো এ ক'দিন একবারও।'

নিস্তারিণী যেন একটু বেজার মুখেই বলে, 'বলব কি বলো, তোমার যা মেজাজ, হয়ত বাপ বলতে গেলেও শালা বলে বসবে। ...টাকা চাইবে কেন—টাকা দিতেই চায় উল্টে। তোমাকে বলতে সাহস হয়নি—আমাকে এসে ধরেছে—তোমরা যখন ছিলে না। বলে, আপনি বুঝিয়ে বলুন মাসীমা, আমি ওর ধম্মকম্মে কিছু বাধা দোব না—মন্দির ঠাকুর পিতিষ্ঠে যা করতে চায় করুক—বরং বলে তো আমি টাকা দিয়ে খুব বড় করে পাথরের মন্দির করিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া বিন্দাবনে থাকতে চায় উত্তম কথা, মাঝে মাঝে গিয়ে থাকবে—তাতেও বাধা দোব না। মাঝে মাঝে এখানে যখন থাকবে যদি আমাকে একটু—মানে থাকতে দেয়, তাহলেই আমি খুশী। মাসে সব খরচখরচা ছাড়াও দুশো টাকা করে দোব, নিজের গাড়ি করে দোব আপনি গঙ্গা নাইতে যাবেন—আগাম আলাদা পাঁচ হাজার টাকা দোব এছাড়াও।'

এইখানে পেঁাছে গলাটা নামায় নিস্তারিণী, কিরণ তখন নিচে, 'যদি তার স্মৃতি নিয়েই থাকত, তাহলে এ-কথা বলবার সাহস হত না আমার—তবে, ঐ তো, এখনও ছ'মাস যায়নি, ঐ একটা ছোঁড়াকে নিয়ে তো সেই ঢলাঢলিই করছে—যা বলেছে তাই বলছি বাছা—আমাকে দোষ দিও না— তা আমি তো তবু তার আপ্তবন্ধুর মধ্যে, ...এই সব।'

বলতে বলতেই মেয়ের কঠিন মুখভাবের দিকে চোখ পড়ায় ব্যস্তভাবে বলে, 'আমি অবিশ্যি তাকে বলেই দিয়েছি—এসব কথা আমি কখনও ওকে বলিওনি, বললেও শোনবার মেয়ে সে নয়। সে যা ভাল বোঝে, তাই করে চিরকাল।...আর এভাবে আমি মেয়েকে মানুষও করিনি। সেও যে রাজী হবে বলে মনে হয় না। তা সে নাছোড়বান্দা একেবারে— হেজ্জাহিজ্জী—হাতে-পায়ে ধরতে আসে, বলে একবার বলে দেখুন আপনি—কী বলে!'

ততক্ষণে সুরবালার কঠিন মুখ কঠিনতর হয়ে উঠেছে। এ-ভয়ঙ্কর মুখের সামনে দাঁড়াতে নিস্তারিণীর ভয়ই করে আজকাল। সুরবালা বললে, 'সে-লোকটা এইসব বলে গেল আর তুমি চুপ করে শুনলে, আবার ইনিয়ে-বিনিয়ে সেই কথা আমার কাছে বলতে এসেছ!...কেন, যখন বললে কথাগুলো—তার পায়ের জুতো নিয়ে তার মুখে মারতে পারলে না!'

'তা কেন মারতে যাব বাছা!' এবার নিস্তারিণীরও কিছু জ্বালা প্রকাশ পায়, 'তোমার এত হিতেকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ, এত আসা-যাওয়া ভাব—এত তদ্বির-তদারক করছে তোমার কাজের—গয়নার ছালা উজোড় করে বার করে দিলে তার হাতে, এত বিশ্বেস—আমি মাঝখান থেকে তার চোখের বিষ হতে যাই কেন! তোমার ওপরও তো ভরসা নেই বাছা, আমি তাকে অপমান করি আর তুমি তাকে ঘরে এনে খাটে বসিয়ে পুজো করো! তখন আমার মুখখানি কোথায় থাকবে?...সে যা বলেছে তাই বলছি। তাকেও বলিনি যে, তোমার হয়ে চেষ্টা করব—তোমাকেও বলছি না যে, তার কথা শোন। জুতো মারতে হয়—ইষ্টদেবতা করতে হয়—তুমিই করো। সে তো আমার দ্যাখ্‌তা লোক নয়—তোমারই লোক।...আর এমন কিছু খারাপ কথাও তো সে বলেনি, তোমার কাজ বজায় দিয়ে, তোমার মজি-খেয়াল জুগিয়েই চলতে চায় সে, এতগুলো টাকা দিয়েও চোর হয়ে থাকতে চায়। নিহাৎ চোখে পড়েছে বলেই—'

'হ্যাঁ। সত্যি! মহৎ লোক! এমন ক' কে বলে! তা তোমারও তাহলে তাই বি' দাঁড়িয়েছে, আমি বাজারের মেয়েমানুষ! একটা বাবু করেছি যখন, আর একটাতে আপত্তি কি—এই তো? যদি দু' পয়সা আসে।...ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে কি ঢলাঢলি করছি—ওর সঙ্গে রাত কাটাচ্ছি আমি? কী করতে দেখলে তাই শুনি!'

ক্রমশ মেজাজের উষ্ণতা আর কণ্ঠস্বরের উচ্চতা চড়তে থাকে সুরবালার। 'টাকাই যদি দরকার বুঝতুম—গান ছাড়ব কেন? আর ঘরে বসে খান্‌কীগিরি করেই যদি টাকা রোজগার করতে হয়, তাহলেই বা শ্যাম বড়াল কেন? তারক দত্ত কতবার লোক পাঠিয়েছে জানো? তু করে ডাকলেই ছুটে আসবে—বললে এক লাখ টাকা গুণে দিয়ে যাবে। আরও ঢের আছে। ওর মতো ডাক-সাইটে লোচ্চাকে দশ হাজার টাকার জন্যে ঘরে বসাব কেন? গলায় দড়ি জুটবে না তার আগে এক গাছা?'

তারপর মায়ের আপাদমস্তক একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে, 'কথাটা তোমারও খুব

মন্দ লাগেনি মা, তা বেশ বুঝতে পারছি। এত টাকার আহিংকে তোমার কেন বলো তো?...ঠাকুর ঠাকুর করে সব উড়িয়ে দিচ্ছ—কিছু থাকবে না, এরপর কী খাবে—এই চিন্তা তোমার?...বেশ তো, তুমি কতদিন আর বাঁচবে, বাঁচতে পারো—তোমার কত টাকা লাগতে পারে বাকী জীবনটায়—তুমি একটা আন্দাজ ধরো দিকি. বেশী করেই ধরো—ষাট তো পেরিয়ে গেছে. পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি হবে—না হলেও ধরো আর তিরিশ বছরই বাঁচলে। এই তিরিশ বছরে তোমার কত লাগতে পারে বলো—আমি আলাদা করে তোমার নামে পোস্টাপিসে জমা করে দিয়ে এদিকে খরচ করব। তাহলেই হলো তো?'

আর যা-ই হোক, এতখানি কঠিন কথার জন্যে নিস্তারিণী প্রস্তুত ছিল না। প্রথমটা রক্তের মতো লাল হয়ে উঠেছিল—ক্রমে বিবর্ণ সাদা হয়ে গেল তার মুখখানা। ঠোঁটদুটো শুধু যেন উত্তরের জন্যে বারকয়েক নড়ল শুধু কিন্তু একটা কথাও বলতে পারল না শেষপর্যন্ত। এতই দুঃসহ আঘাত যে চোখে জলও এল না, স্থির দৃষ্টি, যেন মনে পাথর হয়ে গেছে চোখদুটো।

সুরো কথাগুলো বলে ফেলেই চোখ নামিয়েছিল। আবারও পরোক্ষে সেই খোর-পোশেরই খোঁটা দেওয়া হল। মাথা নামিয়েছিল বলেই নিস্তারিণীর মুখের চেহারাটা দেখতে পেল না—নইলে আজ ভয় পেয়ে যেত সে।

নিস্তারিণী কিন্তু ভয়ানক একটা কিছু করল না। চেঁচামেচি শাপশাপান্ত কিছুই না। সেবারের মতো মূর্চ্ছাও গেল না। অনেকক্ষণ পরে শুধু কেমন এক রকমের চাপা বিকৃত গলায় বলল 'আমার টাকার জন্যেই আমি তোমাকে ঠাকুর দিতেথুতে বলতে বাধা দিচ্ছ। আমার টাকার লোভে তাই তোমাকে বাবু ধরতে বলছি। আমার জন্যে যথাসর্বস্ব বেচে কিনে সেখানে দিয়ে যেতে পারছ না।...আরও তিরিশ বছর হয়ত বাঁচব তাই তোমার দুর্ভাবনা?...না, অত বাঁচব না...ই তোকে বলে দিচ্ছি, তুই নিশ্চিন্ত হ।...তুই বাড়ির খদ্দের দ্যাখ—বেচাকেনা যা করবার করে ফ্যাল—তার মধ্যেই তোকে ছুটি দিয়ে দোব। যদি আমি সে-ই এক লোক ছাড়া আর কারও দিকে দুষ্যভাবে না চেয়ে থাকি তো—মা সতীরাণী আমাকে এই লাঞ্ছনার ভাত আর খাওয়াবেন না—টেনে নেবেন এইবার। নাহলে বুঝব চন্দসূর্যি মিথ্যে, দিনরাত মিথ্যে, ভগবান মিথ্যে!

এতকালের মধ্যে আর এমন বেদনাহত কণ্ঠ শোনেনি সুরো। চোখ তুলে মার মুখের দিকে চেয়ে আরও ভয় পেয়ে গেল। আস্তে আস্তে কাছে এসে মায়ের পায়ে হাত রেখে বললে 'মাপ করো মা—শোকে তাপে আমার মাথার ঠিক নেই তুমি আমাকে তাই বলে শাস্তি দিও না। তোমার মনে সেবার [illegible] আমার ওই কাল হল। তুমি এবার আর অপরাধ ধরো না।'

নিস্তারিণী বাধা দিল না, ব্যস্ত হল না, ধরে তোলবারও চেষ্টা করল না—শুধু তেমনিভাবেই বলল, 'তোমার অপরাধ কি মা, অপরাধ আমার। নইলে যাকে পেটে ধরেছিলুম—সে-ই কোনদিন আমার দিকে ফিরে তাকাল না, উদ্দিশ করল না—মুঠো-মুঠো টাকা রোজগার করে শুনেছি—কোন-দিন এক পয়সার মুড়ি কিনে খেয়ো বলে পাঠাল না। তুমি তো তবু মাথায় করে রেখেছ—ব্রত পাব্বন দান ধ্যান—কোন সাধই মেটাতে বাকী রাখোনি। আসলে আর জন্মের পাপ অনেক জমা ছিল তাই এমন বাড়াভাতে ছাই পড়ল—ছেলে থেকেও ছেলে দিয়ে কোন সাধ-আহ্লাদ মিটল না। বৌ হল, সেটাও বাদেছরাদে গেল।...মলে ছেলের আগুনটা পর্যন্ত পাব না। অথচ সে-লোক জ্ঞানত কখনও কারও অনিষ্ট করেনি—হবে-হন্মে নেয়নি কারও একটা পয়সা। ভগবানকে না ডেকে কোনদিন বিছানা থেকে উঠত না—ভগবানকে না ডেকে কোনদিন শুতে যেত না। তার পরিবার আমি আমাকে এসব কথা শুনতেই বা হবে কেন! তুই যদি না পথ দেখাতিস, তারা কি এসব কথা বলতে সাহস করত! তাদের কী এত আস্পদ্দা যে আমি বামুনের বিধবা—আমার সামনে এইসব কথা তোলে, আমাকে দিয়ে এইসব কথা বলায়!

এতটা বলে, বোধহয় ক্লান্তিতেই চুপ করতে হয় একবার। গলাও বুজে বুজে আসছে—অভিমানে, ক্ষোভে, দুঃখে। সে-জন্যেও থামতে হয় হয়ত—খানিকটা সামলে নিতে।

একটু পরে আবার বলে, 'না, রাগ নয়—অনেকদিন হল মা। মনে হচ্ছে পাপেরও এবার শেষ হয়ে আসছে, প্রাচিত্তিরের আর

বাকী নেই। এ-ভাত হয়ত আর বেশী দিন খেতে হবে না।...কাঁদিস নি, আমি তাই বলে আত্মঘাতী হবো না, কি উপোস করেও থাকব না—নাটুকেপনা কিছু করব না, ব্যাগ্রমে ফেলব না তোকে। তবে তুই নিশ্চিন্তি থাক, আর বেশী দিন তোকে ভোগাব না। তোর পায়ের বেড়ি খুলে দিয়ে যাব শিগ্গিরই।'

শ্যাম বড়াল উত্তর নিতে আসেননি। সম্ভবত উত্তরটা আঁচ করেছিলেন। উত্তর কিছু পাঠাতেও দেয়নি কিরণ। সুরো প্রস্তাব করেছিল, একটা পরিপাটি প্যাকেট করে ওর একটা পুরনো জুতো পাঠিয়ে দেবে বড়ালের আপিসে। কিরণ নিষেধ করল। বলল, ছিঃ! যতই হোক কিছু উপকার তোমার সে করেছে। রাজাবাবুর আত্মীয়, বন্ধুলোক। এতটা অপমান করা তোমার সাজে না। তাছাড়া—সত্যি কথাই, ভেবে দ্যাখো, সে যা জানে, যে-জগতে সে বিচরণ করে, সেই-ভাবেই সে কথাটা বলেছে। তোমার সব খেয়াল বজায় দিয়ে—দয়ার দান কিনতে চেয়েছে মোটা দামে। আমার সঙ্গে সম্পর্কও—তুমি আর আমি ছাড়া সবাই কি ওর চোখ দিয়েই দেখবে না? হয়ত তোমার মাও তাই ভাবছেন, তবে আর শ্যামবাবুর দোষ কি। তুমি এখন ভগবানে মন দিয়েছ—তাঁর সেবা করতে যাচ্ছ—মনে এত রাগ রেখো না। তরোরিব সহিষ্ণুনা, তৃণাদপি সুনীচেন—শুনলে না সেদিন আনন্দবাবা বললেন, তবে হরিসেবার অধিকার জন্মায়।...তুমি লোককে আঘাত দেবে কেন, বরং সইতে চেষ্টা করবে সেই তো ভাল।'

শুনেছিল ওর নিষেধ সুরবালা। কোন উত্তর পাঠায়নি আর।...

বৃন্দাবনের বাড়ি তৈরী হয়ে গেল। বিগ্রহও তৈরী, প্রতিষ্ঠার দিন গুরুদেব দেখে দিয়েছেন—অক্ষয় তৃতীয়া। পুণ্যদিন, মন্দির প্রতিষ্ঠা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার যোগও আছে। বৃন্দাবনে সেদিন খুব উৎসবেরও দিন, সেইদিন বঙ্কুবিহারীর চরণ দর্শন হয়—বছরে এই একদিন সেদিন ওঁকে দর্শন করলে বদরীনারায়ণকে দর্শন করা হয়। ছাতু আর ঘোল খেয়ে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ায় ব্রজবাসীরা। সেদিন ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ খাওয়ানোও পুণ্যের কথা।

সুরবালা মাকে ধরে পড়ল, 'এবার তুমি চলো মা। সেখানে সব করবে কে, তুমি না গেলে?'

নিস্তারিণী বললে, 'না।'

'না কেন? তোমার রাগ এখনও যায়নি?'

'তুই পাগলই আছিস এখনও!' কেমন

এক ধরনের হাসি হাসে নিস্তারিণী, তোর ওপর রাগ করে করতে দেখলি? করলেই বা কষ্টটা থাকে। রাগ যদি করা সম্ভব হত, তাহলে আর তোর ভাত খেতুম না। বামুনের মেয়ে পথে আঁচল পেতে ভিক্ষে করলেও একটা পেট চলে যেত—তাতে কোন লজ্জাও ছিল না। তা নয়—রাগটাগ বাজে কথা—তবে আমি বুঝতে পারছি ভেতরে ভেতরে দিন শেষ হয়ে আসছে আমার—সেইজন্যেই আর কোথাও যাব না।'

'এও তোমার রাগের কথা হল!' সুরো কাছে এসে পুরনো দিনের মতো কোলে মুখটা গুঁজে দেয়, বলে, 'না মা, তোমাকে যেতেই হবে। ওসব ওজর শুনব না। যদি শেষ হয়েই আসছে বুঝতে পেরে থাকো—তাহলেই বা আপত্তি কিসের. অতবড় তীর্থ, তীর্থে মৃত্যু হবে, রজ পাবে—সেই তো ভাল!'

'তীর্থ মাথায় থাক, এমনি তীর্থ করে আসতুম সে একরকম কথা। তবে শেষ তীর্থ আমার এখানেই। উনি যে শ্মশানে, যে চিতেয় গেছেন, সেই চিতেতেই যেন যেতে পারি—এই এখন একমাত্র সাধ আমার। যদি পারিস তো হাড় ক'খানা নিমতলায় দিস—তাহলেই আমাকে তীর্থ করানোর ফল হবে তোর।'

'তুমি অমন কথা বলছ কেন মাগো! রাগের মাথায় কী বলতে কি বলে ফেলেছি—সত্যি সত্যিই সেই অপরাধে তুমি আমাকে ত্যাগ করে যাচ্ছ?' সুরো মুখ তুলে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে।

জোর করে ওর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নিস্তারিণী বলে—ঈষৎ একটু ম্লান হাসির সঙ্গে, 'সেই অপরাধে ত্যাগ করে যাচ্ছি কেন বলছিস পাগলী, আমার যাবার সময় হয়নি? তোর গুষ্টি কর্তদিন আগে গেছে বল দিকি? এ-জন্মটা ঐ অত-দিনের—বয়সে-বড় বরের সঙ্গে কাটাতে হল—আবার আসছে জন্মেও তাই করব বলতে চাস? সেই ভাবনাটাই বড্ড হয়েছে—' বলতে বলতে মুখের হাসি আরও আয়ত হয়। প্রসন্ন মুখেই বলে, 'সত্যিই তোর কথা মনে রাখিনি, বিশ্বাস কর। তুই সৎ কাজে মন দিয়েছিস—পুণ্যি কাজে—আমারই দোষ হয়ে-ছিল, বাধা দিতে যাওয়া। তোর সুখ কিসে হয় সেইটেই ভাবছিলুম—। তবে আমারও বোঝা উচিত ছিল, গোচ্ছার টাকা পেলেই সুখ হয় না।'

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে 'সত্যি সত্যিই—তোরা যখন কোলে এলি, কীই বা আয়, উনি হপ্তায় একদিন একটু পরোটা খাবেন বলে গোনাগুষ্টির পরোটা ভেজেছি। ডাল বেটে ধোঁকা করেছি। তবু সেইসব দিনই আমার সুখে কেটেছে, শান্তিতে কেটেছে। না, তুই যা করছিস তাই কর মা, তুই সুখী হ, শান্তি পা—আমি আশীর্বাদ করছি, তুই শান্তিই পা—আর কিছু চাই না আমি।'

'আসলে কি জানিস—' আর একটু থেমে, অকারণেই গলাটা একটু নামিয়ে কেমন যেন কিন্তু কিন্তু ভাবে বলে, 'ঠিক টাকার জন্যেই যে পাগল হয়ে উঠেছিলুম তাও না। তোর একটা ছেলে হল না, মেয়ে হল না—না সোয়ামী, না শ্বশুরবাড়ি, আমি চোখ বুজলে একেবারে একা হয়ে যাবি সংসারে—সামনে অসুমুর জীবন পড়ে—এইসব যখন ভাবি, তখনই মাথা খারাপ হয়ে যায়। তখন কেবল মনে হয়—এখনও তো সময় যায়নি পেলেপুলে হবার। যদি আর কারও ঘর করে—বে তো আর হবার নয়, এখন এমনিই ঘর করা—হয়ত একটা কিছু কানা-কানি হতেও পারে, এই আশাতেই—। নইলে কি ঐসব কথা সত্যিই আমি মুখ ফুটে তোর কাছে বলতে পারি—না কানে শুনি।.. অনেক আশা ছিল রে, সতীমায়ের দান তুই, সন্ন্যাসী বলেছিল ভগবতীর অংশে তোর জন্ম—তোর এমন হবে—। যাকগে, আর ওসব কথা ভাবব না মা, তুইও আর মিথ্যে পেছন পানে তাকাসনি—এ-কুল তো গেছেই ঐ কুলই যাতে গড়ে ওঠে তাই কর। ভগ-বানকেই আশ্রয় কর—যদি তিনি তোর জীবনে আনন্দ আর অবলম্বন দিতে পারেন।'

বলতে বলতে আর আত্মসংযম করতে পারে না নিস্তারিণী, ঝরঝর করে দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে তার। সুরবালা ইতিমধ্যে কোলের ওপর থেকে মুখটা সরিয়ে এনে মায়ের পায়ের ওপর চেপে ধরেছিল, সে বাধা দিল না, টানাটানি করল না, শুধু নীরবে সস্নেহে মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে লাগল—ছেলেবেলার মতো। মেয়েরও যে চোখ শুকনো নেই তা বুঝতে পারল গরম চোখের জল পায়ে গড়িয়ে পড়তে—কিন্তু সেজন্যেও অযথা ব্যস্ত হল না।

অনেকক্ষণ পরে গাঢ়কণ্ঠে সুরবালা ডাকল, 'মা!'

'কী মা?'

'এই শেষ আব্দারটি আমার রাখো মা, তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমি কথা দিচ্ছি মন্দির প্রতিষ্ঠে হয়ে গেলে আর একদিনও ধরে রাখব না। আমি নিজে সঙ্গে করে ফিরে আসব।'

'তুই বললে আমি যাব—যেতেই হবে, কিন্তু না-ই বা টানা-হেঁচড়া করলি আর। শরীর ভেঙে আসছে—যদি সেখানে গিয়ে শয্যাধরা হয়ে পড়ি—মিছিমিছি আনন্দের মধ্যে একটা অশান্তি—ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়া। তার চেয়ে কাজ শেষ হলেই চলে আসিস—আমি বলছি তোর কোন ব্যাঘাত হবে না।'

'কিন্তু মন তো এখানেই পড়ে থাকবে মা, বিশেষ এসব কথা শোনার পর—সে তো আরও অশান্তি. কেবলই ভয় হবে—যদি তোমার একটা কিছু হয়ে পড়ে। তাহলে না হয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা বন্ধই থাক—কিছুদিন পরে হবে বরং।'

'না না, বাপরে!' নিস্তারিণী ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে কি ছেলেখেলা! মন করেছিস—তোর গুরু মন দিয়েছেন—এখন আর বন্ধ রাখা যায় না। তুই চলে যা—। ভয় নেই তোর হাতের জল না খেয়ে আমি মরব না। তবে—আসল কথাটা তো তোকে বললুমই। তুই এই বয়সে সব সাধ-আহ্লাদ ঘুচিয়ে দিয়ে যোগিনী হলি—মরণের জন্যে তৈরী হতে শুরু করলি এই বয়স থেকে—ঠাকুর প্রতিষ্ঠা মানে প্রতিষ্ঠা মানেই পরকালের জন্যে তৈরী হওয়া—সে আমার বুক ভেঙে যাবে মা, ও-জিনিস আর চোখে না-ই দেখলুম! ছেলেমেয়ে হয়নি—তুই বুঝবি না, দেবতা বল, ধম্ম বল—সন্তানের ওপর কেউ নয়। ঠাকুর আমার মাথায় থাকুন—হয়ত করছিস ভালই করছিস. তবু একটা অবলম্বন আশ্রয় হয়ে রইল দেখে গেলুম। কিন্তু আমাকে আর তার মধ্যে টেনে নাই নিয়ে গেলি!'

(ক্রমশঃ)

মা-লক্ষ্মীরা শুনুন!
সংসার-খরচায় কি
কুলিয়ে উঠতে
পারছেন না? তাহলে
এক কাজ করুন...
ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্কে
একটা সেভিংস্ অ্যাকাউণ্ট খুলুন
তাতেই ঝাঁচোয়া।
BILL
কথায় বলে,
হিসেবের কড়ি
বাঘে খায় না।
ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ মারফৎ আপনি
আপনার খরচ খরচার হদিশ পাবেন।
কবে কত জমা হল, কবে কত তোলা হল
—আপনার পাশ বই'এ নিয়মিত
সব হিসেব পাবেন।
বাড়ি ভাড়া, ইন্সিওরেন্সের কিস্তি ইত্যাদি পাওনা
স্বচ্ছন্দে চুকিয়ে দিতে পারবেন।
দিব্যি হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায় ব'লে মেয়েরা
আজকাল দলে দলে ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজে
এসে সেভিংস অ্যাকাউণ্ট খুলছে।
এ সপ্তাহে আপনিও আসুন। এসে দেখা করুন।
মাত্র ৫৲ টাকা দিয়েই অ্যাকাউণ্ট খুলতে পারেন।
ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
(যুক্তরাজ্যে সমিতিবদ্ধ। সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ।)
কুদে থেকে টাই, সকলেরই ঠাঁই
'দুশ্চিন্তা বন্ধ ক'রে সঞ্চয় চালু করার উপায়'—
এই বিনামূল্যের পুস্তিকাটি যাঁরা চান,
তাঁরা স্থানীয় ন্যাশনাল অ্যাণ্ড
গ্রিণ্ডলেজে চিঠি লিখুন।
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
NGB-19A/68 BEN

পথে ও পথের প্রান্তে

এই কলকাতায় এককালে ধনী লোকে লক্ষ টাকা খরচ করে পোষা বানর বা বেড়ালের বিয়ে দিয়েছে। হীরা মুক্তা বসানো ভেলভেটের পোশাক পরে, হাতীর পিঠে রাজাসনে বসে, টোপর মাথায় বানর বর যখন ব্যাণ্ড বাজিয়ে জুলুষ নিয়ে কনের বাড়ী গেছে, তখন রাস্তার দুপাশে কাতার দিয়ে সাধারণ মানুষ মুগ্ধ অবাক চোখে দেখেছে, আর মনে মনে বরকর্তার উদ্দেশ্যে বলেছে, "ধন্য, ধন্য!"

আজকের বুদ্ধিমান মানুষ এর বিবরণ পড়ে ঘৃণাভরে নাক কুঁচকে অন্তত দুবার বলে, "বর্বর!"

তাহলে বিলিতি সাহেব যখন পোষা কুকুরটি মরে গেলে রীতিমত সমারোহের সঙ্গে যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে তাকে কবর দেন ও তার ওপর মার্বেল পাথরের মহামূল্য স্মৃতিস্তম্ভ তুলে দেন, তখন তাকে কি বলবেন? বুদ্ধিমান আধুনিক এখানে কিন্তু কাৎ। বলবেন, ও বাবা! ওটা অন্য জিনিস—অবোলা জীবের প্রতি প্রেম, যা আমাদের ওদের কাছ থেকে শিখতে হবে।

চমৎকার যুক্তি—কবর দিলে হল জীব-প্রেমিক, আর বিয়ে দিলে হল বর্বর! মানতে রাজী নই, মাপ্ করবেন।

বিলিতি সাহেবের দেখাদেখি কুকুরের কবর আমাদের মধ্যেও অনেকে দিয়ে থাকেন, টিয়া পাখী বা ময়না পাখীরও। কিন্তু দেখাদেখি নয়, এই দেশেরই ধর্ম ও ঐতিহ্যের অঙ্গ হিসাবে মনুষ্যেতর জীবের সমাধি এই কলকাতা শহরেই নিয়মিত অনুষ্ঠান সহকারে দেওয়া হয়ে থাকে সে খবর সকলে রাখেন কি?

এক কর্মক্লান্ত অপরাহ্নে শহরের অনতিদূরে "ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়" কোন এক আশ্রমপরিবেশে বসে থাকতে থাকতে এই কথাগুলি মনে আনাগোনা করছিল। একটা "অ্যাসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ" অবশ্যই ছিল। এই মন্দির-প্রাঙ্গণেই নিয়মিত অতিশয় দরদ ও শ্রদ্ধাভরে মাছের মৃতদেহের সমাধি দেওয়া হয়।

জায়গাটা উত্তর শহরতলীর দুটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বড় রাস্তার মাঝামাঝি একটা বিন্দুতে। অনেকের কাছে সুপরিচিত, অনেকের কাছে নয়। দমদম এয়ার পোর্টের পথে নাগের বাজারের কাছে—যশোর রোড দিয়েও প্রবেশ করা যায়, বিপরীত দিক থেকে কলকাতা-দমদম সুপার হাইওয়ে দিয়েও। মন্দিরের নামে রাস্তার নাম গোরক্ষবাসী রোড।

প্রায় একশ বিঘা জমির ওপর গোরক্ষনাথের এই মন্দিরটিকে প্রাচীন বলা যায় না। তবে জায়গাটি ইতিহাসের সোনালী আলোয় মণ্ডিত বলে লোকের বিশ্বাস। কলকাতার "নাথ" সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীদের মধ্যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে এইখানে এক পুকুরের ধারে বসে তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু গোরক্ষনাথ এক সময় তপস্যা করেছেন।

অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত পাঞ্জাবের সন্ত গোরক্ষনাথ তাঁর মত প্রচার করতে করতে পূর্ববঙ্গ, আসাম হয়ে নেপাল পর্যন্ত গিয়েছিলেন। নেপালের "গুরখা"-রা আজও তাঁর নাম বহন করছে। তাঁর প্রচলিত মত সম্বন্ধে এখানে বেশী কিছু বলবার অবকাশ নেই, মোটামুটিভাবে বলা যায় "নাথ" সম্প্রদায় উত্তর বৌদ্ধদের একটি শাখা, এবং ভারতের সর্বত্র—পাঞ্জাব, রাজস্থান থেকে শুরু করে কামরূপ পর্যন্ত এঁরা আছেন।

গোরক্ষনাথের সঙ্গে বাংলাদেশের বিশেষ সম্পর্ক বর্তমান এই হিসাবে, যে পূর্ব-

বাংলার প্রাচীন লোকসাহিত্যের অন্যতম স্তম্ভ "ময়নামতীর গান" নাথ সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত। যাঁর নামে "ময়নামতীর গান" ত্রিপুরার রাণী সেই ময়নামতীর গুরু হাড়ি সিদ্ধা ছিলেন নাথ গুরু। ময়নামতীর ছেলে গোপীচন্দ্রের অকাল সন্ন্যাস এই গানের বিষয়বস্তু।

পূর্ববংগের নাথেদের অনেক প্রথা সেখানকার হিন্দুদেরও প্রভাবিত করে। গরু বাচ্চা দিলে নতুন গরুর দুধ মানুষকে খাওয়াবার আগে গোরক্ষনাথের উদ্দেশ্যে আগে উৎসর্গ করা হয়। এ প্রথা পূর্ববংগে অনেক হিন্দু গৃহস্থ পালন করে থাকেন।

জৈন প্রভাবের ফলে নাথেরা নিরামিশাষী এবং এইদিক থেকে তাদের কোন কোন প্রথা থেকে তাদের জৈন বলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষত কলকাতার নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ যাঁরা, তাঁরা মারোয়াড়ী বলে খ্যাত সেই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্গত যার বেশীর ভাগ জৈন, এবং ভ্রান্তির কারণও তাই। বাগড়ী, কোঠারী ডাগা ইত্যাদি নাম শুনে এ'দের জৈন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই নামে অনেকে কলকাতায় আছেন যাঁরা নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত।

মন্দিরের ভিতরে একটি পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসেছিলাম। পুকুর ঘাটটি অনেককাল আগের তৈরী বলে মনে হয়। পাশে দাঁড়িয়ে একটি অতিকায় নিম গাছ—অত উঁচু আর বেড় দেখে মনে হয় গাছটির অনেক বয়স। একটু দূরে মন্দিরের প্রবেশ পথ থেকে সোজা চলে এসেছে নারকেল গাছের বীথি, দুপাশে ঘৃতকুমারীর বাগান। নির্জনে বসে নিরুপদ্রব সংচিন্তার পক্ষে আদর্শ জায়গা। এই পুকুর পারে গোরক্ষনাথ মহাপ্রভু ধুনী জ্বালিয়েছিলেন বলে লোকের বিশ্বাস। পুকুরের শান্ত স্বচ্ছ কালো জলের তলার অনেকদূরে পর্যন্ত দেখা যায়। কত বিচিত্র জলের গাছের দাম—তার ফাঁকে ফাঁকে রুই কাৎলা মাছের সোনালী রুপালী পেটের ওপর থেকে আলোর ঝিলিক চাকতে ঠিকরে পড়ে আবার মিলিয়ে যায়। জলে একটু নাড়া দিলেই খাবারের লোভে কিলবিল করতে করতে মাছগুলি পাড়ের দিকে এসে জল তোলপাড় করে। তাদের কালো কুচকুচে পিছল পিঠগুলো এ'কেবেঁকে এক বিচিত্র তরল ছন্দ তোলে।

"একটু মুড়ি ছিটিয়ে দিলে দেখবেন ভেতর থেকে এই বড় বড় রুই মাছ চলে আসবে—" বললেন মন্দিরের একজন সাধুবাবা।

"তাই নাকি"—চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করে ওঠে—আর সাধুবাবার চোখ দুটো একটা বিশেষ অর্থ মিশিয়ে আমার চোখে কি যেন পাঠ চায়। লজ্জায় কালো হয়ে উঠি। অধম সম্পাদকমশাইয়ের কাছে? পেটের, জিভের যত লোভ সব একত্র হয়ে দুই চোখের দুইটি বিন্দুতে এসে জ্বলে উঠেছিল। না, ও পুকুরের মাছ খাবার জন্য নয়—সাধুবাবা মাছের কথা বলছিলেন, নিছক জীবের প্রতি প্রেম থেকে।

এই পুকুরের যত মাছ, সব এই মন্দিরের অধিবাসীদের মতই এক একজন এক একটি ব্যক্তি। এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব আছে যা দিয়ে এখানকার লোকেরা তাদের আলাদা আলাদা করে চিনতে পারে। এদের কোনরকম আঘাত দেওয়া বারণ এবং এরা এই জলে জন্মে এই জলেই দেহ রাখে।

আর মৃত্যুর পর? তাদের নশ্বর দেহ শোকযাত্রা করে জল থেকে তোলা হয়। শুনেছি আগে আগে নাকি মাছের শব রীতিমত শবাধারে শুইয়ে নতুন শাদা কাপড়ে ঢেকে নিয়ে যাওয়া হত মন্দিরের সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে। সেখানে তার পারলৌকিক ক্রিয়াদি করে তার পর সেই সমাধিভূমিতে যেখানে মঠের স্বর্গত সাধুদের দেহ চিরনিদ্রায় শায়িত আছে তাদেরই পাশে সমাধি দেওয়া হত। এখন অতটা হয় না, তবে মৃত মাছ জল থেকে তুলে এনে, পাঁচ সের নুন আর আত্মার নামে উৎসর্গ করে সেই নুনসমেত মাছের দেহকে সমাহিত করা হয়। নাথেরা সর্বজীবে আত্মার অবস্থিতিতে বিশ্বাসী।

*

বেশ কিছু কৌতুকের খোরাক পাওয়া গিয়েছিল কয়েকদিনের মতন, যখন এক একদিন এক একজন ছাত্র হঠাৎ কোথা থেকে এক একটা মার্কশীট হাতে করে দৈনিক সম্পাদকমশাইয়ের দর্শনপ্রার্থী হচ্ছিল। কী ব্যাপার—না রামের ফল যদুর ঘাড়ে চলে গিয়েছে, পাশ করা ছাত্র ফেল হয়ে গেছে, যিনি প্রথম তিনি হয়েছেন শেষ—ইত্যাদি। বোর্ডের কাছে জবাব চাওয়া হলে, দেখা গেল, সত্যই তো—মার্কশীটে যোগে ভুল। ভুল শোধরাতে দেখা গেল হয়ত শেষে উঠেছিল যাঁর নাম, তিনি এক রকেট লাফ দিয়ে একেবারে শীর্ষে উঠে গেছেন, শীর্ষে যিনি ছিলেন তিনি পুনর্মূষিক হয়ে তলায় চলে গেছেন। ফেল করে যিনি এ পৃথিবীকে মুখ দেখাবেন না ভেবেছিলেন তিনি পাশ হয়ে আবার দুনিয়ার সঙ্গে "ছোটী", "বড়ী" সব রকম মুলাকাৎ করছেন।

যাক্‌ সে পর্ব শেষ হয়ে গেছে। ভুলচুক মানুষেরই হয়। যার হয় না সে মানুষ নয়, হয় দেবতা, নয় শয়তান। কিন্তু বোর্ড থেকে একটা যে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল তার জবাব আজও কেউ দিতে পারেন নি—যে ছাত্রকে যোগের ভুলে পাশ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে কি ভুল শুধরে ফেল হতে এসেছিল বঙ্গ সন্তান, বড় রুই মাছের উল্লেখ মাত্রে আসে নি। কিন্তু সে না এলেও অপরের আসার বিরাম নেই। সেদিন যিনি এসেছিলেন তাঁর কথা মনে গেঁথে থাকবে চিরকাল। তাঁরও হাতে একটি মার্কশীট। প্রাক-বিশ্ব-বিদ্যালয় পরীক্ষার ফল। কী আরজি? না, দেখুন সার, টোটাল দিয়ে পাস মার্কের চাইতে তিন মার্ক বেশী আছে, অথচ এ'কে ফেল করানো হয়েছে। অবশ্যই একটি মারাত্মক ভুল, এবং দৈনিক কাগজে এ ভুলটি দেখিয়ে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দুঃখের সঙ্গে ভুলটি স্বীকার করে ছাত্রটিকে পাশ করিয়ে দেবেন, এই আশা বুকে নিয়ে সে এসেছে।

এমন দুঃখে সমবেদনা জানাবে না কোন পাষাণ হৃদয়! অতএব অল্পবয়সের অতি চটপটে সহকর্মী বললেন, "দেখি মার্ক-শীটটি?"

গোবেচারার মত মুখ করে ছাত্রটি মার্কশীট দিয়ে দেন, এবং সহকর্মী সহসা একটি অদ্ভুত কাজ করে বসেন। কাগজটা উঁচুতে ধরে আলোর বিপরীত দিক থেকে কি যেন দেখলেন, তার পর আমার হাতে দিয়ে বলেন, "মার্কগুলো লক্ষ্য করুন, কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছেন?"

পেয়েছি, শাদা চোখেই ধরা পড়ে। প্রতিটি নম্বর ঘিরে ঠাকুর দেবতাদের মাথায় যেমন দিব্যজ্যোতি থাকে, তেমনি ক্ষীণ একটি চিহ্ন। অর্থাৎ একটি রাসায়নিক পদার্থের একটি ফোটার চিহ্ন যা দিয়ে ওখান থেকে একটি কালির লেখা অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে। কালির সঙ্গে কাগজের রঙও খানিকটা জ্বলে যাওয়ায় ওইরকম অস্পষ্ট শাদা দাগ রয়ে গেছে। ওটা "লেম্যান" এর চোখে পড়বে না এই আশায় ছাত্র নির্ভয়ে মার্কশীটটি আমাদের পরীক্ষার জন্য হাতছাড়া করেছেন।

"আপনিই কি ক্যানডিডেট?" জবাবে ছাত্রটি বলে, "না—আমার হাতে যে এটি পাঠিয়েছে সে আমার পরিচিত।"

"তাকে বলবেন, তিনি যা করেছেন তাতে অন্তত তিন বছরের মত তার পরীক্ষা দেবার আশা ঘুচে গেল।"

"নিশ্চয়, যদি করে থাকে তবে তার শাস্তি পাওয়া উচিত," বলে গুটি গুটি তিনি পশ্চাদপসরণ করলেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে মার্কশীট দেওয়া হয়েছিল সেগুলিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অদৃশ্য করে দিয়ে ছাত্রমহোদয় নিজ সুবিধা মত হিসাব করে মার্ক বসিয়েছেন। তিনি জানাতে এসেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুল হয়েছে। কি করা যাবে, ভুল হয়, এবং মারাত্মক ভুল হয় এটা যে একবার প্রমাণ হয়ে গেছে!

এইরকম জাল মার্কশীট এবার নাকি অনেকগুলি ধরা পড়েছে। এও তো দেখা যাচ্ছে আরেক বিপদ!

—স-সে

অভিযুক্ত

কাহিনী

ছোট্ট পা

দাইনে দ্য ম্যারিয়ার

[দাইনে দ্য ম্যারিয়ারের যে পরিবারে জন্ম সেই পরিবারে জন্মেছিলেন বিখ্যাত উপন্যাস TRILBY রচয়িতা। এই পরিবারটি তৃতীয় নেপোলিয়ানের রক্ষিতা-বংশোদ্ভূত—এবং সেই কারণে পারিবারিক পটভূমি যথেষ্ট ঐতিহাসিক। দাইনে দা ম্যারিয়ার রচিত 'রেবেকা', 'মাই কাজিন র‍্যাচেল', 'গ্রীন হিল'. প্রভৃতি উপন্যাস বিশ্ব-বিখ্যাত।]

মারকুই এখন হোটেলের বারান্দায় আরাম কেদারায় দেহ মেলে পড়ে আছে, অঙ্গে একটি পাতলা সিল্কের ওড়না ঢাকা। মাথার চুলগুলি ক্লিপ দিয়ে আঁটা। আবার সেই কেশদাম রিবনে জড়ানো। হাতের পাশের ছোট টেবলটায় তিন রকম রঙের নেল পালিশ। তিন আঙুলে তিন রকম রঙ লাগিয়ে মারকুই দেখছে কোনটা লাগানো যায়। বুড়ো আঙুলের রংটা টকটকে লাল। মনে হবে যেন রক্তের স্পর্শ। মৃদু গোলাপি রঙটা বড়দরের পার্টিতে বেশ জমে। বেহালায় বাজবে রোদন-ভরা সুর, বলনৃত্যের বহুমূল্য গাউনটা অঙ্গে জড়িয়ে, গলায় মুক্তার সাতনরী হার পরে, অস্ট্রিচের পালকের তৈরী হাতপাখাটি ধীরে ধীরে দোলাবে, আর আমন্ত্রিতরা তার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে।

মাঝের আঙুলের নীলকান্তমণির রঙ ভারী সুন্দর, শিশিরভেজা আলোর আগমনী। নীচের লনে পিউনি ফুলের বেডের দিকে চেয়ে দেখলে ফুলগুলি যেন লজ্জায় ম্লান। রঙ পছন্দ হল, নখের রং তুলে ঐ পিউনি ফুলের রং দিয়ে নখ রাঙিত করবে। সময় আছে অনেক। নিদাঘ-তপ্ত দিন। ততক্ষণ বরং একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক—হাতের নখগুলি নিরীক্ষণ করে মারকুই পরিব্রাজিকার আশীর্বাদের মুদ্রায়।

এরপর দুটি চোখ বন্ধ করে সেই গ্রীষ্মশ্রান্ত অপরাহ্নের সঙ্গ-পরশ-হারা স্বস্তিটুকু উপভোগ করে। নীচে কারা চেয়ার নিয়ে নড়ানাড়ি করছে, শোনা যাচ্ছে কে কাকে হুকুম চালাচ্ছে। লনের ওপর বিচিত্রিত ছাতার নীচে চায়ের টেবিল পড়ছে, পেয়ালা-পীরিচের জলতরঙ্গ। কোথায় বিছানায় যেন কে চেপে বসল, পিছনে হয়ত আছে শিশুর কলরব। কোন এক স্বপ্নলোকের স্পর্শ, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাগর জলের কান্না। নিদারুণ হতাশার একটা দুঃসহ যন্ত্রণা অন্তরকে আকুল করে দেয়।

একটানা ছুটি, অখণ্ড অবসর, নির্ভেজাল মুহূর্ত, বিরতিবিহীন বিরাম। কিন্তু এই সীমাহীন ছুটির ভেতর আনন্দ কই, পরিতৃপ্তি কই। সঙ্গ-পরশহারা চিত্তের জ্বালা যে হৃদয়টাকে হিংস্র শ্বাপদের মত আতঙ্কিত করে দিচ্ছে। এই যে নিঃসঙ্গ কারাগারে সে বন্দিনী কি ভাবে মুক্তি পাবে তার থেকে। পরিপূর্ণভাবে অবাধ ছুটিতে সে ত কই তার ডানা মেলে দিতে পারছে না।

নেল-পালিশের বোতলগুলির স্পিরিটের গন্ধে লুব্ধ হয়ে একটা ভ্রমর গুনগুনিয়ে গেল। মারকুই লক্ষ করল ভ্রমরটা আবার নীচে গিয়ে একটা ফুলের বুকে উড়ে বসল।

মারকুই হাত বাড়িয়ে একটি চিঠি তুলে নেয়। এ চিঠি লিখেছেন তাঁর স্বামী এডওয়ার্ড,—

প্রিয়তমে—বড় কাজের চাপ। একটুও সময় পাচ্ছি না যে তোমাদের নিয়ে আসি। এতবড় কারবার সবই একহাতে চালাতে হয়। তুমি বরং তোমার শরীরটা একটু তাজা করে নাও, সমুদ্র-স্নান, বিশ্রাম, আহার, নিদ্রা এইভাবে দিনগুলো দেখতে দেখতে শেষ হবে, তারপর আমি মাসের শেষের দিকে গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসবো—ইত্যাদি।

চিঠিখানা মাটিতে আবার উড়ে পড়ে মারকুই-এর শিথিল হাত থেকে। তার মুখে বিষাদ-ভরা হাসি। দিন-রাত খালি কাজের ভীড়, সব কিছুর জন্য সময় আছে, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে দুদণ্ড বসে কথা বলার সময় কই।

লোকে হয়ত ভাবে তার কত সুখ, সে যেন রাজরাণী—মাদাম-লা মারকুই। চাকর-বাকর দিনরাত উঠতে বসতে সেলাম দিচ্ছে। শুভ্র জুঁইফুলের মত দুটি মেয়ে—এমন গা-ঢালা স্বাস্থ্য—আরও কি তার চাই।

ডাক্তারের মেয়ে মারকুই, শীর্ণা জননী শরীর ভরা ব্যাধি। মঁসিয়ে লে মারকুই তাকে দেখেই বিয়ে করে বসলেন—নইলে ত' বাবার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেই ছোকরা ডাক্তার কপালে নাচছিল।

মঁসিয়ে লে মারকুই-এর বয়স চল্লিশ অতিক্রান্ত, তাঁর সব ছিল শুধু একটা ঘর সাজানোর মত রূপসী গৃহিণী ছিল না। সে অভাব মিটেছে, দুটি ছোট মেয়ে এসেছে সংসারে। একরকম সুখের জীবনই বলা যায়।

ড্রেসিং টেবলের সামনে এসে মাথার ক্লিপগুলি আস্তে আস্তে খুলে ফেলল, এইটুকু খাটুনিতেই সে ক্লান্ত। গায়ের পাতলা আবরণটুকু ফেলে দিয়ে পুরোপুরি উলঙ্গ হয়েই বসল মাদাম মারকুই।

বিয়ের আগে কি সব দিনই না কেটেছে। পথ চলতে কেউ যদি ওদের দিকে একটু নজর দিয়েছে অমনই সবাই হেসে উঠত। লুকিয়ে লুকিয়ে চিঠি পড়া হত আর মাঝে মাঝে চুপি-চুপি কত কথা। যখন তখন সে কি হাসির ফোয়ারা।

এখন আর কার কাছে হাসবে, কাঁদবে। কার কাছে বলবে মনের কথা। মাদাম লা মারকুই পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর সেই হাসির স্রোত নিঃশেষিত। এদের সামনে ওজন করা কথা, ঠোঁট চেপে হাসাটাই হল ভদ্রতা। এরা সবাই ভাগ্যবান সফল জীবনের মানুষ। আত্মীয়-কুটুম্ব সবাই বেশ অভিজাত গোষ্ঠীর মানুষ। শীতকালেও কোনো নবাগত আসে না। এলেই বা কি, বড় ঘরের বউদের ত আর মনের কথা প্রকাশ করতে নেই, মাত্রা ছাড়িয়ে হাসতে নেই।

এর মধ্যে একটু আনন্দ ছিল মারকুই যখন তার কারবারের সঙ্গীদের আমন্ত্রণ করে আনতেন। তারা মাদামের রূপ-লাবণ্যের প্রশংসা করত। তার হস্ত চুম্বন করত বেশ শ্রদ্ধা নিয়ে।

পার্টি চলার সময় মাদাম অনেক সময় কোনো অনুরাগীকে পছন্দ করত। মনে মনে তার সঙ্গ কামনা করে কল্পনা বিলাসে মত্ত হত। লুব্ধ মানুষের নজর মেয়েদের মনে মাদকতা জাগায়।

চুলটা বাঁধা হল, নতুন ধাঁচের বন্ধন। তারপর শাদা সিল্কের পোশাক অঙ্গে জড়িয়ে নিতে হবে। এইবার ঐ রঙদার বিরাট ছত্রছায়ায় গিয়ে খেতে বসবে। সঙ্গে থাকবে মেয়েরা। মেয়েদের কারো চুলটা একটু সরিয়ে দেবে, আর সবাই মনে মনে ভাবে এই ত করুণারূপিণী জননী। ভুবন-মোহিনীর পরিপূর্ণ বিকাশ ত মাতৃ-মূর্তিতে।

এদিকে আরসীর বুকে ফুটে উঠেছে এক অটুট যৌবনা উজ্জ্বল স্বাস্থ্যভরা সুডৌল নগ্নমূর্তি। অজস্র ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার এই দেহ। কিন্তু তবু মাদামের মুখ বিষণ্ণ। কত মেয়ের গোপন প্রেমিক আছে। আজ-কাল ত' চারদিকেই কতরকমের কলঙ্ক-কথা শোনা যায়। সেবার পার্টিতেও একজন মহিলা অঙ্গভঙ্গী করে কি সব ইঙ্গিত করেছিলেন আর সবাই একেবারে হেসে ঢলে পড়ছিল।

একজন ত' তাড়াতাড়ি পালালেন বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে। হয়ত বাড়ি ফিরে পোশাক পাল্টিয়ে কোন বলিষ্ঠ বাহুর উদার আশ্রয়ে মুখ লুকালেন কে জানে!

অমন যে এলিস, মাদামের ছোটবেলার বান্ধবী, তারও একজন গোপন প্রেমিক আছে। তার এই মন-আর্মিটির সঙ্গে সপ্তাহে দুটি দিন মেলামেশা হয়। একটা মোটর আছে ভদ্রলোকের, সেই মোটরে দুজনে বিহার করে। সোমবার আর বৃহস্পতিবার দুটি দিন ওদের বাঁধা।

এলিস আবার ওকে চিঠি লিখে জানতে চায় ওর কজন ভালোবাসার মানুষ আছে। কেমন লাগে তাদের সঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু কি যে ছাই লিখবে—লেখার কিছু বিষয় নেই, খালি দু-একটা চুটকি খবর।

ওকে এমন অবস্থায় দেখে ঝাড়ুদারটা পালালো বোধ হয়। তার ব্রাশের আগাটা শুধু দেখা গেল। লোকটা একটু আগে বারান্দায় লক্ষ্য করছিল। হয়ত মনে মনে ভাবছে মেয়েটা একা একা রয়েছে, অথচ কেমন সুন্দরী।

কি বিশ্রী গরম। গা বেয়ে ঘর্মস্রোত প্রবাহিত।

শাদা পোশাকটি অঙ্গে জড়িয়ে চোখে গগলস দিয়ে একটা প্রস্ফুটিত সূর্যমুখীর মত ভঙ্গী করে বারান্দা থেকে নীচে তাকায়। রেলিংটা বেশ তেতে আছে, গায়ে লাগে। তবু এই রেলিং ধরে মাদাম নীচের জীবন লক্ষ্য করে। কারা যেন হাসছে। একটি পুরুষে আর একটি নারীর গলা। সিগারেটের মধুর গন্ধ। গ্লাস রাখার শব্দ। একটা কুকুর গরমের দাপটে হাঁফাচ্ছে জিভ বার করে। বালি ভেঙে কয়েকজন পুরুষ খালিগায়ে রোঞ্জের প্রতিমূর্তির মত দৌড়ে আসছে। এসেই তোয়ালেগুলো চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলে কুকুরটাকে শীষ দিয়ে আদর করে। লোকগুলির প্রাণে বেশ ফুর্তি আছে। এদের দেখে ওর মনে একটা জ্বালা জাগে।

রেলিং-এর পাশে সাজানো টব থেকে একটা গোলাপ ফুল তুলে নিয়ে বুকের কাছে ফ্রকটায় এঁটে নিতে নিতে মাদাম ভাবে, ভালোবাসা একটা আলাদা ব্যাপার। দুটি হৃদয়ের মধ্যে হৃদয় বিনিময়। তারপর গোপন মিলনের মাধুরী মুহূর্তে। বার সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক, তার ভেতরে কোনো লেন-দেনের ব্যাপার নেই। দেহের চাহিদা মেটানোটাই ত' সব নয়, সে ত' যে কোনো পুরুষই পারে, সে ত' একটি বিশেষ মুহূর্তের আনন্দ। যদি ভালোবাসা না থাকে।

হোটেলটা এতক্ষণে সজীব হয়ে উঠেছে। অনেকে আসছে গাড়ি করে দুপুরের খাওয়া সেরে নেবে। কলরব, সিগারেটের ধোঁয়া, পেয়ালা-পিরীচ নাড়া-নাড়ির আওয়াজ। হোটেল এমনই কলরব-মুখরিত যে সমুদ্রের কলরোলও যেন শান্ত হয়ে পড়েছে।

মেয়েরা ফিরছে তাদের ইংরেজ গভর্ণেসের হাত ধরে, ওকে দেখে মামি-মামি বলে আনন্দভরে চেঁচিয়ে ওঠে। মাদাম হাত নেড়ে তাদের আনন্দে অংশ গ্রহণ করে। মেয়েদের ভঙ্গী লক্ষ্য করে সবাই ওর দিকে তাকাচ্ছে, সঙ্গের বন্ধু-বান্ধবীদের প্রতি ইঙ্গিত করছে। ওরা যে কি কথা বলছে তা বেশ বোঝে মাদাম; সবাই বলছে কেমন মেয়ে দুটি, আর মা-টি কেমন চমৎকার।

কি মূল্য এই প্রশংসার। এই ভালো-লাগার অভিব্যক্তি ত' সব সময় শোনা যায়, খেতে বসে, খেলতে গিয়ে, সাঁতার কাটার সময়। সবাই বলে বাঃ কী চমৎকার। কি খানদানি চেহারা! কিন্তু তাতে কি ওর নিঃসঙ্গতার দুঃখ মেটে। দুটি ছোট মেয়ে আর গভর্ণেস মিস ক্লো।

—মামি! মামি! বালির ভেতর একটা ষ্টার ফিস্ দেখেছি, ওটা আমি নিয়ে যাবো—

ছোট বাচ্চাটি একথায় আপত্তি জানায়—কখনই নয়। আমিই আগে দেখেছি। তারপর দুজনে জাপটা-জাপটি করে ঝগড়া করে। মাদাম মারকুই বিরক্তি প্রকাশ করে বলে—কি হচ্ছে তোমাদের, আমার মাথা ধরবে দেখছি—

গভর্ণেস বেচারী দুজনের এই সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য উদ্যোগী হয়ে বলে ওঠে,—মাদাম বুঝি বড় শ্রান্তি বোধ করছেন, বড় গরম ত'। আপনি বরং খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম নিন। দুপুরে একটু জিরোন ভালো। সে এই বলে নিজের কাজ গুছিয়ে নেয়।

বিশ্রাম! কথাটি ভালো লাগে না। খালি বিশ্রাম! বিয়ের পর থেকে দুটি কথা শুনতে শুনতে একেবারে প্রাণ বেরিয়ে গেল—বড়ো শীত, বাইরে যাওয়া চলবে না। বড় গরম কোথায় বেরিয়ো না যেন।

প্যারিসের বাড়ি যেই দুপুর হল অমনি শার্সি-কবাট বন্ধ করো—বিছানায় গা মেলে দাও। বাড়ির সবায়ের এই এক হাল। ওর দেহটা এমনি করে পুতুলের মত তুলতুলে হয়ে পড়েছে। স্বামী চান বিশ্রাম করি, গভর্ণেস চান বিশ্রাম করি—আর কিছু করার নেই, বিশ্রাম করো। বিশ্রাম করো। একটু চড়াগলায় মাদাম জবাব দেয়—না না, আমি মোটেই ক্লান্ত হয়ে পড়িনি। লাঞ্চ সেরে একটু শহরের দিকে যাবো।

মিস ক্লো বেচারী ত' অবাক। সে সবিনয়ে বলে— মাদাম কোথায় যাবেন। দোকান-পাট সব ত' তিনটে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। বরং বিকালে চলুন—আমিও কাজ-কর্ম সেরে বেবিদের নিয়ে সঙ্গে যাব।

মাদাম নিরুত্তর।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করেই ওপরে উঠে এল মাদাম। অতি দ্রুতভঙ্গীতে মুখের ওপর এক পোঁচ রঙ চাপিয়ে সেজেগুজে, ফিলমের রোলগুলি হ্যাণ্ডব্যাগে পুরে নিল। সঙ্গে নিল আরো দু-একটা দরকারি জিনিস। মিস ক্লো পাশের কামরায় ওদের ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে, মাদাম এই সুযোগে লঘু পায়ে একেবারে পথে এসে দাঁড়াল।

দুপুরের রোদের তাপ একটু গায়ে লাগতেই কিন্তু তার প্রাণের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। পথঘাট সব জনমানব-হীন, সমুদ্র তীর একেবারে জনশূন্য। মাদাম সত্যি কি বোকা! সকালে সবাই যখন সমুদ্রের তীরে বসে মাতামাতি করছে তখন সে নীরবে বারান্দায় বসে কাটিয়েছে, এখন তারা সবাই ঘরে আর মাদাম পথে বেরিয়েছেন।

রেস্তোরাঁগুলিও এখন খরিদ্দারশূন্য। শ্রান্ত কুকুর ধুঁকছে। কোথাও এতটুকু ছা[illegible] নেই। ডাকঘরটাও দেখা যায় না। তাহ[illegible] না হয় টিকিট কেনার ভান করে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াত।

দুটি বাড়ির মাঝখানে একটি ফালি রাস্তা, তার ভেতর ঢুকে পড়ে একটি জানলার নীচে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে মাদাম। বেশ ঠাণ্ডা এখানে। হঠাৎ জানালাটা খুলে গেল, একটি সুন্দর মুখ জানালায় ভেসে উঠল। নাকটা একটু বেঁটে বটে কিন্তু চোখ দুটো যেন টলটল করছে। নিখুঁতভাবে কোনো শিল্পীর আঁকা মূর্তি যেন।

মাদাম কিছু বলার আগেই সবিস্ময়ে সে বলে উঠলো—আরে! মাদাম লা মারকুই।

লোকটা একটি দরজা খুলে বেরিয়ে এল, একটি অতিশয় ক্ষুদে কামরায় চেয়ারে বসেছে সে। মাদাম বলে ওঠে—বাবাঃ, কি ভীষণ রোদ্দুর। প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছলাম আর কি!

সে মাটির পাত্রে একটু জল এনে দেয়। বেশ সুন্দর গলার আওয়াজটা। তাকে

ধন্যবাদ দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে মাদাম দেখলেন ছেলেটি ওকে প্রাণভরে দেখছে। সে বেশ মোলায়েম কণ্ঠে বলে—কি করতে পারি বলুন!

মাদাম এক চুমুক জল পান করে বললেন—আমার একটা রোল আছে ডেভলপ করতে হবে। কিন্তু তুমি আমাকে কি করে জানলে?

লোকটি সেইভাবে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বুকের ওপরকার সেই গোলাপ ফুলটা দেখছে। মাদামের জামাটা ঘামে ভিজে ভিতরের জামাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাঁধের ওপরকার ওড়নাটা টেনে স্তনদুটো ঢাকার চেষ্টা করে মাদাম। ছেলেটা তখন বলছে, আপনি ত' কদিন আগে আমার দোকানে ফিলম কিনেছেন! সংগে দুটি ছোট মেয়ে ছিল।

মাদামের মনে পড়ে। বড় বড় হরফে 'কোডাক' লেখা দেখে তিনি একটা দোকানে ঢুকেছিলেন। যে মেয়েটা ফিলম এনে দিল সে বুঝি ওর বোন। মেয়েটা একটু টেনে চলছিল। পাছে মেয়েরা হেসে ওঠে এই ভয়ে সেদিন তাড়াতাড়ি ফিলম নিয়েই পালাতে হয়েছিল।

মাটির পানপাত্র নামিয়ে রেখে মাদাম মারকুই মনে মনে ভাবে—কি একটা বাজে লোকের প্যানপ্যানানি শুনছি এই ঘুপচি ঘরে বসে বসে। ওর মুখের ওপর চোখ রেখে এইবার মারকুই বলে ওঠে—আমার একটা ফটো তুলে দেবে?

লোকটি তৎক্ষণাৎ বলল—নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! আপনি যে দিক দিয়ে এসেছেন বড় রাস্তায় ওপর ওদিকে যান আমি দোকানঘর খুলছি এখনই।

মারকুই এইবার লোকটির চোখ থেকে মুখ নামিয়ে দেহটা লক্ষ্য করেন। একটা হাত-কাটা 'ভি' গলা গেঞ্জি পরা, সেই ফাঁক দিয়ে দুটি পুরুষ্ট লোমভরা হাত নেমেছে। গলাটা বেশ চওড়া, মুখটা গোল-গাল, মাথায় একমাথা কোঁকড়ানো চুল। মারকুই বলে—আমি না হয় ফিলম রোলটা এখানেই দিই—

লোকটি বলল—না-না, তা হয় না—

বড় রাস্তার ওধারে গিয়ে দাঁড়াল মারকুই।

লোকটি দোকানটা খুলল—এর মধ্যেই গায়ে একটা নীল রঙের শার্ট চাপিয়েছে। একেবারে শাদাসিধে দোকানদার কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে।

মাদাম প্রশ্ন করেন—কখন এগুলি পাওয়া যাবে?

লোকটি তাড়াতাড়ি জবাব দেয়—কালই পাবেন।

মাদাম বলেন—আচ্ছা, তুমি ত' ফটো-গ্রাফার, হোটেলে এসে আমার মেয়ে দুটোর ফটো তুলে দাওনা।

—বেশ ত', আপনি যদি তাই চান!

—আচ্ছা।

লোকটা মাথা নামিয়ে রোলটা বাঁধার জন্য একটা কিছু খুঁজছে, মাদাম লক্ষ্য করল তার হাত কাঁপছে।

কোনোরকম সম্ভাষণ না জানিয়ে মারকুই সেই উত্তপ্ত পথে পা বাড়াল। মনে হল, পিছন থেকে ও লক্ষ্য করছে। মাদাম তাকিয়ে দেখল—সত্যি তাই, এর মধ্যে শার্ট খুলে ফেলেছে, অঙ্গে সেই হাত-কাটা গেঞ্জি।

এর পা-টা ছোট, পুস্ পা। একটা উ'চু গোড়ালির মোটা বুট পরে। তবে ওর বোনকে যেমন দেখিয়েছিল তেমন হাসির উদ্রেক করে না। বরং হিল ওঠানো জুতাটির জন্য ওর আকৃতি একটা বিশেষ রূপ পেয়েছে।

পরদিন হোটেলের নীচের তলা থেকে ফোনে সংবাদ এল মঁসিয়ে পল ফটোগ্রাফার এসেছেন। মঁসিয়ে পলকে ওপরে পাঠানোর হুকুম হল। পল ওপরে এসে দেখে জননী মারকুই দুপাশে দুটি মেয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে। ছবি তুলে নিলেই হয়। পল বলল, এইত বেশ, অমনই থাকুন, আমি একটা ফটো তুলে নিই। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে নানা রকম ভঙ্গীতে ফটো তোলা হল। টব থেকে একটা গোলাপ তুলে নিয়ে মাদাম নিজের গালে বোলাতে বোলাতে বলল—মঁসিয়ে পল, তোমার কিন্তু বেশ টেস্ট আছে দেখছি—

পল বলল—আমার একটা নিবেদন আছে।

মারকুই ফুলটা নীচে ছুঁড়ে বলল—কী বলই না—

পল বলল— আপনার একটা সোলো ফটো ছোটদের বাদ দিয়ে তুলতে চাই।

—তাতে কি! বেশ ত।

এই বলে মাদাম আরাম কেদারায় গা মেলে দিলেন। মাথার নীচে হাতখানা রইল। বলল—কি এই ভঙ্গীতে হবে?

পল আনন্দে আত্মহারা। সে বলে—ওরকম নয়, আমিই সব ঠিকঠাক করে দিচ্ছি। এই বলে সে মাদামের গালটা তুলে দেয়। মারকুই এই স্পর্শ সুখ উপভোগ করছেন চোখ বুজে। বেশ লাগছে ওর মৃদু কোমল স্পর্শ!

এর পর পল সেদিন অনেকগুলি ছবি তুলল। যেমনটি চাইছে সেইরকম ভঙ্গী, আর সব সময়েই ঠিকঠাক করে গুছিয়ে সাজিয়ে দিতে একটা পুরুষালি স্পর্শে মাদামকে আত্মহারা করে দেয়।

মাদামই শেষ পর্যন্ত বলল—তুমি বড় ক্লান্ত। আজ আর থাক।

মঁসিয়ে পল বলল—সে কি মাদাম! আপনিই বেশী ক্লান্ত।

মাদাম মারকুই আজ আর ক্লান্ত নয়। প্রাণে খুশির রঙ লেগেছে। পল চলে যেতেই মাদাম গেলেন সমুদ্র স্নানে। চলতে চলতে মঁসিয়ে পলের কথাগুলি মনে পড়ছে, এই ভাবে বসুন, অমনি করে—আর তার স্পর্শের মধ্যে কি যাদু!

মাদাম বলছিল—আমাকে ছবি তোলা শেখাবে?

পল বলল—এর কি শেখার আছে। ছবি তুলতে তুলতেই হাতটা ঠিক হবে। আমি ঐ পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলি—তাতে ভারী আনন্দ পাই। এর পর পল ওর দিকে তাকিয়ে ছিল—কেমন একটা দৃষ্টি তার চোখে।

তিনদিন টেনিস খেলে, সমুদ্র স্নান করে কাটাল মাদাম। তারপর মিস ক্লোকে ছবি-গুলি আনতে হুকুম দিলেন। ছবি এল—ভারী সুন্দর হয়েছে। ছবিতে তোলা মাদামের প্রতিকৃতি যেন আসল মাদামের চেয়েও সুন্দরী। মাদাম বলে— পল কি বলল?

মিস ক্লো বলল—আশা করছিল যে, আপনি নিজেই হয়ত যাবেন।

মারকুইস বলল—কি বিশ্রী গরম পড়েছে, তা ছাড়া পথে যা ধুলো।

এর পরদিন দুপুরের খাওয়া সেরে একটা কাঁধকাটা ফ্রক পরে মাথায় টুপি চড়িয়ে মাদাম সেই রোদে-পড়া পথে নেমে এল। আজ আর তার কোনো অস্বস্তি নেই। বেশ লাগছে। বালির চড়া শেষ হয়ে পাওয়া গেল নরম ঘাস। টিলার ওপর থেকে হোটেল বাড়িটা খেলাঘরের মত দেখাচ্ছে। পথ চলতে চলতে মাদাম দু একটি ছবিও নিজের ক্যামেরায় তুলে নেয়। এমন সময় একটা 'ক্লিক' শব্দ শুনেই মাদাম পিছনে তাকিয়ে দেখে পল দাঁড়িয়ে।

পল একেবারে কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। আজ অঙ্গে বেশ ভাল পোষাক, বুট জোড়াও বেশ পালিশ করা। এক মাথা কালো চুল নিয়ে মাদামের দিকে তাকাচ্ছে। মাদাম বলল—আমাকে ছবি তোলা শেখাও—

পল পিছন থেকে এসে মাদামের হাত ধরে ক্যামেরাটা ঠিক করে দেয়—

এই স্পর্শের প্রভাবে মাদামের সারা শরীর রোমাঞ্চিত। কি আনন্দ! কি অনুভূতি! মাদাম বলল—তোমার ক্যামেরা কই! আনোনি?

—এনেছি। এই পাথরটার ওপাশে সমুদ্রের কিনারায় একটু সমতলভূমি আছে, সেখানে হরেকরকম পাখির ঝাঁক আসে। আমি সেখানে ছবি তুলি। আমার কোট, ক্যামেরা সব সেইখানে—

—চল দেখি!

মাদামকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে পল। সুন্দর ছায়া ঘেরা মনোরম পরিবেশ। পলের হলুদে রঙের কোট আর ক্যামেরা পড়ে আছে—আর তার ধারে একখানা বই।

মাদাম ছোট্ট খুকির ভঙ্গীতে উচ্ছল হয়ে ওঠে।

—তুমি বুঝি খুব পড়তে ভালোবাসো? এ ধরনের বই ছোটবেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছে মাদাম। তার হাসি পেল। প্রশ্ন করল—গল্পটা কেমন?

পলের গলা ধরে গেছে—সে বলল—বেশ ভালোই—

অনেক কথা। সেই ছবিগুলির কথা উঠল। কথা ত' চালাতে হবে। কি বলা যায়। সেই বলছে আর পল শুনছে।

পল হঠাৎ বলল—একটা কথা—

মাদাম আধশোয়া ভঙ্গীতে একটা লম্বা ঘাসের ডাঁটা দাঁতে করে চেপে হাসি হাসি মুখে বলল—কি কথা আবার?

—ঠিক এমন ভঙ্গীতেই থাকুন। কয়েকটা শট নিই।

মারকুই অন্য কিছু প্রত্যাশা করছিল, যাক গে—লোকটা অতিশয় হাঁদা এবং একেবারে বাচ্চা—

মাদাম অবহেলা ভরে বলল—তা তোলো না, আমার কিন্তু ভারী ঘুম পাচ্ছে—

পল বলল—তাহলে আমার কোটটাকে ...থার বালিশ করে শুয়ে পড়ুন। আমি ...ই সব ঠিক করে—

পল নিজে কোটটা পাট করে মাদামের ...থার তলায় গুঁজে দেয়। তারপর সুরু... ...ল ছবি তোলা, কখনো এপাশ থেকে, ...খনো ওপাশ থেকে। মারকুই ঘুমজড়ানো ...খে ওর দিকে তাকায়—পলকে ভালো ...াগে. ওর ঐ ছোট্ট পা-টার জন্য বড় কষ্ট, ...কথা ভেবে মনে সহানুভূতি জাগে। সে ...বল এক পায়ে ভর দিয়ে কাজ করে।

মাদামের দেহের ওপর পল দুটি চোখ ...লে রেখেছে, সারা অঙ্গে তার দৃষ্টিটা ...লিয়ে নেয়। পলের এই ভালোলাগার ...শটুকু মাদামের অন্তরকে ভরিয়ে ...লে—

এই নিদাঘতপ্ত দুপুরে সমস্ত শরীর ...য় কামনার আগুন ছুঁইয়ে পড়ছে। অন্য- ...কে মুখ ফেরায় মাদাম। একটা রঙীন ...জাপতি নেচে নেচে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে ...লে ফুলে বসে দুলছে। প্রজাপতিটা হঠাৎ ...স মাদামের হাতের ওপর বসল—পল ...বসেছে পাশটিতে. সে বেশ ক্লান্ত হয়ে ...ড়ছে। আর ওর সেই চোখ, দুটি চোখে ...ত দেহটা যেন শুষে নিচ্ছে, সর্বকিছুই ...লুটে নিতে চায়।

মারকুই ভাবে সারা অঙ্গে যে কামনার ...র জেগেছে তা বুঝি এখনই একটু ...ল হলেই হাওয়ায় মিশিয়ে যাবে। সব ...নিঃশেষিত হবে, যে পুলক ভরা আবেশ ...েছে দেহ ঘিরে তা মুহূর্তে অন্তর্হিত ...। চুপ করে নিঃশব্দে শুয়ে আছে ...দাম—এদিকে কামনাবহ্নি দেহটাকে ...লিয়ে পুড়িয়ে যেন ছাই করে দিচ্ছে। ...জাপতিটা এবার হাত থেকে উড়ে পালাল ...এবার ত' দৃষ্টি ফেরাতে হয়।

...যা ভয় করছিল, পল যেন একেবারে ...হিত হয়ে ওর দিকে বিহ্বলভঙ্গীতে ...িয়ে আছে। দুটি চোখের সঙ্গে চোখের ...নিবিড় মিলনের মধ্যে যেন নীরব দেহ- ...লয় ঘটছে। এ এক সম্ভোগ। মাদাম ...জের মুখখানি পলের দিকে এগিয়ে দিয়ে ...লো—এসো একটা চুমু দাও পল। চোখ ...টা বন্ধ করে রইল মাদাম অসহ্য পুলকের ...বেগে।

পল যেন প্রজাপতি, অতি মৃদু মধুর ...। যেন ওর ঠোঁটে একটা ফুলের স্পর্শ ...ল। নিবিড় আলিঙ্গনের মাদকতায় ...র্তে সারা দেহটাকে চেপে, পিষে যেন ...ড়ো করে দিল। কিন্তু পলের এই দেহ- ...গ যেন কিছু নয়, যেন সে অতি লঘু স্পর্শ দিয়ে ছোট্ট শিশুকে ঘুম পাড়াচ্ছে। যখন সে মাদামের দেহ ছেড়ে সরে গেল তখনও তার মুখে কোন প্রকাশ নেই,, আবেগ নেই। যেন কোনো কিছুই হয়নি। যা হয়ে গেল তা যেন কিছু নয়। তার ভয় যদি মাদামের লজ্জা করে, যদি মনে আঘাত লাগে, মর্যাদায় বাধে। মাদামকে সে একটুকু ক্লেশ দেবে না।

মাদাম নিজের চোখে হাত চাপা রেখে সেইভাবে শুয়ে ভাবছে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে এইবার হোটেলে ফিরতে হবে—যদি কারো সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয় ও গম্ভীর হয়ে থাকবে। এতটুকু প্রকাশ করবে না মনো-ভঙ্গী।

উঠে বসল মাদাম। এলোমেলো পোষাক সব আবার সাজিয়ে গুছিয়ে পরল। ব্যাগ থেকে পাউডারের কৌটা বার করে আরসীর সাহায্য না নিয়ে এক পোঁচ পাউডার বুলিয়ে নিল। ঠোঁটে লিপস্টিকটা একবার ঘষে নেয়। উঠে দেখল রোদটার তেজ এখন কম এসেছে বরং বাতাসে একটু ঠান্ডা আমেজ।

ফেরার পথে ভাবে মাদাম রোজ যদি এমন রোদ্দুর থাকে তাহলে রোজ রোজ খাওয়া দাওয়ার পর দুপুর ঘেঁষে এইখানে আসবে। রোদ বরং ভালো। বৃষ্টি হলেই মুশকিল। বৃষ্টিতে কি করে আসবে। বারে, আসবে না ত' কি অমনই বারান্দায় বসে সময় গুনবে। না, বৃষ্টিতেও আসবে। বৃষ্টির সময় পাহাড়ে কেউ উঠবে না।

মারকুই আসবে প্রতিদিন। লাঞ্চ সারা হলে মিস ক্লো যেই মেয়েদের নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকবেন, ও পালিয়ে আসবে। পল যাবে আলাদাভাবে, দুজনে একত্রে যদি না যায় তাহলে কে আর বুঝবে।

মাদাম শুধু ভাবে, আরও প্রায় তিন সপ্তাহ সময় হাতে আছে—কিন্তু দিনগুলি যদি এমনই উজ্জ্বল না থাকে, বৃষ্টি হলেই সব মাটি—বৃষ্টির উৎপাত কিভাবে এড়ানো যাবে ভাবে মাদাম। একটা রেন কোট গায়ে দিয়ে গিয়ে পাহাড়ে বেড়াবে?

ওর দোকানের তলায় ত' একটা ক্ষুদে কামরা আছে। না, কে কোথায় দেখে ফেলবে, দরকার নেই। এসব ত' গ্রাম অঞ্চল, এখানকার মানুষকে বিশ্বাস নেই। সে বড় কেলেঙ্কারি। বৃষ্টি তেমন জোর না হলেই হোল। ঐ পাহাড়টাই ভালো, বেশ শান্ত, নিরিবিলি।

সেইদিন সন্ধ্যায় এলিসকে একখানি চিঠি লিখতে বসল মাদাম—অনেক দিন পরে এলিসকে চিঠি লেখার মন হয়েছে। মাদাম লিখলে—"এইখানে বেশ লাগছে, চমৎকার এই দেশ। দিনগুলি বেশ খুশিতে কেটে যায়। অবশ্য স্বামী বিরহিত অবস্থায় যেমনটি হওয়া সম্ভব—।" ইত্যাদি

এত কথা লিখলেও মাদাম জানালো না তার মনের কথা, জানালো যে আজ সে বিজয়িনী। সে শুধু লিখলে দুপুরের কথা, কেমন উদাসী দুপুর। একটু অস্পষ্টতা থাক। কল্পনা করুক এলিস—হয়ত মনে করবে কোনো আমেরিকান ধনী তাঁর স্ত্রীটিকে দেশে রেখে বিদেশ পর্যটনে বেরিয়েছেন শান্তির অন্বেষণে।

(বাকী অংশ আগামী সংখ্যায়)

—ইন্দ্রনাথ চৌধুরী অনূদিত
ও সংক্ষেপিত

প্রেক্ষাগৃহ

ভারত ও টেলিভিশন

সুচিত্রা সেন

রুমা গুহঠাকুরতা

উত্তমকুমার

সুমিতা সান্যাল

ভারত সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগ আমাদের জাতীয় আয়ের পৌনঃপুনিক বৃদ্ধির কথা যতই তারস্বরে ঘোষণা করুন না কেন, এই অনগ্রসর দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই যে শোচনীয়ভাবে দারিদ্র্যের মধ্যে দিনযাপন করছে, এ-কথা অনস্বীকার্য। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, কলকাতা থেকে মাত্র মাইল পঁচিশেক দূরে অবস্থিত এক গ্রামের কোনো কোনো বড় পরিবারের লোকেরা সারা বছরের মধ্যে জোড় ভাত খেতে পায়। কিন্তু তাই বলে এই ভারতেই লক্ষ টাকা মূল্যের এয়ার-কন্ডিশনড্ মোটরকারে চড়া লোকের কি অভাব আছে? কিংবা এই দেশেরই দিলীপ-কুমার, রাজ কাপুর, ওয়াহিদা রেহমান, বৈজয়ন্তীমালা প্রভৃতি চিত্রতারকা এক একখানি ছবিতে অভিনয় করবার জন্যে দশ-বারো লক্ষ টাকা নেন না? এ হেন অবস্থায় একটি টেলিভিশন সেটের মূল্য যতই হোক না কেন এবং এক একটি টেলিভিশন স্টেশন স্থাপনে যত মুদ্রাই ব্যয় হোক না কেন, এই বিরাট দেশের কোটি কোটি নিরক্ষর জনসাধারণকে প্রমোদের মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলবার গুরুদায়িত্ব পালনের সংকল্প নিয়ে ভারত সরকার চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে আমাদের দেশের তিনটি প্রধান শহরে

াই কলকাতা ও মাদ্রাজে টেলিভিশন থা চালু করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। ন জেনে রাখা দরকার, আমাদের ধানী দিল্লীতে টেলিভিশন ইতিমধ্যেই ট বাস্তব ও প্রত্যক্ষীভূত রূপায়ণ।

কলিকাতাস্থ ইন্দো-জার্মান কালচারাল ার এবং 'এবিসি এক্সপো ৬৮' আয়োজিত ট সচিত্র বক্তৃতাসভায় নিউদিল্লীস্থ ন টেলিভিশন সংবাদদাতা ও টি-ভি পরিচালক মিঃ কার্সটেন ডায়ার্ক'স দের জানালেন যে, পশ্চিম জার্মানীর যোগিতায় ভারত সরকার দিল্লীতে একটি ভিশন কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। ১৯৫৯ সালে স্থাপিত হলেও কেন্দ্রটি ৬৫ সালের আগস্ট থেকে নিয়-ভাবে প্রোগ্রাম চালু করেন। এবং ও লাইসেন্সকৃত টেলিভিশন সেটের া হচ্ছে ৫,০০০। মিঃ ডায়ার্ক'স-মতো দিল্লী টেলিভিশনের দৈনন্দিন াম, যার মধ্যে আছে প্রতিদিনের বিশেষ কৃষিকথা, ছোট ছোট নাট্যানুষ্ঠান, ত চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ —এশিয়ায় প্রচলিত যে-কোনোও ভ প্রোগ্রাম থেকে উন্নতধরনের ও মোটের জনপ্রিয়। তিনি বলেন, ভারতীয় রিককে শিক্ষিত করা, তাঁর সমস্যাবলীর ধান করা, তাঁর কাছে পৃথিবীর খবরা-পৌঁছে দেওয়াই যদি টেলিভিশনের শ্য হয়, তাহলে ভারতীয় টেলিভিশন তেই ব্যবসায়ের মুখপত্র বা কমার্শাল পারে না। অবশ্য টি-ভির মাধ্যমে ন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানমূলক াম বা রাজনৈতিক প্রচারকার্যকে দর্শক-রা সমর্থন করতে পারেন।

ইয়োরোপে টেলিভিশনের প্রচার ও র সম্পর্কে খবর দিয়ে মিঃ ডায়ার্ক'স ন: পশ্চিম জার্মানীর ন'টি বিভিন্ন া রাজ্যগতভাবে ন'টি টেলিভিশন সংস্থা উঠেছে; এরা বিভিন্ন বোর্ড অব ট্রাস্টি া পরিচালিত। জার্মানীতে বর্তমানে কোটি লাইসেন্সকৃত সেট আছে। দের টেলিভিশন হচ্ছে একটি সরকারী া এবং এখানে চালু সেটের সংখ্যা সত্তর লক্ষ। লন্ডনে শুধু বি-বি-সি টিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন) একাই হে বাহাত্তর ঘণ্টা প্রোগ্রাম করে।

মিঃ ডায়ার্ক'স-এর মতে পৃথিবীর কাশে যদি ঠিকভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ বা টেলাইট স্থাপন করা যায়, তাহলে বীর যে-কোনো জায়গায় বসে টি-ভি বা গ্রাহকযন্ত্রের সাহায্যে অপর যে-না জায়গায় স্থাপিত টি-ভি কেন্দ্র রত ঘটনা চাক্ষুস করা সম্ভব। আমরা বীর যে-কোনোর বৃহৎ অনুষ্ঠানে ঠিক ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে পারি। ন, মস্কোয় কোনো ফুটবল খেলা হচ্ছে. খানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়ার ক্ট টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে. ইংলন্ডের সয়ে ডার্বি ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের না গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হচ্ছে, সবই কলকাতার কোনো গৃহে বসে টি-ভি-গ্রাহকযন্ত্রের সাহায্যে ঘটনা ঘটাকালেই দেখা সম্ভব। কিন্তু টেলিভিশন স্যাটেলাইট স্থাপনের সাহায্যে দূরস্থ টেলিভিশন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সাধন করা এমনই অসম্ভব ব্যয়সাধ্য—একটি স্যাটেলাইট স্থাপনের ব্যয় কয়েক কোটি টাকা— যে, ভারতের পক্ষে সে-প্রচেষ্টা অদূরভবিষ্যতে সম্ভব নয়।

কোনো একটি অনুষ্ঠানের সবাকচিত্র সঙ্গে সঙ্গে বহুদূরে প্রেরণ করা টেলিভি-শনের পক্ষে সম্ভব বলে বহু সমালোচকের মতে টি-ভি সংবাদপত্রের পক্ষে সমূহ বিপদ-স্বরূপ। টি-ভিকে যদি ঘটনা ঘটাকালীন সচিত্র সংবাদ প্রেরণের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে বড় বড় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, টেনিস, ফুটবল খেলা বা সাঁতার, অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করবার উৎসাহী দর্শকের উপস্থিতি যথেষ্টই কমে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এতে একদিকে যেমন অনুষ্ঠানকর্তাদের আয় কমে যাবে, অপরদিকে তেমনই শূন্য আসনের সামনে প্রতিযোগীদের উৎসাহেও ভাটা পড়ে যাবে। এই কারণেই আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর টি-ভি প্রোগ্রামকে অন্তত পাঁচ ছ' ঘণ্টা বাদে দেখাবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। মিঃ ডায়ার্ক'স বলেন: টি-ভি কত সত্বর সচিত্র সংবাদ পরিবেশন করতে পারে, তার একটি বিখ্যাত উদাহরণ হচ্ছে কিউবা অভ্যুত্থানের সংবাদ প্রেরণ। সন্ধ্যা সাতটায় এই অভ্যুত্থানের শুরু হয় এবং রাত্রি ন'টার মধ্যে টি-ভি টীম ঘটনাস্থলে পৌঁছে সচিত্র সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।

চিত্র সমালোচনা

তিন বহুরাণীয়া (হিন্দী): জেমিনী (মাদ্রাজ)-র নিবেদন; ৪,৩২০·২৩ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ও পরিচালনা: এস এস ভাসান ও এস এস বালন; কাহিনী: কে বালচন্দর; সংলাপ: কিশোর সাহু; সংগীতপরিচালনা: কল্যাণজী-আনন্দজী; গীতরচনা: আনন্দ বক্সী; আলোকচিত্রপরিচালনা: ইউ রাজ-গোপাল; শব্দানুলেখন পরিচালনা: সি ই বিগ্‌স; শব্দানুলেখন: এস সি গান্ধী; শিল্পনির্দেশনা: এম এস জানকীরাম; সম্পাদনা: এম উমানাথ; নৃত্যপরিচালনা: পি এস গোপালকৃষ্ণণ; রূপায়ণ: পৃথ্বী-রাজ, আগা, রাজেন্দ্রনাথ, ধুমল, কানহাইয়া-লাল, রমেশ দেও, জগদীপ, নিরঞ্জন শর্মা, শশীকলা, ললিতা পাওয়ার, সাওকার জানকী, জয়ন্তী বৈশালী, কাঞ্চনা, ফরিদা প্রভৃতি। জগৎ এন্টারপ্রাইজেস্‌-এর পরি-বেশনায় গেলু ১৯ জুলাই, শুক্রবার থেকে প্যারাডাইস, বসুশ্রী, প্রিয়া, লোটাস, প্রভাত, পূর্ণশ্রী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

তিন ছেলে, তাদের তিন বৌ এবং এক-পাল নাতিনাতনীদের নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দীননাথের দিন বেশ আনন্দেই কাটছিল। অকস্মাৎ তাঁর প্রতিবেশিনী হয়ে এল নামকরা ফিল্মস্টার বা চিত্রাভিনেত্রী শীলা দেবী। শীলার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল তিন বৌ এবং ওদের সঙ্গে তিন ছেলে। 'ফিল্মস্টার'কে নিজেদের বাড়ীতে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ওরা উঠে-পড়ে লেগে গেল বাড়ীকে আধুনিক রুচি-অনুযায়ী সুসংস্কৃত, সুসজ্জিত করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বেশভূষার পরিবর্তন সাধন করতে। ফলে, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হয়ে পড়ল, খরচ সামলাতে প্রাণান্ত হবার যোগাড়। দীননাথের সতর্কবাণী ওরা কানেই তুলতে চাইল না। চিত্রাভিনেত্রী শীলার জন্যে ওরা প্রত্যেকেই তখন ক্ষেপে উঠেছে। বাড়ীর চাকরকে দিয়ে বৌয়েরা রূপোর তৈরী দামী দামী তৈজসপত্র বন্ধক রেখে বা বিক্রি করে টাকা আনতে পাঠাচ্ছে। অবশ্য মধ্যপথে দীননাথ চাকরকে থামিয়ে জিনিসগুলি নিজেই রেখে বৌদের চাহিদামতো অর্থ যোগাচ্ছেন। পরিস্থিতি চরমে উঠল, যখন প্রতিটি ভাই অপর সকলকে লুকিয়ে শীলার প্রতি প্রেম নিবেদন করতে উদ্যত হন। দীন-নাথ অবস্থা আয়ত্তে আনবার জন্যে প্রতিটি বৌয়ের কাছে বেনামী চিঠি ছাড়লেন। গেল তাদের মাথা ঘুরে; প্রত্যেকেই কেঁদেকেটে একাকার। ওদিকে ভাইয়েরাও পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে বেইজ্জত হয়ে একে অপরকে তার বৌয়ের কাছে দোষী প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত। কেলেঙ্কারীর একশেষ! খবরের কাগজে পর্যন্ত বড়ভাইয়ের নামে কেচ্ছা।—সর্বদিকেই যখন বেসামাল অবস্থা, তিন বৌয়ের বাপমা পর্যন্ত বাড়ীতে এসে চড়াও, তখন দীননাথ এগিয়ে এলেন কাণ্ডারীর ভূমিকা নিয়ে—সকল সমস্যার সমাধান হয়ে বাড়ীতে আবার শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।

আদ্যোপান্ত হাসির ছবি হচ্ছে জেমিনীর এই রঙীন ছবি 'তিন বহুরাণীয়া' এবং হাসির ছবি বলেই কাহিনীর বুনোনে যেসব

অবাস্তবতা বা অসম্ভাব্যতা আছে, তা অনায়াসেই উপেক্ষা করা চলে। ছবি থেকে শিক্ষণীয় কিছু আছে বৈকি! গানের ভিতর দিয়েই বলা হয়েছে : আমদনী অঠন্নী, খর্চা রূপেয়া, নতীজা ঠনঠনঠ গোপাল......। নাচ, গান, সংলাপ ও পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রধানত হাস্যরসের নির্ঝর এই ছবিখানি দর্শকমাত্রকেই খুশীতে ভরিয়ে তোলবার মতো করে তৈরী করেছেন অভিজ্ঞ প্রযোজক-পরিচালক এস এস ভাসান।

অভিনয়ে পিতা দীননাথ এবং তিন ভাই শংকর, রাম ও কানহাইয়া বেশে যথাক্রমে পৃথ্বীরাজ, আগা, রমেশ দেও এবং রাজেন্দ্রনাথ তাঁদের গৃহীত চরিত্রগুলিকে উপভোগ্য করতে তুলতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নি। তিন ভাইয়ের স্ত্রীবেশে তিনটি নতুন মেয়ে সওকার জানকী (পার্বতী), জয়ন্তী (সীতা) ও বৈশালী (রাধা) চমৎকার নাটনৈপুণ্য দেখিয়েছেন। স্বামীর মনোহরণের জন্যে রাধা যে আধুনিক নাচ-গান করে, তা বৈশালীর অতিরিক্ত গুণপনার প্রকাশক। অভিনেত্রী শীলার কৃত্রিম চালচলনকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন শশীকলা। এছাড়া শীলার সেক্রেটারী মহেশরূপে জগদীপ ও তারই প্রণয়িনী মালারূপে কাঞ্চনা এবং বৌদের বাপের ভূমিকায় ধুমল, কানহাইয়ালাল ও নিরঞ্জন শর্মাও উল্লেখ্য অভিনয় করে ছবির অভীষ্ট সিদ্ধির পথে সহায়তা করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং উচ্চমানের পরিচায়ক। পরিচয়লিপিতেও হাসির ছবির ইঙ্গিতটি প্রকট। দৃশ্যপট ও রূপসজ্জার পরিকল্পনা অতিমাত্রায় প্রশংসনীয়। হাসির ছবির দ্রুতগতির প্রতি সম্পাদক যথেষ্ট লক্ষ্য রেখেছেন; এমনকি গানের চিত্রণের মধ্যেও এটি মনে রাখবার প্রয়াস দেখা যায়। ছবির পাঁচখানি গানই সুরসমৃদ্ধ ও সঙ্গীত 'আমদনী অঠন্নী, খর্চা রূপেয়া' গানখানির উপভোগ্যতার তুলনা নেই।

'জেমিনী'র 'তিন বহুরাণীয়া' একখানি অনবদ্য হাসির ছবি।

—নান্দীকর

দেশী ছবির খবর

এল ডি ফিল্মস্ নামে একটি নবগঠিত চিত্রপ্রযোজনাসংস্থা তাঁদের প্রথম ছবি "শহীদের ডাক"-এর শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন গান রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে। ভারতে স্বাধীনতাসংগ্রামে যে-সব দেশপ্রেমিক প্রাণোৎসর্গ করেছেন এবং স্বাধীনতাঅর্জনের পরবর্তী যুগে যাঁরা জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্যে নিজেদের বলি দিয়েছেন, তাঁদেরই পুণ্য-স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত এই ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরলোকগত সরোজা রঙ্গনাথনের রোজনামচা (ডায়েরী) থেকে সংগৃহীত উপাদানের উপর নির্ভর ক'রে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শচীন্দ্র ভট্টাচার্য এবং ছবির পরিচালক উমাপ্রসাদ মৈত্র সম্মিলিতভাবে। গোবিন্দ দাস, ডি এন মিথালিয়া, শচীন্দ্র ভট্টাচার্য, জি এস ভাসান ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত গানসমৃদ্ধ এই দেশাত্মবোধক ছবিটির প্রযোজক হচ্ছেন শ্রীমতী লেখা বসু। এতে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে আছেন সুচিত্রা মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর রায় এবং ছবিটির সঙ্গীতপরিচালিকা নীতা সেন স্বয়ং। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় "শহীদের ডাক" ছবিটির একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করবেন।

আর ডি বনসল-এর পরবর্তী বাঙলা ছবিটি হবে রঙীন। গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু রচিত গল্প অবলম্বনে সুধীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় উত্তমকুমার ও তনুজাকে নায়কনায়িকারূপে নিয়ে 'চৈতালী' নামে এই রঙীন ছবিটির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে এ বছরের ১৫ই আগস্ট, স্বাধীনতাদিবস থেকে। শচীন দেববর্মন কর্তৃক সুরারোপিত এই ছবির গানগুলি ইতিমধ্যেই
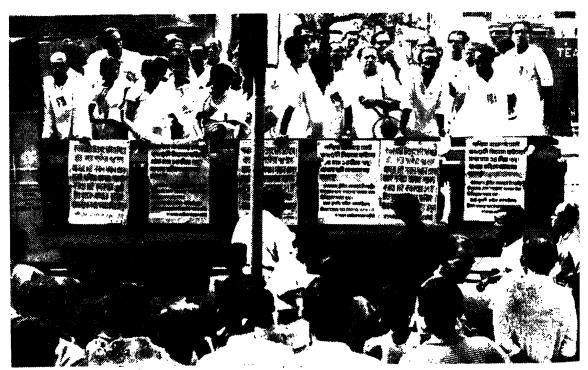
পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনের সমর্থনে রবিবার উজ্জ্বলা প্রেক্ষাগৃহের সামনে সঙ্গীত পরিচালকগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। ফটো : অমৃত

তরুণ মজুমদার এবং সন্ধ্যা রায়ের বিবাহবার্ষিকী অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরাকে উভয়ের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। ফটো: অমৃত

লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে ও মান্না দে-র কণ্ঠে গৃহীত হয়েছে বোম্বাই শহরে।

এ ভি এম-এর নবতম হিন্দী চিত্র ...দো কলিয়াঁ' এই শহরের রক্সী, বসুশ্রী, বীণা, ...গেশ, খান্না এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি-প্রতীক্ষায় রয়েছে। ছবিগুলি ইতিমধ্যেই বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্যান্য রাজ্যে মুক্তিলাভ করে জনসংবর্ধনা লাভ করেছে এবং বহু স্থানেই শতরজনী অতিক্রম করে রজতজয়ন্তীর পথে অগ্রসর হচ্ছে। কৃষ্ণন-পাঞ্জু পরিচালিত এবং রবি কর্তৃক সুরারোপিত ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন বিশ্বজিৎ, মালা সিংহ, মেহমুদ, ওমপ্রকাশ এবং দ্বৈতভূমিকায় আশ্চর্য শিশুশিল্পী বেবী সোনিয়া। সংলাপ ও গীতরচনা করেছেন যথাক্রমে পণ্ডিত মুখরাম শর্মা এবং সাহির।

প্রযোজক-পরিচালক ভী শান্তারামের পরবর্তী গীতিবহুল ইস্টম্যান কলার চিত্র 'জল বিনা মছলী, নৃত্য বিনা বিজলী'তে সুরারোপ করবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল। ছবির সংলাপ লিখেছেন বিশ্বামিত্র আদিল। 'ঝনক ঝনক পায়েল বাজে' ও 'নবরঙ'-এর নায়িকা সন্ধ্যা এই ছবিটিরও নর্তকী-নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। আধুনিক ভারতীয় নৃত্যের নবধারার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে শ্রীশান্তারাম শ্রীমতী সন্ধ্যাকে নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে পরিভ্রমণ শেষ করে ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্বাচিত ভারতীয় ছবি হিসেবে এবারের ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে তপন সিংহ পরিচালিত **'আপনজন'** ছবিটি দেখানো হচ্ছে। আগামী মাসেই এই চলচ্চিত্র উৎসবটি শুরু হচ্ছে। সম্ভবত, পরিচালক শ্রীসিংহ এই উৎসবে যোগদান করছেন। ইন্দ্র মিত্র-র কাহিনী অবলম্বনে পরিচালক আজকের বিশৃঙ্খল সমাজের একটি বাস্তবচিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে আজকের তরুণ যুবকগোষ্ঠীর কথা এ ছবিতে বলা হয়েছে। এবং আজকের রাজনীতি মানুষের মূল্যবোধকে যেভাবে বিনষ্ট করতে চাইছে তারই আলেখ্য এ ছবিতে ফোটানো হয়েছে। ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করেছেন স্বরূপ দত্ত, পার্থ মুখোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, শমিত ভঞ্জ, সুমিতা সান্যাল, রোমি চৌধুরী, যূঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ ও নির্মলকুমার।

বিদেশী ছবির খবর

ইতালীর কয়েকজন নবীন পরিচালক

কাঁচ কাঁচ মুখ আর নাকের তলায় বেশ মোটা গোঁফ নিয়ে বাইশ বছরের চিত্র-পরিচালক সাল্ভাত্তোর স্যাম্প্রির নির্মীয়মান ছবির কথা যখনই ছায়াছবি মহলে আলোচিত হয় অমনি প্রথমেই মনে আসে মার্কো বেল্লুসিওর কথা। বেল্লুসিওর প্রথম ছবি 'ফিস্টস্ ইন্ এ পকেট' সারা ইতালীকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কি বিষয়বস্তু কি ফরম্ সব দিক দিয়েই এক বিস্ফোরণ ঘটেছিল এ ছবিতে: 'থ্যাংকস্ আন্ট'এর লেখক স্যাম্প্রির সঙ্গে বেল্লুসিওর মিল ঐ তেজে, নিজেকে প্রকাশের তীব্র আর্তনাদে। আরেকজন ইতালীয়ান তরুণ পরিচালকের সঙ্গে বেল্লুসিওর নাম করা হয়, তিনি হলেন রবার্তো ফান্জোর 'এস্কালেশন্'। চব্বিশ বছরের এই তরুণের সঙ্গে বেল্লুসিওর নাম প্রায়ই উল্লেখ করা হয় দুজনের প্রকাশের তীব্রতা ও সমাজের ওপর

দুজনেরই দৃষ্টিভঙ্গীর একাত্মতার জন্য। কিন্তু সমাজের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে দুমদাম্ কিছু বলা যেমন ঠিক উচিত নয় তেমনি 'এস্কালেশন্' বাই বলতে চাক সব যেন হট্টগোলের চিৎকার হয়ে গেছে। তবে এ ব্যাপারে গিয়ানফ্রাঙ্কো মিলগোচ্ছির 'আন্‌লফুল অ্যারেস্ট' অনেকটা সার্থক। অবশ্য এর আগে এ'র 'ট্রিও' ছবিটা কাঁ উৎসবে সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়েছিল বেশ। 'ট্রিও' যদি আধা সিনেমা ভেরিতে আধা ডকুমেন্টারী ধাঁচে তোলা হয় তবে তাঁর এই নতুন ছবি 'আন্‌লফুল অ্যারেস্ট' বর্তমান সার্দিনিয়ার এক জটিল বাস্তবের যন্ত্রণাদায়ক সমস্যাকে প্রতিফলিত করেছে। সমাজ নিয়ে এ'রা যেমন চিন্তিত অপরদিকে এলজো মুচ্ছি সমাজ-টমাজ নিয়ে মাথা ঘামান না অত। তাঁর প্রথম ছবি 'ইফ্ আই মে লভ্' অন্ততঃ সেই কথাই বলে।

নবীন কিন্তু তরুণ নয় এমন দুজন হল মার্সেল্লো ফন্দাতো ও ডগো লিবারেত্তোর। দুজনেই চিত্রনাট্য লিখতেন আগে। ফন্দাতোর নতুন ছবি 'দি প্রোটাগনিস্ট' ও লিবারেত্তোর-এর 'দি সেক্স অফ দি অ্যাঞ্জেলস' দুটোই সলিড টেকনিক্যাল কোয়ালিটিজ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একই ব্যাপার ঘটেছে লুইগি রাম্পোনির ব্যাপারেও। ডকুমেন্টারী ছবি করতেন আগে, প্রথম কাহিনী চিত্র 'ম্যান, প্রাইড অ্যান্ড রিভেঞ্জ' দিয়ে শুরু করলেন কাহিনী-চিত্রের পথে যাত্রা।

এ ছাড়াও এমন অনেকে আছেন যাঁরা ছবি করছেন বা করবেন ভাবছেন, অবশ্য তাঁদের সবাই-ই যে বেল্লুসিও বা ডি-সিকা হবে তা নয় তবে প্রতিশ্রুতি আছে সবায়ের মধ্যে। যেমন ধরুন তরুণ মারুজিও পন্‌জির কথাই। মিউজিলের লেখা রোম্যান্স থিয়েটারের ব্যাকগ্রাউন্ডে এক পরিচালক, অভিনেতা আর এক অভিনেত্রীর ভালবাসার কাহিনী নিয়ে জটিল ছবি করেছেন ইনি। নাম— 'দি ভিসিওনারস'। এরকম আরও একজনের নাম বলি। নির্মীয়মান 'দি ওয়াইল্ড ক্যাট' ছবির পরিচালক আদ্রে ফ্রেজ্জা। কলেজের পট-ভূমিকায় একজন যুবকের রাজনৈতিক সমস্যাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন পরি-চালক। সম্প্রতি আবার সাংবাদিকতা ছেড়ে ম্যারিজিও লিভারেনি, জর্জিও বোলতেম্পি সিনেমা লাইনে আসছেন শোনা গেল। এরকম আরও বহু রয়েছেন, সবার নাম করতে গেলে কলমের কালি ফুরিয়ে যাবে। তবে যাঁরা আসবেন বা যাঁরা আসবার জন্য তৈরী হচ্ছেন তাঁদের অনেকের মধ্যেই প্রতিভা না থেকে নিপুণতা আছে।

ইউনিভার্সালের 'ইসাডোরা' ছবির প্রিমিয়র হবে হলিউডের 'লোওস' থিয়েটার হলে আসছে নভেম্বর মাসে। নায়িকা চরিত্রে রয়েছেন ভ্যানেসা রেডগ্রেভ। অভিনয় ও নাচ দুয়ে মিলিয়ে এ-ছবিতে রেডগ্রেভকে এক নতুন রূপে দেখা যাবে। ইংল্যান্ড, যুগো-স্লাভিয়া, ইতালী প্রভৃতি দেশের লোকেশনে ছবির কাজ হয়েছে। কার্ল রেইজ-এর হাতে ভ্যানেসার পরিচালিত হওয়া এই অবশ্য প্রথম নয়। 'মরগ্যান' ছবিতেও ভ্যানেসা ছিলেন। ছবির প্রধান চরিত্র ইসাডোরার ভূমিকায় নামছেন ভ্যানেসা রেডগ্রেভ। আর তাছাড়া আছেন জ্যাসন রবার্টস, জেমস ফক্স, ইভান চেঙ্কো ও আরও অনেকে।

আমেরিকার প্রবন্ধকার ও সমা-লোচক সুসান সনট্যাগ সুইডেনের প্রযোজক সংস্থা স্যান্ড্রুজের হয়ে এ ছবি পরিচালনা করবেন। ছবিটা কি রাজনীতি পাঞ্চ করা আদিরসা ছবি হবে। স্টকহোমে এক অভি দম্পতির আশ্রয়ে থাকা একজন আমেরি উদ্বাস্তুর কাহিনী ছবির মূল উপাখ্য কাহিনী মিস্ সনট্যাগ এর নিজের ছবির আলোক চিত্রায়নে থাকবেন সোয়ানবার্গ। ছবির কাজ শুরু সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি।

মঞ্চাভিনয়

'অবকাশ'এর চরিত্রহীন

'অবকাশ' নাট্যসংস্থা তাদের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবে গত ১৪ই জুন রবীন্দ্র সরোবর রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' নাটকটির এক সুষ্ঠু ও সুন্দর অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। নাট্য-পরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এ নাটকে তাঁর পূর্বপ্রাপ্ত কৃতিত্বের স্বাক্ষর আরও উজ্জ্বল করে তুলেছেন। শরৎ-চন্দ্রের এই বৃহৎ উপন্যাসটির মঞ্চায়নে পরি-চালক শ্রীচক্রবর্তীর গুণপনা অনস্বীকার্য। দলগত অভিনয় সুন্দর। তাদের মধ্যেও যাঁরা সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁরা হলেন চিত্তরঞ্জন দাস, বিমল বন্দ্যো-পাধ্যায়, অনিল মিত্র, তারাপদ ঘোষ, রুবী মিত্র, গীতা নাগ, রত্না পাল, সুতপা চক্রবর্তী ও আরও কয়েকজন।

একক অভিনয়

শিল্পী সাহাদাত হোসেন বিভিন্ন স্বরে ও অভিব্যক্তিতে একাধিক চরিত্রে রূপদানের কৃতিত্বের অধিকারী। সিরাজদৌলা, এদেশ আমার, কলকাতার বুকে, মানুষ ও বৌদির প্রেম প্রভৃতি নাট্যকাহিনীর একক অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলতে উনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। শ্রীহোসেনকে এবার রবীন্দ্রমেলা কর্তৃপক্ষ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। শ্রীহোসেন কয়েকটি অনুষ্ঠানে তাঁর অভিনয় পরিবেশন করে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা'ও অর্জন করেছেন।

বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদের নাট্যানুষ্ঠান

গত ৭ই জুলাই স্থানীয় রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চে বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদের সদস্য-গণ তাঁদের বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে অপরেশ-চন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' নাটক মঞ্চস্থ করেন। যুগোপযোগী করে নাটকটি পরিচালনা ও অভিনয়ে, চরিত্র নির্বাচন বিষয়ে পরিষদ প্রশংসা দাবী করতে পারেন। সুঅভিনীত চরিত্রের মধ্যে শকুনির ভূমিকায় অমল চট্টো-পাধ্যায়, ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের ভূমিকায় কোহি-নুর দত্ত, নিয়তির ভূমিকায় দীপ্তি শীলের অভিনয় আকর্ষণীয়। কর্ণ ও বিকর্ণের ভূমিকায় সুবোধ পাঁজা ও মদন পাল চরিত্রের প্রতি সুবিচার করেছেন।

মঞ্চে 'কড়ি দয়ে কিনলাম'

৮ জুলাই ১৯৬৮ সন্ধ্যা ছটায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে নাট্য-কল্লোল প্রযোজিত বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' পরিবেশিত হয়। নাট্যকার ইলাবন্ত ঘোষ, 'কড়ি দি কিনলাম'কে নাট্যরূপ দিয়ে অসামান্য কৃতি পরিচয় দিয়েছেন।

পরিচালক ও নাট্যকার ইলাবন্ত ঘো মিঃ ঘোষালের ভূমিকায়, সত্য ও লক্ষ্মী ভূমিকায় গীতা দে ও সান্ত্বনা ঘোষ অপ অভিনয় করেন। এছাড়া মুদুল সে ভূমিকায় দীপঙ্কর সেন, গণদেব চট্টোপাধ্যা এর ভূমিকায় সন্তোষ দত্ত, রামুয়ার ভূমিক আলোক মিত্র, দীপুর মা ও নয়নরঞ্জন ভূমিকায় শেফালী দে, ছবি চট্টোপাধ্যায় ভা অভিনয় করেন। আলোক সম্পাত ও সংগী পরিচালনা মোটামুটি।

বাঁশরি

শৌভনিক-এর নিবেদন; রচনা রবীন্দ্রনাথ। মুক্ত অঙ্গনে অভিনী বিলিতি য়ুনিভার্সিটিতে পাসকরা মে বাঁশরি সরকার খ্যাতনামা সাহিত্যি ক্ষিতীশ ভৌমিক সম্পর্কে বলেছে "ক্ষিতীশবাবু ন্যাচারল্ হিস্ট্রি লেখে গল্পের ছাঁচে। যেখানটা জানা নেই, দগদ রঙ লেপে দেন মোটা তুলি দিয়ে। রাঙ আমদানী সমুদ্রের ওপার থেকে।" এবং নি মুখে ক্ষিতীশকে শুনিয়েছে : "বাং উপ ন্যাসে নিয়ুমার্কেটের রাস্তা খু নিজে জোরে, আলকাতরা ঢেলে......লেখবার শ আছে তোমার, কিন্তু নেই স্যার পরিচয়। এটা বিলিতি-বাঙালি মহল, ফ্যাশনের পাড়া।...এদের কাছ থেকে দূরে থাক, ঈর্ষা কর, বানিয়ে দাও গাল।......আমি চাই, তুমি স্পষ্ট জানতে শেখ, সাক্ষা করে লিখতে শেখ।"

আজ থেকে চৌত্রিশ কি প'য়ত্রিশ বছর বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এই 'বাঁশরি' নাটকের মাধ্যমে একদিকে যেমন সে-যুগের ইংগবঙ্গ সমাজের এক দীপ্তিময়ী তরুণীর প্রেমের তীব্রদহন রূপ থেকে কল্যাণময়ী শান্তি-দায়িনীরূপে উত্তরণের বিচিত্র চিত্র এঁকেছেন, অপরদিকে তেমনই সে-যুগের নব্য ঔপ-ন্যাসিকদের প্রতি ইংগবঙ্গ সমাজকে অব-লম্বন করে কাহিনী রচনা সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গেছেন।

ঠিক সমানভাবেই বলা যায়, আজও কোনো রবীন্দ্রনাটককে সাধারণ্যে পরিবেশন করবার সময়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। জানা থাকা উচিত, রবীন্দ্রনাথের রচনা বাঙলার নাট্য

ক জনসাধারণের কাছে আজও সহজপাচ্য ওঠেনি; ও'র রচিত সংলাপগর্লির এমন অনেক পংক্তি আছে, শিল্পীর মুখ একবারমাত্র শুনলেই যার অর্থ প্রাঞ্জল ওঠা কঠিন। দর্শকের শ্রুতি ও মনন- করবার জন্যে শিল্পীর বাচন শুধু ও যথাযথভাবে যতি দ্বারা বিন্যস্ত ই চলবে না, প্রয়োজনমত সংক্ষেপিত ও লীকৃত হওয়ারও প্রয়োজন আছে।

'শৌভনিক'-এর অভিনয়ে মূল 'বাঁশরি' কের কিছু কিছু অংশ পরিত্যক্ত হলেও ন্দ্র-সংলাপগর্লিকে প্রয়োজনানুরূপ লীকরণের কোনো প্রয়াস দেখা যায়নি। ড়া কোনো কোনো শিল্পী, বিশেষ করে -ভূমিকার অভিনেত্রী মমতা চট্টোপাধ্যায়, স্থানেই উপযুক্ত যতি বা বিরাম উপেক্ষা এমন দ্রুতলয়ে এবং সম্ভবত আবেগ শের (যেটা এই বিশেষ চরিত্রটির অনু- ন নয়) জন্য উচ্চগ্রামে সংলাপগর্লি লছেন, যার ফলে সেগর্লি অনুধাবনযোগ্য নি এবং সামগ্রিক রসস্ফূর্তিতে বাধারই ষ্টি করেছে। অবশ্য অন্য বহুস্থানে মতী চট্টোপাধ্যায়ের নাটনৈপুণ্যে আমাদের

কণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কার মানিয়েছেন সোমশংকরের ভূমিকায় পেন মুখোপাধ্যায়কে এবং তাঁর সংযত ভিনয়ও হয়েছে চরিত্র অনুযায়ী। ব্যারি- সতীশের ভূমিকায় বীরেশ্বর মিত্র ন্দর মার্জিত অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। ন ভৌমিকের তারকও প্রশংসনীয়ভাবে ন্দের। কিন্তু সন্ন্যাসী পুরন্দর চরিত্রে ক কুন্ডু উচ্চাদর্শে গঠিত নির্লিপ্ততা কাশ করতে গিয়ে বাচনকে বড্ড বেশী কাটা- শুষ্ক করে তুলেছেন। শচীনবেশী মল বন্দ্যোপাধ্যায়ের খালি গলায় 'আমরা ক্ষ্মীছাড়ার দল'টি অত্যন্ত সুগীত। লেখক তীশরূপে সুধাংশু মন্ডলও সার্থক রিত্রচিত্রণ করেছেন। সুষমারূপে মীনাক্ষী দু অসাধারণ না হয়েও সুন্দর অভিনয়ের দর্শন রেখেছেন। লীলাবেশে অনুরাধা শগুপ্ত কণ্ঠস্বরের কৃত্রিমতা ত্যাগ করলে লো করবেন। সুষীরূপে মায়া বসু সহজ স্বাভাবিক। নেপথ্য থেকে মঞ্জু দাশগুপ্ত দেবাশীস দাশগুপ্ত রবীন্দ্রসংগীতগর্লি ন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। মঞ্চ- জ্জা এবং আলো প্রশংসনীয়।

মমতাময়ী হাসপাতাল

সম্প্রতি হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর- পারেশন এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের শিল্পীবৃন্দ নেতাজী সুভাষ ইন্সিটিটউট ঞ্চে পরিবেশন করলেন 'মমতাময়ী হাস- পাতাল' নাটকটি। হরেন ভৌমিকের নির্দেশনায় এটির সংঘবদ্ধ অভিনয় মোটা- টি উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। কয়েকটি ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেছেন জে, পি, ক্রবর্তী, শৈলেন্দ্রকুমার দাস, কালীকৃষ্ণ য়, কৃষ্ণকুমার ঘোষ, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিত্র মিত্র।

বিবিধ সংবাদ

নব নাট্যম মহিলা শাখা (খড়্গপুর)

২৪ মে শুক্রবার সন্ধ্যায় খড়্গপুরের নব নাট্যম মহিলা শাখার উদ্যোগে রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় রবীন্দ্র ইনস্টিটিউট মঞ্চে। এই উপলক্ষে রবীন্দ্র-নাথের "শাপমোচন" নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়। পরিচালনায় ছিলেন শ্যামল চক্রবর্তী ও রমেন সরকার। নৃত্য পরিচালনায় শ্যামলী বিশ্বাস ও পম্পা চক্রবর্তী। সংগীত পরিচালনায় প্রিয়কুমার রায়। মঞ্চ-নির্দেশে ও আলোকসম্পাতে সুশীল বরণ। মঞ্চসজ্জায় বীরেন গোতম ও দুলাল মিত্র। বিশেষ সংগীত পরিচালনায় সুধাময় ঘোষ। রূপায়ণে পম্পা চক্রঃ, শ্যামলী বিশ্বাস, শার্বরী ভরদ্বাজ, বুলবুলি বসু, গীতা গাঙ্গুলী, দেবযানী বসু ও আরও অনেকে। আবহ-সংগীতে সুধাময় ঘোষ, দেবব্রত মন্ডল, ছবি চক্রবর্তী, ইন্দ্রাণী মৈত্রী, মণী ঘটক, নির্মল দত্ত ও আরও অনেকে।

রবীন্দ্র ও নজরুল জন্ম-জয়ন্তী উৎসব

বাগমারী সি আই টি বিল্ডিংসের 'শুভম' ক্লাবের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্ম উৎসব সি আই টি প্রাঙ্গণে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। আবৃত্তি, রবীন্দ্র গীতি, নজরুল গীতি, গীতিনাট্য, সমালোচনা প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী স্বপন বাগচী, গৌর দে, কাজল রায়, দীপু রায়, বেণু চৌরাশী, চিত্তপ্রসন্ন রায়, শান্তি চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ দাস, দিলীপ দাঁ, কিরিটি দাস, গৌরী কর্মকার।

মধ্য ইন্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

এবারে মধ্য ইন্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ছ'দিন ধরে চলবে। ছ'টিদিনই ছয়জন শিল্পীর স্মরণে উদযাপিত হবে। তাঁরা হলেন গিরিজা চক্রবর্তী, অরুণাভ মজুমদার, সুরেশ চক্রবর্তী, পান্নালাল ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও চন্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হবে নাটক, নৃত্যনাট্য, মূকাভিনয়, লোকগীতি, রবীন্দ্র সংগীত, উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রভৃতি।

সোসাইটি অব অ্যাসিসটেন্ট সিনেমা ফটো- গ্রাফার্স-এর কার্যনির্বাহক সমিতি

গত ২রা জুলাই ইন্ডিয়া ফিল্ম লেবরে-টরীতে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে নিয়োজিত সহকারী আলোকচিত্র শিল্পীদের বর্তমান বৎসরের জন্য এক কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি—অজয় কর; সহঃ সভাপতি—দুর্গা রাহা ও কে এ রেজা, যুগ্ম সম্পাদক— পংকজ দাস ও কালী ব্যানার্জী; কোষাধ্যক্ষ—অশোক দাস; সদস্য —অমূল্য দত্ত, আশু দত্ত, পূর্ণেন্দু বসু ও কানাই দাস।

যাদুকর রাজকুমার

সম্প্রতি তরুণ যাদুকর রাজকুমার পোর্ট ব্লেয়ারে কৃতিত্বের সঙ্গে যাদু প্রদর্শন করে ফিরেছেন। আন্দামানে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন বলে জানা গেল। বাঙালী হিসাবে যাদুবিদ্যা প্রদর্শনে আন্দামানে রাজকুমারের এই জনপ্রিয়তা নিশ্চয়ই গর্বের বিষয়। ইনি খুব শিগ্‌গিরই আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্থানের জয়পুরে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করতে যাবেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

রবিতীর্থের প্রতিষ্ঠা দিবস

সংগীত শিক্ষায়তন রবিতীর্থের দ্বাবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস আগামী ১০ ও ১৮ আগস্ট রবীন্দ্রসদনে উদযাপিত হবে। নৃত্য পরিকল্পনায় আছেন রামগোপাল ভট্টাচার্য।

শিশুস্বর্গ

শিশুস্বর্গের নিয়মিত আসর বসবে মহাজাতি সদনে রবিবার (২৮শে জুলাই) সকাল ৯টায়। এদিন চলচ্চিত্রে কার্টুন ও অন্যান্য ছবি প্রদর্শিত হবে।

জলসা

উৎপলা সেন

সি এল টি-তে মোরারজী দেশাই

গত ৫ জুলাই ক্যালকাটা লিট্‌ল থিয়েটার্স ক্যাম্প পরিদর্শনে এসেছিলেন শ্রীমোরারজী দেশাই। সঙ্গে ছিলেন শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

শিশু রঙমহলের সম্পাদক শ্রীসমর চ্যাটার্জি তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের প্রায় সকল সুসন্তানের আগমনে এই প্রতিষ্ঠান ধন্য কিন্তু শ্রীদেশাইকে অভ্যর্থনা করবার সুযোগ এই প্রথম। প্রতিষ্ঠান-সভ্যরা আশা করেন, শিশু রঙমহল সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট ধারণা যাতে গড়ে ওঠে, সে-প্রচেষ্টা তাঁরা করেছেন। জনপ্রিয় শিশু-প্রতিষ্ঠান অবন মহলের উত্তরোত্তর সম্পূর্ণতা সাধনে শ্রীদেশাই তাঁর মুক্তহস্ত প্রসারিত করবেন, উদ্যোক্তারা এই আশাই রাখেন।

একঘণ্টাব্যাপী অবন মহলের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শনের পর শ্রীদেশাইকে দেখানো হলো সুবিখ্যাত পাপেট ডান্স লব-কুশ।

কাগজের রঙ-বেরঙের পুতুল যেন জীবন্ত হয়ে রামায়ণের বিচিত্র কাহিনী সুন্দরভাবে তুলে ধরলো। আবহসংগীত, পরিবেশ এবং পটভূমিকা থেকে কাহিনী-বর্ণন ও কথোপকথন এত স্বাভাবিক যে, অভিনয় বলে বোঝবার উপায় নেই। প্রাপ্ত-বয়স্করাও যেন মুহূর্তের জন্য বয়সের ভার ভুলে শিশুতে পরিণত হয়েছিলেন। মানুষের অন্তরের চিরন্তন শিশুকে তার কলহাস্য-মুখরতায় যেন যাদুকরের মত জাগিয়ে তুলে-ছিল এই বিচিত্র অনুষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ এবং অনুষ্ঠান দেখে খুশিতে উচ্ছল হয়ে শ্রীদেশাই উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, শিশুদের অন্তরে পবিত্র-সুন্দর ভাব-ছন্দকে মঞ্জুরিত করবার সাধু প্রচেষ্টাই এই অসাধারণ সাফল্যের উৎস। শিশুরা খেলা ও অভিনয়ের মাধ্যমে যা শিক্ষা করছে, পরিণত বয়সে সেই শিক্ষাই তাদের চরিত্রবল সৃষ্টি করে দেশের ও দশের কল্যাণার্থে নিয়োজিত হবে। নানা বৈষম্যের মধ্যেও তারা সাম্যকে দেখবার মত অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে—এই আশাই তিনি রাখেন। একটি সুন্দর ছবি আঁকতে একটি রং-ই যথেষ্ট নয়। নানা রঙের প্রয়োজন। বিভিন্ন বর্ণ-সমন্বয়েই ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সুন্দর ছবি রচিত হয়। অবন মহলের স্রষ্টারাও মহৎ শিল্পী। কারণ, তাঁরা বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের সমাবেশে এক বিরাট সমন্বয়-সুষ্ঠু সামগ্রিক চিত্র রচনা করে আমাদের উপহার দিয়েছেন।

শিশু-শিল্পীরা নির্ভয়চিত্তে ও নিরলস সাধনায় এই সংঘের স্বপ্ন সফল করে তুলুন—এই প্রার্থনাই তিনি জানান। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীবিবেক সেনগুপ্ত শ্রীযুক্ত দেশাইকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন।

ওস্তাদ দবীর খাঁর চিত্তগ্রাহী ঠুংরী

রামপুর ঘরানার ধ্রুপদী শিল্পী ওস্তাদ দবীর খাঁর বীণ, সুরশৃঙ্গার, ধ্রুপদ ও ধামার শুনতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু তিনি যে রসমধুর ঠুংরী পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতে পারেন, সে-পরিচয় পাওয়া গেল সম্প্রতি জুবিলী পার্কের এক ঘরোয়া আসরে। উপলক্ষ্য—প্রবীণ সেতারী শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ৬৩তম জন্মোৎসব। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। প্রধান অতিথি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন। মানপত্র পাঠ করে অনুষ্ঠান-সভাপতি শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস। শিল্পী ও গুণীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ডাঃ যামিনী গাঙ্গুলী প্রশান্ত দাশগুপ্ত, চন্দ্রশেখর নিয়োগী ও শচীন মিত্র। আরো বহু গুণীজন শ্রীসেনগুপ্তের দীর্ঘায়ু কামনার্থে সভায় সানন্দে যোগদান করেন।

এমনি এক মেজাজী পরিবেশে মহম্মদ দবীর খাঁ উচ্ছল হয়ে যেন যৌবনের রাঙা দিনগুলিতে ফিরে গিয়ে ধরলেন এ চিত্তহারী ঠুংরী। শুধু রস, অনুভব অথবা মাদকতাই নয়, খাঁসাহেবের শিক্ষিত রেওয়াজী গম্ভীর কণ্ঠে ঠুংরীর মিলন ও বেদনার বিচিত্র রস যেন স্ব-মাধুর্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। প্রথম পুরব অঙ্গের শুদ্ধতা, তার পরে তার সঙ্গে পাঞ্জাবী ঢং-এর রং লেগে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। অবশেষে শেষের বৈচিত্র্যে আসর জমিয়ে এনে আশ্রয় রাগের আলাপে ফিরে গেলেন। এ যে শিল্পীর প্রাণচাঞ্চল্য ভাবের রঙমহলে বিহার করেও চিত্তের অতলস্পর্শী পিপাসা শান্তি খুঁজে না পেয়ে শুদ্ধ রাগের আলাপকেলে প্রত্যাবর্তন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি রসিক ও সন্ধানীচিত্তের এক আকুল ছবি। কোথায় কোন্ পরিবেশ অথবা উপলক্ষের আলতো ছোঁয়ায় কোন্ শিল্পীর অন্তর-সত্তা হঠাৎ জেগে ওঠে কে জানে? এই আকস্মিক প্রাপ্তির আনন্দটুকুই স্মরণীয়।

দুই জনপ্রিয় শিল্পীর মেগাফোনে [illegible]

দুই জনপ্রিয় শিল্পী শ্রীসতী[illegible] মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উৎপলা সেন এবার পুজোর দুখানি রেকর্ড করে[illegible] মেগাফোন কোম্পানীতে। গান দুটির রচয়িতা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুরকার ও সঙ্গীত পরি-চালক সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

সুরসভার 'বর্ষণ'

সম্প্রতি বালিগঞ্জস্থিত রবিতীর্থ ভবনে দক্ষিণ কলকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা সুরসভা কর্তৃক 'বর্ষণ' গীতালেখ্য পরিবেশিত হয়। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন রথীন চৌধুরী। সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন রঞ্জিতা বন্দ্যো-পাধ্যায়, দীপ্তি রায়, জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপা বাগচী, ইন্দ্রাণী দে, সাবিত্রী ভট্টাচার্য, দীপালী চৌধুরী, ঝর্ণা সান্যাল, গৌতম বসু ও তপন রায় চৌধুরী। সব শেষে গৌর বসাকের পরিচালনায় 'ভজন মঞ্জরী' ও পল্লী-গীতি পরিবেশিত হয়। এতে অংশ নেন চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, মমতা ঘোষ, হাসি দত্ত, প্রগতি রায় ও নন্দা গুপ্ত রায়। সঙ্গতে ছিলেন কিশোর নন্দী। —চিত্রাঙ্গদা

দূরপাল্লার দৌড়বীর

শংকরবিজয় মিত্র

১৯২৪ সালের ১০ই জুলাই দুপুর গড়িয়ে পৌনে চারটে বাজতেই প্যারিসে বিশ্ব-অলিম্পিকের আঙিনায় ১৫০০ মিটার দূরপাল্লা দৌড় আরম্ভের সংকেত-ধ্বনি বেজে উঠলো বন্দুকের আওয়াজে। বিভিন্ন দেশের সেরা দৌড়ানিয়ারা সুরু করলেন দৌড়। বৃটেনের দৌড়বীর ডগলাস লো দুদিন আগেই ৮০০ মিটার বিজয়ী হয়ে যেন উদ্বুদ্ধ হয়ে আছেন। গোড়া থেকেই তাঁকে পুরোভাগে দেখা গেল। কিন্তু প্রথম বাঁকের মুখে হাল্কা নীল রঙের পোষাকের লোকটি তাঁর দৌড়ের বেগ যেন বাড়িয়ে দিলেন। চারপাশ থেকে দর্শকদের আনন্দধ্বনি শোনা গেল আর সেই লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সামনে এগিয়ে গেলেন। ফিনল্যাণ্ডের দুরন্ত দৌড়ানিয়া পাভো নুরমী সকলকে পেছনে ফেলে ছুটলেন, আমেরিকার বাকার ও ওয়াটসন এবং বৃটেনের স্ট্যালার্ড পরপর চললেন। প্রচণ্ড বেগে সকলেই ছুটছে, জেতার নেশায় সকলেই উন্মত্ত। এরই মধ্যে নুরমী তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনায় পথ পরিষ্কার করে চলেছেন। তাঁর পরিকল্পনা হল প্রথম ৫০০ মিটারে সর্বোচ্চ স্পীড দিয়ে সহযাত্রীদের বে-দম করা। এই পরিকল্পনা খাটিয়েই তিনি এর আগে দু-একটা বিশ্ব-রেকর্ড করেছেন। প্রচণ্ড বেগে পাল্লা চলে। নুরমী ৪০০ মিটার অতিক্রম করলেন ৫৮ সেকেণ্ডে, ৫০০ মিটার সমাপ্ত করতে লাগল ১ মিঃ ১৩ সেকেণ্ড। দম ফুরিয়ে যাবে আশঙ্কা করে অন্যান্য দৌড়ানিয়ারা তখন তাঁদের বেগ কমিয়ে আনলেন। কেবল অনভিজ্ঞ আমেরিকান দৌড়বীর ওয়াটসন তখনও পাল্লা দিয়ে চলেছেন। লো আর স্ট্যালার্ড পুরো ২৫ গজ পেছনে। নুরমী যেন কিছুই লক্ষ্য করছেন না। তাঁর প্রচণ্ড বেগ অন্যান্য দৌড়ানিয়ার ওপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তাতে তিনি নিরুদ্বেগ। আপন মনে তিনি পরিকল্পনা এঁটে ছুটে চলেছেন। প্রথম ক্ষেপ (৫০০ মিঃ) শেষ করে তিনি হাতের স্টপওয়াচটা একবার দেখে নিলেন। ঠোঁটের কোণে হাসি ঝিলিক মেরে গেল। হয়তো বা পরিকল্পনা অনুযায়ী দৌড় চালাতে পারছেন বলে এই খুশী মেজাজ।

খুশী হবারই কথা। ১ মিঃ ১৩ সেঃ ৫০০ মিটার শেষ করা ১৯৬৭ সালে জিম রিউন বা, ১৯৬০ সালে হার্ব এলিয়টের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। এরা উভয়েই ১৫০০ মিটারে বিশ্ব-রেকর্ড করেছিলেন। কিন্তু তাদের ৫০০ মিটার সমাপ্ত করতে সময় লেগেছিল—হার্ব এলিয়টের ১ মিঃ ১৩·১ সেঃ এবং জিম রিউনের ১ মিঃ ১৪·৫ সেঃ।

দ্বিতীয় স্তরে (৫০০ মিটার থেকে ১০০০ মিঃ) নুরমী তাঁর গতিবেগ মাইল দৌড়ের প্রথাগত পর্যায়ে নিয়ে আসেন। একটা সুসম ছন্দে যেন বেগটাকে বেঁধে নিয়েছেন। দৌড়ের ভঙ্গিতেও যেন নিশ্চিত জয়ের ছাপ মারা—বুক চিতিয়ে চলেছেন। ওয়াটসন তখনও দু-তিন গজ পেছনে, বেশ বোঝা যাচ্ছে যে তাঁকে সর্বশক্তি নিয়োগ করে দৌড়তে হচ্ছে। বেশীক্ষণ আর তার পক্ষে এটা সম্ভব হল না, তার শক্তিতে নুরমীর সঙ্গে লেগে থাকা আর কুলোল না। স্ট্যালার্ড পায়ে চোট নিয়েও দৌড়চ্ছিলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে যন্ত্রণার চোটে বুঝতে পারেননি নুরমির কত পেছনে পড়েছেন। হুঁশ হয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেন, তাঁর পেছনে চলেছেন লো। পুরোভাগে চলেছেন নুরমী অনায়াস ছন্দে, হাজার মিটার শেষ করলেন ২ মিঃ ৩২· সেঃ। দ্বিতীয় স্তরে তাঁর প্রথম স্তরের তুলনায় ৬ সেঃ বেশী লেগেছে।

শেষ স্তরের ৫০০ মিটারের প্রারম্ভে নুরমী তাঁর স্টপ-ওয়াচটা একবার দেখে নিয়ে ঘাসের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। একটু জোর দিয়ে ওয়াটসনকে ৪০ গজ পেছনে ফেললেন। প্রচণ্ড বেগের ধাক্কায় ওয়াটসনের দম তখন ফুরিয়ে এসেছে। বেশ বোঝা গেল দৌড়ের ফলাফল প্রায় স্থির হয়ে গিয়েছে। কারণ অন্যান্য দৌড়ানিয়ারা তখন ৮০ গজ পেছনে। নুরমী নিরুদ্বেগে সহজ ভঙ্গিতে পুরোভাগে চলেছেন, স্বর্ণ-পদক তখন প্রায় তাঁর করতলগত, তাই কে কোন স্থান পাচ্ছে সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। স্ট্যালার্ড তাঁর যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে মরণপণ করে একটা পাল্লা দিয়ে সপ্তম স্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে এলেন এবং অনেকটা নুরমীর কাছাকাছি এসে পড়লেন। দৌড় তখন সমাপ্তির মুখে। দর্শকরা সোল্লাসে চেচিয়ে উঠলেন। "পাভো নুরমী, ইংরেজ স্ট্যালার্ড তোমায় ধরে ফেললো।" উল্লাসধ্বনিতে উৎসাহিত হয়েই যেন নুরমী তাঁর স্পীড বাড়িয়ে দিলেন। দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে ২৫ গজ ব্যবধানে রেখে ৩ মিঃ ৫৩·৬ সেঃ সময়ে নুরমী ১৫০০ মিটার দৌড়ে সুবর্ণপদক জয় করলেন। সুইডেনের উইলি শেরার শেষ সময়ে পরিশ্রান্ত স্ট্যালার্ডকে পেছনে রেখে দ্বিতীয় স্থান নিলেন। স্ট্যালার্ড শেষ সীমায় এসে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। পর-পর স্থান পেলেন লো, বাকার ও হ্যান। অলিম্পিকে অবিশ্বাস্য মনে হলেও নুরমী এই দৌড়ের শেষ স্তরে গা ছেড়ে দৌড়েছেন। তাঁর শেষ স্তরের সময় থেকেই সেটা প্রমাণিত হয়। কারণ এই স্তরে তাঁর সময় লেগেছে ১ মিঃ ২১·৬ সেঃ—প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের সময় থেকে যথাক্রমে ৮·৬ সেঃ ও ২·৬ সেঃ বেশী।

এই দৌড়ের সময় তাঁর নিজস্ব বিশ্ব-রেকর্ড থেকে এক সেকেণ্ড বেশী হলেও বিশ্বের সেরা সেরা দৌড়ানিয়ার সঙ্গে পাল্লায় তাঁর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, নিজস্ব ছকে ফেলে দৌড়ের প্রতিটি স্তর অতিক্রম এবং সুনিশ্চিততার সঙ্গে স্বর্ণপদক জিতে নেওয়া নুরমী ছাড়া অপর কোন দৌড়বীরের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১৯২৪ সালের বিশ্ব অলিম্পিককে নুরমীর বিজয়-কেতন ওড়ানো অলিম্পিক বলা চলে। এ অলিম্পিকে নুরমী পাঁচটি স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন—যা এপর্যন্ত আর কোন দৌড়ানিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়নি। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত শক্তি, সামর্থ্য ও স্নায়ু-শৌর্যে নুরমী যে অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের সমগ্র ইতিহাসে তার আর দ্বিতীয় নজীর নেই। প্যারিসের এই অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতার সময় তালিকা-প্রকাশিত হলে দেখা গেল যে ১৫০০ মিটার দৌড় ও ৫০০০ মিটার দৌড় ঠিক এক ঘন্টার ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হবে। মাঝখানে এক ঘন্টা সময় রেখে পর-পর দুটো দূর-পাল্লার দৌড় দৌড়ানো যে সহজ-সাধ্য নয় তা সহজেই বোঝা যায় এবং এরূপ ক্ষেত্রে সাহসী হওয়াটাও স্বাভাবিক নয়। নুরমী কিন্তু তাতে ভয় পাননি। তিনি দুটোতেই নাম রাখলেন। অবশ্য অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তিনি ১০,০০০ মিটার দৌড় থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করলেন। এই দৌড়ে তাঁর স্বদেশবাসী রিটোলা তাঁর বিশ্ব-রেকর্ড ভেঙেছিলেন বলে অলিম্পিকে তাঁকেই সুযোগ দেবার মনস্থ করলেন। ১৯২৪ সালের গোড়াতেই নুরমী আটটি দূর-পাল্লার দৌড়ে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন—১৫০০ মিঃ, এক মাইল, ২০০০ মিঃ, ৩০০০ মিঃ, ৩ মাইল, ৫০০০ মিঃ, ৬ মাইল ও ১০,০০,০ মিঃ। ১৯২০ সালেই তিনি ১০,০০০ মিটারে অলিম্পিক স্বর্ণ-পদক জয় করেছিলেন। হয়তো বা সেই-জন্যেই ১০,০০০ মিটারে দৌড়টা এবার ছেড়ে দিলেন।

যাই হোক, ১৫০০ মিটার দৌড় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দলের ম্যানেজার নুরমীকে ড্রেসিংরুমে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁকে গদীর ওপর শুইয়ে দেওয়া হলো। তিনি চোখ বুজে শুয়ে রইলেন, আস্তে আস্তে তাঁর শরীরে 'ম্যাসাজ' করা হতে লাগল। নুরমী বেশ ঘুমিয়েই পড়লেন।

পৌনে পাঁচটা—প্রথম দৌড়ের ঠিক এক ঘন্টা পরে দ্বিতীয় দৌড়, এবারের পাল্লা ৫০০০ মিঃ। নুরমী প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ডাইনে বামে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, সকলেই অন্ততঃ ৪৮ ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে নেমেছেন, কাজেই এবার তাঁর জয় সম্পর্কে সকলেই সন্দিহান হয়ে উঠলেন।

অলিম্পিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় প্রতি-দ্বন্দ্বিরা প্রচণ্ড স্নায়ু-উত্তেজনার শিকার হন। অনিশ্চয়তা ও আত্মসন্দেহ তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। প্রচণ্ড মনোবল নিয়ে এই স্নায়ু-উত্তেজনাকে সংযত করে জয়ের সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হতে হয়। তাছাড়া প্রতি-যোগিতার অবসানে একটা অবসাদ আসে। তা কাটিয়ে ওঠাও সহজ-সাধ্য নয়। কাজেই একটা প্রতিযোগিতার মাত্র এক ঘন্টা ব্যবধানে যে আর একটা প্রতিযোগিতায় প্রস্তুত ও

সুদৃঢ় সংকল্পে এগিয়ে গিয়ে জয়লাভ করা যাবে, তা বিশ্বাস করতে কারুরই মন প্রস্তুত ছিল না।

দৌড় আরম্ভের সংকেত-ধ্বনির সংগে সংগে ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে চললো দৌড়ানিয়ারা। সুইডেনের এডভিন ওয়াইড সকলের সামনে। দর্শকদের দৃষ্টি ছিল নুরমী, রিটোলা ও ফরাসী দৌড়বীর ডোলাকির ওপর। তাই ওয়াইডকে সামনে দেখে তাদের তৃপ্তি হচ্ছিল না। ৫০০ মিটারের প্রথম স্তর শেষ হয়ে দ্বিতীয় স্তরে ওয়াইড, রিটোলা, ডোলাকি আর নুরমী বাকী সকলকে ছাড়িয়ে গেলেন—২ মিঃ ৪৬ সেকেন্ডে ১০০০ মিটার অতিক্রম করলেন তাঁরা। প্রচণ্ড বেগে চলেছেন দৌড়ানিয়ারা। ৪০ বছর পরে ১৯৬৪ সালে টোকিও ওলিম্পিকেও এই হাজার মিটার অতিক্রম করতে সময় লেগেছে ২ মিঃ ৫০·২ সেঃ। এই প্রচণ্ড বেগের কারণ হচ্ছে নুরমীকে গোড়ার দিকেই ঘায়েল করবার জন্যে দৌড়ানিয়াদের প্রবল চেষ্টা। কিন্তু নুরমী যে কি অসাধারণ সামর্থ্যের অধিকারী তা তারা কল্পনা করতে পারেনি। তাই একঘন্টা আগে ১৫০০ মিটার দৌড়ে যে নুরমী সমান পাল্লায় দৌড়েছেন তৃতীয় স্তরে উনিশ বছর বয়স্ক ফরাসী দৌড়ানিয়া ডোলাকির পক্ষে পাল্লা রাখা শক্ত হয়ে উঠল। নুরমী তাকে পেছনে ফেলে তৃতীয় স্থান দখল করলেন। ৫ মিঃ ৪৩ সেঃ লাগল এদের দু-হাজার মিটার দৌড়াতে এবং ডোলাকি তখন ৯০ গজ পেছনে পড়েছে। অন্যান্যেরা আরও ৬০ গজ পিছিয়ে।

পাঁচ হাজারের আধাআধি পথে ওয়াইডের নেতৃত্ব আর রইল না। ফিনল্যাণ্ডের প্রতিযোগীদ্বয় তাঁকে ছাড়িয়ে গেলেন—নুরমী প্রথম, রিটোলা দ্বিতীয় স্থানে। ওয়াইড রইলেন তৃতীয় স্থানে। নুরমী ও রিটোলার মধ্যেই যে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা হবে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। নুরমী তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দৌড়াতে লাগলেন, প্রতিটি চেক-পয়েন্টে বিশ্ব-রেকর্ডের সময়ের সংগে স্টপ-ওয়াচ মেলাতে লাগলেন। এবং যে হারে দ্রুততা বৃদ্ধি করতে লাগলেন, তাতে অন্যান্য প্রতিযোগীরা তাল রাখতে প্রমাদ গনলেন। ৩০০০ মিটারের (৮ মিঃ ৪২·৬ সেঃ) সময় ওয়াইডকে রীতিমত চেষ্টা করতে হয়েছে এবং ৪০০০ মিটারের (১১ মিঃ ৩৮-৪ সেঃ) সময় তিনি ৮০ গজ পেছনে পড়েছেন। কিন্তু রিটোলা স্তরের পর স্তর অতিক্রম করে নুরমীকে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছেন। প্রতিটি স্তরের শেষে নুরমী তাঁর স্টপ-ওয়াচ মিলাচ্ছেন, মনে হচ্ছে, রিটোলার সামীপ্য তাঁকে উদ্বিগ্ন করছে। রিটোলাকে কিন্তু বেশী উদ্বিগ্ন দেখা গেল। নুরমী খাড়াভাবে চলেছেন, সংযত মুখমণ্ডল শান্ত, পরিশ্রমে ও প্রচণ্ড প্রয়াসে রিটোলার মুখে যন্ত্রণার ছাপ, প্রাণপণ শক্তিতে দাঁতে-দাঁত দিয়ে, বদ্ধমুষ্টি হয়ে রিটোলা পাল্লা দিয়ে চলেছেন।

দশম বা শেষ ৫০০ মিটার স্তরে নুরমী শেষবার ঘড়িটা মিলিয়ে আস্তে সেটা পথপার্শ্বে ফেলে দিলেন। সময়ক্রম ঠিকই আছে। এখন রিটোলার উপস্থিতিটা যেন অনুভব করলেন, স্পীড বাড়ালেন। শেষ স্তরের পাল্লা, সামান্য মাত্র ব্যবধান নুরমী আর রিটোলা। জনতা উল্লাসধ্বনি করে অভিনন্দন জানায়, কখনও নুরমীকে, কখনও বা উভয়কে। ফিল্ড এথলীটরা, অফিসিয়্যালরা এই দুই দৌড়বীরের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখতে পথের পাশে ভিড় জমায়। তৃতীয় থেকে দশম—এই অষ্টস্তরে নুরমী যে দু-গজের ব্যবধান রেখে এগিয়ে রয়েছেন শত-চেষ্টাতেও রিটোলা তা এক ইঞ্চিও কমাতে পারেননি। এই সমস্ত দূরত্ব-ব্যেপে নুরমী যেন রিটোলাকে নিয়ে খেলা করেছেন এবং এই নিষ্ঠুর খেলায় এতটুকু নমনীয়তা দেখা যায়নি। এমনকি 'ঘাড় ফিরিয়ে একবার পেছনেও তাকাননি নুরমী। ১৪ মিঃ ৩১-২ সেঃ তিনি ৫০০০ মিটার শেষ করলেন তাঁর নিজের বিশ্ব-রেকর্ড থেকে তিন সেকেণ্ড বেশী সময় লেগেছিল। ১/৫ সেঃ বেশী লেগেছে রিটোলার। তিনি হলেন দ্বিতীয় এবং ওয়াইড পেলেন তৃতীয় স্থান, ১৫ মিঃ ১-৮ সেঃ সময়ে।

একই দিনে মাত্র একটি ঘন্টার ব্যবধানে ১৫০০ মিঃ আর ৫০০০ মিটারের দূর-পাল্লার দুটি প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পাওয়া বিশ্ব অলিম্পিকের ইতিহাসে এই একবারই সম্ভব হয়েছে। এ আর দ্বিতীয়বার ঘটেনি বা ঘটবেও না। দূরপাল্লার দৌড়ে নুরমী তাই আজও অদ্বিতীয়। (পিটার লাভসির "দূরের রাজা" থেকে বিবরণটি সংকলিত)।

এক অলিম্পিক অনুষ্ঠানে একাধিক স্বর্ণপদক জয়ের দিক থেকেও নুরমী অসাধারণ সাফল্যের অধিকারী। ১৯২৪-এর এই প্যারিস অলিম্পিক অনুষ্ঠানে তিনি পাঁচটি স্বর্ণপদক পান। তাঁর এই সাফল্যের সমকক্ষ আর কেউ হতে পারেননি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে ১৯০০ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠানে আমেরিকায় আলভিন ক্রায়েঞ্জলন চারটি স্বর্ণপদক, এবং ১৯৪৮ সালে হল্যান্ডের মহিলা এথলীট ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন চারটি স্বর্ণপদক পেয়ে তাঁর সাফল্যের কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু আজও পাঁচটি স্বর্ণপদক প্রাপ্তির উজ্জ্বল জয়তিলক একমাত্র নুরমীর ললাটেই জ্বলজ্বল করছে।

দৌড়বীর হিসেবে নুরমী ছিলেন অনন্যসাধারণ। তিনি ২৩টি বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী হয়েছিলেন। এছাড়াও আরও কত রেকর্ডের কৃতিত্ব যে তাঁর তা বলে শেষ করা যায় না, সেসব রেকর্ড অনুমোদন করতে কেউ অগ্রসর হয়নি এবং নুরমীও তা নিয়ে মাথা ঘামাননি। স্বদেশ ফিনল্যান্ডের ২২টি জাতীয় রেকর্ডও তিনি সৃষ্টি করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় অসংখ্য দৌড়ে তিনি বিজয়ী হয়েছেন।

এথলীট, বিশেষতঃ দূরপাল্লার দৌড়-বীর হিসেবে তিনি খ্যাতির তুঙ্গশীর্ষে স্থান পেয়েছিলেন। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ব্যক্তিকে নানা সমালোচনা ও হিংসা-দ্বেষের সম্মুখীন হতে হয়। নুরমীও তা থেকে রেহাই পাননি। দৌড়ানিয়া হিসেবে প্রতিযোগিতার কর্মকর্তা এবং সাংবাদিকদের সংগেও তাঁর বিরোধ ঘটেছে। কিন্তু কখন তার প্রতিপক্ষ এথলীটদের সংগে কোন বিরোধ বা কলহ হয়নি। প্রতিযোগী এথলীটদের সংগে তাঁর সম্পর্ক চিরদিনই মধুর ছিল।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ডের টুর্কু শহরে নুরমী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ শারীরিক সামর্থ্যের অধিকারী ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি ফিনল্যাণ্ডের স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় জুনিয়র জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন এবং তখন থেকেই এথলীট হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি প্রায় পৌনে ছ' ফুট লম্বা ছিলেন এবং তাঁর ওজন ছিল প্রায় ৬৫ কে জি। ১৯২০ সালে এন্টোয়ার্পে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে দশ হাজার মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জয় করেন এবং আট হাজার মিটার আন্তর্দেশ দৌড়ে প্রথম হন। এই বছরই তিনি তিন হাজার মিটার দৌড়ে জাতীয় রেকর্ড করেন, ১৫০০ মিটার ও ৫০০০ মিটার দৌড়ে ফিনল্যাণ্ডের চ্যাম্পিয়ন হন ও ৪ : ২৭·২ মিনিটে মাইল দৌড়ে ক্রীড়াজগতের বিস্ময় সৃষ্টি করেন।

১৯২৪ সালের বিশ্ব অলিম্পিকে যোগদানের পূর্বে তিনি আটটি বিষয়ে বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টি করেন। ১৯২৮ সালে আমস্টার্ডামে বিশ্ব-অলিম্পিকে তিনি আবার দশ হাজার মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। এবছর বার্লিনে তিনি ১৫০০০ মিটার দৌড়ে ও ১০ মাইল দৌড়ে বিশ্ব-রেকর্ড করেন। ১৯৩০ সালে স্টকহলমে ২০০০০ মিটার দৌড়ে তিনি আর এক বিশ্ব-রেকর্ড করেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে দৌড় প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রিত হয়ে অসামান্য সম্মান ও সাফল্য লাভ করেন। এর ফলে তাঁর শত্রুসংখ্যাও কম হয়নি এবং ১৯৩২ সালের বিশ্ব-অলিম্পিকের প্রাক্কালে তাঁর এমেচার পদবী ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে অভিযোগ এনে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। অলিম্পিকে এর পর আর তিনি যোগদান করেননি। কিন্তু দূরপাল্লার দৌড়ানিয়া হিসেবে [illegible] সম্মান ও খ্যাতি সে যুগে অক্ষুণ্ণই ছিল। ১৯৩৩-৩৪ সালেও তিনি জাতীয় এমেচার হিসেবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৩৩ সালেও তিনি ফিনল্যাণ্ডের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করেন।

দূরপাল্লার দৌড়ে নুরমী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক-যুগে যে মান সৃষ্টি করেছেন এবং দৌড়ের এই বিভাগের উন্নয়নে যে দান রেখে গেছেন, বিশ্বের ক্রীড়াজগৎ তা চিরকাল শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করবে। ১৯১৪ থেকে ১৯৩৪ দীর্ঘ কুড়ি বছর দূরপাল্লার দৌড়ে নুরমী ছিলেন একটা বিস্ময়, একটা তেজোদ্দীপ্ত গতিপূর্ণ জীবনছন্দ। তাঁর এই বিরাট নাম একদিনে আসেনি। অক্লান্ত সাধনায় তিনি নিজেকে মহিমময় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মোহনবাগান বনাম কালীঘাট দলের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় কালী-ঘাটের গোলের সামনের একটি দৃশ্য। ফটো : অমৃত

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট

ইংল্যান্ড : ৪০৯ রান (কলিন কাউড্রে ১০৪, টম গ্রেভনী ৯৬ এবং জন এডরিচ ৮৮ রান। ফ্রিম্যান ৭৮ রানে ৪ এবং কনোলী ৮৪ রানে ৩ উইকেট)

ও **১৪২ রান** (৩ উইকেটে ডিক্লেঃ জন এড-রিচ ৬৪ এবং গ্রেভনী নট আউট ৩৯ রান। কনোলী ৫৯ রানে ২ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ২২২ রান (চ্যাপেল ৭১, কাউপার ৫৭ এবং ওয়াল্টার্স ৪৬ রান। ইলিংওয়ার্থ ৩৭ রানে ৩ এবং আন্ডার-উড ৪৮ রানে ৩ উইকেট)

ও **৬৮ রান** (১ উইকেটে)

প্রথম দিন (জুলাই ১১) :
বৃষ্টির দরুণ খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় দিন (জুলাই ১২) :
ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ২৫৮ রান সংগ্রহ করে। খেলায় অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক কলিন কাউড্রে (৯৫ রান) এবং টম গ্রেভনি (৩২ রান)।

তৃতীয় দিন (জুলাই ১৩) :
ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৪০৯ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলার বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংসের ১টা উইকেট খুইয়ে ১০৯ রান তুলেছিল। কাউপার (৫৪ রান) এবং চ্যাপেল (৪০ রান) খেলায় অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ দিন (জুলাই ১৫) :
অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২২২ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড ৩ উইকেটে ১৪২ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না-খুইয়ে এইদিন ৯ রান সংগ্রহ করেছিল।

পঞ্চম দিন (জুলাই ১৬) :
বৃষ্টির দরুণ অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের ৬৮ রানের (১ উইকেটে) মাথায় তৃতীয় টেস্ট খেলা পরিত্যক্ত হয়।

এজবাস্টনে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি বৃষ্টির জন্যে পরিত্যক্ত হয়। ফলে খেলা অমীমাংসিত থাকে। লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট খেলাতেও ঠিক এই দশা হয়েছিল। অস্ট্রে-লিয়ার কপাল ভাল, বৃষ্টি তাদের দুবারই বাঁচিয়ে দিয়েছে। ম্যাঞ্চেস্টারের প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করায় বর্তমানে তারা ১-০ খেলায় এগিয়ে আছে। ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজের আর দুটি খেলা বাকি—৪র্থ এবং ৫ম।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে টসে জয়ী হন। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে প্রথম দিন খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ২৫৮ রান সংগ্রহ করেছিল। লাঞ্চের সময় ৬৫ রান এবং চা-পানের সময় ১৫৬ রান (১ উইকেটে) ছিল। এইদিনের খেলায় কাউড্রে (৯৫ রান) এবং গ্রেভনী (৩২ রান) অপরাজিত থেকে যান। প্রথম উইকেটের জুটিতে বয়কট এবং এডরিচ ১৫৪ মিনিটের খেলায় ৮০ রান তুলেছিলেন।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে তাঁর এই ১০০তম টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত নট আউট ৯৫ রান সংগ্রহ করার সূত্রে দুজন বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের টেস্ট খেলায় সংগৃহীত মোট রান-সংখ্যাকে অতি-ক্রম করে যান। যেমন ইংল্যান্ডের স্যার লেন হাটনের ৬৯৭১ রান এবং অস্ট্রেলিয়ার স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের ৬৯৯৬ রান। এইদিন কলিন কাউড্রের টেস্ট ক্রিকেট খেলায় মোট ৭০৩৫ রান দাঁড়ায়। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সর্বাধিক মোট রানের বিশ্ব রেকর্ড আছে ওয়াল্টার হ্যামন্ডের—মোট রান ৭২৪৯। এপর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ৭০০০

রান সংগ্রহ করেছেন মাত্র দু'জন—ওয়াল্টার হ্যামণ্ড (৭২৪৯ রান) এবং কলিন কাউড্রে (৭০৪৪ রান)। এই দু'জনেই ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়। কাউড্রে যদি কোন কারণে টেস্ট খেলা থেকে বাদ না পড়েন, তাহলে হ্যামণ্ডের বিশ্ব-রেকর্ড ভাঙতে তাঁর বেশী সময় লাগবে না। উপস্থিত আরও দু'জনের টেস্ট ক্রিকেটের ব্যক্তিগত মোট ৭০০০ রানের ঘরে পৌঁছবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে; তাঁরা হলেন ইংল্যান্ডের কেন ব্যারিংটন এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গারফিল্ড সোবার্স। বর্তমানে সোবার্সের ৬৫টি খেলায় ৬০৫৯ রান এবং ব্যারিংটনের ৮০টি খেলায় ৬৭১১ রান দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৪০৯ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিন ইংল্যান্ড তাদের বাকি ৭টা উইকেটে ১৫১ রান সংগ্রহ করেছিল। লাঞ্চের সময় ছিল ৩৩৬ রান (৬ উইকেটে)। খেলার শুরু থেকে কাউড্রের দিকেই মাঠের সমস্ত দর্শকের চোখ নিবদ্ধ ছিল। কাউড্রে তাঁর ব্যক্তিগত ৯৫ রানের পুঁজি নিয়ে তৃতীয় দিনে খেলতে নামেন—তাঁর শত রান পূর্ণ হতে আর মাত্র ৫ রানের দরকার। নব্বই রানের ঘরে গিয়ে মাত্র দু'এক রানের জন্যে শত রান পূর্ণ হয়নি টেস্ট ক্রিকেটে এমন নজীর অনেক আছে। কাউড্রেই টেস্ট ক্রিকেট খেলায় দু দুবার তিন-চার রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেননি। নব্বই রানের ঘরে পোঁছে অনেক ঘাঘা ঘাঘা খেলোয়াড় চোখে সরষে ফুল দেখেন এবং ঘাবড়ে গিয়ে আউট হন। এসব কথা স্মরণ করেই কাউড্রে খুব সতর্কতার সঙ্গে ধীরস্থির হয়ে খেলতে থাকেন। ৯৯ রানের মাথায় ১৫ মিনিট ঠুকঠাক খেলার পর তিনি এক রান নিয়ে তাঁর শত রান পূর্ণ করেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এই নিয়ে তিনি ২১টি সেঞ্চুরী করলেন—অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাঁর সেঞ্চুরী ৫টি। বিশেষ উল্লেখ্য, স্বদেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট খেলায় এইটি তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী।

কাউড্রে শেষপর্যন্ত ৯০ রানের গাঁট পেরিয়ে সেঞ্চুরী করলেন কিন্তু টম গ্রেভনী ফাঁড়া কাটাতে পারলেন না—তাঁর ৯৬ রানের মাথায় কনোলীর বলে বোল্ড আউট হলেন। তৃতীয় দিনের বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া ১ উইকেট খুইয়ে ১০৯ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২২২ রানের মাথায় শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়া তাদের বাকি ৯টা উইকেটে এইদিন ১১৩ রান তুলেছিল। অস্ট্রেলিয়ার শেষ ৫টা উইকেট পড়েছিল মাত্র ৯ রানে—১০ ওভারের খেলায়। অস্ট্রেলিয়া কোনরকমে 'ফলো-অন' থেকে ছাড়া পায়। ২য় উইকেটের জুটিতে বব কাউপার এবং আয়ান চ্যাপেল ১১১ রান তুলে দলের যা মুখরক্ষা করেন। তৃতীয় দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরী তাঁর ৬ রানের মাথায় আঙ্গুলে জোর চোট খেয়ে খেলা থেকে অবসর নিয়েছিলেন। চতুর্থ-দিনে তাঁর পক্ষে খেলতে নামা সম্ভব হয়নি। ইংল্যান্ড ১৮৭ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১৪২ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। কলিন কাউড্রের এই ঘোষণা বিশেষ খেলোয়াড়োচিত উদারতার পরিচয়। খেলায় জয়লাভের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার ৩৩০ রানের প্রয়োজন ছিল। চতুর্থ দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া কোন উইকেট না-খুইয়ে ৯ রান তুলেছিল।

পঞ্চম দিনে মাত্র ৯০ মিনিট খেলা হয়েছিল। খেলার বাকি সময়টা বৃষ্টিতে ধুয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের ৬৮ রানের (১ উইকেটে) মাথায় খেলাটি পরিত্যক্ত হয়।

১০০ মিটার দৌড়

দৌড় অনুষ্ঠানের তালিকায় পদমর্যাদার দিক থেকে ১০০ মিটার দৌড়ের স্থান প্রথম। ১০০ মিটার দূরত্বের দৌড় নিয়েই আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকস্ আসরে যত উৎসাহ, উদ্দীপনা, উত্তেজনা এবং প্রতিদ্বন্দিতা। বৈজ্ঞানিক যান-বাহন এবং যন্ত্রপাতির ক্রমবর্ধমান 'গতি' মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী এবং সামাজিক পরিবেশ যেভাবে প্রতিনিয়ত বদলে দিচ্ছে খেলাধুলার আসর তার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। কত কম সময়ে ১০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করা যায় তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকরাও যথেষ্ট মাথা ঘামাচ্ছেন। তবে এ্যাথলীটদের দৈহিক গঠন-প্রকৃতি, শক্তি-সামর্থ্য এবং সামাজিক পরিবেশ সাফল্য লাভের পক্ষে প্রধান উপাদান। এদিক থেকে নিগ্রো এ্যাথলীটরা কতকগুলি প্রকৃতদত্ত উপাদানে বলীয়ান।

১০০ মিটার দৌড়ে আমেরিকার এ্যাথলীটদের নাম-ডাকই সব থেকে বেশী। অলিম্পিকের বিগত ১৫টি অনুষ্ঠানে আমেরিকা একাই পেয়েছে ১১টি স্বর্ণপদক। একটি করে স্বর্ণপদক পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, গ্রেটবৃটেন, কানাডা এবং জার্মানী। আমেরিকার উপর্যুপরি ৫বার (১৯৩২-৫৬) স্বর্ণপদক জয়ের পর ১৯৬০ সালে জার্মানী তাদের একটানা জয়লাভের পথে বাধা দেয়। আমেরিকা পুনরায় ১৯৬৪ সালে স্বর্ণপদক জয় করে। আমেরিকার এই বিরাট জয়লাভের উৎস নিগ্রো এ্যাথলীট। ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে জার্মানীর আর্মিন হ্যারী ১০·২ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙ্গে দেন। রোম অলিম্পিকের আগে ১৯৬০ সালেরই ২১শে জুন জার্মানীর আর্মিন হ্যারী ১০·০ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে যে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন তা আরও পাঁচজন এ্যাথলীট স্পর্শ করলেন—১৯৬০ সালের ১৫ই জুলাই হ্যারী জেরোম, ১৯৬৪ সালে এইচ এস্টেভেস (ভেনিজুলা) এবং টোকিও অলিম্পিকে রবার্ট হেজ (আমেরিকা), ১৯৬৭ সালে জিম হিনেস (আমেরিকা) এবং ইউরিক ফিগুয়েরোলা (কিউবা)। এরপর লোকের দৃঢ় ধারণা হল ১০·০ সেকেণ্ডের কম সময়ে মানুষের পক্ষে ১০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকান এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ানশীপের আসরে তিনজন নিগ্রো এ্যাথলীট—জিম হিনেস, রোনী রে স্মিথ এবং চার্লি গ্রীণ ৯·৯ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার দৌড় অতিক্রম করে পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড (১০-০ সেকেন্ড) ভেঙ্গে দিয়েছেন। সাধারণ লোক এই ঘটনায় তাজ্জব হলেও বিজ্ঞানীরা বলছেন, আরও কম সময়ে ১০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয় এবং তা অদূরে ভবিষ্যতেই সম্ভব হবে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

১৯৬৮ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার ভাগ্যে কি লেখা আছে তা একমাত্র বিধাতা পুরুষই জানেন। বর্তমানের ডামাডোল অবস্থা দেখে ক্রীড়ামোদীরা খুবই হতাশ হয়ে পড়েছেন। গত ২১শে জুলাইয়ের নির্ধারিত মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলের খেলা হয় নি। আই এফ এ'র কাছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন, মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর থেকে ফিরে না আসার আগে যেন এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খেলা না দেওয়া হয়। এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব শেষ পর্যন্ত এই দিনের খেলায় তাদের যোগদানের অক্ষমতা জানিয়ে দেয়। অপর দিকে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিপক্ষে রাজস্থান প্রথমে খেলতে রাজী হয়নি। আই এফ এ-র কাছে তাদের আবেদন ছিল—এরিয়ান্সের সঙ্গে তাদের খেলা সম্পর্কে তারা যে প্রতিবাদপত্র দিয়েছে তার নিষ্পত্তির আগে যেন তাদের খেলা স্থগিত রাখা হয়। সুতরাং কোথাকার জল কোথায় গিয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে তা কেউ জানেন না।

বর্তমানে লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে আছে ইস্টবেঙ্গল—১০টা খেলায় ১৯ পয়েন্ট। ইস্টার্ণ রেলওয়ের সঙ্গে তারা ৩-৩ গোলে খেলা ড্র করেছে। মোহনবাগান ৮ খেলায় সংগ্রহ করেছে ১৫ পয়েন্ট (ড্র ১)। গত বছরের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং ৯টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট তুলেছে (হার ১—ইস্টবেঙ্গলের কাছে)। লীগের খেলায় আজও অপরাজিত আছে মাত্র দুটি ক্লাব—ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ
২য় খণ্ড

১৩শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 2nd August, 1968. শুক্রবার, ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীনীরোদ মজুমদার

পত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠি

পারমাণবিক অস্ত্র নিরোধ

অমৃতের ৭ই আষাঢ় সংখ্যায় পারমাণবিক অস্ত্র নিরোধ (পৃঃ ৫০৯) সম্পর্কীয় আলোচনা সময়োপযোগী হয়েছে। ভারতবর্ষের নিজস্ব পারমাণবিক অস্ত্র থাকা উচিত কিনা সে সম্পর্কে পক্ষে এবং বিপক্ষে সামরিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক অনেক যুক্তি আছে। আর্থিক দিক থেকে এই আলোচনাটি করতে চাই।

পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীতে আমাদের খরচ কত হতে পারে—তার হিসাব বোধহয় দেশের চেয়ে বিদেশেই বেশী হয়েছে। লিওনার্ড বীটন নামে একজন বৃটিশ বিশেষজ্ঞ নাকি হিসাব দিয়েছেন বাৎসরিক ৩০০ মিঃ ডলারের—অস্ত্র এবং অস্ত্রক্ষেপণ ব্যবস্থা তৈরীর জন্য। মার্কিন বিশেষজ্ঞ জেমস আর স্লেসিনজার ২১০ কোটি টাকার এই বাজেটকে আসলের তুলনায় অনেক কম বলে মনে করেন এবং বলেন খরচ হবে এর পাঁচগুণ। রাষ্ট্রসংঘের একটা হিসাব মতে যে কোন দেশ দশ বৎসরব্যাপী যদি মোট ৫½ বিলিয়ন ডলার খরচ করতে পারে তবে অস্ত্র এবং ক্ষেপণ ব্যবস্থা তৈরী করতে সক্ষম হবে। হিসাবগুলির এই বিরাট পার্থক্য স্বাভাবিক ভাবেই বিভ্রান্তিকর।

যদি আমরা দেশে দেশে প্রযুক্তি-বিদ্যার মান এবং শিল্পোন্নতির মানের পার্থক্যের কথা ভুলে যাই তবে পারমাণবিক অস্ত্রের খরচ নির্ভর করবে প্রধানতঃ আমাদের সামরিক আকাঙ্ক্ষার উপর। যদি আমরা প্রথম শ্রেণীর এমনকি দ্বিতীয় শ্রেণীর পারমাণবিক শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে চাই তবে সত্যিই আমাদের খরচ অনেক হবে। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্জ আর প্যাকার্ড থুী, জাপান সম্বন্ধে একটা আলোচনায় বলেন ওদের খরচ পড়বে বৎসরে ৩০ থেকে ৫০ কোটি ডলার, ২০ বৎসরের জন্য, যদি জাপান বৃটেন এবং ফ্রান্সের পর্যায়ের আণবিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে চায়, জাপান আমাদের চেয়ে প্রযুক্তি-বিদ্যায় এবং শিল্পোন্নয়নে অনেক উপরে এবং ধরে নেই এই হিসাবও একটু কমের দিকে। তাহলে আমাদের খরচ হবে অনেক বেশী। কিন্তু এও দেখতে হবে যে আমাদের উদ্দেশ্য উচ্চশক্তিগুলির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া নয়। তাই ক্ষেপণ-অস্ত্রের পিছনে আমাদের খরচ হবে কম। বস্তুতঃ অস্ত্রের চেয়েও ক্ষেপণব্যবস্থার জন্যই খরচ হয় বেশী। আমাদের আণবিক শক্তির ব্যাপ্তিকে আন্তর্মহাদেশীয় না করে স্থানীয় করে রাখাই উদ্দেশ্য। আমরা পাল্লা দিতে চাই চীনের সঙ্গে। হিসাব যাতে কমের দিকে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেও স্লেসিনজার সাহেব সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের খরচ ধরেছেন বৎসরে ২০ কোটি ডলার—এখানে উদ্দেশ্য ইস্রায়েলকে সংযত করা। চীনের সঙ্গে পাল্লা অবশ্য আরো ব্যয়সাধ্য হবে আমাদের, কিন্তু তেমনি আবার আমাদের শিল্পোন্নয়ন আমাদের খরচ কিছু কমিয়ে আনবে। ধরে নেই আমাদের খরচ হবে লিওনার্ড বীটনের হিসাব অনুযায়ী ২১০ কোটি টাকা। আমরা পারি কি এ-টাকা খরচ করতে? আমরা বোমা তৈরী না করলেও এ-টাকার কিছু অংশ ব্যয়িত হবে। শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের কাজে ত আণবিক শক্তির উন্নয়ন এবং গবেষণার জন্য কিছু খরচ করতেই হবে। বোমা তৈরী করলে সেই খরচকেই বর্ধিত করে নিতে হবে। আর দ্বিতীয়তঃ বোমা তৈরী করলে সাবেকী অস্ত্রের পিছনে খরচ কমে যাবে। তাহলে বোমা এবং সাবেকী ধরনের ক্ষেপণব্যবস্থার জন্য যে নেট টাকা খরচ হবে সেটা বোমার কাজে ব্যয় করা উচিত না অন্য উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা উচিত, সেটা নির্ভর করবে আমরা বোমাকে খরচ বলে মনে করি না বিনিয়োগ বলে মনে করি তার উপর।

মানিক সাহা
করিমগঞ্জ : আসাম।

কলংকের ভারী বোঝা

অমৃতে'র (৭ই আষাঢ় '৭৫) পাতায় উপরিউক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ-এর জন্য ধন্যবাদ জানাই। নানা সমস্যায় জর্জরিত আমাদের দেশ। সমস্যা রয়েছে খাদ্যের, শিক্ষার, সার্থক বাসস্থানের আর চরম বেকারত্বের। এর মাঝে অধুনা সাম্প্রদায়িক সমস্যা আর এক নতুন বিপদের ইংগিত দিচ্ছে। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বিষময় ফল আমরা লাভ করেছি খণ্ডিত ভারতকে পেয়ে। সেদিনের মসীলিপ্ত ইতিহাস আজও জাতির মন হ'তে মুছে যায়নি।

যাই হোক সমৃদ্ধ দেশ গঠনের কাজে আজ যেমন আমরা সকলেই ব্রতী, তখন এই অশুভ চিন্তাধারার আশু দূরীকরণে আমাদের সকলকেই, তা সে যে সম্প্রদায়ের লোকই হন, সচেষ্ট হতে হবে। কেবলমাত্র সরকারের প্রশাসনব্যবস্থার উপর ছেড়ে দিলেই চলবে না। এর জন্য প্রতিটি সুনাগরিক তাঁদের বিচার-বুদ্ধি, আত্মসংযম ও বিবেকবোধ ব্যবহার করবেন। দেশের মানুষের মনে এক সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। কেবল বক্তৃতায় নয়, আলাপ-আলোচনায় নয়—সার্থক কর্মের মধ্যে এর পরিচয় দিতে হবে। শিক্ষার ধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। সুশিক্ষার মাধ্যমে ধর্মের গোঁড়ামি দূর করতে হবে।

বিদ্যুৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
আমতা : হাওড়া

নজরুলের নামে পাকিস্থানের ডাক টিকিট

৩ শ্রাবণ ১৩৭৫ অমৃত পত্রিকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগে প্রকাশিত ভারতীয় সাহিত্যের অন্তর্গত নজরুলের নামে ডাকটিকিট শীর্ষক সংবাদে দুটো ভুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছেঃ বলা হয়েছে (১) পাকিস্থান সরকার কর্তৃক এ বছর প্রবর্তিত নজরুল-ডাকটিকিট ১৩ পয়সার; এটি সম্ভবত ছাপার ভুল—ডাকটিকিট ১৫ পয়সার ; (২) নজরুলের বহু পঠিত সাম্যবাদী কবিতার তিনটে ছত্র এই ডাকটিকিটে মুদ্রিত হয়েছে। না, তিনটে ছত্র নয়—দুটো ছত্রকেই স্থানাভাববশত তিনটে লাইনে বিন্যস্ত করা হয়েছে মাত্র। ছত্রদ্বয় সাম্যবাদীর অংশ ; শিরোনাম : মানুষ।

খুব সম্প্রতি এই বহুলালোচিত ডাকটিকিটটি আমি দেখেছি; দুঃখের বিষয়, এটি নানা ভুলে ভরা—বস্তুত এরকম ভুল কদাচিৎ লক্ষ্যগোচর হয়। নজরুল কবিতাংশের উদ্ধৃতিতে গুরুতর ভুল—ডাকটিকিটে উদ্ধৃতাংশ হুবহু এই রকমঃ

"গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে নাহি কিছু বড়,
নাহি কিছু মহীয়ান।"

মূল কবিতাংশ নীচে দেওয়া গেলঃ

গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে
কিছু মহীয়ান!

ভুলগুলো এমনই স্বয়ংপ্রকাশ যে এ বিষয়ে মন্তব্য নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

তাছাড়া ডাকটিকিটে নজরুলের পরি[illegible] প্রসঙ্গে লেখা আছে 'পোয়েট অ[illegible] মিউজিশন'; পোয়েটই কি পর্যাপ্ত ছিল না? জন্ম তারিখ ও সনও ইংরেজিতে প্রদত্তঃ ২৫ মে ১৮৯৯; কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা তো জানি ২৪ মে (আজহার উদ্দীন প্রণীত বাংলা সাহিত্যে নজরুল পৃঃ ২ দ্বিতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৩৬৩, আশুতোষ দেব সংকলিত নতুন বাংলা অভিধান পৃঃ ১১৯১ মহালয়া ১৩৬১ দ্রষ্টব্য; সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত জীবনী অভিধানে, দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল, নজরুল নেই), ২৫ মে নয় (প্রসঙ্গত প্রশ্ন, এই নতুন তারিখটির উৎস কি?); অবশ্য এ বছর ১১ জ্যৈষ্ঠ ২৫ মে পড়েছিল। জন্ম তারিখ ও সন বাংলাতেও (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬) দেওয়া আবশ্যক ছিলো, কেন না ২৫ বৈশাখের মতো ১১ জ্যৈষ্ঠই আমরা জানি।

কবিরুল ইসলাম
সিউড়ি, বীরভূম।

অমৃত

জাতীয় শিক্ষানীতি

জাতীয় শিক্ষানীতি কী হবে তা নিয়ে গত কুড়ি বৎসর ধরে নানা দিক থেকে আলোচনা হচ্ছে এবং বিভিন্ন সময়ে নানা রকম কার্যক্রম অনুসৃত হয়ে চলেছে। শিক্ষা বিষয়টি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। কিন্তু একটি দেশকে সামগ্রিকভাবে যৌথ প্রচেষ্টার মারফৎ উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে হলে শিক্ষা বিষয়েও জাতীয় চিন্তা দরকার। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শিক্ষা কমিশন এই বিষয়ে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে সরকারের কাছে তাদের সুপারিশ পেশ করেছেন। এই সুপারিশ কতটা সরকার গ্রহণ করবেন এবং কীভাবে তা কার্যকর করা হবে তা এখনও সম্পূর্ণভাবে জানা যায় নি।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন সম্প্রতি শিক্ষা বিষয়ে দশ-দফা একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পেশ করেছিলেন মন্ত্রিসভা সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী চান সারা ভারতে বিদ্যালয়সমূহে একই ধরনের পাঠক্রম অনুসৃত হোক। এর জন্য বলা প্রয়োজন, রাজ্য সরকারসমূহের অকুণ্ঠ সহযোগিতা দরকার এবং অর্থ কোথা থেকে আসবে তাও চিন্তা করতে হবে। ছাত্রদের নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এখনও আমরা স্থির করতে পারি নি কী ধরনের পাঠক্রম প্রবর্তন করলে ছাত্ররা সমাজের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে পারবে। এটা আমাদের চিন্তার দৈন্য এবং দূরদৃষ্টির অভাব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলা দেশের কথাই ধরা যাক। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাসূচী প্রবর্তিত হবার পর এটা আশা করা গিয়েছিল যে, সমস্ত স্কুলকেই এগারো ক্লাশের স্কুল অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত করা হবে। দুঃখের বিষয় অর্থাভাবে এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে এখনও বাংলা দেশে বহু স্কুল রয়ে গেছে যারা দশ ক্লাশের ওপরে উঠতে পারে নি। তার ফলে হায়ার সেকেণ্ডারী ও স্কুল ফাইনাল এই দ্বৈত শিক্ষা প্রণালীই বজায় আছে। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্ররাই। একই মানের শিক্ষা লাভ থেকে তারা বঞ্চিত এবং তাতে পরবর্তী কালে কলেজের স্তরে গিয়ে দশ ক্লাশের স্কুল থেকে পাশ-করা ছাত্ররা অসুবিধায় পড়ে। হায়ার সেকেণ্ডারীতে যে-কারণে বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য সফল হয় নি। কলেজগুলিতে আসনের অভাব এবং জীবিকা সংস্থানের সুযোগের অভাবের দরুণ হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেও ছাত্র-ছাত্রীরা দিশাহারা হয়ে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছে।

এই অভিজ্ঞতার পরও শিক্ষামন্ত্রী চাইছেন স্কুলের পড়ার সময় আরও এক বৎসর বাড়িয়ে দিয়ে সমস্ত স্কুলকে বারো-ক্লাশের স্কুলে পরিণত করা হোক। শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকর করতে আগে কতকগুলো বিষয় ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করা দরকার। প্রথমত ভারতের সমস্ত রাজ্য এই পাঠক্রম প্রবর্তনে রাজী আছে কিনা। দ্বিতীয়ত এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন কিনা। এবং তৃতীয়ত বারো-ক্লাশের স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাবে কিনা। এই তিনটি প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর না পেলে এগারো ক্লাশকে বারো কাশে উন্নীত করতে গেলে শিক্ষা জগতে আবার এক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে যা এখন চলছে। হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলগুলোত বিজ্ঞান, কমার্স, কৃষি ও কারিগরী বিদ্যার যে পাঠক্রম রাখা হয়েছে, আমরা জানি, তার জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত শিক্ষক অধিকাংশ স্কুলে সব সময়ে থাকে না। তার কারণ, শিক্ষকদের অনাকর্ষণীয় বেতনের হার এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের বিদ্যালয়ে পড়াতে মনস্তাত্বিক অনীহা। একথা শুনতে অদ্ভুত লাগলেও আসলে সত্য। শিক্ষামন্ত্রী নিজে শিক্ষক ছিলেন। তাঁর তো এ সব বিষয় ভালভাবেই জানা। সুতরাং জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনের সময় এই বাস্তব দিকগুলো যেন ভালভাবে বিচার করা হয়।

সর্বশেষে একটি মৌলিক দায়িত্বের কথা শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমাদের সংবিধানে বলা ছিল যে, ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল নাগরিককে বিনাব্যয়ে বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া হবে। সংবিধান চালু হবার দশ বৎসরের মধ্যেই তা হবার কথা। কিন্তু তা হয় নি। একটি গণতান্ত্রিক দেশে অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর থাকবে এটা ভাবলেই আমাদের শিক্ষানীতির চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাভাব তার প্রধান কারণ হলেও, সর্বজনীন শিক্ষা প্রসারে অনুৎসাহও তার জন্য কম দায়ী নয়। জাতীয় শিক্ষানীতি তো শুধুমাত্র ওপরের দিকে শিক্ষার উৎকর্ষ নিয়ে ব্যাপৃত থাকলে চলবে না। সর্বজনীন শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার অবৈতনিক চরিত্র বজায় রাখার জন্যও তাকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী সে বিষয়ে কি কিছু ভাবছেন?

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রমথ চৌধুরী স্মরণে

"ওঃ আপনি আমার আত্মীয় প্রমথকে চেনেন।" ভদ্রলোক ইংরেজীতে বলেন।

"শুধু কি চিনি। কত অ্যাডমায়ার করি। রবীন্দ্রনাথের পর উনিই তো বাংলার সর্বোত্তম লেখক।" আমি অকপটে বললুম।

"শুনেছি বটে ও লেখেটেখে। বাংলা তেমন জানিনে।" ব্যারিস্টার সাহেব বললেন। "কিন্তু এটা তো জানি যে লিখে কিছু হয় না। বেচারা প্রমথ! জীবনে কিছুই করতে পারল না!"

বলতে বলতে তাঁর চোখের দৃষ্টি ও গলার সুর করুণ হয়ে এল। বুঝতে পারলুম তাঁর মতে প্রমথ চৌধুরীর জীবনটা বিফল, যেহেতু ব্যারিস্টার হিসাবে ওঁর পসার জমল না। অর্থোপার্জনে উনি অকৃতী। আর বুর্জোয়াদের চোখে নিরর্থক ওঁর লেখা, যেহেতু অর্থকরী নয়।

সেই সফল পুরুষ আরেকদিন তাঁর নিজের জীবনের কথা বলেছিলেন। গোড়ার দিকে তিনিও পসার জমাতে পারেন নি, আইন ছেড়ে দিয়ে তিনিও লিখতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে লেখা বাংলা নয়, ইংরেজী। আর সাহিত্য নয়, সাংবাদিকতা। আর স্বদেশে নয়, বিদেশে। এমন সময় হঠাৎ একটা মামলায় তাঁর বরাত ফিরে যায়।

সে এক মজার গল্প। এক দেহাতী বিহারী সাক্ষীকে তিনি কেমন হুঁদু বানিয়ে দেন, দিয়ে কেল্লা ফতে করেন। তার জন্যে বিদ্যার প্রয়োজন হয় নি, হয়েছে কৌশলের। এক বেশ্যার ফোটো যোগাড় করে তিনি তার সামনে তুলে ধরেন। সে বলে ওঠে, "এই তো আমার চাচী!" তারপর বেশ্যাকে আদালতে হাজির করে দেন। ব্যস্, মামলা খারিজ।

না, প্রমথ চৌধুরী ওসব পারতেন না। তাঁর মূল্যবোধ অনারূপ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পয়লা নম্বর ছাত্র তিনি বিলেতে গিয়ে তিন বছরের আইনের কোর্স এক বছরে শেষ করেন ও তিন বছরের পরীক্ষা এক বছরে পাশ করেন। বাকী দুটো বছর থাকতে হলো শুধু হাজিরা দেবার ও খানা খাবার জন্যে। এহেন বিদ্বান যে জীবনে সফল হবেন একথা কে না জানত। কিন্তু জীবনের কোর্স আরো কঠিন। আর আদালত বড়ো নিষ্ঠুর ঠাঁই। অগতির গতি ওই হাইকোর্টের রিসিভার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের লেকচারার হয়ে তাঁর ব্যারিস্টার লীলা সাঙ্গ হয়।

তবে সৌভাগ্যে ধন ছিল। আর ছিল পৈত্রিক জমিদারিতে অংশ। জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দ চালেই চলছিল, কিন্তু পরে এক সময় দারুণ অর্থাভাবে পড়তে হয়। তবু তিনি লেখাকে পেশা করেন নি। বাজার-চলতি উপন্যাস বা গল্প লেখেন নি। পাঠ্যপুস্তক তো নয়ই।

যে দায় তাঁকে বাংলা সাহিত্যে নিয়ে আসে তার নাম রসের দায় ও রূপের দায়। একটু বেশী বয়সেই এটা আসে। আসে ভিতরের তাগিদে। দেশকে ও দেশের ভাষাকে তাঁর কিছু দেবার ছিল। রসের দায় বলেছি, বলতে পারতাম চিন্তার দায়। বিস্তর পড়েশুনে তিনি বিস্তর ভেবেছিলেন। বন্ধুজনের বৈঠকে বিস্তর বলেছিলেন। কথা বলতে বলতেই তিনি কথক হন। আর তর্ক করতে করতেই বাক্‌সিদ্ধ। এর থেকে আসে লেখনীর ব্যবহার ও মাসিকপত্রের সঙ্গে সহযোগ। পরে স্বকীয় মাসিক মুখপত্র। 'সবুজপত্র'।

এর মধ্যে এক সময় বীরবলের আবির্ভাব ঘটেছিল। 'সবুজপত্র' বীরবলের হাস্য-পরিহাসে মুখর। প্রমথ চৌধুরীই যে বীরবল এ ধারণা প্রথমে আমার ছিল না। পরে একটু একটু করে হয়। দুজনের মধ্যে বীরবলই ছিলেন আমার প্রিয়। প্রমথ চৌধুরীকে বোঝা একজন বারো বছরের বালকের সাধ্যের বাইরে। বীরবলকে বোঝা ভার বিশ্বাস তার সাধ্য। বীরবলী রসিকতাই তাকে আকর্ষণ করত।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্য যে 'সবুজপত্র' যেদিন আমি আবিষ্কার করি সেদিন আমার আকর্ষণের বিষয় ছিল 'চার ইয়ারী কথা'র তৃতীয় কথা। সোমনাথের কথা। আগের সংখ্যাগুলো পরে পড়ি। ওসব কাহিনী বোঝবার মতো বয়স আমার নয়। তবু তন্ময় হয়ে পড়েছি। কতকটা ভাষার ও শৈলীর গুণে। কতকটা বিষয়-গুণে। তখন থেকেই বিদেশের প্রতি টান আমার অন্তরে। আর ওই গল্পগুচ্ছের আবেদন বিদেশকে না হোক বিদেশিনীকে ঘিরে। আমি ও বয়সে গোঁড়া হিন্দু ও স্বদেশী সভ্যতার অন্ধ সমর্থক। ওদের সভ্যতা আমার কাছে পরধর্মের মতো ভয়াবহ। অথচ সেই আমি ওদের সম্বন্ধে হাতের কাছে যা পাই তাই পড়ি। বিদেশ যাত্রার কথাও ভাবি।

'সবুজপত্র' আমাকে মনের দিক থেকে মুক্ত করে। আর সেই তো ছিল তার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। তার প্রধান লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী। মনে মনে আমিও তাঁদের অনুগামী হই। কিন্তু ষোল বছর বয়সে টলস্টয় এসে আমাকে আরেক হাত ধরে টানেন। তাঁর সঙ্গে গান্ধী। এই দোটানার মধ্যে পড়ে আমি পুরোপুরি কোনো একটা দিকে ভিড়তে পারিনে। বিদেশ যাত্রার কথা যেমন ভাবি তেমনি ভাবি জনগণের অভিমুখে যাত্রার কথা। যেখানে তাদের অধিষ্ঠান সেখানে অর্থাৎ গ্রামে। এ যন্ত্রণা প্রমথ চৌধুরীর জীবনে ছিল না। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে নাগরিক। অথচ রবীন্দ্রনাথ তা ছিলেন না। কবির পক্ষপাত গ্রামের উপরে, আশ্রমের উপরে। তাঁদের দুজনের জীবনের দোটানা অবশ্য মোটের উপর ছিল একই প্রকার। সেটা আধুনিক ইউরোপ বনাম প্রাচীন ভারত। তাঁরাও কোনো একটা দিকে ভিড়তে পারেন নি।

'সবুজপত্র' রবীন্দ্রনাথকেও আগের চেয়ে মুক্ত করেছিল। আর কোথাও কি তিনি অমন বেপরোয়াভাবে 'ঘরে বাইরে' প্রকাশ করতে পারতেন! পরে অবশ্য 'সবুজপত্রে'ও পারলেন না, প্রথম কয়েক কিস্তির পর সাবধানে পদক্ষেপ করতে হলো। এর ভিতরের রহস্য পরবর্তীকালে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শুনি। সম্ভবত প্রমথ চৌধুরীকেও লেখনী সম্বরণ করতে হয়েছিল। নইলে 'চার ইয়ারী'র ধারা শুকিয়ে যেত না। তিনি বহুদর্শী পুরুষ। ইচ্ছা করলে অমন ধারা উপাখ্যান আরো লিখতে পারতেন। কিন্তু লিখতে গেলে ঘরে ও বাইরে বাধা পেতেন। সাহিত্য এক পায়ে এগোবে কী করে, সমাজ যদি না এগোয়?

সাহসিকতার জন্যে আমরা তরুণেরা শরৎচন্দ্রের দিকে তাকাই। দেখা গেল তাঁরও পাঠকভীতি ছিল। আর ছিল একটা বাঁধা ছক, যার বাইরে যেতে তাঁর ভয় নয়, অনিচ্ছা। তখন 'কল্লোল' জন্ম নিল। নবীনরা রবীন্দ্রনাথকেও ব্যাক নম্বর বলে এড়াতে চাইলেন। প্রমথ চৌধুরীকেও। শরৎচন্দ্রকে তো নিশ্চয়ই।

'কল্লোল' আপনি উঠে যেত। কারণ ওর পেছনে চিরায়ত সংস্কৃতি ছিল না। তার সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রশ্ন ছিল না। 'পরিচয়' ওর তুলনায় তখনকার দিনের মানসিক প্রতিনিধি। ততদিনে রবীন্দ্রনাথের মন চলে গেছে চিত্রকলায়। আর প্রমথ চৌধুরী ফুরিয়ে এসেছেন। তাঁর উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু তো আধুনিক ইউরোপ ও প্রাচীন ভারত। আধুনিক ইউরোপ বলতে তিনি বুঝতেন ইংলন্ড ফ্রান্স ও ইতালি। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর যারা প্রবল হয় তারা সোভিয়েট রাশিয়া ও নাৎসী

জার্মানী। মার্কস বনাম অ্যান্টি-মার্কস। জার্মানীতে যেমন মার্কসের উদ্ভব অস্ট্রিয়াতে তেমনি ফ্রয়েডের। কানু বিনে যেমন গীত নেই ফ্রয়েড বিনে তেমনি সাহিত্য নেই। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য যুদ্ধের পরে ও ফলে এমন একটা মোড় নেয় যে রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে পা মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করলেও প্রমথ চৌধুরী করেন না। তা হলে সমরোত্তর আধুনিক ইউরোপকে তিনি চিনলেন কোথায়!

সমরোত্তর বলেছি, বলতে পারতুম সমরপূর্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন আসে তখন সভ্যতা বলে কিছু থাকে না। মারো শত্রু পারো যে প্রকারে। হোক না কেন পরমাণু বোমা। মরুক না কেন বালবৃদ্ধ-বনিতা। তার থেকে এক ধাপ, গ্যাস চেম্বার। সভ্যতাই যদি যায় তো সাহিত্য থাকবে কী নিয়ে? এ প্রশ্নের উত্তর এখনো মেলে নি। বিদেশের সাহিত্যিকরা চিন্তাকুল! লেখা সমানে চলেছে, কিন্তু লক্ষ্য স্থির নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর নিশ্চয়তা কোথায় হারিয়ে গেছে।

সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর কাছে নতুন কিছু আশা করা যেত না। আমরাও করিনি। এমন কি রবীন্দ্রনাথের কাছেও [illegible]। চিন্তার নেতৃত্ব তখন তাঁর হাত থেকেও চলে গেছে। হিটলারের সঙ্গে লড়তে হলে চার্চিলের পেছনে দাঁড়াতে হবে, এ প্রস্তাবে দেশের লোক সায় দেয় নি। আমিও না। আমি তখন গান্ধীর দিকেই তাকাই। তাঁর চিন্তাধারাই হয় আমার চিন্তাধারা।

গান্ধীজী আধুনিক ইউরোপ বলতে বুঝতেন রণদেব আর ধনদেব। মার্স আর ম্যামন। তাই আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের বা ভারতীয় জনগণের সমন্বয় তাঁর কাম্য নয়। কিন্তু আমার চোখে আধুনিক ইউরোপ ঠিক অতটা অসুস্থ নয়। তার স্বাস্থ্যের রহস্য আমি জানি। মানবিকতা তার ধর্ম। মাঝে মাঝে ধর্মভ্রষ্ট হলেও সে স্বধর্মনিষ্ঠ। রিয়ালিটির অন্বেষণ তার নিত্য কর্ম। তার বৈজ্ঞানিকরা, তার দার্শনিকরা নিরলসভাবে অন্বেষণ করে চলেছেন। তার শিল্পীরাও তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষারত। সুতরাং সমন্বয়ের কথা ভাবতেই হবে। নইলে ভারতের জনগণ স্বাধীন হয়েও কোণঠাসা হয়ে জীবনপাত করবে। জগৎকে বিশেষ কিছু দিয়ে যেতে পারবে না। ভারতের দিকে কেউ ফিরে তাকাবে না।
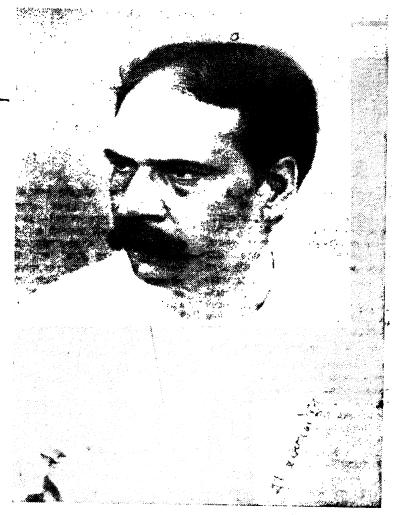
আর সেই প্রাচীন ভারত? তার দিন গেছে। তার মধ্যে চিরন্তন যদি কিছু থাকে তো চিরন্তন বলেই তা আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হবে। পুরাতন বলে নয়। পঞ্চাশ বছর পূর্বে আমাদের সকলের পিছুটান ছিল। নিছক পুরাতনকে আমরা আঁকড়ে ধরতে চাইতুম। নইলে মনে হতো নতুন জগতে আমরা হারিয়ে যাচ্ছি। এখন আমাদের আত্মবিশ্বাস জেগেছে। এটা স্বাধীনতার সুফল। আমরা আর বিদেশীর অধীন নই বলেই পুরাতনের আঁচলধরা নই। তবে মার্স ম্যামনের উপর আমাদেরও ভক্তিভাব উদয় হয়েছে। আশঙ্কার বিষয়।

"বেচারা প্রমথ জীবনে কিছুই করতে পারল না।" একথা যখন শুনি তার বছর তিনেক পরে আমি নদীয়ার কলেক্টর পদে উন্নীত হই। একদিন চৌধুরীদের তরফ থেকে দূত আসেন আমাকে বলতে যে, আমার জেলায় ইন্দিরা দেবীর যে চর জমিদারী আছে সেটা যদি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে দেওয়া হয় তবে তিনি কিঞ্চিৎ মাসোহারা পান। নইলে আদায়পত্রের যা অবস্থা তিনি একেবারে অসহায়। জানতুম অন্যান্য আয়ের সূত্রগুলিরও অনুরূপ অবস্থা। ওঁরা তখন স্বগৃহে বাস করেন না। স্বগৃহ গেছে।

আমার রেভিনিউ ডেপুটির মতে ওটা ঠিক জমিদারীও নয়, আকারে বড়োও নয়, অত ছোট এস্টেট হাতে নিতে কোর্ট নারাজ হবেন, নিলেও অত টাকা মাসোহারা মঞ্জুর করবেন না। কিন্তু মাথার উপরে লাটসাহেবের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের রেভিনিউ মেম্বার ছিলেন সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁর ভরসায় যথাকৃত্য করা গেল।

প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্প

ভবানী মুখোপাধ্যায়

"তাঁর (প্রমথ চৌধুরী) যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধি-প্রবণ মননশীলতায়—এই মননধর্ম মনের সে তুঙ্গ শিখরেই অনাবৃত থাকে যেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন। তাঁর মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি তিনি যদি বঙ্গ-সাহিত্যের চালক-পদ গ্রহণ করতেন তাহলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত।"

(সাহিত্য বিচার—রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্য ১৩৪৭ সাল অর্থাৎ ইংরাজী ১৯৪০-এ লিখিত, আর ১৯৪১ বা ১৩৪৮ সালে প্রমথ চৌধুরী সংবর্ধনা সমিতির পক্ষ থেকে যখন প্রমথ চৌধুরীর "গল্প সংগ্রহ" প্রথম প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখেছিলেন তার মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর গল্প সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—

"প্রমথর গল্পগুলিকে একত্র বার করা হচ্ছে, এতে আমি বিশেষ আনন্দিত, কেন না গল্প-সাহিত্যে তিনি ঐশ্বর্য দান করেছেন। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে মিলেছে তাঁর অভিজাত মনের অনন্যতা, গাঁথা হয়েছে উজ্জ্বল ভাষার শিল্পে। বাংলা দেশে তাঁর গল্প সমাদর পেয়েছে, এই সংগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করবে।

অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের দেশ তাঁর সৃষ্টিশক্তিকে যথোচিত গৌরব দেয়নি সেজন্য আমি বিস্ময় বোধ করেছি।"

রবীন্দ্রনাথের এই দুটি উক্তি নিছক আত্মীয়প্রীতির পরিচায়ক নয়। প্রমথ চৌধুরীর গল্প তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছে বার বার। প্রমথ চৌধুরীর সামগ্রিক সাহিত্যকর্ম তাঁর কাছে ছিল শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের বস্তু। সমকালীন এবং শিষ্যোপম প্রমথ চৌধুরীর মননশীলতা রবীন্দ্রনাথকে বিস্মিত করেছে, বিশেষ করে তাঁর 'বাহুল্য-বর্জিত আভিজাত্য' এবং 'অভিজাত মনের অনন্যতা'।

প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পে সেই আভিজাত্য রয়েছে প্রতিটি ছত্রে।

রবীন্দ্রনাথ যে আক্ষেপ করেছেন 'দেশ তাঁর সৃষ্টিশক্তিকে যথোচিত গৌরব দেয়নি'—একথা সত্য। প্রমথ চৌধুরীর সস্তা জন-প্রিয়তা ছিল না। তাঁর গ্রন্থের প্রকাশক ছিল না। শেষের দিকে বসুমতী—(১৯৩০ খৃষ্টাব্দে) থেকে একটি গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় আর 'বাতায়ন' সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল উদ্যোগী হয়ে প্রকাশ করেছিলেন 'ঘোষালের ত্রিকথা' আর 'অনুকথা সপ্তক।' এই কালে আর কয়েকজন এগিয়ে এসে-ছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে তাঁর যে সংবর্ধনা সভা হয় তাতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সংখ্যায় কম হলেও সেই সময়কার কলকাতার সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন নেতৃস্থানীয়। প্রমথ চৌধুরী তাই অনেকদিন পর্যন্ত একটা নাম হিসাবেই উচ্চারিত হয়েছে, গৌরবমণ্ডিত নাম। আভিজাত্যের প্রতিনিধি হিসাবেই একটু বেশী করে। যেন, প্রমথ চৌধুরী ছিলেন একটি অনাজগতের মানুষ। কিন্তু যাঁরা 'বীরবলের হালখাতা' 'নানাকথা', 'আমাদের শিক্ষা', 'দু ইয়ারকি', 'বীরবলের টিপ্পনী', 'রায়তের কথা', 'নানাচর্চা', 'ঘরে-বাইরে', 'প্রাচীন হিন্দু-স্থান' ও 'বঙ্গ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' পাঠ করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে প্রমথ চৌধুরী বাঙলা সাহিত্যের 'এমেচার' লোক ছিলেন না, লেখাই ছিল তাঁর পেশা এবং নেশা।

প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর প্রমথ চৌধুরীর নব-মূল্যায়ন হয়েছে এটা আশার কথা এবং বাঙলা সাহিত্য-পাঠকের মন যে এখনও সচেতন আছে এই থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রথীন্দ্রনাথ রায়, অরুণ-কুমার মুখোপাধ্যায় এবং জীবেন্দ্র সিংহরায় প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন। বোধকরি জীবেন্দ্র সিংহরায় এই ব্যাপারে প্রথমতম। এই সব বিদগ্ধ লেখকেরা প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম নিয়ে এবং বিশেষ করে তাঁর 'সবুজপত্র', 'সনেট', 'ভাষা' ও 'রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে অমিয় চক্রবর্তী প্রমথ চৌধুরীর গল্প বিষয়ে একটি সাময়িক পত্রে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। তথাপি প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্ভব এবং সেই গ্রন্থ যদি কোনোদিন লিখিত হয় তাহলে প্রমথ চৌধুরীর গল্প উত্তরকালের কথা-সাহিত্য ও বাঙলা রচনারীতিতে কি প্রভাব এনেছে তা বোঝা যাবে।

প্রমথ চৌধুরী সর্বপ্রথম (১২৯৮) প্রসপার মেরিমে' নামক ফরাসী লেখকের "এ ট্রুসকান ভাস" নামক গল্পটি 'ফুল-দানি' নামে অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই অনুবাদ পাঠ করে অগ্রহায়ণ ১২৯৮-এর সাধনায় লিখেছিলেন—

"...গল্পটি যদিও সুন্দর কিন্তু ইহা বাংলা অনুবাদের যোগ্য নহে। বর্ণিত ঘটনা এবং পাত্রগণ বড় বেশী য়ুরোপীয়—ইহাতে বাঙালী পাঠকের রসাস্বাদনের বড়ই ব্যাঘাত করিবে।"

প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আত্মকথা'য় (১৯৫৩) এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে—"আমি অবশ্য সে সমালোচনা পড়ে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। কারণ, রবীন্দ্রনাথের কাছে এ সমালোচনা আশা করিনি। তার-পরেই আমি মেরিমের 'কার্মেন' তর্জমা করি। কিন্তু শেষ করতে পারিনি বলে প্রকাশ করি নি। 'কার্মেন' অনুবাদ করবার কারণ তার বিষয়বস্তু 'ফুলদানি'র চেয়েও ঢের বেশী অসামাজিক।—"

অসামাজিক কোনো কথা সাহিত্যে উচ্চারিত বা উল্লিখিত হবে না এই বিশ্বাস প্রমথ চৌধুরীর ছিল না। সম্প্রতি জনৈক সমালোচক অনুযোগ করেছেন যে প্রমথ চৌধুরীর গল্প সংগ্রহের কোনো চরিত্র জীবনকে দেহগত যন্ত্রণার দিক থেকে উপলব্ধি করতে পারেনি। আর সেই কারণে, প্রমথ চৌধুরীর গল্প সেই সমালোচকের কাছে শুখনো থেকে গেছে। অবশ্য ভিন্ন মানুষের ভিন্ন রুচি—এই সমালোচকের প্রত্যাশা ঠিক যে কি ছিল তা অনুমান করা সহজ নয়, তবে তিনি প্রত্যাশাভঙ্গে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন বোঝা গেল। সমালোচক সম্ভবতঃ বয়সে নবীন, সেই কারণে তাঁর উক্তিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তিনি বর্তমান কালের চোখে অতীতকে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। এই মানদণ্ডে ফেললে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার প্রভৃতি গোড়ার যুগের সব বাঙালী কথাসাহিত্য-কারের সৃষ্ট চরিত্রই 'জীবনকে দেহগত যন্ত্রণার দিক থেকে উপলব্ধি করতে পারেনি' বলে মনে হতে পারে।

প্রমথ চৌধুরীর গল্প বিচারে—তাঁর কালের সামাজিক গঠন এবং রুচির সঙ্গে

পরিচিত থাকার প্রয়োজন। কালের মেজাজ তাঁর গল্পে ধরা পড়েছে। প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে রচিত। এই আঙ্গিক মুখ্যত ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী গল্প লেখকদের আঙ্গিক। মঁপাসাঁ এই আঙ্গিক তাঁর অসংখ্য গল্পে ব্যবহার করেছেন এবং সেই সব গল্প আজও তার পাঠযোগ্যতা হারায়নি। প্রমথ চৌধুরীর ভারতচন্দ্র প্রীতির কথা আজ আর কারো অজানা নেই. ফরাসী কথা সাহিত্যের অলি-গলি ছিল তাঁর নখ-দর্পণে। শুচিবাগী-শতার বালাই তাঁর থাকলে তিনি রবীন্দ্র-নাথের 'আক্রমণে' ক্ষুণ্ণ হতেন না. এবং পরে আরও কড়া ডোজের কাহিনী 'কার্মেন' অনুবাদে প্রবৃত্ত হতেন না। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় যে বস্তু অনুপস্থিত সে হল 'কদর্যতা'। তিনি যা 'ভালগার' তা পরিহার করেছেন. কি জীবনে কি সাহিত্যে।

বিশ্বভারতী থেকে প্রমথ চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 'গল্প সংগ্রহের' একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ (বৈশাখ—১৩৭৫) প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণে ছিল আটত্রিশটি গল্পের সংগ্রহ। এই সংস্করণে আছে ছেচল্লিশটি গল্প এবং সম্ভবতঃ প্রমথ চৌধুরীর সমগ্র গল্পগুলিই এই সংস্করণে সংগৃহীত হয়েছে।

এই সংগ্রহের প্রথম গল্প 'প্রবাস স্মৃতি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৫ সালে 'ভারতী' পত্রিকায়। তখন লেখকের বয়স ত্রিশ বছর এবং ১৯৪৩-এ (১৩৫০) মৃত্যুর তিন বছর আগে লিখেছেন 'সত্য কি স্বপ্ন'। 'প্রগতি রহস্য' সম্ভবতঃ ১৯৩৯-এ প্রকাশিত হয়।

প্রায় পয়তাল্লিশ বছর কাল ধরে প্রমথ চৌধুরী 'ছোটগল্প' লিখেছেন, এবং জরা ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থাতেও শেষ জীবনের কাহিনীগুলি লিখেছেন। কিন্তু বিষয়-বৈচিত্র এবং স্টাইলের দিক থেকে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। সমকালীন কোনো লেখক—রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রভৃতি কেউই তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেননি, এবং সংগল্প শানিত ব্যঙ্গ এবং অজস্র সরসতার স্রোতে শুখিয়ে আসেনি। যে কোনো লেখকের পক্ষে এই অবস্থা নিঃসংশয়ে অশেষ শক্তি-মত্তার পরিচায়ক। তিনি অমিয়চন্দ্র চক্র-বর্তীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

"—আমার যে পেটে কিঞ্চিৎ বিদ্যা আছে, মাথায় কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে, তাই প্রমাণ করবার লোভ আমি সংবরণ করতে পারিনে। ফলে পলিটিক্‌সও লিখি ইকনমিক্‌সও শিক্ষার হয়ে ওকালতি করি, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করি, আর সময়ে সময়ে মহাদার্শনিক হয়ে উঠি......................" (১০, ৬, ১৯২৩)

প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি পাঠ করলে তাঁর এই উক্তির সমর্থন মিলবে। তাঁর গল্প সংলাপপ্রধান এবং সেই গল্পের মধ্যে শুধু—মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ এবং সেই খাওয়া পরার ইতিহাস ছাড়া যে অতিরিক্ত

বস্তুটি উপস্থিত তার নাম "ইনটেলেক্‌ট"—সেই কারণে চার-ইয়ারি কথাই হোক আর বীণাবাঈ-এর কাহিনী হোক, কিংবা ঘোষাল, সারদা দাদা বা নীললোহিতের আখ্যান হোক, তা পাঠ করে কিঞ্চিৎ চিন্তা করতে হবে। সেই চিন্তার মধ্যে পাওয়া যাবে অনেক প্রশ্নের উত্তর। জীবনের অনেক প্যারাডকসের প্রতিলিপি এবং সেই সংগে পাঠকের ব্যক্তিগত জীবনের ফেলে আসা একটা ক্ষণিক মুহূর্ত।

।। দুই ।।

প্রমথ চৌধুরীর চার-ইয়ারি কথাকে (১৯১৬) এককালে উপন্যাস বলা হত। চারজনে মিলে গল্প বলে একটি কাহিনী গড়ে তুলেছে। কিন্তু যেহেতু চারটি বিভিন্ন গল্পের সমাবেশ তাই হয়ত—পরে এটিকে গল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ক্লাবে তাস খেলায় মত্ত হয়ে সময়ের জ্ঞান ছিল না চার বন্ধুর। তারপর ঘরে ফেরার উদ্যোগের মুখে সংবাদ এলো যে 'দো-দশ মিনিট মে পানি আয়েগা সায়েৎ হাওয়া ভি জোর করেগা। ঘোড়ালোগ আস্তাবলমে খাড়া হোকে এইসাই ডরতা হ্যায়, রাস্তামে নিকালনেসে জরুর ভড়কেগা, সায়েৎ উখড় যায়েগা—'

কোচম্যান প্রমুখাৎ এই দুঃসংবাদ শোনার পর ঝড়-বৃষ্টি আসার আশু সম্ভাবনা আছে কিনা দেখার জন্য চার বন্ধুতেই বাইরে গেলেন তারপর যা দেখলেন তাতে আতংকিত হলেন—

"এ দেশের মেঘলা দিনের এবং মেঘলা রাত্তিরের চেহারা আমরা সবাই চিনি, কিন্তু এ যেন আর এক পৃথিবীর আর এক আকাশ—দিনের কি রাত্তিরের বলা শক্ত। মাথার উপরে কিংবা চোখের সম্মুখে কোথাও ঘনঘটা করে নেই; আশে-পাশে কোথাও মেঘের চাপ নেই, মনে হল কে যেন সমস্ত আকাশটাকে একখানি একরঙা মেঘের ঘেরাটোপ পরিয়ে দিয়েছে, এবং সে রঙ কালোও নয়, ঘনও নয়; কেন না তার ভিতর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। ছাই রঙের কাঁচের ঢাকনির ভিতর থেকে যে রকম আলো দেখা যায়, সেই রকম আলো। আকাশ-জোড়া এমন মলিন, এমন মরা আলো আমি জীবনে কখনো দেখিনি। পৃথিবীর উপরে সে রাত্তিরে যেন শনির দৃষ্টি পড়েছিল। এ আলোর স্পর্শে পৃথিবী অভিভূত, স্তম্ভিত, মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। ......"

এই পরিস্থিতিতে চার বন্ধুতে স্তব্ধ আকাশের মুখের পানে চেয়ে যে যার জীবনের প্রেম কাহিনী বলতে সুরু করে। চারটি গল্পের মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য এবং বিষয়গত সাদৃশ্য বর্তমান। প্রথম গল্প সেনের গল্প—তিনি জ্যোৎস্না জোয়ারে যে মেয়েটিকে দেখে মোহিত হয়েছিলেন সেই নায়িকা পাগল। সেন বলেছে সেদিন থেকে চিরকালের জন্য ইটার্নাল ফেমিনাইনকে হারিয়েছি। কিন্তু তার বদলে নিজেকে ফিরে পেয়েছি।"

দ্বিতীয় গল্প সীতেশের কথা—তার নায়িকার সংগে একটি পুরাতন বই-এর দোকানে দেখা হল। মেয়েটির সংগে প্রেমে পড়লেন সীতেশ, মেয়েটির সংগে আবার যাতে দেখা হয় তার বন্দোবস্ত করলেন সীতেশ, মেয়েটি একটি কার্ড দিল। কিন্তু পাঁচ মিনিট বাদে দেখা গেল মেয়েটা চোর, কয়েকটা গিনি ঠকিয়ে নিয়েছে।

এরপরের গল্পটি সোমনাথের—সোমনাথ গিয়েছিল ইংলন্ডের এক সমুদ্র উপকূলে শরীর সারাতে, সেখানে যার সংগে সোমনাথের দেখা হল সেই রূপকথার স্যোভিয়রের নাম 'রিনি'। সোমনাথ ও রিনির প্রেম প্রায় এক বছর টিকেছিল: রিনি তার প্রেমিক জর্জের মনে ঈর্ষা সঞ্চার করে নিজের বিয়েটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। আর চতুর্থ গল্প—রায়ের কথা। তার নায়িকা প্রেতাত্মা। আনি যতদিন ইহলোকে ছিল ততদিন সে দাসী, পরলোকে পেশছে সে কিন্তু তার ভালোবাসা জানায়। ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে নার্স হিসাবে তার মৃত্যু হয় আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার খবর এল ফোনে।

এই গল্পগুলি সেইকালে বিদগ্ধ সমাজে বহুল আলোচিত। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন—'তোমার শেষ গল্পটা (রিনি) সবচেয়ে human—'

প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং বলেছেন—"এ গল্পের ঘটনা ও কথোপকথন সবই আমার স্বকপোল কল্পিত। কিন্তু আমি এমন একটি যুবতীকে জানতাম, যাকে রিনির রূপ দেওয়া যায়। তার যথার্থ নাম ছিল কাটি, ইংরাজী Katie-র ফরাসী উচ্চারণ। এর নাম থেকেই বুঝতে পারছেন সে আধা-ফরাসী আধা-ইংরাজ...

এরপর প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলেছেন যে—আমি সম্প্রতি একখানি বই পড়ছি, যার নাম "Bernard Shaw; His Life and Personality". তাতে উইলিয়ম মরিস নামক একটি প্রসিদ্ধ আর্টিষ্ট এবং সাহিত্যিকের কনিষ্ঠ কন্যা মে মরিসের একখানি ছবি আছে। আমি ছবিখানি যখনই দেখি, তখনই আমার কাতির কথা মনে পড়ে। এমন কি সময়ে সময়ে ভুল হয় ওটা তারই ছবি। আমি একটি সাহিত্যিকারের মেয়েকে ভেঙে 'চার-ইয়ারি কথা'র চারটি নায়িকাকে তৈরী করেছি।"

কাতি তাঁর কাছে একটি 'মিস্ট্রী গার্ল'—তার কথা লেখকের মনে গাঁথা ছিল। প্রসংগত এইখানে বলা যায় যে মে মরিস বার্নার্ড শ'র অন্যতমা প্রণয়িনী, এবং প্রসিদ্ধ চিত্রকর বার্ন জোন্সের 'দি গোল্ডেন স্টেয়ারস' নামক বিখ্যাত চিত্রটির কেন্দ্রীয় মূর্তি—মে মরিস। এই ছবি দেখলে কাতিকে কল্পনা করা যায়।

চার ইয়ারি কথা কয়েকটি তরুণ চিত্তের বিভ্রান্তিকর রোমান্স মাত্র নয়। লেখকের ভাষায় এই গল্পের "যেটুকু শাঁস সেটুকু একটি রক্তিম হৃদয়ের পদ্মরাগ মণি যেমন উজ্জ্বল, তেমনি করুণ—"

এই চারটি কাহিনীর সংলাপ অতিশয় মার্জিত এবং প্রতিটি গল্পের শেষ মুহূর্তে যে আকস্মিকতার আবির্ভাব ঘটেছে তা স্বপ্নালোক থেকে পাঠককে রূঢ় বাস্তবের ভূমিতে নামিয়ে আনে।

প্রমথ চৌধুরীর "রাম ও শ্যাম" (সবুজপত্র ১৩২৫), "বড়বাবুর বড়দিন" (সবুজপত্র—১৩২৩) ও "অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি" (বিচিত্রা—১৩৩৯) এক-সূত্রে গাঁথা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'রাম ও শ্যাম' সম্পর্কে "গল্পটি সুতীক্ষ্ণ—ওটা দেশোচিত, কালোচিত এবং পুরুষোচিত। এরকম খরধার এবং সুগঠিত লেখা আর কারো হাত দিয়ে বের হবার জো নেই।"

রাম ও শ্যাম গল্পটি এপিগ্রাম পদ্ধতিতে লেখা। এই ধরণের গল্প বাঙলা সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন করেছেন প্রমথ চৌধুরী। তবে এই গল্পের মধ্যে রাম ও শ্যামের পারস্পরিক চরিত্রগুণের যে বর্ণনা করেছেন লেখক তার মধ্যে বাক চাতুর্যই বেশী। 'রামের কৃতিত্ব ছিল হিকমতে, শ্যামের হুজ্জুতে—' অর্থাৎ এক অপরের বিপরীত।

কিন্তু 'বড়বাবুর বড়দিন' গল্পটির মর্‍্যাল হল—'পৃথিবীতে ভালো লোকের যত মন্দ হয়—' শরৎচন্দ্র কিন্তু গল্পটি পছন্দ করেন নি, তিনি লিখেছিলেন—

"এক-একটা অত্যন্ত চাপা লোক যেমন তার বড় দুঃখটাকেও বলার সময় এমন একটা তাচ্ছিল্যের সুর দেয় যে হঠাৎ মনে হয় সে আর কারো দুঃখটা গল্প করে যাচ্ছে।—আপনিও বলেন ঠিক তেমনি করে—কিন্তু 'বাঁদর' বানাবার সময় এই চাপা তাচ্ছিল্যের সুরটা লেখায় কোনো মতেই থাকা সম্ভবপর নয়, থাকেও না। বোধকরি এই জন্যই 'বড়বাবুর বড়দিন' আমার ভালো লাগেনি। ওর মর্‍্যালের তামাসাটা ধরতে পারলুম না।"

অবনীভূষণেও এই প্যারাডকস লক্ষ্য করার মত।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আহুতি' গল্প গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন শরৎচন্দ্রকে। এই উৎসর্গ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের যে বৈশিষ্ট্য এবং স্বকীয়তা 'আহুতিতে' তা নেই। আহুতি প্রমাণ করেছে যে তিনি ইচ্ছা করলে অন্য ধারার কাহিনী পরিবেশন করতে পারতেন এবং সেই ধারা রবীন্দ্র ও শরৎচন্দ্র অনুসারী। আহুতি, জুড়ি দৃশ্য, যখ—প্রমথ চৌধুরীর অপূর্ব সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "এ তোমার খাস দখলের লেখা, আর কারো হাত দিয়ে বেরোবার যো নেই।"

রুদ্রপুরের রাণী রঙ্গময়ীর অপূর্ব প্রতিহিংসা পরায়ণতা, পুত্র হত্যায় উন্মাদিনী বিধবা জননীর চরিত্রে একটা করুণ ও বীভৎস রসের সমাবেশ ঘটেছে। সামন্ততান্ত্রিক জমিদার বংশের পতন কাহিনী নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর রচনায় 'বিকট হাসি ও করুণ ক্রন্দনের একত্র সমাবেশ ঘটেছে, যা পাঠকচিত্তে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। একটি সাদা গল্প, ফরমায়েসি গল্প, ছোট গল্প প্রভৃতির মধ্যে লেখার রীতি ও পদ্ধতি নিয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা আছে অথচ পদ্ধতি ও প্রকরণের প্রসংগে কোনো গুরুভার আলোচনা নেই।

প্রমথ চৌধুরীর আশ্চর্য সৃষ্টি 'নীল লোহিত', 'ঘোষাল' এবং 'সারদাদাদা' এই তিনজনে হরেক-রকম উদ্ভট এবং অসম্ভব গল্প বলে যেতে পারেন। সেই সব কাহিনীর মধ্যে সাময়িককালের মানুষ এবং পরিচিত চরিত্রের ছাপ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আবার মজলিসি আবহাওয়ায় বাঙলার প্রাচীন অভিজাত পরিবারের ছাপ এসে পড়ে এবং শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' ও রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'কে স্মরণ করিয়ে দেয়—'নীল লোহিতের স্বয়ম্বর' গল্পটি পরিকল্পনার দিক থেকে বিস্ময়কর বলা যায়। বড়লোকের খেয়াল, মজলিসের মেজাজ সমস্ত ঠিক-ঠিক ফুটেছে। নীল-লোহিতের স্বয়ম্বরে লেখক চরিত্রগুলিকে যেন পুতুল নাচ নাচিয়েছেন, কেবল নীল-লোহিত সেখানে স্বতন্ত্র। নীললোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলার মূলে এক পাটি নাগরা জুতা। সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে যে এক পাটি জুতা এসে পড়েছিল সেটিকে কেন্দ্র করে লেখকের কল্পনার ঘোড়া বলগাহীন উদ্দামতায় মেতেছে। নীল-লোহিত শেষকালে তার শ্রোতাদের বলেছে—

"বাঙালী জাতটা হাড়ে ছিবলে। কোনও Serious জিনিষ তোমরা ভাবতেও পারো না, বুঝতেও পারো না—'

'বীণাবাঈ' গল্পটি প্রমথ চৌধুরীর পরিণত বয়সের আর এক অপরূপ সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘকাল নীরব থাকার পর তিনি এই গল্পটি লিখে সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে বিস্ময় সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথ পড়ে লিখেছিলেন—

"—এ ধরণের লেখা আর কারো কলমে ফুটতে পারে না। সাহিত্যে যারা জালিয়াতি করে দিন চালায় তারা হতাশ হবে।" সেই সময় 'বাতায়ন' নামক সাপ্তাহিক পত্রে 'বীণাবাঈ' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। 'ঘোষালের ত্রিকথা' গ্রন্থের মুখপত্রে—লেখক বলেছিলেন—'মাসখানেক পূর্বে ঘোষালের বেনামীতে আমার লেখা 'বীণা-বাঈ' নামক গল্পের প্রশংসাসূত্রে 'বাতায়ন' পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তার অন্তরে উক্ত লেখক একটি প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন—"ঘোষালের গল্পগুলি একত্র করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা উচিত।"

'ঘোষালের গল্প', 'নীললোহিতের গল্প' এবং সারদাদাদার গল্প কটি তিনটি বিভিন্ন পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

'একটি সাদা গল্পে' প্রমথ চৌধুরী বাঙালী জীবনের আর এক ট্রাজেডির নিরুত্তাপ চিত্র তুলে ধরেছেন। বাঙালী সমাজের বয়স্থা মেয়ের বিবাহের যে ট্রাজেডি তা সহজ ভঙ্গীতে তিনি লিখেছেন এই গল্পে।

বাঙলা সাহিত্যের ছোটগল্পে একটি বিশেষ দিকের নায়ক প্রমথ চৌধুরী। গল্পের রচনারীতি বা বিষয়বস্তু নয়, তার মধ্যে বিচিত্র এবং উদ্ভট পরিস্থিতি ও পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি অদ্বিতীয়। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁর যে কত গভীর অনুরাগ ছিল এবং অসামান্য জ্ঞান ছিল তার পরিচয় তাঁর একাধিক গল্পে ছড়ানো। প্রমথ চৌধুরী বোধকরি বাঙলা দেশের একমাত্র ছোটগল্পকার যিনি উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেন নি। ছোটগল্পের এই যাদুকর স্বয়ং নিজের রচনা সম্পর্কে বলেছেন—

"আমার প্রথম লেখার মধ্যে যে গুণ অথবা দোষ ছিল, আমার আজকের লেখার ভিতরেও সেই গুণ অথবা দোষ আছে, আর সে বস্তুর নাম হচ্ছে Individuality"

প্রমথ চৌধুরীর এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি স্মরণীয়, স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল।*

* গল্পসংগ্রহ —(ছোটগল্প সঞ্চয়ন)—প্রমথ চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক—বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। বিশ্বভারতী কলকাতা-৭। দাম দশ টাকা মাত্র।

বীরবলের আত্মচরিত

"যদিচ আমরা যাদবানন্দ কীর্তনিয়ার বংশধর...আর আমাদের কুলদেবতা শ্যাম রায়, তথাপি আমাদের পরিবার বৈষ্ণব নয়, কীর্তন-বিলাসীও নয়।...আমাদের পরিবার ছিল গোঁড়া হিন্দু: তার অর্থ এই যে, হরিপুরের চৌধুরীরা সমাজের প্রচলিত প্রথা মেনে চলতেন, কিন্তু তাঁদের প্রকৃতিতে ভক্তির লেশমাত্র ছিল না।...আমাদের পরিবারের পুরুষেরা ছিলেন সুপুরুষ, আর আমার খুড়ো-জেঠিরা সব ছিলেন গৌরবর্ণ। আর প্রায় সকলেই ছিলেন চালাকচতুর। তাঁদের ছিল হাসি মুখ ও কথায়-বার্তায় এ'রা হাসির চর্চা করতেন। ... বাবা ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। দেবদ্বিজে তাঁর বিন্দুমাত্র ভক্তি ছিল না। আমাদের চৌধুরী পরিবারের কেউই ভক্তিমার্গের পথিক ছিলেন না।...একে এই অভক্ত চৌধুরী পরিবারের ছেলে, তার উপর হিন্দু কলেজে শিক্ষিত, তাই বাবা সকল ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। বিশেষতঃ খৃস্টান ধর্মের প্রতি তাঁর কোনরূপ অনুরাগ ছিল না। বরং বিরাগ ছিল। এর কারণ বোধ হয় অল্প বয়সে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। উক্ত ভদ্রলোক খৃস্টধর্ম অবলম্বন করায় বাবা খৃস্টধর্মকে ভয় করতেন। পূর্বেই বলেছি তিনি কোন ধর্মে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ বলে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করতে সদাই উন্মুখ ছিলেন। পারিবারিক সংস্কারে তিনি এ বিষয়ে আবদ্ধ ছিলেন।"

পূর্বপুরুষদের প্রসঙ্গে আত্মকথায় এ কথা লিখেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল নানা জায়গায়। যশোরে প্রমথ চৌধুরীর জন্ম ১৮৬৮ খৃঃ ৭ আগস্ট। পাবনা, বিহার, কৃষ্ণনগর, কলকাতা নানা জায়গায় ঘুরেছেন পিতার সঙ্গে। যদিও জন্ম যশোরে। কিন্তু এই জেলাটি তাঁর জীবনে কোন রেখাপাত করতে পারে নি..."যশোরের স্মৃতি আমার অস্পষ্ট। সে শহরের একটি বাড়ী ও দু-একটি ঘটনার কথা আমার মনে আছে। এর বেশী কিছু নয়।"

কৃষ্ণনগরের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর যোগ অচ্ছেদ্য। তাঁর জীবনকে কৃষ্ণনগর গভীরভাবে প্রভাবিত করে। "কৃষ্ণনগরে পদার্পণ করামাত্র ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ সব আমার

নাক, কান, চোখের ভিতর দিয়ে ভিড় করে ঢুকতে লাগল। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে আমার পরিচয় শুরু হল। আমি নানা বস্তুর রূপ দেখলুম। আর তাদের নামও শিখলুম। দার্শনিকেরা যাকে বলেন নামরূপের জগৎ, সেই জগতের সঙ্গে এ জগৎ যে বিচিত্র, সে জ্ঞান আমার জন্মাল।

"কৃষ্ণনগরে আমি শৈশবে ও বাল্যকালে কি শিখেছি, তা বলতে গেলে ৫ বৎসর থেকে পনেরো বছরের হিসেব দিতে হয়। যা শিখেছি তার বেশীর ভাগ unconsciously শিখেছি আর কিছু Consciously সুতরাং আমি Consciously যে শিখেছি, তারই কথা প্রথমে উল্লেখ করব। এই শহরেই আমি ক, খ শিখেছি; a, b, c-ও শিখেছি।' কৃষ্ণনগরে ছাত্রজীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। মিশনারী স্কুল, ব্রজবাবুর স্কুল, বংশী মুচির পাঠশালা, মেয়েদের স্কুল, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পড়েছিলেন। তারপর চলে আসেন কলকাতায়। হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সী কলেজে। সেকেন্ড ইয়ারে উঠে চলে যান কৃষ্ণনগর। ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার আগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবার ফিরে আসেন কলকাতায়। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ-এ পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন; ফিলজফি অনার্সে ফার্স্ট হন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে এম-এ পাশ করলেন।

কলকাতার ছাত্র জীবনের কথা বলতে গিয়ে আত্মকথায় লিখেছেনঃ "আমি কলকাতায় পঠদ্দশায় দুটি ব্যক্তির দর্শনলাভের সুযোগ পেয়েছিলুম, কিন্তু সে সুযোগ গ্রহণ করি নি। সেই দুজনই ভবিষ্যতে আমার জীবন ও মন অধিকার করেন। একজন হচ্ছেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপরটি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী। বোধহয় ১৮[illegible] খৃঃ সরস্বতী পুজোর দিন, হঠাৎ গরম পড়ায় আমি হুজুরিমল ট্যাঙ্ক লেন থেকে হেঁটে প্রেসিডেন্সী কলেজের দক্ষিণের মাঠে এসে উপস্থিত হই। এসে দেখি আমার বন্ধু নারায়ণপ্রসাদ শীল সেখানে একটি গাছতলায় শুয়ে আছেন। তিনি আমায় বললেন যে, অ্যালবার্ট হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি একটা বক্তৃতা করছেন, আর সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর একটি বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। আর বললেন, 'চল না, রাস্তাটা পেরিয়ে আমরা অ্যালবার্ট হলে যাই।' আমি তাঁর এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হলুম না, কারণ আমি শ্রান্ত বোধ করছিলুম। নারায়ণ বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা না শুনতে চাও, অন্তত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে দেখে আসি চল। শুনেছি মেয়েটি নাকি অতি সুন্দরী।' আমি উত্তর করলুম, 'পরের বাড়ীর খুকী দেখবার লোভ আমার নেই।' ফলে অ্যালবার্ট হলে না গিয়ে নারায়ণ আর আমি সেই গাছ তলাতেই শুয়ে থাকলুম। পরে সে মেয়েটিকেই আমি বিবাহ করি।

"এর বছর দেড়েক পরে কৃষ্ণনগরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়।" সে হল ১৮৮৬ খৃঃ এপ্রিল মাসের ঘটনা। প্রমথ চৌধুরীদের বাড়ীতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরবর্তীকালে অন্তরঙ্গতার পর্যায়ে উঠেছিল। দাদা আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সুহৃৎ। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর বিবাহ হয় ১৮৯৯ খৃঃ। "এ বিবাহের পর আমি তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) আত্মীয় হই বটে, কিন্তু তার বহুকাল পূর্বেই তাঁর প্রিয় শিষ্য হই। এবং নানা কারণে তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ হয়। তাছাড়া আমি বছর তিন-চারের জন্য তাঁর জমিদারীর ম্যানেজারী করি, আর সবুজ-পত্রের সম্পাদনা করি—যে পত্রে তাঁর 'ফাল্গুনী', 'বলাকা', 'ঘরে-বাইরে', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। আমি রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসাবেই জানি, শিক্ষাব্রতী হিসাবেও জানি, প্যাট্রিয়ট হিসাবেও জানি।" আর তাছাড়া "আমার পরবর্তী জীবন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এত দূর জড়িয়ে গিয়েছে যে, তার বিবরণ দিতে হলে আমার নিজের জীবনচরিত লিখতে হয়।"

প্রমথ চৌধুরী মানুষটিকে সাহিত্য-জীবনে যেমন স্বাতন্ত্র্যধর্মীরূপে দেখা যায়,

কর্মক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ তাঁর [illegible]। সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তা চাকরী ক্ষেত্রে তাঁকে পরের গোলামী করে চলতে দেয় নি। এম-এ পাশ করে ঘরে বসে থেকেছেন। বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টারী পাশ করে এসেছেন। হাইকোর্টে যোগ দিলেও বেশী দূর সে পথে ঘোরাফেরা করেন নি। দক্ষিণেশ্বরের দেবোত্তর সম্পত্তির রিসিভার হিসাবে কিছু কাল কাজ করেন। তাও ভাল লাগে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যাপক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জমিদারী দেখাশোনা করবার চেষ্টাও করেছিলেন কিছুকালের জন্য। তাঁর নিজের কথায় :

"এম-এ পাশ করবার পর আমি প্রায় দু বৎসর বেকার বসেছিলুম। কিছুদিন পর আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে State Scholarship নেব কিনা, তাই জানবার জন্য একখানি পত্র পাই। এ বৃত্তি তারই প্রাপ্য যার বয়স পঁচিশ বৎসরের কম। আমি উত্তরে লিখি যে, আমার বয়স পঁচিশের দু-এক মাস বেশি। একথা লেখার দরুণ রেজিস্ট্রার ম্যান সাহেব আমার উপর বিরক্ত হন। আমি তাঁর অতিশয় প্রিয় ছাত্র ছিলুম। এর পর বহরমপুরে কলেজের প্রিন্সিপ্যালের চাকরি নিতে রাজী কিনা জানবার জন্য তিনি আমাকে চিঠি লেখেন। কিন্তু রাজী হই নি। তার কিছু দিন পর তিনি আমাকে কুচবিহার কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণের প্রস্তাব করে লেখেন; তার বেতন মাসিক পাঁচশ টাকা। দাদা আমাকে এ চাকরি নিতে পেড়াপেড়ি করেন। কিন্তু আমি ইতস্তত করতে লাগলুম। বাবা কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। দাদা তাঁকে এ প্রস্তাবের কথা বলেন। বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার এ চাকরি নিতে আপত্তি কি?' — আমি বললুম, 'পরের চাকরী করতে আমার মন সরে না।' বাবা বললেন, 'প্রমথ যখন বিবাহ করে নি, তখন তার অনিচ্ছায় আমি তাকে পরের চাকরি নিতে বাধ্য করতে চাই নে।' তাই ম্যান সাহেবের এ প্রস্তাবও আমি অগ্রাহ্য করলুম।

কলেজ থেকে বেরিয়েই পাঁচশ টাকা মাইনের চাকরি কেন যে আমি প্রত্যাখ্যান করলুম, তা বলতে পারি নে। সম্ভবত কর্মবিমুখতাই এর প্রকৃত কারণ।

তারপর আমি জনৈক প্রসিদ্ধ অ্যাটর্ণী আশুতোষ ধরের অফিসে articled clerk হই। এবং বিলেত যাওয়া পর্যন্ত নামমাত্র সে আপিসেই কাজ করি।"

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যচর্চা শুরুর ইতিহাসও বিচিত্র। তাঁর নিজের কথায় : "আমি যখন এম-এ পড়ি, তখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত নামক একটি যুবকের অনুরোধে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য সভায় যোগ দিই এবং সেই সভাতেই জয়দেবের গীতগোবিন্দের উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। তার প্রধান বক্তব্য এই ছিল যে, জয়দেব উঁচুদরের কবি নন। আমার এ মত শুনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও পরলোকগত চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু তাঁরা আমার মতের কোন খণ্ডন করতে পারেন নি। কবি অক্ষয় বড়াল সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন যে, 'এতকাল পর বাঙলায় একটি নূতন লেখকের আবির্ভাব হল।' সে প্রবন্ধ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ করি। ভারতীর সম্পাদিকা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি উক্ত প্রবন্ধের অনেকাংশ বাদ দিয়ে সেটি ছাপেন। সেই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি আমার ভাগিনেয়ী প্রিয়ম্বদা দেবীর কাছে রাখি। এবং বহুকাল পরে সেটি 'সবুজপত্রে' পুনঃ প্রকাশিত করি। এর কারণ সেটি আবার পড়ে দেখলুম যে আমি আমার মত পরিবর্তন করি নি। সেটি অবশ্য তথাকথিত সাধুভাষায় লিখিত। কিন্তু ঈষৎ মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবেন যে, আমার লেখার সব দোষ-গুণই তাতে বর্তমান। এর পর থেকেই আমি বাঙলা লেখক হয়ে উঠলুম।"

কৃষ্ণনগর প্রমথ চৌধুরীর মুখে শুধু ভাষা জোগায় নি। তাঁর মনের মধ্যে সাহিত্যিক রসবোধ জেগে ওঠে কৃষ্ণনগরে বাস করার ফলেই। সেই সাহিত্যিক রসবোধ রবীন্দ্রনাথের নিকট সাহচর্যে অপূর্ব রসমূর্তি লাভ করে। কৃষ্ণনগরের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন : 'কৃষ্ণনগরে বাসকালে আমি কি কি বই পড়েছিলুম, তা বলছি। আমি ছাত্রবৃত্তি স্কুলে কাশীদাসের মহাভারতের কতক অংশ, আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস পড়ি। কৃষ্ণচন্দ্রের বাঙলার ইতিহাস ও তারিণীচরণের ভারতবর্ষের ইতিহাস—এই দুখানি বই আমার স্বদেশের ইতিহাসের জ্ঞান দেয়। সেকালে আমার মনে হত, বই দুখানি ভাল ও সুখপাঠ্য। আমাদের বাড়ীতে বাঙলা বইও যথেষ্ট ছিল। বঙ্গদর্শন বাঁধান ছিল। আর সেই বাঁধান বঙ্গদর্শন থেকে আমি বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ আর বোধ হয় কপালকুণ্ডলা পড়ি। দীনবন্ধু মিত্রের নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য আর নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধও পড়ি। নীলদর্পণ আমি পড়ি নি, কিন্তু তার অভিনয় দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠি। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান আমাদের খুব প্রিয় কাব্য ছিল। তার এ ছাড়া শিশির ঘোষের নওশ রুপেয়া।... অল্প বয়সেই আমি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পড়েছি, আর পড়েছি হরিদাসের গুপ্তকথা। এ বই অবশ্য বালকের পাঠ্য নয়, কিন্তু তার ভাষা সাধুভাষা নয়, আর অতিশয় চটকদার। সে বইয়ের প্রথম পাতা পড়ে দেখবেন—লেখা কি চমৎকার। অবশ্য আরব্য উপন্যাস বাঙলায় পড়েছি আর পারস্য উপন্যাস, রবিনসন ক্রুশো ও রাসেলাস। হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর একটি কবিতা 'ভারত সঙ্গীত' আমাদের সেকালে মুখস্থ ছিল। সেকালে বাঙালীর মনে পেট্রিয়টিসমের জোয়ার এসেছিল — আর আমরা ছোট ছেলেরা সে জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলুম।'

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সবুজপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশ। ১৩২১ সালে ২৫ বৈশাখ সবুজপত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। অন্যতম আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের গল্প কবিতা প্রবন্ধ। আর এই পত্রিকা প্রকাশের পেছনেও ছিল রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও সহযোগিতা। প্রমথ-চৌধুরী লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাবার কিছুকাল পরে, যখন শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে ছিলেন তখন আমি ও মণিলাল গাঙ্গুলী সেখানে যাই, উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাবনা সাহিত্য সম্মিলনে যাওয়া। দু-তিন দিন আমরা পদ্মার উপর বোটে থাকি। রবীন্দ্রনাথ রোজ সন্ধ্যায় পদ্মার চরে বেড়াতে যেতেন; আমি সে সময় বোটেই থাকতুম।

কথায়-বার্তায় আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি নব মনোভাব লক্ষ্য করি। তিনি বলতেন তিনি আর লিখবেন না, কারণ বহুকাল ধরে অনেক লিখেছেন, আরও লিখলে পুনরুক্তি করবেন মাত্র। আমি অবশ্য তাঁর এ অভিমতের ঘোর প্রতিবাদ করতুম।

একদিন সন্ধ্যায় তিনি ও মণিলাল চরে চক্র দিয়ে ফিরে এলেন, মণিলাল ফিরে এসে আমাকে বললে যে, রবীন্দ্রনাথ লিখতে রাজী আছেন, যদি আমি একখানা নতুন মাসিক-পত্র বার করি ও তার সম্পাদক হই। তাহলে তিনি তাঁর সব লেখা সেই পত্রেই প্রকাশ করবেন। আমি হেসে বললুম—আমি এই পত্রিকার বেনামদার সম্পাদক হতে রাজী আছি। আমি প্রস্তাব করলুম—পত্রের নাম দেব সবুজপত্র এবং সে নাম তিনি গ্রাহ্য করলেন।'

তারপরই সবুজপত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে একালে রবীন্দ্রনাথের গদ্য রীতিতে আসে আমূল পরিবর্তন। সেই পরিবর্তনের [illegible] পড়ে প্রমথ চৌধুরীর ওপর। 'যে গদ্য আমি লিখি, তা যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই গড়ে উঠেছে ও বর্তমানের রূপ ধারণ করেছে, এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই—অন্তত তাঁর মনে—যিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত; উপরন্তু বাংলা গদ্যের ইভলিউশনের ইতিহাস জানেন।'

সাহিত্য জীবনে প্রমথ চৌধুরী আর বীরবল একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। আত্ম-চরিতের পাতায় লিখেছেন : 'আমি সেদিন দিল্লি গিয়ে আবিষ্কার করে এসেছি যে, আর্যাবর্তে আমি 'বীরবল' বলে পরিচিত, অবশ্য শুধু প্রবাসী বাঙালীদের কাছে। এ আবিষ্কারে আমি উৎফুল্ল হয়েছি কি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছি, বলা কঠিন। লেখক হিসেবে আমি যে বাংলার বাইরেও পরিচিত, এতো অবশ্য আহ্লাদের কথা;

কিন্তু আমার ধারকরা নামের পিছনে যে আমার স্বনাম ঢাকা পড়ে গেল, এইটিই হয়েছে ভাবনার কথা, কারণ আমি স্বনামেও নানা কথা ও নানা রকম জিনিস লিখি। এর পর আমি যে কেন ও নাম আত্মসাৎ করেছি ও বীরবল লোকটি যে কে ছিলেন, সংক্ষেপে তার পরিচয় দেওয়াটা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

'আমি যখন বালক, তখন আমার পিতার কর্মস্থল ছিল বিহার। কাজেই তিনি সেকালে বছরের বেশির ভাগ সময় সেই দেশেই বাস করতেন। আর আমি বাস করতুম বাংলায়, স্কুলে পড়বার জন্য। আমার বিশ্বাস এর কারণ, বাবা মনে করতেন বিহারের আবহাওয়ায় মানুষের মাথা তাদৃশ খোলে না, যাদৃশ ফোলে তার দেহ।

'এর ফলে তিনি আপিসের পুজোর ছুটিতে বাংলায় আসতেন, আর আমরা কেউ কেউ বিহারে যেতুম স্কুলের শীতের ছুটিতে।

'আমার বয়স যখন এগারো বৎসর, তখন একবার আমি শীতকালে মজঃফরপুরে যাই। সঙ্গে ছিলেন আমার একটি ভ্রাতা ও একটি ভগ্নী। আমি ছিলুম সব চাইতে বয়ঃকনিষ্ঠ। দিনটে এক রকম খেলাধুলোয় কেটে যেত। সন্ধ্যের পর বাড়ির জন্য মন কেমন করত।

'বাবা তাই ঘরের ভিতর প্রকাণ্ড একটা আঙঠি জ্বালিয়ে তার চার পাশে আমাদের বসিয়ে একখানি উর্দু বই থেকে আমাদের কেচ্ছা পড়ে শোনাতেন। এর অধিকাংশ কেচ্ছাই এই বলে শুরু হত 'আকবর বীরবল সে পুছা', আর শেষ হত বীরবলের উত্তরে।

'আমি তখন তারিণীচরণের ভারতবর্ষের ইতিহাসের পারগামী হয়েছি, সুতরাং আকবর শাহের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল; অর্থাৎ তিনি যে জাহাঙ্গীরের বাবা ও হুমায়ুনের ছেলে, একথা আমার জানা ছিল।

কিন্তু বীরবল লোকটি যে কে, হিন্দু কি মুসলমান, বাদশাহের মন্ত্রী কি ইয়ার, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলুম; কারণ তারিণীচরণ তাঁর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি।

কিন্তু সেই সব উর্দু কেচ্ছা শোনাবার ফলে আমার মনে বীরবলের নাম বসে যায়। আকবরের প্রশ্নের উত্তরে বীরবলের চোখা চোখা জবাব শুনে আমি মনে মনে তাঁর মহাভক্ত হয়ে উঠলুম। প্রশ্ন করতে পারে সবাই। কিন্তু উত্তর দিতে পারে কজন? আর যে পারে, আমার বালক-বুদ্ধি তাকেই প্রশ্নকর্তার চাইতে উঁচু আসনে বসিয়ে দিলে। মুখের চাইতে হাত যে বড় হাতিয়ার, বুদ্ধিবলের চাইতে বাহুবল যে শ্রেষ্ঠ, সেকথা আমি তখন বুঝতুম না; সে বয়েসে আমি সভ্য হই নি, ছিলুম শুধু আদিম মানব। সেকালে বাহুবলের একমাত্র পরিচয় পেতুম গুরুজনদের ও গুরুমহাশয়দের বাহুতে। জোয়ান লোকদের কর্তৃক ছোট ছোট ছেলেদের গালে চপেটাঘাত ও কর্ণ মর্দনের মাহাত্ম্য ও-বয়সে হৃদয়ংগম করতে পারি নি। আমাদেরই ভালোর জন্য যে তাঁরা আমাদের গালে তাঁদের পাঁচ আঙুলের ছাপ দেগে দিচ্ছেন, তা বোঝবার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি তখন আমার ছিল না। এই পরোপকারের চেষ্টাটা সেকালে অত্যাচার বলেই রক্ত-মাংসে অনুভব করতুম। তাই তখন মনে ভাবতুম, হায়, আমার মুখে যদি বীরবলের রসনা থাকত, তাহলে এই সব ঘরো আকবর শাহদের বোকা বানিয়ে দিতুম। দুর্বলের উপর বল-প্রয়োগের নামই যে বীরত্ব তা বুঝলুম ঢের পরে, যখন কার্লাইলের Hero-worship পড়লুম।

এর পর বহুকাল যাবৎ বীরবলের নাম আমার গুপ্ত চৈতন্যে সুপ্ত হয়েছিল। আমার যখন পূর্ণ যৌবন, তখন আবার তা জেগে উঠল। বিলেতে আমার অনেক মুসলমান বন্ধু জোটে, তাঁদের কারও বাড়ি লক্ষ্ণৌ, কারও দিল্লী, কারও নাগপুর, কারও হায়দ্রাবাদ। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন আবার নবাবজাদা।

এই নববন্ধুদের মুখে বীরবলের রসিকতার দেদার গল্প শুনি। এসব রসিকতা যে অন্য লোকের বানানো, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা এসব গল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রমাণ করা যে, আকবরের সভায় বীরবলের চাইতেও আর একজন ঢের বড় রসিক ছিলেন, যিনি কথায় বীরবলকে উপহাসাস্পদ করতেন। এই রসিকরাজের নাম হচ্ছে মৌলবী দোপিঁয়াজা। উক্ত মৌলবী সাহেবের সুভাষিতাবলী যে সাহিত্যে স্থান লাভ করে নি, তার কারণ তাঁর রসিকতা তাঁর নামেরই অনুরূপ তীব্র গন্ধী, সে রসিকতা শুনে যুগপৎ কানে হাত ও নাকে কাপড় দিতে হয়।

এই সব কেচ্ছা শুনে আমার এই ধারণা জন্মাল যে, বীরবল ছিলেন আকবর শাহের বিদূষক, আর তিনি জাতিতে ছিলেন হিন্দু। বিদূষক হিসেবে তিনি হিন্দুস্থানে দেশব্যাপী খ্যাতিলাভ করেছিলেন বলে তাঁর পাল্টা জবাব দিতে পারে এমন একজন মুসলমান রসিক কল্পিত হয়েছে। তাঁর নামেই প্রমাণ যে, উক্ত নামধারী কোন মৌলবী আকবর শাহের সভাসদ হতে পারত না।

সে যাই হোক, বছর কুড়িক আগে আমি যখন দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে কতক সত্য কথা শোনাতে মনস্থ করি তখন আমি না ভেবেচিন্তে বীরবলের নাম অবলম্বন করলুম। এ নামের দুইটি স্পষ্ট গুণ আছে: প্রথমত নামটি ছোট, দ্বিতীয়ত শ্রুতিমধুর। এ নাম গ্রহণ করে আমি স্বজাতিকে বাদশাহের পদবীতে তুলে দিয়েছি, সুতরাং তাঁদের এতে খুশি হবারই কথা। আর মুসলমান ভ্রাতৃগণের কাছে নিবেদন করছি যে, আমি যত বড়ই রসিক হই না কেন, মৌলবী দো-পিঁয়াজার নাম গ্রহণ করা আমার শক্তিতে কুলোয় না। ইংরেজী শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান অকাতরে পলাণ্ডু ভক্ষণ করতে পারে, কিন্তু নিজেকে পলাণ্ডু বলে ভদ্র সমাজে পরিচিত করতে পারে না। জাতি জিনিসটে এমনি বালাই।

মৌলবী দো-পিঁয়াজার অস্তিত্ব অসিদ্ধ, প্রমাণাভাবাৎ। কিন্তু বীরবল যে এককালে সশরীরে বর্তমান ছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই; কারণ আকবরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক মৌলবী সাহেবরা তাঁর মৃত্যুর বর্ণনা খুব স্ফূর্তি করে করেছেন। যার মৃত্যু হয়েছে, সে অবশ্য এককালে বেঁচে ছিল। তিনি আকবর শাহের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। ফলে আকবরের বহু প্রসাদ বিত্তদের তিনি সমান অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আর ইতিহাসে সেই ব্যক্তিরই নাম স্থান পায়, যে নিন্দা প্রশংসা দুয়েরই সমান ভাগী। বীরবলের ভাগ্যে দুই যে সমান জুটেছিল, তার পরিচয় পরে দেব।

জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক ফরাসী ভাষার সব পাঁজিপুঁথি ঘেঁটে বীরবলের আসল নামধাম উদ্ধার করেছেন। বীরবল নামটিও রাজদত্ত।

বীরবলের প্রকৃত নাম মহেশ দাস। তিনি ১৫২৮ খৃস্টাব্দে কাল্পি নগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান প্রথমে জয়পুরের রাজা ভগবান দাসের আশ্রয়ে বাস করতেন, পরে রাজাবাহাদুর তাঁকে বাদশাহের কাছে পাঠিয়ে দেন। মহেশ দাসের কবিতা, তাঁর সঙ্গীত, তাঁর রসালাপ, তাঁর গল্প আকবরকে এত মুগ্ধ করে যে, তিনি তাঁকে 'কবি রায়' উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐতিহাসিকেরা তাঁকে কখনো আকবরের মন্ত্রী, কখনো বা প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। পরে আকবর শাহ তাঁকে 'রাজা বীরবল' উপাধি দেন, এবং সেই সঙ্গে বুন্দেলখন্ডের কালাঞ্জর রাজ্য বা কাংরা প্রদেশ জায়গীর দেন। ১৫৮৬ খৃস্টাব্দে আকবর বীরবলকে সেনাপতি করে কাবুল যুদ্ধে পাঠান, এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানদের হস্তে তিনি ভবলীলা সংবরণ করেন।

বীরবলের জীবনচরিত সম্বন্ধে উপরে যা নিবেদন করেছি, তার নামে বেশী আর কিছু জানিনে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই বুঝতে পারবেন যে, তাঁর নাম

অবলম্বন করে আমি কতটা স্ববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছি। আমি কবিও নই, গায়কও নই, গল্প রচয়িতাও নই। তারপর রাজ-দরবার আমি কখনো দূরে থেকেও দেখি নি। কাবুলে যুদ্ধ করতে যাবার আমার কোনরূপ অভিপ্রায়ও নেই, সম্ভাবনাও নেই। তারপর আমি কাউকে নূতন ধর্ম প্রচার করতে কখনো প্ররোচিত করি নি। কারণ নিত্য দেখতে পাই যে, অনেকে আমার সত্য কথাকে রসিকতা বলে, আর আমার রসিকতাকে সত্য কথা বলে ভুল করেন।

এখন এ ভুল শোধরাবার আর উপায় নেই। পাঠকেরা যে আমার লেখার ভিতর সত্য না পান, রস পেয়েছেন, এতেই আমি কৃতার্থ।'

প্রমথ চৌধুরী মারা যান ১৯৪৬ খৃঃ ২ সেপ্টেম্বর। অনেক আগে একটি সনেটে লিখেছিলেন :

মুখস্থে প্রথম কভু হইনি কেলাসে
হৃদয় ভাঙেনি মোর কৈশোর পরশে।
কবিতা লিখিনি কভু সাধু আদি রসে।
যৌবন জোয়ারে ভেসে, ডুবিনি বিলাসে।

চাটুপটু বক্তা নহি, বড় এজলাসে।
উদ্ধার করিনি দেশ, টানিয়া চরসে।
পুত্র-কন্যা হয় নাই বরষে বরষে।
অশ্রুপাত করি নাই মদের গেলাসে।

পয়সা করিনি আমি, পাইনি খেতাব।
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব।

অন্যে কভু দিই নাই নীতি উপদেশ।
চরিত্রে দৃষ্টান্ত নহি, দেশে কি বিদেশে।
বুদ্ধি তবু নাহি পাকে পাকে যদি কেশ।
তপস্বী হব না আমি জীবনের শেষে!

প্রমথ চৌধুরীর গ্রন্থপরিচয়

প্রবন্ধ

১। **তেল নুন লকড়ি।** ১৯০৬ খৃঃ। পৃঃ ৪৮। ১৩১২ সালের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন। পরে প্রবন্ধগুলি 'নানা কথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২। **The Story of Bengalee Literature** (Paper read at the Summer Meeting at Darjeeling on the 14th of June 1917. 15th August 1917. Pp. 17.

৩। **বীরবলের হালখাতা।** ৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ খৃঃ। পৃঃ ২৭৮। ত্রিশটি প্রবন্ধের সংকলন। সূচী : হালখাতা; কথার কথা; আমরা ও তোমরা; খেয়াল খাতা; মলাট সমালোচনা; সাহিত্যে চাবুক; তর্জমা; বইয়ের ব্যবসা; বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ; নোবেল প্রাইজ; সবুজপত্র; বীরবলের চিঠি; 'যৌবনে দাও রাজটীকা'; ইতিমধ্যে; বর্ষার কথা; পত্র; কৈফিয়ৎ; নারীর পত্র; নারীর পত্রের উত্তর; চুটকী; সাহিত্যে খেলা; শিক্ষার নব আদর্শ; কংগ্রেসের আইডিয়াল; পত্র; প্রত্ন-তত্ত্বের পারস্য উপন্যাস; টীকা ও টিপ্পনি; শিশু-সাহিত্য; সুরের কথা; রূপের কথা; ফাল্গুন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ চৌদ্দটি প্রবন্ধ নিয়ে। বীরবলের হালখাতা প্রথম পর্ব নামে প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালের আষাঢ় মাসে।

৪। **নানাকথা।** ১৩ মে ১৯১৯ খৃঃ। পৃঃ ৩৬২। একুশটি প্রবন্ধের সংকলন। সূচী : তেল, নুন, লকড়ি; বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধু ভাষা; সাধু ভাষা বনাম চলতি ভাষা; বাংলা ব্যাকরণ; সনেট কেন চতুর্দশপদী? ব্রাহ্মণ মহাসভা; সবুজ-পত্রের মুখপাত্র; সাহিত্য-সম্মেলন; ভারত-বর্ষের ঐক্য; ইউরোপের করুক্ষেত্র; বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ; নূতন ও পুরাতন; বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি? অভিভাষণ; বর্তমান বঙ্গ সাহিত্য; অলংকারের সূত্রপাত; আর্য ধর্মের সহিত বাহ্যধর্মের যোগাযোগ, আর্য সভ্যতার সঙ্গে বঙ্গ-সভ্যতার যোগা-যোগ; ফরাসী সাহিত্যের বর্ণ পরিচয়; সালতামামি; প্রাণের কথা।

৫। আমাদের শিক্ষা। ২৫ আগস্ট ১৯২০ খৃঃ। পৃঃ ১০৪। পাঁচটি প্রবন্ধের সংকলন। সূচী : আমাদের শিক্ষা; বাংলার ভবিষ্যৎ; বই পড়া; আমাদের শিক্ষা ও বর্তমান জীবন সমস্যা; নব-বিদ্যালয় ১—৩।

৬। দু-ইয়ারকি। ২৯ জুলাই ১৯২০ খৃঃ [১৯ মার্চ ১৯২১ খৃঃ]। পৃঃ ১৭৫। চারটি প্রবন্ধের সংকলন। সূচীঃ দু-ইয়ারকি; দেশের কথা ১—২; রায়তের কথা; নবযুগ।

৭। **বীরবলের টিপ্পনী।** ১৩২৮। ২ আগস্ট ১৯২১ খৃঃ। পৃঃ ১২৪। আটটি প্রবন্ধের সংকলন। সূচীঃ কংগ্রেসের দলা-দলি; 'এন্তো বড়' কিম্বা 'কিছু নয়'; সাহিত্য বনাম পলিটিকস্; টীকা ও টিপ্পনী; পত্র; গত কংগ্রেস। পরিশিষ্ট : গুলিখোরের আবেদন পত্র; গর্জন—সরস্বতী সংবাদ।

৮। **রায়তের কথা।** ১০ আগস্ট ১৯২৬ খৃঃ। পৃঃ ১৸+৪০। সূচীঃ ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত : টীকা—প্রমথ চৌধুরী লিখিত; রায়তের কথা ('দু-ইয়ারকি' থেকে); রংপুরে উত্তরবঙ্গ রায়ত-কনফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণ; পত্র (বীরবলের টিপ্পনী থেকে)। ১৩৫১ সালের বৈশাখ (১৬ মে ১৯৪৪ খৃঃ) বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থমালায় 'অভিভাষণ' ও 'পত্র' বাদ দিয়ে প্রকাশিত হয়।

৯। **নানাচর্চা।** ১ মার্চ ১৯৩২ খৃঃ [১ জুন ১৯৩২ খৃঃ।] পৃঃ ২৭৬। সূচী : ভারতবর্ষের জিওগ্রাফী; অনু হিন্দুস্থান; মহাভারত ও গীতা; বৌদ্ধ ধর্ম; হর্ষ-চরিত; পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলী খাঁ; বীরবল; ভারতচন্দ্র; রামমোহন রায়; বাঙালী পেট্রিয়টিজম্; পূর্ব ও পশ্চিম; য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি?; ভারতবর্ষ সভ্য কি না?; গোল-টেবিলের বৈঠক।

১০। **ঘরে বাইরে।** ২৪ নভেম্বর ১৯৩৬ খৃঃ। পৃঃ ১২৭। নয়টি প্রস্তাব আছে।

১১। অভিভাষণ। ৯ ফাল্গুন ১৩৪৩। চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি প্রমথ চৌধুরীর অভিভাষণ। ইতিহাস ও দর্শন শাখার সভাপতিদের অভিভাষণও এই পুস্তিকায় মুদ্রিত আছে।

১২। **সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর অভিভাষণ।** ২৯ মাঘ ১৩৪৪। পৃঃ ১৺ কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে ভাষণ।

১৩। প্রাচীন হিন্দুস্থান। অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ (৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৪০)। পৃঃ ১১৭। সূচীঃ ভূ-বৃত্তান্ত ('নানাচর্চা' থেকে। ভারত-বর্ষের জিওগ্রাফি ও অনু-হিন্দুস্থান প্রবন্ধদ্বয়ের সংশোধিত রূপ); ইতিবৃত্তান্ত।

১৪। বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ডিসেম্বর ১৯৪৪ খৃঃ (২১ ডিসেম্বর ১৯৪৪ খৃঃ)। পৃঃ ১৭। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা।

১৫। **হিন্দুসংগীত।** বৈশাখ ১৩৫২ (১৪ জুন ১৯৪৫ খৃঃ) সূচী : হিন্দু-সংগীত; সুরের কথা (বীরবলের হালখাতা থেকে) এবং ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর লেখা সংগীত পরিচয়।।

১৬। আত্মকথা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ (২৮ জুন ১৯৪৬ খৃঃ)। পৃঃ ১১৪। ১৮৯৩ খৃঃ বিলাত যাত্রা পর্যন্ত স্মৃতিকথা।

১৭। **প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান।** ফাল্গুন ১৩৬০। পৃঃ ৩২।

১৮। **পত্রাবলী।** ধর্ম ও বিজ্ঞান। ১ অকটোবর ১৯৩১ খৃঃ। ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে বীরবল, অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও দিলীপ-কুমার রায়ের লেখা কয়েকটি চিঠি প্রমথ চৌধুরী স্বীয় 'সবুজ-পত্র'-সহ এই গ্রন্থে প্রকাশ করেন। ঐ ভূমিকা ছাড়া প্রমথ চৌধুরীর তিনটি রচনা বীরবলের পত্র ১-২: ফ্রান্সের নব মনোভাব এই গ্রন্থে স্থান পায়।

গল্প ও উপন্যাস

১৯। **চার-ইয়ারি কথা।** জানুয়ারী ১৯১৬ খৃঃ (২১ আগস্ট ১৯১৬ খৃঃ) পৃঃ ৯৭। গল্প।

২০। **Tales of Four Friends.** June 1944. Pp. 119. চার ইয়ারি কথার ইংরেজি অনুবাদ করেন ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী।

২১। আহুতি। ১৯১৯ খৃঃ। পৃঃ ১৯৯। গল্প সংগ্রহ। সূচী : আহুতি; বড়বাবুর বড় দিন; একটি সাদা গল্প; ফরমায়েসি গল্প; রাম ও শ্যাম।

২২। নীললোহিত। পৃঃ ১৩১। গল্প সংগ্রহ। সূচী : নীললোহিত; নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্র লীলা; নীললোহিতের স্বয়ম্বর; অদৃষ্ট; সম্পাদক ও বন্ধু; গল্প-লেখা; পূজার বলি; সহযাত্রী; ঝাঁপান খেলা; দিদিমার গল্প; ভূতের গল্প।

২৩। **নীললোহিতের আদি প্রেম।** পৃঃ ১০৫। **গল্প সংগ্রহ। সূচী : নীললোহিতের** আদি প্রেম; ট্রাজেডির সূত্রপাত; অবনী-ভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি, অ্যাডভেঞ্চার—স্থলে; অ্যাডভেঞ্চার—জলে; ভাববার কথা।

২৪। **ঘোষালের ত্রিকথা।** ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ খৃঃ। পৃঃ ৯৩। গল্প সংগ্রহ। সূচী: ফরাসী গল্প ('আহুতি' থেকে); ঘোষালের হেঁয়ালি; বীণাবাই।

২৫। **অনুকথা সপ্তক।** ১৩৪৬ (১ জুলাই ১৯৩৯ খৃঃ)। পৃঃ ৫৯। গল্প সংগ্রহ। সূচী : মন্ত্রশক্তি; যখ; ঝোটুন ও লোটুন; মেরি ক্রিসমাস; ফার্স্টক্লাশ ভূত; স্বল্প-গল্প; প্রগতি রহস্য।

২৬। **গল্প সংগ্রহ।** ২০ ভাদ্র ১৩৪৮ (৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ খৃঃ)। পৃঃ ৫০৭। গ্রন্থাকারে ও সাময়িকপত্রে এযাবৎকাল প্রকাশিত সমস্ত গল্পের সংগ্রহ। প্রমথ চৌধুরী সংবর্ধনা সমিতির পক্ষে প্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক প্রকাশিত।

২৭। **বারোয়ারি।** ১৯২১ খৃঃ। বারো-জন সাহিত্যিকের রচনা। 'ভারতী' মাসিক পত্রিকার উদ্যোগে রচিত। ৩৩-৩৬ পরিচ্ছেদ প্রমথ চৌধুরীর রচনা।

কাব্যগ্রন্থ

২৮। **সনেট পঞ্চাশৎ।** ফাল্গুন ১৯১৩ খৃঃ (২৫ মার্চ ১৯১৩ খৃঃ। পৃঃ ৫০।

২৯। পদচারণ। ১৯১৯ খৃঃ (১২ জুলাই ১৯২০)। পৃঃ ৮৪।

গ্রন্থাবলী

৩০। **প্রমথনাথ চৌধুরীর গ্রন্থাবলী।** ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ খৃঃ। পৃঃ ৩১১। সূচী : কাব্য—সনেট পঞ্চাশৎ : পদচারণ। গল্প—চার ইয়ারী কথা, আহুতি; আরও আটটি গল্প (নীললোহিত ও নীললোহিতের আদি কথায় সংকলিত। প্রবন্ধ—'দু-ইয়ারকি' (সম্পূর্ণ); 'বীরবলের হালখাতা'; 'নানাকথা' ও 'বীরবলের টিপ্পনী'-র অংশ বিশেষ। কথাসাহিত্য প্রবন্ধ।

গ্রন্থভুক্ত হয়নি

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা সম্পাদিত 'ছোটগল্প' পত্রিকায় প্রকাশিত সেকালের গল্প (১ আষাঢ় ১৩৩৯), নীললোহিতের আদি প্রেম (৬ ফাল্গুন ১৩৩৯) এবং ট্রাজেডির সূত্রপাত (৩১ ভাদ্র ১৩৪০)। প্রতিভা বসু সম্পাদিত ছোট গল্প গ্রন্থমালায় ৫ম সংখ্যায় বৈশাখ, ১৩৫১-তে প্রকাশিত 'দুই না এক'। এগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি মৌলিক ও বিদেশী গল্প গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

সাময়িক-পত্র সম্পাদনা

১। সবুজ পত্র

২। বিশ্বভারতী পত্রিকা

৩। অলকা

৪। রূপ ও রীতি

রাজধানীর ইতিকথা

নিমাই ভট্টাচার্য

স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে যে ভারতবর্ষের কথা পড়া যায়, মহামান্য ভারত সরকারের কাজকর্ম বা ফাইল-পত্তরে সে ভারতবর্ষের হদিশ পাওয়া যায় না। পাঠ্যপুস্তকে লেখা আছে বাংলা-বিহার -উড়িষ্যা-আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুর থেকে শুরু করে কচ্ছ ও কন্যাকুমারিকার কথা। লেখা আছে শিলং, দার্জিলিং, পুরীর কথা; নালন্দা, ভুবনেশ্বর, মুর্শিদাবাদের কথা। আরো অনেক কিছু পাবেন পাঠ্যপুস্তকে। নবদ্বীপ, গৌড় থেকে শুরু করে সোমনাথের মন্দিরের কথাও পাবেন। পাতা উল্টে যান। আরো পাবেন। গান্ধিজি, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ, গোখলে, সাভারকর, ভগৎ সিং ইত্যাদিদের স্মৃতি বিজড়িত জায়গাগুলির কথাও পাঠ্যপুস্তকে আছে।

মোটকথা অতীত ও বর্তমান ভারতবর্ষের সব ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট স্থানের কাহিনী পাওয়া যাবে আট আনা দামের পাঠ্যপুস্তকে। কিন্তু ভারত সরকারের ফাইলে? ভারত সরকারের টুরিস্ট বিভাগের ফাইলে? সব ফক্কা! পাঠ্যপুস্তকের ভারতবর্ষ ডলারের কাঙালদের ডিপার্টমেন্টে হারিয়ে গেছে। তবে পাবেন ডেল্হি, এ্যাগ্রা, ক্যাশমীর, জ্যাপুর, এ্যাজান্টার কথা। একটু বেশী ঘাটাঘাটি করলে ঐ ময়লা ফাইলটার মধ্যে ভারানাসী বা আর দুটো একটার নাম পাবেন।

খবরের কাগজের পাতায় মোটামোটা হরফে নেতাদের বক্তৃতা ছাপা হয়—ভারতবর্ষ এক। ভারতবর্ষের মানুষ এক ও অভিন্ন। সারা দেশের কল্যাণ-যজ্ঞে সরকার সর্বস্ব পণ করেছেন। পড়তে ভালই লাগে। কিন্তু এই ভারতবর্ষকে স্বদেশে-বিদেশে তুলে ধরা যার কাজ, সেই টুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট ক্যাশ্‌মীর আর জ্যাপুর আর এ্যাগ্রা নিয়েই এত ব্যস্ত যে আর কোন দিকে নজর দিতে পারেন না।

দেশের অতীত-বর্তমানকে সবার সামনে তুলে ধরাই টুরিস্ট বিভাগের কাজ। দেশের সমগ্র ইতিহাসকে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই সব দেশের সব টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন-সাধনা। আর আমাদের দেশে? ক্যাশমীর, জ্যাপুর, এ্যাগ্রা। ব্যস! ভারতবর্ষ খতম! প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। গত একুশ বছরে শত শত কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ভবিষ্যতেও হবে। পৃথিবীর দিকে দিকে দপ্তর খোলা হয়েছে। হার্ড কারেন্সী ভিক্ষা পাবার জন্য তন্বী-শ্যামা বিগত যৌবনাদের পাঠান হয়েছে লন্ডন, প্যারিস, ফ্রাঙ্কফার্ট, নিউইয়র্কে। ডেলিগেশন যাচ্ছে, আসছে। বই ছাপা হচ্ছে, পোস্টার ছাপা হচ্ছে, ফোল্ডার ছাপা হচ্ছে। হচ্ছে আরো অনেক কিছু। কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে পৃথিবীর অসংখ্য পত্রপত্রিকায়। ফিল্ম তোলা হচ্ছে, অতিথিদের নিমন্ত্রণ করে হুইস্কী খাইয়ে সে ফিল্ম দেখান হচ্ছে পৃথিবীর নানা শহরে, নগরে। কিন্তু এই প্রচার, এই ব্যয়, এই সমগ্র লংকাকান্ড হচ্ছে শুধু ডেলহি, অ্যাগ্রা, জ্যাপুর, ক্যাশমীরের জন্য। টুরিস্টরা কোথায় যাবেন—সেটা তাদের পছন্দ, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশটাকে তুলে ধরা টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ভারত সরকারের টুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট সারা দেশকে অবজ্ঞা করে চলেছে অথচ একজনের কন্ঠেও তার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়নি।

লন্ডন-প্যারিস-নিউইয়র্ক বা দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতার টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসে যান। দেখবেন ঐ শুধু ডেল্হি, জ্যাপুর, অ্যাগরা, ক্যাশমীরের প্রচার। কর্মচারীর দল? তাঁরাও অনেকেই ঐ কোরাস ছাড়া যেন আর কিছু জানেন না। শিলং, দার্জিলিং, নালান্দা, ভুবনেশ্বর, সোমনাথ, মহাবলীপুরম বা অন্য কোথাকার কোন প্রচার নেই। কোনারকের ছবি দিয়ে ভারতবর্ষের প্রচার করা হয় কিন্তু কাউকে কোনারক যেতে বলা হয় না। দার্জিলিং থেকে তোলা কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি দিয়ে লন্ডন-নিউইয়র্কে টুরিস্ট অফিসের শো উইন্ডো সাজান হয় কিন্তু কাউকে দার্জিলিং যেতে বলা হয় না।

পৃথিবীর নানা দেশ থেকে অসংখ্য ভি-আই-পি এসেছেন ভারতবর্ষে। ক' বছর আগে পর্যন্ত দু' চারজনকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হতো। গত কয়েক বছরে তাও বন্ধ। সেই ডেল্হি, অ্যাগ্রা, জ্যাপুরে। আর ফেরার পথে বোম্বে। সভা-সমিতি মিটিং-কনফারেন্স-সেমিনার—তাও ঐ ডেল্হি বা ক্যাশমীর। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ডের ভি-আই-পিরা আমাদের নেতাদের মত নিজেদের ধর্মপালনে কুন্ঠাবোধ করেন না। তাই তাঁরা এলে বুদ্ধগয়া যান। এইসব দেশের বহু মানুষ সারনাথ বা বুদ্ধগয়া যান নিজেদের তাগিদে, আমাদের টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের প্রচারের জন্য নয়। দুর্গাপুরে রাণী এলিজাবেথ, ভিলাইতে ক্রুশ্চেভ-কোশিগিন, রাউরকেলায় জার্মান রাষ্ট্রপতি গিয়েছেন অন্য কারণে। তাছাড়া আজ পর্যন্ত একজন বিদেশী ভি-আই-পি'কে শিলং বা দার্জিলিং বা ভুবনেশ্বর বা কোনারক বা সোমনাথ বা পন্ডিচেরী বা কন্যাকুমারিকা নিয়ে যাওয়া হয় নি। ভি-আই-পিরা গেলে শিলং-দার্জিলিং আরো সুন্দর হবে না, সোমনাথ-ভুবনেশ্বর আরো পবিত্র হবে না; কিন্তু এ'দের সফরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায় নানাবিধ উন্নয়নের জন্য। আর তার চাইতে বড় বিশ্বব্যাপী প্রচার হয় এবং তার ফলে পর্যটক আসে। আর পর্যটক এলেই স্থানীয় লোকজনের কিছু আয় বাড়ে। সংগে সংগে নানা উপায়ে ঐসব জায়গাগুলোর নানারকম উন্নতি হয়।

কি জানি কি বিচিত্র রহস্যের জন্য ভারত সরকার ঐ কোরাস গেয়ে চলেছেন, ভিজিট ইন্ডিয়া, ভিজিট ডেলহি, অ্যাগ্রা, জ্যাপুর, ক্যাশমীর। সারা পৃথিবীর মানুষকে জয়পুরে যেতে বলা হয় কিন্তু চিতোর বা আজমীর যেতে বলা হয় না; কাশ্মীর যেতে বলা হয় কিন্তু সিমলা যেতে বলা হয় না। রাজ্য সরকারগুলোও অনেকেই স্থবিরের মত চুপচাপ। পার্লামেন্টের সদস্যরাও বোধকরি ক্যাশমীর আর জ্যাপুরে যাবার জন্য এত ব্যগ্র যে নিজেদের রাজ্যের কল্যাণের কথা ভাববার সময় পান না।

শুধু তাই নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলতে সব নেতাই আত্মহারা হয়ে পড়েন, পলাশীর ইতিহাস বলতে গেলে নেতাদের চোখে জল আসে। কিন্তু দেশে বা বিদেশে ভারতবর্ষের সেই অবিস্মরণীয় যুগের ইতিহাসকে সবার সামনে তুলে ধরার কথা কেউ মনে করেন না। যমুনা পাড়ের তিনটি সমাধিক্ষেত্র আর তিনমূর্তি ভবনের নেহেরু মিউজিয়ামের মধ্যেই ভারতবর্ষের ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়ে আছে। লালকেল্লায় [illegible]ান, দেখতে পাবেন না, জানতে পারবেন না যে এখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের ঐতিহাসিক বিচার হয়েছিল। টুরিস্ট অফিসে কলকাতার ফোল্ডার পাওয়া যায় না। যদিও বা পান, পড়ে দেখুন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কথা লেখা আছে কিন্তু নেতাজী ভবনের কথা লেখা নেই। বোম্বাই'এর ফোল্ডার পড়ুন। বোম্বে রেসকোর্সের কথা লেখা আছে, ছবি আছে কিন্তু সাভারকার বা সেনাপতি বাপতের কর্মক্ষেত্রের কোন কথা লেখা নেই।

বক্তৃতা দিয়ে, ফটো ছাপিয়েই ইন্টিগ্রেশন হয় না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই দেশবাসীর দেশপ্রেম জাগে না। কিছু কাজ করা দরকার। সারা দেশের ইতিহাসকে, সমস্ত মনীষীকে ইতিহাসের সব পথিকৃৎ'কে সমানভাবে শ্রদ্ধার সংগে সবার কাছে তুলে না ধরলে ভারতবর্ষ যে আমাদের দেশ তা দেশবাসী বুঝবে কেমন করে?
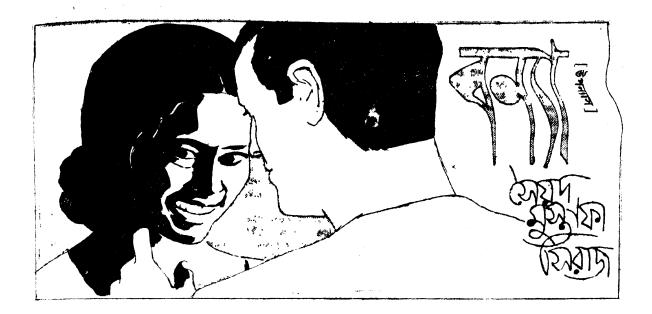
দরজায় সাইকেলের ঘণ্টি শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে লীলা বলেছিল, দেখ, কে ডাকছে। পিওন হয়ত।

সত্য বারান্দার তক্তাপোষে মাদুর পেতে শুয়েছিল। কদিন থেকে ভীষণ গরম পড়েছে। একটুও বাতাস নেই। গাছপালা পুড়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। এবারও প্রচন্ড খরা হবে। আষাঢ় আসতে দেরী আছে। তাহলেও এসময় কিছু বৃষ্টি খুব দরকার। পুকুর ডোবা সব শুকিয়ে গেছে। সত্যচরণ খুব একটা বিষয়ী না হলেও এইসব ছাই-পাঁশ ভাবছিল শুয়ে। হাতপাখা দিয়ে মাছি তাড়ানো ছাড়া হাওয়ার স্বাদ নেবার চেষ্টা করা বৃথা। গায়ে জ্বালা ধরে যায়। ফোস্কা পড়ে যেন। তাই সে বিরক্ত হচ্ছিল। সেইসময় লী[illegible] কথা শুনে সে গা করল না। বলল, পিও[illegible] কেন আসবে? কোন ভিখিরি হবে, জল খাবার ছলে ভাত খেতে চাইবে। ছেড়ে দাও।

রান্নাঘরে থাকার ফলে লীলাও বেশ বিরক্ত। তার কপালে ঘাম, নাকের ডগায় ঘাম, চিবুকে ঘাম। আঁচলে মুখটা মুছে সে বলে উঠল, কী কথার ছিরি তোমার! ভিখিরী ঘণ্টা বাজায়, না সাইকেলে চেপে আসে!

সত্যচরণ পা টানটান করে বলল, অ। সেত একটা কথা। তাহলে এই ভরদুপুরে কে আসতে পারে? পিওন......কিন্তু এই তো সবে গতকাল জামাইবাবু এসেছিলেন। দিদি ছাড়া আর কে চিঠি লিখবে?...অবিশ্যি তোমার মা...সত্য এবার কাত হয়ে কনুই ভর করে মুখ তুলল।...তোমার মা লোক পাঠাতে পারেন। কিন্তু রূপপুর থেকে যদি আসে কেউ—তো সে তোমাদের ঘণ্টা কিংবা হরু। আমি জানি, ও ব্যাটারা সাইকেল চাপতে পারে না। তাহলে...

কথা শুনতে শুনতে লীলা রাগে মনে মনে জ্বলছিল। এবার ফেটে পড়ল। এত আলসে মানুষ তুমি! জীবনে কী করবে, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তখন থেকে কে বেল বাজাচ্ছে দরজায়, বাবুর ননীর শরীর—একটু উঠে গেলেই গলে যাবে। নাঃ, সব দায় আমার ওপর চাপিয়ে বেশ সুখেই আছ।

ঝগড়া লীলা করে না স্বভাবত। কিন্তু এখন তার সুরে সেই ঝাঁঝ—বেশ কটুই লাগল সত্যর। তবু তারও নিজের একটা স্বভাবগোছের আছে—সে হাসল খিকখিক করে। বলল, সুখে থাকবার জন্যেই তো বড়-লোকের মেয়ে বিয়ে করেছি।

লীলা আরও ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিল, হ্যাঁ, বড়লোকের মেয়েকে ঝি-গিরি করিয়ে আশা মিটেছে কিনা। এই গরমে নরকের আগুন সামনে নিয়ে বসে আছি—তুমি কী বুঝবে?

সত্য আপোষের সুরে বলল, ভালো ঝি যে কোথাও পাচ্ছি নে। রাণীচকের মত জায়গায় আজকাল ঝি মেলে না—কী অবস্থা হল দেশে। আশ্চর্য! যদি বা মেলে, মাইনে শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

ওদিকে ঘণ্টিবাজার বিরাম নেই। লীলা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল। সেই সময় একবার মুখ ফিরিয়ে সে দেখল, সত্য ফের চিৎ হয়েছে। পাদুটো আঁকশি করে নাচাচ্ছে। পাখাটা মৃদু-মৃদু ঠুকছে বুকে। ভালুকের মত রোমে ভরতি ওর বুক। আলসেমির যত উৎস, সব যেন ওখানেই—ওইরকম রোমের আড়ালে একটা অদ্ভুত রাক্ষুসে জানোয়ার যেন লুকিয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে এ আবছা ভয়ে গা ছমছম করে তার।

লীলা অগত্যা উঠোনে নামল। গজগজ করছিল সে। আমারই যত দায়! এটা যে ভদ্রলোকের বাড়ি, সে প্রমাণ আমাকেই দিতে হবে। কী ভাগ্যি আমার!

আজ হয়ত অত্যধিক গরমের জন্যেই লীলার মত শান্ত মেয়ে চটে লাল হয়ে গেছে। সত্য গরমকেই দোষারোপ করল মনে মনে। অবশ্যি লীলা কিছুটা জেদীও বটে। বেশি চটানো ঠিক নয়। বাইরে কেউ এসেছে, সাইকেল চেপেই এসেছে—সেটা লীলাই সামলে নিক। সত্যর কিছু করতে ইচ্ছে করে না। তবে একথা সত্যি, বেচারাকে একটা ঝি এনে দেওয়া খুবই দরকার। বিয়ের পর আজ দুবছর ধরে সেটা আর হয়ে ওঠে না। এটা কি সত্যর চিরাচরিত আলসেমি?...ঝি-এর কথা মনে পড়লে, সত্য ভাবে—বড়লোকের ঘরের একমাত্র মেয়ে, বংশের সলতে। কুড়ি বছর তোমার কেটে গেছে শুকনো হাতে-পায়ে। এবার কিছুদিন কষ্ট করতেই বা দোষ কী?...এ যেন শাস্তি দেওয়া একরকম। অথচ লীলা তো কোন দোষ করেনি সত্যর কাছে। ওর মায়ের অগাধ টাকা থাকাটাই কি ওর দোষ? নাঃ, তাও নয়। তবে কি ওর চেহারা? তাই বা কেন হবে? যৌবনে পুরুষমানুষ যুবতীদের স্বভাবত ভালবাসে। তাদের জন্যে রাক্ষসের পেটে যেতেও তার আপত্তি নেই। আর লীলার মত সুন্দরী এলাকার অন্য কারুর ঘরে বৌ হয়ে আছে বলে সত্যর জানা নেই। তাকে কেন সে কষ্ট দিতে চাইবে? এ তো দামী জিনিসের মত আলমারীতে রাখবার সাধ যায়। পাছে ভাঁজ ভেঙে যাবে বলে ধোওয়া জামা পরতে গিয়ে সত্য যেমন বলে, থাক্, গায়েরটা বিশেষ ময়লা হয়নি। লীলা এটা কুঁড়েমি বলে জানে।

শেষ অব্দি সত্য ধরে নিয়েছে, সে প্রকৃতপক্ষে একজন পাঁড় অলস। ভয়ংকর গোঁফখেজুরে। আজ বলে নয়, জীবনের আটাশটা বছর তার হাইপাশ ভাবতে-ভাবতে

কেটেছে। না, সে নিস্পৃহ নয়, নিরাসক্ত নয়। জীবনকে আশ মিটিয়ে ভোগ করতে সে চায়। আহারে তার প্রচুর নিষ্ঠা—যার দরুণ লীলা পঞ্চাশব্যঞ্জন রান্না করেও কূল পায় না। নৈশ শয্যায় এই লীলা সহস্র হলেও সে তুষ্ট নয়। তাই না লীলা ওকে বলে, ওদিকে তো রাক্ষুসে গ্রাস দেখে ভয় করে! একেই পাড়াগেঁয়ে কথায় বলে, 'কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে।' সত্য কদাচিৎ দাড়ি কামায় এবং সেই খোঁচাখোঁচা দাড়িগোঁফ চুলকে বলে, আমি একটা পাগলছাগল মানুষ, ছেড়ে দাও আমার কথা।

পাগল? যে বলে সে পাগল নয়—মহা ধড়িবাজ শয়তান।

সত্য মুখটা একবার ফিরিয়েছে ততক্ষণে। কারণ, ঘন্টাটা আর বাজছে না। এবং লীলার অনুচ্চকণ্ঠে আলাপ শুনতে পেয়েছে সে। ব্যাপার কী? কে এল দুপুরবেলা তেতেপুড়ে—এমনদিনে রোদ মাথায় নিয়ে সাইকেল ঠেলেছে, তার উৎসাহ বড় কম নয়! ওদিকে লীলাও যেন একটা চাপা উৎসাহে চনমন করছে। কে এল রে বাবা!

প্রথমে সাইকেলের চাকা, হ্যান্ডেলে রিস্টওয়াচপরা একটা হাত, দরজার ভিতর এগিয়ে এল। পরক্ষণেই সুখেনের রোদপোড়া গনগনে লাল মুখটা ভেসে উঠল কবাটের ফাঁকে। লীলা মাথায় একটু কাপড় টেনে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে। সত্য শুয়ে থেকেই বলল, আয়।

লীলা টিউবেলের পাশে পেয়ারাতলায় সাইকেলটা রাখতে বলে উঠে এল। চাপা গলায় বলল, এবার উঠবে, না কী? তারপর রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

সত্য ওঠার আগেই সুখেন চলে এসেছে। কীরে সতু, খুব যে গরজ দেখাচ্ছিস মনে হচ্ছে। গায়ে পড়ে এলাম বলে?

সত্য এবার লাফিয়ে উঠে ওকে জড়িয়ে

ধরল। আয়, বোস। এই গরমে কিচ্ছু ভালো লাগে না রে, চুপচাপ পড়ে আছি। শালা, কী গরম না পড়েছে ভাই...যাক্‌গে, আজ দুবছর ধরে তোমাকে খোশামোদ করে আসছি, অ্যাদ্দিনে সময় হল আসবার?

লীলা বালতি হাতে টিউবেলের দিকে যাচ্ছিল। সুখেন তাকে শুনিয়ে বলল, দ্যাখ্ সতু—বিয়ে করেছিলি, তখন তো একবারটিও খবর পাইনি—নেমন্তন্ন করা তো দূরের কথা। কেন আসব, বল্?

সত্য হেসে বলল, এখন যে এলি।

এলাম...সুখেনও একটু হেসে লীলাকে লক্ষ্য করে বলল, এলাম তোর সহধর্মিণীর আমন্ত্রণে। উনি না বললে, বিশ্বাস কর, কিছুতেই আসতাম না। তা সেদিন, এলি কিসে? অত রাতে বাস পেয়েছিলি?

লীলা কলতলায় বালতিটা রেখে যেন কথা শুনছিল। বলল, বাস পাবো কী! লাস্ট টিপ ছাড়ে এগারোটায়। আপনার ওখানে থেকে উঠলাম, তখন তো বারোটা বাজে।

সুখেন চমকে উঠে বলল, সর্বনাশ! বাস নেই জানলে তো ছেড়ে দিতাম না!

সত্য বলল, থাকতে দিতিস কোথায়? তোর ওই প্রেসঘরে? রক্ষে করো বাবা, এই গরমে......

সুখেন বলল, ফ্যান আছে। গরম লাগত না।

লীলা টিউবেলের হাতল থামিয়ে বলল, শঙ্করজ্যাঠার ওখানে যেতে বলেছিলাম। ও গেল না। তবে রিকশোয় দশ মাইল পথ রাত্রিবেলা বেশ ভালোই লেগেছিল! ওতো ঘুমোতে-ঘুমোতে এসেছে।

সুখেন চিমটি কেটে ফিসফিসিয়ে বলল, বাঃ, বৌর কোলে শুয়ে এলি তাহলে? কী কপাল রে!

সত্য জবাব দিল না। হঠাৎ সে সুখেনের মুখটা দেখছিল শান্ত চোখে। সুখেনের স্বাস্থ্যটা কিছুদিন থেকে ভালো দেখাচ্ছে। হয়ত প্রেস কেনবার পর থেকে সুখেন এতদিনে একটা মাটি পেয়েছে। ছিল অবশ্য একজন কম্পোজিটার—এখন নিজেই প্রেস কিনে মালিক হয়ে বসেছে। অবশ্য তার জন্যে দুহাজার টাকা দিতে হয়েছে সত্যকে। লীলাকে লুকিয়ে সত্য এটা দিয়েছিল।

লীলা বারান্দায় জলভরা বালতি রেখে বলল, নিন, হাতমুখ ধুয়ে ফেলুন। নাকি চান করবেন? সুখেন ভ্রূ কুঁচকে বলল, ওকি! আপনাকেই বুঝি সব করাচ্ছে সতুটা! তারপর সত্যর চিবুকে একটা মৃদু টোকা মেরে ফের বলল, এই যাঃ, মাইরি তুই ভীষণ বাজে। বেচারাকে একেবারে ঘানিতে জুড়ে রেখেছিস নাকি রে! ছিঃ!

সত্য জিভ কেটে বলল, নাঃ। তুই অতিথি মানুষ। আমরা গেরস্থ। আমাদের বাড়ির মেয়েরাই এসব করে-টরে। তাছাড়া তুই জানিস নে, চুল দিয়ে অতিথির ভিজে পা মুছিয়ে দিতেও ওরা পারে।

লীলা কটাক্ষ হেনে মুখ ফেরাল। তারপর ঘরে ঢুকল। কাপড়টা বদলাতে গেল সে। শহুরে মানুষের সামনে নিজেকে হঠাৎ তার খুব হতশ্রী লাগছিল যেন।

ওরা দুজনে সিগ্রেট ধরিয়েছে। সত্য হুস হুস করে খানিকটা ধুঁয়ো ছেড়ে বলল, সিগ্রেট আমার পোষায় না, বিড়িই ভালো। তা হ্যাঁ রে সুখেন, এবার নিজের হিল্লে তো বেশ একটা করে ফেললি। আমার একটা কিছু জুটিয়ে দেতো! মাইরি, বসে থেকে-থেকে শরীরে ঘুন ধরে যাচ্ছে একেবারে!

তুই আর কী করবি? কদিন বাদেই তো বাবা অঢেল সম্পত্তির মালিক হচ্ছ। তোমার এত ভাবনা কেন?

নারে। সে তো বৌ পাবে সব। আমার কী?

সুখেন ওর পিঠে থাপ্পড় মারল।...... শালা যখ!

তোর দিব্যি। দে না কিছু করে-টরে।

সত্যি বলছিস?

আমার চোখের দিব্যি, বিশ্বাস কর।

একটু যেন ভাবল সুখেন। তারপর বলল, প্রেস নিয়ে আমি ঝামেলায় পড়েছি। একা মানুষ, কোনদিক সামলাই! তেমন বিশ্বাসী কাকেও পাচ্ছিনে যে পুরোদমে কাজ চালাব। তা তুই যদি কিছু মনে না করিস, থাকবি আমার সঙ্গে?

সত্য ওর হাতটা লুফে নিয়ে বলল, আলবাৎ থাকব। তবে মাইনে দিবি কত?

সুখেন হাসল। মাইনে কেন? তুই পার্টনার হিসেবে থাকবি।

আমার অত টাকাকড়ি নেই রে ভাই।

লীলা আলোচনাটা শুনছিল ঘরে দাঁড়িয়ে। শুনতে শুনতে আয়নার সামনে তার চিরুনীধরা হাতটা থেমে যাচ্ছিল বার-বার। এবার দরজায় উঁকি মেরে সে বলল, টাকার ভাবনা তোমার নেই। সে আমি দেখব'খন।

দুজনে হো হো করে হেসে উঠল। সুখেন বলল, বাস, আর কী চাই! শীগগীর তুই একদিন গিয়ে দেখা কর। চাই কি প্রেসের নামও বদলে দেব...

কী নাম দিবি শুনি?

সুখেন ঘরের দিকে কটাক্ষ করে জবাব দিল, লীলা প্রেস। কেমন হবে?

ঘরের ভিতর লুকিয়ে মুখে স্নো একটু পাউডার ঘসে নিচ্ছিল লীলা,—বড্ড অসময় যদিও, স্নান করা বাকি আছে, খাওয়া হয়নি, রান্না আবার চাপবে আরও দুএক পদ—তা সত্ত্বেও তার হাতে এক অসচেতন বিহ্বলতা খেলা করছিল। সিনেমা দেখতে গিয়ে সে রাতে সুখেনের প্রেসে বসে যা সব আলাপ হয়েছিল, অবিকল বাজছে—যেন দূরে মৃদু প্রতিধ্বনি। 'লীলা প্রেস' সে প্রতিধ্বনিকে আরও প্রসারিত করছিল। লীলার জীবনের উপর মুদ্রিত হচ্ছিল অজস্র কথা—যা সে পড়তে পারছে না।

বেরোল যখন, সত্য লক্ষ্য করল কিনা কে জানে, লীলার চোখ সুখেনের চোখে পড়ল। সুখেনের চাহনিতে একটা দুষ্টুমি ঝিলিক দিচ্ছিল—চোখের ভুলও হতে পারে। লীলা রান্নাঘরের দিকে ফিরতেই শুনল, সত্য চেঁচিয়ে উঠেছে সোল্লাসে।...আরে বাঃ বাঃ! ও লীলা, কী সব এনেছে দেখ তোমার জন্যে?

লীলা অবাক হয়ে গেল। এমন সুন্দর জিনিস অনেক দেখেছে বা ভোগ করেছে। কিন্তু এর মধ্যে কী একটা ছিল। খুব নতুন কিছু। ব্যাগ থেকে সুখেন প্যাকেটগুলো খুলে তক্তাপোষে রাখছে। শাড়ি, ব্লাউস, প্রসাধনী...একরাশ জিনিসপত্তর। সে ডাকছিল, বৌদি, দয়া করে এদিকে আসবেন একবারটি?

ওর হাতে একটা সোনার দুল ঝকমক করছে। ঠিক প্রজাপতির আকৃতি। লীলা সলজ্জ হেসে এগিয়ে এল। বলল, এই স্মা! এসব কী এনেছেন! কেন আনলেন?

সুখেন মিষ্টি হাসল। বিয়েতে তো খচ্চরটা নেমন্তন্ন করেনি। এগুলো আপনার পাওনা ছিল বৌদি।

সত্য ধমক দিল, বৌদি কিরে ব্যাটা? তুই তো আমার চেয়ে বয়সে বড়। তাছাড়া বারবার বিয়ের খোঁটা দিচ্ছিস, ওকে জিগ্যেস কর, হঠাৎ রাতারাতি বিয়ে এসে কাঁধে পড়লে কোনদিক সামলাই। তোকে তো হাজার দিন সব কৈফিয়ৎ দিয়েছি বাবা, আবার কেন ওকথা?

সত্য আজ কেমন প্রগলভ হয়ে উঠেছে যেন। ভীষণ বাকপটু মনে হচ্ছে। লীলার একটু অবাক লাগল। সে দুলটা হাতে নিতে সংকোচ বোধ করছিল। কিন্তু সুখেন এত বেপরোয়া—নাকি কিছুটা বেহায়াও, নিঃসংকোচে বলে উঠল, আমি কিন্তু নিজের হাতে পরিয়ে দোব। এই সতু, তুই চোখ বুঁজে থাক্।

সুখেনটা এমনিই। সত্য জানে। সত্য চোখ বুঁজে বলল, ঠিক আছে বাবা, যা খুশী কর। বৌদি থেকে 'দি'টা তো বাদ দিতেও বলছি!

লীলা হেসেছে—তারপর চোখ বুঁজেছে। সুখেনের হাতটা অসম্ভব গরম—অথবা প্রচন্ড ঠান্ডা, সে বুঝতে পারছে না। তার গালে অপরিচিত আঙুলের স্পর্শ—একটা নতুন স্বাদ। আর সে স্বাদ যেন...যেন বা বন্যার জলের মত—কিছুটা আঁশটে গন্ধে ভরা, হয়ত বা তেমনি ঘোলাটে, স্রোত আর ঘূ[illegible]ংকুল জলোচ্ছ্বাসের সে সর্বনাশা স্পর্[illegible] বন্যার দেশ রূপপুরের মেয়ে লীলার অচেনা নয়। কেবল রূপটাই তার এখন আলাদা। অচেনা লাগে।

সত্য অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। মুখটা তার শুয়ারের মত উঁচু হয়ে শ্বাস টানছিল।

(২)

তারপর সারাটি দিন যেন স্বপ্নের মধ্যে কেটে গিয়েছিল। প্রথম রাত্রিটা লীলা পাশের ঘরে একা অনিদ্রায় কাটাল। দ্বিতীয় রাত্রে পীচেঢাকা পথের উপর এসে লীলার মনে হচ্ছিল, সামনে প্রকৃতই বন্যার সর্বনাশা জলকল্লোল। মাটি থেকে গাছের মত উপড়ে যাবে সে। ভেসে যাবে কোথায়। এমন সাংঘাতিক টান নিয়ে এই নবীন স্রোত তাকে ঘরছাড়া করে ফেলল।

ছেলেবেলায় অনেক বন্যা সে দেখেছে। বাড়ির উঠোনেও কতবার জল উঠেছে। সে জল খুব ঘোলাটে। বড় আঁশটে গন্ধ আর কটু স্বাদ সে জলে। লীলা জানে। বন্যা তার খুবই পরিচিত। তাকে ভয় করতে শেখেনি। বরং ভালবাসতেই শিখেছিল। আকাশ কালো করে মেঘ এলে সে খুশী হত। বৃষ্টি পড়লে জানতে চাইত, এবার তেমনি করে উঠোনে জল আসবে কিনা। কিশোরী লীলা গ্রামের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সত্যি সত্যি সব-ভাসানো জলের আশায় অপেক্ষা করত। ভাসবে। সাঁতার কাটবে। মরার ভয় করবে না। আর তার এই মারাত্মক আকাঙ্ক্ষা দেখে গ্রামের লোকেরা বলত, বড়-লোকের মেয়ে কিনা—সব কিছুই সাজে। পৃথিবী ভাসলেও ওর কী আসে যায়!

ভাসলে লীলার কিছু আসে-যায় না। সে তো ভাসতেই ভালবাসে। তাই মধ্যরাতের ঘুমন্ত পৃথিবীতে বুকে ঘোলাটে জলের কটু স্বাদ আর গন্ধ নিতে চুপিচুপি চলে এসেছিল ঘর থেকে।

অন্ধকারে সুখেনের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না সে। ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের গরম ঝাপটা লাগছিল মুখে। সারা শরীরে বন্যার স্বাদ নিচ্ছিল লীলা। বাইশ বছর বয়সে নিজের এই নতুন সাহসের প্রতি অবাক হচ্ছিল সে। ঘরে সত্যচরণ একা শুয়ে আছে। সুখেন কখন তার পাশ থেকে উঠে গেছে। বাড়ির পিছনে ঘুরে গিয়ে লীলার মাথার কাছে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছে। জানালাটা খুলেই শুয়েছিল লীলা। এই গ্রীষ্মে জানালা খুলে না রেখে উপায় নেই। হঠাৎ চুলে টান পড়তেই সে চমকে উঠেছিল। ভয়ে চিৎকার করে বসত—ভাগ্যিস সুখেন সংগে সংগে ফিসফিসিয়ে ওঠে—আমি, আমি সুখেন! লীলার হাসি সুখেন দেখেনি। সে নীরবতা দিয়ে প্রশ্ন করছিল, কেন—সুখেন যেন তা বুঝেছিল। ফের ফিসফিস করে বলেছিল, বাইরে আসুন, কথা আছে।

চুপিচুপি চলে এসেছিল লীলা। আর সুখেন তার হাত ধরে সামনে একটুকরো পোড়োজমি পেরিয়ে রাস্তায় নিয়ে গেল। তারপর যত দ্রুত বলা সম্ভব, অনেক—অনেক কথা বলছিল। যেন নিশির ডাকে ঘরছাড়া মানুষ কোথায় এসে দাঁড়িয়ে আছে! কোন কথা বোঝে না। শুধু কল্লোল শোনে।

ওর পরণে তখনও সুখেনের উপহারের শাড়ি আর—ব্রেসিয়ারটাও। গরমের জন্যে

ব্লাউস মাথার কাছে খুলে রেখেছিল। মুখে সুখেনেরই দেওয়া স্নো-পাউডারের গন্ধ, চুলে ফুলের গন্ধ—সুখেন যা সব দিয়েছে। যদিও বিয়ের দুবছর পরে হঠাৎ এসে এই-সব সুন্দর উপহার—বাসি বাসি লাগে, তবু দেওয়ার মানুষটির মধ্যে কী একটা ছিল, নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা যায়। এমনকি সত্যও বন্ধুর ওপর বেশ খুশী হয়েছে মনে হয়।

লীলা আঁশটে গন্ধেভরা ঘোলাটে জলে ভাসছিল। কিন্তু ভয় নয়, নিজের এই নির্বিকার আত্মসমর্পণটা লক্ষ্য করেই সে চমকে উঠছিল বারবার। যেন তার কিছু করার নেই, হঠাৎ সে স্রোতের মুখে দারুণ অসহায় হয়ে পড়েছে।

সুখেন আস্তে আস্তে তার কোমরটা ধরে শূন্যে তুলেছিল। উন্মূল গাছের মত—তাই নিঃশব্দ আর মৌন, হাইওয়ের ওপাশের নয়ানজুলির পাশে গিয়ে লীলা দেখল, সে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। গ্রীষ্মের শুকনো খসখসে ঘাস আর পাথরকুচিতে তার পিঠ থেঁৎলে যাচ্ছিল। মুখের উপর নক্ষত্র ঢেকে অন্ধকার নামছিল।

নাঃ, সে রাতে এতখানি হবে, লীলা কল্পনাও করেনি। মাত্র দু'একটা দিন বন্ধুর বাড়ি এসে বন্ধুর বৌকে এমন নিঃসঙ্কোচে দাবী জানাতে পারবে, লীলা সে-সাহসের এতটুকু চিহ্ন সুখেনের মুখে দেখেনি। সত্য বন্ধুর আপ্যায়নে রাণীচকের বাজার তোলপাড় করে ফেলছে, সেই অবসরে কত কী অবাক কান্ড ঘটে গেল। রূপকথার রাজপুত্রকে সামনে দেখলেও লীলা এমন করে ছুটে যেত না! কী একটা আছে সুখেনের চেহারায়। কিছু আছে। জীবনের বাইশটে বছর যেন অনেকখানি আশ্বাসে প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

একটু পরেই ওরা উঠে এল। স্যাঁতসেঁতে গায়ে জীবজগতের অন্ধকার ছোপ ফেলেছিল। একটু গা ঘিনঘিন না করে পারে না। হাড়মাংস থেঁৎলে গেছে মনে হচ্ছিল লীলার। এক আশ্চর্য জবরভাব নিয়ে সে ফিরে আসছিল। বুক ধকধক করছিল।

চলে আসতে-আসতে রাস্তার ওপর হঠাৎ কার টর্চ জ্বলে উঠেছিল। একঝলক আলোয় সুখেন ওখানে একা থমকে দাঁড়িয়েছিল। হয়ত কোন রোঁদের পুলিশ। হাইওয়েতে আজকাল রাতের দিকে ওরা ঘুরে বেড়ায়। পলকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত আগাছাভরা পোড়ো জমি পেরিয়ে এল লীলা।

খিড়কির ঘাট হয়ে আসতে লীলা একটু দেরী করেছিল। উঠোনে পা দিয়েই অন্ধকারে তার চোখ পড়েছিল বাইরের ঘরের দিকে। এদিকের দরজাটা যেন খোলা আছে। সত্য কি দরজা খোলা রেখে ঘুমোচ্ছিল?

দ্রুত দরজা ঠেলে—বেশ নিঃশব্দে, লীলা গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। তারপর বাইরের দিকে সত্য আর সুখেনের গলা শুনে সে উঠেছিল ফের। দরজাটা আটকে দিয়েছিল। দাঁতে দাঁত চেপে সে প্রতি মুহূর্তে প্রতীক্ষা করছিল, যেন বা কোথাও কোন বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

(৩)

কিন্তু ঘটে নি। ঘটল না। গ্রীষ্ম গেল বর্ষা এল। এতদিনে বৃষ্টি এল মরশুমী হাওয়ায় ভেসে। সবুজ হতে থাকল ঘাস গাছ মাঠ। হাইওয়ের দিকে তাকিয়ে লীলা ফের সুখেনের প্রতীক্ষা করছিল। সুখেনের অবশ্য আর আসবার কথা না—এতদিনে সত্যরই যাওয়া উচিত ছিল—যায়নি। তবু লীলা সাহস পায় নি, ওকে যেতে বলার। সত্য ক্রমশ কেমন ঝিম মেরে যাচ্ছে। রুগ্ন গাছের মত। কেন?

লীলা বুঝতে পারছিল না। সত্যর আচরণে লীলাকে ধরে ফেলার কোন আভাস তো দেখা যাচ্ছে না!

সেদিন সত্য ঘরে ছিল না। কোথায় বেরিয়েছিল ভোরবেলা—বলে যায়নি। দুপুর হয়ে এসেছিল, তবু তার ফেরার নাম নেই। লীলা সবে স্নান করে চুলে চিরুণী চালিয়ে জল ঝাড়ছে, বাইরে সাইকেলের ঘণ্টি। বুক ধড়াস করে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু না, এবার সুখেন নয়—তার চিঠি।

ছাপাখানার লোক বলেই বুঝি এমন ঝকঝকে হরফে লিখতে পারে। আর লিখেছেও এত গুছিয়ে—লীলার বুঝতে আদৌ কষ্ট হল না। কবে প্রাইমারী পাস করেছিল, তারপর লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক খুবই কম। তবু চিঠি বলে কথা! ওটা মেয়েদের জন্মগত ক্ষমতা।

সুখেন লিখেছে : যদ্দুর জানি, এখনও রাণীচকের ধারে কাছে কোন কারখানা খোলেনি। তবু তুমি এলে না তো? ব্যাপার কী? এদিকে এই হ্যাঙ্গামা নিয়ে বসে আছি। বিশ্বাসী একজন লোক খুব দরকার। অর্ডার খুঁজে বেড়াবো, না ছাপাখানা দেখবো? পত্রপাঠ চলে এসো।

শেষে এক লাইন মিষ্টি কথা : লীলা বৌদি কেমন আছে? তার আদরযত্ন ভুলতে পারি না।

লীলার চোখে জল এসে গেল। কথাটার কত কী যে মানে হয়, জানে শুধু দুজন। পৃথিবীতে আর কেউ এখনও টের পায় নি। গোপন ক্ষতের উপর কোত্থেকে যেন এক চকিত ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ, জুড়িয়ে গেল।

চিঠিটা বারবার পড়ে এক সময় লীলার ধ্যান ভাঙল। সত্য এসে গেছে। সাইকেলটা উঠোনে লেবুগাছে ঠেস দিয়ে রাখছে।

লীলা চিঠিটা নিয়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে। বলল, তোমার বন্ধুর চিঠি। এবার আর না করো না। আজই একবার যাও—আমার দিব্যি। তোমার টাকার জন্যে ভাবতে হবে না।

সত্য হাসিমুখে পড়ল চিঠি। তারপর বলল, কিন্তু আমার এদিকে গেরো বাধল যে।

কিসের গেরো?

হাটুবাবু একটা বোন মিল করবেন। আমাকে রাজ্যের ভাগাড় থেকে হাড় [illegible]াড় করে দিতে হবে।

লীলা ঘেন্নায় নাক কুঁচকে বলল, ছিঃ, ও তো মুদ্দোফরাসের কাজ!

সত্য খিকখিক করে হেসে বলল, আমি ওসব ভালই পারি। সীসের হরফ ছুঁলে বিষ ছোঁওয়া হয়। তার চেয়ে……

লীলা নিভে গিয়ে বলল, তাহলে ও বেচারা কী করবে?

সত্য বৌর মুখটা যেন খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলল, ওর কাছে একবার যাবো অবশ্য। একটা মতলব খেলেছে মাথায়।

রুদ্ধশ্বাসে লীলা প্রশ্ন করল, কী মতলব?

সত্য গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কাজকর্মের আলোচনায় এ গাম্ভীর্য তার হয়ত স্বাভাবিক, লীলার তা মনে হয়েছে। সে বলল, আচ্ছা লীলা, ওকে যদি বলি, প্রেসটা এখানেই নিয়ে আসতে! রাণীচকের এদিকেও তো আজকাল অনেক ছাপার

কাজের দরকার হয়। একচেটিয়া সুখেনই করবে সব। বাস রিকশোয় ভাড়া দিয়ে লোকে কেন যাবে বহরমপুর—হাতের কাছে যদি ছাপাখানা থাকে? কী বলো তুমি?

উত্তেজনা চাপা রেখে লীলা জবাব দিল, খুব ভালো হবে।

কিছুক্ষণ পরে সত্য খিড়কির ঘাটে গিয়ে একলা নিঃশব্দে হেসেছে আর পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে ব্যাঙ মারতে চেষ্টা করেছে। সীসের হরফে বিষ আছে। সুখেনের অন্ত্র-ক্ষত হতে কত দেরী? সত্য নিরাপদে হাড়ই ছোঁবে। হাড় থেকে সার হবে। উদ্ভিদ আর প্রাণীজগত খেয়ে পরে বাঁচবে। সত্য বাঁচতে ভালবাসে। বেশি করেই ভালবাসে।

(৪)

সত্য যাই বলুক, সুখেন হয়ত আসবে না শহর ছেড়ে। অত সভ্যভব্য ছিমছাম মানুষ; ধুলো কাদা মাড়াবার ভয়ে যারা পথের কিনারা ঘেঁষে পথ হাঁটে, জুতোশুদ্ধ পা ঠুকে ধুলোবালি ঝাড়া অভ্যেস যাদের, তারা ময়লা হবার জন্যে গ্রামে আসতে চাইবে কি? লীলার অবাক লেগেছিল, পুরুষের গাল মেয়েদের গালের মত অমন চিকণ অমন তুলতুলে হয় কী করে? সত্যর গাল যেমন ময়লা, তেমনি শক্ত—সব সময় তেলতেলে হয়ে থাকে। কিন্তু সুখেন যেন আদৌ ঘামে না। আর সত্যর বুকটা চওড়া হলে কী হবে, আস্ত ভালুকের মত রোমে ভরতি। সুখেনের বুক এত পরিষ্কার! সত্যর মত আত্মগোপন করে সে থাকে না। সূর্যের আলোর মত সহজ সুখেন। আর সত্য যেন একটা অন্ধকার রাত্রি—অভিসন্ধি আর ষড়যন্ত্রে ভরা।

পরদিন সত্য সাইকেল চেপে শহরে চলে গেলে সে অস্থির হয়ে ঘরবার করছিল সারাটি দিন। কেবল ঘুরে ফিরে দুটি মানুষের তুলনা করছিল সে।

সত্য ফিরেছিল বেশ রাত করে। দারুণ ভিজেছে বৃষ্টিতে। বাসে যাওয়াই উচিত ছিল [illegible] সুখবর এনেছে শেষ অব্দি। সুখেন নাকি আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে বলেছে! তবে খুব তাড়াতাড়ি পারবে না—কিছুদিন গুছিয়ে নিতে হবে। তারপর পাড়ি দেবে রাণীচক। সত্যকে এখন তার ভীষণ দরকার। সত্য জানাল।

মুখ টিপে লীলা হাসল। সত্যর ভেজা জামা নিঙড়ে শুকোতে দিচ্ছিল বারান্দার তারে। বলল, কিন্তু কাদা মাখতে পারবেন তো সুখেনবাবু?

সত্য থুথু ফেলে বলল, কাদা কোথায়? বাজারের ওদিকেও তো পীচ পড়েছে রাস্তায়। সন্টুবাবুর আড়তের পাশে একটা বড় ঘর খালি পড়ে আছে। ও ঘরটার জন্যেই কথা বলব, ভাবছি। ওখানে ইলেকট্রিকও পাওয়া যাবে।

সত্যচরণ সত্যি সত্যি নিতান্ত ভাল-মানুষ। লীলা উত্তেজনা দাঁত দিয়ে চাপল। তারপর বলল, জানো—অবেলায় বৃষ্টি বাড়লে ভেবেছিলাম, আজ আর ফিরছ না তুমি। থেকে যাবে বন্ধুর বাড়ি। তখন আমার রাত কাটানো সে এক জ্বালা হয়ে যেত। উঃ মাগো!

লীলা চোখ বুজে শিউরোল।

দেখে সত্য বলল, সুখেনের বাড়ি বলতে কিছু আছে নাকি? ও চিরকালই চালচুলো-ছাড়া ছেলে। আমায় আজ সব বলেছে ওর কথা। এর-ওর বাড়ি থেকে-টেকে এত বড়টি হয়েছে। আমার সঙ্গে যখন আলাপ, তখন ও সবে কম্পোজিটারের কাজ শিখছে। প্রেসেই শুয়ে থাকে বিছানাপত্তর নিয়ে। শেষে একদিন কিছু টাইপ চুরি গেলে ওর কাঁধেই দোষ পড়ল। তখন গিয়ে জুটেছিল একটা রেডিওর দোকানে। আশ্চর্যের কথা, সেখানেও একই ব্যাপার ঘটেছিল।

লীলা চমকে উঠে বলল, চুরি?

সত্য বিড়ি জ্বালাচ্ছিল। মুখ তুলতেই কাঠিটা নিভে গেল। ফের না জ্বেলে সে জবাব দিল,—হ্যাঁ চুরি। যাই হোক, সেখান থেকে আরেক জায়গা...এমনি করে এতদিনে একটা মাটি পেয়েছে বেচারা। সত্যি, ওকে চোর ভাবা অসম্ভব। ও খুবই সৎ ছেলে। তোমার কী মনে হয়?

লীলা কোন মন্তব্য করল না। তার মনটা হঠাৎ স্যাঁতসেতে হয়ে উঠেছিল কী কারণে।

সত্য বলতে থাকল। ...আর তাছাড়া ভীষণ উদ্যমী। খাটতে পারে গাধার মত। বাপস্, অমন হলে আমি তো এক মহাজন হয়ে উঠতাম এ্যাদ্দিনে। কারণ, ওর যা ছিল না বা নেই, আমার তা আছে।

আনমনে লীলা বলল, কী আছে তোমার?

মিষ্টি হাসল সত্য। বলল, তোমার মত বৌ আর শ্বাশুড়ির অঢেল সম্পত্তি।

থামো, খুব হয়েছে।

সে রাতে ঘুম হল না লীলার। আর অনেকদিন পরে সত্যকে যেন ছুঁতে পেয়েছিল। তার অজস্র আদর আর অত্যাচারের সামনে লীলা আজ কাঠ হয়ে পড়ে থাকল না। সাড়া দিল। যেন ভয়াল বন্যার পর ওপড়ানো গাছের মত একটা কিছু আঁকড়াতে চাচ্ছিল প্রাণপণে। মূল বিস্তারের জন্যে যে কোন একটা মাটি খুঁজছিল। সে মাটি যত পচা হোক।

খুব ভোরে উঠে সত্য যখন কোথায় বেরিয়ে গেছে, লীলা পটের ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলেছিল, ও আর যাই হোক, যেন চোরছ্যাঁচড় না হয় ঠাকুর।

স্নান করতে অনেকটা সময় নিল সে। পরিপাটি সাজল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। ওদিকে বৃষ্টি ঝরার বিরাম নেই সারা দুপুর। আকাশের মেঘে যেমন অকৃপণ অনাবিল দানের আয়োজন, লীলাও তেমনি একটা আয়োজনের মাঝে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে চাচ্ছিল। সেই সময় ভিজতে ভিজতে সত্য ফিরল।

সত্য একটা খবর এনেছিল সঙ্গে। গত রাতে লীলার মা মারা গেছে।

(ক্রমশঃ)

আঃ ছাড়ুন!

পাখির মতো ছটফট করে ওঠে সে। প্রাণপণে ঠেলে ফেলতে চায় বিশাল পাহাড়টা। দম বন্ধ হয়ে আসে। ঘামে ভিজে যায় শরীরটা। লড়াই চলে। বন্য মহিষের সংগে পাল্লা দেওয়া আর সম্ভব হয় না। ভয়ংকর হিংস্র হয়ে উঠেছে অমলেন্দু। সমস্ত স্নায়ু যেন ওর তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। বলিষ্ঠ বাহুর টান থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারে না শমিতা। শেষ পর্যন্ত হাঁপাতে লাগল। ঘন ঘন শ্বাস। এক আত্মঘাতী অবসাদ নেমে এল। অবশেষে শমিতা নিজেকে নিঃশর্তে ছেড়ে
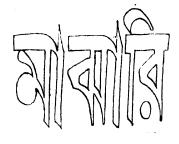
দিয়ে অমলেন্দুর বলিষ্ঠ বুকের মধ্যে মিশে যায়। জমাট কুয়াশায় ওরা ঢাকা পড়ে।

একটা দারুণ ঝড় বয়ে গেল। তছনছ হয়ে গেল সমস্ত ভাবনাচিন্তা। বুকের মধ্যে পুষে রাখা এতদিনকার পোশাক কোথায় তলিয়ে গেল। হারিয়ে গেল অমলেন্দুর ধবধবে মুখখানা। কে যেন ওখানে রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছে। কপালের

গনেশ বসু

শিরাগুলো দপ্ দপ্ করছে কি এক উত্তেজনায়। জ্বরের মতো একটা দাহে ও যেন পুড়ে যেতে চাইছে। অমলেন্দুর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোচ্ছে।

অনন্ত অন্ধকার। মনে হল একটা ঘোরানো সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। ভয়ংকর নিচে। গল গল করে ঘামছে শমিতা। অসহায়ের মতো আঁকড়ে ধরতে চাইল। বিপ্রস্ত শমিতা এবার অতল খাদে নামছে। নামছে......

নিয়তির মতো কে যেন ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

কিছুতেই ভুলতে পারছে না। সে অপমানের জ্বালা ওর শরীরের কোষে কোষে। ঠোঁটের মধ্যে এখনো তেতো স্বাদ লেগে রয়েছে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না নিজেকে। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। হাত নিসপিস করে। প্রতিটি আঙুলই বাঘনখ হয়ে চিরে ফেঁড়ে ফেলতে চায়।

সব কিছু এক মুহূর্তে বিষাক্ত হয়ে উঠল। দারুণ ক্লান্তি চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। মাথাটা কেমন যেন আচ্ছন্ন। ভারাক্রান্ত। হতমান। এমন শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড়ায়নি অমলেন্দু। অথচ কিছুদিন আগেও কত সহজ ছিল শমিতা। মনে হয়েছিল ওর সমস্তই জানা হয়ে গেছে।

ইচ্ছে করলেই মাতাল হতে পারত অমলেন্দু। তিলে তিলে নিঃশেষ করত জ্যোৎস্নাসমুদ্র। শিরায় শিরায় প্রচন্ড উত্তাপ ছড়িয়ে দিত। নিবিড়তার আনন্দে হারিয়ে যেত। সারা জীবনের আকাঙ্ক্ষা পেতে পারত মুক্তির পথ।

কিন্তু তা সে পারেনি। স্বচ্ছ আয়নাই সে চেয়েছিল। তাই যা তার হাতের মুঠোয় তার উপর দাগ কাটতে মন চায়নি।

রাগে, ক্ষোভে আর ঘৃণায় মন ভরে উঠেছে। নিজের নির্বুদ্ধিতায় প্রবল ধিক্কার জাগল। প্রতিহিংসাও।

—শমিতা, তুমি কি এর প্রতিবাদ করতে পারো না?

—সে সাহস আমার নেই।

—কিন্তু

—আমারি ভুল হয়েছিল।

—এটা আবেগের কথা। আবার বলছি

—না, তা সম্ভব নয়।

—কেন?

—সব প্রশ্নের ঠিক জবাব হয় না।

—প্রশ্ন থাকলে তার উত্তরও একটা থাকে বৈকি।

—দোহাই, আমায় মাপ করুন। ভুল বুঝবেন না।

—বাঃ এরই মধ্যে সংলাপও রপ্ত করে ফেলেছ!

—প্লিজ

—আবার বলছি, ভেবে দ্যাখো শমি

—আমার অক্ষমতাকে—। উফ্ আপনি কি নিষ্ঠুর!

—হ্যাঁ নিষ্ঠুরতাই। তবে কি জানো আমি বুঝি আর

—তা কেন? আপনিও দেখে শুনে বিয়ে-থা করে ফেলবেন।

—তা হয় না। অত সহজভাবে আমি সবকিছু নিতে শিখিনি। আসলে নিজেকে ঠিক তোমার উপযুক্ত করতে পারিনি।

—কিসের?

—তোমার ঐশ্বর্যের, আভিজাত্যের

—আপনি বড্ড ভেঙে পড়েছেন। চলুন—

—গিয়ে কোন লাভ আছে? আচ্ছা, তোমরা কি চাও বলতো? নিরাপদ আশ্রয়? অর্থ, ঐশ্বর্য? শক্তিমান পুরুষ?

—ঠিক জানি না।

—জানি না!

সন্ধ্যে গাঢ় হয়ে এসেছিল। কিছুক্ষণ আগেও ঘন হয়ে বসেছিল দুজনে। অমলেন্দুর বুকের ওপর ওর মাথাটা। মাঝে মাঝে কপালের উপর উড়ে-পড়া চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছে। এক সময় ওর লোমশ বুকের মধ্যে মুখ ঘষতে শুরু করে শমিতা। কি এক প্রচন্ড জ্বালা ছড়িয়ে পড়ে স্নায়ুতে। অজানা আনন্দের উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে অমলেন্দু। বিদ্যুতের শিহরণ খেলে যায় শমিতার শরীরে।

চারপাশে এখন ঘন কুয়াশা। আকাশে চাঁদ নেই। কেমন যেন ভারী ঠেকল বাতাস।

একবার তাকিয়ে নিল চারদিক ওরা।

না ছাদে এখনো কেউ আসেনি।

—জানো ছেলেবেলায় ফুল তুলবার বড়ো নেশা ছিল। দুপুর শেষ হতে না হতেই বাইরে বেরিয়ে পড়তাম। কতদিন বন-বিড়ালের সংগে পাল্লা দিয়ে ছুটেছি। দুপুরের ভুতুড়ে হাওয়ায় শুকনো পাতা মস্ মস্ করত। মাঝে মাঝে একটা প্রিয় কালো জলা জায়গায় যেতাম। হোগলা আর কলমী এখানে মাখামাখি। কিন্তু কেতবন বেশি ভালো লাগত। কত বিকেল যে ওখানে কাটিয়েছি। ফড়িংয়ের পেছনে পেছন ঘুরেছি মাঠে মাঠে। কোনদিন একটার পর একটা ফড়িং ধরেছি ফুলের ওপর থেকে। খুব আলগা করেই অবশ্য। ভয় হত পাছে ডানা খসে যায়।

—আপনি তাহলে

—ঠিক নিষ্ঠুর নই। জানো, সোনালি ফুল আর ফড়িংগুলো দেখতে ঠিক—

—যাঃ ভারি অসভ্য আপনি

—সত্যি বলছি, তুমি যখন কাঁচা হলুদ রঙের শাড়িটা পরো তখন বারবার আমার সেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। মনে হয় তোমাকে ঠিক

—জাপটে ধরি। দলে পিষে—। তাই তো?

বলেই খিল খিল করে হেসে ওঠে শমিতা। হাতের মুঠোর মধ্যে ওর আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করত অমলেন্দু। কি এক অজানা আনন্দে চঞ্চল হত সে।

শমিতা বুঝত। প্রসংগ ঘোরাত। বলত

—আচ্ছা এখনো দেশের কথা ভুলতে পারেন নি?

—কি করে পারব বলো? ওখানকার

মাটিতে যে আমার অস্তিত্ব জড়িয়ে। নদীর জলে দাঁড়ের ছপছপানি, সন্ধ্যেবেলায় মসজিদে আজান—সব কিছুর মধ্যে যে আমি নিজেকে খ‍ুঁজে পাই।

—ঠিক ব‍ুঝতে পারি না আপনাদের

—অনেকটা তোমার মতোই।

—বাঃ রে, আমি আবার কি করলাম

—না, কিছ‍ু নয়। আচ্ছা, বলতো, সত্যি কি তুমি আমায় ভালবাস?

—আপনার কি মনে হয়?

—মাঝে মাঝে ভাবি, তুমি বোধ হয় কাউকেই ভালবাস না। এমন কি নিজেকেও নয়।

—এটা নিছক মনগড়া।

—তবে কেন পালিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছো?

—কার সঙ্গে?

—যদি বলি আমার সঙ্গে।

আবার হেসে উঠল। বড়ো রহস্যময়ী সে হাসি।

আচমকা এমন ব্যবহারে অমলেন্দ‍ু কুঁকড়ে গেল। এরকম বিদ্রূপ সে জীবনে পায়নি। নিজেকে বড়ো ছোট মনে হল। ওর মাঝারিপণা কি সত্যিই উপহাসের বিষয়? ওরা কি শ‍ুধ‍ু নিশ্চিন্ত আশ্রয়ই খ‍ুঁজে বেড়ায়? দ‍ুঃসাহসের ইচ্ছাও জাগে না?

ব‍ুকের থেকে একের পর এক ঢেউ উঠে এল। সামনের পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে তা গ‍ুঁড়ো গ‍ুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। চোখের উপর থেকে সমস্ত আলো যেন দপ্ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

শিথিল অবসাদে ঝিমিয়ে পড়তে চায় অমলেন্দ‍ু। চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে শেষে সমতলে এসে যেন ম‍ুখ থ‍ুবড়ে পড়েছে সে।

মন্থর পদক্ষেপে ধীরে ধীরে আসে অমলেন্দ‍ু। একা। মনে হলো, আস্তে আস্তে ওর পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। শ‍ুধ‍ু কালো কালো ছায়ার হাতছানি। এদিক-সেদিক ধোঁয়ার ফোঁসফোঁস।

কে যেন জানান দিয়ে যায়, অমলেন্দ‍ু তুমি কাপ‍ুর‍ুষ। শ‍ুধ‍ু তুমি নও, মাঝারিদের ইতিহাসই এই।

জ্বলে উঠে অমলেন্দ‍ু পিছন ফিরে চায়। আবার শ‍ুনতে পায়, যদি তাই না হবে, তবে কেন জোর করে ছিনিয়ে নিতে পার না শমিতাকে? চুরমার করে দিতে পার না ওর অহংকার আর ঐশ্বর্যকে? সমস্ত দেনা-পাওনা মিটিয়ে দেবার সাহস নেই তোমার।

ম‍ুহ‍ূর্তের মধ্যে একটা প্রচন্ড আক্রোশে অমলেন্দ‍ু ফেটে পড়তে চায়। ক্ষোভের লক্‌লক শিখার বাদামী আভায় সব কিছ‍ু প‍ুড়ে যেতে চায়। মাথার মধ্যে ভয়ংকর যন্ত্রণার দাপাদাপি। চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। চোখের কোণে জল জমে। হ‍ুহ‍ু করে ওঠে ব‍ুকখানা। কে যেন হাজার হাজার বৈঠার ঘা মারছে। তোলপাড় হয়।

প্রেতের মতো একটা স্মৃতি বয়ে বেড়ায় অমলেন্দ‍ু। উঠতে বসতে শ‍ুধ‍ু দ‍ুঃস্বপ্নের ভিতর টেনে নিয়ে যায় শমিতার অস্তিত্ব। এর থেকে বেরোবার পথ নেই? দার‍ুণ উৎকণ্ঠা।

কয়েকদিন পরেই আবার অমলেন্দ‍ু এলো শমিতাদের বাড়িতে। কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়েই এসেছিল। এরকমভাবে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা তিলে তিলে ওকে পিষে ফেলবে তা হতে পারে না। ম‍ুখোম‍ুখি দাঁড়িয়ে তাই শেষ বোঝাপড়া। কিছ‍ুতেই ওই নীরস নিষ্প্রাণ মাঝারি শব্দটার জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না অমলেন্দ‍ু।

এই অভিশাপ ওর গলায় ফাঁস হয়ে বসে যেতে চাইল। একটিমাত্র শব্দ সমগ্র অস্তিত্বকে এমনভাবে নাড়া দিতে পারে তা কোনদিনই ভাবে নি সে। দিন দিন কেমন জিঘাংসায় পেয়ে বসেছিল। শমিতার প্রতিটি আচরণের মধ্যে খ‍ুঁজে বের করে একধরনের ছেলে-মান‍ুষী। প্রচন্ড ঘ‍ৃণা জাগে। প্রতিশোধের জ্বালা লক্ষ লক্ষ ঢেউ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

দরজা ভেজানোই ছিল। সোজা ঢ‍ুকে পড়ল দ‍ৃঢ় পদক্ষেপে। ধারে কাছে কাউকে দেখতে পেল না। সোজা চলে এল শমিতার শোবার ঘরে।

শমিতা কিসের এক উপস্থিতি অন‍ুভব করল। চমকে তাকালো পেছন দিকে। আতঙ্ক।

শমিতা কমলারঙের একটা শিলভলেশ ব্লাউজ পরেছিল শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে। শমিতা গোটা বাড়িতে একা।

কেমন যেন শিরশির অন‍ুভব করল অমলেন্দ‍ু। একটা চাপা উত্তেজনায় থরথর কাঁপছে। স্নায়‍ু টানটান। অসংখ্য হিংস্র নেকড়ে একসঙ্গে ওর চোখের মণিতে লাফালাফি শ‍ুর‍ু করে দিল। পদ্মরাগ মণির মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শমিতা ঠিক ব‍ুঝতে পারছিল না কি করবে। ব‍ুকের দ্র‍ুত ওঠানামায় তখন কারাতের ঘরঘর্ আওয়াজ। স্থির আতঙ্ক। কথা বলবার সাহসট‍ুকু পর্যন্ত নেই।

কোথায় হঠাৎ একটা টিকটিকি ডেকে উঠলো। বিস্ময়ের ঘোর এবার ফিকে হচ্ছে।

নিজের বেশবাসের দিকে নজর [illegible]তেই কেমন সংকুচিত হল। উঠে পড়ে [illegible] বাড়াল। খপ্ করে দ‍ুটি বিশাল পাথরের চাপ অন‍ুভব করল কাঁধের দ‍ুদিকে। চিৎকার করতে যাবার আগেই এক ঝটকায় ম‍ুখটা ঘ‍ুরিয়ে নিল অমলেন্দ‍ু ম‍ুখোম‍ুখি। চোখের চাব‍ুকে বিদ‍্যুৎ।

অনন্ত তৃষ্ণা......সীমাহীন......দ‍ুঃসহ...

অমলেন্দ‍ুর ম‍ুখের দিকে আর তাকাতে পারে না শমিতা। ঢ‍ুকরে কেঁদে ওঠে। কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর শরীর। মনে হল পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। সে তলিয়ে যাচ্ছে, সে হারিয়ে যাচ্ছে......

ধ্বস্ত মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে রইল অমলেন্দ‍ু, স্থির, ভাষাহীন। মাঝারিপণা থেকে ম‍ুক্তি পেতে গিয়ে কোন পাতালে পা বাড়াল সে!

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ॥

গত ২৪ জুলাই কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—'বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের আরও ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন।' বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূমিকারও তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সভাপতির ভাষণে কবি নরেন্দ্র দেব বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদানের কথা স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানে বহু গুণীজনের সমাবেশ ঘটেছিল।

তামিল সাহিত্যের অনুবাদ ॥

তামিল ছোটগল্প, উপন্যাস ও কবিতার [illegible]চিত অনুবাদ সংকলন প্রকাশের [illegible]রিকার 'মহফিল' পত্রিকা উদ্যোগী হয়ে[illegible]। এই বিশেষ সংখ্যাটি সম্পাদনা করবেন চিকাগোর নেলসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডোনাল্ড এ নেলসন ও প্রাগের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিট্যুটের অধ্যাপক কামিল জেভিলিকিন। প্রাচীন তামিল সাহিত্যের পাশাপাশি অতি আধুনিককালের সাহিত্যও সংকলিত হবে।

প্রভাকর মাচ্‌ওয়ের সঙ্গে একদিন ॥

মারাঠি এবং হিন্দি—উভয় ভাষাতেই প্রভাকর মাচ্‌ওয়ের সমান পরিচিতি। অবশ্য মারাঠি তাঁর মাতৃভাষা। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এম-এ পাশ করেন এবং পরে হিন্দিতে পি এইচ ডি সম্মানে ভূষিত হন। তাঁর জন্ম হয় ১৯১৭ সালে গোয়ালিয়রে। 'স্বপ্নভঙ্গ' তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির অন্যতম। অনুবাদক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। হিন্দি ও ইংরেজিতে তাঁর অজস্র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। কিছু দিন আমেরিকাতেও অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে 'সাহিত্য আকাদেমী'র সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন। বাংলাতেও শ্রীমাচ্‌ওয়ের কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'অমৃত'র প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর সম্প্রতি সাক্ষাৎ হয়। সমকালীন সাহিত্য আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এ বিষয়ে যে উত্তর দেন, তা এখানে পরিবেশন করা যাচ্ছে।

প্রশ্ন—কবি সম্মেলনের কি কোন প্রয়োজন আছে?

উত্তর—নিশ্চয়ই আছে। পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবার একটা সুযোগ পাওয়া যায় এতে। ভারতবর্ষের মত একটা বিরাট দেশে—যেখানে আমরা আমাদের প্রতিবেশী সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু জানি না—সেখানে সর্ব-ভারতীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা খুবই আবশ্যক। এতে ভাব-বিনিময়েরও একটা সুযোগ ঘটে। এবার কলকাতায় গিয়েছিলাম 'সর্ব-ভারতীয় কবি সম্মেলনে' যোগ দিতে। খুব ভাল লেগেছে। তবে একে আরও ভাল করে তুলবার জন্য আমার কয়েকটি সুপারিশ আছে। ছোট-ছোট আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হলে ভাল হত। আমন্ত্রিত কবিরা যদি একই জেনারেশনের হন, তাহলেও আমার মনে হয়, এর মাধ্যমে একটা বিশেষ চরিত্র ফুটে ওঠে। কবিদের থাকবার ব্যবস্থা হোটেলে না করে বাড়িতে বাড়িতে করলে বোধ হয়, ভাল হত।

প্রশ্ন—অনেকে বলেন, কবিতার অনুবাদ হয় না। আপনি কি মনে করেন?

উত্তর—কিছু কবিতা আছে, যার অনুবাদ হয় না। সেই সব কবিতার ছন্দ বা মাধুর্যকে ফুটিয়ে তোলা যায় না সত্য। আমি নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি অনুবাদ করতে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি নি। 'ভানু সিংহের পদাবলী' বা 'গীতগোবিন্দ'র মত বই অনুবাদ করতে গেলে মূলের সৌন্দর্য অনেকটা নষ্ট হয়ে যাবে। যদি 'রূপকল্প' খুবই আঞ্চলিক ভিত্তিক হয়, তাহলেও এই সমস্যা দেখা দেবে। তবে এসব সত্ত্বেও অনুবাদ করতে হবে। কেন না, এছাড়া পরস্পরকে জানবার আর কোনও পথ নেই।

প্রশ্ন—কবিতার 'কনটেন্ট' তার 'ফর্ম'কে নির্ধারিত করে বলে যে অভিমত আছে সে সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?

উত্তর—একথা আমি ঠিক মেনে নিতে পারি না। অনেক কবিতা আছে, যার 'ফর্ম'টাই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। বচ্চন, সুমিত্রানন্দন পন্থ, রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের অনেক কবিতা আছে, যা 'ফর্মে'র জন্যই সুন্দর। অজ্ঞেয় তো হাইকু কবিতার 'ফর্ম' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

প্রশ্ন—আধুনিক বাংলা কবিতা আপনার কেমন লাগে?

প্রভাকর মাচ্‌ওয়ে

উত্তর—নিশ্চয়ই ভাল। তবে খুব বেশি কবিতা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। 'কবিতা' এবং 'পূর্বাশা' পত্রিকা দুটি নিয়মিত পড়তাম। এর থেকে যা ধারণা হয়েছে, তাই নিবেদন করলাম।

ডোম মোরেসের নতুন গ্রন্থ ॥

সাহিত্য জগতে ডোম মোরেস এখন একটি খুবই পরিচিত নাম। গোয়ায় তাঁর জন্ম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংরেজিই তাঁর মাতৃভাষা। ভারতীয়দের মধ্যে যে সমস্ত তরুণ লেখক ইংরেজিতে সাহিত্য-চর্চা করেন, মোরেসের নাম তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত। ১৯৫৭ সালে তাঁর 'এ বিগিনিং', ১৯৬০ সালে 'পোয়েমস্' এবং ১৯৬৫ সালে 'জন নোবডি' নামক কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতার একটি সুনির্বাচিত সংকলন সম্প্রতি আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয়েছে।—'কবিতা ১৯৫৫-৬৫'। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মোরেসের কবিতার যে বিবর্তন ঘটেছে, তা আলোচ্য সংকলনে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়।

মোরেসের কবিতার উপর একটি উল্লেখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন ওয়াই এম বেইনস্ 'লিটারেচার ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট' পত্রিকায়। এই প্রবন্ধটি মোরেসের কবিতা সম্বন্ধে বুঝতে সাহায্য করবে।

উর্দু গল্পের ইংরেজি অনুবাদ ॥

ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে উর্দু সাহিত্যের যে একটি বিশেষ স্থান আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। উর্দু সাহিত্যের অনুবাদও খুব কম হয় নি। সম্প্রতি একটি সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে প্রায় ১১৮টি উর্দু গল্প এ পর্যন্ত ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। এর মধ্যে খাজা আহম্মদ আব্বাসের ৫টি, আহমেদ আলীর ৩টি, উপেন্দ্রনাথ আসকের ৬টা, গোলাম আব্বাসের ৩টা, কৃষাণ চন্দরের ৬টা, সাদাৎ হাসানের ৩১টা, প্রেমচাদের ৬টা আছে।

বিদেশী সাহিত্য

জর্জিয়ার মহিলা কবি ॥

জর্জিয়ান সাহিত্যে মহিলা কবিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সকলেই স্বীকার করেন। সম্প্রতি মিডিয়া কাখিদজের একটি নতুন কাব্যগ্রন্থ সেই ধারণাকে দৃঢ়মূল করেছে।

জর্জিয়ান মহিলারা সাধারণত কবিতার ব্যাপারে আগ্রহী। জর্জিয় ভাষায় লেখা প্রাচীনতম যে কবিতা পাওয়া গেছে, তার রচয়িতা একজন পঞ্চম শতাব্দীর মহিলা। মিডিয়া কাখিদজের কবিতাগুলি অত্যন্ত আধুনিক মেজাজের এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লেখা। তিনি বিদেশী ভাষার বহু কবিতা অনুবাদ করেছেন। সম্প্রতি মিডিয়া কাখিদজে যুগোশ্লাভিয়ার মহিলা কবি দেসাঙ্কা মেক্সিমোভিক-এর কবিতা অনুবাদ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে জর্জিয়ার কবিতার ইতিহাসে নারীপ্রাধান্যের স্বাক্ষর সর্বত্র। যে-সব প্রতিনিধিস্থানীয় কবি জর্জিয়ান ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলেছেন, তাঁরা সকলেই মহিলা। আর যাঁরা বর্তমানে জর্জিয়ান কবিতায় নবতর আঙ্গিক প্রবর্তনে উদ্যোগী তাঁরাও মহিলা।

বার্ট্রান্ড রাসেলের আত্মজীবনী ॥

বর্তমান পৃথিবীর দার্শনিকদের মধ্যে বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর গাণিতিক শৃঙ্খলাবোধ ও তীক্ষ্ম যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের জন্য বহু আলোচিত পুরুষ। সারা পৃথিবীর লোক বিভিন্ন সময়ে তাঁর একেকটি বিস্ময়কর উক্তির জন্য উত্তেজিত হয়েছে। সম্প্রতি তিনি তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডটি সমাপ্ত করেছেন। বইটি 'দি অটোবায়োগ্রাফি অব বার্ট্রান্ড রাসেল : ১৯১৪-৪৪' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

সমালোচকেরা এই গ্রন্থটি পড়ে খুশি হন নি। তাঁদের মতে, এই গ্রন্থে লেখকের দুঃসাহসী কর্ম-প্রয়াসের কোনো স্বাক্ষর নেই। বর্তমানে তিনি ছিয়ানব্বই বছর অতিক্রম করছেন। জনসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তিনি এখনো সরব এবং বিশ্ব-রাজনীতির ব্যাপারে যখন উচ্চকণ্ঠ,—তখন একই সময়ে আত্মজীবনী রচনা করতে গিয়ে তিনি এতটা কুণ্ঠিত ও সংকোচিত হবেন কেন? এই গ্রন্থে তিনি একজন রবিবাসরীয় লেখকের মতো একটি বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন প্রায় আকস্মিক ঘটনাসূত্রে। এদিক থেকে গ্রন্থটিকে তাঁর আত্মজীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস না বলে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের লিপিচিত্রণ বলা যায়। সমালোচকের ভাষায়, রাসেল তাঁর পুরোনো ট্রাংক থেকে কিছু সংখ্যক নির্বাচিত পত্র ছাপিয়ে যেন গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি করেছেন।

এই গ্রন্থের পদ্ধতিটি বিশ্লেষণাত্মক না হলেও তথ্যাশ্রয়ী। বইটির সূত্রপাত হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে তাঁর কারাবরণের ঘটনা দিয়ে। এই সময়ে জেলে যাঁরা তাঁর সহযাত্রী ছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে লিখেছেন, "আমার অনুগত বন্দীরা কোনো ক্রমেই, আমার মনে হয়, অবশিষ্ট জনসাধারণের তুলনায় নিকৃষ্ট ছিলেন না, যদিও সামগ্রিকভাবে তাঁরা বুদ্ধিমত্তার স্বাভাবিক স্তর থেকে নিম্নমানের ছিলেন। তাঁদের কারাবাস সেরূপই প্রমাণ করে।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি আমেরিকা থেকে নৈতিকভাবে নির্বাসিত হন। সম্ভবত, সেই ঘটনা রাসেলের মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত তাঁর মার্কিন-বিরোধী মনোভাবের পেছনে প্রাগুক্ত ঘটনাই সক্রিয় রয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

রাসেল এই গ্রন্থে বাস্তবকে বাদ দিয়ে ভাবগত কিংবা হৃদয়গত পরিবর্তনের কোনো বিষয় বর্ণনা করেন নি। উদাহরণ হিসেবে লেডি অটোলিন মরেলের সঙ্গে তাঁর আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের ঘটনাটিকে স্মরণ করা যায়। সেটি ছিল তাঁর জীবনের সবচাইতে ঝোড়ো সময়। লেডি কনস্ট্যান্স ম্যালেসনের সঙ্গেও তখন তিনি অন্তরঙ্গসূত্রে জড়িত। রাসেল লিখেছেন, "আমি অন্ধকারকে আলোকিত করবার জন্য আগুনের সংকেতের মতো ব্যক্তিগত ভালবাসা চাই।"

এইভাবে তিনি ডোরা ব্ল্যাককে দ্বিতীয়া পত্নী হিসাবে গ্রহণ করেন, ৪৯ বছর বয়সে প্রথম সন্তানের মুখ দেখে উল্লসিত হন এবং ৬৪ বছর বয়সে দ্বিতীয়া পত্নীকে ডাইভোর্স করে প্যাট্রিকা স্পেন্সকে বিয়ে করেন।

এই গ্রন্থের বহু ক্ষেত্রে রাসেলকে কোনো এক দীর্ঘ পত্র-প্রদর্শনীর দর্শক, ... ও গৃহকাতর বলে মনে হয়।

পোলিশ গ্রন্থের পাঠক ও প্রকাশক ॥

বিচিত্রচরিত্র পাঠকের ভিড় জমে লাইব্রেরিতে। জানা যায়, জাতির সাহিত্য-চিন্তা কিম্বা শিক্ষা-ভাবনা কোন দিকে বাঁক নিচ্ছে।

সম্প্রতি একটি খবরে জানা যায়, পোলিশ গ্রন্থাগারসমূহে প্রতি বছর প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ পাঠক-পাঠিকা নিয়মিত পড়াশোনার সুযোগ পায় এবং দশ কোটির মতো মানুষ বাড়িতে পড়ার জন্য নানা-প্রকার বই ধার নিয়ে থাকে। সিরিয়াস পাঠকের সংখ্যাও এখানে কম নয়। গণতান্ত্রিক পোল্যান্ডে কেবল অ্যাডাম মিকিউইক্জ-এর রচনাবলী ছাপা হয়েছে

প'চাশি লক্ষ কপি। অবশ্য এই সংখ্যার মধ্যে ১৯১৮ থেকে ৩৯ সালের মধ্যে মুদ্রিত আট লক্ষ কপির হিসেবও ধরা হয়েছে।

ওয়ারশতে অবস্থিত রাষ্ট্রীয় প্রকাশনী সংস্থাটি বই প্রকাশের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছে বলা যায়। এই সংস্থা থেকে প্রচারিত হেনরী সিনকিউকজ-এর রচনাবলীর মুদ্রণ সংখ্যা এক কোটি দশ লক্ষ আর বোলস্ল প্রুসের প'চাত্তর লক্ষ কপি। সাম্প্রতিক সাহিত্যের চাহিদাও দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। ১৯৬৭ সালে পোল্যান্ডের বিভিন্ন প্রকাশক সমকালীন সাহিত্যিকদের যে সকল বই ছেপেছিলেন, তাদের মোট মুদ্রণ সংখ্যা ছিল পনেরো কোটি প'য়ষট্টি লক্ষ।

১৯৬৮ সালের হিসেব-নিকেশ করার সময় এখনো আসে নি। তবে গত বছরের তুলনায় এ বছর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা যায়। পাঠকদের মধ্যে বইয়ের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রধান কারণ অবশ্য পকেট বইয়ের বহুল প্রচার ও সুলভ সংস্করণ গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি। বর্তমান বছরে এদেশ থেকে মিকিউইকজ, সিনকিউইকজ এবং বি প্রুসের রচনাবলী সহ সমকালীন সাহিত্যিকদের ৭৮টি রচনা সংগ্রহ প্রকাশিত হবে।

অনুবাদ সাহিত্যের প্রচারেও এদের উৎসাহ কম নয়। ৪৭টি অনুবাদ গ্রন্থের নতুন সংস্করণ ছাড়াও ২০০টি নতুন বই এ বছরে বেরোবে বলে আশা করা যায়।

পশ্চিম জার্মানীর উপহার ॥

পশ্চিম জার্মানীর রিচার্স অ্যাসোসিয়েশন 'ব্যাড গোডেশবার্গ' কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারকে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত প'চিশ খন্ডের একটি সেট বই উপহার দিয়েছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ডি, আর, কালিয়া এই দান গ্রহণ করেন। উপহারগুলি প্রদত্ত হয় কলকাতাস্থ পশ্চিম জার্মান দূতাবাসের [illegible]ট জেনারেল মিঃ রেণট্রপের ম[illegible]

প্রদত্ত বইগুলি মূলত ভারতীয় দর্শন, শিল্প, স্থাপত্য, রাজনীতি ও ধর্ম-সম্পর্কিত। প্রাচ্য ও পাশ্চত্য দর্শনের ওপর লেখা 'ইন্ডিসকে উইশেইটেন আন্ড দাস অ্যাবেন্ডল্যান্ড' নামে বইটি খুবই মূল্যবান। দক্ষিণ ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্যের ওপর 'সমলপুরম আণ্ড ডাই ওয়েল্টদের সুইডিনডিসকেন কুনস্ট' নামে অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও রয়েছে। বেদ ও হিন্দু ধর্মের ওপর লেখা দুটি মূল্যবান গ্রন্থের নাম হলো, যথাক্রমে—'ডাই আপোক্রাইফেন দেস ঋগ্বেদ' এবং 'হিন্দুইসমাস'।

জাপানী প্রকাশক ॥

জাপানে প্রকাশকের সংখ্যা কত? ভাবতে গেলে অবাক মনে হয়, এই দেশে ছাব্বিশ হাজারেরও বেশী প্রকাশনসংস্থা

পশ্চিম জার্মান দূতাবাসের কনসুলেট জেনারেল মিঃ রেনট্রপ ও জাতীয় গ্রন্থাগারের মুখ্য গ্রন্থাগারিক. ডি, আর, কালিয়াকে অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

রয়েছে। অবশ্য অধিকাংশ প্রকাশকই ক্ষুদ্র পরিধির ভেতরে তাঁদের কাজ-কারবার চালিয়ে থাকেন। পাঁচটি প্রকাশনসংস্থা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে। এই পাঁচটির অন্যতম হলো কোয়াদেসিয়োবু পাবলিশিং হাউস। আশি বছর আগে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাপানের প্রাচীনতম প্রকাশনীগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

আগুতি শাতি নামে একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা বর্তমানে সংস্থাটি পরিচালনা করে থাকেন। বলা বাহুল্য প্রকাশনার প্রয়োজনে তাঁকে প্রায়ই বিদেশ ভ্রমণে বেরোতে হয়।

বিদেশী সাহিত্যের প্রচারে সংস্থাটির সুনাম বহুবিদিত। এপর্যন্ত বহু বিদেশী গ্রন্থকারের রচনাসংগ্রহ তাঁরা প্রকাশ করেছেন। প্রতি বছর তাঁরা যে সকল নতুন বই প্রকাশ করেন—তার মুদ্রণসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় কুড়ি লক্ষ। এইসব গ্রন্থ প্রচ্ছদ, মুদ্রণ ও আঙ্গিক শোভনতার দিক থেকেও অত্যান্ত উন্নত। টলস্টয়ের রচনাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন, বর্তমানে তার বিক্রয় সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চার লক্ষ।

হুস্ট বিনেকের উপন্যাস ॥

সম্প্রতি হুস্ট বিনেকের প্রথম উপন্যাস 'দি সেল্' প্রকাশিত হয়েছে।

একটি কারাগারের ঘটনা নিয়ে এ উপন্যাসের কাহিনী লেখা হয়েছে। বইটির নামকরণের মধ্যেও অবশ্য সে ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। তার নায়ক একজন অপরাধী। বিচারে তার নির্জনবাসের দন্ড দেওয়া হয়। কিন্তু কি অভিযোগে সে শাস্তি পাচ্ছে—তা তার জানা নেই। তার অবস্থান ও অস্তিত্ব প্রতিফলিত হয়েছে কয়েদখানার বর্ণনার মধ্য দিয়ে।

উপন্যাসটির সমালোচনাপ্রসঙ্গে রুডলফ হারটুঙ্গ লিখেছেন, এর নায়কের স্বগতোক্তি ও একক সংলাপের মধ্য দিয়ে গ্রন্থকার কেবল অপরাধীর মানসিক পরিমন্ডলটাই বিশ্লেষণ করেননি, বরং একটি মানুষকে সমগ্রভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন।

অত্যন্ত শান্ত যুক্তিসিদ্ধ পথে লেখক তার কাহিনীকে পরিচালনা করেছেন। কোথাও অকারণ বিষাদ কিংবা জটিলতা সৃষ্টি করেননি। বরং এমন চমকপ্রদ গদ্যে উপন্যাসটি লেখা হয়েছে, যা ভাবলে তাজ্জব বনে যেতে হয়।

উপন্যাসটিতে কেউ কেউ বেকেটের ছায়া লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু তার সম্ভাবনাকে কেউ অস্বীকার করেন নি।

তবে তার অতীত তাকে বিশেষ বিচলিত করেনি। মায়ের ক্যান্সার হওয়ার সংবাদ, পুরোনো পরিত্যক্ত স্বামীর আত্মহত্যার খবর যখন সে জানতে পারে—তখন তৃতীয় স্বামীর সঙ্গে সে সুখের সংসার গড়ে তুলছে।

আসলে ভানে, এই পৃথিবী ও চারপাশের নর-নারীকে দেখেছে খানিকটা বিষম দৃষ্টিতে, অনেক সময় তাকে আত্মনির্যাতনে ব্যাপৃতা বলে মনে হয়।

গ্রন্থকার মাত্র একটি দিনের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা শুরু করেছেন এবং শেষ করেছেন দিন শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই।

উপন্যাসটি পাঠকমহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরিকল্পনায় ভুল হয়নি ঘনাদার। চরম সংকটে অলৌকিক যাদুদণ্ডের মতই কাজ করেছে ইংকা নরেশের প্রতীক-চিহ্ন

রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভুমু নত-মস্তকে সে প্রতীক-চিহ্ন মেনে নিয়ে চলে গেছেন। হুয়াসকার এবার মুক্তি পাবেন.

পরের দিন থেকেই সূর্যদেবের উত্তরায়ণের সঙ্গে রেইমির উৎসব শুরু হবে।

কাক্সামালকা শহরে আতাহুয়ালপা নিশ্চয়ই প্রস্তুত হয়ে আছেন সম্পূর্ণভাবে। রেইমির উৎসবের সুযোগ নিয়ে আনন্দমত্ত জনতার মধ্যে নিজেকে গোপন করে সোসার পথে তিনি রওনা হবেন। ওদিকে হুয়াসকারও তখন সোসায় বসে থাকবেন না। পার্বত্যপথের এক গোপন দুর্গে দুই রাজ-ভ্রাতার সাক্ষাতের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে আছে। বিদেশী শত্রুদের যা তাভানতিন-সুয়ুর পবিত্র সাম্রাজ্য থেকে ঘৃণ্য ক্রীতদের মত ধুয়ে দূর করে দেবে সেরুর সে নব-জাগরণের ঢল নামতে শুরু করবে ওই গোপন দুর্গ থেকেই।

ভিলিয়াক ভুমুর সমস্ত পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে ঘনাদা সেই পরম মুহূর্তের অপেক্ষায় কুজকো শহরেই এমন এক অবিশ্বাস্য গোপন আশ্রয় খুঁজে নিয়েছেন, সমস্ত কুজকোবাসীর প্রায় চোখের ওপরে থেকেও যা তাদের কল্পনাতীত।

অপেক্ষা আর কটা দিন মাত্র, অধৈর্য নেই তাই ঘনাদার মনে।

কাক্সামালকায় কি হচ্ছে তা যেন তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে পান। যা দেখতে পান না, তা হল এই যে, এসপানিওল সেনাপতি পিজারোর সঙ্গে কাক্সামালকা শহরের নতুন এক আগন্তুক গভীর উত্তেজিত আলোচনায় মত্ত। সে আগন্তুকের নাম মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস।

সোসা কারাদুর্গের একটি ঘটনাও তখন ঘনাদার কল্পনার বাইরে।

কোরাকেঙ্কুর পালক দেখিয়ে সোসা দুর্গে কয়া যখন সমস্ত সন্দিগ্ধ অভিযোগের জবাব দিয়ে রাজপুরোহিতের কুটিল গোপন চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছে, আর কাক্সামালকা নগরে পেরু বিজয়ী এসপানিওল সেনাপতি পিজারোর সঙ্গে স্মরণীয় সাক্ষাৎ হয়েছে মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস-এর ঘনাদা নিজে তখন কুজকো শহরেই দিন নয়, দণ্ডপল গুনছেন।

সমস্ত তাভানতিনসুয়ু যাতে কেঁপে উঠবে সে বিস্ফোরণের আর বিলম্ব হবার কথা নয়। হাওয়ায় তিনি উদ্গ্রীব কান পেতে আছেন সোসা থেকে প্রথম সে জয়ধ্বনি শোনবার জন্যে।

কিন্তু কান তিনি পেতে আছেন কোথায়?

নেহাৎ যাদুমন্ত্রে কীটপতঙ্গ না হয়ে থাকলে কুজকো শহরে তাঁর লুকিয়ে থাকাত অসম্ভব। রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভুমুর প্রকাশ্য প্রহরী ও গোপন চরেরা বাড়ি ঘর রাস্তাঘাট'ত তন্নতন্ন করে খুঁজেছে-ই, রেইমি উৎসবের জন্যে সমবেত তীর্থযাত্রীদের জনে জনে পরীক্ষা করবার ত্রুটি রাখেনি। ভিলিয়াক ভুম সোসা রওনা হবার আগে সেই আদেশই দিয়ে গিয়েছিলেন। কুজকো থেকে বাইরে যাবার গোনাগুনতি পাহাড়ী রাস্তা ত আগেই বন্ধ করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঘনাদা তাঁর সঙ্গে দেখা করে চলে যাবার পর তাকে অতিথিশালায় গিয়ে বন্দী করার আদেশের সঙ্গে কুজকো থেকে যাবার আসবার পথগুলিতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা রাজপুরোহিত করেছিলেন। নেহাৎ স্ত্রীলোক বলেই কয়া সে পাহারা এড়িয়ে কিছুদূর পর্যন্ত অন্ততঃ বিনা বাধায় যেতে পেরেছিল। ঘনাদার সম্বন্ধেই সতর্ক হওয়া দরকার মনে করে মেয়েদের সম্বন্ধেও হুঁশিয়ার থাকবার নির্দেশ দেবার কথা রাজপুরোহিতের মাথায় আসে নি। রাজপুরোহিতের এই হিসেবের ভুলটুকু অনুমান করেই ঘনাদা কয়াকে একা অতবড় কঠিন বিপদের কাজে পাঠিয়েছিলেন, নিশ্চয়।

কিন্তু কয়া কুজকো ছেড়ে সোসার পথে রওনা হতে পারলেও ঘনাদা ত তা আর পারেন নি। ভিলিয়াক ভুমুর প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে কুজকো শহরে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

সেই অসম্ভবই কিন্তু ঘনাদা সম্ভব করে তুলেছেন শুধু বুদ্ধির জোরে আর বেপরোয়া সাহসে। এ রাজ্যের মানুষের হাড়হদ্দ জানবার চেষ্টায় সত্যিই এমন এক লুকোবার আস্তানার হদিস তিনি পেয়েছেন সামনা-সামনি দেখেও কুজকো শহরের কেউ যেখানে তাঁকে খোঁজবার কথা কল্পনাও করবে না।

দরকার শুধু সে আস্তানায় নিজেকে লুকোবার সাহস। ঘনাদার সে সাহসের অভাব হয় নি।

সূর্যের দক্ষিণায়ণ শেষ হবার সঙ্গে রেইমির উৎসব শুরু হবে পরের দিন। আগের বছর হুয়াসকার-ই ইংকা নরেশ হিসাবে এ উৎসবের প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। এবারের উৎসবে বিজয়ী নতুন ইংকা আতাহুয়ালপারই এ ভূমিকা যাঁর নেবার

কথা তিনিও কাক্সামালকায় বিদেশী শত্রুর হাতে বন্দী।

রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভ্যুকেই তাই এবারের উৎসব অনুষ্ঠানে একাধারে ইংকা আর রাজপুরোহিতের দায়িত্ব নিতে হবে।

কুজকো নগরে কোরিকাঞ্চা ঘিরে সমবেত নাগরিক আর তীর্থযাত্রীরা একটু বুঝি উদ্বিগ্ন হয়েছে। তাদের সোনার রাজ্যে একটা গভীর অমঙ্গলের ছায়া যে পড়েছে তা তাদের জানতে বাকি নেই। তবু যে তারা এ উৎসবে যোগ দিতে সব কিছু তুচ্ছ করে এসেছে তার কারণ শুধু অন্ধ ধর্মভীরুতা নয়। তাভানতিনসুয়ুর এই প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেবাদিদেব আকাশ-পতি সূর্য তাদের কাতর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে তাদের পবিত্র রাজ্য থেকে পাপের ছায়া সরিয়ে নিতে পারেন এ আশাও একটু তাদের মনে আছে।

তারা উদ্বিগ্ন একটু হয়েছে পাছে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয় এই ভয়ে। ইংকা নরেশ হিসাবে হুয়াস্কার বা আতা-হুয়ালপা এ উৎসবে কোন ভূমিকাই নিতে পারবেন না। কিন্তু ইংকা রাজশক্তির প্রতিনিধি হিসেবে যিনি এ উৎসব পরি-চালনার দায়িত্ব নেবেন সেই রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভ্যুও যে কুজকো শহরে তখনো অনুপস্থিত।

কয়েকদিন আগে বিশেষ কোনো জরুরী প্রয়োজনে রাজপুরোহিত কুজকো ছেড়ে গেছেন তারা জানে। যেখানেই গিয়ে থাকুন রেইমি উৎসবের দিন উত্তরায়ণের প্রথম সূর্যোদয়কে অভিনন্দিত করে অর্ঘ্যসুরা বিতরণ করবার জন্যে কুজকোয় তিনি উপস্থিত থাকবেন নিশ্চয়।

কিন্তু রাত্রির শেষ যাম অতিক্রান্ত হতে [illegible]। পূর্ব দিগন্তের তারারা নিষ্প্রভ [illegible] আসছে সে দিকের অন্ধকার তরল [illegible] ওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, নগরসীমার পার্বত্য প্রান্তরে ভক্ত জনতা সমবেত হয়েছে মধ্য-রাত্রি থেকে, অর্ঘ্যসুরার বিরাট পাত্র যথাস্থানে স্থাপিত হয়েছে অনেক আগেই, শুধু রাজপুরোহিতেরই তখনো দেখা নেই।

গত তিন দিন কোন গৃহস্থ বাড়িতে আগুন জ্বলে নি, তিন দিন ধরে সমস্ত ভক্ত পুরবাসীরা উপবাসী। পূর্বাকাশে প্রথম সূর্যকিরণ দেখবার সৌভাগ্যে ধন্য ও পবিত্র হবার জন্যে তারা দূরদূরান্তর থেকে এসে এই কৃচ্ছ্রসাধন করেছে। স্বয়ং ইংকা নরেশ কি রাজপুরোহিত সেদিনের শিশুসূর্যকে প্রশস্তি মন্ত্রে বরণ না করলে ত সমস্ত অনুষ্ঠানই ব্যর্থ হয়ে যাবে। দেবাদিদেব পরমজ্যোতির আশীর্বাদের বদলে অভিশাপই বর্ষিত হবে সমস্ত তাভানতিনসুয়ুর ওপর।

আকাশের দিকে আর নয়, জনতা ভীত উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পিছনের নগরবর্ত্মের দিকে তাকায়, কোরিকাঞ্চার অধস্তন পুরোহিতদের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিও সেই দিকে। এত বড় বিশাল জনারণ্যকে একই আশঙ্কা যেন ঝড়ের মত উদ্বেলিত করছে। অতি দীনদরিদ্র কৃষক থেকে যথার্থ ইংকা রক্তের অভিজাত সম্প্রদায় পর্যন্ত সকল শ্রেণীর আবালবৃদ্ধ নরনারীই ত সেখানে উপস্থিত। শুধু জীবিত নয় মহান মৃতেরাও এসেছেন উত্তরায়ণের প্রথম সূর্যকে বন্দনা করতে।

তাভানতিনসুয়ুর প্রাচীনতম প্রথা সত্যিই পালিত হয়েছে এই দিনটির জন্যে। পেরু রাজ্যে মৃত ইংকাদের বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। অনেকটা মিশরের ধরনে তাঁদের মরদেহ শাশ্বত করে রাখবার চেষ্টা হয়। জীবনকালে যা পরতেন সেই জমকালো মহার্ঘ পোশাকে সাজিয়ে নিরেট সোনার সিংহাসনে কোরি-কাঞ্চার সূর্যমন্দিরে সারিবদ্ধ তাঁদের শবদেহ বসানো থাকে। পরলোকগত ইংকাদের জন্যে একটি করে প্রাসাদও পৃথক বরাদ্দ। সেখানে তাঁদের নিত্য-ব্যবহার্য জিনিস ও ঐশ্বর্য কোন কিছুরই অভাব রাখা হয় না।

বিশেষ বিশেষ দিনে মৃত ইংকাদের শবদেহ তাঁদের ঐশ্বর্যবিলাসের উপকরণ সমেত এ কাজে নিয়োজিত স্বতন্ত্র প্রহরী ও অনুচরেরা জনসাধারণের সামনে এনে উপস্থিত করে। মৃত ইংকারা তখন জীবিতদের সমানই সশঙ্ক সমাদর পান।

সেই প্রথা মতই রেইমির উৎসব উপলক্ষ্যে মৃত ইংকাদের সংরক্ষিত শবদেহ এনে রাখা হয়েছে নগর সীমার প্রান্তরে। পূর্বতন ইংকাদের মধ্যে হুয়াসকার ও আতাহুয়ালপা দুজনেরই পিতা হুয়াইনা কাপাকের শবদেহকে ঘিরে ঐশ্বর্যগরিমার সমারোহ সবচেয়ে বেশী। পেরুর প্রজা-সাধারণের মনে ইংকা হুয়াইনা কাপাকের স্মৃতি এখনো অত্যন্ত উজ্জ্বল। সোনার সিংহাসনে বসানো, সোনা-রুপোর কাজে ঝলমল পোশাকে সাজানো তাঁর শবদেহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ইংকা প্রজারা সসম্ভ্রমে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে যায়। তাদের কাছে তিনি মৃত নন। রাজ-পুরোহিত যথাসময়ে না এসে পৌঁছোবার দরুণ রেইমি উৎসব যে পণ্ড হতে চলেছে তার জন্যে তিনি গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত বলেই তাদের ধারণা। পূর্ব দিগন্ত আরো পাণ্ডুর হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত ব্যাকুলতায় তারা অনেকে হুয়াইনা কাপাকের কাছেই নিজেদের প্রার্থনা জানায়। যথাবিহিত অনুষ্ঠান না হলে সূর্যদেবের যে অভিশাপ সমস্ত তাভানতিনসুয়ুতে বর্ষিত হতে পারে তা থেকে শেষ মুহূর্তে তিনিই রক্ষা করতে পারেন এই তাদের অন্ধ বিশ্বাস।

সেই অন্ধ বিশ্বাসেই কি তাদের কেউ কেউ সোনার সিংহাসনে বসানো হুয়াইনা কাপাকের সুসজ্জিত শবদেহে ঈষৎ প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করে? বিদ্যুৎ শিহরন অনুভব করে তারা সারা দেহে।

এই নিদারুণ সংকটে সত্যিই কি মহাশক্তিধর হুয়াইনা কাপাক আবার জেগে উঠবেন? অসামান্য বাহুবলে কুজকো থেকে কুইটো পর্যন্ত যিনি ইংকা সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন তিনিই কি আবার এসেছেন তাভানতিনসুয়ুকে বিদেশী গ্রাস থেকে মুক্ত করতে?

শঙ্কিত উৎকণ্ঠিত জনতার মধ্যে একটা উত্তেজিত গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়।

পূবের আকাশ আরো পরিষ্কার হয়ে আসছে। কোরিকাঞ্চার উদ্বিগ্ন অধস্তন পুরোহিতেরা দিশাহারা হয়ে পড়েছেন, এ বিপদে কি যে করণীয় তা স্থির করতে না পেরে।

তাঁরা নিজেরাই কি কেউ আজ ইংকা নরেশ আর রাজপুরোহিতের হয়ে উত্তরায়ণের সদ্যোজাত সূর্যদেবকে বরণ করবার ভার নেবেন?

কিন্তু তাদের ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র অনুষ্ঠানের এ নিদারুণ ত্রুটি রেইমি উৎসবের জন্যে সমবেত বিরাট জনতা মেনে নেবে বলে ত মনে হয় না। রাজপুরোহিত স্বয়ং এসে এখনো সব দিক রক্ষা করতে পারেন। আর কিছুক্ষণ দেরী হলে উত্তেজিত উৎকণ্ঠিত ধর্মপ্রাণ জনতার মধ্যে কি উত্তাল আলোড়ন যে জাগবে তা অনুমান করাই কঠিন।

এই অস্থির বিহ্বলতার মধ্যে জনতার গুঞ্জন পুরোহিতদের কানেও এসে পৌঁছোয়। ব্যাকুল হয়ে তাঁদের কেউ কেউ

হুয়াইনা কাপাকের শবদেহের দিকে ছুটে যান।

পেরুর চরম দুর্দিনে এই ভয়ঙ্কর সঙ্কট মুহূর্তে সত্যিই কি এক অলৌকিক বিস্ময় প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য তাঁদের হবে? উত্তরায়ণের সূর্যকে বরণ করবার জন্যে অদ্বিতীয় ইংকা কুলতিলক হুয়াইনা কাপাক তাঁর সযত্নে সংরক্ষিত শবদেহ আবার সঞ্জীবিত করে তুলবেন? এ অঘটন কি সত্যিই সম্ভব?

সাধারণ জনতার সঙ্গে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাঁরাও স্বর্ণ-সিংহাসনে আসীন মূর্তির দিকে চেয়ে থাকেন। এ মূর্তির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন প্রথম কে দেখেছে কেউ জানে না। কিন্তু মুখে মুখে কথাটা বহু-দূরে পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। পূর্ব দিগন্তে উৎসুকভাবে যারা চেয়েছিল তাদের অনেকেই ভূতপূর্ব ইংকা নরেশের শবদেহ যে রত্ন-বেষ্টনীর মধ্যে সাড়ম্বরে স্বর্ণ-সিংহাসনে স্থাপিত তার চারি ধারে ভীড় করে এসে জড় হয়।

সকলেই উত্তেজিত উৎকণ্ঠিত উৎসুক। অন্ধ বিশ্বাসের চোখে কি না বলা কঠিন, অনেকেই এবার শবদেহে একটা চাঞ্চল্যের আভাস পায়। যা তাদের স্বপ্নাতীত তাই কি এবার সত্যি ঘটতে চলেছে?

না ঘটবার কোন হেতু নেই। কারণ এমনি একটি সুযোগের মুহূর্তের জন্যেই নিখুঁতভাবে সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে।

সৌসার কারাদুর্গ থেকে নিশ্চয় এতক্ষণে মুক্তি পেয়েছেন হুয়াসকার। মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত অনুরক্ত অনুচরবাহিনী বর্ষার বন্যাস্রোতের মতই স্ফীত হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। সেই বাহিনী নিয়ে এই কুজকোর অভিমুখেই তিনি এগিয়ে আসছেন ঝড়ের গতিতে। রেইমি উৎসবের আগে ব্রাহ্মমুহূর্তেই তাঁর সদলবলে কুজকোর এই সূর্যবরণের প্রান্তরে এসে পৌঁছোবার কথা। তিনি এসে পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গে যে উত্তেজনার সঞ্চার হবে তারই মধ্যে জেগে উঠবে অদ্বিতীয় ইংকা নরেশ হুয়াইনা কাপাকের শবদেহ। তারই কণ্ঠে রেইমি উৎসবের জন্য সমবেত সমস্ত তাভানতিনসুয়ুর ভক্ত তীর্থ-যাত্রীরা শুনবে নবজাগরণের এক বহ্নিময় বাণী।

যে কোন কারণেই হোক হুয়াসকার রেইমি উৎসবের আগে কুজকোয় এসে পৌঁছোতে পারলেন না দেখা যাচ্ছে। তাতেও এমন কিছু ক্ষতি নেই। হুয়াসকার এসে না পৌঁছোলেও হুয়াইনা কাপাকের শবদেহ একবারের জন্যে প্রাণ পেয়ে জেগে উঠবে। উত্তরায়ণের শিশুসূর্য পূর্ব দিগন্তে আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি মহামন্ত্র অন্তত সমস্ত পেরুবাসীর কানে পৌঁছোবে। সে মহামন্ত্র তাভানতিন-সুয়ুর পবিত্র গিরিরাজ্য বিদেশী পাষণ্ডের পাপস্পর্শ থেকে মুক্ত করার।

হুয়াইনা কাপাকের শবদেহে প্রাণ-সঞ্চার কিন্তু আর হয় না। হঠাৎ কুজকো শহরের দূর সীমা থেকে দ্রুত অগ্রসর একটা ধ্বনি শোনা যায়। সচকিত হয়ে ওঠে সমস্ত জনতা। হুয়াসকারই কি তাহলে এসে পৌঁছোলেন যথাসময়ে? কিন্তু এ তো তাঁর বাহিনীর পদশব্দ নয়। এ যে অশ্বক্ষুর ধ্বনি।

(ক্রমশঃ)

রুশ ভল্লুকের মতিগতি

১৮৫৩ সালে আমেরিকার সংবাদপত্রের জন্য লেখা একটি প্রবন্ধে কার্ল মার্কস [illegible] দেশের দুজন প্রকৃতিবিজ্ঞানীর [illegible] বলেছিলেন। এই দুই প্রকৃতি-বিজ্ঞানী একটি ভালুক পরীক্ষা করে দেখছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন এই জন্তুটিকে আগে জানতেন না। তিনি অন্যজনকে শুধোলেন, "জন্তুটি ডিম পাড়ে, না, বাচ্চা দেয়?" অপরজন উত্তর দিলেন, "একটি এমনই এক জীব যে সবকিছুই করতে পারে।"

কাহিনীটি বলে সেদিনকার জারশাসিত রাশিয়া সম্পর্কে মার্কস্ লিখেছিলেন. "রাশিয়ান ভালুক সব কিছুই করতে পারে—যদি নাকি সে বোঝে অন্য যে জানোয়ারটির সঙ্গে তার মোকাবেলা করতে হচ্ছে সেটির কোন কিছুই করার ক্ষমতা নেই।"

জারের রাশিয়া আজ আর নেই। কিন্তু রুশ ভল্লুকের মতিগতি এখনও পৃথিবীর অনেকের কাছেই রহস্যময়। চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে সে শেষপর্যন্ত কি করবে, কতদূর যাবে. সেটা সারা পৃথিবী লক্ষ্য করছে।

গত জানুয়ারী মাসে অ্যান্টোনিন নভোৎনিকে সরিয়ে আলেকজেণ্ডার ডুবচেক চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে চেকোশ্লোভাকিয়া কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে। সংবাদপত্র, রেডিও ও অন্যান্য প্রচারযন্ত্রের উপর পার্টির নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়েছে। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়িও কমান হয়েছে।

এইসব সংস্কার রাশিয়া মেনে নিতে পারছে না। তার অভিযোগ এই যে. এইসব সংস্কার আসলে চেকোশ্লোভাকিয়ায় কম্যুনিস্ট-বিরোধীদেরই সুবিধা করে দিচ্ছে। আগেকার আমলের শোষক শ্রেণীর যে অবশিষ্টাংশ এখনও সে-দেশে রয়ে গেছে, তারা এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে চেকোশ্লোভাকিয়াকে সমাজতন্ত্রের শিবির থেকে বার করে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে এবং এই সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল প্রয়াসের পিছনে রয়েছে পশ্চিমী শক্তির, বিশেষ করে আমেরিকার মদত। এই হচ্ছে রাশিয়ার অভিযোগের মূল কথা।

রাশিয়ার আপত্তি যদি এই সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে ব্যাপারটা এত জটিল হয়ে উঠত না। কিন্তু পর পর এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটল যাতে এখন প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, ১৯৫৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়া যেভাবে হাঙ্গারিতে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করেছিল, চেকোশ্লোভাকিয়ার ক্ষেত্রে কি সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে? এই ঘটনাগুলি হচ্ছে :—

(১) ওয়ারশ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির এক সম্মেলন আহ্বান করল। চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়া সেই সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকার করল। অন্য পাঁচটি দেশ—সোভিয়েট ইউনিয়ন, পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গারী, পোল্যাণ্ড ও বুলগেরিয়া সেখানে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে একটি "চরম-পত্রের" খসড়া প্রস্তুত করল। এই চরমপত্রে চেকোশ্লোভাকিয়াকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হল যে, সে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটতে দিচ্ছে, যেগুলি "একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের

পক্ষে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।" চেকোশ্লোভাকিয়ার নিজের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা নেই, এই আশ্বাস দেওয়ার সংগে সংগে ওয়ারশ পত্রলেখকরা লিখলেন, "আমরা ব্যাপারটাকে যেভাবে দেখছি, তাতে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যেখানে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হলে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সকলের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। এই ধরনের বিপদের সামনে আমরা যদি ঔদাসীন্য ও সংকীর্ণচিত্ততার পরিচয় দিই, তাহলে আমাদের দেশের মানুষ কখনও আমাদের ক্ষমা করবে না।"

(২) ওয়ারশ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সামরিক মহড়ার নাম করে যেসব রুশ সৈনিক চেকোশ্লোভাকিয়ায় এসেছিলেন, তাঁরা সেখানকার মাটি ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করতে লাগলেন।

(৩) চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্তসহ সমগ্র রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্তে রুশ-বাহিনীর মহড়ার আদেশ দেওয়া হল। এই মহড়ায় যোগ দেওয়ার জন্য এমনকি রিজার্ভ বাহিনীকেও তলব করা হল।

(৪) সোভিয়েট সামরিকবাহিনীর মুখপত্র 'রেড স্টার' পত্রিকায় বলা হল যে, সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েট-বাহিনী প্রস্তুত।

(৫) 'প্রাভদা', 'ইজভেস্তিয়া' প্রভৃতি রুশ পত্রিকায় চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাবলীর কঠোর সমালোচনা করা হতে থাকল। প্রাভদায় একটি প্রবন্ধে এক জায়গায় লেখা হল, "চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে, শত্রুশক্তিগুলি সেই দেশকে সমাজতন্ত্রের পথ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে সমাজতন্ত্রের শিবির থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার বিপজ্জনক সম্ভাবনার সৃষ্টি করছে।" সেই প্রবন্ধে আরও লেখা হল, "এইসব ঘটনা অনিবার্যভাবেই সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমাজতান্ত্রিক গঠনের পক্ষে ও তার সাধারণ নীতিগুলির পক্ষে বিপদের সৃষ্টি করছে।"

(৬) সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদগোর্ণি একটি বক্তৃতায় বললেন, সোভিয়েট কম্যুনিস্টরা তাঁদের 'আন্তর্জাতিক কর্তব্যের প্রতি' বিশ্বস্ত থাকবে এবং চেকোশ্লোভাকিয়া যাতে তার সমাজতান্ত্রিক সমস্যাগুলিকে টিকিয়ে রাখতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে সে সম্ভবপর সর্বপ্রকার সহায়তা দেবে।"

চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর এইসব চাপ যখন আসছিল, ঠিক তখনই সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ থেকে তার কাছে আমন্ত্রণ এল দুই দেশের মধ্যে আলোচনা-বৈঠকে বসার জন্য। চেকোশ্লোভাকিয়া সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে জানাল, রাশিয়ায় গিয়ে আলোচনা করতে সে রাজী নয়, তবে সোভিয়েট নেতারা যদি চেকোশ্লোভাকিয়ায় আসেন, তাহলে সেখানে আলোচনা হতে পারে।

রাশিয়ার মুখের উপর দাঁড়িয়ে এই ধরনের কথা বলার আগে আলেকজেন্ডার ডুবচেক তাঁর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন নিলেন। কমিটি তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করলেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সমর্থনের দ্বারা শক্তিশালী হয়ে ডুবচেক জাতির উদ্দেশ্যে একটি টেলিভিশন বক্তৃতা দিয়ে বললেন, "জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যে-নীতির সূচনা হয়েছিল, সেই নীতি অনুসরণ করে চলতে আমরা সংকল্পবদ্ধ। স্পষ্টতই এর পিছনে আপনাদের সমর্থন আছে।" তিনি আরও বললেন, "জানুয়ারী মাসের আগের অবস্থায় আমরা ফিরে যাই, এটা জনসাধারণ হতে দেবে না।"

এই টেলিভিশন বক্তৃতায় ডুবচেক আরও কতকগুলি স্বকীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন। তিনি বললেন, "অতীতের ভুলের জন্য আমরা অনেক মূল্য দিয়েছি।...সমাজতন্ত্রকে তার মানবিক চেহারা ফিরে পেতেই হবে।...আজ বহু বছর পরে মানুষ তাদের মতামতের জন্য ভয় না পেয়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে পারছে।"

সর্বশেষ সংবাদ হচ্ছে যে, রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার মাটিতেই সে দেশের নেতাদের সংগে বৈঠকে বসতে রাজী হয়েছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে রাশিয়া স্পষ্টতঃই একটা গুরুতর উভয় সংকটের মধ্যে এসে পড়েছে। ডুবচেক ও তাঁর সহকর্মী অন্যান্য সংস্কারপন্থী কম্যুনিস্ট নেতারা যা করছেন সেটা সমাজতন্ত্রের পথ থেকে বিচ্যুতি, সোভিয়েট রাশিয়া ও তার প্রভাবাধীন অন্য চারটি পূর্ব ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের এই অভিমতের সংগে সব কম্যুনিস্ট পার্টি একমত নয়। ১৯৫৬ সালের অবস্থা আজ আর নেই। সেদিন আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যে একতা ছিল আজ তা অন্তর্হিত। কোনটা সাচ্চা সমাজতন্ত্র আর কোনটা নয় সেবিষয়ে রাশিয়ার কথাই আজ শেষ কথা নয়। সমাজতন্ত্রের পথ অনেক হতে পারে, একথা আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম আজ স্বীকার করে নিয়েছে। রাশিয়া, চীন, যুগোশ্লাভিয়া, কিউবা—এই সব দেশের সমাজতন্ত্রের কোনটার সংগে অন্যটার মিল নেই। চেকোশ্লোভাকিয়ার নতুন কম্যুনিস্ট নেতারা ইতিমধ্যে যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার সমর্থন লাভ করেছেন। যুগোশ্লাভিয়ার টিটো ও রুমানিয়ার কোসেস্কু জানিয়েছেন যে, প্রয়োজন হলে তিন ঘন্টার নোটিশে প্রাগে হাজির হয়ে তাঁরা চেকোশ্লোভাকিয়ার নতুন নেতৃত্বের প্রতি তাঁদের সমর্থন জানাবেন। ফ্রান্স, ইটালী, গ্রেট বৃটেন, জাপান ইত্যাদি কয়েকটি দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি চেকোশ্লোভাকিয়ার পার্টির নতুন কার্যক্রম সমর্থন করেছে। সুতরাং, প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, চেকোশ্লোভাকিয়া কম্যুনিজমকে স্বাধীন সংবাদপত্র, ব্যালট ভোট (এইবারই সর্বপ্রথম সেদেশে পার্টির নির্বাচনে গোপন ব্যালট ব্যবহার করা হয়েছে) ইত্যাদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংগে যুক্ত করার যে নতুন সাহসিক পরীক্ষা শুরু করেছে সেটা সমাজতন্ত্রকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে কিনা, এ বিষয়ে শেষ কথা কে বলবে?

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি দেখা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে, যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, চেকোশ্লোভাকিয়া সমাজতন্ত্রের পথ থেকে সরে যাচ্ছে তাহলেও রাশিয়া ও তার সহমতাবলম্বী অন্যান্য দেশ কি তাকে শুধরে দেওয়ার জন্য তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার লাভ করে? রাশিয়ার পক্ষ থেকে এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে যে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় যদি সমাজতন্ত্রের অবসান ঘটে তাহলে পূর্ব ইউরোপের সমস্ত সমাজতন্ত্রী দেশেরই নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। রাশিয়া আশংকা প্রকাশ করেছে যে, চেকোশ্লোভাকিয়া যে পথে চলেছে তাতে সেখানে পশ্চিমী দেশগুলি, বিশেষ করে পশ্চিম জার্মাণীর ঘাঁটি শক্ত হবে। চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান ঘটনাবলীর পিছনে পশ্চিমী শক্তিগুলির উস্কানি বা সহায়তা আছে, এই অভিযোগের সমর্থনে এখন পর্যন্ত একটা মাত্র নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, পশ্চিম জার্মাণীর সীমান্তের কাছে চেকোশ্লোভাকিয়ার কার্লভি ভেরি শহরে গোপন অস্ত্রের একটি ভান্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব অস্ত্রের মধ্যে আমেরিকান রিভলভার, সাব-মেসিনগান ইত্যাদি ছিল। এই অস্ত্রগুলি পশ্চিম জার্মাণী থেকে চোরাই চালান করে আনা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

কার্লভি ভেরির এই গোপন অস্ত্রভান্ডারের রহস্য যাই হোক না কেন, ১৯৫৬ সালের হাংগারির ঘটনার সংগে পশ্চিমী শক্তিগুলি যেভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন এবার সেভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে তাঁরা নিজেদের জড়াতে চাইছেন বলে মনে হচ্ছে না। চেকোশ্লোভাকিয়ায় রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা ছাড়া এই ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত আর [illegible] অভিমত প্রকাশ করে নি। [illegible] ঘটনার সময় "রেডিও ফ্রি [illegible]রোপের" মারফৎ যে ধরনের উচ্চগ্রামের প্রচারকার্য চালান হয়েছে এবার সেরকম করা হচ্ছে না। বৃটিশ সরকারও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা থেকে পশ্চিমী শক্তিদের তফাতে থাকাই ভাল। পশ্চিম জার্মান সৈন্যবাহিনীর একটি মহড়া বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ভুলবোঝাবুঝির সম্ভাবনা এড়াবার জন্য।

রাশিয়ার সামনে এখন যে উভয় সংকট সেটা হচ্ছে এই যে, সে যদি প্রকাশ্য হস্তক্ষেপের দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনার গতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করে তাহলে দুনিয়ার কম্যুনিস্ট আন্দোলনে ফাটল আরও গভীর হবে। অপরপক্ষে চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা যদি তার আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তাহলে সেখানকার উদারনীতির হাওয়া পূর্ব জার্মাণী,

হাঙ্গারি, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশের কট্টর নেতৃত্বকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে, এমন কি খাস সোভিয়েট রাশিয়ায়ও নতুন সংস্কারের দাবী ঠেকান সেখানকার নেতাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

রাশিয়া এই উভয় সংকট থেকে কিভাবে বেরোবে তার উপর আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করবে।

ভারত-সোভিয়েট

প্যাকিস্থানকে অস্ত্র যোগাতে রাজী হওয়ার জন্য সোভিয়েট রাশিয়াকে নিন্দা করে পার্লামেণ্টে যে প্রস্তাব এসেছিল সেটি গৃহীত হয় নি। কিন্তু এই উপলক্ষে যে আলোচনা হয়েছে তাতে ভারত-সোভিয়েট সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতকগুলি বিষয়ে মোটামুটি মতৈক্য প্রকাশ পেয়েছে।

যেমন একমাত্র স্বতন্ত্র দলের বক্তারা ছাড়া আর কেউই এই আতংক প্রকাশ করেন নি যে, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে চলার চেষ্টা করতে গিয়েই ভারতবর্ষ নিজের যাবতীয় বিপদ ডেকে আনছে। আবার একমাত্র দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা ছাড়া কেউই একথা বলেন নি যে, ভারত সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার নীতি আগে যেরকম বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল এখনও তাই আছে।

রুশ অস্ত্রসম্ভার পাকিস্থানের হাতে পড়লে পাকিস্থান-ভারত সম্পর্ক আরও খারাপ হবে, পাকিস্থানের পক্ষ থেকে যে আশ্বাসই দেওয়া হোক না কেন, বিদেশ থেকে সংগৃহীত অস্ত্র সে ভারতের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে, সোভিয়েট অস্ত্র হাতে পেয়েও পাকিস্থান চীন আমেরিকার প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না— ভারতবর্ষের এই সকল অভিমত বিতর্কের মধ্য দিয়ে ভালভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

এটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, পাকিস্থান রাশিয়ার কাছ থেকে যে অস্ত্রই পাক না কেন, ভারতবর্ষ সামরিক শক্তিতে তার তুলনায় এগিয়েই থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জানিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের দেশরক্ষার দিক দিয়ে এই রুশ অস্ত্র সাহায্যের ফলাফল কি হবে সেটা সঠিকভাবে জানার জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। শ্রীগান্ধী সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষের একদল সরকারী প্রতিনিধির রাশিয়ায় যাওয়ার কথা আছে। তারপর সোভিয়েট দেশরক্ষা মন্ত্রী ভারতবর্ষে সফর করতে আসবেন এবং তারও পর ভারতের দেশরক্ষা মন্ত্রী রাশিয়ায় যাবেন। এই সব আলাপ-আলোচনার পর পাকিস্থানে সোভিয়েট অস্ত্রসজ্জার প্রকৃত তাৎপর্যটা হয়ত আরও স্পষ্ট হবে।

বৈষয়িক প্রসংগ

মার্কিন বৈদেশিক সাহায্য

মার্কিন কংগ্রেসের হাউস অব [illegible]টেটিভস প্রেসিডেন্ট জনসনের [illegible] সাহায্য বিলের প্রস্তাবিত বরাদ্দ যেভাবে হ্রাস করেছে তা যদি শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে তাহলে বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলির ওপরেই তার চাপ পড়বে বেশি।

গত ১৮ জুলাই হাউসে বিলটি অনুমোদিত হয় বটে, কিন্তু তার আগে রিপাবলিকান ও রক্ষণশীল সদস্যরা মিলিত হয়ে বরাদ্দের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে ১৯৯ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার।

এই অঙ্ক হাউসের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির নির্ধারিত ২৩৬ কোটি ৪০ লক্ষ ডলারের চাইতে ৩৭ কোটি ৮ লক্ষ ডলার কম। পররাষ্ট্র কমিটির নির্ধারিত বরাদ্দও ছিল প্রেসিডেন্ট জনসনের দাবীর চাইতে কম।

বিলটি এখন সেনেটে গেছে। যদি সেনেটেও এই হ্রাস বজায় থাকে তাহলে ভারত, পাকিস্থান, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, তুরস্ক ও কয়েকটি ল্যাটিন আমেরিকান দেশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হাউসের প্রস্তাবিত ৩৭ কোটি ডলার হ্রাসের ফলে আফ্রো-এশীয় ৩৩টি দেশের ২০ কোটি টাকার মতো উন্নয়নমূলক সাহায্য এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, থাইল্যান্ড, লাওস, দক্ষিণ কোরিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক ও কঙ্গোর (কিনশাখা) প্রভৃতি সাড়ে ৫ কোটি ডলারের সামরিক সাহায্য হ্রাস পাবে।

একই সঙ্গে হাউস বিলেও কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন করেন যার ফলেঃ

এক, আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে অপরিহার্য না হলে সামরিক সাহায্যের জন্য বরাদ্দ তহবিল উন্নত অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রি করার জন্যে ব্যবহার করা চলবে না। গ্রীস, তুরস্ক, ইরান, ইস্রায়েল, ফরমোসা(?), ফিলিপিন্স ও দক্ষিণ কোরিয়া এ থেকে বাদ যাবে।

দুই, যদি কোন দেশ নিজের টাকা দিয়ে অন্য দেশ থেকে উন্নত অস্ত্রশস্ত্র কেনে তাহলে প্রেসিডেন্ট সম-পরিমাণ অর্থ অর্থনৈতিক সাহায্য থেকে কেটে নেবেন। অবশ্য কয়েকটি দেশের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকবে।

তিন, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার জন্যে ১ কোটি ডলার বিশেষ বরাদ্দ করা হবে।

চার, কিউবার সঙ্গে যে দেশ বাণিজ্য করে কিংবা যে দেশ তার জাহাজকে কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য করতে দেয়, সেই সব দেশে ঋণ বা সাহায্য কিংবা কৃষি পণ্য বিক্রি করা চলবে না।

পাঁচ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইস্রায়েলকে সর্বনিম্ন ৫০টি এফ-চার ফ্যান্টম জেট বিক্রি করার জন্যে আলোচনা আরম্ভ করবেন।

ষাটটি বসন্তের সুখ ও বেদনা

কুদ্দুর চৌধুরী

মনে করা যাক, আপনার পরমায়ু ঠিক ষাট বছরের। একথার মানে কি, আপনি একবারও ভেবে দেখেছেন কি?

আমিও অবশ্য ভাবিনি আগে, আমিও তো জানতাম না কিছুই।

আমার এক মাসতুতো ভাই আছে। আমারই সমবয়সী। তার মাথা ভর্তি ঠাসা যত সব উদ্ভট চিন্তা, বিদঘুটে ভাবনা, হজপজ ধ্যানধারণা। সে-ই একদিন আমাকে ষাট বছরের পরমায়ুর মানেটা—ষাট বসন্তের সুখ ও শান্তি; এবং তার জ্বালা ও যন্ত্রণা—হিসেব নিকেশ করে খানিকটা ধুঝিয়ে দিল।

তার অল্প কিছু যা আমার মনে পড়ছে, তাই আপনাদের জানাচ্ছি।

এখানে থাকছে ষাটের হিসাব; আপনি শতায়ু হলে হিসাবটা আনুপাতিক হারে বেড়ে যাবে মাত্র।

ষাটটা বসন্ত আপনার জীবনকে ছুঁয়ে গেল, দোলা দিয়ে গেল আপনার দেহমনে। তার মানে হচ্ছে, অঙ্কের হিসাবে ঐ সময়ের মধ্যে আপনার হৃদয়খানি—তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক বা যত বৃহৎই হোক—বিরাট একটা পরিশ্রমসাধ্য কাজের এক রেকর্ড সৃষ্টি করল। ঐ সময়ের মধ্যে আপনার হাতের মুষ্ঠির আকারের ছোট্ট হৃদযন্ত্রখানি নিপুণতার সঙ্গে এবং বিশ্বস্তভাবে মোট ২৫০ কোটি বার ধুক্ ধুক্ করবে। এবং প্রত্যেকটি ধুকধুকের মাধ্যমে আপনার শরীরের বিভিন্ন শিরা-উপশিরায় রক্ত সঞ্চালনের সাহায্যে সে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে। আর সেই সঙ্গে সেই একই সময়ে আপনার ফুসফুস নামক দেহযন্ত্রখানি প্রায় ৬০ কোটি বার একবার ফুলে উঠে একবার চুপসে গিয়ে প্রশ্বাস নিঃশ্বাসের সাহায্যে, আপনাকে বিশুদ্ধ বাতাসের অক্সিজেন নিয়ে দহন কার্যের মাধ্যমে আপনার দেহের প্রয়োজনীয় উত্তাপ জুগিয়ে চলবে, দিয়ে যাবে আপনাকে আপনার কর্ম করার শক্তিটুকু।

ঘুমাবেন কত দিন জানেন? ষাটটি বছরের মধ্যে প্রায় কুড়িটি নিরবচ্ছিন্ন বছরই আপনি ঘুমিয়ে কাটাবেন। একটানা বিশ সাল ঘুম—কুম্ভকর্ণের চেয়ে কম কি?

আপনি যদি পাঁচ বছর বয়সে ইস্কুলে ভর্তি হন এবং কুড়ি বছরের মধ্যে কলেজের পাঠ সমাপ্ত করেন, তাহলে মোট ৬৭৫ দিন বা একটানা প্রায় দু বছর বিদ্যাদেবী শ্রীসরস্বতীর শ্রীচরণে পঠনকার্যেই আপনার কেটে যাবে। এ হিসাবে ধরা হয়েছে যে আপনি মাত্র ১৮০ দিন বিদ্যালয় বা মহা-বিদ্যালয়ে যান; বছরের বাকি ছয় মাস বিদ্যাদেবীর নিকেতন বিদ্যালয়, মহা-বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে বলে ধরা হচ্ছে।

গৃহে পাঠাধ্যয়নে—প্রত্যহ তিন ঘন্টা করে—আপনার কেটে যাবে আরও ৬৭৫ দিন বা দুটো বছর।

এবার আসুন, অর্থ উপার্জনে আপনার কতদিন কেটে যাবে, তার একটা হিসাব নেওয়া যাক। বছরে, ধরা যাক, মাত্র ২৫০ দিন অফিসে যেতে হয়। দশটা পাঁচটা অর্থাৎ সাত ঘন্টার অফিস। বছরের আর কটা দিন আপনি নানাবিধ ছুটিতে কাটান। যথা—৫২টি রবিবার; ২৪টি গেজেটেড হলিডে বা সরকারী ছুটির দিন; ১৪টা ক্যাজুয়েল লিভ; ২৫ দিন বিশেষ ছুটি, যেমন অর্জিত ছুটি, মেডিকাল লিভ ইত্যাদি।

ধরা যাক, আপনি কুড়ি থেকে ষাট বছর পর্যন্ত ৪০ বছর এভাবে চাকুরী করলেন। তাহলে শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য আপনার জীবনের ৩,২৫০টি মূল্যবান দিবস বা নয় বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হবে। যদি কলকাতা বা বোম্বের মত বড় সহরে আপনার বাস হয়, তবে বাসে ইত্যাদিতে অফিসে যেতেই সম্ভবত আপনার একটা ঘন্টা কেটে যাবে এবং অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে আরও একটা ঘন্টা। তার মানে—এই শুধু যাওয়া আসাতেই, বাসে বা ট্রামে, কেটে যাবে আপনার জীবনের, সম্ভবত মূল্যহীন ৮৩৩ দিন অর্থাৎ প্রায় সোয়া দু বছর। আর যদি আপনি কৃষ্ণনগর বা বর্ধমান থেকে আসা প্রাত্যহিক যাত্রী বা ডেলি প্যাসেঞ্জার হন, তবে এই মূল্যহীন সময়টুকু ভীতিপ্রদভাবে বিরাট হয়ে দাঁড়াবে। এই সময়টা অবশ্যই মূল্যহীন, কেননা তা সার্থকভাবে কোন কাজে লাগছে না, পরন্তু গাড়ি ভাড়া বাবদ কিছুটা গাঁট গচ্চা দিতে হচ্ছে, সময় ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

প্রত্যহ যদি মাত্র তিন কাপ চা—সকালে এক কাপ, দুপুরে এক কাপ এবং বিকালে একটি—সেবন করেন, তাহলেও আপনি ১,৩২০ গ্যালন চা-ই শুধু পান করবেন।

সারা জীবনে আপনি প্রায় ১২ টন (বা ৩২৫ মণ) চাল, ময়দা, আটা বা অন্যবিধ তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ করবেন। দিনে একটি ডিম হিসাবে মোট ২২,০০০ ডিম খাবেন এবং দৈনিক মাত্র এক ছটাক হিসাবে নামমাত্র মাছ খেলেও মোট মাছ খাবেন প্রায় ৩৫ মণ।

কুড়ি বছর বয়স থেকে দিনে মাত্র দশটি সিগারেট সেবন করলেও ৪০ বছরে আপনি মোট ১,৪৬,০০০ খানি সিগারেট সেবন করবেন। একটি সিগারেট খেতে পাঁচ মিনিট সময় লাগলে আপনি আপনার জীবনের ৫০০ দিনেরও বেশি অবিচ্ছিন্নভাবে শুধু সিগারেট টেনেই কাটিয়ে দেবেন। ঐ সমস্ত সিগারেট জোড়া লাগালে তার মোট দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ১৪ মাইল। অর্থাৎ শিয়ালদহ থেকে ব্যারাকপুর বা হাওড়া থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত।

দু বেলা দুটো ভাত মুখে গুঁজে দিতে যদি প্রতি বারে ১৫ মিনিট করে লাগে, তাহলে শুধু খেতে খেতেই আপনার ৪৫০ দিন কেটে যাবে। মাত্র দশ মিনিটের তিনটি টিফিন—সকাল, দুপুর ও বিকালে একটি করে—তাতেও কেটে যাবে আরও ৪৫০ দিন।

১৬ বছর বয়স থেকে যদি দাড়ি কামাতে আরম্ভ করেন এবং যদি প্রত্যহ দাড়ি মাত্র এক মিলিমিটার করে বাড়ে, অর্থাৎ এক ইঞ্চির পঁচিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র—তাহলে সারা জীবনে আপনি সাড়ে ষোল মিটার বা ৫৩ ফুট লম্বা দাড়ি কেটে ফেলবেন এবং প্রত্যহ দশ মিনিট হিসাবে ঐ দাড়ি কামাতে আপনার সময় চলে যাবে ১১৫ দিন—বিরামবিহীনভাবে শুধু দাড়ি ছেদনের কাজে।

সারা জীবনে আপনি কত আর করবেন, জানেন কি? আপনি কি নিজেকে খুবই ক্ষুদ্র বলে ভেবে থাকেন? আপনি কিন্তু আসলে লাখপতি। মাছি মারা কেরাণী তো কি! মাসে দু শো টাকা আয় আপনার? তবু চল্লিশ বছরের চাকুরী জীবনে আপনার মোট আয় হবে এক লক্ষ টাকা। যদি আপনি ৩০০ থেকে ১০০০ টাকা বেতনক্রমের তথাকথিত অফিসার হন, তবে আপনার ঐ আয় হবে চার পাঁচ লাখ!

খরচ কত হবে, তার হিসাব ভুলে গেছি। আপনারাই তো জানেন ভালো।

আরও অনেক হিসাব সে দি[illegible]—সব আমার মনে নেই। অতিরিক্তের মধ্যে এটুকু মনে আছে—মানুষের শরীরে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ আছে,—কারবন, অক্সিজেন, হাইড্রজেন প্রভৃতি—তার সর্বমোট মূল্য হল সাড়ে সাত টাকা মাত্র! অর্থাৎ মানুষের দেহের বস্তু মূল্য হল মাত্র ঐ, তা আপনি অন্য অর্থে যত বেশি 'কিম্মতি'ই হোন না কেন—হাজারী, লাখপতি, এমন কি কোটিপতি তো বটে!

একজন মানুষের কতটা জমির দরকার? (How much land does a man require?) —আমি প্রশ্ন করেছিলাম তাকে, কাগজ কলম নিয়ে সে বসেছিল হিসাব কষতে। তাতে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম—যাক, এই উদ্ভট মানুষটি হিসাবের বেড়াজালে বাঁধা পড়ে টলস্টয় পড়বার অবকাশ পায় নি! তবে কি বলব, তার জীবনের মূল্য সাড়ে সাত টাকাও নয়!

কিরঘিজিয়ান মেডিকেল ইনস্টিটিউটে গবেষণারত ছাত্রীরা। দেশবিদেশে শিক্ষার আলোয় নারীরাও যে কতদূর অগ্রসর হয়ে চলেছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় নানাভাবে। এই গবেষণাকেন্দ্রে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের অধিকাংশই চিকিৎসা ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে থাকেন।

অঙ্গনা

জীবনের লড়াইয়ে

'আমার মত মেয়েদের কথা কখনো ভেবেছেন?'

কথাটায় যেন চমক ভাঙলো। সোজা হয়ে বসি। খতিয়ে দেখার চেষ্টা করি। অনেক চেষ্টার পরেও হদিশ কিছু পেলাম না। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই বলতে হলো, না আপনার মত মেয়েদের কথা ভাববার ফুরসত ঠিক হয়ে ওঠে নি। এরকম একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি যে আমাকে হতে হবে আদপে তা কোনদিন ভাবি নি। তাই আপনাদের ভাবনার কথা উঠতেই পারে না। স্পষ্ট স্বীকারোক্তির পর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। মুখ তুলে তাকাই মেয়েটির দিকে। বুঝবার চেষ্টা করি কি তার অভিযোগ।

'ঠেকা ঠোকর খেয়ে বেঁচে থাকাই আমাদের বিধিলিপি। শক্ত মাটিতে পা রাখার অনুভূতি যে কি আজও তা জানতে পারলাম না।'

একটু অবাক হলাম। কোন কিছু জিগ্যেস করার আগেই এরকম কথার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তবু নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে নিরীক্ষণ করতে থাকি। মোটেই ক্যাবলাভেজা নয় বরং বেশ দৃঢ় এবং ঋজু কণ্ঠস্বর। ওর চোখের কোণে যেন আগুন দপদপ করছে। যা সামনে পাবে তাই পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলবে। গাদ ফেলে সারবস্তুটুকু গ্রহণের চোখই বটে। সারা মুখ জুড়ে কি রকম একটা কাঠিন্যের ছাপ। হয়ত অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা পুইয়েছে। তারা স্পষ্ট করে নিজেদের দাগ রেখে যেতে ভোলে নি। কথায়ও সে রকমই মনে হচ্ছে। জীবনে নিরাপত্তার আস্বাদ ওর ভাগ্যে বোধহয় ঘটে নি। তাই এত নির্মম আর তীব্র চাউনি। মুখের রেখায় তার স্পষ্ট ইঙ্গিত।

এভাবেই ওকে বোঝার চেষ্টা করছিলাম। সন্ধানী দৃষ্টির সার্চলাইটে ওর অতীতকে আমার সামনে দাঁড় করাবার একটা ছেলেমানুষী সাধ যেন আমাকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু একটু পরেই হুঁশ হলো, এ বড় কঠিন ঠাঁই। আমার স্বল্প সঞ্চয়ের অভিজ্ঞতায় এ হিসেবের মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাছাড়া মাঝে-মাঝে ও আমার দিকে যেমনভাবে তাকাচ্ছিল তাতে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর আর একবার ওরকম তীব্র

চাউনীর পর তাই সকল সঙ্কোচ কাটিয়ে জিগ্যেস করে বসলাম, এরকম খাপছাড়া কথা না বলে সহজভাবে যদি আপনি নিজেকে বিবৃত করেন তাহলে আমার বোঝার সুবিধা হয়।

সেদিক দিয়ে না গিয়ে ফিক করে একটু হেসে মেয়েটি বলে উঠলো, আমার জীবনটাই যে ভীষণ খাপছাড়া। তাই কিছুতেই আপনার কাছে সহজ হতে পারছি না।

আমার কৌতূহল আরও বাড়লো। প্রথম কথার মধ্যেই কি রকম একটু খোঁচা ছিল। সেটা হৃদয়ঙ্গমে এতটা এগিয়েছি। তাই পিছিয়ে যাবার আর প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু কিভাবে এগুনো যায় সে নিয়ে মনে মনে তখন ভীষণ তোলপাড়।

নিতান্ত আকস্মিকভাবেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা। দু-এক-দিনের ছুটি কাটাতে শহরের কাছাকাছি বাইরে যাচ্ছিলাম। ট্রেনেই আলাপ। বছর কুড়ি-বাইশ বয়স হবে। স্বাস্থ্য মাঝারী, রঙ শ্যামলা। চেহারায় মন্দ নয়। জামা-কাপড় সাফসুতরো। দেহের কোথাও আভরণের বালাই নেই। স্বল্প যাত্রীর ভিড়ে নজর পড়তেই বুঝলাম মেয়েটি বেশ একটু স্বতন্ত্র ধরনের হবে। তাই উপযাচক হয়ে এগিয়ে গেলাম আলাপ করতে। দু-এক কথায় আলাপ প্রায় জমে উঠছিল। এমনি সময়ে এই বিপত্তি। আমার অতিরিক্ত কৌতূহলেই সে হয়তো আমাকে সন্দেহ করছে। তাই নিজের পরিচয় গোপন করে এলোপাথারি প্রশ্ন করছে। মনটা একটু দমে গেল। সাত-পাঁচ ভাবনা মাথায় ঘুরপাক খেয়ে ফিরতে থাকে। এত সহজে হার মানবো এ হয় না। ফলে কৌতূহলের মাত্রা আরো চড়েই গেল।

তারপরই দেখলাম মেয়েটির ব্যবহার যেন হঠাৎ কি রকম বদলে গেল। খোলস ছাড়ার প্রাণপণ চেষ্টায় ও একবার গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলো। সহজ-স্বাভাবিক হয়ে নিজেকে ধরা দেবার চেষ্টায় ও এবার তৎপর।

'সেই কবেকার কথা' আমি যেন স্বপ্নলোক থেকে ভেসে-আসা কণ্ঠস্বরে এক অনাস্বাদিত কাহিনী শুনছি, মা মারা গেছে। মায়ের সব কথা আজ আর ভাল করে মনেও করতে পারি না। তখন থেকেই আমি মোটামুটি অনাথ। তবু আত্মীয়স্বজন আছে। অবস্থাও বেশ সচ্ছল। তাই ততটা বুঝতে পারি নি। মোটামুটি দিনগুলি কাটছিল মন্দ নয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে স্বাধীনতার পরবর্তী পরোয়ানা জারী হয়ে গেছে। মান-সম্মান রক্ষার জন্য দেশত্যাগ তাই অবধারিত। আমি অতশত না বুঝলেও বাবার হাত ধরে সীমান্ত পেরিয়ে এলাম। মনে মনে ভাবলাম, স্বাধীন দেশে নিশ্চিত আশ্রয়ের কোন সমস্যা আর হবে না। তাছাড়া রঙীন কল্পনার আনাগোনাও বড় কম নয়। নতুন দেশ দেখব, সবচেয়ে বড় কথা ট্রাম-গাড়ী দেখার স্বপ্ন তখন আমাকে পুরোপুরি পেয়ে বসেছে। তাই প্রদীপের তলায় অন্ধকার তখন চিন্তায় আসে নি। আর বয়সটাও সেদিক থেকে অনুকূল নয়।

কলকাতা শহর আমার স্বপ্নে দেখা, কল্পনায় গড়া। প্রথম কয়েকদিন তাই প্রাণভরে শহর দেখতে লাগলাম। মনের সঙ্গে চোখে দেখার হিসাব মিলিয়ে নিতেই তখন আমি নিতান্ত ব্যস্ত। শহরের মোহিনী মায়ায় আমি একান্ত বশীভূত। খোঁজ-খবর করে বাবার কাছ থেকে শহর সম্বন্ধে আরো সব চমকপ্রদ নানা জিনিষ জানতে পারি। কত না ভাল লাগে। চিড়িয়াখানা, মিউ-জিয়ম সর্বত্র বাবার হাত ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি। চিড়িয়াখানার বাঁদরদের কলা-ছোলা ছুঁড়ে দিয়ে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছি।

অত আনন্দে তখন আর খেয়াল করে উঠতে পারি নি যে, এমন একদিন আসতে পারে যে, আমাকেও চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ার মনে করে কেউ কেউ হাততালি দেবে। আর এসব প্রসঙ্গ আসারই কোন কারণ ছিল না। ছিলাম বাবার নিরাপদ আশ্রয়ে।

মেক্সিকোর হার্ডল চ্যাম্পিয়ন (আশী মিটার) কুমারী এনরিকোয়েটা ব্যাসিলিও (২০)। অক্টোবরে ওলিম্পিক ক্রীড়া উদ্বোধন লগ্নে কুমারী ব্যাসিলিও পুত মশাল হাতে ওলিম্পিক ষ্টেডিয়ামে শেষ চক্কর দৌড়বেন। এর আগে মশাল হাতে দৌড়ের অধিকার তরুণদেরই একচেটিয়া ছিল।

তাই অতশত ভাবনার ধার ধারতাম না। কিন্তু প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে তলে তলে। কিছুই টের পাই নি। আর টের পেলেও কিছু করার উপায় নেই, একমাত্র চোখ ফুলিয়ে জলের ধারা বইয়ে দেওয়া ছাড়া। একাজে আমি চিরকাল অপটু। কাঁদতে শিখি নি। তাই এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, কাঁদতে না জানার এই কঠিন প্রকৃতিই হয়তো আমার কানে কানে রোজ রোজ বাঁচার মন্ত্র দিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ এক সকালে আমি অনাথ আশ্রমে স্থানান্তরিত হলাম। কারণ জানার উপায় ছিল না। ততদিনে বাবাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে আর একজন। দেশ ছেড়ে এসে বাবা আবার বিয়ে করেছেন। এখন বুঝি সেই সংসারে আমি প্রয়োজন-

তিরিক্ত হয়ে পড়েছিলাম। বাবা নিজে এসে আমাকে আশ্রমে রেখে গেল। অনেক টফি-লজেন্স কিনে দিল। আর বলে গেল, এখানে আমার পড়াশোনার সব বন্দোবস্ত হবে। তিনিও নিয়মিত এসে আমার খোঁজ-খবর করবেন। মাথার ওপর মা না থাকলেও বাবা আছেন। আর সংমার চেহারাও তখন আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। তাই ভাবলাম, এটা ভালই হলো। পড়াশোনার সুযোগ পাব। বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবো। নিজের খুশিমত নিজেকে গড়ে তুলবো। আমার উপর খবরদারি করার কেউ থাকবে না। তবে বাবাকে সুখী করবো। আমার বয়স এখন সাত আর বছর দশ-পনেরোর মধ্যে সংসারের চেহারা আমূল বদলে দেব। কিন্তু কল্পনার ডানা মেলতে না মেলতেই যে তা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে তা ভাবতেও পারি নি। আমাকে রেখে বাবা চলে গেলেন।

অনাথ আশ্রমে অনেক মেয়ের ভিড়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে প্রথম প্রথম রীতিমত অসুবিধা হতো। কেউ কেউ ঠাট্টা করতো, বাবা বুঝি তোকে ত্যাজ্য করলেন? আবার কেউ কেউ বলতো, বাবা বুঝি নিজের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন? সংমার তাড়ায় তাই অনাথ আশ্রম।—এসব কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। আবার ভরসাও হতো না বাবাকে জিগ্যেস করি। তাই চুপচাপ বন্ধুবান্ধবের হাসি-তামাসা সহ্য করেছি। পরে বুঝেছিলাম, বয়সে আমার বড় হওয়ায় ওদের অভিজ্ঞতারও বিস্তৃতি ছিল। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই ওরা এসব কথা আমাকে জিগ্যেস করতো। কিন্তু তখন খুব একটা মাথা ঘামাই নি। আসলে মাথায়ই কুলতো না। নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম।

মাঝে মাঝে বাবা আসতো। কাছে বসে সব খোঁজ-খবর নিত। এরকমভাবে কয়েক বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে জেনে গেছি এখানে লেখাপড়া, ক্লাশ সেভেন পর্যন্ত। তারপর আর কোন ব্যবস্থা নেই। বাবাকে জিগ্যেস করলাম এর পর কি হবে? হাসি মুখে বাবা জানালো, তারপর তুই বাড়ী থেকেই পড়বি। আনন্দ আরো বাড়লো। কিন্তু দুঃসংবাদ যে এত তাড়াতাড়ি নিজের রাস্তা করে নিচ্ছিলো তা বুঝতে পারি নি। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, বাবা আর নেই। একবার ছুটে যেতে চেয়েছিলাম বাড়িতে। আশ্রম থেকেই জানানো হলো যে, সেখানে আমার কেউ নেই। সেদিন বুঝলাম যে, পৃথিবীতে আমি একান্ত নিঃসঙ্গ। একা। অনেক কষ্টে চোখের জল চেপে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছি।

কষ্টে-সৃষ্টে আশ্রমে দিন কাটাই। আর ভাবি কোনদিন যদি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি তাহলে আর কোন ভাবনাই থাকবে না। কিন্তু শিগগিরই সে ভাবনাও প্রতিহত হলো। আশ্রমের শিক্ষার শেষ পর্যায়ে গিয়ে জানতে পারলাম যে, এরপর আশ্রম আমার আর কোন দায়িত্ব নেবে না। কি রকম অবাক লাগলো। বাবা বেঁচে থাকতে আমি অনাথ আশ্রমে এলাম। অথচ বাবা মারা যাওয়ার পর আমি যখন প্রকৃত অনাথ হলাম তখনই অনাথ আশ্রমের আশ্রয় আমার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। নানা দুশ্চিন্তা ঝাঁক বেঁধে এসে আমাকে খুবলে খেতে চায়। এমন কোন হাতের কাজও জানা নেই যা থেকে মোটামুটিভাবে একটা পেটের দায় মেটাতে পারি। এখানেও এই সাধারণ শিক্ষাটুকু ছাড়া আর কোনকিছু শেখানো হয় নি। মনে মনে ভাবলাম, এখানে যদি সেরকম কিছু বন্দোবস্ত থাকতো তাহলে বড় সুবিধে হতো। অথচ আজকাল নাকি চারদিকে মেয়েদের হাতের কাজ শেখানোর কত বন্দোবস্ত হয়েছে। তবে অনাথ আশ্রমে অনাথ মেয়েদের তা শেখানোর কোন ব্যবস্থা নেই কেন?

পরীক্ষা দিলাম পাশও করলাম। তারপরই শুরু আজকের কাহিনী। পাশ করার পর আমাকে এক মাসের নোটিস দেওয়া হলো আশ্রম ছাড়ার। অবশ্য আমার প্রার্থিত নিরাপদ আশ্রয়ে তাঁরাই আমাকে পেঁছে দেবেন অথচ এর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় তখন আর আমার নেই। যা হোক বেরিয়ে পড়লাম দূর সম্পর্কের এক দাদার উদ্দেশ্যে। তার কাছে অভ্যর্থনাটা খুব ভাল ঠেকল না। কিন্তু তখন আমি নিরুপায়। ওখানে কয়েক দিন কাটালাম। আর দাদাকে বললাম, হাতের কাজের একটা বন্দোবস্ত করে দিতে। দু-এক দিনেই বুঝলাম দাদাকে দিয়ে কিছু সম্ভব নয়। এদিকে ভাজের প্রাণান্তকর নিষ্ঠুরতা। স্বপ্ন সব তখন মুছে গেছে। তাড়াতাড়ি কিছু একটা জুটিয়ে নেবার তাড়নায় আমি মরীয়া।

বাড়ির কাছাকাছি ছিল একটি আগরবাতির কারখানা। সরাসরি একদিন মালিককে গিয়ে ধরলাম। যে কোন মাইনেয় যে কোন কাজে আমি প্রস্তুত। সেদিন থেকে এই কাজে বহাল আছি আগরবাতির কাজ শিখেছি। এখন আমি কলকাতার দোকানে দোকানে আগরবাতি দিয়ে আসি কোম্পানীর তরফে।

মেয়েটি থামলো। এতক্ষণে আমার নজর পড়লো, সাইড ব্যাগে ভর্তি আগরবাতির দিকে। জীবন সংগ্রামে হাজারো পোড়-খাওয়া মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলাম।

আমাকে কিন্তু কোন সমীক্ষার সুযোগ না দিয়ে মেয়েটি উত্তর চাইলো, আমার মত মেয়েদের ভবিষ্যৎ কি বলতে পারেন?

বলতে পারি নি। সত্যি, উত্তরটা আমার জানাও নেই। তাই স্টেশন আসতেই আত্মরক্ষার তাগিদে নেমে পড়লাম। **প্রমীলা**

রাতের শহর
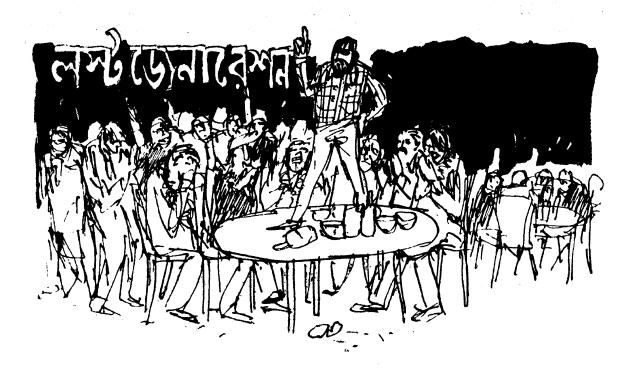
জাহাজীটোলা। মধ্য কলকাতার একটি দিশি মদের দোকান-কাম-বার। চারপাশে ঘেরা—মাথার ওপরে খোলা আকাশ। প্রায় তিন-চারশো লোক একসঙ্গে বসে মদ্যপান করতে পারে, এমন ঢালাও ব্যবস্থা। তাছাড়া ঘর আছে গোটা দুয়েক, বার-স্ট্যান্ডেও অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুশো, তিনশো শাস্তি করে খায়। একজন বয়স্ক লেখককে দেখেছি, একশ খেয়ে-ই দ্রুত বেরিয়ে যেতেন, তারপর সামনের একটা পার্কের চারপাশ প্রদক্ষিণ করে আবার এসে একশ খেতেন। এভাবে ছ-সাত রাউন্ড খাওয়ার পর স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে চুপ-চাপ র‍্যাকের বোতলগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতেন। একদিন বেশ একটু সাহস নিয়ে তাঁকে তাঁর এ-হেন আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কিছুক্ষণ খুদে-খুদে চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। শেষে একটু হেসে বললেন, 'দ্যাখ্, সব সময়ই চেষ্টা করবি স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে। প্রথমত, তুই একটু নেশা হলেই বোতল-গুলির সঙ্গে একটা অ্যাকিনুনেস ফিল করবি; দ্বিতীয়ত, বেশী নেশা ধরে গেলে বড়জোর বসে পড়বি। কিন্তু প্রথম থেকেই বসে বসে খেতে শুরু করলে তোকে ধরা-শায়ী হওয়া থেকে ঠেকাবে কে?'

আমার পরিচিত আর একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক জাহাজীটোলার সদর দরজার কাছে রুমালে একরাশ লেবুর টুকরো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। পরিচিত কাউকে ঢুকতে দেখলেই তার হাতে একটি টুকরো দিয়ে তার লিভার বাঁচানোর দায়িত্ব পালন করতেন। আর বলতেন, 'মাল খেয়েই কাঁচা-জল দিয়ে দাঁত ধুয়ে ফেলবি, দেখবি, বুড়োবয়েস অব্দি দাঁত ঝকঝক করবে।'

নানা ধরনের লোক এখানে আসে। বহু পয়সাঅলা মানুষ আছেন, যাঁরা বিলিতি ছোঁন না, লাল টকটকে ভারি চেহারা, সাঁ করে সন্ধ্যের মাথায় ঢুকে পড়েই বেয়ারাকে ডেকে একটা পুরো এক নম্বর বোতল হুকুম করেন। ফিল্ম লাইনের লোক, কবি-লেখক, কাগজের লোক, উকিল, সোনার চেন গলায় দেয়া কালকাতার বাবু থেকে গুণ্ডা খালাসী, বেনে-পাতির দোকানদার মায় উঠতি বয়সের মস্তানেরা পর্যন্ত। মাঝে মাঝে ভারি হাল্লাগুল্লা হয়, ঘুষোঘুষি চলে, ছুরি ঝলসে ওঠে কখনো [illegible]। বেঞ্চি ভাঙা, গ্লাশ ছুঁড়ে ফেলা—[illegible]তো রোজকারের জলভাত। আর বার-স্ট্যান্ডের ঠিক মাঝখানে উঁচু কাঠের টুলে ধ্যানী বুদ্ধের মতো স্তিমিতনেত্রে বসে থাকেন ব্রঞ্জের বিশাল মূর্তির আদলে দোকানের মালিক কথ-বাবু—পরিচিতদের কাছে কথ-দা। কোনো তাপ-উত্তাপ নেই, সন্ধ্যে থেকে মাঝরাত্তির অব্দি মাপা গ্লাসে কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে মদ ঢেলে দিচ্ছেন খদ্দেরদের—গুনে-গুনে খুচরো পয়সা ফেরত দিচ্ছেন।

কোন এক শনিবার হবে। সারাদিন অসম্ভব গুমোট গেছে। বিকেল হতে না হতে আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। সন্ধ্যে নাগাদ শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি! জামা-কাপড়-মাথা সামলে কোনরকমে জাহাজীটোলায় এসে পৌঁছলাম। পিঁপড়ে গলে না, এমন থই থই করছে লোকজনে। ভীড় ঠেলে বহু কষ্টে বাঁ-দিকের এক কোণে এসে

বসতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। একদল যুবক—প্রত্যেকের গলায় শাদা কাগজ-ফুলের মালা, অনেকগুলো খড়ি-বোতল সাজিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে মাথা নীচু করে বসে আছে। চার পাশের হল্লা-হট্টগোলের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। বেশ কিছুক্ষণ বাদে দলের মধ্যে একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে চীৎকার করে উঠল, 'ঐ—ঐ যে উনি এসে গেছেন।' সবাই উঠে একযোগে বলল, 'আসুন, আসুন; বসতে আজ্ঞা হোক।'

আমার কাছাকাছি বসেছিলেন একটি ইংরেজি দৈনিকের রিপোর্টার। তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু-নেত্রে তাকাতে তিনি আমার কানে-কানে বললেন যে, ঐ যুবকেরা, যারা নিজেদের লস্ট জেনারেশনের কবি বলে দাবি করে, তারা একজন বিশিষ্ট মৃত কবির জন্মোৎসব অত্যন্ত অভিনবভাবে পালন করার জন্য সমবেত হয়েছে। তাদের একাগ্র ধ্যানে মৃত কবিটি মহাশূন্যে আর থাকতে না পেরে স্পিরিটের আকারে বোধ হয় এতক্ষণে নেমে এসেছেন।

একটি যুবক উঠে আমাদের কাছে ধূপকাঠি চাইল। নেই শুনে হতাশ হয়ে একটু এগিয়েছে, অমনি আমার পরিচিত সাংবাদিকটি তাকে প্রশ্ন করে বসলেন, 'বিরাজবাবুর জন্মোৎসব আপনারা এখানে পালন করছেন কেন?' ছাইরঙা পাঞ্জাবি-পরা অপর-একটি রোগাটে যুবক উত্তর দিল, 'মৃত্যুর পর-পরই এ বিষয়ে তিনি আমাদের কাছে একটা গোপন মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া যে-কোন ভাড়াটে মণ্ড, হল্ বা সদনের মতো শৌখিন জায়গা-গুলোকে তিনি আজীবন ঘৃণা করেছেন।'

টি-শার্ট ও পা-জামা পরিহিত একটি যুবক—হয়তো এদের দলপতি, মুখে আঙুল পুরে প্রায় সাপ-খেলানো সুরে দীর্ঘ সিটি বাজাতে লাগল। যেহেতু টেবিলের ওপরে মাইক, ফটো ইত্যাদি রাখার বাবুগিরি ঝামেলা ছিল না, দুটি উন্মত্ত তরুণ সমস্ত জায়গা জুড়ে মাটির গেলাস-গুলি সাজিয়ে প্রতিটিতে সমান মাপে মদ ঢেলে ফেলল। 'প্রিয় বন্ধুগণ, আমরা সবাই এখন বিরাজবাবুর মৃত আত্মার সম্মানে দেড় মিনিট গেলাস হাতে করে দাঁড়াবো—' টি-শার্ট পরিহিত যুবকটির নির্দেশে লস্ট জেনারেশনের সবক'টি কবি একযোগে ঝান্ডার লাঠির মতো মদে ভর্তি খুরিগুলো মাথার ওপরে উঁচু করে ধরে দাঁড়াল। একজন একটি উদ্বোধনী সংগীত গাইবার চেষ্টা করছিল, তাকে থামিয়ে দেয়া হল। শ্রদ্ধা-সম্মান এসব নিবেদন করার পর টি-শার্ট বলে উঠল, 'বিরাজ মুন্সীই হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র পিতা। আর সবাইকে তিনি তাঁর পদ্যের ছুরি চালিয়ে খতম করে দিয়েছেন।' ভক্তদের প্রচন্ড হাত-তালি শেষ হতে না হতে তার নির্দেশে অপর একটি বেঁটে-আকৃতির দাড়ি-গোঁফ না ওঠা ছেলে মিহি অথচ তীক্ষ্ণগলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এখন আমি বিরাজবাবুর সম্মানে আমার সদ্য-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'পরিবার পরিকল্পনা' থেকে 'প্রেতের সঙ্গে অলৌকিক কথাবার্তা' পদ্যটি পড়ছি। এই পদ্য লাথি মেরে বাংলা কবিতার সমস্ত পুরোনো চেহারা ভেঙে ফেলেছে।' সঙ্গে সঙ্গে লস্ট জেনারেশনের আরও দুজন কবি প্রায় তার মুখের ওপর হামলে পড়ে পকেট থেকে একগাদা কাগজ বের করল। একজন প্রবীণ হিন্দিভাষী ভদ্রলোক, যিনি এসব দেখে বোধ হয় খুবই অনুপ্রেরণা পাচ্ছিলেন, লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'হামারা প্রিয় কবি ভরদ্বাজী কি......।' ভদ্রলোক কথা শেষ করার আগেই মুখে জলপ্রপাতের মতো দাড়ি, গায়ে ঢোলা জামা একটি ছোকরা হাইজাম্প দিয়ে টেবিলে উঠে এক পদাঘাতে একরাশ খুরি গুঁড়িয়ে দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ভঙ্গীমায় দাঁড়িয়ে বলল, 'বিরাজ-বাবু এখনি, এই মুহূর্তে, এখানে বেঁচে উঠছেন—আমার মধ্য দিয়ে বেঁচে উঠছেন—ফ্রম রেসারেক্শন টু লাইফ...... ফ্রম রেসারেক্শন্ ......'।

দলের অন্যরাও ততক্ষণে টেবিলের ওপর এক-একটি আইফেল টাওয়ার হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

একটু দুর্বল প্রকৃতির লোক আমি--এত টেন্শান সহ্য করতে পারছিলাম না। তাড়াতাড়ি শেষ ঢোক গিলে দরজা দিয়ে বেরোতে যাবো, হঠাৎ এক পুরোনো বন্ধু আমাকে পেছন থেকে জাপটে ধরল। আমি ফিরে তাকাতেই সে ঝন্-ঝন্ করে কাঁচ-ভাঙা হাসিতে ফেটে পড়ল। বিব্রত গলায় বললাম, 'অনিল, কি ব্যাপার রে?' অনেকক্ষণ টেনে টেনে হাসার পর একটু চুপ করে থেকে অনিল বলল, 'ঝাড়া তিন বছর বাদে আজ একগাদা মাল মুখ দিয়ে উগরে ফেলেছি। ডাক্তার বলেছিলেন, মাল খেয়ে ওগড়াতে পারলে জানবেন, আপনার লিভার ভালো আছে। কি দুশ্চিন্তায় ছিলাম যে, তিন বছর। চ', ভালো লিভারের অনারে দুজনে চুপচাপ আর একটা পাঁইট মেরে দিই। দাঁড়িয়ে থাকিস না— দি নাইট ইজ ইয়ং।'

॥৩৬॥

এরপর আর সুরবালা জোর করে নি। করা উচিত হবে না—সে বুঝেছিল। যার মনে এমন প্রতিক্রিয়া হবে জানলে এখন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা মুখেই আনত না—আর কিছুদিন অপেক্ষা করত। কিন্তু এখন আর পিছনো যায় না। ওঁদের সম্মতি জানিয়ে চিঠি লেখা হয়ে গেছে, আনন্দ বাবা হয়ত এর মধ্যেই কতক উদ্যোগ-আয়োজন শুরু করে দিয়েছেন। সম্ভবত লোকজনও বলা হয়ে গেছে—গুরুদেব ঐ-দিন আসবেন বলে খবর পাঠিয়েছেন—এখন বন্ধ করা মানে বহু হাঙ্গামা। আনন্দবাবার নিজের কোন স্বার্থ নেই—এসবে থাকতে চানও না, তাঁর সাধন-ভজনে বিঘ্ন হয়, নিছাৎ সুরবালার পীড়াপীড়িতেই এতটা খাটছেন। বিশেষ গুরুদেব— আজ-কাল শহরে-লোকালয়ে আসতেই চান না. সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেও ঘোরতর আপত্তি তাঁর—সুরবালার মুখ চেয়ে নিজে থেকেই আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখন এতদূর এগিয়ে প্রতিষ্ঠার তারিখ পিছোলে ওঁরা হয়ত বিরক্ত হবেন, ভবিষ্যতে আর কোন সহযোগিতা করবেন না।

তাই অত্যন্ত উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা এবং একটা অপরাধবোধ নিয়েই এত বড় একটা শুভকাজে যাত্রা করতে হল। এতদিনের সাধ, এই এক বছর প্রায় নিশি-দিনের স্বপ্ন—সার্থক হতে চলেছে, যা ছিল সুদূর কল্পনা তাই বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে; এই এক বছরের টানাপোড়েন ছুটো-ছুটির শেষ হল এবার—সাগ্রহ প্রতীক্ষার অবসান—তবু মনে এতটুকু আনন্দ অনুভব করতে পারল না। যা তার জীবনে অনেকখানি, মা তার জন্যে অনেক করেছে; —সেই মা শুধু মরণকাল আসন্ন বলেই নয়—মা তার এই কাজে কতখানি কষ্ট পেলেন ভেবেই খারাপ লাগছে তার। তারা যখন উৎসবে ব্যস্ত থাকবে—তখন এখানে একা এই শূন্য বাড়িতে সেই উৎসব কল্পনা করে হয়ত তাঁর চোখে জল পড়বে—হয়ত হাহাকার করবেন মনে মনে—তার পরেও কি ওর কাজ সফল হবে—ঠাকুর কি তার পুজো প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারবেন?...

খুবই অসহায় আর অবসন্ন বোধ করতে লাগল সুরবালা যাওয়ার সময়। তবু এর মধ্যে—আর কে-ই বা আছে তার—নানুকে ডেকে পাঠিয়ে তার মত জিজ্ঞাসা করেছিল। নানু সব শুনে চুপ করে ছিল অনেকক্ষণ। সেও নিস্তারিণীকে ভালবাসে। দোষেগুণে মানুষটা, তবু গুণই বেশী, তাছাড়া ওর মনের ভাবটাও সে জানে—এই মেয়ে যে ওর কতখানি, গর্ভেধরা সন্তানেরও বেশী—তা নানুই বরং ভাল জানে। তারও চোখ ছলছল করতে লাগল সব শুনে। তবু বললে, 'না, ও তুই চলেই যা। আগে তো মার কথা শুনিস নি, জননীর তো কোন কালেই মত ছিল না—এখন এতদূর এগিয়ে আর এসব ভেবে লাভ কি! এও তোর ঠাকুরেরই পরীক্ষা—মায়া মমতা ঘৃণা লজ্জা ভয় সব বিসর্জন দিয়েই তাঁকে পেতে হয়।...যদি করতেই হয়, আর করবি বলেই তো এত কাণ্ড করলি—অনর্থক পিছিয়ে লাভ নেই। বুড়ির কথা শুনে মনে হচ্ছে মরবেই এবার। সে তখন আরও হাঙ্গামা, শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়ার আগে ওকথা ভাবাই যাবে না। তখন আবার শোকের মধ্যে আরও মনে হবে এই জন্যেই মা এত তাড়াতাড়ি মল, আত্মহত্যের মতো করে—সে একটা উলটো অনুতাপ।...না, শ্রেয় কাজ দেরি করে লাভ নেই। তুই চলে যা, আমি এ কদিন বরং—কথা দিচ্ছি, এখানেই থাকব। রাতটা সকালটা তো দেখাশুনা করতে পারব—তেমন বুঝলেই টেলিগ্রাম করে দেবে। তুই দুগ্গা বলে রওনা হয়ে যা—'

যাওয়ার সময় সুরো মাকে প্রণাম করতে গিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠল। নিস্তারিণীও সেই ছেলেবেলার মতো বুকে চেপে ধরে—জোর করে মুখটা তুলে চুমো খেয়ে বলল, 'দূরে পাগলি, কাঁদছিস কেন? শুভকাজে যাচ্ছিস—ভাল মনে যা। পেছনে টান রাখিস নি। মা কি আর কারো চিরদিন থাকে—না থাকলেই চিরকাল তাকে দিয়ে কাজ পাওয়া যায়? মন যখন ঠিক করে ফেলেছিস, ভাল কাজ করছি বলে মনে জেনেছিস তখন আর মিছে মন খারাপ করিস নি। দোনোমনোও করিস নি। নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যা, আমি বলছি, সব ভালভাবে হয়ে যাবে।'

'ফিরে এসে তোমাকে দেখতে পাবো তো-মা?' যেন কোনমতে প্রশ্নটা করে ফেরে সুরো।

নিস্তারিণী হাসে, 'এই দ্যাখো—মরণ-কালে তোর জল না খেয়ে যাবো? ছেলে তো একটা খবরও পাবে না, অশৌচ পালা তো দূরের কথা।...তাকে খবরও দিসনি কিছু। তোর জলই আমার ভাল। তুই-ই শ্রাদ্ধ করবি এই বলে গেলুম, তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না। যাই হোক—সেসব এখন ভাবার দরকার নেই. দুগ্গা বলে বেরিয়ে পড় দিকি, সেখানের কথা ভাব—আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

দরজা পর্যন্ত এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল নিস্তারিণী, মেয়ের মাথায় হাত রেখে ইষ্টমন্ত্র জপ করে আশীর্বাদ করে বিদায় দিল।

বৃন্দাবনে গিয়ে অবশ্য আর খুব একটা মন-খারাপের অবসর রইল না। এখানে যে এত বৃহৎ ব্যাপারের আয়োজন করে রেখেছেন এঁরা—তা সুরো কল্পনাও করেনি। দুজন ঋত্বিক এসেছেন—যজ্ঞ করবেন বলে। পুজো-পাঠ অভিষেকের জন্যে আর দুজন। যে পুজারী নিত্যসেবা করবে ভোগ রাঁধবে—সে তো আছেই। এছাড়া গীতাপাঠ-ভাগবৎ পাঠের জন্যে পৃথক লোক। কাজ শেষ হলে একশো আটটি ব্রজবাসী ভোজন হবে— সে আয়োজন আলাদা। সুরোর ঐটুকু বাড়িতে জায়গা হবে না বলে আনন্দবাবা সাম[illegible] একটা বাড়িতে রান্নাখাওয়ার [illegible] করেছেন। অবশ্য ব্রাহ্মণভোজনের আ[illegible] কলকাতার মতো এত বিবিধ বিচিত্র নয়। পুরী, একটা তরকারী চাটনি, খাস্তার কচুরি ও লাড্ডু। বোঁদের লাড্ডু—চিনি-কচ্‌কচে, এই নাকি এদের সবচেয়ে প্রিয় খাবার। পনেরো সের বেসন, পনেরো সের ঘি আর দেড়মণ চিনি ধরা হয়েছে লাড্ডুর জন্যে।

অন্য অনেক মিষ্টির কথা তুলেছিল সুরবালা—এই চিনির ডেলা খাওয়াতে ঠিক ওর মন সরছিল না—কিন্তু আনন্দবাবা নিষেধ করলেন। বললেন, এ লাড্ডু না খাওয়ালে ওদের মন উঠবে না। এই বলে তিনি একটি গল্প করলেন, বাংলাদেশের কে রাণী সম্প্রতি এসে বাংলাদেশ থেকে ভাল সন্দেশ রসগোল্লা, এখানকার রাবড়ি পেঁড়া এইসব মিষ্টি করিয়েছিলেন, পুরীর সঙ্গে তিনচার রকম রসনাতৃপ্তিকর ব্যঞ্জনেরও

আয়োজন ছিল। খেলও সকলে আনন্দ করে, অশীর্বাদও করল। কিন্তু বাড়িতে ফিরে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—'ছোট্ট রাজত্ব, তার রাণী—কীই বা ক্ষমতা, যাই হোক, যা খাইয়েছে বেশ খাইয়েছে। যথাশক্তি তথা-ভক্তি—শ্রদ্ধা করে যা আয়োজন করেছে তাই আমাদের ঢের। জয়পুরের মহারাজার মতো পয়সা ওরা কোথায় পাবে বলো! ঐ ব্রাহ্মণ-ভোজনের দিনকতক আগেই নাকি জয়পুরের মহারাজা ব্রজবাসীদের ডেকে একটি করে থালার মতো খাস্তার কচুরি, আর এক-এক সের ওজনের একটি করে ঐ চিনি কচকচে লাড্ডু, তার সঙ্গে এক টাকা ক'রে দক্ষিণা দিয়েছিলেন!

আনন্দবাবা হেসে বললেন, 'আর সে খাস্তার কচুরি কি জানো তো, দেওয়ালে ছুঁড়ে মারলে লৌট্‌কে এসে—মানে ঘুরে এসে তোমার কোলে পড়বে তবু কোথাও এতটুকু ভাঙবে না—সেই হল খাস্তার কচুরি।'

'সর্বনাশ! সেই কচুরিই এখানে হচ্ছে নাকি?'

'আলবৎ! নইলে এরা খুশী হবে কেন! আসলে এঁদের খাওয়ানোই তো তোমার উদ্দেশ্য, নিজেদের জন্যে তো করছ না? তবে, খেতে খুব খারাপও না, যদি দাঁতে জোর থাকে আর চোয়ালে—চিবিয়ে দেখো, খেতে ভালই লাগবে।'

সুতরাং সেইরকমই ব্যবস্থা হল—অতি-রিক্ত হিসেবে সুরবালা একরকম জোর করেই রাবড়ির ব্যবস্থা করল। তিন আনা সের উৎকৃষ্ট রাবড়ি—এও যদি ব্রাহ্মণরা না খেলেন তো কি হ'ল!

আরও বোধহয় একটা গোপন কথা এর মধ্যে ছিল। রাজাবাবু নিজে মিষ্টির মধ্যে রাবড়ি আর সন্দেশটা পছন্দ করতেন বেশী। সন্দেশ তো আনানো গেল না—রাবড়িটা অন্তত থাক!

[illegible] সেটি আনন্দবাবাও বুঝলেন, তিনি আ[illegible] দিলেন না।

ব্রাহ্মণভোজন দেখে তৃপ্তিই হ'ল সুরবালার। এক একজন ব্রজবাসী একসের দেড়সের করে রাবড়ি এবং পঞ্চাশ ষাটটা করে বড় বড় লাড্ডু খেলেন, দু' একজন আরও বেশি। মিষ্টিই আগে খেলেন—পরে কচুরি ও পুরী। সেগুলো অবশ্য কেউই বেশি খেলেন না। বেগুন কুমড়ো আলু ও টক্—সেই সঙ্গে বিশেষর প্রায় তাবৎ মশলা দিয়ে তরকারী হয়েছিল, খুবই মুখরোচক—কিন্তু সুরবালার মন খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল! সাধারণ যজ্ঞির খাওয়ায় যেমন মাছের কালিয়া, নিরামিষে তেমনি ছানার ডালনা কি ধোঁকার ডালনা করতে হয়—এ-ই সে জানে, এই রকমই দেখে আসছে সে বরাবর, মানুষকে নিমন্ত্রণ করে এইরকম ঘাট খাওয়ানো তার অভিজ্ঞতায় নেই। সব খাওয়ারই একটা আদি অন্ত থাকে—এ কী রকম খাওয়া!...

ঠাকুর প্রতিষ্ঠার উৎসব চুকে যেতেই সুরবালা রওনা দিল। একাই ফিরল সে এবার, সঙ্গে দারোয়ান গিয়েছিল এখান থেকে—তাকে সঙ্গে নিয়ে। কিরণকে রেখে এল। নতুন পূজারী, নতুন দাসী—নিত্য-সেবাটা নিয়মিতভাবে সুশৃঙ্খলে হচ্ছে, এটা না দেখে দুজনেরই চলে যাওয়া উচিত নয়। আনন্দবাবাও তাই বললেন। বললেন, 'আমার এবার ছুটি। আর আমি আসতে পারব না, আসবও না। যা করবার এখন থেকে তোমরাই করবে—আমাকে আর টানাটানি করো না।'

খুবই ন্যায্য কথা। অনেক করেছেন তিনি সত্যিই। এই এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিপুল ঝামেলা বহন করেছেন। আর তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক নয়। তবু, এসব বুঝেও—কিরণ একটু ইতস্তত করতে লাগল, 'সেখানে যদি মাসিমার সত্যিই একটা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ে?'

সুরো বলল, 'হয়—নানুদা আছে। অন্তত আট দশটা দিন দ্যাখো। সত্যিই তো—একেবারে নতুন লোক, কিছুই জানে না—আমরাও কিছু জানি না ওদের—কার মনে কি আছে তার ঠিক কি! কদিনে একটু সড়গড় হয়ে গেলে বরং আমাদের পাণ্ডাকে একটু খবর নিতে বলে চলে যেয়ো।'

কিরণ আর কথা কইল না। কিন্তু তার যে একটা বিপুল দুশ্চিন্তা মনে বোঝার মতো চেপে বসে রইল—বিদায়কালে মথুরা স্টেশনে তার মুখের চেহারা দেখেই বুঝতে পারল সুরো।

কিরণের ইচ্ছে ছিল হাতরাস পর্যন্ত গিয়ে বড় লাইনের গাড়িতে তুলে দিয়ে আসে, সুরবালা কিছুতেই রাজী হল না।

এ কদিন মন্দির প্রতিষ্ঠার উত্তেজনায় মার কথা অত মনে পড়েনি। ট্রেনে চাপার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের দুর্ভাবনা মাথার মধ্যে এসে জুটল। যত ভাবে—তত যেন কান্না পেয়ে যায়। মাকে গিয়ে দেখতে পাবে তো? যদি-যদি না পায়?...মা নেই, পৃথিবীতে সে একা—ভরসার মধ্যে দুটি অনাত্মীয় লোক, পরস্যাপি পর, কিরণ আর নানু—দীর্ঘজীবন এখনও হয়ত সামনে পড়ে; তাও কিরণের মনে শেষ পর্যন্ত কী আছে তা-ই বা কে জানে—কথাটা ভাবতেই যেন বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে, নিজেকে একান্ত নিঃসঙ্গ ও অসহায় বোধ হয়।

যত কাছে আসে, তত চিন্তা বাড়ে। হাওড়া স্টেশন থেকে বাড়ি যেতে যেতে মনে হল তারই বোধহয় বুকের এই ওঠা-নামাটা বন্ধ হয়ে যাবে এবার—কী যেন বলে ডাক্তাররা, হার্টফেল করা—তা-ই বোধহয় হবে।... বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল, হাত-পা অবশ হয়ে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। মনে হল গাড়ি থেকে বোধহয় নিজেই আর নামতে পারবে না।

কিন্তু বাড়ির সামনে গাড়ি গিয়ে থামতেই প্রথম নজরে পড়ল মাকে। গাড়ির শব্দ পেয়ে হাসি হাসি মুখে ছুটে এসেছে।

কিন্তু তবু—আনন্দ যতটা হল ততটা আশ্বস্ত বোধ করতে পারল না। হাসমুখ ঠিকই, মেয়ের জন্যেই উৎকণ্ঠা সে মুখে, তবু তার অপরিসীম শুষ্কতা ও বিবর্ণতা ঢাকা পড়ে নি। শরীর যে ভালো নেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আর একটু লক্ষ্য করে দেখল, পা দুটো কাঁপছে থরথর করে—কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। সে তাড়াতাড়ি মাকে ধরে ফেলে প্রায় আর্তনাদ করে

উঠল, তুমোর কি শরীর খারাপ করেছে? ...ওমা, এ যে জ্বর!'

'হুঁস তো। এই শাড়ির কাপড়ে ছুঁয়ে বসে রইলি তো। দ্যাখো, আবার কাপড় ছাড়তে হবে এখন!'

'হ্যাঁ, কাপড় ছাড়তে হবে না ছাতা, তীর্থ থেকে আসছি আমাকে ছুঁলে এখন পুণ্যি।...কবে থেকে জ্বর হয়েছে—ডাক্তার দেখেছিল নানুদা?'

'সে কি আর অনুষ্ঠানের ত্রুটি আছে! অমনি জ্বর এসেছে, অমনিই কোথা থেকে এক ডাক্তার ধরে এনে হাজির!'

'তা ডাক্তার কি বললে?' প্রায় রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে সুরো।

'কী আর বলবে। ম্যালেরিয়া জ্বর। গোটাকয় কি মিকশ্চার আর পুরিয়া দিয়ে গেল। ও আমি খাবও না তার কথাও নেই।'

'সে কি! অসুখ হয়েছে ওষুধ না খেলে চলবে কেন!...বা রে!'

সে কথার উত্তর দিল না নিস্তারিণী, আসলে তার বোধহয় বেশি কথা বলার শক্তিও ছিল না। সে আর দাঁড়াতেও পারল না, আস্তে আস্তে এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। গাড়ির কাপড়ের ছোঁয়া লেগেছে—সে কথাটাও খেয়াল রইল না।

শুয়ে অনেকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইল নিস্তারিণী। খানিক পরে, আবার যখন চোখ খুলতে পারল, প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে, তা কিরণ আসেনি? কিরণ?'

'না মা।'

'ওমা, কেন রে?...তাকে যে আমার বড্ড দরকার। তাকে রেখে এলি কেন?'

'সেখানে যে সব এখনও অগোছালো হয়ে পড়ে, নতুন লোক নতুন ব্যবস্থা, একজনও না থাকলে চলবে কেন? নিত্য-সেবার ব্যাপার—ভোর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত উনকোটি চৌষট্টি রকমের ফ্যাচাং—কটা দিন না দেখে কি দুজনেই আসা চলে?'

নিস্তারিণী যেন চিন্তিত হয়ে পড়ে, 'তাই তো। তা কবে আসবে সে?'

'আট দশদিন বাদেই এসে পড়বে।' সুরো উত্তর দেয়, তার পরই খট্‌কা লাগে একটা, 'কেন বলো তো? তাকে তোমার কী এত দরকার?'

সে কথার স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায় না, 'আট দশ দিন। অতদিন কি বুঝতে পারব?' অস্ফুট, ক্লান্ত কণ্ঠে কথা কটা বলে আবার চোখ বোজে নিস্তারিণী।

খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দেখে তখন আর বকায় না—বরং যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ব্যাপারটা ভাল লাগছে না তার আদৌ। কী সব বলছে মা? সামান্য ম্যালেরিয়া জ্বর, তাতেই বা এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল কেন?

নানু সে সময়টা ছিল না, একটু পরেই এসে পড়ল; সঙ্গে একটি আধাবয়সী মেয়েছেলে। ওকে দেখে বললে, 'এসেছিস? ভাল হয়েছে।...একে নিয়ে এলুম, জননীর কাছে নিয়ত একজনের থাকা দরকার। তুই কবে আসবি তা তো জানতুম না। আর তুই-ই বা একলা কি করবি। তুই যদি দিনেরবেলা দেখিস—এ মেয়ে রাত্তিরটা দেখতে পারবে। আমার জানাশোনা—লোক ভাল। ওর ওপর ভরসা করতে পারিস, রুগী ফেলে রেখে ঘুমোবে না—'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি নানুদা? ডাক্তার নাকি বলেছে ম্যালেরিয়া জ্বর—তবে এমন নেতিয়ে পড়ল কেন?'

'জননী এবার চলল—আর কি। তোকে গুডবাই করার জন্যেই কোনমতে টিকে আছে। বেটির এখন ভাবনা—নিমতলায় কোথায় ওর কত্তা পুড়েছিল—সেই শ্মশানের ঠিক ওপরে না হোক, আন্দাজে যেন অন্তত তার কাছাকাছি পোড়ানো হয়। কিরণ এসেছে তো? আমিও ছিলুম সে সময়—তবু আমার ওপর পুরো ভরসাটা হচ্ছে না, দুজনে মিলে যদি মনে করতে পারি ঠিক জায়গাটা—!'

সুরবালা আর পারল না সামলে থাকতে, প্রায় চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

'কিন্তু—কেন, কেন নানুদা? বলছে যে সামান্য ম্যালেরিয়া জ্বর—তাতেই এমন হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন?'

'ম্যালেরিয়া তো বলছে—এখানে নাড়ি ধরে ডাক্তারের যে নাড়ি ছেড়ে যাবার দাখিল। আমি কি হাল ছাড়ছি—ডাক্তারই যে ছেড়ে দিয়েছে। বলছে, আর একটুও যোঝবার ক্ষমতা নেই, আস্তে আস্তে তেল ফুরিয়ে যাওয়া পিদীমের মতো নিভে আসছে এবার।...নে, এখনই অত কান্নাকাটি করার মতো কিছু হয় নি, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আর যদি শেষ সময়ই এসে থাকে, কান্নাকাটি না করে সেবা কর, আর যাতে কোন অনুশোচনা না থাকে।...ওঠ্‌ দিকি, চোখ মোছ,—কাপড়চোপড় ছাড়, চান কর। জলটল খেয়ে আর কাছে গিয়ে বোস। কি বলবার আছে, কি খেতেটেতে চায়—খোঁজ কর। এ তো ভালই হচ্ছে রে, তোর বন্ধন কাটছে। আর বেশি বেঁচেই বা ওর কি লাভ হত বল, আর তো কোন সাধআহ্লাদ মেটার আশা রইল না। সে ছোঁড়াটাও যদি ফিরত—এখনও হয়ত তার ঘরকন্না পাতার সময় যায় নি। সে মাগীকে নিয়েও যদি এসে থাকত—তাহলেও বোধহয় জননী আর আপত্তি করত না। একটা নাতি দেখার বড় শখ ছিল বুড়ির!'

প্রতিটি কথাই বুকে কেটে কেটে বসে। কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটের মতোই দুঃসহ মনে হয়, জ্বালা করে বুকের কাছটায়। তবু প্রতিবাদও করতে পারে না। কথাগুলো মর্মান্তিক সত্য, একটা কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই।...

নানুর কথাই শোনে সুরবালা। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে শক্ত করে নেয়। যাওয়ার সময় যদি এসেই থাকে—এ সময়টুকু আর নষ্ট করা ঠিক নয়। বিপুল ঋণ তার মার কাছে—সাধারণ অন্য মেয়ের থেকে অনেক বেশি। সে ঋণ শোধ হল না, হবেও না, তবু এই বিদায়ের সময়টা সেবা দিয়ে ভালবাসা দিয়ে যতটা সম্ভব মধুর করে দেওয়া যায় তা সে দেবে। অনেক আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে মায়ের, অনেক কল্পনার প্রাসাদ ধূলিসাৎ হয়েছে—সে বেদনা নিয়েই যেতে হবে তাকে—তার ওপর এই যাত্রাকালে আর কোন তিক্ততা নিয়ে না যেতে হয়।...

সে স্নান করে একটু শরবৎ খেয়ে মার কাছে এসে বসে। যে নতুন মেয়েছেলেটি এসেছে, কদমের মা—তার কাছ থেকে পাখাটা নিয়ে তাকে মুখ হাত ধুয়ে স্নান করে আসতে বলল। মা কথা কইতে পারছে না, চোখ বুজে বুজেই ইঙ্গিতে মাথাটা দেখিয়ে হাতটা নাড়ছে—বাতাস করার ভঙ্গীতে। অর্থাৎ মাথায় বাতাস করতে বলছে। হেঁট হয়ে দেখল সুরবালা, বোধহয় জ্বরটা ছাড়ছে, গা পাথরের মতো ঠাণ্ডা, গলায় কপালে অল্প অল্প ঘাম।...

খানিক পরে চোখ খুলল নিস্তারিণী, সম্ভবত উঠে নিচে যাওয়া আর এত কথা বলার ক্লান্তিতেই এমন চোখ বুজে নির্জীব হয়ে পড়ে ছিল। এখন আস্তে আস্তে একটু

অবসন্ন কণ্ঠেই বলল, 'তুই কিরণকে একটা জরুরী তার পাঠিয়ে দে সরো, আর একদিন দেরি করা চলবে না।'

'তোমার ঐ এক বাজে চিন্তা। মিছি-মিছি আমাকে ভয় দেখানো শুধু। এই তো জ্বর ছেড়ে গেছে, গা ঠান্ডা, ঘাম হচ্ছে—' মায়ের কপালে নিজের গালটা চেপে ধরে জবাব দিল সরো।

নিস্তারিণী হাসল একটু। তেমনি ক্লান্তভাবেই বলল, 'এবার আর তোর মাকে উঠোধানে পশু করতে হবে না—ভয় নেই। গা ঠাণ্ডা শুধু জ্বর ছাড়ার নয়—নাড়িও ছাড়ছে এবার। সেদিন ডাক্তারের মুখ দেখেই বুঝেছি। তাছাড়া নিজেও বুঝতে পারছি, এমন হা ক্লান্ত হয়ে জীবনে পড়ি নি. এই তো সামান্য একটু জ্বর তাতে এমন হাতপা ছাড়াব কি!...এবার আর মাকে তুলতে পারবি না খুকী। তবে তাতে ভয় পাবারই বা আছে কি! মরতে তো হবেই একদিন। মা কি আর কারুর চিরকাল থাকে! বয়সও তো হয়ে গেল ঢের—আর কি!'

বলতে বলতেই চোখ বোজে আবার। সেই সময় গিরিধারী কি কাজে সেদিকে এসেছিল, তাকে ডেকে চুপি চুপি বলে দেয় সরো—আনুবাবুকে বলে ডাক্তারকে একটু খবর দিতে। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় মার শরীর ভাল নয়।

সেইটুকু সামান্য কথাও নিস্তারিণীর কানে যায়। বলে, 'কেন ও সব হ্যাঙ্গামা করছিস মা। মিথ্যে মিথ্যে সুস্থ শরীর ব্যস্ত করা। ডাক্তারের বাবা এলেও আমাকে আর সারাতে পারবে না। রোগে ধরলে সারে—এবার এ যমে ধরেছে। ও-ই তো একগাদা ওষুধ পড়ে আছে। আবার এসে হয়ত কতকগুলো ওষুধ দেবে—শুধু শুধু পয়সা অপচয় করা।'

শুয়েও খানিক পরে আবার চোখ খোলে। বলে, 'একটা কথা বলব মা? আর হয়ত সময় পাব না। এখনই কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে।...বলেই ফেলি। তোর যদি অসুবিধে হয়—আমি বলছি বলেই করতে যাস নি। বলছিলুম, তোর এসব বেচোকেনে—এই দুখানা বাড়ি বেচে যদি তোর ঠাকুর-সেবার মতো টাকা উঠে যায়—মানে সেই টাকার সুদে চলে যাবে মনে করিস—আগের ঐ ছোট বাড়িটা না-ই বেচলি? ঐ আমার জীবনে প্রথম নিজেদের বাড়িতে আসা, বড্ড আনন্দ হয়েছিল রে! আমি বলছি ওপরের একটা ঘর রেখে বাকীটা যেমন ভাড়া দেওয়া আছে তেমনি থাক।... কখনও সখনও তোরই যদি কলকাতায় আসার দরকার হয়—কোথায় উঠবি তার তো ঠিক নেই। এমন কোন আপনার লোকও নেই—যার কাছে এসে উঠতে পারিস।... হয়ত শেষ অবধি

হোটেলে এসে উঠতে হবে। এ একখানা ঘর থাকলে—নিজের মতো এসে থাকতে পারবি। ...আর, আর কি জানিস, সে ছোঁড়াটার কথাও ভাবি—যদি কখনও নিরাশ্রয় হয়ে এসে পড়ে—তবু একটা মাথা গোঁজার জায়গা থাকবে। সে আমাকে ভুলে গেছে—আমি তো তাকে পেটে ধরেছি, আমি ভুলি কি করে!'

সুরবালা ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, 'তাই হবে মা। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, খোকা যদি তেমনভাবেই ফেরে, শুধু আশ্রয় নয়—ও বাড়ি তাকেই লিখে দেব।'

এতক্ষণ এতগুলো কথা বলার ক্লান্তিতে আবার ঝিমিয়ে পড়েছিল নিস্তারিণী, খানিকক্ষণ সময় লাগল সেটা কাটিয়ে উঠতে। তার পর বলে উঠল, 'না না। তুই আগে হিসেব করে দেখিস। তোর ঠাকুরসেবার ক্ষেতি করে করতে বলছি না কিছু।... যদি কুলোয় তবে।... তাই করিস, আর...যদি সে না ফেরে কিম্বা তার দরকারে না লাগে, তোরও যদি কাজ চলে যায়—বিশ পঁচিশ বছর দেখে বাড়িটা বরং নানুর ছেলেকে দিয়ে যাস। ঐ তো বাউণ্ডুলে ভবঘুরে—বৌ ছেলেকে কখনও দেখল না, কিছু সঞ্চয়ও করল না। বাপ মা বেঁচে আছে তাই ভাইয়েরা দেখছে—এর পর কি আর দেখবে? ছেলেটা নাকি লেখাপড়ায় ভাল, পাস করে কলেজে পড়ছে।... দেখিস, যা ভাল বুঝিস করিস।... আমি বলছি বলে কিছু করিস নি, তোকে কোন বন্ধনে রেখে যেতে চাই না।'

আবারও চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। কেমন যেন আচ্ছন্নর মতো পড়ে থাকে, মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

সরো আঁচল দিয়ে গলা আর কপালের ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, 'অনেক কথা বলেছ মা, এখন থাক। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো দিকি। বরং এইবার একটু খাও কিছু। শুনলুম তো বার্লি আর ছানার জল দিতে বলেছে ডাক্তার—একটু দুধ বার্লিই খাও না। পেট তো ফাঁপ নেই, জ্বরও ছেড়েছে, মিছিমিছি টাঙিয়ে থেকে লাভ কি?'

নিস্তারিণী ইঙ্গিতে নিরস্ত করে। কথা বলতে আরও কিছুক্ষণ দেরি হয় তার; বলে, 'দাঁড়া কথাগুলো সেরে নিই সব। এখনই কেমন যেন মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—বেবাক ভুল হয়ে পড়ছে সব—তা ছাড়া জিভও এড়িয়ে আসছে। এর পর বোধহয় বাকিই হয়ে যাবে একেবারে।'

তারপর কোনমতে একটা হাত তুলে সরোর হাতের ওপর রেখে বলে, 'তুই যা দিতিস আমাকে, তা থেকে অনেকগুলো টাকা জমিয়েছি। আমার পুরনো প্যাড়াটার মধ্যে পুঁটুলি করা আছে—আটশো টাকার

মতো হবে। ঐটেই হেমাদের খরচ করিস। খোকার জন্যে রাখতে হবে না। সে তো এখন রোজগার করছে শুনেছি। আর যদি কখনও দরকার হয়—তুই তাকে ফেলবি না তা জানি।... আর, যদি পারিস—যাওয়া-আসার পথে গয়াটা সেরে ফেলিস আমার। আমাদের দুজনেরই। তুই তো এই সন্ন্যাসী হয়ে গেলি বলতে গেলে—সে তো ঘরের বার নৈরেকার—কে আর বছর বছর বছরকী করবে? সে তোকে নিজের মেয়ে বলেই জানত, আমি তো চিরদিনই তাই মনে করি—তুই না মনে করালে আমার মনেই পড়ত না যে তোকে পেটে ধরিনি। তুই যা করে থাকিস করেছিস—তোর পিণ্ডিই আমার ভাল।'

ক্রমশ গলা আরও ঝিমিয়ে আসে। তবু যেন প্রাণপণ চেষ্টাতেই কথাগুলো সেরে নিতে চায় নিস্তারিণী। বলে, 'আর মতিকে দেখিস। ওর পয়সা খাবার লোক বেস্তর—দেখবার কেউ নেই। তুইও তো বাঁক্যসত্ত্ব আছিস। যেখানেই থাকিস, মরণাপন্ন শুনলে এসে সেবা করিস। ওর দৌলতেই তোর সব—রাজাবাবুকেও পেতিস না, অত যত্ন করে গান শিখিয়ে আলাদা পসার করে না দিলে। তোকে ভালও বাসে খুব।'

আর কথা বলতে পারে না। হয়ত অনেক বেশীই বলে ফেলেছে। চোখ বুজে নিথর হয়ে পড়ে থাকে আর, ইশারা করে মাথায় হাওয়া করতে।

সুরোর কথাতে নানু একজন বড় ডাক্তার ডেকে আনে। তিনি এসে দেখে মুখ বিকৃত করেন, বলেন, 'হার্টের অবস্থা খুব খারাপ—কিছুই আর নেই। পুরনো হাড় বলেই তাই—নইলে এ অবস্থায় বোঝবার কথা নয়।... ওষুধ দিয়ে আর লাভ নেই কিছু। খাওয়া? যা খাওয়াতে পারেন খাওয়ান। দুধ গঙ্গাজলই দিন। তাও কি পেটে যাবে?'

সুরো ব্যাকুল হয়ে বলে, 'কিন্তু রোগটা কি ডাক্তারবাবু?... সামান্য জ্বর হয়েছিল—এ পাড়ার ডাক্তারবাবু তো বললেন ম্যালেরিয়া—তবে?'

'রোগটা কিছু নয় মা এ ক্ষেত্রে। ও—বলতে পারেন 'চন্দ্রগুপ্তের ছুতো'। হার্টটা অনেকদিন ধরেই ড্যামেজড হয়ে এসেছিল—অত কেউ লক্ষ্য করেন নি, উনিও বোঝেন নি বোধহয়। তাছাড়া রোগী একদম ফাইট করতে পারছে না যে। মনে হচ্ছে যেন বাঁচবার ইচ্ছেও নেই ওঁর।'

বাকী দিন এবং সারারাত একভাবে কাটল। দেহ পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আছে—অথচ প্রচুর ঘাম হচ্ছে! এক মিনিট মাথায় বাতাস করা বন্ধ হলেই—সেই আচ্ছন্ন অবস্থাতেও—যেন ছটফট করে উঠছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে যে কষ্ট হচ্ছে। এক আধ চামচ দুধ জোর করে খাওয়াল নানু—কিন্তু শেষের দিকে তাও খেতে চাইল না, খাওয়াতে গেলেই ভুরু কোঁচকায়, ঠোঁট টিপে থাকার চেষ্টা করে।...

পরের দিন দুপুরের দিকে হঠাৎ একটু ভাল বোধ হল। চোখ খুলে চাইল। নানু কোথায় জিজ্ঞাসা করল। তিন চার চামচ দুধও খেল। নানু এক কবিরাজকে ডেকে এনেছিল, তিনি মকরধ্বজ দিয়ে গিয়েছিলেন, এখন মধু দিয়ে মেড়ে জিভে লাগিয়ে দিল সুরো, তাতেও আপত্তি করল না। তারপর বলল, 'কিরণকে তার করেছিস খুকী?'

কতকাল পরে মা তাকে খুকী বলছে।

হঠাৎ ওর বাল্যের নামটাই বা মনে পড়ছে কেন বার বার?

কান্নায় ধরে আসা গলা সহজ করার চেষ্টা করে সে, বলে, 'হ্যাঁ মা, তখনই করেছি।'

'হ্যাঁরে, তাকে বড় দরকার। নানু যদি ঠিক মনে করতে না পারে? পাঁচ ঝঞ্ঝাটে থাকে সবক্ষণ। কিরণের খুব মাথা ঠাণ্ডা—মনেও থাকে খুব। তার ঠিক স্মরণ আছে—ওঁকে কোথায় শুইয়েছিল—তোর গুষ্টিকে।'

বিকেলের দিকে আরও একবার যেন চেতনা ফিরে এল নিস্তারিণীর। ইঙ্গিতে সুরোকে কাছে ডাকল। সুরো মুখের কাছে কান নিয়ে আসতে চুপি চুপি বলল, 'সেই গানটা মনে আছে তোর? সেই যে তোর ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে শুক্রবার করে আমাদের ওখানে সব আসত—? তারা গাইত—"এ ভাবের মানুষ কোথা থেকে এল—তার নাইক রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে হরি বলো।" মনে থাকে তো গা না রে একবার। উনি খুব ভালবাসতেন, তোর গুষ্টি। আহা, কত তখন মন্দ বলেছি—'

মনে আছে সুরবালার। সেও কতদিন বাবার সঙ্গে গেয়েছে। বাবা ভাল গাইতে পারতেন না, তবু সুরের আদলটা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিল সে।

সে অদম্য মনের জোরে দাঁতে দাঁত চেপেই—অশ্রুবিকৃত কণ্ঠকে সহজ করে আনার চেষ্টা করল। শুধু গান ভাল লাগার প্রশ্ন নয়, এ মায়ের একধরনের প্রায়শ্চিত্ত—তা সে বুঝেছে। এ গান গাইতেই হবে তাকে।...

শুনতে শুনতে কী যেন এক অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে প্রসন্ন হয়ে উঠল নিস্তারিণীর মুখ। গান শেষ হতে প্রায় অবশ শিথিল হাতখানা তুলে সুরোর মাথায় দেবার চেষ্টা করছে দেখে নানুই তাড়াতাড়ি সুরোর মাথা নামিয়ে এনে হাতখানা দিয়ে দিল তার ওপরে।

অতি সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটল নিস্তারিণীর মুখে। ঠোঁটটাও যেন নড়ল কয়েকবার। হয়ত আশীর্বাদই করল সে মেয়েকে। কিম্বা মেয়ে ও নানু দুজনকেই।...

সেই যে চোখ বুজল নিস্তারিণী আর খুলল না। চোখও খুলল না, কথাও বলল না। গলার কাছে কাঁপনটা দেখে মনে হল—যাকে অন্তিম শ্বাস বলে—তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কিন্তু আর কোন কষ্ট বোঝা গেল না। সেই অবস্থাতেই, আরও একটা দিন পড়ে থেকে, কিরণ এসে পৌঁছবার ঘণ্টাখানেক আগেই, এখানকার সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। যেন কিরণ ঠিক সময় এসে পড়বে এইটে বুঝেই—নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

(ক্রমশঃ)

আদিমতম মেরুদণ্ডী প্রাণীর কয়েকটি নিদর্শন।

বিজ্ঞানের কথা

পৃথিবীর আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণী
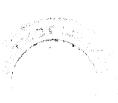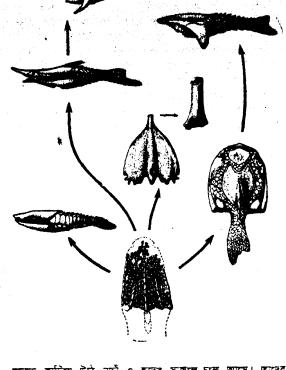
বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল সমুদ্রে এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী থেকে জীব-জগতের সূচনা। তারপর ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে নানা জীব-জন্তুর আবির্ভাব ঘটে এবং সর্বশেষে হয় মানুষের আবির্ভাব। মানুষ যে জীবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণীবিজ্ঞানের ভাষায় তাদের বলা হয় মেরুদণ্ডী প্রাণী। এই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আদিমতম পুরুষ কে বা কারা সে সম্পর্কে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন থেকে গবেষণা করছেন। সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ফলে তাঁরা এই রহস্য উদ্ঘাটনের পথে এক নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছেন। সম্প্রতি পশ্চিম রাশিয়ায় ৫০ কোটি বছরের প্রাচীন সামুদ্রিক বালুকণায় 'হেটেরোস্ট্রাকনস' নামে অভিহিত পৃথিবীর আদিমতম মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। মৎস্য-সদৃশ এই প্রাণী ছিল বর্মাবৃত, কয়েক ইঞ্চি লম্বা। সেই সুপ্রাচীন কালে উত্তর আমেরিকার পূর্বাঞ্চল থেকে বলটিক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সমুদ্রোপকূলে সমুদ্রের তলায় এই প্রাণী বাস করত। সেই স্মরণাতীত কালে আটলান্টিক মহাসাগর বলে কিছু ছিল না এবং উত্তর আমেরিকা তখন ইউরোপের সঙ্গে ছিল সংযুক্ত। সে সময় বিষুবরেখা নোভা স্কটিয়া এবং স্কটল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত ছিল। সেসময়কার ইউরোপের ভূগোল ও জলবায়ুর সঙ্গে বর্তমান ইউরোপের ভূগোল ও জলবায়ুর কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন চান্দ্র মাস ছিল সাড়ে ৩০ দিন এবং সুবিস্তীর্ণ উত্তর মহাদেশের সমতল ভূমির ওপর ঋতু-আবর্তনের সঙ্গে প্রবল বন্যা ও অনাবৃষ্টি দেখা দিত। স্থলভাগে তখন কিছু কিছু ক্ষুদ্র পল্লবের গাছ দেখা দিয়েছে এবং কিছু ডানাবিহীন পোকামাকড়। কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীর তখন স্থলভাগে আবির্ভাব ঘটে নি।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর সর্বপ্রথম আবির্ভাব ঘটে সমুদ্রে। তার কয়েক কোটি বছর পরে এই মেরুদণ্ডী প্রাণীরা শারীরতাত্ত্বিক সমস্যা কাটিয়ে উঠে নদী ও হ্রদের সুজলে চলে আসে। তাদের পরবর্তী কালের জীবাশ্মের নথিপত্র থেকে জানা যায়, সমুদ্রে লার্ভা অবস্থায় বিকাশলাভের পর তারা সুজলে বসবাস করতে থাকে। আদিমতম মেরুদণ্ডী প্রাণী হেটেরোস্ট্রাকানসদের কামড়াবার বা আহার্যদ্রব্য চিববার দাঁত বা চোয়াল ছিল না। এ কারণ সমুদ্রে বা নদীতে আনুবীক্ষণিক প্রাণীদের দেহাবশেষ খেয়ে তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হত। তাদের অধিকাংশ কাদা খুঁড়ে খাদ্য-বস্তু খুঁজে বার করত। তাদের মধ্যে এক দল জলে ভাসমান খাদ্য ছেঁচে নিতে পারদর্শী হয়ে ওঠে। আহারপ্রণালীর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই প্রাণী ১৫ কোটি বছর ধরে বসবাস করেছিল এবং তাদের থেকে বহু বিচিত্র আকৃতির প্রাণীর উদ্ভব হয় এবং শেষ-পর্যন্ত তাদের কেউ কেউ বিবর্তিত হয়ে মানুষে পরিণত লাভ করে।

আগেই বলা হয়েছে হেটেরোস্ট্রাকানস প্রাণীর দাঁত বা চোয়াল বলে কিছু ছিল না। দন্ত-বিজ্ঞানের দিক থেকে এ ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রাণীর বর্মের বহির্ভাগ ছেদ করে অনুবীক্ষণযন্ত্রের তলায় পরীক্ষায় দেখা গেছে, বর্মের বহির্ভাগ গুটিকায় দ্বারা সমাকীর্ণ এবং আমাদের দাঁতের প্রধান উপাদান 'ডেনটাইন' টিশুর অনুরূপ এই গুটিকার আকৃতি। বস্তুত, বিবর্তনবাদের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় আমাদের দাঁত হচ্ছে আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণীর বর্মের বিলীয়মান শেষচিহ্ন। এই ডেনটাইনই জীব ও তার পরিবেশের মধ্যে প্রধান বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে টিশুর মৌলিক সংবেদনের দরুণই ডেনটাইনে সমাকীর্ণ নালিকাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল। কারণ চর্মের মত ঠিকভাবে কাজ করার জন্যে টিশুতে বেদনের একটা পথ নিশ্চয় ছিল। আমাদের নিজস্ব ডেনটাইনের অসাড়ত্বের ব্যাখ্যা বিবর্তনবাদের দিক থেকে দেওয়া যায়। মানুষের দেহে ডেনটাইনের সংবেদী হওয়ায় কোন প্রয়োজন নেই, কারণ দাঁত

হচ্ছে মূলত অসাড় এবং চর্বণের জন্যে ব্যবহৃত কঠিন উপাদান। আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণীদেহে ডেনটাইনের ভূমিকা যে সংবেদনের জন্যে ছিল সেই রহস্য এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

কিন্তু কোনো প্রাণীর বেঁচে থাকার পক্ষে শুধু সংবেদন থাকলেই চলবে না। সংশ্লিষ্ট টিশুর পুনর্গঠন ও ক্ষত নিরাময়ের ক্ষমতা থাকাও চাই। এদিক থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ত্বকজাত বর্মের ক্ষত নিরাময়ের ক্ষমতা ছিল। প্রাণীর জীবিত কালে দেহের যেখানে অস্থিভঙ্গ ঘটত তখন নতুন গুটিকা ফাঁক ভরাট করত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যখন বর্মের কিছু অংশ শিকারীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন হত তখন নতুন ডেনটাইন সৃষ্টি হয়ে সেই ক্ষত পূরণ করত। যখন এই ধরনের আঘাত ঘটত তখন গুটিকাগুচ্ছের মধ্যে অবশিষ্ট বহিস্ত্বকের জাল ক্ষতের ওপর বিস্তারিত হত এবং তারপর নতুন গুটিকাগুচ্ছ সৃষ্টি করত। পুরনো পৃষ্ঠদেশের ওপর নতুন গুটিকাগুচ্ছের 'ফুসকুড়ি' প্রায়ই দেখা যেত। নতুন উপাদান সবসময় পুরনো উপাদানের ওপর গড়ে ওঠে। কিন্তু দাঁতের ক্ষেত্রে বিপরীত ব্যাপার ঘটে. অর্থাৎ পুরনো দাঁতের নিচে থেকে সাধারণত নতুন দাঁতের উদ্গম হয়। উদ্গম-প্রণালীর পার্থক্য বাহ্যত যতটা মনে হয় আসলে কিন্তু ততটা নয়। কারণ ভ্রূণের বিকাশকালে দন্তাংশের বিন্যাস আদিমতম মেরুদণ্ডী বর্মে ডেনটাইন গুটিকারই অনুরূপ। কেবল পরবর্তীকালে বৈশিষ্ট্যমূলক বিকাশের সময় নতুন দাঁত নিচে থেকে উদ্গত হয় অর্থাৎ যে দাঁতটি সে প্রতিস্থাপিত করবে তার তলায় থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দাঁত প্রতিস্থাপনের সামগ্রিক প্রণালী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আদিমতম মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আঘাতপ্রাপ্ত বর্ম নিরাময়ের ক্ষমতা থেকেই এই দন্ত উদ্গম প্রণালী গড়ে উঠেছে।

বর্মের যে অংশবিশেষ ক্রমাগত জীর্ণ হয় সেক্ষেত্রে এক ভিন্নধরনের নিরাময় হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে আমাদের পায়ের পাতা পুরু হওয়ার মতো কোনো উপায়ে বর্ম পুরু হয়ে ওঠে। আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে বর্মের ছিদ্রবহুল অস্থি-টিসু 'প্লেরোমিক' (অর্থাৎ পরিপূরক) নামে অভিহিত একধরনের ডেনাটাইন দ্বারা পূর্ণ হত। যখনই চর্ম জীর্ণ হত তখন প্লেরোমিক ডেনটাইন সৃষ্ট হত এবং এভাবে সব সময় একটা সর্বনিম্ন পুরুত্ব বজায় থাকত। এইভাবেই ক্ষয়পূরণ হত। আমাদের দাঁতের ক্ষেত্রে এই একই পদ্ধতি আজও অনুসৃত হতে দেখা যায়, যখন দাঁতের দ্রুত ক্ষয় বা দন্তচিকিৎসকদের অস্ত্র ব্যবহারের ফলে দাঁতের উপাদান নষ্ট হয়। মূল উপাদানের স্থলে এক ধরন দ্বিতীয় পর্যায়ের ডেনটাইন গড়ে ওঠে, যা আকৃতিতে আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্লেরোমিক ডেনটাইনের অনুরূপ। এছাড়া, আমাদের আদিমতম পূর্বপুরুষের একটি নিরাময় পদ্ধতি আজও আমাদের দেহে বজায় আছে, যদিও নিরাময়ের পরিমাণ খুবই কম এবং খুবই বিলম্বে তা ঘটে থাকে।

ডেনটাইনের স্বকীয় ধর্মাবলী যদি আমরা গভীরভাবে পর্যালোচনা করি তা হলে টিশু-অস্থির একটা ক্রমবিবর্তনের ধারা দেখতে পাব। ১৯৩০ সালে এই নির্দিষ্ট টিশুর নাম দেওয়া হয় 'অ্যাসপিডিন'। এই টিশুতে স্বাভাবিক অস্থিকোষের দেশ (বা স্পেস্) না থাকায় অনুমান করা হয়েছিল, প্রকৃত অস্থি থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে এর উদ্ভব হয়েছে। বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগের নিদর্শন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, প্রথম যুগের অ্যাসপিডিন নমুনায় কোষের মধ্যে কোনো ফাঁক দেখা যায় না। পরবর্তী যুগের নমুনায় সরল, টাকু আকৃতির ফাঁক এলোমেলোভাবে শেষে বিন্যস্ত হতে দেখা যায়।

প্রাণীদেহে অস্থির জৈব ছাঁচের ক্রমবিবর্তন অনুসরণ করে এ বিষয়ে আরও দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখন জানা গেছে, অস্থির খনিজ উপাদানের কেলাস প্রোটিন কোলাজেন-এর তন্তু বরাবর বিন্যস্ত থাকে। এই বিন্যাসধারা লক্ষ্য করে দেখা গেছে, প্রাচীনতম নিদর্শনে সরল ডেনটাইনসদৃশ স্তর থেকে তা ১৫ কোটি বছর সময়ের মধ্যে ক্রমবিবর্তিত হয়ে আধুনিক রূপে উপনীত হয়েছে।

আজ প্রাণীদেহে অস্থির প্রধান ভূমিকা কঙ্কালের ভারসাম্য রক্ষা, কিন্তু আদিতে অস্থির মূল ভূমিকা এধরনের ছিল না। কারণ তখন অস্থি-টিশু চর্মের অন্তর্গত ছিল। সমুদ্রে বসবাসকারী আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে অস্থি-টিশুর ভূমিকা ছিল রাসায়নিক-উৎস হিসাবে। বিবর্তনের শেষ পর্যায়ে অস্থি দেহের ভারসাম্য রক্ষার ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু রাসায়নিক উৎস হিসাবে অস্থির আজও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

বৃদ্ধ বয়সে 'অস্টিওপোরোসিস' নামে যে রোগ দেখা যায় তাতে অস্থি জমা হবার পরিবর্তে শোষিত হয় বেশি। এতে দেহ টিশুর ভারসাম্য রক্ষার ভূমিকা ছেড়ে দিয়ে রাসায়নিক উপাদানের চাহিদা মেটাবার ভূমিকাই গ্রহণ করে। সম্প্রতি মহাকাশ পরিক্রমায় দেখা গেছে, মহাকাশচারীরা দীর্ঘ সময় ভরশূন্য অবস্থায় থাকলে দেহ অস্থির খনিজ উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে শোষণ করে। এ থেকে আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রাথমিক অবস্থায় অস্থির রাসায়নিক উৎস হিসাবে ভূমিকার প্রতিফলন দেখা যায়।

আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বর্ম প্রাণ-রসায়নের দিক থেকে পর্যালোচনার অনেক কিছু আছে। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিশেষ কিছু গবেষণা হয় নি। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, ৫০ কোটি বছর আগেকার মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বর্মের ভগ্নাংশ নিয়ে গবেষণা করার বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে এ নিয়ে অনেক মূল্যবান গবেষণা হতে পারে। এবং তার দ্বারা প্রাণীজগতের ক্রমবিবর্তনে অনেক গোপন রহস্যের ওপর আলোকপাত হতে পারে।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুটিকার মধ্যে দৃশ্য ডেনটাইনের আকৃতি
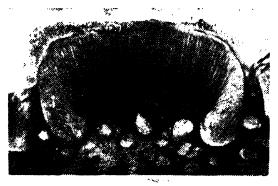
প্রদর্শনী পরিক্রমা

ঠিক একশ এক বছর হল জার্মানী শ্লেশউইগএ বিখ্যাত এক্‌সপ্রেসানিস্ট শিল্পী এমিল নোল্ডের জন্ম হয়। আসল নাম ছিল তাঁর এমিল হানসেন। কিন্তু শ্লেশউইগের উত্তরাংশ নোল্ডে, যেখানে তাঁর জন্ম, সেইখানকার নাম অনুসারে তিনি নিজের নাম রাখেন। উত্তর সাগর থেকে কিছু দূরে এই লাজুক শিল্পী তাঁর স্টুডিও তৈরী করেন। কিন্তু লাজুক হলেও বহির্জগতের সঙ্গে ভ্রমণের মাধ্যমে যোগাযোগ তাঁর অনেকের চাইতে কম ত ছিলই না বরং বেশীই ছিল বলা যেতে পারে। সুইজারল্যান্ড, প্যারিস, ড্রেসডেন, রাশিয়া, চীন, জাপান এমন কি নিউগিনি পর্যন্ত তিনি ভ্রমণ করেছেন।

জার্মানীর বিখ্যাত শিল্পীগোষ্ঠী 'ডি ব্রুকে' বা 'সেতু'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। কিন্তু হিটলারের আধিপত্য বৃদ্ধি পেলে নোল্ডেকে এক রকম নজরবন্দী অবস্থায় থাকতে হয়। কারণ, নাজীদের কাছে তাঁর শিল্পকর্মে নাকি অবক্ষয়ের চিহ্নটাই প্রধান বলে মনে হয়েছিল। এমন কি তাঁকে ছবি আঁকতেই নিষেধ করা হয়। শিল্পের ওপর রাজনীতির প্রভাব যে কতখানি সর্বনাশা হতে পারে নোল্ডের শেষ জীবন তার চরম নিদর্শন। তাঁর শেষ জীবনের বাসস্থান জীবুয়েল, যেখানকার ফুলবাগানে তাঁর সমাধি রচিত হয়েছে, সেটি আজ একটি শিল্প ফাউন্ডেশনে পরিবর্তিত করা হয়েছে এবং তাঁর শিল্পকর্মের অনেকগুলি নিদর্শন স্থায়ী গ্যালারী করে এখানে রাখা হয়েছে।

তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে তাঁর জন্মস্থানে সমতল জলাভূমি আর সবুজ মাঠের আমেজের প্রভাব খুব বেশী। এখানকার প্রকৃতির মেজাজের ক্রম-পরিবর্তনশীলতা এবং বিষণ্ণতা তাঁর কাজকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। দৃশ্যজগতে ক্ষণস্থায়ী রূপের চেয়ে একটা গভীরতার সন্ধানই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এক্‌সপ্রেশনিজমের লক্ষ্যই ছিল বহির্জগতের ওপরকার রূপটি ছাড়িয়ে গভীরে প্রবেশ করা। নোল্ডের স্টিল-লাইফ, ফুল এবং সর্বোপরি দেহাকৃতি ধর্মী ধর্মীয় ছবিতে তাঁর কম্পোজিসান, এবং রঙের দুঃসাহসিকতা আর একটা ভিন্ন জগতের অতিবাস্তবতা তাঁর বিশেষ ধরণের বলিষ্ঠ এবং মৌলিক ভঙ্গীতে উপস্থিত করা হয়েছে। আধুনিক চিত্রকলার ধর্মীয় শিল্পের বিভাগে ১৯১২ সালে আঁকা খৃস্টের জীবনীর নয় ভাগে ভাগ করা গির্জার বেদীকার ওপর রাখা ছবিটি তাঁর একটি চিরস্থায়ী ও অনবদ্য শিল্পকীর্তি।

●

ইয়োরোপে শিল্প-বিপ্লবের পর ভোগ্য-পণ্য উৎপাদনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার রূপের পরিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু সেটা তখন যে রূপ ধারণ করেছিল, হস্তশিল্পের ব্যবহারে যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁদের কাছে সেটা তত সুরুচিকর হয়নি। শিল্পীমহলে ত তা নিয়ে যথেষ্ট অভিযোগ শুরু হয়েছিল। উৎপাদকেরা অনেক বিলম্বে এ সম্বন্ধে সচেতন হতে থাকেন এবং অবশেষে শিল্পীদের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। এ'দের উভয়ের সহযোগিতার ফলে ভোগ্যপণ্যের রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে এবং আধুনিক ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের জন্ম হয়।

জার্মানীতে এই শতাব্দীর শুরু থেকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের দিকে উৎপাদকেরা নজর দেন। বিভিন্ন হস্তশিল্প ও নানারকম কারুশিল্পের জন্যে মধ্যযুগ থেকেই জার্মানীর সুনাম ছিল। প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পীরা নতুন যান্ত্রিক উৎপাদনের নিয়মকে মেনে নিয়ে যে ডিজাইন সৃষ্টি করলেন তার মধ্যে ঐতিহ্যকে একেবারে উপেক্ষা করা হয়নি। তীক্ষ্ণ, সুনির্দিষ্ট রেখা ও নিখুঁতভাবে কাজ করার ধৈর্য নিয়ে আধুনিক নিত্যব্যবহার্য যেসব জিনিসের নক্‌শা তৈরি হল, তার মধ্যে তাঁদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ খুঁজলে পাওয়া যায়। চীনেমাটির বাসন, গৃহকর্মের বিভিন্ন উপকরণ থেকে শুরু করে রেডিও, ট্রানজিস্টর, ক্যামেরা, ডুপ্লিকেটিং মেসিন, টাইপরাইটার ও আপিসের প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তু সবকিছুর মধ্যেই বাহ্যিক রূপ ও ব্যবহারযোগ্যতা এই উভয়ের দিকে ডিজাইনারদের লক্ষ্য দেখা যায়। ম্যাক্সমুলার ভবনের উদ্যোগে গত ৮ থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে জার্মান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের যে ছোট প্রদর্শনী হয়ে গেল তাতে উল্লিখিত বিষয়ের কিছু কিছু সত্যতা অনুধাবন করা গেল। কিছু ফটোগ্রাফ এবং কিছু কিছু ব্যবহার্য বস্তু দিয়ে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের একটা আভাস দেবার জন্যে যেভাবে প্রদর্শনীটি সাজান হয়েছিল, তা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

অলকা মুখোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ-এর শিল্পী শান্তিনিকেতনের কলাভবন থেকে এই বছর চারুশিল্পে ডিপ্লোমা কোর্স সমাপ্ত করেই গত সপ্তাহে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে উনিশখানি তৈল চিত্রের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলেন। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের ছবির মুখ্য বিষয়বস্তু হল রমণী মূর্তি ও সাপ। কোথাও কোথাও রমণী মূর্তির সঙ্গে বৃক্ষরূপকে একত্রিত করে কতকটা ছোট ছেলেমেয়েদের মাসিক পত্রের ধাঁধার ছবিও তৈরী করা হয়েছে। মূর্তিগুলি কাঁচা হাতের রেখায় টানা ব্যঙ্গ চিত্র-ধর্মী এবং পশ্চাৎপটে লাল, হলুদ বা সবুজের জ্যামিতিক নক্‌শা। চিত্র নির্মাণের হাত অত্যন্ত কাঁচা এবং রঙের প্রয়োগে কোন রকম মনোহারিত্ব তিনি সযত্নে পরিহার করে চলবার জন্যে যেন একাগ্রভাবেই সচেষ্ট হয়েছেন। যদি এত তাড়াতাড়ি প্রদর্শনী না করে কিছুকাল অপেক্ষা করতেন তাহলে হয়ত প্রদর্শনযোগ্য ছবি উপস্থিত করতে পারতেন।

●

কলাভবনের অপর এক শিল্পী জে, রাজু দাসানি ১৫ থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত অ্যাকাডেমিতে নয়খানি ক্যানভাস ও একটি আয়না প্রদর্শন করলেন। শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ সৃষ্টি করে। কারণ ক্যানভাসগুলি বর্ণ বা চিত্র-বিবর্জিত—শূন্য ক্যানভাস। দর্শকদের শিল্প সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করাবার আশায় শিল্পী শূন্য ক্যানভাস উপস্থিত করেন। ছাত্ররা কিন্তু এ সব সস্তার চটকদারিতে বিরক্ত হয়ে ক্যানভাসগুলি নামিয়ে দেয়—শুধু মাত্র আয়নাটি স্থানচ্যুত করে নি, কারণ তাদের মতে সেটার তবু কিছুটা মূল্য আছে, অন্ততঃ নিজের মুখটা দেখা যায়। শিল্পী তাঁর এই নতুন ধরনের পরীক্ষার এ ধরনের প্রতিক্রিয়ায় মর্মাহত হয়েছেন। বাস্তবিক ছাত্রদের এবং দর্শকদের উচিত ছিল শূন্য চিত্রপটের দিকে তাকিয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের নিজের মত ছবি তৈরী করে নেওয়া; এবং পরিশেষে সেই শূন্য ক্যানভাসগুলি (যার মূল্য ৭৫ থেকে ২০০ পর্যন্ত) নিয়ে যাওয়া। নিজের ঘরে বন্ধু বান্ধবদের শূন্যপটে প্রতিদিন মনোমত ছবি তৈরী করে নেওয়া। এতে লাভ আছে। একটি ক্যানভাসে একাধিক ব্যক্তি আপন আপন মনোমত ছবি মানস চক্ষে নিরীক্ষণ করতে পারেন। তবে ৪৭·৯৫ টাকার আয়নাটাই লাভের। আয়নায় সকলেই মুখ দেখতে পারেন—কল্পনা শক্তির ওপর বেশী জুলুম হবে না আর নিজের মুখ দেখে সকলেই তৃপ্ত হবেন।

অভিযাত্র কাহিনী
দাইনে দ্য ম্যারিয়ার

এর পরদিন সকালে ফুল্লমনে মারকুই দুপুরের অভিসারের উপযোগী একটা পোষাক নির্বাচনের চেষ্টা করছিল। যেটি পাওয়া গেল এবং পছন্দ হল সেটা সমুদ্রতীরে ব্যবহারের পক্ষে একটু ঝাঁপালো। তারপর চলল মেয়েদের নিয়ে শহরে।

আজ শহরে হাট বসার দিন। বাজার কলরব মুখরিত। অনেক লোকের ভীড়, মেয়ে দুটিকে দুহাতে ধরে তাদের নানা রকম খুঁটিনাটি কথার জবাব দিতে দিতে মারকুই চলেছে, মনটা আজ তার খুশিতে ভরা। হাট থেকে সবাই নানারকম জিনিষ কেনাকাটা করছে। বন্ধুজনের উপহার, ছবিওলা পোস্টকার্ড এমনি কত কি। মারকুইকে সবাই লক্ষ্য করছে, বেশ শ্রদ্ধা নিয়ে তার যাওয়ার পথ করে দিচ্ছে। এগিয়ে গিয়েও ফিরে ফিরে ছোট্ট মেয়েদুটির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। মারকুই চলেছে বিজয়িনীর দীপ্ত ভঙ্গীতে। জিনিষপত্র যা কেনাকাটা হচ্ছে তা মারকুইর ব্যাগে জমা পড়ছে।

পলের ফটোর দোকান খুব কাছে। সে দোকানে আজ অনেক ভীড়। মারকুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা ছবির বই-এর পাতা ওলটায়। তার আজ তেমন তাড়া নেই। দোকান শুদ্ধ লোক মারকুইকে প্রাণভরে দেখছে। পল আজ একটা বেয়াড়া গোলাপীরঙের সার্ট গায়ে চড়িয়েছে, সেদিনের নীল সার্টটার চেয়েও বাজে ধরনের। এর ওপর গায়ে সেই ধূসর রঙের কোটটা চাপিয়েছে।

পলের দিদির গায়ে একটা কালো রঙের পোষাক, তার ওপর একটা পাটকরা শাল। পল লক্ষ্য রেখেছে ওর দিকে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ব্যবসায়ীর ভঙ্গীতে দু-চারটে কথা বলল, কোথাও অন্তরঙ্গতার প্রকাশ নেই। মারকুই মিস ক্লোর ছবি দেখে বললে, কোনটা ইংলন্ডে পাঠাবে মনে করছ? প্রুফটা দেখে দিয়ে দাও। তারপর পলকে বলে, মেয়েগুলোর ছবি একখানাও তেমন হয়নি, কি করে তুলেছ!

পল একেবারে মুখ নামিয়ে সবিনয়ে বলে, বেশত' আবার না হয় তুলে দেব। দোকানের খরিদ্দারের ভীড় সামলাতে পলের দিদি হিমসিম খাচ্ছে। খোঁড়া পায়ে দোকানময় ঘুরপাক খাচ্ছে। মাদাম মিস্ ক্লোকে বললেন, তুমি পলের বিলগুলো মিটিয়ে চলে এসো।

এই বলে মেয়েদের হাত ধরে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল। পলকে একটা মৌখিক সম্ভাষণও জানালো না মারকুই।

হোটেলে তখন বেশ ভীড়। সব টেবল ভর্তি। হোটেলের লনে রোদ ভেঙে পড়েছে। টবের ফুলগাছে অজস্র ফুল। ওদিকে সাগর জলের কলরোল এখানে মানুষের কলরব। সকলের মুখে যেন মাদামের নাম। হোটেল ম্যানেজার ত' মারকুইকে দেখেই ওর দিকে এগিয়ে এলেন। সেই সব অতিক্রম করে যৌবনমদমত্তা মাদাম ওপরে উঠলেন।

পর্দা নেমে যাওয়ার পর মুগ্ধ দর্শকবৃন্দের প্রশংসিত অভিনন্দনের জবাবে যেন আর একবার যবনিকা উত্তোলিত হল—সানন্দে অভিনন্দন গৃহীত হল। আজ প্রাণে খুশির রঙ লেগেছে মাদামের। আজ সে আনন্দ-প্রতিমা।

দুপুরের আহারান্তে মিস ক্লো বেই মেয়ে দুটোকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন মাদাম অমনি তাড়াতাড়ি পোষাকটা বদলে হাত ব্যাগটা তুলে নিয়ে লঘুপদে সেই যালিয়াড়ি ভেঙে প্রখর তপনতপ্ত দুপুরে পাহাড়ের ওপর চলল।

পল অনেক আগে থেকেই এসেছে। এর-মধ্যে যে দুজনের দেখা হয়েছে একবার সে প্রসঙ্গ উঠল না। মাদামকে নিয়ে উঁচু পাথরের পাশটিতে সেই নিরালা নির্জনে গিয়ে দুজনে বসল। হোটেলের কলরব, খাবার আর মদের সৌরভ, অনেক মানুষের ভীড় থেকে বেরিয়ে এই জায়গাটায় এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মাদাম। কি যে ভালো লাগছে সেই কথাই বলে চলে মারকুই।

পল বেচারী কি আর বলবে, তার জীবনে এসেছে নতুন প্রবাহ। সে সেই উত্তাল তরঙ্গে যেন দিশেহারা। একটু পরেই মারকুই-এর সারা অঙ্গে আলস্যের আবেশ —আগের দিনের মত দেহ মেলে শুয়ে পড়ল, আর পল মাদামের হুকুমে অজস্র ছবি তুলল। তারপর সেই মদনযজ্ঞের পুনরাবৃত্তি। সেই নিবিড় পুলকে সারা অঙ্গে আনন্দবন্যা প্রবাহিত। যেন এ এক অন্য ভুবন—কেউ নেই সেখানে খালি পল আর মাদাম। দুজনে মিলে এক। এই দুরন্ত দুপুরে প্রতি রোমকূপে যেন আনন্দবন্যা প্রবাহিত।

মারকুই যেন সুখের সাগরে ভাসছে। প্যারিসের কোনো বিউটি পারলারে নরম কোচে শুয়ে আছে আর মাথার চুলে স্যাম্পুর স্পর্শ। মাঝে মাঝে কিছু উষ্ণ উত্তাপ অনুভূত হচ্ছে। চোখ দুটি বন্ধ করে অতি সন্তর্পনে এই আনন্দের অংশ সে গ্রহণ করছে। এই দৈহিক মিলন কিন্তু অন্তরে কোনো আকুলতা জাগায়নি। সেখানে কোনো চাঞ্চল্য নেই।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। পল আগের দিনের মতই নিঃশব্দে মাদামের পাশ থেকে উঠে পড়ল। মারকুই-এর কোনোরকম অসুবিধে না হয়।

মারকুই একটু পরে ধীরে ধীরে উঠে পড়ে। এইবার সবার নজর এড়িয়ে হোটেলে

ফিরতে হবে। পল তেমনই রয়ে গেল, তাকে কোনো সম্ভাষণ না জানিয়ে মাদাম চলে যায়।

মাদামের কপালটা ভালো, বর্ষার আক্রমণে বিপর্যস্ত হতে হল না। আরো কয়দিন বেশ রৌদ্রভরা দিন রইল আর তার দুপুরের গোপন অভিসার অব্যাহত রইল।

লাঞ্চ সেরে চুপিচুপি রোজ বেরিয়ে পড়ে, সেই পাহাড়ের নির্জন আশ্রয়ে পলের সঙ্গে দুপুরটা কাটিয়ে বিকাল হতেই হোটেলে ফিরে যায়।

মিস ক্রোর নজরে দু-একদিন ধরা পড়েছে, কিন্তু এ নিয়ে তার কোনো ভাবনা নেই। তার ধারণা দুপুরে এইভাবে বেড়ানোর খেয়াল এক রকম ভালো। আগেকার মত শরীরের ব্যাপার নিয়ে সেই ঘ্যানঘ্যানানি নেই। মেয়েগুলোকেও তেমন কড়া শাসন করে না। এখন অনেক প্রশান্ত মন। নিয়মিত অভিসার রঙ্গে কোনো বাধা নেই। এই একইভাবে দেখতে দেখতে প্রায় একটি পক্ষ কেটে গেল।

ক্রমে যেন দুপুরের এই রতি-বিলাসে একই পরিবেশে, একই স্থানে, প্রাত্যহিক একই পরিবেশে, একই স্থানে, প্রত্যাহিক নিঃশব্দ বিহার কেমন যেন মাদকতাহীন মলিন হয়। কোনো আবেগ নেই, কোনো কথা নেই, যান্ত্রিক গতিতে শুধু নীরব দেহ-সম্ভোগ। কোনো নতুনত্ব নেই, আর লোকটাও একটা তৃতীয় শ্রেণীর ফটোওলা।

পল বেচারীর ভালোমানুষী ভঙ্গীটাকে আঘাত করে মাদাম, খোঁচা দিয়ে বলে, তুমি কি বিশ্রী পোষাক পরো। আচ্ছা মাথায় ঐ যে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল রেখেছো ওতে কি তোমার মনে হয় ভালো দেখায়। তোমার এই সব প্যান্ট-কোট বড় সস্তা জাতের।

ফটোর দোকানটি পলের কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয়। মারকুই তাই নিয়েও আঘাত হানতে ছাড়ে না, বলে—কি ছোট্ট ঘুপচি ঘরে দোকান করেছ, এতটুকু ঔজ্জ্বল্য নেই কোথাও। আর তোমার মালপত্রও সব সস্তা দরের। যে কাগজে দিয়ে ফটোগুলি প্রিন্ট করো ও-গুলি তেমন ভালো কাগজ নয়। একটু খেলো ধরণের।

কথাগুলি বলার সময় মাঝে মাঝে আড় চোখে ওর মুখের দিকে তাকায় মারকুই। পলের মুখখানি রক্তহীন হয়ে গেছে, এমন প্রচন্ড কষাঘাতে সে জর্জর হয়ে পড়েছে। তার চোখে জল এসে গেছে। তবু মারকুই-এর মনে এতটুকু করুণা জাগে না।

এতদিন যেন একটা কড়া আরক পান করছিল মারকুই। প্রথমটায় সেই কড়া ওষুধের তেজে শরীরে উত্তেজনা জেগেছে। মন চাঙ্গা হয়েছে, কিন্তু ওষুধটার পৌণপৌনিকত্বর ফলে একঘেঁয়েমি এসেছে, দেহের ওপর প্রতিক্রিয়াটাও তেমন অনুভবযোগ্য নয়। বরং এখন ওষুধটাকে নেহাৎ ওষুধ-ওষুধ মনে হচ্ছে। উগ্র এবং তিক্ততায় ভরা সেই ওষুধ রোগিণীর বিস্বাদ ঠেকছে।

মারকুই আজকাল ঠিক সময় মত এসে পৌঁছায় না, বেশ দেরী হয় এক একদিন। পল বেচারী প্রতীক্ষাকাতর চোখে ওকে দেখে। সে সব দিকে মারকুই-এর কোনো নজর নেই। তবে অনুগ্রহ করে ছবি তোলার কাজে বাধা দেয় না। তারপর কিছুক্ষণ আনন্দ প্রবাহে অবগাহন করে নিঃশব্দে উঠে পড়ে।

পল বেচারী তার অসমান পা টেনে টেনে তার পিছনে পড়ে যায়। মারকুই মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকায়।

পলকে মাঝে মাঝে বলে হোটেলে গিয়ে ছবি তুলতে। সেজেগুজে মহিমামন্ডিত রূপ নিয়ে দাঁড়াবে, পাশে দুই মেয়ে। ওদিকে মিস ক্রোকে ফরমাস করবে। আশ পাশের লোক সচকিত হয়ে উঠবে—তবেত। তা নয়, এইভাবে লোকলোচনের অন্তরালে ছবি তোলা আর ভালো লাগে না, তেমন উত্তেজনা নেই এতে। পল হোটেলে আর যায় না।

একদিন আকাশে মেঘ উঠল, আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে টুকরো মেঘ। আজ মারকুই কেমন অবসাদগ্রস্ত, দীর্ঘপথ অতিক্রম করে পাহাড়ে অভিসারে যেতে মন লাগে না। একখানা বই হাতে নিয়ে বারান্দায় আরাম কেদারায় গা মেলে দিল। এ এক স্বতন্ত্র আনন্দ, ইচ্ছার স্বাধীনতা তাকে একটা একটানা বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। আজ আর কোথাও যে যেতে হল না, এই যেন বেশ। তবু কোথায় যেন একটা অস্বস্তির বোঝা রইল, কি যেন এক অদৃশ্য জ্বালা।

পল হয়ত একটু কষ্ট পাবে। কিন্তু এই কষ্টের কোনো অর্থ হয় না। এই ক'-দিনের অন্তরঙ্গতাটা নিছক একটা সাময়িক আবেগ। এর আবার অন্য কোনো দিক আছে নাকি!

এর পর দিন মারকুই আবার পাহাড়ে গিছল, আবার সেই গোপন অভিসার। পল একেবারে অভিমানে আকুল। ঐ ঠান্ডা, নরম মেজাজের লোকটার যেন রূপান্তর ঘটেছে। পল উত্তেজিত ভঙ্গীতে বলে, ব্যাপার কি। কাল কি হল তোমার! আমি ত' একেবারে ভাবনায় ভেঙে পড়েছিলাম, হোটেলে যাব মনে করেছিলাম।

মারকুই উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে, কেন, কি ভেবেছ আমাকে? আমার বুঝি আর খেয়ে বসে কাজ নেই, রোজ এমনই আসতে হবে এমন কিছু লেখাপড়া আছে?

পল ঠান্ডা হয়ে গেল। বলল, তা নয়, আমার বড় ভয় করছিল, কি না জানি হল তোমার! কাল সারারাত আমার চোখে ঘুম নেই। কেবল ছটফট করেছি। তুমি যে আমার কি তা বলে বোঝানো কঠিন। যেদিন দোকানে প্রথম দেখেছি সেদিন থেকে আমি আর কিছু জানি না, খালি তুমি আর তুমি। 'আমায় ঘিরি, আমায় চুমি, কেবল তুমি, কেবল তুমি'—জানো আমি এই দুপুরের এই মুহূর্তটির জন্যই যেন বেঁচে আছি—এ আমার স্বর্গ, এ আমার স্বর্গ!

মারকুই নারী, তার মনটাও গলে যায়। সে ওর মাথার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ আঙ্গুলে দিয়ে কপাল থেকে সরাতে সরাতে বলে—এরকম অবুঝ হলে কি চলে! তুমি সব জিনিষ ভেবে দেখোনা কেন! আমার এইখানে আসার পথে অনেক বাধা, অনেক বিপদ।

মারকুই ভাবে, কাল ঐ ঝড় জলের ভেতর আমার প্রতীক্ষায় বসেছিল। রোজ কত কষ্ট করে, ঐভাবে পা টেনে টেনে আসে এতদূর পথ শুধু একটু সঙ্গলাভের প্রত্যাশায়। তবে সমস্ত ব্যাপারটিকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়া ওর পক্ষে নিছক ছেলেমানুষী।

পল আজ আর ছবি তুলছে না। ওর পাশটি ঘেঁষে মাথার নীচে হাত রেখে কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। তারপর হঠাৎ বলে বসল, আমার ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে ফেলেছি।

মারকুই চমকে উঠল, বলে কি! শেষকালে আত্মহত্যা করে বসবে নাকি!

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে—কি আবার ব্যবস্থা করলে পল?

পল আবেগভরে বলল, আমি তোমার কাছে কাছে থাকব, তোমার সঙ্গছাড়া হব না। তোমাকে প্রতিদিন না দেখলে আমি বাঁচব না।

এই কথাগুলি যেন আপন মনে বলে চলেছে একটানা সুরে, তবু তার ভেতর বেশ দৃঢ়তা আছে। এমন জোর দিয়ে কথা আগে কোনো দিন ওর মুখে শোনেনি মারকুই।

পল বলছে, জানো যেখানে ভালোবাসাটা বড়ো সেখানে কি কোনো বাধা থাকতে পারে? আমার দোকানটা আমার দিদি দেখাশোনা করবে, দোকানের ভার ওর হাতে তুলে দেব। আমার আর কি প্রয়োজন, কিছুই নয় বলা যায়, তুমি তা জানো। সে তুমিই ব্যবস্থা করতে পারবে। প্যারিসে আমার জন্য একটা ছোট্ট দোকান করে দেবে। আর না হয় তোমার ত অনেক দাস-দাসী, আমি সেইরকম কিছু একটা কাজ নেব। তোমার ব্যক্তিগত চাকর, ফাই-ফরমাস খাটব। তাতে মান অপমানের কোনো প্রশ্ন নেই। হুকুম মাত্র হাজির থাকব। সব সময় তোমাকে চোখের ওপর দেখতে পাবো, সে এক রকম ভালোই হবে। আমার এই ফটোওলার জীবন একেবারে মুছে যাবে। কর্তা ত' তাঁর কাজ কারবারেই ব্যস্ত থাকবেন। মিস ক্রো মেয়েদের দেখাশোনা করবেন আর আমি ওরই মধ্যে একটু সুযোগ করে তোমার সঙ্গে দেখা করব। একেবারে তোমার শোবার ঘরে গিয়ে হাজির হব। কেমন? সেই বেশ হবে কি বল? একটু বেশী সাহসের দরকার এই যা।

মারকুই একেবারে স্তম্ভিত। তার গলায় কি আটকেছে। বলে কি লোকটা। মারকুই কল্পনা নেত্রে দেখল তার বাড়ির কার্পেট পাতা বারান্দায় আরদালির পোষাক পরে পল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছোটাছুটি করছে, হুকুম তামিল করছে। আর দুপুরে বেলা যখন কেউ কোথাও নেই তখন পা টিপে টিপে এসে দরজায় টোকা দিচ্ছে। সব সময় নজর রাখছে ওর মুখের দিকে। ও কল্পনা করা যায় না অবশ্যটা। কি ভয়ংকর আশা রে বাবা। কি সর্বনেশে কান্ড। ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়।

মারকুই মনের ভাব সামলে নিয়ে বেশ ঠান্ডা গলায় বলে, না পল, অতো দুঃসাহস আমার নেই। তুমি আমাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করো পল। আমার কথা আর ভেবো না। এই কটি দিনের আনন্দ মধুর দুপুরের স্বপ্ন চিরদিন আমার মন ভরে থাকবে। কিন্তু পল তুমি আমাকে ভালোবাসো তাই এই সব ভাবছ কিন্তু তা যে হয় না পল। আমার বাড়িতে তুমি থাকবে চাকর সেজে, তারপর আমি গোপনে সেই চাকরের সঙ্গে মিলিত হব সে কি হয় পল—সে মোটেই সম্ভব নয়। খবর এসেছে আমার স্বামী শীগগীর আসবেন, আমার পক্ষে আর আসা সম্ভব হবে না পল—

এই যে শেষ তার ইঙ্গিত দেওয়ার জন্যই বোধকরি মাদাম উঠে দাঁড়িয়ে দোমড়ানো-মোচড়ানো ফ্রকটা হাত দিয়ে ঠিকঠাক করে নেয়, মুখে পাউডার দিয়ে যে সব জায়গায় প্রসাধন নষ্ট হয়ে গিছল তা মেরামত করে নেয়। এরপর হ্যান্ডব্যাগ থেকে দশ হাজার ফ্রাঁর নোট বার করে ওর হাতে দিয়ে বলে টাকাগুলো রাখো, দোকানটা বেশ বড়ো করে নাও।

ক্ষেপে উঠল পল, না, কিছুতেই এই টাকায় আমি হাত দেব না।

তারপর মাদামের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পাথরের ওপর পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। মাদামের মনে কষ্ট হচ্ছে ওর এই আকুলতা দেখে কিন্তু তার চেয়ে ভয় হচ্ছে বেশী। যদিও বেশ নিরিবিলি জায়গা তবু পলের এই আর্ত ক্রন্দনের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে কেউ যদি এসে পড়ে! এমন ভংগীতে পড়ে আছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে ধোবারা যেন ওর কোটটা পাহাড়ের গায়ে কেউ টাঙিয়ে দিয়েছে।

মারকুই বিরক্ত হয়ে বলে, ভালো জ্বালা! তুমি থামবে কিনা বলো। একি কান্ড! যা প্রকৃত ভালোবাসা তা কি এত সহজে পাওয়া যায়। সমস্ত জীবন ধরে কি এমন একটা কান্ড নিয়ে জড়িয়ে থাকা যায়। আর এমন হাউ-মাউ করে কেঁদে-কেটে অনর্থ করার নাম কি ভালোবাসা?

এই ভাবে গঞ্জনার ফলে উঠে বসে পল খেপার মত বলতে থাকে, তুমি মায়াবী রমণী, কুহকী! তুমি নষ্ট স্ত্রীলোক। সহজ সরল পেয়ে আমাকে তুমি ছলনা করেছ। আমি তোমাকে ভুল ভেবেছিলাম, ভালো ধারণা করেছিলাম। কিন্তু তুমি অতি নীচ শয়তানী।

পলের মাথার ঠিক নেই, সে বলছে, আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙব, তোমার স্বামী এলে তাঁকে যতগুলি ফটো তুলেছি তা দেখাব আর দুপুরগুলো কিভাবে কাটিয়েছি তার বিবরণ দেব। হোটেল ম্যানেজারকে বলব, তোমার ঐ ইংরেজ গভর্ণেসকে বলব—সবাই জানবে তোমার আসল রূপ।

পল উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জামা-কাপড় সব গুছিয়ে নিচ্ছে, ক্যামেরা ওঠাচ্ছে, আর বলছে, যা থাকে কপালে, আমার অদৃষ্টে যা হবার তা হবে—তবে তুমিও কোনোদিন শান্তি পাবে না, তোমার কলঙ্ককথা চারদিকে প্রচার করব।

মারকুই-এর সমস্ত শরীরটা রাগে, ভয়ে, অপমানে কম্পমান, গা দিয়ে ঘাম ঝরছে তবু সে অনুনয়ভরা কণ্ঠে বলে, শোনো পল, যা হয় একটা পথ ভাবা যাক—

কিন্তু সে কথা পলের কানে পৌঁছায় না, তার সেই মায়াভরা চোখে প্রতিহিংসা জেগেছে। সে এই কথায় ফিরে দেখল, তারপর ওর লাঠিটা এক পাশে গড়িয়ে পড়েছিল সেটা তোলার চেষ্টা করল।

মারকুই-এর গলায় কি একটা যেন আটকেছে। সে কল্পনা নেত্রে দেখে এই ল্যাংড়া বাদামী কোট পরা কুদে ফটোওলা হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গলাবাজী করছে—। মারকুই-এর স্বামী এডওয়ার্ড যেই তার বিরাট গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে অমনি পল ছুটে গিয়ে একটা একটা করে ছবি দেখাচ্ছে, সে সব ছবি মাদামের।

আর ভাবা যায় না, পল তখন ঝুঁকে পড়ে লাঠিটা কুড়ানোর চেষ্টা করছে, পাহাড়ের সেই প্রান্ত সীমায় নিঃশব্দে ওর পাশটিতে দাঁড়াল মারকুই, তারপর হাত দিয়ে বেশ জোরে ওকে একটা ধাক্কা দিল। আচমকা এই ধাক্কা খেয়ে ছোট এক টুকরো নুড়ির মত গড়িয়ে পড়ল পল—পড়তে পড়তে পলের দেহটা একেবারে অনেক নীচে সাগরের বুকে ঝপ করে পড়ল।—সাগর তার বুকে আশ্রয় দিল বাদামী কোট-পরা কুদে ফটোওলা পলকে। পলকে আর দেখা গেল না।

মারকুই থর-থর করে কাঁপছে, ভয়ে ও উত্তেজনায়। তার পায়ে যেন আর চলার ক্ষমতা নেই। অনেকদিন পরে সে যেন রোগশয্যা থেকে উঠে এসেছে। সমস্ত দেহটা স্বেদাপ্লুত, এমন কি হাত-পা সব। ওঠার চেষ্টা করেও পড়ে গেল মারকুই। বসার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশটা দেখে নেয়, কেউ কোথাও আছে কিনা। এই ভরা দুপুরে কে আর থাকবে, প্রতিদিনের মত আজও এই প্রান্তর জন-মানবহীন।

হাতঘড়িতে সময়টা দেখল ঠিক তিনটে। সময়টা খুব প্রয়োজনীয়। এই সময়টা ও এইখানে ছিল না তার একটা প্রমাণ রাখতে হবে। মুখ হাত রুমাল বার করে মুছে নিয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে গিয়ে শিউরে উঠল মারকুই। ব্যাগ থেকে পাউডার বার করে মুখটায় বুলিয়ে নেয়। সব রকম প্রসাধন সামগ্রীর স্পর্শে আকৃতিটা আবার আগের মত হল। আবার মুখ নামিয়ে নীচে তাকায়— কেউ কোথাও নেই। কোনো কিছুর চিহ্নটিও নেই।
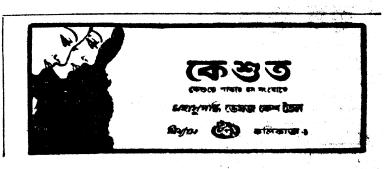
সাগর জলের ঢেউ যেন উন্মাদিনীর মত পাহাড়ের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে, শোকের তীব্রতায় তারা আকুল।

শরীরটা যেন টলটল করছে। মারকুই এখনই চলে যাবে সমুদ্রস্নানে। সবাই তাকে দেখবে সেখানে, প্রমাণ হবে ও সমুদ্রে স্নান করছিল এই সময়টায়।

সমুদ্রের সেই অঞ্চলে তখন বেশ লোক জমেছে। মারকুই সাঁতারের পোষাক পরে টলটলায়মান অবস্থায় জলে নামল। কিন্তু এই জল শরীরে এসে লাগতে সারা অঙ্গ যেন সিরসির করে ওঠে, বেশ শীত শীত লাগছে। তবু তাকে সাঁতার কাটতে হয়। এই সময়টুকু যদি বিছানায় শুয়ে কাটান যেত, যদি একটু স্বস্তি পাওয়া যেত।

কি যেন সোরগোল উঠল। কুকুরগুলো ডাকছে। জলের ভেতর কি যেন পাওয়া গেছে। সাঁতার কাটার সময় পলের শীতল মৃতদেহটা কি পায়ে এসে ঠেকেছে, কে জানে! তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে পড়ে মারকুই। ক্লোকরুমে পোষাক পালটাতে গিয়ে ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে বসে পড়ে। তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না।

খবর এল আরো চারদিন লাগবে এডওয়ার্ডের এসে পৌঁছাতে, কি যেন কাজের চাপ পড়েছে। মারকুই ট্রাংক ফোনে স্বামীকে জানায়—এখানে বড় ভিড়, খাবার জিনিসের অভাব, আমার বিশ্রী লাগছে, মেয়েরাও বাড়ি ফেরার বায়না ধরেছে। তুমি তাড়াতাড়ি এসে আমাদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো।

স্বামী সব শুনে বললেন, সোমবার পর্যন্ত হোটেল বুক করা আছে, আর দিন-চারেক একটু কষ্ট করো। তারপর আমিও একটা দিন ওখানে একটু সাঁতার-টাঁতার কেটে তোমাদের নিয়ে ফেরৎ আসব।

রিসিভারটি নামিয়ে মাদাম ক্লান্ত-ভঙ্গীতে এসে আরাম কেদারায় শুয়ে পড়লেন। হাতে রইল একটা ছবিওলা পত্রিকা। যেন তাই নিয়েই ব্যস্ত। মন পড়ে আছে অন্যত্র—হোটেলে কি শোনা যাচ্ছে ভারী পায়ের শব্দ, ম্যানেজার কি নীচের তলা থেকে ফোনে অনুরোধ জানাচ্ছে এক-বার নীচে চলে আসুন, পুলিশের কর্তারা এসেছেন—

কিন্তু পদধ্বনি নয়, টেলিফোনও নয়। হোটেল প্রতিদিনের মতই কর্মচঞ্চল, সেই রুটিনমাফিক পেয়ালা-পিরিচের ঠুন-ঠুন। আবার এক সময় তাও স্তব্ধ হয়ে যায়। মেয়েদের এবং তার স্নানাহার শেষ। খাওয়ার সময় ভারী খারাপ লেগেছে, এত তিক্ত এবং স্বাদহীন খাবার যেন আগে কোনোদিন স্পর্শ করেনি। মিস ক্লো এক সময় সাঁতার কাটার আমন্ত্রণ জানালেন, মারকুই জানাল, আজ আর মন নেই, তেমন ভালো নেই শরীরটা। সে চুপচাপ চেয়ারে পড়ে রইল ঠিক সেইভাবে।

রাতের ঘুম বিঘ্নিত হল বারবার। পলের সেই উত্তাপতপ্ত দেহস্পর্শ অঙ্গে লেগে, তার গায়ের ঘামের গন্ধটুকুও। আর, মারকুই খুব সন্তর্পণে তার পিঠে হাত দিয়ে তারপর সজোরে জলে ঠেলে দিল। কি ভয়ংকর সেই দৃশ্য! বারবার মনে জাগে সেই ভেসে যাওয়ার হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্তটি। কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই—কিছু নেই।

পাহাড়টার চূড়োয় রোদ ফেটে পড়েছে, সেইদিকে অলস-মধ্যাহ্নবেলায় তাকিয়ে মারকুই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হয়ত ঐখানটায় কারা জমায়েত হয়েছে, কিন্তু অনেক করে চোখ মেলেও কিছু দেখা যায় না।

মিস ক্লো বলেছিল শহরে যেতে, মাদাম বলল, শরীরটা কেমন যেন ম্যাজ-ম্যাজ করছে, এখন আর বেরোবে না। সারা দিনমান অমনই চুপচাপ। এক সময় মেয়েদুটো কোথা থেকে দুটি লাল-নীল পতাকা নিয়ে দৌড়ে এল, বললে : দেখ কেমন নীল, ওর কেমন লাল।

মিস ক্লো এক সময় বলল, ফটোর দোকানে গিছলাম ছবি আনতে। মারকুই-এর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, কি বলে মিস ক্লো। মিস ক্লো মেয়েদুটোকে বাথরুমে পুরে আবার এসে দাঁড়াল, বলল—মাদাম শুনে হয়ত দুঃখিত হবেন, কিন্তু আমার চেপে রাখা উচিত নয়, মঁসিয়ে পল—

মুখ ম্লান করে মাদাম বললেন, কি হয়েছে মঁসিয়ে পলের!

মিস ক্লো সবিস্তারে জানায়—একটা বিশ্রী অ্যাকসিডেণ্ট মাদাম। মঁসিয়ে পল পাহাড় থেকে একেবারে সমুদ্রে পড়ে গেছেন, দেহটা এখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে জেলেরা আবিষ্কার করেছে। শরীরের আঘাতটাও বিশ্রী, আর চেহারাটা নাকি অতি কুৎসিত হয়েছিল।

চেয়ারের হাতলটি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে মাদাম এই কাহিনী শুনছে।

মিস ক্লো তখনও বলে চলেছে, ছবি আনতে গিয়ে দেখি দোকানে তালা ঝুলছে। পাশের ওষুধের দোকান থেকে শোনা গেল সব ব্যাপারটি। মামজেল পল এইভাবে তাঁর ভাইটির মৃত্যু হওয়ায় একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। মেয়েদুটি কাছে ছিল, তাই আর বেশী কিছু জানা গেল না।

মারকুইস বিশেষ ক্লেশসহকারে হাত তুলে ইঙ্গিতে তাকে থামতে বললেন, মেয়েরা এইদিকে আসছে।

মারকুই কিন্তু বুঝল যে তার বুকের বোঝা অনেকখানি হালকা হয়েছে—সেই রাতে খাওয়ার সময় আহারও মুখে রুচিকর ঠেকল। এর কারণটা যে কি হতে পারে তাই ভাবে মনে মনে, হয়ত সব চুকেবুকে গেছে বলেই এই স্বস্তি, সমস্ত ব্যাপারটি নিছক অ্যাকসিডেণ্ট বই কিছু নয়, তাই হয়ত সাব্যস্ত হয়েছে।

মিস ক্লোকে হোটেল ম্যানেজারের কাছে খোঁজ নিতে হুকুম করল মারকুই আর এই দুর্ঘটনার জন্য সে যে ভীষণ দুঃখিত সেই সমবেদনার বাণী মামজেল পলকে পাঠাতে আদেশ দেওয়া হল।

একটু পরে ম্যানেজার নীচ থেকে ফোন করলেন, বললেন—আমি আগে থেকেই সব জানতাম, তবে মাদাম হয়ত কি মনে করবেন তাই জানাইনি। তাছাড়া টুরিস্টরা এসেছেন আনন্দ করতে, তাঁদের এসব হয়ত ভালো লাগবে না। আপনার সমবেদনার বাণী আমাকে আকুল করেছে, আপনি অনুমতি দিলে তাহলে না হয় মামজেল পলকে সম-বেদনার বাণী আর সেই সঙ্গে কিছু ফুল কিনে পাঠিয়ে দিই।

মারকুই টেলিফোন নামিয়ে রেখে মিস ক্লোকে বললেন : শহর থেকে বেশ ভালো দেখে লিলি ফুল নিয়ে এস।

একটি কাগজে সমবেদনার বাণী লিখল —"তোমাদের এই নিদারুণ শোকে আমি মর্মাহত। ঈশ্বর তোমাদের শান্তি ও স্বস্তি-দান করুন।" এরপর মনে মনে সংকল্প করে এখন থেকে সুগৃহিণী, সুজননী হবে। আর কারো প্রতি নির্দয় হবে না। যে-পাপ করেছে, ঈশ্বর তার জন্য যে দণ্ডবিধান করবেন তা মাথা পেতে নেব।

এডওয়ার্ড এলেন ঠিক তার পরদিন। মারকুই তখনও বিছানায় শুয়ে। কর্তা ঘরে আসতেই উদার বাহু মেলে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মারকুই, কি নিবিড় আলিঙ্গন।

এডওয়ার্ড বললেন, বড় ক্লেশ হয়েছে না? সমস্ত দিন একেবারে একা!

মারকুই বুক থেকে মুখ না তুলে বলে, হাঁ, বড় বিশ্রী মনে হচ্ছিল। তাই ত ফোনে তোমাকে এত জ্বালিয়েছি।

ব্রেকফাস্ট টেবলে বসে মারকুই বলে, চলো না হয় কোথাও একটু বেড়িয়ে আসা

থাক। লাঞ্চের ত' অনেক বাকি। বাইরে কোথাও না হয় লাঞ্চ সেরে নেওয়া যাবে। একেবারেই যাই চলো।

মারকুই-এর প্রগাঢ় অনুরাগে পুলকিত-চিত্ত এডওয়ার্ড বললেন ঃ বেশ ত' চলো না। তাই যাওয়া যাক সবাই মিলে।

মাদাম বললেন—বিলটিল সব চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, জিনিসপত্র প্যাক হয়ে গেছে। সামান্য দু-একটা জিনিস গোছাতে বাকি। দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশের পর আর একটুও ভালো লাগে না থাকতে।

সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। মাদাম ঠোঁটে লিপস্টিকের ডাঁটিটা শেষবারকার মত ঘষছেন, এমন সময় টেলিফোন-বেল বেজে উঠল। মাদাম বললেন—দেখো ত' এডওয়ার্ড কে ডাকছে।

এডওয়ার্ড ফোন নামিয়ে রেখে বললেন —মামজেল পল না কে তোমাকেই চাইছে।

মারকুই একেবারে স্তম্ভিত। তার শরীরটা কেমন করছে। সে অশান্তভঙ্গীতে বলে—ভালো জ্বালা। বল না, আমি একটু বেরোচ্ছি এখন—সময় একেবারে নেই।

এডওয়ার্ড টেলিফোনে কথা বলে রিসিভারের মুখটা হাত দিয়ে চেপে রেখে কাঁধ নাড়া দিয়ে বললেন—ও কিন্তু তোমাকেই চায়। কান্নাকাটি করছে। কিছু প্রিণ্ট আছে তোমাকেই দেবে।

প্রিণ্ট! মুখখানা একেবারে ছাই-এর মত হয়ে যায় সেই মুহূর্তে মাদামের, লিপস্টিক বিবর্ণ। মনের ভাব চেপে রেখে মাদাম ধরা গলায় বলে, ওপরে আসতে বল, তুমি ওদের সবাইকে নিয়ে না হয় গাড়িতে ওঠো, আমি দুটো কথা সেরেই যাচ্ছি। পল ছবি তুলতো খুব ভালো। মেয়েদের দু-চারটে ছবি তুলেছিল। আমি এই অ্যাক্সিডেণ্টের খবর পেয়ে কিছু ফুল পাঠিয়েছিলাম। শুনেছে বোধহয় আমরা যাচ্ছি, তাই প্রিণ্ট নিয়ে আসছে।

—সত্যি। তোমার মনটা খুব উদার। তুমি বরং কথা বলো। আমি নীচে গিয়ে সব ঠিকঠাক করি।

এডওয়ার্ড নীচে নামতে না নামতেই মামজেল এসে হাজির। তার গায়ে পুরাতন একটা কালো শোক-পরিচ্ছদ। কান্নায় ভেঙে পড়ল মামজেল পল।

মারকুই সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ছিঃ কাঁদতে নেই। তোমার যে কি ক্ষতি হল তা বুঝি। আমাদেরও মনে বড় লেগেছে।

ছোট্ট পা টেনে টেনে পলের মতই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আরো একটু কাছে এগিয়ে এল মামজেল পল, তারপর নাক-মুখ রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে বলল, আমার সর্বনাশ হল মাদাম। সে আমাদের বড় ভালোবাসত। এখন আর আমার কেউ নেই।

—কেন? তোমার কোনো আপনার লোক নেই? আত্মীয়কুটুম্ব?

—থাকবে না কেন, আছে অনেকে। তবে তাদের নিজেদেরই অন্ন জোটে না, তারা কি করে কি করবে! দোকানটাও চালানো কঠিন, আমি ছবি তোলার কাজ জানি না।

মারকুই তার ব্যাগ থেকে বিশ হাজার ফ্রাঁর নোটের তাড়া বার করল, বলল, জানি, এতে তোমার দুঃখ ঘুচবে না, টাকাটা রেখে দাও। আমার স্বামীকে বলব তিনি যদি কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারেন।

মামজেল ধন্যবাদ না জানিয়ে নোটগুলো নিজের ব্যাগে রাখতে রাখতে বলে, এই টাকায় আমার ভাইটির পারলৌকিক কাজটা হবে। তারপর ব্যাগ হাতড়ে তিনখানি ছবি টেনে বার করল—বলল, আপনারা চলে যাবেন শুনে তাড়াতাড়ি করে নিয়ে এলুম—আরও অনেক ছবি আছে। সেগুলি ডেভলপ করা হয়নি।

ছবি তিনটে হাতে করে আঁতকে ওঠে মাদাম—এ-ছবি যে আছে তা মনে ছিল না—এসব বিস্মৃতির অতলে মিশিয়ে দিতেই সে চেয়েছিল। পলের সেই কোটের ওপর মাথা রেখে বিস্রস্ত ভঙ্গীতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মাদাম।

ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। অনেক ছবিই ত' পল তুলেছিল। দু-চারখানি দেখিয়েছে, তার কাছে অনেক ছিল নিশ্চয়ই।

—তোমার কাছে এই ধরনের ছবি আরো আছে?

—হাঁ, অনেক আছে।

মারকুই মামজেল পলের মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে, কিন্তু তার নজর তখন অন্যদিকে।

মামজেল লক্ষ্য করল—ঘরদোর সব এলোমেলো। বিছানা দোমড়ানো-মোচড়ানো। ড্রেসিং টেবলে কিছু পাউডার পড়ে আছে। ভাঙা হ্যাট। মামজেল পল বলল, আপনি ত' বিশ্রামের আনন্দ উপভোগ করে এইবার ফিরে যাচ্ছেন। আপনার এই দিনগুলি পরমানন্দেই কেটেছে—তার মূল্য হিসাবে বিশ হাজার ফ্রাঁ একটু যেন বেশী শস্তা হল নয়কি মাদাম! আপনার স্বামীকে এই ছবিগুলি নিশ্চয়ই উপহার দিতে আপনি রাজী হবেন না।

মামজেল পল বলতে থাকে, আমার ভাইটির কেন এইভাবে মৃত্যু হল আমি ত' সবই জানি মাদাম, তবু পুলিশের কাছে আমি মুখ খুলিনি। এই ছবিগুলি পুলিশকে দিতে পারতাম, তারা বুঝত যে ঘটনার পিছনে আছে একটা বিফল ভালোবাসার অভিশাপ। কি আশ্চর্য নরম মানুষ আর কি তার মন! একদিন বাড়ি ফিরল, সেকি নিদারুণ ক্লেশের ছায়া ওর মুখে। আমি বুঝলাম যে, কারো জন্য প্রতীক্ষায় থেকে ও নিরাশ হয়ে ফিরেছে। তারপর দিন দুপুরে ও সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আর ফিরে এল না। এর তিনদিন পরে ওর দেহটা পাওয়া গেল। আমার আর কি রইল, সব শেষ। একটা পাকাপাকি কিছু করে দেন ত' ভালো হয়।

দরজাটা খুলে এডওয়ার্ড ভেতরে এলেন; বললেন, কই! তুমি দেরী করছ এত—এদিকে মেয়েদুটো গোল করছে। মালপত্র তোলা হয়েছে—

মারকুই একগাল হেসে বলল, চলো যাই। মেয়েটি বড়ই মুশকিলে পড়েছে, কিছু সাহায্য চায়।

—বেশ ত'। যা হয় ব্যবস্থা করে দিও। এই বলে তিনি মামজেলের দিকে তাকালেন। মামজেল নমস্কার জানায়।

তাড়াতাড়ি কার্ড একখানা বার করে মামজেলের হাতে দিয়ে মাদাম বলে, তুমি না হয় কয়েক সপ্তাহ পরে আমাদের জানিয়ো।

মামজেল এডওয়ার্ডকে লক্ষ্য করে বলে, একটু তাড়াতাড়ি হলে ভালো হয়। নইলে আমিই না হয় প্যারিসে মাদামের কাছে চলে যাব।

মারকুই এডওয়ার্ডকে বলে, এইবার যাওয়া যাক তাহলে।

মামজেল পল একঘেয়ে সুরে বলে, একা একা থাকব, সে যে কত কষ্টের, কে আর আমার আছে বলুন।

এডওয়ার্ডকে ও অভিবাদন জানায়।

নীচে নামতে নামতে এডওয়ার্ড বলেন, আহা বুড়ি মানুষ তার এরকম ছোট্ট পা। ম্যানেজারের কাছে শুনেলাম ওর ভাইটারও নাকি ঐ একই রকমের ছোট্ট পা ছিল?

মারকুই আপন মনে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে সানগ্লাস আর রুমাল বার করতে করতে বলে, হাঁ। তারও একটা পা ঐরকমই ছিল।

এডওয়ার্ড বলতে থাকে, জানো আমার সেই এক বন্ধুর কথা তোমাকে বলতাম, তাদেরও ঐরকম সব ছোট্ট পা।—তো জন স্মিথের পা ঐরকম ছোট্ট হলেও একজন অতিসুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ওর ভালোবাসা হয়, তারপর বিয়ে হল। কিন্তু কি আশ্চর্য কাণ্ড, ওদের যে সন্তান হল, তার একটা পা অমনই ছোট্ট হল। এটা জন্মগত ব্যাপার।

হোটেলের সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে এই ধনী-দম্পতির বিদায়-অভিনন্দন জানালেন। মাদাম ও মঁসিয়ের যাত্রা শুভ হোক। আবার আসবেন আমাদের এই হোটেলে।

ম্যানেজার একগাল হেসে বললেন—এ-হোটেল আপনাদেরই। আপনারা গেলে আমার হোটেলের সব ম্লান হয়ে যাবে।

মারকুই নীরবে স্বামীর পাশে বসে পড়লেন। সেই পাহাড়ের চূড়া পিছনে ফেলে ওদের যাত্রা শুরু হল। পিছনে পড়ে রইল কয়েকটি প্রখর তপন-তপ্ত মধ্যাহ্ন দিনের মাধুরী। এই পথ নিয়ে চলেছে নিরাপত্তার নিশ্চিত নীড়ে। কিন্তু—!

কোথায় নিরাপত্তা? একটি ছোট্ট পা মাদামের সমস্ত শান্তি বিঘ্নিত করেছে। সেই ছোট্ট পা আগামীকাল নতুন কোনো সংকট নিয়ে হয়ত হাজির হবে। ছোট্ট পা জন্মগত শারীরিক বিকৃতি।

।। শেষ ।।

—ইন্দ্রনাথ চৌধুরী অনূদিত

শ্রুতিলিখন ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

লিখছি আটষট্টি সন তোমাদেরই লেখার কাগজে।
পাতার পর পাতা শাদা, ফিটফাট, যেন এখুনি বেড়াতে বেরুবে; অথচ
অক্ষরের জন্য কোনো স্মরণীয় তদন্ত ছিল না। যেন এখনো সহজে
বাংলাদেশ লিখলেই মনে হবে বৃষ্টি এসেছে; যা
চারিদিকে শাঁখ বাজছে, মা মধ্যবিত্ত ঈশ্বরকে প্রণাম করছেন......
কিন্তু না, এখন বাংলাদেশ লিখলে আমার সেই সব সর্বাঙ্গীন সেবা
মনে পড়ে না, কেননা লিখছি আটষট্টি সন তোমাদেরই লেখার কাগজে,
শাদা ফিটফাট এমন যে অশ্রুতে ভেজে না;
তাই ট্রাম, বাস, বাসরঘর ট্যাক্সিতে
বাংলাদেশ দৌড় দৌড় কি ভীষণ পালাচ্ছে কেবলি
শূন্য পৃথিবীর সূর্য থেকে এ গলি ও গলি।
যেখানে প্রত্যেক নিশ্বাসে এখন বিশ্বাসের ক্ষুধা,
হাত উপরে উঠলেও আলিঙ্গনে পৌঁছুতে চায় না,
তারা নীলিমার মধ্যপথে থমকে থাকে, যেন নালিশ জানায় "হে বসুধা
পাথরে দাগ কাটার মতো স্মৃতি দিও আমাদের, শুধু কুটুম্ব হয়ো না।"

মিথ্যাবাদী ॥ শিবশম্ভু পাল

কেবল তোমারই জন্যে আমার জামায় ওরা ছিটিয়েছে দাগ।
শুভ্রতা বিনষ্ট হোল। রজনীগন্ধার গুচ্ছ হাতে নিয়ে যাচ্ছিলাম
তোমার বাড়িতে

অন্ধকার, গলিপথ ভিনদেশি, শহরতলীর
নিরালাবিছানো কোন রবিবার মনে হয় পথে যেতে যেতে।
রজনীগন্ধার শাদা আমার জামায় ছিল সংগোপন, তবু
ওরা সব টের পেল, গলির জানলা থেকে ছুঁড়ে মারলো শব্দগুলি ঃ
তুমি মিথ্যাবাদী।
কাদের বলেছিলাম, কাকে যে বলেছিলাম, নেই

আমার বাগানে নেই কোনো ফুল, বাতাসের উদাসীন যাতায়াত
কিছু নেই দেবার মতন।

গোপনতা ভালো লাগে, অন্ধকার, ভিনদেশি গলি
ভালো লাগে পক্ষপাত তোমার দু'হাতে তুলে দিতে
তাইতো লুকিয়ে ফোটা আমার হৃদয় থেকে তুলে দিই রজনীগন্ধার
আদিম শুভ্রতা, ওরা দলেদলে কিরকম অবিশ্বাস্য
ফুটে আছে দেখ।

তবু ধরা পড়ে যাই। কী করে যে টের পায় কে জানে, আমার
লালিত স্বপ্নের নিত্য জন্মমৃত্যু, শাদাকালো বাগানের
অনুপম ফুল
সবকিছু ধরা পড়ে; সহজাত শুভ্রতায় ছুঁড়ে মারে দাগ।
চাঁদের মতন আমি কলঙ্কিত হয়ে আজ তোমার দুয়ারে
কড়া নাড়ি।।

তুষারকণা

প্রাণীজগতের বিস্ময়

একরাশ বরফের গুঁড়ো না এক বোঝা তুলো তা বোঝার উপায় নেই। নরম শাদা লোমে ঢাকা ছোট্ট এই জীবটি মানুষের সমাজে নিতান্তই অপরিচিত। এটি একটি শাদা গরিলা। শাদা বাঘ আজকাল চিড়িয়াখানায় আমরা দেখতে পাই। শাদা ভল্লুক, শাদা কাক, শাদা শেয়াল ইত্যাদিও দেখা গেছে। শ্বেত হস্তী তো সর্বজনবিদিত। কিন্তু এই শ্বেত গরিলাটি একটি নবতম আবিষ্কার বলেই মনে হয়। আফ্রিকায় রিওমুনি বলে যে একটি স্প্যানিশ উপনিবেশ আছে সেইখানকার এক চাষী ভদ্রলোক এটি আবিষ্কার করেন। নাম তাঁর বেনিটো মানে। কলার চাষ করে ভদ্রলোক জীবিকা উপার্জন করেন। তাঁর সেই কলার ক্ষেতে ঢুকে কে যেন মড়মড়িয়ে গাছগুলো উপড়ে ফেলছিল। কে আর হবে? হনুমানের জাত ছাড়া এমন অনাসৃষ্টি কাজ কে আর করবে! তাই ভদ্রলোক বাড়ীর ভেতর থেকে গাছ ভাঙার আওয়াজ পেয়েই বন্দুক হাতে বার হয়ে এসে গুলি করে মেরে ফেলেন তার কলাচোরকে।

কলাচোরটি ছিল একটি কালো কুচকুচে গরিলা। তার ঘন কালো লোমেভরা দেহের মধ্যে আটকেছিল এক মুঠো শাদা পেঁজা তুলোর মত নরম ছোট একটি শিশু-গরিলা। কি ভাগ্যি মায়ের সঙ্গে শিশুটিও মারা পড়েনি! বেনিটো মানে শাদা গরিলার বাচ্চাটি দেখে খুব অবাক হয়ে যান। কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হননি। সুন্দর স্বাস্থ্যবান প্রাণবন্ত বাচ্চাটি দেখে বেনিটো মানের খুব ভাল লাগলো। বেনিটো মানে এই অজ্ঞাত-কুলশীল শিশুটিকে বাড়ীতে নিয়ে এসে যত্ন করে রাখলেন। পাতা, কাঠিকুটি দিয়ে এর ঘর তৈরী করে দিলেন। সে ঘর প্রায় গরিলাদের স্বাভাবিক ঘরের মতই হয়েছিল। একে বুনো ফল গাছের কাঁচ ডাঁটা, ফুলের কুঁড়ি ইত্যাদি খাওয়াতে থাকেন। এইভাবে চারদিন তিনি গরিলাটিকে নিজের কাছে লালন করেন। বেনিটো মানের ধারণা হয়েছিল যে, এটি প্রাণীতত্ত্ববিদ মহলেও এক অপরিচিত জীব আর এটির অস্তিত্বের খবর তাদের কাছে পেঁছলে সারা বৈজ্ঞানিক জগতে নিশ্চয় এক আলোড়নের সৃষ্টি করবে। এটি যে প্রাণীতত্ত্ববিদদের কাছে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি নমুনা-বিশেষ হবে তা বুঝতে পেরে তিনি জীবটিকে লুইসিনা কভিংটন শহরের কাছে টুলেন য়ুনিভার্সিটির যে "ডেলটা প্রাইমেট রিসার্চ সেণ্টার" আছে তারই ডিরেক্টর জর্জ সাবাটের পি'র কাছে নিয়ে যান।

এই শাদা গরিলাটি সাবাটের পি'রও খুব পছন্দ হয় তাছাড়া এটি দেখে তিনি খুব অবাকও হয়ে যান। এই জীবটি সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করা দরকার বিবেচনা করে তিনি এটি বেনিটো মানের কাছ থেকে কিনে নেন। তার পর "ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি"র তরফ থেকে এ সম্বন্ধে তত্ত্ব-তল্লাস চলতে লাগলো। সেই সঙ্গে সাবাটের পি তার নবলব্ধ শাদা জীবটিকে পোষ মানাবার চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি বলেন, অমন নরম তুলতুলে দেখতে হলে হবে কি? স্বভাবটি মোটেই নরম নয় ভারী দুষ্টু ঐ শাদা গরিলাটি। তবুও ওদের খুব ভালো লেগে গেল ছোট্ট জানোয়ারটিকে। এর নাম রাখলেন স্নো ফ্লেক অর্থাৎ "তুষারকণা।" অবশ্য এর প্রথম মালিক বেনিটো মানেও একে ফুঁম গী অর্থাৎ শাদা গরিলা নামে

অভিহিত করেছিলেন। এখন আবার তার নতুন নামকরণ হলো।

অতখানি রাস্তা আসতে আসতে রাস্তার ধুলোয় তুষারের শাদা শরীর লালচে হয়ে যায় তাই সাবাটের পি ও তার স্ত্রী একে স্নান করাবেন ঠিক করলেন। তার আগে খানিকটা দুধ খাওয়ানো হলো। দুধ খাওয়ার সময় বিশেষ গণ্ডগোল করলো না কিন্তু স্নান করান এক পর্ববিশেষ। মিঃ সাবাটের ও মিসেস সাবাটের দুজনে মিলে ধরে বেঁধে তাকে স্নান করায়। স্নান করাতে আরম্ভ করা মাত্রই ও'দের আঁচড়ে দিতে আরম্ভ করলো তুষার। তারপর একজন পা দুটো শক্ত করে ধরেছেন আর মিসেস সাবাটের ঘষে গায়ের ময়লা তুলে স্নান করিয়ে দেন। আস্তে আস্তে পোষ মানাবার চেষ্টা চলতে লাগলো। প্রায় ষোল দিন পরে মাথায় একটু হাত দিলে কিছু বলতো না, তারপর কেউ একটু কান ধরলে কি পা ধরলেও আর কিছু বলতো না। এর মধ্যে ভাল করে খেতে শিখেছে গরিলাটি। এখন দুধ ছাড়া শক্ত জিনিসও খায়। আস্ত আখ থেকে সরু সরু ফালি বার করে চুষে চুষে রস খায়। ক্রমে বিস্কুট, রুটি, জ্যাম জেলি সব খেতে শিখেছে।

এখন আর তুষারকে বন্দী করে রাখতে হয় না। সাবাটের তার এলিফ্যাণ্ট ঘাসের চারণভূমিতে তুষারকণাকে ছেড়ে দিলেন। তিনি যে সব জন্তু জানোয়ার পোষ মানাবার চেষ্টা করেন তাদের এই ঘাসে ছেড়ে রাখেন। তুষারকণাও এখানে বেশ আনন্দে থাকতে লাগলো। মানুষ সম্বন্ধে আর মোটেই ভয় নেই। ঘাসের ওপর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে যেতে থাকে। এর লাফানো ঝাপানো দেখলে মনে হয় শরীরটা বুঝি খুব হাল্কা আসলে কিন্তু তা নয়। প্রায় ১৯½ পাউন্ড ওজন এই গরিলাশিশুর। ওর বয়স হয়েছে দু বছর অবশ্য ওর বয়সের হিসাব মা বেঁচে থাকলেও দিতে পারতো না। বিশেষজ্ঞরা দাঁত দেখে একে দু' বছরের শিশু বলেই আন্দাজ করেছেন। এই বয়সের একটি মানবশিশুর ওজনও এত হয় না। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই গরিলাশিশুটি তার পরিণত বয়সে ৫০০ পাঃ ওজনের হবে।

তুষারকণা এখন বেশ মানুষ চিনে গেছে। মনুষ্যসমাজে বেশ আনন্দে থাকে সে। এখন সে যখন তখন খাঁচা থেকে বার হতে পারে। কেউ একটু লোভনীয় খাবার দেখালেই তার সঙ্গে চলতে থাকে। এক মাসের মধ্যেই চেনা লোকের সঙ্গে এমনিতেই হাত ধরে চলতো। এখন তো মিসেস সাবাটের বা মিঃ সাবাটের কোথাও গেলেই তাঁদের সঙ্গী হয়। বেশ স্ফূর্তিবাজ হয়েছে। একলাই খেলা করে, কখনও ডিগবাজী খাচ্ছে, কখনও হাততালি দিচ্ছে। নিজে সকলকে ভালবাসছে আর সকলের আদর কাড়তে চায়। কেউ আদর করলে চুপটি করে আদর খায়, কেউ কাতুকুতু দিলে খুশী হয়ে হেসে ওঠে।

এইভাবে বেশ ভালো করে পোষ মানিয়ে মিঃ সাবাটের শাদা গরিলাটিকে স্পেনে বার্সিলোনা জুতে নিয়ে গিয়েছিলেন এর নানারকম ছবি তুলে গবেষণা করার জন্য। এই সময় গরিলাটি বার্সিলোনা জুর পশুচিকিৎসক ডাঃ বাম্যান লুয়েরা কার্বোর কাছে থাকতো। ডাঃ লুয়েরা তাকে নিজের বাড়ীতেই রাখেন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন, যে গরিলা এতদিন ধরে মানুষের সাহচর্য পেয়েছে তাকে একা রাখলে সে তার সহজ স্ফূর্তিটুকু হারিয়ে ফেলবে। বাস্তবিকই এখন তুষারকণার চালচলন দেখলে মনেই হয় না যে সে একটি বন্য জীব। সেও বোধহয় তার বনবাসের কথা একেবারেই ভুলে গেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এমন সুন্দর জীব কি পৃথিবীতে মাত্র একটিই আছে? বৈজ্ঞানিকরা এখনও পর্যন্ত বলেন যে, পৃথিবীতে একটি শাদা গরিলার অস্তিত্ব আছে আর সেটি এই তুষারকণা। আসলে শাদা গরিলা তো কোনও এক বিশেষ জাতের গরিলা নয়। প্রকৃতির রাজ্যে এ একটা সহসা ঘটে যাওয়া ঘটনা। মনুষ্যসমাজেও এমন দু' একটি শাদা মানুষের জন্ম হয়, তারা আমাদের চিরপরিচিত সাহেব অর্থাৎ য়ুরোপীয় নয়। এরা এক অদ্ভুত প্রাণী। এদের গায়ের চামড়া, মাথার চুল, গায়ের লোম, চোখের পক্ষ্ম সব ধবধবে শাদা হয়। এদের বাবা মা হয়তো কালো কিন্তু এরা নিতান্তই দৈবাৎ শাদা হয়ে জন্মেছে। বৈজ্ঞানিকরা এদের "অ্যালবিনো" নামে অভিহিত করেন। তাঁদের মতে এদের শরীরের রক্তের অন্তর্হিত রক্তকণিকার হেরফেরেই এমন বৈচিত্র্য ঘটে।

এই শ্বেত গরিলাটিও গরিলাসমাজের "অ্যালবিনো"। এর মা যে কালো কুচকুচে তা আগেই আমরা জেনেছি। সম্ভবত এর বাপও কালো। সুতরাং এমন কালো মা বাবার শাদা সন্তান লাভ সচরাচর তো ঘটেই না বস্তুত তুষারকণাই বোধহয় একটি মাত্রই শাদা গরিলা।

তুষারকণাকে উত্তর রিওমুনির জঙ্গল থেকে পাওয়া গিয়েছিল সেই কারণে সাবাটের ঐ অঞ্চলের গরিলা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলেন। ঐ অঞ্চলের জঙ্গল লম্বায় মাত্র ১২৫ আর চওড়ায় ৮০ মাইল, কিন্তু এখানে ৫,০০০ এরও বেশী গরিলা আছে। কাজেই টুলেনের প্রাইমেট রিসার্চ সেন্টার-পর পক্ষে এই জঙ্গলটি গরিলা সম্বন্ধে গবেষণা করার লেবরেটরি বিশেষ। যদিও এদের গবেষণা বেশীদূর এগোয়নি তবে এই শাদা গরিলাটি সম্বন্ধে গবেষণা করে তাঁরা যতদূর জেনেছেন তাতে মনে করেন, তুষারকণার যদি আর একটি তার মত অ্যালবিনো পুরুষসঙ্গী না জোটে তাহলে এইটিই বোধহয় জগতে প্রথম ও শেষ শাদা গরিলা হবে। কারণ দুটি অ্যালবিনোর মিলনেই আবার অ্যালবিনোর জন্ম হওয়া সম্ভব নচেৎ নয়।

সুন্দরবনে বন কতটা?

আর্য দেব

হাসনাবাদ বসিরহাট, ন্যাজাট, ক্যানিং, রায়দীঘি, ডায়মণ্ডহারবার কিংবা কাকদ্বীপ—সুন্দরবনের এই সব সিংদরোজা বা বন্দর যেখান থেকেই লঞ্চে বা নৌকোয় রওনা হওয়া যাক না কেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুন্দরবনের ন্যাড়া চেহারা দেখতে খুবই বিরক্তি লাগে। মাইলের পর মাইল কোন গাছের চিহ্ন নেই—কখনো সখনো নদীর ধারে বাণী, কেওড়া, হেঁতালের ছায়া দেখা যায় বটে, কিন্তু গাছের মত গাছ অর্থাৎ বন কোথায়? সেবারে কাশিয়াবাদের মুণ্ডারা বলেছিল: আজ্ঞে, জঙ্গল হাসিলের সময় চকদার-গাঁতিদারদের আদেশে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা সব জঙ্গল সাফ করে দিয়েছিল। কাজেই মাঠে মাঠে সোনার ধান ফললেও বড় গাছের ছায়া বিরল, তাছাড়া বড় গাছের বাঁধন না থাকায় ওপরদিকের জল নীচের দিকে নেমে আসে, ফলে জমির মধ্যে মধ্যে বায়বহুল ভেড়ি-বাঁধ ক্রশ-বাঁধ ইত্যাদি নানারকমের বাঁধ দিতে হয়। মুণ্ডারা মাঠের মাঝে মাঝে পুরনো জঙ্গলের দীন ভগ্নাংশ দেখিয়েছিল, ঐটুকু রেখে দিয়েছিল পূর্ব-পুরুষেরা। ওটুকু এখনো ওদের কাছে পবিত্র পুজোর জায়গা, ওদের 'জাহের থান'। কাশিয়াবাদের মুণ্ডারা আর সাগর-দ্বীপের সাঁওতালরা তাদের গ্রামে গ্রামে এখনো পুরনো জঙ্গলের অবশেষ তথা 'জাহের থান' বজায় রেখেছে।

দুশো বছর আগে সুন্দরবনের দিকে নজর পড়ে কলকাতার লোকদের। সেই উনিশ শতকে কলকাতার খুব নিকট পর্যন্ত ছিল জঙ্গলের প্রান্ত। তখন সুন্দরবনে জন্তু-জানোয়ার ত ছিলই, চোর-ডাকাতেরাও লুকিয়ে থাকতো ঐসব অঞ্চলে। কোম্পানির কর্মচারীরা রাজস্ব বাড়ানোর জন্যে এবং কলকাতার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্যে জঙ্গল হাসিল করে আবাদ পত্তনের জন্যে জমি বন্দোবস্ত দিতে আরম্ভ করলো। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলেও সুন্দরবন তখনও তথাকথিত কোম্পানির সরকারের দখলে। সুন্দরবনের উত্তর সীমার জমিদারেরা সুযোগ বুঝে দক্ষিণে বনের মধ্যে নিজেদের অধিকার প্রায়ই বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতো—ফলে কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে বিবাদও লাগতো।' তা ছাড়া নানারকম 'নুন-কর' 'বন-কর'ও আদায় করতো এইসব জমিদারেরা। ১৭৭০-৭৩ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত প্রায় একশো বছর ধরে মাঝে মাঝেই কোম্পানির সরকার জমি বন্দোবস্ত কিংবা 'লিজ' দেয়। এর মধ্যে সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গার সার্ভেও করা হয় মাঝে মাঝে। ১৭৬৯ আর ১৭৭৩ সালের মধ্যে টিচি, রিচার্ডস আর মার্টিন নামে তিনজন সাহেব সর্বপ্রথম জরিপ করেন সুন্দরবনে। জরিপের ফলে পরবর্তীকালে মানচিত্রও তৈরী হয়।

১৮৭৮ সালে এক সরকারী নির্দেশে বসিরহাট, ডায়মণ্ডহারবার ও সেই সময়কার বারুইপুর মহকুমার ১৮৫১ বর্গমাইল এলাকা সংরক্ষিত বন বলে ধরা হয়। বনসংরক্ষণের কার্যকারিতা ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে। এরপর মাঝে মাঝেই চর উঠলে কিংবা চরের ওপর নতুন বন তৈরি হলে তা সংরক্ষণের আওতায় এসে পড়ে। আঠারো শতকের শেষে যেমন বন হাসিলের পালা চলেছিল, উনিশ শতকের শেষ থেকেও তেমনি বনসংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। চব্বিশ পরগণার সুন্দরবনে এখন বনভাগের পরিমাণ হল ১৬৪৬ বর্গমাইল, তার মধ্যে ১৬৩০ বর্গমাইল সংরক্ষিত (রিজার্ভড), ১৫ বর্গমাইল বিশেষভাবে বদ্ধ (প্রটেক্‌টেড) আর ১ বর্গমাইল শ্রেণীহীন বন। ১৮৬২ সালে যে-বন ছিল ১৮৬০ বর্গমাইল পরিমিত জায়গা, তা এখন দাঁড়িয়েছে ১৬৪৬ বর্গমাইলে। বেশ কিছু জমি যে ইতিমধ্যে হাসিল করা হয়েছে, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এই বনের মধ্যে বহু খাল-বিল-নদী আছে, এবং তাদের পরি-মাণও ঐ হিসেবের মধ্যে ধরা আছে। খাল-বিল-নদী প্রায় ৬৮৭ বর্গমাইল পরিমিত জায়গা জুড়ে আছে। তাছাড়া সমুদ্রের দিকে প্রায় ৫৯ বর্গমাইল পরিমিত জায়গা জুড়ে বালির চর রয়েছে, কিন্তু সেখানেও তেমন উল্লেখযোগ্য কোন বন নেই। ফলে মাত্র ৯০০ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে যে সুন্দর-বনের বন রয়েছে তা আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি।

সুন্দরবনের সিংদরোজা বা বন্দরগুলো ছাড়িয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টার বিরক্তি সহ্য করার পর ঘন অরণ্যের মুখোমুখি হলে বোঝা যায় একশো-দুশো বছর আগে কী ধরনের বন ছিল চারদিকে। একটা চর জেগে উঠলে এখন প্রথমে ধানী ঘাস আর বরুণা ঘাস জন্মাতে দেখা যায়, তারপরেই বাণী, কেওড়া ও খলসি গাছের চারা জন্মায়। এরপর জোয়ারের জলে পলি জমতে জমতে চরটা একটু উঁচু হলে গরাণ, গেঁওয়া, কাঁকরা, সুন্দরী ও পশুর গাছের চারা গজায়। ছোট ছোট খালের ধারে গর্জন আর ধুন্দুল গাছ দেখা যায়। গোলপাতার গাছ সাধারণত উঁচু জমিতে দেখা যায়। এ থেকেই বোঝা যায় নদীর পলিসম্ভূত এই সুন্দরবন—যার বয়স হয়ত আট হাজার বছরের বেশি হবে না—কেমন করে বনে ঢেকে গেল! মিষ্টি জলের ধারা যেসব নদীতে নেই সেখানেই এ ধরণের গাছের জন্মের ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়। আর ২৪ পরগণার সুন্দরবনের নদীগুলির জলের মিষ্টতা খুবই কম। সুন্দরী আর গোল-পাতার গাছ তাই লোনা নদীর পাড়ে বেশি দেখা যায় না। অপেক্ষাকৃত কম লোনা যে-নদীর জল তার পাড়ের বন ঘনসংবদ্ধ, গাছগুলিও বড় বড়। সে যাই হোক, সুন্দর-বনে প্রায় চল্লিশ জাতের গাছ পাওয়া যায়, এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন।...অনেক জায়গাতেই দেখা যায় এক-এক জাতের গাছ পাশাপাশি একসঙ্গে রয়েছে—সেখানে অন্য কোন গাছের দেখা মেলে না...খেজুর পাতার মত হলদে-সবুজ ঝোপের মত হেঁতাল গাছের বনে বাঘেরা নাকি ঝাপটি মেরে বসে থাকে—সত্যিই, এই ঝোপের রঙের সঙ্গে বাঘের রঙের আশ্চর্য মিল।... হরিণেরা নাকি বাণী গাছের অম্ল-মধুর ফল খেতে খুব ভালবাসে। গোসাবার দক্ষিণে পাখিরালা গ্রামের অপর পাড়ে যে সজনেখালি বার্ড স্যাংচুয়ারি রয়েছে—যার পরিমাপ ১৩৯·৯২ বর্গমাইল এলাকা—তার ওয়াচ-টাওয়ারে উঠে হরিণের পায়ের দাগ দেখা যাবে বাণীগাছের তলায়, আর দেখা যাবে গাছের মাথায় মাথায় পাখির বাসা। এতে বাস করে ক্যাটল ইগ্রেট, প্যাডি-বার্ড, লিট্‌ল্‌ করমোরাণ্ট, ব্ল্যাকনেক্‌ড্‌ স্টর্ক, স্নেক-বার্ড, হোয়াইট আইবিস, গ্রীন বিটার্ন, পেলিক্যান। আমরা দেখেছিলাম বাসাগুলো ফাঁকা—শুধু নদীর পাড়ের গাছে গাছে কিচিরমিচির করছিল হাজার হাজার 'শামখোর'। ডায়মণ্ডহারবার মহ-কুমার লোদিয়ান দ্বীপ স্যাংচুয়ারিতে (১৪·৬৭ বর্গমাইল) কিংবা হ্যালিডে দ্বীপ স্যাংচুয়ারিতে (২·৩ বর্গমাইল) তেমনি আছে বাঘ আর হরিণ, পাখি ত বটেই! তাছাড়া বসিরহাট আর নামখানা এই দুটি ফরেস্ট রেঞ্জে কুড়িটা ব্লক রয়েছে জঙ্গলের কি সুন্দর নাম তাদের: হরিণভাঙা, চামটা, বাঘমারা, মায়াদ্বীপ, নেতিধোপানি, ঠাকুরান, সপ্তমুখী ইত্যাদি। প্রত্যেক বছরেই এইসব বনে কিছু কিছু মধু-সংগ্রাহক (মৌলে) আর কাঠুরিয়ার (বাউলের) বাঘের মুখে প্রাণ হারানোর খবর পাওয়া যায়—অনেক খবর হয়ত অপ্রকাশিতও থেকে যায়।

মিসিসিপি উজিয়ে

সুরেশচন্দ্র সাহা

রেড ইণ্ডিয়ানদের ভাষায় মিসিসিপির অর্থ হল জলের জনক, আমাদের হাজামজা নদনদী যেমন জন্মের জনক। মিসিসিপির দুই কূলের সুবিপুল অববাহিকার অধিবাসীরা আজ প্রমাণ করে ছেড়েছে, মিসিসিপি শুধু জলের উৎসই নয়, জীবনীশক্তির মূলাধার। অস্ট্রেলিয়ার সুপেয় জলের অভাবক্লিষ্ট আদিম অধিবাসীদের মত রেড ইণ্ডিয়ানদের হয়ত তেমন করে উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়নি। তবু মিসিসিপির নামায়ন থেকে মনে হয়, জলের কদর তারা বিলক্ষণ বুঝত।

উত্তরে মিনিসোটার ইতাস্কা হ্রদ থেকে জন্ম নিয়ে মিসিসিপি অসহায় শৈশবে যখন ২,১৬০ মাইলের যাত্রা শুরু করেছিল, তখন তার বড়ই দীন অবস্থা। সাড়ে এগারশ' মাইল পথ অতিক্রান্ত হয়েছে; ঠিক তখন বাঁদিক থেকে মিসৌরী এগিয়ে এসে সেণ্ট লুইয়ের কাছে তার সঙ্গে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিল। আরও শ'দুয়েক মাইল দক্ষিণে ভীম ভয়াল ওহিও নদী তার ধারা হারাল মিসিসিপিতে। বেড়ে উঠল মিসিসিপি, ফুলে ফেঁপে হৃষ্টপুষ্ট হল, আবেগে সোহাগে ক্রূরতায় কুটিল হয়ে এগিয়ে চলল চরম স্বেচ্ছাচারে—উপরি টাকায় বাড়ি গাড়ি নারীর মালিকের মত। ওহিও যে-জায়গাটিতে মিসিসিপিতে মিশেছে তার নাম কাইরো। এ-কাইরো সেই কাইরো নয়, যেখানে নায়ক নাসের।

আমেরিকার লোকেরা টুরিস্ট হয়ে বিদেশে গিয়ে বেধড়ক ডলার খরচ করে বলে প্রেসিডেণ্ট জনসন জাতির কাছে আবেদন জানিয়ে বললেন—সবাই আগে আমেরিকা দেখ; যা নেই আমেরিকায়, তা নেই দুনিয়ায়। সুতরাং আমেরিকা দেখার সাড়া পড়ল। কিছু লোক ক্ষেপে উঠল মিসিসিপি ভ্রমণে গিয়ে নিউ অর্লিয়ানস্ থেকে উত্তরে মেমফিস পর্যন্ত সাতশ' মাইল জলবিহার করতে, বিলাস-তরণী ডেল্টা কুইনে। প্রেসিডেণ্ট-নন্দিনী লিণ্ডা বার্ড জনসন আমেরিকা দর্শনের প্রথম দৃষ্টান্ত দেখালেন, অবশ্য ভিন্ন পথে। এরিজোনা থেকে যাত্রা শুরু করে কলোরাডা গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন দেখতে দেখতে উত্তর এবং পরে উত্তর-পূর্ব দিকে এগোতে লাগলেন। সঙ্গে টেলিভিশনের লোক রেডিওর পাণ্ডা, এফ বি আই-র ঘুঘু, কিছু বন্ধু-বান্ধবী এবং অবশ্য জননী লেডি বার্ড। বহু অর্থ ব্যয় করে ভ্রমণের এই পরিকল্পনাটি রূপ দিয়েছিলেন একটি বিশ্ববিখ্যাত মাসিক পত্রিকা, লিণ্ডার অপটু রচনার ডাইরীর অজস্র কোটেশনাকীর্ণ ভ্রমণকাহিনীটি ছাপার সুযোগ নিয়ে। ইতাস্কা হ্রদের কাছে বিশীর্ণ মিসিসিপিকে দেখে লিণ্ডা হেসে উঠলেন, দলবলসহ যখন হেঁটে পার হলেন, তখন জল ছিল তার মিনিস্কার্টের অনেক নিচে।

মিসিসিপিকে প্রথম দেখেছিলাম তার মোহনার কাছে। মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এত আশা নিয়ে এলাম—এই কি বিশ্বের বৃহত্তম নদী! চেয়ে দেখলাম একটি অপরিসর নদী-খাদ; দুদিকেই তার জলে-ডোবা পলিমাটির আভাস, বরিশালের বদ্বীপগুলির মত। দুই তীরে সমান্তর রেখায় নকল কাশ-ঝাড় আর নকল নলখাগড়ার ঘন বন। ওধার থেকে, এধার থেকে, সেধার থেকে বিঘা-প্রসর ঘোলা জলের স্রোত উপচে এসে পড়ছে। মনে এই ভেবে সান্ত্বনা আনবার চেষ্টা করলাম, হয়ত কাশের বনের ফাঁকে ফাঁকে চিংড়ি মাছেরা ঝাঁকে ঝাঁকে ফড়িঙের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পল্লী বাঙলার ইচামাছের মত।

আসলে পনেরো মাইল উজানে মিসিসিপি পঞ্চ ধারায় বিভক্ত হয়ে মেক্সিকো উপসাগরে বিলীন হয়েছে। এই রহস্য জেনে এবং পরে দু'শ' মাইল পর্যন্ত মিসিসিপির নদীরূপ দেখে নদী আর নারীর কথা পাশাপাশি মনে পড়ল। আত্মস্বরূপ লুকিয়ে রেখে এমনি করেই কি এরা ছলনাময়ী? স্মরণ করলাম নদী-নারীর অজেয় অথরিটি চাণক্য পণ্ডিতকে। চাণক্যের হিতোপদেশ আমেরিকানরা কতটা মেনে চলেন জানি না। তবে নদীকে তাঁরা নির্মমভাবে শাসন করছেন, নারীর উপরও নজর রাখছেন, তবে তেমন করে বাগে ফেলতে না পেরে রহস্যের ভাষায় নারী-চরিত্রের ভাষ্য দিচ্ছেন কতকটা এই-রকমে—পুরুষের স্বর বদলায় চৌদ্দ বছর বয়সে, নারীর স্বর ফোনের কাছে এলে।

১৯২৭ সালের এপ্রিলের দুই তারিখের সকালবেলা। মিসিসিপির জল কূল ছাপিয়ে উপরে উঠল; ঢালে-কিনারে হাঁ-করা খানাখন্দগুলি ভরে গেল; মাঠঘাট ভাসিয়ে ফুঁসলে গর্জে বন্যার জল প্লাবিত করল ছাব্বিশ হাজার বর্গমাইল জমি। ফসল নষ্ট হল, গরু-ভেড়া মরল, ২১৪ জন মানুষ প্রাণ হারাল। মাস দুয়েকের—মত অনেকেই উদ্বাস্তু-শিবিরে দুর্গত দিন কাটাল। সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় বর্তমান ভারতীয় মুদ্রামূল্যে সাতশ' কোটি টাকা।

১৮৭৯ সালে মিসিসিপি রিভার কমিশন গঠিত হয়েছিল। কাজ এগিয়েছিল যৎসামান্য। প্লাবনের পর ১৯২৮ সালে ফ্লাড কণ্ট্রোল এ্যাক্ট এলো। বিজ্ঞানী মিস্ত্রী মজুর—সবাই মিলে কাজে লাগলেন। শুরু হল নদী শাসনের এলাহি কারবার। আজ পর্যন্ত দেড় হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে মিসিসিপিকে বাগে আনতে; তার প্রতি কণা সংহারশক্তিকে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগান হয়েছে। মোহনা থেকে হাজার মাইল উত্তরে দুই কূলের উর্বর এলুভিয়াল উপত্যকায় যে তিরিশ হাজার বর্গমাইল জমি শস্যে সম্পদে সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে, তা সারা পশ্চিম বাঙলার মোট আয়তনের চাইতেও বেশী। নিউ অর্লিয়ানস্ থেকে বেটনরুজ পর্যন্ত একটানা একশ' মাইলের মধ্যে গত তিন বছরে নানা শিল্পে এক হাজার কোটি টাকা নিয়োগ করা হয়েছে—গড়ে উঠেছে অজস্র আখের ক্ষেত, তৈল শোধানাগার, পেট্রো-কেমিক্যাল প্ল্যাণ্টস্। আরও উজিয়ে রাবার, ইলেকট্রনিক, মহাকাশ পরিক্রমার জন্য গ্যাসের কারখানা; কাগজের মণ্ড, কাপড়ের কল। পেট্রোল ও গ্যাসের খনি এদিকে প্রচুর; গন্ধক, লবণ এবং চুন অনেক। বনসম্পদ অঢেল।

কলকাতা থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত গঙ্গার অববাহিকাটিকে মনে মনে তাকিয়ে দেখছিলাম। ১৯৫৬ সালের প্রলয়ঙ্কর বন্যার কথা মনে পড়ল। প্লাবনের পর এই দ্বিতীয় কি তৃতীয়বার উদ্বাস্তু হয়ে অনেকেই উচ্ছন্ন শিবিরে দিনকত কাটিয়ে এসে মাথায় [illegible] দিয়ে দেখেছেন, সবই গেছে জলে। তা[illegible]দের জমি আছে শুধু তাঁরা কিঞ্চিৎ খুশী হয়ে বলেছিলেন—যাহোক, আগামী বছর ত গঙ্গার পলিতে ধানের ফলন ভাল হবে। উঁই পোকার উৎপাৎ অনেক কমবে। ফলন-বৃদ্ধি অথবা পোকা-নাশের অন্য অসাধারণ কৌশল আজও তাঁরা অবিষ্কার করতে পেরেছেন কিনা জানি না।

পনের বছর আগে মিসিসিপির গতি পরিবর্তনের এমন একটি লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল যার ফলে নিউ অর্লিয়ানস্ থেকে বেটনরুজ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অববাহিকাটির মৃতপ্রায় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আবার বৈজ্ঞানিকেরা মাথা ঘামালেন। কারিগররা কাজে লাগলেন। এখন সে ভয় কেটে এসেছে।

বেটনরুজ পর্যন্ত মিসিসিপিকে প্রাণভরে দেখলাম। মোহনায় যে ধারাটিকে মনে হয়েছিল শীর্ণ, নারীর তুলনায় যা মাত্র

য়, কন্যা নয়, উর্বশীও নয়, পনেরো মাইল জিয়ে এসে তাকে পূর্ণস্বরূপে দেখলাম। ন্ডনের উজানে ক্ষীণতনু টেম্‌স্‌, স্কট-ল্যান্ডের নৃত্যচ্ছন্দী ডী, দুর্ভেদ্য জঙ্গলের বুক-চেরা থাইল্যান্ডের স্বচ্ছ-স্রোতের কোয়াই রেঙ্গুনের ইলিশ-খনি ইরাবতী, অস্ট্রেলিয়ার াম অরণ্যে নিঃসঙ্গ মারে নদী—দেশান্তরের াবৎ আন্তর্দেশীয় জলপ্রবাহের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলাম মিসিসিপিকে, দিনের আলোয় এবং রাতের আঁধারে। মনে ল রূপে-রঙে মেজাজে মিসিসিপিকে, আমাদের বঙ্গীয় কল্পনার নদীর মতই দেখায়—সব মিলিয়ে একজন রাণীকে ঠিক যমনটি দেখতে হলে রাণীর মত মানায়। মিসিসিপিতে এখন আর গঙ্গার মত ভীম-গর্জনে বান-ডাকা স্রোত নেই, বহু শাসনের লেশ্বরী এলংজানি পদ্মার মত পাক-খাওয়া আবিলতা নেই। সুতরাং নদী-সংশ্লিষ্ট মানু-ষদের মনেও আর তত অশান্তি নই। অবশ্য কলকাতাবাসীরা এবং পোর্ট কমিশনের কর্তারা হাজার পঞ্চাশেক বছর পরে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন—চাঁদের ক্রম-ক্ষীয়মান আক-র্ষণশক্তি বঙ্গোপসাগরকে তখন আর উদ্বেল করে তুলবে না, দুর্বার স্রোতের উচ্ছাস নিয়ে গঙ্গাও আর মারমুখী হয়ে এগিয়ে আসবে না।

গঙ্গার মত মিসিসিপির স্থান শিবের মাথায় নয়। মানুষের মর্জিতে তাকে চলতে হয়, চাঁদের টান, হাওয়ার মাতন, বানের ডাক তাকে ভুলতে হয়। তাই যেখানেই সামান্য একটু ফাটল দেখা যাচ্ছে, বাঁধে একটু চিড় খাচ্ছে, জলের তোড় বেসামাল হচ্ছে, সেখা-নেই ইট বালি সিমেন্টের পাহাড় জমে উঠছে, বুলডোজার মোতায়েম হচ্ছে, মানুষ এসে অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নদীকে ভ্রূকুটি করছে।

মিসিসিপির দুই তীরে সমান্তরাল রেখায় যে বাঁধ বেঁধে রাখা হয়েছে, তার জলার দিকটাতে জংলী উইলো গাছের সার, ওধারের মাঠে শস্যের চাষ। গাছগুলি এক-হার পাইনের মত, তেমন ছায়াসুনিবিড় নয়, তেমন কবিত্বময়ও নয়। অবশ্য কবিত্ব কথাটি একেবারেই আপেক্ষিক ; আমরা যাকে বলি বাঁশ-ঝাড় কবিরাই ত তাকে বলেন বেণু-বন।

বেটনরুজ পর্যন্ত দুইশ মাইলের মধ্যে মিসিসিপির গভীরতা কোথাও প'য়-ত্রিশ ফুটের কম নয়। সুতরাং এত দূরেও দেশ-বিদেশের বিপুলায়তন মালবাহী জাহাজ দোর্দন্ড প্রতাপে যাতায়াত করছে। তীরের বেগে ধেই ধেই চলেছে ছোট ছোট স্পীড বোট। যাত্রী সংখ্যা এক বা দুইজন। এ হচ্ছে নৌকো-বিলাসের এক আধুনিক ধরন। কিন্তু এ সব ত সব দেশের নদীতেই আজকাল দেখছি। মিসিসিপিতে দেখলাম মালবহনের এক নতুন কায়দা, নতুন রকমের বার্‌জে। গঙ্গার গাদাবোটগুলি সে তুলনায় একেবারে সেকেলে। পেছনে নয়, পাশে নয়, ছোট একটি মোটর বোটের সামনে একশ দেড়শ' ফুটের এক একটি বার্‌জ—দেখতে অনেকটা উপর ভেসে চলা সাবমেরিনের মত। ২৮০ ডিগ্রি উত্তাপের গলিত গন্ধক অথবা তেল, কয়লা, শস্যাদি অদৃশ্য খোলের মধ্যে পুরে দেহের অভাসমাত্র জাগিয়ে একসঙ্গে ছ' সাতখানা পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে, একটি মাত্র মোটর লঞ্চের শ' কয়েক অশ্বশক্তির গতিতে।

মিসিসিপির সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি বিশেষ মানুষের জীবন, তার ভাবনা-লাগা মুহূর্তে নদী-চিন্তার ইতিকথা। সে মানুষ সাহিত্যিক মার্কটোয়েন। তিনি ছিলেন মিসিসিপির ছোট্ট একটি জল-যানের অধিনায়ক অর্থাৎ আমা-দের নদীগামী ছোট্ট স্টীমারের চালককে আমরা যে ভাষায় বলি সারেঙ্গ, অনেকটা তাই। আজও মিসিসিপির ছোট একটি পাইলট-বোট মার্কটোয়েনের নাম ধারণ করে আছে। যদিও পৃথিবী থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন ১৯১০ সালে। মিসিসিপি থেকে আরও আগে।

মিসিসিপি-তীরে নিউ আর্লিয়ান্‌স্‌ শহরে মার্ক টোয়েন দীর্ঘ দিন বাস করেছিলেন। সেখানে কত লোককে জিজ্ঞেস করলাম তাঁরই সম্পর্কে এমন কিছু কথা, যা জানার দুর্লভ অধিকার ও সুযোগ ছিল তাঁর নিকটতম প্রতিবেশীদের। দুঃখের বিষয়, তাঁর বাড়িও খুঁজে পাই নি, তেমন প্রতিবেশীরও দেখা মেলে নি। আলাপে মনে হল, অনেকেই মার্ক টোয়েনকে চেনে শুধু নামে, সেই নামের আসল মহিমাটি প্রায় না জেনে। এ হচ্ছে অনেকটা মহাত্মা গান্ধীর নাম-জানা বহু ইংরেজের মত—গ্যান্ডী ওয়াজ এ গুড ম্যান—দুই শতাব্দী ভারত সম্পর্কের পর মহাত্মাজীর এইটুকু পরিচয়ই যাদের জানা ; আর কিছু নয়।

কলকাতার কাছে গঙ্গা দেখে অ-গাঙ্গেয় লোকেরা ভাবে হিমালয় থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত সারাটা নদীই বোধহয় ঘোলা। অথচ পঞ্চাশ মাইলও যেতে হয় না—ফাল্গুনে মাসে কালনার কাছে ভাগীরথী ত একেবারে স্বামী বিবেকানন্দের বর্ণনায় ঋষিকেশের গঙ্গার মত। ভেবেছিলাম, হয়ত কয়েক মাইল পর মিসির্সিপিতেও দেখব তেমনি স্ফটিক স্বচ্ছ জল। কিন্তু পুরো দুইশ মাইল ভরে দেখলাম শুধু বাদাম-রঙের মিসিসিপি, আর দুই তীরে গোটা চল্লিশেক তৈল শোধনাগার। কিছু দূরে পর পরই চোখে পড়ছিল রিফাইনারীর আকাশ-চুম্বিত চিমনিতে লক লক করা অগ্নিশিখা। রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত গ্যাস-নাশের উপায় হিসেবে এমনি অনির্বাণ শিখা দিনরাত দাউ দাউ করে জ্বলছে। মিসিসিপির চলছে নিত্য জাগরণ। তিতাসের মত রাতের তারারা তাকেও ঘুম পাড়াতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে। চারদিক থেকে কেবলই নাকে আসছিল টাটকা কেরোসিন-পোড়া গন্ধ। লুইসিয়ানা, এরিজোনা, ক্যালিফোর্নিয়াতে তেলের খনির অন্ত নেই।

বেটনরুজ পৌঁছাবার আগে মিসি-সিপির উপর পুল দেখলাম অন্তত পাঁচটি-প্রতিটি পুলই আকারের বিপুলতায় যান্ত্রিক জটিলতায় কারিগরী নিপুণতায় হাওড়া-পুলের চাইতে কিছুমাত্র কম নয়। পুলগুলির নিচ দিয়ে বৃহৎ-মাস্তুল এস্তার সমুদ্রগামী জাহাজ অক্লেশে যাতায়াত করছে, আর উপরে-চলা মোটর-গাড়িগুলিকে মধ্য নদী থেকে মনে হচ্ছে খেলনার মত। বেটনরুজের উজানেও নাকি এমনি পুল আছে আরও গোটা কতক। একটি পুলের পাশে দাঁড়িয়ে মনে হল, ঈশ্বরদীর কাছে সারা-ব্রীজের নিকটে যেন পদ্মানদী দেখছি।

মিসিসিপি এখন আমেরিকার সৌন্দর্য সৌভাগ্য সুদিনের প্রতীকই শুধু নয়, সে তার জনমানসে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। এই নদীকে দিয়ে সীমারেখা টেনে আমেরিকানরা গোটা দেশকে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। তাই লোকে হামেশা বলে—অন দিস সাইড অব দি মিসিসিপি, অথবা অন দি আদার সাইড অব দি মিসিসিপি। ওপারেতে সকল সুখ কল্পনা না করে দুইপারের মানুষই আপন আপন বৈদগ্ধ্য নিয়ে বড়াই করছে, পদ্মার এপার আর হে-পারের মানুষের মত।

মিসিসিপিতে অনেক মাছের মধ্যে আছে একটি বিশেষ মাছ। এরা বলে শ্যাড। রেঙ্গুনের ইরাবতীর ইলিশ স্বাদে-গন্ধে পেলবতার গঙ্গা-পদ্মা ইলিশকেও হার মানায়। শ্যাড তেমন সাংঘাতিক নয়—যাকে বলে ইলিশ গোত্রীয়। একথা প্রথম শুনে-ছিলাম আমেরিকা-ফেরত একজন দক্ষিণ ভারতীয় মৎস্য-বিজ্ঞানীর কাছে। যিনি গঙ্গার ইলিশ, বোম্বের ভীমসা, মিসিসিপির শ্যাড চেখে দেখেছিলেন, ইরাবতীর ইলিশ চোখেও দেখেন নি। কম তৈলাক্ত বলে তাঁর মতে শ্যাডের স্বাদই বেশী। দুঃখের বিষয়, নিউইয়র্ক, নরফোক, নিউ অর্লিয়ান্‌সে চেষ্টা করেও একটি শ্যাড সংগ্রহ করতে পারি নি, তার বৈশিষ্ট্যও বুঝি নি।

মিসিসিপিতে অনেক কিছুই দেখলাম এবং শেষপর্যন্ত ভাবতে লাগলাম কি বস্তু সেখানে দেখি নি। হাঁ, মনে পড়েছে। মিসি-সিপির স্রোতে মানুষ, কুকুরের ভাসন্ত মৃত-দেহ একটিও ত চোখে পড়ে নি! তাজ্জব কি বাত!

মিসিসিপি-কূলের মানুষদের অনেকের জীবনের স্বপ্ন, নিউ অর্লিয়ান্‌স্‌-মেমফি গামী প্রমোদতরী ডেল্টা কুইনে সাতশ মাইল নৌকো বিলাসের জন্য পনেরো দিনের টিকেট কাটা—নদী দেখা, মানুষ চেনা এবং অকর্মের অবসরে আত্মভোলা হয়ে জীবনের স্বাদকে তিলে তিলে গ্রহণ করা। এ সুযোগ কেউ ছাড়তে চায় না। সম্প্রতি এক জোড়া নবদম্পতী ডেল্টা কুইন থেকে খবর সৃষ্টি করেছেন। যে তারিখে বিয়ে ঠিক হয়েছিল, আর যে তারিখের টিকেট মিলছিল, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ডেল্টা কুইনে মধুচন্দ্রিমা যাপনের স্বপ্ন তাদের সফল হয় না—বিয়ের অল্প আগে, নয়ত অনেক পরে পরবর্তী সফরের টিকিট মেলে। অবশ্য শেষ-পর্যন্ত ডেল্টা কুইনেই তারা মধু-চন্দ্রিমা যাপন করেছিল—তবে বিয়ের আগে ; ফিরে এসে গীর্জা-গমন মন্ত্রপাঠ প্রীতি-সম্মেলন ইত্যাদি মামুলি অনুষ্ঠানগুলি পালন করেছিল।

প্রকৃতির শিশু বইগা

অরুণ লোধ

কষ্টিপাথরে খোদাই পেশীবহুল মূর্তি। নিপুণ কারিগরের হাতে তৈরী। প্রাণোচ্ছল তার চরিত্র। আদিবাসী বইগাদের কথা বলছি। ঐ শক্ত সবল চেহারার ভেতরে লুকান আছে একটা নরম হৃদয়, শিশু হৃদয়। বইগারা আজও প্রকৃতির শিশু। সভ্যতার হাতছানি ওদের আজও উদ্‌ভ্রান্ত করেনি। চিরাচরিত প্রথার বাইরে আসতে ওরা আজও ভয় পায়। ভীরু, সংকুচিত, সন্ত্রস্ত ওরা সভ্যসমাজে। রাজধানীতে প্রজাতন্ত্র দিবসে ওদের দেখেছিলাম বিব্রত বইগাকে। কিন্তু প্রকৃতি মায়ের কোলে ওরা উদ্দাম, সংকোচহীন, হাসি উচ্ছল।

বইগাদের সাধারণত দেখা যায় মধ্যপ্রদেশে। সভ্যতার আলোকে ওরা যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়নি তার প্রমাণ ওরা আজও খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাতে ভালবাসে। শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যে ওরা ঘুমায় নির্ভয়ে। একপাশে কাঠকুঠো জ্বলতে থাকে। আজও ওরা ঠিকমত চাষবাস করে না। প্রকৃতি যা দেয়—বুনো ফলমূল তাই খেয়ে জীবনধারণ করে। পোষাক নামমাত্র।

সহজ জীবনযাত্রা, আরণ্যক পরিবেশ সব মিলিয়ে বইগাকে সহজ করেছে, সুন্দর করেছে। জীবনকে ওরা উপভোগ করতে জানে। ওদের জীবন সমস্যাকন্টকিত নয় বলে [illegible] ওরা গান গেয়ে ওঠে, হাত ধরাধরি করে নাচে। নবজাতকের অভ্যর্থনাই হোক, আর বিবাহিত নবদম্পতির কল্যাণ-কামনাই হোক বা সাপ্তাহিক হাটে সম্মিলন যে কোন উপলক্ষ্যই হোক না কেন বইগাদের আনন্দ নাচেগানে মূর্ত হয়ে ওঠে। ওরা কাঁদতে জানে না, গম্ভীর হতে জানে না।

ওদের রীতিনীতি অদ্ভুত। অদ্ভুত সব ওদের বিশ্বাস। শিশু জন্মালেই ওরা মনে করে পূর্বপুরুষ কেউ আবার জন্মগ্রহণ করেছেন ওদের স্নেহের বাঁধনে বাঁধা পড়ার জন্য। তিনি দয়া করে দ্বিতীয়বার এসেছেন বলে বইগারা তাঁকে সম্মান জানায় নিজস্ব প্রথায়। এক পাত্র জলে কিছু রূপার গহনা নিয়ে শিশুর পা ধোয়ান হয়। সেই পাদোদক পরম শ্রদ্ধায় পরিবারস্থ সকলে পান করে। কিছুদিন ধরে বাপ-মায়ের কাজ হল শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা এবং বিগত কোন পূর্বপুরুষের সংগে তাঁর দৈহিক সাদৃশ্য আবিষ্কার করা।

বইগারা হিন্দু। দশেরা, দেওয়ালি ও হোলি ওদের বড় পরব। এই উপলক্ষে পচাই মদের বান ডাকে। উদ্দাম নাচ-গান তিন-চারদিন ধরে চলে। তাছাড়া, বইগাদের নিজস্ব দেবদেবীও আছেন। কুটকি হলেন বর্ষার দেবী। তাঁর পূজা উপলক্ষে যে উৎসব হয় তাকে ওরা বলে হারোলি। হারোলির ঠিক দুমাস পরে হয় আর একটি পরব, পোলা। সেদিন সমস্ত বইগা নদীর ধারে গিয়ে খড়কুটো জ্বালায় নিজেদের গ্রামকে সারাবছর অমংগলমুক্ত রাখার জন্য।

বিয়ের ব্যাপারে বইগাদের নিয়মকানুন বেশ কড়া। অন্যান্য আদিবাসীদের থেকে বইগারা এবিষয়ে স্বতন্ত্র। ছেলে বা মেয়ে নিজের পছন্দমত বিয়ে করতে পায় না। অভিভাবকেরা পাত্রপাত্রী নির্বাচন করে থাকে। তাছাড়া স্বগোত্রে বিবাহ নিষেধ। পাত্রের পিতা কয়েকজন আত্মীয়বন্ধুকে নিয়ে পাত্রীর পিতার বাড়ী যায়। কিছু উপহার ও স্বগৃহে প্রস্তুত পচাই মদ দিতে হয়। পাত্রী যদি এ বিবাহে সম্মত থাকে তাহলে কন্যাপণ স্থির করা হয়। সাধারণত দশ থেকে পঁচিশ টাকার মধ্যে কন্যাপণ দেওয়া হয়। পাত্রের পিতা ফিরে গিয়ে এক ভোজ দেয় এবং সেখানেই এই মাগনীর ক[illegible] ঘোষণা করা হয়।

তবে বিয়ের আচার খুব সরল. বর কনে প্রথমে পরস্পরের প্রতি খই ছোঁড়ে। তারপর তাদের কাপড়ের একপ্রান্তে গিঁট দেওয়া হয়। বইগারা মনে করে এই গিঁট যত জোরে দেওয়া হবে ওদের বন্ধনও তত জোরদার হবে। তারপর কনের বাপ ভোজ দেয়।

কিছু বইগা চাষ করে সাবেকী প্রথায়। কিছু কাঠ কেটে, শিকার করে বা মাছ ধরে জীবন নির্বাহ করে। মেয়েরা সাধারণত ঘরের কাজই করে। ক্ষেতেখামারে ওরা কাজ করে না। তবে ঘরে ঝুড়িমাদুর ইত্যাদি বোনে। ওদের তৈরি ঝুড়ির কদর সভ্যসমাজে বাড়ছে। বইগাদের গ্রামে গেলে দেখা যাবে ছেলেবুড়ো মেয়েমদ্দ সবাই মিলে বাঁশ থেকে সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি বানাচ্ছে। কথা বলছে, তামাক খাচ্ছে, হাসছে কিন্তু হাত থেমে নেই। তৈরী হচ্ছে শিকোসি, কিকরাহি, ডালি, চালাগি আরও কত কি। এতে গহনা রাখবেন, এতে চাল রাখবেন, এতে সবজি রাখবেন। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন ঝুড়ি।

উত্তর বার্গম্যান প্রসঙ্গ

স্বপনকুমার ঘোষ

উন্নাসিকেরা প্রায়ই বলে থাকেন যে উত্তর-বার্গম্যান সুইডিশ চলচ্চিত্রকাররা তুলনায় নিরস্তিত্ব। বলা বাহুল্য এদের অধিকাংশই হাফ্‌জান্তা গোষ্ঠীভুক্ত। সুতরাং এই হাফ্‌জান্তারা শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিষধর সাপ।

কিন্তু উন্নাসিকেরা আদৌ জানেন না সুইডেনে এখনও য্যান্‌ ট্রোয়েল, য্যান্‌ হ্যালডফ্‌, বো হ্বাইডোরবেয়ার প্রভৃতি চলচ্চিত্রকার সৃজনশীল। সবথেকে বড়ো কথা এই যে, এদের প্রত্যেকে বার্গম্যানের প্রভাবমুক্ত এবং পরিপূর্ণরূপে 'কন্টি-নেন্টাল'। আমাদের দেশে এ'দের ছবি দেখানো হবে কিনা তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন। সুতরাং এদের সম্পর্কে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। সীমিত তথ্যের ওপর নির্ভর করে 'ইনফর্মেটিভ' কিছু লেখা প্রয়োজন। অন্ততঃ চিত্রামোদী-দের তাঁদের সম্পর্কে অবহিত হবার সার্থকতা আছে।

উত্তর-বার্গম্যান প্রসঙ্গ লিখতে গিয়ে বার্গম্যান সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কিছু লেখার প্রয়োজন অনুভব করছি। কারণ, উত্তরসূরীদের আলোচনায় বার্গ-ম্যানের অদৃশ্য উপস্থিতি হয়তো পাঠক-বর্গের কাছে দুর্বোধ্য হতে পারে।

শুধুমাত্র সুইডিশ চলচ্চিত্রে নয়, বিশ্ব-চিত্রজগতে বার্গম্যান পরম বিস্ময়। ইউরোপের চলচ্চিত্রে তিনি নিজেই এক প্রগতির বাহক। তথাকথিত 'সেক্স-স্টর্ম' তাঁকে আদৌ বিচলিত করতে পারেনি। টেলিভিশন্‌-এর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার শিল্পঘ্ন ঘোড়দৌড়ে তিনি নিরুৎসাহ। নিঃসঙ্গ এই পরিচালকের প্রথম ছবি 'প্রিজন'-এর মাধ্যমে অসাধারণ ক্রাফটম্যান-শিপ সহজেই অনুমেয়।

চারুশিল্পে তার দুই জীবনধারা। অনেকেরই অজানা, বার্গম্যান মূলতঃ নট এবং নাট্য-প্রযোজক। তিনি চলচ্চিত্রকে তাঁর 'মিসট্রেস্' এবং নাট্যক্ষেত্রকে 'ওয়াইফ' বলে অভিহিত করেন। তাঁর ছবিতে নাটকীয়তা, গতি-বৈচিত্র্য, সংঘাত-নির্ভরতা প্রভৃতির স্পষ্টতা ও প্রায় অনিবার্যতা এজন্যই বেশী চোখে পড়ে। তাঁর বিশিষ্টতা এইখানে। সম্ভবতঃ তিনিই একমাত্র (অংশত ঋত্বিক ঘটক ছাড়া) শিল্পী যিনি নাট্যক্ষেত্র ও চলচ্চিত্রে সব্যসাচী। তিনি প্রায় কুড়িটার মতো নাটকে নাট্য-নির্দেশক ছিলেন। সুইডেনের বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চ 'মালমো মিউ-নিসিপ্যাল থিয়েটার' ছিল সাধনার অন্যতম পীঠস্থান। অনেক নাটকের মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য 'ডন যোয়ান' 'দি মেরী উইডো' 'স্যাগন' এবং 'ফস্ট'।

বার্গম্যান বিস্ময়কর ব্যাতিক্রম। নাট্য-কার বা নট চলচ্চিত্রে প্রবেশ করলেই (অন্ততঃ-পরিচালনার ব্যাপার), বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থতাটা ধ্রুবসত্য। তাঁর নাট্যলোকে অনু-করণীয় ব্যক্তিত্ব স্ট্রিন্ডবেয়ার। তিনি একথা ঘোষণা করেছেন একাধিকবার। তাঁর পূর্ব-সূরী সোফেস্টমের পক্ষপাত ছিল সেলমা লাগের লফের প্রতি। বলা বাহুল্য, বার্গ-ম্যানের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র বর্তমান।

উত্তরসূরীদের আলোচনায় প্রথমে ট্রোয়েলের কথা লেখা যাক্‌। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি যা করতে পেরেছেন, তা রীতিমতো ঈর্ষার যোগ্য।

ছেলেবেলা থেকেই আলোকচিত্রের দিকে তাঁর দুর্বার আকর্ষণ। ক্যামেরার পেছনে অন্য কাউকে দাঁড়াতে দিতে তিনি আজও নারাজ। প্রথম জীবনে শিক্ষকতায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। ১৯৬৩ সালে শিক্ষকতা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন। গত দশকের শেষদিক থেকেই তিনি শিশু-চিত্র তুলতে থাকেন। সময় এলো তাঁর সঙ্গে হ্বাইডোর বেয়ারের পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে। 'বর্ণিভাগনেন্‌' ছবিতে তিনি আলোকচিত্র গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরিচালনা করলেন হ্বাইডোর বেয়ার। ১৯৬৫ সালে তিনি 'জলাভূমিতে ভ্রমণ' তথ্য-চিত্র নির্মাণে আমন্ত্রিত হন। সেই ছবি

ওলা ও জুলিয়া পরিচালক :
য্যান্ হ্যালডফ্

চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হ'ল। ১৯৬৬-তে এলো সুবর্ণ সুযোগ। প্রযোজনা করলেন একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি। 'এখানেই জীবন তোমার' পত্র-পত্রিকা এবং দর্শক-দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধন্য হলেন তিনি। স্টকহলমের 'স্বেনস্কা ডাগব্লাডেট' বলেছিল : 'অন্যতম সুইডিশ ছবি যা ইতিপূর্বে খুব কমই প্রদর্শিত।' সবথেকে ভালো লিখেছিল 'এক্সপ্রেস' পত্রিকাটি : 'সুইডেনের গোটা চলচ্চিত্রশিল্প কৃতজ্ঞ চিত্তে এই ছবিকে অভিনন্দিত করবে।'

ট্রোয়েলের 'ইসথেটিক সেন্সিবিলিটি' এবং বাস্তববুদ্ধি বিরল এবং বিস্ময়কর। তিনি মনে করেন সম্পাদনাই চলচ্চিত্রের প্রধান শিল্পাংগ। কাহিনীকার হওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়। অন্যের বিস্ময়-বস্তুর প্রতি নির্ভরশীল এই অনন্যসাধারণ পরিচালকটি বলেন : 'সম্পাদনার সময়েই যথার্থ মৌলিক দৃষ্টি শুরু হয়।'

কিছুদিন আগে বেংগট্ ফরসলুন্ড ও ট্রোয়েল মিলে একটি মৌলিক চিত্রনাট্য লিখেছেন। সুইডেন চলচ্চিত্রজগৎ গভীর-ভাবে চেয়ে আছেন সেই চিত্রনাট্যের পরিপূর্ণতায়।

সুইডেনের আরো একজন যথার্থ উত্তর-সূরী হলেন পরিচালক য্যান্ হ্যালডফ্। সবেমাত্র ত্রিশে পা দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তিনটি পূর্ণাংগ ছবি প্রদর্শিত হয়ে গেছে। তিনি প্রতীকধর্মিতা এবং বুদ্ধিদীপ্ত চাক-চিক্যের বিরোধী। যুব-ধর্মের যুগলক্ষণ তাঁর চলচ্চিত্রের দর্শনভাগ। তিনি পপ-এজ-এর চলচ্চিত্রকার। তার ছবির মুখ্য বৈশিষ্ট্য হলো 'টোন'। এই সংজ্ঞা অবশ্য তাঁর নিজেরই তৈরী। তিনি ছবি তোলার সময় মস্ত খেলোয়াড়। তিনি চিরাচরিত প্রথা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। তিনি যৌনতার চরম বিরোধী। যৌন সংসর্গে তিনি ছবি ভরাতে চান না বা দর্শকের রুচিকে বিকৃতির পথে চালিত করেন না। তিনি মনে করেন যে, সেগুলো হলো চলচ্চিত্রকারের চিন্তা-দৈন্যের প্রতিফলন। পরিবর্তে সমসাময়িক স্থান-কাল-পাত্র, পপ মিউজিক এবং যুবক-যুবতীদের দিকে নজর দিতে চান।

জীবন যথার্থই মহৎ তাঁর দ্বিতীয় ছবি। ১৯৬৭'র বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। তাঁর সর্বাধুনিক ছবি 'ওলা ও জুলিয়া' দুই প্রেমিক-প্রেমিকার জীবন নিয়ে রচিত। ১৯ বৎসর বয়স্ক ওলা এক সংগীত সংস্থার গায়ক। সেই দলের নাম 'ওলা এ্যান্ড য্যাংলারস্'। পাশেই হোটেলে এক নাট্যদলের অভিনেত্রী জুলিয়া। দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ সেই হোটেলের বার-এ। প্রেম শুরু হয়। সহকর্মীরা ঈর্ষায় ও সংস্কারে রুষ্ট হয়। বিচ্ছেদ ঘনিয়ে আসে। কিন্তু— চক্রবৎ আবার মিলনের বৃত্তে দুজনের মুখোমুখি হবার দিন আসে।

ছবিটিতে গতি, হাল্কা মেজাজ এবং কৌতুক মিশ্রিত ভাববৈচিত্র্য বাস্তবিক পক্ষে এক সম্পদ।

সারা পৃথিবীতে যখন বিট্ আর পপ্ চিন্তার উন্মেষ, এহেন পরিবেশ এবং আব-হাওয়ায় সুইডেনের চলচ্চিত্রে জন ডোনারের আবির্ভাব অনেকাংশে আকস্মিক এবং অচিন্ত্যনীয়। জাতে ফিনিশ্ কিন্তু চিন্তা ও আউটলুক সাধারণ সুইডিশদের থেকে আলাদা। বার্গম্যানের অতি ভক্ত ডোনার। অথচ তাঁর ছবিতে বার্গম্যানের এতটুকু উপস্থিতি নেই। ডোনার-এর ছবি সুইডিশ ঠিকই তবে, তাঁর দৃষ্টি আলাদা, দেখবার ভংগীও আলাদা। ভেনিস উৎসবে প্রদর্শিত তাঁর প্রথম ছবি 'সানডে ইন সেপ্টেম্বর' সম্পর্কে মতানৈক্য থাকলেও দাম্পত্য প্রেম নিবেদনের দৃশ্য সাধারণ ছবিথেকে আলাদা। ডোনার দ্বিতীয় ছবি বহু আলোচিত 'টু লাভ'। কোন কলা-কৌশল না দেখিয়ে দেখালেন যে দেহগত প্রেম অনেক স্থানে লিবারেটিং ফেক্টর হতে পারে। ডোনার চরিত্রের ওপর দয়ালু, মোট কথা তিনি আশাবাদী। এ ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে তিনি আন্তনিওনি ও নিউ ওয়েভ দ্বারা অনু-প্রাণিত, কিন্তু অনুসৃত নন।

সুইডেনে বার্গম্যানের সার্থক উত্তর-সূরী এরাই, প্রভাব এড়িয়ে এরাই প্রমাণ করেছেন যে, বার্গম্যানের শিক্ষা নেবার উপযুক্ত তারাই।
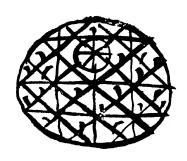
তিন বহুরাণীয়া চিত্রে শশীকলা

নতুন ভূমিকা ঃ

শহর কলকাতার যে-সব চিত্রগৃহে বাঙলা ছবিগুলি মুক্তি পায়, সেইসব চিত্রগৃহের সামনে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র-শিল্প সংরক্ষণ সমিতির পতাকা উড্ডীন দেখা যাচ্ছে এবং তারই সঙ্গে এই সংস্থার 'ব্যাজ'ধারী কিছু স্বেচ্ছাসেবককে, যাঁরা চিত্রগৃহের প্রবেশপথের পাশে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে দর্শকসাধারণকে অনুরোধ করছেন ঐ চিত্রগৃহগুলিকে বর্জন করতে। কারণস্বরূপ বলা হচ্ছে, এই চিত্রগৃহগুলির মালিকেরা নাকি তাঁদের অন্যায় অর্থলোলুপতা দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রাণকে কণ্ঠাগত করে তুলেছেন। গেল ২৩ জুলাই তারিখে ময়দানস্থ প্রেস ক্লাবের তাঁবুতে এই সংস্থার তরফ থেকে যে-সাংবাদিক সম্মেলন আহূত করা হয়েছিল, তাতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সংস্থার মুখপাত্ররূপে অজিত বসু (অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন) এবং অসিত চৌধুরী (ছায়াবাণী ও চারুচিত্র) জানিয়েছিলেন, এই চিত্রগৃহগুলির মালিকদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসবার সকল রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হওয়ার পরেই তাঁরা এই 'সত্যাগ্রহ'-এর পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্পকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এই 'সত্যাগ্রহ'-এর পথ ছাড়া অপর কোনো বিকল্প পথের সন্ধান তাঁরা পাননি। তাঁদের অভিযোগ, এই মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা তাঁদের শর্ত পালনে সম্মত হওয়া দূরের কথা, তাঁদের এই নব-

প্রেক্ষাগৃহ

গঠিত সংস্থাটিকেই স্বীকৃতি দিতে নারাজ। সংস্থা প্রচারিত প্রধান প্রধান শর্ত হচ্ছে : (ক) সাপ্তাহিক 'হাউস-প্রোটেকসন' গ্রহণের প্রথা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে; (খ) প্রমোদকর বাদে টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৫০ শতাংশ প্রদর্শকের প্রাপ্য বলে ধার্য করতে হবে এবং (গ) ছবির মুক্তির ব্যাপারে চিত্রগৃহের মালিকেরা নিজের ইচ্ছামত একটি এবং সংরক্ষণ সমিতির রিলিজ কমিটি নির্ধারিত একটি—এইভাবে পালা করে একের পর এক ছবির মুক্তি দেবেন।

একটি ইস্তাহার মারফৎ সংস্থা সানন্দে ঘোষণা করেছেন, রূপবাণী, অরুণ ও ভারতী—বাঙলা ছবির এই রিলিজ-চেনের কর্তৃপক্ষ সংস্থার উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রকাশ করে এঁদের শর্তাবলী পালনে, সম্মতি জানিয়েছেন। অপরপক্ষে বাকি চিত্রগৃহগুলির মালিকেরা সংস্থাকে আমল দিতে নারাজ। সংস্থার মুখপাত্ররূপে অজিত বসু এবং অসিত চৌধুরী ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন, শহর কলকাতার বাঙলা চিত্রগৃহের মালিকেরা যতদিন পর্যন্ত না তাঁদের অনমনীয় মনোভাব ত্যাগ করে সংস্থার সঙ্গে একটা সম্মানজনক বোঝাপড়ায় আসছেন, ততদিন তাঁরা দর্শকসাধারণের সানুগ্রহ সহযোগিতায় চিত্রগৃহগুলির সামনে শান্তিপূর্ণভাবে 'সত্যাগ্রহ' চালিয়ে যাবেন। এবং তাঁরা আশা করেন, এই পথেই তাঁরা শেষপর্যন্ত জয়লাভ করবেন।

কিন্তু আমরা বলি, উভয় পক্ষ একটি সম্মানজনক আপোষের মধ্যে এলেই সবদিক দিয়ে ভালো হয়। সেটা কি একেবারেই অসম্ভব?

সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় এবং তনুজা। ফটো : অমৃত

চিত্র সমালোচনা

ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড (ইংরাজী) : টমাস হার্ডির বিখ্যাত উপন্যাসের রঙীন চলচ্চিত্র সংস্করণ। এলিট সিনেমায় প্রদর্শিত হচ্ছে।

ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত সুরম্য আন্দোলিত তৃণভূমিসমন্বিত জন্মভূমি ডরসেট শায়ারকেই 'ওয়েসেক্স' এই কল্পিত নাম দিয়ে তাঁর কাহিনীর পটভূমিরূপে ব্যবহার করেছেন ভিক্টোরিয়া যুগের দরদী অথচ বিদ্রোহী লেখক টমাস হার্ডি। মানুষ হচ্ছে তার সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন নিয়তির হাতের একটি ক্রীড়নক মাত্র—এই মতবাদই ব্যক্ত হয়েছে হার্ডির বিভিন্ন উপন্যাসের মাধ্যমে। অবশ্যই হার্ডির উপন্যাসগুলিতে মানবচরিত্র ও জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে তার প্রাকৃতিক পরিবেশ—প্রকৃতিও যেন তার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, মানুষেরই মতো সেও যেন নিয়তির আঘাতকে সহ্য করতেই অভ্যস্ত। 'ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড'-এর নায়িকা বাৎশেবা যে সৈনিক ট্রয়কে ভালোবেসে বিবাহ করল, দেখা গেল, সে গ্রামবালা ফ্যানির অবৈধ সন্তানের জনক। চারিত্রিক হীনতা (কিংবা দৌর্বল্য!) প্রকাশ পাওয়ায় ট্রয় যখন নদীতে আত্মবিসর্জন দিয়েছে বলে সকলেরই ধারণা জন্মাল, তখন বাৎশেবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বোল্ডউডকে বিবাহ করতে সম্মতি দিল এবং এই বাগদান উপলক্ষেই একটি ভোজসভায় যখন সকলেই আনন্দমগ্ন তখন সেখানে আচম্বিতে আবির্ভূত হল ট্রয় এবং বাৎশেবাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে ফেরৎ চাইল। উত্তেজিত বোল্ডউড ট্রয়কে করলেন গুলী দ্বারা নিহত এবং সেই অপরাধে তাঁরও হল ফাঁসির হুকুম। বাৎশেবাকে তখন ফিরতে হল তার সেই নীরব প্রেমিক গেব্রিয়েল ওকের দিকে; যার সঙ্গে প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ হবার কথা সে একদিন উপেক্ষাভরে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল।

শহুরে সভ্যতা থেকে গ্রাম্য প্রাকৃতিক পরিবেশে বিন্যস্ত এই মন্থর আবেগময় কাহিনীটিকে পরিচালক জন স্লেসিংগার রূপেরসে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন জোসেফ জ্যানী প্রযোজিত এবং মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার নিবেদিত এই ৭০ মিলিমিটার রঙীন ছবিটির মাধ্যমে। এমন সুন্দর নয়নাভিরাম সবুজের সমারোহ আমরা কদাচিৎ কোনো চলচ্চিত্রে লক্ষ্য করেছি। শিল্পবুদ্ধিসমন্বিত ক্যামেরা উপস্থাপনা ছবিটিকে যেমন একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য দিয়েছে, তেমনি প্রধান চারটি চরিত্রে জুলি ক্রিস্টি (বাৎশেবা), পিটার ফ্রিঞ্চ (বোল্ডউড), টেরেন্স স্ট্যাম্প (সার্জেণ্ট ট্রয়) এবং অ্যালান বেটস্ (গেব্রিয়েল ওক) যে-প্রদীপ্ত, জীবন্ত অভিনয় করেছেন, তাও দর্শকচিত্তকে সম্মোহিত করে। বিশেষ করে নায়িকা চরিত্রে জুলি ক্রিস্টির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তিকে বর্ণনা দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়; এ-অভিনয় চোখে দেখে উপভোগ করতে হয়।

*

কাসানোভা "৭০" (ইংরাজী) : জোসেফ ই. লেভিন-এর নিবেদন; ৩,৪০০ মিটার দীর্ঘ এবং ১১ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : কার্লো পন্টি; পরিচালনা : মেরিও মনিচেলী; কাহিনী : টোনিনো গুয়েরা; চিত্রনাট্য : ফুরিও স্কার্পেলী, অ্যাগেনোর ইনক্রোচি ও মেরিও মনিচেলী; চিত্রগ্রহণ পরিচালনা : অ্যাল্ডো টন্টি, চিত্রগ্রহণ : লুইগি কুভেইলার; শব্দানুলেখন : এনিও সেন্সি, রূপায়ণ : মার্সেলো ম্যাস্ট্রোইয়ানি, ভার্ণা লিসি, মিচেল মার্সিয়ার, মারিসা মেল, রোজমেরী,

ডেক্সটার, সেইমা সেইন, ইয়োল্যান্ডা মোডিও, লিয়াশা অর্ফ, বেবা লোঙ্কার প্রভৃতি। গুডউইন পিকচার্স (কলিকাতা)-র পরিবেশনায় গেল ২৬ জুলাই থেকে লাইট হাউস-এ প্রদর্শিত হচ্ছে।

কার্লো পন্টির প্রতিভা অমর হোক। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শেষ অবধি একটি "শো-বিজনেস", যার একমাত্র উদ্দেশ্য অগণিত দর্শকের মনোরঞ্জন—এই নীতির প্রতি আনুগত্যে কার্লো পন্টি অভ্রান্ত। তিনি প্রতিটি ছবি তৈরী করেন একমাত্র দর্শক মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে, অথচ ফর্মুলায় বাঁধা কিংবা ছকে বাঁধা ছবি তৈরীর প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার অবধি নেই—তাঁর প্রতিটি ছবি নতুনতর পদক্ষেপের সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর শেষতম ছবি "ক্যাসানোভা ৭০"-এ এই নূতনত্বের নিদর্শন মানুষকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও হতবাক করবে।

ক্ল্যাসিক 'ক্যাসানোভা' ছিলেন একটি মূর্তিমান লাম্পট্য। কার্লো পন্টি প্রযোজিত এবং টোনিনো গুয়েরা বিরচিত আধুনিক ক্যাসানোভা-৭০-ও কি তাই? ছবি দেখবার পরে তাকে লম্পট নামে আখ্যাত করতে মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়। বেচারা ইতালীয় ন্যাটো অফিসার মেজর আঁদ্রে রোসি কোলোমবেত্তি! স্বীকার করি, সুন্দর নারীসঙ্গ লাভের অত্যুগ্র বাসনায় সে বেচারা অহরহ জর্জরিত। কিন্তু যখনই সে কোনো নারীর দিকে একপদ মাত্র অগ্রসর হয়, তখনই কি সে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে না, সেই প্রগলভা সুন্দরী তার প্রতি দ্বিগুণ বেগে ধাবমানা? এবং তখন কি প্রায়ই দেখা যায় না, বেচারা কোলোমবেত্তির যৌন-বাসনা নিদারুণ ভাবে স্তব্ধ হয়ে গেছে? তার ওপর বেচারার কি অদ্ভুত রহস্যপ্রিয়তা! যেখানে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই, সে-রকম স্থলে গোপনে নারী-সম্ভোগেও তার কোনো প্রবৃত্তি নেই। এ-হেন লম্পটকে মেয়েরা ভালো না বেসে পারে কি ক'রে?

কী আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে প্রণয়-বিলাসের চরম মুহূর্তটিতে নারীর বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে আসন্ন বিপদকে এড়িয়ে যায়! একের পর এক সে জয় করেছে দাম্ভিকা ফরাসী বান্ধবীকে, ইন্দোনেশিয় এয়ার-হোস্টেসকে, তারই সুন্দরী গৃহ-পরিচারিকাকে, স্কিক-সঙ্গিণী গিগ্‌লিওলাকে, সার্কাসের সিংহ-বশকারিণীকে, তারই সৈন্যাধ্যক্ষের স্ত্রী ডলি গ্রীনওয়াটারকে, একজন আধুনিকা কাউণ্টেসকে, বিপদ আনয়নে সক্ষমা এক রাহুর দৃষ্টি সমম্বিতা নারীকে এবং আরও অনেককে। শেষ পর্যন্ত প্রায় রণক্লান্ত অবস্থায় সে যখন পুনরায় গিগ্‌লিওলাকেই বিবাহ করে তার যৌন-অভিযানের সমাপ্তি ঘটাতে প্রস্তুত হ'ল, তখনও কিন্তু বিপদের ঝুঁকির প্রতি তার আসক্তি কাটেনি। তাই প্রথম মধুর-রজনীতেও সে সোজা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ না ক'রে বিপজ্জনকভাবে বারোতলা উঁচুতে রাস্তার ধারের কার্ণিশ বেয়ে জানলা দিয়ে প্রবেশে উদ্যত হয়ে নিজের বিবাহিত স্ত্রীকেও সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছিল।

আশ্চর্যভাবে পরিকল্পিত এই ন্যাটো অফিসারের চরিত্র এবং আশ্চর্যভাবে গাঁথা তার যৌন অভিযানগুলি প্রতি পদে বিপদের ছোঁয়াচ লাগানো, হাসির ফুলঝুরিওলা প্রতিটি যৌন-অভিযানের অধ্যায় দর্শক-মনকে রাখে মন্ত্রমুগ্ধ। অথচ মজা এই, ছবির কোনোখানটিতে এমন কোনো ঢিলে গাঁথুনি নেই, যাতে বিভিন্ন অধ্যায়কে বিচ্ছিন্ন ব'লে মনে হবে।

এবং আশ্চর্যভাবে জীবন্ত রূপায়িত করেছেন এই কোলোমবেত্তি চরিত্রটিকে মার্সেলো ম্যাস্ত্রোইয়ানি তাঁর অসাধারণ নাট-নৈপুণ্য দ্বারা। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি নারী-চরিত্রও জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। এবং মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসক রূপে এনরিকো মারিয়া সালের্ণোও সার্থক অভিনয় করেছেন। বিরাট পটভূমিকায় প্রস্তুত এই রঙীন "ক্যাসানোভা-৭০" প্রযোজক কার্লো পন্টির একটি অবিস্মরণীয় অবদানরূপে চিহ্নিত হবে।

—নান্দীকর

দেশী ছবির খবর

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'আরোগ্য নিকেতন'-এর চলচ্চিত্রায়ন করেছেন পরিচালক বিজয় বসু। ছবিটি বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। ছবিতে অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী, জহর গাঙ্গুলী, কালী সরকার, বঙ্কিম ঘোষ এবং দিলীপ রায়। আরোরা ফিল্ম পরিবেশিত এ ছবির সুর-সৃষ্টি করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'জীবনসংগীত' ছবিটি বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। এ ছবিটি পরিচালনা করেছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকৃত এ ছবির চরিত্রলিপিতে অংশগ্রহণ করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়,

দি প্রোটাগনিস্ট—ফন্দাতোর নতুন ছবি।

সন্ধ্যা রায়, **কালী** বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, অনুপকুমার, **মীণা ঘোষ**, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গংগাপদ বসু, শোভা সেন, শেখর চট্টোপাধ্যায়, **বঙ্কিম** ঘোষ, অসীম চক্রবর্তী, **তমাল বাহিড়ী ও মিতা** সেনগুপ্ত। চন্ডীমাতা ফিল্মস **ছবিটির** পরিবেশক।

আশাপূর্ণা দেবী রচিত **'বালুচরী'** **ছবিটির** পরিবেশক হলেন অজিত গাংগুলী। কার্তিক বর্মন প্রযোজিত রাধারাণী পিকচার্সের এ ছবিতে অভিনয় করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, **লিলি** চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, মলিনা দেবী, গংগাপদ বসু, জহর রায়, অজয় **গাংগুলী** এবং স্বর্গত রেণুকা রায়। **নর্মদা চিত্র ছবিটির** পরিবেশক।

উমাপ্রসাদ মৈত্র পরিচালিত **সরস্বতী** চিত্রম সংস্থার **'রক্তরেখা'** ছবিটি বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষায় রয়েছে। এ ছবিতে রূপদান **করেছেন বিজয়া চৌধুরী** (বম্বে), শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, **ললিতা** চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নিরঞ্জন রায় ও দ্বিজু ভাওয়াল। নচিকেতা ঘোষ ছবিটির সংগীত পরিচালক।

পরিচালক মণি ভট্টাচার্য যে হিন্দী ছবিটির কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন সেটির নাম হল **'বাজী'**। সম্প্রতি এ **ছবিটির** একটানা দৃশ্যগ্রহণ শেষ **হল মোহন** স্টুডিওয়। টনি ওয়াকর প্রযোজিত এ ছবিতে অভিনয় করছেন ওয়াহিদা রেহমান, ধর্মেন্দ্র, হেলেন, নাজির হুসেন, চাঁদ ওসমানি ও জনি ওয়াকর। সংগীতপরিচালনা করেছেন **কল্যাণজী**-আনন্দজী।

সুবোধ মুখার্জি প্রোডাকসন্সের ইস্টম্যান কলারে রঞ্জিত **গীতিবহুল** সামাজিক ছবি "শাগির্দ" আজ **শুক্রবার ২রা** আগষ্ট সোসাইটি সহ শহর ও **শহরতলীর ২৬টি** চিত্রগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ **করবে**। গেল **শুক্রবার** বোম্বাইয়ে **এই ছবি** রজত-জয়ন্তী সপ্তাহ উদযাপন করে। **ছবিখানি** পরিচালনা **করেছেন** সমীর **গাংগুলী**। সুরযোজনা **করেছেন লক্ষ্মীকান্ত** প্যারেলাল। ছবিখানির প্রধান চরিত্রে আছেন জয় মুখার্জি, সায়রাবানু, আই এস জোহর, নাজির হোসেন, অচলা সচদেব, মদনপুরী ও নবাগতা উর্বশী দত্ত প্রভৃতি।

বিদেশী ছবির খবর

নতুন ছবি 'দি প্রোটাগনিস্ট'

গ্রীষ্মের শেষে সার্দিনিয়ার এক হোটেলে এসেছে একদল লোক, ক'টা দিন হৈ-হুল্লোড় আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাতে চায় তারা। যুবক রবার্ট ওদের দলে ভিড়ে এক নতুন মজা করার প্ল্যান তাদেরকে জানায়। ক্যান্ডিড নামে এক ডাকাত ধরার জন্য সে অভিযান চালাতে চায়, তাদেরকে সে তার সংগী হতে বলে। ওদের মধ্যে থেকে কার্লো, নানি, নিনো আর গ্র্যাবিয়েল্লা এগিয়ে আসে রবার্টের সংগে অভিযানে যেতে। ত্যাদিউর সংগে দেখা করতে গিয়ে তারা পাঁচজন অনেক আশাতীত অবস্থার সম্মুখীন হয়। হেলিকপ্টারে প্রহারবস্থায় ত্যাদিউর সংগে যখন তাদের দেখা হয় তারা লক্ষ্য করে ত্যাদিউর সংগে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের পার্থক্য বড় কম। ডাকাতের সংস্পর্শে এসে পাঁচজনের বাইরের খোলস খুলে পড়ে, ভেতরের রূপটা বেরিয়ে আসে। নিজেদের ভেতরের অন্তঃসারশূন্যতার

কথা বুঝতে পেরে ত্যাদিউর সেই পরিবেশে নিজেদের ঠিক মেলাতে পারে না। আবার সমাজে তারা ফিরে আসে। কিন্তু ডাকাতের ওপর প্রতিশোধ স্পৃহা তাদের কমে না। সর্বশেষে ঘটনা বিন্যাস এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় যেখানে এই পাঁচজনের আত্মবিশ্বাস হারানোর ঘটনা—আর অপর দিকে এদের সার্থকতার পরিচয় পর্দায় ভেসে ওঠে। শেষ হয় ছবি।

মার্সেল্লো ফনদাতোর প্রথম কাহিনীচিত্র এটা। চিত্রনাট্যও ফনদাতোর। বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন জাঁ সোরেল, সিলভা কোসিনা, পামেলা টিফিন, লুও কাস্তেল, লুইগি পিস্তিল্লি ও অন্যান্যরা। ছবির কাহিনীতে মাঝে মাঝে অতিনাটকীয়তার চড়া সুর থাকলেও ফনদাতোর হাতে তা চরম পর্যায়ে ওঠেনি। রবার্টের চরিত্রে কিছুমাত্রায় অ্যানার্কিজমের সুর শোনা গেলেও তা মোটামুটি দৃষ্টিকটু নয়। ফনদাতোর প্রথম ছবি হিসাবে নিঃসন্দেহে সুন্দর যাত্রা বলতে হয়।

রুনেল্লো রোনদির 'দি লাভারস' নাটক অবলম্বনে ভিত্তোরিও ডি সিকা ঐ একই নামে যে ছবিটার কাজ শেষ করে ফেললেন তার প্রধান দুটি চরিত্রে আছেন মার্সেল্লো মাস্ত্রোয়ানি আর ফে ডনওয়ে। ও ছবি শেষ হবার সংগে সংগে তিনি নতুন ছবি 'জিওভন্না'র কাজ শুরু করবেন। মহাযুদ্ধের সময় স্ত্রী সংবাদ পায় স্বামী তার নিরুদ্দেশ। স্ত্রী জিওভন্না তখন রওনা হয় রাশিয়ার উদ্দেশে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর খোঁজে। মস্কোতে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখে পরে জিওভন্না। সিজার জাভাত্তিনি ও এম্রিও দ্য কর্নাসিনি চিত্রনাট্যায়িত এ ছবির প্রধান দুই চরিত্রে থাকছেন সোফিয়া লোরেন ও মার্সেল্লো মাস্ত্রোয়ানি।

মঞ্চাভিনয়

মাকড়সা

যে সব অভিনেতা অভিনেত্রী রুপোলী পর্দার বুকে আমাদের অনুভবকে কখনো আনন্দের কলরোলে জাগরিত করেন, আবার কখনো কান্নার আলোড়নে বেদনার্ত করে তোলেন, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের কোষে কোষে জমা থাকে অনেক বিষাদ, আর বেদনার দীর্ঘশ্বাস। শ্রীরামপুরের 'উদয় সংঘ' প্রযোজিত ও বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচিত 'মাকড়সা' নাটকের পটভূমিতে রয়েছে এই করুন সত্যের বিস্তার। চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত তিনজনের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতার ধূসরতাকেই নাট্যকার এই নাটকে স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন।

সংঘবদ্ধ অভিনয়ে শিল্পীরা আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অভিনয় করতে পেরেছেন বলেই নাটকের গতি মোটামুটি অক্ষুন্ন থেকেছে বলা যেতে পারে। প্রদ্যোৎশংকর দাশগুপ্ত চিত্র পরিচালক 'ভুজঙ্গ' চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যের নজির রেখেছেন, তাঁর স্পষ্ট স্বরক্ষেপণ ও নিয়ন্ত্রিত গতিবিধি দর্শককে মুগ্ধ করেছে। নায়িকা অরুণার ভূমিকায় আশ্চর্য সুন্দর অভিনয় করেছেন তৃপ্তি দাস; সহকারী পরিচালক 'নিখিল' চরিত্রে সার্থকভাবে রূপ দিয়েছেন বিভূতি মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা হোলেন—সুনীলকুমার দাস, শীতল চক্রবর্তী, সুনীলকুমার সরকার, শৈলেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, সুনীলকুমার ঘোষ, শিবনাথ নাথ, সতীশ দাস, স্বরাজ মুখোপাধ্যায়, বীরেন মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ দাস, সুশীলকুমার দাস, মদনমোহন সরকার।

বেনজ্যু

মানবিকতার স্নিগ্ধমধুর আবেদন বার বার নির্মম কঠোর সামরিক আইনের কাছে পরাভব স্বীকার করে, অতল প্রাণের চিরন্তন আকুলতা হয় বিপর্যস্ত। এই মর্মান্তিক সত্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে রমেন লাহিড়ীর 'বেনজ্যু'; সম্প্রতি 'রঙ্গশ্রী' নাট্যগোষ্ঠী সাফল্যের সংগে এই নাটকটির অভিনয় করেছেন।

যৌবনের সীমাহীন উন্মত্ততায় একদিন সৈনিকের খাতায় নাম লিখিয়েছিল বেনজ্যু। সরল, স্বাভাবিক ছন্দে বয়ে যাওয়া জীবন থেকে নিজেকে ছিন্ন করে রণক্ষেত্রের প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে এসে হয়তো বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু যতই দিন এগিয়ে যেতে থাকলো, ততই তার মন হোল ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত অন্তর জুড়ে তখন ভাসতে থাকলো তার মা, বাবা, স্ত্রী ইন্দুর ছবি। রণক্ষেত্রের ভীষণতা, পরাজিত সৈনিকের মর্মভেদী চিৎকার বেনজুকে প্রায় পাগল করে তুললো। পালাতে চেষ্টা করলো তার সেই ছায়াঘেরা পল্লীপ্রকৃতির মাঝখানে ছোট্ট

কুটিরটির সীমায়। কিন্তু বেনজু কি মায়া, মমতাঘেরা সংসারের মধ্যে আবার নিজেকে বিলীন করে দিতে পারলো? না। যুদ্ধের নির্মমতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার বিচার হোল, নির্মম মৃত্যুদন্ডকেই নতমস্তকে স্বীকার করে নিলো বেনজু।

'রঙ্গশ্রী'র শিল্পীগোষ্ঠী আন্তরিকভাবে এই নাটকের মঞ্চরূপায়ণের চেষ্টা করেছেন। প্রায় প্রতিটি শিল্পীর অভিনয়েই স্বাচ্ছন্দ ও প্রাণের স্পর্শ ছিল। বেনজু চরিত্রের সরলতা ও কারুণ্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত করেছেন নাট্যকার পরিচালক রমেন লাহিড়ী। ক্যাপ্টেন শর্মা'র চরিত্রে নিশীথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রশংসার দাবী রাখে। শিশির চট্টোপাধ্যায় ও সর্বাণী দে যথাক্রমে 'ফাদার' ও 'ইন্দু' চরিত্রে প্রাণ আনতে পেরেছেন। অন্যান্য চরিত্রে মোটামুটি অভিনয় করেছেন—গোপাল ঘোষ, প্রণব সিংহ, সত্য চট্টোপাধ্যায়, কেষ্ট দাস, শুভেন্দু সিংহ, সুভাষ শ্রীমানী, অজয় চট্টোপাধ্যায়, নিতাই গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সূর্য দাস।

'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকের বিশিষ্ট চরিত্রের রূপায়ণে

আবহসংগীতে অরুণ দাস মোটামুটি প্রত্যাশিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। নাটকের শেষ দিকের স্বপনদৃশ্যে বিশ্বনাথ পাল আলোকসম্পাতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

মানময়ী গার্লস স্কুল

সম্প্রতি সি, পি, ডব্লু ডি এম্প্লয়িজ ইনস্টিটিউটের মহিলা কর্মীবৃন্দ রবীন্দ্র-সরোবর প্যাভেলিয়নে 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকটি অভিনয় করলেন। নাট্য নির্দেশনায় ছিলেন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় চরিত্রানুগ অভিনয় করে —নীলিমা মুখোপাধ্যায় (মানস), ভারতী পাল (নীহারিকা), পারুল সরকার (দামোদর), অনিমা মুখোপাধ্যায় (হারা নিধি), আরতি বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজেন) পারুল পোদ্দার (মানময়ী), লক্ষ্মী কর্মকার (বাণী), রেখা দত্ত (মি ফার্ণান্ডেজ), রত্না গুপ্তা (চপলা), রেখা হালদার (রাজুর মা), উষা দে (বৈকুণ্ঠ সরকার)।

কল্লোল-এর নাটকাভিনয়

গত ৬ই জুলাই শনিবার বরাহনগর 'কল্লোল' গোষ্ঠীর বাৎসরিক মিলনোৎসব অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী' নৃত্যনাট্য হৃদয়গ্রাহী হয়। নৃত্য-পরিচালনা ও রাধা ভূমিকায় ছিলেন শ্রীমতী রেখা চ্যাটার্জি। অন্যান্য চরিত্রে সুনৃত্যের পরিচয় দেন শ্রীমতী আরতি মল্লিক, দীপা দাশগুপ্তা, রূপালী দত্ত ও নন্দিতা দত্ত। সঙ্গীত পরিচালনায় দেবব্রত মল্লিক ও কণ্ঠদানে শ্রীমতী মিনতি মুখার্জি, ডলি মৈত্র, ছবি সেন, মায়া সেন ও লক্ষ্মী দাশগুপ্তা। গ্রন্থনা পাঠে শ্রীবিজয় মৈত্র ও যন্ত্রসংগীতে সর্বশ্রী সমর দত্ত, প্রশান্ত মন্ডল, বিশ্বনাথ সিংহ, শিবনাথ দাস, গোপাল দত্ত ও অরুণ দাস। সমগ্র নাটকটি পরিচালনা করেন ও কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্রীমতী রেবা রায়। এছাড়া দীপক ভট্টাচার্যের পরিচালনায় পৃথ্বীশ সরকারের 'লবণাক্ত' পূর্ণাঙ্গ নাটকটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী অশ্রু মুখার্জি, সত্যেশ মজুমদার, রামেশ রায়, অরুণ সেন, শিশির ঘোষ, প্রলয় ঘোষ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, দীপক ভট্টাচার্য, ... মৈত্র, তপন পাল, শ্যামল চ্যাটার্জি, রতন মুখার্জি, গোপাল ব্যানার্জি, সনৎ রায়, অমল দত্ত, বিপুল চ্যাটার্জি, রবীন দে ও গোপাল মিত্র। স্ত্রী চরিত্রে শ্রীমতী নীলিমা চক্রবর্তী মীরা আইচ ও কল্যাণী দাস, দলগত অভিনয় দর্শকবৃন্দকে ভীষণরূপে আকৃষ্ট করে।

'শেষ বিচার' ও 'শিবির'

মেরী ব্রাইট বয়েজ সোসাইটির শিল্পীবৃন্দ এবার দুটো একাংক নাটক নিয়ে প্রস্তুত হোচ্ছেন, তা হোল রতন ঘোষ রচিত 'শেষ বিচার' ও 'শিবির'। জানা গেছে এ মাসের শেষ সপ্তাহে এ নাটক দুটি মঞ্চস্থ হবে হাওড়া ই, আর রঙ্গমঞ্চে।

'মানবতার খাতিরে' ও 'কেয়াকুঞ্জ'

প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা 'শুভময়' ১১ জুলাই সন্ধ্যায় মুক্ত অঙ্গনে পরিবেশন করছেন দুটি একাংকিকা। নাটক দুটির নাম হোল চিত্ত ঘোষাল রচিত 'মানবতার খাতিরে' ও রুপারট ব্রুকের 'লিথুয়ানিয়া' অবলম্বনে বিভূতি মুখোপাধ্যায় অনূদিত 'কেয়াকুঞ্জ'। নাট্য নির্দেশনায় রয়েছেন জ্যোতিপ্রকাশ।।

সুবোধ মুখার্জি প্রোডাকসনের শার্গিদ চিত্রে সায়রা বানু

বিবিধ সংবাদ

একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা

২১ জুলাই সন্ধ্যায় ডোভার রোডের সেই সুবৃহৎ চত্বরবিশিষ্ট বাড়ীটি বিদ্যুতালোকিত মন্ডপে তোরণে যে আশ্চর্য ভাবে ঝলমলিয়ে উঠেছিল, তার স্মৃতি মনের মণিকোঠায় ধরা থাকবে অনেকদিন। এই সন্ধ্যায় বাঙলার চলচ্চিত্র জগতের পরিচালক, সঙ্গীত-পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, কলা-কুশলী, চিত্র-সাংবাদিক, প্রযোজক, পরিবেশক প্রভৃতির যে অভাবনীয় সমাবেশ ঐ বাড়ীটিতে ঘটেছিল, তেমনটি বোধহয় কচিৎই হয়েছে! নতুন পুরোনো—কেউই আসতে বাকী রাখেননি। এই প্রীতি অনুষ্ঠানটিকে একটি বিশেষ মর্যাদায় মণ্ডিত করেছিল এবং আনন্দে অংশগ্রহণের জন্যে স্বয়ং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের সানুগ্রহ উপস্থিতি একদিকে দেবকী বসু, কানন দেবী, অপরদিকে সত্যজিৎ রায়, সুপ্রিয়া দেবী, মাধবী মুখোপাধ্যায়। উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ, সৌমিত্র, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়—কে বা কোন্ মহারথী, রথী থেকে শুরু ক'রে পদাতিক পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত হননি? হ্যাঁ দেখিনি বটে সুচিত্রা সেন, অজিত বসু এবং অসিত চৌধুরীকে। এ'রা হয় বিশেষ ব্যস্ত, নয় অসুস্থ ছিলেন ব'লে অনুমান করা হয়েছিল। এই বিরাট সমাবেশের উপলক্ষের কথাটিই বলা হয়নি। না, কোনো বিবাহ অনুষ্ঠান নয়, পূর্বকৃত বিবাহের স্মারক অনুষ্ঠান ছিল এটি। এবং এই বিবাহ হয়েছে পরিচালক তরুণ মজুমদারের সঙ্গে অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়ের। বাঙলা দেশে এমন ধারা বিবাহ এর আগে কখনও হয়েছে ব'লে আমাদের জানা নেই। আমরা তরুণ-সন্ধ্যার সুখী দাম্পত্য জীবন কামনা করি এবং কামনা করি, এ'রা দুজনে নতুন চিত্র ও চরিত্র সৃষ্টি করে বাঙলার অগণিত চিত্রামোদীদের দীর্ঘকাল ধরে আনন্দ দেবেন।

যোগী যাদুকর মৃণাল রায়ের 'মায়া-মহল'

সম্প্রতি রঙমহলে যোগী-যাদুকর মৃণাল রায়ের "মায়া-মহল" মঞ্চস্থ হয়। বিশ্বের সর্বপ্রথম ও একমাত্র যাদু-নাটক 'মায়া-মহলে'র মাধ্যমে শ্রীরায় সংগীত, নৃত্য যাদু-কৌশল ও মূকাভিনয়ের সমন্বয়ে এক অভিনব শিল্পকলা সৃষ্টি করে দর্শকদের অভিভূত করেন। এই নাটকে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী রমেশ মজুমদার, সুনীল দাস, সুনীল ব্যানার্জি, রঙ্গলাল মন্ডল, প্রবীর রায়, তরুণ সেনশর্মা, রীতা মজুমদার, মিনা রাহা, পুষ্প দাঁ, শ্যামলী দাস, সুস্মিতা চ্যাটার্জি, কাবেরী মুখার্জি স্বপ্না মুখার্জি ও মৃণাল রায়।

এই অনুষ্ঠানে আরো আকর্ষণীয় ছিল শ্রুতিধরী রমা রায়ের অবিশ্বাস্য "স্মৃতি-পাঠ"।

সব পেয়েছির আসর

আগামী ৩ আগস্ট শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০টায় সব পেয়েছির আসরের ২৩তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শিল্পী জপমালা ঘোষ, পূর্ণ দাস (বাউল), মঞ্জু দাস ছোটদের গান শোনাবেন। যাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়ার) যাদু-বিদ্যা প্রদর্শন করবেন। আসরের সোনার-কাঠিরা স্বপনবুড়ো রচিত "নীলপাখী" নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করবে।

জলসা

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের নৃত্যনাট্য

যথারীতি 'মায়ার খেলা' দিয়ে আশ্রমিক সঙ্ঘের নৃত্যনাট্যের পালা সুরু হয়। স্থান—রবীন্দ্রসদন।

নীলাভ আলো, রহস্যাবৃত বনানীর অস্পষ্ট কুহকে মায়াকুমারীদের মোহমন্দির নৃত্য—উপযুক্ত স্বপ্নাবেশ রচিত হয়। কিন্তু এমন শিল্পসুন্দর আচ্ছন্নতা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যখন অমরবেশী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে প্রবেশ করে একবার শান্তা, একবার প্রমদার প্রতি আকর্ষণের ভাবপ্রকাশ ঘটাচ্ছিলেন উন্মাদের মত—গতি-বিধি, চাউনি ও আস্ফালনের দ্বারা। মায়ার খেলা কবির নিজের ভাষায় 'নাট্যের সূত্রে গানের মালা—হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ।'

এই নৃত্যনাট্যে গানের ভূমিকাই মুখ্য এবং এই গানগুলির প্রতি কবির দুর্বলতা পরিণত বয়স অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল। হয়ত সেই জন্যই রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয় শিল্পীদের প্রতি এই গীতিনাট্যের চরিত্র-চিত্রণের দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে। শুধু যদি শ্রবণ-নির্ভর নাট্য হোত, তাহলে এই নির্বাচন হয়ত মায়ার খেলার রসসৃষ্টিতে অসমর্থ হোত না। কিন্তু শ্রাব্য-শিল্পের সঙ্গে যেখানে দৃশ্যবস্তু ঘনিষ্ট-সংশ্লিষ্ট যেখানে দৃষ্টিকে পীড়িত করে, বিষয়বস্তুকে মর্মগোচর করা সহজ নয়। যদিও বা করা যায়, তা আংশিকভাবে এবং অনেকখানি রসের অপচয় ঘটিয়ে। এখানেও তাই হয়েছে।

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ত সুগায়ক, কিন্তু অভিনয়ে বিশেষ আত্মহারা প্রেমিকের ভূমিকায় একেবারেই অচল। এখানে তাঁকে মঞ্চে উপস্থিত করে তাঁর সঙ্গীতখ্যাতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণই করা হয়েছে। বরং অন্তরাল-সঙ্গীতে তাঁর অবদান সীমিত রাখলেই তাঁর প্রতি সুবিচার করা হোত।

প্রমদার ভূমিকায় গীতা সেনের অভিনয়ও যে দর্শকদের মুগ্ধ করতে পেরেছে, তা নয়। তবে তাঁর কণ্ঠ গায়নশৈলী বিশেষ টপ্পা অঙ্গে পরিবেশিত কয়েকটি গান অভিনয়ের ত্রুটিকে অতিক্রম করেও মনকে স্পর্শ করেছে।

অভিনয় এবং সঙ্গীত-পরিবেশন উভয় দিক বিচারে আমাদের খুসী করেছেন শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র।

মায়াকুমারীদের নৃত্য সত্যিই উপভোগ্য। এজন্য অনেকখানি কৃতিত্ব প্রাপ্য নৃত্যরচয়িতা পূর্ণিমা ঘোষের।

তাসের দেশ সুপরিবেশিত।

বাল্মিকী প্রতিভা অভিনয়, সঙ্গীত নৃত্য সকল দিক থেকেই পরিচ্ছন্ন সুন্দর। এখানে অশোকতরুর অভিনয় অনেক মার্জিত এবং গানগুলিও সুগীত। বিশেষ উল্লেখের দাবীরাখে দস্যুদলের স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত নৃত্য ও ভাবপ্রকাশ। কথাকলি ও সাঁওতালী-নৃত্যের মিলনে ব্যাধবৃন্দের নৃত্যরচনা ও নৃত্যকুশলতা খুবই উচ্চাঙ্গের।

সকল দিক বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে 'ভানুসিংহের পদাবলী'। বিদ্যাপতির পদাবলী ও অন্যান্য পদকর্তা-রচিত পদসাহিত্যের সঙ্গীত-ছন্দিত ধ্বনিবৈভব কিশোর রবীন্দ্রনাথের চিত্তে যে মুগ্ধতার সৃষ্টি করেছিল তারই ফলশ্রুতি ভানুসিংহের পদাবলী।

শ্রীরাধিকার অন্তরাকুতি, মিলন-বিহ্বলতা, বিরহ-বেদনা, প্রতীক্ষার অধিরতা পূর্ণিমা ঘোষের নৃত্যে চিত্রসৌন্দর্যে রূপপরি-গৃহীত। মণিপুরী অঙ্গে রচিত নৃত্য যেন পুষ্পগুচ্ছের মত মঞ্জরিত হয়ে, ভাবময়ী শ্রীরাধার তন্মুখী ভক্তি ও প্রেমকে লীলায়িত মাধুর্যে পরিব্যাপ্ত করেছে। মণিপুরীর সুললিত পদক্ষেপ, কমনীয় দেহবিন্যাস, বিচিত্র ভাবের রূপান্তর শুধু তাঁর নৃত্য-কুশলতা নয়, শিল্পী-মনটিকেও ব্যক্ত করেছে।

দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত ও ইন্দ্রাণী দেবরায়ের নৃত্যাভিনয় চিত্তাকর্ষী। কিন্তু অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে কেউই তেমন উল্লেখযোগ্য দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারেননি।

মিউজিক সার্কেলের আসন্ন সঙ্গীতোৎসব

মাত্র এক বছরের হলেও কলকাতা মিউজিক সার্কেল পরিবেশনার অভিনবত্বে রসিক শ্রোতাদের সাগ্রহ সমর্থন পেয়েছে। গত বছর রবীন্দ্রসদনে মাত্র দু'দিনের অনুষ্ঠান (৩০ জুন এবং ১ জুলাই) সুনির্বাচিত কয়েকজন শিল্পীকে উপস্থিত করে শ্রোতা ও সমালোচকবৃন্দের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এবার ১৯ থেকে ২১ জুলাই অবধি ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে মধ্যরাত্রি-কালীন অনুষ্ঠান ছাড়াও ২১ জুলাই সকাল ১০-৪৫ থেকে বেলা ২টো অবধি এক প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। শিল্পীরা হলেন কণ্ঠসংগীতে কুমার-গন্ধর্ব (দেওয়াস), বেনারসের সিদ্ধেশ্বরী দেবী, পণ্ডিত যশরাজ, হাফেজ আমেদ ও এম আর গোতম। যন্ত্রসংগীতে দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ-বাদক পলঘাট মানি। চিত্তবাবুর দক্ষিণ ভারতীয় বীণ, বেহালায় বসন্ত রানাডে (মাদ্রাজ) ও কিষণ মহারাজ। বহুদিন বাদে বেনারসের সুবিখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী বিরজু মহারাজকে কিষণ মহারাজের তবলাসঙ্গতসহযোগে মঞ্চে দেখা যাবে। স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে আছেন রাধিকামোহন মৈত্র (সরোদ) ও বলরাম পাঠক (সেতার)।

পণ্ডিত মণিরামের সাফল্যমণ্ডিত বিদেশ সফর

সম্প্রতি এক সার্থক সাংস্কৃতিক সফর সেরে দেশে ফিরে এসেছেন মেওয়াতী ঘরানার প্রবীণ শিল্পী পণ্ডিত মণিরাম। পণ্ডিত ভাতোয়াদ্‌কার এবং ইস্টার্ন আর্ট প্রোডাকশনের মিঃ হরিশের আমন্ত্রণে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব দেশে যাত্রা করেন। ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়া এবং কাছাকাছি আরো কয়েক জায়গায় তাঁর কণ্ঠসংগীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সব জায়গাতেই তাঁর আন্তরিক সাধনা ও ভারতীয় রাগ-সংগীতের আধ্যাত্মিক শুচিতা বিদেশী শ্রোতাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন লাভ করেছে। তবলায় ছিলেন পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র।

সেতার শিল্পী শ্যামাদাস চক্রবর্তী

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান ও পণ্ডিত রবিশংকরের ছাত্র শ্রীশ্যামাদাস চক্রবর্তী আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত সাত মাস ধরে ঐ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও জনসাধারণের আসরে সেতার বাজনা পরিবেশন করে সম্প্রতি দেশে ফিরে এসেছেন। কাজকর্মের ও পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে সংগীত সাধনা করেছেন ও করে চলেছেন। নানা আসরে এবং বেতারেও তিনি বাজিয়েছেন। পেশাদার শিল্পী তিনি নন।

পিসকোরের উদ্যোগে ও আমন্ত্রণে শ্যামাদাস আমেরিকার ৪০টি অঙ্গরাজ্যের বড় বড় শহরে মোট ৬০টি অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে এসেছেন। ডেভিসের ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক বিনিময় অনুসারে তাঁর এই সফরের ব্যবস্থা হয়েছিল।

সে সবের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলা যেতে পারে নিউইয়র্কের কার্ণেগী হলের রাজধানী ওয়াশিংটনের করকম গ্যালারীতে এবং সিয়াটলের ইগলস অডিটোরিয়ামের অনুষ্ঠান।

১৯৭০ সনে অন্ততঃ দেড় বছরের জন্য আবার আমেরিকায় আসার জন্য তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এই আমন্ত্রণ ও অভিনন্দন প্রসঙ্গে শিল্পী শ্যামাদাস বলেছেন, "গঙ্গাধারার মতো ভারতীয় সঙ্গীতের এই কল্লোলাবী স্রোত ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীজনেরা, আমার গুরু শ্রীরবিশংকর দেশ বিদেশে প্রবাহিত করেছেন—এ অভিনন্দন তাঁদেরই। ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে তিনি আমেরিকার ছাত্র সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে বিপুল আগ্রহ দেখে এসেছেন।

পণ্ডিত কানাই দত্ত প্রসাদের ছাত্র শ্রীনবকুমার পাল শ্যামাদাসের সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করেন।

—চিত্রাঙ্গদা

কাউড্রের আউটে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের মাথা থেকে দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেল—তাই উল্লাস (ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ৫ম টেস্ট, ওভাল, ১৯৬১)

কাউড্রের ১০০ টেস্ট ম্যাচ

ক্ষেত্রনাথ রায়

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে মাইকেল কলিন কাউড্রে একজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়। গত জুলাই মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এজবাস্টনের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে তিনি তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ১০০টি টেস্ট ম্যাচ খেলার দুর্লভ সম্মান লাভ করেন। টেস্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসে অনেক খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করেছেন, কিন্তু ১০০ টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলার নজির একমাত্র কাউড্রেরই। পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড ছিল ইংল্যান্ডের গডফ্রে ইভান্সের ৯১টি টেস্ট ম্যাচ। কলিন কাউড্রে টেস্ট ক্রিকেটে আরও ৩টি বিশ্ব রেকর্ড করেছেনঃ ১৯৫৭ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে বার্মিংহামে পিটার মে-র সহযোগিতায় ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ৪১১ রান, ১৯৬২-৬৩ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েলিংটনে এ্যালেন স্মিথের সঙ্গে অসমাপ্ত ৯ম উইকেটের জুটিতে ১৬৩ রান (এ রেকর্ড ১৯৬৭ সালে ভেঙ্গে গেছে) এবং ১১২টি ক্যাচ। কাউড্রের ১০০টি টেস্ট খেলায় মোট রান সংখ্যা উঠেছে ৭০৪৪ (১৬৫ ইনিংসে। তাঁর টেস্টের এই এই মোট রানের মাথায় আছে একমাত্র ইংল্যান্ডের ওয়াল্টার হ্যামন্ডের ৭২৪৯ রান। এ পর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেটে এই দুজন খেলোয়াড় ৭০০০ রান সংগ্রহ করেছেন। বর্তমানে কাউড্রে টেস্ট ক্রিকেটের এই দুটি বিশ্ব রেকর্ডের নিকটবর্তী হয়েছেন—হ্যামন্ডের ৭২৪৯ রান (১৪০ ইনিংসে) এবং স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের ২৯টি সেঞ্চুরী (৮০ ইনিংসে)। কাউড্রের টেস্ট সেঞ্চুরী ২১টি (১৬৫ ইনিংসে)।

টেস্টে কাউড্রে যা পারেন নি

কাউড্রে এখনও টেস্টের এক সিরিজে মোট ৬০০ রান, একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী এবং এক ইনিংসের খেলায় ৩০০ রান করতে পারেন নি। অথচ এ সমস্ত কৃতিত্বের নজির অনেক খেলোয়াড়ের আছে। টেস্টের এক সিরিজে কাউড্রের ব্যক্তিগত মোট রানের রেকর্ড ৫৩৪ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ১৯৬৮ সালের সিরিজ)। মাত্র ৩ রানের জন্যে তিনি একবার টেস্টের একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার সুযোগ নষ্ট করেন (১১৪ ও ৯৭—বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কিংস্টন, ১৯৬০)। আর যেখানে ৯ জন খেলোয়াড় এক ইনিংসে ১০-বার ট্রিপল সেঞ্চুরী করেছেন সেখানে এক ইনিংসের খেলায় কাউড্রের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ১৮৬ (বিপক্ষে পাকিস্তান, ওভাল, ১৯৬২)।

১৯৫৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্রিসবেন মাঠে কাউড্রে তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে ৪০ রান করেন। আর তিনি যে শক্তিশালী ব্যাটসম্যান তার প্রমাণ দেন মেলবোর্নের তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে। দলের বাঘা বাঘা খেলোয়াড়—এডরিচ, মে, হাটন, কম্পটন প্রভৃতি মাঠে খেলতে নেমে পত্রপাঠ বিদায় নিয়েছেন। চার উইকেট পড়ে দলের রান মাত্র ৪১—খেলার এই সঙ্কট অবস্থায় নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় কাউড্রে খেলতে নেমে শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের মুখরক্ষা করলেন। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ১৯১ রানের মধ্যে কাউড্রে একাই ১০২ রান করেছিলেন। দস্তুরমত একজন পাকা খেলোয়াড়ের ভঙ্গীতে তিনি তাঁর প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী করে সকলকে অবাক করেন। তাঁর বয়স তখন সবে ২২ বছর।

মেলবোর্নের এই তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত ১২৮ রানে জয়ী হয়ে ২-১ খেলায় অগ্রগামী হয় এবং রাবার জয় করে। কাউড্রের প্রথম টেস্ট সিরিজে মোট রান উঠেছিল ৩১৯ (ইনিংস ৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১০২ এবং গড় ৩৫-৪৪)।

কলিন কাউড্রে বিনয়ী, ধীর-স্থির এবং খুব আমুদে প্রকৃতির মানুষ। এক কথায় বিশিষ্ট ভদ্রজন। আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলায় খেলোয়াড়ের চোখ-মুখ এবং দৈহিক চাল-চলনে যে স্বাভাবিক উত্তেজনা চোখে পড়ে কাউড্রের খেলায় তা পাওয়া যায় না। তিনি কেতাবী ঢংয়ে ক্রিকেট খেলেন—তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার মত করে। তাঁর পরিচ্ছন্ন নিখুঁত খেলা খুবই উপভোগ্য। সময় সম্বন্ধে তাঁর কি পাকা জ্ঞান! গালি এবং স্লিপে তাঁর জুড়ি নেই।

খুব ভাল মানুষের জীবনে যে সব অসুবিধা ঘটে থাকে, কাউড্রে তাঁর খেলোয়াড়-জীবনে তার থেকে রেহাই পাননি। তিনি দীর্ঘ পাঁচ বছর ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক পিটার মে-র সহকারী ছিলেন। মে-র অবসর গ্রহণের পর কাউড্রেরই পাকাপাকি ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক হওয়ার কথা। কিন্তু কাউড্রে সম্পর্কে নির্বাচকমন্ডলীর একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাঁর মত অতি ভাল মানুষ দিয়ে ইংল্যান্ড দল পরিচালনা করা সম্ভব নয়। একাধিকবার তাঁকে দলের অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাউড্রের প্রথম ইংল্যান্ড দল পরিচালনা—ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৫৯ সালের টেস্ট সিরিজের ৪র্থ এবং ৫ম টেস্ট খেলা। এই দুই খেলাতেই ইংল্যান্ড যথাক্রমে ১৭১ রান এবং এক ইনিংস ও ২৭ রানে জয়ী হয়। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৮ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কাউড্রে ১৫-বার ইংল্যান্ড দলের নেতৃত্ব করেন—এক সিরিজের পাঁচটা খেলা পরিচালনা করেন মাত্র ১-বার—১৯৬০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। কাউড্রের নেতৃত্বে এই সিরিজে ইংল্যান্ড ৩—০ খেলায় (ড্র ২) রাবার জয়ী হয়েছিল। পিটার মে-র টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের পর কলিন কাউড্রে (কেন্ট), টেড ডেক্সটার (সাসেক্স), এম জে কে স্মিথ (ওয়ারউইকশায়ার) এবং ব্রায়ান ক্লোজ (ইয়র্কশায়ার) ইংল্যান্ড দল পরিচালনা করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬৬ সালের টেস্ট সিরিজে মাইক স্মিথ ১ম টেস্ট এবং কলিন কাউড্রে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ টেস্ট পরিচালনা করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম, ৩য় ও ৪র্থ টেস্ট খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' পেয়ে যায়। সুতরাং বাকি ৫ম টেস্টের ফলাফলের গুরুত্ব খুব বেশী ছিল না। কিন্তু ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের কর্মকর্তারা তাঁদের মুখ রাখতে শেষ-পর্যন্ত মরিয়া হয়ে অবসরপ্রাপ্ত পুরনো টেস্ট খেলোয়াড় ব্রায়ান ক্লোজকে সরাসরি

টেস্ট ক্রিকেটে কাউড্রের পরিসংখ্যান

বিপক্ষে	খেলা	ইনিংস	নটআউট	মোট রান	এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান	গড়	সেঞ্চুরী
অস্ট্রেলিয়া	৩৪	৬০	৪	২১৩৫	১১৩	৩৮·১২	৫
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২১	৩৬	২	১৭৫১	১৫৪	৫১·৫০	৬
নিউজিল্যান্ড	১৭	২২	৫	১০৩৪	১২৮*	৬০·৮২	২
দঃ আফ্রিকা	১৪	২৭	১	১০২১	১৫৫	৩৯·২৩	৩
ভারতবর্ষ	৮	১১	২	৬৫৩	১৬০	৭২·৫৫	৩
পাকিস্তান	৬	৯	১	৪৫০	১৮২	৫৬·২৫	২
মোট :	১০০	১৬৫	১৫	৭০৪৪	১৮২	৪৬·৯৬	২১

* নট আউট

অধিনায়কের পদ দিয়ে দলভুক্ত করলেন। প্রায় ফাটকা খেলার মতই অবস্থা দাঁড়ায়। কাউড্রে ৫ম টেস্টে স্থান পেলেন না। ব্রায়ান ক্লোজের নেতৃত্বলাভে সংবাদপত্রগুলি কঠোর সমালোচনা করলেন। ইংল্যান্ড শেষপর্যন্ত ৫ম টেস্টে এক ইনিংস ও ৩৪ রানে জয়ী হলে ব্রায়ান ক্লোজ ইংল্যান্ডের পয়মন্ত অধিনায়ক হিসাবে রাতারাতি নাম করলেন।
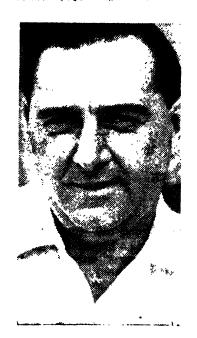
কলিন কাউড্রে (ইংল্যান্ড)

এর পর ব্রায়ান ক্লোজের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড ১৯৬৭ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে 'রাবার' জয়ী হয়। কিন্তু এহেন পয়মন্ত অধিনায়ককেও শেষ-পর্যন্ত সরে যেতে হল। ১৯৬৮ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ব্রায়ান ক্লোজ এম সি সি দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এম সি সি কমিটি ব্রায়ান ক্লোজকে দল থেকে বাদ দিয়ে কলিন কাউড্রের হাতে নেতৃত্ব ভার দেন। ইংল্যান্ড ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় (ড্র ৪) বিশ্ব ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করে যে হৃতগৌরব ফিরে পেয়েছে তা কলিন কাউড্রের দল পরিচালনার দক্ষতায় সম্ভব হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬৮ সালের প্রথম তিনটি টেস্ট খেলা ড্র যায়। পোর্ট অব স্পেনের চতুর্থ টেস্ট খেলার পঞ্চম দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স ৯২ রানের (২ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে খেলার বাকি ১৬৫ মিনিট সময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২১৫ রান তুলতে ইংল্যান্ডকে যে চ্যালেঞ্জ করেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে তার যোগ্য উত্তর দেন। খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র ৩ মিনিট আগে ইংল্যান্ড তিন উইকেটের বিনিময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২১৫ রান তুলে দিয়ে ৭ উইকেটে জয়ী হয়। সুষ্ঠু দল পরিচালনা ছাড়াও এই খেলায় কাউড্রের ব্যক্তিগত রান ছিল—প্রথম ইনিংসে ১৪৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৭১। দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে বয়কট এবং কাউড্রে ১১৮ রান তুলে জয়লাভের পথ সহজ করে দেন। ...নের ১৭৩ রানের মাথায় কাউড্রে যখন তাঁর ৭১ রান করে খেলা থেকে বিদায় নেন, তখন ইংল্যান্ডের জয়লাভের জন্যে প্রয়োজন ছিল ৪২ রানের—হাতে ছিল ৭টা উইকেট এবং ৩৫ মিনিট সময়। খেলার শেষ অর্থাৎ পঞ্চম দিনে মাত্র ১৬৫ মিনিট সময়ে বিপুল সংখ্যক ২১৫ রান তুলে টেস্ট খেলায় জয়লাভ করেছে এমন নজির দ্বিতীয় নেই। সুতরাং কাউড্রের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের এ জয়লাভ টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চল শহর বাঙ্গালোরে ১৯৩২ সালের ২৪শে ডিসেম্বর কলিন কাউড্রের জন্ম। তাঁর বাবা আর্নেস্ট কাউড্রে ক্রিকেট খেলায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁর মাইকেল কলিন কাউড্রে নাম হওয়ার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। ক্রিকেট খেলার হর্তাকর্তা-বিধাতা মেরীলিবন ক্রিকেট ক্লাব তার নামের আদ্য-অক্ষরে অর্থাৎ 'এম সি সি' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। আর্নেস্ট কাউড্রেও তাঁর ছেলের এমনভাবে না

রাখলেন যার আদ্য-অক্ষর নিলে এম সি সি দাঁড়াচ্ছে।

কলিন কাউড্রে খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় হয়ে ইংল্যান্ডের মুখোজ্জ্বল করবে—এই ছিল তাঁর পিতা আর্নেস্ট কাউড্রের জীবনের বড় সাধ। তাই এইভাবে মিলিয়ে ছেলের নাম রাখা, যাতে ছেলে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা লাভ করে।

কলিন কাউড্রের পক্ষে আজ মস্ত বেদনার কারণ যে, তাঁর এই বিশ্বখ্যাতির সময়ে পিতা জীবিত নেই। তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক। ১৯৫৪ সালের কথা। এম সি সি দল অস্ট্রেলিয়া সফরে বেরিয়ে সিংহলে ক্রিকেট ম্যাচ খেলছে। আর্নেস্ট কাউড্রে রেডিওতে খেলার ধারাবিবরণী শোনার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই সফরেই কলিন কাউড্রে এম সি সি দলে প্রথম স্থান পেয়ে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছিলেন।

কাউড্রের টেস্ট সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে—৫টি

১০২ রান মেলবোর্ন, ১৯৫৪-৫৫
১০০ রান* সিডনি, ১৯৫৮-৫৯
১১৩ রান মেলবোর্ন, ১৯৬২-৬৩
১০৪ রান মেলবোর্ন, ১৯৬৫-৬৬
১০৪ রান বার্মিংহাম, ১৯৬৮

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে—৩টি

১০১ রান কেপটাউন, ১৯৫৬-৫৭
১৫৫ রান ওভাল, ১৯৬০
১০৫ রান নটিংহাম, ১৯৬৫

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে—৬টি

১৫৪ রান বার্মিংহাম, ১৯৫৭
১৫২ রান লর্ডস, ১৯৫৭
১১৪ রান কিংস্টন, ১৯৬০
১১৯ রান পোর্ট অব স্পেন, ১৯৬০
১০১ রান কিংস্টন, ১৯৬৮
১৪৮ রান পোর্ট অব স্পেন, ১৯৬৮

ভারতবর্ষের বিপক্ষে—৩টি

১৬০ রান লিডস, ১৯৫৯
১০৭ রান কলকাতা, ১৯৬৩-৬৪
১৫১ রান দিল্লী ১৯৬৩-৬৪

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে—২টি

১২৮ রান* ওয়েলিংটন, ১৯৬২-৬৩
১১৯ রান লর্ডস, ১৯৬৫

পাকিস্তানের বিপক্ষে—২টি

১৫৯ রান বার্মিংহাম, ১৯৬২
১৮২ রান ওভাল, ১৯৬২

বিদেশে টেস্ট খেলা

অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড : ১৯৫৪-৫৫, ১৯৫৮-৫৯, ১৯৬২-৬৩ ও ১৯৬৫-৬৬ (শেষ তিনটি সফরে সহ-অধিনায়ক)

দক্ষিণ আফ্রিকা : ১৯৫৬-৫৭

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ১৯৫৯-৬০ (সহ-অধিনায়ক) এবং ১৯৬৮ (অধিনায়ক)

ভারতবর্ষ : ১৯৬৩-৬৪ (এই সফরে তিনিই এম সি সি দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন; কিন্তু হাতের আঘাতের দরুন সফরে যেতে অক্ষমতা জানান। শেষ পর্যন্ত জরুরী বার্তা পেয়ে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার পর ভারতবর্ষে আসেন এবং দলের সহ-অধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন)

কলিন কাউড্রের দর্শনীয় 'লেটকাট'

কাউড্রের বিশ্ব রেকর্ড

সর্বাধিক ক্যাচ : ১১২টি (১০০টি খেলায়)
পূর্ব রেকর্ড : ১১০টি (৮৫টি খেলায়) —ওয়াল্টার হ্যামন্ড

সর্বাধিক টেস্ট খেলা : ১০০টি

৪র্থ উইকেটের জুটিতে ৪১১ রান : পিটার মে এবং কলিন কাউড্রে, বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বার্মিংহাম, ১৯৫৭ (আজও এই বিশ্ব রেকর্ড অক্ষুন্ন আছে)

৯ম উইকেটের জুটিতে ১৬৩ রান : কলিন কাউড্রে এবং এ্যালান স্মিথ, বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, ওয়েলিংটন, ১৯৬২-৬৩ (১৯৬৭ সালের আগস্টে এই বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে গেছে)

কাউড্রের নেতৃত্ব

কাউড্রে তাঁর ১০০টি টেস্ট ক্রিকেট খেলার সূত্রে যে ২৩টি খেলায় ইংল্যান্ড দলের নেতৃত্ব করেন তার ফলাফল : ইংল্যান্ডের জয় ৭ বার, পরাজয় ৪ বার এবং খেলা ড্র ১২ বার।

খেলার ফলাফল

১৯৫৯ (বিপক্ষে ভারতবর্ষ) :
৪র্থ টেস্ট : ইংল্যান্ড ১৭১ রানে জয়ী
৫ম টেস্ট : ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ২৭ রানে জয়ী

১৯৫৯-৬০ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ) :
৪র্থ টেস্ট : অমীমাংসিত
৫ম টেস্ট : অমীমাংসিত

১৯৬০ (বিপক্ষে দঃ আফ্রিকা) :
১ম টেস্ট : ইংল্যান্ড ১০০ রানে জয়ী
২য় টেস্ট : ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ৭৩ রানে জয়ী
৩য় টেস্ট : ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী
৪র্থ টেস্ট : অমীমাংসিত
৫ম টেস্ট : অমীমাংসিত

১৯৬১ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া) :
১ম টেস্ট : অমীমাংসিত
২য় টেস্ট : ইংল্যান্ড ৫ উইকেটে পরাজিত

টসে জয় : উপরের এগারটি টেস্ট খেলায় কাউড্রে ১০ বার টসে জয়ী হন—উপর্যুপরি জয় ৯ বার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯৬০ সালের টেস্ট সিরিজের ৫টি খেলাতেই কাউড্রে টসে জয়ী হন—টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এরকম জয়ের নজির আছে মাত্র ৮টি।

১৯৬২ (বিপক্ষে পাকিস্তান) :
৩য় টেস্ট : ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ১১৭ রানে জয়ী

১৯৬৬ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ) :
২য় টেস্ট : অমীমাংসিত
৩য় টেস্ট : ইংল্যান্ড ১৩৯ রানে পরাজিত
৪র্থ টেস্ট : ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ৫৫ রানে পরাজিত

১৯৬৮ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ) :
১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম টেস্ট : অমীমাংসিত
৪র্থ টেস্ট : ইংল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী

১৯৬৮ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া) :
১ম টেস্ট : ইংল্যান্ড ১৫৯ রানে পরাজিত।
২য় ও ৩য় টেস্ট : অমীমাংসিত

বৃটেনের মাইক ক্যাম্বেল হাইজাম্পে ৬ ফিট ৭ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম করছেন।

খেলাধূলা

দর্শক
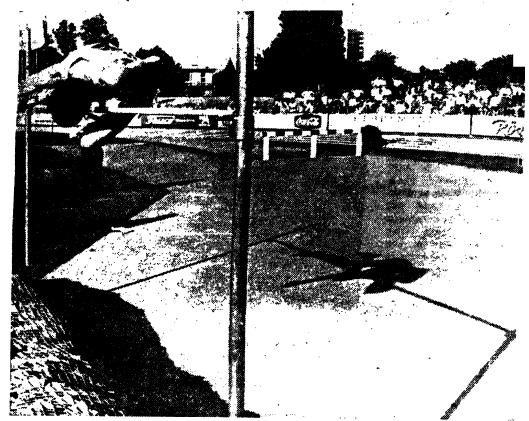
অলিম্পিক প্রসঙ্গ

মেক্সিকোর ১৯তম অলিম্পিক গেমসের আসর বসতে আর বেশী দেরী নেই। আনুষ্ঠানিকভাবে এই অলিম্পিক গেমসের আসর বসবে আগামী ১২ই অক্টোবর। ভারতবর্ষের অলিম্পিক হকি দল গঠনের পালা শেষ হয়েছে। কিন্তু খেলাধূলার অন্যান্য বিষয়ে দল গঠন সম্ভব হয়নি। দল গঠনের ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠি নিয়ে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার সঙ্গে নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রকের মতবিরোধ বেঁধে গেছে। অর্থাৎ মাপকাঠি নিয়ে দুই দলের দড়ি টানাটানির খেলা—দড়ির একদিকে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা এবং অপরদিকে নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক। ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণের প্রশ্নে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা এবং নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদ একমত হতে পারেননি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক এ ব্যাপারে নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের নির্ধারিত নীতি সমর্থন করে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের নীতি অনুযায়ী দল গঠন না হলে তাঁরা মেক্সিকো যাওয়ার ছাড়পত্র মঞ্জুর করবেন না। এদিকে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা দাবী করেছেন, তাঁরাই বিভিন্ন দলের খেলোয়াড় নির্বাচনের একমাত্র অধিকারী। দল গঠনের ন্যূনতম যোগতা সম্পর্কে তাঁরা যে মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা থেকে তাঁরা এক চুল এদিক-ওদিক করতে রাজী নন। মেক্সিকোতে ভারতীয় অলিম্পিক দল পাঠাতে প্রায় **৬ লক্ষ** টাকা ব্যয় হবে। ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা স্থির করেছেন, টাকার ব্যাপারে তাঁরা আর কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রক বা নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের দরজায় ধরনা দিবেন না, ব্যয়ের সমস্ত টাকা তাঁরা নিজেরাই সংগ্রহ করবেন।

খুব উত্তম কথা। কিন্তু ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার কাছে একটি প্রশ্ন আছে—যে-ব্যাপারে জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত, সেখানে তাঁরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক, নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদ এবং জনসাধারণের সঙ্গে একমত হবেন না কেন? উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জনের পর তবে অলিম্পিক গেমসে যোগদান—জাতীয় মর্যাদার প্রশ্নে জনসাধারণের এই সিদ্ধান্তই যোগ্যতার এক-মাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত।

অলিম্পিক ভারতীয় হকি

আগামী অক্টোবর মাসে মে[illegible] শহরে ১৯তম অলিম্পিক গেমসে[illegible] বসছে। সারা পৃথিবীব্যাপী তাই সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। এই ১৮ জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতী[illegible] দল গঠন করা হয়েছে।

নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

গোলরক্ষক : আর ক্রিস্টি (মহী[illegible]) মুনীর শেঠ (মাদ্রাজ)

ব্যাক : পৃথিপাল সিং (পাঞ্জাব), [illegible] সিং (বাংলা) এবং ধর্ম[illegible] (পাঞ্জাব)

হ্যাফ ব্যাক : বলবীর সিং (সা[illegible]), জগজিৎ সিং (পাঞ্জাব), অ[illegible] সিং (পাঞ্জাব), হারমিক সিং ([illegible]) এবং কৃষ্ণমূর্তি (রেলওয়ে)।

ফরোয়ার্ড : বলবীর সিং (রেলও[illegible]) জে পিটার (সার্ভিসেস), হর[illegible] সিং (রেলওয়ে), ইন্দর সিং (রেলও[illegible]) তারসেম সিং (পাঞ্জাব), ইনাম[illegible] রহমান (বাংলা), বলবীর [illegible] (পাঞ্জাব) এবং গুরবক্স [illegible] (রেলওয়ে)।

নির্বাচিত ১৮ জন খেলোয়াড়ের ম[illegible] পাঞ্জাবের ৭ জন, রেল দলের ৩ [illegible] সামরিক দলের ২ জন, বাংলার ২ [illegible] মহীশূরের ১ জন এবং মাদ্রাজের ১ জন

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।